

১০ ১৪৭৫-৪৬-৮ ৩০/৫৬
প্রবাসী, ৫২শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৫৯

মূচীপত্র

বৈশাখ-আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

756

মার চক্রবর্তী	শ্রীকৃষ্ণবিহারী পাল	...	১৮১
মুনী ভরিয়া জলে (কবিতা)	—ফরাদী রমায়নবিদ্‌ গে লুসাক	...	১৮১
গোখামী	শ্রীকুন্ডরাম ভট্টাচার্য	...	১৮৪
দুখের স্বর্ণাধারা (সচিত্র)	—একা (কবিতা)	...	১৮৪
হেবঃসহস্রবৃক্ষে ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ	শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক	...	২১৩
শিয়ার পুনর্গঠন : নতন জাপানের	—অমল্য সভাতা (কবিতা)	...	২১৩
রকর উন্নতি	—জন্মান্তর সম্রতি (ঐ)	...	২১৩
ভট্টাচার্য	—বঙ্গী (ঐ)	...	২১৪
রঞ্জনী (কবিতা)	—দরদী দরিত্র (ঐ)	...	২১৭
বির দত্ত	—স্থপতি (ঐ)	...	২১৭
কঃ হেথা ছিল যারা (কবিতা)	শ্রীকোহিনুরকান্তি করণ	...	২৪২
র রতি (ঐ)	—নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা	...	২৪২
বস্তু	শ্রীকৃষ্ণপ্রভা ভাট্ট	...	২৪২
র এক জীবন (কবিতা)	—অবিস্মরণীয় (কবিতা)	...	২৪২
সন	—আশ্রয় তিন দিন (সচিত্র)	...	২৪৭
বর অধিকার	—শারদোৎসব (কবিতা)	...	২৪৭
মুখোপাধ্যায়	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৪৭
কি-রামায়ণে রামচরিত্র	—সুরেন্দ্রনাথ (কবিতা)	...	২৪৭
চক্রবর্তী	শ্রীগীতা মিত্র ও আর. ডি. মিত্র	...	২৪৭
বেদ (কবিতা)	—অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কৌশল	...	২৪৭
ভট্টাচার্য	শ্রীগোপাললাল দে	...	২৪৭
সান্তরযোগ্য ভোট	—কবি-প্রশস্তি (কবিতা)	...	২৪৭
টাল	—কল্যাণী (ঐ)	...	২৪৭
জ্ঞানাসা (কবিতা)	—রবীন্দ্রনাথের বর্ধাকাব্য	...	২৪৭
(ঐ)	শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৪৭
বাগিচা	—স্বরলিপি	...	২৪৭
নব রবীন্দ্রনাথ	শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়	...	২৪৭
চৌধুরী	—অনামিকা (কবিতা)	...	২৪৭
মুতি : আদি ব্রাহ্মসমাজ	চারুচন্দ্র দত্ত	...	২৪৭
বসন্ত	—একটি পুরানো প্রেমের কাহিনী (গল্প)	...	২৪৭
বসন্ত (গল্প)	শ্রীদ্বিজেন চক্রবর্তী	...	২৪৭
ন কাশ্মিরগো	—“পূজাপার্বণ” (সমালোচনা)	...	২৪৭
দা দারাস্তকো	—সুভারস	...	২৪৭
ন	শ্রীচিন্ময়ী পাঠক	...	২৪৭
নদী	—রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু	...	২৪৭
স্বপ্নবনে আবিষ্কৃত কয়েকটি শৈবমূর্তি (সচিত্র)	—সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি	...	২৪৭
ক গ্রন্থে ভারতের আদিম মানব প্রসঙ্গ	শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়	...	২৪৭
র আহ্বান (কবিতা)	—কি ছিল, কি হ'ল ? (উপস্থাপন)	১৯২, ২১৫, ৩৩১,	
উদ্দেশ্য (ঐ)		৪৮০, ৫১১, ৭২৭	

শ্রীজীবনরায়	...	৭০৫	শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	৭০৫
—বিশুদ্ধ ও শব্দ (কবিতা)	...	৭০৫	—নির্দীপে (কবিতা)	...	৭০৫
শ্রীজ্যোতির্শ্রী দেবী	...	৭০৬	শ্রীনির্মলকুমার রায়	...	৭০৬
—হিন্দু কোড়ি বিল	...	৭০৬	—চিত্রা (গল্প)	...	৭০৬
শ্রীজ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায়	...	৮৬৮	শ্রীনীলরতন দাশ	...	৮৬৮
—মায়ের বাথ (কবিতা)	...	৮৬৮	—এবার পূজা অশ্রু-গঙ্গাজলে (কবিতা)	...	৮৬৮
শ্রীতমস বাগচী	...	১১৭	—শিক্ষা-নীতি ও জনগণ	...	১১৭
—যাত্ৰিক সভ্যতার পরিণতি (অনুদিত গল্প)	...	১১৭	শ্রীনীলিমা দত্ত	...	১১৭
শ্রীতপতী গোস্বামী	...	২২৭	—ফেলে আসা দিনগুলি মোর (কবিতা)	...	২২৭
—সাধারণ মানুষ (সচিত্র)	...	২২৭	শ্রীনীহারকান্তি বোধি দত্তদার	...	২২৭
শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৭১২	—দুপুর বিকেল হয় (কবিতা)	...	৭১২
—কবিগুরু 'চিত্রা' কাব্যে রূপলোক ও ভাবলোক	...	৭১২	শ্রীপকানন রায়	...	৭১২
শ্রীতারামসর চট্টোপাধ্যায়	...	৩৩৬	—একটি দিনের স্থিতি	...	৩৩৬
—ষাপিক (কবিতা)	...	৩৩৬	—কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ (সচিত্র)	...	৩৩৬
শ্রীত্রিষ্ম বাগচী	...	৩২৪	—ফিমাতি সন্ধান (ঐ)	...	৩২৪
—রবীন্দ্রকাব্যে ছন্দোমুক্তি	...	৩২৪	শ্রীপ্রকৃতিরঞ্জন বড়ার	...	৩২৪
দাদা ধর্মাবিকারী	...	৮৩	—বাংলা বানান ও উচ্চারণ	...	৮৩
—সর্বোদয়ের দৃষ্টি	...	৮৩	শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস	...	৮৩
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	...	৩৪৫	—সিহুদী শব্দের উৎপত্তি	...	৩৪৫
—চিরবিলুপ্ত গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়	...	৩৪৫	শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত	...	৩৪৫
—ভুরগুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ	...	৩৪৫	—কাজ ও অকাজ	...	৩৪৫
—“হুগলী জেলার ইতিহাস” (সমালোচনা)	...	৩৪৫	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	৩৪৫
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	১২২, ৩১১, ৪৫৫, ৫৬১	৬০৭	—অহিংসা	...	৬০৭
—পাড়াগাঁয়ের কথা	...	৬০৭	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	...	৬০৭
—বর্তমানের চাষ-বাস (সচিত্র)	...	৬০৭	—ছিন্নশত্রের রবীন্দ্রনাথ	...	৬০৭
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাশ	...	৬০৭	—তাহারি অমর (কবিতা)	...	৬০৭
—বাংলার ঐতিহাসিক পুতানা (কবিতা)	...	৬০৭	—ভাদরে (ঐ)	...	৬০৭
শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়	...	৭১	—রামানন্দ-পরিচয়	...	৭১
—শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সচিত্র)	...	৭১	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য	...	৭১
শ্রীনীলগোপাল চক্রবর্তী	...	৬২২	—প্রাকৃত না জানিলে সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা হয় না	...	৬২২
—নন্দশ্রবাজন	...	৬২২	—রবীন্দ্র-সংলাপ-কথিকা	...	৬২২
শ্রীনীলমোহন চৌধুরী	৪২, ১৫৪, ৩০০, ৪৬১, ৫২০, ৭৩৮	৬৭৩	—সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি	...	৬৭৩
—দেবানন্দ (উপস্থাপন)	...	৬৭৩	শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত	...	৬৭৩
শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	৬০১	—দর্শনের দিগ্‌দর্শন	...	৬০১
—কবিতীর্থে (সচিত্র)	...	৬০১	শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত	...	৬০১
—হাকিজ (কবিতা)	...	৬০১	—চশমা (গল্প)	...	৬০১
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু	...	৫৮	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	৫৮
—ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার নতুন ভবন (সচিত্র)	...	৫৮	—ঠানদিদি (গল্প)	...	৫৮
শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়	...	১৭৩	—হাসির অশ্রু (গল্প)	...	১৭৩
—চ-বাগানের শ্রমিক জীবনের আর্থিক তথ্য	...	১৭৩	শ্রীবিমলানন্দ শাসমল	...	১৭৩
শ্রীনগিনীকুমার ভদ্র	...	৩৪	—সমাধি-সৈকত (কবিতা)	...	৩৪
—বরাহক্ষেত্রে (সচিত্র)	...	৩৪	শ্রীবিষ্ণুভট্টাচার্য	...	৩৪
—মাকিন যন্ত্রাঙ্কে ভরণ ছাত্রদের “আলোচনী” (সচিত্র)	...	১৪৪	—ভারতের সামাজিক সমস্যার এক দিক	...	১৪৪
—মুক্তি-সাধনার পথে অন্ধ দেশ (সচিত্র)	...	২২৪	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	...	২২৪
—রোগবিস্তারের জন্ত আপনিই দায়ী	...	৪৮২	—ফের আগুন (কবিতা)	...	৪৮২
—হেলসিন্ফি (সচিত্র)	...	১০১	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়	...	১০১
শ্রীললিতাভূষণ দাশগুপ্ত	...	৪৭২	—হারজিৎ (গল্প)	...	৪৭২
—প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (সচিত্র)	...	৪৭২	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ ও শ্রীঅন্নাসাহেব সহস্রবুদ্ধে	...	৪৭২
—প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়	...	৬৬৮	—এশিয়ার পুনর্গঠন : নতুন জাপানের বিশ্বায়ক উন্নতি	...	৬৬৮
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র	...	৬৬৮		...	৬৬৮
—মানবশিশুর রহস্য	...	৬৬৮		...	৬৬৮

পাণ্ডায়		শ্রীশিরচন্দ্র বসু	
জী (কবিতা)	... ১৭২	—পঞ্চম (গল্প)	... ২৮৭
হুন (ঐ)	... ২৮০	শ্রীশৈলি নন্দী	
ণে (ঐ)	... ৪২২	—সেন্ট মরিস (সচিত্র)	... ৭২৩
মুখোপাধ্যায়		শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	
স্বপ্নাথের জীবন-দেবতা তত্ত্ব	... ৪৩৭	—অভিনন্দন (কবিতা)	... ৪৬
ইন রায়		—গানের জাগরণ (ঐ)	... ৬৮৬
শব্দের উচ্চারণ	... ৪৩২	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	
র চৌধুরী		—নামের অসম্মান	... ২২৭
ডুমুর জাল (গল্প)	... ১২০	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ	
হন দত্ত		—ঋষি	... ৭০৪
পাতিক প্রতিনিধিত্ব	... ২৩৯	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
র নাম	... ৭৫২	—সেবাশ্রম	... ১৮৬
মান উদ্বাস্ত সম্বন্ধে কিছু তথ্য	... ১০৬	শ্রীশোভনা নন্দী	
রকার		—অবলা বহু	... ২৩৬
লার সমাজ-জীবন—সম্পদ	... ১৭১	শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	
র পাল		—পশ্চিমবঙ্গ বন্দনা (কবিতা)	... ২৮৬
রাজ পৃথ্বীরাজের মহাবীকুল	... ৬৫২	—বঙ্গ-হৃন্দর (ঐ)	... ৭২২
র বাগল		শ্রীসত্যভূষণ দত্ত	
ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের প্রায়কথা	... ২২০	—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে পল্লীকন্মার স্মৃতিকথা	... ১২৭
নাথ রায়চৌধুরী (সচিত্র)	... ৮৮	শ্রীসত্যদর্শ বহু	
বিচ্ছালনের কথা	... ৪২৩	—অক্ষরকর্তৃকালীন (কবিতা)	... ৪৬০
ঐ পরিণতি	... ৭৪৯	শ্রীসাদনা কর	
ঐ প্রথম বৎসর	... ৩৬১	—বাতি-দান (গল্প)	... ৬০২
ট্টাচার্য		শ্রীসাদনা চট্টোপাধ্যায়	
দীপা	... ৬৮৭	—ধনুফোটি ও রামেশ্বর (সচিত্র)	... ২০১
র দত্ত		—শ্রীরতন (ঐ)	... ৪১৯
গ্রাম সেবাশ্রমের গ্রামোন্নয়ন	... ৪৮৫	শ্রীসাহানা দেবী	
র সেন		—রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	... ৮০
ট করণ মুহূর্ত্ত (গল্প)	... ২৩১	শ্রীহরিকৃতকুমার মুখোপাধ্যায়	
ঘোষ		—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দুইখানি পত্র	... ৫৫৫
সিডি' কাদের প্রভু	... ৫৭৩	—পাণ্ডুরোধনাথদান	... ৪৪৯
বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীহরিশঙ্করবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	
শ কবি আলীরাঙ্গা	... ৩৬৯	—ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকা : প্রবাসী ভারতীয়	
বহু		সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ	... ৬১
বখাড়া	... ১৭	শ্রীহরিশঙ্করমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
খোপাধ্যায়		—মুঘল অন্তঃপুরে অসমীয়া রাজকুমারী	... ৫৮৩
মাষ্টার (গল্প)	... ৬৯৩	শ্রীহরীন্দ্রনাথ রায়	
তাম্রি (ঐ)	... ২৮	—আন্তর্জাতিক সন্ধির বাধ্যবাধকতা	... ৩৬৬
ন্যোপাধ্যায়		শ্রীহরীন্দ্রনাথ গুপ্ত	
চার (বড় গল্প)	৪০৯, ৫৪০, ৬৮১	—লীলা (কবিতা)	... ৪২৭
র চক্রবর্তী		শ্রীহরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
ল (কবিতা)	... ৫৬২	—পূর্বপাকিস্তানের একটি আদর্শ পল্লীর অতীত চিত্র (সচিত্র)	১৬২
দাশগুপ্ত		শ্রীহরীন্দ্রনাথ রাহা	
বহু ও মনোব্যবস্থা	... ১৮০	—এক রাত্রির স্মৃতি (গল্প)	... ৪৪২
দাশ		—চৌধুরী মশাই (ঐ)	... ৯০
দীন (কবিতা)	... ৪৪১	শ্রীহরীন্দ্রনাথ বহু	
দত্ত		—কবি মোহিতলাল	... ৫২৭
দীন (গল্প)	... ৪২৪	শ্রীহরীন্দ্রনাথ লাহিড়ী	
দাশ		—শুকুনো গোলাপ (কবিতা)	... ৫৫৩
দর বহির্বর্ণাঙ্গ—১৯৫১-৫২	... ৫৮৫		

শ্রীহুম্মরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

—শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-স্থান (সচিত্র)

—শুঙ্গেরী (ঐ)

শ্রীহরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

—বাংলাভাষীদের সম্পর্কে দু'একটি কথা

শ্রীহরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার

—সিন্ধা জালন্দরনাথ ও রাজা গোপীচাঁদ

শ্রীহনীলকুমার গুপ্ত

—রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে (কবিতা)

শ্রীহনীলচন্দ্র ঘোষ

—বাংলা ও বাঙালী

শ্রীহরিশ্রী শেঠ

—আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব-প্রসঙ্গে শিক্ষার কথা

—শিক্ষা-বিষয়ে বেতারের কার্যকারিতা

শ্রীহিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

—“পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস” (সমালোচনা)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

—ওন্দারমাঠ

বিষয়-সূচী

অনামিকা (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

অন্তর্ভুক্তিকালীন (কবিতা)—শ্রীসত্যানন্দ বসু

অদৃশ্য শব্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কৌশল

—শ্রীগীতা মিত্র ও আর. ডি. মিত্র

অবলা বসু—শ্রীশোভনা নন্দী

অবিস্মরণীয় (কবিতা)—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

অভিনন্দন (ঐ)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অর্থব্যবস্থা ও মনোব্যবস্থা—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অসম্ভা সভ্যতা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অহিংসা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আগের রজনী (কবিতা)—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আগ্রায় তিন দিন (সচিত্র)—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দুইখানি পত্র—

শ্রীহজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আদিগঙ্গা নদী—শ্রীকালিদাস দত্ত

আনুপাতিক প্রতিনিষিদ্ধ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব-প্রসঙ্গে শিক্ষার কথা—

শ্রীহরিশ্রী শেঠ

আন্তর্জাতিক সন্ধির বাধ্যবাধকতা—শ্রীহনীলচন্দ্র রায়

আর এক জীবন (কবিতা)—শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

আলোচনা—

ঋষি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

এক রাত্রির স্মৃতি (গল্প)—শ্রীহরীচন্দ্র রাহা

একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট—শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য

একটি করণ মুহূর্ত্ত (গল্প)—শ্রীরণজিৎকুমার সেন

একটি দিনের স্মৃতি—শ্রীপঞ্চানন রায়

একটি পুরানো প্রেমের কাহিনী (গল্প)—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

একা (কবিতা)—শ্রীকুড়ুমার ভট্টাচার্য্য

এবার পূজা অক্ষর গঙ্গাজলে (কবিতা)—শ্রীনীলরতন দাশ

এশিয়ায় পুনর্গঠন : নতুন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি—

শ্রীঅন্নাসাহেব সহস্রবুদ্ধে ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

ওন্দারমাঠ—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

কবিগুরুর ‘চিত্রা’ কাব্যে রূপলোক ও ভাবলোক—

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিত্ত্বের ‘চিত্রা’ কাব্যে রূপলোক ও ভাবলোক—

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিত্ত্বের ‘চিত্রা’ কাব্যে রূপলোক ও ভাবলোক—

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

... ২৫

... ৪৬০

... ৪২২

... ২৩৬

... ২২৮

... ৪৮

... ১৮০

... ২১৩

... ৪২৬

... ৪১৮

... ৩৩৭

... ৫৫৫

... ৪৩

... ২৩০

... ২২০

... ৫৬৬

... ১৪৩

... ২৪২

... ১০৪

... ৪৪২

... ১০৪

... ২০১

... ১২৬

... ১০৭

... ৩৪৪

... ১৩২

... ৩১৮, ৪৫৬, ৬২০

... ৪২০

... ১১২

... ৬৭৩

কবি-প্রশান্তি (কবিতা)—শ্রীগোপাললাল দে

কবি মোহিতলাল—শ্রীহনীলকুমার বসু

কলা ও শিল্প মহাবিভাগের জন্মকথা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ (সচিত্র)—

শ্রীপঞ্চানন রায়

কল্যাণী (কবিতা)—শ্রীগোপাললাল দে

কাজ ও অকাজ—শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত

কাল হেথা ছিল যারা (কবিতা)—শ্রীঅমরকুমার দত্ত

কি ছিল, কি হ'ল ? (উপস্থাপন)—

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১০২, ২১৪, ৩৩১, ৪৮০

গানের জাগরণ (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

গান্ধীগ্রাম সেবাশ্রমের গ্রামোন্নয়ন—শ্রীরঞ্জনকুমার দত্ত

গান্ধীজী (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণ পদ্যোপাধ্যায়

গ্রামের নাম—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

চশমা (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

চা-বাগানের অমিক জীবনের আর্থিক তথ্য—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

চিত্রচোর (বড় গল্প)—শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রা (গল্প)—শ্রীনির্মলকুমার রায়

চিত্রবিলুপ্ত দোড়ার বৈষ্ণব সম্প্রদায়—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

চৌধুরী মশাই (গল্প)—শ্রীহরীচন্দ্র রাহা

ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জন্মান্তর সঙ্গতি (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জাগরণ-রাত্রি (কবিতা)—শ্রীঅমরকুমার দত্ত

জীবন-জিজ্ঞাসা (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সাইখাল

জীবন-বেদ (কবিতা)—শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্তী

জীবনযাত্রা—শ্রীরাজশেখর বসু

ঝগড়া (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ঝাড়পুণ্ডের বর্ণাধারা (সচিত্র)—শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

ঝিনুক ও শব্দ (কবিতা)—শ্রীজীবনময় রায়

ঠানদিদি (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তাহারা অমর (কবিতা)—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দরদী দরিদ্র (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দর্পণ-বিসর্জন (গল্প)—শ্রীকমল সরকার

দরবেশ কবি আলীরাজা—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শনের দিগদর্শন—শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত

হর (কবিতা)—শ্রীনাথরাস্ত্রি বোধ দস্তিদার ...	৬১৮	ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকা : প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ—	...	৬১
গীতাংশ—		শ্রীহৃৎকৃষ্ণবিল মুখোপাধ্যায়	...	৬১
রাস-চৌধুরী ... ৪২, ১৫৪, ৩০০, ৪৬১, ৫২০, ৭০৮		ভাদরে (কবিতা)—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	...	৬৮০
কথা (সচিত্র)— ১২৪, ২৫২, ৩৮১, ৫১১, ৬০৯, ৭৫৬		ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার নূতন ভবন (সচিত্র)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু	...	৫৮
মেষধর (সচিত্র)—শ্রীসামনা চট্টোপাধ্যায়	...	২০১		৫৮৫
শ্রীহৃৎকৃষ্ণ চৌধুরী	...	৫৮৭		২৮১
শ্রীনরীণোগোপাল চক্রবর্তী	...	৬২২		৫৩৫
ন (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	...	২১৭		২৪৪
টি আদিম দেবতা (আলোচনা)—				৩৫২
পুরকাস্তি করণ	...	২৪২		১১০
শ্রীনিখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	১৭৬		৬৬৮
শ্রীআশুতোষ সান্তাল	...	৭০৬		৪০
শ্রীশিশিরচন্দ্র বসু	...	২৮৭		৪৬৮
শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	...	২৮৬		১৭৭
শ্রীআবিষ্কৃত কয়েকটি-শৈবমূর্তি (সচিত্র)—				৪২৪
সি দত্ত	...	৩২১		১৭৪
দান—শ্রীহজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	...	৪৪২		১০৬
ধা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	১০৯, ৩১১, ৪৫৫, ৫৬১			১১৭
নর ইতিহাস (সমালোচনা)—				২০
বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬৭৩		৬৬
১১২, ২৪৬, ৩৭৭, ৫০৭, ৬০৩, ৭৬২				৮০
সমালোচনা)—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	...	৩৭৫		৪০৬
নর একটি আদর্শ পল্লীর অতীত চিত্র (সচিত্র)—				৪৩৭
বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৬২		৪৬৯
হ ভারতের আদিম মানব-প্রসঙ্গ—				১২৭
সি দত্ত	...	৫৭৯		২২৪
নিলে সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা হর না—				২৮০
ধর ভট্টাচার্য	...	৬৬		৪২৭
শ্রীশিক্ষায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (সচিত্র)—				৬২৩
ভূষণ দাশগুপ্ত	...	১০১		১১
শ্রীশিক্ষায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়—				৬৮৭
ভূষণ দাশগুপ্ত	...	৪৭২		৬৯২
বিবি গেলুসাক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী পাল	...	৫৮১		৪০৭
কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	...	৫৬৮		৪৩৭
দিলগুলি মোর (কবিতা)—শ্রীনীলমী দত্ত	...	২২৬		৪২৭
কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	...	৭২২		৬২৩
বাস (সচিত্র)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	...	৬০৭		১১
সচিত্র)—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র	...	৩৪		৬৮৭
শ্রীলী—				১২৭
শ্রীঘোষ	৯৬, ২০৮, ৩৪৮, ৪৫৮			২২৪
ও উচ্চারণ—শ্রীপ্রকৃতিরঞ্জন বড়ুয়া	...	২২৪		২২৪
উচ্চারণ—শ্রীমেনোজমোহন রায়	...	৪৩২		২৮০
রাজপুতানা (কবিতা)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাশ	...	৩০৭		৪২৭
জ-জীবন—সম্পদ—শ্রীব্রহ্মনাথ সরকার	...	১৭১		৬২৩
রত্ন চারুকলা শিল্পের উদ্বোধন (সচিত্র)—	...	১০০		১১
শ্রীসামনা কর	...	৬০২		৬৮৭
শ্রীরামচন্দ্র—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়	...	২৮৪		৬৯২
সম্পর্কে দু'একটি কথা—শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	...	১৬৮		৪০৭
১, ১২২, ২৫৭, ৩৮৫, ৫১৩, ৬৪১				৪২৭
দান (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায়	...	৩৩		১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১১
				৬৮৭
				৬৯২
				৪০৭
				৪২৭
				৬২৩
				১

শ্রাবণে (কবিতা)—শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়
 শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-স্থান (সচিত্র)—
 শ্রীহরিশচন্দ্র বিজ্ঞানবিদ্যাবিদ
 শ্রীরত্ন (সচিত্র)—শ্রীস্বদেশ চট্টোপাধ্যায়
 সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য
 সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি—শ্রীচন্দ্রী পাঠক
 সন্ধান (গল্প)—শ্রীঅম্বুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
 সমাধান (কবিতা)—শ্রীশান্তীলাল দাশ
 সমাধি-সৈকত (ঐ)—শ্রীবিমলানন্দ শাস্ত্রী
 সাধারণ মানুষ (সচিত্র)—শ্রীভূপতি গোস্বামী
 'সাবসিডি' কাদের জন্ত?—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
 সালতামামি (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
 শোভা জালন্দরনাথ ও রাজা গোপীচাঁদ—
 শ্রীহরিশচন্দ্র নাথ-মজুমদার
 হৃৎকণ্ঠের উদ্দেশ্যে (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায়
 হরেন্দ্রনাথ (কবিতা)—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

২২২ সেকালের দ্বিতী : আদি ব্রাহ্মসমাজ—
 শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
 ২৬৩ সেন্ট মরিস (সচিত্র)—শ্রীশেফালী নন্দী
 ২১৯ সেবাগ্রাম—শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
 ১২২ স্থপতি (কবিতা)—শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক
 ২০৭ স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল
 ৩২৬ ঐ—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
 ২৪১ স্বাপ্নিক (কবিতা)—শ্রীভারতীশ্বর চট্টোপাধ্যায়
 ২৪৩ হাফিজ (ঐ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব
 ২২৭ হারজিৎ (গল্প)—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়
 ২৭৩ হাসির অশ্রু (ঐ)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
 ২৮ হিন্দু কোড বিল—শ্রীজ্যোতির্দয়ী দেবী
 ৩২৮ হিমাজি সন্ধান (সচিত্র)—শ্রীপঞ্চানন রায়
 ১৮৯ "ছদ্মলী জেলার ইতিহাস" (সমালোচনা)—
 ২৭৮ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
 হেলসিন্কে (সচিত্র)—শ্রীন লিনীকুমার ভট্ট

বিবিধ প্রসঙ্গ

অনধীন ভারতরাষ্ট্র
 অন্নদাশঙ্কর রায়ের নূতন সাহিত্য
 অপরাধ-নিবারণ আটক বিল
 আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও স্বর্ণ পরিস্থিতি
 আর্থ সমিতি (বেংগাল)
 আসাম রেল লিকে জরুরি রেল-চলাচল
 ইউরোপীয় কয়লা এবং লৌহ-শিল্প সমস্যা
 ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দলিল ও নন্দকুমার
 উড়িষ্যার অবস্থা
 উড়িষ্যার বাহ্য পরিচয়
 উদ্বাস্ত কাহারা?
 উদ্বাস্ত প্রসঙ্গ
 উদ্বাস্ত সম্পত্তির সমস্যা
 "এই শান্তি আলোচন"
 "একতাবোধই জাতীয়তাবাদের আসল বিনিময়"
 কর্মচারীদের প্রতিভা ও ফাণ্ড
 কলিকাতায় "আইন অমাত্র" আলোচন
 কলিকাতার উচ্চতম "স্থানীয়িকরণ"
 কাকি নজরুল ইসলামের বৃত্তি
 কিশোরলাল মশরুওয়ালা
 কৃষক-মজুর
 কৃষিক্ষেত্র
 কৃষিক্ষেত্রের আবেদন
 কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট
 খাজ-সমস্যা
 গঙ্গার উপর সেতু নির্মাণ
 গারো পার্বত্য এলাকা

২২২ গ্রাম্য জাগরণ ও কমানিষ্ট
 ২২৮ চন্দ্রলোক ভ্রমণ
 ২২২ চিনির কথা
 ৩২৩ চিন্তার দৈন্ত
 ১৪৩ ছাড়পত্র
 ৩২৩ জননগর ধানায় খাজসকট
 ৩২৩ জননিকাশের বিরাট পরিকল্পনা
 ১৩ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ
 ২২৮ জাপানের পূর্ব সার্কভৌমত্ব লাভ
 ৪০০ জার্মানী থেকে বরণান্তের দাবি
 ৩২৪ টিউনিসিয়া
 ৩২১ টালজর্ডানে রাজা বদল
 ২২৩ ডন-ভলগা নদীর সংযোগ
 ১০ ডাক্তার রায়ের স্বপ্নমঙ্গল
 ২৭১ দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যগ্রহ
 ৩৪৭ দুর্নীতির নিবারণ
 ৩৪৮ দুর্ভিক্ষ না ধান্যভাব
 ৩৮৬ ধাপা
 ২২৭ নববর্ষ
 ৩৪৮ "নবমহাভারতের রচনা"
 ২৬৯ নান্দা পাহাড় ও চীন সীমান্ত
 ২২৬ নারী-চক্রের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব
 ৩২০ নিরক্ষর শিক্ষা
 ২৬১ নীলপুর ও সদগোপ সমাজ
 ২৬৬ পুতন মন্ত্রিসভা
 ১৩৯ নেপালে কমানিষ্ট বড়তন্ত্র
 ১৪৩ পণ্যমূল্য

কমাত্র উপায়	...	৬৪৮	মিশর	...	৬৫২
কর জমি বর্টনের সঙ্কল্প	...	১৩৯	মিশর ও হুদানের বাদশাহ	...	৩৯৬
না ও পশু-পালন	...	১৩৭	মুশিদাবাদে খাদ্যশস্ত্রের অবস্থা	...	৩৯১
নশিকা সমিতি	...	১০	মৃত্যু-কর	...	৫১৯
কম্যানিটি পরিকল্পনা ✓	...	৩৮৭	মে মাসে চাউল সম্পর্কে তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন	...	১৩৬
নার্গাস-চাষ	...	১৩৬	রাজনীতি ও দলদলি	...	৬৫১
লখনপঠনক্ষম লোকের হার	...	৫২৬	রাজনীতিতে শব্দের মায়াজাল	...	৬৪৫
শিক্ষক ও অধ্যাপক	...	১৪৪	রাজাজীর "অধঃপতন"	...	৮
সংবাদপত্রের মিথ্যা প্রচার	...	৬৫১	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	...	১৩৮
টি জলসেচ-পরিকল্পনা	...	৩৮৯	রানিয়ার ভারতের নূতন রাষ্ট্রদূত	...	৩৭
র হাসপাতাল	...	৬৫৫	রাষ্ট্রপতির আহ্বান	...	...
চম জাতীর খেলা	...	১৪	রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে মিশর	...	...
শিল্প	...	২৭১	রিলিফ কো-অডিনেশন কমিটি	...	...
মালিকের সাক্ষ্য	...	১২	রেলের পুনর্গঠন	...	...
ন ও ভবিষ্যৎ	...	২৬০	রেলের পুনর্বিভাগ ✓	...	...
রাজ	...	২৬৮	রেলের পূর্ণাঙ্গ বাজেট	...	...
প্রথম জাতীয় প্রতিক্রিয়া	...	৫২৬	লোকশিক্ষা ✓	...	...
বাঙালী-সমাজ	...	৬৫৫	শরকাজাতীয় খাদ্যের গুণাগুণ	...	...
র অবস্থা	...	৫১৬	শারদীয়া	...	...
র ভূদান-বজ্র	...	৫২৭	শিক্ষার্থীর কর্তব্য	...	...
র হুনীতি	...	৬৬৫	শৈব সম্প্রদায়	...	...
কলায় শিশুদের চিকিৎসালয়	...	৮	শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য-সংসদ	...	৩
১-চীন বাণিজ্য-চুক্তি	...	৩৯৯	শ্রীহট্ট সম্মিলনী	...	৬৫৬
র সমাজ	...	৫২১	শ্রীহট্ট শব্দের অর্থ	...	৫২৮
পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ	...	১৪১	ষ্টাকোর্ড ক্রিপস	...	১৪৪
নিষ্ট পার্টি	...	৫১৮	সংস্কৃতির সমন্বয়	...	১৪
র	...	৫১৬	সমাজ-সংস্কার	...	৩৯৯
গণনা	...	২	সমাজে মুসলিম রমজীর স্থান	...	২৭১
র	...	১৪২	সাহিত্য ও-বাংলা ভাষা	...	১৪০
র	...	৬৪৭	সীমান্ত গার্ড অবহুল গফুর খাঁ	...	৩৯৮
র	...	৬৪৬	স্বধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের বৃত্তি	...	৬৪৫
র	...	১২৯	স্বন্দরবনে সরকারী সাহায্য	...	৭
র	...	৫১৫	সোনোরপুর-আড়াপাঁচ পরিকল্পনা	...	১০
র	...	৫১৪	স্বতন্ত্র দার্জিলিং রাষ্ট্র	...	১৩৬
র	...	১৫	স্বাধীনতা দিবস	...	৫১৩
র	...	৩৯৫	স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যানিষ্টদের ভূমিকা	...	৬৪৬
র	...	৬৪২	হরিণঘাটার বাড়ীঘর	...	৩৯২
র ও জাতীয়তার মূলমন্ত্র	...	২৭২	হাওড়া জেলায় কৃষি-ঋণ	...	৩৫৫
র	...	৩৯৭	হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও নৈশ-বিদ্যালয়	...	১২
র	...	৮		...	

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

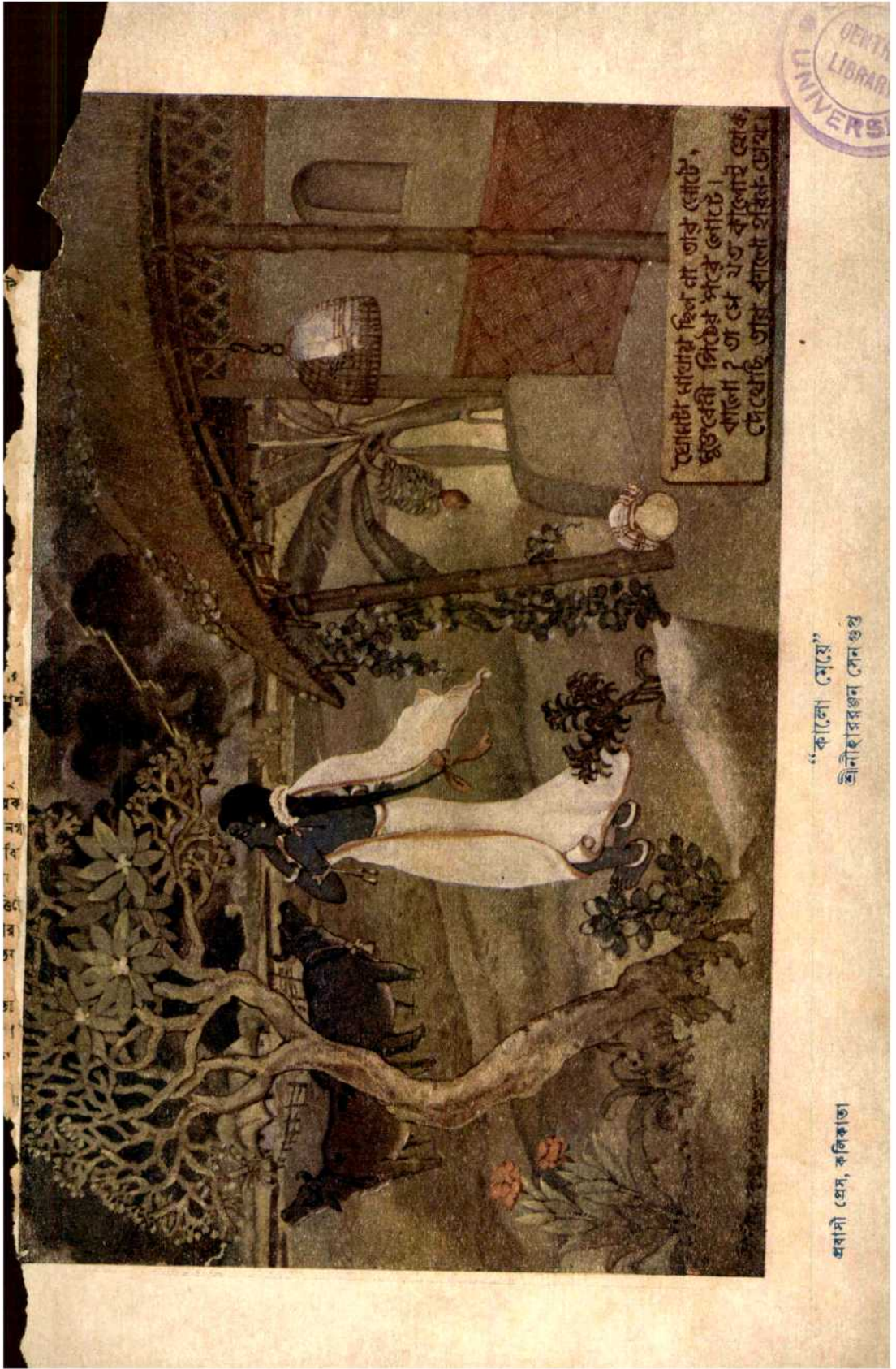
অন্ধ বধু—শ্রীনাথরঞ্জন সেনগুপ্ত
কালো মেয়ে—ঐ
কুরার ধারে—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ঝড়—শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত
নিভুতি—শ্রীভি. ডি. গোবিন্দরাজ
ও ছেলে—শ্রীসুধম মিত্র

একবর্ণ চিত্র

সার—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ধানক্ষেতের দৃশ্য
চিত্রাবলী
কৃষিশিল্প-প্রদর্শনীতে রাজ্যপাল
গো-প্রদর্শনীতে আনীত একটি গাভী
গো-প্রদর্শনীতে আনীত গরু, বাছুর
কা নদী—প্রাচীন মানচিত্রাবলখনে
দ চালু, পি.
মরিকান কেরার মিশন কর্তৃক প্রদত্ত লাল
ডি শ্রীরামরাজা
কা পল কর্তৃক মিসেস্ রুজভেন্টেকে আমন্ত্রণ
ইলভন শৈলমালা
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের আলোচনা-সভা, নিউ-ইয়র্ক
উডমিরার একাডেমি, নিউইয়র্ক
উড় পী শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের সম্মুখস্থ গোপুরম
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ববি রাজনারায়ণ স্মৃতিমন্দির, বোড়াল
ওরাণ্টার স্ট্রট, সারু
ওরাণ্টার স্ট্রটের এবট সফোর্ড চিত্রাবলী
ওরাণ্টার স্ট্রটের সমাধি
ওরাণ্টার স্ট্রটের স্মৃতি-মন্দির
ওরাণ্টার স্ট্রটস্থ ভারতীয় ছাত্রীগণ কর্তৃক খাদ্য পরিবেশন
ওরাণ্টার স্ট্রটে বিখ্যাত বাণিজ্য প্রদর্শনীতে মিঃ হারিম্যান
কর্নকার, এস. জি., ক্যাপ্টেন
কর্নের আফ্রান—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপের চিত্রাবলী ৪২৮-৩১, ৫৫৭-৬০, ৬২৯-৭০৬
কৃষিক্ষেত্রে আটক আউশ ধান
কেদারনাথ ধাম, গুপ্তকাপ্তি (গাড়োয়াল)
কোতা ভেক্টাপ্লাইরা পাণ্ডুলু
ঘোনা ফলস
চন্দ্রশেখর বেকট রামন্
চীনে ভারতীয় সংস্কৃতি মিশন—নিউ দিল্লীস্থ রাষ্ট্রপতি-ভবনে
জবাহরলাল নেহরু
জামনগর আয়ুর্বেদ কলেজ মিউজিয়ম
জানচ—ঘোষ দস্তিদার
টাইগার ফলস

দশাবতার-চিত্র

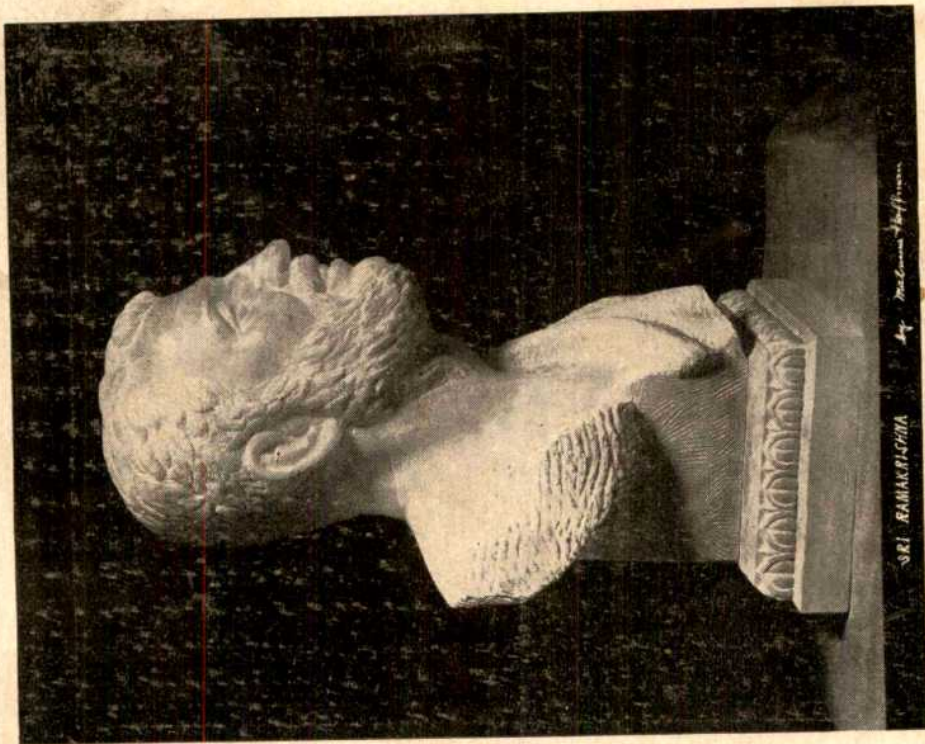
মেরাহন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ভারতের কাঠসম্পদ-প্রদর্শন
নাইরোবিতে ভারত-চিত্র প্রদর্শন
নালন্দা-বিহারের দৃশ্যাবলী
শ্রীপঞ্চানন রায়
পশুপতি মিত্র, ডাঃ
পিকিঙের 'লেবার প্যালেসে' ভারতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনী
পিকিঙের 'সামার প্যালেসে' ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন
পুরীতে অনুষ্ঠিত শিল্প-প্রদর্শনীতে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
শ্রীবাতিরাজ স্বামী (দ্বিতীয় মধ্যাচার্য)
বাকুড়া কৃষ্ণ হাটপাতালের চিত্রাবলী
বাস্তুরাহারের শহর, নীলোথেরি
বিড়লা মন্দির, নিউ দিল্লী
বিবেকানন্দ স্বামী—ম্যাগালভিনা হফম্যান
বিশাখাপত্তন বা বরাহক্ষেত্রের দৃশ্যাবলী
বুদ্ধ ও হুজুতা—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেরা, কালেক্টরকাট গানারি স্থল
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা, বাদমপুর
ভোট-যন্ত্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ
মেঘনাদ সাহা, ডাঃ
মুখ্য কৃষকের পদক লাভ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (তেহেরাণ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৯)
রাজরোশ্না ফলস
রামকৃষ্ণ পরমহংস—ম্যাগালভিনা হফম্যান
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
রামেশ্বরর চিত্রাবলী
লাললের একটি চিত্র
শঙ্করাচার্য, শশিগ্র
শৃঙ্গের চিত্রাবলী
শৈবমুর্তি—পশ্চিম-হন্দরবনে আবিষ্কৃত
শ্রীমধুসরোবর
শ্রীমধ্যাচার্য
শ্রীকৃষ্ণ চিত্রাবলী
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার পত্রের প্রতিলিপি
সাধারণ মানুষ—চিত্রাবলী
সান ফ্রানসিসকোতে বিশ্ববাণিজ্য-মেলায় ভারতীয় ধাতুকলা
হুবারাও পাণ্ডুলু, এন.
সেন্ট মরিন চিত্রাবলী
সোভিয়েট চারুশিল্পকলা প্রদর্শনী, দিল্লী
স্থলগ্রাম, শারদাবাসের চিত্রাবলী
ছড়ক ফলস
হেলসিঙ্কি



‘তোমার মাথায় ছিল না তার মোটে’,
 দুত্তবেরী পিঠের পাত্র মোটে।
 কালো ? তা যে এত কালোই যোক
 দেখোচ্চি আমি কালো ইকি-জোয়।

“কালো মেয়ে”
 শ্রীনিহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

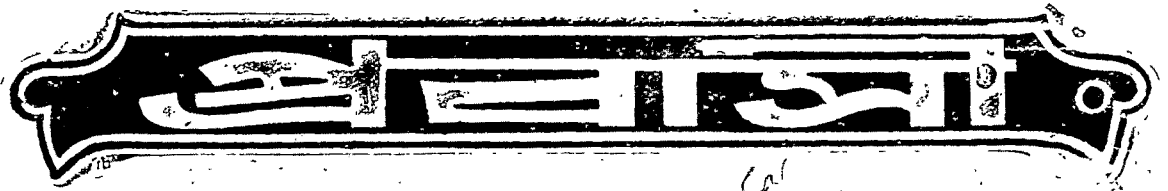
অবাদী প্রেস, কলিকাতা



• ম্যালভিনা হুফমান-কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবদমূর্তি
[নিউ ইয়র্ক]



ম্যালভিনা হুফমান-কৃত স্বামী বিবেকানন্দ ব্রোঞ্জ মূর্তি



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
সারস্বত্যা ব্রহ্মহীনেন সত্যম্”

৫২শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৫৯

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

নববর্ষ আজ আমাদের ঘরে। উহার আগমনে লোকের মনে স্বভাবতঃই আশার উদ্রেক হয়, সঙ্গে সঙ্গে আশকাও করে “কি জানি অদৃষ্টে আরও কত সুখ-দহন আছে?”

তবিশাভের গর্ভে কি আছে তাহা জানি না কিন্তু আমরা কিছুকালের মত দেশের ভাগ্য কংগ্রেসী সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। তাহার ফলাফলে আমাদেরও বুদ্ধি-বিবেচনার পরীক্ষা হইবে। শাসনদণ্ড বাহাদুরের আশ্রিতে গিয়াছে তাহার। এখনও বিজয়গর্ভে উন্নত ও কাণ্ডজ্ঞানবিহীন। নির্বাচনের প্রকৃত তথ্য বিচারের স্পৃহা বা ক্ষমতা তাহাদের নাই। দেশের লোকের অর্ধেকেরও অধিক যে আজ কংগ্রেসবিরোধী সে কথা তাহারা উড়াইয়া দিয়াছেন।

দেশবাসী নির্বাচনের পালা ত অনেক দিন হইল শেষ হইয়াছে। উহার সমস্ত গৌণাণ্ডন্য এখন সাধারণের সামনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং পার্লামেন্টে কোন্ পার্টির কত কৌর তাহাও আমরা জানিয়াছি। প্রদেশের বিধানসভাগুলিতেও কোন্ পার্টির কত সভ্য তাহার হিসাবও আমরা পাইয়াছি।

নির্বাচনে ভোটারদিগের সংখ্যা সবস্বত্ব ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ ছিল। ৭৫টি রাজনৈতিক দল হইতে ১৭০০০ (ষোড়শটি) প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়াইয়াছিলেন তন্মধ্যে পার্লামেন্টের ৪৮৯ সভ্য লইয়া এবং ২২টি রাজ্যের বিধানসভার সভ্য লইয়া সবস্বত্ব ৩২৭৮ সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। ২২টি রাজ্যের মধ্যে ১৮টিতে কংগ্রেস প্রবল শক্তিসাধ করিয়াছে, অন্য চারটিতেও কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবলতম একক দল। বিরোধী সভ্যগণ বহু দলে বিভক্ত হইয়াছেন। সেই কারণে কোথাও কোনও বিরোধীদল মজিৎ গঠনে সমর্থ হয় নাই।

উড়িষ্যা কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়া সত্ত্বেও মজিৎ গঠনে পূর্বেরই সক্ষম হইয়াছে। দুটি অন্য রাজ্যেও মজিৎ প্রবেশই হতে আসিতেছে। মাদ্রাজেও ভো রাজাকীর বৃত্তকোশলে মজিৎ কংগ্রেসেরই দখলে আসিল।

আসামে ১০৮ আসনের মধ্যে ৭৬টি, বিহারের ৩৩০ আসনের মধ্যে ২৪১টি, উত্তর প্রদেশের ৪৩০টি আসনের মধ্যে

৩৯০টি, বোম্বাইয়ের ৩১৫ আসনের মধ্যে ২৬৯টি, মধ্য-প্রদেশের ২৩২ আসনের মধ্যে ১৯৪টি, মাদ্রাজের ৩৭৫ আসনের মধ্যে ১৫২টি, উড়িষ্যার ১৪০ আসনের মধ্যে ৬৮টি, পঞ্জাবের ১২৬ আসনের মধ্যে ৯৮টি, পশ্চিম বাংলার ২৩৮ আসনের মধ্যে ১৫১টি, হায়দ্রাবাদের ১৭৫ আসনের মধ্যে ৯০টি, মধ্য ভারতের ৯৯ আসনের মধ্যে ৭৫টি, মহীশূরের ৯১ আসনের মধ্যে ৭৪টি, পেপলুর ৬০ আসনের মধ্যে ৩৫টি, রাজস্থানের ১৬০ আসনের মধ্যে ৮১টি, সৌরাষ্ট্রের ৬০ আসনের মধ্যে ৫৫টি, জিবারুর-কোচিনের ১০৮ আসনের মধ্যে ৪৪টি, আজমীরের ৩০ আসনের মধ্যে ২০টি, ছুপালের ৩০-র মধ্যে ২৫টি, বিজয়-প্রদেশের ৬০-র মধ্যে ৪০টি, কুর্গের ২৪-র মধ্যে ১৫টি, দিল্লীর ৪৮-র মধ্যে ৩৯টি এবং হিমাচল প্রদেশের ৩৬-র মধ্যে ২৪টি আসন কংগ্রেস-অধিকারে আসিয়াছে।

কিন্তু প্রার্থী সম্পর্কে ভোটদাতাদের ষোণ্য-স্বাধোগ্যের বিচার অতপ্রকার এক তথ্য উল্লেখ্য করে, এ কথার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। কংগ্রেস সমগ্র ভারতে ৩২৬৮ প্রার্থী নির্বাচনে পাঠার ইহার মধ্যে ২২৪৮ জন নির্বাচনে সফলকাম হয়। কংগ্রেসের সপক্ষে ৪,৩৪,৭০,৯২৪ ভোট প্রদত্ত হয়। সোশ্যালিস্ট পার্টি ১৭৯৩ প্রার্থী নির্বাচনে পাঠার। উহার মধ্যে মাত্র ১২৬ জন নির্বাচিত হয়, কিন্তু এই দলের পক্ষে ৯৯,৫৮,৮৪২ ভোট প্রদত্ত হয়। কম্যুনিষ্ট ও তাহাদের অন্তর্গত দল ৫৮৭ প্রার্থী দাঁড় করায়। উহার মধ্যে ১৮১ জন সফলকাম হয়। এই সফল দলের পক্ষে ৬২,৫৯,৩৩৩ ভোট প্রদত্ত হয়। কৃষক-মজদুর-প্রজা দল ৯৪৫ জন প্রার্থী উপস্থিত করে। উহার মধ্যে ৭৮ জন সফলকাম হয়, এবং এই দলের সপক্ষে ৫০,৭৩,৩২৬ ভোট প্রদত্ত হয়। জনসংঘের ৭৩২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৫ জন সফলকাম হয় ও উহার সপক্ষে ২৮,১৮,৮৩৫ ভোট প্রদত্ত হয়। হিন্দু মহাসভার ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২০ জন সফল হয় এবং এই দলের পক্ষে ৮,৫১,৪১০ ভোট পড়ে। রামরাজ্য পরিষদ ৩০৪ প্রার্থী মনোনীত করে, তার মধ্যে ৩২ জন পার হয় এবং এই দলের পক্ষে ১২,১২,৪৬৮ ভোট আসে। অজ্ঞান ফেডারেশনের (আবেদনকারের দল) ২১৩ জন প্রার্থীর

১২ জন মাত্র সফল হয়। এই দলের প্রার্থী ভোট পায় মোট ১৬,৯৬,৩৬০। কিম্বাণ-প্রজা পার্টি (মাজাজের) ১২৭ জন প্রার্থী দাঁড় করার যার মধ্যে ২১ জন পায় হয় এবং এই দল ১০,৮১,৫৬১ ভোট পায়।

বৃহত্তর প্রার্থী ছিল সবচেয়ে ২৫৯৬ যার মধ্যে ২৮৩ জন সফলকাম হয় এবং বৃহত্তরপ্রার্থী সকলের পক্ষে ১,০৯,০২,৪৮১ ভোট প্রদত্ত হয়। অতীত সকল ছোট বড় দল ১২৪৯ প্রার্থী দাঁড় করার যার মধ্যে ২৩৭ জন সফল হয় এবং এই সকল প্রার্থীর পক্ষে ৯১,৩৩,৫৭৯ ভোট প্রদত্ত হয়।

এই সকল সংখ্যার বিচারে বুঝা যায় যে, কতকগুলি দল ভোট বাহা পাইয়াছে তাহার অল্পপাতে আসন অনেক কমই পাইয়াছে। কংগ্রেসের পরই সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ। তাহার পর সোভালিষ্ট পার্টির স্থান, যাহা প্রায় ১ কোটি ভোট পাইয়াছে, কিন্তু আসন পাইয়াছে মাত্র ১২৬টি। কিন্তু কম্যুনিষ্ট দল ও তাহাদের অল্পগামীবর্গ ৬২ লক্ষ ভোটে ১৮১টি আসন দখল করিয়াছে। জনসংখ্যা ২৮ লক্ষ ভোটে মাত্র ৩৫টি আসন পাইয়াছে। উহার তুলনায় রামরাজ্য পরিষদ মাত্র ১২ লক্ষ ভোটে ৩২টি আসন পাইয়াছে। আবেদকারের দল ১৭ লক্ষ ভোট পাইয়াছে কিন্তু আসন পাইয়াছে মাত্র ১২টি।

এই সকল তথ্যের বিচারে নির্বাচনে অদৃষ্টের পরিহাস যথেষ্টই দেখা যায়। সে বাহাই হটুক, দেখা গেল যে, পুরাতন বা নবীন কংগ্রেসবিরোধী দল সবই নির্বাচনে শুধু যে হটিয়া গিয়াছে তাহা নয়, পার্লামেন্টে কংগ্রেসের পরেই প্রধান দল দাঁড়াইয়াছে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তাহার সহচরবৃন্দ, যদিও ভোট-সংখ্যার তাহাদের স্থান বহু নিম্নে। অবশ্য স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ সংখ্যার তাহাদের অপেক্ষা গরিষ্ঠ কিন্তু তাহারা দলবদ্ধ নহেন।

কোনও বিচারবুদ্ধিযুক্ত লোক কখনও তাবে নাই যে, এই নির্বাচনে কংগ্রেস হারিবে। বরং জিবাজুর-কোচিন ও মাজাজে কংগ্রেসের পরাজয় সকলের মনে বিশ্বাস আনে। কিন্তু কেহ একথাও তাবেন নাই যে, নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধীদল একরূপ তাবে বড়ের মুখে বড়ের কুটার মত উড়িয়া যাইবে।

একমাত্র জনসংখ্যার প্রধান নেতা ভিন্ন অন্য সকল দলের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের হাতে পরাজিত হইয়াছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতে বাহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে একরূপ বহু এসিষ্ট ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে পরাজিত হইয়াছেন। যে সকল নেতা সদলে কংগ্রেস ভ্যাগ করিয়া নুতন দল গঠন করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই পরাজিত।

এ সকল কথাই হুঃখ বা পরিতাপের কিছুই নাই। তবে দেশের কল্যাণকামনায় এ কথাই শুধু মনে হয় যে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বিরোধী দল গঠিত হইলে দেশের শাসন ও গঠন কার্যে বহু দুর্নীতির বহিকার সম্ভব হইত।

যে পার্লামেন্টের মেম্বার শেষ হইয়া গিয়াছে তাহাতে একরূপ

লোক অল্পই ছিলেন বাহারা নিরপেক্ষভাবে ভায় ও ধর্মসদৃশ মতের ধারক ও রক্ষক ছিলেন। অতীত ও দুর্নীতির মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করার বা প্রবল বাধা দিবার চেষ্টা করার যোগ্যতা অতি অল্পলোকেরই ছিল। অধিকাংশ সভ্যই ছিলেন অবিবেচক ভাগ্যবৈধী। কেহবা চাটুকাররূপে, কেহবা আত্মীয় বা দলপতির গলগ্রহরূপে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতেন। দেশে দুর্নীতি ও অনাচারের শ্রোত বহাইবার প্রধান সহায়ক ছিলেন এই সকল অপদার্থ লোক।

এবারকার পার্লামেন্টে একরূপ জীবেরই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বের পার্লামেন্টে যে কয়েকজন নির্ভীক সমালোচক ছিলেন তাহারা এবার সকলেই পরাজিত। সুতরাং কংগ্রেসের পথ এখন নিষ্ফলক। কংগ্রেস-বিরোধী দলের মধ্যে হরত ছুই-চার জন আছেন বাহারা নিরপেক্ষভাবে কংগ্রেসের রাষ্ট্রপরিচালনা ও শাসনের সমালোচনা করিতে পারিবেন; কিন্তু তাহাদের সংহতি নাই, সমষ্টিগত ভাবে বিচার বা ভর্তুকের ক্ষমতাও তাহারা এ বাবৎ অর্জন করিতে পারেন নাই। তাহাদের মধ্যে বাহারা রাষ্ট্রধ্বংসের কার্যে উৎসাহী তাহাদের সমালোচনার ত কোন মূল্যই নাই, কেননা তাহাদের হিসাবে বিপক্ষের সকল প্রভাব ও ব্যবস্থাই সমভাবে বিষয় বর্জনীয়। তাহার মধ্যে ভালমন্দ বিচারের কোনও অবকাশ নাই, কোন প্রসঙ্গ নাই, আছে শুধু বিরোধিতার আয়োজন এবং সেই বিরোধ কংগ্রেস অমায়্যাসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে কেননা একরূপ অযৌক্তিক বিরোধ ক্ষমত চালাতে পারিবে না।

পার্লামেন্ট সম্বন্ধে যে কথা লিখিলাম তাহা প্রাদেশিক বিধান সভাগুলির ক্ষেত্রে আরও সত্য। তবে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসকে একটু সাবধানে চলিতে হইবে, কেননা যথেষ্টাচারের ফলে সকল ভিন্ন পক্ষীয় লোক সম্মত হইয়া বিরোধিতা করিতে পারে, বাহার দক্ষ কংগ্রেসী শাসকবর্গ বিপদগ্রস্ত হইতে পারেন।

স্বতন্ত্রপ্রার্থীরূপে বাহারা নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন, তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচারের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে। এবারকার নির্বাচনের ফলে দেশের শাসনভারে বৈরাচার বা যথেষ্টাচারের পথ মুক্ত হইয়া গিয়াছে। দেশের লোক বিভাজিত হইয়া অনেক ভুল করিয়াছে। সে ভুলের পরিণাম ভয়াবহ হওয়া আশ্চর্য্য নয়, যদি কেহ অতীতের প্রতিবাদ ও অনাচারের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমত সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে ও স্থিরবুদ্ধিতে না থাকে।

সম্প্রতি কলিকাতায় ভো কংগ্রেসের মিথিয়ারের পালাগান হইয়া গেল। অধিকারীবর্গ মদগর্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া এক অবাস্তব নাটকের অভিনয় করিয়া গেলেন। নানা বাক্যবাগিধ বক্তৃতার শ্রোত্রে সভা প্রাণিত করিয়া নিজেদের 'গণগণ করিয়া' গেলেন। বহু তথ্যের ভুল বিশ্লেষণ করা হইল, অনেক অসত্য ও অবাস্তব বিষয়ের অবতারণাও হইল। মহাত্মা গান্ধীর প্রাণও হইল অকারণে ও অকালে। সংসদে মধ্য মাত্র

উল্লেখ করা যায় “বর্ধমান বনকর”, অর্থাৎ কিমা কংগ্রেসের সহায়ক চোরাবাকারীর কিঞ্চিৎ অর্থদান।

সেখানে কংগ্রেসের সংস্কার বা কংগ্রেস হইতে দুর্নীতি-পরায়ণ লোকের বিভাষণ সম্পর্কে যে একটি শব্দও উচ্চারিত হয় নাই উহা বলাই বাহুল্য। কেননা দেশের লোককে বোকা বুঝাইবার প্রয়োজন তো আর নাই; অন্ততঃপক্ষে পাঁচ বৎসরের মত সেকাজ হইয়া গিয়াছে।

এই “বহ্মারসে লঘুক্ৰিয়ার” বিষয়ে আর বিশেষ কিছু লিখিবার প্ররুতি আমাদের নাই। ইহার উল্লেখ করিলাম, কেননা যে বুধা আফালাম, ছুরাকথার বিভাগ ও ভণ্ডতপসীর অভিনয় আমরা কলিকাতায় দেখিলাম তাহাতে মনে অবশিষ্টের স্ফূর্তি বিশেষভাবেই হইয়াছে।

আরও অবশিষ্ট ও হুঙ্কার কারণ হইয়াছে দেশের শাসনভঙ্গের অবিকারীবর্ণের যথেষ্টাচারের আভাসে। এই বিজয়মদোদয় অস্তের দল দেশকে কোন্ পথে লইয়া যাইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়।

“নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি”র ঐ পালা সাক্ষর করার সময় উচ্চতম অবিকারী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মনেও বোধ হয় কিছু সংশয় জাগে। তিনি বলেন:

“আমি এই সম্মেলনের সভাপতিরূপে বিগত দুই দিন বসিয়া থাকি কালে কেবল ভাবিতেছিলাম যে, আমাদের এই সকল কার্যক্রম ও প্রস্তাবমালার ভিত্তি কোন্‌ও কিছু বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত, না এ সবই নিছক অলীক অহুষ্ঠান। সময় ও অবস্থার বটনাবলী মাজাই এই প্রশ্নের স্বাধা উত্তর দিবে।”

পণ্ডিত নেহরুর মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হয় কেন? ইহার উত্তরে আমাদের মনে পড়ে এক বিখ্যাত হিন্দী লেখকের মন্তব্যের কথা। ইনি নির্দোষের কলাকল বিচারে সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, নির্দোষের পূর্বে পণ্ডিতজীর বোষণার যে “কেবলমাত্র নির্দোষ চরিত্র ও নির্দোষ ব্যক্তিত্বের সজ্জনদিগকে কংগ্রেসের সমর্থন” দিবার কথা ছিল, সে কথা কি পণ্ডিতজীর আজও মনে আছে? নির্দোষের পরে পণ্ডিতজীর অবস্থা যেন গল্পের পরম বৈক্য এক শেঠজীর মত। ঐ শেঠজীর পাহাড়ী পাচক বোর মাংসাসী ছিল। সে চাহুরী যাইবার তরে একাণ্ডে মাংস খাইত না, লুকাইয়া মাংস পিষিয়া ‘মসলা’র মিশাইয়া ডালের সঙ্গে পাক করিয়া খাইত। এক দিন ভুলক্রমে সেই ডাল শেঠজীর পাতে পড়ে এবং শেঠজী ডালে নুতন মুখরোচক আবাদ পাইয়া, খুশী হইয়া, পাচককে বলেন তাঁহার লজ্জা নিত্য এরূপ ডাল রাখিবে। পাচক তরে তরে বলে, “আজ্ঞে ও মসলা আপনাদের ডালে দেওয়া চলে না উহাতে—”

শেঠজী বুঝিতে পারিয়া বাধা দিয়া বলেন, “আহা, তুমি ডালে কি মসলা দিবে তাহা আমি জানিতে চাই না। আমি শুধু চাই এমন ডাল।”

রেলের পুনর্গঠন

ভারতীয় রেলপথগুলি ব্রিটিশ বণিকস্বার্থ ও তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কোন্‌ প্রকার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর আমাদের রেল-লাইন গঠিত হয় নাই। বহু ক্ষেত্রেই বাস্তবিক জনমিকাশের পথ প্রয়োজনানুসারে রাখা হয় নাই। কালভাটগুলি অত্যন্ত ঘোট করার কলে প্রবল বজার সময় লাইন ভেঙা গিয়াছে, মাইলের পর মাইল ভাসিয়া গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়া লোকেরও দুর্দশার একশেষ হইয়াছে। এই সকল অব্যবহার অপসারণ করিয়া বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে রেলপথকে পুনর্গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করিবার পর উহাদের রেলের সঠিক বিলি ব্যবস্থাও ভারত-সরকারের হাতে আসিয়াছে। সুতরাং ইহাদের পুনর্গঠন নিতান্ত আবশ্যক।

বর্তমানে লাইনগুলি যে অবস্থায় আছে, তাহাতে ধরচ বেগী এবং গাড়ী চলাচলের অসুবিধাও অনেক। কলিকাতা হইতে ডিক্রগড়ে জরুরী প্রয়োজনে কোন্‌ ট্রেন পাঠাইতে হইলে কলিকাতা, গোরক্ষপুর এবং পাণ্ডু এই তিন আপিসের কন্ট্রোল মারফত যাইতে হইবে। কলিকাতায় ই. আই. রেল, গোরক্ষপুরে ও. টি. রেল এবং পাণ্ডুতে আসাম রেলের হেড কোয়ার্টার এই তিন দফার হেড আপিস না রাখিয়া একটি মাত্র হেড কোয়ার্টার রাখিলে তাহাতে ধরচ কম হইবে। বিভিন্ন কোম্পানীর বিভিন্ন লাইনের পরিবর্তে তিন তিন অঞ্চল লইয়া রেল গড়িয়া উঠিলে কাজের সুবিধা অনেক হইবে। এই সকল বিষয় আলোচনার লক্ষ্য ১৯৫০ সালে রেলওয়ে বোর্ড একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিটি রেলের পরিচালন ব্যয় হ্রাস এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতীয় রেলপথকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। ইহারা অর্থ-মৈত্রিক দিক দিয়া পরস্পর নির্ভরশীল হইবে এবং তাহাতে দেশের মঙ্গল হইবে। কমিটি বলেন যে, ইহাতে ‘ওভারহেড চার্জ’ কম পড়িবে। পানাপানি রেলের সঙ্গে অনাবশ্যক চিঠিপত্র আদানপ্রদানের প্রয়োজন হইবে না। লোক কম লাগিবে, কাজ সহজ ও দ্রুত হইবে। দুই রেলের সন্মিলনে দুই কন্ট্রোলের অসুবিধা হ্রাস হইবে। ১৬টি রেলের ১০টি কন্ট্রোল ভাঙিয়া ৬টি কন্ট্রোল হইবে। মালগাড়ী চলাচলের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুবিধাজনক হইবে। ওয়ার্কশপগুলির কাজ অনেক সহজ হইবে এবং উহাদের মধ্যে ‘rationalisation’, অর্থাৎ সুজিসদৃশ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। মাল ফর ও ব্যবহারের আদেশ দেওয়ার কর্তার সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে বলিয়া অপচয়ের একটি বৃহৎ রাস্তা বন্ধ হইবে। ইহাতে কাজেরও উন্নতি হইবে, টাকাও অনেক বাঁচিবে।

রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির এই সুপারিশ ভারত-

সরকার গ্রহণ করিয়াছেন; ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ তারিখে বাজেট বক্তৃতায় আরেকবার তাহা জানাইয়াছেন।

ইহার পর ১৪ই এপ্রিল ১৯৫১ তারিখে এম-এস-এম, এম-আই এবং মহীশূর রেল লাইন সাদার্ন রেলওয়ে গঠিত হয়। সাদার্ন রেলওয়ে পঠনের পর এবং মাল্জাঙ্গে তাহার হেড কোয়ার্টার স্থাপন করার পর ওয়েষ্টার্ন এবং সেন্ট্রাল রেলওয়ে পঠনে হস্তক্ষেপ করা হয়; শেষোক্ত দুইটির হেড কোয়ার্টার হয় বোম্বাই।

অতঃপর বাকী তিনটি এলাকার—নর্দার্ন, ইষ্টার্ন এবং নর্থ-ইষ্টার্ন—রেল পুনর্গঠন শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে। শেষের দুইটির হেড কোয়ার্টার কলিকাতায় হইবে বলিয়াই ঠিক ছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী আরেকবারের এই বক্তৃতার পর ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ সহকারী রেলমন্ত্রী শ্রীমন্ত প্যাঁলামেন্টে বলেন যে, নর্থ-ইষ্টার্ন রেলের হেড কোয়ার্টার কলিকাতা হইবেই, তাহা না হইলে কলিকাতা হইতে গোরক্ষপুরে চার গুণ লোক বন্দী করিতে হইবে।

সাধারণ মর্কিচনের সময় একটি ব্যাপার ঘটে। গোরক্ষপুরে ও. টি. রেলের হেড আপিস ছিল, উহা নর্থ-ইষ্টার্ন রেলের অন্তর্ভুক্ত হইলে গোরক্ষপুরের হেড কোয়ার্টার কলিকাতায় চলিয়া আসিবে। গোরক্ষপুর হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘের একটি বাড়ি। তাহার প্রাদেশিক কারণে গোরক্ষপুরে যাহাতে নর্থ-ইষ্টার্ন রেলের হেড কোয়ার্টার হয় তাহার জন্য দাবি করিয়া গোবিন্দবল্লভ পন্থকে বিপদগ্রস্ত করে। পণ্ডিত জবাহরলাল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা মর্কিচনের প্রাকালে ইহাদের রীতিমত ভয় করিতে থাকেন। হিন্দু মহাসভার এই চালকে বেচাল করার জন্যই গোরক্ষপুরের এই দাবি গোবিন্দবল্লভ তাহার মর্কিচনী প্রতিশ্রুতিতে মানিয়া লইলেন। ওদিকে পাণ্ডুতে হেড কোয়ার্টার রাখিবার ক্ষমতা আসাম চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে সেন্ট্রাল এডভাইসরি কমিটির বৈঠক বসে এবং উহাতে এসব বিষয় সমালোচনা করা হয়। এডভাইসরি বোর্ড এবার তাহাদের পূর্বমতের পরিবর্তনের পথ খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। চাপে পড়িয়া এডভাইসরি কমিটি বলিলেন যে, এখন বাকী তিনটি এলাকার পুনর্গঠন প্রস্তাব চাপা থাকুক, নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে তাহারা ইহা করিবেন। কিন্তু গোপাল-স্বামী ইহা ভাল লাগিল না কেননা ইহাতে তাহার কীষ্টি-ধ্বজা স্থাপনে দেরী হয়, সুতরাং তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই মতামত পেশ করার জন্য কমিটির উপর এক কঠোরা জারী করিলেন।

৬ই মার্চ আবার কমিটি ডাকা হইল। ১৫ জনের মধ্যে ১২ জন উপস্থিত ছিলেন, ভদ্রাঘো পণ্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র, মৌলবী নাজিরুদ্দীন আহমদ এবং ত্রীগোকুলভাই ডাট

কলিকাতা হেড কোয়ার্টারের পক্ষে ভোট দিলেন। বাকী নয়জনে গোরক্ষপুরে নর্থ-ইষ্টার্নের হেড কোয়ার্টার করার প্রস্তাব মানিয়া লইলেন।

এইখানে আর এক কথা বলিয়া রাখা দরকার। প্রথম যখন সমস্ত রেলওয়ে ছয়টি কর্ট্রোল এলাকায় ভাগ করার কথা হয়, তখন দিল্লীতে কোনও হেড কোয়ার্টার বসাইবার প্রস্তাবই হয় নাই। মূল প্রস্তাবে ছিল বোম্বাই, মাল্জাঙ্গ, কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌ এই চার কেন্দ্রের কথা। তারও আগে নাগপুরে সেন্ট্রাল এলাকার কেন্দ্রের কথা হয়, কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মত ইহার বিরুদ্ধে যোগ্য উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দিল্লী বা গোরক্ষপুরের নামগন্ধও মূল প্রস্তাবে ছিল না। বদলের সময় নাগপুরের স্থলে বোম্বাইয়ে ওয়েষ্টার্ন ও সেন্ট্রাল, মাল্জাঙ্গে সাদার্ন, কলিকাতায় ইষ্টার্ন ও নর্থ-ইষ্টার্ন এবং লক্ষ্ণৌতে নর্দার্ন কেন্দ্রের প্রস্তাবই হয়। ঐ প্রস্তাবই সমস্ত প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়।

তারপর পঞ্জাবের দল বরিয়া বসিল যে, তাহাদের একটি কেন্দ্র চাই। দিল্লীতে পঞ্জাবী ও মাল্জাঙ্গীর দল বড়ের চাল চালিয়া, লক্ষ্ণৌকে বেমানান বাদ দিয়া নর্দার্ন কেন্দ্র দিল্লীতে টানিয়া লইল। বলা বাহুল্য, রেলওয়ে কেন্দ্র হিসাবে দিল্লী অপেক্ষা লক্ষ্ণৌ শতগুণে অধিক উপযুক্ত। দিল্লীতে স্থানের অভাব ভীষণ এবং অন্যান্য দিক দিয়াও লক্ষ্ণৌ অপেক্ষা দিল্লীর যোগ্যতা অনেক কম। কিন্তু তাহা হইলে কি-হইবে, গোপালস্বামী একদিকে শক্তের ভক্ত অন্যদিকে রেলওয়ে সহজে প্রায় সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। শুধু রেলওয়ে নয় অন্য সকল বিষয়েও প্রায় তাই, কেবলমাত্র সুযোগ্য বটীরাম ডেপুটির মত হজুর মেহরুর তুষ্টিসাধনে অসীম জানী।

উত্তর প্রদেশের কর্তৃপক্ষ এইরূপে একদিকে কেন্দ্র হিসাবে লক্ষ্ণৌকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারায় খেলো হয়, অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার মাথা, গোরক্ষপুরের মোহন দিগ্বিজয়নাথের চাপে অতিষ্ঠ হওয়ার নর্থ-ইষ্টার্ন রেলকেন্দ্র লাইন বায়না বরিয়া বসিল। গোপালস্বামী তাবিলেন উত্তর প্রদেশ তো তাহার মনিবের মুখুক, সুতরাং এ প্রস্তাব অন্যদিকে যতই ধারাপ হউক ইহা প্রভুর তুষ্টিবিধায়ক হইতে পারে। সুতরাং ব্যবস্থা পাণ্টাইবার চাল চলিল ও চলিল। (গোরক্ষপুরে হেড কোয়ার্টার হইলে কলিকাতার কমান্ডার্স অফিসার্স, স্টোর এবং একাউন্ট বিভাগ রাখিতে হইবে।) ইহাতে বিগুণ ধরচ হইবে বাপিছের এবং আসামে খাদ্য ও মিলিটারী স্পেশালের দ্রুত যাতায়াতের অন্তবিধাও ঘটবে। গোরক্ষ-পুরে নতুন করিয়া কর্ট্রোল বসাইতে গেলে অতিরিক্ত ১৫১৬ কোটি টাকা খরচ হইবে এবং দশ বৎসর সময় লাগিবে। কলিকাতায় সবই আছে, সুতরাং নতুন ধরচ

লাগিবে না, সময়ও নষ্ট হইবে না। গোরক্ষপুরে হেড কোয়ার্টার হইলে কর্মচারীদের ও আপিসের জন্য বাড়ী করিতে কমপক্ষে ৬ কোটি টাকা খরচ হইবে। কলিকাতার তিনটি রেলের হেড আপিস ছিল, উহাদের বাড়ী আপিসের জন্য পাওয়া যাইবে। কলিকাতার কর্মচারীদের জন্য নতুন বাড়ী করার দরকার নাই। আয়েকার এখন বলিতেছেন বটে যে, কলিকাতার কর্মচারীরা গোরক্ষপুর যাইতে না চাহিলে তাঁহাদিগকে কোর করিয়া পাঠানো হইবে না। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতির তরঙ্গ কি? নর্থ-ইষ্টার্ন রেলের হেড কোয়ার্টার গোরক্ষপুরে সরাইবার ফলে আসামের ইংরেজ চাকরেরা অবিকতর পরিমাণে চা চটগ্রাম বন্দর দিয়া রপ্তানীর চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে। ইহাতে কলিকাতার গুরুত্ব কমিবে। পাণ্ডু হেড কোয়ার্টার রাবিয়াই অনুবিধ হইতেছিল, গোরক্ষপুর হইতে চা-এর রপ্তানী চালানো একপ্রকার অসম্ভব হইবে।

ইষ্টার্ন রেল হইতে এলাহাবাদ ডিভিসন সরাইয়া লইলে ইষ্টার্ন রেল অল্পদিনের মধ্যেই অচল হইবার উপক্রম হইবে। রেলের মালগাড়ী চলাচলের পক্ষে এলাহাবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইষ্টার্ন রেল প্রত্যহ প্রতি দশ মাইলে ২৪টি করিয়া মালগাড়ী চলাচল হইবে। সাদার্ন, ওয়েস্টার্ন এবং নর্থ-ইষ্টার্ন রেলে প্রত্যহ প্রতি দশ মাইলে ১০টির বেশী লাগিবে না, নর্দার্ন রেলে লাগিবে মাত্র ৫টি। সুতরাং ইষ্টার্ন রেলওয়ের উপর মাল চলাচলের চাপ সবচেয়ে বেশী পড়িবে। নর্দার্ন রেল যদি সময় মত বোঝাই মালগাড়ী লইতে এবং খালি গাড়ী দিতে না পারে তাহা হইলেই কল্যাণ এবং অন্যান্য জব্য চালানো বিঘ্ন ঘটবে। মোগলসরাই ইয়ার্ডে এত গাড়ী জমিয়া যাইবে যে, সমস্ত চলাচল ব্যবস্থা নষ্ট হইবার উপক্রম হইবে।

তাহার পর এই ইষ্টার্ন রেলে যুক্ত হইবে বি. এন. রেলওয়ে যাহা বিপুল খনিজবাহী রেলপথ। উহা যুক্ত হইলে এক ইষ্টার্ন কেন্দ্রের অধীন রেলপথে প্রতি বৎসর যত কোটি টন মাইল মাল চলাচল হইবে অত পাঁচটি কেন্দ্রের মোট যোগফলেও তত টন মাইল হইবে কিনা সন্দেহ। অথচ সে ভাবে তাহার গাড়ী ও ইঞ্জিনের ব্যবস্থা একেবারেই হয় নাই।

প্রাদেশিকতা রেলের ব্যাপারে কতটা প্রবেশ করিয়াছে তার আর এক প্রমাণ গদার পুল। করকা গদার ব্রিজ ও বাঁধ তৈরির পক্ষে সর্কাপেকা উপযুক্ত স্থান, কিন্তু ব্রিজ নির্মাণের চেষ্টা হইতেছে পাটনায়। মুর্শিদাবাদ জেলার করকার গদার ব্রিজ তৈরি হইলে এবং সেই সঙ্গে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইন বসাইলে দার্জিলিং যাইতে আগে যে সময় লাগিত এখন তদপেক্ষা কম সময় লাগিবে। গদার এপারে ব্রডগেজ লাইনের মাঝখানে একটা মিটারগেজ মাপের লাইন পাতিয়া দিলে আমিনগাঁও হইতে

চারের মালগাড়ী সোজা কলিকাতা আসিতে পারিবে। ঐ সঙ্গে গদার বাঁধ নির্মিত হইয়া কলিকাতার বন্দর রক্ষা পাইতে পারিবে। গদার দল ভাগীরথীতে আগে যেমন আসিত এখন তেমন আসিতেছে না, ফলে চড়া পড়িয়া যাইতেছে এবং কলিকাতার জাহাজ আসা বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে। করকার পুল এবং বাঁধ একসঙ্গে নির্মিত হইলে ছইটির জন্য পৃথক দোকর খরচ হইবে না এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দিক দিয়াও উহাই প্রশস্ত হইবে। কিন্তু উত্তর প্রদেশের প্রাদেশিকতাবাদীরা যেমন গোরক্ষপুর লইয়া টানাটানি শুরু করিয়াছে, বিহারের প্রাদেশিকতাবাদীরা তেমন গদার পুল পাটনা অথবা মোকা-মার লইয়া যাইবার আন্দোলন করিতেছে। এইভাবে রেল পুনর্গঠনের নামে কলিকাতাকে ধ্বংস করিবার এক বিরূপ যত্নময় চলিতেছে। সুখের বিষয় যে, সমস্ত বামপন্থী দল এবং জনসাধারণ ইহার প্রতিবাদে লাড়া দিয়াছে। ইহার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হওয়া দরকার।

বাস্তব পক্ষে এই রেলের পুনর্গঠনের বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন ভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে যে ভাবে প্রস্তাব-গুলি করা হয় তাহাতে আমাদের ধারণা ছিল যে সম্যক বিচার ও পরীক্ষা করার পরে রেলওয়ে পরামর্শদাতা কমিটি ঐক্য সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। পার্লামেন্টে সে বিষয়ে বিশেষ বিতর্ক না হওয়ার আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, এই পুনর্গঠনের সকল সমস্তার পূর্ণ বিচার করা হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, কেবলমাত্র লাইনের দৈর্ঘ্য মাপিরা মোটামুটি হয় ভাগে ভাগ করিয়াই কাজ শেষ করা হইয়াছে। এইরূপ ছেলেবেলার শেষ করা হইয়াছে এত বড় ব্যাপার, যাহাতে ভারতের ৮০০ কোটি টাকার মূলধন হস্ত রহিয়াছে। ইহা বিখাস করাও কঠিন, কিন্তু ঘটনামের ব্যবহার সবই সম্ভব। হয়ত এইভাবে রেল চলাচল বানচাল করিয়া তৎকালের পথ সুগম করা হইতেছে। কে বুঝিবে তাহা? বিচারক ও কংগ্রেসী পণ্ডিতগণ।

রেলের পুনর্বিজ্ঞাস

ক্রীশোপালস্বামী আয়েকারের বুঝকির প্রতিবাদে কলিকাতায় রেলওয়ে এবং জনসাধারণের “সংযুক্ত সংগ্রাম-পরিষদে” ছই দিন ব্যাপী আলোচনার পর এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :

ই. আই., বি. এম. এবং আসাম রেলওয়ের কর্মচারীদের যুক্ত সংগ্রাম-পরিষদের আহ্বানে, দল ও মত নির্বিশেষে কলিকাতার নাগরিক ও রেলকর্মীদের এই সম্মেলন রেলদপ্তর কর্তৃক জনমতকে অগ্রাহ করিয়া নর্দার্ন ও ইষ্টার্ন রেলওয়ে ব্যবহার তাকাহুতা করিয়া পুনর্বিজ্ঞাসের যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে। এই প্রস্তাবিত পুনর্বিজ্ঞাসে কলিকাতা, দিল্লী ও গোরক্ষপুরে তিনটি সদর কার্যালয় স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহাতে ই. আই. রেলওয়েকে তিন ভাগে বিভক্ত

করা হইবে। উহা সমস্ত বিশেষজ্ঞের প্রস্তাব ও অভিমতের পরিপন্থী। বর্তমানে রূপান্তরিত প্রস্তাব সরকারের পূর্বেকার ঘোষণার বিরোধী। পূর্বে বলা হইয়াছিল যে, রেল-চলাচল ব্যবস্থার বিশেষ গোলযোগ না ঘটাইয়া এবং আঞ্চলিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রেলের পুনর্বিন্যাস করা হইবে।

জানুয়ারী মাসে প্রচারিত রেলওয়ে বোর্ডের প্রস্তাবে কলিকাতার মধ্য-ইষ্টার্ন ও ইষ্টার্ন কোমের হেডকোয়ার্টার রাখার ও ইষ্টার্ন কোমের এলাহাবাদ ডিভিশন অন্তর্ভুক্ত রাখার যে সিদ্ধান্ত ছিল তাহার হঠাৎ পরিবর্তন ও উহার ফলে অপর একটি প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করার সম্মেলন উহার নিষিদ্ধ করিতেছে এবং এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, নূতন প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সফীল যাত্রার ভৌষণ ও পোষণ করা। এই প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, এই সম্মেলন পরিবর্তিত পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবে বিশেষ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে। এই পরিবর্তিত প্রস্তাব কার্যকরী করা হইলে শুধু যে পনের হাজার রেলকর্মচারী ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের উপর আঘাত আসিবে তাহা নহে, পরন্তু ইহার ফলে ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের আর্থিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুতর বিপর্যয় ঘটবে। এই নূতন প্রস্তাবের ফলে (১) চলাচল ব্যবস্থায়—বিশেষতঃ কয়লা, পাট, চা, কাঠ প্রভৃতির চলাচলে গোলযোগ দেখা দিবে; (২) কলিকাতা বন্দরের বিরাট কলঙ্ক হইবে; (৩) গাড়ী চলাচলে অত্যন্ত অসুবিধা সৃষ্টি হইবে—বিশেষতঃ ওয়াগন সরবরাহ চালু রাখা এবং কয়লা, খনিজ, লোহা-সিমেন্ট, কাগজ, চিনি, ষাটশস্ত্র প্রভৃতির জন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় গাড়ীর ব্যবস্থা করা কঠিন হইয়া পড়িবে; (৪) ক্রেতাদের ব্যবস্থা, সরবরাহ চালু রাখা এবং শুদামের সংগ্রহ করার ব্যাপারে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে; (৫) কলিকাতায় শহরতলীর বিপুল সংখ্যক বাজীর চলাচল ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই প্রস্তাবে দেখা যায়; (৬) মণিহারিঘাট, মোকামা, ভাগলপুর এবং কান্দিতে গদাবন্ধের উপর দিয়া রেল চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে; (৭) উত্তর প্রদেশ-সহ সমস্ত উত্তর ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে ভীষণ আঘাত পড়িবে; (৮) দেশের চলাচল ব্যবস্থার প্রাদেশিকতা দেখা দিবে; (৯) নূতন আপিস স্থাপন, বাসভবন নির্মাণ, অজান্ত ব্যবস্থার জন্য বহু অর্থ ব্যয় হইবে; (১০) প্রায় সমস্ত গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ হইবে; (১১) ভারতের পূর্বাঞ্চলে গাড়ী চলাচল ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অসুবিধা দেখা দিবে।

সম্মেলন ভারত-সরকারকে জানুয়ারী মাসে ঘোষিত মূল প্রস্তাবকে কার্যকরী করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। যদি তাহা না করা হয় তবে প্রস্তাবিত প্রস্তাব কার্যকরী করা স্থগিত রাখিতে এবং প্রায়টি সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির অভিমত গ্রহণ সম্পর্কে রেল-মন্ত্রকের নিকট আহ্বান জানাইতেছে।

সম্মেলন এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আহ্বান জানাইতেছে।

সম্মেলন রেল-পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত পরিবর্তিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছে এবং এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রেলকর্মীরা যে এক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সম্মেলন অভিনন্দিত করিতেছে।

সম্মেলন এই মুহূর্ত্তে অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, প্রাদেশিক সংকীর্ণতার দিক হইতে নহে, জাতীয় স্বার্থের দিক হইতেও রেলের পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিভিন্ন বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়াই উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

এই অবৈজ্ঞানিক কৃতিকারক রেলওয়ে পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব ভাঙাছড়া করিয়া প্রযুক্ত করার চেষ্টার প্রতিরোধ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করার জন্য সম্মেলন ২০ জনের একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন।

পণ্যমূল্য

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে যে মন্দার সূচনা দৃষ্ট হয় তাহা যে আন্তর্জাতিক ঘটনা পরিজ্ঞমার প্রতিক্রিয়া সে কথা আমরা পূর্বে-সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। সম্ভ্রুতি আমেরিকার “নিউজ উইক” নামক পত্রিকায় এই মর্মে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদের মতেরই অস্বল্পে সাক্ষ্য দিতেছে।

উক্ত পত্রিকায় এই আর্থিক বিশৃঙ্খলার জন্য ব্রিটেনকেই মূলতঃ দায়ী করা হইয়াছে। ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াই ১,৪০,০০,০০,০০০ ডলারের আমদানী বন্ধ করিয়াছে। বাজেটেও অল্পরূপ ‘deflationary’ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ফলে আন্তর্জাতিক কেনাবেচার তাতি পড়িয়াছে। লোকে খরচ কমাইয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। দেশের চাহিদা কমিয়া যাওয়ার ফলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে, বিশেষতঃ ষ্টালিং এলাকার সঙ্গে বাণিজ্যে বিপর্যয় আশঙ্কা করা যাইতেছে। এই সঙ্কল অকালেই ব্রিটেনের রপ্তানী সর্বাঙ্গীণ বৈদেশিক বণিজ্য ইহা অবশ্যস্বাবী এবং ইহা যে অস্বল্প নহে তাহা বিভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনেই প্রমাণিত হইতেছে। উত্তর আমেরিকার বাজার রুদ্ধ হওয়ার পর অষ্ট্রেলিয়াই ছিল ব্রিটেনের প্রধান বিক্রয়-ক্ষেত্র। আন্তর্জাতিক লেন-দেন ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়া বিরাট বাটতির সন্মুখীন হইয়াছে। প্রচুর আমদানীর জন্য তাহাদের সঞ্চিত ষ্টালিংয়ের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। অপর পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য তাহাদের আত্মপক্ষ ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং তাহারও মূল্য ক্রমশঃ পড়িতেছে। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

আমদানী কমাইবার আদেশ দিয়াছেন। ফলে ব্রিটেনের বস্ত্র-শিল্পে, মোটর-গাড়ী শিল্পে বাহ্যিকের অসুবিধা হইয়াছে। ইহার পরিণাম বেকার সংখ্যার আরও বৃদ্ধি। কেজারী মাসে ব্রিটেনে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৯৩,৫০০তে। যদি এভাবে চলিতে থাকে তবে বৎসরের শেষে বেকারের সংখ্যা ১০,০০,০০০ দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

কিন্তু ব্রিটেনে যে বস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আজ আর কেবলমাত্র ব্রিটেনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নাই। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের পথে তাহা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মালয় ও ইন্দোনেশিয়াতে ইহার প্রথম আঘাত লাগিয়াছে রবার শিল্পের উপর। রবারই এই দুইটি দেশের প্রধান সম্বল। রবারের দাম ১৯৫১ সালে ছিল ৭৮ সেন্ট, আজ তাহা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৩৫ সেন্টে। রবার উৎপাদনও পৃথিবীর মোট প্রয়োজন অপেক্ষা প্রায় ৩,৫০,০০০ হইতে ৪,০০,০০০ টন বেশী হইবে। আর এই রবারই ঠালিৎ এলাকার ডলার রোকগারের অন্ততম উপায়। সুতরাং এখানেও মন্দার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাতে এই দুই রাষ্ট্রের মজুতের কমিউনিষ্টদের দলে ভিড়িয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে।

ভারত এবং পাকিস্তানেও শেয়ার মার্কেট ও বাজার দর মাঝিতে স্তব্ধ করিয়াছে। যদিও ইহা সাময়িক কাটাকাড়ির ফলিত তথাপি অন্তরালবর্তী কারণ স্বরূপে পাট ও তুলার মূল্য হ্রাসকেই মূলতঃ দায়ী করা যাইতে পারে। সিংহলেও রবার রপ্তানীতে পোলযোগ দেখা দেওয়ার আমদানীর উপর কড়া কড়ি সুরু হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে আপানে উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পায়। ইদানীং তাহাতে মন্দা দেখা দিয়াছে এবং গত মাসে বস্ত্রশিল্পে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আরজেন্টাইনাতে পশমের বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ার তাহারও অনুরূপ আমদানী কমাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। করাসী দেশেও বর্তমান শতকের তীব্রতম মুদ্রাস্ফীতি বাণিজ্য হ্রাসের দিকে ক্রমশঃ গড়াইতেছে।

এভাবে আন্তর্জাতিক আর্থিক বড়বড় সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অংশে ও আফ্রিকাতে অবস্থার এখনও কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে ইহাদের মধ্যেও অনেকে নানাপ্রকার নিষেধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য প্রস্তুতি চালাইতেছে।

বাহ্যি হটক, অর্থনীতিবিদগণ ইহাকে “স্থায়িত্ব অর্জনের সমস্যা” (stabilization crisis) বলিয়া “বাজার-বাটা” (slump) বলিয়াছেন। তাহাদের মতে ইহা কোরিয়ার যুদ্ধে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতির নিত্যস্থায়ী স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু বিপদের বিষয়

হইয়াছে, যে সকল বিধিনিষেধ সৃষ্টি হইতেছে সে সব নিষেধাত্মক নিয়ম-কানুন এই মন্দাকে পুনরায় মাগ্নির বাজারে পর্যাবসিত করিতে পারে। আবার দ্রুতগতিতে পুনরায় মন্দায়ও টানিতে পারে। অবশ্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, মেরুপ অনিশ্চয়তা বর্তমান শতকে সম্ভব নয়। কারণ বর্তমানে সকল রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার যথেষ্ট অধিকার আছে এবং মন্দা চরম রূপ পরিগ্রহ করার পূর্বেই তাহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে এবং বাজার আবার চড়িবে।

উক্ত পত্রিকার মতে বহির্বাণিজ্যে এই মন্দা কমিউনিষ্টদের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কনফারেন্স-এর বিনিয়াদ বেশ অসুচ-ভাবে গড়িতে সাহায্য করিবে। রাশিয়া ইহার সুযোগ পরিপূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং মনে হয় বিভিন্ন দেশের সহিত, বিশেষতঃ পূর্ব-পশ্চিমের সহিত যে বাণিজ্য এতদিন বন্ধ ছিল, তাহা পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হইবে। এইজন্য রাশিয়া বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত প্রতিনিধিদের নিজস্ব সকল কলকারখানা পরিদ্রমণ করিয়া দেখাইবে এবং সুবিধামত তাহাদের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করিবে।

সুন্দরবনে সরকারী সাহায্য

১৩ই চৈত্রের “আনন্দবাজার পত্রিকা”র এই পত্রটি প্রকাশিত হয় :

“বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবন অঞ্চলে মাননীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আপাততঃ ৬০,০০০ টাকা ধরমাসি সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।...সন্দেহজনকী ধান্যর বেতমঞ্জুর ইউনিয়নের ভাঙ্গা তুষখালী গ্রামের লোক কেন উপরোক্ত সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল বুঝিতে পারিতেছি না। তুষখালী ইউনিয়নেরও কেহই এইরূপ সাহায্যের বিষয় কিছু জানে না।

সুন্দরবন-ক্ষয়ক-দরদী ভূতপূর্ব সুন্দরবন অফিসার ত্রিমুখ্য যতীন্দ্রমোহন মজুমদার গত তাম্র দ্বায়ে উক্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া হৃতিক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রিপোর্ট দিয়াছিলেন—

People are idle. They have no work to do. Immediately some amount requires to be granted for test relief work in Kumirmari, Tushkhali of P. S. Sandeskhali and Jogesgonj of Hasnabad P. S. and modified rationing requires to be increased in each of them.

Unless this is done the people half-fed and starved will pass on Aswin somehow and from Kartic death by indirect or immediate cause of starvation will begin and the situation will go out of control. The stock of Government Pr. Golowns at Atapur and Tushkhali—although it is very small—should not be exported anywhere if Government want to save the lives of cultivators.

ইহাতে বেড়মজুর ইউনিয়নের কথা নাই। ইহারই উপর কালেক্টর সাহেব বাহাদুর আদেশ দিয়া সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই রিপোর্টের পরই আতাপুর গবর্নেন্ট গুদামের দাখল দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল।

তাহার পর পত্রলেখক দাখল বিতরণের ব্যবস্থায় স্থানীয় ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট ইত্যাদির সম্পর্কে বক্তব্য করিয়া ছিলেন। আমরা দেখি যে, জনহিতকর সকল কাজেই এইরূপ ঠিকার।

বেতার বিভাগের দুর্নীতি

কেন্দ্রীয় বেতার বিভাগের কর্তৃক মিঃ লক্ষ্মণনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। কারণ এখনও অজান্ত, যদিও এ সম্বন্ধে দিল্লী নগরীতে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। কয়েকটি নমুনা দিতেছি। কলিকাতায় “লাইফ” পত্রিকার ২০শে চৈত্রের সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ টি. ডি. চট্টোপাধ্যায় একজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, তাঁহাকে ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার করিয়া নামা বাজে কাজে নিযুক্ত করা হইতেছে। যথা, পারধান্য কৃত উঁচু হইবে তাহার মাপ, কলমিকানের ব্যবস্থা ও রাস্তা সারান। একটি মহিলা কেরানী পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন ও মাহিনা পাইতেন ৬০-৫-১২০ টাকা। এলিষ্টাণ্ট ট্রেনশন ডিরেক্টররূপে তাঁহার মাহিনা হইয়াছে ৪৮০-৬০-৭৫০। অন্য একটি মহিলা ৬০-৫-১২০ পাইতেন। এখন ৩৫০-৬০-৬০০ টাকা পাইতেছেন। সুনিয়মি, মিঃ লক্ষ্মণন “পণ্ডিত” লোককে ভর করিয়া থাকেন। তাহার ফলে অ-পণ্ডিতের সঙ্গে পড়িয়া তাঁহার অবঃপতন হইয়াছে।

রাজাজীর “অধঃপতন”

রাজাজী স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার “অধঃপতন” হইয়াছে। বিধান সভার সভ্যদের নিকট বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। বেতার বক্তৃতায় (২৬শে চৈত্র) যে অবস্থায় পড়িয়া মুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাহা বর্ণনা করেন।

ত্রিাধাপোপালাচারী বলেন, আইন সভার কংগ্রেসী সদস্যরা একবাক্যে দাবি করার এবং প্রবীণ সদস্যরা ক্রমাগত গীতাগীতি করিতে থাকায় হঠাৎ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহা নিম্প্রভভাবে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। উপেক্ষা করিলে আমি আত্মবিশ্বাসে নীতি প্রচার করিয়া আসিতেছি, তাহাই স্বীকার করা হইবে। কারণ আমার মতে দেশ বা সম্প্রদায়ের জন্য সকল কাজই সমান মহৎ।

এই কথাগুলির মধ্যে রস আছে, কুরুকুল-পিতামহ ভীষ্মদেবের স্তায় “অম-ধ্বংস” স্বীকৃতি আছে, বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় আছে ততোধিক। ভীষ্মদেবের ইচ্ছামুত্থার অধিকার

ছিল। রাজাজী সেই অধিকার লাভ করিয়াছেন জানিলে সুখী হইতাম। তাহা হইলে তিনি শতায়ু বা সহস্রায়ু হইয়া লোক-সেবা করিতে পারিতেন।

মালান সরকারের অপচেষ্টা

মাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গত ১ই চৈত্র এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, আগিল আদালত কর্তৃক পৃথক প্রতিনিধিত্ব আইন অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পদত্যাগ করাই এখন ডাঃ মালানের দলের যুগ্মকর একমাত্র উপায়।

আরও বলা হইয়াছে যে, আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে গণভঙ্গবাদে বিশ্বাসী খেতকার ও অশ্বেতকারদের দৃষ্টিতে সম-ভাবে এদেশের সর্বোচ্চ ন্যায়বিচারের ধ্যান ও সুনাম অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে। একথা গবর্নেন্টকে বেশ কড়া-ভাবেই সমঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, লোকের মনোভাব গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া ধৃচ্ছভাবে বর্ণবৈষম্যমূলক আইন প্রয়োগের ক্রমতা তাহার নাই।

পৃথক প্রতিনিধিত্ব আইনের বিরোধিতার জন্য গঠিত ভোটাধিকার কর্মপরিষদ অস্বরূপ এক বিবৃতিতে কৃষক ও অশ্বেত জাতিগুলি আদালতের এই জয়ে নিশ্চিত না হওয়ার জন্য সন্তর্ক করিয়া দিয়াছেন।

মাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যত দিন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যমূলক আইনের অস্তিত্ব থাকিবে এবং অশ্বেতকার জাতিগুলিকে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে, তত দিন “দক্ষিণ আফ্রিকা রক্ষা কর” ধ্বনি তাহাদের নিকট মূল্যহীনই থাকিবে।

লণ্ডনের ধবরে প্রকাশ, সুপ্রীম কোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে পৃথক প্রতিনিধিত্ব আইন অবৈধ ঘোষণা করার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার গুরুতর শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কেপটাউন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আদালতের এই সিদ্ধান্তে জনসাধারণের মধ্যে গভীর চাকল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে তাহার মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং অবিলম্বে গবর্নেন্টের পদত্যাগের দাবি ক্রমশঃ দোরালো হইয়া উঠিতেছে। প্রধানমন্ত্রী মালান এখন চেষ্টায় আছেন আদালতের ক্রমতা ব্যাহত করার জন্য এবং এই দুর্কার্যে তাহার প্রধান উপদেষ্টা কেব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আইন-অধ্যাপক।

মালানের এই অপচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ ব্রিটেনে, কানাডায় এবং অন্যান্য বহু দেশে হইয়াছে। মার্কিন কংগ্রেসও কড়া সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু মালান ও তাহার দল এখন বর্ণবৈষম্যরূপ ভূতগ্রস্ত। তাহার এখন দেশের ও বিদেশের জনমত অগ্রাহ্য করিতে বহুপনিকর।

টিউনিসিয়া

টিউনিসিয়ার নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শালেহ-দীন-বাহুচে ৩১শে চৈত্র নুতন শাসনভুক্ত বিবি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন।

করাসী রেসিডেন্ট-জেনারেলের সম্মতি পাওয়া গেলে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা গঠন সংক্রান্ত সমস্তার সমাধান হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

প্রস্তাবগুলি সংযুক্ত ফ্রান্স-টিউনিসিয়ান কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হইবার পূর্বে প্রকাশিত হওয়া রেসিডেন্ট-জেনারেল এতদিন পছন্দ করেন নাই।

প্রস্তাবিত সংস্কার সাধনের মূল বিষয়গুলি হইতেছে এই-রূপ:—(১) অবিলম্বে সরকারী কর্মচারীদের আদেশ প্রকাশিত হইবার পূর্বে করাসী রেসিডেন্ট-জেনারেল সেগুলি অনুমোদন করিবেন না। বাজেট ও অত্যন্ত আর্থিক ব্যাপারে যে-সকল আদেশ জারী করিবেন, সেগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্বে রেসিডেন্ট-জেনারেল দেখিয়া দিবেন—কিন্তু তিনি সেগুলি বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন না। জটিল করাসী চেয়ারম্যানের অধীনে করাসী ও টিউনিসিয়ানগণকে লইয়া যে এডমিনিষ্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে, উহার নিকট তিনি আপীল করিতে পারিবেন। বের নির্দেশ বাতিল করিবার ক্ষমতা এই ট্রাইব্যুনালেরই থাকিবে। ট্রাইব্যুনালের অতিমত না জানা পর্যন্ত বের নির্দেশ কার্যকরী হইবে না।

(২) সমগ্র টিউনিসিয়ার ক্ষেত্রে যে আইন-পরিষদ গঠিত হইবে, উহাতে সর্বাধিক ৩০ জন সদস্য থাকিবেন। উক্ত পরিষদ বের নির্দেশ রচনার কার্যে সাহায্য করিবেন। (এতদিন বের এই কাজটি একাই করিতেন।)

(৩) অর্ধেক সংখ্যক করাসী ও অর্ধেক সংখ্যক টিউনিসিয়ান সদস্য লইয়া একটি নুতন অর্থনৈতিক পরিষদ গঠিত হইবে।

বাজেট ও অত্যন্ত অর্থনৈতিক নির্দেশ জারী হইবার পূর্বে পরিষদ সেগুলি আলোচনা করিয়া ফেলিবেন।

(বর্তমানে ৭ জন করাসী ও ৭ জন টিউনিসিয়ানকে লইয়া যে গ্রাও কাউন্সিল গঠিত রহিয়াছে, উহার কাজও অনেকটা এইরূপ।)

(৪) এত দিন কেবলমাত্র টিউনিসি়ে স্থায়ী পরিষদ ছিল, কিন্তু অবিলম্বে গুরুত্বপূর্ণ সকল শহরেই স্থায়ী পরিষদ গঠিত হইবে। যুগ্ম শহরে অর্ধেক করাসী ও অর্ধেক টিউনিসিয়ান সদস্য লইয়া পরিষদ গঠিত হইবে।

(৫) অসামরিক সরকারী চাকরীতে আরও অধিক সংখ্যক পদে টিউনিসিয়ান নিযুক্ত করা হইবে। (এত দিন

তাহারা নিম্নপদস্থ ও মধ্যবর্তী চাকরীর এক-তৃতীয়াংশ ও উচ্চ-পদস্থ চাকরীর অর্ধেক পাইত)।

(৬) এই সকল শাসন সংস্কার বাহাতে স্থায়ী হইবার সুযোগ, পায়, ভক্ষণ্য আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে আর কোন পরিবর্তন করা হইবে না।

নুতন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ

নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শালেহ-দীন-বাহুচে মন্ত্রিসভা গঠনে ব্যস্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

যদি তাহার চেষ্টা সফল হয়, তবে বের হস্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে নুতন মন্ত্রিসভার হস্তে কার্যভার অর্পণ করিবেন।

টিউনিসিয়ার জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাসিত করার প্রতিবাদে গতকাল্য সাধারণ ধর্মঘট অহুষ্ঠিত হয়। অন্য পুনরায় সাধারণ কার্যকর্ম আরম্ভ হইয়াছে। সকল সাত্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই অবস্থাকে ভিত্তি না করিয়া কোন সংস্কার সাধন করিতে চায় না। ব্রিটিশ শাসনের সময় ইহাই ছিল ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা। তার কলে বড়টা ত্যাগ করিলে চলিত তার অনেক বেশী ব্রিটেনকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। করাসী সাধারণতন্ত্রকেও আফ্রিকা ও এশিয়ার তাহা করিতে হইবে। কেবল কেন্দ্রীয় বিধান সভার দু'জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না।

ভারতরাত্রি ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ

মিঃ জাকরুজা খান ৮ই চৈত্র করাসী পার্লামেন্টে বলিয়াছেন, “আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীর সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদের মনোমালিন্য চলিতেছে এবং আমরা আশাপ-আলোচনা দ্বারা ইহার মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি।” নিকট-তম প্রতিবেশী বলিতে তিনি ভারতকেই বুঝাইতেছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

পার্লামেন্টে প্রস্তোত্তরের সময় তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, “একমাত্র আফগানিস্থান ছাড়া সাধারণ-ভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত এবং বিশেষভাবে মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সহিত আমাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত হৃদয়তাপূর্ণ।”

আফগানিস্থান সংক্রান্ত স্বতন্ত্র একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া জাকরুজা খান বলেন, “আফগানিস্থান সাধারণভাবে পাকিস্থানীদের এবং বিশেষভাবে পাকিস্থানী ব্যবসায়ীদের মানানিষ অনুবিধার ফেলিতেছে এবং তাহাদের উপর কতক-গুলি বিবিনিষেধ আরোপ করিয়াছে। ইহাদের আফগানিস্থানে প্রবেশ, পুণঃপ্রবেশ এবং অবস্থানের অস্থমতিপত্র দানের ব্যবস্থা এমনই হ্রস্ব করা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানীদের গণক অনুমতি পাওয়াই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।”

সাধারণভাবে এই বিরুদ্ধি সত্য। কিন্তু গোড়ার কথা পাকিস্থানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড সিংহাছেন। যে বর্মোদিয়ানার জন্য মুসলমান হইয়াও তাঁহার আহুদদী সম্প্রদায়কে ভুগিতে হইতেছে, তাঁহার জন্য ভারত-পাকিস্থানের সৃষ্টি ও বিরোধ, লক্ষ লক্ষ মরনারীর প্রাণকর, ধনকর, সম্মানের হানি। ইহা বন্ধ না হইলে কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না।

সোনারপুর-আড়াপাঁচ পরিকল্পনা

সোনারপুর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যানিং পর্যন্ত রেল-লাইনের দুই পাশে বিশাল জমি গত ১৪।১৫ বৎসর বন্ধ জলের দ্বারা অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই জমির পরিমাণ ১০৫ বর্গমাইল। এই অঞ্চল সোনারপুর, বাকুইপুর এবং ক্যানিং থানার অন্তর্গত। দীর্ঘকাল চেষ্টার পর এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত-সরকারের সাহায্যে এই বিশাল জমি হইতে জল অপসারণের জন্য একটি সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত হইলে শুধু এই অঞ্চলের মর সমগ্র কলিকাতার খাজের অভাব কথকিং লাঘব হইবে।

সেচ পরিকল্পনাটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্য্যয়ে পিয়ালী নদীর পশ্চিমাংশে জল অপসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অংশের পরিধি ৫৭ বর্গমাইল। বিজাবরী নদী মন্দিরা ষাওয়ার এই অঞ্চলের জল নিষ্কাশনের পথ একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্য্যয়ে পিয়ালী নদীর পূর্বাংশের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহার পরিধি ৪৮ বর্গমাইল। বর্তমান বৎসরে প্রথম অংশের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্য্যয়ের কাজ আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্তমান মূল পরিকল্পনাটি এইরূপ :

সোনারপুরের জলা হইতে একটি বাঁল কাটা হইবে। ইহা সোকা সিরা আউলীপুরের জলার সহিত যুক্ত হইবে। আউলী-পুরের জলা হইতে আরম্ভ করিয়া আর একটি বাঁল সোকা উত্তর ভাগের পাম্পিং স্টেশনের সহিত যুক্ত হইবে। জমি জরীপ করিয়া দেখা গিয়াছে, এই দুইটি অঞ্চল সর্বনিম্ন অঞ্চল। এই মূল বাঁলটির সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট ছোট বাঁলের সংযোগ থাকিবে। পাম্পিং স্টেশনে ৪টি বিরাট বৈদ্যুতিক পাম্প (Heavy duty Electrically operated pump) কাজ করিবে। পাম্প বলাইবার জন্য প্রাথমিক কাজ শেষ হইয়াছে। আশা করা যায় বর্তমান বৎসরের শেষভাগ হইতে পরিকল্পনাটি কার্যকরী হইবে। কলিকাতার ইলেকট্রিক সান্দ্রাই কলিকাতা হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করিবে। এই পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করিবার জন্য ভারত-সরকার ৪৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা

৭৭। মোট ৫৭ বর্গমাইলের মধ্যে ৩৬.৫ বর্গ মাইল জমির জমি। সরকারী হিসাব মতে এই জমিতে বার্ষিক ১৭,৮০০ টন ধান হইবে। ইহার মূল্য প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে, ৪৪ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা হইতে বার্ষিক ৪৪ লক্ষ টাকার শত পাওয়ার যথেষ্ট সভাবনা রহিয়াছে।

সমগ্র পরিকল্পনাটি শেষ হইলে ৭২.৫ বর্গমাইল জমি জল-যুক্ত হইবে, ইহা হইতে বার্ষিক ২৯,১০০ টন শত পাওরা যাইবে, যাহার মূল্য আনুমানিক ৭০ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ জনশিক্ষা সমিতি

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫০-৫১ সালের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। যে আর দেখান হইয়াছে তদনুসারে ব্যয় প্রায় ৬ হাজার টাকা বেশী। সম্পাদকবর ত্রিবিলাস যুগোপাধ্যায় ও জীলজিতমোহন যুগোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, সরকারী সাহায্য ৩১শে মার্চে না পাওয়ার তাহাদের এরূপ করিতে হইয়াছে।

সমিতির অধীনে প্রায় ৩৪টি স্কুল পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে অধ্যাপি বিস্তারিত। পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহের পূর্বতম জেলা জজ মিঃ বিহারের উৎসাহে তাহা সম্ভব হইতেছে। প্রায় ১৫ বৎসর কার্য করিয়া সমিতি আশাশ্রুত সাহায্য পাইতেছে না এবং নিজের কাছের বিস্তার করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি আমাদের এক বন্ধু বাটানগর গিয়াছিলেন। দীপমালী ‘পরিদ্রা’ও, চারদিকের গ্রামাঞ্চল যে ভিগিরে ছিল সে ভিগিরেই থাকিরা যাইতেছে।

কেন এরূপ হয়, তাহার অন্বেষণ করা কঠিন নয়। আমরা তাহার ফল দেখিবার জন্য ব্যর্থ হইয়া রহিলাম। সমিতির সম্পাদকবরও তদন্ত করিলে ভাল হয়। বিলাসবাহু ব্যাপটিষ্ট মিশনের একজন কর্তাব্যক্তি, সলিডবাবুর উপর উত্তর কলিকাতার দুই-তিনটি শিলা প্রতিষ্ঠানের তার আছে। তিনি বিজ্ঞান-ভিক্টু এই ছদ্মনামে অনেক পুস্তকের লেখক। তবুও এরূপ ব্যক্ত লোকেই বেশী কাজ করে ও করিতে পারে। আমরা সমিতির সাফল্য কামনা করি।

“এই শান্তি আন্দোলন”

উপরোক্ত শিরোনামায়ুক্ত তের পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসার্ড ব্লক বিতরণ করিতেছেন। লেখক ৩ জনিল রায়। ইহার মধ্যে নৃত্যনয় কিছু নাই। বর্তমান শান্তি আন্দোলনের যে ইতিহাস আমরা দেখিতে পাই তাহা লেখকের মতে মাত্র চারি বৎসর কালের।

“মকৌ বেড়িও মারকত ঠালিন ৩০শে জাহুয়ারী ১৯৪৯-এ এক রুশ-আমেরিকা যুক্ত যুদ্ধবিরোধী ঘোষণার প্রভাব করেন। ঠালিনের এটা করবার কারণ হ’ল এই যে তখন রাষ্ট্র-পেঙ্গির বিরুদ্ধে উত্তর-অতলাত্তিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-হয়।

৪ঠা এপ্রিল (১৯৪৯) চুক্তি স্বাক্ষর হ'ল এবং রাষ্ট্রা-গোষ্ঠীকে বিধে এক আমেরিকা-ভাবেদার গোষ্ঠীর চক্র রচনা হয়ে গেল। রাষ্ট্রার বিরুদ্ধে এটা আমেরিকার একটা প্রকাণ্ড ঠাঁও। রাষ্ট্রা দেখল বিশ্বময় একটা আমেরিকাবিদ্বেষী প্রচারের বড় না ভুলতে পারলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব এবং পৃথিবীতে মিত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। রাষ্ট্রা সমাজবাদী রাষ্ট্র, স্বভাবতই বর্তমান দুনিয়ার তার প্রতি ও তার আদর্শের প্রতি বহু মাহুষের ও রাষ্ট্রের সহানুভূতি রয়েছে। সেই সহানুভূতিকে ধরে আমেরিকা-বিদ্বেষের বীজ ছড়াতে ও সর্বত্র ক্রম-সমর্পনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। আমেরিকা এটম বোম্বার কথা জাহির করেছে, তাকে যুদ্ধবাজ মানব বলে জনমত গঠন সোজা হবে। শুধু হ'ল শান্তি আন্দোলন, রাষ্ট্রা শান্তি চায়, ঠালিন শান্তিহৃত, আর আমেরিকা যুদ্ধবাজ।

এপ্রিল মাসে (১৯৪৯) প্যারী শহরে শান্তি কংগ্রেস ডাকা হ'ল। সেখানে পৃথিবীর মানাযান থেকে কম্যুনিষ্ট দলগুলি প্রতিনিধি ও নিরপেক্ষ চিন্তামানবদের জড় করবে এবং আমেরিকা-বিরোধী প্রচারের আওরাজ তুলবে; ফরাসী সরকার এটা বুঝে কয়েক জন কম্যুনিষ্ট নেতাকে ছাড়পত্র না দেওয়ার প্রাপ শহরে একটি বিকল্প শান্তি-কংগ্রেসও করা হ'ল। প্যারী শান্তি কংগ্রেস এক হারী বিশ্বশান্তি সংসদ গঠন করল যার প্রকাণ্ড অধিবেশন হ'ল ১৯৫০ সনের মার্চ মাসে ঠেকহলম শহরে। এই অধিবেশনে একটা বিশ্বশান্তির আবেদন হয় যা এখন ঠেকহলম আবেদন নামে বিখ্যাত হয়েছে।...এর পর গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) প্রাত্যহর প্রতিনিধির কাছে ঠালিন এক বিবৃতিতে বিশ্বশান্তির আবেদনের সঙ্গে উনোকে আমেরিকার স্বার্থবাহী যন্ত্র বলে নিন্দা করেন।

এর পর হয় বিশ্বশান্তি-সংসদের বিখ্যাত বার্লিন অধিবেশন (২১-২৫ ফেব্রুয়ারী), আটারট দেশের কম্যুনিষ্ট সমর্থকেরা এখানে দাবী ওঠায়—(১) পাঁচ বড় রাষ্ট্রের (আমেরিকা-ব্রিটেন-রুশ-ফ্রান্স-চীনের)—মধ্যে একটা পক্ষশক্তি চুক্তি চাই। এরা বলুক, 'আমরা যুদ্ধ চাই নে', (২) কোরিয়া-চীন-জাপানী ও জাপ-সন্ধির ব্যাপারে উনো ও আমেরিকার নিন্দা করে এবং প্রকারান্তরে রুশ পররাষ্ট্র নীতিকে সমর্থন করে প্রস্তাব দেওয়া হয়। চৌক জন সমস্ত সহ এক প্রতিনিধি দল এই সব প্রস্তাব ও শান্তি দাবী নিয়ে উনোতে পেশ করবে বলেও স্থির হ'ল। তার পরে এই শান্তি প্রস্তাবের সমর্থন জানার রাষ্ট্রার উচ্চতম সোভিয়েট (৬-১২ মার্চ, ১৯৫১) ফ্রেমলিন বৈঠকে। বার্লিন পক্ষশক্তি চুক্তি এবং ঠেকহলম আবেদন, এই দুটি অবলম্বন করে শান্তি আন্দোলন পৃথিবীর সব দেশেই চলছে কম্যুনিষ্ট দলের নেতৃত্বে। তারভেও বহু শান্তি সম্মেলন হচ্ছে ও হবে। কম্যুনিষ্ট পার্টির এটাই এখন মুখ্য প্রোগ্রাম।...

এই কথাগুলি পাঠ করিলে প্রথম মনে হয় যে, আমেরিকা ও "রাষ্ট্রা" ছাড়া আর কোন রাষ্ট্র শান্তির জড় ব্যঞ্জন নয়। তার পর রাষ্ট্রার ইতিহাসেই টলষ্টয় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ প্রায় ১২৫ বৎসর ঐ দেশের লোকে কত দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াছে। ঠালিন বরং "বিপ্লব চিরজীবী হউক" ধরির অতন্তর পৃষ্ঠপোষক। "পাঁতি" কম্যুনিষ্টগণের ইতিহাস-জ্ঞান আর একটু একদেশদর্শিতাহুই না হইলে জগতের অনেক কল্যাণ হইবে।

চিনির কথা

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে শর্করা-শিল্পের জন্ম হইলেও ইহা ভারতের দ্বিতীয় প্রধান শিল্পে পরিণত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। আজ ভারত একক দেশ হিসাবে বিশ্বের প্রধান চিনি-উৎপাদক দেশ।

ভারতে ৪০ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু মোট উৎপন্ন ইক্ষুর শতকরা মাত্র ২২ ভাগ মাত্রাইয়ের জড় চিনিকলে চালান দেওয়া হয়; শতকরা ৫৫ ভাগ শুভ প্রস্তুত করিতে লাগে, বাকী ২৩ ভাগ খাদ্যসার চিনি প্রস্তুত করিতে এবং যুখে চিবাইয়া খাইতেই ব্যয় হইয়া যায়।

ইক্ষুর সরবরাহ যথেষ্ট না পাওয়ার ভারতের অনেকগুলি চিনিকলই উৎপাদন-কর্মভার চেয়ে অনেক কম উৎপাদন করিয়া থাকে। ভারতের চিনিশিল্প উন্নয়নের জড় বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেক সাহায্য করিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশকে যদি চিনির চাহিদা পূরণে স্বাবলম্বী হইতে হয় তবে ইক্ষুচাষের পদ্ধতি এবং উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইক্ষু উৎপাদনের হার একর প্রতি মাত্র ১৪ টন।

তবে মাত্রাজে ৩০ হইতে ৩৫ টন এবং বোম্বাইয়ে কোম কোম স্থানে ৪০ হইতে ৪৫ টন ইক্ষুও উৎপন্ন হইয়া থাকে। বুঝি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উত্তর ভারতে অধিকাংশ চিনিকল স্থাপিত হইলেও উত্তর ভারতে ইক্ষু উৎপাদনের হার একর প্রতি মাত্র ১৪ টন। চিনিকলগুলি ক্ষুদ্র উৎপাদকের সহিত চুক্তি করিয়া ইক্ষু সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। শর্করা-শিল্পের হ্রস্বলভম দিক হইতেছে কৃষি অর্থাৎ ইক্ষু উৎপাদনের হার।

কোরেবাটোরে উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু জন্মান গিয়াছে। অপর কয়েকটি কেন্দ্রেও ইক্ষু উৎপাদনের গবেষণার বিপ্লব আনিয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক কিছু করিতে হইবে।

কোরেবাটোরে গত চল্লিশ বৎসর ধরিতা গবেষণা চালাইয়া তবে উন্নত ধরণের ইক্ষু জন্মান সম্ভব হইয়াছে। আজ-কাল শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ ভাগ জমিতে এই জাতের ইক্ষু আবাদ করা হইতেছে। ১৯৩১ সালে ভারত-সরকার কাম-পূরের হারকোট বাটিলার টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউটের ভার

এহণ কয়েম এবং উহা সম্ভারণ করিয়া বর্ডমামের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সুরগার টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করেন।

চিনি উৎপাদন ও চিনির রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষা করা ছাড়াও এখানে চিনিশিল্প-জাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালিত হয়। এখানে চিনিশিল্পের বাণিজ্যিক বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। চিনিফল এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করা হইয়া থাকে।

১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটি গঠিত হইবার পর ইন্সটিটিউট অব সুরগার টেকনোলজির ভার এই কমিটির উপর অর্পণ করা হয়। ইক্ষু কমিটির কাজ হইতেছে ইক্ষু উৎপাদন, চালান এবং ইক্ষুজাত দ্রব্যাদির উন্নয়ন সাধন করা।

চিনি উৎপাদন শুদ্ধ শুদ্ধবিলাই ইক্ষু কমিটির আয়ের প্রধান স্রোত। ভারতে উৎপন্ন সাধা চিনির হ্রদর প্রতি এক আনা হারে এই শুদ্ধবিলাই জমা হয়।

এই শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইক্ষু উন্নয়নের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার দ্বারা ভারত-সরকার পৃথক ভাবে ৭৫ লক্ষ টাকা এবং লক্ষ্যে একটি আধুনিক শর্করাশিল্প ও ইক্ষু-গবেষণা মন্দির স্থাপনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ভারতে কেন্দ্রীয় শর্করা গবেষণা-মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা এই প্রথম করা হইল, এমন নয়। প্রথম ভারতীয় ইক্ষু কমিটি ১৯২০ সালে এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা-মন্দির স্থাপনের সুপারিশ করেন।

লক্ষ্যে ক্যাণ্টনমেন্টের ভিত্তিতে যে সাময়িক ঘাসের খামার রহিয়াছে সেখানে গবেষণা-মন্দির স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; এখানে জমির পরিমাণ ৫৫৫ একর এবং উহার দাম ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।

খামারটির অবস্থান খুবই সুন্দর। সর্দা খালটি ইহার ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। এখানকার মাটিও ইক্ষু উৎপাদনের উপযোগী। ইক্ষুর আবাদ উঠিয়া গেলেও বান, গম, ডাল ও তৈল-বীজ আবাদ করা চলে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতের খাত ও কৃষি সচিব শ্রী কে. এম. মুন্সী তত্ত্বকে শর্করাশিল্প ও ইক্ষু গবেষণা-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আজ এই শিল্পের কল্যাণে লক্ষ লক্ষ রাসায়নিক ও জৈবিক জীবিকা উপার্জন করিতেছেন। কৃষি-শিল্পরূপে ছোট ছোট কারবার প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের লোকের চিনির প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে, এই কথা অনেককে বলেন। এই বিষয়ে অজ্ঞাত কথাও জানা প্রয়োজন। গত ১৮-১৯ বৎসর কালের চিনি দেশের লোকের মামাভাবে কি সাহায্য পাইয়াছে তার সম্বন্ধে সূতন করিয়া অসুস্থমান আবশ্যক। ইংরেজ আমলের একজন অর্থসচিব এগ সাহেব প্রায়ই বলিতেন যে, ১৯০২-৩০ হইতে

বঙ্গশিল্প ও চিনিশিল্প ২৭২৮ কোটি টাকা পাইয়াছে। স্বপ্ন জাতীয় চিনির মূল্য ছিল দু'তিন আনা তখন আমরা দিয়াছি পাঁচ আনা। তারপর যুদ্ধ বাধিলে বাহা বটরাছে তাহাও প্রত্যেক অভিজ্ঞতার ফল। ১৯৪৮-৪৯ সালের শরৎকালে, পুষ্কার অব্যবহিত পূর্বে বাহা বটরাছিল, তারপর এই শিল্পের জন্য কাহারও দরদ থাকিতে পারে না। যুদ্ধের সময়ে, ইংরেজের আমলে, ইংরেজ শিল্পপতিগণের শোষণের সময়ে আমরা আট আনা মূল্যে চিনি কিনিয়াছি। আজ কিনিতেছি গবেষণা-কেন্দ্রের দোকানে চৌক আনা নয় পাই-এ, বাজারে এক টাকা বা সত্তর আনার। বাহাই হটক, সূতন প্রায় ইক্ষু-চাষের ফলে চিনি যদি সত্তা হয় তবে উত্তম কথা।

বাঙালী ভৌগোলিকের সাফল্য

১৯শে চৈত্র কালিম্পং হইতে নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে :

“পশ্চিমবঙ্গ গবেষণা-কেন্দ্রের উদ্যোগে তিন বৎসর গবেষণা চালাইবার পরে জনৈক ভারতীয় ভূগোলতত্ত্ববিদ হিমালয়ের পূর্বকালে বরফ-যুগের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার মতে এক কোটি বৎসর পূর্বে এই যুগ বর্তমান ছিল। এই সময়ে উদ্ভিদ-জীবন বা মানব-জীবনের অস্তিত্ব ছিল না।

আগামী বৎসরে এই গবেষণা সমাপ্ত হইবে। তিনতা মন্দির পূর্বদিকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের, দুটানে কিয়দংশ এবং ভিত্তি সীমান্তস্থিত কালিম্পংয়ের পার্শ্বভাগে এই গবেষণার কেন্দ্র-স্থল।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং বিশ্বের অজ্ঞাত স্থান হইতে এই বরফ-যুগের নিদর্শন বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু হিমালয়ের এই অঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। জার্মান ও ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদগণ কাশ্মীরস্থ হিমালয় অঞ্চলে কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রী এন্. আর. কর এই অঞ্চলে বরফ-যুগের বহু নিদর্শন পাইয়াছেন।

এইরূপ গবেষণার দ্বারা চলিলে আমরা সুখী হইব। অসুস্থমান ও গবেষণা সকল বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। উহা ব্যতীত বিজ্ঞানের চর্চাই বুধ। এতদিনে এই সত্যের উপলব্ধি আমাদের হইতেছে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও নৈশ-বিদ্যালয়

প্রথম দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি ২২এ, সুন্দারন বসাক ষ্ট্রীটে ও দ্বিতীয়টি উক্ত ষ্ট্রীটে ৫নং ভবনে প্রতিষ্ঠিত। উভয়েই বড়বাজার অঞ্চলের বস্তির অধিবাসিদের শারীরিক ব্যাধি দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং মানসিক স্বাস্থ্য আনয়নেরও চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতার জিন-লক্ষ-মাগরিকের মধ্যে এক

বিয়ার্ট অংশ বস্তির অধিবাসী। সুতরাং পৌর-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গুরুত্ব হইয়া পড়িতেছে। মানব-শ্রীতিসম্পন্ন নাগরিকই এই ভার বহনে সমর্থ।

সামান্য ১৮৫০ টাকার তহবিল লইয়া সেবা-কার্য্য চালান লহক নয়। তবুও পরিচালকবর্গ অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা আরম্ভ করেন। সমিতির ৫ম বর্ষের (১৩৫৭ বঙ্গাব্দের) কার্য্য-বিবরণী হইতে এই তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কার্য্যনির্বাহক সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বোষ বেদান্ত চিন্তামণি। ১৩৫৭ সনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ পদ্মপতি জট্টাচার্য্য, বি-এল। এ বৎসরের সভাপতি ত্রিগণেশচন্দ্র দাশ ঐ অফিসের এক জন সমাজপতি। স্থানীয় চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে বধ্যাশ্রয় সাহায্য করিতেছেন। এরূপ সেবা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্দ্ধিত হউক।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিল ও নন্দকুমার

“হিমালয়” পত্রিকার ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় নিম্নোক্ত বিবরণটি পাঠ করিয়া অতীত যুগের দুঃখময় যুতি মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। হেষ্টিংসের শোষণের কলে পলাশীর যুদ্ধের দশ বৎসরের মধ্যে “হিমালয়ের মধ্যভাগে”, বাংলা-বিহারের ভদ্রানীতন জনসংখ্যা প্রায় তিন কোটি মরনারী এক কোটিতে দাঁড়াইল। ১৯৪২-৪৩ সালের ছয় কোটি মরনারীর মধ্যে পঁয়ত্রিশ লকের যত্না সেই ভুলনার নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। হেষ্টিংসের ময় বৎসরব্যাপী বিচার—বিলাতী বাগ্মিতা ও সহক মানব-শ্রীতির পরিচয়ে পরিপূর্ণ। বার্ক, শেরিডন, ফক্স-এর বক্তৃতা ইংরেজী সাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ।

এই দুইটি হুজুপা দলিল হইতে জানা যায়, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে মহারাজা নন্দকুমার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন লহ করিতে পারেন নাই। এই দেশপ্রেমিক তেজস্বী ব্রাহ্মণ ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। পরিণামে, ওয়ারেন হেষ্টিংসের চক্রান্তে তাঁহাকে কাশিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল।

[CALCUTTA COUNCIL. At a Select Committee held on the 24th July 1759. Fort William]

২৪শে জুলাই ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট উইলিয়ামের সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব। উমরা রবার্ট ক্লাইভ সভাপতি। যেস্তর বেবলষ্ট এবং হলওয়েল সাহেবদ্বয়ের উপস্থিতিতে কলিকাতা কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল :

নবাব মিরজাকর আমাদিগের সহিত প্রতিক্রিয়া করিয়াছেন যে, আমাদের বাণিজ্যকৃষ্টির সাহেব এবং বাঙালী গোমস্তাগণের কাকর্ষ লব্ধে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না, এবং

বাণিজ্যকৃষ্টির সাহেব ও গোমস্তাগণ আমাদিগের এই বন্দী-মোদিত ও ভ্রাসঙ্গত বাণিজ্যের ত্রিষ্করি করিবার নিমিত্ত এতদেশীয় নেটভদের উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন। কিন্তু নন্দকুমার নামক একজন ধূর্ত ব্রাহ্মণ সর্বদাই অত্যন্ত পোষোষণ উপস্থিত করিতেছে। নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও সে গোমস্তাগণ করে। রেশমকুঠিতে যে সকল ভণ্ডবায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের নিকট হইতে দাখন গ্রহণ করে তাহাদিগের ঘরবাড়ী লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে কিকিং শাসন করিতে আরম্ভ করিলেই এই ধূর্ত ব্রাহ্মণ নন্দকুমার কোম্পানীর কর্মচারীদেরকে বাধা দিতে আরম্ভ করে। এই ব্যক্তি সর্বদাই চীৎকার করিতেছে যে, আমাদের বাণিজ্যকৃষ্টির সাহেব কর্মচারীগণ ও বাঙালী গোমস্তাগণ ভণ্ডবায়দিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার ও নিষ্ঠুরাচরণ করে। ইহার চীৎকার নিবন্ধন আমাদের ভ্রাসঙ্গত বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে। এই ব্যক্তি সত্য সত্যই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরম শত্রু।

At a Select Committee held at Fort William, the 10th September 1763.

১০ই সেপ্টেম্বর ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট উইলিয়াম সিলেক্ট কমিটির অধিবেশন। সভাপতি : যেস্তর বাজিটার্ট। উপস্থিত সভ্যগণ : জন কার্ণাক, উইলিয়াম বিলারস, যেস্তর ওয়ারেন হেষ্টিংস, রায়ডলফ মেরিট, হিটওয়ার্টস্।

আমরা অপরিজ্ঞাত নহি যে বুদ্ধ নবাব মীরজাকর বার্কাক্য প্রযুক্ত, এখন আর রাজকার্য্য শাসনের একেবারেই ক্ষমতা নাই। কিন্তু তাঁহাকে সুবেদারের পদ প্রদান করিলে অপরিমিত অর্থসঞ্চয় হইবেক, এইরূপ অর্থসঞ্চয়ের সুযোগ ভ্রাসঙ্গত-রূপে কখনও পরিভাগ করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাকে সুবেদারের পদ প্রদান করিলে রাজকার্য্যের তৃণমূল্য নিমিত্ত এক জন উপযুক্ত লোককে ইহার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা উচিত। আমাদিগের কাশিমবাজার রেশমকুঠির প্রধান গোমস্তা অর্থাৎ দেওয়ান বাবু ছিদামচন্দ্র বিশ্বাস ভিন্ন বদদেশে আর দ্বিতীয় লোক নাই যে, তাহাকে বন্ধের সুবেদারের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। বাবু ছিদামচন্দ্র বিশ্বাসকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের যে ক্রমে উন্নতি হইতে থাকিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। দেশীয় লোকদের ইনি যম স্বরূপ এবং কোম্পানীর ভাষা পাওনা আদায় করিতে ইঁহার যোগ্য আর কেহ নাই। ছিদাম বাবু সংস্কৃতে এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। পারস্ত ভাষা বিলক্ষণ জানেন। তিনি বদদেশের একটি প্রসিদ্ধ এবং অতি সম্ভ্রান্ত অতিজ্ঞাত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই মহাত্মার হস্তেই আমরা বিশ্বাস করিয়া পূর্বদার রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিতে পারি। অত কোন

লোকের উপর এরূপ অসহ্যুচিত চিন্তে বিবাহ স্থাপন করা যাইতে পারে না।

কিন্তু বৃদ্ধ মীরজাফর নন্দকুমার নামক এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এত ভালবাসেন যে তিনি নন্দকুমারের নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন। নবাবের অভ্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে নন্দকুমারকেই স্বীয় দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি অতিশয় অবিদ্যাসী এবং ধূর্ত। সে সর্বদাই ঈর্ষা ইতিয়া কোম্পানীর ভারসদত্ত বাণিজ্যে ক্রমাগত ব্যাঘাত প্রদান করিতেছে। এই ব্যক্তি ইংরেজদিগের পরম শত্রু কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। ইহাকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলে নবাব মীরজাফর আমাদের আরও তিন লক্ষ টাকা অধিক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই টাকা দুই চার পাঁচ টাকা নহে, তিন লক্ষ টাকা। সুতরাং আমরা কোম্পানীর সভ্যগণ নিত্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও নবাবের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। এবং নগদ দত্ত বদন্ত তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্তি নিবন্ধন নন্দকুমারকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে বৃদ্ধ নবাব মীরজাফরকে আমাদের পবিত্র জহ্মতি প্রদান করিতেছি।

কিন্তু এই বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত যে ধূর্ত নন্দকুমারের কাজকর্মের উপর কোম্পানীর মেম্বরদিগের সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং এই দেশের মদসার্ব এবং ভারের অমরোবে আমরা ইহাই অবধারণ করিয়া রাখিলাম যে ভবিষ্যতে দেওয়ানের পদ শূন্য হইলে বাবু হিদামচন্দ্র বিখাসকে এই পদে নিযুক্ত করা যাইবে।

বাংলার অন্যতম জাতীয় খেলা

বাংলার “সাধারণীতে” (পাক্ষিক পত্রিকা) পশ্চিমবঙ্গ কপাটি কেভারেশনের সম্পাদক ত্রিপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই খেলা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ দিয়াছেন। তাহার মধ্যে সকল ভারতীয় নাগরিকের নিকট একটি আবেদনও আছে।

“সর্ব-ভারতীয় নিয়মে আমাদের রাজ্যে যাতে কপাটি খেলা চালু হয়, তার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। কয়েক বৎসর পূর্বে পর্যন্ত বাংলাদেশে কপাটি খেলার বিশেষ প্রচলন ছিল। কিন্তু হুংগের বিষয়, কপাটি দলের অভাবে প্রতিযোগিতা চালায় এখন প্রায় অসম্ভব হয়েছে। এই খেলা অতি অল্প জায়গায় অতি কম ধরতে চলতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতিও এই খেলার মধ্যেই হয়।

মাস্তাক, বসে ও রাজপুতানা এই খেলার প্রচার ও প্রসারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে এ সব প্রদেশে এই খেলা বেশ উন্নতি লাভ করেছে।

এ বৎসর অন্যান্য রাজ্যের কপাটি দলপতির সহিত ও অল-ইন্ডিয়া সম্পাদকের সহিত এই খেলা ভবিষ্যতে কি উপায়ে ‘এশিয়ান গেমস’র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, সেই সম্বন্ধে অনেক

জালাপ-আলোচনা হয়েছে। আশা করি উক্ত খেলা কয়েক বৎসরের মধ্যেই ‘এশিয়ান গেমস’র অন্তর্ভুক্ত হবে।”

বাংলার “বৌকা-বাচ” প্রতিযোগিতার এক সময় প্রসিদ্ধি ছিল; এখনও তাহা নিঃশেষ হয় নাই। আমরা এই “বৌকা-বাসের” পুনরুজ্জীবনের চেষ্টার অপেক্ষা করি।

সংস্কৃতির সমন্বয়

হামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “ভারতের দারিদ্র্যের মধ্যে এক অধিক সংখ্যায় মুসলমান কেন? তারবারী বলে তাহার। ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, একথা বলা মূর্খতা। কমিদার ও পুরোহিতের দালত্ব হইতে মুক্তির জন্যই তাহার। ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।” পণ্ডিতপ্রবর হ্যাডেল ‘*Aryan Rule in India*’ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।

মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হ’ল। প্রথম প্রথম তাদের বর্ষাবৃত্ত্য ধাক্কা আঘাত-হান সম্ভব হয়ে উঠল না। তখনকার মুসলমানদের যোগস্বয় আরব, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান সভ্যতার সঙ্গে ছিল হর নি, তারা সর্বদাই মনে রেখেছে ভারত তাদের বর্ষদেশ নয়—আরব, পারস্যই তাদের জন্মভূমি, তাদের প্রাণভূমি। ক্রমে যখন তারা বুঝতে পারল যে, হিন্দুদের আহুত্ব ও সাহায্য ব্যতীত রাজ্য-শাসন অসম্ভব, আর জাতিভেদে প্রীতিভিত্তি হিন্দুসমাজের এক বিরাট অংশ যখন মুসলমান হয়ে গেল, তখন তারাও অজান্তে-সারে ভারতীয় হতে বাধ্য হ’ল। যতই তারা দিল্লী, জৌনপুর হেঁচে অঙ্গুর হতে লাগল, ততই সেখানকার লৌকিক আচার-বিচারের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। এইভাবে তুর্ক-আফগান যুগ হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয় ও পুনর্গঠনের যুগ। ধর্ম, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, সামাজিক রীতি-নীতিতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সমন্বয়সাধন প্রচেষ্টার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। কালক্রমে আকবরের সময়কালে পৌছে মুসলমানরা সত্যি সত্যিই ভারতীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়ল। কোন দেশে ইসলাম রাষ্ট্রকেজে বিজয়ী হয়ে সমাজকেজে এমনভাবে পরিবর্তিত হয় নি...

উপরের উক্তি মৌলানা আকাম বাঁ তাঁহার এক অভি-ভাষণে সমর্থন করিয়াছিলেন। মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশনে সাহিত্য-সাধার সভাপতি রূপে তিনি তাঁহার মত এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া আমাদের অনেকের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় ৭ শত বৎসরের মুসলিম রাজত্বের সময়ে রাজদণ্ড ব্যবহার করিয়া বাঙালী সমাজের সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় নাই। জনাব আজহারউদ্দিন বাঁ “রদত্বী” পত্রিকার চৈত্র (১৩৫৮) সংখ্যায় তাহা সমর্থন করিলেন মাজ। তবুও প্রশ্ন রহিয়া গেল যে ভারতবর্ষকে এরূপে বিভক্ত করিয়া দুই বৃহত্তর রাষ্ট্রের স্বষ্টি কেন হইল। “দোয়ার বাংলা”

পত্রিকার গত ২৬শে মাঘ সংখ্যায় “আললামা ইকবাল ও পাকিস্তান” শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলিম সমাজের নবজাগরণ প্রসঙ্গে লেখক জনাব মতিয়ার রহমান বলিয়াছেন :

“... উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আত্ম-বিস্মৃত ও অবসাদগ্রস্ত, দিশেহারা, রাজ্যমান-প্রভাবহারা অধঃপতিত ভারতীয় মুসলিম, জাতির স্থিতি ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে আলোর ও পথের সন্ধান দিতে হালী, ইকবাল, নজরুল প্রভৃতির লেখনীর বাহুস্পর্শ অনেকখানি কাজ করিয়াছিল। সাহিত্যিকের, মনী বীরের, অসি অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী। সাহিত্যিক জাতির জাগরণ ও উত্থানের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেন এবং সুযোগ্য কুশলী নেতা সেখানে ফসল উৎপাদন করেন। আমাদের এই পাকিস্তান অর্জনের ইতিহাসের পুরোতাপে যে সব মনীষী শক্তিশালী সাহিত্যশিল্পীর দান স্বর্ণাকরে লিখিত থাকিবে এবং বাহাদুর লেখনীর বাহুস্পর্শ ব্যতীত জাতির ঘুম ভাঙিত না, তাহাদের মধ্যে মহাকবি ভার মোহাম্মদ ইকবাল অন্যতম।

ভারতের মধ্যে মুসলিম ভারত যুগের দাবী কাগাইরা তিনি বলিলেন ভারতের ও ইসলামের সর্বোত্তম স্বার্থের জন্যই এক নিরবিচ্ছিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন প্রয়োজন।”

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

“ইতিহাস” নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকার ২য় বঙ্গবর্ষের ১ম সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩৫৮) আমরা পাইয়াছি। তাহার মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক ক্রীতদ্রোহী মহম্মদ। প্রবন্ধের ৮ পৃষ্ঠার মধ্যে রাজেন্দ্রলালের জীবনীর মোটামুটি সব কথা আছে। “মুগাভর” পত্রিকার “রবীবাসরীর” সংখ্যায় ক্রীতদ্রোহী প্রসাদ ঘোষ ৪টি প্রবন্ধেই অনেক তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলালের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের কালে হেমেন্দ্রবাবুর প্রবচাবলী জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পণ্ডিত বলিয়া রাজেন্দ্রলালের ব্যাতির কথা উল্লেখ করা মিত্ররোজন। তিনি বাংলা, তথা ভারতের, নব-জাতীয়তার অন্ততম প্রাণী বলিয়াই ক্রীতদ্রোহী তাহার ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কতি-পর প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধি-বেশনে অত্যর্থা সমিতির সভাপতিরূপে রাজেন্দ্রলাল বলেন, “যে, ভারতের নামা জাতি, নামা পরিচয়ের লোক একজিত হইয়া এক মহাভারতের যুগি করিবে ইহাই তাঁর অন্ততম স্বপ্ন।

রমেশবাবু হুঃ করিয়াছেন যে, “বিবিধ সংগ্রহ”, “রহস্য সন্দর্ভ”, নামক মাসিক পত্রিকা আজ প্রায় হুতাপ্য। ১৫ বঙ্গবর্ষ পূর্বে ক্রীতদ্রোহী পত্রীগ্রামেও আমাদের কেহ কেহ তাহা দেখিয়াছেন। সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাহার বিরূপ আশ্রয় ছিল, এই সমুদয় গ্রন্থ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

এই উদ্দেশ্যে “গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহ” নামে একটি

সিরিজ বাহির হইত। বিবিধ সংগ্রহে প্রকাশিত শিল্প-বিষয়ক তাহার কয়েকটি প্রবন্ধ “শিল্পিক দর্শন” নামে গ্রন্থাকারে এই সিরিজে প্রকাশিত হয়।

রমেশবাবু তাহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন এইরূপে—
“জীবিতকালে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিলেও মৃত্যুর পর অদ্যাবধি তাহার স্মৃতির প্রতি যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখান হয় নাই। দেশের এই ক্রটি সংশোধন করার সময় আসিয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক।

মণিপুরবাসীর আশা ও দাবি

“ভূমি” নামক মণিপুরী ভাষায় প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা আমরা মাঝে-মাঝে পাইয়া থাকি। উহার একটি সংখ্যায় (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১) মণিপুরবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে একটি আলোচনা আছে। মনুস্মৃতিরূপে আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :

“মণিপুরদেবী হৌজিক চেঙ অসী মমল খোইনা ভাঙজি— আসামদা সরকারদা ককলিবা কগোল রেট লুপা ৪৫ মি (গোঁহাট্টা) মাহুগি ভাংখাই হোনা মণিপুরদা ভাঙজি, অহু কয়িননো প্রকাশিন্গা লৈবা ওয়গি পানলদি আসামগি অতাঙবা মকমগা অহোঙবা মণিপুরগিগা ধেমবা খোইনা লৈতে। মাসী হুয়া ধহুয়দি মণিপুর সরকারগি শাসন্দা হৈশিংবা রাংপনা প্রকাশি অবহা হোনা কংভবতনি।” অক্ষর বাংলা—অনেকটা অসমীয়ার মত।

আসাম রাজ্যে মণিপুরবাসীর ভাব্য অধিকার বন্ধার থাকিবে কিনা, ভৎসন্যে প্রায় ৮ মাস পরেও একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নাই। নাগা, লুসাই, মণিপুরী বাসিন্দা জাতির ও বাঙালীর এই সব স্বার্থের সমন্বয় বিধান সহজ হইতে পারে না। ভুলও মাহুচ চেষ্টা করিবে, এবং সমগ্র আসামেও তাহা চলি-তেছে। আসাম ভারতরাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তরক্ষী। সুতরাং সেই রাজ্যের শান্তি বন্ধার রাখিতে হইবে।

শৈব সম্প্রদায়

গত মাঘ সংখ্যায় “প্রণব” (ভারত সেবাশ্রম সম্বন্ধে যুগপৎ) এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দিয়া-ছেন :

“রুদ্র অথবা শিবের উপাসনা বৈদিক কাল হইতে এদেশে প্রচলিত। শৈবতন্ত্র ইহার ইতিহাস ও সাহিত্য স্বরূপ। মাহেশ্বর-সম্প্রদায় প্রধানতঃ (১) পাণ্ডপত (২) শৈব (৩) কালাবুধ (৪) কাপালিক, এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মাহেশ্বর তন্ত্র (ক) শিবতন্ত্র (খ) রুদ্রতন্ত্র (গ) তৈরবতন্ত্র—এই তিন ভাগে বিভক্ত। পাণ্ডপত সম্প্রদায়ের মূলগ্রন্থ পাণ্ড-পত রুদ্র বা মাহেশ্বর চরিত। দাক্ষিণাত্যের শৈবরা প্রায়ই শৈব সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থ-মতাবলম্বী। এদের মধ্যে ভগবান

পঞ্চাননের পঞ্চমুখ-মিঃস্বত আগমের নিম্নলিখিত এই ২৮ প্রকার তন্ত্রই জীবের মহায়ুক্তির পৰ্য্যবেক্ষণ :—(১) কামিক (২) বোগিক (৩) চিত্ত্য (৪) কারণ (৫) অজিত (৬) দীপ্ত (৭) অক্ষ (৮) সহস্র (৯) অংশুমান (১০) সুপ্রভেদ (১১) বিজয় (১২) নিঃখাস (১৩) স্বায়ত্ত্ব (১৪) অনল (১৫) বীর (১৬) রৌরব (১৭) যুক্ত (১৮) বিমল (১৯) চন্দ্রজাম (২০) বিশ্ব (২১) প্রোদগীত (২২) সলিত (২৩) সিদ্ধ (২৪) সজ্ঞান (২৫) সর্বোত্তর (২৬) পরমেশ্বর (২৭) কিরণ (২৮) বাতুল। এই সব তন্ত্র ছাড়া পরম শিব-কথিত যুক্তিমার্গ দর্শনাবলী অবল্য সংহিতা পৃথক পৃথক ৮ ভাগে বিভক্ত, যাহা প্রধান প্রধান শৈবচার্য্যগণের মতে অষ্ট-প্রকরণ নামে অবল্য গ্রন্থ শৈব সিদ্ধান্তের দ্বিগদর্শক স্বরূপ। হরদত্ত শিবচার্য্যের “চতুর্বেদ তাৎপর্য্য সংগ্রহ”ও একখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বস্তুতঃ তন্ত্র-সম্বন্ধীয় বিশাল সাহিত্যের দ্বিগদর্শন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়।

বীর শৈব মত

বর্তমানে কর্ণাটক দেশে এই বীর শৈব মতাবলম্বীরা অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। “সিদ্ধান্ত শিখামণি” ইহাদের সর্বমাত গ্রন্থ। বীর শৈবেরা (সিদ্ধান্তে) সর্বকণের জ্ঞত নিজেদের শরীরে ক্ষুদ্রাকার শিবলিঙ্গ ধারণ করিয়া থাকেন। বাসবদেব এই মতের আদি প্রবর্তক। সোমেশ্বর, সিতেশ্বর, রামনাথ, মল্লিকার্জুন এবং বিবেকের নামক পাঁচ শিবলিঙ্গ হইতে আবিভূত হইয়া পাঁচ জন মহাপুরুষ এই বর্ণমত প্রচার করেন।

কাম্বীর দেশে প্রচলিত শৈব আগমের নাম প্রত্যভিজ্ঞা তন্ত্র। এই অষ্টভবাদী “জিক দর্শন” এক অতি বিশাল গ্রন্থ-মালা, যাহা ঐশ্বর্য্য ও এদেশে কিছু প্রচলিত আছে। মহর্ষি হুর্কাসা এই মতের আদি আচার্য্য ও আচার্য্য বহুগুণ জিক দর্শনের মূল প্রবর্তক। আচার্য্য অভিনব গুপ্তের “অভিনব ভারতী”, “বক্তালোক লোচন”, “ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা বিমর্শিনী”, “তত্ত্বালোক”, “তত্ত্বদ্বার”, “মালিনীবিজয় বার্তিক”, “পরমার্থ-সার”, “পরাজিৎশিকা বিবৃতি” প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়কে তন্ত্রশাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে। যৎসঙ্গে মাধ সঙ্কদারের কেম-রাজ নামক একজন পণ্ডিত প্রণীত (১) শিবমুদ্র বিমর্শিনী (২) বহুদত্ত তন্ত্র (৩) বিজ্ঞান ভৈরব (৪) নেত্রতন্ত্র (৫) প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয় (৬) স্পন্দ সমুদ্র (৭) শিবস্তোত্রাবলীর প্রিকা; পোরন্দমাণের (মহেশ্বরানন্দ) পরিমল (৮) মহার্ঘ মঞ্জরী প্রভৃতি এই মতের বিখ্যাত গ্রন্থনিচয় এখনও বিস্তারিত।

শাক্ত তন্ত্র

শাক্ত সঙ্কদারের পূর্বা-উপাসনা পদ্ধতি সমস্তই একান্ত গোপনীয় ও গুরুপরম্পরায় প্রাপ্তব্য। তাই শাক্ত তন্ত্র অসংখ্য হইলেও বর্তমানে ইহার বহুল প্রচার নাই। দেশ, কাল ও যুগ বিভাগে শাক্ত আগম ভিন্ন ভাগে বিভক্ত :—

তন্ত্র (সাধিক আগম), যামল (রাবসিক), ডামর

(ভাসিক আগম) বলা হয়। প্রাচীন কালে এই মত সমগ্র ভারত ছাড়াও তিব্বত, চীন ও এশিয়া মহাদেশের অনেক প্রান্তে এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত ছিল। বহুবেদের তান্ত্রিক উপনিষদ এই মতের পরিপোষক। শাক্ত-তন্ত্রের প্রধান উপনিষদ :—(১) কোল (২) জিপুরা মহোপনিষদ (৩) তাবনা (৪) বহুচ (৫) অরুণোপনিষদ (৬) অষ্টভ তাবনা (৭) কালিকা (৮) তারা উপনিষদ। মিশ্র মার্গেরও তন্ত্র আট প্রকারের :—(১) চন্দ্রকলা (২) জ্যোৎস্নাবতী (৩) কলা-নিধি (৪) কলার্ণব (৫) কুলেশ্বরী (৬) কুলেশ্বরী (৭) বাহ্মপত্য ও (৮) হুর্কাসা মত। সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্র প্রায় এক হাজারেরও অধিক হইবে। মাত্র কয়েকখানা বিশেষ গ্রন্থের নাম দেওয়া হইল। ত্রিবিভার আচার্য্য ‘দত্তাজে’ যে অষ্টাদশ সহস্র মত সংহিতা রচনা করেন এক্ষণে উহার সংক্ষিপ্ত প্রকরণ “পরমহরাম কল্পমুদ্র” হারিতায়ন হুমোদা দ্বারা সঙ্কলিত হয়। আচার্য্য গৌড়পাদ সুভগোদয় ও ত্রিবিদ্যা-রত্ন সুদ নামক দুই খানি অবল্য গ্রন্থ রচনা করেন। শাক্ত দার্শনিক তান্ত্রিক রায় “ব্রহ্মভারত”, “গৌড়গ্য তান্ত্রিক”, “সেতু”, “গুপ্তবতী” ও “কোল” নামক অনেক মহান শাক্ত দর্শন প্রণয়ন করেন। স্বামী পূর্ণানন্দের ঘটক নিরূপণ ও তার ব্যাখ্যা পুস্তক “তত্ত্ব চিন্তামণি” বঙ্গভাষায় রচিত হয়।

এই অষ্টভবাদী সম্প্রদায় কি করিয়া দৈত, বিশিষ্টাষ্টভ-বাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে তাহা মানব-মনের এক রহস্য।

চন্দ্রলোক ভ্রমণ

গত ১৬ই চৈত্র মাস হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রেরিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানের রাজ্য ও কল্পনার রাজ্যের মধ্যে প্রভেদ ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। নিম্নোক্ত সংবাদটিতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই সংবাদের পিছনে এখনও বাস্তব অপেক্ষা কল্পনাই অধিকমাত্রায় বিস্তারিত।

ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির চান্স-বিত্তাণের ডিরেক্টর মিঃ এইচ পারসী উইলকিন্স বলেন, মহাশয় যদি বাস্তবিকই বিমানযোগে চন্দ্রলোকে যাইতে চান, আগামী ১০ বা ২০ বৎসরের মধ্যেই যাইতে পারিবে।

ব্রিটিশ আন্তঃগ্রন্থ সমিতির পত্রিকার এক পক্ষে মিঃ উইলকিন্স লিখিয়াছেন, বিভিন্ন গ্রন্থে ভ্রমণ কল্পনার বিষয় মনুষ্য ইচ্ছা প্রসিক্ত।

অবশ্য এ কার্য্যে এত অর্থ ও সাহায্য প্রয়োজন হইবে যে, সরকারী-প্রচেষ্টা ব্যতীত ইহা সম্ভব হইবে না।

মহাশয় যদি ইচ্ছা করে এবং একজন সর্বশক্তি নির্যোগ করে তবে ১০ বা ২০ বৎসরের মধ্যে এরূপ রকেট নির্মাণ করিতে পারিবে যাহা বাস্তবরূপের উর্ধ্বলোকে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে। বর্তমান অবস্থায় আরও কিছু অধিক সময় প্রয়োজন হইতে পারে।

জীবনযাত্রা

শ্রীরাজশেখর বসু

সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা, plain living and high thinking—এই বাক্যটি এককালে খুব শোনা যেত। এখন তার বদলে শোনা যায়—জীবনযাত্রার মান বা standard of living বাড়তে হবে। এই দুই আপাতবিরোধী বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি? উচ্চ চিন্তার ব্যাঘাত না করেও জীবনযাত্রা কতটা সরল করা যায়? তার নিম্নতম মান কি?

গ্রীক সম্রাট ডায়োজেনিস একটা পিপের মধ্যে রাজি-যাপন করতেন, দিনের বেলা বাইরে এসে রোদ পোষাতেন। বোধ হয় তাঁর পরিধেয় কিছু ছিল না এবং লোকে দয়া বা ভক্তি করে যা দিত তাতেই তাঁর ক্ষুধিবৃত্তি হ'ত। এই রিক্ত জীবনযাত্রায় তাঁর উচ্চ চিন্তার বাধা হয় নি। বাংলায় 'উজ্জ্বল' শব্দ হীন নীচ বা তুচ্ছ অর্থে চলে। কিন্তু এর মূল অর্থ—ক্ষেত্রে পতিত ধানাদি খুঁটে নেওয়া, অর্থাৎ অত্যন্ত উপকরণে জীবিকানির্বাহ। মহাভারতে উজ্জ্বলিত্রতথারীর অনেক প্রশংসা পাওয়া যায়। শাস্তিপর্বে আছে—এক উজ্জ্বলতা সমাধিনিষ্ঠ অনাসক্ত ব্রাহ্মণ ফলমূল জীর্ণপত্র ও বায়ু ভক্ষণ করে সর্বভূতের হিতসাধনে রত থাকতেন। হর-প্রসাদ শাস্ত্রী 'প্রবল নৈমায়িক' বুনো রামনাথের কথা লিখেছেন, যিনি বনের ভিতর ছাত্র পড়াতেন এবং সস্ত্রীক শুধু ভাত আর তেঁতুলপাতার বোল খেয়ে প্রাণধারণ করতেন। মহারাজ শিবচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ইনি জানিয়েছিলেন যে, তাঁর কোনও অল্পপণ্ডিত (অভাব) নেই।

যারা নিম্পৃহ সম্রাসী এবং যাদের পোষ্য কেউ নেই, অথবা যাদের পোষ্যবর্গ অত্যন্তে তুচ্ছ, তাঁদেরও জীবনযাত্রার জন্ত কয়েকটি বিষয় আবশ্যক। সর্বাগ্রে চাই স্বস্থ সবল শরীর যা ধর্মের আশ্রয় সাধন, যা না হলে উচ্চ চিন্তা, জ্ঞান-চর্চা বা সংকর্ষ কিছুই চলে না। আবার স্বাস্থ্যের জন্ত যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয় চাই। যে স্বভাবত স্বাস্থ্যবান ও সবল সে যত অল্প উপকরণে জীবনধারণ করতে পারে, রুগ্ন বা দুর্বল লোকে তা পারে না।

উচ্চ চিন্তা বা জ্ঞানচর্চা এবং সর্বভূতের হিতসাধন বা লোকসেবা—এই দুইএর অর্থ সেকালে যা ছিল এখন ঠিক তা নেই। একালের আদর্শ অল্পসরণের জন্ত যে অল্পতম জীবনোপায় বা necessities of life আবশ্যক তাও বদলে গেছে, সেকালের উজ্জ্বল এখন অসাধ্য। যথোচিত খাদ্য

বস্ত্র ও আশ্রয় ছাড়াও কতকগুলি বিষয়ের ব্যবস্থা না হলে জীবনযাত্রা চলে না।

অত্যাগ্রে তুচ্ছ লোকের সংখ্যা চিরকালই কম, সাধারণ মানুষ ভোগবিলাস চায়। অনেক বিলাসী লোকেও জ্ঞান-চর্চা ও লোকসেবা করে, অনেক অবিলাসী লোকেরও উচ্চ চিন্তা ও সংকর্মের প্রবৃত্তি থাকে না। তথাপি দেখা যায়, ভোগী অপেক্ষা ত্যাগী লোকেই অধিকতর লোকহিতৈষী হয়। এই কারণে সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা সর্ব দেশে সর্ব কালে মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হয়েছে।

অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনোপায় পর্যাপ্ত নয়। আদর্শের অল্পসরণ দূরের কথা, বেঁচে থাকাই অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য, অল্পচিন্তা ছাড়া অল্প চিন্তার অবসর নেই। কোনও লোক জ্ঞানচর্চা ও লোকসেবা করুক বা না করুক, সে রাজপুরুষ ব্যবসায়ী বিজ্ঞানী শিক্ষক কলাবিৎ কৃষক বা মজুর যাই হোক, মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার জন্ত কতকগুলি বিষয় তার অবগুই চাই, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। কিন্তু মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার নিম্নতম মান কি? দেশভেদে নীতাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে জীবনোপায়ের ভেদ হবে। বৃত্তিভেদেও কিছু কিছু পরিবর্তন হবে, শ্রমিকের আহার শ্রমিকের সমান হলে চলবে না। এই রকম বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন যেন নিয়েও সর্বসাধারণের জন্ত জীবনযাত্রার নিম্নতম মান নির্ধারণ করা যেতে পারে কি? ফর্দ করে বা অল্পপাত করে দেখানো বোধ হয় অসম্ভব, কিন্তু জীবনযাত্রার যা প্রধান মাপকাঠি—স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ, তার দ্বারা একটা স্থূল ধারণা করা যেতে পারে।

যে ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের বা ধনী-দরিদ্রের মাঝামাঝি লোকের (যাদের আধুনিক নাম বুর্জোয়া) স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কোনও রকমে বজায় থাকে তাকেই আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নতম মান ধরা যেতে পারে। আমার জন্ম মধ্যবিত্ত সমাজে। বিগত ষাট-সত্তর বৎসরে এই সমাজে জীবনযাত্রার এবং তার সঙ্গে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধের যে পরিবর্তন দেখেছি তা বিচার করলে হয়তো মান নির্ধারণের সূত্র পাওয়া যাবে। এই দীর্ঘকালের গোড়ার দিকে উত্তর বিহারের একটা মাঝারি শহরে ছিলাম। বিহারীর তুলনায় সমশ্রেণীর বাঙালীর জীবন-যাত্রায় আড়ম্বর বেশী ছিল। যে ভদ্র বাঙালী মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকা মোজগার করতেন তাঁরও অল্পবস্ত্র আর

বাসস্থানের অভাব হ'ত না। আমাদের বাড়িতে আধুনিক আসবাব ছিল না, শুধু অনেকগুলো তক্তাপোশ আর গোটাকতক বেটপ টেবিল চেয়ার আলমারি ছিল। জলের কল বিজলী বাতি ছিল না। পায়খানা অনেক দূরে, বর্ষীয় ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে হ'ত। লোকে কদাচিৎ ঔষধার্থে চা খেত। সিগারেট তখন নতুন উঠেছে, গুটিকতক বড়লোকের ছেলে লুকিয়ে খেত, বয়স্করা প্রায় সকলেই তামাক খেত। স্বগন্ধ মাথার তেল দাঁতের মাজন প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যের চলন ছিল না। বাইসিকেল ফাউন্টেন পেন হাতঘড়ি ছিল না, যারা ভাল চাকরি করত কেবল তাদেরই পকেটঘড়ি থাকত। ফুটবল আর ক্রিকেট শুধু নামেই জানা ছিল। আমাদের ব্যবস্থা—কালীপূজোর সময় শখের থিয়েটার, কালে ভদ্রে যাত্রা, আর কয়েকটি বাড়িতে গান গল্প তাস পাশা দাবার আড্ডা। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীতে দেশবিদেশের যে খবর থাকত তাতেই সাধারণ ভদ্রলোকের কৌতুহল নিবৃত্ত হ'ত। বাংলা গল্প প্রবন্ধ আর কবিতার বই খুব কম ছিল, পাওয়া গেলে নিকুঠে বইও লোকে সাগ্রহে পড়ত। তখনকার প্রধান বিলাসিতা ছিল ভাল জিনিস খাওয়া।

এই মধ্যবিত্ত সমাজের যারা আজকাল কলকাতায় বা অল্প শহরে বাস করেন তাঁদের জীবনযাত্রা অনেক বদলে গেছে। এঁরা সেকালের তুলনায় বেশী রোজগার করেন, কিন্তু এঁদের অভাববোধ বেড়েছে। তার কারণ, টাকার মূল্য কমেছে, গ্রাসাচ্ছাদন দুমূল্য হয়েছে, এবং এঁরা অনেক বিষয়ে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে ফেলেছেন। আহা! নিকুঠে হয়েছে, কিন্তু সজ্জা নেশা শখ আর আমাদের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এখনকার যুবক আর কিশোর ধুতি পঞ্জাবিতে তুট্ট নয়, দামী প্যাণ্ট আর নানা রকম শৌধিন জামা চাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই প্রসাধন-দ্রব্য দরকার। মেয়েদের যেমন অস্তুত এক গাছা চুড়ি পরতে হয় ছেলেদের তেমনি হাতঘড়ি আর ফাউন্টেন পেন পরতে হয়। যুবা বৃদ্ধ সকলেরই দিনের মধ্যে অনেকবার চা চাই। সস্তা গুড়ুক তামাক প্রায় উঠে গেছে, এখন অনেকে দিনে ত্রিশ-চল্লিশটা বা অবিরাম সিগারেট খায়। ঘন ঘন সিনেমা আর ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচ না দেখলে চলে না। গ্রামোফোন আর রেডিও না থাকলে বাড়িতে সময় কাটে না। মনের খোরাক হিসাবে গল্পের বই কিনতে হয়, অনেক বই ছ-সাত টাকার কমে পাওয়া যায় না। জগতের হালচাল জানবার জন্ত রোজ একাধিক খবরের কাগজ পড়তে হয়।

নিজের এবং সমকালীন আত্মীয়-বন্ধুদের অল্পভুতি থেকে

বলতে পারি—একালের তুলনায় সেকালে মধ্যবিত্তের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কিছুমাত্র কম ছিল না। তার কারণ—যে ভোগ অজ্ঞাত বা অনভাস্ত তার জন্য অভাব বোধ হয় না। স্বাস্থ্যশুদ্ধ তাঁর বাপের কাছে তপোবনে বেশ সুখে ছিলেন। কিন্তু যেমন তিনি লোমপাদ রাজার দূতীদের দেখলেন এবং তাদের দেওয়া ভাল ভাল লড্ডু আর পানীয় খেলেন, অমনি তাঁর মনে হ'ল যে এত দিন বুখাই কেটেছে।

সেকালের কোনও মধ্যবিত্ত লোককে যদি মস্তবলে হঠাৎ একালের কলকাতায় আনা হয় তবে তিনি কি রকম বোধ করবেন? খাওয়া-পরা, বাড়িভাড়া আর চাকর রাখার খরচ দেখে তিনি আতকে উঠবেন, ছেলেমেয়েদের চালচলন দেখে খুব চটবেন, কিন্তু নানা রকম আধুনিক সুবিধা ও আরাম ভোগ করে খুশীও হবেন। একালের কোনও লোককে যদি কলকাতা থেকে সেকালের মফস্বলে এনে ফেলা হয় তবে তিনি বোধ হয় খুশী হবেন না। ভাল ভাল জিনিস খেয়ে বাচবেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু কলের জল, ড্রেন-পায়খানা, বিজলী আলো আর পাখা, দৈনিক পত্রিকা, সেফ্টি স্কুর, কামাবার সাবান, অজস্র চা এবং ট্রাম বাস প্রভৃতির অভাবে তিনি কষ্ট পাবেন। যদি তাঁর বয়স কম হয়, তবে সিনেমা, রেডিও, রেস্তোরাঁর খাবার, ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচ, নাচ-গানের জলসা, দেবী সরস্বতীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, সর্বজনীন হজোড়, আর টাটকা রাজনীতিক খবরের অভাবে ছটকট করবেন।

পঞ্চাশ বৎসর আগে কলকাতায় মোটরকার দু-একটি দেখা যেত, সাধারণের জন্য টেলিফোন ছিল না। তাতে বড় কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার বা ব্যবসাদার কোনও অসুবিধা বোধ করতেন না। কিন্তু প্রচলন হবার পর কিছু কালের মধ্যেই মোটর আর টেলিফোন অপরিহার্য হয়ে পড়ল। অমুক অমুক রেখেছে অতএব, অপরকেও রাখতে হবে, নতুবা কর্মক্ষেত্রে পরাভব অবশ্যস্বাবী। যেমন, রাশিয়া বিস্তর সামরিক বিমান করেছে অতএব আমেরিকাকেও করতে হবে। আমেরিকা অ্যাটম বোমা করেছে অতএব রাশিয়া ব্রিটেনকেও করতে হবে। রেলগাড়িতে গেলেই সেকালের লোকের কাজ চলত, এখন এয়ারোপ্লেনে না গেলে অনেকের চলে না। আজ যদি জনকতক ধনী হেলিকোপ্টার রেখে এক বাড়ির ছাত থেকে অন্য বাড়ির ছাতে যাতায়াত আরম্ভ করে তবে আরও অনেককে তা করতে হবে।

শুধু কাজের সুবিধা, আরাম বা বিলাসিতার জন্য অথবা ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার জন্যই যে নতুন নতুন জিনিস অপরিহার্য হয়েছে এমন নয়, অল্পকরণ বা ফ্যাশনের জন্যও

হয়েছে। সরকার আইন করে ডুরিভোজ নিষিদ্ধ করেছেন। আইন মানলে চক্ষুলাজ্ঞা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, খরচ বাঁচে, একটা সামাজিক কুপ্রথা দূর হয়। কিন্তু যেহেতু অমুক অমুক আত্মীয় বা বন্ধু আইন না মেনে হাজার লোক খাইয়েছে অতএব আমাদেরও তা করতে হবে নতুবা মান থাকবে না। সরকার মদ বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন, মদের দামও খুব বেড়ে গেছে, কিন্তু উচ্চ সমাজের পার্টিতে বা আড্ডায় স্ত্রীপুরুষের অস্বাভাবিক মদ খাওয়া এখন প্রগতির লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে পয়সা খরচ করে বলনাচ শিখছে। ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিলেন তখন বিদেশী জিনিস ব্যবহারে যে সংকোচ এবং বিলাসিতায় যে সংযম ছিল তা এখন একেবারে লোপ পেয়েছে। পূর্বে যা ছিল না বা থাকলেও যা আবশ্যিক গণ্য হত না এখন তা অনেকের কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। দেশের লোক কুইট ইন্ডিয়া বলে বিদেশী সরকারকে বিদায় করেছে, কিন্তু বিদেশী বিলাস আর ব্যসন সাদরে বরণ করে নিয়েছে।

আধুনিক সমস্ত কৃত্রিম অভ্যাস (বা ব্যসন) যদি অনাবশ্যক গণ্য করা হয় তবে জীবনযাত্রার ন্যূনতম উপকরণ বা জীবনোপায় দাঁড়ায়—যেখোচিত (অর্থাৎ বাহ্যল্যবর্জিত) খাদ্য বস্ত্র আবাস, এবং পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা চিকিৎসা ব্যায়াম আর পরিমিত মাত্রায় চিন্তাবিনোদনের ব্যবস্থা—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু,

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,

সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।...

আমেরিকায় এবং ইউরোপের অনেক দেশে জীবন-যাত্রার মান খুব উঁচু। এদেশের জনসাধারণের দৃষ্টিতে এখনও যা বড়মাস্থা বা বাড়াবাড়ি, পাশ্চাত্য দেশে তা necessary, যেমন, মোটরকার, রিক্সিজারেটর, বিজলী-উন্ন, ধুলো-ঝাড়া কল, কাপড়-কাচা কল, মদ, টিনে রাখা খাবার, নানা রকম পোশাক, মুখ আর ঠোঁটের রং, নাচঘর, নাইট ক্লাব, ইত্যাদি। জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে—এই উপদেশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আমাদের দিয়ে থাকেন। তাঁরা বোধ হয় নিজেদের সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের দুর্দশার তুলনা করে রূপাবেশে এই কথা বলেন। জীবনযাত্রার মান বাড়লে বিলাসিতা বাড়বে, বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের স্ববিধা হবে, এদেশের শ্রমিক অল্প বেতনে কাজ করে বিদেশী শ্রমিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে না—এই স্বার্থবুদ্ধিও উপদেশের পিছনে থাকতে পারে।

ভোগ-বিলাসের প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তা যদি পরিমিত হয়, জনসাধারণের সামর্থ্যের অনধিক হয়,

সমাজের হানিকর না হয়, তবে আপত্তির কারণ নেই। ইউরোপের অনেক দেশের এবং উত্তর আমেরিকার তুলনায় এদেশের ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেশী, দরিদ্রের সংখ্যাও বেশী। ব্রিটেনে নানা রকম করের ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশ কমছে, ধনীর জীবনযাত্রার মান নামছে। এদেশের সরকারও আয়কর ইত্যাদির দ্বারা এবং বিদেশী বিলাস-সামগ্রীর উপর শুল্ক বাড়িয়ে কতকটা সেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোন্ বস্তু বিলাসের উপকরণ এবং কোন্ বস্তু জীবনযাত্রার জগৎ একান্ত আবশ্যক তার যথোচিত বিচার হয় নি, এবং তদনুসারে দেশবাসীকে সংযম শেখাবার চেষ্টাও হয় নি।

সম্প্রতি এদেশে ধনীর সংখ্যা কিছু বেড়েছে, অনেকে সং বা অসং উপায়ে প্রচুর উপার্জন করে অত্যন্ত বিলাসী হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনও ধনীর সংখ্যা দরিদ্রের তুলনায় মুষ্টিমেয়। বলা যেতে পারে, ধনীরা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থেকে অধঃপাতে যাক না, তাতে কার কি ক্ষতি। তাদের ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে সমস্ত প্রজায় মধ্যে ভাগ করে দিলেও দরিদ্রের বিশেষ কিছু উপকার হবে না। কিন্তু দুর্নীতি যেমন সংক্রামক, বিলাসিতাও সেই রকম, সে কারণে উপেক্ষণীয় নয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চুরি আর ঘুষের যে দেশব্যাপী প্রসার হয়েছে তার একটি প্রধান কারণ বিলাসিতার লোভ। এদেশের ভদ্র-সন্তান শ্রমসাধ্য জীবিকা চায় না সেজন্ত তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী। তাদের বিলাস-বাসনা আছে কিন্তু সহুপায়ে তা তৃপ্ত করতে পারে না, সেজন্ত তাদের অসন্তোষ বেড়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্ট ডিক্টেটোরী রাষ্ট্রে জীবিকা বেছে নেবার বিশেষ স্ববিধা নেই, ইতরভদ্র নির্বিশেষে প্রায় সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। লৌহস্ববিকার একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, দরিদ্র সোভিয়েট প্রজা বিদেশী ধনী রাষ্ট্রের বিলাসিতা জানতে পেরে যেন নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট না হয়।

পাশ্চাত্য অর্থনীতি বলে—want more, work more, earn more, অর্থাৎ আরও কামনা কর, আরও পরিশ্রম কর, আরও রোজগার কর; কামনার তাড়নায় খেটে যাও, আয় বাড়াবে, তা হলে নব নব কামনা পূর্ণ হবে, ক্রমশঃ জীবনযাত্রার উৎকর্ষ হবে। ভারতের শাস্ত্র উলটো কথা বলে—যি চালালে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্য-বস্তুর উপভোগে কামনা কেবলই বাড়তে থাকে, শান্তি আসে না; পৃথিবীতে যত ভোগ্য বিষয় আছে তা একজনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই—এই সত্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এখনও বোঝেন

নি। এ-কারণে সর্বত্র লোভ অসন্তোষ আর প্রতিযোগিতা বাড়ছে, যার পরিণাম পরদেশলিপ্সা ও যুদ্ধ।

অমুক দেশে শতকরা পঁচিশ জনের মোটর গাড়ি আছে, প্রতি পাঁচ হাজার জনের জন্য একটা সিনেমা আছে, সকলেরই রেডিও আছে, লোক পিছু বৎসরে এত মাত্রা তড়িৎ, এত পাউণ্ড মাখন, এত পাউণ্ড সাবান, এত গ্যালন পেট্রোলিয়ম খরচ হয়, প্রত্যেক লোকের অন্তত এত ঘন ফুট শোবার জায়গা আছে, অতএব এদেশের আদর্শও তাই হওয়া উচিত—এই প্রকার অন্ধ আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। রাষ্ট্রের আয় আর উৎপাদন-সামর্থ্য বৃদ্ধিই জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যা অত্যাবশ্যক তার সংস্থানের জন্য অনেক বিলাস অনেক স্ত্রীবিধা এখন সৃষ্টিতে রাখতে হবে।

শ্রমিককে তুষ্ট রাখা দরকার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধনিকের লাভ বজায় রেখে যদি মজুরি বাড়ানো হয় তবে অনেক অত্যাবশ্যক বস্তুর (যেমন বস্ত্রের) দাম বেড়ে যায়, তার ফলে সকলেরই খরচ বাড়ে, অন্যান্য পণ্যও দুর্মূল্য হয়, সুতরাং আবার মজুরি বাড়াবার দরকার হয়। এই দুইচক্রের ফল দেশবাসী হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে।

আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি, ইহসর্বস্ব নই, জনক-কৃষ্ণ-বৃদ্ধাদির শিক্ষা আমরা হৃদয়ংগম করেছি—এইসব কথা আত্মপ্রত্যারণা মাত্র। জাতীয় চরিত্রের সংশোধন না হলে আমাদের নিস্তার নেই। সরকার বিস্তর খরচ করে অনেক রকম পরিকল্পনা করছেন যার স্বফল পেতে বিলম্ব হবে। মাটির জমি আমাদের চেয়ে মানব-জমি আবাদ কম দরকারী নয়। এখন যারা অল্পবয়স্ক ভবিষ্যতে তারাই রাষ্ট্র চালাবে, তাদের শিক্ষা আর চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা সর্বাপ্রাণে আবশ্যক। তার জন্য এমন শিক্ষক চাই যার যোগ্যতা আছে এবং যিনি নিজের অবস্থায় তুষ্ট। শুধু বিদ্যা নয়, ছাত্রকে বাল্যকাল থেকে তিনি আচার ও বিনয় শেখাবেন, মনুষ্যতাত্ত্বিক ন্যায় সদভ্যাস ও সংকর্ষের প্রেরণা দেবেন। আমাদের সরকার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শ্রমিকের অনেক আবদার মঞ্জুর করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে শিক্ষকের চেয়ে শ্রমিকের মর্যাদা বেশী, কারণ তাদের কাজের ফল প্রত্যক্ষ। শিক্ষক যদি উপযুক্ত হন তবে তাঁর কাজের ফল পেতে বিলম্ব হলেও তার গুরুত্ব কত বেশী তা বোঝাবার মতন দূরদৃষ্টি সরকার বা জনসাধারণের হয় নি, তাই শিক্ষকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত হয়ে আছেন।

রজনী ভরিয়া জ্বলে

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী

চাদের আলোয় কামিনী হাসিছে
সবুজ পাতার কোলে,—
নিশীথ মলয়ে গন্ধ বিলায়ে
দোলে সে দোহুল দোলে।

মধুপ-বহু গন্ধে পাগল,
বাঁধিল ভাহারে আঁধার-আগল;
চাদিনী বাসিল কামিনীরে ভালো
তাই সে বেদনা তোলে।
চাদের আলোকে কামিনী হাসিছে
সবুজ পাতার কোলে।

মিলন-বেদনা ভবু হিয়াভলে,
লভত দৌহার বিকি বিকি খলে;
রবির পরশে লভিল বরা সে
রজনী ভরিয়া জ্বলে'।

অনামিকা

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

তোমারে দেখেছি বহু দিনান্তের গোপুলি আকাশে,
দ্বিধামায় নামে যেথা আত্মাসিত স্মৃতি-অঞ্চল;
উষণীর আলো-ছারে অক্ষুট আলোক বিকাশে,
অশ্রুধির উর্মিমাবে স্তব্ধিত সফেন চঞ্চল।

রজনীর রঞ্জে রঞ্জে শুনি যেন তব আহ্বান,
নক্ষত্রের দৃষ্টি-মাবে হেরি যেন তব হাতছানি;
রহস্তের গুপ্তককে তুমি আছ চির-দীপ্যমান,
মহাকাল স্তম্ভককে আছে তব পুঞ্জীভূত বাণী।

দিবস-শরীরী মাঝে তুমি রও চির-প্রহেলিকা,
তুমি স্থির ধ্রুবভারা অজ্ঞাত ভবিষ্যের মাঝে;
শায়ত জীবনমাঝে অচঞ্চল চির-অনামিকা,
অতল চেতনামাঝে তব শিক্তিনী শুনি বাজে।

সেকালের স্মৃতি

P30156

আদি ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

আমার দীর্ঘ জীবনের স্মৃতি যতদূরেই পিছিয়ে যাক না কেন, ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের গোড়া পর্যন্ত যায় না—বলাই বাহুল্য। শ্রুতি তার চেয়ে কিছু বেশীদূরে পৌঁছায় অবশ্য, তবে মেয়েদের শ্রুতি স্মৃতি অধিকাংশ পরিবারের গভীর মধ্যেই আবদ্ধ।

তারই জোরে বলতে পারি যে, মহষির এই নূতন ধর্ম প্রবর্তনের নবীন উৎসাহে তাঁর গুণবান সন্তানগণ প্রায় সকলেই মেতে উঠেছিলেন, এবং কেউ তাঁর ব্যাখ্যা লিখে নিয়ে, কেউ গান রচনা করে, কেউ গান গেয়ে ধর্মপ্রচারে তাঁকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। আমার মায়ের কাছে গল্প শুনেছি যে, তাঁর গৌরীদানের ফলে আট বৎসর বয়সে শিশুরবাড়ী আসবার পর—সে আজ একশ' বছরের উপর—তাঁরা সকলে ভোরে উঠে স্নান করে দালানে গিয়ে বসতেন; এক দিকে ছেলেরা, এক দিকে মেয়েরা ও মাঝখানে মহষি। ঐটুকু মেয়ের পক্ষে ভারি ভারি সংস্কৃত শ্লোক বোঝা সম্ভব ছিল না, তাই সেই দীর্ঘ-হৃদয় ছন্দের শব্দবিন্যাস তিনি গ্রহণ করেছিলেন—“ই মা নিভূতা নিম্মা ধণ্ডে”—এই হাতকর রূপে। কিন্তু নাই বা সেই বাক্যের অর্থ তাঁর বোধগম্য হ'ল, তবু “দিনের প্রথম ক্ষণে” সেই যে এক অনির্দেশ্য সন্তার প্রতি সকলে মিলে একটি পবিত্র শ্রদ্ধার ভাব নিবেদন করতে বসতেন, তার মূল্য কি অর্থ দিয়ে নির্ণয় করা যায়? সেই দৌষদর্শন পুণ্যাত্মা নিজের অন্তরে লুক্ক দিয়া জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে সপরিবারে তাঁর প্রাণের আরামকে আনন্দে স্মরণ করতেন।—এ দৃশ্য যে আমরা চর্যচক্ষে না দেখে কেবল কল্পনাচক্ষে দেখতে বাধ্য হয়েছি, সে আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব।

আমার ব্রাহ্মসমাজের স্মৃতি যদি বেশীর ভাগ গানেই পর্যাবসিত হয় তা আশা করি সন্মুখ পাঠকবর্গ ক্ষমা করবেন। আমি পূর্বে অন্যত্র যা বলেছি, এখানেও অকুণ্ঠিত চিন্তে তার পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, ব্রাহ্মসমাজ যদি কালক্রমে বিলুপ্ত হয় (ভগবান না করুন) তা হলেও তার ভাঙারে যে অমূল্য গানের রত্নরাজি সঞ্চিত আছে তারই দৌলতে এটি অন্ততঃ বাংলাদেশে চির সমাদর এবং অমরতা লাভ করবে। তার কথার সম্পদ বাদ দিলেও, শুধু স্মরণ আলোচনা করলে আমাদের সঙ্গীতের অনেক ইতিহাস জানা যাবে; এবং আমাদের ব্রহ্ম-সঙ্গীত পুস্তকখানি স্নানোযোগপূর্বক দেখলে বাংলার সামাজিক তথ্যও কিছু

কিছু পাওয়া যাবে, যথা ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত-রচয়িতাদের কালক্রম, ধারা ইত্যাদি। “আমাদের” সঙ্গীত পুস্তক বিশেষ করে' উল্লেখ করছি এইজন্য যে, সেই পুস্তকেই কেবল রচনার কালানুসারে ভাল ভাল সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। হতে পারে আমার আবাল্য সংস্কার বশতঃ, কিন্তু এইরূপ ভাগে ভাগে বিভক্ত ভিন্ন অন্য সঙ্গীতপুস্তক তত ভাল লাগে না। তৃতীয় ভাগ থেকেই বোধ হয় ব্রহ্ম-সঙ্গীতের সঙ্গে সাফাংশ পরিচয় আমাদের আরম্ভ; কিন্তু স্বরলিপির গুণে বা কানে শুনে ১ম ও ২য় ভাগের দু'চারটি ভাল গানও যে না জানি এমন নয়। বহুকাল আগে আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিল পুরনো (অর্থাৎ প্রথম দুই ভাগের) ভাল ভাল গান বেছে নিয়ে শিখতে। তখন পূজ্যপাদ সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দু'জনেই জীবিত ছিলেন এবং দুই ভাইয়ে রাঁচির শাস্তিধামে বাস করতেন; আমরাও প্রতি বৎসর পূজার ছুটিতে নিয়মিত সেখানে যেতুম। স্মরণে এ সদিচ্ছা পূর্ণ করবার কোন বাধাই ছিল না। প্রত্যেক ভাগের শিক্ষণীয় গান বোধ হয় নির্বাচন করেছিলুম, এমন কি শিখতেও আরম্ভও করেছিলুম, যথা:

“তুমি কার, কে তোমার, করে বলরে আপন,
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন”—

এ দুটি চরণের ছন্দোবদ্ধ এখনো এত ভাল লাগে। কিন্তু কি জানি কেন এ শিক্ষা নিয়মিত ভাবে আর অগ্রসর হ'ল না; সম্ভবতঃ আমাদের মজাগত অধ্যবসায়ের অভাব-দোষে। স্মরণে একবার হারালে আর পাওয়া যায় না। এখন চারিদিকে চেয়ে দেখি, সব অন্ধকার। এমন একটি প্রবীণ মাহুষ বেঁচে নেই, যার কাছ থেকে সেকালের শুধু গান কেন, কোন বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন বা জ্ঞানলাভ করতে পারি। নিজের অসম্পূর্ণ স্মৃতিদ্বারা বরং আমাকেই অপরের সন্দেহ ভঞ্জন করতে হয়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের আদি সঙ্গীতের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের “কি স্বদেশে কি বিদেশে”র সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল; সম্ভবতঃ তাঁর বারিকী রক্ষা-স্মৃত্তে। স্মৃতি এ একই উপলক্ষ্যে তাঁর রচিত “কেন ভোল, মনে কর” নামে আর একটি গান স্বরলিপি দেখে শিখলুম ও শেখালুম, যেটি স্মরণে কথায় ভাবে বেশ এ কালের রুচিসম্মত। নইলে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, “মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর”—এর মত দেহতাত্ত্বিক গান

আজকাল আমাদের মনে ধর্মভাব দূরে থাক, কৌতুকমিশ্রিত ভীতিরই উদ্ভেক করে। শুনেছি নাকি স্বনামধন্য ৬শ্রাম-সুন্দর মিশ্র কোন ব্রাহ্ম বিবাহের পাকা দেখা অহুষ্ঠানে উক্ত গানটি গেয়েছিলেন; কিন্তু এই কিংবদন্তীটি বিশ্বাস-যোগ্য বলে মনে হয় না। মহর্ষি-প্রণীত “পরিপূর্ণমানন্দ”, “দেহ জ্ঞান” আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে খুবই চলিত। বিশেষতঃ শেখোক্তটি সার্বজনীন ও সর্বকালীন প্রার্থনা হিসেবে অনবদ্য, এবং আমাদের কালে প্রত্যেক প্রাতঃ-কালীন উপাসনার প্রথমেই গাওয়া হ’ত। তাঁর বার্ষিকীতে “ভাব সেই একে”, “ভাব তাঁরে” প্রভৃতি তাঁর অপেক্ষাকৃত সেকালে ভাবের গানও গাওয়া হয়। এ নিয়মটি খুব ভাল, নইলে পরবর্তী কালের প্রবল রচনা-বন্যায় সেকালের মুষ্টিমেয় গান কয়টি এতদিন কোথায় ভেসে তলিয়ে যেত তার ঠিক নেই। মনে আছে কয়েক বছর আগে আদি ব্রাহ্মসমাজের শেষ সম্পাদক ৬শ্রোমানন্দ সিংহমহাশয় আমার দাদা ৬স্বরেজনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জস্থ লালবাংলার বাড়ীতে এসে আমাদের বিশেষভাবে অহুবোধ করেন মহর্ষির তিরোধান বার্ষিকীতে সমাজগৃহে গিয়ে উপাসনায় সঙ্গীতের ভার নিতে। তাঁর এই অহুবোধ ব্রহ্মার্থে আমরা পরিবারস্থ সব গায়ক-গায়িকা একত্র হয়ে সেই পুরনো আদি সমাজে কতকাল পরে গেলুম এবং মহর্ষির স্বরচিত কয়েকটি গানের সঙ্গে অন্যান্য উপযোগী দু’ একটি গান মিলিয়ে কার্য্য সুসম্পন্ন করলুম। যতদূর মনে আছে শ্রীযুক্ত হেমলতা দেবী এই উপলক্ষ্যে তাঁর একটি রচনাও পাঠ করেন। এতকালের সমাজগৃহে সেই আমাদের শেষ পারিবারিক উপাসনা। কারণ “ছিল প্রাণ সে গিয়াছে, দেহে কি আর কেহ আছে;” দেহও বোধ হয় আর বেশী দিন ষাড়া থাকবে না। যিনি এই ইটকাঠের দেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরই নামে এখানে এক প্রকার “শেষ আরতি সাজ” করা হ’ল, সেকথা ভাবলে এই ঘটনাটির মধ্যে একটি বিষয় সার্থকতা উপলব্ধি হয়।

মহর্ষির প্রায় প্রত্যেক সন্তানই রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত আছে তা হয়ত সকলে জানেন না। খ্যাতনামা পুত্রগণ এবং স্বনামধন্য কন্যা স্বর্গকুমারীকে বাদ দিলেও তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীর অন্ততঃ একটি গান আছে জানি — “প্রভু পূজিব তোমারে আজি” এবং যার কাছে নানা কারণে আশা করা যায় না, সেই সৌমেন্দ্রনাথও নাকি একটি গান রচনা করেছেন — “দেখিতে তরঙ্গময় ভব-পারাবার”। তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভ্রাতৃপুত্র গণেশ-নাথের দুটি গান সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল — “গাও হে তাঁহার নাম” এবং “দেখিলে তোমার সেই অভুল প্রেম

আননে”। যত দূর জানি গানের স্বর এঁরা নিজেরা দিতেন না, বেশীর ভাগ সেকালের উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান থেকে ভাঙ্গা হ’ত; বিশেষ রূপদাঙ্গের গান। সেইজন্য এমন সব সুন্দর স্বরের দুর্লভ রূপদ ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু যেগুলির স্বরলিপি কাঙালীচরণ-কৃত ব্রহ্মসঙ্গীত ছয় খণ্ডের মধ্যে নেই, সেই সব গানের স্বর বোধ হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল।

শান্তিনিকেতনে গত ১৯৪১ সনের শেষে আসি। এই দশ বৎসরে রবীন্দ্রোত্তর কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত এখানে চালাবার চেষ্টায় কৃতকার্য্য হয়েছি, যথা—দ্বিজেন্দ্রনাথের “অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি”, “জাগো সকলে”, “জয় জয় পরব্রহ্ম” ইত্যাদি। তাঁর “কর তাঁর নাম গান” পূর্বেই চলিত ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের “কে রচে এমন সুন্দর”, “কেন ভোল ভোল”; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “তুমি হে ভরসা মম”, “জানি তুমি মঙ্গলময়”, “শুভদিনক্ষণ”, “প্রণমামি” তাঁর “বিমল প্রভাতে” আগেই চলিত ছিল, কিন্তু লোকে ভুলে মনে করত সেটি কবিগুরু রচিত।

ব্রহ্মসঙ্গীতের ১ম ও ২য় ভাগের অধিকাংশ গানই যদি মহাত্মা রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হয়, তবে ৩য়, ৪র্থ ভাগের গান বেশীর ভাগ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহর্ষিদেবের বড় ছেলের রচিত বলে অস্বাভাবিক অন্যান্য হবে মনে হয় না। কেন যে তাঁরা সেকালের অন্যান্য প্রকার সঙ্গে শেষ চরণে নিজের নাম দেওয়া বা ভণিতার প্রথা অবলম্বন করলেন না তাই ভাবি— তা হলে আর আমাদের প্রকৃত রচয়িতার সন্ধানে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হ’ত না এবং “উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ের চাপাতেও হ’ত না। কাঙালীচরণ সেন শুধু বহু ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি করে নয়, তাদের রচয়িতার উল্লেখ করেও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আরও কিছু দিন বেঁচে থাকলে কত উপকারই না হ’ত। কথের বহরের তুলনায় কর্ম্মীর বহর কত কম ভাবলে দুঃখ হয়।

সঙ্গীত-পুস্তকের ষষ্ঠ ভাগ থেকে যে রবীন্দ্র-যুগ আরম্ভ হ’ল, সেই যুগ দ্বাদশ ভাগ ছাপিয়ে গিয়ে, শান্তিনিকেতন ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত সমানে চলেছিল বলা যেতে পারে; যদিও শান্তিনিকেতন বাসকালে তিনি খুব বেশী তথাকথিত ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। তবে তাঁরই নির্দিষ্ট বিভাগানুযায়ী পূজা, প্রেম ও প্রকৃতির গানে সব রকম ভাব এত ওতপ্রোতরূপে জড়িত যে, দৈবী ও মানবীয় ভাবকে আলাদা করে ছাড়িয়ে নেওয়া শক্ত। তাঁর পরবর্তী বংশধরগণও এই সঙ্গীতের মহাসিদ্ধিতে নিজেদের ছিটে-ফোটা ঢালতে ক্রটি করেন নি। ষষ্ঠ ভাগের

অন্তর্গত “তুমি কি গো পিতা আমাদের,” “মহাসিংহাসনে বসি,” “কোথা আছ প্রভু,” “আমরা যে শিশু অতি” প্রভৃতি গানগুলি আমরা ছেলেবেলায় খুব শুনতুম ও গাইতুম—মনে আছে। তবে কোনটি রবীন্দ্র-রচিত প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত তা হলপ করে বলতে পারব না; সে গবেষণার ভার তাঁর অগ্রাঙ্ক নানা বিষয়ের গবেষকদের উপরেই রইল। এক সময় মাসিক সমাজ প্রবর্তিত হওয়ায় আমি সমাজে গিয়ে তাঁর গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজাতুম এবং তাঁর তখনকার নব নব রচিত সকালের গান—“তবে কি ফিরিব,” “ভব কোলাহল ছাড়িয়ে,” “ভোরের বেলায় কখন এসে” প্রভৃতি খুব ভাল লাগত—বিশেষত: শেষেরটি। অগ্রাঙ্ক হল তখন একালের কেউ জানে না, কিন্তু এটি এখনও লোক-রঞ্জন করে বলে আমার বিশ্বাস। গানের ভিতরেও বোধ হয় যোগ্যতমের উত্তরনের নিয়ম কাজ করে।

তখন একটি কি সুন্দর হারমোনিয়ম বা অর্গ্যান সমাজে ছিল, তার চাবি দোতলা। নীচেরগুলিতে হারমোনিয়মের আওয়াজ এবং উপরেরগুলিতে পিয়ানোর মত টুং-টাং আওয়াজ পাওয়া যেত। এত বড় যন্ত্রটাও কি কালের স্রোতে বেমালাম তলিয়ে মিলিয়ে অন্তর্ধান হয়ে গেল? আশ্চর্য! এই সেদিনও ত মাথোৎসবে বাজিয়েছি মনে হয়। তবে আমার সেদিন মানে অবশ্য অন্যদের বহুদিন। তখন হারমোনিয়মে দু’একটা গং বা গান বাজাতে পারে না, এমন ছেলেমেয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছিল না বললেই হয়। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেতার এসব রাজও বাজাতেন। শেখোক্ত দু’জন ত নাড়া বেঁধে বায়ার বিখ্যাত টেঁড়িজীর শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের ঘরোয়া একতানও হ’ত—হয়ত এক রাগিণীর বিলম্বিত, মধ্য ও ক্রান্ত লয়ের গান পর পর বাজিয়ে। এখনকার মত হারমোনিয়মের উপর এতটা বিশ্বদৃষ্টি তখনও পড়ে নি এবং আমার মনে ঐ যন্ত্রটির প্রতি সেই ছেলেবেলার টান তাই কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। আমি এখনও বলব যে ভাল যন্ত্র ভাল বাজিয়ের হাতে পড়লে হারমোনিয়ম আমাদের গানের সঙ্গত হিসেবে কিছুমাত্র অল্পপযোগী নয়; তার অনেক সুবিধেও আছে। তবে নিরুপস্থিত যন্ত্র ও বাদকের ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দ কানে অসহ্য লাগে এবং তারের যন্ত্র বাজালে দেখতে ও শুনতে সুন্দর হয় তা স্বীকার করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ কখনো কোন বাদ্যযন্ত্রে হাত লাগান নি, কেন জানিনে,। গানের তানও তিনি একপ্রকার বর্জন করেছেন বলতে হয়। তার দুটি কারণ আছে মনে হয়—এক,

তাঁদের ছেলেবেলা থেকে বড় বড় ‘গাওয়াইয়ার’ কাছে ভারি ভারি ঋণ শোনার অভ্যাস; দুই, তাঁর গানে কথার এমন প্রাধান্য যে, এক জায়গায় থেমে অনর্থক স্ববিস্তার করতে গেলে ভাবের রস-গ্রহণে বাধা হতে বাধা। কেবল যেখানে তিনি হিন্দী টপ্পার সুরে কথা বসিয়েছেন (যাকে চলতি ভাষায় বলে গান “ভাড়া”) সেই ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দিতে আপত্তি করেন নি। তাঁর এই গান-ভাড়ার অপরূপ কারিগরী, বা মধ্য জীবনে তাঁর সুরের ক্ষেত্রে বাড়ল সঙ্গীতের প্রবল প্রভাব সম্বন্ধে আজকাল এত সোদাহরণ আলোচনা প্রচলিত হয়েছে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভক্তের নিকট তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

মাথোৎসবের গানের সঙ্গে মাথোৎসবের সভাসজ্জা এবং আলোকমালারও কত পরিবর্তন আমাদের চোখের উপর দিয়ে হয়ে গেছে। যিহেজ্ঞানাথের সেজ ছেলে নীতীন্দ্রনাথকে বাইরের লোকে জাহুক বা না জাহুক, আমরা ঘরের লোকে তাঁর সভাপ্রাঙ্গণ সাজাবার কচি ও নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির জন্য অন্তত: চিরকাল তাঁর গুণ-কীর্তন করব। সেই ছ’ ফুটের উপর লম্বা সুপুরুষের মধ্যে বাস করত যে ছেলে-মানুষ, সে উঠানে দাঁড়িয়ে উপর-দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবত এবার সেই পুরনো গাঁদাফুল ও দেবদারু পাতার মালা দিয়ে থামগুলোকে কি নতুন ছাঁদের পোশাক পরানো যেতে পারে; লম্বালম্বি ঝুলিয়ে বা বরফির মত চকু কেটে, বা আরো কত রকমে মাথা খেলত তা পরদিন বাহার দেখলে তবে বোঝা যেত।

আলোকসজ্জার সর্বপ্রথম অবস্থা মনে পড়ে থাম পোতা। অর্থাৎ উঠানের ধারে ধারে হাত দশেক অন্তর গর্ত খুঁড়ে তাতে বেঁটে মাছুরসমান ছোট ছোট কাঠের থাম পোতা ও এক থাম থেকে অন্য থামে খাসগেলাস বা রেড়ির তেলের আলোকমালা ঝুলিয়ে দেওয়া। ১০ই মাঘে থাম পোতা থেকেই আমাদের উৎসবানন্দ আরম্ভ হ’ত, যেমন হিন্দু-বাড়ীতে প্রতিমার কাঠামো তৈরি থেকে ছেলেদের হয়। একটা কিছু চোখের সামনে পড়ে উঠছে, কাজ এগোচ্ছে দেখতেই ত ছেলেরা ভালবাসে; নিরাকার সৃষ্টিকর্তার ধ্যান-ধারণা অপেক্ষা তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্টি দেখা ও তাতে যোগ দেওয়াতেই তাদের আনন্দ বেশী। তারপর এল উঠানের দোতলার কাগিস বরাবর টিনের ফুলের সারে গ্যাসের আলো; তারপর ক্রমশ: আধুনিক বৈজ্ঞানিক আলো, যা এখনো সকলের চোখ ঝলসিয়ে বিরাজমান। আমার কিন্তু ধর্ম-মন্দিরে অত চোখ ধাঁধানো আলোর চেয়ে হয় মোমবাতি কিংবা প্রদীপের নরম আলো অধিকতর সুন্দর এবং মানানসই ঠেকে। মনে

আছে, বছর দুই আগে যখন শান্তিনিকেতনের মন্দিরে প্রথম বৈজ্ঞাতিক আলোর চল হয়, তখন চোখে বড় বিন্দুশ লেগেছিল; বিশেষতঃ আলোতে কোনরকম অবগুণ্ঠন না থাকায়। পরে অবশু তলায় পাথরের থালা দেওয়া হ'ল।

ছেলেবেলায় বাড়ীর ছেলেমেয়েরাই মাঘোৎসবে গান করত মনে হয়। মাঝে ওস্তাদ দ্বারা গান শেখানো ও গাওয়ানোর রেওয়াজ হ'ল। তাঁরা সেজন্য বেশ মোটা পারিতোষিকও পেতেন। শুনেছিলুম একবার কোন ওস্তাদের বাড়ীতে মহড়ার সময় এত চীৎকার হ'ল যে সেজের আলো নিভে গেল। সেই সময় পুরুষ-মহুসের দরাজ-গলায় খুব কালোয়াতী কাউরাঙ্গুপদ শোনা যেত এবং সেই সংস্কার থেকেই আমার মনে ঋপদের প্রতি একটা পক্ষপাত রয়ে গেছে, বিশেষতঃ পাখোয়াজের গুরু-গম্ভীর জলদমজের সঙ্গে। যদিও পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বলতেন যে, সেকালের অতিকায় জানোয়ারের মত ঋপদগুলিরও লুপ্ত হবার সময় এসেছে। কবিগুরু শান্তিনিকেতনে স্থায়ী হবার কিছুকাল পরে আবার নিয়ম হ'ল যে, দিনেন্দ্রনাথ এখানকার ছেলেমেয়েদের গান শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে একেবারে মাঘোৎসবের সভায় নিয়ে গিয়ে গাওয়াবেন। পরে শুনেছি আমাদের বাড়ীর মেয়েদের একেবারে বাদ দেওয়া হ'ল বলে কেউ কেউ দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু তখন বিবাহাদিহীন অনেক ঘরের মেয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল; তা ছাড়া আসল কথা হচ্ছে গান শেখাবার ভার নেবার মত জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তেমন কেউ ছিল না। এখনো মনে পড়ে দিনেন্দ্রনাথ একটি মাত্র ছোট হারমোনিয়মে বা এস্রাজে সুর দিয়ে তাঁর অত বড় দলকে কি স্মৃঙ্খলায় পরিচালনা করতেন। আর “প্রিয়তম হে আগো জাগো” প্রভৃতি নতুন গানগুলি শুনে কি ভাল লাগত! তখন একক গান অপেক্ষা সমবেত গানেরই রেওয়াজ ছিল বেশী।

আমি যেমন শান্তিনিকেতনে এসে দেখেছি “সোলো” গাইবার জন্য আঁকুবাঁকু ও মান-অভিমান চলেছে, তখন বোধ হয় সে ছরাশা ছিল না। একবার মনে আছে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ একই গান কলকাতার ও শান্তিনিকেতনের গানের দলকে শেখান; গান দুটি হ'ল—“নিত্য তোমার যে ফুল কোটে” এবং “প্রাণ ভরিয়ে।” আমরা এক দল দালানের দিকে এবং আর এক দল গানের মণ্ডপে বসে বেশ উত্তর-প্রত্যুত্তরের মত পালাক্রমে গান গাইতে গিয়ে দেখি—হে হরি! দু'দলকে দু'রকম সুর শিখিয়ে বসেছেন। এ সঙ্কট-মোচন কি ভাবে হ'ল ঠিক মনে করতে পারছি নে। কিছু একটা রফা হয়েছিল নিশ্চয়ই। আর একবার

কলকাতায় পিয়ানোয় বসে আমাকে “কে গো অন্তরতর সে” শেখাতে গিয়ে অহুযোগ করলেন—“তোরা শিখতে বড় দেরি লাগে।” বলা বাহুল্য, তখন আমার বয়স মাঝারি ছিল এবং কথাটা শুনে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম। কিন্তু পরে যখন শুনলুম ও দেখলুম দিহু এবং থুহু (অমিতা সেন) কি রকম অল্প সময়ের মধ্যে ওঁর চার-পাঁচটা নতুন গান একাদিক্রমে শিখে নেয়, তখন বুঝলাম তারা তাঁর অভ্যাস খাড়াপ করে দিয়েছে, এবং আমাদের কোনকালে কোন বয়সেই ভিন্ন ভিন্ন সুরের অতগুলি নতুন গান একটানা বসে শিখে নেওয়া ও মনে রাখা অসম্ভব ছিল।

দিহুর অবর্তমানে আমার উপরেই মাঘোৎসবের গান শেখানোর ভার পড়ল—কি কলকাতায়, কি শান্তিনিকেতনে। এখনো এখানে তাই রয়েছে। তবে কলকাতায় উৎসব চালনা আবার বাড়ীর ছেলেদের হাতে গিয়ে পড়েছে, সেটা সুরের বিষয়; কারণ তাদেরই ত কাজ। এখানে উপাসনা-পরিচালনার ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হয়। কারণ ক্ষতিমোহন বাবু বলেন, গুরুদেব বলতেন—মাঘোৎসবই মহর্ষির বাড়ীর একমাত্র উৎসব। আপনি তাই গিয়ে সেখানকার উপাসনা পরিচালনা করবেন। পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী থাকতে তাঁর বিগুহ সংস্কৃত উচ্চারণে আমাদের মন্দিরের বেদমন্ত্রপাঠে অনেক সাহায্য করতেন। তিনি আমাদের ত্যাগ করবার পর শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ স্বয়ং বেদীতে বসতে সম্মত হওয়ায় আমার খুব আনন্দ হয়েছে। অনেকেই জানেন যে, বিগুহ সংস্কৃত উচ্চারণে বেদপাঠ শেখবার জন্ত মহর্ষি তিন-চার জন ব্রাহ্মণকে কাশী পাঠিয়েছিলেন। আমরা সেই বিশেষ উদাত্ত অহুদাত্ত স্বরিত সুরে মন্ত্রপাঠ শোনায় আবাল্য অভ্যাস বলে অল্প কোন সুরে মন্ত্রপাঠ শুনতে ভাল লাগে না। তিন আচার্য্য বেদীতে বসে এক সুরে মন্ত্রপাঠ করলে যেমন স্বন্দর গম্গমে শোনায়, সেই ঐক্য-সুরের ব্যতিক্রম হলে তেমনি কানে কর্কশ লাগে। এখন কথায় কথায় ছোট ঘরেও প্রতি গায়কের সামনে মাইক ধরে দেওয়া হয়; কিন্তু তখন ত মাইকের অস্তিত্বও জানতাম না। অথচ ঐ প্রকাণ্ড প্রাদুর্ভাৱ শেষ, এমন কি দালানের ভিতর পর্যন্ত ত প্রত্যেক বক্তার গলা পরিষ্কার শোনা যেত। বড় বড় নাট্যশালায় গীতিনাট্য অভিনয়কারীরাও মেয়েদের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকণ্ঠের কোন ব্যক্তিক ক্ষীতির সাহায্য নেওয়া কখনো আবশ্যক মনে হয় নি। কিন্তু অনেক বিষয়েই তে হিন্দো দিবসঃ গতাঃ।

আমি একটু বৈচিত্র্যভক্ত বলে ঘরে বাইরে যেখানে ভাল গলার সন্ধান পেতুম, একক গানের জন্ত সংগ্রহের চেষ্টা

করতুম, তার মধ্যে শ্রীমতী মালতী ঘোষাল, সুনন্দা ও সত্যবা সেন, এবং আমাদের ঘরের বউ অমিয়া ও মেনকা দেবীকেই বেশী মনে পড়ে; যদিও মেয়েদের মধ্যে আরও অনেকে সাহায্য করেছেন। ছেলেদের মধ্যে হরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মুরারীমোহন মিশ্র উভয়েই স্বগায়ক ছিলেন, এবং উভয়েই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সঙ্গীত-জগতের খুব ক্ষতি হয়েছে। এ স্থলে স্বকণ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নামও উল্লেখযোগ্য। আর গোপাল সেনগুপ্ত নামক একটি অন্ধ গায়কের মধুর কণ্ঠে যখন শুনতুম “মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,” তখন কি রকম কষ্ট হ’ত। যাদের নাম করা হ’ল না তাঁরা যেন না মনে করেন তাঁদের ভুলে গেছি। ছেলেমেয়েদের সমবেত সঙ্গীত নানা প্রকার ভাগেযোগে গাইয়ে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করা হ’ত এবং এখনো হয়। তা ছাড়া ছোট ছেলেমেয়েদের একটা আলাদা দল করে তাদের দিয়ে উপযুক্ত গান গাওয়ানোর বেওয়াজ ও আমি নতুন করে প্রবর্তন করি; সে নিয়ম এখনো এখানে রেখেছি। কারণ ব্রাহ্মসমাজে ছোট ছোট গায়কের অভাব নেই, এবং ওরাই ত আমাদের ভবিষ্যতের আশাবরসা স্থল। ইউরোপে শুনেছি গির্জায় যখন কিশোর-কণ্ঠে সমবেত ধর্মসঙ্গীত গাওয়া হয় তখন সে যেন সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠের অতীত মাধুর্য্যে দেবদূতের কল্লনা মনে আনে।

স্বমধুর সঙ্গীতের সঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্য সম্মিলিত হ’ত, তখন জোড়াসাঁকোর উঠানে সে কি ভিড়, এবং উপরের বারান্দাগুলি হ্রদ্ব কিরকম লোকের ঠাসে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হ’ত, তা না দেখলেও সহজেই অল্পমেয়। আমার কোন স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের কাছে যখন এই ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকালীন ব্যাখ্যান বা উপদেশ পাঠে আমার অক্ষমতা এবং অযোগ্যতার অজুহাত জানাই তখন তিনি বলেছিলেন—তোমার কাছে আমরা মামুলি উপদেশ শুনতে চাই নি; কিন্তু তুমি দুই যুগই দেখেছ; তখনকার উৎসাহ এবং ধর্মের অভ্যুত্থান এখনই বা কমে গেল কেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের এমন অযোগ্যতাই বা হ’ল কেন এবং পুনরভ্যুদয়ই বা কিসে হতে পারে, এই সব কথা শুনতে চাই। তাই সে বিষয় আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বা মনে হয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হয়েও এটুকু বোঝা যায় যে, কোন বাহ্যিক আঘাত লাগলে বা আলোড়ন হলে সমাজের মনেও একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়। এই রকম আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ও বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার ফলে। বিশেষতঃ সমাজের উচ্চ স্তরে বিলেতী শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাবে পূর্বতন সমস্ত বিশ্বাস

এবং সংস্কারের ওলটপালট হতে লাগল; ওদের সভ্যতার সবই ভাল এবং আমাদের সবই মন্দ—ক্রমশঃ এইরূপ সিদ্ধান্ত হ’ল। যে বিষয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল, সেই ধর্মক্ষেত্রে যে আরো বেশী কুরুক্ষেত্র বাধে নি, তার একটা কারণ—যেমন এদেশের লোকের হিন্দুধর্মের প্রতি অবিচলিত আস্থা তেমনি আর একটা প্রধান কারণ রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ মহামনীষিগণ দ্বারা বেদবেদান্তের নির্মূল স্রোত ভগীরথের মত আবার বাংলাদেশে বহানো।

তাঁদের স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস দেওয়া বাহুল্য, এবং স্থাপনের অনতিবিলম্বেই আমাদের জাতীয় মজ্জাগত স্বভাবদোষে একখানা ভেঙে তিনখানা হয়ে গেল, তাও কারো অবিদিত নেই। আমার এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আদি সমাজ ও নববিধান সমাজ বলতে গেলে এক একটি পরিবারেই সীমাবদ্ধ রইল, যথাক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে। মহর্ষির জীবিতকালে মোটের উপর ব্রাহ্মসমাজে ও বাড়ীতে তাঁর প্রবর্তিত নিয়মই বহাল রইল; ঘরে বাইরে নিয়মিত উপাসনাদি ও মাঘোৎসব স্চারুক্রমে সম্পন্ন হ’ত। কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, বেহালা প্রভৃতি স্থানে শাখা-সমাজও বোধ হয় স্থাপিত হয়েছিল। বোম্বাইয়ের প্রার্থনা-সমাজ স্থাপনের সঙ্গে পিতৃদেবের কিছু যোগ ছিল কি না তা বলতে পারি নে; তবে তিনি তাঁর প্রবাসের কর্মস্থল থেকেও নতুন নতুন ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা করে পাঠাতেন তা জানি, এবং ওদিককার গুজরাটী ভজনাদিও ভাঙ্গতেন। তার মধ্যে “জয় দেব” “জয় দেব” ভজনটি আমাদের কালে খুব গাওয়া হ’ত; বিশেষ, শ্রদ্ধা-বাসরে। “নমামি মহিষাসুর মর্দিনী” নামক প্রসিদ্ধ দক্ষিণী ভজন ভাঙা পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের “ভজোরে ভজোরে ভবধগুনে”রও বেশ চল ছিল। পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “অল্পম মহিমপূর্ণ” “অস্তরতর অস্তরতম তিনি যে,” “আদিনাথ”, “আজি বিশ্বজন গাইছে,” প্রভৃতি গানের সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত, তাঁর “জয় পরম সত্য সদন”ও ছেলেদের শেখানো হ’ত। কিন্তু গানের স্মৃতির আর অস্ত নেই।

মহর্ষির তিরোধানের পরেও পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ যত দিন ছিলেন, বোলপুর থেকে সঙ্গীতাদি পরিচালনা করতেন, কখনো কখনো নিজেরও বেদীতে বসতেন, তা আগেই লিখেছি। অন্যথা তাঁর নাতিরা বসতেন। ৮ক্ষিতীজনাথ ঠাকুর ত অনেকদিন আদি সমাজের সম্পাদক ছিলেন, তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকাও পরিচালনা করেছেন। তার আগে বেচারাম বাবু ও চিন্তামণি বাবুর আচার্য্য-পদ গ্রহণের কথা মনে পড়ে। শেখোক্তের পুত্রগণ বোধ হয় এখনো

নানা অস্থবিধা সত্ত্বেও বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা করে চলেছেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজও তথৈবচ। অন্য শাখার কথা জানি নে।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে, সত্যের দিকে চেয়ে বলতেই হবে যে, তাঁর নিজ বাসভূমি কলকাতায় মহাবির সেই প্রাণপ্রিয় ব্রাহ্মসমাজের এখন মুহূৰ্ত্ত অবস্থা; তাঁর বাড়ীর একমাত্র সাংসারিক উৎসব মাঘোৎসবও কোন রকমে কাঙ্ক্ষিত সমাধা হয়। এই অধোগতির কারণ কি?

বৈধিক অবস্থার হেরফের একটা কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। আমার মনে হয়, তাঁর উপযুক্ত চার পুত্র যে কলকাতায় বাস ও পৈতৃক বাসভবন ত্যাগ করে, দুই ভাই রাঁচিতে এবং দুই ভাই শান্তিনিকেতনে বাস করতে চলে গেলেন তাতে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর, তথা আদি সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল। পরামর্শপূর্ব্বক তত্ত্বিতরে যে পৈতৃক অস্থান রক্ষা করবেন, সে সুযোগ তাঁদেরও রইল না, নাতিদেরও রইল না; বাইরের লোকদেরও এখানে সম্মিলিত হবার আকর্ষণ চলে গেল।

তা ছাড়া কালের গতিও ক্রমশঃ বদলে গেল। আত্মস্থানিক ধর্ম্মপালন অপেক্ষা সামাজিক কর্ম্মসাধনের প্রতিই আধুনিক শিক্ষিত লোকের মন বেশী আকৃষ্ট হ'ল। ভক্তিব্যোগ অপেক্ষা কর্ম্মব্যোগই এই দুঃখময় পৃথিবীর উন্নতির উৎকৃষ্টতর পন্থা বলে সাব্যস্ত হ'ল। যদিও দুটিই একসঙ্গে না চলবার কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পাওয়া যায় না; বরং ধর্ম্মের প্রেরণা না থাকলে কর্ম্মের প্ররোচনা যথেষ্ট থাকে না, অন্যান্য সমাজে ত দেখা যায়। তবে?—

আদি সমাজের প্রকৃত দুর্ব্বলতা, আমার মনে হয়, অন্যত্র খুঁজতে হবে। 'সমাজ' বললেই একাবাক্য একটি গোষ্ঠী বোঝায়। শুধু নিজের আত্মার মুক্তি যদি কাম্য হয়, কেবল ভগবানের সঙ্গে আমার আত্মার মিলনই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে সংসারাত্মক ছেড়ে বনে গিয়ে সাধনা করাই ত ভাল, যেমন আগেকার ঋষিমুনিরা করতেন শোনা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের একটা সামাজিক অংশ আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজ তাঁদের নিজ সম্প্রদায়কে ধর্ম্মবিশ্বাস ছাড়া কতকগুলি সামাজিক অস্থশাসনে আবদ্ধ রাখেন, কতকগুলি অস্থশাসন মেনে চলেন বলে তাঁদের একতা ও বল থাকে।

কিন্তু মহাবির করলেন কি?—ধর্ম্মের দিক থেকে তিনি হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র গোমুখীতে গিয়ে বেদ উপনিষদের হৃদয় মহান শ্লোক আহরণ করে একটি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচলন করলেন, তাঁর দুই খণ্ডে ধর্ম্ম এবং নীতির উপদেশ সম্মিলিত হ'ল। তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ ছিল,

পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্ত্তিপূজা ও সাম্প্রদায়িক নানাপ্রকার আচার অস্থশাসনে ভাবাক্রান্ত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্তে সেই একমেবাদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ উপাসনা ভারতবর্ষে প্রচার করা। "সবে মিলি তব সত্যধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।" সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত বেদমন্ত্র পাঠ, উচ্চাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত গান, ভগবদ্ভক্তি প্রণোদিত সাহিত্য-রসাত্মক ব্যাখ্যান প্রদান, আলোচনা-সভা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যত রকম সচুপায় সম্ভব তা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক দিক থেকে তাঁর তেমন গভীর ও একাগ্র কামনা ছিল যে, এই ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটি শাখা বলে গণ্য হবে; স্বতন্ত্র একটি ধর্ম্ম বলে নয়। যে জন্ম কেবল ব্রাহ্মণকে বেদীতে বসানো নিয়ে বেশবাবুর সঙ্গে গোল বাধল; যে জন্ম 'Civil Marriage Act'-কে তিনি কিছুতেই Brahmo Marriage Act বলতে রাজী হলেন না; যে জন্ম তাঁর সম্বলিত অস্থশাসন-পদ্ধতিতে তিনি হিন্দুসমাজের দশ সংস্কারের আসল বিচার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অস্থসরণ করলেন, এক মূর্ত্তিপূজা এবং হোম ছাড়া। হিন্দুধর্ম্মের যে প্রধান ভিত্তি জাতিভেদ, তাও তিনি সংস্কার বশতঃই হোক বা হিন্দুধর্ম্মের খাতিরেই হোক সম্পূর্ণ বজায় রাখলেন। কিন্তু 'যার জন্ম করি চুরি সেই বলে চোর।' হিন্দুধর্ম্মকে এত প্রশ্রয় দিয়েও তিনি তার মন পেলেন না। কারণ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে যাই হোক, বাংলাদেশে শালগ্রাম শিলা নইলে চলে না, সংস্কারের কথা বাদ দিলেও বোধ হয় আইনসিদ্ধ হয় না। হোম সম্বন্ধেও তাই শুনেছি।

ফলে দাঁড়াল এই যে, এক দিকে আদি ব্রাহ্মসমাজকে যেমন হিন্দুসমাজও দলে নিল না, অপর দিকে অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজও, অন্ততঃ সামাজিক ক্ষেত্রে, তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি মিশ খেতে পারল না, ঐ অত্যধিক হিন্দুয়ানি-ঘেঁষা বলে। একে ত পিরালী বলে, ব্রাহ্ম হবার আগে থেকেই আমরা হিন্দুসমাজে ঠেকা হয়ে ছিলুম; তবু পিরালী দলটা ত ছিল। তার উপর ব্রাহ্ম হওয়ার পরে সে দল থেকেও ভ্রষ্ট হয়ে সত্যই একঘরে হয়ে পড়লুম। অথচ ছেলেমেয়ের বিয়ে ত দিতে হবে?—যতদিন মহাবির ছিলেন, তাঁর অর্থবল এবং চারিত্র্যবলে তিনি ঘরজামাই রেখে, কুলীনের ঘর ভাঙ্গিয়ে নিজ পরিবারে নিজ মত সমর্থন করেছেন। যে দুই একটি ক্ষেত্রে তিনি থাকতেই তাঁর পরিবারে সে নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে সেখানে তাঁর অমোঘ দণ্ড কি কঠিন ভাবে অপরাধীর উপর পড়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেবার স্থান এ না হলেও পূর্বেই বলেছি, আদি সমাজের সামাজিক ইতিবৃত্তের সঙ্গে মহাবির পরিবার অবচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। এও বলব যে,

যে-স্থলে তাঁর বোঝাঘিতে কোন স্বার্থের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল না, সেখানেও তাঁর প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভক্তি বশতঃ তাঁর সন্তানগণ তাঁর অমতে কাজ করতে বিরত হতেন। মজা এই যে, যেখানে কোন বিশিষ্ট হিন্দুসমাজের বংশধরকে এঁরা স্বপরিবারভুক্ত করে সমাজচ্যুত করতেন, সেখানে তাঁদের কর্তৃপক্ষ অভিশাপ দিয়েছেন তাও যেমন শুনেছি; আবার মহর্ষির পরিবারের কেউ তাঁর নিয়মভঙ্গ করলে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন তাও শুনেছি। কোন দিকে মানুষ যায় ?

এ বকম করে বেশী দিন চলতে পারে না বলা বাহুল্য। শাস্ত্রে বলে—স্বর্গের পথ ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত, তার উপর সংসারের সঙ্কট-পথে যদি অতি সন্তর্পণে দুই দিক বাঁচিয়ে লহমন ঝোলার ওপর দিয়ে চলতে হয় ত বেশী দিন বেশী লোকে পারে না। বিশেষতঃ এখন আগের মত সমাজ-চ্যুতির শাস্তি যখন প্রায় কিছুই ভোগ করতে হয় না, পরকালে নরক-ভোগের ভয়টাও নেই বললেই হয়। ফলে মহর্ষির অবর্তমানে তাঁর বংশের কেউ কেউ বিবাহাদিমুখে হিন্দুসমাজভুক্ত হয়ে পড়লেন। অপর কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদী, উদার কালোপযোগী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেন। আমার মনে আছে একবার স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, বোধ হয় এঁদের বংশের সঙ্গে স্বীয় বংশানুগত সৌহার্দ্য-বশতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষিত হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু যখন বিবাহ সম্বন্ধে জাতিভেদেরক্ষাদি কড়াকড় নিয়মের কথা শুনলেন, তখন নাকি ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন না এই ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। এই একটি ঘটনা থেকেই আমার প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট হবে।

আর একটি দিকে ভয়ে ভয়ে ইঙ্গিত মাত্র করেই সামাজিক অভিযোগের পালা শেষ করব। আদি-ব্রাহ্মধর্ম জ্ঞানের ধর্ম। তার সংস্কৃত শ্লোকের গাভীর স্বীকার্য হলেও, তার অর্থবোধে সৌকর্যের অভাব, দুঃখ-শোকে সাহসনার অভাব, পূজার আয়োজনে ব্যাপৃত থাকার ব্যবস্থার অভাব। আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি নে, কারণ এই ধর্মেই আমরা মানুষ। কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে অহুসানে বলছি যে মানুষ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে একটা কিছু ইঞ্জিয়গ্রাহ্য, একটা কিছু ধরবার ছোঁবার মত চায়; দেবা করবার মত, নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দেবার মত একজন কাউকে পেলে ত কথাই নেই। যে জন্য গুরুবাদ শব্দ দোষ সম্বন্ধে এদেশে এত প্রচলিত। হিমালয়ের উচ্চ গিরিশিখরে সকলে স্বস্তিপূর্বক নিঃশ্বাস নিতে পারে না।

আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের কতকটা সগোত্র হলেও কেন আরও ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করল না, এবং মহর্ষির নিজের পরিবারেও কেন ১০০ বৎসর যেতে না যেতে শিথিলমূল হয়ে পড়ল, তার কারণ সাধ্যমত দেখাবার চেষ্টা করেছি। লোকে বলতে পারে, কতকগুলি অস্বাভাবিক কাণ্ড বর্তমান থাকা সম্বন্ধে নববিধান সমাজ ত আজও সুসম্বন্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ কথা সত্যতা যাচাই করার সুবিধা আপাততঃ না থাকলেও, মেনে নিয়ে বলছি যে, সত্যিই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মেয়েরা পিতৃভক্তির চূড়ান্ত দেখিয়েছেন, এবং আমাদের বাড়ীর মেয়েরা তাঁদের তুলনায় আদি সমাজের জন্য কিছুই করেন নি। কারণ বা অজুহাত দেখাতে গেলে বলা যেতে পারে অবশ্য যে, তাঁদের মধ্যে একাধিক মহারানী বিদ্যমান ছিলেন এবং অনেকগুলি সহোদর ভাইবোন একত্র থাকায় লোকবল, অর্থবল, ঐক্যবল তাঁদের মধ্যে স্বভাবতই সহজপ্রাপ্য ছিল। পূর্বোল্লিখিত জাতিভেদাদির বাধাও ছিল না। কিন্তু কারণ যাই থাকুক নিজেদের অক্ষমতা ও ক্রটি অকপটে স্বীকার করাই ভাল।

পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের কথা এখানে তুললুম না। যেমন তিনি একাই একশ' বা ততোধিক ছিলেন, তেমনি তিনি নিজেই বলতেন শুনেছি যে, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে তিনি নিজেকে আবদ্ধ মনে করেন না। বলতে গেলে তিনি একাই একটি সমাজ ছিলেন, এবং তাঁর প্রকৃত ধর্মমত কি ছিল তা নিয়ে এখনো বাদানুবাদ চলছে। শান্তিনিকেতনে তিনি মূলতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজেরই উপাসনা-পদ্ধতি বহাল রেখেছেন, তবে অনেকদিন থেকেই কাজে দেখিয়েছেন যে, যোগ্য ব্যক্তি হলে ব্রাহ্মণের আচার্য্যও বেদীতে অবস্থাই বসবেন। এমন কি ভিন্ন জাতির বরকন্যার বিবাহে আদি সমাজ-পদ্ধতিতে নিজে পৌরোহিত্য করে তার হিন্দুত্বের (তথা আইনের ?) মূলে কুঠারাবাত করেছেন। অতএব তাঁর কথা থাক। অতঃপর শেষ কথা ওঠে এই যে, মহর্ষির মৃষ্টিময় বংশধরদের মধ্যে এখনো যাদের—হয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কিংবা নিজেদের পূর্বসংস্কারবশতঃ—আদি সমাজের মতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার ইচ্ছে বা অভি-প্রায় আছে, তাঁদের সেই সমাজের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে কি না, এবং কিংকর্তব্য ?*

* ভবানীপুর, ব্রাহ্মসমাজের নব-সমতিতম সাধ্বসমিতি উৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত।

সালতামামি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

জন্ম গরীবের ঘরে। এক পরসার মুক্তি-মুক্তি খেয়ে এক বেলা কাটিয়ে দিয়েছে অনায়াসে। জ্ঞান হওয়া মাত্র দারিদ্র্য কি বস্ত্র জদরদম করেছে। বিদের চোটে সারারাত্রি হুম হুম নি—অথচ মুখ ফুটে বলে নি সে কথা। বড় হয়ে চাকরি পেয়েও সেকথা ভোলে নি। ভোলে নি প্রতিবেশীদের দ্বার অবহেলা, অর্থ না থাকার অসম্মান।

চাকরি পাওয়ার বছরখানেক বাদে বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। অশোচ পালন এবং শ্রদ্ধা-শাস্তির আয়োজন করতেই হ'ল।

মা বললেন, তুই একমাত্র ছেলে—উপার্জন করছিস, একটা ঘোড়শ কর।

না, ভিল-কাকন শ্রদ্ধ করব। গভীর ভাবে অটল উত্তর দিলে।

সে কি রে—নিদেন পক্ষে অন্ন-জল-বস্ত্র না করলে—

নিশ্চই হবে? হোক। পরের দুহোরে হাত পেতে বর্ষ বজাৰ রাখা—সে আমার দ্বারা হবে না।

হ'লও তাই। পড়শীরা বললে, অটল টাকা চিমেছে বুঝ।

অটল মনে মনে হেসে বললে, আর ভোম্বাদেরও চিমেছি। টাকা না থাকলে ভোম্বা ত নিশার স্বপন।

সামাজিক অকৃতিকে গ্রাহ না করে ও লক্ষ্যকে অকৃত আহ্বান জানালে। লক্ষী তাঁর সোনার ঝাঁপি নিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন হিসাবের খাতার—ব্যাকের খাতার। সে ঐশ্বর্য দিন দিন সঞ্চিত হতে লাগল। ব্যাকের খাতাখানি বন্ধ করে তুলে রাখলে ক্যান্স ব্যাগে। প্রত্যহ শোবার আগে বাস্তব ধুলে খাতাখানি বার করে তার পাতা ওপটার অটল—সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব করে। দুই থেকে তিন, তার থেকে চার-পাঁচ সংখ্যার ক্রমায়ত্ত্ব হতে থাকে। প্রতিবেশীদের কার কত ঐশ্বর্য সেই সঙ্গে হিসাব করতে থাকে অটল। পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা না থাকলে জীবন বারপের কোন অর্থই বুঝি পরিষ্কৃত হ'ত না, জীবন বাদে গড়ে অপল্প হ'য়ে উঠত না।

কিন্তু শুধু লক্ষীর ধ্যান করে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেওয়া চলে না। পৃথিবীতে সত্ত্ব যখন আমলের—তা ছাড়া আমল সত্ত্বেরও বহু পছন্দ রয়েছে। মনের সুধাকে এক পাশে তেলে কেলাও হুড়ক। মনের সুধাকে সর্বস্ব অর্থসত্ত্বের মেশার আচ্ছন্ন করে রাখা যায় না। প্রকৃতি তার ভাষা পাওনা আদার না করে ছাড়বে কেন?

মা অনেক দিন থেকে অসুস্থ হয়ে, আর কত দিন সংসার তৈলব?

তখনও চারের অক্ষ পাঁচ ওঠে নি—তাঁর অসুস্থতায় গুরুত্ব অনুভব করে নি অটল। তার পর এক দিন বুকে—বাইরের লোক দিয়ে সংসার চালানোতে—সংসার. ত ভাল ভাবে চলেই না—অর্থের-হর অথবা অপব্যয়। টাকা দিয়ে সম্পর্ক পাতালে টাকার মতই তা শুকনো বন্ বন্ হ'বে—যদিও ওর বস্ত্রাট্টা মধুর—এবং ব্যাকের খাতার অক্ষ বৃদ্ধি করলে হয় মধুরতর। তা ছাড়া নিজের দিক দিয়েও কেমন কঁাকা কঁাকা ঠেকে। আপিস থেকে এসে আর ময়লা বিশুদ্ধ বিছানার বসে শ্রান্তি দূর করতে কেমন বিরক্তি বোঝ হয়। আলো জালা, চা তৈরী করা, কুঁড়ায় জল তরা—এটা ওটা আরও অনেক কাজ—বুড়ো মা একা আর কতই বা করবেন।

অটল মাকে বললে, তা ভোম্বাদের যা ধুশী করগে বাপু—আমি কিছু বেশী খরচ-টরচ করতে পারব না।

শোন কথা! মা পুলকিত হয়ে বললেন, খরচ—আমরা করব কেন—যাদের কল্যাণ সে ভার তাদের।

সম্বন্ধ আসতে লাগল। চলতে লাগল মেয়ে দেখা। কিন্তু কোন মেয়ে আর পছন্দ হয় না অটলের। রূপের সুরে মন বাঁধা থাকলেও রূপের জলুস ওর কল্পনাকে কতকটা হুড়ী করে রেখেছে বইকি। দৃষ্টির দর্পণে যে সব প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে—তার কল্পনার সঙ্গে মেলে না, সম্বন্ধ তেড়ে যায়।

মা ভেবেছিলেন—অর্থ অল্প প্রাণ ছেলের—পাওয়ার পান্নাটা বুকেলেই কণাবার্তা পাকা হয়ে যাবে—কিন্তু ব্যাপার দেখে বুকেলেন—তা হবার নয়। বুকে হতাশ হয়ে একদিন বললেন, বুকেছি—আমার কপালে বোরের সেবা খাওয়া নেই। আমি আর সংসারে থাকব না—আমার তীর্থে নিয়ে চ।

প্রথমটা মায়ের অভিমান বলে বলে নিয়েছিল অটল। ক্রমে বুকেলেন—তার সঙ্গে সন্তানের ঘেম যোগ আছে। মা জিদ ধরেছেন—তীর্থে যাবেনই। তাঁর অভিমান তাদ্ধাবার মত সখল থাকলেও ইচ্ছা মাই অটলের। এখনও মেয়ের বাপেরা হ'বেলা বর্ষা দিচ্ছেন বাড়ীতে। কত অহুস—প্রলোভন—ক্রোধ—কাকুতি—বর্ষনীতি আর মহুসাতের দোহাই যে চললে তার ইয়ত্তা মাই। ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিবেশ—অশান্ত হয়ে উঠছে মন। অটলও এক দিন বললে মাকে, সেই ভাল—চল হ'জনে তীর্থে বেরিয়ে পড়ি।

মা বললেন, আমি আর কিরব না। হয় কানী—মা হয় যুগাবন—যেখানে ভাল লাগবে সেইখানে থাকব।

অটল বললে, চল ত—আগে বেরিয়ে পড়ি—তারপর যা ধুশী ভোম্বার করবে।

একজন দুবসম্পর্কার আত্মীয়ের জিন্সার বাড়ীখানা রেখে হু'বনে বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

মন্দ কি বাইরেটা! ঘরের বাঁধন পথের মাঝে রইল না, তবু পথকে ভাল লাগছে। রেল-লাইনের হু'বারে মাঠের প্রসার যেমন অদ্ভুত—ট্রেনের গতিবেগে প্রকৃতিও ভেমনি প্রাণ-ময়ী হয়ে উঠছে। হু'বারের গাছপালা ছোট্টে—আকাশের তারা ছোট্টে—চন্দ্র সূর্য্য ঘুরে ঘুরে যায়—নদী জল সরে যায় পায়ের তলা দিয়ে—বিদীর্ণ হয় পাহাড়ের প্রাচীর—ছোট ট্রেনগুলো গাড়ী চলার বেগে কাঁপতে থাকে—বড় ট্রেনগুলো বহু আলোর আলুস বাড়িয়ে নিকটে আসার সঙ্কেত করে। একঘেয়ে জীবনে গতি এনে দিল বৈচিত্র্য—ট্রেনের হু'পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল যে প্রকৃতির টুকরো—তা সত্যই অদ্ভুত। তাকা মন নিয়ে ওরা কাশীধামে পৌঁছল।

মা বললেন, অনেক দিন আগে একবার এনেছিলাম কাশী—কাশীমা যেন দেবনাথপুরার থাকতেন। বাড়ীটা দেখলে চিনতে পারি।

বাড়ীটা বার করা কঠিন হ'ল না—কিন্তু কাশীমা নেই। বছর কয়েক আগে তিনি কাশীলাভ করেছেন। যে বর্ষায়নী তাঁর ঘরখানি দখল করে ছিলেন—তিনি সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, থাকুন না এইখানে—ওই পাশের ঘরটা শু খালিই রয়েছে। আপনি যখন জানা চেনা লোক—আপনার কাছে কি আর বেশী ভাড়া নেওয়া ভাল দেখায়, হু'ত যদি বেগান। ঘাড়ী শু কথা ছিল।

হাঁ—কল জলের একটু অসুবিধা। আরও অসুবিধে কিছু হবে হরত—এক বাড়ীতে পনের ঘর শু। কিন্তু তাও বলি—বাবা বিশ্বনাথের ছিচরণে একটু কষ্ট করে পড়ে থাকবার ক্যামড়া যদি না কোপার শু পরকালের গতি কি হবে। স্নান শু গঙ্গায়—পুষ্কো—আত্মিক সব সেইখানে। বাবার মাথায় ফুল জল ঢেলে কতটুকুই বা বাড়ীতে থাকা। রাঁবা আর বাওয়া—আর রাঙিরে একটু চোখ বুজে শোওয়া। তা না হলে রাজা বল, কণ্ঠকতা বল, কেতন বল—কি না হচ্ছে দশাধর্মের ঘাটে। অমন জুড়োবার জায়গা আর আছে তুতারতে? বতকণ বসে থাকবে, মনে হবে—কৈলাসে রয়েছি।

কাশীর মাহাত্ম্য শুই থাক—নীচের তলাটা তারি স্যাণ্ড-সেন্টে আর অন্ধকার। এমন অন্ধকার যে দিনের বেলায় কেরোসিনের সুপি আলিয়ে রাখলে তবে কার সঙ্গে কথা কইছি বুঝতে পারা যায়। ঐশ্বকালে এই নীচের তলাটার প্রাণ-জুড়ান ঠাণ্ডা।

কথাটা মিথ্যা নয়। হুপুরে দোভালা ভিন্ন ভলার বাসিন্দারা নেমে আসেন, ঘরের কোলে চওড়া বারান্দার বলে জুড়লিস। হেম কথা নেই পৃথিবীতে না সে মজলিসে

আলোচিত না হয়। বে বিষয়েই আলোচনা হোক—একটু ফুল বস্ত্রে সেট ঘুরে কিয়ে আসে।

ওমা, এখনও বিরে হর নি ঘেরের। লক্ষ টুকর দেবহ শু ভাল করে? পুরুষদের ওই রকম এলাকাঙ্কি কাজ। তা ভাই—টাকার বাই আর কার কম বল? যেরে সুন্দরী হলে—তবু ওরই মধ্যে একটু—

না দিদি, ঘেরের রূপ শুণ কোনটাই কেউ দেখে না—টাকাটাই আসল। না হলে দেখ না—আমাদের অমিয়ার আকণ্ড আইবুড়ো নাম ঘুচল না।

তা ভাই—সত্যি কথা বলতে কি—কাশীতে ক'টি বাঙালী আছে। বিরে বাওয়া দিতে হলে—ঘেরেকে বাংলাদেশে মানী পিসির বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।

কোন্ ঘেরেট গো? অটলের মা শুধোলেন।

ওই যে কোণে বসে পান সাজছে। অন্ধকার ঘর—তবু ঘর আলো করে আছে। কিন্তু কথায় বলে না—অতি বড় সুন্দরী না পার ঘর—এও হয়েছে ভাই।

এ দিকে এসো শু ঘেরে।

আর না লো অমিয়া—সরে আর। প্রণাম কর দিহিকে। মানী হন ইনি। পান খান শু দিদি? দে একটা পান দে। দোস্তা?

এমনি করে আলাপ জমল এবং হু'পকের ফুল-পরিচর হু'পক সংগ্রহ করলে বুটেরে বুটেরে।

অমিয়ার মা ধপ করে অটলের মায়ের হাতখানি ধরে বললে, তুমি দিদি—আমায় কত দার থেকে উদ্ধার কর না কেন? বাবা বিশ্বনাথই ভোমার পাঠিয়েছেন।

অটলের মা সবেদে বললেন, অনেক দিন থেকে মনে শু ইচ্ছে অমনি কন্ঠে টুকটুক বউ একটা বরে আনি। কিন্তু ছেলের যে বহুকতাটা পণ।

বহুক-তাড়া পথের বৃত্তান্ত শুনে অমিয়ার মা বললেন, একবার দেখুক না ঘেরেটাকে। পছন্দ না হয়—বুঝব ঘেরের অর্হুট।

আচ্ছা—কাল দশাধর্মেরে বেড়াতে বাব বিকেলে—ঘেরেকে বহি নিয়ে যাও—

তার আগেই সুযোগ ঘটল। সেই রাঙিতে হঠাৎ অসুহ হয়ে পড়লেন অটলের মা। সকালে ডাক্তার ডাকতে হ'ল। ডাক্তার বললে, ঘরটা বড় ড্যান্স—পায়ের শু রোগীকে ভাল বরে নিয়ে বাবার ব্যবস্থা করুন। আর শুষ্কবাও দরকার।

হুট জিমিলেরই অতাব। অটল হির করলে মাকে হাস-পাতালে দেবে।

অমিয়ার মা বললেন, মেকি বাবা—আমরা থাকতে দিদি

কেম হাসপাতালে যাবেন? বর বদলাবার ব্যবস্থা করছি—
সেবার তারও আমাদের।

অমিয়াদের দোস্তলার বরে উঠে আসতে হ'ল। সেবার
তারও ছেড়ে দিতে হ'ল উদের উপর। না দিয়েই বা করবে
কি অটল। সে বড় কোর ছুটোছুটি করে ডাক্তার ডাকতে
পারে—ওষুধ পথ্য কোপাড় করতে পারে। ওষুধ খাওয়ান
—ফলের রস তৈরী করে দেওয়া সেটাও যদি বা সম্ভব হয়—
প্রহরে প্রহরে হাওয়া করা—গা হাত টিপে দেওয়া—বিছানা
বদলান—হ'বেলা রান্না—এ সব করে কে।

সব তার নিলে অমিয়া, বললে, সরুন আপনি—আমরা
করছি সব। করলেও পরিপাট করে। বাইরের অনাড়ম্বর
মাহুধকে এমন মমতা ঢেলে সজ্জা করতে কখনও দেখেনি
অটল। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। শুধু কি সেবাই দেখলে?
সেবার পিছনে ফুটে উঠল ঘেরূপ—তা যেন দেহের বস্ত্রে
কোমল কামিনী ফুলের মতই শোভা সৌরভে অতুলনীয়। এই
রূপই কি এতদিন কল্লনার আকাশে সপ্তর্ষি বিস্তার করে উজ্জ্বল
হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ?

আপনি শুনে পড়ুন—আমি দেখছি।

এর উপর অগাধ বিশ্বাস আর নির্ভরতা রাখা চলে।

আল্লম—খাবেন।

সেবাতেও অতুলনীয়।

তবু কি—সেরে উঠবেন না।

আধাসদারিনী—অভয়া।

কল্লনা বাস্তবে মিশে গেল।

মা মুহু হয়ে উঠলেন। ঘেরেটকে ঘণারীতি বিনাপণে
এহণ করে দেশে ফিরল অটল।

তার পর? তার পর বাস্তব অবস্থা কল্লনাতে ফিরে যার
নি। ফিরে যারও না তা। সংসারে রোজ যখন চড়ে—তীক্ষ্ণ
মুগ্ধ জালে দিক হয় কুয়াশারান, দৃষ্টির প্রসার যার কমে।
অমিয়া আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। কল্লনাকে যুছে দিয়ে ও হয়ে
উঠল প্রথর।

বললে, জানালাতে একটুও পরমা মেই কেম? এতদিন
মা করেছ—করেছ—এখন এ বাড়ীর আজ রাতে হবে।

কথার সুরটা কেমম কেমম—তবু অটল হিবা বোণ করলে
না ওর অহুরোণ রাতে।

আর এক দিন অমিয়া বললে, বৈঠকখানা ঘরটি এমন যা-
তা হয়ে পড়ে আছে কেম? পাঁচ জন বাইরের লোক আসেন
কি মনে করেন বল ত?

অটল অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে অমিয়া হেসে
বললে, আচ্ছা—ব্যবস্থা বা করবার আশি করছি—একটা ফর্দ
তৈরী করে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে খাতা পেনসিল নিয়ে বসলে অমিয়া। একটা
গোলমত টেবিল—আর চারখানা চেয়ার, বইয়ের র‍্যাক, একটা
আলমারী, খান আঠেক মাঝারি পোছের ছবি। এই সবীক্ষনাধ
—বিক্ষেপানন্দ প্রভৃতির। একটা ভাল দেওয়াল-আলনা—
জানালার হু'পাশে দুটো ক্র্যাকট—আর জামাকাপড় টাঙাবার
জুত একটা দেওয়াল-আলনা। ইচ্ছে হলে একখানি ইজি
চেয়ারও রাখতে পারা যায়। চেয়ারে নোকা হয়ে বসে বসে
মাক্কা পিঠি টুন্ টুন্ করলে—খানিকটা গড়িরে পড় তাতে।

অটল ফর্দের উপর চোখ বুলিয়ে গভীর হ'ল।

কি, কথা কইছ না যে?

চার পাঁচশোর বাকা—হু'মাসের-মাইনেতেও কুলোবে না।
নীরস কণ্ঠে জবাব দিলে অটল।

সবই কি মাইনের টাকা থেকে করাতে বলছি?

তা ছাড়া ত পরের ছয়োরে হাত পাতে হর। তেমনি
নীরস কণ্ঠের উত্তর।

বারই বা করবে কেম? বলতে বলতে অমিয়াও কুণ্ঠিত
হয়ে পড়ল। অতিমানও হ'ল। বার ছাড়াও যে উপায়
আছে—সেটি মনে মনে জানে অমিয়া—কিন্তু যুগে বলা কত
না কঠিন। সামান্য দিনই হ'ল সে এ বাড়ীতে এসেছে। এ
বাড়ীর ব্যয়কুঠ মাহুঘের পরিচর্যও সামান্য পেরেছে। সেই
সঙ্গে তার কেমম ব্যরণা হয়েছে—অভাবের কষ্ট এখানে
থাকতেই পারে না। এখানে লক্ষ্মীর আসনখানি পাতা আছে।
কোথায় পাতা আছে সেইটুকু শুধু বুঝতে পারে নি।

ওর কুণ্ঠা বুঝলে অটল। গলার ঘর বধাসম্ভব কোমল
করে বললে, বৈঠকখানা নিয়ে মাথা ঘামিও না—আমার বন্ধু-
বান্ধবরা ছেলেবেলা থেকেই জানে আমাকে—এ বাড়ীর
প্রত্যেকটি ভায়গা বা জিনিষ ওদের মনদর্পণে।

অমিয়া আর কথা কইলে না।

ওর সহসা নীরব হয়ে যাওয়ার ব্যাঘাটা ঠিক বুঝলে না
অটল, তবু মনে হ'ল সুর যেন কোথায় কেটে গেল। মনকে
প্রবোধ দিলে—হু'দিন থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু গভীর হয়েই রইল অমিয়া—আর কোম নুতম
অহুরোণ নিয়ে অশান্তি বাড়াতে না।

রাত্রিতে অমিয়া শুখন খেতে বসেছে—শোবার ঘরে
ছয়োর বন্ধ করে ব্যাকের খাতাখানি বুললে অটল। খাতা
বুলেই চমকে উঠল। ইস্—দুটি মাসে মোটেই অকপাত হর
নি ভাতে। যা উপার্জন করেছে—ব্যয় হয়েছে সেই পরিমাণে।
এ ভাবে যদি মাসের পর মাস চলতে থাকে—চকলাকে
রাখা যাবে কি অচঞ্চল করে? না, আরও লজ্জা হতে
হবে।

এবার অহুরোণ এল অজ দিক থেকে। মা বললেন,
হী রে অটল, বৌমাকে কি, একখানা ক্যাটকেটে লাল পাড়

শাভী কিনে দিয়েছিল? হেলেনা মুখ বউ—কোথার রতীন
হেলেনার বাপড় কিনে দিবি—তা না—

ওই শাভীই ত তোমার বউ পছন্দ করলে।

আর তোর পছন্দ নেই বুঝি? অ! আমার কপাল।

অগত্যা আজকালকার সিনেমা-গম্বী একখানা রতীন শাভী
কিনে আনতে হ'ল। রাজিতে প্যাকেটটা অমিরার হাতে
দিয়ে বললে, দেখ দেখি—পছন্দ হয়?

শাভীখানা লোভনীয় বটে—খুসীতে অমিরার হুট চোখ
উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তবু সে ভাব যথাসাধ্য দমন করে ও
বললে, মন্দ কি।

তা হলে তোমার ভাল পছন্দ হয় নি বল?

পছন্দ হবে না কেন। তবে ওবাড়ীর মাদারির পরশে যে
শাভীখানা দেখলাম পরন্ত, সেটা সেটেই ডিকাইনের। করনা
মাহুয কিনা—মানিয়েছে খানা।

অটল চুপ করে রইল। করনা মাহুযকে যে শাভী চমৎকার
মানায়—তা নিয়ে বেশী আলোচনা করা নিরাপদ নয়।
অমিরার গায়ের রঙ একটু ময়লা হলেও বা ও প্রসঙ্গে
আলোচনা দীর্ঘ করা সম্ভব হ'ত। অমিরার বুদ্ধিটা যদি আর
একটু প্রখর হ'ত।

কিন্তু অমিয়া একেবারে নিকেরা নয়—তা শাভীখানা
খাটের উপরে রাখার বরণে অটল বুঝলে। একখানি রতীন
শাভী এনে যে বউকে কৃতজ্ঞ করে দেবে—সে বুঝি ছুরাশাই—
এ যুগে। একখানা শাভী যদি নিজের পছন্দে আনা যায়—
আর ছুখানা বউয়ের পছন্দে—এনে দিলে ক্ষতি কি। বরং
এইটাই ত চিরকালের রীতি। প্রিয়কে ভালবাসা জানাবার
এমন সহজ ও সুঠু প্রণা যে সর্ব সূপেরই।

বাই হোক—এ ক্ষেত্রেও তুর কেটে গেল—মনে মনে
আহত হ'ল হৃদয়েই।

মাসের শেষে অমিরার হঠাৎ অর হ'ল। উপবাস ও বরের
হোমিওতে রোগ কমল না—বাইরে থেকে ডাক্তার আনাতে
হ'ল। ডাক্তারে আর পথ্য যা ব্যয় হ'ল—তা অটলের প্রায়
এক মাসের মাইনে। এতে আর কার মেজাজ কোমল থাকে?

তাই মা যখন বললেন, ডাক্তারবাবু বলেছেন—বউমার
দিনকতক হাওয়া বদলায় দরকার—অটল তখন ক্রককণ্ঠে
জবাব দিলে, আমরা যদি হাওয়া খেয়ে কাটাতে পারি—
তবেই ওকে পেট তরে হাওয়া খাওয়ায় চলবে। কোথার
যেতে হবে তুমি? বালারোর—না কাশ্মীর?

তোর বাপু সবচেয়েই ভিত্তি বিরক্ত ভাব। কেন, কাশ্মীতে
বউমার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া যায় না?

তাই দিযো।

তোকোই ত রেখে আসতে হয়।

আমি পারব না—হুট দেবে না আপিসে।

হুট কিন্তু নিভেই হ'ল। জমাগত ডাক্তার ডাকা—মোট
রকম কীক আর পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা—এখানে থাকলেও
নিতার নাই। তার চেয়ে কিছু খরচ করে যদি রেখেই আসা
যায়।

চল তোমার রেখেই আসি।

না, আমি এখানেই থাকব।

ঠালা সামলারে কে তুমি? ওসব মতলব ছাড়।

না—আমি যাব না। অমিয়া ঈশ্বর ঋজের সঙ্গে জবাব
দিলে। কোন মুখে মার কাছে গিয়ে দাঁড়াব। বিয়ে হয়ে
অবধি একখানা দশি দিয়ে মার মাম রাখতে পেরেছি?
পুণোতে একখানা শুভ বস্ত্র দিয়ে প্রণাম করার সৌভাগ্য হ'ল
না—কোন মুখে যাব তাঁর সেবা নিতে?

হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কান্ডাতে লাগল অমিয়া। রোগা শরীরে
এত কান্ডা ভাল নয়। কালই হয় ত অর উঠবে—ডাক্তার
ডাকতে হবে।

অমিরার মাথার হাত রেখে কোমল বরে বললে অটল,
হিঃ—আবার কীদে? নাও উঠে বস—কালই একখানা মটকার
বুত্তি কিনে আনব—সত্যি বলছি...

মাসের শেষে ব্যাকের বাতাবানি বার করলে অটল।
না—আর কোন আশা নাই। লক্ষী যে পথে প্রবেশ করেন
সেই পরিচিত পথটি চিরদিনের জটাই বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।

তার পর কাশ্মী থেকে বাহ্য নকর করে ফিরে এল অমিয়া।
ওর নিটোল গলার নুতন বরণের কাঁস হার উঠল—ওর কর-
প্রকোষ্ঠ অলঙ্কৃত হ'ল কৃকচূড়া আঁর্দলেটে। শাভী এল করে-
খানা। অলঙ্কার ও শাভীতে সুপ্রসাবিতা হয়ে অমিয়া যেন
প্রফুল্ল সরোবরে পদ্মের মত ফুটে উঠল।

অটল চেয়ে চেয়ে দেখে—কথা বলে না। মনটা ছ—ছ
করে ওঠে। কি যেন হাতের মুঠো থেকে কণ্ঠে গেল—কারা
যেন চক্রান্ত করে ওকে কড়ুর করে দিচ্ছে। নিরুপায় ক্রোধে
ও অলতে থাকে এবং অত্যন্ত ভালমাহুয়ের মতই সব সহ
করে যায়।

এক দিন শরীরটা ধরাপ হওয়ার বাড়ী ফিরে এল সে।
ট্রাম থেকে মেঝে মোড় ঘুরতে যার দেবা পেলেন...দেবা না
পেলেন ও সুখী হ'ত। কিন্তু দৈব বিফলনা।

পথের মাঝে কোন কথাই হ'ল না—অপায়ে একটু অলঙ্ক
বুত্তি নিক্ষেপ করে অটল গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরল।

অমিয়া আসতেই জিজ্ঞাসা করলে, বইখানা কেন লাগল?
বই। চমকে উঠল অমিয়া।

অটল মনে মনে বললে—এইবার ডাকা-ডাকা হয়ে
অমিয়া বলবে, কিসের বই বলছ—বুঝতে পারছি না ত?

হাঁগো—যেখান। জীবগীতে চলছে। ভাল বই ত ?

অমিয়া বুঝলে যেমন করেই হোক, ওর দ্বিপ্রাহরিক সিনেমা-শ্রীতির রহস্য খেমে কেলোছে অটল। কিন্তু এতে স্নেহ করবার কি আছে ?

অমিয়ার মুখও তার হয়ে উঠল। নিজেই যথাসাধ্য সামলে নিয়ে বললে, আজ গিরেহিলাম—মানে ওবাড়ীর ম'দি টেনে নিয়ে গেলেন। সত্যি কি হৃদয় হয়েছে বইখানা। নন্দা দেবী এমন চমৎকার পাঠ করলেন—

নন্দা দেবীকেও চেনা তা হলে। গভীর ধমকমে গলায় ব্যাক করে উঠল অটল।

কেমন চিনব না। আজকালকার দিনে ছবির মানুষদের কে না চেনে। এক মুহূর্তে অমিয়ার খয়েরে ঘন্ডের খুর বেঁকে উঠল।

আমাদের মত বরের লোকদের ওসব নেশা ভাল নয়।

অমিয়া উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, আমাদের মত বরের মেয়েরাই সিনেমা দেখে বেশী। না দেখে তাদের উপায় কি। তারা হিমরাভ দাসীস্বস্তি করবে সংসারে—ছুটো মিষ্টি কণাও কেউ বলবে না—আদর বড় ত দুঃখের কথা। মানুষের শরীর মন বলেও একটা জিনিষ আছে—সিনেমার গিরে ওবু তারা হৃদয় ছুতোতে পায়, না হলে... আর বলতে পারলে না অমিয়া। অশ্রুবাণ্ণে ওর বর স্তব্ধ হয়ে এল—তাড়াতাড়ি চলে গেল ও বর থেকে।

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল অটল। যেন ফুল ফুলতে গিরে তার মধ্যে দেখেছে কালসাপ। এ ত কোনকালেই কল্পনা করে নি সে। গরীবের কতাদার উদ্ধার করে তেবেহে—কৃতজ্ঞতার বুলো এই ধণ পরিশোধ হবে। এমন একটি আশ্রয় পাওয়ার সৌভাগ্য কোন দিন কি কল্পনা করেছিল অমিয়া ? কিন্তু হার—অভাবের সংসারে বাস করেও মেয়েদের মন বহু দুরাশা পোষণ করে। একটা কথা আছে—থোতে পেলে ততে চায়। সে-ও কিছু প্রশ্ন দিয়েছে বটে, সেটা ঠিক প্রশ্ন নয়, খানিকটা মমতা আর ভালবাসাও হয় ত—তারই ভাসিমে খুশী করার চেষ্টা—কিন্তু সে হয়েছে আগুনে ঘি ঢালার ভুল্য। শাস্ত্রকাররা উপমাটা ঠিকই দিয়েছেন—ঘিরের ছিটে দিলে আগুন উজ্জ্বল হয়—সেটা পরিতৃপ্তিকমিত উল্লাস নয়—আরও পাওয়ার লালসা। এই চিরতৃপ্তী লালসা খুঁজি মেয়েদের মনে স্তম্ভি-প্রভৃৎ থেকে বাসা বেঁধে আছে।

সংসারকে শক্ত বনিয়াদে ঠাঁড় করাতে না পারলে হৃৎকণ্ঠে ঠেকানো যাবে না কোনমতেই। সংসারকে শক্ত বনিয়াদে ঠাঁড় করানো মানে মনকে বতহূর সন্তব কঠিন করা—কোয়ল রুটিগুলিকে বিনা মমতার নির্মূল করে ফেলা।

কাগুটা সহজ হ'ল—পরের দিন অভিমানের জেরে তুলে অমিয়া বললে, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দেবে—না আপত্তি তুলবে অনেক খরচ হবে বলে ?

আপত্তি তোলাটাই বাতাবিক। এই ত হু'মাসও হয় নি হাওয়া বদলে এল অমিয়া।

অটল কিন্তু আপত্তি তুললে না। বাতাবিক বরে বললে, বেশ ত—আমি রেখে আসব।

অমিয়া মিমিটখানেক স্তম্ভিত বিষয়ে চেয়ে রইল অটলের পানে। না, পরিহাসে লঘু নর ওর মুখমণ্ডল, অভিমানে বিকৃত হয়ে উঠল না রেখাগুলি। অভ্যস্ত সহজ মানুষের মতই মুখের রং—গলায় খুর। অমিয়ার চোখে জল উপচে পড়ল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে সামনে থেকে সরে গেল সে।

না অবশ্য আপত্তি তুললেন। অটল হেসে বললে, যেতে চাইছে—যাক না দিন কতকের জট। শরীর মন ভাল না থাকলে মানুষ কখনও সুস্থ থাকে না।

সেই শরীর মনের খোঁটা। অভয়ালে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছল অমিয়া। অভ্যস্ত শক্ত হয়ে কি যেন শপথও করলে একটা। তার পর প্রণাম সেরে ধীর পায়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

গাড়ী বদল করতে হ'ল—হু'একবার। হু'জনে পাশা-পাশি বসে—গাড়ী ছুটেছে জোরে। হু'জনেরই মনে হচ্ছে—সেই গতিবেগে পরস্পর ছিটকে পড়ছে বিপরীত দিকে। দীর্ঘ একটি দিন কথা কি কর নি ওরা ? হাঁ কথা বলেছে বইকি, কিন্তু অকানা মানুষের লগে আলাপে এর চেয়ে যথেষ্ট হৃত্তা থাকে।

অমিয়াকে রেখে ফিরে এল অটল। রাজিতে খরচের খাতা আর ব্যাকের পাশ বই নিয়ে বসল। এত দিনে ঘমা-খরচে সামঞ্জস্য হবে হরত। বনিয়াদ শক্ত না হলে...

সংসারের ঘটনাগুলি মানুষকে মাকে মাকে পরিহাস করে। সে পরিহাস কখনো বা মর্শাস্তিক হয়। জমা-খরচের খাতার অক পড়তে লাগল ঘন ঘন। বাতের অক যতটা হিভিনীল—ডাইনের অক সেই পরিমাণে গতিবান। না বাতের বেঘনায় শয্যা নিলেম—তাকে দেখবার জট দুই সম্পর্কীয় পিসিমাকে আনাতে হ'ল। আনতে হ'ল কবিরাজ। দর্শনী—ব্যবস্থাপত্র—অহুপান—ওষুধ আর পথ্যের বহর দেখলে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ে। পিসিমা বিধবা স্ত্রিচারুপ্রভৃৎ মানুষ—তার খাওয়ার বাছবিচার যেমন—তেমনি উপবাস-পারণের ঘটনা ক'ম নয়। অমিয়া শুনে—'যেমন কর্ত্ত তেমনি ফল' বলে মুখ টিপে টিপে হাসবে নিশ্চয়। সুতরাং অমিয়াকে না আনিতে খরচের খাতার অকপাত করে চলল অটল।

অটল বললে মনে মনে, সংসারের পাক যেমন শক্ত দড়ির মত—পাকও তেমনি তল তলে গভীর। পাক যদি বা খোলে পাক কড়িয়ে বরে পারে। এ থেকে কেউ বুঝি কোম কালে পরিজ্ঞাপ পায় নি।

না তখনও বিহানা ছেড়ে ওঠেন নি। পিসি বললেন, নিজের সংসার কেলে আর কতকাল এখানে পড়ে থাকব বাবা—তুই বরক বৌমাকে আনা।

মা—প্রাণ থাকতে তাকে পত্র দিতে পারবে না অটল। দীর্ঘ ছুটি মাসে একবারও খবর নিরেছে কি? তাকে যেতে দিয়ে আসা মানে—তার হাজার রকমের সাধ-আজ্ঞাকে প্রণয় দেওয়া। বৈঠকখানা ঘরের আসবাব, শাড়ী, সিনেমা, গহনা, বহুসমাগম—নানান রকমের উৎপাতকে লাদয়ে আত্মসম আনানো। অমিয়া এলে সেই বসবে ঘরে—লক্ষ্মীর আসনবাশি টেমে ফেলতে হবে পথে। লক্ষ্মীর সঙ্গে আজকের বিবাহ বুঝি অমিয়ার।

পিসি বললেন হাকে, এদের রীতি ব্যভার বুঝি না বাপু। বগড়া কি হয় না বামী-জীতে? সকালে হয়—সন্ধ্যায় মেটে। ছুটো দিন বাপের বাড়ী থাকলে মনে হয়—হুখানা পাখা যদি দিত ভগদান। এ কালের কি সবই ফুটিছাড়া বাপু। তা তোমরা রাগই কর আর বাই কর—আমি পরণ চলে যাব।

চলে গেলেনও তিনি।

মা অলহায বয়ে বললেন, মরণ ত হবে না—আমাকেও না হয় টেমে টেমে গলার কেলে দে, জুড়োই।

অগত্যা অটল মায়ের জবানীতে চিঠি লিখলে শান্তীকে।

তাই বেয়ান—আজ হাসখানেক হ'ল আমি বাতের খেদমায় শয়্যাপত আহি। আমাকে দেখাশোনা—সেবা-তজ্জবা করার লোকের অভাব, সংসারও অচল। অটল আগিল কামাই করে আমাকে দেখাশোনা করছে—তার ত একদণ্ডও অকাজ বাবার অবসর নেই। অন্তএব যদি পত্র পাঠ বউমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন...

পত্রের উত্তর এল :

পূজনীয় বিদ্যাম ঠাকুরাণী—আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আপনার অনুরোধের সংবাদে যার পর নাই হুঃখিত ও চিন্তিত রহিলাম। অমিয়া ত আপনার অনুরোধের খবর শুনিয়া অবধি বাইবার জন্য জিদ বরিয়াছে। কিন্তু আমার জানা-চেনা এমন কোন লোক নাই বাহার সঙ্গে ওকে পাঠাইয়া দিই। আর কোড়া মাসে ঘেরে পাঠানো বা আনা আমাদের হিন্দু ঘরের রীতি নহে। মা যে সম্ভান-সম্ভবা—এই সংবাদ নিশ্চর জানেন। এই কারণে লিখিতেছি যে, অটল বাবাজীবন যদি নিজে আসিয়া হাকে লইয়া যান ত...

সম্মিত মুখে ছেলের পামে চেয়ে মা বললেন, বউমাকে আনতে যাবি তুই? তুই না গেলে—

অটল হিসাব কয়তে বলল—অমিয়াকে আনা মানে তার হাজার রকমের সাধ-আজ্ঞাকেও বয়ে আনা। পুরাতন যে সব সাধ-আজ্ঞাদের বার্তা একে একে অটলের গোচরে এমন-ছিল—তা ছাড়াও নুতন অভিধির জন্য কত নুতন রকমের ব্যয়না যে জমা হচ্ছে...

ভবু আপনার ঘরে এলে অটল এক বার হু'বার ভিন বার আভোপান্ত পড়লে চিঠিখানা। পড়তে পড়তে তার মনে হ'ল—মাহুকে এক সম্পদ থেকে নামিয়ে আর এক সম্পদে প্রতিষ্ঠিত করতে সারা হুনিরাটাই বুঝি মড়বয়ের ভাল দুদছে অহরহ। সে ভাল হিঁড়ে বেকরার সাধ্য বা সাধ হুর্বল মাহুকের নেই।

অটল চিঠিখানি সম্বড়ে ভাঁজ করে বাজের মধ্যে রেখে দিলে এবং হিসাবের বাতাবানি বার করলে টেনে। তারপর জানালার ধারে এসে সেখানে কামালা গলিয়ে কেলে দিলে বাইরে।

বৈকালের আহ্বান

শ্রীকালিদাস রায়

এস বধু এস গাগরী ভরিতে শীতল জলে,
দীঘি ডাকে তোমা কূলে ছলছলি কি কথা বলে।
না মুদিত্তে তার নয়ন-কমল
এস তার হৃদি হয়েছে অমল,
নিবিড় পরশ চায় তব তার গভীর তলে।

এস বধু এসো তরুণাধাপরে পাখীরা ডাকে,
অধর দেরি কেন, এস ত্বরা করি বলদী-কাঁখে।
হয়ে এল বধু দিবা অবসান
তোমাতে তাহার না শুনায়ে গান,
কুলায়ে পশিবে কেমনে, তোমার আশায় থাকে।

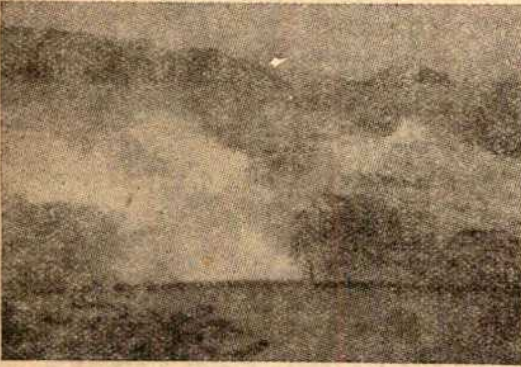
ডাকে রাঙা রবি ঘাটপথে বধু তোমা না ছেরি;
অন্তে নামিতে অথবা তাহার হয় যে দেরি।
গোধূলি-ধুলার আবিবে ভরিয়া
রেখেছে ও পথ ঘোরালো করিয়া,
সে ধুলার ফাগ রঙিন করিবে ও তছু ঘেরি।

ডাকে তব সুই বসি জলে ঐ ডুবায় গলা,
কত কথা শোনা হয় নি কত যে হয় নি বলা।
ঘরে ঘটরা থাকে যদি জল,
ঢালি আঙিনায় এস করি ছল,
ফিরিবার পথে হেরিবে গগনে চন্দ্রকলা।

বরাহক্ষেত্রে

শ্রীনিলিনীকুমার ভদ্র

বরাহক্ষেত্র বিশাখাপত্তন। বরাহ নদী বিশাখাপত্তন জেলার মাঝবান দিয়ে প্রবাহিত। অসংখ্য দেবদেবী অঙ্গদেশের এই সমুদ্রস্রোতা, শৈলকিরীটনী পুণ্যভূমিকে বিরাট মহিমায় মণ্ডিত করে রেখেছে। তদ্ব্যতীত ওরালটেরার থেকে নয় মাইল দূরবর্তী “সীমাচলম” (সিংহাচলম) পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত বরাহনরসিংহ মন্দিরের খ্যাতি সমগ্র ভারতে প্রচারিত। কথিত আছে, পুণ্যকালে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্ম ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞান এই পর্বতে মন্দির নির্মাণ করিয়ে নরসিংহাবতারের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু পুণ্যকামী নরনারী এই ভীর্ণ-স্থানে এসে সমবেত হয়।



সমুদ্রবক থেকে বিশাখাপত্তন বন্দরের দৃশ্য

প্রাচীন ভারতের যে সকল দেশের গৌরবময় কীর্তিকাহিনী সংকলিত কাব্য মাতৃক ভাষ্যশাসন, বৈদেশিক পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদিতে পরিকীর্তিত, কলিক সেগুলির অভ্যন্তর। এই দেশের পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে অরুণপ্রসারী মহাবন, দক্ষিণে বিপুলসজ্জা গোদাবরী, উত্তরে মনোরম চিফা হ্রদ। এই তিন শত বর্গমাইল পরিমিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত। উত্তর অংশের নাম বলরামক্ষেত্র, দক্ষিণ-ভাগ গৌতমক্ষেত্র আর মধ্যভাগ হচ্ছে বরাহক্ষেত্র—এই বরাহ-ক্ষেত্রই বর্তমান বিশাখাপত্তন জেলা।

সমুদ্রোপকূলস্থ বিশাখাপত্তন শহরটি অতি প্রাচীন। এখানকার সত্যীর্ণ সন্ন্যাসী গুলিগুলি কান্নীর গুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রাচীন আমলের কোন কোন সৌধে ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর ছাপ সুপরিচ্ছট। আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় উপকরণই এখানে আছে বটে, কিন্তু তবুও যেম এই নগরের মধ্যে প্রাচীনত্বের স্পর্শটুকু এখনও লেগে রয়েছে।

সন্ধ্যার পরে বিশাখাপত্তনের সাগর-সৈকতের দৃশ্যটি পরম উপভোগ্য। তীরের একেবারে কাছটিকে হ্রদ-সাত হাত উঁচু পোতার উপর প্রস্তর-নির্মিত দৌলসমূহে বৈরাগিক আলোক-মালা জলে ওঠে, সুস্থানে সাগরের বুকে ভাসমান বহাগুলির উপর আলোকরশ্মি দৃষ্টমান হয়, ওবারে লাইট হাউস থেকে নিকিষ্ট, ইত্যন্তঃ সঞ্চরমাণ আলোকচ্ছটার সমুদ্রবক মাঝে মাঝে হয়ে ওঠে শুভ্র রেখাঙ্কিত।

সমুদ্রতীর থেকে হোটেলের ফিরে আসছিলাম। গলি ছাড়িয়ে সবে বড় রাস্তার পা দিয়েছি হঠাৎ অনতিদূরস্থ এক দৌল থেকে মাইকের মাধ্যমে বিকীর্ণ গানের আওয়াজ কানে ভেসে এল। দক্ষিণী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সুরে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে গেলাম। সদর রাস্তার ঠিক পাশেই পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু ভিত্তির উপর তৈরি এক সুরম্য প্রাসাদের নিম্নতলস্থ বৈরাগিক আলোকমালায় উদ্ভাসিত একটি কক্ষে উৎসবের বিপুল সমারোহ।

কিসের উৎসব দেখবার জন্মে মনে আগল প্রবল কৌতূহল। সামনের দিকে ঘুর আগলে আছে ঘাহীরা, চলছে আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনার পালা। সুবলাব এদিকে অমাত্যত আগ-জ্বকের প্রবেশ নিষেধ। পাশের দিকে আর একটি দরজার নিকটে গিয়ে দেখি সেখানে আহম্মদই মত কৌতূহলী মণ্ডকদের ভিড়। অনেক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভেতরকার উৎসব-সমারোহ অবলোকন করছে।

গট গট করে সোপানশ্রেণী অভিক্ষেপ করে উর্ধ্ব আরোহণ করলাম এবং যা থাকে কপালে বলে সুস্থ ঘরপথে সরাসরি ভেতরে ঢুকে ভিত্তির মধ্য পাঁচ হলে বসলাম। হুঁ এক জনের কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি আমার 'পরে নিকিষ্ট হ'ল, কিন্তু কেউ কিছু বললে না।

ভেতরে প্রকাণ্ড ভিড়—লোক একেবারে গিস গিস করছে, তিল ধারণের জায়গাটুকু পর্যাপ্ত নেই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শুভ্র আর বিলামসমূহ উপরের ছাদকে ধারণ করে রেখেছে। ভাল করে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম, বিরাট ভবনটির বহিঃপ্রকাণ্ডে বিবাহ-উৎসবের অহুষ্ঠান শুরু হয়েছে। অন্দরমহলের প্রবেশপথের সামনে, পাশাপাশি বর-কনে উপবিষ্ট। বরের মাথার সপত্রপুষ্পে শোভিত সাদা পাগড়, কপালে খেঁচ চন্দনের তিলক, গলার স্বর্ণহার, হাতে সোনার চুড়ি। বোর কৃষ্ণবর্ণ, দশাশই চেহারা—সাজোয়ান পুরুষ। গায়ে একটা সিকের চাদর আছে বটে, তবে দেহের উত্তরার্ধের প্রায় সবটুকুই অদৃশ্য। মুখে ইয়া প্রকাণ্ড এক ছোড়া ডাম

কেয়ার পৌক—চেহারার বেশ একটা বেপরোয়া ভাব।

বরের বাম পার্শ্বে বসে আছে কনে—রূপলাবণ্যবতী তরুণী। মাথার সাদা কিতে জড়ানো—কবরীতে চাপা ফুলের



সীমালয়ের সোপান-পথ

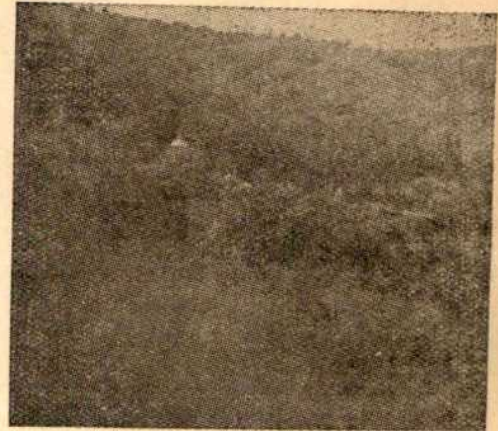
মালা—এক গা গহনা, গলার কয়েক মর স্বর্ণ-হার। বর যেমন বেপরোয়া, কনে তেমনি স্ত্রীভাবনতা। মুখখানি আনত, দৃষ্টি মেঝের নিবন্ধ—লক্ষ্যের মেয়েটি যেমন একেবারে মাটির লড়ে মিশে যাচ্ছে। বিশালবণু বরের পাশে তরুণী বধুটিকে যে কিরণ বেমানান দেখাচ্ছিল তা আর বলবার নয়।

বরকনে ঘেঘানে বসে আছে তার নিকটেই বিচিত্রবেশা অবগুষ্ঠিতা পুরমহিলাদের ভিড়। তাদের নিরাবরণ মস্তকের কৃষ্ণ কেশদাম পুষ্পান্তরণে ভূষিত। স্বর্ণ-নির্মিত নীবিবন্ধে উজ্জ্বল বৈরাগিক আলোক প্রতিফলিত হয়ে বকমক করছে। বরের ঠিক পেছমেই বসে আছেন এক বয়সী বিপুলানী মহিলা—মাথা একদম জাড়া, পরনে ধামধুতি—আবখানা মাথা বোমটায় ঢাকা। মস্তকের অবগুষ্ঠিত অঙ্গ এবং মস্ত্র স্ত্রীলোকদের বৈষ্যবোর নিদর্শন। এই বিধবা মহিলাটির সর্বাঙ্গে কিন্তু অলঙ্কারের প্রচুর্য—গলার স্বর্ণহার, হাততরা সোনার চুড়ি—জুহেলারির দোকানের শৌ-কেনকে হার মানিয়ে এই মেদ-বিপুল। বিধবাটি বিবাহ-বাসরে বিরাজিত।

বরকনের উত্তরপার্শ্বে বসে আছেন পুরোহিতকুল। তাঁদের মাথার চার পাশ ফুর দিয়ে টেচে কামানো—মাঝখানের দীর্ঘ কেশগুচ্ছ উড়ে-তুটির আকারে গ্রহিবদ্ধ।

কিছুক্ষণ পরে অস্ত্র-পূর্ব থেকে এলেন কয়েক জন এয়োদ্রী। তাঁদের মধ্যে এক জন কনের গায়ের উপর চাপিয়ে দিলেন একটা কিনকিনে গুড়মা। এর পর যে ব্যাপারটি শুরু হ'ল তা সম্ভবতঃ স্ত্রী-আচারের অন্ততম অঙ্গ। মেঝের উপর একটা বিশাল, রূপোর থালা ছিল একপ্রকার সাদা গুঁড়োর তত্তি। দুয়ের থেকে ঠিক বৃত্তে পারি নি—সম্ভবতঃ চালের গুঁড়ো হবে। হঠাৎ কয়েক জন তরুণী এই থালার কাছে এসে বসলেন

এবং কিপ্রহন্তে মুঠো মুঠো সাদা গুঁড়ো বর-কনের গায়ের মাথার ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। এ ব্যাপারে স্ত্রীদেবের ক্রান্তি নেই। মাঝে মাঝে তাদের কলহাতে বিবাহ-মণ্ডপ মুগ্ধিত হয়ে উঠতে লাগল। এদিকে আপাদমস্তক সাদা গুঁড়োর আবৃত হয়ে কনে বেচারির অবস্থা কিন্তু কাহিল। তখন বর এগিয়ে এল তাকে এই স্ত্রী-আচার বা অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে। বর শুধু যে নিজের গায়ের সাদা গুঁড়োগুলোই ঝেড়ে মিলে তা নয়, একেবারে আহুত-গা হয়ে, নিজের চাদর দিয়ে কনের দেহেও ঝেড়ে পৌছ শুরু করে দিলে। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে চার দিকে এক বার গুফ আবর্জনা করে তাকালে—মুখের ভাব এমনি যেন কোরিয়ার লড়াই জিতেছে। বিবাহ-বাসরে বাঙালী বরের সলক্ষভাবেবর সঙ্গে অঙ্গ বয়ের এই বীরতাবের তুলনামূলক সমালোচনা স্বতঃই মনে উদ্ভিত হ'ল।



সীমালয় পাহাড়ের একটি দৃশ্য।

বাঁ দিকে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি একটা রূপোর বালভিতে পান তত্তি করে নিয়ে এসে বিতরণ করতে লাগল—বলা বাহুল্য, আমিও বঞ্চিত হলাম না। তন্ত্রদেশের “তাম্বুলম” বড়ই মুগ্ধরোচক, পানবিলাসীদের বিশেষ আদরের বস্তু। হঠাৎ একটা স্ত্রী গড়ে কক আমোদিত হয়ে উঠল। এক জন একটা স্বর্ণপাত্র থেকে সবাইকে গোলাপী রঙের স্নতো আর সোনালী জরিতে মোড়া এক একটা সফ্র কাঠি বিতরণ শুরু করলে, কাঠিটির অগ্রভাগে সুরভিত তুলো জড়ানো। এদের বিবাহ-অহুষ্ঠানের এই অঙ্গটি বড় ভাল লাগল। হাত বাড়িয়ে এই স্ত্রী-উপহার গ্রহণ করে সমস্ত পকেটে রেখে দিলাম। আলোকে হাতে, সৌগন্দ্যে এবং স্ত্রীদেবের কলগুঞ্জে আর অলঙ্কারশিল্পে এমনি একটা বিচিত্রমধুর পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইচ্ছে হ'ল অহুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত দেখে যাই,

কিন্তু এটিকে রাত বেড়ে যাচ্ছে, বেশী দেরি করলে হোটেলের দরজাই হফতো বন্ধ হয়ে যাবে, অগত্যা বিবাহ-মণ্ডপ পরি-
ত্যাগ করে হোটেলের পথ বললাম।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে সীমালম্গামী বাস ধরবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সদর রাস্তায় পা দিতেই একজন অন্ধ ভ্রমলোকের সঙ্গে দেখা—মুখে তাঁর শিক্কা ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, সীমালম্গামী বাস ভিন্ন পথে কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে, তবে চৌরাস্তা থেকে আর একটা বাস সীমালম্গামের পথে কিছু দূর পর্যন্ত যাবে, তিনি ঐ বাসে ফিরবেন নিজের গাঁয়ে। ভ্রমলোক আমাকে তাঁর সঙ্গে ঐ বাসে চাপতে বললেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, আমার সীমালম্গামী পৌছানোর ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।



নুসিংহদেবের মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার

ছ'জনে বাসে আরোহণ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস ছেড়ে দিলে। ভ্রমলোকের সঙ্গে আলাপ বেশ জমে উঠল। সুরুতেই আমাদের আলোচনা রাজনৈতিক প্রসঙ্গের পথে মোড় নিলে।

আমি যেদিন বিশাখাপত্তমে পৌঁছি সেই-দিনই কিষাণ মজহুর প্রজা-পার্টির মেডা ত্রী টি প্রকাশম বিশাখাপত্তমে এসে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে-
ছিলেন। সে প্রসঙ্গে আমার সহযাত্রী বললেন, “প্রকাশম হচ্ছেন অন্ধের লোক, তিনি তেলুগুদের গৌরব। দেশের জন-
সাধারণের উপর তাঁর দরদের পরিসীমা নেই, আপনি অন্ধ-
দেশের সুদূরতম গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত পরিভ্রমণ করলে দেখবেন
গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিত্যর জন্মের তাঁর আসন কিরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত,
কিরূপ প্রভাব সঙ্গে তারা উচ্চারণ করে তাঁর নাম। তেলুগুদের
জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর

কণ্ঠে—তিনি অন্ধের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ লোকনায়ক—
“পিপ্পলস ম্যান” বললে বা বুঝার প্রকাশম হচ্ছেন তাই।”

তেলুগু সংস্কৃতির প্রসঙ্গ উঠলে ভ্রমলোক বললেন, “তেলুগু
ও তামিল দুটি বিভিন্ন জাতি—এই উভয় জাতির ভাষা
আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য
যে দীর্ঘকাল ধরে তামিল-প্রাধান্য আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে।
জোর করে তামিল সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের
বাড়িতে। কিন্তু আমাদের জাতীয় স্বাভাব্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা
বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে—”র দ্বারা যদিও তিনি জাতিতে
তেলুগু—তাঁর পূর্বপুরুষেরা অন্ধদেশ থেকেই মাজাজে গিয়ে
বসতি স্থাপন করেছিলেন।”

ফকাল গভীর চিন্তামগ্ন থেকে ভ্রমলোক কতকটা যেন
বসন্তোজ্জ্বর মত বললেন, “আমরা তেলুগু জাতি এক বিরাট
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। তামিল সংস্কৃতির
আওতায় পড়ে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন পরিপূর্ণ ভাবে
বিকশিত হয়ে উঠতে পারছে না—কাজেই আমাদের আত্ম-
বিকাশের জন্তে ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র অন্ধপ্রদেশ গঠিত হওয়া
একান্ত এবং আশু প্রয়োজন।”

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, “আমাদের এ
আন্দোলন আজকের নয় ভ্রমজী। দেশভক্ত কোণা
তেম্ভটাপ্লাইয়া পট্টলু ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অন্ধের স্বাভাব্য
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। কয়েক বছর পরে
অন্ধ মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারী রূপে স্বতন্ত্র অন্ধপ্রদেশের
দাবি করে লক্ষ্যে কংগ্রেসে তিনি একটি মারকলিপি উপস্থাপিত
করেন। ১৯০৭-এ তিনি মাজাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য
নির্বাচিত হন এবং তার পরের বছর পরিসিদ্দে, ভাষার ভিত্তিতে
স্বতন্ত্র অন্ধপ্রদেশ গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। পরিসিদ্দের
অনেক সদস্য গোড়া থেকেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে
থাকেন, এই আন্দোলনকে দাবির রাগবার জন্তে চেঁচায়ও
ক্রটি হয় নি, কিন্তু সকল বাধা অগ্রাহ করে আন্দোলনের শক্তি
উত্তরোত্তর বর্ধমান হয়ে, স্বাধীন ভারতে আজ তা সাকল্যের
পথে অগ্রসর হওয়ার তেলুগুদের মন আশার ভরে উঠেছে।”

সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছিল টের পাই নি। চমক
ভাঙল যখন এক জারপায় বাস থামলে পরে আমার সহযাত্রী
বললেন, “ভ্রমজী, এবাং আপনাকে নামতে হবে।” আমার
সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বাস থেকে অবতরণ করলেন এবং বারো
আনা ভাতায় সীমালম্গামী পর্যন্ত একটা রিজা ঠিক করে দিয়ে
আমার নিকট বিদায় নিয়ে বাসে গিয়ে উঠলেন।

রিজা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল সীমালম্গামের পথে।
শুইই শহর, বাজার, লোকালয় ছাড়িয়ে এসে পড়লাম প্রকৃতির
উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে। লাল মাটির রাস্তার উপর দিয়ে রিজা
চলেছে ধীরমধুর গতিতে। ভানদিকে সবুজ শম্পারূত উচ্চাবচ

অবিশ্বীর্ণ প্রান্তর। দূরে মেঘমালাসন্নিভ পূর্ব-বাট পর্বতমালা সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত প্রসারিত। বামিকে রাস্তার অনতিদূরে আত্মকানন। সুপরিপক স্বর্ণকান্তি ফলতারাভরিত শাখাসমূহের শোভা অপূর্ণ। "ছন্দোপাত্তঃ পরিণত ফলদোত্ততিঃ

অতিক্রম করবার পর পাওয়া যায় এক একটি প্রশস্ত চাতাল, শ্রাদ্ধ পণিকেরা ভাতে বিশ্রাম করে ক্রান্তি অপমোদন করে।

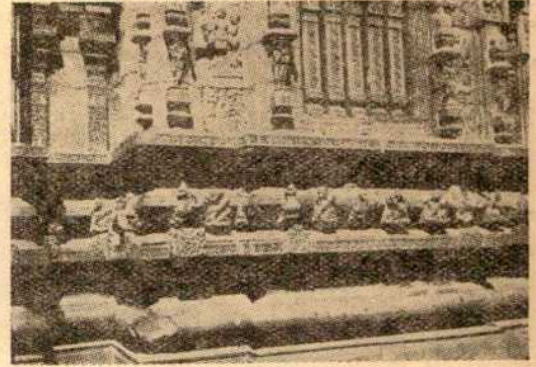
রাস্তার উত্তরপার্শ্বে ঘনসবুজ তরুৱাজি আর লতাগুল্লের নিবিড় জঙ্গল। স্থানে স্থানে পুষ্পরাজির প্রাচুর্য দেখে মনে হয়



মন্দিরগাজের একাংশ

কামনাত্রৈ... "মেঘদূতে, দক্ষিণ-ভারতের পর্বতের প্রান্তভূমিতে আত্মকাননের যে বর্ণনা পাঠ করেছি তা স্মৃতিপথে সন্নিবিষ্ট হ'ল। সুসুখে আকাশের পটে বিলীন পাহাড়ের নীলিমায় যেন সুদূরের তাত্ত্বানি। মনের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে বলেই বুঝি প্রতীতি হচ্ছে—নভোজীম পর্বতমালা উড়ে চলেছে কোন্ অনন্তের উদ্দেশে। "পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ"—কবিশুভর এই উক্তিই গুণাধ যেন উপলব্ধি করতে পারছি। সকালবেলার সোনালী আলো এসে পড়েছে সবুজ তৃণাভীর প্রান্তর আর লাল মাটির পথের 'পরে। বিখসিঙ্গী যেন, লাল ও সবুজ রঙে আঁকা চিত্রপটখানির উপর সোনা মাঝিরে 'ফিনিশিং টাচ' দিয়ে তাকে অপরূপ ত্রিমুখিত করে তুলেছেন। জনবিরল পথ। শীতলসিক্ত শীতল বাতাস শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে—নির্জনতার মোহ সমস্ত অন্তর্গত কেমন যেন করে ফেলেছে আচ্ছন্ন। চোখ বাইরের রূপ দেখছে বটে, কিন্তু মন যেন ডুব মেরেছে একেবারে নিজের অন্তরতম সত্তার গহনভলে। সমস্ত চৈতন্য দিয়ে উপলব্ধি করছি—বাতাসে ধ্বংস প্রবাহ, লিঙ্গ করণ করছে মধু, ধরণীর ধূলি হয়ে উঠেছে মধুর।

কয়েক মাইল এগোবার পর সীমাচলম্ পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে রিজা ঘামল। এবার শুরু হ'ল পর্বতারোহণের পালা। ভৈরব ফটকের পর থেকে প্রস্তরনির্মিত স্তূপসোপান-পথ ধাপে ধাপে আট ম' ফুট উঁচুতে পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত মন্দির পর্যন্ত উঠে গেছে। বারো মত সোপান অতিক্রম করে মন্দিরে পৌঁছাতে হয়। এই সোপান-পথ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন পুণ্যবতী রাণী অহল্যাবাই। ষটকতক সোপান



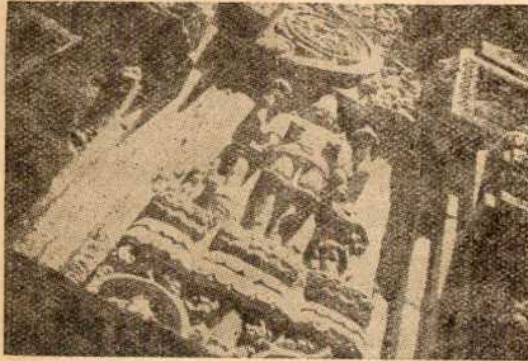
মন্দিরগাজে স্থাপত্যকারকাঁচা

বনভূমিতে শুরু হয়েছে হোলি-উৎসবের সমারোহ, আর রঙের খেলার বনলক্ষীর সবুজ বসনখানি হয়ে উঠেছে বিচিত্রবর্ণে অসু-রঞ্জিত। মাঝে মাঝে কলাবন আর আভাবন আরণ্য দৃশ্যের মধ্যে বেশ একটুখানি অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের পাশাপাশি বিদীর্ণ করে একটি বরণাধারা নেমে এসে কলা-বাগানের ভেতর দিয়ে অদৃষ্ট হয়ে গেছে। তার কুল কুল ধ্বনি যেন নৃত্যপরা বনদেবীর নুপুর-দিক্‌ঘের মত শ্রবণের পরিতৃপ্তিসাধন করেছে।

রাস্তার উপরেও দৃষ্টবৈচিত্র্যের অভাব নেই। সেদিন নৃসিংহদেবের মন্দিরে কিসের একটা উৎসব। দলে দলে পুণ্যার্থীরা চলেছে দেব-দেউলের অভিযুগে। মহিলার সংখ্যাই বেশী—অনেকেই পরনে সবুজ সাদী, গায়ে লাল জামা। নিবিড় অরণ্যের স্ত্রীমালিকা আর মাটির রং বুঝি এই পার্শ্ব্য প্রদেশের জনপদ-বহুদের মনে লাল-সবুজের নেশা ঘরিয়ে দেয়, তাই এখানকার স্ত্রীত্বা এবং প্রকৃতির বর্ণবৈভবের সঙ্গে তাদের বসনের বর্ণ-সুসম্মত এমন সুসঙ্গতি। প্রায় ছয় মত সোপান অতিক্রম করবার পর দেখি সন্মুখে পাহাড়ের উচ্চ স্থানে কারুকার্যবচিত্র এক বিরাট তোরণ, তার দু'পাশে দুটি বরণাধারা সবেগে সঙ্গর্গহনে নিজে গড়িয়ে পড়ছে—একটির নাম আকাশধারা, অপরটির নাম পিচিকা। বরণা দুটি যেন তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটি প্রশস্ত রূপার পাতে মত প্রলম্বিত। বামিকের জলধারা গোয়ালের মত আকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তরনির্মিত একটি ছিদ্রপথে নিম্নাবতরণ করছে। এই বরণার পাশে পাহাড়ের পাশাপাশি কয়েকটি প্রকোষ্ঠে পঞ্চদেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ফটকের ভেতরে হুহুমানজীর মন্দির।

আরো কতকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করে আর একটি

ভোরণের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভোরণের দীর্ঘ-প্রস্তরনির্মিত একটি গণেশমূর্তি সূর্য্যমণ্ডল দর্শনীয়। এই ভোরণের পার্শ্ববর্তী জলমিসরপের দ্বিপ্রান্তে হাতীর মূর্তির মত আকৃতিবিশিষ্ট—ভিতরে মন্দির-প্রাঙ্গণে শাদা বিনুচিহ্ন



মন্দিরগঞ্জে বিষ্ণুমূর্তি

দিয়ে আলপনা আঁকা। অনেকগুলি সোপান (প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি হবে) অতিক্রম করবার পর পরশুরামের সমস্তল স্থানে অবস্থিত এক গ্রামে পৌঁছানো গেল। পার্শ্ববর্তী পরিবেশের মধ্যে এই ক্ষুদ্র পল্লীটি দেখতে বড় ভাল লাগল।

এই গ্রামটি ছাড়িয়ে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর সূর্য্যের পামে ডাকিয়ে দেখি, অদূরে শ্রাম বনাদীর পটভূমিকার মূর্তিসংহতের মন্দিরের স্বর্ণচূড়া দৌলকিরণে বকুবকু করছে। বনলজ্জীর শ্রামল অঙ্গে শোভা পাচ্ছে যেমন একবাণি ছাতি-মণ্ডিত স্বর্ণচূষণ।

অন্তঃপ্রবেশের মধ্যেই সবগুলি সোপান অতিক্রম করে বরাহ-মূর্তিসংহতের মন্দিরের নিকটে এসে পৌঁছলাম। মন্দির-প্রাচীরের বাইরে এক বুড়ীর জিন্দার ছুতো রেখে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ-ভোরণের নিকটে অত্যুচ্চ গুরুত্ব-প্রদ প্রবেশদ্বার দুটি আকর্ষণ করল। পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত বিরাট মন্দিরের শুদ্ধ গাভীর প্রথম দুটিতেই মনকে বিম্বরে অভিভূত করে দিলে। কোন্ মহান শিল্পীর পরি-কল্পনার এ বিশাল মন্দিরের সৃষ্টি তা জানি না, কিন্তু এক পরম-পুরুষের বিরাট রূপকে যে তিনি ধ্যানযোগে উপলব্ধি করে-ছিলেন তাতে সন্দেহ রইল না। মন্দিরটি যেমন সেই ভূমার উদ্দেশে প্রস্তরে তচিত্ত স্তবগাম। চেয়ে দেখি মন্দিরদ্বার রুদ্ধ। শুভলম বেল। এগারোটার সময় ভোগারতির পরে দেব-দর্শনাধীনের জন্মে দ্বার উন্মুক্ত হবে। অগত্যা বারান্দার বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মন্দিরের এক প্রান্ত থেকে নহবতের মধুর আওয়াজ কানে ভেসে আসতে লাগল। এদিকে মন্দিরের প্রান্ত চত্বরে তালপাতার ছাউনির দীর্ঘ

বাড়ীদের ভিড় ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। মেয়েদের প্রায় সকলেরই মুখে হালুদের গুড়ো মাখানো। এটা অল্পদেশে একটি বিশেষ পুণ্যকৃত্য বলে মনে করা হয়। অনেক পাহাড়ী জী-পুরুষও এসে মন্দির-প্রাঙ্গণে ভিড় জমিয়েছে। একপাশে বসে আছে কয়েক জন বিবাহিতা পাহাড়ী রমণী। প্রত্যেকেরই কোড়ে সন্ধান—মাথা একদম ঢাকা, পায়ে মোটা মোটা রূপার ঝাড়ু—কপালে প্রকাণ্ড সিঁহরের কোঁটা, হাত-ভাঙি সবুজ কাচের চুড়ি। কয়েক জন মূলওহালী ঘুরে ঘুরে ফুলের মালা বিক্রি করছে—তাদের কর্ণচূষণ এবং নাসিকার গহনার বহর দেববার জিনিষ। কানের উপস্থিতিগে, মাঝখানে, দীর্ঘ সর্কজ পিভলের আংটি, নাকের দু'পাশে ছোটো করে হিং ভো আছেই, তার উপরে আছে একটি করে হল। কয়েক জন নেটিপরা প্রায় দিগন্তর পুরুষ নিকরকারভাবে একপার্শ্বে উপবিষ্ট। মাথায় তাদের লম্বা চুল, কপালে চন্দনের কোঁটা।

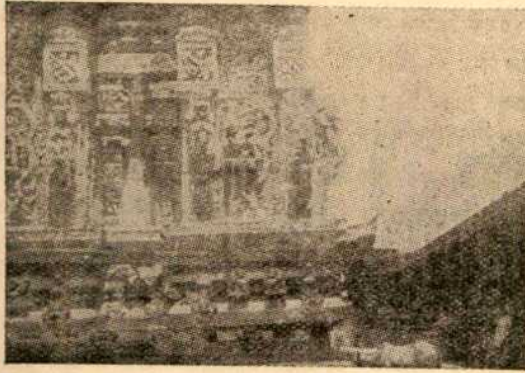
মন্দিরের বারান্দায় বসে আছেন, গলার যজ্ঞোপবীত, সিন্দূর-লিপ্তলাট কয়েকজন পুজারী ব্রাহ্মণ। শুদিকে জমকালো সাকী পরিহিতা কয়েক জন অল্প পুরমহিলা বিভিন্নপক্ষ প্রজা-পতির মত মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই তীর্থমন্দিরের দেবতা আর্ধ্য অনার্য্য সকল শ্রেণীর নরনারীকে টেনে এনে-ছেন নিজের চরণোপাঙ্গে। মাহুয়ে মাহুয়ে ভেদবৈষম্য এখানে ঘুচে গেছে। বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন-প্রতিষ্ঠা যে ভারতের অধ্যাত্ত সাধনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তা এই তীর্থক্ষেত্রে এসে নূতন করে উপলব্ধি করলাম।

যথাসময়ে মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হ'ল। অজ্ঞাত যাত্রীদের দলে ভিড়ে গিয়ে অরু করলাম মন্দির-প্রদক্ষিণ। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের অজতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সীমালম্ মন্দির। মন্দিরের বহিঃপ্রাচীর-পায়ে উৎকীর্ণ প্রফুটন্ত পদ্মনিচয়ের শোভা অপূর্ণ। মন্দিরগঞ্জে চতুর্ভুজ নারায়ণ, বামন অবতার এবং অজ্ঞাত দেবদেবীর মূর্তিসমূহের গঠন-কৌশল এমন অনিন্দ্য যে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। প্রাচীর-পায়ে সংস্থাপিত প্রস্তরনির্মিত একটি নারীমূর্তি দেখে মুগ্ধ বিম্বরে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। নারীদেহের লাবণ্য মৌলুবার্য্য এবং লীলারিত রেখাসমূহকে প্রাচীর ভারতের যে রূপদক্ষ শিল্পী পাশাণে এমন অমবত্ব ভাবে রূপায়িত করে গেছেন, মনে মনে তার স্বকীয়-প্রতিভার উদ্দেশে প্রণতি জানালাম।

মন্দিরের ভিতরে বাইরে অলিন্দে মণ্ডপে সর্কজই বিভিন্ন ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন—একটুকু জায়গায়ও কঁক পড়ে নেই। কোথাও দেবদেবীর লীলাভোক্তক বিভিন্ন মূর্তি, কোথাও-বা শুভগঞ্জে মণ্ডমশিল্পের অপূর্ণ সুখমা। কত বড় রূপসুষ্ঠা ছিলেন সেই সকল শিল্পী যারা নীরস পাশাণে এই রূপ ও রেখার অপরূপ রূপকথা রচনা করে গেছেন। সার্বক হ'ল

তীর্থদর্শন—দৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত হ'ল যেম এক নিরুপম রূপ-লোকের রহস্য-রূপ।

মন্দিরের এক কোণে আছে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত অশ্বমুগ্ধ-বাহিত একটি রথ। এই রথের চক্রসমূহের গঠন-কৌশল

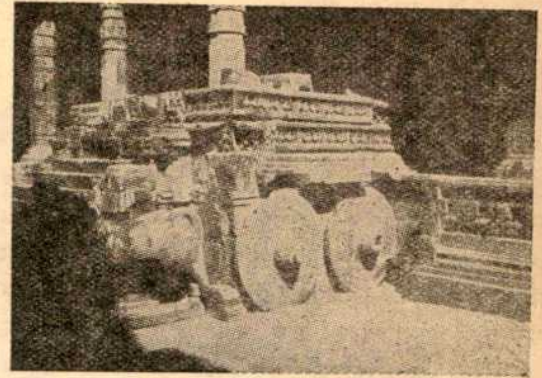


মন্দিরগাঙ্গে মণ্ডনশিল্পের নিদর্শন

যেমন অদ্বিতীয় ভেমি অশ্বপদ ভাঙের স্বাক্ষর কারুকার্য। এই রথের উচ্চতার ভাঙের প্রভাবের পরিচয় পাইচ্ছ। স্ট্রাইট হুতে পারা যায় যে, কোনারকের সপ্তাশ্ববাহিত রথের আদর্শে সীমাচলমের এই অশ্বমুগ্ধবাহিত রথও পরিকল্পিত হয়েছিল।

এই সমস্ত দেখে দেবমূর্তির দর্শনলাভের জন্যে মাটামন্দিরে প্রবেশ করলাম। সেখানে স্বয়ংবাদের মত কতগুলি মূর্ত্যুপরা মারীমূর্তি দেখে চোখ আর ফেরাতে পারি না। কোন কোন মূর্তির ইয়ং উচ্ছিত এক পা মূর্তিকা স্পর্শ করতে উত্তম। মনে হয় এই হুমায়িত পদপাতে তিগিগাঙ্গে দৌলখোর পুষ্পপুজ বিকশিত হয়ে উঠবে। গর্ভগৃহে দেবতার আসন—তিত এত প্রচণ্ড যে, এক রকম শূভে বুলেই এগুতে লাগলাম—মাত্র পথ পর্যন্ত যাবার পর মনে হ'ল, মোক্ষলাভের আর বেশী দেহী নেই। বাই হোক, শেখ পর্যন্ত থাকার চোটে দেবমূর্তির পাদপীঠের কাছে এসে ছিটকে পড়লাম—যনসংস্থাপিত অগণিত দ্ব্যুতপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে গর্ভগৃহের অন্ধকার অপগত। সে আলোকে চোখ-ধাঁধানো তীক্ষ্ণ নেই, আছে রমণীর স্নিগ্ধতা। এত বকল সহ করে এসেও কিন্তু আসল দেবমূর্তির দর্শনলাভ অদৃষ্টে ঘটল না। যা দেখলাম তাকে বলে চন্দনলিঙ্গ—টিক যেম বেত বর্ণাঙ্গুরলিঙ্গ শিবলিঙ্গের মত আকৃতিবিশিষ্ট। এটি আসল দেববিগ্রহের আবরণী। প্রতিদিন পূজার সময় এই আবরণীটিকে চন্দনমুগ্ধলিঙ্গ করা হয়—কলে এটির গারে খেতচন্দন হয়ে উঠে পূজার। সর্বসাধারণে এই আবরণীর অভ্যন্তরস্থ আসল দেববিগ্রহের দর্শনলাভ করতে পারে বৎসরে মাত্র একদিন—সে বৈশাখ মাসে অমর তৃতীয়া দিবসে। কথিত আছে, মুনিংহাবতার যে মূর্তিতে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন, সেই

মূর্তিতেই তিনি সিংহাচলম্ পর্কিতে বিরাজ করছেন। কিন্তু হল পুরাণে এই মূর্তির যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে বিগ্রহটির আকৃতিগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। বং মহামূর্তির সঙ্গেই ইহার অধিকতর মিল দেখা যায়, তবে মূর্তিটি সিংহের মত



সীমাচলম্ মন্দিরে একটি প্রস্তর-নির্মিত রথ

লক্ষ্যবস্ত্র এবং বরাহের মত মতকবিশিষ্ট। মূর্তিটি কি বরাহ এবং মুনিংহ এই দুই অবতারের একীভূত রূপ? কল্পপূরণে অবশ্য এক জায়গায় আছে—“বরাহ মরসিংহস্ত সিংহটেশল-নিকেতনঃ”। বরাহক্ষেত্রেই সিংহাচলম্ পর্কিতের অধিদেবতা বলেই কি ইনি বরাহ-মরসিংহবামী। এ বিষয়ে পৌরাণিক এবং মূর্তিতাত্ত্বিক—আলোচনার অবকাশ আছে।

শ্রীচৈতন্যের পদরেণুকাপুত এই সীমাচলম্ মন্দিরের সঙ্গে বিশিষ্ট ঐক্যবাদের প্রবর্তক রামাহুজাচার্যের পূণ্য স্মৃতি-বিষয়িত। এই মহাপুরুষ একবার সীমাচলমে আগমন করেন। তখন সকলে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করতে থাকে। মন্দিরে থাকতেম কৃষ্ণামাচারী নামে এক ভক্ত। তিনি মৃত্যু-পীত দ্বারা প্রতি রাতে প্রভু মরসিংহদেবের তৃপ্তি-বিধান করতেন। অংকারে বিমূর্তিত হয়ে কৃষ্ণমাচারী রামাহুজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। তখনই মরসিংহদেব তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন যে, যদি তিনি রামাহুজের রূপালত করতে সক্ষম না হন, তা হলে তাঁর মূর্তির কোনও আশা নেই। এই কথা শুনে কৃষ্ণমাচারীর যেম দিব্য জ্ঞান লাভ হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, অহঙ্কার বর্জন না করা পর্যন্ত জীবের মূর্তির আশা প্রত্যাশারহত।

সীমাচলম্ মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি কক্ষে শ্রীশ্রীরামাহুজাচার্যের মূর্তিটি দেখে কোনও কোনও ভক্তের হয় ত উপরি-উক্ত কাহিনীটি মনে পড়ে, অন্তর্ভুক্ত হয়ে তখনই আত্মসমর্পণ ব্যতীত লাভলাভের যে অস্ত্র কোনও উপায় নেই এই বিশ্বাস স্থানমাধ্যম্যে হয়তো তাঁদের হৃদয়ে বহুস্থল হয়।

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তাম্রশাসনাদি থেকে জানা যায় যে, পূর্ব-চাণক্যদের রাজত্বের প্রাক্কাল থেকেই (খ্রীষ্ট ৭ম শতাব্দী) সীমান্তবন্দী মুসিংহদেবের মন্দির বিস্তারিত ছিল। একাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার নৃপতি লাংগাল পঞ্চপতি মন্দির-চত্বরে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। খ্রীষ্ট ১৩শ শতাব্দী থেকে সীমান্তবন্দী বিজয়নগরের রাজবংশের অধীনে আসে, বর্তমানে এই মন্দির তাঁদের দেবোত্তর সম্পত্তি।

প্রত্যাভর্তনের পথে এক জন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়নগরের রাজকীর পুষ্পোদ্ভাদ দেখতে গেলাম। কি রমণীয় স্থান। বিচিত্রবর্ণের পুষ্পরাশি ইন্দ্রধনু বর্ণচ্ছটার মত দৃষ্টিকে করছে বিমুগ্ধ—কতকগুলি কোরারার মত দিগে উর্ধ্বে উৎকীর্ণ জলকণাসমূহে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে অপূর্ণ শোভার সৃষ্টি করেছে। মাথার উপর উনার অনন্ত আকাশ। নিয়ে এক দিকে পার্শ্বাভ্য প্রান্তরের বুকে বর-বাড়ী, যেন ছেলেদের খেলাঘরের মত দৃষ্টমান। অত দিকে সীমান্তবন্দী-প্রসারিত সমুদ্রের সুনীল বকে সফেদ তরঙ্গমালার দৃশ্য চলছে অবিরাম, অবিশ্রান্ত। দূর দিকচক্রবালের কাছে আকাশ নত হয়ে পড়েছে পড়ীর স্নেহে সমুদ্রের বুকে। সমুদ্র তুমার, বিরাটের উৎসে প্রদান করছে মুঠো মুঠো স্তম্ভ ফেনপুষ্পের অর্ঘ্য।

আকাশ এবং সমুদ্রের মহামিলনের দৃশ্য দেখতে দেখতে

মন হয়েছিল বিরাটের অসুখ্যানে ভ্রম, ভাবছিলাম এই মহা অনন্তের মধ্যে আমার ব্যক্তি-সত্তার অস্তিত্ব কতই না অকিঞ্চিৎকর। কেমন একটা বৈরাগ্যের ভাব যেন আচ্ছন্ন করেছিল সমস্ত অন্তরকে—উৎসাহ উত্তমকে করে দিবেছিল মন্দীভূত।

চমক ভাঙল গাইডের ভাঙার। ভাঙাভাঙি না গেলে মাকি বাস করা যাবে না। তার কথায় যেন আবার আত্ম-সচেতন হয়ে উঠলাম। অনন্তপ্রসারিত সমুদ্রের উপর মহা-কাশের নিঃসীম শূভতা কিছুকণের জন্ম মনকে উদাস বিরাগি এবং নির্বৈদগ্ধ করে দিবেছিল বটে, কিন্তু আবার পায়ের নীচে অসুস্থ করলাম রক্ত বাতবের অসুস্থতি—কষ্টিন সৃষ্টিকার স্পর্শ। বরষীর হলিডুসের সন্ট-সন্টল হর্গম পথেই তো আমার এ জীবনের ভীষণজ্ঞা। সমুদ্রে অনন্ত পথ—এসিয়ে যেতে হবে আরও আরও দূরে, নব নব আলোক-ভীর্ণের সন্ধান—সুখ-সুখের অসুস্থ ও পরলে জীবনের পাত্র হয়ে উঠবে কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

প্রান্ত চরণে আবার মৃত্যু করে গতিবেগ সঞ্চারিত হ'ল—দৃঢ় পথকেপে সোপান-পথ বেয়ে নিয়ে অবতরণ করতে লাগলাম।

• এই প্রবন্ধের ছবিগুলি ত্রিশচীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীত।

মানবের অধিকার

শ্রীঅমলেন্দু সেন

নানা রকম অর্থে আমরা 'অধিকার' কথাটিকে প্রয়োগ করে থাকি। বিনা বাধার বা-কিছু আমরা করতে পারি অথবা আমাদের পারা উচিত, সে সবই আমাদের অধিকার। কিন্তু রবিবার বেলা ন'টা পর্যন্ত বিছানার পড়ে থাকবার অধিকার, টিকিট কেটে ট্রাম গাড়ীতে চড়বার অধিকার, আর স্বাধীন থাকবার অধিকার, ঠিক এক জাতের জিনিষ নয়। সেকথা বোঝা যাবে আইনের সঙ্গে এদের সম্বন্ধের বিষয় বিবেচনা করলে।

প্রথমটিকে নিয়ে আইন অথবা রাষ্ট্র মাথা ঘামায় না, যামাতোও কেউ বলে না। বিতীরটির উপপত্তি, স্থিতি ও লয় সবই নির্ভর করে আইনের উপর, এবং সে আইনও সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ কতকগুলি অবস্থার কলে এবং স্থানবিশেষে। দেশ-কালপাত্রভেদে এ ধরনের অধিকারেরও বিভিন্নতা হয়ে থাকে, এর প্রয়োজন সমগ্র মানবজাতির পক্ষে সমান নয়। সেখানে এ সব অধিকারের ব্যবস্থা আছে, সেখানেই এরা আছে, মইলে নেই।

কিন্তু তৃতীয়টির বিষয়ে সেকথা খাটে না। এ জাতের অধিকার মানুষ জন্মেরই অঙ্গবস্ত, কর্ণের কবচকুলের মত সহ-জাত। মানব-পরিবারের প্রতি ব্যক্তির এ অধিকার আছে। আইন তাকে সৃষ্টি করে না, মেনে নেয়। অনেক সময়ই আইন অথবা রাষ্ট্র তা করতে চায় নি, কোর করে তাদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে হয়েছে। এইজন্য যে, স্বীকৃতি না পেলে অধিকারের মূল্য থাকে না। গাঁয়ে না মানলেও আপনি মোড়ল হওয়ার মধ্যে আর বা-ই থাকুক না কেন, নিকরতা নেই।

অথচ রাষ্ট্রকমতা যত দিন ব্যক্তিবিশেষ অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের হাতে থেকে এসেছে, তত দিন তারা জনসাধারণের এই মূলগত অধিকারগুলি মেনে নিতে চায় নি। রক্তমাংস বিক্রয় হয়ে এর প্রতিবাদে পথ-বাংলাকী বারবার মাথা দিচ্ছে, রাষ্ট্রের ভিত্তি পর্যন্ত টলনল করে উঠেছে তার কলে। উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্তে প্রাপ্ত হতে গিয়েছে যেদিনী। তা ছাড়া, এই বন্ধনার কলে সমগ্র মানবজাতিরই উন্নতি ব্যাহত হয়েছে,

কেননা 'যারে ভূমি নীচে ফেল, সে ভোমারে বাঁবিবে যে নীচে'।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জ গঠনের সময় একথা উঠল। তার কালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের সাত দ্ব্যয়গার মানুষের সহজাত অধিকারগুলি রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। সদস্যদের ৫৬ বারার বলা হয়েছে যে, সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সকলেই চেষ্টা করবেন যাতে প্রত্যেকটি মানুষ এই অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারে।

কিন্তু এই অধিকারগুলি যে কি কি, তা সন্দেহ বিতরণিত ভাবে বলা সম্ভব হয় নি। এর চার বৎসর আগে আটলান্টিক চার্টারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী চার্চিল যোটাহুটি ভাবে বলেছিলেন যে, মানুষের চার রকম স্বাধীনতা থাকা দরকার—বাক্যের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, অত্যাচার থেকে মুক্তি, আর তত্ত্ব থেকে মুক্তি। সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের সনদে সে কথাগুলি স্পষ্টভর হ'ল। তার পর সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জ গঠিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষৎ এই অধিকার এবং স্বাধীনতাগুলি কি কি, তা নির্ণয় করে লিপিবদ্ধ করার ভার পেলেন।

এই কাজটিকে তিন ভাগ করে লওয়া হ'ল। প্রথমতঃ, মানবের অধিকারগুলি কি কি, তা নির্ধারণ ও ঘোষণা করা; দ্বিতীয়তঃ, এগুলি সম্পর্কে একটি-আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র সম্পাদন করা; তৃতীয়তঃ, এই ঘোষণা আর চুক্তিপত্র অনুযায়ী কাজ শুরু করা।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষৎ এ কাজের ক্ষেত্রে ১৮টি রাষ্ট্রের সদস্য নিয়ে এক সভা গঠন করলেন, তার নাম হ'ল 'হিউম্যান রাইটস কমিশন' বা মানবাধিকার-আয়োগ। এই আঠারটি রাষ্ট্রের মধ্যে ভারত একটি। সভাপতি হলেন আমেরিকার মিসেস রুজভেল্ট। কাজের অধ্যাপক হলেন ক্যান্সাস হলেন অন্ততম সহ-সভাপতি। পৃথিবীর সমুদয় দেশের শাসনতন্ত্র সংগ্রহ করে কাজ আরম্ভ হ'ল। তা থেকে জানা গেল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষ কি অধিকার পেয়েছে, আর আশু কি অধিকার পায় নি।

এ বিষয়ে দেশে দেশে পাঠ্য আছে বিস্তর। উদাহরণ-বঙ্গের বলা যেতে পারে যে, ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রে অস্পৃহতা বর্জন একটি বড় কথা বলে গণ্য হয়েছে, কিন্তু অল্প-ধারণের অধিকারকে আমল দেওয়া হয় নি। অথচ আমেরিকার শাসনতন্ত্রের বিধান এর বিপরীত। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে অধিকারেরও প্রয়োজনভেদ হয়।

কিন্তু এমন কতকগুলি অধিকার আছে যা দেশজাতিনির্মিত-মধ্যে মানুষমাজেই চেয়ে এসেছে। কোথাও পেয়েছে, অনেক জায়গায়ই পায় নি। সমগ্র মানবজাতির দৃষ্ট সাধারণ ভাবে

একটি অধিকার-ঘোষণা-পত্র রচনা করতে হলে এই অধিকার-গুলিই যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

তার প্রথম খসড়া লিখলেন অধ্যাপক ক্যান্সাস। তার এই লেখার ৪৪টি প্রকরণ নিয়ে অনেক আলোচনার পর ২৮টি ঠাঁড় করা হ'ল। তার পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের মহাসভার (জেনারেল অ্যাসেমবলি) যে অধিবেশন হয়, সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের পক্ষ থেকে এই পাণ্ডুলিপিটি দাখিল করা হয়। এর আলোচনা হয় ৮৫টি অধিবেশনে—সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের ইতিহাসে দীর্ঘকাল-স্থায়ী আলোচনা এইটিই।

শেষে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মহাসভা এই পাণ্ডুলিপি সংশোধিত আকারে অনুমোদন করেন। শুধন এর নাম হয় 'সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা' (ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস)। আর বলে দেওয়া হয় যে, প্রতি বৎসর ১০ই ডিসেম্বর তারিখটি 'মানবাধিকার দিবস' বলে গণ্য করা হবে।

ঘোষণাটি কি, তা এবার দেখা যাক। এর প্রথমই আছে একটি প্রস্তাবনা। তাতে যা বলা হয়েছে তা যোটাহুটি এই—

"যেহেতু মানব-পরিবারের প্রতি ব্যক্তির সদান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলির এবং সহজাত মর্যাদার উপর-প্রভাই পৃথিবীতে স্বাধীনতা, জায় ও শান্তির ভিত্তিরূপ ;

"যেহেতু মানবসাধারণের কামনার ধন এমন একটি জগৎ যেখানে প্রত্যেক মানুষ বাক্যে এবং মনে স্বাধীনতা এবং ভীতি ও অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাস করিতে পারে ;

"যেহেতু এই অধিকারগুলি বিধিমাতে রক্ষিত না হওয়াতে জগতে বারংবার শোণিতকরী বিপ্লবের উৎপত্তি হইয়াছে ;

"যেহেতু সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহ তাঁহাদের সনদে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মানবের মৌলিক অধিকার-গুলিতে, এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার ও নরনারীনির্ভেদে সমানবাধিকারের উপর তাঁহারা প্রাধান্য, এবং মহত্তর স্বাধীনতার মধ্যে মানব-সমাজের উন্নতি ও জীবনধারণের মান উন্নত করিতে তাঁহারা কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন ;

"যেহেতু এই অধিকার পূর্ণভাবে পালন করিতে হইলে মানবের এই স্বাধীনতা ও অধিকারগুলি কি, তাহার সম্যক উপলক্ষ্য আবশ্যক ;

"অন্তএব মহা-সভা মানবাধিকারনিচয়ের এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ব্যক্তি এই আদর্শ-গুলি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হউন।"

এর থেকে দেখা যায় যে, মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা দেশ-পাঞ্জিরপেকভাবে এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তি। এর দ্বিতীয় প্রকরণ আছে।

প্রথম দৃষ্টিতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তিগত মর্যাদার স্বীকৃতির উপরে যে সব অধিকার এবং স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, সেগুলি পৃথিবীর সর্বত্র সকল মর্যাদার সমানভাবে প্রাপ্য।

সত্য-সমাজে বহুকাল থেকে যে সব প্রাথমিক অধিকার স্বীকৃত হয়ে এসেছে, সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় থেকে পঞ্চদশ প্রকরণে। বৈতে থাকবার, স্বাধীন থাকবার, নিরাপদে বাস করবার, আইনের চক্রে সমান বলে গণ্য হবার এবং ভ্রান্তিচার পাবার অধিকার,—এগুলির উল্লেখ হয়েছে সকলের আগে। তার পর বলা হয়েছে যে দাসপ্রথা থাকবে না, কোমণ্ড অপরাধেই নির্দোষ করা কিংবা অমানুষিক বা অপমানকর শাস্তি দেওয়া চলবে না, এবং কাউকে বেআইনী-ভাবে গ্রেপ্তার করা হবে না। পারিবারিক জীবনে, বাসগৃহে এবং চিঠিপত্র আদানপ্রদানের ব্যাপারে ধামধেমালীভাবে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। অবাধে চলাফেরা করবার, উৎপীড়ন এড়াবার ক্ষমতা দেশান্তরে গিয়ে আশ্রয় পাবার এবং কোনও না কোনও রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করবার সুযোগ সকলকেই দেওয়া হবে।

এর পর যৌক্তিক প্রকরণ। তাতে বলা হয়েছে যে, বিবাহ ব্যাপারে মর্যাদারীমাদেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। সপ্তদশ প্রকরণে মানুষমাজেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ প্রকরণের বিষয় হ'ল বর্ণ, মত ও বাক্যের স্বাধীনতা। বিংশ ও একবিংশ প্রকরণে মর্যাদারীনির্বিশেষে সকলেরই শাস্তিপর্যন্ত মতের যোগদান করবার এবং বদেশের শাসনব্যাপারে কিছু-না-কিছু ক্ষমতা পাবার অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে।

আধুনিক কালের প্রয়োজনে যে সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার মানুষমাজেরই থাকা উচিত বলে মনে করা হয়, সেগুলির কথা বলা হয়েছে ষাটবিংশ থেকে ষড়বিংশ প্রকরণে। তার মধ্যে প্রথম হ'ল কাজ করবার অধিকার। তার পর ক্রমে এগেছে ছুটি এবং ছুটির মাইনে পাবার, নিজের মমোমত কাজে লাগবার, ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেবার এবং সমান কাজের জন্য সমান মাইনে পাবার অধিকারের কথা। তা ছাড়া, কর্মরীরা যাতে মানুষের মত হয়ে বাঁচতে পার, তার উপযোগী আশ্রয়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি পাবার অধিকার এতে স্বীকার করা হয়েছে।

সপ্তবিংশ প্রকরণে বলা হয়েছে যে, সমাজ-জীবনে কাউকে এক পাশে ঠেলে রাখা চলবে না। এ ছাড়া, বিজ্ঞানের সমস্ত দান সমানভাবে ভোগ করতে পাবে সকল মানুষই।

সুশাসিত অধিকারগুলির কথা এইখানেই শেষ।

অন্তঃপর অষ্টাবিংশ প্রকরণে বলা হয়েছে সকল দেশের

সহযোগিতা হলেই এই অধিকারগুলি পূর্ণভাবে লাভ করা সম্ভব। আর একথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অধিকার পেলেই সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্ব এবং কর্তব্য মেলে নিতে হয়। সর্বসাধারণের নীতিবোধ, শৃঙ্খলা এবং মঙ্গলের পরিপন্থী যাতে না হয়, শুধু এমন ভাবেই স্বাধীনতা বা অধিকার ভোগ করা যেতে পারে।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার শেষ অর্ধাংশে বিশ প্রকরণে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল বিভিন্ন রকমের অধিকার প্রচলিত আছে, তার কোমন্টি স্মরণ হতে পারে এমন ভাবে যেন এই ঘোষণার কোমন্ড অর্থ করা না হয়।

যে যে অধিকারের কথা এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত হয়েছে তা শুধু হস্তে হস্তে মনে হতে পারে যে, এ তো নিত্যন্তই মামুলি কথা। কিন্তু তা নয়। হস্তে হস্তে মনে হলে বহুকাল থেকে এর অনেকগুলিই মনে দেওয়া হয়ে আসছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশেই এই প্রতিটি অধিকারলাভের পিছনে আছে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। আর আজও এ সকল অধিকারে বঞ্চিত হয়ে আছে, এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে নিত্যন্ত কম নয়।

এর থেকেই বোঝা যাবে যে, এই ঘোষণার গুরুত্ব মানব-সত্যতার ইতিহাসে উপেক্ষণীয় নয়। পৃথিবীর ৫৮টি (এখন ৬০টি) রাষ্ট্র মিলে গঠিত সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের মহাসভা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের কতকগুলি জন্মগত অধিকার আছে, এবং তাঁরা সমস্ত মানবসমাজকে সেই অধিকারগুলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান—এ এক অতীত-পূর্ব ব্যাপার।

শুধু ঘোষণাই নয়। ঘোষণামুখারী কাজ কি ভাবে হবে, মানবাধিকার-আধোগ সে বিষয়েও একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র (ইন্টারন্যাশনাল কন্ভেনশন অব হিউম্যান রাইটস্) রচনা করেছেন। এটা মানবাধিকার সম্পর্কিত আয়োজনের দ্বিতীয় ধাপ।

একথা অবশ্য ঠিক যে, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রটি কোনও মানুষ কিংবা রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলক নয়। সমগ্র মানবজাতির সামনে একটি আদর্শভূলে বলা হয়েছে, এবং তদনুযায়ী কাজ করবার চেষ্টা হচ্ছে—এটাই মাত্র। সব আদর্শের মত এরও সাক্ষ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সেই বিরাট মানবসমাজের উপর, যাদের জন্য এটি রচিত হয়েছে। বাধা অনেক, কিন্তু ভরসা এই যে, মানব-পরিবারের একটা বৃহৎ অংশ, সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি এ ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছেন।

আদিগঙ্গা নদী

শ্রীকালিদাস দত্ত

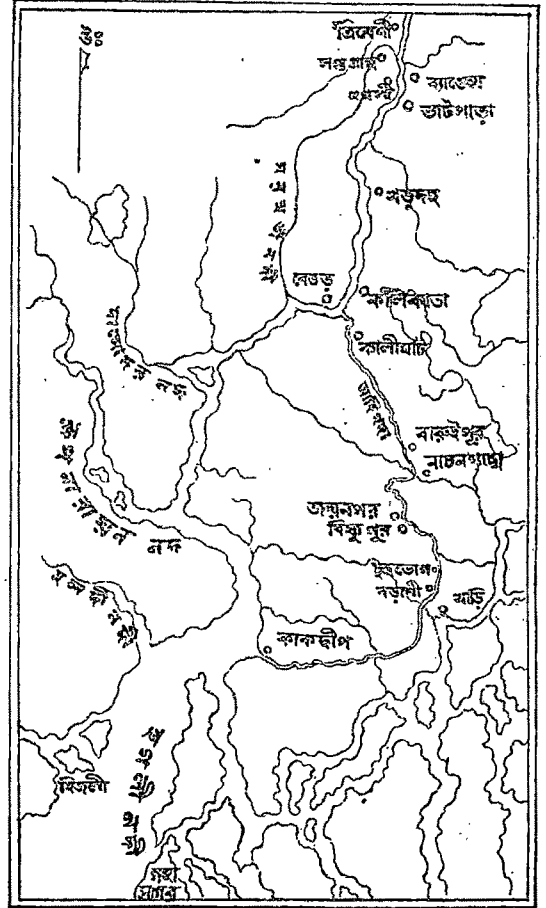
বর্তমানে কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণে, খিদিরপুরের উপর দিয়া প্রবাহিত হুগলী নদীর আকার দেখিলে উহা কলিকাতার পার্শ্ববর্তী গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর নিম্নাংশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ভাগীরথী নদীর নিম্নাংশ নহে।

বঙ্গোপসাগর হইতে হাওড়া জেলার দক্ষিণে, অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর মোহানা পর্যন্ত উহার যে অংশ তাহা হলদী, রূপনারায়ণ, দামোদর ও সরস্বতী এই তিনটি নদীর নিম্ন ভাগ এবং সরস্বতীর মোহানা হইতে কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণ পর্যন্ত যে অংশ তাহা একটি কৃত্রিম প্রবাহ। প্রবাদ, জলপথে সমুদ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রাচীন কালে, বর্তমান কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণে, ভাগীরথী হইতে একটি খাল খনন করিয়া সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং উক্ত খালই কালক্রমে প্রবল হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করে। এইজন্ত হিন্দুগণ আজিও হুগলী নদীর ঐ অংশে, উহা কৃত্রিম বলিয়া গঙ্গাস্নান বা উহার তীরে শবদাহ করেন না। তাহারো তৎপরিবর্তে কালীঘাটের উপর অধুনা টালীর নালা বা আদিগঙ্গা নামে খালের আকারে ভাগীরথীর শাখা রূপে যে প্রবাহ বিद्यমান আছে তাহাতেই গঙ্গাস্নানাদি করেন। দক্ষিণ কলিকাতার হিন্দু শবদাহ ক্ষেত্রও সে কারণ সাহানগর বা কেওড়াতলা শ্মশান নামে উহার উপরই অবস্থিত।

উহাই প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর নিম্নাংশ ছিল এবং কালীঘাটের দক্ষিণ হইতে রসা, বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, যাহিনগর, বারুইপুর, নাচনগাছা (বর্তমান সূর্যপুর), মূলটা, দক্ষিণ-বারাসাত, বড়ু, গঙ্গাঘাটা, জয়নগর-মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, ফুটিগোদা, সাতঘরা, জলঘাটা, ছত্রভোগ, বড়াশী ও খাড়ি প্রভৃতি গ্রামগুলির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া স্বন্দরবন অতিক্রমকরতঃ বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইত।

কালীঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত উক্ত গ্রামগুলির উপর আদিগঙ্গা নদীর ঐ অংশের মজাগর্ভ মথুরাপুর থানার অধীন বড়াশী পর্যন্ত এখনও স্থানে স্থানে কোথাও খালের আকারে আব্যুর কোথাও গঙ্গার বাদা বা মজাগঙ্গা নামে ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া বর্তমান আছে। এ অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীরা আজিও ঐ সমস্ত নিম্নভূমিতে শবদাহ করে ও ঐ সকল স্থানে খনিত পুষ্করিণীসমূহের জল রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের গঙ্গামাহাত্ম্যে প্রদত্ত ব্যবস্থানুসারে গঙ্গাজল রূপে ব্যবহার করে।^১ ঐ সকল পুষ্করিণীও তজ্জগু উহাদের

স্বত্বাধিকারিগণের বংশের পদবী যত ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। ঐ সমস্ত কারণে কালীঘাটের দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর ঐ প্রাচীন পথ এখনও সঠিক নির্ধারণ করা যায়।



আদিগঙ্গা নদী

প্রাচীন মানচিত্র অবলম্বনে

কালীঘাটের পার্শ্ববর্তী গঙ্গার প্রাচীন খাদ মজিয়া আসিলে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল টলী নামক সৈনিক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার খনন করান। তৎপূর্বে উহা একটি নালা

১ "প্রবাহ মধ্যে বিচ্ছেদদেহু অন্ত সলিল প্রবাহিত্যায় দোষঃ।
অতথা ইদানীং গঙ্গায়া সাগর গামিত্যানুপপত্তেঃ।
প্রাক্তিতত্ত্ব, গঙ্গামাহাত্ম্য। শ্রীরামপুর সংস্করণ (১৮৩৪),
পৃঃ ২৯৯

আকারে বর্তমান কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণ হইতে প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রামের উপর দিয়া কালীঘাট পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল এবং ইংরেজগণ এই নালটিকে গোবিন্দপুর ক্রীক বলিত।^৩

বর্তমান বিদ্যুতপুৰ পুলের পশ্চিমে উক্ত আদিগঙ্গা নদীর যে অংশটি হুগলী নদীর সহিত সংযুক্ত আছে উহাও, টলী সাহেবের দ্বারা খনিত নতুন প্রবাহ। গঙ্গার পুরাতন পথ, উক্ত গোবিন্দপুর ক্রীকের উৎকীর্ণ, আরও উত্তরে ছিল। এখন উহার আর কোন চিহ্ন নাই।

ফনডেন ক্রক, থরনটন প্রভৃতি ইউরোপীয়গণের দ্বারা প্রস্তুত খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের মানচিত্রগুলিতে কালীঘাটের উপর দিয়া প্রবাহিত আদিগঙ্গা নদীর উক্ত প্রাচীন প্রবাহের চিত্র আছে। এই সকল মানচিত্রে উহা বেশ প্রশস্ত দেখা যায়। কিন্তু এই মানচিত্রগুলি প্রকৃত জরিপ কার্যের দ্বারা প্রস্তুত নহে বলিয়া এইগুলিতে উহার আকার ও অবস্থান সর্বত্র বর্থাযথ রূপে প্রদর্শিত হয় নাই। ইউরোপীয়গণের পুরাতন মানচিত্রগুলির মধ্যে রেণেলের অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের মানচিত্রখানিই প্রকৃত জরিপ কার্যদ্বারা প্রস্তুত।^৪ সে কারণ উহাতেই এই প্রবাহের পথ সঠিক অঙ্কিত আছে। কিন্তু উহা তখন মজিয়া আসায় রেণেল উহাকে একটি বিচ্ছিন্ন ও সংকীর্ণ খালের আকারে বর্তমান কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণ-পূর্বাংশ হইতে কালীঘাট ও পূর্বোক্ত বারুইপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি জনপদের উপর দিয়া ইদানীন্তন সন্দরবন প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত নালুয়া গঙ্গা পর্যন্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।^৫

সে কারণ এই সময় নালুয়ার দক্ষিণে ছত্রভোগ, বড়াশী ও বাড়ি প্রভৃতি স্থানে উহার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। এই সকল স্থানে ভাগীরথী নদী এই সময়ের কত দিন পূর্বে মজিয়া গিয়া উহার উত্তর ও দক্ষিণাংশের

সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহাও অজ্ঞাত। প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত, বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত নিমতা গ্রাম-নিবাসী, কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে ছত্রভোগ দিয়া উক্ত নদীপথে যাতায়াতের বিবরণ আছে।^৬ এই অঞ্চলে তৎকালে গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ থাকিলেও উহা সম্ভবতঃ খুব সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কারণ এই জনপথ প্রবল থাকিলে উক্ত গ্রন্থখানি রচনার কিছু পরে প্রস্তুত রেণেলের পূর্বোক্ত মানচিত্রে উহা নিশ্চিত প্রদর্শিত হইত। যেহেতু রেণেলের বঙ্গদেশীয় নদীসমূহের জরিপ কার্যের আদেশপত্রে তৎকালীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের গবর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট সাহেব তাঁহাকে ৩০০ মণ পর্যন্ত দ্রব্যবাহী নৌকা যাতায়াতের পক্ষে স্বগম এরূপ নদীগুলিও তাঁহার উক্ত মানচিত্রে প্রদর্শন করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।^৭

রেণেলের মানচিত্রে ছত্রভোগে কোন নদী প্রদর্শিত না থাকায় বুঝা যায় যে, এই সময় হয় সেখানে বড় জলযান যাতায়াতের পক্ষে গঙ্গা স্বগম ছিল না অথবা উহা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গঙ্গার প্রাচীন পথ কলিকাতার দক্ষিণে এই সময়ের পূর্বকাল হইতেই স্থানে স্থানে রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সে কারণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসার ভাসান ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্যে দেখা যায় যে, তৎকালে কালীঘাট দিয়া আদিগঙ্গা পথে ছত্রভোগে আসিতে হইলে স্থানে স্থানে গঙ্গার প্রাচীন খাদ ত্যাগ করিয়া হলীয়ার গঙ্গা ও হাঁহুড়ি প্রভৃতি স্থানের পাশ দিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইত।^৮

২. বর্তমান কলিকাতা দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়াম) ও উহার পার্শ্ববর্তী ময়দাম প্রভৃতি স্থান প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রামের অন্তর্গত ছিল। যে কয়টি পুরাতন গ্রাম জইয়া প্রথমে কলিকাতা মহানগরীর পটন হইয়া গোবিন্দপুর নামে একটি।

3. "To the north of Alipur flows Tolly's Nullah, called after Colonel Tolly. . . . This Nullah was formerly called Govindapur Creek. Colonel Tolly excavated a portion of this creek in 1775. . . . It is supposed that Ganges once flowed on the site of the Tolly's Nullah."—*Good Old Days of John Company*. By W. H. Carrey. Vol. II, page 157.

4. *The Survey of Bengal* by Major James Rennel, F.R.S. (1764–1777). By Major F. C. Hirst, Director of Surveys, Bengal.

5. *Rennel's Atlas*, Plate 5, Parts 1 & 2.

৬. "গাঠের গাবর ঘড়, বাহিতে বড়ই রত, ছাড়াইল
হুজুর মগরা।

গোজানা বাহিয়া চলে, কর্ণার কুতুহলে, বামাই
বেড়াই কৈল পাছে।

নারি গাহি ছুড়ি ছুড়ি, কাক দীপ গজঘড়ি, ছাড়াইল
বণিকের রাড়ে।

টারাবোল পাছ জান, গঙ্গা বারান করি জান
উপনীত হইল ছত্রভোগ।

অমুলিক মহানাম, নাহি বার উপদান, তথায়
বন্দিল বিবদাণ।

বান্য বান্দে হুজুর বহিয়া রাজা বিষ্ণুপুর,
অনমন করিল পঞ্চাং।" (রায়মঙ্গল)

7. *The Surveys of Bengal* by Major James Rennel. Major F. C. Hirst, page 11.

8. *Monographs of the Varendra Research Society*, No.-4, pages 16 and 17.

এ সকল গ্রন্থে চাঁদ, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বণিকগণের ভাগীরথী নদীর এই অংশ দিয়া বাণিজ্যের জন্ত পুনঃপুনঃ মিহলে যাতায়াতের বৃত্তান্তগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে উহা নিয়বন্ধের সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি প্রধান পথ ছিল। স্বন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে উহার উভয় তীরবর্তী ভূভাগে প্রাচীন মনুষ্যবাসের যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় দেখিলে বুঝা যায় যে, উহার উভয় কূলে গঙ্গাসাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত অদূর অতীতকাল হইতে বহু সমৃদ্ধ লোকালয় থাকায় বণিক ও যাত্রিগণের যাতায়াতের পক্ষে এই পথই সর্বাপেক্ষা সুগম ছিল।^৯ ভাগীরথীর এই অংশের শুষ্ক গর্ভে স্থানে স্থানে ভূগর্ভ খননকালে অনেক প্রাচীন জাহাজের ভগ্নাবশেষ, বখা ভগ্নমাণ্ডল, তক্তা ও লৌহ নিশ্চিত শিকল, নদ্র প্রভৃতি দ্রব্যাদিও পাওয়া গিয়াছে। ছত্রভোগ ও খাড়ি প্রভৃতি স্থানে খোঁজ করিলে এখনও এরূপ অনেক প্রাচীন জব্য সংগ্রহ করা যায়।

কালীঘাটের দক্ষিণে ভাগীরথীর এই অংশ কালক্রমে মজিয়া সংকীর্ণ হইলে এই পথে সমুদ্রে যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। তখন হুগলী নদীর বর্তমান নিম্নাংশ দিয়া সরস্বতী নদী অবলম্বনে সমস্ত সমুদ্রগামী পোতাধি সপ্তগ্রাম বন্দরে যাতায়াত করিত। সে কারণ এই সময় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দররূপে সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি খুবই বর্ধিত হয়। পরে সরস্বতী নদী সেখানেও মজিতে আরম্ভ করিলে বাণিজ্যের সুবিধার জন্ত পর্ভুগীজদের দ্বারা হুগলীর বন্দর স্থাপিত হয়।

ইটালীয় পর্য্যটক সিজার ফেডারিকের ১৫৬৩ হইতে ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতভ্রমণ বিষয়ক পুস্তকে দেখা যায় যে, তৎকালে সমুদ্রগামী জাহাজ বর্তমান হুগলী নদীর নিম্নাংশ দিয়া বেতড়ের সন্নিকট পর্য্যন্ত আসিতে পারিত এবং লোকে তথা হইতে নৌকা বা বজরায় সপ্তগ্রামে যাইত।^{১০} ষ্টে ইন্ডিয়া কোম্পানীর পুরাতন কার্য-বিবরণীতেও উল্লিখিত আছে যে, তখন পর্ভুগীজগণ বড় বড় মালবাহী জাহাজ কলিকাতার দক্ষিণে গার্ডেনরিচে রাখিতেন এবং গার্ডেনরিচের উত্তরে যাইবার জলপথ প্রশস্ত না থাকায় সেখানে গণ্যদ্রব্যাদি নামাইয়া এইস্থানের বিপরীত

দিকে অবস্থিত বেতড়ে বিক্রয় করিতেন। সে কারণ বেতড়ে একটি বিখ্যাত গঙ্গ বসিত।^{১১}

প্রবাদ, বাণিজ্যপোতের গার্ডেনরিচের উত্তর দিকে যাইবার অসুবিধা দূর করিবার জন্ত পর্ভুগীজগণ, আবার কাহারও কাহারও মতে মোগলেরা আলিবর্দী খাঁর শাসনকালে গার্ডেনরিচ হইতে কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণ পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত খাল খনন করান^{১২} এবং তাহার ফলে ভাগীরথীর জলরাশি প্রবল বেগে দক্ষিণে প্রবাহিত হওয়ায় আদিগঙ্গা নদী, যাহা স্থানে স্থানে মজিয়া তখনও সংকীর্ণ আকারে বর্তমান ছিল, ইহার পর হইতে সত্তর লুপ্ত হইয়া যায় ও কলিকাতার দক্ষিণ হইতে গার্ডেনরিচ পর্য্যন্ত হুগলী নদীর উক্ত কৃত্রিম অংশ প্রবল আকার প্রাপ্ত হয়। কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণে এই খাল প্রথমে কোন্ সময় কাহার দ্বারা খনিত হয় তাহা সঠিক জানা না গেলেও উহা যে কৃত্রিম এই প্রবাদ বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। শতাব্দিক বৎসর পূর্বেও জর্নৈক ইংরেজ উহা তাহার ভ্রমণ-বিবরণে এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :

"To the south, a branch of the Hoogly flows into the Sundarbans. It is called by the Europeans, Tolly's Nullah, but the natives regard it as true Ganga, the wide stream being as they pretend, the work of human and impious hands, at some early period of their history. In consequence no person worships the river between Kidderpur and the sea, while the insignificant ditch enjoys all the same divine honours which the Ganges and the Hoogly river enjoys at the earlier parts of their course."^{১৩}

পূর্বে বলা হইয়াছে, কালীঘাট হইতে বর্তমান মথুরা-পুর থানার অন্তর্গত বড়াশী গ্রাম পর্য্যন্ত ভাগীরথীর মজা-গর্ভ স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন থাকায় উহার প্রাচীন পথ এখনও উক্ত বড়াশী গ্রামের দক্ষিণে কিয়দূর নাগাদ সঠিক জানিতে

11. "Garden Reach a little to the south, had in bygone days been the great anchoring place of the stately Portuguese ships, and at Betor on the opposite side each year was built afresh the temporary markets in which they exposed their imports for sale. Higher up ships could go at extreme peril."

Fifth Report on the Affairs of the East Indian Company. Edited by Ferminger (R. Cambray & Co., 1917), p. lxiv.

১২ বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ।—স্বাধ-নায়ায়ণ বহু, ত্রিষোপশচল বাগল, পৃষ্ঠা ৯০

13. Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India from Calcutta to Bombay, (1824—1825). By Bishop Reginald Herber. Vol. I, page 31.

9. Monographs of the Varendra Research Society, Nos. 3, 4 and 5.

১০ সমসাময়িক ভারত, উন্নয়ন ৭৩—যোগেন্দ্রনাথ সমাদার। পৃষ্ঠা ১১।

পারা যায়। কিন্তু তৎপরে উহা কোন্ পথে সুন্দরবনের মধ্য দিয়া সাগরে পড়িত তাহা এত দিন নির্দ্ধারিত হয় নাই। সুন্দরবনের মধ্যে এখন যে সমস্ত নদী প্রবাহিত আছে সেগুলির অধিকাংশের প্রাচীন নাম বহুকাল ঐ অঞ্চল জনশ্রুত হইয়া দুর্গম বনমধ্যে থাকায় অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে। সে কারণ উহাদের মধ্যে কোন্টি প্রাচীনকালে গঙ্গা বা ভাগীরথী নামে অভিহিত হইত তাহা জানা যায় না। সুন্দরবনের নদীসমূহ সংখ্যায় বহু ও গঙ্গাসমূহ বলিয়া পূর্বে শতমুখী গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পুরাতন বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে কুন্তিবাসের রামায়ণ ও চৈতন্যভাগবতে উহাদের ঐ নামে উল্লেখ আছে। চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে খ্রীষ্টচৈতন্যদেব বধন শান্তিপুর হইতে নীলাচল যাইবার জন্ত গঙ্গাতীর অবলম্বনে ছত্রভোগে আসেন তখনও ছত্রভোগের দক্ষিণে প্রবাহিত নদীগুলিকে লোকে শতমুখী গঙ্গা বলিত। যথা :

“এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহাকুতূহলে।
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হইয়া শতমুখী।
বহিতে আছয়ে সর্বলোকে করে সুখী।
কলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।

অস্থলিঙ্গ ঘাট করি বলে সর্বজননে ৷” ১৪

চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত উক্ত অস্থলিঙ্গ ঘাটের অবস্থান এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

বর্তমান ছত্রভোগ গ্রামের দক্ষিণে বড়াশী গ্রামে উক্ত অস্থলিঙ্গ নামে শিবের একটি প্রাচীন লিঙ্গমূর্তি মজাগঙ্গার পাশ্চম তীরে দেখা যায়। ১৫ ঐ ঘাটে সম্ভবতঃ ঐ দেবালয়ের সন্নিহিতে গঙ্গাতীরে কোন স্থানে ছিল। অস্থলিঙ্গের বর্তমান মন্দিরের অনতিদূরে ভাগীরথীর মজাগঙ্গার উপর চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ একটি তীর্থক্ষেত্র আছে। ১৬ প্রবাদ ভগীরথ

গঙ্গাকে এখানে চিনিতে না পারায় গঙ্গা তাঁহাকে সেখানে তাঁহার হস্তস্থিত চক্র দেখাইয়া নিজ স্থান নির্দেশ করেন। ঐ স্থানটি হইতে ভাগীরথী প্রাচীনকালে বহু শাখায় বিভক্ত থাকায় উহার মূল প্রবাহ নির্ণয় করা কঠিন হইত বলিয়া সম্ভবতঃ উক্ত রূপ প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্তমানকালে পশ্চিম সুন্দরবনে প্রবাহিত উক্ত শতমুখী গঙ্গা নামে গঙ্গার বহু শাখা নদীর মধ্যে প্রাচীন ছত্রভোগের দক্ষিণে কোন্টি গঙ্গার মূল প্রবাহ ছিল তাহা সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। কারণ সুন্দরবনের প্রাচীন লোকালয়সমূহ ধ্বংস হইয়া ঐ অঞ্চল বহু দিন দুর্গম বনময় অবস্থায় থাকায় উহা অজ্ঞাত হইয়া যায়। এইজন্যই সম্ভবতঃ গঙ্গানদীর ঐ অংশ রেনেলের অষ্টাদশ শতাব্দীর মানচিত্রে সুন্দরবনে প্রদর্শিত হয় নাই। উহাতে উহার কালীঘাটের দক্ষিণে প্রবাহিত অংশ ছত্রভোগের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নালুয়া গ্রামের সন্নিহিত পর্যন্ত প্রদর্শিত আছে। ১৭ ঐ সময়ের পূর্বে নালুয়ার দক্ষিণে ছত্রভোগ ও বড়াশী প্রভৃতি স্থানে উহার কিয়দংশ বোধ হয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ও তৎপরে সুন্দরবনে উহার যে অবশিষ্ট অংশ সাগরসন্নিহিত পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল তাহা অজ্ঞাত হইয়া বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল।

পুরাতন মানচিত্র, বাংলা পুথি ও প্রবাদাদির সাহায্যে কয়েক বৎসর পূর্বে আমি সর্বপ্রথম সুন্দরবন মধ্যে গঙ্গার মূল প্রবাহের পথ নির্দ্ধারণ করি ও বরেন্দ্র অস্থসন্ধান সমিতির ভূতপূর্ব কর্মসচিব শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকারের সাহায্যে একটি মানচিত্রে উহা প্রদর্শিত হইয়া উক্ত সমিতির মনোগ্রাফে আমার সুন্দরবনবিষয়ক একটি প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হয়। ১৮ তৎপরে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট বিভাগ কর্তৃক উক্ত মানচিত্রে প্রদর্শিত গঙ্গার ঐ পথ নির্ভুল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ১৯

বড়াশীর দক্ষিণে বর্তমান ২২ নম্বর লটের পশ্চিম পাশ হইতে যে মজা নদীটি একটি খালের আকারে চড়াগঙ্গা নামে প্রবাহিত হইয়া প্রাচীন ছত্রভোগ (বর্তমান ভূতরভোগ) নদীতে মিলিত হইয়া গোবাদীয়া গাঙ্গে পড়িয়াছে ও পরে গোবাদীয়া গাঙ্গ নামে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে গিয়া ঘিবাটি নদীতে মিশিয়াছে, উহাই প্রাচীনকালে আদিগঙ্গার মূল

১৪। চৈতন্যভাগবত, অষ্ট বঃ, ২য় অধ্যায়

১৫। চৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে ছত্রভোগ গ্রাম আকারে অনেক বড় ছিল এবং বর্তমান বড়াশী গ্রাম উহার অন্তর্গত ছিল। উহার ঐ নাম খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পরে হইয়াছে।

১৬। গঙ্গাতীরস্থ ঐ চক্রতীর্থটি বহু প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত ত্রিফলমিত্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় শাটকে ও বরাহ পুরাণে উহার উল্লেখ আছে। ইদানীং ঐ তীর্থে স্নান উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে নন্দার মেলা নামে একটি বড় মেলা হয়। উক্ত স্নানও প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে লিখিত রায়মঙ্গল কাব্যে উহার উল্লেখ দেখা যায়।

17. Rennel's Atlas, Plate 52, Parts 1 & 2.

18. Monographs of the Varendra Research Society, No. 3.

19. Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of 24-Parganas for the Period of 1924-25, pages 14 and 15. Map No. 4.

প্রবাহ ছিল। কারণ উহার কিয়দংশের উক্ত চড়াগঙ্গা নাম ব্যতীত উহার দক্ষিণাংশে, বর্তমান গোবাদীয়া গাঙ্গের অনতিদূরে গঙ্গাধারা নামে একটি প্রাচীন স্থান ছিল এবং পূর্বে লোকে সেখানে গঙ্গাস্নান করিত। ১৮৪৭-১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত মেজর স্মিথের স্বন্দরবনের মানচিত্রে গঙ্গাধারা নামক ঐ স্থানটি প্রদর্শিত আছে। পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যেও খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত পূর্বোক্ত রায়মঙ্গল কাব্যে কাকদ্বীপ ও টিয়াখোল নামক স্থান দুইটির পরে জনৈক বণিকের ভাগীরথী পথে স্বদেশ প্রত্যাগমনের বিবরণে তাঁহার উক্ত গঙ্গাধারা নামক স্থানে আগমনের ও তথায় গঙ্গাস্নানের উল্লেখ আছে। ২০

গোবাদীয়া গাঙ্গ দক্ষিণে গিয়া বর্তমান ১১।১২।১৫ ও ১৪ নম্বর লটের দক্ষিণে পূর্বোক্ত ঘিবাটী গাঙ্গে পড়িয়াছে। প্রবাদানুসারে ঐ ঘিবাটী গাঙ্গও আদিগঙ্গার পরবর্তী অংশ। লোকে আজিও তজ্জন্য উহার উপর কাকদ্বীপের পার্শ্বে গঙ্গাস্নান ও শবদাহ করে। প্রাচীনকালে উহাই কাকদ্বীপের উপর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে সাগরদ্বীপে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ দিকে গমন করতঃ ধবলাট ও মনসার দ্বীপের মধ্য দিয়া সাগরে পড়িত। ২১ এইজন্য উক্ত ধবলাটের পার্শ্বস্থ খালের ঘোহানায় প্রতি বৎসর পৌষ মাসে, মকর সংক্রান্তিতে ভারতবিখ্যাত গঙ্গাসাগর মেলায় অঙ্কণ হয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রস্তুত রেণেল ও এলিসনের স্বন্দরবন প্রদেশের মানচিত্র দুইখানি দেখিলে বুঝা যায় যে, বর্তমান সময় সাগরদ্বীপের পূর্বদিকে মড়িগঙ্গা বা বারাতলা নদী নামে যে নদী আছে প্রাচীনকালে উহার উত্তরাংশ এই আদিগঙ্গা প্রবাহের অঙ্গীভূত ছিল এবং

২০। “নারি গাছি জুড়ি জুড়ি কাক দ্বীপ গঙ্গাবড়ী হাড়াইল
বণিকের রাখে।

টিয়াখোল পাছুআম বঙ্গা বারায় করি স্থান উপনীত
হইল হুজুগে ৷”
(রায়মঙ্গল)

21. “The present channel of Hoogly is very different from that which the Ganges formerly followed. The original channel was identical with Tolly's Nullah from Kidderpur to Garia (8 miles south of Calcutta), from which point it ran to the sea in the south-easterly direction. Tradition has it that it emerged out of the Sundarban at Kakdwip and then passed along the present Muriganga or Baratala river, after which it found a passage along the creek between Dhoblat and Mansardwip and proceeded first in a westerly and then in a southerly direction until it fell into the Bay of Bengal at Gangasagar.”
—Bengal District Gazeteers (24-Paras.) pages 7 & 8.

উহার দক্ষিণে গঙ্গার একটি শাখা খাড়ির আকারে প্রবাহিত ছিল। সে কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈদেশিকগণ উহাকে চ্যানেল ক্রীক বলিত। ২২ তখন উহার বোধ হয় বারাতলা বা মড়িগঙ্গা নাম ছিল না। প্রাকৃতিক বিপ্লবে সাগরদ্বীপের ভূখণ্ডের রূপান্তর ঘটিলে সাগরদ্বীপস্থ গঙ্গার শেষাংশের সহিত উহার যোগ ছিন্ন হইয়া যায় এবং উহা দক্ষিণে প্রবাহিত শাখার সহিত মিলিত হইয়া হুগলীর জলরাশির চাপে প্রবল আকার ধারণ করে। প্রবাদ, সাগরসঙ্গমস্থ গঙ্গার সহিত উহার যোগ ছিন্ন হইলে উহা মড়ি বা মৃতগঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হয়।

সাগরদ্বীপের দক্ষিণে বর্তমান সময় গঙ্গাসাগর খাল নামে যে খাল আছে উহাই সাগরদ্বীপে গঙ্গার পরবর্তী অংশ। উহা দক্ষিণে মগরা নামক স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্ত সওদাগরের আদিগঙ্গা পথে সিংহল যাত্রার বিবরণে হাতীয়াঘরের পর মগরায় ঝড়ুড়ির বর্ণনা আছে। ২৩ উক্ত মগরা যে সাগরদ্বীপের ঐ স্থানটি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ উহা হাতীয়াঘর পুরগণার পরে ভাগীরথীর উপর অবস্থিত ২৪ এবং উহার পরই গঙ্গার সাগরসঙ্গম। চণ্ডীকাব্যে কবিকঙ্কণের বর্ণনার সহিত ঐ স্থানের অবস্থানের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়।

পূর্বে ঐ সকল স্থানের গঙ্গাকে লোকে তারগঙ্গা বলিত। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে রচিত দক্ষিণ বারাসাত নিবাসী অবোধ্যারাম পাঠকের সত্যনারায়ণের পুথিতে হাতীয়া ঘরের পর সাগরসঙ্গমে উক্ত তারগঙ্গার উল্লেখ আছে। ২৫

২২ রেণেলের ও এলিসনের মানচিত্রে ঐ নদীর Channel Creek নাম আছে। রেণেল উহাকে কেবলমাত্র ঐ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রেণেলের পরে (১৮৭৩) খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত এলিসনের মানচিত্রে উহার Channel Creek নামের সহিত বারাতলা ও মড়িগঙ্গা এই দুইটি নামও দেখা যায়।

২৩ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার বিবরণে উক্তব্য

২৪ বর্তমান সময় ঘিবাটী নদীর উত্তরাংশ প্রদেশ হাতীয়াঘর পরগণার অন্তর্গত। রুক্ম্যাম সাহেব আইন-ই-আকবরীতে উহার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই :

“Hatiagarh Pargana, the most southerly Mahal of the Sarkar Satgaon; a large Pargana extending from Diamond Harbour towards Sagar Island.”

২৫ “অমূলিক হাতীয়াঘর এড়াইল বড় বড় গাঠের গাবর মিলি সব
তার গঙ্গা পরশিয়ে কপিলেয়ে এগমিয়ে পুছে গঙ্গা।

সাগর মাধব ৷”

তাহারা অম্বর

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আকাশ, বাতাস, জল, যৌদ্ধালোক আর
কে বলিবে এ সকলে আছে শুধু যোর অধিকার ?
কে বলিবে দরিদ্রার জল
আমারই মাঠের শুধু ফলাবে ফসল ?
সদী ব'য়ে যায়—
জাতিধর্মনির্বিষেবে সবারে সে আনন্দ বিলার।
বহিছে বাতাস—
নিমেষে নিমেষে মোরা তাহা হ'তে নিতেছি নিখাল।
সে জন পাগল
যে বলে বাতাসে শুধু আমারই দখল,
আর কারও তার 'পরে অধিকার নাই,
সে শুধু আমারই ঘরে বহিবে সদাই।
আমারই প্রাণে স্বর্ঘ্য ঢালিবে আলোক—
হেন কথা বলিবে যে-লোক—
পাগল বলিয়া মোরা ব্যঙ্গ করি তারে।
জ্যোতির মুকুট পরি দিগন্তের পারে
দেখা দেন দিনমণি ;
অরণ্যে অমনি
পাখীদের কণ্ঠে কণ্ঠে জাগে কলরব।
স্বপ্ন হয় প্রাণের উৎসব
দিক হ'তে দিগন্তেরে, জয়ধ্বনি ওঠে সবিতার।
স্বর্ঘ্য—সে তো কারও নহে একান্ত একার।

আকাশের বেলা
আমরা বলি না সে তো আমারই একেলা ;
বলি না আকাশ মোর প্রাণেরে ছাড়,
তারে মিরে কারও সাধে করি না বিবাদ।
ইন্দের স্বষ্টি—সে তো নহে কত একা কারও তরে,
সকলেরই অধিকার আছে সৌরকরে,
আছে জলে, আকাশে সমীরে।
তাই আমি যাহারা ভূমিরে
ভোগ্যবস্ত করিয়াছে হ'য়ে লোভাতুর—
তাহারা অম্বর।
সবারে বকিত করি হোলো যারা ভূম্যধিকারী—
বোদার উপরে ভায়া করিছে ধোঁদকারি।
বেদে বলে, ভূমিলক্ষী জননী সবার।
অক তার যে করিবে একা অধিকার,
পড়শীরে দিবে নাকো ভাগ,—
বাহিরে মাছুষ বটে—আসলে সে রক্তশোষী বাঘ।
বৈষম্যের বাঘ
জাগারে রেখেছে যারা তারা তো উদ্ভাদ।
তাহাদেরই পাপ
পৃথিবীর শিরে ডেকে যুগে যুগে আনে অভিশাপ,
ডেকে আনে রক্তের প্রাবন,
ডেকে আনে ইতিহাসে ছর্ব্বোপগম দারুণ প্রাবণ।

অভিনন্দন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

হে প্রিয় দরদী, প্রীতি-স্নেহ-ভোরে করিয়াছ সবে বন্ধন,
তাইতো বন্ধু, আমাদের এই জ্বরের অভিনন্দন।
দিগন্ত বৃষ্টি রঞ্জিত হ'ল, এসেছে—আশ্রুক সন্ধ্যা,
আকাশে উঠেছে চন্দ্র, এখন ফুটিবে বজ্রনীগন্ধা।
সমুখে এখনো প্রসারিত পথ, এই তো মাত্র সত্তর,
কিসেরি বা স্বরা, পূর্ণা যে ধরা, কেন হবে তবে সত্তর ?
ভাঙার আজো ভরা আছে তব, নিঃশেষ নহে বিত্ত,
কল্পনা আর কোঁতুক-রসে টলমল করে চিত্ত।
গানের আসরে উৎসারি' ওঠে কণ্ঠে স্বরের বর্ণা,
কাহিনী-কথায় নব নব ছবি ফোটে বিচিত্র-বর্ণা।
ভুনেছি অনেক, এখনো অনেক শুনিব তোমার গল্প,
আমরা তোমার অম্বরগী, কোনো প্রোতা নহে তব স্বপ্ন।
সেদিন দিলে যা সে-ভোজে আমরা মিলেছি সকলে হর্ষে,
'বিচিত্রা' পেনে বিচিত্র রূপ তোমারি যাহুর স্পর্শে।
কথাসাহিত্যে কত চরিত্র, আঁকা হ'ল কত চিত্র,
সহস্রভূতিতে ভরা অন্তর, তাই সকলের মিত্র।

প্রবীণ, তোমার নবীন হৃদয়, সেখায় আলোর দীপ্তি,
তাই উজ্জল-বরণী ধরণী দেয় সে এমন তৃপ্তি।
সমাজ-জীবনে জটিলতা যত এড়ায় নি তব দৃষ্টি,
সেই সমস্তা-উপাদানে হ'ল উপন্যাসের সৃষ্টি।
কবি-হৃদয়ের সঙ্গে মিলেছে কিছু উকিলের বুদ্ধি,
অভিজ্ঞতার স্পর্শ—করেছে ভাবের আবেগে শুদ্ধি।
প্রীতি আনন্দ তোমার জীবন-পথের নিত্য-সঙ্গী,
এমন সরস স্মৃতি-কথা, তাই এমন নূতন ভঙ্গী।
রবীন্দ্রস্বরের আসরে আমরা পেয়েছি তোমার সঙ্গ,
ভূমি অন্ধের, ভূমি স্বরসিক, হে প্রিয় উপেন গঙ্গো।
জুঃ-স্বথের কথা সে চলুক, থাকুক হিসাব-পত্র,
বর্ষ-শতের বাকি বহুদিন, এই হ'ল সবে সত্তর।
প্রীতির মালা পরাব কণ্ঠে, লগাটে প্রীতির চন্দন,
গ্রহণ করিও বন্ধু, মোদের হৃদয়ের অভিনন্দন।*

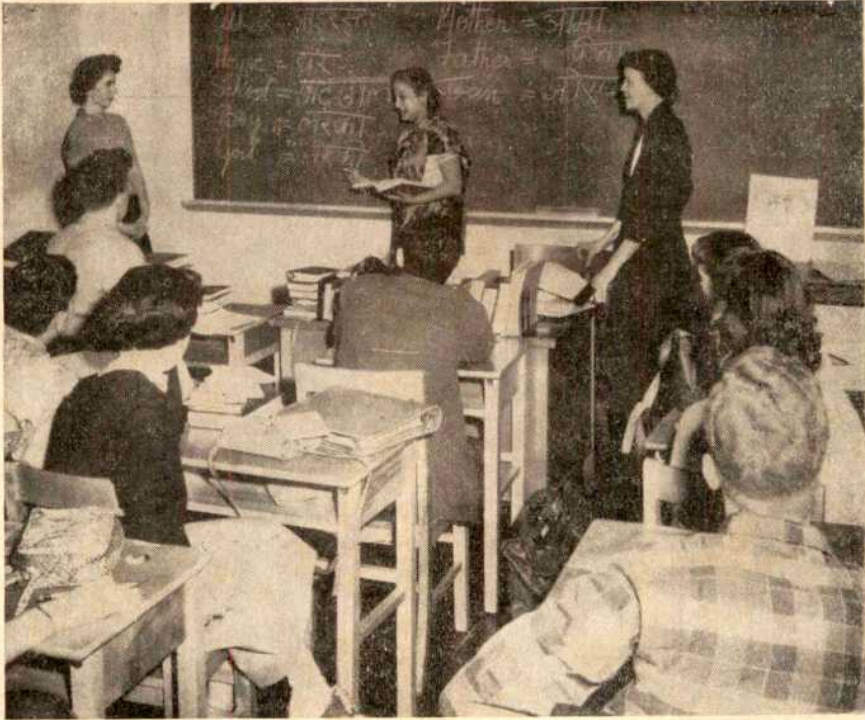
* শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সপ্ততি-বর্ষ-পুষ্টি উপলক্ষে



নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট চাক্ষুশিল্পকলা-প্রদর্শনীতে ভারতরাত্নের শিখলী-সচিব মোলানা আবুল কালাম আজাদ



সৌরাষ্ট্র ভ্রমণকালে মিসেস এলিনোর রুজভেল্ট কর্তৃক জামনগর আবুর্বেদ কলেজ মিউজিয়াম পরিদর্শন



নিউ ইয়র্কের উডমিয়ার একাডেমির একটি ক্লাসে একজন নেপালী ছাত্রী-
প্রতিনিধি ইংরেজী হইতে হিন্দীতে অনুবাদ করিতেছেন



কোরিয়াস্থ ৬০-তম ভারতীয় এম্বুলেন্স কোরের সভ্য সার্জেন্ট মুখু কৃষ্ণনকে নিউ ইয়র্ক
সিটির মেয়র ব্রোঞ্জ মেডালে ভূষিত করিতেছেন

দেবানন্দ

শ্রীমতীমাধব চৌধুরী

এক-সাতকুলার সোলাইটির লতা ডাকা হইয়াছিল বিলাতী বর্জন কার্যকরী করিবার উপায় ও বোঝাঝারে ছাড়দের উপর পুলিশের আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত।

ভাটবাজার, বাগবাজার, তবানীপুর, কালীঘাট হইতে বহু লতা আসিয়াছিল। সত্যেরা বেশীর ভাগ ফুল ও কলমের ছাত্র। বয়স্ক লতাদের অনেক অসুপস্থিত, মেতারাও আসেন নাই। ছাত্র-সত্যেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া মিছেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল।

ভবেশ ও মহেন্দ্র যেখানে বসিয়া কথা বলিতেছিল সেখানে আরও কয়েক জন যুবক আসিয়া বসিল। তাহাদের মধ্যে আরম্ভ হইল মেতাদের সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনা। দেশের সব কারাগার ছেলেরা মার খাইতেছে, মেতারা মিটিঙে আসিয়া গরম গরম বক্তৃতা দিয়া চলিয়া যান, আর তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। আজকের সভায় কয়েক জনের আসিবার কথা ছিল, কেহ আসিলেন না। তাহারা আজকাল ছেলেরদের এড়াইতে চাহেন মনে হয়। কারণ তাহারা আর শুণু বক্তৃতার মুগ্ধ হয় না, তাহারা কাজ চাহে।

একজন বলিল—ছেলেরা পুলিশের হাতে মার খেয়ে ছেলে থাক আর তাঁরা ঘরে বসে চোপ ইংরাজীতে খবরের কাগজ লিখে ইংরেজকে ভয় দেখানো, কান্নাকাটি করে বিলেতে দরখাস্ত পাঠানো—এই বন্দোবস্ত চালাতে চান। যে পাড়ার দোকানে পিকেটিং হচ্ছে সে পাড়া দিয়ে হাঁটেন না পুলিশে ঘরে ঘেলে দেবে ভয়ে।

ভবেশ বলিল—এসব কথা থাক। লড়াইয়ের সময় নৈমিক ও সেমাপণ্ডিকে একই কাজ করতে হলে লড়াই চলতে পারে না। মেতাদের ক্রটি থাকতে পারে, কিন্তু আমরাই বা কি কাজ করছি?

মহেন্দ্র—এটা অজ্ঞার কথা হ'ল। যেটুকু কাজ হচ্ছে ছাত্ররাই সেটুকু করছে। আমাদের কথা এই যে, আন্দোলন মাতে দানা বাঁধে এমন কোন ব্যবস্থা চাই।

ভবেশ—বেশ, সকলে বহুন। এ বিষয়ে কার কি প্রস্তাব আছে শোনা যাক।

বাহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া আলোচনা করিতেছিল তাহারা আসিয়া বসিল। মহেন্দ্র প্রস্তাব করিল—বক্তৃতাঝারে বিলাতী কাপড় বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্ত পিকেটিং চালাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল।

বাঙালীপাড়ার দোকানদাররা ছেলেরদের আনিঙে

দেখিলে বিলাতী কাপড় লুকাইয়া ফেলিত। বড়বাজারের কথা বসন্ত। মাড়োয়ারী বস্ত্র-ব্যবসারীরা স্বদেশী আন্দোলন জাঁকিয়া উঠিলে বাংলাদেশের কাপড়ের বাজার হারাইবার ভয়ে যত নপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ইতিমধ্যে সব ভুলিয়া গিয়াছিল। বিহারী পুলিশ ও মোরা সার্জেন্টরা যখন ছোকরা স্বদেশীওয়ালাদের পিটিয়া প্রায় ঠাণ্ডা করিয়া আনিতেছিল, মাড়োয়ারী ব্যবসারীরা তখন নতুন কণ্ট্রাষ্ট করিয়া হাজার হাজার গাট বিলাতী কাপড় আনিয়া বড়বাজার হাইয়া ফেলিল। কণ্ট্রাষ্টের একটা সর্ভ ছিল—কাপড়ে বিলাতী ছাপ থাকিবে না। তাহারা নতুন নতুন বুচরা দোকান পুলিশ বড়বাজারে বিলাতী কাপড় বেচিবার জন্ত।

‘মছলিধোর’ বাঙালীরা স্বদেশীর নাম করিয়া তাহাদের ভাত মাদিবার যত্ববদ্ধ করিয়াছে বলিয়া বাঙালী-বিদ্বেষী আন্দোলন চলিল মাড়োয়ারী মহলে। স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী মুদলমানদের সঙ্গে তাহারা মিথালি পাড়াইল। তাহাদের দরখাস্তের উত্তরে পুলিশ কমিশনার বেশী করিয়া বিহারী পুলিশ পাঠাইলেন বড়বাজারে পাহারা দিবার জন্ত।

শুণু বড়বাজারী মাড়োয়ারী কেন বাংলার পার্শ্ববর্তী বিহার ও উড়িষ্যার অনেকের রাজতন্ত্র চিত্ত বাঙালী স্বদেশীওয়ালাদের কাছে ক্ষুব্ধ হইল। অর্ধহীন একটা স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া তাহাদের প্রতিবেশী বাঙালীরা বিদেশী সরকারের হাতে মার খাইতেছে—এই বোকামি দেখিয়া বিহারী ও উড়িষ্যা কাপড়গুলি স্ব স্ব প্রদেশবাসীদের সাবধান করিতে অগ্রসর হইল। বিহার টাইমস বলিল—“বিহারী ভাই সব, বাঙালীরা বয়স্ক ও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। তোমরা যেন নিক্কোবেশ মত তাহাদের এই কুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিও না।” উৎকল দর্পণ বলিল—“ওড়িয়া ভাই সব, বাঙালীদের আন্দোলনে যোগ দিও না। তাহাদের স্বদেশী আন্দোলনের মূলে আছে প্রতিহিংসার ভাব। কর্তৃপক্ষ এ জিনিস কখনও সহ্য করিবেন না। তোমরা সাবধান। ওড়িয়া ভাই সব, বাঙালীরা কংগ্রেস চালাইতেছে।—কংগ্রেসের সঙ্গে তোমরা সংগ্রাম রাখিও না।”

সেদিন বড়বাজারে মহেন্দ্রের দলের রুট মার্চ করিবার কথা। স্কুলের কয়েক জন ছোট ছোট ছেলে বন্দোবস্তরূপে ঘনি দিতে দিতে বড়বাজারে প্রবেশ করিল, তাহাদের পিছনে মহেন্দ্র। বন্দোবস্তরূপে গিয়া কয়েকজন দোকানী টীংকার করিয়া বলিল—“বন্দোবস্তরূপে বাংলা আঁ গিয়া।”

ওটিকয়েক জন-এদার বহরের ছেলের সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিয়া মাড়োয়ারী ব্যবসারীদের বৈধেয় সীমা অতিক্রান্ত

হইল। ভাড়া-করা গুণ ও দোকানীরা মিলিয়া ছেলেগুলিকে ও মহেজকে বিরিয়া ফেলিয়া অশ্রাব্য গালাগালি করিতে ও মারিতে লাগিল। দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া বিহারী কনেইলসরা লাঠি খাড়ে আসিয়া পৌঁছিল। দাঙ্গা করিবার অভিযোগে মহেজকে বরিয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া থানায় লইয়া চলিল। ছোট ছোট দেলদেদেরও তাহারাই বহিল। থানায় কয়েক ঘা করিয়া বেত মারিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইল, মহেজকে হাজতে পাঠান হইল।

এই হাঙ্গামার খবর শহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। “মাতোয়ারীরা বন্দেমাভরম্ বিদ্রোহী” এই শিরোনাম দিয়া হিন্দী বঙ্গবাসী, হিতবার্তা, সঞ্জীবনী প্রভৃতি কাগজ ঘটনার বিবরণ ছাপিয়া মন্তব্য করিল—পুলিসকে ঘুষ দিয়া মাতোয়ারীরা এই কাজ করিয়াছে।

এটি-সারকুলার সোসাইটির পক্ষ হইতে উকিল দিয়া মহেজকে জামিনে খালাস করা হইল। ভবেশ বলিল, সে ডক্টর চক্রবর্তীকে মহেজের পক্ষসমর্থনের জন্ত অহরহোষ করিবে। ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ী যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া ভবেশ দেবানন্দকে বলিল—তুই কি বাবি আমার সঙ্গে?

দেবানন্দ বলিল—আপনার আপত্তি থাকলে নাই বা গেলাম।

ভবেশ—আমার আপত্তি নেই, তোর থাকতে পারে।

দেবানন্দ ভবেশের কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। একটু বিম্মিত হইয়া বলিল—আমার আপত্তি হবে কেন?

একটু চিন্তা করিয়া ভবেশ বলিল—ডক্টর চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত জীবনের কথা ভেবে আপত্তির কথা বলছি। আমি মত-টুকু জানি তোমাকে বুলে বলাই ভাল। আই-সি-এস পড়তে গিয়ে বিলাতে থাকবার সময়ে ডক্টর চক্রবর্তী নাকি এক আই-রিশ মেয়ের প্রেমে পড়েন। তার আত্মীয়-বন্ধনের বাবাতেই হোক বা অন্য যে কারনেই হোক তাকে পেলেন না। লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে অনেক দিন তিনি ইউরোপের নানা দেশে ঘুরে বেড়ালেন। তার পর ব্যারিষ্টারী পাশ করে ও ইতিহাসের গবেষণা করে ডক্টরেট নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। এত বিড়া ও বুদ্ধি ভদ্রলোকের কিন্তু কোন কাজে আসছে না। একটু মন দিয়ে কাজ করলে ও খাটলে তিনি সেরা ব্যারিষ্টার-দের মধ্যে একজন হতে পারতেন, সকলেই একথা বলে। কিন্তু কিছু নৈপত্যক কিন্তু তার উপর অল্প আদালত যা পান হাইকোর্টে, তাইতে সন্তুষ্ট হয়ে ছুটি মেশায় ডুবিয়ে দিলেন নিজে। একটু মদের মেশা, অটুট বইয়ের মেশা।...

এমনি চলছিল হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন হ'ল। বঙ্গমহলে কানাকানি হতে লাগল অবিবাহিত ডাঃ চক্রবর্তীর গৃহে কে একটা মেয়ে এসে জুটেছে। কোন ছাত, কি তার স্বর্ণ কেউ গটিক জানে না। কেউ বলে জার্মান, কেউ বলে ইহুদী, কেউ

বলে সেই আইরিশ মেয়েটাই নাকি না খেতে পেয়ে এসে জুটেছে।

কিছু দিন যেতে শোনা গেল ডাঃ চক্রবর্তী বিলেত যাবার আগে একটা মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা হয়েছিল। মেয়েটি জুন্দরী ও একমুগ্ধ। কি কারণে বিয়ে ভেঙে গেল কেউ জানে না। সম্ভবতঃ মেয়ের পক্ষ থেকে কোন কথা উঠেছিল। ডক্টর চক্রবর্তী বিলেত চলে গেলে এক ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা হয়, কেউ বলে বিয়ে হয়ে যায়। সে বা হোক, মেয়েটি এর পর চাক্রিতে ঢোকে। বছরখানেক আগে সেই ডাক্তারটি মারা গেছে। তার পর থেকে মেয়েটি এসে ডক্টর চক্রবর্তীর কাছে রয়েছে। লোকে বলে তাঁদের নাকি বিয়ে হয় নি।

একটু থামিয়া ভবেশ বলিল—তুমি ডাঃ চক্রবর্তীর পসার বাড়ছে হাইকোর্টে, মদ খাওয়া কমে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর বাড়ীতে কোন বঙ্গবাসী বসান না।

দেবানন্দ বলিল—আমরা ত বঙ্গবাসী নই, আমরা কাদের জন্ত যাচ্ছি। চলুন।

8

ভবেশ ও দেবানন্দ যখন ডাঃ চক্রবর্তীর গৃহে পৌঁছিয়া বেয়ারাকে জানাইল তাহার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাহে, বেয়ারা তখন একবার ছোকরা বাবু দুইটির দিকে ভাল করিয়া চাহিল। তারপর পেঙ্গিল ও কাগজের স্লিপ ধরিল তাহাদের সম্মুখে। ভবেশ তাহাদের দুই জনের নাম লিখিয়া স্লিপটি তাহার হাতে দিলে তাহাদের বসাইয়া স্লিপ লইয়া সে ভিতরে ঢুকিল এবং তখনই বাহিরে আসিয়া তাহাদের ভিতরে যাইতে বলিল।

ভবেশ ও দেবানন্দ ঘরে ঢুকিতে দেখিল বিপন্নিত দিকের দরজার পরদা সরাইয়া একজন মহিলা বাহির হইয়া গেলেন। তিনি সরিয়া যাইবার আগে একবার দাড় ফিরাইয়া চাহিলেন, দুই বঙ্গু তাহার মুখ দেখিতে পাইল। গৌরবর্ণ, অতি সুকীর্ষ সে মুখ, একটু যেন গভীর ভাব।

ডাঃ চক্রবর্তী দুই বঙ্গুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। ভবেশ ও দেবানন্দ ঘরের চারদিকে চাহিয়া দেখিল। তিন দিকের দেওয়াল জুড়িয়া দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা যেহগনি পালিশের স্ন্যাক। স্ন্যাকের থাকে থাকে সাজানো বই। টেবিলের উপর বই, সর্বত্র ঠাসা বই। একটা বড় কাঁচের পুস্পাধারে এক গোছা রক্তনীপকা, টেবিলের পাশে একটা তেপারার উপর রাখিয়াছে। ঘরের জানালায় ফিকা নীল রঙের দিকের পরদা।

দেবানন্দ মুগ্ধ হইল ঘরের সজ্জা দেখিয়া। ঘরের হাওরায় কিসের একটু মিষ্ট গন্ধ লাগিয়া রহিয়াছে।

ডাঃ চক্রবর্তী দেবানন্দের যুথের ভাব লক্ষ্য করিলেন। যুথ হাসিয়া বলিলেন—ওয়েল মাই ফ্রেন্ডস, কোন ধরনের আছে ?

ভবেশ বড়বাজারের ব্যাপার, মহেশ্বরের গ্রেপ্তার ও তাহাকে জামিনে খালাস করিবার কথা আগাগোড়া বর্ণনা করিয়া বলিল—পুলিসে দাঙ্গা করবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। এই অভিযোগে তাকে চালান দেবে। একটু ভালমত ডিকেলের ব্যবস্থা করতে হবে। এই জন্ত আপনার কাছে এসেছি আমরা।

ডাঃ চক্রবর্তী হুই-সারিটা প্রশ্ন করিবার পর বলিলেন—ডিকেল যত ভাল দাও—পুলিসের কেস, আর আসামী যখন ছাড় কনভিকশন ইজ সারটেন (কারাদণ্ড নিশ্চিত)।

ভবেশ—যারা ছোট ছোট ছেলেরদের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা পায় নি তাদের একটু শিক্ষা দেবার উপায় নেই ?

ডাঃ চক্রবর্তী একটু হাসিলেন। বলিলেন—মাই ফ্রেন্ড, সে শিক্ষা দেবার এজেন্সী পুলিস কোর্ট নয়। উপায়ের কথা বলছ ? উপায় নেই কিসের ? তোমরা মাইটি (ফরজাশালী) ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে শিক্ষা দিতে চাইছ, কার্ট ইউ টিচ এ লেফ্ট টু দি পেট এমিগ্রি অব ইউর কজ ? (আলোচনের ক্ষুদ্র শব্দদের চিহ্ন করার ব্যবস্থা করা যায় না ?)

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন—এ সব কথা যাক। তোমাদের বন্ধুর কথা বলছি। আমি ডিকেলের ব্যবস্থা করে দেব পুলিস কোর্টের ভাল উকিল দিয়ে। যদি না জানভাম যে ছাত্রদের মোকদ্দমায় পুলিস কোর্ট বল আর হাইকোর্ট বল ডিকেল ইজ ইউজলেস (পক্ষসমর্থন করে বাচানোর চেষ্টা যথা) ত আমি নিজে দাঁড়াই। যে কাজে মেয়েছ হুঁচার মাস জেলের ভাবমায় বাবড়ালে চলবে কেন ?

হুই বন্ধুর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—একটা মজার কথা সেদিন একথানা কাগজে পড়ছিলাম, তোমাদের বলি শোন। পার্টিশন রদ করবার জন্ত আমাদের এত বক্তৃতা রেজলুশন (প্রস্তাব পাস) কান্নাকাটি ইংরেজ কানে তুলছে না দেখে কাগজখানা প্রস্তাব করেছে আমেরিকা ও জাপানের কাছে দরবাণ্ড পাঠানো হোক, তারা হস্তক্ষেপ করে পার্টিশনটা রদ করে দিক। নো জোক ফ্রেন্ডস (ভাষাশাস্ত্র ময় বন্ধুগণ), সত্যিই এই প্রস্তাব করেছে। ভাবলাম আমার ডায়ালগোসিস (রোগ-পরীক্ষা) কেউ কানে ভোলে না—বার্ট আই এম রাইট (কিন্তু আমার ভুল হয় নি)।

ভবেশ—কিসের ডায়ালগোসিস ?

ডাঃ চক্রবর্তী—দ্য লা মাল্লাদি বেঙ্গালেজ (de la mala-die bengalaise) অর্থাৎ ডায়ালগোসিস অব দি ভাশনাল ম্যালাডি অব দি বেঙ্গালীজ (বাঙালীর জাতীয় ব্যাধি নির্ণয়)। এত বড় ভারত সাম্রাজ্যের একটা ক্ষুদ্র প্রদেশ ইংরেজ পার্টিশন

করেছে তার এডমিনিস্ট্রেশনের (শাসনের) সুবিধার জন্ত, তাতে হস্তক্ষেপ করবে জাপান ও আমেরিকা আমাদের কান্ডের আবেদনে ?

দেবানন্দ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আমি ভাল বুঝতে পারছি না তার।

ডাঃ চক্রবর্তী—আই এম সারী। (আমি হুঃখিত)

দেবানন্দ—সংক্ষেপে একটু বুঝিয়ে দিন স্যার।

ডাঃ চক্রবর্তী হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—সব কথা কি সংক্ষেপে বোঝানো চলে ? এমন জিনিস আছে, ভ্রমাক ভাইটাল (প্রয়োজনীয়) জিনিস হয়ত, যা একটু চোখ মিট মিট করে বোঝানো যায়। কিন্তু যে জিনিস বুঝতে চাইছ সেটা এই ক্লাসের নয়। এক কথায় বলা যায়—অল্প উত্তেজনার ব্যালাল (মনের ভারসাম্য) হারিয়ে কেল্লা, বাস্তব জ্ঞানের, মাজাজ্ঞানের অভাব এগুলো হচ্ছে লা মাল্লাদি বেঙ্গালেজের কয়েকটা লক্ষণ।

দেবানন্দের দিকে চাহিয়া ডাঃ চক্রবর্তী হাসিলেন।

দেবানন্দের যুথের ভাব একটু গভীর দেখাইল। সে বলিল—আপনি বাঙালীর চরিত্রের দুর্বল দিকটার কথাই বললেন।

ডাঃ চক্রবর্তী—ভূমি ঠিক বলেছ। সবল দিকটার সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা অনাবশ্যক। আচ্ছা, পরে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল তোমাদের সঙ্গে।

ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাঃ চক্রবর্তী—মহেশ্বরের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করছি। তবে ধরে নিতে পার তাকে হাস হুঁতিন জেলে থাকতে হবে। পরন্তু সন্ধ্যায় রায়ের ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করো।

হুই বন্ধু নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

ভবেশ ও দেবানন্দ বাহির হইয়া গেলে যে মহিলাটিকে তাহার। ধর হইতে ভিতরে চলিয়া যাইবার সময় দেখিয়াছিল তিনি ধরে চুকিলেন।

বয়স বোধ হয় বছর গচিশেক হইবে। বাস্তবিক সুন্দরী। যুথের গড়নটি অতি সুন্দর। বয়সের অম্পাতে যুথের ভাব গভীর। তাহার অভ্যাসি রূপের প্রথমতঃ গাভীর্ষের ছায়ায় কোমল দেখায়।

যেরে চুকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ছেলে হুটি কে ? বেশ ভাল লাগল ওদের দেখে।

ডাঃ চক্রবর্তী কপট গাভীর্ষের সঙ্গে বলিলেন—প্রিক এজপ্লেন (দয়া করে বুঝিয়ে বল) ছেলে বলে ভাল লাগল, না কোম বিশেষত্ব দেখে আনন্দ হ'ল।

ডাঃ চক্রবর্তীর কথার কোন উত্তর না দিয়া তিনি যুথ হাসিলেন। বলিলেন—যেটির বয়স কম তাকে দেখে মনে হয় ছাই চাপা আগুন।

ডাঃ চক্রবর্তী ধীরে ধীরে কথাটি আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—
হাই চাপা আগুন? হোকবার সুখে একটা কমসেন্সট্রেটেড
আরনেইমেন্সের (একপ্রাণী তিষ্ঠার) ছাপ আছে। তাই
দেখে বোধ হয় কথাটা বলছ, যুগল। ঐ টাইপের ছেলেরা
বেঘোরে মারা পড়ে সাধারণতঃ।

তার পর হাসিয়া বলিলেন, তবে বেঁচে যাবার উপায়ও
আছে। কোটনবস্ত্র হয়ে কেটে পড়তেও পারে?

যুগল—অর্থাৎ?

ডাঃ চক্রবর্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, অর্থাৎ এই অখিল
বিশ্বকে, মানে কামিষী ও কাকনকে মানে তোমার আঁচলের ঐ
চাবির গোছা এবং ভোমাকে—

যুগল হাসিতে হাসিতে বাধা দিয়া বলিল—থাক, আর
কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে না।

ডাঃ চক্রবর্তী—হবে না? ব্যাখ্যা না করতেই বুঝে
নিচ্ছে? হোয়াট এ ক্রেডার গার্ল (কি চালাক ঘেরে)?

প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের আদালতে
দাখা করিবার অভিযোগে মহেশ্বরের বিচার হইয়া চার
মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। আসামী-পক্ষে পুলিশ
কোর্টের নামকরা প্রবীণ উকিল দাঁড়াইয়াছিলেন। দাখার
অপর পক্ষ মাদোহাদারীদের চালান দেওয়া হয় নাই বলিয়া
তিনি বিচার সম্পর্কে আপত্তি তুলিলে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে
ঘমকাইয়া বলিলেন—তাহারা নিরীহ, অমেঠ (দাখ) ব্যবসায়ী,
রাফিকান ষ্ট্রুডেন্টরা (গুণ্ডা ছাত্ররা) তাহাদের উপর বুনা
বহিষের মত পড়িয়া তাহাদের হারবার করিয়াছে। তিনি
পুলিশকে ঘমকাইলে অন্য আসামীদের চালান দেয় নাই
বলিয়া। পাব্লিক প্রসিকিউটর বিবীভভাবে তাহাদের বয়সের
উল্লেখ করিতে গিয়া প্রচণ্ড বহক খাইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট
বলিলেন, তাইপার (কালসাপ) ছোট হটক আর বড় হটক
সমান বিপজ্জমক।

তবেশ আদালতে গিয়াছিল। পরদিন সন্ধ্যায় দেবানন্দকে
লইয়া সে চক্রবেড়ের মিঃ রাহের গৃহের উদ্দেশে রওনা হইল।

মিঃ রাহের গৃহে পৌঁছিয়া ভবেশ দেখিল ডাঃ চক্রবর্তী
আসেন নাই ভবনও। মিঃ ডাটা, মিঃ সেন, মিঃ গাজুলী
প্রভৃতি মিঃ রাহের কয়েক জন ব্যারিষ্টার বন্ধু বলিয়া আলাপ-
আলোচনা করিতেছেন। তাহারা ছই জন ধরে গিয়া বলিল।

রাহ বলিলেন, গেলিক আমেরিকান কাগজের লাঠ
ইন্সখানা দেখেছ? মোটা ইন্স তারতবর্ষের ব্যাপার লক্ষ্যে।
কারলাইল ও লায়ন সারকুলার ছেপে দিয়েছে। কতকগুলো
আর্টিকেল ফার্মি ও নাগরী হরফে ছেপেছে দেখলাম।
হদেনী ও বহুকটি সম্বন্ধে কাগজখানার টোন খুব গিমপ্যাণেটিক
(হয় সহানুভূতিপূর্ণ)।

কিছুক্ষণ পরে সিগার হাভে ডাঃ চক্রবর্তী ঘরে ঢুকিলেন।

ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে নমস্কার করিল।
ভবেশ বলিল, আপনার কথাই ঠিক হ'ল। মহেশ্বরের জেল
ঠেকানো গেল না।

ডাঃ চক্রবর্তী—ডোর্ট বি আপসেট (যুড়ে পড়ো না)।
বলো তোমরা।

চার দিকে চাহিয়া ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, অমেঠ জন
মর্লের যুগপাত করছিলে বোধ হয় সবাই। যুগ দেখে তাই
মনে হচ্ছে। কিছু সুবিধে হবে না। মর্লে-লিবারেল
(উদারনৈতিক) হলেও তার পাহের চামড়া গোঁড়া রকবশীল
মর্লের লোকের চেয়ে কম পুরু নয়। বরং আমার কাছে
একটা নুতন খবর শোন। আমি একটা নুতন ধুমকেতুর সন্ধান
পেয়েছি।

সকলে একটু বিস্মিতভাবে তাহার যুগের দিকে চাহিলেন।

ডাঃ চক্রবর্তী হঠাৎ আবার কোন ধুমকেতু আবিষ্কার করিয়া
বলিলেন। মিঃ গাজুলী বলিলেন, মিঃ চক্রবর্তী ইক ইন এ
পোয়েটিক্যাল মুড (মিঃ চক্রবর্তীকে কাব্যভে-পেয়েছে)।

ডাঃ চক্রবর্তী—ইহেৎস।

তার পর মিঃ রাহের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—
ভূমি শু মাঝে মাঝে কাগজে লেখ। মফসলের কাগজগুলো
কি কখনও দেখ না, না ভার্গাকুলার র্যাগ বলে ছোট না?
একখানা অভ্যস্ত আপত্তিকমক লিকসেট আমাকে এক জন
দেখতে দিয়েছে। কুমিলার এক মুসলমানের লেখা। সলি-
মুল্লার ভাড়াটে লেখক। তার বক্তব্য ইংরাজদের পাদশাহ
পূর্ববঙ্গের রাজ্যপাট নবাব সলিমুল্লাকে দিয়েছেন। পূর্ব-
বঙ্গের ছোটলাট, জজ, মেজিষ্টার, পুলপ সাহেবরা এখন নবাবের
চাকর। তার পর লিখেছে, নবাবের হুকুমে মোছলমান
ভাই সব কাফের হিন্দুদের জমি আবাদ করবে না, তাদের
ধাককা দেবে না, কাফের মহাজনদের টাকা দেবে না।—এই
লিকসেট ঢাকা, কুমিল্লা, মৈয়নসিংয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিলি
হচ্ছে।

মিঃ সেন—সিলি একিউজেশনস অব এ র্যাভিড ফেলো।
উই মাষ্ট নট ডিসেও সো লো এজ টু টেক নোটিশ অব সার্চ
ষ্টাক (পাগলের প্রলাপ। এ সব জিনিস নগরে আমবার মত
নীচ মন কেন হবে আমাদের?)

মিঃ গাজুলী—এ সব আমাদের ইগনোর (উপেক্ষা) করা
উচিত।

ডাঃ চক্রবর্তী এই সকল মন্তব্যের কোন উত্তর না দিয়া
বলিলেন, তার পর শোন। মাস দুই আগের এক কাগজের
কথা বলছি। লিখেছে, “হিন্দুদের উৎপীড়ন করবার উদ্দেশে
মুসলমানদের প্রায় দেবার নীতি আমরা সমর্থন করি না।
অনেক দায়গার গভর্ণমেণ্টের এই আচরণের কলে মুসলমানদের
ধারণা হয়েছে, তারা যা খুলি করুক কর্তৃপক্ষ তাদের সাহায্য

করবেন। এই ধারণার ফলে মৈমনসিংহের অপরাধপ্রবণ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরা চকল হয়ে উঠেছে। মুসলমান চাষীদের ধারণা হয়েছে হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে গেলে গবর্ণমেন্ট তাদের সাহায্য করবেন।”

মিঃ গাঙ্গুলী—গবর্ণমেন্টস পারসিকিউশান ইজ ফোর্গিং ম্যাশিনাল ইউনিট ইন দি কাল্টি (নির্ধাতনের ফলে আমাদের জাতীয় একতা গড়ে উঠেছে)। হিন্দু মুসলিম মিলে ইউনাইটেড ফ্রন্ট গড়ে তুলছি আমরা। এ সব কমিউন্যাল মেক্টিজিটির (সাম্প্রদায়িক মনোভাবের) প্রভাব দেখুওঁ উচিত নয়।

মিঃ সেন বলিলেন, তবে তোমার মত কমিউন্যাল নিউজ এক্সলোকে আয়ত্ত্ব একটা ধরন দিতে পারি। কুঠিয়ার হিন্দু মুসলমান মিলে যে সভা করেছে সেটার ধরন পৌছেছে তোমার কানে? এই সভায় কয়েক জন হিন্দু কি বক্তৃতা দিয়েছেন জানো? এক জন বলেন—“মুসলমান ভাই সব, আবার তোমরা ভারতবর্ষের শাসনভার হাতে নাও, আমরা আগে যেমন ছিলাম তেমনি তোমাদের অধীনে থাকব। তোমরা আমাদের আন্দোলনে যোগ দাও।” আর এক জন বলেন—“ইংরেজরা অজ্ঞারভাবে দিরাজদৌলাকে ও শাহ আলমের ছেলের মেরে কেলছে। এর প্রতিপোধ নেবার জন্ত আমাদের আন্দোলনে যোগ দাও।”

ডাঃ চক্রবর্তী হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এ খোশামোদিতে ভবী ভোলবার নয়। পরের ধরনটুকু শোনাও।

মিঃ সেন সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন—উপসংহারটি শোন। এই সব মর্শ্বস্পর্শী বক্তৃতা শেষ হলে সভায় উপস্থিত মুসলমানদের অহরোধ করা হ'ল বদেদী আন্দোলনে যোগ দেবার জন্ত শপথ করতে। এক জন মুসলমানও শপথ করল না। ইজ ইট নট এ ফ্যাক্ট, সেন (এটা কি প্রকৃত তথ্য নয়)?

মিঃ রায়—তোমার ধুমকেতুর কি হ'ল চক্রবর্তী?

ডাঃ চক্রবর্তী—এতক্ষণ এই কমেটের কথাই হচ্ছিল, অবশ্য পুরোক্তভাবে। আমার মনে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে যে নতুন ধুমকেতু দেখা দিয়েছে এর পর তার পুঙ্খ ঘেঁষে ফেলবে সারা ভারতবর্ষের আকাশ। ধুমকেতু বলবার অর্থ—ইউ স্পেলস ওরাইভস্প্রেড এণ্ড কেটাল কমসিকোরেলেন্স (দেশময় যোর শব্দ বাধবে)। হিন্দুদের ও তাদের পোলিটিকাল (রাজনৈতিক) আন্দোলন দমন করার জন্ত ক্যাটালপ (যন্ত্র) হিসাবে মুসলমানদের ব্যবহার করার আইডিয়া একটা গাও আইডিয়া। কেউ কেউ বলবে যেকিটোকেলিয়ান (শয়তানের) আইডিয়া। বাট ইট ইজ দি মোষ্ট নেচারাল

বিং ফর দি ইংলিশ টু পান্স দিস আইডিয়া (ইংরেজের মাথাধারাত্মক ভাবেই একথা উদয় হয়েছে), আমাদের স্পিরিচুয়াল মগজে কথাটা চুকে পাবে নি এ পর্যন্ত। পূর্ববঙ্গে এই আইডিয়া অঙ্গারের কাক কণা আরম্ভ হয়েছে।

একটু বামিরা তিনি আবার বলিলেন—আমার কি মনে হয় জানো রায়? ১৮৮৫-তে কংগ্রেসের জন্ম, এত দিন বাদে এদেশে এই বার মিয়ান পলিটিক্স (আলম রাহমতী) আরম্ভ হবে।

মিঃ সেন হাসিয়া বলিলেন—সাম্প্রদায়িক দাড়াহাঙ্গা আগে ছিল, এখনও আছে। চক্রবর্তী ইজ ট্রাইং টু রিড এ মিউমিনিং ইন্টু দেম (চক্রবর্তী এর নতুন ভাষা উপস্থিত করতে চান)।

কিছুক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। যুদ্ধের ভবেশ বলিল—একটিউজ মি (আমাকে মাগ করুন), মুসলমানদের মধ্যে মিঃ রহুলের মত লীডার (নেতা) রয়েছেন। সলিমুলার ভাই আতিকুল্লা বদেদী আন্দোলনের পক্ষে। আরও অনেক আছেন। এরা এ ভিনিশটী বন্ধ করতে পারবেন না?

ডাঃ চক্রবর্তী হাসিলেন। বলিলেন—মাই ইয়াং ফ্রেণ্ড, মিঃ রহুল ইজ এ মোল্লেম লীডার অব দি হিগুস (মিঃ রহুল হিন্দুদের মুসলমান নেতা)। তিনি মুসলমানদের লীডার নয়।

একটু পরে ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। নমস্কার করিয়া তাহারা বিদায় লইল।

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। দেবানন্দ রাজনগরে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া পিড়াকে চিঠি লিখিল।

পিতার উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন—তাহার এখন রাজনগরে যাইবার প্রয়োজন নাই, ইচ্ছা হইলে কয়েক দিনের জন্ত পুতী বা অজ কোথাও বেড়াইয়া আসিতে পারে, তারপর ছোট্টোলে ফিরিয়া মন দিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে। পরীক্ষার পরে বাড়ী যাইবে।

পিতার এই উত্তরে দেবানন্দ হতাশ ও একটু বিস্মিত হইল। সে জানিত না ইজের সহিত তাহার দেবা-সাক্ষাতের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি এখনও নিশ্চয় হইতে পারেন নাই।

দেবানন্দ বাড়ী যাইবে না জানিয়া ভবেশ তাহার নিকট তাহার স্বগ্রামে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল। দেবানন্দ বলিল—বাবা যখন লিখেছেন তখন পুতীতেই যাই। সমুদ্র দেখি নি এ পর্যন্ত, দেখে আসি।

ভবেশ দেশে চলিয়া গেল। দেবানন্দ পুতীতে গিয়া এক পাথার বাড়ীতে উঠিল। দিন দুই পরে এক ছোট্টোলে চলিয়া আসিল। প্রথম কয়েক দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা দেখিয়া কাটা গেল। তারপর প্রতিদিন সমুদ্রতীরে ঘুরিয়া বেড়াইত বা

বসিয়া কাটাইত। প্রথম সমুদ্র-দর্শনের উত্তেজনা শান্ত হইয়াছিল, এখন কেমন একটু একঘেয়ে মনে হইত তাহার। মনে হইত কঠিন বেলা-বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া সমুদ্র ঘেঁষা অশ্রান্ত কাদিয়া চলিয়াছে। শুধু সমুদ্রের আকর্ষণে সকালে বিকালে সে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইত।

এক দিন হোটেলের কয়েক জন মিলিয়া দল বাঁধিয়া গরুর গাড়ীতে চাপিয়া কোনারক বেড়াইতে গেল। কোনারক পৌষিহা দেখিল তাহাদের আগে আর একটু দল দেখানে পৌষিয়াছে। বেড়াইতে বেড়াইতে কোনারকের স্বর্ধ্য-মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে বিস্মিতভাবে ভাবিতেছিল যে সকল শিল্পী এই আশ্চর্য মন্দিরের পরিকল্পনা করিয়াছিল, যাহাদের অক্লান্ত সাধনায় এই অপূর্ণ মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের বংশধর কি এখনকার ওড়িয়া ভাতারা। সে একমনে এই সব ভাবিতেছে—একটি বছর সতেরোর ছেলে বেড়াইতে বেড়াইতে সেদিকে আসিল। ভয়ঙ্কর চিত্তে দেবানন্দকে স্বর্ধ্যমন্দিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সে সেখানে দাঁড়াইল। দেবানন্দকে দেখিয়া তাহার মনে হইল ইহার যুগ তাহার পরিচিত। কাছে গিয়া সে বলিল—আপনার নাম দেবানন্দ নয়?

চমকিয়া দেবানন্দ হাত ফিরাইয়া দেখিল একটি অপরিচিত ছেলে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে। সে বলিল—হাঁ, আপনাকে ত চিনতে পারলাম না।

ছেলেটি হাসিয়া বলিল—আমার নাম নারায়ণ। আমি একি-নারকুলারের সভায় আপনাকে দেখেছি, আপনার বক্তৃতা শুনেছি।

হুই জনের মধ্যে আলাপ জমিয়া উঠিল। ঘির হইল পরদিন বিকালে সমুদ্রতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে।

পরদিন সমুদ্রতীরে আসিয়া দেবানন্দ দেখিল আগেই আসিয়া নারায়ণ তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া নারায়ণ পকেট হইতে একখানি বই বাহির করিয়া বলিল—কাল আপনি পড়বার জুজ বইয়ের কথা বলেছিলেন, বই এনেছি।

দেবানন্দ বইখানি হাতে লইয়া দেখিল “The Temple of Bhowani” (অবানীর মন্দির)। বইখানির নাম শুনিয়াছে সে, পড়ে মাই।

হুই বেলা তাহাদের নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ ও আলোচনা আরম্ভ হইল। দিন হুই পরে নারায়ণ বলিল—আমি আপনার চাইতে বহুসে বোধ হয় কিছু ছোট। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করছি, দোষ ধরবেন না। আচ্ছা, এখন দেশে এই যে স্বদেশী আন্দোলন চলছে তার লক্ষ্য কি, আপনার মনে হয়?

—কেন, লক্ষ্য ভাঙা বাংলা ছোড়া দেওয়া।

—অর্থাৎ ইংরেজকে দেশের লোকের মত বা দাবি মানতে বলা। ইংরেজ রাজী হবে এতে?

—রাজী হয় নি বলেই ত চাপ দেওয়া হচ্ছে।

—এই চাপে কাজ হবে মনে হয়?

—যদি ঠিকমত চাপ দেওয়া হয় তা হলে হবে। আমার নিজের মত যে ভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে তাতে কাজ হবে না।

—তবে কিসে কাজ হবে মনে করেন?

—এখানে কাজ হওয়া কথটা সম্বন্ধে অনেক রকম মত থাকতে পারে।

—আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।

—পার্টিশন স্বদেশী আন্দোলনের উপলক্ষ্য। এই আন্দোলনের মধ্যে এমন সব জিনিস এসে পড়েছে যে শুধু পার্টিশন রদ তার লক্ষ্য বললে ভুল বলা হবে, যদিও লোকের চোখের সামনে এই লক্ষ্যটাই স্পষ্ট। আসল লক্ষ্য দেশের শাসন-পরিচালনা সম্বন্ধে দেশের লোকের অধিকার মানতে ইংরেজকে বাধ্য করা। ভাঙা বাংলা হরত আবার কোন দিন ছোড়া লাগতে পারে। কিন্তু দেশের লোকের এই দাবি ইংরেজ মানবে না।

নারায়ণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর বলিল—আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। দেশের লোকের দাবি বলতে আপনি কি বোঝেন?

দেবানন্দ একটু হাসিল। বলিল—দেশের লোক কি সম্বন্ধে কোন দাবি করছে? না তাদের সত্যিকারের দাবি কি পরিষ্কার করে কেউ বলছে? তারা চাইছে অম্মত্ব। হিন্দুরা বলছে ভাঙা বাংলা ছোড়া দাও, বেনীয়ার ভাগ মুসলমানের মত ভাঙা বাংলা ভাঙাই থাক। শুধু একটা বিষয়ে সকলে এক মত—আরও চাই। আরও চাকুরি চাই, কাউন্সিলের মেম্বর হতে চাই, মেম্বরদের হাতে আরও কমতা চাই।

—আপনার কি মত?

—তোমার কি মত আগে বল শুনি।

নারায়ণ ঘেঁষা একটু চমকিয়া উঠিল। তারপর বলিল—আমার কোন মত নেই দেবুদা। আমি বাঁদের সঙ্গে আছি তাঁদের বিশ্বাসই আমার বিশ্বাস। তাঁদের কথা এই যে, পার্টিশন একটা সুযোগ এনে দিয়েছে লোককে ঘেঁষে গুঁঠবার, মানে ইংরেজের স্বরূপ চেনবার। ভাঙা বাংলা ছোড়া দেওয়া বা স্বদেশীশিল্পের পুনরুজ্জীবন আসল কাজ নয়, ইংরেজকে এ-দেশ থেকে দূর করা আসল কাজ। স্বদেশী আন্দোলন যারা করছে তারা করুক, আসল কাজ করবার জন্য মোলাদা লোক চাই।

দেবানন্দের মনে হুইল নারায়ণের কথায়—যেন একটা

নুতন পথের ইঙ্গিত আছে। সে সোজা হুজি জিজ্ঞাসা করিল—
কি উপায়ে এই আসল কাজ করা হবে?

নারায়ণ তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। নিজের মনে
চূপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—
আমাকে মাণ করবেন দেবদা, যা জিজ্ঞেস করলেম তার উত্তর
অন্ত লোকের মুখ থেকে শুমবেন। যদি আপনি রাজী থাকেন
কলকাতায় ফিরে আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। তবে
একটা কথা আছে। যেখানে যাবেন, যা কথাবার্তা হবে
সব গোপন রাখা হবে, কারও কাছে গল্প করবেন না।
যাবেন?

—যাব।

নারায়ণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেবানন্দকে জড়াইয়া বলিল।
বলিল—আপনাকে দেখেই আমি চিন্তে পেরেছি আমাদের
দলের একজন হবার মত লোক আপনি।

—তোমাদের কিসের দল নারায়ণ?

—সব শুমবেন পরে।

পর দিন সকালে সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়া দেবানন্দ দেখিল
নারায়ণ ঠিক জায়গাটিতে বসিয়া আছে। সে কাছে আসিতে
নারায়ণ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—আপনাকে আরও কতক-
গুলি জিনিস পড়তে দেব। এদিকটাতে লোকজন যাতায়াত
করছে, চলুন চক্রতীরের দিকে একটু ফাঁকা জায়গাতে যাই।

তাহারা হাঁটিতে লাগিল। নারায়ণ বলিল—আপনি ত
কলকাতায় থাকেন। যুগান্তর পড়েছেন?

দেবানন্দ বলিল—যুগান্তর, সন্ধ্যা, নিউ ইডিয়া—যা হাতে
পাই পড়ি। যুগান্তর পড়েছি, তবে নিয়মিত ভাবে পড়বার
সুযোগ হয় নি। মাঝে মাঝে মনে হরছে যারা এই কাগজ
চালায়—তাদের সঙ্গে আলোপ-পরিচয় করলে অনেক কাজের
কথা জানতে পারব। এ পর্যন্ত সুযোগ হয় নি।

নারায়ণ—ইচ্ছা থাকলে সুযোগ হতে কতকণ? আত্মন
এ জায়গাটিতে বালির উপর বসি থাক।

হুই জনে বসিলে নারায়ণ পকেট হইতে এক বাঙালি কাগজ
বাহির করিল। দেবানন্দ হাতে লইয়া দেখিল যুগান্তর, সন্ধ্যা
ও নিউ ইডিয়া কাগজ। বলিল—আমাকে এগুলো দাও।
আমি পড়ে তোমাকে ফেরত দেব।

নারায়ণ হাসিয়া বলিল—হাঁ, ফেরত দেবেন। এগুলো
আমার কাজের সহায় কিনা।

দেবানন্দ—কি কাজের সহায়?

নারায়ণ—ভাগজগুলো আগে পড়ুন, তার পর বলব।

ইহার পরদিন কলকাতা হইতে হঠাৎ কি খবর পাইয়া
নারায়ণ চলিয়া গেল। যাইবার আগে দেবানন্দের সঙ্গে দেখা
করিয়া বলিল—বই ও কাগজগুলো আপনার কাছে থাক।
আপনি কলকাতা ফিরে আমাকে চিঠি দেবেন। আমি আপনার

হোটেলে গিয়ে ওগুলো নিয়ে আসব আর যুগান্তরের পেছনে
যারা আছে তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেব।

দেবানন্দ কাগজগুলি পড়িয়া শেষ করিল। কিন্তু নুতন
বিষয় শুধু পড়িয়াই তাহার কাজ শেষ হইত না, সতীনের
প্রভাবে আসিবার পর হইতে সে ডায়েরী লিখিত।
ঘেল হইতে বাহিরে আসিবার পর এই অভ্যাস চলিয়া
গিয়াছিল। তবে কোন কাগজে বা বইয়ে নুতন কথা,
তাহার মনোমত কথা পাইলে তাহা গুছাইয়া নিজের
ভাষায় লিখিয়া রাখিত। এই কাজ ও নিয়মিত করিত
না, মাঝে মাঝে করিত। এই লেখার মধ্যে তাহার নিজের
মনের সন্দেহ, বিশ্বাস, আত্মলতা প্রকাশ পাইত। পুরীতে
লিখিত ডায়েরী হইতে তাহার এই সময়ের মনের ভাব কিছু
জানিতে পারা যায়। যেমন :—

“যুগান্তর রুশিয়ার ডুমা ভাদিরা দিবার এবং অমাহুসিক
হত্যাকাণ্ড ও অরাজকতার কথা লিখিয়াছে, বিপ্লবের কল
যদি অনেকের পক্ষে এই রকম হুঃখজনক হয় তাহা হইলে
বিপ্লবের সমর্থন করা কি সম্ভব? এই প্রশ্নে প্রথম প্রশ্ন এই
যে, মহত্ত্ব-সমাজের ক্রমবিকাশের যে বিধান আছে বিপ্লব কি
সেই বিধানের অঙ্গ? এই প্রশ্নের উত্তর—সমাজের ব্যাধি যদি
স্বাভাবিক কারণে হয়, সেই ব্যাধির প্রতিষেধক বিপ্লবও
স্বাভাবিক কারণে হয়। পরাবীনতার অভিশাপগ্রস্ত সমাজে
আর্থিক, নৈতিক, আবাসিক অবনতি ঘটে। এই অভিশাপগ্রস্ত
সমাজের মুক্তির দুইটি উপায় আছে—যথা, বিপ্লব ও বেচ্ছা-
চারী শাসকের প্রদত্ত মুক্তি। এই দ্বিতীয় উপায়ে অর্জিত মুক্তি
সবকে একটা আশঙ্কার কারণ আছে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম
জাতিকে সাহস, দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগে অত্যন্ত করে। স্বাধীনতা
অপরের হাত হইতে দান হিসাবে আসিলে এই সকল গুণের
অভাবে জাতি স্বাধীনতা-ধন রক্ষা করিবার যোগ্যতা লাভ
করিতে পারে কিনা সন্দেহ। পরাবীনতার অভিশাপগ্রস্ত
সমাজের একমাত্র মুক্তির উপায় বিপ্লব।”

যুগান্তর “ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ” এই শিরোনামায় বড় স্তম্ভ
লিখিয়াছে। লিখিয়াছে, “আমাদের বর্তমান সুনিয়ন্ত্রিত,
সুব্যবস্থিত দাসত্বের চাইতে এনার্কি অনেক বেশী কাম্য।
ইংরাজ হঠাৎ চলিয়া গেলে দেশে যদি এনার্কি দেখা দেয় সে
এনার্কিও ভাল—এ বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?”

নিউ ইডিয়া এই মর্মে লিখিয়াছে—“দেশ বিপ্লবের যুগে
দাঁড়াইয়া আছে। এই বিপ্লব নৈতিক শক্তির দ্বারা আনিতে
হইবে, দৈহিক শক্তির দ্বারা নয়। মর্যাল ফোর্স যদি বিপ্লব
আনিতে পারে তাহা হইলে অল্প আইন লঙ্ঘন করিবার জন্য
বড় গলায় উপদেশ দাও কেন? মর্যাল ফোর্স ও আত্মিক
শক্তির কথা শুনিতে শুনিতে কান বালা-পালা হইল। ইংরেজ
কি মর্যাল ফোর্সের বলে সাত সমুদ্র ভের নদী পার হইয়া

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে? তাহার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথার মর্যাদা ফোর্সের কথার এক বার বলিবার উদ্দেশ্য কি? যে রোগের যে ঔষধ তাহার ব্যবস্থা না করিয়া শুধু আত্মবাহু কথার মারপ্যাচ।”

দেবানন্দের মনোজগৎ যে বিচিত্র ভাবপ্রবাহে আলোজিত হইতেছে তাহারই পরিচয় ডায়েরিখানির প্রতিটি পৃষ্ঠায়।

ভবানীর মন্দির বইখানি পড়িয়া দেবানন্দ দেখিল আনন্দমঠ পড়িয়া দুর্গম অরণ্যের মধ্যে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া হাজার হাজার সম্ভাবনাবাহিনী গঠনের যে স্বপ্ন তাহার মনে আসিয়াছিল এককালে, সেই স্বপ্ন উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে বইখানিতে। কিন্তু এই বইখানির চেয়ে তাহার আরও ভাল লাগিল যুগান্তরের অগ্নিগর্ভ রচনাসমূহ। তাহার কেমন ঘেন মনে হইল প্রকৃত পথের সন্ধান এই বার বোধ হয় সে পাইবে। সে স্থির করিল কলিকাতার ফিরিয়া যতদূর সম্ভব সে নারায়ণের সঙ্গে দেখা করিবে।

কলেজ খুলিবার কয়েক দিন আগে সে ফিরিয়া আসিল। হোটেল ভবন একরকম খালি। যাহাদের পরীক্ষা আছে এই রকম জনকয়েক ছেলে তাহার মত ছুটির মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ভবেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ বাড়ীতে থাকিয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। কলেজ খুলিবার দিন দুই আগে সে হোটেল ফিরিল। সে আসিবার পরের দিন সকালে মিঃ মায়ের বাড়ীর এক পিয়ন দেবানন্দের নায়ে এক চিঠি আনিয়া। ক্রিটি চিঠি লিখিয়াছে দেবানন্দকে আমন্ত্রণ জানাইয়া। সে লিখিয়াছে তাহার এক মাসী আসিয়াছেন, তাহার জন্ম নুতন ঠাকুর রাখা হইয়াছে। সুতরাং বাবুটির হাতে ধাইয়া জাত ঘাইবার ভয় নাই। দেবানন্দ চিঠিখানা ভবেশকে দেখাইল। পিয়ন জবাবের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। ভবেশ বলিল, লিখে দাও আমরা দু’জন যাব।

পিয়ন চলিয়া গেলে ভবেশ বলিল, ক্রিটি কি করে জামল কলেজ খোলবার আগে তুই এসেছিস? ওখানে গিরেছিলি?

দেবানন্দ—হট্টলে বড় একা একা লাগাতে আপনার বোঁজ নিতে ওখানে একদিন গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি লক্ষ্যে গিরেছেন। মিসেস রায় খুব আদর করলেন।

ভবেশ মনে মনে হাসিল। ডি. এস. পি. ও রায় বাহাদুরের ছেলে, পড়াশুনার ভাল, দেখিতে ভাল। একবার বিলাত ঘুরাইয়া আসিয়া জ্বাভে জ্বলিতে পারিলে—

দেবানন্দের সঙ্গে ভবেশকে দেখিয়া মিসেস রায় বলিলেন, তুমি লক্ষ্যে থেকে কবে এলে ভবেশ? ভবেশ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—আমি কাল ফিরেছি। ক্রিটি কোথায়? দেবুর আজ নিমন্ত্রণ কিসের?

মিসেস রায়—এমনি খেতে বলেছে। ক্রিটি বলছিল ও একা একা হোটেলের আছে তাই।

ক্রিটি আসিল। সে স্নান করিয়া একখানি চণ্ডা কালো-পাত মিলের ধুতি পরিয়াছে। দুই হাতে দুইখানি নুতন কেনা শাখা। তাহাকে এই বেশে দেখিয়া দেবানন্দের মনে হইল হঠাৎ ক্রিটির বয়স দুই বছর বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া ভবেশ হাসিয়া বলিল—এই যে ক্রিটি লক্ষ্মী, কেমন আহ?

ক্রিটি—ভবেশ-দা, তোমাকে বিজ্ঞার প্রণাম করা হয় নি।

দেবানন্দ ভবেশের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ক্রিটি ভবেশকে প্রণাম করিবার জন্ত আগাইলে সে একটু সরিয়া গেল। প্রণাম সারা হইলে ভবেশ হাসিতে হাসিতে বলিল—হ্যাঁরে, ছেলে-মাছুষ বলে শুকে একটা প্রণাম করলি না?

দেবানন্দ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—ভবেশ-দা কি যে বলেন। আত্মকে কেন প্রণাম করবে? ক্রিটি ভবেশের মুখের দিকে চাহিল। বলিল, পালিয়ে গেলে কি করে প্রণাম করবে? তার পর নিজেই কয়েক পা আগাইয়া গিয়া গভীরভাবে দেবানন্দকে আদেশ করিল—এদিকে এসো।

দেবানন্দ আসিল না। তাহার মুখের ভাবে মনে হইল সে অভ্যস্ত বিব্রত বোধ করিতেছে। ক্রিটি আগাইয়া আসিয়া দেবানন্দকে প্রণাম করিল।

মিসেস রায় এই প্রণামের ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্ব করিলেন না। ভবেশের ব্যবহারে তাহার একটু বিরক্তি হইল। ক্রিটির অভূত বেশভূষাও তাঁহার অপছন্দ। সব-ভাঙেই বাড়াবাড়ি করা মেয়েটার স্বভাব দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কি করিবেন তিনি? বদেখিতে দেশজুস্ত লোককে এমন পাইয়া বলিয়াছে যে মেয়েকে শাসন করিতে পারেন না। শাসন করিতে গেলে সে এমন পাকা পাকা কথা বলিতে শুরু করে যে তাঁহাকে চূপ করিয়া ঘাইতে হয়।

সকলে বলিবার ধরে গিয়া আসন গ্রহণ করিল। একটু পরে মিঃ রায় আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

ক্রিটির দিকে চাহিয়া মিঃ রায় বলিলেন—তোমার মা বলছিলেন তুমি একটা নুতন দেশী গান শিখেছ? গাঙ্গুলীর ওখানে একটা গান শুনলাম তার মেয়ের ঘুপে। গানটা নাকি অতুলপ্রসাদ সেনের লেখা। তুমি কি গান শিখেছ শোনাও ত।

মিসেস রায়—তার একটি গানের খুব চল হয়েছে। বোধ হয় একই গান তুমি মিঃ গাঙ্গুলীর ওখানে শুনেছ।

ক্রিটি খালি গলায় গাহিল—

উঠগো তারভলখী উঠ আঁখি জগতজম-পূজা

হুব দৈত নাশি কর দূরিত ভারত-জঙ্গা।

হাও গো হাও শোকশয্যা, কর সজ্জা

পুনঃ কয়ল কয়ল বনবাচে।

কমনী গো, লহ তুলে বকে
সান্ত্বনা-বাস দেহ তুলি বকে
কাঁদিয়ে অব চরণ ভলে
জিৎপতি কোটি নর-নারী গো।

কিটির গলা খুব মিষ্ট, অবশ্য কিটির গলা ও গানের খুব
প্রশংসা করিল। দেবানন্দ কোন কথা বলিল না, সে লাজুক
প্রকৃতির ছেলে। মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার
কোন লাগল গান?

কিটির মুখে এই গান শুনিয়া মনে যে ভাব হইল দেবানন্দ
তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না, লজ্জায় বাধিল। একটু
হাসিয়া সে বলিল, খুব ভাল।

মিস্ত্রী রক্ষা করিয়া অবশ্য ও দেবানন্দ হঠেলে কিরিল।
মিঃ রায় মিটিতে গিয়াছিলেন। তাহার বখন বাহির হইল
তখনও তিনি ফিরেন নাই।

জন্মশ:

দরদী দরিদ্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তুমিই ধন্য, সদয় জন্ম, দরদী দরিদ্র,
দীন বট তুমি, শুচিহৃদয় তোমার চরিত্র।
কাঠুরিয়া তুমি, ডাকি নিজ আঙিনায়,
দিলে আশ্রয় 'শ্রীবৎস চিন্তায়',
কাঠের ভার বহে দিতে তাঁর—দুঃস্থের মিত্র।

২

রাজ্যভট্ট 'নলে' দংশিল যবে কর্কট নাগে,
তাঁহার ডাকেতে ছুটে এলে বুঝি তুমিই সবার আগে?
ভিষক ডাকিলে, ঔষধ দিলে বাঁটি,
কত উদ্বেগ, কতবার হাঁটাইটি,
পরের লাগিয়া যুগে যুগে বাপ বজ্রনী বিনিত্র।

৩

'হরিশ্চন্দ্র' ভিখারী যখন, 'শৈব্যা'ও ভিখারিণী,
রোহিতাশ্বকে ডাকিয়া খাওয়ালে নাহি, জানি, নাহি:চিনি।
পাণ্ডবদের সাথে ছিল সারা রাত্তি,
জতুগৃহের নির্গম পথে সাথী,
দুখ-সাগরের বলিষ্ঠ ভেলা-না হও বহিত্র।

৪

ছুটিত যখন খর-কণ্টক শ্রীরামের পদে বনে,
তুমি বনচর ছুটিয়া আসিয়া তুলে দিতে সযতনে।
কোলে তুলে নিতে তাঁর দুটি রাজা পদ,
কাঁলো জলে বেন প্রফুল্ল কোকনদ,
তুমি কত ভাবে দেশ ও জাতিকে করেছ সযত্ন।

শ্রীহরিরে দিতে তুমিই 'বিধুরে' দিয়াছিলে খুদ আনি,
সেনিন তোমারও ছিল না কিছুই বেদনা কত তা জানি।
ভাঙার ক্ষীণ, সামর্থ্য তব কম,
প্রজ্ঞায় হয় সবই তব মনোরম,
অকুণ্ঠ তব সাত্ত্বিক দান অকপট হৃদয়।

৬

লোমশ মূনির সঙ্গে রচেছ তাঁহার পর্ণবাস,
ইচ্ছের হয়ে তুমি রাবণের কেটেছ ঘোড়ার ঘাস।
যশোদার ঘরে না থাকিলে ক্ষীর ননী,
তুমি এনে দিতে, ভূলাইতে নীলমণি,
কান্থর বাঁশরী নিজে গড়ে দিতে, করে দিতে ছিত্র।

৭

নিভানো প্রদীপ জালিয়া নিত্য উল্লাসে তুমি নাচো,
বেদনা-বিধুরে সান্ত্বনা দিতে অমর হইয়া আছ।
দেবতা-ধর্মী তুমি নর ধরণীর,
কাঁদিয়া মুছাও পরের নেত্রনীর,
পতিত তাপিত পাপীর সঙ্গী হে অপাপবিদ্ধ।

৮

তুমি দুর্জল বিপন্নদের ঘাচি হও রক্ষী,
পরের লাগিয়া প্রাণ দাও তুমি হে জটায়ু পক্ষী।
হে মরুজ্ঞান, সহনীয় কর মরু,
পাশুপাদপ, সমাজের ক্ষীর তরু,
মাটির মাহুয—গন্ধামাটির মাহুয পবিত্র।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার নূতন ভবন

ত্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

স্বনামধন্য বর্গত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডি, ডি-এল, সি-আই-ই প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা' (Indian Association for the Cultivation of Science) কলিকাতার মধ্যস্থলে স্থিত ২১০ নং বহুবাজার স্ট্রিটের পুরাতন ভবন হইতে দক্ষিণ শহরতলী যাদবপুরে, নূতন বিরাট ভবনে

বিজ্ঞান-সভাকে ভারতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের অত্যন্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিতে সক্ষম হন।

ডাঃ সরকারের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পরলোক-গত ডাঃ অমৃতলাল সরকার, এল-এম-এস, এক-সি-এস বিজ্ঞান-



ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার



ডাঃ চন্দ্রশেখর বেকট রামম

স্থানান্তরিত হইরাছে। কলিকাতার বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় গত ২রা জাহ্নুয়ারী তারিখে ভারতের প্রথমমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু উক্ত ভবন পরিদর্শন করেন। পৃথিবীর মানা দেশ হইতে আগত এবং ভারতীয় ব্যাভিনামা বৈজ্ঞানিক-গণও এক দিন নূতন ভবনে প্রীতি-সন্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতের গৌরববাহিনী এই প্রথম জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটির অপরূপ আয়ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

প্রথম পরিদর্শনার সময় হইতে সাত বৎসর কাল ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কয়েক জম বহাতি স্বদেশবাসী ও জম-সাহায্যের সহায়তার ডাঃ সরকার ১৮৭৬ সালে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা' স্থাপনে সফলকাম হন। ১৯০৪ সালে স্বত্বাকাল পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণধারণ ছিলেন। তিনি

সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইহারই সময়ে ১৯০৭ সালের মধ্যভাগে মাস্তাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র, কলিকাতার সরকারী হিসাব বিভাগের কর্মে উচ্চপদে নিযুক্ত, ভরুণ বিজ্ঞানবিৎ শ্রীচন্দ্রশেখর বেকট রামম প্রথম বিজ্ঞান-সভার সংগ্রহে আসেন এবং অবসর-সময়ে, প্রাতে ও অপরাহ্নে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কিছুকাল পরে কিন্তু তাঁহাকে কর্মহ্রাসে প্রথমে রেফ্রু ও তৎপরে নাগপুরে বাইতে হয় এবং গবেষণাও বন্ধ থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রশেখর ১৯১১ সালের শেষভাগে আবার কলিকাতার বদলী হইয়া আসেন এবং গুরুতর মত বিজ্ঞান-সভার গবেষণা-কার্যে রত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার গবেষণার ফলাফল 'বুলেটিন' আকারে সভা-

কর্তৃক প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এই তরুণ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রতি বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

কয়েক বৎসর পরে ১৯১৭ সালের মহাভাগে তার আন্তাত্য যুগোপাধ্যায়ের পরামর্শে চন্দ্রশেখর সরকারী কর্তৃক পরি-ভ্যাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বিজ্ঞান-সভায়ও তাঁহার গবেষণা-কার্য নিয়মিত ভাবে চলিতে থাকে।

ডাঃ অমৃতলাল সরকারের মৃত্যুর পর, ১৯১৯ সালে অধ্যাপক রামন্ 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'র সম্পাদক নির্বাচিত হন। ভারতের নামা হান হইতে গবেষক ছাত্রদল আসিয়া বিজ্ঞান-সভায় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

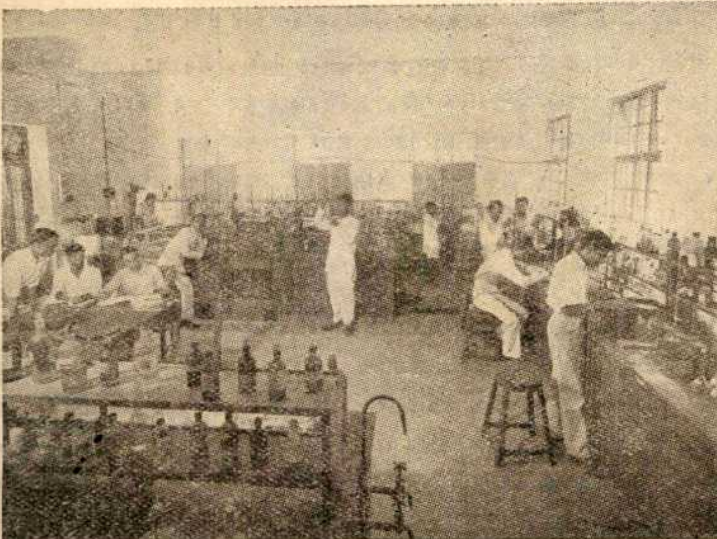
অধ্যাপক রামন্ শব্দ-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান, রঞ্জক-রঞ্জি ও চুম্বক-বিজ্ঞানের গবেষণায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া ১৯২৪ সালে বিলাতের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। আলোক-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণায় এক সম্পূর্ণ নূতন তথ্য (Raman Effect) আবিষ্কার করিয়া অধ্যাপক রামন্ ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন। সমগ্র বিশ্বে তাঁহার খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়। এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম বিজ্ঞান-বিদ রামন্ এই অতুল সম্মানের অধিকারী হন। ইতিপূর্বে মাত্র একজন এশিয়াবাসী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে



ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা, যাদবপুর

'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হইয়া ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়া ছিলেন।

বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের এই প্রতিষ্ঠানকে শুধু শিক্ষাদান-ক্ষেত্রে নহে, অজ্ঞাতম গবেষণা-ক্ষেত্রে পরিণত করার যে একান্ত বাসনা ছিল, তাহা এত দিনে সফলতা লাভ করে। ১৯৩০ সালে অধ্যাপক রামন্ (তখন সভাপতি) বিজ্ঞান-সভা ভ্যাগ করিয়া বাকালোরে চলিয়া যান এবং তাঁহার প্রিয় ছাত্র ডক্টর কে. এস. কৃষ্ণান সভার গবেষণা বিভাগের তার প্রাপ্ত হন। গবেষণা-কার্যে কৃতিত্বের জন্য ডক্টর কৃষ্ণানও বিলাতের রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করিয়াছেন। বর্ধমানের তিনি 'ভাষ্যমাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী'র ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।



ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরী

বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'র নাম আজ সুপরিজাত। যুদ্ধোত্তর কালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে উন্নতি পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার সহিত সমতালে আগের হইতে হইলে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণকেও উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিছুকাল পূর্বে হইতেই এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, বিজ্ঞান-সভার সভাপতি বৈজ্ঞানিক-প্রবর অধ্যাপক ত্রীমেষনাদ সাহা, ডি-এস-সি, এফ-আর-এস এবং অজানা পরিচালকগণ প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণে চেষ্টিত হন।

স্বাধীনতা-লাভের পর ১৯৪৭ সালে

ভারত গবর্ণমেন্ট 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'র নুতন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্য, বার্ষিক বরাদ্দ হিসাবে দুই লক্ষ ছেষটি হাজার সাত শত টাকা দান মঞ্জুর করেন। বিগত চার বৎসরের মধ্যে সভা ক্রমে ক্রমে ছয়টি গবেষণা বিভাগ (X-Rays and Magnetism, Optics, Physical Chemistry, Organic Chemistry, Theoretical Physics and Inorganic Chemistry) স্থাপিত করিয়াছেন। বিভিন্ন অধ্যাপকের উপর এক একটি বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। সভার গ্রন্থাগার বিশেষ ভাবে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। বর্তমানে ইহাকে পদার্থবিদ্যা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক মাসিক ও সাময়িক পত্রাদি পূর্ণ ভারতের একটি অভ্যন্তর গ্রন্থাগার বলা যাইতে পারে।



এক্স-রে ল্যাবরেটরী

ভারত গবর্ণমেন্টের ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণ-
মেন্টের ৭ লক্ষ টাকা দানে এবং তদ্ব্যতীত ভারত গবর্ণমেন্ট
বিনা সুদে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়ার বিজ্ঞান-সভার
এই নুতন ভবন নির্মাণ সম্ভবপর হইয়াছে। ভবনের জন্য এ
যাবৎ মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় দোহা পনের লক্ষ টাকা।
ঘানবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ এবং গেন্ট্রাল গ্রাস এণ্ড সিরামিক
রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নিকট প্রায় ২৯ বিঘা জমির মধ্যে ইহা
অবস্থিত। ১৯৪৯ সালের প্রারম্ভে শুরু করিয়া, ১৯৫০ সাল
সমাপ্তির মধ্যেই ভবনের একতলা, সভাকক্ষ, গ্রন্থাগার, কার-
খানা ও ক্রাইওজেনিক ল্যাবরেটরী ইত্যাদির নির্মাণকার্য
শেষ হয়। সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসর কাল ধরিয়া 'ভারতবর্ষীয়
বিজ্ঞান-সভা'র কার্য যে স্থানে পরিচালিত হইয়াছে, ১৯৫১
সালের প্রথম দিকেই বহুবাক্যের সেই পুরাতন ভবন হইতে
তাহার বিভিন্ন গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, কারখানা ও কার্যালয়
নুতন ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজ্ঞান-সভার উন্নয়নের
এই পরিকল্পনা যে প্রাথমিক সভার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীমোহ-

নাদ সাহার অপরিণীত উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই রূপ-
পরিগ্রহ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক সাহা
১৯৪৬ হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত
ছিলেন।



অধ্যাপক ডক্টর মোহনাদ সাহা

(ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার সভাপতি, ১৯৪৬-৫১)

এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-বিভাগের বর্তমান
কর্তৃপতিব ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি
মহাশয়ের চেষ্টা ও উত্তম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডক্টর সেন
পূর্বে ভারত গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-বিভাগের পরামর্শদাতা ও
পরে সেক্রেটারী ছিলেন এবং সে সময়ে তিনিই দিল্লী হইতে
দানপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। কলিকাতায় বদলী হইয়া
আসিলে, তাহারই সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের নিকট
হইতে দানপ্রাপ্তির সুবিধা হয়।

ভারতের নামা প্রদেশ হইতে আগত বহু কৃতি ছাত্র
বিজ্ঞান-সভার বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা-কার্যে রত আছেন।
বর্তমানে ডক্টর ত্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি-এসসি, এক-
এন-আই 'এক্স-রে ও ম্যাগনেটিজম' বিভাগের, ডক্টর শ্রীমুকুন্দ
সরকার ডি-এস-সি, এক-এন-আই অপটিকস বিভাগের, ডক্টর
শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত 'কিউজিক্যাল কেমিস্ট্রি' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত
অধ্যাপক এবং ডক্টর ত্রীদেবীদাস বসু, পি-এচ-ডি, 'বিওরিটিক্যাল

ফিজিয়' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রীডার। ইহার সফলেই বৈজ্ঞানিক মহলে সুপরিচিত।

বিজ্ঞান-সভা হইতে 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স' নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। সভার বিত্তীয় কার্য-বিবরণী ব্যতীত, এখানকার কোচবিহার ও হিগন অধ্যাপকদ্বয় এবং 'জয়কিষণ মুখার্জি মেডালিস্ট'রা যে সকল বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার সারাংশও ইহাতে প্রকাশ করা হয়।

পৃথিবীর যে সকল বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক মূল্যবান আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, এরূপ গুণীদেরই 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'র 'ডঃ বিমলাচরণ লাহা সুবর্ণপদক' ও 'জয়কিষণ মুখার্জী সুবর্ণপদক' প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। অধ্যাপক এ. আইনষ্টাইন, ডার হেনরি ডেল, ডার রবার্ট রবিনসন, ডার আলেকজান্ডার ফ্রেমিং, অধ্যাপক রবার্ট মিলিকান, ডার ই. জে. রাসেল, ডার জেমস কিন্স, ম্যাডাম আইরিশ কুরী, ডক্টর এস. এস. ভাটনগর প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ উক্ত পদক লাভ করিয়াছেন।

'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা'র সকল কার্য ২৪ জন সদস্যের একটি কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহার মধ্যে ভারত-গণ-মণ্ডলের, পশ্চিমবঙ্গ গণ-মণ্ডলের, 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অফ ইন্ডিয়া'র ট্রাষ্টীদের, ষ্টাক কমিটির এবং সভার

আজীবন ও সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধিরা রহিয়াছেন। বিজ্ঞান-সভার আজীবন ও সাধারণ সদস্যদের সংখ্যা প্রায় আড়াই শত। বর্তমানে ডার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডি-এসসি, এফ-এন্-আই ইহার সভাপতি, অধ্যাপক ত্রিপুরদারজুন রায়, এম-এ, এফ-এন্-আই ডিরেক্টর এবং ত্রীসমরেজনাথ সেন, এম-এসসি রেজিষ্টার।

বর্তমান লেখক দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার আজীবন সদস্যরূপে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার ইহার ক্রমোন্নতির সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত আছেন। তবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটি যে বাংলাদেশের গৌরববহু ভাষাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ভারতও যে নিজেস্ব অম্যান্য পাশ্চাত্য জাতির সমকক্ষ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, ইহা আনন্দের বিষয়। ভারতরাষ্ট্র সরকার আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ এই বিশাল দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকারের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করিতেছেন। 'দার্শনিক' ভারত যে অদূর ভবিষ্যতে 'বৈজ্ঞানিক' ভারত রূপেও জগদ্বাসীর নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকা : প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ

অধ্যাপক ত্রীশুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

চির-চকল ঘটনাপ্রবাহই ইতিহাসের প্রাণ। তাই যুগে যুগে ইতিহাসের পট-পরিবর্তন হয়। ইহাই সনাতন নিয়ম। কালচক্রের আবর্তনে জাতি এবং রাজ্য ও সাম্রাজ্যের পত্তন-অভ্যুদয় ঘটয়া থাকে।

বিশ্বযুগ্মের অতীতে একদা ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি বঙ্গদেশের কূল ছাপাইয়া, দূরদূরান্তে প্রসারিত হইয়াছিল। ইহারই বারক এবং বাহক রূপে ভারতীয়গণ সে যুগে সর্বত্র সমাদৃত ও সম্মানিত হইতেন। কিন্তু আজ এই অবস্থা আবুল পরিবর্তিত হইয়াছে।

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের তীর হইতে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার এখনও প্রায় ৪৫,০০,০০০ প্রবাসী ভারতীয় বসবাস করিয়া থাকে। সুতরাং প্রতি শত্বে এক জন ভারতীয় এখনও প্রবাসী। ভারতীয়গণ যে বহুস্থানে নহে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১ বর্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় বলিতে ভারতীয় এবং পাকিস্তানী এই উভয়কেই বুঝাইবে।—লেখক

ন্যূনাধিক ৪৫,০০,০০০ জন প্রবাসী ভারতীয়ের মধ্যে প্রায় ২৫,০০,০০০ জনই 'কমনওয়েলথ অব নেশন্স' এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীই 'কমনওয়েলথ'-এর কর্তার। ভারতবর্ষ এই 'কমনওয়েলথ'-এর অন্ততম সদস্য। অর্থাৎ এই 'কমনওয়েলথ' ও সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে প্রবাসী ভারতীয়দিগের উপর নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিবিধিষের আরোপ করিয়া তাহাদিগকে পছু করিয়া রাখিবার চেষ্টার আর বিরাম নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ন্যূনাধিক ৩,০০,০০০ ভারতীয়ের মুখ-দর্দশার কথা সর্বজনবিদিত। ঘরের কোণে সিংহলও—ইহাকে ভারতবর্ষেরই অংশরূপে গণ্য করা যাইতে পারে—প্রায় ৭,৫০,০০০ প্রবাসী ভারতীয় সম্বন্ধে উদারতার পরিচয় দিতে পারে নাই। মালয়-প্রবাসী ছয়-সাত লক্ষ ভারতীয়ও মুখে নাই। ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণ সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

টানানিকা, উগাণ্ডা এবং কেনিয়া এই তিনটি প্রদেশ লইয়া

ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকা গঠিত। ১৯৪৬ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকার ভারত হইতে আগত অধিবাসীর সংখ্যা ১,৬৯,০০০। দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী স্ব-জাতীয়-গণের তুলনায় ইহারা অনেক বেশী অযোগ্য-অবিদ্যা ভোগ করিলেও জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ইহাদিগকে খেতাদ উপ-নিবেশিকদিগের সমকক্ষ-জ্ঞান করা হয় না। ইহাদের সম্বন্ধে অনুভূত সরকারী নীতি পক্ষপাতব্ধ। জাতি-বিষেয়ের ক্ষুধার্তা ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকার দিনের পর দিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিতেছে। আশঙ্কা হয় যে, এক দিন হস্ত এখানেও দক্ষিণ-আফ্রিকার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। বিবিধ কারণে খেতাদ উপ-নিবেশিক সম্প্রদায় প্রবাসী ভারতীয়গণের উপর ঝড়োহস্ত। প্রথমতঃ বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য খেতাদ-গণের চক্ষুশূল। দ্বিতীয়তঃ, ইহারা মনে করে যে, ভারতীয়দের দেখাদেখি স্থানীয় অধিবাসিগণও এক দিন-না-এক দিন খেতাদ সম্প্রদায়ের সহিত সমকক্ষতা দাবি করিয়া বসিবে।

স্বদীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর বা তাহারও অধিককাল পূর্বে পূর্ব-আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের শেষ দশকে, মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে ১৮৯৫ সালের পর হইতে ভারতীয়গণ অনভ্যাজিত অধ্যুষিত, স্থাপনসমূহ ক্ষুধার্তদেশের পূর্বাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ১৮৯৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্রিটিশ ইষ্ট আফ্রিকা কোম্পানী কেনিয়া উগাণ্ডা রেলপথ নির্মাণের ক্ষমতা তদানীন্তন ভারত-সরকারের নিকট শ্রমিক আমদানি করিবার অহুমতি প্রার্থনা করে। ভারত-সরকার কোম্পানীকে প্রার্থিত অহুমতি প্রদান করিলে। প্রধানতঃ পঞ্জাববাসী শ্রমিকগণের প্রাণপাত পরিশ্রমেই কেনিয়া উগাণ্ডা রেলপথ নির্মিত হইয়াছিল। পূর্ব-আফ্রিকার সমৃদ্ধির মূলে ভারতীয়গণের দানের পরিমাণ যে উপেক্ষণীয় নহে মিঃ চার্লিস পর্যন্ত তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় টাঙ্গানিকা কার্খানীর শাসনাধীন ছিল। যুদ্ধান্তে ভাসাই সন্ধির সর্তাহুযায়ী কার্খানীর সমস্ত উপনিবেশ কাড়িয়া লওয়া হয়। এই সময় টাঙ্গানিকার শাসন-ভার ইংলণ্ডের উপর অর্পিত হইল।

১৯৪৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট ৪৪,২০০ ভারতীয় টাঙ্গানিকাতে বাস করিত। কার্খান-শাসনে

ইহারা বেশ অধেই ছিল। ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও ভালই চলিতেছিল। কিন্তু ইংরেজ-শাসনে ইহাদের অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটিয়াছে। ১৯৩২ সাল হইতে আইনের পর আইন প্রণয়ন করিয়া ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অধিকার বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। দেশের এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে তাহাদের অবাধে যাতা-য়াতের অধিকার হরণ করা হইয়াছে। ইংরেজ-পূর্ব যুগে এই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের মনঃমশমাংশই ভারতীয় ব্যবসায়ী-দিগের হাতে ছিল। ইহার বহু একটা অংশই আজ ইহাদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে।

টাঙ্গানিকার মোট আয়তন ৩,৪০,০০০ বর্গ মাইল। অথচ ইহার রেলপথের আয়তন ২,০০০ মাইলও মনে। বলাই বাহুল্য যে, প্রয়োজনের তুলনায় ইহা একান্তই অপ্রচুর। যে সমস্ত অঞ্চলে রেলপথ নাই, পূর্বে সে সমস্ত অঞ্চলে ভারতীয় মালিকের মোটর বাস এবং মোটর লরীই ঘাটী ও মাল বহনের প্রধান উপায় ছিল। সুতরাং সমগ্র দেশের অর্থ-নৈতিক সংগঠনে ভারতীয় মোটর-ব্যবসায়ীরা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহাদের হুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলেই টাঙ্গানিকার অনঙ্গর দুর্গম এবং বৃষ্টিগম্য অঞ্চলসমূহে যান-বাহন-ব্যবহার উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং ইহারা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অঞ্চলসমূহের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছে। এই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের চেষ্টাতেই যে টাঙ্গানিকার সর্বত্র বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সহজসাধ্য হইয়াছে তাহা স্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৯৩১ সালে সরকার সর্বপ্রথম মোটর বাস এবং লরীর চালকদিগের উপর উচ্চহারে লাইসেন্স ফি বাধ্য করেন। দুই বৎসর পর ১৯৩৩ সালে আইন করা হইল যে, রেলপথের সমান্তরাল কোন রাস্তায় ভারতীয়দিগকে মোটরের ব্যবসায় চালাইতে দেওয়া হইবে না। তবে যে সমস্ত শাখা-পথ এই সকল রাস্তা হইতে বাহির হইয়াছে সেই সমস্ত রাস্তায় ভারতীয়গণের অধিকার অল্প রহিল। ১৯৩৭ সালে টাঙ্গানিকার ভারতীয় ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের অধিকার আরও সঙ্কুচিত করা হইল। কিন্তু এই-বান্ধে শেষ নহে। ১৯৪০ সালে সরকার আইন করিলেন যে, টাঙ্গানিকা মালভূমির দক্ষিণাঞ্চলে কোন ভারতীয় মোটর-ব্যবসায়ী মোটর চালাইতে পারিবে না। কৃষি-সম্পদে সমৃদ্ধ টাঙ্গানিকার এই অঞ্চলে চা, ককি, গম এবং ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

উল্লিখিত বিধি-নিষেধগুলি সুপরিকল্পিত নীতির একটি দিক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন ব্যবসায় হইতে ভারতীয়দিগের উৎসাদনই এই নীতির লক্ষ্য।

সরকারের অহুমোদিত একচেটিয়া অধিকারসম্পন্ন ব্যবসায়ী ব্যতীত আর কেহই টাঙ্গানিকার কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলের

(2) "It was the Sikh soldier who bore an honourable part in the conquest and pacification of their East Africa territories. It is the Indian trader, who penetrating and maintaining him in all sorts of places to which no white man would go or in which no white man could earn a living, has more than any one else developed the early beginnings of trade and opened up the first slender means of communication. It was by Indian labour that one vital railway on which everything else depends, was constructed."—*African Journey* by Winston Churchill.

উপনয়ন পর্যায়ের করিবার অধিকারী নহে। এই ব্যবসায়িকগণ সকলেই প্রায় ইউরোপীয়। অধিকাংশক্ষেত্রেই ইহারাই ইংরেজ-কাতীয়। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে নিযুক্ত ভারতীয় কর্মচারীগণের বেতনের হার যেতাদ কর্মচারীদের তুলনায় অনেক কম। প্রযোজ্যদের পদোন্নতির সম্ভাবনাও একান্তই সীমাবদ্ধ।

টাদানিকার আইন-পরিষদ এবং বিভিন্ন 'পরামর্শদাতা কমিটি'তে ভারতীয় সদস্য থাকিলেও ইহাদিগের সংখ্যা প্রবাসী ভারতীয়গণের সংখ্যাহুয়ারী নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আইন-পরিষদের ১০ জন সরকারী এবং ১০ জন বে-সরকারী, মনোনীত সদস্যের মধ্যে ৩ জন মাত্র ভারতীয়। ভারতীয়গণের তুলনায় ইউরোপীয় সদস্য-সংখ্যা অত্যধিক।

সরকারী শিক্ষাপাতিত্ব এবং বৈষম্যমূলক নীতি সত্ত্বেও টাদানিকার অর্থনৈতিক জীবনে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের গুরুত্ব উপেক্ষা করিবার মত নহে। ৩

ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকার অন্ততম প্রদেশ উগাণ্ডা একটি আশ্রিত রাষ্ট্র (Protectorate)। উগাণ্ডা-প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা ৩০,৯০০। ইহাদের আত্মপাতিক সংখ্যা সমগ্র উগাণ্ডার জনসংখ্যার শতকরা একতরফেরও কম। অত্যন্ত বহু দেশের প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের তুলনায় উগাণ্ডার ভারতীয়গণ হুবে আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া এদেশে ভারতীয়গণের উন্নতির পথ বিঘ্নস্থল করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

তারপর কেনিয়া। কেনিয়া একটি উপনিবেশ (Crown Colony)। ইহার আয়তন ২,২০,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৪০,৫০,২৮৫। কেনিয়া-প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা ৯০,৯০০—আইনতঃ ইহাদের প্রতি বিশেষ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা না হইলেও সামাজিক ক্ষেত্রে যেতাদ ঔপনিবেশিকগণ অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। এই যেতাদ ঔপনিবেশিক-সম্প্রদায়ই প্রকৃতপক্ষে কেনিয়ার ভাগ্যবিধাতা। ইহারাই এতই ক্ষমতাশালী যে, বিলাতের উপনিবেশ দপ্তর (Colonial office) অতীতে একাধিকবার ইহাদের নিকট মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইহারাই বোলাবুলি ভাবে বিদ্রোহের হুমকি দিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। এই সময় কেনিয়ার মালভূমিতে যেতাদ ব্যতীত অপর সকল জাতির সম্পত্তি অর্জনের অধিকার লোপ করিবার কথা চলিতেছিল। ভারতীয়গণ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলে উপনিবেশ দপ্তর তাহাদের প্রতি

সহায়ত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাই যেতাদ-সমাজের উদ্বার কারণ। কেনিয়ার যেতাদ অধিবাসিগণ স্থির করিয়াছিল যে, উপনিবেশ দপ্তর তাহাদের দাবি অগ্রাহ্য করিলে তাহারা স্থানীয় গবর্ণরকে অপহরণ করিবে। এই সময় ইহারাই ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে জোর প্রচার আরম্ভ করিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণকে সাহায্যে তত্ত্ব দেশের যেতাদ-সম্প্রদায়ের সমান মর্যাদা এবং অধিকার প্রদান করা না হয় ভরদেখেই দুই দেশে কেনিয়া হইতে প্রতিনিষিদ্ধ প্রেরণ করা হইয়াছিল।

কেনিয়ার স্বেচ্ছাগত প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্যবসায়ী এবং নিপুণ শ্রমিক (Skilled workers)। কেনিয়ার পৌর-প্রতিষ্ঠান, আইন-পরিষদ এবং গবর্ণরের শাসন-পরিষদে ভারতীয়গণের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার আছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ইউরোপীয় সদস্য অপেক্ষা ভারতীয় সদস্যগণের আত্মপাতিক হার অনেক কম, ভারতীয়গণের সরকারী চাকুরিলাভের পথে আইনতঃ কোন বাধা নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়-সম্প্রদায়ের তুলনায় ইহাদের সাংস্কৃতিক এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত। কেনিয়ার দুইখানি দ্বিভাষিক দৈনিক সংবাদপত্র প্রবাসী ভারতীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের পরিচালিত কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকাও আছে।

আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত না হইলেও জাতি-বিষেয় এবং জাতি-বৈষম্যের বিষয় বহুদিন হইতেই কেনিয়ার সমাজ-ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এই বিষেয় এবং বৈষম্যের স্রোত দিনের পর দিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে।

১৯০৯ সালের কেনিয়ার গবর্ণর প্রবাসী ভারতীয়গণের একটি প্রতিনিধি-দলকে পরিষ্কার জানাইয়া দেন যে, কেনিয়া উপনিবেশে ভারতীয়-সম্প্রদায়ের স্বার্থ উপেক্ষিত না হইলেও যেতাদ ঔপনিবেশিকগণের স্বার্থ রক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইবে। ৫

উক্তর কেনিয়ার ভূমি বন্ধ্যা। রাজধানী নাইরোবি হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পূর্বোক্তল সুরঙ্গা, সুরঙ্গা, শক্ত-ভাঙ্গা। সমগ্র কেনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ ফুটের কম। এই অপেক্ষাকৃত অল্প অঞ্চল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ কর্তৃক বাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত। প্রাকৃতিক স্রম-সমৃদ্ধ অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ অতিশয় উর্বর। কেনিয়া মালভূমি নামে পরিচিত এই

(3) "... the Indians control more than 25 per cent of the country's production of 'Sisal.' Most of coconut plantations and the majority of cotton-ginning factories belong to them. They own a number of rice and flour mills and several reefs are owned and operated by them."—Indians Outside India by Dr. N. V. Rajkumar, p. 19.

৪ The Daily Mail এবং The Colonial times.

(5) "The principle has been accepted that this country is primarily for European development and that whereas the interests of Indians will not be lost sight of, in all respects the interests of Europeans must predominate."

অঞ্চলে প্রচুর কফি, চা, গম এবং ভুট্টা উৎপন্ন হয়। যুগ্মরাজ্যের ক্ষেপণও কেনিয়া মালভূমির আকর্ষণ উপেক্ষণীয় মহে। ১৯০৮ সালে সর্বপ্রথম এই মালভূমি কেবলমাত্র খেতকার ঔপনিবেশিকদিগের বসবাসের জন্য সংরক্ষিত করিবার প্রস্তাব করা হয়। কেনিয়া-প্রবাসী ভারতীয়গণ এককাল অধঃশান্তিতেই বসবাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছিল। ১৯০৪ সালে উপনিবেশ-সরকার তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে, তাহাদের বৈধ এবং ভায়সরয়ত অধিকার লোপ করা হইবে না। কিন্তু ইহার পর চার বৎসরের মধ্যেই ১৯০৮ সালে বিলাতের তদানীন্তন উপনিবেশ-সচিব লর্ড এলগিন কেনিয়া মালভূমি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদিগের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার নীতি ঘোষণা করেন। কেনিয়া এবং ভারতবর্ষে এই নীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের স্বত্ব উঠিল। ফলে উপনিবেশ-দপ্তর কিছুদিনের জন্য এই বৈষম্যমূলক নীতির প্রয়োগ স্থগিত রাখিল। খ্রিষ্ট বৎসরেরও অধিককাল বহু বাধ-বিত্তার পর অবশেষে ১৯৩৯ সালে রাজকীয় আদেশের বলে কেনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট অঞ্চল কেনিয়া মালভূমি খেতকার ঔপনিবেশিকগণের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইল।

বেশী দিনের কথা নহে, মহামাঝ আগা বা এই খেতকার-বর্গে জমি ক্রয়ের অসুবিধা প্রার্থনা করিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। পরে তাহারা খেতাদিনী বেগমের বেনামীতে তাহাকে প্রাপ্ত অসুবিধা প্রদান করা হইয়াছিল। ইংরেজের একান্ত অসুগত মুসলমান-সম্প্রদায়ের এই বর্ণগতর মনে উক্ত অভিজ্ঞতা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল জানি না।

১৯২০ সালে কেনিয়া সরকার প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়কে আশ্বাস দেন যে, ভারতীয়গণ যেন ভুলিয়া না যান—ভূ-সম্পত্তি অর্জন এবং খনিজ-সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সরকার ইউরোপীয় এবং ভারতীয় উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি একই নীতি অনুসরণ করিবেন। উল্লিখিত ১৯৩৯ সালের রাজকীয় আদেশ এই ঘোষণার সম্পূর্ণ বিরোধী।

কেনিয়ার সৈন্তদলে (কেনিয়া ডিফেন্স ফোর্স) ভারতীয়-গণকে গ্রহণ করা হয় না। বিত্তীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় বাত এবং বাস-গৃহের অভাবের অজুহাতে কেনিয়ার ভারতীয়-গণের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুজ্জবসানে বিবিধ “ইমিগ্রেশন রেজিস্ট্রেশন এক্ট” দ্বারা কেনিয়ার ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত হইয়াছে। এই আইনে বলা হইয়াছে যে, কেনিয়ার অধিবাসী-দিগের মধ্যে যাহারা বেকার তাহারা যে সমস্ত কার্যের

উপযুক্ত সে সমস্ত কার্যের জন্য বাহির হইতে কাহাকেও দেশে যাইতে দেওয়া হইবে না। আইন-পরিষদে এই আইনের প্রস্তাবের আলোচনা-প্রসঙ্গে নির্ধারিত ইউরোপীয় সদস্যবৃন্দের নেতা স্তর এলফ্রেড তিনসেট মন্তব্য করেন—ভারতীয়গণের সহিত তাহাদের দুঃখ, দারিদ্র্য এবং জাতিগত ভিত্তি আন-দানীর ফলে কেনিয়ার সমস্ত জটিলতর হইবে এবং ইহারই ফলে আফ্রিকাবাসী প্রাচ্য-সত্যতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। ভারত-সরকার এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলে বিলাতের উপনিবেশ-দপ্তর আশ্বাস দেন যে, এই আইন ভারতীয়দিগের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না। বিভিন্ন খেতকার জাতির অ-খেতকার জাতিসমূহকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের যে সমস্ত নজির রহিয়াছে তাহা হইতে উপনিবেশ-দপ্তরের আশ্বাসে বিশেষ আশ্বস্ত হওয়ার কারণ বুঝিয়া পাওয়া না।

এদিকে খেতাদপণ প্রবাসী ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসী দিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে উদ্ভিষ্ট-পড়িয়া লাগিয়াছে। এই উদ্বেষ্ট সাধনের জন্য বিধেয়মূলক অপপ্রচারের ক্রটি হইতেছে না। এই কার্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারই যেন সর্বাধিক আগ্রহী। পূর্ব আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদিগের জন্য চিন্তায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভবরমন্ত প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ডি. এক. মালানের চোখে আর ঘুম নাই। পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার কান্দনিক আশঙ্কায় মালান বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের প্রচার বিভাগ দিনের পর দিন রটনা করিয়া চলিয়াছে যে, ভারতীয়-গণ পূর্ব আফ্রিকায় একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করিতে বহুপরি-কর এবং আজ হটক, কাল হটক, ভারতবর্ষ পূর্ব আফ্রিকা গ্রাস করিবে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের লঙমহু হাই-কমিশনার ডাঃ এ. এল. গেমার বলেন যে, বৎসরের পর বৎসর দলে দলে জনবহুল এশিয়া মহাদেশ হইতে আগন্তকের দল পূর্ব আফ্রিকায় ভিড় ক্রমাইতেছে এবং ইহারই ফলে স্থানীয় অধিবাসীদিগের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কোহামেন-বার্গের (ট্রান্সভাল, দক্ষিণ আফ্রিকা) ‘ষ্টার’ পত্রিকার নাইরো-বিহ সংবাদদাতা ১৪।৫।৪৭ তারিখে প্রেরিত সংবাদে মন্তব্য করেন যে, প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আফ্রিকাবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষমক। বহু খেতকার ঔপনিবেশিকের

(6) “They, i.e., the Indians were in error in supposing that the Government had any intention of drawing any distinction between Europeans and Indians so far as rights of mining, settling and acquiring of lands are concerned.”

(7) “The problems (of Kenya) will be aggravated by the importation of poverty, distress and racial bitterness that characterises the lives of so many of the peoples of India, which ultimately means the superimposition of Eastern civilization on the indigenous peoples of the country.”

বিখ্যাস যে, প্রবাসী ভারতীয়গণ কেনিয়াকে ভারতবর্ষের অধীন করিতে চাহে।

এদিকে কেনিয়া-প্রবাসী ইউরোপীয়গণও নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। ইহারা ভারতীয় এবং আফ্রিকাবাসীর মধ্যে সন্দেহ এবং অবিখ্যাস সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াই কাণ্ড হইয়া নাই, ইহারা প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে কেনিয়ার আইন-পরিষদ কর্তৃক উক্ত পরিষদে ভারতীয় মুসলমানদিগের ক্ষত পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে দুইটি আসন সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিষদের হিন্দু সদস্যগণ আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদিগকে হিন্দু সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিবার এই ব্যবস্থা প্রবাসী ভারতীয়-সম্প্রদায় তথা সমগ্র কেনিয়ার স্বার্থের পরিপন্থী। পরিষদের হিন্দুদের নেতা ত্রিপটেলের বক্তৃতায় প্রকাশ যে, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত নির্বাচিত ইউরোপীয় সদস্যগণ মুসলমানদিগের ক্ষত পৃথক নির্বাচন এবং আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু সদস্যগণ তাহাদিগের রাজনৈতিক দাবি সমর্থন করিতে অসম্মত হওয়ার তাহারা মুসলমানদিগের সহিত একজোট হইয়া পৃথক নির্বাচন এবং আসন-সংরক্ষণের দাবি সমর্থন করিয়াছেন। পরিষদের মুসলমান সদস্যগণ বলেন যে, আত্মপাতিক হারে সদস্য-নির্বাচন সম্ভব নহে এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার দিক হইতে হিন্দু এবং মুসলমানগণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহারা আরও বলেন যে, তাহারা হিন্দুগণের প্রমত্ত প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে পারেন না। এই ধরনের মুক্তি আমাদের নিকট নূতন মছে। পরিষ্কার বুঝা যায়, খেতাক প্রভুরা নিজেদের তাঁবেদার মুসলমানদিগের জবানিতে কথা বলিতেছেন। দেশ বিভাগের পূর্বে ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় ভারতবর্ষেও একই খেলা খেলিয়াছেন। পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার ফলে কেনিয়া-প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় বিধাবিস্তৃত এবং পঙ্ক হইয়া পড়িবে। পরিষদের হিন্দু, আরবদেশীয় এবং

আফ্রিকাবাসী প্রতিনিধিবৃন্দ স্বতন্ত্র নির্বাচন-প্রথা এবং আসন-সংরক্ষণের বিরোধিতা করিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয় এবং মুসলমান সদস্যদিগের নিকট তাহারা পরাস্ত হন।

১৯০৯ সালে মলি-মিটো শাসন-সংস্কার ভারতবর্ষে স্বতন্ত্র প্রধারূপ যে বিষয়কের বীজ বপন করিয়াছিল, অনধিক অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে তাহাই মহামহীকূহে পরিণত হইয়া ভারতবর্ষের অঞ্চতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহার মুক্তিসাধনার আদর্শকে শঙ্কিত করিয়াছে। আশার কথা এই যে, মুসলমানদিগের ক্ষত স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রণালীর অন্তর্নিহিত অন্তত সম্ভাবনা সম্বন্ধে কেনিয়াবাসী অনবহিত নহে। তাহাদের আশঙ্কা, ইহারই ফলে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের মাতৃভূমিকে বিধা বা বহুধা বিভক্ত করিবার কথা উঠিতে পারে। এইজন্যই ‘কেনিয়া আফ্রিকান পলিটিক্যাল বডি’ এবং ‘ফ্রিট আফ্রিকান ইন্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেস’ মুসলমানদিগের দাবির বিরোধিতা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছে যে, ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদিগকে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইলে কালে আফ্রিকাবাসীদিগকেও ধর্ম এবং জাতির ভিত্তিতে পরস্পর হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা হইবে। এই উভয় প্রতিষ্ঠানই উপরোক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সচিবের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। উপনিবেশ-সচিব এই প্রতিবাদের কি জবাব দিয়াছেন অথবা আদৌ কোন জবাব দিয়াছেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই। ভারত-সরকারও প্রবাসী ভারতীয়দিগের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শতকরা প্রায় ৯৫ জন কেনিয়াবাসী এবং ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী বহু দল ও ব্যক্তি এই ব্যবস্থার প্রতিফল সমালোচনা করিয়াছেন। কেনিয়া সরকারের বক্তব্য এই যে, ভেদনীতির সাহায্যে কেনিয়া শাসনের অভিপ্রায় তাহাদের নাই। সরকার বাস্তব অবস্থার সহিত সজতি রাখিয়া কেনিয়ার সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ যে, এই তথাকথিত বাস্তব অবস্থা মুখ্যতঃ স্বার্থায়েষীদের স্বষ্ট।

(8) “They (i.e., Indians) hope to turn African eyes towards Indian universities and Indian leadership. Many Europeans believe that the final political aim of the Indian community is to turn Kenya into an appendage of the Dominion of India or an Indian Empire.”

(9) “. . . if the Muslims succeed in obtaining separate representation on religious grounds, the government and others will seek also to divide African representation on a religious and tribal basis.”



প্রাকৃত না জানিলে সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা হয় না

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইলে প্রাকৃত জ্ঞানের আবশ্যকতা কিছুতেই অপলাপ করিতে পারা যায় না। স্থানান্তরে আমি বলিয়াছি যে, কিকিয়াত্রও প্রাকৃত না জানিলে কেহ পরম বৈদাস্তিক বা মীমাংসক, বা এইরূপ অগ্রা কিছু হইতে পারেন, কিন্তু কেহ কেহ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, প্রাকৃত না জানিলে কোন সংস্কৃতবিদ বস্তুত সংস্কৃতবিদ নহেন। কেন না এইরূপ ব্যক্তি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রযুক্ত ভূরি-ভূরি শব্দের সম্পূর্ণ বা যথার্থ অর্থ ব্যাখ্যা তো করিতে পারেনই না, বরং ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

বিধানেরা জানেন যে, বেদ-ব্রাহ্মণেরও ভাষায় বহু-বহু প্রাকৃততাব ও বৈভাষিক^১ মিশ্রণ আছে, পুরাণ,^২ তন্ত্র প্রভৃতির ভাষায় তো কথাই নাই। ইহারই সমর্থনে নিম্নলিখিত কয় পঙক্তি লিখিতে পারা যায়। ইহাতে বুঝা যাইবে সংস্কৃতির উপর প্রাকৃতের কি গুরুতর প্রভাব আছে।

প্রথমত শত শত শব্দের মধ্যে উদাহরণ রূপে আমরা ‘গৃহ’ অর্থে গে হ শব্দটিকে গ্রহণ করি। ইহা খুবই সোজা সকলেরই জ্ঞান, বিদ্যাপতিও লিখিয়াছেন “আজু মরু গে হ গে হ করি মানহু।” এই গে হ শব্দটিকে প্রথমে বোধ হয় আমরা বাজসনেয়ি-সংহিতায় (৩০-২) দেখিতে পাই, তাহার পর পাণিনিতে (৩.১.১৪৪, ইত্যাদি)। কিন্তু বস্তুত ইহা সংস্কৃত নহে, প্রাকৃত। ইহা গৃ হ হইতে প্রাকৃত-প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে।

‘ক্ষুদ্র’ অর্থে সংস্কৃতে এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ আছে, এবং উপনিষদের সাধারণ পাঠকেরাও ইহা জানেন। যথা

১ প্রাকৃত ব্যাকরণে বিভা যা বলিতে কোন ভাষার অবাস্তব-ভেদ (dialect) বুঝায়। যাহা ভৎসন্য ভাষা বৈভাষিক।

২ সত্য কথা বলিতে গেলে পুরাণ শব্দটিও খাঁটি সংস্কৃত নহে, বস্তুত ইহা মূল পুরা ত ন (> পুরা অ ন < পুরা ণ) হইতে প্রাকৃতপ্রভাবে হইয়াছে। এইরূপেই নৃত ন হইয়াছে ন ব ত ন হইতে। দ্রষ্টব্য “নবস্ত নু” অর্থাৎ নব স্থানে নু আদেশ হয় (পাণিনিয়, ব্যাক্তিক, ৫-৪-২৫)। আবার এই নৃত ন হইতে পরে অধ্য বর্ণের লোপে নৃত। এই প্রকারেই প্র ত ন হইতে প্র ত্ত ‘প্রাচীন’। এইরূপ অনেক।

দ ভ (ঋগ্বেদ, ১.১১৩.৫; কেনোপনিষদ্ ২), দ হ্র (তৈত্তিরীয়-সংহিতা ইত্যাদি, মহানারায়ণোপনিষদ্, ১০) এবং দ হ র (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮.১.১)। এখানে প্রথম শব্দটি, দ ভ, প্রথমে ভকার স্থানে হকার হওয়ায় দ হ্র হয়, তাহার পর বিপ্রকর্ষ-বশত দ হ র হইয়াছে। সংস্কৃতে ‘ভালুক’ অর্থে ঋক্ষ শব্দ প্রসিদ্ধ। ইহার প্রাকৃত রূপ অচ্চ। কিন্তু কখন-কখন প্রাকৃতে তাহার দুইটি আকার হইয়া থাকে যথা রিক্ থ ও অচ্চ। তথাপি অচ্চ পদটি সংস্কৃতে সাধারণত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপেই নদী প্রভৃতির ‘তট’ অর্থে সংস্কৃতে কচ্চ শব্দ প্রযুক্ত হয়, যেমন “বমুনাকচ্চমবতীর্ণঃ”, পঞ্চ-তন্ত্র। কিন্তু বস্তুত এই শব্দটি সংস্কৃত নহে, কিন্তু প্রাকৃত, এবং কচ্চ হইতে প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন। প্রাকৃত ধর্মেই বিকৃত হইয়াছে বিক ট, আর বৃষ ভ হইয়াছে ঋষ ভ; এবং এই কারণেই একই √বৃ ধ্ খাতু অপর আর দুইটি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, √ঋ ধ্ ও √এ ধ্, যদিও ইহাদের অর্থে একটুমাত্র ভেদ আছে। এই প্রকারেই ‘আচ্ছাদন করিতেছে’ অর্থে সংস্কৃতে বৃণো তি (√বৃ ‘আবরণ’ অর্থে) ও উর্ণো তি (√উর্ণ ‘আচ্ছাদন’) একই।

সংস্কৃতে প্রিয়শাল নামে এক রকম গাছ আছে। প্রাকৃত প্রভাবে ইহা হইতে হয় প্রিয়াল, আবার ঐ কারণেই এই প্রিয়াল হইতে হয় পিয়াল। কালিদাস কুমারসম্ভবে (৩.৩১) এই পিয়াল শব্দটিকে প্রয়োগ করিয়াছেন—“মৃগাঃ পিয়াল ক্রম মঞ্জরীণাম্।” ইহা ভাগবতেও (৮-৩-১১) আছে।

‘গাল’ অর্থে প্রাকৃতে গল্প শব্দ আছে। ইহা গ ও হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ভবভূতিও ইহা সংস্কৃত রচনায় প্রয়োগ করিয়াছেন (মালতী মাধব, ৫-২২)—“পাতাল-প্রতিমল্লগল্পবিবরপ্রক্ষিপ্তসপ্তার্ণবম্।” এখানে মন্মথের কাব্য-প্রকাশ (৮ম পরিচ্ছেদে) ও বামনের কাব্যসুত্রালঙ্কার (২-১-৭) দ্রষ্টব্য।

‘চন্দ্ৰ’ অর্থে মৃগলাঞ্জন শব্দ সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ। এখানে লঞ্জন ‘চিহ্ন, দাগ’ স্পষ্টতই একটি প্রাকৃত শব্দ, ইহা লক্ষণ হইতে উৎপন্ন। তথাপি আমাদের সংস্কৃত মহা-কাব্যে প্রযুক্ত হয়। দ্রষ্টব্য শিশুপালবধ (১, ৫৩)। এইরূপ

‘লেজ’ অর্থে মূল সংস্কৃত প.শ্চ’ ‘পেছনে স্থিত’ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত পুচ্ছ শব্দ বৈদিক ভাষাতেও (অথর্ববেদ ২.৪.১৩, ইত্যাদি) প্রচুর দেখা যায়। পরে ইহা ভবভূতিও উত্তরয়ামচরিতে (৪-২৭) প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য পাণিনি, ৪-১ ৫৫ বার্তিক। ‘ময়ূরাদির পাখন’ অর্থে পিচ্ছ শব্দ সংস্কৃত প.শ্চ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত। মহাভারতে ইহা আছে, এবং মাঘ (শিশুপালবধ, ৪-৫০) প্রভৃতিও ইহা লিখিয়া গিয়াছেন। বাণের গোড়ার দিকে যে পাখীর পালক থাকে তাহা বুঝাইবার জন্য পুচ্ছ শব্দ সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ আছে (যেমন রঘু, ২,৩১), কিন্তু বস্তুত ইহা সংস্কৃত প.শ্চ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত, সংস্কৃত নহে। আমাদের সুপরিচিত পুচ্ছা হু পুচ্ছ শব্দ ভাগবতেও (৬.১০.২৪) আছে।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ প্রাকৃত শব্দ ভূরি-ভুরি রহিয়াছে, তাই বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত না করিয়া অন্য কিছু একটু আলোচনা করা যাউক যাহাতে সংস্কৃতির উপর প্রাকৃতির কিরূপ গুরুতর প্রভাব তাহা জানা যাইবে।

প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রযুক্ত হয় না। তদনুসারে সংস্কৃত মনস্ হইবে প্রাকৃতে মন অথবা মণ। কিন্তু সংস্কৃতেও এইরূপ প্রচুর দেখা যায়। যেমন অধাসন-স্থায়িন্ অর্থাৎ ‘যে নিম্ন আসনে থাকে (আপসম্বল ধর্মসূত্র, ১-১-২-২১)।’ এখানে অধস্ আসন স্থানে সকারের লোপে অধাসন করিয়া পরে সন্ধি করা হইয়াছে। টীকাকার হরদত্ত এখানে বলিতেছেন আলোচ্য পাঠটি বৈদিক অথবা ভুল পাঠ (“ছান্দসঃ অপপাঠো বা”)। ঐ গ্রন্থেরই অন্যত্র (১-৬-১২-৮) আছে সর্বতো পেত ‘সবদিকে যুক্ত’; এখানে সর্বতস্ স্থানে সর্বত করিয়া উপেত শব্দের সহিত সন্ধি করা হইয়াছে। টীকাকার এখানেও পূর্বোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। মহাভারতে (১,২১,৫) আছে অনোকশায়িন্ ‘যে গৃহে শয়ন করে না।’ বস্তুত ক্রমে-ক্রমে আমাদের নিকটে ‘গৃহ’ অর্থে দুইটি শব্দ হইয়াছে, ওকস্ এবং ওক। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি

১। সাধারণত প.শ্চাৎ শব্দকে আমরা অব্যয় বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। ইহা প.শ্চ শব্দের পঞ্চমীর এক বৃটনের রূপ। প.শ্চাৎ (প.শ্চ-অধ) শব্দে ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু জাতি বারণায়, এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি দেবাইতে গিয়া বলা হয় যে, অর্দ্ধ শব্দ পরে থাকিলে প.শ্চাৎ স্থানে প.শ্চ আদেশ হইয়া থাকে। প.শ্চাৎ হু তা প প্রভৃতি শব্দেও প.শ্চ শব্দকে প্রয়োগ দেখা যাইবে। আবার বলা হয়, অপর শব্দ স্থানে প.শ্চ হয়, ইহা নিপাতনে হয় পাণিনি ৫-৩. ৩২-৩৩)।

দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রাচীন, কারণ তাহা বৈদিক ভাষাতেও (ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদেও) পাওয়া যায়। আচার্য বচস্ ‘আচার্যের কথা’ স্থানে শতপথব্রাহ্মণে (১১.২.৬.৬) পাঠ করা হইয়াছে আচার্য বচস- তুলনীয় ব্রহ্ম বচস্ ‘ব্রহ্মতেজ’ আর ব্রহ্ম বচস্। এইরূপেই বিন্দু স-র-স্ স্থানে ভাগবতে (৩,২৫.৫) বিন্দু স-র-স্ লিখিত হইয়াছে। আবার জটা যু-স্ আর জটা যু উভয়ই রামায়ণে (৩,৪২ ৩৮; ৫০, ১) পাওয়া যায়। এই রূপ বহু-বহু-পদ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়, কিন্তু আর আবশ্যক নহে। ইহাই দেখিয়া পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, যে সকল শব্দের শেষে অ-স্ থাকে বিকল্পে তাহাদিগকে অকারান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়।

এখানে আমরা কয়েকটি সন্ধির কথা আলোচনা করিয়া দেখি। যেমন, মে+আস্য হইতে মেস্য (মহাভারত শান্তি, ৩১৮-৭); কা+ইতি হইতে কাতি (শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১১-৪-৪-৩); মে+আ যুঃ হইতে মে যুঃ (শ্রৌত-পাথ-ব্রাহ্মণ, পূর্ব, ২-৬); পা দ+উন হইতে পাদোন না হইয়া পাদুন (আপসম্বল ধর্মসূত্র, ১.১.২-১৩); ততঃ+উবাচ হইতে ততোবাচ (রামায়ণ, ৩,১৩,১২; ৬,২৫, ২); তুণা+অস্য হইতে তুণাস্য (রামায়ণ, ৬.৫১.২০) ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক।

আবার নিম্নলিখিত কয় পঙক্তি দ্রষ্টব্য—বিদ্যা জিহ্বা ‘বাহার জিহ্বা বিদ্যাতের ন্যায়। তড়িৎ স্থানে ভাগবতে (২.৬.১৫) আছে তড়িত। রামায়ণে (১০.৪.৬৩) দেখা যায় উৎসেক ‘উৎসেচন’ (উৎ+সিচ্) স্থানে আছে উচ্ছেক, যেমন প্রাকৃতে বৎস হয় বচ্ছ। এইরূপই গুগ্-গু লু ‘একরূপ ধূপজাতীয় প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য’ হইয়াছে গুলুগু (ক্যাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র, ৫.৪.১৭) হইতে, যেমন প্রাকৃতে কগ্-গু হয় ফল্ল ‘নিঃসার’ হইতে।

মাতা হইতে প্রাকৃতে হয় মা আ, এবং ইহাই আবার সংশ্লিষ্ট হইয়া হয় মা। তথাপি ইহা সংস্কৃতে ‘লক্ষ্মী’ বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়, কেননা ইনি সমস্ত লোককে মাতার আয় লালন করেন, এই জন্ত লক্ষ্মীর অন্য একটি নাম লো-মাতা সুপ্রসিদ্ধ।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতেও জানা যাইবে যে, প্রাকৃত সংস্কৃতির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যথা, হাশ্রু সি (১/হা ‘ভাগ করা’) স্থানে জহিষ্য সি (রামায়ণ ৬.১০.৬.২৭); তর্জাপয়তি ও তৎসাপয়তি হইয়াছে (যথাক্রমে ১/তর্জ ‘ভয় দেখান’ ও ১/ভৎস্ ‘ভৎসনা

করা' (রামায়ণ, ৬.৩৪.২)। এইরূপ শব্দ আমাদের বিভিন্ন কালের সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যাইবে।

কালিদাস (মেঘদূত, ১.৫০), মাঘ (শিশুপালবধ, ১০.২২) প্রভৃতির ন্যায়-মহাকবিও সংস্কৃতে হা লা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ একপ্রকার মৃত। কিন্তু এই শব্দটি সংস্কৃত নহে; প্রাকৃত, অর্থাৎ দেশী বা দেশ্য। এ বিষয়ে বামনের মন্তব্য দ্রষ্টব্য (কাব্যালঙ্কারসূত্রে, ৫.১.১৩)। ইনি বলেন যে, অতিপ্রচলিত দেশী পদও সংস্কৃতে চলিতে পারে। এইরূপে পরবর্তী সাহিত্যে নিম্নলিখিত ও তৎসদৃশ শব্দসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়—

হে বা ক 'আগ্রহ' (স্বাধাদমঞ্জরী ৬; বিক্রমাক্ষদেবচরিত ৮.৬); ল ট ভ 'হ্রদর' (বিক্রমাক্ষদেবচরিত, ৮.৬; ভর্তৃ-হরির বৈরাগ্যশতক, ৩২)। প্রাকৃতে ইহার রূপ ল ড ভ, ইত্যাদি।^{১০} 'খিড়কী দরজা' অর্থে খ ড কি কা।^{১১} ইহা কখনই সংস্কৃত নহে, কিন্তু দেশী। ইহা হইতে আমাদের খি ড কী। সংস্কৃত দং ষ্ট্রা 'বড় দাঁত', পালিতে দা ঠা আর প্রাকৃতে দা চা; তথাপি হেমচন্দ্র নিজের সংস্কৃত কোশ অভিধান চিন্তামণিতে লিখিতেছেন "দা টি কা দংষ্ট্রিকা দা চা।" হেমচন্দ্র নিজের যোগশাস্ত্রে (১, পৃ. ১৫১) 'খাটাইবে' এই অর্থে খ ট্র য়েৎ লিখিয়াছেন। এই ক্রিয়াপদটি হইয়াছে √খ ট্র হইতে। ইহা নিশ্চয়ই সংস্কৃত নহে, কিন্তু দেশী। এইরূপ অনেক।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্রষ্টব্য। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইহাদের এক অংশে প্রাকৃতে প্রভাব থাকিলেও অন্য অংশে তাহা নাই। যথা, ক্ষু ল্ল ক (নিঘণ্টু, ৩.২১)। ইহা হইয়াছে মূল ক্ষু ল্ল ক হইতে। বৈদিক ভাষায় ইহার প্রচুর প্রয়োগ আছে। ভ ল্লা ক্ষ 'মাহার চোখ ভাল' (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৪.১.২)। ইহার প্রথম শব্দ ভ ল্ল প্রাকৃত, সংস্কৃত ভ ল্ল হইতে হইয়াছে।

১। তথাপি শব্দকল্পদ্রুমে ইহার এইরূপ অঙ্কিত ব্যুৎপত্তি লেখা হইয়াছে—“হল্যাতে কৃত্যত ইব চিত্তমনেনেতি হল্ যঞ্ টাপ্।

২। যেমন হেমচন্দ্র প্রভৃতির রচিত স্বাধাদমঞ্জরী প্রভৃতি। পরে দ্রষ্টব্য।

৩। আপটে স্বকীয় সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে হেবাক শব্দে লিখিতেছেন—

“Such words as *lalabha* is used only by later writers like Kalhana and Bilhana, and is probably derived from Persian and Arabic.”

৪। অভিধান চিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে “পক্ষধারে বঙ্-স্নিকা।”

৫। “পাদমারাদিবিং সূর্য্যাং পাদং বিভাষ্য ষট্টয়েৎ।”

√জ্যাৎ (প্রকাশ পাওয়া) হইতে প্রাকৃত-প্রভাবে হইয়াছে √জ্যাৎ এবং নিঘণ্টুতে (১. ১৬) ইহার উভয়েই একত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে √জ্যাৎ হইতে উৎপন্ন বহু পদের প্রয়োগ দেখা যায়। আমাদের সকলের সুপরিচিত জ্যোতি শব্দটি মূলত জ্যোতি (স্)-হইতে হইয়াছে।

যেমন নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে সেইরূপ বহু-বহু ধাতু-যুগ্মক সুস্পষ্টভাবে দেখাইবে যে, প্রাকৃত-প্রভাব কীরূপে একটি ধাতুকে বিভিন্ন আকারে পরিবর্তন করিয়াছে; যেমন, 'গতি' অর্থে √অৎ ও √অ ট্র, (ঋগ্বেদ প্রভৃতির বহু বহু স্থানে)। বলাই বাহুল্য, প্রাকৃতেই প্রভাবে এই সকল স্থলে তকার টকার হইয়াছে। এই প্রকার 'গতি' বা 'খেলা' অর্থে √ক্রীড় (ঋগ্বেদ), √কেল্ ও √খে ল্; 'গতি' অর্থে √পে ল্ (নিঘণ্টু, ২.১৪) ও √পে ল্ (ধাতুপাঠ, ১৫.৩৫); 'সেচন' অর্থে √ষ ঋগ্বেদ) ও √গৃ (ধাতুপাঠ, ২২.৩৯); ইত্যাদি অনেক।

এইরূপ দেখিয়াই বামন নিজের কাব্যালঙ্কারসূত্রে (৫.২.২) বলিয়াছেন যে, ধাতুগণ বাড়িয়াই চলিয়াছে—“বধত এব ধাতুগণঃ।”

আবার প্রাকৃতে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নিয়ম যে মাহারাদ্বী ও শৌরসেনী প্রাকৃতে সাধারণত সর্বত্র দন্ত্য ন মূর্দন্য হয় (প্রাকৃতপ্রকাশ, ২.৪২; হেমচন্দ্র, ৮.১.২২৮), কিন্তু পৈশাচী প্রাকৃতে সর্বত্র দন্ত্য ন হইয়া থাকে (হেমচন্দ্র, ৮. ৪. ৩০৬)। অপরপক্ষে সংস্কৃতে দন্ত্য ন স্থানে মূর্দন্য হইবার বিশেষ নিয়ম আছে; যেমন, আন্তীর্ণ শব্দে মূল দন্ত্য ন রকারের পরে থাকায় মূর্দন্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ বহু-বহু শব্দ আছে যাহাতে কোন নিয়মের মধ্যে না পড়িলেও মূর্দন্য গকারের প্রয়োগ দেখা যায়। এই সমস্ত স্থলে গকারকে স্বাভাবিক বলা হয়; যেমন, বেণু, বীণা ইত্যাদি শব্দে। কিন্তু সংস্কৃতে মধ্য কোন-কোন স্থানে মনে হয় যে, প্রাকৃতপ্রভাবেই দন্ত্য ন মূর্দন্য হইয়াছে। যেমন, না ম স্থানে ণা ম (আপস্তম্ব জ্যোতিষসূত্র, ১০-১৪.১) এন ম স্থানে এণ ম্ (ঐ, ১৫.২৭.৭) স্থানে; 'বেদির পশ্চাত্তাগ অর্থে' অ নু ক শব্দ স্থানে অণু ক (ঐ ১৬. ১৩. ৬) এইরূপ অ হু লে প ন. স্থানে অ হু লে প ণ (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ১. ৩. ১১. ১৩; ১৩. ৩২, ৫)।

শকার ও সকার সম্বন্ধে প্রথম এই প্রকার। সাধারণত প্রাকৃতে কেবল স আছে, কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে সাধারণত কেবল শ। আমরা বৈদিক সাহিত্যে জ্ঞীয় ভাইকে বুঝাইতে

১। ইহা প্র-√ঈষ্ ধাতুর সহিত সম্বন্ধ।

২। “ভাল আসন্নঃ সংযোগেনেতি মৈদানাঃ; ভালাভানা-বপতীভে”—নিরুক্ত, ৬.২.৬।

দেখিতে পাই শ্রাল (ঋগ্বেদ ১. ১০২. ২)^১। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে সাধারণত ইহা হইয়াছে শ্রাল। প্রাচীন সাহিত্যে 'কুলা' অর্থে শূর্ণ শব্দ দেখা যায়, কিন্তু পরে তাহার স্থানে শূর্ণ হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃতে বসিষ্ঠ ছিল, পরে প্রধানত বশিষ্ঠ দেখা যায়। বৈদিক সংস্কৃতে শূকর দেখা যাইত, পরবর্তী সাহিত্যে শূকর হইয়াছে। অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দ্বিরূপ ও ত্রিরূপ কোশসমূহ (অর্থাৎ যে সমস্ত কোশে এক-একটি শব্দের দুইটি বা তিনটি করিয়া রূপ দেখান হইয়াছে) উল্লেখ করিতে পারা যায়, ইহাতে সংগৃহীত শব্দসমূহের অধিকাংশই প্রাকৃত প্রভাবে

উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। ইহার কোন কোন শব্দে কেবল মাত্র বা বর্ণের ভেদ দেখা যায়।^২ যথা: 'গৃহ' অর্থে অগার ও আগার; আপগা ও অপগা 'নদী'; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে এমন কি নিম্নলিখিত ও তৎসদৃশ বহু শব্দও সংস্কৃতে চলিয়া গিয়াছে; যেমন হুহিতু স্থানে হুহিতা^৩ মাতৃ স্থানে মাতা^৪।

মূল আলোচ্য বিষয়ে আরো বহু বক্তব্য থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে আজ এইখানেই শেষ করা যাউক।

২। "কচিমাভ্রা কৃতো ভেদঃ কচিধ্বজকৃতোহজ চ" ঋঋ।

৩। A Manuscript in the Catalogue of Mss. of the Madras University (pp. 1112, 1204)

৪। "বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাম্", শব্দকল্পদ্রুমে দ্রুত শিবরহস্য।

১। অথর্ববেদ, ৯.৬.১৬; শতপথ ব্রাহ্মণ, ১.১.১.১২।

রবীন্দ্র সংলাপ কণিকা

শ্রী বিশ্বশেখর ভট্টাচার্য

৬ই পৌষ, ১৩৪৪। ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষ্যে কয়েক দিন শান্তিনিকেতনে থাকিব বলিয়া চলিয়াছি। হাওড়া ষ্টেশনেই এগুজ সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি অন্য কামড়ায় ছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি আমারই কাছে আসিলেন। আমরা একত্র আসিলাম। সঙ্গে অনেক ভূতপূর্য ছাত্র।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গুরুদেবের কাছে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি তখন অন্য দুইটি ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া আনন্দের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি ঘরের ভিতরে ছিলেন, আমার প্রস্তাবে বারাণ্ডায় আসিলেন। ওখানেই কয়েকখানি আসনের ব্যবস্থা হইল।

নূতন ঘর

গুরুদেব এক স্থানে এক ঘরে অনেক দিন থাকিতে ভালবাসিতেন না। তাঁহার ঘর কত বদলাইয়াছে। একবার বলিতেছিলেন 'দেখুন, পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া আমি পশ্চিমে আসিয়া পড়িয়াছি।' ইহার তাৎপৰ্য এই যে, তিনি যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম আসিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বাসা ছিল পূর্বদিকে দেহলীর কাছে। তারপর নূতন ঘর করিতে করিতে এখন পশ্চিম দিকে আর এক ঘরে বাস করিতেছেন। গুরুদেবের ঘরের পরিকল্পনার শেষ নাই। কোন একটা ঘরের

ভিতের জন্য মাটি কাটা আরম্ভ হইলে তখনই আবার তাহা অন্য রকম করা হয়, ইহাও দেখা গিয়াছে। কোন ঘর কেমন হইবে স্থির করিয়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা হইল, কিন্তু যখন তাহা সম্পূর্ণ হইল তখন দেখা গেল উহা একটা সম্পূর্ণ নূতন হইয়া গিয়াছে। তাহার পরেও এত যোগ-বিশোগ হয় যে বলিবার নহে। একবার এই পরিবর্তন সম্বন্ধে গুরুদেব বৌমাকে (অর্থাৎ রথীন্দ্রনাথের ধর্মপত্নী শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে) বলিতেছিলেন, "বৌমা, এখনি কি হয়েছে? অনেক বাকি।"

গুরুদেব বড় ঘরে থাকিতে ভালবাসিতেন না। খুব ছোট ছোট ঘরই তাঁহাকে ভাল লাগিত। উত্তরা যুগের কোণার্ক প্রথমে একখানি ছোট মেটে ঘর ছিল। তারপর একটি পাকা স্নানাগার হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবর্তনে-পরিবর্তনে তাহার বর্তমান আকার হইয়াছে। পরে তিনি ইহাতে নিজের জন্য এমন একটি ছোট কুঠরী করাইয়া ছিলেন যে, তিনি নিজেই সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না, মাথা ছাদে লাগিত। ইহাতে বলিতেন, 'মাথাটা উঁচু হইয়া থাকে, ইহাকে নীচু করিয়া রাখাই ভাল।' তা ছাড়া এই কুঠরীটির সম্বন্ধে বলিতেছিলেন, 'আমি এমন জায়গায় থাকিব যে, আপনারা আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইবেন না।' আমি বলিয়াছিলাম, 'রবির প্রকাশ ঢাকিয়া রাখিবে কে?'

গুরুদেব এবার উদয়নের দক্ষিণে যে মনোরম উত্থান তাহারই পশ্চিমে ছোট্ট একখানি দোতলার উপরে ছিলেন। ইহার আগাগোড়া সবই শিল্পকলার কল্পনার প্রকাশে পরিপূর্ণ। ইহা বোমার (শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর) সৃষ্টি। অতি চমৎকার ও কবিজনোচিত।

একদিকে স্বয়ং কবি গুরুদেব, অন্যদিকে নন্দলাল ও স্বরেন্দ্রনাথ, অপরদিকে রথীন্দ্রনাথ ও বোমা। ইহাদের সমবায়ে শান্তিনিকেতনের এই সব বৈচিত্র্য বিশেষভাবে রূপ পরিগ্রহ করিবার সুবিধা পাইয়াছে। অনেকের মনে কল্পনা জাগে, কিন্তু তাহা প্রকাশ পায় না, কিন্তু এখানে সে অসুবিধা নাই। কল্পনার উন্মেষে, তা তাহা গুরুদেবের মধ্যে বা নন্দলাল বা স্বরেন্দ্রনাথের মধ্যে হউক, তাহাকে রূপ দিবার জন্য যে অর্থব্যয়, রথীন্দ্র তাহা করিতে কাতর নহেন।

দণ্ডকারণ্য

গুরুদেব পূর্বোল্লিখিত বাড়ীখানি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘এ আমার দণ্ডকারণ্য!’ ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, তাঁহার বয়স বেশী হইয়াছে, শরীর দুর্বল, বেশী ওঠা-নামা করিতে বা বেড়াইতে পারেন না। একবার দোতলায় উঠিলে নীচে নামা শক্ত। এই হিসাবে বাড়ীখানি দণ্ড বা দণ্ডক। অপরদিকে বৃদ্ধ বয়সে অরণ্যে যাইতে হয়, ইহা তাহারই মত। তাই উহা হইল দণ্ডকারণ্য।

জাপানের ঘৃণদান

জাপান হইতে সম্ভ্রতি তাঁহাকে ফুলদানীর মত একটা সুন্দর জিনিস উপহার দেওয়া হইয়াছে। ঘরের এক পাশে উহা ছিল। গুরুদেব বলিলেন, ‘এটি জাপান হইতে আসিয়াছে। তাহার ঘৃণ দিয়াছে। তাহার ভাবিতেছে, এই সব দিয়া এই যুদ্ধের সময়ে আমাকে তাহাদের অন্তরুল করিয়া রাখিবে। আরো কত কাগজপত্র পাঠাইতেছে। ইহাদের মধ্যে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূলে চীনেরই যে দোষ তাহাই বর্ণনা করা হইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, আমি ইহাতেই ভুলিব।’

নূতন ফ্লীট

দেখিলাম মশার উপজন্মের জন্য একটি চাকর (নীল-মনি)^১ পিচকারী দিয়া চারিদিকে মশারি প্রভৃতিতে একটা

তরল জিনিস প্রচুরভাবে ছড়াইতেছে। আমি বলিলাম, ‘এ বুঝি ফ্লীট (fleet)’? গুরুদেব বলিলেন, ‘উহা তাঁহার তৈরী ফ্লীট, খুব শস্তা।’ আমি বলিলাম, ‘বলিয়া দিন, আমিও করিব।’ চাকরটি কাছে ছিল। সেই বলিল যে, এক টিন কেরোসিন তেলে ২২। সের নেপথলিন, আর ২। সের পেট্রোল তাহাতে মিশাইলেই হয়। গুরুদেব বলিলেন, ‘পেট্রোল না দিলেও হয়। ইহা ছড়াইলে মশা সঙ্গে-সঙ্গে যায়। কেরোসিনের গন্ধ বেশীক্ষণ থাকে না।’ আমি ভাবিলাম আমার বইগুলি রক্ষার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিব। পোকা ও আরম্মলা ইহাতে যাইবে।

ব্রহ্মবিহার

কথাপ্রসঙ্গে গুরুদেব আমার কলিকাতার বাড়ীর কথা তুলিলেন। বলিলেন, তিনি তাহা দূর হইতে দেখিয়াছেন। বীরেন^২ তাহা তাঁহাকে দেখাইয়াছিল। আমার সঙ্গে প্রমদাবাবু^৩ ছিলেন। ইনি বলিলেন, আমি বাড়ীখানির নাম রাখিয়াছি ‘ব্রহ্মবিহার’। গুরুদেব বলিলেন, ‘আপনার ছেলের নামে?’ আমার ছেলের নাম ‘ব্রহ্মব্রত’। আমি বলিলাম, ‘অনেকেই ইহা মনে করেন, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। ব্রহ্মবিহার বলিতে বৌদ্ধ-শাস্ত্রে মৈত্রী, করুণা, মুদ্রিতা ও উপেক্ষা এই চারিটিকে এক সঙ্গে বুঝায়। এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, আর বিহার বলিতে অবস্থা। ইহাই মনে করিয়া আমি বাড়ীখানির এই নাম দিয়াছি।’

শব্দটা গুরুদেবের মনে পড়িল। আমি বলিলাম, আপনি সাধনায় (ইংরেজী) ইহার যে অর্থ (অর্থাৎ ব্রহ্মে বিহার) দিয়াছেন Mrs. Rhys Davids ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। গুরুদেব বলিলেন, ‘তিনি যাই বলুন, আমি এই অর্থেই উহা লইয়াছি।’ তিনি তখন উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার কথা বলিলেন। ‘সপর্ষগাচ্ছুকম্’ ইত্যাদি ঈশোপনিষদের (৮) বাক্যটির ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিলেন, ‘ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সত্যর বিভিন্ন প্রকাশ আছে, সকলের কাছে সবটা প্রকাশ পায় না।’

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

১ ঠাট্টা করিয়া কখনও কখনও ইহাকে লীলমণি বলিয়া গুরুদেব উল্লেখ করিতেন।

২ শ্রীমান বীরেন্দ্রমোহন সেন।

৩ শ্রীমুক্ত প্রমদারঞ্জন বোষ।

শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ত্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

বিংশ শতকের প্রথম দশকে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে চারি জন তরুণ সৈনিক সর্বপ্রথম বীরের ভাৱ যত্নবরণ করিয়া নিজেরা কুতর্ভাগ হইয়াছেন এবং দেশ ও জাতিকে বহু করিয়াছেন, তাঁহারা যুগান্তর বিপ্লবী-দলের যত্ন-মস্ত্রে দীক্ষিত সন্তান। প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদ্রিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু হইলেন সেই বরণ্য বীর-চতুষ্টয়। ইহাদের বীরোচিত যত্নবরণ যুগান্তর জাতির মধ্যে আনিয়াছে প্রাণ-শক্তি—উত্তর কালের যুক্তি-সাধককে দিয়াছে আত্ম-বলিদানের প্রেরণা। দেশমাতার এই বীর সন্তানদেরাই বাংলার অগ্নিবুরুণের বিপ্লবযজ্ঞে প্রথম আহুতি।

অত্যাচারী ইংরেজ বিচারক, বহু স্বদেশী মামলার দণ্ডনাত্মকিংস্ফোর্ড সাহেবকে প্রফুল্ল-ক্ষুদ্রিরামের হত্যা করিবার ব্যর্থ অভিযান এবং বিধাসভাতক দেশজোহী নরেন্দ্র গোস্বামীকে নিধন করার সত্যেন্দ্র-কানাইয়ের সকল প্রচেষ্টা—এই দুইটি স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্বন্ধ অবিস্ফেদ্য।

মজঃকরপুর শহরে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ) রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় ইউরো-পিয়ান ক্লাবের প্রবেশ-দ্বারে একখানা চলন্ত ফিটন গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপিত হইল। সেই গাড়ীতে কিংস্ফোর্ড ছিলেন না। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে বোমা বিস্ফোরিত হয়। গাড়ীর একাংশ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। আরোহিণী মিসেস্ কেনেডি ও মিস কেনেডি নিহত হইলেন।

এই বোমা নিক্ষেপের ঘটনা হইতেই মানিকতলার বোমার মামলার উৎপত্তি হয়। আলিপুর দায়রা জজের আদালতে বিচার হইয়াছিল বলিয়া ইহা আলিপুর বোমার মামলা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ২রা মে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং কলিকাতার বাহিরে কয়েকটি শহরে ও গ্রামে ব্যাপক খানাতল্লাসী হয়। মানিকতলা অঞ্চলে ৩২নং মুরারিপুত্র রোডে অরবিন্দ-বারীল প্রমুখ ভ্রাতৃগণের বাগানবাড়ীতে বোমা নির্মাণের কারখানা এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়। ত্রীবীরীন্দ্র-কুমার ঘোষ, ত্রীউল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইলেন বাগানবাড়ীতে, হেমচন্দ্র দাস (কাছন-গো) গ্রেপ্তার হইলেন ৩৮.৪নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে, অরবিন্দ ঘোষ (ত্রীঅরবিন্দ), ত্রীঅবিনাশচন্দ্র তট্টাচার্য ও শৈলেন বসু গ্রেপ্তার হইলেন ৪৮নং গ্রে স্ট্রীটে এবং কানাইলাল দত্ত ও নিরাপদকে (ওরকে নির্মল রায়) গ্রেপ্তার করা হইল ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু যত্ন হন তাঁহাদের

মেদিনীপুর শহরের বাড়ীতে। পূর্বোক্ত ধরপাকড়ের কয়েক দিন পরে ত্রীরামপুর (হর্গলী) হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হয় তথাকার জমিদার দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামীর পুত্র নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে।



সত্যেন্দ্রনাথ বসু

নরেন্দ্র কিছুকাল কারাবাসের পর পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করে এবং পুলিশের প্ররোচনায় মিথ্যা উক্তি করিয়াও বিপন্ন সহকর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত যত্নমণ্ডযোগ্য অভিযোগ-প্রমাণে সাহায্য করিতে থাকে। সে রাজসাক্ষী হইয়া নিয় আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রাথমিক তদন্ত-কালে সাক্ষ্য দেয়। সেসন জজের আদালতে বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বেই তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করার কথাবার্তা বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাদের মধ্যে চলিতে থাকে। অরবিন্দকে এই সম্পর্কে কিছুই জানানো হয় নাই। জেলের মধ্যে নরেন্দ্র গোপীসী নিহত হইলে অরবিন্দ

মর-হত্যার মামলায় অভিযুক্ত হইয়া পড়িবেন—প্রধানতঃ এই মুক্তিভে বারীজকুমার মরেশ্বর-নিধন-প্রভাবের বিরোধিতা করেন। তাঁহার বিরোধিতার আর একটি কারণও ছিল। বাহির হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিয়া জেল ভাঙিয়া সদলবলে পলাইবার চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্কে কিছুকাল পূর্ব হইতেই বাসা বাঁধিয়াছিল। তজ্জন্ত একটি পরিকল্পনাও রচিত হয়।

সত্যেন বহু দূত হইবার পর মেদিনীপুরের জেলেট ম্যাজি-স্ট্রেট মিঃ মেলসনের আদালতে অস্ত্র আইনের বিধান ভঙ্গের জন্য অভিযুক্ত হন। ধানাতল্লাসী কালে, তাঁহাদের বাড়ীতে বিনা লাইসেন্সের অস্ত্রশস্ত্র কিংবা বে-আইনী কাগজপত্র কিছুই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানেন্দ্রনাথের একটি লাইসেন্স করা বন্দুক ছিল। সত্যেন সেই বন্দুক ব্যবহার করিতেন বলিয়া অভিযোগ আসা হয়। বিচারে তিনি দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। দণ্ডানন্দের পর তাঁহাকে বোমার মামলায় আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া আলিপুর জেলে পাঠানো হইল।

ইহার পরের কাহিনী বর্ণনা করার পূর্বে সত্যেনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। মনসী রাজনারায়ণ বহুর কনিষ্ঠ সহোদর অন্তরচরণ সত্যেনের পিতা। তিনি মেদিনীপুর কলে-জিয়েট স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই (১২৮৯ বঙ্গাব্দের ১৫ই আষাঢ়) রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিটে রাণী-পূর্ণিমা তিথিতে মেদিনীপুরের বাড়ীতে বাংলার এই বীর শিশু জন্মিষ্ঠ হন। ছয় বৎসর বয়সে তাঁহাকে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। বাল্যকালেই তাঁহার ভীষণ বুদ্ধি ও অরণশক্তির পরিচয় মিলে। লেখাপড়ার তিনি ভালই ছিলেন। প্রতি বৎসর প্রথম কিংবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া তিনি পুরস্কার পাইতেন। তাঁহার পিতামহ, পিতৃব্য ও পিতা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ধার্মিক বলিয়া প্রচার পান ছিলেন। বাংলার প্রগতিশীল বিদগ্ধ-সমাজে বহু-পরিবারের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। সরলতা, চরিত্র-বল, অমায়িক ব্যবহার, সত্যাহরণ ইত্যাদি সদগুণ তিনি যেন উত্তরাধিকারস্বত্বেই পাইয়াছিলেন। ছাত্র-জীবনেই তাঁহার মধ্যে এই সমুদয় গুণ পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। অতি অল্প সময়ের মেলামেলায় পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অতুলনীয়। এই কারণে সত্যেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বহু যুবককে বিপ্লবের অগ্নি-মন্ডলে দীক্ষিত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

১৮৯৭ সালে পনের বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হন। ইহার পরের বৎসর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৯৯ সালে তিনি এক-এ পরীক্ষা পাস করিয়া কলিকাতার আসিয়া গিট কলেজে বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। বি-এ পরীক্ষার পূর্বে তাঁহার স্বাস্থ্য এমন ভাঙিয়া পড়ে যে, তিনি পরীক্ষা দিতে

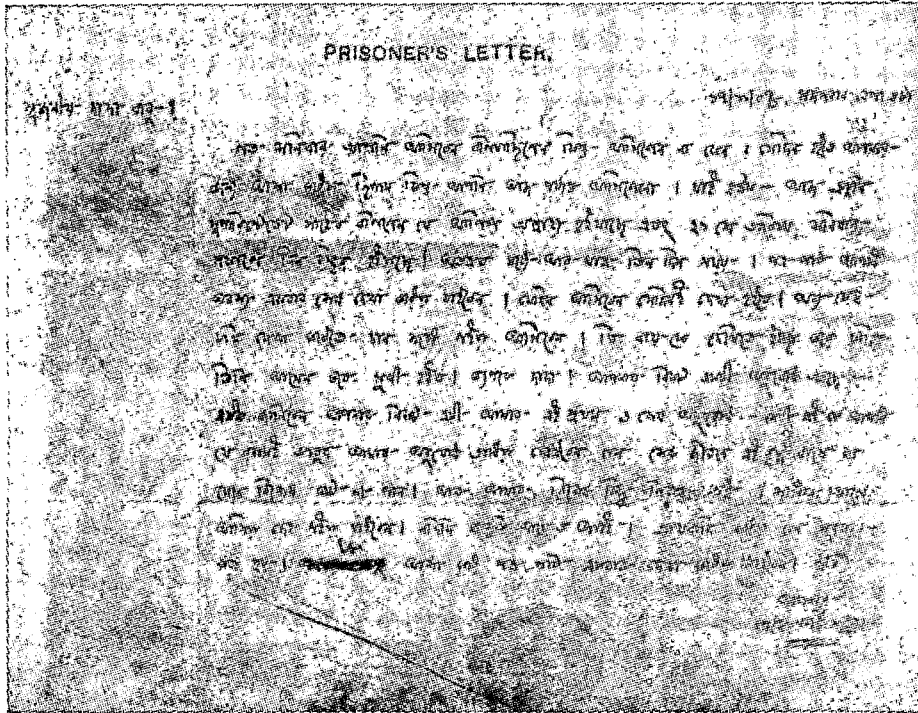
পারিলেন না। প্রথমে চিকিৎসকরা তাঁহার রোগনিবারণ করিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, সত্যেনের রাজস্বজ্ঞা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চিকিৎসকদের উপদেশে তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া ওরাল-টেম্বার ও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করেন। তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি হইল এবং ঐ মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কাও লোপ পাইল, কিন্তু পূর্বস্বাস্থ্য তিনি আর ফিরিয়া পাইলেন না।

সত্যেনের জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার স্বদেশ-সেবার কর্মক্ষেত্রের পথ-প্রদর্শক।

সত্যেনের বৈপ্লবিক জীবন আরম্ভ হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে—স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার তিন বৎসর পূর্বে। বিপ্লবী-মতো অরবিন্দ ঘোষের সহায়তায় বাংলাদেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্বামী নিরালম্ব) গুপ্ত-সমিতির গোড়াপত্তন করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র দাস (কামুনগো) প্রভৃতিও সেই সময় বিপ্লবের অগ্নি-মন্ডলে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই গুপ্ত সমিতির মেদিনীপুর শাখা পরিচালিত হইতে থাকে প্রধানতঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রের নেতৃত্বে। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পরে হেমচন্দ্র যখন বোমা তৈরি শিকার জন্য ফ্রান্সে চলিয়া যান, তখন সত্যেন্দ্রনাথের উপরই মেদিনীপুর শাখা পরিচালনার সমস্ত ভার পড়ে। তাঁহার অক্লান্ত স্বদেশপ্রেম, চরিত্র-বল, কর্ম-শিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব, সাহস, ভেদবিভা ইত্যাদি গুণাবলী তাঁহাকে ছাত্র ও যুব-সমাজের প্রিয়পাত্র এবং প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিল। বয়োজ্যেষ্ঠ দেশ-সেবকেরাও তাঁহাকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বে পর্য্যাপ্ত বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির প্রতি দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও তরুণ-সমাজের ভেদন কিছু আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু বাংলার সেই মনোভাবের যুগে—বিশেষতঃ স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে যখন বৈদেশিক রাজস্বস্তির অন্তঃস্থ চতুর্নীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগ চলিতেছিল—তখন তাঁহাদের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। লোকপ্রিয় তরুণ বিপ্লবী-নায়ক সত্যেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ছাত্র ও যুবকগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার ব্যায়ামশালায় এবং পাঠাগারে যোগদান করিতে লাগিল। যুগান্তর বিপ্লবী দলের হইল। মেদিনীপুর শাখা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। সুদীর্ঘ বহু সত্যেন্দ্রনাথের হাতেগড়া, এই প্রতিষ্ঠানেরই কর্মী। তিনিই সুদীর্ঘকাল বিপ্লবের মঞ্চে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

তরুণ কর্মীদের দৈনন্দিন ব্যায়াম-চর্চা, লাঠি-ছোরা-অসি খেলা, সংবাদপত্রাদি পাঠে জ্ঞানার্জন এবং লম্বছাড়া পাঠে চরিত্রগঠন ইত্যাদি কার্য সত্যেন্দ্রনাথের পরিচালনায় সম্পন্ন হইত। আর্ন্ত-জ্ঞান এবং রূপের সেবাও তাঁহার কার্যক্রমের



আলিপুর জেল হইতে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রের প্রতিলিপি

অভ্যুত্থিত ছিল। “ছাত্রভাণ্ডার” নামে একটি ব্যবসার-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তিনি মেদিনীপুরে স্বদেশীজীব্য প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কর্তব্যবৃত্ত জীবনের দ্বর্গত অবসরটুকু তিনি জ্ঞান-ভারতীর ধ্যানে কাটাইতেন। ষড়ঙ্গপুরে কেল্লার কোম্পানীতে তিনি কিছুকাল কাজ করেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি সেই কাজ ছাড়িয়া দেন এবং মেদিনীপুর কালেক্টরীতে কেরাণীর কাজ যোগাড় করিয়া লন। কিন্তু এই কাজে তিনি বেশীদিন থাকিতে পারেন নাই। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর নগরে একটি কৃষিশিল্প প্রদর্শনী বোলা হইয়াছিল। সেই মেলায় প্রকাশ্য ভাবে তিনি হুদিরাম বসুকে দিয়া “সোনার বাংলা” নামক একখানি রাজকোষোদ্ভূত পুস্তিকা বিতরণের ব্যবস্থা করেন। সেই উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথের চাকরি-জীবনের সমাপ্তি ঘটে। আলিপুর বোমার মামলার অন্ততম প্রধাম আসামী, যাবজ্জীবন বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত ও সত্যেন্দ্রনাথের সতীর্থ হেমচন্দ্র দাস (কাহ্নুদগৈ) এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

“এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে কৃষিশিল্প প্রদর্শনী বোলা হয়েছিল। এই সময় ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ও লালাপালিপুর ‘সোনার বাংলা’ নামক বোমারী বাংলা পাম্পলেট একটা প্রচারিত হয়েছিল। তার ইংরেজী অনুবাদ ‘পাইও-

মিরার’ পক্ষে প্রকাশিত হলে ইংরেজ মহলে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। সত্যেন্দ্র তার আবার বাংলা অনুবাদ করে হাজারখানেক ছাপিয়েছিল। উক্ত প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারের কাছে হুদিরাম নির্ঝিচারে সকলকে ঐ পাম্প লেটগুলি বিলি করছিল; এমন সময় একজন হেড কনষ্টেবল এসে তাকে গ্রেপ্তার করাতে সে বজ্রং-এর খুব কেরামতি দেখিয়েছিল। ইত্যবসরে সত্যেন্দ্র সেখানে এসে পড়ে বলে উঠল, “উও ডীপটিকা লেডকা হার, উস্কো কেঁও পাকড়ায়া।” সত্যেন্দ্র ছিল প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক এবং তখন কালেক্টরীতে একজন ডেপুটি বাবুর এজলাসে কেরাণীর কাজ করত। জমাদার সত্যেন্দ্রকে চিন্ত, সে ডেপুটি বাবুর নাম শুনে, নাকে রক্তপাত সঙ্গেও হুদিরামকে ছেড়ে দিয়েছিল। পরকণে যখন তার ভুল ভাঙল, তখন আর হুদিরামকে বুঁজে পাওয়া গেল না।

“পুলিসকে ধোঁকা দেবার ভুল ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে সত্যেন্দ্রকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। তাতে বোধ হয়, তাকে দোষী সাব্যস্ত করার হত কিছু বুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে সে বেপরোয়া ভাবে হেসে হেসে জবাব দিয়েছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে কেরাণীগিরি হতে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। হুদিরামের বিরুদ্ধে রাজকোষের মামলা রুজু করা

হ'ল। বাংলাদেশে বিপ্লববাদীর বিরুদ্ধে বোধ হয় এই প্রথম রাজকোহের অভিযোগ।

“কেরারী অবস্থায় কিছুকাল থাকার পর ফুদিরাম মেদিনীপুর এসে বসে দিল। মোকদ্দমা দায়রায় গেল। অনেক উকীল ব্যারিষ্টার দয়া করে আদালতে ফুদিরামের পক্ষ সমর্থনের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর কি জানি কি মনে করে মোকদ্দমা ভুলে নিয়েছিলেন।”

১৯০৭, ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মেদিনীপুর শহরে জেলা কনকরেজের অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনকে সর্বদা-জন্মের অমুঠানে পরিণত করিবার জন্য সত্যোজ্ঞনাথ তাঁহার ভরুণ কর্মাদলকে লইয়া যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, উজ্জ্বল কলিকাতা হইতে আগত উভয় দলের নেতারা ইচ্ছাসিক্ত প্রশংসা করেন। ‘নরম পহী’ ও ‘গরম পহী’ দলের মতানৈক্য দূর না হওয়ার সম্মেলন ভাঙিয়া যায় এবং দুইটি পৃথক অধিবেশন হয়। প্রকৃত অধিবেশনে সত্যোজ্ঞনাথের অধিনায়কত্বেই ভরুণ কর্মাদল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত জননায়কের বিরোধিতা করিতে সাহসী হইয়াছিল—যাহার ফলে সম্মেলন পণ্ড হইয়া যায়। তৎকালে তাঁহার মত লোকপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধে মফঃস্বল শহরে এইরূপ আচরণ অভাবনীয় ব্যাপার বলিতে হইবে। সত্যোজ্ঞনাথের কল্যাণেই সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিকূল প্রবল জনমতের সম্মুখীন হওয়ার ভিত্তি অভিজ্ঞতা মেদিনীপুরেই সর্বপ্রথম অর্জন করিতে হয়। ইহার পর সুরাট কংগ্রেসেও সত্যোজ্ঞনাথ গরমপহী দলের পক্ষে কার্য্য করিয়াছিলেন।

এখন আসল কথায় আসিতেছি। বিশ্বাসহতা নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর নিধন-ব্যাপার সম্বন্ধে হইয়াছিল অনেকটা নাটকীয় বর্ণনাই। সত্যেন বোমার মামলায় বিচারার্থ আর্জিপুর জেলে স্থানান্তরিত হইয়া বিচারাদীন অন্যান্য আসামীর সহিত বাস করিবার সুযোগ পান নাই—যেহেতু তখন তিনি ছিলেন এক জন নওপ্রাপ্ত কয়েদী। নরেন গোস্বামীয়ের কাণ্ড শুনিয়া তিনি তাহাকে হত্যা করিবার সম্বন্ধ নিষ্পত্তি হইতেই করেন। কি উপায়ে তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহাই ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার সমমতাবলম্বী হেমচন্দ্র দাসের সঙ্গে এই সম্পর্কে পরামর্শ চলিল। সত্যেন জানিতে চাহিলেন যে, নরেনের মত বিশ্বাসঘাতক তাঁহাদের মধ্যে আর কেহ আছে কিনা এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় এমন কে কে আছে। হেমচন্দ্র জানাইলেন যে, নরেনের মত আর কোন বিশ্বাসঘাতক তাঁহাদের দলে নাই, এবং “সম্পূর্ণ বিশ্বাসী বলে যে কয়-জনকে মনে করেছিল, তাদের অবিকাংশই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেছোকরা, আর বাকী মেহাৎ ভাল মানুষ বললে যা বোকার তাই।”

অবশেষে নরেনের হত্যার একটি পছা উদ্ভাবিত হইল।

পরিকল্পনা অমুঘারী সত্যেন অমুঘের ভান করিয়া জেলখানার হাসপাতালে ভর্তি হইলেন এবং সেখানে থাকার ব্যবস্থাটা পাকা করিয়া লইলেন। সেখান হইতে তিনি নরেন গোস্বামীকে এই বলিয়া সংবাদ পাঠান যে, রুগ্ন হুর্কল শরীরে আর জেলের কষ্ট সহ করিতে পারিতেছেন না এবং তিনিও রাজসাক্ষী হইতে প্রস্তুত। পোস্টাই পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সেই প্রস্তাবের কথা তাঁহার জানাইলে ভয়ঙ্কর করিয়া উহা অকৃত্রিম বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং পোস্টাইকে শিখাইয়া পড়াইয়া প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য বলেন। হাসপাতালে দিনের পর দিন সত্যেনের রাজসাক্ষী ভৈর্য হওয়ার মহড়া নরেনের তত্ত্বাবধানে চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একটি রিভলবার ও কার্তুজ সত্যেনের হস্ত-গত হয়, কিন্তু উহা বড় এবং টিগার্টা বেশী শক্ত থাকায় তাহার জ্ঞান হুর্কল ব্যক্তির পক্ষে উহা ব্যবহার করা কঠিন হইতে পারে মনে করিয়া তিনি দ্বিতীয় রিভলবার হাতে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকেন। দ্বিতীয় রিভলবার জেলের ভিতরে আসিলে হেমবাবু কাপড়ে লুপাইয়া উহা কানাইলালকে দিয়া হাসপাতালে পাঠান। কানাই অমুঘের ভান করিয়া হাসপাতালে গিয়া উহা সত্যেনের হাতে দেন। তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে উহা রিভলভার। সত্যেন যখন আগের বড় রিভলভারটা কানাইয়ের মারফত হেমবাবুকে ফেরত দিতে যান, তখন কানাইলাল টের পাইলেন যে, উহা রিভলভার। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কানাই তাঁহাকে অনেক অহনয়-বিনয় করিয়া ধরিলেন। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া সত্যেন সমস্ত কথা পুলিশ বলিলেন। তখন কানাইলাল তাঁহাকে এই ব্যাপারে সহকারী করিয়া লইবার জন্য খুব কাহুতি-মিনতি করেন। সত্যেন এই সম্পর্কে হেমবাবুর মতামত জানিতে চাহিলে তিনি (হেমবাবু) কানাইলালকে সহকারী করিয়া লইতে সম্মতি দেন। ইহার পর সত্যেন ও কানাইয়ের মধ্যে স্থির হইল যে, প্রথমে সত্যেনই গুলী চালাইবে, তারপর যদি তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে কানাই গুলী চালাইবেন। পরে দেখা গেল যে, সত্যেন কানাইকে সহকারী করিয়া না লইলে নরেন গোস্বামী রক্ষা পাইত।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট, সকাল সাড়ে সাড়টা হইতে আটটার মধ্যে বিপ্লবী বীর-মুগ্ধল সত্যেন-কানাইয়ের হস্তে নরেন গোস্বামী নিহত হয়। সেই দিন ঘটনার পূর্বে নরেন ইউরোপিয়ান কয়েদী-ওয়ার্ডার হিসিন্সকে সঙ্গে লইয়া হাসপাতালে যায় এবং সত্যেনের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে। হিসিন্স পাশের একটি ঘরে চলিয়া যায়। গুলী-তরা রিভলভারটি কেহ কাড়িয়া লইতে না পারে, সেইজন্য সত্যেন পূর্বেই উহা কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। সামান্য কথাবার্তার পরেই তিনি জামার পকেটে হাত রাখিয়াই গুলী ছুঁড়িলেন। গুলী নরেনের উরুদেশে লাগে। সে তখন

প্রাণত্যাগ ছুটিয়া পলাইতে থাকে। হিগিন্স ছুটিয়া আসিয়া রিভলভার হিনাইকা লইবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। ক্ষতাবস্থিতে একটা গুলী ছুটিয়া হিগিন্স-এর মণিবন্ধে বিদ্ধ হয়। সত্যেন্দ্র তাহার হাত হইতে ছুটিয়া নরেনের পশ্চাৎগমন করিতে থাকেন। গুলীর নব সন্নিহিত কানাই দৌড়াইয়া আসিয়া দেখেন শিকার পলাইয়াছে।

হুই জনেই হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়া বিছাদপতিতে নীচে নামিয়া গেলেন। উভয়েই নরেনের নিকটবর্তী হইয়া গুলী চালাইতে লাগিলেন। জেলখানার কর্মচারী, ওয়ার্ডার এবং করেদারী বাবা দিতে আসিলে হাঁহারা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া রিভলভার উঠাইয়া ধরেন; সকলেই প্রাণত্যাগে সরিয়া পড়ে। গুলীবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহে নরেন্দ্র পার্শ্ববর্তী নর্দমার পড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হয়।

ভারপর জেলখানার নিয়মামুসারে পাগলা খুঁটি আর ভোঁখা (Whistle) বাজিয়া উঠিল। বন্দুক-বারী পুলিশ দলে দলে আসিয়া জেলখানায় হাজির হইল। হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়িয়া গেল। একটা বুড়া করেদী ছুটিয়া আসিয়া বাবীনবাবুরদের চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, “বাবুজী, পোসাঁই ঠাণ্ডা হো গিয়া।” এই স্বসংবাদ পাইয়া বোমার মামলার আসামীরা বেআইনী দ্রব্যাদি ও কাগজপত্র নষ্ট করিয়া এবং ফেলিয়া দিয়া পোবেচারী সাজিয়া থানাতল্লাসীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে জোর থানা-তল্লাসী আরম্ভ হয়; কিন্তু আপত্তিজনক বা বেআইনী কিছুই পাওয়া গেল না।

একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট দ্রুত সাক্ষ্যপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাথমিক তদন্ত শেষ করেন এবং নরহত্যার অভিযোগে সত্যেন্দ্র-কানাইকে আলিপুরের সেনান আদালতে বিচারার্থ সোপর্দ করেন। সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রকাশ, দুইটি রিভলভার হইতে মোট নয়টি গুলী ছোঁড়া হইয়াছিল এবং পাঁচটি নরেনের দেহে বিদ্ধ হয়। ছোট রিভলভারটি ব্যবহার করেন সত্যেন্দ্র, আর বড়টি কানাই। ছোটটি হইতে চারিটা গুলী এবং বড়টি হইতে পাঁচটা গুলী ছোঁড়া হইয়াছিল। বিচারকালে সত্যেন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থন করেন, কিন্তু কানাইলাল তাহা করেন নাই। সত্যেন্দ্র বরাবরই স্বীকারোক্তি করিয়া অভিযোগ স্বীকার করার বিরোধী ছিলেন। বারীজ প্রভৃতি হইবার পর যে ভাবে স্বীকারোক্তি করিয়া নিজেদের জড়াইয়া-ছেন এবং সহকর্মীদেরও জড়িত করিয়াছেন, তাহাতে জেলে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। হেমবাবুর লেখায় প্রকাশ, বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির সভ্যদের পক্ষে স্বীকারোক্তি উচিত কি অসুচিত তাহা লইয়া জেলে তাহাদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। এক দলের মোড়ল বারীন, অল্প দলের সত্যেন্দ্র। বারীনকে দোষারোপ করিত সত্যেন্দ্রের দল।

বারীজ প্রমি রাজনারায়ণ বসুর দৌড়িছ এবং সত্যেন্দ্র তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র। সম্পর্কে সত্যেন্দ্র বারীজের মাতুল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গুপ্ত-সমিতির গোড়াপত্তনের সময় (১৯০২ খ্রিঃ) হইতেই মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। হেমচন্দ্রের লেখা হইতে প্রকাশ যে, সেই বিবাদের মিটমাট কোন দিনই হয় নাই, যদিও উভয়ে এক সঙ্গে কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

সেনান আদালতের বিচারে পাঁচ জন জুরী একমত হইয়া কানাইকে নরহত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন; তিন জন জুরীর মতে সত্যেন্দ্র নির্দোষ ও দুই জনের মতে দোষী। দায়রা জজ ১ই সেপ্টেম্বর কানাইকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তিন জন জুরীর মতের সহিত একমত হইতে না পারিয়া মামলা শেষ সিদ্ধান্তের জন্ত হাইকোর্টে পাঠান। হাইকোর্টে জজিস সয়ফরদিন ও কক্সের একলাসে মামলার শুমানি হয়। ২১শে অক্টোবর বিচারপতিদ্বয় রায় দিলেন। কানাইলালের মৃত্যুদণ্ডও বর্হাল রহিল এবং সত্যেন্দ্রনাথকেও দোষী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। ১০ই নবেম্বর কানাইর এবং ২১ নবেম্বর সত্যেন্দ্রের ফাঁসি হয়। দুই জনেই বীরের স্তায় শকাহীন চিত্তে ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যু বরণ করিয়া অমর হইয়া রহিলেন।

কয়েকটি কারণে তৎকালে এক শ্রেণীর লোকের মনে এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মে যে, মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার পর সত্যেন্দ্রের মধ্যে দুর্বলতা আসিয়াছিল। এই স্থলে সেই কারণ সমূহের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ কানাই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, কিন্তু সত্যেন্দ্র কসিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্র যে স্বীকারোক্তি করার বরাবরই বিরোধী, তাহা হেমচন্দ্রের লেখা হইতেই জানা যায়। স্বীকারোক্তির ব্যাপার লইয়া জেলের ভিতরে দলাদলি হয় এবং বারীনবাবুর বিরোধী দলের নেতা ছিলেন সত্যেন্দ্র। দ্বিতীয়তঃ পোসাঁইয়ের হত্যার পরে কানাইয়ের ফাঁসির মঞ্চে ফাঁস গলার পরা পর্যন্ত যে আচরণ তাহা অসাধারণ ও বিস্ময়কর। ইহার তুলনা হইতে পারে শুধু কোন রোমাঞ্চকর নাট্যের বীর নায়কের আচরণের সঙ্গেই। কানাইয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত রাজনিক ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়—অধিকন্তু কানাই বয়সে সত্যেন্দ্র অপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট; সুতরাং তাঁহার মধ্যে উদ্যাদনা ও ভাবোচ্ছ্বাস সত্যেন্দ্রের অপেক্ষা বেশী থাকাই স্বাভাবিক। স্বদেশের শৃঙ্খল-মোচনের জন্ত সত্যেন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বাছিয়া লইলেও তাঁহার প্রকৃতি ছিল সন্তোষে প্রভাবিত।

তৃতীয়তঃ কানাইয়ের অসাধারণ ও অভাবদীন আচরণে দেশবাসীর মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তাহা নষ্ট করিবার জন্ত সরকারী কর্মচারী ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রগুলির যত্নমূল ও সত্যেন্দ্র সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার। কলি-

কাতার তৎকালীন এংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক পত্র ‘এম্পায়ারে’ সত্যেন সম্পর্কে যে একটি বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন সত্যেনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও শ্রদ্ধাশীল বন্ধু বর্গের এ. সি. রায়—অবিনাশচন্দ্র রায়। এই সম্পর্কে হেমচন্দ্র দাস (কাছুনগো) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া তাহার অযোগ্য সতীর্থ সত্যেনের উপর আরোপিত মিথ্যা কলঙ্ক কালন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত মিথ্যাপ্রচারে ইন্দন যোগাইয়াছে এবং সহায়তা করিয়াছে সত্যেনের বিরোধী অর্থাৎ বারীনিবাসীর সমর্থক দল।

হেমবাবুর লেখার সত্যেনের যে বন্ধুর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই বন্ধু হইলেন হেমবাবু নিজেই।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার পরে সত্যেনের মধ্যে দুর্বলতা আসিয়াছিল কিনা তৎসম্পর্কে প্রথমে হেমচন্দ্র দাসের লেখা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :

...“সত্যেনের বিপক্ষ দল এই অযোগ্য সত্যেনের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে তার উপর সাধ মিটিয়ে শোষণ নিয়েছিল। তার মাজা এত দূর বেড়েছিল যে, অনেক পরে শুনেছিলাম, সত্যেনকে নাকি মুক্তি বা মৃত অবস্থার ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তাই সত্যেনের ফাঁসির সময় যারা উপস্থিত ছিলেন, পরে তাঁদের অনেকের নিকট প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য অস্থলভান করেছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বিখ্যাত সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ক্রীষ্ণকৃষ্ণমায় মিত্র মহাশয়; আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সত্যেনের ফাঁসির দিন তিনিও জেলখানায় গেলেন। নিতান্ত হৃদয়হীন বলে ফাঁসির ব্যাপারটা নিজে দেখেন নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গীদের ও জেল-কর্মচারীদের মধ্যে যারা দেখেছিলেন, তাঁদের মুখে সত্যেনের ভয়সী প্রশংসাই শুনেছিলেন। অথচ পরে কোন সংবাদপত্রে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র রকম মত প্রকাশিত হয়েছিল দেখে বিশেষ অস্থলভান করেছিলেন, আর জেনেছিলেন, আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রকমের দলাদলি ছিল—তার কলেই সত্যেনের বিপক্ষ দলের দ্বারা এই রকম মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।” (“বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা”)

হাইকোর্টে আশ্রয় করার ইচ্ছা যে সত্যেনের ছিল না, তাহা হেমবাবুর লেখা হইতেই জানা যায়। পৌঁসাইকে হত্যা করার পর সত্যেনের মনে কি ভাব জাগিয়াছিল, তাহা হেমবাবুকে গোপনে লিখিত তাহার একখানি পত্রেও প্রকাশ পাইয়াছে। এই সম্পর্কে হেমবাবুর লেখা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :

“সত্যেনও জানত, আগিলের কল কিছুই হবে না; তার মা বিশেষ করে বলা সত্ত্বেও প্রথমে রাজী হয় নি। তার পর আমি তাকে তার মায়ের ইচ্ছার দোহাই দিয়ে রাজী করিয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে যে সত্যেনকে লোকমতে মিলিত হতে

হবে তা তাবতে পারিনি। বরং তখন মনে করেছিলাম, দেশে সত্যাকার গুপ্তমতি কখনও হলে তারা সত্যেনকে বুঝতে পারবে। কিন্তু সে আশা বুধা হয়েছে। মরমকে হত্যার দিন পাঁচ ঘণ্টা পরে আমরাও, সত্যেন কানাই বেখানে আবদ্ধ ছিলাম, সেই ৪৪ ডিগ্রী মাস্ক জেলখানার মধ্যকার দূরতর জেলে অর্থাৎ অন্দর মহলে রক্ষিত হয়েছিলাম। বিশেষ কড়া-কড়ি পাহারা সত্ত্বেও ‘কোডে’ মেথরকে দিয়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলত। প্রথমে চেয়ে সেই মেথরের হাতে একটু কল খেয়েছিলাম তাই তার প্রভাও অর্জন করেছিলাম।

‘পৌঁসাইয়ের’ মৃত্যুতে সত্যেন কত আশাই করেছিল, কত কথাই সে বলে ছিল। কাব্যবিশারদের একটি গানের ভাব নিয়ে লিখেছিল,* অচিরে ভারতের মিশ্রণ ‘বন্ধন মোচন’ হবে, এই বন্ধন মোচনের কাজে সে ‘নিজ দেহ প্রাণ বিসর্জন’ করে ‘মাতৃগণ প্রতিদান’ করছে, এই তার অনন্ত তৃপ্তি।”

সত্যেনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বর্গের অবিনাশচন্দ্র রায় (এ. সি. রায়) তাহার মাতার অস্থলভাষে শবদাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কারণ তখন সত্যেনের ক্ষোভ সহোদর জামাবাবু জেরে শয়্যাগত। সত্যেনের মৃত্যুর পূর্বে তিনি এবং তাহার পত্নী তাহার সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎও করিয়াছিলেন। হেমবাবুকে তিনি-সত্যেন সম্পর্কে ১৯২৪ সনের ২রা জুলাই যে পত্র লেখেন, তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

“...ফাঁসির দিন আমি অতি প্রত্যুষে জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। আমরা ঐ নির্ধর ব্যাপার দেখিতে প্রস্তুত ছিলাম না। উহা সমাপ্ত হইলে একজন চন্দ্রবর্ষপরিহিত বেত পুলিশ অফিসারকেও আমার সমীপবর্তী হইয়া বলিলেন, “You can go now. The thing is over, Satyendra died bravely.”

তৎপরেই একজন সার্জেন্ট বলিতে লাগিল,

“When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake; when I said ‘Satyendra be ready,’ he answered, ‘Well, I am quite ready’ and smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it all cheerfully. A brave lad.”

“মৃত্যুর পূর্বে আমি ও আমার পত্নী দুই দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। দুই সহস্র বদনে দুই দিনই সে আমাদের সহিত প্রায় এক বটা ধরিয়া স্বদেশী কথাবার্তা বলিয়াছিল। তাহার কিছু কিছু উক্তি আমার মনে আছে। সে বলিয়াছিল, ‘আমার বা কানাইয়ের মৃত্যু কি দার। আমা-

* “প্রকৃত সন্তান হবে সেই জন

নিজ দেহ-প্রাণ করি বিসর্জন,

যে করিবে মাতৃ বন্ধন-মোচন

হবে তার মাতৃগণ প্রতিদান।”

দের মত সহস্র সহস্র মরিলে তবে দেশ উদ্ধার হইবে, তবে দেশে জাগরণ আসিবে।’

“আমিই তাকে কঁাসির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিবার প্ররুতি দিই। সে কিছুতেই রাজী হয় নাই। তাহার মাতার ইচ্ছা বারংবার বুঝাইলে তখন সে বলে, ‘ভাবিয়া দেখিব’,—পরে জেল হইতে তাহার সম্মতি জাপন করে।

“মাতার সাক্ষাতের ইচ্ছা জানাইলে বলিয়াছিল, ‘যদি তিনি এখানে আসিয়া না কাদেন, তবেই আমি সাক্ষাৎ করিতে পারি, নচেৎ নয়।’ তাহাই হইয়াছিল। তাহার দুটা জননী এক কোঁটা অশ্রু পরিত্যাগ করেন নাই। তাহার যত্নের পূর্বে প্রার্থনা করিবার জন্য আমিই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে টিক করিয়া দিই।”

“তখনকার বালক বালিকারা নানা স্থানে কানাই ও সত্যেনের প্রতিমূর্তি পড়িয়া পূজা করিয়াছিল। এই সংবাদ আমি কারাগারে সত্যেনকে দিয়াছিলাম। শুনিয়া তাহার মুখ বুঝ উৎফুল্ল হইয়াছিল।”

হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত তৎকালের বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক *The Bengalee* পত্রের প্রতিনিধি সত্যেন্দ্রনাথের যে সকল আত্মীয়-বন্ধন কারাগারে কঁাসির দুই তিন দিন পূর্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহাদের সত্যি দেখা করিয়া সত্যেনের মানসিক অবস্থা অবগত হইয়াছিলেন। ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

“So far as we are concerned,” he continued, “I mean so far as the relations and friends are concerned, we could gather from his appearance and conversation that Satyendra Nath is never the least nervous or discomforted.”

“His last conversation with us on Thursday was quite bright and cheerful. He said he was fully prepared for the worst. He asked his relations not to be making themselves uncomfortable and troubling about

appeals and motions.”—*The Bengalee*, dated Saturday, November 21, 1908.

সত্যেন জেল হইতে তাহার অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথকে কঁাসির দিনকয়েক পূর্বে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাহার মনোবল কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হওয়ার পরিচয় মিলে। পত্রখানি এই :

১৭১১১০৮ মঙ্গলবার

বেলা ৪টা

পূজনীয় দাদা বাবু,

গত শনিবার আপনি আসিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু আসিলেন না কেন? সেদিন হইতে আপনার জন্য আশা করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি আজ পর্যন্ত আসিলেন না। যাই হউক—আজ এক্ষুনি জুপারিটেণ্টেণ্ট সাহেব বলিলেন যে আপিল অগ্রাহ হইয়াছে এবং ২১শে তারিখ শনিবার সকালে দিন স্থির হইয়াছে। অতএব মধ্যে আর মাত্র তিন দিন সময়, পত্র পাঠ আপনি অবশ্য একবার শেষ দেখা করিয়া যাইবেন। যেদিন আসিবেন সেই দিন দেখা হইবে। অন্য কেহ যদি দেখা করিতে চান সঙ্গে লইয়া আসিবেন। যিঃ রাখকে দেখিতে ইচ্ছা করে যদি তিনি আসেন তবে জুখী হইব। তৎপরে দাদা, আপনার নিকট একটি অহরোধ আছে—জানিবেন আপনার নিকট এটি আমার এই প্রথম ও শেষ অহরোধ—সেটি এই যে আপনি যে রকমই তাহান আমার অহরোধ ভাবিয়া দেখিবেন যেন শেষ জীবনে কষ্ট না পান আর আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শনিবার সকালে আসিয়া দেহ লইয়া যাইবেন। ন’দিদি প্রভৃতি আসে ত ভালই। প্রার্থনাদি করিয়া যেন সংকার করা হয়। আশা করি পত্রপাঠ একবার দেখা করিয়া যাইবেন।

ইতি আপনার

স্নেহের ভাই সত্যেন



ঠানদিদি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গিয়ে দাঁড়াতেই গোবিন্দমাসি বললেন—“এই যে এসে গেছিস, জানি মা একটা ব্যবস্থা করবেনই।”

প্রশ্ন করলাম—“কিসের ব্যবস্থা মাসি?”

“মনসা পূজোটা করে দিবি...”

বললাম—“সে কি মাসি, আমি যে মস্তুর-টমুর কিছু জানি না।”

পূজোর যোগাড়ই করছিলেন, হাত বন্ধ করে আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন, তারপর যেন কথা কইবার মত অবস্থা হলে বললেন—“কি হ’ল রে শৈল! বামনের ঘরের ছেলে, মুখ দিয়ে বের করতে পারলি কথাটা! তোদের কি ঠাকুরদেবতার ভয় নেই?”

বললাম—“মস্তুর জানি বললেই বেশী ভয়ের কথা নয় কি মাসি? ইনি আবার যেমন কাঁচা-থেকো দেবতা।”

“আচ্ছা, হয়েছে; আর এসেই ধূলো-পায়ে অমুল্লো কথাগুলো তোমার মুখ দিয়ে বের করতে হবে না, খুব নিকিয়ে হয়েছে, খুব বলিয়ে-কইয়ে হয়েছে।...নে, জামা জুতো ছেড়ে হাত পা ধুয়ে নে, আমি ততক্ষণ পিটুলি দিয়ে সাপ ক’টা একে ফেলি...”

“না মাসি, আবার মার পেয়াদাদের সামনে বসে!... অত অনাচার সহাবে না।”

গোবিন্দমাসি হেসে ফেলতে গিয়ে আরও গভীর হয়ে আমার মুখের দিকে ঠায় চেয়ে রইলেন, তারপর উঠে পড়ে বললেন—“আচ্ছা, তার ব্যবস্থাও আছে, মনের খুঁতখুঁতনি যেতে না চায়, গঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে আয়, যা তা কথা মুখে আনবার দোষটাও যাবে কেটে। জানি না বাপু, কি যে তোরা হয়ে উঠছিস দিন দিন।”

তেল মেখে গামছা কাপড় নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছি, দরজার কাছ থেকে ডাকলেন—“ওরে শোন শৈল, পেছু ডাকলাম, তা মা-মাসির ডাকে দোষ নেই, এইটে নে, নেয়ে উঠে গায়ে দিয়ে আসবি।”

এগিয়ে এসেছেন, হাতে একটা নামাবলি।

একটু বিমূঢ় ভাবেই বললাম—“ও কি হবে মাসি। অনাচারের শরীর, যা তা খাওয়া অব্যাস...”

“ভুই নে দিকিন, দেহটা শুদ্ধ থাকবে। আর যা মুখে আসে তাই বলিস নি অমন করে; এখুনি পূজায় বসতে হবে।” তা হলে যখন যাচ্ছিই একটু দাঁড়া, কমণ্ডলুটাও এসে দিই; জলটুকু খরচ করে ফেললাম।”

এর পরে যা হ’ল সেটাকে মতিচ্ছন্নই বলতে হয়। কিন্তু হ’ল বোধ হয় স্বাভাবিক নিয়মেই। কথাটা হচ্ছে, নেশা করলে যদি বিভুল বকবার ঝোঁক হয় তো মাসির যা ব্যবস্থা তাতে ধর্মভাবই বা ক্রমে মনটা অধিকার করে বসবে না কেন? হ’লও তাই; ফেরবার সময় একটা অস্বস্তি ঠেলে উঠতে লাগল মনে—একটা লোব—ব্রাহ্মণই—গঙ্গাস্নান করে গায়ে নামাবলি জড়িয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, অথচ মনে যাই থাক, মুখে সংস্কৃতের একটু অল্পাশ্র-বিসর্গ নেই—কেমন যেন নেড়া নেড়া, বেমানান বোধ হতে লাগল। অথচ নেয়ে নামাবলি গায়ে তুলেছি বলেই যে সরস্বতী এসে কণ্ঠে অধিষ্ঠান করবেন এমনও তো হয় না। তবুও এক রকম করে বোধ হয় কাটিয়েই উঠতাম অস্বস্তিটা—পূজি নেই একেবারে, করা যায় কি? কিন্তু এই সময় পরিস্থিতিটা একটু বদলে গেল।

গ্রামের পথ, বেলাও হয়েছে, লোক চলাচল খুব কম, অল্প যা যাওয়া-আসা করছে তাও নিম্নশ্রেণীর মানুষ, একটা মোড় ঘুরেই কিন্তু দেখি সামনে হাত পঞ্চাশেক দূরে তিন জন ভদ্রবরের মেয়েছেলে, আমি যেদিকে যাচ্ছি সেইদিকেই এগিয়ে চলেছে। একজন বেশ বুড়ী চওড়া রাঙাপেড়ে কাপড় পরা; তার পাশেরটি যুবতী, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে, পায়ে হালফ্যাশানের জুতো, হাতে একটি ভ্যানিটি বাগ, পরনের শাড়ি, ব্লাউস দূর থেকে যতটুকু দেখা যায়—সব ঐ মেলেরই, পরাও হালফ্যাশানে; তার পাশের মেয়েটি নেহাত ছেলেমানুষ, বছর দশেকের হবে, ফ্রক-পরা, পায়ে স্ট্র্যাপ স্নু। বুড়ীর দেহটা সামনে একটু ঝুঁকে গেছে, বাঁ-হাতে একটি লাঠি; চলেছে কিন্তু বেশ খর খর করে, মেয়ে ছটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। গল্পও হচ্ছে, একটু হাসিও ভেসে এল।

বিনা সংস্কৃততেই দিচ্ছিলাম চালিয়ে, কিন্তু এই নূতন সমাবেশের সামনাসামনি হয়ে সেই অস্বস্তিটা আরও বেড়ে গেল। গ্রামের প্রাচীনা, সে কত পূজো দেখেছে, কত পুরোহিত কত পণ্ডিত দেখেছে; তার পাশ দিয়ে ঘটা করে জলভরা কমণ্ডলু নিয়ে নামাবলি গায়ে একজন গঙ্গাস্নাত ব্রাহ্মণ চলে গেল, মুখে একটিমাত্র মন্ত্র নেই, কি রকম হবে এটা?...যেন মনশক্ষে দেখছি ‘আমি এগিয়ে গেছি, বুড়ী লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আছে চেয়ে...যেন মন্ত্রহীন কলির ব্রাহ্মণ নিয়ে অতিআধুনিকানাতবোকে স্তম্ভ জড়িয়ে কি একটা টিপ্পনী কার্টলে।

নাতবোয়ের কথা ভেবেই কি স্বস্তি পাচ্ছি? ছোট মেয়েটিকে না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু ঐ যে নব্যা, পায়ের হীল-তোলা জুতো থেকে মাথার এলো খোঁপা পর্যন্ত বার সমস্তটুকুই বা পুরাতন, বা বিগতপ্রায় তার উপর বিজ্রপে ঠাসা, তার সামনে দিয়ে এ অবস্থায় আসল বা জিনিষ, অর্থাৎ মন্ত্র, সেটাকেই বাদ দিয়ে চলে গেলে তার বিজ্র-স্পর্শটাকেই কি বাড়িয়ে দেওয়া হবে না?

এখন অবশ্য ধীরে স্বপ্নে অবস্থাটা বিশ্লেষণ করে বুঝছি, সমস্তটাই ছিল আমার মনের দুর্বলতা—ঐ যে জানি না মন্ত্র—ঐটেই বড় হয়ে প্রাচীনা নব্যা উভয়ের কাছেই সমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কি করে, নইলে ব্রাহ্মণও নিয়ত গঙ্গাস্নান করে যাচ্ছে, সব গঙ্গার রাস্তাও কিছু সংস্কৃত টোল হয়ে ওঠেনি; তখন কিন্তু সত্যই বিধা-সঙ্কোচে আমার যেন পা উঠতে চাইছিল না।

এদিকে বেশি দেরী করাও চলে না; আরও একটা চিত্র মনস্ফে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—গোবিন্দমাসির পূজার জোগাড় শেষ হয়েছে, নেড়া মাথায় ভিজা গামছা পাট করে বসিয়ে বাইরের দুটো চৌকাঠে হাত দিয়ে আমার জন্ত প্রতীক্ষা করছেন। ঘটাকয়েকের জন্ত দেখা করতে এসেছি, কিছু বলবেন না নিশ্চয়, কিন্তু সেই কিছু না বলতে পারার জন্তই পাড়ার ভালোখাকী শতেক খোয়াড়ীদের উপর ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছেন, কি তুমুল হট্টগোলের মধ্যে গিয়ে যে পড়ব ভেবে পাচ্ছি না।

অবশ্য দাঁড়িয়ে পড়ি নি, কিন্তু গতি শ্রুত হয়ে গেছে।... ভগবান, ভুলে একটা শ্লোকও কি জীবনে মুখস্থ করি নি? তা হলে সেই-পুণ্যে তার সিকিটুকুও মনে পাড়িয়ে এটুকু পার করিয়ে মান বাঁচাও।

একটি অক্ষরও মনে পড়ল না, এত উদ্বেগ চঞ্চলতার মধ্যে পড়ে না, তবে নিতান্ত শ্লোক মনে না পড়ুক খানিকটা কাজ চালানো সংস্কৃত হাতড়ে পাওয়া গেল। সামনের এইটুকু পথ কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়া—বিদ্যাসাগর মশাইয়ের “উপক্রমণিকা” থেকে একটা শব্দরূপের অস্থায়ী বিসর্গগুলো বেশ ঘটা করে জাগিয়ে, কমগুলটা শব্দ করে দ্বন্দ্বের পা চালিয়ে দিলাম। গট গট করে এগিয়েও গেলাম। ...তারপর পাপের প্রায়শ্চিত্তও হ'ল।—

ওদের ছাড়িয়ে প্রায় আরও হাত-পঞ্চাশেক গেছি, কানে গেল—“ঐ যে! শুনচ? বলি অ!...”

ঘুরে দেখি সেই বুড়ী। একাই রয়েছে। রাস্তা থেকে একটু নেমে একটা বাগানের এদিকে নুতনে-পুরনোয় একটা বড় দোতলা বাড়ী, বুঝতে পারলাম মেয়ে দুটি সেই দিকেই চলে গেছে।

বুড়ী আসছিলই, আমিও হু'পা এগিয়ে সামনাসামনি হতে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখে সোনার ফ্রেমের মোটা কাঁচের চশমা, তার মধ্যে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু যেন চটুল হাসি ঠোঁটে টেনে প্রশ্ন করলে, “বলি, চিনতে পারলে?”

বেশ ভাল করে দেখলাম—সন্তর-পঁচাত্তর বছর বয়স হয়েছে, চেহারাটি কিন্তু সরস—পরনে চওড়া রাজা-পেড়ে শাড়ি, তার মধ্যে রুটির লেচির মত পাকা চূণের ছোট্ট খোঁপাটি ঢাকা, মুখে টানা-দেওয়া নথ, বাঁধানো দাঁত শুকন গাল দুটিকে ঠেলে রেখেছে, গায়ে গয়নারও বেশ বাহুল্য।

আমি বিমূঢ়ভাবে চেয়ে আছি দেখে বেশ বড় করেই হাসলে এবার, বললে, “আমাকে নয়; ঠানদিদিকে অত শীগগির ভুলবে না, জানি। আমি বলছিলাম, ঐ ঠেকে—রূপের ঢেউ ভুলে পাউডারে, এসেনে গম্বগোকুল হয়ে আসছিলেন না রাস্তা দিয়ে?—আমার সঙ্গেই গো!...ঐ ঠের কথা বলছি।”

বেশ ভাবাচাকা খেয়ে গেছি। কি বলা ঠিক হবে তাড়াতাড়ির মধ্যে ভেবে না পেয়ে উত্তর করলাম, “কৈ, চিনলাম না তো।”

ঠোঁটের একটা দিক গুটিয়ে নিয়ে একটু হাসলে, তারপর চোখ দুটো একটু টিপে বললে, “আমাদের নতুন চৌধুরী-গিন্নি, সনতের দ্বিতীয়পক্ষ গো!...চিনবে আর কোথেকে?—বিয়ের পর তো হু'বছর পাহাড়ে পাহাড়েই ঘুরে বেড়ালেন রাণী; দোজবরে—চালসে বর, মুখের কথাটুকু খসাতে দেরি, তক্ষণি তামিল হয়ে যাচ্ছে তো!...পাড়া-গাঁ—এখানে কি মাহুবে থাকতে পারে?—বন, জঙ্গল, ডোবা, ম্যালেরিয়া!...বিয়ের কনের মুখের কথা বলছি তোমায়—সেই কোন হু'বছর আগেকার কথা, কিন্তু প্রত্যেকটি মনে আছে তো আমার!...আমি হচ্ছি ক্ষেমী বামনী, নাত-বোয়ের সঙ্কল্প ধরে রসিয়ে রসিয়ে সব পেটের কথা বের করেছিলুম তো?—সে কি ঠাকার! কি দেমাক! কি নাকসিটুকুনি!...বলি তোমার শহরে মেয়ের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার বাবা!...তা বছর দুই এ-পাহাড় ও-পাহাড়ের জল খেয়ে এখন আবার সেই অজ পাড়া-গাঁ, সেই এঁদো পুকুর, সেই ম্যালেরিয়াই গতি তো? আমি বলি, পথে এসো বাছা!...হ্যাঁগা, ঐ মেম-সায়েরী খরচ কত দিন যোগাবে আর? জমিদার!...ন্যাও, ক্ষেমী বামনীর আর জানতে বাকি নেই বাছা; নামেই তালপুকুর, এদিকে ঘটি ভোবে না!...এখন আবার এই রাধানগরের ওপর কত টান।...মেয়েদের স্কুল বসাব, জঙ্গল পরিষ্কার করাব, ওপরে লেখাপড়া করে রাস্তাঘাট তোরের করাতে হবে...সব স্ননতে স্ননতে আসছিলাম...হাসিতে পেট গুড়-গুড় করছে,

কিন্তু বলি কাকে ?...চাপা হাসিটাকে বেশ প্রাণ খুলেই মুক্তি দিলে।

আমি এমন অপ্রতিভ আর বিমূঢ় হয়ে গেছি যে কি বলব, কি করব যেন ভেবে উঠতে পারছি না। আমার হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে ধরে এসব কাহিনী বলে কেন ? একটা যে বাগড়াটে ছোট-পাকানে পাড়া-গেয়ে বড়ী এটা তো বেশ বুঝা যায়, কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে, এ যেন একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া।...পাগল কি ?... কিন্তু তারও লক্ষণ তো কোন দেখা যাচ্ছে না...

আমার অবস্থাটা দেখে হাসিটা আরও বেড়ে গেল বুড়ীর। বেশ জমে এসেছে, মাথাটা ছলিয়ে ছলিয়ে বললে, “তুমি যে একেবারে অবাক হয়ে গেলে গো! তবে আরও শোন—অবাক হবার এখনও অনেক বাকি আছে। ক্ষেমী বামনীর তো জানতে কিছু বাকি নেই—বলি, মেমসাহেব পাঁহাড় থেকে নামতেন নাকি একুনি ?—মনঃ এইসা এক মোচড় দিয়েছে যে!...ভাটা পড়ুক, তবু জমিদারই তো ?—রটিয়ে দিয়েছে আবার একটা বিয়ে করবে—এই তখন এসেছে সাত-তাড়াতাড়ি নেমে। এখন এই রাধানগরই মগ্গ, ঐ সোয়ামীই ইন্দির-চন্দো—দেখছ না ঠাটব্যাটের ঘটা ?...সাধে কি বাবা বলে ?—গুঁতোর চোটে বাবা বলায় ; এখন ঐ দোজবরেরই মন জোগাতে...”

আমিও কুটুস করে দিয়েছি কামড়।...ছাড়ব! আমার নাম ক্ষেমী বামনী বাপু!—বলা মুখ, বাদশাকেও রেহাই দিই না। বললাম, “নাতির আমার বয়েস হয়েছে, তার ওপর নাতবৌকে ঘর আলো-করা রূপও দিয়েছেন ভগবান,

এর ওপর যদি আবার নাতবৌ আমার সাজে-পোশাকে, হাবে-ভাবে...”

এই সময় একটা ব্যাপার হ’ল; আমার পেছনে খানিকটা দূরে একটা আওয়াজ উঠল—“ঠানদিদি যে! পথে দাঁড়িয়ে করছ কি ? একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে জোগাড়-বস্ত্র করে রাখো তো পূজার, আমি চৌধুরীদের বাড়ীটা সেরে এই এলাম বলে।—সাজকেও যেন গাড়ী ফেল করিয়ে দিও না, দোহাই।...ইনি কে ? নতুন দেখছি যে...”

ফসাঁ, একটু রোগা-রোগা; গায়ে নামাবলি, বয়সও প্রায় আমারই মতো। গ্রামের ডেলী-প্যাসেঞ্জার পুরোহিত, কথাগুলো বলতে বলতেই হন-হন করে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বড় রাস্তা থেকে নেমে চৌধুরী-বাড়ীর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। “ইনি কে ?”—বলে একবার আমার দিকে চকিতে আড়ে চেয়ে নিলেন, কিন্তু উত্তর শুনবার ফুরসত কোথায় ?

—দিচ্ছেই বা কে ?

বুড়ী মোটা চশমার ওদিকে চোখ দুটো কুঁচকে পিট পিট করে একটু আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর নাক-মুখ সিটকে আমার পাশ কাটিয়েই ঠক-ঠক করে লাঠি ঠকতে ঠকতে গেল বেরিয়ে।

ক্ষেমী-বামনী, বলা মুখ, সে বাদশাকেও রেহাই দেয় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ স্পষ্ট-স্পষ্টই কানে গেল—

“কি রকম গো! পোড়ারমুখো মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরের বৌয়ের কেছটা আগাগোড়া শুনলে, একবার-বললে না যে আমি অমুক, পুরুত নই।”

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসাহানা দেবী

স্বর্ণকমল হাতে,

আসিলে স্বপ্ন হস্তের গগনে শুকভারা ছিল সাধে।

ভবন ময় সব,

নিশীথ স্বপ্নমজ্জিত ভুবন স্রুতি অন্তরে ধবে—

সুগের প্রভাত সম,

চারিদিক করি’ উজ্জল মনোরম ;

ধরণীর শির চুমি’,

আজার পথে আমিরা হেথায় এলে বল কোন্ পথের পথিক তুমি।

কণ্ঠে ভরিয়া গান,

—যেন কোম আস্থান—

গাহিয়া জাগালে জীবনের মন প্রাণ,

হাস্ত হোল অবলান।

ভোরের আলোতে দিগে গেল কারে ডাক :

—এলো সেইদিন,—সে পঁচিশে বৈশাখ।—

তুলে মিলে বীণাধারি,

আপনার সুরে সুর দিলে যবে আমি’—

আনন্দে কোম মন-উৎসবে মাস্তি’—

প্রকৃতি সাক্ষর বরণের ডালা তুলিয়া দিবসরাতি।

গুহু কাহার আসন বিহার আমি’,

হৃদে হৃদে কাননে কাননে শুধু কানাকানি।

পাথে দালা ভারি তরে,

তাহারি চরণে পড়িতে করিয়া ফুল কোটে ধরে ধরে।

বিশ্বভূবন বিশ্বয়ে রহে চাহি’

তব পানে, ওগো বাণীর অমৃতবাহী,

ভারি বিচিঙ্গ রূপরসমুখা পান করে অবগাহি',
অন্ত নাহি যে নাহি।

হে কবি, অমরকবি,
হে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের হবি,
রেখে গেছ একে বিশ্বের হিয়াপটে,
তোমার প্রাণের ঢেউগুলি সব লেগেছিল কোন্ ভটে।
অতুলন ভব যন্ত্রির এই অবর্ণ্য ফুলগুলি,
চিরবসন্ত-মালঞ্চ তারি' র'বে চিরকাল ফুটিয়া আমন তুলি'।

হে কালদর্শী, হে শিল্পীগড়াই,
বিরাট প্রতিভা কিরণেচ্ছল তোমার রাজ্যপাট।
কত অগণন ফুলভ বনরতনে পূর্ণ ভব রাজভাণ্ডার,
রাশি রাশি ভরা কত রূপসম্ভার।
প্রতি কথা ভব কি যে অপূর্ব বাণী,
কণ্ঠেতে ধেন কথা কয় বীণাপাণি
অপরূপ সঙ্গীতে,—

হৃদ তোমার কল্লোলি' চলে গুটিনীর গুটীতে :

কুহু কুলু কুলু ফল ফল ফুলে ফুলে,
বহি চলে কোথা কোন্ গিরিপাদমূলে,—
বনানীর গুরুহায়ে,—
দিকে দিকে কতু রাজাপথে কতু ছামলের গায়ে গায়ে।—

—কবে কোন্ পর্বতে,
রাজার ছলান চলেছিল কোন্ মেঘের শুভ্র রথে,
আনিতে জিনিয়া পাষাণপুত্রীর পর্বতহৃদিতারে
মাশিরা দৈত্য—ছিল যে জাগিরা দ্বারে।—

—কোথার মেঘের গায়,
মরালীর ওই স্তম্ভর পাখা হেলিয়া গগনে কোন্ পথে তেলে যায়।

—কোন্ শৃঙ্গের ধবল ভূষার 'পরে
কে নিকরৈর বগ্ন ভঙ্গ করে।—
গিরিশুভ্রা গঙ্ঘরে,
কোন্ মুনি ধ্যান ধরে।—

—কোথা নীল সরোবরে,
করেছিল কারা জলকেলি কবে কমল তুলিয়া করে।
কবে কোথা কোন্ অঙ্গুরা সে রূপসী,
গেয়েছিল কার প্রাণের রাগিণী কোন্ প্রাঙ্গণে বসি'।—
রাজার কড়া, বৌবন-ডাক শুনি এক দিন কবে,
হাড়ি' আপনার বীরের সজ্জা চেয়েছিল কোন্ বীরশ্রেষ্ঠের
ছিল বনবালে যবে।—

কত কথা, হবি, কত কাহিনীর স্তম্ভর বস্তার
তুলিয়া চলে যে হৃদ তোমার প্রোভসঙ্গীতে তার।

ওগো মহীয়ান, ওগো মহারূপকার,
হে সৌরভের গৌরবমণিহার,
নিবিলের অন্তর,
পূর্ণ করিয়া দিয়েছ তরিয়া ওগো ধ্যানী স্তম্ভর।
ভব গৌরবে গৌরবী আজ যবে,
জগৎ জীবন তোমার কাহিনী কবে,
মর্মে মর্মে মুরতি তোমার র'বে
চিরকাল চিরদিন।

শিল্পীর ধ্যান-অন্তরে র'বে তোমার প্রেরণা চিরঅন্তর্লীন।

এই বরণীর বেগেছিলে কত ভালো,
মননে তাহার ছেলে দিয়ে গেছ আলো।
দিতে ভাষা, দিতে গান,
দিতে রূপ, রস, বৈচিত্র্য মহান
এসেছিলে তুমি, কবি,
রেখে যেতে ভারি ছবি।

শারদ পূর্ণিমার,
স্বরের জ্যোৎস্না দিয়েছ বিছারে বিশ্বের আভিনার।
ভরা প্রাণের বনবরিষণ সাধে,
কণ্ঠ ছাড়িয়া গেয়েছ গান সে বরষামুখর রাতে
বসন্ত উৎসবে,
চিরস্তম্ভরে দিয়ে গেলে ডাক স্তম্ভর সব যবে।
জীবনের সাদি ভ'রে
দিয়েছ সাজারে পুজার কুসুম কাহার পুজার ভরে।

'আমার কুসুম আনি',—
এসেছি চরণে নিবেদিতে আজ প্রাণের প্রণামখানি।
আজ নাই, তুমি নাই,
আমার কণ্ঠ বুকে করে ভব সে-পরশ মাঝে ঠাই।
শৈশব হ'তে ভব গীতমুখা পানে,
তুনেছি গানের মর্মে কথা কানে,
নিবেছি তাহার গভীর প্রাণের ভাষা,
চিনেছি স্বরের সুষমার মাঝে কি তার নিহিত আশা।
তোমার কাব্যে নিখিলের সনে হোল পরিচয়, হোল মন
জানাজানি,
তোমার কাব্যে তারত-গাথার শুনি কতভাবে তারতের মহাবাগী।

আমি আজ রেখে যাই—
আমার কাব্যে তোমারি লিখন—“তুলি নাই, তুলি নাই”।—

কীভাবে দিল মহিয়ার এই উচ্চশিখর যেই শিল্পীর তুলি,
মরণের মারে অমরণ নিল তাহারে হুমার তুলি'।

শুভারম্ভ

অধ্যাপক শ্রীচিহ্নাহরণ চক্রবর্তী

নূতন নাটক বা সিনেমার বইয়ের শুভারম্ভের বিজ্ঞাপন অহরহ আমাদের চোখে পড়ে। আমরা পরমাগ্রহে নূতন নাটকভিনয়ের রসাস্বাদন করি—যাহাদের অভিনয় নৈপুণ্য অভিনেতৃত্বমাজের মুখোজ্জল করিয়াছে সর্গোরবে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের আচরণ ও কথাবার্তায় যে একদল লোক বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করেন ভাবান্তিহীন আমরা তাহা লক্ষ্য করি না। অথচ একটু অবহিত হইলেই আমরা নিজেদের ক্রটিতে নিজেরা বিন্মিত হইব—ভাষাপ্রয়োগে আমাদের শৈথিল্য আমাদেরকে অপ্রস্তুত করিবে।

হেঁয়ালি ছাড়িয়া কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলা যাক। বাক্য মধ্যে শব্দসম্মিলনের ক্রম এবং একই শব্দের উচ্চারণের আংশিক উচ্চতা বা নীচতা অর্থের যথেষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে। পাশাপাশি দুইটি শব্দ বিচ্ছিন্ন ভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে সংযুক্ত বা সমাসবদ্ধ সন্ধিসংযুক্ত অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই তাহার পরিবর্তন হইয়া থাকে। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় বিশেষণ শব্দের উচ্চারণে যে জোর পড়ে বিশেষণ শব্দটিকে বিশেষ্যের সহিত জুড়িয়া সমাসবদ্ধ করিয়া দিলে সে জোর নষ্ট হইয়া যায়—বিশেষণের সার্থকতা কমিয়া যায়। তাই বৈয়াকরণ বলেন—বিশেষণের সহিত বিশেষ্য জুড়িয়া কর্মধারয় সমাস করিলে বিশেষণের অর্থ গোণ হইয়া পড়ে এবং বিশেষ্যের অর্থ প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় শুভারম্ভ, পরমাগ্রহ, পরমাত্মীয়, ঘনাক্ষকার প্রভৃতি শব্দগুলি ভাঙ্গিয়া শুভ আরম্ভ, পরম আগ্রহ, পরম আত্মীয়, ঘন অক্ষকার ব্যবহার করাই সঙ্গত। তাহাতে যথাস্থানে জোর পড়ে—অভীষ্ট অর্থ প্রকাশে কোন বাধা হয় না। বক্ষিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও এই জাতীয় একাদিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইবে বলা চলে না। বক্ষিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কয়েকটি প্রয়োগ এখানে উদ্ধৃত করা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না।

সেই যুক্ত দ্বার পথে, কীপালোকে, এক ছায়াতুল্য সূঁচি দেখিলেন।

—বিষয়ক (৪৪শ পরিচ্ছেদ)

পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে।

—প্রাচীন সাহিত্য, রামায়ণ, পৃ. ৫

শব্দগুলিকেও কল্পনাচ্ছাদনে আবরিষত করিতেছে।

—প্রাচীন সাহিত্য শব্দমালা, পৃ. ৩৪

মেনক্ষীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলানুভব দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্বদা চলাকেরার জন্য সে হয় নাই।

—প্রাচীন সাহিত্য—কাদম্বরী চিত্র, পৃ. ৫৬

সন্ধ্যার সমস্ত শান্তি এবং শ্রান্তি এবং দুঃস্বপ্নাদি কবি মুহূর্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিয়াছেন।

—প্রাচীন সাহিত্য—কাদম্বরী চিত্র, পৃ. ৬০

দীর্ঘায়ু বিয়ল হইয়া আসিয়াছে।

—আত্মপরীক্ষা, পৃষ্ঠা ২১

কেবল পূর্ববর্তী বিশেষণের সঙ্গে পরবর্তী বিশেষ্য জুড়িয়া দিয়াই অস্থবিধায় পড়িতে হয় এমন নহে। বিশেষ্যকে অপর পদের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া বিশেষণটিকে বিচ্ছিন্ন রাখাও সঙ্গত নয়। তাই গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন না বলিয়া ‘গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন’ বলা উচিত। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে এরূপ না করিলে বিশেষণটি বড়ই দুর্বল হইয়া পড়ে।

বাংলায় অনেক স্থলে ক্রিয়া দুইটি পদের সমবায়ে গঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে একটিকে অপর পদের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার একটা রীতি মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেও সমর্থন করা চলে না। ‘নামোল্লেখ করা’ ‘রসাস্বাদন করা’ ‘মুখোজ্জল করা’ ‘দ্বারোদ্ঘাটিত হওয়া’ ‘কার্য্যারম্ভ’ ‘ভারপ্রাপ্ত করা’ প্রভৃতি স্থলে সংযুক্ত শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অত্যাধিক অস্থবিধা হয়—কর্মপদগুলি যথাযোগ্য মূল্যনাভে বঞ্চিত হয়। বাংলায় অনেকক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সমাসবদ্ধ পদের মধ্যেও সন্ধি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রথাই প্রচলিত হইতেছে দেখা যায়। প্রয়োজনানুসারে না বলিয়া এখন আমরা প্রয়োজন অনুসারে বলিতে দ্বিধা বোধ করি না—বিবাহ-উৎসব, মাতৃ-আজ্ঞা, গ্রাম-অগ্রায়, প্রীতি-উপহার, জৈশ্বর-ইচ্ছায়, উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভৃতি প্রয়োগে কেহ আপত্তি করেন না। বরং সন্ধি করিলে তাহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে। সুতরাং এখন আর নূতন করিয়া সন্নিহিত দুই পদের মধ্যে সন্ধি করিবার চেষ্টা বাংলার প্রকৃতি-বিরোধী। ইহা দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা শক্তি সঞ্চারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে ক্রমবর্ধমান আর এক জাতীয় প্রয়োগের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। আজকাল স্থানে স্থানে ‘অনস্মীকা’ ও ‘অবিস্মরণীয়’ এই দুইটি কথার ছড়া-

ছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কথা দুইটির মধ্যে কোন দোষ নাই সত্য তবে কোন বাক্যে বিধেয় রূপে ইহাদের ব্যবহারে অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশিত হয় কিনা ধীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। বস্তুতঃ সেরূপ স্থলে নিষেধের অর্থ গোণ হইয়া পড়ায় প্রকৃত অর্থের প্রতীতি হয় না। ‘এ কথা অনস্বীকার্য’ আর ‘এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই’—এই দুইটি প্রয়োগের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে। প্রথম বাক্যে ‘না’-এর উপর আদৌ জোর পড়ে না অথচ বক্তা অবশ্যই সেই জোর দিতে চান। একখানি বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে একজন লিখিতেছেন—‘হায় হায়, আহা-উহ, খেদ, দীর্ঘশ্বাস, অভিসম্পাত প্রভৃতি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের স্বপরিচিত গুণাবলী এখানে অল্পপস্থিত।’ স্পষ্টতই ইংরেজী অ্যাব্‌সেন্টের প্রতিশব্দ রূপেই অল্পপস্থিত কথাটি এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী না জানা পাঠক ইহার তাৎপর্য কতটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলা শক্ত। যে সকল পাঠক নির্বিচারে সকল কথা মানিয়া লইতে চান না এখানে নিষেধের অপ্রাধান্য তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইবে না। ‘অনন্ত’, ‘অনবন্ত’ প্রভৃতি শব্দও আজ অনেকে বিধেয়রূপে ব্যবহার করিতেছেন—ইহাদের প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে লেখক বা পাঠক কাহারও তেমন লক্ষ্য আছে মনে হয় না।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অল্পসারে যেখানে প্রতিষেধের প্রাধান্য বিবক্ষিত সেখানে নঞ-তৎপুরুষ সমাসই হইতে পারে না। অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাংলায় মানিতে হইবে এমন দাবি করা চলে না। তবে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইলেও একটা যুক্তি ও শৃঙ্খলা থাকা চাই। সর্বাপেক্ষা বেশী দরকার অর্থের স্পষ্টতা।

যে কোন শব্দ ব্যবহার করিবার সময়ই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা দ্বারা অভীষ্ট অর্থ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইতে পারে কিনা—সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর তাহা বুঝিবার পক্ষে কোন বিশেষ বাধা আছে কিনা। বাধা থাকিলে এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে বিস্তৃত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও বাঞ্ছনীয় নহে। তাই সাধারণের জন্য লিখিত গল্পের মধ্যে যখন নিশীথ রাত্রে হ্যারিকেনটি অল্পজ্বল করিয়া দেওয়ার কথা বা ‘অল্পদিত প্রাতে সেতার লইয়া’ বসার কথা শুনি তখন লেখকের উদ্দেশ্য ও পাঠকের অবস্থা চিন্তা করিয়া বিচলিত হই।

বস্তুতঃ ধ্বনিমাধুর্যের প্রলোভনে এবং শব্দাঙ্কুরের আকর্ষণে বাংলা ভাষায় নিত্য যে সব নূতন নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে বা প্রাচীন শব্দ নূতন ভাবে নূতন অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে তাহাতে সাধারণ পাঠকের পদে পদে বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু সাধারণতঃ পাঠক-সমাজ এ বিষয়ে উদাসীন—ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা পরিতৃপ্ত—রহস্য অল্পসন্ধানের আগ্রহ বা স্ববোগ অনেকের নাই। লেখকও এ বিষয়ে সর্বত্র যথোচিত অবহিত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ অবস্থা কখনই কাম্য হইতে পারে না। ভাষার সারল্য, সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধির প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের আন্তরিক অহুসার ও সজাগ দৃষ্টি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের প্রধান অবলম্বন। তাই প্রত্যেকটি নূতন শব্দ বা নূতন প্রয়োগের ভাল-মন্দ বিচারের জন্য সকলকে যথা-সাধ্য যত্ববান হইতে হইবে। খোলা মনে বিচার করিলে অনেক ক্রটি ধরা পড়িবে এবং অল্প আয়াসেই সেগুলির সংশোধন সম্ভবপর হইবে—ভাষা জড়তামূল হইয়া সকলের সহজবোধ্য হইবে।

সর্বোদয়ের দৃষ্টি

দাদা ধর্মাদিকারী

অল্পবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

এশিয়া সাবধান—বর্তমান সময়ে দুনিয়ায় দুইটি সম্প্রদায়-পীঠস্থান, একটি মস্কো, আর অপরটি ওয়াশিংটন। দুই গীর্জা। এক ক্রেমলিন, আর অপর ক্যাপিটল। একটির পুরোহিত জোসেফ ষ্টালিন, আর অপরটির হেরিস ট্রুম্যান। কিছুদিন যাবৎ এই দুই পীঠস্থান হইতে মানব-জাতির উদ্ধারের জন্য নূতন নূতন ঘোষণা ও নূতন নূতন আয়োজন বিজ্ঞাপিত হইতেছে। এদিকে ভেরী বাজে ত

ওদিকে শঙ্খনিবাদ হয়। আর খানিকক্ষণ ধরিয়া নূতন নূতন ধ্বনিতে আকাশ মুগ্ধ হইতে থাকে।

এশিয়ার জন্ত ব্যবস্থাপত্র : এদিকে কিছু দিন হইতে ট্রুম্যান নিজ তুর্ক বেষ একটু জোরে বাজাইতেছেন। কিছু দিন আগে আমেরিকাবাসীদের তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের বন্দুক চাই, উপকরণ চাই, আর চাই মাখন। উপকরণ, হাতিয়ার আর মাখন! বড়ই বিচিত্র এই

সমাবেশ! উপকরণ এবং হাতিয়ারেরও স্বেচ্ছ-পদার্থ আবশ্যক হয়, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র চালাইবে তাহাদের শরীরে যদি 'তাকত' না থাকে, তাহা হইলে দুই-ই ত বুঝা; তাই ট্রুম্যান সাহেব বলিয়াছেন, মাখনও চাই। আমেরিকার জন্য ত তাহার ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন হইতেছে অস্ত্র, উপকরণ আর মাখন; কিন্তু প্রাচ্যের জন্য ব্যবস্থা একেবারেই আলাদা। এখানকার কথায় তিনি বলেন যে, এখানে লাঙ্গল চালান দরকার। কারণ প্রাচ্যের মুখ্য ব্যাধি হইতেছে বুভুক্ষা। তাই মহান উদারতার সহিত তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—প্রাচ্যে অন্নোৎপাদন বৃদ্ধি করার নিমিত্ত আমেরিকার উচিত হইবে টাকা-কড়ি বিজ্ঞান, এমন কি প্রতিষ্ঠা দিয়াও সহায়তা করা।

খুব সুন্দর চিত্তাকর্ষক কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই, বস্তুতঃ ইহা কি কেবল নিরপেক্ষ উদারতাই? আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক স্বেচ্ছ পুণ্য ও আশীর্বাদ অর্জনের নিমিত্তই কি প্রাচ্যদেশসমূহের সহিত এই শুভ ব্যবহার করিতে চাহেন? অথবা এটা এমন একটা দানবীর্যতা যার পশ্চাতে কোন সম্প্রদায়গত অভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে?

বলদেবের নব অবতার : কথিত আছে, অতি প্রাচীন কালে, এই স্থিতি যখন বাঙ্গাল্যবস্থায় ছিল, তখন ট্যুবল কেন্ নামে এক কারিগর কেবল তলোয়ার আর তলোয়ার তৈয়ারি করিত। যখন সে দেখিল যে ঐ তরবারি দ্বারা লোকে মূলা-কাঁকুড়ের মত একে অন্যকে কাটিতেছে তখন তাহার অন্ততাপ হইল, আর সে সর্বপ্রথম হল বানাইল। তদবধি মানুষ একে অন্যকে মারার পরিবর্তে জমি চাষ-আবাদ করিয়া পরস্পরকে খাওয়াইতে ও পোষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ট্যুবল কেন্ যে হল বানাইল—উহার এবং বিধ ব্যবহার তো সর্বত্র হইল না। শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলদেবের আয়ুধ হলই ছিল, কিন্তু সে হল দ্বারা তিনি ক্ষেত চাষ করিতেন না, মানুষের কলিজা চিরিতেন। আমাদের আশংকা এই যে, ওয়াশিংটনের পুরোহিত এশিয়ার দেশগুলিতে যে হল চালাইতে চাহেন, তাহার পশ্চাতে বলদেবের মনোবৃত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। তিনি তরবারিকে হলে রূপান্তরিত করিতে চাহেন না, বরং হলে তরবারির ভাবনা ভরিয়া দিতে চাহেন। আমেরিকায় সিপাহীদের মাখন খাওয়াইয়া তিনি বন্দুক চালাইবার জন্য পুষ্ট করিতে আর উপকরণ হইতে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারি করিতে চাহেন। প্রাচ্য দেশসমূহে জঠরাগ্নি ধুক্ ধুক্ করিতেছে। এখন তথায় হাতিয়ার ও সরঞ্জামে কাজ হইবে না। সেখানে আবশ্যক জঠরাগ্নিকে অগ্নের আলোতি প্রদান। অতএব

ট্রুম্যান এখানে বৈশ্বানরের হোম করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনি মক্কো-বিরোধী উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে চাহেন। তিনি চাহেন যে, এখানে যে অন্ন উৎপাদন হইবে তাহা কমুনিজম বিরোধী ভাবনা দ্বারা অভিমল্লিত ইউক, তাহাতে ঐক্য মাদকতা বৃদ্ধির শক্তি থাকুক।

পরশুরামের প্রক্রিয়া : মক্কোতে গীর্জা রহিয়াছে, উহার প্রধান পুরোহিতও দুনিয়াকে কাস্তে ও হাতুড়ির প্রতীক দিয়া ছিলেন, কিন্তু পরশুরামের পরশু যেমন গাছ কাটার পরিবর্তে ক্ষত্রিয় কাটিতে সুরু করে, এই কাস্তে এবং হাতুড়িতেও তেমনি লোকের গলা কাটার ও মাথা ভাঙ্গার ভাবনা ভরিয়া দেওয়া হইল। লোকে বলে ঔষধে যত বেশী ভাবনা ভরিয়া দেওয়া যায়, ততই তাহার গুণ—পোটেন্সী অথবা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। লোকে মনে করে কোদাল মাটি খুঁড়িবার হাতিয়ার, কৃষির একটি সাধারণ উপকরণ; কিন্তু সেই বেলচা-ই খাকসারদের হাতে পড়িয়া শব্দ বনিয়া যায়। আহুতিরূপে মানুষের ব্যবহার চাই না।

কমুনিজমের গীর্জায় যে পুরোহিত ধূপ জাল'ন, তিনি কৃষির ও শিল্পের যাবতীয় উপকরণকে অস্ত্রের কাজে লাগাইতে চাহেন, আর জনতন্ত্রের গীর্জায় জনতার মাঝে ধূপ দীপ নৈবেদ্যের আড়ম্বর প্রদর্শনকারী পুরোহিতও উৎপাদন এবং কারিগরী যাবতীয় উপকরণকে অস্ত্রশক্তির বিকাশ-কল্পে ব্যবহার করিতে চাহেন। নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক সোমযজ্ঞের নিমিত্ত দুই সম্প্রদায়ের এই পুরোহিতেরা মাখনে আলতির সঙ্গে মানুষের চর্বি আর মানুষকেও আলতি দিবেন।

করজোড়ে আমাদের প্রার্থনা এই যে, সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগে কাণ্ডজ্ঞান হারাওয়া সংসারের গীর্জায়ের এই প্রধান পুরোহিতেরা প্রাচ্যের মানুষদের যেন নিজ নিজ পরীক্ষাগারের ধরগোস বা আপন আপন হোমশালার অজাপুত্র মনে না করেন। আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা কাহারও আশ্রিত বা মুখাপেক্ষী হইয়া কুকুরের মত মরিতে চাই না, আর কুকুরের জীবন যাপন করিতে চাই না। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী—কিন্তু স্বয়ংতৃপ্ত নহে—মানব হিসাবে আমরা জগতের সাংস্কৃতিক প্রগতি ও সভ্যতার রক্ষাকার্যে পৌরুষের সহিত যোগদান করিতে চাই।

বাজারের ময়পুরী : পুঁজিবাদী সভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় সংস্থা বাজার। বাজারে রহিয়াছে ছায়ার চঞ্চলতা ও মায়াবী মাদকতা। মায়াবী স্বরূপ বড় বড় বুদ্ধিবাদীরাও

নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পরাজিত হইয়া অস্তে তাহাদের এই কথাই বলিতে হইয়াছে যে মায়া অনির্বচনীয়। অর্থাৎ কেহই বলিতে পারে না যে উহা কি? মায়ার অপর লক্ষণ হইতেছে ধোঁকাবাজি, ছল-প্রপঞ্চ। মায়াস্বরের অদ্ভুত ময়-সভায় দুর্বোধনের ছায় চতুর ব্যক্তিও জল এবং স্থলের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। সংসারের সম্পত্তিবাদী ব্যবসায়ীরা বাজার নামধেয় যে পরম অদ্ভুত ধোঁকাগৃহ নির্মাণ করিয়াছে, তাহাতে ময়-সভার বিশেষত্বের সহিত চক্রব্যূহের দুর্গমতাও বিদ্যমান।

উপযোগিতা ও বিনিময় : বাজারে যে সকল জিনিষ আসে তাহাদের উপযোগিতার প্রশ্ন গৌণ হইয়া যায়। উপযোগিতার আগে বিনিময়ের কথা ভাবা হয়। বিনিময়ের অর্থ জিনিষের অদল-বদল। যে জিনিষের বদলে অপর জিনিষ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, বাজারে তাহার কদর হইয়া থাকে। অথবা অন্য কথায় বলিলে, যে বস্তুর জ্ঞাত অধিক হইতে অধিকতর মূল্য পাওয়া যায়, তাহার গুরুত্ব হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বাজারে উপযোগিতার মূল্য নহে, মূল্য বিনিময়ের।

আবশ্যকতা ও চাহিদা : অতএব বাজারে চাহিদার যতটা গুরুত্ব, বাস্তবিক আবশ্যকতার ততটা গুরুত্ব নাই। আবশ্যকতা এক জিনিষ, আর চাহিদা আর এক জিনিষ। কৃত্রিম উপায়ে আবশ্যকতা বাড়ান বা কমান যায় না, কিন্তু চাহিদার যোগাযোগ যুক্তি-কৌশলে করা বাইতে পারে। চাহিদার নিয়মন করিতে যে সকল লোক দিক্‌দৃষ্টি, তাহাদের মূন্ডা বাজারে চলিয়া থাকে।

ঘরে আর বাজারে : পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দ্রব্যের মূল্য স্রেফ বাজারেই নিরূপিত হইয়া থাকে। তাই বেচারী লক্ষ্মীতে পৰ্বন্ত চঞ্চলতার কলঙ্ক লাগিয়াছে। ঘরে যে সব বস্তু হয় তাহাদের নির্ধারিত উপযোগিতা থাকে, তাই তাহাদের মূল্যও নিশ্চিত এবং স্থায়ী হইয়া থাকে। ভাত, ডাল, দুধ, তরকারি, জামা, জুতা, লেপ, খাট-পালঙ্ক, বাসন-কোসন, লঠন ইত্যাদির উপযোগ ব্যবহার নিশ্চিত, আর তাহাদের উপযোগই তাহাদের মূল্য। তদ্রূপ সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, শিল্পকলা, সেলাই-ফোড়াই, জরি-কাজ এই সবেরই ব্যবহার ঘরে। বস্ত্র, কলা, বিদ্যা ও গুণ যতক্ষণ ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহাদের কুলীনতা, আর কুলীনতা হেতু তাহাদের মূল্য স্বপ্রতিষ্ঠিত। বাজারে গেলেই চাহিদা অল্পসারে রূপ, গুণ, কলা ও বিচার মূল্যভেদ হইয়া থাকে।

দুই বিরোধী নীতি : আজ ত বাজারের কৃত্রিমতা চরম-সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাই বাজারের উঠতি-পড়তি বুঝা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অতীত। দুইটি কথা

বুঝা যায়। এক, যে জিনিষ যত বেশী আবশ্যক, সে জিনিষের উৎপাদন যদি কম হইয়া যায় ত তাহার দর চড়িয়া যায়। দ্বিতীয়, এই কথাও বুঝা যায় যে, যে জিনিষের আবশ্যকতা যত বেশী হইবে সে জিনিষ লোকের পক্ষে তত অলপ্যাসে স্থলভ করা যায়। প্রথমোক্ত অবস্থাটি হইতেছে পুঁজিবাদী সংগঠনের চোতক, যেখানে আবশ্যক বস্তুসমূহের মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে ও লোকের কষ্ট বাড়িতে থাকে। দ্বিতীয়টি মানবতার অর্থনীতি। এই নীতি অনুসারে যে জিনিষ যত বেশী দরকারী তাহা তত স্থলভ হইয়া থাকে। বিধাতার ইহাই বিধান। জীবনরক্ষার জন্য বাতাস ও জল সর্বাধিক প্রয়োজন, অতএব এই দুই পদার্থ সর্বাপেক্ষা স্থলভ এবং সস্তাও। হাওয়া ও জলের পরে অন্ন-বস্ত্রের স্থান। সুতরাং অন্ন-বস্ত্রও স্থলভ এবং সস্তা হওয়া চাই। পরন্তু, আজ বাজারে দ্রব্যের ভাও যেভাবে বাড়ে ও কমে তাহাতে কোন নিয়মের ব্যবস্থা খুঁজিতে যাওয়া বুঝা। আজিকার তেজমন্দি কোনরূপ ব্যবস্থা-জনিত নহে, ব্যবস্থার অভাব-জনিত।

চাহিদা ও পুঁতির যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রণ : ব্যক্তি ও ব্যাপারীদের সত্য নিজেদের ইচ্ছামত অথবা লাভের জন্য জিনিষের চাহিদার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

কৃত্রিম উপায়ে চাহিদার ধ্বংস নিয়ন্ত্রণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পুঁতিরও নিয়ন্ত্রণ হইয়া থাকে। প্রয়োজনের সঙ্কোচন একটা সীমা পর্যন্ত করা যায়, কিন্তু তাহার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে। চাহিদা ও পুঁতির যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করা বাইতে পারে।

পরিস্থিতিগত বিরোধ : শহরে লোকে জিজ্ঞাসা করিত, “প্রয়োজনীয় জিনিষ কবে সস্তা হইবে? চাল, ডাল, কবে হইতে সস্তা দামে পাওয়া যাইবে?” প্রশ্নে তাহাদের উবেগ ও বেদনা ফুটিয়া উঠিত। নেতাদের অনেকে তাহা-দিগকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, “আমরা কি করিব? আমাদের হাতে শাসনভার আসিলে টাকায় পাঁচ-সের করিয়া চাল দিব।” এই সব নেতাই যখন গ্রামে যাইতেন, চাষীদের বলিতেন, “দেখিব, তোমাদের চাষ-আবাদে লাভ কেমন না হয়? চাল-গম, কার্পাস, আখ, চীনাবাদাম সব কিছুই দাম বাড়িবে। কিশাণদের আমরা মরিতে দিতে পারি কি!” খরিদারদের বলিতেন, “জিনিসপত্র তোমরা সস্তায় পাইবে।” এই অসঙ্গতির প্রতি কেহ যদি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত তো তাহারা বলিতেন, “ইহা তো সরকারের কাজ। আবশ্যক বস্তু বেশী দামে কিনিয়া কম দামে বিক্রয় করা সরকারের কর্তব্য।” ইহা দ্বারা সঙ্কট এড়ান যায়, কিন্তু সঙ্কটের কারণ দূর হয় না।

আট-দশ দিন পূর্বেও মজুর বলিত, “পয়সায় আমরা মজুরি চাই না। চাল-গমে চাই।” আজ তাহারা বলে, “চাল চাই না, পয়সা দাও।” ইহার অর্থ আদৌ এই নয় যে, চাল-গমের আবশ্যকতা কমিয়া গিয়াছে, আর পয়সার আবশ্যকতা বাড়িয়াছে।

বাজারেরই অন্ত হওয়া চাই : এই সব পরিস্থিতির পরি-বর্তনের একটিই উপায় আছে, আর তাহা এই যে, ধীরে ধীরে বাজার নামক সংস্থার অন্ত হওয়া চাই। জিনিসের বিশেষ ডিপো থাকিবে; প্রয়োজনমত জিনিস তথায় পাওয়া যাইবে। এখনও এবংবিধ ডিপো রহিয়াছে। ডাকঘরে টিকিট পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে কেহ দোকান বলে না। আজ গুরুত্ব বস্তুকে দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় পয়সাকে।

পয়সা মানদণ্ড, সম্পত্তি নহে : ওজনের বাটখারার মত, গজের মত, এবং থার্মোমিটারের মত, পয়সা যে মাপিবার উপায় মাত্র, নিজে সম্পত্তি নহে—ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। থার্মোমিটার আমাদের স্বাস্থ্য নহে, গজ কাপড় নহে, সেইরূপ পয়সা সম্পত্তি নহে।

আপনি আজ কোন মজুরকে সোনা লইতে বলুন, সে অস্বীকার করিবে। কিন্তু পয়সা দেন ত আগ্রহে লইবে, যদিও তাহাতে না আছে সোনা, আর না আছে বিস্তর চাঁদি। পয়সার নামে কাগজের টুকরা সে আগ্রহে লইবে। পয়সা নিজে উৎপাদনের উপকরণ নহে, আর ব্যবহারের উপকরণও নহে, তাই উহার উপযোগিতা কমে ও বাড়ে।

বস্তুর শাস্ত্র মূল্য : বস্তুর আসল মান এইরূপ নহে। লবণ সব সময়েই নোনতা, শর্করা সব সময়েই মিঠা। পাকা কলা এক আনায় যখন একটি তখনও মিঠা, আর আধলায় যখন একটি তখনও মিঠা। যেখানে আধ-পয়সায় একটি কলা মিলে, সস্তা বলিয়া সেখানকার কলা পান্সে লাগে না; আর যেখানে পচা কলা আনায় বিক্রয় হয়, মাগুগি বলিয়াই তাহা সেখানে ভাল নয়। কলা মিষ্টি লাগে, উপকারী, ইহাতেই তাহার মূল্য। দাম কমিলে বাড়িলে উহার গুণে পার্থক্য হয় না।

বিনোবার ইঙ্গিতের সারাংশ এই যে, মুদ্রা অপেক্ষা বস্তুর প্রতিষ্ঠা যখন বাড়িবে তখনই আর্থিক স্বাস্থ্য, আর্থিক শ্রায় ও আর্থিক স্বাভাব্যতার প্রতিষ্ঠা হইবে। সোনা-রূপা, মনি-মাণিক্যের মূল্য কমাইয়া মাটির দাম বাড়াইবার যে অভিনব প্রক্রিয়া বিনোবা লোক-সমক্ষে ধরিয়াছেন, আর্থিক ‘বিমোক্ষে’র দিক হইতে তাহা নিতুল সংকেত ও অমোঘ উপায়।

আমেরিকার অল্পকম্পা-রাজ

মূলীভূত অভিযোগ : শ্রীমতী এলিনর রুজভেল্ট বলেন

যে, কমুনিজমের প্রতিকার কেবল তলোয়ারেই নহে, পেটের অন্নও হইতে পারে। ঠিক কথা বলিয়াছেন। তরবারি দ্বারা ত কেবল তরবারিরই সম্মুখীন হওয়া যায়। কোন মতবাদ বা বিচারকে তরবারি দিয়া বুঝা যায় না। প্রাচীনেরা কথায় কথায় বলিত যে, দৌলত, জমি, আর স্ত্রী, এই তিনটি পৃথিবীর যত ঝগড়ার মূলে। কথাটা বিলকূল ঠিক, কিন্তু অন্নের জন্ত যত ঝগড়া-ফেসাদ, পাপ, গালাগালি, টানা-হেঁচড়া হয়, অল্প কিছু জন্ত তেমন হয় না। তার কারণ অন্ন, জীবনের প্রথম প্রয়োজন। প্রাথমিক আবশ্যকতার মধ্যেও উহার ক্রম ঠিক বাতাস ও জলের পরে। গিরিধর কবিরায়ের মতে রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধ স্ত্রীর জন্ত হইয়াছিল, আর হোমারের মতে ট্রয়ের যুদ্ধও স্ত্রীর জন্তই ঘটয়াছিল। কিন্তু সংসারে কমুনিজমের প্রাদুর্ভাব ত অন্নের প্রশ্ন লইয়াই হইয়াছে। অন্ন-সংখ্যক লোকে এত অন্ন পায় যে তাহাদের উদর মশকের মত ফুলিয়া উঠে আর উহাতে ঠাসিয়া ঠাসিয়া ভরার পরেও উদ্ধত থাকেই। পরন্তু সংসারে এমন লোকের সংখ্যাই অধিক, সারা দিন মেহনত করা সত্ত্বেও পেটের এক কোণ ভরাও বাহাদের পক্ষে কঠিন। বাসি ভাতও তাহাদের মিলে না। ইহাই মূলীভূত অভিযোগ।

মূল কথা : রুশের তরবারি হইতে আমেরিকার তরবারি যদি বড় হয়, এবং আমেরিকার সিপাহীরা রুশিয়ার সিপাহীদের অপেক্ষা অধিক মালাই-মাখন খাইতে পাইয়া থাকে ত আমেরিকার তরবারি রুশের তরবারিকে পরাস্ত করিয়া দিবে; কিন্তু তাহাতে কমুনিজমের অবসান হইবে না। তাই আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেন্টের পত্নী বলেন যে, পেটের ভাত দিয়া কমুনিজমের সম্মুখীন হইতে হইবে, আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট বলেন যে, লাঙ্গল-মইয়ের দ্বারা তাহা রুখিতে হইবে। দুইয়ের একই অভিপ্রায়, উভয়েই মূলীভূত কথা বলিয়াছেন।

লোক-সংখ্যার প্রশ্নই আসল কথা : ছনিয়াতে এখন দুইটি প্রভুত্বপ্রয়াসী দল। উভয়েই যেন-তেন-প্রকারেই সমগ্র পৃথিবীর উপর নিজ বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। রুশ হইতে আরম্ভ করিয়া জাপান পর্যন্ত ভূখণ্ডকে পূর্বজগৎ বলা হয়, আর রুশিয়া বাদে সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকা যে ভাগে পড়ে তাহাকে পশ্চিম গোলাধ বলা হয়। এই পশ্চিম গোলাধে বিজ্ঞানের প্রগতি হইয়াছে এবং জীবনধারণের এক বিশিষ্ট চং বা স্তর তথায় স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। দৈহিক স্ব্থের এক পর্যাপ্ত উচ্চ আদর্শে সেখানকার লোকে পৌছিয়াছে। ঐ আদর্শ সংরক্ষণার্থে তাহারা নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক উপায় দ্বারা লোক-

সংখ্যার বৃদ্ধি অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাই তাহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস দানা বাধিতেছে যে, আমরা যদি নিজেদের লোকসংখ্যা বেহিসাবে বাড়িতে না দিই ত আমরা বেশ স্বথ-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব।

কিন্তু রুশিয়া ও রুশিয়ার পূর্ব দিকের দেশগুলিতে লোক বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকসংখ্যা যদি এইরূপে বাড়িতে থাকে তবে পূর্ব গোলাধার লোকের হাতে অমোংপাদনের জন্য পর্যন্ত পর্যাপ্ত ভূমি থাকিবে না। অমোংপাদন আশঙ্কিত হইতেছে। পৃথিবী দিন দিন সঙ্কুচিত হইতেছে। কোন দেশ একলা আলাদা থাকিতে পারিতেছে না। আমেরিকার মতই মানবজাতিকে বাঁচাইবার আগ্রহে আগ্রহান্বিত রাষ্ট্র পাশে থাকিয়া নিশ্চয়ই তামাশা দেখিতে পারে না।

বিপদের চিকিৎসা : পরিণাম এই হইবে যে, প্রাচ্যে অম-হীনের সংখ্যা বাড়িয়া চলিবে, আর পাশ্চাত্যকে, বিশেষতঃ আমেরিকাকে, তাহাদের পেটের খোরাকের কথা ভাবিতে হইবে। ইহা স্বস্পষ্ট যে, আজ ইউরোপ ও আমেরিকা ঘেরুপ ঠাটেবাটে থাকিতে পারিতেছে, তাহাতে কাটাইট করিতে হইবে।

এ বিপত্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার দুইটি উপায় আছে। এক, লোকসংখ্যা এখন যাতে না বাড়ে, আর দুই, অন্ন সম্বন্ধে এশিয়ার লোক পূরাপূরি আত্মনির্ভরশীল হইয়া যায়। ইতি-মধ্যেই আমেরিকা এই দুই দিকে চেষ্টা স্বরূপ করিয়াছে। ভারতে পরিবার-নিয়ন্ত্রণ ও সম্ভতি-নিরোধকে তাহারা যথা-সাধ্য উৎসাহ দিতেছে, এবং ভারতে অমোংপাদন বাহাতে বাড়ে সেদিকে প্রাণপণ সাহায্য করিতে চাহিতেছে।

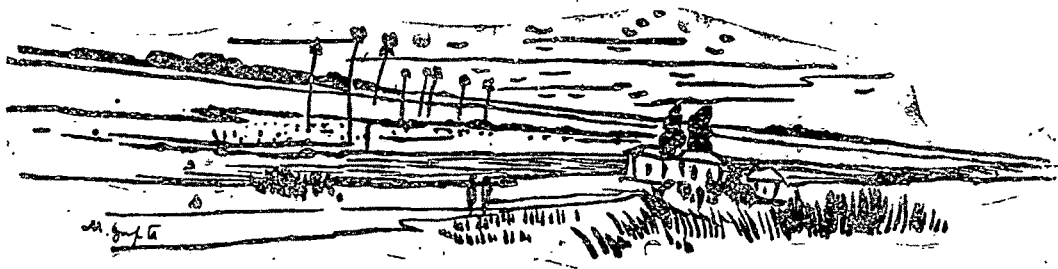
ক্ষমতাবাদী রাজনীতির পরিণাম : এই উভয় উপায় সর্বথা বাঞ্ছনীয় আর আবশ্যকও। কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, আমাদের উৎপাদন ও পরিবার-নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম যেন—জাগতিক প্রভুত্বের নিমিত্ত এই সময়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাদের কাহারও চালের অঙ্গ না হইয়া যায়। ক্ষমতাবাদকে

ইংরেজীতে ‘পাওয়ার পলিটিক্স’ বলা হয়। ‘পাওয়ার’ শব্দের এক অর্থ ‘ক্ষমতা’, আর অপর অর্থ ‘শক্তি’। এই অর্থে আমরা উহার ব্যবহার হস-পাওয়ার (অশক্তি) রূপ শব্দে করিয়া থাকি। ক্ষমতার রাজনীতিতে মনুষ্যের ব্যক্তিত্বের, তাহার সংস্কৃতির এবং তাহার চরিত্রের কোন মর্যাদা নাই। উহাতে তাহার বিচার কেবল ‘ম্যান-পাওয়ারের’ এক ‘ইউনিট’—মনুষ্যশক্তির এক একক—হিসাবেই হইয়া থাকে। যুদ্ধে শত্রু আর সাধারণ সৈনিকের মধ্যে বড় বিশেষ পার্থক্য করা হয় না। পুঁজিবাদী অর্থ-বিদ্যানে অকুশল মানুষের আর উপকরণে বিশেষ বিচার-ব্যবধান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় না। তদ্রূপ ক্ষমতাবাদী রাজনীতিতে মনুষ্যকে ব্যক্তি হিসাবে কোন মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাহাকে কেবল শক্তির এক একক মনে করা হয়।

প্রভুত্ববাদ আর চলিবে না : আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা ও অল্পে দ্রুত স্বাবলম্বী হওয়া এখন ভারতের পক্ষে অনিবার্য—প্রয়োজন। দুনিয়াতে আমাদের নিজ শক্তিতেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কিন্তু সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ও অপর সকলকে নিজেদের স্বত্বের ভাগী করিয়া। অতএব আমরা সংশয়াস্রার ভূমিকা গ্রহণ করিব না। সকলকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিব না। নিরপেক্ষ ভাবে সহায়তা যে করিবে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা এই আশা ও প্রার্থনা করিব যে, পুরাতন সাম্প্রদায়িক প্রচারকদের ন্যায় কেহ যেন এখন মুষ্টি মুষ্টি ভাত ছড়াইয়া মানুষকে প্রভুত্ববাদের উপকরণে পরিণত করার আশ্রয়ী লালসা না পোষণ করেন।

আমাদের পক্ষে আত্মমর্যাদার ও আত্মোদ্ধারের একটিই মাত্র পন্থা। নিজেদের সমস্ত স্বজনমূলক প্রতিভার ও সংগঠনী কৌশলের সমাবেশ করিয়া অধিক উৎপাদন ও নির্মাণকার্যে একান্ত অভিনিবেশে আমাদের প্রবৃত্ত হইতে হইবে।*

* ‘সর্বোদয়ের’ লৌক্যে।



প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কি ক্ষণেই বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা ক'টি উচ্চারণ করেছিলেন, 'বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি'। যতই আমরা নিজেদের কথা আলোচনা করি ততই এর বাথার্থ্য আমাদের উপলব্ধি হয়। গত এক শ' বছরের ভিতর বাংলায় যে-সব মনীষী কবি সাহিত্যিক যশের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁদের ক'জনের খবর আমরা রাখি? অথচ আমাদের চিন্তা ও কর্মে তাঁরা কতই না রসদ জুগিয়েছেন। এইরূপ এক জনের কথা এখানে আলোচনা করা যাক।

কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মাত্র তিন বৎসর পূর্বে বাংলা ১৩৫৫ সালের ২২শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী ১৯৪৯) ইহধাম থেকে চলে গেছেন। তখন তাঁর পরিণত বয়স। জানে শুণেও তিনি পরিণতিলাভ করেছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল সাহিত্য-সেবা করে তিনি বাংলা ও বাঙালীর কতই না হিতসাধন করেছেন। এ যুগের অনেকে তাঁকে হয়ত জানে না—পরিণত বয়সে তিনি অবসর জীবনই বাপন করছিলেন। কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন প্রমথনাথের বৈঠকখানার সাহিত্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, দেবকুমার, স্বদেশ সমাজপতি, জলধর সেন প্রায়ই যোগ দিতেন। আরও কত খ্যাত-অখ্যাত লোক আনাগোনা করতেন তার কি ইয়ত্তা আছে? জলধর সেন লিখেছেন :

“বড় ভাই প্রমথবাবু কবি ও সাহিত্যিক, বড় ভাই মন্থবাবু তখন সাহিত্যিক এবং রাজনীতিকক্ষেত্রে সুপরিচিত দেশপুঙ্খ স্বরেজনাথের উপযুক্ত শিষ্য।...

“ভাদের বীড়ন ধীরে বাঙালীতে এক বৈঠকখানার সাহিত্যিকদের বৈঠক বসত—সেখানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার প্রমুখ বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক প্রতিদ্বি, আড্ডা দিতেন—বানা বিষয়ের আলোচনা হ'ত। আর সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার আর এক প্রান্তে মন্থবাবুর মজলিস বসত।...

“আমার এই দুই মজলিশে মিশবারই ছাড়পত্র ছিল।...”*

ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলের অন্তর্গত সন্তোষ এক বিখ্যাত জমিদার-পরিবারের বাসভূমি। এই পরিবারে প্রমথনাথ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দ্বারকানাথ, মাতা বিদ্যাবাসিনী। প্রমথনাথের শৈশবেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁর এবং তাঁর অল্পজের প্রতিপালনের

ভার পড়ল বিদ্যাবাসিনীর উপর। বিদ্যাবাসিনীর নাম সে যুগে কে না জানত? জমিদারী পরিচালনে সে সময়ে যে ক'জন বুদ্ধিমতী বঙ্গমহিলা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যাবাসিনী অন্ততম। দানশীলা ও ধর্মপরায়ণা মহিলা রূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। তিনি টাঙ্গাইলে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, দেব-মন্দির, অতিথি-শালা প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িত্রী। বাংলার উন্নতি শুধু একটি কি দুটি শহর বা গ্রামের উন্নতির মধ্যেই নিবদ্ধ রাখলে চলবে না; বাংলার উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম দূর-দূরান্তের সকল অঞ্চলের উন্নতি হলেই তবে তাকে বাংলার যথার্থ উন্নয়ন বলা চলে। তাই দেখি সে যুগে কলকাতায় ভিড় না করে, সত্যাকার স্বদেশহিতৈষী নরনারী নিজ নিজ অঞ্চলে থেকেই স্বদেশবাসীর হিতকর্মে রত থাকতেন। বিদ্যাবাসিনীও এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিদ্যাবাসিনীর সার্থক শিক্ষায় প্রমথনাথও পল্লীর মধ্যেই বঙ্গজ্ঞানীর প্রাণসত্তার স্পর্শ পেয়েছিলেন। তাই তিনি শুধু জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণেই নয়, চিন্তা ও কর্মের ভিতর দিয়েও দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষা পল্লীমায়ের কোলে বসেই তাঁর হয়েছিল। সাহিত্যানুরাগী গৃহশিক্ষকের সংস্পর্শে এসে তাঁর মধ্যে সাহিত্যপ্রীতির সূচনা হয়। গণিতে তিনি ছিলেন খুবই কাঁচা। এজ্ঞা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তিনি বেনীদুর অগ্রসর হতে পারেন নি। কিন্তু তাতে তাঁর সাহিত্যসেবায় এতটুকু ব্যাঘাত হওয়া তো দূরের কথা, এ বিষয়ে তিনি যেন আরও বেশী করে তৎপর হয়েছিলেন। প্রমথনাথ লিখেছেন :

“কৈশোরে বঙ্কিমের আদর্শগুলি আমার কল্পনাভ্রমতে ছবির পর ছবি আঁকিয়া আমাকে এক লোকাভীত মায়ারাজ্যে লইয়া যাইত...। আমার স্মরণ আছে, বঙ্কিম পড়িয়াই আমার মনে স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি অহুরাগ জাগিয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাতীয় বিলাসিতা ও আচার-পদ্ধতির উপর বিরাগ জন্মে।”

বস্তুত: স্বদেশী যুগে যারা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠে অল্পপ্রেরণা লাভ করেন। প্রমথনাথ আসলে কবি, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনকালে তিনি বিপুল উৎসাহ নিয়ে এর মধ্যেও যোগ দিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কবি-মন এর ভিতরে

* ‘স্মৃতি-তর্পণ’—ভান্ডারবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৪৩

যেন আকৈশোর-পোষিত বঙ্গজননীর একটি স্মৃষ্টি রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনকালে তাঁর রচিত গানগুলি দেশবাসী আপামর সাধারণের কতই না আশা-উদ্দীপনা জাগরিত করিত। এই গানগুলি আমাদের জাতীয় সাহিত্যে কি উচ্চ স্থানই না অধিকার করেছে। দু'একটির থেকে দু'এক স্তবক মাত্র এখানে উদ্ধৃত করি।

‘বঙ্গ-বন্দনা’য়—

‘মমঃ বঙ্গভূমি, ভাংমাছিনী,

জমিনী, যুগে যুগে পতিত-পালিনী।

দূর নীলাশ্বর-প্রান্ত সঙ্গ নীলিমা ভব, মা, মিশিছে রসে,
রূপসী প্রেমসী হিত-কারিণী।”

আর একটি গানে :

‘তুই মা মোদের জগত-আলো।

স্বপ্নে স্বপ্নে হাসিমুখে

আমারে দীপ তুমিই আলো।

মা ব’লে, মা, ডাকলে তোরে,

সারাটি প্রাণ ওঠে ভ’রে,

বেসেছি, মা তোরেই ভাল,

তোরেই যেন বাসি ভালো।

আবার, আর একটি সঙ্গীতে :

“শুভ দিনে শুভ কণে গাহ আজি জয়,

গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয়।

জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয়।

পূণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয়।

লক্ষ যুগে একা গাথা রচাও জগৎ ময়।”

বঙ্গ-সন্তানদের প্রাণে দেশভক্তি উদ্বেকের সঙ্গে সঙ্গে কতই না বল সঞ্চার করত এই গানগুলি। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গীত রচনার কথাও কিছু বলা যাক। প্রমথনাথ গান রচনা করতেন, গানে স্বর দিতেন; একথা হয়ত অনেকে জানেন না যে, তিনি স্বগায়কও ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতে স্বরসম্রাট রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়ে যেতেন। প্রমথনাথের ‘আগমনী’—‘এসেছ তুমি এসেছ, কমলার বেশে আজি’; আবার, ‘পল্লীলক্ষ্মী’র ‘রূপসী পল্লীবাসিনী, শূন্য ঘাটে কেন একাকিনী হুহাসিনী’ তাঁর অগোচরে রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে স্বর শিখে নিয়ে তবে ছাড়লেন। ‘গান’ পুস্তকের প্রত্যেক গানটিতেই প্রমথনাথ নিজে স্বরলিপি জুড়ে দিয়ে ছাপিয়েছিলেন।

প্রমথনাথের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধেও এখন কিছু বলা যাক। প্রমথনাথ ছিলেন খাঁটি বাঙালী কবি; তাঁর কবিতায় বাংলার অতি তুচ্ছ জিনিসটুকুও—ধূলিকণা পর্যন্ত স্বন্দর দোষ্টবপূর্ণ হয়ে উঠত। তিনি দীর্ঘকাল কাব্য-

লক্ষীর আরাধনায় লিপ্ত থেকে বহু কবিতা ও কাব্য এবং নাটক রচনা করেছিলেন। এর কাব্য অংশ জলধর সেনের সম্পাদনায় ১৩২২ ও ’২৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে রয়েছে প্রমথনাথের পদ্মা, যমুনা, গীতি ও গীতিকা; দ্বিতীয় খণ্ডে—গৌরান্দ, গল্প, গাথা, আখ্যায়িকা, চিত্র ও



প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

চরিত্র; আর তৃতীয় খণ্ডে—কবিতা, পাথের, পাষাণ, পাথার, গৈরিক, গান (স্বরলিপি সমেত)। তিন খণ্ডের ভূমিকাতেই স্বযোগ্য সম্পাদক প্রমথনাথের কাব্য আলোচনা করে এর ভিতরকার মূল স্বরটি ধরিয়ে দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

“সব বড় কবির মায় প্রমথনাথের একটা ‘মিশন’ আছে।

তাঁহার সমস্ত কাব্য, নাটক ও অন্যান্য রচনা পাঠ করিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে, তিনি মানবপূজার কবি। তিনি মরে নারায়ণ দেখেন, লোক-দেবাই তাঁর কাছে দেব-পূজা। তাঁহার কল্পিত মানব

‘দেবে বিশ্বহিত হোমে আত্ম বলিদান’,

(নবগান,—‘ঐতিহ্য’)

‘শুভ হই মানবের মানব জীবন

জাগে সবে বিশ্ব রঙ্গ মাঝে।’

আবার বলিতেছেন :

‘অমল কল্যাণময় লোকহিত ব্রত

মহা গর্বে বহি চলে শিরে।’

(জীবন মাধুরী—‘ঐতিহ্য’)

তাঁহার আধুনিক কাব্য ও নাটকে এই লোকপ্রীতি উজ্জলতর হইয়া মানাভাবে আকার লাভ করিয়াছে।”

দ্বিতীয় খণ্ডে, “গৌরাঙ্গ” মহাকাব্য সম্বন্ধে জলধর বলেছেন যে, এর ‘key-note’ বা মূল ভাব হ’ল “ভক্তি যার ভরভিত্তি প্রেম যার প্রাণ।” কবি দ্বিজেন্দ্রলাল খানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি ‘নব-প্রভা’ নামক মাসিকে (ভাদ্র-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩১০) ‘গৌরাঙ্গ’ মহাকাব্যের বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করেন। ইহার প্রথম সর্গের শেষ কয়েক চরণ এই :

“হায় শচী, হায় মাতা পুত্র পরবিণী,
সে দিন অলক্ষ্যে বলি’ ঘুরাইল কাল
যে ভাবে নিমিতি চক্র, তাহার ছায়ায়
তোমার স্নেহের শশী হ’ল অন্তর্মিত ;
জগতের ভাগ্য-রবি উদিল নীরবে।” (১ম সর্গ, পৃ. ৩৫)

প্রমথনাথ নাটক-রচনায়ও সিক্ত হস্ত ছিলেন। বঙ্কিম চন্দ্রের ‘হুগেশনন্দিনী’ ও ‘রাজসিংহ’কে তিনি নাট্যরূপ দেন। এ ছাড়া তাঁর মৌলিক রচনা—‘ভারতচক্র’, ‘জয়-

পরাজয়’, ‘চিতোরোদ্ধার’, ‘দিল্লী-অধিকার’ নাটক এবং ‘আক্কেল দেলামী’ প্রহসন থিয়েটারে অভিনীত হয়ে বিশেষ স্তূথ্যতা লাভ করে। তাঁর মতে “নাটকের প্রকৃত মর্মকথা মানবপ্রকৃতি উদ্ঘাটন করিয়া মানবপ্রকৃতিতে অজ্ঞাতে সর্বসম্ভাব্যরাশি সঞ্চারিত করা।”

শেষে তাঁর কবিতা থেকে এই চরণ ক’টি উদ্ধৃত করে আজকার স্মৃতি-তর্পণ সাধ করব—

“ও বাঙালী আমি তোদের ভাই,
বাংলা আমার জনম মরণ ঠাই,
হয় যদি মোর এই দণ্ডে মরণ,
নিম্নে যাব জাতির কীর্তি অরণ,
তোদের পায়ের ধূলা অঙ্গে যেবে
অবে মরব তোদের বাঁচতে দেখে।”*

* অল-ইন্ডিয়া রেডিও—কলিকাতা কেন্দ্রে কণ্ঠিত ও রেডিও-কর্তৃপক্ষের সৌজতে প্রকাশিত।

চৌধুরী মশাই

শ্রীশুধীরচন্দ্র রাহা

চিন্তাহরণবাবুর সহিত চায়ের দোকানেই আলাপ। আমাদের নিরমিত আড্ডাস্থল আমার এক বন্ধুর চায়ের দোকানটিতে। সকাল সাতটা হইতে বেলা এগারটা পর্যন্ত দোকানে, শেষের একখানি বেঞ্চি ও একটি টেবিলকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের আড্ডা চলিতে থাকে। আড্ডায় পৃথিবীর বাবতীয় জটিল ও সহজ তত্ত্বের আলোচনা হয়। ‘সাময়িক ঘটনা’ হইতে সুরু করিয়া পৃথিবীর রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা চলিতে চলিতে প্রায় বেলা বারটার সময় প্রাতঃকালীন আড্ডা মূলত্ববি রাখিয়া রান-আহারের জন্ত নিজ নিজ বাড়ী গিয়া পিতামাতাকে বৃত্ত করি। তার পর স্নানার্থে দিবাশ্রম। বৈকালে ফুটবলের মাঠ ও সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কোন বন্ধুর বাড়ীতে তাঙ্গের আড্ডায় যাতিয়া থাকি। ঠিক জলস্রোতের মত সময় চলিতে থাকে। ইহাতে আমরা বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত নই। সময় ভো হাইবেই, কদাচ বসিয়া থাকিবে না। অতএব উপস্থিত যখন আমাদের খাওয়া-পরাই কোন অসুবিধা নাই, তখন স্নেহ-আড্ডা দিয়া জীবনটা পুরোপুরি সার্থক করিয়া লই না কেন? এইরূপ আড্ডার মাঝেই চিন্তাহরণবাবুকে আবিষ্কার করা গেল। প্রায়ই দেখিতাম, এক জন অবেশ ভ্রমলোক সম্মুখে এক কাপ চা রাখিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে একমনে

আমাদের আলোচনা শুনিতেছেন; কখনও বা তাঁহার মুখে হাসির সামান্য রেখা বা আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার কখনও বেশ নিলিপ্তভাবেই আলোচনা শুনিয়া যাইতেছেন। কিন্তু বেশী দিন নয়—হঠাৎ এক দিন ভ্রমলোক নিজ হইতেই বরা দিলেন। আমাদের আড্ডা জমিতেই তিনি উঠিয়া আমাদের কাছে আসিয়া পকেট হইতে সিগারেটের বাজ বাহির করিয়া বলিলেন—আমায় আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন। আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ না করে থাকতে পারলাম না। আপনাদের আলোচনা আমি রোজই শুনে থাকি, আমি নিজে একটু আড্ডাবাজ গালিক লোক। আড্ডা দিতে পেলে বর্গে যাই। নিম্ন সিগারেট ধরান্—।

এইদিন আড্ডাটি বেশ জমিয়া উঠিল। কাড়া হই যট্টা, চৌধুরী মশাই নামা বিষয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ঘটনাগুলোকে যেরূপ যুগ্মরোচকভাবে আমাদের সম্মুখে হাজির করিলেন তাহাতে আমরা পরম বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কথার ভিতর এমন ষাছ ও মধু থাকিতে পারে, তাহা কখনই কল্পনা করি নাই। কিন্তু একটা সন্দেহ বার বার মনে উঁকি মারিতে লাগিল। লোকটির এই গায়ে-পড়া ভাবটার আসল উদ্দেশ্য কি? সম্ভবতঃ কোন বীমা-কোম্পানীর দালাল। তা হোক উহাতে কোন কতি নাই। আমাদের মতব্য কেহই

মোট বীমা করিবার মত সরেস মক্কেল নহি। কিন্তু আর একটি সন্দেহ মনে জাগিল। লোকটা কোন গোয়েন্দা নয় ত? তাহা হইলেই কিন্তু সর্বনাশ। মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম। মাসকয়েক পূর্বে আমাদের পাড়াতেই একটি ছেলেকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই ছেলেটি পাড়ার লাইব্রেরীতে যাতায়াত করিত, পড়িবার জন্য বইপত্র আনিত। তাহার সহিত কালেভদ্রে ছই-একটি কথা হইত এই পর্যন্ত। কিন্তু কোনরূপ অন্তরঙ্গতা আমাদের সহিত ছিল না। লাইব্রেরীতে অস্ত্রাস্ত্র পুস্তকের মধ্যে কিছু কিছু জাতীয় সাহিত্য ছিল। কিন্তু আমরা কোনদিনই সেই সব পুস্তক স্পর্শও করি নাই। লাইব্রেরীতে যে ক'খানি মোহম-সিরিজ, রহস্যলহরী সিরিজের বই ছিল, তাহাই পড়িতাম। 'বদেঈ' পুস্তকের ধার দিয়াও ঘাইতাম না। কিন্তু কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠার বা। হইলও তাহাই। পুলিশ তাহাকে ধরিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরীর যাবতীয় বই খাটিয়া তখনই করিয়া কয়খানি পুস্তক বগলদাবা করিয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম বইগুলি নাকি ভারি সাংখ্যাতিক—বোমা, বন্দুকের তুল্য ভীষণতম। মনে মনে ভাবিলাম, পুলিশ লইয়া গিয়াছে, বেশ সংকাজই করিয়াছে। নতুবা দৈবাৎ লাইব্রেরীর মধ্যে পুস্তকগুলির বিক্ষোভ হইলে নিশ্চয়ই সাংখ্যাতিক ঘটনাই ঘটত। শুধু পুস্তকগুলি লইয়াই পুলিশ ক্ষান্ত হইল না, লাইব্রেরীর যাবতীয় সত্য়, লাইব্রেরিয়ান সকলকেই টানিল। কয়দিন কি হয়রানি না হইতে হইল। অবশেষে বহু কষ্টে কপালের গেরো কাটিল। সেই হইতে কোন দিন আর লাইব্রেরী-যুগে হই না। আমরা আড্ডাঘরে রান্না-উজীর মারিতে মারিতে বে-মজা বহু কথাই বলিয়া ফেলি। মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, আজ আড্ডায় কি পরিমাণ গুল কাড়িয়াছি—কিন্তু না সবই বুঝা। একটা কথাও অরণে আসিল না। ঘুঁড়ুকে আমার সন্দেহের কথা বলিলাম ঘুঁড়ু একমুখ খোঁয়া ছাড়িয়া, ধোয়ার শিৎ করিতে করিতে বলিল, পাগল—ও গোয়েন্দা না হাতি—। তবে বলিলাম ঐ দালাল-টালাল হবে বা—

বলিলাম—নাঃ কাজের কথা নয়। সন্দেহটা ঘুচিয়ে নিতে হবে। বাক্সাঃ যে হয়রানি হতে হয়েছিল। রাতে ঘুম নেই, খেয়ে, শুয়ে, বসে কিছুতেই স্থখ ছিল না। এর মধ্যে সব ভুলে যেতে দিলি—ঘুঁড়ু নিবিষ্টচিত্তে সিগারেট টানিতে বলিল, তুই বড় ভয়ভরাসে—নে তবে খোঁজই নে—। আমার সন্দেহের কথাটা চাপা রহিল না। আড্ডার সকলেই জানিতে পারিল এবং আমরা সকলেই খোঁজধর লইতে লাগিলাম। খোঁজ লইয়া জানিলাম—নাঃ সন্দেহের কোন কারণ নাই। তবে ভ্রমলোক ঐ রকম কোন দালালী-টালালী করিয়া থাকেন। অনেকগুলি কাকাবাচ্চা লইয়া

ষ্টেশনের ধারে ভাড়া-বাড়ীতে বাস করেন। আমাদের দেখে ঘাম দিয়া জর হাডিল।

আমাদের আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। চিন্তহরণ বাবুকে সংক্ষেপে আমরা চৌধুরী মশাই বলিয়া থাকি। এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, সকাল-সন্ধ্যা চৌধুরী মশাই আড্ডায় না আসিলে আড্ডা জমিতে চার না। আড্ডাতে চা ও সিগারেটের খরচ আমাদেরই। সেই যে প্রথম দিন চৌধুরী মশাই এক প্যাকেট সিগারেট বাহির করিয়াছিলেন, তার পর আর কোন দিনই তার পকেট হইতে একটাও সিগারেট বাহির হয় নাই। শুধু সিগারেট কেম, চা, পান, বিড়ি এমন কি নম্র পর্যন্ত তাঁর দিব্যি সমানে চলিয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত বস্তুই পরের পকেট হইতে। বিড়ি, নম্র প্রভৃতি কিছুতেই তাঁর অনিচ্ছা বা অরুচি দেখি না। সমানভাবে গল্প করিতে করিতে আমাদের যেন মজবুত করিয়া রাখিয়া দেন। আমরা তাঁর বিস্তৃত বিভাবৃত্তিতে এবং তাঁর সুখে জগতের বহু তত্ত্বের সংবাদ জানিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া ঘাই। ভ্রমলোকের সব কিছু যেন মথদর্পণে। মনে হয় জীবনে উনি বহু দেশ দেখিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের মর-মারীর বহু বিচিত্র জীবন-যাত্রার প্রণালী, আচার-ব্যবহার সবই যেন তাঁর পরিচিত। স্বপ্নাভু ও ভাঙ্গা ভাসা দৃষ্টিতে যেন উনি কিছুই দেখেন না। সমস্ত-কিছুকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সত্যাসত্য ভালরূপে নির্ধারণ করিয়া থাকেন। সেদিন আড্ডাতে সঙ্গীত সহজে কথা উঠিল। আধুনিক গান ও গায়কদের কথা হইতে হইতে সঙ্গীতের ইতিহাস সহজে আলোচনা শুরু হইল। কিন্তু এই আলোচনাকে সঙ্গীত সহজে নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক আলোচনা বলিলে বাড়িয়াই বলা হয়, কেননা সঙ্গীত বিদ্যায় যেমন আমরা ওস্তাদ, সঙ্গীতের ঐতিহাসিক বিবর্তন সহজেও ভ্রূপ।

ঘুঁড়ু বলিল, তোরা জানিস খালি সিনেমার গান। ও গানগুলো শুনে শুনে, কান কালাপালা হয়ে গেল। ও সব গান আবার গান নাকি। জানিস মিয়া ভানসেনের গানে বৃষ্টি নামত, আগুন ছিলত—পাথর পর্যন্ত গলে যেত—

বলিলাম—হ্যাঁ, 'ভানসেন' বইয়ে তাই দেখেছি বটে। হবেও বা—

চৌধুরী মশাই, আমাদের এই অবিখ্যাতের সুরটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, জানেন, আমি ভানসেনকে দেখেছি। মিথ্যে নয়—সঙ্গীত জগতে সবই সম্ভব। আমরা একযোগে সবিস্ময়ে বলিলাম, বলেন কি চৌধুরী মশাই। আকবর বাদশাহ সজাগায়ক মিয়া ভানসেনকে দেখেছেন। এ বড় তাজবকা বাৎ—

—মা। তাঁকে ঠিক নয়। ইনি দ্বিতীয় ভানসেন। এক-বার ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছিলেন মাগুতে। মাগুটা হচ্ছে

কোথায় জানেন? জানেন না—আজকে যাকে আমরা বার-
রাজ্য বলি—এককালে যার নাম ছিল মালব। সেখানে কেম
সিয়েহিলাম, তা আর নাই বললাম। বরে দিন দেশ-ভ্রমণের
জন্তেই ওখানে দৈবাৎ গিয়ে পড়েছিলাম। দ্বিতীয় ভানসেনের
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যে স্থানে সেটা মাছু শহর থেকে দশ ক্রোশ
দূরে। পথ ভুলে এক নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আর
বেকুণ্ঠে পারিমে, এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে গেল। কুণ্ডা, ভূঞা ও
পরিশ্রমে সমস্ত শরীর অবসন্ন। বার বার মনে হতে লাগল,
এই বুঝি ভিন্নমি লেগে মাটিতে পড়ে যাই। কিন্তু অতদূর
আর হ'ল না। কিন্তু আর চলতে না পেরে, একটা গাছের
তলায় বসে পরলাম। রাত তখন অনেকটা হয়েছে। ভাবছি
বনের ভেতর এই তলায় থাকলে নির্বাণ বাঘের পেটে যেতে
হবে। তাই সঙ্কল্প করলাম, প্রাণটা বাঁচাবার জন্তে একবার
চেষ্টা চরিত্রির করে কোন মতে এই গাছটার ওপর উঠে রাত
কাটা। কিন্তু শরীর তখন এত অবসন্ন যে, গাছে উঠবার
আর কোন শক্তিই নেই।

ভেবে দেখুন ব্যাপারখানা। অপরিচিত জায়গা—
সমস্ত দিন হেঁটে হেঁটে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, তার ওপর এই
ভীষণ নির্জন বন। শীতে শরীর তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে।
হাত পা ক্রমশঃ যেন অবশ্য হয়ে আসতে লাগল। তাবলাম,
এই বুঝি সব শেষ হয়ে যায়। হঠাৎ আমার কান ছটোকে
বিশ্বাস করতে না পেয়ে, আরও অবাক হয়ে গেলাম। মনে
হ'ল কে যেম কোথায়, তারের বাজনা বাজছে। তারের
বাজনার সে অপূর্ণ বজ্র, সেই শীতের নিস্তব্ধ রাতে, ঐ তরা-
বহ জড়লে, কি ভাবে আমাকে মোহাবিষ্ট করেছিল তা এই
দিনের আলোয়, শহরের চায়ের দোকানে বসে বর্ণনা করা
পূর্ব কঠিন। যাই হোক, আমি সবকিছুকে ঠেলে ঠেলে উঠে
দাঁড়ালাম। তাবলাম, দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি?
কোথা হতে এই অপূর্ণ বাজনার বজ্র ভেসে আসছে, এ
আমার দেখতেই হবে। মনে মনে তাবলাম, এই গভীর
জড়লে, মাহুত কথ'খো নয়—নিশ্চয়ই কোন পরীটরী এই
নির্জন রাতে, গানের আসর বসিয়েছে। যাই হোক, মরি আর
বাঁচি এই বাজনার স্থান দেখে আসতেই হবে। আমি উঠে
দাঁড়ালাম, অন্ধকার আর কঁটা ঝোপঝাড় ঠেলে চলতে শুরু
করলাম। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই মনে হতে লাগল, এই বুঝি
কোন বাঘ, ভালুক কিংবা দাঁতাল হাতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে
যায়। ক্রমশঃ বাজনার শব্দ যেন আরও স্পষ্ট শুনে পেলাম।
এতকণে চাঁদ উঠেছে, সমস্ত গাছপালার ওপর চাঁদের কিরণ
পড়েছে, ভাতে মনে হচ্ছে একখানা সাদা পাভলা চাঁদের যেন
গাছপালাকে কে মুড়ে দিয়েছে। গাছের পাতা থেকে টুপ
টুপ করে ফোঁটা ফোঁটা শিশির বরে পড়ছে। হঠাৎ একটা
মোড় ঘুরতেই, আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাঙ্কব ব্যাপার
—এ নিজের চোখে না দেখলে, বিশ্বাস করতেই পারতাম না।

অপরের কাছে, কথাকাটা শুনে অবতাম, লোকটা গল্প করছে।
কিন্তু নিজের চোখে দেখেও, নিজ ছটো চোখকে বিশ্বাস
করতে পর্যন্ত পারলাম না। তাবলাম, চোখের ভুল নাকি?

এইবার চৌধুরী বামিলেন। আমরা উদ্ভীষ হইয়া
রহিলাম। চায়ে চুমুক দিয়া, ধীরে স্বহস্তে সিগারেটে টান দিয়া,
চৌধুরী নিম্নলিখিত চক্ষে চুপ করিয়া রহিলেন। আমরা বলি-
লাম—তার পর—

চৌধুরী মশায় আরম্ভ করিলেন, দেখলাম, অনেকখানি
করসা জায়গা—আর প্রকাণ্ড একটা গাছের তলায় একজন
সন্ন্যাসী, তারের একটা যন্ত্র বাজাচ্ছেন—আর গান করছেন।
বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে ঘিরে শুয়ে রয়েছে বাঘ, হরিণ, দাঁতাল কাল
রঙের শূয়ার, প্রকাণ্ড ভালুক। গোটাকয়েক হাতী চুপ করে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুড় দোলাচ্ছে। সন্ন্যাসী চোখ বুজে গান
করছেন। সেই তারের যন্ত্রটা এক অদ্ভুত আকৃতির। সেটা
এসরাজ—বীণ—তানপুরা—সেতার এ সবের মত আকৃতি-
বিশিষ্ট নয়—আর যে গান করছেন, তার ভাষাও ভারি
অদ্ভুত। ইংরেজী, বাংলা, কানসী, উর্দু, হিন্দী, তামিল,
ভেজুও এ কোন ভাষাই নয়। আমি বুঝলাম—কারণ ঐ
সব ভাষা সবই আমি জানি কিনা। হতে পারে প্রাচীন আর্য
ভাষা—বা সংস্কৃত নয়। জানেন ত তারতবর্ষের সুদূরতম
অভীভূত পাঁচশো বছরের ইতিহাস জানা যায় না। মনে
হয়, সেই ভাষা সেই যুগের। ভাষা—সুদূর কোমটাই বোধ-
গম্য হ'ল না। কিন্তু আশ্চর্য্য সুরেলা কণ্ঠ—ও গান আর সুর
শুনলে মাহুত সব ভুলে যায়—নিজেকে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।
আমি আত্মবিশ্মিত হয়ে ঠিক মোহমত্তের মত এক পা এক
পা করে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে দাঁড়ালাম। বাঘ, হরিণ,
ভালুক, দাঁতাল শূয়ার একবার মাত্র আমার দিকে তাকিয়ে,
মাথা গুঁজে শুয়ে রইল। হাতীগুলো শুধু একবারমাত্র দাঁড়িয়ে
শুড় দোলাতে লাগল। বাজনার সুরে সকলে মগ্নমুগ্ধ।
এর মাসিগীর আলাপে বৃষ্টি হয় কিনা, বা আশুন জলে কিনা
তা দেখি নি বটে। কিন্তু যে লোক, শুধু গান গেয়ে বনের
হিংস্র পশুকে হিংসা জ্বলিয়ে একত্র করতে পারেন, তিনি সবই
পারেন। তবেই বুঝুন আমি ভানসেনকে দেখেছি কিনা?

তার পর?

চৌধুরী মশাই যুহু হাসিয়া বলিলেন, তার পরের ঘটনা
শুধু। আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না বন্ধুগণ, জবাব
মিলবে না—

আমরা চাপিয়া বরিয়া বলিলাম, না তার পরের ব্যাপারটা
ভুলে বসুন।

—বলব। কিন্তু সে আজ নয়।—চৌধুরী মশাই আর
একট সিগারেট ধরাইলেন। আজ্ঞা ভাঙিবার যুখে, চৌধুরী
মশাই আমার একান্তে তাকিয়া লইয়া যাইয়া বলিলেন,
হঠাৎ ভারি ঠেকে গেছি। গোটা কুড়ি টাকার বিশেষ

প্রয়োজন। দিন দেখি। হু'চার দিনের মধ্যেই দিয়ে দেব। বাড়ী ভাঙার টাকাটা পেলাম না। বাদা অঞ্চলে সামান্য জমিদারী আছে, মাথের মশাই আজ হু' সপ্তাহের ওপর হয়ে গেল, কোন চিঠিপত্র দিলেন না। মনে হয়, আদায় ব্যস্ত—কই দিন দেখি।—আমার পকেটে টাকা ছিল। মনিবাগ বাহির করিয়া ছইখানি দশ টাকার নোট দিলাম। চৌধুরী মশাই আর একটি সিগারেট ধরাইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার মুখে বলিলেন, এ টাকা মেওয়ার কথারি যেন কঁস করবেন না। তবে তারি লজ্জাতেই পড়ব।

দিন কয়েক হইয়া গেল, কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যে চৌধুরী মশাইকে আর আড্ডার দেখি না। লোকটি আমাদের আড্ডার ঠিক ধুমকেতুর মতই উদয় হইয়াছিলেন। এই কয়দিনে আমরা সকলেই চৌধুরী মশাইয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আজ কয়দিন তাঁহার অল্পপস্থিতিতে আড্ডার আনন্দটুকু যেন গ্লান মনে হইতেছে। আড্ডার সমস্ত জমজমাট তাবটী যেন ভাঙিয়া চুরিয়া শতখান হইয়া গিয়াছে। আমরা যেন প্রাণহীন পুতুলের মত, কলের মস্তুর মত আড্ডা দিতেছি। কোন পুরাতন গানের রেকর্ডের উপর পিন চাপাইলে, যেমন বহুপ্রত পুরাতন গান শোনা যায়, তেমনি আমাদের মুখ দিয়া সেই পুরাতন কথাগুলিই বাহির হইতেছে। কোন বৃত্তনয় নাই—কোন বৈচিত্র্য নাই। সকলেই মুখে এক প্রেত চৌধুরী মশাই কোথায় ডুব যাইলেন। শহরে থাকিলে নিশ্চয়ই দেখা হইত। তাবিলাম, হস্ত তন্ত্রলোকের অল্প-বিশ্ব কয়িয়াছে। একবার বৌজখবর লইলে হইত। কিন্তু অল্পবিশ্ব এই—তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা ভালভাবে চিনি না। যাই হোক, একটু বৌজ খবর লইয়া বাড়ী ঠিক বাহির করিব।...

সকালবেলার বাহির হইয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। হঠাৎ দেখি বাজারের থলে হাতে করিয়া, চৌধুরী মশাই একটি গলি হইতে বাহির হইতেছেন। লবিন্মরে বিশেষ পুলকিত হইয়া ডাকিলাম, বাঃ চৌধুরী মশাই যে—

একমুখ হাসিয়া চৌধুরী মশাই বলিলেন, আর বলেন কেন—শুধু হস্তরানের একশেষ। এই কয়দিন খালি কলকাতা আর বাদা অঞ্চল চষে ফেলিলাম। খালি পরসার প্রাণ হ'ল আর শরীর নষ্ট—

—তাই ত দেখছি। শরীর যে খুব ধারাপ হয়ে গেছে। এই কয়দিনে, আপনার কি বিক্রী চেহারাই না হয়েছে—

—ওই তো বললাম। খালি অথবা হস্তরানি, এক পরসার আদায় হয় নি। আচ্ছা করে বমকে দিয়ে এলাম নায়েব গোমস্তাকে। বলে এলাম, এই হস্তাহ'র মধ্যে আমার তিন হাজার টাকা চাই-ই। বামপান উঠতে এখনও দেখি, তার ওপর নানা মামলা-মোকদ্দমা। নাঃ, জমিদারি করা বকমারী

ব্যাপার। কলকাতার বাড়ীর ডাড়াও আদায় হ'ল না। দেখছি, নালিশ করিয়াও না করলে ওরা বাড়ী ছাড়বে না। কিন্তু যাই হোক, বাদার জমিদারী-কাছারীতে এ কয়দিন বাঁচি ছব, আর ডিম, মাংস, খি খুব খাওয়া গেল। সবই প্রকারা তেট দিত, আমি একা মানুষ কতই আর খাব। কিন্তু এত খেয়েদেয়েও শরীরের এই হাল, কাজেই বুঝুন কি বাটুনিটাই না গেছে। তবে সবই বেকারদা। আমার বড্ড জ্বল হয়ে গেছে খুব, ভেবেছিলাম সঙ্গে করে কিছু নিয়ে আসব। সাত কাজে, আর মানান কামেলায়, ওসব আনার কথা আর মনে নেই। এদিকে বাসায় এসে দেখি, খি বেটীর অল্প-কাজে আসে না। চাকর বেটাও সময় বুঝে ছুটি নিয়ে এসেছে। এখন কি যে করি—সন্ধ্যাে ভাল বেশ বিশ্বাসী লোক আছে?

বলিলাম—কই আর সে রকম। শুভক্ষণ চৌধুরী মশাই আমার টানিতে টানিতে চায়ের দোকানে উঠাইয়াছেন। টোষ্ট ও চা অর্ডার দিয়া সিগারেট বাহির করিলাম। চৌধুরী মশাই সমস্তে কোঁচাটি কোলের উপর রাখিয়া সন্তর্পণে বসিলেন। পাছে পরিষ্কার স্বব্বে জামা কাপড়ে ধুলা-বালি লাগে। ছুতা কোঁচাটি এত স্নদের বার্নিশ করা যে, আয়নার মত ঝক ঝক করিতেছে। চোখের চশমা—হাতের ঘড়ি, আঙ্গুলের সোনার আংটি সমস্তই যথাস্থানে যথানিয়মে শোভা পাইতেছে। সমস্ত-রচিত কুশিত একরান কাল চুলের সিঁথির মাঝে, রূপার তারের মত দুই একগাছি পাকা চুল চক্ চক্ করিতেছে শুধু। সন্তর্পণে চায়ের কাপটি টোষ্টের আগায় তুলিয়া চৌধুরী মশাই বলিলেন, ভাল কথা—আমি আপনার কাছেই যে যাছিলাম। সব পরচপা করে, হাত খালি। কুড়িটা টাকা দিতে হবে। আগের কুড়ি, আর আজকের কুড়ি। এই চল্লিশ টাকা হু' একদিনের মধ্যেই দিয়ে দেব। ব্যাকের টাকায় এখন আর হাত দিচ্ছি না—নিম চটপট উঠুন। আবার বাজার করতে হবে—যত সব ছইসেল ব্যাপার। এই সব বাজার করা কি ভজলোকের পোষার যশাই। দরদস্তর করে কেনাকাটা এ আমার কুঠিতে লেখেনি। তাই হরদম ঠকতে হয়—চলুন এখন।—অগন্ত্য আমাকে উঠিতে হইল। চৌধুরী মশাইয়ের মুখের উপর 'না' বলিতে পারিলাম না। চৌধুরী মশাই আরও কুড়িটা টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন।

দিমকয়েক আবার চৌধুরী মশাইয়ের দেখা নাই। তাবিলাম বোধ হয় উনি কলকাতা অথবা বাদা অঞ্চলে গিয়াছেন। হু'একদিন পর খুঁতু আমার অজ্ঞান করিল, আছে, চৌধুরী মশাইয়ের খবর কি?

—জানি না ভো। ক'দিন থেকে তো দেখছি নে। কিন্তু কেন?

একটুখানি ইভন্ততঃ করিয়া খুঁতু বলিল, কদিন হ'ল,

আমার কাছে গ্রামোফোন আর অনেকগুলো রেকর্ড চেয়ে নিয়ে গেলেন, আর তা ছাড়া পঞ্চাশটি টাকাও নিয়েছেন। বাদা অঞ্চলে যাবেন বললেন। এখন গ্রামোফোন কেন্দ্র না পেলে তারি গোলমাল হবে। দাদার তারি সখের জিনিস, তিনি কাল পরশুর মধ্যে বহরমপুর থেকে ফিরবেন। এসে গ্রামোফোন দেখতে না পেলে কুরুক্ষেত্র বাধাইবেন। আমি আমার টাকা কয়টির কথা চিন্তা করিলাম। বলিলাম, তবে খোঁজ নিতে হয়। চল, ওবেলা ওর বাড়ীটা ঘুরে আসি।

ঘুঁতু বলিল, আমাকে যেতেই হবে। বাড়ীও যে আমি চিনি নে—তা হোক লোকজনকে শুধিয়ে জেনে নেব।

দুই জনে বিকালবেলা চৌধুরী মশাইয়ের বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলাম। সদর রাস্তা ছাড়িয়া, এক বিক্ৰী গলির ভিতর ছোট একটি একতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিলাম। যে লোক সন্ধান দিয়াছিল, সেই বলিল, এই বাড়ীই বটে—

ছোট সুরু গলি। নর্দমার বিক্ৰী গঙ্গে চতুর্দিকের বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। এঁটো পাতা, মাছের আঁশ, ইত্যাদি নানা আবর্জনার রাস্তা-চলা তার। এঁটুকু সুরু রাস্তার উপর, চারিদিকের ময়লা আবর্জনা পচিয়া ভুটু ভুটু করিতেছে। মনে হয় না যে, কোনদিনও এখানে মিউনিসিপালিটির নজর পড়িয়াছে। মনটা বিরূপ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে যে লোক জমিদার, বাহার কলিকাতার বাড়ী আছে, সেই রকম লোকের পক্ষে এই জায়গায় বাস করাটা মেহাতই বেমানান। আমি দরজায় কড়া নাড়িয়া ডাকিলাম, চৌধুরী মশাই—ও চৌধুরী মশাই—

হঠাৎ দেখি গলির ভিতর হইতে আর একটি লোক আসিয়া আমাদের দিক্‌খা করিল, ও মশায় শালাকে পেয়েছেন নাকি?

আমরা অবাক হইয়া বলিলাম—কার কথা বলছেন আপনি। লোকটি একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, আবার কার কথা, এই শালা জুয়োটোরের কথাই বলছি। আপনারা চিন্তাহরণ চৌধুরীকে খুঁজছেন তো?

আমরা প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, এক জন ভদ্রলোককে বা-তা গালাগালি দিচ্ছেন।

—দেব না? শালার কাছে তিন মাসের বাড়ীভাড়া বাকী রয়েছে, তার ওপর দোকানের জিম্মিপত্র ধরেছে অনেক টাকা। রাগা দিয়ে মোটা টাকা মেরে এমন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে—

ঘুঁতু বলিল, আরে উনি যে জমিদার, কলকাতার ওর বাড়ী আছে—

লোকটি হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, বাড়ী? হাই আছে—কোথাকার জমিদার উনি?...কতাপুরের জমিদার। ও বেটা আবার জমিদার।

আমরা ডাকিতে লাগিলাম। ভিতর হইতে মেরেলী গলার সাড়া আসিল—বাবা বাড়ী নেই।

বলিলাম, বাড়ী মেই? কোথায় গিয়েছেন? কবে আসবেন?

জবাব আসিল এখানে নেই। কবে আসবেন জানি নে। লোকটি বলিল, জুয়োটোর কোথাকার। বাড়ী নেই—দাঁড়া রাস্তায় পেলে গলার গামছা দিয়ে টানব। খালি পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ক’দিন পালিয়ে বেড়াবে। যে দিন ধরব বাছাধনের সব চালাকি বের করব।

কয়দিন ঘুরিয়াও ঘুঁতু চৌধুরী মশাইয়ের দেখা পায় নাই। আমি টাকা পাই নাই, ঘুঁতুর দুর্দশা হইয়াছে যথেষ্ট। দাদার বন্ধুনিতে বেচারী অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি আরও কয়দিন চৌধুরী মশাইয়ের খোঁজে গিয়াছিলাম, রোজই দেখিলাম, সেই বাড়ীওয়াল। লোকটি অতি কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করিতেছে। না—চৌধুরী মশায়ের সহিত দেখা বুঝি আর হইবে না। যে শ্রদ্ধার, যে ভালবাসায় আমরা চৌধুরী মশাইকে দেখিতেছিলাম, এখন এই সকল ঘটনার সবই ধূলিসাৎ হইয়া গেল। লোকটির উপর অসীম ঘৃণা আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিল। আচ্ছা বাপাবাছ লোক—যা হোক। কেমন দিব্য আলাপ জমাইয়া আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া নিশ্চক্রে ভক্ষণ করিয়া প্রহান করিল। এখন অবস্থা হইয়াছে এমন যে, নিজের কান নিজেই মলিতে ইচ্ছা করে। একে একে জানিতে পারিলাম আমাদের বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকের কাছেই গোপনে কিছু কিছু টাকা ধার লইয়াছেন। প্রত্যেককেই একই কথা বলিয়াছেন। বুকিলাম, লোকটির ঐ পেশা। কিন্তু এইভাবে কতদিন চলিবে?

দুই-চার দিন পর শুনিলাম, চৌধুরী মশাই এখানেই আছেন এবং শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিবার ভোড়ছোড় করিতেছেন।

সেদিন ভোরবেলায় আমি একাই চৌধুরী মশাইয়ের বাসার সম্মুখে গিয়া হাজির হইলাম। দরজা খোলা রহিয়াছে। খোলা দরজার ভিতর দিয়া দেখিলাম, বাড়ীর ক্ষুদ্র অপরিসর ভিজে উঠানে দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে গড়াগড়ি দিয়া তারতরুরে কাঁদিতেছে। এই ভীত শীতে তাহাদের গায়ে জামা নাই। ঘরের ভিতর হইতে কীংখরে একটি মেরেলি কণ্ঠের কথা শুনিলাম, কাঁদলে আমি কি করব বাবা। ঘরে কি ছাই এক মুঠো মুড়ি পধ্যস্ত আছে যে দেবো। কাল থেকে খালি তা কি আমি জানি নে। ভগবান, এ কষ্ট আর সহ্য হয় না।
আমার মাও—

এক মুহূর্তে সমস্ত রহস্তের সমাধান হইয়া গেল। আমি নিশ্চক্রে চলিয়া আসিতেছিলাম, ভিতরে ছেলে ক’টির কান্না

ঠিক তেমনি সমানভাবে চলিতেছে। একটি দশ-বারো বৎসরের মেয়ে বালতি লইয়া বাহিরের রাস্তার কলে জল লইতে যাইতেছিল। দারুণ শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে—গায়ে যে জামাটি রহিয়াছে তাহা শতহির আর তেমনি অপরিচ্ছন্ন। আমাকে দেখিয়া মেয়েটির মুখ শুকাইয়া গেল, আড়ষ্ট হইয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বলিলাম, বুকী তোমার বাবা কোথায়?

—বাবা—? জানিনে কোথায় গেছেন—

জিজ্ঞাসা করিলাম, ওরা যে কাঁদছে, ওরা তোমার ভাই না? বোধ হয় ওদের খিদে লেগেছে—খেতে দাও গে।

মেয়েটি অবাক হইয়া বলিল, খেতে দিতে বলছেন! কি দেব খেতে? কাল থেকে আমরা সবাই এক মুঠো যুড়ি খেয়ে আছি। সারা দিন সারা রাত কিছু খাই নি।

বলিলাম, বল কি? তা চৌধুরী মশাই কিছু উপায় করে যান নি?

—বাবা? বাবা কোথায় পাবেন? বাবা যে বড় গরীব! হার করে যা এনেছিলেন সব ফুরিয়ে গেছে। মার যে খুব অসুখ। জামেন, মা বোধ হয় বাঁচবে না—খুব কঠিন অসুখ করেছে। বাবা বলছিলেন কিনা—

নিমেষের মধ্যে চৌধুরী মশায়ের উপর হইতে সমস্ত যুগা ঘুরে চলিয়া গেল। আমার চোখের সামনে অতীব অনশন-ক্লিষ্ট পরিবারের ছবিটি ভাসিয়া উঠিল, কয়টি ক্ষুধাতুর শিশুর কান্না আর সহ্য করিতে পারিলাম না। বেকার ভদ্র-সন্তান—ঘরে রুগী জী—ক্ষুধাতুর শিশুপুত্রকন্যা—গৃহহীন, অন্নহীন বেচারী চৌধুরী মশাইয়ের কথা ভাবিয়া মন বিবাদে ভরিয়া গেল। ভাবিলাম, সমাজের এইরূপ লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার ভদ্রলোক দিন দিন ধ্বংসের পথে নামিয়া যাইতেছে। এইবার আমি এক কাণ্ড করিলাম। পকেট হইতে একখানি পাঁচ টাকার মোট বাহির করিয়া মেয়েটিকে দিয়া বলিলাম, তোমার মাকে দাও গে। বল গে, তোমার বাবা আমার কাছে টাকা পেতেন। যাও দাও গে—

মোটখানি হাতে লইয়া মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তার পর ভীরবেগে বাতীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিল—মা!—আমি আর দাঁড়াইলাম না, চলিয়া আসিলাম।

হু'দিন পর ঠিক এমনি ভোরবেলায় হঠাৎ চৌধুরী মশাইয়ের সহিত আমার দেখা হইয়া গেল। শতহির একখানি ময়লা কাপড় দোভাজ করিয়া পরিয়া বালতি লইয়া রাস্তার কল হইতে জল লইতেছেন। আমার দেখিয়া দাঁড়াইলেন। এ কি চেহারা হইয়াছে ভদ্রলোকের! সমস্ত মুখে গৌকদাড়ি, মাথার চুল আরও পাকিয়া গিয়াছে, সারা দেহে ব্যাধি জরা যেন দ্রুতগতিতে আসিয়া কায়ের হইয়া বলিতেছে।

চৌধুরী মশাই আমার পানে বিমূঢ়ের মত তাকাইয়া বলিলেন, আমার অপরাধ অনেক। আমার অপমান করতে পারেন, হু'খা মারতেও পারেন।

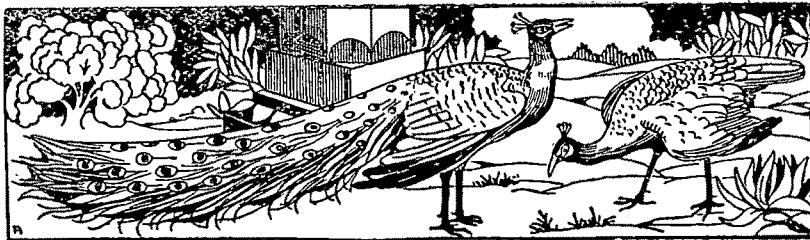
বলিলাম, চৌধুরী মশাই আমি অপমান করবার জন্তে আসি নি।

—কেন? করাই তো উচিত। ওটাই তো আমার পাওনা। অপমান আর গলাধাক্কা খেতে খেতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছি। আমি ঝাঞ্জাঝাজ্জুরোচোর ঠিকই। ইনিরে-বিনিরে নিছের হু'খের কথা আর বলব না। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমরা মধ্যবিত্তেরা কোন পথে পা বাতালে হু'বেলা হু'মুঠো ভাত ছোট্টে বলতে পারেন?

আমি কি বলিব? শুধু চূপ করিয়া রহিলাম।

চৌধুরী মশাই পুনরায় বলিলেন, আপনারা অনেক দিয়েছেন। সে গুণ শোধ করার সামর্থ্য নেই। এই পিঠ পেতে দিলাম, হু'খা মারুন অথবা অপমান করে শোধ নিন—

আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—ছিঃ, কি যে বলেন। আমি চলিয়া আসিলাম। ইহার পর চৌধুরী মশাইয়ের সহিত আর দেখা হয় নাই।



বাংলা ও বাঙালী

শ্রীশুশীলচন্দ্র ঘোষ

৭

পূর্ব প্রবন্ধে স্মৃতিরক্ষা ব্যাপারে উৎসাহীদের মঠ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া প্রকৃত জন-হিতকর কার্যে ঐ সমস্ত অর্থ নিয়োজিত করিবার জন্য আমি আবেদন করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার একজন প্রিয় বন্ধু এ বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন—“সম্প্রতি আমরা বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও মেম্বরদিগকে একটি আপিল করিয়াছি। এই আপিলে স্বামিজীর ভ্রাতা ডঃ ভূপেন দত্ত, বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন বসু, ডঃ কালিদাস নাগ, বিচারপতি গোপেন দাস, বি. কে. গুহ এবং ব্যবহারজীবী শ্রীঅতুল গুপ্ত প্রভৃতি সই করিয়াছেন এবং কলিকাতার বহু পুরুষ ও নারী এই আপিলে সই করতঃ তাঁহাদের সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। আপিলের মূল উদ্দেশ্য হইল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিবেকানন্দ স্কলারশিপ প্রবর্তন করা। স্বামিজীর নামে নূতন করিয়া মন্দির হলঘর নির্মাণের কোনও সার্থকতা নাই ঐ আপিলে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে।” তাঁহার মতে, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবিত “কর্যাল ব্যাঙ্ক” গঠন করা সময়সাপেক্ষ। সেইজন্য ঐ সমস্ত স্মৃতি-তহবিলের সংগৃহীত অর্থের দ্বারা “আপাততঃ বৃত্তি বা স্কলারশিপ স্থাপন” করা উচিত। তাঁহাদের এই স্মৃতিস্তিত প্রস্তাব যে খুবই সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত ৩রা মার্চ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকে. এম. মুন্সী বোম্বাই শহরে কেন্দ্রীয় তুলা উৎপাদন কমিটির সভায় উদ্বোধন-বক্তৃতায় এই মর্মে বলিয়াছেন :

‘ভারত চিরকাল খাদ্যশস্যের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল (পাট, তুলা ইত্যাদি) উৎপাদনে উৎসাহ দান করিতে পারে না।’

সমগ্র ভারতের পক্ষে বাহা সত্য, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তাহা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

গত ১৯৪৭ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত ধান্যের চাষ কমাইয়া পাটের চাষ বাড়াইবার দরুন এই প্রদেশের খাদ্যসমস্যা যে কিরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হিসাব হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক পাটচাষের পরিমাণ :

একর
১৯৪৭—২,২৯,১৭৫
১৯৪৮—৩,১৪,২২০
১৯৪৯—৪,৫৭,৫০০
১৯৫০—৬,৫০,৯০৯
১৯৫১—৮,৭৬,১০০

এই পাটের চাষ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ-সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ধান্যের জমিতে পাট উৎপাদন করিবার কারণে যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইবে সেই অল্পপাতে চাউল—কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ-সরকারকে বিদেশ অথবা অপর প্রদেশ হইতে সরবরাহ করিয়া তাহা পূরণ করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ-সরকারকে যে চাউল সরবরাহ করেন তাহার মূল্য নানা কারণে অনেক বেশী পড়ে। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোনও প্রদেশকে অধিক মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহের হেতু ঘাটতি টাকা পূরণ করিবার জন্য আর অর্থ দিবেন না।

পাটের চাষ প্রদেশবাসীর পক্ষে যে কিরূপ অনিষ্টকর সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। উপরি-লিখিত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ সাল অপেক্ষা ১৯৫১ সালে ৬,৪৬,৯২৫ একর বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। যদিও সঠিক জানা যায় না, ইহার মধ্যে কত ধান্যচাষের জমি ছিল, তাহা হইলেও মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, ইহার শতকরা অন্ততঃ ৮০ ভাগ জমিতে ধান্যের চাষ হইত। আরও জানিতে পারা যায় যে, ১৯৫১ সালে প্রদেশ-সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে পূর্ববৎসর অপেক্ষা এক লক্ষ একর ধান্যচাষের জমিতে (বেশীর ভাগ আউস ধান্যের জমি) পাটের চাষ করিবার ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়ে। প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা যে আউস ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাতে প্রায় ৯২ মণ চাউল পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রতি তিন একর জমিতে কমপক্ষে এক টন চাউল পাওয়া যাইতে পারে। সেই হিসাবে ১৯৫১ সালে ৬,৪৬,৯২৫ একর বেশী জমিতে যে পাটের চাষ করা হইয়াছিল তাহাতে আউস ধান্য রোপণ করিলে আরও অন্ততঃ ২,১৫,৬৪১ টন চাউল পাওয়া যাইত, অর্থাৎ এই প্রদেশের খাদ্যশস্যের ঘাটতির প্রায় অর্ধেক অংশ একমাত্র

বর্ধিত পাট চাষের জমি হইতে পূরণ করিতে পারা যাইত। বিশেষ ভাবে অল্পধারন করিলে দেখা যায় যে, পাটের চাষই বাংলা ও বাঙালীর আর্থিক ও রাজনৈতিক দুর্গতির একটি মূলভূত কারণ। ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জাতির স্বাস্থ্যহানির জন্যও পাটের চাষ যে অনেকটা দায়ী তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে, পাটের চাষ হইতে প্রদেশবাসীরা যথেষ্ট লাভবান হয়, কিন্তু উহা আদৌ ঠিক নহে। ম্যালেরিয়া ও খাদ্যাভাবের জন্য এই প্রদেশে যে প্রতি বৎসর লক্ষ-লক্ষ লোক প্রাণ হারাইতেছে তাহা কাহারও অবদিত নাই। যতদূর অবগত হওয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলিতে উপস্থিত ৩,০৭,৩৫০ জন শ্রমিক কার্য করে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী উহার শতকরা ৮৫ ভাগ অপর প্রদেশবাসী, বাকি শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গবাসী। পাটের মহাজন, দালাল ও পাটকলের অংশীদারদের মধ্যেও এই প্রদেশবাসীর সংখ্যা ঐ অল্পপাতিক হার অপেক্ষা বেশী হইবে না, বরং কম হওয়াই সম্ভব।

আমার ধারণা—যদি এই প্রদেশে কমসংখ্যক পাটকল থাকিত তাহা হইলে প্রদেশবাসীর বিশেষ কিছুই ক্ষতি হইত না। পাটের চাষ হইতে চাষীরা সকল সময় লাভবান হয় না, কারণ পাটকলের মালিকরা সম্ভবতঃ ভাবে তাঁহাদের স্ববিধা-মত পাটের দাম কমাইতে ও বাড়াইতে পারেন। অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, প্রতি বৎসর পাটের চাষ আরম্ভ হইবার পূর্বে পাটের দাম হঠাৎ বাড়িয়া যায়, ফলে ঐ চড়া দামের জন্য পাটচাষীরা বেশী পরিমাণ পাট উৎপাদন করিতে উৎসাহিত হয়। আবার পাট উৎপাদনের পরেই, অধিক পাট উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি নানা অজুহাতে পাটের দাম প্রতি বৎসরই কমিয়া যায়। যদি এই সমস্ত পাটকলের বেশীর ভাগ পার্শ্ববর্তী প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হয় তাহা হইলে অপর প্রদেশবাসী শ্রমিকের সংখ্যাও অনেক কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই এবং ঐ সমস্ত শ্রমিকের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বও সেই অল্পপাতে আমাদের প্রদেশ-সরকারের লাঘব হইবে ও সেই সঙ্গে কম পাট উৎপাদনের জন্য পল্লী-অঞ্চলের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং প্রদেশে অধিক খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইতে পারিবে।

রাজনৈতিক দিক হইতেও ইহার উপকারিতা পশ্চিম-বঙ্গবাসীদের কম নহে। পাট উৎপাদন যদি অন্ততঃ ১২৪৭ মালের অল্পপাতে (২,২২,১৭৫ একর জমি) কমাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে প্রায় দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার অপর প্রদেশ-বাসী শ্রমিক এই প্রদেশের বিধান সভার সভ্য নির্বাচনে এখনকায় মত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। আপাততঃ যখন পশ্চিমবঙ্গের আয়তনবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখা

যাইতেছে না তখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে পাটের চাষ যতদূর সম্ভব কমাইয়া দিয়া ঐ সমস্ত জমিতে ধানচাষের ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। নচেৎ এই প্রদেশের অধিবাসীদের নিজেদের খাদ্যাভাব পূরণ করিবার জন্য নগাদিল্লীর দিকে চিরকাল তাঁকাইয়া থাকিতে হইবে। আমি পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণকামী প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির, বিশেষ করিয়া তরুণদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে এখন হইতেই গ্রামে গ্রামে ও পল্লীতে পল্লীতে রীতিমত প্রচারকার্য আরম্ভ করা উচিত। আশঙ্কা হয়—স্বার্থান্বেষীর দল এই প্রস্তাবকে “প্রাদেশিকতা-পূর্ণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক” বলিয়া অভিহিত করিয়া নানা ভাবে এই “অধিক ধান্য ফলাও” আন্দোলনকে বাধা দিবার চেষ্টা করিবেন। পাট ও পাটজাত দ্রব্য যে-কোনও প্রদেশে উৎপন্ন হউক না কেন, উহার বেশীর ভাগই কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পাট-করের অংশ পাইবেন না—এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার প্রদেশের কল্যাণকল্পে এই আন্দোলনকে বাধা না দিয়া সহায়ত্বভূতিসূচক মনোভাব দেখাইবেন।

কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাত্তবিভাগ “অধিক খাদ্য-উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ” আখ্যায়িত একখানি পুস্তিকা সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে, “পশ্চিমবাংলায় প্রায় ১৪ লক্ষ একর পতিত জমি আছে। এই রাজ্যে বিভিন্ন কারণে এই পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া চাষের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব নহে। প্রত্যেক রাজ্যেই জলবায়ু ও অন্যান্য বিষয়ের সহায়ক রূপে মোট জমির শতকরা ২৫ ভাগ অরণ্যভূমি রাখা প্রয়োজন। ভূমিসংরক্ষণ ও পর্যাপ্ত বাসিপাতের স্ববিধার জন্য অরণ্যভূমির অত্যাৱশ্যকতা অনস্বীকার্য। পশ্চিম বাংলায় প্রায় জমীয় বনভূমির যথেষ্ট অভাব। বর্তমানে এই রাজ্যের পতিত জমির বেশীর ভাগ অংশই চাষে না আনিয়া অরণ্যভূমির জন্য সংরক্ষণ করা দরকার। তদুপরি চারণভূমি ও খাদ্যের অভাবে পশ্চিম বাংলার গবাদি পশু একেই যথেষ্ট হীনবল এবং ইহাদের দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষমতাও ভারতের অনেক অঞ্চলের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশের অধিক নহে।” অর্থাৎ, পতিত জমি উদ্ধার করিয়া উহাতে খাদ্যশস্য-উৎপাদন-বৃদ্ধির কোনরূপ আশা নাই এবং সেইরূপ ব্যবস্থা করাও উচিত হইবে না। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন খুবই কমিয়া গিয়াছে। জমির অভাবে গৃহস্থ যেমন তাঁহার বাগভবন ইচ্ছামত শূন্যের দিকে উঠাইয়া নির্মাণ করিতে

পারেন না, সেইরূপ বনভূমির আয়তন বৃদ্ধি দ্বারাও ফসল উৎপাদনের জমির অভাব পূরণ করা যায় না। সাধারণে বুঝিতে পারিতেছে না যে কি করিয়া পশ্চিমবঙ্গে “বন-মহোৎসব”, “অধিক খাদ্য ফলাও”, “অধিক পাট উৎপাদন করো” এই তিনটি আন্দোলন একই সঙ্গে চলিতে পারে; এবং তাহাদের ধারণা যে ইহা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।

জলসেচন ও নানাপ্রকার সার প্রয়োগ দ্বারা জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার বিষয় উক্ত পুস্তিকাতে বাহা লেখা আছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা এই প্রদেশে উপস্থিত কার্য্যকারী করা সম্ভব কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। প্রথমতঃ; আবশ্যকমত কম্পাষ্ট অর্থাৎ পাচা সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে না; দ্বিতীয়তঃ পোড়া কয়লার অভাব হেতু লক্ষ লক্ষ মণ গোবর-সার জালানি-কার্য্যে লাগিয়া যাইতেছে, কারণ ভারত সরকার পোড়া কয়লার জন্য রেলগাড়ী সরবরাহ একেবারে নিয়তম ধাপে স্থির করিয়া দিয়াছেন। যদিও সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, জনসাধারণের স্বার্থোৎসাহিত্যে ভারত-সরকারের প্রথম ও চরম উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা কমিশনও স্পষ্টাঙ্গরে লিখিয়াছেন যে, ফসল-উৎপাদনকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, সমস্ত পল্লী-অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার সময়সাপেক্ষ এবং উহা না হওয়া পর্য্যন্ত জলসেচন-ব্যবস্থার বিশেষ কোনরূপ সুবিধা হইতে পারে না। ঐ পুস্তিকাতে কৃষিক্ষেত্রে এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাও শোনা গিয়াছে যে, টেনিসি ভ্যালির সুবিখ্যাত কৃষিক্ষেত্রে এই রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া বহু সহস্র একর জমি একেবারে চাষের অল্পপযোগী হইয়াছে। ইহা ব্যবহার করিলে প্রথম দুই-তিন বৎসর অবশ্য অধিক পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরে সেই জমি নাকি চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অল্পপযোগী হইয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে একেই চাষের জমির অভাব, তার উপর এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হওয়া মারাত্মক। সেই জন্য এই সার ব্যবহার করিবার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ ভাবে অল্পসন্ধান করিয়া দেখা দরকার যে, সত্যি টেনিসি ভ্যালিতে এইরূপ ঘটিয়াছে কিনা।

ঐ পুস্তিকা পড়িয়া মনে হয়—একমাত্র খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া খাদ্যবিভাগ মনে করেন না। শস্য-রক্ষা ও শস্য-অপচয়ের বিষয় উহাতে বাহা লিখিয়াছেন তাহারও কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। —“পশ্চিম বাংলায় বরাহ, হুন্মান ও বাঁদরের অত্যাচারে প্রতি বৎসর বহু শস্য নষ্ট হইয়া থাকে। দেশের অনেক

লোকই সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া এই শস্য-অনিষ্টকারী বাঁদর ও হুন্মান নিধনে বিরত হন। জীবনধারণের প্রতিযোগিতায় বাঁচিতে হইলে এই শস্তহানি নিবারণকল্পে বন্যবরাহ, বাঁদর, হুন্মান প্রভৃতি ফসল-অনিষ্টকারী জন্তুর নিধন অত্যা-বশ্যক। দেশের জনসাধারণকে এই কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকার প্রতি নিহত বন্যবরাহ বাবদ চার টাকা এবং প্রতি নিহত হুন্মান বা বাঁদর বাবদ তিন টাকা পুরস্কার দিয়া থাকেন। ১৯৪৯-৫০ সালে হাওড়ার জেলা..... একক প্রচেষ্টায় ৬১৩টি হুন্মান নিধন করিয়া ১,৮৩৯ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।”

খাদ্যবিভাগ এই অভিনব উপায়ে প্রদেশে একই সঙ্গে শস্যরক্ষা ও বেকার-সমস্যার সমাধানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সমস্ত নিহত হুন্মান, বাঁদর, বন্যবরাহ ইত্যাদি পশুদের মাংসের দ্বারা প্রদেশের খাদ্যসমস্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান হইয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে উক্ত পুস্তিকায় কিছুই উল্লেখ নাই। শুনিলাম কোন কোন মহকুমায় হুন্মান ও বাঁদরের লেজটি মাত্র কাটিয়া আনিয়া দেখাইলেই তিন টাকা করিয়া পুরস্কার পাওয়া যায়।

পার্শ্ববর্তী প্রদেশে হুন্মান ও বাঁদরের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশী তাহা সকলেই জানেন। যদি এই প্রদেশের উৎসাহী বেকারের দল নিজেদের প্রদেশ হইতে হুন্মান ও বাঁদরের লেজ কাটিয়া আনিয়া উক্ত হারে পুরস্কার দাবি করেন তাহা হইলে তাহা উপেক্ষা করা শক্ত হইবে, কারণ কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে ঐরূপ আপত্তি “প্রাদেশিকতার পরিচায়ক।”

খাদ্যবিভাগ “শস্ত্রহানি নিবারণকল্পে” “অনিষ্টকারী জন্তুর নিধন অত্যা-বশ্যক” বলিয়া মনে করে। কিন্তু উক্ত বিভাগের কর্তৃপক্ষ বোধ হয় অবগত নহেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য ও পুনর্ন্যস্তি বিভাগ বহু উৎকৃষ্ট শস্ত্র উৎপাদনকারী চাষের জমি, মধ্যবিত্ত অ-চাষী বাস্তহারা-দের গৃহনির্মাণের জন্ত “অনাবাদী ও পতিত জমি” বলিয়া ঘোষণা করিয়া সরকার কর্তৃক গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত জমি গ্রহণ করিবার পূর্বে সাহায্য ও পুনর্ন্যস্তি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগের নিকট অল্পসন্ধান করেন নাই যে, প্রস্তাবিত জমিগুলি সত্য-সত্যি অনাবাদী ও পতিত কিনা। সম্প্রতি সাহায্য ও পুনর্ন্যস্তি বিভাগ কলিকাতার নিকটবর্তী কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ-সরকারের কৃষিবিভাগের পরামর্শে পরিচালিত একটি উচ্চ ধরনের মিশ্র কৃষি-প্রতিষ্ঠানের জমিগুলিকে অনাবাদী ও পতিত জমি বলিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন—এই

সংবাদ পাইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগের এন্টি-ষ্টাণ্ট ডিরেক্টর ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কলিকতায় মহোদয়কে জানাইয়াছিলেন। পরে শুনিলাম কলিকতায় মহোদয়ও এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তীব্র মন্তব্যসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রিপোর্ট দিয়াছেন। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় শস্যহানি নিবারণকল্পে হস্তাক্ষর ও বীজের নিধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা করি সরকারী কোনও

কর্মচারী শস্য উৎপাদনে বাহাতে বাধা না দিতে পারেন তাহার সুব্যবস্থাও তিনি করিবেন।

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী “পশ্চিম বাংলার খাদ্যসমস্যা” শীর্ষক পুস্তিকায় নিজেই লিখিয়াছেন, “আমাদের বর্তমান খাদ্যসমস্যা জাতির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের একটি মৌলিক সমস্যা। একে মাত্র একটি সাময়িক বা আকস্মিক সমস্যা বলে উপেক্ষা করে বহুদিন আমরা ভুল করেছি।”

যিহুদী শব্দের উৎপত্তি

শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস

বর্তমান প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত যিহুদা (Judaea) নামক অঞ্চলের নাম যিহুদা-জমের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে হইতে পরবর্তী পাঁচ শতাব্দীকাল পর্যন্ত ছিল—(হিব্রু) Yehudah, যিহুদা (Judah)। এই হিব্রু শব্দ yehudah হইতে প্রথমে গ্রীক ও তৎপরে লাতীন অনুবাদে মধ্য দিয়া ‘যুডা’, ও উহা হইতে ইংরেজী Judah শব্দের উৎপত্তি হয়। উক্ত যিহুদাভাষীরা ইসরায়েল বংশের লোক বুঝাইতে হিব্রু শব্দ yehudah হইতে উদ্ভূত ‘yehudai’ (যিহুদাই) বা y’hudi (যিহুদী) শব্দ ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে গ্রীক ও গ্রীক হইতে লাতীন অনুবাদে Judaeus (যুডাইউস), তৎপরে ফরাসী ভাষায় juif ও তাহা হতে ইংরেজী Jew শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত বাংলা ‘যিহুদী’ শব্দ মূল হিব্রু ‘যিহুদাই’ শব্দের নিকটতর। হিব্রু yehudai শব্দ (ইংরেজী অনুবাদে Jew) Old Testament-এর 2 king’s নামক পুস্তকের বোডন অধ্যায়ে প্রথম পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তক সম্ভবতঃ যিহুদাবাসিনগরের ব্যাবিলন দেশে তৎকালীন রাজা কর্তৃক নির্বাসিত হওয়ার পর খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিব্রুভাষায় লিখিত হয়, পণ্ডিতেরা এইরূপ অনুমান করেন। এই সময়ের পূর্বে পর্যন্ত যিহুদী জাতির পূর্ব-পুরুষগণকে বুঝাইতে ইসরায়েল শব্দই O. T. গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

* লাতীন ভাষায় আত্ম ‘J’ উচ্চারণ ছিল ‘য’ (সংস্কৃত ‘য’এর মত)।

হিব্রু, ইসরায়েল ও যিহুদী—যিহুদী জাতির উদ্ভূত পিতৃপুরুষ আব্রাহাম ‘হিব্রু’ (Hebrew মূল হিব্রুভাষায় ‘ইব্রাই’) এই নামে অভিহিত হন, হিব্রু ইব্রাই (গ্রীক Hebraios) শব্দের অর্থ,—‘দূরস্থিত অপরপার হইতে আগত’,—যেহেতু আব্রাহাম নূর ইউফ্রেজীস নদীর পার হইতে আসিয়া পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের পূর্বোপকূলস্থ কানাআন প্রদেশে (বর্তমানে প্যালেষ্টাইনের পশ্চিমাংশ) বসবাস করেন। বর্তমানে ‘হিব্রু’, ‘ইসরায়েল’ ও ‘যিহুদী’ এই শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ‘হিব্রু’ শব্দ প্রথমে আব্রাহাম ও তদীয় বংশধরগণকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। তৎপরে আব্রাহামের পৌত্র যাকোব (Jacob) ইসরাএল নাম গ্রহণ করিলে যাকোব ও তদীয় বংশধরগণকে বুঝাইতে ইসরায়েল নাম প্রচলিত হয়। একত ‘হিব্রু’ নাম ব্যাপক অর্থে আব্রাহাম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ইসরায়েল জাতিকে বুঝাইতে পারে। আর ইসরায়েল রাজ্য ও তৎপার্বর্তী কানাআন-এর আদিম অববাসিনগরের সংমিশ্রণে পরবর্তীকালে উদ্ভূত যে মিশ্রিত জাতি yehudah বা যিহুদার বাস করিতে থাকে তাহাদিগকে যিহুদাবাসী এই অর্থে yehudai বা y’hudi (যিহুদী Jew) নাম দেওয়া হয়।*

* এই শব্দের প্রথমার্থে লিখিত যিহুদী শব্দের উৎপত্তি-নির্ধারণ সম্পর্কে আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু, ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীহরীশ-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।



বাগ্দাদে ভারতীয় চারুকলা শিল্পের উদ্বোধন

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) ইরাক সরকারের শিক্ষা-সচিব মিঃ খলিল কেরা বাগদাদের 'ফাইন আর্টস' ইনস্টিটিউটে একটি ভারতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ভারত-সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভারতের চারুকলা ও হস্ত-শিল্প সমিতি ঐ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। উদ্বোধন-কালে মিঃ কেরা বলেন—ইরাকের যুব-সমাজের মধ্যে শিল্পাভিরাগ প্রসারে এই প্রদর্শনী বিশেষ সহায়ক হইবে এবং ভারতের সহিত আমাদের মধ্যে সংস্কৃতির বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিবে। ঐ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন—আমাদের আনন্দের বিষয় এই যে, ভারত-সরকার ও ভারতীয় শিল্পীগণ তাঁহাদের উদ্যোগবাহক চারুকলার মনুনা দর্শনের সুযোগ দিয়াছেন। মহান মানবিক ধর্মের প্রেরণা বরাবর ভারত হইতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতালাভের জন্ত কিরূপে সংগ্রাম করিতে হয় তাহা ভারত আমাদের শিক্ষা দিয়াছে। দেশের সম্পদগুলির জন্ত সরকার ও জনসাধারণ কি ভাবে পরস্পরকে সহযোগিতা করিতে পারে তাহা ভারত বর্তমানে আমাদের শিক্ষা দিতেছে।

ইরাকের প্রধান মন্ত্রী ও অজ্ঞাত মন্ত্রিগণ, বিভিন্ন মিশনের প্রধামগণ, প্রধাম প্রধান শিল্পীগণ, কয়েক জন শিক্ষাব্রতী এবং পাঁচ শত গণ্যমান্ত অতিথি ঐ উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ইরাকের প্রধান মন্ত্রী বলেন—ইরাকের শিল্পীদেরও ভারতে অসুস্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা উচিত।

ঐ প্রদর্শনীতে সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পীদের প্রায় দুই শত চিত্র প্রদর্শিত হয়। তাহা ছাড়া ভারতের ভূমিভাগ ও জন-সাধারণ, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যবিভাগের নিদর্শন এবং হস্ত-শিল্পের বিশিষ্ট আলোকচিত্রও সেখানে রাখা হয়। ঐ প্রদর্শনীতে পূর্বযুগের চিত্রের এক শতাব্দী মুদ্রিত কপিও রহিয়াছে। ইতিপূর্বে কায়রো, ইস্তাম্বুল এবং আফ্রিকাতেও অসুস্থ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।





নালন্দা-বিহারের সাধারণ দৃশ্য

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ, বি-টি

বৈদিক যুগে তপোবনের শাস্ত্র পরিবেশের মধ্যে সত্যত্রষ্টা ঋষিগণ লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে যে শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন, বৌদ্ধসঙ্ঘের পরিচালনাধীন হইয়া সেই শিক্ষা-পদ্ধতি উত্তরকালে যেন আরও উন্নততর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। নালন্দা-পদ্ধতিতে তাহার পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হইয়াছিল। সঙ্ঘ-পরিচালিত শিক্ষাতেও বৈদিক যুগের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

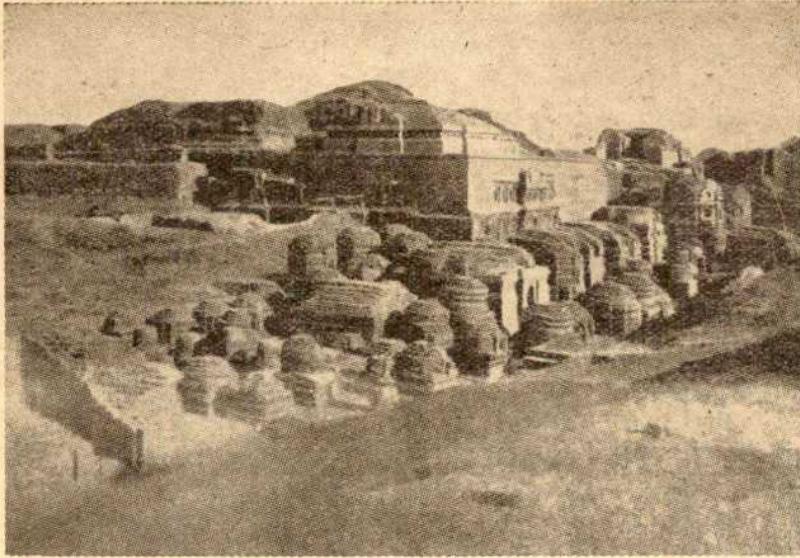
সঙ্ঘ-পরিচালিত শিক্ষার পৌরবয়স্ক যুগেও হিউয়েন-সাঙ তারতবর্ষকে পো-লো-মেন-কিউ অর্থাৎ ‘ব্রাহ্মণের দেশ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ ভগ্নমণ্ডল শিক্ষা-দীক্ষায় সমাজের শীর্ষস্থানে সমাক্রান্ত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ভগ্নমণ্ডল দেবভাষা বলিয়া সমাদৃত ছিল।^১ ‘সিদ্ধিরত্ন’ নামক যে পুস্তকের উল্লেখ হিউয়েন-সাঙ ও ইংসিং উভয়েই করিয়াছেন সেই পুস্তকের প্রারম্ভে “মমঃ সর্বজ্ঞান” এই শোভা বুদ্ধ বা পরম-পুরুষ ভগবান বীহার উদ্দেশ্যেই রচিত হউক না কেন, এই পুস্তকের বিষয়বস্তু শুধু আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবিভেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহাতে বর্ণিত পাঁচটি বিভাগ মধ্যে যুগোপযোগী শিল্পবিজ্ঞা, চিকিৎসা-বিজ্ঞা প্রভৃতিরও যেমন উল্লেখ রহিয়াছে তেমনই উপনিষদের অধ্যায়বিজ্ঞা, পানিনির ব্যাকরণ প্রভৃতিও উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবাসীর রাজনৈতিক

ও ধর্মমৈত্রিক জীবনে বহু বিপ্লব সংঘটিত হইলেও ভারতের শিক্ষাবারা তার মূলপ্রবাহ পরিবর্তন করে নাই। অরপাভীত-কালে যে শিক্ষাবারা তপোবন-উৎস হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল, কালের পরিবর্তনে কখনও তাহা ক্ষীণ-শ্রোতা হইয়াছে এবং কখনও হু’কুল প্রাবিত করিয়া ভারতের সভ্যতাকে অশ্রুত-রসে সিক্ত করিয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাহা মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। এই মূল স্রোতের উপর তত্ত্ব করিয়াই নালন্দার ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে।

বর্তমান পাটনা জেলার বিহার মহকুমার বড়গাঁও (বিহার গ্রাম)-এর নিকট প্রাচীন নালন্দা অবস্থিত ছিল। ‘নাল’, ‘নালক’, ‘নালেজ’ প্রভৃতি বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত স্থানসমূহ নালন্দার অংশবিশেষ ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। প্রাচীন রাজগৃহ হইতে নালন্দা মাত্র সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত, ফলে রাজগৃহের এই উত্তর স্থানের সংস্কৃতিগত যোগাযোগ ছিল গভীর। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার সহিত নালন্দাও প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। শৈলশ্রী-মণ্ডিত প্রকৃতির স্নেহকোড়ে অবস্থিত এই গ্রামটি বহু প্রাচীনকাল হইতেই জ্ঞানানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণী নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। চীনদেশের সহিত ভারতে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের স্বচনা খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক হইতে। পরবর্তীকালে ভারত-চীন সাংস্কৃতিক যোগসূত্র আরও

^১ On Yuan Chwang's Travels in India—walters—vol. II, pp. 140, 153.



নালন্দার প্রস্তরনির্মিত মন্দির

দুট হইয়াছিল। চীন পরিব্রাজকদের মধ্যে ফাহিয়ান, হিউয়েন-সাঙ, ইংসিং ও সেন্টি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'সঙ্ঘ' গ্রহণ করার পরেই চৈনিক বৌদ্ধপ্রচারণা বর্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত ও বর্ধসমজ্ঞা সমাধানের জন্ত ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন, নালন্দা বৌদ্ধবর্ধ ও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র হওয়ার তাহার সহিত চৈনিক জ্ঞানীদের সঙ্গ আরও গভীর হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধবর্ধের ক্রমবিবর্তনের তথ্যাদি তিব্বতীয় গ্রন্থাদি হইতেও বহুল পরিমাণে উদ্ধার করা হইয়াছে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের বিবরণ, তিব্বতীয় 'তাবু' নালন্দা ও বিক্রমশীলার পণ্ডিতদের লেখা গ্রন্থসমূহের তালিকা, সূত্রাং প্রণীত পাণ-সাম-জোম-জাং প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নালন্দার ইতিহাস সম্পর্কে ভারতীয় উপকরণসমূহের মধ্যে সমসাময়িক রাজাদের শিলালিপি, শীলমোহরে উৎকীর্ণ 'শ্রী নালন্দা মহাবিহারীধর্ম-ভিক্ষু সঙ্ঘ' লিপি, হিন্দু ও বৌদ্ধ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রাচীন পালি-সাহিত্যে 'বিহার' কথাটি—এক একজন ভিক্ষুর বাসের জন্ত এক একটি স্বতন্ত্র-কক্ষ এই অর্থে প্রযুক্ত হইত।—পরে 'বিহার' বলিতে সাধারণতঃ বুঝাইত একরূপ নিকেতন বা মঠ। যেখানে কতকগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুর চেষ্টায় বিহারগুলি ক্রমে বিভাজ্যতনে পরিণত হইল। রাজা, মহারাজ এবং শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও বিহার নির্মাণ করিয়া বা বিহার নির্মাণে অর্থসাহায্য করিয়া পুণ্যার্থীদের প্রয়াস পাইতেন। বুদ্ধ-শিষ্য

সারিপুত্র মদগৌল্লারনের সহিত নালন্দার স্থতি জড়িত থাকায় পুণ্যার্থীদের দৃষ্টি নালন্দার উপরে পড়িল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা-পাঠে জানা যায় যে, নালন্দায় বালাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিহারের উত্তর-পূর্ব দিকে যে তপস্ট বিজয়াম ছিল সেই স্থানে বসিয়া বুদ্ধদেব বর্ধপ্রচার করিয়াছিলেন।^১ ভারতবর্ষে বসেন, অশোক সারিপুত্রের চৈতন্য স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন।^২ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান মতের কেন্দ্র হিসাবে নালন্দা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। গুপ্ত-সম্রাট কুমার গুপ্ত ও তাঁহার বংশধরগণ, এবং পরবর্তীকালের বহু রাজগণ নালন্দা মহাবিহারের ত্রিভুজী সাধনে যুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা গৌরবের উজ্জ্বল শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায় পর্যন্ত পাল-সম্রাটদের দামে নালন্দা পুষ্ট হইয়াছিল।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে রাজগৃহ এবং তৎসঙ্গে নালন্দাও সম্ভবতঃ স্থবিরবাদীদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সম্রাট অশোকের অধিনায়কত্বে এবং যোগেশ্বরী পুত্র তিসুদের পৌরোহিত্যে যে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্ঘীতি আহুত হইয়াছিল তাহাতে বুদ্ধদেবের কথোপকথন ও উপদেশাবলী সঙ্কলিত হইয়া 'ত্রিপিটক' রচিত হয়। স্থবিরবাদীদের বর্ধমত তাহার উপরেই

১ On Yuan Chwang's Travels in India—Walters—Vol. II, p. 171

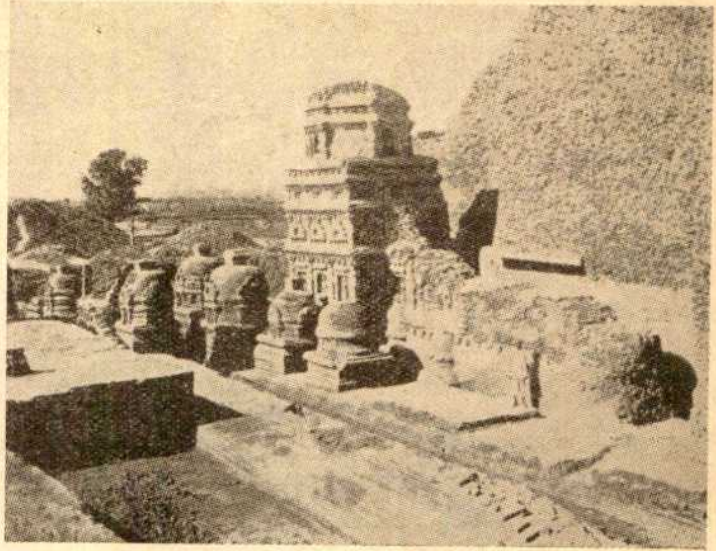
২ রাজগৃহ ও নালন্দা—ডক্টর অম্বল্যচন্দ্র সেন, পৃ. ৮০

প্রতিষ্ঠিত। তিব্বতীয় কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, সম্রাট অশোকের সময় হইতে সম্রাট কণিষ্কের সময় পর্য্যন্ত হুবিরবাদ উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্রই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বা মহিন্দ এই মতবাদ সিংহলেও প্রচার করিয়াছিলেন।^৩ সম্রাট অশোককর্তৃক নালন্দাতে সারিপুত্তের চৈত্রে পূজাদান এবং গুপ্ত নির্মাণের বিবরণী পাঠে এইরূপ অনুমান করা অসম্ভব হইবে না যে, অশোকের পৃষ্ঠপোষকতার সংগত হুবিরবাদের অত্যন্ত শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দাতেও ছিল।

হুবিরবাদীদের কল্যাণে বৌদ্ধধর্মের কঠোর নিয়ম ও অনুশাসনের প্রভাব দেখা দিল। ব্যক্তিগত অর্জিত লাভই ধর্মের মূল লক্ষ্য হইল ফলে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয়তা হারাইতে লাগিল। দ্বিতীয়

বৌদ্ধ সঙ্গীতির ফলে যে মহাসাংলিক সম্প্রদায় সৃষ্ট হইল সেই সম্প্রদায় অর্জিত লাভ হইতে বোধিসত্ত্ব লাভের উপরেই বেশি জোর দিয়াছিল। বুদ্ধ জগজ্ঞানান্তর ধরিতা বোধিসত্ত্বরূপে আবির্ভূত হইয়া জীবজগতের অশেষ কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব লাভ কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের অনুশাসনাবলী নহে। সকলেই পারমিতা বা গুণ বিশেষের (দান, শীল, ক্ষান্তি, বীৰ্য, ধ্যান, উপায়, কৌশল, প্রণিধান, বল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা) চর্চা করিয়া বোধিসত্ত্ব অবস্থা লাভ করিতে পারে।

মহাসাংলিক মতবাদ এবং এই মতবাদ হইতে সৃষ্ট লোকোত্তরবাদ উত্তর-ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করিতে লাগিল এবং ক্রমে দক্ষিণপথে অরুণদেশের অমরাবতী ও নাগার্জুনীকোণ্ড এই মতবাদবহুর প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। অমেরেই ধারণা যে সম্রাট কণিক কর্তৃক আনুত চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির ফলেই মহাযান মতের সৃষ্টি। অবশ্য চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি উপলক্ষ্য মাত্র। এই সঙ্গীতিতে যে সকল সত্য যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হুবিরবাদীদের প্রতিনিধি অতি অল্পই ছিলেন, অবিকাংশই ছিলেন মহাসাংলিক।^৪ চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির পরে মহাসাংলিকদের প্রচারের ফলেই মহাযান মতবাদ জনপ্রিয় হইতে লাগিল। ভারতবর্ষের বিবরণ হইতে জানা যায়, মহাযান মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক নাগার্জুন



নালন্দার প্রধান স্তূপের সহিত সংশ্লিষ্ট তোরণ ও অন্যান্য স্তূপ

নালন্দা সঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে হীনযান মতের প্রধান কেন্দ্র 'বজ্রাসন' বা বুদ্ধগয়ার প্রাধান্য নষ্ট হইল এবং নালন্দাই মহাযান মতের প্রধান কেন্দ্র হইল।^৫

নালন্দা মহাবিহারের ইতিহাসের অব্যাহতকে দ্বিতীয় মহাযান মতের অব্যাহত বলা যাইতে পারে। শিক্ষা ব্যাপারে সমসাময়িক রাজাদের এবং পুণ্যার্থীদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই নালন্দার উন্নতি। নাগার্জুনের সমসাময়িক হুবিস্ন নামক একজন ব্রাহ্মণ অভিধর্ম রক্ষাকল্পে নালন্দায় একশত আটটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।^৬ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষের দিকে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বর্ণনায় বঙ্গদেশের তাজলিগুপ্তে দ্বাবিংশটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের উল্লেখ থাকিলেও নালন্দার বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ফা-হিয়েন তাজলিগুপ্ত ও পার্শ্বলিগুপ্ত ব্যতীত অতঃপর কোন স্থানে এমনকি বৌদ্ধতীর্থ সারণাধেও গিরাছেন বলিয়া কোন উল্লেখ তাঁহার বিবরণীতে পাওয়া যায় না।^৭ সম্ভবতঃ নালন্দা বিহার তখন ছোট ছিল বলিয়া ফা-হিয়েন ঐ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বর্ণনা করেন নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের রাজত্বকালে (আ: ৪১৫-৫৫ খ্রি: অ:) সম্ভবতঃ মহাবিহারের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। পরবর্তী গুপ্তসম্রাটদের

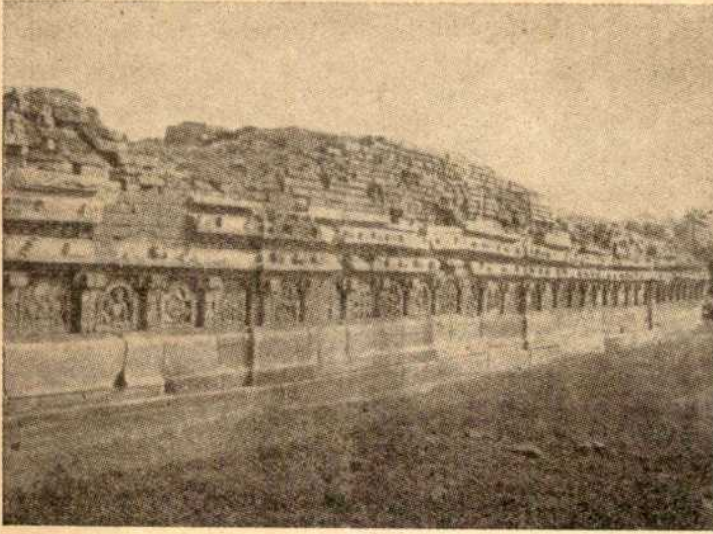
^৩ Age of Imperial Unity—Edited by Dr. R. C. Majumder and A. D. Pushalkar, p. 388

^৬ Ancient India Education—Dr. R. K. Mukherjee, p. 558

^৭ বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম—মলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃ. ৪৪

^৩ Age of Imperial Unity—edited by Dr. R. C. Mazumder and A. D. Pusalkor, p. 380

^৪ বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম—মলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃ: ১১



১২নং চৈতন্য ও শু পসমুহ

প্রথম কুমারগুপ্ত, বৃহগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য, বৈশম্ভগুপ্ত, বজ্র প্রকৃতি রাজগণের দানে নালন্দা মহাবিহার উত্তরোত্তর ত্রিগুণি লাভ করিয়াছিল। হিন্দু দেবদেবীর ভায় বৌদ্ধমূর্তি নির্মাণ এবং তাহাতে অর্ঘ্যদান মহাযান মতের প্রচারের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মহাপরিমর্কারণের অনতিকাল পরেই শু পপূজা এবং বৌদ্ধব্রহ্মরূপে চৈতন্যরূপের পূজা আরম্ভ হয়—ভারতের এবং সীচিন্তপের বৈদিকার লিপিমাল্য তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করে।^৮

রাজসাহী জিলার বিহারেইল গ্রামে যে বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, এবং বগুড়া মহাধামে বলাইবাগ শুপের নিকটে বৌদ্ধমুখী মঞ্জুত্রীর ব্রোঞ্জমূর্তি নির্মিত যে মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বৌদ্ধ মহাযানীয় মূর্তি বলিয়া অনেক অনুমান করেন।^৯ খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্মে যে মহাযান মতবাদের সৃষ্টি হইল, অষ্টম শতাব্দীতে তাহা প্রবল আকার ধারণ করিয়া তাত্ত্বিক বৌদ্ধ ধর্মের জন্মদান করিল। মহাযান মতের কল্যাণেই বুদ্ধ হইয়া গেলেন দেবতা এবং বৌদ্ধসত্ত্বগণও বিভিন্ন দেবরূপ পরিগ্রহ করিলেন।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মান্দাসোররাজ যশোধর্ম্মের মন্ত্রী মালদা মালন্দা মহাবিহারে প্রভূত অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন। হিউয়েনসাঙের বর্ণনায় জানা যায় যে, দেশের রাজা বিশ্ববিভ্যালয়ের সাহায্যের জন্য একশতটি গ্রামের রাজস্ব দান করিয়াছিলেন।^{১০} এই রাজ্য নিম্নরূপে পুষ্যভূতি বংশীয়

ধর্ম্মরাজ। কনৌজরাজ যশোধর্ম্ম ও (আ: ৭২৫-৭৫২ খ্রি: অ:) মালন্দার অর্ঘ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। বাংলার পালসম্রাটগণের মধ্যে ধর্ম্মপাল, দেবপাল এবং তাহাদের বংশধরগণ মালন্দার প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেন। এই প্রকারে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মতপন্থীদের দানে মালন্দা বিশ্ববিভ্যালয়ের সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল।

মালন্দার ভায় বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আর্থিক দায়িত্বভার সমসাময়িক রাজগণ এবং সম্পৎশালী ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালন্দা ছিল আবাসিক বিশ্ববিভ্যালয়। বিরাট ছাত্রাবাস পরিচালনা, অধ্যাপনার ব্যবস্থা এবং বিদেশীয় ছাত্রগণের অধ্যয়নাদির যাবতীয় ব্যবস্থা তিসুসভ্যের অধ্যাপক-মণ্ডলীর উপরেই তত্ত্ব ছিল। বিশ্ববিভা-

লয়ের কর্ণধারকে বলা হইত 'সর্কীয়াক' বা প্রধামাচার্য্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অধ্যাপকগণই করিতেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, সুদীর্ঘ সাত শত বৎসরের মধ্যেও মালন্দা বিশ্ববিভ্যালয়ে নিয়ম ভঙ্গের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই।

আহার, বাসস্থান, অধ্যয়নাদির জন্য ছাত্রদের কোন অর্থ ব্যয় হইত না, বিভ্যালয়ের কর্তৃপক্ষই ব্যয়ভার বহন করিতেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় মালন্দার অবস্থান কালে তাহার দৈনন্দিন খাওয়ার একটি তালিকা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এইজন্য তাহাকে কোন অর্থব্যয় করিতে হইত না। তৎকালে মগধে উপায় মহাশালি চাউল রাজ্য, মহারাষ্ট্র এবং সল্লাস্ত উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধারণের ভোগ্য জুটত না। দৈনিক এক পেঙ্ক (১৪ আউন্স বা ৭ হুটাক) মহাশালি চাউল হিউয়েন সাঙ আহারের জন্য পাইতেন। ইহা ব্যতীত বিশটি বাদাম জাতীয় ফল, এক শত বিশটি বাতাবি লেবু (বর্তমান সময়ে মৌসুমী জাতীয় ফল ?) এক আউন্স কপূর এবং দুই ও মাখন প্রয়োজনাত্মক পাইতেন।^{১১} হিউয়েন সাঙের সময়ে মালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার, ইংলিণ্ডের সময়ে ছিল তিন হাজারের অধিক।

প্রবেশাধিকার

চৈনিক পরিব্রাজক ইংলিণ্ড ভ্রমণকার কালের প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বিশ্ববিভ্যালয়ের অধ্যয়ন পর্য্যন্ত একটি পাঠক্রম বর্ণনা করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে ছয় বৎসর বয়সেই "সিদ্ধিরন্ত"

৮ মূর্তি ও মন্দির—রমাপ্রসাদ চন্দ, পৃ. ৩

৯ বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্ম—মলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃ: ৪৫-৪৬

১০ Harsha—Dr. R. K. Mukherjee, p. 130

১১ Ancient India Education—Dr. R. K. Mukherjee, p. 571

(সিদ্ধিলাভ হটক) নামক তিন শত শ্লোক সম্বিত একবানি পুস্তক পাঠ আরম্ভ করা হইত। আট বৎসর বয়সে পাণিনির ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ হইত। ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিতে দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইত। ব্যাকরণের পরে হেতু বিজ্ঞা ও অতিবর্ষ কোষ-পাঠ আরম্ভ হইত এবং সর্বশেষে নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া পাঠ সমাপ্ত করা হইত। ১২ ইংসিঙের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, ছাত্রদের বিশ-বৎসর বয়সের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হইত না। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাতি বর্ষ-নির্বিশেষে সকলকেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত, কিন্তু প্রবেশ লাভের যোগ্যতালভ দেশ-দেশান্তর হইতে আগত ছাত্রগণ, দ্বারপণ্ডিতদের নিকট নিজেদের উচ্চ-শিক্ষা লাভের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিত। এই পরীক্ষা এত কঠিন ছিল যে, প্রতি দশ জন প্রবেশপ্রার্থী ছাত্রদের মধ্যে সাত-আট জনকেই ব্যর্থতার হুঁশে ভারাক্রান্ত চিত্তে ফিরিয়া যাইতে হইত। ১৩ চীন, তিব্বত, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রগণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন।

নালন্দার পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ ও ইংসিঙের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য। বর্ষনির্বিশেষে ভারতের সমগ্র জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা নালন্দার পাঠ্য সূচীতে দেখা যায়। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পাঠ্য সূচীতে স্থান লাভ করিয়াছিল : ১। চতুর্বেদ, ২। বৌদ্ধহীনযান বর্ষ পুস্তক-৩। মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার (মহাসাধিক ৭, ধেরবাদী ১১) তত্ত্বনিচয়, ৪। হেতুবিজ্ঞা বা ভাষ্য শাস্ত্র, ৫। শব্দবিজ্ঞা বা ব্যাকরণ, ৬। রসায়নশাস্ত্র, ৭। চিকিৎসা বিজ্ঞা, ৮। বাহুবিদ্যা, ৯। যোগশাস্ত্র, ১০। জ্যোতিষ বিদ্যা, ১১। ব্যবহারিক শাস্ত্র, ১২। শিল্প স্থান বিদ্যা, ১৩। বাতু-বিদ্যা, ১৪। তান্ত্রিক বৌদ্ধ শাস্ত্র। ১৪

হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন যে, নালন্দায় শিক্ষক ও ছাত্রের নিকট প্রব্রোত্তর জিজ্ঞাসা ও আলোচনার পক্ষে গোটা দিনটিও যথেষ্ট ছিল না। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানে আলোচনা ও বিতর্কের বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষণীয় বিষয়ের তাৎপর্য

উপলব্ধির উপরেই বেশি জোর দেওয়া হইত বলিয়া মনে হয়। আবৃত্তির উপরে তৎকালীনার ভাষ্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিত। মৌলিক প্রবন্ধাদি রচনার নালন্দা-পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। বক্তৃতা অভ্যাসের উপরে বেশী জোর দেওয়া হইত। তপোবন-প্রবর্তিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা এইস্থলে সমগ্রগত বা শ্রেণী শিক্ষার পর্যাবসিত হওয়ার বক্তৃতা পদ্ধতির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। হিউয়েন সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈনিক এক শতটি বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল একথা উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপনার জন্য আটটি বড় হলঘর এবং তিন শত প্রকোষ্ঠের বর্ণনা ইউসিঙের লেখায় পাওয়া যায়।

নালন্দা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরীক্ষার পরে উপাধি দানের ব্যবস্থা ছিল। তৎকালীনার ভাষ্য মৌলিক পরীক্ষা গ্রহণের রীতি এখানেও প্রচলিত ছিল—তবে পরীক্ষণীয় বিষয়-সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দশ হাজার ছাত্রের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারীকে ‘কুলপতি’ আখ্যা দেওয়া হইত, কুলপতির নীচেকার ত্রয়ের উপাধি ছিল ‘পতিত’।

ভিক্ষতীয় লেখকের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নালন্দা মহাবিহারে ‘বর্ষগল্প’ নামক স্থানে, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক ও রত্ন-দধি নামক ত্রয়্য প্রাসাদে তিনটি উন্নত ধরনের পাঠাগার ছিল। ‘রত্নসাগর’ নামক একটি নয়ভলা প্রাসাদে সর্কোপেক্ষা বৃহৎ পাঠাগারটি অবস্থিত ছিল। অগ্নিকাণ্ড এবং মুসলমানদের আক্রমণের ফলে এই পাঠাগার কয়টির মূল্যবান পুস্তক সকল নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তিব্বতীয় তালিকায় কেবলমাত্র তাহাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দার শিক্ষা-পদ্ধতিই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক। এই যুগের ভারতীয় ঐতিহ্যে নালন্দার পণ্ডিতদের দান সর্কোপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। হিউয়েন সাঙ এই সকল অধ্যাপকের নিকটে পাঠ গ্রহণ করার বৃত্ত হইয়াছিলেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বত এই সকল জানী শিক্ষককে, তাহাদের দেশে গিয়া জ্ঞানের আলো প্রছলিত করিবার অহুয়োব ছাড়াইয়া সাদরে আমন্ত্রণ করিয়াছিল।

শিলভদ্রের পূর্বে নালন্দার সর্কোধ্যাক ছিলেন কাকিদেশের বর্ষপাল। সম্রাট-নিবাসী ব্রাহ্মণ্য বর্ষাবলম্বী রাজবংশের সম্ভান নালন্দার সর্কোধ্যাক শিলভদ্রের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি ‘সদর্মমনি’ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাহার রচনার মধ্যে তিব্বতীয় ‘ভ্যতুবে’ ‘আখ্যতুমি-ব্যাখ্যান’ নামক একবানি গ্রন্থের অনুবাদ এখনও সম্বলিত রক্ষিত আছে। চক্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিজ নামক নালন্দার পণ্ডিতদের কথাও হিউয়েন সাঙ লিখিয়া গিয়াছেন। ইংসিঙের বর্ণনাভেদে বর্ষপাল, শিলভদ্র এবং গুণ-মতির উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমির অধি-

১২ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—ডাঃ প্রফুল্ল

বোষ-পৃ. ১৫৮

১৩ On Yuan Chwang's Travels in India—Walters, vol. II, p. 168

১৪ ‘নালন্দা গমনের ফলে অসুমান হয় যে, ৬ম ও ৭ম বিহারের উপরভাগের প্রাঙ্গণে যে উনানগুলি দেখা যায় তাহাতে ছাত্রদের কিছু রাসায়নিক বিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। ১৩ মং চৈতন্যের উত্তরে যে উনানগুলি দেখা যায় তাহা বাতু গালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা যায়।

বাসী বলিয়া কথিত চম্পগোমী নালন্দার অন্ততম-খ্যাতিমান অধ্যাপক ছিলেন। নালন্দার অপর একজন শিক্ষক চম্পকীতির ছাত্র বলিয়াও অনেকে চম্পগোমীকে মনে করেন। চম্পগোমী কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষা ও তাত্ত্বিক শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

নালন্দার অন্ততম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শাস্ত্ররক্ষিতের নাম তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সহিত যুক্ত। এই সম্পর্কে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিব্বতীয় উপদেবতাদের অভিযাত্রার ফোন প্রতিকার করিতে না পারায়, শাস্ত্ররক্ষিতের অহুরোধে তিব্বত-রাজ নালন্দা হইতে যোগাঙ্গতন্ত্র শাস্ত্রে পণ্ডিত পদ্মসত্ত্ব (শাস্ত্র-রক্ষিতের ভগ্নীপুত্রকে) তিব্বতে আমন্ত্রণ করেন। তিনি তাত্ত্বিক পদ্ধতি অহুসারে ফ্রিয়াকলাপাদি করিয়া উপদেবতার কোপ হইতে তিব্বতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কমলাশীল নামক নালন্দার আর একজন পণ্ডিত তিব্বতে শাস্ত্ররক্ষিতের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্ররক্ষিত, পদ্মসত্ত্ব, কমলাশীল প্রমুখ পণ্ডিতদের সময়ে নালন্দা পাল-সম্রাট বর্ধ-পালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল।

প্রাচীন নালন্দা ছিল এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধভিক্ষু মৌদগলীপুত্র তিস্তের অহু-প্রেরণায় সম্রাট অশোক যে বর্ধবিজয়ের স্মৃতি করিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দী পরে নালন্দার তাহার বিজয়ভেরী পুনরায় মিনামিত হইল। কা-হিরেন, হিউয়েন সাঙ, ইংসিং, সেন্টি প্রভৃতির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইংসিংয়ের পূর্বে হিউয়েন চাও নামক একজন চৈনিক শ্রমণ জীনপ্রভ ও রত্নসিংহ নামক দু'জন পণ্ডিতের নিকট নালন্দার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইংসিংয়ের বর্ণনায় উহিং নামক আর একজন চীনদেশীয় শ্রমণের নালন্দার পাঠের কথা জানিতে পারি। মদোলীয়া হইতেও শিক্ষার্থীরা এই সময়ে নালন্দায় অধ্যয়ন করিতে আসিডেন। আঙভিং, লুই-তা, তাও-হি, হই-লা, তাঙ, তাও-সিং, তাও-লিপ প্রভৃতি চীনদেশীয় শ্রমণগণ, তিব্বত রাজমন্ত্রী থাও-মি এবং কোরিয়া হইতে আগত আর্থবর্মার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান উদ্বাস্ত সম্বন্ধে কিছু তথ্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ইংরেজ আমলে রাজ্য-শাসনের সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার বিবিধ তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করিতেন, কিন্তু তাহার বহুলাংশ সরকারী দপ্তরখানায় ফাইল চাপা পড়িয়া থাকিত। দেশ স্বাধীন হইবার পর দেশের নানা সমস্যার সমাধানকল্পে আমাদের দেশের মন্ত্রীরা বহু তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করিতেছেন। সেগুলি ছাপাও হইতেছে; কিন্তু সাধারণ্যে সেইগুলি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে না। ১৯৫০ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে অনেক মুসলমান উদ্বাস্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ পাকিস্থানবাসী হইয়াছেন; কেহ কেহ বা পাকিস্থানে গিয়া আবার ভারতরাষ্ট্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১ সালের মে-জুন মাসে বাড়ী বাড়ী লোক পাঠাইয়া ইহাদের সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। এইগুলি পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বইখানির নাম *Report on the Survey of Non-migrant displaced Muslims in West Bengal*।

যে সকল মুসলমান ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর পর

উদ্বাস্ত হইয়াছেন, কিন্তু পাকিস্থানে যান নাই তাহাদের সংখ্যা নিয়ে দেওয়া গেল :

কোথায় বর্তমানে আছেন	১নং কোঠা		
	পরিবারের সংখ্যা	লোকের সংখ্যা	প্রতি পরিবারে জনসংখ্যা
কলিকাতা ও হাওড়া	৪,০৮৬	১৬,৫০২	৪.০
অপরূপার শহর অঞ্চল	৩,৭৭০	১১,৪০০	৩.০
পল্লী অঞ্চল	৪,৭৩৬	২০,২১৩	৪.৪
মোট ১২,৫৯২		৪৮,৮১৫	৩.৮

২নং কোঠা

যে সকল মুসলমান-পরিবার ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর পর পাকিস্থানে গিয়াছিলেন এবং ইদানীং ভারত-রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন :

বর্তমান অবস্থান	পরিবারবর্গের সংখ্যা
কলিকাতা ও হাওড়া	৫৬২
অপরূপ শহরসমূহ	২,৩৫১
পল্লী-অঞ্চল	১৮,৭৬১
মোট	২১,৬৭৪

এইবার উদ্বাস্ত মুসলমান-পরিবারে গড়পড়তা লোক-সংখ্যার হিসাব দেওয়া যাইতেছে। সাধারণের ধারণা যে, প্রায় প্রত্যেক মুসলমানই চারটি করিয়া 'নিকাহ' করে; ফলে প্রতিটি মুসলমান-পরিবারের পোষকের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া থাকে। এই ধারণা যে কিরূপ ভ্রমাত্মক তাহা নিয়ে প্রদত্ত পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে :

৩নং কোঠা

উদ্বাস্ত মুসলমান-পরিবারের জনসংখ্যা :

	কোথায় বাস করিতেছেন	মোট	
জনসংখ্যা	কলিকাতা ও হাওড়া	অঞ্চল	পরিবারের সংখ্যা
১	৫৭৩	১,৭১৫	২,২৮৮
২	৫৬৮	১,৪০৭	১,৯৭৫
৩	৭৬০	১,২০১	১,৯৬১
৪	৭০৩	১,২৭৪	১,৯৭৭
৫	৫৩১	১,১৩৫	১,৬৬৬
৬	৩৮৭	৬৪১	১,০২৮
৭	২২৮	৩০৭	৫৬৫
৮	১৩৫	৩১২	৪৪৭
৯	৮৯	২৯০	৩৭৯
১০ বা ততোধিক	১১২	১৯৪	৩০৬
	<u>মোট ৪,০৮৬</u>	<u>৮,৫০৬</u>	<u>১২,৫৯২</u>

উপরের কোঠা হইতে দেখা যায় যে, অর্ধেকের উপর মুসলমান-পরিবারে জনসংখ্যা চারের কম। পরিবারের মধ্যে মাত্র একজন লোক দিনমজুরি করিয়া খায় বা কুলকারখানায় চাকুরি করে। উদ্বাস্তদের মধ্যে এইরূপ লোকের অল্পপাত প্রায় শতকরা সত্তের জন।

২৪ পরগণা, কলিকাতা ও হাওড়া জেলায় মুসলমান-উদ্বাস্তর সংখ্যা বেশী। শতকরা হিসাবে যথাক্রমে ৩৯, ২২ ও ১৬ জন। কিন্তু ইহার উদ্বাস্ত হইলেও জেলা ছাড়িয়া বাহিরে যান নাই।

হাওড়া জেলার ২০০৬টি উদ্বাস্ত-পরিবারের মধ্যে ১৫৫৮টি পরিবার হাওড়াতেই বাস করিতেছেন। ২৪

পরগণা জেলার ৪২০৪টি পরিবারের মধ্যে ৪৪৫৭টি ২৪ পরগণায় অবস্থান করিতেছেন। আর কলিকাতায় এইরূপ ২৭৪০টি পরিবারের মধ্যে ২৬৮৩টি পরিবারই কলিকাতার বাসিন্দা। সরকারী রিপোর্টে একটি বিষয়ের উল্লেখ নাই, কিন্তু উদ্বাস্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে যাহারা ওয়াকিবহাল তাঁহারা জানেন যে, বাস্তহারা মুসলমানেরা মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে বাস করিতেছেন। ফলে মুসলমানদের সংহতি বৃদ্ধি পাইতেছে।

একগণে মুসলমান উদ্বাস্তদের বসবাসের বর্তমান ব্যবস্থা কিরূপ, বাস্তহারা হইবার আগেকার সময়ের তুলনায় তাহাদের স্ববিধা না অস্ববিধা হইয়াছে তাহা নিয়ে কোঠাটি হইতে পরিস্ফুট হইবে।

বাস্তহারা হইবার পূর্বে মুসলমান পরিবারসমূহের বাসস্থানের কিরূপ স্বত্ব বা অধিকার ছিল এবং উদ্বাস্ত হওয়ার পরে কিরূপ হইয়াছে তাহা ইহা হইতে বোধগম্য হইবে :

৪নং কোঠা

উদ্বাস্ত হইবার	উদ্বাস্ত হইবার পূর্বে			
পরে	ভাড়াটিয়া	নিজস্ব	অন্যান্য	মোট
ভাড়াটিয়া	৪,৩৩৮	২,৭৭৪	১১৪	৭,২২৬
নিজস্ব	৯৯	৮৩৮	৩৪	৯৭১
অন্যান্য	১,০৭৮	৩,১৫৬	১৬১	৪,৩৯৫
মোট	৫,৫১৫	৬,৭৬৮	৩০৯	১২,৫৯২

(উপর হইতে নীচে পড়িলে পূর্বেকার অবস্থা; আর বাম দিক হইতে ডান দিকে পড়িলে উদ্বাস্ত হইবার পরের অবস্থা বুঝা যাইবে।)

উদ্বাস্তদের মধ্যে অর্ধেকের উপর অর্থাৎ ১২,৫৯২টির মধ্যে ৬,৭৬৮টি পরিবার স্বগৃহ বা বাস্তহ্যুত হইয়াছেন। যাহারা স্বগৃহ্যুত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ৮৩৮টি পরিবার ইতিমধ্যেই (মেড় বৎসরের ভিতরে) পুনরায় নিজেদের বাস-গৃহ নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পূর্বে যাহারা ভাড়াটিয়া গৃহে বাস করিতেন তাঁহাদের অল্পপাত ছিল শতকরা ৪৪ জন। উদ্বাস্তদের মধ্যে এই অল্পপাত বাড়িয়া হইয়াছে শতকরা ৫৭ জন, অর্থাৎ ভাড়াটিয়া গৃহে বাসিন্দার সংখ্যা এখন শতকরা ১৩ জন বেশী।

মুসলমান উদ্বাস্ত পরিবারের মধ্যে যে পরিমাণ চাষের জমি বাস্তহারা হইবার পূর্বে ছিল ও পরে হইয়াছে তাহা নিয়ে কোঠা হইতে বুঝা যাইবে :

৫নং কোঠা			
চাষের জমির পরিমাণ	উদ্বাস্ত পূর্বে পরিবারের সংখ্যা	হইবার ও পরে পরিবারের সংখ্যা	
১ একর পর্য্যন্ত	৮৪২	১৭৭	
১—২ "	৩৬২	৮২	
২—৩ "	৩৩৫	৭১	
৩—৪ "	২০৩	৪০	
৪—৫ "	১১৮	১১	
৫—৬ "	৮০	২	
৬—৮ "	১৩৮	৪০	
৮—১০ "	১৩৮	৩০	
১০—১৫ "	১৬৩	৪০	
১৫—২০ "	৪১	২১	
২০—৩০ "	৩১	—	
৩০—৪০ "	৪	—	
	মোট ২,৪৫৫	৫১৪	

উদ্বাস্ত মুসলমান পরিবারসমূহের মধ্যে ২,৪৫৫টির চাষের জমি ছিল। অর্থাৎ মোটামুটি প্রতি পাঁচটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবারের চাষের জমি ছিল। গড়ে এই জমির পরিমাণ ছিল সাড়ে এগার বিঘা। এই তথ্য হইতে ইহাও অনুমান করা অসম্ভব হইবে না যে, চাষী মুসলমানরা তত সহজে উদ্বাস্ত হয় নাই, যত সহজে বাস্তুহারা হইয়াছে শহরের কারখানার কুলি-মজুররা। ইহার হেতু এই যে, পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের মধ্যে মুসলমান চাষীরা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা এই—যাহারা ভূমি লাভ করিয়াছে তাহাদেরও গড়পড়তা জমির পরিমাণ সাড়ে এগার বিঘা।

এইবার বাস্তুহারা হইবার পূর্বে উদ্বাস্ত মুসলমানদের আয় কি পরিমাণ ছিল এবং উদ্বাস্ত হওয়ার পরে কিরূপ হইয়াছে তাহার একটি হিসাব নিম্নের কোঠায় পাওয়া যাইবে। যাহারা পরমুখাপেক্ষী বা ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিত তাহাদের মাসিক আয় ০ বলিয়া দেখান হইয়াছে। যে-সকল পরিবারের গড়পড়তা মাসিক আয় ৫১ টাকা হইতে ১০০ টাকা সেগুলির মধ্যেই উদ্বাস্তদের সংখ্যা খুব বেশী।

হিসাবটিতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ঐ পরিমাণ অর্থ-উপার্জনকারীর সংখ্যা বাস্তুহারা হইবার পূর্বে যত ছিল, উদ্বাস্ত হইবার পর তাহার তুলনায় খুব বেশী হ্রাসপ্রাপ্ত

হয় নাই, কমিয়াছে মাত্র কয়েক শত। ফিরিওয়ালার ছোট-খাটো ব্যবসাদার, কল-কারখানার মজুর প্রভৃতি এই শ্রেণী-ভুক্ত। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উদ্বাস্ত হইবার পর গড়ে উদ্বাস্তদের আয় কমিয়াছে। উদ্বাস্তদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ১২৮ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭৪০ হইয়াছে।

৬নং কোঠা			
আয়ের পরিমাণ মাসিক	উদ্বাস্ত পূর্বে	হইবার ও পরে	
০	১৯৮	৭৪০	
১—৫০ টাকা	১,৭৭৭	৪,২৮২	
৫১—১০০ "	৫,৭৪২	৫,১৩০	
১০১—২০০ "	১,১২৪	৫৬২	
২০১—৩৫০ "	১,১০৭	৪৪০	
৩৫১—৫০০ "	২৫৩	৪২	
৫০১—৭৫০ "	৮৬	১৪	
৭৫১—১০০০ "	২৩	৫	
১০০০ টাকার উপর	২১	২	
	মোট ১২,৫২২	১২,৫২২	

এই প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যগুলি মুসলমান উদ্বাস্তদের নিকট হইতে সংগৃহীত। তাঁহারা কতখানি বানাইয়া বা বাড়াইয়া বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও সরকার কিছু কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অবগত হওয়া যায়।

শতকরা ৪৮.৮টি পরিবারের লোকেদের উক্তি বড় রকমের গরমিল (major discrepancy) ধরা পড়িয়াছে। শতকরা ২.১টি পরিবার—যাহারা ১৯৫০ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠার পূর্বে উদ্বাস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরে বাস্তুত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন। খোঁজ লইয়া জানা গিয়াছে যে, শতকরা ৩.৫টি পরিবার পূর্বে যেখানে থাকিতেন বলিয়াছেন আসলে সেখানকার বাসিন্দা তাঁহারা ছিলেন না। শতকরা ১৩.৩টি পরিবারকে পূর্বের ঠিকানায় কেহই জানিত না। সম্পত্তি সম্বন্ধে অত্যাুক্তি করিয়াছেন শতকরা ৬.৬টি পরিবারের লোকেরা। শতকরা ২.১টি পরিবারের সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ তদন্ত সম্ভব হয় নাই। শতকরা ২৩.৬টি পরিবার সঠিক ভাবে পূর্বের ঠিকানা বলিতে পারেন নাই।

অচিরেই এই সব তথ্য সাধারণে প্রকাশ করা পশ্চিম-বঙ্গ সরকার তথা ভারত-সরকারের একান্ত কর্তব্য।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১.

উদাস্ত। কথাটা যেন গালাগালি। কিন্তু, কেন? কার প্রয়োজনে—কে আমাকে উদাস্ত করেছে? তোমাদের বাস্তব আছে—আমার নেই। জিজ্ঞাসা করি—কেন নেই?

একদিন তো ছিল? আমার ঘর ছিল, বাড়ী ছিল। ছুধোলো গরু, চাষের জমি, একজোড়া লাঙল—কি না ছিল আমার? 'কি ছিল, আর হ'ল।' সেকথা যখন ভাবি তখন যেন একেবারে পাগল হয়ে যাই। আমার বাহুতেও ছিল বল, বুকেও ছিল সাহস। আর আজ? আজ আমি যেন নিকরদেশের যাত্রী। সর্বহারা উদাস্ত। কিন্তু কেন?

এই কেনর সঠিক জবাব নিবারণ তার মনের ভিতর খুঁজে পাচ্ছে না। নিপ্রভ চোখ ছুটি জলে ভরে উঠছে। বিশীর্ণ গণ্ডে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

শীতের সকাল। নগ্ন গায়ে রোদে বসে নিবারণ ঠক্কড় করে কাঁপছে। কাঁধের উপর আছে একখানা অতি মলিন ছিন্ন গামছা—

আজ দু'দিন নিবারণ এখানে এসে পৌঁছেছে। বহু বাধা-বিয়ের ভিতর দিয়ে, ছেলে ও মেয়ে সঙ্গে নিয়ে পূর্ব পাণ্ডি-হান-সীমান্ত পার হয়েছে।

এক মাস আগে সে এসেছিল বুলনার। সেখানে তার জী কলেরা-রোগে মারা গেছেন। মরবার আগে, কভা মাধবীর হাতখানা স্বামী হাতে তুলে দিয়ে, সতীলক্ষ্মী অশ্রুরোষ কানিয়ে গেছেন—'সর্বর হারিয়েও আমার মাথুর সন্তান যাতে রক্ষা পায় সে চেষ্টা করো।' মাধবীর বয়স মাত্র তের বৎসর।

নিবারণের একমাত্র ছেলে হুলালের বয়স আট বছর। সর্বস্বান্ত ও পঞ্চাশে ক্লাস্ত এই বালকটিও আজ দু'দিন উপবাসী। মেয়েটির চেয়েও অবুর ছেলেটা বেশী কাতর হয়ে পড়েছে খিদে জ্বালায়।

কাঁদো-কাঁদো স্বরে হুলাল ডাকল—বাবা।

—কি বাবা? নিবারণ হুলালকে কোলের ভিতর টেনে নিলে।

—আজও কি কিছু খেতে পাব না?

মাধবী শুনেছিল—নিকটেই কোথায় নাকি চাল ডাল বিতরণ হচ্ছে। খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার 'রিকিউজ কার্ড' আছে?

ইংরেজী কথাটার মানে সে বুঝল না। অবাক হয়ে চেয়ে রইল মুখের দিকে। দেখল অনেকেই এক-একখানা কাগজ

দেখিয়ে চাল ডাল নিয়ে যাচ্ছে। কাগজখানা যে কোথায় পাওয়া যায়, তাও সে জানে না। বহুকণ চূপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হতাশভাবে কিরে এস গাছভলার।

সেই গাছভলার অভ দিকে বসেছিলেন—পূর্ববঙ্গের কোন অধ্যাপক-পঞ্জীর হৃদে জমিদার দীনেশবাবু। বয়স তার যাটের কোঠায়। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল—সৌন্দর্য ও সুদর্শন চেহারা। স্বাস্থ্যের প্রতি বেশ যত্ন আছে। বয়সে তঁাটা পড়লেও যৌবনত্ৰি এখনও উবে যায় নি। গাছভলার বসেও পৌকদাড়ি কানিয়ে মুখখানি পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা করতেন।

দীনেশবাবুর চেয়ে বয়সে প্রায় দশ বছরের ছোট হলেনও, তাঁর গৃহিণী পদ্মাবতীকে বুদ্ধা বলা চলে। দাঁত তাঁর একটিও নেই—সব বাঁধানো। চুলে পাক হয়েছে, দীনেশবাবুর চেয়েও চের বেশী।

একটা ঈল ট্রাকের উপর বসে—দীনেশবাবু নির্নিমেষ চোখে চেয়ে ছিলেন নিবারণের দিকে। চারদিকে ছড়ান রয়েছে—তিন চারটে স্কটেক্স ও গোটা দুই বিছানা, কয়েকটা বড় বালুতি ও বস্তা ভর্তি গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় বহুবিধ জিনিষপত্র। একটা ছোট বালুতিতে 'হুকো-কল্কে ও ভাষাকের সরঞ্জাম।

দীনেশবাবুর বিখাসী চাকর বেঁটে ঘনশ্রাম সঙ্গেই আছে। তাকে ডেকে বললেন, দে রে ঘনা, একটু তামাক দে...

পদ্মাবতী রান্না চাপিয়েছেন। ইট পেতে উজুন তৈরি করে, চালে-ডালে ঝিঁড়ি পাকানো হচ্ছে। প্রায় আধ-ডজন ছেলে-মেয়ে যথেষ্ট ছুটিছুটি করে বেড়াচ্ছে। নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক ও কলহাস্যে রক্ততল, মুখরিত করে তুলছে। বাবার মুখে শুনেছে—ভাষা নাকি পেয়েছে—'ভিটেহাড়া-স্বরাজ।' তাই তাদের নামকরণ হয়েছে—উদাস্ত।

বেশ নামট। সম্পূর্ণ অপরিচিত আহহাওয়ার, যুক্ত আলো-বাতাসে—এখন বনভোজনের নির্মূল আনন্দই কি উদাস্তদের স্বরাজ বা স্বাধীনতা? স্থলে যাওয়ার ভাগিদ নেই—মাষ্টারের রাঙা চোখের ভয় নেই—এমন কি কোনও বিষয়েই কোনও নিয়ম-নিষ্ঠার উৎপীড়ন নেই। সত্যিই আজ তারা বন্ধনমুক্ত স্বরাট বা স্বাধীন। তারা প্রার্থনা করছে—হে ভগবান। আমাদের চির দিনের জন্তে 'উদাস্ত' কর।

দীনেশবাবুর বড় ছেলে—কলিকাতার নিকটবর্তী কোনও মকবল-শহরের ডেপুটি। তাকে 'ভার' করা হয়েছে—সে

আসবে ট্যান্ডি নিয়ে। বাপ-মা আর ছোট ভাই-বোনদের কলকাতার নিয়ে যাবার জেতে।

ডেপুটির পিতা দীনেশবাবু এ দুর্গতি সাময়িক। কলকাতা পৌঁছাতে পারলেই যা-হোক একটা সুবাহা হবে। কিন্তু নিবারণের উপায় কি? ছেলেমেয়ে নিয়ে সে কোথায় যাবে?

পদ্মাবতীর মুখের দিকে চেয়ে দীনেশবাবু ভাবছেন নিবারণের কথা। নিবারণের বাঁচবে কি করে? তাদের হাত ধরে ভাঙ্গার তুলবার শক্তি ও সামর্থ্য কি কারো নেই? থাকলেও তারা কি এগিয়ে আসবে? মানুষের স্বার্থপরতা ও নীচতা দিন দিন যেরূপ বেড়ে উঠছে, তাতে এই উদ্বাস্ত-সমস্তার কোনও সুস্থ সমাধান যে হবে সে তরঙ্গ দীনেশবাবু করেন না। তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস—ওই সব হতভাগ্য নিবারণের সাঁতার-না-জানা মানুষের মত অন্তরে ভলিয়ে যাবে—কেউ তাদের জেতে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না।

কাঁদতে কাঁদতে ছলল বলল, দিদি আজও কি ভাত জুটবে না?

সেই মা-হারা ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে মাতৃস্নেহেরই যোল-আনা অভিব্যক্তি দেখিয়ে কুমারী মাধবী বললে, লক্ষ্মীটি আমার, কাঁদিসুনে—সহ্য কর...

সে নিজেও কি সহ্য করতে পারছে? চোখ মুছে, আকাশের দিকে চেয়ে অদৃশ্য দেবতার কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানাল—ঠাকুর। আমি মরি, তাতে হুঃখ নেই—আমার এই ভাইটিকে রক্ষা কর...

কুশার কাতর এই ছুটি অসহায় বালক-বালিকার করুণ মুখজুবি দীনেশবাবুর অন্তরে যে আলোড়ন জাগিয়েছিল, রক্তনরত পদ্মাবতী তা লক্ষ্য করেন নি। উল্লুনের উপর থেকে হাঁচিটা নামিয়ে রেখে দীনেশবাবুকে তিনি বললেন, ভালো মান্তর একখানা আছে। তুমিই আগে গরম গরম ধেরে নাও, তারপর ওরা খাবে তোমার পাতে...

দীনেশবাবু অচমমক। পদ্মাবতীর কথা তাঁর কানে ঢুকেছে—মনে পৌঁছয় নি। পদ্মাবতী আবার বললেন, ওগো, শুনছ...?

—হ্যাঁ, দাও...বলেই দীনেশবাবু মাটির উপর থেকে খালাখানা তুলে নিলেন পদ্মাবতীর হুটকেনের উপর।

—ওমা! হুটকেনটা এটা হয়ে যাবে যে...

দীনেশবাবু হাসলেন। উল্লিষ্টের বিচার আর কর না পদ্মা। কোথায় যে যাচ্ছি আমরা, তা কি এখনও বুঝতে পারছ না?

—না না, ওর ভেতর আমার গীতাখানা আছে...

—ভাই মাকি? তা হলে ত গীতাকে বাঁচাতেই হবে। আমরা মরি তাতে কতি নেই—আমাদের গীতা বেঁচে থাক।

গীতার মর্যাদা বাড়িয়ে, গীতার ভগবানকে মাটিতে আছড়ানোই ত আমাদের নীতি...

দীনেশবাবু মাটিতে মেঘে বসলেন। শীতের দিনে, খেচরারের কুঙলী-পাকানো গরম বোঁরা ফুঁত ছলালের নাকে পৌঁছছিল। পদ্মাবতী একটা বোতলের মুখ ধুলে খানিকটা টাইকা দি ঢেলে দিলেন। দেশ থেকে আনা সেই খাঁটি গব্যমুত্তের সুস্বাদু কি চমৎকার। ঢোক গিলতে গিলতে ছলল একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল। ছুটে এসে তার হাতখানা চেপে ধরে, খুব নীচু স্বরে মাধবী বলল, ছিঃ! বাবু খেতে বসেছেন। ওই খাবারের দিকে মজর দিলে, তাঁর অসুখ করবে যে—এদিকে ঘুরে দাঁড়া...

নীচু গলায় বললেও মাধবীর কথাগুলি দীনেশবাবুর কান এড়াল না। গৃহিণীর দিকে কাতরভাবে চেয়ে দৃঢ়-কণ্ঠে বললেন, নাঃ, পদ্মা। খেতে পারব না...

—কেন?

—তোমার কি চোখ-কান মেই?

—যে দিনকাল পাড়েছে—চোখ কান বুজে না খেলে তো অমাহারেই থাকতে হবে...

—ভাই থাকব...চোখে মুখে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা জানিয়ে দীনেশবাবু হাত ঘুরে সরে বসলেন। বনাকে ডেকে বললেন—ভামাক দিতে। আর, পদ্মাবতীকে বললেন—খালাখানা ধরে ওই ছেলেটাকে দিয়ে এস...

—আঃ, বাড়াবাড়ি করো না। ধেরে নাও...

—কি বলছ তুমি? আর কত নীচের নামাতে চাও? শুনেছ—মেয়েটা কি বলেছে? 'বাবুর অসুখ করবে!' কি ভয়ানক কথা বল ত? আমার অসুখের ভয়ে ওরা মুখ ফেরাল? কুহুরের মত কেড়ে খেতে এলে হয় ত দুঃ দুঃ করে তাকিয়ে দিতে পারতাম। এখন ওগুলো গিলব কি করে?

—শেষে ওদের হুমুঠো দেওয়া যাবে...

—না। আগে ওদের পেট ভরে খাওয়াও, তার পর আমরা খাব। আজ দু'দিন ওরা উপবাসী।

গাছের একটা তাল ধরে দীনেশবাবু চেয়ে রইলেন দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের দিকে। তাঁর মনে পড়তে লাগল—ছেড়ে-আসা পল্লীসমাজের কত সুখ-সুখের কথা। তিনি যে বাড়ী-ঘর ও বিষয়-সম্পত্তি ফেলে এসেছেন তার জেতে একটুও হুঃখ নেই তাঁর। বৈষয়িক উত্থান-পতনের বহু ইতিহাস তিনি জানেন। কাল যে বনী ছিল, আজ সে দরিদ্র হোক, কাল যে দরিদ্র ছিল, আজ সে বনী হোক—এ ভাঙাগড়ার নিয়মকে তিনি অস্বীকার করতে চান না। কিন্তু জাতি হিসাবে বাঙালী যে অমাহুয় হয়ে যাবে, তার শিক্ষা ও সংস্কারের বৈশিষ্ট্যকে আর

বাঁকড়ে থাকতে পারবে না, যোল আনা আত্মরূপসমরূপ হয়ে উঠবে—একজন বাঙালী হয়েও তিনি তা সহ্য করবেন কি করে ? প্রাণের প্রাচুর্য হারালে বাঙালীর আর কি থাকবে ?

দীনেশবাবুর মনে পড়ল—তার বাবা সন্ধ্যার কিছু পূর্বে লোক পাঠিয়ে খবর নিতেন—গাঁয়ের কোন লোক অভুক্ত আছে কিনা, তবে মিছে আহ্বারে বসতেন। ভাতখানি কুজ-সাধন না করলেও, দীনেশবাবু কখনও কোন অভিজি বা অত্যাগতকে অভুক্ত রেখে আহ্বার করেন নি। আর কাজ ?

হাতখানা ঘরে পদ্মাবতী বললেন—পাশলাসি কর না। মাহুয যখন যে অবস্থায় পড়ে ব্যবস্থাও করে সেইরূপ...

—ভাই নাকি ? নিবারণের দিকে চেয়ে দীনেশবাবু বললেন—ওহে, এদিকে এস ত ? তোমার নাম কি ?

সলফোচে এগিয়ে এসে নিবারণ বলল—আজ্ঞে, নিবারণ পরামণিক...

কঠোর আদেশের সুরে গভীর ভাবে দীনেশবাবু বললেন—আমার স্মরণ থেকে ভাতের থালা কেড়ে নিয়ে, তোমার হেলমেয়ে ছটোকে ধাওয়াতে পার ?

—কি যে বলেন বাবু ? ঘেন কোন গোপন-অজ্ঞার-ধরা-পড়া অপরাধীর মত নিবারণ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবল, বোধ হয় তার স্থবিত হেলমেয়েদের লোলুপ দৃষ্টি ভ্রলোকের আহ্বারে বিদ্র বটিয়েছে। ভাই তিনি ভয়ানক চটে গেছেন। লজ্জিত ভাবে বলল—না না, আপনি সেবা করুন, ওদের আমি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ওরে, চল চল—ওদিকে চল—বাবুর অস্থবিধে হচ্ছে...

দীনেশবাবু বুঝলেন—এ কাড়াকাড়ির যুগে ওদের মত ভালমাহুয়েরা বাঁচতেই পারে না। যাদের বর্ণ-শিক্ষা আত্ম-ত্যাগের মাহাত্ম্যে সম্বদ্ধ, পর-পীড়নের পাপ যাদের মনে নরকের বিতীর্ণিকা সৃষ্টি করে—তারাত এ যুগে মরে ভুত হয়ে আছে।

পদ্মাবতী এগিয়ে গেলেন। স্বামীর হাত ছাড়িয়ে ছললকে আর মাধবীকে নিজের কাছে টেনে আনলেন। দীনেশবাবুর গাভীর্য দেবে তারা যতখানি ভয় পেয়েছিল, মাতৃদেহের স্নেহ-শীতল করস্পর্শে তারা ঠিক যতখানি অভিভূত হয়ে পড়ল। একটা মেটে-পাখি গুরে মুছে ভাতেই চলে গেলেন খানিকটা বিচুড়ি।

চোখ মুছে মাধবী তার ভাইটির মুখে বিচুড়ি তুলে দিতে লাগল। পদ্মাবতীর অহরোধ সত্ত্বেও নিজে এক গ্রাস খেল না। মাধবীর আচরণ দেখে দীনেশবাবু বললেন, তুমি বাছ না কেন ?

মাধবী একটু হেসে বলল, আমি ভো ভাইটির মত অবুখ নই, আগে আপনাদের সেবা হোক। তার পর যদি পাতে কিছু থাকে, আমি আর বাবা এসাদ পাব।

২

ডেপুটি নরেশবাবু টুয়ে বেরিয়েছিলেন। বাবার প্রেরিত ভারবর্জী তাঁর আপিসের টেবিলেই চাপা থাকল।...

সামনে শীতের রাজি। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন ট্যান্ডি এল না। কাঁকা মাঠে গাছতলায় রাজিবাস। কি ভয়ানক কথা। পদ্মাবতীর চোখমুখ শুকিয়ে গেল। শক্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কি উপায় হবে ?

একটু হেসে দীনেশবাবু বললেন, নিজের কথাটাই ভাবছ ? ওই নিবারণের কি উপায় হবে—তাও একটু ভাব। আমাদের জামাকাপড় আছে—বেড়িং আছে—ওদের কিছু নেই। ঘনতামকে বললেন বেড়িং ছুটে ধুলে ফেলতে।

পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করলেন, নিকটে কি কোন লোকালয় নেই ?

—না। দীনেশবাবু বললেন, আবার সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্থানে যেতে হবে। যাবে ? আমি কিছু রাজী আছি।

—রক্ষে কর...

—ভা হলে হেলমেয়েদের নিয়ে লেপ-তোষক চাপা দিয়ে গুরে পড়। তার পর আমরা দেখি কি করতে পারি...

নিবারণ বলল, ভাববেন না বাবু। রাঙের ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি...

—কি করেছ ?

—ওই বাগান থেকে ছুটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি আর ভালপালা এনে রেখেছি। সারা রাত জ্বলবে।

দীনেশবাবু সাগ্রহে বললেন, তা হলে আর দেরি কর না, জালিয়ে দাও। জানই তো, গায়ে জামাকাপড় থাকলেও—বাবুরা শীতে বড্ড কারু...

—আজ্ঞে হ্যাঁ তা জানি বই কি। সূতের শরীর আপনাদের। আমাদের মত রোদেও পোড়েন নি, জ্বলেও ভেঙেন নি। নরোত্তম মোড়লের নাম শুনেছেন ?

—না ভো...

—শোনেন মি ? নিবারণ বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল সূতের দিকে। তার ভাব দেখে মনে হ'ল—‘নরোত্তম’ বোধ হয় দেশবন্ধু বা নেতাজীর মতই কোন বিখ্যাত ব্যক্তি, যার নাম না-শুনেছে এমন বাঙালীর সন্ধান নিবারণ আজ প্রথম পেয়েছে। সে বলতে লাগল—নরোত্তম মোঠেল মাজ, এক-খানা জাঠিহাতে পাঁচ শ' পুলিশকে ঠেঙিয়ে, তিন দিন তিন রাত্তির লুকিয়ে ছিল একটা পানা-পুকুরের ভিতর। নরোত্তম বলে সবই অভ্যাস।

নরোত্তমকে না চিনলেও উপস্থিত নিবারণকে চিনতে পেরে দীনেশবাবু বেশ কৌতূহ্য বোধ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পুলিশের হাতে বন্দুক ছিল না বোধ হয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিল। অনেক বন্দুক ছিল। নরোত্তম

এমনভাবে লাঠি ঘুরিয়ে ছিল যে, বন্দুকের গুলি লাঠিতে লাগে আর ছিটকে পড়ে যায়...হাত ঘুরিয়ে নরোত্তমের লাঠি ঘোরানোর কসরৎটিও একটু দেখিয়ে দিলে।

দীনেশবাবু বললেন, তা হলে আগুন জ্বালো নিবারণ। নরোত্তমের লাঠির গল্প শুনেই রাঙিরটা কাটানো যাক।

অভিরঞ্জন যদি আঁট হয়—তা হলে এই নিবারণ যে বাংলা-দেশের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট সে বিষয়ে দীনেশবাবুর মনে কোন সন্দেহ হইল না।

নিবারণ আগুন জ্বাল।

সেই আগুন দেখে আরও কয়েকজন শীতল উদাস এসে হাজির হ'ল সেখানে। তাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট আগন্তুককে দেখে নিবারণ জাকিয়ে উঠল।

—আরে, আরে—মোড়লের পো। তুমিও এসেছ দেখছি। তোমার কথাই বাবুকে বলছিলাম। অনেক দিন বাঁচবে...

—আরও অনেক দিন? স্নানস্থলে বৃদ্ধ নরোত্তম একটু হাসল।

নরোত্তম মোড়লের বয়স বাহাত্তর ছাড়িয়ে গেছে। বাঁচের নৌকার অগ্রভাগে বসে যে কালো-বাবরিটা ঝেঁকে ঝেঁকে সে তার নিজের নৌকা সকলের আগে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে পারত—আজ তা একেবারেই হুধের মত সাদা। অধঃপ্রবর্তিত সাদা গৌলদাড়িতে ঢাকা মুখখানা দেখে এখন আর বুঝবার উপায় নেই যে, তার ওই দল্লহীন চোয়ালে একদিন কতখানি দৃঢ়তার অতিব্যক্তি ছিল। লেলি চর্খের মীচের পাকান-পাকান মাংসপেশীগুলি এখনও অত্যন্ত সামর্থ্যের সাক্ষী হয়ে আছে বটে, কিন্তু তাও নরোত্তম ঢেকে রেখেছে একখানা জীর্ণ গৈরিক চাদরে। লাঠিরালাতে ইস্তফা দেওয়ার সাক্ষী তার গলায় তুলসীর মালাটা।

খুব নিবিষ্টভাবে দীনেশবাবু লক্ষ্য করলেন নরোত্তমকে। তারপর স্তব্ধ হ'ল সকলের সঙ্গে সকলের আলাপ-পরিচয়। দীনেশবাবু একে একে সবাইকে প্রশ্ন করতে লাগলেন—কার কোথার বাড়ী? কে কি অবস্থায় আঁম ছেড়ে গালিয়ে এসেছে? কত সুখের সংসার ভেঙে এসে পথের ভিখারী হয়েছে?

সবার মুখেই একটি মাত্র প্রশ্ন—কার প্রয়োজনে হিন্দু মুসলমানের এ বিরোধ বেধে উঠল? সাত পুরুষ যারা একই মাঠে চাষ করেছে, একই মাঠের শান ঘরে ভুলেছে, একই বিলের মাছ বেয়েছে—একই আলোবাতাসে পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে, পরম শান্তিতে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেছে—তাদের মধ্যে এ আগ্নেয়াস্ত্রী বিদ্বেষবুদ্ধি জাগিয়ে তুলল কে?

দীনেশবাবুর কাছে একটু এগিয়ে বসে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বাবু আমরা তো মুখ্য চাষ। আপনি কি একটু বুঝিয়ে দিতে পারেন—কেন এমন হ'ল?

দীনেশবাবু বললেন—এখন আর বুঝে লাভ কি? প্রতি-কারের তো কোন উপায় নেই। তবে মিছের লাড়ুনার কতে একটা কথা ছেনে রাখতে পার—এ আমাদের পাপের শাস্তি—

—‘পাপের শাস্তি’? নরোত্তম গর্জ্জে উঠল। ‘কি পাপ আমরা করেছি বাবু? ব্রাহ্মণের পানোদক খেয়েছি—ভেজিৎ কোটি ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা খুঁড়েছি। পল্লিকার শুভা-শুভ বিচার মেনে, দিন-রুণ-নক্ষত্র গণনা করে যে কোমণ্ডা-কাছে পা বাড়িয়েছি—তবু আমাদের পাপ?’

একটু ধমত খেয়ে দীনেশবাবু বললেন, না না, পাপটা তোমাদের নয়, আমাদের। আমরা যারা শিক্ষা ও সভ্যতার অহঙ্কার নিয়ে—সমাজের বুকে নেতৃত্বের দাবি করি তাদের। আমাদের প্রথম পাপ হচ্ছে—তোমাদের কিছু জানতে দিই নি বা বুঝতে দিই নি। সামাজিক সুযোগ ও সুবিধা তোমাদের লোভে—তোমাদের রেখেছি অশিক্ষিত করে, অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে...

আরও অনেক উদাস এসে ঘিরে বসল সেই অগ্রিকূণ্ডকে। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল—তারপর? দ্বিতীয় পাপটার কথাও বলুন...

দীনেশবাবু বলতে লাগলেন—পৃথিবীর এই গণহত্যার আন্দোলনের দিনে, আমরা বড় বেশী অর্ধেক হয়ে পড়ে-ছিলাম। তাই হঠাৎ রাজনৈতিক দাবার চালে হেরে গেছি। পিল্চকর হয়ে ঘরে-বাইরে বেসামাল হয়ে পড়েছি...

দীনেশবাবুর এ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত অনেকেই বুঝল না। তিনিও আর বেশী আলোচনা করতে রাজী হলেন না। মনে মনে ভাবতে লাগলেন—আমাদের অহিংস-রক্ষাব্যবহারের কোথায় ছিল একটা ফাটল, স্বার্থাঘেযী ব্রিটিশ তা জানত। তাই যাবার সময় আমাদের হুকুল-হামটিতে এমন আঘাত দিয়ে গেল যার ফলে আমাদের মেরুদণ্ড গেল ভেঙে। রক্তপাতহীন অহিংস-সংগ্রামের যত গৌরবই করি—একথা সত্যি যে, লক্ষ লক্ষ উদাসের তাজা রক্ত আজ বাপ্পাকারে শুকিয়ে যাবে।

নরোত্তম ভাবছিল—অতীত জীবনের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি। কায়িক শ্রমের বিনিময়ে পল্লীর বুকে গড়ে তোলা কত সহজির ইতিহাস।

নিশ্চিন্ত ভেঙে নিবারণ জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বাবু আমরা কি বেঁচে থাকতে পারব?

দীনেশবাবু সংক্ষেপে বললেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে... কে যেন একজন বলে উঠল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শতকরা পাঁচ জনও তোমরা বাঁচবে না। কোন সরকারী তহবিলের সাধ্য নেই যে, এই বিরাট সমস্যার আংশিক সমাধানও করতে পারে। দেশের ঘনীরা যদি এগিয়ে আসেন—পাথরের সোমনাথের চেয়েও মাহুষ সোমনাথের প্রতি

যদি তাঁদের দরদ বেশী থাকত তা হলে ভোমাদের বাঁচিয়ে রাখা খুব কঠিন হ'ত না।

নরোত্তমের কোটিরগত চোখ দুটো যেন আগুনের কুলকির মত জ্বলে উঠল। হতাশার বাণী শুনে শুনে হঠাৎ একটু সোকা হয়ে উঠে বসল। পাকা বাবরিটা একটু ঝেকে বলল—না না, আমরা সে ভাবে মরব না। এখানে যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখার কোন ব্যবস্থাই না হয় তা হলে আবার ফিরে যাব আমাদের বাপ-ঠাকুরদার ভিটের। সেখানে গিয়ে নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে লড়াই করে মরব তবু ভিকের আগে বেঁচে থাকার লক্ষ্যনা লক্ষ্য করব না।

এই সপ্ততিপরি ব্রতের সামাজিক সম্মানবোধ ও আত্ম-নির্ভরতার দাবি নিয়ে লড়াই করে বেঁচে থাকার উৎসাহ দেবে দীনেশবাবু বিন্ধিত হলেন।

যিনি হতাশার বহুতা শোনাচ্ছিলেন তিনি একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। দীনেশবাবু তাকে চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই বুড়োকে চেনেন ?

—খুব চিনি। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করলে ওই বুড়ো হতে পারত একজন বিখ্যাত বীর—আদর্শ জননেতা। ওই বুড়োর মত চরিত্রবান ও সাহসী পুরুষসিংহের নেতৃত্বাভাব বাংলা আজ হাড়ে হাড়ে অহতব করছে। কিন্তু ওই বুড়ো তো বয়সের মাগল পাবে না। শুনবেন ওর বিচিত্র জীবন-কাহিনী ?

—বলুন...

ঔপন্যাসিক বলতে আরম্ভ করলেন—

৩

আজ ভুলগীর মালা গলায় বেঁধে পরম বৈষ্ণব সাক্ষলেও, এক দিন নরোত্তম ছিল শক্তি-সামর্থ্য বীর-যোদ্ধা। সেখানেই দাদা সেখানেই নরোত্তম। কিন্তু সর্বজাই সে দাঁড়াত নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকায়। কখনও কোন অজ্ঞানকারী বা অজ্যা-চারীর পক্ষ সমর্থন করে নি সে।

কালী-মন্দিরে গিয়ে মাকে একটা প্রণাম না করে বা তাঁর নির্মালা মাথায় না নিয়ে নরোত্তম কখনও কোন দাক্ষ্য অবতীর্ণ হ'ত না।

গায়ের কালী-বাড়ীটা ছিল মোড়লদের তত্ত্বাবধানে, যদিও তার মালিক ছিলেন জমিদার। সেবারেও-ঠাকুর এক দিন নরোত্তমের কাছে গিয়ে বললেন, নরোত্তম! দেবীর ভোগ-সেবা কি বন্ধ হয়ে যাবে ?

—কেন ঠাকুর ? বিন্ধিতভাবে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল।

জমিদার তাঁর পূর্বপুরুষের দত্ত জমিগুলো দখল করে নিচ্ছেন...

সে কি ? নরোত্তমের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল।

অখনই সে ছুটে গেল জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে। জমিদারের সুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় বলে এল—আপনার কোন লোক যদি মাঝের কোন জমির 'আইলে' গিয়ে দাঁড়ায়, তা হলে কাঁধে মাথা নিয়ে ফিরে আসবে না আর...

জমিদার অপমানিত হলেন। শুধু মাঠের জমি নয়, সেবারেও-ঠাকুর তাড়িয়ে 'মূল কালী-বাড়ীটা' দখলের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। গোপন ব্যবস্থা চলতে লাগল।

হঠাৎ এক দিন খবর এল—অজ্ঞান লোক আসছে, কালী-বাড়ী দখল করতে। কি সর্বনাশ ! নরোত্তমের যারণা ছিল—শুধু মাঠের জমিগুলির উপরেই জমিদারের মোত। কালী-বাড়ী দখলের হুকুমি যে ভার মাথায় গজিয়ে উঠতে পারে সে কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

এইরূপ অত্যন্ত আক্রমণের ক্ষেত্রে নরোত্তম তদানক বিব্রত হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু একটুও দমল না। বাড়ী বাড়ী ঘুরে নরোত্তম জোগাড় করল কয়েক ধামা পাকা লক্ষা।

সেবারেও-ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এত পাকা লক্ষা দিয়ে কি হবে নরোত্তম ?

নরোত্তম সে প্রশ্নের কোন জবাব দিলে না। পারের তলা থেকে এক মুঠো দুর্বা ছিঁড়ে নিয়ে শুতে ছেড়ে দিয়ে দেখল বাতাসের গতি কোন্ দিকে। তার পর তাইদের তরুম দিল, কালী-বাড়ীর দক্ষিণ দিকে সাতটা ভিজ্জে-বড়ের পালা সাজাতে।

কেউ বুঝতেই পারছে না—জমিদারের লোক-লকরের বিক্রেতা মাজ নিজের তিনটি তাইকে সঙ্গে নিয়ে নরোত্তম কি ভাবে লড়বে ? ভিজ্জে-বড়ের পালায় মধ্যে পাকা লক্ষাগুলি ছুঁকিয়ে দিয়ে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ছোটতাই মনোহর এসে খবর দিল—বড়দা ! জমিদারের লোকেরা দক্ষিণ ডাকার পথে আসছে।

—তাই তো আসবে। কতদূর এসেছে ?

—মাঠের প্রায় মাঝামাঝি...

—তা হলে আমি পালাগুলো বয়িয়ে দি'—তোরা কুলো এনে বাতাস কর।

সাতটা ভিজ্জে বড়ের পালা অমর্গল ধুম উদ্দীর্ণ করতে লাগল। মাঠের দিক থেকে শোনা গেল—শুধু হাঁচি আর কাশির শব্দ। চোখের জলুনি নিয়ে ছজ্জদ হয়ে জমিদারের লোকেরা যে যেদিকে পারে, পালাতে আরম্ভ করল। ধূম-জ্বালের আড়ালে দাঁড়িয়ে মা-কালীর দিকে চেয়ে—'জয় মা ধুমাবতী !' বলে নরোত্তম একটা প্রণাম করল।

নরোত্তম জামত—সেবারেও-ঠাকুর পক্ষে দাঁড়িয়ে জমিদারের সঙ্গে তার এই শক্তি পরীক্ষা এখানেই শেষ হবে না। জমিদারের আক্রমণ যে আরও সুপরিকল্পিত, আরও তীব্র হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্থানীয় দশখানা গায়ের

লোক নরোত্তমের বিরুদ্ধে লাঠি ধরবে না, একথা সে জানে এবং লুকিয়ে দু-দশ জন সাহায্যও করতে পারে। তাই ভোঁ জমিদার আনন্ডেন বহু অর্থব্যয়ে নদীর ওপার থেকে ভাড়াটে লেঠেল। তাদের এবার নরোত্তম এমন জব্দ করবে যে, কীবনে আর কখনও জমিদারের ডাকে সাড়া দেবে না।

নরোত্তমের তিনটি ভাই ঙ্গামাচরণ, সখিচরণ ও মনোহর চিরদিনই ছোট্টের অত্যন্ত অহংগত ও আদেশাত্মক। তাদের ডেকে নরোত্তম বলল—তিনথানা দা নিয়ে তিন জন আর—কর গাড়ী ‘চ্যাঙা’ কাটিতে হবে।

ঙামাচরণ জিজ্ঞাসা করল—কেন? চ্যাঙা দিয়ে কি হবে?

নরোত্তম বলল—হু-এক দিনের মধ্যেই জমিদারের লোক আবার আসবে। সংখ্যার তার হাবে আমাদের চেয়ে টের বেশী। লাঠি চালিয়ে আমরা ক’জনে এঁটে উঠতে পারব না। তোর ক’জন তিন গাড়ী চ্যাঙা নিয়ে তিন দিকে ঘাঁটি করবি। আমি একলা থাকব কালী-বাড়ীর সিং-দরজার। গেটের উপরকার সিংহ মূর্তিটার আড়ালে আমি ইঁড়াব এক বোঝা শড়কী নিয়ে—দেখব কোম খালা কালিবাড়ীতে ঢুকতে পারে।

নরোত্তমের অনুমান সত্যি হ’ল। তিন-চার দিনের মধ্যেই পদ্মপালের মত সুসংবদ জনতা অগ্রসর হতে লাগল কালী-বাড়ীর দিকে। ঘোড়ার চড়ে একটা বন্দুক হাতে জমিদার নিজেই তাদের পুরোভাগে। তাঁর লক্ষ্য নরোত্তম। দুইপথে পড়লেই গুলি করবেন। দুর্ভাগ্য নরোত্তম এবার শেষ হবেই। কিন্তু কোথায় সে?

জমিদার জানতেন—দশখানা গাঁয়ের বিজোহী প্রজারা

সকলেই নরোত্তমের সমর্থনকারী। যেঠো দাকার নরোত্তম এবার লাঠির কসরৎ দেখাবে, সে বিষয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এবার তারা দক্ষিণ-ডাকা দিয়ে আসছে না, অর্থাৎ ধূজালার আড়ালে লুকানো আর চলবে না। কিন্তু কোথায় নরোত্তম? কোথায় তার লোকজন? কালী-মন্দিরের একশো গজের মধ্যে এসে পৌছানোর পরেও জমিদার কোন প্রতিবাদ বা প্রতিঘম্ভিতার লক্ষণ দেখলেন না। ব্যাপার কি? এত সহজে কালী-বাড়ী দখল করা সম্ভব হবে, তা তো তিনি ভাবতেই পারছেন না?

হঠাৎ চারদিক থেকে—বৌ বৌ সন্ সন্ শব্দে নক্ষত্রবেগে ‘চ্যাঙা’ আসছে। কোথা থেকে, কি ভাবে আসছে—কেউ তা বুঝতে পারছে না। কারও মাথা, কারও হাত-পা ভয়ানক-ভাবে জ্বম হতে লাগল। জমিদার ‘ব্রাক-কারার’ করলেন—তাতেও নিরুত্তি নেই। হঠাৎ একটা শড়কী এসে জমিদারের উরু আর ঘোড়ার পেট একসঙ্গে গের্গে ফেলল। ঘোড়া ছুটল দর-মুখো। জমতা ছড়ল হয়ে পড়ল। কেউ আর কালী-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে সাহসী হ’ল না।

নরোত্তমের শৌর্য ও বীর্যের গল্পকথা নানাভাবে পল্লবিত হয়ে দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেকের বিশ্বাস করল শক্তিশালী নরোত্তম মা-কালীর বরপুত্র। গাঁয়ের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দীনবন্ধু সিদ্ধান্তরত্ন ও সদরের উকিল দেবেন্দ্রনাথ গুপ্তাচার্যের মধ্যস্থতায় নরোত্তমের সঙ্গে একটা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে জমিদার বাধ্য হলেন। কিন্তু মনে মনে নরোত্তমকে এক বার ‘দেখে-নেবার’ প্ররুতি ত্যাগ করলেন না।

ক্রমশঃ

একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট

অধ্যাপক শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম-এ

কোন প্রকৃত গণতন্ত্র রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যাপারেই গণভোট গ্রহণ করিয়া তদনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব। প্রাচীন গ্রীসের “নগররাষ্ট্র”গুলিতে হয়ত উহা সম্ভব ছিল, কিন্তু আধুনিক বিস্তৃত রাষ্ট্রগুলিতে উহা কোনমতেই সম্ভব নহে। অথচ নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা ব্যাপারে প্রত্যেক দেশবাসী, তা সে যে দলভুক্তই হউক না কেন, নিজ নিজ মত জানাইবার অধিকারী। এইজন্য দেশের বা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা-পরিষদ বা বিধান-পরিষদ সেই রাষ্ট্রের জনগণের সমস্ত দলের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত। সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবার অধিকারী অবশ্যই সংখ্যাগুরু দল,

কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী সকলেই। কিন্তু সচরাচর প্রচলিত ভোটপ্রথা এইরূপ সকল দলের প্রতিনিধি ব্যবস্থা-পরিষদে নির্বাচিত হইতে পারে না। সংখ্যাগুরু দলই অধিকাংশ “সীট” দখল করে। “একক হস্তান্তর যোগ্য” ভোটপ্রথা দ্বারা সদস্য নির্বাচন করা হইলে কিন্তু এরূপ বৈমানান সংখ্যাধিক্যের সম্ভাবনা থাকে না, গণতন্ত্রও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, সংখ্যাগুরু দলের সংখ্যার অনুপাতে কর্তৃত্ব বজায় থাকে এবং সংখ্যালঘু দলগুলিরও যথোচিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইতে পারে।

সাধারণ ভোট, যাহাকে ‘Ballot voting’ বা ‘Block

voting' বলা হইয়া থাকে, তাহাতে অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অভূত প্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতিতে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যেক দল বা মতের প্রতিনিধি সংখ্যানুপাতে গ্রহণ করিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিত হয়। যেমন ধরা যাক—একটি নির্বাচনক্ষেত্রে ২০০ ভোটার, তাহাদের মধ্যে ৫ জনকে নির্বাচন করিতে হইবে। ভোটারদের মধ্যে ৩০০ জন কংগ্রেস দলীয়, ২৪০ জন কম্যুনিষ্ট, ১৮০ জন সোশ্যালিষ্ট এবং ১০০ জন হিন্দুমহাসভাবুক্ত। Ballot ভোট পদ্ধতিতে এই ৩০০ জন কংগ্রেসী ইচ্ছা করিলে ৫ জনই তাহাদের দলভুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করিতে পারেন। অথচ মোট ভোটারের সংখ্যার তঁাহারা এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। বাকি দুই-তৃতীয়াংশের কোন প্রার্থীই আইনসভায় সদস্য হইতে পারিল না এবং দেশের বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর কোন সমস্তায় তাহাদের মত প্রকাশ করিবার সুযোগ পর্যাপ্ত পাইল না। আবার এরূপ Ballot ভোট পদ্ধতিতে এরূপ অঘটনও ঘটিতে পারে যে, উক্ত একক সংখ্যাগুরু দল হইতে একজন সদস্যও নির্বাচিত হইতে পারিল না। অপর তিন দল নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্য হইতেই ৫ জন সদস্য নির্বাচিত করিল। ফলে সংখ্যাগুরু দল হইয়াও উক্ত দলের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব রহিল না।

এই দুই প্রকার ব্যাপারই প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিপন্থী। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে কিন্তু কখনও এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। একজন জন ষ্টুয়ার্ট মিল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেসিডেন্ট উইলসন এবং সার জন সাইমন প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের মতে পার্লামেন্টে বা বিধানসভাগুলিতে এই সকল কারণে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতিই প্রচলিত করা উচিত, কারণ উহাই সর্বাপেক্ষা অধিক গণতন্ত্রসম্মত।

“একক” ভোটের সুবিধা

যদি ৫ জন সদস্য নির্বাচিত করিতে হয় এবং যদি প্রতি ভোটারের ৫টি করিয়া ভোট থাকে তাহা হইলে সংখ্যাগুরু দল ৫টি সীটই দখল করিতে পারে। কিন্তু ৫টি বা ৭টি বা ততোধিক সীট থাকিলেও যদি প্রতি ভোটারের মাত্র একটি বা “একক” ভোটের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে সে যাহাকে সর্বোত্তম ব্যক্তি মনে করিবে তাহাকেই ভোট দিবে। ৫ জনকেই দিতে পারিবে না। ফলে সংখ্যাগুরু দল ৫টি সীটই দখল করিতে পারিবে না। যুক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, একজন ভোটার যে স্বয়ং বিধানসভায় গিয়া দেশের কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না সে নিজের proxy বা প্রতিনিধি হিসাবে মাত্র

একজনকেই সেই ক্ষমতা দিতে পারে, অর্থাৎ মাত্র একজনকেই প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। একাধিক লোক একজনের প্রতিনিধি হইতে পারে না।

“হস্তান্তরযোগ্য” হইবার সুবিধা

কিন্তু শুধু “একক” ভোটের দ্বারা সংখ্যালঘু দলগুলির যথাসম্ভব প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার সুযোগ থাকিলেও উহা দ্বারা সংখ্যাগুরু দলের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কারণ সংখ্যাগুরু দল হইত একজন প্রার্থীকে সকলে ভোট দিবে। তাহাতে তাহাদের বড় ভোটের অপচয় হইবে এবং প্রতিনিধিমণ্ডলীতে সংখ্যাগুরু দল বজায় থাকিবে না। আবার এমনও হইতে পারে যে, তাহারা তাহাদের দলীয় একাধিক প্রার্থীকে ভোট বিভাগ করিয়া দিল এবং হইত কেহই নির্বাচিত হইতে পারিল না।

ভোট “হস্তান্তরযোগ্য” হইলে এইরূপ ভোট অপচয়ের আশঙ্কা থাকে না, কারণ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা (quota) পূর্ণ হইলেও এক ব্যক্তির ভোট অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর অর্পণ করা যাইবে। এই ভাবে সংখ্যাগুরু দল নিজ সংখ্যার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া অধিকতর সংখ্যায় প্রার্থী নির্বাচিত করিতে পারিবে।

এই ভোটপ্রণালীর আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে ভোট অপচয় হয় না। প্রত্যেক ভোটার তাহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এই ভাবে স্বীয় মনোনয়ন জ্ঞাপন করে। যে কয়েকটি ভোটের দ্বারা প্রথম মনোনীত ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারিবে, তাহার নামে অতিরিক্ত ভোটগুলি সেই সেই ভোটারের দ্বিতীয় মনোনীত ব্যক্তির উপর অর্শায়। আবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইয়া নির্বাচিত হইয়া গেলে তাহার নামের অতিরিক্ত ভোটগুলি তৃতীয় মনোনীত ব্যক্তির উপর অর্পণ করা হয়।

আবার যদি এরূপ হয় যে, কিছু সংখ্যক ভোটার এমন একজন প্রার্থীকে তাহাদের প্রথম মনোনয়ন হিসাবে ভোট দিয়াছে যাহার নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্ন-সংখ্যক ভোটও মিলে নাই, তাহা হইলে সেই প্রার্থীর নামীয় ভোটগুলি তাহার নাম হইতে অপসারণ করিয়া তৎসমুদয় দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থীর নামে অর্পণ করা হইবে। এইভাবে একটিও ভোট নষ্ট হইতে পারিবে না। সর্বোত্তম ব্যক্তি ৩০০ ভোট পাইল এবং সর্বনিম্ন ব্যক্তি মাত্র ৪০ ভোট পাইল এরূপ হইয়া ভোটের অপচয় হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

কোটা (Quota) নির্বাচিত হইবার ন্যূনতম ভোটসংখ্যা

এখন ন্যূনতম কয়টি ভোট পাইলে একজন প্রার্থী নির্বাচিত বলিয়া গৃহীত হইবে এবং তাহার নামের উদ্ভূত

ভোটগুলি অন্যের নামে অর্পণ করা চলিবে তাহার আলোচনায় আসা যাক। ধরা যাক, একটি নির্বাচনে একটি আসনের জন্য ১০০ জন ভোটার ৫ জন প্রার্থীকে ভোট দান করিয়াছে। এখন গণনাকালে যদি কোন প্রার্থীর নামে ৫১ জনের মতদান পাওয়া যায় তাহা হইলে বাকি ৪৯ জন আর যাহাকেই ভোট দিক না কেন তাহা গণনা না করিয়াও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তি নির্বাচিত হইবেই। আবার যদি দুইটি আসনের জন্য ১০০ জন মতদাতা মতপ্রকাশ করে তাহা হইলে যদি কোন প্রার্থী ৩৪ জনের ভোট পায়, তাহা হইলে সে নির্বাচিত হইবেই, কারণ বাকি ৬৬ জনের ভোট যদি একজনের উপরও প্রদত্ত হয় তাহা হইলেও উক্ত ৩৪ ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তি দুই জন নির্বাচিতের মধ্যে একজন হইবেই।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ৫১ বা ৩৪ সংখ্যাটি কিভাবে পাওয়া গেল? উহা নিম্নলিখিত ভাবে পাইতে হইবে—
 $১০০ \div (১+১) + ১ = ৫১$ এবং $১০০ \div (২+১) + ১ = ৩৪$
 অর্থাৎ মতদাতার সংখ্যাকে আসনসংখ্যার সহিত ১ যোগ করিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিলে ঐ ন্যূনসংখ্যা বা Quota পাওয়া যাইবে।

দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাপারটি আরও পরিষ্কৃত হইবে। ধরা যাক ৫টি আসনের জন্য ১০ জন প্রার্থী ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হইল এবং ১২০০৪ জন ভোটার নিম্নলিখিত ভাবে তাহাদের ভোট প্রদান করিল—

প্রার্থী	ক	প্রথম মনোনয়ন	১৮৭৮
„	ঘ	„	২০২৮
„	গ	„	৪০১৮
„	ঘ	„	১৪২৬
„	ঙ	„	৯৮৬
„	চ	„	৬৪২
„	ছ	„	৩১৪
„	জ	„	৩০৪
„	ঝ	„	২৩৬
„	ঞ	„	১০২

এখন নির্বাচিত হইতে হইলে প্রত্যেক প্রার্থীকে অন্ততঃ $১২০০৪ \div (৫+১) + ১$ অর্থাৎ ২০০১ ভোট পাইতে হইবে। তদনুসারে খ এবং গ নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইল।

গ সর্বাধিক ভোট পাইয়াছে, এজন্য প্রথমে তাহার অতিরিক্ত ভোটগুলি (অর্থাৎ ৪০১৮ - ২০০১ = ২০১৭) সেই সেই ভোটদাতার দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থীর প্রাপ্য।

তাহাদের ভোটপত্রগুলি হইতে নিম্নলিখিত রূপ দ্বিতীয় মনোনয়ন পাওয়া গেল—

ঘ—	৫০৬
ঙ—	১৪
চ—	২০
ছ—	৩৪৭৮

যেহেতু মাত্র ২০১৭টি ভোট হস্তান্তর করা চলিতে পারে সেইজন্য উল্লিখিত দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থীরা নিম্ন হিসাবমত ভোট পাইবে।

ঘ—	$\frac{১৮৭৮}{১০০} \times ৫০৬ = ২৫৪$
ঙ—	$\frac{১৮৭৮}{১০০} \times ১৪ = ৭$
ছ—	$\frac{১৮৭৮}{১০০} \times ৩৪৭৮ = ১৭৪৪$
চ—	$\frac{১৮৭৮}{১০০} \times ২০ = ১০$

ঘ, ঙ এবং ছ এইভাবে হস্তান্তরিত ভোটগুলি পাইবার ফলে তাহাদের নিম্নরূপ মোট ভোট হইল—

ঘ—	১৪২৬ + ২৫৪ = ১৭৫০
ঙ—	৯৮৬ + ৭ = ১০০০
চ—	৬৪২ + ১০ = ৬৫২
ছ—	৩১৪ + ১৭৪৪ = ২০৫৮

দেখা যাইতেছে যে, ছ কোটা অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছে। অতএব ছ নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইল এবং তাহার উদ্ভূত ভোটগুলি অর্থাৎ ৫৭ এবং খ-এর উদ্ভূত ভোটগুলি অর্থাৎ ২৭ পুনরায় হস্তান্তরিত করিতে হইবে।

এইখানে আর একটা উল্লেখযোগ্য নিয়ম এই যে, উল্লিখিত ৫৭ এবং ২৭-এর যোগফল ৮৪টি ভোটও যদি সর্বনিম্নস্থ প্রার্থী একে দেওয়া যায় তাহা হইলেও তাহার ভোটসংখ্যা ঝ-এর ভোটসংখ্যার সমানও হইবে না। অতএব তাহার নির্বাচিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেজন্য তাহার নামীয় ভোটপত্রগুলিতে যে যে প্রার্থীকে দ্বিতীয় মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই প্রার্থীর নামে ঐ ভোটগুলি হস্তান্তরিত করিয়া একে প্রতিযোগিতা হইতে “বহিষ্কার” করিতে হইবে।

এইভাবে বহিষ্কার এবং ভোট হস্তান্তর করিতে করিতে ৫ জন প্রার্থী নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবে। ফলে দেখা যাইবে যে, সংখ্যাগুরু দলের সংখ্যানুপাতে গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে অথচ সংখ্যালঘু দলগুলির সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে। এই বিশেষ গুণের জন্যই এইচ. জি. ওয়েলস্, পোয়েকারে, অ্যাস্‌কুইথ প্রভৃতি মনীষী ও রাজনীতিজ্ঞগণ এইরূপ ভোটপ্রথা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতি

আলফা অব্‌ দি প্লাউ

অল্পবাদক—শ্রীতমস বাপটী

দিনের বেলায় চিন্তাগুলো কাল রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্নে দেখলাম :

অজানাকে জানবার, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতের কথা

ভাববার আগ্রহ আমাদের অনেকেরই প্রবল। অনেক অনেক কিছু অহুমান করেও একটা কাজে লাগাতে পারে নি। বর্তমানের কালো যুগোসের অবশ্যুঠনের তলে যদি ভবিষ্যতের দেখা পাওয়া যেত...। দশ...কুড়ি...ভিরিশ...পঞ্চাশ...একশ' বছর পরের পৃথিবীর রূপ যদি আমরা দেখতে পেতাম...। এখনকার হিংসার উন্নত বরণী ভবনি বা কি রূপ নিত...। চারি দিকের অব্যবস্থা আর অনাস্থির কথা আমরা যেন ভাবতেই পারি না। মহাকাল গোপনে আর নীরবে অনেক কথাই নিজের খেলালে লিখে চলেছে—কিন্তু তার একটি কথাও মুহূবার বা আগে থেকে অহুমানের ক্ষমতা আমাদের কোথায় ?

আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন—‘দিনরাত যত সব অদ্ভুত কথা ভাববে, তাই রাতে উদ্ভট স্বপ্ন দেখবে না কেন ?’

স্বপ্নের মধ্যে যখন জাগলাম ভবন মনে হ’ল আমি যেন অদ্ভুত স্থতির কোন্‌ সূর্য শতাব্দীর প্রতিমিধি। অনেক... অনেক বছর আগে জন্মেও এখনও যেন বেঁচে আছি।

এ পৃথিবীতে তাই আমি একা নিঃসঙ্গ। আশপাশ, সূর্য দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কীকা জয়গা—যেখানে না আছে কোন বসতির চিহ্ন, না উঠেছে কোলাহল আর প্রাণের স্পন্দন। তবু সেই নিশ্চলতার মাঝে আমার যাত্রা সুরু হ’ল। মদী পথ ঘাট বন জঙ্গল পার হয়ে এগিয়ে চলেতে চলেতে ধেমে পড়লাম বড় বড় শহরের স্বংসন্ত পের মাঝে। কোথাও চোখে পড়ল বিরাট বাঁধ আর তার উপরে নির্জীবের মত পড়ে আছে রেলের লাইন। কোথাও বা ভাঙা ভাঙা বিলান—এককালে ত্রিভু-হিল বোঝ হয়। সন্মুখের ধারে কোথাও বা আহাঙ্ মেরামতি কারখানা—তারই ছোট ছোট কন্ডালের গারে জমে উঠেছে পুরু শেওলা। সেগুলো আবার ইভন্ততঃ ছড়ান।

সেইখানে ঠাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীকে একবার ভাল করে দেখতে চেষ্টা করলাম। সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা ম্যাপের মত আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। তারি এক রেখা ধরে আবার পথ-চলা সুরু করলাম। চারদিকে বয়ে চলেছে পরিবর্তনের স্রোত। একটা উদ্যম আবেগ আর প্রচণ্ড শক্তি চতুর্দিক ভেঙেচুরে একেবারে শুড়িয়ে ছারখার করে ফেলছে। কোথাও সাদা মেই, কোথাও ওঠে না শব্দ; চতুর্পার্শ্বেই ক্রয়ঙ্গ যেন একটা ভয়াবহতা আর নীরবতা। এই নিশ্চলতা

সহ করতে না পেরে চীৎকার করে উঠলাম। কিন্তু চীৎকার শূন্যে মিলিয়ে গেল—অত বড় নীরবতাকে ভেঙে বান্ধান করবার শক্তি কোথায় তার ? তা ছাড়া এখানে সময়ের প্রয়োজন কিসের ? অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি ত আসি নি। আমার আবির্ভাব হয়েছে অনেক শতাব্দী...বহু যুগ আগে।

পাহাড় আর মরুভূমি দেখে আমার মনে পড়ে যায় অনেক...অনেক দিন আগের পৃথিবীকে। কিন্টার জোচের বরফ-ঢাকা চূড়ার উঠতেই দেখলাম, ভোরের গোলাপী আলোর প্রথম পরশ এসে লেগেছে আল্পসের উপর। পাহাড়ের গায়ের সাদা বরফখণ্ডগুলো সেই আলোর বন্ধুক করছে। আসতে আসতে পাহাড় আর মরুভূমি পার হয়ে পৌছলাম পিরামিড আর ফিংজের রাজ্যে।

ফিংজের শিখরে যে লোকটির-দেখা পেলাম, অগুনতি বছর ধরে সে বোধ হয় ওখানে ঐ ভাবে পড়ে আছে। তার দাঁত-গুলো পড়ে গেছে, হ’চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে আর নিম্প্রভ। সমস্ত শরীরটাকে কুঁকড়ে এক অদ্ভুত উদ্দীপ্তে শুয়ে আছে। মনে হ’ল একটা তরোয়ালকে সে যেন আদর করছে আর তারি উচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটা তার কঁপে কঁপে উঠছে।

আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম।

ত্রু ছটো কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত স্থির ভাবে আমাকে দেখে নিয়ে সে উত্তর দিলে—‘হেঁ...হেঁ আমি ওডিন। সারা পৃথিবীর মালিক আমি তা জান। আবার...আবারই দখলে রয়েছে এই তরোয়াল...জান না আমারই সারা ছন্নিসার রাজ্য...হ্যাঁ...হ্যাঁ...এই ফিংজও আমাদের দলেরই...তরোয়ালকে জড়িয়ে আদর সুরু হ’ল তার।

‘আর কাউকে দেখছি না ত ? বাকী সবাই গেল কোথায় ?’—রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠি আমি।

‘স...অ...ব চলে গেছে। কেউ নেই...। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ভাড়িয়ে ভবে আজ আর একটি প্রাণও নেই। মানুষ সভ্য বলেই ত এত ভাড়াভাড়ি আমরা জন্মী হয়েছি। অনেক বছর ধরে তীর বহুক বর্ষা হোরা নিয়ে মারাধারি করণ্ড শেষ হতে পারে নি। তার পর মানুষ তৈরি করল বারুদ। কিন্তু তাতেও তার ক্ষয় হ’ল না। শেষকালে সভ্য-তার সিঁড়ির অনেকগুলো বাপ যখন সে টপকে গেল আর বিজ্ঞান তার পিছু মিলে—তখন থেকেই আমাদের জয়ের স্বহ-পাত। সে তখন বাতাসে উড়তে পারে—জলেও তাসতে

পারে ভেমনি ভাবেই। পাহাড়ের চূড়ায় সে নিৰ্ম্মিয়ে ছুটো-ছুটি করতে আরম্ভ করল। আকাশ থেকে হাতের-মুঠোর পুরল বিছাৎকে। শোহার বিরটি পাহাড় ভেঙে তৈরি করল ছাহাড়; মাটির ভলা থেকে খুঁড়ে বের করল করলা, তারপর থেকে সব সময়েই সে আপন মনে বলে চলে—“কি সুন্দর পৃথিবীর জন্ম দিলাম আমরা।...হি...হি...কি সুন্দর সব যন্ত্র-পাতি তৈরি করলাম—এই যন্ত্রই করবে শাস্ত আর শোনাতে শান্তি-বাণী।...হিঃ...হিঃ...কারণ ছাড়া আর কিছু মানতে রাজী নই। বিশ্বপ্রেমে বাঁধব বিশ্বভ্রাতৃত্বকে...অনেক বছর ধরে ভগবানকে খুঁড়ে খুঁড়ে আজ ভবে তার দেবী পেয়েছি। সেই সঙ্গে আপন বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে করে নিরেছি নিছের। এতদিনের পরিশ্রান্ত দেহ তাঁকে খুঁড়ে বের করেছে এই ল্যাব-রেটরীতে। পৃথিবীর সব শক্তি জড়ো করে তাঁকে সৃষ্টি করেছি। আমাদের যন্ত্র-ভগবান বিরটি...বিপুল...অনন্ত। সন্মান, আশীর্বাদ পৌরব—এই যন্ত্র-ভগবানের কাছে স্নান হয়ে যাবে। তার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিমান...”

তার সেই কীর্ত্তির্গ দেহ যেন বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—“কেবল আমারই জন্ম হ্যাঁ...হ্যাঁ...এই ওড়নের জন্ম সে সব কিছু তৈরি করে চলে। বড় বড় বোঝাচারী অভ্যাচারী রাজা তো আমার ভৃত্য আর মাহুষের শত্রু। আমি তখন হেসে বলেছিলাম মাহুষের যন্ত্রই তার কাল হ’ল। ক্রমেই সে হয়ে পড়ল যন্ত্রের দাস। যন্ত্রের প্রচণ্ড গর্জন আর বিকট চীৎকারের তলে পড়ে মাহুষের মৃত পিয়ে মরল তারা। শুধু সে বলে বিশ্বের এই বিরটি শ্রেষ্ঠ শক্তি আমার ভৃত্য...আমার বন্ধু। কি অপূর্ব জিনিষই না আমাদের মাথা থেকে বের হয়েছে। এদব ব্যাপার কিন্তু আমার...হেঁ...হেঁ...যন্ত্র তৈরি সাদ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভৃত্যদের হাতে তুলে দিলাম। আর সেই মকলময় যন্ত্র তখন হয়ে উঠল প্রলয়ঙ্কর। প্রথমে এক অভ্যাচারী চেষ্টা করে বিফল হ’ল, তার পর চেষ্টা করল আর এক জন। কিন্তু সেও সফল হতে পারল না। প্রথমে যে খেতাদ জাতি অস্ত্র পেয়েছিল তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে আর এক গীভাত জাতি, কিন্তু এই অভিযানই ধ্বংস করল যন্ত্রকে, কলে মাহুষ তখন হ’ল শেষ। আমার জয়ের প্রতিটি বাপ যন্ত্রকে করে তুলল ভীষণ আর তার চাহিদা মেটাতে গিয়ে পৃথিবী হারাল সব কিছু প্রেরঃ। ধীরে ধীরে গোটা মাহুষ-জাতি তার উদরে তলিয়ে গেল। হাজার হাজার...লক্ষ লক্ষ

...একটা জাতির পর একটা জাতিকে সে নিশ্চিহ্ন করে দিলে। যন্ত্রই করলে মাহুষকে খুন, খাওয়ালে বিষ, রাখল উপবাসে। দীর্ঘ দিনের চেষ্টার পর পৃথিবী যখন আমার আর এই ভরোয়ালের করতলগত হ’ল তখন শখাম হয়ে গেছে।...”

এবল উত্তেজনার এতক্ষণ সে চীৎকার করে চলেছিল, কিন্তু শেষের দিকে তার গলা ধরে এল।

‘কিন্তু এসবের মূল্য আছে কিছ? পৃথিবী জন্ম করে তোমার কতটুকু লাভ হবে?’

‘মূল্য!...তা তো জানি না। সেকথা জানবার জন্মই তো এই ফিংগের কাছে এসেছি। বহু শতাব্দী ধরে তারি প্রতীক্ষায় আছি, কিন্তু সে শুধু তার শাস্ত চোখ ছুটো দিয়ে হিরভাবে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখযুগ দেখে মনে হয়, সে জানে সব কিছু, কিন্তু ভবু নিরুত্তর থাকবে, একটি কথাও বলবে না। তার মধ্যেও আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে যেন কিছু বলতে চাচ্ছে—ঐ দেখ...ঐ দেখ...’

এবল উত্তেজনার লোকটি আবার চীৎকার করে উঠেছে—‘হ’ হাতের তলোয়ারটা কেঁপে উঠল বারকরেক। তার খোলাটে চোখ ছুটো হিরভাবে আটকে রয়েছে ফিংগের মূখের দিকে।

আমিও মুগ্ধ ফেরালাম। হ্যাঁ...হ্যাঁ...সত্যি তো ফিংগের ঠোঁট ছুটো মড়ছে—এখুনি হয়ত খুলে যাবে। মাহুষ কি অদ্ভুত প্রাণী। তার ভগবান সে নিজেই সৃষ্টি করল ভবু আবাত এল কিনা নিছের ভগবানের কাছ থেকে। এ যেন এক বিরটি হেঁয়ালী। কিন্তু তার উত্তর আজ আমি শুনে পাব। ধীরে ধীরে ফিংগের ঠোঁট ছুটো খুলে গেল, কিন্তু বার কয়েক ধর্ম শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হ’ল না।

ফিংগের ধর্ম শব্দ কতক্ষণ শুনেছিলাম জানি না, হঠাৎ এক ঝড়ো হাওয়ার চারদিকের ধুলোবালি আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিলে। চারদিক গরম হয়ে উঠেছে; ঝড় যেন আকাশের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে অর্ধের অস্তিত্ব। ফিংগও ঝড়ের হাওয়ার কোথাও ছিটকে পড়েছে; বুড়ো ওড়িনও কোন্ শূড়ে মিলিয়ে গেছে তার হৃদয় পাওয়া ভার।

তাই নিবিড় ঘন অন্ধকারের মাঝে ডুবে গেল সমস্ত পৃথিবী।

সেই বিরটি আধার-ভরা শূড়ের মাঝে কেবল আমি একা শুধু বসে রইলাম।*

* “Odin Grown Old” অবলম্বনে।

গুপ্তক গল্পচয়

ব্রাহ্মসঙ্গীত—স্বরলিপি (নতুন সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। ত্রীরমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধনাপ্রসঙ্গ—২১০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে আদি সমাজের একনিষ্ঠ কর্মী ত্রীকাকালীচরণ সেন ছয় খণ্ডে “ব্রাহ্ম সঙ্গীত স্বরলিপি” প্রকাশ করেছিলেন—তারই একটি সমস্ত ভাগ—অধুনা দুইখণ্ড গানগুলি সংগ্রহ করে ছাপাবার অনুরোধ জানিয়েছেন নিজে প্রজ্ঞেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। ব্রাহ্মসমাজের তরুণ দল তাঁর আদেশ পালন করবেন বলে আশা করি। ইতিমধ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রবীণ ত্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কুড়িটি ব্রাহ্মসঙ্গীতের সঠিক স্বরলিপি প্রকাশ করে আমাদের ধন্যবাদার্থ হয়েছেন। রাজা রামমোহন রায়ের রচিত গান ও মহানির্বাণ তন্ত্রের শ্লোক হয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাঁর সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ও তাঁর মনোবী পুত্র-ধর্মের কতকগুলি প্রসিদ্ধ গান পেলাম। তাঁর পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন চক্রবর্তী, অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতি ভক্তগণের গানগুলিও শিখার হৃদয়গে রমেশবাবু করে দিয়েছেন। আশা করি তিনি এই ভাবে সাধন সঙ্গীতের উত্তরোত্তর প্রসার করে যাবেন। তাঁর স্বরলিপি গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বরবিতান—অষ্টম ও বিশ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬৩, দারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনবার ও শেখবার আগ্রহ রবীন্দ্র-মুগেও প্রবল ছিল,

এখন যেন প্রবলতর হয়েছে, কিন্তু ভাবে, ভাবার এবং স্বরে তিনি যে কত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, সে বিষয়ে বেশী মানুষ এখনও সজাগ হয় নি। তাঁর গানগুলির অনেক স্থলে পাঠভেদ যেমন আছে, তেমনি স্বরভেদও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। এক এক গান একটু আখটু অমলবদল করে তিনি নিজেই নানারূপে পরিবেশন করতেন। বহুক্ষেত্রে আমরা তা দেখেছি এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে যাকে সবাই আমরা প্রজ্ঞা করি, সেই ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও তা স্বীকার করেছেন এবং তাঁর স্বরলিপিতে প্রকাশ করে গেছেন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনায় নেমে আমি তাঁর প্রথম গীতসংগ্রহ “রবিচ্ছায়া” পুনরালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এবং বিভিন্ন পত্রিকায় আমার মন্তব্য প্রকাশ করেছি। ঐশ্বর্যবাহিকভাবে গান ছাপা যত সহজ তাদের স্বরলিপি ছাপা তত সহজ নয়, কারণ সঠিক স্বর নিখুঁতভাবে লেখবার মত গুণী মেলা ভার—তবু অষ্টম খণ্ড স্বরবিতানে ৩০টি প্রাচীন ধর্মসঙ্গীত, ‘রবিচ্ছায়া’ ও ‘গানের বহি’ প্রভৃতি বই থেকে নিয়ে স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে দেখে আমরা খুশি হলাম। বিশ খণ্ডে আরও ৩০টি গানের স্বরলিপি ছাপা হয়েছে এবং “গ্রন্থ পরিচয়” রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আদি সঙ্কলন-গ্রন্থ রবিচ্ছায়ার প্রতি স্থবিচার করা হয়েছে দেখে আনন্দ পেলাম। কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কত বিচিত্র গানের পদ, কত রকমের স্বর তিনি নিজে বা তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা করবার



মলয় চন্দন সাধন
ক্যাষ্টরল এগারো আউন্স
রেণুকা চন্দন সাধন
লানলি মোও ক্রীম

দিত্য প্রসারনে.

সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধন করতে হলে আপনার নিত্য-প্রসাধনে এগুলি ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসাধন সামগ্রীগুলি, দেহতী, কেশতী, বর্ণতী ও অঙ্গতী আশাতীতরূপে বৃদ্ধি করে।



কিনিবার ক্ষেত্রে
আমল দ্বিবিধ
দেখিয়া নইনে

দি ক্যালকাটা কোমিক্যাল কোং লিঃ

হৃদয়োগ এখন পাওয়া গেল। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আরও অনেক অধুনা-বিশ্বত-রবীন্দ্র-সদীত-বরলিপি প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীকালিদাস নাগ

অনামী—শ্রীদীনেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম এক টাকা চারি আনা।

অনামীর লেখক 'সাহিত্য-জগতে নবাগত এবং বয়সেও তিনি তরুণ। এই রচনাটি তাঁহার কিশোরকালের। কাঁচা মনের ভাবাতিশয়ো-সাধারণতঃ কাঁচা বয়সের লেখা ফাঁপিয়া উঠে এবং পাঠকের রসগ্রহণ-ক্ষমতাকে বহু পরিমাণে ক্ষয় করে। বস্তুর চেয়ে ভাবের প্রাধান্য বেশী থাকে বলিয়াই এমনটি হয়। হৃদয়ের বিষয়, এই কিশোর-লেখকের রচনাতে ভাবোচ্ছ্বাস কম। দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও মনের বিচার-বোধ বস্তু ও ভাবকে পরিমিতভাবে মিলাইয়া সত্যাকার একটি ভাল গল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। গল্পের বিষয়বস্তু অভিনব না হইলেও দেশের মাটি ও মানুষ-গুলির পরিচয়ে কৃত্রিমতা নাই। হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতি বাংলার জল মাটিকে হৃদয়কাল ধরিয়া আঙ্গমাং করিয়াও যে পরস্পরের আপন হইতে পারে নাই—তাঁহার মূলে আচার্যধর্মের বিভিন্নতা অথবা দীর্ঘ দিনের পরাধীনতা—কোনটি প্রধান এই গ্রন্থ লেখকের মনে জাগিয়াছে এবং গল্পের মধ্য দিয়া তিনি এই সত্যটিকে প্রকাশ করিয়াছেন। লেখার দরদ ও চরিত্র-চিত্রণের কুশলতা—দুটি সম্পদই লেখকের আছে।

কেদার-বদরিকা ভ্রমণ-রহস্য—শ্রীমৌরহরি ঘোষ। ৩, নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা-২। মূল্য তিন টাকা।

স্বর্ণযাত্রাকাল হইতে দুর্গম পথ মানুষের মনকে আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাহাকে নির্বিক্রম জীবনযাত্রার গভী হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে। প্রকৃতির-রূপদর্শনের নেশা কিংবা পুণ্যসঙ্কল্পের বাসনা অথবা অজানাকে

জানিবার ও তাহার রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস যে নামই দেওয়া থাক—দুর্গম পথ কোন দিন মানুষকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় নাই—জীবনের প্রকৃত অর্থ, আরাম-বিরামকে ভুচ্ছ করিয়া ওই পথচলার মধ্যেই যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভায়তবর্ধের মুকুটমণি শেখতান্না হিমালয়; সর্বোচ্চ বলিয়া নহে—শেখতান্না-সিংহ-চারণ-বিহারভূমি বলিয়াই হিন্দুর মনে ইহার প্রভাব আশ্চর্য রকমের। এই হিমালয়ের বুকে হিন্দুর প্রেত তীর্থ কেদার-বদরী, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, প্রভৃতি পঞ্চাশোদ্ভব তীর্থ—শাস্ত্র ইহাকে মহাপ্রস্থানের পথ বলিয়া নির্দেশ করে। মহাভারতকার পঞ্চ-পাণ্ডবের শেষযাত্রাকে চিহ্নিত করিয়া এই পথের মহিমাকে হিন্দুর মনে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন এবং অগণ্য তীর্থকামী পুণ্যাভিলাষী এই দুর্গম পথে দ্রুত ক্রমে অগ্রাহ্য করিয়া পরমপুরুষের কৃপাবিন্দুলাভের জন্য তীর্থ-পরিক্রমা করিতেছেন। এই তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া যুক্তিবাদী মনও নাকি স্তম্ভিতবৃত্তির রহস্যকে নুতন করিয়া বিচার করিতে বসে। এই তীর্থ-পথকে লইয়া বাংলা সাহিত্যও কম সমৃদ্ধ হয় নাই।

আলোচ্য-কেদার-বদরী ভ্রমণ-রহস্য লেখক সহজ সরলভাবে বাংলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সাহিত্য-সৃষ্টির পর্যায়ে হরতো উন্নীত হয় নাই—কিন্তু তীর্থরাজের মহিমাকে নিঃসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছে। ভ্রমণকে উপলক্ষ্য করিয়া সাহিত্য যদি সৃষ্ট হয় সেটি পরম লাভেরই কথা। তা ছাড়া ভ্রমণ-কাহিনীর আর একটি দিক আছে। সেটি হইতেছে পথকে ঠিকমত জানাইয়া দেওয়া ও পথচলার আনন্দকে যথাযথভাবে মনের মধ্যে পৌছাইয়া দেওয়া। লেখক এই ক্ষেত্রে কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন।

যাত্রীসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার খুঁটিনাটি বিবরণগুলি লেখক সঘর্ষে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনেকগুলি শব্দের ছবি এবং পথের নির্দেশনামাট্রিও যাত্রীদের মনকে তীর্থভ্রমণে উদ্বুদ্ধ ও তাঁহাদের পথের ক্লেশ নিরাকরণে সহায়তা করিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

AT-১ তত্ত্বজিজ্ঞাসা—শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএচ-ডি। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী লিঃ। ৫৪৩, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকার কতৃক বিভিন্ন সময়ে লিখিত কতকগুলি দার্শনিক গ্রন্থক বর্তমান গ্রন্থে একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। 'আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দার্শনিক মতবাদ' শীর্ষক দীর্ঘতম গ্রন্থকটি ছাড়া বাকী এগারটি গ্রন্থকের সকলগুলিই দর্শন, উদ্বোধন, বস্তুজ্ঞী, বিশ্ববাসী, ভায়তবর্ধ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম তিনটি গ্রন্থকে দর্শনের স্বরূপ, ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ এবং দার্শনিক প্রমাণপদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতের আলোচনা করা হইয়াছে। কয়েকটি গ্রন্থকে হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও

সত্যতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্যকুশলতার নির্দেশন

ব্যাঙ্ক অফ বাবুডা

লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপ্লবের সঙ্কে ও ভায়ত-সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অল্পমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীহরিন্দ্রনাথ ব্যানার্জি



বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার *Fundamentals of Hinduism* নামক ইংরেজী গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বিস্তৃততর আলোচনা করিয়াছেন। 'বিশ্বসাহিত্য-সম্মেলনের' সার্থকতা কোথায় প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্রগুলির ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। দুইটি প্রবন্ধে শ্রীধরবিন্দু ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষার সারমর্ম উদ্ঘাটিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠক গ্রন্থখানির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পাইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য। এ. মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩৫৮। পৃষ্ঠা ৩৫৫। মূল্য ছয় টাকা।

ইংরেজী ভাষায় লেখা শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বহুসংখ্যক বই আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার এ ধরণের বই কেবলমাত্র ট্রেনিং স্কুল কলেজের ছাত্রগণ বা শিক্ষক-সম্প্রদায়ই পড়েন না; সম্ভাব্য কল্যাণকামী পিতান্নাতাও আগ্রহের সঙ্গে এই সকল পাঠ করেন এবং তদনুযায়ী সম্ভাব্যদের 'মামুষ' করিবার চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ গৃহ ও বিতালয়ের মিলিত প্রযুক্ত এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর দিয়াই শিশুর মনের সার্থক বিকাশ সম্ভবপর। আমাদের দেশে শিশুর অভিভাবকদের মধ্যে এ সম্বন্ধে কোন সচেতনতার লক্ষণ দেখা যায় না; শিশুকে পালন করার দায়িত্ব সম্বন্ধেও অধিকাংশেরই কোন হুস্পষ্ট ধারণা নাই। কাহাকেও দোষ দিয়া লাভ নাই, কেননা মাঝারি রকমের শিক্ষিত জনক-জননীর পক্ষে বোধগম্য এবং চিন্তাকর্ষক পুস্তকেরও একান্ত অভাব রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের বর্তমান পুস্তকখানি ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদের জন্য পরিকল্পিত। ইহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ, শিক্ষার সংজ্ঞা, বিভিন্ন পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বহু জটিল তত্ত্ব ও তথ্য এবং শিক্ষার উন্নতির পরিমাপ-প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। এত অল্পপরিমিত মধ্যে মনোবিজ্ঞানের সকল বিষয় বিস্তৃত ও বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। তবু সাধারণ পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করার বহু উপকরণ ইহাতে আছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি—শ্রীনারায়ণচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। বিদ্যার্ণী প্রণব, ২৩, হরটোল লেন, কলিকাতা-৫। পৃষ্ঠা ৪৪। মূল্য আট আনা।

উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা। আচার্য্য-গ্রন্থচন্দ্র রায়, ডক্টর শ্রীমতীতিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অল' অব চেম্বারফিড প্রভৃতি দেশবিদেশের নানা-মনীষী ও পণ্ডিতদের রচনা হইতে মূল্যবান 'উক্তি'সমূহ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সংযম, স্মরণশক্তি, অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ, চরিত্র, এবং নৈতিক জীবন ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান উপদেশাবলী ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা বাস্তবিক বানী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আবুতোয, মহাত্মা গান্ধী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুরূপ উপদেশ-বলিও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুস্তিকার দ্বারা দেশের তরুণগণ উপকৃত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

সোসালিষ্ট পার্টি কি চায়—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস। সোসালিষ্ট পার্টি অফিস, পি-৩৫, গণেশ এভিনিউ, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৩৪। দাম চারি আনা।

সম্প্রতি ভারতের প্রথম গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনে দল হিসাবে সোসালিষ্ট পার্টি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। আধুনিককালে সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব পৃথিবীর নানা দেশেই দেখা বাইতেছে। কিন্তু

শুধু বাংলা নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্ব-জগৎ

আজ যে মহাজীবনের দিব্য-প্রকাশের দিকে চেয়ে আছে, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সেই অপরূপ বিস্ময়কর আবির্ভাব।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-জীবন-কাহিনী

জনক-জননী

লেখক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর জননী সারদামণির অপরূপ মানবীয় লীলা, কোন ভাষায় এমন অপরূপ সৌন্দর্যে ইতিপূর্বে আর উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই অপূর্ব রচনা প্রত্যেক বাঙালীকে মুগ্ধ করিবে।

‘জনক-জননী’

বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব কীর্তি, একটা নূতন যুগের সূচনা।

বাংলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ... প্রত্যেক পাঠক একথা সানন্দে স্বীকার করেছেন।



মূল্য—সাধারণ ২৯, বাঁধাই ২৯ টাকা

রামকৃষ্ণ মতাবলম্বী বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অধিনায়কগণ বহু শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষবৃন্দ; নানা বিচারালয়ের বিচারপতিগণ; বিশিষ্ট সাহিত্যরথিগণ; দেশবরেণ্য নেতাগণ; প্রখ্যাত সমালোচক, গ্রন্থগারিক ও সাংবাদিকগণ মুক্তকণ্ঠে এই অপূর্ব গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান :—

প্রকাশক—সত্যেন্দ্রলাল রায়

৮সি, বিভূষণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

এবং

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১২বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৪ বছরের হিসাবে

১৯৫০-এর ভ্যালুয়েশন

গত ৪ বছরের হিসাব-নিকাশে 'হিন্দুস্থান'-এর উন্নত উন্নয়ন পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উপর। সেই টাকা হইতে লাভ-সহিত সকল বীমাপত্রের বছর প্রতি হাজারকরা বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে :

মেসাদী বীমাস— } ৮- টাকা
আজীবন বীমাস— }

ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস এবং অগ্রাঙ্ক অনিশ্চিত ব্যয় সাপক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়া এবং স্বদের হার অঙ্কিত হার অপেক্ষা ৫% কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে হিসাব-নিকাশের এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে।

লগ্নীতে কমহারে হুদ অর্জন, ছুমুল্যের বাজারে অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী নিরাপত্তা, হৃদয় আর্থিক সম্ভতি এবং পরিচালন-ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চলতি বীমা ৭৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল ... ১৫ " ৯৭ " " "
প্রিমিয়ামের আদায় ৩ " ৪০ " " "
দাবী শোধ ৭ " ২০ " " "



হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা সর্বসাধারণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সন্ত্রাসীদের মধ্যেও, খুব স্পষ্ট নহে। লেখক সংক্ষেপে—এই পার্টির নীতি ও আদর্শ সরল সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়া অনেকেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সাম্যবাদ বা কমুনিজমের সহিত সোশ্যালিজম বা সমাজ-তন্ত্রবাদের পার্থক্য কোথায় লেখক তাহা খুব খোলাখুলিভাবেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। লেখকের মতে—রাশিয়ার কমুনিজম হইতেছে 'শৈর্যচারা' (Totalitarian) আর সোশ্যালিজম হইতেছে গণতান্ত্রিক (Democratic) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাশিয়ার বাহা চলিয়াছে তাহা গণতন্ত্রবিরোধী—একটু উহা মূল মার্জার নীতিরও বিরোধী। স্ট্যালিন এই ভ্রান্তনীতির পথপ্রদর্শক। সুতরাং রাশিয়ার 'শৈর্যচারা' সাম্যবাদ সভ্যতার সমাজতন্ত্র নহে। "সোশ্যালিজমের কাঠামোতে স্বাধীনতা-রাষ্ট্রকে, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা ব্যক্তিগত বা হোক না কেন—সর্বদা বিধাঙ্গমান।" সোশ্যালিস্ট পার্টির মতে উৎপাদনের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে সমগ্রবদ্ধ ও সমবায়মুখে আবদ্ধ আত্মসচেতন শ্রমিকসম্প্রদায়ের হাতে। লেখক বলেন, "এই পার্টি এ দেশের ঐতিহ্য বজায় রেখে মাল্ল বাদ গ্রহণ করেছে অথবা মাল্ল বাদ গ্রহণ করে এদেশের আপনাদের নামগ্রী হয়েছে।" ইহা কিরূপে সম্ভব বা কতটা সম্ভবতালাভ করিয়াছে ইহা অবশ্য বিতর্কের বিষয়। বাহা হটক, এই পুস্তিকখানি পাঠ করিলে পাঠক ভারতের সমাজতন্ত্রী দলের আদর্শ ও কর্তব্যস্বায় স্বরূপ জানিতে পারিবেন এবং এ পথে দেশের নানা সমস্যার সমাধান কতটা সম্ভব সে সম্বন্ধে ভাবনার খোলা পাইবেন। পুস্তিকার ভাষা সরল।

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত

অমরী—ডাঃ ত্রিফলগোপাল ভট্টাচার্য। "সাহিত্য-কোণ", ৪৪-সি, বাগবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

উপগ্রাস। ডাঃ বিন্দুপ্রকাশের সহিত তাঁহার রোগিণী মিসেস রাশিয়ার অবৈধ প্রেম ও পরিণয়ের কাহিনী। পড়িতে বিরস্তির উদ্রেক হয়।

বিমুক্তা পৃথিবী—দেবাচারিয়া। হুমিত্রা প্রকাশক, ৪-বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন। কলিকাতা-৫। মূল্য দুই টাকা।

সমালোচ্য পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটি বড় গল্প। নায়ক—চিরকর অজয়—বিবর্ণ, হুঁকার মুখ ও চোখ দুটি উজ্জল, দৃষ্টি হৃদয়গ্রাসী বর্ণময়। অজয় চিত্তাঙ্গীল—তার চিন্তাকে সে ভাষায় রূপদান করে। শাসককে দার্শনিক আর দার্শনিককে শাসকরূপে সে দেখিতে পায়—নহিলে জনসেবা নাকি সম্ভবপর নয়। পুরাতন পৃথিবীকে গতানু-গতিকতা হইতে মুক্ত করিতে হইলে শাসককে দেখাইতে হইবে তাদের আদর্শ, আর শ্রমিক করিবে ভোগ। শাসকশ্রেণীর প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য, সাধুতা, পবিত্রতা। এক কথায় শাসকের দৃষ্টিভঙ্গী হইবে দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের। এমনি আরও বহু সম্ভব অসম্ভব কল্পনাকে অজয় মনে মনে পোষণ করে, এবং ভাষায় রূপ দেয়।

নায়িকা পূর্ণিমা হুম্মরী ও যুবতী, কিন্তু তাহাই তাহার সবটুকু পরিচয় নয়। তার বাড়ি, সৌন্দর্য ইত্যাদি সব লইয়া সে এমন এক গুরুর বিচরণ করিত যেখানে কেহই তাহার সান্নিধ্যে পৌঁছিতে সাহস পাইত না। যে বেঁটে ছেলেটি অগ্রসর হইয়াছিল, পূর্ণিমা তাহাকে অধিক ব্যায়ম করিতে এবং পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়াছে। অঞ্চল এই মেয়েই ঘটনাচক্রে ভালবাসিল আত্মভোলা ধামধেনালী দরিদ্র শিল্পী অজয়কে। এদিকে তিলডাঙ্গার কুমার বাহাদুরের সহিত তার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া গিয়াছে। দেখা দিল বড়—যে ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে সব বিপর্যাস হইয়া গেল। অজয় পূর্ণিমার চলার পথ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইল, কিন্তু তাহাতেও ভাঙন রোধ করা গেল না।

ভিলডালার জমিদারবাড়ীর প্রতিহিংসা ও ক্রোধ পূর্ণিয়ার বাবা অমল-বাবুকে ধ্বংস করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হইল না, তার নামে জঘন্য অপবাদ রটনা করিতেও সক্ষম করিল। পূর্ণিমা সংসার ছাড়িল, অজয়ের বহু ধোঁজ করিল, কিন্তু সবই হইল বিফল। অবশেষে একটি ঘেরে-বুলের শিক্ষকতার কাজ লইয়া সে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। তার পর একদিন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে অজয়ের সাক্ষাৎ মিলিল। সে তখন জীবনযুদ্ধার সন্ধিক্ষণে। পূর্ণিমা এই উদ্ভট দার্শনিক ও তরুণ শিল্পীকে বাঁচাইয়া তুলিতে একে একে তার সমস্ত সঞ্চয় ও সম্বল নিঃশেষ করিল। গল্পটির আখ্যানভাগ মোটামুটি এইরূপ।

দেবাচারিয়া বাঙালী এবং আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার রচিত প্রথম বাংলা বই। কিন্তু রচনার কোথাও জড়তা প্রকাশ পায় নাই। দুই-এক স্থলে সামান্ত ক্রটি-বিচ্ছাতি থাকিলেও লেখকের অনবদ্য পরিবেশ সৃষ্টি, সাবলীল ভাষা, শাণিত সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যে পুস্তকখানি অত্যন্ত সুবর্ণা হইয়াছে। নারক অজয়ের পুস্তক-রচনাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর শাসকশ্রেণীকে যে ধরণের প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞপ্তি তিনি করিয়াছেন তাহা সুপ্রযুক্ত ত হইয়াছেই, সমরোপযোগীও হইয়াছে।

ত্রিবিভূতিভূষণ গুপ্ত

পূর্বরঙ্গ—শ্রীঅমিরতন মুখোপাধ্যায়। সাধনা মন্দির, ৫৫, নারায়ণ রায় রোড, কলিকাতা-৮। মূল্য তিন টাকা।

'পূর্বরঙ্গ' লেখকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "পূর্বরঙ্গকে দু'ভাগে ভাগ করেছি—রঙ্গ ও সাধনা।... 'রঙ্গ' পর্যায়ের রচনাবলীতে যে ধ্রুং, যে নৈরাশ্র, যে সংশয় ও দ্বন্দ্ব বাঞ্জিত হয়েছে, বলাই বাহুল্য তা যুগগত সত্য।" শুধু নৈরাশ্র-সংশয় নয়, সকৌতুক আনন্দের সুরও কোথাও কোথাও শুনি, যেমন 'রিয়ালিটে'।

"ভাদরের জলে ধুয়ে তকতকে হয়ে গেছে

রায়েদের দালান ও রক—

ছাখো ছাখো, আছা ছাখো, রকে শুয়ে সোনারোদ:

স্বধারামে করে আনচান।"

কবির সৌন্দর্য্যভূতি একান্ত সহজ ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহা ভূষিকর।

কোথাও কোথাও অসঙ্গত প্রসাধনে কবিতার স্বভাবলাবণ্য ঢাকা পড়িয়াছে। আশা করি, এই ক্রটিটুকু ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে। অধুনা ভবিষ্যতে তাঁহার কাব্যরঙ্গ আরও প্রাণীকৃতি লইয়া দেখা দিবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেদান্ত ও সূফীদর্শন—রমা চৌধুরী। শ্রীপ্রাচ্যবাণী মন্দির গ্রন্থমালা চতুর্থ পুস্তক। মূল্য দুই টাকা।

বেদান্ত ও সূফী মতের তুলনামূলক সমালোচনা-গ্রন্থ। বেদান্তশাস্ত্র যেরূপ বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত, সূফীদর্শনও তদ্রূপ বিভিন্ন মতবাদের সমষ্টি। গ্রন্থকর্ত্রী সূফীবিচারপূর্বক দেখাইয়াছেন যে, অনেক স্থলে উভয় দার্শনিক প্রস্থানে যেমন বহু সাদৃশ্য রহিয়াছে তেমনই বৈদাদৃষ্টেরও অভাব নাই। লেখিকার মতে "বেদান্ত মতবিশেষের সহিত সূফী মতবিশেষের সর্বাংশে সাদৃশ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা বুধ। সাধারণ সাদৃশ্যই গ্রহণীয়।" প্রাচ্য ভূখণ্ডের এই দুইটি মতবাদই অধ্যাত্মক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারত উভয় ধারার মিলনক্ষেত্র। গ্রন্থকর্ত্রীর পক্ষপাতপূর্ণ সমীক্ষা গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান, ধর্ম্মসাধনা ও নীতির পথে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্য বিশেষরূপে আলোচিত হইলে মিলনের প্রশস্ততার সেতুর সন্ধান পাওয়া যাইবে। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেদিকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিতেছে।

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

মহামানব শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথের মহানির্বাণ—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২১, কালিদাস পতিভূতি লেন, কলিকাতা-২০ হইতে প্রকাশিত। ৪+২০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

নৃপেন্দ্রনাথ ছিলেন পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের অন্ততম ভক্ত। এবং "বার শেষ ভাল তার সব ভাল।"—এই প্রচলিত প্রবাদের সার্থকতা এই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অন্তিম সময়ের ঘটনার প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি কত বড় পুণ্যাত্মা ছিলেন এবং কিরূপ আদর্শ অধ্যাত্মজীবন বাগন করিয়া গিয়াছেন তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় সমালোচ্য পুস্তকখানিতে পাওয়া যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

টোল ও কোম্পানীর



বরানগর, কলিকাতা

দাদ ও কাউরের
মেসার্স মলম

ক্রিউটা-টোন
পোড়া মেদনা ও চর্ম্মরোগের জন্য

নিম্ন মলম
খোস পাঁচড়া ও চুলকানীর জন্য





আটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী

আটপুর গ্রাম হলদী জেলার ত্রিপুরা মহকুমায় অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ২৫।২৬ মাইল, হাওড়া ময়দাম ট্রেন হইতে মার্টিন কোম্পানীর রেল আটপুর যাওয়া যায়। একদা আটপুর একটি বর্জ্য গ্রাম ছিল। ইহা বহু ব্যাভাষ্যমাত্র ব্যক্তির জন্মস্থান। স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম ঘোষ) আটপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহারই বাটীর প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রী জালাইয়া অপর আট জন গুরুভাতার সহিত প্রথম গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন; বাবুরামও তাঁহাদের সহিত ছিলেন। পরে



আটপুর কৃষিশিল্প-প্রদর্শনীতে কোদালি হস্তে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

শ্রীশ্রীমণ্ড বাবুরামের বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন। বাবুরামের ভাতা শ্রীশ্রীমণ্ড বাবু মহাশয় অতাপি জীবিত আছেন এবং তাঁহাদের পৈতৃক বাড়ীতে এখনও হুগাঁও ও অত্যাভ দেবদেবীর পূজা-অর্চনা যথানিয়মে অহুষ্ঠিত হইতেছে। যে

স্থানে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুভাতার শ্রী জালাইয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং যে ঘরে শ্রীশ্রীমণ্ড অবস্থান করিয়াছিলেন সেই দুইটি স্থানে শ্রীশ্রীমণ্ড বাবু দুইটি প্রস্তরকলক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; স্বামী প্রেমানন্দেরও জালাইয়া একটি প্রস্তরকলক স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমন্ডল সমিতির উদ্যোগে এবং আটপুরবাসী বর্ধমান লেখকের অক্লান্ত চেষ্টায় গত তিন বৎসর যাবৎ আটপুরের মিত্র-বাটীর প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর একটি পল্লীমন্ডল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইতেছে। এই প্রদর্শনীর নানা বৈশিষ্ট্য আছে। বর্ধমান বৎসরে গত ১৬ই মার্চ এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্বাটন হয় এবং ২৮শে মার্চ পর্যন্ত উহা খোলা থাকে। দ্বারোদ্বাটন করেন মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সভাপতি শ্রীঅপরূপকুমার চন্দ। তিনি ছাত্র-সম্মেলনেও পৌরোহিত্য করেন। ২৮শে মার্চ প্রদেশপাল ডঃ শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রদর্শনী পরিদর্শন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন; এই উপলক্ষে একটি শিশুপ্রদর্শনী অহুষ্ঠিত হয় এবং অহুষ্ঠিত সম্প্রদায়ের শিশুদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এতদুপলক্ষে “ভূমিসেনার সমাবেশ” হয় এবং বর্ধমান লেখক প্রদেশপালকে ভূমিসেনার ‘ব্যাজ’ ও কোদালি উপহার দেন। পুরস্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—আমেরিকার ‘কেয়ার’ লাদল এবং অত্যাভ ‘কেয়ার’ যন্ত্রাদি, ‘কেয়ার’ বাত, ‘কেয়ার’ বস্ত্রাদি—এই সকল অব্য ‘কেয়ার’ মিশন হইতে বিদায়ল্যে প্রাপ্ত। উক্ত দিবসে হা-ডু-ডু খেলায়ও প্রতিযোগিতা হয়। রাজ্যপাল মহোদয় ভূমিসেনা সমাবেশ, হা-ডু-ডু খেলা, পুরস্কারের আয়োজন, শিশু-প্রদর্শনী প্রভৃতি দেখিয়া অতিশয় আমন্দ প্রকাশ করেন।



অমৃততাঞ্জন
সর্বপ্রকার বেদনায় আণবিক বোমার ন্যায় কার্যকরী।

দাদেয় মলম
চর্ম রোগে 'পরমানু শক্তির' ন্যায় কার্যকরী।
অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকতা ৭



স্বাগতি ১৮৯৩

রাজ্যপালের আগমনের সংবাদে দূরবর্তী পরীলমুহ
হইতেও বহু লোক আঁটপূরে আসেন, পরী অকলে এক
অভূতপূর্ব সাক্ষাৎ, পড়িয়া যায়।

ত্রিবেঙ্গনাথ মিত্র

আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান-পরিষদ

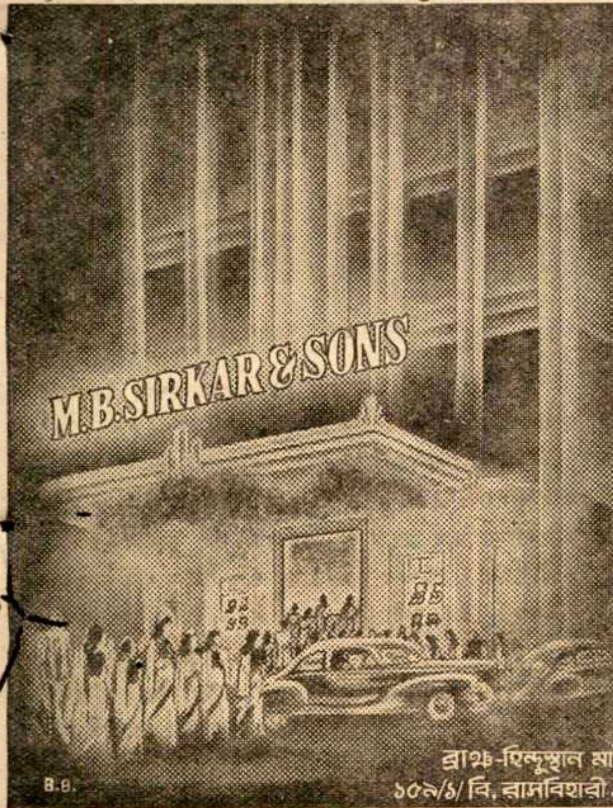
আয়ুর্বেদের প্রচার ও প্রসারকল্পে ২০ বৎসর পূর্বে
আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান-পরিষদ নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
ইহার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ ত্রিবেঙ্গনাথ মিত্র-
দার, এম-এ। এই পরিষদের বহুযুগী কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা
আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্র আবার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে
বলিয়া আশা করা যায়। বিগত ৩রা জুন পরিষদ কর্তৃক
মহা বিচরকের দুই হাজার বৎসর পুষ্টি উপলক্ষে চরক প্রশস্তি
দিবস উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতার আয়ুর্বেদ গ্রন্থের একটি
আদর্শ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেও পরিষদের আছে।
পরিষদের উদ্দেশ্যে বিগত বৎসরে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে ছয়টি
আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার বিশিষ্ট
আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।
বর্তমানে ৫২ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা, ১—এই ঠিকানার
পরিষদের কার্যালয় অবস্থিত।

গত ৩রা কাঙ্কন কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি
হলে পরিষদের বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন শুরু
হয়। অধ্যাপক ত্রিবেঙ্গনাথ বসু অধিবেশনের উদ্বোধন
করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে আয়ুর্বেদের লুপ্ত গৌরব
পুনরুদ্ধারের জন্য আয়ুর্বেদের গবেষণা এবং উহার কলাকল
প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

কবিরাজ ত্রিবেঙ্গনাথ মিত্রমণ্ডলীর্ষ অধিবেশনে সভা-
পতিত্ব করেন। সভার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা আয়ুর্বেদের
গবেষণা, গ্রন্থাগার স্থাপন ও আলোচনার মধ্য দিয়া উহার
প্রচার ও প্রসারে আয়ুর্বেদাচার্য চিকিৎসকদের আত্ম-
নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতার বলেন : আয়ুর্বেদের জীবন-
মরণের এই যুগলদ্বিকক্ষে উহার পুনরুদ্ধার করিয়া অতীত
গৌরবের উজ্জল পাদপীঠের উপর পুনঃস্থাপিত করিবার
গুরুদায়িত্ব মূলতঃ জাতীয় সরকারের উপর থাকিলেও
উহার ভবিষ্যৎ রূপ নিরূপণ করিবার দায়িত্ব সমগ্রভাবে
আয়ুর্বেদসেবীদের উপর ভর্য থাকিবে।

আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি সভার
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, আয়ুর্বেদের নীতির সহিত



আমাদের নূতন শোরুম এবং কারখানা

১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীটের
বিপরীত দিকে, আমহাট স্ট্রীট
ও বহুবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম.বি. সরকার এও সন্স

শুষ্ক ও নিষ্কলি ওলফার নির্মাতা
প্রথিত-সুবজায়ী

ব্রাহ্ম-বিক্রম ষাট বালিগঞ্জ
১০২/১/বি, বাসবিহারী এডিনউ কলিকাতা

ফোন, বি, বি, ১৭৬১
গ্রাম-ব্রিলিয়ান্ট স্ট

উহার অহুশীলন-রীতির সামঞ্জস্য বিধান, অসাধ্য রোগ নিরসন-কল্পে উহার অহুশীলন ও চিকিৎসার সংস্কার করিতে হইবে।

অধ্যাপক ত্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, কবিরাজ ত্রীহুশীলকুমার সেন, কবিরাজ ত্রীবিমলানন্দ ভট্টাচার্য প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন।

সোমবার এই-কান্ডন পরিষদের তৃতীয় ও শেষ দিবসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অতিথি ত্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আয়ুর্বেদ এই দেশের বিজ্ঞান, সেই হেতু এই দেশের পক্ষে উপযোগী ও কলপ্রদ। কবিরাজ ত্রীমণীজলাল দাসগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন, পরিষদের প্রতিষ্ঠা-সভাপতি কবিরাজ-সমাজকে একত্রিত করিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যতে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের উন্নতি ও অহুশীলনের দ্বারা আলোকসম্পাত করিয়া তাহা আয়ুর্বেদের বনিয়াদ দৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিবে। একটি গবেষণাগার স্থাপন করিবার জন্ত পরিষদকে সকলের সাহায্য করা উচিত।

ঐ দিনের সভায় কবিরাজ ত্রীমনোরঞ্জন রায়চৌধুরী ও কবিরাজ ত্রীঅমলাচরণ সেন প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবিরাজ ত্রীহেরমণাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন।

‘রবিবাসরে’ ত্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংবর্দ্ধনা

গত ১০ই চৈত্র ত্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের বাসভবনে ‘রবিবাসরে’র এক বিশেষ অধিবেশনে লক্ষপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক ত্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সপ্ততি-বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। ডক্টর ত্রীজ্ঞানাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অহুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই অহুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। রবি-বাসরের সম্পাদক ত্রীমহেন্দ্রনাথ বসু মূল অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। উপেন্দ্রনাথের প্রতি রবিবাসরের সভ্যদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অহুহাপের নিদর্শন

ছোট ক্রিমিটোডগের অব্যর্থ ঔষধ “ভেরোনা হেলমিন্‌থিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন-বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২।০ আনা।

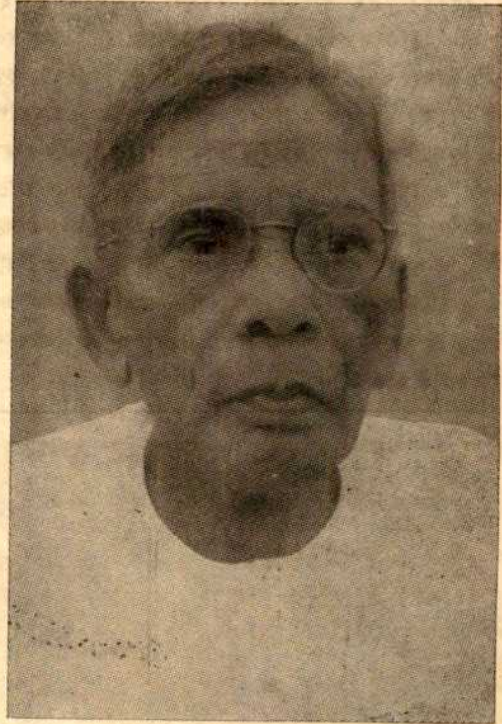
ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১।১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

কোন—সাঁউথ ৮৮১

এই বর্ষাভিত্তি অপূর্ণ কারুকার্যশোভিত এবং চিত্রিত মানপত্র-খানি ৭০টি তারকাধ্বিত সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো।

সভাপতি ডক্টর মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন—“আজ শ্রবণ চক্রে কণা মনে পড়ে। তাঁহার ভিতরে যে শক্তি ছিল তাহার ফুরণ হয় উপেন্দ্রনাথের সাহচর্যে। উপেন্দ্রনাথ যে সকল গল্প ও কাহিনী লিখিয়াছেন তাহাতে মানুষের অন্তরের ব্যথা হুটুয়া উঠিয়াছে।...সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার স্থান অতি উচৈ।



ত্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মানপত্রের উত্তরে উপেন্দ্রনাথ একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন :

“আপনাদের অভিনন্দনপত্র আমাকে বিহ্বল করেছে। আমার সংশ্লিষ্ট মনে বারবার প্রশ্ন জাগছে হুঁহু ভাবে আপনাদের কাছ থেকে যা নিলাম আমি তার যথার্থ অধিকারী কিনা। কেবলই মনে হচ্ছে, হায়, আমি যদি আপনাদের অভিনন্দনপত্রের যোগ্য হতে পারতাম। বিশ্বাস করুন, এ আমার কপট বিনয় নয়, এ আমার অন্তরের কথা। টাকা আনা পয়সার সদরপত্র ছিল আমার কারবার। সে পত্রের অধিদেবতা কমলাসনা কমলা। তাঁর কৃপাধুষ্ট যে একেবারে পাই নি তা নয় কিন্তু বেশি দিন যাতে সইল না। সেখানকার কারবার বন্ধ করে এসে জুটলাম দেবী বীণাপাণির দরবারে। এ দরবারের যা

বধাধ' বর্ণনায় তারই মানে আজ আপনারা আমাকে পুরস্কৃত করলেন, আজ আমি কৃতার্থ'। আপনারা আজ আমাকে বৃত্ত করেছেন, আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। রবীবাসর আমার সম্মুখে এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার মহিমা দিন দিন বর্ধিত হোক।"

রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বৎসরের রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কারের কল সম্ভ্রান্তি ঘোষণা করিয়াছেন। সাহিত্যে অীহৃত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুরস্কার লাভ করিলেন। ব্রজেননাথ দ্বীর্ঘকাল নিরলস ভাবে বাংলা-সাহিত্যের সেবার নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাঁহার সন্মিলিত ও সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দুই খণ্ড উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের উপর নতুন আলোকপাত করিয়াছে। এই পুস্তকখানি উক্ত বিষয়ক আলোচনা-গবেষণার সুপ্তর আনিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্রজেননাথ "বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস" এবং "বঙ্গীয় সাময়িকপত্রে"রও রচয়িতা। এ বই দুইখানি তাঁহার ঐকান্তিক ভ্যাসসঙ্ঘিনার পরিচায়ক। তিনি এক যুগ ধরিয়া মিঠার সহিত "সাহিত্য-সাধক চরিতমালার" বাংলার বহু সাহিত্য-সাধকের জীবন-কথা ও রচনা-সংক্রান্ত মালমশলা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এই চরিতমালার সংখ্যা প্রায় এক শতের কাছাকাছি। তন্মধ্যে পাঁচ-ছয়খানি ছাড়া বাকী সকল পুস্তকই ব্রজেননাথের লিখিত। দীর্ঘকালব্যাপী একমিষ্ট সাহিত্য-সাধনার দরুন তিনি যে পুরস্কারলাভ করিলেন তাহাতে সাহিত্যিক মাঝেই বিশেষ আনন্দিত হইবেন। আমরা তাঁহার শতায়ু কামনা করি।

শ্রীশচন্দ্র নন্দী

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী গত ১ই ফাল্গুন শেষরাতে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩০৪) কলিকাতায় রাজবাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ স্কুল ও কৃষ্ণনাথ কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসে উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। পিতা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আদর্শ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া শ্রীশচন্দ্র শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতেই জন্মসেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ সন হইতে একাদিক্রমে তিন বার তিনি বহরমপুর পৌরসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি কয়েক বৎসরকাল মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডেরও সভ্য ছিলেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র প্রথম বঙ্গীয় আইন-পরি-



শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৫-এ ভারতশাসন আইন প্রবর্তনের পর মিঃ এ. কে. কক্সসহ প্রথম যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তখনালিষ্ট পার্টি হইতে মহারাজা অন্ততম মন্ত্রী হিসাবে তাহাতে যোগদান করিয়া সেচ, বজা ও পুর্ন বিতাপের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালেই বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক উপারে নদী-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং তাহারই প্রাথমিক অঙ্গরূপ বাংলার নদী অঞ্চলের জমির ঢালের জরীপ করা হয়। গত বৎসর হরিণ-বাটাতে যে নদী-নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা উপরোক্ত নদী-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনারই ফল। ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। তিনি বর্তমান বিদ্যায় বিধান সভার সদস্য ছিলেন।

সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা ও ক্রীড়াঙ্গরঙ্গী ছিলেন শ্রীশচন্দ্র। মনপ্যাণি, দণ্ড্যহুহিতা, শান্তি কোন্ পথে, বজা ও তাহার প্রতিকার, বেঙ্গলস রিতার প্রবেশমস, বেঙ্গল রিতাস' এও আওয়ার ইকনমিক ওয়েলফেয়ার ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁহার সাহিত্যসেবা ও মনমশীলতার পরিচায়ক। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, নিবিল-ভারতীয় সঙ্গীত সভা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, বিশ্বভারতী, ইতিহাস সন্মান নিউজ এসোসিয়েশন ইত্যাদির আধীশ্বর সদস্য এবং ব্রিটিশ ইতিহাস এসোসিয়েশন, বেঙ্গল

অটোমোবাইল এসোসিয়েশন, বঙ্গীয় মহাজন সভা ইত্যাদির প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন।

ডাঃ পশুপতি মিত্র

গত ১৯শে চৈত্র ষাণ্মাসে চিকিৎসক ও অস্ত্রোপচার-বিশারদ ডাক্তার পশুপতি মিত্র প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। পশুপতি-বাবু ভারতের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ শারীরসংস্থানবিদ (Anatomist) রূপে বিখ্যাত ছিলেন। পশু-চিকিৎসারও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।



ডাঃ পশুপতি মিত্র

পশুপতিবাবু কলিকাতার “বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজে”র সর্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে শারীরসংস্থান বিভাগের লেকচারারী অধ্যাপক রূপে এবং ই. বি. রেলওয়ের “মেডিক্যাল অফিসার”রূপে প্রায় ষোল বৎসর কার্যে রত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই (১৯০৫-৬ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি কয়েক মাসের জন্য আলিপুর চিকিৎসাখানার সুপারিটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন। পরে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে এনাটমির শিক্ষক হিসাবে দশ বৎসর কার্য করিয়া ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকরি হইতে অবসর

গ্রহণ করেন। ইহার পরে আরও দশ বৎসর তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে এনাটমির অধ্যাপকরূপে কার্য করেন।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী

প্রসিদ্ধ কীর্তনাচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ বর্ষাকালের একটি অমূল্য রত্ন হারাইল। বাংলার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ভাণ্ডারকে মহাজন পদাবলীর সংগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ করার তিনি অত্যন্ত উদ্যোক্তা ছিলেন। ব্রজবাসী মহোদয়ের ৯২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ নিকলক, তত্ত্বমাধুর্য্যপূর্ণ জীবন বাঙালী জাতির আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বর্ষসাহকগণের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি নিজেকে যেমন আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছেন তেমনি তাঁহার অভূতনীয় তত্ত্বমাধুর্য্য দ্বারা তাহাদিগকেও জ্ঞান দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গত ১৪ই চৈত্র তাঁহার দ্বি-নবতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল, ঠিক তাঁহার পূর্বদিনেই মহাপ্রাণ ত্যাগসাধকের আকস্মিক জীবনাবসান ঘটনটিকে অধিকতর বিষাদময় কুরিয়া তুলিয়াছে। আমরা তাঁহার আত্মার উদ্দেশে প্রভাতলি অর্পণ করিতেছি এবং তাঁহার শোকাত্ত আত্মীয়স্বজনকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

একাধিক দৈনিক সংবাদপত্রে নবদ্বীপচন্দ্রের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। নবদ্বীপচন্দ্রের চরিত্রমাধুর্য্য সম্বন্ধে কোন ভুক্তের অবকাশ নাই, তাহাকে কলিকাতা সমাজে আরও সুপরিচিত করিবার কৃতিত্ব আর একজনেরও প্রাপ্য। তিনি ডাঃ হুন্দরী-মোহন দাস। তাঁহার দীনেজ খ্রীষ্টবাবুতে প্রোভে বা সন্ধ্যায় বাহারা নবদ্বীপচন্দ্রের কীর্তন শুনিয়াছেন তাঁহারা এই কথা স্বীকার করিবেন। হুন্দরীমোহনের কীর্তন ও খোলবান্দন বা নবদ্বীপচন্দ্রের কীর্তন ও খোলবান্দন, এবং উভয়ের আখর দিবার মধ্যে যেন অলক্ষ্যে একটি আধ্যাত্মিক লোকের সৃষ্টি হইত। হুন্দরীমোহন ৯৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জীবনের খুঁটিমাটি ব্যাপারও একটি “দিনপঞ্জী”তে স্থান পাইয়াছে। সে দিনপঞ্জী প্রকাশিত হইলে অনেক তথ্য আমরা পাইতাম। তাহা এখনও হয় নাই। হুন্দরীমোহনের “দিনপঞ্জী” হইতে নবদ্বীপচন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিতাম। নবদ্বীপচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু লিখিবার আছে।



নিভৃতি
শ্রী. ডি. গোবিন্দরাজ

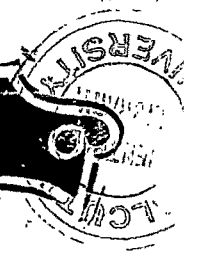
অবনী প্রেস, কলিকাতা



ব্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(তেহেরাণ, ২৪শে বৈশাখ ১৩৩৯)

৩

একাদশ



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

মায়মাক্ষা বলহীনেন লভ্যঃ”

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতের ভবিষ্যৎ

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে “তাবী ঘটনার ছায়া পূর্বোক্তেই পড়ে”। সেই ছায়াপাত আরম্ভ হইয়াছে।

১৩ই মে, ময়াদিল্লী, হইতে শবর আল রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র-প্রদান একশ জন মন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। এই মন্ত্রিসভায় আছেন পনের জন পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রী, চারি জন মন্ত্রী এবং দুই জন সহকারী মন্ত্রী। রাষ্ট্রপতিভবন হইতে এক ইত্তাহারে এই ঘোষণা করা হইয়াছে :

প্রধানমন্ত্রীকে লইয়া মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। পূর্বের মন্ত্রিসভার নয় জন এবং নূতন ছয় জনকে লইয়া বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। শ্রী সি. সি. বিখাস পূর্বতন মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘুদলের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাকে পূর্ণ মর্যাদা-সম্পন্ন মন্ত্রিরূপে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইয়াছে।

মন্ত্রিসভার বাহাদুর নূতন লওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের নাম হইতেছে—মিয়া রকি আহমদ কিদওয়াই, শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, সর্দার শরণ সিং, শ্রী তি. ভি. গিরি এবং শ্রী কে. সি. রেড্ডী।

মন্ত্রী হিসাবে অতঃ বাহাদুরের নাম ঘোষিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে সর্দার শরণ সিং এবং শ্রী কে. সি. রেড্ডী সংসদের নির্বাচিত সদস্য নহেন।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ও তাঁহাদের দপ্তর :

পণ্ডিত জব্বাহরলাল নেহেরু—প্রমুখ।

মোজানা আবুল কালাম আজাদ—শিক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

শ্রীমদসিংহ গোপালস্বামী আয়েদার—প্রতিরক্ষা।

রাজকুমারী অম্বাভকুমারী—স্বাস্থ্য।

ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজ—বরাষ্ট্র এবং রাজ্য।

শ্রীযুক্তি আহমদ কিদওয়াই—বাণিজ্য এবং কৃষি।

শ্রীচিন্তামন দারকানাথ দেশমুখ—অর্থ।

শ্রীকৃষ্ণকীবন রাম—যোগাযোগ।

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ—জাতীয় পরিকল্পনা এবং নদী উপত্যকা পরিকল্পনা।

শ্রীভিক্রমভাবুর ষাণ্ডাই কৃষ্ণমাচারী—বাণিজ্য ও শিল্প।

শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস—আইন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সংরক্ষণ।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী—রেলওয়ে ও যানবাহন।

সর্দার শরণ সিং—পুর্ন, গৃহ ও সরবরাহ।

শ্রীবরাহগিরি বেহেরা—শ্রম।

শ্রীকিশোরী চন্দলসারা রেড্ডী—উৎপাদন।

পূর্ণ-মর্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী (কিছু মন্ত্রিসভার সদস্য নহেন)।

শ্রীঅমিতপ্রসাদ জৈন—পুর্নবসতি।

শ্রীমদ্যনারায়ণ সিংহ—সংসদ সংরক্ষণ।

শ্রীমহাবীর ভ্যাগী—অর্থ-দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী।

ডাঃ বালকৃষ্ণ বিষ্ণুনাথ কেশকর—তথ্য ও বেতার।

সহকারী মন্ত্রী—শ্রীমদজ্যেষ্ঠ পরশুরাম কারমারকার।

শ্রীমদরেন্দ্্রনাথ বড়গোহাইন।

আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তাহাতে বলা চলে যে, এই যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইল উহা সাড়ে পনেরো আনা নেহেরু-মন্ত্রিসভা—অর্থাৎ এই যে পঁচিশ জন মহাশয় ব্যক্তি আমাদের এ অভাগা দেশের মন্ত্রিসভা অলঙ্কৃত করিলেন, বাহাদুরের হস্তে দেশের ও দেশের ভাগ্য আগামী পাঁচ বৎসরের মত ‘করুণলগ্ন’ আমলকবৎ প্রদত্ত হইল। ইঁহারা প্রায় সকলেই নেহেরুরূপী জব্বাহরলালের আরাধনার ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ‘হুঁচকার’ প্যাটেলের অমুগামী কেহই নাই, সাক্ষী বিজয়নগর তো বহু পূর্বেই হইয়াছে। মন্ত্রিসভার হিসাবে খোল আনার স্থলে দুই পরলা কম বরা হইয়াছে। শ্রীবরাহগিরি বেহেরা গিরির দক্ষম। ইনি দ্বিগুণ বৎসর যাবৎ গ্রন্থিক আন্দোলনে আছেন।

এবং প্রকৃতপক্ষে মেহেরু-চরণাশ্রিত নহেন। মিঞা রকি আহমেদ কিদওয়াই নুতনও বটেন, পুরাতনও বটেন। ইনি গোসা করিয়া মজিসভায় ইত্তিকা দিরাহিলেন, তার পর সাত খাটের জল চাষিয়া ও ঘোলা করিয়া শেষে বড়ের চালে দাবা বনিয়াছেন।

তাহার পর মজিসভায় গুণ কীর্তনের পালা। কোথায় আজ রায় গুণাকর, কোথায় বা 'গৌড়ানন্দ কবি', সুত্তরাং কে ভণিবে আজ এই মন বিক্রমাদিত্যের প্রাচীন মনরত্নের ও অকীর্তন যত্নের মহিমা? তবে কবির ভাষায় জুফান রতনের খোঁজে "উড়াইয়া দেখে ছাই, যদি তার মধ্যে পাই" সে সন্ধান। দেশের অবস্থা ঘেরাপ হইয়া চলিতেছে তাহাতে ছাইয়ের অস্তাব দেশে ঘটবে না, বরঞ্চ সোনার লক্ষ্যর মত সোনার ভারত দিগন্ত প্রসারিত ভূমতুপে পরিণত হওয়ার লক্ষণ ক্রমেই দেখা দিতেছে, সেইজন্ত রাষ্ট্রপতিজ্ঞে আমরা অভিসম্মিত করিতেছি সমগ্রমত এই পঞ্চদশ মহারত্ন ও স্বত-উপরত্ন আহরণ করার জন্ত।

পণ্ডিত মেহেরুর বিষয় আর কি লিখিব? দেশের এই নিদারুণ ছববস্থা দৃষ্টেও যাহার চৈতন্য হয় না তাহার চিকিৎসা ব্যবহারীয়ও অতীত। নির্বাচনের পূর্বেই যে সকল প্রতিশ্রুতি তাহার মুখে দেশবাসী শুনিরাহিল এবং যে ভোকবাক্যে তাহার তুলিয়াহিল—সে সকলের পুনরাবুত্তি এখানে অবান্তর। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের মনে কণি আশা ছিল যে, হয়ত সেই ছলনার অল্পমাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত মজিসভা গঠনে দেখিতে পাইব। এখন দেখিতেছি তাও ছিল ভুল ধারণা। পাকীজীর মহাপ্রয়াণের পর পাঁচ বৎসরও না যাইতে যে পণ্ডিত মেহেরুর একপ পদবিবর্তন ঘটবে তাহা আমাদের হৃৎকেন্দ্রেও অতীত ছিল।

মার্কিনদেশে প্রবাদ আছে, "প্রতি মিনিটে একজন নির্কোষ জন্মার।" আমাদের দেশে প্রতি মিনিটে উনষাট জন নির্কোষ এবং একজন চাটুকার বা খল জন্মার। প্রতি মিনিটে একজনও যদি স্থিরবুদ্ধি জন্মাইত—এমন কি প্রতি ঘণ্টার বা প্রতি দিনে একজন—তাহা হইলেও ঐ চাটুকারদিগের একপ জন্ম সার্থক হওয়া সম্ভব হইত না। সে-যাহাই হউক, এখন বুঝা আক্ষেপে সময় নষ্ট করার সাক্ষ্য নাই। আমাদের এখন বুঝিতে হইবে পর, নিজের পরিজ্ঞানের এবং ভবিষ্যকালের সন্তান-সন্ততির পরিজ্ঞানের ও কল্যাণের।

পার্লামেন্টে প্রবল বিপক্ষ দল গঠনের সম্ভাবনাও গিয়াছে। যদি-বিরোধী দলের মধ্যে যুক্তিমের দৃঢ়চিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ-লোভ-ব্যক্তিভেদ; যদি তাহাদের চিত্ত-প্রকৃতই স্বাধীন ও স্বাধশূন্য হইত; যদি নেতৃত্বের কাম্য গুণবান তাহাদের মস্তিষ্কে ও মর্মে বিদ্যাজ্জ্বলিত, তবে সংখ্যালঘু হইলেও তাহারা পণ্ডিত মেহেরু ও তাহার এই অপকৃপ মন্ত্রণাসভাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারি-

ভেন। কিন্তু তাহারও কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। সুত্তরাং আমাদের পথ বুঝিতে হইবে সংসদ-পরিষদ ইত্যাদির বাহিরে; পথের লোকের মাঝে।

এই ত গেল পার্লামেন্টের কথা। এখন দিল্লীর লাজুর প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ধরের হেঁসেলে যে "আকে পিঠে চাক পিঠে ও বাক পিঠে" প্রস্তত হইয়াছে তাহার প্রসঙ্গ ধরি। এখানে তো মজিসভার বিষয়ে না রাম না গদা কিছুই শুনা যায় না। যে তিন চারি জনের কথা লোকমুখে শুনিতেছি তাহা অদ্ভুত, তবে ত্রিবিধানচক্র রায়ের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নহে। কলিকাতা কর্পোরেশনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বহু পূর্বেই ঘটয়াছে তাহার পুনরতিনয় অসম্ভব কিছুই নহে। তবে আশ্বাসের কথা এইটুকু যে, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসে গৃহবিবাদ চলিতেছে। তাহার নিদর্শন বেশ কিছু পাওয়া যাইতেছে।

নিয়ের মন্তব্য "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ২২শে বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। কুরুকুল ধ্বংস হইলেও পাণ্ডবকুল আরামে ছিলেন না। 'বর্ষারাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হইলেও বৈদ্য দিম টিকে নাই।

আমাদের এই নুতন ইলপ্রস্থের বর্ষারাজ্যের কলির বর্ষপুজ যুক্তির ভ একাধিকবার "ইতি নজ" করিয়াছেন। সুত্তরাং নরকদর্শন নিশ্চিত। তবে ভয় হয় হয়ত সে মরক এই ভারতেরই পরিণাম এবং হয়ত আমাদেরও তাহা ভুগিতে হইবে। সে যাহা হউক মন্তব্য এইরূপ :

"পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের কর্তাদের কার্য ও কীর্তি সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রযুক্তি আর আমাদের নাই। আপন গোষ্ঠির স্বার্থে গলবদ্ধরজ্জু জীবটির ন্যায় যাহারা খোলা চোখে মানে সন্ধান কংগ্রেস ফেলটিতে নিত্য আবর্তিত হইয়া চলিয়াছেন, তাহাদিগকে কিছু বলার কোন অর্থ আছে কি? বরং তাহাদের নিকট দেশবাসীকেই 'ত্রিভুজবান উবাচ' মার্কি উচ্চাদের ভৃত্ত ও বাক্যাবলী নিত্য শ্রবণ করিতে হইবে। বাক্যের তাহাদের অনটন নাই, যুক্তিরও তাহাদের অভাব হইবে না এবং অর্থবল সম্বন্ধে ইজিত না করাই শোভন। যাহা তাহাদের নাই, তাহা হইল—চরিত্র। এই কথাটাই হই সপ্তাহ পূর্বে একান্তিক আবেদন লইয়া জানাইয়াছিলাম, 'তাহারা নিজেরা একটু মায়া হউন।' ইহা কি আমাদের দান্তিকতা বা বৈদ্যদবী? আমরা তাহা মনে করি না। এমন উপদেশ দিবার অধিকা কি আমাদের আরো নাই? নিশ্চয় আছে এবং পূর্ণ অধিকার আমাদের রহিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া অগণিত বীরের প্রাণদানে, লক্ষ লক্ষ মরণার্থীর ত্যাগ ও সেবার এবং জাতি ও অজাতি সংখ্যাভিত সাধকের সাধনার ভিলে ভিলে ভারতের বিরাট ও মহান কংগ্রেস জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ, ভারতের কংগ্রেস ভারতের সর্বসাধারণের জাতীয় সম্পত্তি। বীরের প্রাণদান, কর্মীর কর্মপ্রচেষ্টা এবং সাধকের সিজির পুঞ্জী-

ভূত রূপ এই কংগ্রেস, তাহার উত্তরাধিকার আজ কোথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং ন্যস্ত হইয়াছে? যদি ক্রুদ্ধ অভিযাপ লইয়া আমরা এখন উচ্চারণ করি যে, যজ্ঞের পবিত্র হবি আজ লেহন করিতেছে সারমেয়ের দল তাহাও অমার্জনীয় অপরাধ ও অন্যায় উক্তি বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। কংগ্রেসের বন্না হতে তুলিয়া লইয়া পণ্ডিত নেহেরু সেদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন—কংগ্রেস সমগ্র জাতির সর্বসাধারণের সাধনার সিদ্ধি, সম্পত্তি ও শক্তি; ইহাকে কাহারও বা কোন গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইতে দেওয়া চলে না। কিন্তু তাহাই হইতে দেওয়া হইয়াছে, অন্ততঃ এই পশ্চিমবঙ্গে; কাজেই আমাদের দুঃখ এবং অভিযাপও অভিশ্রব স্বাভাবিক ও সমত।”

পূর্ব সম্পাদকীয় আমরা দিলাম না, কেননা সারাংশ এইরূপ যাত্রা। তবে একথাও বলি যে, এই সকল কথা সময়মত যদি লেখা হইত তবে অঙ্গযোগ অভিযোগ আক্ষেপাদির কারণ হয়ত এতটা থাকিত না। এই সকল কথা লিখবার উপযুক্ত সময় ছিল নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের মধ্যে। তখন সে কাজ করা হয় নাই—আমরা কেহই করি নাই; সুতরাং সে ক্রটি-বিচ্যুতির ফল আমাদের উপর বর্তিবেই। সেইজন্য এখন এই সব লেখা গণতন্ত্রী-কলহের পর্যায়ে পড়িতেছে।

এই স্মরণীয় ছদ্মরাগীর কৌদলের বিষয়ে আমাদের কোমল বিশেষ আগ্রহ নাই, উৎসাহও নাই। সে কৌদলের অন্তই হইবে না, কেননা কংগ্রেস এখন ভূতাবিষ্ট এবং রাষ্ট্র-নীতির ওকা যে সংবাদপত্র তাহাদের “সরিয়া”ও ভুতগ্রস্ত।

যদি তাহা না হইত তবে দেশের রাজনীতি এরূপ বিকার-গ্রস্ত হইল কি করিয়া? একদিকে দেখা গেল দেশের প্রতি-মিষি নির্বাচিত হইল শতকরা ৬২ জন সেইরূপ লোক যাহাদের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ আজ, “যজ্ঞের পবিত্র হবি-লেহন-কারী সারমেয়” আখ্যা দিতেছেন।

আবার একদিকে দেখি অপরিণতযুগ্মিক অর্ধাচীনদের দল দেশের লোকের হাতে শতকরা ১২।১৪ জনকে পার করিল যাহাদের শির বিদেশীর ধ্বজার নীচে অবনত। বাকী অনেকে ভোটনদী পার হইলেন কেহ বা যুগ্মিত কুংসার জোরে, কেহ বা জাতিগত কুসংস্কারের প্রবাহে। বাস্তবিকই রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে আমরা অতি শিশু, নহিলে কি দক্ষিণহস্তে প্রবাহন করি মেকিটাদকে এবং বাম হস্তে উমিটাদকে? আমরা গৌড়বাসী প্রকৃতই বুদ্ধিমান জাতি। যেরে বসিয়া সর্বস্ব-খাটি সোনার চৌদ্ধ আনা খাদনির্ণয়ে আমরা সিদ্ধহস্ত পৃথক হাটে বেয়াতির ব্যাপারে আমরাই আমি বেকি টাকার খলি ডরিয়া। এমন কোন উঁচু মাথা আছে যাহাকে লজ্য করিয়া আমরা কর্দমনিক্ষেপ না করি। আবার এমন কোন ভাগ্যাবধেয়ী চতুরব্যাক্যবানিশ আছে যে চাটুবাড়্যে বা গোক-বাড়্যে আমাদের গলাইতে না পারিয়াছে?

আজ আমরা এই কাণ্ডজানহীন আত্মপ্রতারণা ও তাব-প্রবণতার ফলে কোথায় দাঁড়াইয়া আছি সেটা কি কাহারও জানিতে বাকী? তবে এখনও প্রতিকারের চেষ্টা হইতেছে না কেন? বাঙালী কি শক্তিহীন জীব বা বুদ্ধিহীন উত্তোগ-বর্জিত জরদগব?

আজ বাঙালী অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র। বাংলার পথে-ঘাটে ভিন্নপ্রদেশীদের আধিপত্যই সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে বাংলার ঘেরে ঘুরে ঘের কবলে ধরিয়া হইয়া ভিন্ন প্রদেশে নীতা হয়। বাংলার বিচারকের আদেশ তুচ্ছ করিয়া অতঃপ্রদেশস্থ বিচারক সে ঘেরের উদ্ধারে বাধা দেয়। প্রতিকার নাই। কর্মক্ষেত্রে বাঙালীর স্বার্থ—যাহা তাহার জন্মগত অধিকার—অবহেলার সহিত উপেক্ষিত হয়, যেমন দেখিলাম আমরা যেলের পুনর্বিচ্চাসে।

অথচ এমন একদিন ছিল—সুদূর অতীতে নয়, নিকট অতীতে—যখন এদেশ বারংবার দীক্ষা পাইয়াছে, অগ্নিমন্ত্রে, এবং শত সহস্র বাংলার সম্ভান আত্মাহুতি দিয়াছে সে পৌরুষ ও স্বাতন্ত্র্যের ছোমামজে। আজ কি সে সকল আলতিই বুধা যাইবে যুগ্মিমের প্রভারকের প্ররোচনার?

ছাড়পত্র

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতের জন্য পাকিস্তান সরকার ছাড়পত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উত্তর ডোমিনিয়নের সম্পর্কে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

কয়েক মাস পূর্বে উত্তর বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী স্মেলনে লোক যাতায়াত লইয়া আলোচনার সময় পাকিস্তানের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী পশ্চিমবঙ্গের জনৈক পদস্থ ব্যক্তির নিকট কথা-প্রসঙ্গে প্রকাশ করেন যে, পাকিস্তান সরকার অতি শীঘ্র উত্তর দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ছাড়পত্র ব্যবহার প্রচলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। যথাসময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ বিষয় জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ গবর্নমেন্ট প্রথমে অবস্থান করিলেও শেষ পর্যন্ত ভারত-সরকারকে এ বিষয় অবগত করান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্যাপারে ভারত গবর্নমেন্ট যেরূপ নিরীকতার ও অজুত মনোভাবের পরিচয় পূর্বাপর দিয়া আসিতেছেন এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না, যিথ্যা গুজব বলিয়া প্রথমতঃ ব্যাপারটিকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্বন্ধাতিশয়ে ভারত-সরকার কিছুটা সচেতন হন এবং সংবাদের সভ্যতা নির্ধারণের জন্য পাক-পররাষ্ট্র দপ্তরকে এক লিপি পাঠান।

পাকিস্তান সরকার প্রায় ছয় সপ্তাহকাল একেবারে নিভৃত থাকিয়া গত ১ই এপ্রিল এক পত্রযোগে ভারত-সরকারকে জানান যে, পাকিস্তান সরকার উত্তর ডোমিনিয়নের মধ্যে ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সত্তর ছাড়পত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে

যাতায়াত ব্যাপারেও প্রযুক্ত হইবে, কারণ-স্বরূপ বলা হয় যে, পাকিস্তান সরকার কিছুকাল ধাবৎ অসুস্থ করিতেছেন যে ভারত ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে গমনাগমনের জট বর্ধমানে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, উহা সন্তোষজনক নহে। উহা দ্বারা যাতায়াতের সুবিধা না হইয়া নানাপ্রকার বিঘ্নেরই স্রষ্টা হয়। সুতরাং উহার পরিবর্তে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে।

প্রত্যুত্তরে ভারত-সরকার পাকিস্তান গবর্ণমেন্টকে জানান যে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে পাকিস্তান সরকার যেন স্থানীয় অবস্থা ও অজ্ঞাত বিষয় ভাল-ভাবে-বিবেচনা করেন, কারণ ভারত ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে লোক চলাচল কম বলিয়া অল্পমতি পাত্র ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে। কিন্তু পূর্বে পাকিস্তান ও ভুৎসংলগ্ন ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে লোক চলাচল খুব বেগী বলিয়া সেখানে গমনাগমনের অবাধ ব্যবস্থা আছে।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবাধ ভ্রমণ গত ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে ভারত ও পাকিস্তান প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই বিধানের অতির্ভূত ও প্রয়োগ উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ও নিরাপত্তার ভাব পুষ্টিপ্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছে। হাজার হাজার লোক দৈনিক এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে। তদুপরি পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অজ্ঞাত সম্পর্ক এত নিবিড় যে, গমনাগমনের উপর কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপিত হইলে উহার ফল উভয় দেশের অবিবাসীরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পক্ষে অনিষ্টকর হইবে।

কিন্তু হুংগের বিষয় ভারত-সরকারের এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। পাকিস্তান সরকার ছাড়পত্রের ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত পুনরায় ব্যক্ত করিয়াছেন। পাক-সরকারের মতে বর্ধমান সিদ্ধান্তে ১৯৫০ সালের চুক্তির কোন সর্ব লঙ্ঘন করা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও পূর্ববঙ্গে অসুস্থিত সাম্প্রদায়িক হাদ্যমার ফলে উদ্ভূত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জটাই এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। হাদ্যমার জট বাহারা দেশভাগ করিয়াছিল তাহাদের গতিবিধির স্বাধীনতা ও পথে তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাই এই চুক্তিতে ছিল। যে কারণে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহা আর নাই। সংখ্যালঘুদের পূর্ববঙ্গ ভাগ বন্ধ হইয়াছে। দেশভাগীদের মধ্যে অমেকে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। সুতরাং ১৯৫০ সালের চুক্তি কোন প্রকারেই ভঙ্গ করা হয় নাই। তবে তাহারা একথা জানাইয়াছে যে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন ব্যবস্থা গ্রহণও হিঁদ হয় নাই এবং সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে

তাহারা উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সম্মিলিত আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। আগামী ১৫ই মে সম্মেলনের দিন বার্ষ্য হইয়াছে।

পক্ষান্তরে ভারত-সরকার বোষণা করিয়াছেন যে, বর্ধমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হইয়া তাহাদের সীমান্তদেশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

শোন। যার তিন প্রকারে এই পাসপোর্ট ব্যবস্থা বহাল হইবে। প্রথমতঃ প্রকৃত পাসপোর্ট যেমন আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। ইহা পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে দেওয়া হইবে এবং ইহার জট visa দরকার হইবে। দ্বিতীয়তঃ এক রাষ্ট্রের অংশ হইতে অপর রাষ্ট্রের অংশে যাতায়াতের জট অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম ইত্যাদির মধ্যে চলাচল যেমন পশ্চিম-পঞ্জাব ও পূর্ব-পঞ্জাবের মধ্যে আছে। ইহা স্থানীয় প্রাদেশিক সরকার করিতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ এক জেলা হইতে অন্য জেলার যাতায়াতের জন্য একরূপ ব্যবস্থা হইবে। ইহার জন্যও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিবেন, কারণ অসংখ্য ব্যবসায়ী সবুজী, হুগ, মাছ ইত্যাদি কাঁচামাল লইয়া দৈনিক অপর ডোমিনিয়নের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করে। ইহা যাহাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য একরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু এই ছাড়পত্র কেবলমাত্র যে অঞ্চলের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে দেওয়া হইবে তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যে যাতায়াতের জন্য প্রাপ্ত ছাড়পত্র লইয়া পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ বা পশ্চিম পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চলাচল করা নিষিদ্ধ থাকিবে। সেরূপ থলনা ও বনগাঁও এর মধ্যে প্রচলিত ছাড়পত্র লইয়া রাজসাহী ও পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্যে যাতায়াত চলিবে না। প্রতিবার যাতায়াতের জন্য পৃথকভাবে ছাড়পত্র দেওয়া হইবে, ইহাতে কত লোক উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে যাতায়াত করে তাহারও সঠিক হিগাব পাওয়া যাইবে।

উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে বর্ধমানে যে অবস্থা চলিতেছে তাহাতে পাকিস্তান সরকার ভারত-সরকারের সহিত কোন প্রকার আলোচনা না করিয়া হঠাৎ কেন যে একরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন তাহা একান্তই হুর্কোব্য। তবে দেশবিভাগ স্বীকার করিয়া লওয়ার সময় একথা অরণ রাখা উচিত ছিল যে, এ পরিস্থিতির একদিন উদ্ভব হইবেই। কোন রাষ্ট্র অনির্দিষ্টকালের জন্য তাহার সীমান্ত প্রদেশ অরক্ষিত অবস্থা কেলিয়া রাখিতে পারে না। তাহাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূন ডাকাতি করিয়া হুংগের ভারত ডোমিনিয়নে আশ্রয় লইলে পাকিস্তান সরকার তাহাকে শান্তি দিবার কোন সহজ উপায় নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও সীমান্ত রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। সে কারণে অব্যাহত লোককে দেশের

অত্যন্ত প্রবেশাধিকার না দেওয়া যাইতে পারে। পাকিস্তান সরকার যদি এই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া পাসপোর্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তবে অবশ্য তাহাকে দোষ দিবার কিছুই নাই। আশ্রয়কার প্রচেষ্টা প্রত্যেকের পক্ষেই স্বাভাবিক। প্রতিবেশী ভারত ডোমিনিয়ন তাহার সীমান্ত অরক্ষিত অবস্থায় রাখিবারে বলিয়া যে তাহারও যে তাহাদের সীমান্ত অসুরূপ রাখিবে ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ভারত নির্যাসের ন্যায় কাজ করিলে পাকিস্তানকেও করিতে হইবে ইহা আশা করা যুক্ত। পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু ইহাতে অসুবিধা হইবে। তাহার উত্তর ডোমিনিয়নেই কাজকর্ম ব্যবসাদি চালাইয়া নিজেদের কার্য সিদ্ধি করিতেছিল। ইহারাই বর্তমান ব্যবস্থা গৃহীত হইলে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। কিন্তু ভারত-সরকারকে একথা পূর্ববঙ্গের বাস্তবাসীদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল যে, এক দিন তাহাদের নিকট এ সমস্তা উপস্থিত হইবে যেদিন তাহাদের এই উত্তরের মধ্যে এক রাষ্ট্রকে আপনাদের দেশ বলিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে। দুই দেশে এককালীন রাষ্ট্রাধিকার ভোগ করা যায় না; পাকিস্তান সরকার পাসপোর্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহাদের সম্মুখে সেই সমস্তাই দেখা দিবে। সুতরাং এমিক হইতে ব্যাপারটির একটি চরম বোঝাপড়া হইয়া যাওয়া উত্তর ডোমিনিয়নের পক্ষেই মঙ্গলের।

কিন্তু ছাড়পত্রের পক্ষেও পরোক্ষ কারণ ইহা হইলেও বর্তমানে পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন প্রত্যক্ষ কারণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। পাকিস্তান সরকার বারম্বার একথাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন যে, ভাষা আন্দোলনের পক্ষে হিন্দুদের ও পশ্চিমবঙ্গের প্ররোচনা আছে, যদিচ পূর্ব-পাকিস্তানের একাধিক নেতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনে হিন্দুদের কোন স্বার্থ থাকিলেও তাহাদের উচ্চাশ্রিতে প্ররোচিত হইবার পাত্র তাহারা নহেন, এবং বস্তুতঃ পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত ভালভাবেই তাহা জানেন। উহ পূর্ববঙ্গবাসীদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া তাহারা যে অন্যায় করিয়াছেন, হিন্দু ও পশ্চিমবঙ্গের উপর ঘোষারোপ করিয়া তাহারা সেটা চাপিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে মন্তব্য নিম্নরোজন।

পূর্ববঙ্গ সরকার গত হাদ্দামার পর বুঝিয়াছেন—বিশেষতঃ যখন পাকিস্তান গবর্নমেন্ট পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ সরকার দারিদ্র্য তাহারা লইবেন না—পূর্ব অল্পশ্রীত পন্থায় হিন্দু বিভাজন করা আর সম্ভব হইবে না। তাহার পরিণাম এত বিষমর যে তাহাকে সামলাইতে পাকিস্তানকে নাজেহাল হইতে হয়। এই কারণেই তাহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিতেছে। তাহারা নিশ্চিত যে ভারত-সরকার এমন কোন

ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না যাহাতে মুসলমানদের প্রধানকার বাস চিরন্তন ভুলিতে হয়। তাহারো এখানে নাগরিক অধিকার ভোগ করিবে এবং অনেক সেই সঙ্গে পাকিস্তানেও সেই অধিকার পাইবে তাহাতে কোন সমস্যা নাই। কিন্তু হিন্দুরা কেবল একই রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার পাইবে, এবং তাহা কোন রাষ্ট্রের হইবে তাহা এই ছাড়পত্র ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হইবে। ইহাতে অনেক হিন্দু রাষ্ট্রহীন হইবে।

স্বতন্ত্র দার্জিলিং রাষ্ট্র

‘গ্রেটসম্যান’র কাল্পন্যস্থিত নিম্ন স্বতন্ত্র সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর দার্জিলিং ও সিকিম অঞ্চল পরিভ্রমণ কালে নিম্নলিখিত ভারত গুর্খালীগের প্রতিনিধিগণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গুর্খালীগের সভাপতি মিঃ গুরাং বলেন যে পণ্ডিতজীর দার্জিলিং অবস্থানকালে লীগ-তাহার নিকট চার পৃষ্ঠাব্যাখী এক স্মারকলিপি পেশ করে। তাহাতে গুর্খা দল দাবী করে যে, দার্জিলিংকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাসন ক্ষেত্ররূপে গঠন করা হউক। দার্জিলিং ও ডুয়াঙ্গ লইয়া গঠিত এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র আসামের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। কারণ পার্শ্ববর্তী জনসংসারণ কখনই বাংলার সহিত থাকিতে ইচ্ছুক নহে। বাংলার সহিত তাহাদের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। মিঃ গুরাং বলেন যে, গুর্খাদের এই দাবী অত্যন্ত ভাঙ্গসদৃশ এবং ইহা কোন প্রকার স্বার্থবুদ্ধি বা স্বাতন্ত্র্যবোধ হইতে উদ্ভূত নহে। ইহার দ্বারা পার্শ্ববর্তী অধিবাসিগণ শাসন কার্যে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিবার অধিকারই দাবী করিয়াছে।

প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, গুর্খালীগের এই দাবী বাস্তবে প্রবর্তন করিতে নানা প্রকার অসুবিধা আছে, বিশেষতঃ ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক্ষণে পুনর্গঠন সম্ভব নহে। তবে স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে গুর্খাদের যে সকল অসন্তোষের কারণ আছে তাহা অচিরে দূর করার প্রতিশ্রুতি তিনি তাহাদের দিয়াছেন।

গুর্খালীগের এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চীন, বিশেষতঃ তিব্বতে সাম্প্রতিক ঘটনার পরিবেশে ভারতের উত্তর সীমান্ত রূপে দার্জিলিং ও সিকিম জেলার গুরুত্ব যথেষ্ট। সুতরাং সামরিক প্রয়োজনে দার্জিলিংয়ের অধিবাসীদের দারিদ্র্য অত্যন্ত প্রবল, এ অবস্থায় গুর্খালীগের এই মনোভাব বিশেষ আশা প্রদ নহে, দার্জিলিংকে বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে গুর্খালীগের বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না, এমন কি যে দার্জিলিং ও ডুয়াঙ্গ লইয়া তাহাদের এত আকাঙ্ক্ষা তাহাকে গুর্খাদল ভিত্তার বড়া ও

বর্ষার ভাঙ্গন ইত্যাদির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। দার্জিলিং শহর বাঙালীর অর্ধে ও পরিশ্রমেই গড়িয়া উঠিয়াছে যদিও তাহার লাভ অল্প প্রদেশবাসী ভোগ করিতেছে। অল্পদিন পূর্বে বর্ষার ধ্বংস ও ভাঙ্গনে যখন দার্জিলিং শহরের শ্রেষ্ঠ স্থানসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল তখন বাংলা সরকারই দ্রুত তাহার পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। বাংলার গবর্নর ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু তখন সেখানে ছিলেন এবং মন্ত্রী জীতুপতি মজুমদার প্রাণ হাতে করিয়া সেখানে গিয়াছিলেন। তাহার ভাৱতের বিভিন্ন স্থান হইতে ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি-বিদদের আনয়ন করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে দার্জিলিঙের সংস্কার সাধন করেন। এ সকল কথা ঐতিহাসিক নহে বলিয়া দার্জিলিঙের অধিবাসিগণ এত শীঘ্র তাহা ভুলিবে না—ভুলিতে পারে গুণীগণ যাহারা শুধাকার স্থানী অধিবাসী নহে; গুণীগণ পার্শ্ববর্তী নেপাল রাজ্যের অধিবাসী। দার্জিলিঙে তাহার বসবাস করিতেছে যেমন বাঙালী করে, বিহারীরা করে, আসামীরা করে, এখানকার আদিম অধিবাসী লেপচাগণ। দার্জিলিঙে বসবাস করে বলিয়াই দার্জিলিঙের ভাগ্যনিঃস্তা গুণীরা নহে। তাহার মোট জনসংখ্যার একটি সান্নাধ্য অংশমাত্র। দার্জিলিং অঞ্চলের চা-বাগানের মালিকদের বরাবর বাঙালীদের প্রতি একটী বিদ্বেষ ছিল। কারণ বাঙালীর জন্যই চা-বাগানের কুলীদের তাহার নির্ধাতিত করিতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং বাঙালীর বিরুদ্ধে স্থানীয় আদিবাসীদের উক্কাইয়া দিতে তাহার বরাবর চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহাদের প্ররোচনাতেই এই সকল অশিক্ষিত যুষ্টিমের লোক সময় সময় আন্দোলন করিয়াছে। তবে গুণী-লীগের বর্তমান দাবীর পক্ষাতে তাহাদের কোন প্ররোচনা নাই বলিয়াই মনে হয়, গুণীগণ বাঙালীদের জন্যই লেপচা প্রভৃতি অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণের উপর আধিপত্য করিতে পারিতেছে না, সে কারণে এ প্রতিবন্ধক অপসারণ করা তাহাদের দরকার। এইজন্যই এই উদ্ভট পরিস্থিতি তাহাদের মস্তিষ্কে দানা বাঁধিয়াছে।

ভূতিক্ষ না খাড়াভাব

খাড়া-পরিস্থিতি বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে তাহাতে ইহাকে ভূতিক্ষ ছাড়া আর কিছুই আখ্যা দেওয়া যায় না। যত দিন পর্যন্ত খাড়াভাব কেবলমাত্র দুইটি রাজ্যের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল তত দিন বিষয়টি তত ভয়াবহ ছিল না; কিন্তু অবস্থা ইদানীং যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে দেশব্যাপী এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশের সকল অঞ্চল হইতেই খাড়াভাব, খাড়াভুল্য বৃদ্ধির দরুন জনসাধারণের দুর্দশার সংবাদ আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গেও ইহার সুস্পষ্ট পূর্বাভাব আঘরা লক্ষ্য করিতেছি। প্রায় সকল

জেলা হইতেই চাউলের অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধির সংবাদ আসিতেছে। বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাউলের ব্যাপক মূল্য-বৃদ্ধিতে জনসাধারণের এক ক্ষুদ্রাংশকে ইতিমধ্যেই অর্ধাশনে দিন যাপন করিতে হইতেছে। ২৪ পরগণা জেলার এক সময় “বাংলার শস্যভাণ্ডার” বলিয়া অভিহিত সন্দরবন অঞ্চলের কতিপয় ইউনিয়নে খাদ্যদ্রব্য বর্তমানে চরম ভাবে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ২৪ পরগণার সন্দেশবালি, হাসনাবাদ ও হাটোয়া খানাব্যাগী এই ময়ূরময় পদধামি দ্রুত হইয়াছে—বৎসরাদিক কাল পূর্বেই বিপদের আভাস ছিল, ইতিমধ্যে ছিল এবং সে সময়ে কর্তৃপক্ষকে পূর্ন হইতে সচেতন করিয়াও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সময়েচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় বর্তমান অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

১৯৫০ সালের বস্ত্রায় নোনাফলে সন্দরবনের ময়ূরকুলোপ-বর্জী বাঁধ ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সন্দরবন প্রজামলয় সমিতি ও গ্রামবাসিগণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এবং বাঁধের অধিকারী জমিদারবর্গকে এই বাঁধ মেরামতের প্রয়োজনীয়তা জানান এবং দ্রুত তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু জমিদারদিগের কাপণ্য ও কর্তৃপক্ষের নৈপিল্যের জন্ত সময়ে তাহা হয় না। ফলে বাঁধ ভাঙিয়া লোনা জল দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাইলের পর মাইল শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যায়। পর বৎসর অনাবৃষ্টির জন্ত ব্যাপক শস্যহানি ঘটে। লোনা জলে বিধ্বস্ত অঞ্চল-পুনরায় চাষের উপযুক্ত হইতে অন্ততঃ দুই বৎসর লাগিবে। সুতরাং চাষী-মজুরের বৃত্তি ধ্বংস হইয়াছে। সন্দরবন এক-কসলী অঞ্চল। কতিপয় বড় জমিদার ও কোতদার ব্যতীত অধিবাসীদের অধিকাংশ ভাগচাষী, ছোটখাট চাষী এবং চাষী মজুর। চাষ ব্যতীত অন্য আয়ের পথ তাহাদের নাই। সুতরাং পর পর দুই বৎসর অজমার ফলে তাহার আঁজ বেকার। তাহাদের পক্ষে বর্তমানে অগ্রিমূল্য দিয়া বাধ্যশুল্ক ক্রয় করা হঃস্বপ্ন। সুতরাং সন্দরবনের এই সর্বহারা নিরন্নদের আঁজ খালের মূল ও গাছের পাড়া ধাইয়া জীবনরক্ষার চেষ্টা করিতে হইতেছে। সম্মিলিত সাংবাদিক দলের বিবরণে প্রকাশ—বৃষ্টির জন্য ও খাদ্য অধেষণে দলে দলে সাঁওতাল ও অন্যান্য চাষীরা পিতৃ-পুরুষের ভিটা পরিভ্রমণ করিয়াছে—পক্ষাতে কেলিয়া আসিয়াছে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। সন্দরবনের এই সব বৃত্তিহীন উপায়হীন দরিদ্রজন জনসাধারণ তাহাদের বস্ত্রসমস্তা অনেকটা মিটাইয়াছে, কারণ অধিকাংশ শিশু ও কিশোরীই নগ্নদেহ। দেখা যাইতেছে খাদ্যসম্ভাও তাহারা অনেক সহজ করিয়াছে—শাকপাতার, মূল ও শিকড়ে। কিন্তু তাহাতেও যে অচিরেই কাড়াকাড়ি পড়িবে ইহাই ভাবনা।

সংবাদপত্রে দেশবাসীর দাবীর প্রত্যুত্তরে পশ্চিমবঙ্গের সমবার, সাহায্য ও পুনর্বাসতি-বিভাগীয় মন্ত্রী ডাঃ আর আমেদ

গত ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল সন্দেহবাসি ও হাসনাবাদ থানার দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়া সাংবাদিক বৈঠকে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

তিনি বলেন, ঐ অঞ্চলের লোকের অভ্যস্ত হুজুফি বটরাছে সন্দেহ নাই। কিন্তু হুজুফি এমন নহে যে, উহাকে হুজুফের অবস্থা বলা যাইতে পারে। তাহার দুট ধারণা—এখানকার অবস্থা সম্পর্কে ইতিমধ্যে যে সব বিবরণী বা বিবৃতি বাহির হইয়াছে তাহা অতিরিক্ত। তিনি অনাহারে মৃত্যুর কোন প্রমাণ পান নাই। খাদ্য বা বস্ত্র যাহা আছে তাহা লোকের চাহিদা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু লোকের হাতে পরমা নাই ইহাই বড় সমস্যা এবং ইহাই বর্তমান হুজুফির মূল। সরকারী রেশন দোকানে যদিও চাউলের পরিমাণ যথেষ্ট নহে, কিন্তু গম পর্যাপ্ত ভাবে মজুত আছে।

অতএব সরকারী মতে উক্ত অঞ্চলে হুজুফি বা খাদ্যাভাব নাই—অভাব হইয়াছে অর্থের। লোকের বৃত্তি নাই সুতরাং ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে এবং সেই কারণেই তাহার অন্ন-ভাবে দিন কাটাইতেছে।

আমাদের প্রশ্ন এই যে, কাহারো এই মূল্যবৃদ্ধির পশ্চাতে আছে? ১৯৫১ সালের প্রাপ্ত শস্যের ও আমদানী শস্যের পরিমাণ হইতে মোট খাদ্যের যে ধারণা করা হয় তাহাতে এত দীর্ঘ দেশে হুজুফি বা খাদ্যাভাব দেখা যাইবে বলিয়া মনে করার কোন কারণ ছিল না।

সাধারণতঃ বৈশাখ মাসে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা অভাব অনুভূত হয় না। শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্তই অভাব দেখা দেয়।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ করার চোরাকারবারী মুদাকালোভী ব্যবসায়ী মহলে দারুণ জ্বালের সৃষ্টি হয় এবং মূল্য-মান উন্নত করিবার জন্ত ভাণ্ড-সরকারের বড়কর্তাদের নিকট আবেদন-নিবেদন চলিতে থাকে। তাহারই প্রতিফলিত-রূপে ভাণ্ড-সরকার খাদ্যমূল্য-হ্রাসে সরকারী সাহায্য দান বন্ধ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কারণ একমাত্র খাদ্যের মধ্য দিয়াই অতি দ্রুত তাহাদের উদ্দেশ্য সকল হওয়া সম্ভব। এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেশন-বহির্ভূত এলাকার খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, বড় বড় মজুতদার ও আড়ম্বারগণ যদি প্রতিদিনই বিক্রয়ের সময় মণ প্রতি আট আনা, এক টাকা মূল্য বৃদ্ধি করিতে থাকে তবে মূল্য ২৭ টাকা হইতে ৪০।৪৫ টাকার উঠিতে কতদিন লাগে? এবং ইহা তুলিতে তাহাদের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না, বনিক-ভোষণকারী সরকারের সহায়তায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিড়া কট্টোল করিয়া চোরাকারবারের আর একটি রাস্তা খুলিয়া দিল। এতদ্বারা পাট ও তুলার চাষ বৃদ্ধির দ্বারা খাদ্যমূল্যের উৎপাদন কমাইয়া সরকার তাহাদের মূল্য বৃদ্ধি

করিতে সাহায্য করিতেছে। কৃষি-বিভাগ ফসল উৎপাদন কমাইয়া রাখিতেছে; বাণিজ্য-বিভাগ বাণ্ড আমদানীতে বৈদেশিক মুদ্রা শেষ করিতেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের দোহাই দিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানী ঠেকাইতেছে, শিল্প-বিভাগ কলকারখানাকে কাজ বন্ধ করিয়া বা কমাইয়া উৎপাদন হ্রাস করিতেছে। সুতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে কোনই অসুবিধা নাই, এবং সকলের মিলিত প্রত্যাবর্তনের উপর পড়ার খাদ্যের অবস্থা যে শোচনীয় হইবে তাহাতে আশঙ্ক্যের কিছুই নাই। যে কৌশল ও যে উপায় অবলম্বনে '৪৩ সালে যমুনার ঘটাইয়া ৫০ লক্ষের জীবন বলিদান করা সম্ভব হইয়াছিল আজও সেই সকল কৌশলেরই পুনরাবৃত্তি হইতেছে বলিয়া মনে হয় এবং ইহাতে যে কত জীবন হানি হইতে পারে তাহা অনুমান করা সহজ নহে। কর্তৃপক্ষের ভরসা যে, এদেশের লোকে না খাইয়া মরে তবুও খাবারের দোকানে হানা দেয় না। কিন্তু তাহাদের অরণ রাধা দরকার যে, ১৯৪৩ সালে ও ১৯৫২ সালে প্রভেদ অনেক; অনেক পরিবর্তন যাহাযের দেখে-মনে ঘটাইতে। নির্বিকারে সহ্য করিবার মত মানসিক অবস্থা আর দেশবাসীর নাই; এ সমস্ত সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সময় আসিয়াছে। দেশের সর্বত্র খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পুণ্ড্র সোভালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এক সম্মেলন সভ্যগ্রহে সফর হইয়াছে। বাণ্ড ফ্রন্টে তাহাদের এই সভ্যগ্রহ জনসাধারণের সম্পূর্ণ আন্তরিক সহায়তুত্তি ও সহায়তা যে পাইবে তাহাতে দ্বিধা নাই। সুতরাং কর্তৃপক্ষকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া অবস্থার বিচার করিতে হইবে।

বস্তুতঃ সরকারী মহল বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্যাভাব বা হুজুফি আখ্যা দিতে আরো প্রস্তুত নহেন। কারণ হুন্দর-বন অঞ্চলে এক-আধজন লোক অনাহারে মারা গেলেও মৃত্যু-হার ব্যাপক নহে। কিন্তু মৃত্যুসংখ্যা যাহাই হউক, একজন লোকও যদি খাদ্যাভাবে মৃত্যুবৃত্তে পতিত হয় তবে তাহা যে-কোন সভ্য রাষ্ট্রের পক্ষে কলঙ্কের কথা। আর এ মৃত্যু যদি ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে হয় তবে তাহা আরও পরিভাপের বিষয়। সুতরাং মৃত্যুর সংখ্যা স্বতঃ বা মৃত্যুর কারণ কি তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক না করিয়া সহজতার সমাধান করাই আস্ত কর্তব্য। অবশ্য হুন্দর-বন অঞ্চলে বাংলা-সরকার সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। সাহায্য দান ব্যাপারে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা এখনই কর্তব্য। সন্দেহবাসি, হাসনাবাদ অঞ্চলের অবস্থা যে-ওরফের তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এদেশের অভাভাঙ্গেলা হইতেও দৈনিক যে সকল সংবাদ আসিতেছে তাহাতে মনে হয় সে সকল স্থানের অবস্থাও বিশেষ আশাশ্রয় নহে। বর্তমান জেলার কালনা অঞ্চলে, নদীয়ার কোন কোন অংশে

বাঁধাবস্থা স্পন্দন অঞ্চল অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল নয়, একথা ডাঃ আমেদও সাংবাদিক বৈঠকে স্বীকার করিয়াছেন। এ সকল স্থানে বাঁহাতে খাজমূল্য মাহুষের ক্ষয়-ক্ষমতার মধ্যে নামিয়া আসে তাহার ব্যবস্থা যে কোন উপায়ে করা দরকার। এ বিষয়ে জনসাধারণের দায়িত্ব সরকারী কর্তব্য হইতে কোন অংশে কম নহে। বিশেষতঃ যখন কণ্ডকগুলি মিথ্যা কুসংস্কার সমস্ত সমাধানের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন বেসরকারী দায়িত্ব অনেক বেশী। সংবাদে প্রকাশ, সরকারী শুদামে যদিও চাউল প্রয়োজন অস্থায়ী নাই তথাপি গম পর্যাপ্ত মজুত আছে। কিন্তু জনসাধারণ গম ব্যবহার করিতে নারাজ। অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে গম পাওয়া সত্ত্বেও তাহারা গম ক্রয় করিবে না। বাঁহাদের সঙ্গতি আছে তাঁহারা ই “বাঙালীর পেটে আটা নয় না” এই কুসংস্কারে চড়া দামে চাউল ক্রয় করিয়া দাম চড়াইয়াছেন এবং দরিদ্রের সর্বনাশ করিতেছেন। এ ধরনের কুসংস্কার বাস্তবিকই নিন্দনীয়। এবং ইহা দূর করার দায়িত্ব সরকারী ও বেসরকারী উভয় তরফেরই।

আর একটি বিষয় আমাদের খুবই অদ্ভুত লাগিতেছে। বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই বন্দরে দৈনিক গম ও মাইলো বোম্বাই জাহাজ আসিতেছে। কিন্তু মাল খালস করিয়া রাখিবার স্থান অভাবে মাল নামানো হইতেছে না। কারণ বোম্বাই বন্দরের শুদামে এত খাজ মজুত আছে যে, সেখানে ভিলাজি স্থান নাই। অনেক খাজ অরক্ষিত অবস্থায় বাহিরে কেলিয়া রাখিতে হইতেছে, ভারত-সরকারও অস্বল্প অসুবিধার পড়িয়াছেন। তাঁহাদের শুদামে এত খাজ জমা হইয়াছে যে, নুতন খাজ আনিবার সাধ্য তাঁহাদের নাই। উদ্ভিদ্যা ও উত্তর প্রদেশের সংবাদে প্রকাশ যে, ট্রান্সপোর্টের অভাবে তাহারা মাদ্রাজ ও পঞ্জাবের হুর্ডিকাঞ্চলে খাজ পাঠাইতে পারিতেছে না।

সুতরাং দেশে খাজ আছে, এক ক্ষয়-ক্ষমতার অভাবে, দ্বিতীয়তঃ রেলের অসুবিধার বিপর্য অঞ্চলে খাজাভাব মিটিতেছে না। এ বিষয়ে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মে মাসে চাউল সম্পর্কে তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন

“রাষ্ট্রসভার খাজ ও কৃষি সংস্থার উত্তোগে যবদীপের বান্দুং নগরীতে তিনটি বৈঠক অস্থগানের আয়োজন চলছে। এই তিনটি বৈঠকেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল চাউল উৎপাদন সম্পর্কে কিছু কার্যকরী সিদ্ধান্ত করা।

আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনের তৃতীয় অধিবেশন হবে ১২ই মে, ভারিখে। চাউল উৎপাদন ও জমির সারের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দুটি বৈঠক হবে এর আগে। সংশ্লিষ্ট কর্মীরা তাদের আলোচনা আরম্ভ করবেন এই মে থেকে।

চাউল কমিশনের সম্মেলনের অস্থায়ী আলোচ্য বচী নিম্নরূপ :

- (১) উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও ব্যবহার্য্য পণ্যের রূপান্তরকরণের দায়িত্ব কৃষির হার কমানো।
- (২) জলসেচ প্রক্রিয়া।
- (৩) বিভিন্ন দেশে চাউল উৎপাদন যে-সব সুমিহিষ্ট কারণে ব্যাহত হয়।
- (৪) চাউল উৎপাদনের সহায়ক আর্থিক ব্যবস্থাসমূহ।
- (৫) ভাল চাউল উৎপাদনের ব্যবস্থা ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

কমিশন উক্ত দুই ধরনের কর্মীদেরই বিবরণ শুনবেন। ধান গাছ ও উৎপন্ন কলস রক্ষার বৈজ্ঞানিক পন্থা কি এবং চাউল গাছ পালনের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন — সে সম্পর্কে গবেষণা করবেন একদল কর্মী। বিদেশের কারিগরি সাহায্য নিয়ে এ ব্যাপারে কতদূর কি চেষ্টা করা সম্ভব তাঁরা এসব চিন্তা করে দেবেন।

জমিতে সার দিয়ে তার উর্বরা শক্তি বাড়ানোর উপায় কি তা অহুসজ্ঞান করবেন অপর একদল কর্মী। এই দল কমিশনের কাছে কৃতিপর উপাধি করবেন। সংশ্লিষ্ট দেশ-গুলি নিজের শক্তিতে এবং অন্যের সহায়তায় এগুলি কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করবেন।

১৯৪৮ সালে ফিলিপাইনে যে আন্তর্জাতিক চাউল সম্মেলন হয় সেখানেই এই কমিশন গঠনের ব্যবস্থা হয়; চাউল উৎপাদন সংরক্ষণ, বণ্টন ও ভোগ সম্পর্কে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাকে স্বকর করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই কমিশন গঠিত হয়েছিল।

বাইশটি দেশ এই কমিশনের সদস্য, প্রতি দুই বছর অন্তর এর সভা হয়। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেভুনে কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা যুদ্ধবিগ্রহ, অভাব-অনটন সত্ত্বেও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের বাঙালী ত্রীকানাইলাল মুন্সীর মতে এই বৃদ্ধি নিরন্তরিত না করিলে খাদ্যসরুটি মিটিবে না। এই সমস্তা কেবল ভারতবর্ষের নয়; সারা জগতের। সেই জন্যই এত আয়োজন-উত্তোগ, সম্মেলন ও পরিচালনার হুড়া-হুড়ি। ইহার মধ্যে নুতন কিছু নাই। জীবনাজেই অগ্রপট্টাৎ বিবেচনা করিয়া কার্যে অগ্রসর হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস চাষ

সমন্বিত পরিকল্পনামুখারী পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে ১৯৫১-৫২ সনের কার্পাস চাষের অবস্থা ও পর বৎসর ১৯৫২-৫৩ সনের কার্পাস চাষের নির্ধারণ উদ্দেশ্যে গত ২৪/৪/৫২ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গ্রেট-কটন সাবকমিটির অধিবেশন হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৫০০০ একর জমিতে চাষ হইবে

বলিয়া কার্খা আরম্ভ হইলেও বৃষ্টির অভাবে সময়মত চাষ না হওয়াতে ৩৫০০ একর জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত চুর্নসের ও সময়মত গবর্নেন্ট হইতে সার ও অন্যান্য সাহায্য না দেওয়ায় মাত্র ১০০০ একর জমি হইতে ফসল সংগৃহীত হইয়াছিল। বঙ্গীয় মিল মালিক-সমিতি কার্খাস হইতে বীজ ছাড়াইবার ক্ষমতা কয়েকটি ফল বসাইয়া বীজ সমেত তুল্য বরাদ্দ করিবে স্থির করে। কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রতি মণ কার্খাসের ক্ষমতা ৪০ মূল্যে চাষীদের নিকট হইতে কার্খাস বরাদ্দ হইতেছে। একর প্রতি গড়ে তিন মণ কার্খাস পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ১০০ একর পর্যন্ত চাষ করিলেও অবিকাংশই ক্ষুদ্র চাষী। ৩০০০ একর জমিতে উৎপাদক সংখ্যা ছিল ৮০০০। এ প্রকার ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে কেহ কেহ একরে ৮৯ মণ কার্খাসও পাইয়াছে। উৎপাদন বরাদ্দ একর প্রতি ১৫০ হইতে ২৫০ পর্যন্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় খুব কমসংখ্যক উৎপাদকই ইহার চাষে লাভ করিতে পারিয়াছে। সুখ্যমজী এ বিষয় লইয়া বিশদ আলোচনা করেন। ত্রীদারদাচরণ চক্রবর্তী প্রস্তাব করেন যে, আমেরিকার ক্ষুদ্র চাষীদের অহু-করণে বীজ পুঁতিবার পর এক মাস হাতে নিড়ান খোঁড়া না করিয়া হাত লাগল ও বিদে ব্যবহার করিলে (এবং তাহার পর ১ গুরুতালিত লাঙ্গল ও বিদে ব্যবহার করিলে) চাষের খরচ অনেক কমিবে। এভাবে জমি আগাছা মুক্ত ও মাটি আলগা থাকিবে বলিয়া কার্খাসেরও ফলন বাড়িবে। বাংলায় ইহার উপযোগিতা প্রমাণিত হইলে ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে সহজেই এই প্রণালীর চাষ প্রচলন করা সম্ভব হইবে। বর্তমানে বাস্তব-হারাধের পুনর্গতিস্তির কাজে—যাহাতে তাহারা সকলেই কার্খাস উৎপন্ন করিয়া চরম্বার হতা কাটিয়া বজ্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই ডাঃ রায় প্রধাম উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করেন। এবারে সরকারী পরিকল্পনামুযায়ী বীজ, সার প্রভৃতি অল্প মূল্যে (subsidised rate) সরবরাহ ও চাষের ক্ষমতা যথাবে ফসল হইতে মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা রাখিয়া সরকারী ট্রাক্টর দ্বারা জমি প্রস্তুত বিষয়ে সাহায্য করা হয়, তাহা করা হইবে। ওজাবধানের সুবিধার ক্ষমতা ২৫ একরের অধিক জমিতে যাহারা চাষ করিবে তাহাদিগকে পরিকল্পনা ফুক্ত করিয়া উপরোক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে। অন্যান্য চাষীরা যাহাতে সময়মত কার্খাস বীজ পায় সরকারী কৃষিবিভাগে তাহার ব্যবস্থা থাকিবে এরূপ আশা দেওয়া হয়। কার্খাস না হওয়াতে বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট তুল্য প্রচুর আমদানী করিতে হয়। ইহাঙ্গে ভারতবর্ষের কোথাও মিহি হতা তৈরির উপযোগী উৎকৃষ্ট ইজিপশিয়ান কার্খাস চক্রবর্তী মহাশয় উৎপাদন করিতেছেন এবং তাহা হইতে বোহিনী মিলসের মতে ৮০ নং তানার হতা প্রস্তুত হইতে পারে এবং কেশরাম কটন মিলসের মতে উহার আশ. ৩৬ দীর্ঘ করিতেছেন

আনাইলে ডাঃ রায় মন্তব্য করেন যে, বর্তমানে তিনি যেভাবে অল্প পরিমাণে ইহার চাষ করিতেছেন গবর্নেন্ট সাহায্যে তাহাই চালান হইবে।

বাংলার কার্খাস চাষীপন যাহাতে মাঝে মাঝে একজ হইয়া কার্খাস চাষের সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে আলোচনা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইলে কার্খাস চাষের প্রভুত উন্নতি হইবে। আমেরিকা ও আফ্রিকাতে এম্পায়ার কটন প্রোমোশন সমিতি সে সকল দেশে এই প্রণালীতে কার্খাস উৎপাদন বিষয়ে প্রভুত উন্নতি করিয়াছে।

পশু-চিকিৎসা ও পশু-পালন

উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মধুরায় পশু-চিকিৎসা ও পশু-পালন মহাবিদ্যালয়টি ভারতে অধিতীয়। ১৮৪৪ একর জমির উপর ইহা অবস্থিত। একটি গৃহপালিত পশুগবেষণা-কেন্দ্র ইহার সঙ্গে যুক্ত আছে। এই মহাবিদ্যালয়ে পশু-পালন ও শস্ত-বপন প্রভৃতি একযোগে শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালে যখন ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এখানে মাত্র ৬০টি ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে এখানে ১৭৫টি ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। এই মহাবিদ্যালয়ে আশ্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. ডি. এল-সি. এ. ও. এইচ. ডিগ্রীর ক্ষমতা বৎসরের পাঠ্যক্রম অল্পহস্ত হয়। এই শিক্ষায়তনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে গৃহপালিত পশুসংক্রান্ত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। পশু-পালনের উপর এখানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই শিক্ষায়তনে পশু-প্রজনন ও পশুর পুষ্টিসাধন সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণা করা হইয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়ে পশু-প্রজনন জনপ্রিয় করা হইয়াছে। গরুর বাচ্চের ভারতম্য করিয়া দুগ্ধোৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণাকার্যে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করা গিয়াছে।

উত্তর প্রদেশে কৃত্রিম উপায়ে পশু-প্রজননের বাদ্যলি কেন্দ্র আছে। আরও চতুর্দশটি নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। হর্শোন চিকিৎসার ফলে গরু ও ঘোড়ার বন্ধ্যাত্ব দূর করাও গবেষণার ফলে সম্ভব হইয়াছে। গবেষণা সকল হইলে তাহা যথাসময় জনসাধারণকে জানান হয়।

এখানে একটি গৃহপালিত পক্ষী-কেন্দ্রও আছে। তথায় প্রায় ১,০০০ পক্ষী পালন করা হয়। গ্রামবাসীরা এখানে হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পক্ষী ও ডিম লইয়া যায়। এইভাবে প্রতি বৎসর প্রায় ১,৫০০ হইতে ২,০০০টি ডিম (এইগুলি হইতে বাচ্চা হইতে পারে) এবং ৫০০ হইতে ৬০০টি পক্ষী সরবরাহ করা হয়।

শস্ত্রকণা, কপি প্রভৃতি দান্য জাতীয় খাদ্য পক্ষীদিগকে খাওয়ান হয়। প্রাতে বেলা ১২টার, বৈকাল ৩টার এবং সন্ধ্যা ৬টার এই চারি বার নিয়মিতভাবে পক্ষীগুলিকে কৃচিকর

খাবার দেওয়া হয়। প্রতিটি পক্ষীর জন্য মাসে ২০ টাকা ব্যয় হয়। পক্ষীর খাওয়ার জন্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় শাকসব্জী এখানকার ক্ষেতেরই হয়।

এই মহাবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি পশু-হাসপাতাল আছে। পশুর রোগ-নির্ণয়ের সুবিধার জন্ত এখানে একটি এক্স-রে যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই হাসপাতালটির সুনাম দিন দিনই বাড়িয়া পড়িতেছে। রাজ্যের দূরতম স্থান হইতেও চিকিৎসার্থে রুগ পশু এখানে আনা হয়।

এখানে চার বৎসরে যে পাঠ্যপুস্তকী অহুত হয় তাহার মধ্যে শারীর-বিজ্ঞান, শারীর-স্থান, পশু-পরিচালন, পশু-পুষ্টি, জ্বক-সংরক্ষণ, পশু-প্রজনন, পশুসংক্রান্ত অর্থনীতি ও পরি-সংখ্যান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে ভর্তি হইতে হইলে প্রার্থীদিগকে অন্ততঃ (জীববিদ্যাসহ) আই-এসসি পাস হইতে হইবে।

সত ৬ই বৈশাখ নূতন দিল্লী হইতে উপরোক্ত বিবরণটি প্রচারিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটার ভুলনামধুরার পশু-চিকিৎসালয় ও পশু-পালন প্রতিষ্ঠানটি বৃহৎ ব্যাপার। বৃহৎ ব্যাপারে নানারূপ গলদ থাকে, যেমন আছে হরিণ-ঘাটার। কলিকাতা নগরীর বহুবাজার হরিণঘাটার “টোনড মিক” ও বিপুল গোহুঁক বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রাণ্ডে ২ বছর মধ্যে কর্মীরা কাজ সারিয়া চলিয়া যান। স্বত্তরাং যাহারা অগ্রিম মূল্য দিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা অনেক সময় হুণ না পাইয়া ফিরিয়া যান। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কয়েক-জন এম-এ, বি-এ পাসকারা মহিলা হুঁকটার জন্ত একাক্ষ করেন। রাষ্ট্র ঘরন ব্যবসায় চালাইতে অগ্রসর হন, তখন এরূপ অব্যব-সায়ী পন্থা অবলম্বন করিলে, ক্ষতি স্বীকার ছাড়া গত্যন্তর নাই। সে ক্ষতি শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের ক্ষেপে গিয়া পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের নদনদী

‘আর্থিক প্রসঙ্গ’ নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় একটি প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ও নদ-নদীর অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। নূতন কিছু না থাকিলেও, তাহা বলার ও জানার প্রয়োজন আছে। লেখক এই উপলক্ষে রাজ্য দিগন্তর মিজের নাম করিতে পারিতেন। তিনিই বাঙালীর মধ্যে বাংলাদেশে নদনদীর অবনতির কারণ ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন। তাহা আজ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বের কথা।

লেখক বেন্টলি সাহেবের পুস্তকের, সার উইলিয়ম উইলকিন্সের উপর নির্ভর করিয়াছেন। আমরা উক্ত প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম :

“সুস্থ পলিপূর্ণ বস্তার জল জমির উৎপাদিকা শক্তির সহায় এবং জলস্বাস্থ্যের পক্ষেও বিশেষ কল্যাণকর। এ সম্বন্ধে ডাঃ বেন্টলি তাহার ম্যালেরিয়া এবং কৃষি (Malaria and

Agriculture) পুস্তকে লিখিয়াছেন, অত্যন্ত ‘ব’ দীপের ভার বাংলাদেশেও পরিপূর্ণ বস্তার জলের দ্বারা সেচের উন্নতি ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপের অবনতি একই সঙ্গে ঘটিত।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ হ্যামিলটন লিখিয়াছেন—“জমির আয়তনের অল্পপাতে জমির উৎপাদন বিষয়ে সমগ্র হিন্দুস্থানে বর্ধমান প্রথম ও তাগোর দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।”

পরিবহন এবং বহির্বাণিজ্যেও বাংলার প্রাচীন ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। বাংলা নদীযাত্রক দেশ। জলপথে বাণিজ্যই ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। পদ্মা, গদা, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাঈ, অজয়, ময়ূরাক্ষী, কপোতাক্ষী প্রভৃতি নদনদী ও ইহাদের সংশ্লিষ্ট খালগুলি যে বৃহত্তর বাংলার সুষ্ঠু ও সুনির্ভরিত দীর্ঘ জলপথ রচনা করিয়াছিল, আজও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই জলপথের সহিত সমুদ্রোপকূলের যোগাযোগ ও বাণিজ্য-সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত বন্দর যে বাংলায় জলপথের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিল এবং ইহাই বৃহত্তর বঙ্গের তথা সমগ্র উত্তর ভারতের প্রধান বন্দর ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বাংলার বিস্তৃত সমুদ্রোপকূল বহির্বাণিজ্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া ছিল। জলপথ ব্যতীত কটক রোড, অহল্যাবাই রোড প্রভৃতি আন্তঃপ্রাদেশিক রাজপথগুলি আজও প্রাচীন বাংলার উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার পরিচয় দেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই কৃষি ও সেচব্যবস্থা সহযোগিতার সহিত কাজ করিয়াছিল। সার উইলিয়মের মতে, মোগলসাম্রাজ্যের অবসান, বর্গীর হাঙ্গামা ও ইংরেজ রাজত্বের সুপ্রাপ্তের সময় দেশে যে অত্যাচার ও অরাজকতা চলিয়াছিল, তাহারই ফলে এই কৃষি ও সেচব্যবস্থার অবনতি ঘটয়াছিল। মারাঠা-আফগান-যুদ্ধজনিত রাষ্ট্রবিপ্লবের গোলযোগে মধ্য-বাংলার রায়ত ও জমিদারগণ সেচের জন্য খালগুলি পরিষ্কার রাখা এবং খাল হইতে উদ্ধৃত পলিদ্বারা খালের তীরবর্তী বাঁধ মেরামত করার কাজে অবহেলা করার ১৮৩৫ সালের পূর্বেরই গদার সেচব্যবস্থা একেবারে অচল হইয়া পড়িয়াছিল। তদানীন্তন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এই সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকায় সেচের জন্য প্রস্তুত খালগুলিকে দৌকা যাতায়াতের মদীপথ ভারিরা তাহার সংস্কারের কিছুই চেষ্টা করেন নাই। এই ভাবে একে একে সমস্ত সেচব্যবস্থাই অচল হইয়া যাওয়ার কৃষির অবনতির মুখ্য কারণ ঘটিল।

“তথু তাহাই নহে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বাংলার রাজ্যিক ও সামাজিক পরিবেশ একেবারে রূপান্তরিত হইল, তখন দেশে আসিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ১৭৬৭ সাল হইতে ১৭৭৬ সালের মধ্যে বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্র একেবারে বদলাইয়া গেল—নদ-নদীর গতি পরিবর্তন হেতু।

হুমিকম্প ও কয় বৎসর ধরিয়া ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার গতি পরিবর্তিত হইয়া উত্তরবঙ্গে নতুন ক্ষীতকার যমুনা নদীর সৃষ্টি হইল (১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে)। দামোদর নদী কয়েক বৎসর প্লাবনের পর বর্তমান জেলা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-গামিনী হইল। পদ্মা নদীও পূর্ব-গামিনী হইল। ইহার ফলে কমে, ভাগীরথী, জলঙ্গী, নৈরব ও মাথাবাদার অধোগতি আরম্ভ হইল। সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য-বাংলা হইল যুত নদীর জীর্ণ-বকালে, তরা, বনজঙ্গলাকীর্ণ ম্যালেরিয়া-মহামারী নিপীড়িত ক্ষয়িত্ব অঞ্চল।”

গঙ্গার উপর সেতু নির্মাণ

গত ৫ই বৈশাখ গঙ্গা সেতু নির্মাণ কমিটির পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে ত্রিবেংখরারায় সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল তাঁহাকে বলেন যে, পাটনা মোকামা অঞ্চলে পাটনার যতদূর সম্ভব নিকটে সেতু নির্মিত হওয়া উচিত।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন—বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীজ্ঞানন্দন সহায়, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু, বিহার প্রেস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীমবলকিশোর সিংহ, শ্রীজ্ঞানন্দন আজাদ এবং শ্রীজ্ঞানেশ্বর বর্ম্ম। গঙ্গার উপরে কোন স্থানে সেতু নির্মিত হইবে তাহা নির্বাচনের ভার বিবেখরায় কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে।

একটি আরকজিপি পেশ করা হয়। আরকজিপির সারমর্ম এই—উত্তর-পূর্ব ভারতে গঙ্গার উপর সেতু নির্মাণের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে আমরা আপনার বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পেশ করিতেছি :

(১) সেতু পাটনা মোকামা অঞ্চলে অবস্থিত হইলে এবং যতদূর সম্ভব পাটনার নিকটবর্তী হইলে, ইহার দ্বারা উত্তর বিহারের দেড় কোটি অধিবাসী, উত্তর প্রদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৪৫ লক্ষ অধিবাসী, নেপালের ৭৮ লক্ষ অধিবাসী এবং দক্ষিণ বিহারের ১ কোটি ১২ লক্ষ অধিবাসীর সুবিধা হইবে।

(২) ইহার ফলে উত্তর বিহারের অর্থনৈতিক স্থিতি সুদৃঢ় হইবে। ২১০০০ বর্গমাইল অঞ্চলের অধিবাসী ইহার সুবিধা ভোগ করিবে।

(৩) ইহার ফলে নদী উপত্যকা পরিকল্পনাসমূহের কার্য অপেক্ষাকৃত অধিকতর দ্রুত সম্পাদিত হইবে।

(৪) এই স্থানে সেতু নির্মিত হইলে ইহার ফলে হুর্ভিক সাহায্য কার্যের সুবিধা হইবে এবং বাজারজাতিকরণে সহজে প্রেরিত হইতে পারিবে।

(৫) ইহার ফলে উত্তর বিহারের উৎপন্ন ধাতু, কয়লা, শাকসবজী প্রভৃতির দ্রুত বাজার গড়িয়া উঠিবে।

(৬) ইহার ফলে নেপালের উন্নয়নে যে সুবিধা হইবে, সেতু অত্ৰ কোন অঞ্চলে নির্মিত হইলে তাহা হইবে না।

প্রতিনিধি দল বলেন, গঙ্গার উপরে বাঁধ রাজমহলে অবস্থান করাকালে নির্মিত হইবে এ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। এরূপ একটি পরিকল্পনার কার্যে প্রায় ৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং এই কার্য সম্পূর্ণ হইতে সময়ও যথেষ্ট লাগিবে। কিন্তু পাটনা, মোকামা অঞ্চলে সেতু নির্মাণের কার্য অবিলম্বে আরম্ভ করা প্রয়োজন। বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সেতু নির্মাণ স্থগিত রাখা উচিত হইবে না। সেতু নির্মাণ ও বাঁধ নির্মাণ দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কার্য। গঙ্গার সেতু নির্মাণের জন্য ১০-১৫ বৎসর অপেক্ষা করা বিহারের পক্ষে সম্ভব নয়।

কোন জায়গায় সেতুটি নির্মিত হইবে, তাহা তর্ক-বিতর্কের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। গঙ্গার উপর অসংখ্য সেতু নির্মিত হইয়াছে। তার মধ্যে কাশীর সেতু ও উইলিংডন সেতু প্রধান।

২৫ লক্ষ একর জমি বণ্টনের সঙ্কল্প

সেবাপুরীর চতুর্থ সর্বোদয় সম্মেলনে গত ১লা বৈশাখ তারিখে গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশের সমুদয় গঠনমূলক কর্ম্মকে ভূদান যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিতে এবং আগামী দুই বৎসরের মধ্যে ২৫ লক্ষ একর জমি বণ্টনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে বলা হয়। গঠনমূলক কার্যে রত কর্ম্মীরা যাতে কেন্দ্রীভূত শিল্পজাত দ্রব্য বর্জন করিয়া ভগ্নশিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করেন, আলোচ্য প্রস্তাবে তাঁহাদের সেই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়।

“প্রস্তাবটিতে আরও বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারাই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। আজ কেন্দ্রীভূত শিল্প-ব্যবস্থার জন্মই দেশ খাদ্য ও বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারছে না। কেন্দ্রীভূত শিল্প-প্রয়োগকে সর্বোত্তমভাবে বরকট করে দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকৃত কৃষি-শিল্প চালু করা দরকার। আরও বলা হয় যে, মাতার উপর যেমন শিশুর অধিকার আছে, মাটির উপরও ভেদনি প্রতিটি মানবের অধিকার বর্তমান। সুতরাং যাহাতে প্রতিটি পরিবারে পাঁচ একর সাধারণ জমি এবং এক একর করে জল জমি পেতে পারে, ভূদান যজ্ঞ এইভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার।”

“বিতর্ককালে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রীযুক্ত পাণ্ডিল বলেন যে, ভূদান যজ্ঞ পরিকল্পনাদ্বারা কাজ হলে জমি অত্যন্ত ছোট ছোট টুকরায় ভাগ হয়ে যাবে, আর যৎসামান্য জমি হতে কোন কৃষক তার পরিবারের আশ্রয়স্থানের সংস্থান করতে পারে না, উপরন্তু ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত হওয়ায় জমিতে ফসল উৎপাদনও বাতান যাবে না এবং শিল্পব্যবস্থাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শ্রীযুক্ত পাণ্ডিলের উক্তির বিরোধিতা করে ও ভূদান যজ্ঞ সমর্থন করে বহু গঠনকর্ম্ম নেতা বক্তৃতা দেন।

শ্রীপাণ্ডিলের বক্তৃতা ভারত গবর্নমেন্টের মনোভাবের

পরিচয় প্রদান করে। মেহেরুজ্জী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই গঠনমূলক কার্য ও শিল্পের বিকল্পীকরণ চান। কিন্তু তাঁহাদের সকল কথার মধ্যে ‘কিন্তু’ আছে। একথাও সভ্য যে দেশের অমীর পরিমাণের সীমা আছে। তাহার প্রেষ্টতম উপায়ে ব্যবহার ভিন্ন দেশের লোকের বাচিবার পথ নাই।

সাহিত্য ও বাংলা ভাষা

পূর্ববঙ্গে উর্দু বনাম বাংলা রাজনীতির ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মুহম্মদ আমীনের প্রস্তাব অনুসারে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিকল্প রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করিবার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

এই বিষয়ে পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত শ্রেণী ও জনসাধারণ একমত। তাহার প্রমাণ পাই ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের ইমরোজ মাসিক পত্রিকার। প্রথমেই প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁর একটি বক্তৃতা প্রকাশিত করা হইয়াছে। ইহা কুমিল্লার অমুখ্যিত প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ। এই ভাষণের মিয়লিখিত অংশ প্রণিধানযোগ্য :

“আমাদের জীবনে বর্ষকে রূপান্তরিত করতে চাইলে বর্ষকে আমাদের মাতৃভাষায় সাহিত্য-সুসমায় মণ্ডিত করে পেশ করতে হবে। লা রাহবানিয়াত। ফিল-ই-ইললাম—ইসলামে বৈরাগ্য নাই। ইসলামের মূল ভাষাতেও বৈরাগ্য নাই। ইসলাম-মণ্ডিত আমাদের ভাষাতেও বৈরাগ্য থাকলে চলবে না। কোম দেশের কোম যুগের কোম বর্ষের ভাষাতেই বেশী দিন চলে নাই।

বাংলা ভাষার কোরআন ও হাদীসের অনুবাদ শুরু হয়েছে; ইসলাম সবচেয়ে বই লিখতেও অমেকে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা দেশের বক্তাবাদাহ। তবে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—স্বয়ং আল্লা যেমন কোরআনের মহাবাণীকে অপূর্ণ সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করে মাহুষের কাছে পাঠিয়েছেন, আমাদের সাহিত্যিক বজুরাও যেন সে বাণীকে সাহিত্যিক সুসমায় মণ্ডিত করে এ দেশের পাঠক সমাজের সামনে পেশ করেন। অল্পখার মিলাদ খাঁ মুখী সাহেবের মতই আকশোস করে বলতে হবে—কিয়ামত নজদিক, মইলে বর্ষের এমন ভাল ভাল কথা না পড়ে হতভাগারা নাটক নভেলের দিকে খুঁকে পড়ে কেন?

একথা আমাদের কিছুতেই ভুললে চলবে না যে, জীবনে যেখানে কাব্য নাই, সেখানে জীবনের আনন্দের কোঠা অনেকখানি খালি পড়ে থাকে। আর আনন্দ যেখানে কম, সৃষ্টির স্রোত সেখানে স্তিমিত।

আমাদের নুতন রাষ্ট্র, আর সে রাষ্ট্রে আমরা নুতন বুনিয়াদের উপর আমাদের সামাজিক ও নাগরিক জীবন গড়ে তুলতে চাই। জাতি-বর্ষ-বর্ণ-নির্কিশেবে এ রাষ্ট্রে সকলে

পাবে সমান অধিকার—আত্ম-বিকাশের সমান সুযোগ। বাংলা-সাহিত্যে এই মহান সাম্যের আদর্শ আজও যথেষ্ট রকমে অপরিণত হয় নাই। কমিউনিষ্ট রাশিয়া হতে আমদানী এক রকম সাম্যের কথা আমরা মাঝে মাঝে শুনি। সাম্য মন্ত বড় জিনিষ’, এর আদর্শগত আবেদনের শক্তিও বিরাট। কাজেই আমাদের তরুণেরা কেউ কেউ বতাবতঃই এই রুশীয় সাম্যের দিকে খুঁকে পড়েছেন। আমার মনে হয়, ইসলামের সাম্যের অন্তরে আছে যে দরদ, রুশীয় সাম্যের অন্তরে তা নাই। সেখানে আছে বিকোভ। ইসলাম বলে—সকলে এক আদমের সন্তান, অন্তঃকরণ সকলে ভাই ভাই। রুশীয় সাম্য ছোট্ট প্রতি বড়র অতীতের লক্ষ্যকোটি জুজুমের করুণ কাহিনী আওড়িয়ে আওড়িয়ে চিন্তকে বিক্ষুব্ধ করতঃ বড়র বিরুদ্ধে প্রতিশোধে হস্তার ছেড়ে ধ্বংসের জন্য শাবল হাতে অগ্রসর। সাম্যের পেছনে যদি প্রেম না থাকে তবে সে সাম্য বরগীরও হয় না, সহনীরও হয় না। কিন্তু রুশীয় সাম্যের বিরুদ্ধে কেবল কথায় নালিশ করলে বা তার মিন্দাবাদ করলে চলবে না। আমাদের সাম্য যে তার চেয়ে বড়, তার চেয়ে বাস্তব এবং তার চেয়ে টেকসই, তা আমাদের কল্পনা, কথা ও কাজ দিয়ে সপ্রমাণ করতে হবে এবং এই কাজে আমাদের সাহিত্যের অবদান হতে পারে অপ্রমেয়। আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের মজর আমি এদিকে আকর্ষণ করছি...।”

এই আবেদনের সমর্থন করে সম্পাদকীয় মন্তব্য যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞবোধোচিত।

“বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন উচ্চতাসী ও কয়েকটি পত্রিকা যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাতে আমরা খিঁচুই হইয়াছি। কোম শিক্ষিত সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক কোম ভাষাকে অমৈ-সলামিক ভাষা বলে অভিহিত করতে পারেন তাহা বাবাবে উর্দু নামে পরিচিত উর্দু কবি ও সাহিত্যিক ডাক্তার আবদুল হক ও এককালের রাজনীতিজ্ঞ চৌধুরী খালিকুজ্জমানের উক্তি শোনার পূর্ব পর্যন্ত, আমরা কল্পনাও করতে পারি নাই। আমাদের মতে এতে শুধু তাঁদের মগ প্রাদেশিকতা, বীর বিচারবুদ্ধিহীনতা, গণতন্ত্রের প্রাথমিক আইন-কাহুমে অজ্ঞতাই প্রকাশ পেরেছে।

“কোম মুসলমানের পক্ষে কোম ভাষাকে অমৈসলামিক ভাষা আখ্যা দিয়ে সে ভাষাকে ভ্যাগ করতে বলাকে আমরা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ কার্য বলেই মনে করি। সার্বজনীন বিশ্ববর্ষ বলে যে বর্ষকে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন ও মাহুষকে মেনে নিতে বলেছেন, সে বর্ষ কোম একটি ভাষা বা হরফে প্রথম প্রবর্তিত হলেও, তাকে তারই মধ্যে আটকে রাখার কল্পনা বা প্রচেষ্টা তার সার্বজনীনতাকে বিনষ্ট করবার প্রচেষ্টা ছাড়া অজ কিছু নয়।...

ধরতে গেলে কোম ভাষাই ইসলামী ভাষা নয়। খোদ আরবী ভাষাকেও ইসলামী ভাষা বলা চলে না। যখন আরবী ভাষার কোরান শরীফ নাজেল হয় তখন এ ছিল অজ-কুসংস্কারাজ্ঞের পৌত্তলিকদের ভাষা। ইসলাম প্রবর্তনের পরেই এ গড়ে ওঠে ইসলামী ভাষা হিসাবে। উহু ভাষার ত কথাই নেই।...”

আত্মস্বাক্ষর ভারত-ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়া লেখক তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন।

ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন বাণিজ্য চুক্তি

মস্কো ৮ই এপ্রিল—পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে বাণিজ্যের সম্ভাবনা ও সমাজের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতি আত্ম বিশদভাবে আলোচনা করেন।

আর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ কনজ সভার অধিক সদস্য ও ব্রিটেনের জটনৈক প্রতিনিধি মিঃ সিডনী সিলভারম্যান অতঃপক্ষে ঘোষণা করেন যে, চীনা প্রতিনিধির সহিত উভয় দিক হইতে এক কোটি ষ্টালিং-এর বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁহাদের এক চুক্তি হইয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটেন চীনে যে মাল রপ্তানী করিবে তার শতকরা ৩৫ ভাগ বস্ত্র, ৩০ ভাগ রাসায়নিক দ্রব্য ও ৩৫ ভাগ বাতবস্ত্র হইবে। ইহার বিনিময়ে চীন শতকরা ২৫ ভাগ কয়লা, ২০ ভাগ ডিম ও ডিম্বজাতীয় দ্রব্য ও ৫৫ ভাগ সোয়াবিন, তৈলবীজ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য ব্রিটেনে রপ্তানী করিবে।

ব্রিটিশ ও চীনাদের মধ্যে পদ্ধতিবিনিময়ের দ্বারা চুক্তি সমাপ্ত হয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের পক্ষে বলা হয় যে, যে সকল দ্রব্য ক্রীত ও বিক্রীত হইবে উভয় দিক হইতেই তাহার মূল্য এক কোটি ষ্টালিং করিয়া হইবে এবং ১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই বাণিজ্যিক লেনদেন শেষ করিতে হইবে। পক্ষে এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, প্রতিনিধিরা ব্যাপ্ত ও গোষ্ঠীগতভাবে পরিকল্পিত বাণিজ্য কার্য্যকরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনার আন্তরিক চেষ্টা করিবেন। অবশ্য উভয় সরকারের বাণিজ্যের লাইসেন্স মঞ্জুরের উপরই উহা নির্ভর করিতেছে।

চীন প্রতিনিধিদের পক্ষে বলা হয় যে, ব্রিটেন ও চীনের জনসাধারণের পারস্পরিক সুবিধার জন্য ব্রিটিশ ও চীনা প্রতিনিধি দল পক্ষে বর্ণিত সর্বের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে কি কি দ্রব্য বিনিময় হইবে পক্ষের সহিত এখিত এক স্মারকলিপিতে তাহার বিবরণ দেওয়া হয়। ব্রিটেন

চীনের নিকট যে বস্ত্র বিক্রয় করিবে তাহাতে পশু ও বিভিন্ন তুলাজাত দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে।

মিঃ সিলভারম্যান বলেন যে, ইতিমধ্যেই কয়েকটি আদান-প্রদান হইয়াছে হইয়া গিয়াছে। অতঃপক্ষে আদান-প্রদানের জন্য ব্রিটিশ ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল শিকিৎ অথবা লণ্ডনে চীনা বাণিজ্য দূতাবাস না থাকিলে বার্লিন যাইবেন।

রুশ ও ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি মিঃ বাসেলি কোসনেভফ বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের কার্য্যকরী কমিটির সভাপতি লর্ড বরোড ওরের সহিত সামাজিক সমতার সমাধান-কল্পে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয় আলোচনা করেন।

রাশিয়া ও পশ্চিমী গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারিত বাণিজ্যের জন্য রুশ প্রতিনিধি দলের সদস্য যে প্রস্তাব পেশ করেন মিঃ কোসনেভফ তাহা আরও সম্প্রসারিত করেন। তিনি বলেন যে, রাশিয়া পশ্চিমী গোষ্ঠীর নিকট হইতে জিনিষপত্র ক্রয়ের যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ফলে তিন বৎসরের জন্য ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, জাপান ও ইটালীর অধিক সমস্ত সমাধানে সাহায্য হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ইটালীর নিকট রাশিয়া যে অর্ডার পেশ করিয়াছে তাহার ফলে ইটালীর জাহাজী অধিকদের বেকারত্ব হ্রাস হইবে এবং পূর্ণ সময়ের জন্য তাহার কার্য্য পাইবেন।

অনুরক্ত দেশগুলির বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে রুশ বাণিজ্য সমিতির জটনৈক মুখপাত্র দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির কাঁচা মালের বিনিময়ে যন্ত্রপাতি ও সাঁজসজ্জাম সরবরাহের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ দেন।

সকল প্রতিনিধি দলই বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কে সোভিয়েট ও অস্ত্র প্রতিনিধি দলের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

পার্লামেন্টের অধিক সদস্য সিডনী সিলভারম্যান চীনের সহিত বেসরকারী বাণিজ্য চুক্তির যে সংবাদ ঘোষণা করেন ব্রিটিশ বাণিজ্য বোর্ড ভৎসম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

বোর্ডের জটনৈক মুখপাত্র বলেন যে, তাহার চীনের সহিত বাণিজ্য পরিচালনার প্রয়াসী অবশ্য যে সকল দ্রব্য বিনিময়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে ভৎসম্পর্কে তাহার কিছু বলিতে চাহেন না।

মিঃ সিলভারম্যান স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাহার বেসরকারী প্রতিনিধি দলের সদস্য এবং তাহাদের কোন সরকারী মধ্যদা দেওয়া হয় নাই। সেজন্য তাহার যে চুক্তি করিবেন তাহা অবশ্যই আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য লাইসেন্সের আওতার পড়িবে।

লণ্ডন ৮ই এপ্রিল—এশিয়ার দেশগুলির উন্নয়নের জন্য পাক-প্রতিনিধি যে ষ্টালিন পরিকল্পনার প্রস্তাব করিয়াছেন

ভ্রমসম্পর্কে কোন প্রকার সম্ভাব্য করিতে ব্রিটিশ সরকারী মহল অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

বেসরকারী ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক মহল এশিয়ার দেশগুলিকে যত্নপাতি সরবরাহে রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট দেশগুলির অস্বীকার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এশিয়ার দেশগুলির যত্নপাতি ও সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কম্যুনিষ্ট দেশগুলির নিজেদের শিল্পায়নের জন্য অল্পকাল প্রকার যত্নপাতির প্রয়োজন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এশিয়ার অল্পমাত্র দেশগুলিকে যত্নপাতি সরবরাহ করা কতদূর সম্ভব হইবে তাহারা ভাড়া বলিতে পারেন না। বস্তুতঃ সোভিয়েট ইউনিয়নই চেকোস্লোভাকিয়ার নিকট হইতে যত্নপাতি ক্রয় করিতেছে।

লণ্ডন, ৯ই এপ্রিল—ব্রিটিশ বাণিজ্য বোর্ড আজ এ বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রিটেন ও রাশিয়া অথবা চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের কোন বাধা নাই। অবশ্য রাশিয়া ও চীনের মনোভাবের উপর উহা নির্ভর করিতেছে।

ব্রিটিশ বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি মিঃ পিটার নিয়োল্ড যুদ্ধে বিরতি দিয়াছেন : সভাপতি বলিতেছেন যে, চীনের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে ব্রিটেন বরাবরই সম্মত আছে এবং হুং ও সাংহাইয়ের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা ব্যবসায়ীরা ইহার চেষ্টা করিতেছেন।

চীনারা যদি বাণিজ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে তাহারা উক্ত ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পারেন, অন্যথায় সরকারীভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতে পারেন।

ব্রিটিশ বঙ্গ-শিল্পের ৭৫ হাজার শ্রমিক যে বেকার আছে তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্য বোর্ডের বিরতিতে বলা হয় যে, ব্রিটিশ পণ্যক্রয় বিশেষতঃ বস্ত্র ক্রয়ের জন্য লণ্ডনস্থ কৃষ প্রতিনিধির নিকট তাহারা গত ছয় মাস ধরিয়া অহুত-বিনয় করিতেছেন। ইহার বিনিময়ে তাহারা রাশিয়ার কিছু মাল কিনিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। এমনকি বাণিজ্য দূতাবাসে বিভিন্ন বস্ত্রের নমুনা প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং মূল্যও জানান হইয়াছিল, কিন্তু এই সম্পর্কে আর কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

জাপান রাশিয়া ও চীনের নিকট হইতে আশী লক্ষ টন উত্তম কয়লা ক্রয় করিতে চাহে বলিয়া জনৈক জাপানি মহিলা প্রতিনিধি আজ জানাইয়াছেন। ইহার বিনিময়ে জাপান রাশিয়া ও চীনকে কৃত্রিম রবার, রেশম ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করিবে।

রাষ্ট্রসভা রিপোর্ট পেশ

বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধন কমিটির সভাপতি ও পোল্যান্ডের সদস্য অধ্যাপক ওস্কার লান্দে মস্কো অর্থনৈতিক

সম্মেলনের বিবরণ রাষ্ট্রসভা পেশ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন।

অধ্যাপক লান্দে বলেন যে, সাধারণ পরিষদকে মস্কো সম্মেলনের রিপোর্ট শুনিতে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারদের এক সম্মেলনে আহ্বান করিতে বলা হউক।

পশ্চিমী গোষ্ঠীর সহিত আগামী দুই-তিন বৎসরে তাহারা ৫৩৫ কোটি হইতে ৬৭৮ কোটি ষ্ট্যালিং-এর বাণিজ্য করিতে দিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া অধ্যাপক লান্দে জানান।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর সহায়ক। সেই হিসাবে এই সকল চুক্তির গুরুত্ব অপরিমেয়। কিন্তু শান্তি ও মৈত্রী তখনই আসিবে যখন এইরূপ আদান-প্রদান মুক্ত ভাবে চলিবে এবং প্রত্যেক দেশই স্বাধীন ভাবে লেন দেন করিবে। সেই জন্য এই চুক্তি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতে চাই। মস্কো নগরীতে চীনা প্রতিনিধির ঘন ঘন উপস্থিতি চীনের মধ্যস্থতা হানি করে। ব্রিটেন মস্কোতে রাশিয়ার সঙ্গে ও পিকিং-এ চীনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করিলে এই সন্দেহ মনে জাগিত না।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি

গত ১৯শে বৈশাখ কলিকাতায় নিখিল-ভারত মাস্তাবাদী কংগ্রেস রক্তের ওয়াশিং কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। ২১ দিন এই অধিবেশন চলে। মধ্যে মধ্যে অধিবেশন বন্ধ ছিল। ছেমারেল মোহন সিং ওয়াশিং কমিটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। নিখিল-ভারত কংগ্রেস রক্তের ইতিহাসে এই অধিবেশনটি দীর্ঘতম অধিবেশন। কমিটির সভায় ৩৫ হাজার শ্রমিকমণ্ডলিত কংগ্রেস রক্তের খসড়া বিজ্ঞপ্তি-প্রবন্ধ গৃহীত হয়। সে সকল মুদ্রিত হওয়ার পর উহা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইবে।

ওয়াশিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, নিক্রীচনের পূর্বে ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালে নিখিল-ভারত কংগ্রেস রক্তের বাকমণ্ডলীদের সকলের সম্মিলিত দল গঠনের জন্য সম্মিলিত সমাজতন্ত্রী প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের সমাজতন্ত্রী দল এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকট পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানান সত্ত্বেও তাহারা এই প্রতিষ্ঠানে যোগ না দিয়া বাকমণ্ডলী একা সম্পাদনের কার্যের অশেষ ক্ষতিসাধন করিয়াছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টি আরও একটু অগ্রসর হইয়া আঞ্চলিক গণ-ভাজিক দল গঠন করে। নিক্রীচনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ঐক্যাত্মিক ইচ্ছার অনেকগুলি আসন ত্যাগ করিয়া আমরা কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত নিক্রীচনী মৈত্রী সম্পাদন করি।

কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত সহযোগিতা করিয়া এই অভিজ্ঞতাই

হইয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ বামপন্থী একা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহশীল নহে। তাহারা কেবল তাহাদের দলের সুবিধার জন্য বামপন্থী একা প্রতিষ্ঠাকে কাজে লাগাইতেছে। বিভেদ এবং বিশ্বাসঘাতকতা যেন তাহাদের মজ্জাগত। তাহাদের কোন পরিবর্তন হয় নাই এবং কোন পরিবর্তন হইবেও না।

“ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্কটময় মুহূর্তে তাহারা সকল সময়েই দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা, নেতাজী এবং আজাদ হিন্দ কোডের গৌরবজনক কার্য্যকে উপহাস, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ছদ্মভিত্তিমূলক ধর্ম্মি তুলিয়া পাকিস্থান সৃষ্টিতে তাহাদের সমর্থন, সম্মিলিত সমাজতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন, কাম্মীর সম্পর্কে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সাম্প্রতিক ধর্ম্মি এবং দেশরক্ষা বাজেটের ৫০ ভাগ হ্রাস করা সম্পর্কে তাহারা যে নুতন ধর্ম্মি তুলিয়াছে, তাহা আকস্মিক ব্যাপার নহে।

“করোয়ার্ড ব্লক গভীর উৎসর্গের সহিত তাহাদের অতীত ও বর্তমান কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছে এবং দেশের স্বার্থের জন্য তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও করোয়ার্ড ব্লক অভ্যন্তরীণ সন্দেহান।

“কম্যুনিষ্ট পার্টি বর্তমানে সংস্কারপন্থী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ ও সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের সহিত একযোগে সরকার গঠনের পরিকল্পনা করিতেছে। তাহাদের গণতান্ত্রিক প্রণেতার কার্য্যকলাপে বুঝা যায় যে, জেগী সহযোগিতার মতবাদকে তুচ্ছ করার জন্য জেগীসংগ্রামকে উপেক্ষা করা হইতেছে।

“কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে করোয়ার্ড ব্লকের সহজাত কোন বিবেচ ছিল না। আজ তাহাদের কার্য্যকলাপে দেশ-দ্রোহিতার পরিচয় পাইয়া সেই বিবেচ জন্মিয়াছে।”

মাজাজের প্রধানমন্ত্রী ত্রিচক্ষুবর্তী রাজাগোপালাচারিয়া গত ২৬শে বৈশাখ যে ঘোষণা করেন তাহা গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রদরাদরদের তেলেদানাও মাজাজের প্রতিবেদী। তেলেদানার কম্যুনিষ্টরা কি বিপর্য্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সুবিদিত। অনেক কথা আমরা জানি না, যাহা এই দুই রাষ্ট্রের শাসকবর্গের নখাণ্ডে। সেই ভিত্তি অভিজ্ঞতার কলেই রাজাজী-ঘোষণা করিয়াছেন : “আমি কম্যুনিষ্ট পার্টিতে অস্ত্র কোনও দেশ অপেক্ষা ভারতের পক্ষে অধিক বিপজ্জনক বলিয়া মনে করি। সেই কারণে আমি আপনাদিগকে (কম্যুনিষ্ট-গণকে) বলিতে চাই যে, আপনারা আমাকে আপনারদের এক নম্বর শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইবেন।”

রাজাজীর এরূপ ঘোষণার আসন্ন কারণ আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি। ভারতবর্ষের এই “বিত্তীয়” দল যত

দিন নিম্নলিখিত হইবে, তত দিন দেশবাসী স্বস্তিতে থাকিতে পারিবে না। এই সমস্ত রাজাজীর সুস্পষ্ট ঘোষণা আমরা সম্যকোচিত বলিয়া মনে করি।

গারো পার্বত্য এলাকা

গত ১লা বৈশাখ গোহাটি হইতে ১৯০ মাইল দূরে তুরা শহরে (পার্বত্য গারো অঞ্চলের প্রধান শহর) ত্রিবিষ্ণুদাস যেহি এই এলাকার জন্য স্বাধীন জেলা পরিষদের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে প্যারেড এটিতে উপজাতীয় জনগণের এক সমাবেশে বক্তৃত্য বলেন, “আপনারা যাহাতে নিজেরদের আশা-আকাজ্জার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আপনারদের জেলা শাসনের কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন, তদুপযোগী একটা প্রতিষ্ঠানকে চালু করিয়া দিবার জন্যই আমি আজ এখানে আসিয়াছি।”

জেলা পরিষদের কর্ম্মভার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, জেলা পরিষদের কর্ম্মতা ব্যাপক রকমের, প্রকৃত পক্ষে দেওয়ানী কোজদারী বিচার ও শাসনকার্য্য পরিচালনের সমুদয় কর্তৃত্বই উহার রহিয়াছে। জেলা পরিষদ জমি বটন অধিকার ও ব্যবহার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন, পল্লীর অরণ্যের উদ্ভাবন, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিধি-ব্যবস্থাদি করিতে পারিবে। উহা ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় এবং কর নির্ধারণও করিতে পারিবে।

এই জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ অপূর্ণ্যাপ্ত। এই অঞ্চলে যে উচ্চ স্তরের কয়লা ও চুনা পাথর রহিয়াছে তাহা যখন আহরণ করা সম্ভব হইবে তখন জেলা যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে। গারো জাতীয় পরিষদের সভাপতি ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন সাংমা এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট গারো-নেতা সভায় বক্তৃতা করেন।

আমরা আশা করি যে, স্বায়ত্তশাসনের প্রথম পদক্ষেপ সূত হইবে, এবং এই সরল জাতি ভারতবর্ষের আশা-আকাজ্জার সঙ্গে নিজেরদের স্বার্থ ও আশা মিলাইয়া দিতে সমর্থ হইবে। এখন পর্য্যন্ত আসামের ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যন্ত প্রদর্শনের লোকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই প্রাধান্য সংযত করিয়া স্থানীয় লোকের মর্য্যাদাকে সম্ভব করিয়া দিতে হইবে।

আর্য্য সমিতি (বেহালা)

বেহালা আর্য্য সমিতির রক্ত-জয়ন্তী উৎসবের বিবরণ আমরা পাইয়াছি। প্রায় ৬৮ বৎসর পূর্বে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্বে “সারস্বত সমিতি” নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল; তারই ভগ্ন-ভূপের উপর এই নুতন গাছটি গজাইল। গান, বাজনা, ভাসের আড্ডা হইতে এই প্রতিষ্ঠান আজ এক অঞ্চলের সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কার্য্যবিবরণীতে বহু উৎসবের ছলনা ও সাংস্কৃতিক

আলোচনার বিবরণ দেখিতে পাইলাম। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি :

“হুঃ পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে এবং এদের ভবিষ্যৎ জীবন যাতে সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের বেতন এবং পাঠ্য পুস্তক দান করে এদের শিক্ষালভের পথ সুগম করে তুলতে সাহায্য করে আসছে। এখানে প্রধানতঃ দীকার করছি যে অল্পসংখ্যক হালদার মহাশয়ের সহযোগিতা ত্রিপুরা দেবী হুঃ ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্যবান এই সমিতিতে এককালীন এক সহস্র টাকা দান করে আরও কার্যে সহায়তা করেছেন। স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সম্পাদকদ্বয় সমিতির প্রেরিত কয়েকজন ছাত্রকে বিনা বেতনে বা অর্ধবেতনে শিক্ষা-লাভের সুযোগ দান করে আমাদের শিক্ষাসেবাকে সুকর করে তুলেছেন। ফেব্রুয়ারি আমাদের বেহালা ও সংলগ্ন গ্রামের মধ্যেই আমাদের এই শিক্ষাসেবা আবরু ময়—উপযুক্ত ভূমিাদি সংগ্রহ করে মকঃবলের কয়েকটি ছাত্রকে ও পুস্তকাদি দান করা হয়েছে। এই সব দরিদ্র ছাত্রের লেখাপড়া যাতে গৃহ-শিক্ষকের অভাবে ব্যাহত না হয়, সেজন্য কয়েকটি শিক্ষিত গুরুণ কন্ঠীর তত্ত্বাবধানে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে।

“অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহে যারা অসমর্থ, রোগের সময় তাদের পক্ষে ঔষধ-পথ্য সেবা-শুশ্রূষার ব্যবহার কথা দিব্যবল যাত্র। সমিতির এই অভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে উপশম করবার আশায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অক্সান্ত কন্ঠী ত্রিশচন্দ্র হালদার মহাশয়ের স্থতিপুত ত্রিশচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়। গত চার বৎসরে মোট ৩১,০২৯ জন রোগী চিকিৎসা প্রাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া, রেড্ ক্রস্ সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হতে বিবিধ এলোপ্যাথিক ঔষধ ৩,২০০ জনকে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবস্থানস্বারে রোগীর পথ্য এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। ডাঃ ত্রিশাঙ্গিরাম যুগোপাধ্যায় মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে নিম্নমিত ভাবে অক্সান্ত সেবার দ্বারা এই কার্য সম্ভবপর করছেন।”

একটি মহিলা শিশু-বিদ্যালয়ের কর্মসূচির উল্লেখ দেখিলাম। তাহা বড় হইয়া ঘাইবার কোন কারণ দেখান হয় নাই। উপযুক্ত কন্ঠীর ও উৎসাহের অভাবই বোধ হয় কারণ। ইহার পরিচালক সমিতি আর একবার চেষ্টা করুন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক ও অধ্যাপক

গত ৯ই চৈত্র পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক ও অধ্যাপক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি সভার বার্ষিক অধিবেশন উলুবেড়িয়া শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর যথেন্দ্র সাহা সভাপতির কার্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার বক্তৃতায় এক শ্রেণীর শিক্ষকমণ্ডলীর মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, যারা গালাগালি দিয়াই নিজেদের কর্তব্য পালন

করেন। ডক্টর সাহা ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। গত কয়েক বৎসর হইতে তিনি হইয়া পড়িয়াছেন রাজনীতিক।

তাঁহার রাজনীতিক মতবাদ অস্বাভাবিক তিনি বলেন, “অর্থ পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য অর্থব্যয়ের সীমা নাই।” ছুই লোকে বলে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের নীতির জন্যই সকল দেশের সামরিক ব্যয় বাড়িয়া চলিতেছে।

অর্থব্যয় সম্বন্ধে ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমর্থনযোগ্য। নিজের কর্তব্য পালনের সহজ পথ তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে :

“অর্থের অভাবই শিক্ষা প্রসারের একমাত্র বাধা নহে।... নিষ্ঠা থাকিলে অর্থব্যয় আপনাই হয়।... স্বাতন্ত্র্যের দ্বাধ্যমে অবিলম্বে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।... স্বাধীন ভারতকে সম্পূর্ণাঙ্গী করিয়া ভোলায় যুগ আসিয়াছে। ইহার জন্য কর্মীর প্রয়োজন। শেখান বুলি কপটাইলে চলিবে না। শুধু বড় বড় বুলি আওড়ালেই চলিবে না। এই কার্যে শিক্ষা-ব্রতীদের গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে।”

এই কথার তুলনায় ডক্টর সাহা অভিত্যয়ণ কত অকিঞ্চিৎকর।

ষ্টাফোর্ড ক্রিপস

বর্তমান যুগের বিলাত নানাভাবে বিপন্ন। যুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ নয়। তাহার সাম্রাজ্যবাদের অবসান বা ভগ্নদশাও কারণ নয়। সমাজ-জীবনে কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। একটা কথা বলিতে পারা যায় যে, বিলাতের বক্ষিত শ্রেণী সজাগ হইয়াছে, সাম্রাজ্যের চাকচিক্যে আর ভুলিবে না।

লর্ড শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ক্রমে ক্রমে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। ষ্টাফোর্ড ক্রিপস তাহার প্রমাণ। বিলাতের প্রাক্তন লর্ড-চ্যান্সেলর লর্ড পারমুরের পুত্র, মিছে প্রসিদ্ধ আইনজীবী, নিরামিষাশী, সংযতজীবন এই ব্যক্তি শ্রেণীর স্বার্থে ভুলিলেন না। জমিক দলে যোগদান করিয়া নিজের ভাগ্যব্রতের পরিচয় দিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার সর্বকর্মে সাথী, সচিব ছিলেন।

গত ৮ই বৈশাখ হুইজারল্যাণ্ড রাষ্ট্রের জুরিক শহরে লেডী ক্রিপস সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তাঁহার স্বামী ঐ রাষ্ট্রে ১১ ঘটিকার সময় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যত্নকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের জীবনকথা বর্তমান ব্রিটেনের অদ্ভুত উন্নয়ন চাক্ষুণ্যে যেমন তাঁহার দেশকে রক্ষা করিয়া অমর কীর্তি অর্জন করিয়াছেন, সেইরূপ ষ্টাফোর্ড ক্রিপস দেশের অর্থ-নৈতিক বিশৃঙ্খলা ও শোষণ-ক্রিয়া দূর করিয়া জাতির জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি দার্শনিক ছিলেন।

কাজ ও অকাজ

ত্রিবারদাচরণ গুপ্ত

গীতায় জ্ঞানযোগের বিবৃতিপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলেছিলেন, কৰ্মের মধ্যে অকৰ্ম, আর অকৰ্মের মধ্যে কৰ্ম যে দেখতে পায় মাহুঘের মধ্যে সে-ই বুদ্ধিমান। দেশে তখন শস্ত্র আর শাস্ত্রের যুগ্ম আধিপত্য স্বপ্রতিষ্ঠিত; বর্ণাশ্রম ধৰ্ম দ্বারা সমাজ তখন বিনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত। অনাগত কলির সেই আদিম উষ্ম বুদ্ধিমানেরই যে সংজ্ঞা, তার আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত বাদ দিলেও, ওটা শুধু মৌলিক এবং সময়োচিতই হয় নাই, সার্থকও হয়েছিল। আজ কিন্তু কলির দীপ্ত মধ্যাহ্নে, অন্ধাবিরহিত বুদ্ধির জৌলুসে সবাই আমরা অপরের কৰ্মের মধ্যে অকৰ্ম, আর নিজের অকৰ্ম, এমন কি অপকৰ্মের মধ্যেও কৰ্মের সন্ধান অহরহই পাচ্ছি। কাজেই বুদ্ধিমানেরও সংজ্ঞা এবং প্রশস্তি বর্তমান যুগে বাতিল না হলেও নিতান্তই যে বাহুল্যের পর্যায়ে পড়ে গিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এ যুগে যদি মানবদেহ ধারণ করে ভগবান আবার এদেশে অবতীর্ণ হন, তবে মানব-বুদ্ধির অভাবনীয় অভিব্যক্তি দেখে অতিমাত্র বিস্মিত তাঁকে হতেই হবে; আর এই বহু বর্ণাকৃতি বুদ্ধির ইঞ্জরাল থেকে মানবমনকে মুক্ত করার কাজটা যে তাঁর পক্ষেও সহজসাধ্য একটা ব্যাপার হবে না সেটাও স্বচ্ছন্দেই বলে দেওয়া যেতে পারে।

বুদ্ধির ইঞ্জরাল আমাদের সহজ দৃষ্টিকে সম্বোধিত করেছে আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য যেখানেই আমাদের আঙুল সমবেত চেষ্টার ঐকান্তিক প্রয়োজন সেখানেই নানা বুদ্ধি এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার সমাবেশ আসন্ন সমস্যার সমাধি-রচনায় ব্যাপৃত রয়েছে। খাদ্যাভাব বহুরের পর বছর স্বাধীন ভারতকে প্রপীড়িত করছে; আমাদের হাঁড়ির খবর বিদেশেও অজানা নাই। আমাদের দেশে কিন্তু এমন বুদ্ধিমানের অভাব নাই যাদের বিশ্বাস খাদ্যাভাব আছে বটে, কিন্তু শস্যের অভাব এদেশে আদৌ নাই, যথাস্থানে দক্ষিণা দিলেই যথেষ্ট খাদ্যশস্য পাওয়া যেতে পারে। তার পর উৎপাদনবুদ্ধি?—কে করবে?—কৃষক?—জমি কই?—জমিদারী-প্রথার বিলোপ না করলে কৃষির উন্নতি অসম্ভব। জমিদারী-প্রথার বিলোপ?—সে ত মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ। তার পর জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াবে?—সার কই?—কমপোষ্ট?—এ যুগে অচল। রাসায়নিক সার, খনিজ সার?—ওসব জমিকে ক্রমশঃ উষ্ম করবে, জমির পরকাল নষ্ট করবে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই যে সব বহু শাখাবিশিষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা এর শেষ কোথায়? সেই যে ছেলে-ভুলানো ছড়া আছে, “সই লো সই, তোর পুত কই—হাটে গেছে—কি মাছ এনেছে...” শেষ কথা তার হচ্ছে, “সভা কই—ভেঙে গেছে”। আমাদেরও ও-সব বুদ্ধি-বিবেচনা, জল্পনা-কল্পনার উপসংহারে তেমনিধারা সভা ভেঙে যায়। ছ’চার জন হয়ত আইন-সভায় বা বিজ্ঞান-মন্ডিরে তার জের টানে; বাকী সবাই বিষয়াস্তরে মনোনিবেশ করে। স্বল্প কাজের সঙ্গে বিশ্বের অকাজের ভেজাল দিয়ে জানে-অজ্ঞানে আমরা ক্রমাগত আত্মপ্রতারণের জেরই টেনে চলেছি। লোকশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কুটিরশিল্প, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব বিভাগেই এমনিধারা কর্মাকর্মবাদের সাধনাই ও অপসাধনাই সমানে চলেছে। সিদ্ধিও সাধনার অহরূপই হচ্ছে। এতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নাই, রাগ করবারও কারণ অধিকার নাই।

স্বরাজ বুদ্ধিমানদের বিচার-বিবেচনার বাহনে চড়ে এ দেশে আসে নাই—এসেছে বহু বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যা আর ত্যাগের মস্ত্রে প্রবৃত্ত কোটি কোটি নরনারীর ঐকান্তিক আহ্বানে। স্বরাজসাধনায় বিচারবুদ্ধির স্থান ছিল না এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় মোটেই; আমি শুধু বলতে চাই সে স্থান গৌণ। ঘোড়ার সঙ্গে লাগামের যে সম্বন্ধ গণ-আন্দোলনের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির ঠিক সেই সম্বন্ধ। ঘোড়ার অভাব লাগামের আফালনে পূরণ হয় না; বরং অমনধারা অপব্যবহারে ও-বস্তুর কার্যকারিতা ক্রমশঃ কমেই যায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আরও অনেক জিনিষের সঙ্গে এটাও নিঃশেষে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

গণদেবতার প্রসন্নতা যুক্তিতর্ক দিয়ে উদ্দীপিত হয় না। তার জন্যে চাই প্রত্যক্ষ অহুভূতির সোনার কাঠি। সে বস্ত্র গ্রোসের দরে রাস্তার মোড়ে ঘোড়ে বা হাটে-বাজারে বিক্রী হয় না। ওর যারা ভাগ্যবান, যাদেরকে বলে জাতির ভাগ্যবিধাতা, তাঁরা জন-গণ-মন-অধিনায়ক যিনি তাঁরই শুভ আশিষ রূপে আসেন যুগে যুগে। আর তাঁদেরই প্রদর্শিত পথে পরবর্তীকালে জনগণের অগ্রগতি হয় অব্যাহত। তাঁদেরই আদর্শ এবং প্রেরণাকে অবলম্বন করে জাতি হয় সম্ভববদ্ধ। সেই সম্ভবজন্মের ভারে আর আদর্শের ধারে সর্বপ্রকার অবল্যাণ আর অস্থম্বরের যুলোচ্ছেদ তখনই হয়

সম্ভবপর। এমনি করেই বিভিন্ন জাতি মানব-সভ্যতার ভাণ্ডারে নিজ নিজ বিশিষ্ট অর্ঘ্য নিবেদন করে এসেছে চিরকাল। বিশাল ভারতের মহাজাতিও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

২

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা যখন এক দিকে যাগ-যজ্ঞের রাজসিক আড়ম্বরে ক্রিয়, আর অপর দিকে কঠোর তপশ্চর্য্যার অল্পষ্ঠানে পরিক্রিষ্ট হয়ে উঠেছিল; যখন জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন ধর্ম্মহীন আর আধ্যাত্মিক জীবন নিরালস্য হয়ে পড়েছিল তখন বুদ্ধদেব এনেছিলেন এ দেশে সং সঙ্কল্প, সং জীবন, সং কর্ম্মের প্রাবল। এ প্রাবল শুধু ভারতের শুদ্ধপ্রায় ধর্ম্ম-জীবনকেই পুনরুজ্জীবিত করে নাই, এর ঢেউ সমসাময়িক সভ্য জগতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কেমন করে এটি সম্ভব হয়েছিল সেই স্মৃতির অতীতে—যখন রাস্তাঘাট ছিল অচল-আর যানবাহন ছিল আদিম! যে বিশ্বাসে পর্ব্বত টলানো যায়, বুদ্ধদেবের উত্তরসাধকদের প্রাণে সে বিশ্বাস ছিল, আর ছিল তাদের মৌল্যত্র এবং সংহতি। ‘বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি’র সঙ্গেই তাঁদের মূলমন্ত্র ছিল ‘সজ্জং শরণম্ গচ্ছামি’। এই আদর্শ-প্রীতি আর সজ্জ-শক্তিই বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম্মকে বিশ্বের দিকে দিকে আলোর মত, বাতাসের মত সহজেই ছড়িয়ে দিয়েছিল; যাতে করে ‘আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে তাঁর’।

তিন শতাব্দী আগে সর্বগ্রাসী ধর্ম্মাঙ্কতার কবল থেকে ধর্ম্ম আর কর্ম্মের স্বাধীনতাকে প্রাণপণে বাঁচিয়ে যে কয়টি ইংরেজ ব্রতচারী মহাসিকুর ওপারে গিয়ে নতুন জগতে নতুন স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন, তাঁরা সেই যে সেদিন পরস্পর মনে মন মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে দেশ-সেবা-ব্রতের সজ্জ-পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, জাতি-বর্ণ-ভাষা-ধর্ম্মনির্বিশেষে আমেরিকার প্রত্যেকটি নরনারীর মনে যুগ যুগ ধরে পুরুষপরম্পরাক্রমে তার প্রতিটি বাণীর অম্লরসন চলেছে। নানা ভাষা, নানা সম্প্রদায় আর বহু বিচিত্র সভ্যতার সমাবেশ হয়েছে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে। দু’ শতাব্দী আগেকার অজানা দেশের বৃকে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ছাড়া-ছাড়া, কাটা-কাটা কয়েকটা কৃষি-উপনিবেশ আজ আদর্শের মাহাত্ম্যে আর সজ্জশক্তির প্রভাবে এক মহাজাতিতে পরিণত হয়ে সভ্যজগতের রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করছে।

আদর্শ-প্রীতি এবং সজ্জ-শক্তির অপূর্ব্ব আর অমোঘ প্রকাশ ফুটে উঠেছে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্তিতে পৃথিবীর

ভূ-ভাগের ষষ্ঠাংশ জুড়ে আজ সোভিয়েট রাশিয়াতে। মধ্যযুগে তাতার-মোগলের নৃষ্ঠনে অত্যাচারে জর্জরিত আর আধুনিক ঐতিহাসিক যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজকীয় অরাজকতায় প্রদীড়িত ভীত, ত্রস্ত, মাহুষের অধিকারে বঞ্চিত রাশিয়ার মুচ্ছাক্ত ‘দরিদ্রনারায়ণ’ আজ সারা দেশে নতুন ধর্ম্মের সংস্থাপন করেছে।

যেচ্ছাতন্ত্র রাজশক্তির সমূল উচ্ছেদ আর সোভিয়েট শাসনযন্ত্রের সম্যক প্রতিষ্ঠা—এ দুয়ের মাঝখানে বছরের পর বছর—বারো বছর ধরে চলেছিল সে দেশে নানা অশান্তি, অনাচার, রক্তপাত, নির্কাসন, আভ্যন্তরীণ দলাদলির নানা বিরোধ-সংঘাত আর আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তির বিস্তার বাদ-বিতণ্ডা। সমস্ত ঝড়-ঝাপটা, আশা-আশঙ্কার মধ্যে রাশিয়ার গণতন্ত্র তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে অবিচলিত, দৃষ্ট পদক্ষেপে। মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে সোভিয়েট রাশিয়া কায়মনোবাক্যে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজনায় ব্যাপ্ত আছে। তার আদর্শনিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস আর সংঘশক্তি বিগত মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সর্গোরবে। আজ তার বিশাল দেশ থেকে অকর্ম্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের সমিধ তার জাতীয় মহাস্বার্থের হোমায়িক করেছে অনির্ব্বাণ।

আজ পাঁচ বছর হতে চলেছে ভারত রাজনৈতিক পরাধীনতার হীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে বিরোধের সূচনা, ১৯৪২ সালের ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের সংগ্রামাত্মক দিকে তার পরিসমাপ্তি হয়েছে। এই যে স্বদীর্ঘকালব্যাপী স্বাধীনতার সংগ্রাম, এ বিশেষ কোন এক বা একাধিক পলাশী বা পাণিপথের প্রাস্তরে অল্পশ্রিত হয় নাই; সমস্ত ভারত জুড়েই ছিল এর কুরুক্ষেত্র। আর জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক সমস্ত ভারতবাসীই ছিল এই স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিক। নানা মতে দীক্ষিত, নানা পথের পথিক, ভারতের অগণিত জনগণ এক স্লোকোশলী যণিকারের স্তনিপুণ হাতের ইঙ্গিতে, একে একে এসে একত্রিত হয়েছিল স্বাধীনতা-যুদ্ধের পতাকা-মূলে, ‘স্বত্রে যণিগণাইব’। আদর্শের প্রেরণায় অল্পপ্রাণিত, সজ্জ-শক্তিতে বলীয়ান ভারতবাসী সেদিন ‘সঙ্কটের কল্পনাতে ত্রিয়মাণ’ না হয়ে ‘দুর্দ্ধ কাঙ্জে নিজের কঠিন পরিচয়’ দিয়ে সারা বিশ্বের বিশ্বয় উৎপাদন করেছিল। সত্যের ‘পরে অটল থেকে ভারতবাসী শুধু স্বদেশে স্বরাজ আনে নি, সারা দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদে ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছে।

যে বিপুল জন-জাগরণের প্রাবল্য মাথায় করে এনেছিল স্বরাজ, সে কিন্তু বিজয়ের উল্লাসে অবলীলাক্রমে পায়ে ঠেলে দূর করে দিতে পারে নাই এদেশ থেকে বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার নানা উপদ্রব। স্বরাজ-সংগ্রামের তীব্রতা-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শাসনের নয় স্বরূপ যতই প্রকাশ পেতে লাগল, আমাদের উচ্ছ্বসিত স্বাধীনতাস্পৃহা তলার তলই চাপা পড়ে যেতে লাগল আমাদের নিজস্ব স্বরূপ। বানের জল অপস্থত হয়ে গেলে যেমন আবার ভেসে ওঠে যার যার স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে খাল-বিল, বাড়-জঙ্গল, ঘাট-বার্তা; স্বরাজ-সংগ্রামের সমাপ্তির পরে আমরাও তেমনি দেখতে পাচ্ছি সাম্প্রায়িক বিদ্বেষ, প্রাদেশিক স্বার্থতা, সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য আর সর্বোপরি অভাব আমাদের জাতীয় জীবনে রয়েই গেছে, ঠিক ব্যক্তির জীবনে ঘড়িরপুর মতই স্থায়ী বাসা বেঁধে।

আমাদের দেশ আয়তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক আর সোভিয়েট রাশিয়ার সিকি চাইতেও অনেক কম। অধিবাসীদের মধ্যে ভাষাগত বিভিন্নতা, সংস্কৃতিগত পার্থক্য আর প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য এই দুই দেশেও আমাদের দেশের চাইতে কোন কালেই কম ছিল না। এ সব সম্বন্ধেও কিন্তু উক্ত দুই দেশে আত্মকর্তৃত্ব লাভের অব্যবহিত পরেই সমষ্টিগত ভাবে জাতির সর্বস্বাধীন উন্নতির জন্য যে স্বল্প সাড়া পড়ে গিয়েছিল আমাদের দেশে ঠিক তেমনি পড়ে নি। দেশের নেতৃস্থানীয় যারা তাঁদের অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ, এক কথায় তামসিকতাই এর জন্য দায়ী। খাদ্যসঙ্কট, পুনর্বাসন-সমস্যা এ সবের অজুহাত আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩

চলতে গেলে মুখ সামনের দিকে রাখা আবশ্যক—এটা ত নিতান্তই আটপোরে সত্যি কথা। আর দ্রুত চলতে হলে কাঁধের বোঁচকা যত হালকা হবে ততই যে সুবিধা, এটাও মোটেই আদর্শবাদ নয়। এ দেশের বুদ্ধিমানদের পক্ষে এই দোজা কথা দুটো বুঝা কিন্তু ক্রমশঃই দুরূহ হয়ে উঠছে। চলার প্রস্তাব মাত্রই তাঁদের দৃষ্টি আশে-পাশে পিছনে হারিয়ে যায়; আর বোঁচকাও কোনটা ফেলে যে কোনটা নেবেন সঙ্গে সে সমস্তাও শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে যায়। বুদ্ধির আতিশয্যে কর্মক্ষমতার সংঘম করে মনে মনে তারা যে কর্মস্থলী খসড়া গড়েন আর ভাঙেন, ভাঙেন আর গড়েন গীতার ভাষায় তাকেই বলে মিথ্যাচার।

এদেশে এমনটা কিন্তু চির দিন ছিল না। তা যদি থাকত তা হলে রাম-লক্ষ্মণকে খামকা বনে যেতে হ'ত না;

আর ভীষ্ম-দ্রোণও বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধ করে মারা না পড়ে হত আরও অনেক দিন বেঁচে থাকতেন। আসল কথা, পরাধীন হয়ে দিনের পর দিন ভারত অনেক কিছুই হারিয়েছে বহু শতাব্দী ধরে; হারায় নি শুধু তার বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। পালাজরে দীর্ঘকাল ভুগলে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লীর্ণ হয়ে রোগীর চোখ দুটো হয় অস্বাভাবিক উজ্জল, আর মাথাটি দেখায় যেমানান রকমের বড়,—এও কতকটা তেমনি।

পুরোনো পৃথিবীর গ্রীস, ইটালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন দেশে স্বদীর্ঘ দু'হাজার বছরের অবিরাম চেষ্টায় জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি মানব-সভ্যতার বিভিন্ন বিভাগে যতটা সংস্কৃতি, সমৃদ্ধি, উন্নতি সম্ভব হয়েছে, নতুন পৃথিবীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মাত্র দু'শ বছরে কোন কোন ক্ষেত্রে তা ছাড়িয়ে গেছে অনেক দূর। যাত্রার পথে মার্কিনের মুখ বরাবরই ছিল সামনের দিকে; আর বোঁচকা-বুঁচকির বালাইও তার ছিল না প্রায় কিছুই। সভ্যতার খোসাভূষি, ধর্মের কচকচি, মতামতের বেধায়েষি, রাজনীতির দলাদলি, সাম্প্রায়িকতার হানাহানি—এ সব পিছনে ফেলে রেখে শুধু সভ্যতার শাস্ট্রকু সঞ্চল করে সে এসেছিল নূতন জগতে নূতন জীবনের সন্ধানে। ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান—সবাই এসে এই নূতন রাষ্ট্রে হয়েছিল আমেরিকান। পুরাতন অতীতকে সেলাম ঠুকে তারা সবাই মিলে নূতন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কাজে লেগে গিয়েছিল কায়-মনোবাক্যে। আজ পুরাতন তার দুয়ারে মাথা বুটছে নিতান্ত প্রাণের দায়ে। আমেরিকার লোকের বুদ্ধি নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য সেখানে আছে মাত্র দুটি রাজনৈতিক দল।

আর সোভিয়েট রাশিয়াতে ত তাও নাই। সেখানে একশ্চলন্তমো হস্তি। মাত্র একটি দল। নির্ধম হস্তে সমস্ত জঙ্গল-জঙ্গল সাফ করে তারা জাতীয় জীবন নিজস্ব প্রণালীতে আবাদ করে সোনা ফলাচ্ছে। দৃষ্টি তাদের সামনের দিকে; পিছু ডাকবার তাদের কেউ নেই। অতীতকে তারা পেন্সন দেয় নি,—দিয়েছে বিদায়। কাজেই যাত্রাপথে বোঁচকা-বুঁচকির বালাই তাদেরও নেই মোটেই। ঐতিহ্যের ভারে বিব্রত আর আর দেশে শত-বর্ষে বা সম্ভব হয় নাই, সোভিয়েট রাশিয়াতে এক দশকে তা সুসম্পন্ন হয়েছে। মোদল, তাতার, কালমুক, কশাক ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ অশান্ত হৃদ্বাস্তুর মনে আদর্শের আলো, দিকির আকাঙ্ক্ষা, কষ্টের উন্মাদনা আনবার জন্যে সেদেশে বিপ্লবের পরে কয়েক বছরের মধ্যেই কোটি কোটি

পুস্তক-পুস্তিকা প্রণীত ও প্রচারিত হয়েছে; হাজার হাজার বিদ্যালয়, কলাভবন, শিল্পায়তন গড়ে উঠেছে বিশাল দেশের সর্বত্র। সে দেশের বুদ্ধিমানদের ঐকান্তিক প্রযত্ন হয়েছে আপামরসাধারণ সবারই মনে নব-উন্মেষিত মুক্তির চেতনাকে জাগ্রত রাখা; মুক্তির আলোক-শিখাকে প্রোজ্জ্বল করা, উদগ্ৰ করা, উন্নতির পথে তাদের সমস্ত কর্মশক্তিকে সঞ্চারিত করা।

কর্মযজ্ঞের এই যে বিপুল সমারোহ, যাঁরা মনে করেন এর পিছনে রয়েছে শুধু “রেড টেরর” বা বলশেভিক অবরুদ্ধতা; দৃষ্টি তাঁদের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, আগুনের অল্পভূতি, হতে তা বঞ্চিত। স্বরাজ্যভের পরে জাতির গঠনমূলক কর্মক্ষেত্রে যে দৈন্য তার কৈফিয়ৎ হিসাবে যাঁরা খাদ্যসঙ্কট, পুনর্বাসন সমস্যা ইত্যাদির অবতারণা করেন, আর যাঁরা তার প্রতিবাদকল্পে রামরাজ্য-কম্যুনিজম ইত্যাদির জিগীর তোলে, সবাই তাঁরা আগুনের স্বল্পতাকে চাপা দিতে ধুমলোকেরই সৃষ্টি করেন। আসলে, আগুন জ্বালাতে হলে আর তা জ্বীয়ে রাখতে হলে বিস্তর কাঠ-খড়ের দরকার। যজ্ঞের আগুন সযত্নেও ঐ কথা। ওতে চাই ত্যাগের সমিধ। দেশে ঐ বস্তুই বর্তমানে সমূহ অভাব হয়ে পড়েছে। ত্যাগের আর প্রয়োজনীয়তা নাই; বরং এই মনোবৃত্তি প্রকট হয়ে উঠেছে যে, দেশে ভোগের চাহিদা যতই বাড়বে, উন্নতিও ততই দ্রুত হবে। খুব সম্ভব স্বাধীন দেশের শ্রেষ্ঠ লোকেরা এই রকমই আজকাল ভাবছেন। অন্ততঃ তাঁদের আচরণ থেকে ইতরসাধারণ এই শিক্ষাই পাচ্ছে।

ফলে আমাদের কর্মযজ্ঞ দক্ষযজ্ঞ রূপান্তরিত হতে চলেছে শটেনঃ শটেনঃ। যজ্ঞক্ষেত্রে বিভিন্ন বাহনে সমারুঢ় নানা গ্রহরণধারী বহু দেবদেবীর সমাগমে শিব অদৃশ্যপ্রায় হয়ে গিয়েছেন। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যাদের দেখা মেলে নি; অথবা কবির ভাষায় যাঁরা তখন ‘চিত্রিত পুতলিপ্রায় দাঁড়াইয়া এক ধারে’, ‘রণ-পয়োধির উর্ধ্বমালা’-‘গণ’ ছিলেন, আজ তাঁরা প্রাণবন্ত হয়ে স্বাধীনতার পংক্তিভোজে আগের সারিতে বসবার দাবিতে মুগ্ধ হয়ে উঠেছেন। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, এঁরাই আবার বলছেন—এখনও ভারতের সত্যিকারের স্বাধীনতা অজ্ঞিত হয় নাই; আর তৎপর হয়েছেন যথাসম্ভব সমস্ত দেশে তা আনতে। ইতিমধ্যে কিন্তু এই ‘ভূয়ো’, ‘তীবোদারি’ স্বাধীনতার কাছেও এঁদের দাবির অন্ত নাই, আবদারের অবধি নাই।

এই যে ‘গাছেরও খাই তলারও কুড়াই’ মনোভাব, এটা স্বস্থও নয় স্বাভাবিকও নয়। অথচ এই মনোভাবই

ক্রমাগত দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিঘ্নিত করেছে বছরের পর বছর। তাগ আর নিষ্ঠার পুত, সত্য আর অহিংসায় উদ্দীপ্ত কর্মপ্রবাহের অভাবেই দেশে এই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি সম্ভব হয়েছে। যাঁরা বুদ্ধির জোরে আজ অকর্মকে কর্ম আর কর্মকে অকর্ম প্রমাণিত করছেন, যাঁরা সহযোগিতার পরিভ্রমের বদলে সমালোচনার কসরৎ দিয়েই লোকসেবা করছেন, তাঁরা শুধু দেশের অগ্রগতিই ব্যাহত করছেন না, জনগণের মনকেও বিভ্রান্ত করছেন। আর যাঁরা আশা করছেন, দেশজোড়া এই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির পরিণতি চরমে পর্য্যবসিত হবে কম্যুনিজমে—তাঁরা জানেন না কম্যুনিজম কোন্ ধাতুতে গড়া, তাঁরা চেনেন না তাঁদের স্বদেশকে।

এই স্বজলা স্বফলা দেশে ব্যাপক অকর্ম আর অপকর্মের যোগাযোগে যা আসবে, নাম তার যাই হোক বস্তুতঃ তা হবে পরাধীনতা। দুই আর দুইয়ে চার হওয়ার মতই এটা এ দেশের পক্ষে স্বাভাবিক। এ দেশের ইতিহাসে এর নজিরেরও অভাব নাই। স্বয়ং বিশ্বকর্মার হাতেগড়া উত্তরের উদ্ভুদ্ধ প্রাকার আর দক্ষিণের অসীম অতল পরিখাও এ দেশকে বিদেশীর লুন্ড দৃষ্টি আর নির্যম লুণ্ঠনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে নাই সেকালে। একালেও পারবে না, যদি এ দেশের বুদ্ধিমানেরা দলাদলির অসংখ্য পাঁচিল ভুলে আমাদের স্বাধীনতার বরণাধারাকে ক্রমাগত খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করার কাজেই তাঁদের সমস্ত বিজ্ঞাবুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য বিনিয়োগ করতে থাকেন।

অতীতে এ দেশে শৌর্ধ্যবীৰ্য্য, বিজ্ঞাবুদ্ধির অভাব ছিল না—একান্ত অভাব ছিল জাতীয় ঐক্যবোধের। আত্ম-ঘাতী অনৈক্যের ঐ ছিদ্রপথেই আমাদের স্বাধীনতার ভরা-ডুবি হয়েছে বারংবার। আর ঐ অনৈক্যের জয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের আজকের এই স্বাধীনতা। এ কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে যে, আমাদের স্বাধীনতার সার্থকতা আর শক্তি একান্ত ভাবে নির্ভর করবে আমাদের সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার উপরে। আমাদের জাতীয় একতাবোধ যতই দৃঢ় হবে স্বাধীনতা আমাদের ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ পথে যেতে হবে আমাদের এখনও বহু দূর।

আমাদের জাতীয় জীবনে বা সমাজদেহে মানবতার বিরোধী, উন্নতির পরিপন্থী যা-কিছু আর যত কিছু অনাচার অবিচার বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে, আর নিষ্পূল করে তাদের উচ্ছেদসাধনের কাজে দেশের শুভাকাজক্ষীদের মধ্যে মতবৈধের অবকাশ কোথায়? অশিক্ষা আর অস্বাস্থ্য

বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণায় কার আপত্তি হতে পারে? কৃষি, পল্লীশিল্প, প্রামোদ্যনের কাজে কৰ্মীদের মধ্যে দলাদলির স্থান কোথায়? এ সব এবং আরও অনেক কাজ ছড়ানো রয়েছে এই বিশাল দেশের বুক জুড়ে সেবাত্রত কৰ্মীর প্রতীক্ষায়।

পরাদীন ভারতে শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও বহু কৰ্মী গড়ে তুলেছিল বহু প্রতিষ্ঠান, বহু আশ্রম, গুরুকুল ইত্যাদি। আজ স্বাধীন ভারতে তাদের সংখ্যা বাড়ে নাই, প্রসারও খুব সম্ভব দিন দিন কমেই আসছে। প্রতিকূল বাতাসে যারা জল-কাদা ভেঙে গুণ টেনেছিল প্রাণপণে, আজ বাতাসের অহুকূলে নৌকায় উঠে তারা পাল ভুলে দেবার বেলায় ঝেঁলাঠেলি করছে পরস্পরে। এমনধারা নৈকৰ্ম্যের পথে জাতির কল্যাণ কখনও আসে না।

৪

পঞ্চালের স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যভেদ করেই অর্জুন যাজ্ঞসেনীকে পান নি। ‘অসম্ভব কৰ্মে দ্বিজের প্রয়াস’ দেখে লক্ষ্যভেদের আগে যারা হেসেছিলেন; পরে তাঁরা অবিশ্বাসভরে বললেন—‘ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয়’। তার পরে যখন অপ্রত্যয়ের আর কোনই অবকাশ রইল না তখন ‘যার ঘেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ’ শেষ পর্যন্ত স্বমুষ্টি ধারণ করেছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতার স্বপ্নধরেও চিরকাল ধরে এই প্রাচীন ধারাই চলে আসছে।

রাজা-রাণীর মাথা কেটেই ফরাসী বিপ্লব তার লক্ষ্য স্থানে পৌছয় নি, ছোট-বড় অনেক মাথাই তার যাত্রা-পথের ধলায় জুটিয়েছে। ইংরেজের স্বাধীনতাও নর্মান রাজার ম্যাগনা কার্টার স্বাক্ষরের সঙ্গে সন্ধেই সে দেশে আগ্নে নাই—১২১৫ সালের শঙ্কাতুর রাজার অনিচ্ছুক হাতের পরিক্রিষ্ট দানে পুরা দখল পেয়েছে ইংরেজ বহু শতাব্দী পরে ১৬৮৮ সালে গর্কিত ষ্টুয়ার্ট রাজবংশকে পরাভূত করে। আমেরিকা তার পরাদীনতা-পাশ ছিন্ন করেছিল জর্জ ওয়াশিংটনের রণকৌশলে ১৭৮৩ সালে, আর সমগ্র রাষ্ট্র জুড়ে স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ সে দেশে সম্ভব হয়েছে তার অশীতি বর্ষ পরে আব্রাহাম লিন্কনের নেতৃত্বে ১৮৬৫ সালে। রাশিয়াতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

রুশ-রাজলক্ষ্মী বিপ্লবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ১৯১৭ সালে। নবরূপে তাঁর বিশাল রাজ্য তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বলশেভিক প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিসমাপ্তির সঙ্গে ১৯৩২ সালে। মাঝখানের এই

পনেরটি বছরের ঘটনা-পরস্পারার বিবরণী রাশিয়ার ইতিহাসে লাল হরফে লেখা হয়েছে সে বিষয়ে দুই মত হবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বিরাট জাতির বহু শতাব্দীর অবরুদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা, কৰ্মের প্রবাহ বাধামুক্ত হয়ে সমস্ত দেশের বৃকের ‘পরে ছড়িয়ে পড়েছে উদ্দাম গতিতে। গতিমুখে কত ঐরাবত ভেসে গেছে, কত জহু মূনির আশ্রম নিশিচ্ছ হয়েছে। অকৰ্মের জড়তা আর আলস্যের ভ্রম্মা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। অতি বুদ্ধির সতর্কতা আর অবিশ্বাসের বিধা শুধু অবমানিত হয় নাই, নিশ্চয় ভাবে অপসারিত হয়েছে।

এই নিশ্চয়তার ফলেই রুশ সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট কেয়েনস্কি বিপ্লবের বছর না ঘুরতেই হলেন দেশ থেকে বিতাড়িত। হতভাগ্য রুশ সম্রাট নিকোলাস রাজ্যচ্যুতির পনের মাস পরে উরলের স্বদূর প্রবাসে নিহত হলেন সপরিবারে। সেনানায়ক কর্ণিলফ প্রথমে হলেন বিতাড়িত, পরে সহকারিগণসহ হলেন নিহত। দেশ জুড়ে শ্বেত আর লোহিত আতঙ্ক আবার্তিত হতে লাগল চক্রবৎ। সৃষ্টির পূর্বাব্দে এই যে শিবতাণ্ডব—এর নায়ক লেনিনকে থাকতে হ’ত অতিকায় লেট (Letts) আর বেতনভোগী চীনা দেহরক্ষীতে পরিবৃত হয়ে অষ্টগ্রহর। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর প্রধান সহকৰ্মী ট্রটস্কি হলেন দল থেকে বহিষ্কৃত এবং দেশ থেকে নির্বাসিত ও পরে আততায়ীর হস্তে নিহত। অন্যতম নেতা জিনোভিয়েফের ভাগ্যও প্রায় ঐ দশাই ঘটল।

এত যে অশান্তি, এত যে অনাচার এর মধ্যেও কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্ঘাপনের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া জগৎ-সভায় ঘোষণা করতে পেরেছে, ‘দীর্ঘরোহহং ভোগী সিদ্ধোহং বলবান স্থখী’। তার কৃষক সংঘবদ্ধ হয়েছে, কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে, কৃষিপ্রণালী উন্নত হয়েছে; পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাকে সে আকার দিয়েছে; খনিজ ও ধাতুশিল্পে অভাবনীয় উন্নতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে সম্ভব করে তুলেছে। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সেদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহির্কীর্ণজ্যে আর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রসার-প্রতিপত্তির পথ আজ উন্মুক্ত, আর সে পথে সে অগ্রসর হচ্ছে অকুতোভয়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিধানে একেই বলে স্বাধীনতা।

ভারতে স্বাধীনতার সোনার মন্দিরের ছায়া আজ খুলে গেছে—এ বিষয়ে সন্দেহ গোষণ করা বৃথা আত্ম-অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়। শাস্ত্রে বলে—নাং লোকোহস্তি ন পরো ন স্থং সংশয়াত্মনঃ—সংশয়ীর না আছে ইহলোক, না

দায়িকতার খোরাক জুগিয়েছে; স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার উগ্রতাও ঠিক তাই করছে। ভারত-পাকিস্তানে আছে কিনা জানি না, কিন্তু পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশেই মদ্যপান-নিবারিণী বহু সভা-সমিতি, বহু প্রচার-পত্রিকা রয়েছে। আমাদের কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধকল্পে তেমনধারা কোন কিছু ত নাই-ই, বরং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, সাম্প্রদায়িকতা প্রচারিণী পত্রিকাদি এখনও কোন কোন স্থলে রয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসনকল্পে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাধ্যতামূলক অধিবাসী বিনিময়ের পরামর্শও মাঝে মাঝে আমাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দিয়ে থাকেন। সে যে কি বস্তু, তার স্বাভাবিক পরিণতি যে কোথায় সে সব বিষয়ে তাঁদের চিন্তা ভাবনাই নাই। মদের বোতল ভেঙে ফেলার চাইতে পাকস্থলীর পুনর্গঠনই এঁদের মতে সহজসাধ্য। আসলে এমনধারা সব যুক্তি পরামর্শ আমাদের সনাতন সেই নৈকস্ম্যসিদ্ধির সাধনারই অন্যতম অঙ্গ। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সম্মুখবুদ্ধ করতে হলে যে অভয় আর সঙ্ক-সংস্কৃতির প্রয়োজন, জাতির মনে তার অল্পশীলনের কোন ব্যবস্থাই আমরা করি নাই। জয়ের কোন চেষ্টা না করেই আমরা

পরাজয়ের মনোভাব অনায়াসে আয়ত্ত করে নিয়েছি। আমাদের যুক্তি পরামর্শ, বিক্ষোভ সহ্যভূতি সবই ঐ মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। এতে করে কল্যাণের চাইতে ঘরে-বাইরে আমাদের অকল্যাণই হচ্ছে বেশী। কেবলমাত্র ব্যাপক কর্মের উদ্দীপনাই এই তামসিক মনোভাব থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে পারে। এ সম্বন্ধে জাতির জনকের নির্দেশ সুস্পষ্ট :

“...কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, এইবার তাহাকে সংগ্রামের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক মুক্তি অর্জন করিতে হইবে। রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রাম অপেক্ষা ভবিষ্যতের এই সংগ্রাম আরও কঠিন। তাহার এক কারণ, ইহার জন্য গঠনকর্মের প্রয়োজন হয় এবং গঠনকর্মে উত্তেজনা অথবা বাহিরের আড়ম্বর বা আকর্ষণের স্থান নাই। অথচ সর্বতোমুখী গঠনকর্মের দ্বারাই অগণিত জনসাধারণের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে শক্তির সম্যক উদ্দীপন ও বিকাশ হওয়া সম্ভব।...”*

* “কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ”, নয়াদিল্লী, ২৭-১-৪৮; বঙ্গানুবাদ ‘ইন্ডিয়ান পত্রিকা’, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮।

জীবন-জিজ্ঞাসা

শ্রী আশুতোষ সান্যাল

যতবার দেখি চেয়ে এ অনন্ত, অদ্ভুত সংসার,—
শত প্রশ্ন, দ্বিধাষন্দ মনে মোর ছাগে বারবার।
জানি নাকো এ বরায় আসিযাহি কোন্ প্রয়োজনে
কালস্রোতে ক্ষুদ্র তুণ—কেন চলি ভেসে অকারণে ?
জগন্মের বাতা কোথা—কে সে জন্ম—কিছু নাহি জানি,
আদিম পাপের বোকা হুজুগুঠে চলিয়াছি টানি।
জান্তব আসন্নত্বা—আমি তার বৃত্তিমায় কল,—
বুকে ভবু দেবজের দুর্নিবার ক্ষুধা অবিরল।
জানি শুভ্রা ধ্রুব যোর—ভবু করি-অমৃতের আশা,
যাযাবর শত্ৰুচিল—কত গাছে বাঁধি আমি বালা।
সর্বজ্ঞের ভাণ করি অভভেদী অহমিকা নিয়া,
যাহা পাই দেখি তাতে শির নাড়ি’ চিরিয়া চিরিয়া
বিশ্বের রহস্য নিয়া দিবারাতি করি টানাটানি,
আমি শুধু আপনারে নাহি চিনি, নাহি কভু জানি।
প্রকৃতির করি’ বশ ভাবি আমি সর্বশক্তিমান,—
মোর চোখে একাকার ভূত, প্রেত আর ভগবান।

হৃৎপিণ্ড হ’তে ভবু কোনোমতে বাহিক নিভার,
ক্ষুদ্র এক বিস্ফোটক চূর্ণ করে মোর অহঙ্কার।
কোথা মিলে জীবনের নিঃশ্রেণী—কে কবে আমার ?
কেমনে কহিব মন্দ—ক্ষুধাতুর প্রাণ বাহা চার।
একপ্রান্তে রমণীর স্নেহময় উদয় মোত্তন—
অভপ্রাপ্তে বর্গ, যুক্তি—রে নিকোঁষ তিবা আকিঞ্চন ?
ওয়ে জ্ঞান, কেবা ভোরে চিরভরে দিল অবিকার—
নীতির প্রাচীর গড়ি’ জীবনপ্রবাহ ঘোষিবার ?
কারে বলি মহাপুণ্য—এ বরার কারে বলি পাপ—
চিরভ্রম মানদণ্ডে কিসে ভার করি পরিমাপ ?
ভাবি ব’সে—হয়তো এ জীবনের কোনো অর্থ নাই,
মৎগতা ভাষা তাঁর রচি মোরা বসি’ সর্বদাই।
অলক্ষ্য ব্যক্তের হাসি হাসিছে রসিক ভগবান,
সত্ত প্রহেলিকাসম তার গড়া বিশ্বের বিধান।
কোথা বৃষ্টি—কোথা স্রষ্টা। মাঝখানে অন্ধ যবমিকা,
চির আশারের জীব—তারি আলোকের অহমিকা।

সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

সংস্কৃতজ্ঞগণ জানেন সংস্কৃতশিক্ষার সম্ভ্রতি দুইটি পদ্ধতি আছে, প্রাচীন ও নবীন। ইহার কোনটাকেই আমরা একবারে অবজ্ঞা করিতে পারি না, উভয়কেই যথাযথ স্থান দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা দুঃখের বিষয় যে, কেবল টোলগুলিতে নহে, বিশ্ববিদ্যালয়েও সংস্কৃতশিক্ষায় নবীন পদ্ধতিকে একবারে অবজ্ঞা করা হইয়া থাকে। আজ নিম্নে সামান্য কয়েকটি পংক্তিতে ইহা কিছু দেখা যাইবে।

কয়েক দিন হইল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভাল ছাত্র আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে তিন বিষয়ে এম-এ, সংস্কৃত, পালি ও বাঙলায়। কোন এক কলেজে বিশিষ্ট পদেও সে নিযুক্ত। কথাপ্রসঙ্গে দম্পতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তিভা অর্থ লইয়া আমাদের আলোচনা উঠে। ছাত্রটি একবারে চুপ করিয়া থাকে। আমার মনে হয়, সম্ভবত আমাদের প্রাচীন পদ্ধতিসম্মত যে ব্যুৎপত্তি ও অর্থ আছে, সে তাহা জানিত, অর্থাৎ সে জানিত যে, জায়া পতি শব্দের জায়া স্থানে দম্ম আদেশ হওয়ায় উহা হইতে দম্পতি হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে জায়া দম্ম আকারে পরিবর্তন প্রাপ্ত হইতে পারে ইহা ব্যাখ্যা করিতে না পারায় সে চুপ করিয়া থাকাই ভাল মনে করে।

ঠিক ইহার কিছু দিন পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি ছাত্র আমার কাছে আসে। এও তিন বিষয়ে এম-এ, দুইটি সংস্কৃত বর্ণে ও প্রাকৃত। এ কিছুকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও আংশিক সময়ে কিছু পড়াইত। আমি ইহাকেও ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ইহারও উত্তরে পূর্বেক্ত প্রাচীন পদ্ধতির উত্তর ভিন্ন নতন কিছুই জানা যায় নি।

কিন্তু বস্তুত এই প্রশ্নটি খুব সহজ। বৈদিক ভাষায় 'গৃহ' অর্থে দুইটি শব্দ আছে, দম্ম আর দম। দ্বিতীয়টিই প্রসিদ্ধতর। লক্ষ্য রাখিতে হইবে উভয় শব্দেরই প্রথম স্বরটি উদাত্ত। ইহার সহিত গ্রীক domos, লাতিন domus ও ইংরেজী dom. দম্ম শব্দের সহিত পতি শব্দের যোগে দম্পতি হওয়ার কোন বাধাই নাই। দম্ম শব্দেরও যোগে ও সহজেই হইতে পারে, কেননা দম্পতি শব্দের আদ্যস্বর অর্থাৎ দকার স্থিত অকার উদাত্ত হওয়ায় তাহা প্রবল এবং সেইজন্য ঠিক থাকে, কিন্তু পরবর্তী

মকারস্থিত অকার অল্পদাত্ত বলিয়া দুর্বল হওয়ায় তাহার লোপ (syncope) হয়।^১

দম্ম শব্দের অর্থ 'গৃহ' হওয়ায় দম্পতি বলিতে মূলত 'গৃহপতি' বুঝায়। পালি ভাষাতেও ইহার অর্থ 'গৃহপতি' বা 'গৃহপতি'। বৈদিক ভাষায় দেখা যাইবে ইহা অগ্নি, ইন্দ্র ও অশ্বিনের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়। সায়নাচার্য ঋগ্বেদভাষ্যে (২.১২.৮) ইহা অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন :

"দম্পতিং গার্হপত্যাদি রূপেণ গৃহস্য পালকম্ দম্ম ইতি গৃহস্য নাম। অকার লোপশ্চান্দসঃ।"

সংস্কৃত সাহিত্যে এক শ্রেণীর শব্দ আছে। ইহার দ্বিবিচনে প্রযুক্ত হইলে এক ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ দ্বন্দ্ব বা মিত্রনকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন পিতারো বলিতে পিতা ও মাতা উভয়কেই বুঝায়। আমাদের ব্যাকরণের প্রাচীন পদ্ধতিতে সাধারণতঃ এখানে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়, এবং ব্যাখ্যা করা হয় মাতা চ পিতা চ পিতারো। এই অল্পসারে আলোচ্য স্থলেও বলিতে পারা যায় দম্পতিঃ দম্পতী চ দম্পতী। কিন্তু বস্তুত এখানে কোন সমাস নাই।

এইরূপে দম্পতি শব্দের মূখ্য বা ব্যুৎপত্তিভা অর্থ 'গৃহপতি' বা 'গৃহস্বামী' আর দ্বিবিচনে ("দম্পতী") গোপ অর্থ 'স্বামী' ও 'স্ত্রী'।

এখানে আমরা এই প্রশ্নে দম্পতি শব্দেরও আলোচনা করিতে পারি। দম্পতি শব্দের ত্রায় ইহাও দ্বিবিচনে 'স্বামী' ও 'স্ত্রী'কে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি কি? কিরূপে ইহা হইল? আমার মনে হয়, ইহা জায়া পতি হইয়াছে। বৈদিক নিঘণ্টুতে (১.১) পৃথিবী বা ভূমি বুঝাইতে একুশটি শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি হইতেছে জায়া, এবং বৈদিক ভাষায়

১। √দম্ম শব্দ হইতে অতি, শুঃ, সন্তি পদ হয়। এখানে প্রথম পদে শব্দের অকারটি কেন আছে, এবং অপর পদ দুইটিতে তাহা কেন নাই অল্পসন্ধান করিলে এই বিষয়টি কিঞ্চিৎ জানা যাইবে। সংস্কৃতে জগ্মতুঃ (<জগ্মতুঃ) প্রভৃতি পদে (পাণিনি, ৬. ৪. ৯৮) এইরূপ বর্ণলোপ বা মধ্য বর্ণলোপ (syncope) সকলেরই পরিচিত ও সমস্ত ভাষাতেই প্রসিদ্ধ।

ইহার বহু স্থলে প্রয়োগও আছে। যাক স্বকীয় নিরুক্তে ইহা উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এই জ্ঞা শব্দ বর্ণবিপর্যয়ে প্রথমত জা ম্ হয়, পরে প্রাকৃতের প্রভাবে তাহা জ ম্ হইয়া থাকে। এইরূপেই জ্ঞা প তি হইতে জ স্প তি সহজেই হইতে পারে, কোন বাধা দেখা যায় না।

এখানে আমাদের প্রাচীন বৈয়াকরণগণ যে সূচনা দিয়াছেন, তাহা মনোরম। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, জা য়া প তি শব্দের জা য়া স্থানে জ ম্ ও দ ম্ নিপাতনে হইয়া থাকে। ইহার একপদ অর্থ নহে বা তাৎপৰ্যও নহে যে, জা য়া শব্দ জ ম্ ও দ ম্ শব্দে পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়। না, ইহা কখনও হইতে পারে না। ইহার একমাত্র অভিপ্রায় এই যে জা য়া শব্দ স্থানে জ ম্ ও দ ম্ পাঠ করিতে হইবে।

২। বৈদিক ভাষাতেও প্রাকৃতের কত প্রভাব পড়িতেরা জানেন। একটু অল্পসন্ধান করিলেই ইহা জানা যায়। পালি ও প্রাকৃতের একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, পরে অল্পস্বর থাকিলে পূর্ববর্তী অ, ঈ, ও উ হ্রস্ব হইয়া যায়। এই অনুসারে সংস্কৃত মালাম্ পালি ও প্রাকৃতে মা লং হইয়া যায়।

৩। অর্থাৎ জা য়া শব্দের স্থানে জ ম্ ও দ ম্ হয়, “জা য়া শব্দজ জন্তাবো দন্তাবশ্চ নিপাত্যতে।”—কাশিকা, পাণিনি, ২. ২. ৩১।

৪। সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠকেরা জানেন যে, আদেশ করিয়া অথবা নিপাতনে (“যদ্বন্ধনোঃপূর্ণং তৎসর্বং নিপাতমাং সিক্ষিত্ব”) বিবিধ পদ সাধন করা হয়। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে যে পদের ব্যুৎপত্তি পাওয়া শক্ত, সহজে তাহার অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রাচীনেরা এইরূপ করিয়াছেন মনে হয়। ভাষাতত্ত্বের নিরমাহুসারে মূল তত্ত্ব প্রদর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য এই বলিয়া প্রতিষ্ঠাত হইয়া যে, সমগ্র শব্দশাস্ত্রানুসারে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করিয়া পাঠকগণকে সাহায্য করা। বৈয়াকরণগণ বলেন, ব্যাকরণস্থলের অবস্থানও ক্রমাইতে পারিলে তাঁহারা পুস্তকের আনন্দলাভ করেন।

আদেশ ও নিপাতনের দ্বারা এক পদের স্থানে অল্প পদের প্রয়োগ করার পদ্ধতি বিবিধ ভাষাতেই আছে। কেবল ব্যাকরণের নিরমাহুসারে নুত্তন নুত্তন পদ উদ্ভাবন করিলেই চলে না, প্রয়োগ অঙ্গসঙ্গ করাও আবশ্যিক হয়। প্রয়োগ না থাকিলে ব্যাকরণ হয় না। এক একটি ভাষা এত বিপুল যে, তাহাকে সংযত করিয়া এইরূপ প্রয়োগ অবিসর্ঘ্য।

আমরা দেখিলাম জ্ঞা প তি হইতে জ স্প তি হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞা শব্দের অর্থ ‘পৃথিবী’ বা ‘ভূমি’ হইলে তাহার সহিত প তি শব্দের যোগে ‘জা য়া প তি’ অর্থ কিরূপে হয়? ঠিক দ স্প তি শব্দ স্থলে যেমন, এখানেও তেমনি, কোন ভেদ নাই। ঘরবাড়ী থাকিলে তাহার মালিক ও তাঁহার স্ত্রী এক কথায় যেমন দ স্প তি তেমনি ভূমি বা জমি থাকিলে তাহার মালিক ও তাঁহার স্ত্রী এক কথায় জ স্প তি।

মূল জ্ঞা শব্দটি যে, $\sqrt{\text{জম্}}$ (গমনার্থক) ধাতু হইতে হইয়াছে নিঘণ্টুর টীকায় দেবরাজবজ্রা তাহা স্পষ্ট ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আবার $\sqrt{\text{গম্}}$ আর $\sqrt{\text{জম্}}$ ধাতু বস্তুত একই, কেবল আকারে ভিন্ন। $\sqrt{\text{গম্}}$ হইতে জ গা ম পদ আমাদের সকলেরই জানা। বৈদিক ভাষায় ‘পৃথিবী’ অর্থে গা শব্দ স্প্রসিদ্ধ। ইহা মূলত গ মা ($\sqrt{\text{গম্}}$) হইতে হইয়াছে, এবং এই গা শব্দই পরে জ্ঞা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য নিরুক্ত, ১২. ৪২।

এখানে একটি কথা বলা উচিত। যদিও জ স্প তি শব্দ আমাদের অনেকের জানা তথাপি প্রচলিত কোশসমূহ ও ব্যাকরণগুলির পূর্বস্থিত কথটি (অর্থাৎ জা য়া স্থানে জ ম্ হয়) ভিন্ন অন্যত্র ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না। অবশ্য যতটুকু আমার জানা আছে। কিন্তু মনে হয় নিশ্চয়ই ইহা ছিল, এবং কোনদিন হয় ত ইহা পাওয়াও যাইবে।

ইংরেজীতে go ধাতু হইতে he goes, কিন্তু অতীতকালে he went। এই went পদ go হইতে নহে, wend হইতে। কিন্তু সাধারণত ঐ উত্তর পদ একই ধাতুর বলিয়া প্রচলিত। আমরা be ধাতুর প্রয়োগে বলি I am, I was। কিন্তু এই am ও was কি be হইতে হইয়াছে? কখনই নহে। ক্রাসীতে to be অর্থে ধাতুটি হইতেছে etre। ইহা হইতে I am বুঝাইতে বলা হয় je suis, আর I was হয় je fus; এই suis ও fus কি বস্তুত etre হইতে হইয়াছে? এই প্রকার জার্মান ভাষায় to be অর্থে ধাতুটি হইতেছে sein, ইহা হইতে I am হইতে ich bin, কিন্তু I was হয় ich war, এই ক্রিয়া পদ দুইটি কি sein হইতে হইয়াছে, না কেবল এরূপ ব্যবহার মাত্র হইয়া আসিতেছে? সাধারণ ব্যবহারের জন্ত যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার তত্ত্ব কি অবজ্ঞাই জ্ঞাতব্য।

আমাদের সংস্কৃতের মধ্যে ইহা এত বেশী যে, সংস্কৃতজগৎ ইহা কিছুতেই অবজ্ঞা করিতে পারেন না।

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

৬

কয়েক দিন পরে মহেন্দ্র জেল হইতে ছাড়া পাইল।

মহেন্দ্র জেল হইতে ছাড়া পাইবার দিন সকালে ভবেশ, দেবানন্দ, এটি-সারকুলার সোসাইটির কয়েক জন সভ্য আসিপুর সেন্ট্রাল জেলের কটকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেবিল ফুল ও কলেজের কতকগুলি ছেলে আগেই সেখানে জড়ো হইয়াছে। কেহই জানে না কখন মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিবে তবু অন্ধকার থাকিতে ছেলেরা আসিয়াছে। নিজেদের মধ্যে তাহার জটলা করিতেছে আর মাঝে মাঝে বন্দেমাভরম্ ধ্বনি দিতেছে। মহেন্দ্রের সঙ্গে যাহারা বড়বাজারে শোভাযাত্রার যোগ দিয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ আসিয়াছে। মাতোয়ারী দোকানদার ও ভাড়াকরা গুণাদের হাতে প্রহার ও পুলিশের হাতে বেজাযাতের কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।

বেলা বাড়িয়া চলিতে তাহাদের চাকল্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেহ বন্দেমাভরম্ গান করিল, কেহ গাহিতে লাগিল কাব্যবিশারদের গান—

“ভেইয়া, দেশকা এ কেয়া হাল

ধাক মিট্রি জোহর হতি সব, জোহর হোয় জঞ্জাল
ধর ছোড়কে সব পরকো সেবে ভাইকো দেং ভগাই।

সাগর পার সব বন গয়া ঐর ধরমে লহমী নাই।

ধরকা লহমী পরকো দেকর সব কোই রয়ে ভুখ।”

গান শুনিয়া কটকের সিপাহীরা বার বার ছেলের দিকে চাহিতে লাগিল। কি তাহাদের মনের ভাব বুঝিবার উপায় ছিল না। হঠাৎ সিপাহীরা সমস্ত হইয়া উঠিল। কটক ভুলিয়া জেলার সাহেব কয়েক জন যণ্ডমার্কী কয়েদী ওয়ার্ডার ও পুলিশসহ বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের পিছনে মহেন্দ্র। জেলারের আদেশে তাহারা ছেলের উপর কাঁপাইয়া পড়িল। তখন বেশ বেলা হইয়াছে। ছেলের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইতে রাতার ভিত্তি জমিতে লাগিল। কয়েদী, ওয়ার্ডার ও পুলিশ লইয়া জেলার সাহেব জেলের ভিত্তর প্রবেশ করিল।

জেলার অদৃষ্ট হইলে কটকের সিপাহীদের এক জন আগাইয়া আসিয়া বলিল, আরে ভেইয়া, আবি ভাগ যা। ভূম্ হজা করতা উনলিয়ে দাহাব গুঙ্গা ছা। আবি চলা যা।—পুলিশের প্রহার ও গালাগালি ভুলিয়া ছেলেরা বন্দে-মাভরম্ ধ্বনি দিতে দিতে মহেন্দ্রকে লইয়া চলিল।...

এরকম ব্যাপার মাঝে মাঝে হইত। কয়েক দিন আগে মৈমনসিংহের জেল হইতে ছাড়া পাওয়া এক বন্দেদী

পিকেটারকে অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা জেলের সম্মুখে অপেক্ষমাণ সম্রাট ডায়ালোকদিগকে পুলিশবাহিনী লইয়া স্বয়ং পুলিশ সাহেব এইভাবে সন্মুখীন করিয়াছিল।

কাগজওয়ালারা দুই-চারি দিন ভীত প্রতিবাদ করিতেন, কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ কোন দিনই জানে ভুলিতেন না।

মহেন্দ্র ছাড়া পাইবার দিন দুই পরে বিকালের দিকে গোলদীঘির পূর্ব-কোণে রেলিং ধরিয়া দীঘির জলের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল দেবানন্দ। নারায়ণকে সে লিখিয়াছিল বিকালের দিকে এই জায়গায় সে অপেক্ষা করিবে।

গোলদীঘির দুই কোণে দুইট সন্ধ্যা হইতেছিল। শ্রোতার অধিকাংশ ফুল-কলেজের ছাত্র। বায়ুসেবনকারী বৃদ্ধেরা কেহ কেহ দাঁড়াইয়া দুই-চারি মিনিট বক্তৃতা শুনিতেছেন, তার পর কেহ একটু হাসিয়া, কেহ নিজের মনে মাথা নাড়িয়া নীরবে বক্তার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাইয়া আবার লাঠি হাতে হাঁটিতে আরম্ভ করিতেছেন।

পিঠে কে হাত দিতে দেবানন্দ কিরিয়া—দেবিল নারায়ণ। দুই-একটা কথার পরে নারায়ণ বলিল, চলুন, আপনাকে যেখানে নিয়ে যাব বলেছিলাম সেখানে নিয়ে যাই।

দেবানন্দ উৎসাহিত হইয়া বলিল, চল।

চলিতে চলিতে দেবানন্দ বলিল, তোমাদের দলের কথা ত কিছু বললে না?

নারায়ণ বলিল, দলের কথা ত আমার বলবার নয়। আর আমি কতটুকু বা ধবর রাধি যে আপনাকে বলব? কত জায়গায় কত দল আছে আমি কি সে সব ধবর রাধি? আমার কাজ আপনাকে ঠিকমত জায়গায় পৌঁছে দেওয়া।

ট্রাম হাতিবাগানের ঘোড়ে পৌঁছিলে তাহারা নামিল। ঠার বিয়েটারের পিছনে একটা বাড়ীতে তাহারা প্রবেশ করিল।

বাহিরের ঘরটিতে মেঝে জড়িয়া মাহুর পাতি। কয়েকটি যুবক মাহুরে বসিয়া বই বা ধবরের কাগজ পড়িতেছে। কয়েক জন নিয়মের আলোচনা করিতেছে। নারায়ণ ও দেবানন্দ ঘরে ঢুকিতে সকলে তাহাদের দিকে চাহিল। নারায়ণ এক জন যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, হারীভদা, ইনি দেবানন্দ বাবু, হার কথা আপনাকে বলেছিলাম।

দেবানন্দ দেবিল নারায়ণের হারীভদা এক জন লম্বা, রোগা যুবক, বড় বড় চোখ, মাথায় উকো-খুঁকো চুল। ডায়ালোক উঠিয়া দেবানন্দকে বলিলেন, তুমি এসো আমার সঙ্গে।

নারায়ণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাকে যে কাজ বলেছি সেই কাজে যাও।

নারায়ণ চলিয়া গেল।

হারীতবাবু দেবানন্দকে সঙ্গে লইয়া ভিতরের একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। সে ঘরটিতে মাহুদের উপর কয়েক জন যুবক বসিয়া আলোচনা করিতেছিল। ঘরের দেয়ালে বড় বড় কতকগুলি ম্যাপ ঝুলিতেছে। দেবানন্দ দেখিল এই ঘরের পরে একটি লম্বা দালান। দালানে বিদ্য-পণ্ডিত জন যুবক বসিয়া কাহার বক্তৃতা শুনিতেছে। বক্তার চেহারা সে দেখিতে পাইল না, গলার স্বর শুনিতে পাইল।

হারীতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন সে রাজনীতি সম্বন্ধে কি কি বই পড়িয়াছে, ভবানীর মন্দির পড়িয়াছে কিনা, লাঠি-খেলা, বক্সিং, বোডার চড়া জানে কিনা ইত্যাদি। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, তোমাকে কিছুদিন পণ্ডিতজীর ক্লাসে নিরমিত লেকচার শুনতে হবে। চল, তোমাকে ভর্তি করে দিচ্ছি।

দেবানন্দকে সঙ্গে লইয়া হারীতবাবু দালানে যেখানে পড়ানো হইতেছিল সেখানে আসিলেন। দেবানন্দ দেখিল এক জন বয়স্ক ভদ্রলোক বোর্ডে অঙ্ক লিখিতেছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা দিতেছিলেন। ভদ্রলোকের চেহারা দেখিয়া অবাঙালী বলিয়া যেনে হইল। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া হারীতবাবু বলিলেন—এক জন নুতন ভর্তি হচ্ছে। ক্লাস শেষ হলে একে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন।

তাঁহাকে বদাইয়া দিয়া হারীতবাবু চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বক্তৃতা শুনিয়া দেবানন্দ বুঝিতে পারিল উইলিয়ম ডিগবীর *Un-British Rule in British India* ও রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History of British India* পড়ানো হইতেছে। বক্তা বোর্ডে অঙ্ক লিখিয়া বুঝাইতেছিলেন পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে নানা অজুহাতে নির্যম শোষণ চালাইয়া কি বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংরেজ ভারতবর্ষ হইতে দেশে লইয়া গিয়াছে ও তাহার ফলে কি ভাবে আর্থিক সম্প্রাণী ভারতবর্ষে ক্ষয়বর্জমান দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়াছে। উল্লেখিত হইয়া তিনি বলিলেন, সেদিনও এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট অনাভাবে কাভর, ককালসার দেশবাসীর অয়ের লুপ্ত করণ আবেদনের উত্তরে হাসিয়া বলিলেন,—কেন, এখনও গাছে পাতা আছে দেখিতেছি, এখনও তোমাদের ঘরের জীলোকেরা দেহ বিক্রয় করিবার লজ্জা হস্তার আসিয়া দাঁড়ায় নাই, অনাভাবে কণা বলিতেছ কেন?

ক্লাস শেষ হইলে ছাত্রেরা উঠিয়া গেল। বক্তা দেবানন্দকে কাছে ডাকিলেন। হারীতবাবু আসিয়া সেখানে বসিলেন। বক্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি পড়ছ? ইকনমিক্স, পলিটিক্স, হিষ্ট্রি পড়েছ কিছু?

দেবানন্দ—বিশেষ কিছু পড়ি না। আমি সাহায্যের ছাত্র।

বক্তা—তোমাকে খুব খাটতে হবে তা হলে। আগে ইকনমিক্স ক্লাস ও হিষ্ট্রি ক্লাস কর কিছুদিন। তার পরে পলিটিক্স পড়বে।

হারীতবাবুর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—একে কি কাজ দেবেন? রিক্রুটিং, ইনটেলিজেন্স, কিনাল না প্রোপাগান্ডা?

হারীতবাবু বলিলেন, পণ্ডিতজী, ও কিছুদিন ট্রেনিং থাক, তার পর ব্যবস্থা করা যাবে।

দেবানন্দকে বলিলেন, কিছুদিন নিয়মিত পণ্ডিতজীর ক্লাস ও ডাঃ চক্রবর্তীর হিষ্ট্রি ক্লাস কর। কাল সন্ধ্যা ছয়টায় ডাঃ চক্রবর্তীর ক্লাস আছে।

ডাঃ চক্রবর্তীর নাম শুনিয়া দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—কোন ডাঃ চক্রবর্তী? ডাঃ এম. কে. চক্রবর্তী বার-এট-স? ল্যাংলডউনে বাড়ী?

হারীতবাবু—হ্যাঁ, তুমি তাঁকে চেন?

দেবানন্দ—তার সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছে। খুব পণ্ডিত লোক। মিঃ রায়ের বাড়ীতে আলাপ হয়েছে।

হারীতবাবু—ব্যারিষ্টার মিঃ রায়ের বাড়ীতে? মিঃ রায় আমাদের সোসাইটির ডাইন-প্রেসিডেন্ট। তাঁকে তুমি জান?—দেবানন্দ বিস্মিত হইল। মিঃ রায়ের সঙ্গে হাঁহাদের সংস্রব আছে একথা কি ভবেশ জানে না? কই তাঁহাকে ত কোন দিন কিছু বলে নাই সে। সে বলিল, মিঃ রায় আমার এক বন্ধুর আত্মীয়। দু-চার দিন তার সঙ্গে মিঃ রায়ের বাড়ীতে গিয়েছি।

হারীতবাবু—তুমি আমাদের দলে আসতে চাও কেন?

দেবানন্দ—সত্য, প্রস্তাব পাস, স্বদেশী প্রচার, পিকেটিং অনেক করেছে। নুতন কোন কাজ পাবার আশায় আসতে চাই।

তাঁহার উত্তর শুনিয়া পণ্ডিতজী যুহ হাসিলেন ও মাথা নাড়িলেন। হারীতবাবু একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—কি কাজ তোমাকে দেওয়া হবে সেটা তোমার সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করছে।

দেবানন্দ বলিল, আমার কয়েকটা কথা আছে। ইংরেজের কামানবন্দুক, সৈন্যসামন্ত আছে, কি করে আমরা তাদের দেশ থেকে ভাঙাতে পারব? তারপর ইংরেজকে ভাঙাতে পারলে দেশের রাজা হবে কে?

হারীতবাবু—তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। বাংলায় হবে সাধারণতন্ত্র। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। মায়ের প্রেরণায় লক্ষ লক্ষ সন্তান এগিরে আসবে ইংরেজকে দেশ থেকে দূর করে দেবার জন্য। কতজন ইংরেজ সৈন্য আছে এদেশে? কতই বা তাদের অস্ত্রবল?

তারপর হারীত বাবু বলিলেন—ভূমি কিছুদিন হিট্রি, ইকনমিক্স ও পলিটিক্সের ক্লাস কর। যথাসময়ে ভোমাকে দীক্ষা দেওয়া হবে। দীক্ষার পরে উপযুক্ত কাজ দেওয়া যাবে।

হারীত বাবু ও পণ্ডিতজীর কাছে বিদায় লইয়া দেবানন্দ হোটেলে ফিরিল। পথে সে ভাবিতে লাগিল, দলের নেতা কি হারীত বাবু? রংপুর কেন্দ্রের কথা উঠিয়া বলিলেন। সতীন-না কবে এই দলে যোগ দিলেন? আর কোথায় কোথায় কেন্দ্র আছে? মিঃ রায় ও ডাঃ চক্রবর্তীর কথা ভাবার মনে পড়িল। ইহাদের যে এই দলের সঙ্গে সংযোগ আছে সে কি ভাবিতে পারিত? ইহারাত কি ইংরেজ ভাড়াইবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন? ভবেশদাও কি এই সমিতির কথা জানেন? জানাই শু সম্ভব। কিন্তু জানিলে তাহাকে কোন দিন কোন কথা বলেন নাই কেন?

পর দিন বেলা তিনটা মাগার সে যখন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে তখন ভবেশ বলিল—আজ এটি-সারকুলার সোসাইটির সভা আছে। সভায় যাবে, না হাতিবাগানে যাচ্ছ?

দেবানন্দ ফিরিল। ভবেশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া বলিল, হাতিবাগানের কথা কে আপনাকে বলল?

ভবেশ হাসিল। বলিল, কেউ বলে নি। তোমার টেবিলে “টেম্পল অব ভবানী” বইখানি দেখে আন্দাজ করছি।

দেবানন্দ ভবেশের বিছানায় আসিয়া বসিল। বলিল, হাতিবাগানের কথা না জানা থাকলে কি করে আন্দাজ করবেন? আপনি তা হলে এই সমিতির কথা জানেন? আমাকে ত সে কথা কোন দিন বলেন নি?

ভবেশ—আমি সমিতির বাইরের লোক। এ সম্বন্ধে আর এক জন বাইরের লোকের সঙ্গে কি আলোচনা করব? আর বাস্তবিক আমি ভেতরের কথা বিশেষ কিছু জানি নে।

দেবানন্দ—আপনি কিছু ভেবে কথাটা স্বীকার করছেন না। আপনার মামা মিঃ রায় যে সমিতির তাইল-প্রেসিডেন্ট, সমিতির সঙ্গে ডাঃ চক্রবর্তীর যে সংশ্লিষ্ট আছে সেটা শু জানেন?

ভবেশ হাসিয়া বলিল, ভূমি ভাবছ আমি সভ্য গোপন করছি। তা নয়। আমার মামা ও ডাঃ চক্রবর্তী সমিতির সিমপ্যাথাইজার, টাকা পরসাদ দিয়ে সাহায্য করেন, দরকার হলে উপদেশ, পরামর্শ দেন। সমিতির ভেতরের খবর, তার কাজের কথা তাঁরা কিছু জানেন বলে মনে হয় না। হাই-কোর্টের বারো আনা ব্যারিষ্টার, উকিল এই রকমের সিমপ্যাথাইজার। এঁদের টাকাতাই সমিতির কাজ অনেকটা চলে। ইংরেজ ভাড়াবার কাছে এঁদের সহায়ত্ব আছে বলে এঁরা নানা ভাবে সমিতিকে সাহায্য করেন। কিছু

রাজা, জমিদার, বড়লোকেরাও সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁরা কেউ সমিতির সভ্য নন।

দেবানন্দ—ব্যারিষ্টাররা সবাই আচার-ব্যবহারে ঘোর সাহেব। ইংরেজ ভাড়াবার ব্যাপারে এঁদের আগ্রহ একটু অদ্ভুত মনে হয়।

ভবানন্দ হাসিয়া বলিল, বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক এটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। কেন নয় বলছি তোমাকে। ইংরেজের দেশ থেকে ফিরে এসে এদেশে ইংরেজ-সমাজের সঙ্গে মিশতে গিয়ে তাদের ভাঙ্গিল্য দেখে, লাথি, ঘুঁষি খেয়ে, নিগার, ব্লাডি সোয়াইন, বাষ্টার্ড, সম অব বিচ প্রভৃতি অমিষ্ট সম্ভাষণ শুনে এঁদের অনেকের মনে বিকার জন্মে গেছে। শুধু কি ইংরেজ, পাঁচ আঁশলা ফিরিঙ্গী রেলের গার্ড পর্যন্ত লাথি মেরে গাড়ী থেকে আমাদের নামিয়ে দিড়ে দিবা করে না। মনে মনে অনেকেই ইংরেজকে এ দেশ থেকে অর্ধচন্দ্র দেওয়া সম্ভব হলে খুশী হন। আর একটা কারণও আছে। দেশের বাইরে গিয়ে পাঁচটা স্বাধীন দেশের লোকের সঙ্গে মিশে পরাধীনতার অপমান কি জিনিষ এঁদের চেয়ে আর কে ভাল বুঝেছেন? আচার-ব্যবহারে সাহেব হলেও তাই এঁরা ইংরেজ-বিদ্বেষী। নিজেরা সাক্ষাৎ ভাবে কোন কাজ করতে পারেন না,—বয়সে, শিক্ষা-দীক্ষায় বাবে, অর্থলালসার জন্য, বিপদের ভয়ে নিজেরা আড়ালে থাকতে বাধ্য হন, কিন্তু যারা কাজ করে তাদের সাহায্য করেন। এবার বুঝলে?

দেবানন্দ এত কথা কোথা হইতে জানিবে? মনোযোগ দিয়া সে ভবেশের কথা শুনিতেছিল। ভবেশের প্রেমের উত্তরে সে বলিল, বুঝলাম ভবেশ-দা।

ভবেশ—এবার হাতিবাগানে যাও।

দেবানন্দ—যাই। আর একটা কথা জানতে চাই। আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনার কাছে আমি কিছুই নয়। কিন্তু আপনি মুখ্য কাজ ছেড়ে গৌণ কাজ, এই যেমন এটি-সারকুলার সোসাইটি, স্বদেশী, সভা-সমিতি নিয়ে থাকেন কেন?

ভবেশ কথা না বলিয়া হাসিতে লাগিল। দেবানন্দ তাহার হাসিতে একটু অপ্রস্তুত রোধ করিল।

দিন তিনেক পরের কথা। মহেজ কয়েক দিনের জট দেশে গিয়াছে, ঘরে ভবেশ ও দেবানন্দ থাকে। দেবানন্দ রাতে ভবেশকে বলিল, সেদিন আপনি আমাকে সব কথা বলেন নি, আজ সব কথা বলতে হবে।

ভবেশের কথাটা মনে পড়িল। তবু সে জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা দেবু?

দেবানন্দ হাসিল। বলিল, আপনার ঠিক মনে আছে।

হাতিবাগান কেন্দ্রের কথা আপনি সব জানেন। এই রকম একটা আয়োজন চলছে যেখানে আপনি স্বদেশী ও বরকট নিয়ে যেতে আছেন কেন? স্বদেশী ও বরকট আন্দোলন চালিয়ে কি ইংরেজ ভাঙান যাবে?

ভবেশ—সর্বনাশ। তুমি কি আমাকে রিজুট করতে চাইছ ভোমার গুপ্ত সমিতিতে?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—আমাকে এখনও রিজুট করবার তার দেয় নি। ট্রেনিং হচ্ছে। তার পেলে আপনাকে পাকড়াও করবার জন্য চেষ্টা করব নিশ্চয়।

ভবেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর বলিল—দেবু, আমি হচ্ছে একজন ডাউটিং টমাস। সবকিছুতে সংশয় করা আমার স্বভাব। তাই কোন জিনিষ নেবার আগে নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত্তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখি। এদের দলের স্ফূর্তি জন্মের চরিত্র বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছে, দিল ইজ নট এ রেভলুশনারী টাইপ (এটা ঠিক বৈপ্লবিক টাইপ নয়)।

দেবানন্দ কথাটা বুঝিল না। সে বলিল—আচ্ছা, ভবেশ-দা, আপনি আগে কি হাতিবাগান গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন?

ভবেশ—না, এই সমিতি কিছু দিন হ'ল হয়েছে। ভোমাকে আগের কথা কিছু বলছি, তা হলে সব বুঝতে পারবে। ১৯০২ সনে বঙ্কিমচন্দ্রের অমুখীলনের আদর্শে সভাপতিত্ব বঙ্গ অমুখীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যারিষ্টার পি. মিত্র মহাশয় এবং আরও অনেকে এই সমিতিতে যোগ দেন। সভ্যদের অনেকের বেলেড় মঠের সঙ্গে সংযোগ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা স্বরবার আগে তাঁর কাছে গিয়ে উপদেশ নিতেন। বোম্ব হুয়, ১৯০২ সনেই বরোদা থেকে স্বাভীজ্ঞান বঙ্গোপাধ্যায় বরোদা কলেজের এক অধ্যাপকের কাছে থেকে সরল দেবীর নামে চিঠি নিয়ে এখানে আসেন। ইনি মুক্তপ্রদেশের লাক্ষণ সেজে উপাধ্যায় নাম নিয়ে বরোদার মৈত্রদলে ঢুকেছিলেন যুদ্ধবিজ্ঞা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার জন্য। বরোদা থেকে ফিরে ইনি সার-কুলার রোডে অক্ষিয়া ষ্ট্রীট ধানার কাছে এক বাড়ী নিয়ে গুপ্ত বিপ্লবী দলের প্রথম কেন্দ্র স্থাপন করেন। পি. মিত্রের পরামর্শে অমুখীলন সমিতি এই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ দিলে। সভাপতি হলেন পি. মিত্র, সহ-সভাপতি সি. আর. দাশ ও বরোদা কলেজের অরবিন্দ ঘোষ আর ট্রেজারার হলেন সুরেন্দ্র চাকুর। অনেক উকিল, ব্যারিষ্টার, লেখক, বক্তা সভ্য হলেন, তাঁরা নিরমিত টাকা দিতেন। লাঠিবেলা, খোড়ায় চড়া, বজ্রং, সাইকেল চালানো, সাঁতার দেওয়া শেখান হ'ল সার-কুলার রোডের কেন্দ্রে। সিষ্টার নিবেদিতা তাঁর বিপ্লববাদ সম্পর্কিত পুস্তক-সংগ্রহ কেন্দ্রে দিলেন। তার মধ্যে ছিল আইরিশ বিপ্লবের ইতিহাস, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস,

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, ম্যাটিসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত, কাভুরের জীবনচরিত, জাপানী কবি ওকাকুরার বই ইত্যাদি। অমুখীলন সমিতি ছাড়া আয়োজন সমিতি বলে আর একটা সমিতির সভ্যরাও এসে এই কেন্দ্রে যোগ দিলেন।...

ভোমার হাতিবাগানের হারীত বাবু সারকুলার কেন্দ্রে এসে যোগ দিলেন। মাকে মাকে সরকারী চাকুরীর যোগেজ বিভাজন যশোরের বাড়ীতে বিপ্লবী কেন্দ্রের সভ্যদের সভা বসত। আমি প্রথমে তাঁর বাড়ীতে দলের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিত হই। তার পর দলের সভ্য হলাম।...

আমার বৈদ্য আকর্ষণ ছিল কুশিয়ার গুপ্ত আন্দোলনের ওপর। ভাবতাম কবে কুশিয়ার বিপ্লবীদের মত আমাদের দেশের ছেলেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশবাসীর রাজ-মৈত্রিক দৃষ্টি খুলে দেবে। একখানা বই এদেছিল সমিতির লাইব্রেরীতে। তাতে জারকে হত্যা করবার অনেকগুলো যত্নস্বল্পের বিবরণ ছিল। মনোযোগ দিয়ে আমি এই বিবরণ পড়তাম।...

এ ছাড়া কেন্দ্রের বড় একটা কাজ ছিল দেশের মানা জারগার ঘুরে সভ্য সংগ্রহ করা ও শাখা সমিতি স্থাপন করা। খড়দা, চুঁচড়া, চন্দননগর, বর্দমান, যশোর, বুলনা, কুষ্টিয়া, ককনগর, বাঁকুড়া, যেদিনীপুর, কটক, গোঁহাটি, শিলং, রংপুর রাজসাহী, মালদহ, বরিশাল, মৈয়মনসিং, টাঙ্গুর প্রভৃতি মানা জারগার শাখা সমিতি স্থাপন করা হ'ল।

এই সব সমিতির প্রধান কাজ ছিল শরীরচর্চা ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা। প্রকৃত কাজ, যামে ইংরেজ ভাড়াটো কি তাবে হবে সে সম্বন্ধে কারো মনে স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

এই পর্যন্ত বলিয়া ভবেশ চুপ করিল, কি চিন্তা করিতে লাগিল নিজের মনে। দেবানন্দ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল—তারপর?

ভবেশ—তারপর? তারপর নিজেকে মধ্য দলাদলি, ঈর্ষা, মেত্বেজের লড়াই আরম্ভ হ'ল। সারকুলার রোডের কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত নেতার নামে তাঁর বিরোধীরা অপবাদ রটনা করতে শুরু করলেন। স্বতন্ত্রের ফলে তিনি অপমানিত ও মেত্বেজ হতে অপমানিত হলেন। গায়কোবান্দ কলেজের অধ্যাপক এলেন দলাদলি মেটাতে; একটা মিলন হ'ল বটে কিন্তু স্থায়ী হ'ল না। কলকাতার গুপ্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্রে তেওঁ যাবার মত হ'ল।

—হারীত বাবু তাঁর নিজস্ব দলবল নিয়ে মদন মিত্রের সেনে আলাদা বাড়ী ভাড়া করে নতুন করে কাজ আরম্ভ করলেন।

ভবেশ ও দেবানন্দ উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চিন্তা-

ময় হইয়া রহিল। অবশেষে ভবেশ বলিল, কেন্দ্রের এই অবস্থা হ'ল, কিন্তু দেশের অনেক জায়গায়, শহরে ও পল্লীতে, আগ্রহীন্দ্র, ভাবপ্রবণ ছেলে ও বয়স্ক অনেকের মধ্যে নৃত্য সভাবার আশ্রয় রহিল। সমিতির কাজে নামা জায়গায় ঘুরে ঘুরে আমার এই ধারণা হয়েছিল যে, মধ্যবিত্ত সমাজের লোকেরা একটি পরিবর্তনের জন্ত বিকল্প ভাবে ঠিকি হচ্ছে। বড় একটা ধাক্কা বা আঘাত না এসে এই পরিবর্তনের জন্ত মানসিক প্রস্তুতি কাজে লাগবে না, গুপ্ত সমিতি যে ব্যাপক অল্পভুক্তি জাগাতে চায় সে অল্পভুক্তির জাগরণ সম্ভব হবে না।...

সে ধাক্কা এসে বঙ্গভঙ্গরূপে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ-আন্দোলন ঘেরূপ নিরেছে, বঙ্গভঙ্গের কর্তাদের তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আগে থেকে কোন ধারণা করা সম্ভব হলে তাঁরা বোধ হয় এ কাজ করতেন না। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন কংগ্রেসের মাহুলি আবেদন নিবেদনের পথে আরও অনেক দিন সীমাবদ্ধ থাকত। স্বদেশী ও বয়স্কট আন্দোলন দেশবাসীর উদ্যোগী, শিক্তিকার মনকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছে। দেশ-বাসীর এই চাকল্য কাজে লাগাবার জন্ত গুপ্ত সমিতি চেষ্টা করেছে। আগে মঞ্চমলে যে সকল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল সেগুলো হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন চালাবার কেন্দ্র।

নৃত্য গুপ্ত সমিতির মধ্যে অনেক নৃত্যন জিনিস এসেছে। এগুলো এসেছে নাকি পশ্চিম ভারত থেকে। শুনেছি রাজ-বাড়ার না পুনার এক ঠাকুর সাহেব এই নৃত্যন দলের সর্বময় নেতা। ইংরেজ ভাঙানো হলে তিনি নাকি হবেন হিন্দুধানের সম্রাট। সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে, দ্বিতী হাতে নিয়ে দীক্ষা দেবার ব্যবস্থা এসেছে। ভবানীর মন্দির ও রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর দল গভাবার কল্পনা এসেছে। যোগাভ্যাস, ব্যান-ধারণার চেষ্টা এসেছে।...

—জানিনে কি স্বজ্ঞে এই দলের নেতাদের মনে ধারণা হয়েছে ধর্মের সাহায্যে অর্থাৎ মন্ত্র, ভূকতাক ছাড়া দেশবাসীর মনে রাজনৈতিক চেতনার উদ্বেগ করা যাবে না। কেউ কেউ বলছেন যোগাভ্যাসের দ্বারা কুলজুগলিনী শক্তি জাগ্রত হলে আত্মিক চাপে ইংরেজ পালিয়ে-যাবে এ দেশ ছেড়ে। কারো মতে প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার মিশ্রিত আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের মধ্যে ছেপে উঠলে তার প্রভাবে ইংরেজ রাজনৈতিকতা ভুলে সাংস্কৃতিক ভাবের সাধনা করবে।

—এদিকে দলের মূল সভাপতি মিঃ মিজের সঙ্গে নৃত্যন গুপ্ত সমিতির জন্ত নেতাদের গোলমাল চলছে। মিঃ মিজের লাঠিবেলা, শরীরচর্চার দিকে ঝোঁক বেশী। ধারা যুগান্তর চালাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে নাকি ওর যুগান্তর হয়েছে। কলে অল্পভুক্তি সমিতি থেকে যুগান্তর দল আলাদা হয়ে যাবার মত হয়েছে।

ভবেশ দেবানন্দের দিকে চাহিল। সে গভীর মনোযোগ

সহকারে তাঁহার কথা শুনিতেছে। কথার যোড় ফিরাইয়া ভবেশ বলিল, তেতরে তেতরে গুপ্তসমিতিওয়ালারা কি কাজ করছেন আমি জানি নে। যতীন্দ্রনাথ অপহৃত হবার পরে আমি নৃত্যন কেন্দ্রে আর যোগ দিই নি। আগেকার পরিচিত কয়েক জন নেতার সঙ্গে আলাপ করে আমার যে ধারণা হয়েছে তোমাকে বললাম। মোট কথা, তাঁদের এই এটি-চ্যাডের (মনোভাবের) দরুন তাঁদের দলের সঙ্গে যোগ দিতে উৎসাহ বোধ করি নি। তুমি যাকে গৌণ কাজ বল তাই নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভবেশ হাসিয়া বলিল—পূরোমো সম্পর্ক একেবারে মুছে যায় নি দেখু। আমি গুপ্ত সমিতিতে এখনও চান্দা দিই। একটি-সারকুলার সোসাইটির খরচও কিছু বহন করতে হয়।

দেবানন্দ হাসিতে লাগিল। বলিল, গুপ্ত সমিতির কাজ যদি সমর্থন না করেন তবে চান্দা দেন কেন?

দেবানন্দের হাসি দেখিয়া ভবেশও হাসিল। বলিল, চান্দা দিই কারণ তাঁরা দেশের কাজ করছেন। এই হোটেলের কত ছেলে—গুপ্ত সমিতি কাজ করছে, শুধু এইটুকু জেনে-নিজ্বাদের সামান্য খরচ থেকে পয়সা বাঁচিয়ে চান্দা দেয় তুমি জানো না। আর এই চান্দা সংগৃহীত হয়ে সমিতির লোকের হাতে যায় আমার হাত দিয়ে। কদকাতার কত হোটেল, যেস বোর্ডিঙের ছেলেরা, আপিসের বাবুরা এই রকম চান্দা দেয়। তেতরের খবর তারা কিছু জানে না। একটা কিছু চেষ্টা হচ্ছে এইটুকু জেনেই তারা চান্দা দেয়।

দেবানন্দ বিশ্মিত হইয়া ভবেশের মুখের দিকে চাহিল। বলিল, আপনি ত কোন দিন একটা কথাও বলেন নি আমাকে।

ভবেশ—বলবার ত কিছুই নেই। এই হোটেলের দ্বারা চান্দা দেয় তারা কেউ আমার কাছে কোন খবর পায় নি। তারা এইটুকু জানে যে আমি পোষ্টাপিস। আমার ছাতে টাকা দিলে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে এ খবরও তারা অজ্ঞ স্বজ্ঞে পেয়েছে। আমি একটি-সারকুলার সোসাইটির কাজ করছি, গোড়া থেকে তোমাকে নিয়ে এ কাজে মেহেমছি।

একটু পরে দেবানন্দ বাহির হইয়া গেল।

বেলা হইয়াছে। দেবানন্দ হাতমুখ ধুইয়া বই মুদ্রিয়া বসিয়াছিল। ভবেশ ভ্রমণও শুইয়া আছে। তাহার দেরিতে ঘুম ভাঙে, তাই দেবানন্দ মনে করিয়াছিল সে ঘুমাতেছে। হঠাৎ সে বিশ্মিত হইয়া শুনিতে ভবেশ শুইয়া শুইয়া মহেশ্বরের প্রিয় মীরা বাদ্যের ভজনের একটি পদ গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দেবানন্দকে খাড়া ফিরাইয়া চাহিতে দেখিয়া ভবেশ বলিল,

মহেন্দ্র নেই, তার প্রাণ:কালীন কর্তব্যের তার আমার ওপর দিয়ে গেছে জানি। আমার গলাটা মহেন্দ্রের গলার মত মিঠে না হলেও ত্রীত্ৰী কানাইরা তার অভ্যন্তরীণ সন্তোষগমিসু করণ্ডে পারেন তেবে আমি অহাঙ্গীভাবে কাজটা চালিয়ে দিচ্ছি।

দেবানন্দ তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। বলিল, শুনে শুনে এই রকমের ডাকে কানাই কি বুশী হবেন, তবেশ-না?

তবেশ বলিল—তা হলে উঠে বসে ডাকি, কি বলি?

বরের বাহির হইতে কে বলিল—বাবুজী আহেন?

দেবানন্দ দেখিল একজন তরুণা ঝাঁটা পিঠন দরকার সমুখে দাঁড়াইয়া। সে অসুখান করিল তবেশের মামাবাড়ীর লোক। তবেশ ডাকিতে পিঠন বরে চুকিয়া সেলাম করিয়া একখানি চিঠি তাহার হাতে দিল।

চিঠি লিখিয়াছেন মিসেস রায়। কিটির আজ জন্মদিন। বিকালের দিকে সে যেন আসে। তাহার বন্ধু দেবানন্দকেও যেন সঙ্গে আনে।

চিঠি পড়িয়া তবেশের জ্ঞ কুণ্ডিত হইল। জন্মদিন মানে কেক, পুডিং, ভাঙটাইচের স্নেহ ব্যবস্থা। ইহার মধ্যে মিঠাবান মাদ্রুদ দেবানন্দকে টানা কেন? এংলো-বেঙ্গলী হাই সার্কেলের সাহেব মেমসাহেব ও মিসিবাবার ভিড়ে মকরলের ডি-এস-পি'র ছেলে এই পাইবে না। অতি অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িবে বেচারী।

পিঠনকে বিদায় দিয়া সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সে একটা উপায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। দেবা-নন্দকে বলিল, ওহে মনোবাগী ছাত্র, তোমার সমুখে কট্টন নবভা উপস্থিত হয়েছে। এদিকে যুগ ফেরাও।

মিসেস রায়ের নিমন্ত্রণের কথা কানাইরা বলিল, আমার আত্মীয় হলেও বলতে হচ্ছে যে এটা সাহেববাড়ীর কেতাদোরস্ত ব্যাপার হয় নি। তোমাকে যখন জানেন আলাদা চিঠি দেওয়া উচিত ছিল। তা দেন নি। আমি বলি কি নিমন্ত্রণ স্বীকার করলে জামিরে সামান্য কিছু একটা জিনিষ পাঠিয়ে দাও, নিজে যাবার দরকার নেই।

সে তবেশের পরামর্শে সায় দিল। সে পড়াশুনা করে বটে, কিন্তু তাহার মন অন্য চিন্তার পূর্ণ থাকে। তাহার মনে হক প্রকাণ্ড একটা ভরক যেন আগাইয়া আসিবেছে, মিসেস রায়, কিটি, বিলির অগংকে উহা কোন সূত্রে আসাইয়া লইয়া যাইবে।

কি দেওয়া যাইতে পারে কথা হইল। তবেশ বলিল, একটা বইটাই কিনে দিস।

দেবানন্দ রাজী হইল। হুপুরের পরে দোকানে গিয়া সে একখানি আনন্দমঠ কিনিয়া আনি। তবেশের পরামর্শে

তাহাতে কিটির নাম লিখিয়া কাগজে মুক্তিরা তাহার হাতে দিল।

তবেশ সে রাতে কিরিল না। পরদিন সকালে সে কিরিল দেবানন্দের দেওয়া বইখানি হাতে লইয়া। বলিল, আমার গ্লানটা কাছে এল না দেখু। কিটি ভরানক রাগ করেছে। বলল, তুমি নিজে হাতে না দিলে প্রজেক্ট নেবে না। এ দিকে বইখানার ওপর খুব লোভ আছে দেখলাম। এ পর্যন্ত আনন্দমঠ তার হাতে পড়ে নি। তোকে একবার যেতে হচ্ছে। আজ যাবি?

দেবানন্দ কিছুকণ কি তাখিয়া বলিল—আপনার হাতে কোন কাজ না থাকলে আজ সন্ধ্যার বেতে পারি।

সন্ধ্যাবেলা চক্রবেতেতে মি: রায়ের বাড়ীতে চুকিবার সময় কটকে ডা: চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হইল। তাহাদের দুই জনকে দেখিয়া ডা: চক্রবর্তী যুথের সিগার বাঁ হাতে লইয়া ডান হাত বাড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, গুড ইভনিং মাই ইয়ং ফ্রেন্ডস। দেবানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আই মিসড ইউ ইয়েষ্টার-ডে—কাল কেন তোমাকে দেখতে পাই নি। চল, তোমাদের সঙ্গে একটু গল্পগল্প করি।

ডা: চক্রবর্তী তাহাদের ঘরিয়া বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। মি: রায় বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলেন, আর কেহ ভখনও আসে নাই। সকলে বসিলে ডা: চক্রবর্তী বলিলেন, হালো তবেশ, তোমাদের এটি-সারকুলার সোসাইটির কাজ কেমন চলছে? আমার এক মরাগী ফ্রেন্ড, এডিটর অব এ জার্নাল, (একটি পত্রিকার সম্পাদক) জিজ্ঞেস করছিলেন সোসাইটির কথা। তিনি এর আগে ভিলকের কেন্দ্রী কাগজে ছিলেন। বালকৃত ও দামোদর চাপেকরের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাদের বরা পড়বার পরে পুণা থেকে পালিয়ে যান একেবারে বিলেতে। সেখানে আইন পড়তে আরম্ভ করেন। কিছুদিন হ'ল কিরেছেন। তাঁর যুখে জামজী কৃষ্ণবর্মা ও প্যারিস এস. এস. রাণীর গল্প শুনলাম। বললেন, কৃষ্ণবর্মা ইণ্ডিয়া হোমিরল সোসাইটির অনেক ধর শুনলাম। তিনি বিলাতের ভারতীয় ছাত্রদের অরগ্যানাইজ করবার চেষ্টা করছেন।

দেবানন্দ মহারাজের আন্দোলন সম্বন্ধে সতীমের যুখে কিছু শুনিয়াছিল। চাপেকর জাত্বয়ের নাম শুনে নাই। সে ডা: চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, বালকৃত ও দামোদর চাপেকর কি করেছিলেন?

ডা: চক্রবর্তী হাসিলেন। বলিলেন, করেছিলেন অনেক কিছু। ১৮৯০ সনে বোম্বেতে হিন্দু-মুসলমান রায়টের পর বৎসর প্রথম সর্কজরীদ গণপতি উৎসব আরম্ভ হ'ল। দশ দিন ধরে মেলা, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, আর বক্তৃতা চলল। ছোট ছোট স্কুলের ছাত্রদের হাত দিয়ে লিকলেট হুড়ানো হ'ল।

“হে মারাগী জাতি, শিবাজী মহারাজের মত ভোমরাও বিজ্ঞান প্রদর্শন কর”—এই হ’ল লিকলেটের বক্তব্য। চাপেকর জাতারা হিন্দুধর্মের বিরূপসরণ নাম দিয়ে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজীর অভ্যর্থনা-উৎসব প্রথম আরম্ভ হ’ল। চাপেকররা উৎসব উপলক্ষ্যে কবিতা লিখে প্রচার করলেন : “জাতীয় সংগ্রামে যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা জীবন উৎসর্গ করব; যে সকল শত্রু আমাদের ধর্মে আঘাত করছে তাদের বুকের রক্তে মাটি সিক্ত করব। শত্রুকে হত্যা করে তবে আমরা মরব।” পূর্ণপতি উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁরা লিখলেন : “হার, গোলাম হয়ে থাকতে এখনও ভোমাদের লজ্জা হয় না? যুদ্ধক্ষেত্রে আলিঙ্গন কর, কিন্তু তার আগে ইংরেজকে মার, এদেশ হিন্দুধর্ম, ইংরেজ কেন এদেশ শাসন করবে?”

ডাঃ চক্রবর্তী চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, সিগার একবার মুখের কাছে উঠাইয়া আবার নামাইয়া লইলেন। ভবেশ ও দেবানন্দের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন—কথাটা প্রায় ভিলকের কথার মত। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে উৎসবের সময় ভিলক বক্তৃতা দিলেন—“ঈশ্বর ইংরেজকে হিন্দুধর্মের রাজত্ব দান করে তাজশাসন হাতে দিয়ে পাঠান নি। কৃষ্ণগুকের মত ভোমাদের দৃষ্টি সজীর্ণ রেখো না, পিনাল কোডের গভী তেজে বেরিয়ে পড়।” তারপর শোম। বোমের প্লেগের হাকামার কথ্যাত প্লেগ কমিশনের রায় ও তার সদী লেপ্টেন্যান্ট আর্চার্ড বালকুক ও দামোদর চাপেকরের গুলিতে নিহত হ’ল। বরা পক্ষে হুই ভাইয়ের কীসি হ’ল। চাপেকর সমিতির আরও কয়েকজনের কীসি ও হীপান্তর হ’ল।

ঘরের সকলে চূপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ। পরদা সরাইয়া মিঃ ডাটা প্রবেশ করিলেন। মিঃ রায় ও ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে করমর্দন করিয়া ভবেশ ও দেবানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, শুভ ইভিনিং।

ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, মরগী ও বাঙালী ইংরেজের চন্দ্র-শূল হয়ে উঠেছে। লর্ড কার্জন কান্দীয়ে যাবেন স্থির হ’ল। এক অসুস্থ বাঙালী ভক্তলোক হাওরা পরিবর্তনের জন্ত জম্মুতে হিলেন। হি ওয়াঙ্ক লর্ড উইথ র্যান অর্ডার টু কুইট (তার উপর জম্মু ত্যাগ করবার আদেশ হ’ল)। শিরালকোটে পুলিশ তাঁকে বলল, বড়লাট কিরে গেলে আবার জম্মুতে যেও, একরেকটা দিন পঞ্জাবের কোথাও কাটিয়ে দাও। ভক্তলোক সবিনয়ে বললেন, বড়লাট আসবেন, ভাল কথা। সেজ্ঞ আমাকে বাড়ি ধরে বের করে দেওয়া হ’ল কেন ভর? ভর বললেন, ইউ সি, ভাইসরয়ের হুঁহাজার পঞ্জের মধ্যে কোম বাঙালী ও মরগীকে বেতে দেওয়া নিষেধ। বাঙালী ও মরগী সিডিপন করে।

মিঃ ডাটা বলিলেন, রায়, আজকের কাগজে দেখেছ ডুমা

মিট করছে। টাইমস্ লিখেছে, উইদাউট রডশেড শুধু ট্রাইকের চাপ দিয়ে ডেনপটিক শাসকের কাছ থেকে অবিকার আদায় করতে হয় কিভাবে রূপকান্ত পৃথিবীকে দেখিয়েছে। বলেছে, নো-বডি এতার সাসপেন্ডেড ডাট পিপল পজেসড সো পাওয়ারফুল এ ওয়েপন্ অব কোরারশন (কনসাধারণের হাতে যে এত বড় শক্তিশালী বাণ্য মানাবার অস্ত্র আছে কেহ একথা সন্দেহ করে নাই)। জারকে উপদেশ দিয়েছে, প্রকারা যা চাইছে দিয়ে দাও লক্ষ্মীছেলের মত।

ডাঃ চক্রবর্তী জা কুঁচকাইয়া বলিলেন—টাইমস্ কি লিখেছে? উইদাউট রডশেড? হি ওয়ড লাজার।...

১৯০৪ সনে মিহিলিটরা রাশিয়ান মিহিটার M. de Plevé-কে হত্যা করলে পরাজয়ের কাগজ “কাল” লিখল,—ইউরোপের জাতিদের সঙ্গে সংশ্রবের ফলে ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর অপরাধের আমদানী হলে বড় ভয়ের কথা। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া চিংকার করে উঠল—“কাল” এদেশে মিহিলিকম্ম আনতে চার। বিনা রক্তপাতে বটে।

মিঃ ডাটা—ইণ্ডিয়ান মিররের পরস্তর লীডরটা কে লিখেছে, রায়? লিখেছে, লর্ড ক্যামিং আসবার সময়ে দেশের অবস্থা যেমন হাঁড়িরেছিল এখনকার অবস্থা তেমনি উদ্বেগজনক। ডিপ্রেসনের ফলে লোকের মন বিগ্নবমুখী হয়ে উঠেছে। একখানা বাংলা কাগজে দেখলাম বর্তমান অবস্থার ভাল এমালিসিস করেছে।

মিঃ রায়—কি লিখেছে?

—লিখেছে সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, কমসেট বিল সম্বন্ধে এক্টিভেশন (আন্দোলন) এডুকটেড (শিক্ষিত) শ্রেণীর মধ্যে আবহ ছিল। বদেদী আন্দোলনে সমাজে উঁচুনীচ সব স্তরের লোক যোগ দিয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ঠিক—

মিঃ ডাটার কথা শেষ হইবার আগে মিঃ গাভুলী ও মিঃ মিটার এক সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন—ভোমরা উঠছ? আই সে ভবেশ, কম টু মাই প্লেগ সার ডে উইথ ইওর ফ্রেন্ড (ভোমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একদিন আমার বাড়ীতে এসো)। যেদিন ভোমাদের কলেজ বন্ধ থাকে ও কোর্ট বন্ধ থাকে এই রকম একদিন সকালের দিকে এসো। গল্পগল্প হবে।

মমত্ব করিয়া তাহারাই হুই জন বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া ভবেশ বলিল—চল, ওপরে যাই।

কিট বরর পাইয়াছিল ভবেশ ও দেবানন্দ, আসিয়াছে। ডাঃ চক্রবর্তী তাহাদের সঙ্গে লইয়া নীচে বসিবার ঘরে চুকিয়াছেন এ বররও পাইয়াছিল। চক্রবর্তী সাহেবের হাতে পড়িলে শীত হাজা পাওয়া মুশকিল সে জানে। ভক্তলোক এত বকবক করিতে পারেন। এত খ্রিষ্টাব্দে ইহা হইয়াছিল, এক

ঐষ্টাকে উহা হইয়াছিল, এত ঐষ্টাকে তাহা হইয়াছিল—
তনিলে মনে হয় যেম হিড়ির ক্লাসে পড়াইতেছেন। আর
কত রকমের গবর যে তাহার পেটে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা
নাই। দেখিতে কাদার কুম্যামের মত পত্তীর গোছের মাহুয
কিন্তু যখন হাসির কথা আরম্ভ করেন তখন হাসিতে হাসিতে
পেটে বিল ধরিয়া যায়।

কিট মিছের ঘরে গিয়া কাল যে সাক্ষীখানা পরিয়াছিল
সেখানা পরি। আরনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর একবার
সাক্ষসজ্ঞা টিক আছে কিনা দেখিল। তারপর বসিবার ঘরে
গিয়া একখানা ছবির বই দেখিতে লাগিল ও মাকে মাকে
ঠোট কামড়াইয়া মুখখানাকে পত্তীর করিবার চেষ্টা করিতে
লাগিল।

তবেশ ও দেবানন্দ ঘরে ঢুকিতে মিসেস রায় একটু
অজ্ঞোপের ঘরে দেবানন্দকে বলিলেন—তোমাকে নিমন্ত্রণ
করে পাঠালাম কিটির জন্মদিনে, কাল এলে না কেন?

দেবানন্দ একবার তবেশের দিকে চাহিয়া বলিল—কাল
একটু কাজে আটকা পড়েছিলাম।

কিট পত্তীর মুখে বলিল—কি কাজ?

তাহার দিকে চাহিয়া দেবানন্দ হাসিল। হাত বাড়াইয়া
বইখানি তাহার হাতে দিতে গেল। মিসেস রায়—ওটা কি
বই?

দেবানন্দ—বক্তিমচক্রের আনন্দমঠ।

মিসেস একটু জ্র কুক্ষিত করিয়া বলিলেন—বাংলা বই?
ইংরেজী ভাল বই পেলেন না? কিটির বাংলা বই পড়া ব্যয়ণ।
পত্তর্ণে দেখতে পেলেন বাংলা বই কেলে দেবে।

মাঝের কথা তনিয়া চোখের পলকে গাভীর্ষা ত্যাগ করিয়া
কিট দেবানন্দের হাত হইতে বইখানি ছেঁ। মারিয়া লইল।
মাঝের দিকে চাহিয়া বলিল—পত্তর্ণে আনন্দমঠ কেলে দেবে?
দিলেই হ'ল?

এক মুখ হাসিয়া দেবানন্দকে বলিল—থ্যাক ইউ। তোমার
প্রজেক্ট আমি যত্ন করে পড়ব, যত্ন করে রাখব। নাম লিখে
দিবেছ?

তবেশ হাসিয়া বলিল—কিট ইজ এ গুড গার্ল (কিট লক্ষী
মেরে) বা মুখের চেহারা করেছিল—

কিট হাসিয়া বলিল—মিস বাদলের মত, মর? জানো
তবেশ-না, আমার পত্তর্ণে মিছের নাম বলে মিস বাদল, আমি
বলি মিস বাদল আর বিলিটা আড়ালে বলে মিস জাদল।

বিলি কোথায় গিয়াছিল। লাকাইতে লাকাইতে ঘরে
ঢুকিল। চারদিকে এক মজর দেখিয়া সে বলিল—তুই আজ
আবার ও সাক্ষীটা পরেছিস? আজও কি তোর জন্মদিন?

চোখ মিট মিট করিয়া হঠ হাসি হাসিয়া বিলি বলিল—
বুকেছি।

কিট—কি বুকেছিস বিলি দি ডেভিল?

বিলি তারহরে প্রতিবাদ করিল সকলের সম্মুখে তাহাকে
বিলি দি ডেভিল বলিবার। বলিল—ভ্যাডি বলে তাই তুইও
বলবি? নটী কিট। তবেশ-না, ও আজ ও সাক্ষীটা পরেছে
তোমাদের দেখাবার জত।

দেবানন্দের দিকে ইদিত করিয়া সে চোখ মিট মিট
করিতে লাগিল। তবেশ হাসিল।

কিটির মুখ একটু লাল হইল। সে বলিল—পরেছি বেশ
করেছি। বিলি দি ডেভিল, বা এখান থেকে।

বিলি মার পাশে আঁটিয়া বলিল। বলিল—না যাব না।
মামী, ও আমাকে বকেছে দেখ না।

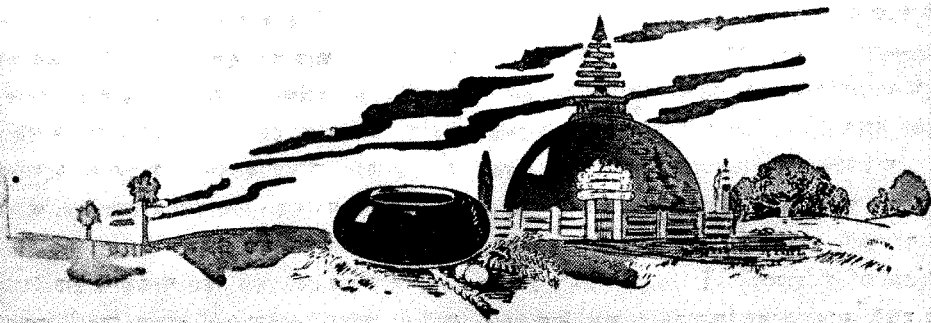
দেবানন্দের দিকে চাহিয়া বিলি বলিল—তুমি কাল এলে
না, কত খাবার হয়েছিল। মামী, ওকে রসগোল্লা দেবে না?

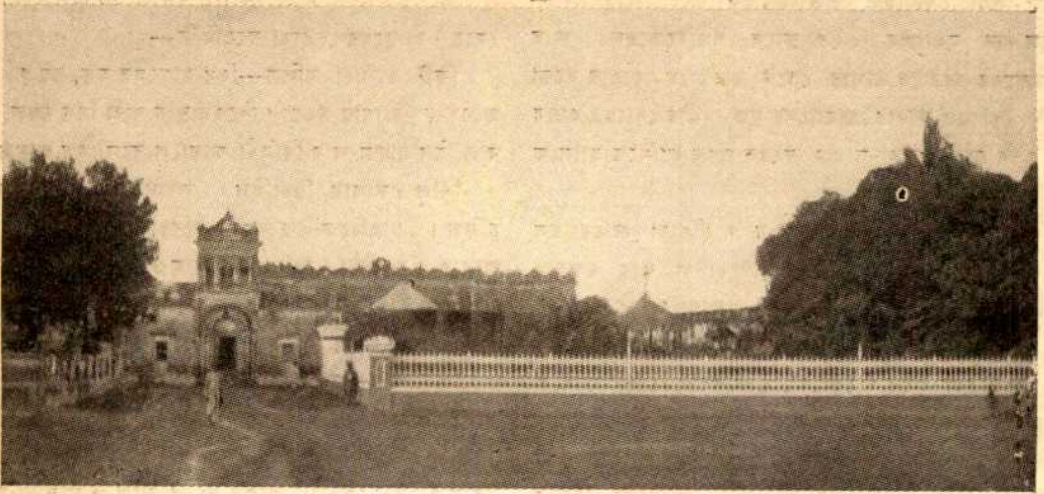
বিলির মাঝের কাছে বৈসিয়া বসিবার কারণ বুঝিতে
পারিয়া যবের সকলে হাসিয়া উঠিল। মিসেস রায় বাহিরের
লোকের সম্মুখে ছেলেমেয়ে বগড়া করার বিরক্ত হইলেও
সকলের সঙ্গে হাসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মিটমুখ করিয়া ছই বন্ধু বিদায় লইল। কিট
কটক পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে আসিল। দেবানন্দকে বলিল—
তোমার বই পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি, বুকেলে?

দেবানন্দ তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

ক্রমশঃ





শারদাবাস—সম্মুখের দৃশ্য

পূর্ব পাকিস্তানের একটি আদর্শ পল্লীর অতীত চিত্র

শ্রীশুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৩০ সালের পৌষ মাসের ‘প্রবাসী’তে যে আদর্শ গ্রামের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, দেশ-বিতাগের পর সেই আদর্শ পল্লীর অভাবনীয় পরিবর্তন অতীতের স্মৃতিকে জাগ্রত করিতেছে। পূর্ববঙ্গের পল্লীর আদর্শ সমাজ-জীবন কিরূপ ছিল এবং দেশ-বিতাগের কলে তাহার কিরূপ বিপর্যয় ঘটয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই প্রবন্ধে দেওয়া যাইতেছে।

উত্তরবঙ্গের সিরাজগঞ্জ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে “হুল” গ্রামটিকে তখন একটি ক্ষুদ্র শহর বলিলেও অত্যাতি হইত না। শহরের যাবতীয় সুবিধাই ঐ গ্রামে ছিল। প্রথমেই মনে পড়ে, গ্রামের সামাজিক জীবনের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের বিষয়, আর বাহারা এই আদর্শ সমাজের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই পাকড়াশী পরিবারের কৃতী সন্তানদের কথা। তাঁহাদের সমাজসেবার আদর্শে এই পল্লী-নিকেতনে একটি সত্য-বড় বিরাট হিন্দু সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেখানে প্রাচ্য আদর্শের সঙ্গে গণতন্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচ্ছন্ন হইত—যেখানে ধনী সমাজপতিগণের জমকল্যাণ-প্রচেষ্টার বহুস্থলী অহুপ্রেরণার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছিল।

হুল-সমাজের নামে পরিচয় দিত পার্শ্ববর্তী দশখানা গ্রামের অধিবাসীরা। গোয়ালন্দ বাহাছরাবাদ সাতিসের গ্রামার আকও তরুণের মত হুলের বাড়ী বহির্ভাগে বহন করিতেছে। স্বর্গত প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় ৭০ বৎসর পূর্বে “হুলচক্” গ্রামার ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গ্রামার কোম্পানীর ক্যাচি আকও পূর্বের মতই আগন্তুকদের অত্যাধিকার জন্ম দাঁড়াইয়া

আছে। কিন্তু ধরের ছেলেরা আর ধরে কিরিয়া আসে না। পূজার ছুটিতে জমপল্লী-প্রত্যাগতদের ভিড় আর নাই।

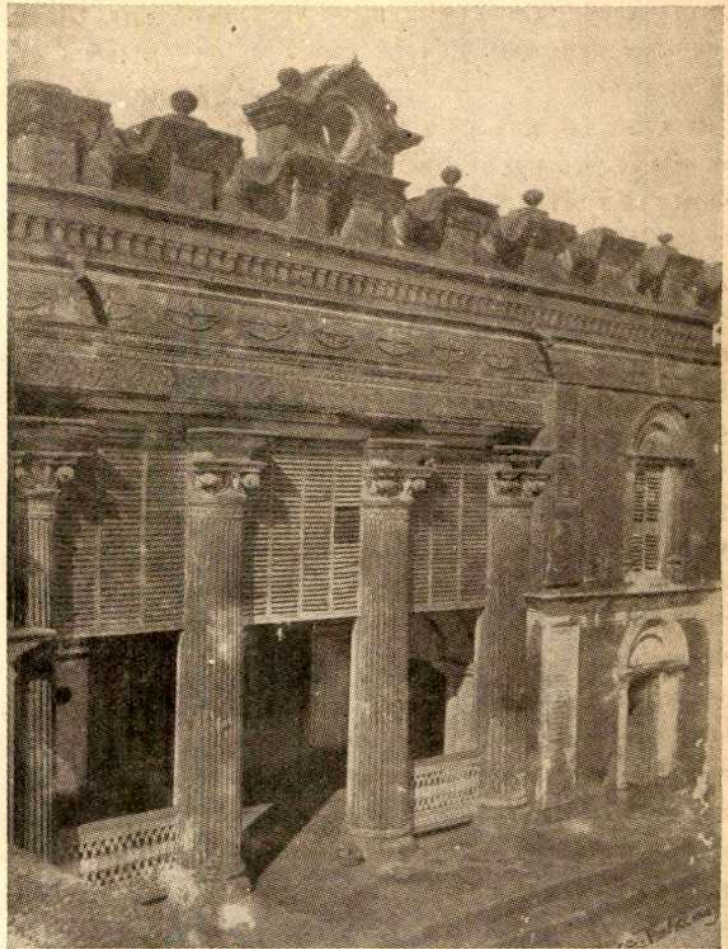
প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যও গ্রাম ছিল সমৃদ্ধ। পূর্ব ও দক্ষিণের সবুজ ঘাসের বিস্তৃত মাঠ গ্রামবাসীর নয়ন-মন মুগ্ধ করিত। এখানে খেলা হইত একসঙ্গে তিনটি কুটবল টিমের এবং যুবক সজ্জের টেনিস ক্লাবের। বর্ষায় খেলা বোর্ডের সড়কের পাশ-পাশি প্রবাহিত খালের স্রোত ছিল হাট বাজারের দৌকা-চলাচলের পথ। সড়কের পশ্চিম প্রান্তে ছিল ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েশনের “গণেশচন্দ্র মেমোরিয়াল হল”। যুবক সজ্জের কর্ম্মী গণেশচন্দ্রের স্মরণে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে প্রতি বৎসর সংকার্ধ্য উৎসাহ বর্ধনের জন্ত স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই সজ্জের প্রচেষ্টার রাজিতে গ্রামের রাস্তার মোড়ে মোড়ে আলো আলামোর ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখানেই ছিল সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন আইন অস্থায়ী রেজেষ্টারী করা “হুল বাণীমন্দির” বা সাধারণের পত্রিকাপাঠের মিলনক্ষেত্র ও লাইব্রেরী। তার পর ছিল “হাতীবর”। এক সময় এখানে তিনটি হাতী থাকিত। জমিদার শারদাপ্রসাদ পাকড়াশী মহাশয় তাঁহার মায়ের “দানসাগর” প্রাঙ্গণে “মতিলাল” নামক হাতীটি দান করিয়াছিলেন। মতিলাল মধ্য-মধ্যে কিঞ্চিৎ হইয়া অমর্ষ খটাইত। পাগলা মতিলালের অনেক কাহিনী উত্তরবঙ্গে রূপকথার মত প্রচলিত আছে।

সড়কের ধারেই ছিল “হুল পাকড়াশী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়”। সম্মুখে “হরচন্দ্র হল” নামক বিরাট হলঘরটি হুলের

শোভা বর্ধন করিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে, ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সুদূর গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টি পাকড়াশী-জমিদারগণের সংকল্প ও বিদ্যাহরণ, এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। রাতার পূর্বপ্রান্তে টেলিগ্রাফ ও সব-পোষ্ট আপিস, “বিনোদলাল হল” নামাঙ্কিত দাতব্য চিকিৎসালয়, ঈশ্বরী জয়কালী মাতার সুন্দর পাকা মন্দির। আরও পূর্ব দিকে ডাকবাংলো, সব্বেরজে-ঠারী আপিস, থানা, হাট বাজার চৌহালী গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জেলা বোর্ডের বীধান সভকের দ্বারা সবগুলি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সোমবার ও বুহুস্পতিবার হাটে হাজার হাজার লোকের সমাগম হইত।

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে সারা-সিরাঙ্গগঞ্জ রেলপথ চালু হওয়ার পূর্বে, গোয়ালন্দে পথে ঈমার যোগে কলকাতার ডাক বিকালে আসিয়া পৌঁছিত। বেলা ৪টা হইতে না হইতেই যুবকেরা খেলার মাঠে গিয়া হাজির হইত—প্রোট ব্যক্তিগণ পোষ্ট আপিসের দিকে রওনা হইতেন এবং বুড়েরা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সভকে আসিয়া জমায়েত হইতেন। দৈনিক পত্রিকার খবরাদি লইয়া আলোচনার বৈকালিক আসর সরগরম হইত। উঠিত। যে-কোন নবাবগত ব্যক্তি বৈকালে সদর রাতার উপস্থিত হইলেই গ্রামের অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ লাভ করিতেন। গ্রামের পুরুষেরা সকলেই সাধ্য মন্দিরনে একত্রিত হইতেন।

গ্রামের দক্ষিণের মাঠ হইতে উত্তর দিকে তাকাইলে সান্ত-জামি শ্রেণীবদ্ধ পাকা বাড়ী মন্দির পড়িত। মধ্যস্থলে শারদা-বাসের জিহল উচ্চ বড়ি-ঘরের চূড়া বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। গ্রামাঞ্চলে শারদাবাসের ভায় সুরম্য প্রাসাদ বিরল। সমুখে ঈশ্বরী দয়ামতী কালীমন্দিরের দোতলা মহাবতের দৌর। ১৯৬৪ সালে পরলোকগত হরচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় স্বীয় মাতার নামে এই অস্থায়ী দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। দেশ বিতাগের পর এই বিগ্রহ পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হইয়াছে। শূন্য পাকা মন্দিরটি এখনও অতীতের স্মৃতি বহন করিতেছে। মন্দিরে যাওয়ার পাকা রাস্তার দুই দিকে রেলিং-



শারদাবাস চণ্ডীমণ্ডপ, শীর্ষদেশে বড়ি-ঘরের চূড়া

বেরা ফুলের বাগান, উত্তর দিকে লৌহভোরণ ও সেবায়ের-গণের সিংহদ্বারযুক্ত বাসভবন সবকিছু মিলিয়া এই গ্রামের জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ দর্শক মাজকেই বিম্বিত করিত। এখন বাগানে ফুল ফোটে না। পরিভ্রমণ বরবাড়ীতে মিরপায়-নর-নারী আশ্রয় লইয়াছে।

গ্রামের অন্ততম দ্রষ্টব্য ছিল দুইটি দীর্ঘ জলাশয়। একটির নাম “বড়কুম”, অপরটির নাম “ছোটকুম।” পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই উত্তর জলাশয়ের চারিদিকে পাকড়াশী জমিদারগণ বহু সন্তান ও শিক্ষিত তত্ত্ব-সন্তানকে ব্রাহ্মোত্তর, বসন্তবাট ও ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়া স্বাধীনভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বড়কুম বার-মাস জলপূর্ণ থাকিত। বড়কুমের দক্ষিণ অংশে বট পাকড় গাছের তলায় ছিল গ্রামের কিশোর ও যুবকদের দারিয়া, হাড়ুচু প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রীড়ার ময়দান। এই বটগাছের একধারে

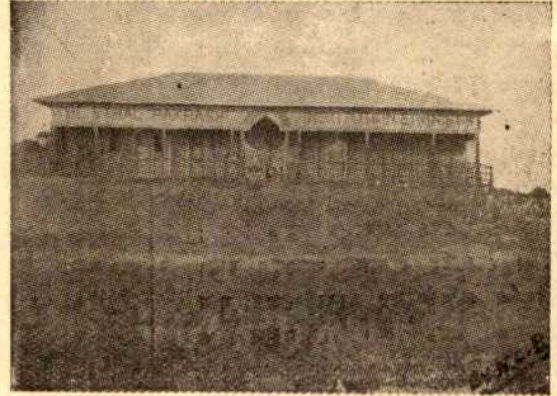
জগদ্বাদ্যেবীর সমাধির উপরে ছিল শিব-মন্দির। বিপরীত দিকে কেদারেশ্বর শিব-মন্দির। বর্ষার প্রাৰ্ধনে যখন বড়কুম কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া ঘাইত সে সময়ের দৃশ্য ছিল পরম উপভোগ্য।

এই অঞ্চলের খাঁটি ছড়ের প্রসিদ্ধি ছিল। তিন গ্রাম ও যমুনা নদীর চর থেকে প্রচুর ছব্ব ছলের বাজারে প্রত্যাহ আম-দানী হইত। কাজেই খাঁটি দ্রুত, উৎকৃষ্ট দধি এবং ছানার প্রস্তুত ব্যবতীয় খাড়াই সুলভ ছিল।

গ্রামের পূর্বদিকে ছিল অধিকারীদের পল্লী। তাঁহাদের কোলিক বিগ্রহ—গৌর ও নিতাইয়ের স্তূপায় দারুশক্তি। আগেকার আমলে শ্রীমহাপ্রভুর পার্শ্ব ৬৪ মোহাশের অত্যন্ত কবিচল ঠাকুর রাঢ়দেশে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালক্রমে মুসলমানদের উৎপীড়নের আশঙ্কায় কবিচলের বংশধরগণ উত্তরবঙ্গে আগ্রয় লয়, অবশেষে তাঁহারা এই স্থল-গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। গ্রামের বদাভ জমিদার শারদাপ্রসাদ পাকড়াশী মহাশয় এই বিগ্রহের একটি স্তূপের পাকড়াশী মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। এই বিগ্রহের অষ্টম দোল উপলক্ষে গ্রামে তিন দিন ব্যাপী বিরাট মেলা হইত। মাগর-দোলা, ম্যাজিক প্রভৃতির তাঁবু মাঠ ছাইয়া কেলিত। বহুদূর হইতে হাজার হাজার যাত্রীর সমাগম হইত। বিগ্রহ এখন ২৪ পরগণার মদনপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মেলার আমদোংসব আজ শ্রুতিমাজে পর্যাবসিত। ঠাকুরের মঙ্গলারতির কঁাসর ঘণ্টা আজ আর গ্রামবাসীদের নিদ্রান্তর করে না। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে পাকড়াশী বাবুদের প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরী জয়কালী মন্দিরের চারিধারে ছিল মুসলমান-পল্লী। মুসলমানরাও এক সময় এই কালীবাড়ীতে মানভ করিতে ঘিষা করিত না। দেশ-বিভাগের পর ঈশ্বরী জয়কালীমাতাকে নবমীপধামে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেবাসন্তগণের পরিত্যক্ত বসন্তবাটি এখন মনে বিষাদ-মাখা শ্রুতির উল্লেখ করে। মন্দিরের পিছনে ছিল যুধাধের বসন্তবাটি। এই যুধা-বংশের লোকেরা পুরুষাত্মক্রে পাকড়াশী-জমিদারদের বিখণ্ড অশ্রুচর ছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গ্রামবাসীদের অবাধ গতি ছিল জমিদারদের বাড়ীতে। হিন্দু গৃহস্থদের কাজকর্ম করিয়াই প্রতিবেশী মুসলমানগণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত।

শ্রীহুজ দেবেশচল পাকড়াশী মহাশয়ের অহুপ্রেরণায় প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় যুবকগণের উডোগে বিজয়া সন্মিলনের অহুষ্ঠান হইত। এই উপলক্ষে সস্তরণ, আবৃত্তি-প্রতি-যোগিতা প্রভৃতির আয়োজন হইত। সন্মিলনে গ্রামের অভাব-অতিযোগের কথা উপাণিত হইত এবং তাহার প্রতিকারের পছা নির্দেশ করিয়া কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। এইরূপে গ্রামে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল।

৮শিবেশচল পাকড়াশী এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের উদ্যমে গ্রামে বহনশিল্প প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারাও প্রচারিত হইয়াছিল। “স্থল-সমাজ” নামে হাতে লেখা একখানি সাপ্তাসিক পত্রিকা বৈশাখ ও আশ্বিন মাসে তাঁহার চেষ্টায় প্রকাশিত হইত।



হরচল ‘স্থল’—স্থল পাকড়াশী, উচ্চবিদ্যালয়

১৯১৯ সনে শ্রীহুজ সুরেশচল পাকড়াশী মহাশয় “স্থল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক লিমিটেড” নামে যে ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কয়েক বৎসর অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দান করিয়াছিল। গ্রামের জমিদার এবং ভাস্করদারদের ১০১২টি কাছারির কর্ণচারী, পাইক-বরকন্দাজ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি বহু বিদেশী লোক গ্রামে অবস্থান করিত। গ্রামে স্তূতার-মিজি, তুঁইমালী, রজক প্রভৃতি বিভিন্ন লোকেরা জমিদারের কাজকর্ম করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। সেই হেতু গ্রামের জমিদারদের বাড়ী “সরকারী বাড়ী” নামে পরিচিত ছিল।

গীতবাত্তাহুশীলনেরও সুযোগ-সুবিধা গ্রামে ছিল। ৮অখিলচল পাকড়াশী যুদ্ধশাস্ত্রী মহাশয় পাখোন্ডাজ বাদনে বহুবিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদকে দীর্ঘকাল প্রতিপালন করিয়া নিজ গৃহে গীতবাত্তাহুশীলনের এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রামের অনেক যুবক বীরা-তবলা বাজনার এবং সঙ্গীতচর্চায় পারদর্শী হইয়াছিল। গ্রাম-প্রত্যাহ সন্ত্যায় গান-বাজনার বৈঠক বা জলসার অহুষ্ঠান হইত। অনেক বিদেশী ওস্তাদও এখানকার সমর্থদারদের গুণগ্রাহিতার কথা শুনিয়া এখানে আসিতেন এবং নিজেদের গুণপণার জন্ত পুরস্কৃত হইতেন। “স্থল আদি আর্ধ্য রত্নমি” নামক নাট্য সমিতি ১২৮০ সনে স্থাপিত হয়। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে প্রতি বৎসর নিয়মিত নাট্য্যতিনয় হইত। পাকড়াশী-পরিবার ছিলেন এই নাট্য সমিতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁহাদের অর্থাহুকুল্যে রত্নমকের নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদ, দ্রুতপট,

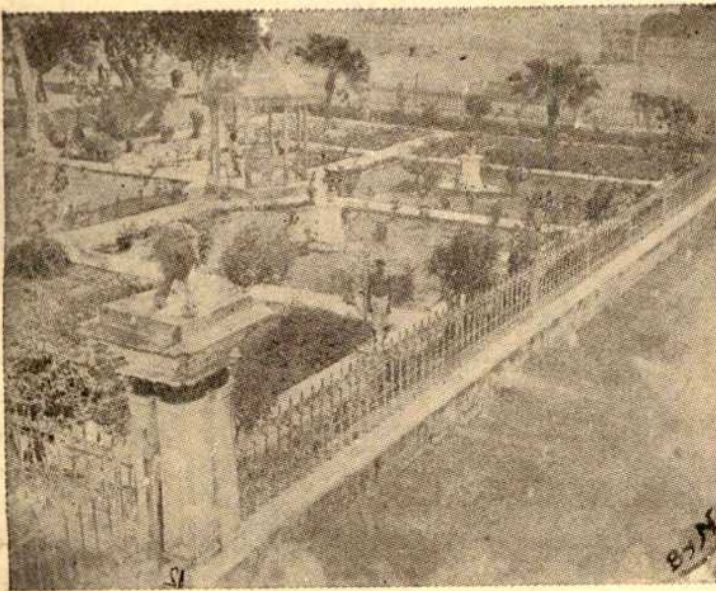
গ্যাসের ফুট-লাইট প্রভৃতির ব্যবস্থাও হইয়াছিল। অভিনয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য বার্ষিক ভিন্ন-চার শত টাকা মির্কিষ্ট ছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই অভিনয়কলার পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। চিকিৎসার সর্বপ্রকার সুবিধাই গ্রামে ছিল। স্বতঃপ্রসূত হইয়া হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিয়া ৬৮০০০০০ পঞ্চোপাধ্যায় ও গ্রীষ্মকাল নবোদয় পাকড়াশী মহাশয় গরীব-দুঃখীদের হৃদয়োগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিতেন।

গ্রামে আর দ্বাদশে ভোগ পার্কে ভোজ-নিমন্ত্রণের রূপ পড়িয়া যাইত। ইহাতে মুসলমানরাও বাদ যাইত না। বৈশাখ মাসে প্রত্যহ অহুষ্ঠানে যোগদান করিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে পদ্মকালী পূজা বা ৬শোভার পাকড়াশী-প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেব বিগ্রহের আমন্ত্রণা পূজা উপলক্ষে সারা রাজিব্যাণী উৎসব ও ভোজের



ঈশ্বরী দয়াময়ী কালীমন্দিরের মহাবৎসরক তোরণ



বাগানের ভিতরের দৃশ্য

বিপুল আয়োজন, আবারে জমিদার ও তালুকদারদের বাড়ীর পুণ্যাহ, আবণ-সংক্রান্তিতে মনসাপূজায় হিন্দু-মুসলমানের মৌকবাচ-প্রতিষোপিতা, তাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী মন্দোৎসবে গ্রামবাসীদের গ্রীতিভোজ—এই সকল অহুষ্ঠান পল্লী-জীবনে বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিত। আশ্বিনে দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রবাসীদের নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনে গ্রামে যেমন আনন্দের হাট ধুলিয়া যাইত। এক সময়ে গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছাকিশ-খানি প্রতিমা নিম্নিত হইত। নবমী পূজার বলিদানের সময় গ্রামবাসীরা সকলে একত্র সমবেত হইত। প্রত্যেক বাড়ীর কর্তব্যাক্তি বলিদানের সময় উপস্থিত থাকিতেন এবং পর্যায়ক্রমে সবগুলি বাড়ীর বলিদান অহুষ্ঠান সমাধা হইলে ঈশ্বরী দয়াময়ী কালী-বাড়ীতে একত্রিত হইতেন। পূজার সময়

শ্রীমতী-ভোগ ও আরতি-কীর্তন উপলক্ষে সমগ্র গ্রামবাসীর সাক্ষ্য-ভোজের ব্যবস্থা সেবায়ত্তদের বাড়ীতে করা হইত। বৈশাখী সংক্রান্তিতে হরিসতার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক দিন অষ্টপ্রহর নামকীর্তন ও এক দিন পদ্ম-কীর্তন হইত। অদূরবর্তী টুটুয়া পাচিল গ্রামের এক দল মুসলমানও এই

বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণের প্রথা ছিল না। ভোগ নিবেদিত হওয়ার সংবাদ দিলেই প্রত্যেক বাড়ীর অন্ততঃ দুই-তিন জন অল্প বাড়ী গিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিত। জমিদার ও তালুকদারদের বাড়ীতে কালিকা পুরাণোক্ত বিবি অহুযায়ী কালো রঙের দেবীমূর্তি নির্মাণ ও রাজিতে ভোগের ব্যবস্থা থাকার দিবারাজ

উৎসব এবং আমদের শ্রোতা চলিত। বিজয়ার দিন শোভা-
যাত্রাসহ প্রতিমা নিরঞ্জম হইত। এতদুপলক্ষে একে একে
গ্রামের সবগুলি প্রতিমা নিরঞ্জনের শেষে সকলে একসঙ্গে গৃহে
প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং জাতিধর্ম-নির্কিশেষে গ্রামবাসীরা



কেশরেশ্বর শিবমন্দির

পরস্পর পরস্পরকে বিজয়ার আলিঙ্গন করিতেন। দেশ
বিশাগের অব্যবহিত পূর্বেও যোলখানি প্রতিমার পূজা
হইত। ১৩৫৮ সনে মাত্র তিনটি পূজা অহুষ্ঠিত হয়। কিন্তু
তাহা নিরামন্দ পুরীতে নিয়মকর প্রয়াসমাত্র।

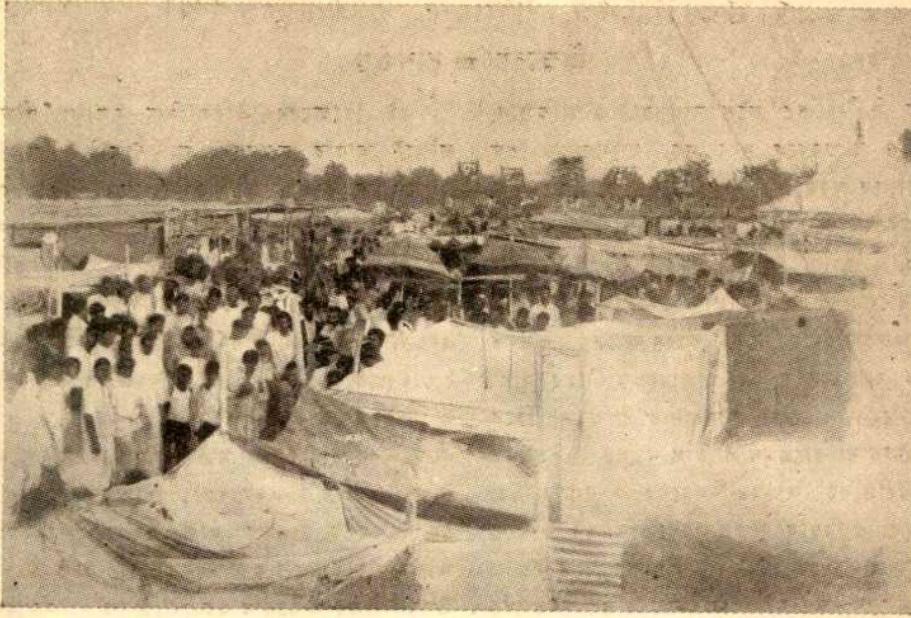
কোকাগরী পূর্ণিমা, জাত্বিতীয়া, দীপাবিত্তা প্রভৃতি পার্শ্ব
উপলক্ষে প্রতিবেশীদের জন্য প্রতিটি গৃহের দ্বার ছিল
অবরিত—সকলেই সাধ্যানুযায়ী আদর-আপ্যায়ন ও
আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। অগ্রহায়ণ মাসে এখানে
গৌরাক মন্দিরের রাসপূর্ণিমার সমারোহ দেবীবার জন্ম বিস্ত্র
গ্রাম হইতে বহু লোকের সমাগম হইত। পৌষে “মূলা-
মুড়ির ভোজ” একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব ছিল। পাকড়াশী
মহাশয়ের বাড়ীতে পর পর সাত দিন ৩০দিবসের বৈকা-
লিক ভোগ উপলক্ষে প্রচুর মোষা মুড়কি চিঁড়া নাড়ু মূলা ও
ফলাদির দ্বারা প্রস্তুত প্রসাদ গ্রহণের জন্ম হেলে বুড়া সকলেই
আমন্ত্রিত হইতেন। দোলের সময় আবার কুহুমে গ্রামের
মাটি রান্ধা হইয়া উঠিত। হোলির দিন জমিদার-বাড়ীর

বিহারী দারোয়ান, সহস প্রভৃতি দলবদ্ধ ভাবে মাদল বাজাইয়া
গাম করিতে করিতে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ফিরিত। চৈত্র
মাসে হইত পাঠ, ঠাকুরের গাঙ্কন ও সন্ন্যাসীদের লোকনৃত্য।
চাকের ভালে ভালে কত রকম নৃত্যের জন্মে তাহার ঠাকুর
লইয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করিত। চৈত্রপূজার পরিসমাপ্তি হইত
হর-গৌরী নৃত্য ও চড়ক উৎসব অহুষ্ঠিত হইবার পর। চড়ক-
পূজায় গ্রামে মেলা বসিত। কোন কোন বার বড়ক্কে
মৌকর মাঙলে চড়কগাছ জুড়িয়া দিয়া বাচবেলা হইত,
কোন বার বা গরুর গাড়ীর উপর চড়কগাছ লাগাইয়া সড়কের
উপর চলন্ত চড়কে সন্ন্যাসীরা ঘুরপাক খাইত। এইরূপে
নানাবিধ আমদোৎসবের ভিত্তর দিয়া বাহো মাস কাটিয়া
যাইত।

জমিদারগণ হিন্দু হইলেও তাঁদের প্রজাবৃন্দ অধিকাংশই
ছিল মুসলমান। নামাজের জন্ম বাজারে জুম্মাঘর ছিল এবং
পীরের দরগাহ জমিদার-বাড়ী হইতেও সিঁচী পাঠানো
হইত। স্কুলের মুসলমান ছাত্রেরা বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে
মিলাদ সরিক স্তম্ভ অহুষ্ঠান করিত। মহরমে মুসল-
মান লাঠিয়ালরা লাঠিবেলা দেবাইয়া বংশিস লইয়া
যাইত। বড় চৌহানীর আসান মোল্লা, গোলামাধপুরের
ফরমান খাঁ, পাচিলের মেরু সর্দার, কেতাব সর্দার প্রভৃতি
নামজাদা লাঠিয়ালরা হিন্দুদের আপদে বিপদে পূর্ণ বিক্রমে
লাঠি হাতে লড়াই করিত। তখন সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ মনো-
ভাবের লেশমাত্র লক্ষণও দৃষ্ট হইত না। আজ সেই সম্মতি
লোপ পাইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আজ সমাজ-জীবনকে
জর্জরিত করিয়াছে।

এই গ্রামের স্বর্গত হুর্গমাধ পাকড়াশী মহাশয় ছিলেন
সামাজিক আচার-অহুষ্ঠানের ধারক ও শাস্ত্রীয় ধর্মচরণের
পথপ্রদর্শক। তাঁহার অহুষ্ঠিত দানসাগর তোরণ, বৃষোৎসর্গ,
মবরাজি ভ্রত, দশমহাবিত্তা পূজা ও ১০৮ কালীপূজার বিবরণ
আজও প্রৌঢ়দের মুখে মুখে প্রচারিত হয়। ১৩০২ সনে
দানবীর সারদাপ্রসাদ পাকড়াশী মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে অষ্টাদশ
যোড়শ, স্বর্গস্থাসন, হাতী, বোড়ার গাড়ী, পাকী, মোকা
প্রভৃতির শাজ্জবিহিত দানসাগর অহুষ্ঠান বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ-
সমাজের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠা।

১২৮৩ সনে একবার ও ১২৯৪ সনে আর একবার বটক
কুলীন সম্মিলন উপলক্ষে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল এবং স্থল-
সমাজ যেরূপ অতিথি সংকার-পরায়ণতা ও সৌজ্ঞেয়তার পরিচয়
দিয়াছিল সে কাহিনী এখন প্রাচীন ব্যক্তিগণের মুখে শুনিতে
রূপকথার ভায় অলীক বলিয়া মনে হয়। এই সকল সামাজিক
ক্রিয়াকর্মে সকল গ্রামবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতা ও সজ-
শক্তির পরিচয় সর্বদাই পাওয়া যাইত। বিবাহাদি উপলক্ষে
মতি রায়, ভূষণ দাস, ভোলামাধ অপেরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ



গৌরান্দোলার মেলা

যাত্রা পার্টের অভিনয় বহুবার গ্রামবাসীদের আনন্দ পরিবেশন করিয়াছে।

১৩০৪ সনে যাত্রাভিনয়ে, সুপ্রসিদ্ধ মতি রায় মহাশয় এই গ্রামের সামাজিক জীবন বর্ণনা করিয়া যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহার উচ্চাভিহাসে পাঠক ভদ্রানীতম আদর্শ পল্লীসমাজের পরিচয় পাইবেন। সঙ্গীতের প্রারম্ভ এইরূপ—

“বহু হুল-বসন্তপুরে আনন্দ ভবন।

নহে কতু হৃৎকের আগমন,

মরি কি কান্তি, দেবি যেম

শান্তিদেবীর সিংহাসন।

গ্রামবাসী যত জন, সকলেই সুভাষন

দ্বিজগণ সবে বিজ বিচক্ষণ।

আভিষ্কার চূড়ামণি মুনি ঋষি মনে গণি,

ধর্ম আশ্রয় দেবি সর্বক্ষণ।

মাহি হিংসাধেষ

সংকল্প নির্দেশ,

এঁদের দেথলে উপদেশ লাভ

করে সব মূঢ়গণ।

বহু হুলবসন্তপুর আনন্দ ভবন।”

কালের কুটিল গতিতে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রবৃত্তির ফলে এই আদর্শ পল্লীর সমাজ-জীবন বিধ্বস্ত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাপ্পে এখানকার আকাশ-বাতাস ভায়াক্রান্ত। আনন্দমুখের হুলগ্রাম আজ শুষ্ক নীরব। সকালে মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজে না, সন্ধ্যাসমাগমে গোবিন্দদেবের ধূপারতির বাদ্য শ্রুত হয় না। পল্লীর অধিকাংশ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইয়াছে। হিন্দুদের অধিকাংশ ধরবাড়ী তির সপ্তদ্বারের লোকেরা বেদবল করিয়া লইয়াছে। কীর্তিমান সমাজপতিদের—লীলাভূমিতে আজ মিরানন্দের ছায়াপাত হইয়াছে।

অভীভূতের স্মৃতির সহিত বর্ধমান পরিবেশের তুলনা করিলে গভীর বিষাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

• ‘হুলবসন্তপুর’ পরবর্তীকালে হুল নামেই পরিচিত হয়।



বাস্তব্যাগীদের সম্পর্কে দু'একটি কথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

মেহরু-লিরাফত দিল্লী-চুক্তির কলে ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান, তথা পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুসম্প্রদায় নিজ বাসভূমিতে নিরাপদে অবস্থানের ভরসা পাইলেও, বোধ হয়, বিশেষ আশঙ্কিত হইতে পারে নাই। তাই সরকারী বিজ্ঞাপন-সত্ত্বেও ইহাদের বাস্তব্যাগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। রেলপথে উদ্বাস্তদের যাতায়াতের যে সংখ্যা প্রত্যাহ প্রকাশিত হয় তাহার নিম্নলিখিত সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রত্যেক অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে, এই যাতায়াতকারীদের মধ্যে সকলে উদ্বাস্ত নহে—অনেকেই ব্যবসাদার কেহ বা দিনে কারবার করে, কেহ বা রাজে মাল চালান দেয়। ইহাদের সংখ্যা বরিলে উদ্বাস্তদের আগমন-নির্গমনের সংখ্যা বাড়িয়া যায় সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে হইলে ইহাদিগকে বাদ দিতে হইবে। কার্যব্যাপশে ইহারা উত্তর বঙ্গে বঙ্গকালের জন্ত যাতায়াত করে রাজ। ইহাদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। কেহ কেহ প্রকৃত কিংবা ভাবী উদ্বাস্তদের মালপত্রাদি লইয়া আসে, কেহ পারিশ্রমিক পায়, কেহ বা পায় না। এই সকল চলমান সংখ্যা সরকারী স্থিতিশীল সংখ্যার হিসাবে গোলযোগ ঘটাইতেছে। রাষ্ট্র হিসাবে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ আঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও উত্তর বঙ্গের সামাজিকতার দাড়ীর টান আঙ্গও নিখুঁত হইতে পারিতেছে না। তাই সরকারী পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে পৌছানো সমীচীন হইবে না। ছোট কথা, সরকারী বোষণাসত্ত্বেও বাস্তব্যাগ আঙ্গও চলিতেছে এবং আশঙ্কা হয় ভবিষ্যতেও এইরূপ চলিতে থাকিবে।

ইহা সুপরিষ্কৃত যে, সামাজিক দিক দিয়া এই বাস্তব্যাগ গুরুতর ক্ষতি করিতেছে। সে তুলনার আধিক দিকটা হয় তো লুপ্ত করিয়া তাবা যাইতেও পারে। অর্ধের অপচরকে সম্ভবতঃ এক দিন জন্ত উপায়ে উপচরে আনা যাইতে পারে, কিন্তু সমাজে যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইল, তাহাতে অন্ততঃ পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের সামাজিক জীবনযাত্রার ও ঐতিহ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটিল, তাহার আর পূরণ বা পুনরুজ্জীবন হইবে কিম্বা সম্ভব। জমিতে উদ্বাস্তদের পুনরুজ্জীবনের সূত্র ব্যবস্থা ভবিষ্যতে এক দিন হইতেও পারে, কিন্তু সামাজিক জীবনধারণ ও পুরুষাঙ্গক্রমিক ঐতিহ্যকে আর কিরাইয়া পাওয়া যাইবে না।

তাবীকালের সহিত এই অতীত ও বর্তমানের বিচ্ছেদের যে সূচনা আঙ্গ দেখিতেছি তাহার পরিণাম ভাল হইবে কি মন্দ হইবে সে তর্ক নিশ্চরোক্ত। কিন্তু এই বিচ্ছেদটা যে সত্য, তাহা অস্বীকার করিব কি করিয়া?

এই বিচ্ছেদের ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াই আমার আবেদন জানাইতেছি। আমরা বাহারা পাকিস্তানে এখনও আছি বা থাকিব বলিয়া আশা করি, তাহাদের পক্ষ হইতেও যেমন আমাদের আবেদন, তেমনি বাহারা পাকিস্তান ছাড়িয়া ভারতরাষ্ট্রে বসতি করিচ্ছিলেন বা করিতেছেন, তাহাদের পক্ষেও এই আবেদনের ঐক্যিকতা এবং আবঙ্গকতা আছে বলিয়া মনে করি। অবস্থা যেহেতু দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কালে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনের যোগসঙ্গ, সাংস্কৃতিক ঐক্যবন্ধন, প্রাণের টান একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা অনেকেই মনে উদ্ভিত হইতেছে। এমতাবস্থার পূর্ববঙ্গের পল্লীসমূহের গৌরব-ময় ঐতিহ্যকে বিনষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত অবিলম্বে মনোযোগী হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রামের ইতিহাস-রচনার জন্ত ব্যক্তিগত বা সমবেত প্রচেষ্টার প্ররোজন আঙ্গ যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের সামাজিক জীবনে বাঙ্গ্রামের একটা বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল। শুধু বংশের নয়, গ্রামের নামের সঙ্গে যে প্রতিষ্ঠা বিজড়িত ছিল তাহার পরিচয় দিতেও আমরা গর্ক অহুতব করিভাম। আঙ্গ পূর্ববঙ্গের সেই সব গ্রাম হিন্দুরা একান্ত নিরুপায় হইয়া পরিত্যাগ করিতেছে। কিন্তু ভবিষ্যৎবংশীরেরা যে পিতৃপিতামহের স্মৃতিবিজড়িত গ্রামের পরিচয় তুলিয়া যাইবে সেকথা অনেকেই ভাবিয়া দেখিতেছেন না। বাহারা সক্ষম ও লিপিকুশল, তাহাদের নিকট অহুরোধ, তাহারা নিজ নিজ গ্রামের বিবরণ লিখিয়া এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হউন। ভবিষ্যৎ ইতিহাসকার এই সমস্ত রচনা হইতে বহু মালমশলা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন। এটাই হইবে সত্যকার জাতীর ইতিহাস—রাজরাজকার ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা নয়, সমাজ-জীবনে ছোট বড় সকলের ইতিহাস।

আমরা দেখিরাছি, হিন্দুসমাজে বঙ্গাভিদের মধ্যেও হান এবং পারিপার্শ্বিক ভেদে চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি তাবা ইত্যাদিতে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পূজা-পার্কণ, বিবাহ, জ্রাদ ইত্যাদি দান্য অহুঠানে এই পার্থক্য বেশ স্পষ্ট। এই সকল বিষয়ের বর্ণনা লিখিবঙ্গ থাকিলে সামাজিক ইতিহাস-রচনার প্রকৃত সহায়তা হইতে পারে। বাস্তব্যাগী প্রত্যেকটি বংশের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত থাকাত প্ররোজন। একই গ্রামের, একই সমাজের, একই বংশের বিভিন্ন পরিবার, আঙ্গ বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া হারী বাসস্থান

সংগ্রহ করিতেছেন। ইহাদের ভবিষ্যৎশীলেরা যাহাতে বংশ-পরিচয় ও গ্রামের সহিত সম্পর্কের কথা ভুলিয়া না যায় সেজন্য “বংশাবলী” রচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এগুলি ভবিষ্যৎ বংশবর ও জীবনীকারদের কাছে আসিবে।

এই বিবরণাদির মধ্যে সবগুলিই যে সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইবেই তেমন আশা অবশ্য করা যায় না। বহু ক্ষেত্রে এই সকল রচনার হয় শুধু লিপিকুলতার অভাব দেখা যাইবে, কিন্তু তাই বলিয়া কোন গ্রামের বা বংশের বিবরণই ফেলিয়া দিবার নহে। তাই আজও যতক্ষণ এক গ্রামবাসী বা একবংশীয় সকলে সম্পূর্ণ

বিচ্ছিন্ন হন নাই ততক্ষণ সকলের সমবেত চেষ্টায় এরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাহাদের পক্ষে পুস্তকমুদ্রণ সম্ভব হইবে না, তাহারা তাহাদের হস্তলিখিত এই সব গ্রন্থ—হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ ও রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দিলে সেগুলির সম্বন্ধ-রক্ষণের ব্যবস্থা হইবে।

আমার এই আবেদনটির কথা সকলকে তাহারা দেখিতে অমরোচ করিতেছি। এই সব বিবরণের মধ্য দিয়া ফোত বা উদ্ভা প্রকাশ করা চলিবে না। এগুলি হইবে মিরপেক্ষ ঐতিহাসিক তথ্য।

রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু

ত্রিচিন্ময়ী পাঠক, এম-এ

রবীন্দ্রনাথ যে দেশে জন্ম নিয়েছেন সে দেশের আকাশ-বাতাসে সঞ্চিত হয়ে আছে যুগযুগান্তের অপার্থিব অমৃত্যু—অপূর্ণ আনন্দের উচ্ছ্বাস। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে আর্ধ্য-ধর্মির ঐকান্তিক সাধনার যে পরম সত্য প্রকাশিত হয়েছিল, কঠিন বস্তুতান্ত্রিক জগতের মলিন ছায়ায় তা প্রচ্ছন্ন হলেও বিলীন হয় নি। এখনও সাধকের গভীর চেতনার অন্তঃকালে অমরবিত্ত হচ্ছে সেই অনাদিকালের পরম সত্যের বাণী—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশিৎ

নাং কৃতশ্চিন্ন বভূব কশিৎ।

অজো নিত্যঃ শাখতোহয়ং পুরাণো

ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে। কঠোপনিষৎ, ২ঃ

মানবাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। উপজীবিনাশ-মহিমা চৈতন্যরূপ আত্মাতে জন্মমরণাদি কল্পনা মৃত্যুর লক্ষণ। মৃত্যুতে মানবের পঞ্চভূতে গঠিত পার্থিব দেহের লয় হয়, কিন্তু অবিস্মরণ আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। এই কথাই তগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার বলেছেন—

বাসাসি জীর্ণানি যথা বিহার

নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহার জীর্ণা-

ণ্যস্থানি সংযতি নবানি দেহী ॥ গীতা—২ঃ

বর্তমান যুগের অবিগ্রাম কোলাহলের মধ্যেও তারতবাসী ভুলতে পারে নি তার অভীত ভগ্নতার বশকে। ক্লান্তদেহে বাতী ফিরবার পথে ক্রমেকের কণ্ঠে শুনি সেই যুগযুগান্তের গান, দেউলে দেউলে সাধকের কণ্ঠে শুনি সেই মন্ত্র, বাউলের এক-তারাতে বাজে সেই সুর।

এমনি দেশে কবিগুরু জন্মেছেন, পালিত হয়েছেন এরই আবহাওয়ায়। তাই এই দেশের দার্শনিক অমৃত্যুভীতির জীবনে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর কবিতার মাঝে ব্যক্ত হয়েছে আর্ধ্যধর্মির সাধনা—তাঁর গানের মাঝে ধ্বনিত হয়েছে সেই শাস্ত্র আনন্দের বাণী। তিনি উদাত্ত-কণ্ঠে গেয়েছেন—“তার অস্ত্র নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ”; এই অস্ত্রহীন আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি মগ্ন, মৃত্যুকে তাঁর, কি ভয়? ছরস্তু কালবৈশাখীর ঝড়ে তাঁর স্নেহের কুমুমগুলি একটি একটি করে বয়ে গেছে, শুধু বিধাতার কাছে নাই তাঁর কোন নিরুদ্ধ অভিমান। বেদনার আঘাত যত তীব্র হয়েছে তত নিবিড়ভাবে অমৃত্যব করেছেন :

“জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন

ছিন্ন ছড়াছড়ি

মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি অর্থপূর্ণ করি।”

মৃত্যু ত নিষ্ঠুর ঘাতক নহে, সে যে পথিকৃৎ। তার উদার উদ্বুদ্ধ পথে চলে ক্ষুদ্র মানবের অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে অভিযান। তাই মৃত্যু আমে না ভীতি, বুকফাটা আর্দ্রানাদ, মর্মান্ধা হাহাকার। অসম্পূর্ণ জীবনকে সম্পূর্ণ করে তার মোহন স্পর্শ। এ জীবনে যা বিফলতাময়, চঞ্চল, অমিত্য, তা মৃত্যুর আলোতে সফল হয়ে উঠে। তার একটি মাত্র ইচ্ছা জীবনের অবগুণ্ঠন বসে যায়, প্রকাশিত হয় অপূর্ণ জ্যোতির্ময় নুতন কান্তি। তাই নির্দম আঘাতে জর্জরিত হয়েও কবি চেয়েছিলেন :

“মরণ আঁহক চুপে পরম প্রকাশ রূপে
সব আবরণ হোক লয়, ঘুচুক সকল পরাজয়।”

কখনও কখনও বুলায় পৃথিবীর রূপ, রস ও বর্ণবৈচিত্র্যের সমারোহে ভ্রম হয়, বুঝি বা টুকরো টুকরো সুখে-দুখে তারা, ‘কারা হাসির দোলদোলানো’ এই ক্ষুদ্র পার্থিব জীবনটুকুই স্থলর; তাই যত্নের দ্বারে এসে মনে ব্যথা লাগে সেই অতিপরি-
চিত ছোট গভীর ছেড়ে যেতে, আঁখি হলহল করে। কিন্তু এই বেদনার অহুত্বিত ক্ষুদ্র চক্কলভামাত্র। যত্নের মাঝেও নেই বিরহের আভাস, সে যে আমে পরম মিলনের বার্তা,—

ওরে মৃত, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম মুহূর্ত হ’তে তোমার অজ্ঞাতে
তোমার ইচ্ছার পূর্বে। যত্নের প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিব আবার
মুহূর্তে চেনার মতো।

কবি ভেবেছিলেন যত্নের মাঝে আমার লয় হবে না। তার উচ্চায় স্রোতে ভেসে যাবে বুলামাটির গভীর এই পুরাতন দেহবানি, চিরপুরাতন আমার ‘আমি’ নতুন উজ্জল রূপে প্রকাশিত হবে। তাই আমার কেন হৃৎ, কেন বেদনা?

“স্তন হ’তে তুলে নিলে কাঁদে নিশু ডরে
মুহূর্তে আবাস পায় গিরে স্তনান্তরে।”

যে বোঝা এই হাটে কিনেছিলাম তাকে শূন্য করে দিলাম, আমার ‘আমি’র ত কোম পরিবর্তন হ’ল না। তাই বুঝি ঋষি উদাত্ত কর্তে গেরেছিলেন ‘অজ্ঞো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ’—আমি জগদ্বহীম নিত্য, আমি শাশ্বত, পরিবর্তনহীন। যুগ যুগ ধরে নতুন নতুন রূপে পৃথিবীতে দেখা দেয় বার বার সেই চিরপুরাতন আমি।

“তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি
সকল খেলার করবে খেলা এই আমি।”

সংসারের যে মলিনতা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যে অজ্ঞতা আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছে ক্ষুদ্র গভীর ভিতরে, যত্নের একটি ফুৎকারে সে অজ্ঞতা, সে মলিনতা যাবে দূরে। যত্নের মাঝে আছে পরমা মুক্তির সন্ধান। তাই—

“জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রভার
যত্নেতে এমন ভাল বাসিব নিশ্চয়।”

কি অপরাধ রূপে কবি দেখেছিলেন যত্নকে। জীবনের পৌলিন্দ্র্যে সে এসেছিল তার দ্বারে প্রণয়ীর বেশে চোখে স্বপ্নের ঘোর বিছাতে। তার পিঙ্গল জটীভার চূড়া করে বাঁধা, যেন কেপা মহেশ্বর চলছেন উদ্যকে বিবাহ করতে। কবির অন্তরে তাগে চিরবিরহিণী নারিকার আকুল মিনতি।

“তুমি উৎসব করো সারা রাত
ভব বিজয় শব্দ বাজারে
যোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্ত বসনে সাজারে।”

কখনও বা তার অলৌকিক প্রেমে আত্মহারা হয়ে কবি গেরেছেন—

“মরণ রে, তুই মম শ্রীম সমান”

কবির অন্তরে কি পরম মুক্তির উদ্যাস, কি অপূর্ণ আনন্দের অহুদর! যেন প্রেমবিহ্বল রাধিকা বরণ করছেন তাঁর প্রিয়কে, এবার হ’ল তাঁর দীর্ঘ বিরহের অবসান, এবার এল তাঁর মিলনের লগ্ন—

“হির হির রাধবি অমুদিন অমুখণ
অতুলন তৌহার লেহ।”

এই মিলনামন্দের শেষ নাই। রাধাও হারিয়েছিলেন তাঁর ক্রীড়কে, কিন্তু মরণরূপী শ্রীম দয়িতাকে কখনও ত্যাগ করেন না,—

“তুই নহি বিসরবি, তুই নহি ছাড়বি
রাধা হলম তু কবই ন তৌড়বি”

তাই বধন এল মিলনের আস্থান, নির্ভরে কবি তরীধামি তালিরে দিলেন অনন্ত শান্তি-পারাবারে নীরব কর্ণধারের যুগ চেয়ে; সকল চিন্তার অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করলেন আপনাকে—সঁপে দিলেন সেই পরম সত্যের চরণে:

“হে মহা জীবন, হে মহা মরণ।
লইয় শরণ, লইয় শরণ ॥
আঁখার এদীপে আলো শিখা,
পর্যাপ্ত জ্যোতির টিকা—
করো হে আমার লজ্জা হরণ।”



বাঙ্গলার সমাজ-জীবন—সম্পদ

শ্রীযত্ননাথ সরকার

সব দেশেরই সম্পদ আসে তার মাটি হইতে এবং সেই জলবায়ুতে যুগ যুগ ধরিয়া বাস করার ফলে লোকদের যে চরিত্র ও শক্তি গড়ে ওঠে, তাহা থেকে। একেই বলে উপাদান ও জনশক্তি, *natural resources and man-power*.

বাঙ্গলা দেশ কৃষিজীবী এবং নদীমাতৃক, অর্থাৎ জমি চাষ করাই লোকদের প্রধান কাজ, এবং নদী নিজে থেকে যে জল এনে দেয় মানুষ তা দিয়ে ক্ষেতে গাছে ফল জন্মায়, নৌকা চালিয়ে মাল পাঠায়, আর দেশময় তরকারীর অভাব এই প্রচুর মাছ খেয়ে পূরণ করে।

আদি ও মধ্য যুগে অনেক বন জঙ্গল ছিল, চাষ করা জমি বড় কম, গাছের ফল এবং লতার শাক খুব প্রচুর। কারণ তখন লোকসংখ্যা এখনকার চেয়ে অনেক কম, এবং সেজন্য অতি অল্প জমি হতে তাদের আবশ্যক খাদ্য জুটিত। সেই স্বল্প দু'তিন হাজার বছর আগেকার বাঙ্গালী গ্রাম্য জীবনের দৃশ্য কল্পনা করিতে পারি যদি আমরা আসামের পাহাড়ের গায়ে বস্তু জাতিদের জম্ম নামক চাষের প্রণালী দেখি। তাদের এক পরিবার আসিয়া জঙ্গলের মধ্যে গাছ কাটিয়া পুড়াইয়া একটু গোলাকার জমি সাফ করিয়া, তাহাতে ধান বা ভুট্টা জন্মায়। পাতার কুঁড়ের বঁাধিয়া থাকে, এবং এই প্রণালীর চাষ করার ফলে চার-পাঁচ বৎসর পরে যখন জমিটা একেবারে অস্বর্কর হইয়া পড়ে, তখন তাহার জঙ্গলের মধ্যে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে অত্র এক জায়গায় গিয়া ঠিক এইরূপ গাছ ধ্বংস এবং নতুন চাষ আরম্ভ করে। এর ফলে বন ক্রমশঃ লোপ পায়, বর্ষার খর স্রোত বিনা বাধায় জমি ধুইয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়, শুষ্ক বছর বালি এবং নালা অবশিষ্ট থাকে।

কিন্তু বাঙ্গলাদেশের জীবন নদীজলের উপর নির্ভর করে, অথচ প্রতি বৎসর বর্ষার স্রোত জমির পলিমাটি ধুইয়া নাগরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, আর বালি ও পরে ধূলা জমা হইয়া নদীগুলির উচ্চ দিক মজিয়া বাইতেছে, পুতুরগুলি আর তত জল পায় না, নদীতে নৌকাচলা প্রতি বৎসরই জল কমার ফলে কঠিন হইতে কঠিনতর, এবং কম হইতে আরও কম দিন ধরিয়া সম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। উঁচু বাঙ্গলার ক্ষেতগুলি শুষ্ক ও অস্বর্কর হইতেছে। পুরাতন ম্যাপ হইতে প্রমাণ হয় যে আত্রেয়ী নদী কত বিস্তৃত ও প্রবল ছিল, যেন এখনকার পদ্মার সমান। আর ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পের আগে তিস্তা নদী আসামের দিকে তাহার জল

চালিত না, সব জল পাবনা জেলা দিয়া বাহিয়া আত্রেয়ীতে পড়িত; তখন চলন বিল এক প্রকাণ্ড সমুদ্র ছিল, এখন তাহা শুষ্ক চাষের ক্ষেতে ভরা। আমাদের নদীগুলির ক্রমশঃ যুত্ব বাঙ্গলাদেশের ভবিষ্যৎ বিপদ, ইহা হইতে কলিকাতাও বাঁচিবে না।

তার উপর ক্রমশঃ জমির উর্বরতা হ্রাস হচ্ছে। আসল কথা প্রতি বিঘা থেকে খুব বেশী পরিমাণে শস্ত পেতে হলে, গোবর ও গোচোনার মত উৎকৃষ্ট সার আর জগতে নাই, এরা হিউমাস সৃষ্টি করে বাহা শস্তের প্রধান প্রাণ অথচ জমির উর্বরতা ধ্বংস করে না। এত দিনে বিজ্ঞান এই সত্য জানিয়াছে; জমিতে যতই *ammonia sulphate* আর *phosphate* ঢাল না কেন, দেখিবে যে, দশ বৎসরে ঐ জমি মরুভূমির মত বন্ধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গাছের পাতা পচিয়াও সার হয়, কিন্তু গাছ কোথায় আছে? বাঙ্গলাদেশে জালানী কাঠের যেমন অভাব তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোককে ঘুটে পোড়াইয়া রান্না করা হইতে নিবারণ করা বাইবে না; জমি চিরদিন গোবর অর্থাৎ *humus* হইতে বাঞ্ছিত থাকিবে, কম ফসল হইবে। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন পথ দেখি না।

বাঙ্গলাদেশের জীবনযাত্রার কথা ইতিহাসে পড়িলে দেখা যায় যে পূর্বে এই দেশ খাদ্য সম্বন্ধে স্বাধীন ছিল, অর্থাৎ অত্র দেশ হইতে ধান আনিতে হইত না, বরং জাহাজে চাউল রপ্তানী করিত (পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত)। কাপড় অতি কম প্রস্তুত হইত, কিন্তু এই গরম প্রদেশে অতি কম কাপড়ই চলিত, সৌধীন লোক ছাড়া ভদ্র-সম্প্রদায়ও এক জোড়া ধুতি ও এক জোড়া গামছা দিয়া গ্রামে সমস্ত বৎসর চালাইতেন। রপ্তানী-মধ্যে ছিল প্রধানতঃ চাউল ও শুকনো নোনা মাছ, বাহা সমুদ্রগামী জাহাজগুলি চাটগাঁ হুগলী প্রভৃতি বন্দর হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার কিনিত। সোনারূপা বড় কম ছিল, রাজকর অনেক স্থানে নগদ টাকায় দেওয়া অসম্ভব ছিল, ক্ষেতের চাউলের ভাগ মাত্র রাজা পাইতেন—হিন্দু যুগে যষ্ঠাংশ, শের সার সময়ে চতুর্থাংশ এবং আকবরের সময় হইতে এক তৃতীয়াংশ, তেভাগা। লক্ষা হলুদ ও পেঁয়াজ বেশ রপ্তানী হইত।

কিন্তু আকবরের বঙ্গবিজয় হইতে দেশের শাসন ইংরেজ নিজ হাতে লওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৫৭৫-১৭৭৫ এই দুশ' বছরে বঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনে এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন

হইল, অর্থাৎ আমাদের ক্রমবিকাশ আধুনিক সভ্যতার পথ ধরিল। বিদেশী সামুদ্রিক বাণিজ্য এদেশকে ছাইয়া ফেলিল, কিন্তু আমরা মিতব্যয়ী জাতি বড় কম বিদেশী আমদানী জিনিষ কিনিতাম, এবং তাহার ফলে আমরা রপ্তানীর জন্ত যে জিনিষ বেচিতাম, ঐ বণিকেরা তাহা রূপা দিয়া কিনিত, জিনিষ বদলাইয়া নহে। পাঠান যুগে চীনা বণিকগণ রূপা আনিয়া বাঙ্গলা হইতে জিনিষ কিনিয়া রপ্তানী করিত। আওরঙ্গজীবের সময়ে ডচ ও ইংরেজ বণিকেরা প্রতি বৎসর বহু লক্ষ তোলা রূপা আমদানী করিয়া বাদশাহী টাকশালে তাহা গলাইয়া সিকা টাকা করাইয়া, তাহা দিয়া নিজেদের রপ্তানী মাল কিনিত।

এক ইংরেজ ষ্ট্রট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৬৮০-৮৩ সালে চার বৎসরে বঙ্গদেশে ১৬ লক্ষ টাকা আনিয়া ঢালিয়া দেয়, তখন টাকার ক্রয়শক্তি আজকার অপেক্ষা ত্রিশ গুণ ছিল।

এই বিদেশী জাহাজের বাণিজ্যই বঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রথম ধাপ। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে আমরা কি কি মাল রপ্তানী করিতাম? তার মধ্যে পাট, কয়লা ও চা ছিল না। দামী জিনিষ ছিল নীল, কিছু চিনি, সূতার কাপড় (মসলিন, মলমল, ছিট এবং মোটা গড়া), রেশমী কাপড় ও অনেক রেশমী সূতা, এবং বিহার হইতে আনীত সোরা—এই শেষটি যুদ্ধরত ইউরোপের বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্ত আবশ্যক, ইহা আমাদের একচেটে ছিল।

কিন্তু ১৮০০ সালের পর হইতে ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হারিয়া গিয়া বঙ্গের হাতে বোনা কাপড় প্রায় লোপ পাইয়াছে। রাসায়নিক নীল, নূতন সাদা বারুদ, বীট হইতে চিনি আবিষ্কার হওয়ায় এই তিনটি মূল্যবান রপ্তানীর মাল আর বঙ্গদেশে বেচিতে পারে না, প্রস্তুত করা বৃথা। স্ততরাং যতদিন পর্যন্ত আমরা বিলাত বা জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দামে পাকা মাল প্রস্তুত করিতে না পারিব ততদিন আমরা শিল্পজগতের বাহিরে ভিক্ষকের মত বেকার হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব। এই গুরুতর সমস্যার সম্মুখে কোম্পানীর শাসন শেষ হইল, দিপাহী বিদ্রোহের পর পার্লামেন্ট ভারত-শাসন নিজ হাতে লইল, এবং ভারতব্রাট্টে নব্য যুগ প্রকৃতই আরম্ভ হইল। সেই দিন হইতে ৫০ বৎসরের চেষ্টার ফলে কতকগুলি কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে, কারিগর মিত্রী শিক্ষিত হইতেছে, এবং পাকা মাল রপ্তানী করিয়া তাহার মূল্য হইতে দেশের খাজের ঘাটতি পূরণ করা হইতেছে বিদেশ হইতে শস্ত আনিয়া।

এই আধুনিক কলকারখানা চালান সম্ভব হইয়াছে,

ব্রিটিশ যুগে আমাদের মধ্যম শ্রেণীর অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধি ও শিক্ষা, দক্ষতা এবং রাজনৈতিক বললাভের ফলে। মানুষ নিজের ভাগ্য নিজের হাতে গড়িয়া তোলে, স্ততরাং এই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজই আমাদের ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা।

কিন্তু গত দুই বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলার ফলে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ লোপ পাইতে চলিয়াছে। তাহারা ধ্বংস হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমাজ এবং বাহিরের জগৎ আজকাল যেদিকে মুখ ফিরাইয়াছে তাহা ভাবিয়া যদি বর্তমানে বাঙ্গালীরা নিজেদের জীবনযাত্রা, শিক্ষার প্রণালী, এবং সামাজিক ব্যবহারের রীতি সম্পূর্ণ না বদলায় তবে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সেই সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর সকলে সত্যি লোপ পাইবে, লক্ষ লক্ষ পিপড়ার মত নিম্ন শ্রেণীর হাতের-কম্বী শ্রমিক মাত্র এ দেশে থাকিবে।

কিন্তু মুক্তি কোন্ পথে? আমার মনোভাব এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি—

একথা ভুলিলে চলিবে না যে বঙ্গদেশে পাথর নাই, ভাল কাঠের গাছ নাই, কাঁচা লোহা নাই; স্বল্পপ্রপাত না থাকায় সমুদ্র প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় না, প্রথম শ্রেণীর তুলা জন্মে না, চাটগাঁ হিল্ ট্রাক্টস্-এ দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলা হইত কিন্তু তাহাও পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে; খাদ্যের মধ্যে ডাল সামান্য কয়েক রকম মাত্র প্রচুর জন্মে, ভাল ডাল এবং তিল সরিষার জন্ত আমরা বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের মুখ চাহিয়া থাকি। এই সব দিক দিয়া প্রকৃতি-দেবী আমাদের প্রতি বিমুখ। কাজেই বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইবে, আধপেটা থাইয়া ডবল মেহনৎ করিতে হইবে। ইংরেজ রাজ্যবিস্তারের দিনে একটু ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত লোক যে ভারতময় চাকরি পাইত, সে দিন গিয়াছে।

আমাদের প্রথম কর্তব্য মিতব্যয়ী হইতে হইবে, সর্বত্র, সব শ্রেণীতে যাকে ইংরেজীতে বলে tightening the belt, কম খাইয়া ভুঁড়ীটাকে ছোট করিতে হইবে। আর অপব্যয়, নবাবী ঢং একদিনও চলিবে না। বিবাহের সময় বাহ আড়ম্বর এবং জিনিষ ফেলাফেলিকে যেন অপরাধ বলিয়া সমস্ত সমাজ নিন্দা করেন। এই ব্যয়বাহুল্যের ভয়েই ছেলেরা বিবাহ করিতে চায় না; তবে তাহাদের এবং আমাদের কন্ডাদের কি দশা হইবে ভাবিয়া দেখুন।

পুরাতন শুচিবাই এবং শাস্ত্রীয় শত শত বৃথা আচারও ছাড়িতে হইবে, কারণ এক বাড়ীতে একের অধিক চুলা রাখার অর্থ ও সময় নষ্ট সহ্য করিবে কে? মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মত সমবেত ভোজনালয় হইতে অনেক মাদ্রাজী

ও পঞ্জাবী হিন্দু প্রভিদিনের খাদ্য আনেন এরূপ অনেক বড় শহরে দেখিয়াছি। অনিবার্য চাপে বাঙ্গালী হিন্দুও তাহাই করুক।

ছেলের শিক্ষা দিবার সময় তাহার ভবিষ্যৎ জীবন ভাবিয়া সেই ধরনের শিক্ষা দিতে হইবে। আগেকার দিনে পিতারা চোখ বুজিয়া ছেলেকে জেনেরাল এডুকেশন দিতেন পরে গ্রাডুয়েট হইবার পর সে নিজ পথ বুজিত; অধিকাংশ স্থলে হাবুডুপ থাইত। এখন আর এরূপ করা চলিবে না। তরুণ বালকের বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ১১ বৎসর বয়সেই ভিন্ন ভিন্ন কারিগরী বিদ্যালয়ের vocational training-এর জন্ত ভর্তি করিতে হইবে।

আর সবার উপর দেশময়, সকল শ্রেণীময় একত্বভাব, এক প্রণালী অবলম্বন করিবার অবাধ ইচ্ছা জাগাইতে হইবে, ব্যক্তিগত পরিবারগত, বর্ণগত, ভাষাগত পার্থক্য ত্যাগ করিতে হইবে, যাহাকে বলে standardise your social life। ইংলণ্ডের মত অভিমাত্রী ও ধনী জাতি এই সামাজিক ঐক্য মানিয়া লইয়াছে। আর বাঙ্গালী; তাহাতে অবহেলা করিলে কতদিন বাঁচিবে?*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে কথিত। রেডিও-কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে মুদ্রিত।

চা-বাগানের শ্রমিক জীবনের আর্থিক তথ্য

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

বাংলাদেশে চা-বাগান আছে দার্জিলিং জেলার পাহাড়ে, পাহাড়ের পাদমূলে তরাই অঞ্চলে এবং জলপাইগুড়ি জেলার দুয়ারে (ভূটান দুয়ারে)। এই প্রবন্ধে আমরা এই তিন স্থানের চা-বাগানের শ্রমিকদিগের আর্থিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

চা-বাগানের শ্রমিক আসে সাধারণতঃ মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ হইতে। কিছু কিছু বিহার ও সাঁওতাল পরগণা হইতেও আসে। বাগানের সূচনার সময় ইহার বাগান তৈয়ারী চা গাছ রোপণ করে। বাগান তৈয়ারী হইয়া গেলে তাহার বাহিরে গাছের গোড়ায় বেদী তৈয়ারী, আগাছা পরিষ্কার, সার দেওয়া, গাছ ছাঁটা, গাছের পোকা নিবারণের জন্ত ঔষধ জল নিক্ষেপ করা, পাতা তোলা, ফ্যাক্টরীর ভিতরে সকল প্রকার কাজ এবং ঘরবাড়ী, পথ-ঘাট নিৰ্মাণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করিয়া থাকে।

মার্চ হইতে চা তৈরির কাজ শুরু হয়। এপ্রিল মে এই দুই মাসে কাজের তেমন চাপ পড়ে না। জুন হইতে অক্টোবর পর্যন্ত কাজের মরহুম। আর নভেম্বরে কাজে ভীতি পড়ে। ডিসেম্বর হইতে মার্চ পর্যন্ত কাজ কতকটা কম থাকে।

শ্রমিকদিগের আর্থিক অবস্থা বুঝিবার জন্ত প্রথমেই জানা দরকার তাহাদের পরিবারের গঠন, অর্থাৎ প্রতি পরিবারের জনসংখ্যা, উপার্জনক্ষম লোকের ও পোষকের সংখ্যা ইত্যাদি।

দুয়ার তরাই দার্জিলিং
প্রতি পরিবারের গড় জনসংখ্যা ৪'৪৩৬ ৪'১৪৪ ৫'৩৯০
এই জনসংখ্যার মধ্যে আছে—

	দুয়ার	তরাই	দার্জিলিং
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১'২৫১	১'২৫২	১'৩২১
এ নারী	১'১৬২	১'২২৩	১'৩৯৭
১২ হইতে ১৮ বৎসরবয়স্ক বালক	০'৩২১	০'২০৬	০'৫১৬
এ বালিকা	০'৩৬২	০'২৮৮	০'৫০১
১২ বৎসরের কম বয়সের বালক	০'৬৮১	০'৫৭৮	০'৮৮১
এ বালিকা	০'৬৫১	০'৫৯৭	০'৭৭৪

প্রতি পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির গড় সংখ্যা দুয়ারে ২'৯২৬, তরাই অঞ্চলে ২'৫৪০, এবং দার্জিলিং এ ২'৯৫০ জন ইহার মধ্যে

	দুয়ার	তরাই	দার্জিলিং
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১'১৫৩	১'১২২	১'১১০
এ নারী	০'৯৪৬	০'৯৭৪	০'৯৭৫
১২ হইতে ১৮ বৎসরবয়স্ক পুরুষ	০'২৭৮	০'১৫৮	০'৩৯৭
এ নারী	০'৩৩৭	০'২৫২	০'৪২৫
১২ বৎসরের কম বয়সের বালক	০'১০৭	০'০১৫	০'০২২
এ বালিকা	০'১০৫	০'০১৯	০'০২১

চা-বাগানে ১২ বৎসরের কম বয়সের বালকবালিকাদিগকে এখন বাগানে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। কাজেই ইহাদিগকে পোষ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। বাহিরে গিয়া কাজ করিবার অল্পযুক্ত বৃদ্ধা এবং নারী প্রসবের পূর্বে

ও পরে ঘরে বসিয়া চায়ের ভাঁটা বাছাই করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে। কাজেই চাবাগানের শ্রমিকের পরিবারে উপার্জনহীন পোস্তের সংখ্যা মধ্যবিত্ত ঘরের কর্মচারীর পোস্ত-সংখ্যার চেয়ে কম। প্রতি পরিবারে উপার্জনহীন পোস্তের সংখ্যা সর্বত্র একজনেরও কম।

চা-বাগানের শ্রমিক ও অপর কর্মচারীদিগের ন্যূনতম বেতনের হার কি হওয়া উচিত তাহা স্থির করিবার জন্ত ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের “মিনিমাম ওয়েজ্‌স এক্ট ১১-এর ৫ (১) (এ) ধারানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিটি ১৯৫১ সনে নিম্নলিখিত বেতনের হার অনুমোদন করিয়াছেন :—

তরাই ও ছয়ালের চা বাগানে

	হাবিয়া	ডবলি	মাপ্‌গিতাতা	মোট
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১০/০	১০/০	১০/০	১০/০
ঐ নারী	১/০	১/০	১০/০	১/০
কাজের উপযুক্ত শিশু	০/০	০/০	১০	১০/০

তরাই ও ছয়ালের চা ক্যাক্টরীতে

	বেতন	মাপ্‌গিতাতা	মোট
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	৫০	১০/০	১০/০
ঐ নারী	১০/০	১০/০	১/০
কাজের উপযুক্ত শিশু	১০/০	১০	১০/০

উপরে বাগানের উপার্জনের যে হার দেখান হইল তাহা ৫ হইতে ৮ ঘণ্টা কাজের জন্ত। যদি কেহ ‘ডবল’ কাজ করিতে না চায়, তাহা হইলে সে শুধু ‘হাজিরা’ ও ‘মাগ্‌গি-ভাতার’ জন্ত ১/০ আনা মাত্র পাইবে।

দার্জিলিং জেলায় পাহাড়ের বাগানের জন্ত পৃথক হার অনুমোদিত হইয়াছে, কারণ তথায় ‘ডবলি’ কাজ করিবার রেওয়াজ নাই।

দার্জিলিংয়ের বাগানে

	বেতন	মাপ্‌গিতাতা	মোট
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১১০	১০/০	৫০/০
ঐ নারী	১০/০	১০/০	৫০/০
কাজের উপযুক্ত শিশু	১০	—	১০

দার্জিলিংয়ের ক্যাক্টরীতে

	বেতন	মাপ্‌গিতাতা	মোট
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১১/০	১০/০	১
ঐ নারী	১১০	১০/০	৫০/০
কাজের উপযুক্ত শিশু	১/০	১০	১১/০

এখন উপরে লিখিত উপার্জনের হারই ছয়াল, তরাই ও দার্জিলিংয়ে চলতি হইয়াছে।

ঐ কমিটি অনুমোদন করিয়াছেন যে, দৈনিক ৮ ঘণ্টার, অথবা সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশী কাজের সময় যেন না হয়।

সপ্তাহে এক দিন বিনা উপার্জনে ছুটি থাকিবে। কিন্তু ক্যাক্টরীর বাহিরে বাগানে কি কি পরিমাণ কাজের জন্ত উক্ত উপার্জন হইতে পারে তাহার কোনও নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু কার্যতঃ কোনও কোনও বাগানে দেখিতেছি, কাজের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের রেওয়াজ আছে। যেমন, চা পাতা তুলিবার সময় ১২ সের পাতা তুলিলেই একজন ‘হাজিরা’ ও ‘মাগ্‌গি ভাতা’ পাইবার অধিকারী হয়। তাহার চেয়ে বেশী পাতা তুলিলে অতিরিক্ত পাতার জন্ত সের প্রতি দেড় বা দুই পয়সা হারে পাইয়া থাকে। ইহাতে একজন শ্রমিক কম-সে-কম দৈনিক ১১/০-১১/০ উপার্জন করিতে পারে। অবশ্য কাজের এই মাপকাঠি সব বাগানেই যে একই প্রকার তাহা নহে।

বর্তমান ব্যবস্থায় প্রতি শ্রমিক পরিবারের সাপ্তাহিক আয় কমপক্ষে ১৬০ টাকা। দার্জিলিং, তরাই ও ছয়াল হিসাবে সামান্য কয়েক আনার পার্থক্য আছে। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া আরও বেশী টাকা উপার্জন করিতে পারে।

নগদ টাকায় উপার্জন ছাড়া চা-বাগানের কুলী পরিবারের অন্যপ্রকার উপার্জনও আছে। তাহারা বাগান হইতে কম-দামে খাদ্যসামগ্রী (চাল, আটা, তেল, গুড় ইত্যাদি) কাপড়, চা, কেরাসিন তৈল, ছাতা, জামানি কাঠ ইত্যাদি পাইয়া থাকে। চিকিৎসা-ব্যয় লাগে না। শিক্ষা-ব্যয়ও কম। বিনা ভাড়ায় বাড়ী, জমি ইত্যাদিও ভোগ করে। গরু, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি রাখিয়াও কিছু কিছু উপার্জন হয়। নারী প্রসবের পূর্বে ও পরে আট সপ্তাহ পর্যন্ত ভাতা পাইয়া থাকে। কাজেই এই সব দফায় যে খরচ বাঁচে তাহাও উপার্জনের অংশ বলিয়াই গণ্য হইবে। এই আয়ের পরিমাণ প্রতি পরিবারে সাপ্তাহিক প্রায় ২ টাকা হইতে ১২ টাকা।

হয় কর্মক্ষমতার অভাবে নয় অল্পপস্থিতির জন্ত প্রায় শতকরা ২৫ জন শ্রমিক ন্যূনতম আয় করিতে পারে না।

শ্রমিক যখন বাগানের কাজে অল্পপস্থিত থাকে তখন সে যে অল্পতর উপার্জন করে তাহা নহে। সে আলস্তে সময় নষ্ট করে। পরিবারের ছয় দিনে যে উপার্জন হয় উহা দ্বারাই সাতদিন চালাইতে হয়।

শ্রমিক পরিবারের সাপ্তাহিক আয়ের হিসাব দেওয়া গেল। এখন প্রতি পরিবারের সাপ্তাহিক ব্যয়ের হিসাব জানিতে পারিলে তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাইবে। প্রতি শ্রমিক পরিবারে সপ্তাহে ব্যয় করে—ছয়াল প্রায় ১৮০, তরাইয়ে ২০, টাকা;

এবং দার্কিলিঙে ২৫০ টাকা। দফাওয়াসি ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :

	দুয়ার	তরাই	দার্কিলিং
খাণ্ড	১২'৬৫০ টাকা	১৩'৯০৫ টাকা	১৭'৯৮৭ টাকা
আলাদি কাঠ			
ও আলো	১'৮০৬ ,,	১'৬০০ ,,	২'৭১৪ ,,
জামা কাপড়	১'২৮৫ ,,	১'৩৪৩ ,,	১'৬৯৮ ,,
গৃহস্থালির			
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি	০'১৭৩ ,,	০'১৮৪ ,,	০'১৯০ ,,
বাড়ীভাড়া	০'৫৪৬ ,,	০'৬৬৪ ,,	০'৩৩৪ ,,
জীবন ধারণের জন্য			
নহে অথচ অত্যাশয়ের			
জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি	১'০৫৭ ,,	১'২১২ ,,	১'৭২০ ,,
বিবিধ	১'০০২ ,,	১'৩৯৭ ,,	১'২৪২ ,,

মোট ১৮'৫১৯ ,, ২০'৩০৫ ,, ২৫'৮৯২ ,,

এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, ব্যয়ের প্রধান দফা খাদ্য। তাহারায় খায় কি? খাদ্যসামগ্রী বাছিয়া দেখিতে পাই উহার মধ্যে আছে চাউল, ভুট্টা, আটা (শুধু দার্কিলিঙে), চিঁড়া মুড়ি ইত্যাদি। ডালের মধ্যে খায় অড়হর, মগ, মগুর, বুট, কলাই। আর, মাছ, শুকনা মাছ, ভেড়া ও পাঠার মাংস, শূকর ইত্যাদির মাংস, সরিষার তৈল, ঘি, মাখন বতটুকু ব্যবহার হয় তাহা দার্কিলিং পাহাড়েই। খাদ্যের মধ্যে আরও পাই দুধ, দই, গুড়, চিনি। এই সব খাদ্যের মধ্যে ভাত ও ডালের পরিমাণই বেশী। অন্যান্য উপকরণ সামান্যমাত্র। কাজেই খাদ্য যে যথেষ্ট পুষ্টিকর হয় তাহা নহে। আদর্শ পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেও উহা অভ্যাশে আনিতে সময় লাগিবে।

পানীয়-তালিকার মধ্যে একটি জিনিস আছে তাহা 'হাড়িয়া' (দেশী মদ)। শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সামান্য পরিমাণ 'হাড়িয়া'র প্রয়োজন। কিন্তু সেই পরিমাণেই তাহারায় সন্তুষ্ট থাকে না। অতিরিক্ত খাইয়া হয় মাতাল হয়, নয় কাজ কামাই করে। তাহাতে উপার্জন কমিয়া যায়, কিন্তু ব্যয় ঠিক থাকে। ১৯৪৮ সনে বাংলার চা-বাগানের শ্রমিকদিগের উপার্জন ১/১০ বাড়িয়াই দেওয়া হইয়াছিল। তাহার ফলে সেই পরসায় 'হাড়িয়া' খাওয়াই বাড়িয়াছিল, অন্যবিধ স্বাস্থ্যের নিমিত্ত উহা ব্যয় হয় নাই।

ভারত গবর্ণমেন্টের আদেশ অনুযায়ী চা-বাগানের শ্রমিকদিগের বাসের জন্য ঘরের উন্নতি শুরু হইয়াছে। পূর্বেকার আবাসস্থলের চেয়ে নতুন ঘর বাড়ী নিশ্চয়ই ভাল হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকেরা ঘরের পাকা মেঝে পছন্দ

করে না, কারণ তাহাদের মাটির বাসনকোসন সহজে ভাঙিয়া যায়। শ্রমিক-জীবনের স্বাস্থ্য বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে গেলে শ্রমিকের জীবনধারা, রুচি ও মতামত সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানা দরকার। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রমিকের রুচি ও আকাজক্ষানুযায়ী, ব্যবস্থা করিলে কার্যতঃ বহুবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

আর্থিক স্বাস্থ্য কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু নানা কারণে চা-বাগানের শ্রমিকের সামাজিক জীবনে পরিবর্তনও আসিয়াছে। ব্যসনের জন্য ব্যয় বাড়িতেছে। বাড়তি আয় কি উপায়ে খরচ করিলে নিজেদের কল্যাণ হয় তাহা তাহারায় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ছোটখাটো অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরের ঘরের অল্প-মূল্যের দ্রব্যাদিও ইহারায় চুরি করে। অপরকে ঠকাইবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। এককালে- যাহারায় মিথ্যা কথা বলিত না আজ তাহারায় অথবা মিথ্যা বলিতে ইতস্ততঃ করে না।

স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে; কিন্তু স্ত্রী এখনও স্বামীকে প্রহার করিতে ইতস্ততঃ করে। নারী এখনও পুরণো আদর্শের মায়া ছাড়িতে পারে নাই। "হাড়িয়া" খাওয়া যে লজ্জাজনক তাহাদের মধ্যে বর্তমানে এই জ্ঞান কিছু কিছু জাগিয়াছে।

পরজী বা কন্যা হরণ, এবং লাম্পট্য সমাজে নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পঞ্চায়েতের বিচারে পূর্বের মত কঠোর শাস্তির বিধান হয় না। জারজ সন্তান সমাজে নিন্দনীয় ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বর্তমানকালে সেও অলক্ষ্যে সমাজে স্থান করিয়া বসে।

চা-বাগানের শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য প্রতি-বাগানেরই খরচ বাড়িয়াছে। যদি চায়ের বাজার পড়িয়া যায়, বা বাংলারে চায়ের দাম কোন কারণে কমিয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শ্রমিকের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি বন্ধায় থাকিবে কি না তাহাও বিচার করা দরকার। যে ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারিবে তাহাই বাঞ্ছনীয়।

দুয়ারে চায়ের উৎপাদন-ব্যয় ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে বাড়িয়াছে পাউণ্ড প্রতি ৥৫ পাই। আর, প্রতি পাউণ্ড চা বিক্রয় করিয়া ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৯-এ বেশী পাওয়া গিয়াছে ৥১/২ পাই। কাজেই ১৯৪৯ সালে চা এর দাম বাড়িলেও সেই অল্পপাতে মুনাফা বাড়ে নাই। ছোট বাগানে লাভ আরও কম হইয়াছে।

তরাই ও দার্কিলিঙের চায়ের বেলায়ও প্রায় এই অল্পপাত রক্ষিত হইয়াছে।

লণ্ডনের চায়ের নীলাম-বাজার পুনরায় খুলিয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্ট যে একটা নির্দিষ্ট দরে সব চা ক্রয় করিতেন

তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার চায়েস আবার যুদ্ধের পর আবার প্রথমদে শুরু হইয়াছে। প্রতি বৎসরই উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বআফ্রিকার চায়েস উৎপাদনও বাড়িতেছে। ভবিষ্যতে এই সব দেশের সহিত টকর দিয়া বাংলার চায়েস কাটতি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেও পারে। এই অবস্থায় বাংলার চা-বাগানে চা উৎপাদনের খরচ যদি কমানো না যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বাংলার চা-বাগানের পকুতপ্রাপ্তি, ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের স্বাচ্ছন্দ্যবুদ্ধির মূল উৎপাদন দুইই হইতে পারে।

ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সর্বপ্রকার সংস্কারের অগ্রগতির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।*

* The Indian Tea Planters Association কর্তৃক প্রকাশিত "Reports of Minimum Wages (Tea Plantation) Committees, West Bengal, Behar" হইতে ভণ্ড সম্পর্কিত সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

চা-বাগানের অভিজ্ঞ ম্যানেজার ক্রিয়াজ্ঞ বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।—লেখক

নিশীথে

শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্যার লম্পাশি-লগ্ন আরস্তিল সূর্য্য অন্ত গেল,
মহোচ্চ ভাষাত মত নিকপিল রৌদ্র-ভয়কণা ;—
সুন্দর্য প্রাণদয়ালু রক্তস্নাত তুলি' লক্ষ কণা
অন্তোদ্বিগ্ন আতা লরে চাহে এবে দীপ্ত মেঘ মেলে।

অন্ধকার নিশা মাঝে বিহ্বল বিপুল পক্ষ লরে,
বিশাল পৃথ্বীতে ঢাকি' প্রান্তে প্রান্তে আপনা হারায়।
বিহ্বলিত বহুদূর বদীভূত শোণিত-হারায়।
ওমরি' ওমরি' কাদে মত্ত বান্ধু লক্ষ্যহারায় হরে।

চারিপাশে তমোরাজি ; দিশাহীন রক্তাক্ত আধার।
মৌন বিশ্ব অধোমুখে কাঁপিতেছে নিশ্বসি' নিশ্বসি' ;
উর্ধ্বমুখী ঘোরা রাজি মগ্ন লপে কক্ষ নভে বসি' ;
লোহিত-অধুবি ঘিরি' ঢেউ উঠে বিরাট বাধার।

সারা বরা কম্পমান, জর্জরিত গুচ-ভয়সার ;
সুদূর-বিহ্বল দৃষ্টি হরে আসে নিভেজ ভিমিত ;
দূরপাত ভারকার স্নান দীপ্তি হতেছে দীপিত।
অসীমের মরীচিকা প্রসারিত ভীত পিপাসায়।

মূলিমর দিগন্তের প্রান্তদেশে আচ্ছন্ন কামন
দীর্ঘরাজি ঘাপিভেছে মৃত্যুতরে মলিন পাতুর।
চতুর্দিক বিমলিন, হত্যার পরলে পরিপূর্ণ।—
পৃথ্বী মেখে অন্তরনে অন্তরের ভয়াল স্বপন।

ওগো ঘোরা রাজি।—এই লোলজিহ্বা লক্ষলক্ষ করি'
লেহন করিহ তুমি অন্তহীন বিপুল নিধিল।
হিংস্র-দংষ্ট্রারাজি বুঝি জিবাংসার হতেছে কুটিল,
ওষ্ঠাধর বাহি' তব লালারানি পড়িতেছে করি'।

কুবিদ-নিষিদ্ধ দেহ আত্মহারা আকর্ষণ-মগ্ন।
কোড়ে শিশু-বিশ্ব গিরে রক্তধারা পীযুষের প্রায়,
আরক্ত বিকট মেঘ মেলি' লহো তুলে বকে ভার,
নির্ধর-মর্দনে সে যে আর্দ্ররবে জ্বলিবে ভীষণ।

মথরে বিদীর্ণ করি' শিশুবক, হই হাতে চিরি'
ছিন্নত্নিত হৃৎপিণ্ড—উন্নত উল্লাসে ওঠো হাসি'।
তব চক্ষে উঠে তাসি' মরকের রক্ত-পাপরাশি।
সে-পাপের উগ্র মদ্য পান করি' শূন্যে বাও কিরি'।

হে ঘোরা রক্তনী। ওগো, ডাকি তোমা' শাস্তি বিবজ্জিতে,—
এস হেথা। কর্ণে মম শোমাও সে কবিতা নৃতন।
চিন্ত ভরি' দেখি তব রক্তরাজি বিকট-ভীষণ।
রক্তমুগ্ধ আসিরাছি তব পাশে অকুণ্ঠিত চিতে।

পাপার্ঘ্য পৃথিবী মাঝে জগিরাছে বিশ্বস্তির সাব,
তাই আজি দাঁড়ায়ছি তব পার্শ্বে অন্তিম সময়ে,
এস, ওগো এস। লহো গ্রাসি' মোরে ভয়ামস্তা হরে।
তোমা' তরে ওগো রাজি। হের, করিতেছি আর্দ্রনাথ।

এই দেহ হবে চূর্ণ। আবাদিব আনন্দ বিকট।
বিষধ-আহ্বানে বরি' পাব তব অন্তরের হৃদিত ?
রক্তাঙ্গুষ্ঠ মর্মে মম লবু করে করিহ আছতি।—
তোমার পরলে যাব জ্বরোরাগে শমন-নিকট।

ওগো মম সহচরী। হে ঘোরা রক্তনী। কহো কথা।
তোমার শাস্ত্র্য তেজে নিঃশেষে আমারে লয়ে গ্রাসি',
অবর-শোণিতে সিক্ত করি' মহাবেগে ওঠো হাসি'।
রক্তাক্ত-দেহের হৃদে লাভ করি চির-নিভৃত্য।

চিত্র।

শ্রীনির্মলকুমার রায়

বেশী দিনের কথা নয়; আমরা তখন গভীর 'শুকনা' জঙ্গলের মধ্যে রেল লাইন পাতিবার জরিপের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম। এক দিকে শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রাস্তা ও অন্য দিকে শিলিগুড়ি-কালিঙ্গা রাস্তা, ইহাদের মধ্যে যে বিশাল ও রহস্যময় বনভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে উহারই নাম 'শুকনা'। ঋজুদেহ ঘনসন্নিবিষ্ট শাল, বৃহৎ পত্রাচ্ছাদিত 'পানিশাস', লতা-বেষ্টিত 'লাম্পাতি', দীর্ঘকায় 'গামহরি' ও অন্যান্য বৃক্ষ, অশেষবিধ তৃণলতা ও গুল্ম, মহানদী, গুল্ম চকলং মেভোক প্রভৃতি পার্শ্বত্যা নদী, বিচিত্র আলোক-অন্ধকারের খেলা, শুকনাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা, শম্বর, বাইসন, বন্য বরাহ প্রভৃতি পশু এই বিরাট বনভূমিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। শুকনা ঋতুতে ঋতুতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তরাই বর্ষার অবিরাম বারিবর্ষণে বৃক্ষলতাগুলি সজীব হইয়া উঠে; পার্শ্বত্যা নদীগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ উপলক্ষেও আহত-ব্যাহত হইয়া গজিয়া ছোটে; সমগ্র বনভূমি ক্রোদাক্ত আর্দ্রবাস্পে বিধাক্ত হইয়া বনের পশু ও অসতর্ক পখিককে কণ্ঠবোধ করিয়া মারিতে চায়। আকাশে জল, বৃক্ষপত্রে জল, নদীতে জল, বনমৃত্তিকাতে জল। বর্ষাশেষে মাটি শুকাইয়া যায়, বৃক্ষতৃণলতা মঞ্জরিত ও পুষ্পিত হয়, বনমল্লিকার লঘুশব্দ গন্ধ অরণ্যচারী পশু ও মাছুষের ক্রান্তি অপহরণ করে; পরিষ্কার-পরিষ্কৃত নদী-জলধারা তাহাদের তৃষ্ণা দূর করে। রৌদ্রতাপ বাড়িতে থাকে; আকাশে, বনে, বৃক্ষে, বায়ুতে দাহ লাগে, নদীর জল শুকাইয়া যায়, 'শুকনা'—শুক, ধীরে ধীরে আপন মূর্ত্তি ধারণ করে। আকাশে জল নাই, নদীতে জল নাই, মাটির নীচে জল নাই, আট-নয় মাইলের মধ্যে জল নাই। অসতর্ক অসাবধানী পখিক জল না লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলে রাক্ষসী শুকনার তীব্র শোষণে মৃত্যু বরণ করে।

মহানদীর তীরে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছিলাম। সমস্ত দিন গভীর জঙ্গলের উচ্চাচচ ভূমির উপর দিয়া একটা লাইন আবিস্কারের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছি। অনেক গাছ কাটিয়া, কটকবহুল লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বহন করিয়া যেমনই কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি তখনই হয় উচ্চ ভূমি, গভীর গর্ত্ত কিংবা বিসপিল পার্শ্বত্যা নদী গতি-বোধ করিয়াছে। সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরিতে মন ও দেহ দুই-ই কিছু অবসন্ন হইল। জরিপের সার্থকতা ও কৃত-

কার্য্যতা পুনঃপুনঃ চেষ্টা ও অমাহুষিক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। আজ না হয় দুই দিন পরে একটা ভাল লাইন নিশ্চয়ই আবিস্কৃত হইবে। যথারীতি খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তখন মাঘ মাসের শেষাংশে, 'শুকনা' জঙ্গলে প্রচণ্ড শীত। বিশেষতঃ, দুই তীরে ঘনসন্নিবিষ্ট শালবনের মধ্যে মহানদীর যে উপলময় শুষ্ক উন্মুক্ত খাত পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা বাহিয়া যখন উত্তরের অনতিদূরবর্ত্তী হিমালয় হইতে হিমবায়ু আসিতে থাকে তখন শীত দুই পর্দা তাঁবু, লেপ ইত্যাদি ভেদ করিয়া অস্থি মজ্জা জমাইয়া ফেলিতে চায়। শেষরাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল, অসময়ে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং কুল কুল শব্দে মহানদীতে ক্ষীণ জল-ধারা চলিতেছে। শীত এত দুর্জয় হইয়া উঠিল যে, খালাসিদের আগুন জ্বলাইতে বলিলাম। বৃষ্টিতে বনজঙ্গল ভিজিয়া গিয়াছিল, কিন্তু খালাসিদের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন জলিয়া উঠিল।

যে মুহূর্ত্তে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা বনভূমির কিয়দংশ আলোকিত করিয়াছে ঠিক সেই সময়েই কিছু দূরবর্ত্তী এক খালাসির তাঁবু হইতে চীৎকার শোনা গেল—“শের হায়া, শের হায়া”। একটা চিতাবাঘিনী ও তাহার অতি ক্ষুদ্র বাচ্চা বহুদিন পরে শুষ্ক মহানদীতে জলধারার সন্ধান পাইয়া, বোধ হয়, তৃষ্ণা নিবারণ করিতে আসিয়াছিল। আগুনের আলোকে ও মাছুষের চীৎকারে বাঘিনী ছুটিয়া পলাইল, বাচ্চাটি পড়িয়া রহিল। খালাসি ও বাবুরা বাচ্চাটিকে ঘেরিয়া ফেলিল। অতি ক্ষুদ্র ও অনাহারে শীর্ণ একটি চিতাশাবক, তাহাকে ধরিতে বেশী সময় লাগিল না। ক্রমে অন্ধকার দূর হইয়া রাত্রি প্রভাত হইল এবং শাবকটিকে আমার তাঁবুতে আনিয়া উপস্থিত করা হইল।

মনুষ্যশিশু পালন করিবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু জরিপের কাজের মধ্যে পনের দিনের এক ফুট লম্বা চিতাশিশু প্রতিপালনের ভার আমার উপর পড়িল। শাবকটি অতিশয় রুগ্ন; চক্ষু দুটি অত্যুজ্জ্বল হইলেও পিচুটিতে ভরা; গায়ে দুই-চারিটি কীট ও অনেকটা দুর্গন্ধ ছোট ছোট দাঁত ও ছোট ছোট নখ। প্রথম দিনেই ঈষদ্রুক্ষ জল ও কার্বলিক সাবান দিয়া তাহাকে স্নান করানো হইল। অনতিদূরবর্ত্তী শহর হইতে সরু চেন ও পাতলা কলার আনিয়া পরানো হইল। ইহার পরে কিছু মহিষের দুধ

একটি বাটিতে রাখিয়া পান করিতে দেওয়া হইল। গন্ধমাত্র গ্রহণ করিয়া সে পানীয় প্রত্যাখ্যান করিল।

কাজকর্ম চুলায় গেল; ক্ষুদ্র চিতাশাবকের আহাৰ, নিজা, স্নান ও স্বাস্থ্য লইয়া চিন্তার অবধি রহিল না। অনেক চেষ্টার পরে সে দুধকুটিতে অভ্যস্ত হইল, কিন্তু শুধু দুধ কিছুতেই সে পান করিতে চাহিত না।

জরিপের কাজ শেষ হইল। অনতিদূরবর্তী শৈলশহরে স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও আড়াই মাসের চিতাশাবক লইয়া আবার ঘর পাতিলাম। শিশুপুত্র প্রায় সমস্ত দিন স্থলে থাকিত, আর আমি থাকিতাম হয় আপিসে নয় মফস্বলে। স্ত্রীর যত স্নেহ, যত চিন্তা, যত যত্ন চিতাশাবকটির উপর পড়িল। তাহার নামকরণ হইল চিত্রা। বন্যশিশু চিত্রা অল্প কয়েক দিনেই এমন কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ত করিল যাহা বন্য ও মানবীয় প্রবৃত্তির অপূর্ব সংমিশ্রণ। ভোরে আমার যখন চায়ের টেবিলে বসিতাম, তখন নিয়মিত ভাবে সে দুধসংযোগে দুইটি কুটির টুকরা ভক্ষণ করিত। ইহার কিছু পরে তাহার 'প্রকৃতির ডাকে'র প্রয়োজন হইত। অস্পষ্ট ও অক্ষুট শব্দে সে আপনার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিত এবং কখনও ঘর নোংরা করিত না। দ্বিপ্রহরে স্নানপূর্ব লইয়া একটা মহামারী ব্যাপার হইত। সপ্তাহে তিন দিন চিত্রাকে সাবান ও 'ডেটল' দিয়া স্নান করানো হইত। স্নান করিতে সে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল, আর তাহার পালয়িত্রী জননী সর্বদাই চিন্তিত থাকিতেন পাছে তাহার ঠাণ্ডা লাগে। স্নানের পর কাঁচা ছাগমাংস সে অতি তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করিত। বাস্তবিক পক্ষে নিষ্কিপ্ত ছাগমাংসের উপর চিত্রা যে ভাবে লাফাইয়া পড়িত তাহা দেখিলে মনে হইত সে বনের পশু, ঘরের জীব নয়। রাজিতেও সে আমমাংস ভক্ষণ করিত।

আদর-যত্ন ও উপযুক্ত আহাৰে চিত্রার অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়িয়া চলিল। গায়ের গন্ধ দূর হইল, মৃদু হরিদ্রাবর্ণের উপর কালো টিকাগুলি বাক্মক করিত। চক্ষু দুটি ক্ষুটিকস্বচ্ছ এবং সর্বোপরি দীর্ঘ লাজুলের শোভা মনোরম। আমার স্ত্রীর সে অতিশয় ভক্ত হইয়া পড়িল এবং শিশুপুত্রের খেলার সঙ্গী হইল। শাড়ী, জুতা ও হাতব্যাগ লইয়া চিত্রা ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলা করিত; নথ দিয়া কিছু ধরিলে ছাড়ানো অসম্ভব হইত। সময় সময় আমার স্ত্রীর হাত কামড়াইয়া ধরিত। শরীরে কখনও নখও বসাইত না, দাঁতও না।

আমাকে সে দেখিতে পারিত না এবং আমিও তাহাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখিতাম। চিত্রার কতকগুলি মনুষ্যোচিত ভাবভঙ্গী দেখিয়া অবাক হইতাম। আমাদের

ছেলেটি বুকে হাত দিয়া শুইত, চিত্রাও ঠিক মনুষ্যশিশুর মত চিং হইয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া শুইত। তাহার বুকের শুভ্র চিক্কণ রোমরাজি ক্রমশঃ হরিদ্রাভ হইয়া পৃষ্ঠের দিকে উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আমাদের খাবার খাইতে দেখিলে সে বেশ বড় থাথা পাতিয়া খাবার চাহিত।

চিত্রা বড় হইতে লাগিল এবং অনেকেই বলিতে লাগিলেন যে, এখন আর তাহাকে ঘরে রাখা নিরাপদ নহে। আমিও মাঝে মাঝে ভাবিতাম যে চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া দিব। কথাটা উঠিলেই স্ত্রীর চোখে জল আসিত। তিনি শিকল ছাড়িয়া দিতেন, চিত্রা তাহার কোলে উঠিয়া মাথা লুকাইয়া বসিয়া থাকিত।

ক্রমে চিত্রার মধ্যে তাহার আদিম প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তড়িৎবেগে সে গাছে চড়িত। বাগানে কোন পাখী বসিলে এ গাছের আড়ালে সে-ঝোপের কোণে আত্মগোপন করিয়া সে ধীরে ধীরে অতি সন্তুর্পণে অগ্রসর হইত এবং শেষে একেবারে শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত। শিকল টানিয়া তাহাকে রাখা দুঃসাধ্য হইত। নিজের শক্তি সহজে সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। ছোট কুকুর ও ছাগল দেখিলে আক্রমণ করিত, কিন্তু ঘোড়া কিংবা গরু দেখিলে ভয় পাইত।

একবার কয়েক দিনের জন্য সঙ্গীক বাহিরে গিয়াছিলাম। বাড়ীতে ফিরিয়া গুলিলাম চিত্রা শিকল ছিঁড়িয়া প্রতিবেশীর একটা মুরগী ভক্ষণ করিয়াছে এবং আর একটি ছাগলের গলা চিরিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। রাগে লাঠি দিয়া মারিলাম; সে নোড়াইয়া স্ত্রীর কোলে আশ্রয় লইল এবং অল্পতপ্ত অপরাধীর মত কঁো কঁো শব্দ করিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবেরা পরামর্শ দিলেন চিতা যখন একবার রক্তের স্বাদ পাইয়াছে তখন আর তাহাকে বাড়ীতে রাখা উচিত নয়। যেরূপ ক্রতগতিতে চিত্রা বাড়িয়া চলিয়াছিল তাহাতে এক এক সময় তাহাকে দেখিয়া ভয় করিত। তাহার রূপ দেখিয়া কিন্তু মুগ্ধ হইতাম। তাহার নাকের ডগায় একটি বড় কালো টিপ; জিহ্বা অমৃদু হইলেও পরিষ্কার ও লাল; দাঁত উজ্জল সাদা; চক্ষু দুটি যেন স্বচ্ছ কাচের কিন্তু মামুদী মায়ায় ভরা। আর গাত্রচর্ম! এমন মৃদু এমন উজ্জল আর দেখি নাই। লেজটি মোটা। হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। থাথাগুলি শরীর-অল্পপাতে বেশ বড়, যখন রাগিত লুকানো নখ বাহির করিয়া গর্জন করিত। সে ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্য অপরূপ।

মায়া বাড়াইয়া লাভ নাই। এক দিন চিত্রাকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। প্রতিদিন সে আমাদের সঙ্গে

রাশ্তায় হাঁটিয়া বেড়াইত, কিন্তু সেদিন সে কিছুতেই ষ্টেশনে যাইবে না। জোর করিয়া টানিতে চেষ্টা করিলাম; সে হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল এবং টানাটানিতে তাহার সর্বাত্মক ক্ষতবিক্ষত হইল। কোলে করিয়া অতি কষ্টে চিত্রাকে টেনে উঠাইলাম। মনিহারিঘাটে তেমনই কোলে করিয়া ষ্টীমারে তুলিলাম। ষ্টীমারে এঞ্জিনের শব্দে, কৌতূহলী বহু লোকের আলাপ-আলোচনায় সাহসী চিত্রা একেবারে চূপ করিয়া রহিল। যথাসময়ে তাহাকে কাঁচা মাংস দেওয়া হইল। অন্য দিন যে মাংসখণ্ডের উপর লাফাইয়া পড়িত আজ সে তাহা স্পর্শও করিল না। অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাহাকে মাংস বা দুধ কিছুই খাওয়ানো গেল না।

বড় লাইনের গাড়ীর ‘ডগবক্সে’ চিত্রাকে পুরিয়া দেওয়া হইল; খাঁচার ভিতরে জল ও মাংস দেওয়া গেল। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে দেখা গেল সে খাদ্য বা পানীয় কিছুই স্পর্শ করে নাই, এক কোণে চূপ করিয়া বসিয়া সে যেন কাঁদিতেছে। চেন ধরিয়া তাহাকে প্ল্যাটফরমে নামানো হইল। নির্জন শুকনা জঙ্গলের ক্ষুদ্র শিশু আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে পাহাড়ে ‘মামুঘ’ হইয়াছে, বর্দ্ধমান ষ্টেশনের লোকারণ্যে সে বিষম ভয় পাইল; এদিক-সেদিক ছুটিতে চাহিল। হঠাৎ যখন এঞ্জিনটা তীব্র চীৎকার করিল সে একেবারে ছুটিয়া নোংরা হাত-পা লইয়া তাহার মায়ের কোলে উঠিয়া বসিল।

রাত্রিটা শিয়ালদহ ষ্টেশনের বিশ্রামঘরে কাটাইলাম। ভোরে উঠিয়া দেখি টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

আকাশ যেমন মলিন আমাদের মনও তেমন অগ্রসর। সমস্ত রাত্রি চিত্রাকে খাঁচের পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল চিত্রাকে শুকনা জঙ্গলে ছাড়িয়া দিতে। বনের শিশুকে ঘরে আনিয়া কি ভাল করিয়াছি? সে কি আর জঙ্গলে বাস করিতে পারিবে? মামুঘের সঙ্গে থাকিয়া সে বনের পশুর সাহস, শিকার ধরিবার কৌশল ভুলিয়াছে। মামুঘের ভয় জন্মাইবার আকৃতি চিত্রার হইয়াছে, কিন্তু খাপদসকুল নিবিড় বনে একাকী বিচরণ করিবার বয়স কি তাহার হইয়াছে?

চিড়িয়াখানা হইতে খাঁচা লইয়া লোক আসিল। চিত্রা কিন্তু কিছুতেই যাইবে না। যতই চেষ্টা হইতে লাগিল ততই সে খাঁচের নীচে লুকাইতে লাগিল। কখনও বা তাহার মাকে চার পায়ের নখ দিয়া জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। পশুরা কাঁদে কিনা জানি না, কিন্তু চিত্রার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

আবার দূর দেশে ডাক পড়িল; নূতন রেল-লাইন নির্মাণ করিতে হইবে। নিজের পুত্রকে কন্ডেন্টে ও জীবকে পিত্রালয়ে রাখিয়া তাঁবুতে বাসা বাঁধিলাম।

কলিকাতা গেলে আমাদের অবশ্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে চিড়িয়াখানা অন্যতম। শিশু চিত্রা আজ তরুণী হইয়াছে। বনের মাকে ভো সে অতি শৈশবেই হারাইয়াছে। আজ যখন লোহার গরাদ-দেওয়া প্রকাণ্ড খাঁচার বাহিরে তাহার মামুঘ মা দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকে, চিত্রা তাহাকে চিনিতে পারে না; সে তাহার কাছে আসে না। তাহার মায়ের দুই চোখ ভরিয়া জল আসে।

গান্ধীজী

ত্রিবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ওগো নয় কপণক, কোথা তুমি এ সঙ্কটকালে?
পশ্চিম সমুদ্রপারে আজো যে গো চিতা বজ্রমান।
আজো চলে কুরুক্ষেত্র, না জানি কি আছে বাঁ কপালে,
হিংস্রক খাপদ দল ঘরিসাছে মিথ্যা সাম্য গান।

লোভাতুর দামবের মূঢ় অট্টহাসি যায় শোনা।
কাঁদিলে মানব-শিশু, কেঁপে ওঠে দিক চক্রবাল।
ভিলে ভিলে পলে পলে মরণের দিন হয় গোনা
রক্ত-রাঙা পৃথিবীকে জমে উঠে করোটি, কঙ্কাল।

দণ্ডধারী হে ভাপন, যেমে এসো ভেজঃমুগ্ধি লয়ে,
আরবার গাহ তব অহিংসার সঞ্জীবনী গীতা।
দুঃশাসনে তুচ্ছ করি ক্লিষ্টা নারী দুম্বাক অভয়ে
প্রেম-মৈত্রী মল্ল শুনি রণচণ্ডী হটুক মুচ্ছিতা।

পরম আত্মাঙ্গ লভি বহে যাক জীবন-জাহ্নবী।
অমৃত-বাগীজে শুব হুঃখ কষ্ট দূর হোক সব।

অর্থব্যবস্থা ও মনোব্যবস্থা

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ, পিএইচ-ডি

আজকাল এক সম্প্রদায়ের লোক প্রায় অন্ধভাবেই এই কথায় বিশ্বাসী যে, আমাদের সমাজব্যবস্থা আমাদের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার উপরেই গড়িয়া উঠে। তাঁহারা শুধু সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা দেখিয়া ক্ষান্ত হইবেন না, তাঁহারা আমাদের মনোব্যবস্থার ভিত্তিতেও দেখিয়াছেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই একাধিপত্য না হইলেও প্রধান আধিপত্য। তাঁহারা বলিবেন, সমাজের সুস্থ স্বকুমার সম্বন্ধগুলিই যে শুধু মানুষের আর্থিক ব্যবস্থার উপরে গড়িয়া উঠে তাহা নহে, আমাদের মনের সুস্থ স্বকুমার বৃত্তিগুলিও অনেকাংশে এই আর্থিক ব্যবস্থার প্রভাবে গঠিত হয়। আর এক সম্প্রদায় আবার এই মতটির সম্পূর্ণ বিরোধী; শুধু বিরোধী বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেই চলে না, তাঁহাদের বিশ্বাস এই মতবাদটির দুই বন্ধকে অবলম্বন করিয়াই বর্তমান মানুষের জীবনে দুরন্ত 'কলি'র প্রবেশ ঘটিয়াছে এবং মানুষের সকল প্রকারের মহৎ মূল্যবোধকে সে তছনছ করিয়া দিয়াছে। আর এক দল আছেন, যাঁহারা নৈষ্টিক ভাবে কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, 'ঘরেও নহে, পরেও নহে, যে-জন আছে' মাঝ-খানে—অনেকটা এই দলের। আমরা মোটামুটিভাবে নিজেদের এই শেষোক্ত দলের অন্তর্গামী বলিয়াই অনুভব করিতেছি। অর্থাৎ মানুষের মনের সর্বপ্রকারের স্থূল সুস্থ বৃত্তির এবং মূল্যবোধের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ মানুষের উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং তজ্জনিত আর্থিক বণ্টন ব্যবস্থার উপরেই একান্ত ভাবে নির্ভরশীল এমনতর কথাকে স্বীকার করিয়া লইতে মন রাজী না হইলেও আমাদের মনোবৃত্তি ও বিবিধ মূল্যবোধের বিবর্তনে যে আর্থিক ব্যবস্থারও একটা বিশেষ প্রভাব বহিয়াছে সে কথাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

এ সকল বিষয়ে নিছক তর্কে তেমন লাভ হয় না, ইতিহাসের সাক্ষ্যই এ সব ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক। আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনের কিছু কিছু অংশ বিশ্লেষণ করিয়াই সত্য নির্ণয় করার চেষ্টা করা যাক।

কয়েক দিন আগে একজন বন্ধু রসিকতা করিয়া বলিতে-ছিলেন—'আমরা কলিকাতার লেক-অঞ্চলের লোক হওয়াতে আমাদের কতকগুলি সুবিধা আছে; নাটক দেখিতে আমাদেরিগকে সব সময় বাগবাজার বা গ্রাম-বাজারের দিকে দৌড়াইতে হয় না, সন্ধ্যায়-সকালে আমরা

অনেক জীবন্ত নাটক বিনা পয়সাতেই অভিনীত হইতে দেখিতে পাই।'

কথাটা শুনিয়া সহজ ভাবেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। আমার জিজ্ঞাসা-বৃত্তি অপেক্ষা তাঁহার বিবক্ষা-বৃত্তি কিছুমাত্রা অগ্রচূর ছিল না; স্তবরাং নাট্যাভিনয়ের একটি সবিস্তার এবং সরস বর্ণনা পাইলাম। যাহা শুনিলাম তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে এই :

এক দিন সন্ধ্যায় তিনি বালিগঞ্জের চাকুরিয়া লেকের পারে বসিয়া আছেন। লেক আস্তে আস্তে নির্জন হইয়া উঠিয়াছে, সন্ধ্যার অন্ধকারও ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে, এমন সময় দেখা গেল, একটি যুবক এবং যুবতী ধীরপদবিক্ষেপে আসিয়া অদূরস্থ একটি আসনে উপবেশন করিল। তাহারা অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল; অদূর হইতে তাহাদের কথাবার্তা কিছু কিছু শোনা বাইতেছিল।

এরূপ স্থানে এই সময়ে ঈদৃশ যুবক-যুবতীর মনো-ভাব অনেক সময়ে অকথিত ভাবেই ব্যক্ত থাকে। প্রারম্ভিক কথাবার্তায়ই যাহা বোঝা গেল, তাহাতে আশস্ত হইবার প্রচুর কারণ ছিল; ব্যাপারটি শ্রেফ রোমান্স নহে, তাহারা পরস্পর বিবাহহুত্রে আবদ্ধ হইতে কৃতসঙ্কল্প। লেকের পারে বসিয়া তাহারা অদূর ভবিষ্যতের বিবাহিত জীবনেরই ব্যবস্থাদি সম্বন্ধেই একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতেছিল। প্রথম কথাই হইল বাসাবাড়ী লইয়া। ছেলেটি একটি মেসে থাকে, চাকুরি করে; বিবাহের পূর্বেই বাসা করা দরকার; কি রকম বাসা করা উচিত হইবে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা আরম্ভ হইল।

অনাস্থাদিতপূর্ব দাম্পত্য-জীবনের প্রথম বস্তীন কল্পনা; স্তবরাং উভয়তঃই উৎসাহের আবেগ। নিজেদের অজ্ঞাতেই তাহাদের কণ্ঠস্বর একটু একটু করিয়া উচ্চগ্রামে উঠিতেছে। কিন্তু তাহারা আশ্চর্যভাবে রিয়ালিষ্ট। প্রসঙ্গটি উঠিতেই মেয়েটি গার্হস্থ্য জীবনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মেয়েদের অভিজ্ঞতা-প্রাচুর্য এবং সহজাত বুদ্ধির দাবি লইয়া বলিয়া উঠিল, 'ভাড়া করিতে হইবে একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট বাড়ী, সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে সব দিক হইতেই, অথচ তাহাতে একটি রান্নাঘর এবং ছোট্ট দুইটি চমৎকার আলো-হাওয়াযুক্ত ঘর ছাড়া আর স্থান-বাহুল্য থাকিতে পারিবে না।' ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, 'দুইটি ঘরে চলিবে কি করিয়া?' মেয়েটি

বলিল, 'কেন, একটি হইবে আমাদের শোবার ঘর, আর একটি হইবে আমাদের বসিবার ঘর।' ছেলেটি বলিল, 'তাহ্য কি করিয়া, মা থাকিবেন কোথায়?' মেয়েটি যেন একটু বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়া বলিল, 'মা? কেন, তুমি কি আরও এই সব বক্সাট দিয়া ঘর বোঝাই করিতে চাও? তা কিন্তু হইবে না বলিয়া দিতেছি।' ছেলেটি বলিল, 'সে তোমার কি রকম কথা? আমি বিবাহ করিয়া বাসাবাড়ী করিব, মায়ের সেখানে স্থান হইবে না?' মেয়েটি এবারে একটু যেন চটিয়াই গেল; সে জুঁচকাইল কিনা অন্ধকারে দেখা গেল না বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠে ছিল তাহার আভাস। সে বলিল, 'কেন, তুমি ত এখন মেসে আছ, তোমার মা এখন কোথায় থাকেন?' ছেলেটির কণ্ঠে কেমন একটা শুষ্ক গাঙ্গীর্ষ দেখা দিল; সে বলিল, 'মা এখন থাকেন দাদাদের কাছে।' মেয়েটি বলিল, 'তবে আর দু'চার বছর তাঁহাদের কাছেই থাকিলে দোষ কি?' ছেলেটি উদাসীন ভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'সেখানে তাঁহার ভাল যত্ন হইতেছে না।' মেয়েটি বলিল, 'কেন, সেখানে তোমার বৌদিরা নাই?' ছেলেটি কেমন চুপ করিয়া গেল, খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, 'বৌদিরা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মায়ের তেমন যত্ন করেন না।' মেয়েটি একটু কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'তাহারা কেহ যত্ন করিতে পারিবে না, আমিই বা তবে প্রথমাবধি তাঁহার সব ভার লইতে যাইব কেন?' ছেলেটি বলিল, 'আমার বিবাহের পরে আমার স্বেচ্ছাই থাকিবেন, অনেক দিন ধরিয়া মায়ের এই রকমই ইচ্ছা।' মেয়েটি দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, 'ও সব ইচ্ছা রাখিয়া দাও; প্রথম হইতেই এমন করিয়া ঘর বোঝাই করিতে হইলে তুমি অন্য 'লক্ষ্মী বউ' খুঁজিয়া লও, আমাকে দিয়া তাহা হইবে না। তোমার মা আসিলেই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া দিনে-রাত্রে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের রীতিমত ভিড় জমিয়া যাইবে, এত সব বামেলার মধ্যে আমি নাই।' বলিয়া মেয়েটি একটু মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া লেকের ওপারের দিকে চাহিয়া রহিল, ছেলেটির মুখেও আর কথা ফুটিল না। দাম্পত্য-জীবনের সিদ্ধান্তের প্রথম আলোচ্য বিষয়টিই যে এমন করিয়া তিক্ততা সৃষ্টি করিবে ইহার জন্য কোন পক্ষই প্রস্তুত ছিল না। কে জানিত লেকের পারের নির্জন সন্ধ্যার আবছায়া প্রদোষালোকের এমন স্বপ্নাবেশের ভিতরে তাহাদের নবীন প্রেম-নীড়ের বিচিত্র কল্পনা এমন করিয়া অকস্মাৎ উন্মীষা যাইবে! কিন্তু বাহা হইবার ছিল না তাহাই হইল; যুবক-যুবতী-দ্বয়ের প্রেম-নাট্যের সেইখানেই সত্য সত্য একেবারে যবনিকা-পাত হইল কিনা তাহা বলা যায় না; কিন্তু দেখা

গেল, তাহারা উপরি-উক্ত আলোচনার পর প্রায় দুই দিকে মুখ ফিরাইয়াই কতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল এবং তাহার পর আবার আস্তে আস্তে আসন ছাড়িয়া নীরবেই একদিকে চলিয়া গেল।

গল্পটি বলিয়া আমার বন্ধুটি যে মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিক তাহাই। সংক্ষেপে করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমাদের দেশের মেয়েদের এই সব 'হায় কি হইল!' কথাটি এই জাতীয় একটা সাক্ষেপ উক্তির মধ্যে ফুরাইয়া ফেলিতে পারিলেই এ সম্বন্ধে আরার এতগুলি কথা লিখিবার কোনও তাগিদ আসিত না। কথাটি গভীর ভাবে মনকে নাড়া দিয়াছিল বলিয়াই একটু আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মযজ্ঞিক ভাবনাও দেখা দিয়াছে।

উপরে একটি আধুনিক যুবতীর যে মনোভাবের পরিচয় পাইলাম তাহাকে যদি একটি বিশেষ যুবতীর একটি বিশেষ মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি মাত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিতাম তবে আর ভাবিবার মত কোনও সমস্যা দেখা দিত না; কিন্তু পারিপাশ্বিক জীবন সম্বন্ধে একটু সচেতন হইবার চেষ্টা করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, ইহা একটি বিশেষ যুবতীর বিশিষ্ট মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে না, শুধুমাত্র আধুনিক যুবতীগণের মনোবৃত্তির পরিচয়ও প্রদান করে না; ইহা যুবক-যুবতী, প্রোট-প্রোট, বুদ্ধ-বুদ্ধা সকলেরই সামাজিক মনের প্রবণতার জোতক। সুতরাং ইহাকে আধুনিক যুগের বিকার বলিয়াই দিকার দিই, আর ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়াই তারিফ করি, মোটামুটি একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বর্তমান যুগে আমাদের সামাজিক জীবনে ইহা একটি বিশেষ সত্যরূপেই দেখা দিয়াছে।

আমরা আমাদের দেশ-গাঁয়ের পূর্বকার সমাজ-জীবন সম্বন্ধে বাহা জানি তাহাতে মনে হয়, তখন বিবাহ অর্থই ছিল চারিদিক হইতে কেবল ঝামেলা বৃদ্ধি। ইহা বিবাহেচ্ছু যুবক-যুবতীও জানিত, কিন্তু তাহাতেই ছিল আনন্দ। বিবাহের পূর্বে পাত্রী যদি জানিত যে, তাহার যে বাড়ীতে বিবাহ হইবে সে বাড়ীতে কোনও রকমে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিবার মত মাত্র দুইখানি ঘর আছে, সেখানে শস্তুর নাই, শাশুড়ী নাই, দেবর নাই, ভাস্কর নাই, ননদ নাই, জা নাই, তবে সে মনে মনে খুব খুশী হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে যাইয়াও দেখা গিয়াছে মা-বাপ-বড়ঘর খুঁজিয়াছেন এবং বড়ঘরের লক্ষণই ছিল শস্তুর-শাশুড়ী, দেবর-ভাস্কর, ননদ-জা, আত্মীয়-স্বজন, ইত্যাদিতে সংসার চারিদিক হইতে ভরপুর। কিন্তু এখন যে এই দুইখানি মাত্র

‘খোপে’র মধ্যে জীবনযাপনের মনোবৃত্তি তাহা যে কেবল আধুনিককালের যুবক-যুবতীগণের মধ্যেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, প্রাচীনপন্থী পিতামাতা, অভিভাবকগণও পর্যন্ত এ যুগে মেয়ের বিবাহ দিতে হইলে খোঁজেন এমন বর বাহার পোষ্য-পরিজন এবং অন্যান্য সাংসারিক দায়িত্ব অতি অল্প। আগে যেমন কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া মা, ঠাকুরমা, পিসিমা প্রভৃতিকে পাড়ায় গল্প করিতে দেখিতাম, যেখানে সম্বন্ধ করা গিয়াছে তাহাদের বাহির-বাড়ী ভিতর-বাড়ীতে কত ঘর-দরজা, কত পোষ্য-পরিজন, আত্মীয়-কুটুম্ব, অতিথি-অভ্যাগত—কত ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বণ। এখন আবার মা-ঠাকুরমাকে তেমনিধারা খুশী হইয়া বলিতে শুনি, ছেলেটি ভালই পাওয়া গিয়াছে, লেখাপড়া তেমন না জানিলেও চাকুরে ছেলে, বাপ নাই, মা থাকেন অন্য ভায়েদের সঙ্গে, একটি বোন তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ভাইদের মধ্যে একজন বড়, সেও চাকুরি করে—ছেোটটিও চাকুরি করে। ছেলে বিবাহ করিয়াই মেয়েকে লইয়া কর্মস্থলে গিয়া বাসা করিয়া থাকিবে, স্ততঃ সর্ব দিক বিচার করিয়া মেয়ের কপালই বলিতে হইবে।

আমি আলোচনাটা এতক্ষণ বিবাহকে অবলম্বন করিয়া করিতেছি বটে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা নিছক বিবাহ-সম্পর্কেই নহে, ইহা আমাদের সমাজ-জীবনের বিরাট একটা পরিবর্তনের এবং তৎসঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তিরও একটি বৃহৎ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতেছে।

আমরা আমাদের প্রথম জীবনের কথা—অর্থাৎ যখন রীতিমত নাগরিক না হইয়া একান্তভাবে পল্লীবাসী ছিলাম,—সেই সময়ের কথা যখন স্মরণ করি তখন দেখি যে, আমাদের পারিবারিক পরিধির সীমা-রেখাটা যে ঠিক কোথায় ছিল তাহা আমরা তেমন বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। এখন যেমন আমার বাসস্থানের পরিধি—আমার পরিবারের লোকের সংখ্যা, আমাদের মাসিক ও দৈনিক কৃত্যসমূহ এবং তাহার জন্য আর্থিক রসদের পরিমাণ প্রত্যেকটা জিনিসকেই অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া জানি; এমনতর পূর্বে কোনও দিনই জানিতাম না—জানিবার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। আমরা যে খুব বনিয়াদী ধনী-পরিবারের লোক ছিলাম তাহা নহে, নেহাতই ‘নেউগী চৌধুরী নাহি না করি তালুক’—জাতীয় মধ্যবিত্ত ঘরের লোক। কিন্তু আমরা আমাদের পরিবার বলিয়া যে জিনিসটিকে জানিতাম তাহাকে বহু স্তরবিশিষ্ট একটি বিস্তীর্ণ সজ্জ বলিলেই চলে। প্রথম স্তরেই আমরা একসঙ্গে নিত্য ‘হু’ বেলা পাত পাড়িতাম চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক, ইহা জ্যোতা-

খুড়া, জ্যোতুত-খুড়ুত ভাই এবং তাহাদের পুত্রকন্যার সমষ্টি। দ্বিতীয় স্তরে আমাদের বাড়ীর মাহুদ, গ্রামের এবং আশ পাশের আত্মীয়-স্বজন। ইহারও অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করিয়া এত আসিতেন, থাকিতেন, খাইতেন লইতেন এবং আমরাও অনুরূপ আচরণ এমন করিতাম যে, আমাদের ভিতরকার স্পষ্ট ভেদ-রেখা কাহারও নিকট তেমন অস্বভব-গম্য ছিল না। ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া আবার মাথার উপরে গুরু-পুরোহিত ছিলেন (পুরোহিতের ভিতরেও আবার প্রকারভেদ ছিল, শাল-গ্রাম শিলার নিত্য পূজার জন্য একটি পুরোহিত-পরিবার, অন্যান্য পারিবারিক পূজানুষ্ঠানের জন্য অন্য পুরোহিত-পরিবার, আবার কালীপূজা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পূজার জন্য বিশেষ বিশেষ পুরোহিত), আর কিছু নিয়ন্ত্রণে খোপা-নাশিত, নট্ট মাল্যাকর, কাহার-কুমার-ভূঁইয়ালী প্রভৃতি ত সমস্ত পরিবারটিকে জড়াইয়া ছিল। আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন দুই ঘর ‘রাইয়ত’ ছিল, তাহাদের খাজনার পরিমাণ নিত্যসুতী অকিঞ্চিৎকর ছিল, তাহাও আইনতঃ দেয় হইলেও কোনও দিন দেওয়া হইত বলিয়া বড় একটা দেখি নাই। কিন্তু এই দুই ঘরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের সঙ্গে আমরা কাজে-কর্মে, আহারে বিহারে, রোগে-শোকে, স্বখে-দুঃখে এমন করিয়াই এক হইয়াছিলাম যে, আজ বহু দিনের ছাড়াছাড়ির পরেও তাহাদের কাহাকেও দেখিলে পরম আপনার বলিয়া বোধ করি। ইহা ছাড়া, আমাদের বাড়ীতে নিত্য পান দিয়া যাইত যে বাকুই সে ছিল আমাদের একান্ত আপনার জন, আমাদের ভূমি চবিত যে চাষী, আমাদের খেজুর গাছ কাটিয়া রস, ‘ভিড়’ গুড়, পাটালি প্রভৃতি যোগাইত যে ‘শিউলী’ ইহার সকলেই ছিল আমাদের আত্মীয়স্বরূপ। মাঝে মাঝে এক মুঠো চালের ‘খুদ’ বা ডালের ‘খুদে’র বিনিময়ে লাউ-কুমড়োর শাক, পাট শাক, কলাই-মটর শাক দিয়া যাইত যে বুড়ী তাহাকেও ত আমাদের পরিবারের স্বখ-দুঃখের ভাগী দেখিয়াছি, তাহাকেও ত কখনও একেবারে পর বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। এইরূপেই জাতিধর্মনিরপেক্ষ একটা বৃহৎ বন্ধন গড়িয়া উঠিত।

এই বৃহৎ বন্ধন আবার একটু একটু করিয়া শিথিল হইয়া স্তরে স্তরে ভাঙন ধরাইয়াছে। এখন সেই ভাঙন এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে যে, সহোদর ভাই-ভাইয়েও বেশ ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইতেছে। পূর্বে যে বৃহৎ পারিবারিক বন্ধনের কথা বলিলাম, সেই বন্ধনের মূল শক্তি কোথায়? সে শক্তি অনেকখানিই নিহিত ছিল তৎকালীন

গ্রাম্য আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে। প্রাচীন যৌথপরিবার-প্রথা একটা পুরণো অর্থ-ব্যবস্থার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেই আর্থিক প্রথা এখন সম্পূর্ণভাবে বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার ফলেই দেখা দিয়াছে সমাজ-ব্যবস্থারও একটা আমূল পরিবর্তন। প্রাচীন গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেখানে ‘অর্থ’ শব্দের মানে বিশুদ্ধ ভাবে ধাতব মুদ্রা বা কারেন্সি নোট ছিল না; সেখানে অর্থ শব্দে ব্যাপকভাবে মাছের সাধারণ সম্পদ বুঝাইত। সুতরাং গ্রাম্য আর্থিক ব্যবস্থার সহিত নগদ টাকার সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে প্রধান ছিল না। মধ্যবিত্তগণের মধ্যে যে সকল বড় বড় যৌথ-পরিবার গড়িয়া উঠিত, তাহাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইত, পরিবারের কিছু যৌথ ভূমি-সম্পদ ছিল। এই যৌথ-সম্পদই ছিল যৌথ-পরিবারের বনিয়াদ-স্বরূপ। এই জাতীয় জমি-জমাতে বৎসরে যে ধান পাওয়া যাইত, মোটা ভাতের সংস্থান প্রায় তাহাতেই হইত। আমাদের পরিবারে দেখিয়াছি, নগদ টাকার অল্পটী সর্বদাই নগণ্য ছিল,—কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সচ্ছলতার অভাব আমরা কখনই দেখিয়াছি। পাল-পার্বণ, উৎসব-অমুষ্ঠানাদির দ্বারা খুব ক্রিয়ান্বিত বাড়ী বেগুনি ছিল সে সব স্থলে একটু অল্পসম্পদ করিলেই দেখা যাইবে, এই সকল ক্রিয়া-কর্মের জন্যও অধিকাংশ স্থলেই পৃথক ভূসম্পত্তি ছিল। ইহা হইতে যে ধান-চাল পাওয়া যাইত তাহা বিক্রয় করিয়া মুদ্রা-সংগ্রহ করিয়া আমরা কাজ করিতে বেশী দেখি নাই; ধান-চালের এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময় দ্বারাও কাজ চলিতে দেখিয়াছি। যে পুরোহিত তিন দিন উপবাসী থাকিয়া মহা ধুমধামে দুর্গাপূজা করাইতেন তিনি নগদ কিছু পাইতেন শুধু নবমীর দিনে দক্ষিণার সময়ে—তাহাও যৎকিঞ্চিৎ ‘কাঞ্চন-মূল্য’ ‘রক্ততথু’—তাত্রথওও যে কাজ চলিত না এমন নহে। কিন্তু পূজার পরে দেখিতাম, তিনি নৈবেদ্যের চালে সবশুদ্ধ প্রায় মণথানেক চাল সংগ্রহ করিয়াছেন, সঙ্গে তিন-চারি মণ ধান পাইয়াছেন (তাহার ভিতরে কিছু আবার ফরমাস করা খইয়ের ধান, কিছু মুড়ির ধান, কিছু বা চিড়ার ধান), সঙ্গে কয়েক কাঁদি কাঁচকলা, কাঁদি কয়েক পাকা কলা, দুই কুড়ি মান কচু, চার কুড়ি নারিকেল, এক জালা ইক্ষু গুড়, কিছু শশা চালকুমড়া। ইহার বহু জিনিসই ছিল যজ্ঞমানের বাগানে স্বচ্ছন্দজাত অথবা অনায়াসলব্ধ; সুতরাং যজ্ঞমানেরও তেমন গায়ে লাগিত না, গুরু-পুরোহিতেরাও সমুদ্র চিত্তে আশীর্বাদ বর্ষণে কার্পণ্য করিতেন না; এবং মোটের উপরে এতদুভয়ের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ যোগও তাই সহজ ভাবেই গড়িয়া উঠিত। কিন্তু আজিকার

দিনে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা ধেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অর্থ শব্দের একমাত্র তাৎপৰ্য হইয়া উঠিয়াছে মাসান্তে লব্ধ কিছু নগদ টাকা।

আজিকার বাজারদর যাচাই করিয়া পূর্বোক্ত পুরোহিত-দক্ষিণার একটা অঙ্ক ফেলিয়া দেখুন, দেখিবেন নয়নের বিস্ফারিত দৃষ্টি গুরুপুরোহিতকে কতখানি ব্যবধানে সরাইয়া দিয়াছে। ধোপা-নাপিত, নড়-ভুঁইমালী প্রভৃতি সখস্বেও অনেকটা অল্পরূপ ব্যবস্থারই প্রচলন ছিল; পুত্র-কন্যার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দোল-দুর্গোৎসব বাহা কিছু অমুষ্ঠান হোক, তাহাদের খাওয়া-দাওয়া ও পাওনা ছিল যখন-তখন; তদুপরি সর্বকার্যই পাওনা ছিল ‘দিধা’ অর্থাৎ ধান-চাল, ডাল-তেল, নুন-লব্ধা এবং আহুযজ্ঞিক অনেক প্রকারের ইত্যাদি ইত্যাদি। নগদ পয়সার জন্ত দাতাও তেমন হুচিন্তা-গ্রস্ত হইতেন না, গ্রহীতারও নগদ পয়সার লালসা তেমন ভাবে দেখা যায় নাই। আসলে সংসার-যাত্রা নির্বাহের কিছু রসদ জুটিলেই চলিয়া যাইত। আমরা বহুদিন ধাবৎ এমন ব্যবস্থাও দেখিয়াছি, দীর্ঘ তিন মাস বসিয়া বাড়ীতে মণ্ডপ-জোড়া দুর্গাপ্রতিমা গড়িয়া দিয়াছে যে কুমার তাহারাও নগদ টাকা কিছুই পাইত না—তিন মাস কাল ধরিয়া পাঁচ-ছয় কিস্তিতে চারি-পাঁচ জন লোক প্রতিবারে তিন-চারি দিন পরম সন্তোষ সহকারে আহারাদি করিয়া যাইত এবং পূজার পরে প্রতিমা গড়ার বাবদে কয়েক মণ জমির ধান মাধ্যম করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইত। বাড়ীতে কোনও পাল-পার্বণ বা ক্রিয়ামুষ্ঠান হইলে গ্রাম্য চৌকিদারেরও কিছু ‘ভেটের ভাগ ছিল; অল্প কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও আমাদের মুসলমান চৌকিদারের দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা এবং কালী-পূজার চাল-কলার নৈবেদ্য পাওনা ছিল। গ্রামের পাঠ-শালার পণ্ডিত যিনি মাসিক কোনও বেতন পাইতেন না, বৎসরান্তে কিছু ধান তাহার পাওনা হইত। গুরু-মহাশয়কে কোনও কোনও ছাত্রের নিকটে বেতন না পাইয়া অন্য প্রকারে দক্ষিণা লইতে দেখিয়াছি। ‘কোনও গরীব’ ছাত্র হয়ত বেতন দিয়া পড়িতে পারে নাই,—গুরুমহাশয়ের জীব খড়ের ঘর সংস্কারের সময়ে নিজের ‘ছাড়াভিটা’য় জাত বেত দিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছে। পাল-পার্বণ ও উৎসবাদি উপলক্ষে মাঝি-মাল্লারা চারি-ছ’ আনা পয়সায় সানন্দে আট-দশ মাইল পথ পৌছাইয়া দিত; ইহা তাহারা পারিত এই জন্য যে, কোনও চুক্তি থাকুক কি না থাকুক, তাহারা যেখান হইতে রওনা হইবে সেখান হইতে এক বেলার ‘খোরাক’ এবং যেখানে গিয়া পৌছিতে সেখান হইতেও এক বেলার ‘খোরাক’ অনায়াসে আদায় করিয়া লইতে পারিত। এই ‘খোরাক’ শব্দটি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা-

সাপেক্ষ; অর্থাৎ ইহার ভিতরে মাথাপ্রতি চাল, ডাল, তরকারী, মাছ, তেল-চুন, হলুদ-লঙ্কা, এমন কি জালানি কাঠ, রাজিতে বাতি জালাইবার কেরোসিন প্রভৃতি সকলই পরিমাণমত দেয় ছিল।

আমাদের পূর্বতন আর্থিক ব্যবস্থার পরিচয় লইতে হইলে এই সকলেরই খুঁটিনাটি সংবাদ রাখিতে হইবে। এখন ভাবিয়া দেখিতেছি, মূদ্রা ব্যবহারের রীতিই তখন পর্যন্ত খুব কম ছিল। একটু বিনিয়াদি পরিবারের ইস্তক চণ্ডীপাঠ মায় জুতা সেলাই সব কাজের জন্য প্রায়ই জমি-জায়গীরের ব্যবস্থা ছিল। দেবতা-ব্রাহ্মণের জন্য দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ছিল, ধোপা-নাপিত, নট-ভূঁইয়ালী প্রভৃতির জন্য 'চাকরাণ' জমি ছিল। স্তত্রাং পদে পদে নগদ হিসাবের মন-কষাকষি এবং তজ্জনিত অবশ্য-জাবী মনোমালিন্যের সম্ভাবনা ছিল না; আর টাকার হিসাব যেখানে যত গৌণ আত্মীয়তার বন্ধন সেখানে তত সহজ এবং দৃঢ়। কিন্তু আজ যে আপনি বাস করিবেন তাহার জন্য রক্তবিহীন আলমারির তাকের গায় ছুইখানি প্রকোষ্ঠ ত জানকবুল করিয়া একরূপ সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার পরে চলিতে থাকিল প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে নগদ আদানপ্রদান তাহাকে সারা মাস ধরিয়া কত করিয়া ভুলিবার চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিতেছেন না। প্রতি দিনের কৃত্য রূপে বাজারে একবার না গেলেই নয় এবং সেখান হইতে ফিরিবার সময়টুকুর মধ্যে নগদ মূল্যের আদান-প্রদানে পিত্ত কিছু তপ্ত না হইয়া যায়ইবে না। ধোপা আপনার কাপড় কাচিবে, তাহার নগদ-মূল্যের নিত্য নূতন রেট, নাপিত আপনার দাড়ি চাঁচিবে, তাহারও নিত্য নূতন কায়দা এবং তদনুরূপ নগদ মূল্যের উঠতি-পড়তি। রেল-ট্রাম-বাস—ইহাদের চালকদের সহিত আপনার কোনও দিন 'খোয়াকি'র কোনও সম্বন্ধ থাকিবার কথা নহে; তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রম-বর্ধিত নগদ মূদ্রার আদান-প্রদানে। গুরু-পুরোহিতের বালাই তুলিয়া দিতে চাহিয়াও তুলিয়া দিতে পারিতেছেন না—বিবাহ আছে, শ্রাদ্ধ আছে, অগত্যা কালীক্ষেত্র কালীঘাট গীঠে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া নগদ পঁচিশটি টাকা কোনও পুরোহিতের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং একেবারে একোদ্ভিষ্ট পিণ্ডদান হইতে ষোড়শ বৃষোৎসর্গ প্রায় ঘটাপ্রদানের ভিতরেই সারিয়া আসিলেন। সর্বত্রই শুধু নগদ মূল্য—আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে কাহার সঙ্গে? প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত আপনার পারিপার্শ্বিক জগৎ আপনাকে শুধু সচেতন করিয়া দিতেছে, নিছক বাঁচিয়া থাকিতে হইলেও নিরন্তর কি নগদ মূল্যের চাহিদা! সংসারটা যেন আর কিছুই

নহে, আপনি সারাটি মাস গলদ্বর্ম হইয়া যে কয়েকটি ধাতব মূদ্রা বা যে কয়খানি কারেন্সি নোট সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই ছিনাইয়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার একটা বিরাট ষড়যন্ত্র।

গ্রাম্য আর্থিক ব্যবস্থায় এই সেদিন পর্যন্তও একটা বিনিময়প্রথা বর্তমান ছিল। গরীব যে, নগদ পয়সায় নলেন গুড়ের পাটালি কিনিয়া খাইতে পারে না, সে তাহার ভিটায় জাত 'ছনে'র দু' আটির বিনিময়ে কিছু গুড় সংগ্রহ করিতে পারে। দেশ-গাঁয়ে সর্বপ্রকারের শাকের ব্যবসা বাড়ীতে বাড়ীতে চলিত মুখ্যতঃ চালের বা ডালের 'খুদে'র বিনিময়ে। বেত-বাঁশের সহিত আহাৰ্য্যদ্রব্যের বিনিময় আমরা অনেক দেখিয়াছি। স্থপারির ঋতুতে স্থপারিকে প্রায় মূদ্রাংশের ন্যায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি।

অর্থনীতির দিক হইতে হয়ত বলা হইবে বিনিময় সর্বত্রই বিনিময়, তাহা বস্তু বিনিময়ই হোক, অথবা মূদ্রার মাধ্যমেই হোক। কিন্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিয়া আমরা ইহাকে একেবারে তুল্যমূল্য দিতে রাজী নই। বস্তু-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সর্বত্র না হইলেও, অনেক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা আদানপ্রদানের ফল্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছি। অর্থবিনিময়ের ক্ষেত্রে ইহার সম্ভাবনা স্বল্প। গ্রাম্য জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার জন্য দ্রব্যবিনিময়ের একটি গভীর প্রভাব গ্রাম্য সমাজ-জীবনের উপরে লক্ষ্য করিয়াছি, ইহা আমাদের পল্লীর সমাজ-বন্ধনের ভিতরে একটা শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল।

মোটের উপরে আমাদের পূর্বতন আর্থিক ব্যবস্থা এবং বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করিতে হইলে আমরা এই বলিতে পারি যে, পূর্বে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা নির্ভর করিত মুখ্যতঃ ভূমিজাত সম্পদের উপরে; আর বর্তমান অবস্থায় এই ভূমিজাত বা প্রাকৃতিক অগ্ন কোন প্রকারের সম্পদের সহিত আমরা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক-বিহীন হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের সম্পর্ক শুধু মাত্র ব্যাঙ্কের চেক বা কারেন্সি নোটের সঙ্গে। আমাদের বিশ্বাস অর্থনৈতিক জীবনের এই পরিবর্তনই আমাদের পূর্বতন পারিবারিক বন্ধন এবং সমাজ বন্ধনের ভিতরে ভাঙন ধরাইয়াছে। সেই ভাঙন-প্রক্রিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করিয়া আমাদেরকে যেখানে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়াছে তাহারই একটু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে পূর্ববর্ণিত লেকের পারের যুবতীটির মনোবৃত্তির ভিতরে।

আমি পুরাতনের প্রতি সহজাত অন্ধ-প্ৰীতির বশবর্তী হইয়াই এ কথা বলিতেছি না। পুরাতন প্রথা ভাঙবেই; সে ভাঙনের ভিতরে অবিমিশ্র অকল্যাণই রহিয়াছে এমন

কথাও শ্রদ্ধেয় নহে। কিন্তু আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়া যে কথাটি মনে হয় তাহা এই যে, আমাদের পূর্বতন গ্রামীণ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা এবং তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক—তথা সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে চিত্তের যে ঔদার্য ছিল তাহা আমাদের আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরে গ্রথিত পারিবারিক তথা সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে মায়া পড়িতে বসিয়াছে। আমাদের গ্রামীণ সভ্যতার ভিতরে এই একটি চিন্তাধর্ম লাভ করিতাম যে, সাংসারিক ছোটবড় কোনও স্বখ-সম্পদকে একা একা ভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করা যায় না; নানানভাবে বছর সঙ্গে যুক্ত হইয়া বাস, স্বখ-সম্পদকে বণ্টন করিয়া লওয়াই ছিল আমাদের ধর্ম। পৌষ-সংক্রান্তির দিনে নিজের ঘরে ছয়ার আঁটিয়া পিঠা-পুলি খাইতে বা নবায়ের দিনে নিজের ঘরে বসিয়া একা একা বোড়শ ব্যঞ্জে আহার করিতে আমাদের কোনও আনন্দ ছিল না; দশ জনের সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইবার একটা সহজ মনোবৃত্তি আমরা অল্পভব করিতাম। ইহার পিছনকার অর্থনীতির উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, সে অর্থনীতি যে আমাদের একটি বিশেষ মনোবৃত্তিকে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নিতান্ত যে গরীব—সামান্য বরণণ বা কন্ডার গায়ে না দিলেই নয় এমন দুই-একখানি গহনা জোপাড় করিতে যাহার ভদ্রাসন বাঁধা পড়িয়াছে বা তৈজসপত্র বিক্রি করিয়া দিতে হইয়াছে, তাহার পক্ষে চুপি চুপি বিবাহকার্য সমাধা করিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তিই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যাহা যুক্তিসঙ্গত তাহাতে তাহার হৃদয় সায় দিত না; স্বতরাং সেই যে সর্বশ্ব খোয়াইবার মজ্ঞ তাহাতেও সে সকলকে না তাকিয়া পারিত না। ইহা কোনও ঐশ্বর্য-প্রচারের লোভে নয়, কোনও ভবিষ্যৎ স্বার্থসিদ্ধির কামনায় নয়; আমার মনে হয়, ইহা পুরাতন গ্রামীণ মনোবৃত্তিরই একটা অভিব্যক্তি মাত্র।

অপর পক্ষে একবার আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। তাহার চারি দিক জুড়িয়া নিশিদিন কেবল একটি স্বর—‘চাচা, আপন বাঁচা’। এই নিরন্তর ‘আপন বাঁচা’ইবার অত্যন্ত তাগিদে আমরা এমন করিয়াই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছি যে, তাহার পরিণামে এই ‘আপন’ কথাটি যে শেষ পর্যন্ত কি সংজ্ঞা লাভ

করিয়া কয়টি লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবে তাহা বুঝিতে পারি না। বর্তমান মাস-মাহিনার অর্থনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনে যাহারা থিতাইয়া পড়িয়াছি, তাহারা কন্যার বিবাহ দিতে হইলে যাহা কিছু খরচ করিব তাহা শুধুমাত্র মেয়ে-জামাইকে কি দিব এই একমাত্র দিকে নিবদ্ধ রাখিতে অশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছি; আর তাহাদের অতিমাত্রায় সাহায্যকারী রূপে আসিয়া জুটিয়াছে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের যত নিয়ম-কানুন। যাহারা কালোবাজারের সর্ববিধ পাপাচরণের সহিতই নিজেদের সর্বদা যুক্ত রাখিতে এবং সেই উপায়ে প্রচুর অধাগম করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, এই সময়ে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলীর প্রতি তাঁহাদের কঠোরতা এবং নিষ্ঠা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়।

আমি পুরাতন গ্রাম্য অর্থনীতির পক্ষে কোনও ওকালতি করিতেছি না, কেহ করিলেও মহাকাল তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র কর্পপাত করিবেন কি না সন্দেহ। এই অর্থনীতির সপক্ষে যদি বলিবার কিছু থাকে, তবে বিপক্ষে বলিবারও অনেক কথা রহিয়াছে। আমি যে জিনিসটি সশব্দে নিজেদের সচেতন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা হইল এই যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাপে আমরা আমাদের কতকগুলি সামাজিক গুণ হারাইয়া ফেলিতেছি—যে গুণগুলি আমাদের চিন্তা-ধর্মের ভিতরে একটা প্রসারতা দান করিত। ভূমিজ ও অন্যবিধ প্রকৃতিজ সর্বপ্রকারের সম্পদহারা হইয়া আমরা খালি ব্যাকসর্বশ্ব বা মনিব্যাগসর্বশ্ব হইয়া উঠিয়াছি; ইহা সর্বদাই আমাদেরিগকে অতিমাত্রায় হিসাবী ও সাবধানী করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু সেই হিসাব ও সতর্কতার পরিণাম যদি হয় শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থবোধের প্রাচীর তুলিয়া তুলিয়া কেবলই বৃহৎ মানব-সমাজ হইতে নিজেকে বিচ্যুত এবং বঞ্চিত করিয়া রাখা, তবে সেই আত্মসঙ্কোচনের ভিতরে আমাদের অকল্যাণ এবং অপমানই নিহিত আছে। যে অর্থনীতি আমাদের এইজাতীয় মনোবৃত্তির জন্য দায়ী তাহাকে ইচ্ছা করিলেই আমরা এক দিনে পরিবর্তিত করিতে পারি না; কিন্তু সচেতন চেষ্টা দ্বারা মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিকের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এ বিশ্বাস আমরা এখনও রাখি।



সেবাগ্রাম

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পশ্চিমে জি. আই. পি. রেলওয়ের মেন লাইনের উপর ওয়ার্ধা শহর। মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা জেলার সদর এই শহরটি। এখান থেকে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে গান্ধীজীর সাধনক্ষেত্র সেবাগ্রাম।

সেবাগ্রামের মূল নাম সেওগাঁও। বর্তমানে ওয়ার্ধা থেকে একটি মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তা সেবাগ্রাম পর্যন্ত এসেছে। গান্ধীজীর আশ্রম বা তাঁর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পার হয়ে তবে মূল গ্রামটিতে পৌঁছান যায়। আইন অমান্য আন্দোলনের পর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে গান্ধীজী হরিজন উন্নয়ন উপলক্ষে সারা দেশ পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় ভারতের গ্রামসমূহের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা ভাল করে তাঁর চোখে পড়ে এবং তখন থেকে তিনি “গ্রামে ফিরে যাবার” আন্দোলনের উপর বিশেষভাবে জোর দেন। এই সময় গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ শিষ্যরাও গ্রাম-সংগঠনের জন্ত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন এবং মীরা বেন নিজের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নেন মধ্যপ্রদেশে সর্ববিষয়ে অনগ্রসর এই সেওগাঁওকে। দাণ্ডিযাত্রা শুরু হবার প্রাক্কালে গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আর সবরমতীতে ফিরবেন না। তাই হরিজন যাত্রা শেষে শেঠ বমুনালাল বাজাজের আমন্ত্রণে গান্ধীজী তখন ওয়ার্ধায় শেঠজীর বাগানবাড়ীতে (বর্তমানে নিখিল ভারত গ্রামোত্তোগ সংঘের সদর কেন্দ্র মগনবাড়ী) ছিলেন এবং কোন্ গ্রামে কর্মক্ষেত্র স্থাপন করা যায় এ সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। মীরা বেন এই সময় তাঁর কাছে গিয়ে সেবাগ্রামে আশ্রম স্থাপন করতে অহুরোধ জানান এবং মীরা বেনের উত্তোঙ্গেই সেবাগ্রাম গান্ধীজীর কর্মক্ষেত্র তথা প্রায় এক যুগ যাবৎ ভারতের প্রাণকেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

গান্ধীজী ১৯৩৬ সালে সেবাগ্রামে আসার পর তাঁকে কেন্দ্র করে বাপু-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর ক্রমশঃ নিখিল-ভারত চরখা সংঘের প্রধান কার্যালয় এবং চরখা সংঘের খাদি বিতালয়ের কাজও এখানে শুরু হয়। ১৯৩৭ সালে দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের জন্য হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ স্থাপিত হয়। নূতন শিক্ষাপদ্ধতি গান্ধীজীর ব্যক্তিগত পর্ববেষ্ণনের অধীনে চালাবার জন্য তালিমী সংঘের প্রধান কার্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্র ও একটি করে প্রাক-বুনিয়াদী, বুনিয়াদী ও উত্তর-বুনিয়াদী বিতালয়ও

এখানে চলছে। খাস সেবাগ্রামে বর্তমানে চরখা সংঘ, তালিমী সংঘ এই দুটি প্রতিষ্ঠান এবং বাপুজীর আশ্রম ও কঁতুরবা হাসপাতাল বিদ্যমান।

গান্ধীজী বেঁচে থাকতে সেবাগ্রামের ক্ষুদ্র বাপু-কুটিরটি ছিল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর বাপু-কুটিরের শুধু ঐতিহাসিক মর্যাদাই আছে। প্রত্যাহ বছ যাত্রী এই পুণ্যভূমি দর্শন করে যান। আশ্রমে ছয়-সাত জন কর্মী আছেন। এঁদের মধ্যে বল্লভস্বামী হচ্ছেন সর্ব সেবাসংঘের সহ-সম্পাদক। গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের “Confederation” বা সম্মেলন এই সর্ব সেবাসংঘ। সংঘের সদর কার্যালয়ও এইখানেই। এ ছাড়া আহাৰশাস্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্রজীও এখানে থাকেন এবং তিনিই হচ্ছেন বাপু-আশ্রমের বর্তমান পরিচালক। কৃষ্ণচন্দ্রজী উত্তর প্রদেশবাসী। এম-এ’তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করা ছাড়া পরে ইনি একাধিক বিষয়ে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতবর্ষে এঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যায়। বাপুর কুটিরে প্রবেশের আগে ছোট ছোট হুড়িতে ভরা প্রার্থনা-ভূমি পার হতে হয়। কাঠের যে ছোট্ট মঞ্চটির উপর বসে গান্ধীজী প্রার্থনা করতেন এবং প্রার্থনাস্তিক ভাষণ দিতেন, সেটি সেই অবস্থাতেই রাখা রয়েছে। গান্ধীজীর কুটিরের মেঝে সিমেন্টের এবং দেয়াল মাটি ও বাঁশের তৈরি। এই ছোট্ট এবং অতি সাদাসিধে ঘরে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব থাকতেন এ কথা ভাবতেই বিস্ময় বোধ হয়। কুটিরের ঢুকতেই প্রথমে ছোট্ট এক ফালি বারান্দা এবং তার পর গান্ধীজীর বসবার ঘর। ঘরের এককোণে গান্ধীজীর ভ্রমণসহায়ক লাঠিটি দাঁড় করান রয়েছে। তাঁর বসবার জায়গার সামনে তাঁর খড়ম দুটি সাজান। খদ্দেরের একটি স্বল্পপরিসর তোষক পাতা রয়েছে এবং তার উপর সাদা খদ্দের চাদর। তোষকের শেষপ্রান্তে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া একটি বালিশ। গান্ধীজী এইখানে বসতেন। ডান পাশে খুলে রাখা রয়েছে তাঁর চরখা এবং তার পিছনে ছোট্ট একটি বইয়ের সেলফ। গীতা প্রভৃতি যে অল্প কয়েকখানি বই গান্ধীজী সঙ্গ-সর্বদা পড়তেন, সেগুলো সেখানে রক্ষিত আছে। সেলফের নিচের তাকে সেই বিখ্যাত জাপানী তিন বাঁদরের মূর্তি। একটির মুখে হাত—কুকথা

বলব না। অন্যটি চোখ চাপা দিয়ে আছে—কুদৃশ্য দেখব না। তৃতীয়টি কান বন্ধ করে আছে—কুকথা শুনব না। এমন ভাবে সব জিনিস রাখা আছে যে, ঘরে ঢুকলেই মনে হয় গান্ধীজী কিছুক্ষণের জন্য বুঝি বাইরে গেছেন, এখনই আবার আসবেন। মহামানবের আসন্ন আগমনের সম্ভাবনায় শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠে এবং প্রতিটি পদবিক্ষেপ হয় সতর্ক। এক ধারের দেয়ালে একটি পিচবোর্ডের উপর কাগজ এঁটে তাতে লেখা আছে রাষ্ট্রবিনোদনের অমর বাণী :

"The essence of lying is in self deception, not in words: A lie may be told by silence, by equivocation, by the accent on a syllable, by a glance of the eye, attaching a peculiar significance to a sentence, and all these lies are worse and baser by many degrees than a lie plainly worded."

গান্ধীজীর আসনের ঠিক সামনের দিকের দেয়ালে পিচবোর্ডের উপর লেখা আছে :-

"When you are not right, you can afford to keep your temper; but when you are right, you must keep your temper."

বসবার ঘরের ডান পাশে একটি বারান্দা এবং পিছনে আর একখানি ছোট কামরা। এই কামরাটিতে দুটি বাঁশের পেটি রয়েছে। এতে কস্তুরবা এবং বাপুর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকত। একটি সাদা চৌকীও রয়েছে এখানে। এটি ছিল মাতা কস্তুরবার শয়ন-কক্ষ। ডান পাশে বাপুর স্নানাগার ও পায়খানা। কয়েক বছর ধাবৎ বাপু সেপটিক ট্যাক ল্যাটরিন ব্যবহার করছিলেন। কোন ভক্তের উপহার এটি। পায়খানার পাশে একটি ছোট খোপে সাময়িক পত্রিকা থাকত। পায়খানায় গিয়ে উনি এটুকু সময়ে কোন পত্রিকা পড়তেন। এর পিছনে তেল মাখবার একটি লম্বা বেঞ্চি রয়েছে। বাপু শরীরের খুবই যত্ন নিতেন। তৈল মর্দন ও স্নান ছিল তাঁর একটি বিলাস। ঐ বেঞ্চিতে তিনি শুয়ে থাকতেন ও কেউ তাঁকে তেল মাখাত। ঘরে রোজ আসার জন্যে বাঁশের ঝাঁপ দেওয়া জানালা রয়েছে। তেল মাখার পর তিনি স্নান করতেন এই বেঞ্চিতে শুয়েই। আশ্রমে অনেকটা জমি এবং ভাল বাগান আছে। সমবায় প্রণয় এখানে চাষ হয়। আশ্রমের কর্মীদের সঙ্গে যে সব শ্রমিক এখানে কাজ করেন, উৎপন্ন ফসলে তাঁদের ও আশ্রমবাসীদের সমান অধিকার। গান্ধীজী-লিখিত এবং গান্ধীবাদ-সম্পর্কিত ইংরেজী, হিন্দী এবং মরাঠী ভাষার একটি পুস্তক-ভাণ্ডারও এখানে আছে।

এর পর রয়েছে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ। গান্ধীজী যে অহিংস শোষণবিহীন সমাজ স্থাপন করতে চান, তার বীজ হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষা। সর্বোদয় সমাজে সকলে শ্রমিক

হবে বলে তাতে শোষণের স্বযোগ থাকবে অতি কম। স্বতরাং সর্বোদয় সমাজে উপনীত হবার মাধ্যমস্বরূপ বুনিয়াদী শিক্ষায় শারীর-শ্রমের স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাশেষে ছাত্র যাতে নিজ পরিশ্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে, অর্থাৎ বাঁচবার জন্তে যাতে তাকে পরনির্ভর-শীল না হতে হয়, সেইজন্য শারীর-শ্রমের মাধ্যমে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া এর ফলে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং শিক্ষক ও ছাত্রের শ্রমে বিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা হয় বলে ভারতের মত দরিদ্র দেশে দ্রুত সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির চেয়ে শ্রেয়স্কর অন্য কোন শিক্ষা-পদ্ধতি আছে কিনা সন্দেহ।

হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের সভাপতি ছিলেন দিল্লীর জমিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়ার পরিচালক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডঃ জাকির হোসেন। বর্তমানে তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করায় কাকা কালেলকর এখন তালিমী সংঘের সভাপতি। কাকা কালেলকর মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট জননায়ক এবং শান্তিনিকেতন ও গান্ধীজীর সর্বমতী আশ্রমে তিনি অধ্যাপনা করতেন। বর্তমানে তিনি 'হিন্দুস্থানী প্রচার সভা'র সভাপতি এবং গান্ধী-সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ। তালিমী সংঘের যুগ্মসম্পাদক হচ্ছেন আর্থনায়কমজী এবং তদীয় পত্নী আশা দেবী। আর্থনায়কমজী সিংহল দেশবাসী খ্রীষ্টান। ইংলণ্ড, জার্মানী এবং আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ডিগ্রী আছে এর। অনেক দিন ইনি রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকও ছিলেন। আশা দেবী বঙ্গললনা। ইনিও শান্তিনিকেতনের অধ্যাপিকা ছিলেন। এর চেহারায় এবং আচরণে একটি স্নিগ্ধ মাতৃভাব প্রকাশ পায়। শুধু তালিমী সংঘের বাসিন্দাদেরই নয়, সেবাগ্রাম ও ওয়ার্ধার অনেকেরই ইনি মাতাজী। এঁদের দু'জনের অক্লান্ত পরিশ্রমই তালিমী সংঘের অভাবনীয় উন্নতির উৎস। এঁদের সঙ্গে আছেন শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষা ইংরেজ মহিলা মার্জোরী শাইক্স, উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পাণ্ডে গুরুজী, সেবাগ্রাম বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিচালিকা শ্রীমতী শান্তা নাকুলকর এবং আরও অনেক শিক্ষাব্রতী। আগেই বলেছি যে, সেবাগ্রামের মূল জনপদটিতে তালিমী সংঘ একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালান। বস্তুতঃ সেবাগ্রাম এবং তার আশপাশের গ্রাম কয়টিতে গঠনমূলক কাজ করবার প্রত্যক্ষ ভার নিয়েছেন তালিমী সংঘ। সেবাগ্রামের বিদ্যালয় ছাড়া

তালিমী সংঘের এলাকার ভিতর আরও একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় তালিমী সংঘের দ্বারা পরিচালিত হয়। সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রায় দেড় শত যুবক-যুবতী প্রতি বৎসর এখানে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী হবার শিক্ষা নেন; বিদ্যালয় চালাবার জন্যে কাতাই, বুনাই, কাঠের কাজ, কাগজ ও পিচবোর্ডের কাজ এবং বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র ছাড়া স্বন্দর একটি গোশালাও চলে তালিমী সংঘের পরিচালনাধীনে। এখানকার সমস্ত কাজই অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা করেন।

তালিমী সংঘে শান্তিনিকেতনের ছাপ পড়েছে গভীর ভাবে। নায়কমজী এবং আশা দেবী তো রবীন্দ্রনাথেরই হাতে গড়া। এই দু'জন ছাড়া চিত্রকলা শিক্ষাদান কার্বে শান্তিনিকেতন ফেরত আরও কয়েকজন নিযুক্ত আছেন। গান্ধীজীর অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও কবিত্বের সমন্বয় হওয়ায় তালিমী সংঘ শিক্ষার এক আদর্শ কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। তালিমী সংঘ মারফত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ভাবী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী বর্তমান বিশ্বের এই দুই যুগ-মানবের সম্মিলিত আদর্শ গ্রহণ করছেন।

১৯৪৪ সালে শেষবার স্কেল থেকে ছাড়া গেয়ে গান্ধীজী চরখা সংঘের সামনে এক নূতন কার্যক্রম পেশ করলেন। এত দিন চরখা সংঘ এবং খাদি কর্মীরা শুধু দরিদ্রদের কথঞ্চিৎ আর্থিক সহায়তা দেবার জন্যে খাদির কাজ চালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী এবার জানালেন যে, খাদির লক্ষ্য আরও উচ্চ। জীবনধারণের জন্যে অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বণ্টনের জন্যে আমাদের সমাজে শোষণ চলছে। এই কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বণ্টনের ফলে এক দল পরভ্রমজীবীর ভার বইতে হচ্ছে উৎপাদকশ্রেণী অর্থাৎ কৃষক ও মজদুরদের। এরই জন্যে আবার রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছে এবং ফলে তার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চলে গেছে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও আয়ত্তের বাইরে। ফলে আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন হয়ে গেছে মুষ্টিমেয় লোকের করায়ত্ত। উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্র-পরিচালিত হলেও এই ক্ষমতার একাধিপত্যের অবসান ঘটবে না। বরং উৎপাদন-যন্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসনযন্ত্র একই কর্তৃপক্ষের হাতে যাওয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকতর পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হবে এবং এর ফলে ক্যাসিজম বা কম্যুনিজম যে নামেই হোক না কেন, কোন-না-কোন প্রকারের একনায়কত্ব কায়ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ব্যক্তির স্বাধীনতা অধিক আত্মবিকাশের সুযোগ রাখার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় সংঘ-

শক্তিকে যদি বজায় রাখতে হয়, তাহলে স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম্য সাধারণতন্ত্র কায়ম করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়। জীবন-ধারণের উপযোগী অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদনের প্রতীক চরখা এই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়।

গান্ধীজী বেঁচে থাকতেই চরখা-সংঘের সমস্ত শক্তিকে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কর্মী তৈরি করা ও অহিংস বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রূপে তাদের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেবার কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয়। তবে ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ কাজ তেমন ভাবে এগোয় নি। গান্ধীজীর তিরোধানের পর চরখা-সংঘের সভাপতি-পদের গুরু দায়িত্বভার স্বয়ং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের উপর পড়ে, তখন এই স্বল্পপরিচিত খাদি-সেবকের যোগ্যতা সন্দেহে অনেকের মনেই স্রিধার ভাব জেগেছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণের মধ্যেই ধীরেন্দ্রাই প্রমাণ করলেন যে, তিনি চরখা সংঘ-গান্ধীজীর যোগ্য উত্তরাধিকারী। ধীরেন্দ্রাই উত্তরপ্রদেশ-প্রবাসী বাঙালী। ইনি বিখ্যাত নেত্রী শ্রীমতী সূচেতা কৃপালিনীর অগ্রজ। বেনারসে ইন্ডিয়ানিং পড়বার সময় অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তখন থেকেই গান্ধীবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। উত্তরপ্রদেশে গান্ধী-আশ্রম মারফত এ বাবৎ তিনি গঠন-মূলক কাজ চালিয়ে এসেছেন এবং সেখানে শত শত কর্মী তৈরি করে জনসেবার কাজে নিয়োগ করেছেন। বর্তমানে ধীরেন্দ্রাই সেবাগ্রামের খাদি বিদ্যালয়কে এই আদর্শের উপযুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র রূপে গড়ে তুলছেন এবং সমগ্র চরখা-সংঘে ইনি নবজীবন এনে দিয়েছেন। তিনি ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে দেশ-বাসী ও শিক্ষিত-সমাজের মনে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং বহু বৎসর গঠন-মূলক কাজে লিপ্ত থাকার কারণে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও ভ্রমোদর্শনের দ্বারা গান্ধীবাদ এবং চরখার দর্শনকে তিনি অকাট্য যুক্তি বলে প্রমাণ করেছেন। মৌলিক চিন্তাশক্তি এবং ক্ষুধার বুদ্ধির জন্যে তিনি কর্মীমহলে সমাদৃত। স্বীয় মত অকস্মাৎ বর্জন করতে সংস্কারে বাধে বলে বিরোধীরাও ধীরেন্দ্রাইকে যথেষ্ট সমীহ করেন।

চরখা-সংঘে ধীরেন্দ্রাইয়ের পর নাম করতে হয় সংঘের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদাস গান্ধীর। বাল্যকাল থেকে গান্ধীজীর কাছে মানুষ এই ক্ষীণকায় ব্যক্তিত্বের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং অপূর্ণ সংগঠনীশক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়। খাদির 'টেকনিক'ের সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন নন্দলাল ভাই। চরখা ও তাঁতের উন্নতি করা

এবং খাদিকলার উপযোগী নতুন নতুন গবেষণা করবার ভার এর উপর। সদাহাস্যময় পণ্ডিতজী খাদি বিদ্যালয়ের মূর্তিমান অনুপ্রেরণা স্বরূপ। সন্তানবৎ স্নেহে ইনি খাদি বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে অহিংস বিপ্লবের হোতা হবার শিক্ষা দেন। ছাত্রছাত্রীদের সকল কর্মের সঙ্গী ভাইজী চন্দনসিংজীর সঙ্গে একবার পরিচিত হলে তাঁকে ভোলা শক্ত। স্বমধুর ব্যবহারে সবাইকে তিনি বশ করে রেখেছেন। এ ছাড়া এখানে থাকেন ছাত্রাবাসের ব্যাপারে চন্দনসিংজীর সহকারী সং স্বভাববিশিষ্ট আত্রেজী এবং চরখা সংঘের কার্পাস-গবেষণা বিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত পুণ্যব্রত ঘোষ—এঁরা ছ'জনেই যুবক। শ্রীযুক্ত পুণ্যব্রত ঘোষ কলকাতার বাসিন্দা। ইনি নাকি বাংলার এক বিখ্যাত সাম্যবাদী দলের কর্মী ছিলেন। আত্মগোপন করে থাকার সময় শ্রীকিশোরলাল মশরু ওয়ালার সংস্পর্শে এসে গান্ধীবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অতঃপর চরখা-সংঘে যোগদান করেন। খাদি বিদ্যালয়ের কাতাই, ধুনাই এবং বুনাই ক্লাস ছাড়া কৃষিক্ষেত্রও বেশ বড়। এখানকার সংগ্রহশালাটিতে খাদি এবং তার উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ক্রমবিবর্তনের ধারাটি সুন্দর ভাবে বুঝাবার ব্যবস্থা আছে।

এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া সেবাগ্রামে কস্তুরবার নামে একটি হাসপাতালও আছে। ডাক্তারী করা গান্ধীজীর

বহু দিনের নেশা। সেই উপলক্ষে তাঁর আশ্রমে ক্রমশঃ একটি ছোটখাটো ঔষধালয় স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ ডাঃ সুনীলা নাম্নার ইহার ভার নেন। পরে এটি আরও বেড়ে যায়, এ কারণ আশ্রমে এর স্থান সংকুলান না হওয়ায় তালিমী সংঘ ও চরখা সংঘের মধ্যবর্তী মাঠে এর জন্য নতুন ঘর তৈরি হয়। বর্তমানে এখানে রোগীদের রেখেও চিকিৎসা করবার ব্যবস্থা আছে। শল্য, চিকিৎসাসহ আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এই ছোট হাসপাতালে আছে। দূরের গ্রামের বহু রোগী এখানে এসে অতি অল্পব্যয়ে চিকিৎসা করিয়ে যান। কস্তুরবা ট্রাষ্টের তরফ থেকে প্রতি বৎসর কয়েক জন মহিলা এখানে ধাত্রীবিদ্যা এবং রোগী-পরিচর্যা শেখেন। এখানকার হাসপাতালের সেবিকাদের অধ্যক্ষা হচ্ছেন বাংলাদেশের মণিদি। কস্তুরবা ট্রাষ্টের বঙ্গীয় শাখা দ্বারা প্রেরিত দু'জন বাঙালী ছাত্রীও এখানে আছেন।

সর্বশেষে পরলোকগত শেঠ যমুনালাল বাজাজের দানের কথা উল্লেখ না করলে সেবাগ্রামের প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেবাগ্রামের এই গান্ধীগ্রাম স্থাপন করবার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টাও কম কার্যকরী হয়নি। গান্ধীজীকে ওয়ার্ধাতে তিনিই আনেন। বাপু-আশ্রমের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি তাঁরই দান। বাপু-আশ্রমের অন্যান্য খরচ, চরখা-সংঘ, তালিমী সংঘ এবং কস্তুরবা হাসপাতাল স্থাপনা ও পরিচালনার পিছনে রয়েছে তাঁর অজস্র অর্থায়নকূল্য।

সুগভের উদ্দেশে

শ্রীকালিদাস রায়

বাল্যে জানিতাম প্রভু যত্ন হ'লে লোকে
যায় স্বর্গে অথবা নরকে।

তার পর জানিলাম বিজ্ঞানীরা কর,
জীবনান্তে চিরত্তরে পাইব বিলয়।

হে সুগভ, তুমি এলে নিয়ে এক নতুন বারতা,
বিশ্বাস আমার সাধে সঞ্চারিল শ্রীযুগের কথা।

আমারে বলিলে তুমি—“শেষ না হইলে কামনার,
অনুপণে একগুণে আসিতে হইবে বার বার।

আশ্রয় হ'লাম শুনি—যত্ন নাহি মোর,

হিন্ন কভু হবে না মা ধরণীর সাধে বাঁধা ডোর।

তালবাসি এ বরাহে, বার বার আসিব ত ফিরে,
পশু হই, পক্ষী হই, হই ব্যাধ পাড়ার কুটীরে।

আশ্রয় হুঃখানয় জানি এই বরা,

পাপ তাপ জরা যত্ন ভরা,

তবু এরে ভালবাসি। নাই প্রভু আমার সাধনা

জানি মোর কোন দিন যাবে না কামনা।

তোমারি লজিতে বাহা কোট জখ লাগিয়াছে প্রভু,

জানি তাহা এ পাণীর লভ্য নয় কভু।

নাই মোর নির্বোধের ভয়

হে প্রভু, অমর আমি কোন দিন পাব না বিলয়।

অনুজ্ঞাতর পথে আমি যত্নাহীন,

সর্ব জীবনের স্বাদ আমার অধীন।

আশ্রয় করোহ তুমি, তোমার নির্বোধ

তোমারি থাকুক প্রভু, চাহি নাকো শূন্যে অবসান,

চাই জীর্ণ দেহবাস তাজি নব বাস পরিধান।

মাকড়সার জাল

শ্রীমন্তকুমার চৌধুরী

চেউয়ের হুন্দ নাচতে নাচতে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এল রমলা।

এখনই মায়ের সঙ্গে দেখা। সুহাসিনী চালের কাঁকড়া বাঁহিলেন। রমলার দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার তিনি কাছে মন দিলেন। রমলার সঙ্গে কোন দিনই বনিবনাও হ'ত না সুহাসিনীর। এই বয়সে রমলার বিদ্যাপনা নিয়ে প্রায়ই স্বামীর কাছে অসুযোগ করতেন সুহাসিনী। কিন্তু কাঁকড়া পরিবেদনা। টাকার স্বাদ্য রাধাকান্তবাবু এত ব্যস্ত যে মেরেকে মৌখিক শাসন করবার পর্য্যন্ত তাঁর সময় নেই। এদিকে চোখ থাকতে এসব বসে বসে দেখতে পারেন না সুহাসিনী। সোমস্ত মেয়ে রাত আটটা অবধি বাইরে ঘুরে বেড়াবে—সুহাসিনী এ কিছুতেই সহ্যে পারেন না। কলে অরু হর মা-মেয়েতে বাগ্‌বুজ। আর শেষকালে মেয়ের বুকের ভেতরে ভেসে যান সুহাসিনী—বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকতে হয়। তা হাজা আর উপায় কি। মেয়ে এখন রীতিমত বড় হয়েছে, তার স্বাধীন মতামত গড়ে উঠেছে—মা'র চোখরাঙানি আর গলা-কাঁপানো শাসন এখন মানতে চাইবে কেন রমলা? বি-এ পাস করিয়ে মেয়েকে বহুদল চলাফেরার সুযোগ তো তাঁরাই করে দিয়েছেন—তাঁরাই রমলাকে সুযোগ দিয়েছেন মুক্তপক্ষ বিহিনিনীর মতো আকাশে লগ্নু ফুড়ির পাখা মেলে দিয়ে উড়ে বেড়াবার। সুতরাং এখন রাশ টাঙলে দড়ি কাটা যাবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই লজ্জা হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন সুহাসিনী।

অন্য দিন হলে হাতের ত্যানিটি ব্যাগটা মা'র চোখের সামনে দোলাতে দোলাতে গট গট করে লোজা চলে যেত রমলা। কিন্তু আজ মাকে নিজের আনন্দের তাগতুই না দিলে আর চলছে না।

“মা, আমার চাকরি হয়েছে।” হাউই বাজির মতো হসু করে ধুশীতে যেন আকাশে বিচ্ছুরিত হ'ল রমলা।

“কোথায়? সিনেমা কোম্পানীতে? পর্দার আড়ালের গানের চাকরি?” ধ্রু-ব্যাক্ গানকে সুহাসিনী বলতেন পর্দার আড়ালের গান।

“বাঃ রে, সিনেমাতো আবার মাস মাইনের চাকরি হয় মাকি? এ আপিসের কাজ—রোজ দশটা পাঁচটা।”

“সরকারী আপিসে?” সুহাসিনী মুখ না তুলেই ডিক্লেস করলেন।

“ষ্টিক সরকারী আপিসে নয়, তবে প্রায় আপিসের মতোই সব কার্যদা-কাহ্ন। মারকেলডাঙাতে মস্ত বড় পটারির

কারখানা। মজুমদার সাহেব এ কারখানার ম্যানেজার—তাঁরাই আপিসে কাজ...”

“কে মজুমদার সাহেব?” সুহাসিনীর সুরে সেই প্রশ্নো নক্সা ও সম্ভেহ।

“ও, তোমাকে বলি নি বুঝি?” আজ আর মাকে চটাবে না রমলা। একগাল হেসে বললে, “রেকর্ড কোম্পানীর অমরেশবাবুর বিশেষ বন্ধু হলেন মজুমদার সাহেব। অমরেশবাবুর সুপারিশেই কাজটা হয়েছে। কাল থেকেই বেতে হবে।” একটু থেমে আবার বললে রমলা “তোমাকে বলি নি মা—আজকালকার দিনে পাঁচটা লোকের সঙ্গে চেনাশোনা না থাকলে...” এই পর্য্যন্ত বলে তকীতে একটা টেটে তুলে চঞ্চলকণ্ঠে বললে রমলা, “বাই বাবাকে বলে আসি। কাল সকালে উঠেই তো আপিসের ভাড়া।”

রাধাকান্তবাবু পুলিশের চাকরি করে চুল পাকিয়েছেন। এক সময় বিত্তর টাকাও রোজগার করেছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। ব্রিটিশ আমলের হরস্ত লাল বোড়ার অবাধপুত্তি স্বাধীন ভারতের নরা প্রাকারে এসে রুহ হ'ল। হুমড়ি খেয়ে পড়লেন রাধাকান্ত। কি একটা ঘুরের ব্যাপারে ধরা পড়ে তাঁর চাকরি গেল। স্বাধীনতার মুণ্ডপাত করতে করতে কলকাতার অজস্র চোরাপথে লক্ষ্মীর আরাধনায় মগ্ন হলেন এককালের জাঁদয়েল পুলিশ অফিসার রাধাকান্ত সিংহ রায়।

কিন্তু সৌভাগ্যবশি তখন তাঁর পশ্চিমে হেলে পড়েছে। রাধাকান্তের অবস্থা আর ফিরল না। এত বড় পরিবার নিয়ে তিনি বেশ একটুখানি বেকারদায়ই পড়ে গেলেন। কাল শনিবার। ‘রেসে’ যাবেন কি না—তাই ভাবছিলেন রাধাকান্ত। এমন সময় দমকা হাওয়ার মতো খবর চুকল রমলা। “বাবা, আমার চাকরি হয়েছে।” রমলা ধুশীতে টলমল করছে।

চোখ থেকে চশমা টেনে নিয়ে প্রসন্ন মুখে ভাকালেন রাধাকান্ত।

“কোন আপিসে?” রাধাকান্ত ধুশি হয়ে উঠবার একটা দৃঢ় ভিত্তি বুঁজছেন—যেন হঠাৎ তার আশা আনন্দ মিথ্যে না হয়ে যায়—আবার যেন তাঁকে লাল ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আচমকা মাটিতে গড়াগড়ি না যেতে হয়।

“সেই যে মজুমদার সাহেবের কথা তোমাকে বলেছিলাম—অমরেশবাবুর বন্ধু। মারকেলডাঙার এক গ্রাম ফ্যাটীর ম্যানেজার। তাঁরাই পাল-মাল এসিস্ট্যান্ট...” উচ্ছ্বাসের

বাগ্পে রমলার কথা জড়িয়ে আসছিল—যেন দিগ্বিজয় করে এসেছে রমলা।

রাধাকান্তবাবু জীবনে টাকাটাই বড় করে চিনেছেন—তাই কড়িয়ে হিসেব করে তবে তিনি খুশী হতে চান। নিশ্চিত ভরসা পাবার উদ্দেশ্যে রাধাকান্ত জিজ্ঞেস করলেন “কত করে দেবে?”

“তা আর কে জিজ্ঞেস করতে গেছে।”

বাবার এই অতিরিক্ত হিসেবিপনার মনে মনে তীষণ ক্ষুব্ধ হ’ল রমলা। কোথায় বাবা খুশী হয়ে ছুটো ভাল কথা বলবেন, না শুধু খুট্টিয়ে কেরা আর কেরা। রমলার আনন্দের উল্লসিত উচ্ছ্বাস-ভরদের সঙ্গে ভাল দিয়ে চলতে পারছেন না রাধাকান্ত।

“ধাক পে—এই বাজারে চাকরি হয়েছে তাই ধেপেট। কম করে হলেও অন্ততঃ শ’বানেক টাকা নিশ্চয়ই দেবে।” নিজের সঙ্গে সন্ধি করলেন রাধাকান্ত। চশমা কোঁড়া চোখে এটে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ডাকলেন ছোটকু—বাজারের থলিটা নিয়ে আর তো মা।”

ছোটকু রাধাকান্তবাবুর ছোট মেয়ে। বাবাকে এই অসময়ে ব্যাগের ভাঙা ভাঙা দিতে দেখে রমলা জিজ্ঞেস করলে, “এখন তুমি আবার বাজারে যাবে নাকি বাবা?”

“তাই যাব ভাবছি। যা হউক কিছু নিয়ে আসি। সেই নারকেলভাঙার আপিস। তোকে যে সকাল আটটার মধ্যেই ধেরে ধেরে আপিস বেরুতে হবে রমলা। এত সকালে বাজারের পর আর রান্না হয়ে উঠবে না।”

রাধাকান্তবাবু বাজারে বাবার জন্যে তৈরি হলেন।

ছোটকু ব্যাগ নিয়ে নাচতে নাচতে এলো। রমলাকে জড়িয়ে আবদারের সুরে বললে, “সেজদি তোর নাকি চাকরি হয়েছে। আমাকে ছুটো পুতুল কিনে দিবি?”

পেছন থেকে ছোট তাই বাবলু আবদার করলে, “সেজদি, আমার একটা হাওরাই সার্ট।”

মেজতাই মর্মে অনেকদিন থেকেই একটা পুরনো ক্যামেরার ভাঙা রমলার পেছনে লেগে আছে। রমলা কথা দিয়েছিল—তার আগামী গানের রেকর্ড হয়ে গেলে সেই টাকা দিয়ে মর্টুকে একটা পুরনো ক্যামেরা কিনে দেবে। এবার সুযোগ বুকে মর্টু চেপে ধরলে। সেজদির চাকরি হয়েছে—চাই কি একটা নতুন ক্যামেরাও জুটে যেতে পারে। তবে ক্যামেরা কিনবার কথা শুনলে বাবা মারমুখো হয়ে উঠবেন, তাই এখনি বক্তব্যটা সকেতেই রমলাকে বলে এসেছে মর্টু। এবারও ইমিতিয়ে বললে, “সেজদি—সেই যে দেবে বলেছিলে। মনে আছে?”

“হ্যাঁ-হ্যাঁ,—খুব মনে আছে। বাকি যা দেব বলেছি—সবাইকে তা দেব। তবে তো কাল থেকে চাকরি। এক

মাস সবুর কর—মাইনে পাই—তবে তো কেনাকাটা করব। এত ব্যস্ত কেন?”

তুলতুল সব হাঁটতে শিখেছে। রমলার নতুন চাকরি পাওয়ার সংবাদ তার শিশুচেতনায়ও যেন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সে রমলাকে বেঠেন করে আধো আধো সুরে বললে, “সেজদি—আমার বিছুট কিনে দিবি?” রমলা তাকে বুক জড়িয়ে নিয়ে আদর করে বলে, “এই দেখ—তোর জন্যে কত কি কিনে নিয়ে এলাম।” কয়েকটা লেজের তুলতুলের হাতে জুড়ে দেয় রমলা।

রমলার চাকরির খবরে সারা বাড়ী জুড়ে খানিকক্ষণ এই চমক ও চাকল্যের আলোড়ন চলল। ছোট তাইবোনরা লম্বু আনন্দের হাওয়ার ছলতে গুরু করলে। এই করনার কেনোচ্ছ্বাস হরত আরও কিছুক্ষণ আবর্তিত হ’ত যদি না মাঝখান থেকে সুহাসিনী এসে এদের রঙীন দেশার ঘোর ভাঙিয়ে দিতেন।

এই ছেলেমেয়েরা—এত টেচামেচি, হটগোল কিসের? কি হয়েছে তুমি?

আকস্মিক যেন বজ্রনির্ধোষ স্তমভে পাওয়া গেল। মার’র ক্রন্দসুর্ভি দেখে বড়রা বুঝিমানের মত গা-ঢাকা দিল। ছোটকু সবাব আহরে। সে শুধু বলতে গেল, “মা, সেজদির চাকরি হয়েছে, আমার পুতুল কিনে দেবে বলেছে।”

“তবে আর কি। এবার থেকে তুমি বেই বেই করে নাচতে শুরু কর।” সুহাসিনী ধমক দিয়ে উঠলেন।

মার’র কাছ থেকে এ ধরনের কটুক্তি কোনদিন শোনেনি ছোটকু। বেচারী লজ্জায়, কোঁড়ে, হুঃখে কেঁদে কেলল। সুহাসিনী তবু নরম হলেন না। আরও কড়া সুরে বললেন, “ধাক—আর প্যান্ প্যান্ করে কাঁদতে হবে না। যাও—হুঃ ধেরে পড়তে বস গে।”

মার’র এই অতিরিক্ত কঠোরতা রমলার মনে হ’চের মত বি’ষতে লাগল। মনে হ’ল—সুহাসিনী যেন ইচ্ছে করেই তাকে অপমান করার জন্যে তাইবোমদের কলোচ্ছ্বাস ঘামিয়ে দিলেন। রমলাও চুপ করে যাওয়ার মত মেয়ে নয়। মার’র সঙ্গে খিটখিট তার মিতাই লেগে আছে। তার টোটেটা জবাব দেবার জন্যে নড়ে উঠল। কিন্তু অনেক বিবেচনা করে সংযত হ’ল রমলা। প্রথম চাকরির মুখেই একটা কুৎসিত খগড়ার অবতারণা করা সঙ্গত হবে না তবে সে চুপ করে রইল। নিজে মনে মনে রাগের জ্বালায় উত্তপ্ত হতে লাগল রমলা। ধাক—আজকের দিন সে চুপ করেই থাকবে।

বাকা চোখে রমলার দিকে তাকিয়ে সুহাসিনী বললেন, “এতদিন বোরাহুরি করে চাকরি যাও-বা একটা ছুটল—ভাও আবার মুলুক জড়িয়ে—একেবারে নারকেলভাঙার—যেজ

আলতেই ত প্রাণান্ত। আমাদের বরাতেই এমনি—চাকের দারেই মনসা বিকোর।”

আর সহ হ'ল না রমলার। বাধা মানল না সংঘের শাসন। রমলার সারা দেহে কে যেম আঙনের হলুকা ছুঁতে মারছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রমলা বজ্রের দিগে উঠল, “তোমার জ্বিবে হবে বলে কেউ ত আর বাজীর পাশে আপিস বানিয়ে আমাকে চাকরিতে ডেকে মেবে না না। চাকরি করতে হলে, যেখানে চাকরি খালি থাকে সেখানেই কাজ নিতে হবে। আর লোক যেখানে টালিগঞ্জ থেকে টালা পর্যন্ত টানাপোড়েন করতে পারছে, সেখানে তবানীপুর থেকে মারকৈলডাঙ্গা কি আর এমন ম'শ নিরানবই মাইল দূর শুনি? ও, পরের চাকরি করতে গেলে অত বাহুবিচার চলে না না।”

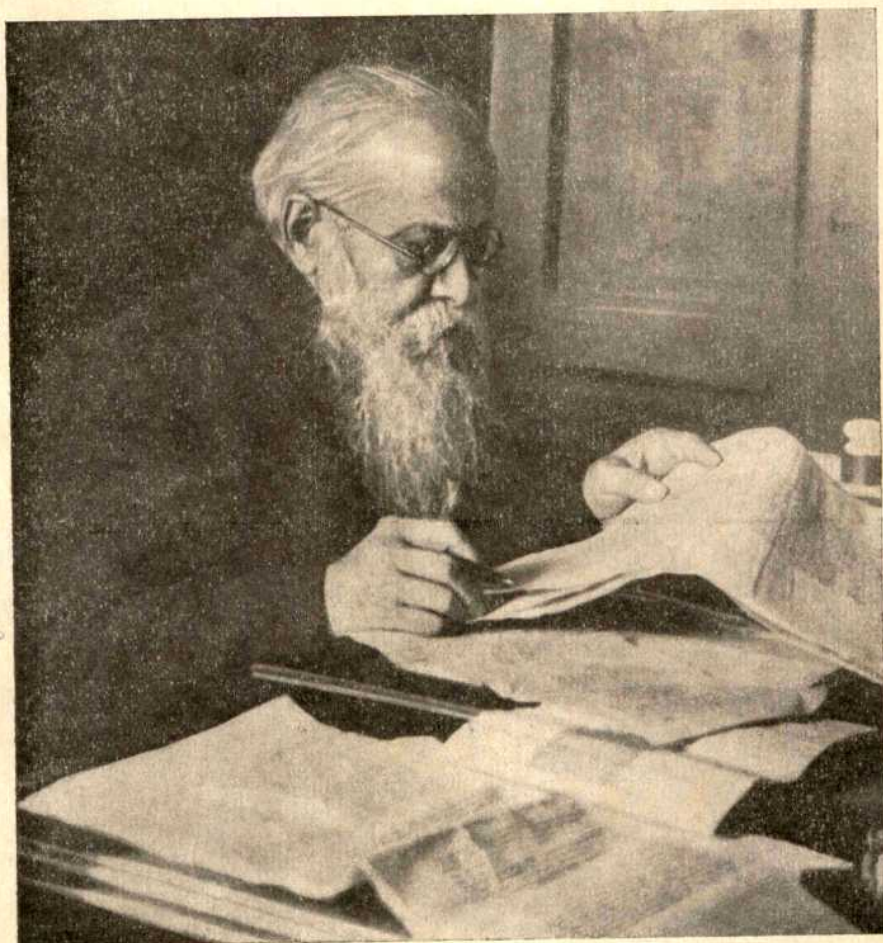
এই বলে কথায় বাপটা মেরে ক্রত বর থেকে বেরিয়ে গেল রমলা।

বিহানার গুরে চট করে ঘুম আসছিল না রমলার। কাল থেকে শুরু হবে দশটা-পাঁচটার জীবন—সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। অচেনা লোক—কতখানি খাপ খাইয়ে চলতে পারবে তাই বা কে জানে। যে বিদ্যাপনার জন্ত আত্মবিক্রম, বিশেষ করে মার অক্স বাকা কথা তাকে শুনে হেরেছিল অহনিশ—আজ সেই কলকের দাগ করতীকা হয়ে উঠেছে তার জীবনে—তাকে জীবনে বনির্ভর হতে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি। মাসান্তে মাইনের টাকটা যখন মার হাতে তুলে দেবে রমলা—মার তবনকার মনোভাব ও মুখের প্রসন্ন দীপ্তি কল্পনা করে একটা কৌতুকমিশ্রিত আনন্দ অশ্রুতব করলে রমলা। টাকার জোহুসে সেদিন আপনা থেকেই ঢাকা পড়ে যাবে রমলার সব অপযশ। মধ্যবিত্ত পরিবারের অঙ্ককার মরকুতে টাকার চেয়ে বড় বড়, বড় সহায়ক, বড় আশীর্বাদ আর কিছু নেই। রমলা তা জানত—আর জানত বলেই সকলের কাণাছুয়া, প্রকাত বা প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞপ উপেক্ষা করে সকলের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করত রমলা। আর তারই ফলে নিজের কোরেই সে এই চাকরিটা জোটাতে পেরেছে—আজ তার বিরুদ্ধে সকল নিন্দা কটুজি মাথার ভূষণ হয়ে দেখা দিয়েছে সকলের কাছে।

কালকের রুটিনটা মনে মনে ঠিক করে দিল রমলা। সকালে চটীর মধ্যেই তাকে আপিস বেরুতে হবে। সুতরাং আগের দিনের এন্গেজমেন্টগুলো সব ওলটপালট হয়ে যাবে। কোথায় কোথায় তার সব দেখা করবার কথা ছিল?...রমলা মনে মনে হাতড়াতে লাগল—আগামী কালের হুটী। ‘হুনলাইট পিকচানের’ একটি ছবিতে প্লে-ব্যাক গানের জন্ত তার পাওনা টাকা অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। তাগিদ দিলে মেঘবহল মালিক এক গাল হেসে বলেন, “অবস্থা ত নিজের চোখেই দেখছি দিদি; হাতে আমার টাকের

তাড়া এক আমার বাড়তি একটি আধলাও নেই।...দেব... দেব...কাউকে নিরাশ করব না, ছবিটা একবার রিলিজ হোক...এদিনই যখন সবুর করলে তখন আর ক'টা দিন...” অদ্ভুত লোক এই কানাইবাবু। কথার যেন মনু বঁরে। কাল দুপুরে একবার আপিসে দেখা করবার জন্ত বলে দিয়েছিলেন কানাই বাবু। বোধ হয় কাল হাত উপুড় করতেন। কিন্তু রমলার ত আর কাল যাওয়া হবে না। অবিভি বাবাকে এ কথা জানায় নি রমলা। এই সব সিনেমাওয়ারার উপর রাধা-কান্তবাবু হাতে চটা। তবু কিছু বাড়তি রোজগার হবে বলে রমলার প্লে-ব্যাক গানের দেখাকে তিনি বরং প্রত্নরই দিয়েছিলেন। কিন্তু রেকর্ড-সিনেমা লাইনে ক'বছর বোরাঘুরি করেও যখন আশাহরুপ টাকার মুখ দেখলে না রমলা তখন রাধাকান্তবাবুর উদ্বা প্রকাশ পেল। বিরক্তির সুরে বলেন, “তোকে তো আগেই বলেছিলাম রয়, ও সব সিনেমা-ঘুরদের কাছে আর খাবি নে। পাওনা টাকা দেবার নাম নেই, তবু বাকুফটাই।” চূপ করে থাকে রমলা। বাবা সহজে তার স্বাধীন ইচ্ছার বাধা দেয় না। সব কিছুকেই টাকার কটীপাথরে ঘাচাই করে নেন রাধাকান্তবাবু। আর্ট-কোর্টের দার বারেন না তিনি। শিল্পীর গালতরা নামের চেয়ে অর্থের ফুলঝুরির আকর্ষণ তার কাছে অনেক বেশি।...হঠাৎ মনে পড়ল রমলার—কাল বিকেলে উৎপল আসবে। তাকে না পেয়ে খুবই মর্মান্ত হতে হবে উৎপল। হঠাৎ ইনিরে-বিনিরে চিঠি লিখবে, না হয় দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেবে অনেক দিনের জন্য। শিল্পীরা সাধারণতঃ অতিমানী আর স্পর্শকাতর হয়েই থাকে। কিন্তু উৎপলের ভালবাসা যেন তাকে সর্বকণ সব দিক থেকেই ঘিরে রাখতে চায়, গভীর করতে চায়। তাই এক দিন সমরে রমলার দেখা না পেলেই অদর-সমুজ আলোড়িত হয়ে উঠে।...মাকে লুকিয়ে কাল দুপুরে তাদের একটি বিলিতি ছবি দেখতে বাবার কথা ছিল, উৎপল টিকেট কিনে একেবারে বাবার জন্তে তৈরি হয়েই আসবে। কিন্তু সে তো আর আগেভাগেই চাকরির খবর জানত না। কিন্তু এবার যদি এ নিয়ে কোম বাড়াবাড়ি করে উৎপল তবে রমলা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেবে...এ বরণের মিইয়ে পড়া, যেয়েদী পুরুষদের অন্তর থেকে ঘৃণা করে রমলা...

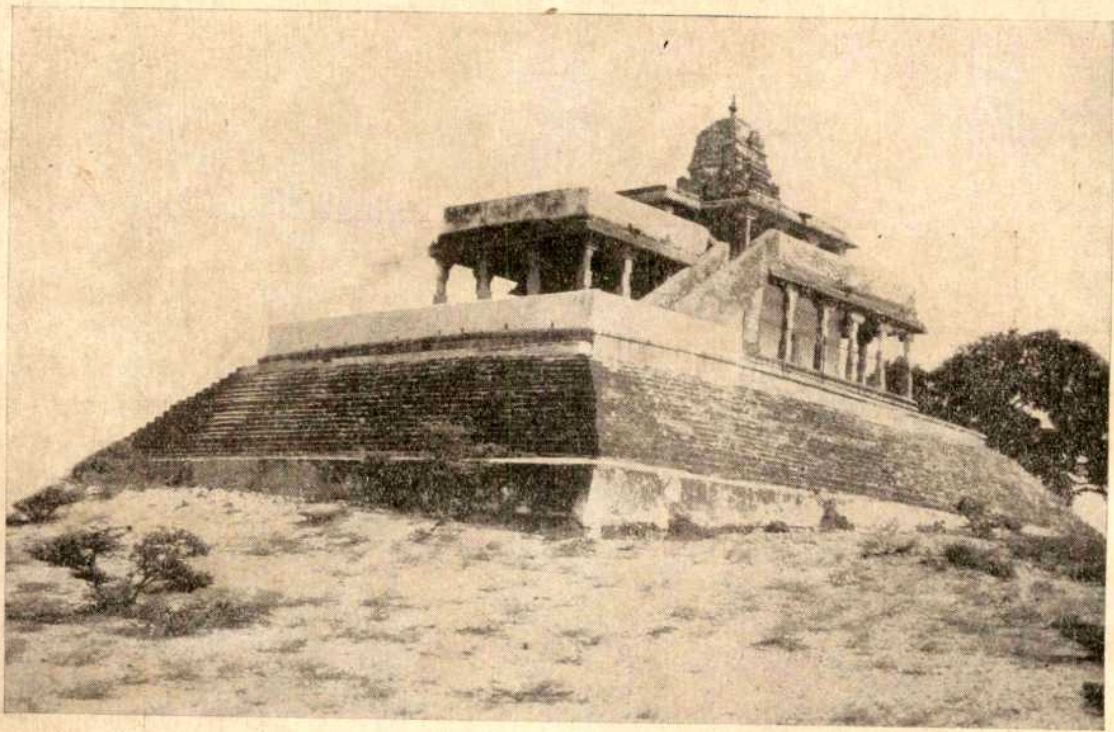
চোখ দুটো তার মনু আবেশে জড়িয়ে আসছিল। রমলার মনে হ'ল—এক দিন তার মনের যুত্রে-উৎপলের যে ছায়া পড়েছিল ক্রমশঃ তা যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। উৎপলের অনুরোধ এড়াতে না পেয়ে আজও তার সঙ্গে রমলা রেস্তোর। আর সিনেমার ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু হ'বছর আগের সে আবেগ ও উদ্বাসনা, সে অন্তর-মাধুর্য—সব বেদ আজ ভুল, অকিংকর হয়ে গেছে রমলার কাছে...।



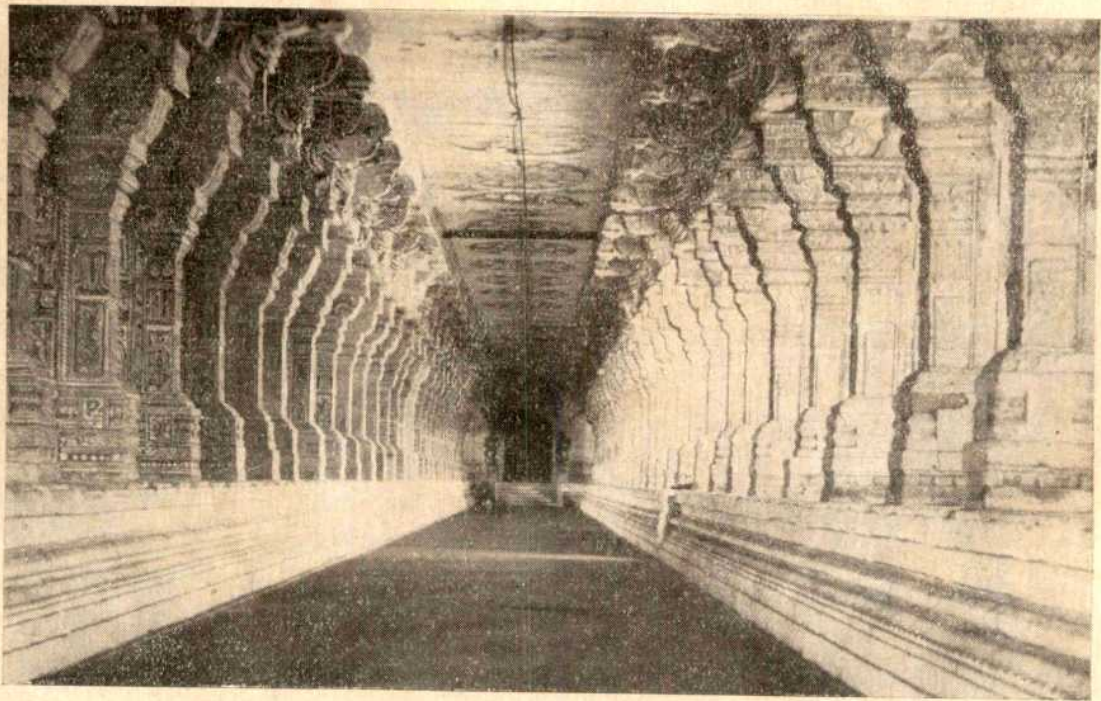
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম, মে ১৮৬৫

মৃত্যু, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩



রামগরকা—রামেশ্বর



রামেশ্বর মন্দিরের অভ্যন্তরে কারুকার্যময় দালান

ঘটনা ও ঘটনা মিলিয়ে রমলাকে ঘিরে যে সুখরোচক কুংসা-কল্পনার বনিয়াদ পড়ে উঠেছিল, রমলার এক আশাতেই তা ধুলিসাং হয়ে গেল। শত্রুপক্ষ এবং বিরুদ্ধবাদী আত্মীয়-দের মুখে ছাই দিয়ে রমলা সপোয়বে ভ্যানিটি ব্যাগ হুলিয়ে আপিসে বেরুতে আরম্ভ করলে। চাকুরিতে বহাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেড়শ টাকা মাইনে—তা ছাড়া কাজ দেখাতে পারলে তবু তবু করে উপরে উঠে যাবার সিঁড়ি ও তার সামনে বোলাই রয়েছে। রূপ-বোবন ও বিদ্যার অহঙ্কারে পরবিণী রমলা আর্থিক স্বীকৃতি লাভ করে বিজয়িনী হয়ে উঠল। এই সাকল্যে সবচেয়ে বেশী খুশী হলেন রমলার বাবা রাধাকান্ত বাবু। খুব চাপা লোক, তবু খুশীর উদ্ভেজনা তিনিও চেপে রাখতে পারলেন না। সুহাসিনী চা দিগে চলে যাচ্ছিলেন, রাধাকান্ত বাবু ডেকে বললেন, “শোন—এবার হ’ল তো। রমুর চলাকেরা নিয়ে রোজ যে চেষ্টাযেচি করতে... এবার। এবার মাইনের টাকাগুলো কার ধরে আসবে তুমি?” সুহাসিনী শাওকপটে জবাব দেন, “তা না হয় হ’চার দিন টাকাকড়ির সুবিধেই হ’ল। কিন্তু যেহেতু তোমার চিরকাল চাকরি করে কাটাবে না। আজ হোক—কাল হোক বিয়ে তোমাকে দিজেই হবে। তখন দেখো—কত কথা ওঠে যেহেতু চাল-চলন নিয়ে।”

রাধাকান্তবাবু বাঁকা হেসে বললেন, “রমুর জন্ত এখনও আমাদের পাজি ঝোগাড় করে আনতে হবে? এখনও পাজি-পক্ষ এসে দরকষাকষি করে, যেহেতু রঙ দেখে, চুল টেনে, হাঁটা পরখ করে তবে মেয়ে ধরে নেবে?” রাধাকান্তবাবু শব্দ করে হেসে উঠলেন।

“এটা আমাদের সেই পুরনো কাল নয়। রমুর বিয়ের জন্ত তোমাকে—আমাকে, কাউকে ভাবতে হবে না। রমু নিজের বর নিজেই জুটিয়ে নেবে—তুমি ঠিক দেখে নিও।”

মাস দুয়েকের মধ্যেই সারা আপিসে অভিশয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রমলা। মজুমদার সাহেবের দেকনজের পক্ষেই নুতন তরুণী টাইপিস্ট—এই নিয়ে কেরানীমহলে চাপা কানাঘুসা, হাসি-ঠাট্টা আর রহস্যলাপের অন্ত নেই। তার হ’চারটে বুচেরা মন্তব্য ছিটকে রমলার কানেও এসেছে—কিন্তু সে তা গ্রাহ্য করে নি। স্বভাবচরিত্র নিয়ে নিন্দা আর বক্রোক্তি তার গা-নওয়া হয়ে গেছে।

রামলোচন ভরকদার এই আপিসের সব চাইতে মাওকর কেরানী। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—কিন্তু মনটা কাঁচা—রসে ভুবুভুবু। সবাই তাকে বড়দা বলে ডাকে। সকলের সকল অসুবিধার বড়দার পরামর্শ অপরিহার্য। আর সাহায্য কেউ না চাইলেও তিনি যেচে সাহায্য দিতে কোন দিন কুণ্ঠিত নন। সব সময়েই হাসিখুশী—হাতে পায়ের ডিবে। এক-রাশ

করে পান খান, আর বন বন মজ দেন। আপিসের নাতী-নকল তার কান—তাই বড়দাকে কারো না কারো সব সময়েই প্রয়োজন।

সেদিন বড়দা নিজে থেকেই বললেন রমলাকে, “দিদি, তোমার বরাত খুব ভাল। হু’দিনেই মজুমদার সাহেবের চোখে পড়ে গেছে। তোমার কাজ দেখে তারি খুশি। কাল তোমার কথাই আলাপ হচ্ছিল...” এই বলে একগুচ্ছের পান নিজের মুখে ঠেলে দিলেন বড়দা।

রমলা চট করে কি জবাব দেবে ভেবে পেলেন না। তবু বললে, “ভুলচুক যদি কিছু হয় আপনি শুধরে দেবেন বড়দা।”

হাঁ হা করে হেসে উঠলেন বড়দা, “বল কি দিদি—একি তোমার বলবার অপেক্ষার আছি। যখনই যার কোন কিছুতে বাধা ঠেকবে, তোমাদের এই বড়দাকে ঠিক তখনই পালে দেখতে পাবে দিদি।” এই বলে খুব জোরে এক টিপ্ মজ দিলেন বড়দা।

এমন সময় মজুমদার সাহেবের বর থেকে রমলার ডাক এল।

ছোকরা কেরানী প্রিয়ভোষ ক’দিন থেকেই রমলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাতা না পেয়ে সে-ই রমলার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইহানীৎ। রমলা চলে যেতেই বড়দার দিকে ইশারা করে চাপা-গলায় বললে প্রিয়ভোষ, “ব্যাপার কি বড়দা—সাহেবের বর থেকে যে খুব বন বন ডাক আসছে। জমে উঠতে আর দেহি নেই।”

পাল্পের চেয়ার থেকে আর একজন টিগনি কাটল, কতই ত দেখলাম দাদা। ও জমতেও দেহি হয় না, আবার গলে যেতেও বেশী সময় লাগে না।”

বড়দা ক্রিমি শাসনের সুরে বমকে উঠলেন, “বড়কড়া, ছোটকড়ার কেছা নিয়ে তোমাদের কে বাধা খাওয়াতে বলছে অবিকারী। নিজের চরখার ভেল দাও গে—পঁচাত্তর টাকার কেরানীকে আর স্বপন দেখতে হবে না।”

“বহুন”—গভীরভাবে মজুমদারসাহেব রমলাকে বললেন।

এর আগে মজুমদারসাহেব কোন দিন তাকে খাতির করে বসতে বলেন নি। কাজের জন্ত ডেকেছেন—কাজ বুঝে নিয়ে সে চলে এসেছে। একটু ইভুভুভু করে, কুণ্ঠিতভাবে সামনের চেয়ারটার বসে পড়ল রমলা। বুকাটা তার হুক হুক করছে। কি বলবেন মজুমদারসাহেব—হরতো বলবেন তাকে দিয়ে কাজ ঠিকমত চলছে না। সুতরাং তাকে আর রাখতে পারলেন না বলে তিনি হুঃবিভ।...কিন্তু আশ্চর্য, আপিসের কোন কথাই পাড়লেন না মজুমদারসাহেব।

“আজ আপিসের পর একবার আমাদের ওদিকে যেতে

পারবেন মিস্ সাতাল?" খুব ঘোলাধেম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মজুমদারসাহেব।

প্রশ্নটার পূর্ণ ভাৎপর্ষা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে রমলা।

বুহু হাসি টেনে ব্যাখ্যার তদীক্বে মজুমদারসাহেব বললেন, "আপনি রেকর্ডে গান-টান করেন—সে খবর কেমন করে জানি না বৌদির কানে উঠেছে। ভাই আজ বলছিলেন, একদিন মিরে এসো না ভোমাদের আপিসের সেই তক্ত-মহিলাকে, চেমা-পরিচরও হবে, গানও শোনা হবে। বৌদি বেচারী চিরকরা, ভাই হুঁদও কারো সঙ্গে কথা কইতে পারলে যেন বর্ডে যায়। তা যাবেন আজ?"

এর পর 'না' বলতে পারে এমন কঠোর এখমও হতে পারে নি রমলা। বললে, "তা আপনার ওখানে যাব—তাতে আর অসুবিধে কি?"

"ঠিক আছে। আপনি আমার পাড়ীতেই যাবেন। নইলে একা গেলে আমার বাতী বোঁজার হালাল পোতাতে হবে। হুঁদ তো বড় কম নয়।"

রমলা উঠতে ছাড়িল, মজুমদারসাহেব বাধা দিয়ে বললেন, "বহু না, বহু না।"

বেচারী এরই মধ্যে চা ও খাবার দিয়ে গেল। "তা আজ-কাল গান কি একেবারেই ছেড়ে দিলেন?" এক মুখ কুণ্ডলী-কৃত বোঁরা ছেড়ে জিজ্ঞেস করলেন মজুমদার।

"রেকর্ডের দিকে লোকের আর ভেমন ঝোক নেই আগের মত। ভাই ওঁরা খুব নাম-করা পাইয়ে ছাড়া বড় একটা কাকুর গান রেকর্ড করতে চান না।" কুণ্ঠিত ভাবে জবাব দিলে রমলা।

"কিন্তু সিনেমা"—জুকে নিলেন মজুমদার, "সিনেমা ত আজকাল ভাল টাকা দিচ্ছে মিস্ সাতাল।"

"তা দিচ্ছে। হুঁ একটা কোম্পানীতে প্লে-ব্যাক গেয়েও ছিলাম। কিন্তু সব জারপাতেই আজকাল বরাবরির ব্যাপার।।।"

"বলেন কি মিস্ সাতাল"—উত্তেজনার সোজা হয়ে বললেন মজুমদারসাহেব, "আপনার মত টেলিষ্টকেও গান দেবার জ্ঞে করে না কারো মাসতুতো কি পিসতুতো বোন হতে হবে? নো-মেন্টার। হাঁড়ান—জনাক্যেক মিউজিক ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার বিশেষ জানাশোনা আছে। আমি তাঁদের বলে আপনার প্লে-ব্যাক গানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এমন গলা... অবশ্য গান সম্বন্ধে আমার মতামতের মূল্য কতটুকু আমি জানি—কিন্তু অমরেশ্বর মুখে আপনার গান সম্পর্কে যা শুনেছি... এমন প্রতিভা শুধু সুযোগের অভাবে ছাইচাপা থাকবে—এটা খুবই ভাড়া মিস্ সাতাল...এত বড় অজার আমি দৃষ্টিতে দেখ না।।।"

এর জবাবে রমলার সারা অস্তর কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বলে আগ্রুত হয়ে উঠল। টেলিফোন বাজছে। কোন ঘরে রমলাকে উদ্দেশ করে মজুমদারসাহেব বললেন, "আচ্ছা, তবে ঐ কথাই রইলো মিস্ সাতাল।"

রমলার জীবনে নেমে এলো সমারোহের একটা নুতন জোয়ার—সে উত্তীর্ণ হ'ল অভ্যর্থনার এক নব পর্য্যায়ে। আপিসে, পরিজন এবং সহকর্মীদের কাছে আজ রমলার কত কদর। এর মধ্যে হুঁহুটো ছবিত্তে প্লে-ব্যাক গান করে এসেছে রমলা। প্রতিষ্ঠা এবং ঐখ্যের বর্ণদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে তার সামনে।

দামী স্বস্তি, কলম আর সিকের কামা কাপড়ের জোড়সে আজকাল আর চেমাই যায় না রমলাকে। সুহাসিনী মেয়েদের 'টাইল' করা মোটেই পছন্দ করেন না, কিন্তু রমলার সঙ্গে কথা বলবার সাহস তাঁর আর নেই। রাবাকান্তবাবু এখন হিসেবী হয়েছেন অবস্থার চাপে পড়ে—কিন্তু মাসান্তে ষ্টিক দেখশ' টাকাই তাঁর হাতে তুলে দেয় রমলা। সুতরাং মেয়ের বিলাস-ব্যসনের খরচ কে জোগাচ্ছে তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেন না।

আর বেচারী উৎপল। রমলার বিকীর্ণ জীবন-সমারোহের মাঝে সে যে কোথার হারিয়ে গেছে—কেই বা তার বোঁজ রাখে। উৎপলের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে মিহিপুরে প্রেমালাপ করবার সময় নেই রমলার।

তার জীবনে এসেছে নুতন বর্ণবৈচিত্র্য—জুগেজে নুতন প্রাণের স্ফুটি।

হঠাৎ সেদিন ট্রাকের তলা থেকে একখানা কটো বেরিয়ে পড়ল। নিজের অজান্তারাই কটো দেখে চমকে উঠল রমলা। রমলা ও উৎপলের একজুে তোলা কটো—কোন এক ভাব-নিবিড়, হুঁকল মুহুর্তের পাপল্যামি। অতীতের হারিয়ে-বাওয়া স্মৃতি ভিড় করে এল তার মনের গহনে। কিন্তু স্মৃতির উৎসকে জোর করে চাপা দিলে রমলা। হাসির বক্সিম, রেখা কুটল তার মুখে। এককালে কি বোকাই না ছিল রমলা। উৎপল তার হাতে হাত রেখে বলেছিল, "বলো, কোনদিন তুমি আমাকে ভুলবে না।"

রমলা মজুমদারের মত জবাব দিবেছিল, "না, ভুলব না।"

"আর কোথাও যদি বিয়ে হয় তবুও না।"

"না—কোনদিনও না।"

অকস্মাৎ আপন মনেই বিল বিল করে হেসে উঠল রমলা। কি হেলেমাহুয়ের মতোই না উৎপলের কাছে নিজের মনকে বিলিয়ে দিয়েছিল সে। আজ সে সব পুরনো কথা মনে পড়লে অপরিণীত লক্ষ্য তার মাথা হেঁট হয়ে আসে। ওমা—পাঁচটা

সাধারণ মানুষ

শ্রীতপতী গোস্বামী

কলকাতার বাইরে কুমাই যাওয়া ঘটে, তবু একদিন সুযোগ পেয়েছিলাম। হাতে একটি ক্যামেরা ছিল। ক্যামেরা নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। পথে বাজার পার হতে হ'ল। এরকম জনতার মধ্যে মেয়েদের পক্ষে ছবি তোলা সহজ নয়। সন্ধ্যা ছিলেম ত্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা গোস্বামী। জায়গাটা তাঁদের পরিচিত এবং আমার অপরিচিত। সাহস করে বাজারের মধ্যেই ক্যামেরা ধূললাম।

কাছে যে আমন্দ পেল, ক্যামেরার ছবি তোলাতে যে গর্ব অনুভব করল, তার নিমিত্ত তো আমরাই। আমাদেরও আমন্দ হচ্ছিল খুব সেরে।



হাটের পথে

চলার পথে নজরে পড়ল রাস্তার ধারে বসে আপন মনে ফুরুরি তাজহে একটি জীলোক। আপন কাজে কি মিঠা! আমরা ক্যামেরা নিয়ে গেলাম তার সামনে, সে একটু অবাক হয়ে তাকাল। কি তাবল কে জানে। ওর যে একখানা ছবি তুলতে পারি তা অবশ্যই ভাবে নি। তাই সে নিজের কাজে মন দিলে। কিন্তু যখন সত্যিই তার সামনে ক্যামেরা ধরলাম তখন ধুশি ও গর্বে ফুলে উঠল। আমরাও উৎসাহিত হয়ে বাজারের মধ্যে গিয়ে অনেক ছবি তুললাম। ভাল লাগল এই সব মানুষকে। মনে হচ্ছিল যেন ওরা আমাদের



ডালহুট তাজহ রত



মাটির কুঁজো, গামলা

কেবলবার পথে দেখি ভিটমিট ছোট ছোট তাইবোন কিলের পুঁটলি নিয়ে হন্ হন্ করে ছুটে চলেছে বাজারের দিকে। তাদের দাঁড়াতে বললাম। তারা বিমিত্ত হ'ল এবং মনে

হ'ল একটু যেম বিব্রত বোধ করছে। বলা হ'ল ভোমাদের জানে। ভাই কোম ভ্রমশ্রেণীর লোক তাদের সঙ্গে বন্ধুতবে ভ্রমের দেওয়া হবে। তারা তাবন্তেও পারল না যে, তাদের কথা বললে বিব্রিত হয়।



ফলের বাজার



জমাদারগী

তসবিরের কি প্রয়োজন থাকতে পারে। ফুলুরি ভাজার রত বউট, রাভায় চলা ভাইবোন ভিনট, হরিজন-বোয়েরা, কুঁজো-গামলা বিক্রেতা, ফলবিক্রেতা, এদের দিকে কে বা তাকায়। এরা অতি সাধারণ মানুষ। এরা যেম নিজেদের ছোট বলেই

এ রকম একটা অহুত্ব আমার এই প্রথম। ছবি যেমনই উঠুক, ওদের সঙ্গে কিছুকণ মিশে আমরা যে আনন্দ পেয়ে-ছিলাম তার চেয়েও হয়তো বেশী ওরা আনন্দ পেয়েছে। তা হরত বা সামাজ কিছু কুটেছে ছবিতে।

অবিস্মরণীয়

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাঙ্কড়ী

বৈশাখীর আমজগে প্রকৃতির রম্য পাদপীঠে,
নৃত্য করে মটরাজ রক্ত বধা তালে।
অরণ্য-সদীতে আর বটকার যুগল বাদনে,
অভিনয়ে উল্লসিত তৃণ-পত্র লতা-গুলজালে।
নেপথ্য হইতে হয় বৃষ্টিরূপে পুষ্প বরিষণ।
বজ্রধরা পর্জন্মের প্রলম্বিকা পাঠে,
ব্যক্ত হয় বৈশাখীর স্মরণীয় ছুটি জয়ক্ষণ ॥
অবিস্মরণীয় ছুটি জয়ের মুহূর্ত;
প্রেম আর প্রজারূপে বিধে হয়েছিল সমাগত
বৈশাখের রৌদ্রদীপ্ত গৈরিক লগাটে;
জানী সিদ্ধ তারভাষা মূর্ধ তথাগত।
ত্রিহস্তে চিজিয়া গেছে আপমার জয়ের স্বাক্ষর,
প্রেম-প্রীতি-বৈরাগ্যের চন্দন তিলকে।
প্রচণ্ড মাতও ক্ষুর তুফান ভুলোকে।
আকুল অজস্র ধারে স্নিগ্ধ বারিধার,
ভুলুপ্ত হিংসার তীক্ষ্ণ তরবার
অহিংসার ক্রমাসন্ন প্রেমময় পাঠে।

আত্মতোলা সন্ন্যাসীর বিখণ্ণাবী সর্বভ্যাগী প্রেমে;
বিধাতার আশীর্বাদ প্রজারূপে মর্ন্ত্য এল মেমে।
স্মরণীয় আরও এক জন্ম-মঞ্জুষ্ম;
অমৃত নিষিক্ত আজি বৈশাখীর কৃষ্ণচূড়া বন।
আত্মকৃষ্ণে পুষ্পপুঞ্জে নিত্য ব্যক্ত হয়,
“এস কবি, ধরা মাঝে স্থপ্তি কর শান্তিনিকেতন”।
ভারতীর পদবনে স্মরণের সার্বক পুজারী;
গহন কটিল পহা দ্বিধাহীন নিঃশব্দ দিশারী
দীপ্তিমান বিবস্বান। বৈশাখের অমর অধ্যায়;
স্বাক্ষর রাধিমা গেছে অবিনাশী স্থপ্তি-প্রতিভায়।
খন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন বৈশাখীর আবৃত আননে;
বিহ্বাৎ চমকে আর ইন্দ্রনীল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে
যে সৌন্দর্য্য বস্তঃসুত অহনিশ পলকে পলকে;
সেই ত রবীন্দ্র-আত্মা, বিধাতার আশিস ধরায়।
শাখত জীবন-মজ, সিক্ত প্রেম জাহ্নবীধারায়।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব-প্রসঙ্গে শিক্ষার কথা

ত্রিহরিহর শেঠ

ভারত-সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের উদ্যোগে ভেইশটি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ভারতে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব মহাসমারোহের সহিত প্রথমে বোম্বাই এবং পর পর মাদ্রাজ, দিল্লী ও পরিশেষে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইল, মনে হয়, এত বড় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। আমেরিকার শিকাগো নগরে ১৮৯৩ সনে অনুষ্ঠিত বর্ধ-মহাসম্মেলনের কথা হাডিয়া দিলে, জগতের ইতিহাসে আর কোথাও এত বড় আন্তর্জাতিক সম্মিলন ইতিপূর্বে হইয়াছিল কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। ভারতে বড় বড় সাংস্কৃতিক সম্মিলন হইত অনেক হইয়া থাকিবে, কিন্তু এমন আন্তর্জাতিক সম্মেলন সভ্যই ইহার পূর্বে হয় নাই। এত ব্যয়ে এই যে আকর্ষণপূর্ণ সম্মেলন হইয়া গেল ইহার যথার্থ জন-কল্যাণমূলক সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই মনে প্রায় জাগে।

কি উদ্দেশ্য লইয়া কর্তৃপক্ষ এই উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা জানা না থাকিলেও, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং বিদেশাগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি মহাশয়ের ভাষণাদি হইতে ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁহাদের অনেকেরই মতে ইহার সুফল পাওয়া যাইবে, এই উৎসব নিরর্থক হয় নাই। ইহা যেমন অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক পরিচালকের নিকট, তেমনিই দর্শকদের কাছেও নূতন চিন্তা, নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দিবারও সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। বিদেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ আশা করিয়াছেন যে, এই উৎসবের মাধ্যমে তাঁহাদের দেশ ও ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইবে। কেহ বলিয়াছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প বিশ্ববাসীর মন ও সংস্কৃতির ধোঁরাক ঘোণাইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলি বিশ্বের সর্বত্র শান্তির দূত হিসাবে কার্য্য করিতেছে। আমেরিকার প্রতিনিধি আশা প্রকাশ করিয়াছেন, অদূরভবিষ্যতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক ভারতীয় চিত্র আমেরিকাবাসীদের প্রিয় হইয়া উঠিবে। তাঁহারা এইরূপ ভাসা ভাসা মন্তব্য এবং বাঙালীর হৃদয় ব্যবহার, তাহাদের আতিথেয়তার প্রশংসা অথবা চলচ্চিত্র-শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন এ ধরণের কথা কেহ কেহ কিছু বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বৈদেশিকদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানের প্রতিনিধি এই শিল্পের যথেষ্ট প্রগতি স্বীকার করিয়াও বলিয়াছেন উহার আরও কিছু করিবার আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট কাজ আছে।

আমি নিজে একদিনও এ উৎসবে যাই নাই বা এই সম্পর্কে প্রদর্শিত কোন ছবিও দেখি নাই। ইহাতে যোগ দিলেও এই

মত বুঝিলাম কিনা সন্দেহ। ভারতীয় ছবিগুলি কিভাবে বিশ্বের সর্বত্র শান্তির দূত হিসাবে কাজ করিতেছে তাহা বুঝিবার সৌভাগ্যও আমার হয় নাই। সংবাদপত্র হইতে যাহা পাইয়াছি মাত্র তাহা অবলম্বন করিয়া সেই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রী ও বয়স্কদের চলচ্চিত্র ও বেতারের মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্পর্কে আমি যেভাবে চিন্তা করিয়া থাকি তাহাই একটু আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য।

এই শিল্পের ভাল দিক ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা পূর্বোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জবানিতে ব্যক্ত হইলেও, ইহার যে একটা অল্প দিকও আছে তাহা তাঁহারা বিশেষ করিয়া বলেন নাই। প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ইহার শিল্প ও সৌন্দর্য্যাহুত্ব জাগ্রত করিবার উপর, গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও ইহার অঙ্গকার দিকটা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, এই অপরিণীত শক্তির অধিকারী শিল্পটিকে সর্বদা উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন, অল্পথা বিপদ অবশ্যস্তাবী। ইহার দ্বারা মানুষের নিম্নাভিমুখী হওয়ার আশঙ্কা তাঁহার বক্তৃতায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে এবং সেজন্য চলচ্চিত্র নির্মাণে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সচেতন থাকিতে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, মানুষকে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞানদান চলচ্চিত্রের প্রধান কর্তব্য। তিনি শিক্ষা-প্রসারে চলচ্চিত্রের প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কথা—এ বিষয়ে আমাদের দেশ বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। শিশু-শ্রেণী হইতে উচ্চস্তরের শিক্ষা-ব্যাপারে যাহাতে ইহাকে নিয়োজিত করা যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করা দরকার বলিয়া তিনি সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই শিল্পের দ্বারা কলা ও সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত করার আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করিলেও ইহা যাহাতে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত হয় তাহা করা উচিত বলিয়াছেন। এই শিল্পকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে কত কাজ হইতে পারে এবং ভূগপরিবর্তে অনেক স্থলে ইহা দ্বারা কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে বিবিধ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যেও তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে।

ইহারা সকলেই যাহাতে এই শিল্পকে শিক্ষার বাহন করিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন দ্বারা মানুষের হিতসাধন হয়, তাহাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে—চলচ্চিত্র বিলাসের বস্তু নহে, সাধারণ মানুষের জীবনে ইহা অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং এই শিল্পের যে একটা শিক্ষার দিক আছে—এই সব

স্বীকার করিলেও, চলচ্চিত্র আৰু কোন ছবিৰূপে অবতীর্ণ হইবে এবং কি হওয়া উচিত ইহার উত্তরে তিনি ছোৱাগলাৰ বলিয়াছেন, জনগণের চিত্ত-বিনোদনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত ভাষ্যাদি হইতে জানা যায়, একমাত্র আমেরিকার কথা ছাড়াই দিলে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এই শিল্পে ভারতের স্থান সর্বোচ্চে এবং ভারতে চিত্রগৃহের সংখ্যা মোট ভিন্ন সহস্রের অধিক। আর ফিল্ম ডিভিশন নামক যে সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার অত্যন্ত উদ্বেগ ভারতীয় চারুকলা, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প, জনস্বাস্থ্য সমাজ-সমস্ত প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষামূলক চিত্র প্রস্তুত করা এবং ভারত ও ভারতের বাহিরে সেগুলি প্রচারের ব্যবস্থা করা। রাজ্যপালের বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রের মন্তব্য হইতে জানা যায়, তাহাদের কর্ম-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। এক দিকে যেমন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে, অপর দিকে তেমনই তাহার কলা-নৈপুণ্য ও রুচিবোধ বিধ্বংসের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

ফিল্ম ডিভিশনের সহিত চলচ্চিত্র সমিতির কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। কিন্তু বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্প বিষয়ে এই সমিতির যে কিছু হাত আছে ইহা মনে করিবার সম্ভব কারণ আছে। তাহার সভাপতি মহাশয় যদি মনে করেন, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য জনগণের চিত্ত-বিনোদন, তাহা হইলে অল্প সকল বিষয় গোপন উদ্দেশ্যের মধ্যেই পড়ে—চলচ্চিত্রের পক্ষে শিক্ষার বাহন হওয়াও তাহারই অন্তর্ভুক্ত। আজ যখন অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে চোরাকারবার প্রভৃতি দুর্নীতি-মূলক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার দেশের সাধারণ জনমণ্ডলী ভিলে ভিলে যুড়ার পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে, সেই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বিনীত নিবেদনে, রাজ্যপাল অথবা মুখ্যমন্ত্রীর শিক্ষামূলক চিত্র প্রস্তুতির আহ্বান বা উপদেশে, অথবা সম্পাদকদের সুজ্ঞাপূর্ণ লেখায় নিজ নিজ ব্যবসায়গত আর্থিক স্বার্থ হ্রাস করিয়া দেশের কল্যাণের কথা ভাবিবেন এ প্রত্যাশা কতকটা অমূলক বলিয়াই মনে হয়। যদি সত্যই এই শিল্পের সাহায্যে শিক্ষাবিসয়ক জ্ঞান বা উন্নতি সম্ভবপর বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারকেই সে বিষয়ে চেষ্টা হইতে হইবে। গণ-আন্দোলনে, সংবাদপত্রের সমালোচনায়, সাধারণের চাপে যে কাজ না হয় তেমন মহে এবং কতকটা তাহারই দরুন ‘বিভাগগর’, ‘স্বপ্নদেবতা’, ‘স্বামিজী’, ‘মাইকেল মধুসূদন’ প্রভৃতি কয়েকখানি স্ক্রল চিত্রের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে মনে হয়। বোধ হয় ভারতে বাংলাই এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রদেশের ভুলনার অগ্রগণ্য। ইহা দ্বারা সেই সকল শিল্পের কর্তৃপক্ষেরা সকলেই লাভবান হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

চিত্তাশীল মনীষিগণ মনে করেন এতাদৃশ জনপ্রিয় ক্ষমতা-শালী শিল্পকে যেদিকে পরিচালনা করা যায় সেই দিকেই

সাক্ষ্য সৃশিক্ষিত। আমাদের দেশে—যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যধিক—যদি কেবলমাত্র প্রমোদ-পরিবেশনের কাজে ইহাকে নিয়োজিত করা যায় তাহা অপেক্ষা পরিভাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? শিক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশনের কার্যকারিতার কথা সম্যক অবগত নহি। তাহা বাদ দিলে বোধ হয়, স্বাক-চলচ্চিত্রের উপযোগিতা সর্বাপেক্ষা অধিক। বর্তার পর বর্তা ক্রমে শিক্ষকের অধ্যাপনার কলে যাহা না লাভ হয়, শিক্ষামূলক একখানি ছবিতে সহজেই সে ফললাভ হইয়া থাকে। আর শিক্ষার্থীরা আনন্দের সহিতই তাহা গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সর্ব-সাধারণকে আনন্দ-পরিবেশন, তাহাদের কৌতুহল চরিতার্থ করা ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষা-মূলক ও গঠনমূলক ছবি নির্মাণের দিকেও সমান দৃষ্টি দেওয়া হয়। এদেশে সেরূপ ছবির একান্ত অভাব আছেই, এমন কি আমাদের বর্তমান হঃশ্বেদৈশপূর্ণ বিপর্যস্ত জীবনের রূপায়ণের সহিত যাহাতে তবিস্যভের আকাজক্ষার ইঙ্গিত থাকে এ ধরনের ছবিও দেখা যায় না।

চলচ্চিত্রের দ্বারা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে। ইতিহাস, জীবনী, রোমাঞ্চকর অভিযান প্রভৃতিও যেমন দেখান যাইতে পারে, তেমনই স্কুল কলেজের উপযোগী এবং মাত্র সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শিক্ষাব্রতীদের সহযোগিতায় বিজ্ঞান, ভূগোলাদি ভাঙ্গরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। স্কুল কলেজে শিক্ষামূলক ছবি প্রস্তুতের জন্য বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা-বলী, মানা দেশের দৃষ্টাবলী সম্বলিত ছবি অপেক্ষা ব্যয় অধিক নহ, বরং কমই হওয়ার কথা। তবে ইহা স্বীকার্য, এখানে সাধারণ স্কুল বা কলেজে ইহা নিয়মিত দেখানোর ক্ষমতা যে ব্যয়, তাহা সংকুলান করা কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত সম্ভব না হইতে পারে। তবে কলেজে বা স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে এই প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অধ্যাপকের বেতনের ব্যয়ভার লাঘব হইতে পারে। আমাদের চিন্তামান্যকদের কথায় চলচ্চিত্র সাহায্যে দুর্নীতি নিবারণ, তাহার গুণগত উৎকর্ষ সাধন শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক ও গঠনমূলক এবং জনগণের রুচি মার্জিত ও উন্নতভর করিবার উপযোগী চিত্র নির্মাণের আবশ্যকতা ব্যক্ত হইলেও যাহারা এই শিল্পে রুচি হেঁচকাইয়াছেন তাহাদেরই যেন এ বিষয়ে একমাত্র দায়িত্ব এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। দায়িত্ব তাহাদের আছে সত্য, কিন্তু দায়িত্ব দেশবাসী মাজেরই আছে। এ সম্পর্কে দৈনিক বস্তুমতীতে শ্রীযুক্ত অক্ষুমাণ সেনগুপ্ত মহাশয় একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাষণার্থ এই যে, এ বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব শতকরা আশী ভাগ। নির্মাতা যাহারা তাহাদের একটি স্বতন্ত্র স্বার্থ আছে। ব্যক্তিগতভাবে সরকারের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আমাদের শক্তি কতটুকু। সুতরাং পবর্নমেন্ট এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে আশু কোন উপায় বিধান হইবে না।

একটি করুণ মুহূর্ত

শ্রীরঞ্জিতকুমার সেন

রাতে শুয়ে শুয়ে স্বামী জীতে কথা হচ্ছিল।

আঁকপের সুরে ভিনকড়ি বলল, 'তোমার দিকে ফিরে তাকাবার এক দণ্ড যদি অবসর পাই। সংসার পেতে অবধি তোমাকে কেবল হুঃখই দিলাম, নীলুর মা।'

সাদরে নিজে হাতের মুঠোর মধ্যে স্বামীর একখামি হাত টেনে নিয়ে থাকমণি বলল, 'না ভো, আমি কেন হুঃখ পেতে যাব। স্বামী-পুত্রের এমন সোনার সংসারে আমার মত স্ত্রী ক'জন? আমার হাতের বোরা অক্ষয় হোক, তাইই আমার শান্তি।'

—'চিরকাল ভো এমনি করেই তুমি বললে, ভাই বলে মাহুয কি কখনও অমর হয়।' হৃদয়বেগে কথাগুলো এক বার কেঁপে উঠল ভিনকড়ির কণ্ঠে। 'দেহ ছেড়ে আত্মা একদিন-না-একদিন মুক্তি পায়। সেদিন নীলু-ওদের হাত ধরে তোমাকে গণ্ডে দাঁড়াতে না হয় ভাই ভো এমন করে দিন রাত গাধার খাটনি খাটিছি। তবু ভো সামান্য এক ছোড়া শাঁখা এনেও তোমাকে হাতে তুলে দিতে পারি না। এ কি আমার কম হুঃখ, নীলুর মা?' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিল ভিনকড়ি।

বাঁ-হাতের কব্জিতে তখনও এক কালি লাল সূতো বাঁধা রয়েছে থাকমণির, তার পানে দীর্ঘকালের ক্ষয়ে যাওয়া এক খণ্ড বলবিত 'নোয়া' নরম মাংসের উপর চলু চলু করছে। অলসার বলতে ডান-হাতে একটা মাজ শাঁখা। ক'দিন আগে হৈসেলের কাছে বাঁ-হাতেরটি ধোয়াতে হয়েছে; ভিনকড়িকে জানতে দেয় নি থাকমণি, নিজেই এন্ডোভির চিহ্ন-বরূপ শাঁখার ছানকে কাঁধা সেলাইয়ের লাল সূতো দিয়ে পূর্ণ করে নিয়েছে। বড় মেয়ে চিন্তা এক বার বাবার কানে দিতে চেয়েছিল কথাটা, কিন্তু মায়ের বকুনি ধেরে নিজে থেকেই আবার মিথুত হয়েছে।

বেহালার ভারের উপর দিয়ে ছড়ি বুলিয়ে খেবার মত স্বামীর হাতের উপর দিয়ে নিজের নরম আঙুলগুলো বুলিয়ে নিতে নিতে থাকমণি বলল, 'এমনি করে বলে বলে হুঃখ দিও না গো। বিষয়-আশয় আর পরনাপাটি আগলেই কি সুখ, আমার এ অশ্বের কাছে তা কি দাঁড়াতে পারে? তুমি ঘুমোও, আবার ভো সেই ভোরে উঠেই কাজের ভাড়া।'

কাজ কি একটা ভিনকড়ির, সারা দিনে তার মরবার অবধি কুরসত বেই। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পোয়াল পরিষ্কার করে বুধি আর তার বাচ্চাটাকে জাবনা দিতে হয়, ছেলেমেয়ে-গুলোর পড়াগুলো থেকে শুরু করে তাদের প্রাণরান পর্যন্ত

সমস্ত কিছুই ব্যবস্থা করতে হয়, তার পর উর্ধ্বদ্বায়ে ছুটেতে হয় জমিদারী সেরেস্তার। মাসিক মাজ পচিশ টাকা মাইনের চাকরি, বাজনা আদায়ের কাজ। সারাদিন এ মহলা থেকে সে মহলার টহল দিয়ে বেড়াতে হয়। আগে আগে মাঝে মধ্যে ভাতে কিছু উপরিও এসে যেত হাতে। ধরাবাঁধা রোজগার নয়, তা না হলেও আর ভো বটেই। ইদানীং তাতেও বাদ সেবেছে প্রজারা; সুযোগ পেলেই কাঁকি দেয়। ভবি করে উঠে সুবের উপর, জমিদারের তিন পুরুষ উদ্ধার করে বিদায় করে দেয় ছত্রাণ থেকে। সেই সঙ্গে জমিদারের লোক হিসেবে তার নিজের বিরুদ্ধেও তাদের বিরুদ্ধে কিছু কম প্রকাশ পায় না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়, মনের আশা মেটে না তার। বিকেলে এসে আবার লেগে যেতে হয় তাকে জমি-জিরেত নিয়ে। বিঘাখানেক জমিতে লাউ-কুমড়া তরিতরকারী কলিয়ে তিন ভাগ বাজারে ছেড়ে তবে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় এটা-ওটা সংগ্রহ করতে হয়। পাড়ার রামলোচনের দাওরায় গিয়ে একহাত দাবা পর্যন্ত খেলে আসার সময় হয় না। রমণীর সন্ধ্যাগুলো কাটে তার থাকমণি থেকে শুরু করে সংসারের ক্ষুদ্রতম প্রাণী নীলুর অবধি বাস্তব পর্যবেক্ষণে। কারুর বাস্তবই ভাল নয়। থাকমণি সুস্থ থাকলে পোয়ালঘরটাকে নিজের শোবার ঘরের মত একাই ঠিক রাখতে পারত। মেজ্ব ছেলে হারাণ পেটে আসার পর থেকেই শরীর কেমন হঠাৎ ভেঙে পড়ল থাকমণির। এই বাস্তব নিয়েই সে আরও ভিনকড়ি ছেলেমেয়ের মা হয়েছে, রক্ষা করে চলেছে সংসারটাকে। সেজ মেয়ে টুলির আজ সাত দিন ধরে ঘুমঘুমে জ্বর আর আশা চলেছে; নীলুর যে কি হয়েছে—ভা-বোঝা মুশকিল, যখন বা ধায়-অমনি বমি হয়ে যায়। গাঁয়ের ভিষগুরের কাছে থেকে রায়করেক ওয়ুধ এসে দিয়েছে ভিনকড়ি, কিন্তু কাজ হয় নি। হারাণকে চেষ্টা করে কিছু কিছু লেগাপড়া শেখাছিল সে, তবু যদি হারাণ মাহুয হয়ে এক দিন সংসারের অবস্থা ফেরাতে পারে। কিন্তু আশা করলে কি হবে, মাঝে মাঝে রোগে ভুগে ভুগেই ছেলেটা অস্থিচর্মসার হ'ল। মাহুয়ের আকৃতি নিয়ে জন্মেও কেউ মাহুয হ'ল না সংসারে। এ হুঃখ কোথায় রাখবে ভিনকড়ি। নিজের শরীরেও তার ভাটা পড়ে এসেছে, এই কান্ডমে আটচল্লিশ পেরিয়ে গেল। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে ভিনকড়ি।

থাকমণি তাকে ঘুমাতে বললে কি হবে, ঘুম কি আছে হাই পোড়া হ'চোখে। ধেনে জিজ্ঞেস করল, 'টুলির আজ

পায়খানা হয়েছে ক'বার, রং কি রকম, আমের পরিমাণ কি ? কাল কাঁজে বেরোবার মুখে আর একবার ভিষগুরু মশাইয়ের কাছ হয়ে যেতে হবে। নীলুকে ভাল করে লেবুর রস মিশিয়ে খোল দিচ্ছ তো ? অল্পখ তো ওদের নয়, অল্পখ হয়েছে আমার। কি যে করি, কিছুই ভেবে পাচ্ছি নে নীলুর মা।'

—‘এ সব ভাবনা আমার উপর ছেড়ে দিয়ে তুমি আপাতত নিশ্চিন্ত হও দিকি। এর পর বায়ু চড়ে গিয়ে আর যে ঘুম আসবে না তোমার।’ কথা দিয়ে স্বামীকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করে থাকমণি।

কিন্তু তাতেই কি স্থিতি আছে তিনকড়ির। বলল, ‘সব ভাবনার বোঝা তুমিই যদি বইতে পারবে, তবে যে নিশ্চিন্তেই আমি ছুটি মিয়ে বসে থাকতে পারতাম। ওদিকে যে আর এক বিপদ মাথার উপর ঝাঁপে হয়ে আছে, কিছু জান ?’

থাকমণি এবারে আরও খানিকটা কাছ ধেঁষে এল তিনকড়ির। ‘কি গো, কি এমন বিপদ শুনি।’

কথাটা বলতে গিয়ে একবার থামল তিনকড়ি। থাকমণির কাছে এসব কথার উল্লেখ না করলেই ভাল ছিল। কিন্তু পারল না; পাষাণের মত ভারী হয়ে আছে বুকের ভিতরটা, বলে বলতে না পারলে যেন যুক্তি পাচ্ছে না সে।

—‘কি গো, চূপ করে রইলে কেন, বিপদটা কি, বল ?’ খানিকটা উৎকণ্ঠার দৃষ্টি ফেটে পড়ল এবারে থাকমণির চোখ থেকে।

লুকাতে পারল না তিনকড়ি, বলল, ‘জমিদারের মুন খাই বলে অনেকেরই আমি শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি। বার্ষিক পাঁচ টাকা সেলামীতে এই বাড়ীতে আছি, এক ষণ্ড জমিতে কিছু করে খাই, এও অনেকের সহ্য হচ্ছে না। পূর্ব-পাড়ের সহদেব চেষ্টা করেছিল কর্তাদের সেরেস্তায় ঢুকে আমার এই কাজটা হাত করবার, পারে নি বলে আমাকে মনে করে তার বড় শত্রু। সে-ই প্রজামহলে ঘুরে ঘুরে আমার বিরুদ্ধে ইদানীং ভাতিয়ে বেড়াচ্ছে সবাইকে। প্রজাদের বাড়ীতে খাজনা আদায় করতে গেলে আজকাল আর মুখ পাই না। লোভ যে মানুষকে কত নিচে নামাতে পারে, তাই এক এক বার ভাবি নীলুর মা। এর পর হয়ত কর্তাদের সেরেস্তাতেও আমাকে আর প্রয়োজন হবে না। ঐ সহদেব হারামজাদা তখন মুখ টিপে হাসবে।’ নিজের অলকোই বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিলে তিনকড়ি।

কিন্তু সহদেব ব্যক্তিটি সত্যি সত্যিই হাসবে না কীভাবে, তা নিয়ে আপাতত চিন্তা নেই থাকমণির, মনে মনে তার নিশ্চিন্ত করে সে ঘুম থেকেই। বলল, কেন গো, ও-কথা বললে কেন, কর্তাদের সেরেস্তায় তোমাকে প্রয়োজন হবে না কেন ?

—খাজনা আদায় করে যদি নায়েবের হাতে এনে তুলে দিতেই না পারলাম, তবে প্রয়োজন কি আমাকে দিয়ে। তিনকড়ি বলল, ‘দিনকালের গতিক ভাল নয় নীলুর মা, জমিদারেরাও হয়ত আর বেশীদিন টিকবেন না।’

—তবে তো ভালই, সব এক হয়ে যাবে; প্রজা-মালিক সম্বন্ধ থাকবে না, আমরাও কিছু মানী লোক হয়ে তাদের কাছে সম্মান পাব।—মনে মনে খানিকটা যেন ধুশী হয়েই উঠল থাকমণি।

কিন্তু কথাটা ঠিক হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারল না তিনকড়ি। বলল, সম্মান না ছাই পাবে। এখন তবু টারটোর সংসার চলছে, তখন একেবারে ডালমুটি হয়ে যাবে।

আপাত পেলো এবারে থাকমণি। সম্মানের পরিবর্তে ছাই : এফি বলছে তিনকড়ি। আর বিরক্তির কারণ না সে। রাত তখন কম নয়, কিছুক্ষণ থেকে ছাই উঠে চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল থাকমণির। এবারে তার চোখ দুটো ঘুমে ভেঙে এল। ধীরে ধীরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

কিন্তু তিনকড়ি সত্যি সত্যিই কিছু একটা পাণ্টা দ্বাব আশা করেছিল জীর কাছ থেকে, না পেয়ে বুঝল—অভিমানের কথা বন্ধ করেছে সে। বড় অভিমান থাকমণির। যতকণ্ঠে ডাকল একবার তিনকড়ি : ‘নীলুর মা ঘুমিয়ে পড়লে মাকি ?’ উত্তর নেই।

মাথা তুলে ডাকিয়ে দেখল তিনকড়ি—সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে থাকমণি। চোখের পাতা দুটো কেমন অদ্ভুতভাবে বুঁজে আছে তার; নীচের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে কালি পড়েছে। সহসা একবার কেমন শিউরে উঠল তিনকড়ি। খেটে খেটে আর ভুগে ভুগে আজ তার বোয়ের শরীরে কিছু নেই। এক দিন এই চোখ দুটো ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। অল্পমম লাবণ্যময়ী করে তুলেছিল তাকে এই চোখ দুটি, আজ সেই চোখের পাতা দুটো শুকিয়ে নীচে কালি জমে উঠেছে। একটা দিনের জন্যও তাকে স্থগী করতে পারল না তিনকড়ি। তার স্বামিদের মর্যাদা ভেঙে কবেই চুরমার হয়ে গেছে। তবু কি প্রশান্ত হুঁচি থাকমণির, একটা দিনের জন্যও নিজের কণ্ঠের কথা মুখ ফুটে জানাল না। অভিমান হলে হয় নীরবে অন্য কোথাও উঠে গেছে, নয় ত নির্বিবাদে হুঁচোখ বুজে এক সময় এমনিবারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

পাশ ফিরে শুয়ে এবারে নিজের ঘুমাত্তে চেষ্টা করল তিনকড়ি; কিন্তু হুঁচোখের কোথাও তার ঘুমের লেশমাখ নেই। বায়ু চড়ে গিয়েই থাকবে। এমনি সব নিজস্বাভিমান রাজিতে মন তার বিসিয়ে ওঠে, হচ্ছে হয় আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা। কথাটা মনে পড়তেই হঠাৎ চমকে উঠল তিনকড়ি। আত্মহত্যা করলে ছেলেরাও নিয়ে কার হুমারে গিয়ে দাঁড়াবে থাকমণি ? আত্মহত্যা না বলে বলতে

হয় আশ্রয়দোহ, ঘুমের সঙ্গে বিদ্রোহ করে জয়ী হতে চায় সে।

হঠাৎ ওপাশের মেঝে থেকে ঘুমের মধ্যেই টুলি কেঁদে উঠল। থাকমণিকে ডেকে মিথ্যে আর বিরক্ত করতে চাইল না ভিনকড়ি, সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু ঘুমিয়েছে, বসতে ত সময় পায় না একদণ্ডও। ভিনকড়ি নিজেই উঠে এসে টুলির শিরে বসল : ‘মা, সোনা মা আমার কষ্ট হচ্ছে, পেট কামড়াচ্ছে, তাই না?’

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল টুলির, কেঁদে কঁকিয়ে উঠল সে : ‘উঃ, হিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে পেট।’ আমাশার কামড়ানি সহ করতে পারে না টুলি।

আলগোহে ছই হাতের উপর তাকে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে আনল ভিনকড়ি। এতকণে ব্যাথাটা কিছু কমল।

কিন্তু নিজের চোখের মণি ছটো ব্যাথার কেটে পড়ছে ভিনকড়ির; বিনিজ রাত্রির দিশেহারা দৃষ্টি যে কি সাম্মাতিক, তা নিজামুন্না ব্যক্তির কি বুঝবে। আবার বিছানায় এসে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল সে।

তোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে অনেক বেলা হয়ে গেল। শেষরাত্রির দিকে অকস্মাৎ গাঢ় ঘুম আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে। স্বপ্ন ঘুম ভাঙল—প্রভাতসূর্য্য ভবন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। গোয়ালঘর থেকে বুধি আর তার বাচ্চাটা কেমন ছুঁকল কণ্ঠে মাঝে মাঝে চিংকার করে উঠছে, প্রতিদিন এতকণে ভোরের জাবনা তাদের উদরস্থ হয়ে যায়, বর থেকে বাইরের নরম বাসের উপর এসে স্বর্ষ্যের মুখ দেখে। চিংকার করবার কারণ আছে বৈকি তাদের আজ।

চোখেমুখে ধানিকটা জল হিট্টে ভাড়াভাড়ি গিয়ে তাদের জাবনা কেটে দিতে বসল ভিনকড়ি। দেখল—কেমন যেম মিরুংসাহ আর নিমন্তক হয়ে পড়েছে বুধি আর তার বাচ্চাটা। শরীর ধারণ করল নাকি তবে বুধির? চোখে কেমন খোলাটে দৃষ্টি, খাড়া তুলে ভাল করে তাকাতে পারছে না। এ আবার কোন্ বিপদে পড়তে হ’ল ভিনকড়িকে? নীলু সবে সেবার হ’ল। মাস ছ’য়েকের বেশী থাকমণির বুকে ছব রইল না, নীলুকে বাঁচানো মুশকিল দেখে গাইয়ের সন্ধান নিলে ভিনকড়ি। বিল মাদুদপুরের হাটে পাওয়া গেল বুধিকে; হুড়ি টাকা দিয়ে তাকে কিনে এনে বাড়ীতে গোয়াল বাঁধল সে। অল্পদিনেই বাচ্চাটা পেটে এল। ছব এল বুধির ‘বাটে।’ ছব না যেন কীর। এতদিন বরে সেই কীরই পরিবেশন করে এসেছে বুধি। আজ এ তার কি হ’ল?—কিছুকণ বরে স্নেহের হাতি বুলিয়ে দিল সে বুধি আর তার বাচ্চাটার মাথার উপর। তারপর আর বিম্বমাত্র অপেক্ষা না করে সোকা রওনা হ’ল সে ভিষগুরের বাড়ীর দিকে। এর পর তাকে গিয়ে আর বরা যাবে না। টুলি আর নীলু দিকে তাকাতো গিয়ে হুঃখে বুক কেটে যায়।

রোগী দেখতেই সম্ভবতঃ বেরুচ্ছিলেন ভিষগুর, চৌকাঠে পা দিতেই ভিনকড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেল। ভিজেন করলেন, ‘কি হে, বাড়ীর অবস্থা কি তোমার?’

যথাযথ অবস্থা বর্ণনা ক’রে কাতর কণ্ঠে ভিনকড়ি বলল, ‘এমন কিছু স্বস্তরী ওষুধ দিন কবরেক মশাই—যাতে এ হুভোগ আর আমাকে না পোহাতে হয়। বাপ হয়ে নিজের চোখে ছেলেমেয়ে ছটোর কষ্ট আর দেখতে পারি নে।’

—দেখতে পারি না কি হে, না পারলে চলবে কেন, ধৈর্য্য ধরতে হবে।’ ভিনকড়ির বৈদ্যজ্ঞান ললাটের দিকে তাকিয়ে যেন কি একবার লক্ষ্য করলেন ভিষগুর। ওষুধ কবরেক নন তিনি, জ্যোতিষীও বটে; মাহুঘের অদৃষ্টের লেখা বলে দিতে পারেন তিনি রাশিচক্র মিলিয়ে। বললেন, ‘সময় ধারণ পড়লে মাহুঘের এমনিই হয়। এখন তোমার রাহুর দশা চলেছে; অল্পস্বল্প অর্থশাস, রোগভোগ আর মানসিক ক্ষতির সঙ্গে এ সময়টা ধৈর্য্য ধরে চলতে হবে রোগের প্রতি-যেধক হিসেবে ওষুধ নেবে বটে, কিন্তু ভোগান্তি তাতে দূর হবে না। তবে শীঘ্রই শুভদিন আসবে, জী-পুজ নিয়ে স্থণে থাকবে, একথা নিশ্চিত।’

ওষুধের কথা তুলে গেল ভিনকড়ি। কিছুকণ অভিভূতের মত ভিষগুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অক্ষুট কণ্ঠে ভিজেন করল, কবে ভেমন শুভদিন আসবে কবরেক মশাই?’

কিছুমাত্র দ্বিধা না করে ভিষগুর বললেন, ‘একটা নবগ্রহ কবচ ধারণ করে গ্রহশাস্তির জন্য তুমি কিছু ব্যয় কর দেখবে—নিশ্চিত ফললাভ হবে।’

নবগ্রহ কবচ, গ্রহশাস্তির জন্য ব্যয়, নিশ্চিত ফললাভ : মনে মনে বারকয়েক কথা করটি উচ্চারণ করল ভিনকড়ি। তারপর ধৈর্য্যে বলল, ‘সংসার ত আর আমার একার ভাগ্যে চলে না, তাতে আমার জীও ভাগ্যের ষোগও আছে, একবার আলোচনা ক’রে নিই তার সঙ্গে। আপনি বরং আপাতত কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করুন কবরেক মশাই।’

—‘বেশ, অপেক্ষা কর।’ বলে ওষুধের বাজ নিয়ে বসলেন ভিষগুর।

জমিদারী সেরেভার স্বপ্ন এসে সে পৌছল, স্বর্ষ্য ভবন মাথার ঠিক উপরে উঠেছে। বুড়ো মাহুঘের সঙ্গে দেখা হতেই দাঁতমুখ বিচুনি খেতে হ’ল ভিনকড়িকে। ‘এমন খুশীমত কাছে বেরুলে স্বস্তরবাড়ীর বাকার করা চলে, জমিদারের কাছ চলে না।’

লজ্জায় মাথা নীচু করে নিলে ভিনকড়ি, তারপর অক্ষুট কণ্ঠে বলল, ‘আজ্ঞে ছেলেমেয়ে ছটো অন্তখে ভুগছে, ওষুধের

ব্যবস্থা করে আসতেই যা একটু দেরি হয়ে গেল। বিশ্বাস না করেন ত ভিষগুরু মশাইকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।’

ভর্ক করবার মানুষ নয় নায়েব, সরাসরি বলল, ‘কথা না বাড়িয়ে পার ত এবারে একবার ভাগিদে বের হও। দত্তপাড়ার হারু দত্ত যদি খাজনা না দেয় ত তার জমি নীলামে তুলবার ব্যবস্থা করবে।’

নীলামে তুলবার ব্যবস্থা ভিনকড়ি কেন করতে যাবে, খাজনা আদায়ের ব্যাপার পর্যন্তই তার সম্পর্ক, তারপর যা করবার নায়েব নিজেই করবেন। কিন্তু যুগ ফুটে সেটুকু বলতে পারল না ভিনকড়ি। নীরবে খাড় কাৎ করে সোজা সে-কাজে বেরিয়ে পড়ল।

না পড়ল মাধার একটু ভেল জল, না পড়ল পেটে হুঁদান। তাত। সারাটা দিন আজ অভুক্তই থাকতে হ’ল ভিনকড়িকে। স্বর্ঘ্যের প্রথর ভাঁপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ব্রহ্মভালু, এক একটা মুহূর্ত কাটছে আর সূর্য্য পাক দিয়ে উঠছে পেটের নাড়ী। মাথা গুঁজবার মত একখানি ঘর, বিখ্যাতানেক জিরেতি জমি আর হাসান্ডে নগদ বিদায় পচিশ টাকা—ছকুমের গোলাম হয়ে আছে এর কাছে ভিনকড়ি। সেখানে সূর্য্য ভুজার বালাই নেই, গ্রীষ্ম বর্ষা নেই, সেখানে জমিদারের খাজনা আদায়কারী নির্দম কর্মচারী সে।

যখন বয়ে ফিরল। ভিনকড়ি—স্বর্ঘ্য শুধন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। দেখল—সারাদিন তার জন্য অপেক্ষা করে করে থাকমণিও অভুক্ত থেকে বসে বসে বাড়াভাত আগলান্ছে। হুঃখে একবার চোখে জল এল তার। বলল, গোলামি করে মান-ইজ্ঞা আর শরীর বলে কিছু রইল না, নীলুর মা।

কেন বেন উত্তরে কিছু একটাও বলতে পারল না থাকমণি। স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ দুটি একবার মল মল করে উঠল তার। কিন্তু বারো বর্ষিত হ’ল না। অতি কষ্টে নিজেকে স্তব্ধ করে নিলে থাকমণি।

ভিনকড়ি জিজ্ঞেস করল, টুলি আজ সারাদিনে ক’বার পাখ-খানার গেছে, ওয়ুধ খেয়ে ব্যাধা কিছু কমেছে ত? নীলু আর বমি করে নি ত. একবারও?

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে থাকমণি পাণ্টা জিজ্ঞেস করল, তুমি আবার কোথাও বেরোবে নাকি এফুনি?

—না, বেরুব আর কোথায়? ভিনকড়ি বলল, জমিতে লাউয়ের কচি চারা ছটো-বেশ লভিয়ে উঠেছে; পাটখড়ির খেয়াও করে মাসান বেঁধে দেব; নইলে গরু ছাগলে খেয়ে ফেলতে পারে।

‘আজ আর জিরেতে গিয়ে হাত না লাগালেই কি চলে না?’ থাকমণি বলল, ‘এই ত সারাদিন খালি পেটে কত পরিশ্রম করে এলে, কিছু খেয়ে বিশ্রাম না নিলে যে-শরীর টকবে না।’

‘না গো না, ভা নয়। ব্যস্ত হয়ে ভিনকড়ি বলল, হুঁদিন বাদে চিন্তার বিয়ে দিতে হবে, তারাপের ভবিষ্যৎ আছে, আমি অস্থির হলে কি চলে? এক আধ বেলার উপোসে শরীর বরং ভালই থাকে। জমি থেকে ফিরে এসে গরম গরম ছুটি বেয়েই বরং শুয়ে পড়ব।’

আর বাধা দিতে গেল না থাকমণি। হুঃখে অভিমানে ভেঙে পড়ল সে। সারাদিন সে যে স্বামীর আশাপাশ চেয়ে নিজেও অভুক্ত রইল, সেটুকু বুল না ভিনকড়ি। চোখ ফেটে আর একবার জল এল থাকমণির, হয়ত এখনই কিছু একটা অনর্থ ঘটে যাবে, জেতে উঠে তাই অচল কোথায় একদিকে চলে গেল সে।...

ইতিমধ্যে কোথা থেকে চিন্তা এসে ঝাপিয়ে পড়ল। হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে থুতনিটা ভীষণ ভাবে হড়ে গেছে। চল-কোয়াম এখনও সতর্ক হতে পারে নি চিন্তা, বয়স চৌদ্দ পেরিয়ে পনেরর পড়েছে।

বমক দিয়ে ভিনকড়ি বলল, বুড়োভাড়া মেয়ে হলি, হুঁদিন বাদে পরের খর করতে যাবি, এখনও ভাল করে পা ফেলে হাঁটতে শিখলি-নে। আমার হয়েছে জ্বালা, এখন বসে বসে যথো আবার ওয়ুধ।

সশকে কঁদে উঠল এবারে চিন্তা। অপরাধ করে নি সে, ঘাট থেকে কলমীতে জল ভরে আনতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে যেতেই এই দুর্ঘটনা। কিন্তু সেটুকু বুলে বলতে পারল না সে-বাবার কাছে।

মেয়ের কান্নায় রাগ ক্রমে জল হয়ে এল ভিনকড়ির। প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে ছেলেমেয়েদের। বলল, লক্ষ্মী মা, বুঝ চোটি পেয়েছিস, তাই না? কাদিস নে, চোখ মোছ, একুপি ভাল হয়ে যাবে; জল দিয়ে ডলে দিচ্ছি, একটুও আর ব্যাধা থাকবে না।

জিরেতের কাজে আর বেরুনো হ’ল না ভিনকড়ির। চিন্তাকে নিয়েই সে আপাতত ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আড়ালে থেকে মনে মনে থাকমণি বলল: এই যদি আমার মাধার দিকি দিয়েও বলভাম, তবু বেরুতে হত তাকে; এখন থাক বসে মেয়েকে নিয়ে।—আসলে মনে মনে কতকটা বুঝীই হ’ল থাকমণি। স্বামী-অন্ত-প্রাণ তার, স্বামীকে কাছে পেয়েই তার সুখ।

ছেলেমেয়েদের বাইরে, টুলি আর নীলুর পথ্যের ব্যবস্থা করে আজ একসঙ্গেই খেতে বসল হুঁজমে। অনন্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও এ এক অভূত আনন্দ। ভিষগুরুর কথাটা উল্লেখ করে ভিনকড়ি বলল, গ্রহশান্তির জন্যে কত ব্যয় হতে পারে, কিছু জান? এস না, হুঁজনেই ছটো গ্রহশান্তি কবচ ধারণ করি। কথাটা যন্দ বলেন নি কবরেজ মশাই, কত বড় জ্যোতিষী তিনি।

ভনে কণাটা হেসেই উড়িয়ে দিল থাকমণি। বলল, তুমিও যেমন, যে যা বলে অমনি বিশ্বাস করে বস। গ্রহশাস্তি কবচ ধারণ করলেই যদি অদৃষ্ট ফিরবে, তবে কবরেজ মশারই-বা এমন বক্তি টিপে থাকেন কেন, তাঁরও ত মনে শাস্তি নেই; ক' মাস আগে কবরেজ-নিদ্রী কালাজরে ভুগে মরল, গ্রহশাস্তি দিয়ে আরাম করলেই ত পারতেন।

কণা কাটতে পারল না তিনকড়ি। সংসারের জন্য খেটে মরে বটে সে, কিন্তু থাকমণির সাংসারিক বুদ্ধিকে কখনও কোন ক্ষেত্রেই সে উড়িয়ে দিতে পারে নি। এখনও পারল না। বলল, তবে থাক। ভগবানের বিধানকে কি কেউ খণ্ডাতে পারে সংসারে। অদৃষ্টে থাকলে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না আমাদের সুখ।

খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল হু'জনে।

টুলি আর শীলু আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছে বলেই মনে হ'ল; দুম আছে চোখে, আজ আর রাঙে উঠবে বলে অন্তত মনে হয় না।

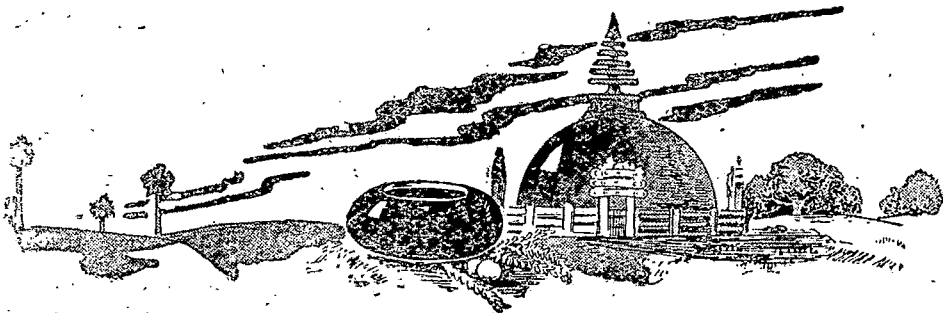
তাত্তাভাড়াই ভয়ে পড়ল তিনকড়ি। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমে হু'চোখ জড়িয়ে এল। খুব ভোরে উঠেই জমিতে গিয়ে জল দিতে হবে গাছগুলোর গোড়ায়, পাটখড়ি দিয়ে বেড়াও করে দিতে হবে লাউয়ের কচি চারা-ছটোকে, তার পর গোয়ালের কাজ। একটা মুহূর্তও কি বিজ্ঞান আছে তার? আগামী প্রভাতের কর্তব্যচরী কণা তাবতে তাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল তিনকড়ি।...

উঠল সে ভোরে কাকডাকার আগেই। তখনও ভাল করে কস' হয় নি। পূর্বদিগন্তে ইষৎ আলোর আভাস দেখা দিয়েছে মাত্র। দেখল—তখনও অঘোরে ঘুমোছে সবাই। নরম হাতে একবার থাকমণিকে ঠেলে দিয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ল তিনকড়ি। তার পর চোখে ঘুমে খানিকটা জলের ছিটে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে জমির দিকে। সামনের ছোট গলিটা পার হয়ে একটু বাঁক ঘুরেই বাঁ-হাতি জমি। এসে পৌছতেই হু'চোখ তার কপালে উঠে গেল। হুঃখে

রাগে হঠাৎ ছ ছ করে উঠল বুকখানা। কাদের নির্ধম অভ্যাচারে সমস্ত জিরেত তার নষ্ট হয়ে গেছে। কুমড়োর মাসানটা ভেঙে গুড়িয়ে আছে; অসংখ্য তুল আর গুটি দেখা দিয়েছিল, আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। পুঁইয়ের কচি ডগা-গুলোকে পিষে রেখে গেছে, লাউয়ের কচি চারা-ছটোর কোথাও আর অস্তিত্ব নেই; নবরকাস্তি ডাঁটা, লক্ষা, বেগুন আর টেঁচসের চারাগুলো মুলিসাং হয়ে আছে। সজনে-পাছটা শুধু ঘিন্নপড়ে সাকীগোপালের মত দাঁড়িয়ে আছে। মনে হ'ল—তার বৃকের পাছরাগুলোই যেন ভেঙে খানখান হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে সারা জমিতে। তিনকড়ির গোটা পরিবারের ভবিষ্যৎ, দরিদ্র-জীবনের ভবিষ্যতের সংস্থান—তার মূলে কার অদৃষ্ট হস্ত এমন করে ঋশান রচনা করে দিয়ে গেল একটা রাত্রির অবকাশে?

নির্ধম হয়ে উঠল সে। বুঝতে তার কিছুই বাকী রইল না। মুহূর্তে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে সব কিছু। এক দিকে কমতার অটুট সিংহাসন, আর এক দিকে কমতা-হীনের জীবন-সংগ্রাম : মাঝখানে ত্রিশতর মত বুলছে তিনকড়ি। এক দিকে অবিশ্বাস, আর এক দিকে বিদ্বেষ। না পারছে সে কমতার সিংহাসন স্পর্শ করতে, না পারছে কমতা-হীনের জীবন-সংগ্রামে গিয়ে হাত মিলিয়ে দাঁড়াতে। মাস-কাবারী বিদায় তার নচিশ টাকা। হারিয়ে অর্থ। তার চাইতে কি কম মূল্য কিছু বৃকের এই পাছরা ক'খানার? পারে নাকি এই পাছরাগুলো পেঁথে পেঁথে জীবনের একখানি অমূল্য সিংহাসন গড়ে তুলতে তিনকড়ি—যেখান থেকে থাকমণিকে একটা মুহূর্তের জন্যও সরে দাঁড়াতে হবে না শীলুদের নিয়ে। কিন্তু ভাড়া হাড়ে সত্যিই যে কোড়া লাগে? জিরেতগুলোর দিকে আর একবার তাকাতে গিয়ে হু'চোখ ছাপিয়ে ছ ছ করে জল এসে গেল তিনকড়ির।

প্রভাতের তরুণ অর্যের কোমল আলোর তখন চারদিক উজ্জল হয়ে উঠেছে।



অবলা বসু

শ্রীশোভনা নন্দী

বাংলা ভাষা ভারতের সর্বজনবরণ্য। পরম শ্রদ্ধা লেডী অবলা বসুর মহাপ্রয়াণের আজ প্রথম যুত্মবার্ষিকী দিবস। সেই পুণ্যবতীর আত্মার পবিত্র স্মৃতিপাদমূলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তাঁর চরণোদ্দেশে নিবেদিত ভক্তি-অর্থ্য তিনি গ্রহণ করুন, তাঁকে বার বার প্রণাম জানাই।

জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে লেডী বসুকে পরম আত্মীয়া রূপে পাবার সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটেছে; এ দীর্ঘজীবনে তাঁর যে স্নেহ উপভোগ করেছি তার তুলনা হয় না। মাতৃহীনা আমরা, মাতৃস্নেহের অভাব তিনি আমাদের পূর্ণ করেছিলেন— তাঁর কাছে আমার গুণ অপরিশোধ্য। লেডী বসু সর্বদেয় কিছু বলবার জন্য আমার আদেশ করা হয়েছে। জানি না এ সম্বন্ধে যোগ্যতা আমার কতটুকু, তবে সন্দেহি পিতৃমাতৃ ভরণে নাকি সন্তানেরই অধিকার; সেখানে যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না; আমিও আজ সেই সন্তানের দাবিতে এ গুরু ভার বহন করতে সাহসী হয়েছি, আশা করি আমার ভুলত্রুটি আপনারা দয়া করে মার্জনা করবেন।

মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের ক্ম ও ভিরোধান ভিধিতে তাঁদের গুণাবলী স্মরণে, স্মৃতিভরণে ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, চিত্ত পবিত্র হয়। তাঁদের জীবনাদর্শ চির উজ্জ্বল থেকে পথের নির্দেশ দেবে, যাত্রাপথের সহায় হবে—এ উদ্দেশ্যেই স্মৃতিবার্ষিকী অমুষ্ঠানের প্রয়োজন। মহাত্মাদের স্মৃতি-পূজা জাতীয় জীবন গঠনের অমুত্তম সোপান। আজ আমরা সেই বরগীয়া মহিলার অপূর্ণ জীবন-কথা আলোচনা করে ধন্ত হই, নারী-কল্যাণে তাঁর অতুলনীয় দানের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই বিদেহী আত্মার চরণে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। তাঁর আশীর্বাদ আমাদের সকল, বর্ধ ও শ্রায়ের পথে পরিচালিত করুক এই প্রার্থনা।

এক পরম শুভ মুহূর্তে বঙ্গমাতার ক্রোড়ে লেডী বসুর আবির্ভাব হয়েছিল। জননী জন্মভূমির দুর্গতিমোচনে বহু-পরিকর হয়ে যেদিন তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন সেদিন বৃষ্টি আকাশ বাতাস মুগ্ধিত করে ঘোষিত হয়েছিল “কুলং পবিত্রম্, জননী কৃতার্থা”।

লেডী বসু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী। কিন্তু এইটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়, জনসাধারণের কাছে তাঁর আরও পরিচয় আছে—তিনি ছিলেন বাংলার মেয়েদের জননীস্বরূপা, হিতৈষিণী বসু, গুণাধিনী অভিভাবিকা ও নারী-সমাজের পথ-প্রদর্শিকা জননেত্রী।

কবি বলেছেন, “জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর হারয়ে জীবন মদে?” বিধাতার অমোঘ বিধানে মানব-জীবনের ইহাই অনিবার্য্য পরিণতি। পৃথিবীতে প্রতিদিন সহস্র সহস্র যুত্মমুখে পতিত হচ্ছে। কে তার সংবাদ রাখে, আত্মীয় বন্ধু ছাড়া কয়জনই বা তার ক্ষত অশ্রুমোচন করে? কিন্তু সেদিন দেখেছি লেডী বসুর মহা-প্রয়াণে ঘরে ঘরে ক্রন্দনের দোল উঠেছিল, সারা বাংলা শোকে মুহমান হয়েছিল। আজ নিঃসন্তান লেডী বসুর শত শত কণ্ঠা চোখের জলে মাতৃভরণ করেছে। সেদিন মনে হয়েছিল যুত্ম ত সকলেরই হয়, কিন্তু মরজীবনের এমন গৌরব-ময় পরিসমাপ্তি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে।

নারী-কল্যাণে লেডী বসুর যে অমর অবদান তার বৃষ্টি তুলনা বেই। ভারতের নারীসমাজে আজ যে যুগান্তর উপস্থিত হয়েছে, শিকার দীক্ষার, রাষ্ট্রে ও সমাজে—জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ এদেশের নারীদের জীবনে আজ সহজলভ্য হয়েছে, তার মূলে যে কয়জন মনীষী এবং মনস্বিনীর সম্মিলিত সংগ্রাম ও সাধনা রয়েছে, লেডী বসু ছিলেন তাঁদেরই অমুত্তমা।

উচ্চশিক্ষার শিক্ষিতা লেডী বসু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে প্রায় সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বিদগ্ধগুণী ও অভিজাত পরিবারসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার প্রচুর সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছিল; কিন্তু পাশ্চাত্যের কোনও প্রভাব তাঁর জীবনে বা আচরণে ছাড়াপাত করতে পারে নি। ভারতীয় ভাবধারার অমুপ্রাণিত লেডী বসু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনেপ্রাণে ছিলেন আদর্শ ভারতনারী। তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেতি, জাতীয় আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক অমুরাগ আমাদের কতই না মুগ্ধ করেছে। এই দেশপ্রেতিই তাঁকে দুর্গতদের সেবার উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর ছিল উদার দৃষ্টি-ভঙ্গি—যেখান থেকেই পাওয়া যাক না কেন যা ভাল তা সর্বদাই সাদরে গ্রহণীয় এ ছিল তাঁর আদর্শ। হাঁস নাকি জল মিশ্রিত দুগ্ধ থেকে নীর পরিত্যাগ করে ক্ষীর বা দুধের সান্নিধ্য গ্রহণ করে। অবলা বসুও তেমনি পাশ্চাত্য নারী-সমাজে যখন যা ভাল দেখেছেন দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করে নিজের প্রতিষ্ঠানগুলিতে তা প্রবর্তিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ ছিল তাঁর চরিত্রের অমুত্তম বৈশিষ্ট্য, পূর্ব-পশ্চিমের অপূর্ণ সমাবেশ।

বাংলার মেয়েরা শিশুকাল থেকে ভারতীয় ভাবধারার শিক্ষালাভ করে যেদিন “শ্রদ্ধা, গুণসা, সেবসা” এ মন্ত্র নিজ

নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে তুলতে পারবে সেদিনই ভারতে নারীত্বের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। লক্ষ্য স্থির রেখে অগ্রসর হব, এক দিন সিঁড়িলাভ হবেই হবে এ ছিল সেজী বহুর জীবনের সাধনা। বিখ্যেয় দরবারে ভারত-নারীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। এই স্বপ্নকে রূপায়িত করে ভোলাদেবী একান্তিক আগ্রহই বৃদ্ধি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকার গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সেদিন তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। এই বিভারতনটিকে তিনি সুদীর্ঘকাল কঠোরমেহে লালন করে এসেছেন, এর সর্বদীর্ঘ উন্নতিসাধনে আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আজন্ম শিক্ষালব্ধী অবলা বহু শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন চিন্তাবারা, নতুন আদর্শের পথ ধুলে গিয়েছেন। বিদেশে থাকা কালেও স্কুল সঙ্কে তাঁর চিন্তার বিরাম ছিল না। শিক্ষালয়ের কাছে তাঁর ক্রান্তি ছিল না, নিত্য নতুন পরিকল্পনা নিয়ে সর্বদা তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে দেখেছি। সর্বদা আমার বলতেন, “শিক্ষার্থীর মনে স্বদেশ-প্রীতি জাগিয়ে তুলে দেশসেবার আত্মনিয়োগ-স্পৃহা জন্মানোর চেষ্টাই শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ, শিক্ষার মূলগত নীতি।” তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা যত্ন ও একান্তিক সাধনার ফলেই আজ এই শিক্ষায়তনটি ফল-পুষ্প-সুশোভিত বিশাল মহীকূলে পরিণত হয়েছে। ইহার আজিকার এই সফলতা ও প্রতিষ্ঠার মূলে সেজী বহুর অতুলনীর দানের কথা কারও অবদিত নেই। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের ইতিহাসে তার এই অব্যুল দানের কথা স্বর্ণাকরে লিখিত থাকবে। প্রাক্তন ছাত্রীরা দাবিতে তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সহস্র প্রণতি জানাই।

সেজী বহুর ছিল অদ্বুত কর্ম-প্রতিভা। এই শিক্ষালয়টি তাঁর একমাত্র কর্মক্ষেত্র নয়। নারী শিক্ষা-সমিতি, বিভাগগণ বাগীতবন তাঁর আর দুটি অমর কীর্তি। এ ছাড়া মহিলা শিল্প-তবন, মহিলা কো-অপারেটিভ হোম ও কামারহাট শিল্পাশ্রম, ট্রেনিং স্কুল তাঁরই পরিকল্পনায়, তাঁরই পরিশ্রমের ফলে গড়ে উঠেছে, তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণধরুণ। তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও একান্তিক সাধনার ফলে কত ছাত্র-অব-হেলিত কণ্ডা আজ বাঁচবার পথের সন্ধান পেয়েছে; সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে পরযুগোপেক্ষিণী নারীর একদা ব্যর্থ জীবন আজ সার্থক হবার, বহু হবার। এই সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে আজ শত শত বিধবা ও অসহায় নারী অর্থোপার্জন দ্বারা নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণে সক্ষম হয়েছে।

দেশ-সেবার পথ কোম-দিনই কুসুমাতীর্ণ নয়, সেজী বহুর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কত বড় বড়, কত নিন্দা প্রতিবাদ, কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাঁকে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলতে হয়েছে, কিন্তু কোনও দিন তিনি নিরুত্তম হন নি—কত বড় শক্তি থাকলে এটা সম্ভব হয় তা

ভেবে দেখা উচিত। সাধু সফল ও নিঃস্বার্থ সেবা কি কখনও বিফল হতে পারে। সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল তাঁর বিশ্বাসের প্রতি গভীর নির্ভরতা ও বিশ্বাস। আজ সে সব কথা মনে পড়ে হৃদয় প্রকাণ্ড আল্প্রুত হয়ে ওঠে। উপরে যেগুলোর কথা বলা হ’ল তা ছাড়া আরও বহু নারী-কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

একটা জীবনে এতগুলি কর্মপ্রচেষ্টার সফলতাল্লাত খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। শরীর যখন জীর্ণ, শক্তি যখন ক্ষীণ তখনও তাঁর মনে কত নতুন নতুন কল্পনা। যত্নের অল্প কিছু দিন আগেও আমার বলেছিলেন, “মেয়েদের জন্ত আরও কত কি করার আছে, কিন্তু আমার ও আর সময় নেই—” কোত্তের যেন অন্ত নেই, তখনও জনসেবার কি অদম্য স্পৃহা! দেখে ছিল না শক্তি, কিন্তু মনে ছিল যৌবনের উৎসাহ, অপূর্ণ কর্ম-প্রেরণা।

সেজী বহু ছিলেন ধর্মীয় কণ্ডা, সম্পন্ন ধর্মের বধু, ধর্ম মান, যশ প্রতিপত্তি জীবনে কিছুরই অভাব ছিল না; অথচ এই প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁর ছিল সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন। কর্ম-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিচিহ্ন কর্মদাশিকা দেশের নেত্রীস্থানীয়া, আবার পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে দেখেছি তাঁকে ছাত্রের তাঁর পতির অল্পগামিনী সহধর্মিণী ও আদর্শ-গৃহিণী। স্বামী ও পরিবার-পরিজনদের সেবার কি একাধি নিষ্ঠা। তাঁর সেই শান্তিগ্ধ মনোভাবী মাতৃমুর্তির স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠার আয়তন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। অবলা বহু ছিলেন অতীত ভারতের মহিমময়ী নারীত্বের প্রতীক।

পিতা ও স্বামীগৃহের ঐশ্বর্য তাঁর হৃদয়কে সজ্জিত করেনি, দিয়েছিল বিস্তৃত পরিসর, শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির স্নিগ্ধ পরিবেশ এনে দিয়েছিল চরিত্রের শালীনতা, মহাহৃদয়তা, সৌজত, উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্ম-প্রবণতা। এই দুই পরিবারের কণ্ডা ও বহুরূপে যে অতুল শিক্ষা-সম্পদের অধিকারিণী হয়েছিলেন, নিঃশেষে তিনি তা সমাজসেবার দান করে গেছেন। সমাজ-সংস্কারক পিতা দুর্গামোহন একদিন জী-শিক্ষার প্রসার ও জী-স্বাধীনতা-সংগ্রামে আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। সেই মহাহৃদয় পিতার কাছে কণ্ডা সেদিন যে কল্যাণরূপে দীক্ষাগ্রহণ করেন, কঠোর সংগ্রাম ও সাধনার, দেশমাতৃকার সেবার মধ্য দিয়ে সে রূপে তিনি উদ্ঘাপন করে গেছেন।

সেজী বহু ছিলেন নীরব কর্মী, নামমশ বা পদগোরবের অহমিকা তাঁর মনে কোনও দিন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ভগবদ্ভক্তিতে অল্পপ্রাণিত এই পুণ্যলোকা নারীর ভাগ, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-মার্ধ্য্য সঙ্গুলে যুক্ত ও তাঁর প্রতি একান্ত ভাবে আকৃষ্ট করবে এ আর বিচিহ্ন কি?

আজ এক বৎসর হ’ল সেজী বহুকে আমরা হারিয়েছি। কিন্তু আজও তাঁর অভাবের ভীততাবোধ, আমাদের কমে নি,

তার বিরোধানে বদমাযা এক বিশিষ্ট কতাকে হারিয়েছেন কিন্তু তার অমর কীর্তি বাংলার নারী-জাগরণের ইতিহাসে চিরকাল অক্ষর হয়ে থাকবে।

সেই অপরূপ জীবন-কাহিনী বাংলার মেয়েদের কাছে 'অমৃত সন্ধান' হউক, তার শিক্ষা; তার আদর্শ স্বাধীন ভারতের ভাবী কালকে পথের নির্দেশ দিক—এই প্রার্থনা।

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিদেশ থেকে লিখিত লেডী বুক্স একটি পত্রের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করছি। আশা করি এই শিক্ষালয়ের ভর্তুকী কভারা এর দ্বারা উপকৃত হবেন, তার আদর্শকে সার্থক করে তুলবেন:

“আমি চাই দেশপ্রেমিত বজায় রেখে দেশসেবার জন্য মেয়েদের Efficient করা। আমাদের মতো “প্রব্রু তপসা সেবয়া” সেই অহুসারে মেয়েদের গড়িয়া তুলিতে যেন পারি। সেই Distinctive stamp দিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

*** আমাদের শিক্ষা, নীতি সযুদায় দেশীয় ভাব দ্বারা অঙ্গপ্রাণিত হইয়া করিতে হইবে। আমাদের নিজের দেশের শাস্ত্র ও চিন্তার দ্বারা ছাড়িয়া দিলে দেশের মঙ্গল নাই।”

ইহার ছত্রে ছত্রে কি উচ্চ আদর্শের অভিব্যক্তি।

আজ এই প্রান্ত বাসরে শিক্ষালয়-কর্তৃপক্ষ লেডী বুক্স ও ভদীয়া ছোট্টা ভগিনী স্বর্গীয়া সরলাবালা রায়ের তৈলচিত্র দুখানি বিজ্ঞানসম্মত প্রণীতির আয়োজন করে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। লেডী বুক্স তার, তার ভগিনীও শিক্ষারত্নীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। লোকান্তরিতা সরলাবালা এই বিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা কর্মসূচিব।

বালিকাদের শিক্ষা ও তাদের চরিত্রগঠনে নারীরই অধিকার, অতএব মেয়েদের শিক্ষার তার পুরুষদের হাতে না রেখে মেয়েদের নিজে হবেন এ ছিল সরলাবালা রায়ের অভিপ্রেত।

তাই তিনি শিক্ষালয়ে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে শিক্ষা-দগতে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন। তখন পর্যন্ত সর্বত্রই মেলে-মেয়েদের শিক্ষণ-তার পুরুষদের হাতেই ছিল। বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী-নিয়োগ-প্রথা প্রবর্তনের তিনি অন্ততম পথ-প্রদর্শিকা। শিক্ষালয়ের আভ্যন্তরীন কার্য পরিচালনাবোধে তিনি একটি মহিলা কমিটিও গঠন করেন। স্কুলের আর্থিক অবস্থা তখন অতি শোচনীয়, বুঝি বা স্কুল উঠে যায় এই ভাবনায় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। চারদিকে নানা-বিশৃঙ্খলা, কিন্তু সরলাবালার দক্ষ পরিচালনার সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে বিদ্যালয় দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হ'ল। শিক্ষালয়টিকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করার যে পরিকল্পনা সেদিন স্বর্গীয়া রায় করেছিলেন পরবর্তী কালে তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল তারই কনিষ্ঠার সাধনার। এই শিক্ষালয় এঁদের উত্তরের নিকটই অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ।

পরলোকগত, প্রিয়জনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও তাঁদের স্মৃতিকে নিজেদের মধ্যে সজীবিত করে রাখার উদ্দেশ্যেই আমরা যত আত্মীয়ের আলোচ্য নিম্ন-গৃহে স্থাপন করি। এই ভগিনীদ্বয় বাংলার মেয়েদের একান্ত আপন জন, পরম আত্মীয়। তাঁদের স্মৃতির এবং তাঁদের মহৎ কার্যাবলীর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্যই আজিকার এ অস্থান, কিন্তু এ যেন যাত্রা এক দিনের চিত্র প্রতিষ্ঠারই পর্যাবসিত না হয়। সেই লোকান্তরিতা ভগিনীদ্বয়ের পরচিহ্ন অঙ্গুরণ করে, তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলে, সেই পুণ্যাদর্শ নিজেদের জীবনে প্রতি-ফলিত করতে যদি পারি তবেই এ অস্থান সার্থক হবে, তাঁদের আত্মাও তৃপ্ত হবে।*

* লেডী অবলা বুক্স প্রথম যুত্বাধিকীতে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে অমুষ্ঠিত স্মৃতি-সভায় পঠিত।



আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বঙ্গীয় বিধান-সভার ২৩৮ জন সদস্য বঙ্গীয় বিধান পরিষদের
জন্ম ১৭ জনকে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট (Single
Transferable Vote) দ্বারা “আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব”
করিবার জন্ত পাঠাইবেন। এই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব
সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিব।

‘এন্টাইক্লোপিডিয়া অফ সোসাল সায়েন্সেস’-এর ১২শ
খণ্ডে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে এইরূপ
লিখিত হইয়াছে :

“The term proportional representation is used to
designate the various electoral devices which aim to
secure a legislative body reflecting with more or less
mathematical exactness the strength of the groups in
the electorals.”

ইহার বহু প্রকার-ভেদ আছে; সকল ‘প্রকারে’রই উদ্দেশ্য
হইতেছে সংখ্যালঘুরা যাহাতে উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি
নির্বাচন করিতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে নানা
প্রকারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা মতবাদী থাকিতে পারে,
কিন্তু এই প্রকার তাঁহারা আইন-সভার নিজ নিজ সংখ্যাভূমার
প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন।

গত ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেস শতকরা ৮৫টি
ভোট পাইয়া শতকরা ১৭টি আসন দখল করে; আর হিন্দু-
মহাসভা শতকরা ৭টি ভোট পাইয়া একটি আসন মাত্র পায়।
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকিলে হিন্দুমহাসভা
শতকরা ৭টি আসন পাইত। যাক পুরাতন কথা।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দুইটি প্রধান রূপ আছে—
একটি হইতেছে “হস্তান্তর-অযোগ্য ভোটসহ আনুপাতিক
প্রতিনিধিত্ব” (proportional representation with
non-transferable vote); অপরটি একক হস্তান্তরযোগ্য
ভোটসহ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (proportional
representation with the single transferable
vote)।

হস্তান্তর-অযোগ্য ভোট (Non-Transferable Vote)

আমরা এখন পূর্বোক্ত প্রথম রূপটির আলোচনা করিব।
ইহার আবার তিনটি প্রধান রকম আছে যথা : (১) পরিমিত-
সংখ্যক ভোট (limited vote); (২) একক-হস্তান্তর-অযোগ্য
ভোট (single non-transferable vote) ও (৩) সামগ্রিক
ভোট (cumulative vote)। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একই
নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে বহু ব্যক্তিকে নির্বাচন করা একান্ত
আবশ্যক। তাহা না হইলে ইহার কার্যকারিতা থাকিবে না।

পরিমিতসংখ্যক ভোটের স্বরূপ বুঝাইবার সুবিধার জন্ত

আমরা ধরিয়া লইলাম যে, একটি নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে ৩ জন
সদস্য নির্বাচিত হইবেন। আর এই তিনটি সদস্য-পদের জন্ত
“রক্ষণশীল” ও “উদারনৈতিক” দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
আরও ধরা গেল, এই কেন্দ্রে রক্ষণশীলরা সংখ্যাগুরু।
তাঁহারা তিনটি পদের জন্ত তিন জনকে মনোনয়ন করিলেন।
আর “উদারনৈতিক” দল একজনকে মনোনীত করিলেন।
প্রত্যেক নির্বাচকের যদি তিনটি করিয়া ভোট থাকে তাহা
হইলে ৩টি পদই রক্ষণশীলরা দখল করিবেন। এইজন্য সদস্য-
সংখ্যার পরিমিতসংখ্যক ভোট (limited vote), যেমন
প্রত্যেক নির্বাচকের দুটি ভোট আছে। ইহার ফলে রক্ষণ-
শীলরা যদি সংখ্যায় শতকরা ৮০।৯০ জন হন ত তাঁহারা তিনটি
সদস্যপদই অধিকার করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি
সংখ্যায় ৭০।৭৫ জন হন তবে একটি পদ “উদারনৈতিক”দের
হইবেই। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের একেবারে হটাইয়া
দিতে পারিবেন না। এই প্রকার গলদও আছে, তবে ইহার
গলদ আলোচনা করিবার স্থান এখানে নহে।

একক হস্তান্তর-অযোগ্য ভোট

(Single Non-Transferable Vote)

এই প্রকার প্রত্যেক নির্বাচকের একটি করিয়া ভোট,
এবং ঐ ভোট তিনি যে-কোন প্রার্থীকে দিতে পারেন। যে
যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট পাইবেন, তিনিই নির্বাচিত
হইতে পারিবেন। উপরি-উক্ত উদাহরণে দুই জন “রক্ষণশীল”
ও ১ জন “উদারনৈতিক” নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা বেশী।

সামগ্রিক ভোট (Cumulative Vote)

এই প্রকার যত জন সদস্য নির্বাচন করিতে হইবে, প্রত্যেক
নির্বাচকের ততটি ভোট আছে। উক্ত উদাহরণ অনুসারে
প্রত্যেক ভোটারের তিনটি ভোট আছে। এই তিনটি ভোট
ইচ্ছা করিলে তিনি একজনকে দিতে পারেন, বা একজনকে
দুটি অপর একজনকে একটি বা তিন জনকে তিনটি ভোট দিতে
পারেন।

উপরোক্ত দুইটি প্রকার জটিল আছে। পরাজিত প্রার্থীকে
যে ভোট দেওয়া হইয়াছে সেগুলি একেবারেই নষ্ট হইয়া
যাইবে। সংখ্যালঘুরা কিছু প্রাপ্য অংশ পাইলেও সবটা
পাইল না। একক হস্তান্তর-অযোগ্য ভোটের কার্যকারিতা
বুঝা সহজ।

১৯৩৭ সালে ভারত-শাসন আইন অনুসারে যে নির্বাচন
হইয়াছিল, তাহা হইতে সামগ্রিক ভোট-দান (cumulative
voting) ও নির্বাচকমণ্ডলী সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ

সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কি করিয়াছিল তাহার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

বোম্বাই শহর হইতে বোম্বাই বিধান-সভায় চার জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে হির হইয়াছিল। আট জন প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াছিলেন—কংগ্রেস চারটি আসনের মধ্যে দুটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াছিল ও দুইটিই জিতেছিল। যদি কংগ্রেস একটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করিত, তাহা হইলে আরও একটি আসন বেচ্ছার হাড়িয়া দিত। যদি তাহারা তিনটি বা চারটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দী দাঁড় করাইত, তাহা হইলে সব কয়টি আসনই তাহাদের হস্তচ্যুত হইত। ভোটের কলাকল নিয়ে দেওয়া গেল :

প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা
করঞ্জিয়া*	স্বতন্ত্র	১৫৫২
মিসেস হংস মেহতা*	কংগ্রেস	১২২৭
রতীলাল গান্ধী*	কংগ্রেস	১১০৫
ডাক্তার*	স্বতন্ত্র	৮৮৩
ভেঙ্কটরাও	ঐ	৭২৮
ডাঃ ছাওলে	ঐ	৫০১
দেশাই	ঐ	৪১৬
আগবালে	তপশ্বীলী	১৯৫

মধ্যপ্রদেশে ভাণ্ডারা-সাকোলি গ্রাম্যক্ষেত্রে দুটি আসন, একটি তপশ্বীলী সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত। কংগ্রেস দুটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করেন ও দুইটিই হারান। ভোটের কলাকল নিয়ে দেওয়া হইল :

সাধারণ আসন		
গণপংরাও যাদবরাও পাণ্ডে*	স্বতন্ত্র	১৬,৭১১
পালাচলে	কংগ্রেস	১৬,৫৩০
সংরক্ষিত আসন		
রাধব গান্ধীরা*	আবেদকরী দল	৭,৯১৬
সুরজ উকর-কুণ্ডা	কংগ্রেস	৪১৬
গজারাম মাতাজী	স্বতন্ত্র	৩,২৬২
পাণ্ডুরং পাকোজী	স্বতন্ত্র	১১০৯

যদি কংগ্রেস একটি মাত্র আসনের জন্য, তা সাধারণ আসনই হটুক কিংবা সংরক্ষিত আসনই হটুক, নির্বাচন-দ্বন্দে অবতীর্ণ হইত তাহা হইলে ইহা সেই আসনটি লাভ করিত।

মধ্যপ্রদেশের হিজলঘাট নির্বাচন-ক্ষেত্রে দুটি আসন। একটি সাধারণ ও একটি সংরক্ষিত। কংগ্রেস দুটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করেন ও একটি আসন পান। কিন্তু তাহারা অতি নহকেই দুটি আসনই দখল করিতে পারিতেন, যদি উপযুক্ত ভাবে ভোট বিভাগ করিয়া দিতেন।

সাধারণ আসন

শেঠ পোকরাড কোচার*	কংগ্রেস	১৪,০০৪
কোটাস্বাকার	অ-ব্রাহ্মণ	৮,৬১৬
দেশপাণ্ডে	স্বতন্ত্র	২৫৭

সংরক্ষিত আসন

দশরথ পাতিলা*	স্বতন্ত্র	৩,২২৬
কেশব নারায়ণ	ঐ	১,৬৫৯
বিখনাথ	কংগ্রেস	১০৬৮
দৌলত মদলজী	স্বতন্ত্র	৩২৬

সাধারণ আসনে শেঠ পোকরাড তাহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী অপেক্ষা ৫,৩৮৭ ভোট বেশী পাইয়াছেন। তিনি ৩০০০ হাজার কম ভোট পাইলেও প্রতিদ্বন্দীর অপেক্ষা তাহার ষষ্ঠে বেশী ভোট থাকিত। আর বিখনাথ যদি এই ৩০০০ ভোট পাইতেন তাহা হইলে পাতিলাকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিতেন।

এইবার আমরা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যদিও বিধান পরিষদে বহু প্রতিনিধি থাকেন; এবং একটি নির্বাচন-ক্ষেত্র হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন তথাপি কোনও ভোটার বা নির্বাচক তাহাদের সকলকে তাহার প্রতিনিধি বলিয়া দাবি করিতে পারেন না। তিনি তাহাদের মধ্যে একজনকে তাহার প্রতিনিধি বলিয়া দাবি করিতে পারেন। সুতরাং একই নির্বাচন-ক্ষেত্র হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার বিধান থাকিলেও নির্বাচকের একের অধিক ভোট থাকিবে না।

কিন্তু দেখিতে হইবে তিনি যাহাকে ভোট দিলেন তিনি যেন নির্বাচিত হন। অল্পধার শাসন-পরিষদে তাহার প্রতিনিধি রহিল না। তিনি যাহাকে ভোট দিলেন, তিনি যদি পরাজিত হন তাহা হইলে তাহার ভোটটি নষ্ট হইল। পক্ষান্তরে তিনি যাহাকে ভোট দিলেন তিনি যদি বহু ভোটে বিজয়ী হন তাহা হইলেও তাহার ভোটটি নষ্ট হইল এইজন্য যে, এই ভোট বিশেষভাবে তাহার মনোনীত প্রার্থীর কাছে আসিল না। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতিতে এই ভাবে যাহাতে ভোট নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভোটারের একটি ভোট; কিন্তু তাহার ভোট যদি পূর্বেক্স দুইটি কারণের মধ্যে একটি কারণেও নষ্ট হয় তাহা হইলে তাহারা ভোট অপর প্রার্থীর প্রতি হস্তান্তরিত হইয়া তাহাকে নির্বাচিত হইতে সাহায্য করিবে। এই ভাবে নষ্ট ভোটের সংখ্যা খুব কম রাখা যায়।

একজন প্রার্থী হইতে অপর একজন প্রার্থীর প্রতি ভোট

* নির্বাচিত

হস্তান্তরিত হয় দুই রকমে। এক রকমে ভোটার প্রত্যেক প্রার্থীকে সরাসরি ও ব্যক্তিগত ভাবে ভোট দেয়। কাহাকে কাহাকে তিনি চাহেন তাহা তিনি তাঁহাদের নামের পার্শ্বে ১, ২, ৩, ... ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা ইঙ্গিত করিবেন। এই প্রথা 'হেয়ার পদ্ধতি' বলিয়া পরিচিত। এই প্রথার সমস্ত ভোটপত্র একত্র করিয়া গণনা করা হয়। প্রথমে 'কোটা' (Quota) নির্ধারণ করা হয়—অর্থাৎ কত ভোট পাইলে একজন প্রার্থী নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবে। এই 'কোটা' নির্ধারণেরও আবার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, যথা—'সিঙ্গেল কোটা', 'ডুপ কোটা', 'চেঞ্জিং কোটা', 'ডেসিমেল কোটা'।

তাহার পর যে যে প্রার্থী ১ পাইয়া অর্থাৎ 'first preference' পাইয়া নির্বাচিত হইলেন বা নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হইলেন তাঁহাদের ভালিকা প্রস্তুত করা হইল। বাকীরা নির্বাচিত হইলেন তাঁহাদের 'surplus vote' বা বাড়তি ভোট অপর প্রার্থীদের মধ্যে 'second preference' অনুসারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে যদি কাহারও ভোট 'কোটা'র উপর যায় ত তিনিও নির্বাচিত হইলেন। যদি ইহাও সমস্ত আসন পূর্ণ না হয় তাহা হইলে যিনি সর্বাপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকে বাদ দিয়া তাঁহার "২য়" ভোটগুলি অপর প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেখা যায় কাহারও পূর্ণ হইয়াছে কিনা। 'কোটা' পূর্ণ হইলে তাঁহাকে নির্বাচিত বলিয়া গণ্য করা হয়।

বাড়তি ভোট হস্তান্তর করিবার দুইটি পদ্ধতি আছে—একটি 'chance method', অপরটি 'exact method', লিষ্ট পদ্ধতি (List system) সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে হেয়ার পদ্ধতি—যাহা সাধারণতঃ একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট বলিয়া জনসাধারণের নিকট পরিচিত—বিভিন্ন প্রকারের 'কোটা' কি করিয়া নির্ধারিত হয় তৎসম্বন্ধে লাম্বাট কিছু আলোচনা করা যাক।

'কোটা' নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সমস্ত নির্বাচনের সমস্ত এমন উপযুক্ত ভোট-সংখ্যা নির্ধারণ করা যাহাতে ভোট নষ্ট না হয়। বঙ্গীয় বিধান সভার ২৩৮ জন সদস্য বঙ্গীয় বিধান পরিষদের ১৭ জন সদস্য নির্বাচন করিবেন। ২৩৮-কে ১৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ১৪ হয়। 'Simple quota' হইতেছে ১৪। যিনি ১৪টি "১" (বা first preference) পাইবেন তিনিই নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু নির্বাচনী কমিশন যে নিয়ম বাধা করিয়াছেন তাহা হইতেছে এই:

'Rule 97. Ascertainment of Quota—The Returning Officer shall then divide the total number of valid papers by a number exceeding by one the number of vacancies to be filled, and this result increased by one, disregarding any fractional remainder shall be the

number of votes sufficient to secure the return of a candidate (in this chapter referred to as the "quota").

সুতরাং উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে 'কোটা' আমাদের হইতেছে $\{238 \div (17 + 1)\} + 1$ অর্থাৎ $14 + 1 = 15$ । এই পদ্ধতিতে যে 'কোটা' নির্ধারিত হয় তাহাকে 'ডুপ কোটা' বলে। এই পদ্ধতিতে কম ভোট নষ্ট হয়।

আর একটি পদ্ধতি হইতেছে 'Changing quota', যেখানে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা কম সেখানে এই পদ্ধতি অনুসারে ভোট গণনা হইলে সংখ্যালঘুদের ভোট আরও কম নষ্ট হয়। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার অঙ্গুষ্ঠদের দ্বারা "single voting" (একক ভোটদান) করান, তাহার কুফল অপরকে ভুগিতে হয় না।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে, বরুন রামবাবু তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা কেবলমাত্র তাঁহার নামে ভোট দেওয়াইলেন, তাহাদের দ্বারা অপর কাহাকেও ভোট এমন কি দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ 'প্রেকারেল' দেওয়াইলেন না। রামবাবু পাইলেন ৩৮টি ভোট। তিনিও নির্বাচিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পরে বাকীরা আসিবেন তাঁহাদের বেলায় ১৪ এই 'কোটা' রাখিলে অম্যার করা হয়। ২৩৮-এর মধ্যে রামবাবু পাইয়াছেন ৩৮টি। বাকী ২০০ ভোটের মধ্যে যিনি ১৪ পাইবেন, তিনিও নির্বাচিত হইবেনই; কিন্তু যিনি ১৪ অপেক্ষা কম পাইবেন তিনিও নির্বাচিত হইবেন। এই 'কম' নির্ধারণ এই প্রকারে হয়:—রামবাবুর নির্বাচনের পর ১৬ জন নির্বাচিত হইবেন। পূর্বোক্ত 'ডুপ কোটা' হিসাবে এইবারকার 'কোটা' হইতেছে $200 \div [(16 + 1)] + 1 = 12$ । এই পদ্ধতিতে যিনি ১২ ভোট পাইবেন তিনিও নির্বাচিত হইবেন। এই 'কোটা' পরিবর্তন হয় বলিয়া ইহার নাম 'changing quota system'—এই পদ্ধতিতে ভোট নষ্ট সবচেয়ে কম হয়।

আর একটি পদ্ধতি হইতেছে 'ডেসিম্যাল' বা 'দশমিক কোটা'। এই পদ্ধতিতে পূর্বে বেলল সেজিস্ট্রেলিট এসেমবলির সাহেবরা মেম্বর নির্বাচন করিতেন।

বাড়তি ভোট কি করিয়া হস্তান্তর করা হয় তৎসম্বন্ধে দুইটি নিয়মের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। একটি 'চাল মেথড' (chance method)। রামবাবুর ৩৮টি ভোটপত্র গণনা হইবার পর প্রথম ১৪টি আলাদা করিয়া রাখা গেল। এই প্রথম ১৪টি গণনাকারীর হাতে প্রথম যে ১৪টি উঠিয়াছে সেই ১৪টি। বাকী ২৪টির মধ্যে জোড়া নম্বর বা বেজোড় নম্বর তুলিয়া লওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে বিত্তীয় প্রেকারেল কাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখা হইল। এই পদ্ধতিতে গণনাকারীর সুবিধা হইলেও খানিকটা লটারির ভাব ভোট-গণনার মধ্যে প্রবেশ করে। সেজন্য যেখানে ভোট-সংখ্যা হাজারের কম সেখানে 'Exact Method' অনুসরণ করা

হয়। 'Exact Method' হই রকমে অস্বস্ত্য হয়। এক রকম হইতেছে—রামবাবুর ৩৮টি ভোট-পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, বাহারী রামবাবুকে ভোট দিয়াছেন তাঁহারদের মধ্যে ২০ জন হরিবাবুকে আর ১৮ জন কৃষ্ণবাবুকে দ্বিতীয় প্রেক্ষারক্ষেপ দিয়াছেন। রামবাবুর নিজের ১৪টি ভোট বাদে বাকী ২৪টি দ্বিতীয় প্রেক্ষারক্ষেপ হরিবাবু ও কৃষ্ণবাবুর মধ্যে বাঁটরা দিতে হইবে। হরিবাবুকে ১৩টি ও কৃষ্ণবাবুকে

১১টি ভোট দেওয়া হইল—অস্বপাত অস্বপারে। কিন্তু এই অস্বপাত স্বল্প হিসাবে হইল না। সেজন্য অপর পদ্ধতি হইতেছে হরিবাবু পাইবেন $\frac{৩৮}{২} \times ২০$ ভোট, আর কৃষ্ণবাবু পাইবেন $\frac{৩৮}{২} \times ১৮$ ভোট এই স্বল্প হিসাবই বঙ্গীয় বিধান সভার সভাপণ কর্তৃক বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে প্রযুক্ত হইবে। দেখানো নির্বাচকের সংখ্যা অল্প দেখানো এই শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করাই সমীচীন।

আলোচনা

নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা

ত্রিকোহিনুরকাস্তি করণ

নিম্নবঙ্গের দুইটি লৌকিক দেবতা সম্পর্কে কিছু নূতন কথা জানাইতেছি। ত্রিহুত কালিদাস দত্ত লিখিয়াছেন—“বারা বা জাতাল শব্দের অর্থ কি তাহা অজ্ঞাত” (প্রবাসী আষাঢ়, ১৩৫৮)। অক্ষরবাবু প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য হইতে ‘বারা’ শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন এবং উহার অর্থনির্দেশ করিয়াছেন (ঐ তাম্র ১৩৫৮), কিন্তু ‘জাতাল’ শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় জাতাল শব্দ প্রচলিত আছে; উহার অর্থ—অতি উত্তম। সম্ভবতঃ জাঁক-জমকপূর্ণ পুজাকে জাতাল পুজা বলা হইয়া থাকে।

দক্ষিণবঙ্গ সর্বদে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতের আলোচনা ত্রিহুত নীলিমা মণ্ডল করিয়াছেন (ঐ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮)। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত ডঃ ত্রিহুতমহার সেনের ‘ইসলামি বাংলা-সাহিত্য’র মিশ্রলিখিত বাক্যটি উল্লেখযোগ্য : “অগ্রিক-মোদল জাতির অন্ততম উপাত্ত ব্যাঙ্গমানব অপদেবতা কালক্রমে দক্ষিণবঙ্গের জাদল-অনুপ প্রান্তে দক্ষিণবঙ্গ ঠাহুরে পরিণত হইলেন।”

পকানমের যে ধ্যানমন্ত্রটি পকানম রায় মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন (ঐ মাঘ, ১৩৫৮), তাহা কৃষ্ণচন্দ্র খুন্ডিতীর্ষ সম্পাদিত ‘পুরোহিত মর্গণ’ প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও তাহার আরও বিভিন্ন ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র আছে। আমরা নিয়ে নূতন একটি ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র দিতেছি। ইহা হইতে পকানমের পরিচয়ও কিছু স্পষ্ট হইবে।

ধ্যান :

পকানমঃ মহাদেবঃ রক্তবর্ণঃ দিগম্বরঃ
ভাঙ্করঃ (৭) গলিতমুদ্রঃ পট্টযজ্ঞোপবীতকঃ
শিরঃ পিঙ্গল জটাবর শিশুগ্রীব
বামহস্তে দক্ষিণবারা দক্ষিণহস্তে ত্রিশূলকঃ
গৌরুণ হারপালকঃ বেষ্টিত নাগভূষণঃ
কণ্ঠে কুম্ভাকমালাদি ভূষিত রক্তচন্দনঃ
উগ্রভেজোময়ঃ উগ্রঃ বলিদম্বা তপস্বিনি
ধ্যায়্যে পকানমঃ দেবঃ ভক্তানুগ্রহকারকঃ।

(ত্রিমোহিনীমোহন চক্রবর্তীর নিকট প্রাপ্ত)

প্রণাম :

পকানন্দ জটাবারী শূণ্ণ ভবকুবান্দনঃ।

ভূতনাথ জরাসুর পকানন্দ নমোহস্ততে।

(ত্রিভামাপদ যুগোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্ত)

বস্তুতঃ, বিভিন্ন লেখক ইচ্ছামত এই লৌকিক দেবতাটির ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র রচনা করিয়াছেন।

অক্ষরবাবু পকানমের বিভিন্ন বাহনের উল্লেখ করিলেও একটি বিশিষ্ট বাহন তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। উহা ‘গৌরুণ’—সম্মুখার্দ্ধ গোকর, পশ্চাদ্ধর্দ্ধ নর। চেতলা, বেহালা প্রভৃতি অঞ্চলে এই বাহন প্রচুর দেবীতে পাওয়া যায়। চব্বিশ পরগণার পাইকানে পকানমকে সরপুঠেও আরুঢ় দেখিয়াছি। পকানন বা শীতলা দেবীর পাশেই জরাসুর নামে আর একটি মূর্তি দেবীতে পাই। উহার তিন পা, তিন মুখ ও দুই হাত।

পকানন মন্ডলের কাহিনী হইতে জানা যায় যে, ইনি বৃক্ষাধিপতি ভৈরব বা কেদারপাল।

সমাধি-সৈকত

শ্রীবিমলানন্দ শাসন

নিধর দাগর-শিখরে চলেছে পালপক্ষীর দল,
পাইনের ফাঁকে, কবরের ফাঁকে ছবি তার চঞ্চল ;
মধ্যদিবস যেনা নিভি রচে অগ্নিপুঞ্জমালা
সে যে সাগর, কিরে কিরে দেহ যাত্রার পথে পাড়ি,
চিন্তাভালের বোঝাভার মহামাধুরীতে লয় কাড়ি
দেবলোক-রচা সেই সুবনীতে এক পলকের পালা ।

দিব্য আলোর হুস্র কিরণে জীলারিত আল্পনা
পেঁথে নিরে চলে ফেম-বাষ্পের লক হীরার কণা,
কি মহাশক্তি আপন গহনে ব'রে থাকে তারি কান্না,
অভবহীন গতিচক্রের শাস্ত্র ব্যথা-বেগে,
একটি সূর্য অসীমের বৃকে বৃকে যবে থাকে ছেপে
কালের নয়নে লহরী নাচিছে, ভাবের চক্রে মায়ী ।

এক নিখাসে ধরা দাও তুমি, মহাকাশ-মন্দির,
ভোমার ভুমির যোগ্য হবারে আমি তুলিতেছি শির
বিশালের মহা-প্রেরণা-দৃষ্টি সাধে ল'রে চারিপাশে,
দেবতার পদে অর্ঘ্য যেমন দান করি নীচ থেকে,
তব ভরদ্বন্ধি-লহরী রাজগৌরবে ঢেকে
ভেমনি ভোমার স্বর্ণ-জুহুটিরে ছুঁতেছ মহাকাশে ।

রসনা-বিবরে যেমনে ফলের অপকূপ জীলা চলে,
নিজ কায়াটারে সে বিলায়ে দেহ দানের চরণ-ভলে,
হারিয়ে যাবার ব্যথা নিয়ে দেহ পুলকের অবদান,—
ভেমনি বিলীন মনে মোর মম ভবিষ্য ছায়ায়,
আর নভ হ'তে মোহিত প্রাণের সাধে করে পরিচয়
একুল-ওকুলের ফল-চঞ্চল ভাঙা ও গড়ার গান ।

যে আমি রেখেছি এত অহমিকা, নিঃশংক অলসতা,
মধুর গগন, শাস্ত্র তুমি, হেরো তারি কণিকা !
তবু আছে মোর গভীর প্রাণের বীর্ষের সন্ধান,
তাই নিয়ে ওই দীপ্ত অসীমে করি মোরে শিবেদন,
ছায়াখানি মোর পার হ'রে চলে স্বভাব নিকেতন,
নহর তারি গতি মোরে যিরে বেড়িতেছে শৃঙ্খল ।

অনাগত আজি হয়েছে অলস ভোমার হুয়ারে ব'লে,
ওজ্জ্বল্যের আঁচড়ে যতক শুকতা যায় ব'লে ।
সকলি হেথার পবনে মিশিছে লঘু হ'রে দাহ-শেষে
অজ্ঞানিত কোন্ নিদারুণ মহা-দহনের নির্ধাসে ;...
জীবন হয়েছে বিশাল মাতিয়া শূতের আধাসে,
আশা হেথা আলোয়, ভিত্ততা কোমলের মাঝে যেনে ।

এই ভূমিতলে মতিহে আরাম প্রোথিত যত্নের দল,
তাপের পরশ ভায়া পায়, হয় রহস্তে নিফল ।
অভ্রলিহ মধ্যদিবস কম্পবিহীন সাজে
নিজের চরণে নভ হ'রে পুনঃ কিরে আসে নিজ 'পদে,
আপন প্রত্যয় কীর্ণ মুকুট শোভারে সে শিরে বরে,
গোপন বিবর্তনের সে-ছায়া হেরি গো ভোমারি মাঝে ।

স্পর্শ-শিহরে মত্ত মেয়ের উজ্জল কলরোল,
নয়ন ভাহার, দশন ভাহার, ভেজা পল্লব-কোল,
মোহিনী তাহার যে-বন্ধ করে বহিরে নিয়ে খেলা,
নিবেদিত তার অবরে অবরে যে-শোণিত জ্যোতি অলে,
শেষের যে-ছোঁয়া, যে আঙুল তারে চেপে রাখে হৃদিতলে,
সবি এসে যেনে এই ভূমিতলে, পুনঃ হুস্র করে মেলা ।

নবীন স্বপ্ন রচিত চাও কি, ওগো তুমি মহাপ্রাণ ?
যেথা থাকিবে না মিথ্যার এত রদিল উপাদান
চর্ম-চোখেতে সোনা-ভরদ্বন্ধ এখানে যেমন জাঁকে ?
ঐতিকা ভোমার শুনাবে কি যবে বাষ্পেতে পাবে লয় ?
যাও, যদি সবি যাবে, মম স্থিতিও নহে গো অব্যয়,
স্বপ্নের পুত বেদন-জালাও স্বভাব মেখে ঢাকে ।

কালোতে সোনোতে মেশানো, হে তুমি অনক অমরতা,
ভয়াল শোভাতে সেজে শুনাতেছ চির-প্রবোধের কথা ;
স্বভাব-আধারে গ'ড়ে তোলা তুমি মাতৃহের কোল ;
চোখ-বলসানো অলস আর মহতা-মাধানো কীকি
জানোনা তো তুমি, তবু তাহাদের দামিতে রাখো নি বাকি
তব অসীমের গৌরব-ছায়া, সনাতন কদ্রোল ।*

* Haul velery-র একটি কবিতার ভাবাহুবাধ

মহামানব রবীন্দ্রনাথ

শ্রীআশুতোষ বাগচি

মাহুঘের ইতিহাসে পচিশে বৈশাখ একটি বিশেষ স্মরণীয় আনন্দোন্মত্তার দিন। ১২৬৮ সালের এই দিনে এক জ্যোতির্ময় মহামানবের আবির্ভাব হয়। মাতা বসুন্ধরা মানব-স্বর্ষ রবীন্দ্রনাথকে কোলে পাবার পর আজ এক নবতিতম বার আকাশের রবি-প্রদক্ষিণ শেষ করলেন। রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সার্থক সাধনায় সকল মাহুঘের আনন্দময় জীবন-বিকাশের সম্ভাবনার আশা উদ্দীপ্ত করে গেছেন। মহাভারতের মত সুবিশাল তাঁর রচনাবলী, তাঁর অপূর্ণ সৃষ্টি বিশ্বভারতী এবং তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিবিধ কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তাঁর যে অভূতপূর্ব অনিন্দ্যসুন্দর জীবনালেখ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তাকে একটি “পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত” বলা যেতে পারে। এটি ভক্তহৃদয়ের অতিশয়োক্তি নয়।

কবি স্বাধীন স্বরকার রূপকার ভাস্কর প্রভৃতি জীবনশিল্পি-গণের কল্পনায় ধ্যানে ও অহুতাবে যেসব বিচিত্র ভাবরাজির উদ্ভব হয়, যেসব স্বর্গীয় সত্য মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হয় তার অতি অল্পই মাহুঘের ইন্দ্রিয়গোচর করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা ভাষায় সুরে রেখায় রঙে ও গতি-ছন্দে এবং অনেকখানি ব্যঙ্গনার সাহায্যে। ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন,

“* * * প্রত্যক্ষ প্রকাশ

কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস
কোথা সেই অধোদেহী অজ্ঞোদেহী সঙ্গীত উচ্চাস
আত্মবিদায়নকারী মনোজ্ঞিক মহান নিদ্রাস।

* * *

মাহুঘের তাষাটুকু অর্থ দিয়ে বন্ধ চারিধারে
ঘুরে মাহুঘের চতুর্দিকে। অবিরত রাঙ্গিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে কণি।
পরিপূর্ণ ভক্ত ভাব সীমা ঘের ভাবের চরণে
ধূলি ছাড়ি একেবারে উর্দ্ধযুগে অমৃত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের অনন্ত স্বাধীন
যেলি দিগ্ধা সপ্তরস সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।”

কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-জীবনের প্রভাতকালেই
অনুভব করেছিলেন,

“না পারে বুঝতে আপনি না বুঝে
মাহুঘ ফিরিছে কথা বুঁজে বুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কুঞ্জে,
মাগিছে ভেমনি সুর।”

এবং দেবী সরস্বতীর নিকট এই প্রার্থনা জানানলেন;

কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদ্যার-আগে-ছচারিটা কথা
মেখে যাব স্মরণ।”

তাঁর সেই সুরসাধনায় তিনি যে কল্পনাভীত সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তা সমস্ত জগতের বিমুগ্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। ইংরেজী ভাষায় তাঁর অধিকার কত গভীর আমরা হয়ত ঠিকমত বুঝতে পারি না। ইংরেজ সাহিত্যিক টমসন তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনীর একস্থানে লিখেছেন,
“It is one of the most surprising things in the world's literature that such a mastery over an alien tongue ever came to any man.”

রবীন্দ্রনাথের দিব্য প্রতিভার স্পর্শে আমাদের বাংলা-ভাষা-সরসীতে যে অজস্র কাব্য-শতদল প্রস্ফুটিত হয়েছে তার বর্ণ-স্বাদ-সৌরভ এবং সরস্বতীর সহস্র তন্ত্রীতে তাঁর এই বরপুত্রের যে বিচিত্র সুর-বাক্যের বেজে উঠেছে তা নিতানিয়ত আমাদের প্রাণ মনকে আলোকে পূলকে পূর্ণ করে আনন্দে বেদনায় আপ্ত করে ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার উর্দ্ধে তুলে ধরছে। কিন্তু আমাদের চরিত্রবলের দৈন্যে আমরা বারবার নেমে পড়ছি।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁর প্রতিকৃতি পুষ্পপল্লবে সজ্জিত করে ধূপ-ধূনার গন্ধে আমোদিত করে নৃত্য গীত-আবৃত্তি-বক্তৃতার সমারোহে উৎসব অহুষ্ঠিত হয়। এ সবে যথেষ্ট মর্যাদা মূল্য ও প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কারণ এই রকম উৎসবের মধ্যে খুব স্পষ্ট করে, তাঁর স্পর্শ ও সান্নিধ্য অনুভব করা যায় এবং এই রকম সৌন্দর্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লোক-সাধারণের, বিশেষ করে শিশুদের পরিচয় করে দেওয়া সহজে সম্ভব হয়। কিন্তু মহামানব রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবন-যাত্রার যে পথনির্দেশ করে গেছেন সেদিকে আমাদের চোখ পড়েছে বলে মনে হয় না। অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ অভিজাত জমিদার, স্বপ্নবিলাসী মাত্র ছিলেন। নিভৃত কবিকুঞ্জে বসে নিশ্চিন্ত মনে কেবল আকাশ-কুসুমই চয়ন করে গেছেন। সংসারের যোগশোক অভাব-অভিযোগ দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর কোনই পরিচয় ছিল না, কিংবা ঐসব নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা মোটেই ছিল না। আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্তই তাঁর সম্বন্ধে এই ভুল,

বিপরীত ধারণা অবিলম্বে দূর হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রথমেই জানা দরকার তিনি কত গুণসম্পন্ন, কলুষহীন-চরিত্র, সংযতবাক, মিথাহারী, মিথ্যাকারী, কঠোর শ্রমশীল মানুষ ছিলেন। কি গভীর মানবপ্রেমিক ছিলেন তিনি!

রবীন্দ্রনাথের লোকান্তরপ্রাপ্তির পর বিনয়কুমার সরকার একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে "The greatest man of the world ever born"—‘জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ’ বলেছিলেন; তার এগারো বৎসর পূর্বে জার্মান মনীষী কাউন্সীল কাইজারলিং লিখেছিলেন,

"There has been no one like him anywhere on our globe for many and many centuries. . . . He is the most universal, the most encompassing, the most complete human being I have known."

এই দুটি উক্তি অন্ধ স্তাবকের স্তুতিবাদ ও অভুক্তি কিংবা অর্থহীন প্রশংসা নয়। এই দু'জন দেশী ও বিদেশী মনীষীর এই উক্তির যথার্থ যাচাই করে নিতে হলে রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত জীবনচরিত্র, এবং তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে কাজ করবার ও তাঁর খুব নিকটে বসবাস করে তাঁর প্রতিদিনের জীবনযাপনের ঘনিষ্ঠতম, পরিচয়লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন যেসব ভাগ্যবান তাঁদের প্রকাশিত 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথের সামান্য ছোট-ছোট কথা ও কাজ সম্পর্কীয় বিবিধ লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। বাইরে যিনি যত বড় বলেই পরিচিত হোন, অভ্যন্তর কাছের মানুষের চোখে তাঁর কোন ক্ষুদ্রতাই গোপন থাকে না। এই সব লেখা, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র যা পুস্তকাকারে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর রচনাবলী যদি একত্রে মিলিয়ে পড়া যায় তবেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে তাঁর কীত্তির চেয়ে কত মহৎ ছিলেন সেটা তখনই আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

তিনি সাধারণ মানুষের মতই জীবন-চর্চা করেছেন; কিন্তু চারদিকের নিম্নাভিমুখী পরিবেশের মধ্যেও স্বকীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও চরিত্রের আভিজাত্য সর্বদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন। সাধারণ মানুষের স্বহৃৎথের চিন্তা তাঁর মনে সব সময়ে আগ্রহ ছিল। দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের মনে মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে তিনি চিরজীবন প্রাণপণ-চেষ্টা করেছেন। তিনি বড় জমিদারীর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন; কিন্তু সেই জমিদারী সম্বন্ধে তাঁর মনে কি ভাব ছিল তার একটুখানি ব্যক্ত হয়েছে তাঁর আপন-জনকে লেখা একখানি পত্রে। তিনি লিখেছেন,

"* * আমাদের যা-কিছু আছে তা যে আমাদের নিজের

নয় এবং যা কিছুকে আমাদের নিজের বুলে গ্রহণ করি তা যে চুরি করে করি এটা আমাদের খুব স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। * * *

এই পত্রখানি ১৩১২ সালের (১৯১২ খ্রী:) ১লা পৌষ তারিখে লেখা। কবি তখনও নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন নি এবং আনুমানিক অর্থলাভ করেন নি। মার্কস-লেনিনের বাণী এ দেশের শিক্ষিত-সাধারণেরও তখন অজ্ঞাত। দেখতে পাই, এই সর্ঘ্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অর্থাভাবে তিনি অভ্যস্ত দুশ্চিন্তায় আছেন; এবং অর্থদংগ্রহের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বহুতর দিয়ে বেড়াচ্ছেন ক্রান্ত পীড়িত প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ। এর থেকে তাঁর অন্তরের মানুষটির যে পরিচয় পাই সেটা নিবিড় ও উজ্জল হয়ে উঠে যদি তাঁকে ঠিক ভাবে জানতে যথার্থই যত্নপর হই।

রবীন্দ্রনাথের স্বরণে আমাদের উৎসব-তখন সকল ও সার্থক হবে, তাঁর গৌরবে আমরা তখন সত্য গৌরবের মহিমা অর্জন করব যখন কঠিন আয়াসলব্ধ চরিত্রবলে তাঁর প্রতি আমাদের ঋণশোধে সচেষ্ট হব। যেদিন আমাদের প্রতিদিনের ছোট বড় সকল কথায় ও কাজে সংঘম, গুরুত্ব, শ্রী, হ্রী ও ত্যাগের শুভ বিনম্র গুচি তা সর্বদা সর্বত্র প্রকাশ পাবে। বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একদা ব্যথিত হৃদয়ে লিখেছিলেন,

"আমরা কোনোদিন এমনভরো হাটের মানুষ ছিলাম না। আজ আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইয়া ঠেলাঠেলি ও চাঁৎকার করিভেছি—ইতর হইয়া উঠিয়াছি, কলহে মাতিয়াছি, পদ ও পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি করিভেছি, বড়ো অকরের ও উচ্চ কণ্ঠের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর পাঁচ জনের চেয়ে অগ্রসর করিয়া ঘোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি অল্পই আছে। ইহার মধ্যে শাস্তি নাই, শান্তির্ধ্য নাই, শিষ্টতা শীলতার সংঘম নাই, শ্রী নাই।"

তাঁর জন্মদিনের আনন্দোৎসবে সবচেয়ে বেশি করে মনে হচ্ছে যে, ধীরে আবির্ভাবে বাঙালী জাতি ধরা হয়েছে, ধীর নাম নিয়ে বাঙালী গৌরব ও গর্ব করে সেই স্বরলোক-বাসীর নিকট যে অপরিশোধ্য ঋণে আমরা আবদ্ধ তা শোধ দেবার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়েছি। এ বিষয়েও তিনি আমাদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে গেছেন তাঁর শারদোৎসব নাটকের যেখানে সম্রাট-সম্রাণী বিজয়াদিত্য অনাথ বালক উপনন্দকে তার প্রভু সত্য পরলোকগত বীণাচার্য সুরসেনের ঋণশোধের জন্য তার সঙ্গী বালকদলের উৎসবের ডাকে সাড়া না দিয়ে পুখি নকলে নিযুক্ত দেখে বলছেন,

“এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে। ঐ ছেলেটিই তো আজ সারদার বরণ হলে তাঁর কোল উজ্জল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা আজ এই বালকের ঋণ-শোধের মতো এমন শুভ ফলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো। লেখো, লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ করতে পারব না। * * *

আমরা যেন আজ এই আনন্দোৎসবের মধ্যেও আমাদের এই ঋণশোধের কথা ভুলে না থাকি। মহামানব রবীন্দ্রনাথ যে বাণীমূর্তিতে ও স্বরের রূপে আমাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ বিরাজ করছেন এই অমূল্যত্ব যেন আমাদের অন্তরে বহন করি এবং আমাদের আচরণের কোন ক্রটি-বিচ্যুতিতে তাঁর অসম্মান না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকি।



**আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা**

১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীটের
বিপরীত দিকে, আমহার্ট স্ট্রীট
ও বহুবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম.বি. সর্কার
এও সন্স

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমতী সর্কার দ্বারা
প্রস্তুতকৃত

১৯৬১/১ বি. রাসবিহারী এডিনউ কলিকাতা

ফোন, বি, বি, ১৭৬১
গ্রাম - ব্রিলিয়ান্ট

পুস্তক পরিচয়

চড়াই উৎরাই—খ্রীস্টোফার মিস। মিত্রালয়, ১০, জামাচরণ দে ষ্ট্রট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

এই সংগ্রহে আছে—রস, অবতরণিকা, জৈব, হেড মাস্টার, হেড মিস্ট্রেস, চড়াই-উৎরাই প্রভৃতি গল্প।

বাংলা কথা-সাহিত্যের আসরে লেখক খুব বেশী দিন আসেন নাই—কিন্তু ভাল গল্প-লেখক বলিয়া ইতিমধ্যেই রসিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রে মিস্র যে নতুন কোন রীতি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নহে—তবু তাঁহার গল্পগুলি জমিয়াছে। গল্পকে শুধাইয়া বলা ও মানুষের মনের কথা টানিয়া বলার মুসিয়ানাই যে ছোট গল্পের প্রাণ এটি তিনি জানেন। গল্পের মধ্যকার জীবন-সত্যের মহিমাকে কল্পনার গাঁথনি দিয়া প্রত্যক্ষগোচর করাইতে না পারিলে সমস্ত জিনিষটাই অব্যবহীন বস্তুতে পরিণত হয়, সে বস্তু মনের রস-পিপাসাকে কোনমতেই পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। বাস্তব-চিত্রণে—চোখের দেখার সঙ্গে মনের রং খানিকটা না লাগিলে ছবিটা চোখেও ধরে না, মনেও লাগে না। তাই বলিয়া গল্পের কাঁধে বাস্তববোধবর্জিত কল্পনাকে চাপাইয়া দিয়া বস্তু পাঠককে ভুলানো চলে না। বৎসরের হিসাবে যে বয়সের পরিমাপ তাহার কথা বলিতেছি না, মনের হিসাবে বয়সটা কখনো কমে, কখনো বাড়ে। কোন কোন যুবক তো রীতিমত

শিশু। যে-কোন চিত্র-উদ্বেগ্নক গল্প পাইলেই ইঁহারা ভূপ—পাঠক-সমাজে ইঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠও বটে। অবাস্তব উদ্ভট রহস্য সিরিজের আদ গ্রহণ করিয়া ইঁহারা প্লবিত না হইলে অবিকার পাঠ্যগারে এই জাতীয় গল্পের অঞ্চাল জমে কেন?

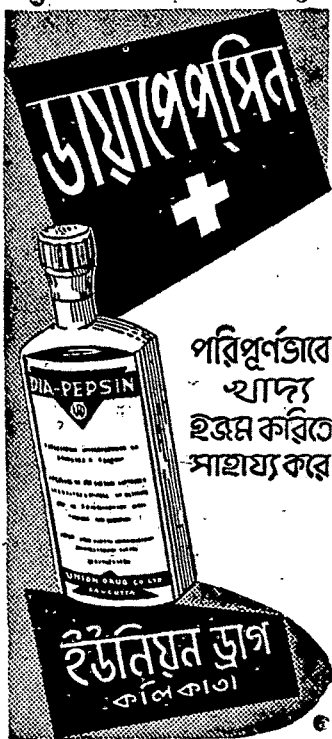
সে বাহা হউক, ভাল কাহিনীকার বাহিরের ঘটনার পিছনে মানসিক বিপর্যয়ের ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাহিনী রচনা করেন। মনুষ্য চরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা অকিঞ্চিৎকর হইলে এই কাঁধা সম্ভবপর হয় না। জীযুত মিস্র মানুষকে জানেন, তার মনের ধর রাখেন এবং চারিপাশের বস্তুপুঞ্জও তাঁর দৃষ্টিতে অস্পষ্ট নহে। আর এই কারণেই তাঁহার কল্পনার যে ছবি ফুটিয়া উঠে পাঠকের কল্পনাকেও তাহা উদ্দীপ্ত করে—রস-উপভোগের ক্ষেত্রটিকে করে প্রশস্ত।

পৌত্রান্ত—বিধুবর্ণ বহু। ৩১-বি, গর্ডা ফাট' লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এই উপস্থানের লেখক অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁহার 'লক্ষ্মী বউ', 'লক্ষ্মী যা' ইত্যাদি প্রকাশিত হয় দুর্দীর্ঘকাল পূর্বে। আমাদের বাংলাকালে বই দুখানি হয়তো পড়িয়া থাকিব, কিন্তু বহুকাল তাঁহার কোন রচনা আত্মপ্রকাশ না করার লেখকও আমাদের স্মৃতি হইতে প্রায় মুছিয়া গিয়াছিলেন—পৌত্রান্তের মধ্যে তাঁহাকে ফিরিয়া পাইতেছি।

ইতিমধ্যে বাংলার ভাগ্যে বহু দুর্বিপাক ঘটয়াছে। অগভূমি ও স্বজনচ্যুত বহু মানুষ দেহে ও মনে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। লেখকের ভাগ্যেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শোকদগ্ধ, বাস্তবচ্যুত, ক্ষীণদৃষ্টি অন্ন-আশ্রয় সমস্তাঞ্জালে জড়িত অশীতিপর বৃদ্ধের লেখনী যে শুষ্ক হইয়া যায় নাই—ইহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। এত বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁহার গ্রাম ও প্রতিবেশীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। গল্পের আসরে অতি আপনকার জনের সত লেখক তাহাদের টানিয়া আনিয়াছেন। জড় এবং চেতন দুইয়েতেই প্রাণসঞ্চার হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়



সরল হিসাব প্রণালী

অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিগুণাত্মক প্রণালীতে (Double-entry) হিসাব-পদ্ধতি শিখিবার একমাত্র পুস্তক, শিক্ষকের বিনা সাহায্যে বুঝা যায়। ছাত্র ও ব্যবসায়ীর পক্ষে সমভাবে উপযোগী। ব্যাক ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত বাবতীয় তথ্য জানা যায়। আইকম পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরসহ মূল্য ৫/- টাকা।

মর্ডার বুক এজেন্সি—কলকাতা, কলিকাতা।

সাহিত্য-প্রবাহ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ. মুখার্জি
এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন
টাকা।

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হুবহু এবং সুসাহিত্যিক।
“সাহিত্য-প্রবাহ”র অধিকাংশ প্রবন্ধই কবি এবং কাব্যের আলোচনা।
কাব্যরূপা, জীবন, জাপানী কবিতা, জীবনের জয়মুক্তি, সাংহাইয়ে বড়,
আণ্টন চেখভ, কবি হার্লি, কবি ইকবাল, আধুনিক বাংলা কবিতা,
বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি, গোবিন্দচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,
ছোট গল্প, ‘খাপছাড়া’র কবি, মানসী, সোনার তরী, খেরা, রক্তকরবী এই
আঠারটি প্রবন্ধ আছে। ‘কাব্যরূপা’র গ্রন্থকার বলিতেছেন, “এই
রহস্যদৃষ্টি শিল্পসৃষ্টির মূল।...মানুষের বিশ্বাস কতদিন পরে ভাঙা গেয়েছিল
কে জানে। কিন্তু ঐ বিশ্বাসকে ভাঙা দিতে গিয়েই শিল্পের জন্ম।”
এসময়ান্তরে তিনি বলিতেছেন, “জাপানী কবিতার কথার অত্যাচার নেই।
তাতে আছে শুধু ইঙ্গিত।...আর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রতিদিনকার জীবনের
সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ।” গোবিন্দচন্দ্র দাসের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,
“তার কবিতা কোথাও পরের অনুকরণ বা কাল্পনিক স্বপ্ন-দৃষ্টির অস্পষ্ট
চিত্র নয়...তার অলঙ্কারের প্রয়োগও দেখতে পাই, তা পুথির পাঠা
থেকে ধার করা নয়, স্বতাবধেই চরম করা। জয়মুক্তির যেন তা
আপনিই এসে পড়েছে।” সবচেয়ে লেখক আনন্দ পাইয়াছেন শেষ
কবিতা প্রবন্ধ রচনায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কাব্য ও নাটকের আলো-
চনায়। তিনি বলিতেছেন, “প্রকৃতি, প্রেম আর দেশ—এই তিন
উপচারে ‘মানসী’র অর্থরচনা। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কবির দৃষ্টি অন্তর্যামী।”
“অপ্রত্যক্ষ শক্তির কল্পনা ‘সোনার তরী’তে রোমান্টিক-বর্ণনামূলক।”
লেখক বলিতেছেন, “রক্তকরবী রচনার কয়েক বৎসর পূর্বেকার ‘বিজয়ী’
কবিতার ওর ভাবভঙ্গি ফুটে উঠেছে।...শক্তিমত্তা পাশ্চাত্য মানবগণ
ছুটে চলেছে ‘দুগ্ধবেগের বিজয়রথে’। মশালের আলোর অন্ধকার দূর
করবে ভেবেছে তারা, ‘বহিরলোকের রক্তকমল ফুটল এবল দম্ভভরে’।
‘আপনাকে হার দেখছিল কোন স্বপ্নাবেশে—বক্ষপূরীর সিংহাসনে লক্ষ
মণির রাজার বেশে।’ মনে পড়ে যায় নাটকের প্রথম নাম ‘বক্ষপূরী’।
“সত্যকার ধ্বনি বেজে ওঠে সার্বিক সাংকেতিক নাটকে, মানবীয় স্বপ্নদৃষ্টির
তরঙ্গকল্লোলে ভেসে আসে হৃদয়ের দ্বারে।” ধীরেন্দ্রনাথের রচনায় কোথাও
অস্পষ্টতা নাই। তিনি বাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা সরল এবং
প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। “সাহিত্য-প্রবাহ” সাহিত্যা-
মোদী পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাভা

জীবন-জলতরঙ্গ—শ্রীযামপদ মুখোপাধ্যায়। কমলা পাব-
লিশিং হাউস, ৮১ এ. হরিপাল লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য চার টাকা।

বাংলাদেশের একটি পল্লীগাম এই উৎপত্তাদের ঘটনাবলি। গ্রামখানি
সম্বন্ধে বইয়ের গোড়ার দিকে লেখক বলেন, “এর মাটিতে মাড়ে চারশো
বছর আগে ছিল যে বিজোহ-বহি—সারা ভারত তা আত্মনাৎ করে
ভিন্নরূপে ঐক্য এনে দিয়েছে জাতির জীবনে—অথচ এ মাটি রইলো
পবিজ হয়ে—পাণ্ডাণবিগ্রহে যে পবিজতা আরোপ করে গ্রামবাসী নিশ্চিন্ত
হয়ে আছে। জীবন এর নিঃশেষিত। নিঃশেষিত বলেই কি পবিজ।”

শ্রীচৈতন্যদেবকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ এই গ্রাম হৃদয়বাকাল ছিল
মোহাচ্ছন্ন, সাধিকতার নামে তামসিকতাকে আশ্রয় করিয়া জড়তাগ্রস্ত।
১৯০৬ সালের বঙ্গদেশী আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া সারা দেশের বুকের
উপর দিয়া বিভিন্ন সময়ে মুক্তি-আন্দোলনের স্রোত কত বিচিত্র পথে
আবর্তিত হইয়া চলিল, কিন্তু এই গ্রাম রহিয়া গেল যে তিনিরে সেই
তিনিরেই—মহাজাগরণের তরঙ্গোচ্ছ্বাস ইহার প্রান্ত-সীমাকে মাঝে মাঝে
ছুইয়া গেল মাত্র, কিন্তু পল্লীর শান্ত গল্বে জলকল্লোৎসবনি শ্রুত হইল
না।

মালী-পরিবারের পুরন্দর এই গ্রামেরই সন্তান—মহাত্মা গান্ধীর
অহিংসার আদর্শে অনুপ্রাণিত সে—দেশের মুক্তিই তাহার একমাত্র ভাবনা
ও জীবনের সাধনা। তাহার কঠোর ধ্যানিত হইয়া উঠিল গণজাগরণের উদ্যোগ
আহ্বান। কৈবর্ত গোরালা প্রভৃতি গ্রামের তথাকথিত নীচশ্রেণীর লোকেরা
নতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার চারিপাশে আসিয়া সমবেত
হইল—তখন গ্রামের প্রাচীনগণী প্রতিক্রিয়াশীল দলের নেতা শ্রীধর
ভূপেন সেন প্রভৃতির স্বার্থবুদ্ধির সহিত বাধিল পুরন্দরের প্রচারিত আদর্শের
সম্মত। এই সম্মত ও সংঘর্ষের ফলে পল্লীর সমাজ-জীবনে প্রবল আলো-
ড়নের স্রষ্টা হইল। ইহাতে অমৃত উঠিল বতটুকু, হলাহল উথিত হইল তার
চেয়ে ঢের বেশী—শেষ পর্যন্ত পুরন্দরের অদৃষ্টে জুটিল দেশ ও মানব-
সেবার চরম পুরস্কার—লাঞ্ছনা অপবাদ আর অপমান।

ওদিকে অভিজ্ঞাত মিত্রপরিবারের সন্তান মাত্রগণী অপূর্ব গ্রামের
অজ্ঞ, পদদলিত, অত্যাচারিত নর-নারীর কানে দিল সাম্যবাদের নবমন্ত্র।
নিয়ন্ত্রণের অনেকে তাহার শিক্ষার ব্যবসায়িক কার্যে মাতিয়া উঠিল।
শেষ পর্যন্ত চোরাকারবারী এবং মুনাকাধোরদের বড়বড়ের অপূর্বর বধন
ধরা পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন একদিন গভীর রাত্রিতে পুলিশের
চোখে ধূলা দিয়া সে গ্রাম পরিত্যাগ করিল।

পুরন্দর এবং অপূর্ব যেন জাতির মুক্তিসাধনার পরস্পরবিরোধী দুইটি
আদর্শের প্রতীক। এক জন জাতির মুক্তি চায় অহিংসার শান্তিপূর্ণ পথে,

বরানগর, কলিকাতা

দাদ ও কাউন্সেল
যোমার্থ মলম

কিউটা-টোন
পোড়া বেদনা ও চর্মরোগের জন্য

লিম মলম
খোস পাঁচড়া ও চলমানীর জন্য

আর একজন জনগণকে পুঞ্জিবাদের ধ্বংস-সাধনের কথা শুনাইয়া হিংসার রক্তাশ্রিত পথে মৃত্তি-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে উদ্বুদ্ধ করে। পুরন্দর ও অপূর্বের সংলাপে এই দুই আদর্শের বিশ্লেষণে লেখক মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু জাতির সর্বাক্ষয় মৃত্তি কোন পথে—তাহার মীমাংসা তিনি করেন নাই—মহাকাালের বুকে একটি বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছেন মাত্র।

“মহৎ জীবন মাত্রই বার্থ হইতে বাধ্য”—এই উক্তির সত্যতা আমরা পুরন্দরের জীবনের পরিণতিতে লক্ষ্য করি। তাহার জীবনের ট্রাজেডি মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে সত্য, কিন্তু তাহার প্রচারিত আদর্শ ও শিক্ষা যে ভিতরে ভিতরে গ্রাম-জীবনের একেবারে মর্দনহলে শিকড় বিস্তার করিতেছিল তাহার পরিচয় পাই এই উপস্থাসের উপসংহারে। ক্ষেত্র তৈরি হইয়াই ছিল, ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী স্বভাবচক্রের জয়তিধিকে উপলক্ষ্য করিয়া গ্রামে শোবা দিল অপূর্ব জাগরণ। মহাজীবনের জল-তরঙ্গ পল্লীর পল্লব উদ্বেলিত করিয়া আকুল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—কিন্তু এমনি অদৃষ্টের পরিহাস যে, পুরন্দর রহিল সেই উৎসবে অপাংক্তের হইয়া। পুরন্দরকে লেখক আঁকিয়াছেন সহনশীলতা ও ভিত্তিকার মূর্ত্ত প্রতীক-রূপে। পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে মেজবাবুর চরিত্রটি বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং অভ্রভেদী আভিজাত্য লইয়া অপূর্ব মহিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার অন্তিম রোগশয্যার বর্ণনাটি এমনি করণ মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ যে, মনে হয় যেন পশ্চিম আকাশে শেষ রশ্মিচ্ছটা বিকীরণ করিয়া বাংলার পল্লীর আভিজাত-সমাজের গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত হইতেছেন। তাহার মৃত্যু যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু নয়, এ যেন নতুন আদর্শের অভ্যাগমে বঙ্গপল্লীর জমিদারীপ্রথা-আত্মীয় সনাতন আভিজাত্যের চিরবিলুপ্তির পূর্ব-সূচনা।

এই উপস্থাসের আর একটি প্রধান আকর্ষণ লেখকের অনুভূতির রসে সিক্ত ‘রিলে কখন’গুলি। এগুলি স্থানে স্থানে (যেমন পৃ. ১৫৩, ১৫৪) এমনি মর্দস্পর্শী হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—মনে কেমন একটা অনির্দেশ্য আকৃতির সঞ্চার হয়।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

প্রিয়তমের চিঠি—শ্রীগোবিন্দর ভট্টাচার্য্য। মির্জাপুর,

১০, আমাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

গল্প-সঙ্কলন। এগারটি গল্প পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। লেখক ইতিপূর্বে অনুবাদ-সাহিত্যে হুনাম অর্জন করিয়াছেন, মৌলিক রচনায়ও তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ছোট গল্প রচনায়ও যে তিনি সিজ্জহস্ত তাহার প্রমাণও সমালোচ্য পুস্তকখানিতে পাইলাম। গল্প বলার কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়াই সাধারণ বিষয়বস্তুও তাঁহার লেখনীতে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রিয়তমের চিঠি, জগমোহনের বিবাহ, মিনতি, বিকলন, আদিম ও ষারোগানা-এতুতি গল্প যুগ্ম রসানুভূতির প্রকাশে সমৃদ্ধ। শেষ করিবার পরেও মনে যেন রেশ থাকিয়া যায়।

যুগ-বান্ধব — শ্রীহরিনন্দন মুখোপাধ্যায়। দি নিউ ওরিয়েন্টাল প্রেস, বরিশা। মূল্য আড়াই টাকা।

বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের অগ্নিতে গলিতে যে অগণিত সমস্তা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাসাখানি রচিত হইয়াছে। লেখক আশাবাদী, তিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন এবং সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সৌরেন, দীপক, স্বপ্না, চিত্রা প্রভৃতির জীবনালেখ্যের মাধ্যমে। কিন্তু ঘটনা-সংঘটনের

অভিজ্ঞের উপদেশ

উৎকৃষ্ট কেস্টেল নির্বাচনের সময়
ক্যালকেমিকোর

ক্যাষ্টরল

অভিজ্ঞের বিবেচনায় সবচেয়ে ভাল কেন?

কারণ, এর প্রত্যেকটি উপাদান বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত।

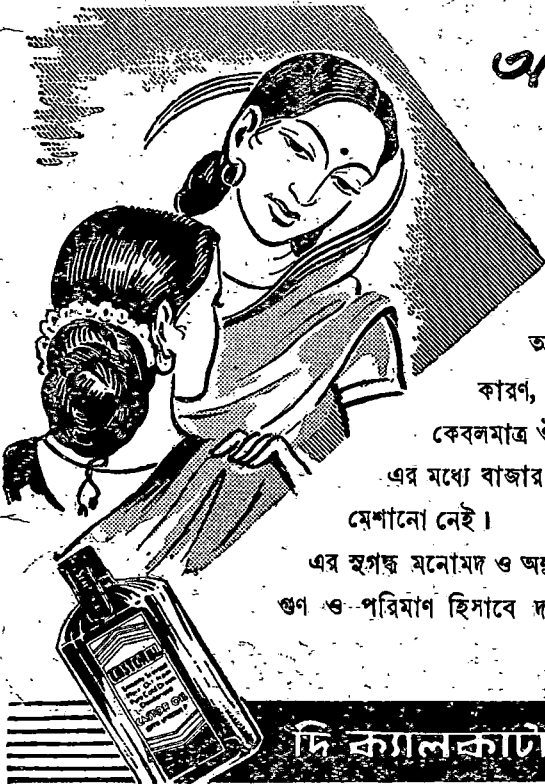
কেবলমাত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত খাঁটি দামী ক্যাষ্টর অয়েলে তৈরী।

এর মধ্যে বাজার প্রচলিত ক্যাষ্টর অয়েলের ত্রায় পাতলা বাদ্যাম তৈল-মেশানো নেই।

এর স্বগন্ধ মনোমগ্ন ও অল্পপম। ব্যবহারে চুল বাড়ে, টাকপড়া বন্ধ হয়।

গুণ ও পরিমাণ হিসাবে দাম সস্তা।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং. লিঃ কলিকাতা ২১



ক্রটিতে উপভাসের গতি পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে। লেখকের ভাষা ভাল, কিন্তু সংলাপ দীর্ঘ ও বহুভাগী।

ত্রিবিভূতিভূষণ গুপ্ত

জনগণের উপনিষৎ—ত্রিবোণেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-টি। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২২। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে ঈশ, কেন, কঠ ও যুগল—এই চারটি প্রধান উপনিষদের সরল বাংলা পঠানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ‘উপনিষদের যৎকিঞ্চিৎ’ শীর্ষক অধ্যায়ে উপনিষদের ঐতিহাসিক বিবরণ এবং এই সম্বন্ধে শোপেনহাওয়ার, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি দেশ-বিদেশের মনীষিগণের হস্তাক্ষিত অভিমত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক উপনিষদের আরম্ভে উহার সংক্ষিপ্ত নির্গলিতার্থ আছে। পাঁচটিকার কঠিন শব্দসমূহের সরলার্থ এবং নানা বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও উদ্ধৃতি স্থানলাভ করিয়াছে। স্থানবিশেষে ত্রিরাশিক, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুগধর মহাপুরুষগণের আধুনিক ব্যাখ্যা, বিবিধ ছন্দের সমঝার এবং কতিপয় রেখা-চিত্রের সন্নিবেশ প্রভৃতি ইহার বৈশিষ্ট্য। উপনিষদকে এইভাবে রূপদান বাংলা-সাহিত্যে অভিনব। বাঙালী হিন্দু ‘জনগণের’ মধ্যে এই ‘উপনিষৎ’ ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ত্রিরাশিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

“প্রসাদ”, “গণেশের কাহিনী” এবং “আমিতভূ” —ত্রিরাশিনাথ। ১২১, কালিদাস পতিতুটি লেন, কলিকাতা-২৬ হইতে প্রকাশিত। ১ম গ্রন্থ ১৯১ পৃ., মূল্য আড়াই টাকা, ২য় গ্রন্থ ১৩৯ পৃ., মূল্য দুই টাকা চার আনা এবং ৩য় গ্রন্থ (১০+৩৬) পৃ., মূল্য পাঁচ টাকা।

প্রথম গ্রন্থে “ত্রিরাশিনাথ” হইতে “উপদেশায়ত” পর্যন্ত নানা ছন্দে রচিত ছোট বড় আকারের পঁয়ত্রিশটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতা হিসাবে এইগুলি খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও ইহাদের ভাব ও তত্ত্ব সাধক-ছন্দ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থে গণেশ নামক এক রাখাল বালকের মাতৃসাধনার রূপক-চিত্রে মাতৃশরণপ্রতির মহিমা নিপুণভাবে কীর্তন করা হইয়াছে। গ্রন্থের শেষাংশে গণেশের মূখ্য দিয়া যে ঘাদন আদেশ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা স্নেহস্বামী নরনারী মাজেরই অনুধাবনযোগ্য।

তৃতীয় গ্রন্থে আশ্রুভাষামুকানী ‘আমি কে’?—এই প্রশ্নের আলোচনা পাইবেন। ৩১ পৃষ্ঠায় আছে: প্রকৃত ‘আমি’ চিৎ মহাসমুদ্রের তিনগুণ-শুষ্ণ ও তিনগুণদ্রুজ পুরুষপ্রকৃতিভাবাপন্ন একজোড়া বৃন্দ বা যুগ্ম জ্যোতিষ্কণী।

ত্রিউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বাংলা সাময়িক-পত্র, ২য় খণ্ড;

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, অষ্টম খণ্ড।

—ত্রিব্রজেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩, ১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য বর্ধাক্রমে আড়াই টাকা ও ছয় টাকা।

প্রতিবৎসা সাহিত্যিক, সম্ভ্রতি রবীন্দ্র-পুস্তক-প্রাপ্ত অক্লান্ত কর্মী ত্রিব্রজেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইখানি পুস্তক সমালোচনার্থ আমরা পাইয়াছি। বাংলা সাময়িক-পত্র, প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বে রবীন্দ্রসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। আলোচ্য খণ্ডে ১৮৬৮ হইতে ১৮৮৬ সন পর্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বৎসরাত্মকরূপে ব্রজেননাথ দিয়াছেন। শুধু কলিকাতা বা ঢাকা নহে, দূরতম নগর্য মক্কা শহর হইতেও যে কত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা এই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ব্রজেননাথ একান্ত নিষ্ঠা ও অপরিণীম আয়াসে এগুলির তালিকা—কখনও মূল পত্রিকা দৃষ্টে, কখনও বা সরকারী রিপোর্ট ও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নূতন পত্র-পত্রিকার সমালোচনার উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য, ইহাদের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিরও পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাংলা সাময়িক-পত্রের এরূপ নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক বিবরণ এই আমরা প্রথম পাইলাম।

আলোচ্য দ্বিতীয় পুস্তক, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা অষ্টম খণ্ডে চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বট্টাচার্য, ত্রিউমেশচন্দ্র মজুমদার, শিশিরকুমার বোষ, অধরলাল সেন, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেমস ষ্টয়ার্ট, কেলিক্স কেরী, হট্টা বিতালকার, হট্টা বিতালকার, জব্বারী, কমলাকান্ত বিতালকার, দীনেশচন্দ্র সেন ও সধারাম গণেশ দেউস্বর—এই কুড়ি জন সাহিত্য-সাধকের জীবনী ও কীর্তিকথা লিপিবদ্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে ‘জেমস ষ্টয়ার্ট’, ‘কেলিক্স কেরী’—ত্রিব্রজেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ত্রিউ



অমৃততাঞ্জন
সর্বপ্রকার বেদনায় 'আণবিক বোম্বার' ন্যায় কার্যকরী!
দাদের মলম
চর্ম রোগে 'পরমাণু শক্তির' ন্যায় কার্যকরী!
অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮-২৫-কলিকাতা ৭



স্বাগতি ১৮৯৩

৪ বছরের হিসাবে

১৯৫০-এর ভ্যালুয়েশন

গত ৪ বছরের হিসাব-নিকাশে 'হিন্দুস্থান'-এর উন্নত ভেদে পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উপর। সেই টাকা হইতে লাভ-সহিত সকল বীমাপত্রে রহর প্রতি হাজারকরা বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে :

মেসাদী বীমায়— } ৮- টাকা
আজীবন বীমায়— }

ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস এবং অগ্ৰাণ অনিশ্চিত ব্যয় সাপক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়া এবং স্বদের হার অজ্ঞিত হার অপেক্ষা ৫% কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে হিসাব নিকাশের এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে।

লগ্নাতে কমহারে স্বদ অর্জন, দুমূল্যের বাজারে অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী নিরাপত্তা, স্বদূঢ় আর্থিক সম্বলি এবং পরিচালন-বায়ো মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চলতি বীমা ৭৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল ... ১৫ " ৯৭ " " "
প্রিমিয়ামের আয় ৩ " ৪০ " " "
দাবী শোধ ৭ " ২০ " " "



হিন্দুস্থান
কো-অপারেশনাল
ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

সজনীকান্ত দাসের যুগ্মরচনা। এতদ্ব্যতীত সমুদয়ই একা ব্রজেননাথের। এই সকল সাধক বাংলা সাহিত্যে কত বিচিত্র কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা ক্রমশঃ ভুলিতে বসিয়াছি। বঙ্গ-সাহিত্য-সৌধ গঠনে তাঁহার ক্রি পরিমাণ মালমশলা ছোঁগাইয়াছিলেন তাহা এতদিন আমাদের জানা ছিল না। ব্রজেননাথ বহু পরিশ্রমে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তৎসমুদয় সংগ্রহ করতঃ আমাদের গোচরে আনিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কার বাঙ্গলার শিক্ষিত-সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে।

নেহরু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব—শ্রীপ্রমথনাথ বিশা। বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর কথা বিবরণী আজ নানাভাবে জানিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনুলুল এবং প্রতিকূল মতবাদও অনেক পোষণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি বা আলোচনা করি? আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক মূলতঃ নেহরু-রচিত গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার ব্যক্তিত্বকে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যক্তিরূপ, ব্যক্তিত্বের উপাদান, আশ্রয়িত, ভারত-আবিষ্কার, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, নেহরু-আবিষ্কার, দুই জীবন—এই কয়টি অনুলুলে লেখক এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। নেহরুর আশ্রয়িত জীবনী-সাহিত্যে একটি অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে নেহরু-জীবনকে বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হয়। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর বিভিন্ন বিষয়ে কোথায় মিল ও কোথায় অমিল রহিয়াছে তাহা আলোচ্য বইখানিতে লেখক ধারাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নেহরু একাধারে ভাবুক ও কর্মী। 'দুই জীবন' অনুলুলে এই বিষয়টির স্পষ্ট আলোচনা আছে।

এই পুস্তকখানিতে স্বল্পপরিমানে নেহরুর জীবনের বিভিন্ন দিক সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার কোন কোন মতবাদ সম্বন্ধে সমালোচনাও করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে সাধারণ পাঠকও নেহরুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দুইখানি এবং নেহরুর নিজের একখানি চিঠি ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

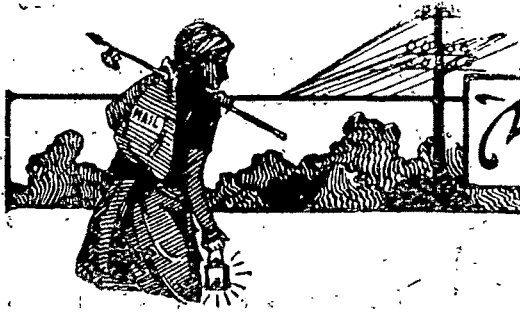
শ্রীঅরবিন্দ—নীরদবরণ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পল্লিচেরী। পৃষ্ঠা ৩২। মূল্য এক টাকা।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে পুস্তক-পুস্তিকা বর্তমানে কয়েকখানি লেখা হইয়াছে। বর্তমান পুস্তিকাখানি 'তাঁর জীবন-বৃহত্তর ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা, ছোটখাট কথা' সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। মৃত্যুর অন্তকাল পূর্বেও শ্রীঅরবিন্দ কিরূপ কর্মরত ছিলেন, বিখ্যাত 'সাবিত্রী' কাব্য সমাপ্ত করিতে তাঁহার কিরূপ আগ্রহ, উৎকণ্ঠা ও পরিশ্রম—ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। লেখক এসব কথাও পুস্তিকাখানিতে মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

সামাজিক ও নাগরিক জ্ঞান—শ্রীপ্রজ্ঞানকুমার প্রামাণিক। প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান, ২, থামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৪৮। মূল্য দশ আনা।

শৈশব হইতেই ছেলেমেয়েদের সামাজিক রীতিনীতি, আদবকায়দা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আর নাগরিক জীবনে আমাদের দায়িত্ব, পরম্পরের প্রতি আচরণ প্রভৃতি বিষয় এই বইখানিতে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। লেখকের সঙ্গে আমরাও বলি "শিক্ষা, সামাজিকতা শিক্ষার স্থান কেবল বিদ্যালয় নহে, গৃহও।" পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের অবগতপাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল



দেশ-বিশেষের কথা

অন্ধ্র, শ্রমিক বর্ষরাজ্য সভার সম্পাদক

শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মার ভাষণ

সম্প্রতি কাশীতে অনুষ্ঠিত সর্বোদয় সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করিয়া অন্ধ্র, শ্রমিক বর্ষরাজ্য সভার সম্পাদক শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মা উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত অরিল ভারত বৈজ্ঞানিক পরিষদের সম্পাদক শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মা এম-এ সহ কলিকাতায় আসেন। গত ২৭শে এপ্রিল ৬বি ব্রড স্ট্রিট সেবারতনে শ্রীনলিনীমোহন মজুমদারের উদ্যোগে এক সভার আয়োজন হয়। শর্ম্মাজী'র পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীনলিনী-কুমার ভট্ট বলেন যে, গত বৎসর অন্ধ্র শ্রমিক বর্ষরাজ্য সভার আমন্ত্রণে পশ্চিম গোদাবরী জেলার কব্বুর নামক স্থানে গিয়া তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মা শুধু যে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তাহাই নয়, তিনি ইহার প্রাণস্বরূপ। প্রথম যৌবনে শর্ম্মাজী ছিলেন লোকমাতা ভিলকের সহকারী। অবশেষে তিনি গাজীজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন এবং দেশের সেবা করিতে গিয়া বহুবার কারাবরণ এবং বহুবিধ মিথ্যাতন ভোগ করেন। সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শর্ম্মাজী অবশেষে গঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে অন্ধ্রদেশের টুনি নামক স্থানে 'শ্রমিক বর্ষসাবক সঙ্ঘ' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর তিনি গোদাবরী নদীর পশ্চিমতীরস্থ কব্বুর নামক স্থানে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে থাকেন এবং তখন হইতে তৎপ্রতিষ্ঠিত সংস্থানট 'শ্রমিক বর্ষরাজ্য সভা' এই নূতন নাম পরিগ্রহ করে। কিছুকাল পরে অন্ধ্রের দেশপ্রেমিক বীর শহীদদের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে গোদাবরী নদীর তীরে বীরমন্দির নামক ভবনটি নির্মিত হয়। বর্তমানে উহা শ্রমিক বর্ষরাজ্য সভার প্রধান কার্যকেন্দ্র। শর্ম্মাজী'র মেত্বাহীনে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি যে-ভাবে অন্ধ্রদেশের সমস্তলয়ের শ্রমিক এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে কল্যাণকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছেন তাহা আমাদের দেশে সেবা-বর্ষের ক্ষেত্রে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। সেবার ভিতর দিয়া গণসংযোগ স্থাপনই শ্রমিক বর্ষরাজ্য সভার আদর্শ।

শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মা দেহবর্তীরাণী এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথমেই বাংলার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—বাংলা একদা সমগ্র ভারত-বর্ষকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে, তাহারা সমগ্র বিশ্বের নিকট বাংলা ও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান ভারতে মনুষ্যগণের প্রবর্তন করেন রাজা রামমোহন রায়, আবার বাঙালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দই প্রথম পাশ্চাত্যে ভারতের বাণী প্রচার করেন।

শিখের রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গে শর্ম্মাজী বলেন যে, প্রথম যৌবনে চারিটি জিনিষ তাহাকে স্বাধীনিকতার অগ্রিমস্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লোকমাতা ভিলকের অনুগামী হইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। প্রথমতঃ বাংলার স্বদেশী আন্দোলন, দ্বিতীয়তঃ বঙ্গিমের বন্দোবস্তরূপ সঙ্গীত, তৃতীয়তঃ বাঙালী বীর-বালক ক্ষুরিয়ারের কাঁসি এবং চতুর্থতঃ বিপিনচন্দ্র পালের অগ্নিগর্ভক বক্তৃতা।

শ্রমিক বর্ষরাজ্য সভার আদর্শ বর্ণনাপ্রসঙ্গে শর্ম্মাজী ভারতীয় শ্রম দর্শনের সঙ্গে মাজ বাদের তুলনামূলক সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, যদিও শ্রমদর্শন এবং মাজবাদ এ দুটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন—প্রথমোক্তটি অধ্যাত্মবাদী এবং দ্বিতীয়টি জড়বাদী, তথাপি উভয়ের টেকনিকের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। শ্রমরাজ্য-ব্যাপ্যাত ভারতীয় অদ্বৈতবাদের মূল ভিত্তি এই যে, অমাদিকাল হইতে যে চৈতন্য-শক্তি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজিত তাহা এক এবং অদ্বিতীয়, আমরা যাহাকে সংসার বলিয়া জানি তাহা ঐ একের বহুবিচিত্র বিকাশ বা 'বিকার' মাত্র। আসলে ইহা মাত্র—ঐ মাত্রাকে মিথ্যা জানিয়া সেই একমেবাদ্বিতীয়ের প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধিই অদ্বৈতবাদী সাধকের চরম লক্ষ্য।

মাজ যে আদিম সাম্যবাদের hypothesis-এর উপর তাহার জড়বাদী দর্শনের গোড়াপত্তন করেন তাহাকেও বলা যাইতে পারে, অর্থনৈতিক অদ্বৈতবাদ। সেই সাম্যমূলক অর্থ-ব্যবস্থাবিশিষ্ট সমাজে শ্রেণীবিভাগ বা শোষণ-শোষিতের বলাই ছিল না। তার পর ক্রমে ক্রমে সেই অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতের সৃষ্টি হইল—পর পর আসিল রিনিময় প্রধায়ুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা, দাসত্ব, কুটুম্বত্ব, রাজত্ব, ব্রহ্মোদ্য গণ-

তত্ত্ব। অবশেষে আবার সমাজের ভেদ-বৈষম্য ঘুচাইয়া মৌলিক সাম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার—অবশ্য উন্নততর আকারে—নীতি প্রচার করিয়াছে মার্ক্সের দর্শন। শ্রেণীহীন সমাজ ও অর্থনৈতিক ‘একত্ব’ প্রতিষ্ঠাই মার্ক্সবাদীর লক্ষ্য।

ভারতীয় অধ্যাপকশাস্ত্র, এবং হেগেল ও মার্ক্সের দার্শনিক মতবাদ আলোচনা করিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ভারতীয় অদ্বৈতবাদ মার্ক্সের দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। মার্ক্স যে হেগেলের দর্শনশাস্ত্র অধিগত করিয়াছিলেন তাঁহার নিছক উক্তিভেদেই তাহার প্রমাণ আছে। তিনি বলিয়াছেন—‘আমি হেগেলের দার্শনিক মতবাদকে ওলট-পালট করিয়া দিয়াছি’ (“I have turned Hegel upside down”)। সুতরাং ইহা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, হেগেলের নৈতিক ‘একত্ব’ই (moral oneness) শেষ পর্যন্ত মার্ক্সের দৃঢ় ‘একত্ব’ (material oneness) পরিণত হইয়াছে। ইহা জানা কথা যে, হেগেল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর আরও কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক ভারতীয় বেদান্ত-দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

শতাব্দীখানেক শতাব্দীর এবং মার্ক্স উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক। কিন্তু নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া উভয়ে যে ‘টেকনিক’ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা হুবহু একই রূপ। উভয়ের দার্শনিক রচনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে ইহাদের পরস্পরের দার্শনিক সিদ্ধান্তের টেকনিকের মধ্যে একটা গভীর একাত্মতার সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে একটীমাত্র মিল দেখাইতেছি। শতাব্দীখানেকের মধ্যে নিত্য অনিত্য বস্তু বিচারের পর অদ্বৈতবাদী সাধক সংসারকে অসার মনে করেন এবং সাংসারিক ভোগস্বপ্নের উপর বীড়রাগ হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। তেমনি মার্ক্সবাদীও ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সমাজকে শ্রেণী-বৈষম্যকে অসার বলিয়া উপলব্ধি করেন এবং পুঁজিবাদের উচ্ছেদ-সাধনে সচেষ্ট হন।

উপসংহারে শর্মাঙ্গী বলেন, মোটামুটি আমার বক্তব্য হইল এই যে, মার্ক্স চিন্তাবাদী ভারতের নিকট সম্পূর্ণ অভিনব বা অপরিচিত নহে এবং হঠাৎ একদিন মাটি ফুটিয়া ইহা ইউরোপে গড়ান নাই। সুতরাং যথোচিত সমালোচনা এবং বিচার-বিতর্ক না করিয়া ইহাকে আমরা যেন অজ্ঞাত ‘বেদ’ বলিয়া গ্রহণ না করি।

দুঃখের বিষয়, দ্বারা আজ নিছকদের কয়লাসিঁই বলিয়া সর্গেরে আহির করিয়া মানাপ্রকার অমানুষিক এবং নিষ্ঠুরতাপূর্ণ আচরণ করিয়া থাকে তাহারা মার্ক্সকে তাঁহার সিংহাসন হইতে ধলাই টানিয়া নামাইয়াছে। আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে নিকরই আজিকার পৃথিবীতে তাঁহার এই সকল ভবাক্ষিপিত ঢেলা-চাঁচুগার দ্বারা অহুষ্ঠিত

হিংসাত্মক কার্যকলাপ দেখিয়া নিদারুণ মর্দ-গীড়া অনুভব করিতেন।

উপসংহারে শর্মাঙ্গী বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখি ভারতবর্ষ যুগে যুগে নতুন আদর্শকে আত্মসাৎ করিয়া নবরূপ দিয়াছে—সুতরাং মার্ক্সবাদও যে শেষ পর্যন্ত তাহাকে নিছক চিরন্তন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবে না এ বিশ্বাস আমার আছে। জড়বাদ নহে, আধ্যাত্মিকতায় মথোই যে ভাবী বিশ্বের কল্যাণ নিহিত ভারতের সাধনা বর্তমান যুগেও আবার নতুন করিয়া তাহা প্রমাণিত করিবে।

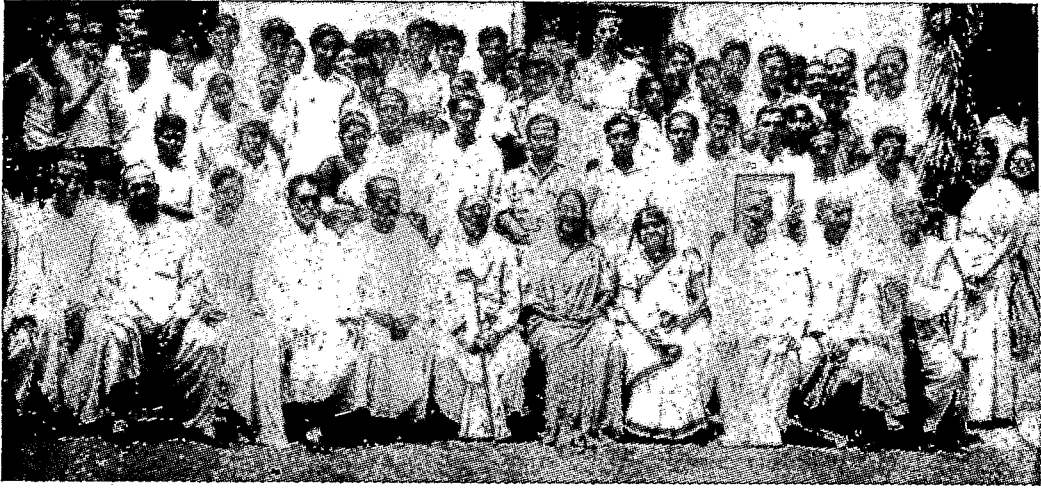
শর্মাঙ্গীর বক্তৃতার পর সত্য মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল, ত্রিযুক্তিৎ সেনগুপ্ত প্রভৃতি আলোচনার যোগদান করেন।

শর্মাঙ্গীকে বন্যবাদ দিতে গিয়া ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল বলেন, বঙ্গ মার্ক্সবাদের যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা যেমন মৌলিক তেমনি অভিনব—ইহা অনেকের চোখ বুন্দিয়া দিবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশ-বিদেশে সংস্কৃতির অশ্রুশীলন বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। হেগেল, কার্ট প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণ হিন্দুদর্শন ও তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে অধিগত করেন। মার্ক্স উহা দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত হন। ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি যে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার ফলেও রহিয়াছে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। মার্ক্সের *Letters of India* ইহার প্রমাণ।

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন

জেলা ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রাম রাজনারায়ণ বসুর জন্মস্থান। কালক্রমে তাঁহার পৈতৃক বসতবাটী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ত্রিযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে সভাপতি ও বোড়ালমিবাসী ত্রিযুক্ত বিজিতকৃষ্ণ মিত্রকে সম্পাদক করিয়া—রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিমন্দির নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডক্টর জামায়াপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডাঃ শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত সমিতির পৃষ্ঠপোষক। সমিতির উদ্দেশ্য রাজনারায়ণের জন্মভিটায় একটি স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ করা, শিক্ষা ও সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং তাঁহার পুস্তকাবলী পুনরুদ্ভাৱ করা।

সম্মত ইতিমধ্যেই স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করিয়া তদ্ব্যবস্থা একটি অদ্বৈতমিত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছেন। গত ২রা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর ত্রিহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। এই অমূল্যমূল্যে গ্রন্থাবলিগণের বিশেষ আগ্রহ পরি-



বোতাল গ্রামে নব-নির্মিত 'শ্রী রাজনারায়ণ স্মৃতি মন্দিরে'র উদ্বোধন অমুষ্ঠান

উপবিষ্ট (বামদিক হইতে)—শ্রীদাশরথি ঙ্গাচার্য, শ্রীহীরেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ সুবোধকুমার বসু, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীআলামোহন দাস, রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী, রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীমতী বদালা মুখার্জী, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তী, ডাঃ প্রশান্তকুমার বসু, শ্রীসুকুমার মিত্র, শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

লক্ষিত হইল। প্রায় এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে রাজ্যপালকে স্মৃতিমন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়।

বিভাগের ও গ্রামাঙ্গণের উদ্বোধন করিতে গিয়া রাজনারায়ণের উদ্দেশে প্রদ্বাঞ্জলি নিবেদন করিয়া রাজ্যপাল বলেন—“শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক ও দেশসেবক হিসাবে রাজনারায়ণ ভারতবাসীর হৃদয়ে এক নব-জাগরণের স্পন্দন তুলিয়াছিলেন। আজ দেশবাসী যে সেই মহাপুরুষের স্মৃতি-রক্ষায় যত্নশীল হইয়াছেন ইহা এক পরম স্তুত লক্ষণ।”

রাজনারায়ণ স্মৃতিরক্ষা সম্ভার সম্পাদক শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বলেন—“এই স্মৃতিমন্দির আরতনে সজ্জ হইলেও ইহা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের পৃষ্ঠার পরিপূরক।” তিনি আরও বলেন যে, স্মৃতিমন্দির প্রভৃতির নির্মাণকার্যে এ যাবৎ ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১৩০০০০ টাকা এবং উহা সম্পূর্ণ করিতে আরও অন্ততঃ ৬০০০০ টাকার প্রয়োজন। এই টাকার জন্য তিনি জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন।

শ্রীআলামোহন দাস মহাশয় স্মৃতিমন্দির নির্মাণকার্যের জন্য ২৫০০০ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

রাজনারায়ণের দৌহিত্র শ্রীসুকুমার মিত্র রাজনারায়ণের ব্যবহৃত প্রায় ১০ বৎসর আগেকার একটি পুরাতন চশমা, তাঁহার নিত্যসঙ্গী বাঈ সজ্জিত ছুইট ভৈলচিহ্ন এবং রাজনারায়ণের পিতা মদনকিশোর বসুর একখানি সংকীর্ণ ডায়েরী রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিরক্ষা সম্ভার কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন।

অমুষ্ঠানে রাজ্যপালের পত্নী শ্রীমতী বদালা মুখোপাধ্যায়,

শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তী, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ সুবোধকুমার বসু, ডাঃ প্রশান্তকুমার বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব, শ্রীহীরেন্দ্রলাল সরকার, শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিসমূহ উপস্থিত ছিলেন। অমুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হইতে “শ্রীমা” একটি আশীর্বাদী প্রেরণ করেন।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা

ভারতপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৬ই এপ্রিল কলিকাতায় আসেন। ১৭ই এপ্রিল কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের এক বিশেষ অমুষ্ঠানে তিনি সংবর্ধিত হন এবং রাজি সাড়ে আটটার সময় তাঁহার মধুর ধ্রুপদ সঙ্গীত প্রচারিত হয়। বহুদিন পরে তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলী পরিতৃপ্ত হন।

১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় ১৫৫ রঙ্গা রোডস্থিত ‘শ্রীত-বিভাগ শিক্ষারতনে’ শ্রীত বিভাগ সঙ্গীতনায়ক এক বিশেষ অধিবেশনে সঙ্গীতনায়ককে সংবর্ধিত করা হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ সঙ্গীতের উন্নতি, প্রচার ও শিক্ষাদান-কার্যে ত্রুতী থাকিয়া তিনি সমগ্র ভারতের সঙ্গীতজগৎকে কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কবিতুর্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবুর গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ‘বর-সরস্বতী’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এখনও তিনি বিষ্ণুপুর সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষের পদে আসীন থাকিয়া সঙ্গীতের উন্নতি ও নানাবিধ গ্রন্থ-প্রণয়নে রত আছেন।

১৯শে এপ্রিল ২২বি বলরাম ঘোষ ট্রাস্ট "ভবভারিণী নাট-মন্দিরে" গোপেশ্বরবাবুর আর একটি বিদ্যুৎ সংবর্ধনা-সভার আয়োজন হয়। অধ্যাপক শ্রীমদ্বন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সকল বিভিন্ন সভার অধিবেশনে গোপেশ্বর বাবু তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া তাঁহার তত্ত্বমণ্ডলী ও শিষ্যবৃন্দকে পরিভূক্ত করেন। সঙ্গীত-নাটক অঙ্গদেহে দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতীয় সঙ্গীতকে আরও গৌরবান্বিত ও উন্নত করুন, ইহাই আমাদের বাসনা।

হাজারিবাগে প্রবাসী বাঙালীদের বসন্তোৎসব

গত ২২শে মার্চ পরলোকগত অধ্যাপক ঞ্জামিৎহ ঘোষের "নির্দ্বন্দ্ব" ভবনে হাজারিবাগের কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি ও মহিলাদের সম্মিলিত চেষ্টায় "বসন্তোৎসব" অমুষ্ঠিত হয়। কবিত্ত্বর "নবীন" নাটিকাটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। শ্রীমতী অলকা নিয়োগির নেতৃত্বে স্থানীয় "সীতালি" স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ ইহাতে যোগদান করেন। অধ্যাপক মানিকচন্দ্র বুধোপাধ্যায় এই অমুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীতপতী মায়, ছাত্রা আরকট্ট, কল্পনা পুরকারহ, সীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্ঠপ্রভা সেন, তত্ত্ব চক্রবর্তী, অমিয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি একক, বৈভ ও সমবেত ভাবে গান করেন। নৃত্য, গীত, আবৃত্তি ইত্যাদির সমন্বয়ে অমুষ্ঠানটি সর্বাদমুগ্ধ হইয়াছিল। প্রবাসী বাঙালী ছাত্রা আরও বিভিন্ন সঙ্গমসভার অনেকে এই অমুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডক্টর শ্রীঅমরেশ দত্তের পুরস্কার লাভ

সম্রাট 'ইন্টার-নেশন্যাল এসোসিয়েশন অব পোয়েট, রোম' নামক সংস্থার কবিতা-নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক মধ্য-প্রদেশের সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রবাস অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅমরেশ দত্ত, এম-এ, পিএইচ-ডি'র "ক্যাপটিভ মোমেন্টস" নামক কাব্যগ্রন্থখানি পুরস্কারপ্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

ইটালীতে ভারতীয় দূতাবাস হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, এই উপলক্ষে ইটালীয় গবর্নমেন্টের মধ্যবর্তিতায় ডক্টর দত্তকে যে ডিপ্লোমা ও পদক পুরস্কার দিবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা শ্রীদেবী তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ৯ই ডিসেম্বর রোমের Siracusa নামক স্থানে যে সম্মেলন অমুষ্ঠিত হইবে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য ডক্টর দত্ত আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

ডক্টর দত্তের কাব্যগ্রন্থখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করিয়াই নির্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

নলিনীমোহন রায়চৌধুরী

গত ১২ই চৈত্র উত্তরবঙ্গের জমিদার-পরিবারের নলিনী-মোহন দেহভাগ্য করিয়াছেন। তাঁহার পিতা অন্নদাচরণ রায়চৌধুরী শিক্ষার উন্নতিকল্পে লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের এই জমিদারশ্রেণী সর্ববিষয়ে অগ্রণী হইয়া নানা-ভাবে দেশের মঙ্গল-জাগরণকে সাহায্য করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের জমিদারী অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার জমিদারীর কার্যপরিচালনা করিতে হইয়াছিল। কাশিমবাজারের রাজপরিবারের বাহারকন্দ পরগণার আয়েই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের দাম-মজের ব্যয় নির্বাহ হইত। পূর্ববঙ্গের স্বর্ধ্যাকান্ত, ব্রজেনকিশোর, রাণী দিনমণির দান বিখ্যাত।

নলিনীমোহন বাংলার সেই ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন। তার উপরে তিনি ছিলেন রাজনীতিক। রংপুর কনফারেন্সের অধ্যক্ষা সমিতির সভাপতিরূপে এবং পরে নেতাজীর সহকারী-রূপে তাঁহার চিন্তা ও কর্ম স্মরণীয়। নানাবিধ ব্যক্তি ও ব্যবসারে সাহায্য করিতে গিয়া তিনি আর্থিক কতিপাত হন এবং তৎকালিত হস্তিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হয়। কলে তাঁহার অকালমৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র ও পত্নীর উদ্দেশে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

কান্তিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষপ্রতিষ্ঠ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক কান্তিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বালীগঞ্জস্থ ভবনে গত ১৬ই বৈশাখ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রের অপূরণীয় কতি লইল। তাঁহার অসামান্য ব্যবহার ও চারিত্রিক মিঠার জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। তিনি বিপত্তীক ছিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ মিত্র

প্রবীণ সাংবাদিক ও পাটনার ইউনাইটেড প্রেসের সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মিত্র গত ২২শে বৈশাখ ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক-

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

"ভেরোনা হেলমিনথিয়া"

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়-স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের অস্ববিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ—২। আনি।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১ বি, গোবিন্দ আজী রোড, কলিকাতা—২৭

কোন—সিউএ ৮৮

গমন করিয়াছেন। যত্নর পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত কাজ করিতেছিলেন। দীর্ঘ ৫০ বৎসর যাবৎ তিনি সাংবাদিকতা-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন পুরাতন যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক এবং সে যুগে ১৯০৭ সালে যুগান্তরের সম্পাদকরূপে রাজকোষের অভিযোগে তিনি ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে তাঁহাকে জুজি দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

জনসাধারণের সহিত তাঁহার যোগ ছিল অতি বনিষ্ঠ। পাটনায় কেন, বিহারের সর্বত্র বাঙালী-অবাঙালী-সিঁকিঁশেষে প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তিই তাঁহার প্রতি গভীর ভ্রাতা পোষণ করিতেন। তাঁহার গুরুতর অসুস্থতার খবর পাইয়া বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ক্রীষ্ণক সিংহ সহ চারজন মন্ত্রী, বিধানসভার স্পীকার ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে ভ্রাতা নিবেদন করিতে গিয়াছিলেন এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শোকযাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন। যত্নর পর তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির আপিস ও বিহার বিভাগিষ্ঠ বহু রাণী হইয়াছিল। তাঁহার যত্নে সাংবাদিকশ্রেণীর ও বিহার-প্রবাসী বাঙালীদিগের যে কতি হইল তাহা পূরণ হওয়ার আশা অদূরপর্যন্ত। সর্বসাধারণের ভ্রাতাভাজন ও জ্ঞাতপক্ষ একরূপ ব্যক্তির বিরোধে মনঃস্তবঃই ব্যক্তি হইল। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমরা সহায়ত্ব জ্ঞানাইতেছি।

মেরিয়া মণ্টেসোরি

গত ২০শে বৈশাখ শিশুশিক্ষার নূতন ভাব ও কর্তৃনীতি প্রবর্তনকারিণী মাদাম মণ্টেসোরি সন্ধ্যারোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। যত্নাকালে তাঁহার বয়স ৮৯ বৎসর হইয়াছিল। ইটালীর এই কতৃা হল্যাণ্ড দেশে দেহভ্যাগ করিলেন।

শিশুর বাস্তবিক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়া মণ্টেসোরি তাঁহার শিক্ষা-ভ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গে “শিক্ষক” নামক মাসিক পত্রিকার গত ফাল্গুন সংখ্যায় ক্রীকিন্তুষণ বিশ্বাস লিখিত একটি ভব্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। মণ্টেসোরি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন দারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে কি ভাবে চিন্তা করিতেছেন তাহা নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে :

“মনস্তাত্ত্বিকরা বলেছেন যে, কর্ণচাপল্যাটা শুধু শিশুর প্রকৃতি নয়, তার আদিম প্রবৃত্তিও বটে। কাজেই মনঃ-

শিলতার সঙ্গে কর্ণতৎপরতার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। শিশুর কাছে জ্ঞানমুখী শিক্ষার চেয়ে কর্ণমুখী শিক্ষার মূল্য অনেক বেশী। কারণ শিশুদের যে-কোন অসুস্থতাই তার কাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ বোঝে। শিশুর ধ্যান-ধারণা মূর্খ হয়ে উঠতে চায় তার প্রকাশভঙ্গিমা; অর্থাৎ child's impression must be followed by expression. এই জন্যেই শিশুর হাতে রং তুলি, খেলার সরঞ্জাম, কাঁচি কাগজ মিলেই, শিশু সেগুলি নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। প্রথমে উদ্বেগজনকভাবে মাড়াচাড়া করতে করতে শিশুর মাঝার কাজের প্রেরণা আসে, অমনি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে শিশুর অক্লান্ত কল্পনা,—স্বল্পমাত্রক কাজের আনন্দে মগ্ন হলে উঠে শিশুরা। শুধু কি তাই? তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে লাগে কাজ করার দুনিবার পিপাসা। কাজের চাকার তার অক্লান্ত ইচ্ছা যেন ঘূরপাক বেতে থাকে, কাজের জন্ত অধির হয়ে উঠে শিশু। তাই একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, ‘For the young motion education is cardinal.’ কাজেই এই সুযোগ থেকে শিশুরা বঞ্চিত হলে তাদের মনে যে বিক্ষোভ সঞ্চিত হবে, তার কলে শিশুর মানসিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। এই জন্যে বৃন্দাদি বিদ্যালয়ে শিশুর অল্পবয়সের ছাঁচে ঢালাই করার প্রচেষ্টা হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পাঠ্যসূচীতে। প্রত্যেক প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই যতদূর সম্ভব শিশুদের সুযোগ দেওয়া হয় : ‘to think through the muscles’।

এই কারণে মনস্তত্ত্ববিদরা কর্ণকেন্দ্রিক শিক্ষাকে বিজ্ঞান-সম্মত বলে মনে নিয়েছেন। শিক্ষার আয়োজনে কাজের প্রয়োজন যে কত তা তাঁরা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁরা জোরগলায় বলেছেন যে, কাজটাই শিক্ষার উপলক্ষ মাত্র, বাস্তবিক উপায়ে জ্ঞান পরিবেশন করাই তার মূল্য উদ্বেগ। সেই জন্যে কাজের ভালমন্দ নিয়ে অকারণ মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নাই, লক্ষ্য ঠিক থাকলেই হ’ল। কাজ যাই হোক না কেন, লক্ষ্য সাধনে হবে যে, প্রতিটি কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে শিশুর আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ, কার্য-ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণশক্তি, শিশুর বাস্তবিক কৌতুহল এবং মনঃ-সংযোগ বাড়ছে কিনা, অথবা সাধনে সে তার কাজ করছে কিনা।

শিক্ষার এই বৈজ্ঞানিক ভাব নিয়ে গান্ধীজী সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তিনি তার স্বাবলম্বিতার কথাও চিন্তা করেছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে শিক্ষারতাকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন নি। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক সূত্রের সঙ্গে ঘুড়ে দিয়েছেন অর্থনৈতিক সমস্যাকে।”



বাড়
শ্রীসত্যোষ সেনগুপ্ত

অবনী ঘোষ, কলিকাতা।



চেতুয়া চিত্ররীতির ও প্রচ্ছন্ন বোধ্যমতের পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন—আয়ুধসহ দশাবতারের চিত্র
[ক্রীপক্ষানন রায়, কাব্যতীর্থ জ্যোতির্বিদ্যাদ প্রদত্ত]

বাক্যে। আর দেবী নয়। মজুমদার হয়তো চকল হয়ে উঠেছেন।...

রমলা ভৈরি হয়েই ছিল। সে দ্রুত নীচে নামছে। দোতলার সিঁড়ির বাঁকেই উৎপলের সঙ্গে দেখা। কি আপদ।

“এই যে।” উৎপল অস্পষ্ট ভাবে বললে।

“চিনতে পারছ তুমি?” রহস্য করেই উৎপল বললে।

এর জবাবে রমলা শুধু হাসল। সে হাসির না আছে রূপ, না আছে রঙ।

বললে নিশ্চয় গলায়, “অনেক দিন বাদে যে।”

“এলেই কি আর আজকাল সহজে তোমার দেখা মেলে রম্ম।” উৎপলের কণ্ঠে বেদনার স্বর বেজে উঠল।

“এসো—যেতে যেতে কথা হবে।” হৃৎকনেই সিঁড়ি বেরে নীচে নেমে গেল।

“তোমার সঙ্গে অনেক কথা ছিল যে।” উৎপল জোর দিয়েই বললে “চলো না কাকি হাউসে বসেই আলাপ হবে।”

রমলার জরুরি তাত্ত্বিক সত্ত্বও যুগের উপর সে ‘না’ বলতে পারল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে উৎপলের অহুসরণ করতে হ’ল। উৎপলের পাল্লার পড়ে শেষ পর্যন্ত ট্যান্ডি করেই মজুমদারের ওখানে পৌঁছতে হবে রমলাকে।...

...কাকি হাউসে হৃৎকনে যুগোযুগি বসেছিল—রমলা ও

উৎপল। রমলার চুলের গুচ্ছ হাওয়ার উড়ছিল। পূর্বনো দিনের স্বপ্ন-জড়ানো কত কথাই না মনে পড়ল উৎপলের, রমলাকে নিয়ে কত আশ্রয়ী হৃদয়, কত মধুর সন্ধ্যা, কত আলো-বলমল রাজি কেটেছে কাকি হাউসে, রেশোরায়, সিনেমায়। সেদিনও এমনি করেই হাওয়ার হুলত রমলার চূর্ণ কুন্তল, হাওয়ার এমনি ভেসে বেড়াতে তার দেহ-সৌরভ।

প্রথম কথা কইলে উৎপল, “গান-টান কি একেবারেই ছেড়ে দিলে নাকি?”

রমলার জিহ্বাৎ কুণ্ডিত হ’ল। যেন এ প্রশ্নের প্রশ্ন করা উৎপলের পক্ষে মত্তবড় একটা স্পর্জীর ব্যাপার। বাঁকা স্বরে জবাব দিলে রমলা, “চাকরি বজায় রেখে বড়টা পারা যায় তোমাদের ভাষায় যাকে বলে শিল্পচর্চা—তা করছি বৈ কি। শিল্পগিরই আমার হুখানা রেকর্ড বেরাবে।”

রেকর্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে উৎপল আক্ষেপের স্বরে বললে, “শেষ পর্যন্ত তুমিও চাকরিরগতপ্রাণ হয়ে উঠলে রম্ম?”

“আমার তো বাবার জমিদারী বেই যে বলে বসে আরামে সন্ধ্যাচর্চা করব।” বঙ্কর দিয়ে উঠল রমলা।

“সে তো আমাদের কারুরই নেই রম্ম। কিন্তু তা নেই বলে জীবনের চেয়ে জীবিকাকে বড় হয়ে উঠতে দেখ কেন?”

শিল্পীর কাছে শিল্প একটা ভগ্নাত্ম। তুমি চাকরি করছ সেটা বড় কথা নয়, তুমি গায়িকা সেইটেই তোমার আসল পরিচয়।” বলতে বলতে ভাববিহীন হয়ে উঠল উৎপল।

“শিল্পীর ভগ্নাত্ম।” শ্রবণের সুরে রমলা মুখ বাঁকাল, “গারাদিন তুলি আর রঙ নিয়ে নাড়াচাড়া করে মাসে ক’টাকা রাজগার কর তুমি?” বিজ্ঞপের ভীক্স ভীর হানল রমলা, “বজুরা ছবি দেখে শিল্পী বলে বাহবা দেয়, শুভাহুখ্যায়ীরা উৎসাহ দেন, সমালোচকরা কাগজেকলমে শিল্প-সম্রাটের আগনে বসিয়ে দেন—কিন্তু ছবি যেতে যা রাজগার হয় তাতে যে আজকাল কোন ভদ্রলোকের জামা-জুতোর ধরচাই কুলোর না উৎপল।”

মসীবর্ণ হয়ে এস উৎপলের মুখ। যুহুফুটে বললে, “শিল্পের পক্ষে তার আর্থিক মূল্যটাই তো বড় কথা নয় রম্ম।”

“ঐ মিথ্যে সাজনাটুকু আছে বলেই তো এমন করে আমরা বেঁচে আছি। একে আর যাই বল—শিল্পীর গৌরব বলে জাহির করবার চেষ্টা করো না উৎপল।” এই বলে উঠে দাঁড়াল রমলা, কিন্তু আর কথা নয়—হুঁটা ভিরিশে আমাদের গানের জলসা—এবার উঠতে হ’ল।

উৎপলের মনে কত কথাই না জমা হয়ে ছিল রমলাকে বলবার জতে, কিন্তু এর পর আর কথা চলে না।

রম্মা তরুণহিলাকে গান শোনাবার স্বপ্ন করে মজুমদার-সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যে নূতন অব্যাহত সুর হয়েছিল রমলার জীবনে, তার পরিণতি যে এই হবে—প্রথমে সে তা বুঝতে পারে নি। নাহ, যশ, অর্থ আর সম্মানের হুনিবার আকর্ষণে সে উজাগতিতে ছুটে চলেছিল প্রলোভনের বহির্গর্ভে। তার পর যখন নিজের সত্যিকার অবস্থাটা বুঝতে পারলে রমলা—তখন পেছনে ফেরবার আর উপায় ছিল না।

মজুমদারসাহেবের সঙ্গে আপিসের সম্পর্ক ছাড়িয়ে রমলার ঘনিষ্ঠতা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল—প্রথমে সে তা বুঝতে পারে নি। কিন্তু রমলার চমক ডাঙল সে সম্পর্কের শোচনীয় পরিণতির আশঙ্কায়। কিন্তু তখন ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। গানের রাজ্যে প্রতিষ্ঠা পাবে রমলা—এই মোহই তাকে হুনিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গভীর আবর্ভে। মজুমদার তাকে বিয়ে করবে এমন ইদিতও সে পেয়েছিল। কিন্তু এদের বরুণ জানতে রমলার তখনও দেবি ছিল। যখন নিজের সত্যিকার অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পারলে, তখন তার আত্মগোপন সীমা রইল না।

হুঁতাবনার যৌবনের দীপ্তি নিভে গেছে রমলার, চোখের কাঁড়লকে ছাপিয়ে উঠেছে কালির রেখা। দেখেই মনে হয় যেন ভিল ভিল করে অল্পশোচনার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে রমলা।

এই দুঃসময়ে মনে পড়ল উৎপলের কথা। কিন্তু বসন্ত-

বাহারের সোনালী দিনে যাকে সে অবহেলায় কিরিয়ে দিয়েছে, আজ ঝরা-পাতার দিনে তাকে ডাকতে যাবে কোন লজ্জায়। ..

প্রস্তুত হয়েই ছিল রমলা—এমন সময় ডাক এল মজুমদারসাহেবের ঘর থেকে।

“দেখুন মিস্ সাজাল, আমি অনেক ভেবে দেখলাম।” কোন ভনিভা না করে স্পষ্ট ভাবেই বলতে শুরু করলেন মজুমদারসাহেব, “আমার মনে হয়, আপনার দিনকণ্ডক বাইরে চলে যাওয়াই উচিত। যুসৌরি, দার্কিলিং কিংবা রাঁচি। তাতে আপনার শরীরও সম্পূর্ণ সেরে উঠবে আর মনও ভাল থাকবে।”

রমলা বিবর্ণ হয়ে এল—যেন ফাঁসির হুকুম শুনেছে।

হৃৎ কণ্ঠে বলতে চেষ্টা করলে, “কিন্তু।” মজুমদার থামিয়ে দিয়ে বললেন, “সে আমি আগেই ট্রিক করে রেখেছি। এই পাঁচশ টাকা কোম্পানী আপনাকে চিকিৎসাবাদ দিচ্ছে। তা ছাড়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে এলে আপনার মত মেয়ের পক্ষে কাজ একটা জুটবে মেওয়া মোটেই শক্ত হবে না মিস্ সাজাল।” টেবিলে চাপা দেওয়া ছিল পাঁচ শ টাকার নোট।

মজুমদার টাকাগুলো রমলার হাতে এসিয়ে দিয়ে বললেন, “আচ্ছা, আপনি আনুন।”

রমলা বিহ্বলিত হয়ে ব্যাকুল—এখন সে শুধু অবাহিতই নয়,—যে কোন সময় মজুমদারের ঘুণোল সে টান মেরে ধুলে ফেলতে পারে, এইজন্য মজুমদার তাকে তাড়াতাড়ি পারলেই বাঁচেন।

হিঃহিঃ, যুগায় লজ্জায় রমলার সারা দেহ রি রি করে উঠল। মজুমদারকে তার আগেই চিনতে পারা উচিত ছিল। তার আগেই বোঝা উচিত ছিল—এরা যাকে বিয়ে করে, তাকে ভালবাসে না। আর যার সঙ্গে ভালবাসার ভান করে, তাকে ঘরে নেয় না।

স্তম্ভিত, কুণ্ঠিত, ত্রিস্রমণ রমলা মজুমদারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু তার পর? চিরটা কাল যে তাকে লোকের টটকারি-বিজ্ঞপ্তি শুনতে হবে।

...রমলার পায়ের ভলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। টলতে টলতে বেরিয়ে এল সে। পৃথিবীর বুকে এখন রাজির ছাড়া নামছে—যেন তার জীবনের প্রানিকে ঢেকে দেবার জন্য ছুটে আসছে হায়ামরী বিভীষিকা।

একটি দিনের স্মৃতি

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

১৯১৮ সাল। তখন আমি আদি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগীতে আহাঙ্গাদি করি ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। ঐ বৎসরই আমার কবিতা প্রথম ভদ্রবোধিনী পত্রিকায় বাহির হয়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া একটি কবিতা লিখিয়া প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য প্রভেদে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গেলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশের গলির একটি বাগির কক্ষে রচনার পাণ্ডুপিলি লইয়া তিনি তখন ছিলেন; কিন্তু এই অপরিচিত বালকের প্রতি তাঁহার মনোযোগও কম হইল না। আগ্রহ সহকারেই কবিতাটি দেখিলেন, সন্তোষে দোষ-গুণ বিচার করিলেন ও ‘সন্দেশ’ কিংবা ‘শিশু’তে পাঠাইতে উপদেশ দিলেন। আমার বিফলতার দুঃখও সহদয়তার আশ্রয়ে ঢাকিয়া গেল।

সুদীর্ঘকাল প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক হিসাবে উপলব্ধি

করিয়াছি তাঁহার প্রজ্ঞা তাঁহাকে ভারতের প্রথম শ্রেণীর মনীষীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। শিক্ষাপীঠের সীমাবদ্ধতা ও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া তিনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাধারণ দেশবাসীর শিক্ষার ত্রুটি উন্মোচন করিয়া প্রবাসী, বিশাল ভারত ও মডার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকাজয় প্রবর্তন, সম্পাদন ও পরিচালনায় অসীম সাফল্যলাভ করিয়া গিয়াছেন। সর্বাঙ্গিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই-গুলি ভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সমালোচনার দৃষ্টির স্বচ্ছতা তাঁহার নির্ণাত বিষয় বিরোধী পক্ষকে মুক্ত করিয়া দিত। অশিবকে বর্জন করিবার ক্ষমতা তাঁহার মত পূর্ব কল্প লোকেরই ছিল। শুণীকে চিনিয়া কাছে লাগাইবার পটুতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। অনেক ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ্তি এই স্থিতিধীকে আর্শে বিচলিত করিতে না পারিয়া পরাস্ত হইয়াছিল। আধুনিক যুগের এই সভ্যসমুদ্র পুরুষকে প্রণাম করি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে পল্লীকর্মীর স্মৃতিকথা

শ্রীসত্যভূষণ দত্ত

কয়েকটি বছর চলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যার ঋণসদৃশ সৌম্য মুক্তি আশ্রম মানসপটে সুস্পষ্ট রেখাপাত করিয়া রহিয়াছে—যার অমর স্মৃতি অহাঙ্গুত বাস্তবজী আশ্রম কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে, সেই মহানুভব মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি উদ্দেশে প্রথমেই আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া তাঁহার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ছেলেবেলা হইতেই দেখিতাম পিতৃদেব 'প্রবাসী'র গ্রাহক ছিলাম এবং মাঝে মাঝে উক্ত পত্রিকার লেখাও পাঠাইতেন। তখনও কুলের পড়া শেষ হয় নাই। শহরে ছিলাম। মাস মাস। বাড়ী আসিয়া দেখিলাম পাড়ার ঘেরেরা বেশ ঘটা করিয়া "হর্ষের ব্রত" করিতেছেন। ব্রত দেখিয়া খেয়াল চাপিল এই ব্রত সব্বদে কিছু লিখিতে হইবে। ছোট একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বরাবর প্রবাসী-সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তিন-চার মাস পরে প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া মাঝে মাঝে ছোট ছোট লেখা 'প্রবাসী'তে পাঠাইতাম। কোনটা বা ছাপা হইত, কোনটা বা ফেরত আসিত।

এই সকল রচনার মাধ্যমে প্রবাসীর সহিত আমার যোগসূত্র স্থাপিত হইল এবং রামানন্দ বাবুর সহিত পত্রালাপেরও সুপ্রসঙ্গ হইল। ১৯২১ সনে ত্রিহট্টের 'জমশক্তি' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে কিছুকাল কাজ করিবার পর আমি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এবং ভক্তিবাজন রামানন্দের আশীর্বাদে মাধার লইয়া পিতৃদেবের আদেশে কুড়া শিল্পবিভাগের কার্যভার গ্রহণ করি। পিতৃদেব ৩শশীভূষণ দত্ত ১৯১৯ সালে কুড়া শিল্পবিভাগের পোড়াপত্তন করেন।

কুড়া শিল্পবিভাগের কার্যভার গ্রহণ করার পর চার-দিক হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহায়ত্ব পাঠাইতেছিলাম। ইহার দরুন নুতন উৎসাহ ও উত্তমের সহিত কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলাম। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাজের বিবরণ বাহির হইতে লাগিল। এমন কি এই ক্ষুদ্র পল্লী-প্রতিষ্ঠানটির কর্মপ্রচেষ্টার সচিব বিবরণ ১৩৩৪ সালের মাঘের প্রবাসীতে প্রকাশিত করিয়া সম্পাদক মহাশয় ইহার কর্মীদের মনে একটা নুতন প্রেরণা জাগাইয়া দিলেন। যাহাতে সমগ্র বাংলা ও পার্শ্ববর্তী সুরমা উপত্যকায় এই কুটির-শিল্পের প্রচার ও প্রসার হয় আমাদের দৃষ্টি তৎপ্রতি নিবদ্ধ ছিল, সেইজন্য নানা স্থানের শিল্পপ্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া হাতে-কলমে কাজ দেখাইয়া লোক-চিতে কুটিরজাত শিল্পের

প্রতি অহরাগ সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইলাম। ইহাতে যে বেকার-সমস্যার সমাধানের কভকটা সহায়তা হইতে পারে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করি নাই।

এই বৎসরই কান্তন মাসে শিলচর শহরে সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। কর্তৃপক্ষ ইহার সঙ্গে একটি বিরাট শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদেয় রামানন্দবাবু এই অস্থানে পৌরোহিত্য করিবার জন্য শিলচরে আসেন। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের আহ্বানে যথাসময়ে শিলচর শহরে উপস্থিত হইলাম। রামানন্দবাবুর দর্শনলাভ করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে বিশেষ ব্যাকুলতা অনুভব করিতে-ছিলাম। সভাস্থলে পৌছিয়া দেখি সভ্যমণ্ডপ লোকে লোকারণ্য। মঞ্চোপরি শুভ কেশ, শুভ শ্রুঙ্গ-বিমণ্ডিত, শুভ বেশ পরিহিত সভাপতি রামানন্দ সমাগীম। তখনও সভার কার্য আরম্ভ হয় নাই। তাড়াতাড়ি মঞ্চোপরি উদ্ভীয়া প্রণাম করা মাত্রই আমাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া কি বলিতে যাইবেন, এমন সময় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি প্রদেয় কামিনীকুমার চন্দ পরিচয় করাইয়া দিলেন। চন্দ মহাশয় পূর্বে হইতেই আমাকে বিশেষভাবে জানিতেন। আমি কামিনীকুমার উপস্থিত হইয়াছি জানিয়া রামানন্দবাবু অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আমি তাঁহার মহানুভবতা ও সহৃদয়তা মুগ্ধ হইলাম। আমার আদন প্রেস গেলারীতে নিষ্টিষ্ট ছিল, সেখানেই গিয়া বসিলাম।

সভার কাজ শেষ হইলে পর প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। রামানন্দবাবু ষোলগুলি ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে অবশেষে আমাদের ষ্টলে উপস্থিত হইলেন, এবং ধুব মনোযোগ সহকারে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের হাতে তৈরি শিল্পব্যাধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ষ্টল পরিভ্রমণ করিবার পূর্বে আমাকে পরদিন প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিয়া গেলেন। তিনি চন্দ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতে চা-পর্ব শেষ করিয়াই চন্দ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলাম, সেই সকালবেলায়ই বেশ ভিড় জমিয়াছে, কয়েকজন মহিলাও আসিয়া হাজির হইয়াছেন। বিভিন্ন অনুরূপ ও প্রতিষ্ঠানে পৌরোহিত্য, বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদির অহরোহ লইয়াই তাঁহার আসিয়াছেন—ধুব অল্প সময়ই আমার সঙ্গে আলাপ হইল। কিন্তু তাঁহার হিত এবং মনোহারা বাস্তবজী আশ্রম আমার কানে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। "হিতং মনোহারী চ হর্ষতং বচঃ" কথাটির যথার্থ আমি রামানন্দবাবুর সহিত

আলাপ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। পূর্বে রামানন্দবাবুকে আমি কালে ভদ্রে পজা লিখিতাম, কিন্তু সুরমা উপভ্যক্তা সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হওয়ার পর যখন যখন চিঠি লিখিতে লাগিলাম। আমার পরম সৌভাগ্য যে, কখনও তাঁহার নিকট হইতে পত্রের জবাব পাইতে বঞ্চিত হই নাই। শিলচর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি আমাকে যে পত্র লেখেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

২-১, টাউনসেণ্ড রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ বাং
২-৬-২৮।

শ্রীভিত্তিকন্যেয়,

তোমার চিঠি ঠিক সময়ই পাইয়াছিলাম। উত্তর দিতে বড় বিলম্ব হইল, ত্রুটি মার্জনা করিবে।

তুমি যে আমার সম্বন্ধে কোন অসম্মানকর মন্তব্য করিবে, এ কল্পনাও আমার মনে কখন উদিত হয় নাই।

জিপুরা গাইড বোর্ড হয় আমাদের আসে। কিন্তু আমি প্রায় কোন কাগজেই পত্রবার অবকাশ পাই না। আমার মৌখিক বক্তৃতা তোমার ভাল লাগিয়াছিল আমিরা স্তম্ভী হইলাম। সুরমা সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের এক অহরোধ এখানে আসিয়া পাইয়াছিলাম মৌখিক বক্তৃতাগুলি লিখিয়া দিবার জন্য। কিন্তু তাহা ঠিক মনে না থাকায় এবং সময়ের অভাবে লিখিয়া দিতে পারি নাই।

তোমার পিতৃদেবের রক্ত ও তাঁহার জীবনীর cutting-টি পাঠাইতে পার। ব্যবহার করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু দেবী হইলে রাগ করিও না।

শুভাকাজী—

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—

তোমার সহিত শিলচরে হুঁদণ্ড গল্প করিতে না পারায় মনে অতৃপ্তি বোধ করিয়াছি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অভঃপর ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে কলিকাতা মিছিল-ভারত শিল্প প্রদর্শনী ও বলিরহাট (২৪ পরগণা) প্রদর্শনী হইতে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান আসিল। বলিরহাট প্রদর্শনী কমিটি আমাদের ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি জানাইয়া বিশেষ অহরোধ করিলেন যেন একজন কর্ম্মীসহ কলিকাতা যাই। সে সময় একদিন আমার আত্মীয়, মহার্ঘ ব্রিটিশ পত্রিকার তখনকার অধ্যক্ষ সহঃ সম্পাদক ডুপেন্সলাল দত্ত সহ রামানন্দবাবুর ওয়েলসলি প্রিটং বাড়িতে ষাই। হুঁদ্যাক্ষমে

তিনি বাহিরে থাকায় সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই। কিন্তু ‘প্রবাসী’তে সেবারও আমাদের প্রতিষ্ঠানের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশিত হয়।

কুণ্ডা শিল্প বিদ্যালয়টির প্রতি তাঁহার অল্পএহ-দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ ছিল। বিদ্যালয়ের কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিবরণ তিনি বার বার সমাদরে প্রবাসীতে স্থান দিয়াছেন। এমন কি সময় সময় তিনি আমার লিখিত পত্রের অংশবিশেষ প্রবাসীতে ‘বিবিধ প্রসঙ্গে’ মুদ্রিত করিয়া পত্রের গুরুত্ব বাড়াইয়া দিয়াছেন। গঠন-মূলক কর্ম্মের প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল ইহা তাহারই প্রমাণ এবং সূদূর মক্কাবনের একটি ক্ষুদ্র গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের অগণ্য কর্ম্মী হইয়াও যে আমি তাঁহার স্নেহলাভ করিতে পারিয়াছিলাম সেটা আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

প্রবাসীর দৌলতে কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়ের কথা দেশের শিক্ষিত-মহলে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। একবার কুমিল্লার অহুষ্ঠিত মিছিল-বদ মহিলা সম্মিলনীতে শ্রীহুতা উম্মিলা দেবী ও ডক্টোরাতিম্বদী গাঙ্গুলী আসেন। সেখানেও একটি বিরাট শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন হয়। তাঁহারা বলেন যে, কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়ের বিবরণ প্রবাসীতে পড়িয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি রামানন্দবাবু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অহুরাগের কথা বিশেষ ভাবে বলেন।

আমাদের শিল্পবিদ্যালয়ের কাছে তিনি কিরূপ উৎসাহ দিতেন তাহার মিতর্দর্শন-স্বরূপ তাঁহার একখানা পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :

কল্যাণীয়েয়,

আপনার প্রেরিত পাসেলটি কাল পাইয়াছি। জিনিষগুলি বেশ সুন্দর।

শিল্পবিদ্যালয়ের এক একটি বিভাগের এক একখানি ফোটো-গ্রাফ পাঠাইলেই হইবে। প্রেক্ষিতা দেখাইবার দরকার নাই। কারিগররা যখন কাজ করে সেই সময়ে ফোটোগ্রাফ তুলিলেই হইবে। ফোটোগ্রাফগুলির সঙ্গে শিল্পবিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও দিবেন এবং কি কি জিনিষ তৈরি হয়, কাটি-কিরূপ, এবং কলিকাতায় বা অন্যত্র বিক্রয়ের বন্দোবস্ত আছে কি না, লিখিয়া দিবেন। জিনিষগুলির দামের একটি তালিকা দিলেও মঙ্গল হয় না।

মঙ্গলাকাজী

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামানন্দবাবু নামা দিক দিয়াই বড় ছিলেন। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের যে দিকটির সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল আমি তাহারই আভাস দিবার চেষ্টা করিলাম। দেশের

যেখানেই গঠনমূলক কাজ হোক না কেন, তাহা তাঁহার সহানুভূতি লাভে সক্ষম হইত। মাহুই হোক, আর প্রতী-
ষ্ঠানই হোক ছোটকে ছোট বলিয়া যে তিনি তুচ্ছ করিতেন
না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি তাহার সাক্ষ্য দিতে

পারি। বাবীম তারতে আমরা যদি আতিগঠনমূলক কর্মে
আত্মনিয়োগ করি, কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন করিয়া পল্লীর
উন্নয়নে মনোযোগী হই তাহা হইলে রামানন্দের আত্মার
পরিভূক্তি হইবে।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্প্রতি দেশে গিয়েছিলাম। দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোক-
দের সঙ্গে অনেক বিষয় বোলাবুলিভাবে আলোচনা কর-
বার সুযোগ পেয়েছি। সকলের মুখেই অভাব, অভিযোগ,
নানারকমের অসুবিধার কথা শুনেছি; প্রত্যেকেরই কথা
শুনে মনে হয়েছে কেউই সুখে শান্তিতে নেই—সকলেই যেন
অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছে। যাদের অর্থ আছে তারা
অত্যন্ত অনেক রকমের অসুবিধার অশান্তিতে আর্হে, যাদের
অর্থ নেই, তাদের ত কথাই নেই, বেঁচে মরে আছে। এদের
সংখ্যাই বেশী।

বেশীর ভাগ লোক স্বাধীনতার ‘ব’ও বোঝে না, উপলব্ধি
করা ত দূরের কথা। তারা বরং স্বাধীনতাকে অতিলম্পাত
দিয়েছে। এত বড় একটা “নির্বাচন পর্ব” শেষ হ’ল; কত দল
উপদল আসরে নামলেন, দেশের জনসাধারণ তাদের নামও
বলতে পারে না—তারা কেবল ‘কংগ্রেস’ের নামের সঙ্গে
পরিচিত, কিন্তু তা বলে তারা সকলেই কংগ্রেসের পক্ষে নয়;
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেকের অনেক রকমের অভিযোগ।
প্রধানতঃ “যুক্তফ্রন্টের” কথা অসুদারেই বেশীর ভাগ লোক
ভোট দিয়েছে। দল উপদলের বা বাদের ভোট দিয়েছে
তাদের বিষয় কিছুই জানে না। কংগ্রেস-ফ্রন্টগণকে এক জন
কংগ্রেসপ্রার্থীর বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারা বললেন
প্রার্থীর যোগ্যতা সম্বন্ধে তারা কিছুই জানেন না—যেহেতু
তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী, তারা সেইজন্য তাঁর পক্ষে প্রচারণা
করছেন। অত দলের প্রার্থী সম্বন্ধেও একই উত্তর পেয়েছিলাম।

কংগ্রেসের পক্ষে বিপক্ষে ভোট দেবার অনেক যুক্তি
শুনেছি। কেউ কেউ বলেছিল কংগ্রেস পার্টির দাম বাড়িয়ে
দিয়েছে সেইজন্য কংগ্রেসকে ভোট দেবে। আবার কেউ
কেউ বলেছিল, ‘কন্ট্রোলে’র দোকানে সমস্ত দিন অপেক্ষা
করেও একখানা কাপড় পাওয়া যায় না—অথচ ‘বাবু’রা
পেছন দিক দিয়ে ঢুকে কাপড় নিয়ে যান—এই কারণেই
কংগ্রেসকে ভোট দেবে না। আবার কেউ কেউ বলেছিল—
আমরা ‘ফুদে’ কংগ্রেসীদের কথা শুনব না, মজীরা এসে যদি

ভোট চান আমরা ভোট দেব। এই রকম অনেকের মুখে
অনেক রকম কথা শুনেছিলাম। এখন নির্বাচনের পরের কথা
হচ্ছে—নির্বাচনের জট কত লোক কত টাকা অকাতরে খরচ
করলেন, কিন্তু পল্লীর উন্নতির জট কেউ এক কপর্দকও ব্যয়
করলেন না। কেউ বা যদি কিছু করে থাকেন তা অত
খরচের তুলনায় খুবই কম। জনসাধারণ জানে না কে
নির্বাচিত হ’ল, কে হ’ল না—কার কি গুণ।

গত বৎসর কৃষি ও বাণিজ্যবিষয়ক ঐ অঞ্চলে গিয়েছিলেন
তখন পুরস্কারলাভের আশায় ‘কম্পোষ্ট’ তৈরি করবার
‘হিটিক’ পড়ে গিয়েছিল; অনেকেই পুতুর, ডোবা, ষাল
ইত্যাদি থেকে কচুরিপানা তুলে পাড়ের ওপর জমা করেছিল,
বাণিজ্যবিষয়ে দেখে আমলপ্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত
কেউ কম্পোষ্ট তৈরির দিকে তেমন মনোযোগ দিলে না—
তবে অনেকেই পুরস্কার পেয়েছিল। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে
কত টাকার ‘প্রদ’ হয়েছে জানি না; তবে নিজের অঞ্চলের
অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে বিশেষ কোন স্বাস্থ্য ফল হয়
নি। এবারে আরও পুতুর বা ডোবার পাড়ে কচুরিপানার
একটা গাদাও দেখি-নি। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,
সকলের কাছেই এক উত্তর পেয়েছি—সরকারকে বলুন
আমাদের “জাওনা” গুলো কেটে দিক, আমাদের আর কিছু
চাই না।

আজকাল পুরস্কারের হতাশা চলেছে, কিন্তু তার কি ফল
হয়েছে বা হচ্ছে? গত বৎসর কাছাকাছি অঞ্চলের এক জন
আলুর ফলন দেখিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন।
এখন সে সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে। এ বৎসরও
এই অঞ্চলের এক জন ফলন দেখিয়ে পাঁচ হাজার টাকা
পুরস্কার দাবি করছেন। শুনছি তাঁর ওকনে কর্তৃপক্ষ বিধান
স্থাপন করতে পারছেন না; বিষয়টি কতদূর গভাবে কে
জানে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই রকম পুরস্কার দিয়ে স্বাস্থ্য কি
ফল পাওয়া যাচ্ছে কি? গত বৎসর যে এলাকায় পুরস্কার
দেওয়া হয়েছিল, এ বৎসর সে এলাকায় আলুর চাষ বেড়েছে

কি? সে এলাকার আলুর গড় ফলন বেড়েছে কি? যিনি গড় বৎসর পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি কি এই বৎসর আলুর চাষ বাড়িয়েছেন, তাঁর ফলনই বা কত হয়েছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরের উপরই পুরস্কার দেওয়ার সার্থকতা নির্ভর করে। হ'এক জন ফলন বাড়ালে দেশের কিছুই উপকার হবে না; দেশের গড় ফলন বাড়লেই দেশের উপকার হবে। গড় ফলন বাড়ানোর উপায় অল্প রকম—যথা, উপযুক্ত সময়ে প্রত্যেক অঞ্চলের জম উপযুক্ত শ্রেণীর উপযুক্ত পরিমাণ বীজ সরবরাহ, সার সরবরাহ, জল সেচনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। বীজ ও সার সরবরাহ লম্বক্রে কৃষকদের অভিযোগ যথেষ্ট আছে—কিন্তু সে অভিযোগ দূর করার দিকে কর্তৃপক্ষের কোন মনোযোগ নেই। এবার যিনি সর্বাঙ্গীণ অধিক ফলনের জন্য পুরস্কার দাবি করেছেন তিনিও বলছেন—আলুর চাষে তাঁর যথেষ্ট লোকসান হবে। তিনি পুরস্কারের জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে আলুর চাষ করেছিলেন এবং সেই চাষের জন্য যে পরিমাণ খরচ করেছেন সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির ফলন বিক্রয় করে তাঁর খরচ উত্তল হবে না—লাভ ত দুয়ের কথা। এই রকম খরচ করে ফলন বাড়িয়ে লাভ কি? আর পুরস্কারের সার্থকতাই বা কোথায়?

কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করলে ফলন বাড়ে। ধারা কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করেছেন তাঁরা ফলন বেশী পেয়েছেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হয়েছেন। কিন্তু তার ধারা দেশের মোট উপকারের পরিমাণ কতটুকু বেড়েছে? ফলন দেখে পুরস্কার দেওয়া হোক আপত্তি নেই; কিন্তু স্থায়ী ফল পাবার জন্য অর্থাৎ কসলের গড় ফলন বাড়ানোর জন্য অল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কৃষি ও খাদ্যসচিব বলেছেন—কৃষির উন্নতির জন্য জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যিক। কথাকাটা খুবই ঠিক; কিন্তু সর্বপ্রথমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা দরকার, তাঁরা কিন্তু সেই আদর্শের পথেই চলছেন। উপরিওলাদের সংখ্যা এখন খুব বেশী। তা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষজ্ঞ এখন আছেন। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে তাঁদের খনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই বললেই চলে। কৃষক সম্প্রদায়ের অভাব, অভিযোগ, অসুবিধার কথা তাঁরা জানেন না, জানবার চেষ্টা করেন না, বা কেনেও তার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না। কৃষকদের মতামত তাঁরা গ্রহণ করেন না, জানবারও চেষ্টা করেন না। 'রাইটাস' বিল্ডিংসে' বসেই তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, পল্লী অঞ্চলের অবস্থা না কেনে নিয়ন্তর কর্মচারিগণের উপর আদেশ-জারি করেন। কোন্ কোন্ উপরিওলা, কোন্ কোন্ বিশেষজ্ঞ, কোন্ কোন্ পল্লী অঞ্চলে বৎসরে কত দিন অবস্থান করেছেন—এই প্রশ্নের উত্তর দাবি করা যেতে পারে না কি? বিধান পরিষদে কেউ

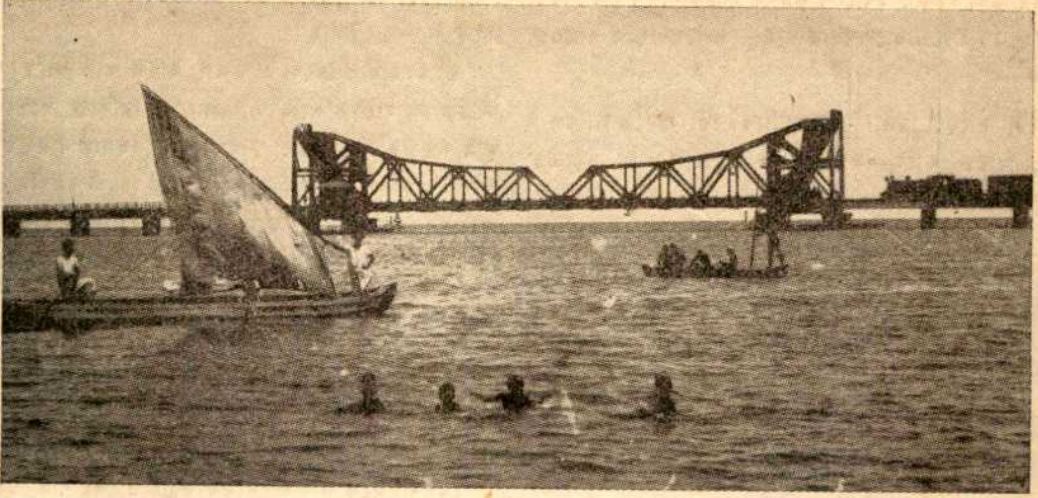
এই প্রশ্ন করতে পারেন। পাশ্চাত্য দেশ থেকেও নানা কাজের জন্য অনেক বিশেষজ্ঞকে আনানো হয়েছে—তাঁরা না জানেন এ দেশের ভাষা, না জানেন এ দেশের অবস্থা, না জানেন জনসাধারণের মনের পরিচয়। এরা পল্লী অঞ্চলে না গিয়েই কলিকাতার 'রাজার হালে' থেকে পল্লী অঞ্চলের উন্নতির নানা রকম পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন—এঁরা দেশের (পল্লী অঞ্চলের) লোকের মতামতও গ্রহণ করেন না—এঁদের সব আলোচনা হয় রাইটাস' বিল্ডিংসে—পল্লী অঞ্চলে নয়। পল্লী অঞ্চলের লোকেরা (কৃষক সম্প্রদায়) জানেন না—কৃষি বিভাগের স্বরূপ কি? কোন্ বিষয়ের জন্য কে বিশেষজ্ঞ আছেন—এ সম্বন্ধে পল্লী অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকের কোন জ্ঞান নেই। উপরিওলাদের সঙ্গে পল্লী অঞ্চলের লোকদের কিরূপ যোগাযোগ আছে "মুগান্তরে" প্রকাশিত নিয়োক্ত চিঠিখানি থেকেই তা স্পষ্ট বুঝা যাবে। পল্লী অঞ্চল যে তিমিরে ছিল, এখনও সেই তিমিরেই আছে, বরং তিমির জন্মণ: পাচত্তর হচ্ছে। কর্মচারীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে "লাল কিতার" (Red tapism) বহরও বেড়েছে। এখন উপর থেকে একটা নির্দেশ এসে পৌছতে পাঁচ হ'টা আপিস ঘুরে যেতে হয়। যখন পৌছয় তখন সে নির্দেশের আর কোন মূল্য থাকে না। একথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। মুগান্তর থেকে উদ্ধৃত পত্রখানি এই:

“কৃষি-বিভাগের অব্যবস্থা

বঙ্গবিভাগের পর সাধারণ পল্লীর প্রতিটি অধিবাসীর সুবিধার্থে কৃষি বিভাগকে বহুলাংশে সম্প্রসারিত করা হয়, তখন হইতেই প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায় এবং প্রতি থানায় ও ইউনিয়নে কৃষি কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—হাওড়া ও হুগলী এই দুই জেলায় জন্য একজন কৃষি-অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। উপরন্তু তাঁহার অফিস এই দুই জেলার বাহিরে—আলিপুর এগারসন হাউসে অবস্থিত। ইহাতে আমাদের যে কত অসুবিধা তাহা একবার কর্তৃপক্ষকে তাবিয়া দেখিতে অস্বরণ্য করি। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে দক্ষিণ কলিকাতায় যাইতে হইবে। হাওড়া-হুগলী জেলার কৃষি-অধ্যক্ষ মহাশয় আলিপুরে বৈদ্যাতিক পান্থার নীচে বসিয়া আমাদের এই দুই জেলার “অধিক খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনার” সাক্ষ্য লাভে আমাদের যে কি ভাবে সহায়তা করিতেছেন ও করিবেন—ইহা আমাদের দুহির অগম্য। তাঁহার অফিস ত্রীরামপুরে অবধা হাওড়া সদরে হওরাই বাহুল্য। বর্তমান ব্যবস্থা যেমন অসঙ্গত তেমনই অপ্রোভনীয়।

ত্রীকণীক্সনাথ দত্ত

পোঃ—হরিপাল, জেঃ—হুগলী”



রামেশ্বর দ্বীপ ও ভারতের মধ্যে সংযোগ-সেতু

ধনুকোটি ও রামেশ্বর

শ্রীসাধনা চট্টোপাধ্যায়

অচিন্তনীয় হইতে গাড়ী ছাড়িবার কথা রাজি লাভে নব্বটার, কিন্তু ধবর লইয়া জানা গেল এগারটার পূর্বে গাড়ী আসিবারই কোম সম্ভাবনা নাই। অতএব প্লাটফর্মের চলচ্চিত্র দেখা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর রহিল না।

এ চিত্র আমার চিরদিনই ভাল লাগে। ইহাতে শুধু রূপ আর রস মছে, গন্ধ ও স্পর্শও আছে; আর অভিনেতা না হইয়া শুধু দর্শক হিসাবে দেখিলে এ চিত্র পরম কোতূহলকর। প্রচুর লটবহর ও সম্ভ্রামসম্পত্তি লইয়া প্রৌঢ় গৃহস্থানীর ব্যভি-ব্যস্ত ভাব, সর্কায়ে গাড়ীতে উঠিয়া আকাজিক হান এত্ন করিবার জন্ত বালক, যুবা ও বৃদ্ধের ঠেলাঠেলি, যাত্রীদের উল্লাস বা দীর্ঘশ্বাস, মোটবাহীর কোলাহল ও যাত্রীর সহিত বচসা এ সমস্তই যেন বিখজগতের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। এই সব কোলাহল, অনিশ্চয়তা ও চঞ্চলতার অন্তরালে কোথাও বা মাতা ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে করিয়া স্বর্ণমুখ উপভোগ করিতেছেন, আবার কোথাও বা কোনও ভরুণ ও ভরুণী একান্তে বসিয়া কলমায় ও স্বপ্নের আমেজে বিভোর হইয়া রহিয়াছে।

দক্ষিণাভ্যে আসিয়া ঠেশনে ঠেশনে বাঙালী যাত্রী বোঁকা মজাপত্ত অত্যাগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সারা প্লাটফর্মের চোখ বুলাইয়াও কিন্তু এখানে একটি বঙ্গসন্তানকেও খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু যাহাকে পাইলাম সে পাণ্ডা—আর্ধ্যবর্ডার যাত্রী খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। হিন্দীতে তাহার সহিত ভাবের আদানপ্রদান চলিতে পারে, আর দুই-একটা ভাড়া ভাড়া বাংলা কথা বলাও তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়।

পাণ্ডা রামেশ্বর বামের; ঠিক পাণ্ডা নয়, পাণ্ডার কর্মচারী—বোঁবা হয় কমিশন হিসাবে কাজ করে। তাহার মতে ধনুকোটি তীর্থ সারিয়া রামেশ্বর দর্শনই সমীচীন। আমরা অবশ্য সেইরূপ ব্যবস্থাই পূর্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়া-ছিলাম।

রেলপথের কর্মচারীদের আশংকাকে কিঞ্চিৎ অবলুপ্ত প্রতি-পন্ন করিয়া গাড়ী প্রায় পৌনে এগারটার আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, প্রতীকার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভোগেরও শেষ হইল। কিন্তু ভবিষ্যৎ কে বণাইতে পারে? কামরায় আলো ও জলের অভাব, পাণ্ডা চলে না আর আসনগুলিও ধূলিলিপ্ত। পরিদর্শকদিগের নিকট অহরোধ বা অহুছোপে বিশেষ কোনও কললাত হইবার সম্ভাবনা দেখা গেল না; তাগ্যকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলাম। গাড়ী ছাড়িবার পর আবার আর এক উপসর্গ দেখা দিল। যাত্রিক পোলযোগের জন্ত এই বিকলাদ বাঙ্গালীর বাস হইতে যে বর্ধর স্বনি উঠিতে লাগিল তাহা মস্তিষ্কের পক্ষে তীব্র উত্তেজক। রাজে দুমাইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

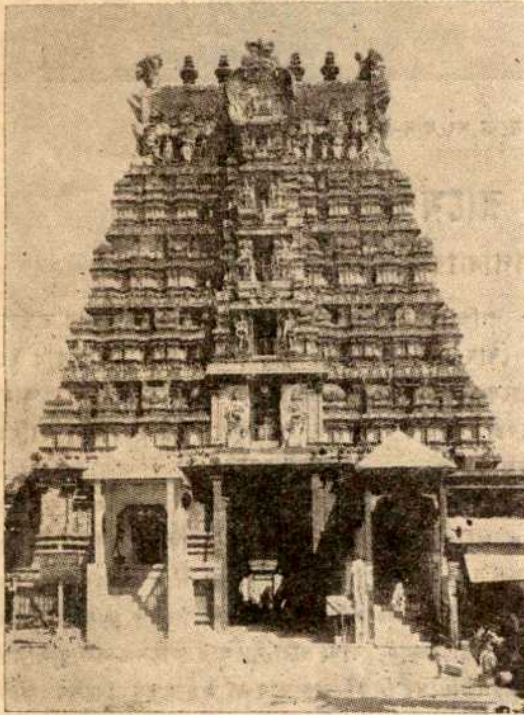
কিন্তু তথাপি উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যে কোন কাঁকে নিতেজ হইয়া পড়িল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দ্বাশিয়া উঠিয়া দেখিলাম রথ ‘মণ্ডপম্’ ঠেশনে থামিয়াছে আর যাত্রীর দল ঠেশনের জলের কল হইতে জলসংগ্রহ করিতেছে।

আমরাও হাত, মুখ ধুইয়া প্রান্তরাস্থের বন্দোবস্ত করিলাম। ঠেশনে চা বা আহাৰ্যের কোন ব্যবস্থা দেখিলাম না।

কিছু দূরে সমুদ্রের নীল আভাস দেখা যাইতেছিল।

পরিষ্কার প্রভাত কিন্তু সূর্য্যদেব তখনও উঠেন নাই। ডিসেম্বর মাস, ভূগাপি শৈত্যের লেশমাত্র নাই; প্রভাতবায়ুতে বসন্তের আমেজ।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সমুদ্র নিকটবর্তী হইতে লাগিল। কাছে, আরও কাছে—সহসা যেন সমস্ত গাড়ীটা সমুদ্রের উপর ভাসিতে লাগিল। সে এক অতুতপূর্ণ অহুতুতি। চাহিয়া দেখি, যে সেতুর উপর দিয়া গাড়ী যাইতেছে তাহা সমুদ্রের জল হইতে অল্পমাত্র উঠে—মনে হয়, গাড়ী যেন জল ছুইয়া যাইতেছে। গাড়ীর দুই দিকে সমুদ্রের গুরদারিত জলোচ্ছ্বাস আর চঞ্চল বাতাস আরোহিণীগকে অভিমন্বিত করিতেছে।



রামেশ্বর মন্দিরের উত্তরমুখী তোরণ

সেতুটি বেশ দীর্ঘ; প্রায় দেড় হাইলের মত। ইহাই ভারত-বর্ষের স্থলভাগের শেষ সীমার সহিত রামেশ্বর দ্বীপের সংযোগ-রক্ষা করিতেছে। কারিগরির কোশলের জন্ম এই সেতুর প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু ইহার দৌলতে যাত্রাপথের যে চিহ্নটি মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায় তাহার মার্ঘ্য ও স্থায়িত্ব সে শিল্পনৈপুণ্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

রামেশ্বর দ্বীপের প্রথম ঠেঁশন 'পন্থনে' গাড়ী থামতেই স্থল-পথে সমুদ্রযাত্রার এই অত্যাকর্ষ্য অহুতুতি মিলাইয়া গেল। 'পন্থন' ক্ষুদ্র জংসন-ঠেঁশন। এক দিকে লাইন সোজা বহুদোটি

চলিয়া গিয়াছে—অন্ত দিকে রামেশ্বর। আমরা বহুদোটির দিকে অগ্রসর হইলাম।

রামেশ্বর দ্বীপ দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ মাইল আর প্রস্থে তাহার অর্ধেক। গাড়ী চলিতে লাগিল। চারিদিকে বালুকাস্তর, ছুমি অহুর্কর, কসলের বা কৃষিকার্যের চিহ্নমাত্র নাই। মাহুয়ের আবাসস্থলের চিহ্ন কদাচিৎ চোখে পড়ে। ঐ রসহীন ভূমিকে অবলম্বন করিয়া স্থলে স্থলে যে স্তম্ভ শোভা-সম্ভার জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে নারিকেলশ্রেণীর প্রাচুর্য্য দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে। কণ্টকাকীর্ণ আগাছাও কম নয়।

প্রায় আশ দশটা পরে বহুদোটি ঠেঁশনে গাড়ী থামিল। অদূরে বহুদোটি 'পায়ার'; সেখান হইতে সিংহলের জাহাজ ছাড়ে। গাড়ী সে পর্যন্ত যাইবে; কিন্তু আমাদের নামিতে হইবে ঐ ঠেঁশনেই।

ঠেঁশন হইতে ভারত সমুদ্রের ভীরে স্নানের খাট প্রায় দুই মাইল। সমস্তটা পথ বালুর উপর দিয়া যাইতে হয়—অনেক কষ্ট। যানবাহনের মধ্যে একমাত্র ভরসা গরুর গাড়ী; তাহাও সব সময় জুটয়া উঠে না। আমরাও হাঁটিয়াই চলিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র শিশুটিকে পাণ্ডুর লোক কোলে করিয়া লইয়া চলিল; কিন্তু অপরিচিত লোকের কাছে থাকিতে তাহার বড় অনিচ্ছা। কাজেই তাহাকে লইয়া ঐ দ্রুতিক্রমা পথে কিছু বিব্রত হইতে হইল।

খাট বলিতে যাহা মনশ্চক্রে ভাসিয়া উঠে, বহুদোটির খাটে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। স্নানের খাট বালুবেলাছুমি মাত্র; উত্তাল লবণানুরাশি কণে কণে ইহাকে ঘুইয়া মুছিয়া দিয়া যাইতেছে।

হাঁটু-জলে স্নানই বিবেক। ইহা অপেক্ষা গভীর জলে বিপদের সম্ভাবনা। তাহার উপর আবার ক্রমাগত পায়ের নীচ হইতে বালু চলিয়া যাইতে থাকে। শতাধিক লোক আজ স্নান করিতে আসিয়াছে; স্নানের পরে ত্রীমারের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ ও পূজা। তাহার জন্ম পুরোহিত রাজীদের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের তাপও বাড়িয়া উঠিয়াছে। বালুও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঠেঁশনে কিরিবার পথে কষ্ট আরও বেশী হইল।

কিরিয়া দেখি, ঠেঁশনে মেল গাড়ী প্রস্তুত। গাড়ী 'পায়ার' ঠেঁশনে যাইবে অনতিবিলম্বে। তারপর সেখান হইতে সিংহলের যাত্রী লইয়া সোজা পন্থনে যাইবে—এ ঠেঁশনে আর দাঁড়াইবে না। আমরা আর দিবা না করিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। মোটিবাহীরা বলিল, তাহার আশ্রয় ঠেঁশনে রক্ষিত মালপত্র 'পায়ার' ঠেঁশনে লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিবে।

মোটিবাহীরা তাহাদের কথা রাখিল বটে, কিন্তু তাড়া আদায় করিল মাজাতিরিক্ত। আর কথা রাখিল বহুদোটির

হোটেলওয়ালা; সেও আমাদের খাবার টিফিনবাজে 'পান্নার' টেশনে পৌঁছাইয়া দিল। কিন্তু ষাট দেখিয়া চম্ভুহির। বর-বটির বিচির মত ভাত, দ্রব্য পীতাত জলের মত ডাল আর অজ্ঞাতনামা কোন শাক ও সব্জির ঘণ্ট। এগুলি কিছুতেই আর গলাধঃকরণ করিতে পারা গেল না। রানের সঙ্গে উপ-বাস-পুণ্যের যোগ হইল।

রাজী বোঝাই সিংহলের জাহাজ আসিয়া পড়িল। এখানে 'কাঠম' পরীক্ষা হয়—কিন্তু পরীক্ষার বেশীর-ভাগই তরাইয়া যায়। আমাদের গাড়ীতে ঘে করজন রাজী স্থান পাইল তাহা-দের অধিকাংশই নুতন নুতন স্ট্রাকেশ বুলিয়া কে কোন দ্রব্য 'কাঠম'কে কঁকি দিয়া লইয়া আসিতে পারিয়াছে তাহা একে অজ্ঞকে দেখাইতে লাগিল। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশে তৈরি কাপড় আর সজ্জাদ্রব্য। শুনিলাম, সিংহল আর ভারতের মধ্যে এইরূপ গোপন ব্যবসা প্রায় প্রকাণ্ডই বহুদিন যাবৎ চলিতেছে—মাঝে মাঝে ইহা প্রসারলাভ করে মাজ।

আমরা যে ফেবল এই গোপন কার-বারের দ্রব্য-সস্তারের দৃষ্ট অবলোকন করিলাম তাহা নহে, আমাদের রসনাও সে গোপন রসের আবাদন লাভ করিল। এই মলেরই এক উদ্বলোক আমাদিগকে কিছু আতুর উপহার দিলেন। আতুরগুলি খুব বড়, রসাল ও ভাজা। শুনিলাম, এপারে ওপারে দামের পার্থক্য বিস্ময়কর।

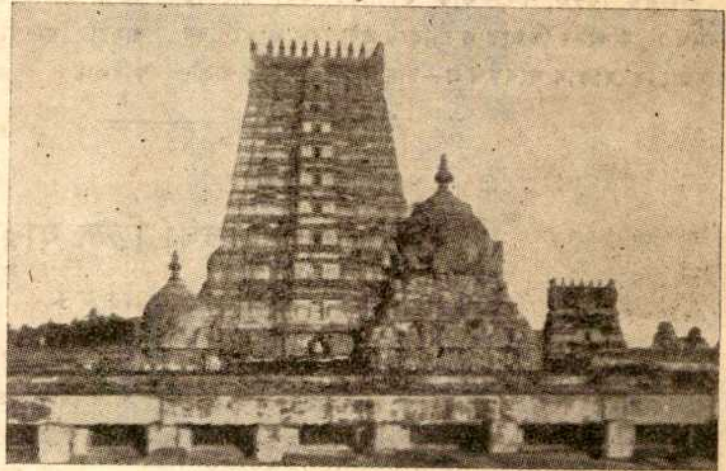
'পন্থবনে' গাড়ী বদল করিয়া আমরা অপরাহ্নে আসিয়া রামেশ্বরে পৌঁছিলাম। পাণ্ডার লোক সঙ্গে ছিল; টাঙ্গা করিয়া যাত্রীনিবাসে পৌঁছান গেল।

রামেশ্বর একটি গ্রামবিশেষ আর প্রখ্যাত মন্দিরটি এই স্থানের শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র আকর্ষণ। গ্রামাইট পাথরে নির্মিত এই বিরাট দেবালয় স্থাপত্যশিল্পে ও আয়তনে এক বিস্ময়ের বস্তু। মন্দিরের দুইটি ভোরণ; একটি সমুদ্রের দিকে দক্ষিণমুখী, অপরটি বাজারের দিকে উত্তরমুখী। ভোরণ দুইটি উচ্চতার এক শত ফুট; তাহাদের কক্ষে রামায়ণ ও অজ্ঞাত পৌরাণিক চিত্র-লেখার অজস্র সমাবেশ। চাহিয়া দেখিলে চম্ভু কিরাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মন্দিরের স্প্রশস্ত অত্যন্তরভাগ, আর মূল মন্দিরের চতুর্দিকে যে দালাল তাহার পরিসর চারি হাজার বর্গফুট। সে দালালের স্থাপত্যশিল্প অজুলনীয়। দ্রাবিড়-জাতির আধ্যাতিকতার এক মহা গৌরবময় নিদর্শন।

ভোরণের মধ্যে প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেমন অজ এক জগতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ভিতরে, প্রহরে প্রহরে মিছিল করিয়া দেবতার মূর্তি এদিক হইতে ওদিকে

লইয়া যাওয়া হইতেছে; মিছিলে হস্তী, অশ্ব, পদাভিক আর চতুর্দোলা কিছুই অস্তাব নাই। সঙ্গে সঙ্গে বাজ বাজিতেছে, শব্দ-ধবনি-রবের অস্ত নাই আর মন্ত্রধ্বনির স্রোত বহিয়া চলিতেছে। এমন মহিমময় পরিবেশ শুভঃই দর্শকের মনে এক অপূর্ণ ভাবরসের সঞ্চার করে।

প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের রামনাদের মহারাজা এই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। কিন্তু কি করিয়া যে এই স্থানের উপর এত বড় একটি সৌধ তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ভাবিতেও বিস্ময় বোধ হয়। এখন মন্দিরে আছেন বার জন মূল পুজারী আর তাহাদের সহকারী প্রায় দুই শত পুজা জন। সেখানে দৈনন্দিন পুজাও যে কি বিরাট ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মন্দিরের বাৎসরিক আয় এখন প্রায় চারি লক্ষ টাকা। মন্দিরের কার্যপরিচালনার জন্য একটি কার্য-



মন্দির ও ভোরণ—দূর হইতে

নির্বাহক সমিতি আছে—মাঝে মাঝে সমিতির সভ্য অদল-বদল হয়। এই সমিতির কার্যকলাপের দিকে গবর্নমেন্টের দৃষ্টিও সজাগ।

দেবতার রত্নভাণ্ডারে দর্শনীয় জিনিষের হুড়াহুড়ি। মহামূল্য প্রাচীন অলঙ্কার আর স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত শৈলসম্পদের অস্ত্র নাই। কাকনমূল্যে দর্শনের অমূল্যমূল্য মিলে।

শিবলিঙ্গ স্বর্ণবেদীতে রক্ষিত। লিঙ্গের মস্তকে স্বর্ণনির্মিত সর্পের আচ্ছাদন। কিন্তু দেবাদিদেবকে দূর হইতেই দর্শন করিতে হয়; অন্যান্য মন্দিরের মত এখানে মহাদেবকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না।

রামেশ্বরের মন্দির হইতে মাইলখানেক দূরে তিনটি জলাশয় আছে। সেগুলি যথাক্রমে ত্রীশম, লক্ষ্মণ ও সীতা-দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত। লক্ষ্মণের নামে উৎসর্গীকৃত জলাশয়টিই সর্বাঙ্গীকৃত বৃহৎ; আর পাণ্ডাদের মতে এই লক্ষ্মণ-

মহে দ্বানই সর্বাংগেণা প্রশস্ত। জলের চেহারা দেবিলে
অবশ্য দ্বানের লিপা কমিয়া আসে।

ওখান হইতে মাইল দুই দূরে একটি টিলার উপর একটি
মন্দির আছে। মন্দিরটি 'রাম বন্ধু' নামে খ্যাত। মন্দিরে
ত্রীশচন্দ্রের পদচিহ্ন আছে; মিত্য তাহার পূজা হয়।
মন্দিরটি কিছু পুরাতনও মহে আর ইহাতে স্থাপত্যশিল্পেরও
কোন নিদর্শন নাই। বালুকাময় পথ। একমাত্র যান গরুর
গাড়ী। পথে এবং মন্দিরের সারিবে তিফুরের অল্প
সমাবেশ। ভ্রমণি এই দ্রষ্টব্য স্থানটিতে না গেলে রামেশ্বর-
ভ্রমণ অর্পণ থাকিয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, মন্দিরটি একটি
টিলার উপর অবস্থিত। সে টিলার উপর উঠিলে রামেশ্বর
দীপের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় আর সে পরিচয় মনের মধ্যে
বহুদিন অঙ্কিত থাকে।

সাধারণ বিহু, লখ, কড়ি ইত্যাদির জন্য রামেশ্বর
বিখ্যাত। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে এই সুদৃষ্ট ও মনোরম
দ্রব্যসম্ভারের দোকান অনেকগুলি—দামও অধিক মহে। বাড়ী-

দের মধ্যে প্রায় সকলেই কিছু-না-কিছু সংগ্রহ না করিয়া পারে
না। শুনিলাম, বেশীর ভাগ জিনিষই সিংহল হইতে আসে
আর ওখান হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে হুড়াইয়া পড়ে।

রামেশ্বরে আহাৰ্য্য সংগ্রহ এক বিরাট সম্ভা। প্রায়-
জনীর খাতি না লইয়া ওখানে যাওয়া সমীচীন মহে। সজীর
মধ্যে সামান্য আলু পাওয়া যায়, ইহা ছাড়া আর যে সকল
জিনিষের সমাবেশ দেখিলাম তাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই
অশাস্ত।

কিন্তু শারীরিক কষ্টকে দূর করিয়া রাখে মনের প্রফুল্লতা।
ওই অপরূপ মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়া মন বহুলোকে চলিয়া যায়।

আমরা যেদিন রামেশ্বর ছাড়িলাম সেদিন সত্যই মনে
কষ্ট হইল। ভ্রমণ রাজির তৃতীয় প্রহর; অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে
মন্দিরটিকে একটি স্নানাপূরী বলিয়া মনে হইতেছিল। নির্জন
পথ বাহিয়া আমাদের গরুর গাড়ী সন্ধ্যা বীরে বীরে চলিল।
আমরা হুজুপাণি হইয়া আবার দেবাদিদেবকে প্রণাম
করিলাম।

কাল হেথা ছিল যারা

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

কাল হেথা ছিল যারা, কোথা আজ গেল তারা।
নিমেষে নিশারে গিয়ে মহাশূন্তে হ'ল হারা ?
শূন্ত পানে শূন্ত মনে প্রাণ করি এই কথা,
জবাব মেলে না তার বাড়ে শুধু ব্যাকুলতা।

কাল যারা হেথা ছিল কুন্দ-শুভ্র কলিঙ্গ,
রূপে রূপে ভরপুর দেবপিত্ত অঙ্গুণম;
মা'র কোলে কেন যার দুমাইয়া চিরতরে
ফুটিবার বহু আগে শুকাইয়া শাখা 'পরে ?

স্বপন-কুহুম রচি' কুহুমিত যে কিশোর
হেসে খেলে গেরে গাম বাতাইত এ আসর;
মল্লিত নন্দন সেই, অস্তহীন ভমলায়,
না বাঁধিয়া বীণা-তার কেন ছাড়ি' চলে যায় ?

যৌবনের সপ্ত-অধে ছুটেছিল যারা কাল,
অন্তরেতে এঁকেছিল সাত-রঙা স্নানজাল;
তাহাদের মাঝখানে বিচ্ছেদ-গোদুলি এসে
এক জনে নিরে যায় সঙ্গীহীন কোন্ দেশে ?

পূজনীয় ছিল যারা, বাহাদের মহাপ্রাণ
বিস্তারিত ছিল হেথা অহমিশ অনির্বাণ;
ঠাৱাত গেছেন চ'লে দূরে দূরে বহুদূরে
হেথা হতে অভ কোন অজানা অচিন্ত্যুরে।

অজানা অচিন্ত্য দেশ কেহ নাহি জানে তার,
ফিরিয়া আসে নি কেহ লইয়াছে যে বিদায়;
হেথার বেঁচেছি বর, একখানি ছোট নীড়
স্নেহ, প্রেম, শ্রীতি-মাথা অধে হঃখে সুনিবিড়।

প্রাণের খেলার হেথা অনির্দেশ চলি পথ
মরণ-কুহেলি মাঝে চালায়ে জীবন-রথ,
ধেরে চলি ভাবীকালে দুর্গবায়ু উড়াইয়া
মুহুর্তে মিলায়ে বাই মহাভীতে হারাইয়া।

হে অতীত ! নিভি নিত্য নিভেছ হরণ করি'
স্নেহের প্রেমের নিবি যুগ যুগ কাল বরি;
শুধায় তোমারে সব স্মরণ-সন্ধান-হারি,
কোথাও কি আছে তারা চলিয়া গিয়াছে যারা ?

হিমালয় সন্ধান

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

হিমালয়-সন্ধান চলায় পথে আধ্যাত্মিক যে সকল পুরাকীর্তি আমার মনে বিশ্বাসের আলোড়ন এনেছিল, সেগুলো হচ্ছে প্রয়াগের সুপ্রাচীন যুগের দুর্গের নিম্নতলে পৌরাণিক দেব ও ঋষিগণের মূর্তির সহিত সনাতন অক্ষয় বট, আর ঋষ্যবাসের সমরৈবিক সমাধিশ্রেণী। এই ভবনগুলির কোন কোনটি জিভল, লুপ্তপ্রায় রঙীন চিত্রাবলী ও ফারসী লিপিসূক্ত। আগ্রার তাজ-উত্থানের সপ্ত সৌর; প্রথমে চারিদিকে চারিটি দ্বার-মণ্ডপ, শেষাংশে দুই পাশে মসজিদ ও জমায়তখানা—মধ্যে তাজ-মহল। মসজিদের সম্মুখের প্রথম সারির পাঁচটি প্রস্তরফলক, চারি পুঙ্গবহ বাদশাহ সাজাহানের উপাসনার আসন। এখানকার পরিখায়ুক্ত বিরাট কেল্লার অমর সিংহফটক দিয়ে প্রবেশ করে বাদশাহী আমলের নামা মহল, প্রাসাদ, দেওয়ানী খাস ও আম, আর দুটি মসজিদ দেখা যায়।

হাথরাস হয়ে মথুরার পথে ময়ূর, উটের গাড়ী, মথুরার কংস-কারাগার, কীর্ণ যমুনা দেখে টাঁকার ব্রহ্মমণ্ডলে সাত মাইল গিয়ে কুন্দাবন; এখানে সাড়ে পাঁচ হাজার দেবালয়, কোন কোনটি কেল্লার মত। মন্দ ঘোষের মন্দির সর্বপ্রাচীন—শেঠেদের মন্দিরে বিরাট স্বর্ণধ্বজা বা সোনার তালগাছ। এতে নাকি সাড়ে বার মণ সোনা আছে। স্তিতরে চন্দন-কাঠের দণ্ড। বস্তু মন্দির স্তম্ভরাশি শোভিত শাহ কুন্দম-লালের মন্দির। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন এখানকার প্রধান দেবতা। এঁদের প্রাচীন মন্দিরগুলি বিমল; নূতন মন্দির বাঙালী জমিদারদের কীর্তি। শহর থেকে যমুনা এক মাইল সরে যাওয়ার ফলে, প্রাচীন ঘাটগুলি অন্ধজো হয়ে গেছে। এখানকার মরুভূমির মত প্রান্তরে বড় নীল গাই আর ময়ূর দেখা যায়। করিল নামক এক প্রকার কাঁটাগাছ এদেশে আছে।

এখান থেকে হাথরাসের অটালিকারগা, আলীগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, অল্প সহরের বাঙালী জমিদারদের কাছারি, পুল, অগভীর গঙ্গা, প্রাচীন লৌহরাজি আর বুলন্দ শহরের জমাকীর্ণ পথ ছাড়িয়ে বাসে দিল্লী এলাম। বিড়লা-দের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরসংলগ্ন ঋষ্যালয় থেকে শহর দেখলাম। চৌদ্দ মাইল দূরে মেহরৌলিতে দেড় হাজার বছরের পুরাতন লিপিসূক্ত চন্দ্রাবার কলকহীন লৌহস্তম্ভ, কুতুবমিনার (৩৭৮টি ফিট), সের শাহের ভাঙা কেল্লা, হুমায়ূনের কবর, যত্নর মন্দির নামক হামামন্দির, বিশাল লাল-কেল্লা—এর ভেতরে দেওয়ানী আমের সিংহাসন, বেদীর গায়ে রঙীন পাথরে খচিত ফুল পাতা ও পানীর অপকল্প ছবি,

প্রাচীন কীর্তিসকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কালের রাষ্ট্রপতি-ভবন, লোকসভা-সৌর দেখবার মত। লোকসভার দ্বারে কাঠের ফলকে বৈদিক বচন উৎকীর্ণ।

এর পর পূর্ব পঞ্জাবের আদালা থেকে ফেরবার পথে কৃষ্ণসার যুগের দল দেখলাম। হিন্দুর সকল ঋষ্যশাস্ত্রকারই এই জীবগুলির প্রশংসা যুগের। হরিদ্বারে গঙ্গার উপরকার অস্বামী কাঠের পুণ্ডলি মনে বিশ্বাস এনেছিল। এপারে পাহাড়ের চূড়ায় মনসা-মন্দির। ওপারের চণ্ডীপাহাড়-শিখরে চণ্ডী ও অঙ্কনার মন্দির। তীর্থরাজ ব্রহ্মকুণ্ড, কুন্ডমেলার বিরাট আতনা আর হেলপথের সুউচ্চ দুটি দর্শনীর।

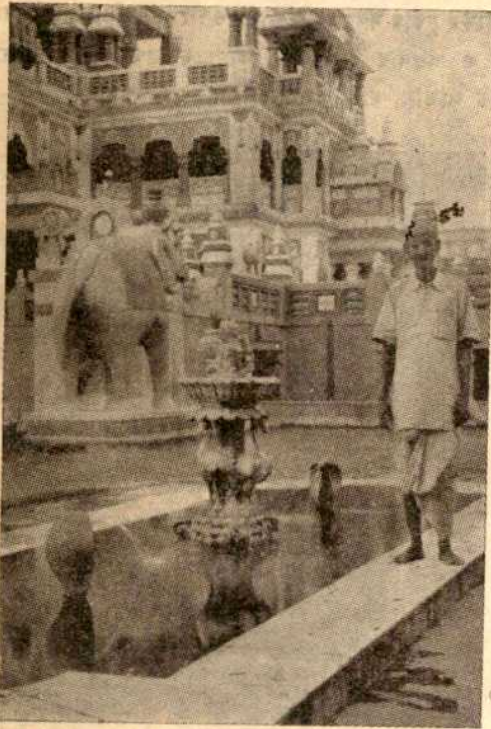


হিমালয় যাত্রার পূর্বে ঋগৃহে লেখক

অধীকেশ শহরে পৌছে ভপোবন দেখার কল্পনা বিফল হ'ল। শিবালয়ে আশ্রয় পেয়ে তরুতজীর প্রাচীন মন্দির, ঋষি-কুণ্ড, গঙ্গা-চন্দ্রভাগা-সদয় ঘুরে এলাম। মন্দির উৎকল-রীতির আমলাশীর্ষক। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের মতই এখানকার সদয়ে মাছের খেলা।

১১ই বৈশাখ ভোরবেলা এখান থেকে ত্রিবদ্রীনাথের পথে এগিয়ে চললাম। সকালে বিকালে ছিল পথচলা। দুপুরে আর রাতে চণ্ডীতে আহার ও বিশ্রাম। স্তিন দিকে দেয়ালধেরা

পাতা বা খড়ের ছাউনিওয়ালার খরই চটি। চটিওয়ালার কাছে জিনিষ কিসেলে এখানে আশ্রয় মেলে, মচেন নয়। রাধবার উমান, থাকবার স্থান, বাসনকোসন, চাল, ডাল, আলু, লবণ, মশলা, জালানি, পাভবার চাটাই চটিতে পাওয়া যায়। উমান পাশাপাশি বা সামনাসামনি জোড়া জোড়া। খরণা কিংবা নদী, অথবা ঐ ছুটির কাছেই চটি। নামা জাতি, আচার, আচরণ ও সংস্কারের মিশ্রণে এখানকার তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। হরিবার থেকে ত্রিবদরীনাথ একশ' ভিন্নাশি মাইল। এক মাইল চিহ্নের পর এক ফার্ম চিহ্ন, সাত ফার্ম এর পর দুই মাইল চিহ্ন। এই ক্রম একশ'



নিউ দিল্লীর বিড়লা মন্দিরে

পর্য্যন্ত মাইল দূরত্ব চামোলি পর্য্যন্ত আছে। তার পর বদরী পর্য্যন্ত উণ্টো ক্রম। ঐ অংশে মাইল-চিহ্ন হিন্দিতে লেখা। বাকী অংশে ইংরেজীতে। পাহাড়ের গায়ের পাথরেই মাইলের দাগ লেখা।

পাহাড়ের গা কেটে বেশ চওড়া পথ তৈরি হয়েছে। নদীর এপার দিয়ে লোকচলাচলের, ওপার দিয়ে বাস যাওয়ার পথ। পথে ডাইনে পর্বত, বামে অগভীর খালের নীচে বেগবতী নদী। পথ কোথাও সমতল, কোথাও চড়াই, কোথাও উৎরাই। বিজ্ঞানী, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকানী, ব্যাক, ত্রিহুগী, কেরার, উদীমঠ, গোলিয়ারগড় প্রভৃতি স্থানের চড়াই বিখ্যাত। প্রাণান্ত-

কর কষ্টের মধ্যেও যেন কিসের টানে বিস্তার হয়ে যাত্রিগণ চলতে থাকে। কেরারের এক মাইল পথ বরফে পূর্ণ। কেরার শহর বরফে ঢাকা। বদরীপথে প্রায় দশ মাইল দূর থেকে যাকে যাকে বরফ প্রবাহাকারে জমাট। একটি জলধারা যেন হঠাৎ জমে গেছে। লবণের তুপের মত এই বরফরাশি। বরফ ধরসে বিপদ ঘটতে পারে—একজনের সাবধানতা প্রয়োজন।

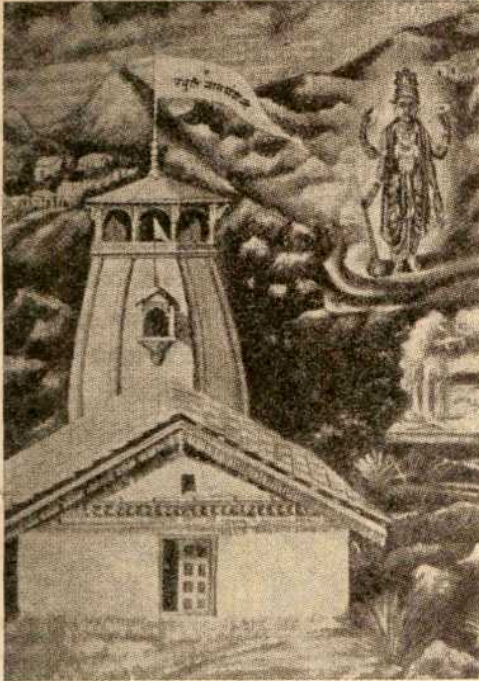
পায়ে চলার যাত্রীই বেশী। ধনীরা ডাঙী বা বাম্পানে চলেন। একটি দোকান চেয়ার বসিয়ে রিক্সার ছাউনী দিলেই বাম্পান হয়। চারি জন বাহকে শ্রমীকেশ থেকে যাত্রাভারের জাড়া সাড়ে পাঁচ শত টাকা আর বাম্পান-মূল্য পঞ্চাশ টাকা লয়। গুয়েট-পেপার বাজেরের মত বুড়ির নাম ডাঙী। যাত্রাভার খরচ এক শত টাকা। কেউ কেউ বোড়াত্তেও চলেন। ছাগলই বেশী মাল বহন করে। গোরু, বোড়া, বছর আর চমরীর পিঠেও মাল যায়। সর্কারী পার্বত্য-পথে এই সকল পশু, যান আর যাত্রীর চাপে ভ্রমণ দুকর। পাহাড়ী আর ভিথারীরা পথে পরস্পর ও হ'চ হতা চায়। পুণ্যকামীরা তাদের প্রার্থনা পূরণ করেন।

প্রায়ই পথের ডাইনে খরণা আর বামে নদী, নদীতে নামবার বাট সব জায়গায় নেই, পাহাড়ের গা বেয়ে নামা বিপজ্জনক। পাহাড়ের সকল নদীর জলই বরফের মত শীতল, তাতে অবগাহন অসাধ্য। এই সকল নদীর প্রচণ্ড স্রোতেও মহাশোল মৎস্যকুলের অবিরাম ক্রীড়া চলছে। কেরার হরে বদরীপথে গঙ্গা, হেমগঙ্গা, অলকানন্দা, বিষ্ণুগঙ্গা, মন্দাকিনী, শোণগঙ্গা ও রুদ্রগঙ্গা নদীর তীর ধরে যেতে হয়। সমগ্র পথে অসংখ্য ছোটবড় খরণা গিরিরাজের গলিত স্নেহের মত যাত্রীকুলকে শান্তি দেবার জন্তই যেন বয়ে যাচ্ছে। হিমালয়ে হাতে চালানো তেলের দানিও দেখেছি।

নদী-পারাপারের জন্ত বেশীর ভাগ স্থানেই বোলানো পুল আছে। কয়েকটি লোহার কাছির উপর ঐ সকল পুল বোলায়। অধীকেশ থেকে তিন মাইল দূরে বিখ্যাত লহমণ বোলা চারি শত পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ; উহা বারটি কাছি ও চারটি ধামে সম্বিত। ইহার পর হেমগঙ্গা, কীর্তিনগর, দেব-প্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, ভীরি, শোণপ্রয়াগ, উদীমঠ, চামোলি, বিষ্ণুপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত বোলা পুল, আর কেরারে মন্দাকিনী ও বদরীনাথে অলকানন্দার উপর এবং আরও কয়েকটি স্থানে লোহার কড়িতে টানা পুল আছে। ঐ সকল পুলের উপর নির্মাণকাল ও সেতুর দৈর্ঘ্য লেখা আছে। লহমণ-বোলা ১৯৩০ সালে পুনর্নির্মিত হয়। অগত্যমুনি-পথে রাম-পুরের পর একটি মেকেলে দড়ির বোলা আছে।

কেরারনাথ ও বদরীর মিকটে কোন ক্ষেত বা বাগান নেই—এ ছাড়া সমগ্র পথে ডাইনে ও বামে পাহাড়ের গায়ে সোপানের মত থাকে থাকে ক্ষেত। স্থানে স্থানে আম, কলা,

বেল, লেবু প্রভৃতির বাগান। যোশীমঠ, গোপেশ্বর ও গুপ্ত-কাশীতে উত্তম গোলাপফুলের বাগান আছে। যব ও গমই প্রধান ফসল। ফেদার-বদরীর কাছাকাছি শীতের আধিক্যে ফসল কাঁচা। বাকী পথের ফসল সোনালী রঙের। বিচালির গাধা গাছের উপরই দেখা যায়। ফেদার ও বদরীর সান্নিধ্যে বরফমুক্ত পাহাড়ে একপ্রকার আগাছা ও বেগুনী রঙের ফুল-গাছের বাহার।



ফেদারনাথ ধাম, গুপ্তকাশী (গাড়োয়াল)

গ্রাম ও শহরের বাতীগুলি পাহাড়ের গারে থাকে থাকে সন্ধ্যা। গিরিরাঙ্কের অনায়াসলভ্য পাথর আর কাঠ দিয়েই এই সকল বাতী নির্মিত। অনেক স্থলেই এই সকল কাঠে স্থলর শিল্প-কার্যের মিলন আছে। কাপিসের কাঠ-গুলিতে নানা পশুপক্ষি উৎকীর্ণ। পাহাড়ের শিখরের কোন কোন গ্রামকে যেন অলকাপুরী বলেই মনে হয়।

বর্ষাকাল ছাড়বার পর বাকসের বন শুরু। পরে মমসা, খাউ, লাল রঙের রোডোডেনড্রন, শেওলাধরা একপ্রকার বিশাল বনগাছ, সাদা বনগোলাপ, লাল ফেদাসে ও সাদা বোরাস ফুলের গাছ। বোরাসের পাতা ছাতিয়ের মত, ফুল জবার মত—এক গুচ্ছে অনেক ফোটে। চাটনী ও আম্রাশ্বরের ঔষধ এই ফুল থেকে হয়। গারে আশওয়ালা দেবদারু ও সুরু এক জাতীয় বাঁশ পথের পাশে দেখা যায়। লিগুড়ি নামক শাক আর তম্বাপুত্রী ফুল পথে প্রচুর। সারি সারি দাঁড়ানো

খাউয়ের বন দেখেই মনে হয় যেন এরা গিরিরাঙ্কের সেনাদল।

পথে বহুপশু কমই দেখা যায়। একদিন মাত্র ঝাঁকুল জাতীয় দুইটি হরিণ দেখি। বহুপাখী সময়ে সময়ে নজরে পড়ে। ময়ূর দেখি নাই; কেকাধ্বনি শুনেছি মাত্র।

চৌজিশ মাইল দূরবর্তী অগত্যমুনি থেকে ফেদারশ্বরের বরফরাশি দেখা যায়। আর বদরীর বরফ নজরে পড়ে প্রায় কুড়ি মাইল দূর হতে। এ ছাড়া সমগ্র পথের পর্বত বরফ-মুক্ত ও অনেক স্থানে বনাকীর্ণ। কোথাও পর্বত পাষাণময়, কোথাও-বা পর্বতগাজে যুক্তিকারি। চামোলির নিকট যেত পাথরের পর্বত। পাথরবাসার কাছে অভরাশি আর গৌরীর নিকট দত্তা। স্থানে স্থানে বৃহৎ গুহা। যোশীমঠের নিকট



ফেদারনাথ ধামের মন্দির

একটি গুহায়ুগ হতে বায়ুপ্রবাহ বার হচ্ছে। কালিদাস যে “দরীমুখোং সমীরণ” বলিয়াছেন, এ তাই। রাজিতে কোম কোম স্থানের পর্বত-গাজের গর্ভ হতে জ্যোতি নির্গত হয়। এ কোম সরীষপের চোখ বা গায়ের আলো। পর্বত-রাজ্যের রত্ন, ওষধি, বনস্পতিসম্পদের পরিমাপ করা অসাধ্য। ফেদার হতে সাত মাইল নিয়ে গৌরীকুণ্ডে একটি গরম জলের প্রস্রবণ আছে। জল কুণ্ডে সঞ্চিত হয়। এই শীতের দেশে এই প্রস্রবণের জল যাজ্ঞিকের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। ত্রিবদরীনাথেও সোপান-রাজির নীচে এরূপ একটি প্রস্রবণ আছে।

গ্রামই এক মাইল অন্তর চটি। অনেক চটিই ছোটখাটো তীর্থবিশেষ। পথে দুইটি গুরুত্ব চটি। প্রথমটি লছমনকোলায় পর, দ্বিতীয়টি যোশীমঠের নিকট। উত্তর স্থানের গুরুত্ব দেবতার মূর্তি। পথের অনেক স্থানে দামামা-বাদক গুরুত্ব-স্বরূপে পথরোশ-কমাবার উপদেশ দেয়। দেবপ্রসঙ্গে গদা ও অলকা-নন্দা সঙ্গমে বদরীনাথের পাণ্ডগণের বাস। রত্ননাথ এধাম-কার দেবতা। ত্রীনগর গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজবাড়ী।

এখানে বৃহৎ জলপাত, ঢোলকের ধোল প্রভৃতি স্থানীয় ভৈরবস মেলে। নিকটে কমলেশ্বরের প্রাচীন মঠ। পঞ্চমুখ শিব, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি এখানকার দেবতা। রুদ্রপ্রয়াগ জলকানন্দা ও মন্ডাকিনীর সঙ্গমস্থল। অগস্ত্যমুনি উক্ত মহাবীর ভগতাক্ষের। গুপ্তকালীতে বিবেশ্বর, অন্নপূর্ণা দেবতা—মণিকর্ণিকাভীর্ষ। বৈষ্ণবীতে মহিষমর্দিনী, জিহ্মীর পথে শাক্তস্তরী ও জিহ্মীতে নারায়ণ বর্ধশিলায় শিবের বিবাহস্থান; মন্দিরের মণ্ডপে ভিন্ন বৃণের বৃন্দা প্রচ্ছলিত। গৌরীকৃতে গৌরীদেবী, কেনারে অনাবিলিক্ষর, অন্নপূর্ণা। উত্তীর্ণ কেনারের মহান্তের আন্তান ও দেবস্থান। গোপেশ্বর শেষ শিবস্থান। হেলংগে কাক্তিকেশ্বরের জমস্থান, বোশিমঠ বদরীর মহান্তের স্থান। এখানে ষাটুধর বদরীনাথ ও শঙ্করাচার্যের ক্যোতিমঠ আছে। বিষ্ণু-প্রয়াগে জলকানন্দা বিষ্ণুগঙ্গা সঙ্গম। পাণ্ডুক্ষেত্র পাণ্ডুর ভগতাক্ষ—এখানে বদরীনাথ দেবতা। হুম্মান চট্টতে হুম্মান দেবতা।

বদরীনাথ শহরের উচ্চতম স্থানে ত্রীবদরীনাথের মন্দির। মন্দিরমধ্যে বদরীনাথ প্রভৃতি দেবতা—আমাদের তাপ্যে দেবতার ভাবমুখ দর্শনই ঘটল। হিমাচলে অনেক ভীর্ষেই এই ভাবমুখ-আচ্ছাদন রীতি। বামে এক মন্দিরে লক্ষ্মীদেবী। উল্লিখিত এখান ভীর্ষগুলিতে ডাক ও তারঘর, সরকারী কার্যালয়, হাসপাতাল ও বর্ধশালা আছে। এখান ভীর্ষস্থান-

গুলির মন্দির টংকলীর রীতির চতুর্কোণ, শীর্ষে আমলাশিলায় উপর ছাউনি, সমুখে বিশাল মণ্ডপ।

কেনার ও বদরী হতে প্রায় মণ্ড কোশ দূর থেকে শীতের বেশ প্রকোপ দেখা যায়। দ্বয়ীকেশ থেকে ঐ স্থান পর্যন্ত পথে সকালের দিকে বেশী শীত বোধ হয়। রাজির কিরদংশেও শীতের মাজা বাড়ে। বাকী সময় গরম। যাত্রি-গণ গরম-পোশাক, আমাশর ও সর্দির ঔষধ, সরিষার তৈল, সরবতের সরঞ্জাম নিয়ে ভ্রমণ করেন। পথে বড়, বৃষ্টি ও তুলার মত তুষারপাত প্রায়ই হয়। কোন একট মলের সঙ্গে ভ্রমণই সমীচীন। পাহাড়ীরা সরল হলেও আত্মকাল এদিকে চোরের উপজীব বাঙছে।

ত্রীবদরীনাথের দ্বার অক্ষর তৃতীয়ার দিন বোলে জানতাম। এবার অনেক পরে দ্বার খুলল।

পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জীবমুক্ত সাধুগণের সঙ্গ মাতৃস্বকে অন্তর্মুখী করে। জব্যম্বুলা এই রাষ্ট্রে অধিক। মাতৃস্বের সংকীর্ণতা ভীর্ষের কল্যাণকেও ব্যাহত করে। তক্ত ও ভগবানের চিরবাহিত মিলনই পৃথিবীর সকল ক্লেশ দূর করে পরম শান্তি এনে দেয়। সেই শান্তির আশাতেই বদরীর মাতৃস্ব এত দূর এসেও ক্লান্ত হয় না। হিমাঙ্গি-সন্ধ্যানে এসে এই অনাবিল অপার্থিব বিষয়ে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীশুশীলচন্দ্র ঘোষ

নববর্ষ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল প্রদেশবাসীদের সম্বোধন করিয়া তাঁহার বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন :

“আজ সকলকে নতুন উদ্যমে, নতুন আশায়, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে বাবার সঙ্গ করিতে হবে। বাঙালীর কর্মশক্তিতে প্রেরণার অভাব যেমন কোন দিন না আসে, আত্মঘাতে বাঙালী অথবা শক্তিকর না করে। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও অপরাধের কর্মশক্তির পারস্পরিক সহযোগিতায় সাকল্যের পথে হোক আমাদের অগ্রগতি—আজকের দিনে এই কামনাই করি।”

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন :

“আমাদের প্রধান সমস্যা শাস্যসমস্যা। গত কয়েক বৎসরের চেঁচায় কলেও আজ পর্যন্ত আমরা শাস্য বিষয়ে আত্ম-নির্ভর হতে পারি নি। শাস্যসমস্যা মেটাবার দারিদ্ৰ্য আমা-দের নিষেধেরই নিতে হবে।”

পশ্চিমবঙ্গে খাজশস্ত্র ও অস্ত্রাস্ত্র ফল উৎপাদনের জমির যে কতটা অভাব তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। এইরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপালের উপরি-উক্ত আশা ও আকাজক্ষা যে কি করিয়া পূরণ হইবে তাহা অসম্ভবমান করা শক্ত। ময়ুরাক্ষী ও দামোদর বীধ এবং অস্ত্রাস্ত্র পরিকল্পনার দ্বারা সেচ-ব্যবস্থার কতকটা উন্নতি হইলেও পাট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রদেশের আয়তন বৃদ্ধি ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ কখনও খাজে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে।

সংবাদপত্রে দেখিলাম আচার্য্য বিনোবা ভাবে তাঁহার “ভূদান যজ্ঞ” এই প্রদেশে শীঘ্রই আরম্ভ করিবেন। অনেকে ইহা একটা নিদারুণ পরিহাস বলিয়া মনে করেন, কারণ সমগ্র প্রদেশবাসীই যখন একরূপ ভূমিহীন তখন তিনি কোথা হইতে ভূমি পাইবেন? সমস্যা-প্রধান বাংলায়

ভূমির অভাবই প্রধান সমস্যা। যদি সত্য সত্যই তিনি বাংলায় তাঁহার “ভূদান যজ্ঞ” সফল করিতে চাহেন তাহা হইলে প্রথমে “প্রাদেশিক” স্তরে তাঁহার “ভূদান যজ্ঞ” আরম্ভ করা উচিত। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ও পার্শ্ববর্তী প্রাদেশিক সরকারগুলির নিকট হইতে অগ্রে পশ্চিমবঙ্গের জন্ত ভূমি ভিক্ষা করিয়া তাহার পর এই প্রদেশের ভূমিহীন কৃষক-পর্ধ্যায়ে তাঁহার এই যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তবেই বাস্তব ক্ষেত্রে উহা সফল হইতে পারে। তিনি হায়দ্রাবাদে প্রথমে যখন “ভূদান যজ্ঞ” আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন কৃষক ও মধ্যবিত্তদিগকে কমিউনিষ্টদের প্রভাব হইতে দূরে রাখাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে যাহা সত্য প্রাদেশিক স্তরে তাহা অধিকতর সত্য। আশা করি, বাংলাদেশে এই “ভূদান যজ্ঞের” নবনির্ধারিত কমিটির সভ্যরা এ বিষয়ে আচার্য্য ভাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে তুলিবেন না। বাংলায় ভূমি সমস্যা যদি অচিরে সমাধান করিতে না পারা যায় তাহা হইলে আচার্য্য ভাবে “ভূদান যজ্ঞ” করিয়াও এই প্রদেশে তাঁহার মূখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবেন না।

পাটচাষের জমিতে ধান্য ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের কথা আমি পূর্বে যাহা লিখিয়াছি, বহু পাঠক বন্ধু উহা বিশেষ ভাবে সমর্থন করিলেও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রস্তাবকে “প্রাদেশিকতা” বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে পশ্চিমবঙ্গ যখন ভারতরাষ্ট্রের একটি অংশ তখন প্রস্তাবটি প্রদেশের স্বার্থের দিক হইতে ন্যায়সঙ্গত হইলেও ইহা গ্রহণ করা উচিত হইবে না। আমি এই মতাবলম্বী কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, খাদ্য-ভাবে, অর্থাভাবে বাঙালী জাতি ধ্বংসের পথে আগাইয়া গেলেও রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য কি তাহাকে আত্মবলি দিতে হইবে? “প্রাদেশিকতা” কি একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই বর্জনীয়? বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা প্রদেশে এবং সম্প্রতি ভারতীয় রেল পুনর্বিদ্যায় ক্ষেত্রে “প্রাদেশিকতা”র প্রকট মুক্তি কি দেখা দেয় নাই? এত দিন ভারত-সরকার কেন ইহার প্রতিকার করেন নাই? পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বাংলার জীবনমরণ সমস্যা ক্ষেত্রে এইরূপ যুক্তিতর্ক সমীচীন কি? এই সব প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর তাঁহাদের কেহই দিতে পারেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মতে এই প্রদেশে বনভূমির অভাব হেতু যে ১৪ লক্ষ একর অনাবাদী ও পতিত জমি আছে তাহা আবাদী জমিতে পরিণত করা প্রদেশের স্বার্থের অমূল্য হইবে না। যদিও বেশীর ভাগ পাট ও আউস ধান্যের জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল উৎপন্ন করা খুবই

সম্ভব তথাপি এই প্রদেশে মোট ১১৮ লক্ষ একর আবাদী জমি যাহা আছে উহার শতকরা ৯০ ভাগ জমিতে বৎসরে মাত্র একটি করিয়া ফসল উৎপন্ন করা হয়। তাহা ছাড়া আমাদের যৌথপরিবার প্রথা কৃষি ও খাদ্যোৎপাদনের পক্ষে একটি বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে। অধিকাংশ চাষের জমি অংশীদারদের মধ্যে বংশানুক্রমে বন্টনের ফলে ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর আয়তনে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে। এই একই কারণে পল্লী অঞ্চলে ভাল ভাল ফলের বাগান ও পুষ্করিণী একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত চাষের জমি, ফলের বাগান ও পুষ্করিণী যাহাতে ঐ ভাবে আর নষ্ট না হয় আইনের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা প্রদেশ সরকারের করা উচিত। যৌথপরিবার-ভুক্ত ব্যক্তির যদি ঐ সমস্ত জমি ও পুষ্করিণীর পুনরুদ্ধার না করেন অথবা আর্থিক ও অন্যান্য কারণে তাঁহাদের দ্বারা উহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আমার পূর্ব প্রস্তাবিত জেলা ডেভলপমেন্ট ট্রাস্টগুলি ঐ সকলের উন্নতি সাধন করিয়া যাহাতে উহার সমৃদ্ধ ব্যয় মালিকদের নিকট হইতে আদায় করিতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা প্রদেশ সরকারকে করিতে হইবে।

চাষের জমিগুলিকে ন্যূনতম পক্ষে ২৫ বিঘা বা ততোধিক পরিমাণে একত্রীকরণ করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে মালিকদের দ্বারা ঐ সমস্ত একত্রিত জমি হইতে ফসল উৎপাদন করাইতেও আইনের দ্বারা বাধ্য করা উচিত। ইহা না করিলে জমিতে জলসেচন ও কলের লাঙ্গল ব্যবহার করার সুবিধা হইবে না এবং খাদ্যশস্য ও ফসল উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে না। অনাবাদী পতিত জমি-গুলিতে স্থান-বিশেষে ফলের বাগান, বাঁশের চাষ, সেগুন, মেহগনি, শাল ইত্যাদি বৃক্ষ রোপণেরও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা দরকার। ইহার দ্বারা একই সঙ্গে ভূমি সংরক্ষণ (Soil Conservation) এবং নানা প্রকার ফল ও অর্থকরী ফসল ও কাষ্ঠ ইত্যাদির উৎপাদন হইতে পারিবে। প্রতি বিঘা জমিতে কমপক্ষে অন্তত ১২টি করিয়া আম্র, কাঁঠাল ও ঐ জাতীয় ফলের বৃক্ষ রোপণ করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিঘা প্রতি খরচাদি বাদে অন্তত ২০০ টাকা হইতে ২৫০ টাকা আয় হওয়া খুবই সম্ভব। এরূপ প্রতি বিঘাতে ৯টি করিয়া বাঁশের ঝাড় বসান যাইতে পারে এবং বিঘা প্রতি ৩০০ঃ৪০০ শত টাকা আয় হইতে পারে।

প্রদেশ সরকারের কৃষি বিভাগে সকল পর্ধ্যায়ে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকি সঙ্কে ও কার্যতঃ উৎপাদনের দিক হইতে তাঁহারা “বিনামূল্যে ব্যবস্থা-পত্রের” ন্যায় কৃষকদের উপদেশ দেওয়া ভিন্ন বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। প্রথমতঃ সব রকমের ভাল বীজ তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে ও

প্রয়োজনমত সরবরাহ করিতে একেবারেই অক্ষম। ইহা যদি অর্থাভাব হেতু হয় তাহা হইলে ঐ বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমাগত না বাড়াইয়া সেই অর্থে ভাল বীজ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা উচিত। আমার মিশ্র কৃষিক্ষেত্রের জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মাত্র দুই মণ আউস ধান্যের বীজ স্থানীয় কৃষি-বিভাগের ইন্স্পেক্টরের নিকট চাহিতেছি, কিন্তু তিনি উহা দিতে পারিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতে পারিতেছেন না, কারণ উপস্থিত তাঁহাদের হাতে কোন আউস ধান্যের বীজ নাই এবং কবে উহা পাইবেন তাহারও কোন স্থিরতা নাই। স্থানীয় কৃষকেরাও আউস ধান্যের বীজের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে। তাহাদের ধারণা যে, প্রদেশ সরকার পাটের চাষ লইয়াই বেশী ব্যস্ত; এজন্য ধান্য উৎপাদনের জন্য তাঁহারা বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন না। আশা করি, আমাদের কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মহোদয় সাধারণের এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা অবিলম্বে দূর করিতে চেষ্টা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য ছোট ছোট পেট্রোল অথবা তৈল চালিত পাম্প ভাড়া হিসাবে সরবরাহ করিবার কোন ব্যবস্থা কৃষি বিভাগে নাই। সাধারণে বেশী টাকা মূল্যের ঐ সমস্ত পাম্প উক্ত বিভাগ হইতে ক্রয় করিতে অক্ষম একথা তাঁহাদের জানা উচিত। তৃতীয়তঃ, পল্লীবাসীরা বাধ্য হইয়া বহুল পরিমাণ গোবর সার ও ভাল ভাল ফলের বৃক্ষ কাটিয়া কয়লার অভাবে জালানীর জন্য ব্যবহার করিতেছে। ইহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই সম্পূর্ণ দায়ী। তাঁহাদের খাদ্য-বিভাগ “অধিক খাদ্য ফলাও”, “বন মহোৎসব করো” ইত্যাদি বলিতেছেন ও এই কারণে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন, আর সেই সঙ্গেই কেন্দ্রীয় বানবাহন বিভাগ জনসাধারণের ব্যবহার্য্য পোড়া কয়লা চালান দিবার মালগাড়ী সরবরাহ করিবার জন্য সর্বনিম্ন ‘প্রায়রিটি’ স্থির করিয়া দিয়াছেন, সে কারণ আবশ্যকমত নিয়মিত ভাবে খনি হইতে পোড়া কয়লার চালান হইতেছে না। ফলে রাষ্ট্রে খাদ্য উৎপাদন বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে। ইংরেজী ভাষায় একটা কথা আছে—“Consistency in Politics is the virtue of an ass”, অর্থাৎ “রাজনীতি ক্ষেত্রে বরাবর একমত শোষণ করা একমাত্র গর্জভের ধর্ম্য”। কেন্দ্রীয় সরকার এই মতাবলম্বী কিনা তাহা তাঁহারা ই বলিতে পারেন।

কৃষি আয়কর (Agricultural Income Tax) খাদ্যশস্য ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির যে আর একটি অন্তরায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থ আয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ নানা কারণে বেশী ধার্য্য হইবার

দকন খাদ্যশস্য ও ফসল বৃদ্ধি করিতে কৃষকদের সেইরূপ উৎসাহিত করে না। আমার মতে যত দিন বাংলা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে না পারে ততদিন পর্যন্ত কৃষি আয়কর আদায় স্থগিত রাখা একান্ত কর্তব্য। কম পরিমাণ জমিতে বেশী ফসল উৎপাদন করিবার পক্ষে পানের চাষ, রেশম পোকার চাষ ও লাঙ্গার চাষের নিকে কৃষি-বিভাগের অধিক লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রদেশ সরকারের এ বিষয়ে যেরূপ প্রচার কার্য্য করা প্রয়োজন সেইরূপ হইতেছে না বলিয়া আমার ধারণা। অপর প্রদেশের তুলনায় বাঙালী শ্রমিকেরা শারীরিক দুর্বলতা হেতু অধিক পরিশ্রম করিতে পারে না। এই কারণ রেশম পোকার চাষ, পানের চাষ ও লাঙ্গার চাষ মধ্যবিত্ত যুবকদের ও স্বাস্থ্যহীন কৃষকদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমার একটি মিশ্র কৃষিক্ষেত্রে আউস ধান্যের ও পাটচাষের উপযুক্ত জমিগুলিতে প্রতি বৎসর একাধিক ফসল ও খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া আসিতেছি। প্রথমে আউস ধান্যের ক্ষেত্রে তিতর ১৬ হইতে ২০ হাত অন্তর কলার চারা রোপণ করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাতে লাঙ্গল পরিচালনার কোনরূপ অসুবিধা হয় না এবং বিঘা প্রতি ফসলের পরিমাণও কম হয় না। ইহাতে একটি সুবিধা যে, বর্ষার সময় ক্ষেত্রে মাটি ধুইয়া পার্শ্ববর্তী পুকুরিণীগুলি নষ্ট করে না। ক্ষেত্রে ধারে ধারে অড়হর গাছ লাগাইয়াও দেখিয়াছি যে, উহার ফলন সাধারণ ফলন অপেক্ষা কম হয় না বরং বেশী হয় এবং অড়হর রোপণের জন্য আলাদা ভাবে জমির দরকার হয় না। আউস ধান্য ও পাট উৎপাদনের পরই সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব জমিতে লাঙ্গল দিয়া মুগ, মুগুরী, ছোলা, মটর, কলাই ইত্যাদি লাগাইয়া মন্দ ফল পাই নাই। তাহার পর ঐ সব ফসলের শেষে শ্রীম্মকালের উপযোগী কুমড়া, ফুটি ইত্যাদির গাছ লাগাইয়া থাকি। বৎসরে এইরূপ একাধিক ফসল করিতে হইলে সকল সময় জলসেচনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। এই কারণ আমার ২৩টি পেট্রোল চালিত পাম্প আছে। মাত্র দুই গ্যালন পেট্রোলে প্রায় ২১ ঘণ্টা চলে এবং উহার দ্বারা ৩৪ বিঘা জমিতে ভালরূপে জলসেচন করিতে পারা যায়। প্রদেশ সরকারের কৃষি-বিভাগ যদি এরূপ কতকগুলি পাম্প ও পাম্পচালক প্রত্যেক মহকুমায় তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কৃষকদের আবশ্যকমত ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে সব রকম ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রদেশবাসী ও প্রদেশ সরকার উভয়েই যদি এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ সচেতন হন তাহা হইলে প্রতি বৎসর অড়হর, মুগ, মুগুরী, ছোলা, মটর ইত্যাদি

ক্রয় করিবার জন্য বাংলার যে লক্ষ লক্ষ টাকা অপর প্রদেশে পাঠাইতে হয় তাহা বাংলাদেশেই থাকিয়া যাইবে।

পেঁপে ও কলার চাষ খুবই অর্থকরী। কলার চারাগুলি ১০১২ হাত অস্তর সারি করিয়া বসাইয়া প্রতি গাছের মধ্যে যদি একটি করিয়া ভাল পেঁপের চারা বসান যায় তাহা হইলে কোনই ক্ষতি হয় না। ভাল জাতীয় পেঁপের বীজ প্রথমে সংগ্রহ করা দরকার। আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে, খুব কমপক্ষে প্রতি পেঁপের গাছে বাৎসরিক ৮ টাকা হইতে ১০ টাকা মূল্যের পেঁপে পাওয়া যাইতে পারে। সীমানার ধারে ধারে ৬ হাত অস্তর স্থপারি গাছ এবং ৪ হাত অস্তর কাগজি ও পাতি লেবুর চারা সারি করিয়া বসাইলে পরে ঐ সমস্ত গাছ বড় হইলে ভালরূপ বেড়ার কার্য্য করিবে। তাহা ছাড়া সীমানার ও পুষ্করিণীগুলির চারি ধারে ৫৬ হাত দূরে সারি দিয়া নারিকেল চারা ৮১০ হাত অস্তর বসাইলে জমি নষ্ট না করিয়া বহু নারিকেল, স্থপারি ও লেবুর চারা বসান সম্ভব। যদি পল্লী অঞ্চলে উঁচু আবাদী জমিগুলির চারি ধারে সম্ভবমত ঐরূপ স্থপারি, নারিকেল ও লেবুর চারা রোপণ করা যায় তাহা হইলে এই প্রদেশে ঐ সকল অর্থকরী ফসল উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইতে পারে।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে প্রদেশ সরকারের কৃষি-বিভাগ স্বল্প মূল্যে আমাকে অনেকগুলি হাঁস (Khaki Campbell) ও মুরগী (Leghorn এবং R. I. Red) দিয়াছিলেন। গত কয়েক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত যুবকরা যদি ছোট ছোট Poultry Farm (হাঁস মুরগীর চাষ) করে এবং প্রদেশ সরকার যদি ঐগুলির তত্ত্বাবধান করিবার ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার হাঁস, মুরগী ও ডিম অপর প্রদেশ হইতে আমাদের আর ক্রয় করিবার আবশ্যক হইবে না। দুঃখের বিষয়, প্রদেশ সরকার প্রতি বৎসর যথেষ্ট পরিমাণ ঐ জাতীয় হাঁস ও মুরগী বিদেশ হইতে আমদানী করিতেছেন না, ফলে ভাল জাতীয় হাঁস ও মুরগীর সংখ্যাও দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। একমাত্র সংক্রামক রোগই হাঁস ও মুরগী পালনের অন্তরায়। যদি আমাদের কৃষি-বিভাগ নিয়মিত ভাবে ঐ সমস্ত হাঁস ও মুরগীর টিকা দানের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে ঐ সব সংক্রামক রোগের ভয় খুবই কমিয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এ বিষয়ে ভালরূপ মনোযোগ দেন তাহা হইলে হাঁস ও মুরগী পালন এই প্রদেশের একটি বিশেষ অর্থকরী ব্যবসা হইবে এবং সেই সঙ্গে বেকার-সমস্যাও কতকটা সমাধান হইবে।

মৎস্য বাঙালীর একটি প্রধান ও অন্যতম খাদ্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রয়োজনের অর্ধেক পরিমাণও জন্মায় না। এই প্রদেশের নদী, বিল, পুষ্করিণী ও অন্যান্য জলাশয়গুলির যদি ভালরূপ সংস্কার করা যায় তাহা হইলে মৎস্য উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রদেশ সরকারের মৎস্য-বিভাগ গভীর জলের মৎস্য সংগ্রহ (Deep Sea Fishing) লইয়াই বেশী ব্যস্ত। কলিকাতার বাজারে আমি বহুদিন গভীর জলের মৎস্য ক্রয় করিবার জন্য খুঁজিয়াছি, কিন্তু মাত্র একদিন ছাড়া আর সকল দিনই গভীর জলের খাত্ত-উপযোগী মৎস্যের পরিবর্তে নানা প্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তুর মাংস বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি।

আমার মিশ্র কৃষিক্ষেত্রে ছোটবড় ৮১০টি পুষ্করিণী আছে। উহাতে নিয়মিত ভাবে মৎস্যের চাষ করিবার জন্য আমি গত কয়েক বৎসর ধাবৎ বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রদেশ সরকারের মৎস্য-বিভাগের সদর ও মহকুমা দপ্তরের কর্মচারীদের সহিত বহু পত্র-বিনিময় করিয়াও বৎসরে একবারও ঐ কৃষিক্ষেত্রে তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে পারি নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার মৎস্যচাষের জন্য প্রদেশ সরকারকে প্রতি বৎসর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয় অর্থ বিভাগীয় কর্মচারীদের বেতন বাবদই খরচা হইয়া যায় কিনা তাহা জনসাধারণ জানিতে পারিলে স্তম্ভী হইবে।

প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় প্রদেশ সরকারের মৎস্য-দপ্তরের তত্ত্বাবধানে পুষ্করিণীর পুনরুদ্ধারের জন্য জল তুলিবার পাম্প, মাটি কাটার মজুর ইত্যাদি সরকারী মনোনীত ঠিকাদারদের মারফৎ আবশ্যকমত জনসাধারণ বাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে পল্লী অঞ্চলে পুষ্করিণীতে মৎস্য থাকা সত্ত্বেও সময়মত জাল ও জেলের অভাব হেতু সাধারণে মৎস্য ধরিতে পারে না। যদি মৎস্য-দপ্তর এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে নিয়মিত ভাবে পল্লী-অঞ্চল হইতে আরও অনেক বেশী পরিমাণ মৎস্য পাওয়া যাইতে পারে।

দেশবাসীদের দুঃখের অভাব মিটাইবার জন্য প্রদেশ সরকার নানারূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কয়েক বৎসর হইল হরিণঘাটাতে একটি সরকারী ডেয়ারী স্থাপন করা হইয়াছে। যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে হরিণঘাটা ডেয়ারী হইতে গো-দুগ্ধ অপেক্ষা বিদেশ হইতে আমদানী টিনের দুগ্ধই গো-দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চালান হইয়া থাকে। ঐ চালানী দুগ্ধের শতকরা ৭৫ ভাগ নাকি টিনের দুগ্ধ এবং বাকী ২৫ ভাগ মাত্র সরকারের

নিজস্ব ডেয়ারী হইতে ও নিকটবর্তী স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

সম্প্রতি প্রদেশ সরকার একজন ডেয়ারী ডেভলপমেন্ট অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুঃস্থতির পরিকল্পনা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রদেশ সরকার এই পরিকল্পনার জ্ঞাত যে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবেন তাহারই উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

এই প্রদেশে যে সমস্ত দেশী গাভী আছে উহাদের দ্বারা দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। যদি প্রদেশ সরকার ভাল জাতীয় গাভী অপর প্রদেশ হইতে আমদানী করিয়া পল্লী-অঞ্চলে মধ্যবিত্ত যুবকদের দ্বারা সমবায় পদ্ধতিতে ডেয়ারী প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটা স্থিতিস্থাপক পরিকল্পনা অনুসারে স্বল্প মূল্যে অথবা বিনামূল্যে এই সমস্ত গাভী দিবার ব্যবস্থা করেন তবেই দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি কতকটা সম্ভব হইতে পারে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মধ্যেও এই রূপ ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা তাঁহাদের উদ্ভূত দুগ্ধ সরকারী দুগ্ধ-সংগ্রহ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরবরাহ করিতে পারে। এই সমস্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করিবার জন্য Cooling Plant যুক্ত মটর ভ্যান নিয়মিত সকালে ও বিকালে প্রধান প্রধান জেলা রাস্তাগুলির ধারে ধারে দুগ্ধ-সংগ্রহের ষ্টেশনগুলি হইতে দুগ্ধ লইয়া কলিকাতা অথবা স্থানীয় নিকটবর্তী শহরগুলিতে সরবরাহ করিতে পারে। এই প্রদেশে গোচারণ ভূমিরও খুবই অভাব এবং পল্লীতে পল্লীতে সেই অভাব পূরণ করিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে দুগ্ধবৃদ্ধি পরিকল্পনার মধ্যে দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ হইবার পর এই সমস্ত সরকারী বিতরিত গাভীগুলিকে জেলার সরকারী ডেয়ারী ফার্মে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নচেৎ উহাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকিবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, খাদ্যের জন্য প্রতিদিন অপর প্রদেশ হইতে দুই-একখানি ট্রেন বোঝাই বহু ছাগল ও ভেড়া কলিকাতায় আমদানী করা হয় এবং এই বাবদ প্রতি বৎসর বাংলাদেশকে কয়েক লক্ষ টাকা অপর প্রদেশে পাঠাইতে হয়। বাংলাদেশে সকল ঋতুতে নানারূপ ঘাস ও গাছের পাতার অভাব না থাকা সত্ত্বেও এই প্রদেশে

ছাগল ও ভেড়া পালনের প্রথা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক কম। ইহাদের মূল্য ও মাসিক খরচা বেশী নহে। বাংলায় পল্লী ও গ্রামাঞ্চলে এমন কি শহরাঞ্চলেও সকল গৃহস্থই ছাগল ও ভেড়া পালন করিয়া অল্প খরচায় যথেষ্ট দুগ্ধ পাইতে পারেন। যদি পশ্চিমবঙ্গে ছাগল ও ভেড়া পালনের প্রসার লাভ করে তাহা হইলে একই সঙ্গে প্রদেশে দুগ্ধ উৎপাদন ও খাদ্য বৃদ্ধি হইবে।

সরকারী কৃষি-বিভাগ এ বিষয়ে সেরূপ মনযোগ দিতেছেন না এবং এইজন্য কোন প্রচারকার্য চালাইতেছেন না কেন তাহা বুঝিতেছি না।

প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় মাটির গুণের প্রভেদ আছে। একই রকম ফসল ও খাদ্যশস্য এক জেলায় অথবা মহকুমায় সেরূপ উৎপন্ন হয় অপর জেলায় ও মহকুমায় শত চেষ্টা করিলেও সেইরূপ উৎপন্ন হয় না। তাহার উপর জলবায়ুর সমতাও সকল জেলায় একরূপ নহে। এ ক্ষেত্রে যদি ভাল ভাবে এই প্রদেশে কৃষির উন্নতি করিতে হয় তাহা হইলে প্রত্যেক জেলায় এবং সম্ভব হইলে প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া সরকারী কৃষিক্ষেত্র গোচারণ ভূমিসহ থাকা একান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে বীজ উৎপাদন এবং স্থানীয় মাটির গুণ ও জলবায়ু অনুসারে যে সমস্ত খাদ্যশস্য ও ফসল ভালরূপ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া স্থানীয় কৃষকদিগকে উপদেশ দিতে হইবে এবং সেই ভাবে প্রচারকার্য চালাইতে হইবে।

সংবাদপত্রে দেখিলাম, পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ও পুনর্বাসিত মন্ত্রী (Relief & Rehabilitation Minister) ২৪ পরগণার কয়েকটি থানা পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থাভাবে স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাদের নিজেদের আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিতে একেবারেই অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন, —“ইহা খাদ্যের দুর্ভিক্ষ নহে—অর্থের দুর্ভিক্ষ।”

যদি এই ভাবে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা বাংলা হইতে অপর প্রদেশে চলিয়া যায় তাহা হইলে আজ হাসনা-বাদ, সন্দেহখালি, হারোয়া, জয়নগর, ক্যানিং প্রভৃতি থানা অঞ্চলে অর্থের যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তাহা যে এক দিন সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিতে পারে একথা লেখাই বাহুল্য।



শ্রীকুম্ভরঞ্জন মল্লিক

2

9

8

9

b

এসো, পরিধিতে নিরঞ্জন
 'রঞ্জন' রশ্মির,
 দেখ, তুমি সেই বন্য মানব
 হস্তে ধনুক তীর ।
 কোথা সজ্জিত রঙ্গিন পটভূমি ?
 কুৎসিততর দেখিবে হয়েছ তুমি ।
 বিশ-শতকের সভ্যতা হবে
 লজ্জায় নতশির ।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

৪

দীনবন্ধু সিংহাসনর ছিলেন জমিদারের সভাপতি। পারিবারিক সন্তান-গণনা ও মাদলিক নির্দেশদানের জন্তে প্রত্যহ তাঁকে জমিদার-বাড়ীতে পদধূলি দিতে হ'ত। সে কারণে তাঁর স্বস্তিত্বের ব্যবস্থাও ছিল প্রচুর।

বর্তমান যুবক-জমিদার সিংহাসনরঠাকুরকে সম্মানে অপসারিত করেছেন। কালীবাড়ীর জমিদার মত পণ্ডিতের স্বস্তি-ব্যবস্থাও অনাবশ্যক বাক্য ব্যর ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না তিনি। ব্যয়-সংকল্পের অজুহাতে এরূপ একটি হিতাকাজকী পণ্ডিতের স্বস্তিলোপ জমিদার-গ্রহিণী রমাদেবী সমর্থন করেন নি। মাঝে মাঝে দীনবন্ধু ঠাকুরকে তিনি ডেকে পাঠাতেন—যথারীতি প্রণামীও দিতেন। সেই সুযোগে অন্দর-মহলে থেকেও জমিদারের উচ্ছ্বল আচরণের জন্তে প্রজ্ঞা-সাধারণের অসন্তোষস্বস্তির কারণটাও অবগত হতে পারতেন।

জনমন্ত উপেক্ষা করে কালী-মন্দির দখলের অভিযান দেখে রমাদেবী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েও জমিদারকে প্রতিশ্রুত করতে পারেন নি।

একদিন তিনি গোপনে দীনবন্ধু ঠাকুরকে ডেকে পাঠালেন। উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কি উপায় হবে ঠাকুরমশাই ?

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে দীনবন্ধু ঠাকুর বললেন, আমি আর কি বলবো মা ? মতপের উচ্ছ্বলতা চরমে উঠেছে। এ জমিদারী বোঝ হয় ধ্বংস হবে...

—তবেই নরোত্তম আপনার বিশেষ অহুগত। দয়া করে তাকে বলবেন...কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই চূপ করে রইলেন। কি যে বলবেন, তবে ঠিক করতে পারলেন না। হঠাৎ নিজের একমাত্র পুত্র খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন।

রমাদেবীর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে দীনবন্ধু ঠাকুর তাঁকে নামান্তরে সাত্ত্বনা দিতে লাগলেন। বুঝিয়ে বললেন, নরোত্তম একটা নির্ধন ডাকাত, অতি হৃদয় লেঠেল—সেকথা সত্য। কিন্তু সে অমাহুষও নয়, অধার্মিকও নয়। নিতান্ত অশিক্ষিত চাষা হলেও তার মাতৃভক্তি অসাধারণ। কোমল মায়ের বুকে আশ্রয় দিতে সে কখনই পারবে না...

—কিন্তু মা-কালীর কোপ-দৃষ্টি। তাঁকে অবজ্ঞা করার শাস্তি ? রমাদেবী শিউরে উঠলেন।

দীনবন্ধু ঠাকুর জানতেন যুবক-জমিদার ঘোর নাস্তিক—সেই জন্যে পৌত্তলিকতা-বিরোধী। বাড়ীর সর্বত্র বারুচির

গতিবিধি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যেমন দেব, তেমনি দেবী। কিন্তু একি ! মা-কালীর কোপদৃষ্টির তরে রমাদেবীর চোখ-মুখ পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে যে।

অতীতে এই জমিদার-বংশের খেতাব ছিল 'রাজা'। এখনকার যুবক-জমিদার কুমারবাহাদুর নামেই পরিচিত। কুমার-বাহাদুর ছোটবেলা থেকেই উচ্ছ্বল ও অধ্যয়নে অমনো-যোগী। যুদ্ধ জমিদারের বন্ধুত্ব এই পিতৃ-মাতৃহীনা রমা দেবী আবাল্য জমিদার-বাড়ীতেই প্রতিপালিত। কুমারবাহাদুরের সমবয়সী, খেলার সাথী ও সহপাঠিনী। যুদ্ধ জমিদার রমাকে নিজের ঘরের মতই ভালবাসতেন ও আদর-বস্তু করতেন। কুমারবাহাদুর উচ্চ-ইংরেজী বিভাগের বোমার পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। কিছুতেই তার দেহাল ভিত্তিরে কলেজে পৌঁছতে পারলেন না। রমাদেবী সম্মানে বি-এ পাস করলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমারবাহাদুরের পানাসক্তি ও আর্থ-মদিক ব্যাপারাদির কথা যখন যুদ্ধ জমিদারের কানে পৌঁছল, তখন তিনি কুমারকে ত্যাগ্যপুত্র বোধবার সঙ্গ জানালেন। প্রতিবাদী হলেন—রমাদেবী।

গম্ভীরভাবে যুদ্ধ জমিদার জিজ্ঞাসা করলেন, রমা ! পারবে তুমি আমার এই জমিদারী রক্ষার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে ?

প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রমাদেবী বহুক্ষণ সজ্জিতভাবে ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন।

যুদ্ধ জমিদার বলতে লাগলেন—ভেবে দেখ, বুঝে দেখ, একটা উচ্ছ্বল মাতালের সঙ্গে গাঁটহড়া; বেঁবে সারাজীবন চোখের জলে ভাসবে কিনা...?

রমাদেবী নিরুত্তর। কুমারবাহাদুরের সঙ্গে তার প্রকৃতিরও কোন সাদৃশ্য ছিল না, মতেরও মিল ছিল না। কুমারের প্রহারের হু'একটা চিহ্ন এখনও তার দেহে আছে। কতদিন পুত্রঘাটে গিয়ে কুমার তাকে বাঁকা দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছে—আবার পিঠে ভুলেও সাতার শিখিয়েছে। পড়ার বই কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে, আবার দগ্ধরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে এনে সোনার জলে নাম খোদাই করেও দিয়েছে। স্নেহের এইরূপ বহু অভ্যাসের মধুর স্মৃতি রমার মনে ভেসে উঠতে লাগল। তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। সেই কুমার হবে ত্যাগ্য-পুত্র ! একেবারেই বক্ষিত ও ব্যর্থ হবে তার জীবন। রমা তা সহ করবে কি করে ?

উচ্ছ্বল কুমারের প্রতি রমার এই দয়াদী মনের সহানুভূতির কথা যুদ্ধ জমিদার জানতেন। তবু তাকে সন্তর্ক হতে বললেন।

কুমারের এই অসংপত্তনের দ্বারা তার লোকাভিমান স্নেহশীল জননীকে দারী করে বলতে লাগলেন, যেহেতু শুধু ভাল-বাসতেই জানে। নির্জলা স্নেহ আর মমতা দিয়ে মানুষ তৈরি করা যায় না। শাসন নির্ঘন না হলেও নিরপেক্ষ ও নির্দ্বিষ্ট হওয়া উচিত। তুমি পারবে না রমা। তোমার সহিত্য ও কোমলতার ধরনও আমি রাখি।

—না না, আমি পারব। কুমারের প্রতি এত বড় অবিচার আপনি করবেন না।—রমাদেবী অবুঝ বালিকার মত কেঁদে কেললেন।

একটু হেসে দীনবন্ধু ঠাকুরের দিকে চেয়ে বুদ্ধ জমিদার বললেন, তবে আর ভাবনা কি সিদ্ধান্তরত্ন? পাঁজি খুলে দিন দেখ। লোকে-কথা-সম্প্রদান করে, আমি পুঙ্খ-সম্প্রদান করব—আমার ওই শিক্ষিত-মা রমার হাতে...

ভালবাসা অল্প। নিমজ্জমান শৈলব-সাবীকে ডাঙার তুলতে নিয়ে রমাদেবী মিছেও ডুবে মরতে রাজী হলেন। মহা-সমারোহে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল।

আজ পর্যন্ত স্বামীর চরিত্র-সংশোধনের বহু চেষ্টা রমাদেবী করেছেন, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন নি। যুগ্মের যত্নের পর কুমারকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ ঘুরে এসেছেন, বর্তমান জগতের উদার মতবাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কুমারের নিম্ন মতবাদের কোমল পরিবর্তন ঘটে নি।

কুমারবাহাদুরের ধারণা শুধু শাসন ও শোষণই জমিদারী রক্ষার একমাত্র উপায়। রমাদেবীর প্রজা-হিতৈষণা অতি অবাস্তব ভাষা। চাষার জন্ম জমি-চাষের দ্বারা, আর জমিদারের জন্ম সেই চাষের উপস্থিত ভোগদলের নিমিত্ত। নরোত্তমের মত একটা চাষীপ্রজা আজ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী—একথা তাবলেও কুমারবাহাদুরের রক্ত গরম-হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্য পরিবেশ থেকে কুমারবাহাদুর আহরণ করে এনেছেন অতি উৎকৃষ্ট মতবাদ আর নানাবিধ বিলাস-ব্যসনের প্রবৃত্তি। হঠাৎ জমিদারবাড়ীতে বিজলী-বাতির রোশনাই দেখে, প্রজাদের চোখ বল্গে গেল। তারা কুমারের নিউ-মডেলের মোটরখানাকে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু রমাদেবীর ঐকান্তিক অস্বস্তি সত্ত্বেও হ'লারটা টিউবওয়েল খুঁজে প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণের কোনও ব্যবস্থা হ'ল না।

নরোত্তমের সন্তকীর আখ্যাত্তে কুমারবাহাদুরের উচ্চদেশ জখম হয়ে আছে। এক মাসের উপর তিনি শয্যাশায়ী। এ অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে যত্নের চেয়েও বেশী মনে হচ্ছে। রমাদেবী কোনও কথা বলতে এলেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন—চিংকার করে বন্ধুকে ডেবিরে বলেন, পার ত নরোত্তমকে জলি করে এস...

নরোত্তম কে? রমাদেবী মনে করেন উচ্চ জমিদারের

অভ্যচারের বিরুদ্ধে মা-কালীর প্রতিবাদ-মুষ্টি। কালীমাতা সবচেয়ে রমাদেবীর মনে ঘেঁষে কতখানি গোপন দুর্বলতা আছে—সেকথা কুমারবাহাদুর জানেন না। দেব-দেবীর মধ্যে কালীকে তিনি অত্যন্ত ভয় করেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে তার বানিকটা মতৈক্য থাকলেও ক্রমাল-বদনীকে একেবারেই অস্বীকার করতে পারেন না তিনি। কালীকে মনে করেন—অনিশ্চিত অন্ধকারের বিভীষিকা। সেই রুধিরাক্ত লোলরসনা ভয়ঙ্করী দেবী যদি বিরূপ হয়ে উঠেন—মামুষের প্রতি মামুষের অবিচার ও অভ্যচারের বিরুদ্ধে খড়া ধারণ করেন, তা হলে কুমারবাহাদুরের মত অভ্যচারীরাই যে হবে তার প্রথম বলি, এ বিষয়ে রমাদেবীর কোন সন্দেহ নেই।

রমাদেবী এক দিন কুমারবাহাদুরকে ডিজানা করলেন—আচ্ছা, কালীবাড়ীটা দখলে নিয়ে তুমি কি করতে চাও, তোমার উদ্দেশ্য কি?

সদন্তে কুমারবাহাদুর সর্জিত উঠলেন, ওখানেই হবে আমার বাগানবাড়ী। ঐ কুৎসিত পাথরের মূর্তিটাকে আমি বিসর্জন দেব নবগঙ্গার জলে...

রমাদেবীর বুকের তিতরটা কেঁপে উঠল। থোকাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চিংকার করে তার বলতে ইচ্ছা হ'ল—ওগো, না, না, আমার এত বড় সর্বনাশ-করো না। শুধু এ জমিদারী ধ্বংস হবে না, আমার থোকাও মরে যাবে।—মামুষের সংস্কার বা বিধাংগকে কোনও মুক্তিভরকের গভীতে আবদ্ধ রাখা যায় না।—একথা কুমারবাহাদুরের জানা নেই।

দীনবন্ধু ঠাকুর বলেছেন, এ জমিদারী ধ্বংস হবে। কালী-বাড়ী দখলের চেষ্টাই যে হবে সেই ধ্বংস-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সে বিষয়ে রমাদেবীর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু উপায় কি?

রমাদেবী দীনবন্ধু ঠাকুরকে মনের উদ্বেগ জানিয়ে ডিজানা করলেন, কুমারবাহাদুরের মতিগতি পরিবর্তনের কি কোনও উপায় নেই?

দীনবন্ধু ঠাকুর হতাশভাবে বললেন, তাই ত মনে হয় না। 'প্রকৃতি মুর্খনি বর্জিত'...

সাহোদর তিনটি ভাইকে নিয়ে নরোত্তম ঘেঁষে মনের সংসার গড়ে তুলেছিল—সেখানে কারও গারে কোনও ছুঁধের আঁচ লাগত না, যদি বোয়েরা একটু বুকে-বুকে চলত। বোয়েরদের মধ্যে কারও সঙ্গেই কারও বনিবনাও ছিল না। সে কারণে নরোত্তমের মনেও অশান্তি ছিল পূর্ব।

সাধিক ব্রাহ্মণ দীনবন্ধু ঠাকুরকে নরোত্তম বিশেষ ভক্তি-প্রজ্ঞা করত। সন্ধ্যার পর তাঁর মুখে ধর্মকথা শোনা

নরোত্তমের একটা দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজের পারি-
বারিক সুখ-দুঃখের কথা দীনবন্ধু ঠাকুরের কাছে নিবেদন
করতে না পারলে তার মনে শান্তি হ'ত না।

বৌয়েরের বগড়া-খাট ছিল নরোত্তমের সংসারে শিথ্য-
নৈমিত্তিক ঘটনা। কি তাবে সামান্য একটা কথার ভুল বা ক্রটি
উপলব্ধ করে কলহের সৃষ্টি হ'ত তা দেখে নরোত্তমের
স্নেহাৰ্চ উদার মন ব্যাধার ভরে উঠত। কিন্তু প্রতিকারের
কোনও উপায় বুঁজে পেত না। বগড়ার কারণ বিশ্লেষণ করে
এক দিন সে দীনবন্ধু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল—বল ত ঠাকুর-
বুড়ো! কি উপায় করি।

দীনবন্ধু ঠাকুর বললেন, নরোত্তম! শুণু উপেক্ষা। এ ছাড়া
এদের শাস্ত রাখবার কোনও উপায় নেই।

—আমার মনে হয়, বৌয়েরা হাঁড়ি আলাদা করতে চায়...

একটু চিন্তা করে দীনবন্ধু ঠাকুর বললেন, হাঁড়ি আলাদা
করলে যদি শান্তি হয় করতে পার, কিন্তু বাড়ী আলাদা করো
না। বাড়ির বাঁশ বড়ো পড়ে না। চারটি ভাই, এক ঠাইয়ে
আছ বলেই লোকে তোমাদের সমীহ করে চলে। বুদ্ধিমান
লোকও একা হলে বোকা হয়ে যায়...

—তা সত্যি...নরোত্তম একটু ভাবল। হাঁড়ি আলাদা
করার কথা তাবতেও তার বুকটা কেটে যায়। একটু উত্তেজিত
ভাবে হঠাৎ বলল, আমার ভ্রামাচরণ, আমার সখিচরণ,
আমার মনোহর যে আমার পাঁজরার এক-একখানা হাড়—এ
কখাটা বৌয়েরা কেন বুকে না? বলতে পার ঠাকুরবুড়ো?

—ভারা যে পরের মেরে।—এক টিপু মস্ত টেনে দীনবন্ধু-
ঠাকুর বললেন।

ব্যাখ্যা করে মানে বুঝিয়ে দেবার সময় দীনবন্ধু-ঠাকুর লক্ষ্য
করলেন—নরোত্তমের হুঁচোখ সজল। বিষয় প্রকাশ করে
জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা নরোত্তম! তুমি লাঠিবাড়ী কর।
সড়কীর খোঁচার মানুষের বুকটাকে একেঁড়-ওকোঁড় করতেও
তোমার হাত কাঁপে না। তোমার চোখে জল কেন?

ঠিক এই সময়ে দীনবন্ধু গৃহিণী খামিভাঙা সরিষার ভৈজে
মাখা এক বামা মুড়ি আর কয়েকটা কাঁচা লক্ষা এনে রাখলেন
নরোত্তমের সামনে।

—আমার যে বজ্র ধিমে পেয়েছে তা তুমি কি করে
জামলে মুড়িমারীকরণ?—হাসতে হাসতে মুড়ির বামাটা
কোলের উপর তুলে নিয়ে নরোত্তম বলল, ছেলের চোখ-বুখ
দেখলেই মারেরা বুঝতে পারেন, সে না-থেরে আছে, বৌয়ের
সঙ্গে বগড়া করেছে। ভাই নয় কি মা? নরোত্তম খুব হাসতে
লাগল।

বুড়ো বলে ডাকলেও নরোত্তম প্রায় দশ বছরের বড়।
এমন বুড়ো-ছেলের মা ডাক শুনে দীনবন্ধু-গৃহিণী ঘোমটার খুণ
ঢেকে এক খট জল রেখে চলে গেলেন।

ভাত্র মাস। পল্লীর মাঠ-বাট কানায় কানায় ভরা। ধান
আর পাট সেই জলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বেড়ে উঠছে।
দিশন্ত-বিস্তৃত একটা সবুজ আন্তরণ যেন দূরে—বহু দূরে গিরে
মিশেছে নীল আকাশের কোলে। যেখানে যেখানে আগাম
পাট-কাটা সারা হয়ে গেছে, সেখানে ফুটে উঠেছে অসংখ্য
শালুক ফুল। দূরে দূরে হুঁ একটা হিজল গাছ যেন বুক-জলে
দাঁড়িয়ে আছে।

পাঁয়ের ঘাটে ঘাটে ডিঙ্গি নৌকা আর লগি। বর্ষাকালে শস্ত-
ভ্রামল পূর্ববঙ্গের বিলাফলে এবাড়ী-ওবাড়ী ঘাভায়াত করতে
হলেও জলঘানের সাহায্য চাই। বাড়ীগুলি যেন পটে আঁকা
ছবির মত জলের উপর বিকিণ্ডভাবে ভেসে আছে।

দীনবন্ধু ঠাকুরের বাড়ী পাঁয়ের দক্ষিণপ্রান্তে। তার দাওয়ার
বসে মধুমতীর তেউ দেখা যায়। বহু দূর পর্য্যন্ত কাঁকা। ধানের
জমির ভিতর দিয়ে 'দাঁড়া' পড়ে গেছে। সেই দাঁড়াই হ'ল
গ্রাম্য নৌকাগুলির গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘাভায়াতের পথ।
বাভাসের অুরোগ বুকে কেউ-বা পাঁয়ের চাদর উড়িয়ে পাল
ভুলেছে, কেউ-বা লগি ঠেলছে বাভাসের বিরুদ্ধে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ভখনও মাঠে নামে নি, গৃহস্থের
আনাচে-কানাচে উঁকি দিচ্ছে। অন্তর্গামী স্বর্ষ্যের শেষ-রশ্মি
গাছের আগায় বিকিম্বু করছে। নরোত্তম তার দেশকে
ভালবাসে। মুষ্টি দৃষ্টিতে মাঠের দিকে চেয়ে মুক্তি চিরুচ্ছে—
তার মনের ভাব বোঝ হয় এইরূপ—'এই দেশেতেই লক্ষ ঘন
দেশেতেই মরি।'

এমন সময় একটা পুরো-পেটো ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে
বকা-ছেলে এসে হাজির হ'ল। দীনবন্ধু ঠাকুর জিজ্ঞাসা
করলেন, কিরে বকা—ববর কি?

—বড়ই মুশকিলে পড়েছি ঠাকুরদা।

—কি মুশকিল?

—ওপাড়ার মণ্ডাঠাকুর এই মাছটা দর করলেন হুঁ'আনা।
আমি চেয়েছি দশ পরস। না, না, হুঁ'আনাই দিচ্ছি
বলে, একটা হুঁ'আনি কেলে দিলেন তিনি আমার নৌকোর
ভিতর...

—তারপর?

—হুঁ'আনিটা আমি বুঁজে পাচ্ছি না—মাছের দাবিও
তিনি ছাড়ছেন না। এখন কি উপায় করি বল ত...?

—হুঁ'আনিটা তুই দেখেছিস?

—আজ্ঞে না। তবে নৌকোর ভিতর 'ঠক' করে একটা
শব্দ হয়েছে—তা শুনেছি...

নরোত্তম বলল, একটা পরস। ফেললেও ত 'ঠক' করে শব্দ
হতে পারে...

—উহঃ! একটা ঠক-শব্দ শোনার জন্যে একটা পরস
ব্যয় করবেন—এত নিরর্থক মণ্ডাঠাকুর নন। থাকগে...ট্যাংক

থেকে ভিন্ন আমার পরমা বন্ধন হাতে দিয়ে দীনবন্ধু ঠাকুর বললেন, এই যে দাম। মাছটা আমাকেই দিয়ে যা...

—বাবুদের অভিযান লাগবে না ত ?

—আরে, আমিও ত বাবু। আশীর্বাদ করছি—‘তুই একশো বছর বাঁচবি’। অভিযানে আর আশীর্বাদে কাটা-কাটা হয়ে যাবে, তোর পরমাত্ম ঠিকই থাকবে।

মাছটা দীনবন্ধু ঠাকুরের পারের কাছে রেখে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বন্ধা চলে গেল পরমা নিয়ে।

নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপারটা কি হ'ল ঠাকুর-বুড়ো ? নৌকোর ভেতর মধু ঠাকুর কি ফেললেন ?

—মা ফেললে ঠক্ক-শক্ক হয় তার বেশী কিছুই ফেলেন নি। মধু ঠাকুরের কাছে মাছের চেয়েও পরমা বেশী মধুর। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে নরোত্তম...

—কি ?

—যাবার পথে এই মাছটা পৌঁছে দিও মধু ঠাকুরের বাড়ীতে...

—কেন ?

—আরে, তিনি যে আমার বোমাই। মেরে মেরে গেলেও সম্পর্কটা ত এখনও আছে ? বিনা পরমায় মাছটা পেলে খুব খুশী হবেন তিনি...

মরা মেয়ের কথা মনে পড়ে দীনবন্ধু ঠাকুরের চোখ ছুট পড়ল হয়ে উঠল। মধু ঠাকুর অনেক নির্ধাতন করেছিলেন মেয়েটিকে। মানা রোগে ভুগে মরেছিল সে। কখনও এক কোঁটা ওষুধ বা পথ্যের জন্তে ব্যয় করেন নি। সেই অর্ধ-পিশাচকে খুশী করার আগ্রহ দেখে নরোত্তম অবাক হয়ে চেয়ে রইল দীনবন্ধু ঠাকুরের যুগের দিকে।

মাছটা হাতে তুলে নিতে নরোত্তম বলল, আমি কিন্তু দুটো পক্ষ কথা শুনিয়ে দেব তোমার বোমাইকে।

—না মা, পক্ষ কথা শোনানো মানেই মাদ্রুঘের কুপ্রভৃতিকে আরও বেশী করে জাগিয়ে তোলা। হ্যাঁ ভাল কথা, দাক্তার মোকদ্দমার তারিখটা কোন্ মাসে পড়েছে নরোত্তম ?

—আধিন মাসে, পূজোর পর...

—তাই নাকি ? খুব হুঁসিয়ারী সবে তবির কর, ভাল ডাক্তার লাগাও... জমিদার-গৃহিণী কি বলেছেন জান ?

—কি ?

—যত টাকা লাগবে তিনি দেবেন। তোমার যেন জেল না হয়। তবে, কথাটা খুব গোপন রাখা চাই। কুমার-বাহাদুর জানতে না পারেন...

নরোত্তমের বিষয়ের সীমা ছিল না। যত টাকা লাগবে জমিদার-গিণী দেবেন—এ কথার মানে কি ? এও কি সম্ভব ? নরোত্তম উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার বলে, পড়ল। সবিস্ময়ে

বলল, কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ঠাকুর-বুড়ো ! বুঝিয়ে দাও তুমি কি বলছ...?

দীনবন্ধু ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন—রমাদেবী অন্তত তীত হয়ে পড়েছেন তাঁর একমাত্র পুত্রের অমঙ্গল আশংকার। নরোত্তম যে মা-কালীর অঙ্গুষ্ঠীত সে বিষয়ে তাঁর মনেও কোনও সন্দেহ নেই। সামনের অমাবস্যা তিথিতে দীনবন্ধু ঠাকুর মিছেই দেবীকে বিশেষভাবে অর্চনা করবেন বোকার দীর্ঘায়ু কামনার জন্তে। নরোত্তম অবাক হয়ে শুনল সেই অবিখ্যাত অদ্ভুত কাহিনী।

৬

যুগের বাজারে বামের দাম চড়ে গেছে—বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত। সারা বছরের ধোঁরাকী দাম ধরে তুলেও নরোত্তম অনেক দাম বেচল। টাকাও পেলে অনেক। চারটে পিতলের খুঁট কেনা হ'ল। নোটভর্তি খুঁটগুলি পুঁতে রাখা হ'ল চার ভাইয়ের ঘরের মেঝের বিছানার নীচে।

কিছু টাকা হাতে রেখে ছায়াচরণ-বলল, এবার চার বোকে চার ছড়া হার গড়িয়ে দিতেই হবে। কি বল বড়না ? সবিচরণ বলল, উহঃ ! মেয়েদের গলার হার শু প্রায় ঢাকাই থাকে। লোকের চোখে পড়ে না। তার চেয়ে ভাল—চারটে নথ গড়িয়ে দাও। দিনরাত ঘরা যুধ মেড়ে মেড়ে বগড়া করে, তাদের যুধে নথের বাহারই গুলবে ভাল।

নরোত্তম হো হো করে হেসে বলল, ঠিক বলেছিল...

মমোহর প্রতিবাদ জানাল—এখন কোনও গরম গড়াবার দরকার নেই। টাকা কমাও। সামনের বছর ইট কাটা হবে। চার-ভাইয়ের চারটে রুইরি আগে দরকার। এ টিনের খরগুলো বড় গরম। চোত-বোশেধ মাসে যেন আগুনের মালসা মাথায় নিয়ে বসে থাকতে হয়...

নরোত্তম বলল, সেই কথাই ভাল। এবার খুব জোরে লাঙল চালিয়ে জমিগুলো দব চষে ফেল। সামনের বছর দ্বিগুণ ফসল কলানো চাই। দোতলাই তুলব...

সোৎসাহে চার ভাই মাঠে যায় ও লাঙল চালায়। বোয়েরাও প্রতিজ্ঞা দিয়েছে, আর বগড়া-বাঁটি করবে না। কিন্তু ক'দিন ? পাঁচ-সাত দিন পরেই হঠাৎ আবার এক দিন বেধে গেল।

তাদের একমাত্র বোন কাদম্বিনী হাঁকাতে হাঁকাতে গিয়ে হাজির হ'ল মাঠে—বড়না ! বোরা বেকার বগড়া বাধিয়েছে...

—তাই নাকি ? আচ্ছা চল—আজ তাদের বগড়ার চূড়ান্ত কয়লা করা। লাঙল ছেড়ে দিয়ে গরু-ভাড়া নো লাঠিটা হাতে নিয়ে নরোত্তম রওনা হ'ল। যাবার সময় ভাইদের বলে গেল—তোরা তাদের কাজ কর...

বাড়ীতে পৌঁছেই চোরের মত পা টিপে টিপে নরোত্তম

গিরে দাঁড়াল বড় বৌয়ের পিছনে। সে তা জানতেও পারল না।

ভর্জনী নেড়ে ও চোখমুখ ঘুরিয়ে বড়বৌ ভখন বৌদের শাশাঙ্কিল—আমুক সে আজ বাতীতে। ভোদের সবাইকে খেটিয়ে ভাড়াব তবে আমার নাম চমকলা।

হঠাৎ সামনে একটু সুঁকে, মুখের কাছে মুখটা নিয়ে বিজ্ঞপের সুরে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা চমকলা! তুমি কি একাই এ বাতীতে থাকতে চাও?

চমকলা নিঃসন্তান। মেজমাই ভামাচরণের একটা বোবা ছেলেকে সে আতুত থেকে মাহুত করেছে। ছেলেমেয়েরা কেউ তাকে মা বলে ডাকে না, বোবার মুখেও কথা ফুটবে না—এই দুঃখই চমকলাকে অত বৌদের উপর নির্ভরিতা করে তুলেছে।

আজ সকালে একজন গণংকার এসেছিলেন। একটা টাকা দক্ষিণা নিয়ে বলে গেছেন—‘শ্রীশ্রীই শুভো কথা বলবে।’ শুভো সেই বোবা ছেলেটার নাম। বয়স প্রায় সাত বছর।

শুভো কথা বলবে—এই আনন্দ-সংবাদ সবাইকে শুনিবে চমকলা পাঠা মানত করেছে মা-কালীর কাছে। কিন্তু সমস্তা দাঁড়িয়েছে মুখে কথা ফুটলে শুভো কাকে মা বলে ডাকবে?

ঝগড়া বাধাবার কৌশলটা বুঝ ভাল জানে মেজবৌ—সখিচরণের স্ত্রী সুহাসিনী। বাহিরে দিয়ে সরে দাঁড়ায়, বোঁচা দিয়ে ঝগড়া বাড়াই, কিন্তু নিজে বেশী ঝগড়া করে না। ছোটবৌ মনোহরের স্ত্রী—নীহারিকার টিপনীগুলি হুসারী করাত—মাতৃ নিয়ে বিবর্তমানা বড়বৌ ও মেজবৌ দু’জনকেই খায়েল করছে।

তুহল ঝগড়া বেধে গেল। অনেক অতীত সুখ-দুঃখের কথা, অভাব-অভিযোগ, অজ্ঞান-অবিচারের কথা কাঁস হয়ে গেল। পিছন থেকে নরোত্তমের কণ্ঠস্বর শুনে চমকলার চমক ভাঙল। কঁদতে কঁদতে সে বলল—ওগো, কি কলঙ্কের কথা! আমি মাকি কবে তাড়ের ভিতর লুকিয়ে তোমাকে দিয়েছি পাঁচখানা তাক মাছ?

নরোত্তম বলল—পাঁচখানা না দাও—সবার চেয়ে হুঁচার খানা বেশী ত রোজই দাও আমাকে। আমি কি তা পছন্দ করি? তুমি হচ্ছে সকলের বড়। তোমার যদি বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকে—এ সংসার টিকবে কি করে?

চমকলা চিংকার করে কঁদে উঠল—ওগো তুমিও? তুমিও আমাকে অপবাদ দিচ্ছে?

—আঃ, চৈতিও না। অপবাদের কথাটা কি হ’ল? আমিও মধু ঠাকুর নই, তুমিও শিব বৌ নও। এই নরোত্তম মোড়লের বৌ তুমি...সে কথাটা তুলে যাও কেন?

জলতরা আরক্ত চোখে নরোত্তমের দিকে চেয়ে চমকলা বলে উঠল—আমি যদি এতই বন্দ, আমাকে আলাদা করে দাও...

আত্মালে দাঁড়িয়ে মেজবৌকে লক্ষ্য করে মেজবৌ বলল—সেই কথাই তাল। কি বলিল তাই? যার যা জোটে, সে তাই ধাবে। আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, ও’র ত সে বালাই নেই? কেন মিহিমিহি আমার শুভোকে টেনে নিয়ে না নাড়তে চান?

বহু দিনে নরোত্তম বলল—চুপ কর মেজবৌমা! আমি তোমাদের সবার মতলবই বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আজ থেকে সেই ব্যবস্থাই হবে...

সেখান থেকে একটু সরে এসে নরোত্তম তার বোনকে ডাকল—ওরে কাছ। বাইরের ঘরে আমাদের চার তাইয়ের আর ভোর রান্না চড়িয়ে দে। এক মায়ের পেটের তাইবোন আমরা। আমরা কেন পরের মেয়েদের ছোটলোকমির ভেঙে আলাদা হতে যাব?

কতকগুলো বাঁশের খুঁটি কেটে এনে, উঠানের মাঝখান দিয়ে নরোত্তম বেঁধে ফেলল একটা শক্ত বেড়া। তারপর চিংকার করে বৌদের বলল—ধবরদার! তোমরা কেউ করুনও এই বেড়া ভিঙিয়ে বাইরের দিকে এস না কিন্তু...

দৌয়েরা যে বার ঘরের দাওয়ার দাঁড়িয়ে নির্ঝাঁক ভাবে দেবেতে লাগল।

বেড়ার বাঁধন শেষ করে, হাতের দা’খানা উঁচু করে ঘরে নরোত্তম আর একবার বৌদের শাসিয়ে বলল—সাবধান!...

কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করল—ছেলেমেয়েগুলো কোন্ দিকে থাকবে বড়দা?

—ছেলেরা আমাদের দিকে আর মেয়েরা বৌদের দিকে। বলেই নরোত্তম গিরে উঠে বলল বাইরের ঘরের দাওয়ার উপর। ধর্ম্মাজ দেহটা মুছে, পামছা ঘুরিয়ে হাওয়া বেতে লাগল।...

হুপুয়ে বাতীতে ফিরে এসে ভামাচরণ, সখিচরণ ও মনোহর বিনা প্রতিবাদে দাদার এ ব্যবস্থা মেনে নিলে। সত্যিই ত বৌয়েরা পরের মেয়ে। তারা মোড়লদের কে? নরোত্তমের এ যুক্তি অকাট্য।

ভামাচরণ একটু জেগ। মেনে নিতে বাধ্য হলেও তার মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল। সখিচরণ নির্ঝাঁক। সারা-দিনের ক্লান্তির পর গোপী-ঘরটা বাগিরে নিয়ে হুঁচারটে ভজন গাইতে পারলেই তার তৃপ্তি। বেহুয়ো গানের পরেই আরম্ভ হর তার সুরেলা নাসিকা গর্জন। মনোহর সেদিন বিয়ে করেছে—এবমও বছর ঘোরে নি। দাদার এ আদেশ তার কাছে কিসির হুকুমের মতই নির্দ্বন্দ্ব মনে হ’ল।

বাইরের ঘরটা বুঝ বড়। তার এক দিকে ঢালা করা

পেতে চার তাইয়ের শোবার ব্যবস্থা হ'ল। আর এক দিকে কাদম্বিনী রইল বাচ্চা ছেলেদের নিয়ে। কারও ঘুম আসছে না। সবাই পড়ে আছে ঘুমের তাম করে। সবাই মনে করছে—সে ছাড়া আর কেউ কেপে নেই।

কালীবাড়ীর পেটা বাড়িতে ঢং ঢং করে ছটো বাজল। মনোহর উঠে বসল। দাখানা যে ঘুমিয়ে আছে সে বিষয়ে তার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। অন্ধকার ঘর। চারদিকে তাকাতে তাকাতে চোরের মত পা টিপে-টিপে সে গেল দরজার ধারে। তার পর নিঃশব্দে দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। পিছন ফিরে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে অতি সন্তর্পণে।

কাল্পন মাস। গুরুপক্ষ। আশ্বাষা চাঁদ তখনও আকাশের এককোণ থেকে গ্রাম জোছনা ছড়াচ্ছেন। বসন্তের হাওয়ায় গাছের পাতাগুলিও কেঁপে কেঁপে নবজীবনের সাদা অহুতব করছে। সর্বদে শিহরণ নিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে মনোহর গিয়ে দাঁড়াল ছোট্টো নীহারিকার জান্নার কাছে। খোলা জান্না-পথে উঁকি মেরে দেখল—এলোচুলে নীহারিকা ঘুমিয়ে আছে অকাতরে। কি আশ্চর্য! মনোহরের মেজাজ ধরাপ হয়ে গেল। যার জেতে তার চোখে ঘুম নেই, সে কি করে এমন নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল? হুধে ত বলে খুব ভালবাসি। এই কি ভালবাসা? ভালবাসাকে ছাপিয়ে ঘুম আসে কি করে? নিশ্চয়ই তার ভালবাসার একটুও গভীরতা নেই।

মনোহর ভেবেছিল, সে এসে দেখবে—নীহারিকা জান্না-পথে চাঁদের দিকে চেয়ে হাপুস মননে কাঁদছে। মনোহরকে দেখেই ছটে এসে দরজা খুলবে। কিন্তু এ কি?

খুব নীচু সুরে মনোহর ভিন চারবার ডাকল—নীহার... নীহার...তবু নীহারিকার ঘুম তাড়ল না। অভ্যস্ত বিরক্তির সঙ্গে জান্না-পথে হাত বাড়িয়ে এক গোছা চুল ধরে চাঁদ বিভেই নীহারিকা হাউ-মাউ করে চৈচিয়ে উঠল।

চুপ চুপ—আমি—চৈচিও না...

কে কার আমি? নীহারিকার ঘুমের বোর তখনও তাতে নি। তখনও সে চৈচাচ্ছিল—চো—চো—চো...

ছোটবোয়ের ঘরের পাশেই মেজবো সুলাসিমীর ঘর। সে বাইরে ছটে এসে দরজা খুলে। মনোহরকে দেখেই খুবল—ব্যাপারটা কি? নীচু সুরে বমক দিয়ে ছোটবোকে বলল—মুখ বালাই? দরজাটা খুলেই দেখ না—কে?

মনোহর দাঁড়িয়ে রইল লজ্জার মাথা হেঁট করে।

বাইরের ঘরে তখন স্ত্রীমাচরণও উঠে বসেছে। মনোহরের পছন্দসরগের প্ররুতি তার মনেও জেগেছে। মনোহর আর সখিচরণ ত ঘুমিয়েই আছে—ভয় কি?

শ্রৈণ স্ত্রীমাচরণের হুই ঘরে ও এক ছেলে। ছেলেটিকে কাদম্বিনী নিয়ে এসেছে। স্ত্রীমাচরণের দুর্ভাবনা কোলের

মেয়েটির জেতে। সে বড় রোগী। সারারাত সাবু ধার। মেজবো সৌরভিনীর কত কষ্ট হয় তাকে নিয়ে। স্ত্রীমাচরণ যদি একটু সাহায্য না করে, বেচারী পারবে কেন? নিজে সে সারাদিন মেঠো-রোদে লাঙল চবে। তার চেয়েও চের বেশী কষ্ট হয় সেজবোয়ের—হেঁসেলের উড়াপে।

নাঃ, মনোহর কোন অভয় করে নি। স্ত্রীমাচরণের সহায়ত্বভি জেগে উঠল। বড়দার এই নির্ধাতন সহ করতে-পারে—একমাত্র ঐ কুস্তকগী। সখিচরণের দিকে একবার কটমট করে তাকাল, তার পর মনোহরের মতই বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

নীচু সুরে সখিচরণ বলল—বড়দা! এবার মেজদাও গেল কিঙ্ক...

বিরক্তির সঙ্গে মনোহর বলল—তুইও যা...

সখিচরণ পাশ ফিরল। সদন্তে বলল—আমি মেজদার মত 'মেজো' নই...

মনোহর বলতে লাগল—দেখ স'খে! তোদের জেতেই পারছি নে বৌগুলোকে টিটু করতে।

বা রে আমাকে বকছ কেন? আমি ত চুপটি করে শুয়েই আছি।

এখনও ঘুমোও নি কেন?

তুমিও ত ঘুমোও নি...

আমার কি হুস্তিকার সীমা আছে? মাথার উপর খুলছে ছটো ঘুম আর ঘশটা জ্বমের মামলা। আমিমে খালস আছি। খেল খাটলে আমিই খাটব। তোরা কেন ঘুমিয়ে শরীরটা হুহু রাখতে পারিস না?

পাশ ফিরে শুতে শুতে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মনোহর বলল—যা, যা, তুইও যা।

সখিচরণ একটু উত্তেজিত ভাবে বলল—আমি যদি ঘাই, ওদের ছটোকেই মারতে মারতে এ ঘরে টেনে আসব কিঙ্ক...

না না, মারামারি করতে হবে না। তোরা কি ভেবে-ছিল—উঠানের বেড়াটা বেশী দিন রাখব? মিহিমিহি আর কেসেকারী করিস নে। সুরটা একটু নামিয়ে মনোহর বলল—চুপ করে শুয়ে থাক। ওরা জানে, আমরা ঘুমিয়ে আছি। কিছুই জানি নে। আরও হুঁচার দিন এই ভাবে চলুক। দেখি ওদের বেহায়াপনার দৌড় কত দূর।

বেশ, তাই থাক...অতি মিলিত ভাবে কথাকাটা বলে সখিচরণ আবার পাশ ফিরল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার নাক-ডাকা শুক হ'ল।

(ক্রমশঃ)

কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা

ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল

শিল্প-কলার উপরে জাতীয় জীবনের ছাপ কিরূপ পড়ে, আবার জাতীয় জীবনও ইহা দ্বারা কতখানি প্রভাবান্বিত হয় তাহা কলিকাতার কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। আগামী বর্ষে ইহার শতবর্ষ পূর্তি হইবে। তখন হয়ত ইহার বিস্তারিত ইতিহাস রচনারও আয়োজন হইবে। এখানে এই বিদ্যালয়টির মাত্র জন্মকথা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চাই। এবিষয়ে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার উপরেই আমাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে।

১৮৫৪ সনের প্রথম দিকে, ২রা মার্চ তারিখে কর্ণেল ই. গুডউইন বেথুন সোসাইটিতে “Union of Science, Industry and Arts” শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। ইহার পর হইতে এই উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। এ নিমিত্ত অচিরে প্রথমে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার নাম হইল ‘শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা’ (ইংরেজী নাম—“Society for the Promotion of Industrial Art”)। এই সভার সভাপতি—কর্ণেল ই. গুডউইন স্বয়ং; সম্পাদক—হুজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইহার কমিটিতে সদস্য ছিলেন পনের জন, যথা—সি. এলেন, সি. বীডন, ডাঃ জি. বেভেফোর্ড, পাদ্রি জে. এম. বিপু, জে. এ. ক্রফোর্ড, ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, রামমোহন ঘোষ, ডবলিউ. এন্. লীস, পাদ্রি জে. লঙ, রামচন্দ্র মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ক্যাপটেন এইচ. খুলিয়র, হেনরি উড্ডো, ডবলিউ. জে. ইয়ং। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তখন পর্যন্ত এখানকার শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী বিদগ্ধজনেরা একত্র হইয়া লোক হিতকর কার্যে লিপ্ত হইতেছিলেন।

শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা একটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। সভার পক্ষে সম্পাদক হুজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের একখানি অস্থায়ী পত্র রচনা করেন। ইহার তারিখ ৬ই এপ্রিল ১৮৫৪। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে এখানি প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা ‘বেঙ্গল হরকরা’য় প্রকাশিত হয় ১৮৫৪, ২৪শে এপ্রিল দিবসে। পরবর্তী ২৫ মে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ এখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ এখানে

প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্যক জানা যাইবে। অনুবাদটি এই :

“শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উৎসাহার্থে এতদ্ব্যতীত এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তৎকর্তৃক আদেশিত হইয়া আমরা সাধারণের শিক্ষাপ্রযুক্ত একটি প্রকৃত বিভাগের সংস্থাপনের নিমিত্ত মহাশয়দিগের সাহায্য বাচ্ছা করিতেছি। উক্ত বিভাগে চিত্রবিদ্যা, কাঠ, বাতু প্রভৃতির তৎপরিদৃষ্ট ও যুগপাত্ত গুণলিখাদির গঠনোপযোগি বিচার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

দেশীয় শিল্পসাধ্য ব্যবসায়ের উৎসাহ ও তদুন্নতি চেষ্টা, এতদ্ব্যতীত চিত্রকর ও তৎকরের অত্যাব নিরাকরণ করা, এবং হিন্দু মোসলমান ও ইংরাজ সন্তান সাহায্য কিঞ্চিৎ বিভাগ্যাস করিয়া পরে উপকীর্ষিকা প্রাপ্তির ক্রেশ পাইতেছে, তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যবসায় প্রস্তুত করা প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য, এবং তৎকার্যসম্বন্ধ করণাভিপ্রায়ে এই সাহায্য প্রত্যাশা করা যাইতেছে।

যে সকল মহাশয়েরা এতদ্ব্যতীত ঐহিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তাহারা অনায়াসেই জানিতে পারিবেন যে প্রস্তাবিত কার্যে পুরোক্ত লাভ অপেক্ষাও অধিক উপকারের সম্ভাবনা আছে, ইহা দ্বারা প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর এক অত্যাব নিরাকরণ হইবার উপায় হইবে। সর্বোৎকৃষ্ট ও মহোপকারি শিক্ষা কি ভবিষ্যে সকলের এক্য না হইলে হইতে পারে, পরন্তু ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, যে সকল ব্যক্তি উপকীর্ষিকা অস্থায়ী করিয়া দিনপাত করে অথচ মিকৃষ্ট প্রমোদকীর্ষী হইতে তদ্রূপস্থায়ী স্থিত, তাহাদিগের পক্ষে এক বিভাগ উৎকৃষ্টতা অপেক্ষা বিবিধ বিভাগ আলোচনা শ্রেয়স্কর, অর্থাৎ ইদৃশ নানা বিভাগ শিক্ষা পাওয়া উচিত, যাহাতে প্রত্যেকে য য ক্ষমতানুসারে লাভজনক ব্যবসারে নিযুক্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের ব্যক্তিব্যুৎকে তদ্ব্যতীত ঐহিক মঙ্গলসাধনের উপায় করণার্থে, তথা সকল ব্যবসারে নিযুক্ত করণার্থে একান্ততঃ তাহাদের অবিকাংগ্যকে কারিক ও দ্বারমিক উন্নয় প্রকারে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। এই উন্নয় প্রকারে শিক্ষার প্রতি অপর এক কারণ আছে। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিবর্গের মনকে স্বাধীন করণার্থে সকল মনোবৃত্তির চালনা করা অত্যন্ত আবশ্যক। যাবৎ শিক্ষা প্রণালী এমনত অসম্পূর্ণ থাকে যাহাতে কেবল কয়েকটি মনোবৃত্তির চালনা হয়, বিশেষতঃ যে পর্যন্ত মনুষ্যের ব্যবহারাদি বিভাগ প্রয়োগ করিবার উপায় নিরূপিত না হয়, যদ্বারা উৎসাহ স্বপ্ন সাধন প্রভৃতি মনোবৃত্তির চালনা হইতে পারে, তাবৎ কদাপি এতদ্ব্যতীত যাবৎ উন্নতি সম্ভব না।

আমাদেরিগের এমনত অভিমান নাই যে বর্তমান শিক্ষা প্রণালী বিষয়ের যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইল, শিল্প বিষয়ক একটি বিভাগের সংস্থাপনে তত্তাবতের নিরাকরণ হইবে, পরন্তু ইহা তদীষ্ট সাধনের সাহায্যকর বটে। মনুষ্য ব্যবহারে বিভাগ প্রয়োগ করণার্থে কার্যিক শ্রমসাধ্য শিল্প এক শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং কোন সভা কর্তৃক তাহার সাধন চেষ্টা অনার্য্যসেই হইতে পারে। বোধ হয় অত্যন্ত বিষয় শিক্ষার উপায় রাজ-পুরুষেরা গ্রহণ করিবেন।

প্রাচীন রীত্যাচারে কার্যিক শ্রমসাধ্য শিল্প অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে সমর্পণ করাতে তদুন্নতির প্রতি যে হানি হইয়াছে এই বিভাগের সংস্থাপন তাহার দূরীকরণের প্রতি এক প্রধান কারণ হইবে।

প্রস্তাবিত ব্যাপারে সত্য অভিপ্রায় এই যে বুদ্ধি ও হস্ত এককালে এই উভয়ের শিক্ষা হইতে পারে, এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে শ্রমসাধ্য শিল্প শিক্ষা করাইয়া অভ্যন্তরীণ ধনী, ধানী ও বিজ্ঞানগণের নিকট তাহার পরিমা সংস্থাপিত হয়।

মাস্তাজ নগরে এই প্রকার প্রযত্নের যথোচিত কল হওয়াতে প্রস্তাবিত সভা নির্ভয়ে সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উক্ত নগরে ডাক্তার হক্টর সাহেব যে সকল বিভাগের সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে যে ২ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা ক্রয় করিতে ও যে সকল ছাত্র অশিক্ষিত হয় তাহা-দিগকে কর্মে নিযুক্ত করিতে লোকে এতাদৃশ ব্যগ্র হইয়াছেন যে ডাক্তার সাহেব সকল প্রার্থাদিগের মানস সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই।

মনস্থ করা গিয়াছে যে উপরে যে সকল বিভাগ উল্লেখ হইল তদ্বিষয়ের শিক্ষাপ্রদান অত্র মাস্তাজ হইতে অশিক্ষিত আনান যাইবেক, অথবা এই নগরস্থই কোন অশিক্ষিত নিযুক্ত করা যাইবেক। হিন্দু পন্ডীর মধ্যভাগে বিভাগের নিমিত্ত এক বাগী ভাড়া লওয়া যাইবেক, এবং এ প্রকারে শিক্ষার সময় নিরূপিত করা যাইবে বাহাতে অত্যন্ত বিভাগের ছাত্রেরা ভৎ পরিভ্যাগ না করিয়াও প্রস্তাবিত বিভাগে অধ্যয়ন করিতে পারে। সাধ্যমত আপন আয়ে এই বিভাগের অবস্থান করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে ছাত্রদিগের নিকট হইতে বিভাগরূপ কিঞ্চিৎ বেতন লওয়া যাইবেক। পরন্তু কোন মতে সেই বেতন মাসিক এক টাকার অধিক হইবেক না।

সত্য অভিপ্রায় যে একান্ততঃ এই বিদ্যালয় এক বৎসরকাল বর্তমান রাখেন, তদর্পে ও গৃহসজ্জা, চিত্রপট প্রভৃতি বস্তু ক্রয় করিতে বোধ হয় সপ্ত সহস্র টাকা সংগ্রহ করিতে হইবেক, তদ্ব্যতীত কিঞ্চিৎ ছাত্রিক বেতনে প্রাপ্তব্য।

সভা বোধ করেন বহু সংখ্যক মনুষ্যকে লাভজনক ব্যবসায় প্রাণ্ডির উপায় প্রদান করা কলতঃ আপনা আপনি সাহায্য

করিতে লোককে সাহায্য করা অপেক্ষার মহৎকার্য্যে দয়া প্রকাশ হইতে পারে না।

মাসিক ব্যয়ের নিমিত্ত মাসিক দান, ও কর্তারন্তের উপযুক্ত পুস্তক, চিত্র পুস্তিকাদি দান বা তৎকর নিমিত্ত এককালিক অর্থদান সভার প্রার্থনা শেষোক্ত নিয়মের নিমিত্ত বোধ হয় দুই সহস্র টাকা প্রয়োজন হইবেক। ইতি কলিকাতাঃ ইং ৬ আপরেল। ১৮৫৪ অব্দ

শিল্প বিভাগে সাহিনী সভা সম্পাদকত্ব।

শ্রীহাজ শ্রী প্রাচীন দায়ঃ।

শ্রীরাধেন্দ্রলাল মিত্র চ।”

২৪ মে ১৮৫৪ দিবসে ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রস্তাবিত শিল্পবিদ্যালয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় লেখেন। ইংরেজ ও বাঙালী চাঁদাদাতাদের একটি তালিকাও প্রভাকরে দেওয়া হয়। ইহা হইতে দেখা যায়—ইংরেজদের নিকট এককালীন দান পাওয়া যায় দুই হাজার টাকা ও মাসিক দান একশত তেত্রিশ টাকা। বাঙালীদের দানের ফিরিস্তি আলাদা করিয়া দিলাম। ‘সংবাদ প্রভাকর’—২৫ মে ১৮৫৪ সংখ্যায় হিসাবটি এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :

দাতা	দান	
	এককালীন	মাসিক
পচন্দ্র সিংহ	২০০	৮
বকুহার ঠাকুর	১০০	১০
নাথ ঠাকুর	০	৫
লৌচন ঘোষ	১০০	৫
রত্ননাথ ঠাকুর	১০০	০
রত্ননাথ ঠাকুর	১০০	০
প্রসাদ রায়	৫০	০
বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০	০
অরুণ মুখোপাধ্যায়	১০০	৫
রত্ন দত্ত	১০০	০
চরণ ঘোষাল	১০০	৩

দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সন্দেহে আলোচনাস্তর ৪ মে ১৮৫৪ তারিখে ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্ট’ লেখেন :

“What is now absolutely necessary to ensure the progress of our nation is to disturb the optimism into which they complacently take refuge whenever an improvement is suggested, and the school design will according to the measure of its ability effectually contribute towards that end.

Col. Goodwyn and Mr. Hodgson Pratt with whom the new scheme originates, have placed us under much obligation by their active labour in promoting it and carrying into its execution . . .”

এই প্রসঙ্গে একজন বাঙালী প্রধানের নামও উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্রলাল মিত্র শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের জল্পনা হইতেই ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার অন্ততর সম্পাদকরূপে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তাহার তৎপরতা বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি স্বদীর্ঘকাল ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ইহার পরিচালনায় যে নানারূপে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে।

শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে অল্পসংখ্যক প্রচারিত হইবার পর হইতেই শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চলিতেছিল। বিদ্যালয়-গৃহের জন্য নূতন বাজারের সম্মুখ চিংপুর রাস্তার ধারে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের একটি বাড়ী বিনাভাড়া পাওয়া গেল। কে কে শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন তাহাও নিরূপিত হয়। ২ মে ১৮৫৪ 'সংবাদ প্রভাকর' এই সকল সংবাদ দিয়া লিখিলেন :

"পারিভ্রমিক ও শিল্পাদি বিদ্যাশিক্ষার বিদ্যালয় এক মাসের মধ্যে খোলা হইবেক, পরম বদান্তবর ত্রিযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত চিংপুরের রাস্তার ধারে এক উত্তম বাড়ী প্রদান করিয়াছেন তাহার মাসিক ভাড়া ১৫০ টাকা নিরূপিত ছিল, মেং রিগউড সাহেব কাদা প্রস্তুত ও তদ্বারা জব্যাদি নির্মাণ করণ বিষয়ের উপদেশক এবং মেং আগিয়ার সাহেব চিত্রবিষয়ক শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইবেন, এমত কল্পনা আছে যে মেং হেণ্ডরি সাহেব কাঠের উপর প্রতিবৃষ্টি বৃদিবার বিষয়ে ছাত্রদিগকে উপদেশ দিবেন, মেং সি, এন্ট নামক একজন অতি উপযুক্ত ব্যক্তি শীঘ্র বিলাত হইতে আসিবেন, এবং তিনি তাহার গ্লেনের উপর অক্ষর ও প্রতিবৃষ্টি বৃদিবার শিক্ষা প্রদান করিবেন, এই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইলে সাধারণের সামান্য উপকার দর্শিবেক না অনেক উত্তম জব্য এদেশে হইতে পারিবেক।"

কিন্তু শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য্য নানা কারণে বিলম্বিত হইতে লাগিল। মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর' এক দীর্ঘ প্রস্তাবে এরূপ বিদ্যালয়-আশু প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি লিখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্টেরও যে এরূপ একটি শুভকর বিদ্যালয়ের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য সে বিষয়েও তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

যাহা হউক, প্রারম্ভিক আয়োজনাদি সম্পূর্ণ করিয়া সভার সম্পাদকবৃন্দ ইংরেজী বাংলা সংবাদপত্রে বিদ্যালয় স্থাপনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' ১১ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে এই বিজ্ঞাপনটি এরূপ বাহির হয় :

"শিল্পবিদ্যালয় বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, ওলালাবাবুর নূতন বাজারের বাড়িতে আগামি ৩১শে শ্রাবণ সোমবার বেলা

৪ ঘট্টা সময়ে উপরোক্ত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন হইবেক। তাহাতে অল্পনা চিত্রকরণ এবং পুস্তলিকাদি গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার দিবসে চিত্রকর শ্রেণীর শিক্ষা হইবেক, এবং বৃষ্টি নির্দ্বািত শ্রেণীর শিক্ষা মঙ্গলবার, রহস্পতিবার এবং শনিবার হইবেক।

এক শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১ টাকা।

উত্তর শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১।০ টাকা।

উক্ত বৃত্তি প্রতি মাসের শেষ দিবসে দিতে হইবেক।

বিদ্যাধিরা বিদ্যালয়ের ছাত্র নির্দেশ পুস্তকে আপন আপন নাম নির্দিষ্ট করাইসে এক একখানি ছাত্রীয় পত্র (টিকিট) প্রাপ্ত হইবেন, ঐ পত্র বিদ্যাধি কর্তৃক প্রত্যহ শিক্ষকদিগকে দেওয়াইতে হইবেক। উক্ত পত্র ছাত্রেরা এক মাসের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইবেন। মাস পূর্ণ দিবসে ছাত্রীয় বৃত্তি আদার হইলে আগামি মাসের নিমিত্ত পুনঃ নূতন পত্র প্রদত্ত হইবেক।

বৃত্তিগ্রহণ ও বিদ্যাধিদিগের নাম নির্দেশকরণার্থে এক ব্যক্তি প্রত্যহ বিভাগে অপরাহ্নে দুই ঘট্টা অবধি চারি ঘট্টা পর্যন্ত উপস্থিত থাকিবে। অতাবধি এক সপ্তাহ সে ব্যক্তি পূরোহিত সাত ঘট্টা অবধি দশ ঘট্টা পর্যন্ত তদর্থে তথায় উপস্থিত থাকিবেক।

চিত্র শিক্ষাধিগকে এক একখানি প্রস্তরফলক দেওয়া য়েট ও পেন্সিল আনিতে হইবেক।

চিত্রকর শ্রেণীস্থ বালকেরা চিত্রকরণে কিঞ্চিৎ সক্ষম হইলেই তখন বিভাগদেখার্থে অপর এক শ্রেণীতে সংস্থাপিত হইবেক। হজ্জ সন্ম প্রাচী, ত্রিরাজেন্দ্রলাল মিত্র। শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক। কলিকাতা, ইং ৯ আগষ্ট ১৮৫৪ সাল।"

পর দিবস ১২ই আগষ্ট তারিখেও এই বিজ্ঞাপনটি 'সংবাদ প্রভাকর'ে হুবহু পুনর্মুদ্রিত হয়। এই দিন 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক মূল সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন :

"আমরা অতিশয় আনন্দপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে সম্মিলিত শিল্পবিভাগ আগামি সোমবারাবধি [১৫ই আগষ্ট] খোলা হইবেক, তাহার মিয়ম সকল পাঠকবর্গ বিজ্ঞাপনমূলে দৃষ্টিগোচর করিবেন, ঐ বিভাগের দ্বারা যেরূপ উপকার নষ্টাবস্থা আমরা তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি, এতদ্ব্যতীত লোকেরা অত্যন্ত বিদ্যায় যেরূপ পারদর্শি হইতেছেন, শিল্প বিভাগও তজ্জপ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমতঃ ঐ বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা ও পুস্তলিকাদি গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক, পরে তক্ষণাদি অস্ত্র বিষয়ে ছাত্রগণ উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, শিল্প বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখা সাধারণের পক্ষে যজ্ঞপ প্রয়োজনীয় শিক্ষাধিগণের পক্ষে তজ্জপ আনন্দজনক, বিশেষতঃ তাহার ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বিকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু প্রস্তুত করিয়া

ভাষার মানা প্রকার মনোহর ও শোভাকর অব্যাদি নির্মাণ করণে পারণ হইলে বিলাতীর লোকদিগের ভার এতদেশীয় সাধারণ ব্যক্তিদিগের গৃহাদি সম্বন্ধিত হইতে পারিবেক, আত্মীয় বন্ধুগণের চিত্ত প্রতিমূর্তি সকল অনায়াসে অণুচ অণু ব্যয়ে প্রাপ্ত হইলে সামান্য উপকার দর্শিবেক না, অতএব যে সকল মহানরো এই বিদ্যালয়ের অস্থাপন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে অগণ্য বত্ববাদ করিলাম, বিশেষতঃ পরম ধার্মিকবর সুবিখ্যাত ালাবাবুর কুলভিলক ক্রিয়ত রাধা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ক্রিয়ত রাধা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ নৃত্য বাজারের বাগী প্রদান করাতে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যথেষ্ট অহরূপ প্রকাশ হইয়াছে, অতএব এতদেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা শিল্প বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া স্বাধীনরূপে শোভা পাইয়া সক্ষমপূর্বক বদেশের যুগোচ্ছল কলনের বাসনা করেন, তাঁহারা আগামি সোমবার অপরাহ্ন বেলা চার ঘটিকা সময়ে বিদ্যালয়ের বাগীতে উপস্থিত হইবেন।”

“সংবাদ প্রভাকর”-নির্দেশিত তারিখে কিন্তু শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার প্রতিষ্ঠা হয় দুই দিন পরে, ১৬ই আগষ্ট বুধবার দিবসে। এই দিন ‘বেঙ্গল হরকরা’ বিদ্যালয়টিকে অভিনন্দিত করিয়া ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। ইহার কোন কোন অংশ মাত্র এখানে দিলাম :

“The opening of the Industrial School of Art is an event in native improvement well deserving attention . . . The Industrial School is one of those Institutions originated as the best of such are by private enterprise and philanthropy. It addresses itself to a want which must have long been felt in Calcutta; but for which no provision has ever yet been made. And yet this seems marvellous, when we consider the peculiar mechanical designs either of Nature or of Art. Block-cutting—that sort of block which is used in Calico Printing—has for a long time been familiar to the natives, and these instruments of their handicraft we believe have often been used in England to print those very Calico's which are produced in our Exchange here. The talent has, however, been allowed to lie fallow up to the present day . . . To draw forth the mechanical and artistic abilities of the people of Bengal, the Industrial School has been established. Today it opens to the public . . . The names of Col. Goodwyn and Mr. Hodgson Pratt must ever be associated with this school, if it becomes an established member of the Calcutta Institutions, as we foresee it will. The design has been Col. Goodwyn's, the execution Mr. Pratt's . . .

“As the school opens to the public this afternoon, we hope that all interested in the progress of Art and Science will be present on the occasion.”—

(The Bengal Hurkaru and the India Gazette, August 16, 1854.)

বেঙ্গল হরকরা নিজ মন্তব্যে একথা স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মচরির কাজ বহু পূর্ব হইতেই এদেশীয়দের জানা ছিল। কিন্তু অসুশীলনের অভাবে তাহাদের জ্ঞান প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ‘বেঙ্গল হরকরা’ ইঙ্গিতীয়ার কর্ণেল গুডউইন এবং হজসন প্রাটের কথাই এখানে মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙালী-প্রধানেরা যে এই প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনা হইতে ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং দেশীয় সম্পাদকগণও যে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেন তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। ‘সংবাদ ভাস্কর’ ২২ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে “শিল্পবিদ্যা শিক্ষালয়” শিরোনামায় বিদ্যালয়টিকে অভিনন্দিত করিয়া বাহা লেখেন তাহার কিয়দংশ এই :

“পাঠক মহাশয়েরা! স্মরণ করুন এই বিদ্যালয় সংস্থাপন সভাবনার আমরা পূর্বে বিস্তারিত প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম এবং শিল্পবিদ্যা শিক্ষার যৎ উপকার তাহা প্রদর্শন করাইয়াছি এক্ষণে আনন্দিত হইয়া বলিতেছি ক্রিয়ত রাধা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও ক্রিয়ত রাধা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরদিগের পরাধারিতার প্রাপ্ত বাগীতে বিদ্যালয়ের কার্যায়ত্ত হইয়াছে, প্রতিদিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে...।”

শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী এবং ছাত্রসংখ্যা সম্পর্কে ‘সংবাদ প্রভাকর’ পরবর্তী ২৪শে আগষ্ট আরও বিশদ ভাবে লিখিলেন :

“শিল্পবিদ্যালয়ের কার্য অতি সুনিরম্মে নির্বাহ হইতেছে, তথাকার সেক্রেটারী ক্রিয়ত হজসন প্রাট সাহেব ও অধ্যাপক অরূপ নিরম্ম করিয়াছেন যে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রণীতে ৫০ জন ও যুগ প্রতিমূর্তি প্রাপ্ত করণ বিদ্যা শিক্ষার প্রণী ৪৫ জন আপাতত গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ঐ সংখ্যা প্রথম দিবসেই পরিপূর্ণ হওয়ার প্রতীতি দিবস-বহু ব্যক্তি তথার গমন করতঃ হতাশ হইয়া প্রত্যাগত হইতেছে, কর্মব্যাকেরা বতশি নৃত্য ছাত্র নিয়োগ করেন তবে ৪৫ দিবসের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা ৫০০ হইতে পারে, অতএব অধিক শিক্ষক নাই, একারণ অধ্যাপকেরা তাহাতে বিরত হইয়া অতি সুবিবেচনার কার্য করিয়াছেন।”...

বিদ্যালয়ের ভাবী শিক্ষকদের নামের কিরিত্তি পূর্বে পাইয়াছি। প্রতিষ্ঠার সময়ে যুগ-পুত্তলি নির্মাণ প্রণীতে এম. রিগউড শিক্ষক-পদে বৃত্ত হন। চিত্র-বিভাগের শিক্ষকের নাম প্রতিষ্ঠাকালীন বিবরণাদিতে পাই নাই। মনে হয়, পূর্বোক্ত আগিয়াঁর সাহেবই এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে সরকারী কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইল।

রোগবিস্তারের জন্য আপনিই দায়ী

শ্রীনিলিনীকুমার ভট্ট

যে কাজ আপনি করেন মাই, অন্তত: জ্ঞাতদ্বারা করেন মাই তাহার জন্য কেহ যদি সরাসরি আপনাকে দায়ী করিয়া বসে তাহা হইলে সেটা আপনার পক্ষে অসম্ভব মনে হওয়া খুবই বাস্তবিক। যে সকল কৃত্তিকর কাজের জন্য অল্প কোন বিষয় বা অল্প কোনো ব্যক্তির উপর দোষারোপ করা অর্থোত্তিক মনে, সেগুলির জন্য আপনি নিশ্চয়ই বিন্দুতাক্ষম হইতে চাহেন না। কিন্তু ভৎসনোৎপাদকতা যে অপরের স্বাস্থ্যহানির জন্য আপনিই দায়ী।

আপনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—“কিন্তু কেন, আমার কি দোষ?” আচ্ছা, হয়ত চেষ্টা করিলে আপনি মনে করিতে পারিবেন যে, শেষবার যখন আপনি সর্দি কাশি অথবা গলগ্রন্থির প্রদাহে আক্রান্ত হন, কিংবা যখন আপনার টাইফয়েড, অল্প-পীড়া বা উদরাময় হয় তখন কোন্ কক্ষে যে এই রোগ আপনার দেহে আসিয়া প্রবেশ করিল তাহা তাবিয়া আপনি অসমর্থ হইয়াছিলেন। আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য অপর কাহাকেও দায়ী করিবার কথা হয় ত আপনার মনেও উদ্ভিত হয় নাই। বরন আপনি রাহ বসিতে, পিকনিক করিতে অথবা কমি চম্বিতে গেলেন, এমনভাবে যদি বাদল নামে তাহা হইলে আপনি যেমন এই দুর্ঘটনার জন্য আপনার শত্রু মিত্র কাহারও উপরেই দোষারোপ করেন না (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে খুব যত্নমাত্রায় করিয়া থাকেন)—ইহাও তদন্তরূপ। প্রাথমিক:ই বলা হইয়া থাকে যে, এই সমস্ত দুর্ভাগ্যকর ঘটনা—হয় দেহাত্তই দৈবক্রমে, মতুবা ভগবান কিংবা আমাদের বোধশক্তির অতীত কোনো অজ্ঞাত কারণে।

ব্যাপি সেইজন্য অনেকের নিকট এমন একটি অনভিজ্ঞতা অগত বলিয়া প্রতীয়মান হয় যাহাকে—পছন্দই হোক আর না-পছন্দই হোক, বাহার প্রকৃতি বোকা বাক অথবা দুর্বোধ্যই থাকুক—মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং কেহ যদি আপনাকে একথা বলে যে, অন্যান্য লোকের মতো রোগের প্রসারের জন্য আপনিই দায়ী তাহা আপনার নিকট পুরাপুরি আকণ্ঠ, অশ্রীতিকর এবং অশোভন উক্তি বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অনুগ্রহতাকালে আমরা মনোভা, অক্ষমতা, রোগের প্রতিক্রিয়া, এবং ইহার প্রতিকারকল্পে অর্থব্যয় ইত্যাদির জন্য হয়তো আপনার মন এরূপ উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করি, যে-ব্যাপিতে আপনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহার আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভাব্য ছিল কিনা নিজেদের সে প্রশ্ন করার কুরসত্তও বোধ করি আপনার হয় নাই। কিন্তু আরোগ্যলাভের পরে ব্যাপির

পুনরাক্রমণে কাবু হইয়া পড়িলে হয়তো আপনার মনে এই ইচ্ছা জাগিতেও পারিত যে, যদি চিকিৎসক, সজ্জাকারী অথবা স্বর্ণমোটে ভবিষ্যতে আপনাকে ইহার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কিছু করিতে সমর্থ হইতেন।

সম্ভবত: আপনার মনে থাকিতে পারে যেমন করিয়া এক দিন ঘুম হইতে উঠিয়া নির্দল আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া আপনি অল্পভব করিলেন, আপনি অল্পভব। যেহেতু আগের দিনও মনে হইয়াছিল যে, আপনার স্বাস্থ্য ভাল, কাজেই এই ব্যাপি পোষণ করিবার জন্য আপনার দেহের উপর দোষারোপ করার কোনো সম্ভব কারণ বুঝিয়া পাওয়া আপনার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। হয়তো আপনি মনে মনে বলিতে পারেন যে, সম্ভবত: বাহির হইতে “কোনো-কিছু” আপনার অস্থির দেহে প্রবেশ করিয়া নিত্য আকস্মিকভাবে এই রোগ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু আপনার অলক্ষিতে কি করিয়াই বা এরূপ “কোন-কিছু”—আপনার শরীরে ঢুকিল?

ইহার সকল রহস্যই কিন্তু অত্যন্ত সহজ এবং যা আপনি সন্দেহ করিয়াছেন তাহা অজ্ঞাত। ব্যাপি, অথবা অধিকাংশ ব্যাপিরই সৃষ্টি হয় বাহির হইতে যে সকল ‘এজেন্ট’ বা রোগবীজগুণাহক দেহে প্রবেশ করে তাহাদের দ্বারা। এই সমস্ত বাহিরের এজেন্ট আকারে এত ক্ষুদ্র যে সাদা চোখে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। ‘ম্যাগনিকাইং গ্লাস’ বা বহু ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা দৃষ্টিগোচর হয়। বাহিরের একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিক হইতে ইহারা দেহাত্তরে প্রবেশ করে এবং পরে দেহ আভিরা পুনরায় বাহিরের পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করে। চুপিসারে মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়া এই সমস্ত জীবাণু ইহাকে ব্যাপিগ্রস্ত করে এবং পুনরায় ভেদমি নিশেধে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা অল্প ব্যক্তির দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে—কলে শৈথিল্য ব্যক্তিও রোগাক্রান্ত হয়।

অল্প কথায়, দৃষ্টান্তরূপ বলা যায় যে, আপনি যদি পিতা হন ত যে ছেলে আপনার সঙ্গে একই গৃহে বাস করে তাহার দেহে আপনার সর্দি-কাশি সংক্রামিত হওয়ার জন্য আপনিই দায়ী। আর আপনি যদি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন ত আপনার শিশুকন্ডার দেহে এই ব্যাপির বীজাণু যে সংক্রামিত হইল সে আপনারই দোষে। অথবা আপনি যদি বাদ্যবস্তুর ব্যবসায়ী হন তবে যে সকল লোক আপনার সর-বরাহ-করা বাবার আহাৰ করে তাহাদের মধ্যে টাইফয়েড

রোগের প্রসারের জন্তু আপনাকেই দায়ী করিতে হয়। এইরূপ বিভিন্ন প্রেণীর অসংখ্য ব্যাধির কথা বলা হইতে পারে যেগুলি এমন সব বীজাণুদ্বারা সংক্রামিত হয় যাহারা আমাদের শরীরে অলক্ষিতে আসা-যাওয়া করিয়া থাকে।

উপরের কথাগুলি ভাল করিয়া অস্থাবন করিলে এখন আপনি মনে মনে বলিতে পারেন—“আচ্ছা, আমার প্রতিবেদী যদি অজ্ঞাতসারে নিজের দেহ হইতে টাইফয়েডের বীজাণু আমার পুত্রের দেহে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারেন (তাহার অস্থবের পরে আমার পুত্র রোগাক্রান্ত হইয়াছিল), তাহা হইলে তাহার পুত্রের চোখের ক্ষতের জন্ত আমিও ত দায়ী হইতে পারি (প্রথমে ত আমারই চোখে যা হয়, তার পরেই না ছেলেটির ঐ অস্থবের স্রাবপাত)। অন্য কথায়—বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনাম যখন ‘দোষী’ বলিয়া আপনার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে, অথবা আপনার দেহে ‘রোগ বিস্তারকারী’ এই লেবেল আঁটয়া দেয় তখন আপনাকে একজন ছরভিসন্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিপন্ন করা নিশ্চয়ই ইহার উদ্দেশ্য নয়, অথবা উক্ত শিরোনাম যে কেবল একলা আপনাকেই দায়ী করে তাহাও নহে। ইহা নিঃসন্দেহরূপে যেমন আপনার প্রতিবেদীকে তেমনি আপনাকেও বুঝায়। শুধু তাহাই নয়—ইহা বুদ্ধ অথবা যুবক, চিকিৎসক কিংবা অব্যবসায়ী, পুরুষ অথবা স্ত্রী, শিক্ষিত অথবা অজ্ঞ, বনী এবং দরিদ্র—সমাজের অপর প্রত্যেককেই সমভাবে দায়ী করে। বস্তুতঃ সমাজের প্রত্যেককেই—অবশ্য অনিচ্ছাসত্ত্বে—রোগবিস্তারের জন্ত দায়ী।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, সকল প্রকার ব্যাধির প্রসারের জন্য আপনি দায়ী নহেন। একথা হয়ত আপনার জানা থাকিতে পারে যে, ক্যান্সার, বহুভূজ, হৃদরোগ, পাকস্থলীর ক্ষত প্রভৃতি এমন অনেকগুলি ব্যাধি আছে যাহা এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইতে পারে না। এগুলিকে বলা হয় অ-সংক্রমণীয় (Non-Communicable) ব্যাধি। পক্ষান্তরে অন্য সব তথাকথিত সংক্রমণীয় (Communicable) ব্যাধিসমূহ সংক্রামক ব্যাধিও অথবা পীড়িত ব্যক্তির দেহ হইতে স্তম্ভ ব্যক্তির দেহে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, সিকিলিস (‘উপদংশ’) ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত ব্যাধির বহুই হয় পূর্বোন্নিবেশিত, বাহিরের এজেন্ট—তথাকথিত জীবাণুসমূহের দ্বারা। এই জীবাণুগুলিই একসকল রোগের সংক্রামকতার কারণ।

এই সমস্ত বীজাণু এক দেহ হইতে অল্প দেহে গিয়া আশ্রয় লইবার ক্ষমতাবিশিষ্ট। কিন্তু অজ্ঞাত ব্যাধিসমূহ কোনও বাহিরের এজেন্টের দ্বারা উপপন্ন হয় না বলিয়া স্বেচ্ছলিখে বলা হয় অ-সংক্রমণীয়।

এখন আপনি বলিতে পারেন যে, রোগের বীজাণু যে কেমন করিয়া আপনার দেহে প্রথম প্রবেশ করিল তাহা

যখন আপনি ঘূর্ণাকরেও টের পান নাই, তখন আপনার শরীর হইতে অজ্ঞাত লোকের মধ্যে তাহার সংক্রমণের জন্ত আপনাকে দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

আপনার কথাটা যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। এই ধরনের প্রশ্ন যে আপনার মনে জাগিতে পারে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে কিভাবে আপনার শরীর হইতে অপরের দেহে রোগ সংক্রামিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে তাহা আমরা অত্যন্ত সহজ সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই রোগসংক্রমণ হইতে পারে তিনটি বিভিন্ন প্রণালীতে বা ধাতে।

ধাত নং ১—স্বাসনালীর মাধ্যমে

যখন আপনি থুথু ফেলেন, কাশেন বা হাঁচেন তখন প্রস্থান-বায়ুর সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বের বায়ুস্তরে আপনি আপনার শরীরে যে-কোনও ব্যাধির বীজাণু আছে তাহা নিক্ষেপ করেন। যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া, টবসিল, হাম প্রভৃতি নানা রোগের বীজাণুই এগুলি হইতে পারে। এই সকল বীজাণু বায়ুতে পৌছিবাব পর, অপর কাহারও নিঃস্বাসবায়ুর সঙ্গে তাহার দেহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ঐ ব্যাধিতে আক্রান্ত করিতে পারে।

ধাত নং ২—মলমূত্র-ধাত

এই ধাতের দ্বারাও বিবিধ রোগ সংক্রমণের সহায়তা হয়। আপনার দেহে যদি টাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি রোগ থাকে তাহা হইলে চতুষ্পার্শ্বের জমিতে এবং জলে আপনার মলমূত্র ত্যাগের ফলে ঐ সকল রোগের বীজ নিঃসৃত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এই সমস্ত জীবাণু মাটিতে অথবা নদী এবং হ্রদের জলে পৌছিবাব পর অপর কাহারও কাঁচা খাদ্য বা পানীর জলের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইতে এবং তাহার দেহে ঢুকিয়া তাহাকে ঐ সকল ব্যাধির কবলিত করিতে পারে।

ধাত নং ৩—হস্ত-ধাত

এই ধাতের মাধ্যমে আপনার দেহের যাবতীয় বীজাণুই অপরের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। কেননা হাত নাগিকা এবং মুখ (নিঃস্বাস-প্রশ্বাসের ধাত) এই দুটিকে যেমন ছোঁয় তেমনি মলমূত্র নিঃসরণের ধাতকেও স্পর্শ করে। সেই জন্ত প্রথম দুইটি ধাতের সাহায্যে যে সকল রোগের বীজাণু বিস্তার-লাভ করে তৎসমূহই ঐ সকল ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকের হাতের মাধ্যমে প্রথমে অজ্ঞাত লোকের হাতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে; তারপর ক্রমে ক্রমে উক্ত ব্যাধিসমূহ তাহার দেহে সংক্রামিত হয়। যখন, আপনার হাতের মাধ্যমে যদি আপনার টাইফয়েডের বা গলকণ্ঠের বীজাণু অল্প কাহারও হাতে পৌঁছে তাহা হইলে নিশ্চয়ই বীজাণুগুলি শেযোক্ত ব্যক্তির নিজের হাত হইতে তাহার নাক এবং মুখের ভিতরে গিয়া ঢুকিবে এবং তাহাকে ঐরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত করিবে।

হস্তরাং যদি আপনি আপনার দেহ হইতে বাহিরে ব্যাধি-বীজাণুর বিস্তার বন্ধ করিতে চাহেন ত আপনাকে নীচের ভিনট নীতি মানিয়া চলিতে হইবে।

নীতি—১

কাসিবার, হাঁচিবার অথবা থুতু ফেলিবার সময় আপনি আপনার মাকের উপর একটি কুমাল ব্যবহার করিবেন। কুমাল ধানসালী-পথে রোগবীজাণুর বিস্তার বন্ধ করিবার পক্ষে সহায়ক হয়।

নীতি—২

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে নির্মিত পায়খানায় মলমূত্র ত্যাগ এবং জ্যানিটরী টয়লেট ব্যবহার করিবেন। ইহা ছাড়া অজ্ঞ মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস বর্জন করিবেন। জ্যানিটরী টয়লেট এবং পায়খানা মল-মূত্র খাতে রোগ বিস্তার প্রতি-রোধের সহায়তা করে।

নীতি—৩

প্রতিবার মলমূত্র ত্যাগের পর এবং আহারের পূর্বে সাবান-জল ব্যবহার করিবেন। সাবান হস্ত-খাতে রোগ-বিস্তার প্রতিরোধের সহায়ক হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা বলিলাম তাহার সারাংশ হইতেছে এই :

একথা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে যে, যে সকল বীজাণু ব্যাধি সৃষ্টি করে সেগুলি ভিনট খাতের মাধ্যমে বিস্তার

লাভ করে : (১) খাস-খাত, (২) মলমূত্র খাত (৩) হস্ত-খাত। ভিনট নীতি পালন করিয়া আপনি রোগ-বিস্তার বন্ধ করিতে পারেন—(১) কুমাল ব্যবহারের নীতি, (২) টয়লেট ও পায়খানা ব্যবহারের নীতি এবং (৩) সাবান ব্যবহারের নীতি—প্রত্যেকটি খাতে রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত এক একটি নীতি প্রতিপাল্য।

যে পর্য্যন্ত সংক্রমণের রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আপনি অসুস্থ হইতে থাকিবেন, অর্থাৎ—যে পর্য্যন্ত অপরে তাহাদের রোগের বীজাণু আপনার দেহে ছড়াইতে থাকিবে সেই পর্য্যন্ত অপরের মধ্যে রোগ-বিস্তারের জন্ত আপনিও দায়ী থাকিবেন। কাজে কাজেই আপনি যদি অপরের মধ্যে রোগ ছড়ানো বন্ধ করেন তাহা হইলে অপরেও আপনার মধ্যে ব্যাধির বীজাণু বিস্তারে বিরত হইবে।

এই বিষয়টি অনুধাবন করিয়া যাহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিলেন তাহারা প্রত্যেকে কি অন্ততঃ আর দুই জনকে এ সম্বন্ধে ওরাকিবহাল করিবার চেষ্টা করিবেন না? অতীতে যদি আপনি রোগ বিস্তারের জন্ত অনিচ্ছাক্রমে দায়ী হইয়া থাকেন তাহা হইলে এই “ভিন খাত এবং ভিন নীতির” নুতন ‘বেদ’ প্রচার করিয়া আপনি যেচ্ছার ইহার সংক্রমণের পথ বন্ধ করিয়া কৃতিত্বের ভাগী হইতে সক্ষম হইবেন।*

* ‘ওয়াশ’ হেলথ অর্গেনাইজেশনের সৌজন্যে।

ফেলে আসা দিনগুলি মোর

শ্রীনীলিমা দত্ত

ফেলে আসা দিনগুলি মোর—

মনোমাবে এসো বীরে ভেদে

ঘমাইয়া স্বপনের ঘোর

অমথুর স্মৃতির আবেশে ;

ফেলে আসা দিনগুলি মোর—

একদিন তোমাদের সনে

করেছি যে খেলা আনমনে ;

অব-অব পরশ বিস্তার

র’তেছি যে স্নেহমায়া-ভোর

জীবনের সব সব পথে

দূরে যদি যাই তোমা হ’তে

কতি নাই ;

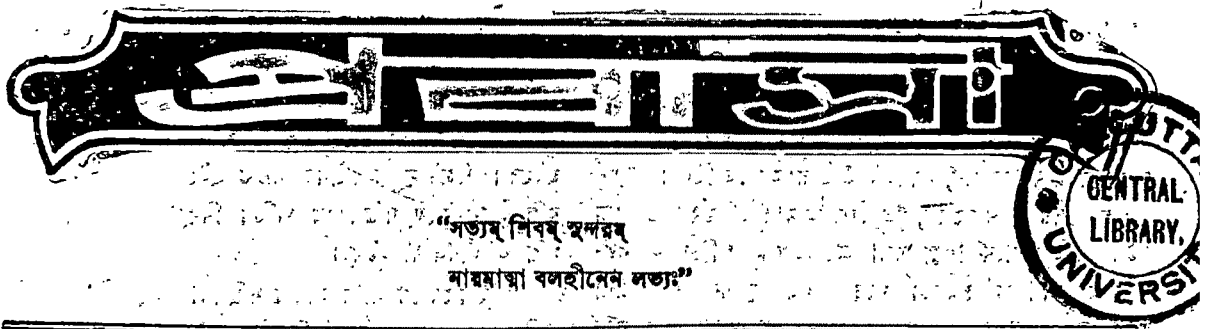
তোমাদের কথা

রবে হয়ে স্মৃতি-কল্পলতা,

রচি স্বপনের মায়াভোর

ফেলে আসা দিনগুলি মোর।

২
দিগন্তের অর্থ যবে তাপদধি দিবসের শেষে ;
স্নান হ’য়ে নিবে যাবে, দিগন্তের অন্তাগলে এসে,
আধারে বিরামকণে নাম ব’রে ডাকিও আমারে
নিশীথ-স্বপনের মাকে জেগে ওঠা অরুণীর পারে।



১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আমি, ১৩৫৯

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ডাক্তার রায়ের স্বপ্নমঙ্গল

পশ্চিম বাংলা এখন বাহাদুরের হাতে আছে তাঁহার মোটামুটি ত্রিশ বৎসর আগেকার অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেসের অধিকারী বর্গের উত্তরাধিকারী। ঐ ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাংলার অধঃপতন আরম্ভ হয়। অধঃপতনের মুখে বাংলার রাষ্ট্রনীতি কূটনীতিতে পরিণত হয় এবং সেই সময়েই রাষ্ট্রনীতি কেবল হইতে নীতি ও সত্য—ইংরেজীতে যাহাকে বলে moral values—বহিষ্কৃত হয়। সেই সময় বলা হয় নীতিজ্ঞান, তথ্য-বিচার, বর্ধভীকতা ইত্যাদি পৌরুষের পরিপন্থী এবং রাষ্ট্রনীতিতে উহার স্থান নাই। ফলে-বলে-কৌশলেই রাষ্ট্রাধিকার লাভ ও রক্ষা করিতে হয় এবং বিবেক ও বর্ধভীকতা বিসর্জন দা দিলে রাষ্ট্রচালনা অসম্ভব। যিনি বাংলার এই কূটনীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাঁহার ইতিহাস-জ্ঞান একবারেই ছিল না এবং অচিরেই তিনি বুঝিতে পারেন যে, দেশের কি সর্বনাশের পথ তিনি উদ্ভূত করিয়াছেন। হৃৎকের বিষয়, অকালমৃত্যুর কালে তিনি কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই, যদিও প্রতিকারের সম্ভব কথ্য তিনি অনেককেই আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন, বাহাদুরের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, প্রবোধ গ্রীষ্মমাধব সরকার, জীবিত আছেন।

ত্রিবিধানচন্দ্র রায়-তাঁহারই প্রধান শিষ্য, কিন্তু গুরু-ভিত্ত অভিজ্ঞতার কথা তিনি হয় ভুলিয়াছেন নয় মনে করেন যে উহা ভুল। সুতরাং আজও সেই ১৯২১-২৪ সালের কূটনীতিই তিনি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। কলিকাতা কংগ্রেসেই তাঁহার রাষ্ট্রত্বের শেষ পরিচ্ছেদের কথাও ভুলিয়াছেন।

ডাঃ রায় ১০ বৎসর পার হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার নীতি-জ্ঞান বা বর্ধভীকতার কথা বলা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। তবে দেশ যে কোন বাহাদুরের পথে চলিয়াছে সে কথা সকলেরই চিত্তের বিষয়।

পুরাতন মন্ত্রিসভা গিয়াছে এবং নতুন বসিয়াছে। পুরাতনের মধ্যে সর্বাধিক কদম্বক এবং অকপট ও সাহসী কর্মী ত্রিভূপতি

মহুমদার কংগ্রেসী চক্রান্তে এবং ডাঃ রায়ের বুধির অভাবে মন্ত্রিত্ব হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। গ্রীষ্মেই রায়েচৌধুরীর বিদায়ও অস্বরূপ। নতুন দলের মধ্যে ইহাদের পদাঙ্ক অহুসরণের যোগ্যতা কাহারও আছে কিনা তাহা অদূরতবিধাতেই বুঝা যাইবে। পশ্চিম বাংলা তো সখিহারা, 'গতগৌরব হত আসন' অবস্থায় ভুবিতে চলিয়াছে। কেন্দ্রের পদলেহনই তাঁহার একমাত্র মঙ্গল। এই অবস্থায় আজ এই অপরূপ লোকহৃদয়কর মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার পরত্যাগ পত্র পেশ করিবার প্রাকালে ডাঃ বি. সি. রায় নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতি সুপাঠ্য হইয়াছে, কিন্তু ইহা কতটা সুসার তাহা অল্প-বিচারেই বুঝা যাইবে। পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ যের তমসাহস্র, এই বিষয়ে কাহারও বিশেষ সন্দেহ নাই। একমাত্র ডাঃ রায় প্রমুখ কয়েকজন, বাহাদুর পশ্চিম বাংলা বলিতে বুঝেন কলিকাতা এবং দেশবাসী বলিতে বুঝেন সংবাদপত্রের তুয়া কথার পসারী, তাঁহাদের স্বপ্নগণ্ডের পশ্চিম বাংলা স্বর্গ-রাষ্ট্রের মন্দনকানন। যাহা হউক, আমরা পাঠকের বৈধ্য-চ্যতির ভয় থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বিবৃতি পরিবেশন করিলাম :

"প্রায় সাত্বে চার বৎসর পূর্বে আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করি। তখন রাষ্ট্রনৈতিক আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। জাতির জনক গান্ধীজীর অপমৃত্যু, যুক্তা, পূর্ববঙ্গের উত্তরাধিকার আদায় ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার—এই সব বিভ্রান্তিকর পরিবেশে আমাদিগকে কান্ড আরম্ভ করিতে হয়। ইহা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রীয় তত্ত্বী হস্তের ও বিপৎসঙ্কল জাতীয় সময়ে পাতি জমায়। ১৯৫০ সালের প্রথম কং-গ্রাসের ঘটনাবলী ও পরবর্তী দাদা-হাদাদা এবং সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচন অল্পকালকালে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে আমাদের কার্যকরতার হ্রাসের পরীক্ষা চলে। এই সময় মন্ত্রিসভায় আমার সহকারিগণ একান্তবোধে অগ্রপ্রাণিত ছিল এবং তাঁহাদের পারম্পরিক প্রজ্ঞা ও আহুগত্য অস্বল্প ছিল।"

এই ‘শ্রদ্ধা ও আত্মগত্য’ যে কতটা ছিল তাহার প্রমাণ নিকাচনাই দেখা গিয়াছে। পূর্বেও অনেক কিছু ঘটনায়ে। ডাঃ রায়ের কথার অর্থ, সকলেই তাহার অত্মগত্য ছিল।

অন্তঃপুরে তিনি বলেন, “এ স্থলে আমার ভবিষ্যৎ মন্ত্রিসভার গঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক দুর্বলতা সত্ত্বেও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়নের ব্যাপারে প্রতি বৎসর অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। এই হেতু মন্ত্রিসংখ্যা, বিশেষ করিয়া তরুণবয়স্ক মন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করিয়াছি।”

অর্থাৎ কিনা পশ্চিমবঙ্গবাসী পৌরীসেনবর্গ কড়ি যোগাইবে এবং ডাঃ রায় পাঁচ মিল চাট্টকারবর্গ জইয়া মন্ত্রিদের ইচ্ছা চালাইবেন। পড়ুরা অর্কাটীনের দল যদি দেশ-উচ্ছেদ দেয় তো ভালই, পশ্চিম বাংলার লোক মরিয়া বাস্তবদুদের স্থানের সংকুলান করিবে। প্রকৃত বাস্তবহাদের কোনও ঠাই কোথাও নাই, সে পূর্ববঙ্গের বাস্তবহারাই হউক বা পশ্চিমবঙ্গেরই হউক। বাংলার মন্ত্রিসভা বাস্তবহারি বলিতে বুঝে বাস্তবদু।

ডাঃ রায় বলেন, “সাত্তে চার বৎসর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার সময় আমাকে আমার সহকর্মীদের বাহাই করিতে হয়। কার্যভার গ্রহণের দিন আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, আমার সহকর্মিদল ‘স্বাধীন-পরিবারে’র লোক। বিগত ৫২ মাসে আমাদের মন্ত্রিসভার ২৩৮ বার বৈঠক হয়। ইহার মধ্যে একবার ছাড়া আর কখনও আমাদের মধ্যে মতভেদ হয় নাই। সেইবারের বৈঠকে শাসন-বটিত কোন আলোচনা হয় নাই; আমাদের সামাজিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি নীতিবটিত প্রশ্ন, উহাতে আলোচিত হয়। মন্ত্রীদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু মতভেদ যতবারই উপস্থিত হইয়াছে, ততবারই আলোপ-আলোচনায় ও আপোষে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। ইহাতেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মন্ত্রিসভা কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াও প্রতিবুল পরিবেশের মধ্যেও একটি সুগঠিত দল হিসাবে কাজ করিয়াছে।

“মন্ত্রি গ্রহণের অব্যবহিত পরই গান্ধীজী নিহত হন এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির উদ্ভব হয়। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণ দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে থাকে; খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের নিরন্তর দর বহাল ছিল; জনসাধারণের ভয় হয় যে, ‘অহিংসার ঐশ্বর্য’র ভিরোবানে দেশে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইবে। সাম্প্রদায়িকতা শক্তি সঞ্চয় করিয়া গান্ধীজী প্রবর্তিত নীতির ধ্বংস করিয়া ফেলিবে বলিয়া মনে হয়। এহেন বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে কাজ আরম্ভ করিতে হয়। ইহা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রীয় তরঙ্গী অবিচল গতিতে অগ্রগতি হইতে থাকে।”

কিনা ‘অবিচল গতি’ এবং অহো, কিনা ‘অগ্রগতি’।

“একগুণে আমাদিগকে নূতন পথে যাত্রা শুরু করিতে হইবে। শীঘ্রই নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। কাজেই আমরা বলিতে পারি যে, মন্ত্রিসভার অভিন্ন বিলুপ্ত হইয়াছে; তবে মন্ত্রিসভা দীর্ঘজীবী হউক।

“এই সুযোগে আমি আমার মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি এবং তাহাদের সহযোগিতা ও আত্মগত্যের জন্য বন্যবাদ জানাইতেছি। তাহাদের কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা নাই। আমার বিশ্বাস প্রয়োজনমত তাহারা ভবিষ্যতেও যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।”

কর্তব্য নিষ্ঠার প্রতিদান বলিতে ডাঃ রায় কি বুঝেন ও তাহার শ্রদ্ধার মূল্য কি তাহা ত্রিভূপতি মজুমদার, কামেন এবং কামেন আরও অমেকে। সে বাহাই হউক, তথিতা এই পর্যন্ত। ইহার পর স্বপ্নদলের কথা।

“আমি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের অহুসাদনের জন্য নূতন মন্ত্রীদের একটি তালিকা পেশ করিয়াছি। এ বিষয়ে প্রথমে আমার বক্তব্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর বেশী পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে আমরা এই ষাণ্ডে কিঞ্চিদধিক দশ কোটি টাকা এবং পর বৎসর বার কোটি টাকা ব্যয় করি। ইহার মধ্যে নদী উপত্যকা পরি-কল্পনা ষাণ্ডে ব্যয়ের পরিমাণ বরা হয় নাই। একগুণে পরি-কল্পনা, বিদ্যাস সম্পূর্ণ হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেক ও যথাসাধ্য উদ্ভাবন করা অত্যাবশ্যক। এই হেতু মন্ত্রিসংখ্যা বিশেষ করিয়া তরুণ মন্ত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাহারা ঘটনাস্থলে স্বচক্ষে সমস্ত বিষয় দেখিয়া মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য নিতুল সংবাদ পরিবেশন করিতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ, যেসব যুবক বিধানসভার সদস্য হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেককে ভবিষ্যৎ কাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই হেতু আমাদের মধ্যে বাহারা বয়োবৃদ্ধ আছেন, তাহারা লোকান্তরিত হইলে ষাণ্ডে এই সব তরুণ সদস্য তাহাদের স্থান গ্রহণ করিতে পারেন, শুধুনা তাহাদিগকে অধিক সুযোগ দেওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ, আমার মনে হইয়াছে যে, শাসন বিভাগের প্রত্যেকটি দপ্তরের কার্য-কলাপ সম্পর্কে ষাণ্ডে অধিক মাত্রায় ব্যক্তিগত মজুর দেওয়া সম্ভবপর হয়, এমনভাবে সবকয়টি বিভাগকে একত্র আঁখিত রাখা উচিত। তাহা ছাড়া, এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যথা খণ্ডজাতি সম্পর্কিত ব্যাপার এবং কুটুমশিল্প—যাহা রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার পটভূমিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ অবস্থার আমি উপরোক্ত বিষয়ে অবহিত হইয়া মন্ত্রিসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি।”

২২ কোটি টাকা দুই বৎসরে ‘উন্নয়ন’ কার্যের ষাণ্ডে ব্যয়

করা হইয়াছে। কিন্তু দিব্যানয়ন ব্যতিরেকে তাহার চিকিৎসা দর্শন করার উপায় নাই। খাড়ে, বিড়ে, বাসে, শিকার, সম্মানে, বাঙালীর, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার বাঙালীর, স্থান সর্বোচ্চে—অন্ততঃপক্ষে ডাঃ রায়ের স্বপ্নজগতে।

স্বপ্নমন্ডলের কথা অমৃত সমান

মুখ্যমন্ত্রী ভণে তথা শুনে পুণ্যবান ॥

নৃতন মন্ত্রিসভা

স্বপ্নরাজ্য বিহারের পর ডাঃ রায় বামুন ভগ্নে নামিয়াছেন। চৌক জন মন্ত্রী ও যোল জন উপমন্ত্রীর নাম শুনাইয়া আমাদের শঙ্ক করিয়াছেন। বাকী আছে ৩০ বা ৩৬ জন পরিষদ-সচিবের নামগণ। অবশিষ্ট ১০ জনেরও ব্যবস্থা হইবে মনে-বলে-কোশলে। তাহা হইলেই মন্ত্রিসভা “সুখী-একানবর্তী পরিবার” হইয়া পরিচারক লইয়া ঘর করিতে পারিবে। এই একানবর্তী পরিবারের সুখই তো দেশের কাম্য। হুঃহু, বুডুহু, বেকার ইত্যাদি হুঁই লোকে নানা কথা বলিতেছে। সে কথা বর্ডবের মধ্যে বা হইলেও মুখ্যমন্ত্রী তাহা শুনিয়াছেন।

ডাঃ রায় বলেন, “বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, আমি স্বয়ং অনেকগুলি দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছি এবং এইগুলি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর; দ্বিতীয়তঃ, আমি অনেকগুলি মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি। আমি মনে করি, আমার এই উত্তম কার্য্যই যে সমস্ত হইয়াছে তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে।”

প্রতিপাদন ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী যাহা বলিতেছেন তাহাও শুনা প্রয়োজন। অতএব ‘স্বপ্ন বিধে অমৃতত পুত্রাঃ’—

“তাহারা বলিতেছেন যে, আমি অনেকগুলি দপ্তরের ভার লইয়াছি তাহারা সম্ভবতঃ জানেন না যে, গত কয়েক মাস হইল এই সমস্ত দপ্তরেরই কার্য্যাবলী আমি তত্ত্বাবধান করিতেছি। ইহার সহিত গুরুদায়িত্বসম্পন্ন সাহায্য ও পূর্বসন্নিহিত দপ্তরও আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। যদিও ত্রীনলিনী-রঞ্জন সরকার তাহার পরামর্শ এবং পরিচালনা দ্বারা আমাকে কৃতিত্বের সহিত সাহায্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার শারীরিক অবস্থা এরূপ ছিল যে, চিকিৎসক হিসাবে তাহাকে আমি অমর্যক উৎকর্ষ ও উদ্বিগ্ন হইতে রক্ষা করিতে চাহি। এই রাজ্যের আর্থিক অবস্থার জন্য আমি কোমরুপ কৃতিত্ব দাবি করিতেছি না। ত্রীযুক্ত সরকারের উত্তম ও প্রেরণার ফলেই অর্থ নৈতিক অবস্থা এইরূপ হইতে পারিয়াছে। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি বরাবরই রাজ্যের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি সম্পর্কিত ব্যবস্থার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। যে সমস্ত বিষয়ের ভার আমি নিজের গ্রহণ করিয়াছি এইগুলির জন্য আমি ছয় জন উপমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি। যদিও তাহারা আপাততঃ প্রথম দপ্তরের কোনও

একটি দপ্তরের ভার লইবেন, তথাপি তাহারা যখনই অমৃতত করিবেন যে, তাহারা আরও গুরুদায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ তখনই আমি যথাসম্ভব দ্রুত দায়িত্বভার ত্যাগ করিব। এইরূপ মানবিকতাবোধ আমার আছে। ইহাতে আমি প্রম ও উদ্বিগ্ন হইতে অব্যাহতি পাইব। শাসনকার্য্য পরিচালন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে আমি এই সমস্ত উপমন্ত্রীদের পরিচালনা করিতে পারিব বলিয়া গর্ববোধ করিতেছি।

ত্রীনলিনীরঞ্জন সরকার সবকে কিছুই বলার প্রয়োজন নাই। তবে ডাঃ রায় এই রাজ্যের আর্থিক অবস্থার জন্য “কৃতিত্ব” দাবি না করিয়া ভালই করিয়াছেন। “উড়ো খই গোরিন্দার নমঃ” ইহাই উত্তম ব্যবস্থা। এখন একা রাগে যাহা করিয়াছেন তাহার উপর সুগ্রীব, নল, নীল, গরু, গবাক, জাবান সংযুক্ত হইলে কি হইবে তাহাই বিচার্য্য। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা দৈবজ্ঞ আমরা নহি, ডাঃ রায়ের উপদেষ্টারা সে বিষয়ে পটু। তবে গর্বের পরিণতি সম্পর্কে ইংরেজী প্রবাদবাক্য কি একটা আছে যেমন হয়, Pride cometh before...

“আমি ব্যক্তি-বিশেষকে বা কয়েক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি—সম্ভবতঃ এই ধারণা হইতেই এরূপ সমালোচনা করা হইতেছে যে, আমি বেশী উপমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি। আমি দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছি যে, এইরূপ ধারণার মূলে কোনও সত্য নাই। একজন মানুষের পক্ষে যেরূপ অভিনিবেশ প্রদর্শন সম্ভবপর গত সাড়ে চারি বৎসর সেইরূপ অভিনিবেশসহ রাজ্যের প্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। সহকর্মীদের সাহায্যে আমি রাজ্যের উন্নতির দ্রুত সত্যকতার সহিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছি। দুই দিন পূর্বে আমি যে লিপিটি প্রচার করিয়াছি তাহাতেই আমি ইতোমধ্যে আভাস দিয়াছি যে, আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও এই রাজ্য গত দুই বৎসর যাবৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ প্রুতি বৎসর ১০ হইতে ১২ কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্রুত উন্নতি সাধিত হইবে এবং আরও বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভবপর হইবে। পরিকল্পনাগুলি সবই প্রণয়ন করা হইলেও আমি ইহা অমৃতত করিয়াছি যে, এইগুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্য যথাযোগ্য সংস্থা গঠন করিতে হইবে। যদি উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় পর্য্যবেক্ষণ এবং সে সম্পর্কে তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়, তাহাঁ হইলে অনেক অপচয় নিবারণ করা যাইতে পারে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপারমে অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। বাণিজ্য এবং নানারূপ ব্যবসায়ের চেষ্টার দ্রুত উন্নতিশীল একটি রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে রাজ্যের শাসন-বিভাগের অধিকাংশ বর্তমান কর্মকর্তৃবৃন্দের—মুখ্য আধিকারিকদের—জ্ঞান নাই। ইহা খুবই বাতাবিক যে, যত

সবচেয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হউক না কেন তাঁহারা কোনও মুক্তি লইতে বা কোনরূপ সাহসিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টার রত হইতে বিধা বোধ করিবেন। ইহা ছাড়া কয়েকটি উপলক্ষ্য ব্যতীত এই সমস্ত কর্মচারীকে জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রতিষ্ঠা হইতে সময়ে দূরে রাখা হইয়াছিল।”

মন্ত্রী-উপমন্ত্রী-সংখ্যা সম্পর্কে ডাঃ রায় যদিচ বলিয়াছেন ‘আমি দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছি’ ইত্যাদি, তথাপি তাঁহার মুক্তি শুনিয়া আমাদের ঐ শারীরা দৃঢ়তর হইয়াছে।

“সুভরাং রাষ্ট্রের উন্নয়নে বাহাদুরের উৎসাহ ও সাহস্য আছে এবং বাহাদুর এই কাজের জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে পারেন, তখন একদল লোককে একত্র করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকটি কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের উক্ত কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন কার্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। জনসাধারণের আকাজকা এবং পরামর্শের সঙ্গেও তাঁহাদের পরিচয় আছে। এইরূপে জনসাধারণের সঙ্গে শাসন বিভাগ যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবে। মন্ত্রিসভার যত সংখ্যক সদস্য আমি গ্রহণ করিয়াছি, তাহার জন্য আমি কোন কৈফিয়ৎ দিতে চাই না। শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগে উন্নতিসাধনের জন্য আমি বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ করিয়াছি এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমি ইহা অঙ্গীকার করি যে, আমি সমস্ত কার্যই করিয়াছি। আমি যাহা করি, তাহার পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করি। এই নতুন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্বও আমার। আমি বিশেষ ভাবে আশা করি যে, এই মন্ত্রিসভা বর্তমানে এই প্রদেশে যে অবস্থার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহাকে অধিকতর বাসযোগ্য করিয়া তুলিবেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই সুখী হইব।

“আমাদের দেশবাসীর নিকট আমি বলি যে, আপনারা আমাদের উপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। কর্তব্য পালনে আপনারা আমাদের গণকে শক্তি দিন। আমরা চেষ্টার জটিল জন্য ব্যর্থ হইব না। আমরা কেবল আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাই করিতে পারি। আগামী পাঁচ বৎসরে প্রত্যেকের নিকট হইতে আমরা পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করিব এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা সফল হইব।”

পালা সাক্ষ হইল। মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদিগের গুণগণার কথা ভবিষ্যতের শিকার তুলিয়া রাখিলাম।

বাঙালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

প্রায় ১৫ মাস পূর্বে মাসিক “উত্তরা” পত্রিকায় ত্রিবিমল বোষ ও ত্রিমনগোপাল সেনগুপ্ত লিখিত দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তখন ডাঃ রায়ের ‘স্বাধীন-পরিবার’ মন্ত্রিত্ব চলিতেছে। ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধে উপর আমাদের মন্তব্যের সমর্থনে উহা উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্গদেশের ঘটনাবলী দর্শকের চক্ষে দেখানো ছিল এই প্রবন্ধ দুইটির উদ্দেশ্য। বাংলার অবশিষ্ট

বা অগ্রগতি হইয়াছে কিনা উহাতেই বুঝা যায়, কেননা দর্শকেই খেলার গতি বুঝে ভাল। প্রবাসী বাঙালীর গুরুপাঠ-হীন চোখে তখনকার বাংলার চিত্র এইরূপ :

“তবু যদি আজ বারানসী-প্রয়াগে ব’সে কোন বাঙালী মনের আনন্দে সন্তোজনাথের করিতা পড়েন—

কোথার কলে সোনার কলস,

সোনার কলস কোটে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদেরই বাংলা রে।

আর মনে মনে বাংলার কথা ও বাঙালীত্বের কথা ভেবে গুলকবোধ করেন অথবা দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, তা হলে সেটা ওদের স্বর্গলোকে বিচরণের মত ভাল হবে, মিথ্যা হবে। চণ্ডীদাস আর রামপ্রসাদের কণ্ঠ ‘কোথার বাজে রে’ ব’লে দূরে ব’সে আমল ক’রে আজ লাভ নেই; কারণ একদিকে আজ হুমায়ুনপ্রসাদ এবং আর একদিকে হিন্দুস্থানী দাদার বাঙালী ভাইদের কণ্ঠে মোসাহেবের সুর বাজছে। যে বাংলা দেশে বাতের গর্জন চিরকাল শোনা গেছে, আজ সেখানে এলে শেরাল-কুহুরের চীৎকার শুনতে পাবেন, গাছে গাছে কিঙের নাচের বদলে দেখতে পাবেন মাটিতে ডুগডুগি বাড়ির বাদরের নাচ। নেতাবুনেরা যে কি চমৎকার “কীর্তিনিয়া” হয়েছেন যদি দেখতে চান, তা হলে বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক হরিসংকীর্ণমাসের একবার এসে বোগদান করুন। সেকালে ব্রাহ্মণরা বংশপরম্পরায় গুরুগিরি ও পুরোহিতগিরি ক’রে এসেছেন, একালে আমরা বংশাহুক্ষে রাজনীতির নেতাগিরি করছি। বাংলার বনগাঁয়ে এইভাবে অনেক ‘শেরাল রাজা’ গজিয়ে উঠছেন এবং তাঁদের “কাছরা” আত্মানে আমরা সকলে “হুকা ছয়া, হুকা ছয়া” বলে সাতা দিচ্ছি।”

রাজনীতি ছেড়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আসুন। সেখানেও এই শারদীয় পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আরম্ভ করলে করতে ঘুমিয়ে পড়লে ছঃঃঃঃ দেখবেন। ‘মাঠে মাঠে বান আর ভারে তার’ চলছে না, গ্রাম পথে পথে তার গন্ধও ত’রে উঠছেনা। ‘হে মাভ: পশ্চিমবদের’ কোন ‘মদুর মুরতি’ শরদ প্রভাতে দেখতে পাবেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বদলে, রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘শরতে বঙ্গভূমি’ স্মরণ করতে হবে—

জননী, তোমার ভিক্ষার বাঁতা

পাঠারে দিয়েছ ভুবনে।

রোগে বভার ‘ভাঙে ভবানী’,

তোমার ভবনে বনে!

অবসর আর নাহিক তোমার

দলে দলে ছুটে ভলন্টিয়ার,

লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত,

পান্ত—আনিতে লবণে।

কমনী, তোমার চির-চাঁদা খাতা

বুলিয়া রেখে ভুবনে।

একথা শুধু যে লক্ষ লক্ষ ভিটেমাটিহীন উদ্বাস্ত বাঙালী পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, সাধারণভাবে সমস্ত বাঙালীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

“পোণে চুনো বহর-বরে এই চলতে চলতে, এমন অবস্থা হয়েছে যে কলকাতা সারা দেশের বিদ্যা, বিত্ত ও সামর্থ্য শুধে নিয়ে বিষম রকম কৈপে উঠেছে—আর গ্রামগুলি হয়েছে রিক্ত, সর্ব্বশূন্য। অথচ ক্রমবর্ধমান জনতার অস্থপাতে কলকাতায় জীবিকার পথ উন্মুক্ত হয় নি, বসবাস ও শিক্ষা-দীকারও ব্যবস্থাপনা হয় নি—দেখা দিয়েছে ব্যাপক দারিদ্র্য, বেকার দশা, দুর্নীতি ও অধঃপত্তন।

“আজ একদিক থেকে পাকিস্থানের রাহ, অজ দিক থেকে সর্ব্বতারতীরতার বিষম জর তাকে একই সঙ্গে চেপে ধরেছে। এর মধ্যে আত্মরক্ষা করে জ্ঞান ও সংস্কৃতির, সত্যতা ও জীবন-নীতির নিজস্ব ঐতিহ্য সে কি আর বাঁচাতে পারবে? সন্দেহ করার সত্যিই কারণ আছে। কিন্তু কেউ কি ভাবছেন তা?”

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট

অর্থমন্ত্রী ত্রিচিন্দ্রাবন দেশমুখ ১৯৫২-৫৩ সালের যে চূড়ান্ত কেন্দ্রীয় বাজেট লোকসভার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, পূর্ব্বেকার অন্তর্ভুক্ত বাজেটের মতই তাহা বৈচিত্র্যবিশীল। ত্রিদেশমুখ বলেন, সংশোধিত হিসাবে রাজস্বখাতে মোট আয় হইবে ৪০৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা; পক্ষান্তরে এই খাতে মোট ব্যয় হইবে ৪০১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। কাজেই ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা রাজস্বখাতে উদ্ধৃত হইবে। পক্ষান্তরে অন্তর্ভুক্ত বাজেটে রাজস্বখাতে উদ্ধৃতের পরিমাণ ১৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার আশিরা দাঁড়াইবে। এই ঘাটতির কারণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, বহির্বাণিজ্যের শুদ্ধ খাতে ২৫ কোটি টাকা আয় হ্রাস পাইবে।

অব্যয়্য হ্রাসের বিষয় আলোচনা করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন যে, কতকটা আন্তর্জাতিক কারণে এবং কতকটা ভারত-সরকারের মুদ্রা ও অর্থনীতি ব্যবস্থার জট উহা হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে অবশ্যস্তাবীরূপে ব্যবসায়ী মহলে কিছু অন্তর্বিধা হইলেও অব্যয়্য হ্রাস দেশের অর্থনীতির পক্ষে মঙ্গলকরই হইয়াছে, অপ্রত্যাশিতভাবে অব্যয়্য হ্রাস স্বরূপ হওয়া এবং দেশের রপ্তানী শুল্কের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হওয়া যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহার প্রতিকারার্থ ভারত-সরকার যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ত্রিদেশমুখ তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। রপ্তানী শুল্কের পরিবর্তন, পাট-জাতকর্য ও কার্পাসজাত দ্রব্যের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি হ্রাস, বিদেশী তুলা ক্রয়ের জট বজাশিল্পকে বিশেষ

সাহায্যদান এবং কাঁচা তুলার মূল্য হ্রাস বন্ধ করিবার জট যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তিনি সেগুলির উল্লেখ করেন।

শিল্পোৎপাদন হার মোটামুটিভাবে অব্যাহত আছে। কৃষি উৎপাদনের হারও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক মূল্য হ্রাস মন্দার সূচনা নহে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকের মতে এই মূল্য হ্রাসে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, বিশ্বের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির ফল নিঃশেষিত হইয়াছে। সরকার যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেও মুদ্রাস্ফীতির কুফল হ্রাস পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, মূল্য হ্রাস এখনও এমন স্তরে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই যে তাহার জট অবিলম্বে কোন কর্তারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তবে ভারত-সরকার এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন আছেন এবং দ্রব্যমূল্য-বিশৃঙ্খলার ফলে উৎপাদন হ্রাস ও কর্মহীনতার সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার জট সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

ইহার পর অর্থমন্ত্রী মহাশয় বহির্বাণিজ্যের অবস্থা বিবৃত করেন। ১৯৫১ সালে বহির্বাণিজ্য ১৯৫০ সালের মত সুবিধাজনক হয় নাই। এই অবস্থা একেবারে অভাবনীয় ছিল না। মুদ্রামূল্য হ্রাস ও কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে মূল্য হ্রাস বাড়াইয়া পাওয়ার ১৯৫০ সালে ও ১৯৫১ সালের প্রথম ভাগে বৈশ্ব কিছু পরিমাণ অর্থ উদ্ধৃত থাকে। সরবরাহ পাওয়ার অন্তর্বিধা থাকায় আমদানীও এই সময়ে কম হইয়াছে। গত মাসের শেষ পর্য্যন্ত সঞ্চিত উদ্ধৃত হইতেই বহির্বাণিজ্যের বাটতি মিটানো হইয়াছে। পাওনা ঠাগিং হইতে টাকা লওয়ার প্রয়োজন হয় নাই।

অতঃপর অর্থমন্ত্রী ভারত ও সমগ্র ঠাগিং অঞ্চলের ডলার অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কেন্দ্রীয় সঞ্চয় দ্রুত গতিতে হ্রাস হওয়া বন্ধ করিবার জট কমনওয়েলথ সরকারগুলি যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহাতে অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। গম ও কাঁচা তুলা মজুত যথেষ্ট থাকায় ১৯৫২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতকে কম পরিমাণ অর্থ লইতে হইয়াছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। এই ঋণ পাওয়া গেলে দেশের ডলার সঞ্চয় অবস্থার উন্নতি হইবে।

তারপর অর্থমন্ত্রী খাজ ব্যাপারে সরকারী সাহায্যদান ব্যবস্থার হ্রাসের উল্লেখ করেন। মাইলোর ব্যাপারে সরকারী সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও যদি শিল্পাঙ্গ ও অন্যান্য এলাকার খাজমন্ডের মূল্য ১৯৫১ সালের হারেই রাখিতে হয় তবে আমদানীকৃত খাজমন্ডের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ভরবিলে ব্যয় প্রায় ৬০ কোটি টাকার দাঁড়াইবে। ত্রিদেশমুখ

বলেন যে, আমাদের আর্থিক সম্পদের অধিকতর স্থায়ী লাভ-জনক উন্নয়নের জন্য অধিকতর প্রতিযোগিতা হইতে থাকিলে, বাজের ব্যাপারে সরকারী সাহায্যদান করিয়া এত বেশী অর্থ ব্যয় করা নিরর্থক হইবে।

সাধারণ মূল্যহার হ্রাসের পটভূমিকায় খাদ্যশস্যের মূল্য-বৃদ্ধি পর্যালোচনা করিতে হইয়াছিল। শহর অঞ্চলের শ্রমিক-দের জীবনধারণের ব্যয়ের মান হইতে জানা যায় যে, খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের মোট মূল্য হ্রাস যথেষ্ট হইয়াছে। সেজন্য প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়; সরকার মাইলোর ব্যাপারে সাহায্যদান করিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। কোন প্রকার সরকারী সাহায্য দিয়া কষ্ট লাঘবের আশা তিনি দিতে পারেন না।

অর্থসচিব ঘোষণা করেন যে, তিনি করের হারের কোন পরিবর্তন করেন নাই। করভার লাঘবের কথা উল্লেখ করিয়া ত্রিদেশমুখ বলেন, বাড়তি টাকা কি তাবে বিলাইয়া দিব ইহা আমাদের সমস্তা নহে। পরন্তু আমি যে সকল পরিবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছি তাহাদের দ্বারা যে নীট লোকসান হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ কি তাবে করা যায় তাহাই সমস্তা। উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন এত কাজ করিবার আছে তখন কেহই বোধ হয় সত্য সত্যই করভার লাঘবের কথা প্রস্তাব করিতে পারেন না। গত দুই বৎসর নানা কারণে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি বাবদ ব্যয় ক্রমেই বাড়িতে থাকে। বর্তমান অবস্থায় ভারত-সরকারের রাজস্ব পরিস্থিতির পরিবর্তনসাধন বিপজ্জনক হইবে।

সরকারী ব্যয় হ্রাসের কথা আলোচনা করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে এখন অর্থনীতি ক্ষেত্রের যে সম্প্রসারণ চলিতেছে তাহাতে শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিভাগগুলির ব্যয় হ্রাসের ফলে যে অর্থের সাঞ্চর হইবে উন্নয়ন পরিকল্পনা-গুলি রূপায়ন বাবদ তাহা ব্যয় করা যাইবে। ব্যয় হ্রাসের ফলে এত অর্থ বাঁচিয়া যাইতে পারে যে, তাহাতে করের হার বিশেষ ভাবে হ্রাস করা সম্ভব হইবে এ কথা ঠিক নহে।

বাজেট বৎসরের শেষে সরকারের হাতে মগদ টাকার পরিমাণ ৮৩ কোটিতে দাঁড়াইবে। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে ইহা অপেক্ষা দুই শত কোটি টাকা বেশী ছিল। ইহা হইতে মোটী টাকা অত্যাবশ্যক কারণে ও উন্নয়ন কার্যে ব্যয় করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে সঞ্চিত ও উদ্ধৃত আকারে টাকা মজুত রাখা হইবে না। দেশকে রাষ্ট্রকার্য্যে ব্যয় ও উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ব্যয়ের টাকা সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া লইতে হইবে।

পরিশেষে অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রাণ-শক্তি কিছুমাত্র ভারগ্রস্ত না করিয়া শুধু মাত্র বিদেশের সাহায্যের ভিত্তির উপরে

দেশের সমৃদ্ধি গড়িয়া তোলা যায় না। আমাদের জনগণের প্রচেষ্টায়ই আমাদের দেশের সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

অর্থসচিব ত্রিদেশমুখের মতে আন্তর্জাতিক মন্দার জন্য পাট, চট, তুলার রপ্তানী শুদ্ধ অসম্ভব কমিয়া যাওয়ার ১৯৫২-৫৩ সালের রাজস্বের উদ্ধৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। এই সকল দ্রব্য হইতে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ—

রপ্তানী শুদ্ধ (কোটি টাকার হিসাব)

	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩
প্রকৃত আয়	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	বাজেট
পাট ও চট	২৬'১২	৩৬'০০	৫৭'০০	৪০'০০
তুলা	১'২০	৪'৫০	৭'৭০	৫'৫০
কাপড় ও স্বতা	৩১	২'৫০	২'৩৫	২'৫০
চা	১১'২৪	১০'০০	১০'০০	১০'০০
গোলমরিচ	৪'২৬	৩'২৫	৪'০০	৩'০০
অজ্ঞাত কৃষিপণ্য	৪০	২৪	৫০	৪০
মোহা ও ইম্পাত	২১	১৮	১৫	১০
অন্ন	২৯	২১	৪০	২৫
তৈল ও তৈলবীজ	২	১'৫২	১'৫০	১'০০
পশম	১'৯১	২'৮৫	১'২৫	৭৫
	৪৭'৩৬	৬২'২৫	৮৭'৭৫	৬৫'০০

সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা বর্তমান বাজেটে পাট ও চটের রপ্তানী শুদ্ধ বাবদ ১৭ কোটি টাকা বাড়তি হইবে এবং তুলার মূল্য মোট ২'২০ কোটি টাকা আয় কমিয়াছে। কিন্তু বহির্বাণিজ্যে মোট শুদ্ধের পরিমাণ বাড়িয়াছে। আবগারী শুদ্ধ ও গত সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। নিম্নের হিসাব হইতে ইহা বুঝা যাইবে:

আবগারী শুদ্ধ

১৯৫০-৫১ (প্রকৃত আয়)	৬৭ কোটি	৫৪ লক্ষ টাকা
১৯৫১-৫২ (বাজেট)	৭৯	৬৩
১৯৫১-৫২ (সংশোধিত বাজেট)	৮৪	৩০
১৯৫২-৫৩ (বাজেট)	৮৬	

আয়কর হইতে ১৯৫২-৫৩ সালে রাজস্ব আদায় হইবে ১১৯ কোটি টাকা। পর পর দুই বৎসর আয়কর ১৩২ কোটি টাকা আদায় করিয়া হঠাৎ এ বৎসর তাহা কমানো হইয়াছে এবং অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের মতে দেশ বর্তমানে যেরূপ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে আয়কর আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা আছে।

বাজেটে মোট রাজস্ব ২০ কোটি টাকা সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা কম হইবে। কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা অনেক বাড়ানো হইয়াছে। এই ধরনের খাতার

পরমিলই দেশমুখের বড় কৃতিত্ব। যে সামরিক বিভাগ ইংরেজ রাজত্বকালে এত সমালোচনার বিষয় ছিল সেই সামরিক খাতে এখনও প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে। বস্তুতঃ দেশের শ্রোত্রী রাজস্বের মোটা অংশ এই একটি মাত্র বিভাগেই খরচ হইবে।

এই খরচ কমাইবার পথে অশেষ বাধা আছে সত্য, কিন্তু এখন সময় আসিয়াছে সে বিষয়ে চিন্তা করার। দেশরক্ষার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্র-নিৰ্মাণ শিক্ষা এখন নিতান্ত প্রয়োজন।

সমগ্র বাজেটের কোথাও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কোন আলোচনা নাই। অথচ ইহারই দোহাই দিয়া অনেক কিছু পাস করাইয়া লওয়া হইতেছে। পাঁচসালী বন্দোবস্তের কাজ এক বৎসরে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহারও কোন বিবরণ নাই। পরিকল্পনার স্থির হয় যে, ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকার ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা অর্থ উদ্ধৃত্ত করিয়া তাহার দ্বারা কমিশন-নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু ব্যয়-সঙ্কোচের কোন আভাসই ত্রীদেশমুখের বক্তৃতার পাওয়া গেল না। হীরাকুণ্ড, দামোদর ত্যাগি প্রভৃতি বিভিন্ন পরিকল্পনা ক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতার চূড়ান্ত চলিতেছে। এ সকল ব্যাপারে যে পরিমাণ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন ছিল তাহা হয় নাই। ব্যয়-সঙ্কোচের কোন চেষ্টাও দেখানো করা হয় নাই, কারণ সরকার হইতে কোন প্রকার বাধা পাওয়ার আশঙ্কা তাহাদের ছিল না এবং ব্যয়ব্যবহার অরূপ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা আজ পর্যন্ত হয় নাই।

ত্রীদেশমুখ বলেন, দেশের আর্থিক সমতা রক্ষা করাই সরকারের একমাত্র কাম্য এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ভারত-সরকার তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্যাপারে বাজেট পলিসির উপর তাহার যথেষ্ট নির্ভর করেন। কিন্তু বাজেটের রদবদল করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা ব্যাক্ত অব ইংলণ্ডের পক্ষে সহজ হইলেও ভারতবর্ষের পক্ষে সহজ নহে। আমাদের দেশে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এখনও তেমন সুগঠিত নহে এবং তাহাদের প্রভাব, ব্যবসা বাণিজ্যের উপর এখনও অতি সামান্য। মহাজনদের প্রভাবই অত্যন্ত বেশী এবং তাহাদের আইনের কবলে আনয়ন করার কোন ক্ষমতা ভারত-সরকারের ব্যাক্ত নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য নীতি এদেশে চলিতে পারে না। আমাদের এখানে সম্পূর্ণ অস্ত্র ব্যবস্থাই গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য সরকার যতই নিয়ন্ত্রণ ও অধিক ট্যাক্সের দ্বারা সমতা আনয়নের চেষ্টা করিতেছেন ততই তাহা বিফল হইতেছে। ইংলণ্ডের সোসালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতে সক্ষম হইল না ভারত-সরকার তাহা কি ভাবে করিবেন? সর্বপ্রকার কণ্টোল ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া কর্তার হ্রাস করিয়া ব্যবসায়ের টাকা খাটাই-

বার সুযোগ করিয়া দিলে দ্রুত কাজ পাওয়া যাইত বলিয়াই মনে হয়। বনভূমি ও সমাজতন্ত্রের ধোঁয়াভালি নিবৃত্ত করিতে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দুইটিরই অভাব।

ভারত-সরকারের বৎসর শেষে মগদ ভহবিলের যে শোচনীয় পরিবর্তন ঘটয়াছে তাঃ মুখোপাধ্যায় তাহাই সংসদের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছেন। দেশ বিতাগের পূর্ব প্রথম সম্পূর্ণ বাজেটের সময় ভারত-সরকারের হাতে ২৭৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ছিল। এই মোট অর্থ হইতে ১৯৫০-৫১ সালের মধ্যে প্রায় ১৬০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া মাত্র ৭৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট ছিল। ১৯৫২-৫৩ সালে বৎসর শেষে মগদ ভহবিলে মাত্র ৮৩০৮ কোটি টাকা থাকিবে। ইহার মধ্যে আবার বিদেশ হইতে ভারত-সরকার যে সকল সাহায্য পাইতেছেন তাহার বাবদ ৪০ কোটি টাকা আছে। অর্থাৎ ইংরেজ এ দেশ ত্যাগ করার সময় আমাদের প্রায় পৌনে তিন শত কোটি টাকার মত দিয়া গিয়াছিল এবং ১৯৫২-৫৩ সালে তাহার মধ্যে মাত্র ৪৭ কোটি টাকার মত অবশিষ্ট আছে। দেশ-মুখ বলিতেছেন যে, টাকাটা 'essential purpose'-এ ব্যয় করা হইয়াছে। কিন্তু এমন কোন কাজ দেখা যায় না যেখানে এ টাকার সন্মত ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। খাদ্য উৎপাদন সেরূপ বাড়ে নাই, কৃষির উন্নতি হয় নাই, শিল্পের প্রসার হয় নাই, তবে কিসে এই অর্থ খরচ হইল? ইহার হিসাব-নিকাশ কাম্য।

ভারত-সরকারের বাজেটের একটি প্রধান ভ্রুটি এই যে, রেভিনিউ ও ক্যাপিটাল বাজেট এক সঙ্গে ধরা হয়। বিদেশে মূলধনের টাকা ব্যয়ের পরিমাণ ইদানীং যথেষ্ট বাড়িয়াছে। চলতি বৎসরে ভারত-সরকার মোট ২১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠাইবেন। এতদ্ব্যতীত ব্যাক্তের মাধ্যমে যে টাকা বাহিরে যাইবে তাহার কোন হিসাব নাই। এই টাকার ৩০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে সাধারণ রাজস্ব হইতে, ১১৬ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা মূলধন বাবদ, ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ শোধ বাবদ এবং বাকী টাকা ঋণ ও ডিপোজিট একাউন্ট হইতে দেওয়া হইবে। বিদেশ হইতে আমাদের রোজগার হইবে দুই কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং বিদেশে মোট ২১৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পাঠানো হইবে। ১৯৫২-৫৩ সালে রাজস্ব ও মূলধন সম্মিলিত ভাবে আয় হইবে ৫৩৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ৫৯৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ২১৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সরকারের হাত দিয়াই বিদেশে যাইবে। ইংরেজ আমলে হোম চার্জ রূপে বাহা দেওয়া হইত তাহা লইয়া কংগ্রেসীদের আন্দোলনের সীমা ছিল না। আর আজ অন্য খাতে নিঃশেষে এত টাকা বিদেশে যাইতেছে।

রেলের পূর্ণাঙ্গ বাজেট

গত কেরাদ্বারী মাসে ভদ্রানীতন রেলমন্ত্রী শ্রীমোপালস্বামী আয়েদার যে বাজেট পেশ করিয়াছিলেন, নতুন মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে তাহার কোন বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই, শ্রীআয়েদারের উত্তরাধিকারী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী রেল শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত এক কোটি টাকা ব্যয়বৃদ্ধির উল্লেখ এবং মোট আয়-ব্যয়ে আনুমানিক পরিবর্তন সাধন করিয়া পুরাতন বাজেট নতুন লোকসভায় প্রাস করাইয়া লইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় রেলের পুনর্বিভাগ লইয়া বক্তৃতায় দীর্ঘ সময়কেন্দ্র করিয়াছেন। রেলওয়ের উত্তর, পূর্ব-উত্তর ও পূর্ব অঞ্চল গঠন সম্পর্কে যে সকল সমালোচনা করা হইয়াছে সেগুলি বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিয়া তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন রেলওয়ে ব্যবস্থাকে একত্রিত করিয়া উহাকে ছয়টি এলাকার বিস্তৃত এক অসংহত রেল-ব্যবস্থা হিসাবে গঠন করার জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছিল, তাহা দেশ-বাসী সমর্থন করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার, ব্যবসায়, শিল্প, গ্রাম প্রতিষ্ঠানসমূহ দক্ষিণ, পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় রেলওয়ে গঠন অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাকী তিনটি অঞ্চল গঠন লইয়া কোন কোন স্থানে ভীত ও বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে।

রেলমন্ত্রী বলেন যে, গত জাহ্নবী মাসে (১৯৫২) যখন রেলওয়ে দপ্তরের সাময়িক পরিকল্পনাটি প্রচার করা হইয়াছিল, তখন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগণ মিছেদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন এবং এই সকল রাজ্যের ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ-গুলি ছিল পরস্পরবিরোধী এবং উহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সঙ্গতি-স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। যাহাতে এই সুপারিশগুলি বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখা হয় এবং একটি সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা হিসাবে সমগ্র রেলওয়ের কর্মক্ষমতা রক্ষা ও উন্নয়ন করা যায় এমন একটি পরিকল্পনা রচনা করা তখন সরকারের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন, এই নব্য গণ-তান্ত্র্যবোধ দেশবাসী জাতির এক্য ও সমৃদ্ধির জন্য সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তি পরিহার করিতে পারিবে।

পূর্ব-উত্তর রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার্স সম্পর্কে তিনি বলেন, ও. টি. এবং আসাম রেলওয়ে একত্র করিয়া এই রেলওয়ে গঠন করা হইয়াছে, এই রেলওয়েটি সম্পূর্ণ ভাবে মিটার-গেজ রেলওয়ে। মিটার গেজ রেলওয়ে হাড়া অত্যন্ত উহার হেড কোয়ার্টার্স স্থাপনের প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এলাহাবাদ ডিভিসনের উত্তরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত লইয়া মন্তব্যে দেখা দিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহে এই বিষয় লইয়া সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। উহার ভিত্তি হইল

ওয়েজ উদ্-ও কৃষ্ণকমিটির অভিমত। সরকার এই সকল অভিমত অতি যত্নসহকারে বিচার-বিবেচনা করিয়া, এলাহাবাদ ডিভিসন উত্তর রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কারণ কমিটির সুপারিশের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটনাছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে যাহা সম্ভব তাহাই করা হইয়াছে।

শ্রীলালবাহাদুর বলেন, প্রধানতঃ কল্যাণনি অঞ্চলে পর্যাপ্তসংখ্যক ওয়াগন সরবরাহের জন্যই কেহ কেহ এলাহাবাদ ও লক্ষ্মী ডিভিসন দুইটিকে এবং সম্ভবতঃ মোরাদাবাদ ডিভিসনকেও পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত রাখার জিদ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল যে, এই দুইটি বা তিনটি ডিভিসন পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত হইলে উন্নীত উদ্দেশ্য সাধন সহজ হইবে। ইহারা স্বীকার করেন যে, এই তিনটি ডিভিসনের ওয়াগনের সংখ্যা একত্রে ৪০০০-এর অধিক হইবে না। অথচ মোগলসরাইতে প্রত্যহ এক হাজার ওয়াগনের প্রয়োজন হয়, এবং তাহাও আবার এই তিনটি ডিভিসনের অম্যান্য পণ্যবোঝাই নিরস্ত্রিত করিয়া। ভারতের সম্মিলিত রেলওয়ে এইরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী হইয়া কাদ করিবে, তা এই তিনটি ডিভিসনের বরাবর কতি সাবমের দ্বারা এই অবস্থা স্থায়ী করিয়া রাখিবে, তাহা বিবেচনা করা দরকার। রেলওয়ে মন্ত্রী বলেন, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রেলওয়েসমূহের সংহতি বিধান হইলে এবং সকল অঞ্চল মিছেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইলে দেশের কল্যাণ চলাচল ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত হইবে। এক্ষত রেলওয়ে বোর্ডের একজন ডেপুটি ডিরেক্টরকে মোগলসরাইতে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যাহাতে কল্যাণনি অঞ্চলে যথেষ্টসংখ্যক ওয়াগন কিরিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি সকল অঞ্চলের রেলওয়ে ও রেলওয়ে বোর্ডের সহিত সর্বদা যোগাযোগ রাখিবেন।

শিয়ালদহ বিভাগ সম্পর্কে যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, পূর্বোক্ত রেলওয়েকে কলিকাতার প্রবেশের একটা রাস্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী পরিকল্পনায় এই বিভাগটি উক্ত রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব হয়। বাংলা-সরকার ও ব্যবসায়ী মহল ইহার প্রতিবাদ করেন। বাংলার ব্রড গেজ রেল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে এই বিভাগটি পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত রাখা হউক বলিয়া বাংলা যে দাবি করিয়াছে বিশেষ বিবেচনার পর ভারত-সরকার তাহা মানিয়া লইয়াছেন। কলিকাতা বলরে মাল চলাচল ও যাত্রী যাতায়াত-অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে রেলওয়ে বোর্ডের একজন অফিসার কলিকাতার রেল চলাচলের অবিকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এই অঞ্চলের যাত্রী ও মাল চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

লোকসভার সদস্য ও জনসাধারণকে এই বিষয়টি নিরপেক্ষ

দৃষ্টিতে বিচার-বিপ্লবপূর্বক দেখিবার আবশ্যক করিয়া তিনি বলেন, সকলেই দেখিতে পাইবেন যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্ত এই সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ত্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আরও বলেন যে, যাহারা রেলের পুনর্বিভাগের বিরোধিতা করিতেছেন তাহারা কৃত্রিম প্রাদেশিক স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই সেরূপ করিতেছেন—দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি তাহারা দৃষ্টি দিতে পারিতেছেন না।

অপরকে মোষারোপ করিয়া নিজের অপরাধ কালন করার মত নির্লজ্জতা আর কিছু হইতে পারে না। ২৭শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার পর রাতারাতি একটি বিশেষ প্রদেশের স্বার্থের জন্ত যেভাবে সমগ্র পরিকল্পনাটির পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই ভাল বলিতে পারিবেন প্রাদেশিকতা কোথায় কি তাৎকাল্য করিতেছে।

সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে মাত্র তিনটি বিষয়েই বিরোধিতার উদ্ভব হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার্স কলিকাতায় না হইয়া পোরবন্দর করার, শিমলাদহ ভিভিসনকে নবগঠিত পূর্ব-ভারতীয় রেলওয়ের সহিত যুক্ত করার এবং এলাহাবাদকে উত্তর বিভাগের সহিত ছুড়িয়া দেওয়ার বিকল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রথম অভিযোগের উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, এই রেলওয়েটি সম্পূর্ণ ভাবে মিটার গেজের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মিটার গেজের রেলওয়ে হাতা অত্যন্ত উহার হেড কোয়ার্টার্স স্থাপনের প্রশ্ন উঠে না। এইরূপ অস্বস্তি হুক্তি আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার দ্বারা রেলওয়ে বোর্ডের নিজের কাকেরই কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। নবগঠিত দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথটিতে মিটার, ব্রড ও ম্যারো গেজ এই তিন প্রকার লাইনই আছে। কিন্তু ভগাণি সেখানে একটি মাত্র হেডকোয়ার্টার্স করা হইয়াছে। যদি তাহাদের গঠিত এক রেলওয়েতে ইহা কার্যকর হইবে বলিয়া তাহারা মনে করেন তবে অল্প বিভাগেই বা কেন তাহা হইতে পারে না? এতদ্ব্যতীত আসাম রেলওয়ে সম্পূর্ণ একটি মিটার গেজ পথ। কিন্তু পুনর্গঠনের পূর্বে পর্যন্ত ইহার ব্রড গেজ স্টেশনের হেডকোয়ার্টার্স কলিকাতায় ছিল এবং তাহাদের রেল পরিচালনা জটপূর্ণ ছিল বলিয়া কোনও অভিযোগ হয় নাই।

এলাহাবাদ ভিভিসনকে উত্তর রেলপথের সহিত যুক্ত করা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বর্তমানে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার পটভূমিকাতে যতদূর সম্ভব ওয়েজউড ও কুঞ্জর কমিটির সুপারিশ অনুসারেই তাহারা নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মাত্র দুই বৎসর হইল কুঞ্জর কমিটি তাহাদের সুপারিশ পেশ করেন। এত অল্প দিনের মধ্যেই যদি ইহাদের প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে বিশেষ চিন্তার

কথা। যে কোন পরিকল্পনাই কার্যে পরিণত হইতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া আশী করা যায় না, সুতরাং এত অল্পদিনের মধ্যে কুঞ্জর কমিটির রিপোর্টকে বাতিল করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য সহজেই বোধগম্য হয়। অথচ কুঞ্জর কমিটিকে গবর্ণমেণ্টই নিযুক্ত করেন। এই ভাবে যদি বিশেষজ্ঞদের অভিমতকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয় তাহা হইলে বিভিন্ন প্রামাণ্য কমিশনের পক্ষাভেদে দেশের লোকের রক্ত-শোষিত অর্থ বিসর্জন দেওয়ার সাংক্ৰান্ত কোথায়? দেশবাসী সরকারের কর্ণারই বা কি করিয়া আস্থা রাখিতে পারে?

এলাহাবাদ ভিভিসন উত্তর রেলপথের সহিত যুক্ত হইলে করলা ও অভ্যন্তর প্রয়োজনীয় অবস্থা চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে এই অভিযোগের উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রেলওয়েসমূহের সংহতি বিধান হইলে এবং সকল অঞ্চল নিজেদের দ্বারিহ সম্পর্কে সচেতন হইলে দেশে করলা চলাচল ব্যবস্থা অবিকৃতর উন্নত হইবে। কিন্তু এলাহাবাদ ভিভিসন উত্তর বিভাগের সহিত যুক্ত না হইয়া পূর্ব অঞ্চলের সহিত থাকিলে তাহাতে কোন বাধা হইত কি, না আরও অল্প ধরতে স্পষ্ট তাৎকাল্য হইত তাহাই প্রশ্ন। সমগ্র মাল চলাচলের শতকরা ৪৫ ভাগ একমাত্র পূর্ব রেলপথে হয়। সুতরাং এখানে চাপ অত্যন্ত বেশী হইবে। যদি উত্তর রেলওয়ে সময়মত খালি ওয়াগন পাঠাইবার ও লরাইবার ব্যবস্থা না করিতে পারে তবে মাল চলাচলের যথেষ্ট অসুবিধা হইবে। মোগলসরাই টার্মিনাস স্টেশনরূপে এত খালি ওয়াগনের স্থান দিতে পারিবে না। সুতরাং উত্তর রেলপথের সামান্য গাফিলতির জন্য সমগ্র দেশের আর্থিক হ্রাসের সৃষ্টি হইবে। ইতিমধ্যেই পূর্ব রেলওয়ে অঞ্চলে করলা চলাচলে যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

রেলসচিব মহাশয় বলেন যে, পুনর্গঠন ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সরকার, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, এই অনুমোদন দেওয়া হইয়াছিল মূল পরিকল্পনাটিতে—আরেন্দার-রচিত প্রায়শঃ নহে। কলিকাতার প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, বেতনভোগী কর্মচারী, জনসাধারণ সকলেই এই নূতন ব্যবস্থার বিরোধিতা করিতেছেন এবং তাহারা সকলেই একটি নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট বিষয়টি পুনরালোচনার জন্য পাঠাইবার আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিছক প্রাদেশিকতার বশে, ভোটের জোরে, সমস্ত ভুক্ত-বিভুক্ত উপেক্ষা করিয়া রেল-বাজেট পাস করিয়া লইলেন।

বাংলার দাবি মানিয়া ফরকার রেল গ্রীক তৈয়ারী বীকার

করা হইয়াছে। বিহারের দাবি মানিয়া মোকামার আর একটি ব্রীক তৈয়ারী হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। যাহা হউক, গদার যত বেশী ব্রীক হয় ততই ভাল—এইরূপ ব্রীকের দরকারও যথেষ্ট আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রাধান্য দিতে হইবে ফরকার, কারণ এই পথ ব্যতীত আসামের সহিত যোগাযোগের অন্য পথ নাই এবং ফরকার বাঁধ ও লকহুজ খাল দিলে গদার মোগলসরাই পর্য্যন্ত গিয়া চলিবে। তাহা হইলে দেশবাসী লালবাহাদুর ও গোপালবাহাদুর চরম অধর-দণ্ডিতার অভিলাষ হইতে অংশতঃ মুক্তি পাইবে।

খাত্ত সমস্যা

গত ৬ই জুন এক বেতার বক্তৃতায় মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিলাক্ষাগোপালাচারী ঘোষণা করেন যে, মাদ্রাজ রাজ্যের সর্বত্র খাত্তশক্তির সরকারী রেশন-ব্যবস্থা অবিলম্বে স্থাপিত হইবে। তিনি বলেন, “বিশেষরূপে বিবেচনার পর আমরা একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিন্যাস করি; কেন্দ্রীয় খাত্তমন্ত্রীর সহিত এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়। এক্ষণে ভারত-সরকার এই পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা সড়ে সড়ে চলবে হইবে।”

তিনি বলেন যে, মাদ্রাজ রাজ্য ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত হইবে। প্রত্যেকটি অঞ্চলের সহিত এক বা দুইটি উন্নত জেলা জড়িয়া দেওয়া হইবে। উন্নত জেলাগুলি প্রকৃত বাজার মারফত সংলগ্ন বাটতি জেলাসমূহের প্রয়োজন মিটাইবে। এই সব অঞ্চলের মধ্যে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য ও খাত্তশক্তির আমদানী-রপ্তানী চলিবে।

তিনি স্পষ্টভাবে জানান যে, প্রকৃত বাজারে খাত্তশক্তির মূল্য অথবা কোন ক্ষেত্র বা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয়-যোগ্য চাউলের পরিমাণ সম্পর্কে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল থাকিবে না। তবে যাহাতে জনসাধারণকে আকস্মিক অসুবিধা ও দুর্গতি তোপ না করিতে হয় শুধুকে—প্রতি-বেধক ব্যবস্থা হিসাবে—গবর্ণমেণ্ট জাঘ্যমূল্যে খাদ্যশক্ত বিক্রয়ের দোকান মারফত খাত্তমূল্য ও বিক্রয় খাত্তের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

তিনি বলেন যে, বর্তমানে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সাত্বে চারি লক টন চাউল মজুত আছে, তাহা অল্পসী অবস্থার জন্য সংরক্ষিত হইবে। আগামী বৎসরে উন্নত জেলাগুলিতে সহজ পদ্ধতিতে দেড় লক টন খাদ্যশক্ত সংগ্রহ করা হইবে। কয়েকটি রেশনের দোকান খাত্তমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য জাঘ্য মারে খাত্তশক্ত বিক্রয়ের দোকান হিসাবে চালু থাকিবে। তাহা ছাড়া আমদানী গম এবং চিনিও অবাধে বিক্রয় করা হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সব সরবরাহ করিবেন এবং পাইকারী সমবার সমিতিসমূহের মারফত তাহা বিক্রয় করা হইবে।

তিনি বলেন যে, এক-একটি অঞ্চলের মধ্যে খাত্তশক্ত অবাধে আমদানী-নেওয়া চলিবে; কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পূর্ব প্রদত্ত অসুবিধা ছাড়া খাত্তশক্ত আমদানী-নেওয়া যাইবে না।

তিনি অতঃপর বলেন যে, জনসাধারণ যদি সন্তুষ্ট হয় এবং অপচয় না করে তাহা হইলে কুলাইয়া যাইবার মত প্রচুর খাদ্য দেশে আছে। তিনি সকলকে সংযত হইতে, লোভ পরিহার করিতে এবং সং, ধর্মভীরু ও স্বদেশপ্রেমিক হইতে অনুরোধ করেন।

ত্রিলাক্ষাগোপালাচারীর এই প্রচেষ্টা বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ মনের পরিচায়ক। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত জনসাধারণের মনে যে স্বস্তির ভাব ফিরাইয়া দিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা রাজ্যতীর সহিত একমত যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে দেশে খাত্তের বাটতি হইতে পারে না। রাজ্যতীর প্রচেষ্টা অচিরেই ফলপ্রসূ হউক ইহাই বাঞ্ছনীয়। সংবাদে প্রকাশ যে, ইতিমধ্যেই মাদ্রাজে খাত্ত-শস্যের মূল্য কমিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাদ্রাজে খাত্তাবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও খাত্তাতাব পরিলক্ষিত হয়। প্রদেশের বিভিন্ন জেলার স্থত্বিকের পূর্বীভাস দেখা দেয়। অবস্থা মাদ্রাজের মত তত সাংঘাতিক না হইলেও অচিরে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে অধরভবিষ্যতে যে ঐরূপ হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। মাদ্রাজ সরকার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। বাংলার খাত্ত সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত-সরকারের খাত্তমন্ত্রী মিঃ রফি আমের কিদোয়াই পশ্চিমবঙ্গের দুর্গত অঞ্চল সফরে আসেন। তাঁহার সফরের উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাজের ব্যবস্থা এখানে প্রবর্তন সম্ভবপর কিনা তাহা লক্ষ্য করা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন ও বাংলা-সরকারের সহিত আলোচনা আলোচনা করিয়া খাত্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। গত বৃহস্পতিবার কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব কিদোয়াই পশ্চিমবঙ্গের খাত্তমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলসমূহের অধিবাসীদের জন্য খাত্তশস্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলগুলিকে এইজন্য বেটনীদারা (বুর্ডন) রাজ্যের অভ্যন্তর অংশ হইতে পুথক করা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, কলিকাতার রেশন-ব্যবস্থার মারফত সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক লক টন চাউল দিবেন। তাহা ছাড়া বৃহত্তর কলিকাতার অধিবাসীদের জন্য সরকার মনোনীত দোকান মারফত তাহাদের চাহিদা অসুহারী চাউল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে

কেন্দ্রীয় সরকার আমদানীকৃত চাউল হইতে আরও এক লক্ষ টন চাউল সরবরাহ করিবেন। এই চাউল মণপ্রতি ত্রিশ টাকা হইতে বত্রিশ টাকা দরে বিক্রয় করা হইবে।

দ্বিতীয়তঃ জনাব কিম্বোয়াই বলেন যে, খাজা সরবরাহ ব্যাপারে রাজ্য সরকার এমন একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন যাহার ফলে বস্তৃতঃ পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্টাংশে খাজাশুলের ব্যাপারে বিনিয়োগ ব্যবস্থাই বলবৎ হইবে। দুর্গত অঞ্চলে হুঃ অধিবাসীদের কষ্ট লাঘবের জন্য সরকারী মজুত চাউল সরকার-মোনীত দোকান হইতে ১৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হইবে। প্রোকিউরমেন্টের জন্য সরকার হইতে লেডি প্রকার প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে যে কৃষক পনর একর ক্রমি চাষ করিবে তাহার নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে উপর শস্যের একাংশ সংগৃহীত হইবে। অবশেষে খাজমন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বিভিন্ন জেলার মধ্যে কর্ডন ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইবে।

মাস্ত্রাজে রাজাকীর ম্যার আমরাও মনে করি যে, বাংলাদেশে খাজের বাটতি নাই। কতকগুলি মুন্সিফাখোর কৌতদার ও আড়ম্বারের পাল্লায় পড়িয়া, দেশে এক কৃত্রিম খাজা-ভাবে স্বষ্টি করিয়া মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে মাত্র। সরকারের প্রোকিউরমেন্ট ব্যবস্থা, ক্রটিপূর্ণ কর্ডন ব্যবস্থা ও কতকগুলি হুঃ লোকের লোকের ফলেই বাংলাদেশে খাজের আজ এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

খাজ সমস্যার কোন প্রকার প্রতিকার করিতে হইলে এই প্রোকিউরমেন্ট ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। বিভিন্ন জেলাগুলিকে বাড়তি ও বাটতি অঞ্চল বলিয়া যে ভাবে ভাগ করা হইয়াছে তাহার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এভাবে পরিবর্তন করিয়া আমাদের এখানেও মাস্ত্রাজের মত সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা দরকার। তারপর সেখানে সরকারের অহুমোদিত ব্যবস্থা মত 'কেয়ার প্রাইস' দোকান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই দোকান মারফত সমস্ত খাজ বিলি করা যাইবে। গরীবেরা এই দোকানের সুবিধা পাইবে। চাউলের বরাদ্দ সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যতা না থাকিলে এবং ইচ্ছাকৃত ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে রেশনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। অপর পক্ষে প্রাদেশিক কর্ডন কড়া করিয়া অন্য সকল কর্ডন তুলিয়া দিলে প্রদেশের সর্বত্র চাউলের স্বাভাবিক বেচাকেনা আরম্ভ হইবে। তাহাতে চাউলের দর কোথাও উঃ কোথাও নীচু না থাকিয়া সর্বত্র একটি অঙ্কে আসিয়া স্থির হইবে।

শিক্ষার্থীর কর্তব্য

সম্প্রতি হাওয়া যুব-মাত্র-কংগ্রেস-সভার সভাপতি অধ্যাপক ক্রীষ্ণনীতিসুন্দর চট্টোপাধ্যায় যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা

সমস্তর ঠিক মধ্যস্থানটিতে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। অধ্যাপক মহাশয় বলেন :

“যুবাংলা বা ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া মানুষ এক ভীষণ অবস্থার মধ্যে দিয়া চলিয়াছে। মানুষের কর্তব্য কি, কি ভাবে জীবনে সুখ-শান্তি কিরিয়া আসে, সে বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ এখন আমাদের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিতেছে। পৃথিবীর শক্তিশালী জাতির মানুষেরা এখন একাত্মিক দল বা গোষ্ঠিতে বিভক্ত। আমাদের দেশের মধ্যেও নানা রাজনীতিক, অর্থনীতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দল বিভ্রম। এই সকল দলের লোকেরা দেশের যুব-শক্তিকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হাজ ও যুবকগণ দিগ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। সকলের মনের মধ্যে এই প্রশ্ন—পথ কোথায়? কোন্ পথ?

“হাজ ও যুবকগণই দেশের আশাশ্রয়। কারণ, ভবিষ্যৎ তাহাদের লইয়াই। আজ তাহারা যে ভাবের ভাবুক এবং যে কর্মধারার ধারক, কাল সেই ভাব আর কর্মধারার ভিত্তিতেই জাতি এবং তাহার কার্যকারিতা ও শক্তি অথবা তাহাদের বিপরীত গড়িয়া উঠিবে।

“দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন কেহই থাকিতে পারে না। দেশের অর্থাৎ দেশের জনগণের কল্যাণ চিন্তা করা, মদলসাধন করা সকলেরই প্রধান কর্তব্য। কোন্ পথে এই কল্যাণ আসিতে পারে, যথার্থ মদল সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। বিশেষ ভাবে তাহা জ্ঞান ও ধর্ম, বিচার ও চিন্তাশীলপেক। অভিজ্ঞতাও ইহাতে বিশেষভাবে অপেক্ষিত।

“হাজজীবনের ও যুবজীবনের আদর্শ কি? আমাদের দেশের মনীষীরা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, পাপ আর কিছুই নয়, পাপ হইতেছে অজ্ঞান। ‘অজ্ঞানং পাতকং মহং’। মানুষ অজ্ঞান করে, ন্যাকার জ্ঞান তাহার নাই, এই জটিল।

“ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাই হাজদের প্রধান কর্তব্য হইতেছে—জ্ঞানার্জন করা। ‘ম হি জ্ঞানেন সদ্গুণং পবিজ্জমিহ বিত্ততে।’ অভিজ্ঞ হইয়া হাজ-জীবনে জ্ঞানের সাধনা করাই হাজের কর্তব্যসাধন। এই জ্ঞানকে সর্বতোমুখী করিতে হইবে। হাজজীবনের পরিপূর্ণতার জন্ত দম, ভ্রাপ ও অপ্রমাদ, এই তিনটি সদ্গুণ বা বৃত্তি অপরিহার্য। এই ভীষণ প্রমাদ-কালে যেন অপ্রমাদ বজায় থাকে।

“মানুষের জগতের সব কিম্বদীপ্তি নিজ অধিকারে জ্ঞান বিচার করিয়া, তাহার মধ্যে যাহা শাস্ত, যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাকে আত্মসাৎ করিবার প্রয়াসই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির প্রকাশ হয়—মানুষে মানুষে পরস্পরের মধ্যে কি ভাবে ব্যবহার করিবে, তাহাতে। হাজদের চরিত্রনীতি হিসাবে কতকগুলি কথা বলিতে চাহি—সব ব্যাপারে বুদ্ধি, বিচার,

বিবেক বাটাও, মিছেকে জান, পরকে আপন কর, পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইও না, অপরের শ্রমের মূল্য না দিয়া নিজের সুবিধা করিও না।

“আর একটি কথা—ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া নিজের সত্য হারাইও না।

“মাহুষের মধ্যে মানব-সামান্যতা আছে, আবার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও আছে, দুইটিই মূল্যবান। একটিকে হারাইলে, জীবনে খোঁড়াইরা চলিতে হয়।

“জাতীয়তাবাদ মাহুষকে আত্মত্যাগে ও জনসেবার উদ্বুদ্ধ করে, দেশরক্ষার প্রেরণা দিতে পারে। এই জাতীয়তাবাদ যদি অজ্ঞ অহংকার বা আত্মসন্ত্রস্তি-প্রবৃত্ত হয়, অজ্ঞ জাতির প্রতি অবজ্ঞা যদি ইহার মূল হয়, তাহা জগতের পক্ষে বিপজ্জনক হয়।

“আমি ৩৮ বৎসর ধরিয়া শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার সজীবতম আত্মরিক প্রার্থনা, আমাদের যুবশক্তি প্রাণবন্ত হউক, কল্যাণের উৎস হউক।”

জাতীয়তাবাদ প্রার্থনা দেশের যুব-শ্রেণীকে অকল্যাণের পথ হইতে সংপথে পরিচালিত করুক।

বালুরঘাট কলেজ

নিম্নোক্ত মন্তব্যটি “আজেরী” মাসিক পত্রিকার ১৩৫৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সম্পাদকীয় মন্তব্যটির সারবত্তা স্বীকার করি।

“নব-প্রতিষ্ঠিত বালুরঘাট কলেজ বালুরঘাট জনসাধারণের একমিষ্ট কর্ম, সাধনা ও আত্মত্যাগে গতিলা উঠিয়াছে। ১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লবে বালুরঘাটের জনসাধারণের নিকট হইতে যে পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়, তাহার একটি বৃহৎ অংশ বালুরঘাট কলেজ লাভ করিয়াছে। কলেজটি গঠনের যুগে শহরের বিভাগসাহী কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি অবৈতনিক অধ্যাপনার কার্য এবং অধ্যক্ষের কার্য পরিচালনা করিয়া অকুণ্ঠভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন। কলেজের ক্ষুদ্রপূর্ব সম্পাদক কলেজের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাদের ত্যাগের ইতিহাস বালুরঘাটনিবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে।

“পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজটিকে ডিমপাসার্স পরিকল্পনার মধ্যে গ্রহণ করার কলেজের বিজ্ঞান বিভাগেরও আশাতীত উন্নতি হইয়াছে।

“আমরা কলেজটির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। তবে ইহার পরিচালনার কোনরূপ জটিল-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হইলে তাহা সংশোধনের নিমিত্ত ও জনস্বার্থের স্বার্থে আলোচনা করা কর্তব্য মনে করি।

“গণস্বার্থের প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণকল্পে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কলেজ পরিচালন ব্যাপারে নিরন্তরতার সামান্ততম শৈথিল্য ও ব্যতিক্রম যে কোন মুহূর্তে মহা অমর্থ ঘটাইতে পারে এবং ঘোটখাটো নিয়মতন্ত্রের উৎসাহ ও মজির পরিশেষে বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।

“বালুরঘাট কলেজে সাহায্যে বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে কলেজের একটি সাম্প্রতিক ঘটনা জনসাধারণের গোচরীভূত করা কর্তব্য মনে করিতেছি। ঘটনাটি বালুরঘাট কলেজে ঘটতে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত ও হঃষিত হইয়াছি। বালুরঘাট কলেজের গঠনতন্ত্র এমনভাবেই বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, জনপ্রতিনিধি মারকত জনসাধারণের বক্তব্য পেশ করিবার কোন ব্যবস্থাই রাখা হয় নাই। তবে মন্দের ভাল, জনসাধারণের মধ্য হইতে মাত্র দুই জন বিভাগসাহী ব্যক্তিকে কার্যকরী সমিতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণের ভোট দ্বারা সদস্য নির্বাচিত (co-opt) করিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তহুজ্ঞে জানিতে পারিলাম, কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ মহাশয় কার্যকরী সমিতির সভায় সদস্য নির্বাচনের সিদ্ধান্তের (co-opt-এর) অপেক্ষা না করিয়া পূর্বেই দুই তালুককে গ্রহণ করিয়া ‘কনফারেন্স’ লইবার জন্ত কার্যকরী সমিতির সভায় উপস্থিত করাইয়াছেন।...”

লোকশিক্ষা

“গল্পভারতী”র গত বৈশাখ সংখ্যায় ত্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার উপরোক্ত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

সত্যেন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধে আক্ষেপ আছে; সোভিয়েট ইউনিয়নের গণশিক্ষার উন্নতির বর্ণনা আছে; স্বামী বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। স্বামীজীর দিগ্‌দর্শন যে এই বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবহার নির্দেশ দিয়াছিল; তাহা অজানা নয়। তবুও ৫০ বৎসরের মধ্যে আমরা বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই তাহাও সত্য। সত্যেন্দ্র-বাবু সাহা বলিয়াছেন, তদপেক্ষা কঠিন ভাষার রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে আমাদের শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি আপনি মাষ্টার সাজিয়া সকলকে শিক্ষাভ্রমে আত্মনা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, কবি, সংগঠক, সাংবাদিক। আমরা কেবল সাংবাদিকতা লইয়াই পড়িয়া আছি। অবশ্য সংবাদপত্রসেবীও পরোক্ষে গণশিক্ষক। কিন্তু একাধারে শিক্ষা ও কূটরাষ্ট্রনীতি চলে না। সে অভিজ্ঞতা উন্নিচাদ ও তাহার পরবর্তী দেড় শতাব্দীর ভারত-ভাগ্যনিয়ন্তা, দেশী ও বিদেশী ভাগ্যদেবীস্বরূপ, আমাদের দিয়া গিয়াছে। ‘বিলাতী সাহেব’ সাজিয়া আমরা ভারতভূমিকে রক্ত করিয়াছিলাম, রুশীয় “টোতারিস” সাজিতে গিয়া কোথায় চলিয়াছি?

ডাক ও তার বিভাগের পুনর্বিবাস

ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ কলিকাতায়

পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ কলিকাতা হইতে তুলিয়া জব্বলপুর ও বাদ্দালোরে স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তহুই জানিতে পারা গিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে আলীপুর ওয়ার্কশপের পাঁচ সহস্র কর্মচারীর চাকুরী লইয়া চীনাটানি অরু হইবে।

আলীপুরের ডাক ও তার বিভাগীয় কারখানা সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ ঐ জাতীয় কারখানা। টেলিকোম ও টেলিগ্রাফের যাবতীয় 'কলকজ' এখানে প্রস্তুত হয়। সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে এশিয়ার সর্ববৃহৎ কারখানাটি একটি মামুলী কারখানায় পরিণত হইবে।

দক্ষিণ কলিকাতায় আলীপুর অঞ্চলে ২৪৮নং লোহার সাকুলার বোডে এই বিরাট কারখানাটি অবস্থিত। এই কারখানাটির মধ্যে সর্কাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ। প্রায় আড়াই হাজার ব্যক্তি এখানে কাজ করে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের ছোট-বড় যন্ত্রাদি এখানে প্রস্তুত হয়।

তৈরী যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হয় গোস্ হইতে। এই গোস্ও দেড় হাজার ব্যক্তি কাজ করে।

ইহার পর আছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-ইম-চীফের অফিস—এখানকার কর্মচারীর সংখ্যা দেড় শত। এখানে তৈরী যন্ত্রাদি পরীক্ষা করা হয়।

টেলিগ্রাফ গোস্‌র চীফ কন্ট্রোলারের অফিসের কর্মচারী-সংখ্যা দুই শত। আঁরা, জব্বলপুর, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের গোস্‌র রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এই অফিস হইতে। ভারতের সকল ডাক ও তার বিভাগীয় গোস্‌র ইহাই হইল হেড কোয়ার্টার।

পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপসমূহের জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের কর্মচারী সংখ্যা দুই শতাধিক। এই অফিস সকল ডাক ও তার বিভাগীয় কারখানার রক্ষণাবেক্ষণ করে। একাউন্টস অফিসের কর্মচারীর সংখ্যাও শতাধিক।

সরকার যে নতুন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে এই সর্ববৃহৎ কারখানাটিকে শুধুমাত্র কলিকাতার উপযোগী যন্ত্রাদি সরবরাহ করিতে হইবে। এই নতুন ব্যবস্থাসমূহের কারখানার নির্মাণ বিভাগ (কনস্ট্রাকশন ব্রাঞ্চ) সম্পূর্ণ উঠিয়া যাইবে এবং যন্ত্র বিভাগ (ইনস্ট্রুমেন্ট ব্রাঞ্চ) আরও ছোট করিয়া বাকীটিকে বাদ্দালোরে পাঠান হইবে। বাদ্দালোরে ইংরেজ মালিকের অর্ধে পুণ্ডিভিয়ান টেলিগ্রাফ ইন্সটিটিউট খোলা হইয়াছে। অতঃপর যন্ত্রাদি নির্মাণের দায়িত্ব ইহার উপর দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত সরকার আলীপুরস্থ গোস্‌টি যথাসম্ভব ছোট করিয়া আসাম ও উত্তর বাংলার কার্যের জন্য কাটিহার (বিহার) এবং দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বাদ্দালোরে দুইটি ডিপো স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কারখানা এবং গোস্‌ উঠিয়া যাওয়ার ফলে অত্যন্ত অফিস-খালিও কম্বশ: উঠিয়া যাইবে। ফলে রেলওয়ে পুনর্গঠন প্রস্তাবের দক্ষম যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ উদ্ভেদনাপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইবে। আলীপুরের প্রমিকমহলে ইতিমধ্যেই রীতিমত বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। এই বিবরণটি পাঠ করিয়া একটা কথা মনে হয়। 'নাই কাজ তো খই ভাক'। এই পরিবর্তনের পক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি আছে, তৎসম্বন্ধে একটা সরকারী বিবৃতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। জব্বলপুর ও উজ্জয়িনী মগরীর সন্নিকটস্থ অঞ্চলে ভারতবর্ষের রাজধানী স্থাপিত করা হউক, এমন প্রস্তাবও বিধান পরিষদে করা হইয়াছে। কংগ্রেসের চাই ও ভাহাদের চেলা ও চাটুকার-বর্গের পোষকের জন্য চাকরী ও কাজ তো প্রয়োজন।

কৃষক-মজুর

সেদিন কলেক্টর কোয়ার্টেটস হলে কবি ত্রিবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় কৃষক-মজুর শ্রেণীর হুঃখে কবিত্বনোচিত ভাবাবেগে অতিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমরা সকলেই তাহাদের শোষণ করিতেছি। কবিরা বা চারপেয়া তাহাদের শোষণ করেন কিনা, সেই প্রশ্ন তাহাকে সেই সময়ে কেহই করেন নাই।

আজকাল কৃষক-চাষীর জন্য ক্রন্দন ও কুন্তীরাশ্রুপাত এক শ্রেণীর লোকের বাধাগণ দাঁড়াইয়াছে। অথচ বর্তমানে আমরা মালিক-চাষী এবং মজুর তাহাদের জীবনযাত্রা অনেক সুগম করিয়াছে ও জীবিকার মান উর্দ্ধমুখী হইয়াছে। মরিভেছে সেই মধ্যবিত্ত, যেসারা জগতে সমাজের উন্নয়ন করিয়াছে। মানবজগতের সকল উন্নয়ন, সকল স্বাভাবিকমুখী প্রয়াসের ফলে রহিয়াছে এই মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তার দ্বারা, শোণিত তর্পণ। আজ শোষিত নিষ্পেষিত সেই-ই।

কবি বিজয়লাল রবী রঙ্গার ভক্ত। সেই জন্ত তাহাকে ক্রেমায় বোর্ট-এ বর্ণিত কৃষক-প্রকৃতির স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। "যখন কৃষক কোন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তখন সে কেবলই অভিযোগ করিয়া থাকে; ইহা তাহাদের অত্যাগে দাঁড়াইয়াছে। এই অত্যাগের একমাত্র কারণ মনে হয় যে, সে ভয় করে যে হয়ত তাহার নিকট কোন সংকার্যে দেয় টাকার জন্য হাত পাড়া হইবে।"

এই মনোভাবের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করা যায়। তাহার পক্ষে যুক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু এখানে সে চেষ্টা করিব না। কৃষকের প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন বিদেশী সাহিত্য-রচী ও চিন্তানারক কি বলেন, তাহা সাধারণ পাঠকগণকে জানাইয়া দিলাম, বাহাতে তাহার বাধ্যতাবিচারে সমর্থ হইতে পারেন।

জাপানের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব লাভ

যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সহিত আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ অবসান করিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছে।

বলকালস্থায়ী একটি অস্থানের পর ২০শে বৈশাখ জাপ-শান্তিচুক্তি কার্যকরী করা হয়। ইহার ফলে জাপানে যি-পক্ষীয় দর্শন শেষ হইল ও জাপান পূর্ণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইল।

চুক্তি বলবৎ হওয়ার দ্বিতীয় মহাসমরের অবসান ঘোষণা করা হইল।

জাপান এবং জাপ-শান্তিচুক্তি অমুমোদনকারী ৩৮টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই অস্থানে যোগদান করেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ভবনের বাদশ ভলে অবস্থিত সম্মেলন-কক্ষে এই অস্থান সম্পন্ন হয়। মিঃ একিসন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের স্বাক্ষরযুক্ত চুক্তিপত্রের একটি কপি অস্থানে উপস্থাপিত করেন। এই অস্থানে জাপ-মার্কিন দেশরক্ষা চুক্তিও কার্যকরী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

অপর যে আটটি রাষ্ট্র জাপ-শান্তিচুক্তি অমুমোদন করিয়াছে, সেগুলি হইল- পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, মেক্সিকো নিউজিল্যান্ড, সিংহল এবং যুক্তরাষ্ট্র।

সামুদ্রাঙ্গিলকো সম্মেলনে চুক্তিতে স্বাক্ষরদানকারী আরও ৩৮টি রাষ্ট্র তাহাদের অমুমোদন ব্যবস্থা শেষ করিলে ঐ রাষ্ট্রগুলির ব্যাপারে এই চুক্তি কার্যকরী হইবে।

জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাপানে অবস্থিত বাইল্যান্ডের প্রতিনিধির সহিত একটি বোট বিনিময় করেন। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, প্রাক্তন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ হার্বার্ট মরিসন বলেন যে, উদারনীতির ভিত্তিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ইহার ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে জাপান মনোজ্ঞ লাভ করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

টোকিওর খবরে প্রকাশ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দিনেই জাপানে ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে বিনা ভাডায় ট্রেন ভ্রমণের সুবিধা দিতে অস্বীকার করা হয়। কারণ বলা হয় যে, কমনওয়েলথ বাহিনীকে এ ব্যবস্থা জাপানে যে সকল সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহার যেহেতু বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। রেল-কর্তৃপক্ষ বলেন যে, ভবিষ্যতে কি ব্যবস্থা করা হইবে তাহা অজ্ঞাত থাকায় তাহার সৈন্যদিগকে আর বিনা পয়সার টিকেট দিবে না।

জাপান স্বাধীন হইলেও জাপ-মার্কিন দেশরক্ষা চুক্তি অমুসারে মার্কিন সৈন্য অবস্থান করিবে। কিন্তু বিংশতম শতাব্দীর প্রকাশ ইদ-জাপান চুক্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী শিগেমু যোশিদা জাপানের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বলেন যে, এখন হইতে সম্ভাব্য কমুনিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে জাপানকে তাহার নিজ জাতীয় সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইবে।

বিশেষ এক সরকারী বিবৃতি প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী আরও

বলেন: “নিরাপত্তা চুক্তিবলে এ বিষয়ে আমেরিকাকে অমুরোধ জানাইয়াছি। কিন্তু এই নিরাপত্তা চুক্তিও অনির্দিষ্ট কালের জন্য নহে।”

“অম্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত সম্মিলিতভাবে বাহাতে আমরা বিধে শান্তি স্থাপন করিতে পারি, তাহার জন্য আমরা দিগকে ধীরে ধীরে আমাদের শক্তি ও দেশরক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।”

জাতির প্রতি এক আবেদন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন: “আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি, এখন আমরা মুক্ত। কিন্তু এখন আমাদের এমন ভাবে কাজ করিয়া যাইতে হইবে, বাহাতে আমরা একটি উন্নতিশীল নয়া জাপানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গর্ববোধ করিতে পারি।”

জাপানের স্বাধীনতা এশিয়ার কাম্য। কমুনিজমের প্রসার দমন করিতে জাপান যেমন সক্ষম, এশিয়ার কোন রাষ্ট্র তত নয়।

ডন-ভল্গা নদীর সংযোগ

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরাট পরিকল্পনামুহু অপরূপ সাফল্য-লাভ করিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই এবং খাতের উপাদান ও শিল্পকার্য বিস্তার সম্বন্ধে যে-সব হিসাবের কথা বলা হয়, তাহার মধ্যে, অত্যাশ্চর্য্য হান থাকিলেও, বাদসাদ দিয়া যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও বিশ্বাসকর। এই সব পরিকল্পনার মধ্যে ডন-ভল্গা নদীর সংযোগসাধন অত্যন্তম।

কলিকাতা কমুনিষ্ট দৈনিক “স্বাধীনতা”র লণ্ডন মগরীস্থ সংবাদদাতা গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

“সোভিয়েৎ ইউনিয়নে যুদ্ধোত্তর যুগে যে পাঁচটি বিশাল গঠনকার্যের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, আজ তাহার একটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ডন ও ভল্গা, এই দুইটি বিরাট নদীর মধ্যে সংযোগ সাধিত হওয়ার বাণ্টিক হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত এক বিশাল জলপথ উন্মুক্ত হইল। এই জলপথ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে সোভিয়েৎ ইউনিয়নে পঞ্চ-সমুদ্রের সংযোগ সাধিত হইল। এখন হইতে বাণ্টিক সাগর, ব্লেডসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, আজত সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ অনায়াসে চলাচল করিতে পারিবে।

যে খালের মারফত ডন ও ভল্গা যুক্ত হইয়াছে সেই খালের খননকার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ১৯৫৭ সালে এই খাল আরম্ভ সমুদ্রের সহিত যুক্ত হইবে। সারা জগতের মধ্যে দীর্ঘতম এই খাল আরম্ভ ও আয়ুর্দায়ার জলরাশিকে কাস্পিয়ান সাগরের নিকটবর্তী করিবে। মূল খাল হইতে ছোট ছোট যে সমস্ত খাল কাটা হইয়াছে সেগুলির দ্বারা ১৯৫২ সালে ১ লক্ষ হেক্টর তৃণ-ভূমিতে সেচকার্য চলিবে। আগামী আরও ৪ বছরের মধ্যে এই সকল খালের জল বণ্টনের

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে মোট লাভে লাভ লক্ষ হেউর কমিতে সেচ কার্য সম্পন্ন হইবে।”

আজ কত বৎসর হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত জম্মার চলাচলের সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিবার পরিকল্পনা সরকারের দপ্তরে চাপা আছে। অপেক্ষারও একটি সীমা আছে।

সমাজে মুসলিম রমণীর স্থান

এই বিষয় লইয়া সংবাদপত্রে নানারূপ আলোচনা চলিতেছে। এই তর্ক-বিতর্ক শেষ হইবে না, যত দিন না মুসলিম-সমাজ, মোলানা মোলবী বর্তমান যুগের চিন্তার গতি বৃত্তিতে পারিবে ও উদযুগী সমাজ-বিভাগের সমন্বয়পন্থী পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে। এই বিষয়ে প্রায় ১৪ বৎসর পূর্বে কলিকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকের স্তম্ভে যে পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল তার আভাস এখানে দিতেছি :

যুক্তপ্রদেশের সত্য জনার কাজামি বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা সম্বন্ধে একটি আইন প্রবর্তন করেন। তদুপলক্ষে ‘এক জন মুসলিম মহিলা’ এই ছদ্মনামে পত্রখানি প্রকাশিত হয়।

“জমাব কাজামি বহু বিবাহ সম্বন্ধে কোন বিধানের উল্লেখ করেন নাই। অল্প বয়সে অবলম্বন করা সম্বন্ধে একটি বিধান ছিল। মুসলিম মহিলা এই বিধানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।” জমাব কাজামি বর্তমান লোকসভার সভ্য। তাঁহার রক্ষণশীল মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটনায়ে কিনা জানি না। তবে তিনি যে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের কাজি-প্রথা-যুগী কাছিশেগী মুসলিম বিবাহের নিয়ম ছিলেন—নিজের অধিকার হরণ করার কালে মুসলিম সমাজ তারতবর্ষকে দার-উল-হারব (শুক্রপুত্রী) বলিয়া মনে করিত, তাহা নিঃসঙ্কোচে কিছু পূর্বে তিনি ব্যক্ত করেন। দার-উল-হারব, দার-উল-আম্ন (বন্ধুর বাসস্থান) প্রভৃতি তত্ত্ব মুসলিম সমাজের মজাগত সংস্কার।”

“একতাবোধই জাতীয়তাবাদের আসল বুনিয়াদ”

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় অর্থসচিব মোহাম্মদ আলী গভ ২১শে বৈশাখ সরকারী কর্মচারীদেরকে পাকিস্তানের স্বয়ত্ত্বের জন্য সর্বপ্রযত্নে কর্তব্য করিতে অহ্বোধ করেন। তিনি বলেন, “পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বীহার দেশের সেবা করার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, সেই কর্মচারীদের উপর বিশেষ দায়িত্ব আছে। কারণ তাহারা এখন যে পথ প্রদর্শন করিবেন তাহাদের বংশধরগণ কার্যতঃ তাহাই অনুসরণ করিবে।

“এক্যের মনোভাব গভিরা তোলা সরকারী কর্মচারীদেরই একান্ত কর্তব্য। যত প্রকার উপাদান লইয়া জাতি গঠিত হউক না কেন, একতাবোধই জাতীয়তার মূল আদর্শ। তিনি আরও বলেন যে, সরকারী কর্মচারীদের যে অঞ্চলেরই হউক না কেন, উত্তর পাকিস্তানে তাহাদের সমান অধিকার রহিয়াছে। তাহাদের কেহই বিশেষ সুবিধা দাবী করিতে পারেন না।

পারিহামের উন্নতির জন্য রোগ্যভার সহিত অবিরাম কাজ করিয়া বাইতে হইবে এবং সেখানে ব্যক্তিগত উন্নতিকে প্রাধান্য দিলে চলিবে না। কারণ সরকারী কর্মচারীদের মোটাটুটিভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহা দরিদ্র কৃষকদের নিকট হইতেই আদায় করা হয়। সুতরাং আপনাদের নিকট অবিরাম কাজ আশা করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে।”

এই নীতিকথার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু মুসলিম সমাজ ‘অবিভক্ত’ নয়। তার প্রমাণ দিয়াছেন পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন মোলবী মোলানা। তাঁরা কতোটা জারী করিয়াছেন যে ‘কাদিয়ানীরা’—পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জাকিরউল্লা খাঁর স্বঘোষিত—‘মুসলিম’ নয়, তাঁদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত করা হউক।

বাংলার কাঁথা শিল্প

২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের “লোকসেবক” (দৈনিক) পত্রিকার স্তম্ভে ত্রিপুরেশ সিংহ রায় একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম :

“আজ সভাই ছুঃখ হয় যে, আমাদের আগের দিদিমা বা ঠাকুরমাদের বলিতে বলিতে কত বীরত্বপূর্ণ গল্প বা কত রহস্যময় ঘটনা ছিল, তার বহলে আজকাল দিদিমা বা ঠাকুরমাদের বলিতে আছে শুধু ত্যানিটি ব্যাগ বা পাউডার ও লিপস্টিক। এর চেয়ে আর কি ছুঃখের হতে পারে।

“আজ অপব্যবহারের জন্য দেশে কত মহৎ শিল্প চলেছে যত্নের পথে। বাংলার মা-বোনেরা সামান্য কয়েক খণ্ড ছেড়া নেকড়া দিয়ে তার গায়ে কত বিচিত্র রঙের সূতা দিয়ে কত কি কণা, ছবি, হুতা, বস্ত্রের কাহিনী লামাত সূতা দিয়ে হাজার টাকার শাল বা চাদরকে হার মানিয়ে দিতে পারত। হয় আজ আমাদের সেই কুটিরশিল্প কোথায় চলেছে ?

“এই বিংশ শতাব্দীতে যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব, তিনি আরম্ভ করেছিলেন দেশের কুটিরশিল্পকে রক্ষা করতে। মহাত্মা গান্ধী প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন দেশে কুটিরশিল্পকে বাঁচাবার জন্য। দেশের কুটিরশিল্প বীরে বীরে যত্নের পথে চলছিল, তিনি দেখেছিলেন যদি আমার দেশে জাতীয় শিল্প মরে যায় তবে আমাদের জাতীয় কৃষ্টি মরে যাবে।

“প্রাচীন কালে এত সুন্দর কাঁথা তৈরি করে গেছে আমাদের মা-বোনেরা তা যদি আমরা অহুগ্রহ করে যাচ্ছরে গিরে দেখি তবে আশ্চর্য হয়ে যাব, যার কাছে কান্দীরী শাল হার মানে। কান্দীরী শাল হ’ল ভাল ভাল পশমের কাপড়ের উপর আর আমার কাঁথা হ’ল আমাদের ব্যবহারের পর কেলে দেওয়া অল্প দামের সূতার কাপড়। তার উপর এই সামান্য দরের বা কেলে দেওয়া পাড়ের সূতার কত সুন্দর নক্সা করে দেশে একটা নতুন জাতীয় শিল্পের সৃষ্টি করে গেছেন।”

নীলপুর ও সদগোপ সমাজ

বর্ধমান হইতে প্রকাশিত “আর্য্য” (সাপ্তাহিক) পত্রিকার ১লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার নিম্নোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে।
রাজা-ভূমি প্রাচীন বঙ্গের অত্যন্ত গীঠস্থান। প্রতি জেলা ও মহকুমার সংবাদপত্র যদি “আর্য্য” পত্রিকার উদাহরণ অনুসরণ করেন, তবে বাঙালীর ইতিহাসের অনেক মালমশলা সংগৃহীত হইতে পারে :

“নীলপুরের বিখ্যাত কাহিনীর বিবরণ দিতে গিয়ে মনে পড়ে যায় গোপ-সাত্বাত্যের কীর্তিকথা।

“এখনকার মুসলমান ও উচ্চাঙ্গ অধ্যুষিত নীলপুর একদা রাজা কালী ঘোষের সাত্বাত্যভূমি ছিল। কালী ঘোষ জাতিতে ছিলেন সদগোপ। এ সম্পর্কে আবার একমতের মত তির। তাঁরা বলেন : কালু ঘোষ নীলপুরের রাজা ছিলেন। তিনি জাতিতে গোয়াল। কিন্তু এ মত তাঁরা টকিয়ে রাখতে পারেন নি। বর্ধমান বর্ধমান নগরী ছিল কালী ঘোষের আবাসভূমি, আর নীলপুর ছিল তাঁর রাজধানী। আর এক মতে জানা যায়, নীলপুরে কালী ঘোষের দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ ছিল। কালী ঘোষের বহু পরে বর্ধমান রাজ বংশের উদ্ভব।

“১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে ‘বর্ধমান’ের মাসিক গাজুলী লিখেছেন :

কালিদাস রাজা বর্ধমানে বস

যুগরা করিরা যায় কালিদাস নৃপতি।

“‘বর্ধমান’ চারশো বছর পূর্বের। সমগ্র বর্ধমান একদিন গোপ জাতির শালনাথিকারে ছিল। মুসলমান রাজত্বের পর বর্ধমান রাজবংশ বর্ধমানের শাসক হন। নীলপুর যে শৌর্য্য-বীর্ধ্য ও পরাক্রমের কেন্দ্রভূমি ছিল, তার নিদর্শন কালি ঘোষের স্থিতি। বিক্ষিপ্ত ও ভাঙ্গা ইটের ভূপ দেবে অসুস্থ মান করা যেতে পারে : একদিন হিন্দু শাসন ঘুচে গিয়ে বর্ধমানে মুসলমান শক্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আর কালিদাস ঘোষ যে মুসলমান শক্তির অনেক আগেই নীলপুরের অধীশ্বর ছিলেন এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নাই।

রাজা কালি ঘোষ তাঁর স্ত্রীগণ ও বিমলা—হুঁম্বের বিয়ে দেন ময়নার রাজা লাউসেন কোঙারের সঙ্গে। লাউসেন, ইছাই ঘোষ, তলুপদ ও বর্ধপাল কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন।

“নীলপুরের ঘোষ বংশ সদগোপ সমাজের বিখ্যাত বংশ। আইন-ই-আকবরী ও ফরিস্তায় নীলপুরের উল্লেখ রয়েছে। অনেকের ধারণা : বর্ধমান কালী রাজার পত্নী রাজা কালিদাসের স্থতিচিহ্ন। কিম্বদন্তী আছে, নীলপুরে নীলামদ নামে এক সদগোপ ছিলেন। ইনি কালীভক্ত হওয়ার কালিদাস নামে খ্যাত হন।

মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজবংশের আদিরাজ লক্ষণ সিং-এর আদি বাসভূমি নীলপুর। মাসিক গাজুলীর সময় অর্থাৎ ৪০০

বছর আগে নীলপুরবংশ বঙ্গোরে ছিল কিন্তু বনভ্রামের সময়ে এ বংশের ঐতিহাসিক গৌরব কীর্তমান হয়ে পড়ে।

নীলপুর এখন জঙ্গলাকীর্ণ—ভাঙ্গা শিব মন্দির, দেবস্থান আর নীলামদের প্রাসাদ আজ লোকচক্ষুর অগোচরে রয়েছে। শিবমন্দিরগুলো রাজা কালিদাসের শিব উপাসনার নিদর্শন। এরূপ ভ্রমপ্রবাদ যে, কালিদাসের সময় বাংলায় বর্ম্মঠাকুরের পূজা ও বৈষ্ণববর্ম্ম প্রচারের স্রষ্টাপাত হয় নি।”

মার্কিনগণতন্ত্র ও জাতীয়তার মূলমন্ত্র

“আমরা বিশ্বাস করি : সকল মানুষ সমান, সকল মানুষেরই স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবনযাপনের কতকগুলি ক্ষমগত অধিকার রয়েছে, আর এই সকল অধিকার অস্বল্প রাখার ক্ষেত্রেই মানব-সমাজে সরকারের প্রতিষ্ঠা। শাসনাধীন মানুষের সম্পত্তির উপরই সরকারের ক্ষমতা নির্ভরশীল।”

“জেকসন বলিভেন, ‘মানুষের মনের উপর সকলের স্বৈচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে চির-শত্রুতার শপথই আমি গ্রহণ করেছি।’ কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ থেকে যুগ্ম পূর্বদিক পর্য্যন্ত তিনি এ কথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করেছেন। স্বৈচ্ছাচারিতার সঙ্গে আত্মজীবন সংগ্রাম করে জেকসন গণতন্ত্রের তিৎ গড়ে গিয়েছেন। বস্তুতঃ জেকসনই আধুনিক গণতন্ত্রের প্রধান স্থাপরিতা। এর আগেও যে মানুষের গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না, তা নয়। তবে সে ধারণা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট।”

এই বিবরণ সত্য। তবে এই সঙ্গে আর একজনের নাম সংযোগ করা উচিত। তাহা টমাস পেনের। তিনিই বর্ধমান মার্কিন গণতন্ত্রের প্রথম উদ্যোক্তা।

চিত্র-পরিচয়

প্রায় তিন শত পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এই দশাবতার চিত্রটি চেতুয়া অক্ষয়-রীতির একটি পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন। খ্রীঃপূঃ সম্পর্কে চেতুয়া সমাজের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতবাদটি ইহাতে প্রকটিত। বহু মন্দিরের কবাতের খোপেও এইরূপ ভগ্নপ্রাণ সমেত দশাবতারের দারুণত্ব কোদিত দেখা যায়। মারী-রূপিণী বরাহদন্তোদ্ধতা ধরণী, বামনের নাভিনির্গত চরণ, ভীম বহুকধারী পরশুরাম, শিখারী বলরাম এই চিত্রে লক্ষণীয়। মেদিনীপুর জেলার দাঁসপুর থানার অন্তর্গত পোঃ শঙ্করপুরের অধীন চেতুয়া বাহুদেবপুরের ভায়ভূষণ পাড়ার আদিকবি কুড়ি-বাস ও মহাকবি রায়গুণাকর তারতচন্দ্রের জাতিবংশীয় মহা-মহাধ্যাপক উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের পুঁথিখণ্ডে রক্ষিত ১০১৩ সালের একটি ভাগবতের পাটার রঙীন চিত্র হইতে এই চিত্রগুলির অমূল্য গৃহীত হইয়াছে। ন্যায়ভূষণ মহাশয় গত শতকে মেদিনীপুরের একজন শ্রেষ্ঠ নৈসর্গিক ছিলেন। ইং ১৮১২ সালে মঃ মঃ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন কর্তৃক সম্পাদিত টোলের তালিকায় তাঁহার নাম আছে। তাঁহার প্রপৌত্র জ্ঞানকামন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতির্বিদ্যেদে কর্তৃক চিত্রটি প্রদত্ত।

শুঙ্গেরী

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কড়ুর জেলায় তুঙ্গভদ্রা নদীর বাম তটে শুঙ্গেরী নামক শহরটি অবস্থিত। প্রাচীন যুগের রাজন্যবর্গ শুঙ্গেরী জায়গীরটি তদানীন্তন মঠাধীশগণকে দান করিয়াছিলেন। উক্ত জায়গীর কোপ্পা তালুকের অন্তর্গত এবং প্রায় ৪৪ বর্গমাইল পরিব্যাপ্ত। উহার অন্তর্গত প্রায় ২৫০টি গ্রাম আছে, লোকসংখ্যা আনুমানিক বিশ হাজার হইবে। শুঙ্গেরী শহরটি প্রায় এক বর্গ-মাইল। শহরে বৈজ্ঞানিক আলো বা জলের কল নাই। শুঙ্গেরী মঠের মঠাধীশগণ কেবলমাত্র মঠের মধ্যে ডায়নামো বসাইয়া আলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। শুঙ্গেরী শহরের লোকসংখ্যা প্রায় চারি সহস্র হইবে। স্থানীয় লোকদের মাতৃভাষা কানাড়া। শুঙ্গেরীতে তুঙ্গা নদী পূর্বোত্তরবাহিনী—“যত্র পূর্বোত্তরবাহিনী তুঙ্গা তত্রৈব শুঙ্গগিরি।” শুঙ্গেরীর চতুর্দিক্ নীল শৈলমালায় বেষ্টিত ও উহাদের স্বগভীর উপত্যকাগুলি পার্বত্য শ্রামল বনরাজিতে ভূষিত হইয়া এক অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক সুষমার সৃষ্টি করিয়াছে। কথিত আছে, আদি শঙ্করাচার্য যখন পরিব্রাজক রূপে বিভিন্ন স্থান পর্যটন করিতে করিতে বর্তমান শুঙ্গেরী মঠের নিম্নস্থ তুঙ্গা নদীতে আসিয়া এক নিদাঘকালীন মধ্যাহ্নের সময় স্নান করিতে-ছিলেন, তখন উহার নিকটেই একটি শৈলখণ্ডের উপরে প্রথর সুর্যোত্তাপের মধ্যে প্রসব-বেদনায় অত্যন্ত কাতরা একটি গর্ভবতী ভেকের উপর একটি বিষধর সর্পকে ফণা বিস্তার করিয়া রোদ্রতাপ নিবারণে সচেষ্ট দেখিতে পান। ইহা দেখিয়া শঙ্করাচার্য বিস্মিত হন এবং মনে মনে বিচার করেন যে, যে স্থানে খাচ্ছ-খাদক সপ্তদ্বিংশিষ্ট প্রাণিঘয়ের মধ্যে একরূপ প্রীতির ভাব স্বভাবতঃই বিরাজিত রহিয়াছে, সেই স্থানই ব্রহ্মচিন্তার উপযুক্ত স্থান। এইরূপ বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য এই স্থানেই তাঁহার পাঠস্থান, প্রধান মঠ ও বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনার্থ সঙ্কল্প করিলেন এবং এই স্থানে সারদা দেবীর যন্ত্র (মতান্তরে চন্দনদাক্ষময়ী সারদা-মূর্তি) প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি এই স্থানে স্নানঘাটের উপর মণ্ডুক-শঙ্কর-লিঙ্গ নামক একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে, যে স্থানে শ্রীশঙ্করাচার্য সারদা-দেবীর যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বহস্তে পূজা করিয়াছিলেন, তাহাই শুঙ্গেরীর আদিস্থান। ইহার পরে আদি শঙ্করাচার্য ভারতের চতুর্দিকে চারিটি মঠ স্থাপন করেন।

এই স্থানের প্রকৃত নাম ঋষ্যশৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গগিরি। কথিত আছে, এই স্থানে কণ্ঠপাত্মজ বিভাণ্ডক মূনির পুত্র

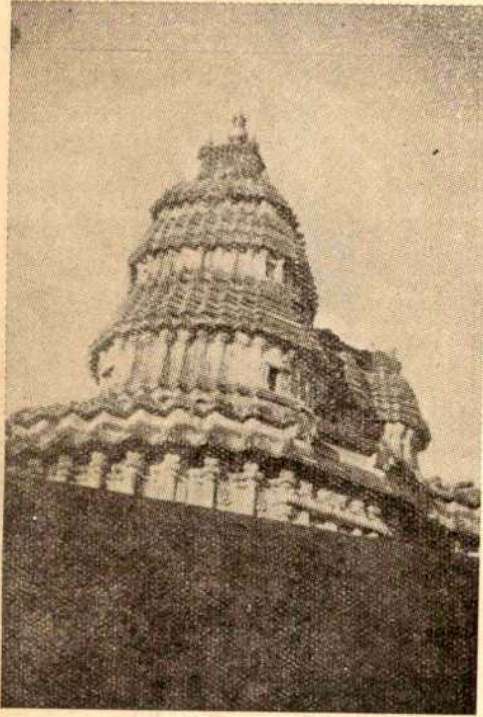


শুঙ্গেরীর অধিষ্ঠাত্রী শ্রীসারদা দেবী (বিহারণ্য প্রতিষ্ঠিত)

ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুঙ্গেরী হইতে পাঁচ মাইল দূরে ঋষ্যশৃঙ্গপুর নামক একটি গ্রাম অদ্যাপি ঋষ্য-শৃঙ্গের আবির্ভাব-স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। তথায় একটি মন্দিরে লিঙ্গরূপী ঋষ্যশৃঙ্গ ও তাঁহার পত্নী শাস্তা দেবীর মূর্তি অধিষ্ঠিত আছে। বাম্বীকি-রামায়ণে* উক্ত হইয়াছে যে, কাশ্যপ ঋষির পুত্র বিভাণ্ডক, তৎপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। ইনি কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন ও পিতার গুশ্রীয়া করিয়া এই স্থানে (শুঙ্গেরীতে) বাস করিতেছিলেন। সেই সময় অঙ্গদেশে রোমপাদ নামক এক সুবিখ্যাত রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণগণ উক্ত রাজাকে পরামর্শ দেন যে, যে কোন উপায়ে উক্ত ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গদেশে আনয়ন করিয়া শাস্তা নাম্নী রাজকুমারীকে ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত বিবাহ প্রদান ও উক্ত রাজ্যে স্থায়ী ভাবে বসবাস করাইতে পারিলে রাজ্যে প্রচুর

* ত্রিমদ্বাণীকি রামায়ণ (বালকাণ্ড ২ম হইতে ১৮শ সর্গ)।
প্রকাশক—আর. নারায়ণশাস্ত্রী আয়ার, মাদ্রাজ। ১৯৩০।

বৃষ্টি ও শস্তাদির উদগম হইবে। তদনুসারে রাজা অগ্নির জ্বায়ে তেজস্বী ও বীৰ্যবান ঋষ্যশৃঙ্গকে বারবনিতাগণের দ্বারা ভূলাইয়া অঙ্গদেশে আনয়ন করেন। ঐরূপ কার্যের জন্য রোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার শাস্তা নায়ী কন্যাকে সম্প্রদান করেন।



বিখাশঙ্কর মন্দির—শুজেরী

ইক্ষাকুবংশীয় স্বধামিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথের সহিত অঙ্গরাজ রোমপাদের বন্ধুত্ব ছিল। অপুত্রক রাজা দশরথ স্তম্ভের মস্তনায় বশিষ্ঠ ঋষির অমুমতি লইয়া যে স্থানে রাজা রোমপাদ ও ঋষ্যশৃঙ্গ বাস করিতেন তথায় গমন করেন। দশরথ পুত্রোপস্থি যজ্ঞসাধনার্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করেন। ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রণী করিয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রোপস্থি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত পায়স কৌশল্যাঙ্গ দশরথের মহিষীগণ ভোজন করিয়া যে গর্ভধারণ করেন, তাহাতেই ত্রিবিষ্ণু চারি অংশে—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন রূপে আবির্ভূত হন।

শুজেরী যাইবার পথ : এম্. এস্. এম্. রেলপথের বাঙ্গালোর সিটি—হরিহর শাখা লাইনে বীরুর জংসন। বাঙ্গালোর সিটি হইতে বীরুর ১৩১ মাইল। বীরুর জংসন হইতে শুজেরীতে সরাসরি মোটর-বাস চলে। বাসভাড়া জনপ্রতি তিন টাকা মাত্র। বীরুর হইতে শুজেরী মোটর-

বাসে ৭৪ মাইল। মোটর-বাস পার্বত্যপথ দিয়া গমনা-গমন করে। বীরুর জংসন হইতে টেরিকেরী ১৪ মাইল; টেরিকেরী হইতে কোপ্পা ৪২ মাইল; কোপ্পা হইতে হরিহরপুর ৬ মাইল; হরিহরপুর হইতে শুজেরী ১২ মাইল। ঐ সকল স্থানে বাস দাঁড়াইবার জায়গা আছে।

সীমোগা ও টেরিকেরী—এই দুইটি রেলওয়ে স্টেশন হইতেও শুজেরী পর্যন্ত বাস চলাচল করে। উভয়েরই দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল।

উড়ুপী হইতে শুজেরী মোটর-বাসে ৬৪ মাইল। উড়ুপী হইতে পুত্তিগে ১২ মাইল। তথায় বাস পরিবর্তন করিয়া ও পুত্তিগে নদী পার হইয়া পেরেডুর হইতে অন্য বাসে সোমেশ্বর ১৫ মাইল; সোমেশ্বরে বাস বদল করিয়া সর্কার্ণ পার্বত্য পথ দিয়া ট্যান্ডিতে আশুয়ে পর্বত প্রায় ২ মাইল অতিক্রম করিতে হয়। তথায় পুনরায় ট্যান্ডি পরিবর্তন করিয়া মোটর-বাসে হরিহরপুর ১৬ মাইল। হরিহরপুর হইতে শুজেরী ১২ মাইল।

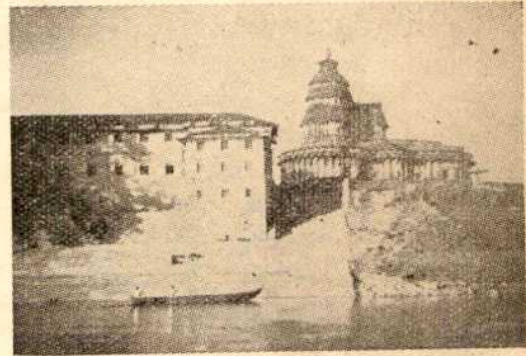
শুজেরী মঠ : তুঙ্গা নদীর উত্তর-পশ্চিম তটে শুজেরী মঠ অবস্থিত। পরশোতা স্বচ্ছসলিলা তুঙ্গা শুজেরীর উত্তর প্রাচীন বিদ্যাশঙ্কর-মন্দির মন্দিরের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত। তুঙ্গার পূর্ব তীরে ও শুজেরী মঠের চতুর্দিকে শ্রামলবনরাজি-মণ্ডিত উপত্যকা-বিভূষিত নীল গিরিমালা সারদা মন্দিরের বেষ্টনী রূপে শোভা পাইতেছে। বিদ্যা-শঙ্কর মন্দিরের পাদদেশে মন্দির সোপানাবলী শোভিত একটি স্নানঘাট আছে। স্নানঘাটের সোপানাবলীর উপরে আদি শঙ্করাচার্যের পাদপীঠ ও মণ্ডুক-শঙ্করলিঙ্গের মন্দির বিরাজিত। শুজেরীস্থ নদীর নাম তুঙ্গা হইলেও স্থানীয় লোকেরা ইহাকে তুঙ্গভদ্রা বলেন। বস্তুত তুঙ্গা ও ভদ্রা দুইটি পৃথক্ নদী কড়ুর জেলার প্রান্তস্থ পশ্চিমঘাট নামক পর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তুঙ্গা শুজেরী, তিথল্লী ও সিমোগা দিয়া প্রবাহিত এবং ভদ্রা বাবাবুদন গিরিশ্রেণীর পূর্ব উপত্যকা হইতে পশ্চিম উপত্যকা দিয়া এবং তৎপরে উত্তর দিকে বৈকিপুর দিয়া প্রবাহিত। ইহার উভয়ে সিমোগা জেলার উত্তরে কুড়লীতে মিলিত হইয়াছে। মিলিত তুঙ্গা ও ভদ্রা মহীশূর এবং মাজ্জাজের মধ্যে এবং তৎপরে মুখাই ও মাজ্জাজের মধ্যে সীমারেখা রচনা করিয়াছে। কথিত আছে, একটি অশ্বর এই তুলোককে নিম্নলোকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে ত্রিবিষ্ণু বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহাকে পুনরায় উদ্ধার করেন। ইহাতে বিষ্ণু লীলা প্রকট করিয়া যে পর্বতো-পরি বিশ্রাম করেন, তাহা কোল-পর্বত বা বরাহপর্বত নামে খ্যাত হয়। উক্ত বরাহদেবের বাম ও দক্ষিণের

দংষ্ট্রা হইতে যে ঘর্ম নির্গত হয়, তাহাই যথাক্রমে তুঙ্গা ও ভদ্রা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তুঙ্গা নদীর উত্তর-তটে ও শৃঙ্গেরী মঠের প্রাকারের মধ্যে বিদ্যাশঙ্করের সমাধি-মন্দির। তুঙ্গভদ্রার তীরস্থ শৃঙ্গেরী মঠের স্নানঘাটের নাম অম্বাতীর্থ।

মায়নের ঔরসে ও শ্রীমতীর গর্ভে মাধব (বিদ্যারণ্য), সায়ন ও ভোগনাথ নামক তিন পুত্র জন্মে; মাধবের সন্ন্যাস-আশ্রমের নামই বিদ্যারণ্য। তিনি যজুঃ শাখা, বোধায়ন-সূত্র ও ভরহাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রায় ১২৬৮ (মতান্তরে ১২২৬) খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের (নামান্তর বিদ্যাতীর্থের) শিষ্য। বিদ্যারণ্য শৃঙ্গেরী মঠের গুরুপরম্পরায় দ্বাদশ গুরু। এই বিদ্যারণ্যই আনুমানিক ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের প্রথম নৃপতি রূপে হরিহর নামক রাজাকে রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছিলেন। উক্ত ভূপতির উপর বিদ্যারণ্যের বিশেষ প্রভাব ছিল। এই রাজা শৃঙ্গেরী মঠের জন্ম বহু গ্রাম, ধান্যক্ষেত্র ও অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন বলিয়া ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়। প্রথম হরিহরের ভ্রাতা বুদ্ধাঙ্গা রাজা হইবার পর আনুমানিক ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শৃঙ্গেরীতে আগমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, বিদ্যারণ্যই প্রসিদ্ধ বিদ্যানগরের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বেদের ভাষা ও কেবলাদ্বৈত মতবাদের বহু গ্রন্থ রচনা করেন। প্রায় ১১২ বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া তিনি ১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হাম্পিতে পরলোকগত হন।*

বিদ্যাশঙ্কর সমাধিমন্দির: বিদ্যারণ্য তাঁহার গুরু বিদ্যাশঙ্করের স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ রাজা প্রথম হরিহরের অর্থাভ্যুত্থানে উক্ত সমাধি-মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দির তুঙ্গভদ্রার উত্তর-পশ্চিম তটে একটি উচ্চ স্থানে শৃঙ্গেরী মঠের প্রাকারের অভ্যন্তরে অপূর্ব কারুকার্য-খচিত উত্তুঙ্গ মর্মরমন্দির রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দর্শক-মাত্রেই বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এই মন্দিরে চালুকা ও দ্রাবিড় শিল্পকলার অপূর্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ভারত সরকার কর্তৃক এই মন্দিরটি প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার আইনানুসারে রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরটি মেরুচক্রের আকারের অক্ষুরূপে নির্মিত। ইহা মঠের প্রাঙ্গণ হইতে প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চ মর্মরবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের বিভিন্ন অবতারের মূর্তি মন্দিরের গাত্রে খোদিত রহিয়াছে। মন্দিরের

ছয়টি দ্বার; প্রধান দ্বারটি পূর্বাভিমুখী, একটি পাশাণময় কূর্মের উপর মন্দিরটি নির্মিত। কূর্মের চারিটি পা, যুগ ও পুচ্ছ উক্ত ছয়টি দ্বারের প্রতীক। মন্দিরের নিম্নভাগে সপ্তলোক ও উর্ধ্বভাগে সপ্তলোক প্রস্তরগাত্রে খোদিত রহিয়াছে। অভ্যন্তরস্থ নাট্যমন্দির দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। স্তম্ভগুলি এরূপ সুসজ্জিত ভাবে নির্মিত হইয়াছে যে, দ্বাদশ মাসের (সম্বৎসরের) এক-একটি বিশেষ মাসে সূর্য-রশ্মি এক-একটি বিশেষ স্তম্ভের উপর পতিত হয়। মন্দিরে বিদ্যারণ্য-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শৈলেশ্বর বিগ্রহ আছেন। গর্ভ-



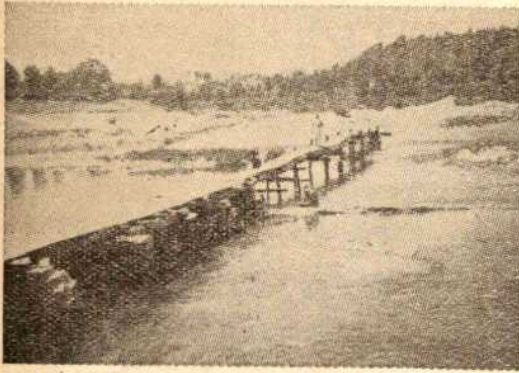
তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে প্রাচীন বিদ্যাশঙ্কর মন্দির ও শৃঙ্গেরী মঠ

গৃহে রৌপ্যকবচারূত শিবলিঙ্গ একটি উচ্চ বেদীর উপর অধিষ্ঠিত। এখানে বিদ্যাশঙ্কর "লঙ্কিকা-যোগ" অবলম্বন করিয়া তপস্যায় বসিয়াছিলেন। তপস্তায় বসিবার পূর্বে তিনি তাঁহার কুটিরের দ্বার বদ্ধ করিয়া তাহা দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে কাহাকেও খুলিতে নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু প্রায় তিন বৎসর অতীত হইবার পর কেহ কেহ কোঁতুল-বশতঃ তাঁহার তপঃকুটিরের দ্বার ভাঙিয়া খুলিয়া দেখিতে পান যে, বিদ্যাশঙ্কর শিবলিঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। সেই লিঙ্গরূপী বিদ্যাশঙ্করের মূর্তির উপর তাঁহার প্রধান শিষ্য বিদ্যারণ্য এই সমাধিমন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন সেই লিঙ্গের উপর বিদ্যাশঙ্করের একটি রৌপ্যমূর্তির কবচ স্থাপিত হইয়াছে। সেই গর্ভগৃহের চতুর্দিকে প্রাকার ও তপঃকুটিরটি আছে। তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবীর মূর্তি বিরাজিত। উত্তর ও দক্ষিণ কোণে দুইটি গুহা আছে। প্রবাদ, উক্ত গুহা হৃদয়ের মত তুঙ্গভদ্রার অপর তীর পর্যন্ত গিয়াছে।

অন্য বিবরণানুসারে বিদ্যাশঙ্কর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী লঙ্কিকা-যোগ অবলম্বনে শিবলিঙ্গে পরিণত হইবেন—এইরূপ কথা তাঁহার শিষ্য ভারতী কৃষ্ণতীর্থ ও বিদ্যারণ্যকে বলিয়া নিজের তপঃকুটিরে বোগালনে বসেন এবং বার বৎসর পূর্ণ না

* Vide "Vijayanagara and Vidyaranya" by S. Shrikantaya, B.A., B.L., Secretary, Mythic Society, Bangalore. Published in Vijayanagara Sexcentenary Commemoration Volume, Dharwar, 1936, pp. 163-165.

হওয়া পর্যন্ত যেন উক্ত কুটিরের দ্বার উন্মুক্ত করা না হয় এই আদেশ করিয়া যান। কিন্তু প্রায় তিন বৎসর পরে কুটিরের দ্বার খুলিয়া তথায় বিদ্যাশঙ্করকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই রাজিতে বিদ্যাশঙ্কর শিষ্য ভারতী কৃষ্ণতীর্থকে স্বপ্নে দর্শন দান করেন এবং তিনি যে স্থানে যোগাবলম্বন করিয়া বসিয়াছিলেন, তথায় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে বলেন। তদনুসারে আনুমানিক ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তথায় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই শিবলিঙ্গই বিদ্যাশঙ্করের সমাধিমন্দিরের গর্ভালয়ে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণদেব রায়ের শিলালেখ আছে। শৃঙ্গেরী মঠে যত স্বর্ণরত্নাকার আছে, সমস্তই বিদ্যাশঙ্করের নামে লিখিত আছে।



শৃঙ্গেরী নিকট তুঙ্গভদ্রা নদী

বিদ্যাশঙ্করের নামান্তর সর্বজ্ঞ বিষ্ণু; তাঁহার পিতার নাম শাঙ্গপাণি। ইনি বিলারণ্য নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যাশঙ্কর পনের বৎসর কাল হিমালয়ের পাদদেশে লম্বিকা যোগাভ্যাস করেন। তিনি ৭৩ বৎসরকাল শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আটটি মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার আট জন সন্ন্যাসী-শিষ্যকে সেই সকল মঠের রক্ষক রূপে স্থাপন করেন। ভারতী কৃষ্ণতীর্থ ও বিজ্ঞানরণ্য তাঁহার প্রসিদ্ধ এবং প্রধান শিষ্য।*

শঙ্করাচার্য তাঁহার চারি জন শিষ্যদ্বারা ভারতের উত্তরে বদরিকাশ্রম—জ্যোতির্মঠ, পুরুষোত্তমে—ভোগবর্ধন বা গোবর্ধন মঠ, দ্বারকাশ্রম—সারদামঠ ও দাক্ষিণাত্যে—শৃঙ্গেরীমঠ স্থাপন করান। শৃঙ্গেরী মঠে ‘সরস্বতী’, ‘ভারতী’ ও ‘পূরী’—এই ত্রিবিধ নামের সহিত একদণ্ড সন্ন্যাস গৃহীত হয়। “চতুর্থো দক্ষিণাম্রায়ঃ শৃঙ্গেরীং বর্ততে মঠঃ। সম্প্রদায়ো ভূরিবারঃ ভূভূবঃ গোত্র উচ্যতে ॥ পদানি ত্রীণি ধ্যাতানি

সরস্বতী ভারতী পূরী। বরাহো দেবতা যত্র ক্ষেত্রং রামেশ্বরং বদেৎ ॥ তীর্থঞ্চ তুঙ্গভদ্রাখ্যং শক্তিঃ কামাক্ষিকা স্বতা। চৈতন্য-ব্রহ্মচারীতি হস্তামলকদেশিকঃ ॥ আজ্ঞ-দ্রাবিড়-কর্ণাট-কেরলাদি প্রভেদতঃ। শৃঙ্গেরীনা দেশান্তে হাবাচীদিগবস্থিতাঃ ॥ স্বর জ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ। সংসারসাগরাসারহস্তাসৌ হি সরস্বতী ॥ বিজ্ঞাভাবেণ সম্পূর্ণঃ সর্বভাঃ পরিত্যজন্ ॥ দুঃখভাঃ ন জানাতি ভারতী পরিকীর্তিতে ॥ জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্ব পদে স্থিতে। পরব্রহ্মরতো নিত্যং ‘পূরী’ নামা স উচ্যতে ॥”—(মঠান্নায়)

অর্থাৎ মঠনাম—শৃঙ্গেরী, দিক—দক্ষিণ, দেশ—আজ্ঞ, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও কেরলাদি, সম্প্রদায়—ভূরিবার, গোত্র—ভূভূবঃ, ক্ষেত্র—রামেশ্বর, মহাবাক্য বা বোধ—“অহং ব্রহ্মাস্মি”, দেব—বরাহ, শক্তি—কামাক্ষী, আচার্য—হস্তা-মলক, সন্ন্যাসপদবী—‘সরস্বতী’, ‘ভারতী’ ও ‘পূরী’, ব্রহ্মচারী—চৈতন্য, তীর্থ—তুঙ্গভদ্রা, বেদ—যজুঃ।

শৃঙ্গেরী মঠের গুরু ও সন্ন্যাসগ্রহণ কাল-পরম্পরা—যথা, ১। শঙ্করাচার্য—২২ শক, ২। সুরেশ্বরীচার্য—৩০ শক, ৩। বোধনাচার্য—৬৮০ শক, ৪। জ্ঞানধনাচার্য—৭৬৮ শক, ৫। জ্ঞানোত্তম শিবাচার্য—৮২৭ শক, ৬। জ্ঞানগিরি আচার্য ৮৭১ শক, ৭। সিংহগিরি আচার্য—৯৫৮ শক, ৮। ঈশ্বরতীর্থ ১০১৯ শক, ৯। নরসিংহতীর্থ—১০৬৭ শক, ১০। বিদ্যাতীর্থ-বিদ্যাশঙ্কর—১১৫০ শক, ১১। ভারতী কৃষ্ণতীর্থ—১২৫০ শক, ১২। বিদ্যারণ্য ভারতী—১২৫৩ শক, ১৩। চন্দ্রশেখর ভারতী—১২৯০ শক, ১৪। নরসিংহ ভারতী—১৩০৯ শক, ১৫। পুরুষোত্তম ভারতী—১৩২৮ শক, ১৬। শঙ্করানন্দ—১৩৫০ শক, ১৭। চন্দ্রশেখর ভারতী—১৩৭১ শক, ১৮। নরসিংহ ভারতী—১৩৮৬ শক, ১৯। পুরুষোত্তম ভারতী—১৩৯৪ শক, ২০। রামচন্দ্র ভারতী—১৪৩০ শক, ২১। নরসিংহ ভারতী—১৭৭৯ শক, ২২। নরসিংহ ভারতী—১৪৮৫ শক, ২৩। ধনমডি নরসিংহ ভারতী—১৪৯৮ শক, ২৪। অভিনব নরসিংহ ভারতী—১৫২১ শক, ২৫। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৫৪৪ শক, ২৬। নরসিংহ ভারতী—১৫৮৫ শক, ২৭। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬২৭ শক, ২৮। অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৬৩ শক, ২৯। নৃসিংহ ভারতী—১৬৮৯ শক, ৩০। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৯২ শক, ৩১। অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৭৩০ শক, ৩২। নরসিংহ ভারতী—১৭৩৯ শক। ইহাদের সমাধি সম্বন্ধে জানিতে হইলে “বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহতি” (৪র্থ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য। ৩৩। সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব নরসিংহ ভারতী—১৭৮৮ শক, ৩৪। শ্রীচন্দ্রশেখর ভারতী (বর্তমান প্রধান মঠাধীশ), ৩৫। শ্রীঅভিনব বিদ্যাতীর্থ (ভাবী মঠাধীশ)।

* Vide Vijayanagara Sexcentenary Commemoration Volume, 1936, p. 163 and p. 296.

ভগবান্ ত্রীক্ষকচৈতন্যদেব শৃঙ্গেরী মঠে পদার্পণ করিয়া মৎস্ততীর্থ দর্শন ও তুঙ্গভদ্রায় স্নানলীলা প্রকট করিয়া-
ছিলেন।

শৃঙ্গেরী মঠে আইলা শঙ্করাচার্য-স্থানে।

মৎস্ত-তীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥*

শৃঙ্গেরী মঠস্থ অন্যান্য মন্দিরঃ বিদ্যাশঙ্কর-সমাধি-
মন্দিরের উত্তরে আদি শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানার্দন-বিষ্ণুর
মন্দির; মন্দিরটি খুব প্রাচীন। শ্রীজ্ঞানার্দন এক অথও
শিলায় শ্রী ও ভূদেবীর সহিত প্রকাশিত চতুর্ভুজ-মূর্তি।
শ্রীজ্ঞানার্দন-মন্দিরের দ্বারের দক্ষিণ দিকে বীর হুম্মান ও
উত্তর দিকে যুক্তকর গরুড়। এই উভয় মূর্তিই আদি
শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এখানে উক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীজ্ঞানার্দন মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে বিদ্যারণ্যের
সমাধিমন্দির; তৎপার্শ্বে অর্থাৎ শ্রীজ্ঞানার্দন মন্দিরের উত্তর
ভাগে স্বরেশ্বরাচার্যের সমাধি। উক্ত সমাধির উপর শিবলিঙ্গ
প্রতিষ্ঠিত এবং তদুপরি ছদ্মাকার একটি ক্ষুদ্র মন্দির। ইনি
আদি শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য ও শৃঙ্গেরী মঠের আদি-
গুরু। ‘শঙ্কর বিজয়ে’র মতামুসারে স্বরেশ্বরাচার্য কুমারিল
ভট্টের ছাত্র ছিলেন। ইহার পূর্বাশ্রম মাহিষ্মতী পুরীতে
ছিল। স্বরেশ্বরাচার্যের পূর্বাশ্রমের নাম মণ্ডন মিশ্র। যখন
প্রয়াগে কর্ণবাদি-মীমাংসক কুমারিল ভট্ট মুমূর্ষু অবস্থায়
ছিলেন, সেই সময় শঙ্করাচার্য কুমারিলের সহিত সাক্ষাৎ
করেন। কুমারিল মুমূর্ষু অবস্থায় শঙ্করের সহিত নিজে
বিচার না করিয়া তাঁহার প্রধান শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের নিকট
মাহিষ্মতী নগরীতে পাঠাইয়া দেন। মণ্ডনের সহিত শঙ্করের
যে বিচার হয়, তাহার মধ্যস্থ ছিলেন মণ্ডনের পত্নী সরস্বতী
বা উভয়ভারতী। মণ্ডন বিচারে পরাজিত হইয়া শঙ্করা-
চার্যের শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুর সহিত পর্যটন
করেন। আচার্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায়
স্বরেশ্বরাচার্যকে মঠাধীশ রূপে স্থাপন করেন।

প্রবাদ, মণ্ডন মিশ্রের (স্বরেশ্বরের) সহধর্মিণী সরস্বতী
(নামাস্তর উভয়ভারতী) শঙ্করের সহিত কামশাপ্ত বিষয়ে
বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আজীবন ব্রহ্মচারী
শঙ্কর উভয়ভারতীর নিকট হইতে এক মাস কাল সময়
লইয়া যোগবলে একটি সত্ত্বমত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া
কামশাপ্তে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং উভয়ভারতীর
সহিত বিচারার্থ প্রস্তুত হন। উভয়ভারতী আর বিচার না
করিয়া শঙ্করাচার্যের প্রাথনামুসারে তাঁহার শৃঙ্গেরী মঠে
অচলা থাকিবেন এই বর দিয়া অস্থিত হন।

* টে, চ, ম, ১২৪৪; শৃঙ্গেরীতে বহু অনুসন্ধান করিয়াও মৎস্ততীর্থের
কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।—লেখক

স্বরেশ্বরাচার্য নৈকর্মসিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি ও ইষ্টসিদ্ধি নামক
তিনটি প্রকরণগ্রন্থ, ‘বিধিবিবেক’ নামক একটি নিবন্ধগ্রন্থ
এবং তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের ব্যুত্তি রচনা করিয়া
ছিলেন।



শৃঙ্গেরীতে দুর্গাধার রথোৎসব

বিদ্যাশঙ্কর মন্দিরের পশ্চিম দিকে শৃঙ্গেরী মঠের দশ
জন পূর্বগুরু সমাধিমন্দিরসমূহ বিরাজিত। স্বরেশ্বরাচার্যের
সমাধির উত্তরে শিলাময় প্রাকারবেষ্টিত সারদাদেবীর
মন্দির।

শ্রীসারদা মন্দিরঃ স্থানীয় বিবরণামুসারে আদি শঙ্করাচার্য
সর্বপ্রথমে সারদাদেবীর যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং খ্রীষ্টীয়
দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞারণ্য উক্ত যন্ত্রের উপর পঞ্চ ধাতুময়ী
সারদামূর্তি স্থাপন করেন। বর্তমান শিলামন্দিরটি
সচ্চিদানন্দ শিবাভিনববিদ্যা নরসিংহ ভারতী (১৭৮৮ শক)
নির্মাণ করেন। সারদা দেবী চতুর্ভুজা ও স্বর্ণকবচারিণী।
দেবীর দক্ষিণোর্ধ্ব হস্তে গুরুপক্ষী ও জপমালা; দক্ষিণ নিম্ন-
হস্তে অভয় মুদ্রা, বামোর্ধ্ব অমৃত-কলস ও বাম নিম্নহস্তে
বেদ। অচল মূর্তি ব্যতীত একটি উৎসবমূর্তিও এখানে
অধিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে, আদি শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত
সারদাদেবীর শ্রীমূর্তি চন্দন-দারুময়ী ছিল। কোন কোন
মতে আদি শঙ্করাচার্য সারদাদেবীর যন্ত্রমাত্র প্রতিষ্ঠা
করেন। পরবর্তী কোন শঙ্করাচার্য উক্ত যন্ত্রের উপর চন্দন-
দারুময়ী সারদামূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিধর্মীর
আক্রমণে শৃঙ্গেরী মঠ ও মন্দিরের কিছু ক্ষতি হয়। ইহার
পরে সারদাদেবীর মন্দির পুনর্নির্মিত এবং পঞ্চধাতুময়ী
সারদাদেবীর মূর্তি প্রকাশিত হয়।

সারদা-মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে সর্বজ্ঞ পীঠ ব্যাখ্যান
সিংহাসন। এই স্থানে নূতন আচার্যের পট্টাভিষেক ও গুরু-
মন্ত্রের উপদেশ হয়।

সারদাদেবীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আদি শঙ্করাচার্য-

প্রতিষ্ঠিত শক্তি গণপতি, তৎসংলগ্ন পশ্চিমে বহু শালগ্রাম ও বহু দেবমূর্তি রহিয়াছে। সারদামাতার পিছনে ও পশ্চিম দিকে বিদ্যারণ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী মূর্তি।

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় রৌপ্যরথে সারদামাতার উৎসব-মূর্তিকে মন্দিরের ভিতর বাদ্যভাণ্ডাদি সহযোগে তিনবার প্রদক্ষিণ করানো হয়।

সারদা-মন্দিরের উত্তরে আদি শঙ্করাচার্যের মন্দির। ইহার চতুর্দিকে বেদ-সংস্কৃত-সিদ্ধি-সঙ্কীর্ণী মহাপাঠশালা। ইহাতে বেদ, বেদান্ত, তর্ক, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও আগম-শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়। শুন্যাম, এই স্থানে প্রত্যহ প্রায় এক শত বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করেন। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবটুগণই এখানে অধ্যয়ন করিবার অধিকারী। তাঁহাদের বাসস্থান, ভোজ্য, বস্ত্র, ঔষধ, উপচার সমস্তই মঠ হইতে প্রদত্ত হয়।

একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে আদি শঙ্করাচার্যের একটি প্রস্তরময় মূর্তি। সেই মূর্তির পাদপীঠে সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, হস্তামলক ও ত্রোটক—এই প্রধান শিষ্যচতুষ্টয়ের খোদিত মূর্তি এবং তৎসম্মুখে কালাভি হইতে আনীত ধাতুময় উৎসব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত মূর্তিঘর বিদ্যারণ্যের দ্বারা এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। চন্দ্রশেখর ভারতী (১২২০ শক ৭, ১৩৭১ শক ৭) শঙ্করাচার্যের এই মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই স্থানে ‘সরস্বতী ভাণ্ডার পুস্তকালয়’ নামক একটি প্রাচীন পুথিশালা ও পুস্তকাগার আছে।

বিদ্যাশঙ্কর মন্দিরের দক্ষিণদিকে এবং তুঙ্গা নদীর তীরের সন্নিকটে মঠের পাকশালা। ইহাতে মঠসেবকগণের এবং বিদ্যার্থীগণের জন্য পৃথক পৃথক দুই ভাগে রন্ধন হয়। ঐ দুই শ্রেণীর মঠবাসীগণের জন্য পাকশালারই সংলগ্ন পৃথক পৃথক ভোজনশালাও আছে।

শৃঙ্গেরী মঠের প্রবেশদ্বারের পূর্বদিকের ‘শৃঙ্গেরী ব্রহ্মা’ নামক শৃঙ্গেরী মঠরক্ষকের একটি শিলামূর্তি রহিয়াছে। আদি শঙ্করাচার্য নাকি কোন এক ব্রহ্মরাক্ষসকে মুক্তি-দান করিয়া উক্ত মূর্তি শৃঙ্গেরী মঠের দ্বারপাল রূপে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে কোদণ্ডরামস্বামীর মন্দির। সারদাদেবীর মন্দিরের সামনে অথও প্রস্তরে নির্মিত প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ দৃষ্ট হয়, ইহা ধ্বজস্তম্ভ নহে; জৈন রাজগণের প্রাচীন কীর্তিবিশেষ। শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়ের পূর্বে এই স্থান জৈন রাজগণের শাসনাধীন ছিল।

বর্তমান মঠাধীশগণের আশ্রম : তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ-স্ফট প্রায় এক বর্গমাইল একটি ক্ষুণ্ণে শৃঙ্গেরী মঠের

বর্তমান প্রধান মঠাধীশের গুরু সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব নৃসিংহ ভারতী স্বামীর একটি স্বরম্য মর্মরমন্দির ও উহারই সম্মুখে বর্তমান আচার্যদ্বয়ের বাসস্থান। তুঙ্গভদ্রার তটে চতুর্দিকে শ্রামল উপত্যকা-শোভিত নীল শৈলমালা ও শাস্ত্র পরিবেশের মধ্যে এই স্থানটি বর্তমান মঠাধীশগণের ব্রহ্ম-চিন্তার স্থান রূপে নির্বাচিত হইয়াছে। এই স্থান ‘নৃসিংহ-বন’ নামে খ্যাত। একটি সুন্দর পুষ্পোজ্জ্বল এই স্থানের বিশেষ শোভা বর্ধন করিয়াছে। শুনা যায়, এই স্থানে পূর্বে মঠাধীশগণের গ্রীষ্মাবাস ছিল। বর্তমান প্রধান মঠাধীশ শ্রীচন্দ্রশেখর ভারতী ও দ্বিতীয় মঠাধীশ শ্রীঅভিনব বিদ্যাতীর্থ স্বামিধ্ব এই স্থানে সকল সময়ই বাস করেন।

নৃসিংহবনে সন্ন্যাসী ব্যতীত কোন গৃহস্থের থাকিবার অধিকার নাই। এখানে একটি গোশালা আছে। যে অট্টালিকার মধ্যে স্বামীদ্বয় বাস করেন, তথায় আদি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত ও তৎপ্রদত্ত কয়েকটি বিগ্রহ ও অন্যান্য দ্রব্য আমাদিগকে দেখানো হইল। আদি শঙ্করাচার্য যে চন্দ্রমৌলীখর নামক শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন তাহা তথায় প্রতিষ্ঠিত আছে। অদ্যাপি প্রতি রাত্রিতে মঠাধীশগণ স্বহস্তে উক্ত শিবলিঙ্গের অর্চনা ও অভিষেক করেন। ঐ লিঙ্গের উপর একটি চন্দ্ররেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত চামুণ্ডেশ্বরী শালগ্রাম নামক একটি স্বরূপ শালগ্রামশিলাও দর্শনীয়। শালগ্রামের মধ্যে চামুণ্ডেশ্বরীর মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। নবরত্নগর্ভ-গজানন, স্ববর্ণ শ্রীচক্র, স্ফটিক মেরু শ্রীচক্র তথায় রৌপ্যসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। এই সকল বস্তু শঙ্করাচার্য সুরেশ্বরাচার্যকে প্রদান করিয়াছিলেন।

স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ আমাদিগকে বিশেষ আগ্রহের সহিত উক্ত নৃসিংহবনে লইয়া যান। স্বামীজী তখন তুঙ্গভদ্রায় স্নানার্থ গমন করিতেছিলেন। তিনি অল্পগ্রহ করিয়া আমাদের সহিত কিছুকণ আলাপ করিলেন। স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের পিতার নাম ব্রহ্মরাক্ষা নামান্তর গোপী শাস্ত্রী এবং মাতার নাম লক্ষ্মা গাঙ্গ। তাঁহার পূর্বাশ্রমের পিতার বোলটি সন্তানের মধ্যে তিনি চতুর্দশ, একমাত্র স্বামীজী ব্যতীত তাঁহার পূর্বাশ্রমের ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে আর কেহই জীবিত নাই। ইনি সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব নৃসিংহ ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

উৎসব : বৈশাখ মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে শুক্লা পঞ্চমী পর্যন্ত পাঁচ দিবসব্যাপী আদি শঙ্করাচার্যের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এতদ্ব্যতীত বৈশাখ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে গিরিজা-কল্যাণোৎসব ও প্রতিপদ দিবসে সারদাদেবীর মহাভিষেকোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আবার পূর্ণিমাতে

চাতুৰ্মাস্ত সঙ্কলোৎসব হয়, ভাদ্রী অমাবস্যাৰ আবার শ্রীসারদা-দেবীৰ মহাভিষেক উৎসব হয়, আশ্বিন মাসেৰ শুক্লা প্ৰতিপদ হইতে পনৰ দিবসকাল বিবিধ উৎসব হইয়া থাকে ; ইহাৰ মধ্যে পঞ্চমীতে চণ্ডীশালা-প্ৰবেশ, নবমীতে চণ্ডীহোম, একাদশীতে সারদাদেবীৰ রথোৎসব ও পূৰ্ণিমাতে নৌকা-বিহাৰ উৎসব হয়। কাৰ্ত্তিকী শুক্লা তৃতীয়ায় ধ্বজারোহণোৎসব, শুক্লাষ্টমীতে রথোৎসব ও নবমীতে ভাসানোৎসব হইয়া থাকে। শিবৰাত্ৰিৰ সময় মল্লিকাজুৰ্নেৰ রথোৎসব অল্পপ্ৰতিষ্ঠিত হয়।

মল্লিকাজুৰ্ন : শুদেৱী মঠেৰ অনতিদূৰে ও উত্তৰাভিমুখে একটা শৈলোপৰি মল্লিকাজুৰ্ন-শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছে। উক্ত শৈলে আরোহণ কৰিবার জন্য ১৬০টি সোপান আছে। মল্লিকাজুৰ্ন মন্দিৰেৰ সম্মুখে এক পাৰ্শ্বে একটা শিলালেখ দৃষ্ট হয়। মন্দিৰটি পূৰ্বাভিমুখী—পৰ্বত হইতে চতুৰ্দ্দিকে অত্যুচ্চ নীল শৈলমালা ও হৰিধ্বজ বনৰাজি-শোভিত উপত্যকাসমূহ দৃষ্ট হয়। মল্লিকাজুৰ্ন মন্দিৰেৰ প্ৰাকাবেৰ মধ্যে দক্ষিণ দিকেও একটা শিলালেখ আছে। উহা দেবনাগৰী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

মল্লিকাজুৰ্ন মহাদেবেৰ পৰিক্ৰমাৰ পথে পূৰ্বদাৰেৰ উত্তৰ পাৰ্শ্বে স্বয়ম্ভূ-গণপতি একটা স্তম্ভগাত্ৰ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই স্তম্ভটি দেখিতে শুদেৱী মঠেৰ প্ৰাঙ্গণস্থ সারদাদেবীৰ মন্দিৰেৰ সম্মুখস্থ এবং উড়ুপীৰ বডভণ্ডেৰেৰ মন্দিৰেৰ সম্মুখস্থ জৈন স্তম্ভেৰ স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহা সম্ভবতঃ জৈন স্তম্ভই হইবে।

মল্লিকাজুৰ্ন বিভাগক ঋষিৰ আশ্ৰমস্থ অৰ্চন লিঙ্গ বলিয়া খ্যাত। স্থানীয় অৰ্চকগণ বলেন, এই লিঙ্গ হইতে মহাদেব প্ৰকটিত হইয়া বিভাগক ঋষিকে দৰ্শন দিয়াছিলেন এবং বিভাগক এই লিঙ্গেৰ সহিত ঐক্য লাভ করেন।

মহাদেবেৰ ‘মল্লিকাজুৰ্ন’ নাম হইবাৰ একটা বিশেষ কাৰণ আছে। মহাদেব অজুৰ্নেৰ তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাৰ বীৰত্ব পৰীক্ষা কৰিবাৰ জন্য কিৰাতবেশে অজুৰ্নেৰ সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অজুৰ্ন ব্যাধৰূপী সেই মহাদেবেৰ উপৰ বাণ বৃষ্টি কৰিতে থাকিলে ব্যাধৰূপী মহাদেব তাহা অতিশয় প্ৰসন্নচিত্তে স্বীয় অঙ্গে ধারণ কৰিয়া অক্ষত শৰীৰে পৰ্বতেৰ ন্যায় অচল ছিলেন।* শিব অজুৰ্নেৰ বাণ মল্লিকাপুষ্পেৰ স্তায় সুকোমল বস্তু ৰূপে ধারণ কৰিয়াছিলেন বলিয়া শিবেৰ নাম মল্লিকাজুৰ্ন হয়। অজুৰ্নেৰ বীৰত্ব দেখিয়া শিব তাঁহাকে পাশুপত অস্ত্ৰ

প্ৰদান করেন। উক্ত পৰ্বতেৰ উপৰ মল্লিকাজুৰ্ন মহাদেব স্থাপিত হওয়ায় পৰ্বতেৰ নামও ‘মল্লিকাজুৰ্ন’ হইয়াছে। শুদেৱী মঠেৰ দ্বাৰাই মল্লিকাজুৰ্ন মন্দিৰ পৰিচালিত হয়।



শশিগ আদি শঙ্করাচাৰ্যেৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি

শুদেৱী মঠেৰ আয় : শঙ্করাচাৰ্যেৰ অলৌকিক প্ৰতিভা ও যশঃসৌভে আকৃষ্ট হইয়া ক্ৰমে ক্ৰমে তদানীন্তন বহু ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাজন্যবৃন্দ শুদেৱী মঠেৰ শ্ৰীবুদ্ধিৰ সহায়ক হন। কিন্তু ঐ সকল দানেৰ স্মাৰক কোনও প্ৰমাণ ৰক্ষিত হইতে পাৰে নাই। ১৩৪৬ খ্ৰীষ্টাব্দে ৰাজা প্ৰথম হৰিহৰ শুদেৱী মঠেৰ জন্য ৰাজস্ব, ভূমি ও গ্ৰামাদি দান কৰিয়া তাহা শিলালেখৰ মধ্যে উল্লেখ কৰিয়া যান। তাহা হইতেই শুদেৱী মঠেৰ দানভাণ্ডাৰেৰ প্ৰথম ৰক্ষিত প্ৰমাণ পাওয়া যায়। যখন বিজয়নগৰেৰ ৰাজা শুদেৱী মঠেৰ বিশেষ পৃষ্ঠপোষক হইলেন, তখন ৰাজমুদ্ৰাঙ্কিত বহু প্ৰকাৰ উপঢৌকন শুদেৱী মঠেৰ ধনকোষকে আৰণ্য সমৃদ্ধ কৰিয়া তুলিল। বিজ্ঞানস্বৰূপ ও বিদ্যাৰণ্যেৰ প্ৰচাৰ এবং ৰাজা প্ৰথম হৰিহৰেৰ পৃষ্ঠপোষকতা দৰ্শনে অজ্ঞান ৰাজস্বৰ্গ ক্ৰমশঃ শুদেৱী মঠেৰ সহায়ক হইতে থাকিলেন। এই ভাবে খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীৰ প্ৰাৰম্ভে শুদেৱী মঠ নিৰ্বাঢ় ও স্থায়ী ভাবে ৰাজস্ব, ভূমি, গ্ৰাম এবং নানাপ্ৰকাৰ অধিকাৰ ভোগ কৰিতে লাগিলেন। শুদেৱী একটা দুৰ্গম পাৰ্বত্য কান্ধাৰে অবস্থিত। স্তত্ৰাং সেই বিপুল ভূসম্পত্তি ৰক্ষণাবেক্ষণ এবং প্ৰজাদেৰ সহিত ভূসম্পত্তিৰ মালিক মঠাধীশগণেৰ

* মহাভাৰত বনপৰ্ব ৩৫ অঃ (মঃ মঃ ক্ৰীষ্ণদাসঃ সিদ্ধান্তবাগীসঃ সংস্কৰণ) ও শিবপুৰাণঃ জ্ঞানসংহিতা ৬৭ অধ্যায় (বঙ্গবাসী সং ১৩১৪ বঙ্গাব্দ ক্ৰষ্টব্য)

তথা দাতৃগণের সহিত মঠাধীশগণের পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের অভাবে তাহাদের স্ব স্ব অধিকারগত নানা প্রকার বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। শিবাল্লানায়েক নামক একজন কর্মকুশল ব্যক্তির প্রয়াসে প্রজা, জমিদার ও মঠাধীশগণের স্বাধাযথ অধিকার নির্ণীত হইয়া বিবাদ মীমাংসিত হইয়া যায়।

যখন হায়দার আলি ও টিপু সুলতান মহীশূর রাজ্যের অধিকারী হইলেন, তখন তাঁহারাও শৃঙ্গেরী মঠ সম্বন্ধে বিজয়নগরের পূর্বতন রাজস্ববর্ণের আদর্শের সম্মান করেন। তাঁহারা শৃঙ্গেরী মঠে সম্পত্তি প্রভৃতি দান করিয়া উক্ত

প্রতিষ্ঠানের ধর্মসংক্রান্ত অধিকারসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। এমন কি, তাঁহারা মঠের উৎসবদির ব্যাপারেও আত্মকূল্য করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, তাঁহারা তদানীন্তন মঠাধীশগণের সহিত পত্রাদি ব্যবহারও করিতেন।

মহীশূরের কোনও রাজা শৃঙ্গেরীর মঠাধীশকে মাসিক এক সহস্র টাকা করিয়া প্রণামী দিতেন। বর্তমানে শৃঙ্গেরী জায়গীরের আয় বাৎসরিক প্রায় তিন লক্ষ টাকা। এখনও গবর্ণমেন্ট নাকি মঠের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

কল্যাণী

শ্রীগোপাললাল দে

একদা শঙ্খের নাদে, বাঁশী-সুরে তুমি এস গেহে,
নত আঁখি, শুচিন্মিতা শাস্ত পদে দ্রুত দ্রুত হিরা,
সীমন্তে সিন্দূরলেখা 'লজ্জাবাসে' আবরিত দেহে,
মোদের স্বাগত স্নেহ সেই ক্ষণে রহিল ঘিরিয়া।

দিনে দিনে ধীরে ধীরে বিথারিলে তোমার মহিমা,
আপনে করিয়া পর, বাড়াইলে আপনার সীমা;
শাখা মেলি ফুলে ফলে প্রাণময়ী কুঞ্জবীথি খানি,
সেবায় সার্থক করি নিরলস সাজাইলে রাণি।

তোমাতে হেরিছ রোগে শয্যাপার্শ্বে জাগিছ যামিনী,
উৎসবে উল্লাসময়ী উদাসিনী নিজস্ব পানে,
জননী আত্মীয়া জায়া নর্ম-সখী মুখে হাসি আনি,
ব্যস্ত আছ অবিরত গৃহস্থের মঙ্গল-বিধানে;

দীর্ঘ জীবনের পথে স্থখে দুঃখে সৃষ্টির সঙ্গিনী,
ফাস্তনের শ্রাম শোভা মিলাইছ আবেশের দানে।

রোমন্থন

শ্রীবেণু গঙ্গাপাধ্যায়

আমারে রেখেছ তুমি যৌবনের উপাসক করি,
লীলায়িত দেহ-পাত্র পূর্ণ প্রেমে করে টলমল,
অতঃপর দাহ সে কি চলিয়াছে যুগ যুগ ধরি ?
সম্মুখে গভীর সিদ্ধ, তবু যেন নাই বিন্দু জল।

বিহ্বল নয়নে জাগে অতন্ত্রিত মধু পৌর্ণমাসী,
পরশ বভসে কাঁপে দারা অঙ্গ মুগ্ধ শিহরণে,
ইজ্জৎহু রচা মন ক্ষণে ক্ষণে হয় যে উদাসী।
চুষন-মদিরা আজো থেকে থেকে পড়ে যে স্রবণে।

কি রহস্য নাহি জানি উছলিছে স্নিগ্ধ দুটি চোখে,
আলুলিত কেশপাশ স্বপ্নাতুর করে যে গো মোরে,
মর্মের গোপন কথা ফিরে পড়ি প্রেমের আলোকে।
হাস্তে, লাস্তে, মমতায় বাঁধিয়াছ দুটি বাহুডোরে।

স্রবণের কুঞ্জে মন আজো ফেরে করে মাধুকরী,
প্রৌঢ়ত্বের দ্বারদেশে শুনি যেন যৌবন-বাঁশরী।



ভারতের সামাজিক সমস্যার এক দিক

শ্রীবিষ্ণুভট্ট ভট্টাচার্য, এম-এ

ভারতবাসী আজ চরম সঙ্কটে কাল যাপন করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পরও দেখা যায় সমাজের কোন উন্নতিই হয় নাই। সমাজের অগ্রগতির বাধা অনেক। লোকসংখ্যা যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তদনুপাতে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর। রাষ্ট্রবিপ্লবের পর দেশে যে সকল অভিনব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধান করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। দেশে আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বাসস্থান নাই, জীবিকার সংস্থান নাই, ভারতীয় নাগরিকের সামাজিক চেতনা নাই। জাতীয় জীবনের এই ঘোর তমসাক্ষর অমারজনীতে উজ্জল ভবিষ্যতের আলোক-বর্তিকা বহন করিয়া পথ নির্দেশ করিবে কে? পথ কোথায়?

কেবলমাত্র রাষ্ট্রনায়কদের প্রচেষ্টায় জাতি এই সংকট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। বাহাদুর লইয়া এই সমাজ গঠিত, সেই নাগরিকবৃন্দের প্রত্যেকে যদি অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী হয় তবেই রাষ্ট্রনায়কদের সাধু প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে নাগরিকদের স্বভাব নির্ভর করে সমাজের অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলির গঠন ও প্রকৃতির উপর। পরিবার ও সমাজের সম্বন্ধ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থানের মধ্যে ভিন্ন-প্রকৃতির পরিবারের উদ্ভব ও সেই পরিবারের স্বরূপ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকগণের কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই তত্ত্বগুলি সধক্ষে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের দেশীয় পরিবার-গুলির প্রকৃতি নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। দেশে প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও কেন জনসাধারণের উন্নতি হইতেছে না? সাধারণের উৎসাহ, উদ্বীপনা, প্রাণশক্তির কেন এত দৈন্ত? ইহার সহিত আমাদের পরিবারের গঠন ও প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা চিন্তা করার আজ প্রয়োজন আসিয়াছে।

প্রথাভাষ্য সমাজতাত্ত্বিক ল্য প্লে ও তাঁহার অনুবর্তীদের মতে পরিবারগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে-ভাগ করা যায়—বর্জপ্রধান পরিবার, অস্থায়ী পরিবার ও ব্যক্তিপ্রধান পরিবার।

বর্জপ্রধান পরিবারে পিতা অথবা গোষ্ঠীর প্রধান সর্বময়

কর্তা। বিবাহিতা কন্যা ছাড়া সকল পুত্রকন্যাই এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করে। নিতান্ত নগণ্য দ্রব্য ভিন্ন এই পরিবারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছু থাকে না, সবই পরিবারের সাধারণ সম্পদ। ব্যক্তি সমাজদেহের একটি অঙ্গ মাত্র। তাহার নিজস্ব কোন সত্তা থাকে না। এইরূপ পরিবার শিশুদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখানে শিশুরা নিজের উপর নির্ভর না করিয়া পরিবারের উপর এবং চিরাচরিত সামাজিক রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা পায়। ফলে এই প্রকার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ রক্ষণশীল হইয়া পড়ে এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অতীতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের উপর পরিবারের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। যে সমস্ত স্থানে জীবিকার জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না, সেই সকল স্থানেই কর্তৃপ্রধান পরিবারের অস্তিত্ব দেখা যায়। পরিবারের খাদ্য, পরিচ্ছদ, আবাস প্রভৃতির উৎকর্ষ যে কি পরিমাণে ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল 'দেমোলি' সাহেব টেপস্ অঞ্চলের পরিবারের স্বরূপ-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় দেখা যায়, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত দুগ্ধ ও মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, কারণ ঐ অঞ্চলে তৃণভোজী পশুর অভাব নাই। ঐ খাদ্য সংগ্রহ করিতে অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না; এক-একটি পরিবার সহজেই নিজ খাদ্যের সংস্থান করিতে পারে। যাযাবর জীবন যাপন করিতে হয় বলিয়া প্রত্যেক পরিবার পশুচর্যনির্মিত তাঁবুতে বাস করে। গোচারণ ঐ অঞ্চলের অধিবাসীর জীবনধারণের উপায়। তাই এক স্থানে তাহারা অধিক দিন একত্র বাস করিতে পারে না। সমগ্র দেশ তাই সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব থাকে না। পরিবারের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তিত্ব কর্তার প্রতি আত্মগত্যে পরিণতি লাভ করে।

মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার হুগম অরণ্যে অস্থায়ী পরিবারের অস্তিত্ব দেখা যায়। বন্য জীবজন্তু শিকার দ্বারা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকার সংস্থান হয়। এই শিকার এতই অনিশ্চিত যে, ইহার উপর নির্ভর

করিয়া একত্র অনেক প্রাণীর চলিতে পারে না। তাই মাত্র স্বামী ও স্ত্রী লইয়া এখানকার এক-একটি পরিবার গঠিত। শিশুগণকে শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করা মাত্রই নিজেদের আহাৰ্য সংগ্রহের জন্য পরিবারের বাহির হইয়া পড়িতে হয়। কাজেই এখানে স্থায়ী কোন বৃহৎ পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই প্রকার পরিবারে জ্যেষ্ঠদের প্রতি কনিষ্ঠদের কোনরূপ আত্মগত্যা স্বীকার করিতে হয় না।

ব্যক্তিপ্রধান পরিবারের উৎপত্তি, তাহার কারণ ও বিকাশ সম্বন্ধে হ্যারি ডি তুরভিয় (Henri de Tourville) বিশেষ ভাবে গবেষণা করেন। তাঁহার মতে নরওয়ের ফ্রিও অঞ্চলে, অপ্রচুর উর্বর ভূমিতে এই প্রকার পরিবারের উদ্ভব। মৎস্য শিকার এই অঞ্চলের অধিবাসীর প্রধান উপজীবিকা। উপরন্তু কৃষিকার্যের সাহায্যে স্বামী, স্ত্রী ও পরিবারের কতিপয় শিশুর ভরণ-পোষণ কোনক্রমে সম্পন্ন হয়। কৃষিযোগ্য ভূমি উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় এইরূপ অঞ্চলে বৃহৎ পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদিগকে তাই পরিবার ত্যাগ করিয়া অন্তর্য জীবিকার সন্ধানে যাইতে হয়। ভৌগোলিক অবস্থান অল্পরূপ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে এইরূপে উদ্যমশীল, আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলে। ভূমিকর্ষণের দ্বারা জীবিকা অর্জনের ফলে ভূমিখণ্ডের উপর এক-একটি পরিবারের অধিকার স্থাপিত হয়। প্রত্যেকটি পরিবার আত্মনির্ভরশীল বলিয়া প্রয়োজনবোধে তাহারা সমাজবন্ধনস্থজে আবদ্ধ হইলে শুধনই গণতন্ত্রের সূচনা দেখা দেয়।

প্রত্যেক প্রকার পরিবার নিজ প্রকৃতি অনুসারে শিশুদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। কর্তৃপ্রধান পরিবারে শিশুরা পরিবার বা গোষ্ঠীর প্রধানের আশ্রয়ে পরম শান্তিতে বসবাস করে। তাহাদিগকে সমগ্র পরিবারের জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সমস্তই উৎসর্গ করিতে হয়। তাহারা পরিবারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সমাজের জন্ত তাহারা নিজ ব্যক্তিগত সত্তা হারাইয়া ফেলে। অল্প-সংস্থানের জন্যও তাহাদিগকে কোন চিন্তা করিতে হয় না, পরিবারের কর্তা তাহাদের ক্ষুদ্রিত্বের ব্যবস্থা করিবেন। কোন কারণে কোন ব্যক্তি যদি সমাজ হইতে বাহির হইয়া পড়ে তবে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিলেও পরিবার তাহাকে নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দেয়। এই প্রকৃতির পরিবারে শিশুদিগকে বিশেষ শিক্ষাদানের কোন প্রয়োজন হয় না। সামান্যতম শিক্ষার ব্যবস্থাও যদি করা হয় তবে পরিবারেরই কেহ অথবা ধর্মযাজক বা পুরোহিত-

গণই তাহা করেন। এই প্রকার পরিবার লইয়া যে সমাজ গঠিত তাহা নিঃসন্দেহে রক্ষণশীল হইয়া পড়ে। জড় স্থাপত্য সেই সমাজ; প্রগতির কোন সম্ভাবনাই সেই সমাজে থাকে না।

অস্থায়ী পরিবারে শিশুদের শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকে না। কর্তৃপ্রধান পরিবারের তায় এই পরিবারের শিশুদিগকে কর্তৃ বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না, আবার কোন নতুন ভাব-ধারণার অনুপ্রাণিতও করা হয় না। এই পরিবারে কাহারও আত্মগত্যের প্রত্যাশা করা হয় না অথচ তাহাকে নিজের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকে না। কোন বিশেষ শিক্ষা না পাওয়ার শিশুরা কোন কাজ করিতে শিখে না, স্বতরাং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাহারা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে।

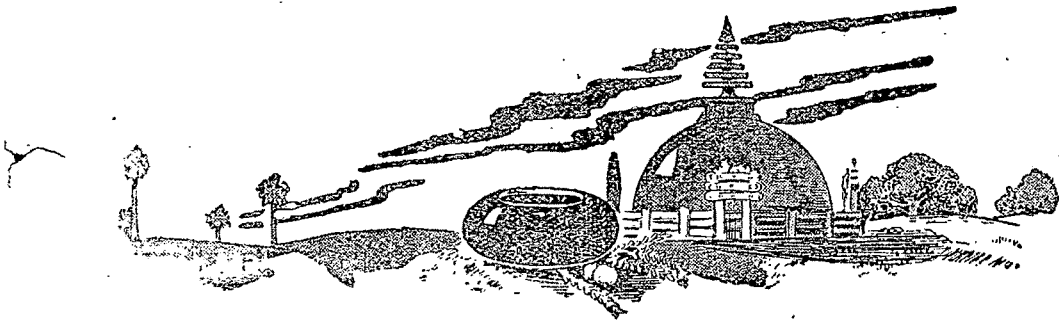
ব্যক্তিপ্রধান পরিবারে শিশুরা যাহাতে নিজ জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা হয়। শিশুর অন্তঃপ্রকৃতির বৃত্তিগুলি এই পরিবারে পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে। নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত চলিতে পারে। সমাজবন্ধনে জড়িত হইলেও নিজ নিজ স্বাভাব্য যাহাতে বিলুপ্ত না হয় ব্যক্তি তাহার দিকে লক্ষ্য রাখে। কোন লোক নিজেদের কোন বিষয়ে পরিবার, গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রের দিকে তাকাইয়া নিশ্চেষ্ট থাকে না। এই পরিবারে ব্যক্তিকে প্রধানত নিজ শক্তিসামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাস্তব জীবনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, এই পরিবারে সেইরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই করা হয়। শিশুগণ পরিবারের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় না, শৈশব হইতেই তাহাদিগকে প্রাপ্তবয়স্কদের অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। এই প্রকার ব্যবহারের ফলে পরিণত বয়সে তাহারা আত্মনির্ভরশীল, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। শিশুদের মধ্যে উৎসাহ, প্রাণপ্রাচুর্য, উদ্দীপনা, জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার প্রেরণা ও সাহস প্রভৃতি গুণের সঞ্চার হয়। শৈশবকাল হইতেই বাস্তব জীবন সম্পর্কে তাহাদের পরিচয় হওয়ার ফলে তাহারা সাহসের সহিত সর্ববিধ সমস্তার সম্মুখীন হয়। জীবিকার সন্ধানে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িতে ইহারা বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া ভিন্ন প্রকৃতির কোন পরিবারের সহিত সংঘাত উপস্থিত হইলে পরিণামে ইহারাই জয়লাভ করে। ইংলণ্ডের সমাজ এই ব্যক্তিপ্রধান পরিবার লইয়াই গঠিত। তাই ইংরেজগণ সমগ্র পৃথিবীতে এতকাল আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ

হইয়াছিল। যদিও অন্যান্য সমাজের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে খর্ব হইয়াছে, তবু সমগ্র পৃথিবীতে আজ ইংরেজ-মার্কিন সমাজের প্রতিপত্তি অপরিণীম।

এইবার ভারতীয় সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, এই সমাজ কর্তৃপ্রধান পরিবার লইয়া গঠিত। ভারতভূমি স্কন্ধলা স্কন্ধলা বলিয়া এখানে জীবিকার সংস্থান করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। তাই ধীরে ধীরে এখানে এই প্রকৃতির পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে; এখানে পরিবারের সকলেই পরিবার বা গোষ্ঠীর প্রধানের আশ্রয়ে থাকিয়া বসবাস করে। বাংলায় সাধারণতঃ স্ত্রীপুত্র পরিবারের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও উত্তর-ভারতে এইরূপ অনেক পরিবার রহিয়াছে। প্রবাদ আছে, যুক্তপ্রদেশের কোন একটি পরিবারের জন্য প্রস্তুত একটি ডালের পাত্রে কয়েকটি বালক ডুবিয়া মারা যায়। এই প্রবাদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট থাকিলেও সেই পরিবারের আকারটি কল্পনা করিয়া দেখিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের এই সমস্ত পরিবারে শিশুদের কোন পৃথক সভা থাকিতে পারে না। সর্ববিধ ব্যাপারে পরিবারের প্রধানের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া শিশুরা আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে শিখে না। তাহাদের অধিকাংশ সময় বিনা কাজে অথবা পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট কোন কাজে কাটিয়া যায়। শিশুদের জন্য আদৌ কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। সামান্য কয়জনের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাও প্রায়ই তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতির বৃত্তিনিচয়ের স্বয়ম বিকাশের অল্পকূল হয় না। এই শিক্ষালাভের পর

জীবন-সংগ্রামে রত হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে ব্যর্থ হইতে হয়। কিছু দিন পূর্বেও ভারতবর্ষে অল্পসমস্ত্রী এত ভয়ঙ্কর আকারে দেখা দেয় নাই। বর্তমানে পরিবারের প্রত্যেকের অমের সংস্থান করা দুঃসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। উপার্জনক্ষম একটিমাত্র প্রাণীর উপর নির্ভর করে বহু লোকে। এমন পরিবারের সংখ্যা এদেশে নিতান্ত কম নয়। আবার শিশুগণও এমন কোন শিক্ষা পায় না যাহাতে পরিণত বয়সে তাহারা সাফল্যের সহিত বর্তমানের কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইতে পারে। ফলে দেশে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে।

পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে আজ নবজাগরণের সাত্তা পড়িয়াছে। ভারতও আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। আইনের দৃষ্টিতে ভারত আজ সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। কিন্তু দেশের যে সমাজ-ব্যবস্থা তাহাতে কেবলমাত্র রাষ্ট্রনায়কদের প্রচেষ্টায় দেশ দ্রুত প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আজ দেশের উন্নতিকল্পে সমাজ-নায়কদেরও দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে। তাহাদিগকে বর্তমান সমাজ এমন ভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিপ্রধান পরিবারের শিশুদের যত আমাদেরও শিশুরা স্বাধীনচিত্ত, আত্মনির্ভরশীল, কর্মনিষ্ঠ এবং অক্ষরশ্রুত প্রেরণা ও দুর্দম প্রাণশক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। সমাজে ব্যক্তিস্বাভাব্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই তাহা দেশকে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে। নচেৎ দুর্বলচিত্ত উন্মত্তমবিশীন, পরভূৎ শিশুরা দেশ ও সমাজের অগ্রগতিতে প্রতি পদক্ষেপে বাধার সৃষ্টি করিবে।



বালাীকি-রামায়ণে রামচরিত্র

শ্রীঅরীজজিৎ মুখোপাধ্যায়

রামচন্দ্রকে অনেকেই ভগবান বলিয়া মানেন এবং তিনি ভগবানের দশ অবতারের এক অবতার বলিয়া গণ্য। মহাত্মাজীর রামধ্বনে তিনি স্বয়ং ভগবান। হিন্দুর ক্ষাত্র-শক্তির পূর্ণ বিড়ম্বনার যুগে রচিত ‘রামচরিতমানসে’ গোস্বামী তুলসীদাস বলিতেছেন :

কনিয়গে ন করম ভগতি বিবেকু,
রাম নাম অবলম্বন এঁকু।

কৃত্তিবাসের অবস্থা তথৈবচ।

বালাীকি-রামায়ণ পড়িলে আসলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম বলিয়া মনে হয়। সেখানে আমরা দেখি জিগীষু আর্ধ্য-সভ্যতা ও সেই সভ্যতার প্রধান পুরুষ রামচন্দ্রকে অগ্র মূর্তিতে। উত্তর-ভারতের অনেকখানির উপর আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া আর্ধ্যগণ তখন ক্রমে দক্ষিণাপথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আর্ধ্যগণের প্রধান রাজ্য কৌশল এবং রাজ্যের নগরীর নাম অযোধ্যা—যুদ্ধে অজেয় বলিয়াই অযোধ্যা নাম। মহারাষ্ট্র-বিবর্দ্ধন দশরথ অযোধ্যার রাজা। অযোধ্যা নগরী কপাট-ভোরণ-সমন্বিতা সুবিভক্ত-ক্ষুদ্র-পথ-শোভিতা, শত শত শতাব্দী প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে সজ্জিতা এবং গভীর জলে পূর্ণ পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। ইহার পরে আছে অযোধ্যার সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা।

অযোধ্যার দক্ষিণে গাজ্জয় অঞ্চল তখন জলস্থলময় এবং অনাৰ্য্য নিষাদপতি গুহকের রাজ্য। কৈবর্ত-চালিত পঞ্চ শত নৌকা তাঁহার নৌবল; মৎস্য মাংস ও মধু তাঁহার উপঢৌকন দ্রব্য। গঙ্গার দক্ষিণে চিত্রকূট; তাহার কিছু দক্ষিণ হইতেই গভীর দণ্ডকবনের আরম্ভ। দণ্ডকবন আসলে অনাৰ্য্য রাক্ষসজাতির রাজ্য এবং ইহার উত্তরাংশ জনস্থানে রাবণের আধিপত্য তখনও বিদ্যমান। খর প্রভৃতি রাবণের আত্মীয়গণ সৈন্যে ঐ সব অঞ্চলে বিরাজমান। কিন্তু আৰ্য্য সংস্কৃতির অগ্রদূত ঋষি তপস্বীরা ইতিমধ্যে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণে বহু দূর পর্য্যন্ত আপনাদের আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। মনে হয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রের সহিত শস্ত্রেরও কারবার করিতেন। ফলে অনাৰ্য্য রাক্ষসদের সহিত তাঁহাদের ঠোকাঠুকি হইতেছে এবং পশ্চাতে আসিতেছেন ক্ষত্রিয় রাজারা সৈন্যে অশ্ব-যোজিত রথে চড়িয়া, লৌহ-বর্ষাবৃত দেহে ধনুকে লৌহ-মুখ তীর জুড়িয়া। তাঁহাদের সৈন্যদলও

অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত এবং উন্নততর অস্ত্রশাস্ত্রে সজ্জিত। ফলে অনাৰ্য্যেরা পিছু হটিতেছে এবং আৰ্য্যেরা রক্তাক্ত ভূমির উপর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন।

সংক্ষেপতঃ ইহাই বালাীকি-রামায়ণের পটভূমিকা এবং সেই পটভূমির পুরোভাগে আমরা পাই একান্ত মানবীয় ও নানা লৌকিক সদগুণসম্পন্ন, স্বধর্ম ও স্বজ্ঞানগণের রক্ষক শত্রু-নিহন রামচন্দ্রকে। কতকগুলি অবাস্তব ও অসংলগ্ন অংশ ছাড়া আদি রামায়ণে আখ্যানভাগে কোথাও রামচন্দ্রের উপর দেবত্বের আরোপ করা হয় নাই। আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বারটি শ্লোকে রামের যা বর্ণনা আছে তাহাতে অতি-মানবত্ব কোথাও নাই :

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ
সমুজ্জ ইব গান্ধার্যে ধৈর্যেন হিমবানিব।
বিষ্ণুনা সদৃশো বীৰ্য্যে সৌমব্যঃ প্রিয়দর্শনঃ
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
ধনদেন সমন্ত্যানে সত্যো ধর্ম ইবাপরঃ

ইহাই সংক্ষেপতঃ তাঁহার পরিচয়। নরশাৰ্দূল, মহাবাহু, রাজীবলোচন, লক্ষণাগ্রজ, কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন ইত্যাদি রামের সাধারণ বিশেষণ। আদি রামায়ণে রামের অল্পভূতি ‘প্রক্ষেপ্ত’ (emotion), কল্পনা, বাসনা, ব্যবহার ও চেষ্টা সব কিছুই লৌকিক ও মনুষ্যোচিত। রণক্ষেত্রে আহত লক্ষণের জন্য তাঁহাকে একাধিক স্থানে সাধারণ মানুষ্যের মত শোক প্রকাশ করিতে দেখা যায়।

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বাহুবাবঃ
ভক্ত দেশং ন পশ্যামি বহু ভ্রাতৃসহোদরঃ।

রামায়ণের এই শ্লোক আজ অনেকেরই পরিচিত। সীতা-হরণের পর তাঁহার তীব্র শোক ও অস্থিরতার বর্ণনা একাধিক স্থানে আছে। অধিকাংশ স্থলে এই সব বর্ণনার পশ্চাতে আছে প্রাকৃতিক পটভূমিকা। এই সব স্থলে রামের শোক ও আচরণ নিতান্ত মানবোচিত এবং অপূর্ণ কাব্যসুধময় মণ্ডিত :

“বাচি বাত বতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্টা মামপি স্পৃশ
যয়ি মে গাজসংস্পর্শক্ষেত্রে দৃষ্টি-সমাগমঃ।”

সীতা-হনুমান-সংবাদে হনুমান বলিতেছেন, “রাম আপনার বিরহে মধু ও মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছেন, নিত্য আপনার ধ্যান করিতেছেন, সর্বদা এত অন্যমনস্ক থাকেন যে গাজে মশক ও মক্ষিকা বসিলেও অনেক সময়ে সাড় হয় না।” সুপ্ননখার সহিত কথোপকথন এবং লঙ্কা হইতে

উদ্ধারের পর সীতার সমক্ষে তাঁহার মনোভাবের প্রকাশ সকলই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মানবোচিত। স্ত্রীষ্যের প্রতিজ্ঞা পালনে বিলম্ব দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ; সমুদ্রকূলে আসিয়া সমুদ্রের অগাধত্ব ও হস্তরত্ন অল্পভব করিয়া তিনি হতাশায় মূহমান। কাব্য রচনা করিতে গেলে ইহাই চাই; কাঠের পুতুল লইয়া কাব্য হয় না। তবে সব-কিছুর উপরেই আছে তাঁহার মহামানবোচিত ধৈর্য, দৃঢ়তা ও শৌর্য বাহা পরিণামে সমস্ত আলোড়ন ও চঞ্চলতার মধ্য দিয়া তাঁহাকে মহাজনোচিত কর্তব্যের পথে পরিচালিত করিতেছে।

কিন্তু শুধু ত্রায়ধর্মপরায়ণ হইলেই হয় না। ব্যবহারিক জীবনে দক্ষতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। মহাকাব্যের নায়ক শুধু উদাত্ত নহেন, তিনি চতুর অর্থাৎ কর্ম-কৌশল-সম্পন্ন। তাই দেখি ‘সত্যে ধর্ম ইবাপর’ রামচন্দ্র কর্ম-কুণল, রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ। বালী ও স্ত্রীষ্যের বিবাদের স্বযোগ লইয়া তিনি স্ত্রীষ্যের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজেকে সহায়-সম্পন্ন ও সৈন্যবলে বলীয়ান করিলেন। বালী-বধের সমর্থনের জন্য তিনি—ভরত পৃথিবীর রাজা স্তবরাং ভরতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বালীকে অগম্যাগমনের জন্য শাস্তি দিতেছেন ইত্যাকার সাফাই গাহিলেন। অধিকন্তু বলিলেন, বানরের সহিত ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজন নাই এবং শেষটায় বুঝাইলেন রাজাকে হিংসা, নিন্দা বা অপমান করা, কিংবা অপ্রিয় বলা উচিত নয়; কেননা ‘দেবা মনুষ্যরূপেণ চরন্ত্যেতে মহীতঙ্গা’। ‘ভেদ চতুরঙ্গ রাজনীতির অঙ্গ; স্তবরাং এইসব যুক্তি প্রয়োগ করিয়া শাস্ত্রমতে রামচন্দ্র বোধ হয় ধর্মদ্রষ্ট হন নাই। অথচ সমস্ত রামায়ণ পড়িলে বেশ বুঝা যায়—দাক্ষিণাত্যে তখন আর্য-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; বিভিন্ন অনার্যেরাই ছিলেন সেখানকার রাজা। দাক্ষিণাত্যের ভূগোল সম্বন্ধে রামচন্দ্রের পরিচয় ছিল নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও অস্পষ্ট। এমন কি রাবণ বা লঙ্কার সংবাদও তিনি রাখিতেন না। রামের সৈন্যপত্ন্যের পরিচয়ও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। লঙ্কা হইতে প্রত্যাগত হনুমানের নিকট তিনি রাবণের দুর্গ ও বলাবল সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ লইতেছেন। পরে লঙ্কা অবরোধ করিয়া তিনি শত্রুপক্ষের সেনা-সংস্থানের উপর লক্ষ্য রাখিয়া যথোপযুক্ত যুদ্ধ-পরিচালনা করিতেছেন এবং তাহাদের আক্রমণের গতি ও প্রকৃতি অল্পমান করিয়া বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ রণকৌশল নির্দ্ধারিত করিতেছেন। পর্বতের উপর অবস্থিত এবং প্রাচীর ও পরিখা-বেষ্টিত লঙ্কা জয় করা সহজসাধ্য ছিল না। অস্ত্রবলে

নিকট হইলেও রামচন্দ্রের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক। রাক্ষসেরা প্রাচীরের উপর হইতে মুক্ত অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিত এবং মাঝে মাঝে বাহির হইয়া অতিক্রম করিত। স্ত্রীষ্য অবরোধের পর অবশেষে রামচন্দ্র লঙ্কা-নগরীকে করতলগত করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্যময়ী মহানগরীকে লুণ্ঠন করিবার লোভে বানরসৈন্য দীর্ঘকাল সংহত থাকিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিল।

আগলে রামচন্দ্র সে যুগের আর্য-আধিপত্য-বিস্তারের অগ্রণী। নিজের আর্য দ্বিজসম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের তিনি পৃষ্ঠপোষক এবং তাহাদের সঙ্গে আচরণে তিনি ন্যায়ধর্মপরায়ণ—‘রক্ষিতা স্বস্ত্র ধর্মস্ত স্বজনস্ত চ রক্ষিতা’। সমাজ উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট না হয় এজন্য তিনি লঙ্কা-জয়ের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষা করাইলেন এবং দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষার দাবি করিয়া তাঁহাকে মর্ত্যধাম ছাড়িয়া পাতাল প্রবেশ করিতে একরূপ বাধ্য করিলেন। অনধিকারচর্চা করিবার জন্য তিনি শূদ্রকে দিলেন চরম দণ্ড। অনেক মিষ্ট কথার প্রয়োগ থাকিলেও দেখা যায়, সে যুগে স্ত্রীলোক সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হইত এবং শূদ্রজাতির অধিকার ছিল সঙ্কীর্ণ।

সে যুগের এই সব কতকগুলি অসম ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া বলা যাইতে পারে যে, রাম ছিলেন ত্রায়পরায়ণ, প্রজা-হিতৈষী ও প্রজা-রক্ষণে সমর্থ মহান রাজচক্রবর্তী। পারিবারিক জীবনে নানা দিক দিয়া তিনি এখনও আমাদের আদর্শস্থানীয়। তাঁহার দীর্ঘ স্থাশাসনে দেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং সাধারণ লোকের জীবন অভাব ও উৎপীড়নের হাত হইতে অনেকখানি রক্ষা পাইয়াছিল। আজ তাই আমাদের দেশে ‘রামরাজ্য’ শব্দের অর্থ জনসাধারণের মধ্যে একটা শান্তি ও প্রাচুর্যের অবস্থা।

বাল্মীকি-রামায়ণ আগলে ‘সেকুলার’ কাব্য এবং মানব-মনের রতি-শোক-উৎসাহ আদি বাসনা-ব্যাপার লইয়াই ইহার কারবার। এই মহাগ্রন্থ বিবিধ চরিত্রের সমাবেশে পূর্ণ এবং প্রত্যেক চরিত্রই মানবীয় এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। অধিকাংশ স্থলেই চরিত্রগুলির একটা নিত্যকালীন সত্তা আছে। পাঠকালে তাহাদের কাছে পাওয়া যায়, তাহাদের সত্তা অল্পভব করা যায় এবং নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় বোধ হয়। তাহারা সকলেই প্রাণবান রক্তমাংসের মানুষ। গ্রন্থের নায়ক রামচন্দ্র সর্বপ্রকার অলৌকিকত্ব ও দেবত্ববর্জিত মানবচরিত্র। রামকে মহামানব বলা যাইতে পারে, কেহ আদর্শ মানবও বলিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাতে

দেবত্বের আরোপ করা যায় না। মানবচরিত্র বলিয়াই
কাব্যে সে চরিত্র এত উচ্চ অঙ্গের সৃষ্টি এবং এত কাল
ধবিয়া লোকের মনে শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু রূপে বিরাজ
করিতেছে। এ চরিত্র মনে আশা জাগায়, ভরসা জাগায়,
মাহুকের অধ্যবসায়কে উদ্বুদ্ধ করে ও মহাশ্বে মহীয়ান্ন করে।
আদি রামায়ণের রামচন্দ্রকে আমরা পাই একান্ত ভাবে

নিজদের মধ্যে। তাঁহার স্বপ্নে দুঃখে আমাদেরও চিত্র
আন্দোলিত হয়।

ইন্দ্র মম দীনস্ত মনো ভ্রমঃ প্রকথতি
যদিহাস্ত শ্রিয়াখাতুর্ন কুর্শি সদৃশং শ্রিয়ম্।
এষ সর্বশ্রুতস্ত পরিব্রজোহমৃতঃ।
ময়া কালমিদং প্রাপ্য দত্তস্ত মহাজনঃ।

এ সকল কথা মাহুকেই বলিতে পারে, এগুলি দেবতার
উক্তি নহে।

পশ্চিমবঙ্গ বন্দনা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ,

গঙ্গায় ধোত মা পুণ্য শ্রীঅঙ্গ।

বাস্তার পর্বে তব মন্দির দুর্বার স্নিগ্ধ মা প্রাঙ্গণ,
পদ্মার ঘোরনছন্দের নৃত্যে ঝঙ্কত সৃষ্টি ও ভাঙ্গন।
আম-জাম-নারিকেল-খজুর তাল-বেল-কুঞ্জেরি রসভরা কাস্তি,
উর্দ্ধেতে ওঙ্কার-ঝঙ্কত অম্বর নিম্নেতে মাঠঘেরা শাস্তি
ভৈরব দামোদর ভিত্তা চপলকলছন্দা,
অজয় জলঙ্গী ও রূপনারায়ণ মহানন্দা,
চূর্ণি কংসাবতী দ্বারকা কোণাই যমুনাঙ্গী,
ছোট্ট বালিকাদম হাস্তেতে চঞ্চল তব স্নেহ-বক্ষেরি সাক্ষী।

সঙ্গেতে ষড়ঋতু নর্তনরঙ্গ,

বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ।

রঙ্গীন প্রত্যাষে লক্ষ বিহঙ্গম-সঙ্গীতে বেজে ওঠে পল্লী,
মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা আরতিকে নেচে ওঠে অন্তর-বল্লী।
গোলাপ পদ্ম যুঁই মল্লিকা বেলফুল করবী গন্ধরাজ চম্পা,
টগর হাম্বুহানা রজনীগন্ধা বৃকে গন্ধে বিতর অম্লকম্পা।
শেফালি রক্তজবা কুন্দ কেতকী-মকরন্দ,
কঙ্কে মালতীফুল হাস্তে ঢালিছে রসে ছন্দ।
মত্ত হরষে কালবৈশাখী বৃকে তোর গর্জে,
হর্ষের হিল্লোলে লক্ষ বর্ষা এসে লীর্ধেতে ঢেলে ষায় বরষে।

শ্রীগৌরানন্দপদচুম্বিত অঙ্গ,

বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ।

মালদহ বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমানে গৈরিকরূপধ্যানমগ্না,
হাওড়া মেদিনীপুর হুগলী নবদ্বীপে শিল্পকল্ললোকলগ্না।
জলপাইগুড়ি কোচ দিনাজ দার্জিলিঙে পুলকি বলকে রূপ ইন্দু,
চব্বিশ পরগণা স্বন্দরবনতলে পদযুগ চুম্বিছে সিন্ধু।

মুর্শিদাবাদ তোর গজমোতি মুক্তার মালা,

নিত্যনামাযুত কীর্তনে ঢালে নির্মালা।

সর্বভারতহৃদিকৃষ্টিতীর্থ তুমি ধন্যা,

জয়িল তোরি বৃকে ধরার শ্রেষ্ঠ কবি, গৌরবময়ী কত কথ্য।

গঙ্গার নন্দিনী নন্দন অঙ্গ,

বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ।

বুজবনেতে তোর ভৃঙ্গের ঝঙ্কার মেঘে বাজে বজ্রের ডঙ্কা,
লক্ষ্মীর মূর্তিতে গোধুম ধাতু হাতে কালিকার বেশে নাশো শঙ্কা।
পিক শুক চন্দনা দোয়েল ফটিকজল বৌকথাকও যুগু গায় গান,
বিদ্যুৎ চকুমকি বৃষ্টির ঝঝঝম্ আনন্দে প্রাণ করে আনন্দান্।

ভক্তের মাটি তুমি রক্তের তর্পণে ধন্যা,

বক্ষে বহিল তব যুগ যুগ ধর্মের ধন্যা।

অগ্নির শিখা তুমি মূর্তি তোমাতে হরিহর গো,

জন্মভূমির মহামুক্তির যজ্ঞের হে আদিম মুময়ী স্বর্গ।

লক্ষ আশীর্বাদে ভরা তব অঙ্গ,

বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ।



পম্পম্

ঐশিরিচন্দ্র বসু

এক

মেরেট সামনে এসে বসে দাঁড়ায়। আগ্রহের চোখে দেখে।

—এই যে, এসেছেন। সমস্যা।

সন্ধ্যার আধারে পার্ক তখন প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। একটু আগে ধারা বেড়াছিলেন, একে একে কিরে যেতে শুরু করেছেন।

—আপনিই বুঝি লিখেছেন চিঠিখানা? আমি ভিজেন করি।

মেরেট বসে বসে এসে বসে। বলে—হ্যাঁ, আমিই লিখেছি। আশ্চর্য হচ্ছেন?

—আশ্চর্য যদি বা হই, তাতে কি ঘোষ দিতে পারেন?

আশ্চর্য ব্যাপারই বটে। কিছুদিন হ'ল চাকরি নিয়ে কেমিভাবে এসেছি। নিত্যকাল বিদেশী আমি। আলাপ-পরিচয় কারও সঙ্গে এখনও বিশেষ হয় নি। আপিস বাই—বাড়ী কিরি। অল্পোরে পড়ে কখনও কখনও স্থানীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিই। ঐ পর্যন্ত। হঠাৎ সে-দিন ভোরের ডাকে একখানা চিঠি আসে—আপনি আজ সন্ধ্যার যদি একবার পার্ক তে জোড়িতে (Parc des Baux-Vives) আসেন, তা হলে বাণিত হই। না এলে কিন্তু হতাশ হব। ইতি দি, এম্।

জি, এম্ বাকরবারী কাউকে আমার পরিচিত বলে মনে হয় না। তাবতে থাকি দাব কিনা। কোঁড়ল জরী হয় শেষ পর্যন্ত। আপিসের ছুটির পরে পার্ক দ্যে জোড়িতে যাই। একটা খালি বৈকি দখল করে বসে অপেক্ষা করি। ক্রমশঃ সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে আসে।

মেরেট বলে—আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনি চিঠিটা পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছেন?

—না, ঠিক তা' নয়। তবে ব্যাপারটা একটু অসাধারণ মনে হয়েছে।

পার্কের আলো জ্বলে ওঠে। এককণে তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ হয়। সুন্দরী তরুণী। বয়স আন্দাজ হুড়ি একশ। তরু দেহ যৌবনের পূর্ণ কোয়ারে বিটোল। সুডোল মাঝার কেশরাশি যেন সোনালী রেশমের তবক। সুখানি ভলভলে। ডাগর হুটি চোখের নীলাভ দৃষ্টিতে সাগরমোলায় শিহরণ—মেরেট রুও। ননী রঙের রাউক এবং লাল টকটকে মেরিনো-কাঁটে তাকে যামিয়েছে চমৎকার।

চাপার কলি আঙুলের আছরে চাপে ফানের পাশে এলিয়ে পড়া চুল সরিয়ে মেরেট বলে—যাক, বাঁচলুম যে অসন্তুষ্ট হন নি।

—না, কিন্তু কেন লিখেছেন, জানতে পারি কি?

—নিশ্চয়। শুধু। গত শনিবার আপনি আন্তর্জাতিক ছাত্রপরিষদে বক্তৃতা দিয়েছেন, মনে আছে? আমি সেখানে ছিলাম। কেমন যেম খেয়াল হ'ল আপনার সঙ্গে আলাপ করি। আপনার ঠিকানা যোগাযোগ করতে অনুবিধা হয় নি—পরিষদের কর্মসূচি আপনার সম্বন্ধে সবই জানেন।

ভিজেন করি—কেমন লাগল আমার বক্তৃতা?

মেরেট হাসে—আমি কি ছাই শুনেছি কিছু। কি করে আপনার সঙ্গে আলাপ করা যায়, তাই কেবল ভেবেছি যে।

জুর হয়ে বলি—আপনি আমার চেমনে না, বক্তৃতা পর্যন্ত ভুলেন না, অথচ আলাপ করতে ইচ্ছে হ'ল?

মেরেট কথার সুরে আব্দার মিশিয়ে বলে—কিন্তু আপনাকে কেমন যেম খুব ভাল লাগল।

বিস্মিত হয়ে বলি—আমার সঙ্গে ভাষাশা করছেন?

শে অপ্রস্তুত বোধ করে—না, হুঁত্বিয়ে, ভাষাশা নয়, সত্যিই ভাল লেগেছে...না হলে...বিখ্যাস করুন আমাকে।

গভীর হয়ে বলি—কিন্তু ভাল করেন নি।

মেরেটের মুখ আবার হয়ে যায়। বলে—কেন? আপনি কি আমার বন্ধু হতে পারেন না?

চোখ দুটি তার ছল্ ছল্ করে।

সুর নরম করে বলি—বন্ধু হলেই যদি আপনি পুণী হন, বেশ ভাল। কিন্তু আপনার পরিচয় শু কিছু পেলাম না?

—পরিচয় পাবেন বৈকি।

মেরেট একটু চুপ করে থাকে। তার পূর বলতে শুরু করে—আমি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। জাতিতে আমরা করালী। আত্মীয়বন্ধন একরকম নেই বললেই হয়। ছোটবেলায়ই মাকে হারিয়েছি। বাবা ছিলেন—প্যারিসে মোটরগাড়ীর কারবার করতেন। হু' বছর হ'ল তিনিও নেই। থাকার মধ্যে আছেন এক বুড়ী পিসি। তা শহরের আবহাওয়া তাঁর সহ হয় না, তিনি বেশীর ভাগ সময়ই লীস-এ সহুদ্রভীরে থাকেন। তাই প্যারিসের বাস তুলে আমি এখানে চলে এসেছি। বাবা সামান্য কিছু রেখে গেছেন, সুতরাং অর্থ-কষ্ট ভেমন নেই। পড়াশুনো নিয়েই সময় কাটে, কিন্তু বড় একা মনে হয়।

চোখ থেকে তার হু'কোটা জল গড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন সহুদ্রভূতি জাগে তার প্রতি। বলি—কৈ, আপনার মার ভুললেন না?

—জেনীভিত। জেনীভিত দ্য মিরাবেল। বাবা কিন্তু ডাকভেন পম্পম্ বলে। বেশী বক বক করি কিনা, তাই

তা আপনিও পম্পম্ বলেই ডাকবেন, কেমন? ঐ নামটাই আমার বেশী ভাল লাগে। এবার আপনার পরিচয় দিন।

—আমার পরিচয় তা আপনি সবই সংগ্রহ করেছেন, পরিষদ থেকে। নয় কি?

—তা সত্যি।

সে একটু ইত্তত্ত: করে বলে—তা হলে, আমরা বন্ধ, কেমন?

—আপনার যখন এড ইচ্ছে, তাই হোক।

সে কাছে গরে আসে। হাতখানি বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। হাতে হাত রেখে বসে থাকি। আবারের ঘেরাটোপে রাতি ক্রমশ: এগিয়ে আসে। আকাশে তার পথ জুড়ে ফুটে ওঠে সহস্র তারার রোশনাই। বিরাট পার্ক, বিজ্ঞান-নিষ্ঠুর। বিজলীবাতির ছায়াগুলো ছলে ছলে প্রশস্ত তৃণভূমিতে আলো-আবারের আলপনা আঁকে।

হাত ছেড়ে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়—রাত হ'ল, আজ তবে বাই।

এক পা হুঁ পা করে সে এগিয়ে যায়। আবার সে করে—

আপনি কি বাসার ফিরবেন এখন? সঙ্গে গাড়ী আছে, চলুন নামিয়ে দিয়ে বাই তা হলে।

গাড়ীতে ওঠার সময় সে বলে—ঐ যা, আপনাকে বলতে ভুলেছি, আমার বাসার ঠিকানাটা। আমি থাকি—মৎ অ্যাডেনিট সাঁপেলে। ঐ যে ট্রামের ডিপো, ঠিক তার উল্টোদিকে যে একখানা ছোট দোতলা বাড়ী, তাতে। মনে থাকবে ত?

গাড়ী ছুটে চলে। আমরা নীরবে পাশাপাশি বসে। তার হাতে গিয়ারিং। হঠাৎ থেমে আসে গাড়ীর গতি। ক্যাচ করে ব্রেকের শব্দ হয়।

—এগে গেছি, নামুন এবার।

এক রকম ঠেলেই আমাকে নামিয়ে দেয় গাড়ী থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে মাথাটি হেলিয়ে বলে—আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

পলকের তর নয় না, গাড়ী আবার চলতে থাকে। তার পিছনের লাল আলো রাস্তার বাকি চোখের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ে।

২

মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয় না। প্রথম দিন দুইয়ক তার কথা মনে হয়েছে। তারপর নানা কাজে ব্যস্ত থেকে তার কথা ভাববার অবসর হয় নি।

দিন দশেক কেটে গেছে। সেদিন রবিবার। আপিসে বেরুতে হয় নি। সারাদিন আলসেমি করে কাটিয়েছি। বিকালবেলাটা ঘেন আর কাটিতে চায় না। বেড়াতে

যাওয়ারও উৎসাহ নেই। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। এ সময়ে সাক্ষ্য ভ্রমণ আরামদায়ক ত নয়ই বরং রাস্তার চলার সময়ে বিশেষ মনোযোগী না হলে পা পিছলে ছাড়পোড় ভাঙার সম্ভাবনাই বেশী। এ সময়টাতে রাস্তার জল থাকলে তা পাতলা সরের মত ভ্রমে পথ পিছল করে রাখে; তাই খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয় সুতরাং বায়ুসেবনের আকর্ষণও নেই।

একখানা বই টেনে নিয়ে মন বসাতে চেষ্টা করি। বাইরে কে যেন দরজা ঠেলেছে। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলি। দেখি মেয়েটি দাঁড়িয়ে।

হেসে বলে—নমস্কার, আসতে পারি?

—নমস্কার, এই যে, আনুন আনুন।

লঘু চরণক্ষেপে সে ঘরের ভিতর আসে। একখানা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিই। সে বলে—“মেম্বার সি (বক্তাবাদ) মন্ আমিঁ (বন্ধু), কিন্তু তুমি আমাকে আপনি করে কথা বলছ কেন? আমাকে ত পম্পম্ বলে ডাকলে না”—এই বুঝি বন্ধুর মত কাজ?

এমন ভঙ্গী করে সে বলে, যেন কতদিনের জ্ঞানাতোনা।

আমি হেসে বলি, আচ্ছা, এবার থেকে বন্ধুর মতই তোমাকে ডাকব। আজ যে, হঠাৎ আবার মনে পড়ল—ব্যাপার কি?

অভিমানের স্বীকৃতি সে বলে—তা ত বলবেই। নিজে ত গেলে না একদিন। বাড়ীর ঠিকানা ত দিয়েছিলাম।

—কিন্তু যেতে ত আমাকে বল দি।

চোখ দুটি বড় করে সে বলে—ও লালা, যেতে বলতে হবে বুঝি। বড্ড ফরম্যাল তুমি কিন্তু।

উপযুক্ত জবাব বুঁজে পাই মি। আশ্চর্য লাগে মেয়েটিকে। কিই বা বলি।—

—চা খাবে পম্পম্?

সে খুশী হয়ে ওঠে।

—খেতে পারি। কিন্তু চা করবে কে? তুমি? চায়ের ফোনও ব্যবস্থা আছে নাকি?

—হাঁ আছে। তুমি একটু অপেক্ষা কর তা হলে। বেশী দেরী হবে না।

রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যাই, সেও উঠে সঙ্গে আসে। আমার হাত থেকে কেটলি কেড়ে নিয়ে বিজলী-উনানের উপর চড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করে—লেবু আছে ত? চায়ে হুঁ আমায় ভাল লাগে না।

—আছে বৈকি। তা হলে লেবু কাটো তুমি। পাশের ঐ ছোট আলমারীতে রয়েছে।

আলমারী খুলে লেবু ও ছুরি নিয়ে সে কাটিতে বসে যায়। ট্রেয় উপর চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে বসবার ঘরে

কিরে আসি। এক পেয়াল চা টেলে সে আমার দিকে এগিয়ে দেয়—নিজেও এক পেয়াল চা মের, তাতে পাতলা একটুকরো লেবু ডুবিয়ে সেটা চামচ দিয়ে টিপে বলে—এমন অসময়ে এসে তোমাকে বিরক্ত করলাম না ?

চারে চুয়ু দিলে বলি—সত্যি কথা বলব ?

—নিশ্চয়।

গান্ধীধ্বজ তাম করে বলি—দরজার শব্দ শুনে মনে হয়েছিল, এমন সময়ে আবার কোন্ আপদ এসে ছুটল।

মুখখানা তার ফ্যাকাসে হয়ে যায়—তাই নাকি। তারি অভায় হয়েছে ত তা হলে। আমার মাপ করুন।

কোতুকে হেসে উঠি—না না, মোটেই অভায় হয় নি তোমার। তুমি যে এসেছ, খুব ভাল লাগছে আমার। আজ সারাদিন চুপচাপ বসে। বিকেলবেলাটা যেন আর কাটে না, এমনি বোধ হচ্ছিল।

উৎসুক হয়ে সে কথাগুলো শোনে। তার মুখের প্রশান্তি আবার কিরে আসে। সে নিশ্চিন্তভাবে চারে চুয়ু দেয়।

তার পেয়ালতে আরও খানিক চা টেলে ভাঙউইচের প্লেটখানা এগিয়ে দিই। হুট আতুল দিয়ে আলগোছে সে একখানা ভাঙউইচ তুলে নেয়, একটু ইডডত করে বলে, একটা কথা বলব ? কিছু মনে কর না কিছু।

—বল।

—মনে হয় তুমি নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে এর আগে একা কোথাও থাক নি কোনও দিন।

—কিলে বুঝলে ?

—তোমার ঘর-দোরের চেহারা দেখে। গৃহস্থালির তদারক করার অভ্যাস তোমার নেই।

হেসে বলি, তাই নাকি। বেশ ত, অগোছালো যদি তুমি মনে কর—শুধিয়ে দাও না তবে। দেবে।

সে চুপ করে থাকে, যেন কি ভাবে।

হঠাৎ বলে, দু'দিনের যদিও পরিচয়, কিন্তু আমাকে কি তুমি বিশ্বাস করতে পার না ?

—একথা মনে এল কেন ?

—না, এমনিই।

চারের পেয়ালার শেষ চুয়ু দিলে সে নামিয়ে রাখে। তার পর ট্রে নিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। অলক্ষণ পরেই সে ঘর থেকে পেয়াল গীরিচ ঘোয়ার শব্দ আসে।

চারের সরঞ্জাম আলমারীতে শুধিয়ে রেখে, হাসিমুখে সে লামনে এসে দাঁড়ায়।

—মেরারসি বকু (অনেক বড়বাদ), আজ তবে আসি বন্ধু। দরজা পেরিয়ে সে চলে যায়। আবার কিরে আসে।

—তোমার দরজার জুড়ি-চাবি আছে ত। একটা দাও

আমাকে। আমার সুবিধামত ঘাব আসব। বারে বারে দরজা ঠেলতে হবে না।

আমি নিরুত্তর হয়ে থাকি। সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকায়, ঝাঁঝালো স্বরে বলে, তাবছ কি এত ? ওগো, তর নেই কিছু চুরি করে নেব না। বন্ধু বলে যখন স্বীকার করেছে, বিশ্বাস কর আমাকে।

টেবিলের টানা থেকে জুড়ি-চাবিটা বার করে তাকে দিই। চাবিটা ছুরিয়ে কিরিয়ে দেখে সে বলে, তারি পুন্নি হলাম বন্ধু আজ তবে ঘাই, কেমন ?

নাচের ভঙ্গীতে সে বাইরে চলে যায়। সিঁড়ির কাছ বরাবর গিয়ে কিরে তাকায়। হাত মেড়ে বলে, আবার দেখা হবে।

তার পর সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। আমার মুগ্ধ দৃষ্টি তার সাবলীল গতিভঙ্গীকে অত্মসমর্পণ করে।

পরদিন আপিস থেকে কিরে ঘরে ঢুকে বিশেষায়া হয়ে পড়ি। সমস্ত ঘরখানা জুড়ে আশ্চর্য পরিবর্তন। আমার আসবাবপত্র যা কিছু ছিল সবই অন্তর্হিত হয়েছে। তাদের স্থানে পরিপাটি করে সাজানো হাল-ক্যান্সানের সব দামী আসবাব। বাট-বিছানা থেকে মায় জানালার পর্দাগুলো পর্যন্ত গেছে বদলে। অবাক হয়ে বারে বারে দেখি। দরজার বাইরে গিয়ে দেখি, ভুল করে অস্ত কারও আস্তানায় চুকি নি ত। পিছ থেকে হাসির শব্দ কানে আসে। চমকে কিরে দাঁড়াই।

—কেমন, সব পছন্দ হয়েছে ত ?

পম্পম্ হাসতে থাকে।

—এ সব তুমি কি করেছে পম্পম্ ? এযে রাজারাজতার ব্যাপার। এর দাম আমি দেব কেমন করে ?

—না গো না, এর দাম তোমাকে দিতে হবে না।

সে খিলখিল করে হাসে।

—তার মানে ?

—মানে, খুবই সহজ। এসব জিনিস আমার। না না, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমার বাবার বেজার সব ছিল আসবাবপত্রের। ঐ সব জিনিস যোগাড়ও করেছিলেন প্রচুর। প্যারিস থেকে বাসা উঠিয়ে এখানে আসবার সময় কিছু কিছু আসবাব আমি নিয়ে আসি। তা থেকে কয়েকটা মাত্র তোমাকে দিয়েছি।...

বাধা দিয়ে বলি, তারি অভায় করেছে তুমি। না, এ সব আমি কিছুতেই নিতে পারব না।...কিছুতেই না।

সে হুঁপা সামনে এগিয়ে আসে। ছুঁতের মত শাদা কপোল দুটি তার রক্ত-রাঙা হয়ে ওঠে। কোমরে হাত দুখানি রেখে সে দৃষ্টান্তে বলে, এমন করে বন্ধুত্বের অমর্যাদা করতে পার তুমি। বেশ, না নাও এগুলো আমি পুড়িয়ে

দেব। তোমার জিনিসপত্র একতলায় স্থপরিতে বন্ধ করা আছে, সেগুলো তা হলে আনিবে নাও তুমি।

সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। ধামতে চার না সে কারা।

বীরে বীরে তার দিকে এসিয়ে বাই। তার কাঁধে হাত রেখে বলি, পম্পম্, কেঁদ না লক্ষ্মীটি, আমি এগুলো নিলেই যদি তুমি বুশী হও বেশ, মিলাম।

মুহুর্তে হাসির ঝিলিকে তার মুখে রোদ-রুটির খেলা সুরু হয়। মধুর স্বরে সে বলে, নিলে তুমি? সত্যি বলছ? বন্ধু, তুমি মহৎ, তুমি আমার সম্মান রেখেছ।

ম্যার্টল পিসের উপর ছোট এনামেলের বড়িটার টুং টুং শব্দ হয়। সে বলে, ঐ যা, রাত্তির আটটা বাজল যে, এবার ভবে উঠি। তোমারও ত খাওয়ার সময় হ'ল, কিন্তু বাড়ীতে ত দেখি তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা কিছু নেই।

—ঠিক বলেছ, বাড়ীতে ওসব হাদ্যমা আমি রাখি নি। এখন থেকে খুবই কাছে রুজু ইতালীতে যে চীনে রেস্টোরাঁ আছে, সেখানেই রাজিতে আমি খাই। আজ তুমিও চল না, দু'জনে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।

—আজ থাক, আর এক দিন যাব।

আমি অহুযোগ করে বলি, আজ যাবে না ত? বেশ।

সে কাছে ঘেঁষে আসে, কানের কাছে মুখ এনে বলে, রাগ করো না লক্ষ্মীটি, শীগ্গিরই এক দিন যাব।

বীরে বীরে সে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি পর্যন্ত তাকে এসিয়ে দিবে আমি।

৩

পম্পমের সঙ্গে দেখা হয় না; কিন্তু তার অজুত খেয়াল আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে। আমার অহুপস্থিতিতে সে প্রায়ই যে আমার বাসায় আসে, ঘর-দোর গুলিয়ে দেয় তা আমি টের পাই। যেদিন সে আসে, ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারি। অগোহালো জিনিসগুলি সেদিন শৃঙ্খলাহীন হয়ে মনোরম দেখায়। এক এক দিন টেবিলের উপরে বড় কাগজে গোটা-গোটা অক্ষরে তার অহুযোগ লিপিবদ্ধ থাকে।

—বড় অগোহালো তুমি বন্ধু! আশা করি এবার থেকে একটু সাবধানে চলবে।

কোন দিন বা লেখা থাকে, পোড়া সিগ্রেটগুলি ঘরময় ছড়িয়ে কি আনন্দ পাও তুমি বল ত? ছাইছানীগুলো তবে রয়েছে কি জন্তে।

এক-এক দিন অহুযোগ হয়—না, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না! যা বুশি কর বাপু, আর আমি আসব না।

কিন্তু সবুজ সে আসে। তার এই ব্যবহার দ্ব্যর্থ্য লাগে—ভালও লাগে।...

সেদিন নৈশ-ভোজনে খাওয়ার জন্ত তৈরি হচ্ছি।

পোশাক পরা হয়ে গেছে। আরম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে চুলে বুরুশ ঘষছি।

দরজার টোকা পড়ে—আসতে পারি?

—এসো—এসো।

দরজা খুলে যার, স্তম্ভজিতা পম্পমের অনবত্ত রূপ-রেখা ফুটে ওঠে আরশির বুকে।

—বা: ঠিক সময়েই এসেছি তা হলে। খেতে যাচ্ছ ত?

—এতদিনে বুঝি তোমার সময় হ'ল?

—নিশ্চয়, তাই ত তৈরি হয়েই এসেছি। ঠিক আড়কের দিনটিতে যাব বলেই ত সেদিন বাই নি তোমার সঙ্গে। বল ত কেন? আজ আমার জন্মদিন—ডেইশ বছর পূর্ণ হ'ল আজ।

হেসে বলি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, পম্পম্। মধুর হোক তোমার জীবন। সুখী হও তুমি।

—তোমার শুভেচ্ছার জন্তে বক্তবাদ, বন্ধু। কিন্তু আমার দীর্ঘ-জীবন কামনা করো না তুমি। বুড়ী হয়ে বেঁচে থাকা আমি সইতে পারব না।

কাছ ঘেঁষে সে এসিয়ে আসে—খাওয়ার পোশাকে কি চমৎকার দেখায় তোমাকে।

—আরশিতে আপে নিজের চেহারা দেখে, তারপর বল, শুনব।

—জেজ্জেইমাবল্ মুঁতিয়ে (মশায় বড়ই বিনয়ী)। তোমাকে কথার এঁটে উঠতে পারা যায় না।

তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলে, আমি যে এলাম তাতে তুমি বুশী হয়েছ?

—খুব।

—সত্যি?

—সত্যি।

সে আরও কাছে সরে আসে। আমার দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক মিনিট এমন করে কাটে। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস কেলে সে বলে, কোথায় খেতে যাবে, কিছু ঠিক করেছ কি?

—না, তুমিই বল, যেখানে তোমার ইচ্ছে।

—তা হলে পেরারল্ ডু লাকেই চল। ওখানে খাবার খুব ভাল, আর কার্গাটাও নিরালা।

পেরারল্ ডু লাকের মনোরম পরিবেশে পম্পম্ যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে। তার আনন্দ যেন ভিরেনীজ্ ডাল্‌জের সুর-ভরদ। হলে-হলে, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে প্রাণবন্ত হতে চায়। মুখের কথা তার ধামতে চায় না। আমি অবাক হয়ে শুনি।

হঠাৎ সে থেমে যার, সুরে মধু করিয়ে বলে, কই, তুমি কিছু খাচ্ছ না।

—তোমার কথা শুনি। তারি ভাল লাগছে।

—যা—ও!

তুমি আবেশ হুটে ওঠে তার মুখে।

ওয়েস্টে পুড়ি নিরে আসে। পদ্মপদ্ম বলে, ও, লাল-
ষ্টবেরী আভেক কেইয়! খাও পেট ভরে।

বড় চামচে নিরে অনেকখানি সে আমার প্লেটে ঢেলে
দেয়। নিজের ভাত একটুখানি নেয়। আমি অস্বাধোগ করি।
সে হাসে।

—তোমার গায়ের বারান্দার গায়েই লাগেয়া একটা পার্ক।
ককি শেষ করে ছ'জনে পার্কে নেমে আসি। পূর্বদিকের
রেলিং বেঁধে সুবিশ্রুত জেনীভা-ব্রুদ। তার ধারে এসে দাঁড়াই।
নিধর রাজি। তারা-বিচ্ছুরিত আকাশের ছায়া হ্রদের বুকে
চুমকির মালা গাঁথে। অন্ন অন্ন হিম পড়ছে।

ধীরে ধীরে বলি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব; পদ্মপদ্ম?

—বল।

—একি তোমার অভূত খেয়াল!

—কি বললে?

—আমার জন্তে তুমি এত কর কেন?

—তোমার জন্তে এত করি? তার মানে?

—এই যেমন, আমার বর-দোর গোহানো। কত কষ্ট হয়
তোমার! তা ছাড়া, এ আস্বাবপত্র কেন দিলে আমাকে?
বাধা দিয়ে সে বলে—ধাক, আচ্ছ আর ওসব কথা নয়।

—বেগ না কি চমৎকার রাজি। আজকের এই যে আনন্দ তা
আমাকে উপভোগ করতে দাও। আচ্ছ কিছু বলো না, লক্ষীট!

আকাশ থেকে তারা খসে পড়ে। সে উত্তেজিত হয়ে
বলে—এ তারার দিকে চেয়ে নিজের মনের ইচ্ছা জানাও,
শীগগির। যা ইচ্ছা জানাবে তাই পূর্ণ হবে।...

তার পর জিজ্ঞেস করে—কি ইচ্ছা জানালে, বল।

—ইচ্ছে জানিয়েছি, তুমি স্বামী হও পদ্মপদ্ম।

—আমি প্রাণনা করেছি, এদেশে তোমার অবস্থান অদীর্ঘ
হোক বহু।

অদূরে দীর্ঘ থেকে মাঝরাতেই ঘড়ি বাজে। সে দীর্ঘ-
নিঃশ্বাস কেলে। বলে—কিরে যাওয়ার সময় ঘে'ল, চল।

৪

পদ্মপদ্মকে আর হেঁয়ালি বলে মনে হয় না। অনেকখানি
সহজ হয়ে এসেছে তার ব্যবহার। দরদী বজুর মতই সে
আসে—যায়। আমার মনের বিধা-সঙ্কোচ কেটে গেছে,
আমি নিশ্চিন্ত। নির্দোষ বিদেশে তার অরূপণ মমতা পেয়ে
নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হয়।

প্রতি সন্ধ্যায় সে আসে। গল্পে, আলোচনার কাঁটে রাজি
আটটা পর্যন্ত। আমি নৈশ-ভোজনে যাওয়ার জন্য তৈরি
হই। সে বাড়ী ফিরে যায়। কোনও দিন বা আবার সন্ধ্যা
বেশেও যায়।

তার সন্ধ্যা কথা বলে প্রচুর আনন্দ পাই। সে যে শুধু
বুদ্ধিমতী তা নয়, বিভিন্ন-বিষয়ে তার পড়াশোনা এবং জ্ঞানও
যথেষ্ট। সারা সন্ধ্যা ধরে চলে আমাদের ভুক্ত-আলোচনা।
দেশ-বিদেশের রাজনীতিক, অর্থনীতিক পরিস্থিতি থেকে শুরু
করে দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনের দুটিনাটি সমস্যা—কিছুই
বাদ যায় না। বড় ভাল লাগে এই সন্ধ্যার আসর।

সেদিন বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নর-নারীর বিয়ের বয়স
সহজে আলোচনা হচ্ছিল। বহুজন একটানা ভক্তের পর
গভীর পরিবেশকে কিছু হাকা করার জন্য আমি জিজ্ঞেস
করি—আচ্ছা, পদ্মপদ্ম, তুমি-বিয়ে করছ, কবে বল ত?

চমকে সে ডাকায় আমার দিকে। কিছু বলে না।

হেসে বলি—কি? এর বেলায় যে উত্তর নেই?

ধীরে ধীরে সে বলে—কি, উত্তর দেব আমি।

—কেন? নিজের বেলায় কোনও উত্তর নেই বুঝি?

মাথা হুইয়ে সে বলে—এর উত্তর আমি-কি দেব? সে-ত
তুমি জান।

—আমি জানি?

নিমিত্ত উপলক্ষিতে অন্তর ভরে ওঠে। অবীর হরে বলি
—তুমি মন্ত ভুল করেছ, পদ্মপদ্ম। তুমি হয়ত সব জান না,
তাই বুঝতে পার নি। শোন, আমার অনেক কথা বলার
আছে তোমাকে।...

সে বাধা দিয়ে বলে—দোহাই তোমার, আর কিছু বল না
আমাকে। আমি শুন্তে চাইনে। এত দিনেও যদি তুমি...
না না, তুমি হৃদয়হীন—অমাহুষ তুমি!

চাপা কান্নায় তার সারা দেহ কাঁপতে থাকে। তার
পাশে গিয়ে বসি। হাত জুখানি ধরে বলি—ভুল বুঝ না পদ্ম-
পদ্ম, বলবার অবকাশ দাও আমাকে।

সঙ্কোরে হাত ছিড়িয়ে সে উঠে দাঁড়ায়—বলতে হবে না
আর কিছু। শুন্তে চাইনে আমি।

ঠোঁট ছুটি তার কাঁপতে থাকে। ভাগর চোখে জল করে।
জল কপোল বেয়ে মুক্তোর দানা গড়িয়ে পড়ে। ঘর থেকে
ছুটে সে বেরিয়ে যায়। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ। আমার
বুকে তার প্রতিধ্বনি বাজতে থাকে।

৫

পদ্মপদ্ম আর আসে না।...আমি কিন্তু সোয়ান্তি পাইনে।
নিজেকে ঘোর অপরাধী মনে হয়। সর্বদাই মন খচখচ করে।
এক একবার ভাবি, যাই তার বাড়ীতে—বুঝিয়ে বলি তাকে
সব কথা। আবার ভাবি, না কাজ নেই। এতদিনে সে হয়
ত নিজের মনকে সংযত করতে পেরেছে—গেলে, সে যদি
নুতন করে ব্যাধি পায়।

ক্রমশঃ শীত এসে পড়ে। ডিসেম্বরের মারামারি। জুই-

কারল্যাণের শ্রীত। ক'দিন তুষারপাত হচ্ছে অবিরত। রাশি রাশি পেঁজা তুলার মত মরম—ঠাণ্ডার ঘেন ক্ষুরধার। তুষারবর্ষণ আজ চরমে পৌঁছেছে। আবহ-ভাপ শূড়ের নীচেও আরও আঠার ডিগ্রী নেমে গেছে। সন্ধ্যা নাগাদ ঝড়ের আশঙ্কা করে সিঁগড়াল পড়েছে। তাই আজ সকাল সকাল আপিস ছুটি হয়েছে।

বাড়ী কিরতে কিন্তু বেশ দেরি হ'ল। রাত্তা ঘাটে তুষার-রাশি ভূপে ভূপে জমেছে। শুণ্ড বর্ণের বিরাম নেই। ট্রাম-বাস চলাচল বন্ধ। অতি কষ্টে হেঁটে বাড়ী কিরি।

বসবার ঘরে ঢুকে দেখি, সোফার আর-শোয়া ভাবে এক নারীমূর্তি। মুখ দেখতে পাই না—কুশনে তার মাথাটি পৌঁছ। আমার পায়ের শব্দে সে মাথা তোলেন, সোজা হয়ে বসেন। তার সুনীল চোখ দুটি কান্নার আরক্ত। আমাকে দেখে আরও উচ্ছ্বাসে মাঝে তার চোখের জল।

ক্রম এগিয়ে গিয়ে বলি—পম্পম্।...এ কি তুমি কঁাদছ? আমার কথার সে কঁকিয়ে ওঠে—ওগো, কে ঐ মণিকা? বল?

আজুল দিয়ে সে দেখায়, দেয়ালের পা-যেঁষে ভেপায়া টেবিলের উপর বসানো একখানা কটোপ্রাকের দিকে। হবি-খানা আজকের ডাকেই পেয়েছি, দেশ থেকে। হাতমরী নারীমূর্তি। নীচে টানা ইংরেজীতে লেখা তোমারই মণিকা।

আমাকে নিরুত্তর দেখে, সে অধীর হয়ে পড়ে।

—কি চূপ করে রইলে কেন? বল না গো ও কে? বলবে না।

ধীরে ধীরে বলি—আমি ত তোমাকে বলতেই চেয়েছিলাম পম্পম্, কিন্তু...

—আমি ত শুনতে চাই নি। কেন, জান? আমার মন তা মেনে নিতে চায় নি। আমি সহ করতে পারব না বলে। আজ ক'দিন হ'ল মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি—তাই ছুটে এসেছি আবার। কি করব আমি বলে দাও।

মীরবে দাঁড়িয়ে থাকি। সাত্তমার কথা বুঁজে পাইনে। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ের প্রলয়-হুড়ার—দরজা-জানালাগুলো ঝড়ের ঝাপ্টার বন্ বন্ করে।...

ক্রমে সে শান্ত হয়ে আসে। মাথা তুলে বলে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস। না, না, ওখানে—অন্ত দূরে নয়, আমার পাশটিতে বস। মণিকার কথা বল আমাকে।

তার পাশে এসে বসি। সে ডাম হাতখানা বাড়িয়ে দেয় আমার হাতে। ঠাণ্ডার নিঃসাড় সে হাত।

তাকে বলি মণিকার কথা। আমাদের বিয়ের দিনের কথা। আমাদের সংসারের কথা। জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষার কথা—কিছুই বাদ দিই না।—

কথা শেষ হলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে—মণিকাকে তুমি বুঝ ভালবাস, নয়? সেও তোমাকে বুঝ ভালবাসে, তাই—হবিতো সে হাসে।

তারপর সে যেমন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়। চোখের পলক পড়ে না। সারা দেহ যেমন পাণ্ডর। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি প্রচণ্ডতর হয়ে আসে। হঠাৎ সে চমকে কেঁপে ওঠে।

বলি—তোমার শ্রীত করছে। এক পেয়লা গরম চা কিংবা ককি এনে দিই, কেমন।

প্রিঙ্ডের পুতুলের মত সে ছিটকে উঠে দাঁড়ায়।

—না না, কিছু দরকার নেই। এবার আমি বাই।

বাণ দিই—এ কি বলছ তুমি। এই হুয়োপে বাবে কেমন করে। বস, বরং গরম কিছু খাও। হুয়োপে খামুজ, তখন যেও—আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।

বহুপাকাতর সুরে সে বলে—না, গো, না। আমি আর থাকতে পারছিনে। বাণ দিও না তুমি—আমাকে যেতে দাও...যেতেই যে হবে। পথ ছাড়।

ধাক্কা আমাকে সরিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। তরতর করে নামতে থাকে সিঁড়ি দিয়ে।

আমিও ছুটি পিছু পিছু—পম্পম্, শোন, যেও না তুমি। ফের। একি পাগলামি করছ?

কোনও ফল হয় না। হৃদ্যন্ত ঝড়ের মধ্যে সে পথে বেরিয়ে পড়ে। তুষারের নিবিড় স্ববমিকা নিমেষে ভাঙে। চোখের আড়াল করে দেয়।

শীতে বুকের রক্ত যেমন জমে আসে। ছুটে ঘরে ফিরি। ওভারকোটটা টেনে নিয়ে নেমে বাই—পথে বেরিয়ে পড়ি তার খোঁজে। কি ভীষণ তুষারপাত। কি নিদারুণ ঠাণ্ডা।

মাহুঘের সমান উঁচু হয়ে তুষার জমেছে পথের উপর। হাতে পায়ে মাথার ঘেন হুঁচ কোটার। কনকনে বাতাস ঘেন হাড়ের ভিত্তর করাত চালাতে থাকে। চোখে মজর চলে না—আন্ধাজে পথ করে নিই। তাকে বুঁজে কিরি, এ রাত্তা সে রাত্তা। ক্রমশঃ দেহ অবশ হয়ে আসে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হয়। পা ছুটো নিঃসাড়, অচল হয়ে ভেঙে পড়তে চায়।...মরিয়া হয়ে তবু চলি। বুঁজে পাইনে তাকে।

নিরুপায় হয়ে বাসার ফিরে আসি। হতশাশ্রয় মন আচ্ছন্ন, অবসন্ন শরীর। ওভারকোট খুলতে হাতের শক্তি নেই—

অর্ধচেতন অবস্থায় সোফার এগিয়ে পড়ি।...

টেলিফোনের গোলমিতে ভল্ল। ছুটে যার। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, রাত্তি ভিন্নটে পেরিয়ে গেছে। ঝড়ের শব্দ আর কানে আসে না। মিস্তি রাত, চারদিক ধূম ধূম করে।

টেলিফোন বেজে যায়।...

রিসিটার তুলে ডিজেক্স করি,—হ্যালো, কাকে চান আপনি?

উত্তর আসে, প্লাস্ বেই-এয়ার হাসপাতাল থেকে বলছি, আপনি কি হুঁতিয়ে—?

—হাঁ, বলুন।

—এত রাত্তিরে বিরক্ত করছি, মাপ করবেন।

—আচ্ছা, কি বলতে চান বলুন।

—আজ রাতে বড়ের সময় একটি মহিলাকে অচৈতন্য অবস্থায় পথ থেকে তুলে আনা হয়েছে।

বুখানা ছাঁৎ করে ওঠে। হার ভগবান! টেলিকোমের রিসিভার শক্ত করে ধরে স্তন্যে থাকি।

—এই মাত্র তার চেতনা একটু ফিরেছে। তিনি আপনাকে খবর দিতে বলেছেন, বলেছেন, এখানে আপনিই তাঁর একমাত্র মিকটভম বন্ধু। মহিলাটি তাঁর নাম বলেছেন, কুমারী মিরাবেল—কেনীভিড্ড মিরাবেল।

অস্থির চিত্তে জিজ্ঞেস করি, এখন কেমন আছেন তিনি? জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই ত?

উত্তর পাই, শীঘ্র চলে আসুন আপনি।

টেলিকোম রেখে দৌড়ে বেরিয়ে পড়ি।

ভূবারত্বপের মধ্যে পথ করে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছতে প্রায় কুড়ি মিনিট লাগে। নাস' রোগিণীর ঘর দেখিয়ে দেয়। সেখানে ঢুকে দেখি, শয্যায় শায়িত পদ্মপদ্ম। ছুখানা নরম পুরু কবলে তার দেহ আচ্ছাদিত, শুধু মুখখানি বেরিয়ে আছে। চোখ দুটি মুদ্রিত। পেলব মুখের ফুল রক্তিম পোলাপ কোন সে নির্ভর যাহকরের দণ্ডম্পর্শে নীল অপরাধিতার রূপান্তরিত হয়েছে। বালিসে বিক্লিষ্ট সোনালী চুলের রাশি তার রূপকে করুণ ও বেদনাতুর করে তুলেছে।

মিস্ট্রিক বিশ্বাসে আমি চেয়ে থাকি। তার দেহে জীবনের সাদা হুঁজি।

হঠাৎ কাঁধে ন্যার স্পর্শ অহতব করে চমকে উঠি। ফিরে দেখি এক বেঁটেখাটো মানুষ। মাথার চুল সব সাদা সবধবে। সৌম্যমুখি বৃদ্ধ।

স্বিগ্নস্বরে তিনি বলেন, আপনি কি হুঁতিয়ে—? আমি এই হাসপাতালের ডাক্তার। মমকার।

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করি, রোগিণী এখন কেমন? কোনও ভয় নেই ত?

মাথা নেড়ে তিনি বলেন, উহঁ! ভাল নয় মোটেই ভাল নয়, তবে জার্ম ফিরেছে, একটু আগে। ডাকুন, হয়ত সাদা পাবেন।

মেঝের হাঁটু রেখে বসি। তার দিকে হুঁকে ডাকি।

—পদ্মপদ্ম, আমি এসেছি।

কোনও সাদা নেই! ডাক্তার নীচ হয়ে মাড়ি দেখেন।

—বোরে ডাকুন, আপনি।

এবারে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বসি, পদ্মপদ্ম, আমি এসেছি। একটি বার চেয়ে দেখ লক্ষ্মীটি।

গায়ের কবলখানা কঁপে ওঠে। সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায়। অতি কষ্টে সে তার হাতখানি বের করে এগিয়ে দেয় আমার হাতের দিকে। স্নেহে আমি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরি। তার মুখে মুহু হাসি ফোটে। আমার দিকে চেয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে প্রীতি উপচে পড়ে।

তার ঠোঁট ছুখানি কাঁপে, যেন বলতে চায়—বন্ধু আমি যাই...আরও চোখের নীল তারা দুটি ধীরে ধীরে নিশ্চল হয়ে আসতে থাকে, তার পর চোখ দুটি তার মুদ্রিত হয়ে যায়। আমার মুঠোর মধ্যে তার হাতের আঙ্গুলগুলি মুহুভাবে কাঁপতে থাকে।

বৃদ্ধ ডাক্তার আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, ধরে রাখতে পারা যাবে কিনা সন্দেহ। চেঁচায় তো জুট হচ্ছে না। চমৎকার সুন্দরী মেয়েটি!...কি ভীষণ বড়। কি সাংঘাতিক...সাংঘাতিক...

আমি শুক হয়ে বসে থাকি। যন্ত্রণায় বুখানা ছিঁড়ে পড়তে চায়।



বাংলা বানান ও উচ্চারণ

অধ্যাপক শ্রী প্রকৃতিরঞ্জন বড়ুয়া

বাংলা বামানেৰ উচ্ছৃংখলতা নিয়ে আৰু কাল আবার আলোচনা সুরু হয়েছে। অতএব এ সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলা সম্বোধনযোগী বলে মনে হয়।

বাংলা ভাষায় বানানের উচ্ছৃংখলতা হু'রকমের আছে—একটা অজ্ঞতাপ্রসূত, অপরটি স্বেচ্ছাচার-জনিত। প্রথমোক্তটির কথাই আগে আলোচনা করা যাক।

বাঙালীর ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষা লিখতে গিয়ে কি রকম মারাত্মক বর্ণান্তরিত কবলে পড়ে তা বাঙালী অভিভাবক, শিক্ষক এবং পরীক্ষক মাঝেই অবগত আছেন। ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশের তরুণ শিক্ষার্থীরা বোধ হয় নিজ নিজ মাতৃভাষায় এমন কঠিন বানান-সমস্যার সম্মুখীন হয় না। অথেকে হয় তো ভনে বিভিন্ন হবেন যে, মারাত্মক ভাষী অঞ্চলে ছোটদের পাঠশালায় বানান শেখাবার যেওয়াছ নেই, কারণ তাদের উচ্চারণ এমন বিস্তৃত যে একই শব্দ একাধিকরূপে লিখিত হওয়ার সম্ভাবনা নিত্যন্ত কম। বিস্তৃত হিন্দীভাষী অঞ্চলেও বানান শেখাবার জড় অভিযুক্ত কোনও চেষ্টা দেখা যায় না, যদিও 'হিঙ্গে' (বানান) বলে একটা বস্তু তাদের অপরিচিত নয়। কিন্তু বাঙালীর ছেলেমেয়েদের বেলায় বর্ণশিকার স্তর ছেড়ে শব্দশিকার স্তরে উঠতেই সুরু হয় বাবানের পাথর-ভাঙ্গা। হ্রস্ব-দীর্ঘ, অন্তস্থ-বর্গীয়, দন্ত্য-মৃদু-জ-তালব্য ইত্যাদি সমস্যার ভিত্তি তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। এক অন্ধ ধারণা আমাদের মনে বহুদূর হয়ে আছে যে শুধু বানান করবার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তির ইতিহাস আয়ত্ত করতে হবে এবং ব্যাকরণের যাবতীয় বিবিস্তৃত একেবারে নখদর্পণে রাখতে হবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে এটা যে কি অসাধ্য ব্যাপার তা আমরা এক মুহূর্তও চিন্তা করে দেখি না। কেবল ব্যাকরণ-বিশারদগণই এসব নীরস চুলচেরা স্বস্বাভি-স্বস্তি নিয়মকানুন নিয়ে মশগুল হয়ে থাকতে পারেন। সাধারণের পক্ষে ব্যাপারটা যতই সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলা যায় ততই ভাষা এবং ভাষা-ভাষীদের মঙ্গল হয়। আমাদের বানান-সমস্যার গোড়ার কারণ হচ্ছে উচ্চারণ-বিকৃতি। এই গোড়ার গলদ শোধরাবার দিকে মজর দিলে বানান-সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। বানান উচ্চারণকে অহুসরণ করবে, কি উচ্চারণ বানানকে অহুসরণ করবে সে প্রশ্ন অতি জটিল। আমার মনে হয় অবস্থাবিশেষে বিচার করে কোথাও বা বহু-প্রচলিত উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়ে, আবার কোথাও বা বহু-প্রচলিত বানানকে প্রাধান্য দিয়ে ভাষার

সংস্কার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু এই উদ্দেশ্যট মনে রাখা চাই যে, প্রত্যেক শব্দ যেভাবে লিখিত হবে যথাযথ সেভাবেই যেন তার বর্ণাহুগ উচ্চারণ হয়। যে-কোনও ভাষায় এক একটা বর্ণমাত্রার উচ্চারণ এক একটা ধ্বনির সঙ্কেত। একই ধ্বনিকে বিভিন্ন বর্ণপ্রয়োগে প্রকাশ করতে গেলে ভাষার উচ্ছৃংখলতা বৃদ্ধি পাবেই; তেমনি আবার কোনও বিশেষ ভাষায় কোনও ধ্বনিবিশেষের অন্ত্র না থাকলে সেই ভাষায় উক্ত ধ্বনির প্রতীকরূপে কোনও বর্ণ রাখবার মানে হয় না। এ রকম বর্ণের উদ্বেগুহীন উপস্থিতি এবং অকারণ প্রয়োগে ভাষার উচ্ছৃংখলতা বাড়তে পারে। অতএব বর্ণমালার কোনও বর্ণ যদি অপ্রচলিত থাকে, অথবা ভাষা-ভাষীদের স্বাভাবিক উচ্চারণশক্তির পক্ষে অতি কঠিন হয়, তবে সেই বর্ণকে চিরনির্বাসন দিতে আপত্তি কি? অনেক ভাষারই বিবর্তনের ইতিহাসে এরকম দু'একটা বর্ণ-বিলুপ্তির মজির পাওয়া যায়। বাংলা ভাষাতেও তার নজির রয়েছে। কিন্তু এ আলোচনা পরে হবে, এখন আমাদের বিস্তৃত বর্ণোচ্চারণ নিয়ে দু'কথা বলা যাক।

প্রত্যেক ভাষাতেই উচ্চারণ এবং কণ্ঠধ্বনির (intonation) কিছু কিছু আঞ্চলিক ভারতম্য দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের কথা ভাষার মধ্যে বাহু পার্থক্যের একটা মুখ্য কারণ বিসদৃশ উচ্চারণ এবং ধ্বনি। ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টিতে উচ্চারণ এবং ধ্বনির কি রকম বৈসাদৃশ্য তা জানতে হলে বিলাত-যাত্রারও দরকার নেই, Phonetics-এর বিশেষ চর্চাও নিম্নপ্রয়োজন—বার্ণার্ড শ'-এর পিগমেলিয়ন নাটক পড়লেই এর মজাটা উপভোগ করা যায়। কিন্তু নিজের দেশের কথাই বরা যাক না কেন? বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার কথা ভাষারই বৈশিষ্ট্য আছে—সকলেই তা জানেন। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে 'স'র একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা যায়। পূর্ব-বঙ্গের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গীয়দের ঠাটা করে বলে থাকেন—'সামবাক্যের সসীবারু সসা নিয়ে সস্তরবাড়ী যায়।' পূর্ববঙ্গে তেমনি 'শ'র প্রাধান্য। পূর্ববঙ্গের অনেক অঞ্চলে চ, ছ, জ-এর উচ্চারণ কিছু শিথিল, এবং তা পশ্চিমবঙ্গীয়দের কৌতুক উজ্জিত করে। "জান্ডে পার না" কথাটা পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে "জান্ডি পার না" হয়ে যায় (পরশুরামের গল্প স্মরণ্য)। 'দেব'—'দেবো'—'দোব', 'করুল'—'করুলো', 'করুছেন'—'কোচ্ছেন'—'কর্চেন', 'গেল'—'গেলো'—'গ্যালো' ইত্যাদি জাতীয় বানান বৈকল্পিক বানানের গোড়াতেও রয়েছে ঐ উচ্চারণ-বৈসাদৃশ্য। কিন্তু কথা ভাষার যতই স্কেননা বিভিন্নতা

ধাতুক, লিখিত ভাষার একটি প্রামাণ্য রূপ থাকাই উচিত, নইলে ভাষার অরাজকতার সৃষ্টি হয় এবং তাই বাংলা ভাষার হচ্ছে।

এই সব আকলিক পার্থক্য ছাড়াও আমাদের ভাষার কতকগুলি সাধারণ উচ্চারণ-সম্পর্কিত দ্রুতি রয়েছে। “বেটার যত-পত জ্ঞান নেই”—কথাটা একটা গালিতে পরিণত হয়েছে। এটা হচ্ছে কারো যুক্তিহীনতা বা বুদ্ধতার অভাব তিরস্কার। কিন্তু আমাদের মনে হয় যত-পত জ্ঞান যতটা সহজ বলে ধরে নেওয়া হয় ততটা সহজ নয়। তার আগে ভেবে দেখা উচিত আমাদের হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান সহজ এবং স্বাভাবিক কি না। এ দুটির মধ্যে আমরা প্রায়ই গোল পাকাই। চিঠিপত্রে অনেকেই আমাদের “শারিরীক কুশল” জানতে চান। আরও সহজ এবং সাধারণ একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—“রীতিনীতি।” আমাদের অন্ত্যন্ত উচ্চারণ অস্থায়ী শব্দটার বানান হওয়া উচিত “রিতিমিতি”। কিন্তু আমরা জানি “রীতি” এবং “নীতি” উভয় শব্দেই একটা হ্রস্ব এবং একটা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে মিল না থাকতে ঠিক কোন্টা হ্রস্ব আর কোন্টা দীর্ঘ তাই নিয়ে আমরা মুশকিলে-পড়ে ঘাই। কলত: সবরকম উলট-পালট ঐ শব্দটার বানানে হতে পারে, এবং হয়েছে থাকে। রীতি, রিতি, আর নীতি, নিতি এই চারটেতে মিলে আমাদের মাথা গুলিয়ে দেয়। প্রকৃত সুনীতিবাসু “সুনীতীকুমারের” নামে কোনও চিঠিপত্র পেয়ে থাকেন কি না জানিনে, কিন্তু আমি “প্রকৃতিরঞ্জনর” নামে মাঝে মাঝে চিঠি পেয়েছি। উ-উচ্চারণের বেলাতেও একই সঙ্কট। এই সঙ্কট থেকে পরিজ্ঞান লাভের দুটো উপায় আছে; হয় হ্রস্ব-দীর্ঘ দুটির একটিকে উচ্ছিন্ন করা, নতুবা শৈশব হতেই হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ অভ্যাস করা। কোন্ উপায় গ্রহণযোগ্য সে বিচার সুবীজ্ঞান করবেন।

এখন বিচার করে দেখা যাক ‘অন্তহ’ আর ‘বর্গীয়’ সমস্ত। আমাদের বর্ণমালায় বর্গীয় ‘জ’ আর অন্তহ ‘য’ এবং বর্গীয় ‘ব’ আর অন্তহ ‘ব’ নিয়ে কি ভয়ানক ফেলেছারি। বস্তুত: এই বর্ণযুগলের মধ্যে গোল বাববার কোনও কারণই নেই। ‘য’ ও ‘জ’ আর ‘ব’ (অন্তহ) ও ‘ব’ (বর্গীয়) সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ। দেবনাগরী ‘অ’ ও ‘জ’ এবং ‘ব’ ও ‘ব’তে কিছু-মাত্র বৈধাৰ্য্যই নেই, বাংলার কেন তা হয়? প্রথম জোড়ার এর একমাত্র কারণ আমাদের উচ্চারণ-দোষ; এবং দ্বিতীয় জোড়ার এই দোষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুই বিভিন্ন বর্ণকে একই রূপে লিখবার রীতি। এমন নয় যে বাঙালী এই পৃথক পৃথক বর্ণগুলির উচ্চারণে অসমর্থ। ‘অ’ এবং ‘ব’ আসলে দুটা অর্ধ-স্বর বর্ণ বা semi-vowel, ইংরেজী y এবং wর মতো। বাঙালীরা কি ইংরেজী y এবং w উচ্চারণ করতে পারে না যদি পারে, তবে লেই একই উচ্চারণ নিজের

ভাষার করতে পারবে না এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিজের ভাষায়ও যে বাঙালী এই বর্ণের উচ্চারণ করে থাকে তার প্রমাণ অতি সহজেই দেওয়া যায়। দেবনাগরী ‘অ’ আর বাংলা ‘য’ একই বর্ণ, এবং তাদের উচ্চারণ একই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাঙালীরা ‘অ’র মত একটা অভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি করেছে—‘র’। অর্থাৎ উচ্চারণটা বাঙালীর যুগে ঠিকই আছে, কিন্তু বর্ণটির ঠিকমত উচ্চারণ না করে অনাবশ্যক একটা নতুন বর্ণের উদ্ভাবন করা হয়েছে। ‘য’ স্বধারীতি উচ্চারিত হলে ‘র’র কোনও দরকার থাকে না। বাঙালী ‘য’কে ‘র’র মত উচ্চারণ করলেই লেঠা চুকে যায়। আমরা যে ‘অ’ সহজেই উচ্চারণ করতে পারি তার আর একটা প্রমাণ ‘j’ ফন্টার বহুলা প্রয়োগ এবং তার স্বধাযণ উচ্চারণ। এই চিহ্নটিকে আমরা বলি বটে “জ-ফন্টা”, কিন্তু উচ্চারণ ‘অ’-ফন্টাই করি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ‘য’ ‘জ’-এর সমস্তা বাঙালীর দ্বিভিন্ন লক্ষ্যতাহেতু উৎপন্ন হয় নি, যেহেতু মোটেই হয়েছে। বর্ণমালা থেকে ফালতো ‘য’টাকে অপসারিত করে ‘য’কে ‘র’র মত উচ্চারণ করতে সুরু করলে বোধ হয় সহজেই সমস্তার মীমাংসা হয়।

দেবনাগরী ‘অ’ এবং ‘ব’ একই রূপে বাংলা বর্ণমালায় দুই ভাষাগার বিরাজ করেছে,—প-বর্ণের ‘ব’ (বর্গীয়), আর অন্তহ বর্ণের ‘ব’ (অন্তহ)। কিন্তু যেহেতু এই দুই বর্ণের চেহারার মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নেই, সেহেতু তাদের সনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, এবং এইজন্যই সর্বত্র বর্গীয় উচ্চারণই হয়ে থাকে। সংযুক্ত ‘ব’-এর কথা পরে আলোচিত হবে। এখন শুধু একথাটা বলতে চাই যে কোমল ‘ব’ (ব) উচ্চারণেও বাঙালীর সহজাত অক্ষমতা নেই, ‘ব’কেও যে বাঙালী ‘ব’ উচ্চারণ করে তাও বামবেদ্যালীর দোষ, এবং দুই বর্ণের লিখিত রূপের অভিন্নতা এই বামবেদ্যালীকে প্রভ্রম দিয়েছে। বাঙালী যে দুই ‘ব’-এর উচ্চারণ কেবল করতে পারে তা নয়, হামেশাই করে থাকে। একটা পরিচিত ইংরেজী নাম উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক—Wordsworth। নামটা ইংরেজরা যেরূপ উচ্চারণ করে, আমরা বাঙালীরাও তা করি এবং হিন্দীভাষীরাও তাই করে। কিন্তু লিখবার বেলায় মত গওগোল। দেবনাগরীতে এ নামটা লিখা হবে—‘ওয়ার্ডসওয়ার্থ’, আমরা বাংলার লিখি—ওয়ার্ডসওয়ার্থ। বাংলার ‘বার্ডসওয়ার্থ’ লিখলে তা কিভাবে উচ্চারিত হবে আমরা সবাই জানি। অর্থাৎ, নামটির শুদ্ধ উচ্চারণ বাঙালী মাঝেই করতে পারে, কিন্তু বর্ণ আর উচ্চারণে সঙ্গতি নেই বলে লিখবার সময় নামটাকে বেশ লম্বা এবং জটিল করে আমাদের লিখতে হয়—ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ‘ব’র স্থলে ‘র’র মত এখানেও আমরা ‘ব’র স্থলে ‘ওর’ উদ্ভাবন করেছি। কিন্তু এই উদ্ভাবনে গলদ আরও আছে। নামটা যেভাবে বাংলার লেখা হয় ঠিক উচ্চারণ করতে

সেলে তা হবে ইংরেজী “Oyardsoyarth”-এর সামিল। দেবনাগরীতে বাংলার মত বানান করে লিখলেও নামটা এইভাবেই পড়া হবে। আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু বাংলা অক্ষর চেমেন, কোথাও তিনি বাংলার লিখিত ‘করওয়ার্ড’ শব্দটা দেখেন, এবং তার অর্থোকারে অসমর্থ হন। আমি তাঁকে বলে দিলে পর তিনি ঠাট্টার স্বরে আমার জিজ্ঞেস করেন, “আচ্ছা, ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রীশ্রী, শব্দটা Forward না foroyard? সেরূপ West End-এর জন্ত আমরা লিখি ‘ওয়েস্ট এন্ড’। উপরোক্ত শব্দগুলি দেবনাগরীতে এইভাবেই লেখা হবে—वार्डस्वार्थ, फर्नार्ड, वेष्टुयार्ड। ‘व’ বর্ণটার উচ্চারণ ‘ও’ নয়, ‘ওঅ’, কিন্তু এটা স্বচ্ছন্দে লেখা যায় না, তাই ‘ওয়’ লেখা হয়। আমাদের বর্ণমালায় व ও अ রয়েছে সনাক্ত-চিহ্নহীন দুই স্বরজ্ঞ তাইয়ের মত। উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ দুটি যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণ, এবং কোনটাই যদি আমাদের সহজ উচ্চারণ-পদ্ধতির বহির্ভূত নয়, তবে লিখবার সময় তাদের কিছু পৃথকত্ব দিলে কি ক্ষতি হয় বুঝতে পারি নে। একটার পেটে দাগ কেটে দেওয়ার কথা ভেবে দেখা উচিত; বর্তমান যুগে অজ্ঞোপকারে অনেক সময় স্কুল পাওয়া যায়। এ প্রস্তাবের সমর্থনে আরও যুক্তি আছে, কিন্তু এখন ওসব যুক্তির অবতারণা করে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। কেবল যুক্তাকরের প্রসঙ্গে আরো দু’একটি কথা বলব।

অন্তঃ-বর্ণীয় সমস্তার সমাধান তো হ’ল। এবার দন্ত্য-মূৰ্ধ-ভালব্য সমস্তা সংক্ষেপে বিচার করে দেখা যাক। ন এবং ণ-এর বেলায় দন্ত্য-মূৰ্ধ সঠিক উচ্চারণ করা বাঙালীর পক্ষে সম্ভব কঠিন। কেবল বামামের উদ্দেশ্যে এই দুটোই রাখা উচিত, কি একটাকে চিরবিদায় দেওয়াই বাঞ্ছনীয় তা বিশেষজ্ঞগণ বলবেন। শ, ষ, স-এর বেলাতেও অনেকে কেবল একটাকে রেখে বাকী দুটাকে বর্জন করার পক্ষপাতী। কিন্তু এ প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ বাঙালীর দুটি ভিন্ন উচ্চারণ আছে—স (s) এবং শ (sh)। কেবল ‘ষ’ই আমরা উচ্চারণ করতে অপারগ। অর্থাৎ এখানে সমস্তাটা দন্ত্য-মূৰ্ধ বা দন্ত্য-ভালব্য নয়, এটা ভালব্য-মূৰ্ধ সমস্তা। অতএব শ, ষ, স-এর মধ্যে কাটিকে বাদ দিতে হলে কেবল ‘ষ’কেই বাদ দিতে হয়। দুটাকে বাদ দেওয়ার পক্ষে প্রবল যুক্তি নেই, দুটাকেই রাখতে হয়। তৃতীয়টাকেও সম্পূর্ণ লোপ করে দেওয়া যায় কিম্বা সন্দেহের বিষয়, কেননা তাতে বানানের ক্ষেত্রে অনেক মুশকিল এসে পড়তে পারে। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সূচিস্তিত অভিমত নেওয়া দরকার।

এখন আসা যাক যুক্তাকরের ক্ষেত্রে। অনেক যুক্তাকরের স্পষ্ট বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমরা করি না। ‘অক্ষর’ শব্দটাই নেওয়া যাক না কেন? বানানমতে শব্দটা ‘অক্খর’, কিন্তু উচ্চারণমতে ‘অক্খর’। ‘ক’ কদাপি আমরা শুদ্ধরূপে উচ্চারণ

করি না। শব্দের আদিতে এর উচ্চারণ পরিষ্কার নির্জলা ‘ব’, যথা—ক্ষেত্র (খেত্র), ক্ষতি (খতি), কমা (খমা) ইত্যাদি। অল্প উহা ‘ক্খ’, যেমন—অক্ষর (অক্খর), লাক্ষর (লাক্খর), ভক্ষণ (ভক্খণ), পরীক্ষা (পরীক্খা) ইত্যাদি। অথচ মজা এই যে, কেউ যদি ‘খতি’ ‘খমা’ ‘ভক্খণ’ লিখে বলেন তবে তাঁকে ‘গওমূৰ্খ’ প্রভৃতি উপাধিদানে আমরা এতটুকু দ্বিধা করব না। আর ঐরূপ বিভা জাহির করলে ‘পরীক্খাখীর’ তো ‘পরীক্খার’ অর্থভিত্তিই ছুটবে। আমার ধারণা ‘ক’ যথাযথ উচ্চারণ করা বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব তো নয়ই, উপরন্তু ‘ক্খ’-এর চেয়ে ‘ক্খ’ই কবিত্ববর্ণী বাঙালীর বেশী প্রিয় হওয়া উচিত। অক্খর, ভক্খণ, পরীক্খা বড় কাঠখোঁড়া; পক্ষান্তরে অক্খর, ভক্খণ, পরীক্খা অনেক মার্জিত এবং শ্রুতিমধুর। ‘ক’ সম্বলিত শব্দকে যথাযথ উচ্চারণ করে দেখলেই এটা সবাই বুঝতে পারবেন।

সংযুক্ত ‘ম’ও আমাদের উচ্চারণে এভাবে উপেক্ষিত হয়, এবং ঐ উপেক্ষার প্রতিশোধ গ্রহণে মিশ্র উচ্চ থাকে। বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে প্রায়ই ‘ম্মরণ’ ও ‘শ্মরণ’ শব্দদ্বয় দেওয়া হয় তাদের বিভিন্ন অর্থ প্রকট করার জন্য, যেন এ দুটি শব্দের অর্থ নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। কিন্তু উচ্চারণের দৃষ্টি হেতু বাংলাভাষায় এ গোলযোগ সম্ভব হয়েছে। আর একটা সাধারণ উদাহরণ ‘শ্মান’ শব্দ; কারও হাতে এসে পড়ে ‘শ্মান’, কারও হাতে বা ‘শ্মান’। আমাদের যুগে এবং কাজেকাজেই আমাদের অনেকের লেখাতেও ‘রামের’ সঙ্গে ‘লক্ষণের’ যতটা অভিন্ন-সদৃশ সম্পর্ক দেখা যায় বোধ করি ‘সুজ্ঞানন্দন’ ‘লক্ষণের’ কোনকালেই ভঙটা ছিল না।

কোয়ল ‘ব’ (অন্তঃ) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা তো আগেই হয়েছে। এটা যখন অল্প বর্ণের সহিত যুক্ত হয় তখন আমাদের উচ্চারণে তার আভাসমাত্র থাকে না। ফলতঃ সাধারণ শব্দের বানান নিয়েও অনেকে সমস্তার পড়েন। চিঠিপত্রে অনেকের হাত থেকেই আমরা “স্বভক্তি প্রণতি” গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। স্বয়ং বাণীবিশদারিনি মাঝে মাঝে আমাদের সমুখে “স্বস্বভী”রূপে আবির্ভূত হন, বিশেষতঃ তাঁর পুত্রের আমন্ত্রণপত্রে। ‘দ্বন্দ্ব’ শব্দ নিয়ে কত লোক যে ‘দ্বন্দ্ব’ পতিত হয় তার হিসাব কে রাখে? ভ্রমলোকদের মধ্যে অনেক “স্বত্বদার”-এর লাক্ষ্যও আমরা পেয়ে থাকি; তাঁদের জন্য সম্ভব হুঃখ হয়।

সংযুক্ত ঙ, ঞ, ন, ম এবং ণ সম্বন্ধে “দেশ” পত্রিকার প্রকাশিত ত্রীয়াঙ্কশেখর বসু মহাশয়ের প্রস্তাব মোটামুটি সমর্থনযোগ্য বলে আমি মনে করি। তবে সামান্য একটু সংশোধনের প্রস্তাব করতে চাই। অল্পস্বরকে বাংলার মত না লিখে দেবনাগরীর মত লিখলেই ভাল হয়। আমাদের

দীর্ঘকালের সংস্কারবশতঃ বাংলায় ‘পণ্ডিত’ লিখলে সেটাকে ‘পণ্ডিত’ উচ্চারণ আমরা করব না। কিন্তু ‘পণ্ডিত’ লিখলে ‘২’ উচ্চারণ করতে দীর্ঘকাল লাগবে না।

বাংলাদেশের সর্বত্র না হোক, অধিকাংশ অঞ্চলে শিশুদের যেভাবে বর্ণশিক্ষা দেওয়া হয় তা অত্যন্ত হাঙ্গর। ‘য’ এবং ‘জ’-এ যদিও ‘আসমান-জমীন্ ফারাক্’, তবুও উচ্চারণকারী তাদের পার্থক্য শিশুদের বোধগম্য করানো হয় না। একই ‘জ’-ধর্মের পূর্বে ‘অন্তঃ’ বা ‘বর্গীয়’ বিশেষণ যোগ দিয়ে তা শিখানো হয়। হ্রস্ব-দীর্ঘ, তালব্য-মূর্ধন্ত-দন্ত্য সকল বর্ণের বেলাতেই এ এক শিক্ষাপদ্ধতি। বলে দিচ্ছি দীর্ঘ, অথচ উচ্চারণ করছি হ্রস্ব।

সংক্ষেপে আমার মূল বক্তব্য এই—বাংলাভাষায় উচ্চারণ এবং বাস্তবের সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করা উচিত কিনা? যদি উচিত হয় তবে কোন্‌টার কভর সংস্কার করা সম্ভবপর? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার শক্তি এবং সর্বজনস্বীকৃত অধিকার যাদের আছে, সমস্তর দিকে তাদের মনোযোগ দেওয়া আন্তঃপ্রয়োজন। এই পথে ভাষা প্রয়োজন সংস্কারের প্রস্তাব নুতনও নয়, অসীকও নয়। ইংরেজী ভাষাতেও এই চেষ্টা হয়েছে, আমেরিকানদের দ্বারাও এই চেষ্টা হয়েছে। আমাদের ভাষায়ও যথাসম্ভব Phonetic spelling (ধ্বনিসঙ্গত বানান) গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

নামের অসম্মান

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আমলী যদি গো নামটি তোমার
চাপার বরণ রংটি কেন?
গৌরী তোমার “পাউডার”-মাখা
মুখের বর্ণ নীলাভ যেন!
ভিখারিণী ওই মেয়েটির নাম
অম্পূর্ণা—অম্প চেয়ে
ছুমারে ছুমারে ভিক্ষা মাগিয়া
আমাসদ্বীত বেড়ায় গেয়ে।
স্বনয়না নামে মেয়েটির আখো
অন্ধ নয়ন জনমাবধি;
তাহার বোনের লীনা নাম কেন
হাতীর মতন চেহারা যদি?
‘টিচারি’ করেন হাসিরাশি-দিদি
মুখটি যদিও পেচক সম
হাসিতে তাহারে দেখে নি কো কেউ
যদিও হলেন ভগ্নী মম!
অবলা তাহারে কে দিয়েছে নাম
সার্কাসে বাঘ খেলান যিনি
সরলার মনে জিলাপীর প্যাঁচ,
বিপুলার দেহ বেজায় ক্ষীণই!
রঙ্গিণী হায় কলহ করেন
চপলতাময়ী কুমারী ধীরী,
গলাখানি হেঁড়ে গানের কিস্ক
জানেন না হায় শ্রীমতী মীরা।
করুণাময়ীর নিষ্ঠুর হৃদয়
করেন না কভু কাউকে ক্ষমা,

উজ্জ্বলা আর হিমালী মাসীমা
—টিপিটিপি বলি—কাজল সমা!
অপরাজিতারা পরাজিতা হন
দজ্জাল স্বামী শান্তদী হ’লে
বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-সোহাগিনী
পুত্রকন্যা পেয়েছে কোলে।
বীণাপাণি, বাণী, সবস্বভীর
অক্ষর-জ্ঞান হয় নি মোটে
বালিকা-বয়সে হয়েছে বিবাহ
বরের আদর তাই না ছোটে!
হেঁড়া শাড়ী আর ময়লা সেমিজ
পরেন পাড়ার বিলাসিনী-দি
কুৎসিত ওই মেয়েটির নাম
সুন্দরী কেন দিলেন বিধি?
সত্যবালার সকল কথাই
অকারণে শুধু মিথ্যা-ভরা
নমিতা বিনীতা দুইটি বোনেই
দেমাকে দেখেন ধরাকে সরা!
লজ্জাবতীরা পর-পুরুষেরে
অধুনা খোড়াই ‘কেয়ার’ করে,
মীতাসাবিত্রী স্বামীত্যাগ করি,
যাচ্ছে কতই পরের ঘরে।
* * *
কত আর কব? নাম-সম্মান
এ জগতে হায় কেহ না রাখে,
আমারই আখো না মহাদেব নাম
সাহেবী পেশাক টুপীটি টাকে।

রামানন্দ-পরিচয়

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবনের পথে চলতে চলতে যে কয়েক জন দুর্লভ পুরুষের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য হয়েছে, পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁদের অন্ততম। তাঁকে নানা অবস্থার মধ্যে দেখবার সুযোগ জীবনে ঘটেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের নব নব পরিচয় আমাদের কাছে তাঁর প্রতি বেশী করে আকৃষ্ট করেছে। বজের মত তিনি কঠোর ছিলেন; কিন্তু সেই কঠোরতার অন্তরালে প্রহর ছিল পুষ্পের কোমলতা। তাঁর গান্ধীর্ষের বশ্বকেই সাধারণ লোক বড় করে দেখত। কিন্তু সেই গান্ধীর্ষের তলে তলে রসের যে ফল্গুবারা বইত তা ছিল তাঁর চরিত্রের একটি অত্যন্ত সত্য পরিচয়। মাথা তিনি কারও কাছে নত করতেন না। তাঁর সাধুতা ছিল সকল সংস্কারের উর্দ্ধে। কিন্তু সেই ভালমাহুষির মধ্যে ছিল পুরুষ-সিংহের তেজস্বিতা। কেবল খাঁটি মানুষই তিনি ছিলেন না; শক্ত মানুষও তিনি ছিলেন। দেশের সুরে সুর মেলানো তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী। তাঁর সংবাদপত্রসেবা ছিল সত্যেরই সেবা। সত্যকে অহসরণ করতে গিয়ে বিস্তর বাধা; বিস্তর বিজ্ঞপ তাঁকে সহ করতে হয়েছে।

তবু বলব—মাথা ঠুঁচ করে যিনি চলতেন চিত্তে অপরিমেয় নির্ভীকতা নিয়ে, তাঁর মধ্যে নম্রতারও সীমা ছিল না। মানুষের মধ্যে ধারা যথার্থ বরগীর তাঁদের কাছে কত সহজে তিনি মাথা নোয়াতে পারতেন।

একটি ঘটনার স্মৃতি আজও হৃদয়-আকাশে জল জল করছে সন্ধ্যাতারার মত। অনেক দিনের কথা। কলিকাতা থেকে চলেছি কলিকাতার মহাকবি কৃতিবাসের স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। একই ট্রেনে রামানন্দবাবুরও বাবার কথা। শিবালদহ ষ্টেশনে এসে তাঁকে খুঁজছি। প্রথম শ্রেণীর কামরার তিনি নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতেও তাঁর দেখা মিলল না। তবে কি তিনি আসেন নি? ট্রেন ছাড়ার ভয়ম আর বেশী বিলম্ব ছিল না। এমন সময় একজন বললেন, রামানন্দবাবু থার্ড ক্লাসে। সত্যই তাই। আমি গিয়ে দেখি সেই ঐতিহাসিক সৌম্যদর্শন মানুষটি প্রশান্তচিত্তে বসে আছেন ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরার একটি প্রান্তে। আমি যেতেই তিনি বললেন তাঁর অমহুকরণীয় ভঙ্গিতে : ‘তীর্থে চলেছি। তীর্থ করতে হলে কষ্ট স্বীকার করতে হয়।’ বিনয় যে যথার্থ প্রতিভার লক্ষণ—এ সত্য সেদিনের ঘটনার মর্মের গভীরে উপলব্ধি করেছিলাম। যারা শুধু পণ্ডিত, কেবল বুদ্ধির কসরত করেছে তাদের ঔদভ্যই চিরকাল এবল।

এই প্রতিভার যারা প্রতিভাবান তাঁরা কিন্তু চিরদিনই নম্র ও নিরতিমান। রামানন্দ উত্তম হয়েও নিরতিমান ছিলেন।

আর এক দিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে। সেবার তাঁকে কুমিল্লার নিরে চলেছি কি একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে। তিনি চলছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। আমি সঙ্গীক থার্ড ক্লাসের যাত্রী। রাণাবাট ষ্টেশনে তিনি এসে আমাদের কামরার উঠলেন। এক বন্ধু আমার ক্ষুদ্র কন্ঠার হাতে ধাবার দিলেন। সে এক হাতে ধাবার নিয়ে আর এক হাত বাড়াল। ইচ্ছা আরও নেবে। রামানন্দবাবু সর্কোতুকে এই দৃষ্ট দেখছিলেন। স্মিতহাস্তে বললেন, ‘তোমার কন্ঠাটি যিভুজা না হরে যদি দশভুজা হ’ত।’

তিনি সমালোচনা করবেন বলে আমার একখানি পুস্তকের দুই কপি তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিছু দিন পরে দেখি এক কপি তিনি কেবল পাঠিয়েছেন। যাদের তিনি স্নেহ করতেন তারা জামত—সেই স্নেহ নিঃশব্দে প্রকাশ পেত কত খুঁটিমাটি জিনিষের ভিতর দিয়ে। কত রকমের সমজা নিয়ে তাঁকে ভাবতে হ’ত, লিখতে হ’ত। কত দেশ দেশান্তরে বাবার জন্ত তাঁর কাছে ডাক আসত। সখ্যের এ পারের এবং ও পারের কত মনীষীদের চিঠির জবাব দিতে হ’ত তাঁকে। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও তিনি মনে করে বইখানি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর চেতনার আলো ছিল দিগন্ত-বিস্তারী। তাঁর খ্যাতি ছিল জগৎ-জোড়া। তবু যারা ছিল আমাদের মত নগণ্য তাদেরও জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল অনন্ত। তাঁর বিশ্ব ছিল বৃহৎ। মানবতার তিনি ছিলেন উপাসক। কিন্তু সেই বৃহৎ বিশ্বের বিস্তারের মধ্যে তাঁর কাছের মানুষগুলি কখনও হারিয়ে যার নি। নিকটের মানুষগুলির সুখ-দুঃখকে বাদ দিয়ে যে একরকমের তাসা-তাসা মানবতার জয়গান আজকাল একটা ক্যান্টোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে সেই মানবতাকে তিনি সংস্কারের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর মানবতার ভিত্তি ছিল রক্তমাংসের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কল্যাণ।

বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন বৃহস্পতি। তাঁর যুক্তির বাঁহুনি সফটওয়্যারের কথা শ্রবণ করিয়ে দিত। ‘প্রবাসী’র এবং ‘মডার্ন রিভিউ’-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির প্রথম আকর্ষণ ছিল তাদের অকাট্য যুক্তির সারবত্তা। গ্রীসের মাতবরেরা সফটওয়্যারকে বিব খাইরেছিল। ভরুণ গ্রীকদের তিনি শিখিয়েছিলেন যুক্তিবাদী অমাসক্ত মন নিয়ে কেমন করে সত্যের অন্বেষণ করতে হয়। যারা দেশের ভরুণচিত্তকে

তর্ক করতে, বিচার করতে শেখার ভার অজীভের শাসনের ভিত্তিতে দেয় কার্টল বরিয়ে, মিথ্যার আধিপত্যে হামে দারুণ আঘাত। রামানন্দবাবুর সমালোচনার পদ্ধতি তরুণ-বাংলাকে শিখিয়ে গেছে যুক্তির স্তম্ভীর সন্ধানী আলোর সত্যকে কি করে আবিষ্কার করতে হয়। কমতা ছিল যাদের হাতের মুঠোর মধ্যে তাদের কাছে তাই তিনি ছিলেন এত ভীতিপ্রদ। বাংলা তথা ভারতকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে রামানন্দবাবুর সন্তোষ লেখনী কতখানি সাহায্য করেছে, বিশ্লেষণ করে তার পরিমাপ করা যায় না। তাঁর কাছে আমাদের গুণ অপরিশোধ্য। স্বাধীন ভারতবর্ষের তিনি নিশ্চয়ই অতন্তর অষ্ট।

তবু বলব—তাকে যুক্তিবাদী নিহক পণ্ডিত বললে তাঁর সম্পর্কে সবখানি বলা হয় না। ভাবাবেগও তাঁর মধ্যে ছিল প্রচুর যদিও সেই ভাবাবেগের অতিব্যক্তির মধ্যে কোনরকমের নাইকোপনা ছিল না। এক দিনের কথা আদ্য ও তুলতে পারি নি। শান্তিপুরে তিনি গিয়েছেন এক সাহিত্য-সভার সভাপতি হয়ে। আমি তাঁর সঙ্গে আছি। সকালে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে উপাসনা হচ্ছে। আচার্য্যের আসনে রামানন্দবাবু। তিনি উপাসনা করছেন। তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে দরদর ঝাঝ ঝগলিত হচ্ছে প্রেমাত্ম। তক্তের সে কি মর্ম্পর্শী কান্না! সেদিনের সেই স্নিগ্ধ প্রভাতের একটি ঘটনা বিহ্বলীকৃত্তে আমাকে যা দেখাল তার পরিচয় আগে আমি কখনও পাই নি। সম্পাদক রামানন্দকে দিনের পর দিন দেখেছি তাঁর টেবিলে। কত রকমের কাগজে ভর্তি সেই টেবিল। প্রাচীন তপোবন থেকে আর্ধ্য ঋষি ঘেন: আবির্ভূত হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর বদদেশে। মুখচ্ছবিতে কি অভলম্পর্শী প্রশান্তি। চলায়, বলায়, তাবে, ভঙ্গীতে কোন রকমের চাকল্য নেই। আপনা থেকে মাথা বার বার হুয়ে পড়েছে তাঁর পদপ্রান্তে। বক্তা রামানন্দকে দেখেছি। সেই বক্তৃতার উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যুক্তির পর যুক্তির দ্বারা বক্তব্য বিষয়টিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর জ্বরে ধারে ধারে বসিয়ে দেবার কৌশল ছিল তাঁর বাগ্গিতার বৈশিষ্ট্য। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতাও শুনেছি। সেই বক্তৃতার মধ্যে ছিল নারোঁ জলপ্রপাতের গর্জম। তা শ্রোতাদের মনকে নিমেষে কোথায় তাসিয়ে নিয়ে যেত। বিপিনচন্দ্র বক্তৃতা করতেন আর সেই বক্তৃতার ভাষা শ্রোতৃবর্গের মনের গভীরে স্রষ্ট করত একটা বিপুল আলোড়ন। দ্বারা তাঁর বাগ্গিতার পরিচয় পায় নি তাদের বোঝানো যাবে না বাংলা ভাষায় বক্তৃতা কতখানি কোরালো হতে পারে। কিন্তু রামানন্দবাবুর বক্তৃতার ধরণ ছিল স্বতন্ত্র।

আমাদের নিত্যন্ত আপনার জন্ম হয়ে যিনি প্রাণ পূলে গল্প করতেন সেই সহজ মাহুয় রামানন্দকেও আমরা কতদিন

কত বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে পেয়েছি। সে সময়ে তিনি কোন আড়াল রাখতেন না। দেশ-বিদেশের মনীষীদের কথা বলতে তিনি ভালবাসতেন। তগিনী নিবেদিতার ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অনেক কাহিনী তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথ এগেছেন তাঁর বাড়ীতে। তাঁর শিশু মাভনী হাত কবির হাতে। হাসতে হাসতে পরিহাসপ্রিয় কবি তাঁকে বলে-ছেন “রামানন্দবাবু, আপনার মাভনীর পানিগ্রহণ করলাম।” মজলিসী রামানন্দের পরিচয় দ্বারা পায় নি তাদের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের অতি সামান্য অংশই উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাঁর চোখ দিয়ে আমি ইউরোপের ছবি দেখেছি। ইউরোপ থেকে স্বদেশে ফিরেছেন। ওদেশের এক তরলোক কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন: “আমাদের দেশের রাশা আপনার কেমন লাগল?” অপ্রিয় সত্য বললে পাছে বিদেশী তরলোক হুঃপান তাই অননুসরণীয় ভঙ্গিতে রামানন্দবাবু জবাব দিলেন, “ভালই লেগেছে, তবে আপনাদের দেশের রাশা বেশী খাওয়া যায় না।” তাঁর মুখ থেকে এই রকমের গল্প শুনতে শুনতে আমরা কত হাসিই না হেসেছি।

তখন তিনি ইউরোপে। কানের গীড়ার কষ্ট পাচ্ছেন। চিকিৎসকের বাড়ীতে গিয়েছেন কান দেখাতে। ডাক্তার হিসাবে তাঁর ইউরোপে খুব নাম। চেয়ারে বসে প্রবীণ সম্পাদক রামানন্দবাবু। ডাক্তার সামনে দাঁড়িয়ে। রামানন্দবাবুকে তিনি হাঁ করতে বললেন। হাঁ করতেই ডাক্তার তাঁর মুখের মধ্যে একটা লজ্জেল ফেলে দিলেন। তার পর খুব যত্ন নিয়ে তাঁকে দেখে ডাক্তার ব্যবহাগ্রস্ত লিখে দিলেন। রামানন্দবাবু যখন বাড়ী ফিরে এলেন লজ্জেলের ব্যাপারটা তখনও তাঁর মনের মধ্যে ছোট কাঁটার মত ঝুঁকু করছে। একই বাড়ীতে তখন রবীন্দ্রনাথ সদলবলে অবস্থান করছেন। একই চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথকেও দেখেছেন ইতিপূর্বে এবং যথারীতি তাঁর মুখের মধ্যেও লজ্জেল কেলেছিলেন। ব্যাপারটা কবির কাছেও খুব ঐতিকর বলে মনে হয় নি। কিন্তু ঘটনাটা চেপে গেছেন তিনি। ডাক্তারের ওখান থেকে ফিরে রামানন্দবাবু বসেছেন কবির কাছে। আর কেউ নেই। হুঁ এক কথা হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মশাই, ডাক্তার কি আপনাকেও লজ্জেল ধাইয়েছে?’ রামানন্দবাবুর তারাত্তাল মন থেকে সঙ্গে সঙ্গে আহত অভিমানের বোকা নেমে গেল। লজ্জেল খাওয়া সম্পর্কে হুঁজনেরই অভিজ্ঞতা এক। কারও মনে আর কোভ রইল না। গল্পের মজলিলে এই ধরণের কাহিনী যখন তিনি পরিবেশন করতেন, আমরা প্রচুর হাসির সঙ্গে তাদের নির্মল রস আবাদন করতাম।

সম্পাদক রামানন্দকে দেখেছি, বক্তা রামানন্দকে দেখেছি, মজলিসী রসিক রামানন্দকে দেখেছি, তাঁকে বিভিন্ন রূপে

দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। দেখেছি তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞানের পিপাসা, কবিত্বের নির্ভীক চিত্তের অপরিণীত দৃঢ়তা, দেখেছি বুদ্ধির এবং চরিত্রের আভি-
জাত্য। কিন্তু শাস্ত্রপুত্রের ব্রাহ্মসমাজে তাঁর অশ্রুপ্রাপ্তি মুখ-
মণ্ডলে যে ছবিখানি সেদিন দেখেছিলাম তারই মধ্যে বোধ
হয়, ফুটে উঠেছিল তাঁর পরম পরিচয়। আসলে রামানন্দ
ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। তাঁর হৃদয়-আকাশে যে কামনা সর্ব-
সময়ের জন্ত জ্বলন্ত প্রবর্তারকার মত সে হচ্ছে ভগবানকে
পাওয়ার ব্যাকুল কামনা। কিন্তু মর্দের গভীরতম প্রদেশের

এই নিবিড় আকাজক্ষাকে বাহিরে প্রকাশ করতে তাঁর
কুণ্ঠার অবশি ছিল না। আমার সঙ্গে কথাবার্তার তাঁকে
ভগবানের কথা বলতে কখনও স্তম্ভেই বলে মনে পড়ে না।
তবু তাঁর হৃদয়কে জুড়ে ছিল সেই পরম পুরুষকে উপলব্ধি
করবার সর্ব্বপ্রাণী কামনা। আর মানুষের মধ্যে ইখরকে
তিনি ভালবেসেছিলেন বলেই মরদেবতার অসম্মানকে তিনি
কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না, বরদাস্ত করতে পারতেন
না অত্যাচারীর স্পর্ধাকে।

দেবানন্দ

শ্রীনীনীমাম্বর চৌধুরী

কলিকাতার শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে বাংলার নবাবের তিলক
আসিতেছেন, সঙ্গে আসিতেছেন খাপার্দে ও ডাঃ মুন্সে। ছাত্র-
মহলে মহা উৎসাহ। বরিশালে ফুলারী লাঠিবাজির পরে
দেশময় যে উত্তেজনার ঢেউ উঠিয়াছিল বীরে বীরে তাহা
মিলাইয়া যাইতেছিল। দমননীতির নিষ্পেষণে স্বদেশী ও
বরকট আন্দোলনের গতি কীণ হইয়া আসিতেছিল। ব্রিটিশ
“কেয়ার ডিলে” বিশ্বাসী নরমপন্থী মডারেট নেতাদের অধিকৃত
কংগ্রেস, বিলাতী পার্লামেন্টে লিবারেল পার্টির প্রভাবের
উপর অনেকখানি আশা রাখিয়াছিল। এই নেতারা তখনও
বিলাতে ডেপুটেশন পার্ঠাইবার কথা ছাড়া আর কোন উপায়
দেখিতেছিলেন না। গোপালকৃষ্ণ গোস্বালে বিলাতে গিয়া
তারত গবর্নমেন্টের অবরদত্ত নীতিকে একটু উদার করিবার
জন্ত বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন। ছাত্রমহলে ও যুবক-
সম্প্রদায় প্রাচীন নেতৃত্বের উপর বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।
নূতন নেতৃত্ব তখনও রাজনৈতিক রদমকে স্থান করিয়া লইতে
পারে নাই। এই অনিশ্চিত অবস্থা ও স্বদেশের মধ্যে পড়িয়া
ছাত্রসমাজ খামিকটা উচ্ছ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, কথার কথার
দেশের প্রাচীন, অভিজ্ঞ নেতাদের অসম্মান করিতেছিল।
ইতিহাস মিরর এই অশিষ্ট আচরণের মিন্দা করিয়া বলিল,
“হুইকোড নেতারা ই একত দারী।

শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে চরমপন্থী নেতারা যখন তিলককে
নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন কলিকাতার মডারেট নেতারা মনে
মনে শঙ্কিত হইলেন ও একটু মিষ্ট নেতাদের সঙ্গে হাত মিলাইলেন
মহারাত্রের নেতাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্ত। তাহারা

তাবিলের তিলকের আগমনে স্বদেশী আন্দোলনে যদি নূতন
উৎসাহ আসে তাহাতে মঙ্গল হইবে।

প্রত্যক্ষ রাজনীতির আড়ালে যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে
যে অত প্রকার আন্দোলনের চেষ্টা বিচ্ছিন্নভাবে আরম্ভ হইয়া-
ছিল, প্রবীণ নেতারা অনেক তাহার ব্যাপকতা ও ভবিষ্যৎ
নয়কে বিশেষ ধরন রাখিতে নাই। কিন্তু দূর মহারাষ্ট্রে সে
ধরন পৌঁছিয়াছিল। নব জাগরণের প্রথম হইতে হুই দেশের
মধ্যে তাবের আদান-প্রদান আরম্ভ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের
গণপতি ও শিবাজী উৎসবের পরে পঞ্জাব হইতে আসিল
গুরুগোবিন্দ উৎসব। বাংলার নিজেদের বীর সন্তানদের কথাও
মনে পড়িল—কলে প্রভাপাদিত্য উৎসব, মিরকাশের উৎসব
আরম্ভ হইল।

দেশের বীর সন্তানদের পূণ্যস্মৃতি স্মরণে জাতীয় চেতনা
উজ্জ্বল করিবার জন্ত বাঙালী হিন্দুরা এই সব উৎসব আরম্ভ
করিলে হুই শ্রেণীর লোকের ইহা ভাল লাগিল না। তাহারা
প্রতিবাদ ও পার্টি উৎসবের প্রস্তাব করিল। ইংরেজ সম্প্র-
দায়ের মনে হইল, স্মরণ করিবার মত তাহাদের অনেক
কীর্তিকলাপ ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা আছে, তাহারাই
বা কেন সেগুলি স্মরণ করিয়া উৎসব করিবে না? পলাশী
মেমোরিয়াল, মিউটিনি মেমোরিয়াল, ক্রাইস্ত মেমোরিয়ালের
প্রস্তাব উঠিল তাহাদের পক্ষ হইতে। দ্বিতীয় শ্রেণীর
প্রতিবাদকারী বাংলাদেশের শিক্ত মুসলমান-সম্প্রদায়।
এই সম্প্রদায়ের কেহ কেহ, আহম্মদ শা হুসাইন পানিপথের
যুদ্ধের স্মরণ করিয়া উৎসব করিবার প্রস্তাব করিলেন শিবাজী
উৎসবের প্রতিবাদে।

মহা উৎসাহে শিবাজী উৎসব হইল। উৎসবের বিবরণ দিয়া যুগান্তর এই মর্মে লিখিল—শিবাজী মহারাজের কাছে তাঁহার ভরবারি ছিল রাজসম্মানের চাইতে বেশী আদরের বস্তু। ভরবারির জন্তই তিনি ভবানীর প্রিয় হইয়াছিলেন। হে ভারতবাসী, আজ যদি তোমরা ভরবারি দূরে ফেলিয়া দিয়া ভরবারিহীন শিবাজীকে হৃদয়ে স্থান দিতে অগ্রসর হও, নিশ্চয় জাতিও তোমাদের ঐ হৃদয় কতবিকৃত হইবে। ভিলক বক্তৃতা করিলেন, “ইংরেজ আমাদিগকে চণ্ডালের মত যুগা অপমান করে। বাহারা এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করে না তাহারা মহাশয়মানের যোগ্য নহে। বিদেশী জিনিসের বিরুদ্ধে সকলের মনে যুগা ও বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যত অভ্যাচার হউক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আমাদের স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতে হইবে।” সমবেত শ্রোতাদের সম্বোধন করিয়া তিনি আরও বলিলেন—“স্বদেশীর শত্রু আত্মাদের স্বদেশবাসী দ্বারা বিদেশী সরকারের গোলামী করেন। মনিষের কাছে তাঁরা আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, সত্য বলিবার সাহস কই তাঁদের। শিবাজী ছিলেন ণাঁটি স্বদেশী। তাঁর পিতা সরকারের চাকুরি করিতেন, শিবাজী তাঁহার বিদ্রোহে বিরোধ করিয়াছিলেন।”

একদিকে প্রকাণ্ড স্তম্ভ সম্বিভূক্ত বক্তৃতা চলিতে লাগিল আবার তাঁহার হই ভ্রম মরাগী সহকারীকে সঙ্গে লইয়া ভিলক মহারাজ অহুশীল সমিতির অধিনায়ক মিঃ মিজের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাংলার গুপ্ত সমিতি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল।

বাংলার বিপ্লবী দলের নেতাদের কাছে মহারাষ্ট্র হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, মরাগী নেতারা তিন শত যুবককে আমেরিকা হইতে যুদ্ধ-পরিচালনা-বিভাগে প্রশিক্ষিত করিয়া আনিয়াছেন এবং বোম্বাই প্রদেশে প্রায় দেড় লক্ষ খেছা-সৈনিক সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া বাংলার এক লক্ষ খেছাসৈনিক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ঢাকার কেন্দ্র হইতে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের সর্বত্র অহুশীল সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। কলিকাতা, মেদিনীপুর ও চন্দননগরের কেন্দ্র হইতেও খেছাসৈনিক সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইল। রক্তধার কক্ষে মহারাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে বাংলার নেতাদের আলোচনা হইল, দ্বারমুখ করিতেছিলেন ঢাকা অহুশীল সমিতির পুলিশবিহারী দাস ও আমল চক্রবর্তী।

হাতিবাগানের কেন্দ্র উত্তীর্ণ যুগান্তর আপিসে গিয়াছিল। তরুণ-সমাজের মন বিপ্লবমুখী করিবার জন্ত যুগান্তর জোর প্রচারকার্য চালাইতে লাগিল। যুগান্তরের গ্রাহকসংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিল। নূতন সভ্য সংগ্রহ, সভ্যদের শিক্ষার ব্যবস্থা চলিতেছিল। জায়গার জায়গার স্থানীয় নেতাদের অনীনে পৃথক সমিতি স্থাপিত হইতেছিল।

বিপ্লবমুখী যুগান্তর, অরবিন্দের বন্দেমাতরম, বিপিনচন্দ্র পালের নিউ ইণ্ডিয়া ও ব্রহ্মবাহবের লক্ষ্য যুগপৎ সরকার ও মডারেট নেতাদের আক্রমণ করিতে লাগিল। লোকে নূতন ভাব ও চিন্তার এই সকল সাহসী প্রচারকে বন্দেমাতরম পার্টি নাম দিল। এই দলের প্রধান পুরুষ বন্দেমাতরমের পরিচালক। সমাজের অনেক পন্থ ব্যক্তি এই দলের প্রত্যক্ষ ও গোপন সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক হইলেন। নিউ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টার বাংলার সর্বত্র ঘুরিয়া নূতন ভাব ও চিন্তা প্রচার করিতে লাগিলেন।...

মিঃ মিজের এক জরুরী পত্র পাইয়া ভবেশকে চক্রবেড়ের ঘাইতে হইল। সে ঘাইবার জন্ত জামা কাপড় পরিতেছে, দেবিল বগলে কতকগুলি কাগজ লইয়া দেবানন্দ বাহিরে ঘাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। সে বলিল, আজও যুগান্তর বিক্রী করতে বেরুচ্ছিস না কি?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, হাঁ, এই কাজের তার পড়েছে আমার উপর।

ভবেশ বলিল, আমার কথা শোন। আমি চক্রবেড়ের ঘাইছি, আমার সঙ্গে আজ চল। এর পর আর তোকে কর্তব্যচ্যুত করার জন্ত ডাকব না।

দেবানন্দ—কাগজ বিক্রি করে পরসে জমা দিতে হবে।

ভবেশ—কাগজগুলো হষ্টেলের ছেলেদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া যাবে। দাম আমার কাছ থেকে নিয়ে জমা দিয়ে আসিস। আজ চল ভাই আমার সঙ্গে। মামা লিখেছেন, বাবা তাঁকে মাকি এক চিঠি লিখেছেন আমার বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে। জরুরি পরামর্শ আছে।

দেবানন্দ—আপনার সঙ্গে জরুরি পরামর্শ, আমি গিয়ে কি করব?

ভবেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, ভুই কীটির সঙ্গে গল্প করবি।

দেবানন্দ লক্ষ্য করিয়াছে আজকাল ভবেশদা মাঝে মাঝে কীটির কথা তুলিয়া তাহাকে ঠাটা করেন। কীটি যেম পর্বৎসের কাছে পড়ে, সাহেবী চালে থাকে, কিন্তু দেবানন্দ দেবদ্বায়ে তাহার নিজের একটা আলাদা চেহারা আছে। সেটা যেন অনেকখানি শান্ত, আর একটু মিষ্ট। সেদিনকার কথা তাহার মনে পড়িল। কি একটা বেলেমামুখি করিতে করিতে কীটি হঠাৎ বাড় কাৎ করিয়া তাহার দিকে চাহিল। মনে হইল যেন দৃষ্টি দিয়া বলিতেছে, দেখ আমি কেমন হষ্টুমি করছি। মনে হইল চাহনি দিয়া সে যেন বলিতে চাহিতেছে, তোমার সঙ্গে আমার ত বোঝাপড়া হয়ে গেছে, নয় কি? এই বোঝাপড়াটা যে কি সে বহু চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারে

না। তাহা না পারুক, কিটিকে বেশ লাগে তাহার। আর বোধ হয় কিটির জন্মই সে চক্রবেড়ে যায়।

ভবেশের কথা শুনিয়া তাহার একটু লজ্জা হইল। সে তাবটুকু বাড়িয়া ফেলিয়া সে বলিল, আজ থাক।

ভবেশ মুচকি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা।

একটু পরে সে আবার বলিল, বি-এ পাস করে বিলাত যাবার কথা। হঠাৎ বাবা এখন এ কথা ভুললেন কেন, আর আমাকে কিছু না লিখে মামাকে লিখলেন কেন বুঝতে পারছি নি।

ভবেশের পিতার ও তাহার এই পত্রের কথা একটু বলা হইতেছে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম অব্যাহত ভাবে বঙ্গা বহিয়াছিল দেশে। মহারাজা, রাজা, জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া মুটে, মজুর, চাষী, গাভোয়ান, দোকানদার, সবাই যেন একটা বাহু-মস্তে নবজাগ্রত দেশপ্রেমের প্রেরণায় আলাদা মাহু হইয়া উঠিল। ভবেশের পিতা চিরকালের রাজভক্ত জমিদার। মহারাজা ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর সনে তাহার যে মেয়ে জন্মিল তাহার নাম রাখিলেন ভিক্টোরিয়া। তার পরের বছর তিনি রায়বাহাদুর খেতাব পাইলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হইলে রায়বাহাদুর গ্রামের সর্ব-সাধারণের সঙ্গে মিলিয়া খালি পায়ে স্বাধীনবন্ধনের শোভা-যাত্রায় যোগ দিয়া গান করিলেন—

তাই ভাই এক ঠাই, ভেদ নাই ভেদ নাই।

বন্দেমাতরম্ সারসুলায় জারি হইলে যে সব ছেলে স্কুল হইতে বিভাচিত হইয়াছিল তাহাদের জন্ম তিনি গ্রামে জাতীয় বিভাগের পুলিশের। দেশী কাপড় বিক্রয়ের জন্ম হাটে তিনি দোকান পুলিশের।

তারপর আন্দোলনের বিস্তারিত অব্যাহত হইল সুন্দারী অভিযানে। রেগুলেশন লাঠির আবির্ভাব হইল। আরম্ভ হইল হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের, জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের উচ্চাঙ্গ দেওয়া, বন্দেমাতরম্ ও স্বদেশীর বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান। ইংরেজ রাজপুরুষগণ ও ইংরেজ কাগজওয়ালারা ঘোষণা করিল—এডুকটেড বেঙ্গালীজ আর সিরিয়াসলি ডিসলয়াল (শিক্ষিত বাঙালীরা একেবারে রাজতন্ত্রবিরোধী)। দেশের অনেক জমিদারের যত রায়বাহাদুর খেতাবইয়া গেলেন। দেশের সর্বত্র সমাজের পদস্থ, অর্থশালী ব্যক্তিদের পশ্চাদপসরণ আরম্ভ হইল। রায়বাহাদুর হাত ওটাইলেন।

অর্থাভাবে জাতীয় বিভাগের উদ্ভিগ্না গেল। তাহার প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী দোকান হইতে বাহারা ধারে কাপড় কিনিভেন তাহারা বাকী টাকা শোধ করিতে ছুটিয়া গেলেন। শেষে হইল দোকানের কাপড় চুরি। অনেক লোকসান খাওয়াইয়া দোকান উদ্ভিগ্না গেল। হাটে বিলাতী লবণ বিক্রয় বন্ধ

করিবার জন্ম ছেলেরা পিকেটিং আরম্ভ করিলে তিনি দারোয়ান পাঠাইয়া তাহাদের ধরিয়া আনিয়া খুব বমকাইয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন তাহার হাটে কেন পৌলশাল করিলে তিনি তাহাদের ধরিয়া ধামার পাঠাইয়া দিবেন। এখন স্বদেশী আন্দোলন, বরকট তাহার চোখে রাজদ্রোহ, তাহাদের পারিবারিক রাজতন্ত্রের সুমার নষ্ট হইবার ভয়ে তিনি সর্বদা হুঙ্কিতাগ্রস্ত।

শালক-পত্নীর এক পত্রে পুত্রের কার্যকলাপের সংবাদ পাইয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। ব্যারিষ্টার শালককে লিখিলেন—আর দেবী না করিয়া ভবেশকে বিলাতে পাঠাইয়া দাও।

মিসেস রায়ের ভবেশকে ভাড়াভাড়া বিলাতে পাঠাইবার আগ্রহ জন্মিবার একটা কারণ ঘটয়াছিল। ভবেশ এই কারণের কথা কিছু জানিত না। কিন্তু এই কারণ বশতঃই মিসেস রায় ভবেশের পিতাকে ভয় দেখাইয়া তাহার সম্মতি আদায় করিবার জন্ম পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের উত্তর আসিলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ম মিঃ রায় ভবেশকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

মিঃ রায়ের গৃহে পৌছিয়া নীচে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া ভবেশ উপরে উঠিল।

বসিবার ঘরে মিসেস রায় একজন অপরিচিত ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। একটু দূরে কিটি, একটু মেয়ে ও একজন যুবক বসিয়া নিজেদের মধ্যে আলাপ করিতেছিল। ভবেশ ঘরে ঢুকিবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছে, ইতিমধ্যে বিলি সিঁড়ি দিয়া লাফাইতে লাফাইতে উঠিয়া আসিল। ভবেশকে দেখিয়া সে চিংকার করিয়া কি বলিতে বাইতেছিল, ভবেশ ভাড়াভাড়া টোটে আঙ্গুল স্পর্শ করিয়া তাহাকে চূপ করিতে ইঙ্গিত করিল। তাহার হাত ধরিয়া টা টায়া সে পাশের একটু ঘরে লইয়া গেল।

ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল, কারা এসেছে বিলি? ওদের ও চিনি না।

বিলি উত্তর না দিয়া হাসিতে লাগিল। ভবেশ বলিল, কি হ'ল তোমার মাঠার বিলু? এত হাসি কেন?

হাসিতে হাসিতে বিলি বলিল, ইয়া আজা! ওয়া কারা তুমি জান না ভবেশ দা?

‘ইয়া আজা’ কথাটা বিলি শিখিয়াছে নিজামুদ্দা বাবুজির কাছে। বাজারে চুরি করিবার জন্ম মিসেস রায়ের কাছে বকুনি খাইয়া সে প্রথমেই বলে ইয়া আজা।

ভবেশ বলিল, না, ত।

বিলি—চূপে চূপে বলছি তোমাকে। কিটিটাকে যেন বলে দিও না। কিটির কাছে এ যে আচ্ছাদী পুতুলের মত গালকোলা মেরেটাকে দেখে ওর নাম আইভি বুকসি বা বাকসি। ও ইংরেজী বলে কিটির গর্ভবর্ণনের মত শ্রুত করে।

ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। ম্যামী সেদিন বলছিল ড্যাভীকে, আমি মুকিরে শুনেছি। আর ওর কাছে খুব কলী, পিংপং খেলবার বলের মত নাকওরালো যে বলে আছে ও হচ্ছে আইডি বুকসির তাই। ক্রিটর সঙ্গে ওর বিয়ে হবে।

এই পর্যন্ত বলিয়া বিলি খুব হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, পিংপং বলের কথা কে বলেছে জান তবিশ না? ক্রিট বলেছে। ক্রিট ইজ মট। সে বলে চীনাওয়ান চ্যাং চুং।

হালি সংক্রামক। খবর শুনিয়া বিস্মিত হইলেও তবিশ বলির সঙ্গে হাসিতে লাগিল। বিলি বলিল, ক্রিট বলে ঐ চীনাওয়ানকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে। জান তবিশনা, ও কিন্তু সত্যি চীনাওয়ান নয়, ও একজন ম্যাডিস্ট্রিট। বিলেতে পাশ করেছে, ম্যামী বলেছে।

ভারপর সে বলিল, আমি ম্যামীকে বলছি তুমি এসেছ। পালিও না বেন। বিলি চলিয়া গেল।

বিলির মুখে যাহা সে শুনিয়া তাহাতে তবিশ খুব পিতার হঠাৎ মত পরিবর্তনের পিছনে মিসেস রায়ের সুপরি-কল্পিত যত্নবদ্ধ আছে। তাহার পিতা জিয়া গেল। আর অপেক্ষা না করিয়া তখনই সে নীচে নামিয়া গেল।

বিলির সঙ্গে খরের বাহিরে আসিয়া মিসেস রায় তবিশকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

১

তবিশ লক্ষ্য করিতেছিল দেবানন্দ যেন দূরে সরিয়া যাইতেছে। সে প্রায়ই বাহিরে যায় ও দিনের অধিকাংশ সময় হঠেলে অসুপস্থিত থাকে। পরীক্ষা দিবে বলিয়া নাকে নাকে বই বুলিয়া বলে—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। খাওয়া ও থাকা ছাড়া হঠেল-জীবনের সঙ্গে তাহার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইবার মত। তবিশ নিজের মনে চিন্তা করে, হুঃ করে দেবানন্দের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, কিন্তু জানে তাহাকে চেকাইবার চেষ্টা করা যুগ।

তাহার নিজের ভবিষ্যৎও একটু অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কয়েকদিন হইল তাহার পিতার আর একখানি পত্র আসিয়াছে। পিতা লিখিয়াছেন—তাহার মামা প্রভাব করিয়াছেন বিলাত যাইবার পূর্বে তাহার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য, কারণ বিলাত অভিশ্রম প্রলোভনের স্থান। তিনি এই প্রভাব যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। তাহার-মামা একটা সু-পাক্ষীর সন্ধানও দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন এই কার্য সর্ব্বথা করণীয়। তবিশ অবিলম্বে এই পাক্ষীটিকে দেখিয়া তাহার মত তাহার মাতার্তাহারীকে যেন জানায়।

তবিশ বুঝিতে পারিল তাহার মামীর পরামর্শে মামাবাবু বিলাত যাইবার আগে মিস বজীর সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রভাবে তাহার পিতার সম্মতি আদায় করিয়াছেন। সে মিস

বজীরকে বিবাহ করিয়া তাহার নিজের মেয়ের আই-সি-এল পাজের সঙ্গে বিবাহের সুবিধা করিয়া দিবে তিনি এই প্রত্যাশা করেন। তবিশ জানে তাহার পিতাকে তিতরের চক্রান্ত বুঝাইবার চেষ্টা করা নিরর্থক, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাহার ব্যারিষ্টার ছালকের প্রভাবাবাহীন। সেই দিনই সে পিতাকে লিখিল বিবাহ করিয়া বিলাত যাওয়া তাহার মতের বিরোধী, তিনি মত পরিবর্তন না করিলে সে বিলাত যাইবে না।

দেবানন্দ বাহিরে গিয়াছিল। বোঝাপড়া করিবার অভিপ্রায় লইয়া তবিশ সন্ধ্যাবেলা একাই চক্রবেড়ে রওনা হইল।

নীচে বসিবার ঘরে আজ্ঞা জমিয়াছে, বেয়ারার কাছে খবর পাইয়া সে সোজা বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। ডাঃ চক্রবর্তী, মিঃ গোহো, মিঃ মিটার ও মিঃ গাঙ্গুলী উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ চক্রবর্তী তবিশের সঙ্গে করমর্দন করিয়া চোখের একটু ইঙ্গিত করিয়া হাসিলেন। প্রকাণ্ডে বসিলেন, আলো মাই ফ্রেড, উই হেভার্ট সীন ইউ কর এড্‌জ (এক হুগ তোমার সঙ্গে দেখা নেই।)

তবিশ শুনিয়া আলোচনা হইতেছে পালার্মেন্টে তার হেনরী কটনের প্রবন্ধ উত্তরে মিঃ মলের উক্তি “পার্টিশান ইজ এ সেটলড ফ্যাক্ট” লইয়া।

মিঃ গাঙ্গুলী উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, ইংরেজের ইতিহাসে কতবার সেটলড ফ্যাক্টকে আনসেটল করতে হয়েছে মিঃ মরলে কি খবর রাখেন না?

ডাঃ চক্রবর্তী—তোমাদের ডেলিক্ট মডারেট ষ্টম্যাক আপসেট (পেটের গোলমাল) না হয় এছাড়া মিঃ মলে একটু মোলারেম করে বলেছেন। সেদিনকার পারোনিয়ার দেখেছ?

মিঃ গাঙ্গুলী—কবেকার? যে ইস্ততে “গোল্ডেন বেদল লিকলেট হোপসু” বেরিয়েছে?

ডাঃ চক্রবর্তী—না, যে ইস্ততে বাঙালীদের এই বলে তার দেখিয়েছে “দি ইংলিশ উইল ডিসেও আপন দেম উইথ কায়ার এও সোর্ড এও শুট এও হ্যাং এড্‌ রিমোস লেশলি এড্‌ ইন এইটন কিকটি সেভন্” (ইংরেজ আশুন এবং তরবারি নিয়ে তাদের উপর কাঁপিয়ে পড়বে এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যেমন বেপরোয়া গুলি ও তরবারি চালিয়েছিল আবার সেইরূপ চালাবে।)

তবিশের মনে পড়িল পারোনিয়ারের এই তীতি প্রদর্শন সম্বন্ধে বেদলী কি ভাবে তাহার মন্তব্য শেষ করিয়াছিল। তাহার মামা মিঃ সুরেন্দ্র ক্যানাক্সির বিশেষ ভক্ত। মামার উপর পরোকে একটু কটাক করিবার লোভ সে সত্তরপ করিতে পারিল না। বলিল, প্রিন্স এক্সকিউজ, পারোনিয়ার অকারণে তার দেখিয়েছে। বেদলী এ সম্বন্ধে কমেট করে

লিখেছে, “The educated Indians will never agree to England withdrawing from India as such an event will automatically result in anarchy” (শিক্ষিত ভারতবাসীরা ভারত হইতে ইংরেজদের চলিয়া যাইবার প্রস্তাবে কখনও রাজী হইবে না, কারণ তাহার ফলে দেশে সঙ্গে সঙ্গে অরাজকতা দেখা দিবে।) স্বতরাং প্যানোনিয়ার অপাঙ্গে ভয় দেখিয়েছে।

ডাঃ চক্রবর্তী উচ্চ হাস্য করিলেন। বলিলেন, তেরি ক্রেন্ডর অব ইউ টু সে দ্যাট (বেশ বলেছ)। কিন্তু যাই বল টাইমসের “ইণ্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কন্সার্ড বাই দি সোর্ড এণ্ড ইজ হেণ্ড বাই দি সোর্ড” এই কথার চাইতে প্যানোনিয়ারের লেখা বেশী জোরালো।

মিঃ গোহো—ইংলিশম্যান কি কম যার ভেবেছ? টমি এটকিন নামে একটা লোক লিখেছে ইষ্ট বেঙ্গলের “বাডিং ওয়ারিয়রদের (ফুটনোয়ুথ যোদ্ধা) ঠাণ্ডা করবার জন্য ইষ্ট বেঙ্গলে টমিদের একটা রুট মার্চই যথেষ্ট।

ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, এতদিন গবর্ণমেন্ট স্বদেশী আন্দোলনকে দমাবার জন্য রেগুলেশন লাগির সদ্যবহার করছিলেন, এবার এখানকার সব ইউরোপিয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানের মাথা ধারাপ হয়েছে ভরে। আসামসালের রেলের এংলো-ইণ্ডিয়ানরা মিঃ সুরেন্দ্র ব্যানার্জির একিছি পুড়িয়েছে, দো টু হেড বেরিড দি একিছি উড হেড বীন মোর এপ্রোপ্রিয়েট (যদিও কবর দেওয়া বেশী সদভ হ’ত) মিঃ গাঙ্গুলী—দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ভাস কি বলেছে, শুনেছ? এক বক্তৃতায় সে বলেছে সুরেন্দ্র ব্যানার্জি দিনাজপুরে এলে তার গলার আমি জুতোর মালা পরিয়ে দিয়ে এখান থেকে বিদেয় করব।

এদেশের সব এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো এক সঙ্গে চীৎকার করছে—আরও রিপ্রেসন চালাও, আর বিলাভী কাগজগুলোর কনসপমডেন্টরা এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে ক্রমাগত এলামিষ্ট রিপোর্ট পাঠাচ্ছে।

মিঃ মিটার—মেদিনীপুরে জারগার জারগার গ্রেন রায়টস হয়েছে। ইষ্ট বেঙ্গলে কয়েকটা জারগার কারসিটি (অরাভাব) দেখা দিয়েছে। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি এই খাতাতাব সম্বন্ধে কি বলেছে জান?

মিঃ গাঙ্গুলী—এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজের কথা বলছ কেন? ফুলার মিজে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সকে চিঠি লিখেছে স্বদেশীওয়ালাদের কাছের ফলে চাউল ও অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়েছে, লোকের কষ্ট হয়েছে। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো সঙ্গে সঙ্গে বলতে আরম্ভ করেছে স্বদেশী আন্দোলন খাতাতাবের জন্য দায়ী।

মিঃ গোহো—আচ্ছা, সোনার বাংলা লিকলেট নিয়ে

প্যানোনিয়ার, ইংলিশম্যান যে হৈ চৈ করছে ব্যাপারটা কি? সত্যি এই নামে কোন সোসাইটি আছে?

কিছুক্ষণ কেহ কোন উত্তর দিলেন না। শেষে মিঃ রায় বলিলেন, যাদের খবর রাখবার কথা তারা জিনিসটাকে উড়িয়ে দিচ্ছে। বন্দেমাতরম বলেছে, সোনার বাংলা লিকলেটের পেছনে কোন গুপ্ত সমিতি নেই। টেলিগ্রাফ বলেছে, চুঁচুড়ায় কোন টেররিষ্ট বা অর্গানি বোমাওয়ালার সমিতি বেই। রক্তপাত করা বাঙালীর স্বভাবের বিরোধী। কোন লিকলেট যদি সত্যি বেরিয়ে থাকে সেটা কোন অপ্রকৃতিস্থ লোকের কাজ। কোন কোন কাগজ ঠাট্টা করেছে। সত্যি বলেছে, “ডাক, ডাক, যত নীলকর, চা-কর, কাগজের সম্পাদক, কুলি, ব্যারিষ্টার, ভবঘুরে আর ব্যাঙ বাঙলাদার আছে সবাইকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হতে বল, দেশে ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত।”

ডাঃ চক্রবর্তী মিঃ রায়ের কথা শুনিয়া মুচকিয়া হাসিলেন। তিনি জানিভেন যুগান্তর দলের লোকেরা মাঝে মাঝে এই সোনার বাংলা ইস্তাহার ছাপাইয়া বিলি করে। মিঃ রায় দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন।

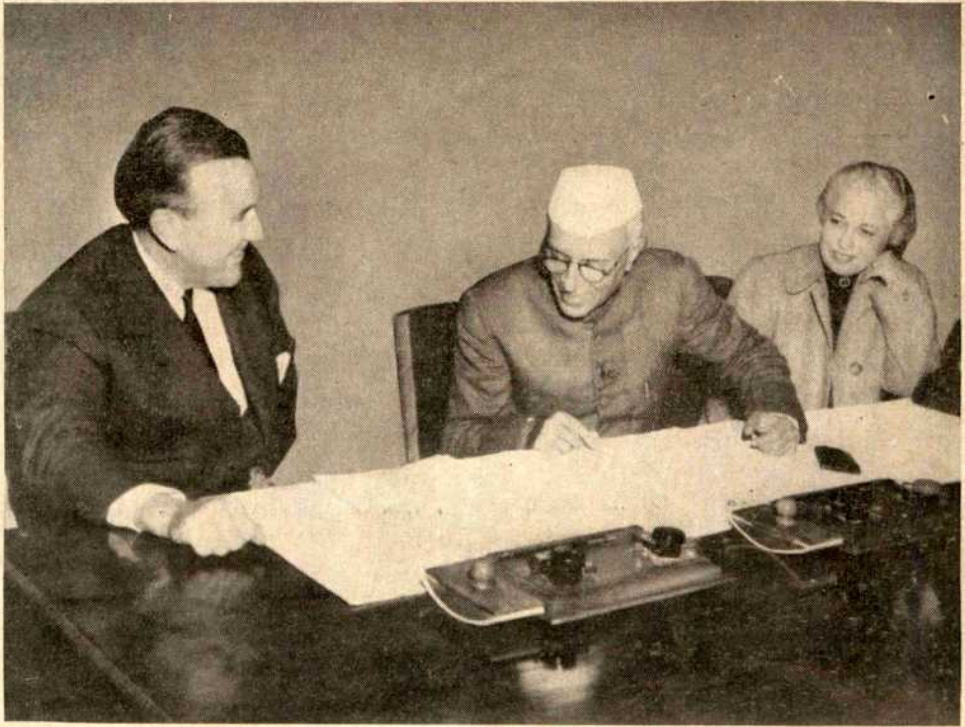
মিঃ রায় উঠিয়া ভবেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভবেশ আমার সঙ্গে একটু এস। গ্লিফ এক্সকিউজ মি ফর এ কিং মিনিটস (ছ’চার মিনিটের মধ্যে আসছি)।

তিনি ঘর হইতে বাহিরে গেলেন। ভবেশ ডাঃ চক্রবর্তী দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বাহিরে গেল।

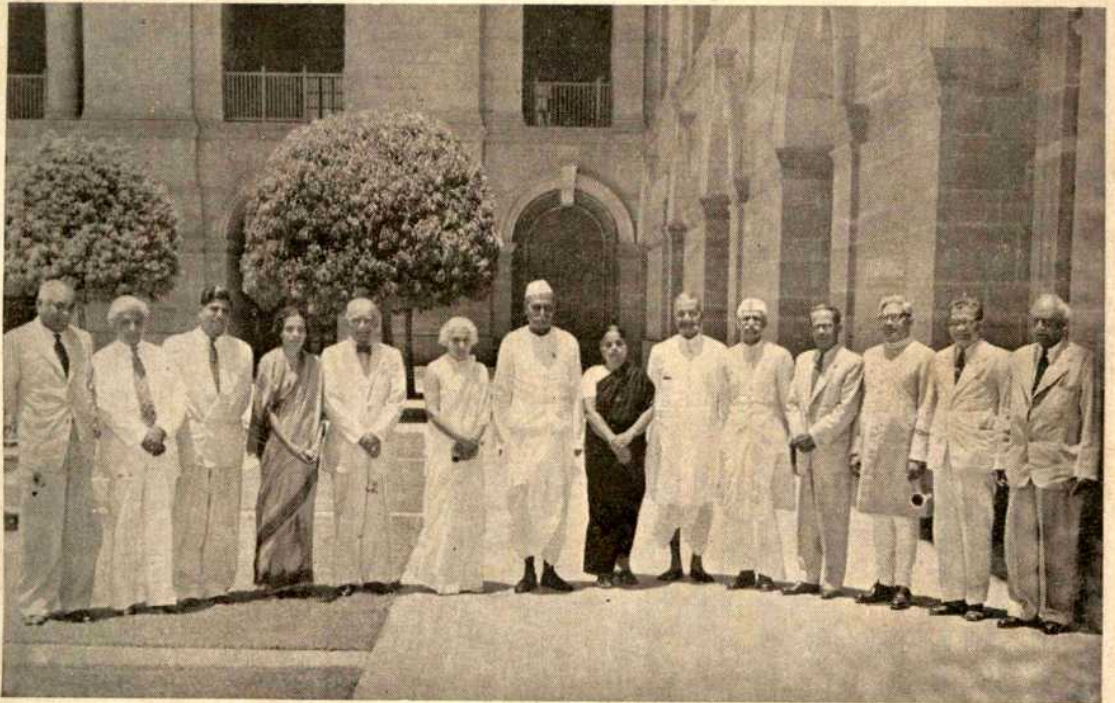
মিঃ গাঙ্গুলী—চক্রবর্তী, মৈমনসিংয়ের ব্যাপারটা কি বর দেখি? মৈমনসিং ও ঢাকার লেঙ্গলসেনস ক্রমিক ডিজিৎ দাঁড়িয়েছে। খবর পেলাম ঢাকার-কের ট্রাবল ফ্রম হয়েছে এ দিকে খশোরেরও নাকি কমিউন্যাল ইল-ফিলিং (সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য) দেখা দিয়েছে।

ডাঃ চক্রবর্তী—আই এম এক্সেড উই আর গোইং টু হোমোর নিউজ ফ্রম মৈমনসিং, ঢাকা এণ্ড কুমিল্লা, হট-বেঙ্গল অ’ অ্যাটি হিউ একটিভিটিজ ইন ইষ্ট বেঙ্গল (হিন্দু-বিদ্রোহ আন্দোলনের কেন্দ্র মৈমনসিং, ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে আরম্ভ সংবাদ আসবে)। মৈমনসিংয়ে মুসলমানরা বলে বেড়াতে ইমান মেহেদীর আবির্ভাব হবে এদেশে তার শাসন করে করবে। মোলবীরা প্রকট্রে বলে বেড়াচ্ছে কাকেরের সম্পর্ক লুঠ করা, ডাকে ইসলামে দীক্ষিত করা কোরাণের মতে মেরি টোরিয়াল কাজ। মৈমনসিংয়ের কাগজে এই সব একটিভিটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে আর কমপ্লেন করেছে পুলিশ চূপচা বেশ আছে।

মিঃ গোহো—মৈমনসিং ইশ্বরগঞ্জ রায়টের মোকদ্দমা ম্যাজিস্ট্রেটের জাজমেন্ট দেখেছ? তার মত এই যে স্বদেশ আন্দোলন এই সব রায়টের জন্য দায়ী।



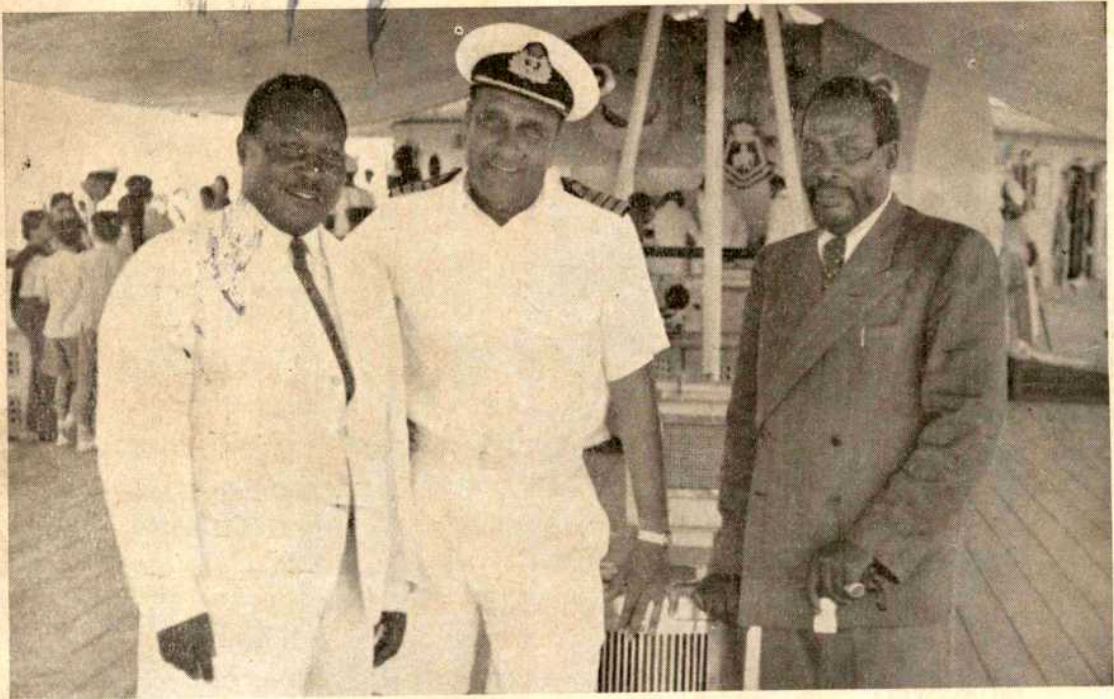
এই জাহ্নয়ারী, ভারত-মার্কিন শিল্প-সহযোগিতা চুক্তি সম্পর্কিত কাগজপত্র পরিদর্শনরত
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু



নিউ-দিল্লীস্থ রাষ্ট্রপতি-ভবনে, চীনে ভারতীয় সংস্কৃতি মিশনের নেত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও
অস্থায়ী সভ্যগণসহ ডক্টর শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ



নিউ-ইয়র্কের কালডরফ এন্টোরিয়া হোটেলে অনুষ্ঠিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের আলোচনা-সভা



পূর্ব-আফ্রিকায়, আফ্রিকার নেতা পিটার কইনাঙ্গ (বামদিকে)
সহ দিল্লীর 'আই. এন. স্কোয়াড্রনের' ক্যাপটেন এস. জি. কর্মকার

ডাঃ চক্রবর্তী—কোম্বাইট সে। সেই জন্যই ড. ঢাকার আবার কতকগুলি বাজার লুণ্ঠ হয়েছে। আর সেই জন্যই টাঙ্গাইলের ঘাটাইল হাটের স্বদেশী কাপড় আর দেশী লবণের কতকগুলি দোকান মূলস্ফোটার লুণ্ঠ করেছে। স্বদেশী জিনিসের দোকান যখন লুণ্ঠ হয়েছে তখন স্বদেশী আমোলমকেই ড. এজন্য দায়ী করতে হবে।

মিঃ পোহো—বারে একজন ফ্রেণ্ড বলছিল মৈমনসিংগে “স্বাভি আমোলম ও জাতীয় বিজ্ঞাপন” নামে এক প্যামফ্লেট মুসলমানদের মধ্যে বিলি হচ্ছে। প্যামফ্লেটের বক্তব্য, “হিন্দুদের সঙ্গে লব সংগ্রহ বন্ধন কর, তাদের অধীনে চাকুরি করো না, তাদের কুলে ছেলের পড়াতে দিও না, তাদের তৈরি জিনিস কেবো না, তাদের চাকুরি দিও না,—হিন্দুদের কাছারমে পাঠাও।”

ডাঃ চক্রবর্তী—এর কলে লুণ্ঠপাট, গৃহদাহ ইত্যাদি ঘটলে ম্যাজিস্ট্রেট বলবে স্বদেশী মুভমেন্ট এর জন্য দায়ী। এও দি ট্রেটমেন্ট উইল বি স্ল্যাপড বাই অল দি হোম পেপারস (বিলাতের কাগজে এই সংবাদ ফলাও করে ছাপা হবে)।

মিঃ রায় ভবেশকে লইয়া উপরে ড্রাইংরুমে গেলেন। মিসেস রায় ভাষাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্রিট পতর্নসের কাছে পড়িতেছিল। ঘরে আর কেহ ছিল না। মিসেস রায় বলিলেন, এই যে ভবেশ এস। আজকাল তুমি এদিকে আসা ছেড়ে দিয়েছ। নিজের মাথা-মাথা পর হয়ে গেছে। তোমার সেই ডি. এস. পি-র ছেলে বহুটিকে আর দেখি না। সে কোথায়?

ভবেশ—সে পড়াশোনার ব্যস্ত আছে।

মিঃ রায়—তোমার বাবার চিঠি পড়েছ? হি ফুলজি এগ্রিক উইথ মি (আমার মত তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করেন)। তোমার বিয়ে করে বিলেভ যাওয়া উচিত। রিসেন্টলি করেকটা কেসে দেখা গিয়েছে ব্রিগিয়ার্ড সং ছেলে একেবারে মঠ হয়ে গিয়েছে। আই ভোর্ট ব্লেন দেম মার্চ (আমি তাদের দোষ দিই না)। টেম্পটেশন ও অপার-চুনিটিজ এত বেশি যে এ ইয়ংম্যান ইজ ইজিলি ক্যারেড অফ হিজ ফিট আনলেস দেয়ার ইজ সামথিং টু পুল হিম ব্যাক (পিশনের কোন আকর্ষণ না থাকলে ছোকরারা সহজে বিপড়ে যায়)। তাদের বিয়ে দিয়ে বিলেভে পাঠালে এ রকমটা হ'ত না। তুমি বাপের বড় ছেলে, হি জাজ এন্ট হোপস অব ইউ (তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক আশা রাখেন)। আমার মত এই যে মো রিক স্টুর্ট বি টেক্স (কোন বিপদের খুঁকি নেওয়া উচিত নহে)।

মিসেস রায়—তোমার জন্য যে মেয়েটি আমরা দেখেছি তেমন মেয়ে আমাদের সমাজে পাওয়া যায় না। যেমন একমিল্লিড তেমন দেখতে।

মিঃ রায়—কথা দেবার আগে তুমি যদি দেখতে চাও ইট মে বি এরেক্সড (সে বন্দোবস্ত করা যেতে পারে)।

মিসেস রায়—ও রকম রং বাঙালীর ঘরে দেখতে পাবে না সহজে।

মিঃ রায়—সি ইজ তেরি হাইলি কামেটেড (তার আত্মীয়-স্বজন সম্রান্ত পরিবারের)

মিসেস রায়—মেয়েটির ভাই আই-সি-এস, বাপ বিহারের একটা বড় এন্ট্রের দেওয়ান, কাকা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জ্যেষ্ঠা ষ্টাটুটরি সিবিলিয়ান ছিলেন।

মিঃ রায়—সি স্পিকস ইংলিশ লাইক মাদারটং। (মাতৃভাষার মত ইংরেজী বলে)

মিসেস রায়—বরাবর ইংরেজী কুলে পড়েছে। সবে বাংলা কথা বলতে শিখেছে।

মিঃ রায়—সি উড লাভ দি আইডিয়া অব একমপ্যানিং ইউটু ইংল্যাণ্ড জাকটার ম্যারেজ। আই ক্যান এরেক্স দি ম্যাটার উইথ ইওর ফাদার। আই ডেয়ার সে হি ওর্ট এন্ড দিস এক্সট্রা একপেন্স কর ইওর সেক। (বিয়ের পরে তোমার সঙ্গে বিলেভ যাওয়ার প্রস্তাবে বৃষ্টি হবে। তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে এ বন্দোবস্ত করে দিতে পারি, তোমার লজ এ বাড়তি খরচে তিনি আপত্তি করবেন না)।

মাথা মাথার কথাবার্তার মধ্যে এতক্ষণ ভবেশ কোন কথা বলিবার অবকাশ পায় নাই। তাঁহার একটু ধামিতে সে বলিল, বাবাকে আমি লিখে দিয়েছি আমি বিলেভ বাব না।

মিঃ ও মিসেস রায় আকাশ হইতে পড়িলেন। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে। প্রথমে মিঃ রায় কথা বলিলেন। তাঁহার গলায় স্বর তেমন যোলায়েন শুনাইল না। ভবেশের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, হোয়াট ইজ দি আইডিয়া? (তোমার মনের ভাব কি?) তোমার এই মত পরিবর্তনের কারণ?

ভবেশ—পাস করলে আমি এখানে বি-এল ক্লাসে ভর্তি হব।

মিঃ রায়—উকিল হবে? বাট ইওর ফাদার ওয়ার্ল্ডস ইউটু গো টু ইংল্যাণ্ড। (তোমার বাবা চান তুমি বিলেভ যাও)।

তা হইত চান। তবে আমার ইচ্ছে না থাকলে তিনি জোর করবেন না লিখেছেন।

মিসেস রায়ের মুখে কথা আসিতেছিল না। তাঁহার এত দিনের প্র্যানটি ভবেশ এক কথার চূর্ণ করিয়া দিল। ক্রিটর মত কালো মেয়েকে আই-সি-এস ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া কি সহজ কথা? মেয়েটির মনের পতিতও সুবিধার নয়। স্বদেশী লইয়া মাতিয়াছে। মাঝে মাঝে বলে মিস জাদলকে

ছাড়িয়ে দাও, ও আমাদের দেশের সন্ধে অসম্মানের কথা বলে, স্বদেশী নিয়ে বিক্রয় করে। বলে, ইউ এপ আস ইন এজিথিং (তোমরা আমাদের প্রত্যেক ব্যাপার নকল কর)। তোমাদের আবার 'সোম্বাদেশী' কি? বাবুদের সোম্বাদেশী একটা fraud (ধাড়া)—একটা মেকি জিনিস; রাগ করিয়া মাঝে কয়েকদিন গবর্ণমেন্ট কাছে পড়িতে বলে নাই। আই-সি-এস-এর হাতে পড়িলে এই স্বদেশীয়ানা দুই দিনে ছুটিয়া যাইত। তিনিও হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিতে ন। সব গুছাইয়া আনিয়াছিলেন, ভবেশটা ঘাটে আসিয়া ভরাডুবি করিল।

মিসেস রায় ভাবিয়া পাইলেন না কেন ভবেশ বিলাত যাইবার ব্যবস্থা পর্যন্ত কাঁচিয়া দিল। বোধ হয় হঠেলে বাজে ছেলেদের সঙ্গে থাকিয়া তাহার নৈতিক ও মানসিক অধঃপতন হইয়াছে। স্বামীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, আমি গোড়াতে তোমাকে বলেছিলাম ভবেশকে হঠেলে বাজে ছেলেদের সঙ্গে থাকতে দিও না, এখানে রাখো। তখন কথাটা শুনলে না।

মিঃ রায় একটু চটয়া বলিলেন, আমি কি জোর করে ধরে আনব? তোমাকে কি বলি নি ভবেশ হঠেলে থাকতে চায়?

শান্ত হইয়া মিঃ রায় ভবেশকে বলিলেন, ইণ্ডর ডিসিশন হ্যাঙ্ক বিন এ সারপ্রাইজ টু আস (তোমার সিদ্ধান্তে আমরা বিস্মিত হইয়াছি), ধীর ভাবে কথাটা ভেবে দেখ। তোমার বাবাকে আমি চিঠি লিখছি।

মিঃ রায় অপেক্ষা না করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। মিসেস রায় ভবেশের সঙ্গে আর কথা বলিলেন না। সে নীচে নামিতে লাগিল।

বিলি লাকাইতে লাকাইতে উপরে উঠিতেছিল। ভবেশকে দেখিয়া সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, তুমি কখন এলে ভবেশদা?

ভবেশ বিলির গালে হাত বুলাইয়া একটু আদর করিল, বলিল, হাউ-ডু-ডু মাষ্টার বিলু? কিটি বুঝি এখনও পড়ছে?

বিলি—ওপরে চল না ভবেশদা। কিটি আর আমি একটা গান শিখেছি, শুনবে।

ভবেশ—আমি এই উপর থেকে আসছি। আজ কাজ আছে। কাল পরণ্ড এসে তোমার গান শুনব। কিটিকে বলবে আমি এসেছিলাম।

বিলি তখনও ভবেশকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। সে বলিল জান ভবেশদা কিটি আর মিস জাদলের কাছে পড়বে না। সেদিন হু'জনে দারুণ ঝগড়া। মিস জাদল নাকি বলেছিল গবর্ণমেন্ট খুদ গ্যাং বাবু এজিটেটরস। কিটি তেড়েমেড়ে বলেছিল—

কথা শেষ না করিয়া বিলি হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভবেশ—কি হ'ল তোমার বিলু? কিটি কি বলেছিল?

হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বিলি বলিল, কিটি কি বলেছিল জান ভবেশদা? কিটি মিস জাদলকে বলেছিল, হি হি—

ভবেশ—এত হাসি কেন বিলু? কিটি কি বলেছিল?

বিলি হাসিতে হাসিতে বলিল, হোয়াইট মানে জান ভবেশদা? হোয়াইট মানে সাদা। আর মকি মানে জান? জান না? মকি মানে বাদর। জু'তে গিয়েছ ভবেশদা? জু'তে যে লেজওয়ালা বাদর আছে সেই বাদর। কিটি বলেছিল, উই গ্যাং হোয়াইট মুক্জ হি—হি—। গ্যাং মানে জান?

বিলির হাসি দেখিয়া ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ভবেশও হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে সে বলিল, গ্যাং নয় বিলু দি এট, কথাটা হ'ল হ্যাং, মানে ফাঁসি দেওয়া।

বিলি সোম্বাদেশী বলিল, ঠিক বলেছ, গ্যাং, হ্যাং, হ্যাং।

কিটি বলেছিল সাদা বাদরকে ফাঁসি দেব। মিস জাদল সাদা বাদর—হি, হি।

বিলির হাসির শব্দ মিসেস রায়ের কানে পৌঁছিয়াছিল। ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া গভীর স্বরে তিনি বলিলেন—বিলি কি হচ্ছে ওখানে দাঁড়িয়ে? মাষ্টার আসে নি আজ?

বিলির হাসি বন্ধ হইল। সে বলিল, নো মমী, আজ ছুটি।

মিসেস রায়—তাই অসম্মানের মত চোঁচাচ্ছে? উঠে এস।

বিলি আস্তে ভবেশকে বলিল, তুমি ঠিক আসবে পরণ্ড ভবেশদা?

ভবেশ—তুমি এখন ওপরে যাও বিলু, ইণ্ডর মমী ইজ ফ্রস (তোমার মা রাগ করেছেন)।

ভবেশ নীচে নামিয়া পর্দার আড়াল হইতে উঁকি দিয়া দেখিল আলোচনা তখনও চলিতেছে। সে ধরে ঢুকিবে কি না ভাবিতেছে, দেখিল, ডাঃ চক্রবর্তী সিগার ধরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভবেশ আর ধরে গেল না। দুই দিকে জনের মধ্যের পথ ধরিয়া সে কটকের বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

একটু পরে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাঃ চক্রবর্তী বাহিরে আসিলেন। ভবেশকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, হালো ভবেশ, ইউ আর ওয়েটিং ফর সমবডি? (কারও জন্ত অপেক্ষা করছ?)

ভবেশ হাসিয়া বলিল—যাঁর জন্ত অপেক্ষা করছি তিনি আমার সামনে।

ডাঃ চক্রবর্তী উচ্চহাস্য করিলেন। বলিলেন—রাষ্ট্রায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তোমাদের বোষ্টম কবিদের কি একটা মনে-পড়ছে-পড়ছে পড়ছে না কবিতা আছে এই ধরণের

অপেক্ষা করা সব্বকে। বাট সিরিয়াসজি, হোয়াট ইন্ড আপ ? (বাস্তবিক, ব্যাপারটা কি ?) তোমার মাঝাবাবুর মুখের ভাব কেমন-কেমন মনে হ'ল, আর এদিকে তুমি অপেক্ষা করছ রাত্য়। কি ব্যাপার বল দেখি ? চল হাঁটা বাক্।

দুই জন ল্যান্ডডাউন মোড়ে পড়িয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন। ভবেশ বলিল, আই হাড ডান উইথ জাট বিজনেস (ও ব্যাপার আমি শেষ করেছি, অর্থাৎ বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে)।

ডাঃ চক্রবর্তী—তার নামে কি ভবেশ ? আর ইউ গোইং অর নট ?

ভবেশ—নো।

ডাঃ চক্রবর্তী একটা বিষয়স্বত্বক শব্দ করিলেন। বলিলেন—ইট টিকলস মি (কোতুলল বাতছে)। চল দেখি আমার বাড়ীর দিকে। আই উড লাইক টু হিয়ার দি ফুল টোরি। (সমস্ত ব্যাপারটা শুনতে চাই)।

সেদিন হাট্টেলে ফিরিতে ভবেশের বেশ একটু রাত হইল। তাহার মুখ দেখিয়া দেবানন্দ অহুমান করিল একটা কোম বিরক্তিকর ব্যাপার হইয়াছে। তখনই সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। খাওয়া শেষ হইবার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, ভবেশদা, আপনার বিলেত যাবার কথা ঠিক হ'ল ?

ভবেশ হাসিয়া বলিল, না-যাবার কথা ঠিক হ'ল। মিস

বকসির কথা তোমাকে সেদিন বলেছি। মামা মামীর কথা, মিস বকসিকে বিয়ে করে বিলেত যেতে হবে। আমি স্পষ্ট জবাব দিয়েছি বিয়ে করে বিলাত যাওয়া আমার প্রিজিপলের বিরোধী, বিশেষ যখন আমি বাপের পরসায় যাচ্ছি। এঁদের এই বিরক্তিকর জেদের একটা কারণ আছে জানতে পেরেছি। সে কথা পরে তোকে বলব। আমি স্থির করেছি বি-এ পরীক্ষার-কলটা বেরুলেই একটা যে-কোন কাজ নিয়ে আমি কলকাতা থেকে পালাব যদি এরা আমার বিরুদ্ধে এই আন-হোলি ক্রুজ্জড চালাতে থাকেন। না হয় এক বেটা কিরিন্দীকে চেষ্টা দিয়ে দেব। দয়ালু কিংসফোর্ড আছেন, ছয় মাসের কত খুশুহালয়ে পাঠাবেন এক কথায়। সেদিন তবানীপুরের ট্রামে জনভিত্তিক কিরিন্দী ছোকরার সঙ্গে লেগে গিয়েছিল প্রায়। বেটারা এই লাইনের ট্রামে নিরীহ আপিসের বাবুদের ওপর বেশ জুলুম করে। একে বাকা দেয়, ওর পা মাড়িয়ে দেয়, তাকে “রাডি সোয়াইম” বলে গালাগালি করে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, লোক উঠতে দেবে না। অনেক দিন ধরে এই কাণ্ড করছে এরা। সন্ধ্যা এটা নিয়ে বাঙালী ছেলেরের খুব খানিকটা গালাগালি করবার পর থেকে ভিন্ন চার বার মারামারি হয়েছে। ফলে এই ছাইজাল একটু কমছে। (জ্বমঃ)

বাংলার প্রাতি রাজপুতানা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আমি মরু

তৃষ্ণার্ত উত্তপ্ত ক্ষুধা ; মোর বক্ষে তরু

ভূগ গুল্ম শ্রামলের ক্ষীণ স্নিগ্ধ রেখা

উর্দ্ধমুখ ঘূর্ণিমাঝে নাহি যায় দেখা,

নাচাইয়া মায়ামরীচিকা

নির্বাণিত আলোকের দগ্ধপ্রায় শিখা

টেনে আনি নিতি নিষ্করণ

প্রভাতের আশার অরুণ-

রেখা হেথা গোখুলি ধূসর

উদাস উষর

সায়াজের উদার পূর্ববী

হেথা আঁকে শুধু বক্ষ্যা বালুকার ছবি

বাঁচে শুধু কটকিত বোপ

নিরাশার নিষ্ঠুর প্রকোপ।

তবু তুমি একদিন, দূর পূর্ব মেঘের শ্রামল,

পেয়েছিলে মোর মাঝে বীর্ঘা ঝলমল

মরুপ্রান্তে অঙ্কুরিত বাঁচিবার অনন্ত প্রয়াস

অমৃতের গৌরব নিঃশ্বাস,

ছন্নছাড়া ভূষিত সাহারা

মাঝে কান্ত দেশপ্রেমধারা,

বক্ষে লৌহ আর চক্ষে সোনার স্বপন

চারণের নিত্য কাব্য কুহুমবপন

চির-মর্ম্মরিত প্রাণ। আমারে ত তুমিই জাগালে

গিরিগাজ্রে মরুপ্রান্তে স্থগ্ত মহাকাশে

দিলে নব পরিচয়

বিশ্বয়ে অক্ষয় ;

তাই তুমি বাঁচ ওগো, বাঁচ লয়ে তব ভূগ তরু,

তব প্রাণে প্রাণ পাব, আমি, আমি প্রাণহীন মরু।

শিক্ষা-নীতি ও জনগণ

খ্রীস্টীয় দশ

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে এবং সেই মুষ্টিমেয়ের জ্ঞানও শিক্ষা অপরিহার্য ছিল না। জৈনিক শিক্ষাবিদেবর ভাষায় “রাজা বাদশার পক্ষে শিক্ষা ছিল মার্জিত বিলাস, উজির-নাজির প্রভৃতি রাষ্ট্রচালকদের পক্ষে ছিল ক্ষমতা হাতে রাখিবার যন্ত্র, পাত্রী-পুরোহিতের পক্ষে ছিল মোক্ষলাভের সহায়ক। আর দেশের অগণিত জনগণ হাজার হাজার বৎসর অশিক্ষা ও অজ্ঞতার পক্ষে আকর্ষণ নিমগ্ন থাকিয়া, নিজেরা অনশনে অর্দ্ধাশনে জীবনযাপন করিয়া dumb driven cattle-এর মত উচ্চসমাজের ভৃত্যরূপে আজীবন বিলাস-উপকরণ জোগাইত মাত্র।”

প্রাচীন যুগে শিক্ষার সমস্তাও খুব জটিল ছিল না; কারণ তখনকার দিনে জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও সরল। তখন মানুষের মনোজগতের বিস্তার-সাধন করাই ছিল শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষকও সাধারণতঃ নিজের ইচ্ছামত এবং স্বীয় আদর্শ অনুসারে শিক্ষার ক্ষেত্র এবং বিষয় নির্বাচন করিতে পারিতেন। কিন্তু বর্তমান কালে জগতের রাষ্ট্র-নৈতিক মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষানীতির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ অত্যাশঙ্কক বলিয়া বিবেচিত হয়। অধুনা রাষ্ট্র-নাযকগণ রাষ্ট্র-পরিচালনা, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্বের জন্ত জনগণের অন্তর্কূল মত গঠন করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে শিক্ষার লক্ষ্য এবং নীতি নির্ধারিত হইয়াছে। ইউরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টই সর্বপ্রথমে ‘এডুকেশন কোড’ রচনা করিয়া শিক্ষাকে রাষ্ট্রের অঙ্গরূপ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। জার্মানগণ ১৮৭০ সালে আল্-সাস্ লোরেইন অঙ্গ করিবার পর ফরাসী চিন্তাধারাকে পঙ্ক করিবার জন্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনমত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে। পোলাণ্ড বিজয়ের পর রাশিয়া কর্তৃক পোলাণ্ডের শিক্ষাবিধি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করা হয়। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন একদা সাম্রাজ্যবাদী-মূলক মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমরা বিস্তারিত স্থাপন করছি সত্যিকার, লোকশিক্ষার জন্তে নয়, শুধু জগৎকে জানাব যে আমরা প্রজাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছি। প্রজাবর্গ যে শিক্ষা দাবি করে, সেই শিক্ষা যদি

আমরা জনগণকে দিই, তবে আমাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি ধ্বংস পড়বে।” বস্তুতঃ, সাম্রাজ্যবাদিগণের নিয়ত আশঙ্কা এই যে, জনসাধারণ যদি প্রকৃত শিক্ষা-লাভে সত্যিকার মানুষ হইয়া উঠে তবে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি শিথিল হইয়া যাইবে। টলষ্টয় রাশিয়ার তদানীন্তন শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান যুগে অল্প-বিস্তর সকল দেশের শিক্ষাবিধি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তিনি বলিয়াছিলেন,

“The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realised that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo-educational establishment which it controls, schools, high schools, universities, academies and all kinds of committees and congresses.”

বহুদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাম্রাজ্যবাদ এখনও সকল দেশে ছদ্মবেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। কবি ইকবাল সত্যই বলিয়াছেন :

“The tyranny of imperialism struts abroad in the masks of Democracy, Nationalism, Communism and Fascism. Under these masks, in every corner of the earth, the spirit of freedom and the dignity of man are being trampled under foot.”

বস্তুতঃ বর্তমান যুগে অনেক ক্ষেত্রে মনোবিস্তার অপেক্ষা মনোবিকারের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা-নীতি নির্ধারিত এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সকল দেশ একনায়কত্বপ্রধান, সে সমস্ত দেশে রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে। স্বাধীনভাবে মনোবৃত্তিবিকাশের চেষ্টা প্রাগ-যুদ্ধকালীন জার্মানী, জাপান ও ইটালীতে করা হয় নাই; ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে বিনা বিধায় তরুণেরা যেন রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে। এই সকল রাষ্ট্রে একটা বিশিষ্ট মতবাদের পরিপোষক জ্ঞান ও বিকৃত শিক্ষা-নীতির সাহায্যে সমগ্র জাতিকে বিদ্বেষ-প্রসূত, জাতিক্রমণাত্মক মনোভাবাপন্ন করিয়া তোলা হইয়াছিল। এবশ্যক্য শিক্ষাব্যবস্থায় সমস্ত জাতির স্বাধীন চিন্তাশক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল এবং নেতা বা নায়ক অথবা দলবিশেষের উপর দেশের ইষ্টানিষ্ট বিচারের ভার দিয়া সমগ্র জাতিটাই যেন মোহাচ্ছন্ন মত

তাহাদের অহুসরণ করিয়াই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু একটা বিশিষ্ট মতবাদকে অন্ধের মত প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা প্রকৃত জীবনধর্মের বিপরীত লক্ষণ। ইহার শোচনীয় পরিণামের কথা আজ সর্বজনবিদিত। রাশিয়ার ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন,

“অপরিসীম উৎসাহে রাশিয়া নিরক্ষরতা ও অসাহিত্য দূর করে এই বিরাট মহাযশে বেকে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য মুছে দিবেছে।...আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিবেছে। যারা ছিল মুক, তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিন্তের আবরণ উলটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরক, যারা অবমাননার ভুলায় ভলিয়েছিল আত্ম ভারা সমাজের-অন্ধ-কুঁহুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী।”

অবশ্য, জার-শাসিত রাশিয়া ছিল একটি বিশাল কারাগারস্বরূপ, লেনিনের কথায়—‘A prisonhouse of nationalities’। শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার এবং উন্নয়নের জন্য জার সরকার কোনই চেষ্টা করিতেন না। পক্ষান্তরে, জনসাধারণকে সর্বপ্রকার অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত রাখার প্রয়াসের বিরাম ছিল না। লেনিন বলিয়াছিলেন, “রাশিয়া গবর্নমেন্টের ন্যায়, রাশিয়ান জন-সাধারণের শিক্ষালাভের বিরুদ্ধে এত বড় শত্রু আর একটিও নেই।” সোভিয়েট রাশিয়ায় লেনিনের আমলে স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইত বটে, কিন্তু ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ষ্টালিনের নির্দেশে উক্ত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। অনেকে বলেন যে, তৎকালকার বর্তমান শিক্ষা-বিধি একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালা,—রাষ্ট্রাঙ্গগতের ভাবধারার ভিতর দিয়া শিক্ষার্থীরা বাহ্যতে বদ্ধিত হইতে পারে সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন সেই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে।

মাহুষকে তাহার প্রকৃতি অনুসারে বিকশিত করিয়া তোলাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিক্ষাব্যাপারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিলে শিক্ষারও যেমন অবনতি ঘটে, রাষ্ট্রেরও তেমনি ক্ষতি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত—

“শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর কোমও অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায়, তবে তাহাতে বিকার জন্মায়। আইরিশকে আকসন্ করিবার চেষ্টার তাহার শিক্ষাকেই মাটি করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ আজকাল

আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল মন্তব্যকে সাদ করাই-বার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বুঝা কঠিন বহে। সেইজন্য তাহারা শিক্ষা ব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা নানা দিক দিয়া থরক করিতে উত্তত হইয়াছেন।”

তিনি অতীত বলিয়াছেন—

“নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনভর মাহুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের লুক্কায় মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না ও পরের কাজের জোপাটদার হইয়া থাকিবে না, এমন মাহুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বাধীনতাকে স্বাভাব্যরূপে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই অতীত শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্বদেশতন্ত্রদের বিরোধ অবশ্যস্বার্থী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিভাগের সাহায্যে এদেশে তাবদারির চিরস্থায়ী ভিত্তি পত্তন করিতে কিছুতেই সক্ষম হইতে পারি না। কাজেই সমগ্র উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিভাগশিক্ষাকে যেমন করিয়া হটুক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।”

ইংরেজ আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই—একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষের চিন্তাধারাকে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির অহুকুল পথে চালিত করিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কার্যক্রম নির্ধারণ করিয়াছিলেন। আমেরিকার ভূতপূর্ব আঁণ্ডার সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট মিঃ সামুনার ওয়েল্‌স ইংরেজদের এই শিক্ষা-নীতির আসল উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন :

“Higher education of a purely literary character was given to a certain class of people to provide English-knowing clerks and assistants for their masters though nobody doubts that it has produced results undreamt of in the philosophy of those who wanted only quill-drivers.”

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

“কোচিন-চারনার শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শুনেছি কোমও করানী পাণ্ডিত্য-ব্যবসায়ী বলেছেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেছেন ফ্রান্স যেম সে ভুল না করেন। একথা মানতে হবে যে, ইংরেজের চরিত্রে এমন একটা বহুত্ব আছে যে কষ্টে বিদেশী শাসন-নীতিতে তাঁরা কিছু কিছু ভুল করে বলেন, শাসনের ঠাল-বুঝানিতে কিছু কিছু খেই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুটে আরও এক-আধ শতাব্দী দেবী হ’ত।”

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে এদেশের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা প্রতীচ্য-ভাবশ্রোতে গা ভাসাইয়া দিল, আর জনগণ অজ্ঞান-তার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া প্রগতিশীল শিক্ষিত-সমাজ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িল। “ভারতের মুষ্টিমেয়

শিক্ষিত সম্প্রদায় গর্বভরে আপনাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া চলিল—মানবত্ব কত বিকৃত শিক্ষার অন্তরালে গুমরিয়া মরিতে লাগিল।” বাস্তবিক একই যুগে একই দেশে শিক্ষাগত ব্যবধানই ভারতে জাতীয় শিক্ষাকে এত দিন পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় লোকের কৃষ্ণিগত করিয়া রাখিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের বৃহত্তম অংশ জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে শিক্ষা যেমন প্রাণহীন হইয়া পড়ে, অপর দিকে জনগণ শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত হইয়া অন্ধকারে ডুবিতে থাকে। ফলে দেশের অগ্রগতি হয় ব্যাহত। সুবিখ্যাত Filtration theory দ্বারা ইংরেজ এদেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার যে আশা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ শিক্ষাবিদেবের অভিমতের মর্ম এই :

“হিমালয়ের শীর্ষ হইতে বিজ্ঞানীরা বিন্দু বিন্দু করিয়া নীচে পতিত হইয়া ভূমিত মরুভূমিকে সিক্ত করিতে থাকিবে, এবং এই অভিসিক্ত মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে আশাশুভী ভোম্বাধারা। এই ভোম্বাধারায় অবগাহন করিয়া জনগণ হঠে, গুঠে ও পুলকিত হইবে।”

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে ভোম্বাধারা গঠিত হইতে পারিল না। যাহারা ভাগ্যবান, তাঁহারা বিজ্ঞানস বিন্দু বিন্দু পান করিয়া হইয়া উঠিলেন মণীজীবী, তুলিতে বসিলেন নিজেদের সংস্কৃতি, শ্রদ্ধা করিতে শিখিলেন নগরের বিলাস ও আরামদায়িনী সভ্যতাকে। যাহাদের জ্ঞান এই ভাগ্যবান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, তাহাদিগকেই ইহারা ঘৃণা করিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

“এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল-কামরার দীপের মত। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ী চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়ীটাই যেম সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেম অবাণ্ধব।...সেই ভাবে ইংরেজী শিখে যারা বিশিষ্টতা পেয়েছেন, তাঁদের মনের দিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড় জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।”

দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে, এবং স্বাধীনতার চরম উদ্দেশ্য হইতেছে দেশে এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি হইল শিক্ষিত জনসাধারণ। নিরক্ষর বা অশিক্ষিত লোকের আধিক্য থাকিলে কখনই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এরূপ তন্ত্রে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ধনী ও শক্তিশালী ব্যক্তি দেশের সমস্ত রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়া থাকেন; সেরূপ ব্যবস্থা অধিকাংশ লোকের উন্নতি

বিধায়ক বা কল্যাণপ্রসূ হয় না, উহা ডিক্টেটরী শাসন বা স্বৈর-তন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর। এই অজ্ঞতার অচলায়তন সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে এক বিরাট অন্তরায়। দেশের বিশাল জনসমষ্টি যদি অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া যায়, তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হইবে। সুতরাং মানব-জীবনের জ্ঞান সর্বাঙ্গসম্মত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের দ্বারা দেশের জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। এই শিক্ষাপদ্ধতি এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে সমাজের সর্বস্তরের লোক সমভাবে উপকৃত হইতে পারে। জনৈক শিক্ষাবিদ বলেন, “স্বাধীন গণতন্ত্রের যুগে মানবের সমান অধিকার এবং মানবত্বের দাবি আজ সমাজদেহকে বিশেষ ভাবে আন্দোলিত করিয়া শিক্ষাজগতেও বিপুল তরঙ্গ তুলিয়াছে। ফলে অতীতের সেই শ্রেণীশিক্ষার আয়োজন আজ ধ্বসিয়া পড়িতেছে এবং তৎপরিবর্তে দেখা দিতেছে সর্বশ্রেণীর সর্ব-প্রকারের মানুষের জ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন।” কিন্তু ঠিক পথে সুপরিচালিত না হইলে এই সার্বজনীন শিক্ষাও বিকৃত হইয়া জাতিকে বিভ্রান্ত করিয়া সর্বনাশের পথে লইয়া যায়। সুতরাং যাহারা গণশিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করিবেন, তাঁহাদের লক্ষ্য হইবে কি উপায়ে শিক্ষাকে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া মানবগঠনের ও সমাজ-কল্যাণের পথে পরিচালিত করা যায়। এ সম্পর্কে স্যার রিচার্ড লিভিংষ্টোনের মন্তব্য স্মরণীয় :

“What is most important is to get the people mentally and emotionally roused. They must learn to hear, to see, to think and to use their own powers.”

জাতিকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার জ্ঞান জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন “শিক্ষামে অহিংসক্রান্তি,” অর্থাৎ শিক্ষায় অহিংস বিপ্লব। তাঁহার পরিকল্পিত ওয়াদ্ধা-পদ্ধতি শিক্ষাজগতে যুগান্তকারী বলিলেও অতুক্তি হয় না। সহযোগিতা ও ফলপ্রসূ কর্মকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতির বুনীয়াৎ গঠিত। ভারতের স্থপ্ত ও লুপ্তপ্রায় গ্রামগুলিকে সর্বপ্রকারের দুর্নীতি এবং কুসংস্কারের হাত হইতে মুক্ত করিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচার ও প্রসার করিতে না পারিলে প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয় এবং স্বরাজ বা স্বাধীনতা নিরর্থক একধা মহাত্মাজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ভারতের গ্রামগুলিই ভারতের স্বপ্নগিও; অতএব গ্রাম-উন্নয়ন ব্যতীত দেশের উন্নতি অসম্ভব। তিনি

আরও বুঝিয়াছিলেন যে, অর্থের অভাব বশতঃ গ্রামবাসীগণ শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে চায় না। যাহারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও অন্নবজ্রের সংস্থান করিতে পারে না, তাহাদের মনে কখনও শিক্ষালাভের অল্পপ্রেরণা জাগা সম্ভব নয়। তাই গান্ধীজী মনে করিতেন যে, দরিদ্র পল্লী-বাসীদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিই দেশের পক্ষে একান্ত উপযোগী। বস্তুতঃ তাঁহার শিক্ষাপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে চাহিয়াছেন এবং গ্রামাঞ্চলকেই দেশের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র-রূপে গঠন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, “আমাদের দেশের গ্রামগুলি শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্ভূতভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক আমি এই কামনা করি।”

স্বাধীনতার মত শিক্ষাও মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষকে সেই অধিকার দিতে কার্পণ্য বা বিলম্ব করিলে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করাই হইবে। তাই আজ প্রজাতন্ত্রী ভারতে নব নব শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। স্বাধীন ভারতের জননায়কগণ

সেই সকল শিক্ষা-পরিকল্পনায় যেন কোন রকম মারাত্মক তুল না করেন, দেশবাসীগণ একান্তভাবে সেই কামনা করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

“এদেশের শিক্ষা-ইমারতের সিঁড়ির সমস্ত গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রীর দ্বায়ে ওঠে নি। নীচের ভলাচাঁ উপরের ভলাকে নিঃস্বার্থ বৈধে শিরোবাহ্য করে নিয়েছে; আর তার তার বহন করেছে, কিন্তু অযোগ্য গ্রহণ করে নি; দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করে নি।”

যাহারা জনশিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন এবং যাহাদের উপর গণশিক্ষা প্রসারের উপায় নির্ধারণের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহাদের পক্ষে বিবেকানন্দের অমর উক্তি স্মরণীয় এবং অনুসরণীয় :

“ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতন জীবনযাপন করেছে, তার কারণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আজ চার হুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি আর ছ’পা দিয়ে দলেছি। যদি কতকগুলো নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষ সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিড়া বিতরণ করে বেড়ায়, ম্যাপ, ক্যামেরা, গ্লোব ইত্যাদির সহায়ে আচড়ালের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে কালে মদল হতে পারে।...এদেশে আগে ‘গ্রাউণ্ড’ ভৈরবী করতে হবে, তবে বীজ ফেললে গাছ হবে।”

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত ক্রোড় মাসের প্রবাসীতে “পাড়াগাঁয়ের কথা” শীর্ষক আমার একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল; উক্ত প্রবন্ধে প্রধানতঃ আমার নিজের এলাকার কথাই অভি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। অনেক এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার নিকট পত্র লিখিয়াছেন; সকলের পত্রের সারাংশ মোটামুটি একই রকমের, অর্থাৎ সকল পল্লী অঞ্চলের অবস্থা উক্ত প্রবন্ধে লিখিত অবস্থার অনুরূপ। হুই একটি নতুন সংবাদও পাইয়াছি। হুগলী জেলার জমাইয়ের জমিদার শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—“পশ্চিম বাংলা সরকার খাজ উৎপাদন হ্রাস উদ্দেশ্যে কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ফসল রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই; বাদর, হুহমান প্রভৃতির উৎপাতে হাওড়া ও হুগলী জেলার লোকদের ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, খরের চাল ইত্যাদির বি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে। এ সম্বন্ধে তাঁহারা কোম বোঁক রাখেন কি? সম্ভ্রুতি কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন বাদরের উৎপাত নিবারণ

করিবার তাঁহাদের কোন ব্যবস্থা নাই; স্থানীয় লোকেরা যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন—তাঁহাদের চিঠিখানির মকল এই—

Sri Bhutnath Mukherjee,
Zemindar, Janai,
P.S. Chandidola (Hooghly)

Dear Sir,

I beg to inform you that there is no monkey-killing squad for the district of Hooghly. In these circumstances you are requested to adopt other local suitable arrangements for coping with the problem.

Yours faithfully,

S. C. Ray,
Deputy Director of Agriculture,
E. Range.

শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—
“কৃষিবিভাগের নিকট হইতে হালের ভাল গরু চাহিলে উচ্চ-

পদস্থ কর্মচারীগণ সরকারী গো-প্রজনন কেন্দ্রের কথা বলেন এবং কত বৎসর পর ভাল গরু পাওয়া যাইবে তাহার হিসাব দেন।... তিনি আরও বলেন জনসাধারণের সহায়ত্ব ও সহযোগিতার জন্য সরকার মাঝে মাঝে আবেদন করেন কিন্তু জনসাধারণের নিবেদন তাঁহারা মোটেই গ্রাহ্য করেন না।”

তিনিতে পাই পল্লী অঞ্চলে প্রায় সকল বিভাগের সরকারী কর্মচারী আছেন, কিন্তু তাঁহারা কোথায় থাকেন, কি করেন, কি ভাবে পল্লীবাসিগণের উপকার করিতেছেন তাহা জনসাধারণ জানে না; সরকারী এমন বহু পরিকল্পনা আছে যাহা কার্যকরী করিতে পারিলে নানা দিকেই পল্লীর জনসাধারণ উপকৃত হয়; কিন্তু উপযুক্ত প্রচারকার্যের অভাবে সেই সকল পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন জ্ঞান নাই। আবার ছুই-এক জন যদি কোন পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন ও কোন কোন কেন্দ্রে তাঁহাদের হস্তাধার সীমা থাকে না; শেষ পর্যন্ত তাঁহারা কোন ফল পান না; অথচ ইহার জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট সময় ও অর্থ মষ্ট হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। আমার একটি অভি পুরাতন পুকুর আছে। পুকুরটির আরম্ভ প্রায় চারি বিঘা; চতুর্দিকের পাড়ের আরম্ভ প্রায় ১২ বিঘা। আশৈশব পুকুরটিকে হাজা মজা অবস্থায় দেখিতেছি; পদ্ম, শালুক এবং নানাবিধ জলজ উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে উহাতে জন্মায়, পাড়টিও জললে পরিপূর্ণ ছিল। তন্মধ্যে পাইলাম এইরূপ পুকুর সংস্কারের জন্য সরকারের একটি পরিকল্পনা আছে; এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে, নানাবিধ সর্পে পুকুর-সংস্কারের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বণ পাওয়া যায়; অতি কষ্টে এই পরিকল্পনার একটি নকল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম; তাহার পরের পাল হইল—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুকুর পরিদর্শন ও মন্তব্য পেশ। ইহা করাইতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে ১৯৫০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার মৎস্য-কর্মচারী (District Fishery Officer) পুকুরটি পরিদর্শন করেন এবং তাহার মন্তব্য উপরিওয়ালার নিকট পেশ করেন। পেশ করিবার তারিখ ছিল—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ইহার পর আমাকে বহু নির্দেশ পালন করিতে হয়; বহু চিঠিপত্র লিখিতে হয়; হুগলী জেলার সরকারী উকীল মহাশয়ের নিকট পুকুরের দলিলপত্র পাঠাইতে হয়। আমাকে জানান হয় যে, হুগলী জেলার সরকারী উকীল মহাশয় পুখুপুখুরে বোজখবর লইয়া যদি বলেন যে, পুকুর আমার মিলব, দলিলপত্রাদিতে কোন গোলমাল নাই, এবং পুকুর বন্ধক নাই, তবেই আমাকে অন্যান্য সর্পে অনুযায়ী সরকারী বণ দেওয়া হইবে। সরকারী উকীল মহাশয় দলিলাদিতে কোন গোলমাল দেখিতে পান নাই; এবং পুকুর

আমার মিলব, উহা বন্ধক নাই—এই মন্তব্য করেন। তিনি বোজখবর করিয়া এই মন্তব্য দিবার জন্য দীর্ঘ সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে ১৬ টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে দিতে হইয়াছিল। ইহার পর আমার দলিলপত্রাদি লিগ্যাল রিসেমন্ডেজারের নিকট পাঠাইতে হইয়াছিল। তিনিও সরকারী উকীল মহাশয়ের মন্তব্য সম্বন্ধে করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হুগলী জেলার মৎস্য-কর্মচারী মহাশয় নির্ধারিত কর্মে সরকারী ঋণের জন্য আবেদন করিতে বারবার তাগিদ দিতে লাগিলেন। কর্ম পূরণ করা এতই জটিল ছিল যে, আমি এই বিষয়ে তাঁহাদের উপদেশ ও সাহায্য চাহিয়াছিলাম। ১৯৫১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ‘সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ ফিশারিজ’ আমাকে লেখেন—

I have taken up your case with interest. The District Fishery Officer, Hooghly, is to assist you in drawing up the scheme and he has been intimated to contact you immediately in this connection. Before he meets you, I will give him necessary instructions to expedite the matter without the least possible delay.

এইরূপ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে কাহার না আশঙ্ক হয়, এবং সরকারী কর্মচারীগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা বর্জিত না হয়? আমি তৎক্ষণাৎ আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম।

ইহার পর ১৯৫২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী চিঠিতে হুগলী জেলার মৎস্য-কর্মচারী আমাকে যাহা লেখেন তাহার নকল এই—

“As it has been decided to discontinue the scheme for the improvement of tank fisheries in the dry districts of West Bengal and the fund allotted to this office under this scheme for the current financial year has been totally exhausted, I regret to inform your loan application for pisciculture is hereby treated as cancelled.

Thanking you for the trouble you have undertaken.”

দেড় বৎসর ব্যাপী চেষ্টা, পত্রাদি লেখালেখির পর আমাকে জানান হইল, “পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে, আপনার ঋণের আবেদন ‘ক্যানসেল’ (বাতিল) করা হইল।” চিঠি লেখালেখিতে যে খরচ হইয়াছে তাহা না হয় হাতিয়া দিলাম, যে সময় নষ্ট হইয়াছে তাহাও বরিলাম না, কিন্তু সরকারী উকীল মহাশয়কে যে ১৬ টাকা দিতে হইয়াছে তাহার জন্য দাবী কে? সরকারের এইরূপ অব্যবহার কথা পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ শুনিবে কি সরকারী পরিকল্পনার উপর তাহারা কোন আস্থা রাখিতে পারিবেন? বিভিন্ন বিভাগের এইরূপ অব্যবহার অনেক উদাহরণ দিতে পারি।

চশমা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

অশোককে আত্ম সম্বন্ধে চিন্তিত মনে হ'ল। কিন্তু নীলিমা সংবাদটা কিছুতেই সত্য বলে যেমন নিতে পারে নি। একান্তে প্রতিবাদ জানিয়ে সে অশোককে বললে, আমার মন বলছে, এ কথনও হতে পারে না—নিশ্চয়ই কোথাও কোম গোলমাল বেঁধেছে।

অশোক বিশ্বস্ততা দৃষ্টিতে শ্রীর মুখের পানে চোখ তুলে তাকাতাই সে পূনশ্চ বললে, যার পিতৃমাতৃকুলে আত্ম পর্যন্ত কেউ চশমা ব্যবহার করেন নি তাঁদেরই বংশের ছেলের এত অর ব্যবসে...

শ্রীকে কথার মাঝখানে বামিয়ে দিলে অশোক। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, তুমি চূপ কর নীলিমা—

‘চূপ করব কিসের জন্ত?’ তার কণ্ঠে বিশ্বাস, ‘কথাটা মিথ্যে বলেছি নাকি? তোমার বাবা পঁচাত্তর বছর বয়সেও চশমা ছাড়া লেখাপড়া করে গেছেন—আমার বাবা আজও...’

অশোক অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। যত সব অমাবস্ত্যক কথা... তা ছাড়া তোমার কথা অস্বীকার করছে কে?

নীলিমা বলে, বার বার বাবা দিচ্ছ...তবুও বলবে অস্বীকার করছ না?

অশোক জবাব দেয়, তুলনাটা ঠিক হয় নি বলেই বাবা দিয়েছি। সকাল আর একালের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভকাৎ...এই মোক্ষা কথাটাই আমি তোমায় বলতে চাইছি।

নীলিমা বললে, ঠিক বুঝলাম না...

অশোক বললে, বলতে পার নীলিমা আজকের দিনে দেহ-পুষ্টির জন্তে আমাদের ছেলেরা কতটুকু পাচ্ছে? পড়সা যায় জিনিষ খেলে না। খাঁটির মাঝে ভেজালকেই হাসিযুখে মাথায় তুলে নিতে হচ্ছে। না নিয়ে উপায় নেই। ওরা উঠেছে জাতে, আর খাঁটি হয়েছে জাতিচ্যুত। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। উপরন্তু মম ধারাপ হয়ে যায়। তাই বল-ছিলাম যে, বাস্তব ব্যাপারটাকে পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে আমাদের অবজ্ঞা করা উচিত হবে না।

নীলিমা রাগ করে জবাব দিলে, তোমার ছেলে আমার ত আর কেউ নয় তাই তোমায় চূপ করে থাকতে বলছি। কথা চমকেও গা জলে যায়।—সে আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না। ক্ষত প্রস্থান করলে।

নীলিমা চলে যেতেই অশোক অচমক হয়ে তাবতে লাগল। নীলিমার ভাল লাগে নি তার কথা। না লাগবারই কথা। আত্মবিশ্বাস সহরে লালিত পালিত সে—কতটুকু সে জানে পূর্বপুরুষদের জীবনব্যাপার কথা। শুধু কানে শুনেছে—চোখে দেখেনি—ভেবেও দেখেনি। কিন্তু অশোকের আছে প্রত্যক অভিজ্ঞতা। তাই আজ আর কোনকিছুতেই সে

আশ্চর্য্য হয় না বরং বিস্মিত হয় এই ভেবে যে, আজও তারা বেঁচে আছে কেমন করে!

শ্রী রাগ করে চলে গেলেন। তাকে দোষ দেওয়া চলে না। অত্যাচার আর অন্যতনের পাকে পাকে তারা এমনি জড়িয়ে পড়েছে যে, মন অতিরিক্ত হিসেবী হয়ে উঠেছে। কোম-কিছুকেই সহজ ভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। ভয় হয় যে, অন্যতনের ফাঁসটা হয় ত আরও দৃঢ়ভাবে গলার চেপে বসে যাবে। কথাটা অশোক সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করে এবং কতকটা যেম-বিহ্বল হয়েও পড়ে। কিন্তু নীলিমার মত পূর্বপুরুষের নজির দেখিয়ে নিজের মনকে চোখ ঠারতে পারে না।

অশোক অচমক হয়ে পড়ে। তার মনে অতীত স্মৃতির রোমন্থন চলতে থাকে। কোথায় ছিল তখন শ্রী আর কোথায় ছিল তার পুত্র। তার স্পষ্ট মনে আছে তখনকার দিনগুলোর কথা। প্রথম মহামুহূর্ত সবেমাত্র শেষ হয়েছে। যুদ্ধের যে সামান্ততম পরোক্ষ প্রভাব এখানে এসে পৌঁছেছিল তারই আঘাতে অশোকের বাপঠাকুরদার অত্যন্ত জীবনমজা ব্যাহত হয়েছিল। তারা চমকে উঠেছিলেন—আত্মমাদ করে উঠে-ছিলেন, বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন দিন চলবে কেমন করে এই কথা ভেবে। অথচ আজকের সঙ্গে সেদিনের কোন দিক দিয়েই তুলনা করা চলে না। তবুও তারা ভয় পেরেছিলেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। অশোক সহসা আপন মনে হেসে উঠল। এই সহজ কথাটা তার বোঝা উচিত ছিল একজন। ভবিষ্যৎ...তাদের আবার ভবিষ্যৎ কোথায়? যেদিকে চোখ ফেরানো যায় সবই অন্ধকার...কিন্তু তবুও মানুষকে তাবতে হয়—অশোকও তার হাত থেকে রেহাই পায় না। পূন্মরায় সে তার অতীতের মধ্যে ডুবে যায়। তার বাবা তার ঠাকুর-দাদা এসে সব চিন্তার মধ্যে আসন পেতে বসেন।...অশোক-যেমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তাঁদের ব্যাকুলতা...অথচ সেদিনের দুর্দৃশ্যতা আজকের তুলনায় বর্ধবাই নয়। কাপড়ের ছোঁড়া পাঁচ টাকার গুনে তারা বিশ্বাসে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু অশোক তাবছে আজকার দিনে কোমকিছুতে বিস্মিত হওয়াই একটা বিশ্বস্তকর ব্যাপার। তাই বলে অতীতের কথা চিন্তা করে নিশ্চেষ্ট-ভাবে বসে থাকা চলে না। অশোকের চিন্তাব্যায় বাবা পড়ল—বাস্তব উপস্থিতিতে।...অত্যন্ত সন্তোষে একটি মিঃখাস চেপে নিয়ে অশোক বাস্তবকে কাছে ডাকলে। তার পিঠে মাথায় সন্নেছে হাত বুলিয়ে দিয়ে অশোক তাকে মানা প্রেরণ করে। বাস্তব কোম জবাব দিতে পারে না। কেমন একপ্রকার অপরাধীর মত মুখ করে নীরবে চেয়ে থাকে। চোখ দুটো হল হল করে ওঠে। মনটা তার

হঠাৎ বিকল্প হরে ওঠে পাশের বাড়ীর গোপার দাদার উপর।...মইসে...

পুঞ্জের বিমর্ষ মুখের পানে খানিক নিঃশব্দে চেয়ে থাকে অশোক। সে দৃষ্টির কাছে বাস্তব এতটুকু হয়ে যায়। সে মাথা নীচু করে।

অশোক যুহু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, চোখে কি বড় ব্যাপস দেখিছ বাস্তব?

সহসা বাস্তব কেঁদে ফেলে—মাথা মেড়ে জানাচ, না...সে আর ঠাণ্ডা না। কণ্ঠকটা পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে সরে পড়ল। কিন্তু অশোকের তখন কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। হেলের বিমর্ষ মুখ, চোখের কল ভার সারা নন আচ্ছন্ন করে আছে। অশোক ভাবছিল যে, নীলিমা ঘাই বলুক না কেন সে কোন ক্ষমাই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারে না। অবিলম্বে একটা কিছু ব্যবস্থা থাকে করতেই হবে।

পরদিন আপিস-কেরত অশোককে তার বালাবহু রাজেনের শরণাপন্ন হতে দেখা গেল। রাজেনের ভগ্নীপতি ব্যাভিমান চোখের ভাস্কর। অতীতের সখ্যাকে বালিয়ে নিয়ে সে তার নিজের কথা ভুলে আর দশটা সাংসারিক সুখ-সুখের প্রসঙ্গে। একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে সে বললে, আমার এ উপকারটুকু তোমাকে করতেই হবে রাজেন। না না, একেবারে খালি হাতে তার কাছে আসি যেতে চাই না—সামান্য দেব বৈকি। বাস্তব আমার একমাত্র সন্তান—তা ছাড়া ভাস্করিটা তোমার ভগ্নীপতির পেশা একথা ভুলে গেলে চলবে কেন।

রাজেন যুহু যুহু হাসতে থাকে।

অশোক বলে, তুমি হাসছ কেন রাজেন?

রাজেন বলে, আমার ভগ্নীপতিও ঠিক এই কথাই বলেন। আর এছাড়া বাস্তবের তার বদনামও আছে। তিনি তাঁর আত্মীয়বন্ধুকেও খাতির করেন না। বলেন, ভাস্করিটা তাঁর ব্যবসা এবং কোন বুদ্ধিমান লোকেই ব্যবসারে লোকসান হতে দিতে পারে না।

অশোক বিকল্প দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এতটা সে আশা করে নি। সুতরাং নিরাশ হয়েছে তাকে ফিরে আসতে হয়। প্রয়োজনের তুলনায় সজ্জিত কম। মনটা দমে যায়। নিঃশব্দে দেয় বিস্ময়।

বাড়ী ফিরতে নীলিমা হাসি-মুখে কাছে এসে দাঁড়াল। মিত মুখে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু ব্যবস্থা হ'ল?

—একটি নিঃশ্বাস ঘোচন করে অশোক যুহু কণ্ঠে জবাব দেয়, না—রাজেনের ভগ্নীপতি ব্যবসারে বিদূষাজ লোকসান করতেও রাজী নন। আর তুমিও জান—

—নীলিমা তাকে ধামিয়ে দেয়। অতঃপর বাস্তব পড়তে বসেছে। এসব আলোচনা ওর সামনে না হওয়াই ভাল।

কথাটা সে অশোককে জানিয়ে দেয়। কিন্তু যতটুকু বাস্তব কানে গেছে তাইতেই সে স্তব্ধ হয়ে উঠল। তারই চশমার বিষয় আলোচনা হচ্ছে একথা বুঝে নিতে তার বেগ পেতে হ'ল না। সে একটু অভয়নক হতেই গোপার দাদার চশমা-পরা মুখখানা তার মনকে তেমে উঠল। চশমা পরলে বেশ দেখায় কিন্তু তাকে। চোখে তার বুলোবালি চুপতে পারে না—চশমার ঢাকা থাকে তার চোখ। সহসা তার বাবার পানে চোখ পড়তেই বাস্তব তদন্ততার বোর কেটে যায়। বুকের মধ্যে হস্ত মিতান্ত অকারণেই আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

দিনকরেরের মধ্যেই তার তত্তে চশমা আসবে একথা সে শুনেছে, কিন্তু চশমা-প্রাপ্তির আনন্দের চেয়ে একটা অজানা আশঙ্কা তার মনের উপর বোকার মত চেপে আছে। একটা ভীত অস্বস্তি তাকে কণে কণে আনমনা করে তুলছে। কি জানি যদি...বাস্তব সহসা চমকে উঠল—যেন সে মত্ত বড় একটা অজ্ঞান কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ বরা পড়ে গিয়েছে।

নীলিমা যথাসম্ভব মিয় বরে পুনশ্চ বললে, এমনিতেই ক'দিন বরে মুখ শুকিয়ে বুকে বেড়াচ্ছে তার উপর ওর সামনে আর এসব কথা ভোলো না তুমি।

অশোক যুহু কণ্ঠে বলে, অক্ষমতার লজ্জা যে কি তা আজকের মত এমন করে আর কোন দিন অনুভব করি নি। রাজেন আমার শেষ পর্যন্ত কি উপদেশ দিলে আন নীলিমা? বলে, হাসপাতালে নিয়ে যাও মিথরচায় হবে।

নীলিমার একটি নিঃশ্বাস পড়ল—কোন জবাব দিলে না। কিন্তু অশোক খামতে পারলে না, বলে ফেলল, আমিও মুখের মত জবাব দিয়েছি।

নীলিমা একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, এ তোমার অজ্ঞান রাগ করা। রাজেন বাস্তব মিত্যে বলেন নি—ওখানে পৌছবার ক্ষমতা কি সকলের থাকে?

অক্ষমতা অশোক উক হয়ে উঠল, তোমার মত অতটা চুল-চেরা হিসেব অবশ্য আমি করে দেখি নি। কিন্তু মানুষের স্পর্ধারও একটা সীমা আছে।

নীলিমা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে, তুমি অকারণে রাগ করছ। বেশ ত ওরই কাছে ছেলেকে দেখিয়ে এসে না হয় মুখের মত জবাব দিয়ে এস।

অশোক দমে গেল, বললে, তুমিও কি আমার ঠাটা করছ।

নীলিমা বললে, না সত্যি কথাই বলেছি, কিন্তু আর নয়—অনেক বাজে কথা বলা হয়েছে, আর দেখি না করে কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে এস। ততক্ষণে চা হয়ে যাবে। নীলিমা চলে গেল।

এরই কিছুকাল পরে অশোককে দেখা গেল রাগাধরে বসে চা পান করতে। পেয়ালার বারকয়েক চুমুক দিয়ে পূর্ব-কথার স্মৃতি বরে সে পুনরায় স্মৃতি করলে, ঠাটা ত তুমি কর নি

কিন্তু একে ঠাট্টা হাজা আর কি ভাবা বায় বল দেখি। আমি যে নিকুপার একথা তোমার চেয়ে আর বেশী কে জানে।

এ কথার কোন সোজা জবাব না দিয়ে নীলিমা বড় মধুর একটুখানি হাসল। এ হাসির সঙ্গে অশোকের পরিচয় আছে, সে মাথা নত করলে।

তার মনের কথা অনায়াসে নীলিমা পড়ে ফেললে। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, এ তোমার অমায়িক বাপু। আচ্ছা তোমরা আমাদের কি মনে কর বল ত? কাঠের গুড়ুল?

বায়করেক ঢোক গিলে অশোক বলে, তা ভাবতে পারি না বলেই যে এত ছুঁৎ পাই...

ঐবা বাকিয়ে নীলিমা উত্তর দিলে, এ তোমাদের অহকারের কথা। প্রয়োজনে তোমাদের দেখা করতে বাধে না, কিন্তু জীর গরনা মেবার কথায় তোমরা কুণ্ঠিত হয়ে ওঠ। এই ভুল ভিন্মিয়কে যে কেন এত বড় করে দেখে তা কি আমরা বুঝি না মনে কর?...

এই ভুল বস্তুটি শেষ পর্যন্ত অবশ্য বড় বলে গণ্য করতে অশোক পারে নি। বায়র চোখের চিকিৎসা রাক্ষসের ভয়পতিক দিয়ে করাতেও তারা পারে নি। একটা তীব্র অভিমান—বা হয়ত মোটেই সত্য নয়—তাই অত্যন্ত বড় হয়ে উঠেছিল তাদের কাছে। আর হাসপাতাল? সেখানেও তারা যেতে পারে নি। রাক্ষসের অবাচিত উপদেশ পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল।

বায়কে অবশ্য তার মা বাবা কোন কথাই জানতে দিতে চান নি, কিন্তু বায় সব ধরই রাখে। কলে তার ভয় এবং সঙ্কট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অথচ অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে তার একখানি কাম এবং একটা চোখ মা বাবার প্রহার নিমুক্ত না রেখেও বৃদ্ধি পাচ্ছে না।...আঃ এই সময় সে একবার যদি গোপার দাদার সাক্ষাৎ পেত...এমন জানলে কে তার কথায়...কথাটা সে পুরোপুরি ভাববারও অবসর পেলো না, হঠাৎ তার বাবা এসে দেখা দিলেন। বায় একটু নড়ে-চড়ে স্থির হয়ে বসল, কিন্তু মনের মধ্যে তার রাগি রাগি চিন্তা পাক খেতে লাগল।...গোপার দাদা...তার চন্দ্রমাপরা একখানি মুখ, তার উপদেশ...স্থল—সেখানকার ব্যাপার, তার মা বাবার হুজুগ...সবকিছু এক সঙ্গে চিন্তা করতে গিয়ে বায় নিশাহারা হয়ে পড়ে।

অবশেষে বায়র চোখের ঔষধ এল। কিন্তু এরই মাঝে কি ঔষধ—চোখে দেবার পর থেকেই নে কাপসা দেখতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে না ত। বায় লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—গোপার দাদাকে মনে মনে অভিসম্পাত করে। নিজের বৃত্তিকে দেয় বিচার, কিন্তু প্রকাণ্ড কোন কথা বলতে সে সাহস পায় না। মায় কাছে

একটা অভি গোপনীয় কথা প্রকাশ করবার ভক্ত ক'দিন বয়েই বায় হট্টকট্ট করেছে। বহুবার বলতে গিয়েও কি অভ্যস্ত কারণে পিছিয়ে এসেছে।...আর তারই চন্দ্র শান্তি সে হাতে হাতে পেয়েছে।

মাকে ডেকে করুণ কণ্ঠে বলে, চোখে যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না মা? নীলিমা তাকে আশ্বাস দিয়ে চলে যায়।... কিন্তু বায়র হুজুগের ভাতে বিন্দুমাত্র লাঘব হয় না।

দীর্ঘ চক্ৰিশ ঘণ্টা একটা তীব্র অহস্তির মধ্যে কাটিয়ে বায় পুনরায় তার স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। তার হুজুগনা কেটে গেছে। চোখে মুখে দেখা দিয়েছে হাসি। গোপার দাদাকেও সে কমা করে ফেলেছে।...

আজ তার চন্দ্রমা আসবে। গত রাতে ঘুমের তান করে শুয়ে থেকে বায় তার মা-বাবার সব কথা শুনেছে। তার পরে বহুক্ষণ সে ঘুমতে পারে নি। একটা মধুর উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসেছিল। চোখের সম্মুখে তেলে বেড়াছিল একখানি চন্দ্রমা-পরা সুন্দর মুখ—সে মুখ বায়র নিজেরই।

বায় একবার খোলা জানালা-পথে গোপাদের সুবহু অট্টালিকার পানে চেয়ে দেখে। আজ এই মুহূর্তে তার মনে আর কোন কোত নাই। ওদের মত অমন সুন্দর বাড়ী আর গাড়ী না থাকার ছুঃখটাও যেন ক্রিকে হয়ে গেছে।

চন্দ্রমা কিন্তু সেই দিনই বায় পেলো না। শুধু তার বাবা ওকে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থাটা পাকা করে এলেন। তাই কি কম কামেলা। নামা 'পাওয়ারের' লেন দিয়ে বায়র উপর চলল পরীক্ষা। পরীক্ষা না ছাই। যত সব কাপসা কাঁচ বায়র চোখের সামনে ধরে বলে কিনা কেমন দেখছে? ওর ভিতর দিয়ে আবার মাহু কখনও দেখতে পার না কি। বায় মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে তার রা নেই। আজ এই মুহূর্তে এই লোকটির হাতেই তাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

অনেকক্ষণ ক্ষতাক্ষতি করে শেষ পর্যন্ত একখানি কম পাওয়ারের কাঁচের মধ্য দিয়ে বায় অনায়াসে দূরের লেখাগুলি পড়ে ফেলল। ডাক্তার দুঃস্থ হলেন। মুখে তাঁর হাসি ফুটল।

ডাক্তার তাঁর কাজ শেষ করে দিয়েছেন। দিন ভিনেকের মধ্যেই তিনি চন্দ্রমা করে দিয়েছেন কিন্তু বায়র আর ইদানীং চন্দ্রমা সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নাই বরং চন্দ্রমা চোখে পরতেই সে ভয় পায়। অথচ বাবা হুঃস্থ দিয়েছেন চক্ৰিশ ঘণ্টা চন্দ্রমা চোখে দিয়ে থাকতে হবে। এমন জানলে সে কখনই গোপার দাদার কথায় কান দিত না, আর এমন ভয়ে ভয়ে তাকে দিন কাটাতে হ'ত না।

মা বলেন, কিছুদিন নিয়মিত চন্দ্রমা ব্যবহার করলে মাকি চোখ ভাল হয়ে যাবে ডাক্তারবাবু এই কথা বলে দিয়েছেন। মা ত আর বোঝেন না যে ঐ ডাক্তারবাবুটি কিছুই জানেন না। কিন্তু এসব কথা আজ আর বলবার নয়।...

দিনকরেক ধরেই নীলিমা ছেলের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে আসছে, কিন্তু এর সঠিক কোন কারণ সে বুঝে পায় নি। বাসুর সর্দাদা বাপ-মাকে এড়িয়ে চলার প্রাণপণ চেষ্টা, তার সদা-শক্তি চোখ মুখের ভাব তাকে আবার নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। কোথাও যে একটা গোল বেবেছে একথা সে নিঃসংশয়ে টের পেয়েছে। তা হাড়া এমন শু বাসু কোন দিন ছিল না। গোপা ডাকতে এসে ফিরে যায়। তার দাদার নাম করতে মুবিয়ে উঠে...বিকেল হলই মাথা ধরার নাম করে শুয়ে পড়ে...এসব নীলিমার মোটেই ভাল ঠেকছে না। অশোককে সে কোন কথা বলে না...হেলেকে কাছে ডেকেও কোন প্রশ্ন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে কেনন একটা অজান্ত আশঙ্কা, কিন্তু এমন চুপ করেই কত দিন থাকা যায়। এই একটু আগেও গোপা ডাকতে এসে অকারণে কতকগুলি কটু কথা শুনে গেল বাসুর কাছ থেকে। অন্তরাল থেকে নীলিমা সবই লক্ষ্য করেছে। গোপা মুখ কালো করে চলে গেল। নীলিমা হেলেকে কাছে ডেকে সরেছে জিজ্ঞেস করলে, আজও কি তোর মাথা ধরেছে বাসু? ওমা চলমা চোখে নেই কেন তোর? আর গোপাকেই বা ফিরিয়ে দিলি কেন?

এত দিনের-লুকিয়ে রাখা কথাটা অকস্মাৎ বাসু তার মার কাছে অকপটে স্বীকার করলে। চোখের অশ্রু তার কোম দিমই ছিল না—এখনও নেই। এ গোপার দাদার পরামর্শেই সে এত কাণ্ড করেছে।

দেখতে দেখতে নীলিমার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। পমায়ের এমনি মুখের ভাব বাসু কোন দিন দেখে নি। তার অন্তর কেঁপে উঠল। কিন্তু একটা শক্ত কথাও নীলিমা তাকে বললে না, শুধু হঃখিত করে জানালে, তুমি এখন নিতান্ত ছেলে-বাল্যবট নও, এই ভোমার ভের বছর বয়স হ'ল বাসু। কত বড় অজায় তুমি করেছ তা একবার বুঝবার চেষ্টা কর।...

অশোকের আগিল থেকে ফিরে আসবার সময় হয়েছে। খানিক আগে নীলিমা বাসুকে ছোর করে খেলতে পাঠিয়েছে।

বছ দিন পরে পুনরায় সে তার ভুলে যাওয়া অভ্যাগকে ঝালিয়ে নিতে প্রবৃত্ত হয়েছে। সমস্ত রচনা করেছে কবরী—কপালে দিলে কুসুমের টিপ...পায়ের আলতা। ট্রাক বলে বের করলে সাবেক দিনের একখানি সাজী। বিয়ের অব্যবহিত বৈ এই কাপড়খানি অশোক তাকে লুকিয়ে উপহার দিয়ে-ছিল। বিশেষ কোন উপলক্ষ্য ছাড়া এখানি সে কোনদিন ব্যবহার করে নি। বিগত দিনে মিড়ুত কক্ষে এই কাপড়খানি পরে কতদিন সে অশোকের সামনে সহাত মুখে দাঁড়িয়েছে। অশোক খুশী হয়ে উঠেছে...আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তার মন।

অতীতের সে দিনগুলি ফুরিয়ে গেছে...মমের সে ঐশ্বর্যও

আজ আর নেই...২৭০ ফিকে হয়ে গেছে...নীলিমা আরমা নিজেই দেখে...আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে বলে...কোথায় ঘটেছে পরিবর্তন তার খোঁজ করতে থাকে। পরিবর্তনটা দেখে চোখে মনকেই বার্ককোর সাজ পরিয়েছে...নইলে...নীলিম চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল। অশোক নিঃশব্দে এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। বড় মধুর করে সে একটুখানি হাসল, শ্রিঃ কঠে বললে, এমন চোরের মত এসে ঘরে ঢুকেছ যে একা হলেই আমি চিংকার করে উঠতাম। অমন-ই করে দেখা কি তুমি? আজ মতুন দেখছ নাকি?

অশোক সত্যই বিস্মিত হয়েছে। বিশ্বস্তির স্তম্ভগর্ভ থেকে হারানো দিনের কতকগুলি মধুর স্মৃতি জীবন্ত হয়ে তাকে ঘেন তার বর্তমান জীবনের হুঃখদারিত্যভরা বৈচিত্র্যহীন পরিবেশ থেকে কিছুকণের জন্য এক নতুন জগতে নিয়ে এল। এ জগতের সঙ্গে তার পরিচয় থাকলেও পারিপার্শ্বিকের চাপে তা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তার আসল সত্তার ঘেন মৃত্যু হয়ে-ছিল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার মনে হ'ল—সে মরে নি, শুধু মুমিয়ে ছিল। সামান্য স্পর্শেই আবার জেগে উঠেছে। তার ধমনীতে রক্তধারা আবার ঘেন মৃত্যু সুরু করেছে।

অশোকের মুখের পানে খানিক নিঃশব্দে চেয়ে থেকে নীলিমা হেসে বললে, অমন করে চেয়ে আছি কি...জামা কাপড় ছাড়বে না?

অশোকের স্বপ্ন টুটে গেল। একটা নিঃশ্বাস চেপে নিঃশ্ব বললে, এই যে যাচ্ছি, কিন্তু ব্যাপার কি বল ত নীলিমা? বড় যেমন খুশী হয়েছে মনে হচ্ছে।

নীলিমা বললে, তুমি ঠিকই বরোছ। আজ আমার আদম রাখবার ঠাই নেই কিন্তু তুমি হয়ত খুশী হতে পারবে না।

মোহা কথাটা কি বলত নীলিমা, অশোক বললে, তুমি যে ক্রমেই হুঃখোধ্য হয়ে পড়ছ।

স্বামীর কাছ থেকে প্রথমে নীলিমা একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলে। তারপর একে একে বাসুর চশমা সজ্জাস্ত সকল কথা জানিয়ে দিলে।

শুধু বিষয়ে হতবাক হয়ে রইল অশোক। নীলিমা পুনশ্চ বললে, তুমি বিশ্বাস কর গরমার জন্য আজ আর আমার এক-বিশ্ব কোড নেই। তবে যদি বাসুর কথা বল ত আমাকে বলতেই হবে যে, ও ছেলেমানুষ পরের বুদ্ধিতে একটা অজায় করেছে বৈত ময়।

অশোক ঘেন আপন মনেই কথা করে উঠল, কিন্তু ডাক্তার...

নীলিমা বললে, কেন তুমিই শু বলে থাক যে, আজকের দিনে কোন কিছুতে বিশ্বস্ত হওয়াই একটা বিশ্বকরব্যাপার—

এ কথার কোন কবাব অশোক দিতে পারলে না, শুধু তার কঠ থেকে একটি মাজ শব্দ বেরিয়ে এল...হুম...

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তরুণ ছাত্রদের “আলোচনী”

জীনলিনীকুমার ভদ্র

আজ যারা ছাত্র ভবিষ্যতে ভারাই হবে দেশের মেতা। তাদের আদর্শবাদ, বিশ্বাস, আশা-আশঙ্কা এ সকলের মতোই নিহিত রয়েছে অনাগতকালে উন্নততর বিশ্ববোধের আগুতি এবং বিশ্ব-জাতীয় প্রতিষ্ঠার বিপুল সম্ভাবনা।

প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারত-সরকারের শিক্ষা-পরিষদের উদ্যোগে অহুষ্ঠিত এক নিবিলভারত রচনা-প্রতিযোগিতার কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য এই ছাত্রদের ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আমেরিকার উপস্থিতির পর অন্যান্য বিদেশী ছাত্রদের ভার

উচ্চ ইংরেজী বিভাগের ছাত্রেরা যাতে আন্তর্জাতিক সমস্তাসমূহ সম্বন্ধে সচেতন হন সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকার অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র, নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের উদ্যোগে ১৯৪৬ সালে উচ্চ ইংরেজী বিভাগসমূহের জন্য বার্ষিক আলোচনী (forum) স্থচনা হয়। “যে পৃথিবী আমরা চাই”— এইটাই ছিল এই আলোচনীর মূল বিষয়বস্তু।

১৯৪৮ সালে এই আলোচনীর পরিধি সম্প্রসারিত হয় এবং যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় অঞ্চল, এমন কি বৈদেশিক ছাত্রেরাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়। বিগত চার বৎসরের মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার ৬২টি দেশ থেকে প্রায় পাঁচ শ ছাত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে এই আলোচনীতে অংশ গ্রহণ করেছে। এই সকল বৈদেশিক ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করে তাদের কাজকর্ম খেলাধুলা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে এবং এই মেলামেশার দরুন তারা আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে অহুপ্রাণিত হয়।

বর্তমান বৎসরে এই প্রোগ্রাম অহুসারে এশিয়া এবং মধ্য-প্রাচ্যের ১৬টি দেশের ২৪ জন ছাত্র-প্রতিনিধি জাহুয়ারী মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে হাজির হয় এবং মার্চের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। ২২শে মার্চ তারিখে নিউ-ইয়র্কের একটি সেরা হোটেলে বসরুমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের ২০০০ ছাত্রের যে আলোচনা-সভার অহুষ্ঠান হয় তাতে তারাও যোগদান করে।

এই অহুষ্ঠানে, মাদ্রাজের ষ্টেলা ম্যারিস কলেজের মার্টল ডোরাই রাজ এবং আসামের পৌহাট, কটন কলেজের রাজেন্দ্র-নাথ বেদা এই হু’জন তরুণ ছাত্র ভারতীয় ছাত্র-সমাজের



ওয়ারিংটন, কানেক্টিকাটের গানারি স্কুলের কয়েকজন ছাত্রসহ শ্রীবেদা (বা-দিক হইতে দ্বিতীয়)

ভারতের এই হু’জন ছাত্রও মার্কিন-পরিবারের অন্তরঙ্গ হিসাবে অবস্থান করতে থাকেন। কলে তাঁরা তাঁদের তরুণ আমেরিকান বন্ধুদের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টার যোগদান করবার সুযোগ লাভ করেন। তাঁরা মার্কিন উচ্চ-ইংরেজী বিভাগসমূহে হাজিরা দেন এবং গ্রহাগার, সংবাদপত্রের আপিস, বেতার ষ্টেশন, বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, আদালত ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। ওয়াশিংটনে গিয়ে তাঁরা ম্যাটট ভার্গনহু জর্জ-ওয়ারিংটন হোম, লিফন এবং জেফারসন শ্রুতি-সৌধ ও ‘লাইব্রেরি অব কংগ্রেস’র মত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান-সমূহ পরিদর্শন করেন।

কেজারারী পোড়ার দিকে প্রতিনিধিরা দুই দিন ব্যাপী

একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৫ই মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকারও একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়।



আমেরিকায় ব্রাঙ্ক ইয়ং-এর গৃহে আসামের ছাত্র-প্রতিনিধি
শ্রীমদেন্দ্রনাথ বেরা

‘ফোরামে’ প্রতিনিধিরা উভোক্তাদের নির্দেশিত বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ এবং আলোচনার যোগদান করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষী, বিশিষ্ট মার্কিন গুণী এবং জামীরাও আলোচনার মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নিকট ভাষণ প্রদান করেন।

এমনভাবে পারস্পরিক জ্ঞানের আদান-প্রদানের ফলে আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের ছাত্রেরা উত্তমতঃই লাভবান হয়েছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যেমন আমেরিকানদের

কাছ থেকে বিদেশের ছাত্রদের অনেককিছু শেখবার আছে তেমনি মার্কিন ছাত্রেরাও বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও জীবন-যাপন-প্রণালী থেকে বহুবিধ শিক্ষালাভ করে উপকৃত হতে পারে। সময় সময় ভুক্ত-বিত্তকে আসর সরগরম হয়ে উঠেছিল সত্য, কিন্তু অন্যেরা কি চিন্তা করছে তা জানবার জন্য সকলের উৎসুক্য থাকার অপ্রীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় নি—পরিণামে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ছাত্রেরা নিজ নিজ দেশে ফেরবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানসম্মত এবং মাপনিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে এমন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সুশ্পষ্ট ধারণা যা শুধু বইপুঁথি পড়ে বা চলচ্চিত্র দেখে সফর করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। মার্কিন রীতিনীতি, রূপকথা, এবং জীবনধারার স্বরূপ সম্বন্ধে এখন তারা অধিকতর ওয়াকিবহাল।

অন্যদিকে, এর দরুন ছাত্রেরা ছাত্রের মাইল দূরবর্তী দেশ-গুলির অধিবাসীদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তাবোধ মার্কিন ছাত্রদের মনে জাগ্রত হয়েছে; তাদের হৃদয়ে ব্যক্তিগত দোহাধ্য-হাপনের যে আগ্রহ জেগেছে তাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর মূল ভিত্তি। তাদের দৃষ্টি প্রসারিত হ’ল—তাদের চিন্তার নুতন ধোঁরাক জুটেছে এবং একদা যে সকল দেশ তাদের নিকট ছিল মানচিত্রের উপরকার কতকগুলি স্থান মাত্র, আজ সেই সকল দেশের সমজা সমূহকে স্পষ্টতররূপে বুঝবার ক্ষমতা তাদের হয়েছে।

এই অহুষ্ঠামের সার্থকতা সম্বন্ধে একজন পরিদর্শক-ছাত্রের নিম্নোক্ত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—“আন্তর্জাতিক মৈত্রী-প্রতিষ্ঠার পক্ষে মজারদের লগ্না-চওড়া আলোচনার চেয়ে এতদূর অহুষ্ঠাম যে চের বেশী সহায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই।”

এশিয়ার পুনর্গঠন : নূতন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি

শ্রীঅম্মাসাহেব সহস্রবুদ্ধে

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

[বিমোচনার ছু-দান যজ্ঞের প্রেরে সরকার-পক্ষ হইতে শ্রীআর. কে. পাটিল আশ্রয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, “কাছটা ভাল, আমরা উহাকে অতিমন্দির করি; তবে মুশকিল এই যে, জমি টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে, আর তার ফলে উৎপাদন কমিবে।” এই আশঙ্কা যে সঠিকই অমূলক তাহা ‘সর্বোদয়ের’ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত শীর্ষক লেখা হইতে স্পষ্ট সপ্রমাণ হইবে। কিছু দিন পূর্বে শ্রীঅম্মাসাহেব সহস্রবুদ্ধে জাপানের কুটির-শিল্প ও কৃষির সবিশেষ অব্যয়নের নিমিত্ত

ভাষ্য প্রিয়ান্বিলেন। তিন মাস কাল ব্যাপী নিরন্তর নিরীক্ষণ ও অব্যয়নের সার তিনি তিনটি লেখায় ‘সর্বোদয়ের’ পাঠকদের কাছে ধরিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ লেখাটি ঐ লেখামালার প্রথমটির অনুবাদ।

প্রসঙ্গক্রমে এডওয়ার্ড বিংহাম কৃত Rice পুস্তকের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। বিংহাম জাপানের কৃষিকে ‘hoe-farming’ বলিয়াছেন। লাকল-বলদ পর্যন্ত নয়, যজ্ঞের ব্যবহার শু দূরের কথা। যজ্ঞ ব্যবহারের অবসরও

সেখানে প্রায় নাই। পর্তুগিজ দেশ। পর্তুগিজ ভরে ভরে কাটিয়া (terraconig) ক্ষেত তৈরি করা হয়। অথচ জাপানের একর-প্রতি উৎপাদন আমাদের উৎপাদনের তিন গুণ। একথা গ্যামিং কমিশনের ত্রিযুক্ত পাটিলের না জানার কথা নয়। অবুও তিনি এই কাকাকতা তুলিয়াছেন, ইহা বিশ্বের বিষয়।]

১

যে দেশের সহিত আমাদের সমস্তাঙ্গের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় : আজ সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য লোকে পশ্চাত্য দেশের দিকে যায়। এই প্রবণতা এতটা বাড়িয়া গিয়াছে যে, কৃষিশিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যন্ত লোকে আমেরিকা যাইয়া থাকে। বর্ত্তমান পক্ষে আমাদের কৃষি-সমস্যা এক বস্তুর প্রকারের এবং দেশের অবস্থাও অভিন্ন। আমাদের সমস্তাঙ্গের সহিত যে দেশের সমস্তার মিল আছে এবং তাহা সত্ত্বেও যে দেশ প্রগতিশীল এরূপ দেশ হইতে আমাদের অবশ্যই কিছু শেখার আছে। চীন, জাপান ও ভারতের কৃষি-সমস্যা কতক পরিমাণে একই রূপ। ভারতের লোকসংখ্যা ৩৬ কোটি। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের এখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ একর। আমেরিকার ইহা অপেক্ষা বেশী। যন্ত্রের দিক হইতে আমরা পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এখানকার প্রায় ঘোল আমা চাষ-আবাদ মনুষ্য ও পশুশক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। পশ্চাত্য দেশের কৃষিতে যন্ত্রের সহায়তা লওয়া হয়। চীন ও জাপানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ আমাদের মতই হইবে।

জাপানে ‘কৃষি-কৃষি’ : প্রাচ্যের এই সব দেশে কৃষি-ব্যবসার পূর্ণ ব্যবসার মতো। কৃষির সহিত অপর কোন শিল্পের সংযোগ না করিলে চলে না। ভারতেও কৃষি পূর্ণ ব্যবসার মতো। জাপানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ এক-পঞ্চমাংশ একর। তথাকার সমগ্র জমির আধিভাগ জমির আবাদ কেবল মনুষ্য দ্বারা হইয়া থাকে। জাপানে ট্রাক্টর বা অস্ত্র যন্ত্রের ব্যবহার সাধারণতঃ করা হয় না। আজও তথাকার কৃষক ছোট ছোট কৃষি-যন্ত্র দিয়া চাষ-আবাদের কাজ করে।

আমাদের এখানকার মত জাপানেও পূর্বে এক প্রকারের জমিদারী-প্রথা ছিল। কিন্তু কম্যুনিস্টের কবল হইতে দেশকে বাঁচাইবার নিমিত্ত জেমারেল ম্যাকআর্থার একটি বড় বিপ্লবী সংস্কার সাধন করিয়াছেন—জমি পুনর্গঠন করিয়া দিয়াছেন। আজ জাপানের কোন এক ব্যক্তির তিন একরের বেশী জমি নাই। কিন্তু জমি এত কম হইলেও জাপানী কৃষকের জীবনযাত্রার মান আমাদের কৃষকদের অপেক্ষা বেশ বানিকটী উঁচু। বিনোবাকী পওনারে হস্ত সাহায্যে চাষ-আবাদ করার পরীক্ষা চালাইতেছেন। এই পদ্ধতিকে তিনি ‘কৃষি-বেতি’ নাম দিয়াছেন। জাপানের বেতিও এই প্রকারের কৃষি-বেতি। কিন্তু জমি এত কম হইলেও উহা হইতেই সেখানকার কৃষক

নিজ পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা আয় করে। সাধারণতঃ আমাদের এখানকার কৃষকদের অপেক্ষা জাপানী কৃষক অনেক বেশী শ্রম করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কৃষির এবং বিধি সুব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের পুরাপুরি সহায়তা সকল কৃষকই পায়। কৃষক পরিশ্রমী ও অভিজ্ঞ, ইহাই তাহার ব্যক্তির মূল কারণ।

যেখানে কেবল আর্থিক বিচার মাত্রই সম্ভব : জাপানে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ জন। যেতি কয় বসিয়া লোকে যেতির সহিত অপর শিল্পের সংযোগ করিয়া পূর্ণ কর্ম (full employment) বৃদ্ধি করিয়া লয়। এক দিক হইতে জাপানের প্রকৃতি তথাকার লোকদের পক্ষে কতকটা অসুস্থ, আর এক দিক হইতে দেখিলে মনে হইবে যে প্রকৃতি তথাকার লোকের বাঁচিয়া থাকার অভিলাষকে প্রতি মুহূর্ত্তে ‘চ্যালেঞ্জ’ (চ্যুতৌতি) দিতেছে। আমাদের দেশের তুলনায় জাপান ঠাণ্ডা দেশ। আবহাওয়া ভাল, আর লোকের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। লোকে দীর্ঘ সময় পরিশ্রম করিতে পারে; ক্লান্তি বোধ হয় না। জাপান শিল্পের ক্ষেত্রে পর্যন্ত ইংলও-আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম, অথচ না আছে তথাকার কাঁচামাল, না আছে জীবনের কোন দিশ্চিন্তা হারিষ। কৃষিক্ষেত্রের তরুণ অল্পকণ রহিয়াছেই। কলে তথাকার লোকদের সংস্কৃতির উপর উহার ছাপ পড়িয়াছে। কোন জিনিষ দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে ইহা ভাবিয়া তাহারা কোন কাজই করে না। তাহারা শুধু বর্ত্তমান কালের জীব, একথা বলা চলে। শিক্ষার দিক হইতে জাপানের মান সর্বোচ্চে। সেখানে এক শতকে এক শ’ জনই লেখাপড়া জানে। মনর বর্ষ পর্যন্ত বালক-বালিকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শেষের তিন বৎসর তাহাদিগকে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবক বিচার-বিবেচনা করিয়া কারিগরি পাঠ্যের বিষয় নির্ণয় করিয়া থাকেন। কোন কাজই ওখানে হিসাব না করিয়া উদ্বেগহীনভাবে করা হয় না। অভিভাবক হিসাব করিয়া দেখিয়া লয়, নিজ সন্তানদের মধ্যে কয়জনের কৃষিতে, আর কয়জনের গৃহ-ক্যাস্ট্রীতে পূর্ণাঙ্গ কাজ মিলিবে। সেই সব সন্তানকে সেই সেই শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশিষ্টদের জন্য অভিভাবক ও শিক্ষক কোম-না-কোম ব্যবসার সুবিধা বাহির করেন। স্থানীয় কসলের কথা বিবেচনা করিয়াও শিক্ষার যথোচিত পরিবর্তন করা হইয়া থাকে। এক স্থানে আমি গিয়া-ছিলাম। সেখানে স্কুলে ‘ক্যানিং’ শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। টিনের কোটার কল তরিয়া রাখাকে ক্যানিং কহে। ঐ সময়ে স্কুলের শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, “এখন এখানে কমলালেবুর বাগান নুরু হইয়াছে। এখন কোনরূপ

প্রতিবোধিতা নাই, মালের দাম বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু কলম যখন বাড়িতে তখন এতটা চাহিদা এখানে থাকিবে না। অতএব প্রতিবোধিতার দর কমিয়া যাইবে, চাষীর লোকসান হইবে। তাই এখন হইতেই বালকবালিকাদের ক্যানিং-এর শিক্ষা দিতেছি, যাহাতে ক্রমক্রমে যত্নে যত্নে ইহা একটি বড় শিল্পরূপে গড়িয়া উঠে এবং নিজেকে মধ্য প্রতিবোধিতার বলে অধিক কল বাহিরে রপ্তানি করা যায়। এই প্রকার হুদুদীর সঙ্গে জাপানীদের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দৈনিক পরিষ্কারি কণা চিন্তা না করিয়া ওদেশে উপর হইতে নীচ পর্যন্ত আমাদের এখানকার মত একই হাঁচে শিক্ষা দেওয়া হয় না। গান্ধীজী বলিতেন যে, যে শিক্ষা প্রয়োজন পূরণে লক্ষ্য তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জাপানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

আবর্জনা-জঙ্গাল হইতেও রহঃ জাপানে যেমন অস্বচ্ছ কু-কম্পের ভয়, তেমনি অত এক দিক হইতেও প্রতি তাহার উপর বিরূপ। শিল্পের জন্ম তাহার যে কাঁচামাল আবর্তক তাহা সেখানে উৎপন্ন হয় না বলিলেই চলে। বাতুর খনি সেখানে নাই, কাঁচামাল উৎপাদনের মত আবর্তক কমিও নাই। জাপানের প্রায় সব শিল্পের জন্মই বাহির হইতে কাঁচামাল আমদানী করিতে হয়। তাহাদের মনোবৃত্তি উহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। অন্যদেয় হইতে অধিক মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে হয়, আর পণ্য অন্য সকল দেশের সহিত প্রতিবোধিতার বিদেশে বিক্রয় করিতে হয়। তাই ভাল জিনিষ সস্তা দামে দিতে হয়। কলে সব জিনিষেরই উৎপাদনে তাহারা দক্ষ বনিয়া গিয়াছে। আরও ভাল ক্রিভাবে করা যায়, সকল ক্ষেত্রে সেমিকেই তাহাদের দৃষ্টি। প্রত্যেকেরই ভাবনা, আমার কাজ এই নির্দিষ্ট ভয়ের হওয়া চাই। সেই ভয় পর্যন্ত যদি কেহ পৌছিতে না পারে ত তাহার হুঃখের সীমা থাকে না। প্রাপণ করিয়া সে মৈপুণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করে। তাহাতে সাকল্য না মিলিলে সে অপর কোন হাভের কাছে মৈপুণ্য লাভ করিতে লাগিয়া যায়। নিয়ন্তর বহু করা সত্ত্বেও কার্যের নির্দিষ্ট ভরে পৌছিতে না পারিলে লোকে বেজার হারিকিরি করিয়া বসে এইরূপ উদাহরণও আছে। এই হেতু পৃথিবীর যে-কোন দেশের কারিগরদের অপেক্ষা জাপানের কারিগরেরা সমধিক নিপুণ। দ্বিতীয় পরিণাম এই হইয়াছে যে, লোকে কোন জিনিষকেই

নিরর্থক বাইতে দেয় না, প্রত্যেক জিনিষের পুরাপুরি সন্যবহার করিয়া থাকে।

এখানে আমরা হাতে-ভৈরি কাগজ প্রস্তুত করিতে মেকড়ার ব্যবহার করিয়া থাকি, একথা তুমিরা তাহাদের বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। তাহারা মেকড়াকে ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান মনে করে। মেকড়া পরিষ্কার করিয়া, দুনিয়া শতরঞ্জি ভৈরার করা হয়। জাপান অত দেশ হইতে সস্তার মেকড়া কিনিয়া থাকে। কার্পাস জাপানে ঘোটেই হয় না। কিন্তু কাপড়ের উৎপাদনে জাপান পৃথিবীর সকল দেশের অগ্রণী। আমদানী কার্পাস হইতে প্রথম এক কারখানার যতদূর সম্ভব হস্ত হস্ত প্রস্তুত করিয়া কাপড় বোনা হয়। ঐ প্রক্রিয়াতে বাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অপর এক কারখানার চলিয়া যায় এবং উহা হইতে সাধারণ কাপড় তৈরি হয়। এই ভাবে তিন-চার কারখানার ব্যবহারের পরে বাহা বাঁচে তাহা কাগজের কলে গিয়া পৌছে। ভাল কাগজ তৈরির পরে বাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বিতীয় এক কারখানার খেলো কাগজ তৈরির কাছে লাগে। দ্বিতীয় কারখানার অবশিষ্ট পদার্থ দ্বিতীয় এক কারখানার খেলনা প্রস্তুত হয়। এইরূপে প্রত্যেক জিনিষের পূর্ণ সন্যবহার তথ্য করা হয়।

আবর্জনা জমা করারও একটি বিশেষ রীতি আছে। বড় বড় শহরের আবর্জনা এক জারগার শু পীড়িত করার পরে শ্রেণী বিভাগ করা হয়। হাজার হাজার লোক উহা হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া পরস্পর রোজগার করে। জাপানীরা খুব সজাগ, সতর্ক। আমাদের এখানে লোকে আবর্জনা আঁতাকুড়ে যেমন-ভেমন ভাবে ফেলিয়া থাকে। জাপানে লোকে মিছ-গৃহের জঙ্গালগুলিকে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া গর্ভে কলে—লোহার টুকরা এক জারগার, কাঁচ-তালি আর এক স্থানে। আর কম্পোষ্ট তৈরির উপযোগী প্রাণিক অবশেষ তৃতীয় কোম স্থানে। আবর্জনাও তাহারা এইরূপ ব্যবস্থা পূর্বক মিক্কেপ করিয়া থাকে। রাস্তার বিভিন্ন উচ্চিষ্ট যে সব অংশ পড়িয়া থাকে, তাহা একত্র করিয়া, তাহা হইতে তামাক বাহির করিয়া পুত্রার বিড়ি তৈরি হয়। হরেক রকম জিনিষ হইতে খোল আনা লাভ ওয়াসিল করার প্রবৃত্তি জাপানের সর্বত্র আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। প্রকৃতির 'চ্যালেঞ্জ' বিবশ না হইয়া, তাহারা উন্টা উহাকে পুষ্কবার্ণের সাধন করিয়া লইয়াছে। জাপানের মত দক্ষ, উত্তমশীল, নিপুণ জাতি জনতে আর আছে কিনা সন্দেহ।

পশ্চিম স্তূপবনে আবিষ্কৃত কয়েকটি শৈবমূর্তি

শ্রীকালিদাস দত্ত

বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণে অবস্থিত স্তূপবন প্রদেশের বনমধ্য হইতে এবং বনহাসিলের পর উহার বিভিন্ন অংশে পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে ভূগর্ভ হইতে এনাগাং বহুসংখ্যক পুরাকীর্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শনের মধ্যে অনেক প্রস্তরনির্মিত হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি আছে। ইতিপূর্বে কতকগুলি ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রিকায় আমি উহাদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি।

এখনও সময় সময় এই প্রদেশের নানাস্থানে ঐরূপ প্রস্তরমূর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে প্রাপ্ত ঐ প্রকার কয়েকটি মূর্তির মধ্যে একটি শিবের অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধনারী (Androgynous) মূর্তি ও দুইটি শিবের বাহন বৃষ বা নন্দী মূর্তির পরিচয় আমি এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছি।

উক্ত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তিটি জয়নগর থানার অন্তর্গত বাঁটার গ্রামে শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্তের কাছারি-বাটির সন্নিকটে একটি পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া যায়। উহা এক খণ্ড কাল প্রস্তরের উপর খোদিত এবং উচ্চে প্রায় দুই ফুট। উহাতে দক্ষিণে শিবমূর্তির অর্দ্ধাংশ ও বামে পার্শ্বতীর মূর্তির অর্দ্ধাংশ দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রদর্শিত আছে। শিবের মস্তকে জটামুকুট ও তাঁহার দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে ত্রিশূল ও দক্ষিণাধঃ হস্তে অক্ষমালা এবং পার্শ্বতীর মস্তকে ঐরূপ মুকুট ও তাঁহার বামোর্দ্ধ হস্তে শূল ও বামাধঃ হস্তে ঘট আছে।

শিবের দক্ষিণপার্শ্বে গণেশ ও পার্শ্বতীর বাম পার্শ্বে কার্তিক পার্শ্বদেবতা রূপে দণ্ডায়মান। পাদপীঠের উপর পদ্মাসনের নীচে শিব ও পার্শ্বতীর বাহন বৃষ, সিংহ ও শিবের অশ্রুচর ভৃঙ্গ প্রভৃতি উপবিষ্ট। যে প্রস্তর খণ্ডটির উপর ঐ সমস্ত মূর্তি খোদিত তাহার উপরিভাগে কীর্তিমুখ ও তন্নিয়ে দুই পার্শ্বে মালাহস্তে উড্ডীয়মান দুইটি গন্ধর্ব্বমূর্তি এবং তাহারও নিম্নে দুইটি গজসিংহ মূর্তি আছে।

গঠনভঙ্গী ও সাজসজ্জার ধরণ হইতে ঐ মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় ষাটশতকের বঙ্গীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন বলিয়া জানা যায়।

শিবের এই জাতীয় মূর্তি দক্ষিণভারতে অনেক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তর ভারতে উহাদের সংখ্যা কম। এই প্রবন্ধে বর্ণিত মূর্তিটি ব্যতীত বাংলাদেশে আর একটিমাত্র ঐরূপ মূর্তি কিছুদিন পূর্বে ঢাকা জেলায় আবিষ্কৃত হয়। উহা এখন বরেন্দ্র অজুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত

আছে।^১ উহা কিন্তু একটি হাত-পা ছাড়া মূর্তি (sculpture in the round) এবং এই প্রবন্ধে বর্ণিত মূর্তিটির



অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি (বাঁটার)

মত প্রস্তরগাত্রে উদ্গত (in relief) নহে। ইহ

(1) Iconography of the Buddhist and Brahmarcal sculptures in the Dacca Museum, Bhattasa Plate LII.

অপেক্ষা আকারেও উহা অনেক বড় ও অধিকতর সুষমামণ্ডিত।

পুরাণমতে প্রজাসৃষ্টির জন্য আদিতে ব্রহ্মার মুখ হইতে এই প্রকার অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধনারী (Hermaphrodite) রূপেই শিব আবির্ভূত হন এবং ব্রহ্মার বাক্যে পুরুষ ও নারীর আকারে দ্বিধা বিভক্ত হন। কুর্শ পুরাণে উহা যেরূপে বিবৃত আছে তাহা এই :

“এবং সৃষ্ট। মরীচাদীন দেবদেবঃ পিতামহঃ।
সহৈব মানসৈঃ পুত্রৈশ্চতাপ পরমং তপঃ।
তইশ্চবং তপতো বজ্রাক্রমঃ কালাগ্নিসম্ভবঃ।
ত্রিশূলপাণিরীশানঃ প্রাহরাসীৎ ত্রিলোচনঃ।
অর্দ্ধনারীশ্বরবপুর্দ্বিপ্ৰেক্ষ্যাহতি ভয়ঙ্করঃ।
বিভজ্যজ্ঞানমিত্ত্বাক্ত্রা ব্রহ্মা চাত্তর্দধে ভয়ং।
তথোক্তোহসৌ দ্বিধা স্ত্রীং পুরুষং তথাকরোং॥” (১)

শিবপুরাণেও উক্ত মূর্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐরূপ একটি



নন্দীমূর্তি (মলগৌড়া)

কাহিনী আছে। এই প্রকার দেবমূর্তি নির্মাণ প্রসঙ্গে মৎস্তপুরাণকার বলিতেছেন :

“অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি অর্দ্ধনারীশ্বরং পরম্।
অর্দ্ধে দেবদেবস্ত নারীরূপম্ হুশোভিনম্।
ঈশার্দ্ধে তু জটাতাগো বালেন্দুকলয়া যুতঃ।
উমার্দ্ধে চাপি দাতবো সৌমন্ততিলকাবুভৌ।
বাহুর্দ্ধি দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেং।
বালিকা চোপরিষ্টাতু কপালং দক্ষিণে করে।
ত্রিশূলং বাপি কর্তব্যং দেবদেবস্ত শূলিনঃ।
বামতো দর্পণং দম্ভাঙ্গং পলঙ্গ বিশেষতঃ।
বামবাহুশ্চ কর্তব্যঃ কেয়ুর বলয়াদিতঃ।
উপবীতঞ্চ কর্তব্যং মণিমুক্তাময়ং তথা।
স্তনভারং তথার্দ্ধেতু বামে গীনং প্রকল্পয়েং।
পরমার্দ্ধবৃঙ্কলং কুর্খ্যাচ্ছেদ্যার্দ্ধে তু তথৈব চ॥

১ কুর্শ পুরাণ, ১১ অধ্যায়

লিঙ্গার্দ্ধবৃঙ্কলং কুর্খ্যাৎ বালাজিন কৃতাশ্বরম্।
বামে লম্বপরীধানং কটিস্থত্রয়াদিতম্।
নানারত্ন সমোশেতং দক্ষিণে ভূজগাদিতম্।
দেবস্ত দক্ষিণং পাদং পদ্মোপরি হুসংস্থিতম্।
কিঞ্চিদুর্দ্ধে তথা বামং ভূষিতং নৃপরেণতু।
রত্নৈঃ বিভূষিতাম্ কুর্খ্যাৎ দল্লীঘল্লীকান্।
সালঙ্ককং তথা পাদং পার্শ্বতো দর্শয়েৎ সদা।
অর্দ্ধনারীশ্বরস্তেদং রূপমাস্ত্রম্ দাক্ষতম্॥” ১

এই বর্ণনার সহিত উল্লিখিত মূর্তিটির সূক্ষ্মরূপে মিল না হইলেও মোটামুটি মিল আছে। প্রাচীন স্থপতিরী দেবমূর্তি নির্মাণের সময় শাস্ত্র বচন সম্মুখে ধরিয়া রাখিতেন না। তাহারা তাহাদের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত দেবমূর্তি বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান অল্পসারেই দেবতার মূর্তি নির্মাণ করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় সর্বত্র শাস্ত্র বচনের সহিত প্রাচীন মূর্তিগুলির সূক্ষ্মরূপে মিল দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্বোক্ত নন্দী বা বৃষের মূর্তি দুইটির মধ্যে একটি জয়নগর থানার অধীন ২২ নম্বর লটের অন্তর্গত শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য মহাশয়ের চকে ভূগর্ভ খননকালে পাওয়া যায়। ঐ মূর্তিটিও কাল পাথরের এবং উচ্চে প্রায় ১ ফুট। গঠন-পদ্ধতি হইতে উহাও খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে নির্মিত বলিয়া বোধ হয়।

অন্য বৃষ মূর্তিটি উহা অপেক্ষা আকারে ছোট। ঐ মূর্তিটি কুলপী থানার অধীন কাটাবেনিয়া গ্রামের সন্নিকটে একটি শিবের লিঙ্গমূর্তির সহিত আবিষ্কৃত হয়। প্রথম মূর্তিটি মজিলপুরে শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটিতে ও দ্বিতীয়টি কাটাবেনিয়া

গ্রামের অনতিদূরে একটি বৃক্ষতলে রক্ষিত হইয়া পূজিত হইতেছে।

মৎস্ত পুরাণমতে “ধর্মোহয়ং বৃষরূপেন নন্দী নাম গণাধিপঃ” ২। অর্থাৎ ধর্মই বৃষরূপে নন্দী নামে শিবের গণাধিপ হন। শাস্ত্রে শিবের মন্দিরে ঐরূপ বৃষ, শক্তির গৃহে সিংহ ও বিষ্ণুর আলয়ে গরুড়মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে উহা এইরূপ :

“দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষস্ত শঙ্করালয়ে।

গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদম্ভাৎ সাধকোত্তমঃ॥” ৩

এই প্রবন্ধে বর্ণিত অর্দ্ধনারীশ্বর ও বৃষভমূর্তি দুইটি ভিন্ন পশ্চিম স্তম্ভরবনের নানা স্থানে আরও অনেক শিবের

১ মৎস্ত পুরাণ, ২৬০ অধ্যায়

২ মৎস্ত পুরাণ, ৯৫ অধ্যায়

৩ মহানির্বাণ তন্ত্র, ১৩/১২

লিঙ্গমূর্তি ও অন্যান্যরূপ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রস্তরের নটরাজমূর্তি, একটি ধাতব চন্দ্রশেখর মূর্তি ও কয়েকটি প্রস্তরের ও ধাতব উমামহেশ্বর বা আলীঙ্গনমূর্তি উল্লেখযোগ্য। উহাদের সচিত্র পরিচয় আমি ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছি।^৩

দক্ষিণবঙ্গের সাগরতীরবর্তী ভূখণ্ডে যে অতীত যুগে শৈবসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল তাহা এই সকল প্রাচীন মূর্তির আবিষ্কার হইতে জানিতে পারা যায়। এখানে গঙ্গাসাগর সঙ্গমেও প্রাচীনকালে ত্রাঙ্কারামেশ্বর নামে একটি শিবের প্রসিদ্ধ লিঙ্গমূর্তি ছিল। স্কন্দপুরাণে কাশীর বিশ্বেশ্বর, প্রয়াগের ললিতেশ্বর, সৌরাষ্ট্রের সোমেশ্বর (সোমনাথ) প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত লিঙ্গমূর্তিগুলির সহিত উহার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা এই :

“কাষ্ঠাং বিশ্বেশ্বরং দেব প্রয়াগে ললিতেশ্বরং ।
ত্রিযথকাং ত্রাঙ্কাগিরৌ করৌ ভবেশ্বরং তথা ।
ত্রাঙ্কারামেশ্বরং লিঙ্গং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ।
সৌরাষ্ট্রে চ তথা লিঙ্গং সোমেশ্বরমিতিস্মৃতম্ ॥”^৪

পূর্বে সাগর ধীপে মগরা নামক স্থানের পরে সঙ্কত-মাধব নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। দুই একটি প্রাচীন বাংলা পুঁথিতেও সেখানে একটি সোনার মহেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন ঐ স্থানটির পরেই গঙ্গার সাগরসঙ্গম ক্ষেত্র অবস্থিত ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত তাঁহার বিখ্যাত চণ্ডীকাব্যে, শ্রীমন্ত সওদাগরের ভাগীরথী পথে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে ঐ সোনার মহেশ্বরের এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

“ঝড় বৃষ্টি দূর হইল চণ্ডীর কুপায় ।
তরী মেলি সদাগর শীঘ্র গতি যায় ।
ডানি বামে ছাড়ি যায় কত কত দেশ ।
সঙ্কত মাধবে দেখে সোনার মহেশ ।

(3) Varendra Research Society's Monographs No. 3 and 5. Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol. IX, 1941, pages 147-148.

৪ স্কন্দপুরাণ, মহেশ্বর খণ্ডে কেদার খণ্ড, ৭ অধ্যায় ।

সাগর সঙ্গম দেখি কাণ্ডারের রজ ।

কহে সাধু শ্রিয়পতি সাগর প্রসঙ্গ ॥”^১

এই প্রদেশে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে লিঙ্গমূর্তিটি আছে তাহা একটি গুপ্তযুগের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে



শিবলিঙ্গ ও নন্দী (কাঁটাবেনিয়া)

কয়েক বৎসর পূর্বে ১১৪ নম্বর লটে, গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। উহা এখন সেখানেই পূজিত হইতেছে। ঐ মূর্তিটি বালি পাথরের, আকারে ছোট এবং গৌরীপট্ট বিহীন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে গুপ্তরাজ্যকালের যে সকল লিঙ্গমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলির সহিত উহার আকারের খুব বেশী সাদৃশ্য আছে।

১ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সংস্করণ, শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার বিবরণ ।



রবীন্দ্রকাব্যে ছন্দোমুক্তি

ত্রিযুগ বাগচী

আগে কাব্য বিনা গীত ছিল না, আর গীত বিনা ছিল না ছন্দ। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলের মত বড় বড় কাব্য আসরে গান করা হ'ত, আর স্বর করে পড়াও হ'ত। কিন্তু ছন্দকে স্বরে ফেলার একটা মন্ত অস্ববিধা এই যে, শব্দের নিজস্ব ওজন তাতে অনেক সময় হারিয়ে যায়।

ভাষা, ভাব আর ছন্দ—এই তিনের সমন্বয়ে কাব্য গড়ে ওঠে। কাব্যের জন্মবৃত্তান্ত খোঁজ নিলে দেখা যায়, আবেগের সঙ্গে ছন্দের সংমিশ্রণেই কাব্যের সৃষ্টি। ভাষা তার প্রকাশভঙ্গীর অঙ্গমাত্র। এদের মধ্যে অগ্রজের আসন দাবি করে ছন্দ। এখানে একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়। সমস্যাটা হচ্ছে, আবেগ আর ছন্দের সম্বন্ধে। আবেগ আর বেগ বিষমার্থবাচক—আবেগের মধ্যে বেগের চেয়ে বিরামই বেশী; অর্থাৎ মুখর আবেগ উর্দ্ধ্বাশে দৌড়ায় না, চলে বিরতিবহুল গতিতে। ধ্বনি ও বতির সুব্যবস্থিত নজ্রাই হচ্ছে ছন্দ। এখন ছন্দের এই সংজ্ঞাই যদি সমীচীন বলে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে গল্প-গল্পের সীমারেখা স্পষ্টতর হয়ে আসবে। শেষে হয়ত হার্বার্ট স্পেন্সরের মতে মত দিয়ে বলতে হবে—মুদ্রাকরের মজির উপরই নির্ভর করে গল্প-গল্প রচনারীতির তারতম্য।

স্পেন্সরের এই মত আপাতদৃষ্টিতে অতিরঞ্জিত মনে হলেও সমর্থনযোগ্য। সাহিত্য-রসিকদের এ অভিজ্ঞতা হয়তো আছে—এমন অনেক গল্প-রচনার সাক্ষাৎ মেলে, যা বক্তিবিবেচনার পাহারা এড়িয়ে একেবারে তাঁদের অন্তরের দ্বারে ঘা দেয়, তখন কাব্য থেকে আলাদা করে তাদের যেন আর চেনাই যায় না। আবার কবিতার ক্ষেত্রেও, এমন কবিতাও প্রায়ই দেখা যায়—ছন্দ-মিল-উপমা-অনুপ্রাসের প্রাচুর্য সত্ত্বেও যাকে রুঢ় গল্পের প্রতিভূ বলেই মনে হয়।

যাহোক এই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে ধরে নিলাম, ছন্দ আর আবেগ যমজ—তাদের টান নাড়ীর টান। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ছন্দ আর মিল এক জিনিষ নয়। মিল কাব্যের অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের অলঙ্কার, ছন্দ অনাদি। আর আধুনিক কালে মিলকে বলা যায় অনেকটা গাণিতিক ছন্দ। আলঙ্কারিকের প্রাণয় পেয়েই আজও সে গদি আঁকড়ে বসে আছে। সংস্কৃত-কবিতা এই বিজ্ঞাটাকে খুব ভাল ভাবে আয়ত্তে এনেছিলেন।

“শগিরং যদি জীবিতাপহা
ক্বরে কিং নিহিতা ন হস্তি মাম্,
বিষমপাশতং কচিদ্ ভবেৎ
অমৃতং বা বিষমীশ্বেরচ্ছয়া।”

অজবিল্যপের এই শ্লোকটি শোকের সঙ্গে কোন সংশ্রব না রেখেও পাঠক-মনে বিষাদের একটা করুণ মূর্তি ফুটিয়ে তোলে; কিন্তু ছন্দের স্বর মিলিয়ে গেলেই বোঝা যায়, আবেগের স্বসমুখ ধারা শুকিয়ে এসেছিল বলেই কালিদাস সুন্দরীর শরণ নিয়েছিলেন। কাব্যের ভাষা যেমন অকৃত্রিম-তার কর্তৃস্বর, কাব্যের ছন্দ তেমনি অকৃত্রিমতার পদধ্বনি।

তাই বলব আবেগ আর ছন্দের মিতালি অনাবশ্যক। আসলে আবেগকে আপনার ছন্দ খুঁজে নিতে দেওয়াই উচিত। ছন্দমাত্রেরি যেকালে আবেগের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে, তখন অতিমাত্রিক আবেগের চলনে ছন্দ বাঁধন ছিঁড়তে পারে। আবেগও আবার উপযুক্ত আধারের অধেষণে এমন ছন্দে পৌঁছতে পারে যার সঙ্গে ছান্দসিকের কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি কাব্যের মূল শক্তিই হ'ল ছন্দ। এখানে গদ্য-পদ্যের স্বাধিকারের তর্ক উঠলেও বোধ করি, ধীমান ব্যক্তি উভয়ের অভিন্নতা স্বীকার করবেন। কারণ গদ্য-পদ্যের স্বকীয় মূলধন একত্র করে যে যৌথ ব্যবসায়ের উৎপত্তি তাকেই আমরা কাব্য বলি। আর আমাদের কাছে এই কাব্যই হচ্ছে সকল বস্তুর অতি নিশ্চিত উপলব্ধির উৎস। কাব্যের মূল লক্ষ্য রস-সৃষ্টি, এবং এর সাক্ষ্যেই তার সার্থকতা বিচার্য। এই রস-সৃষ্টিও হবে জীবননিষ্ঠ। গদ্য ও পদ্যের স্বভাব যদি সত্যি বিভিন্নধর্মী হয়, তবে বিস্তৃত গদ্য অথবা বিস্তৃত পদ্য দিয়ে কোনমতেই জীবননিষ্ঠ কাব্য গড়া যেতে পারে না। গদ্য-পদ্যের এই ধাতুসঙ্করকেই বলা হয় ছন্দোমুক্তি বা ‘free verse’।

ছন্দের সার্থকতা কোথায়, তার উপযোগী স্থানই বা কোথায়—রবীন্দ্রনাথ সে কথা পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বস্তাকরে এই ছন্দের জৌলুস সবপ্রথমই চোখে এসে লাগে—সে কি গানে, কি কবিতায়, কি নাটকে, কি গদ্য-প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

“কাব্যের মূল শক্তিই হ'ল ছন্দ। ছন্দ তার সেই শক্তি, শতাব্দীর পর শতাব্দীর জুড়ুকুটিল কটাক থেকে তাকে বাঁচায়। ছন্দে বেঁধে

দলে তাই কবির কথাটি ফুরিয়েও ফুরায় না; যে-কথা অতি সাধারণ
একটা গুণের মাত্র, তা হয়ে ওঠে বাণী। ছন্দ জিনিষটা মূলত হচ্ছে গতি,
সেইটেই বিশেষ ভাবে ভেবে দেখবার। বাক্য তার অর্থের দ্বারা বাইরের
টিনাকে স্বাক্ষর করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।”

তারপর উদাহরণ দেখিয়ে বলেছেন :

“শ্রামের নাম রাখা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে
একটা অদৃশ্য বেগ জমাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটা হ’ল
চাই। সেইজন্য কবি ছন্দের বন্ধনের মধ্যে এই কথাটাকে ছলিয়ে
দিয়েছেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে, ততক্ষণ এই দোলা থামবে না। ‘সই,
কে-বা শুনাইল শ্রাম নাম।’ কেবলি চেষ্টা উঠতে লাগল।...ওদের
অন্তরের স্পন্দন আর কোনদিনই শান্ত হবার নয়।”

রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন হ’ল;
শাস্ত্রাজ্য ভাঙল, গড়ল—যুদ্ধের অঙ্ককারে পৃথিবীর শ্রামল
মুখশ্রী ঢাকা পড়ল। এল দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, কত নব নব চিন্তা,
কত যুগান্তকারী দর্শন-বিজ্ঞান—কিন্তু এত সব তোলপাড়
ওলট-পালট করেও, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও ‘সই, কে-বা
শুনাইল শ্রাম নাম’ এই চেষ্টা ঠাট্টা থামল না।

ছন্দের আসল কৃতিত্ব এইখানেই। এই কারণেই
‘হামলেট’, ‘কিং লিয়ার’ আজও ‘লুক্রেশিয়া’ ‘প্যাশনেট
প্লেগ্‌রিম’-এর সঙ্গেই এক আসনে আসীন। এলিজাবেথীয়
যুগের বিলুপ্তির পরও তারা অপাঙ্কজ হয়ে পড়ে নি।
প্রথমোক্তগুলি নাটক, শেষোক্তগুলি কবিতা—কিন্তু ছন্দো-
মুক্ত বলে উভয়ই কালাতীত।

রবীন্দ্রকাব্যে এই ছন্দের পরিচরমাণ বিশেষ ভাবে উল্লেখ-
যোগ্য। ভাব ও রসের সহযোগিতায় তাঁর কাব্যে ছন্দ
এক স্তর থেকে আর এক স্তর ভেদ করে পাখা মেলে দেয়।
পাঠক-মনে তার গত্যাত স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ।

এক বিশিষ্ট মর্যাদায় ছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করলেন রবীন্দ্র-
নাথ। রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন যে, প্রত্যেক শব্দকে
তার স্বাভাবিক মূল্য দিলে বাংলা ছন্দ অসংখ্য বিস্ময়কর
নূতন সম্ভাবনায় ভরে ওঠে। নিজের সুদীর্ঘ কবি-জীবনে
রবীন্দ্রনাথ এ সম্ভাবনাকে যে কত দিকে, কত ভাবে ছড়িয়ে
দিয়েছেন, রবীন্দ্রকাব্যের বার আংশিক পাত্রচয়ও আছে সেই
তা জানে।

প্রাক-বৈবিক যুগে ছন্দ ছিল প্রায় নিয়মের অঙ্ককূপে
বন্দী। ‘আট-ছয়-আট-ছয়’ এই ছিল পয়ারের চাল।
পর্বাংশের মধ্যে যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, সেইটুকুই ছিল
পয়ারের সর্বস্ব। মাইকেল এসে তার বাঁধন আলগা করে
দিলেন, যেখানে সেখানে যতি ফেলে পয়ারের চৌদ্দ অঙ্কের
পংক্তিকে তিন টুকরা করে দিলেন। পদ্যের সমস্ত পংক্তিতে
ন্যূনতম পর্বাংশগুলির মধ্যেও যে কত বৈচিত্র্য আনা যায়,
সেদিকে মাইকেল নজর দিলেন না। ফলে বাংলা কবিতায়
চালের নূতনত্ব এসে, কিন্তু চলন বদলাল না।

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছন্দ নূতন চালে চলতে
শিখল। সে আর আগেকার ঢিমে তেতলা চলনই
আঁকড়ে রইল না। বাংলা ছন্দে এল দুই-তিন-
চার-পাঁচ-ছয়-সাত মাত্রার চলন। রবীন্দ্রনাথ লঘু-গুরু
স্বরের ভেদে ছন্দে এক নূতন পথ দেখিয়ে দিলেন।
রবীন্দ্রনাথ নাকি প্রথম চৌধুরীকে বলেছিলেন, পৃথিবীর
যে কোন ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করা যায়। এ যে
কত বড় সত্য তা তিনি নিজেকে এলিফট বদলেয়ারের
কবিতা অনুবাদ করে দেখিয়ে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ
কালিদাসের মন্দাকিনী ছন্দকে অবিকৃত রেখে বাংলায়
অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন :

পিলল বিহ্বল বাধিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও ;

সন্ধ্যার তল্লায় যুরতি ধরি আজ মল্লমহর বচন কও।

নুর্ধোর পিলল নয়নে তুসি মেঘ, দাঁও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম

বুষ্টির চুখন বিখারি চলে যাও, অঙ্গে হর্ষের পড়ক ধুম।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে সর্বদাই এগিয়ে চলেছেন—

ছন্দের দিক থেকেও তাঁর দান তাই অভিনব। তিনি
আমাদের দিয়েছেন সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা ; দিয়েছেন
বলাকা, যেখানে পংক্তির নির্দিষ্টতার শাসন ভেঙে ছন্দ
ভাবপ্রবাহের সঙ্গে ছুটে চলেছে। আর দিয়েছেন পলাতকা
যেখানে সেই অসম পংক্তির কাহিনীর ছন্দ কখনও দ্রুত-
গতির তালে কখনও টিলে হয়ে একাক্স হয়ে গেছে।
রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ছড়ার ছন্দের
নূতন রূপ, পেয়েছি ‘লিপিকা’ ‘পুনশ্চ’।

হারজিৎ

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

বুক্‌র কনেনবো-পুতুলটি সম্প্রতি অকর্ষণ্য হয়ে পড়েছে। অবশ্য দোষটা সম্পূর্ণ পুতুলটার নয়। তার এই অকর্ষণ্যতার পিছনে বার্কক্যোচিত জড়তা বা যোগ্য্যাবিবশতঃ অক্ষমতা নেই, আছে নিভাঙ্ক একটা আকস্মিক ঘটনা। বুক্‌র এক দিন বর-কনে পুতুলদ্বয়ের বিয়ের দিনে কনেকে বিশেষ নতুন বরণে সাজাতে গিয়ে এই বিপর্যয় ঘটয়েছে। তার দিদিরা যে বরণে শাড়ী পরে, বুক্‌র ইচ্ছা জেগেছিল প্রতিদিনকার একঘেয়েমি বাদ দিয়ে ঠিক সেই ভাবে পুতুলকে শাড়ী পরায়। কিন্তু হাজার রকম করে পরীক্ষা করেও, যথা—কনেকে পাশ ফিরিয়ে, চিৎ করিয়ে, পা উণ্ড করে ইত্যাদি কোন প্রকারেই শাড়ীটা ঠিক দিদির মত জুতসই মানাল না। বরঞ্চ এক অসতর্ক মুহুর্তে এই জিম্ভাষ্টিকসিদ্ধা কনেটি তার হাত কসকে পড়ে গিয়ে বাঁ পা'টা হারিয়ে বসে। মাঝে অবশ্য বুক্‌র সেই রকমই কৈফিয়ত দিয়েছে, কিন্তু আমাদের খুবই সন্দেহ হয় যে মাত্র এক হাত উপর থেকে পড়ে গিয়ে ভাঙবার মত নয় পা পুতুলটির ছিল না, এ নিশ্চয়ই জুদা বুক্‌র নিজের অকৃতকার্যতার প্রতিশোধ পুতুলটির উপর তোলা।

যাই হোক বুক্‌র এখন বিশেষ অহুতপ্ত ও দুঃখিত। তার বিপত্নীক বর-পুতুলটির শোচনীয় দ্রববস্থার কথা নিজের শোকোদ্ধাপক ভাষায় ও ভঙ্গিতে বর্ণনা করে বুক্‌র ইতিমধ্যে বাড়ীর প্রায় সকলের কাছ থেকেই কিছু না কিছু আদায় করেছে—বরের জন্ত নতুন কনে আমদানী করতে হবে। বাবা এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দিয়েছেন, আট আনা—বোধ হয় তিনি বিপত্নীকত্বের দুর্দশা কতকটা অহুতব করতে পারেন। যা দিয়েছেন মোটে দুই আনা—বর-পুতুলটার কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে হয়তো বেশী দিতেন। অবশিষ্ট দাদা দিদিরাও দিয়েছে হু'পরশা এক পরশা করে। এই রকম করে তার ছোট টিনের বাজ্রে অর্থাৎ বুক্‌র নিজের তহবিলে জমা হ'ল প্রায় সাড়ে বারো আনা। পরশাগুলো টিনের বাজ্রে বাজাতে বাজাতে বুক্‌র মনে আঘোদ জাগে। কেমন ভিড়ে গেছি। বোকা পুতুলটাকে দিয়েছি আছড়ে ভেঙে। কেউ বকল না ত, বরঞ্চ কাল সকালেই নতুন পুতুল আমব, নতুন শাড়ী পরাব—ইত্যাদি বুক্‌রজানোচিত কত দুর্লভ কল্পনা ও হবি তার মনে ভেসে আসে।

রবিবার সকালে সে দাদার সঙ্গে বাজারে গিয়ে নিজের পছন্দমত রঙচঙে—সম্পূর্ণ নতুন প্যাটার্নের একটা পুতুল কিনে আনল—মাটির নয় সেলুলয়েডের। সে অবশ্য মাটিরই কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু তার দাদা সমীর মত প্রকাশ করেছিল

যে, মাটির পুতুল নাকি 'জাষ্টি', সেলুলয়েড অনেক ভাল। বুক্‌র কী প্রতিবাদ করতে সমীর ভাড়াভাড়ি তাকে একটা বড় পুতুলের দোকানে নিয়ে গেল। বুক্‌র চোখ ত ঝলসে যাবার জোগাড়। এত পুতুল! এত রকমারি! এ যেম সম্পূর্ণ নতুন জগৎ। বুক্‌র ধারণা এক মুহুর্তে বদলে গেল। সে দেখল তার নিজের পুতুলের মত ধারাপ পুতুল দোকানে একটিও নেই। সব বক্বকে ভক্বকে ফিটকাট। বুক্‌র প্রবুজ আগ্রহে নিজের তহবিলের ওজন আন্দাজ না করেই একটা ভাল সেলুলয়েডের পুতুল তুলে নিলে, বললে—“এইটে নিই দাদা?” দাদা একটু বেশী পড়ল। বুক্‌র নিজের সমস্ত সঞ্চয়টা সমর্পণ করে দিলে। বাকীটা সমীর নিজের টক্কিন-সঞ্চিত পরশা থেকে পূরণ করে দিয়ে দাদার পদোচিত মর্যাদা বজায় রাখল।

বুক্‌র লাকাতে লাকাতে বাড়ী ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে তার জিনিষ দেখিয়ে বেড়াতে লাগল এবং সন্ত-ক্ৰীত পুতুলটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করতে লাগল। “মাটির নয় জেনে রেবো, এ হ'ল বাঁটা 'সেলুডের'। মাটির পুতুলগুলো কেমন বোকা-বোকা লাগে দেখ নি। আর এটা দেখ কেমন সুন্দর ফকসুত পরা রয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে, না?”—এই বলেই মতামতের জন্ত অপেক্ষা মাত্র না করে আর একজনের কাছে ছুটে যাচ্ছে। যেখানে নিজের খাস একেবারে নিশ্চিত সেখানে পরের মতামত সম্বন্ধে অগ্রহ থাকে কৈ?

এইভাবে বাড়ীর সবার দেখা হলে সে সারাদিন বরে পুতুলটাকে পাড়ার পরিচিত অপরিচিত সবাইকে দেখিয়ে শুনিবে যেম 'প্রসেশন' সেরে বিজয়িনীর মত বাড়ী ঢুকল। নতুন পুতুল তার মান রেখেছে। শিশুমহলে সবাই তার অপরিমিত প্রশংসা করেছে। বড়রা অবশ্য বিশেষ মতামতের দাবি দিয়েই যায় নি। তবে পুতুলের তারা বোঝেই বা কি? তাদের ঊদাসীন্ত বুক্‌র এতটুকুও বাবড়ার না। যারা সত্যিকার রসিক, বুক্‌র তাদের সবার উপর টেকা দিয়েছে। এমন পুতুল ছ' ছ' ইত্যাদি।

রবিবার সন্ধ্যাবেলা। সুত্তরাং পড়াশোনার বালাই নেই। বুক্‌র বেশ কষ্টচিন্তে বসে গেছে পুতুল সাজাতে। সে নতুন পুতুলটাকে প্রথমে যথাস্থানে অর্থাৎ পুরোনোটির স্থানে অভিযুক্ত করলে। পুরনো পুতুলটির শাড়ী, জামা, পুঁতির মালা, আংটি, চুড়ি ইত্যাদি সমস্ত একে একে আত্মসাৎ করে

সে মবাগভার অঙ্গে জড়তে লাগল। চোখে মুখে তার হুটী উহলে পড়ছে। ঘেন কত বড় রাজ্য জয় করে ফিরেছে—এই ভাব।

হঠাৎ এই সাজসজ্জার মাঝখানে কি একটা খুজতে গিয়ে তার হাত ঠেকল একখানা ভাঙা মাটির পাত্রে। বুহু সেটা তুলে দেখল সেটা তার পুরনো পুতুলটির ভাঙা পা-খানি। তার কিয়দূরেই নিতান্ত যুয়ুভাবে শায়িতা সেই বোকা কনে-পুতুলটি—জিমতান্তিক করিয়েও যাকে শাভী পরান্ডে পারা যায় নি। এমন কত পুতুল শু ভেঙেই থাকে—অতি সামান্য ঘটনা। কিন্তু এত দিনের সঙ্গিনী, বুহুর কত সুখে দুখে সমব্যথী সেই অতিপরিচিত পুতুলটিকে আজ বুহুর এই চরম বিজয়-মুহুর্তে এমন অসহায়ভাবে পরাজয়ের প্রতিমূর্তির মত পড়ে থাকতে দেখে বুহুর সহসা অক্ষুট বেদনাবোধ জেগে উঠল। বেদনাবোধ থেকেই হয়তো মনের গহনে শুরু হয় অতীত স্মৃতির আনাগোনা। বুহুরও অতীত আছে, স্মৃতির উপর অধিকার তারও আছে। স্মৃতি নিয়ে কারবার কিন্তু তার এই প্রথম। এর আগে বেদনা সে অনেকই হয়তো পেয়েছে, কিন্তু যে ধরনের গভীর বেদনায় স্মৃতির ভলদেশ পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে তা বুঝি এই প্রথম ঘটল। আজ সে পরিপূর্ণ ভাবে বিজয়িনী। বাড়ীর সকলে, পাড়ার সকলে তার পছন্দের তারিক করেছে। তার পুতুলের সৌন্দর্য্য নিঃসংশয় সকলের দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু তার সবচেয়ে পরিচিত বহুটিও আজ তার জয়ের সমারোহে যোগদান করতে পারল না। বুহুর এই ছোট জীবনে দুর্গতি ক্রম ঘটে নি। নানা কারণে দাদার কানমলা, মার বহুনি, বাবার বহু বিচিত্র শাস্তি সহ করে যখন এই পুতুল ছুটি নিয়ে বসন্ত তখন কোথায় যেত ওই সব শান্তিলাভের বেদনা ও গ্লানি। পুতুলের জগতে প্রবেশ করে মনে জাগত অনাবিল আনন্দ, পুতুল ছুটি যেন পরমাত্মীর মত সব ভিজ্ঞতা ও বেদনা মুছিয়ে নিয়ে যেত। ছুটির দিনে, উল্লাসের দিনেও আবার সে এই পুতুলের সাহচর্য্যেই সবচেয়ে নিবিড় আনন্দলাভ করেছে। বিশেষ করে এই কনে-পুতুলটির প্রতিই তার আসক্তি ছিল সম্বিক, কারণ তাকে সাজানো গুহানোর মধ্যে দিয়ে বুহুর নিজস্ব চিন্তাধারা ও জগৎ সংস্কারগুলো যেন রূপান্তরিত হ'ত। বর-পুতুলকে সে সাজাত তার জানাশোনা অভিজ্ঞতার সাহায্যে, কিন্তু কনেকে সাজাত তার সহজাত অপরিণত প্রযুক্তির বর্ণপ্রলেপ দিয়ে। সেই প্রিয় সঙ্গিনীকে সে আজ ভাঙিয়েছে পা ভেঙ্গে দিয়ে, অকর্মণ্যভার মিথ্যা অপরাধ তার ঘাড়ে চাপিয়ে। কারণ ঘোষত বুহুর, পা ত সে-ই ভেঙেছে। তার ভাঙা পা নিয়ে সে আজ তাই পিছনেই পড়ে রইল, বুহুর বিজয়-অভিযানে এই প্রথম সে অভিমন্দন জানাতে আসতে পারল না। বুহু এককণে যেন তার ভাঙা

পুতুলের এই না-পারার মর্মবেদনা অনুভব করতে পারল। তার ঔৎসুক্যচঞ্চল হাত পা ও মনের গতি যেন কিসের মন্ত্রবলে শুক হয়ে রইল, বিজয়িনীর ইজিয়গুলি যেন পরাধিতা সঙ্গিনীর মুক ব্যাধার স্পর্শে নিজস্ব গতিবেগ হারিয়ে ফেলল। বুহু সন্নেহে পুতুল ও তার ভাঙা পা'টি উঠিয়ে নিলে। মবাগভার অপকূপ সাজসজ্জা অসমাপ্তই রইল। একমনে বুহু ভাঙা পা'টি যথাযানে স্থাপন করে পরীক্ষা করতে লাগল সত্যিই আবার ছোড়া লাগানো যায় কি না। একখানা মাটির পা স্বীয় স্থানচ্যুত হয়ে আজ তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জয়ের সমস্ত উদ্যমনাকে ব্যর্থ করে দিল।

“কিরে কতদূর সাজানো হ'ল দেখি?” পাশের বাড়ীর টুহু ঘোড়ে এসে প্রায় তার ঘাড়ে ঝাপিয়ে পড়ল।

নতুন পুতুলটি তখনও অর্ধসজ্জিত খাপছাড়া অবস্থায় একধারে পড়ে আছে। বুহুর দুই হাতে পুরানো পুতুলটির ছুটি অংশ।

টুহুর প্রচণ্ড বিস্ময়। এমন কে মেয়ে আছে যে আজকারই কেনা নতুন পুতুলকে হাতছাড়া করতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে নতনের এই অভূতপূর্ব অনাদরে তার রাগও হ'ল, শাসনের ভঙ্গীতে বললে—

“তুই কি মেয়ে বল দেখি? নতুন স্কলর পুতুলটাকে ফেলে রেখেছিস যেন কার না কার জিনিষ, আর কি একটা বাজে জিনিষ নিয়ে সমস্ত কাটাছিস।”—‘বাজে’ জিনিষটা যে কি সে লক্ষ্যই করলে না।

বুহু ঘেন তার কথা শুনতেই পায় নি এমনি ভাইে চুপি চুপি টুহুকে প্রশ্ন করলে—“হ্যাঁ রে মাটি কিসে ছোড়া লাগে জানিস?”

টুহু একেবারে আকাশ থেকে পড়ে—“এর মধ্যে আবার মাটি কোথায় এসে রে। মাটি দিয়ে করবি কি শুনি?”

বুহুর চোখে অপ্রস্তুত চাহনি। সে ভাঙা পা সমেত নিজের ডানহাতখানাকে এই উদাত প্রশ্নের আঘাত হতে বাঁচবার ভঙ্গিতে আলোর আড়াল করে ফেলল।

টুহু বেশ আরাম করে বসে নতুন পুতুলটাকে নিয়ে সাজাতে লাগল। তার চোখে মুখে লুকা প্রশংসার চাহনি। নতনের পরিচর্যায় সে সম্পূর্ণ ব্যস্ত, শুধু মাঝখানে অল্পমনস্ক ভাবে একবার বললে—“তুই যে মাটি মাটি করে কৈন মাথা ঘামাচ্ছিস বুঝি না। এ তো খাঁটি ‘সেখুডে’র দেখতে পাস না? এর সঙ্গে আর মাটির কারবারই রইল না, বুঝলি?”

আশ্চর্য্য। এই সেলুলয়েড-ভক্ত বুহু নিজেই আজ সমস্ত পাড়ায় তার মূঢ় সঙ্গিনীদের কাছে প্রচার করে বেড়িয়েছে, ঘেন সেই একমাত্র এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কেউ একটা কথা বলতে এলে শিক্ষাদাতার ভঙ্গিতে বুহু তাকে দশ কথা শুনিয়ে বুঝিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এই মুহুর্তে এক টুকরো ভাঙা

বিবর্ণ মাটির তালের মধ্যে তার সমস্ত মনস্ক জ্ঞান কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল। সেলুলয়েড যে মাটি নয় সে জানে, কিন্তু এইটুকু জানার জোরেই প্রাচীন স্মৃতিশ্রুতির সন্ধানীকে নৃতনের জয়যাত্রার রথের চাকার তলার ছড়িয়ে শুঁড়িয়ে নিশ্চল করে ফেলতে পারা যায় কি না সে বিষয়ে বুকুর মনে সন্দেহ-বেদনার আলোড়ন-প্রাচুর্য।

চুইয় সাফানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সে পূর্ণসজ্জিত

পুতুলটাকে ঘুরিয়ে কিরিয়ে নিজের মনের মত ভাল করে দেখে নিলে। তারপরে বুকুর দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—কিরে এমন চূপচাপ বসে আছিস কেন? দ্যাখ দেখি পুতুলটাকে কেমন মানিয়েছে। একেই বলে ঘর-আলো-কল পুতুল, জানিস?

বুকু নিরুত্তরে বা হাতের অপরাংশটিও অতি সন্তর্পণে আলোর আড়ালে লুকিয়ে ফেলল।

সিদ্ধা জালন্দরনাথ ও রাজা গোপীচাঁদ

শ্রীশুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার

বাঁটি বাঙালী রাজা গোপীচাঁদকে বাঙালীরা বড় একটা চেমে না, একথা শুনিলে ভারতের অন্যান্য স্থানের অনেকেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়েন। জাঁহার বৈরাগ্যের কাহিনী বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গীত কাব্য ও উপন্যাসের উপাদান যোগাইয়াছে, ভারতের বিভিন্ন স্থানের রঙ্গালয়ে তাঁহার রাজ্য-ভ্যাগের অপূর্ণ আদর্শ অবলম্বনে রচিত দৃষ্টকাব্যের অভিনয় দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছে। রাজা গোপীচাঁদের পিতার নাম মাণিকচাঁদ এবং মাতার নাম ময়নামতী। ইঁহার কল্পনার স্রষ্টা নহেন, ভিন্ন জনই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মাণিকচন্দ্র রাজ্যের গান শিবের গীত নামে প্রসিদ্ধ। এই গীতে গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র গোপীচন্দ্র ও গোবিন (৪৭০ শ্রোকে) নামে বিখ্যাত। শ্রীমদ্রসন সাহেব বলিয়াছেন—রঙ্গপুর জেলার সদর মহকুমার নয় দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বর্ধ-পালের নগর। এই নগরের দুই মাইল পশ্চিমে মাণিকচন্দ্র রাজ্যের নগর ছিল। ঐ স্থানটি বর্তমানে মাণিকচন্দ্রের মহিষী ময়নামতীর নামানুসারে ময়নামতীর কোর্ট বলিয়া কথিত হইতেছে। গোবিন্দচন্দ্রের গীত হইতে জানা যায় যে, ময়নামতী বাল্যকালে মাণিকচাঁদ গোরক্ষনাথের নিকট যোগবিষয়ক জ্ঞান লাভ করেন। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনেক প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কুমিল্লার ময়নামতীর পাহাড়ে গোপীচাঁদের রাজধানী ছিল। তিনি বলেন—“মাণ-সাহিত্যে হাড়িপার (জালন্দর) শিখা যোলবদ বা যোলদন্ত বা মেহের কুলের রাজা সর্বভারতগীতকীর্তি গোপীচাঁদ এবং বঙ্গাল রাজ গোবিন্দচন্দ্রের অভিন্নতা সম্বন্ধে আর বড় সন্দেহ থাকে উচিত নহে।...গোপীচাঁদের রাজ্য যে মূলতঃ মেহেরকুল পাটিকার ছিল এই বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে উচিত নহে। কুমিল্লার পাঁচ মাইল পশ্চিমে লালমাই পাহাড়, তাহার উত্তরাংশের নাম ময়নামতীর টীলা।...ময়না-মতীর পশ্চিম দিকস্থ পরগণার নাম পাটিকার, সমস্ত পূর্বদিক

জুড়িয়া মেহেরকুল পরগণা”। (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস ৭০ পৃ.) গোপীচাঁদের মাতার নামানুসারে পাহাড়ের নাম ময়নামতী টীলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মাণিকচাঁদের যুড়ার পর রঙ্গপু হইতে ময়নামতীর টীলায় রাজধানী স্থানান্তরিত কর হইয়াছে।

গোপীচাঁদ ১১শ ১২শ খ্রীষ্টাব্দের লোক। সে সময় পরমাণু লাভের জন্ত রাজ্য ধনসম্পদ ছাড়িয়া অরণ্যাশ্রমে যাইবার প্র-রোজ্য ছিল। অবিখ্যাসীর দল ইঁহাকে জাতীয় জীবনে অবনতির নিদর্শন বলিতে পারেন, কিন্তু অধ্যাত্ম-সম্পদের জু বিষয়স্থল বিসর্জন দেওয়া ভারতের মাটিতে অভিনব কি নহে। গোপীচাঁদের জন্মের পর যোগবলে ময়নামতী জানি পারিলেন অষ্টাদশ বৎসরে তাঁহার পুত্র গোপীচাঁদ, গোপীচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের যুড় হইবে। তাহাতে তিনি অস্থির হই পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে গোপীচাঁদ অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। মাতা বুঝিলেন যোগবিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন পুত্রের বাঁচো নাই। তিনি পুত্রের স্নেহের জন্ত লালান্নিত, কিন্তু তাঁহাে বিলাসিতার বেদীমূলে বলি দিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি পুত্রের জীবনরক্ষার জন্ত আত্ম, কিন্তু স্বীয় বর্ধবিধান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। ময়নামতীর কার্য স্বাধীনতাব্যঞ্জক, বা তেজস্বিতাপূর্ণ এবং তিনি স্বয়ং তেজস্বিনী রমণী। তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে একমাত্র পুত্র গোপীচাঁদকে বর্ধাচরণে উদ্দেশ্যে দ্বাদশ বৎসরের জন্ত অরণ্যাশ্রমে প্রেরণ সম্ভব হই কি? রাজ্য স্তব্ব রাজসন্মান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া মাণিকচাঁদ জালন্দর বা হাড়িপা সিংহাসনে বসিয়া বন্যাশ্রমে যাইবার জন্ত নিজের একমাত্র পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

“মাস্তাজাল বিশম জাল জম রাজ্যর ধান।

গ্রিহেতে ১ থাকিলে বাছা জমে দিবে হানা।

* * *

হাফ বাহা রাজ্য পাঠ যুগে যাব হাই২।

মা'এ পুণ্ডে৩ মুগি হৈয়া চারিগুণ বেড়াই ॥”

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৩১ পৃ.) ১৪

“তন পুত্র গোপীচন্দ্র যুগে কর মন।

বরাঙ্গণ গ্যান৫ সাদ৬ মুগি হইবার ॥

বরাঙ্গণ গ্যান সাদিলে নাহিক মরণ।

জিহ্বা থাক৭-গোবিচাঁদ মাথে দেউক বর ॥”

(ভবানীদাসের মহনামতীর গান) ৮

পরমার্থের জন্ত বিষয় স্তববর্জন করার উপদেশ শুনিয়া
রাজা গোপীচাঁদ মাতা মহনামতীকে বলিতেছেন—

“আরের মা'এ বাটা৯ চাহে রাবিবারে বর১০।

তুমি মা'এ কহ মোরে মুগি হইবার ॥

আর মা'এ পুত দেখি জুগতাত বাণ৫১১।

নাতিপতি লইয়া ঘরে আনন্দে গৌরাএ ॥

তুমি মা'এ হিরাধানি১২ পাভারে ১৩ বলিয়া।

মিত্য প্রতি কহ মোরে যাইতে মুগি হইয়া ॥

মিত্য প্রতি কহ মোরে মুগি হইবার।

কোন জুগীর সহিত মা'ও কহ যাইবার ॥

হেন গ্যান পাইলে আকি মুগি হইয়া যাই ॥”

(মহনামতীর গান—ভবানীদাস)।

“এতক মুনিয়া রাজা কহে মা'এর ঠাঞি।

নিচ্চএ হইব মুগি মোনে১৪ কিছু নাঞি১৫ ॥

চারি রাণির আগে আমি বিদাএ হৈয়া আশি।

কালিকা বেহানে১৬ আমি হইব শতাজি১৭ ॥”

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৩১ পৃ.)

রাজা গোপীচাঁদ সন্ন্যাসমগ্নে দীক্ষিত হইয়া বনাঙ্গমে
যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন জানিয়া রাণীরা তাঁহাকে প্রতিমিত্ত
করার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু সফল কলিল
না। মাতার আদেশে তিনি নাথযোগী হাড়িপা বা জালন্দর-
মাথের নিকট সন্ন্যাসমগ্নে দীক্ষিত হইবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া
রাণীদিগকে বলিতেছেন—

“মায়ী দূর কর রাণি না বৈশ১৮ মোর কাছে।

নিচ্চএ হইব মুগি যাইব শত্যাশে ॥

এযুক১৯ সম্পদ মোর মোনে নাহি ভাএ।

চিন্তাবার্তা আছে মোর হাড়িপার পাএ২০ ॥

হাড়িপার চরণে আমার মোন আছে বার্তা।

রাজ্যপাট যারি পুরি শব মিথ্যাযাজা ॥”

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪২ পৃ.)

রাণীদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রাজমাতা মহনামতী—

“পুত্র মুগি করিবেন মএনামস্তি রাই ॥

নাপিত্ত আনিঞা রাজ্যর মন্তক হুড়িল।

গলে কেবা দিয়া যুগে ভুশদ চড়াইল ॥

বগলে বগলি২১ দিল শিনদাদ গলে।

রক্তচন্দনের কোটা পরাইল কপালে ॥

চকমকি পাথর দিল বটু২২ আর্কারি২৩।

ঘোর মেথিলি২৪ আর বোজশের বাপু২৫ ॥

গলাএ পরাইতে দিল উজ্জাকের২৬ মালা।

কটিতে পরাইতে দিল ছোপবস্ত্র ছাল২৭ ॥

কহুচ বিপ্রশম দিল শামশ দিল হাতে ॥”

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৮ পৃ.)।

হাজার হাজার লোকের দণ্ডযুগের কর্তা রাজা গোপীচাঁদকে
এভাবে যোগীবশে সাজাইয়া রাজমাতা মহনামতী বিমল
আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। যোগীরূপে রাজা গোপীচাঁদ—

“গুরু শেবিতে জাএ রাজা মজে মুনি২৮ মাথে ॥

আপে জাএ মএনামস্তি পাছে জাএ রাজা

দেখিয়া হাহাক্যার করে ত্রিভূলের প্রজা ॥”

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৮ পৃ.)।

এ ভাবে

“জৈবানে হাড়িপা সিদ্ধা আছিল বশিরা।

শেহিবানে গেলো মুনি পুত্র শঙ্গে লৈঞা ॥”

শুরুকে দেখিয়া রাজা চরণ বন্দি।

গলে বশন দিয়া মাথের শাক্তাতে রহিল ॥

হাড়িকা দেখিল যদি রাজ্যর বদন।

মুগিরূপ দেখি বোলে না হবে মরণ ॥

মুনি২৯ বোলে মুন গুরু হাড়িকা জলদ্বার৩০।

আজ হৈতে পুত্র হইল তোমার কিঙ্কর ॥

তোমার চরণ বিনে অস্ত নাহি জানি।

এতক বলিয়া হস্তে৩১ শপিল৩২ মাণ্ডমুনি ॥

২ ভুশ। ৩ মাণ্ডাপুজ। ৪ গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—

উত্তর নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক সম্পাদিত। ৫ জ্ঞান।

৬ সাধনা কর। ৭ দীর্ঘজীবী হও। ৮ মহনামতীর গান—উত্তর

নলিনী ভট্টশালী সম্পাদিত। ৯ ছেলে। ১০ সংসার।

১১ বাইতে দেয়। ১২ জন্মধানি। ১৩ পাষণে। ১৪ মনে।

১৫ নাই। ১৬ আগামীকাল্য সকালে। ১৭ সন্ন্যাসী।

১৮ বল।

১৯ স্তব। ২০-পদে। ২১ কাপড়ের ছোট বলি।

২২ তুলি বা বলি। ২৩ পাজবিশেষ। ২৪ কালবর্ণের কট-

অব্র। ২৫ লাউয়ের খোলার ডিঙ্কাপাজ। ২৬ রক্তাকের।

২৭ চর্ক। ২৮ মহনামতীর। ২৯ মহনামতী মহনামতীকে

অনেক স্থানে মুনি বলা হইয়াছে। ৩০ জলন্দর। ৩১ হস্তে।

৩২ সমর্পণ করিলেন।

হাড়িকা বোলেন মুনি থাক বার মাস।
 গুপিচক্ষক লৈঞা আমি করিগা শতাস ॥
 এতক বলিয়া শিখাও আশোন তুলিল।
 শিকনাথ পুরিয়া হাড়ি জাজা করিল ॥
 মা'এর চরণে রাজা হইয়া বিদাএ।
 শতাস হইতে রাজা গুরুর শব্দে জাএ ॥
 রাজ্য হাড়িয়া রাজা জাএ বোন পথে।"

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৮ পৃঃ)।

মানাবির সুখসম্পদের অবিকারী বদালরাজ গোপীচাঁদ
 প্রজাসাধারণকে বিষাদমূলিলে নিময় করিয়া স্বীয় গুরু
 হাড়িপানাতের সহিত ভিক্ষার খুলি কড়ে লইয়া যোগাত্যাস
 করার জন্য রাজ্য পরিত্যাগকরতঃ বনে গমন করেন এবং
 অবর্ণনীয় ক্রেশ সহ করিয়া গুরু কৃপায়—

"জোগ আসন করি রাজা মোহাজন হৈল ॥
 জোগান্ত ভেদান্ত ভেদ সরির৩৪ বিচার।
 যুগ্মলা৩৫ ভেদিয়া রাজা কায় কৈল সার ॥
 সবচক্র ভেদে আর সব চক্র * * *।
 চৌর্ধুবন৩৬ ভেটে আর বিড়কি হুয়ার ॥
 চাকি কুণ্ডল ভেটে আর অব৩৭ ভুড়ে বন্দ।
 তিনি ভিহড়ি৩৮ ভেটয়া মোনের ভাদে বন্দ ॥
 আদ্য উজি দিয়া বন্দ দশমিত৩৯ দিল তালি।
 গগন মন্দিরে যু৪০ করে গাভুরালি ॥
 ভোমর কোঠা৪১ ভেটয়া তথা ত্রিকলার হাট৪২।
 পূর্ব পশ্চিম৪৩ ভেটয়া তথা নাগাইল কপাট ॥
 উত্তরদক্ষিণ ভেটে হেমন্ত বশন্ত।
 বারো কাল৪৪ ভেটয়া মোনের ভাদে বন্দ ॥
 শোলাকাল ভেটিল আর কায় শরবর।
 তিনকাল ভেটয়া মোন কৈল একাশতর ॥
 আদ্য নাম ভেটয়া তিথের্য কৈল ধাম।
 একে একে ভেদিল রাজা অদের পঞ্চজন৪৫ ॥
 পিতার মেদ রসবিন্দু জননির শব্দ।
 ভেদিল সকল ভৎপ্রিথিবির রস ॥
 উজনি বাহিয়া জাএ কামারশালাঠামে৪৬।
 ভদ্রদিল করা ত্রিষ্ট হুই কাল জমে ॥

৩৩ সিদ্ধা। ৩৪ শরীর। ৩৫ সূর্য। ৩৬ দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের
 চতুর্দশ ভূবন। ৩৭ 'অ' হইতে 'ক' পর্যন্ত অক্ষর দ্বারা
 চিহ্নিত ষট্চক্রের কমলগুলির মলসমূহ। ৩৮ ত্রিপুরী।
 ৩৯ দেহ নববার। ৪০ কুণ্ডলিনী শক্তি। ৪১ ব্রহ্মপুরী।
 ৪২ মীনচেতনে ত্রিগোত্রার হাট বলা হইয়াছে। ৪৩ দেহের
 মধ্যে পূর্বাদি দিক এবং ষড় ঋতু আছে। ৪৪ কলা।
 ৪৫ পঞ্চভূত। ৪৬ সহস্রাব্দ।

নিজ নাম শাহিন রাজা গুরুর শাকাত্তে।
 অখোর৪৭ পড়িল রাজার মরণের পথে।
 নিকটে আছিল জতো মরণের ভাএ।
 শির্ষ৪৮ পথ হুয়ে গেলো রিপু হৈল খাএ।"৪৯

(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৫৫-৫৬ পৃঃ)।

যোগশক্তি-বলে যুত্বতর হু হুয়। রাজা গোপীচাঁদ
 যোগাত্যাস করিয়া অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া-
 ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে রাজা গোবিন্দচন্দ্র—

"জোড় হাতে কহে রাজা করিয়া মিনতি।
 হইব তোমার চেলা যুগ জুগীষর
 জুগীর চরণে রাজা কাপে ধর ধর।

* * *
 কিছু জ্ঞান দেহ আমি কলিঙ্গ ভূপতি ॥৬০৬
 জ্ঞান দিয়া কর জুগী জগতে অমর।
 পড়িল জুগীর পায় বন্দের ইন্দর।"

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)।

সিদ্ধা জালন্দরনাথ যে তাবে গোপীচাঁদকে যোগবর্ষে দীক্ষিত
 করিয়াছিলেন গোবিন্দচন্দ্র গীতে তাহার বর্ণনা আছে—

"মন্তক যুড়িয়া, কর্ণে যুড়া দিয়া,
 বরিব জোগির বেঘে।
 কহে জলন্দরি, লব সঙ্গে করি,
 আজি জাহ নিজ বাঘে ॥"৫১৪

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)।

রাজা গোপীচাঁদের গুরু সিদ্ধা জালন্দরনাথ বা হাড়িপা-
 নাথের সম্বন্ধে ডাঃ হুকাশন বলেন—Haripa a religious
 mendicant (yogi) of remarkable sanctity (J,
 A. S. B. 1838, page 5)। গোবিন্দচন্দ্র গীতে আছে—

"হাড়িপা হাড়ের সিদ্ধা কুলে হাড়ি নয় ॥৬১৯
 সর্ব্বঘটে আছে হাড় হাড়ি একজন ॥
 হাড়িপা মহুস্ত মহে হাড়ের স্বজন।"

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)।

হাড়ি নহে হাড়িপা বাউল ব্রহ্মজানী ॥৫৭

(গোবিন্দচন্দ্র গীত)।

সংস্কৃত অধিবাক্য প্রাকৃত শব্দ হুড্ড, হিন্দীতে হাড়ী,
 তৎপরে পা (পাদ) ইহার প্রাচীন বাংলা হাড়িপা। অথবা
 পা=পাট=কাটা। (অসমীয়া ভাষায়) হাড়ির অর্থাৎ
 হাড়ের কাটা মালা ধার গলায় সে হাড়িপাট বা
 হাড়িপা। দিল্লীর পশ্চিমের অস্তোর গ্রামের যোগীদের নাম
 হরপা যোগী। হাড়িপা হরপা শব্দের রূপান্তর হওয়াও

৪৭ আগড়, অর্গল। ৪৮ যুত্ব। ৪৯ কর।

অসম্ভব নহে। হাড়িপা সর্বজ্ঞ জালন্দর মায়ে খ্যাত। পঞ্জাবের জলদর নামক স্থানটি প্রসিদ্ধ। অনেক মনে করেন, সিন্ধা জালন্দরের নামানুসারে ঐ স্থানের নামকরণ করা হইয়াছে। জলদর অর্থে মেঘ এবং সমুদ্রও বুঝায়। কণ্ঠ-সঙ্কোচ করিয়া প্রাণবায়ুর গতি রোধ করাকেও জলদর মুদ্রা বলা হয়। হয়ত এই মুদ্রা সাধন করার জন্য অথবা জলদরে তাঁহার আসন ছিল বলিয়া তাঁহার নাম জালন্দর হইয়াছে।

ময়মনসিংগের টিলায় (কুমিল্লার নিকটে) বসিয়া হাড়িপা বা জালন্দরমাথ যোগসাধনা করিতেন। জলপানের ইচ্ছা হইলে তিনি মন্ত্র আওড়াইতেন। মন্ত্রবলে গাছের কচি মারিকেল তাঁহার মুখে জল ঢালিয়া দিত। একবার অবজী-দেশে দেবতার নিকট বলি দিবার জন্য আনীত কয়েক হাজার হাগলকে নাকি তিনি মন্ত্রবলে নেকড়ে বাঘে পরিণত করিয়া ছিলেন (J. R. A. S. B. pt 1, 1898 page 20)।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলদর চট্টোপাধ্যায়

দাদার মামলায় বহু সাক্ষী। গভ হ'লাত মাসের উপর উত্তর পক্ষ আদালতে ছোটোছুট করছে। দিনের পর দিন মোকদ্দমার তারিখ পড়ছে। কুমারবাহাদুর অর্থব্যয় করছেন জলের মত। দীনবন্ধু ঠাকুরের মারকত রমাদেবী অর্থ সাহায্য পাঠাচ্ছেন নরোত্তমকে, কুমারবাহাদুর তা জানতেও পারছেন না।

হঠাৎ আজ তিনি কেনে কেলেছেন—রমাদেবী মাঝে মাঝে ধোকাকে নিয়ে কালীবাড়ীতে গিয়ে থাকেন। আজও যাচ্ছেন।

কুমারবাহাদুর রমাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথার যাচ্ছি ?

—কালীবাড়ীতে...

—ধোকাকে রেখে যাও...

—কেন ?

—সে জমিদারের ছেলে। তার আত্মসন্মান-বোধটা নষ্ট করো না।

—সে ত বন্দুক নিয়ে কালীবাড়ী দখল করতে যাচ্ছে না ? বাগামবাড়ী তৈরির পরিকল্পনাও তার নেই। সে কেন আত্ম-সন্মান হারাবে ?

—তুমি যেতে চাও—যাও। আমার অসুস্থতা—ধোকাকে নিয়ে যেও না।

—ধোকার জেটেই ত যাচ্ছি...

—তার মানে ?

—আমার ভয় হচ্ছে তোমার পাপে ধোকার অকল্যাণ হবে। আমার সর্বনাশ হবে...

রমাদেবী মা-কালীকে কত ভক্তি এবং ভয় করেন, সে কথা জানতে পেরে কুমারবাহাদুর পরিহাসের ছলে কালী-সম্বন্ধে নানা অপ্রভাসচ্ছক মন্তব্য করতে লাগলেন।

উত্তেজিত ভাবে রমাদেবী বললেন—ওই নরোত্তম কে তা জান ?

—কে ?

—মা-কালীর অমুগ্ধহীত ভক্ত।

হো হো করে হেসে উঠে কুমার বাহাদুর বললেন—আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ পাই নি, সেজন্তে আমার মনে আজ আর কোন কোত রইল না। একথা বুঝতে পারছি যে, বি-এ পাস করলেও যেহেঁরা যেহেঁই থাকে।

—ভারা বাগামবাড়ীতে গিয়ে মদ খেতেও চায় না...

—ঠাকুরের চরণায়ত পান করে পরকালের পাথের সংগ্রহ করতে চায়।

—হ্যাঁ, তাই চায়। ইহকালের মাডলামোটাই জীবনের লক্ষ্য নয়।

কুমারবাহাদুর ব্যাক করে বললেন—শোম রমা ! তোমার মা-কালীর বরণজুটি শীগিরই ছেলে চুকবেন, সে ব্যবস্থা আমি করছি, দেখি তখন মা কালী কি করে তাকে রক্ষা করেন ?

তার এ কথার কোন জবাব না দিয়ে ধোকাকে বুকে নিয়ে রমাদেবী চলে গেলেন সেখান থেকে।

দীনবন্ধু ঠাকুরের ব্যবহার কালীবাড়ীতেই নরোত্তমের সঙ্গে রমাদেবীর প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল। নরোত্তম তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

বিস্মিতভাবে রমাদেবী লক্ষ্য করলেন—নরোত্তমের চোখে মুখে আর পেশীবহুল দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গে যেসব মাতৃদর্শনের আনন্দ-স্পন্দন জেগে উঠেছে। —এ কি অদ্ভুত ভাবাবেশ ? এই নরোত্তমই দাদার মাঠে হুজুর হয়ে ওঠে ?

রমাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা নরোত্তম ! মা-কালী

নাকি ভোমার দেখা দেয় ? তুমি নাকি তাঁর সঙ্গে কথা বল ?
একথা কি সত্যি ?

নরোত্তম বলল—এই ত মা এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে । তাঁর সঙ্গেই ত আমি কথা বলছি—

—আমিই তোমার সেই-মা ?

—সেই-মা আর এই-মা, দুটো মা আমার সেই । আমার এক-মা ! আমার মা কি ওই মন্দিরের পাঁচিলের মধ্যে আটক থাকতে পারে ? পথে ঘাটে কোথায় সে নেই ? যেখানে বাই সেখানেই থাকে দেখতে পাই । দাক্ষার মাঠে সে এসে দাঁড়ায় আমার সামনে । আমি কি লড়াই করি ? সেই ত করে । আমাকে আড়াল করে দাঁড়ায় বলেই, আমার গায়ে আঁচড়টিও লাগে না ।

রমাদেবী দীনবন্ধু ঠাকুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—
এই নরোত্তমকে আপনি বলেন অশিক্ষিত চাষা ?

নরোত্তম বলল—মা ? ভোমার ধোঁকাকে একবারটি দেবে আমার কোলে ?

রমাদেবী বললেন—না । জমিদারের সঙ্গে ভোমার মামলা চলছে । ভোমার সঙ্গে আমি দেখা করেছি জানলেও তিনি কেপে উঠবেন । তুমি এখন যাও...

মাঠের পথে যেতে যেতে নরোত্তম ভারদেবের বলে গেল—
আজ তোরা ছপুতের আগেই লাঙল ছেড়ে বাড়ীতে ফিরিস্...

গত রাত্রের নির্লজ্জ ব্যবহারের জন্যে মাঠে এসেই সখিচরণ অতি নির্ধন ভাবে তিরস্কার করেছে বেচারী মনোহর ও বেকুব ভ্রামাচরণকে ।

বিশেষ ভাবে ভ্রামাচরণকে বলেছে—আচ্ছা মেজদা ! তুমি কি কামরূপ-কামিন্যের মেয়ে বিয়ে করেছ ? মতুবা, এমন 'ভেড়াকাত' ব'নে গেলে কেন ? মনোহর ছেলোমামুষ । মতুম বিয়ে করেছে । তার সাত বুন-মাপ । কিন্তু বুড়ো তুমি ! চলে ভোমার পাক রয়েছে । লজ্জা-ধেয়ার মাথা ধেরে একটা সান্তিরও কি মেজ বৌকে ছেড়ে থাকতে পারলে না ? একটা কলসী আর দড়ি নিয়ে মধুমতীতে যাও ।

বাড়ীতে ফিরে নরোত্তম শুভল গুড়োকে বড়বৌ চন্দ্রকলা নিয়ে গেছে তার কাছে ।

—না না, তা হতে পারে না । যত দিন বৌদের আলাদা হবার সাধ না মিটবে—শুভদিন এ ব্যবহার কোন পরিবর্তন হবে না । নরোত্তমের আদেশে কাদম্বিনী গিরে গুড়োকে কেড়ে আনল বড়বৌয়ের কোল থেকে ।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও নরোত্তমকে যমের মত ভয় করে । বেড়ার কাঁক দিয়ে ভাইবোনরা কিস্ কিস্ করে কথা বলে । বড় বোন ছোট ভাইটিকে দিচ্ছে একটা রাঙ্গী । বড় ভাই ছোট বোনকে দিচ্ছে একটা পুতুল । তবে সবাই নন্দন রাখছে ঘোঁঠা না জানতে পারে ।

পাড়াপ্রতিবেশীরা ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেছে । বগড়া-বাটির ভয়ে যে মোড়লবাড়ীর চালের উপরেও কাক বসতে সাহস পেত না, সেখানে আজ, হুঁ-শব্দটি নেই । সবাই কিস্ কিস্ করে কথা বলছে আর ইমারার কাছ চালিয়ে যাচ্ছে ।

সেদিন রাতে ভাইরা কেউ আর বিহান্না ছেড়ে উঠল না ।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে সখিচরণকে একান্তে ডেকে নরোত্তম বলল—দেখলি ত কাল আর কেউ ঘর থেকে বেরন-নি । একটু ভাববার বা বুঝবার সময় ও সুযোগ দিলে সবাই শোধরায় । এই ব্যবস্থা আর দুটো দিন রাখতে পারলে—বোঁরাও শোধরাবে ।

—হেঁঃ শোধরাবে ! এই সখিচরণের মধুর বাক্যি না শুনলে কেউ শোধরাবে না...

চৌধু হুটো বিস্ফারিত করে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল—
ভ্রামাকে কিছু বলেছিস্ নাকি ?

—বলব না ? সে ভেড়াকাতের কি কোন আক্কেল-পছন্দ আছে ? ভোমার মত দাদাকে যে অগ্রাহ করতে পারে, সে কি মামুষ ? মাঠে গিরে এমন বাক্যি ছেড়েছি যে পেটের ভাত চাল হয়ে গেছে । বেড়ার কাঁক দিয়ে বৌদেরও আজ হুঁকথা শুনিতে দিয়েছি ।

—কি বলেছিস্ ?

—বলেছি, যদি মদল-চাও, সবাই মিলে বড়দার পারের উপর গিরে পড় । নইলে চাল-ডালের ভোগানও বন্ধ হয়ে যাবে । আমাদের ভাত গিলতে লজ্জা করে না ভোমাদের...?

—ছি ছি, তুই বজ্ঞ হুন্দুৰ ।

—যেমন কুকুর, তেমন মুণ্ডর না হলে কি চলে বড়দা ? তুমি বেশী কথা কও না, তাই ওরা ভোমাকে বুঝতে পারে না । কখনও হও কাদার মত নরম, আবার কখনও হও লোহার মত শক্ত । বাক্যি ছাড় বড়দা ! বাক্যি ছাড় । বাক্যির জোরেই ত মধুঠাকুর শিবুর বৌটার মাথা ধারাপ করে দিয়েছে ।

—তা সত্যি ।

এমন সময় পারের বাড়ীর একটি প্রাচীনা এসে বললেন—
ওরে ও নরোত্তম ! কাল রাত বারোটার পর থেকে ভোদের বড়বৌয়ের কোন খোঁজখবর নেই । সেকথা জানিস ? বৌটা কোথায় গেল বুঝে দেখ...

নরোত্তম চমকে উঠল ।

সখিচরণ জিজ্ঞাসা করল—কি বলছ তুমি ? এ কথার মানে কি ?

প্রাচীনা বললেন—মানে আমরা কি জানি ? শিবুর বৌয়ের মত সেও দীনবন্ধু ঠাকুরের বাড়ীতে উঠল কিনা, তাই বা কে জানে ?

সখিচরণ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল। চিংকার করে বলল—বৌদি যদি আমার দাদার বুকে চূর্ণকালি দিয়ে থাকে, তা হলে আমি তাকে কেটে ছ'খণ্ড করব।

চক্ষকলা যে শিবু বৌয়ের মত আত্মসন্মান হারাতে পারে না, নরোত্তম তা জানত। একথাও জানত যে চক্ষকলা অত্যন্ত অভিমানিনী। শুভোকে তার কোল থেকে কেড়ে আনার পর সে চুপটি করে বসে বহুক্ষণ কেঁদেছে। কাদাখিনীর কাছে সেকথা শুনে একটা ছুঁটনার আশঙ্কাও নরোত্তমের মনে এল।

চার ভাই চার দিকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল। মনোহর গেল দীনবন্ধু ঠাকুরের বাড়ীতে। ছাতি চান্দর নিরে জামাচরণ ছুটল চক্ষকলার বাগের বাড়ীঘুণে। সখিচরণ ভাবল সে নিশ্চয়ই জলে ডুবে মরেছে। ব্যস্তভাবে নদীর বাটে গিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল।

নরোত্তম যেন ছুতাবিষ্ট। চারি দিকে বিহ্বলভাবে ভাকাতে ভাকাতে সে গিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ীর উত্তরে একটা বাগানের মধ্যে। হঠাৎ চিংকার করে উঠল—ওই যে, ওই যে।

চক্ষকলা একটা আম গাছের ডালে গলার দড়ি বেঁধে ঝুলছে। সে ঝুলেছে গভীর রাজে। এখন হয়ে পড়েছে—কার্টের মতই শক্ত। চোখে বুঝে যুড়া-যন্ত্রণার শেষ চিহ্নগুলি পরিস্ফুট হয়ে আছে।

নরোত্তমের চিংকার শুনে সবাই ছুটে এল। একথানা দা হাতে নিরে নরোত্তম উঠল গাছে। তার পর তাকে নিরে বীরে বীরে নীচে নেমে এল। লাগটা বাইরের ধরের দাওয়ার নামিরে বহুক্ষণ চেয়ে রইল সে চক্ষকলার বুকের দিকে।

চক্ষকলাকে নরোত্তম বাস্তবিকই ভালবাসে। সে চেয়েছিল তার প্রকৃতির সংশোধন, দারিদ্র ও কর্তব্যবুদ্ধির আগরণ, প্রাণাধিক। চক্ষকলার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ তা সে কামনা করে নি? নরোত্তমের মনে পড়ল, চক্ষকলা তার সংসারে এসেছিল শান্তভীর কোলে উঠে। বয়স তখন মাত্র তিন বছর। এই তিন বছরের বালিকা বধূটির জন্ত মেয়ের বাপকে তিনশ' টাকা পণ দিতে হয়েছিল।

বিবাহের সময় নরোত্তমের বয়স ছিল কুড়ি। চক্ষকলাকে পরিপূর্ণ ভাবে বধু হিসাবে পাবার জন্তে, তার চিন্তাগুলির স্বাভাবিক স্মৃতির জন্তে, নরোত্তমকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় পনের বছর। অল্প বালিকা বধুর কত অসহ্য আবদার ও ক্রুদ্ধ অজ্ঞান অত্যাচার তাকে সহ করতে হয়েছে। কবে

নরোত্তম তার একটা পুতুল ভেঙে ফেলেছিল, সে কারণে চক্ষকলা একটা মতি ছুঁড়ে মেরেছিল তার কপালে। সে কত চিহ্নটা আঁকুও মোহে নি।

তিন বছরের বালিকার শৈশব-মুগ্ধতায় মনে থাকা সম্ভব নয়। বয়োবৃদ্ধির পর নরোত্তমের পলাটা জড়িয়ে ধরে, অহুঃস্বাসে চক্ষকলা এক দিন জিজ্ঞাসা করেছিল—আমি যে মতি ছুঁড়ে কপালটা কেটে দিয়েছিলাম—তাতে রক্ত পড়েছিল? ব্যথা লেগেছিল?

নরোত্তম হাসল। আদর করে বলেছিল—দাগটা দেখেও কি বুঝতে পারছ না?

—সেজ্ঞে তুমি আমাকে কিছু বল নি? একটা চড়ও মার নি?

তেমনি হাসতে হাসতেই নরোত্তম বলল—তুমি তখন পাঁচ-ছ' বছরের বুকাটি, আর আমি একটা তরা বয়সের জোয়ান। আমার একটা চড় খেলে তুমি ত মরেই যেতে। বিয়ের সময় মত্তরের মানে বুঝি নি, তা সত্যি, কিন্তু বাসরে খেলার হলে শালী-শালাকেরা যে একরার আদায় করে নিয়েছিলেন—‘তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করব।’ তা কি এ জীবনে ভুলতে পারি?

চক্ষকলার চোখ দুটি হলহল করতে লাগল। তার ইচ্ছে করে, নিজে না-খেয়ে, বা আর কাকেও না-বাইয়ে, ভাল ভাল খাণ্ডগুলি, একমাত্র নরোত্তমকেই খাওয়ায়। ভাতপুস্তপ্রাণ। নরোত্তম তা পছন্দ করে না। নরোত্তম ও চক্ষকলার মধ্যে দাম্পত্য-কলহের মূল ত সেইখানে। বড়ার দত্তান-বাংসল্য যে স্বামীকে মিরেই তৃপ্ত হতে চায়, নরোত্তম তা বুঝতে পারে না, গোপনে ছব ছাল দিয়ে কীর করে এমন চক্ষকলা এখন নরোত্তমের বুকের কাছে ধরে—নরোত্তম তাবে—হি, হি, এ কি স্বার্থপরতা?

সব বৌকে পৃথক করে দিয়ে, যে নিরপেক্ষতার দাবি নিয়ে নরোত্তম তাদের পারিবারিক কলহ-নিবৃদ্ধির অভিমত পছন্দ আবিষ্কার করেছিল, তা আর কোন বৌয়ের পক্ষে ভুলটা পীড়াদায়ক হয় নি, মতটা হয়েছিল চক্ষকলার পক্ষে।

চক্ষকলার দিকে চেয়ে চেয়ে নরোত্তমের চোখের জল শুকিয়ে গেল। বেড়ার বাবা অস্বীকার করে মেজবো, সেজবো, আর ছোটবোও এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। নিত্য-কলহের পরিণাম যে এমন ভয়াবহ হতে পারে, তা তারা কল্পনাও করেনি। সবাই মুখ ঢেকে ছুঁপিয়ে ছুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বড়বোয়ের অপমৃত্যুর সংবাদ পেয়ে জামাচরণ রাভা থেকেই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছে। নরোত্তম তাকে ডেকে বলল—ওরে জামা। বেড়াটা তুলে দে...

এমন সময় দীনবন্ধু ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মনোহর এসে হাজির হল।

—ব্যাপার কি নরোত্তম? উদ্ভিগ্ণ ভাবে দীনবন্ধু ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন।

—দেখতেই শু পাছ ঠাকুর-বুড়ো! বড়বো! আমাদের সংসারের সব অশান্তি আঁচলে বেঁধে নিয়ে সরে পড়েছে...

—কি সর্বনাশ! দীনবন্ধু ঠাকুর বহুক্ষণ মাথাটা চেপে ধরে একটা চৌকির উপর বসে রইলেন। তার পর উৎকণ্ঠিত ভাবে বললেন—একটা সমস্যা যে বড়ই জটিল হয়ে উঠল নরোত্তম?

—কি সমস্যা?

—এ লাস ত পুড়িয়ে ফেলতে পারবে না...

—কেন?

—আত্মহত্যা আশুন পাবে না। শাস্ত্রের নিষেধ। ওকে জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তাতেও বিপদ আছে...

—কি বিপদ?

—ধানার না জানিয়ে কোন লাস জলে ভাসাতে পার না তুমি। ভয়ানক বে-আইনী...

ধানার কথা শুনে নরোত্তম চমকে উঠল। তাকে দৃক করার জন্তে জমিদারের সঙ্গে ধানার আভাতের খবর সে রাখে। কালীবাড়ীর দাখাটা প্রমাণভাবে কৈসে ঘাবার সম্ভাবনা আছে। এখন চক্রকলার গলার দড়িটা অস্ত্র ভাবে প্রমাণের চেষ্টা দারোগা ত না করেই ছাড়বে না?

নরোত্তমও কিছুক্ষণ মাথাটা ঝুঁকিয়ে বসে রইল। হঠাৎ দীনবন্ধু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল—পুড়িয়ে ফেললে ওর সঙ্গতি হবে না?

—না। শাস্ত্রে সে ব্যবস্থা নেই। আত্মহত্যা মহাপাপ। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত জলজ প্রাণীর ভক্ষ্য হওয়া...

—মনোহর! শুনে যা—নরোত্তম মনোহরকে ডেকে বলল—শীগগির একটা বড় বস্তা নিয়ে আর...

—বস্তা দিয়ে কি হবে? দীনবন্ধু ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন।

—বস্তায় ভর্তি করে ইট বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেব, তবু ধানার খবর দেব না। দারোগা এসে যদি জিজ্ঞাসা করে, বলব বাপের বাড়ী গিয়েছিল। তার পর কোথায় গেছে, কি হয়েছে, জানি না।

—তোমার পাড়াপ্রতিবেশীরা যদি সাক্ষী দেখ...

—আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে এমন পাড়াপ্রতিবেশী আমার একটিও নেই। তবে তোমাদের পাড়ার কেউ যদি বলে, বলুক। তারা শু দূরের লোক। তাদের সাক্ষীতে কি আসে যায়?

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই ঠিক হ'ল। চার-ভাই মিলে চক্রকলাকে বস্তাবন্দী করে নবগদায় ডুবিয়ে দিলে। ধানার সে খবর গোপন রইল না—ভিন্ন দিন পরে চক্রকলার মৃত্যু সম্বন্ধে

তদন্ত আরম্ভ হ'ল। কুমারবাহাহর রমাদেবীকে বললেন—এইবার তোমার মা-কালীর বরণপুঞ্জটিকে দেখে দেব। ধূনী আসামী সে।

চক্রকলার গলায় দড়ি সম্বন্ধে নানা লোকে নানা মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগল। হাট্টের লোকরা কেউ বলল, বৌটা নিজেই বুলেছে। কেউ বলল, ঘোড়লের পো মেয়ে বুন্ডিয়ে রেখেছে।

নরোত্তমকে সর্বাই চেনে। অনেকেই দ্বিতীয় অহুমানের প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, না না, তা হতেই পারে না। ঘোড়ল যদি তেমন কাজ করত, তা হলে নিজেই ধানার গিরে বরা দিত। কোম মিথ্যে কারবারের ভিতর সে নেই।

জনমত চিরদিনই সন্দেহের ঝোলায় দোলে। জনমতের বিচারে বহু নিরপরাধ শাস্তি পেয়েছে, আবার বহু অপরাধী ফুলের মালা পরেছে। সেজন্তে দারী মাছবের অসংখ্য রসনা আর কল্লিত প্রচার। দারিদ্রহীন মন্তব্য ও মিথ্যা-প্রচারের ফলে কত নিরপরাধের প্রাণহানি যে ঘটেছে, তার সাক্ষী হিন্দু-মুসলমানের দাখা।

ভিন্ন-চার দিন পরে নবগদায় কোমও বাকি ভেসে উঠল একটা জীলোকের বিকৃত লাস। চারদিকে হৈ চৈ। প্রচার-বিশারদরা মুগ্ধ হয়ে উঠল। ধানার গেল খবর। নরোত্তমের ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করে দারোগার সঙ্গে কুমারবাহাহরের বহু প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। মদের গ্রাস চৌকাঠুকি করে হুঁহুনাই সানন্দে মন্তব্য করলেন—নিশ্চয়ই এ লাস চক্রকলার।

লাস সনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত নরোত্তমের বিরুদ্ধে অভিযোগ সাজানোও চলছে না। পুত্তিগদায় লাসটাকে ডাঙ্গার তুলবার উপায় কি? চৌকিদাররা রাজী হ'ল না। জমিদার সদরে লোক পাঠালেন—পাঁচ জন মুদকরাস আনবার জন্তে।

উপস্থিত লাসটাকে ধানার মাটে ভাসিয়ে এনে একটা খোঁটার বেঁধে রাখা হ'ল। সাত জন চৌকিদার নিযুক্ত হ'ল সাতখানা ডিলি নৌকো দিয়ে দ্বিগুণে সারারাত লাসটা পাহারা দেবার জন্তে। কালই মুদকরাস আসবে।

সন্ধ্যার পর দীনবন্ধু ঠাকুর এলে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন উপায় কি নরোত্তম?

লাসটা যে চক্রকলার সে বিষয়ে নরোত্তমের মনে কোনও সন্দেহ নেই।

—ভাই শু ঠাকুরবুড়ো! কি করা যায় বল ত? নরোত্তম মাথায় হাত রেখে ভাবতে লাগল।

বহুক্ষণ পরে হঠাৎ সে রুদ্র-মূর্তি ধারণ করে উঠে দাঁড়াল। মাথার বাবরিটা খেঁকে দাঁতে দাঁত চেপে অক্ষুট খরে বলে উঠল, না, না, এত বড় মিথ্যে, এত বড় অত্যাচার, এত বড় দুর্ভিক্ষ-সঙ্কটের প্রজ্ঞা সে কখনও দেবে না। চক্রকলাকে ধূম করেছে

নরোত্তম ? এত বড় একটা মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা নরোত্তমের
বাঁড়ে চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ জমিদার কখনও পাবে না।

—কি করবে ? অসুস্থজিৎস্ব ভাবে দীনবন্ধুঠাকুর জিজ্ঞাসা
করলেন।

চারদিকে একবার চেয়ে খুব নীচু হয়ে নরোত্তম বলল,
আজ রাতেই লাসটা সরিয়ে ফেলব...

—তা কি করে সম্ভব হবে ? পাহারার খুব কড়া ব্যবস্থা
হয়েছে। সাত জন চৌকিদার নিযুক্ত আছে সাতখানা ডিকি
নিরে...

—সাতশ' ফৌজ এসে পাহারা দিক্ না, তবুও ও লাস
ধানার ঘাট থেকে আজ রাতেই সরে যাবে...

—মাথা ধরাপ ? একটু মান হাসি হেসে দীনবন্ধুঠাকুর
বললেন, কোনও মন্তর খাড়বে নাকি ?

—হ্যাঁ, আমার এক মন্ত্রর মন্তর—‘জয় মা-কালী !’ তা
ছাড়া আর কোনও মন্ত্রর আমি জানি না ঠাকুর-বুড়ো। যেন
এক অপূর্ণ দিব্য জ্যোতিতে নরোত্তমের মুখখানা উজ্জ্বলিত
হয়ে উঠল। সদন্তে বলল, আমার বুকটা চিরে দেখ, সেখানে
মার বৃষ্টি আঁকা আছে। মার রূপায় আমি অসাধ্য সাধন
করব, কেউ আমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না।

বিস্মিতভাবে দীনবন্ধুঠাকুর চেয়ে রইলেন নরোত্তমের
মুখের দিকে, মনে মনে স্বীকার করলেন—এত বড় মাতৃভক্তের
বিনাশ নেই। কিন্তু ধানার ঘাট থেকে লাস সরানো সম্ভব
হবে কি করে ?

নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল, বলতে পার ঠাকুরবুড়ো ! ধানার
ঘাটে নবগলা কতখানি চওড়া ?

—তা প্রায় ছ'শ-আড়াই'শ গজ হবে বৈকি !

—তা হলে যাও, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও গে। কাল
সকালে শুনতে পাবে—লাসটা ধানার ঘাটে নেই...

এত বড় একটা অসাধ্য-সাধন করা মানুষের পক্ষে কিভাবে
সম্ভব হবে, দীনবন্ধুঠাকুর তা ভাবতেই পারলেন না। তবে
মাতৃভক্ত নরোত্তমের অদম্য শক্তি ও সামর্থ্যের উপর তাঁর
অগাধ বিশ্বাস আছে; তাই হুশিয়ার মধ্যেও খানিকটা
নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

উঠানের বেড়া উঠে গেছে। বৌদের বগড়া-বাঁটিও বেঁধে
গেছে। নরোত্তম ছেলেরদের নিয়ে বাইরের ঘরে পড়ে থাকে।
তার সেবায়ত্ত করে কাদম্বিনী। খাওয়া-দাওয়া সেরে আশাচরণ
আর মনোহর গিয়ে ঢোকে তাদের বৌদের ঘরে। সখিচরণ
বারান্দায় শুয়ে ভজন গায় আর নাক ডাকায়।

সন্ধ্যার পর সখিচরণকে ডেকে নরোত্তম বলল, ছুখানা
দায়ে বার দে। আর আমার শিরে রেখে যা ছুটো বস্তা।
হ্যাঁ ভাল কথা—ক'গাছা নৌকোর গুণ ঘরে আছে রে ?

—কেন ?

—দরকার আছে। গুণ ক'গাছাও গুহিরে রাখিন।
আর একটু লক্ষ্য রাখিস। রাত দুটো আড়াইটার সময় এক
ছায়গায় যেতে হবে আমার সঙ্গে...

সখিচরণ বাসি-কাঁচার লা বসতে বসতে গান বলল—

এই মানব-জীবন জোয়ার-ভাটা।

ভাটার টানে পড়লে রে মন—

ওরে—মিছেই হবে তোর সাঁতার-কাটা।

অরণ রাখিস মায়ের চরণ

হবে না তোর অকাল মরণ।

জোয়ার-ভাটা আসবে বাবে—

তবু, ভাববে কে তোর বুকের পাটা ?

দা ছুখানা বাসিশের নীচে রেখে সখিচরণ কাত হয়েও
সুর ভাঙতে লাগল। ক্রমে গানের সুর মিশে গেল নাসিকা-
গর্জনের সঙ্গে।

কালী-বাড়ীর পেটা-ঘড়িতে দুটো বাজার সঙ্গে সঙ্গেই
নরোত্তম এসে সখিচরণকে থাকা দিল। উঠে বসে চোখ
রগড়ে-সে জিজ্ঞাসা করল—কি বড়না ?

—চল আমার সঙ্গে...

কোথায় যাচ্ছে, কি করতে যাচ্ছে, সে সব কথা সখিচরণ
কিছুই জানে না। তাই তিনটি শুধু দাঁড় টানতেই জানে।
বড়না যদি হালে থাকে, তা হলে তাদের নৌকো কখনই
বান্ধাল হবে না, এ বিশ্বাস তাদের আছে। তাই তারা
কোনও বিষয়েই মাথা ধামায় না। নরোত্তমকে মাথায় রেখেই
তারা নিশ্চিন্ত।

অন্ধকারে ধানার অপর পারে নদীর কূলে বসে নরোত্তম
কিস্ কিস্ করে সখিচরণকে বুঝিয়ে দিল—কি করতে হবে।
গুণের দড়ির একটা দিক সখিচরণের হাতে রেখে, আর একটা
দিক গুহিরে নিল নিজের হাতে। তারপর দাঁটা কোমরে
গুঁজে ‘জয় মা-কালী’ বলে নেমে পড়ল কূলে। একটা কাল
হাঁড়ি দিয়ে মাথাটা ঢেকে ভাসতে ভাসতে চলল ধান-মুখে।

কূলের যুহু টেউয়ের উপর দিয়ে হাঁড়িটা ভেসে চলেছে
অতি বীর ও মহুরগতিতে। দেখলে কারো মনে সন্দেহমাত্র
জাগে না যে ওই হাঁড়ির নীচে কোনও মানুষ আছে। মাঝে
মাঝে হাঁড়িটা একটু উঁচু করে নরোত্তম দেখে নিচ্ছে—ধানার
ঘাট কতদূর।

কূলে বসে সখিচরণ ভাবছে—ঠৈ হৈ করে হাড়-পা ছুঁড়ে
সাঁতার কাটতে সবাই পারে। কিন্তু এমন শান্ত ও সংযত
ভাবে অতি মহুর সাঁতার-কাটা একমাত্র তার বড়নার মত
কৌশলী-সাঁতারু ছাড়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

লাসটা যেখানে বোঁটার বাঁধা ছিল—হুই নৌকোর ফাঁক
দিয়ে হাঁড়িটা গিয়ে ধামল সেখানে। রাজি ভখন প্রায় তিনটে
হাঁড়িটা সরিয়ে চারদিকে চেয়ে নরোত্তম বিশেষ ভাবে লক্ষ্য

করতে লাগল—কেউ কোথায়ও জেগে আছে কিনা। কি ভয়ানক ছুঁনাহসের কাজ সে করছে। দারোগা টের পেলে, এবুনি হুম করে বন্দুকের একটা আওয়াজ হবে—আর মরোত্তমের মাথাটা ঘাবে চৌচির হয়ে কেটে।

নিশুভি রাত। কেউ কোথায়ও জেগে নেই। মরোত্তম নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে গেল লাসটার কাছে।

মরোত্তমের মনে পড়ল সেই নবনীভকান্তি তিন বছরের ছোট্ট মেয়েটিকে, তার পরে একদিন এল তার যৌবন। দেহের লাবণ্য সর্বদা উজ্জ্বল উঠল। আর আজ তার এই পরিণাম। বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা হ'ল তার। এই যেহেতুকেই মানুষ কেন এত ভালবাসে? সংসারের অনিত্যতা গ্রহণ করে মরোত্তমের হাত-পা শিথিল হয়ে আসছিল। হঠাৎ সে আবার শক্ত হয়ে উঠল।

না না, তা হতে পারে না। সংসার যতই অনিত্য হোক

—যত দিন প্রাণ আছে কর্তব্য মানুষকে করতেই হবে। না যে পথে চালাবেন—সে পথে চলতেই হবে। কাসি-কাঠকে মরোত্তম ভয় করে না। কিন্তু জমিদারের মিথ্যা স্বভাবের জমী হবে—লোকে জানবে মরোত্তম জমী-হস্তা। এত-খানি কাপুরুষতার গ্লানি তার পক্ষে অসহ্য।

মানুষের মায় গ্রহণ করে আবার সে কর্তব্যে কঠোর হয়ে উঠল। হু'একটা চৌকাকে লেজ ধরে টেনে সরিয়ে দিল। গুণের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল চক্ষকলার পা-ছথানা। তারপর খোঁটার সঙ্গে যে দড়ি দিয়ে লাসটা বাঁধা ছিল, তা দিল কেটে। হাঁড়ি মাথায় দিয়ে যে ভাবে এসেছিল, ঠিক সেই ভাবেই আবার ফিরে গেল, মদীর অপর পারে সখিচরণের কাছে। ডাঙার উঠে তাকে বলল—গুণটা খুব আন্তে আন্তে টান—হু'মৌকোর কাক দিয়ে বেরিয়ে আসবে লাসটা।

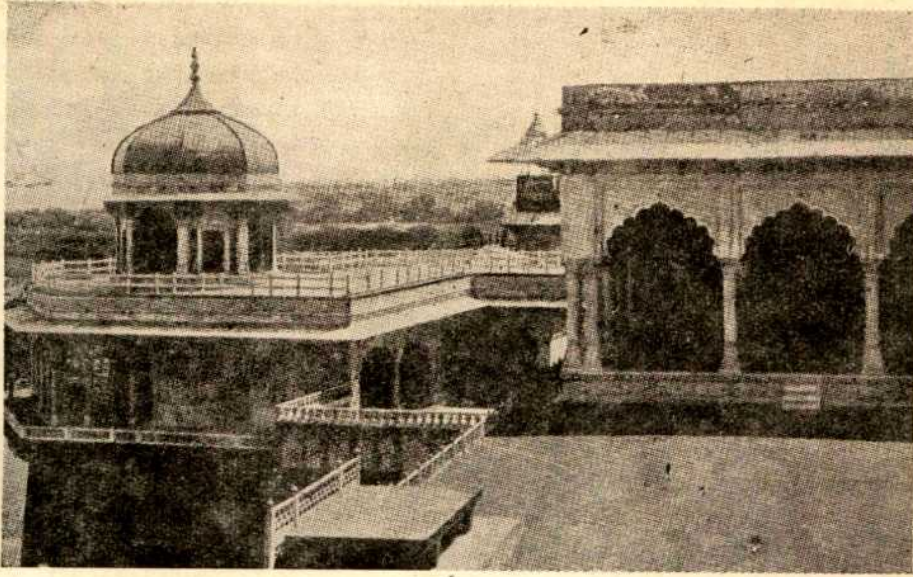
(ক্রমশঃ)

স্বাপ্নিক

শ্রীভারতপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন তোমার আজও কি হয়নি শেষ
স্বাপ্নিক তুমি হুম হতে আজ কাগো,
আবার খনার, চারিদিক হতে উঠেছে স্বপ্ন
অন্তর দিয়ে আজিকে তুমি স্বপ্নের বর মাগো।
সারাটি জীবন গেয়ে গেলে তুমি স্বপ্নের জয়গান,
রঙীন নয়নে রাঙালে এ পৃথিবীরে,
হু হু মাঠে তুমি দেখে গেলে শুধু সবুজ বাঘের শীষ
নিঃস্বপ্ন কাঁচেরে বলে গেলে তুমি হীরে।
স্বপ্ন দেখার দেশার তুমি কি আজিও রবে বিভোর
কল্পনা-রণে উবাও হবে কি তাদের দেশে?
মত্ত সাগর বুকে সাঁতারিয়া কূল পেতে চাবে তুমি
সীলাকাশে বুকি উড়ে যাবে এক ছোট পাখীর বেশে।
যদি একবার নয়ন মেলিয়া চেরে দেখ পৃথিবীরে
লজ্জার তুমি ফেরাবে তোমার মুখ;
এতদিন যবে কোন্ পৃথিবীর গান গেয়ে গেলে তুমি
কোন্ পৃথিবীর মাঝে ফিরে যেতে অন্তর উৎসুক।

হেবার কি তুমি দেখনি কখন কারা কেঁদে যায় পথে
কাদের নয়ন-জলে হ'ল আজ পথ-পিছল,
শ্রেষ্টের মত পথে পথে চলে কারা আজ দিশাহারা
দেখনিক তুমি নরককালে ভুখ মিছিল।
হেবার কি তুমি দেখেছ কখন ভাঙবিন হুঁটে কারা বাঁচে,
আন্তাকুড়ের অমের লাগি মানুষে কুহুরে হানাহানি
স্বাপ্নিক তুমি দেখনি কখন হাজারে হাজারে কারা মরে
কাদের কান্না আকাশে বাতাসে আজিও ভরিছে কানাকানি।
স্বাপ্নিক তুমি দেখ চেরে দেখ মুদিত নয়ন মেলিয়া চাও
স্বপ্ন দেখার রাতি হোক আজ শেষ।
জীবনে জীবনে যত যন্ত্রণা অজুতব-কর মনে মনে
দেখ চেরে দেখ আলোর বাহিক লেশ।
স্বাপ্নিক তব আস্থানে আজ পথহারাদের জাগারে দাও
যারা কেঁদে যায় এক কোঁটা আলো লাগি,
অন্তবিহীন বেদনার যদি পার তবে দাও সাহুনা
তব সঙ্গীতে উঠুক তাহারি আগি।



দেওয়ান-ই-খাস ও জাসমিন টাওয়ার—আগ্রা-দুর্গ

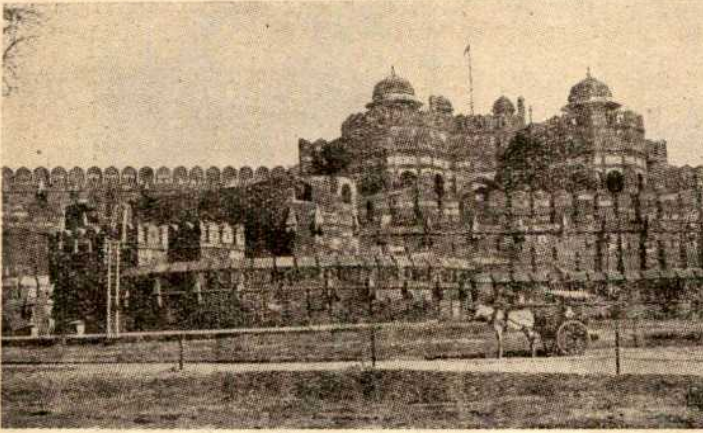
আগ্রায় তিন দিন

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

একদা শরৎকালের বেলাশেষে আমরা এসে দাঁড়ালাম তাজ-মহল স্থিতি-সৌধের সম্মুখে। মনে ছিল বিস্ময়, ছিল ব্যাকুলতা; যত্নকে অস্বতন্ত্রপে, প্রেমকে ক্ষেমরূপে, হৃৎকে কীর্তীরূপে, স্বপ্নকে সৌন্দর্যরূপে অবলোকন করবার প্রবল আগ্রহ। তাজ-মহল দেখে সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলাম এক অপার্থিব প্রেমের সত্যকে—যে প্রেম অবিনশ্বর হয় বিচ্ছেদের দহনে। ক্রামল তরুরাজি ও উজ্জ্বল-বাটিকা-সমাজ, এবং চতুর্দিকে সুবৃহৎ রক্তবর্ণের ভোরগোলাবর্ণিত শুভ মর্মর-সৌধে বন্দী হয়ে রয়েছে সত্যটি শাহজাহানের বন্ধ—অক্ষয় কীর্তি তাজমহল। আমরা এই পবিত্র সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। সত্যটি ও বেগমের আসল সমাধি আছে একেবারে মীচের তলায় একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। একদা যে স্থান মণিমাণিক্যের উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত ছিল, আজ সেখানে অন্ধকার বিদূরণের জট মিটমিট করে জ্বলে একটি কেরোসিনের প্রদীপ। মামাবর্ণের বিচিত্র কারুকর্মাবৃত খেত প্রস্তরের দুটি পাখাণ-বেদিকার অন্তরালে পাশাপাশি চিরনিজ্জাতিকৃত রয়েছেন সত্যটি শাহজাহান ও তাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ। সমাধিগাঙ্গে কোরাণের শ্লোক উৎকীর্ণ—সেই সমাধিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে উপরে এলাম। এখানে সাধারণের দর্শনার্থে বাদশাহী সমারোহের নিদর্শনস্বরূপ নকল সমাধি রাখিত হয়েছে। এই সমাধিগুণল টিক আসনেরই অনুরূপ

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, শুধু আরও কিছু বৃহৎ হবে। এই সমাধির চতু-পার্শ্বে যে খেতপ্রস্তরের জালির পর্দাটি বিলম্বিত তার কারু-কার্য অতি চমৎকার। তাজমহল যে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য নামে খ্যাত তার অন্ততম প্রথম কারণ হচ্ছে এই জালির পর্দাটির শিল্পনৈপুণ্য। এই বৃহৎ মর্মর-প্রাসাদের সমস্ত প্রাচীর-গাঙ্গে জড়ুর কল, ফুল, লতা আর পাতা বোদিত। প্রত্যেকটি লতা-পুষ্পের নির্মাণকৌশল বিভিন্ন প্রকারের। স্থানে স্থানে প্রাচীরগাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুর্কোণ ছিদ্র বিস্তারিত—সেই ছিদ্রগুলি ফটিকখণ্ড দ্বারা আবৃত এবং সেই ফটিকাবরণের মাধ্যমেই বাইরে থেকে সমাধিকক্ষে আলোক প্রবেশ করে। এই সমাধি-মন্দির নাকি একদা সূর্য্যকান্ত মণি, চন্দ্রকান্ত মণি, মীল-কান্ত মণি, পদ্মরাগ মণি এবং আরও নানা মূল্যবান রত্ন দ্বারা পরিশোভিত ছিল। মনে হ'ল প্রাচীরের ঐ ফটিকদ্বারা আবৃত ছিদ্রগুলিতে একদা ঐ সকল মণিমাণিক্য এঁষিত ছিল এবং সেই রত্নরাজির প্রভাই সমাধিতবন উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে থাকত।

সমাধিতবনের বাহিরে প্রাপ্ত চত্বরের প্রাচীর-গাঙ্গেও বিচিত্র ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। কোমল কোমল স্থানে মর্মর-গাঙ্গে উৎকীর্ণ বৃহৎ পুষ্পের অভ্যন্তরভাগ ভয় এবং ক্রুরবর্ণ দেখে গাইডকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললে, “অগ্নির সাহায্যে এই সকল স্থান হতে



আশোক-মূর্তি

তীরক অপহরণ করা হয়েছে।" এই সুবহুং স্মৃতি-সৌধের সর্বত্র স্থান সৌন্দর্য্যবোধের ভোক্তক ভাস্কর্য্যশিল্পের বিভিন্ন সব নিদর্শন ভিন্ন শত বৎসরের কালের জুড়ুট উপেক্ষা করে মুক্ত আকাশের তলায় সগর্বে উচ্চ শিরে দণ্ডায়মান আছে। বহু চত্বরের চারদিকে অনেককণ ঘুরে বেরিয়ে অবশেষে আমরা যমুনার ধারে একটি প্রস্তর-বেদিকায় গিয়ে বসলাম। এ যমুনায় প্রাণও নেই, গানও নেই; শুধু অতীতের স্মৃতি নিয়ে গে নিজীবের মত পড়ে আছে। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার বনিয়ে আসতে লাগল, অবশেষে অন্ধকার কেটে গিয়ে দূরে যমুনার পারে দেবদারু বনের শীর্ষে আকাশে উঠল দেবীপঙ্কের টাদ। সেই অনতিদূর জ্যোৎস্নার দেখলাম তাজের আর এক স্বপ্নময় রূপ—যে রূপের মাধুরী শুধু মর্মে মর্মে অজুতব করা যায়, কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। নির্জন বনস্থলী, নির্বাক যমুনা—জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশালি পাতিয়ে তাজ যুহু যুহু হাসছে। এরিকে রাত বাড়ছে—আর দেরি করা চলে না, কাছেই আমরা উঠে পড়লাম। হুন্না পাপড়ি বিরাট চত্বরের অঙ্কার কোণে অপদেবতা আছে কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল আমাদের ডাকে তারা ফিরে এল। জ্যোৎস্নার আল্পনা-আঁকা তরুণীধিকার ছায়াপথ অতিক্রম করে নীরবে তাজের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা মুসাফিরখানা পিছমে ফেলে রাজপথে এসে দাঁড়ালাম। পশ্চাতে দুষ্টিপাত করতে দেখলাম বহুদূরে আকাশের পটে আঁকা তাজের শুভ্র গুহু—যেন মহাকালের ললাটে খেত-চন্দন-ভিলক, এক মহাশিল্পীর নিপুণ হস্তের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

আশা হোটেল থেকে কোর্ট ঘুব কাছে। পরের দিন তোরবেলা বেরিয়ে পড়লাম আমরা কোর্ট দেখবার উদ্দেশ্যে। এই বিরাট চূর্ণ এক বেলায় দেবে শেষ করা অসম্ভব। এর সামরিক বিভাগটি এখন বন্ধ আছে। আমরা অমরসিং

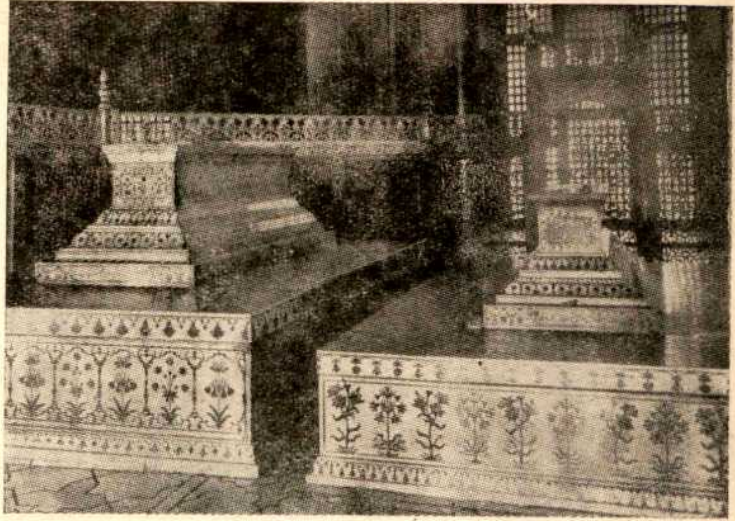
সিংহদ্বার দিয়ে চূর্ণাভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-যুদ্ধের সময় থেকে এই প্রবেশ-পথের নাম হয়েছে অমরসিং দ্বার। অতীতে এই প্রাকারভ্যন্তরে পাঁচ শত মহল ছিল, কিন্তু এখন তার বেশির ভাগই কালের খুল হতাবলেপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তথাপি আজও যাহা বিদ্যমান আছে, তাহা দর্শকের চিত্তকে বিশ্ময়ে অভিভূত করে। এই চূর্ণে যথাক্রমে আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান এই তিন জন শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাটের কীর্তিচিহ্নের নিদর্শন বিদ্যমান। একদা যেখানে দলে দলে প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত থাকত আজ সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি

ফলরব করে বেড়াচ্ছে। প্রাকারভ্যন্তরে কি অজুত নীরবতা, কি গভীর প্রশান্তি। আমরা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে জাহাঙ্গীর মহলে প্রবেশ করলাম। এখানে লাল বেলে পাথরে নির্মিত যোষাবাই মহলের কারুশিল্প অতি চমৎকার। সমস্ত কক্ষের প্রাচীর-পায়ে গোলালী ও নানা বর্ণে মিশ্রিত চিত্রাবলী লক্ষ্য করা যায়। যোষাবাই মহলে মোগলযুগের এই স্থাপত্য-শিল্পের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতিরও কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়—যদিও বর্তমানে সে শিল্পসম্পদ বহুল পরিমাণে বিনষ্টপ্রায়।

এই প্রাসাদ-সংলগ্ন উভানে একটি প্রকাণ্ড জলাধার আছে। এর উচ্চতা পাঁচ ফুট, ব্যাস আট ফুট এবং পরিধি আটশ ফুট। এই আশ্চর্য্য জলাধারটি একবারি কষ্টিপাথর কেটে নির্মিত হয় ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে। প্রবাদ—এটা সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্মিত এবং তাঁর আমলে সুরাধার রূপে ব্যবহৃত হ'ত। তারপর ভরপ্রায় আকবরী মহল ও রমণীর বাসমহল দেখে আমরা গেলাম শাহজাহানের স্মৃতিজড়িত তবন মুসাফির হুকুজে। এই বিরাট চূর্ণের বহুসংখ্যক মহলের মধ্যে আমার এই মহলটিই সবচেয়ে ভাল লাগল। এইখানেই পুজহন্তে বন্দী সম্রাট জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন, এবং এই মর্দুরনির্মিত কক্ষেই ষ্টিক ভীষ্মমহলের সুখোদুখি পেতেছিলেন তাঁর শেষশয্যা। এখানকার এই যমুনার শিকরসিক্ত বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস। এই তবনটি এমন সুপরিকল্পিত ভাবে নির্মিত যে, এর চতুর্দিক থেকে তাজমহলকে স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। এই তবন এবং জলিন্দ শুভ্র মর্দুর-প্রস্তরে নির্মিত। এখানকার প্রাচীর-পায়েও স্থান জালির কার্যের শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময়কর। সমগ্র তবনটির পায়াপগাছ বহু মূল্যবান নানাবর্ণের রত্নরাজি দ্বারা শোভিত। এর বহু স্থান হতে বহু রত্ন অপহৃত

হয়েছে, শূন্য ছিন্নগুলি দেখলে সেকথা বুঝতে বিলম্ব হয় না। এই ভবন-সংলগ্ন অলিন্দের রক্তশোভিত কারুকার্য গৃহেরই অঙ্গরূপ। এই অলিন্দে বসে বন্দী সত্রাটি তাজমহল দেখতেন। দেখতে দেখতে হঠাৎ অশ্রুজলে তাঁর দুটি ঝাপসা হয়ে যেত তবুও তিনি চোখ ফেরাতে পারতেন না। অলিন্দের প্রাচীর-গায়ে একটা অতি ক্ষুদ্র ফটিক-খণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা তাজমহলের পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখতে পেলাম। গাইড বললে, সত্রাটি কখনও কখনও এই ফটিক-খণ্ডের মধ্য দিয়ে তাজমহলকে দেখতেন। মনে হ'ল বাদশাহী আমলে নিশ্চয়ই এখানে কোনও সূর্য্যবান প্রস্তর গাঁথা ছিল, তা অপভ্রুত হওয়ায় এখন সে স্থানে কাচ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মহলটি মোগলের পৌরবসুগের শেষ অধ্যায়ের স্বাক্ষর বকে নিয়ে আজও বিদ্যমান।

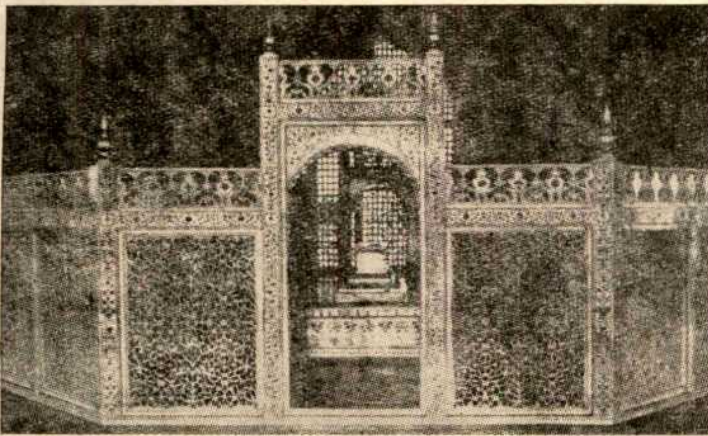
দেওয়ানী বাসের দরবারী-মহল যেন দূর থেকে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। প্রকাণ্ড দরবারী মহলের আনাচে কানাচে আমরা ঘুরে বেড়ালাম। একদিন এ স্থান কত না



নমতাজের সমাধি

উপবেশন করলাম। কি রমণীর স্থান! চতুর্দিকের তরু-বীধিকা থেকে ভেসে আগছে স্নিগ্ধ বায়ুবাহিত পাখীর কুজন; মাথার উপর মুক্ত নীলাকাশ, পাখের নীচে পাথরে বাঁধানো শীতল বেদী, চতুর্পার্শ্বে গভীর প্রশান্তি। একান্ত নির্মমভাৱে জায়গাটি ধর্মময় করেছে। অতীতে গ্রীষ্ম-কালের সান্নাৎবেলায়, বেগম সহ বাদশাহাদারা এই স্থানে বসে বিশ্রাম করতেন। কোথায় হারিয়ে গেছে সে সকল দিন। আজ আমরা কয়েক জন ভ্রমণ-বিলাসী সেই শূন্য আসনে বসে তিন শত বৎসরের অতীত ইতিহাসের পানে দৃষ্টিপাত করছি; বিগত দিনের মহিমাকে প্রত্যক্ষ করছি মনস্তক্ষে।

মন্দির মসজিদের ঐশ্বর্য্য সত্যই বিস্ময়কর। এই গুরুত্ব প্রাপ্ত প্রাচীর-বেষ্টিত বৃহৎ ভবনালয়টি আগাগোড়া খেতপ্রস্তরে নির্মিত। এর গঠনে শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার নিদর্শন পরিলক্ষিত না



তাজমহলের জালির পর্দার সুন্দর কারুকার্য

আমীর-ওমরাহদের আলাপ-আলোচনার মুখর ছিল। আর আজ সেই স্থান মহাশূন্যতা বকে নিয়ে নির্জীবের মত পড়ে রয়েছে; মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ উত্তীর্ণমান চামচিকাগুলো এই নীরবতা ভঙ্গ করেছে। এই ভবনটি দুর্দ্ববল খেত প্রস্তরে নির্মিত। এখানেও প্রাচীর-গায়ে মহারাজ রক্তরাজি বলমল করেছে—কত বিচিত্র বর্ণ ও গঠনের সে সব মণি-মাণিক্য। দরবার-সংলগ্ন উত্তানের মর্দরাসনে আমরা কিছুক্ষণের জন্ত

হলেও এই বিরাট পরিবেশের মধ্যে এতদ একটা শান্ত গাভীর্য্য ও মুক্ত ঔদার্য্য বিরাজ করেছে যা মনকে স্বতঃই আকৃষ্ট করে, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত প্রশান্তি চকল চিতে হৈর্দ্য্য দান করে। মন্দির মসজিদ ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সত্রাটি শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত হয়। এর নির্মাণ-কার্য্যে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয় এবং এতে সাত বৎসর সময় লেগেছিল। উদ্বুদ্ধ উত্তানে খেত প্রস্তরাসনে এক সপ্তে ৫৭০ জন পুরুষ ও

২০ জন মারীর প্রার্থনার যোগবাসের দ্বিত্ব নির্দিষ্ট আসন সং-
রক্ষিত ছিল। কিন্তু আওরকজেব পিতাকে বন্দী করার পর
আর তাঁকে উপাসনা করবার জ্ঞান এখানে আসতে দেখি, তাঁর
অন্য সীমা মসজিদ নামে একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ
করে দিয়েছিলেন। মসিদা নামে এখানে আর একটি মস-
জিদ আছে। এর পূর্বদেশে পিতলের গম্বুজগুলি দেখতে ভারি
সুন্দর। মহাযজ্ঞের পররৌজ্জে যখন এই গম্বুজের পূর্বগুলি
বন্ধক করে গলে তখন এক অপূর্ণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়।

দুর্গ পরিষ্কার করে বহুদণ কাটল। আর সময় দেই, এবার
আমাদের কিরতে হবে। মহলের পর মহল পার হয়ে
আমরা এসে দাঁড়ালাম দুক্ত প্রাঙ্গণে। সমুখে বিরাট পাথর-
দৌর, পদতলে ভায়ল তণ্ডুলি। এক দিকে পাথর ঐশ্বর্য,
অপর দিকে প্রকৃতির অপাথিব সৌন্দর্যপ্রিয়তা—এই দুইয়ের
অপূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিল সম্রাট শাহজাহানের জীবনে। মনে
হ'ল এই মাটির গভীরে, এখনও হরত তকিরে আছে তাঁর শেষ
জীবনের কয়েক কৌণ্টা অশ্রুবিধু।

শিক্ষা-বিষয়ে বেতারের কার্যকারিতা

তীহরিহর শেঠ

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিশুশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ-
শিক্ষার ক্ষেত্র পর্যন্তও যে ভাল ভাবে শিক্ষা দিতে পারা যায়
একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং তাহার ব্যবস্থা হওয়া
উচিত এ সম্বন্ধেও ব্যক্ত হইতে দেখা যায়, কিন্তু এতাবৎ
সে বিষয়ে কোন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আর
বেতারের মাধ্যমে শিক্ষা-প্রবর্তন সম্পর্কে তেমন কিছু শুনা
না গেলেও প্রকারান্তরে যে তাহা হইতেছে তাহা গান-
শিক্ষা, সীবন-শিক্ষা, হিন্দীশিক্ষা, রত্নশিক্ষা প্রভৃতির
ব্যবস্থা হইতে বেতারের নিয়মিত জ্ঞোতা মাঝেই অবগত
আছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বেতার যে সজীভ-
শিক্ষার পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক মাধ্যম একথা বোধ হয়
কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং
দেখা যাইতেছে, যে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত-সমাজ
উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা কার্যে পরিণত করিবার প্রয়াস
নাই।

বেতারযন্ত্রকে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যাপারের অঙ্গ
হিসাবে ব্যবহার করিলে কত সহজে স্বল্পবয়ে সুষ্ঠু ভাবে
নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন দ্বারা শিক্ষা-জগতে যে যুগান্তর
আনয়ন করা সম্ভব তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই উপলব্ধ
হইতে পারে। এই বিষয়টির প্রতি বাহাতে দেশের শিক্ষা-
হুরাগীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেই আশায় আমার এই সামান্য
প্রয়াস। এ সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা যে ভুলভ্রান্তিশূন্য
তাহা আমি মনে করি না। তবে যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ-
যোগ্য বিবেচিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ ইহার সাফল্যের জন্য
তৎপর হন, তাহা হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অনেক সুযোগ
সুবিধার সৃষ্টি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার মনে হয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অন্তর্গত স্কুল-কলেজের কতিপয় শ্রেণীতে শিক্ষকের বিনা
সহায়তায় বেতার-যন্ত্র সহযোগে বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত
প্রভৃতি সাহিত্য, ইতিহাস, স্বাস্থ্যনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি এবং
যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে যে যে শ্রেণীতে যতটুকু বিজ্ঞান
শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা এবং হয়ত বা লজিক, দর্শন, অর্থ-
নীতি প্রভৃতিও বেশ শিক্ষা দিতে পারা যায়। এই ভাবে
অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইলে নিম্নলিখিত
বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করা আবশ্যক

(১) কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে :
এ সম্পর্কে আমার মত পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। এ বিষয়টি
মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত
বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা স্থির করিবেন।

(২) কোন্ কোন্ শ্রেণীতে এই ভাবে শিক্ষা দিতে
পারা যায় : আমার মনে হয়, স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীতে
এবং কলেজের নিম্ন শ্রেণীতেও হয়ত বেতার-মাধ্যমে শিক্ষা-
দান করা চলিতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন কোন
বিষয়ে সাহায্যের জন্য, বিশেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীরা বাহাতে
অমনোযোগী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার এবং বাল-
স্কুল চাপল্যবশতঃ তাহার নিয়ম ও শৃঙ্খলাবিরোধী আচরণ
না করিতে পারে তাহা পর্যবেক্ষণের জন্য একজন শিক্ষকের
উপস্থিতি ও সহায়তা প্রয়োজন। সুতরাং সে ক্ষেত্রে এ
ব্যবস্থায় ব্যয়ভার লাঘবের কথা আসে না।

(৩) কি উপায়ে স্কুল-কলেজসমূহে শিক্ষা দেওয়া
হইবে : এজন্য প্রথমে প্রয়োজন যে যে শ্রেণীতে যে যে
বিষয় বেতারে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার নিমিত্ত মাধ্যমিক
শিক্ষা পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বেতার ক্রানের জন্য
নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত এবং বিজ্ঞাপিত করা। যেমন, নবম

শ্রেণীর ইতিহাস ৪র্থ পিরিয়ড, ১২টা হইতে ১টা। ইংরেজী ৫ম পিরিয়ড ১১টা হইতে ২টা। এইখানে বলা দরকার যাবতীয় বিদ্যালয়ে একই পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যিক। অবশ্য স্কুল ফাইনাল, আই-এ, বি-এ—এ সকলের জন্য প্রায় একই পাঠ্য পুস্তক স্থির করা থাকে।

(৪) বিদ্যালয়ে বেতার-সাহায্যে শিক্ষাদানের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যিক : প্রথমই দরকার একটি বা দুইটি করিয়া বেতারযন্ত্র সংগ্রহ করা এবং রেডিও ক্লাসের জন্য একটি করিয়া স্বতন্ত্র বা অন্ততঃ পক্ষে পাথের কক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া রাখা।

(৫) মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয় : বেতারে শিক্ষাদান সম্পর্কিত সকল বিষয়ে ইতিকর্তব্য স্থির করিবার দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের। বেতার বিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থনিপুণ, বেতারে শিক্ষা দিবার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করা তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য। তা ছাড়া একই সময়ে বিভিন্ন 'ওয়েভে' কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া চলিতে পারে তাহা জানিয়া সুচিন্তিত রুটিন প্রস্তুত করা, এই কার্যের উপযোগী বেতারযন্ত্র যাহাতে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিদ্যালয়সমূহ পাইতে পারে কোন কোম্পানীর সহিত তাহার ব্যবস্থা করা, যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নাই সেখানকার জন্য যেরূপ যন্ত্র আবশ্যিক তাহা পাইবার ব্যবস্থা করা। এ সকল বিষয় তাঁহাদের কর্মতালিকার অন্তর্গত।

(৬) যিনি রেডিও ট্রেনিং হইতে শিক্ষা দিবেন তাঁহার কর্তব্য : এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা। তিনি যে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতেছেন এ বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকিয়া ধীরে ধীরে বারংবার এক কথা বলার দৈর্ঘ্য থাকা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যিক এবং দরকারমত বলার মাঝে মাঝে ছাত্রদিগকে লিখিয়া লইবার মত সময় দেওয়াও তাঁহার কর্তব্য। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশে পাঠ্যপুস্তক সম্মুখে খুলিয়া পাঠ গ্রহণ করিতেও পারিবে। বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলি সচিত্র হইলে এবং চিত্রগুলিতে যদি ক্রমিক সংখ্যা থাকে তবে বুঝাইয়া দিবার সুবিধা হয়।

বেতারের সাহায্যে অতি সহজে নীতিবিষয়ক শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ ভাবে উপদেশাদি দেওয়া যাইতে পারে এবং একসঙ্গে সমগ্র শিক্ষালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাহা গ্রহণ করিতে পারে। এমন কি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে নির্দিষ্ট মানচিত্র বা অন্যান্য চার্ট টাঙ্গাইয়া ভূ-গোল, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াও চলিতে পারে। যদি বেতারের সাহায্যে কলেজের শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলেও এ বিষয়ে সহজসাধ্য এবং নতন নতন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে।

ইহার প্রবর্তন মনে হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষা-গ্রহণ অপেক্ষাকৃত প্রীতিকরই হইবে, স্বতরাং তাহাদের মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হইতে পারে। আর ব্যয়-লাঘব হইবে এই অর্থে যে, যে সময়টা বিনা শিক্ষকে বেতারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে, সে সময়ের জন্য শিক্ষকের পারিশ্রমিক দেওয়া বাঁচিয়া যাইবে। মোটামুটি বাংলায় যদি কম-বেশী দুই হাজার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থাকে, সেগুলিতে দুই বা তিন ঘণ্টা বিনা শিক্ষকে কাজ চালাইলে সমষ্টিগত হিসাবে যে ব্যয়ভার লাঘব হইবে তাহা নিতান্ত অল্প নহে। এখানে বেতারের সাহায্যে শিক্ষাদাতার পারিশ্রমিকের কথা মনে হইতে পারে। তাঁহাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক অবশ্যই দিতে হইবে। এক দিকে তাহা যেমন দিতে হইবে অন্য দিকে তেমনি সে সময়টার জগ্ন অন্যকে বাহা দিতে হইত সেই খরচটা বাঁচিয়া যাইবে। আর যদিই দিতে হয়, তাহা হইলে বেতার পরিচালনা ও পারিশ্রমিক বাবদে বোধ হয় প্রত্যেক স্কুলের মাসিক দুই টাকার অধিক ব্যয়বৃদ্ধি হইবে না।

কি শিক্ষানীতি, কি বেতারযন্ত্র এতদুভয়ের কোন বিষয়েই আমি বিশেষজ্ঞ নই। তবে শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করিতে করিতে ইহার সৌকর্য্যবিধান সম্বন্ধে যে সকল কথা মনে হইয়াছে তাহা বলিবার চেষ্টা করিলাম। আজিও আমাদের দেশে বেতারে শিক্ষাদান সম্পর্কে কোন প্রচেষ্টার কথা শুনা যায় নাই, কিন্তু যদি বাস্তবিকই ইহা দেশ ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর বিবেচিত হয় তবে শিক্ষানুরাগীদের এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করি।



গান

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল

সাহানা—কাওয়ালী

অন্তরবাসি, জাগো তুমি জাগো—

আঘাত দিয়ে মোরে জাগাও

অন্তরে বল কাছে আছে

তুমি জাগো !

একা আমি নই ক্ষণতরে

তুমি আছ তব্ব মন ভরে

প্রতি কায়া-মন্দির পূর্ণ করে

সুন্দর দেবতা বিরাজে !

তুমি জাগো !

বাহিরে বাহিরে ঘুরে মরি

মাথা ঠুকি 'স্বথ' 'স্বথ' করি,

তুমি বলি' দাঁও মোরে নেই স্বথ,

স্বথ শুধু ধোয়ানে তোমারি !

কবে হবে জাগরণ মম

ফুটিব সে শতদল সম

ভক্তি-প্রেমে নহ্ন হয়ে

চরণে প্রণাম হয়ে রব

তুমি জাগো ॥

II সা -১ সা সা | রা -০ রা -সা I রা -পা মা -জ্ঞা | -১ -১ -১ -১ I
অ ন্ ত র বা ০ সি ০ জা ০ গো ০ ০ ০ ০ ০

II

মা মা রা -১ | সা -১ -১ -১ I সা গা -১ ধা | গা -১ ধা পা I
তু মি জা ০ গো ০ ০ ০ আ বা ত্ দি য়ে ০ মো রে

ধা -মা পা -১ | -১ -১ -১ -১ I সা -১ সা সা | রা রা রা সা I
জা ০ গা ০ ০ ০ ও ০ অ ন্ ত রে ব ল কা ছে

রা -পা মা -জ্ঞা | -া -া -া -া I মা মা রা -া | সা -া -া -া II
 আ ০ ছো ০ ০ ০ ০ ০ তু মি জা ০ গো ০ ০ ০

[না না] [সী নসী -রী]
 II { মা পা না না | না -া না না I না -সী সী -া | -া -া -া -া I
 { এ কা আ মি ন ই ক্ষ ণ ত ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

পা গসী সী সী | সী সী সী সী I নসী -রী রী -া |
 তু মি আ ছ ত হু ম ন ভ ০ ০ রে ০

-া -া (-জ্ঞরী -জ্ঞরী) } I -া -া I সী রী সী সী | সী -া পা পা I
 ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ প্র তি কা য়া ম - ন্দি র

ধা -সী পা ধা | পা -া -া -া I সা -া -া সা | রা রা রা সা I
 পূ - ০ ণ ক রে ০ ০ ০ স্ত ন্দি র দে ব তা বি

রা -পা মা -জ্ঞা | -া -া -া -া I মা মা রা -া | সা -া -া -া II
 রা ০ জো ০ ০ ০ ০ ০ তু মি জা ০ গো ০ ০ ০

II { পা পা পা পা | না না না না I না -সা সা -া | -া -া -া -া I
 { বা হি রে বা হি রে ধু রে ম ০ রি ০ ০ ০ ০ ০

পা সা সা সা | সা -া সা -া I নসা -রা রা -া | -া -া -া -া I
 মা থা টু কি স্ত থ্ স্ত থ্ ক ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০

স্মা মা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -মা মা মা I মা -পা পা -া | -া -া -া -া I
 তু মি ব লি' দা ও মো রে নে ই স্ত থ্ ০ ০ ০ ০ ০

মা -জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা মা মা মা I রা -া সা -া | -া -া -া -া } II
 স্ত থ্ শু ধু ধে য়া নে তো মা ০ রি ০ ০ ০ ০ ০

[না না] [সী নসী -রী]
 II { মা পা না না | না না না না I না -সী সী -া | -া -া -া -া I
 { ক বে হ বে জা গ র ণ ম ০ ম ০ ০ ০ ০ ০

পা পর্সা সী সী | সী সী সী সী I নর্সা -রী রী -া |
 ফু টি ব সে শ ত দ ল স ০ ০ য ০
 -া -া (-জর্সা -জর্সা) } I -া -া I সী -রী সী সী | সর্গা -া -া -া I
 ০ ০ ০০ ০০ } ০ ০ ভ ক্ তি প্রে মে ০ ০ ০
 ধা -সী গা ধা | পা -া -া -া I সা সী সা সা | রা -া রা সা I
 ন ০ 'অ হ য়ে ০ ০ ০ চ র নে প্রে গা ম্ হ য়ে
 রা -পা মা -জা | -া -া -া -া I মা মা রা -া | সা -া -া -া I
 র ০ বো ০ ০ ০ ০ ০ তু মি জা ০ গো ০ ০ ০

একা

শ্রী“কুড়রাম” ভট্টাচার্য্য

চৈতন্য দিনের বেলাশেষে জীর্ণ দেহধানি
 এনেছি আজ শীর্ণ নদীকূলে,
 চেয়ে আছি ঘাটের ধারে, পারের তরী যত
 একে একে চলছে হেলে হলে।

ক্লান্ত রবি দিগন্তের ঐ পারে
 ছাত্ত্বানিতে ডাকছে বারে বারে,—
 বেলা যে নাই, নাইক সময় আর,
 নামুলো ছায়া স্তম্ভধরগীর 'পরে;
 ভাবছি বসে নদীর কূলে একা
 কেমন করে ফিরবো আপন ঘরে।

গোধূলিতে ধূসর মলিন দেহ
 রাখালেরা কিরছে ঘরের টানে,
 উদাস প্রাণে বাজিয়ে বাঁশের বাঁশী
 মেঠো হাওয়া মাতিয়ে বাউল-গানে।

চলার পথে সঙ্গে এলো যারা
 অবেলাতে কেউ দিল না সাড়া;
 সবাই শুধু মত্ত আপন কাজে,
 আমার পানে চোখ মেলে না কেহ,
 একলা আমি নদীর বালুচরে
 ভাবছি বসে লয়ে মলিন দেহ।

অশ্রু ভরুর শীর্ণনাথ হ'তে
 শেষ পাতাটি ঐ যে বিদায় রাগে,
 আকাশভরা লক্ষ তারার মাঝে
 একটি ভায়া আপন মনে রাগে।

নিবিড় হলো সাঁঝের কালো ছায়া,
 ডাকছে শিবা লুকিয়ে আপন কান্না;
 আঁধার 'হেরি' উভন্ত ঐ পাবী
 ফিরছে কুলার কাঁপিয়ে কালোপাখা,
 নদীর ধলে ছড়িয়ে রূপের আলো
 চাঁদের ছায়া ডুবছে আঁকা-বাঁকা।

বারেক দেবি পিছন ফিরে চাহি'
 তিমির ঢাকা পথের রেখাপানে।
 “কেয়ার পথে কে আছে মোর সাথী?”
 আকুল হয়ে ডাকছি কাতর প্রাণে।

সে ডাক আমার কিরেই শুধু আসে,
 ছুরু ছুরু, প্রাণ যে কাঁপে জ্বালে;—
 এই পারেন্তে সন্ধ্যা হয়ে এলো
 পারের তরী ফিরবে কখন ঘাটে?
 একলা বসে সারা সকাল-সাঁঝে
 আপন মনে দিনগুলি মোর কাটে।

চিরবিলুপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রূপকথায় পথিলুপ্ত রাজপুত্র বর্জক অরণ্যমধ্যে অট্টালিকা ও তদধিষ্ঠাত্রী কোন রাজকন্যার আবিষ্কারবার্তা বালক-বালিকাদের চিত্ত যেমন আকৃষ্ট করে, তেমনই সময়ে সময়ে বিশাল অরণ্যসদৃশ সংস্কৃত গ্রন্থরাশির মধ্যে অশ্রুতপূর্ব গ্রন্থের আবিষ্কার গবেষকের শ্রমকাতর চিত্তে অমৃত-সিঞ্চনের কাজ করে। বর্তমান প্রবন্ধে এইরূপ একটি অপূর্ব আবিষ্কারের কথা সংক্ষেপে লিখিত হইল। ছয় বৎসর পূর্বে মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত এক স্থবিধাত পণ্ডিত-প্রবরের অনুরোধে তাক্সোরের 'সরস্বতী মহাল' পুথিশালা হইতে "প্রেমরসায়ন" নামক একটি গ্রন্থের অল্পলিপি আমবা আনাইয়াছিলাম।^১ আমাদের ধারণা ছিল, ইহা বোধ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মহাপ্রভুর মতাবলম্বী কোন গোষ্ঠামি-রচিত গ্রন্থ। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, গ্রন্থকার 'বিশ্বনাথ পণ্ডিত' চৈতন্যমতাবলম্বী ছিলেন না—তিনি সম্পূর্ণ পৃথক্ এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক এবং এই চিরলুপ্ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থরাশির মধ্যে বোধ হয়, এই একটি মাত্র নিবন্ধই আবিষ্কৃত হইল। ইহা গণপত্নাত্মক একটি 'প্রকরণ' (৫০ পাত্রে সম্পূর্ণ) মোট ২১২ কারিকা ও তাহাদের গণাত্মক ব্যাখ্যা। মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ব্যাজস্ততিরূপে রচনা করিয়া গ্রন্থকার কবিত্ব দেখাইয়াছেন :

কীর্তিপ্রভাপ-বিধুভাঙ্গসমুজ্জ্বলানি
বীরৈঃ কুভামি বদনানি দিশাং প্রযম্ব।
সুব্যক্ত-গোপবনিতাননহনান্দপাত-
পাঠৈকরূপভিমিরাপি ময়া হু ভানি ॥

(অর্থাৎ, পণ্ডিতেরা যে দিগ্‌বধুদের বদন কীর্তিচন্দ্র ও প্রতাপসূর্য্যের আভায় সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন আমি প্রযত্নপূর্ব্বক তাহা তিমিরাবৃত করিয়া দিলাম, গোপিনীগণের দৃষ্টিপাতের একমাত্র পাত্রটির আয়কপদ্বারা)। ব্যাখ্যাটি অতি সংক্ষিপ্ত :

"ইহ কশ্চিদগ্রহায়ন্তে প্রেম নিরূপয়িতুং প্রেমাতিশরাস্তি-
ব্যক্তকর্ম্মেণ শ্রীকৃষ্ণং নির্দিশতি কীর্তীতি। অত্র ব্যাজস্ততির-
লংকারঃ। যতপি নায়ং কবিরদোংকর্ম্মমাবেদয়ন্ গ্রহায়ন্তে

১ তাক্সোরের পুথিশালা হইতে পুথি বার দেওয়া হয় না, কিন্তু অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে পুথির নির্ভরযোগ্য অল্পলিপি পাওয়া যায়। বাংলাদেশে পুথিশালাগুলিতে এইরূপ স্থবিধা কুত্রাপি নাই। বাতালী জাতি সর্ব্ববিষয়ে পক্ষাৎপদ হইয়া যাইতেছে।

নিবন্ধমর্হিঃ তথাপ্যেতদ্রূপকার্ষত শ্রীকৃষ্ণকতানভারূপশ্চ প্রকৃত-
গ্রন্থপ্রতিপাত্তপ্রেমনিরূপণোপযোগিত্বাৎ সোর্হ এব নিবন্ধুম্।"

গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনা দ্বিতীয় শ্লোকে আছে :

উচ্ছলদ্যাবকল্লোল-শৃঙ্গারাদিরসাকরঃ।

জয়তাপারো গন্তীরশ্চিরং প্রেমমহার্ণবঃ ॥

ব্যাখ্যা—উচ্ছলন্তোহহমহমিকরা ইব-ব্যাক্তীভবন্তো তাব-
লক্ষণাঃ কল্লোলা বৃহত্তরঙ্গা যেনু শৃঙ্গারাদিরসেনু ভেদামাকরঃ,
প্রেমশৃঙ্গেরসানামনাবির্ভাবাৎ। অত্র ভাবাঃ কল্লোলপদসামা-
নাধিকরণাদ্য ব্যাভিচারিণোহহুভাবাক্ত গৃহ্যন্তে।-অপারঃ ইতর-
চেতোবৃত্তিবং কালরোপানান্তরাৎ। গন্তীরঃ বিরোধিনন্তৎসময়ে-
হহুভাবাৎ কথঞ্চিদুদ্ভবেপি ভেদানন্তিভবাৎ।...অতএব জয়তি,
যুক্তিহেতুজ্ঞানে এবাত্ত বিশ্রান্তেঃ)।

লক্ষ্য করা আবশ্যক, গ্রন্থকার 'কশ্চিৎ' বলিয়া স্বকীয় নাম এ স্থলে গোপন করিয়াছেন। গোপীপ্রেমের বিশ্রাস্তি যুক্তিহেতু জ্ঞানে—একথা চৈতন্যসম্প্রদায়ের দ্বিহাস্ত-বিরোধী। গ্রন্থশেষে চারিশ্লোকে গ্রন্থকার মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

চিরন্তনগ্রন্থসমুচ্ছতোশো ব্রহ্মোপি সত্তাবমকল্পবল্লিঃ।

নানামতব্যাক্তিফলিবকো নির্দন্তবিধমুদমাভমোহু ॥১

অর্থাৎ, এই নিবন্ধে নানা মতের ব্যাখ্যা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদুজং বহন্তিএ 'হুঃ' "হুজ-ভজায়তাদিভিঃ"।

তদেবানুদিতং কিঞ্চিৎ ময়া স্বহৃদ্বিভম্ ॥২

অর্থাৎ—হুজ, ভজায়ত প্রভৃতি গ্রন্থে যাহা সন্নিহিত রণিত হইয়াছে তাহারই কিয়দংশ মৎকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, নিজের কথা ইহাতে নাই।

অননং বজ্র শক্তানামপি স্তন্থেহপিচ্ছিলে।

পথি ভজ মশান্তবতংসন্তেহ কা কথ্য ॥৩

চিত্তবৎসেন সংযোজ্য দোজ্য যদি মিলিচ্ছতি।

তর্হি গৌরহ্যভপ্রেমদুর্গমেষা প্রদান্ততি ॥৪

পুঙ্খিকা যথা :

ইতি শ্রীবিশ্বনাথপণ্ডিত-বিরচিতং তজ্জায়তমভাঙ্গমারি
প্রেমরসায়নং নাম প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রধানতঃ দুইটি—প্রেমশব্দের বিস্তৃত
লক্ষণ বিচার ও দ্বাদশবিধ প্রেমভেদের উদাহরণসহ বর্ণনা।
এই পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের 'হুজকার' ছিলেন শান্তিল। যথা :

সংযোগেপি পদার্থস্ত যদ্বিযোগোপলব্ধম্ ।

শাণ্ডিল্যঃ স্বরূপং গ্রাহ ভদেব প্রেমলক্ষণম্ ॥ (১১ কারিকা)

ব্যাখ্যাস্থলে মূল সূত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে, “যোগে বিযোগ-বৃত্তিঃ প্রেম”তি । এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে, শাণ্ডিল্যের ‘ভক্তিসূত্র’ এই সূত্রাত্মক গ্রন্থ হইতে পৃথক—ভক্তিসূত্রে এই সূত্র নাই । বোধ হয়, ‘প্রেমসূত্র’ নামে শাণ্ডিল্যরচিত গ্রন্থ ছিল, যাহা অত্য়পি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি । “তত্ত্বামৃত” গ্রন্থ এই অজ্ঞাতপূর্ব শাণ্ডিল্যসূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ । উদ্ধৃত সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে পাওয়া যায় : ‘বৃত্তিবর্তনং, বিযোগে বর্তনমর্থাজ্ঞানশ্চ, বিযোগশ্চ বর্তনমবস্থিতির্বা । বিযোগবৃত্তিরিতি তত্ত্বামৃতকারোক্ত ব্যাচখ্যো’ । যে সকল প্রেমলক্ষণ খণ্ডিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটি হইল ভরতকৃত :

দ্রবাবস্থেব চিত্তস্ত প্রেমোতি ভরতোহত্রবীণ । (১৪ কারিকা)

এই দ্রবাবস্থাবোধের উপায়ই হইল স্বেদাদি অষ্টবিধ সাত্বিক ভাব (১৯-২০ কারিকা) । প্রেমের সিদ্ধান্তলক্ষণ যথা, ইচ্ছাবিশেষঃ প্রেমোতি গুপ্তপাদার্থ্যসংমতম্ (৩৮ কারিকা) । এই গুপ্তপাদার্থ্যই তত্ত্বামৃতকার এবং এই সম্প্রদায়ের পরম প্রামাণিক পুরুষ । তাঁহার বহুতর সন্দর্ভ এই প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে । দুইটি প্রদত্ত হইল :

“চিরকালাবস্থান্বিতরূপা গাঢ়তা তু ন বাচোতি “গুপ্তপাদা-চাঠ্যেমেব তত্ত্বামৃত্তে অভিহিতম্ ।” (৩৫১ পত্র)

“অত্র বহুনি প্রেমমূলবচনানি তত্ত্বামৃত্তগ্রন্থাদ্ জ্ঞেয়ানি, বিস্তরতন্ময় লিখ্যন্তে ।” (৪০১২ পত্র) ,

এই সম্প্রদায়-প্রবর্তক আচার্য্যের পরিচয়াদি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । বলা বাহুল্য, তিনি কাশ্মীর-নিবাসী বিখ্যাত আলঙ্কারিক ও শৈবগমরচয়িতা অভিনবগুপ্তাচার্য্য নহেন । কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক, আনন্দাশ্রম-প্রকাশিত ‘শঙ্কর-দিগ্ বিজয়’ গ্রন্থানুসারে শাক্তভাষ্যকার অভিনবগুপ্তের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিচার হইয়াছিল কামরূপে; কাশ্মীরে নহে (১৫ সর্গ ১৫৮ শ্লোক) এবং গোড়নিবাসী মুরারিমিশ্র ও উদয়ন ভিন্ন এক “ধর্মগুপ্তমিশ্র”কেও শঙ্করাচার্য্য বাদে পরাস্ত করিয়াছিলেন । এই সকল প্রমাণবিরুদ্ধ উক্তির কোনই মূল্য নাই বটে, কিন্তু পূর্বাঞ্চলে গুপ্তনামক এক প্রধান আচার্য্যের ক্ষীণস্থিতি এইরূপ বিকৃতাকারে বাচিয়া ছিল বলিয়া আমরা মনে করি । কাব্যপ্রকাশের বহু প্রামাণিক টীকাকার অভিনবগুপ্তকে বিখ্যাত গোড়ীয় গ্রন্থকার ভবদেব ভট্টের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছিলেন (সা. প. প. ৫২, পৃ. ১০০-২; I. H. Q., xxii, p. 135) —এই আশ্চর্য্য কথাও এ সম্পর্কে স্মরণীয় । গুপ্তনামক এক তান্ত্রিকের নাম প্রামাণিকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে নৈষধকার শ্রীহর্ষের

‘স্বৈর্য্য-বিচার’ প্রকরণে—তিনি ছিলেন শ্রীহর্ষের গুরু চিৎখিলাসের প্রতিদ্বন্দ্বী, অর্থাৎ প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক (I. H. Q. xxii, p. 148) । কিন্তু তাঁহাকে তত্ত্বামৃত-কারের সহিত অভিন্ন ধরার কোন প্রমাণসূত্র আবিষ্কৃত হয় নাই ।

প্রেমের বিভাগ দুইটি আখ্যাঙ্কনের কারিকায় উল্লিখিত হইয়াছে :

উপ্তং ষত্তং ললিতং দলিতং মিলিতং তথা কলিতং ।

হলিতং চলিতং ক্রান্তং বিহতং গলিতং চ সংতপ্তম্ ।

এতদ্বাদশভেদং প্রেম নিকৃৎ “রসামৃত্ত”-গ্রন্থে ।

বয়মপি লক্ষণভোজ ব্যাখ্যামেতত্ত্ব সংতপ্তমঃ ।

(৭৯-৮০ কারিকা)

এই বিভাগ অজ্ঞাতপূর্ব এবং যে প্রমাণগ্রন্থের নামোল্লেখ রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, ভক্তিরসামৃত্তসিদ্ধি প্রভৃতি চৈতন্যসম্প্রদায়ের কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নহে । এই সকল বিভাগের বিস্তীর্ণ আলোচনার পর গ্রন্থশেষে (৪৪-৫০ পত্র) দার্শনিক মুক্তিবিচার ও তার্কিক-বেদান্তাদিমতের খণ্ডন-পূর্বক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছে—এই অংশ বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ । স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের যুক্তি যে ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে তদ্বারা বুঝা যায় তিনি নব্যন্যায়ের কৃত-বিদ্যা ছিলেন—“সমানাধিকরণদ্বঃসমানকালিকত্বাত্য-স্তিকত্বস্ত দুঃখসামগ্র্যভাবনিবন্ধনতয়া নাত্যন্তিকত্বাংশেপি তত্ত্বজ্ঞানোপযোগঃ” (৪৬.২ পত্র), “বাচ্যতাভেদকে লাঘবাদিতি ভাবঃ” (৪৭.২ পত্র) প্রভৃতি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য । এতদ্বারা প্রমাণিত হয়, গ্রন্থকার “বিশ্বনাথ পণ্ডিত” খ্রী. ১৫শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহেন এবং বেশী পরবর্তীও নহেন । কারণ “পণ্ডিত” উপাধি বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীর পরে আর প্রচলিত ছিল না—কৃত্তিবাস পণ্ডিত, শ্রীকান্ত পণ্ডিত, কামদেব পণ্ডিত প্রভৃতি অনেকেই ১৫শ শতাব্দীর লোক । বলা বাহুল্য, এই উপাধি একমাত্র বাংলাদেশেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, মিথিলায় নহে এবং নব্যন্যায়ের প্রবীণতা গোড় মিথিলার বাহিরে তাঁহার অবস্থিতি সূচনা করে না । এই প্রকরণে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের বর্ণালুক্কমিক সূচি ও কতিপয় সন্দর্ভ প্রদত্ত হইল :

কৃষ্ণকল্পক্রম (১৪:১, ১৮:২, ১৯:২, ৪২:১) —একটি প্রধান প্রমাণ গ্রন্থ । যথা :

তত্ত্বজ্ঞানতুর্বা গদিতঃ কৃষ্ণকল্পক্রমাদিহু । (৬০ কারিকা)

তৎপর ‘কৃষ্ণকল্পক্রম’স্থাঃ কারিকা আঃ—(৬১-৬৬ কারিকা)

নিত্যং প্রেমপরীতাত্মা কদাচিৎ প্রেমমোহিতঃ ।

কৃত্তিমপ্রেমযুক্তস্ত প্রেমোদারশতভূষণঃ ॥

চত্বারঃ প্রেমভক্তাঃ স্যুস্তজ্ঞাতো গোপিকাগণঃ ।

নৈভস্ত বিপ্রলভ্যন্তি কৃষ্ণপ্রেমসমাধিনা ॥

যিভীষঃ শুকদেবাদিঃ সমাধিহেদদর্শনাং ।

ঈষৎপ্রেমি হঠাচ্ছিত্তং চিরং যেম নিবেশ্যতে ॥

সঃ স্তাত্ত্বীঃ সোপি স্তাদ্বিবিষন্তজ চাধিমঃ ।

বিষয়ন্ত বিরোধেনাবিরোধেনাপি চেতয়ঃ ॥

প্রহ্লাদাদিমুখ্যস্ত অঙ্কনামিত্ত্বাপরঃ ।

গৌণীমুখ্যামুজ্ঞানং যথো নৈকভমোপাধং ॥

ইতি পৌচতি যো নিত্যং প্রেমোদারঃ স উচ্যতে ।

যথা খুঁটিরো রাজ্যেভ্যং তত্তত্বত্বয়ম্ ॥

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বে হইতেই ভক্তিমার্গের নানা সম্প্রদায় বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিল—আলোকবর্তিকার ন্যায় এই সকল নবাবিষ্কৃত কারিকা সেই অন্ধকার যুগের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

কৃষ্ণচৈতন্যগোস্বামী (১৭২) —“কৃষ্ণচৈতন্যগোস্বামিনস্ত ভক্তিরত্নে, অধীরসম্বোধীরসম্বোধী ধীরধীরসম্বোধেতি প্রেমধারান্ত ত্রেধা ভেদমাদর্শয়ন্তঃ প্রেমবিষয়বিজ্ঞেযে প্রাপ্তস্ত পক্ষত্রয়ং ব্যবস্থিতমন্তীতি বিশেষমুচিরে।” মহাপ্রভুর পূর্বে অবিকল ভগ্নমধারী একজন “গোস্বামী” ছিলেন এবং তৎ-রচিত ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থ ছিল ইহা আশ্চর্য্য আবিষ্কার সন্দেহ নাই। ‘কৃষ্ণচৈতন্য’ নাম যে তৎকালে প্রচলিত ছিল, কুলপঞ্জী হইতে তাহার একটি মূল্যবান নিদর্শন আমরা উল্লেখ করিতেছি। নবদ্বীপাধিপতি ভবানন্দ মজুমদারের পিতামহ কাশীনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল বাণীনাথ। বাণীনাথের পাঁচ পুত্র “ভবানন্দ-জগদানন্দ-রায়-গঙ্গবর্ননারায়ণ রায়-পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য-কৃষ্ণচৈতন্যঃ”। ভবানন্দ মজুমদারের পিতৃব্য এই কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রায় সমকালীন ছিলেন।

গুণাকর (৯২, ৪৭২) —“ভাবচন্দ্রিকা”কার। যথা, “এতদ্ব্যক্তান্তসারিণা গুণাকরেণাপি ভাবচন্দ্রিকায়াং হাদ-সৌহাদয়ৈলক্ষণমুক্তম্” (৯২)।

শুশ্রূষাদাচার্য্য (৮১, ৩৫১) —তন্ত্রামৃতকার।

গোবিন্দ চক্রবর্তী (১২২) —“গোবিন্দচক্রবর্তিনস্ত প্রেম-কলিকায়ামিদমাহঃ

বাচব্যসমসাহস্রসংপাতেপি নিরন্তরং ।

ন হীমন্তে যদীহেতি সাত্ব ভং প্রেমলক্ষণম্ ॥ ইতি

তন্ত্রাস্তর (২২২) —তন্ত্রাস্তরোক্তমেবামৃতরোত্তর ভূমি-কাত্ত্ব বিশদয়তি।

তন্ত্রামৃত (৪১, ১৮১-২, ২০২, ৩৪১, ৩৫১, ৩৭২, ৪০২, ৪২২, ৪৫২, ৪৯)।

নামকৌমুদী (৩৪২) ।

“দূতপ্রেমা তত্র ইত্যাদৌ তু প্রেমশব্দোদ্বারাগসামান্যতঃ ।

পুরা ন জ্ঞাতং প্রেম জাতং চেৎ বিনশতি ।

যদি নশতি চেতৎ প্রেম রাগো হি কেষলম্ ॥

ইতি নামকৌমুদ্যং ক্রমোক্তেঃ ।”

নারদপঞ্চরাত্র (৪৭২) —

“গুণাকরস্ত...‘প্রেম সত্ব হরৌ লীনং স যুক্তপদবীং গতা’

ইতি নারদপঞ্চরাত্রাদিত্যাহ ।”

পরমানন্দ ঠাকুর (১৩১) —

“পরমানন্দঠাকুরস্ত প্রেমচন্দ্রিকারামৃতত্বা প্রেমলক্ষণমুদাহরণং চ সংজগদিরে। ভক্তত্বা,

বস্তব্যাপারবিষয়া সমীহা হার্দশব্দভাক্ ।

বস্তমজ্ঞাবলম্বা তু প্রেমোতি পদবীং গতা ॥

পাতঞ্জল (৪৩১) —

“আনন্দাকারভাবত্বিং বিনা স্বাভাবিকী স্বদঃ ।

অসংপ্রজাতনামায়ং ব্যক্তঃ পাতঞ্জলোক্তিমু ॥ ১৮৭ কারিকা

প্রেমকলিকা (১২২) —গোবিন্দকৃত ।

প্রেমচন্দ্রিকা (১৩১) —পরমানন্দকৃত

বিষ্ণুরহস্ত (৪০২, ৪২১) —

“ইহ ভগ্নামৃতভাবত্বং বিষ্ণুরহস্তং শ্লোকং প্রমাণত্বেদ দর্শয়তি,

অমেকজ্ঞানসংগিতঃ সংস্কৃতদ্বয়ঃ স্বধীঃ ।

কীবমুক্তদশোপেতো নাস্ত কর্তব্যমিচ্ছতে ॥”

ইতি (১৭৩ কারিকা)

“কৃষ্ণকল্পক্রমগ্রন্থত্বং বিষ্ণুরহস্তং শ্লোকমত্র দর্শয়তি,

কুরুধ্বং প্রেম মৎপ্রেমবিষয়েত্ব মদাঙ্গমি ।

আনন্দরূপে যজ্ঞান্তে ন বিরোধো যমগপি ॥” ১৮২ কারিকা

ভক্তিচিন্তামণি (৮২) —

“ভক্তিচিন্তামনোভু বিরোধবিস্তিতি অত্রস্ত বিরোধোপ-লাবহেতুত্বচিহ্নবিস্তিতিত্বার্থং বিবায় প্রাপ্তক্লেছা স্বজ্ঞাৎ এব ইতি বিবৃতম্ ।”

ভক্তিরত্ন (১৭২) —কৃষ্ণচৈতন্যকৃত ।

ভক্তিরত্নাকর (৪১, ৪৮১-২ —হরিদাসকৃত ।

ভরত (৪২) ।

ভাবচন্দ্রিকা (৯২) —গুণাকরকৃত ।

বসামৃত (১৩১) —পূর্বোক্ত কারিকা দ্রষ্টব্য ।

শাণ্ডিল্য (৩২) —সূত্রকার ।

হরিদাস (৪১, ৩৫২, ৩৭১, ৪১২, ৪৫২) —ভক্তি-

রত্নাকরকার, সম্প্রদায়ের একজন প্রধান গ্রন্থকার। “ভক্তি-রত্নাকরে হরিদাসঃ” (৪১) । তিনি তন্ত্রামৃতকারের পরবর্তী ছিলেন—

“গুণামৃতবিনী হেতুঃ সাধ্যাশুগমবিনী ।

ভক্তিরেখা বিবেচ্যাহ 'ভদ্রায়ত'কবি: স্বয়ং ॥ ১১৮ কারিকা।
“এতন্ময়ে জ্ঞানং পূর্বতাবিনি সংতপ্তে যথা ন কলরূপভা-
পত্তিস্থা সুবীতি: পরিচিন্তনীয়মিত্যাহ হরিদাস ইতি
দিক্।” (৪৫১২)

উপসংহারে আমরা দুইটি বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গ্রন্থকার গৌড়দেশীয় ছিলেন,
ইহা গ্রন্থমধ্যে কোথাও স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু
গ্রন্থকারের “পণ্ডিত” উপাধি ব্যতীত তাঁহার প্রমাণভূত

ব্যক্তির গোষ্ঠ্যমী, চক্রবর্তী ও ঠাকুর উপাধি দেখিলে এ
বিষয়ে সকল সংশয় দূর হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থকার
মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত কোন গ্রন্থকারের বচনাদি খণ্ডন-
মণ্ডনের জন্য উদ্ধত করেন নাই। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর
পূর্বেই এই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। মহাপ্রভুর
অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রভাবের ফলে যে এই বিরূঢ়
সাহিত্যপুষ্ঠ সম্প্রদায় লোপ পাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ
নাই।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীশুশীলচন্দ্র ঘোষ

৯

ব্যবসা ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙালী কেন এত পিছাইয়া
রহিয়াছে তাহার মূলগত কারণ ও উহার প্রতিকারের
উপায় কি ইহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যিক।
ইংরেজ রাজত্বের প্রাকাল হইতে বাঙালী অপর প্রদেশ-
বাসীর অপেক্ষা ইংরেজী শিক্ষালাভের অধিকতর সুযোগ-
সুবিধা পাইয়াছিল। ইহার ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে তৎকালীন বাঙালী
যুবকেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার পর ব্যারিষ্টার, উকিল,
ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হইত এবং সিভিল সার্বিস ও গবর্ণ-
মেন্টের উচ্চপদ লাভ করিবার জন্তই বিশেষ আগ্রহান্বিত
ছিল। ঐ সময় অনেক বাঙালী তাঁহাদের স্বাভাবিক
দক্ষতার গুণে বাংলার বাহিরে পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ,
উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, বিহার এবং অত্যাশ্র প্রদেশেও ঐ সমস্ত
ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্যবসা-
বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়াটা শিক্ষিত ও উদ্ধতন বাঙালী সমাজ
একরূপ আত্মমর্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিতেন। আজ
যে ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান অপর প্রদেশবাসীর
অপেক্ষা অনেক পিছনে ইহা তাহার অত্যন্ত কারণ।
বাংলায় চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথাও ইহার আর একটা
অস্তরায় ছিল। তৎকালীন অর্থশালী ও অর্থোপার্জন-
কারী ব্যক্তির তাঁহাদের অর্থ ব্যবসায়ে নিয়োজিত না
করিয়া জমিদারী ক্রয় করিতে ও লগ্নিতে টাকা খাটাইতে
এবং কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিতে বেশী উৎসাহী
ছিলেন, কারণ তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে
টাকা আবদ্ধ করা নিরাপদ নহে।

ইহার পর দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই প্রদেশের
জমিদার ও মহাজন অর্থাৎ সূদীকারবারীদের এবং অর্থ-
শালী ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ যৌথ কোম্পানীর অংশ
ক্রয় অথবা নিজেরাই গঠন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত
হইতে আরম্ভ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ হইলেও
নিজেরাই ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ
করেন। কিন্তু তাঁহাদের জমিদারী অভ্যাস, মহাজনী
মনোবৃত্তি, আত্মাভিমান ও শ্রমবিমুখতা ঐ সমস্ত ব্যবসায়-
প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হওয়ার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়
হইয়াছে। তাঁহারা অপর অভিজ্ঞ সংখ্যালঘু ডাইরেক্টরদের
উপদেশ গ্রহণ করা নিশ্চয়োজন বলিয়া মনে করিয়া
থাকেন এবং কাহারও কোন প্রকার স্বাধীন সমালোচনা
তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের
ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, জমিদারীতে নিজে উপস্থিত না
থাকিলেও নায়েব মহাশয়দের দ্বারা যেরূপ ভাবে জমিদারী
পরিচালনা করা সম্ভব হয় সেইরূপ ভাবে ব্যবসা-ও-শিল্প-
প্রতিষ্ঠানেও নিজেরা উপস্থিত না থাকিয়া অপর ব্যক্তিদের
দ্বারা এগুলি সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে।

সকলেই অবগত আছেন যে, এই প্রদেশে বহু
কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী নিজেরা লাভবান হইবার
উদ্দেশ্যে নানারূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া অংশীদারদের
বঞ্চিত করিয়াছেন। ব্যাক হইতে কোম্পানীর কার্যের জন্ত
টাকা বর্জ্য করিয়া উহার অপব্যবহার করিবার দৃষ্টান্তও
যথেষ্ট পাওয়া যায়। ফলে বাঁহারা ঐ সমস্ত কোম্পানীর
অংশ খরিদ করিয়াছিলেন তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি-
গ্রস্ত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে যে সমস্ত কোম্পানীতে

ঐরূপ অনভিজ্ঞ ও অবাজ্জনীয় পরিচালনামণ্ডলী থাকিবে, উহার অংশ খরিদ করিবার পূর্বে জনসাধারণের বিশেষ ভাবে তাঁহাদের কার্যদক্ষতা ও সত্তার বিষয় অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ইহার প্রতিকারকল্পে ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধনের ব্যবস্থা করিতেছেন তথাপি আমি মনে করি, কেবলমাত্র আইনের দ্বারা ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকার হওয়া সম্ভবপর নয়। হুংখের বিষয়, আমাদের দেশের যৌথ কোম্পানী-সমূহের বেশীর ভাগ অংশীদারগণ সেরূপ সচেতন ও সজ্জবদ্ধ নহেন। এই কারণ এই প্রদেশের যৌথ কোম্পানীর অংশীদারদের স্বার্থরক্ষার জন্ত একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যে সমস্ত খ্যাতিনামা বাঙালী নিজেদের অধ্যবসায় ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ধনীর সন্তান খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, অধিকাংশ অর্থশালী ব্যক্তিদের বংশধরেরা অগ্রাভাব না থাকায় অর্থোপার্জনের আবশ্যকতা মনে করেন না ও আলস্য এবং গল্পগুজব করিয়া দিন কাটাইতে ভালবাসেন।

ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষমতা সকল ক্ষেত্রে বংশগত ভাবে থাকা সম্ভব নয় ইহা লেখাই বাহুল্য। অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরই বহু প্রসিদ্ধ ব্যবসা-ও-শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে নানা প্রকার মতবিরোধিতার জন্য বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়ে অথবা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। আরও দেখা যায় যে, যৌথ পরিবারভুক্ত কোনও ব্যক্তি যদি নিজের কর্মকুশলতার দ্বারা কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান লাভজনক ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে উক্ত যৌথ পরিবারের সকলেই ঐ ব্যবসায়ে তাহাদের অংশ দাবি করিয়া নানারূপ মামলা মোকদ্দমা স্বরূপ করিয়া দেন। যৌথ পরিবারভুক্ত সকল ব্যবসায়ীর প্রথম হইতেই আইনগতভাবে এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। এই সকল অন্তরায়ের প্রতিকার করিতে হইলে সমস্ত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হইতে হিন্দু-আইনের প্রভাব কমাইতে হইবে অর্থাৎ উহার পরিচালনার ভার কেবলমাত্র বংশধরগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, আবশ্যক হইলে লভ্যের অংশ দিয়া অপর কোন সূক্ষ্ম পরিচালক নিযুক্ত করা সমীচীন। স্বনামধন্য বাঙালী ব্যবসায়ী স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম-পদ্ধতি প্রত্যেক বাঙালী ব্যবসায়ীর আদর্শ হওয়া উচিত। তিনি কখনও তাঁহার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে অনভিজ্ঞ আত্মীয়-স্বজনদের নিযুক্ত করিতেন না এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে

প্রত্যেক বিভাগের পরিচালনার জন্য কেবলমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিদিকেই নিযুক্ত করিতেন। এমন কি তাঁহার পুত্রদিগকেও পূর্বে বিশেষ ভাবে শিক্ষা না দিয়া কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার দিতেন না।

প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে আমার ব্যবসা-জীবনের প্রারম্ভে আমি একদিন নতুন বৎসরের ক্যালেন্ডার সংগ্রহের জন্য মার্টিন কোম্পানীর আপিসে গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ বিভাগই অভিজ্ঞ ইংরেজ ও অন্যান্য প্রদেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আমার উপস্থিতি-কালে রাজেন্দ্রনাথ ষখন তাঁহার প্রধান কর্মচারীদিগের বসিবার হলঘরের মধ্য দিয়া নিজ কক্ষে যাইতেছিলেন তখন ঐ সকল উদ্বৃত্তন কর্মচারী মণ্ডল-মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। এই দৃশ্যটি সেই সময় আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশের ব্যবসায়ীরাও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতন দিয়া কেবলমাত্র সূক্ষ্ম ব্যক্তিদেরই পরিচালকরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের তত্তাবধানে নিজেদের শিক্ষিত পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে ব্যবসা সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। বাঙালী ব্যবসায়ীদেরও এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

আমার মতে অল্পপুঙ্ক্ত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন উত্তরাধিকারী অথবা আত্মীয়-স্বজনের হস্তে কাহারও কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠান অর্পণ করিয়া একেবারে নষ্ট করা অপেক্ষা উহা কোনও সূক্ষ্ম ব্যবসায়ীকে হস্তান্তর করা শ্রেয়। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ব্যবসা-শিক্ষাভিলাষী অধিকাংশ বাঙালী যুবকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, উচ্চশিক্ষিতদের পক্ষে ব্যবসা-শিক্ষা খুবই সহজসাধ্য এবং অল্পদিনের মধ্যেই ও সামান্য পরিশ্রমে উহা আয়ত্ত করিতে পারা যায়। তাঁহাদের ধারণা নাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করিতে হইলে যেসকল বহু বৎসর ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় এবং তাহাও অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যবসা-শিক্ষাও তদনুরূপ। কয়েক ক্ষেত্রে আমি দেখিয়াছি যে, কিছুদিন চেষ্টা করিবার পরই তাঁহারা ধৈর্য হারাইয়া ব্যবসা-শিক্ষা পরিত্যাগ করেন।

আমাদের আর একটি ভ্রুটির বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, নবীন ব্যবসায়ীদের মধ্যে কাহারও কাহারও শেয়ার ও ফাটকা বাজারে, বোড়দোড়ের মাঠে এবং রাত্রিকালে বড় বড় হোটেল ও ক্লাবে বহু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যাতায়াতের অভ্যাস অতিমাত্রায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার

বিষয় ফল ও শোচনীয় পরিণাম যে কিরূপ হইতেছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

সকল ক্ষেত্রেই যে এইরূপ হইয়া থাকে এরূপ ধারণা করিলে ভুল করা হইবে। একথা স্বীকার করিলে চলিবে না যে, আজকাল কেবলমাত্র বাংলাদেশেই নহে, অপরাপর প্রদেশেও বাঙালীর ব্যবসা পূর্বাপেক্ষা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। তবে আমাদের নিজেদের দোষ ও ত্রুটিগুলি অকপটে স্বীকার না করিলে উহার প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থা হইবে না এই বিশ্বাসেই আমি এই সমস্ত অগ্রিম সত্যের আলোচনা করিতে কুঠা বোধ করিতেছি না।

প্রদেশে শক্তিশালী বণিকসভা ও শিল্প-সমিতির একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করা নিম্নপ্রয়োজন বলিয়া মনে করি। কিন্তু এগুলি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে উহা কতিপয় অর্থশালী উচ্চাভিলাষী এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির কুক্ষিগত না হয় এ দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এই সমস্ত সভা ও সমিতির পরিচালকগণ দলগতভাবে অথবা অহুগত বন্ধুদের দ্বারা গঠিত না হইয়া একমাত্র বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত হওয়া আবশ্যক এবং সভ্যদের কর্তৃত্বপূর্ণতা কেবলমাত্র নির্বাচন-দ্বন্দ্বের সীমাবদ্ধ না থাকিয়া প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ও প্রদেশবাসীর উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বণিকসভা ও শিল্প-সমিতিগুলি সকলেই দেশের ও দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন কিংবা কেবলমাত্র নিজেদের সভ্যদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত আছেন তাহা নির্ধারণ করা শক্ত। কারণ উচ্চ পর্যায়ের অনেক ব্যবসায়ী বাহারা এই সকল সভা ও সমিতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন—তাহাদের মধ্যে অনেকেই কালোবাজারে বিশেষ সুপরিচিত। দুষ্টান্ত-রূপ একটি শিল্প-সমিতির বিষয় উল্লেখ করিতেছি। কিছু দিন পূর্বে এরূপ একটি সমিতির একজন বহু পুরাতন সভ্য কোনও এক অত্যাচার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য পরিচালকমণ্ডলীতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশ সভ্যই এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, সমিতির বেশীর ভাগ সভ্যই (majority) যখন এরূপ অন্যায়ের সুযোগ লইতেছেন তখন উহার বিরুদ্ধাচরণ করা একেবারেই undemocratic হইবে অর্থাৎ মাইনরিটির উহা মানিয়া লওয়া কর্তব্য এবং উহার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন চালানো উচিত হইবে না। গণতন্ত্রের এইরূপ অভিনব ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে অক্ষম হওয়ায় এই সভ্যটি পরিচালকমণ্ডলীর এবং সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ

করেন। পরে শুনিয়াছি যে, তাহার পদত্যাগে অপরা সভ্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ সরকার নানারূপ নির্মাণকার্যে বৎসরে বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ঠিকাদারী কার্যে বাঙালী নিজ প্রদেশেও অনেক পিছাইয়া রহিয়াছে। ইহার একটি কারণ এই যে, অনেক ক্ষেত্রে ঠিকা বন্টনের সময় বাঙালী ঠিকাদারেরা সমান সুযোগ পান না। অনেকেই জানেন যে, অপরা প্রদেশবাসী বহু শিল্পপতি প্রথমে সরকারী ও বেসরকারী ঠিকাদারী কার্য করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন তাহার দ্বারাই পরে তাহারা বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকদের দৃষ্টি-এ বিষয়ে আকর্ষিত হওয়া উচিত। প্রদেশ-সরকারের উচিত যে, প্রদেশের অভ্যন্তরে তাহাদের ও কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত নির্মাণকার্য হইয়া থাকে, উহার ঠিকা বন্টনের সময় যাহাতে বাঙালী ঠিকাদারেরা সমান সুযোগ পায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। সকলেই জানেন যে, মার্টিন কোম্পানীর খ্যাতিনামা প্রতিষ্ঠাতা রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথমে ঠিকাদারী কার্য আরম্ভ করেন এবং উহা হইতে লাভবান হইয়া পরে তাহার কোম্পানীতে নানা বিভাগ খুলিয়াছিলেন।

শিল্পপতিদের ও শ্রমিকদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে সকল সময়ে সমন্বয় করা সম্ভব নয়। দেইরূপ ক্ষেত্রে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য; ইহা ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ভূমির এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিকের অভাব হেতু ও অন্যান্য কারণে ভবিষ্যতে আর কোনও বৃহত্তর শিল্প অথবা কলকারখানা প্রতিষ্ঠা প্রদেশবাসীর স্বার্থের অমুকুল হইবে না এ বিষয় পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং কুটীর-শিল্পের প্রসারণের উপরই যতটা সম্ভব আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। ইহার দ্বারা শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা ও মূলধন অভাবে মহাজনদের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন অনেক কমিয়া যাইবে।

বাংলার আর্থিক পরিস্থিতি উপস্থিত যেকোন জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইলে সর্বপ্রথমে প্রদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করা দরকার। বৎসরের পর বৎসর যে কোটি কোটি টাকা নানাভাবে বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে তাহারই ফলে আজ ২৪ পরগণা, নদীয়া ও অত্যাশ্র জেলায় দারুণ অর্থান্ধাভাব হেতু অন্নান্ধাভাব দেখা দিয়াছে। ইহা যে ক্রমে ক্রমে সকল জেলাতেই ও সকল স্তরের প্রদেশবাসীর

মধ্যেও শীঘ্রই বিস্তার লাভ করিতে পারে তাহা অল্পমান করা অন্যায্য হইবে না। গত কয়েক বৎসর হইতে “অধিক পাট উৎপাদন কর” অভিযানের জন্যই আজ শস্তাঞ্চাল বাংলাতে তাহার প্রয়োজনানুরূপ ধান্য ও অন্যান্য খাদ্যশস্ত উৎপাদন হইতেছে না। ধান্য ও খাদ্যশস্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা অগ্রে করিয়া কেবলমাত্র উদ্ধৃত্ত জমিতে পাট ও ঐ জাতীয় ফসল করিতে দেওয়া প্রদেশ সরকারের উচিত ছিল। সম্প্রতি খাদ্য বিভাগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল মাঝি মহাশয় ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান সফর করিয়া সংবাদপত্র মারফত একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফল ও শাক-সজী কলিকাতার বাজারে না পাঠাইয়া স্থানীয় অধিবাসীরা উহার দ্বারা খাদ্যের অভাব অনেকটা পূরণ করিতে পারেন। মাঝি মহাশয় যে পথ দেখাইয়াছেন তাহা সমীচীন কি না জানি না, কারণ অভাবক্লিষ্ট জনসাধারণের নিজেদের ফলের গাছ এবং তরিতরকারী উৎপাদনের জমি আছে কি না সন্দেহ। ঐ সমস্ত জিনিষ ক্রয় করিতে তাহারা অর্থ কোথায় পাইবে তাহা তিনি বলেন নাই। এইরূপ অবস্থায় মাঝি মহাশয়ের উপদেশানুসারে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের অগ্নাভাব দূর করিতে হইলে তাহাদের তৎস্বের বৃত্তি অবলম্বন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মাঝি মহাশয়ের স্বরণ আছে কি না জানি না যে গত মহাযুদ্ধের সময় খাদ্যাভাব পূরণ করিবার জন্য জনৈক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, দুর্ধ্বা ঘাসের তৈরি নানারূপ খাদ্য মাছুষের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর। মাঝি মহাশয়কে বাংলাদেশে মৎস্ত ও মাংসের অভাব পূরণ করিবার জন্য নানা জাতীয় ফডিং-এর মধ্যে কি পরিমাণ প্রোটিন আছে তাহাও গবেষণা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি কি? বাংলার সরকারী অন্নদাতারা সভাই কি এইরূপ বিবৃতি দিয়া প্রদেশের অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন?

বাংলার পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামো নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে একমাত্র কুটীল-শিল্পের প্রসারের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যেমন কোন বৃহদাকার বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে হইলে কেবলমাত্র উহার

উপরের শাখা-প্রশাখাগুলি কাটিয়া দিলে কিছুই ফল হয় না, মাটির নীচে উহার সহস্র সহস্র শিকড়কে অগ্রে নষ্ট করা দরকার, সেইরূপ আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন করিতে হইলে সর্বোপরি অর্থের শোষণের শিকড়গুলি কাটিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব গ্রামের টাকা গ্রামে, পল্লীর টাকা পল্লীতে এবং জেলার টাকা জেলাতে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে উহা প্রদেশের বাহিরে চলিয়া না যায়। এই উদ্দেশ্যে প্রতি গ্রামে ও পল্লীতে “দেশকল্যাণ সমিতি” গঠন করিয়া “অধিক ধান্য ফলাও”, “বাংলার টাকা বাংলায় রাখ”, “পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি করো” ইত্যাদি অত্যাবশ্যক অভিযান শুরু করিয়া অর্থের বহির্গমনশ্রোত বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, ইদানীং যুবকদের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে সেরূপ লক্ষ্য নাই। এমন কি গুরুজনদিগের প্রতি বৈরূপ মৌজনা প্রকাশ করা কর্তব্য অনেক স্থলে তাহা তাঁহারা করেন না। এই সমস্ত বিষয়ে প্রস্তাবিত সমিতির প্রত্যেক সভ্যের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, অন্যথায় দেশের কল্যাণের পরিবর্তে তাহারা একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবেন, কলে অভিযানগুলি অন্ধুরেই বিনষ্ট হইবে এবং এই বিষয়ে সর্বসাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। প্রত্যেক জেলার পরিস্থিতি একরূপ নহে। সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কৃষিক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রত্যেক স্তরে স্থানীয় অধিবাসীদের অর্থ কি ভাবে ক্ষয় হইতেছে এবং উহার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করিবার পর সমিতিগুলি তাহাদের নিজ নিজ কার্যসূচী স্থির করিবেন। এই সমস্ত সমিতিতে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তিদিগকে যোগ দিতে দেওয়া আদৌ উচিত হইবে না, কারণ তাহারা ঐগুলিকে কুক্ষিগত করিয়া ভবিষ্যৎ নির্বাচনঘন্ডে জনসাধারণকে নিজ নিজ দলের সপক্ষে প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। উল্লিখিত দেশকল্যাণ সমিতি গঠনের প্রস্তাবে সম্ভবতঃ রাজনীতিবিদ পণ্ডিতেরা প্রাদেশিকতা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বাংলার নবীনরা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইবেন।

মহারাজ পৃথ্বীরাজের মহিষীকুল

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইহার ঠিক ৭৫০ বৎসর পূর্বে তয়ারনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর হস্তে ভারতের শেষ স্বাধীন হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ বন্দী হন, নৃশংসভাবে তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করা হয় এবং আঘাতের পর আঘাত হানিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। সেই দিন হইতে ভারতবর্ষ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়।

সম্রাট পৃথ্বীরাজের পরাক্রমের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাকরে লেখা আছে। সদে সদে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী সংযুক্তার কথাও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। এই সংযুক্তাকে লইয়াই আরম্ভ হইয়াছিল হিন্দু রাজ্য, তথা ভারতবর্ষের ও ইতিহাসের উলটপালট। কিন্তু মহিষী সংযুক্তা মহারাজ পৃথ্বীরাজের একমাত্র রাণী ছিলেন না; শুধু ইহাই নহে, তিনি পৃথ্বীরাজের পাটরাণীও ছিলেন না। রাণী হিসাবে তিনি ছিলেন একাদশ স্থানীয় ছোট রাণী। রাণী সংযুক্তা ভিন্ন মহারাজ পৃথ্বীরাজের আরও দশ জন রাণী ছিলেন।

কোন কোন পুস্তকে মহারাজ পৃথ্বীরাজের এগারজন রাণীর নাম বা পরিচয় পাওয়া যায়। আবার কোন পুস্তকে দেখিতে পাই যে, যখন তিনি শেষ বার মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যাত্রা করেন তখন তিনি তাঁহার দশ জন রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এই হিসাবে দেখা যায় যে, তাঁহার মহিষী ছিলেন দশ জন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার মহিষী এগার জনই ছিলেন; তবে যুদ্ধযাত্রাকালে দশ জন মহিষী জীবিত ছিলেন এবং এক জন সেই সময় স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন পুস্তকে দেখা যায় যে, পৃথ্বীরাজ প্রথম বিবাহ করেন মণ্ডবরের পরিহার রাজা নাহর রায়ের কন্যাকে। নিম্ন অস্থানে তাঁহারই হওয়া উচিত পাটরাণী। কিন্তু পৃথ্বীরাজের সত্যকবি চন্দ্র “পৃথ্বীরাজ রাসো” নামক পুস্তকে মহারাণী ইচ্ছানীকে পাটরাণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাণী ইচ্ছানী ছিলেন পৃথ্বীরাজের দ্বিতীয় রাণী। তিনি পাটরাণী হইতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনিই ছিলেন পাটরাণী। তাই আমরা বলিয়া লইতে পারি যে, অল্প বয়সেই পৃথ্বীরাজের প্রথমা মহিষী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন এবং এইজন্যই দ্বিতীয় রাণী ইচ্ছানী হইয়াছিলেন পাটরাণী। আর এইজন্যই পৃথ্বীরাজের যুদ্ধযাত্রার সময় আমরা দশ রাণীর নিকট হইতে তাঁহার বিদায় গ্রহণের উল্লেখ দেখিতে পাই। নানা পুস্তকে পৃথ্বীরাজ মহিষীদের পরিচয় পাওয়া যায়;

বিশেষ করিয়া কবি চন্দ্র লিখিত “পৃথ্বীরাজ রাসো” নামক মহাকাব্যে পৃথ্বীরাজ-মহিষীদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়া মহারাজ পৃথ্বীরাজের রাণীদের সামান্য সামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

পরিহার রাজা নাহর রায়ের কন্যা

দিল্লীর মহারাজ অনঙ্গপালের দ্বিতীয় কন্যা কমলার বিবাহ হয় আজমীরের রাজা সোমেশ্বরের সহিত। এই কমলার গর্ভে পৃথ্বীরাজের জন্ম। পৃথ্বীরাজের জন্মের পর হইতেই দিল্লীর অঞ্জক মহারাজ অনঙ্গপাল পৃথ্বীরাজকে খুব ভাল-বাসিতেন এবং মনে মনে তাঁহাকেই দিল্লীর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। মাতামহের স্নেহের টানে পৃথ্বীরাজ অনেক সময়ই দিল্লীতে কাটাইতেন। পৃথ্বীরাজের বয়স যখন আট বৎসর তখন তিনি তাঁর মাতামহের নিকট দিল্লীতে ছিলেন। এই সময় কোন কার্যোপলক্ষে মণ্ডবরের পরিহার রাজা নাহর রায় দিল্লীতে আসেন। দিল্লীতে মহারাজ অনঙ্গপালের দরবারে অষ্টম বর্ষীয় বালক পৃথ্বীরাজকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। মহারাজ অনঙ্গপাল সাদরে এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। ফলে রাজা নাহর রায় তাঁহার কন্যাকে দিল্লীতেই পৃথ্বীরাজকে বাগদত্তা করিয়া রাখেন।

রাজা নাহর রায় কন্যাকে বাগদত্তা করিয়া দেশে চলিয়া গেলে দিল্লীতে, আজমীরে এবং মণ্ডবরে সমারোহ চলিতে থাকে। তিনটি রাজ-পরিবার আত্মীয়স্বজ্ঞে আবদ্ধ হইবার সন্তোষের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু কালের কুটিল গতি কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। কিছু দিন যাইবার পর রাজা নাহর রায়ের মত বদলাইয়া যায় এবং তিনি স্থির করেন যে, পৃথ্বীরাজের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না। কেহ কেহ অস্থান করেন যে, কনৌজের রাজা বিজয়পালের পরামর্শে নাহর রায় পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দিতে অসম্মত হন। বিজয়পালের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার পুত্র, অর্থাৎ অনঙ্গপালের প্রথম কন্যা সুরম্মলার গর্ভজাত পুত্র জয়চন্দ্রের সহিত এই বিবাহ হয়।

আজমীরের রাজা সোমেশ্বর যখন জানিতে পারিলেন যে, রাজা নাহর রায় তাঁহার বাগদত্তা কন্যাকে তাঁহার পুত্র পৃথ্বী-রাজের সহিত বিবাহ দিবেন না, তখন তিনি ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি ইচ্ছাতেই মহা অপমান বোধ করিলেন। এই অপমানের জ্বালায় তাঁহার রক্ত টগবগ করিয়া

টরা উঠিল। তিনি রাজা মাহর রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে মাহর রায় পরাজিত হইলেন। অবশেষে সন্ধি স্থাপন করিয়া পৃথ্বীরাজের সহিত কস্তার বিবাহ মিলেন। এই সময় পৃথ্বীরাজের বয়স ছিল মাত্র এগার বৎসর।

এই মাহর রায়ের কন্যাই হইলেন পাটরাণী। কিন্তু পাটরাণী বলিয়া যে তাঁহার উল্লেখ দেখা যায় না একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

মহারাজী ইচ্ছনী

মহারাজী ইচ্ছনী ছিলেন পৃথ্বীরাজের দ্বিতীয়া মহিষী। ইচ্ছনী ছিলেন আবু রাজ্যের পরমার রাজার দ্বিতীয়া কন্যা। এই পরমার রাজাদের কীর্তি—শিল্পকলা ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ আজও আবু পাহাড়ের নানা স্থানে বর্তমান। ইচ্ছনী ছিলেন পরমা মুন্ডরী, রূপবতী ও গুণবতী। বহু রাজা মহারাজা ইচ্ছনীর রূপেণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা পরমার পৃথ্বীরাজের সহিত ইচ্ছনীর বিবাহ দিবেন বলিয়া বাগ্দস্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই অল্পকাল রাজা মহারাজা ইচ্ছনীর পাণিপ্রার্থনা করিলে রাজা পরমার তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেন।

ইচ্ছনীর বড় ভগিনীর নাম ছিল মন্দোদরী। গুজরাটের রাজা ভোলাভীমের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; কিন্তু ভোলাভীম ইচ্ছনীর অসামান্য রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইচ্ছনী বা তাঁর পিতা কেহই ইহাতে রাজী হন নাই। এই কারণে ভোলাভীম তাঁহার খুশর সলপ পরমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে পরমার রাজাকে পরাজিত করিয়া ইচ্ছনীকে বলপূর্বক বিবাহ করিবেন—ইহাই ছিল তাঁর মনোগত ভাব। এই সময় পৃথ্বীরাজ যৌবনে উপনীত হইয়াছেন। তিনি আবুর রাজার নিকট হইতে ভোলাভীমের যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ পাইলেন। তাহার নিকট বাগ্দস্তা ইচ্ছনীকে ভোলাভীম বিবাহ করিবেন, তাহাও আবুর পরমার রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, ভোলাভীমের এই সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া পৃথ্বীরাজ চকল হইয়া উঠিলেন এবং বাছা বাছা সৈন্য লইয়া আবুতে গিয়া হাজির হইলেন। ভোলাভীম আবু পৌছিবার পূর্বেই পৃথ্বীরাজ তাঁহার রাস্তা অবরোধ করিয়া রহিলেন। পৃথ্বীরাজের হাতে পরাজিত হইয়া ভোলাভীম গুজরাটে চলিয়া যান। পরমার রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইচ্ছনীকে বিবাহ করিয়া আজমীরে ফিরিয়া আসেন।

পৃথ্বীরাজের সহিত ভোলাভীমের যে যুদ্ধ হইয়াছিল ইতিহাসে তাহা নাগর যুদ্ধ নামে খ্যাত। আবুর নিকটে নাগর নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। এই নাগর যুদ্ধে ইচ্ছনীর

তাই কৈতরাও পরমার পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ইনি পৃথ্বীরাজের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

ভোলাভীম যুদ্ধে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া গুজরাটে, ফিরিয়া গিয়া চূপ করিয়া বসিয়া রহিলেন না। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভোলাভীম পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিবার নিমিত্ত মহম্মদ বোরীকে এক অহরোধ-পত্র প্রেরণ করিলেন। সর্দার ও প্রধানগণের প্রতিকূল মত সত্ত্বেও ভোলাভীম মকবানা নামক একজন সর্দারকে বোরীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্র পাইয়া মহম্মদ বোরী তখন তখনই পৃথ্বীরাজের পিতা সোমেশ্বরের রাজ্য আক্রমণ করেন নাই। পরে যখন মহম্মদ বোরী হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন ভোলাভীমের পত্র অনেকখানি প্রেরণা জোগাইয়াছিল এবং আক্রমণ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। অবশ্য এই প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ বোরী পৃথ্বীরাজের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থান আর আক্রমণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে করুণাপরবশ হইয়া পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইচ্ছনী তাঁহার যুক্তি, বিচক্ষণতা, আচরণ ও দারিদ্র্য বোধের জন্য রাণীদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন এবং পাটরাণী হন। যেমন তিনি ভীক্ষুবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন তেমনি চারিত্রিক সৌন্দর্য্যে ছিলেন মাধুর্য্যময়ী। অস্তার আচরণকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এজন্য পৃথ্বীরাজের বাল্যসখা ও প্রধানমন্ত্রী কৈমাসকে পর্যন্ত তিনি কোশলে হত্যা করাইয়াছিলেন।

ব্যাপারটি এইরূপ। কৈমাস পৃথ্বীরাজের অন্তরঙ্গ বন্ধ ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এক সময় কর্ণাটরাজ পৃথ্বীরাজের সম্ভার এক অপরাধ রূপলাবণ্যবতী মর্ডকীকে ভেঁটে পাঠাইয়াছিলেন। ইতিহাসে এই মর্ডকী “কর্ণাটকী” নামে পরিচিত। পৃথ্বীরাজ এই কর্ণাটকীকে খুব সম্বাদ করিতেন এবং রাজসম্ভার শ্রেষ্ঠ মর্ডকীর সম্মান দিয়াছিলেন। কর্ণাটকী দরবারে আসিবার পর হইতেই কৈমাস ইহার প্রতি আসক্ত হন, কিন্তু ইহার সহিত মিলনের কোন সুযোগ তাঁহার হয় নাই। তিনি সুযোগের অপেক্ষা করিতেন। সুযোগ আসিল।

একবার পৃথ্বীরাজ রাজ্যের তার কৈমাসের উপর রাগিয়া যুগ্মরাজ্য চলিয়া যান। সুযোগ পাইয়া কৈমাস কর্ণাটকীর সহিত প্রণয়লীলায় লিপ্ত করিলেন। এই প্রেমের জন্য কৈমাস রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যে কৈমাসের অবহেলা বুদ্ধিমতী ইচ্ছনীর নিকট বরা পড়িল। তিনি জানিতে পারিলেন যে, কৈমাস কর্ণাটকীর সহিত প্রণয়সক্ত হইয়া কর্তব্য কর্ত্তে অবহেলা করিতেছেন। কৈমাসের এই ব্যবহারে রাণী ইচ্ছনী অতিশয় ক্ষোভান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার এক দাসীকে গোপনে পৃথ্বীরাজের

নিকট এক পত্রসহ পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে এই মাত্র লেখা ছিল, “কাক কপূর খাইতেছে।”

অনেক রাজ্যে এই খবর পাইয়া পৃথ্বীরাজ জলিয়া উঠিলেন। বর্ষাকাল, শুক্লকায় রাজ্য, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছিল। পৃথ্বীরাজ হর্ষোন্মত্তের কথা না ভাবিয়া তখনই অখারোহণে একাকী দিল্লী রওনা হইলেন। দিল্লী আসিয়া ইচ্ছনীর সহিত দেখা করিলে ইচ্ছনী সব খুলিয়া বলিলেন এবং কণাটকীর মহলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সেই দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। মহারাজ বীরে বীরে শুক্লকায় ভেদ করিয়া কণাটকীর মহলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন কণাটকীর ঘরে আলো জলিতেছে আর তাঁহার বালা-সখা কৈমাস সেই ঘরের গবাক্ষে বসিয়া কণাটকীর সহিত মধুর আলাপ করিতেছেন। পৃথ্বীরাজ অধিকক্ষণ এই দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না; ফোবোমুগ্ধ হইয়া বাণ চালাইলেন। বাণ কৈমাসের বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কৈমাসের হৃৎস্পন্দে গবাক্ষপথে নীচে পড়িয়া গেল।

সংযুক্তাকে বিবাহ করিবার পর মহারাজ পৃথ্বীরাজ রাজকাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া সংযুক্তাকে লইয়া প্রমোদে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। কোন পুরুষের রাজপ্রাসাদে প্রবেশাধিকার রহিল না। কাহারও পৃথ্বীরাজের সহিত দেখা করিবার ক্ষমতা রহিল না। রাজকাৰ্য্যে ও রাজ্য-পরিচালন ব্যবহার আসিয়া পড়িল শিথিলতা ও অসিরহ। মহম্মদ ঘোরী তাঁর পূর্বপরাভব ও অপমানের কথা ভুলেন নাই। তিনি শুণ্ডচর পাঠাইয়া পৃথ্বীরাজের উচ্ছলিত কণা জানিতে পারিলেন। এদিকে জয়চন্দ পূর্বেই মহম্মদ ঘোরীকে আশ্রয় জানাইয়াছিলেন। ঘোরী কিছুদূর পার হইয়া অনেকটা অগ্রসর হইলেন। ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, এই সংবাদ দিল্লীতে সকলেই জানিতে পারিল কিন্তু পৃথ্বীরাজ জানিতে পারিলেন না। তিনি সংযুক্তাকে লইয়া প্রমোদে মগ্ন। কেহই এ সংবাদ তাঁহাকে হিতে সাহস করিল না। মহম্মদ ঘোরী কোরান স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবেন না; তাই কোম দিনই পৃথ্বীরাজের মনে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের আশঙ্কার কথা জাগে নাই। তিনি সংযুক্তাকে লইয়া প্রমোদে মগ্ন।

এদিকে পৃথ্বীরাজের ভগ্নপতি রাণা সমর সিংহ মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী আক্রমণের কথা শুনিয়া দিল্লী আসিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি পর্য্যন্ত পৃথ্বীরাজের সহিত দেখা করিতে পারিলেন না এবং তাঁর কথাও পৃথ্বীরাজের নিকট পৌঁছিল না। অবশেষে এই রাণার মত বন্ধু ও ভক্তাকাজী পৃথ্বীরাজের আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। অবশেষে সফট বুকিয়া রাজ্যের কুল-পুরোহিত মহারাণী ইচ্ছনীর সহিত পরামর্শ করিলেন। তখন

ইচ্ছনী কর্তব্যের বাস্তবে সমস্ত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও পৃথ্বী-রাজকে ঘোরীর আক্রমণের সংবাদ জানাইলেন। প্রমোদে বাধা পড়িল। ঘোরীর বিশ্বাসভঙ্গে ফোবে তিনি জলিয়া উঠিলেন। তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু বড় অসমর্থ ও অসজ্জিত অবস্থায়। অনেকে মনে করেন পৃথ্বীরাজ বীর হইলেও অভিমানের ভোগাসক্ত ছিলেন। ইহা ছিল ঘোরীর নিকট তাঁহার পরাজিত এবং বন্দী হওয়ার অভ্যস্ত কারণ।

মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পৃথ্বীরাজের বন্দী হওয়ার সংবাদ শুনিয়া অসংখ্য রাণীদের সহিত ইচ্ছনীও জহরপ্রত্ন করিয়া মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

রাণী চম্পাবতী

চম্পাবতী ছিলেন পৃথ্বীরাজের তৃতীয়া রাণী। পিতৃকুলের দিকে ইনি ছিলেন দাতিমা রাজা চামুণ্ড রায়ের তগিনী। রাণী চম্পাবতীর গর্ভে রাজকুমার রেনসীর (রবসিংহ) জন্ম হয়। রাণী চম্পাবতীর ভ্রাতা অর্থাৎ রাজকুমার রেনসীর মাতুল প্রবল-পরাজিত বীর ছিলেন। পৃথ্বীরাজের এক শত বাছাই-করা প্রধান যোদ্ধার মধ্যে রাজা চামুণ্ড রায়ের স্থান খণ্ডে উঠে ছিল।

এক দিন রাজা চামুণ্ড রায় দিল্লীর এক গলির মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন; এমন সময় পৃথ্বীরাজের অভি প্রিয় হস্তী “শূনার হার” মাহুতের হস্তচূত হইয়া পাগলামি আরম্ভ করে এবং গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চামুণ্ড রায়কে আক্রমণ করে। চামুণ্ড রায় প্রাণ বাঁচাইবার অল্প কোম উপায় না পাইয়া তাঁহার হস্তস্থিত অস্ত্র দ্বারা “শূনার হার”কে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন। এই “শূনার হার” রাজা পৃথ্বীরাজের পুত্র প্রিয় ছিল। প্রথম বার যখন ঘোরীর সহিত পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের কাকা, কাকা কহু ঘোরীকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। তখন মহম্মদ ঘোরী কোরান মাধার লইয়া কসম খাইয়া বলিয়াছিলেন যে, পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে তিনি আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না। কসম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীরাজকে শূনী করিবার জন্য মহম্মদ ঘোরী তাঁহাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ হস্তী “শূনার হার” উপহার দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কথা রক্ষা করেন নাই।

পৃথ্বীরাজ শেষবার যখন ঘোরীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তরাইনের সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হন, তখন রাজ্যের ভার চম্পাবতীর গর্ভজাত পুত্র রেনসীর হস্তে স্তম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন। ঘোরী পৃথ্বীরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। পৃথ্বীরাজের সভ্য-কবি চন্দ্র লিখিত ‘রাসো’তে দেখা যায় যে, পৃথ্বীরাজকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া কিছুদিন পর নৃশংসভাবে তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করা হইয়াছে। অল্প অবস্থায় রাজা পৃথ্বীরাজ কারাগারে পড়িতে থাকেন। পরে কোশলে নন্দভেদী বাণ দ্বারা ঘোরীকে

হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করেন। অবশ্য এই কথা ইতিহাস সমর্থন করে না। যাহাই হউক, মহম্মদ বোরী চলিয়া যাইবার পর রেনসী যথার্থীতি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বোরীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। এই সময় রাজকুমার রেনসীর বরষ আঠার বৎসর ছিল।

রেনসীর যুদ্ধায়েজনের কথা জানিতে পারিয়া বোরী কুতুবুদ্দিন এবেককে দিল্লী অধিকার করিতে আদেশ দেন। সাত মাস পর্য্যন্ত এবেক দিল্লী বেঠেন করিয়া রাখেন। তার পর ধমাসান লড়াই হয়। লড়াইয়ে রেনসী মারা যান। দিল্লী এবেকের দখলে আসে এবং লুণ্ঠিত হয়। রাণী চন্দ্রাবতী ইহার পূর্বেই 'সতী' হইয়াছিলেন।

হাছলি হরীরের হুহিতা

পৃথীরাজের চতুর্থ রাণী ছিলেন হাছলীর কন্যা। ইহা তিনি ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বড় গুর্জরের রাজকুমারী

পৃথীরাজের পঞ্চম রাণী ছিলেন বড় গুর্জরের রাজা রাম রায়ের কন্যা।

রাণী পদ্মাবতী

পৃথীরাজের পিতা সোমেশ্বর যখন আজমীরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন দেবগিরিতে যাদব বংশের এক রাজা রাজত্ব করিতেন। এই যাদব রাজার কন্যাই ছিলেন রাণী পদ্মাবতী। ইনি অতিশয় রূপবতী ছিলেন। এই সময় যোদ্ধা ও বীর হিসাবে পৃথীরাজের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পদ্মাবতী মনে মনে পৃথীরাজকে পতিত্ব বরণ করেন। এদিকে জয়চন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (লঘু-ভ্রাতা) বীরচন্দ্র কম্বজের সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ হওয়া ঠিক হয়। রাজকুমারী পদ্মাবতী গোপনে পৃথীরাজকে জানাইয়া দেন যে তিনি তাঁহার বিপেয় অম্বরগিণী। পৃথীরাজ একথা শুনিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতে পারেন। তিনি বহু সৈন্ত লইয়া দেবগিরির দিকে রওনা হন। এদিকে পৃথীরাজ দেবগিরি পৌঁছিবার পূর্বেই কম্বজের বহু রাঠোর সৈন্তসহ দেবগিরিতে পৌঁছেন। পৃথীরাজ হট্টিবার পাছ ছিলেন না। দেবগিরিতে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই কম্বজের রাঠোর সৈন্তের সহিত তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং কম্বজকে পরাজিত করিয়া মহাসমারোহে পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া আজমীরে প্রত্যাবর্তন করেন। পৃথীরাজের প্রতি জয়চন্দ্রের শত্রুতার ইহাও একটি কারণ ছিল।

পুঙ্জন রায় কচ্ছ বাহারের ভগিনী

পুঙ্জন রায় পৃথীরাজের এক জন অতি পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। দ্বোহবার যুদ্ধে তিনি অশাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া

ছিলেন। একবার তিনি মহম্মদ বোরীকে বাঁধিয়া আনিয়া ছিলেন। তুমুল যুদ্ধের মধ্যে এক বার তিনি গুজরাটের রাজা ভোলাভীমের যুদ্ধে হিনাইয়া আনিয়াছিলেন। পৃথীরাজ যখন বাহা বাহা যোদ্ধা লইয়া সংযুক্তকে আনিতে গিয়াছিলেন তখন এই বীর পুঙ্জন রায়ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই উপলক্ষে জয়চন্দ্রের হাজার হাজার সৈন্তের সহিত পৃথীরাজের বাহাই-করা শত সৈন্যের যে লড়াই হয়, তাহাতে পুঙ্জন রায় অশাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন। পৃথীরাজ এই বীর পুঙ্জন রায়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার রূপভণের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ইহা সত্য যে, ইনি কোন রাজপরিবারের দুহিতা ছিলেন না। পৃথীরাজের খেদালের জন্যই এই বিবাহ হইয়াছিল।

চন্দ পুণ্ডীরের কন্যা

পুঙ্জন রায়ের ভগিনীর ন্যায় চন্দ পুণ্ডীরের কন্যাও কোম বিশেষ রাজপরিবারের কন্যা ছিলেন না। চন্দ পুণ্ডীর পৃথী-রাজের প্রতিনিধি হিসাবে লাহোরের শাসনকর্তা ছিলেন। চন্দ পুণ্ডীরের কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াই পৃথীরাজ তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইনি ছিলেন পৃথীরাজের ষষ্ঠ রাণী।

রাণী শশিভদ্রা

পৃথীরাজের সপ্তম রাণী ছিলেন দেবাসের রাজার কন্যা রাজকুমারী শশিভদ্রা।

রাণী হংসাবতী

রাণী হংসাবতী ছিলেন রণধরর রাজা ভাহু রায়ের কন্যা। রাজকুমারী হংসাবতী ছিলেন অতিশয় সুন্দরী ও লাভ্যময়ী। হংসাবতীর গুণ গরিমা ও সৌন্দর্যের মহিমার কথা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য অনেক রাজা মহারাজা হংসাবতীকে রাণীরূপে পাইবার জন্য রাজা ভাহু রায়ের নিকট অম্বরোপ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল রাজার মধ্যে চান্দেহীর হিন্দু রাজা পকাইম অন্যতম ছিলেন। রাজা ভাহু রায় রাজা পকাইমের অম্বরোপ রক্ষা করিতে পারেন নাই; কারণ রাজকুমারী হংসাবতী মহারাজ পৃথীরাজের প্রতি অম্বরক্ত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বাগদত্তাও ছিলেন। রাজা পকাইমের অম্বরোপ রক্ষা না হওয়ার জন্য তিনি ভাহু রায়ের উপর ক্রোধাবিষ্ট হন এবং এক বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া রণধরর আক্রমণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, ভাহু রায়কে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজকুমারী হংসাবতীকে বিবাহ করিবেন। রাজা পকাইম কোর করিয়া হংসাবতীকে বিবাহ করিবার জন্য রণধরর আক্রমণ

করিয়াছেন জানিতে পারিয়া রাজা পৃথীরাজ্জ এক বিরাট সৈন্য-বাহিনী লইয়া গিয়া রণধ্বরে উপস্থিত হন এবং তাহু রায়ের সৈন্যদের সহিত যোগ দেন। উত্তর পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে অন্ন-পরাক্রমের মধ্যে রাজা পঞ্চাইন পৃথীরাজের হস্তে নিহত হন।

কথিত আছে, রাজা তাহু রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য রাজা পঞ্চাইন মহম্মদ খোরীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। চান্দেবীর রাজা পঞ্চাইন, গুজরাটের রাজা ভোলা-ভীম এবং কনৌজের রাজা জয়চন্দ মহম্মদ খোরীর নিকট তাঁহাদের দেশের হিন্দুরাজদিগকে দমন ও পরাস্ত করিবার মানসে সাহায্য প্রার্থনার জন্য ইতিহাসে কলঙ্কিত হইয়া আছেন।

পৃথীরাজ্জ যখন রাজা পঞ্চাইনের বিরুদ্ধে রাজা তাহু

রায়কে সাহায্য করিবার জন্য রণধ্বরের যুদ্ধ-শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি রাজিতে স্বপ্ন দেখেন যে, এক চন্দ্রবদনা রমণী তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিতেছেন। পৃথীরাজের ঘুম ভাঙিয়া যায়; কিন্তু ঐ স্বপ্ন-সুন্দরীকে পাশে না পাইয়া অস্থির হইয়া উঠেন। এত রাজিতে পৃথীরাজের এই অস্থিরতার কথা জানিতে পারিয়া কবি চন্দ তাঁহার নিকট গমন করেন এবং তাঁহার স্বপ্নের মূল কথার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, ঐ স্বপ্ন-সুন্দরী আর কেহই নহেন; যিনি হু'দিন পরে তাঁহার অক্কাগিনী হইবেন, সেই অনিন্দ্যসুন্দরী হংসাবতী। এই বলিয়া হংসাবতীর রূপ, গুণ ও যৌবনের সূচনা বর্ণনা করিয়া পৃথীরাজের মনোরঞ্জন করেন।

কিছুদিন পর এই অনিন্দ্যসুন্দরী হংসাবতীকে বিবাহ করিয়া পৃথীরাজ রাজধানী দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন।

সন্ধান

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

দেরে নয়, ঘেন সাক্ষাৎ প্রতিমা। নুতন বউ দেববার কতে যারা কৌতূহলে ভিড় করেছিল, সবাই অবাক হয়ে তাকাল। টকটক করছে শায়ের রং, বড় বড় কাঁজল-কালো ছুটো চোখ। নাঃ, পছন্দ আছে হরিপদর। শৌভমার রূপ সহজে কারও কিছু বলবার নেই। নানা মুখে প্রশংসা গুণ্ণুনিয়ে উঠল গুজনের সুরে।

মেতায় মা বলল, আহা, বউ নয় ঘেন সাক্ষাৎ মা হু'গা।

বিলী পিঙ্গী মন্তব্য করলে, ভাগ্য ভাল আমাদের অমরের। আর হবেই না কেন, অমর আমাদের যে-সে ছেলে তো নয়।

‘তা বাই বল’, কামিনী আলোচনার যোগ দিলে, ‘পছন্দ বলতে হবে আমাদের হরিপদর।’

তা তো নিশ্চয়ই। সে কথা একশো বার। মেতায় মা মুখে একটা পাম পুরে সার দিলে।

অবশ্য সবচেয়ে বেশী আনন্দ হবার কথা অমরের মামা হরিপদর। কেমন তাকা গোলাপ বুঁকে পেতে বার করেছেন। বুঁদে হরিপদ তামাক টানতে লাগলেন বম্বন।

কল্যাণী বউয়ের মুখ দেখে স্বামীর পছন্দের তারিক করলেন বার বার। বরাবরই ভর ছিল, শেষে কি জানি একটা নিরে আসবে। বাক, সেই দুর্ভাবনা থেকে রেহাই পেয়ে হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু এই আনন্দ বৈশিষ্ট্য স্থায়ী হ'ল না। বউয়ের সঙ্গে যে সমস্ত জিনিষপত্র এসেছে তা পরীক্ষা করতে গিয়েই চম্ চম্ কগাছ। মেজাজ মুহুর্তে

গেল বিগড়ে। কনের তরক থেকে যা জিনিষ দেবার কথা ছিল তার অর্ধেকই যে নেই। কল্যাণী তথুনি ছুটলেন স্বামীর কাছে। একি সর্বশেষে কাণ্ড।

হরিপদ তামাক টানছিলেন। এমন শুভদিনে সহ-বন্দিনীর গম্ভীর মুখে আবিভাবে ভয়ের আভাস পেলেন।

কি হয়েছে? মলটা ছিটকে গেল মুখ থেকে।

সর্বশেষ হয়েছে। ভোমার হাতে যখন তার দিয়েছি তখন জানি এমন একটা হবেই গুণগোল।

‘মানে? হয়েছেটা কি?’ হরিপদ জীর কথার আরও ঘাবড়ে গেলেন। নুতন বউয়ের হঠাৎ কিছু অস্বাভাবিক হ'ল নাকি?

তাই হলে তো বাঁচতাম। আমরা মহা কোঁকোরের পাল্লার পড়েছি। তাহা ঠিকিয়েছে ব্যাটা।

কে? কার কথা বলছ? হরিপদ উঠে দাঁড়াল।

বাক আর তাকরা করতে হবে না। মেয়ের রূপেই মেয়ের বাপ ভোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। বলি দেমাণাওনার সর্বমত কনের তরক থেকে যা দেবার কথা ছিল দিয়েছে কিনা দেখে নিরেছিলে?

অবশ্য খুঁটিনাটি সব দেখে নি হরিপদ। বিয়ের ব্যবহাতেই ব্যস্ত ছিল সারারাত। শুভ দেববার সুরসভ কই? আর দেমাণাওনার কথা যখন অনেক আগে থেকেই পাকা হয়ে গেছে, দেখবারও তত প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় নি। বললেন, কেন দেয় নি?

যোড়ার ডিম দিয়েছে। যা যা বেবে বলেছিল তার আঁকেকেরও পাতা নেই।

বল কি? চমকে উঠলেন হরিপদ।

বলব আর কি? নিজেই দেখ না গিয়ে।

দেখলেন হরিপদ। তাই বটে।

কল্যাণী রাগে ফুলতে লাগলেন। লোকজনের ভিত্ত কমতে, বউকে একা পেয়ে বললেন আচ্ছা মত।

বলি বোমা, তোমার বাপ ব্যাটার আঁকেলটা কি শুনি?

শোভনা প্রস্টার ঘরনে একটু অবাকই হ'ল। বলল, কেন মা, কি হয়েছে বাবার?

‘মা, তুমি যেম কিছু জান না। কচি মুকি কিনা একেবারে।’ কল্যাণী বিভিন্ন ভঙ্গীতে মুখ বিকৃত করে উঠলেন। ‘ধাক, আর ভাকামি করতে হবে না তোমার।’

সত্যি সে কিছুই জানে না। তাই অকারণ এই বমকে শোভনা আহত হ'ল। বেদমাণু কণ্ঠে বললে, আপনি কিসের কথা বলছেন, সত্যি কিছু জানি না আমি।

তা কেন জানবে? বেদমা বাপ আর তার ভেদমি মেয়ে। হুই-ই চোর।

নুতন বউ হিসেবে শোভনা যতটা সম্ভব সংযত হয়েছিল। কিন্তু আর বৈধব্য রাখা সম্ভব হ'ল না।

আমার বাবাকে আপনি চোর বলবেন না।

ওর রাগে কল্যাণী গর্জনের আরও ধোরাক পেলে। চোরকে চোর বলব না? একশ' বার বলব। হাজার বার বলব।

কি চুরি করছে আমার বাবা?

শুধু চুরি? জোঁকোর, বদমায়েস। ঠকিয়েছে আমাদের। দেব বলে আঁকেক জিনিষ দেয় নি সে।

যে দেয় নি তাকে বলুন না। তার সঙ্গে বোকাপড়া করুন। আমার বলতে এসেছেন কেন?

তাকে ত বলবই। কাছে পাই সেই হারামজাদাকে একবার। তুমি সেই বাপেরই গুণঘর মেয়ে কিনা, তোমাকেও তাই বলতে এলুম।

ধবরদার বাবাকে গালাগাল দেবেন না বলছি।

ইস, বাপের উপর যে দরদ একেবারে উৎপলে উঠল। একশ' বার গালাগাল দেব, হাজার বার দেব। কি করবে? মারবে নাকি?

প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে।

বাস। নুতন বউয়ের এই জবাবের সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণী চীৎকারে রাড়ী মাধার করে ডুললেন। ওগো শুনছ একবার। ওরে ও অমর, একবার শুনে যা।

বাদের ডাকা হ'ল, তারা ত এলই, ছুটে এল আরও অনেকে। কাছের বাড়িতে লোকজনের ত অভাব নেই।

কি হয়েছে মামীমা? অমর শুভাল।

হবার আর কি বাকি আছে বল? বউয়ের এত বড় আশ্রয়ী, বলে দরকার পড়লে আমার গায়ে হাত ওঠাবে। তারপর স্বামী দিকে চেয়ে বললেন, কি মেয়েই পছন্দ করে এনেছ। মেয়ে নয় ত, দজ্জাল মাগী। রূপ নিয়ে কি হবে? অমর রূপের মুখে ঝ্যাটা মারি।

অমর নুতন বউয়ের দিকে তাকাল। মামীমাকে তুমি এই সব বলেছ?

হ্যাঁ। গভীর কণ্ঠ শোভনার।

কেন?

উনি আমার বাবাকে চোর বলেছেন।

বেশ করেছেন, বলেছেন। তাই বলে তুমি এমন ছোট-লোকেদের মত বগড়া করবে নাকি। আর চোর ত সত্যিই তোমার বাবা।

না। শোভনা বললে।

চুপ, তর্ক করো না। অমর গভীর।

তর্ক করছি না। আর বগড়াও আমি আরম্ভ করি নি। তোমার মামীমাই ছোটলোকের মত বগড়া আরম্ভ করেছেন।

কল্যাণী কেটে পড়লেন। শুনহিস ছোটলোকের মেয়ের কথা? শোন্। আমার বলে কিনা ছোটলোক। জোঁকোরের গুণ্ডি সব।

আমরা জোঁকোর হতে পারি, কিন্তু আপনাদের চামার।

এর পর অমরের গলা বজ্রের মত গর্জে উঠল, কেন যদি কোন দিন একথা তোমার মুখে শুনি, গলা টিপে মাটিতে পুঁতে ফেলব। যাও এখন থেকে, শিশু গির যাও। যাও।

এই আদেশ অমর করবার মত হুঃসাহস পেলে না শোভনা। ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিলে। বিছানার এগে বসল। চোখ কেটে তার কান্না আসছে। কি করেছে সে? কিছুই নয়। অপরাধের লেশমাত্রও নেই তার। অমর যদি কিছু হয়ে থাকে ত সে তার বাবার। এদের কাছ থেকে চোর, জুয়াচোর এই ধরনের অপবাদ বিনা প্রতিবাদে বাবাকেই সহ্য করতে হবে। কিন্তু এই অপরাধ বাবা করেছেন তারই জন্তে। মরত বিয়ে তার হ'তই না। তাই ত শোভনা অপবাদের সব বোকা বাবার মাথা চাপিয়ে দিয়ে নিজে বেইমানের মত এক পাশে সরে দাঁড়াতে পারছে না। কেনম করে পারবে? কোনও মেয়েই কি পারে?

অপরাধ শোভনার, সে ওই বাপের মেয়ে। আরও অপরাধ, সে প্রতিবাদ করেছে। হতভ প্রতিবাদ করত না। কিন্তু এদের অভিযোগের ভাষা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদ না করে তাই ত পারল না শোভনা। ওরা ত জানে না তার ‘জোঁকোর’ বাপ সর্বত্র বেচেই সাধামত দিয়েছে। প্রতিবাদ সে করেছিল এই তেবে যে, স্বামীর কাছে

ভরসা পাবে, প্রতিবিধানের আশা পাবে। তাই ত সেও
ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে এক রাপ নীচে নেমেছিল।

না, তার ভুল। এখানে কেউ নেই তার পাশে। সে
একা। স্বামীও তাকে ভুল বুঝল। বিয়ের শুভ লগ্ন থেকেই
তার সুর হ'ল দুঃখের পৃথিবী। তার কুমারী-জীবনে নীচ
বাঁধার সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল।

কাজলকালো চোখের বগ্নসুরভিত নীল তারা, ফুলের
বাসরে কিছুই পেলো না খুঁজে, পেলো শুধু নোনা ছলের বড়া।

রমানাথ এলেন যেরকম নিতে।

ওকে দেখে কল্যাণী তুবড়ির মত কেটে পড়লেন, মেরে
নিতে এসেছে? সাহস ত কম নয় দেখছি।

আজ্ঞে। হাত কচলালেন রমানাথ।

ছোড়ো, বদমায়েস, চামার।

হাললেন রমানাথ। যেন কালা হয়ে গেছেন।

আজ্ঞে, কমা করুন। দোহাই, বিশ্বাস করুন, এর চেয়ে
বেশী আর দিতে পারলাম না।

হরিপদ এবার কথা কইলেন। মহা বড়িবাড় ভূমি।
এখন কমা চেয়ে আর কি হবে? তখন তো বড় বাড়
মেড়েছিলো যা চেয়েছিলোয় তাতেই। যাও এখন।

আজ্ঞে দয়া করুন।

দয়া? এর চেয়ে বেশী আর কেউ করতে পারে না।
আমাদের হাতে পড়ছে, তাই খুব বেঁচে গেলে। অত কারও
পাল্লায় পড়লে টেরটি পেতে। যাও, মেরে পাবে না।

আজ্ঞে...

যাও বলছি।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনতে শুনতে শোভনার
দেহের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল দুঃসহ আলায়। কেন বাবা
দাঁড়িয়ে এভাবে অপমানিত হচ্ছেন তখন থেকে? যাম না
চলে। মাই-বা গেল শোভনা। তাকে তো বিসর্জন
দিয়েছেনই এদের হাতে। ক'দিনের জন্তে কাছে পেয়ে কি
হবে? তাতে দুঃখই বাড়বে শুধু।

রমানাথ মেরের কাছে দাঁড়ালেন একটুখানি।

চললাম মা।

আমি বেশ ভালই আছি বাবা। তোমার কোন ভয়
নেই। শোভনা কান্না চেপে বহকটে জানাল।

আশীর্বাদ করি তাই থাক মা, তাই থাক।

কিন্তু রমানাথ চলে যেতেই শোভনা নিজের বরে ঢুক
কুপিয়ে কুপিয়ে কঁদতে লাগল।

হিঃ বউ, অল্প কাদো না। শরীর ধরাপ হবে, চোখ
ধরাপ হবে। এখনই উঁকি দারি, বেশি বউ আমার কঁদছে।

কে? কে এত ভাল কথা বলে? কে এমন আঙু এ

বাড়ীতে। বিমানা ছেড়ে বড়ফড় করে উঠে-বসল শোভনা।
জলতরা চোখে তাকাল।

কে তাই তুমি?

আমার তুমি চিনবে না বউ। আমি নেতার মা। আমি
বাসম মাছি।

ওঃ, তুমি ভাল, খুব ভাল।

না বউ, না। ভাল আমি নই। ভাল হলো কি তোমার
সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে হ'ত। আহা, এই ক'দিনেই
আমার সোনার পিভিমের কি ছিঁরি হয়েছে গা। যেমন
চামার মাগি, তেমনি হতভাগা অন্নরটা।

আন্তে বল নেতার মা, আন্তে।

কেন? নেতার মা কাউকে ডরায় না। তা সে যেই
হোক। সত্যি কথা বলতে ডর কিসের? তোমার ওরা
মেরে ফেলবে বউ।

শোভনা হাসল। দ্বান হাসি।

ভয় নেই, এত ভাড়াভাড়ি আমি মরব না।

সে তোমার পেরমাই মা। তবে ও মাগির বড় মোলা।
ও সহজে মরছে না। জলে পুড়ে মরবে।

হিঃ, অমন কথা বল না।

মাঝে কি বলি মা। তোমার চোখে রাতদিন জল দেখে
বুকটা যে কেটে যায় বউ।

বুক বরিজীর মতই সর্ব্বসহা হয়ে শোভনা কাটিয়ে চলে
তার নুতন জীবন। কথা বলে মা, কথা শোনাও না। জানে
প্রতিবাদে কোন সুফল হবে না, বরং দুঃখই টেনে আনবে
আরও। শুধু গোপনে ফেলে চোখের জল। এই বাড়ীতে
এত মাহুষের মারে তার আপন কেউ নেই। কেউ তাকে
বাসে না ভাল। এই সঙ্গীহীন জীবন হরত দুঃসহ হয়ে উঠত,
নেতার মাকে না পেলে। সত্যিই সে ভাল।

ওর সঙ্গে কথা বলে শোভনা—সুখদুঃখের কথা।

কেউ আমার ভালবাসে না, কেউ চায় না আমার। বল
আমার কি দোষ?

দোষ তোমার নয় বউ, এই হ'ল সংসারের নিয়ম। যে
ভাল, যে নির্য্যাস তার ভাগেই তো কোটে অপবাদ।

নেতার মার কথাগুলো তারি ভাল লাগে শোভনার।
বলে, তবে তুমি কেন কাছে আমার আস? কেন আমার
ভালবাস?

আমি তো আর ওদের মত বুকটা পাখর করতে পারি নি।

এই নির্ধন পৃথিবীতে নেতার মা-ই শুধু তার আশ্রয়।
ওকে ভালবাসে নেতার মা।

ক'দিন থেকে শরীরটা ধরাপ লাগছে শোভনার। মাধার
দাক্ষণ যুগ্মা—চোখের দুটি বাপনা। কিছুকণ দাঁড়িয়ে

ধাকলে সারাটা শরীর টলমল করে ওঠে। এখনে তেমন নজর দেয় নি শোভনা। অমন একটু-আট্ট শরীর খারাপ করাই বা না হয়। ঠিক হয়েছে যাবে। কিন্তু না। মাথার ব্যথা যেন দিন দিন আরও চেপে বসতে লাগল। চোখের ভারার স্নান হয়ে আসে জ্যোতি। যেন কুয়ালা মেঝেতে পুঁথিবাঁতে।

তাই শেষে এক দিন অমরের কাছে এস।

ওগো শুভম?

কি? অমর আপিসের কাজ করছিল। বিরক্ত হয়েই সাড়া দিলে।

এক বার ডাক্তারবাবুকে ডেকে দেবে?

কেন? ডাক্তার কি হবে?

অমরের কথার ধরণ দেখে আর জবাব দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল না শোভনার। ভুবুলল, মাথাটা আমার ক'দিন থেকে এত ব্যথা করছে কি বলব।

মাথা ধাকলেই ব্যথা ধরবে। মাথাব্যথা কি এমন রোগ যে তার ক্ষেত্রে একেবারে ডাক্তার ডাকতে হবে। পরলা আমাদের অভ্যস্ত নয়।

জবাব শুনে শোভনা চলে গেল। আর একটা মুহূর্তও দাঁড়াল না।

মামীমা ধাবার নিয়ে এলেন।

বউকে যেন এখানে দেখলাম?

হ্যাঁ।

কি কিসকাস করছিল রে?

কিছু নয়। বলল, মাথা ধরেছে, ডাক্তার ডাক।

‘ইস, লবাবনলিনী এসেছেন। ডাক্তার ডাক।’ মামীমা দুখের বিভিন্ন ভঙ্গী করলেন। ‘মাথা ধরেছে তো শুয়ে থাক, কপালে মালিস কর। মাথা যেন আর হুনিয়ার কারও কোন দিন ধরে নি।’...

দিনের পর দিন চোখ দুটোর দীপ্তি নিভে আসছে, বুকেতে পারে শোভনা। আর সেই সঙ্গে মাথার অসহ্য যন্ত্রণা। আর কিন্তু কাউকে সে কিছু বলে না। ভাল হওয়া যদি অদৃষ্ট থাকে আপনাই হবে।

বলে শুধু নেভার মাকে। না বলে পারে না।

চিকিৎসা করাও।

ডাক্তার ডেকে লাভ নেই। টাকাই নষ্ট। এমনই ভাল হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, ভাল হবে না বোড়ার ডিম। এমন করে থাকলে চোখ দুটো যে-যোয়াবে বউ।

হাসল শোভনা। এ চোখ যাওয়াই ভাল।

শোম কথা। দাঁড়াও, এখুনি আমি মাগীর কাছে যাচ্ছি। না।

না কেন?

আমি বলেছিলাম।

তাঁ কি জবাব দিলে সে?

শোভনা স্নান হাসল শুধু।

দরজার চৌকাঠে পা আটকে শোভনা কেটলিটা ভাঙল। কল্যাণী চীৎকার করে উঠলেন, ভাঙ সব, ভাঙ। কি আকুটে বউই এসেছে রে বাবা। বলি হ্যাঁ বউমা, কি আকুল তোমার শুনি? দেখে চলতে পার না? চোখের মাথা ধরেছে নাকি?

শোভনা লজ্জার মুহূর্তে বললে, চোখ দুটো আমার—

অমন চোখের যাওয়াই ভাল।...

শেষ পর্যন্ত সত্যিই চোখ দুটো গেল শোভনার।

‘যাবে না? চিকিৎসা না করলে যাবে না?’ নেভার মা না বলে পারল না। ‘যেমন পিঁশেচের বাড়ীতে এসেছে।’

শোভনা চাপা গলায় বললে, হুপ। কেউ শুনে ফেলবে।

কেন, তরুটি কিসের? সত্যি কথা বলতে নেভার মা কাউকে ডরায় না।

কিন্তু কথা কানে ঠিকই গেল। তৈরবী মৃত্তিতে কল্যাণী ছুটে এলেন।

কি, আমারই বেয়ে পরে আমারই গারে বিষ তোলা। বেরো এ বাড়ী থেকে, আজই বেরো। এখুনি।

যাচ্ছি। এই চামারের বাড়ীতে এক মুহূর্ত আর থাকার ঘর? হুঁ হুঁ করে চলে গেল নেভার মা।

চোখ গেছে, আরও কত কি যাবে। এখন হয়েছে কি। আমাদের ঠিকানো, গুরুজনকে গালমন্দ দেওয়া। পাপের ফল ফলবে না? মাথার উপর কি ভগবান নেই?

নেভার মা চলে গেল। এ বাড়ীতে যাও একজন সত্যি-কারের দরদী ছিল, সেও চলে গেল। তাকে ফেলে গেল না, তাকে ভালবাসত বলেই চলে গেল। অজ্ঞানের প্রতিবাদ করে গেল। ওর ক্ষেত্রে হুঃ হুঃ শোভনার। কেন তাকে ভাল সে বাসল? শোভনার ক্ষেত্রেই ত তার চাকরিটা গেল।

ওই বউ মাগিই যত নষ্টের পোড়া। তাই ত ভাবি, রাত-দিন ওদের কি এত কিস্কিসানি। কই আগে ত নেভার মা এমন ছিল না। ওই বউটাই ওর কানে বিষ ঢুকিয়েছে।

এমনি নামা ধরণের মন্তব্য কানে আসে শোভনার। সত্যি কথাই, নেভার মার এই স্বভাবের ক্ষেত্রে সে-ই দায়ী। কেন সে পৃথিবীর হুঁজুগের বোকা সঙ্গে নিয়ে এ বাড়ীতে পা দিলে?

অমর রাঙ করে বাড়ী ফিরে দেখে, শোভনা তার অপেক্ষায় বসে। পারের সাড়া পেতে ধাবার এগিয়ে দিলে।

আঃ, তুমি আবার কেন? ওসব আমি নিয়ে নিচ্ছি। চোখে দেখতে পাও না। আবার কিছু একটা ভাঙবে।

না গো না, কিছু ভাঙবে না। হাসল সে অমরের কণ্ঠ।
না, ভাঙবে না আবার? আর ভাঙলে তোমার আর
কি, কতি ত আমাদেরই হবে। সর এখান থেকে, যাও।
এর পর আর কিছু বলতে পারে না শোভনা। আঙুলে চলে
যায়।

বেলফুলের গাছটা সাদা ফুলে তরে গেছে। দেখতে না
পেলেও, আকুল গড়ে ফুলের অঙ্গভঙ্গা সে বুঝতে পারে।
চাকর ফুল এনে দেয় সাক্ষি তরে। মালা গাঁথে শোভনা।
মালা হাতে অমরের কাছে যায়।

শোন।

কি আবার?

দেখ কি সুন্দর বেল ফুলের মালা বেঁধেছি। এস না,
পরিয়ে দিই।

আঃ, বিরক্ত করো না এখন। যাও।

সুখ হর শোভনা। বলে, পরবে না?

আজ্ঞা দাও। চোখে ত দেখতে পাও না, এদিকে মালা
গাঁথবার লব দেখছি ষোল আনা। থাক থাক, আমাকেই
দাও, তোমাকে আর ওস্তাদি করে পরাতে হবে না। পড়বে
শেষে আমার গারে হুমড়ি খেয়ে।

মালাটা হাতে নিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দেয় অমর।

সত্যি বল, ভাল মানার নি তোমার?

চমৎকার মানিয়েছে। অমর ব্যঙ্গ করে বলল।

তুমি ফেলে দিয়েছ? হঠাৎ বলে উঠল শোভনা।

কে বললে? চমকে উঠল অমর। কি করে জানলে?
চোখে ত দেখতে পাও না।

কিন্তু মাকে ত গল্প পাই। অভ গল্প বেল ফুলের, কোথায়
গেল? কেমন ছুঁমি ফেলে দিলে? কেমন?

বেশ করেছি। যাও এখন বিরক্ত কর না।

এই নিঃসঙ্গ, অবজ্ঞাত, জীবনের বেদনার যেম এক দিন
শেষ হ'ল—যেদিন টের পেল শোভনা, একজনের আগমনের।
বিয়ের পর এই দীর্ঘ দিনগুলোর ভেতর দিয়ে যা কিছু অবজ্ঞা,
অভ্যাচার ও অনাদর সে পেয়েছে, আজ সে সব মনে হ'ল
ভুচ্ছ। বহু দিনের পর সত্যিকারের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ শোভনার
মেহে জোরার বইয়ে দিয়ে গেল। মা হবে সে, মা। আমদেরই
ধর। এর চেয়ে বড় আনন্দ তার কাছে আর কিছু
নেই। সব আশাভ ভুলে গেছে শোভনা। মাতৃয়ের
অনুভূতি অতিথিত দেহের শিরার শিরার এক আশ্চর্য
পুলকানুভূতি। আর সে একা নয়। তার একা থাকার
দিন শেষ হতে চলেছে। আসছে একজন তার একান্ত
আপনার জন। ও ত তাকে স্থগা করতে পারবে না,

পারবে না অবজ্ঞা করতে। সেই শিশু ত তারই, তারই
রক্তের—তারই একাএ কামনার। মাকে সে কেমন করে
দূরে রাখতে পারবে? ভাল যে তাকে বাসতেই হবে। ওর
উপর দাবি আছে শোভনার। মায়ের দাবি। সবচেয়ে
বড় দাবি।

দবাগত একজনের আগমনের সাদা ছাপে বাড়ীতে।
সকলের ব্যবহারে শোভনা আশ্চর্য রকম পরিবর্তন লক্ষ্য
করে। সে মা হতে চলেছে, তাই কি?

শোভনা যেন এতক্ষণ সুন্দর এক আলোর পৃথিবীতে
বেড়িয়ে এল। স্বপ্নের মতই অপূর্ণ।

‘জানি, এমন বউ যখন ঘরে এনেছি তখনই কপাল পুড়েছে।
নাতির মুখ দেখব, সে ভাগ্য কি আর এই অজুহুণে বউ
থাকতে হবে।’

কল্যাণীর এই কথাগুলো কানে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল
শোভনার। পাশে হাত দিয়ে কাকে যেন বুজল। কই
সে? কই?

হর্বিস দেহে ও আঁর্জ কঠে বললে, বোকা? আমার
বোকা কই?

থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না। থাম।

সত্যি বল না, কোথায় সে। তোমাদের পারে পড়ি।

মরি মরি, ঢং দেবে আর বাঁচি না। সে নেই।

নেই? কে মিলে? কোথায় গেল? শোভনার মাতৃহৃদয়
উবেল হয়ে উঠে এই নির্ধন বোধগার।

বাবে আবার কোথায়? শোন কথা। নিজের ছেলেকে
নিজেই ধরেছে। তা মনে নেই? ঢং দেবে আর বাঁচি
না।...

সে নেই? তবে কোথায় গেল? এই তো সে ছিল।
ধানিক আগেই সে যে ছিল। শোভনা মর্শ করেছিল সেই
আলোর শিশুর চোখ, মুখ, নাক। মাথার নরম চুলে সে যে
বুলিয়েছিল হাত। কানে বেজেছিল তার প্রথম ডাক। এই
তো ছিল। একটু আগেই ছিল। কোথায় গেল?

হ্যাঁ, ঠিক। এরাই লুকিয়ে রেখেছে। এরা শোভনার
মুখ যে ছ'চোখে দেখতে পারে না। এরা বুঝে হিংস্রটে।
তার শব্দ এ বাড়ীর মাহুঘের। হ্যাঁ, এরাই লুকিয়ে রেখেছে।
এরাই।

কিন্তু কোথায় লুকিয়ে রাখবে? কত দিন? এক দিন
শোভনা ওকে খুঁজে বের করবেই।

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, রোজ রাতের অন্ধকারে সকলের
অগোচরে এ বাড়ীর অন্ধ বউ কি যেন হাতড়ে বেড়ায়।

শিল্পবিদ্যালয়ের প্রথম বৎসর

শ্রীযোগেশচন্দ্র রাগল

“কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা” শীর্ষক পূর্ব প্রবন্ধে শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। উহাতে এই সময়কার পত্র-পত্রিকা হইতে বিদ্যালয়টির শিক্ষক, ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষণীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। শিল্পবিদ্যালয় ১৮৫৪, ১৬ই আগষ্ট* প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পরে ‘দি ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া’ ১৮৫৪, ২৪শে আগষ্ট সংখ্যায় ইহার উপরে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে বিদ্যালয়ের সমর্থন করিতে গিয়া ‘ফ্রেন্ড’ বাঙালীদের দানশীলতা এবং নব নব বিদ্যার্জ্জম-স্পৃহার প্রশংসা করিতেও পক্ষাণ্ণদহন নাই। বিদ্যালয়ের উন্নতির পক্ষে ছোট ছোট বাধা—যেমন উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অপ্রতুল প্রতীতির প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, এম. আগিয়ার এক শত কুড়ি টাকা মাসিক বেতনে চিত্র-বিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। মুৎ-পুতুলি-নির্মাণশ্রেণীর অধ্যাপক এম. রিগউড বিনাবেতনেই শিক্ষকতাকার্য্য করিতে থাকেন। তবে তাঁহার একজন দক্ষ বাঙালী সহকারী ছিলেন। এই সহকারীটির নাম এখনও পাই নাই। ‘ফ্রেন্ড’ বলেন, বিদ্যালয়টিতে ব্যবহারিক শিল্পাদি শিক্ষারও আয়োজন হইয়াছে। ইষ্টক ও মুৎ-শিল্পের রকমারি দ্রব্য তৈরি পরীক্ষামূলক ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রগণও হাতের কাজ করিতে কুঠা বোধ করিতেছে না। যেসব ছাত্র ভর্তি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আটশ জন এংলো-ইণ্ডিয়ান, বাকী সকলই হিন্দু। শেবোক্তদের মধ্যে আবার এগার জন ব্রাহ্মণ। আমরা পূর্ব প্রবন্ধেই জানিতে পারিয়াছি যে, চিত্রবিদ্যা শিক্ষার শ্রেণীতে পঞ্চাশ জন এবং মুৎ-শিল্পাদি শিক্ষার শ্রেণীতে পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্র ভর্তি করা হইয়াছিল। স্থানাভাবে ইহার অধিক আপাতত ভর্তি করা হইবে না—কর্তৃপক্ষ এক্রপ স্থির করিয়াছিলেন।

শিল্পবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধেও প্রথমে আমাদের একটু স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী

সভা শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার সভাপতি ছিলেন কর্ণেল এইচ. গুড উইন। তিনি সে যুগের একজন বিখ্যাত সরকারী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন দুই জন—বাংলা-সরকারের আওর-সেক্রেটারী হজমদ প্রাট ও এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিয়ান, পরবর্তীকালে সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ও রাজনীতিজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্য্য শিল্পবিদ্যালয় পরিচালনা ও উন্নতি-চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার যে কয়েকটি অধিবেশনের বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভার অন্ততঃ সম্পাদক হইলেও, প্রথম বৎসরে বিদ্যালয় সম্পর্কে পত্রিকাদিতে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয় প্রথম বিজ্ঞপ্তি-পত্র ব্যতীত সমুদয়ই অবৈতনিক সম্পাদকরূপে প্রাটের একক স্বাক্ষরযুক্ত দেখিতেছি। তবে ১৮৫৫ সনের জুলাই মাসের শেষে দ্বিতীয় বৎসরের জন্য যে অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয় তাহাতে হজমদ প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র দুই জনই পুনরায় অবৈতনিক সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। বর্তমান বৎসরে সভার বিভিন্ন অধিবেশন সম্পর্কে শিল্পবিদ্যালয়-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হইবে। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও শিল্পবিদ্যালয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি ছিল, প্রথম হইতেই আমাদের সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এজ্ঞা এখানে এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখিলাম।

২
রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও দীন্দ্রচন্দ্র সিংহ প্রমত্ত চিংপুরের বাড়ী হইতে শিল্পবিদ্যালয় ১৮৫৪ সনের নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি মতিলাল শীলের কলুটোলাস্থ একটি দ্বিতল ভবনে উঠিয়া আসে।* এই ভবনটি ছিল তখনকার নিউ ফিভার হস্পিটালের (বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ জেনারেল হাসপাতাল) উত্তর দিকে কলেজ ষ্ট্রিটের উপরে। তখন উক্ত হাসপাতাল ও এই বাড়ীর ভিতরে একটি গলি ছিল—এরূপ উল্লেখ পাইতেছি। তখন মতিলাল শীল গতায় হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ—হীরালাল শীল ও তদীয় ভাতার্য্য এক বৎসরের জন্ত এই বাড়ীটি বিনা ভাড়ায় শিল্পবিদ্যালয়ের জন্ত ইহার কর্তৃপক্ষ শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভাকে অর্পণ করেন। এই বাড়ীতেই পূর্বে মতিলাল

* ১৬ আগষ্ট বুধবার ১৮৫৪ তারিখের ‘বেদন্ত হরকরা’র সম্পাদকীয় নিবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়াইয়াছি যে, এই তারিখেই শিল্পবিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল। উক্ত নিবন্ধে এই কথা কয়টিও আছে:

“It opens today with a modelling class, and a drawing class. . . .”

* The family of the late Muttu Loll Seal, have offered the building formerly known as Seal's College, rent free, to the Industrial School of Art; and the offer has been greatly accepted. . . .—The Friend of India, November 23, 1854; Weekly Epitome of News—Friday, November 17.

শীলের 'শীলস কলেজ' প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে বিদ্যালয়টি উঠিয়া আসায় বাঙালী-অবাঙালী উভয় অঞ্চলের ছাত্রদেরই বাতায়নের সুবিধা হইল। ছাত্রেরাও অধিক সংখ্যায় ভর্তি হইতে লাগিল।

শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার অন্যতর সম্পাদক হজসন প্রাট বিদ্যালয়ের আবাসস্থল পরিবর্তন ও ছাত্রদের শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে একখানি দীর্ঘ-পত্র ১৮৫৪, ২০শে নবেম্বর 'বেঙ্গল হরকরা'য় লিখিয়া পাঠান। এখানি পরবর্তী ২৭শে নবেম্বরের 'হরকরা'য় প্রকাশিত হয়। তিনি লেখেন, ছাত্রেরা মডেলিং বা মৃৎ-পুত্তলি নির্মাণ এবং শিল্পকার্যে প্যারিস-প্রাণ্টারের ব্যবহারে বেশ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার দরুন ছাত্রাবস্থায়ই তাহারা কিছু কিছু রোজগার করিতে সক্ষম হইবে। বাহির হইতে যেসব মাটির বা প্যারিস-প্রাণ্টারের দ্রব্য অথবা মূর্তি নির্মাণের অর্ডার আসিবে তাহার লাভের অংশ অথবা কমিশন আত্মপাতিক ভাবে প্রত্যেক ছাত্রের হিসাবে জমা পড়িবে। শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে কোন ছাত্র বিদ্যালয় ছাড়িয়া গেলে তাহার প্রাপ্য বাজেয়াপ্ত হইবে। আর, প্রশংসানুচক সার্টিফিকেট-সহ শিক্ষাকাল অন্তে বাহির হইলে প্রত্যেক ছাত্রই তাহার মজুত টাকা পাইবার অধিকারী থাকিবে। ইহা দ্বারা তাহার পক্ষে নূতন কার্য বা ব্যবসায় আরম্ভ করা কতকটা সহজ হইবে। পত্রে তিনি আরও বলেন-যে, যে-কেচ বিদ্যালয়ে আসিয়া ছাত্রদের শিল্পকর্মে উৎসাহদান করিলে কর্তৃপক্ষ স্থখী হইবেন। তাহাদের মন্তব্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একখানি 'পরিদর্শক-বহি'ও রাখা হইয়াছে। ইহার পর উক্ত পত্রে তিনি এমন একটি শুভকর প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থদান করিতে সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন।

৩

বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মৃৎ-পুত্তলি-আদি নির্মাণে অল্প-কালের মধ্যেই কতকটা পারদর্শী হইল। চিত্রবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করা সম্ভবপেক্ষ। ইহাতে তখনই তাহারা তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। তথাপি শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে সভাপতি গুডউইন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিল্পকার্যাদি সাধারণের গোচরে আনিবার জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি ১লা নবেম্বর (১৮৫৪) তারিখযুক্ত একখানি বিজ্ঞপ্তি-পত্র কলিকাতার দেশী-বিদেশী শিল্পরসিক ও বিদগ্ধ-মণ্ডলীর নিকট প্রেরণ করেন।* পত্রখানির শিরোনাম ছিল—“To the Patrons and Lovers of Art,

Industry and Science”। তিনি বিজ্ঞপ্তি-পত্রে লেখেন যে, ছাত্রেরা ইতিমধ্যেই চিত্রবিদ্যা এবং মৃৎ-পুত্তলি নির্মাণে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখাইয়াছে। লিথোগ্রাফি, কাঠ-খোদাই এবং কারুকার্যখচিত মৃৎ-পাত্রাদি নির্মাণেও যে তাহারা দ্রুত উন্নতিলাভ করিবে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। কিন্তু শিল্পকর্মের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, ছাত্রেরা যাহাতে উৎসাহ পায় সেজন্য সাধারণের নিকট হইতে সহায়ভূতি এবং অর্থলাভ একান্ত আবশ্যক। প্রদর্শনীর মারফতই ইহা সম্ভব। তিনি প্রস্তাব করেন, পরবর্তী জাম্বুয়ারী মাসে টাউন হলে একটি চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে, ছাত্রদের শিল্পকার্যের সঙ্গে বাহিরের শিল্পীদের চিত্রাদি এবং এদেশীয়দের গৃহে সংরক্ষিত শিল্প-দ্রব্যাদিও প্রদর্শিত হইবে। এ সকল কারু ও চাকু শিল্পের নিদর্শন লইয়া ভবিষ্যতে কলিকাতায় যে সাধারণগণ্য একটি 'পাবলিক আর্ট গ্যালারি' স্থাপিত হইতে পারিবে তাহারও আভাস গুডউইন উক্ত পত্রে দিলেন। সাহায্যকারী ব্যতিরেকে আর সকলের নিকট হইতেই প্রবেশ-মূল্য গ্রহণের প্রস্তাব হয়।

শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজনও চলিতে লাগিল। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এই প্রথম সাধারণ শিল্পপ্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা সবিশেষ তৎপর হইলেন। ১লা জাম্বুয়ারী ১৮৫৫ তারিখের একটি বিজ্ঞাপনে* জানা যায়, শিল্পপ্রদর্শনী টাউন হলে ২২শে জাম্বুয়ারী হইতে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকিবে। ইহা যে শিল্পবিদ্যালয়ের সাহায্য ও উন্নতিকল্পে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, একথাও স্পষ্টই উল্লিখিত হয়। ঐ তারিখের মধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ততঃ দেড় হাজার চিত্র সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।†

৪

প্রদর্শনী যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রদর্শিত চিত্রাদি সম্বন্ধে ঐ সময়ের বিভিন্ন পত্রিকায় সাধারণভাবে আলোচনা বাহির হয়। দর্শকগণ কেহ কেহ সংবাদপত্রে পত্র লিখিয়া নিজস্ব অভিমতও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ সমুদয়েই শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের এত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পকর্মে নৈপুণ্য প্রদর্শনের উল্লেখ আমরা পাই। ছাত্রদের শিল্পকর্ম এবং বিদ্যালয়ে তাহাদের কার্যপদ্ধতি সাধারণের গোচরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে টাউন হলের একটি অংশ নির্দিষ্ট ছিল। 'বেঙ্গল

* এই বিজ্ঞপ্তি-পত্রখানি ১৮৫৪, ২৭শে নবেম্বর তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় বাহির হয়।

* The Bengal Hurkaru and the India Gazette, January-1, 1855.

† এই সম্পাদকীয়

হরকরা' ২৪শে জাহুয়ারী ১৮৫৫ সংখ্যায় প্রদর্শনী সম্পর্কে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে ছাত্রদের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে লেখেন :

"At the East end of the Hall is a compartment appropriated to the Industrial School of Art; which is intended to exhibit the manner in which the pupils of the school are employed while under instruction. In this place they are seen working at the clay models by which they are instructed."

ছাত্রদের চিত্র ও মৃৎশিল্পকার্যাদি সম্বন্ধে জর্নৈক দর্শকের সমালোচনা উক্ত সংবাদপত্রে পরবর্তী ৩১শে জাহুয়ারী (১৮৫৫) তারিখে তাহারই একখানি পত্রমধ্যে প্রকাশিত হয়। ছাত্রেরা শিল্পবিদ্যা শিক্ষায় কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, ইহা হইতে তাহারও কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি লেখেন :

"To begin with the students of the Industrial Art. The modellers shew an ability for their work which is very encouraging, but the subjects chosen as copies are injudicious, to say the least of them, a bust of Napoleon or a Wellington requires real talent and the study of years to copy well, and is immeasurably beyond their present powers; the same may be said of a spirited sketch in clay of a Boar and Dogs, by a French Artist. The models of leaves, and some of the smaller animals in relieve, and the studies of hands and feet are much better done, and will be more useful to the pupils. The drawing it is unnecessary to mention. By the way how is it that the students do not draw from the books published by the London school of design, and why is the whole Exhibition under the superintendence of a French Artist?"

দর্শক এখানে ছাত্রদের মৃৎ-শিল্পকার্য ও অঙ্কনাদির দোষত্রুটি দেখাইলেও, কোন কোন বিষয়ে যে তাহারা উৎকর্ষলাভ করিয়াছে তাহা বলিতেও ভুলেন নাই। যাহা হউক, প্রদর্শনীতে টিকেট বিক্রয়ে বেশ অর্থাগম হয় এবং তাহা যথারীতি শিল্পবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ জমা থাকে।

৫

শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমিতি—শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার একটি সাধারণ অধিবেশন কর্ণেল গুড্‌উইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইল ১৮৫৫, ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। পূর্বেই কথা ছিল, সভা বিলাত হইতে তক্ষণশিল্পের (কাষ্ঠাদি খোদাই) অধ্যাপক আনয়ন করিবেন। লণ্ডনের মিঃ হুইটলি নামক এক তক্ষণশিল্পবিদ শিক্ষাপদ্ধতি ও বেতনাদি সম্বন্ধে সভাকে পত্র লেখেন। কিন্তু সভা তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণে এই বলিয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন যে, ইহার বর্তমান আর্থিক অবস্থায় সরকারের নিকট হইতে সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত এরূপ প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য করা সম্ভব নয়। ভ্যান গেল্ডার শিল্পবিদ্যালয়ে একটি সঙ্গীত বিভাগ খুলিবার জন্য গুড্‌উইনকে পত্র লিখিয়াছিলেন। একটি

প্রস্তাবে এ বিষয়ের বিবেচনাও স্থগিত রাখা হয়। এবারকার কার্যবিবরণে জে. আর. বেডফোর্ড—অস্থায়ী সম্পাদক বলিয়া সহি আছে। মূল সম্পাদক প্রাট এ সময় কলিকাতার বাহিরে ছিলেন।* 'বেঙ্গল হরকরা' শিল্পবিদ্যালয়ের বাহাতে দ্রুত উন্নতি হয়, সে বিষয়ে বরাবর লেখনী চালনা করিতেছিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫ সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'হরকরা' বলেন যে, অন্ততঃ মাদ্রাজের শিল্পবিদ্যালয়ে সেখানকার গবর্নমেন্ট যেরূপ অর্থসাহায্য করিতেছেন, বাংলা-সরকারেরও উচিত এই বিদ্যালয়টিকে অন্ততঃ সেইরূপ সাহায্য করা—বিশেষতঃ যখন দেখি এরূপ একটি বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার দ্বারা সমাজের অত্যধিক স্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা।

শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১২ই মার্চ (১৮৫৫) তারিখে। বাঙালী সভ্যেরা সভার কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এদিনকার সভায় বাঙালীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রায়চন্দ্র মিত্র, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সভায় ধার্য হইল, মৃৎ-কার্যাদি শিক্ষাদানের অধ্যাপক এম. রিগউড প্রত্যহ ছয় ঘণ্টা করিয়া কাজ করিবেন, ইহার জন্য তাঁহার মাসিক বেতন হইবে তিন শত টাকা। চিত্র-বিদ্যার শিক্ষক এম. আগিয়ার ইতিপূর্বে কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রতীতি হইতেছে। কারণ ইহার পরেই দেখিতেছি, রিগউড ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিখাইবার ভারও গ্রহণ করিয়াছেন। এই সভায় আরও স্থির হইল যে, প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে মাসিক টাকা তিন টাকা অথবা এককালীন আড়াই শত টাকা দেয়। এ অধিবেশনে ডবলিউ. টেলর ও রাধানাথ সিকদার নূতন সভারূপে গৃহীত হইলেন। ইউরোপীয় ও দেশীয়দের নিকট সাহায্য প্রার্থনাকল্পে একখানি আবেদন-পত্র রচনার বিষয় স্থির করিয়া সভা একটি সাব-কমিটির উপর তাহার ভার দেন। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হয় : এইচ. গুড্‌উইন, জি. স্কালো, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হরমোহন সেন ও হুজসন প্রাট।

৬

ইহার পরেই মনে হয়, মিঃ ফাউলার নামক একজন শিল্পী বিলাত হইতে শিল্পবিদ্যালয়ের তক্ষণশিল্পের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার বেতন হয় তিন শত

* The Bengal Hurkaru and the India Gazette, February 19, 1855.

টাকা। ১৬ই মে, ১৮৫৫ তারিখে লিখিত একখানি পত্র* হইতে এ বিষয় আমরা সর্বপ্রথম জানিতে পারি। পত্রলেখক এক দিন অকস্মাৎ শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদের শিল্পশিক্ষা সম্পর্কে বাহা বাহা দেখেন ও শুনে তাহা এই পত্রে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, দ্বিতলে একটি হল-ঘরে প্রায় এক শত ছাত্র তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষায় রত ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা রেখাচিত্রাদি অঙ্কন করিতেছিল। দ্বিতীয় বিভাগে গাছ, ফুল, ফল ও পাতা আঁকায় ছেলেরা লিপ্ত, প্রথম বিভাগে প্রতিভূতি ও পরিপ্রেক্ষিত (perspective) আঁকা হইতেছিল। এ সমুদয় এম. রিগউড শিক্ষা দেন। মৃৎ-শিল্প, ছাঁচে-ঢালাই, ভাস্কর্য, এবং স্থাপত্য শিল্পের অঙ্কনাদি তাঁহাকে শিখাইতে হইত। এসব কর্মে তাঁহার একজন মাত্র বাঙালী সহকারী। পত্রলেখক আর একটি প্রকোষ্ঠে ত্রিশ জন ছাত্রকে তক্ষণশিল্প—কাঠ-খোদাই প্রভৃতি কার্যে নিরত দেখিতে পান। অধ্যাপক ফাউলারের তত্ত্বাবধানে তাহারা এ বিষয়টি শিক্ষা করে। ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ যেরূপ অভিনিবেশ সহকারে নিজ নিজ কর্ম করিতেছিলেন, তাহাতে বিদ্যালয়ের ক্রম উন্নতি সম্বন্ধে পত্রলেখকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ছাত্রেরা সত্য সত্যই যে কোন কোন বিভাগে ক্রম উন্নতি করিতেছিল তাহার প্রমাণও শীঘ্রই পাওয়া গেল। ‘মিটিংজেন’ নামক দৈনিক জুলাই মাসের আরম্ভেই লিখিলেন :

“We are happy to state that the school of Industrial Art is now getting on well. The financial state of the Institution has been somewhat reclaimed. The encouragement of Mr. Fowler has done eminent benefit to it. Several of his pupils have so improved that the woodcuts that will adorn the pages of the work of Capt. D. L. Richardson “On flowers and flower gardens” have for the most part been prepared by them. From our knowledge of the performance we are able to say that they have been neatly executed, and reflect much credit both on pupils and instructors.”†

পত্রিকাখানি এখানে এই মর্মে বলেন যে, ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের ‘অন ফ্লাওয়ারস এণ্ড ফ্লাওয়ার গার্ডেনস’ পুস্তকের কাঠখোদাই চিত্রগুলি অধিকাংশই এই বিভাগের ছাত্রগণ তৈরি করিয়াছে। ইহাতে অধ্যাপক ফাউলার ও তাঁহার ছাত্রদল—দুইয়েরই কৃতিত্ব প্রকাশ

পাইতেছে। কাঠখোদাই ছবিগুলি খুবই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করিয়া করা হইয়াছে।

জুলাই মাসের শেষে শিল্প বিদ্যালয়সাহিনী সভার আর একটি অধিবেশন হইল।* এই অধিবেশনে পরবর্তী বৎসরে শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর কি কি সংস্কার সাধিত হইবে তাহা স্থির হয়। এখানে বৎসরে চারিটি প্রাথমিক শিক্ষা-শ্রেণী ও তিনটি উচ্চ শ্রেণী খুলিতে সভা মনস্থ করেন। প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে নানারূপ অঙ্কন-পদ্ধতি শিখানো হইবে। এ সকল শ্রেণীতে পারদর্শিতা দেখাইবার পর উচ্চতর বিভাগে ছাত্রেরা প্রবেশ করিতে পারিবে। তিনটি উচ্চ শ্রেণীতে যথাক্রমে শিক্ষা দেওয়া হইবে—১. মৃৎ-পুত্তলি আদি নির্মাণ ও ছাঁচে-ঢালাই, ২. তক্ষণশিল্প ও লিথোগ্রাফী, এবং ৩. উচ্চতর চিত্রবিদ্যা। প্রথম দুই শ্রেণীতেও চিত্রবিদ্যা শেখানো হইবে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে ছাত্র-বেতন মাসে আড়াই টাকা, তৃতীয় শ্রেণীতে দুই টাকা দেয়। ইহা ছাড়া সভা বয়স্কদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্ত একটি বিশেষ শ্রেণী খুলিবারও সিদ্ধান্ত করেন। এরূপ প্রত্যেক ছাত্রের বেতন ধার্য হয় মাসে পাঁচ টাকা। সপ্তাহে একদিন করিয়া তাঁহারা শিক্ষালাভ করিবেন। পূর্বোক্ত সাব-কমিটি কর্তৃক সাধারণের নিকট সাহায্য চাহিয়া যে আবেদন-পত্র রচিত হইয়াছিল তাহাও এখানে গৃহীত হইল। প্রতিষ্ঠাকালীন বিজ্ঞপ্তি-পত্রসহ ইহা সংবাদপত্রে প্রকাশের প্রস্তাবও সভা গ্রহণ করিলেন। নব-রচিত আবেদন-পত্র হইতে জানা যায়, শিল্পবিদ্যালয়ের তখনকার ব্যয় ছিল মাসিক ৭২০০ টাকা। ইহা দফাওয়ারী ভাবে এইরূপ দেখানো হয়—

মৃৎ-শিল্পকার্য, ছাঁচে-ঢালাই ও চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক (বাহির হইতে যেসব অর্ডার আসে তাহার আয় ও কমিশন বাদে)	মাসিক বেতন—৩০০০
তক্ষণশিল্প ও চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক	—৩০০০
ভূত্যা ও অজ্ঞাত ব্যয়	প্রতি মাসে —১২০০

মোট ৭২০০

সভ্যদের মাসিক টাঙ্গা ২৫০০ টাকা, ছাত্র বেতন ১২০০ টাকা, একুনে ৩৭০০ টাকা মাত্র শিল্পবিদ্যালয়ের মাসিক আয়। নূতন শিক্ষাবিষয়ক সরকারী ডেম্পাচে বিদ্যালয়-সমূহে সরকারী অর্থসাহায্য প্রদানের যে নিয়ম হইয়াছিল তাহাতে বিদ্যালয়ের মাসিক টাঙ্গার সমপরিমাণ সাহায্য সরকারের নিকট হইতে তাহারা পাইতে পারিতেন।

* The Bengal Hurkaru and the India Gazette, May 17, 1855.

† Quoted in The Bengal Hurkaru and the India Gazette, July 5, 1855.

* The Bengal Hurkaru etc., Aug. 9, 1855.

সুতরাং তখনও এক শত টাকার মত সভার আয় বাড়ানো দরকার ছিল। প্রয়োজনীয় ব্যয় তখন পর্যন্ত প্রতি মাসে স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে মিটানো হইতেছিল। আবেদন-পত্রে সর্বশেষে সাধারণের নিকট এই পরিমাণ অর্থসাহায্যের জন্ত অনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়।

এই দিনের অধিবেশনে পরবর্তী বৎসরের জন্ত শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধ্যক্ষ-সমিতিও গঠিত হয়। সভাপতি কর্ণেল গুড্‌উইন এবং সম্পাদকদ্বয় হজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্ববৎই রহিলেন। কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ডাঃ এ. সি. ম্যাক্রি। ইহা ছাড়া সদস্যদের মধ্যে ছিলেন একুশ জন ইউরোপীয় ও দশ জন বাঙালী। শেখোক্তদের নাম এই : ডাঃ সুর্যকুমার গুপ্তি চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, বিশ্বেশ্বর দত্ত, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামচন্দ্র মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, হরি-মোহন সেন, হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রাধানাথ সিকদার।

উক্ত অধিবেশনে আরও সাব্যস্ত হয় যে, পরবর্তী ১লা সেপ্টেম্বর শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করা হইবে, ঐ সময়ে তাহাদের শিল্পকার্যের একটি প্রদর্শনীও তাহারা আয়োজন করিবেন। সভার পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে (২২ আগষ্ট ১৮৫৫) অধ্যাপক রিগউডের অস্থস্থতানিবন্ধন উহা কিছুকালের জন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইল।* এদিনকার অধিবেশনের আলোচনা হইতে কয়েকটি নতুন বিষয় জানা গেল। লাইসিয়াস হইতে চিত্রবিদ্যার পুস্তক ও তদুপযোগী দ্রব্যাদি বিদ্যালয়ের জন্ত পাওয়া যায়। সম্পাদক প্রাট নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্ত প্যারিস হইতে অনেকগুলি রেখাচিত্র এবং প্যারিস-প্রাষ্টার আনয়ন করিয়াছেন। সরকার হইতে অর্থসাহায্য পাওয়া গেলে, তিনি সানন্দে এগুলি বিদ্যালয়কে দান করিবেন, বলেন। একটি প্রস্তাবে সরকারকে এই বলিয়া অনুরোধ জানানো হয় যে, এখানকার শিল্পী ছাত্রগণকে শিক্ষান্তে যেন সরকারী জেলা ও অত্রাঙ্ক স্থলে চিত্রাঙ্কনের শিক্ষকরূপে গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘকাল পরে, সম্প্রতি কিছুকাল হইতে এই অস্থায়ী কার্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আর একটি প্রস্তাবে সম্পাদক হজসন প্রাটের কলিকাতায় অল্পপস্থিতিকালে আমেরিকান একেশ্বরবাদী পাদ্রী সি. এইচ. এ. ড্যালকে অত্রতর সম্পাদকপদে নিয়োগ করা হয়।

অবশেষে ১৮৫৫ সনের ১০ই অক্টোবর শিল্পবিদ্যালয়ের বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই দিন ছেলেনের শিল্প-

বিদ্যা শিক্ষার উৎসবের নিরিখে ষথারীতি পারিতোষিক ও প্রদান করা হয়। এ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিয় কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর লরেন্স পীল। সভাপতির ভাষণে তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদের শিল্পবিদ্যায় উৎকর্ষ দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এরূপ একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান—যেখানে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্র গণ স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের স্বযোগ পাইতেছে তাহার সাহায্যার্থে সরকারকে অগ্রদূর হইতেও বিশেষ জোরের সহিত দাবি জানান। এই উপলক্ষে ছেলেনের চিত্রাদির একটি প্রদর্শনীও ১০ই ও ১১ই অক্টোবর বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্যন্ত খোলা হইল। ঐ সময়কার সংবাদপত্র সম্পাদক-গণ শিল্পবিদ্যালয়ের ভাবী স্বফল-সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া নিজ নিজ পত্রে বিশেষ প্রশংসা করেন। আমরা এখানে ডি. এল. রিচার্ডসন সম্পাদিত 'ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

“... For our own part we were perfectly astonished at the progress made by the students in so short a time; and we can hardly speak in terms of sufficiently high praise of all concerned in the establishment of this well-meant and well-judged attempt to instruct the mind and hand simultaneously of the youthful Hindoo, so that he may become at once an enlightened and a practically useful member of society. A man so educated, conscious that he has the means, will insensibly acquire the habit and the pride of self-support and independence. If this Institution be continued, as we earnestly hope it may, the most generous-spirited amongst the middle-classes of natives will soon scorn the work of mere copying clerks. Because they will learn to trust and respect their own powers for something infinitely better.” (Quoted in *The Bengal Hurkaru and the India Gazette*, October 15, 1855, (Supplement).

শিল্পবিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যেরূপ অল্পকালের মধ্যে শিল্প-বিদ্যায় উন্নতিলাভ করিয়াছে, ‘গেজেট’র মতে তাহা সভ্য সভ্যই বিস্ময়কর। হিন্দু ছেলেরা নকলনবিশ কেরানীগিরির জন্য ধরনা না দিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। তাহারা আত্মশক্তিতে আস্থা ফিরিয়া পাইবে, নিশ্চয়। ‘গেজেট’ অত্র সভ্যকারী সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১১ই অক্টোবর শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যগণ ছোটলাট হেলিডের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য সাফাৎ ভাবে একখানি আবেদন-পত্র পেশ করিয়াছেন। সরকারী সাহায্যলাভে আরও কিছু বিলম্ব হয়। যাহা হউক, ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণ উৎসব ও শিল্প-প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ উদ্‌যাপিত হইল।

আন্তর্জাতিক সন্ধির বাধ্যবাধকতা

শ্রীমুখীন্দ্রলাল রায়

স্বাধীন ভারতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমস্যা ও প্রকৃতির আলোচনা অবাস্তব নহে, বরং প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। আজ কোনও রাষ্ট্র অস্ত্র এক রাষ্ট্রের সহিত যে চুক্তি করিল, কিছুদিন পর সে চুক্তি ভঙ্গ করিবার যথেষ্ট অধিকার তাহার আছে কি না; যদি থাকে তবে সে কিরূপ ক্ষেত্রে? চুক্তিভঙ্গ যদি অপর রাষ্ট্রের অসম্মতিক্রমে হয় এবং সেই রাষ্ট্র যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে শেযোক্ত রাষ্ট্রের প্রতিকার কি?

আমরা চারিদিকে এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত অধুনা দেখিতে পাইতেছি যাহাতে এই বিষয়টির আলোচনা সময়োচিত মনে হয়। বিগত বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটেন মিশরের সঙ্গে এক চুক্তি করে যাহার দরুন ইংরেজ প্রতি-শ্রুতি দেয় যে যুদ্ধান্তে মিশর ও সূয়েজখাল হইতে সে তাহার সৈনিক ও ডেরাডাঙা তুলিয়া লইবে, সুদান অঞ্চলও মিশরের কর্তৃত্বাধীনে ছাড়িয়া দিবার অঙ্গীকার করে। আজ ইংরেজ এই সব সর্ব পালনে অস্বীকার করিতেছে।

মাস দুই পূর্বে যখন ইরাণ রাষ্ট্র পারস্যদেশে প্রায় বার-তেরটি ইংরেজ বাণিজ্য দূতাবাস বা কনসুলেট বন্ধ করিবার আদেশ দেন, তখন ইংরেজ পক্ষ হইতে পৃথিবীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে ১৮৫৭ সালের সন্ধি অনুসারে ইরাণের এ কার্য গর্হিত। ইরাণ সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছে।

কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ সেই রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা বিধিবদ্ধ অর্থাৎ ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত লিপিবদ্ধ আইনও হইতে পারে বা চিরাচরিত প্রথা বা ‘কমন ল’ও হইতে পারে। কোনও ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করিলে, অপর ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিচার-বিভাগের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারে এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত পালিত হয় কি না ইহা দেখিবার ভার থাকে রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগের উপর। সুতরাং সমাজজীবনে ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবার, বিরোধ মিটাইবার ও অত্যাচারীকে শাস্তি দিবার জন্ত রাষ্ট্রশক্তি বর্তমান রহিয়াছে। যেহেতু এই রাষ্ট্রশক্তি জনসাধারণের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সেই কারণে ইহাকে দোষী ব্যক্তি অসম্মত করিতে পারে না।

আন্তর্জাতিক সমাজে বিভিন্ন রাষ্ট্র একত্র হইয়া এমন কোনও শক্তিকে রচনা করে নাই যাহার আন্তঃ-রাষ্ট্রিক বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন বিধিবদ্ধ আইন নাই এবং সেই আইন প্রয়োগ করিবার কোন পদ্ধতিও নাই।

যদিও আমরা ‘ইন্টারন্যাশনাল ল’ বা আন্তর্জাতিক আইনের উল্লেখ সর্বদাই পাই, উহা একটি ভুয়া পদার্থ। রাজনীতির অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণ তত্ত্ব-বিচারে স্ববিধার জন্য “আইন” শব্দটি ব্যবহার করিলেও উহার “আইন”রূপে কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ইউরোপ ও এশিয়া জুড়িয়া দুইবার যে মহাসমর হইয়া গেল—তাহার অবসানে দুই বারই বিজিত রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রসম্মত নামে প্রতিষ্ঠান খাড়া করিয়া দুনিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের জালের মধ্যে গুটাইয়া তুলিয়া প্রভুত্বের বাঁটোয়ারার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু শক্তিমানদের পরস্পর হিংসা ও নিজের কোলে কোল টানার প্রচেষ্টায় ধাপ্পা ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

আইন (রাষ্ট্রের) ব্যক্তি-অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায়। আন্তর্জাতিক সমাজের কল্পনা সত্য হইলে একক-রাষ্ট্রের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োজন। এখন তাহা নাই—শীঘ্র যে হইবে তাহার আশাও দেখিতেছি না। কেন না, ডেমোক্রেটিক রাজ-চক্রবর্ত্তিদের স্বত্র এখনও আবিস্কৃত হয় নাই।

সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধরূপেই দুইটি রাষ্ট্রের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং এতাবৎকাল (অন্ততঃ গত মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত) বিশেষজ্ঞেরা সন্ধি-পত্রকে আন্তর্জাতিক আইনের অংশরূপে উল্লেখ করিতেন। অধ্যাপক ছাত্রদের এবং রাজনৈতিক নেতারা ভোটদাতাগণকে শিখাইয়া আসিয়াছেন যে, সন্ধির সর্ব শাস্ত্রের অনুশাসনের মতই অলঙ্ঘনীয়। রাজনীতি ও ধর্মনীতিকে ইহারা জড়াইয়া জট পাকাইয়া ফেলিয়াছেন।

অনেকেই মনে থাকিতে পারে যে, ১৯১৪ সালে যখন জার্মানী বেলজিয়াম আক্রমণ করিল, তখন ইংলণ্ডের শাসক-সম্প্রদায় তারম্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিলেন যে, জার্মানী একটা আস্ত পাষাণ—রাবণ কিংবা মহিষাসুর। সে সন্ধিপত্র “চোখা কাগজের” মত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। বেলজিয়ামের নিরাপত্তামূলক সন্ধি-সর্ব অবহেলা করিয়াছে, ইংলণ্ডের জনগণকে এই ধাপ্পাবাজি দ্বারা উত্তেজিত করিয়া ইংরেজ যুবক, বালক, প্রৌঢ়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ নাগরিককে কচুকাটা হইতে পাঠাইয়াছে।

অথচ ইংলণ্ড, আমেরিকা বা অন্য যে-কোনও স্বাধীন দেশে যাহারা রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেন, তাহারা জানিতেন যে, সন্ধির সর্ব অবশ্যপালনীয় হইতে পারে না। সন্ধির সর্ব আন্তর্জাতিক আইনের অংশরূপে অলঙ্ঘনীয় বলিয়া যত জোরগলায় প্রচারিত হউক না কেন, অবস্থা-

বিশেষে উহা পালন করা রাষ্ট্র-স্বার্থের পরিপন্থী হইলে কাল-বিলম্ব না করিয়া সে সন্ধি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে সে রাষ্ট্র বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না। অবশ্য এরূপ বাতিল করিবার আগে নিজ শক্তিসামর্থ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। কেননা, যদি অপর রাষ্ট্র গায়ের জোরে সন্ধিসম্পাদন করাইতে অগ্রসর হয় তবে তাকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা থাকে প্রয়োজন। সে ক্ষমতার অভাবে অবশ্য কোনও রাষ্ট্র চুক্তিভঙ্গে সাহসী হয় না। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ঘোষণা করিয়াছিল—“১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিগুলি ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের দ্বারা স্বীকার্য্য নহে।” ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসানে পরাজিত রাশিয়ার উপর বসফোরাস প্রণালী ও বাটিক-শাগরের প্রণালীর মধ্য দিয়া জাহাজ চালানো নিষিদ্ধ করিয়া কতকগুলি সর্ত্ত আরোপিত হয়। ১৮৭১ সালে রাশিয়া এই সন্ধিসর্ত্তগুলি মানিয়া চলিতে অস্বীকার করে।

এই সব ঘটনার পর আন্তর্জাতিক আইনজগৎ রাষ্ট্রনীতির এক নতুন সূত্র বা ফরমুলা আবিষ্কার করিলেন। তাহার বলিতে লাগিলেন যে, আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে কোনও সন্ধি ততক্ষণই পালনীয় যতক্ষণ যে অবস্থায় ও যে পরিবেশে উক্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, সেই অবস্থা ও সেই পরিবেশ বর্তমান থাকে—অন্যথা নয়। ইহার নির্গলিতার্থ এই যে, সাময়িক শক্তির দাঁড়িপাল্লার হেরফের হইলেই সন্ধিপত্রের অমুশাসন-ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। তখন প্রবলতর রাষ্ট্রের চোখে উহা “চোখা কাগজ”। বিসমার্কের একটা বিখ্যাত উক্তি এই—“ইউরোপের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির স্থায়িত্বের দ্বারা সন্ধির বাধ্যবাধকতার নীতি নিরূপিত হয়।” বিয়োডোর রুজভেল্ট বলিয়াছেন—“কোনও সন্ধি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করার অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই আছে। ইহা তাহার স্বাভাবিক ও মৌলিক অধিকার। এরূপ আচরণের সঙ্গতি ও অসঙ্গতি বিচার করিবার মালিকও রাষ্ট্র স্বয়ং—যেমন যুদ্ধ ঘোষণা করার বা অন্য কোনও পররাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার অপর রাষ্ট্রের বিচার বা নির্দেশ-নিরপেক্ষ।” (প্রিন্সলি লিখিত “বিয়োডোর রুজভেল্টের জীবনী”, ৩০২ পৃঃ)। প্যারিস শহরে ১৯১৯-২০ সালে যখন শান্তিটোষক চলিতেছিল, তখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উডরো উইলসন ঘরোয়া আলাপে একবার বলেন—“আমি যখন কলেজে আন্তর্জাতিক আইন পড়াইতাম তখন ছাত্রগণকে বলিতাম—আমার বিশ্বাস প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই যে-কোনও সন্ধি নাকচ করিবার অধিকার আছে।” (মিলারের “ড্রাকটিং অফ দি কন্ভেন্যান্ট, ১ম অঃ, ২৩৩ পৃঃ)

এখন এ সম্বন্ধে ইংরেজের আচরণ আলোচনা করা

যাক। এক সময়ে ব্রিটেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরাক্রান্ত রাষ্ট্র ছিল। কূটনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের ইচ্ছায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সন্ধির সর্ত্তগুলি নির্দিষ্ট হইত। নিজ স্বার্থ বিচার করিয়াই ব্রিটেন যে সব সর্ত্ত আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্রে চাপাইয়া দিত, সেগুলি সম্বন্ধে তাহার নীতি ছিল “পরের বেলা আটিনাটি, নিজের বেলা দাঁতকপাটি।” পূর্বে বেলজিয়মের নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে সন্ধির উল্লেখ করিয়াছি তাহা ১৮৩৯ সালে সম্পাদিত হয়। কোনও প্রবল শত্রু বেলজিয়ম অধিকার করিলে শুধু যে ইংলণ্ডের আক্রান্ত হও-য়ার সম্ভাবনা থাকে তেমন নয়, অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ চুক্তি বেলজিয়মের জনগণের মঙ্গল চিন্তা করিয়া কেহ করেন নাই, ব্রিটেনের নিজ গরজেই ইহা প্রণীত হয়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ১৮৭০ সনে ফ্রান্স ও জার্মানীর লড়াইয়ের সময়, ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার সাময়িক প্রয়োজনে, জার্মানীকে আক্রমণ করার প্রয়োজন হইলে বেলজিয়মে সৈন্যসমাবেশ অপরিহার্য্য বলিয়া সাময়িক কর্ত্তার মত প্রকাশ করেন। তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন কমন্স সভায় বলেন—“তাহারা বলেন যে সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থাতেই, যতই গুরুতর প্রয়োজন হউক না কেন, চুক্তির সর্ত্ত অবশ্যপালনীয়, তাহাদের সহিত একমত হইতে আমি অক্ষম।” গ্লাডষ্টোনের মতে এরূপ মনোভাব কঠিন (রিজিড) ও অবাস্তব (ইমপ্র্যাকটিকেল)। (ভাইকাউন্ট গ্রের “স্পীচেস অন ফরেন এফেয়ার্স” পুস্তকের ৩০৭ পৃঃ)। প্রথম মহাযুদ্ধের আগের দিন, ১৯১৪ সালের ৩রা আগষ্ট, গ্লাডষ্টোনের এই উক্তিটি গ্রে পার্লামেন্টে উল্লেখ করেন। কিন্তু ১৯১৪ সালের অনেক পূর্বেও আমরা ব্রিটেনের মনোভাব সম্বন্ধে নিজের পাইতেছি। ১৯০৮ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র দপ্তরের স্থায়ী উপমন্ত্রী ছিলেন (ইনি পরে ভারতের বড়লাট হন)। ইনি বিশেষ একটি গোপনীয় দলিলে মন্তব্য করেন—“আমাদের দায়িত্ব অবশ্য অস্বীকার্য্য (বেলজিয়মের নিরাপত্তাচুক্তি সম্পর্কে)....কিন্তু বেলজিয়মের নিরাপত্তার বিষয় ঘটলে বিষয়-কারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সে দায়িত্ব ইংলণ্ড পালন করিবে কিনা তাহা নির্ভর করে সেই সময়ে আমাদের পর-রাষ্ট্রনীতির দ্বারা ও তাৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর। ধরুন, জার্মানীর সহিত যুদ্ধে ফ্রান্স বেলজিয়মের নিরাপত্তায় বিষয় ঘটাইতেছে, তাহা হইলে ব্রিটেন ও রাশিয়া বিষয়কারী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অঙ্গুলিহেলনও করিবে কিনা সন্দেহ। অথচ আজ যদি জার্মানী অম্লরূপ কারণে বেলজিয়ম আক্রমণ করে, তাহা হইলে ইংলণ্ড বিপরীত পন্থাই গ্রহণ করিবে।” (গুড ও টেম্পলি সম্পাদিত,

“ব্রিটিশ ডকুমেন্টস অন দি অরিজিন অফ দি ওয়ার” পুস্তকের ৮ম অধ্যায়, ৩৭৭-৮ পৃঃ)

সন্ধির নিরঙ্ক চুক্তিভঙ্গের আর একটা যুক্তি কূটনৈতিকেরা অল্পমোদন করেন। “প্রয়োজন” বা “বৃহত্তর স্বার্থের” খাতিরে উহা সমর্থিত হয়। আইনের ছাত্রদের ইহা স্ববিদিত যে, আইন কাহাকেও কোনও অসম্ভব কার্যে চুক্তিবদ্ধ হইতে সমর্থন করে না। পর-রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গীতে, যাহা কিছু আমাদের রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী তাহাই উহার পক্ষে অসম্ভব। কোন কোনও পণ্ডিতের মতে রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার তাগিদে ভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত চুক্তিভঙ্গ করার অধিকার আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই সিদ্ধ। এরূপ ব্যাখ্যা অবশ্য যুদ্ধের সময় সব রাষ্ট্রই সাধারণে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৯১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ড যখন ইউরোপের উপকূল অবরোধ (ব্লকেড) করিয়া জার্মানীতে মালসরবরাহে বাধা দিতেছিল তখন নিরপেক্ষ আমেরিকার স্বার্থহানি হওয়ায়, ইংলণ্ডের নিকট সে এক প্রতিবাদ পাঠায়। কিন্তু প্রতিবাদ করিয়াও একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক নীতি অনস্বীকার্য বলিয়া উল্লেখ করে। তাহা এই—“আন্তর্জাতিক আইনমতে যুদ্ধদান রাষ্ট্র কর্তৃক নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অবাধ বাণিজ্য-অধিকারে বাধাদান আইনবিরুদ্ধ বটে; তবে যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এরূপ বাধাদান একান্ত আবশ্যিক হয়, তাহা গর্হিত নহে। তবে প্রয়োজনানুসৃত্তি বাধা সৃষ্টি করা সঙ্গত নহে।” মার্কিন নোটের এই মন্তব্যটুকুর সম্পূর্ণ স্বযোগ ব্রিটেন গ্রহণ করিল এবং “দেশের নিরাপত্তার” “একান্ত আবশ্যিকতার” অজুহাতে অবরোধ তুলিয়া লইতে আপত্তি করিল। যখন “জের্মান রেইড” নামে কুখ্যাত ডাকাতি অস্থগিত হয় তখন অনেক ইংরেজ ইহাকে অন্যায় বলিয়াছিলেন। এই ডাকাতি বুয়র যুদ্ধের সূচনা বলা চলে। তখন ইংলণ্ডের রাজ সভাকবি লর্ড টেনিসনের একটি কবিতা লণ্ডনের “টাইমস্” পত্রিকায় প্রকাশিত হয় :

“নেট ল-ইয়ার্স অ্যাণ্ড ষ্টেটসমেন অ্যাডল্

“দেয়ার পেটস্ ওভার পয়েন্টস্ অফ ল’;

“ইফ্ সাউণ্ড বি আওয়ার সোভ’ অ্যাণ্ড স্ট্রাডল্

“আণ্ড গান-গিয়ার, হু কেয়ার্স ওয়ান ট্রু?”

অর্থাৎ—নিছক ডাঙার যুক্তিই পররাষ্ট্রনীতিতে একমাত্র যুক্তি, ইহাই ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি ও সংবাদপত্র উভয়েরই মত। গভ মহাযুদ্ধের পূর্বে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে তখন জাপানী রণতরী চীনের উপকূল পাহারা দিত ও চীনগামী বিদেশী জাহাজ খানাতল্লাসী করিত। ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইলে জাপানী নৌবিভাগের একজন কূটনৈতিক বল্লী বলেন, “এ ব্যাপারে আমাদের অধিকার আছে কিনা ইহা বিচার্য নহে। আমাদের প্রয়োজন আছে এবং আমরা তাহা করিতেছি।”

(“টাইমস্” পত্রিকা, ২৬শে মে ১৯৩৯)। এ সম্বন্ধে হিটলারের উক্তি—“জাতি যখন বিনাশ বা অত্যাচারের সম্মুখীন, তখন নীতি আইন-সদত কিনা এ প্রশ্ন নিতান্তই গোপন।” (মীন কেম্ফ—১০৪ পৃঃ)।

দেখা বাইতেছে যে, যখন কোনও রাষ্ট্র সন্ধির সর্ব্ অগ্রাহ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যে সব কৈফিয়ৎ সে দেয় তাহা হইতে বুঝা যায় হইয়া পড়ে যে, সে আইন-নিষ্ঠা বা ধর্ম-নিষ্ঠা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এরূপ করিতেছে। ১৯৩৫ সনে জার্মানী যখন হেসেরাই সন্ধির সাময়িক সর্ব্গুলি মানিয়া চলিতে অস্বীকার করে তখন সে বলে যে সন্ধিপত্রের অন্যান্য স্বাক্ষরকারিগণ, অস্ত্র-হাসের সর্ব্গুলি পালন করিতেছে না। পরবর্তী বৎসরে যখন জার্মানী লোকার্নো চুক্তি বাতিল করে, সে কারণ দেখায় যে, ফরাসী-সোভিয়েট সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকার্নো সন্ধি বুলিমাৎ হইয়া গিয়াছে। এগুলি আইন-ঘটিত যুক্তি। রাইনল্যাণ্ড অধিকার করিয়া হিটলার বলিয়াছিলেন—“সমস্ত বিশ্ব সন্ধির বাক্যার্থ লইয়া কচকচি করুক; আমি রাষ্ট্রধর্ম আঁকড়াইয়া থাকিব।”

পরাজিত রাষ্ট্রকে যখন বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ করেন, তখন প্রভূত অনায়াস সজ্জাটিত হয়। হেসেরাই সন্ধি ও ব্রেষ্ট-লিট্‌ভস্ সন্ধি—এই দুইটাই ছিল অত্যাচারমূলক। এগুলি অস্বীকার করিয়া জার্মানী অধর্ম করে নাই এ মত এখন অনেকেই পোষণ করেন। এ ধরণের সন্ধি যে-কোনও রাষ্ট্রকে মানিতে বাধ্য করাই অধর্ম।

স্বতরাং সাময়িক সামর্থ্যই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সন্ধি-ব্যাপারে আসল দিক-দর্শক। প্রবল রাষ্ট্র দুর্ব্বলের সঙ্গে সন্ধি করিয়া মনে করে অপর পক্ষকে সন্ধির সর্ব্পালনে সে বাধ্য করিবে, কিন্তু বলসাম্যের পরিবর্তন হওয়ামাত্র ঐ দুর্ব্বল রাষ্ট্র সন্ধি উপেক্ষা করিবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে সব দুর্ব্বল রাষ্ট্র প্রবলতর রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিল তাহারা জার্মানী, জাপান ও ইটালী। এই তিন রাষ্ট্রই পরবর্তী-কালে সাময়িক শক্তি বৃদ্ধি হওয়া মাত্র পূর্ব্বে সব সন্ধি বাতিল করিয়াছিল। ১৯১৮ সনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার অপেক্ষা প্রবলতর কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিস্থজে আবদ্ধ হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যে চুক্তি সে পোদা ও ইয়ালটাতে করিয়াছিল, তাহা এখন নড়বড় করিতেছে। স্বতরাং কে প্রবলতর তাহার পরীক্ষা অবশ্যস্তাবী।

যত দিন পাকিস্থান নিশ্চিন্ত যে ভারত-রাষ্ট্র অস্ত্রের যুক্তি প্রয়োগ করিবে না, তত দিন সে খোশ-মেজাজে সব চুক্তি নস্তাৎ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। পাসপোর্ট-পদ্ধতির প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আমরা যতই চীৎকার করি, সে তাহা অনাবশ্যক চীৎকার মনে করিয়া নিজের গৌরবজায় রাখিয়া চলিবে।

দরবেশ কবি আলীরাজ

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গের কোন জেলার এক রাজ-নৈতিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে কোন প্রসিদ্ধ বাঙালী মুসলমান বলিয়াছিলেন—“আমি ধর্ম্মে মুসলমান কিন্তু জাতিতে বাঙালী।” বাঙালীতে বিশ্বাসের যে পরিচয় উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, পাকিস্তানের আন্দোলনের বহুয় তাহা একেবারে ধূইয়া-মুছিয়া ফেলিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় সে চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ফলবতী হইতে পারে নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যে অভিযান পাকিস্তানের উর্দু ভাষাভাষী কর্তাদের দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান ভ্রাতাদের মন হইতে বাঙালীত্বের অল্পভূতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই।

বাঙালীত্ব অর্থাৎ বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাস ছিল বঙ্গদেশের মুসলমানগণের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ব্রিটিশ শাসনের যুগে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও পর্য্যবেক্ষকেরা বিশ্বাসের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এই কারণেই অনেকটা পৃথক রকমের ছিল।

বাঙালী মুসলমান ভ্রাতাগণের এই বাঙালীত্ব বোধের কথা আলোচনা করিতে গিয়া যদি আমরা এ দেশের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাই, তবে দেখিতে পাই যে এককালে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক অতিশয় নিবিড় হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য যে এই সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্গদেশের তুর্কী-আরব বংশীয় মুসলমান ধর্ম্মবিশ্বাসী শাসনকর্তাদের সময়ে। বিজেতা শাসনকর্তাদের সমধর্ম্মাবলম্বী হওয়ার জন্য বিজিত্ত্বলভ করিবার ক্ষীতি হওয়া তো দূরের কথা, বাংলার মুসলমানসমাজের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা যে স্বদেশবাসী হিন্দুদিগের সহিত ধর্ম্মব্যতীত অন্য প্রায় সকল বিষয়েই একাত্মতা বোধ করিতেন, আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারায় হিন্দুর সহগামী ছিলেন, বিখ্যাত লেখকগণের রচনা পড়িয়া এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানসমাজ কেবল যে আচার-ব্যবহারেই হিন্দুধর্ম্মে হইয়াছিল তাহা নহে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র এবং হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাধনা-পদ্ধতি বাঙালী-মুসলমানসমাজের অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির চিন্তাধারাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল। ডাঃ এনামুল হক “আরাকান রাজ-

সভায় বাংলা সাহিত্য” গ্রন্থে এই বিষয়ের তুর্কি তুর্কি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান-সমাজের বর্ণনায় তিনি দেখাইয়াছেন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার-ব্যবহারের প্রভাব এই সমাজে কত বেশী লক্ষিত হইত। হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুর সাংন্যাপদ্ধতির প্রভাবের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হইতেছে মুসলমান-সমাজে প্রচলিত পীরপূজার প্রথা। এই পীরপূজা হিন্দু-গুরুবাদেরই নামান্তর মাত্র। ডাঃ এনামুল হকের নিজের কথায়—“বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে এই সময় পীরপূজার বহুল প্রচলন হয়। এই পীরপূজা ও হিন্দুর গুরুবাদে কোন প্রকারের প্রভেদ ছিল না। পীরদের হাতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে মুসলমানগণ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বিশ্বাসে পরিণত করে। পীরগণ ‘মুর্শিদ’ বা পরমার্থ পথপ্রদীপ নামে সর্বত্র পূজিত হইতেন। তাঁহাদের ভক্ত শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে ভগবানের জাগতিক প্রতিনিধি ও ‘ম-রফত’ অথবা তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, মুর্শিদ বা পীরকে পূজা করিলে হৃদয়ের স্বাভাবিক অজ্ঞানতা-অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, পরলোকে মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া যায় এবং শরীর পবিত্রীকৃত ও বিশুদ্ধ হয় :

কায়্য স্কদ্ধ হয় জ্ঞান মুর্শিদ ভজিলে।

লাগি লৈল্যে চলে যেন আদ্বিগ্যান সফলে ॥

মুর্শিদ প্রসাদে হয় আধির প্রকাশ।

মিহির কিরণে যেন উজ্জ্বল আকাশ।”

(জটনৈক মধ্যযুগীয় মুসলমান কবির রচনা) :

উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে হিন্দুশাস্ত্রের “অজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত জ্ঞানাজ্ঞান শলাকয়া” প্রভৃতি গুরুমাহাত্ম্যব্যঞ্জক কথাগুলির অবিকল প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে। সেকালের মুসলমান-সমাজে হিন্দুদিগের মতই অন্নপ্রাশন, বিবাহের পূর্বে অধিবাস, মঙ্গলঘট, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, প্রভৃতি প্রথার প্রচলন ছিল, একথা কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন কি? অথচ বর্তমান যুগের একজন সুপণ্ডিত ও বিখ্যাত মুসলমান লেখক মধ্যযুগীয় মুসলমানদিগের রচিত বহু বাংলা পুথি ও মুদ্রিত পুস্তক হইতে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইতেছে এই যে, হিন্দুধর্ম্মে আচার-ব্যবহার সেকালে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানসমাজ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের মুসলমান-সমাজেই অধিকতর প্রচলিত ছিল।

হিন্দুশাস্ত্রে লক্ষ্যমান এবং হিন্দুর আধ্যাত্মিক ভাবধারার অল্পরাগী বলিয়া পরিচিত বহু মুসলমান লেখকের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকের সম্বন্ধে “মুসলমান বৈষ্ণব কবি” এই আখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ হিন্দু-শাস্ত্রাদিতে গভীরতর জ্ঞানলাভের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের দু'এক জনের জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা না করিলে আমরা সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিব না যে জ্ঞানমার্গের পথিক এই বাঙালী মুসলমান ভ্রাতারা হিন্দুর আধ্যাত্মিক ভাব-সাগরে কতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন। কবি আলাওয়াল প্রভৃতি এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বল। কিন্তু এই প্রবন্ধে যে দ্রবণ কবির কথা আলোচিত হইতেছে, তিনি হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সহিত অধিকতর পরিচিত ছিলেন।

আলীরাজার অপর নাম কালু ককির। প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী ও সঙ্গীতগুলি হইতে মনে হয় তিনি একজন ভক্ত সাধক ছিলেন এবং হিন্দুর সাধনা-পদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দুর শাস্ত্র, বিশেষতঃ যোগশাস্ত্র ও আধ্যাত্মবিজ্ঞা সম্বন্ধে তিনি প্রচুর জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার রচনা হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। আলীরাজার প্রধান গ্রন্থ হইতেছে “জ্ঞানসাগর”। ইহা গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। রচনাপদ্ধতি, ভাবধারা সমস্তই হিন্দুর মত। “মোহাম্মদ,” “পয়গাম্বর,” “রজুল,” “হর” প্রভৃতি কথাগুলি না থাকিলে কেহ মনে করিতে পারিবে না যে গ্রন্থখানির রচয়িতা অ-হিন্দু। আলীরাজা অল্পরূপ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ ও কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সাধারণ পারমার্থিক সঙ্গীতের সম্বন্ধে আলীরাজার রচনার মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণবপদ এবং দুইটি শ্রামাসঙ্গীতও আছে বলিয়া কথিত হয়।

বহুকাল পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আলীরাজার “জ্ঞানসাগর” গ্রন্থখানির যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, মুন্সী শ্রীআবুল করিম সাহিত্যবিহারদ কর্তৃক লিখিত উহার ভূমিকায় আলীরাজার “জ্ঞানসাগর” ও অন্যান্য রচনার নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায় :

“ইহা (জ্ঞানসাগর) একখানি দ্রবণী গ্রন্থ। ইহার প্রায় আশোপাশত নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথায় পূর্ণ। সে আধ্যাত্মিকতার আবার হিন্দু-মুসলমানী ভাবের সংমিশ্রণ দেবো যাহা... এই ‘জ্ঞানসাগর’ ব্যতীত আলীরাজার রচিত ‘সিরাজু-রূপ’ ও ‘ব্যানমালা’ নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ ‘যোগ কালন্দর’ নামক যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থকেও তাঁহার লেখনী গ্রহণ বলিয়া মনে করেন... এই সকল ভিন্ন তাঁহার রচিত ‘যাইচক্র ভেদ’ গ্রন্থের কথাও শুনা যায়।”

আলীরাজার বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে মুন্সী আবুল করিম বলেন :

“তাঁহার সে সমস্ত গীতে রাধাকৃষ্ণের লীলার বর্ণনা আছে। ... তাঁহার আর একজন স্বর্ণপরাশর মুসলমান এরূপ করিলেন কেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কেহ কেহ বলেন, মুসলমান ককিরদের মতে মানবদেহই রাধা ও মনই ক্রীষ্ণ। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আলীরাজা প্রভৃতি কবিগণকে ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি’ নামে অভিহিত করা সঙ্গত হয় না। ... দেখা যায় বহু পদেই তিনি আপনাকে ‘কৃষ্ণকথোক্ত রাধা হরির চরণে’ বলিয়া পরিচিত করিতে কৃত্তিত্ব হয় নাই... (তাঁহার রচিত শ্রামাসঙ্গীতে) দেবো যাহা, তিনি ‘শিশু আলী রাজা তপে তাম কালিকা দাস’ বলিয়া ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে তাঁহার এই হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভক্তি, অত্র দিকে ‘জ্ঞানসাগর’ প্রভৃতি হইতে তাঁহার স্বর্ণমাহুরাগের পরিচয়— এই পরস্পর বিরোধী ভাব দুইটি মিলিয়া সমস্তটিকে বড়ই জটিল করিয়া তুলিয়াছে।”

মুন্সী আবুল করিম সাহিত্যবিহারদ মুসলমানী বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। আলীরাজার গ্রন্থ ও সঙ্গীতাদি হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আলীরাজা একদিকে হিন্দু দেবদেবীতে ভক্তিমান, অপর দিকে তাঁহার স্বর্ণমাহুরাগও সন্দেহাতীত। এবং এই জন্য আলীরাজা যে স্ব-সম্প্রদায়ের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন কথাও শুনা যায় নাই। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর উদারচেতা ও সুপণ্ডিত বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের মৌলিক আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও যোগ-শাস্ত্রের চর্চা যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ আলীরাজা ভিন্ন আরও অনেক বাঙালী মুসলমানের লিখিত এই সম্বন্ধীয় পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে এই প্রবন্ধ লেখকের সহিত ডাঃ মুহাম্মদ এনামুল হকের সাক্ষাৎকালে ডাঃ হক বলিয়াছিলেন যে, বাঙালী মুসলমানগণের দ্বারা বাংলা ভাষায় লিখিত যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পুথি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আগুন, প্রাণায়াম প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকখানি হস্তলিখিত পুথি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থমুদ্রণের পরিকল্পনাও ডাঃ হক স্থির করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, আলীরাজাকে আমরা সেই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম-সম্বন্ধের যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং তাঁহার রচিত “জ্ঞান-

“সাগর” গ্রন্থ এই সময় প্রচেষ্টার প্রোঁঠ নিদর্শন। এই সময় প্রচেষ্টা যে পক্ষ প্রথম আরম্ভ করে তাহারা হিন্দু কি মুসলমান, সে প্রশ্ন অবাস্তব। এই প্রচেষ্টা উভয় সমাজের বৈশীক ভাগ নরনারী দ্বারা আন্তরিকতার সহিত গৃহীত না হওয়ার কথাও আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি না। মুসলমান পণ্ডিতগণের কেহ কেহ এই সময়ের পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, “জ্ঞানসাগর” গ্রন্থ হইতে রচনা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাহারই একটি স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে পারিব।

“জ্ঞানসাগর” গ্রন্থের প্রারম্ভেই গুরুবাদের পরিচয় পাওয়া যায় :

নবী বোলে শুন আলি অপরূপ বাণী ।
প্রভুর আগমতত্ত্ব সুরস কাহিনী ॥
অপরূপ কথন শুন আলি ভূমি ।
প্রভুর গোপন রত্ন তত্ত্ব সে কাহিনী ॥
এই সব কথা নহে জ্ঞান শুদ্ধ সার ।
মোর পাছে পরগাধর না লয়িব আর ॥
মোর পরে হইবেক কবি ঋষিগণ ।
প্রভুর গোপন রত্নে বাস্তবিক মন ॥
শাস্ত্র সব ভ্যাগ করি ভাবে ডুব দিয়া ।
প্রভু প্রেমে প্রেম করি রহিবে জড়িয়া ॥
মোর পাছে হইব শুদ্ধ ককির প্রধান ।
গুরুর পাইবে দেখা প্রভু নিজ স্থান ॥

উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে দেখা যাইতেছে যে আলীরাজা “মহম্মদের পরে আর পরগাধর নাই” ইসলামের এই গোড়ার কথায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু পরগাধরের পরে “গুরুর শরণ লইতে হইবে” এই মতবাদও মানিতেছেন।

অতঃপর সাধনার পথ নির্ণয় হইতেছে। প্রেম সাধনাই প্রধান সাধনা :

যথা রস তথা বশ সমস্ত ভুবন ।
সকল রসের মূল পীরীতি ভজন ॥

... ..

এ বুলিয়া বড় কৈল প্রেম পন্থ সার ।
মোহাম্মদ রূপে ভক্ত জগতে প্রচার ॥
জন্মে জন্মে ভক্ত হৈলো নারায়ণ হরি ।
জিয়া কৈল রাধার সঙ্গে মন রূপ ধরি ॥
মহম্মদরী সঙ্গে ভক্ত হইল দশামন ।
জামকীর রূপে ভক্ত রাম নারায়ণ ॥
শচী সঙ্গে ভক্ত হইল দেবকুল ব্রাহ্ম ।
সকল নারীর প্রেমে ভক্ত হইল ব্রজাঞ ॥ ইত্যাদি

কেবল হিন্দু দেবগণের প্রেমসাধনাই কবির আদর্শ

নহে, মুসলমানগণের নবী প্রভূতিরাও তাহার মতে প্রেমসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন :

জোলেখা হইল ভক্ত ইছপ দেবিয়া ।
সামীর হোছন ভক্ত জয়নব পাইয়া ॥
উরিয়ায় রামা ছিল অধিক সুন্দর ।
ভক্ত হৈল সেই রূপে দাউদ পরগাধর ॥
হালওয়ানী স্তম্ভ ছিল মোবারক সুন্দর ।
ভক্ত হৈল সেই রূপে বুআলী কালন্দর ॥
পদম সুন্দরী ছিল কৈবর্ত কুমারী ।
নবী জোলেয়ায় ভক্ত পাই সেই নারী ॥

রূপের ধ্যান ও প্রেমের সাধনায় বহু মহামানব এইরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন :

এই মতে বহুত তপস্বী ভক্ত হইয়া ।
যথা রূপ তথা ভাবে রহিল মজিয়া ॥
রূপ ভিন্ন প্রেম নাহি ভাব বিহু ভক্তি ।
ভাব বিহু লক্ষ্য নাই সিদ্ধি বিনা মুক্তি ॥
নবী কুলে প্রথমে আদম ভক্ত হইল ।
হাবা দেবী সঙ্গে রসরূপে ডুবি ছিল ॥
দেব কুলে অতি ভক্ত হইল মহেশ্বর ।
গৌরী দেবী সমুখে থাকিত দিগম্বর ॥
... ..
গলা গৌরী মুগ্ধনারী রাধি দিগম্বর ।
ভক্ত ঘোণে সাধি সিদ্ধা হইল মহেশ্বর ॥
আছিল আরেসা বিবি পরম সুন্দর ।
সেই রূপে মোহাম্মদ ভক্ত পরগাধর ॥

কেবল যে হিন্দু-দেবতারা এবং মুসলমানের নবী-পরগাধরেরাই প্রেমসাধনকে সিদ্ধির পথ বলিয়া জানিয়াছেন তাহা নহে। কীট-পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষকুলের মুক্তি লাভেরও সেই একই পথ :

মর নারী পশু পক্ষী কীট ভরুর ।
প্রেম রস বিহু কার নাই মুক্তি বর ॥

প্রেম হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি :

প্রথমে বহির সঙ্গে বারির পিরীতি ।
হইল মাটির প্রেম জলের সঙ্গতি ॥
এ সব প্রেমে যদি মন না ডুবিত ।
স্বর্ণ মর্ত্য পাতাল আদি কিছু না জগিত ॥
গগনের সঙ্গে হইল স্বর্গের পিরীতি ।
স্বর্ণ সঙ্গে মর্ত্যের পিরীতি আছে অতি ॥
ত্রিভুবনে প্রভু প্রেম আছে অস্তিত ।
মরক পাতাল সঙ্গে আছে পিরীতি ॥ ইত্যাদি ।

সুতরাং আলীরাজার “প্রেম” সাধারণ লোকে উহাকে

যে অর্থে বুঝে তাহা নহে। এই প্রেম বিশ্বপ্রেম, ঐশ্বরিক প্রেম; জাতি, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের পরিধি দ্বারা ইহা সীমাবদ্ধ নহে। অতএব গোঁড়া মুসলমানগণের প্রচলিত মতের সঙ্গে আলীরাজার এইখানে যে প্রকাণ্ড প্রভেদ তাহা ত দেখাই যাইতেছে। প্রেমের এই উদার আধ্যাত্মিক অর্থ কোন কোন হিন্দু (বৈষ্ণব) সম্প্রদায়ের মতবাদেই যে প্রতিধ্বনি, ইহাতে সন্দেহ নাই। আলীরাজা যে হিন্দুদের যোগ-সাধনা পদ্ধতিও আয়ত্ত করিয়াছিলেন, “জ্ঞান-সাগর” গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় :

শুভ সাহা আলি তুমি জ্ঞান-পঞ্চামন।

কহিছ যোগের কথা এমাল বরণ।

যোগিগণকে আহ্বান, নিজা প্রভৃতি বিষয়ে সংযত হইতে হইবে এবং ক্রোধাদি বিপ্লবময় করিতে হইবে :

অতি নিজা ভোজন করিতে না জুয়াএ।

বহু নিজা মহাকাল কহে জ্ঞান রায়।

মগ্ধ মাংস যোগী কুলে না করে তক্ষণ।

দোষ নাহি অন্ন অন্ন করিলে ভোজন।

কোষ হস্তে সিদ্ধি পছ সমুলে বিনাশে।

তে কারণে সকল ককির কোষ পরাশে।

হিংসা কোষ তেজিলে নির্দল হঞ ছয়।

চিহ্ন শুদ্ধ হৈলে পুরে সকল বাঞ্ছিত।

সর্বোপরি গুরুর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিবে না :

পালিবে মন্তকে করি গুরুর আদেশ।

লংঘিলে অখণ্ড পাপ জন্মিবে বিশেষ।

হিন্দুধর্মের মধ্যে সংসার-বৈরাগ্যের একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে, কিন্তু মুসলমান ধর্মে সেরূপ কিছু আছে বলিয়া শুনা যায় না। বরং বিবাহাদি করিয়া সংসারী না হওয়াই মুসলমান ধর্মামুসারে অবাস্তিত কার্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যে সকল মুসলমান স্বফী ও দরবেশ শ্রেণীর মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সংসার-বৈরাগ্য সিদ্ধি-লাভের একটি বিশিষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। “জ্ঞানসাগর” গ্রন্থে আলীরাজা সংসারভাগী “সন্ন্যাসী”- (ফকির) দিগের আদর্শকে অল্পকরণীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :

রাজ্য পাঠি তেজি কথ কথ মরপতি।

জন্মে কায় ইচ্ছিল ফকিরী হালপতি।

রাজ্য পাঠি বন জন সকল আনিত।

মাতা পিতা ইষ্ট মিত্র কেহ নহে হিত।

জী পুত্র সমস্ত সংসার মরকুল।

কেহ মিত্র নাহি এক প্রভু সমতুল।

সংসার অসার অর্থ মূপতি জানিল।

এক চিন্তে দহু ভাবে ফকিরী ইচ্ছিল।

সংসার অসার জানিয়া অনেক মহাপুরুষ ধর্মের পথে অগ্রসর হইয়াছেন :

আমা সবে জানিল সংসার নহে সার।

অন্ন দিনে বল গরু হয় ছারখার।

সংসার অসার সার নিশ্চয় জানিল।

সকলে রত্নলী হাল করুল করিল।

ভেজিল ধর্মের আশা আলী কভেমাএ।

ভেজিল ধর্মের আশা আব্বা সবার। ইত্যাদি।

অবশ্য, কবির এই আধ্যাত্মিক কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে তিনি নিজে “সংসার অসার” মতবাদে কতখানি বিশ্বাস করিতেন, তাহা উদ্ধৃত কথাগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। এই মতবাদ হিন্দুদের নিকট হইতেই গৃহীত।

শাস্ত্র পাঠ করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চয় হওয়ার পরেই ঈশ্বরকে চেনা যায়। তখন সাধক জানিতে পারে :

লা এলাহা ইল্লাহা তিম লোক সার।

তিন লোকে বেয়াপিত সেই করবার।

ঈশ্বরের এক কায় এ তিন ভুবন।

সর্বশাস্ত্র কোরানে কহিছে নিরঞ্জন।

কলোমার অর্থ বুজি চাও বীরগণ।

ঈশ্বরের অষ্ট অঙ্গ এ তিন ভুবন।

এই জ্ঞানলাভ হইলেই লোকে প্রকৃত “ফকির” হইতে পারে :

ঈশ্বরের লীলা আর ঈশ্বর কেবা চিনে।

চলিতে রত্নলী হালে পারে সেই জনে।

কে চিহ্নিল তিন লোক আর করবার।

সে সব ফকিরী পছ পারে চলবার। ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, পংক্তিগুলি পড়িতে পড়িতে বাঙালী পাঠকের মনে হইবে যে “রত্নল”, “ফকির” প্রভৃতি কথাগুলি সম্বন্ধে হিন্দুধর্মেরই কোন আলোচনা পড়িতেছেন। কোতুলী পাঠককে “জ্ঞানসাগর” গ্রন্থ হইতে আর একটি বিষয় উপহার না দিয়া পারিতেছি না। আলীরাজা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই হউক অথবা কোন কারণ-বশতঃ “চাকুরীর” প্রতি বীতরাগ ছিলেন। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা যেন কখনও চাকুরী না করেন, এই উপদেশ তিনি দিয়াছেন :

কায় মনে প্রভু সেবা করিবে পণ্ডিতে।

নরের চাকরী যুক্ত না হয় করিতে।

নরের চাকরী যদি করে বীরগণ।

সে সব আলিম শুধু নহে কদাচন।

মহোষ্যের সেবা করে যে সব পণ্ডিত।

শাস্ত্র পড়ি হইল কবি পুস্তক চরিত ॥

আলীরাজার মত উদারমনা মুসলমান বিদ্বানগণের যুগ চলিয়া গিয়াছে। ধর্ম-সম্বন্ধ, নিজের ধর্মে বিশ্বাস রাখিয়াও পরধর্মে শ্রদ্ধা, অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ—এ সমস্ত মনোবৃত্তি বঙ্গের মুসলমান সমাজ হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে স্বাধীন-সংগঠিতদের দ্বারা অবলম্বিত হইতেছে তাহা পুরাপুরি

সাফল্যমণ্ডিত হইবে কিনা, উপযুক্ত সময়েই বুঝা যাইবে। আলীরাজা ও তাঁহার মত অনেক বাঙালী মুসলমান লেখকের জন্মস্থান ছিল সেই পূর্ববঙ্গে যেখানে তাঁহাদের প্রিয় মাতৃভাষার মর্যাদা-হানি করিবার অপপ্রয়াস চলিতেছে। মাতৃভাষার মর্যাদা এমন কি অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে দেখিয়া উহার রক্ষার চেষ্টায় পূর্ববঙ্গের যে তরুণ ও প্রবীণ মুসলমান ভ্রাতারা বীরের মত মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছেন, আলীরাজা প্রভৃতির লোকান্তরিত স্বর্গীয় আত্মা নিশ্চয়ই সেই বাঙালী মুসলমানদের মস্তকে আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছেন।

“পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস”

শ্রীহরিনন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির অন্ততম বলে পরিগণিত হবার মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু যাকে বলে রসসাহিত্য সেই দিকে বিশেষ রকম পরিপুষ্ট হয়ে থাকলেও বাংলা সাহিত্যে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক রচনার অভ্যুত্থান। কিন্তু এমন হলেও সাহিত্য সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না, এবং বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তার মর্যাদারও হানি ঘটে। বাংলা সাহিত্যের এই ত্রুটি দূর করা বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই কারণেই বাঙালী দার্শনিক বা বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কর্তব্য বাংলা ভাষায় তাঁদের সাধনার ফল লিপিবদ্ধ করা।

শ্রীতারকচন্দ্র রায় লিখিত “পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)” পড়ে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, তিনি এই কর্তব্য সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। এই বিব্রাট ও জটিল গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা সার্থক হয়েছে।

দর্শনের বিষয়বস্তু অভ্যুত্থান জটিল। বস্তুর জটিলতা বশতঃই প্রথমতঃ দর্শনশাস্ত্র নীরস। তা কোন ব্যবহারিক কাজে লাগে না, তাই সাধারণ মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। অথচ সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে এবং দুঃখকষ্টবিমিশ্র জীবনে মানুষের মনের একটা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হিসাবে তার যে প্রয়োজনীয়তা নাই তাও নয়। সেই কারণে তাকে যত সরল ও চিত্তাকর্ষক করে উপস্থাপিত করা যায় ততই ভাল।

সমালোচ্য গ্রন্থে এই উদ্দেশ্যটিকে সকল করবার বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ দার্শনিকের দর্শনবিষয়ক মত-গুলি তাদের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের সহিত সংযুক্ত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যে ভাবধারার সহিত তা সংযুক্ততার দ্বারাবাহিকতা রক্ষা করে বিশেষ বিশেষ মতটি পরিবেশিত হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ সফ্রেটিসের কথা বরা যাক। সফ্রেটিসের মত বিস্মিষ্ট আকারে উপস্থাপিত হয় নি। তিনি কোন্ দেশের লোক, সেই দেশের সামাজিক অবস্থা তখন কিরূপ ছিল, তার পূর্ববর্তী দার্শনিক মতবাদের কি বৈশিষ্ট্য ছিল, তার সহিত সফ্রেটিসের প্রচারিত বাণী কি তাবে সংযুক্ত হয়ে দ্বারাবাহিকতা রক্ষা করেছে, এই সকল আত্মবৃত্তিক বিষয়-

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ “ভেরোনা হেলমিন্থিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৩০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্রুড ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন-স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অস্বস্থি দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আ: শিশি ডা: মা: সহ—২৫ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লি:

১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

কোব—সিউ ৮৮১

* পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর নিকট প্রাপ্য : মূল্য ৮/-

গুলিও বর্ণিত হয়েছে। এইরূপে পরিবেশের অঙ্গীভূত করে তাঁর মতটি স্থাপিত হওয়ায় তা এক দিকে যেমন চিত্তাকর্ষক অপর দিকে ভেতন সহজবোধ্যও হয়েছে। সফ্রেটিসের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিও সেই সঙ্গে সন্নিবেশিত করার তা সরসও হয়েছে। এই ঘটনাগুলির মাধ্যমে সফ্রেটিস নামক ব্যক্তির সহিতও আমরা পরিচিত হই। ফলে শুধু তাঁর বাণীকে জানি না, ব্যক্তি হিসাবে তাঁর স্পর্শও পাই।

এই ঘটনা বিষয় আলোচনা করতে লেখক যে রচনাভঙ্গি অবলম্বন করেছেন, তা সরল ও সহজবোধ্য। ভাষা বাগাড়ম্বর নাই, কঠিন বিষয়কে সরল ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। ফলে আলোচনাগুলি বেশ স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল হয়েছে। দার্শনিক মতগুলির সমালোচনা বা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে লিখিত প্রাধান প্রাধান দর্শনের ইতিহাসের গ্রন্থগুলি হতে মানা-মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এই সম্পর্কে আমরা তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই। কোথাও কোথাও এই সম্পর্কে কিছু মতও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। হু' একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

পাইথাগোরাসের দর্শনে সংখ্যাই বিশ্বের মূল ভিত্তি। তাঁর ব্যাখ্যা বাস্তবিক রাসেল কি দিয়েছেন তা বর্ণনা করে, তিনি পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। তা জড়জগৎকে ব্যাখ্যা করেছে কতকগুলি গাণিতিক স্বত্রের সাহায্যে। তাঁর উপাদান সর্বজাই সংখ্যা। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “জগৎ বিখকর্ম্মার মানসস্থি”; সে স্থিতি সংখ্যার নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গুহুতত্ত্ববিদ পাইথাগোরাসের মনে জগৎ-রহস্য এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা কে জানে।”

এই সম্পর্কে গ্রীক দর্শনের উপর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাবের আলোচনার তাঁর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। জন্মান্তর-বাদ, জ্ঞান ও অপজ্ঞার সাহায্যে মুক্তিলাভ, সমাধি অবস্থার জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ প্রভৃতি কয়েকটি প্রকটরূপে ভারতীয় তত্ত্বের সহিত তুলনীয়। এই সকল সম্পর্কিত দার্শনিক মতের উল্লেখ তিনি অত্যন্ত সঙ্গত ভাবে করেছেন। এ ছাড়া তিনি প্লেটোর ‘সামান্য প্রত্যয়’ (Universals)-এর সহিত বৃহদারণ্যক উপনিষদের উল্লিখিত যাজ্ঞবল্ক্যের মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

এখানে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিপাত বিষয় হ’ল—আত্মার জ্ঞান হলে সবই জ্ঞাত হওয়া যায়। ‘আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন্দ্রিয়ং সর্বং বিদিতম্’। (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫।) এই মন্তব্য প্রতিপাদনের জন্য তিনি নানা উপমার দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, বিশ্বের কোন অংশ সম্পর্কে বিশেষের জ্ঞান তাঁর মূলকে জানা হলে আয়ত্ত হয়ে

যায়। যেমন ছন্দুতির শব্দগুলি সহজে জ্ঞান তাঁর উৎপাদক ছন্দুতির সহজে জ্ঞান আহরণ করলে লাভ করা যায়, যেমন সকল আত্মাণের বস্তুর জ্ঞান তাঁর উৎপত্তিস্থল প্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞান হলে আয়ত্ত হয়। এইরূপে স্থিতিশীল এক মৌলিক সত্তার সাহায্যে পরিবর্তনশীল বস্তু বিশেষের যে জ্ঞান হয়, তাঁর সঙ্গে তিনি প্লেটোর ‘সামান্য প্রত্যয়’ের ও বিশেষের ভিত্তিতে যে বৈতবাদ স্থাপিত করেছেন, তাঁর তুলনা করেছেন। মতটি তাঁর নিজস্ব বলেই মনে হয়। এখানে বিভক্তের অবকাশ থাকলেও আলোচনাটি প্রণিধানযোগ্য।

এই সম্পর্কে ঋগ্বেদের পরিকল্পনার ‘ব্রহ্মণের’ বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। তাঁকে ‘বৃহত্তম’ বলা হয়েছে এবং ‘ঋত’ বা যে শাস্ত্র নীতি দৃষ্টমান জগৎকে পরিচালিত করে তাঁর সংরক্ষণ-কার্য তাঁর কর্তব্য বলে নির্দ্বারিত হয়েছে। তাই তিনি ‘ঋতস্ত গোপা’। (ঋগ্বেদ ১।১২৪।৮।) প্লেটোর দর্শনে যে দৃষ্টমান পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হতে স্বতন্ত্র ‘সার্বিক প্রত্যয়’-এর জগৎ ‘প্রের’ দ্বারা অধিষ্ঠিত বলে পরি-কল্পনা করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে এই ‘ঋত’ের যেন মিল পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ এই মত সমর্থন করেন। এই সম্পর্কে তাঁর ভারতীয় দর্শন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্য ভাষাগুলিতে পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনার উপযোগী দার্শনিক পরিভাষার অভাব নাই। আমাদের দেশের ভাষায় ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যার উপযুক্ত পরিভাষা পাওয়া দুষ্কর নয়। সংস্কৃত ভাষা হতে তা প্রাধানতঃ আহৃত হতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের বিকাশের দ্বারা এবং আলোচনা-পদ্ধতি এমন পৃথক যে তাঁর উপযুক্ত ভারতীয় পরি-ভাষা পাওয়া কঠিন। কাজেই যিনি ভারতীয় ভাষায় পাশ্চাত্য দর্শন আলোচনা করেন, তাঁর নিজেকে পরিভাষা সৃষ্টি করে নিতে হয়। প্রত্যেক লেখকের পরিভাষা একে একে ভিন্ন হতে পারে এবং একই তত্ত্ব নির্দেশ করতে বিভিন্ন পরিভাষা সৃষ্ট হয়ে পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। সে সম্ভাবনাকে পরাহত করবার একটি মাত্র উপায় আছে। তা হ’ল বিদেশী পরি-ভাষাকে সেই সম্পর্কে যুগপৎ উল্লেখ করা। গ্রন্থকার প্রতি পৃষ্ঠার নিয়ে যে সকল বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তাঁর পাশ্চাত্য প্রতিশব্দ লিপিবদ্ধ করে এই অনিশ্চয়তা থেকে পাঠকের মনকে নিরাপদ করেছেন।

বিশেষ বিশেষ দার্শনিকের মত আলোচনা সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে মূল রচনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। হু’এক জায়গায় মূল রচনাটি কবিতার লিখিত। সেখানে গ্রন্থকার—কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতায় অহুবাদ উদ্ধৃত করে মূলের রূপটিকে অহুবাদে অক্ষর রাখবার চেষ্টা করেছেন।

“পূজাপার্বণ”

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নানা বিষয়ে নানা মনীষীর বহু মূল্যবান তথ্যপূর্ণ লেখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈনিক সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোন পত্রিকায় কখন কি প্রকাশিত হইতেছে, অল্পসংখ্য পাঠকের পক্ষেও সব সময়ে তাহার সংবাদ রাখা দুঃসাধ্য। সংবাদ পাইলেও অনেক সময় দরকারমত পত্রিকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিপুল সাহিত্যিক অপচয় ঘটিয়া থাকে—পূর্বসংগৃহীত উপকরণ ও তথ্য অজ্ঞাত ও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে—এদিকে সেই সব জিনিষ নুতন করিয়া সংগ্রহ করিবার জন্য নবীন কর্মীকে অযথা পরিশ্রম করিতে হয়। এ অবস্থায় এ জাতীয় লেখা যথাসম্ভব স্বল্প পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে পারিলে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হয়—পাঠক ও সাহিত্যিক সমাজ বিশেষ উপকৃত হন। সুতরাং বিষয়, এদিকে সুবীক্ষণীয় দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাই দেখিতেছি একই লেখকের বা একই বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত, সুপ্রণয় রচনা একত্র সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের

সম্পাদকতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ‘সমালোচনা সংগ্রহ’ ও ‘বাঙালীর পূজাপার্বণ’ এবং শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পালের সম্পাদকতায় প্রকাশিত ‘সমালোচনা সাহিত্য’ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগও মাঝে মাঝে এ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। ‘বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ’ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ‘প্রাচীন বাংলার গৌরব’ এই গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অনতিপরিচিত ও অজ্ঞাত কার্যবিবরণের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া ইহা প্রকাশ করা হয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশ্বভারতীর এই জাতীয় প্রচেষ্টার নুতনতম নিদর্শন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদের দেশে প্রচলিত প্রধান প্রধান পূজাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে সমস্ত সুন্দর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন সেইগুলি একত্র করিয়া ‘পূজাপার্বণ’ নামে



অভিজ্ঞের উপদেশ

উৎকৃষ্ট কেস্টেভল নির্বাচনের সময়
ক্যালকেমিকোর

ক্যাষ্টরল

অভিজ্ঞের বিবেচনায় সবচেয়ে ভাল কেন?

কারণ, এর প্রত্যেকটি উপাদান বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত।

কেবলমাত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত খাঁটি দামী ক্যাষ্টর অয়েলে তৈরী।

এর মধ্যে বাজার প্রচলিত ক্যাষ্টর অয়েলের জায় পাতলা বাদাম তৈল
যেশানো নেই।

এর স্বগন্ধ মনোমদ ও অল্পময়। ব্যবহারে চুল বাড়ে, টাকপড়া বন্ধ হয়।
গুণ ও পরিমাণ হিসাবে দাম সস্তা।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং.লিঃ কলিকাতা-২৫

এই স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। * প্রবন্ধগুলি দুই খণ্ডে ভাগ করা হইয়াছে। - 'আমাদের পূজা ও পার্বণ' নামক প্রথম খণ্ডে আছে দোলযাত্রা, শারদোৎসব, রাসযাত্রা, ত্রীত্রীসরস্বতী পূজা ও বারমাসে ভের পার্বণ এই পাঁচটি প্রবন্ধ। দ্বিতীয় খণ্ডে হর্গোৎসব বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধ (হর্গোৎসব প্রঙ্গ, ত্রীত্রীহর্গা, মহিষমর্দিনী, হর্গার প্রতিমা, হর্গাপূজা শরৎকালীন যজ্ঞ, হর্গোৎসব নববর্ষোৎসব এবং হর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল) স্থান পাইয়াছে। পরিশিষ্টে অন্নন, বিহুব, রাশি, নক্ষত্র, ভিষি, মাহেশ্বরমুগ, বৎসর, যুগ, মনু প্রভৃতি বিষয়গুলির ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

প্রবন্ধকারের মূল প্রতিপাদ্য মোটামুটি এইরূপ : আমাদের প্রধান প্রধান উৎসবগুলি অতি প্রাচীনকালের—অনেক ক্ষেত্রে ইহারা হাজার হাজার বৎসর পূর্বের স্থিতি বহন করিতেছে। বিহুব দিনযজ্ঞ, অন্ননাদি দিনযজ্ঞ ও ঋতুর আরম্ভ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জ্যোতিষিক যোগ উপলক্ষে স্মরণীয় কালে কোন না কোনরূপে এই সব উৎসবের স্মরণপাত হয়। কালক্রমে সেই সমস্ত যোগের সময় পরিবর্তিত হইলেও উৎসবের দিন ঠিকই আছে। গ্রন্থকারের মতে দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, হর্গোৎসব মূলতঃ নববর্ষোৎসব। এক এক যুগে এক এক সময় বর্ষ আরম্ভ হইত—উৎসবগুলি তাহারই স্থিতি বকে ধারণ করিয়া বিরাজমান। বর্ষার আরম্ভসূচক অনুষ্ঠান বা তৎসদৃশ উৎসব বিভিন্ন যুগে নিম্ননির্দিষ্ট বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হইত—আষাঢ়ের শেষ দিন, আশ্বিন-পূর্ণিমা, তাজ-পূর্ণিমা, আশ্বিন-পূর্ণিমা, আশ্বিনী কৃষ্ণাষ্টমী, আশ্বিন-সংক্রান্তি, তাজ-সংক্রান্তি (পু.

২১, ২২, ৬৩, ৬৪, ৬৯)। প্রথম বর্ষার সূচনা এই দিনগুলিতে না হইলেও আজও আমরা এই সমস্ত দিনে কোন না কোন উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

এই ভাবে আলোচনা করিলে উৎসবগুলির প্রাচীনতা অনুধাবন করিয়া মনে একটা স্রোতের ভাব জাগরিত হয়। শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যখন ধর্মীয় বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অশ্রদ্ধা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে তখন বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে লেখা, আচার্য রায়ের এই রচনাগুলির প্রচার সমরোপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়। আশ্রয়-সহকারে এগুলি পাঠ করিলে পাঠকের দৃষ্টি প্রসারিত হইবে—মন তৃপ্তিলাভ করিবে। লেখাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে গণিত-জ্যোতিষের হিসাব-নিকাশের কঁাকে কঁাকে সাহিত্যিক রস ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা এই পুস্তকের একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য অনেক স্থলে হিসাব-নিকাশের প্রাচুর্য সাধারণ পাঠকের বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে। তবে একটু বৈধ বরিয় পড়িয়া গেলে ইহাদের সারমর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হইবে না।

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার জন্ত লিখিত হওয়ার নক্সা স্থানে স্থানে কিছু কিছু পুনরুক্তি ও স্ববিরোধী উক্তি রহিয়া গিয়াছে। প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত শারদোৎসব প্রবন্ধের সহিত হর্গোৎসব বিষয়ক দ্বিতীয় খণ্ডের কোন কোন অংশের যথেষ্ট মিল আছে। এ সম্পর্কে প্রকাশকদের পক্ষ হইতে একটা কৈফিয়ত দিলে ভাল হইত। কতকগুলি বর্ণান্তরিত চোখে পড়িল। এগুলির জন্তও প্রকাশকদের দায়িত্ব অধীকার করা চলে না। তবে এই সকল সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁহারা আচার্য যোগেশচন্দ্রের মূল্যবান প্রবন্ধগুলি মনোজ্ঞ আকারে উপস্থাপিত করিয়া বাঙালী পাঠক-সমাজের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

* পূজাপার্বণ। ত্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থালয়, ২ বক্সিস চাট্‌জো, ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ডোল ও কোম্পানীর



বরানগর, কলিকাতা

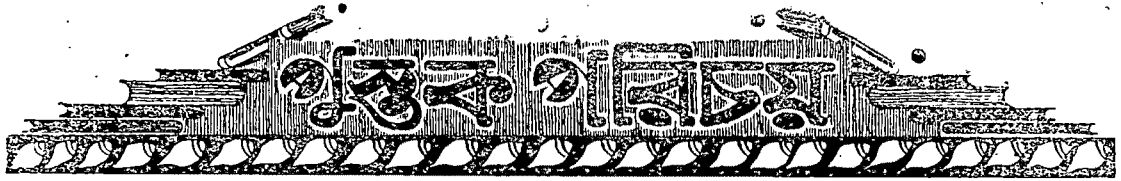
দাদ ও ক্রাউনের
মেসার্স হালম

ক্রিউটা-টোন
পোড়া বেদনা ও চর্মরোগের জন্য

লিম্ব হালম
হোম পাঁচড়া ও চুলকানীর জন্য







শরৎ-পরিচয়—ব্রজেননাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ গ্রান্ডচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। পৃ. ২২৭, সাড়ে তিন টাকা।

রামায়ণ এবং মহাভারতে আমাদের ভিন্ন প্রসিদ্ধি আছে, ভাগিনেয়ের জীবনী-লেখক মাতুল এই প্রথম। তবে এই জীবনীতেও লক্ষ্যভাগের আভাস আছে। শরৎ-চন্দ্রের “মন্দির” গল্প নিজের নামে ছাপাইয়া ব্রজেননাথের উপস্থাসিক-খ্যাতির সূত্রপাত, “শরৎ-পরিচয়” সেই খ্যাতিরই সমাপ্তি, উপস্থাস হুপঠা হইয়াছে। সত্য ভাল, নিছক মিথ্যাও ভাল, কিন্তু সত্যের সঙ্গে মিথ্যার পাঞ্চ করিয়া যে বস্তু প্রস্তুত হয় তাহা মারাত্মক। ব্রজেনবাবুর গল্পাংশ সম্বন্ধে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু সত্যাংশে অর্থাৎ তথ্যংশে তিনি বহু গলদ ঘটাইয়াছেন। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি :—

পৃ. ১। “(ইং) ১৮৭০-৭২ সালে ভাগলপুর থেকে এন্ট্রাল পাস করে মতিলাল পাটনা কলেজে পড়তে যান।”—এই মালটির গল্প পাঠকের কোনও মাথাবাধা ছিল না, না দিলেও পারিতেন। কিন্তু দিলেনই যখন, একটু দেখিয়া শুনিয়া দিলে, ভগিনীপতিভিক এন্ট্রাল পাস করাইতে ব্রজেনবাবুর তিন বৎসর লাগিত না। ক্যালেণ্ডার খুঁজিলেই দেখিতে পাইতেন, মতিলাল ১৮৭৩ সনে তৃতীয় বিভাগে এন্ট্রাল পাস করেন।

পৃ. ৫। “কনিষ্ঠ বিপ্রদাস...বর্তমানে পাটনার আছেন। বর্তমানে তিনিও গত হয়েছেন।” অতীত অর্থে বর্তমানের প্রয়োগ এই প্রথম।

পৃ. ৪২। “১৮৮৬ সালে তাঁদের আবার [ডিহিরি থেকে] ভাগলপুরে ফিরতে হল।” ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠার হিসাবে দেখান হইয়াছে, শরৎ-চন্দ্র ১৮৯০ পর্যন্ত ডিহিরিতে ছিলেন। নিখুঁত হিসাব সন্দেহ নাই।

পৃ. ১৫৩। “ভারতীতে নামহীন ‘বড়দিদি’ লেখা।” ১৩১৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা অর্থাৎ শেষ কিস্তিতে শরৎ-চন্দ্রের নাম বাহির হয়।

পৃ. ১৫৪। “সেই সময়ে ৬ প্রমথ ভট্টাচার্য্য মহাশই-এর মাধ্যমে ভারতবর্ষ বার করার প্ল্যান এসে উপস্থিত হোল।” “সেই সময়” অর্থাৎ ১৩১৪ সাল, ‘ভারতবর্ষ’ প্রকাশের প্ল্যান হয় ছয় সাত বৎসর পরে ১৩২০ সালে (পৃ. ১৫৫ দ্র.)।

পৃ. ১৬০। ব্রজেনবাবু ‘শরৎ-পরিচয়ে’ শরৎ-চন্দ্র ভাগলপুরে “বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলে” পড়িয়াছিলেন এইরূপ উক্তি কৃত্রিম করেন নাই, অথচ এই কারণেই এই পৃষ্ঠার ব্রজেননাথ এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রতি বহু বক্তব্য করিয়াছেন। মিথ্যা দোষারোপ করিয়া কটু ভাষণ তাঁহার মত প্রবীণের সাজে না।

আরও আছে। উপস্থাসের সমালোচনার তথ্যের এই সকল ভুল প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল না, তবে তিনি স্বয়ং যখন ১৫৮ পৃষ্ঠার বলিয়াছেন—“[জীবনীতে] ভুল থাকে উচিত হয় না” তখন তাঁহার “ভুল-ভাঙ্গি হবার বয়স বর্তমানে এসেছে, সে কথা” (পৃ. ১৫৮) তাঁহাকেও সনিদ্রায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ব্রজেনবাবুর ‘শরৎ-পরিচয়ে’ বিভূতিভূষণ ভট্টের চিঠি নাই, ব্রজেনবাবুর মাত্র একখানি আছে, ইহার কারণ যে ব্রজেনবাবুর অবহেলা নয় তাহা ব্রজেনবাবুই সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। বিভূতিভাবু সমস্ত চিঠিপত্র হারাইয়া ফেলিয়াছেন (দ্র. ‘ভারতবর্ষ’ চৈত্র ১৩৪৪, পৃ. ৫২২-২৩), ব্রজেনবাবু অনুরুদ্ধ হইয়াও চিঠি দেন নাই। মোটের উপর, ব্রজেনবাবুর ‘শরৎ-পরিচয়ে’ অনেক কোতুকের খোঁচা আছে।

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রবেশিকা—ঐহিমাংশু চৌধুরী, এম-এ, বি-এল। জেনারেল প্রিন্টার্স ‘ম্যাণ্ড পাব্লিশার্স’ লিমিটেড, ১১০ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা।

ডক্টর ঐহীলকুমার দে মহাশয় পুস্তকখানির “পরিচিতি” লিখিয়া ইহার মধ্যদা বাড়াইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহার দীর্ঘকালের সঞ্চয়নের ফল আজ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। কেন বৈষ্ণব পদাবলীকে “মহাজন পদাবলী” বলিয়া বাংলাদেশে পরিচয় দেওয়া হয়, এই পুস্তকের পরিশিষ্টে তাহার ইতিহাস আছে। “মহাজন” বলিতে বহুল-প্রচলিত অর্থে হৃদযোঁর বুঝায়। আমাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে “মহাজন” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারী, পুঁজিদার—বীর ভাণ্ডারের ভাগ লইতে পারে সকল পিপাসু বা ক্ষুধিত—এই অর্থে।

জয়দেবের পর হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত গীত রচনা হইয়াছে তাহা “পদ” নামে পরিচিত। পদের সাহায্যে জীবনমাত্রেরই চলে। এই সব গানের সাহায্যেও জীবনপথে অগ্রসর হওয়া যায়। বাংলাদেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর পর হইতে যে আধ্যাত্মিক ভাবধারা বহিয়া চলিয়াছে, তাহা লইয়া আমরা গর্বি করি। গ্রন্থকার জানান যে, আচার্য্য ব্রজেননাথ শীল মহাশয়ের মতে নারদের ষেতবীণে ভ্রমণের ফলে পৃথিবীতে ভক্তিবর্গের প্রচার আরম্ভ হয়। এই বিষয়ে ডক্টর হীলকুমার দে একটু আলোচনা করিলে আমরা উপকৃত হইতাম। পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে

শ্রীশিশির আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত

বাংলা বর্ষলিপি নবম বর্ষ (১৩৫৯)

বাংলার সমস্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য সর্বপ্রথম “ইয়ার বুক”। ১৩৫৯ সালের নতুন বই বন্ধিত কলেবরে অধিকতর তথ্যসম্বারে প্রকাশিত হইল।

মূল্য—২।০ টাকা। ভিঃ পিঃ-তে—৩.০ টাকা।

সকল বিশিষ্ট পুস্তকালয়ে ও নিয়টিকানায় পাইবেন—

সংস্কৃতি বৈঠকের অদ্বাদ্য বই

হনীল বিপী ও অসিত রায়ের—ফুয়েড ও মনঃসমীক্ষণ	১।।
ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের—নিজ্ঞান মন	২।।
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের—চারশ বছরের পাশ্চাত্য দর্শন	২।।
মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহের—শিকারের কথা	২।।
কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরীর—ইজিত (১ম ভাগ)—গল্প-সমষ্টি	১।।
প্রবাসজীবন চৌধুরীর—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শন	১।।
ডাঃ হৃদয়চন্দ্র মিত্রের—অনিচ্ছাকৃত	২।।

সংস্কৃতি বৈঠক

১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা—২৯

বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস আছে, তাহা পাঠ করিয়া এই আধ্যাত্মিক সম্পদের বহু স্রোতের সন্ধান পাওয়া যায়। যুক্তিবাদী এবং প্রায় নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে বর্তমান বৈষ্ণব ধর্মের যোগ স্থাপ্য। ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের হুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। হুদী-সম্প্রদায়ের মতে সম্পূর্ণ শরণাগতিই জীবনকে মার্ককতা দান করে। খ্রীষ্ট-ধর্ম ত এ কথা বলে যে, যীশুর আশ্রয় ভিন্ন পাপ-তাপ-দগ্ধ পৃথিবীতে শান্তির অস্ত্র কোন উপায় নাই।

আমাদের বিশ্বাস যে, এই পুস্তক পাঠকমহলে সমাদৃত হইবে।

শ্রীমুরেশচন্দ্র দেব

সোভিয়েট-মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি—শ্রীবিবেকানন্দ
মুখোপাধ্যায়, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
মূল্য ২৫ টাকা। পৃষ্ঠা ১৩৬।

বর্তমান জগতের অশান্ততম ভাগানিয়ন্তা, হইলেও মার্কিন রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ইহার স্বাধীনতা ঘোষণা হয়, আর ১৮৬১-৬৫ পর্যন্ত চলে ইহার গৃহযুদ্ধ। রহুদিন পর্যন্ত ইহা ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির ছোয়াচ এড়াইয়া চলিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াও ইহা জাতি-সত্ত্ব (লীগ অব নেশনস্) ঘোষণা করে নাই। কারণ ইঙ্গ-ফরাসী কূটনীতির নিকট মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সঙ্গে আমেরিকা ওত্তপ্রোত্তভাবে নিজেকে জড়াইয়াই ফাস্ত হয় নাই, দুনিয়ার রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ বাপারে ক্রমে ক্রমে এতটা জড়িত হইয়াছে যে, প্রগতিশীল পৃথিবী আজ দুইটি বিরোধী শিবিরে পরিণত হইয়াছে। অথচ রুজভেল্ট-চার্লিস-ষ্টালিনের সম্মিলিত নেতৃত্ব পৃথিবী হইতে ফাসিবাদ ও ফাশিস্তির উচ্ছেদসাধনে মহাযুদ্ধের কয়েকটি বৎসর বিরূপ গভীর সৌহাদ্দ্যযুগেই না আবদ্ধ হইয়াছিল। এই পরমাশ্রম্য ঘটনার তাৎপর্য বুঝাইতে গিয়া লেখক বহু তথ্য উল্লেখিত করিয়াছেন। রুজভেল্টের সহিত টুমানের পার্থক্য কোথায় তাহা বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানি পড়িলে পাঠকের ধারণা হইবে ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতিই বর্তমান বিশ্বের অশান্তির জন্ত দায়ী। সোভিয়েট প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আজ পর্যন্ত বারো এবং আচরণে শক্তিকামী রহিয়াছে। সোভিয়েট মতবাদের প্রসারজনিত ভীতি মার্কিন জাতিকে পাইয়া বসিয়াছে। যুদ্ধ-কালীন মৈত্রী ও সহযোগিতা যেন একটা সাময়িক বাবস্থা মাত্র আজ ইহাই হয়ত অনেকে মনে হয়, কিন্তু রুজভেল্ট-ষ্টালিনের পুরাতন কথা ও ঘোষণাগুলি উদ্ধৃত করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়েই বিশ্বশান্তির ও বিশ্বমৈত্রীর পরিকল্পনার বীজ উণ্ড হইয়াছিল বাহা আজ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

নামে (ইউনাইটেড নেশনস্) রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধও চলিতেছে না, অথচ শান্তিরও অভাব দেখা যায়—বাহার নাম 'ঠাণ্ডা লড়াই' ইহা খুবই অবাস্তব অবস্থা। লেখক বলিতে চাহেন, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে সাময়িক প্রভাবই এরূপ অবস্থার জন্ত দায়ী। এই উৎকট অবস্থার কতকটা অবমান ঘটাইবার জন্ত টুমান জেনারেল ম্যাক আর্থারকে কোরিয়া রণাঙ্গন হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। সমষ্টিগত নিরাপত্তা রক্ষা দ্বারা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বার্ষিকতা পর্যাবসিত হইতেছে। বর্তমানে কোরিয়ার 'ঠাণ্ডা'র বদলে 'গরম লড়াই' চলিতেছে। অথচ কেহই যুদ্ধ চাহে, মুখে একথা বলে না। ফে জিনিব কোন পক্ষই চাহে না তাহা কেন হয় তাহার হৃদয় কেবল পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে পাওয়া যায় না, ধনিকভক্তের রাষ্ট্রীয় গঠনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। ইঙ্গ-মার্কিনের এশিয়া-নীতি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে ইহার সন্ধান মেলে। অবশ্য মার্কিন ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত ব্যবধান স্থাপ্য, কিন্তু ইহাই বিরোধ বা বিপ্লবের শেষ কিংবা একমাত্র কথা নহে। অপর দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাই সে দেশকে বিপ্লবের মধ্যে টানিয়া লয়। বিপ্লব কিছু চালানি মাল নহে যে অপর এক দেশ হইতে আমদানী করা চলে। ষ্টালিনের ভাবায় "The export of revolution is nonsense."

সাম্যবাদ বা সাম্যবাদী আদর্শে পরিকল্পিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যেরূপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা সোভিয়েটের স্বপ্ন, সমগ্র পৃথিবীতে পুঞ্জিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও তেমনি মার্কিনের কাম। কিন্তু ইহার কোনটাই মার্কিন বা রাশিয়ার পক্ষে অপর জাতির উপরে চাপাইয়া দেওয় সম্ভব নহে, যদি না অপর জাতিগুলি ইহাতে রাজী হয়। -এই জন্তই যত

নূতন ধরণের কবিতার বই

প্রাত্যহিক

মূল্য দুই টাকা

শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কালিদাস রায়, সজনীকান্ত দাস, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বাংলা-দেশের খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক কর্তৃক অভিনন্দিত। অমৃতবাজার পত্রিকা, দেশ, যুগান্তর, পূরীশা, পূরীচল, সংহতি, বর্তমান প্রভৃতি পত্রিকায় কাগজে উচ্চপ্রশংসিত।

কমলা বুক ডিপো—১৫, বঙ্কিম চার্জার্স স্ট্রীট, কলিকাতা



প্রচার ও কূটনৈতিক চাপের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই যে নানা রাষ্ট্রকে দলে টানিবার চেষ্টা ইহাই বর্তমান জগতের রাষ্ট্রনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখকের মতে এই প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার নীতি ও কর্মপদ্ধতি সহজ ও সরল, কিন্তু পুঁজিবাদী মার্কিনের পররাষ্ট্র-নীতি কূটিল পথে চলিয়াছে। এক্ষণেই আজিকার বিশেষ শান্তি ব্যাহত হইবার যে আশঙ্কা বিদ্যমান, তাহার জন্ত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ ভাবে দায়ী। গ্রন্থকার রাশিয়ার পক্ষে রায় দিলেও, রাষ্ট্রনীতির পাঠকগণ অল্প পরিসরের মধ্যে এই পুস্তকে অনেক তথ্য জানিয়া লাভবান হইবেন।

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত

খাণ্দেরীয় মন্ত্র-সঙ্কলন—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। ত্রিওম লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৩। ৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১০ টাকা।

পৃথিবীর প্রাচীনতম পুস্তক গ্রন্থেই হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। বর্তমান যুগে এই লুপ্তপ্রায় পুস্তকের পুনরুদ্ধার করেন জার্মান মনীষী ম্যাক্সমুলার। তিনি অল্পকোড় হইতে ভাষ্যসহ গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ না করিলে পাশ্চাত্য জগতে ইহার প্রচার হইত কিনা সন্দেহ। পরিতাপের বিষয় এই যে, গ্রন্থের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অপরিণীম। আলোচ্য পুস্তিকা বাঙালী পাঠকসাধারণের এই অজ্ঞতা দূরীকরণে কতকটা সহায়ক হইবে বলিয়া মনে হয়।

ইহাতে গ্রন্থের ২২৮টি মন্ত্র অনুবাদসহ প্রদত্ত হইয়াছে। মন্ত্রগুলি ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা, সূর্য্য, পর্জন্ত, রুদ্র, বরুণাদি দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত

এবং অধ্যাক্ষতবে পরিপূর্ণ। সঙ্কলনিতা পনের পৃষ্ঠাখাপী তথ্যপূর্ণ ও স্থলিখিত ভূমিকায় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে বৈদিক ভাষা, দেবতা, ধর্ম, সমাজ, খাতাদি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের জন্মকাল সম্বন্ধে সঙ্কলনিতা কেবলমাত্র মার্টিন, কোলব্রুক, ম্যাক্স-মুলার ও বালগম্বাধর তিলকের মত উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস পান নাই। উক্তর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এই পুস্তিকায় যে সংক্ষিপ্ত প্রাধানী লিখিয়া দিয়াছেন তাহাতে বলেন, গ্রন্থের একাধারে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যগ্রন্থ। এই পুস্তিকা পাঠে মূল বেদ অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষা পাঠকদের মনে জাগিতে পারে। গ্রন্থের সংস্কৃত দুর্ভেদ্য। সুতরাং অনুবাদের সহিত অধর-মুখে শব্দার্থ থাকিলে মন্ত্রগুলির মর্মার্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম হইত।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভজহরি—শ্রীজ্যোতিষ্বর বোষ (ভাস্কর)। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২০ টাকা।

রসিক বলিয়া বাঙালীর খ্যাতি আছে—সেই হেতু বাংলা-সাহিত্যে রসের অবদানে সমৃদ্ধ। প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত—এই সাহিত্যের রসপ্রবাহারা অব্যাহত আছে। সম্প্রতি অন্ন বস্ত্র ও জীবিকা প্রভৃতি কতকগুলি স্থল সমস্যার আঘাতে আমরা বিশেষভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি এবং বাস্তববাদ আমাদের অভিরিক্ত গষ্ঠীর করিয়া তুলিয়াছে—আর তাহারই অবশুস্তাবী ফলস্বরূপ আমাদের সাহিত্যরসধারাও কিছু পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছে। ক্ষীণ হইয়াছে বটে, কিন্তু সে রসধারা একেবারে

আমাদের নূতন শোরুম এবং কারখানা

১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীটের
বিপরীত দিকে, আমহাট স্ট্রীট
ও বহুবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম. বি. সরকার
এও সন্স

পূর্ণাঙ্গ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নির্মাণে
শ্রী ব্রজবাবু সরকার

ব্রাহ্ম হিন্দুস্থান হাট বালিগঞ্জ

১০৯/১/বি, ব্রাহ্মবাজার এডিনব্র কলিকাতা

ফোন: বি. বি. ১৭৬১

গ্রাম: ব্রিলিমানক

শুকাইয়া যায় নাই। জানি, যুগের পরিবর্তনে চিন্তার ধারাও বদলাইয়া যায়—রসোপভোগের ক্ষেত্রও হয় ভিন্নতর। এক কালের রস-রসিকতা বহুক্ষেত্রে অল্প কালের মানুষকে ভেদন ভাবে মাতাইতে পারে না—তাহার আবেদন কেমন স্থূল বলিয়া বোধ হয়। যুগের অগ্রগমনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতেছেন যে সব রস-রচয়িতা—তাহাদের সংখ্যাও আজ-কাল অল্পদির পক্ষে গোণা যায়—ইহাও বৃথিতেছি। তবু বা লা সাহিত্যের হাত-কোড়কের ধারাটি এই সংখ্যালব্ধ রস-রচয়িতারা যে দক্ষতার সঙ্গে প্রবহমান রাখিয়াছেন—ইহাই আশ্চর্যের কথা। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ষ্ময় ঘোষ এই সার্থক রস-রচয়িতাদের অন্ততম। আলোচ্য গল্প-সংগ্রহখানিতে তাহার কয়েকটি রস-রচনা স্থান পাইয়াছে। উজ্জ্বল এই একটি নামের সূত্রে গল্পগুলি গাঁথা হইলেও বিষয়বস্তুতে এগুলি বিভিন্ন এবং প্রত্যেকটি গল্পের প্রকাশভঙ্গীতে বৈচিত্র্যও বিস্তারিত। বেকার-জীবনের অলোখ্য হইতে সাংসারিক জীবনের নানা সমস্তাকে (উৎপাত বলাই বাহুল্য) কেন্দ্র করিয়া এক একটি গল্পের উৎপত্তি। গল্পগুলিতে স্থূল রসের আবেদন কম, রসের আবির্ভাবও চোখে পড়ে না। শুচিশুদ্ধ হৃদয়সে ঝলমলে এই কাহিনীগুলি পড়িয়া আমরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। যাহারা হাসিতে ভালবাসেন এই সব গল্প যে তাহাদের চিত্ত হরণ করিবে এই কথা অসঙ্কোচে বলা যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-সঙ্গীত-প্রসঙ্গ—শ্রীশেফালিকা শেঠ। প্রকাশক : শ্রীবারেন্দ্রনাথ শেঠ। ২১৫, পার্ক স্ট্রিট, কলিকাতা ১৭। দামের উল্লেখ নাই।

তিনটি প্রবন্ধের সমষ্টি :—(১) সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ : শ্রীহিম্মিরা দেবী চৌধুরাণী, (২) ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্থান : শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত : শ্রীশেফালিকা শেঠ।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুরাগী পুস্তিকাখানিতে জানিবার ও ভাবিবার অনেক খোরাক পাইবেন। বিশেষ করিয়া, রবীন্দ্রনাথের নব নব স্বর-রচনার পশ্চাতে যে এদেশীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের জ্ঞান ও সযত্ন সাধনা বর্তমান, একথা আমাদের উপলব্ধি করা আবশ্যিক।

দেশপ্ৰীতি ও চট্টলার বীরস্মৃতি—শ্রীমতী কুম্মপ্রভা সেন। প্রকাশক : শ্রীজগদ্বন্ধু সেন। সদর ঘাট রোড, চট্টগ্রাম। মূল্য ১০। বিপ্লবী বীরগণের স্মৃতি অবলম্বনে রচিত পঞ্চগ্রন্থ। বিষয় মহৎ রচনা গভীরগতি।

রূপলোক—শ্রীকরণসিন্ধু পালিত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ২০।

বড় গল্প—ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।, রচনা সাবলীল, কথনও কবিত্ব-গন্ধী, কথনও কৌতুকে উজ্জ্বল। নৈমিত্তিক অবকাশ-বহুল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রজীবনকে কেন্দ্র করিয়া লেখক একটি রোমাঞ্চিক প্রেমকাহিনী রচনা করিয়াছেন। 'লাগে নে', 'আসে নে', 'সখা', 'উৎসাহ' প্রভৃতি ভাষা ও বানানের ক্রটি মারাত্মক।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সীমাহীন—শ্রীসত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রিমিয়ার বুক কোম্পানী, ৮, ক্যানাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১০ টাকা।

এই উপন্যাসের নায়ক হুবোদ দত্ত বিলাতফেরত এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। বিলাতে অধ্যয়নকালে লতিকার নামী একটি মেয়ের সঙ্গে তাহার প্রণয় হয়। দেশে ফিরিবার পর ঘটনাক্রমে লতিকার অন্তঃকরণ বিবাহ হইয়া গেল—তাহার স্বামী মদ্যপ ও চরিত্রহীন। হুবোদের বোদির বৈবাহিক বোন তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। তাহার সঙ্গে হুবোদের আসন্ন বিবাহের আয়োজনে বাড়ী যখন সরগরম তখন সে

কাহাকেও কিছু না জানাইয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে গৃহত্যাগ করিল। তার পর লেখক তার সন্ন্যাসগ্রহণ, মানবসেবার আত্মনিয়োগ, বরিশাল জেলায় গিয়া মৃত্যুপথবাঞ্ছিনী লতিকার শয্যাপার্থে তাহার উপস্থিতি, লতিকার মৃতদেহ স্বন্ধে তাহার শ্মশানঘাটে গমন, লতিকার পুনর্জীবন-লাভ ইত্যাদি নানা চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজির অন্ধকারে নৌকাযোগে হুবোদ ও লতিকাকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করাইয়া উপন্যাসের উপসংহার করিয়াছেন।

কাহিনীটি নামূলি এবং স্থানে স্থানে আকর্ষণীয় হইলেও লেখকের যে লিখিবার হাত আছে সে পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বর্ণনা মন্দ নয়, কিন্তু উচ্ছাসের আধিক্যবশতঃ এবং মাত্রাজ্ঞানের অভাবে কাহিনীটি দানা বাঁধিতে পারে নাই। রচনার সংযম এবং মাত্রা-বোধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইলে ভবিষ্যতে তাহার হাত দিয়া ভাল জিনিষ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীনিলাকুমার ভদ্র

“সিন্ধান্তসার”, “শ্রী শ্রীভাগবত”, “শ্রীকৃষ্ণ”—

শ্রীবিহারীলাল সরকার। ১২-২এ, মনোহর পুকুর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬ হইতে প্রকাশিত। ১ম গ্রন্থ ৪৩৬ পৃ., মূল্য দুই টাকা; ২য় গ্রন্থ ৪৫৬ পৃ., মূল্য দুই টাকা এবং ৩য় গ্রন্থ ১৪৬ পৃ., মূল্য দশ আনা।

প্রথম গ্রন্থে কর্মশক্তি, বেদান্তমত, তত্ত্বমত, পুরাণমত, অবতারের আশ্রয় এবং সিদ্ধপুরুষের ধর্মজীবন এই বিষয়গুলি ছয়টি-অধ্যায়ে সহজ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অসংখ্য মূল শাস্ত্রগ্রন্থাদি মহন করিয়া সনাতন হিন্দুধর্মের সারি উদ্ধার পণ্ডিতদের পক্ষেও দুঃসাধ্য, সাধারণের ত কথাই নাই। গ্রন্থকার সাধারণ নরনারীর জ্ঞাত দ্রুত দর্শন, উপনিষৎ, তন্ত্র, পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে প্রধান প্রধান বহু বিষয় সম্মিলিত করিয়াছেন। শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুকূল, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষের বহু অমূল্য উক্তি স্থানে স্থানে পরিবেশন করিয়া শাস্ত্র-মর্ম অতীব সরল ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের “বাণীরূপ” শ্রীমদ্ভাগবতের যথিমা কীর্তন এবং ষাটশ স্বন্ধে বিবৃত বৈচিত্র্যময় ভাগবতী লীলাকথার সারসংকলন অতীব সরল মধুর ভাষায় করা হইয়াছে। পরিশেষে চতুঃশ্লোকী ভাগবত এবং সপ্তশ্লোকী গীতা সামুদায়িক সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থের সম্পদ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

তৃতীয় গ্রন্থে মহাভারত, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং বহু মহাজন পদ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের অনুপম লীলাকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। গীতা ও ভাগবতের একাদশ স্বন্ধস্থ অমূল্য উপদেশাবলী পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন।

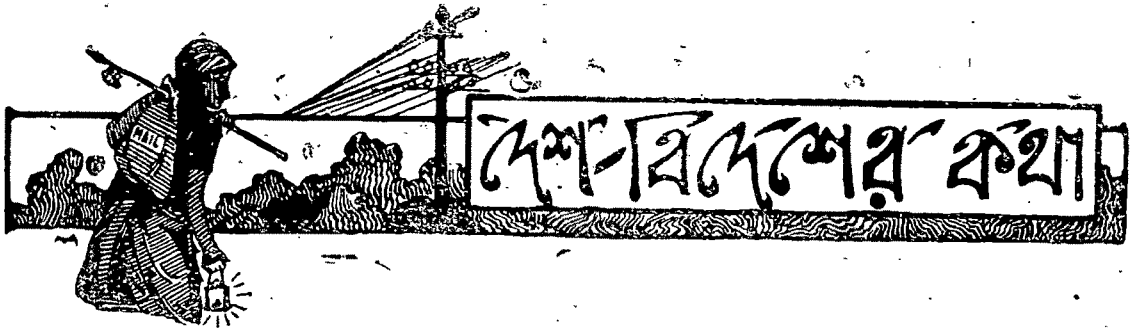
শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সরল হিসাব প্রণালী

অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিগুণাত্মক প্রণালীতে (Double-entry) হিসাব-পদ্ধতি শিখিবার একমাত্র পুস্তক, শিক্ষকের বিনা সাহায্যে বুঝা যায়। ছাত্র ও ব্যবসায়ীর পক্ষে সমভাবে উপযোগী। ব্যাক ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানা যায়। আইকম পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরসহ মূল্য ৫০ টাকা।

মডার্ন বুক এজেন্সি—কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।



রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় সুবর্ণ জয়ন্তী

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগিনী নিবেদিতা ভারতের নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্ত এই বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন এবং ১৮৯৮ সনের নবেম্বর মাসে শ্রীকৃষ্ণাতীর্থরূপী সারদামণি দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য-বৃন্দের উপস্থিতিতে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে স্বামীজীর মার্কিন শিষ্যা ভগিনী ক্রীষ্টিন এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালন-ভার রামকৃষ্ণ মিশনের উপর অর্পিত হয়। এই শিক্ষামন্দিরে অর্জনভাবী অধিককাল যাবৎ বহুসংখ্যক বালিকা বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৭ সাল হইতে যাত্রা মাধ্যমিক বিভাগে বেতন নির্দিষ্ট হইয়াছে। বহু অন্তঃপুরচারিণী মহিলাও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত শিল্প-মন্দিরে বহু দরিদ্রা মহিলা শিল্পবিদ্যা দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের অর্জনভাবী পুষ্টি উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইহার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব আয়োজন করিতে সক্ষম করিয়াছেন।

১৯৫২ সনের ডিসেম্বর মাসে সপ্তাহব্যাপী জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। জয়ন্তী উৎসব সমিতি এতদুপলক্ষে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণিক ও বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ, বিদ্যালয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন, প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষার ইতিহাস রচনা, ছাত্রীদের জন্ত ভগিনী নিবেদিতার জীবনী সম্বন্ধে রচনা-প্রতিযোগিতা, শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতি বৎসর উপযুক্ত ছাত্রীদের স্বর্ণপদক প্রদানের ব্যবস্থা, শিল্পবিভাগের সম্প্রসারণের জন্ত অর্থায়নিক ২৫০০০ টাকার এক ধও জমি ক্রয় ইত্যাদি বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। যাবতীয় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে অন্ততঃ পক্ষে ১০০,০০০ টাকার প্রয়োজন হইবে। লক্ষদণ্ড দেশবাসীর কর্তব্য যথাসম্ভব দান

করিয়া জয়ন্তী উৎসব এবং উৎসব কমিটি কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাক্রমে সাফল্যমণ্ডিত করা। টাকাকড়ি নিরোক্ত ঠিকানায় প্রেরিতব্য :

১। নিবেদিতা সুবর্ণ জয়ন্তী কণ্ড।

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়

৫নং নিবেদিতা লেন, বাগবাড়ার, কলিকাতা-৩

২। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫১ সালের

কার্যবিবরণী

আলোচ্য বর্ষে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগেই সবিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আশ্রমের অধীনে এই বৎসর (১) একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়,

বিনামূল্যে



আমাদের ৫০১ রেজিষ্টার্ড নম্বরযুক্ত কৃষ্ণতৈল ব্যবহারে সব রকম চুল ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং এরপর চিরকাল কাল চুলই গজাইবে। ইহা চুলপড়া বন্ধ করে এবং চুলকে লম্বা, উজ্জ্বল ও কোঁকড়ান করে। মূল্য প্রতি শিশি ১১০, একত্রে তিন শিশি (পূর্ণ কাল) ব্যবহারের জন্ত ৪৮০ টাকা। এই অত্যাবশ্যক তৈলকে লোকপ্রিয় করার জন্ত আমরা স্থির করিয়াছি যে, প্রতি এক শিশি কেতাকে শিশির সহিত একটি ১৫ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত স্কন্দর মানানসই হাতঘড়ি এবং নূতন স্বর্ণের একটি আঙটি আর একত্রে তিন শিশির কেতাকে অনুরূপ ৩টি হাতঘড়ি ও ৬টি আঙটি বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হয়। তৈলের গুণ প্রমাণিত না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়। চিঠিপত্রাদি ইংরাজীতে লিখিতে হইবে।

LONDON COMMERCIAL CO.,

P. B. 2 (D-180-14) AMRITSAR.

(২) একটি দাতব্য প্রাথমিক চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার বিভাগ,
(৩) একটি অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিভাগ, (৪) ইন্ডেন্ট
হোম এবং (৫) একটি সাধারণ প্রোগ্রাম ও রিডিং-রুমের
কার্য স্বল্পভাবে পরিচালিত হইয়াছে।

চিকিৎসা বিভাগ—(ক) স্ববৈধর দাতব্য চিকিৎসা-
লয়ের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিভাগে এবার ৬৮,৮৫৪ জন
রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে—গত বৎসর রোগীর সংখ্যা ছিল
৫৪,৫১৯ জন। (খ) প্রাথমিক সাহায্য বিভাগটি মুখ্যতঃ
ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির বিহার শাখার ৩,৫৫০ অর্থ-
সাহায্যে ১১১৪ ষ্ট্রীটের নবেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।
আলোচ্যবর্ষে এই বিভাগের চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯,২২৭ জন।
ডাঃ এস. সি. ভট্টাচার্য্য নাথক সরকারী চিকিৎসাবিভাগের এক
জন অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

হৃৎগতের সেবাকার্য—আলোচ্য বর্ষে মিশনের উদ্যোগে
বিহারের হারডাঙ্গা জেলার মধুবনীতে একটি সেবাকেন্দ্র খোলা
হয় এবং পার্শ্ববর্তী হৃৎকলীড়িত গ্রামসমূহে চাল বিতরণের
ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষাদান-প্রচেষ্টা—হৃৎ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে
পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অভুতানন্দের (লাট্ট মহা-
রাজের) স্মৃতিরক্ষার্থে স্বামী অভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক পাঠ-
শালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বিহার প্রদেশের লোক ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ১৫১ জন ছাত্র শিক্ষা-
লাভ করিয়াছে এবং এই বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ইন্ডেন্ট
হোমে অবস্থানকারী ছাত্রদের মধ্যে একজন আই-এসসি
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এই বিভাগের স্বামী তুহীরানন্দ লাইব্রেরী রিডিং রুমের
পুস্তকসংখ্যা বর্তমান বর্ষে ১০১১ খানি। ইহাতে নিয়মিত
ভাবে দুইখানি দৈনিক ও বারখানি মাসিক পত্রিকা রাখা
হয়।

বর্তমান বৎসরে আশ্রমে আধ্যাত্মিক বিষয়ে ৩৬৮টি ক্লাস,

৯টি বক্তৃতা ও ২৭টি আলোচনা-সভা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত
মহাসমারোহে ঠাকুর ও স্বামিজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত
হইয়াছে। এই উপলক্ষে বহু দরিদ্রসারস্বতকে ভোজন করানো
হয়।

আশ্রমের সকল বিভাগের উন্নয়নের জন্ত অন্ততঃপক্ষে বার
হাজার টাকার প্রয়োজন। এই সমুদায়ের বাহারা অর্থসাহায্য
করিলেবন তাঁহাদের দান সাহায্যে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। টাকা-
কড়ি—সেক্রেটারী, রায়স্বয় মিশন আশ্রম বা পোঃ বাকিপুর,
পাটনা, এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

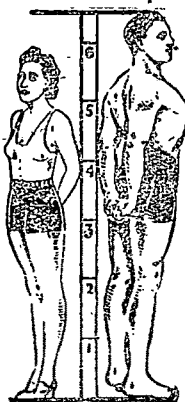
নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ

নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুম-
দার সেবাশ্রম ওয়ার্ডা হইতে দেশের যুবসম্প্রদায়ের নিকট
নিম্নোক্ত আবেদনপত্রটি প্রচার করিয়াছেন :

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আজ পাঁচ বৎসর হইতে চলিল
দেশের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হওয়া ত দুইয়ের কথা, ইহা ক্রমশঃ
বৃদ্ধি পাইতেছে। এইজন্য যুবসম্প্রদায় হয় আজ মৈত্র্যবাদী হইয়া
পড়িয়াছে আর নচেৎ বর্তমান অবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্তান-
বাদের পথ ধরিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যেও পরস্পরের
উপর দোষাবোপের মনোভাব দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহাতে
কোনই ফল হইবে না। এ অবস্থার স্থিতির কারণ আমাদের
গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে। সমস্তর সমাধান কি
উপায়ে হইবে তাহা আবিকারান্তে জীবন পণ করিয়া সেই কঠ-
ন পন্থা অহসরণ করিতে হইবে।

গান্ধীজী বলিভেন; সভ্যতার স্বরাজ ইংলণ্ড, জার্মানী, আমে-
রিকা বা রাশিয়া কোথাও নাই। গণপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-
ব্যবস্থা এ সকল দেশে থাকিতে পারে; কিন্তু শাসন-ক্ষমতার
অপব্যবহার হইলে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সহকারে বিদ্রোহ
পরিচালনা করিবার শক্তি যখন প্রতিটি ব্যক্তির ভিতর জাগিবে
তখনই শুধু তাহাকে সভ্যতার স্বরাজ আখ্যা দেওয়া সম্ভব
হইবে (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-১-২৫)। জনসাধারণ যখন নিজেদের
জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী প্রয়োজনীয় অব্যাসমূহের জন্য
কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হইবে না, তখনই শুধু এরকম অবস্থার সৃষ্টি
হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ জনসাধারণের মরণ-বীচন যে সব অব্য-
সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল, সেগুলির ব্যাপারে অন্ততঃ তাহাদের
স্বাভাব্য হওয়া দরকার। এ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য বর্তমান
আর্থিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

পুঁজিবাদের ব্যাপক সংগঠনের জন্য দেশ জুড়বেগে
একাধিনায়কত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অনেক যুবক-
যুবতী মনে করেন যে, পুঁজিপতিদের ধ্বংসসাধন করিলেই
পুঁজিবাদের অবসান ঘটবে। তাহারা ভুলিয়া যান যে, জন-
সাধারণের জীবন যত দিন পুঁজির উপর নির্ভরশীল, তত দিন



দীর্ঘতর হউন !!

আপনি যদি আপনার দৈর্ঘ্য বাড়াইতে চান
২ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত তবে অল্প
হইতেই আমাদের বিখ্যাত “স্টিটো
মেডিসিন” ব্যবহার করিতে থাকুন।
এই বটিকাগুলি ব্যবহারের ১২ দিনের ভিতরই
অত্যন্ত ফল দর্শাইয়া থাকে। যে কোন
বৃত্তে নরনারী সকলেই উহা ব্যবহার করিতে
পারেন। মূল্য প্রতি বাক্স ৪৮০।

IMPERIAL CHAMBER OF
SCIENCE

P. B. 61. (D-181-13) AMRITSAR.

তাহাদের পুঁজির পরিচালক ব্যক্তি বা দলের পদানত হইয়া থাকিতেই হইবে।

অতএব ভারতের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীকে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়া অনবজ্ঞাদি-জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় জব্য-সমূহের জন্য গ্রামের ভিত্তিতে স্বাবলম্বী হইয়া আর্থিক অবস্থা কায়েম করার বিপ্লবে যোগদান করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপ্লবসাধন করিতে হইবে।

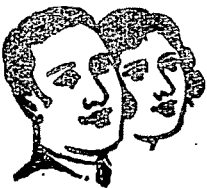
শ্রেণীভেদমোহর ফলসত্ত্বে শোষণ ও উৎপীড়নের নিরাকরণ করিয়া বিধে সভ্য ও শান্তির রাজত্ব স্থাপন করিতে হইবে। বর্তমানের মজুর ও ছাত্রদের পার্থক্য দূর করিয়া এক শ্রেণীহীন সমাজ রচনা করিতে হইবে।

নব বিপ্লবের পদ্ধতি সম্বন্ধে হিংসাত্মক ও অহিংসাত্মক এই দুই উপায়ের কথা লোকে চিন্তা করে। গান্ধীজী অহিংসাত্মক রাজনৈতিক বিপ্লব সকল করিয়া দেখাইয়াছেন।

আমাদের এইভাবে এখন আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লবসাধন করিতে হইবে। যুবক-যুবতীদের এখন গ্রামে গ্রামে গিয়া কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে হইবে। কৃষক ও শ্রমিক সমাজের সঙ্গে একাত্ম হইয়া তাহারা পঠনশুলক কার্য দ্বারা তাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বনের শক্তি সৃষ্টি করিবে। বয়োবৃদ্ধ বিনোবাজী শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আজ বিপ্লবের পথে স্থির পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। এ অবস্থার ভারতের যুব সমুদায় কি আলোকে কালাতিপাত করিবে?

যুবক-যুবতীরা অনেক সময় বলে যে তাহারা ত প্রস্তুত। তাহাদের মধ্যে উদ্বীপনা ও ভ্রাত্যের জন্য আগ্রহ ও শক্তি সকলই বর্ধমান। কিন্তু তাহাদের পথপ্রদর্শক হইবে কে এবং কেই বা তাহাদের পরিচালনার দায়িত্ব লইবে? নিখিল ভারত চরখা সম্বন্ধে এই উদ্বেগে সারা দেশে আগ্রহে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে নূতন বিপ্লবের জন্য সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। দেশব্যাপী কাতাই মণ্ডল স্থাপনার দ্বারা এই লক্ষ্যভিত্তিতে চলিবার কাজও শুরু হইয়া গিয়াছে।

বিনামূল্যে কাশ্মিরী শাস্ত্র



আপনার অতি প্রয়োজনীয় বইটি প্রকাশিত হইল। ইহাতে নর-নারীর ২৮৪টি রঙীন চিত্র আছে। বিজ্ঞাপনের খরচা বাবতে মাত্র আট আনার ষ্ট্যাম্পসহ সমস্ত পত্র লিখুন। বিলম্বে হতাশ হইবেন।

PARIS ART HOUSE
HALQA. 5. (D-194) AMRITSAR

নিখিল ভারত চরখা সম্বন্ধে পক্ষ হইতে আমি দেশের প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীর নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, দেশকে বাঁচাইবার জন্য তাহারা যেন হাজারে হাজারে আমাদের এই কার্যে যোগদান করে। এই কার্যে যোগদানকারী যুবক-যুবতীদের আমরা এই কাজের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানান্তর ভারতের গ্রামে গ্রামে পাঠাইব। সেখানে তাহারা কাতাই মণ্ডল স্থাপন এবং গ্রাম-সেবা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণের ভিতর স্বাবলম্বন ও আত্মশক্তি জাগ্রত করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। এই কার্যে যোগদানকারী যুবক-যুবতীদের বর্তমান বিধে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদ ও 'সর্বোদার' বিচার দ্বারা বুদ্ধিবার মত বুদ্ধি এবং সর্বোদারের পথে চলিবার মত শারীরিক শক্তি ও মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। আবেদনপত্রের সঙ্গে তাহারা যেন সবিস্তারে নিজ নিজ যোগ্যতা সম্বন্ধে লেখে এবং এ সম্বন্ধে অধিক তথ্যের প্রয়োজন হইলে আমার সহিত পত্রব্যবহার করে।

শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নিউ ইয়র্কে আন্তর্জাতিক কাউন্সিল কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইবে, বোম্বাই প্রবাসী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাহাতে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত অমুঠানে যোগদান করিবার জন্ত শৈলেন্দ্রবাবু ২০শে এপ্রিল তারিখে বিমানমোপে নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন।

পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যসম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব

বার্ণপুর হইতে শ্রীকালীপদ সিংহ জানাইয়াছেন যে, গত ডিসেম্বর মাসে পাটনায় অমুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যসম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে সবমুহুর চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভাষ্যে সিংহ মহাশয়েরই একটি প্রস্তাব অমুসারে উক্ত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাবিধি দরদী পৃষ্ঠপোষক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে স্থির হয়।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর (মহারাজ) সম্বর্ধনা

গত ২৩শে বৈশাখ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাপাসাটীয়া পল্লীগঠন কেন্দ্রে কাপাসাটীয়া ও ভৎসংলয় গ্রামের অধিবাসীরা বিপ্লবী মেতা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর (মহারাজ) ৬৪তম জন্মতিথি পালন করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর স্বভীষ্মমোহন রায়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মানপত্রাদি পাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও গাঃ সতীশচন্দ্র রায়ের বক্তৃতার পর ছোট বালিকাদের চরকা-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এই প্রতিযোগিতায় শক্তি দে প্রথম পুরস্কার এবং ইন্দু চক্রবর্তী দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

মানপত্রের উত্তরে মহারাজ বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর গঠন-মূলক কাজের মধ্য দিয়া জাতিকে সবল করিয়া গড়িয়া তোলা প্রত্যেকের কর্তব্য। তিনি সকলকে স্বাবলম্বী এবং সজবদ হইতে উপদেশ দেন।

বীরেন্দ্রকুমার সাহা

গত ১৮ই মে জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনে অগ্রণী পরলোক-গত বীরেন্দ্রকুমার সাহার সপ্তম বার্ষিক মৃত্যু দিবস উপলক্ষে ত্রিভুজচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে এক সভার আবিবেশন হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বীরেন্দ্রকুমারের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

বীরেন্দ্রবাবু বাংলা ১৩০০ সনের ১৫ই আশ্বিন কলিকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স হইতে প্রতিভুল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা, উত্তম, উৎসাহ, অধ্যবসার এবং উদ্ভারনী শক্তির দ্বারা দেশের ঐশ্বর্য ও শিল্পসম্পদ বৃদ্ধির যে দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গেলেন তাহার তুলনা নাই। কাঁচ ও ম্যাটল শিল্পের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বীরেন্দ্রকুমার বৈদেশীযুগের লোক ছিলেন এবং সেই অগ্র-যুগের আদর্শ দ্বারা অম্প্রাপিত হইয়া তিনি দেশসেবার আত্ম-নিয়োগ করেন। এদেশের কাঁচ ও ম্যাটল শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতন্তম পথিকৃৎ। তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত “সোদপুর গ্লাস ওয়ার্কস” বাঙালী জাতির সার্থক শিল্পপ্রচেষ্টার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তারতে তিনিই সর্বপ্রথম যন্ত্র-সাহায্যে শিশি, বোতল, শিট গ্লাস, এবং অন্যান্য কাঁচের জব্যাদি তৈরি করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই কারখানাই কাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁচ বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের “হাতে কলমে” কাজ শিক্ষা দিবার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তিনি শেক্সপিয়ার-সোসাইটি অব গ্লাস টেকনোলজির ভারতীয় বিভাগের এবং ইন্ডিয়ান সিরামিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন।

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

“ত্রিভুজচন্দ্র” পত্রিকার প্রকাশক ত্রিবেদীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা এবং বেহালা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৮ বৎসর বয়সে গত ১২ই বৈশাখ শুক্রবার বেহালাস্থ তাঁহার নিজ বাসভবনে লোকা-গুহিত হন। তাঁহার তার ছাত্রকল্যাণকামী, বিচক্ষণ এবং আদর্শ শিক্ষক, দারিদ্রজ্ঞানসম্পন্ন অথচ জনপ্রিয় নাগরিক বিরল। প্রথম জীবনের অতি সাধারণ এবং সামান্ত অবস্থা হইতে উত্তরকালে তিনি যে সর্বজনপ্রিয়তা, সম্মান ও সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তার মূলে ছিল তাঁহার কর্মশক্তি, আত্ম-নির্ভরতা ও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা। বহু বর্ষ-প্রতিষ্ঠান ও জন-হিতকর সঙ্ঘের সহিতও তিনি সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

বঙ্কুবিহারী মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ও শ্রম দপ্তরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী বঙ্কুবিহারী মণ্ডল গত ৩১শে বৈশাখ ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গত নির্বাচনে রাণীগঞ্জ কেন্দ্র হইতে গুপীলী আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। লীগ আমলেও তিনি পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ছিলেন এবং ১৯৩৭ সাল হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই রাষ্ট্রনৈতিক জীবন আরম্ভের পূর্বে তিনি আসামসোল কোর্টে ওকালতী করিতেন।

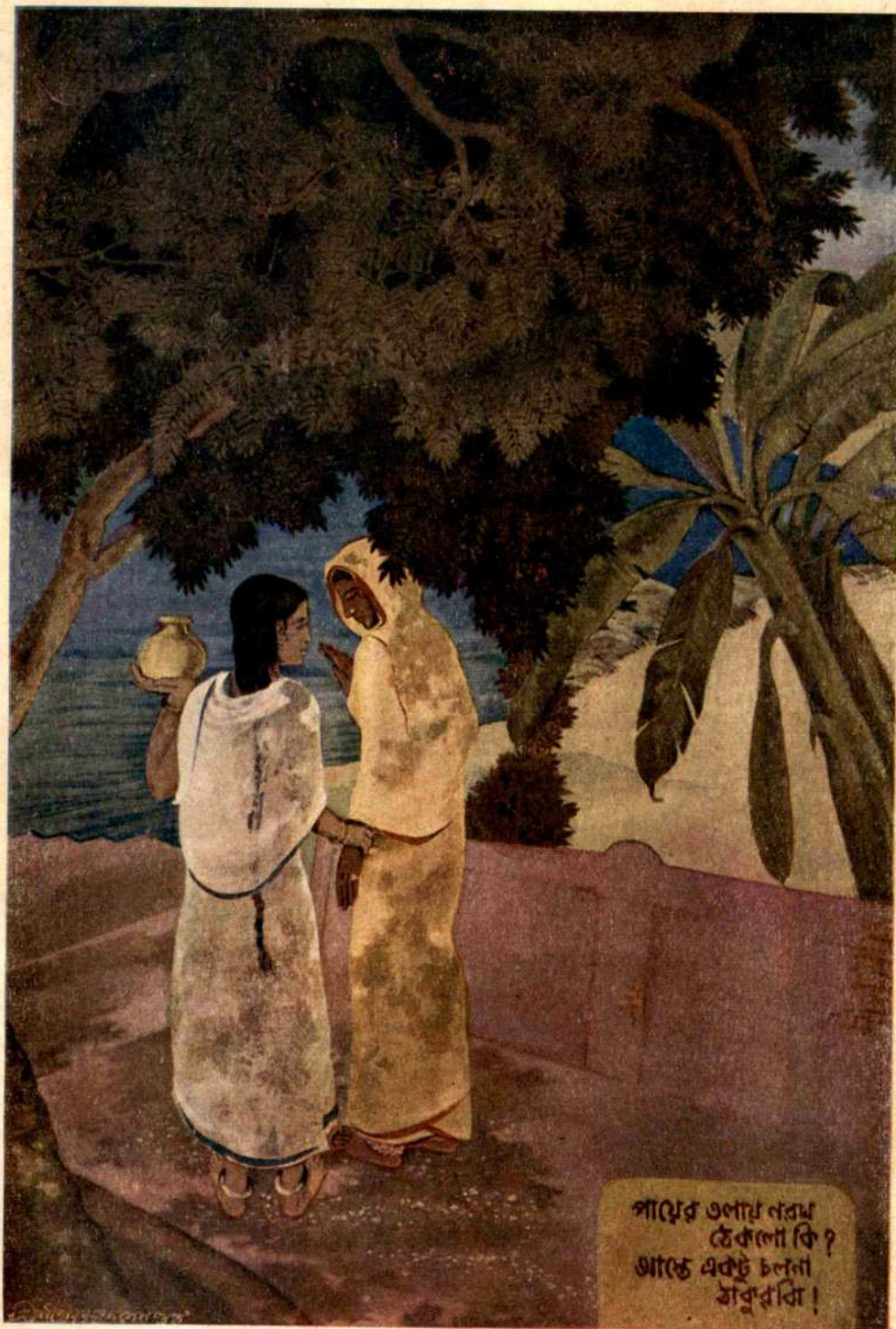
তাঁহার অসামান্য ব্যবহার এবং পরোপকার-প্রবৃত্তির জন্ত তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তিনি স্ব-শ্রেণীর উন্নতি ও উপকারের জন্ত সর্বদাই চেষ্টা করিতেন। যখনই আসাম-সোল মহকুমার কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট কোন কার্যের জন্য প্রিয়াছেন, বঙ্কুবাবু তাঁহার সেই কার্য সমাধা করিয়া দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন।



অমৃততাঞ্জন
সর্বপ্রকার রোগে আণবিক রোগের ন্যায় কার্যকরী।

দাদের মল্লম
চর্ম রোগে 'পরমানু' শক্তির ন্যায় কার্যকরী।
অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭





প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অক্ষবধু

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত



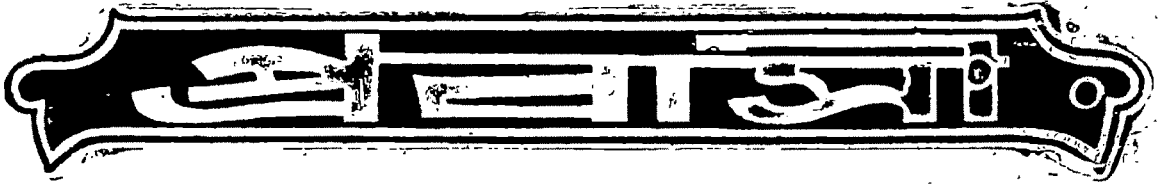
শ্রীরঙ্গমন্দিরের প্রধান তোরণ



সহস্র স্তম্ভনির্মিত কক্ষগাত্রে প্রস্তরের মধ্যে বিচিত্র কারুকাৰ্য্য



শ্রীরঙ্গমের সাধারণ দৃশ্য (পশ্চিম দিক হইতে)



“সত্য শিবম্ সুন্দরম্
মায়মায়া বলহীনেন সত্যম্”

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৫৯

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতায় “আইন অমান্য” আন্দোলন

বিগত মঙ্গলবার ৩১শে আষাঢ় কলিকাতায় এক “জন বিকোত্তের” বসি হয়। “আইন অমান্য”, “জনবিকোত্ত” ইত্যাদি শব্দ কিছুদিন বাবং পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রিকমিশনের করণে অপোচর ছিল। কিন্তু প্রাচীর বিগাম পরিষদে সরকারী ও সরকার-বিরোধী দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাতের ফলে উহার পুনরাবির্ভাব ঘটয়াছে। এই ব্যাপারের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সরকারী বিবৃতি এইরূপ :

“পরিষদ ভবন এলাকার প্রথম ১৪৪ নম্বর আদেশ বলবৎ রহিয়াছে। হুতিক প্রতিরোধ কমিটি ঘোষণা করেন যে, তাহারা ১৪ই জুলাই ঐ আদেশ অমান্য করিবেন। পৰ্য্যবেক্ষকে তাহাদের বাধ্য পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে বাধ্য করাই তাহাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ছিল। ১৪ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, পৰ্য্যবেক্ষ বাধ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন আছেন তবে আগামী বৎসরের পূর্বে তাহাদের পক্ষে কিমোহাই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হইবে না, কারণ কলিকাতা ও শিল্প এলাকার জট নির্দিষ্ট পরিমাণ গম ও চাউল যে ভারত-সরকার সরবরাহ করিতে পারিবেন এরূপ ‘প্যারান্টি’ তাহারা দিতে পারিতেছেন না। এই বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, ভারত পৰ্য্যবেক্ষ কিমোহাই পরিকল্পনা বর্তমান বৎসরেই কার্যকরী করিতে চাহে আছেন কি না তাহা জানাইবার জন্ত তিনি কেন্দ্রীয় বাত্মজীর নিকট একটি তার প্রেরণ করিয়াছেন। সরাসরি ব্যবস্থা অবলম্বন হইতে বিরত থাকার জন্য তিনি সংযুক্ত হুতিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণকে অহরোধ করেন। তিনি তাহাদিগকে আরও অহরোধ করেন যে, তাহারা যেন বিবাদসত্তা বর্জিত সম্পর্কিত আলোচনা শান্তিপূর্ণভাবে চলিতে দেখেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি ১৪৪ নম্বর অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি অবশ্য এই হুতিক দেখান যে, তাহাদের এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে রাজ্য

সরকারের পক্ষে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ গম ও চাউল সংগ্রহের সুবিধা হইবে। তাহার এই সিদ্ধান্ত অঙ্গুরে মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৩টার ওয়েলিংটন রোডে প্রায় বার শত লোক সমবেত হয়। এখানে কয়েকজনের বক্তৃতার পর ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি, ব্রীহমন্তহুয়ার বহু প্রকৃতির মেত্বে একটি শোভাযাত্রা পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। নিবিড় এলাকার প্রবেশ-পথের মুখে পুলিশ শোভাযাত্রা আটক করে এবং তাহারা শোভাযাত্রাগণকে ১৪৪ নম্বর অমান্য না করিতে বলে। শোভাযাত্রাকারীরা তখন পুলিশ-বেইনীতে দৌড় করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। শোভাযাত্রাকারীদের মধ্যে হইতে কয়েকজন মেত্বে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শোভাযাত্রাগণ ভবন রাস্তার মাঝখানে বসিয়া পড়ে। ইহার পর তথার ঘটনায় বিরাট জনতা সমবেত হয় এবং তাহারা পুলিশের উপর ইট-পাটকেল হুতিতে আরম্ভ করে। জনতাকে সরাইয়া দিবার জন্ত পুলিশকে দুই লাঠি চালনা করিতে হয়। কিন্তু চারিদিক হইতে আরও লোক আসিয়া তথার জমিতে থাকে এবং তাহারা পুলিশের উপর প্রবলভাবে ইট-পাটকেল হুতিতে থাকে। একজন পুলিশ গুরুতররূপে আহত হয় এবং তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কয়েকজন পুলিশ অফিসার এবং জনসাধারণের মধ্যেও অনেক আহত হয়। গ্রেপ্তারের সময় জনতা সমুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্ত চাপ দিতে থাকে। পুলিশ তখন ১৬ রাউন্ড কাঁহনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং জনতা হতভম্ব করার জন্য অশ্রাব্য পুসিগ ও আগুইয়া আসে। এই সময়ে এসপ্ল্যামেড রো ইটে কিছু লোক একত্র হয়। কার্জন পার্কের ভিতর হইতেও জনতা প্রস্তুত হুতিতে থাকে। এই সময় আরও সাত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাত্রি প্রায় আটটার সময় জনতা হতভম্ব হয়। দূত ব্যক্তিদের মধ্যে আট জন সামান্য আঘাত পাইয়াছে।”

অতঃ দিকে বিরোধী দলের বর্তমান মুখপাত্র “আনন্দবাজার

পত্রিকা" এ একই ব্যাপার সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য—বৃহস্পতি ৩২শে আষাঢ়—এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন :

“পশ্চিমবঙ্গ সরকার লাঠির যুক্তির প্রয়োগে অভিযাত্রার উৎসাহী হইয়া উঠিতেছেন, দেখিতেছি। মাত্র কিছুদিন পূর্বে বিধানসভার হারদেশে সমবেত দৃষ্টিকর্ষিত জনতার উপর লাঠি চালনা হইয়াছে। পুনরায় গত মঙ্গলবার সরকারী খাদ্যনীতির প্রতিবাদে বিকোত প্রদর্শনের জন্য যে জনতা বিধানসভার দিকে যাইতেছিল, তাহার উপর লাঠি চালনা করা হইয়াছে। কেবল লাঠি চালনা হইয়াছে বলিলে ভুল বলা হইবে; লাঠি চালনা, বোঁড়াচালনা, কাঁচুনে গ্যাসচালনা—সবরকম পরীক্ষাই হইয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত সংবাদ, শতাব্দিক সংখ্যক ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন এবং অভিযানকারীদের নেতৃস্থানীয় বক্তৃতা জমকে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই অভিযানের বিজ্ঞপ্তি যখন প্রথমে প্রকাশিত হয়, তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় শাসনের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার শাসন যে মিরজ ও শাজ জনতার উপর সরকারী বলপ্রয়োগের এই মধ্য রূপের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইবে, তাহা কেহ ভাবে নাই।”

‘প্রবাসী’ মন্তব্য হইবার সময়ের অবস্থা এইরূপ। পরে উহা কোন্ দিকে চলিবে বুঝা যাইতেছে না। তবে রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেরূপ মধ্য ও বীতংগ রূপে দেখা দিয়াছে তাহা এপ্রদেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইবে না নিশ্চয়। এ প্রদেশের সংবাদপত্র—বলিতে কি সমস্ত ভারতের সংবাদপত্র—আজ “নারকুলেশন” নামক দেবতার পূজারী, স্তূতরাং সেদিক হইতে পথ নির্দেশের আশা বৃথা। দেশে প্রকৃত নেতৃত্বের যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রবীণ দেশসেবী আজ কেহই নাই যিনি এই আত্মঘাতী ঘৃণের মীমাংসা করিতে পারেন। নাগরিকবর্গ হির ও মিরপেক থাকুন ইহাই আমাদের নিবেদন।

কলিকাতার উচ্চতম “ন্যায়াধিকরণ”

আমাদের দেশে হাইকোর্ট অর্থে “উচ্চতম বর্ধাধিকরণ” শব্দ পূর্বে ব্যবহৃত হইত। বর্ধাধিকরণ বলিতে কি বুঝায় তাহা আজিকার দিনের অবিকাংশ লোকেরই হয় বারণা নাই, নয় স্মৃতির অজীভ। “High Courts of Judicature” শব্দের দ্বারা কি অহুবাদ করিয়াছেন তাহা অল্প লোকেই জানেন এবং ব্যবহার করেন আরও অল্প লোকে, কিন্তু এ অধিকরণে আমাদের নূতন ব্যবস্থার কি ভাব অর্পিত হইয়াছে সে বিষয়ে দিল্লীর দরবার জনসাধারণকে বিশেষ জ্ঞানান নাই। জানাইলে দেখা যাইত যে, হাইকোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি অশেষ ভাবে করা হইয়াছে, কিন্তু লেখানকার অবিকারীবর্গের দায়িত্ব-জ্ঞান সরল ও সজাগ রাখিবার ব্যবস্থা কিছুই করা হয় নাই। অধুনা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর উচ্চতম বর্ধাধিকরণে ধর্মবিচার ও

ভারবিচার যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিচারক-বর্গের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিচারকের কর্তব্যচ্যুতি হইলে তাহার শোভন অভিশ্র কঠিন ও দুঃসাধ্য পূর্কেই ছিল, বর্তমানে তাহা আরও দুরূহ করা হইয়াছে। ফলে বিচারকের কাজ সহজ হইয়াছে, বিচারপ্রার্থীর অবস্থা সঙ্গীন হইতে সঙ্গীনতর হইয়াছে।

এই ব্যবস্থার ফলে আমরা বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ “বর্ধাধিকরণে” যথেষ্টাচারের দুস্পষ্ট লক্ষণ কয়েকবার দেখিয়াছি এবং আমাদের আশঙ্কার কারণ আছে যে, পরে অবশ্ব ও অনাচারও ঐপথেই প্রবেশ করিতে পারে। কেননা যেখানে বিচার অভিযানে বা পরোক্ষ প্রভাবের ফলে বিচার বর্ধচ্যুত হইতে পারে সেখানে অনাচার প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাওয়া অসম্ভব কোনমতেই নয়। তিন্ন কয়টি প্রদেশে উহা ইতিপূর্বেই অল্পবিস্তর ঘটয়াছে, স্তূতরাং এখানে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, না হইলে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারের উচ্চ আদর্শ নান হইয়া ক্ষম কীর্ণ হইয়া যাইবে।

আমরা অনেক চিন্তা ও আলোচনার পর এই বিষয়ে সিদ্ধি-তেছি, কেননা আমরা আইন-কাহুনে পটু নহি এবং “প্রবাসী” ভার-মীমাংসার ক্ষেত্রও নহে। কিন্তু অল্প সাধারণ জনের ভায় আমাদেরও এ বিষয়ে আলোচনা করার অধিকার আছে এবং সে অধিকার প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের জন্মগত স্বত্ব।

প্রশ্ন হইতে পারে, হাইকোর্টের বিচার সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার জনসাধারণের কেমন করিয়া হইতে পারে, কেননা সেরূপ জ্ঞান কয়জনের আছে? তাহার সহজ উত্তর যে, সে জ্ঞান বিশেষজ্ঞ। তিন্ন কাহারও নাই, কিন্তু বিচারের ফলাফল যদি সাধারণের সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে সমীচীন না হয় তবে সে বিচার ব্যর্থ, সে আইনজ্ঞান ব্যর্থ এবং বর্ধাধিকরণের যে মূল উদ্দেশ্য—অবিচার—তাহাও ব্যর্থ। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু—বিচার, আইন-কাহুনের কূটতর্ক নহে।

কালোবাক্সের উৎপত্তি দেশবাসী হস্তসর্ব্ব ও অনেব ভাবে স্মিষ্ট, কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে কেহ শান্তি পায় নাই। অনাচারের প্রাবলে দেশ রূপান্তরে যাইতে বলিয়াছে, কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে কচিং এক আশঙ্কন সামান্য শান্তি পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। প্রবলের অভ্যাচারে দুর্কল বা অসমর্থ লোক জর্জরিত, হাইকোর্টে তাহার প্রতিকার দুরূহ হইতে দুরূহতর হইতেছে। এ সকল কথা সর্বজনবিদিত এবং সকলের মনেই প্রশ্ন এই যে, কেন এমন হয়? তবে প্রত্যেক অবিচার কোথায়?

বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ত্রিযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান-বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে পরদিনের সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সমাচার প্রকাশিত হয় :

“শপথ গ্রহণ অস্থানের পর বার লাইব্রেরীর পক্ষে এড-ভোকেট কোমারেল জি এস. এম. বসু, বার-এসোসিয়েশনের পক্ষে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং ইমকরণপোর্টেড ল’ সোসাইটির পক্ষে জীশিশিরকুমার বোষ মনমিযুক্ত প্রধাম বিচারপতির প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

অভিনন্দনের উত্তরে প্রধাম বিচারপতি বলেন যে, এই দেশের ন্যায়বিধিকরণের মর্যাদা ও কমতা পূর্ণমাত্রার রক্ষার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে সচেতন আছেন এবং সংবিধানে ন্যায়বিধিকরণকে যে মর্যাদা ও কমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই আদালত ও অন্যান্য আদালতে বাহ্যতে হ্রাস না হয়, তাৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিচারপতি আরও বলেন, আমরা—জনসাধারণ ও বিচারক উভয়েই সমানভাবে এখন পরীক্ষার সম্মুখীন। বিচারকগণ যতই চেষ্টা করুন না কেন, আইনজীবীগণও যতই পরিশ্রম করুন না কেন, জনসাধারণ ও শাসনতান্ত্রিক অন্যান্য বিভাগের মধ্যে আদালতের কর্তৃত্ব স্বীকৃতি এবং আদালতের চতুর্দিকে আদালতের নির্দেশে চলিতে মানিয়া লওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে ন্যায়বিধিকরণের কাজ অসুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না।

বিচারপতি বলেন যে, হাইকোর্টের ঐতিহ্য মাত্র বিচারকগণের স্বাধীনতা অথবা বিচার-বিভাগের দক্ষতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। আইনজীবীদের ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বাধীনতা এবং আদালতের কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার উপরই উহা নির্ভরশীল। তাহাদের সহযোগিতায়ই বিচার বিভাগের স্তম্ভ পরিচালন সম্ভবপর।”

জীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্তীর খ্যাতি আছে জ্ঞানলিপ্যার কারণে এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণের জন্য। সুতরাং তিনি যে ন্যায়বিধিকরণের সংবিধান প্রদত্ত মর্যাদা ও কমতা অক্ষুর রাখিতে চেষ্টা করিবেন তাহা বলা বাহুল্য এবং আমাদের বিশ্বাস আছে যে, তিনি জাতসম্মানে সে কমতার অপব্যবহার নিক্ষেপ করিবেন না। সে কারণে তাঁহার বিযুতি পূর্ণভাবে গ্রাহ্য, কিন্তু তিনি যেখানে জনসাধারণের স্বীকৃতি ও সন্তোষে নির্দেশ পালনের কথা তুলিয়াছেন সেখানেই আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। জনসাধারণের হৃদয়ে হাইকোর্টের স্থান আচ্ছাদিত কোথায় সেটা হয়তো প্রধাম বিচারপতি হাইকোর্টের উচ্চাঙ্গনে আসীন বলিয়াই ঠিক দেখিতে পাইতেছেন না।

আমাদের বক্তব্য এই মাত্র যে, আচ্ছাদিত জনসাধারণ হাইকোর্টকে “ন্যায়বিধিকরণ” বলিয়া মানিয়া লইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাকে “স্বাধিকরণ” বলিয়া স্বীকার কেহই করে না এবং সেই কারণেই উহার নির্দেশ সন্তোষে মানিতেছে কেবল বে-কসুর থালাস হইবার জন্য ছাড়াচার লোকে। কচিং কেহ যদি ন্যায়বিচারের সঙ্গে স্বর্ষবিচার পায় তবে সেও এতই বিলম্বে

এবং এরূপ হ্রাস-হ্রস্বপাক অতিক্রম করিয়া যে, তাহারও মনে প্রসন্নতার স্থান থাকে না। চক্রবর্তী মহাশয় চিন্তাশীল ব্যক্তি, তিনি হাইকোর্টের আড়ম্বর ও ভাষামোদের পরিবেশ হইতে দূরে বলিয়া যদি এ বিষয়ে চিন্তা করেন তবে আমাদের বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ণয় ও প্রতিকারের পথের নির্দেশ, দুই-ই তিনি করিতে পারিবেন ইহাই আমাদের আশা।

পশ্চিমবঙ্গে “কম্যুনিটি” পরিকল্পনা

বিশ্বত এই জাহ্নবীর দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন রাষ্ট্রপতির থাকরে এক চুক্তি সংস্থাপিত হয়। তাহার বহু পূর্বে, ১৯৫০ সনের ২৮শে ডিসেম্বরে যে “টেকনিক্যাল এন্ড”, অর্থাৎ কার্যকৌশল সহায়ক ব্যবস্থাসম্পর্কিত চুক্তি হয়, বর্তমান চুক্তি তাহারই স্বাভাবিক বিকাশ। এই চুক্তি অঙ্গসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ২৫ কোটি টাকা ও ভারত-সরকার সমপরিমাণ টাকা দিয়া একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিবেন। ঐ পঞ্চাশ কোটি মুদ্রা ভারতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ব্যয়িত হইবে।

বলা হইয়াছিল, “যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে সমবার প্রচেষ্টা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন—অর্থাৎ সর্ববিষয়ক উন্নতি—পরি-কল্পনাগুলি উৎসাহ পায় সে বিষয়ে এই তহবিল পরিচালক-দলের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।” আরও বলা হয় যে, যে সব পরিকল্পনার কৃষি ও দেশের খাদ্যবাহার উন্নতির ব্যবস্থা আছে, এই তহবিলের একটি মোটা অঙ্ক সেই বাবদে ব্যয় করা হইবে। পরিকল্পনার সাধারণ বিবরণ এই ভাবে দেওয়া হয় :

সার্বজনীন উন্নয়ন কার্যসূচী

এই ভাণ্ডার হইতে যে সকল সার্বজনীন উন্নয়ন কার্যসূচীর জন্য অর্থ সাহায্য করা হইবে, তাহাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫০টি গ্রাম্য-সহায়ক উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। ইহার জন্য প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রায় ৭০০টি করিয়া গ্রাম এবং ২,০০,০০০ করিয়া লোক থাকা প্রয়োজন। এটোরা উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং নিলোথেরী ও করিদাবাদের নতুন নগর পটনে উন্নয়ন প্রদেশ সরকার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই অভিজ্ঞতা অঙ্গসারী নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হইবে। এটোরাতে ৩ বৎসর সময়ের মধ্যে ১০২টি গ্রামের ৭৯,০০০ জন অধিবাসী ১০০ বর্গ মাইল কেন্দ্রে খাত উৎপাদন বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করিয়া সমবারমূলক সুপরিপক্ক প্রচেষ্টার সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছে। তাহার উদ্ভিদ-রোগ বিনাশ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যেও বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। নিলো-থেরী ও করিদাবাদে ভিন্ন বৎসরের মধ্যে সুপরিপক্কতা এবং জনগণের সমবারমূলক সহযোগিতার ফলে সর্বপ্রকার আধুনিক ব্যবস্থা সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি

এই চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, একটি ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং এই কমিটিই পরিকল্পনাগুলির

নীতি নির্ধারণ করিবেন এবং ঐগুলির তদারকের ব্যবস্থা করিবেন। ভারত-সরকার এই কমিটি নিয়োগ করিবেন। ভারতে মার্কিন টেকনিক্যাল সহযোগিতা পরিচালনা ব্যবস্থার অধ্যক্ষ মিঃ ক্লিফোর্ড উইলসন এই কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

চুক্তির মূল উদ্দেশ্য দুই দফায় সংক্ষেপে বলা হয় এইরূপ :

১। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ নির্দেশ ও তাহার গতিবেগ বৃদ্ধি।

২। জগতের সর্বজাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সম্যক পরিচয় স্থাপনা, জগদ্ব্যাপী শান্তি স্থাপনা এবং (চুক্তি-কারী) দুই সরকার কর্তৃক এরূপ কার্যসূচনা যাহাতে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের কারণ দূরীভূত হয়।

বলা হইয়াছিল যে, ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির প্রধান অন্তরায় তাহার বাণিজ্যের বাধিত। প্রতি বৎসর গড়পড়তা প্রায় ২৫০ কোটি টাকার বাদ্যশুল ভারতকে আমদানী করিতে হয়। ঐ ২৫০ কোটি টাকায় কেমন পঞ্চাশ লক্ষ টন শুল্ক যদি এদেশে উৎপাদন করা যায় তবে ঐ টাকায় বহু প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতিবিধান এবং বহু অত্যাবশ্যক কার্যসূচীর গতিবৃদ্ধি সম্ভব হইবে।

এই চুক্তি সম্পর্কে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা এত দিন চলিতেছিল। অধিকাংশ লোক এ বিষয়ে কোনও সন্নিবেশ সংবাদ অবগত নহেন। তাহার কারণ উহার কার্য-ক্রমের পূর্ব বিবরণ এখনও রচিত ও প্রকাশিত হয় নাই। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে আলোচনাও অল্পই হইয়াছে, ইহার প্রথম কারণ এই চুক্তি মার্কিন-পক্ষের স্বার্থের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। তবে মোটামুটি বলা যায় যে, ভারতীয় সংবাদপত্রের অধিকাংশ এই চুক্তিকে ভারত-মার্কিন সম্প্রীতির আরম্ভভূমি বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে। বামপন্থীদের এক অংশ স্বত্বাভঃ ইহাকে “মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের” প্রতিষ্ঠান বলিয়াছিলেন এবং পাকিস্তানীরা এক দলও ইহাকে ভাল চোখে দেখেন নাই।

আমরা এই চুক্তি সম্পর্কে “কলম পরিচীত” বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। কারণ প্রথমতঃ দেশের দুর্দশাবৃত্তি যে ভাবে চলিতেছে এবং দেশের শাসনযন্ত্র যে রূপ অযোগ্য অধিকারী-বর্গের হস্তে গিয়াছে, তাহাতে দেশের ভিতরের শক্তি-সামর্থ্য ও আর্থিক সম্বলের দ্বারা কোনও উন্নয়ন কার্যের প্রগতি যথাসময়ে হইবে কি না সন্দেহ। বিদেশের ও বিদেশীর সাহায্য লওয়া আমাদের বিশেষ পছন্দ নয়, কেননা এক দিন মোগল-পাঠান ও তার পর ইংরেজও এদেশে আসিয়াছিল বহুর বশে। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখিতেছি এক দিকে বিদেশীর সাহায্যে উন্নয়নের আশার কীণ আলোক, অল্প দিকে নিরবচ্ছিন্ন দুর্দশা, তৎপরে অসহায়তা ও মাংসভার এবং সর্বশেষে অবশ্যস্বার্থী বিদেশীর দাসত্ব।

সর্বশেষে বিদেশীর দাসত্ব অবশ্যস্বার্থী বলিতেছি এই কারণে যে, একদিন এদেশের সমাজের এক উচ্চশিক্ষিত স্তর—যে স্তরকে এখন ‘বুর্জোয়া’ আখ্যা দেওয়া হইতেছে—ইংরেজের প্রশংসার পঞ্চমুখ হইয়াছিল এবং বর্তমান “বুনিয়াদি ঘরানা”—অর্থাৎ বমদী অভিজাতবর্গ—ইংরেজের দালালী করিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। বর্তমানে ঠিক সেই বুর্জোয়া স্তরেরই এক অংশ অল্প এক বিদেশী জাতির প্রশংসার পঞ্চমুখ এবং তাহাদের সাম্রাজ্যবাদ এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার দৃঢ় বিদেশী পতাকা লইয়া দালালী করিতেছেন। সুতরাং বিদেশীর সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা দুই দিকেই রহিয়াছে, এক দিকে কিছু কম, অল্প দিকে কিছু বেশী।

বিত্তীয়তঃ, আমরা দেখিয়াছি সম্পূর্ণ এদেশের টাকার যে সকল উন্নয়ন-কার্যের সূচনা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই বহু অযোগ্য লোক অধিকারী বা ছোট বড় ঠিকাদার বা সরবরাহকারী রূপে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার কারণ দেশের শাসনতন্ত্র ও ব্যবস্থাজ্ঞের উচ্চ অধিকারীবর্গের আত্মীয় ও চাটুকার পোষণের স্পৃহা এবং জাতিনীতি ও কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। এই ঘোষ শুধু কংগ্রেসের একচেটিয়া নহে বলা বাহুল্য, ইহা আমাদের জাতিগত দুর্বলতা। বিদেশী বিশেষজ্ঞের মধ্যে সেরূপ অযোগ্য লোকের নিয়োগ কিছু কম হওয়াই সম্ভব।

চুক্তি অনুযায়ী মূল পরিকল্পনার ছিল সমগ্র ভারতে ৩০০টি গ্রাম লইয়া এক একটি সামগ্রিক উন্নয়ন কেন্দ্র গঠিত হইবে এবং এইরূপ ৫০টি কেন্দ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হইবে। এখন শুনিতেছি, পশ্চিমবঙ্গে ঐরূপ ৮টি কেন্দ্র স্থাপিত হইবে কিন্তু সেগুলির প্রত্যেকটিতে ১০০টি গ্রামের স্থান থাকিবে।

উন্নয়নের সমস্তা নানারূপ, অন্তরায়ও বহু। কিন্তু প্রথম অন্তরায় হইবে আত্মীয়-চাটুকার ও দলীয়-পদাভিক ভোষণ ও পোষণ। বাস্তবায়ন জন্য প্রদত্ত অর্থ ও অর্থ যে ভাবে বাস্তব-দুহস্তে লুপ্তিতেছে, গ্রাম উন্নয়নের সমস্তাভারও লুপ্তিত হইবে সেইরূপই অযোগ্য লোকের দ্বারা এবং দলগত স্বার্থের ধ্বংস-কারীদের দ্বারা, যদি না প্রথম হইতেই তাহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়।

দ্বিতীয় সমস্তা অভিজাত্যের অভাব। পশ্চিমবঙ্গের সকল গ্রামাঞ্চলই প্রায় পঞ্চাশ বৎসর উপেক্ষিত ও অবহেলিত অবস্থায় আছে। উপরন্তু সেখানে কৃষিযোগ্য পতিত জমিও অল্প। সুতরাং জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ লাগব করা কঠিন সমস্তা। তবে কৃষ্টি-শিল্পের অবশিষ্ট এখনও সর্বত্রই অতি হীন অবস্থায় আছে। যদি সে সকলকে জাগ্রত ও সচল করা হয়, তবে সম্ভাব্য সংগঠনের সাহায্যে তাহাতে জনসংখ্যার এক বিশেষ অংশ নিয়োজিত ও উপার্জনক্ষম হইতে পারিবে। কিন্তু এই সম্ভাব্য সংগঠনে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পরিবেশের মধ্যে তাহা সহজে ও যথায়গ ভাবে

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সেই কারণে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সর্ব-প্রথমেই প্রয়োজন কৃষি, পশুপালন, দক্ষ শিল্পী ও কুটিরশিল্প সম্বন্ধে ভাব্য সংগ্রহ। আমরা জানি, ঐরূপ তথ্যের একান্ত অভাব রহিয়াছে, বাহা আছে তাহা প্রকৃত মতে, আনুমানিক এবং অনেক ক্ষেত্রে ভরানক ভ্রমপ্রদায়ক।

তৃতীয় ও সর্বপ্রধান সমস্যা জনসাধারণের উদাসীন্য ও কর্মবিমুখতা। দেশের অধিক নানা কারণে অলস ও অস-কাতর হইয়া পড়িয়াছে। উপরন্তু এক দল চতুর বল প্রকৃতির লোক উহাদের জমাগতই পরামর্শ দেয় কাজ না করিতে। অসমিযুৎ লোককে যদি কেহ বুঝাইয়া বলে যে, “আমি একজন শিক্ষিত মেতা, আমি বলছি তোরা এ কাজে হাত দিসনে, আমার কথা শোন আমি সরকারের বাড়ি ঘরে অন্য লোককে দিবে তোদের জন্যে এ কাজ করিয়ে দিচ্ছি”, তবে তাহার কি ফল হয় তাহা সহজেই বিবেচ্য। উক্ত কথাগুলি আমাদের কল্পিত নহে। যাহা আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি তাহাই অপেক্ষাকৃত মার্জিত ভাষায় লিখিলাম। ঐ শ্রেণীর সুপরামর্শ-দাতার কবল হইতে নিরঙ্কর গ্রামবাসীদিগকে উদ্ধার করাই এক প্রধান সমস্যা। ঐরূপ লোক এদেশের প্রত্যেক রাজ-নৈতিক দলে অজস্র রহিয়াছে।

সমস্যার কথা শুনে অনেক হইল, সমস্যা পূরণের কি আছে? সমস্যা পূরণ তখনই হইবে যখন এই উন্নয়নের পরিকল্পনা দলগত স্বার্থের বাহিরে রাইবে। যদি প্রাদেশিক সরকার কার্যতঃ দেখাইতে পারেন যে, এই কার্যে একমাত্র প্রাদেশিক গ্রাম্যকলের উন্নয়নই তাহার কাম্য তবেই দলমির্জিগোষে সকল সং এবং দেশের ও দেশের প্রগতিকামী লোকের সাহায্য ও সহায়তই সে পাইবে, নচেৎ নয়, এবং গ্রামের লোককে জাগ্রত ও উত্তর করিতে পারিবে শুধু ঐ প্রকৃতির লোক।

সেই কারণে এই উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল কার্যসূচীই সাধারণের গোচরে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেই কার্য কাহাদের হাতে অর্পিত হইতেছে তাহাও সেই ভাবে জানানো প্রয়োজন।

বঙ্গের ছোটখাট জলসেচ-পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ১৯৫১-৫২ সনে ছোটখাট জলসেচ-পরিকল্পনা অস্থায়ী কার্য-আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। এই পরিকল্পনা-সংখ্যা মোট ৮৬৪। বর্ধমান বৎসরে আরও ৫৭১টি ছোট ছোট পরিকল্পনা চালু হইবে। কোন্ কোন্ জেলায় আরও পরিকল্পনার সংখ্যা কত, একটি বিবৃতিতে তাহা ঐরূপ বলা হইয়াছে—বর্ধমান ২১৯, মেদিনীপুর ১৭৯, হুগলী ৮৬, বীরভূম ৮০, চব্বিশ-পরগণা ৭০, হাওড়া ৫০, জলপাইগুড়ি ৩৮, মালদহ ৫১, বাঁকুড়া ৪৩, মুর্শিদাবাদ ৩৮, নদীয়া ৫ ও পশ্চিম দিনাজপুর ৫। এই প্রকার জলসেচ ব্যবহার ২,৮২,৮৯৮

একর জমি জল পাইবে। যে সকল পরিকল্পনা এ বৎসর বিভিন্ন জেলায় চালু হইতে থাকি আছে তাহা এই—বাঁকুড়া ৮২, মালদহ ৫৮, হুগলী ৫০, হাওড়া ৪৯, বর্ধমান ৪৯, চব্বিশ-পরগণা ৩২, মুর্শিদাবাদ ২৫, বীরভূম ২০, দার্জিলিং ১২, জলপাইগুড়ি ৮ এবং নদীয়া ৩।

জলনিকাশের বিরাট পরিকল্পনা

কলিকাতা ও ইহার সম্মিষ্টবর্তী স্থানসমূহের জলনিকাশের জট পরিকল্পনা প্রণয়নকালে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সেই কমিটি সোনারপুর-আরাপাঁচ-ও-মাড়লার জলনিকাশের বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে কলিকাতা ও ইহার সম্মিষ্টবর্তী স্থানসমূহের জলনিকাশের ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিয়াছে।

সমগ্র পরিকল্পনাটির জট ১০৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। টালির মালা এবং সোনারপুর, বাকুইপুর ও ক্যানিং থানার মধ্যে বিভাবরী নদীর দক্ষিণাংশে ১০৫ বর্গমাইল অঞ্চল এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই অঞ্চলের মধ্যে ‘পিয়ালী’ নদীর পশ্চিমাংশের ৫৭ বর্গমাইল স্থানই সর্বাপেক্ষা বেশী কতিপাত অঞ্চল।

হুড়ি বৎসর আগে এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর স্থান ছিল। কিন্তু বিভাবরী নদী ক্রমশঃ শুক হইয়া যাওয়ার এবং পিয়ালী নদীর উপরের অংশ প্রোতহীন হইয়া পড়ার এই অঞ্চল সর্বদা জলপ্রাণিত থাকে।

এই পরিকল্পনার জট উক্ত অঞ্চলকে দুই ভাগ করা হইয়াছে। মোট ১০৫ বর্গমাইল অঞ্চলের মধ্যে ৩২.৫ বর্গ-মাইল উচ্চ বসতিযোগ্য স্থান আছে। কাজেই মোট ৭২.৫ বর্গমাইল স্থানই এই পরিকল্পনা হইতে উপকৃত হইবে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে ২৯,১০০ টন ধরিক ও রবিশজ উপর হইবে এবং ইহার আনুমানিক মূল্য হইবে ৭০ লক্ষ টাকা।

বর্ধমানে রাজ্য সরকারের পক্ষে অবিলম্বে এত টাকা দেওয়া সম্ভব না হওয়ার ফেলীর সরকারের নিকট অর্ধসাহায্য চাওয়া হয়। ফেলীর সরকার সীমাবদ্ধ পরিকল্পনার ভিত্তিতে ইহাতে সম্মত হইল এবং এই ১১ বৃহৎ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় ১০৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪৪ লক্ষ টাকা দিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই উদ্দেশ্যে ফেলীর সরকার ১১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। বাকী ৩০ লক্ষ টাকা ঋণরূপে দেওয়া হইবে। উক্ত ঋণ ১৫টি কিস্তিতে শোধ করিতে হইবে। ভারত-সরকারের পাঁচশালা পরিকল্পনার মধ্যে ইহাকে বরা হইয়াছে। কিন্তু বাকী ৬১ লক্ষ টাকার এখনও কোন সংস্থান হয় নাই।

এই সীমাবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে পিয়ালী নদীর পশ্চিমাংশের

আরপাঁচ অঞ্চলের ৫৭ বর্গমাইল জায়গা ছড়িরা বর্তমান কাজ শুরু হইবে। এই অঞ্চলটি কলিকাতার খুব নিকটবর্তী ও সর্বাপেক্ষা কতিপয় জায়গা।

এই সীমান্ত পরিকল্পনার একটি প্রধান ক্যানাল, কয়েকটি শাখা ক্যানাল খনন, চারিটি বেশী শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ‘পাল্পিং সেট’ প্রভৃতি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। সোনারপুরের জলাভূমির উত্তর ও সোনারপুর-ক্যানিং রেল লাইনের দক্ষিণদিকস্থ আলিপুরের জলাভূমি এই জলমিকাশ ব্যবহার গ্রহীতা রূপে কাজ করিবে। প্রধান ক্যানালটি উত্তরদিকের জলাভূমি হইতে রেলওয়ে লাইন পার হইয়া দক্ষিণ দিকের জলাভূমির সহিত সংযুক্ত হইবে এবং ‘উত্তরভাগ’ পাল্পিং শ্রেনের দিকে চলিয়া যাইবে, এই সন্দে কয়েকটি ছোট ছোট শাখা ক্যানালও ইহার সহিত পশ্চিমদে সংযুক্ত হইবে। উক্ত পরিকল্পনার আরও কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের গড়িয়া কেন্দ্র হইতে পাল্পিং শ্রেন পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তার স্থাপন করার এবং পিয়ালী নদীর বাঁকে উচ্চ ও দৃঢ় করার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাল্পিং সেট স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ হইবে। ইহার পর পরিকল্পনার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিবে।

বাঁপা

বাঁপার সব জী চাষ কলিকাতা ও তাহার বাহিরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রতি বৎসর শীতের সময় বহুল পরিমাণে ফুলকপি, বেগুন, লাউ, কুমড়া এই বাঁপাতেই উৎপন্ন হয়। বর্ষার সময়ও নানা প্রকার শাক, ভুট্টা ইত্যাদির চাষ হয়। বাতবিক কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত বাঁপা সব জী-চাষে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

বাঁপা বাস কর্পোরেশনের অধীন কলিকাতা শহরের আবর্জনা নিকাশের স্থান। বাগবাড়ারের সেন-পরিবারের ইহা একটা চাকরাণ ভূমি। বাঁপার মাঠের পরিমাণ প্রায় দুই বর্গ মাইল। পূর্বে বাগভল্লাহাট, উত্তরে ভাদর থানা, পশ্চিমে চ্যাংরা মৌজা, দক্ষিণে চৌবগা মৌজা বাঁপাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছে।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাঁটা, চাপামটে প্রভৃতি শাক বহুল পরিমাণে জন্মে। আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে ভুট্টা ও বিঙা উৎপন্ন হয়। শীতের সময় ফুলকপি, বেগুন, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির চাষ হয়। বাঁপার অধিকাংশ চাষী উড়িষ্যা, বিহার ও মেদিনীপুর হইতে আগত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় পনের শত।

কলিকাতা শহরের যে আবর্জনা বাঁপায় সংরক্ষিত হয়, তাহা প্রথম দুই ভিন্ন বৎসর সব জী-চাষের পক্ষে একান্ত

উপযোগী বলিয়া মনে হয়। ইহার পর আবর্জনার মধ্যে সারের অভিজ্ঞ থাকে না; তখন কৃত্রিম সার প্রয়োগ না করিয়া উপায় নাই। গত দুই বৎসর যাবৎ চাষীরা কৃষি বিভাগের নিকট হইতে প্রায় ১০০০ মণ এমোনিয়া কম্পোজট সংগ্রহ করিয়া শীতের ফসল প্রচুর পরিমাণে ফলাইয়াছে। বেধা গিয়াছে, প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ৬০০০ ফুলকপির চাষ করা হয়। সন্দে সন্দে বেগুন ও লাউ কুমড়ার গাছ লাগানো হয়। এ ছাড়া, মূলা ও পুঁই শাকের চাষ হয়। এই সকল সব জী-চাষের জন্য জলসেচেরও বড়ই প্রয়োজন। অনেক কৃষকই পাল্পিং মেশিনের সাহায্যে নিকটস্থ বিল হইতে জমিতে সেচ দিয়া থাকে। প্রত্যেক বিঘা জমিতে প্রায় ১৬ বার সেচ দিতে হয়।

বাঁপার মাঠে শা ওয়ালেস কোম্পানীর সারের কারখানা আছে। যত পশুর কফাল হইতে হাড়ের ত্বা প্রস্তুত হয় এই কারখানার। এ ছাড়া পশুর শিং ও ঘূর হইতে আঠা প্রস্তুত হয়। বাঁপার মাঠে পরিভ্রম্য ছিন্ন বস্ত্রও যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাহা কুড়াইয়া এক শ্রেণীর লোক জীবিকা নির্বাহ করে। ইহা ছাড়া পুরাতন মোহার টুকরা, তাগা কাচ, কয়লাও প্রচুর পরিমাণ বাঁপার মাঠ হইতে সংগৃহীত হয়। বাঁপায় পরিভ্রম্য আমের আঁঠি হইতে যে চারা জন্মায়, তাহা বহু কলমের ব্যবসায়ী নামমাত্র পারিশ্রমিকে সংগ্রহ করে।

বাঁপায় পশুখাতও যথেষ্ট জন্মে। কর্পোরেশনের ময়লা জল যে খাল দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার স্থানে স্থানে পলি পড়িয়া উঁচু হইয়া গিয়াছে। তথায় দল জাতীয় এক প্রকার বাস জন্মে। এই বাস কলিকাতার রঙানী করিয়া অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

বাঁপায় মৎস্য উৎপাদনও প্রচুর পরিমাণে হয়। মৎস্য উৎপাদনের জন্য যে সকল ‘ভেড়ি’ আছে তাহাদের পরিমাণ প্রায় ৮০০ বিঘা।

বাঁপায় চাষ করিয়া বহু চাষী উদ্যমের সংস্থান করিতেছে, তবুও বলিতে হয় তাহারা নিভান্ত দুঃখী। তাহারা যে সকল গৃহে থাকে সেগুলি অসহ্যকর। বস্তি জীবনের দুঃখ হইতে তাহারা রেহাই পায় নাই। পানীর জলের জন্য ব্যবস্থা নাই। শোরা যায়, প্রতি বিঘা জমির খাজানা ২৫০ হইতে ৫০০ টাকা। চাষীর পক্ষে খাজনা অত্যধিক স্বীকার করিতে হয়।

বাঁপায় এই উর্বর ভূমির বর্ণনা ‘খাত উৎপাদন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক ত্রিঅবনীমোহন গোপ, কৃষি সহকারী। অবনীবাঁবু বর্ণনার শেষ অঙ্কে কৃষক পরিবারের দুঃখের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই দুঃখবহা দূর করার কোন উপায় নির্দেশ করেন নাই। কেবল অত্যধিক খাজানাই এক মাত্র কারণ নয়। ভাড়া পাওয়ার অত্যাশ

একটা কারণ। সে পাপ কি রাষ্ট্র দূর করিতে পারে? রাজনা যথাযথ হওয়া উচিত সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজনা কমিলেই কি অর্থের সম্যবহার নিশ্চিত?

জয়নগর থানায় খাদ্যসঙ্কট

আমরা আজ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ “বঙ্গ” নামীয় একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পাইতেছি। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি প্রভুভববিদ্রী ত্রিকালিদাস দত্ত। জয়নগর-মজিলপুর গ্রামে অবস্থিত তাঁহার পুস্তকাগার ও বাহুবর দর্শনীয়।

গত ১১ই ও ১৮ই জ্যৈষ্ঠের পত্রিকায় ঐ অঞ্চলের খাদ্য-সঙ্কটের আলোচনা আছে ও তাহা সমাধানের উপায়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৮ই আষাঢ়ের পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে সমাধানের একটি সন্ধান দেওয়া হইয়াছে:

“জয়নগর থানার খাদ্যসঙ্কটের কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। সরকারী তরফ থেকে বাটতি এলাকা ধোষণা না করা হলেও এই অঞ্চলের দুর্গত অধিবাসিগণের যে সাহায্যের প্রয়োজন প্রকারান্তরে তা স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিম-বাংলার খাদ্য-মন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ঐনিশাপতি মারি এক বিষয়টিতে বলেছেন যে, বান চালের অবস্থা খুব খারাপ না হলেও অধিকাংশ লোকের কেনার ক্ষমতা অসম্ভব রকমে কমে গেছে কিন্তু তিনি বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, সরকারের হাতে যথেষ্ট চাল না থাকায়, সরকারী সাহায্যের পরিমাণ অভ্যস্ত হতে বাধ্য। তবে সরকারীভাবে অল্পসঙ্কটের কালে কোন জায়গা থেকে মজুত বান চাল পাওয়া গেলে তা সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফত সেই এলাকার দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করা হবে।

একথা খুবই সত্য যে, জনসাধারণের কেনার ক্ষমতা অসম্ভব রকমে কমে গেছে। তবে মারি মশাইয়ের মতে ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করার কাজে অনেকের আয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। আর শাক-সব্জী চালান দেওয়া বন্ধ করা গেলেই খাদ্যের অভাব অনেকটা মিটিবে।

কিন্তু মারি মশাই নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন যে, এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই ক্ষেতমজুর যাদের এক পরসাদে সংস্থান নেই। এই সব সহায়-সম্পাদহীন লোকের পক্ষে ব্যাপকভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করার কাজে লেগে যাওয়া কল্পনা করা সম্ভব হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তা মোটেই কার্যকরী হতে পারে না। তবে সরকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলে যদিও বানিকটা সম্ভব হয়, তাও সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করে তুলতে অনেক সময় লাগতে বাধ্য। সুতরাং এখনই সাধারণের আর বাড়ানোর কোন ব্যবস্থাই এ থেকে হতে পারে না; এবং অদূর ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না।

শাক-সব্জী চালান দেওয়া বন্ধ করলে স্থানীয় বাজারে

তাদের ভীড় অসম্ভব কমে যাবে। একেই ত লোকের কেনার ক্ষমতা কমে গেছে, এত জিনিষ তখন কিভাবে কে? চালান দিলে যদিও বিক্রি করে কিছু লাভ করার সম্ভাবনা থাকে, চালান বন্ধ করলে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। তবে অমনি দিলে যারা পাবে তাদের কিছু সুবিধা হতে পারে বটে; কিন্তু খাদ্যসমতা সমাধান হবে না নিশ্চয়ই।

মারি মশাই আরও মজির দেখিয়ে বলেছেন যে, কর্ডন প্রধার কড়াকড়ি করার কালে অনেক জায়গার চালের দর ১৭/২০ টাকার বেশী উঠতে পারে নি। এই প্রধার যতই কড়াকড়ি করা যাক না কেন, বাটতি এলাকা থেকে সরকারী প্রয়োজনে চাল কেনা চলতে থাকলে চালের দাম ত কমতেই পারে না বরং বাড়তে বাধ্য। অতএব কর্ডন প্রধার কড়াকড়ি নয়—একে উন্মীয়ে নিয়ে আংশিক রেশন প্রথা চালু করা একান্ত দরকার। কিন্তু আংশিক রেশন মানে এ নয় যে, “এ” এবং “বি” পাবে আর “সি” পাবে না। কোনও “এ”, “বি”, “সি” ভাগভাগি না করে সকল শ্রেণীর লোককেই চাল, আটা রেশনের মারফত বিলি করতে হবে।”

মুর্শিদাবাদে খাদ্যশস্যের অবস্থা

মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ত্রিভিংশেচন্দ্র তালুকদার জেলার সংবাদপত্রগুলির সম্পাদক ও শহরের সংবাদদাতাদের খাস-কামরার এক সাংবাদিক সম্মেলনে আস্থান করেন এবং জেলার খাদ্যসমতা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

জেলার অভাবগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে, বিশেষ করিয়া কান্দী মহকুমার বিভিন্ন ইউনিয়নে, আংশিক রেশনিং ব্যবস্থার গম ও চাউল দেওয়ার ব্যবস্থার কথা জেলা-শাসক উল্লেখ করেন। জেলার খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে সকল প্রকার সুবিধা-অসুবিধার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, গত ১৯৫০-৫১ সনে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ২,২৫,০০০ মণ বান্য ও চাউল সংগ্রহ করা হয়, তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুর্শিদাবাদ জেলার মোট ৬ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য প্রেরণ করেন। কিন্তু বর্তমান ১৯৫১-৫২ সনে মুর্শিদাবাদ জেলায় এ পর্যন্ত মাত্র ৪০,০০০ মণ বান্য ও চাউল সংগৃহীত হইয়াছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ দোর দিয়া বলেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলার সংগৃহীত বান্য ও চাউল হইতে জেলা-কর্তৃপক্ষ এক মণ খাদ্যশস্য এই দুই বৎসর জেলার বাহিরে প্রেরণ করেন নাই। কান্দী মহকুমার গত বৎসর অর্ধেক বান্য ফসল পাওয়ার কালে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ভাল হয় নাই। তজ্জাত তিনি জেলার খাদ্যভাব দূরীকরণার্থে সকল প্রকার চেষ্টার ক্রটি করিতেছেন না।

প্রাদেশিক সরকার এই জেলার জন্য প্রচুর পরিমাণে গম বরাদ্দ করিয়াছেন এবং বর্তমানে এই জেলার বিভিন্ন সরকারী উদ্যমে প্রায় দুই লক্ষ মণ গম আছে। জেলাবাসী মরদা

বাইতে অভ্যাস করিলে খাদ্য-সঙ্কট অনায়াসেই দূরীভূত করা যায়।

গ্রামাঞ্চলের লোক গম লইতে রাজি না হওয়ার সাংবাদিকদের তরফ হইতে বলা হয় যে, গ্রামাঞ্চলে গম ভাড়াইয়া মরদা করার ব্যবস্থা সহজ না হওয়ার জন্য গ্রাম-বাসীরা গম লইতে চায় না। সরকার হইতে গম ভাড়াইয়া মরদা করিয়া তাহা আংশিক রেশনিং প্রণালী দিলে গ্রামবাসী-দের মধ্যে গম বাণিজ্য চালু করা সহজ হইবে। তাহা হাড়া সরকারী গম ও বাজারের গমের দরের কথাও উল্লেখ করা হয়। জেলা-শাসক বলেন যে, বাজারের গমের দরের উঠা-নামা আছে, কিন্তু সরকারী গমের দর সারা বৎসরেই এক থাকে। তথাপি তিনি গমের দর কমানো সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

বর্তমান বৎসরে বাগড়ী অঞ্চলে আউস ধান্য ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকায় কর্তৃপক্ষ আউস প্রকিওরমেন্ট স্বত্ব চিন্তা করিতেছেন। এইভাবে যদি অন্ততঃ ১০,০০০ মণ আউস ধান্য সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে জেলার ধান্যের মজুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এ বাবৎ কান্দী অঞ্চলের আমন ধান্য বাগড়ী অঞ্চলকে বাঁচাইয়াছে, বর্তমান বৎসরে বাগড়ী অঞ্চলের আউস ধান্য কান্দী অঞ্চলকে বাহাতে রক্ষা করে, সে বিষয়ে সকলের সহযোগিতা করা কর্তব্য। সরকার মনস্থ করিয়াছেন যে, ধান্য হইতে যে পরিমাণ আউস ধান্য সংগৃহীত হইবে, তার তিন ভাগের এক ভাগ সেই ধান্যর জন্যই বরাদ্দ করা হইবে। মুন্সিবাবাদ জেলার ধান্য-সমগ্র সমাধানের জন্য তিনি জেলাবাসীর সর্ববিধ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। সমালোচনা ও আন্দোলন অপেক্ষা সহযোগিতার ভিত্তিতেই সঙ্কট মোচনের ব্যবস্থা সহজ হয়।

সড়ল জেলার—মাত্র ১৪টি জেলার অবস্থা জানিলে বাদ্যের অনটন বলিয়া যে হৈ-চৈ উঠিয়াছে তাহা বন্ধ হইতে পারে। বাদ্যশস্ত্রের অনটন যত বলিয়া সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তাহা সত্য নয়। আমাদের কুটির একটু অদল-বদল করিলে ধান্য সম্বন্ধে এত ভাবিতে হইবে না।

এখন গড় বিশ্বযুদ্ধ হইতে বাদ্যের প্রায় সকল দেশের মর-নারীকে বিজ্ঞাত করিতেছে। রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ তাহাতে ইতন যোগাইতেছেন এবং বড় বড় পরিকল্পনা করিয়া নাগরিককে বৈধ্য বরিতে উপদেশ দিতেছেন।

হরিণঘাটার বাড়ীঘর

“লোকসেবক” পত্রিকার ১৯শে আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীঅন্নদা-প্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার কিয়দংশ আমরা তুলিয়া দিলাম :

“হরিণঘাটার বাড়ীঘর, কান্দা-কাহ্নই এমন যে, সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে উহাকে পরিহার করিতে চাহে। উহার কটকে

মাথা গলাইতে ভরসা পায় না।” সিমেন্ট করা পাকা গো-শালা, দুর্গার জড় পাকা বাড়ী, স্ট্রটকী ঘাছ ইত্যাদিতে মিশাইয়া দুর্গার আড়ম্বরপূর্ণ বাড়-ব্যবস্থা প্রভৃতি দেখিয়া সাধারণ মানুষ উৎসাহ বা প্রেরণা পাইবে কিরূপে, ইহাই তিনি প্রশ্ন করিয়া-ছেন।

এইরূপ ব্যবস্থার ব্যবহার দ্বারা প্রকৃত উন্নতি কখনই সম্ভব মনে। ২৫.৩০ বিঘা জমির উপর মাটির ঘর প্রস্তুত করিয়া চতুর্দিকে মাটির দেওয়ালযুক্ত গোশালা ও দুর্গা পালনের ব্যবস্থা করিয়া অধিক পরিমাণে ছব, ডিম উৎপন্ন করিতে পারিলে তাহাই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ও অহুসরণের উপযোগী হইত।

“চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য এই-রূপ : “কিন্তু কৃষিমতা আর কৃটনীতিই বাহাদের সম্বল, তাঁহারা এই সহজ সরল গ্রামীণ পন্থা গ্রহণ করিবেন কিরূপে ? প্রকৃত জনকল্যাণ-রাষ্ট্রে সরকার এবং সরকারী কর্মচারীগণ জনসেবক মাত্র—তাই জনসাধারণ তাঁহাদের বহুরূপেই সর্বি-ক্ষেত্রে গ্রহণ করে। আর, এতদেখে আশঙ্ক সরকারী কর্মচারী-দের বাহ্যিক আড়ম্বর হেতু গ্রামবাসী তাঁহাদের দেখিয়া ভয়ে বা সন্দেহে পলাইতেই চাহে। এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার আবহু পরিবর্তনের মতোই যে দেশের কল্যাণের বীজ-নিহিত আছে, তাহা কি সরকার বুঝিবেন ?”

এই মন্তব্যের মধ্যে মৌলিকতা কিছু নাই। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—তিনি যখন অধঃগতিব ছিলেন তার পূর্বে হরিণঘাটার পরিকল্পনায় লাট কেলি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পরে সেখানকার কাজ বন্ধ হয় নাই। ত্রিপ্রকুলচক্র ঘোষের মন্ত্রীমণ্ডলী তাহা করিতে পারেন নাই। সেই অকৃত-কার্যতার জন্ত চৌধুরী মহাশয় যত দায়ী সরকার মহাশয় তার বেশী নয়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্বন্ধে বলিতে চাই—কৃষিমতার প্রশ্ন বর্তমান যুগে অবান্তর। রোটারি মুদ্রামত্রে পত্রিকা ছাপানও কৃষিম। পূর্বের দিনের সহজ, সরল জীবনে ফিরিয়া বাইতে হইলে “লোকসেবক” পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে হইতে হইবে কঁধক। চৌধুরী মহাশয়কে বিধান-সভায় বাইতে হইবে পারে হাঁটরা বা গরুর গাড়ীতে। অনিলবরণ রায় বা মঞ্জী-ভুষণ সিংহের মত তিনি কোণীমবস্ত্র হইতেও পারেন নাই।

শর্করাজাতীয় খাতের গুণাগুণ

“জাম-বিজাম” মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য উপরোক্ত শিরোনামের একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :

“শর্করাজাতীয় খাত—মিহরি, চিনি ও শুদ্ধ এই তিন-প্রকার খাতের নামের মধ্যে একমাত্র শুদ্ধ কথাটি আমাদের

মিষ্ণু। গৌড় দেশক (বাংলাদেশের পূর্ব নাম) গৌড় হইতে শুদ্ধ কণাটির উৎপত্তি।

“আধি গুড়ে সুকোচ ও সুকটোলের (mono saccharides) পরিমাণের আধিক্য হেতু ইহা অজ্ঞাত শুদ্ধ অপেক্ষা দ্রুত ও সহজপাচ্য। ফস্ফরাস এবং ভাতের পরিমাণও আধি গুড়ে অধিক। প্রতি এক শত গ্রাম আধি গুড়ে ৭৫ মিঃগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৩৮ মিঃগ্রাম ফস্ফরাস, ১১ মিঃগ্রাম লৌহ, ৫৬ মিঃগ্রাম ভাত ও অজ্ঞাত বাতব পদার্থ রহিত। তাই পরিমাণ অধিক থাকে হেতু আধি গুড় রক্তশূন্যতা রোগে অধিক প্রযোজ্য। কারণ ভাত সহযোগে লৌহ এই রোগে বেশী কার্যকরী। উপরন্তু বাতপ্রাণ বি ১ ও বি ২ যাহা পাণ্ডুরা যায় তাহা প্রায় সমস্ত প্রকার গুড়েই থাকা সম্ভব।

“বর্তমানে কতক রাষ্ট্রো নাটিকেল গুড় প্রস্তুত করিয়া অভ্যাবতক ডাবের ফলন নষ্ট করা হইতেছে। ইহা ঠিক নহে। কারণ ডাবের ফলের বিশিষ্ট গুণাগুণ পরিলক্ষিত হয়। প্রতি ১০০ সি, সি, ডাবের ফলে প্রায় ৩ মিঃগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১৩০ মিঃগ্রাম ক্লোরিন, ৭ মিঃগ্রাম ফস্ফরাস ও ১৫০ মিঃগ্রাম পটাসিয়াম পাওয়া যায়। প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট ব্যতীত ইহাতে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং বি ১ ও বি ২ বাত-প্রাণ রহিত।”

আমাদের খাড়ে শুদ্ধ ও পানীয়ে ডাবের জল পূর্বে খুবই প্রচলিত ছিল। লোকের রুচি বদলাইয়াছে, সুতরাং ঐ দুই-ই এখন প্রায় অচল। সেই সঙ্গে শরীরের অবস্থাও কাহিল।

“প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যে চিনি প্রস্তুত হইত তাহা দুই প্রকার ছিল—বগু: এবং শর্করা। শ্বেতবর্ণ বাগুফাকার বগুকেই উৎকৃষ্ট শর্করা বা সিভা বলা হইত। “বগুস্ত সিকতা-রূপ: সুশ্বেত: শর্করা সিভা।” বগু: যাহা আয়ুর্কেন্দ-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে তাহা বাগুগুড় বা ভূরা।

“বগুস্ত মধুরো রসো চক্ষুষ্যো বৎসরো হিম:।

বাতপিভহর: স্নিগ্ধো বল্যো বাস্তিহর: পর।”

বগু (ভূরা)—শুক্রবর্জক, চক্ষুর হিতকারক, শরীরের উপচায়ক, শীতবীর্ষ্য, বায়ু ও পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, বলকারক এবং বমননাশক।

অনুরূপভাবে উক্ত শাস্ত্রে চিনি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

“সিভা স্নেহব্যা কচ্যা বাতপিভাশ্রনাহরো।

বৃছাচ্ছদ্বিষ্মান হস্তি স্নেহীতা শুক্রকারিণী।”

সিভা—অতিশয় মধুরস, রুচিকারক, শীতবীর্ষ্য, শুক্রবর্জক এবং ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, বৃহা, বমি এবং জ্বরনাশক। ঔষধি শাস্ত্রে, ঔষধি গুণবর্ধক প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে মিষ্ণুর বিশেষ গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সিন্তোপলাদি, চন্দ্রবিবট এবং অজ্ঞাত বহু গুণসম্পন্ন ঔষধ প্রায় অর্ধ পরিমাণ দ্বিভুতি সহযোগে লেবনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। উপরন্তু ছে-

পিণ্ডের ধুকধুকি, অভ্যাবিক ক্লান্তিবোধ, শুষ্ক কক্ষ, উদর-পীড়া, চক্ষু-কণ্ড প্রভৃতি নির্দিষ্ট পীড়ার মিষ্ণুর আমরিক প্রয়োগবিধি বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। সিন্তোপলা—সারক, লঘু, শীতবীর্ষ্য এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

“সিন্তোপলা সরালদী বাতপিভহরী হিমা।”

আসাম রেল লিঙ্কে দ্রুততর রেল চলাচল

“১৪০ মাইল দীর্ঘ আসাম রেল লিঙ্ক পথে বর্তমানে দ্রুত-গতিতে রেল চলাচল আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে যোগাযোগকারী এই পথটিকে ক্রমে ক্রমে সহনশীল করে তোলার ফলেই মালবাহী এবং যাত্রীবাহী গাড়ীগুলি এখন দ্রুতগতিতে চলাচল করতে সক্ষম হচ্ছে।

“এই গুরুত্বপূর্ণ পথে যখন প্রথমে যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচল আরম্ভ হয় তখন ঘণ্টায় মাত্র ১৫ মাইল বেগে গাড়ীগুলি চলতে পারত, কারণ লাইন এবং পথ ভবনময় শক্ত ও মজবুত হয়নি। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে যে পথ গাড়ীতে ৩১ ঘণ্টার অভিক্রম হওয়ার কথা তাহা তখন অনেক বেশী সময়ে অতিক্রান্ত হত। ট্রেন বর্তমানে ঐ পথ মাত্র ২২ ঘণ্টার অভিক্রম করে। এখন গাড়ীগুলি ঐ রাস্তা ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে অতিক্রম করে। পথের আরও উন্নতি হলে গাড়ী তখন ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে চলতে পারবে বলে আশা করা যায়।

“আসাম রেল লিঙ্ক পথে প্রথম মাল চলাচল আরম্ভ হয় ১৯৪৯ সনের ৯ই ডিসেম্বর। প্রথম কয়েক মাস কাঁটহার এবং শিলিগুড়ির মধ্যে ১২০ মাইল পথ অভিক্রম করতে মাল-গাড়ীর ২০ ঘণ্টা সময় লাগত। বর্তমানে মাত্র ১১ ঘণ্টার মালগাড়ী ঐ পথ অভিক্রম করে।

“তখন ঐ পথে মালগাড়ীর সংখ্যাও খুব কম ছিল। বর্তমানে ঐ পথে ২০০ মালগাড়ী চলাচল করে। রেল-কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঐ পথে ৪০০ মালগাড়ী চালান সম্ভব হবে।

“বর্তমানে উত্তর-পূর্ব রেলের অন্তর্গত আসাম রেলপথ কেবলমাত্র পাট এবং চা’ই বহন করে না, উপরন্তু আলু, আমরাস, কমলা লেবু এবং রাতা নির্মাণের ভাট পাথরও বহন করে।

“পাট চালান ব্যাপারেই অসুবিধার সৃষ্টি হয় বেশী। রেল-কর্তৃপক্ষ বলেন যে, পুনরায় পাট উঠবার পূর্বেই একবারের পাট তাঁরা বিদেশে পাঠাতে সক্ষম হন, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে রপ্তানী দ্রুততর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

“পাট সাধারণতঃ মধ্যম লোকের মারকত উপকারকের দিকট হতে ফেলা হয়। সে প্রধানতঃ জীত পাট মজুত করে রাখে এবং পাটের দান যখন বেশ বেড়ে যায় তখন কলকাতার

পাটিয়ে দেয়। হুজুরাং-কলকাতা-বাঙ্গারের পরিবর্তন অহুসারেই পাটের জুত মালগাড়ীর চাহিদা বাড়তে কমে। পাট বহন-করবার জুত দৈনিক ১০০ হতে ২৫০০ মালগাড়ীর প্রয়োজন হয়। রেল-কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, আগামী ৬ মাসের মধ্যেই আসাম হতে পাট বহন করে আশা সম্ভব হবে।

“১৪০ মাইলের অধিক দীর্ঘ এই যোগস্বজ্ঞ চারিটি পৃথক পৃথক যোগস্বজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত এবং ইহাদিগকে পূর্বে হতে অবস্থিত মিটার গেজ লাইনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ইহার যথাক্রমে কিশগঞ্জ হতে শিলিগুড়ি (৬৬ মাইল), শিলিগুড়ি হতে বাগদাকোট (২২ মাইল), মাদারিহাট হতে হাসিয়ারা (৮ মাইল) এবং আলিপুরহাট হতে কতিরা গ্রাম (৪৫ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

“এই যোগস্বজ্ঞের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় ১৯৪৮ সনের ২৮শে জানুয়ারী এবং নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৪৯ সনে।

“আসামের রেলপথ ভারতের সুন্দর সুন্দর স্থানের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। এই সকল পথের মধ্যে আছে চা-বাগান, ঘন বনের বন, নারিকেল, সুপারি এবং কলার ক্ষেত। এই অঞ্চল ঘন বসতিপূর্ণ কিন্তু গ্রামিকের সংখ্যা খুবই কম। আসাম রেল লিকে ছোট ও বড় অনেক সেতু আছে।

“এই যোগাযোগ স্বজ্ঞ নির্মাণ করতে ৮ কোটি টাকার অধিক ব্যয় হয়েছে।

“রেলওয়ে ষ্টেশন, যাজিগণের অপেক্ষা-করবার ঘর এবং কর্মীদের জুত কলোনির নির্মাণ কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। এই নতুন রেল-কলোনিতে আধুনিক-ধরণের জলসরবরাহ যন্ত্র এবং নতুন জলনির্গমন প্রণালী থাকবে।”

“যোগাযোগ” পত্রিকার উপরোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর বন্যার ঐ যোগস্বজ্ঞ ছিন্ন হওয়ার সংবাদ আসিয়াছে। এইরূপে বন্যা ও ভূমিকম্পের অধীন থাকিলে ঐ রেলওয়ের কার্যকরী-কমতা ব্যাহত হইতে বাধ্য। ইহার কি কোনও প্রতিকার নাই?

উদ্বাস্তু কাহারো?

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য “সংগঠন” পত্রিকার চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যায় নিম্নোক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন :

“মাহারা আকস্মিক উৎপাতের ফলে বাসস্থান হারাইয়া অতঃকালিয়া যার তাহার প্রকৃত উদ্বাস্তু। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ হইতে আগত এই শ্রেণীর লোক বহুসংখ্যক বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত উদ্বাস্তু সংখ্যা কত তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তি মাত্রই উদ্বাস্তু হইতে পারে না। মাহারা যুক্ত অবস্থায় পুরুষাত্মকে হই বঙ্গের বাস করিত এবং আজ দেশ ভেদের পর পশ্চিমবঙ্গেই রহিয়া গেল, তাহার উদ্বাস্তু কি

না? মাহারা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হইয়াও যুক্তবঙ্গের উপার্জনে থাকার একাকী বা সপরিবার পশ্চিমবঙ্গে বাস করিত এবং মাহাদের জীবনযাত্রা যেমন পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ব্যক্তির উপার্জনেই চলিত তেমনই আত্মও চলিতেছে তাহার উদ্বাস্তু কি না? আর মাহারা দেশের শান্ত অবস্থায় পরিবার পূর্ববঙ্গে রাখিয়া বিদেশে অর্ধাঙ্গন করিত এবং অবসরমত দেশে যাইত, কিন্তু বিদেশলব্ধ অর্থই পরিবার প্রতিপালন করিত, তাহার বর্তমানে সেইভাবেই অর্ধাঙ্গন করিতেছে এবং পরিবারবর্গকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করিয়া প্রতিপালন করিতেছে তাহার উদ্বাস্তু কি না? এই প্রশ্নেরও সূক্ষ্মমাংসা মাহুষের সমাজে, বিশেষতঃ এদেশের আত্মপ্রদায়ণ মাহুষের সমাজে, মাহারা কেমন করিয়া নিজের মাহা পাইবার মন ভাড়াও অতিরিক্ত মাহার পাইতে চান, তাহাদের মধ্যে কোন দিনই সম্ভাবনা নাই, তথাপি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব কম মাহুষকে পাইতেই হইবে। অতএব উদ্বাস্তু সত্ত্ববুদ্ধির উপর সবটুকু ছাড়িয়া না দিয়া এই দেশের জনসাধারণ যদি এই উদ্বাস্তু সংজ্ঞা নির্ধারণে সচেষ্ট হয় তাহা হইলে কাজ অনেকটা হইবে বলিয়া মনে হয়।”

উক্ত প্রশ্ন মাহুষের সহজ বুদ্ধির উপরে ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। কারণ তাহা প্রায়ই অসম্ভব। সেইজন্য আইনের প্রয়োজন।

এই সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে বহুবার লিখিয়াছি। আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী শুধু নয়, পূর্ববঙ্গের অসংখ্য সংলোকও ভাব্যকণিত উদ্বাস্তু কার্যকলাপে বিভ্রত ও বিরক্ত। তাই “সংগঠন” পত্রিকার এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে। দেশের জনসাধারণ সচেতন হইলে উহার পূরণ হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবিষয়ে অর্থ চালিয়াছেন অল্প, কিন্তু তাহার অপব্যয়ই হইয়াছে প্রায় সর্বক্ষেত্রে। বাস্তবস্থ-ভাষণ, ছুরাচার সরকারী কর্মচারীর অনাচারের সমর্থন, মারীমেধে উৎসাহী পশুদিগের কার্যে বাধা না দেওয়া—এসবই হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম অধিকারী মহাশয়ের বুদ্ধি-বিশেষতার অভাবে। জুয়াচুরীর পথ যেমন সবদিকে সরল করা হইতেছে সেইভাবে এখানেও কাজ চলিতেছে।

প্রকৃত বাস্তবতার হৃদয়-সীমা নাই। তাহার সহায়ক কেহ নাই। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া দলগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, এমন কি পাশববৃত্তির পরিতৃপ্তি, সবই হইতেছে।

রাশিয়ার ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত

গত ২৫শে আষাঢ় তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের সেক্রেটারী ব্রী কে. পি. এল. মেঘম, আই-সি-এল, সোভিয়েট রাশিয়ার ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বর্তমানে ছুটী-লইয়া ব্রিটেনে

রহিয়াছেন। তিনি জুলাই মাসের শেষভাগে দিল্লীতে তাঁহার নিজ পদে প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম-ভাগে তাঁহার নূতন কার্যভার গ্রহণের জন্ত মক্কা যাত্রা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ক্রীমেনন ১৯২২ সালে ভারতীয় লিবিগ সার্ভিসে প্রবেশ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি ভারত-সরকারের পররাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগে যোগদান করেন। ঐ বিভাগে তিনিই প্রথম ভারতীয় অফিসার নিযুক্ত হন। ঐ বিভাগের চাকুরিতে অবস্থানকালে হায়দরাবাদ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেঙ্গলস্থানে বিভিন্ন পদে কাজ করেন। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি সিংহলে ভারত-সরকারের এজেন্ট ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারত-সরকারের প্রতিনিধি-রূপে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে জাঞ্জিবার, কেমিয়া ও উগাণ্ডা গমন করেন। পরে তিনি ভারত-সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের এবং বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগের সহকারী কর্মসচিব নিযুক্ত হন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ক্রীমেনন রাজপুতানায় ভরতপুর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং পশ্চিম রাজপুতানা রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক এজেন্টরূপে কাজ করেন। ১৯৪৩ সালে আগষ্ট মাসে তিনি চীনে ভারত-সরকারের এজেন্ট-জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে সান-ফ্রানসিস্কো সম্মেলনে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধি-মণ্ডলীর তিনি প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন এবং ১৯৪৬ সালে বিশ্বরাষ্ট্র সন্মেলন সাধারণ পরিষদে অষ্টম ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ক্রীমেনন চীনে প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর তিনি কোরিয়া সম্পর্কে বিশ্বরাষ্ট্র সন্মেলনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৬ই এপ্রিল হইতে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মসচিবের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি 'দিল্লী-চুংকিং ডায়ারি' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

এইরূপ সম্মানসন্মিত আমরা সাধারণতঃ সমর্থন করি না। বেসরকারী রাজনীতিবিদেরা কি কেবল রাজ্যসমূহের গবর্নর-রূপে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা সঙ্কলের পর নৈবেদ্যের মাধার বাতাসার মত বিরাজ করিবেন? কে. পি. এস. মেমনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কোন কিছু বলিবার নাই, তাঁহার যোগ্যতা আছে অঙ্গ দিকে। আমরা নীতির কথা বলিতেছি।

মার্কসীয় মতবাদ

মাহুষ বা তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাগিদ্র সজবদ্ধ সমাজ-সংগঠনের একমাত্র নিয়ামক, ইহাই বর্তমান যুগের ষ্টালিনপন্থী কম্যুনিষ্টদের প্রচারের মূলমন্ত্র। কিন্তু কাল মার্কসের নিয়ন্ত্রিত উক্তি তাহা সমর্থন করে না:

“মাহুষ নিজের ইতিহাসের নির্মাতা, কিন্তু তারা একে যেমন খুশী তেমন করে—নির্মাণ করিতে পারে

না; তাদের নিজেদের দ্বারা নির্মীচিত পারিবেশিক অবস্থার মধ্যে নয়, পরন্তু অতীতের কাছ থেকে পাওয়া, প্রদত্ত, এবং সংক্রমিত (transmitted) পারিবেশিক অবস্থার অধীনে তাহারা ইহাকে তৈয়ারী করে। সমস্ত যুগ ‘পুরুষের’ (generations) ঐতিহ্য জীবিত ‘পুরুষের’ মস্তিষ্কে ‘নিশি’র (nightmare) মত চেপে থাকে এবং ঠিক যখন লোকেরা নিজেদের এবং (অভ্যন্তরীণ) ব্যাপারের আবুল পরিবর্তনের কাছে সম্পূর্ণ নৃত্যম কিছু স্থিতি করার কাছে ব্যাপ্ত বলে যেন হয়, বৈপ্লবিক সঙ্কটের সেই সব যুগেই তারা তাদের কাছে সাগ্রহে অতীতের ভূতগুলিকে ডেকে আনে এবং বিশ্ব ইতিহাসের নূতন দৃষ্টিকে এই বহুকাল সম্মানিত ছদ্মবেশে এবং এই ধার-করা ভাষায় উপস্থাপিত করবার জন্য তাদের কাছ থেকে নাম, সংগ্রাম-ধ্বনি (slogans) এবং পরিচ্ছদ ধার করে।” (Eighteenth Brumaire).

গ্রাম্য জাগরণ ও কম্যুনিষ্ট

গত ১৫ই চৈত্র তারিখের ‘হরিভূম’ (বাংলা) পত্রিকায় আচার্য বিনোবা ভাবের তেলেদাশ পরিচয়কার মিল্লিপিভিত্তি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার লেখক ক্রীমামোদর দাস মুখোপাধ্যায়:

বিনোবা শ্রোতাদের শহর স্রব্দে সাবধান হইতে বলিলেন এবং পাছে ঐ সকল চতুর লোক তাঁহাকেও কাজে লাগায় সেই ভয়ে তিনি ভীত ছিলেন। কম্যুনিষ্টরা সেখানে থাকার দরুন যদিও মাঝে মাঝে গ্রাম্য জাগরণ ভুল পথে পরিচালিত হইতেছে ভাব্যি এইরূপ গ্রাম্য জাগরণ সকলের পক্ষে মঙ্গল-জনক। কম্যুনিষ্টদের উপস্থিতি জাগরণের সূচনা করিতেছে কিন্তু যে পন্থা তাহারা গ্রহণ করিয়াছে তাহা কঠিন। জাগ্রত কিন্তু ভুল পথে পরিচালিত এই সকল ভাইকে ঠিক পথে আমন্ত্রণ করা তাহাদের সংস্থার জ্ঞানী লোকদের কর্তব্য।

প্রাণনা-সত্য কোরাণের যে পদটি গীত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া বিনোবা এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার অর্থ—“ভগবান তুমি আমাদের ঠিক পথে পরিচালিত কর।” কোরাণের “ঠিকপথ” হইতে কম্যুনিষ্টদের পথ ভিন্ন। যাহা হউক, লোকেরা জাগ্রত হইয়াছে, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও ঘুমাইয়া নাই দেখিয়া তিনি খুশী হইয়াছেন। কারণ লোকেরা জাগ্রত হইলে তাহাদের ঠিক পথ দেখাইতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না।

গ্রাম্য জাগরণ ভগবানের ইচ্ছার একটি প্রকাশ; শহর ইহা লক্ষ্য করিয়া সং উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহার সহিত নিজেদের ঠিকরূপ মানাইয়া লইবে। বিনোবা বলিলেন যে, শহর গ্রামের পরিপ্রায়ের ফল প্রচার লাভ করিয়াছে। এখন তাহাদের গ্রামকে কিছু কিরাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। ভগবান এখন ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত

অশিক্ষিত সকলকে প্রেমের গ্রন্থের দ্বারা একত্রে গাঁথিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই কার্যে বিনোবা তাঁহার হস্তের একটি যন্তু যাহা। তিনিই এই কার্য সম্পাদনের জন্য বিনোবাকে এই ভূমিদান যজ্ঞের পথ দেখাইয়াছেন। যদি শহরের লোকেরা ইহার জন্য তাহাদের দান দেয় তবে কমুনিষ্টরা সস্ত্র পলারন করিবে এবং প্রেমের জয় হইবে। একটি অমিশ্র দোষ বৈশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। কমুনিষ্টদের প্রভুত্ব বর্জিত হইতেছে ইহার কারণ তাহাদের মধ্যেও কিছু মন্দল নিহিত আছে। গরীবদের উন্নতি সাধন করিবার শুভ ইচ্ছা তাহাদের আছে। তাহাদের নিকট হইতে লোকের এই শিক্ষা লওয়া উচিত। যদি একবার তাহারা ইহা করিত তবে কমুনিষ্টরা এই কার্যে বিরত হইত।

বর্তমান অসমতা যাহা সমাজকে কড়কগুলি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছে তাহা হইতে শ্রোতাদের বিরত থাকিবার আদেশ দিয়া বিনোবা বলিলেন যে, ভল যেমন সর্বজন সমতা রক্ষা করে সেইরূপ সমাজকেও সর্বজন সমতা রক্ষা করিতে হইবে। ইহা গর্ভকেও তাহার সমতাকে নষ্ট করিতে দিবে না। সমাজেরও সেইরূপ দেওয়া উচিত নহে। কবীর বলিয়াছেন, “ভল যখন নৌকার অথবা অর্থ যখন গৃহে জমা হয় তখন দুই হাত দিয়া তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করাই বুঝিমানের কাজ।” নৌকাকে ভাসমান রাখিতে ও চালাইতে নীচে ও আশেপাশে জলের প্রয়োজন, কিন্তু ভিতরে নহে। একজনকে বাড়ী সম্বন্ধেও ইহা সত্য। আমাদের অর্থের প্রয়োজন আছে কিন্তু বাড়ীর বাহিরে অর্থ সমাজের জন্য ইহার প্রয়োজন।

তাঁহার ভাষণের শেষে বিনোবা কমুনিষ্টদের এই বলিয়া সাবধান করিলেন যে, যদি তাহারা হিংসার আশ্রয় লয় তবে তারতম্য বৈশী দিনের জন্য তাহা সহ্য করিবে না। কারণ তাহার স্বভাবের কাছে হিংসার মোহ অপরিচিত। তিনি বলিলেন যে, তিনি নিজেই গরীবদের একজন প্রতিনিধি বলিয়া মনে করেন। তিনি তেলেন্দানায় আসিয়াছেন এবং লোকদের দুঃখ দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের প্রেমের পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছেন এবং লোকেরা তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেছে। কমুনিষ্টদেরও শিক্ষা লওয়া উচিত এবং কাজের জন্য তাহাকে অনুসরণ করা উচিত। তাহারা যদি এইরূপ করিত তবে তাহাদের কাজ ফলপ্রসূ হইত এবং ভারতের সর্বজন তাহা জড়াইয়া পড়িত এই আশা তিনি তাহাদের দিতে পারেন।

এই ভাষণের পর ছাত্রদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য একজন তাঁহাকে একটি চিরকুট পাঠাইল। বিনোবা বলিলেন, ছাত্রদের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাহারা সমাজের নিকট হইতে শিক্ষার দান পায়। সুতরাং তাহারা অবশ্য সমাজের জন্য কাজ করিবে এবং ঐ পদাশ্রয় করিবে।

প্রশ্ন ও উত্তর

দেবেরকোণার বজুরা ও দর্শকরা বিনোবার সহিত যাহা আলোচনা করিয়াছিল তাহা হইতে কড়কগুলি প্রধান প্রধান প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে দেওয়া হইল—

আইনের স্থান

প্রশ্ন : জমি সমতা সমাধানের জন্য কেন আপনি প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কথা উত্থাপন করেন না ?

উত্তর : আমি আইনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আইনে জনসাধারণের মত থাকা দরকার। অস্পষ্টতার পক্ষে জনসাধারণের মত থাকায় ইহার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা অনাধ্য হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আইন সর্বজন কাজ করিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। দৃষ্টান্তরূপ বলি যাহা যে, জাতিভেদ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ আইন দ্বারা বন্ধ করা যায় না।

কমুনিষ্টদের লক্ষ্য

প্রশ্ন : অর্থনৈতিক কারণ হইতে এখানে কমুনিষ্টদের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল কারণ দূর করিলে আপনা হইতে এই আন্দোলন বন্ধ হইবে। এই ব্যাপারে কেবলমাত্র বক্তৃতা কি সাহায্য করিতে পারে ?

উত্তর : আমি তোমাদের মত সমর্থন করি না। আমি বিশ্বাস করি না যে, ভারতের কমুনিষ্টরা লোকদের দারিদ্র্যে অভিভূত। সরকারের ধ্বংস সাধনই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি শত্রু পুড়িয়া যায় তবে তাহারা অত্যন্ত খ্রীত হয়, কারণ ইহাতে তাহারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইবার আরও একটি অস্ত্রোপায় পায়। যদি লোকদের সেবা করিবার ইচ্ছা তাহাদের থাকিত তবে তাহারা অন্যান্য অসংখ্য কার্যক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইতে পারিত। তেলেন্দানায় লোকেরা অধিক পরিমাণে দেশী মদ্য “সিদ্ধি”তে আসক্ত, এই কু-অভ্যাস দূর করিবার জন্য তাহারা কি কিছু করিতেছে ? আমি তাহাদের ভালরূপে চিনি। তাহারা এই স্থানে মাত্র আবদ্ধ নাই, ভারতের সর্বজন তাহারা জড়াইয়া আছে। আমার বন্ধুদের মধ্যে আমি অনেককে কমুনিষ্ট বলি। তাহাদের প্রধান লক্ষ্য রাজনীতি এবং তাহার পরের লক্ষ্য অর্থনীতি। তাহাদের আন্দোলনের সমস্ত গাঁথুনি রাজনীতির ভিত্তিতে দণ্ডায়মান। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর তাহারা অর্থনৈতিক কাঠামোকে ঠিক করিতে চায়।

মিশর ও সুদানের বাদশাহ

গত ২৯শে কার্তিক মিশরের রাজা বা নবাব ফারুক উপরোক্ত উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঘোষণার মূল্য সাত ঘণ্টার মধ্যেও নিরুপিত হইল না।

এই ঘোষণার পরের দিন প্যারিস নগরীতে মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শালেহ-উদ্দীন পাশা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে

গভাভূগতিকতা হাজা কিছু নাই। তবিস্যভের মজির হিসাবে তাহা উল্লভ করিলাম :

“জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিশরের পররাষ্ট্র সচিব শালেহ-উদ্দীন পাশা বলেন যে, সুদানে অব্যবস্থাপিত এহণ সম্ভবপর করিয়া ভোলায় জন্ত ব্রিটেনকে সুদান হইতে অফিসার ও সৈন্যদল অপসারণ করিতে হইবে।

সুদান হইতে ব্রিটিশ সৈন্য ও অফিসারদের অপসারণ করা হইলে মিশরও তথা হইতে স্বীয় সৈন্যদল ও অফিসারদের অপসারণ করিবে। অতঃপর জাতিসংঘের সহযোগিতায় গণ-ভোট গ্রহণের দ্বারা সুদানবাসীকে অবশেষে মত প্রকাশের সুযোগ দান করিতে হইবে।

ব্রিটেন এই ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে সাহসী হইবে না।

তিনি এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, মিজ্রাব সম্পর্ক বন্ধার থাকার সময়ে ব্রিটিশ প্রকৃতপক্ষে মিশরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ব্রিটেন সুরেজ খাল এলাকা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়াছে। তথায় সামরিক আইন জারি করিয়াছে এবং এই এলাকাকে কার্যতঃ দেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।”

মিশরের ভিতরের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটা অভ্যবস্বেবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। “মুসলিম ব্রাদারহুড” যে “মুক্তি ফৌজের” নেতৃত্ব করিতেছে তাহাদের সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপে মিশরের গবর্নেন্টও বিরক্ত বোধ করিতেছেন। ২৯শে কার্তিক আলেকজান্দ্রিয়ার বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়ক “জেনারেল” আলি-জল-মুয়ত্তাব গবর্নেন্টের এই ফৌজের মিয়গ্রন-ভার গ্রহণ করিবার ঘোষণায় তিনি বিরক্ত প্রকাশ করিয়া এই মন্তব্য করেন—

“সরকারের এই নীতির তাৎপর্য আমি বুঝিতে পারি না। যে ব্রিটিশ সৈন্যদল বেআইনী ভাবে আমাদের দেশকে দখল করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের বিভাভিত্ত করাই মুক্তি ফৌজের উদ্দেশ্য, সরকার কি তাহাদের কার্যকলাপ দমন করিতে চাহেন ?

জাতীয় মুক্তির জন্ত গণ-আন্দোলনের পরিচালন ভার জন-সাধারণের উপরই আতিয়া দিতে হইবে। জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত ‘গেরিলা’ সংগ্রামের দ্বারাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, আয়ারল্যান্ড এবং সম্প্রতি ফ্রান্স আত্মাধীন লাভ করিয়াছে। সরকার যে সময়ে সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা করিতে থাকিবেন, সেই সময়ে জন-সাধারণকে রক্তবিন্দু বিসর্জন করিয়া আত্মাধীন সংগ্রামে কর্তব্য পালনের সুযোগ দান করা উচিত।

কোন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিষয়ট সম্পর্কে সরকার পুনর্বিবেচনা করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন। কারণ সরকারের উক্ত মন্তব্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।”

মিশরের সমস্তাইয়া পাকিস্থানেরও দুই হয় না। সেই জন্ত পাকিস্থানের রাজধানী করাচী নগরীতে মিশরীয় দূত আব্দুল ওয়াহাব আজম বে ২৪শে কার্তিক নিয়মিত বিয়তি প্রদান করেন। পাকিস্থান সম্পাদক-পরিষদের “পার্টচক্রে” বক্তৃতা প্রদান উপলক্ষে এই মন্তব্যগুলি করা হয় :

সুরেজ খাল বিরোধ হইতে মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লবের সূচনা হইতে পারে। পাকিস্থান শক্তিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী অভি-সন্ধির বিরুদ্ধে মোসলেম জাহান মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। মিশর এক্ষণে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য চুক্তি করিতেছে।

মিশরের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মিশর সরকার সাধারণকে জনগণকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইংরেজদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ফলে পরিস্থিতি ক্রমেই খোরালো হইয়া উঠিতেছে।

মিশরের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, মিশরীয়রা সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন কামনা করে। ব্রিটেন যে মিশর হইতে বিভাভিত্ত হইবে এবং সুদান যে মিশরের সহিত মিলিত হইবে, ইহা এক্ষণে অবশ্যম্ভাব্য।

রুশ সমর্থন সম্পর্কে তিনি বলেন, গত মহাসময়ের আমেরিকা ও রাশিয়া দুই দিক হইতে যেমন করিয়া জার্মানীকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ দুইটি বিভিন্ন শিবিরও তাহাদের সাধারণ শত্রুকে আঘাতের পর আঘাত হামিতেছে। রাশিয়া মিশরের জীবনধারা গ্রহণ করে নাই, মিশরীয়রাও রাশিয়ার জীবনধারা গ্রহণে সম্মত হয় নাই। মিশরীয়রা তাদের জীবনধারা সম্পর্কে ঈর্ষবোধ করে। তথাপি মিশর কম্যুনিষ্ট বনিয়া যািতে পারে।

সুদান মীল উপত্যকা একত্রীকরণের পক্ষে ভোট প্রদান করিবে। সুদানীরা মিশর ও সুদানের এক্য কামনা করে। সেই ভোট-মুহুৎ এখনও দূরে আছে।

মালয় উপদ্বীপ

এই উপদ্বীপের আকার একধামি খণ্ডের মতন। ১৯৪১ সনের পর তাহা ব্রিটিশের হাত হইতে জাপানীদের হাতে যায়—তার পর জাপানের পরাজয়ের পরে ব্রিটিশের হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তদবধি সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ, কম্যুনিজম বনাম জাতীয়তাবাদ, চীনা বনাম মালয়ী মালয়ী বনাম ভারতবাসী—এই চতুষ্প্রস্তর রণাঙ্গন হইয়াছে।

লোকসংখ্যার হিসাবে মালয়ীদের সংখ্যা ২৫ লক্ষ, চীনাতে সংখ্যা ২৫ লক্ষ, ভারতীয়দের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ইউরোপীয়ান ৩০ হাজার ও ইউরেশিয়ান ২০ হাজার। এই হিসাবে ১৯৪৫ সনের। গত ৭ বৎসরে চীনা, মালয়ী, ভারতীয়

বালীর সংখ্যা বাড়িয়াছে; অশান্তি ও অরাজকতার জন্য শেখোক্ত দুই শ্রেণীর সংখ্যা কমেিয়াছে।

এগমও হেইক নামক একজন লেখক বলিতেছেন, যে নুতন মালয় প্রান্ত হইতেছে তাহা এই চারি জাতির সমন্বয়ে গঠিত। উটিবে। এ আশা সার্থক হইবে কি না সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। চীনা ও ভারতীয়েরা সহজে কাহারও সঙ্গে মিশিয়া যায় না। ভারতীয়দের জাতিভেদ এক কারণ; চীনা-দের পারিবারিক ও গোষ্ঠীর বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। তার উপরে বর্তমানে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে যে চীন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তার ফলে চীনাদের যেন বন্ধন আরও দৃঢ় হইবে। মালয় উপদ্বীপের ৩০ লক্ষ আদিম অধিবাসী এই অবস্থা বোধ দিম সহ্য করিবে না। সুতরাং ইংরেজের রবার বাগান, টিনের খনির কর্তৃত্ব ক্রমশঃই তাহাদের আয়ত্তে চলিয়া যাইবে। তখন এগমও হেইকের “ধর্মরাজ্য” স্থাপিত হইবে। তৎপূর্বে কি আর এক ছোট কুরুক্ষেত্রের সূচনা দেখা যাইতেছে না?

জাকিরুল্লা খাঁকে বরখাস্তের দাবী

গত ২৪শে আষাঢ় রাজিতে অল্পাধিক প্রায় ২৫ হাজার লোকের এক জনসভায় পাকিস্থানের পররাষ্ট্রসচিব মহম্মদ জাকিরুল্লা খাঁর “বরখাস্ত” এবং কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে একটি “পৃথক অসুসলমান সংখ্যালব্ধি” সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণার দাবি করা হয়।

পূর্ব পাকিস্থান জমাইং-উল-উলমার সভাপতি মৌলানা আবদুল হামিদ বদাউনী সহ কয়েক জন উলেমা এই সভায় বক্তৃতা করেন। অত্যন্ত সকলের সহিত পাকিস্থান পঞ্জাবের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মামদোভের খানও এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

কাদিয়ানি সম্প্রদায় একটি ছোট মুসলিম সম্প্রদায় এবং পাকিস্থানের পররাষ্ট্রসচিব মহম্মদ জাকিরুল্লা খাঁ এই সম্প্রদায়েরই লোক। সম্প্রতি কাদিয়ানিদের বার্ষিক সম্মেলনে পাক-পররাষ্ট্রসচিবের বক্তৃতায় সময় করাচীতে কাদিয়ানি ও অকাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছিল। মৌলানা আবদুল হামিদ বদাউনী সাহেব বাঙালী নন, তবুও তিনি পূর্ববঙ্গের আলেম সম্প্রদায়ের নেতা। উপরোক্ত প্রস্তাবে ইসলামের “সাম্যবাদের” ভণ্ড ফুটি হইয়া গিয়াছে।

শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য-সংসদ

শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য-সংসদের চতুর্দশ বার্ষিকী উপলক্ষে নামরা এই প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন জানাইতেছি। এই সাহিত্য-সংসদে, তের বৎসর পূর্বে দরিদ্রতার পরিবেশের মধ্যে জনাব রুল হক সাহেব তাঁহার জন্মভূমিক সাহিত্য-রসিককে লইয়া গিয়াছেন সাহিত্য সাধনার ত্রস্তী হন। তিনি রাজনৈতিক দলকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া সংসদের পুস্তকাগারটি

সংগঠিত ও ‘আল ইস-সাহ’ নামক মাসিক সাহিত্য-পত্রিকাখানি ধীরে ধীরে সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিতে থাকেন এবং বিভিন্ন সময়ে এই সংসদের সাহিত্যসাধনালয় কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। স্বর্গগত কবি রজ্জাকের ‘পথ-সন্ধানী’, ‘জীবন গানের নাইয়া’ প্রভৃতি উহাদের অঙ্কন। এই পুস্তকাগারটি এ অঞ্চলের অত্যন্ত প্রধান পুস্তকাগারের গৌরব দাবি করিতে পারে। “আল ইস-সাহ” এখনও চলিতেছে। ইহার সম্পাদক শ্রীহট্ট মুনাযগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক আফজার আলী।

সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খাঁ

এই মহাপুরুষ আজ পাঁচ বৎসর হইতে পাকিস্থানের শাসকবর্গ দ্বারা নানাভাবে লাঞ্চিত হইতেছেন। দুই-তিন মাস পূর্বে কারাবাসের অভ্যাচারে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। এখনও বিপদ কাটে নাই। ভারতের প্রধান-মন্ত্রী পূর্বের সহকর্মীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া পাকিস্থানীদের শ্রীতি অর্জম করেন নাই এবং ভারতব্যাগী “খোদাই খেদমৎ” দিবস বা সপ্তাহ পালন করিয়া ব্যাপার আরও জটিল করা হইতেছে।

ভারতরাষ্ট্রের কর্তব্য কি তৎসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। পাকিস্থানের সঙ্গে কখনও যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইবে, সেই তরনাজমশঃ স্তিমিত হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ভারতরাষ্ট্রের আইন বিভাগীয় মন্ত্রী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষক শ্রীচরণচন্দ্র বিশ্বাস গত ৫ই আষাঢ় যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাও আশাশ্রম নয়। পাকিস্থান কখনও তাহার চুক্তি পালন করিবে না—ইহাই তাঁহার বক্তৃতার মর্মার্থ। এই বাগবিত্ততার শেষ আমরা দেখিতে পাইব না।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্তা মিঃ উইলিয়ম বার্টন তাঁহার “নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার” নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, গফুর খাঁর অহিংসাবাদ তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি গান্ধীজীর নিকট হইতে ধার করেন নাই। কোরাণের নির্দেশ তাঁহাকে এই বিধানে উপনীত হইতে সাহায্য করিয়াছে। শ্রীমুকুমার রায় প্রণীত “সীমান্ত গান্ধী ও খোদাই খেদমৎগার আন্দোলনের ইতিহাসে” এই উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে :

অহিংসাবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পিছনে পাঠান সনাজের প্রয়োজনের একটা তাগিদ ছিল। বংশাধিকারিক যুদ্ধ, পরস্পরের মধ্যে পুনঃপুনি দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। কত পরিবার ইহার ফলে ধ্বংস হইয়াছিল তাহার হিসাব নাই। এই দোষের সুযোগ বিদেশী শাসকবর্গ পূর্ণভাবে লইয়াছেন। পাঠানের বীরত্বের প্রশংসায় তাঁহারা পঞ্চযুগ ছিলেন এবং “বাসাদার” প্রভৃতি কর্মে নিরোপে তাহারা পাঠানদের একাংশকে হাত করিয়াছিলেন। বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকা এতদ্বারা ব্যয় হইত। এখন পাঠানদের দমন করিবার জন্য পাকিস্থান সরকারও রীতিমত সৈন্যবাহিনী পুষিতেছেন।

ইংরেজের নীতি ভাঙ্গার পালন করিতেছে। ব্রিটিশ জেনারেল অফিসেল ও এলি ব্যক্তি ব্যবসারে বা কার্পেট প্রস্তুতের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। ক্রাইভের সময়ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা করিত। তারপর বণিকের মানদণ্ড রাখিতেও পরিণত হইল।

বোম্বাইয়ে বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসালয়

“বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসার জন্যে বোম্বাই নগরীর হাজি আলি পার্কে একটি সুন্দর হাসপাতাল আছে। পোলিও-মাইলিটস, অণ্ডিমাইলিটস, সাময়িক পক্ষাঘাত অথবা অন্তর্ভুক্ত যক্ষ্মারোগে যে সব শিশু ভুগছে, যে সব শিশু জন্মগত বিকলাঙ্গ কিংবা কোনও রকম দুর্ব্বলতার ফলে যাদের অঙ্গ হানি ঘটেছে এই রকম শিশুরোগীদের জন্যেই এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিশু চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররাই এই হাসপাতালের রোগীদের পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করে থাকেন। বিজ্ঞানসম্মত শরীর-মর্দন-প্রক্রিয়া এই জাতীয় রোগ নিরাময়ে বিশেষ সহায়ক বলে এই প্রক্রিয়ার বিশেষজ্ঞ লোকদেরও রাখা হয়েছে হাসপাতালে; এঁরা যুদ্ধের সময়ে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন। হাসপাতালে একটি সুসজ্জিত অস্ত্রাগার আছে এবং হাসপাতালে নিযুক্ত ডাক্তার ও নার্সদের থাকবার ব্যবস্থাও হয়েছে সংলগ্ন আর একটি বাড়িতে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই জাতীয় শিশুরোগের চিকিৎসার যে রকম ব্যবস্থাদি দেখতে পাওয়া যায়, সে সবই এই হাসপাতালটিতে আছে। বিকলাঙ্গ শিশুদের ব্যবহারের জন্যে যে সব যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়ে থাকে সে সবই তৈরি করা হয় স্থানীয় কারিগরদের দ্বারা এবং তুলনায় সেগুলি কোনও দেশের থেকে মিস্ত্রি নয়। বিকলাঙ্গ শিশুদের আধুনিকতম চিকিৎসাপদ্ধতি অর্থাৎ জল-চিকিৎসা, আলো-চিকিৎসা, অঙ্গমর্দন এবং নানারকম পদ্ধতিতে শরীর সকালম ইত্যাদি সবই এখানে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

শরীরের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মনের দিকে লক্ষ্য রাখাও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার একটি অঙ্গ। এই হাসপাতালটিতে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সুন্দর সুন্দর রঙীন ছবি আর চার্ট দিয়ে লজ্জান একটি স্থলবর এখানে আছে এবং সুশিক্ষিত শিক্ষকও একজন সেখানে আছেন। মাঝে মাঝে শিশুরোগীদের জন্যে পার্টি, সিনেমা-শো এবং এখানে-সেখানে বেড়ানর ব্যবস্থাও করা হয়, যাতে মনমরা না হয়ে আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিশুরোগীরা সহজে সেয়ে উঠতে পারে।

এই হাসপাতালে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই চিকিৎসার জন্যে গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক: দুঃস্থ ও দধ্যাবিতদের শিশুদের জন্যে স্থাপিত হলেও বন্দীদের সন্তানদেরও এখানে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। অভিভাবকের স্খতি অনুযায়ীই শিশুদের চিকিৎসার খরচ দিতে হয়।

বোম্বাইয়ের এই বিকলাঙ্গ শিশু চিকিৎসালয় ও হাসপাতালটির প্রতিষ্ঠাত্রী হলেন মিসেস ক্রুডেনা ইসমাইল। সমাজ সেবিকারূপে বোম্বাই এবং অন্যত্রও তাঁর প্রসিদ্ধি যথেষ্ট। বোম্বাই শহরেই তাঁর জন্ম এবং সেখানে শিক্ষালভের পর তিনি ভিয়েনাতে যান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

বিকলাঙ্গ শিশু বা ব্যক্তি যে কোন রাষ্ট্রের পরিচালক পর্যন্ত হতে পারেন, তার প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের কল্যাণে এরূপ আরোগ্য সহজ হইয়া পড়িয়াছে। সকল দেশেই এরূপ চিকিৎসার আয়োজন আছে এবং তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।”

নারী-চক্রের প্রতিষ্ঠা দিবস-উৎসব

ইটালী নারী-চক্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বালিকা বিদ্যালয়ে জীভায়াশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি মনোজ্ঞ অধিবেশন হয়। নারী-চক্রের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া রেভারেন্ড দাস একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ক্যাপ্টেন নরেন দত্তের সহধর্ম্মিণীর উদ্বোধনে অঙ্গ কয়জন মহিলাকে লইয়া এই সমিতিটি প্রথম স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহার কার্যক্ষেত্র ইটালী ছাড়াইয়াও বিস্তৃত হইয়াছে। মহিলাদের শিল্পকার্যে শিক্ষা দেওয়া, পড়াশুনার সাহায্য করা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক চর্চা করার কাজে সমিতি লিপ্ত আছে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে নারীদের এই অগ্রগতির প্রশংসা করিয়াও অতীতকে না ভুলিবার পরামর্শই দেন। আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রদূতদের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতিও প্রভা পোষণ করিতে—রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতিতেই পাঠ করিতে অগ্রয়োণ জ্ঞান।

আজ পল্লীগ্রামে পর্যন্ত নারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিস্তৃত হইয়াছে। তাহাদের প্রয়োজন আছে বলিয়াই যুগের ভাগিদে এগুলি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই ভাগরণের পিছনে কয়েকজন বাঙালী নারীর সক্রিয় যোগ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর কথা নাই তুলিলাম। বিংশশতাব্দীর প্রথম দশক হইতে উচ্চ শিক্ষার রাজ্যে সুরলা রায় (মিসেস পি. কে. রায়) যাহা করিয়াছেন “গোবর্দন মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ” তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার সহোদরা অবলা বসু (আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী) ও সরোজনিনী দত্তের নাম শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য।

এইরূপ প্রচেষ্টার সাক্ষ্য আমরা কামনা করি।

সমাজ-সংস্কার

“বাকুড়া ভিলি সমাজ উন্নয়ন সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমহা-দেব দে এক পক্ষে জানাচ্ছেন, বাকুড়া মেদিনীপুর ভিলি সমাজের যুগ্মপাঠাগল গত চৈত্র মাসে এক সত্য মিলিত হয়ে তাঁদের সমাজের পণ-প্রণা সমূলে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত করেন।

অন্যদৃষ্টান্তে এই অঞ্চলের তিলি সমাজে যে সমস্ত বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হয়েছে, কোথাও কেহই বরণণ গ্রহণ করেন নাই। বিবাহগুলিতে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই ৫০০ টাকার মধ্যে সর্ববিধ ব্যয় নিষ্পন্ন হয়েছে। তিলি সমাজের এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য আমরা এই সমাজের যুগপাত্তদের অভিন্নমন জানাচ্ছি। হিন্দু সমাজে পণপ্রথা যে অবস্থায় বৃষ্টি করেছে তাতে পণপ্রথা সমূলে উচ্ছেদ করা না হলে হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো অদূর ভবিষ্যতেই ভেঙ্গে পড়বে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের তিলি সমাজ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, হিন্দু জাতির অন্যান্য সমাজগুলির পক্ষে তা অমূল্যকরীয়। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক সমাজের যুগপাত্তপণ চেষ্টা করলে নিজ নিজ সমাজের ভিতর অনায়াসে পণপ্রথা উচ্ছেদ করতে পারেন।”

বাঁকুড়ার “হিন্দুবাণী” পত্রিকার ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার উপরোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা উচিত। পণপ্রথাই হিন্দু সমাজদেহে একমাত্র কলুষ ময়। শত শত শ্রেণীতে বিভক্ত হিন্দু সমাজকে সংহত করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে চেষ্টা চলিতেছে। তাহা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই।

নিরক্ষর শিক্ষা

গত অগ্রহায়ণ মাসের “শিক্ষা” (মাসিক) পত্রিকার জীবীরেক্সমাধ গুহ উপরোক্ত শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের শিরোনাম কি বাংলা ব্যাকরণসম্মত? প্রবন্ধ-লেখক আক্ষরিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব অর্পণ করেন নাই; করিয়াছেন আচরণ শিক্ষার উপর।

এই শিক্ষা দান কে করিবেন? “এ ত ঘরের ব্যাপার। শিক্ষক ত আক্ষরিক শিক্ষার বণিক। এ কাজ জননী, গৃহকর্তার।”

“মায়েরা যেমন সন্তানের প্রসূতি, মায়েরা তেমন সমাজেরও বাজী। সমাজের ভালমন্দ রূপ দেওয়া তাহাদের হাতে। শাবকের হানিভয়ে শক্তিশি সিংহিনী যেমন শাবক রক্ষাকল্পে ব্যাকুল হয়, হিংস্রমূর্তি ধারণ করে, প্রয়োজন হইলে গৃহকর্তার বিরুদ্ধে গৃহকর্তাকে সন্তান ও সমাজের হিতকল্পে সিংহিনীর মত উগ্রমূর্তি ধারণ করিতে হইবে। মাতারা যদি এই দিকে মন দেন, এই দায় বহন করেন, তবে দেখিতে দেখিতে তাহাদের সন্তানেরা শতে সহস্রে অনক্ষর শিক্ষার জন্ম শিক্ষক-রূপে পথে-বাটে বিচরণ করিবেন আর অচিরে জাতি ক্রটিমুক্ত হইয়া জগতের কাছে সম্মানলাভ করিবে। এই মহান দায় ও গৌরব মাতাদেরই।”

চিত্তার দৈন্য

গত ১৭ই আষাঢ় তারিখের “বঙ্গবাণী” (আসামগোল) পত্রিকার আমাদের সমাজ-জীবনে চিত্তার দৈন্য সম্বন্ধে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে:

“আমাদিগের জীবনে দৈন্য আজ নামা দিকে। চিত্তার দৈন্যের জন্য কেহ কেহ উহাকেই দায়ী করেন। পেট পুরিয়া

বাইতে পরিতে পাই না, চিন্তা আসিবে কোথা হইতে? কণাটা হয়ত আংশিক সত্য হইতে পারে। কিন্তু তেঁতুল পাতার কোল বাওরা বাংলার রামনাথকে দেখিয়া একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুতি হয় না। উনবিংশ শতক চিত্তার দিক দিয়া বাংলার স্বর্ণযুগ। বাংলার বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাবীর-গণ এই যুগেই জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু “রূপার খিলক” যুগে করিয়া আসিয়াছিলেন কর জন? কথা উহা মনে; এই চিত্তার দৈন্যও হইতেছে আমাদের চারিদিক অধঃপতনের আর একটি দিক। আজ আমরা অত্যন্ত বহিষ্কৃত; অন্তর্হী হইয়া ছই দণ্ড অসংবদ্ধ প্রণালীতে চিন্তা করিব এমন শক্তি এবং বৈর্যও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, সভাসমিতি, প্রোগান এবং সংবাদপত্র সকল সময়েই আমাদের দিককে বাহিরে টানিতেছে। তাহারাই রেডিমড (Ready made) চিন্তা ও সিদ্ধান্ত (Conclusion) আমাদের সন্মুখে ধরিতেছে। আমরা নির্দিষ্টারে তাহাই গ্রহণ করিতেছি। ফলে গভীরভাবে চিন্তা করা আমাদের অধ্যাত্মের বাহিরে দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থা সম্বন্ধে পরিহার করিতে হইবে। মহিলে দেশের যুবশক্তির নিকট বড় কিছু আমরা প্রত্যাশা করিতে পারিব না।”

উপরোক্ত বাক্যগুলি সত্য। কিন্তু চিত্তার দৈন্য আমাদের এখনও একেবারে দেউলিয়া করিতে পারে নাই। “আমরা নিরাশ না হইবার দৃঢ় পণ করিলাম”—ইহাই বাংলা ভাষা ভারতের জপমন্ত্র হওয়া উচিত।

উড়িষ্যার বাহ পরিচয়

উড়িষ্যা গবর্নমেন্ট প্রচার বিভাগ ‘নব-কলেবর অরঙ্গী’ ও উড়িষ্যা পরিচিতি’ নামক একখানি ৪৫ পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। পুরীষাজী এক জন বহুর নিকট তাহা পাইয়াছি।

উড়িষ্যার আয়তন ৫৯,৩১৮ বর্গমাইল। পশ্চিমবঙ্গের বিত্ত; লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬৮ হাজার (১৯৪১ আদমশুমারী)। পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের কিস্বদিক। শহরের সংখ্যা মাত্র ৩০টি। রাজধানী কটক জেলার লোকসংখ্যা ২৪ লক্ষ ৪৯ হাজার। পুরী জেলার লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার। বালেশ্বর জেলার ১১ লক্ষ ১৬ হাজার; সিমলাপুর জেলার ১২ লক্ষ ২৫ হাজার; গঙ্গাম জেলার (হুগলুর) ১৫ লক্ষ ৬১ হাজার; কোরাপুট জেলার ১১ লক্ষ ২৮ হাজার; ময়ূরভঞ্জ ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার। ২৩ পৃষ্ঠা হইতে ৩৩ পৃষ্ঠার উড়িষ্যার “প্রাচীন” গৌরবের বিবরণ আছে। ২৭ পৃষ্ঠার একটি ভর্কের বিষয় দেওয়া হইয়াছে। “রাজা প্রতাপ-রুদ্র ও তাহার স্ত্রী মল্লী রামানন্দ বার উড়িষ্যার বৈকুণ্ঠ বর্ষকে শ্রেষ্ঠবর্ষে পরিণত করেন, এবং এই গুরুপতি রাজাদের সুপ্রতিষ্ঠিত উৎকল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেন।” “সুদক্ষ মল্লী” কি সুখিয়া ও ভাবিয়া এই বর্ষের প্রাচীন স্থাপন করিয়া জাতীয় ধ্বংসের পথ সুপ্রশস্ত করিয়াছিলেন জানি না।

শাহজাদা দারাগু কো

ডক্টর শ্রীকালিকারজন কানুনগো

ভাড়া-বিরোধের পূর্বভাস

চতুর্থ অধ্যায়*

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮শে মে। আগ্রা দুর্গের পাদচুম্বিনী ক্ষৌণতোয়া যমুনার প্রাণন্ত বালুকা-সৈকতে নগরীর উৎস্রক জনতার বিপুল সমাবেশ ও অশ্রুট উল্লাসগুঞ্জন। অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং সম্রাট শাহজাহান কুমার দারা, শুজা, আওরঙ্গজেব, কচ্ছবাহপতি মীর্জা রাজা জয়সিংহ প্রমুখ সেনানীমণ্ডল পরিবেষ্টিত হইয়া দুর্গপ্রাচীরের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। দলিল না থাকিলেও অল্পমান হয়, বাদশাহের অল্প পন্থিতিতে অন্তঃপুরচারিণীগণ অবগুণ্ঠনাবৃত্তা হইয়া অন্তরালে ছিলেন না; শাহীমহলের পূর্ব দিকের অলিন্দ হইতে মর্মর জালমার্গ-বিচ্ছুরিত কান্তা-মুখশ্রী নিয়ন্ত্ৰ রঙ্গভূমিকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

যথাসময়ে চলমান পর্বতসদৃশ স্বধাকর এবং স্বরতন্তুদের নামক হস্তিগুণল শাহী দর্শনব্যরোকার নীচে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিছুক্ষণ শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি করিয়া মত্ত মাতঙ্গধ্ব কিঞ্চিৎ পিছনে হটিয়া গেল, জনসমুদ্র চঞ্চল তরঙ্গায়িত, সর্বত্র প্রবল উত্তেজনা। অজাতশত্রু কুমার আওরঙ্গজেব যুদ্ধের দ্বিতীয় দফা ভাল করিয়া দেখিবার জন্ত ঘোড়া দাবাইয়া স্বধাকর হাতীর খুব নিকটে আসিলেন। ক্রোধাক্ত স্বধাকর স্বরতন্তুদেরকে সামনে না পাইয়া শাহজাদার উপর হামলা করিল, চারিদিকে হাং হাং পড়িয়া গেল। দোরগোল চীংকার ও আতসবাজীর আশ্রয় উপেক্ষা করিয়া স্বধাকর আওরঙ্গজেবের ঘোড়াকে ধরিবার উপক্রম করিল। ধোল বৎসর বয়সেই কুমার পাকা সওয়ার; ঘোড়া সামলাইয়া তিনি হাতীকে বর্শা ছুড়িয়া মারিলেন। হাতী হার না মানিয়া ঘোড়াকে শুঁড়ে জড়াইয়া ধরিতেই কুমার ভূমিতে লাফাইয়া পড়িয়া খোলা তলোয়ার হাতে রুখিয়া দাঁড়াইলেন। পলায়মান ছত্রভঙ্গ জনতার ভিড় ঠেলিয়া সম্রাট কিংবা অথ কেহ সহসা সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সময় কুমার শুজা এবং মীর্জা রাজা জয়সিংহ দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া স্বধাকরের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে সৌভাগ্যক্রমে স্বরতন্তুদের পুনরায় যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল।

* প্রবাণা—জ্যেষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ—১৩৫০ সংখ্যায় পূর্ব তিনটি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মাহুষ ও প্রতিস্পর্ধী স্বরতন্তুদের সহিত একাকী যুদ্ধে ভরসা না পাইয়া স্বধাকর শুঁড় তুলিয়া ছুটিয়া পলাইল। শাহজাদা রক্ষা পাইলেন;—গরীবের খবর ইতিহাসে নাই।

এই বাহাদুরীর জন্য সম্রাট ত্রিদিন আওরঙ্গজেবকে “বাহাদুর” উপাধি ও বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন; সারাদিন তাঁহাকে কাছছাড়া করেন নাই। আওরঙ্গজেবের অসীম সৌভাগ্যে ভ্রাতাদের মন সেদিন ঈর্ষায় ব্যথিত হইয়াছিল, কিংবা পিতার প্রিয়তম পুত্র দারার মুখে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল—এমন কথা ইতিহাসে লেখা নাই; তবুও আওরঙ্গজেব সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বাপকে শুনাইয়া দিলেন—খোদাতালার হাতে মাহুষের জ্ঞান; আমি শুধু ভাইসাহেবদের আচরণে ব্যথিত ও লজ্জিত। তাঁহার স্নেহের একমাত্র লক্ষ্য দারা; ইহা দারার প্রতি তাঁহার জন্মগত বিদ্বেষ ও ঈর্ষার ভাবী অমঙ্গলসূচক কাঁজ, সর্পশিশুর প্রথম বিবোদনার, শাহজাহানের আশঙ্কা আওরঙ্গজেবের পরবর্তী আচরণে আরও ঘনাইয়া উঠিল।

জাহানারা বেগমের ঠিক বার মাস পরে কুমার দারা এবং কন্যা রোশনারা জন্মের চৌদ্দ মাস পরে (২৪শে আগষ্ট ১৬১৭) আওরঙ্গজেব ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে জাহানারা দারা এবং রোশনারা-আওরঙ্গজেবের ন্যায় পান্টা জুড়ি ইতিহাসে বড় বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লোকের ধারণা ছিল শাহজাহান জাহানারা-দারাকে এক মাপে এবং রোশনারা-আওরঙ্গজেবকে অন্য মাপে ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন। শাহী পরিবারে এই “যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ” ব্যাপার গতানুগতিক কিংবা অস্বাভাবিক নহে; কারণ জাহানারা এবং দারার স্বভাব ও জীবনাদর্শের ঘেরকম মিল দেখা যায়, রোশনারা এবং আওরঙ্গজেবের স্বার্থবুদ্ধি ও চরিত্রে তদ্রূপ সামঞ্জস্য ছিল। দারা এবং আওরঙ্গজেব শাহজাহান-চরিত্রের এপিঠ ও পিঠ; এইজন্য তিনি পুত্রদ্বয়কে লইয়া দোটানা শ্রোতে পড়িয়াছিলেন। শাহজাহানের সংসারে এই সন্তান চতুষ্টয়কে আশ্রয় করিয়া ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধি এবং লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর যুগপৎ সমাবেশ যেন একটি সুপরিকল্পিত বিয়োগান্ত নাটকের ভূমিকা।

মাতা মমতাজমহলের মৃত্যুর পর জাহানারা বেগম

সমস্ত ভাতা-ভগিনীগণকে স্নেহের সমান অংশই দিরা-
ছিলেন, চরিত্রগুণে এবং নিত্য সাহচর্যের জন্য হয়ত
দারার প্রতি টান একটু বেশী ছিল। তিনি দারার ইষ্ট
কামনা করিলেও অন্য কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতেন
না; সকলের নালিশ এবং পিতার কাছে স্থপারিশ
করিবার তাগিদ তাঁহার নিকটেই আসিত। আওরঙ্গজেব
ভাতা-ভগিনীদের মধ্যে একমাত্র জাহানারাকে শ্রদ্ধা
করিতেন, কিঞ্চিৎ বিশ্বাসও করিতেন।

জাহানারা সাম্রাজ্যের সর্বপূজ্যা “বেগম সাহেবা”।
অন্দরমহলে এবং দরবারের আড়ালে শাহী তক্তের ছায়ায়,
পুত্রী হইয়াও তিনি সম্রাটের মাতার মর্যাদা ও ক্ষমতা
লাভ করিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডা-বিজাপুরের রাজদূত,
অর্থী-প্রত্যর্থী ও অভিজাতবর্গ “বেগম সাহেবা”র দরবারে
কুণিশ করিতে আসিতেন, অভাব-অভিযোগ জানাইতেন।
সেকালেও ঘুম, নজর, তদ্বির এবং স্থপারিশ ব্যতীত কাজ
হাসিল হইত না। লোকে মনে করিত, বাদশাহের
মর্জির চাবিকাঠি উজীর সাদুল্লার হাতে নয়, দারা ও
জাহানারার হেফাজতে। রোশনারা বেগম জ্যেষ্ঠা
ভগিনীর সৌভাগ্যে হিংসায় জলিয়া উঠিলেন; কিন্তু পিতা
ও শাহজাদা দারা বাচিয়া থাকিতে জাহানারাকে স্থানচ্যুত
করা দুঃসাধ্য, এইজন্যই আওরঙ্গজেব ও তাঁহার ভাগ্য
একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িল।

আওরঙ্গজেব, শুজা, মোরাদ—কেহই জাহানারার প্রতি
বিশ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না; তাঁহার অভিমান করিতেন,
অনিষ্ট কিংবা প্রতিহিংসার চেষ্টা করেন নাই। ইহার
কারণ, জাহানারা কাহারও ন্যায্য দাবি এবং অধিকারের
বিরোধিতা করেন নাই। দারার প্রতি তাঁহার অন্তরের
টান কোন ইহলৌকিক স্বার্থদৃষ্ট ছিল না। রোশনারা
জাহানারাকে ঈর্ষা নয়, দস্তুরমত হিংসা করিতেন। নারীর
দুর্দমনীয় ক্ষমতাস্পৃহা অতি প্রলয়ঙ্করী, ক্ষমতার নেশা
শরাবে নেশা হইতে শত গুণ মারাত্মক। মুসলমান
ইতিহাসে নারী-চরিত্রের উল্টা পিঠ দেখিতে গেলে বক্ত
জমাট হইয়া যায়,—যেমন আবু স্ফিয়ানের পত্নী এবং
মারিয়ায় মাতা “হিন্দা” প্রথম যৌবনে প্রেম প্রত্যাখ্যানের
প্রতিহিংসা পূর্ণ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে শায়িত হজরত
মহম্মদের খুল্লতাতে বুক হামজার কলিঙ্গা চর্কণ করিয়া-
ছিলেন। হারুণ-অল-রশিদের মাতা খাইজুবান স্বামীকে
ভেড়া বানাইয়া সাম্রাজ্য শাসন করিতেন; পুত্র হাদি
খলিফা হইয়া মাতাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিলেন—এই
দোষে হাদিকে তিনি দাসীগণের দ্বারা হত্যা করা হইয়া
হারুণকে খলিফা করিয়াছিলেন। শাহজাহানের কন্যা

রোশনারা এই জাতীয় স্ত্রী-চরিত্র, মুষ্টিমতী অসুখা ও
লালসা জড়িত বিজীগিধা।

৩

পুণ্যশীলা জাহানারা বেগম মহিমময়ী নারী,—সম্রাট
পরিবারের পারিজাত-প্রস্থন। রোশনারা অশিব শ্রীশান-
কুসুম, পঙ্কিল সরোবরে নলিনী নহেন; জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী
ধর্ম ও জ্ঞান চর্চায়, ত্যাগ ও সেবায় জীবন-মকর মধ্যে
অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। রোশনারার ভোগমুখী
চিন্তাবৃত্তি অনীপিত কোমার্যে ব্যাহত হইয়া বিপ্লব ও
ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ভূষিত খুঁজিতেছিল। তত্ত্ববাদিনী হইয়াও
জাহানারা দারার মত শরিয়তের অল্পশাসন লঙ্ঘন করেন
নাই। তিনি রোজা-নমাজে নিষ্ঠাবতী ছিলেন, অবসর
সময়ে ধ্যানধারণা করিতেন, কিংবা গ্রন্থ রচনা করিতেন।
যথা খাজা মুইনুদ্দীন চিশতীর ফারসি জীবন-চরিত
Munis-ul Aruwah (comforter of souls) দ্রষ্টব্য।
এইরূপ খেয়ালে সময় নষ্ট করিবার ফরসত চঞ্চলা রোশনারার
ছিল না। দারা সম্রাট হইলে পিতার অবর্তমানেও
জাহানারা কর্তৃত্ব করিবেন—এই দৃষ্টিভঙ্গি রোশনারাকে
নিরন্তর দগ্ধ করিত। বিধাতার তথা পিতার সঙ্কল্প বিফল
করিবেন,—ইহাই যেন তাঁহার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। এইজন্য
সমস্বার্থে আবদ্ধ সমানধর্মী ভাতা আওরঙ্গজেব রোশনারার
নির্দোষিত ভাবী দিল্লীধর। রোশনারা শাহীমহলের সংবাদ
নিয়মিত ভাবে গুপ্তচরের মারফত বাহিরে প্রেরণ করিতেন,
ষড়যন্ত্রের জাল বুনিতে।

ইতিহাসে রোশনারা দুই বার ছিন্নমস্তা রূপে আত্মপ্রকাশ
করিয়াছেন; প্রথম বার বন্দী ভাতা দারার বিচার-প্রহসনের
সময়, দ্বিতীয় বার আওরঙ্গজেবের রোগশয্যায়া। সম্রাট
একবার ৪৪ দিন শয্যাশায়ী ছিলেন (১২ই মে হইতে ২৪শে
জুন ১৬৬২)। রোগের সঙ্কট-সময়ে তাঁহার জীবনের
আশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছিল, তখন সম্রাটের প্রকোষ্ঠে
নূতন “বেগম সাহেবা” রোশনারার কড়া পাহারা, স্ত্রীপুত্র-
গণের পর্যন্ত প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। এক দিন
সম্রাটের অন্ততমা পত্নী নবাববাজি মরিয়া হইয়া কাদিতে
কাদিতে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া মুম্বু স্বামীর বিছানার উপর
আলুখালু বেশে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; রোশনারা চামুণ্ডা
মুষ্টি ধারণ করিয়া হতভাগিনীকে চুল ধরিয়া টানিতে
টানিতে ঘরের বাহির করিয়া দিলেন।

আরোগ্যের পর চতুর আওরঙ্গজেবের বুঝিতে বিশেষ
হইল না ভগ্নী তাঁহার পরেও নিজের ভবিষ্যৎ রচনা করিতে-
ছেন। রোশনারার স্বপ্ন টুটিয়া গেল; সম্রাটের কন্যা

জেবউল্লিমা অন্তরমহলে সর্বদা হইলেন। নিজের জন্য উদ্যান-পরিবেষ্টিত স্বরম্য সমাধি (বর্তমান রোশনারাবাগ) প্রস্তুত ব্যতীত রোশনারাবাগে প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল।

৪

শাহজাহান দুঃখ করিতেন, পুত্র আওরঙ্গজেব বুদ্ধিমান ও বাহাদুর বটে, তবে বড় রোগা; কিন্তু পুত্রের রোগের কারণ তিনি বুঝিও বুঝিলেন না। পেটে কুবুদ্বির ভুট-ভাট, মগজে কুটনীতির দাবাখেলা অষ্টগ্রহ চলিতে থাকিলে হেঁকেমী চরণে গুরুদ্বাও হজম হয় না। কোনকালে আওরঙ্গজেবের প্রাণে শান্তি ও তৃপ্তি এবং চিন্তে প্রফুল্লতা ছিল না। কৃতকার্যতার প্রশংসায় তাঁহার মুখ কঠোর ও গভীর হইয়া উঠিত, কেহ তাঁহার নিন্দা করিয়াছে শুনিলে কিংবা পরের অনিষ্ট-সংবাদ পাইলে কদাচিৎ মুচকি হাসিতেন। শাহজাহান তাঁহার প্রিয়তম পুত্র দারাকে অনেককিছু দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন কিছু না পাইলেও এই পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না; কিন্তু আওরঙ্গজেব? দারাকে বঞ্চিত করিয়া শাহজাহান যদি স্বহস্তে রাজমুকুট আওরঙ্গজেবের মাথায় পরাইয়া দিতেন তবুও তাঁহার দৃষ্টিস্তার অবদান হইত না; বিনা দ্বিধায় হয়ত পিতাকে বলিতেন, “বাগজান! আপনি এখন মক্কা শরীফে বাস করিলে সুবিধা হয়; জাহানারা বেগম আগ্রায় থাকিয়া যাইতে পারেন।”

শাহজাদাগণের মধ্যে শুভা সর্বপ্রথমে মনসব পাইয়াছিলেন এবং আওরঙ্গজেব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে কর্তৃত্ব ও স্ববাদারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব বুদ্ধেল্লা বিজোহ দমন করেন। ইহার পর তিনি আট বৎসর দাক্ষিণাত্যের স্ববাদারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া (১৬৩৬—১৬৪৪ খ্রী:) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের সহিত যুদ্ধে অসীম কৃতিত্ব দেখান। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ রাজ্যে সিঁড়ির উপর মোম-বাতির শিখায় অনবধানতাবশতঃ জাহানারা বেগমের কাপড়ে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল, সর্কান্ন দগ্ধ হইয়া তিনি মরণাপন্ন হইলেন। ভগ্নীকে দেখিবার জন্য আওরঙ্গজেব হুয়া মে আগ্রা পৌঁছিলেন। ইহার তিন সপ্তাহ পরে এমন কিছু ঘটনাছিল যাহার জন্য তিনি হঠাৎ তাঁহার স্ববাদারী হইতে বরখাস্ত হইলেন এবং মনসব পর্য্যন্ত হারাইলেন। মনের দুঃখে আওরঙ্গজেব ফকীর হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু শাহজাহানের কঠোর মনোভাব অনমনীয় রহিল। ইতিমধ্যে জাহানারা বেগম আরোগালাভ করিলেন। তিনি সম্রাটের কাছে আওরঙ্গজেবের অপ-

রাধের জন্ত ক্ষমা-প্রার্থনা করেন। কতাকে অদেয় কিছু শাহজাহানের ছিল না, আওরঙ্গজেব গুজরাটের স্ববাদারী এবং নিজের পূর্ব মনসব কিরিয়া পাইলেন।

দাক্ষিণাত্য হইতে একটা বড় রকমের মতলব আঁটিয়া আওরঙ্গজেব আগ্রায় আসিয়াছিলেন। পিতার সৌভাগ্যের পীঠস্থান দাক্ষিণাত্যের স্ববাদার হইয়া বিজাপুর-গোলকুণ্ডাকে পদানত করিয়া তিনি হয়ত দিল্লীর সিংহাসনে বসিবার আশা প্রায় ফলপ্রসূ মনে করিয়াছিলেন, অন্ততঃ যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ দারার উপরে একটা দ্বিধা হাজারী মনসব ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। দরবারে আসিয়া তিনি কেবল দারার বিরুদ্ধে বিবোধগার করিতে-ছিলেন; শাহজাহান জাহাঙ্গীর নহেন, পুত্রের আসল মতলব বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। এইজন্তই তিনি পুত্রের ক্ষমতা ও দুরাকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু কতবার স্কন্ধে প্রার্থনায় তিনি গুলিয়া জল হইয়া গেলেন।

এই ঘটনার সম্ভবতঃ কিছুদিন পরে দারা তাঁহার নব-নির্মিত প্রাসাদে সম্রাট ও ভ্রাতাদের আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে সঙ্গে লইয়া দারার প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি অভ্যর্থনা এবং আগ্যায়াদির পর দারা স্বয়ং পিতা ও নিমন্ত্রিতবর্গকে প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ দেখাইতে লইয়া গেলেন। সকল জায়গা ঘুরিয়া তাঁহার তায়খানা, অর্থাৎ ভিভিনিয়ন্স শীতল প্রকোষ্ঠ দেখিবার জন্য নীচে নামিয়া গেলেন, অন্যের অলক্ষ্যে উহার প্রবেশ-পথে একাকী কুমার আওরঙ্গজেব সশস্ত্র দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপরে উঠিয়া পুত্রকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া সম্রাট অত্যন্ত বিস্মিত ও রুষ্ট হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া আওরঙ্গজেব নিবেদন করিলেন, কেহ যদি উপর হইতে সিঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া সম্রাটের জীবন বিপন্ন কবে এই আশঙ্কায় আমি পাহারায় ছিলাম।

পুত্রের বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া সম্রাট প্রমাদ গণিলেন; কোন্‌ খাতে আওরঙ্গজেবের সপিল চিন্তাধারা চলিয়াছে, বুঝিতে বাকি রহিল না। দারার পেটে এতখানি কুবুদ্ধি, এক টিলে দুই পাখী মারিবার কৌশল জানা থাকিলে হিন্দু-স্থানের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়া যাইত।

৫

বাপের ‘আলালের ঘরের দুলাল’, ভগ্নী জাহানারার নয়নমণি শাহজাদা দারা পিতার জীবদ্দশায় কোন কৃতিত্বের পরিচয় না দিয়াও অর্ধেক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, ছয় স্ববার অল্পপস্থিত স্ববাদার। তাঁহার মনসব অল্প তিন ভ্রাতার

মোট মনসবের প্রায় সমান। দরবারে সত্ৰাটের ময়ূব-সিংহাসনের পার্শ্বে সোনার চৌকি একমাত্র তাঁহার জন্ত নির্দিষ্ট;—উভয়ের মধ্যে ব্যবধান পিতার পরমায়ু। সত্ৰাটের পৌত্রগণের মধ্যে দারার পুত্রস্বয় তাঁহার সর্বাঙ্গের অধিক স্নেহ ও অল্পগ্রহভাজন, এমন কি তাঁহার কর্মচারিগণও অল্পরূপ সৌভাগ্যের পাত্র। কেন পিতার, ত্রায়নিষ্ঠ গুণগ্রাহী সত্ৰাটের এই দুর্বলতা ও অবিচার?

দারাকে শাহান্‌শাহ আত্মরে বড় খোকাটির মত গায়ে জঁ চড় লাগিবার ভয়ে সর্দার চোখে চোখে রাখিতেন, পারতপক্ষে যুদ্ধবিগ্রহে পাঠাইতেন না। যে বয়সে আওরঙ্গজেব বুলন্দখণ্ড ও দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া গুজরাটের স্ববাদারী করিতেছিলেন সে বয়সে দারা দূর হইতেও লড়াই দেখেন নাই। ২৪ বৎসর বয়সে দুই ছেলের বাপ হওয়ার পর দারা কান্দাহার স্ববা রক্ষা করিবার জন্য প্রথম অভিযানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শাহজাদা ময়দানে দুশমন খুঁজিয়া পাইলেন না, ফাঁকা মাঠে খেলা জিতিয়া বাহবা লইলেন। তিন বৎসর পরে আবার গুজব শুনা গেল, ইরানের শাহ্-সফী বিরাট ফৌজ লইয়া কান্দাহারের দিকে কুচ করিতেছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য দিল্লীর দারাকে দ্বিতীয় বার মোগলবাহিনীর অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন। বুলন্দ-ইকবাল শাহজাদার উচ্চ কপাল; শাহ্-সফী নিশাপুরের পথে বহুদূরে কাশান শহরেই কবরস্থ হইলেন। বিজয়-দাম্যাস বাজাইয়া দারা লাঞ্ছনায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং পিতা কর্তৃক এমন বিপুলভাবে সম্বাদিত ও পুরস্কৃত হইলেন যেন তিনি গোটা ইরান-তুরান ফতে করিয়া ফিরিয়াছেন। সবই বরাতের জোর।

পাকা মুসলমান ও কাজের লোকের নজরে দারা হইলেন কুঁড়ের বাদশাহ; কোন ঝকঝক নাই; দিল-খোলা হাসি লইয়া আনন্দমাগরে গা ভাসাইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার রোজা নাই; শুক্রবার ব্যতীত অল্পদিনে নমাজ নাই, আছে কেবল কোরাণশরীফ লইয়া বেইমানী গবেষণা, ‘নাপাক হিন্দুয়ানী’র সহিত পবিত্র ইসলামের তুলনামূলক উত্তম বিচার। সকাল-সন্ধ্যা শাহজাদার মজলিসে যত রাজ্যের পাগলের আনাগোনা, অর্ধ উলঙ্গ কাফের যোগী সন্ন্যাসীর ভিড়। সেখানে মাঝে মাঝে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সংস্কৃত প্রশস্তি পাঠ কিংবা বর্ণাটক ভাষায় গান শুনাইতেন; নিভৃতে চলিত তাঁহার হিন্দুগুরু কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতীর সহিত দর্শন উপনিষদ আলোচনা। কবি; গায়ক, গুণী, চিত্রকর, শিল্পী, গরীব ফকিরদের নিকট তাঁহার দ্বার ও ভাণ্ডার সর্দার উন্মুক্ত; যাহারা দশ ছয়রে তাড়া

খাইয়া ফিরে তাহাদের ফটক পার হইতে আপত্তি নাই,— তাহাদের কাছে তিনি মাটির মানুষ। শাহী দরবারে বড় বড় মনসবদার এমন কি উজীর-ই-আজম সাহুলা খাঁর সহিত ব্যবহারে কিন্তু তিনি দ্বিতীয় ফরায়ুন (Pharaoh)। ঈর্ষামূলক হইলেও এই চিত্র দারার চরিত্রের এক দিক সন্দেহ নাই।

৬

পিতা শাহজাহান আওরঙ্গজেবের মত পাকা নমাজী; স্তত্রবাং দার হযত ভয়ে শুক্রবারের জুম্মা নমাজ খেলাফ করিতেন না। ঐদিন তিনি দরাজ হাতে ফকীর গরীবকে দানখয়রাত করিতেন; তাঁহার স্ত্রফিয়ানা ব্যাখ্যায় দান এবং ক্ষমাই হইল খোদাতালার আসল ইবাদৎ। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শাহজাদা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন; কেননা রাজ-জ্যোতিষী ভবানীপ্রসাদ কোষ্ঠী বিচার করিয়া বলিয়াছেন দারা নিশ্চয়ই বাদশাহ হইবেন; তাঁহার অন্যতম গুরু স্ত্রফী সংমদ বলিয়াছিলেন দারা দুনিয়ার মালিক হইয়া জন্মিয়াছেন। জ্যোতিষী ভবানীপ্রসাদকে তাঁহার এক বন্ধু সাবধান করিয়া বলিয়াছিল দারা বাদশাহ্ না হইলে তোমার মাথাটাই আগে যাইবে। ধৃত্ত ভবানীপ্রসাদ বলিল, তোমার যেমন বুদ্ধি! বাদশাহ্ না হইলে নিজের মাথা বাঁচাইতেই শাহজাদা ফাঁপরে পড়িবেন, আমার মাথা লওয়ার ফুরসত কোথায়? আওরঙ্গজেবের হুকুমে শিরশ্ছেদ করিবার পূর্বে এক মোল্লা সাধু সরমদকে টিটকারী দিয়া বলিয়াছিল, দারার বাদশাহী গেল কোথায়? সরমদ নিতান্ত সপ্রতিভভাবে জবাব দিলেন, তিনি বেহেশতের বাদশাহ হইয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যাবেলা শাহীমহলে ডাক না পড়িলে দারা তত্ত্বজ্ঞানী স্ত্রফী সাধকগণের জীবনী সঙ্কলন, উপনিষদ এবং ধোগবাশিষ্ট গ্রন্থের ফার্সী অল্পবাদ প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, কিংবা শাহমুহব্বীবুল্লা এলাহাবাদী, সরমদ এবং অন্যান্য ছোট বড় সাধু ফকীরগণের কাছে বস্তা বস্তা চিঠি লিখিতেন, স্ত্রষ্টিছাড়া প্রশ্ন করিতেন। নিশীথ রাত্রে তিনি কাদেদিয়া কীর্ত্তন পদ্ধতি অনুসারে দিলের উপর জেকের-ফেকেরের “জবর” [জপে “ধনির” আঘাত] মারিতেন; কখনও প্রাণায়াম করিতে করিতে “গায়েবী আওয়াজ” [“অনাহত” ধনি] শুনিতেন। ঘুমাইয়া পড়িলেও তিনি রাজবোগ সম্বন্ধে পুস্তিকা (যথা স্বরচিত রিসালা-ই-হক্কুম) লিখিবার জন্য ফেহেশতের মারফত খোদার হুকুম পাইতেন। কোন কোন রাত্রিতে তাঁহার স্বপ্নপ্রমাণ হইত, জঙ্গলে বশিষ্ঠ ঋষি ও রামচন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ করিয়া জাগিয়া উঠিতেন।

এই সমস্ত ব্যাপারের উপর আরও ছিল শাহজাদার

কুণ্ডলিনী ভেদ প্রক্রিয়া। লা-হারের হজরত মিক্রা মীরের মুরীদ হজরত শাহ বাক্শী দারার মন্ত্রগুরু। তাঁহার কৃপায় নিজের কুণ্ডলিনী ছাড়াইয়া তিনি পরের কুণ্ডলিনী ভেদ করাইবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্মচর্চায় তিনি সাধিকা জাহানারার অন্ততম গুরুস্থানীয়। কাশ্মীর সফরের সময় জাহানারা গুরু বদক্শীর কাছে বসিয়া তিন দিন এই সাধনা (untying the knot) করিয়া সফলতালাভ করিয়াছিলেন।
 ৭ দারা পরের মুখে স্তোত্রবাক্য শুনিতে শুনিতে নিজেও বিশ্বাস করিতেন তিনি বাস্তবিক একজন দৈবানুগ্রহীত “ইনসান-ই-কামিল বা “পূর্ণপুরুষ”।

দারা ও আওরঙ্গজেব পরোক্ষে পদস্পর্শের প্রতি বাছা বাছা বিশেষ্য প্রয়োগ করিতেন। দারা বলিতেন ভাই আওরঙ্গজেব নন জী বন্ধুধর্মিক; আওরঙ্গজেব বলিতেন কাফের শাহজাদা দরবারী মোসাহেব, মতলববাজ পাগল। আওরঙ্গজেবর অপ্রিয় ছুটি কথা ই-লাম ও মোগল সাম্রাজ্য; ইস্লাম বিপন্ন করিয়া ভগ্নী জাহানারার সহায়তায় তৈমুরের শাহীতক্তে বসিবেন দার ? আর আওরঙ্গজেব ?

৭

প্রথম বয়স হইতেই দারা দৈবে দারুণ বিশ্বাসী, সাংসারিক ব্যাপারে বাস্তবদৃষ্টি ও দৃঢ়তা শূন্য; উপায়-অপায় নির্ণয়ে অপারগ, লেখাপড়া ব্যতীত অন্য কার্যে পরমুখাপেক্ষী; পরের মুখে ঝাল খাওয়া তাঁহার স্বভাব। আওরঙ্গজেব ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ এবং স্বভাব-চরিত্র, বুদ্ধি ও জীবনযাত্রায় দারার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাল্যকাল হইতে তিনি বাপের বাড়ি পাকা স্ত্রী, ইমাম আবুহানিফার মতানুগামী। লড়াইয়ের ময়দান কিংবা সফরেও তাঁহার রোজা নমাজ আয়তন বাদ পড়ে নাই। ইসলামীয় ধর্ম-শাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, সর্বদা হারাম হালাল জায়েজ-নাজায়েজ, বিধি-নিষেধ বিচার করিয়া চলিতেন। এই বিচারের ফাঁকিও তিনি জানিতেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেন। আওরঙ্গজেব শিকার ব্যতীত সর্ববিধ ব্যসন বর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে ছন্দ ও প্রাণে সঙ্গীত ছিল না, কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল। তাঁহার দাড়ির দৈর্ঘ্য, পায়জামার বুল, জামার স্ফুতা ও রং শরিয়তের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। বাদশাহ হইয়াও তিনি ফকীর, হিন্দুস্থানের জিন্দাপীর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজকোষের অর্থ তিনি হারাম মনে করিতেন। রুজী (উপার্জন) হালাল করিবার জন্য তিনি নিজে কোরাণশরীফ লিখিয়া বিক্রয় করিতেন কফনের কাপড় ও দফনের থরচের জন্য ঐ টাকা জমাইয়া

রাখিতেন। সারা জীবনে শরাবের পেয়ালা তিনি দুই বার স্পর্শ করিয়াছিলেন, গলাধঃকরণ করেন নাই— একবার সুন্দরী হীরাবাজির নিকট প্রেমের পরীক্ষায়, এবং দ্বিতীয় বার মথুরায় নৈশ-ভোজের পর পেয়ালার পর পেয়ালা ভাই মোরাদের মুখে তুলিয়া দিয়া অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে। বাদশাহ হইয়া তিনি শাহীমহল ও রাজধানী হইতে নৃত্যকলা ও সঙ্গীতকে নিরাসিত করিয়াছিলেন, পাপ-বাৎসল্য দমন করিবার জন্য নাচওয়ালী ও রূপোপজীবনীগণকে শরিয়ত মতে স্বামী-গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন।

৮

ইতিহাসে আওরঙ্গজেব মূর্ত্তিমান পুরুষকার। দারার সহায়কারী দৈব এবং মানবীয় শক্তিকে পরাজিত করিবার জন্য তিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন। জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্রের পক্ষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডিঙ্গাইয়া সিংহাসন-লাভ যদি পাপকর্ম্য না হয়, শাহজাহানের বীরত্ব ও বুদ্ধি-মত্তার অধিকারী তাঁহার তৃতীয় পুত্র কেন ঐ সিংহাসন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন ?

মুখে সর্বদা আল্লা ভরসা আওড়াইলেও আওরঙ্গজেব সম্পূর্ণ নিজের উপর ভরসা রাখিয়া চলিতেন। আল্লার উপর অটুট বিশ্বাস থাকিলেও আল্লার সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন প্রকার মমতা কিংবা বিশ্বাস তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। আওরঙ্গজেব মাটির পৃথিবীর উপর দিয়া চলিতেন। এক পা ফেলিয়া আগে কি আছে আর এক পা দিয়া দেখিতেন; দারার ন্যায় ভাবের ডানায় ভর করিয়া কল্পনা-পরীর রাজ্যে উড়িয়া বেড়াইতেন না। মানুষ হিসাবে দারার সদর-অন্দর প্রায় এক ছিল; কিন্তু আওরঙ্গজেব যেন দৌলতাবাদ দুর্গ। মনের দুয়ার মানুষ দূরের কথা খোদাতালার কাছে খুলিয়াছিলেন কিনা তিনিই জানেন। স্বার্থ, বিবেক ও ধর্ম তাঁহার মধ্যে গোল পাকাইয়া এমন এক গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছিল যাহার মধ্যে ঐতিহাসিক খেই খুঁজিয়া পায় না।

ধর্মের দিক দিয়া দেখা যায় দারা এবং আওরঙ্গজেবের “আল্লা” বিপরীতধর্মী, দুইটি বিভিন্ন সত্ত্ব। আওরঙ্গজেবের আল্লা একমাত্র মুসলমানের আশ্রয় ও সহায়। মুসলমানের ভোগের জন্য আল্লা দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কাফেরগুলি ইহকালে মুসলমানের গোলামী ও খোদার গজব বরদাস্ত করিয়া মরণের পর অনন্তকাল দোজখের আগুনে পুড়িবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। কাফেরগণকে আঁধার হইতে গলায় শিকল দিয়া আলোকে আনিবার ভার, এমন কি বেহেশতে

উঠাইবার অধিকার আল্লাতাল্লা ইমানদারকে সোপর্দ করিয়াছেন।

অপর পক্ষে দারা আল্লাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, বাক্যমনের অগোচর পরব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করিবার দাবি করিতেন; চিঠিপত্রে শিরোনামার উপরে (যা মীর্জা রাজা জয়সিংহের কাছে লিখিত পত্র) দারানী অক্ষরে “সচ্চিদানন্দ” লিখিতেন। স্তম্ভভাবে বিভোর হইয়া দারা ‘মাসুদ’ অর্থাৎ অশরীরী আল্লার চেহারা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—জ্যোতি-স্বরূপ আল্লার মুখমণ্ডলের শোভাবর্দ্ধন করিয়া দুইটি অলক-গুচ্ছ বা জুলফি বুলিয়া রহিয়াছে: উহার একটি ইসলাম, অপরটি হিন্দুর ধর্ম—মুর্তি ও বহু দেব উপাসনা।

যোট কথা, আওরঙ্গজেবের আল্লা ভৌরীত (Old Testament) এবং উহার আরবীয় সংস্করণ কোরাণশরীফের “স্টেমটিক” কুলপতিধর্মী “আল্লা” (tribal god); দারার

আল্লাকে আর্ধ্য বা হিন্দুস্থানী আল্লা বলা বাইতে পারে। ভ্রাতৃদ্বয়ের “আল্লা”র স্বরূপ এবং উহার কোন কোন “সিপৎ” বা গুণ আসল এবং কোনটি প্রক্ষিপ্ত—ইহা তর্ক অপেক্ষা তলোয়ারের ধারে পরীক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন আওরঙ্গজেব এবং যুযুৎসু মোল্লাসমাজ।

ইতিহাসে দেখা যায় শাহজাহান মনে প্রাণে, নীতি ও ধর্মাত্মশাসনে, মন্দির মূর্তি ধ্বংসসাধনে, হিন্দুকে মুসলমান করিবার উৎসাহে এবং আদর্শ মুসলমান হিসাবে কেবল আওরঙ্গজেব অপেক্ষা এক ধাপ নীচে ছিলেন। পনের বৎসর বয়স হইতে প্রোচন্ডের অবসান পর্য্যন্ত ইসলামের খেদমত করিয়া এহেন পিতার নিকট হইতে তাঁহার যোগ্যতম পুত্র আওরঙ্গজেব পুরস্কার তেমন কিছু পান নাই, অধিকন্তু পাইয়াছেন সকল কার্যে বাধা ও ভিন্নস্বার্থ।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

ঐশ্বরীলকুমার গুপ্ত

আগবিক বিস্ফোরণে থরথর কাঁপে বসুন্তরী
লুপ্ত হ'ল হিরোশিমা, দানবের বিকট উল্লাস;
প্রেম-স্বপ্ন-আশা-গ্রানী চিতাগ্নিতে প্রাণের আরতি,
মহুয়ায় বিকৃতির প্রদর্শনী; রক্তাক্ত আকাশ।
দ্রুত মন সংশয়ে উত্তাল;
সভ্যতার মৃত্যু-ঘণ্টা তবে কি বাজায় মহাকাশ?
অভিশপ্ত এ-শতাব্দী, ব্যর্থ শিক্ষা-দীক্ষা-ধর্ম-ধ্যান,
বর্বর গুহার যুগ এনে দিল গর্ব-অন্ধ উজ্জল বিজ্ঞান?
ধূলি-ভস্ম ধূমে লুপ্ত সময়ের বর্ণ আলো-রেশ,
পলায়িত স্বপ্ন প্রেম; অমৃতের সন্ধান কি শেষ?

হঠাৎ তোমার কথা মনে হয়, বইগুলি পড়ি;
প্রভুত্বের আফালন, হত্যার উল্লাস, কোলাহলে
তোমার উজ্জল স্বপ্ন দেখে ছুঁ ছুঁ বকে গড়ি
কোন এক স্নহ ছায় পৃথ্বী দীপ্ত নীলাকাশতলে।

শান্ত মন আশ্বাসে মুখর,
প্রেত-রাত্রে দেখি লেখা নভো গাজে তারার অক্ষর!
কঙ্কাল-আকীর্ণ মাঠে তৃণ সাড়া দেয়, ফুল হাসে;
দুর্যোগ অধ্যায় উড়ে যায় রাঙা ভোবের বাতাসে।
রুঢ় মৃত্যু-পদধ্বনি হ'য়ে ওঠে জীবনের স্তব,
পাখীর কাকলি বনে, নদী ডাকে, প্রাণের উৎসব।

সে সময় ভাবি—এই সভ্যতার ঋণ-ক্ষতি-ক্ষয়
অনেক শুধেছ তুমি; স্বপ্নে প্রেমে নয়, ব্যর্থ নয়
বন্দ-ক্ষুধ এ শতাব্দী; সভ্যতার মহনের বিষ
পান করে নীলকণ্ঠ দিয়ে গেছ সৃষ্টির আশিস।*

* আচার্য্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনে রবীন্দ্র-স্মৃতিবাসরে
পঠিত।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি

ত্রীচিন্ময়ী পাঠক

এক অচ্ছেদ্য নিবিড় বন্ধনে মানুষ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সভ্যতার অভিযানে মানুষ চায় প্রকৃতিকে বিসর্জন দিতে, কিন্তু পারে না; তাহার অন্তরের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া রহিয়াছে প্রকৃতিপ্রেম। আকাশের রঙে, কুহুমের সৌরভে, বিহগের কাকলিতে আছে মাদকতা। প্রকৃতির অক্ষুট আত্মহান রঙে জাগায় শিহরণ, প্রাণে সঞ্চারিত করে নবীন স্ফূর্তি। দক্ষিণ পবনে আন্দোলিত কৃষ্ণচূড়ার রাঙা গুচ্ছ কঠিন বস্ত্ততাল্লিকের চোখেও ক্ষণিকের জন্য রঙীন আবেশ আনিয়া দেয়, আষাঢ়ের কালে কৃষ্ণমেঘপুঞ্জ দেখিয়া তাহার চিত্ত মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। মানুষ প্রকৃতিকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেও প্রকৃতি মানুষকে ভুলিতে দেয় না। রূপে, বর্ণে, আভাসে, ইন্দ্রিতে মানুষের মনে জাগাইয়া রাখে অভূতপূ আকাজক্ষা। তাই শহরের বুকোও দেবী সমভ্ররচিত পুষ্পপল্লবে সজ্জিত রমণীয় উদ্যান। সাহিত্য-জগতেও মানুষ প্রকৃতিকে ভুলিতে পারে নাই। কাব্যে, নাট্যে প্রকৃতি বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়া আছে। শিল্পী আপনার কল্পনার মাধুরী দিয়া প্রকৃতির পুষ্পপল্লবের রঙীন ছবি আঁকিয়া দেয়, অন্তরের স্বধা সিঞ্চন করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলে নূতন রূপে। অজ্ঞাত দেশের সাহিত্যের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যেও যুগে যুগে প্রকৃতি দেখা দিয়াছে নূতন নূতন রূপে।

ভারতীয় সভ্যতার আদিপর্বে উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারিত যে
বৈদিক মন্ত্র আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়াছিল তাহা
প্রকৃতির স্তবগানে পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন—

The higher gods of the Rigveda are almost entirely personification of the natural phenomena such as Sun, Dawn, Fire, Wind:

“ঋগ্বেদের অধিকাংশ দেবতা, যথা সূর্য, উষা, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের মূর্তি বিগ্রহ মাত্র।” বস্তুতঃ আর্থ ঋষিগণ সূর্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতার স্তবের মধ্য দিয়া প্রকৃতির স্তব করিয়াছেন।

আধিগণ সিদ্ধান্তের উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন
করিয়াছিলেন। তখন চারিদিকে মুক্ত প্রকৃতি আপন
লীলায় বিভোর। প্রভাতে ধীরে ধীরে আঁধারের যবনিকা
সরাইয়া সোনার আলোয় দিগন্ত প্রাবিত করিয়া যখন সূর্য
পূর্ব গগনে আবির্ভূত হইতেন তখন অপরিসীম আনন্দে
অভিভূত আধিগণ তরুণ অকণের বন্দনা গান করিতেন :

सुखा अन्ना हरिषः पूर्यन्ते

ଚିନ୍ତା ଏତଦ୍ଵା ଅନୁସନ୍ଧାନଃ ॥

অমৃতসেৱা দিব আ। পৃষ্ঠমন্ত্ৰঃ

પરિ મ્યાવા પ્રથિવી ચક્ષુ જગ્ઃ ॥

কখনও বা যখন প্রচণ্ড রবে বজ্র আকাশ বিদীর্ণ করিত, রুদ্ধ
আক্রোশে পৃথিবী হুলিয়া উঠিত, প্রবল বারিষাতে ধরাতল
ভাসিয়া যাইত, কুটিরে কুটিরে জাগিত তীব্র আর্তনাদ, তখন
ভয়ে বিশ্বয়ে স্তব্ধ হইয়া ঋষিগণ বজ্রের দেবতা ইন্দের স্তব-
গান করিতেন :

ન્યાયા ટિપ્પણ્ય પૃથિવી મમેતે

ସୁଆଞ୍ଚିନନ୍ଦ ପର୍ବତା ଉଦ୍ଭବେ ।

যঃ সোমপা নিচিভো' বজ্রবাহু—

ধৌ বজ্রহস্তঃ স ত্বনাগ ইন্দ্রঃ ।

এইরূপে প্রকৃতির বিভিন্ন লীলায় কখনও ভয়ে, কখনও
বিস্ময়ে, কখনও বা আনন্দে অভিভূত হইয়া আর্ষ ঋষিগণ
প্রকৃতিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা
করিতেন। স্মৃতিরাং প্রকৃতিই বৈদিক মন্ডে দেবতা রূপে
আবির্ভূত হইল।

মহাকাব্যের যুগে প্রকৃতিকে দেখি অন্য রূপে। এখন
আদিম যুগের ভয় বা বিস্ময় আর নাই। আর্দেহা তখন
প্রকৃতির রূপ, রস ও বর্ণমাদুর্ধ্য আকর্ষণ পান করিলেন।

মহাকবি বালাকি প্রকৃতিকে দেখিয়াছিলেন তাহার
নিজস্ব রূপে। তরুলতা, পুষ্পপল্লব আপন রূপেই তাহার
চিত্ত মোহিত করিয়াছিল। তাই রামায়ণে পাই বহিঃ-
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা, মধুর ভাষায়, স্থলজিত ছন্দে। পঞ্চ-
বটীর বনে শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতির রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত
হইয়াছিলেন :

अद्भ्यः देशः जम्भः श्रीमान् पुष्पितैस्तद्वत्तिरुतः ।

ইদমাশ্রমপদং রমাং কলবং কর্তুমইসি ॥

000 000 000 000 000

সৌবৰ্ণে নাজটন্তাঐর্দেমে দেশে: তথা শুভে: ।

गवाक्षिडा इवाडासि गङ्गाः परमवृद्धिः ॥

ਸਾਣੇਸੁਆਣੇਸੁਆਣੇਸੁ ਭਰ੍ਜੈ ਰੇ: ਪਸਣੇਸੁਆਣੇ ਰੇ: ।

मीवाटेरुष्टिमिटेष्टव पुंमाटेष्टाष्टाष्टा ॥

চুতৈৰণোঠৈকন্তিলোঠৈক: ক্ৰেতুঠৈকপি চম্পঠৈক: ।

পুষ্পগুণ্যাদভোপেতৈত্তৈস্তস্কৃতিরাবৃত্তৈঃ ॥

পক্ষার তীরে প্রকৃতির কি অপূৰ্ণ শোভা! কিন্তু

এ প্রকৃতি নিছক জড় প্রকৃতি, কোন অন্তর্লীন চেতন সত্তার বহিঃপ্রকাশ নহে। এ প্রকৃতি আপন রূপের বিচিত্র লীলায় কখনও চিত্তে জাগায় আনন্দ, কখনও বিষম, কখনও বা হারানো প্রিয়ার স্মৃতি উদ্বেলিত করিয়া চিত্তে আনে নিবিড় বেদনা।

কালিদাসের কাব্যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তর্লীন প্রাণবন্ত সত্তার মিলন দেখা যায়। তরু, লতা, নদী, পর্কত সকলই যেন এক অনির্কচনীয় চেতনার অধিকারী। স্নেহ, প্রেম, করুণা প্রভৃতি মানবমনের স্ফূর্তির বৃত্তিগুলি জড়প্রকৃতির অন্তরেও যেন বিরাজমান। ‘মেঘদূত’ কাব্যের ভূমিকায় পণ্ডিতপ্রবর এম. আর. কাল্লে বলেন :

“He (Kalidasa) sets forth...that the oceans and the rivers, the mountains and the forests, the trees and the flowers, the beasts and the birds are as much conscious of a personal life as man;...All forms of Nature—from the sublimest mountains to the tiniest flower that blows—have for him as conscious an individuality as real a personal life as men or gods.”

বস্তুতঃ, কালিদাসের প্রকৃতি ইংরেজকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতির মত ঈশ্বরের বহিঃপ্রকাশ মাত্র নহে। কালিদাসের প্রকৃতি মানুষের স্বখঃখের সঙ্গী। তাই আঘাতের ঘনকুঞ্জে মেঘপুঞ্জ বিরহী যক্ষের আকুল বার্তা স্নান অলকায় প্রিয়ার কাছে লইয়া যায়, বহুস্বপ্নের যৌবনশ্রী উপভোগ করে। পর্কতরাজ হিমালয় স্নেহশীল পিতার মত বন্যা উমার ব্যাধায় কাতর :

সপদি মুকুলিতাক্ষীং ক্রমলংরন্তভীত্যা

হৃদিশ্বরমহুকম্প্যামমিরাদায় দোভ্যাম্।

স্বরগজ ইব বিলং পদ্মিনীং দম্বলগাং

প্রতিগবগতিরাঙ্গীদ বেগদীর্ঘকৃত্যধঃ ॥

শকুন্তলা নাটকে প্রকৃতি ‘আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয় ভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে।’ শকুন্তলার চরিত্র অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত, পশুপক্ষীর সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ। তরুলতাগুলিতে শকুন্তলা জনসেচন করিয়া সোদর-স্নেহে অভিষিক্ত করে। সে নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আপনায় কোমল হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছে। ‘লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেরূপ সম্বন্ধ।’

তাই শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালে ঋষি বধ প্রকৃতির কাছে শকুন্তলার বিদায়-প্রার্থনা করিতেছেন :

পাতুং ন প্রথমং ব্যবহৃত্তি জলং যুগ্মাংগীভেয়ু যা

নাংদন্তে প্রিয়মণ্ডনংপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।

আত্মে বঃ কুসুমপ্রসুতিসময়ে যচ্চা ভবত্যাংসবঃ

সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরমুজ্জায়তাম্ ॥

‘প্রাচীন সাহিত্যে’ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

“অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনন্য প্রিয়বন্দা যেমন, ক

যেমন, হৃদয় যেমন, তপোবন প্রকৃতিও যেমন একজন বিশেষ পাত্র। এই মূঢ় প্রকৃতিকে কোন পাঠকের তিতরে যে এমন প্রধান, এমন অভ্যাবতক স্থান দেওয়া যাইতে পারে তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্যে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার যুগে কথাবার্তা বসাইয়া রূপক নাট্য রচিত হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করা হইয়া লওয়া—এতো অসম্ভব দেখি নাই।”

আদিকবি বাণীকির মত ভবভূতিও বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নদীপর্কত, পুষ্পপল্লব তাহাদের নিজস্ব রূপে তাঁহার চিত্ত আবর্ষণ করিয়াছিল, কোন নিগূঢ় সত্তার আভাস দেয় নাই। সীতা অরণ্যকে ভাগবাসিয়াছিলেন তাহার বাহু রূপের মোহে, প্রাসাদে থাকিয়াও তাঁহার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাদিত :

জানে পুনরপি প্রসন্নগীতার বনরাঙ্গিণী বিহ্বল

পবিত্রদীর্ঘশিশিরসলিলাং ভগবতীং ভাগীরথীম্

অবগাহিষ্য ইতি।

শ্রীহর্ষ, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি পরবর্তী কবি ও নাট্যকার-গণও প্রকৃতির বাহিরের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, তাহার অন্তরের গোপন চৈতন্যের সন্ধান পান নাই। তাই তাহাদের রচনায় পাই কেবল বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যবর্ণনা, নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গিতে। যথা :

গলংপরাগং ভ্রমিভদ্রিঃ পতংপ্রসজ্জঙ্ঘাবলি নাগকেশরম্।

স মারনারাচমিধর্ষনৈস্বলজ্জলংকণং শাণমিব ব্যালোকয়ং ॥

(নৈষধঃ ১.)

এই কবিগণ মানুষের সহিত প্রকৃতির নিবিড় সৌহার্দ্য-বন্ধন অনুভব করেন নাই। তাহাদের প্রকৃতিপ্রেম নিবন্ধ ছিল কেবলমাত্র প্রকৃতির বাহিরের রূপে; তাহারা গোপন অন্তর্লোকের চৈতন্যময় সত্তার আভাস পান নাই।

চিত্রচোর

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কাচের পেয়ালার ডালিমের রস লইয়া সত্যবতী ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'নাও, এটুকু খেয়ে ফেল।'

যত্নের দিকে তাকাইয়া দেবীলাস বেলী ঠিক চারটে। সত্যবতীর সময়ের মতচড় হয় না।

ব্যোমকেশ আরাম কেদারার বলিয়া বই পড়িতেছিল, কিছুক্ষণ বিরামপূর্ণ চক্ষে পেয়ালার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'রোজ রোজ ডালিমের রস খাব কেন?'

সত্যবতী বলিল, 'ডাক্তারের হুকুম।'

ব্যোমকেশ অকুটকুটিল যুধত্তদী করিয়া বলিল, 'ডাক্তারের নিষ্কৃতি করেছে। ও খেতে আমার ভাল লাগে না। কি হবে খেয়ে?'

সত্যবতী বলিল, 'গায়ে রক্ত হবে। লক্ষ্মীটি খেয়ে ফেল।'

ব্যোমকেশ চকিতে একবার সত্যবতীর যুগ্মের পানে দৃষ্টিপাত করিল, প্রমত্ত করিল, 'আজ রাতিরে কি খেতে দেবে?'

সত্যবতী বলিল, 'মুগীর সুরমা আর টোষ্ট।'

ব্যোমকেশের অকুট গভীর হইল, 'হঁ, সুরমা।—আর মুগীটা খাবে কে?'

সত্যবতী মুখ টিপিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো।'

আমি ভাড়াভাঙি বলিলাম, 'গুণু ঠাকুরপো নয়, ভোমার অর্ধাদিনীও ভাগ পাবেন।'

ব্যোমকেশ আমার পানে একবার চোখ পাকাইয়া তাকাইল, তারপর বিকৃত মুখে ডালিমের রসটুকু খাইয়া ফেলিল।

কয়েকদিন ছিল ব্যোমকেশকে লইয়া সাঁওতাল পরগণার একটি শহরে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছি। কলিকাতার ব্যোমকেশ হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিল; ছই মাস যমে-মামুষে টানাটানির পর তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছি। রোগীর সেবা করিয়া সত্যবতী কাঠির মত রোগী হইয়া গিয়াছিল, আমার অবস্থাও কাহিল হইয়াছিল। তাই ডাক্তারের পরামর্শে পৌষের পোড়ার দিকে সাঁওতাল পরগণার প্রাণপ্রদ জলহাওয়ার সন্মানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখানে আসিয়া ফলও মস্তুর মত হইয়াছে। আমার ও সত্যবতীর শরীর ভো চাড়া হইয়া উঠিয়াছে, ব্যোমকেশের শরীরেও ক্রম রক্তসঞ্চয় হইতেছে এবং অসম্ভব রকম ক্ষুধার্তি হইয়াছে। দীর্ঘ রোগভোগের

পর তাহার স্বভাব অল্প বালকের মত হইয়া গিয়াছে; সে দিবসারাজ খাই-খাই করিতেছে। আমরা দু'জনে অতি কষ্টে তাহাকে সামলাইয়া রাখিয়াছি।

এখানে আসিয়া অবধি মাত্র দুই জন ডাক্তারের সহিত পরিচয় হইয়াছে : এক, অধ্যাপক আদিমাণ সোম, তাহার বাড়ীর নীচের ভাড়াটা আমরা ভাড়া লইয়াছি। দ্বিতীয়, এখানকার স্থানীয় ডাক্তার অধিনী ঘটক। রোগী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, তাই সর্বাঙ্গে ডাক্তারের সহিত পরিচয় করিয়া রাখা প্রয়োজন মনে হইয়াছে।

শহরে আরও অনেকগুলি বাঙালী আছেন, কিন্তু কাহারও সহিত এখনও আলাপের সুযোগ হয় নাই। এ কয়েকদিন বাড়ীর বাহির হইতে পারি নাই, নতুন স্থানে আসিয়া গোছ-গাছ করিয়া বলিঙেই দিম কাটিয়া গিয়াছে। আজ প্রথম সুযোগ হইয়াছে; শহরের একজন গণ্যমান্য বাঙালীর বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ আছে। আমরা যদিও এখানে আসিয়া নিজেদের জাহির করিতে চাহি নাই, তবু কাঁঠালী চাপার সুগন্ধের মত ব্যোমকেশের আগমন-বার্তা শহরে রাঙি হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে চায়ের নিমন্ত্রণ আসিয়াছে।

ব্যোমকেশকে এত শীঘ্র চায়ের পার্টিতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ থাকিয়া সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; ডাক্তারও ছাড়পত্র দিয়াছেন। সুতরাং যাওয়াই স্থির হইয়াছে।

আরাম কেদারার বলিয়া বই পড়িতে পড়িতে ব্যোমকেশ উসুসু করিতেছিল এবং বারবার যত্নের পানে তাকাইতেছিল। আমি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া অলস ভাবে সিগারেট টানিতেছিলাম; সাঁওতাল পরগণার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। এখানে শুকতার সহিত আমলতার, প্রাচুর্যের সহিত রিজতার শিবিড় মিলন ঘটরাছে; মাহুষের সংস্পর্শ এখানকার কঙ্করময় মাটিকে গলিত পঙ্কিল করিয়া তুলিতে পারে নাই।

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রমত্ত করিল, 'রিক্স কখন আসতে বলেছে?'

বলিলাম, 'সাত্তে চারটে।'

ব্যোমকেশ আর একবার যত্নের পানে তাকাইয়া পুস্তকের দিকে চোখ নামাইল। বুঝিলাম যত্নের কাঁটার মতর আভাস তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। হাসিয়া বলিলাম, 'রাই বৈধব্য রহ বৈধব্য—'

ব্যোমকেশ বিঁচাইয়া উঠিল, 'লজ্জা করে না। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট বাচ্ছ।'

অর্ধদশ সিগারেট কামালার বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। ব্যোমকেশ এখনও সিগারেট খাইবার অহুমতি পায় নাই; সত্যবতী কঠিন দিব্য দিয়াছে তাহার অহুমতি না পাইয়া সিগারেট খাইলে মাথা খাইবে, মরা মুখ দেখিবে। আমিও ব্যোমকেশের সম্মুখে সিগারেট খাইতাম না; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নেশাবোরকে লোভ দেখানোর মত পাপ আর নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল হইয়া খাইত।

ঠিক লাড়ে চারিটার সময় বাড়ীর সদরে দুইটি সাইকেল রিক্স আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা প্রস্তুত হিলাম, সত্যবতীও ইতিমধ্যে সাজপোশাক করিয়া লইয়াছিল। আমরা বাহির হইলাম।

আমাদের বাড়ীর একতলার সহিত দোতলার কোমর যোগ ছিল না, সদরের খোলা বারান্দার ওপাশ হইতে উপরের সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছিল। বাড়ীর সম্মুখে খানিকটা যুক্ত স্থান, তারপর ফটক। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দেবিলাম আমাদের গৃহস্থানী অধ্যাপক সোম বিরজঙ্গতীর মুখে ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

অধ্যাপক সোমের বয়স বোধ করি চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া জিশের বেশী বয়স মনে হয় না; তাঁহার আচার-ব্যবহারেও প্রৌঢ়ের ছাপ নাই। সব কাজেই চটপটে উৎসাহশীল। কিন্তু তাঁহার জীবনে একটি কাঁটা ছিল, সেটি তাঁর স্ত্রী। দাম্পত্য জীবনে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

প্রোফেসর সোম বাহিরে যাইবার উপযোগী সাজপোশাক করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের দেখিয়া করুণ হাসিলেন। তিনিও চায়ের নিমন্ত্রণে যাইবেন জানিতাম, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাঁড়িয়ে যে। বাবেন না?'

প্রোফেসর সোম একবার নিজের বাড়ীর দিক্‌লের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'বাব। কিন্তু গিহীর এখনও প্রসারম শেষ হয় নি। আপনারা এগোন।'

আমরা রিক্সেতে চড়িয়া বলিলাম। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী একটাতে বসিল, অপরটাতে আমি একা। ঘটি বাজাইয়া মস্তক-চালিত জিচক্র-যান ছাড়িয়া দিল। ব্যোমকেশের মুখে হাসি ফুটিল। সত্যবতী সমস্ত তাহার গায়ে শাল জড়াইয়া দিল, অন্তর্ভুক্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া না যায়।

কাঁকর-ঢাকা উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়া দুই দিক দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। রাস্তার দু'ধারে ঘরবাড়ীর ভিড় নাই, এখানে একটি ওখানে একটি। শহরটি যেন হাত-পা হুড়াইয়া

অসমতল পাহাড়ভূমীর উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে, গাদাগাদি চৈন্যচৈন্য নাই। আয়ত্তনে বিস্তৃত হইলেও নগরের জনসংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু সমৃদ্ধি আছে। আশেপাশে কয়েকটি অল্পের ধনি এখানকার সমৃদ্ধির প্রদর্শন বস্তু। আদালত আছে, ব্যাংক আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা গণ্যমান্য তারা প্রায় সকলেই বাঙালী।

যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহার নাম মহীধর চৌধুরী। অধ্যাপক সোমের কাছে তিনিইহা জল্পলোক প্রচুর বিত্তশালী; বয়সে প্রবীণ হইলেও সর্বদাই নানাপ্রকার ছুপুপ লইয়া আছেন; অর্থব্যয়ে যুক্তহস্ত। তাঁহার প্রযোজনায় চতুর্ভুতা, শিকার, খেলাধুলা লাগিয়াই আছে।

নিমিত দশ-পনেরার মধ্যে তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রায় দশ বিঘা জমি পাথরের পাঁচিল দিয়া ঘেরা, হঠাৎ দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। ভিতরে রকমারি গাছপালা, মরুমুখি ফুলের কেয়ারি, উঁচু-নীচু পাথুরে জমির উপর কোথাও লাল-মাহের বাধানো সন্নোর; কোথাও নিভৃত বেতসকুঞ্জ, কোথাও বা কৃত্রিম ক্রীড়া-দৈল। সাজানো বাগান দেখিয়া সহসা বনানীর বিস্তৃত উপস্থিত হয়। মহীধর বাবু যে ধনবান তাহা তাঁহার বাগান দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বাড়ীর সম্মুখে ছাঁটা বাসের সমস্তল টেনিস কোর্ট, তাহার উপর টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সাজাইয়া নিমন্ত্রিতদের বসিবার স্থান হইয়াছে, শীতের বৈকালী রৌদ্র স্থানটিকে আশুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর দোতলা বাড়ীটি যেন এই দৃশ্যের পশ্চাৎপট রচনা করিয়াছে। আমরা উপস্থিত হইলে মহীধর বাবু সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। জল্পলোকের দেহায়ত্তম বিপুল, গৌরবর্ণ দেহ, মাথার সাদা চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, দাড়িগৌক কামানো, গাল দুটি চালতার মত, মুখে ফুটি-কাটা হাসি। দেখিলেই মনে হয় অমাহিক ও সরল প্রকৃতির লোক।

তিনি তাঁহার ঘরে রজনীর সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটির বয়স কুড়ি-একুশ, সুত্রী গৌরাদী হাতযুখী; ভাসা-ভাসা চোখ দুটিতে বুদ্ধি ও কৌতুকের বেলা। মহীধর বাবু বিপত্নীক, এই মেয়েটি তাঁহার জীবনের একমাত্র সখল এবং উত্তরাধিকারিণী।

রজনী যুক্ত-মধ্যে সত্যবতীর সহিত ভাব করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে লইয়া ঘরের একটা দোকানে বসাইয়া গল্প জুড়িয়া দিল। আমরাও বলিলাম। অভিধিরা এখনও সকলে আসিয়া উপস্থিত হন নাই; কেবল ডাক্তার অধিনী ঘটক ও আর একটি জল্পলোক আসিয়াছেন। ডাক্তার ঘটক আমাদের পরিচিত, পূর্বেই বলিয়াছি; অভ জল্পলোকটির সহিত আলাপ হইল। এর নাম মকুলেশ সরকার; শহরের একজন মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসাদার, তা ছাড়া কটোপ্রাকির দোকান আছে।

ফটোগ্রাফি করেন সন্দের ক্ষমতা, উপরন্তু এই স্বভেদে কিছু-কিঞ্চি উপার্জন হয়। শহরে অল্প ফটোগ্রাফার নাই।

সাধারণভাবে কথাবাতা হইতে লাগিল। মহীধরবাবু এক সময় ডাক্তার ঘটককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ওহে ঘোটক, তুমি অ্যাঙ্কিনেও ব্যোমকেশবাবুকে চান্না করে তুলতে পারলে না! তুমি দেখছি নামেও ঘোটক কাজেও ঘোটক—একেবারে ঘোড়ার ডাক্তার।' বলিয়া নিজের রসিকতার হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নরুলেশবাবু কোড়ন দিয়া বলিলেন, 'ঘোড়ার ডাক্তার না হয়ে উপায় আছে? একে অঘিনী তার ঘোটক।'

ডাক্তার ইহাদের চেয়ে বয়স অনেক ছোট, সে একটু হাসিয়া রসিকতা হজম করিল। ডাক্তারকে লইয়া অমেকেই রস-রসিকতা করে দেখিলাম, কিন্তু তাহার চিকিৎসা-বিজ্ঞা সম্বন্ধে সন্দেহই প্রকাশ্য। শহরে আরও কয়েকজন প্রবীণ চিকিৎসক আছেন, কিন্তু এই তরুণ সংবত্তাব ডাক্তারটি মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে বেশ পঙ্গর জমাইয়া তুলিয়াছে।

ক্রমে অস্ত্রাভিধিরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আসিলেন সঙ্গীক সপুঞ্জ উষাধাণ ঘোষ। ইনি একজন ডেপুটি, এখানকার সরকারী মালখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। লম্বা-চওড়া চেহারা, খসুখসে কালো রঙ, চোখে কালো কাঁচের চশমা। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, গভীরভাবে ধামিয়া ধামিয়া কথা বলেন, গভীরভাবে হাসেন। তাঁহার জীর চেহারা কৃষ্ণ, মুখে উৎকণ্ঠার ভাব, থাকিয়া থাকিয়া স্বামীর মুখের পানে উদ্বিগ্ন চক্রে দৃষ্টিপাত করেন। ছেলেটি বছর পাঁচেকের, তাহাকে দেখিয়াও মনে হয় যেমন সর্বদা শক্তিত সজ্জ্বিত হইয়া আছে। উষাধাণবাবু সম্ভবত নিজের পরিবারবর্গকে কঠিন শাসনে রাখেন, তাঁহার সম্মুখে কেহ মাথা তুলিয়া কথা বলিতে পারে না।

মহীধরবাবু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলে তিনি গভীর মুখে পঙ্গর মধ্যে দুই-চারিট শব্দ উচ্চারণ করিলেন, বোধ হয় তাহা লৌকিক সম্ভাষণ, কিন্তু আমরা কিছু শুনিতে পাইলাম না। তাঁহার চক্ষু দুটিও কালো কাঁচের অভ্যন্তরে আবৃত হইয়া রহিল। একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। যাহার চোখ দেখিতে পাইতেছি না এমন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ নাই।

তারপর আসিলেন পুলিশের ডি-এস-পি পুরন্দর পাণ্ডে। ইনি বাঙালী নয়, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলেন; বাঙালীর সহিত মেলামেশা করিতেও ভালবাসেন। লোকটি সুপ্রকৃষ, পুলিশের সাজ-পোশাকে দিব্য মানাইয়াছে। ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া যুহুহাড্ডে বলিলেন, 'আপনি এসেছেন, কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, একটা জটিল রহস্য দিয়ে যে আপনাকে সংবর্ধনা করব তার উপায় নেই। আমাদের এলাকার রহস্য

জিনিষটার একান্ত অভাব। সব খোলাখুলি। চুরি বাটপাতি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তাতে বুদ্ধি খেলাবার অবকাশ নেই।'

ব্যোমকেশও হাসিয়া বলিল, 'সৈন্টা আমার পক্ষে ভালই। জটিল রহস্য এবং আরও অনেক মোড়মীর বস্ত থেকে আমি উপস্থিত বকিত। ডাক্তারের বারণ।'

এই সময় আর একজন অভিধি দেখা দিলেন। ইনি স্থানীয় ব্যাকের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। কৃষ্ণ ব্যক্তিত্বহীন চেহারা, তাই বোধ করি যুগে ফ্রেককাই দাড়ি রাখিয়া চেহারায় একটু বৈশিষ্ট্য দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বয়স যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি একটা অনিদিষ্ট স্থানে।

মহীধরবাবু বলিলেন, 'অমরেশবাবু, আপনি ব্যোমকেশবাবুকে দেখবার জন্তে ব্যস্ত হয়েছিলেন—এই নিন।'

অমরেশবাবু নমস্কার করিয়া সহান্তে বলিলেন, 'কীতিমান পুরুষকে দেখবার ইচ্ছে কার না হয়? আপনারাও কম ব্যস্ত হন নি, শুধু আমাদের দোষ দিলে চলবে কেন?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'কিন্তু আজ আপনি আসতে বড় দেরি করেছেন। সকলেই এসে গেছেন, কেবল প্রোফেসর সোম বাকি। তা তাঁর না হয় একটা ওজুহাত আছে। মেয়েদের সাজসজ্জা করতে একটু দেরি হয়। আপনার সে ওজুহাতও নেই। ব্যাক তো লাগে তিনটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে।'

অমরেশ রাহা বলিলেন, 'তাড়াতাড়ি আসব তেবেহিলাম। কিন্তু বড়দিন এসে পড়ল, এখন কাজের চাপ একটু বেশী। বছর ছুরিয়ে আসছে। নুতন বছর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত আপনারা ব্যাক থেকে টাকা টানতে আরম্ভ করবেন। তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে তা।'

ইতিমধ্যে কয়েকজন ভৃত্য বাড়ীর ভিতর হইতে বড় বড় ট্রেতে করিয়া নামানিষ ষাড-পানীর আমিয়া টেবিলগুলির উপর রাখিতেছিল; চা, কেক, সন্দেশ, পাঁপ-ভাজা, ভালমুট ইত্যাদি। রজনী উঠিয়া গিয়া ধাবারের প্লেটগুলি পরিবেশন করিতে লাগিল। কেহ কেহ নিজেই গিয়া প্লেট তুলিয়া লইয়া আহার আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসি গল্প আলাপ আলোচনা চলিল।

রজনী মিষ্টান্নের একটা প্লেট লইয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে দাঁড়াইল, হাসিমুখে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একটু জলযোগ।'

ব্যোমকেশ আড়চোখে একবার সত্যবতীর দিকে তাকাইল, দেখিল সত্যবতী দূর হইতে একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ব্যোমকেশ বাড়ি চুলকাইয়া বলিল, 'আমাকে মাগ করতে হবে। এসব আমার চলবে না।'

মহীধরবাবু হুরিয়া ফিরিয়া ষাওয়া তদারক করিতেছিলেন, বলিলেন, 'সে কি কথা! একেবারেই চলবে না? একটু

কিছু—? ওহে ডাক্তার, তোমার রোগীর কি কিছুই খাবার হুজুম নেই?’

ডাক্তার টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া এক মুষ্টি ভালমুষ্টি মুখে ফেলিয়া চিবাইতেছিল, বলিল, ‘না খেলেই ভাল।’

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল, ‘শুভলেন শু। আমাদের শুধু এক পেয়াদা চা দিন। ভাববেন না, আমার আমরা আসব; আজকের আসাটা মুখবন্ধ মাত্র।’

মহীধরবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, ‘আমার বাড়ীতে রোজ সকালবেলা কেউ না কেউ পারের ধুলো দেন। আপনারাও যদি মাঝে মাঝে আসেন সাত্য-বৈঠক ভরবে ভাল।’

এতক্ষণে অধ্যাপক সোম সজীক আসিয়া পৌঁছিলেন। সোমের একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব। বস্তুতঃ লজ্জা না হওয়াই আশ্চর্য। সোম-পত্নী মালতী দেবীর বর্ণনা আমরা এখনও দিই নাই, কিন্তু আর না দিলে নয়। বয়সে তিনি স্বামীর প্রায় সমকক্ষ; কালো মোটা শরীর, ধলধলে গুঁড়ম, ভাঁটার মত চক্কু দুটি সর্বদাই গর্বিতভাবে ঘুরিতেছে, মুখখানী দেখিয়া কেহ মুগ্ধ হইবে সে সম্ভাবনা নাই। উপরন্তু তিনি সাদৃশ্য-পোশাক করিয়া থাকিতে ভালবাসেন। আজ যেরূপ সর্বাঙ্গকার হুঁহুতা হইয়া চারের ফলসার আসিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রপুরীর অপসরা-দেরও চমক লাগিবার কথা। পরিবানে ডগ্‌চগে লাল মাদ্রাজী সিকের শাড়ী, তার উপর সর্বাঙ্গে হীরা-জহরতের গহনা। তাঁহার পাশে সোমের কুণ্ডিত ত্রিমাণ মূর্তি দেখিয়া আমাদেরই লজ্জা করিতে লাগিল।

রজনী-তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাদের অত্যাশা করিল, কিন্তু মালতী দেবীর মুখে হাসি ফুটিল না। তিনি বক্রচক্রে রজনীর মুখ হইতে স্বামীর মুখ পর্যন্ত দৃষ্টির একটি কশাঘাত করিয়া চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

খাওয়া এবং গল্প চলিতে লাগিল। ব্যোমকেশ মুখে শহীদদের তার অবব্যঞ্জনা ফুটাইয়া চুক দিয়া দিয়া চা খাইতেছে; আমি নকুলেশবাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে পানাহার করিতেছি; উষাধাধবাবু গভীরমুখে পুরন্দর পাণ্ডের কথা শুনিতে শুনিতে ষাড় নাড়িতেছেন; তাঁহার ছেলেকে লুপ্তভাবে খাবারের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইয়া শব্দিত-মুখে আবার ফিরিয়া আসিতেছে, তাহার মা-খাবারের একটি প্লেট হাতে বসিয়া পর্যায়ক্রমে ছেলে ও স্বামীর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এই সময় বাফালাপের মিলিত কলবরের মধ্যে মহীধর-বাবুর ইয়রুচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল, ‘মিষ্টার পাণ্ডে খানিক আগে বলছিলেন যে আমাদের এলাকার জটিল রহস্যের একান্ত অভাব। এ কথা কতদূর সত্য আপনারাই বিচার করুন। কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল।’

স্বরশৃঙ্খল নীরব হইল; সকলের দৃষ্টি গিয়া পড়িল মহীধর-

বাবুর উপর। তিনি হাতবিকশিত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, যেন সংবাদটা ভারি কৌতুকপ্রদ।

অমরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কিছু চুরি গেছে মাকি?’ মহীধরবাবু বলিলেন, ‘সেইটেই জটিল রহস্য। ড্রিং-ক্রমের দেওয়াল থেকে একটা বাধানো ফটোগ্রাফ চুরি গেছে। রাত্রে কিছু জামতে পারি নি, সকালবেলা দেখলাম ছবি নেই, আর একটা জান্না খোলা রয়েছে।’

পুরন্দর পাণ্ডে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, ‘ছবি। কোন ছবি?’

‘একটা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ। মাসখানেক আগে আমরা পিকনিকে গিয়েছিলাম, সেই সময় নকুলেশ বাবু তুলেছিলেন।’

পাণ্ডে বলিলেন, ‘হঁ। আর কিছু চুরি করে নি? ঘরে দাবী জিনিষ কিছু ছিল?’

মহীধরবাবু বলিলেন, ‘কয়েকটা রূপোর ফুলদানী ছিল; তা ছাড়া পাশের ঘরে অনেক রূপোর বাসন ছিল। চোর এসব কিছু না নিয়ে শ্রেফ একটা ফটো নিয়ে পালান। বলুন দেখি জটিল রহস্য কি না?’

পাণ্ডে তাক্সিল্যভরে হাসিয়া বলিলেন, ‘জটিল রহস্য মনে করতে চান মনে করতে পারেন। আমার তো মনে হয় কোনও জঙ্গলী সাঁওতাল জানলা খোলা পেয়ে ঢুকেছিল, তারপর ছবির সোনালী ফ্রেমের লোভে ছবিটা নিয়ে গেছে।’

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ‘ব্যোমকেশবাবু, আপনার কি মনে হয়?’

ব্যোমকেশ এতক্ষণ ইহাদের সওয়াল জবাব শুনিতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহার চক্কু অলসভাবে চারিদিকে ঘুরিতেছিল। সে এখন একটু সচেতন হইয়া বলিল, ‘মিষ্টার পাণ্ডে ঠিকই বলেছেন মনে হয়। নকুলেশবাবু, আপনি ছবি তুলেছিলেন?’

নকুলেশবাবু বলিলেন, ‘হঁ। ছবিখানা ভাল হয়েছিল। তিন কপি ছেপেছিলাম। তার মধ্যে এক কপি মহীধর বাবু নিয়েছিলেন—’

উষাধাধবাবু গলা বাড়া দিয়া বলিলেন, ‘আমিও একখানা কিনেছিলাম।’

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, ‘আপনার ছবিখানা আছে তো?’

উষাধাধবাবু বলিলেন, ‘কি জানি। এলুবাঘে রেখে-ছিলাম, তারপর আর দেখি নি। আছে নিশ্চয়।’

‘আর তৃতীয় ছবিটি কে নিয়েছিলেন, নকুলেশবাবু?’

‘প্রোফেসর সোম।’

আমরা সকলে সোমের পানে তাকাইলাম। তিনি এতক্ষণ নির্ভাব ভাবে খীর পাশে বসিয়াছিলেন, নিজের মাথ উচ্চারিত হইতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখ বীরে বীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। সোম-গৃহিণীর কিন্তু কোনও

প্রকার ভাবান্তর দেখা গেল না; তিনি কষ্টপাথরের যক্ষী-
মূর্তির ভায় অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আপনার ছবিটা নিশ্চয় আছে।’

সোম উত্তর্যুখে বলিলেন, ‘অ্যা—তা—বোধ হয়—ঠিক
বলতে পারি না—’

তাহার ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। এমন কিছু
গুরুতর বিষয় নয়, তিনি এমন অসহ্য হইয়া পড়িলেন কেন?

তাহাকে সজ্ঞা হইতে উদ্ধার করিলেন অমরেশবাবু,
হাসিয়া বলিলেন, ‘তা গিয়ে থাকে যাক গে, আর একখানা
নেবেন। নকুলেশবাবু, আমারও কিন্তু একখানা চাই।
আমিও গ্রুপে ছিলাম।’

নকুলেশবাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, ‘ও ছবিটা আর
পাওয়া যাবে না। মেগেটিভ বুঁজে পাচ্ছি না।’

‘সে কি! কোথায় গেল মেগেটিভ?’

দেখিলাম, ব্যোমকেশ ভীর্ণ দৃষ্টিতে নকুলেশ বাবুর পানে
চাহিয়া আছে। তিনি বলিলেন, ‘আমার ঠুঁড়িতে অত্যন্ত
মেগেটিভের সঙ্গে ছিল। আমি দিন দুয়েকের ভেঁজে কলকাতা
গিয়েছিলাম, ঠুঁড়িও বন্ধ ছিল; ফিরে এসে আর সেটা বুঁজে
পাচ্ছি না।’

পাণ্ডে বলিলেন, ‘ভাল করে বুঁজে দেখবেন। নিশ্চয়
কোথাও আছে, যাবে কোথায়।’

এ প্রসঙ্গ লইয়া আর কোনও কথা হইল না। এদিকে
সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। আমরা
গাছোখানের উদ্যোগ করিলাম; কারণ অর্ধাশ্বের পর
ব্যোমকেশকে বাহিরে রাখা নিরাপদ নয়।

এই সময় দেখিলাম একটি প্রেক্ষাগৃহ লোক-কখন
আসিয়া মহীধর বাবুর পাশে দাঁড়াইয়াছে এবং নিঃশব্দে
তাহার সহিত কথা কহিতেছে। লোকটি যে নিমজ্জিত
অভিধি নয় তাহা তাহার বেশবাস দেখিয়াই অনুমান করা
যায়। দীর্ঘ কক্ষালসার দেহে আব ময়লা মুক্তি ও স্তম্ভিত
কামিজ, চক্ষু এবং গণ্ডস্থল কোটরপ্রবিষ্ট, যেন মুতিমান হুঁজি।
তবু লোকটি যে ভক্তশ্রেণীর তাহা বোঝা যায়।

মহীধরবাবু আমার অনতিদূরে উপবিষ্ট ছিলেন, তাই
তাহাদের কথাবার্তা কানে আসিল। মহীধরবাবু একটু
অগ্রসর হয়ে বলিলেন, ‘আবার কি চাই বাপু? এই তো
পরশ তোমাকে টাকা দিয়েছি।’

লোকটি ব্যগ্র-বিহ্বল হয়ে বলিল, ‘আজ্ঞে আমি টাকা
চাই না। আপনার একটা ছবি একেছি তাই দেখাতে
এসেছিলাম।’

‘আমার ছবি?’

লোকটির হাতে একটা পাকানো কাগজ ছিল, সে তাহা
খুলিয়া মহীধরবাবুর চোখের সামনে ধরিল।

মহীধরবাবু সন্মুখে ছবির পানে চাহিয়া রহিলেন।
আমারও কৌতূহল হইয়াছিল, উঠিয়া গিয়া মহীধরবাবুর
চোখের পিছনে দাঁড়াইলাম।

‘ছবি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শাদা কাগজের
উপর ফ্রেমের আঁকা ছবি, মহীধরবাবুর বুক পর্যন্ত প্রতিচ্ছবি;
পাকা হাতের নিঃসংশয় কয়েকটি রেখায় মহীধরবাবুর
অবিকল চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে।’

‘আমার দেখাদেখি রজনীও আসিয়া পিতার পিছনে
দাঁড়াইল এবং ছবি দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, ‘বাঃ! কি
সুন্দর ছবি!’

তখন আরও কয়েকজন আসিয়া জুটিলেন। ছবিখানা
হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল এবং সকলের মুখেই প্রশংসা
গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। হৃৎকণ্ঠীভিত্তি চিত্রকর অদূরে দাঁড়াইয়া
গদগদ মুখে দুই হাত ঘষিতে লাগিল।

মহীধরবাবু তাহাকে বলিলেন, ‘তুমি তো খাসা ছবি
আঁকতে পার। তোমার নাম কি?’

চিত্রকর বলিল, ‘আজ্ঞে আমার নাম ফাল্গুনী পাল।’

মহীধরবাবু পকেট হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির
করিয়া প্রদত্ত করে বলিলেন, ‘বেশ বেশ। ছবিখানি আমি
নিলাম। এই নাও তোমার পুরস্কার।’

ফাল্গুনী পাল কঁকড়ার মত হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ নোট
পকেটস্থ করিল।

পুরস্কার পাণ্ডে ললাট কুঞ্চিত করিয়া ছবিখানা দেখিতে-
ছিলেন; হঠাৎ মুখ তুলিয়া ফাল্গুনীকে প্রশ্ন করিলেন, ‘তুমি তাঁর
ছবি আঁকলে কি করে? কটো থেকে?’

ফাল্গুনী বলিল, ‘আজ্ঞে না। তাঁকে পরশুদিন একবার
দেখেছিলাম—তাই—’

‘একবার দেখেছিলে তাতেই ছবি একে ফেললে?’

ফাল্গুনী আশ্চর্য্যে কহিয়া বলিল, ‘আজ্ঞে
আমি পারি। আপনি যদি ছকুম দেন আপনার ছবি
একে দেব।’

পাণ্ডে কণ্ঠক নীরব থাকিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা বেশ।
তুমি যদি আমার ছবি একে আনতে পার, আমিও তোমাকে
দশ টাকা বকশিস দেব।’

ফাল্গুনী পাল সন্মুখে সকলকে নমস্কার করিয়া চলিয়া
গেল। পাণ্ডে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘দেখা
যাক। আমি তাঁদের পিকনিক গ্রুপে ছিলাম না।’

ব্যোমকেশ অহুমোদনচক বাত্ন নাড়িল।

অন্তঃপুর সভা ভঙ্গ হইল। মহীধরবাবুর মোটর আমাদের
বাড়ী পৌছাইয়া দিল। সোম-দম্পতিও আমাদের সঙ্গে
ফিরিলেন।

৩

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় আমরা তিন জন বসিবার ঘরে দোরভাড়া বসে বসিরা বসিরাছিলাম। মৈশ আহারের এখনও বিলম্ব আছে। ব্যোমকেশ আরাম কেন্দ্রার বসিরা বলবৎক ডাক্তারি মত চুপ দিয়া দিয়া পান করিতেছে; সভ্যবতী তাহার পাশে একটা চেয়ারে রূপার মুড়ি দিয়া বসিরাছে। আমি সমুখে বসিরা মাঝে মাঝে পকেট হইতে সিগারেটের ডিবা বাহির করিতেছি, আবার রাখিয়া দিতেছি। ব্যোমকেশের গল্পনা খাইবার আর ইচ্ছা নাই। চারের জলসার আলোচনাই হইতেছে।

আমি বলিলাম, ‘আমরা শিল্প-সাহিত্যের কত আদর করি ফান্ডনী পাল তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। লোকটা সত্যিকার গুণী, অথচ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।’

ব্যোমকেশ একটু অতমনক ছিল, বলিল, ‘পেটের দায়ে ভিক্ষে করছে তুমি জানলে কি করে?’

বলিলাম, ‘ওর চেহারা আর কাপড়-চোপড় দেখে পেটের অবস্থা আন্দাজ করা শক্ত নয়।’

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, ‘শক্ত নয় বলেই তুমি ভুল আন্দাজ করেছ। তুমি সাহিত্যিক, শিল্পীর প্রতি তোমার সহানুভূতি স্বাভাবিক। কিন্তু ফান্ডনী পালের শারীরিক দুর্গতির কারণ অস্বাভাবিক নয়। আসলে খাওয়ার চেয়ে পানীয়ের প্রতি তার টান বেশী।’

‘অর্থাৎ মাতাল? তুমি কি করে বুঝলে?’

‘প্রথমত, তার ঠোঁট দেখে। মাতালের ঠোঁট যদি লক্ষ্য কর, দেখবে বৈশিষ্ট্য আছে; একটু ভিজে ভিজে, একটু শিথিল—ঠিক বুঝতে পারব না, কিন্তু দেখলে বুঝতে পারি। দ্বিতীয়ত, ফান্ডনী যদি সুখার্ড হ’ত তা হলে খাজদব্যক্তদের প্রতি লোভন দৃষ্টিপাত করত, টেবিলের উপর ভরমণ প্রচুর খাবার ছিল। কিন্তু ফান্ডনী সেদিকে একবার ফিরেও তাকাল না। তৃতীয়ত; আমার পাশ দিয়ে যখন চলে গেল তখন তার গায়ে মদের গন্ধ পেলাম। খুব স্পষ্ট নয়, শুধু মদের গন্ধ।’ বলিয়া ব্যোমকেশ নিজের বল-বর্ধক ওষধিট ভুলিয়া লইয়া এক চুমুক পান করিল।

সভ্যবতী বলিল, ‘বাক পে, মাতালের কথা শুনে ভাল লাগে না। কিন্তু ছবি চুরির এ কি ব্যাপার গা? আমি শু কিছু বুঝতেই পারলাম না। মিথিলা ছবি চুরি করবে কেন?’

ব্যোমকেশ কতকটা আপন মনেই বলিল, ‘হয়তো পাণ্ডে-সাহেব ঠিকই বলেছেন। কিন্তু—। যদি তা না হয় তা হলে তাববার কথা... পিকনিকে গুপ্ত-ছবি তোলা হয়েছিল। আজ চারের পার্টিতে বীরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই পিকনিকে ছিলেন—পাণ্ডে ছাড়া।... ছবির তিনটে কপি ছাপা

হয়েছিল; তার মধ্যে একটা চুরি গেছে, বাকি দুটো আছে কিনা জানা যায় নি—মেগেটটটাও পাওয়া যাচ্ছে না।—’ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, ‘ইনি ছবির কথার এমন দাবড়ে গেলেন কেন বুঝা গেল না।’

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর আমি বলিলাম, ‘কেউ যদি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটা সরিয়ে থাকে তবে সে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘উদ্দেশ্য কি একটা অজিত? কে কোন্ মতলবে ফিরছে তা কি অত সহজে বরা যায়? প্রথম কর্মণো গতিঃ। সেদিন একটা মার্কিন পত্রিকার দেখছিলাম, ওদের কোন্ একটা ছু’তে এক বানর-দম্পতি আছে। পুরুষ বানরটা এমনি হিংস্রটে, কোন্ও পুরুষ-দর্শক বাঁচার কাছে এলেই বোকে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে।’

সভ্যবতী থিলু থিলু করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, ‘তোমার যত সব আবারে গল্প। বানরের কখনও এত বুদ্ধি হয়?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘এটা বুদ্ধি নয়, হৃদয়বোধ; সরল ভাষায় ধোঁম ঈর্ষা। মানুষের মধ্যেও যে ও-বস্তুট আছে আশা করি তা অস্বীকার করবে না। পুরুষের মধ্যে তা আছেই, মেয়েদের মধ্যে আরও বেশী আছে। আমি যদি মহীশূরবাবুর মেয়ে রজনীর সঙ্গে বেশী মাখামাখি করি তোমার ভাল লাগবে না।’

সভ্যবতী রূপারের একটা প্রান্ত ঠোঁটের উপর বসিয়া মত চক্ষে চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, ‘কিন্তু এই ঈর্ষার সঙ্গে ছবি চুরির সম্বন্ধটা কি?’

‘যেখানে জী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আছে সেখানেই এ ধরনের ঈর্ষা থাকতে পারে।’ বলিয়া ব্যোমকেশ উল্লসিত হৃদয়ে ছাদের পানে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, ‘মোটত খুব জোরালো মনে হচ্ছে না। কিন্তু এ ছাড়া অত কোন্ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে না কি?’

‘পারে। চিত্রকর ফান্ডনী পাল চুরি করে থাকতে পারে। একটা মানুষকে একবার মাত্র দেখে সে ছবি আঁকতে পারে, তার এই দাবি সম্ভবত মিথ্যে। কটো দেখে ছবি সহজেই আঁকা যায়। ফান্ডনী সকলের চোখে চমক লাগিয়ে দিয়ে বেশী টাকা রোজগার করার চেষ্টা করছে কিনা কে জানে।’

‘হঁ। আর কিছু?’

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, ‘কটোআকার মকুলেশবাবু স্বয়ং ছবি চুরি করে থাকতে পারেন।’

‘মকুলেশবাবুর দাব কি?’

‘তার ছবি আরও বিক্রি হবে এই দাব।’ বলিয়া ব্যোমকেশ হুচ্‌কি হুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

‘এটা সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?’

‘ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। আমেরিকার ফসলের দাম বাড়ানোর জন্য ফসল পুড়িয়ে দেয়।’

‘আচ্ছা। আর কেউ?’

‘ঐ দলের মধ্যে হয়তো এমন কেউ আছে যে নিশ্চিন্তভাবে নিজের অস্তিত্ব হচ্ছে ফেলতে চায়—’

‘মানে—দাঙ্গী আসামী?’

‘এই সময় ঘরের বাকি ঘরে যুহু টোকা পড়িল। আমি গিয়া ঘর পুলিশ দিলাম। অধ্যাপক সোম গরম ডেসিং পাউন্ড পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে বাগত করিলাম। আমরা আসা অবধি তিনি প্রায় প্রত্যহ এই সময় একবার মামিয়া আসেন। কিছুকণ গল্পগুজন হয়; তার পর আহ্বারের সময় হইলে তিনি চলিয়া যান। তাঁহার গৃহিণী দিনের বেলা দু’একবার আসিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্যবতীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ তাঁহার দেখা যায় নাই। সত্যবতীও মহিলাটির প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে নাই।

সোম আসিয়া বলিলেন। তাঁহাকে একটি সিগারেট দিয়া নিজে একটি ধরাইলাম। ব্যোমকেশের সাক্ষাতে ধূমপান করিবার এই একটা সুযোগ; সে খিঁচাইতে পারিবে না।

সোম জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আজ পার্টি কেমন লাগল?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘বেশ লাগল। সকলেই বেশ কথিত-চিত্ত ভ্রমলোক বলে মনে হ’ল।’

সোম সিগারেটে একটা টান দিয়া বলিলেন, ‘বাইরে থেকে সাধারণতঃ তাই মনে হয়। কিন্তু সেকথা আপনার চেয়ে বেশী কে জানে? মিসেস বক্সী, আজ বাদের সঙ্গে আলাপ হ’ল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কাকে ভাল লাগল বলুন।’

সত্যবতী নিঃসংশয়ে বলিল, ‘রজনীকে। ভারি সুন্দর স্বভাব, আমার বড় ভাল লেগেছে।’

সোমের মুখে একটু অকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিল। সত্যবতী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিল, ‘যেমন মিষ্টি চেহারা তেমন মিষ্টি কথা; আর ভারি বুদ্ধিমতী।—আচ্ছা, মহীধরবাবু এখনও মেয়ের বিয়ে কেন দিচ্ছেন না? ওঁর তো টাকার অভাব নেই।’

ঘরের দিকট হইতে একটি ভীম ভীম কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিলাম—

‘বিধবা! বিধবা! বিধবাকে কোন্ হিঁহর ছেলে বিয়ে করবে?’

মালতী দেবী কখন ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন জানিতে পারি নাই। সংবাদটি যেমন অপ্রত্যাশিত, সংবাদ-দাতার আবির্ভাবও তেমন বিস্ময়কর। হতভম্ব হইয়া

তাকাইয়া রহিলাম। মালতী দেবী ঈর্ষাভিহীন মননে আমাদের একে একে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বলিলেন, ‘বিধাস হচ্ছে না? উনি জানেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন। এখানে সবাই জানে। অতি বড় বেহারা না হলে বিধবা মেয়ে আইনুতো সেকে বেড়ায় না। কিন্তু হুঁকান কাটার কি লজ্জা আছে? অত ঘে ছলা-কলা ওগব পুরুষ ধরবার কাঁদ।’

মালতী দেবী যেমন আচম্বিতে আসিয়াছিলেন তেমন অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর হুঁ হুঁ পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অভিভূত হইয়াছিলেন অধ্যাপক সোম। তিনি লজ্জার মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না। কিছুকণ ধীরে-কাটরা গেল। শেষে তিনি বিভ্রান্ত মুখ তুলিয়া দীনকণ্ঠে বলিলেন, ‘আমাকে আপনারা মাপ করুন। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় কোথাও পালিয়ে যাই—’ তাঁর স্বর বুদ্ধিয়া গেল।

ব্যোমকেশ শীঘ্রেরে প্রশ্ন করিল, ‘রজনী সত্যিই বিধবা?’

সোম ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘হ্যাঁ। চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়। মহীধরবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃত্তী ছাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিইয়াছিলেন। বিয়ের দু’দিন পরে প্লেনে চড়ে সে বিলেত যাত্রা করে; মহীধরবাবুই জামাইকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে বিলেত পৰ্যন্ত পৌঁছল না; পথেই বিমান-দুর্ঘটনা হয়ে মারা গেল। কাজেই রজনীকে কুমারী বলা চলে।’

কিছুকণ সবাই চুপচাপ। আমি সোমকে আর একটি সিগারেট দিলাম এবং দেশলাই জ্বলাইয়া ধরিলাম। সিগারেট ধরাইয়া সোম বলিলেন, ‘আপনার আমার পারিবারিক পরিস্থিতি বুঝেই পেরেছেন। আমার জীবনের ইতিহাসও অনেকটা মহীধরবাবুর জামাইয়ের মত। গরীবের ছেলে ছিলাম এবং ভাল ছাত্র ছিলাম। বিয়ে করে খণ্ডরের টাকার বিলেত যাই। কিন্তু উপসংহারটা সম্পূর্ণ অত রকমের হ’ল। আমি বিদ্যালয় করে ফিরে এলাম এবং এক কলেজের অধ্যাপক হলাম। কিন্তু বেশীদিন টিকতে পারলাম না। কাজ ছেড়ে দিয়ে আজ সাত বছর এখানে বাস করছি। অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই; আমার জীবন অনেক চাঁকা।’

কথাগুলিতে অন্তরের তিত্ততা ফুটিয়া উঠিল। আমি একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কাজ ছেড়েছিলেন কেন?’

সোম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ‘লজ্জার। জী-বাবীনতার যুগে জীকে ঘরে বস করে রাখা যায় না—অশচ—। মাঝে মাঝে তাবি, বিমান-দুর্ঘটনাটা যদি রজনীর খাবীর না হয়ে আমার হ’ত; সব দিক দিয়েই সুখী হ’ত।’

সোম ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ব্যোমকেশ পিছন

হইতে বলিল, 'প্রোকেশার লোম, যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করি। যে গ্রুপ ছবিটা কিনেছিলেন সেটা কোথায়?'

সোম কিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'সেটা আমার জী কুচি কুচি করে ছিঁড়ে কেলে দিয়েছেন। তাতে আমি আর রজনী পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম।'

সোম বীরপদে প্রস্থান করিলেন।

রাতে আহায়ে বসিয়া বেশী কথাবার্তা হইল না। হঠাৎ এক সময় সভ্যবতী বলিয়া উঠিল, 'যে যাই বলুক, রজনী তারি ভাল মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছে, বাপ যদি সাজিয়ে গুজিরে রাখতে চান তাতে দোষ কি?'

ব্যোমকেশ একবার সভ্যবতীর পানে তাকাইল, তারপর নির্লিপ্ত স্বরে বলিল, 'আজ পার্টিতে একটা সামান্য ঘটনা লক্ষ্য করলাম, ভোমাদের বোধ হয় চোখে পড়ে নি। মহীধরবাবু তখন ছবি চুরির গল্প আরম্ভ করেছেন, সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে। দেখলাম, ভাতার খটক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, রজনী চুপি চুপি তার কাছে গিয়ে তার পকেটে একটা চিঠির মতন ভাঁজ করা কাগজ কেলে দিলে। ছ'জনের মধ্যে একটা চকিত চাউনি খেল গেল। তারপর রজনী সেখান থেকে সরে এল। আমার বোধ হয় আমি ছাড়া এ দৃশ্য আর কেউ লক্ষ্য করে নি। মালতী দেবীও না।'

৪

দিন পাঁচ ছয় কাটায়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশের শরীর এই কয়দিনে আরও সারিয়াছে। তাহার আহায়ে বরাদ্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সভ্যবতী তাহাকে দিনে দুইটি সিগারেট খাইবার অনুমতি দিয়াছে। আমি নিত্য গুরুভোজনের ফলে দিন দিন ধোদার বাসী হইয়া উঠিতেছি, সভ্যবতীর গারেও গতি লাগিয়াছে। এখন আমরা প্রত্যহ বৈকালে ব্যোমকেশকে লইয়া রাস্তার রাস্তার পাদচারণ করি, ফারণ হাওরা বদলের ইহা একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সকলেই খুশী।

৫

এক দিন আমরা পথ-ভ্রমণে বাহির হইরাছি, অধ্যাপক সোম আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, বলিলেন, 'চলুন, আজ আমিও আপনাদের সহযাত্রী।'

সভ্যবতী একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল,—'মিসেস সোম কি—?'

সোম প্রকৃত স্বরে বলিলেন, 'তার সর্দি হয়েছে। শুয়ে আছেন।'

সোম যিকত লোক, কেবল জী সঙ্গে থাকিলে একটু নির্ভাব হইয়া পড়েন। আমরা নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ছবি চুরির প্রসঙ্গ আপনা হইতেই উঠিয়া পড়িল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা বলুন দেখি, এই ছবিখানা কাগজে বা পত্রিকায় ছাপানোর কোনও প্রস্তাব হয়েছিল কি?'

সোম চকিতে একবার ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর জঁ কুচি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, 'কৈ আমিও কিছু জানি না। তবে নকুলেশ বাবু মাঝে কলকাতা গিয়েছিলেন বটে। কিন্তু আমাদের না জানিয়ে তিনি ছবি ছাপতে দেবেন কি? মনে হয় না। বিশেষত ডেপুটি উবা-নাথ বাবু জানতে পারলে তারি অসন্তুষ্ট হবেন।'

উদ্যানাথ বাবু অসন্তুষ্ট হবেন কেন?

উনি একটু অদ্ভুত গোছের লোক। বাইরে বেশ গ্রাস্তারি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীক প্রকৃতি। বিশেষত ইংরেজ মনিবকে * যমের মত ভয় করেন। সাহেবেরা বোধ হয় চায় না যে এক জন হাকিম সাধারণ লোকের সঙ্গে কটো তোলাবে, তাই উদ্যানাথবাবুর কটো তোলাতে ঘোর আপত্তি। মনে আছে, পিকনিকের সময় তিনি প্রথমটা কটোর দলে থাকতে চান নি, অনেক বলে-করে রাজী করাতে হয়েছিল। এ ছবি যদি কাগজে ছাপা হয় নকুলেশ বাবুর কপালে হুঃখ আছে।

ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম সে মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, উদ্যানাথ বাবু কি সব সময়েই কালো চশমা পরে থাকেন?

সোম বলিলেন, 'হাঁ। উনি বছর দেড়েক হ'ল এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, তার মধ্যে আমি তাঁকে কখনও বিনা চশমায় দেখি নি। হয়ত চোখের কোনও দুর্বলতা আছে, ভ্রমলোক আলো সহ করতে পারেন না।'

ব্যোমকেশ উদ্যানাথবাবু সবচেয়ে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। হঠাৎ বলিল, 'কটোআকার নকুলেশ সরকার লোকটি কেমন?'

সোম বলিলেন, 'চতুর ব্যবসাদার, খটে বুদ্ধি আছে। মহীধরবাবুকে খোশামোদ করে চলেন, শুনেছি তাঁর কাছে টাকা ধার নিয়েছেন।'

তাই নাকি? কত টাকা?

তা ঠিক জানি না। তবে মোটা টাকা।

এই সময় সামনে কটু কটু শব্দ শুনিয়া দেখিলাম একটা মোটর বাইক আগিতেছে। আরও কাছে আগিলে চেনা গেল, আরোহী ডি-এস-পি পূরন্দর পাণ্ডে। তিনিও আমাদের চিনিয়াছিলেন, মোটর বাইক থামাইয়া সহাত্মস্বপ্নে অভিবাধন করিলেন।

কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কান্তনী পাল আপনাদের ছবি এঁকেছে?'

* যে সময়ের গল্প তখনও ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয় নাই।

পাণ্ডে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, ভাঙ্কর ব্যাপার মশাই। পর দিনই ছবি নিয়ে হাজির। একেবারে ছবছ ছবি একেছে। অথচ আমার ফটো তার হাতে যাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। সত্যি শুণী লোক। দশ টাকা বসাতে হ'ল।

ব্যোমকেশ সহান্তে বলিল, কোথায় থাকে সে ?

পাণ্ডে বলিলেন, আর বলবেন না। অন্তবস্ত্র শুণী কিন্তু একেবারে হস্তভাগ্য। পাঁচ মেশাখোর—মদ পীড়া শুণী কোকেন কিছুই বাদ যায় না। মাসখানেক এখানে এসেছে। এখানে এসে যেখানে সেখানে পাণ্ডে থাকত, কোনও দিন কাকুর বারান্দার, কোনও দিন কাকুর খড়ের গাদায় রাত কাটাতে। মহীধরবাবু দয়া করে নিজের বাগানে থাকতে দিয়েছেন। তাঁর বাগানের কোণে একটা যেটে ঘর আছে, দু'দিন থেকে সেখানেই আছে।

হস্তভাগ্য এবং চরিত্রহীন শিল্পীর যে-দশা হয় কান্ডমীরও তাই হইয়াছে। তবু কিছুদিনের জন্তও সে একটা আশ্রয় পাইয়াছে আশ্রয় মনটা আশ্রয় হইল।

পাণ্ডে আবার বাতীতে ঠাঁট দিবার উপক্রম করিলে সোম বলিলেন, আপনি এদিকে চলেছেন কোথায় ?

পাণ্ডে বলিলেন, মহীধরবাবুর বাড়ীর দিকেই যাবি। মকুলেশ বাবুর ঘুবে শুমলাম তিনি হঠাৎ অনুহ হয়ে পড়েছেন। তাই বাতী যাবার পথে তাঁর ঘর নিয়ে যাব।

কি অনুহ ?

সামান্য সর্দিকাশি। কিন্তু তাঁর আবার হাঁপানির বাত।

সোম বলিলেন, তাই ত, আমারও দেহতে বাতওয়া উচিত।

মহীধরবাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করেন—

পাণ্ডে বলিলেন—বেশ ত, আমার পাড়ীর পিছনের সীটে উঠে বসুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক। ফেরবার সময় আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।

‘তা হলে ত ভালই হয়’, বলিয়া সোম মোটর বাইকের পিছনে গদি-খাটা আসনটিতে বসিয়া পাণ্ডের কোমর জড়াইয়া লইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, আচ্ছা, মহীধরবাবুকে বলে দেবেন আমরা কাল বিকেলে যাব।

আচ্ছা। মনস্কার।

মোটর বাইক দুই জন আরোহী লইয়া চলিয়া গেল।

আমরাও বাতীর দিকে ফিরিলাম। লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশ আপন মনে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। বাতী ফিরিয়া চা পান করিতে বসিলাম। ব্যোমকেশ একটু অসমমনক হইয়া রহিল। দরকা খোলা ছিল, সিঁড়ির উপর ভারী পাথরের আওরাক শোনা গেল। ব্যোমকেশ চকিত হইয়া বাটো গলার বলিল, অব্যাপক সোম কোথায় গেছেন এ প্রেমের যদি

কবাব দেবার দরকার হয়, ব'লে তিনি মিষ্টার পাণ্ডের বাড়ীতে গেছেন।

কথাটা ভাল করিয়া জরদরদ করিবার পূর্বেই প্রেমের উত্তর দিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। মালতী দেবী ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সন্নিহিত তাহার যুগধানা আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু রক্তাক্ত, তিনি ঘরের চারিদিকে অনু-সন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সভ্যবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আহম মিসেস সোম।

মালতী দেবী ধরা ধরা গলায় বলিলেন, না, আমার শরীর ভাল নয়। উনি আপনাদের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন, কোথায় গেলেন ?

ব্যোমকেশ ঘরের কাছে আসিয়া সহজ স্বরে বলিল, রাত্তার পাণ্ডে সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি প্রোফেসর সোমকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

মালতী দেবী বিস্ময় ভরে বলিলেন, পুলিশের পাণ্ডে ? তাঁর সঙ্গে তার কি দরকার ?

ব্যোমকেশ সরলভাবে বলিল, তা তো কিছু শুনলাম না। পাণ্ডে বললেন, চলুন আমার বাড়ীতে চা খাবেন। হয় ত কোমণ্ড কাজের কথা আছে।

মালতী দেবী আমাদের তিন জনের যুগ ভাল করিয়া দেখিলেন, একটা গুরুভার নিশ্বাস ফেলিলেন, তার পর আর কোমণ্ড কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

ব্যোমকেশ আমাদের পানে চাহিয়া একটু সজ্জিত তাবে হাসিল, বলিল, ডাঁহা মধ্যে কথা বলতে হ'ল। কিন্তু উপায় কি ? বাড়ীতে দাম্পত্য-দাদা হওয়াটা কি ভাল ?

সভ্যবতী বাকা স্বরে বলিল, ভোমাদের সহানুভূতি কেবল পুরুষের দিকে। মিসেস সোম যে সন্দেহ করেন সে মেহান্ত হচ্ছে নয়।

ব্যোমকেশেরও বর গরম হইয়া উঠিল, আর ভোমাদের সহানুভূতি কেবল মেয়েদের দিকে। স্বামীর ভালবাসা না পেলে ভোমরা হিংসের চৌচির হয়ে যাও, কিন্তু স্বামীর ভাল-বাসা কি করে রাখতে হয় তা জান না।—যাক, অজিত, ভোমাকে একটা কাজ করতে হবে তাই, বাইরের বারান্দার পাহারা দিতে হবে। সোম ফিরলেই তাঁকে চেতিয়ে দেওয়া দরকার, নৈলে মধ্যে কথা যদি ধরা পড়ে যায় তা হলে সোম ত যাবেই, সেই সঙ্গে আমাদেরও অশেষ দুর্গতি হবে।

আমরা কোমণ্ড আপত্তি ছিল না। বাহিরের বারান্দার একটা চেয়ার পড়িয়া থাকিত, তাহাতে বসিয়া মনের সুখে সিগারেট টানিতে লাগিলাম। বাহিরে একটু ঠাণ্ডা বৈশি, কিন্তু আলোয়ান গারে থাকিলে কষ্ট হয় না।

সোম ফিরিলেন প্রায় বটাখানেক পরে। পাণ্ডের মোটর

বাইক কট কট শব্দে কটকের বাহিরে দাঁড়াইল, সোমকে
নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তিনি বারান্দার উঠিলে আমি
বলিলাম, শুনে যান। কথা আছে।

বসিবার ঘরে ব্যোমকেশ একলা ছিল। সোমের মুখ
দেখিলাম, গভীর ও কঠিন। ব্যোমকেশ বলিল, মহীধরবার
কেমন আছেন?

সোম সংক্ষেপে বলিলেন, ভালই।

ওখানে আর কেউ ছিল নাকি?

শুধু ডাক্তার ঘটক।

ব্যোমকেশ শুধু মালতী-সংবাদ সোমকে শুনাইল।

সোমের গভীর মুখে একটু হাসি ফুটল। তিনি বলিলেন,

—‘যতবাদ।’

ক্রমশঃ

আগ্নেয় রজনী

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অস্থির অশান্ত যুগে পঞ্চায়েদী সমাজের আঁহা
পড়েছে কি-আজ তব মুক্ত বাতাসনে।

ঐতিহ্যের উপকণ্ঠে উৎকণ্ঠিত মরমের মায়া

এ যক্ষ বাতব ভূমে ভ্রম্মা জাগরণে

প্রত্যক হ'ল কি ভব?

বহ্নিম পহার রেখা পাহা জ্বলে দীর্ঘতর হয়ে

এনে দেয় বক্ষ আশা আলত বিলাসে,

অন্ধ বজ্র বহিরের প্রাত্যহিক আর্জনাৎ লয়ে

জীবন-সাগর হ'তে বিশ্বচিন্তাকালে

বিষবাপ্প ওঠে নব।

তুমি স্নহ মননের শিল্প একে রাবিবে কোথায়?

চুর্যোগ উৎসবে ছের বনবীধি শিহরে ব্যথায়।

দূরে দূরে যার দেখা অবলম্ব পায়ে-চলা পথে

যাঈদল—বৈদে ক্রান্ত ভয় মনোরথে :

হৃদয়ের কণ্ঠে

সান্ত্বনা-প্রলেপ কেহ দিয়েছে কি?—প্রশ্ন জাগে মনে।

শক্তির মূঢ়তা লয়ে যুববন্ধ বর্করের সনে

চলে ইতিহাস।

ঔরতের অভিযানে নাহি কোন বাণীর সঙ্গতি।

পরিহাস করে কারা? কোন অভিনায়

পুলিল না প্রিয়তমে। নিখিলের সন্তানসন্ততি

করে উপবাস।

রাজির ললাটে কোন নাকুল্যের ছলে নাক' টিপ,

বারে বারে শিবে যার সংসারের কল্যাণ-প্রদীপ।

শোণিতের স্রোতে হার, ডুবে গেল বৃদ্ধ বন্যপতি

একে একে অরণ্যের যত মহীকূহ।

বিশাল বিটপীশ্রী তেদে পড়ে : অসংখ্য হুগতি

সমাজ-সংসারে ছের রচিত্তেছে হাহ।

ভয়াবহ অনাগত দিন।

বিখ্যায় বিজয়ধ্বজা উড়িতেছে শঠতার শিরে

প্রান্তরে কান্তারে কত দহন যাবাবর।

সত্যের শাখত শক্তি পছ হ'ল জীবনের তীরে

দলিত পদ্মের মত মধ্যবিত্ত বর ;

এ নিখিল আনুহুধাহীন।

তুমি তো জানিলে নাকো ভালোবাসা—ভাও মিলহার,

প্রেমের সমাধি-তীর্থে বিরহের কোথা অশ্রুবারা।

আগ্নেয় রজনী এলো আঁধারের হাহ ভেদ ক'রে

অশান্তির কোলাহল আর কলরবে

আদিগন্ত নীল নভে

লক তারা করে।

গলিত উলঙ্গ শব স্থলিত প্রহরে।

প্রশ্নোন্মেষ বন্ধে জলে চিতা : চাঁদ ডুবে গেছে কবে।

কালের স্থবির যাত্রা চলে অবিরত,

তুমি তো জানিলে নাকো কত প্রাণ ছুঁবে হ'ল পত।

কত যৌবনের আশা টুটে গেল নিমেষে সহসা,

মেমে এলো ভাঙা ঘরে অবিশ্রান্ত হুঃখের বরষা।

শ্রীরঙ্গম্

ত্রিসাধনা চট্টোপাধ্যায়

ভিলেমের শেখ সপ্তাহ। ইচ্ছা ছিল, 'বৈকুণ্ঠ' একাদশীর দিন শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের দরবারে হাজির থাকি। কিন্তু কার্যসমূহে তাহা আর ঘটনা উঠিল না। চিদমপুট হইয়া

জিচিমপল্লীর দিকে রওনা হইলাম সর্বসিদ্ধা জয়োদশিতে।

রাজি সাত্রে আটটার 'জিচিমপল্লীতে' গাড়ী পৌছিবার কথা। কিন্তু গাড়ী আটকা পড়িল শ্রীরঙ্গম্ ষ্টেশনে— জিচিমপল্লী হইতে তিন মাইল দূরে। ষ্টেশনের অনতিদূরেই মন্দির। গাড়ী হইতে মন্দিরটি একটি অত্যাচ্চ, কিন্তু বিশালকার, মিমারের মত দেখায়— নানা রঙের বিজলী আলোর লতা উহার দেহ বাহিয়া শিখরদেশে উঠিয়া গিয়াছে। শিখর-শীর্ষে অত্যাচ্ছল আলো—বহুদূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

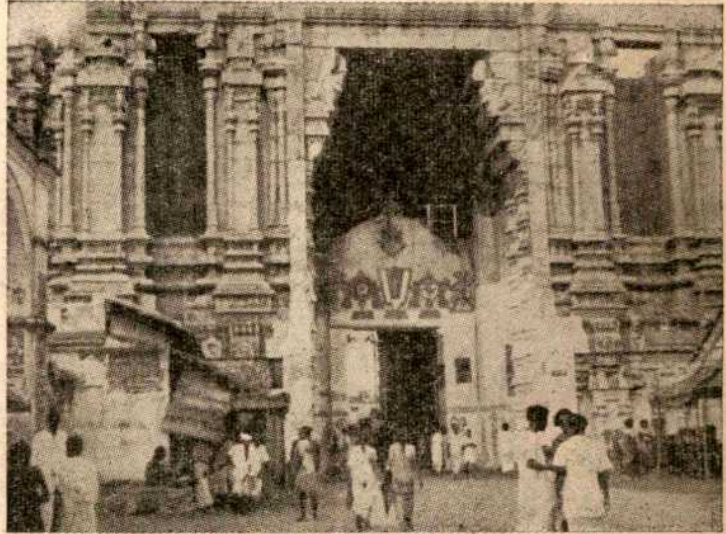
'শ্রীরঙ্গনাথ জয়তু'। ষ্টেশনে সে কি কোলাহল। পিপীলিকাক্রোশের মত লোক সারি বাঁধিয়া আসিতেছে, যাই-তেছে। তাহার আদি মাই অন্তঃ মাই। চারিদিকে তক্তের উচ্ছাসময় কলকণ্ঠের সঙ্গীত, ভোজপাঠ ও বন্দনাসংগীত। বেশীর ভাগই তামিল ভাষায়। বুধবার সাধ্য মাই অথচ অষ্টকু মর্গ স্পর্শ করে।

'শ্রীরঙ্গনাথ জয়তু'। অবাধ হইলাম। দক্ষিণাপথ শিবের দেশ। কৈলাসপতি মটরাজের বিভিন্ন রূপের উপাসনা চারি দিকে—জয় শিব, জয় শঙ্কর, জয় শূলপাণি। যে দেশে মন্দির বলিতেই 'শিব'মন্দির বুঝায় সে দেশে এক বিজুতন্ত্র। শ্রীরঙ্গম্ বিজুমন্দির—সারা ভারতের বৈজবদের পরম ভীষণ।

ভীষণযাত্রীদের এখন ঘরে কিরিবার পালা। মিনিট পনের পর পর করেফোনা স্পেশাল ট্রেন চলিয়া গেল। ষ্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার জন্ত রেলকর্তৃপক্ষ 'লাউড স্পীকার'ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে সকল শ্রেণীর যাত্রীদেরই সুবিধা হইয়াছে। লাইট স্পীকারে প্রচারিত ভাষা তামিল, মালায়ালম্ ও ইংরেজী।

এদিকে আমাদের আটক থাকার মেয়াদ শেষ হইল। ভীষণ হইতে কিরিয়া-আসা প্রচুর তক্ত বোঝাই হইয়া আমাদের গাড়ী বীরে বীরে জিচিমপল্লী ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। যতদূর দেখা গেল, আমরা মন্দিরগাজের আলোকমালার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

জিচিমপল্লী দক্ষিণাপথের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। চালুক্য-দের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চোলরাজবংশ প্রথমে তাঞ্জোরে ও পরে জিচিমপল্লীতে রাজধানী স্থাপন করেন। চোলরাজবংশের প্রতিপত্তি কালে তাহাদের রাজত্ব সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে, এমন



মন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রথম তোরণ

কি মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিশাল ছিল তাহাদের নৌ-বাহিনী। সে বাহিনীর সাহায্যে সিংহল এবং ভারত মহা-সাগরের কতকগুলি দ্বীপও আঁসিয়াছিল তাহাদের অধিকারে। ভারপর হইল চোলবংশের পতন। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে চালুক্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা পরাজিত হইলেন। চালুক্যরাজ বিজয়নগরের পরাক্রমে চোলরাজ্য কপূরের মত উবিয়া গেল।

চোল-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য জিচিমপল্লীর ইতিহাস শেষ হয় মাই। কালচক্রের আবর্তনে বহু রাজবংশের উত্থানপতন ঘটয়াছে, কিন্তু জিচিমপল্লীর নাম এবং পৌরব কথনও ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হয় মাই।

জিচিমপল্লীতে থাকিবার ব্যবস্থা হইল রেল কোম্পানীর যাত্রী-নিবাসে। ষ্টেশনের উপরেই সেই যাত্রীনিবাস; ঘরগুলি আধুনিক হোটেলের ধরণে সাজানো। ভোজালে, বিছানা ইত্যাদি সমস্তই রেল কোম্পানী সরবরাহ করে। তাড়া জমপ্রতি চব্বিশ ঘণ্টার চারি টাকা। আহাদের ব্যবস্থা

নির্ভেদে করিতে হয়; যাজ্ঞানিবাসের সঙ্গেই রেল-কর্তৃপক্ষ পরিচালিত ভোজনালয়। আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যেরই বন্দোবস্ত আছে—রন্ধন হয় ইউরোপীয় আর ভারতীয় উভয় পদ্ধতিতেই। তবে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে, উভয়-ভারতের লোকের পক্ষে সে খাদ্যের স্বাদ ক্রটিকর না হওয়াই সম্ভাবনা বেশী।



মন্দিরের সর্কাপেক্ষা উঁচু তোরণ (পূর্বে)

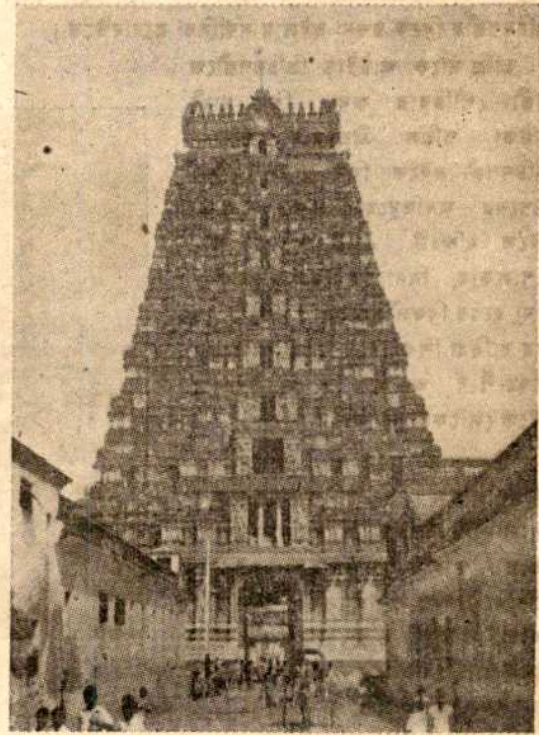
প্রতিদিন সকালবেলা স্নান করিয়াই জীরজনাথ মর্শমে বাহির হইয়া পড়িলাম। ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ হইতে বাস যায়। কলিকাতার তুলনায় বাসের ব্যবস্থা ভাল। বাসের কণ্ট্রিভর বাস কোম্পানীর নির্দেশেই হটক বা পুলিশের ভয়েই হটক নির্দিষ্টসংখ্যক যাজ্ঞীয় বেশী গ্রহণ করে না।

জিচিনপল্লী নুতন পুরাতনে মিশ্রিত অগাধিচুড়ি শহর। চোলরাজ্যের অন্তরমহলের মধ্যে যেন আধুনিক শহর রাতা আসিয়া চুকিয়া পড়িয়াছে। শহরতলীর চারিদিকে নবনগরের জয়পতাকা—সেখানে সুপ্রাচীন জাবিড সত্যভার বা স্থাপত্যের নামগন্ধও নাই। পুরাতন শহরের মধ্যেও আধুনিক ক্রটির নিদর্শন ক্ষুণ্ণগতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চারিদিকে সামঞ্জস্যের অভাব। যেন হয়, চোল-চালুক্য-পল্লীর চিহ্ন বিলুপ্ত হইবার বড় বেশী দেরি নাই।

এক, অপেক্ষাকৃত স্থির আছে পুণ্যভোজ্য কাবেরী। নদীটি

শহরকে ঘর্তন ও বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। তাহার বুকের উপর আধুনিক ও স্নদুত সেতু হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বহুমে না আসিয়াছে তার জড়তা, না থামিয়াছে তার পূর্বভন গতি-ভলী।

বাস আমাদের জীৱজনের দরজার নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজির অঙ্ককারে মন্দিরের যে কলন। করিয়াছিল,ম,

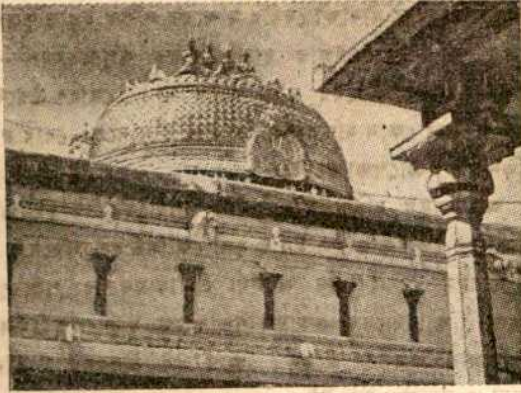


তোরণ (পশ্চিমে)

দিনের আলোকে বাস্তব সে কলনাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। অপূর্ব এ মন্দির, অদ্বুত ইহার কারুকার্য ও স্থাপত্য-শিল্প, আর বিশ্বকর এর বিশালতা।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদ। তখন জিচিনপল্লীর প্রাসাদ-শীর্ষে চোলরাজের জয়পতাকা। কিন্তু দেশে সর্কাদীণ শান্তি নাই। দহ্মা, ভক্তরের তর ব্যাপক। দহ্মাদের মধ্যে যে সর্কাপেক্ষা শক্তিশালী তাহার নাম নীল। সে শত্ৰুবলে বলীয়ান আর লোকবলও তার অগণিত। রাজসৈন্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে সে পরাজিত নহে, বরং রাজসৈন্তরাই সম্যক্রূপে বিচার বিবেচনা না করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাকে সমীচীন মনে করে না। কারণ নীল এই চোলরাজেরই তৃতপূর্ব সেমাপতি। কিন্তু হুধিবার অর্ধলোভ ও প্রাধাত-লোভ তাহার রক্তে। কাজেই রাজাহুযুক্তি তাহার বেশী দিন ছিল না।

যোদ্ধবংশের স্বৰূপ, যুগ্মসংসার তাহার মঙ্গলকর কিন্তু আত্ম-প্রতিষ্ঠার মোহে সে উদ্বৃত্ত। রাজার সমকক্ষতা তাহার কাম্য।



মূল মন্দিরের বর্ণচূড়া

নীলের মঙ্গলকর চোলরাজ সর্বশক্তি মিস্ত্রোজিত করিলেন। ফলে এক সত্ত্বি হইল। নীল দম্যতা বর্জন করিয়া চোলরাজার এক করদ রাজ্যের অধিপতি হইল। নীলের বিচিত্র জীবন-কাহিনীর ইহা প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় বর্ণে তাহার অপরাধ প্রথম-কাহিনী।

কুম্ভবল্লী বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে। রূপে ও গুণে সে অনন্তসাধারণ। ব্যাতি তাহার দেশব্যাপী। বহু বনী ও বিদ্যান স্বৰূপ তাহার পাণ্ডিত্য। কিন্তু কাহাকেও তাহার পছন্দ হয় না।

নীলের কানেও তাহার ব্যাতি পৌছিয়াছে। কিন্তু এত দিন যুক্ত-বিগ্রহে লিপ্ত থাকার এদিকে সে পুরাপুরি মত্ত দিতে পারে নাই। কিন্তু এখন সে একাকী কুম্ভবল্লী সকাশে যাত্রা করিল।

দর্শনমাজ্জই প্রেম। নীলের মনে হইল, কুম্ভবল্লী তাহার যুগ যুগ আকাজিকতা প্রিয়া, কুম্ভবল্লী তাহার জীবনের আনন্দের উৎস। সে তাহার পানি-প্রার্থনা করিল।

এদিকে কুম্ভবল্লীও নীলের প্রতি অহরহ। কিন্তু বৈষ্ণব-বংশের মেয়ে হইয়া কি করিয়া সে শৈববংশের ছেলেকে পতিত্ব বরণ করিবে? বর্ধসিদ্ধাস অপেক্ষা কি সাংসারিক জীবনের সুখ বড়? না, তাহা সে পারিবে না। নিজের জীবনের সুখকে জলাঞ্জলি দিয়া সে বর্ধসিদ্ধাসকে বড় করিয়া রাখিবে।

এদিকে নীল নাছোড়বান্দা। কুম্ভবল্লীকে লাভ করিবার জন্ত সে জীবন-পণ করিয়াছে।

ফলে নীলকে জীবনমূল্য না দিয়া বর্ধসিদ্ধাস দিতে হইল। রক্ষা হইল, যদি নীল প্রতিদিন জনকরূপে বৈষ্ণবের সাধ্যমত সেবা করে, তবে এক বৎসর পরে কুম্ভবল্লী তাহাকে স্বামিত্ব বরণ করিবে। তথাপি।

এক বৎসর পরে নীল ও কুম্ভবল্লীর বিবাহ হইল। আর দীর্ঘকাল বৈষ্ণব ভজনের ফলে নীল পুরাপুরি বিমুক্ত হইয়া পড়িল। যথার্থীতি তাহার বৈষ্ণববর্ণে দীক্ষা হইল। দম্য রত্নাকরের হইয়াছিল শ্রীরাধামাধ-সিদ্ধি আর দম্য নীলের হইল শ্রীবিষ্ণু-সিদ্ধি।



শ্রীমদ্ভগবতের রথযাত্রা

তাহার পর আসিল নীলের বিচিত্র জীবনের তৃতীয় পর্যায়।

বর্ধে দীক্ষা হইল; কিন্তু বর্ধমন্দির কোথায়? দেশ শিবের আবাস—রাজাও শৈববর্ধী। সারা দেশে বিষ্ণু মন্দির একটিও নাই। এ অবস্থা কি নীল মানিয়া লইতে পারে? কিছুতেই না। মন্দিরের জন্ত তীক্ষ্ণ? না, তাহা সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। অবিরত বৈষ্ণবসেবার তাহার নিজের বন সবই নিঃশেষিত হইয়াছে—এমন কি করদ রাজ্যটুকুও বোহ হয় থাকে না। কিন্তু তথাপি একটি বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। উপায়?

উপায়?—উপায় লুপ্ত। ফলে মেগাপটমের বিরাট বৌদ্ধ-মন্দির ধ্বংস হইল, আর সেই ঐশ্বর্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা হইল শ্রীমদ্ভগবতের।

চতুর্থ অধ্যায়ে নীল আর নীল মতে, পরম বৈষ্ণব তিরুমল্লুই আলোড়ায়। তিরুমল্লুই এখন দক্ষিণাপথের বিখ্যাত আলোড়ায়।



‘রঙ্গবিলাস’ তোরণ

সম্রদায়ের কৰ্ত্তা আর বহুসংখ্যক বৈষ্ণব পদাবলীর রচনিত।
তামিল ভাষার এই পদাবলীকে ‘ধেবারম্’ বলে। ‘ধেবারম্’
সুধাবর্ষী ও প্রাণবন্ত বলিয়া বিখ্যাত।

অষ্টম শতাব্দী হইতে বর্তমানে কিরিয়া আসিলাম। দ্বিতীয়
হটক, প্রেমিকই হটক আর ভূপতীই হটক, নীলের সাধনা
অসাধারণ। বিশালভার এ মন্দির ভারতে অদ্বিতীয়; হয়ত
একমাত্র মাহরার মীমাকী দেবীর মন্দিরের সহিত ইহার তুলনা
চলে। কক্ষে কক্ষে ইহার স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ণ মিলন—
চাহিয়া চাহিয়া চোখের তৃপ্তি আসে না। ভোরণ-ঐশ্বৰ্য্যে
দাক্ষিণাত্যের কোন মন্দির অপেক্ষা ইহা হীন নহে—বোধ হয়
অভিন্নবস্ত্রে সৰ্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

আর সমগ্র দক্ষিণাপথের বৈষ্ণব-সমাজের ভিত্তিই এই
ত্রীমম্। সেদিক হইতে ইহার মূল্য কে নির্ধারণ করিবে?

ত্রীমম্ বৈষ্ণবপ্রধান আচার্য্য ত্রীরাধামুখ্যদের পদরেণু-
রঞ্জিত। আচার্য্যদেব একাদশ শতাব্দীতে মাজ্জার চিদল-
পুট জেলার জন্মগ্রহণ করেন। আর এই ত্রীমম্ই তাঁহার
সাধনা ও প্রচারের পাদপীঠ।

মন্দিরের সমস্ত স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে অনেক
সময়ের দরকার। আর মাঝে মাঝে বিশ্রাম না করিলে
চলে না।

যদিও ‘বৈকুণ্ঠ’ একাদশীর মেলা শেষ হইয়া গিয়াছে
তথাপি জনশ্রোতের বেগ মন্দীভূত হয় নাই। প্রায় সকলেই
দক্ষিণাপথের লোক। কিছু কিছু উত্তর ভারতের লোকও
চোখে পড়িল—চোখে পড়িল না কেবল কোন বদবাসীর
মুখ।

মন্দির দর্শন করিয়া আমরা যখন আবার পথে বাহির
হইলাম তখন বেলা আর বড় বেশী নাই।

শ্রাবণে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশে বাজিয়া উঠে মেঘের সারঙ,
হয়ত কিছুটা ফিরে ধরণীর রঙ।
আর্দ্র-বায়ু ধালে কঁাদে ভবন-বলতি,
বনানী বিলাস ঘেম সৌদালি-সুরতি।
বাহিরে বিছাৎ-বটী, ক্ষুদ্র হাহাধর,
কিসের বেদনা তারে গুহরে অন্তর।
ঝাপটে ভিজিয়া গেল শরম-শিখান,
বেশ-বাস-কুন্তল হ’ল যে বিধান।

তুমি কাছে সরে এলে, আরো—আরো কাছে,
এমন মিলন কণ আর না কি আছে।
নিশীথের নীলাঙ্গনে বিরহের লেখা,
পড়ি কঁাদে অহরহ কত মন-কেকা।
শ্রাবণের ঝাঁপি ঘুরে তমালের বনে,
কত রাধা ব্যাকুলিত স্তম-বাশি-বনে।

শিল্পবিদ্যালয়ের কথা

ক্রিয়োগেশচন্দ্র বাগল

১

কলিকাতার কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা এবং প্রথম বৎসরের কার্যকলাপের বিষয় পূর্ববর্তী দুইটি প্রবন্ধে (প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৫২) আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান প্রস্তাবে ইহার পরের আরও দেড় বৎসরের কথা সমসাময়িক সংবাদপত্রসমূহে প্রাপ্ত তথ্যাদির নিরিখে এখানে বলিতে চাই। তবে প্রসঙ্গ আরম্ভের পূর্বে ঐ দুইটি প্রস্তাবের পরিপূরক হিসাবে কয়েকটি বিষয় এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব :

(১) মাস্ত্রাজস্ব ভাঃ হাষ্টারের শিল্পবিদ্যালয়ের অন্তরূপ কলিকাতায় একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া শিল্প বিজ্ঞোৎসাহিনী সভা গঠিত হয় ১৮৫৪, ৩১শে মার্চ দিবসে। এই দিনকার সভায় ঐহারা যোগদান করেন ঠাহারাই শিল্প বিজ্ঞোৎসাহিনী সভার প্রাথমিক সদস্যরূপে পরিগণিত হন। ঠাহারা যথাক্রমে চার্লস এলেন, সিসিল বীভন, ভাঃ বেডফোর্ড, পাত্রী জে. এম. বীলু, ভাঃ সূর্য্য-কুমার গুপ্তিব চক্রবর্তী, জে. এ. ক্রফোর্ড, রামগোপাল ঘোষ, কর্ণেল এইচ. গুড্‌উইন, লেঃ ডব্লিউ. এন্. লীস, পাত্রী জেমস লং, হজসন প্রাট, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ক্যাপটেন এইচ. থুইলিয়র, হেনরি উড্রো এবং ডব্লিউ. জি. ইয়ং। অস্থগীত সভার সভাপতি হন চার্লস এলেন। গুড্‌উইন ও প্রাট সভার উদ্দেশ্য তথা কলিকাতায় একটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করেন। ইহার পর এখানেই স্থির হয় যে, কর্ণেল গুড্‌উইন প্রস্তাবিত সভার সভাপতি এবং হজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদক হইবেন। অর্থ সংগ্রহ, সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবৃতি রচনা এবং আত্মজিক কার্যাদি পরিচালনার নিমিত্ত একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত হইল। সভাপতি ও সম্পাদকদ্বয় বাদে ইহাতে এই সকল সদস্যও ছিলেন—চার্লস এলেন, ভাঃ বেডফোর্ড, জেমস লং, ক্যাপটেন থুইলিয়র, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং চার্লস এলেন। চিত্রবিজ্ঞা, মুৎকার্য ও তক্ষণশিল্প প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এ-দিনকার অধিবেশনেই তাহা স্থিরীকৃত হয়। স্কুল-কলেজ ছুটির পর বৈকালের দিকে এই সকল শিক্ষাদানের কথাও এই সভায় উঠিল।

২। শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তারিখ যে ১৪ই আগষ্ট

নহে, পরন্তু ১৬ই আগষ্ট, 'বেঙ্গল হরকরা' বাদে, ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৫৪ তারিখের 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার'ও "Chronological Table for the year 1854" শীর্ষক সালতামামিতে ইহার সমর্থক উক্তি এইরূপ পাওয়া যাইতেছে :

"August 16.—Opening of the School of Industry and Art in Calcutta."

তখনকার দিনে শিল্পবিদ্যালয় ইংরেজীতে এই নামেও পরিচিত ছিল।

৩। শিল্পবিদ্যালয়ে প্রধানতঃ তক্ষণশিল্প শিক্ষাদানের জন্ত বিলাত হইতে টি. এফ. ফাউলার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ১৮৫৫ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী শিল্প বিজ্ঞোৎসাহিনী সভার অধিবেশনে ফাউলারকে সদস্যগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। এই সভায় একটি প্রস্তাবে স্থির হয় যে, ফাউলার মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন বৎসরের জন্ত অধ্যাপনা কার্য করিবেন। এটিং, লিথো ও তক্ষণশিল্প সম্বন্ধে প্রত্যহ তিন ঘণ্টা করিয়া তিনি ছাত্র-দিককে শিক্ষা দিবেন।

২

এখন মূল বিষয়ের আলোচনায় আসা যাক। ১৮৫৫, ১০ই অক্টোবর প্রথম বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভার অস্থগীতের পরে শিল্পবিদ্যালয় কয়েকদিনের জন্ত বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ একটি সংবাদে জানা যায়, '১লা নবেম্বর, ১৮৫৫ হইতে শিল্পবিদ্যালয়ের নববর্ষের কার্যারম্ভ হইবে। অধ্যাপক বিগ্‌উড ও ফাউলারের অধীনে ছাত্র-গণ চিত্রবিজ্ঞা, মুৎকার্য ও তক্ষণশিল্প শিক্ষালাভ করিবে। বিদ্যালয়ের স্থান যথাপূর্ব মেডিক্যাল কলেজের সন্নিকট ভবন।'

শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষার উৎকর্ষের প্রতি প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ উৎসবের সময় হইতে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িল। ছাত্রদের শিল্পশিক্ষার উৎসাহ-দানের নিমিত্ত কেহ কেহ পদকাদি দিবারও প্রস্তাব করিলেন। প্রথমেই, রামায়ণের কাহিনী লইয়া মুৎ-পুতলী রচনায় কোন ছাত্র কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলে একটি

* প্রথম প্রবন্ধে অন্যভাবে 'বীণা' লিখিত হইয়াছে।

* The Bengal Hurkaru and the India Gazette, October 26, 1855.

প্রশস্ত স্বর্ণ পদক পাইবে, এইরূপ প্রস্তাব সম্বলিত একটি সংবাদ পাইতেছি। সংবাদটি এই :

"... A broad gold medal will be given in October next, to the author of the best original design in clay from the Ramayuna. The group of figure is to be beautiful rather than grotesque, national rather than 'cosmopolitan.' Above all, it is as far as possible (to) bear proof that it is not a copy. . . . Lastly, should the best design be unmistakably and unmitigatingly bad, the medal will be reserved for another year. The judges will, we believe, be the managers of the School, assisted by Sir Arthur Buller and Mr. Macdonald Stephenson. . . ."

এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা হইল যে, মুৎ-পুত্রলিপি স্মরণ ও 'জাতীয়' ভাবাপন্ন হওয়া চাই। পরীক্ষকদের বিবেচনায় মুক্তিটি যম্ম বিবেচিত হইলে, পর বৎসরের জন্য পদক প্রদান স্থগিত থাকিবে। শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ, বাহির হইতে ছইজন শিল্পরসিকের সাহায্যে, পুত্রলির গুণাগুণ নির্ধারণ করিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছিল।

শিল্পবিদ্যালয়ের চিত্রবিদ্যা, মুৎ-কার্য, তক্ষণশিল্প প্রভৃতি শিক্ষাদান কিরূপ চলিতেছিল এবং ছাত্রগণই-বা এ সমুদয়ে কতখানি কৃতিত্ব দেখায় তাহা লইয়া শিল্প বিজ্ঞোৎসাহিনী সভার বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা চলিত। ইতিকর্তব্য নির্ধারণেরও ব্যবস্থা হইত এখানে। উক্ত সভার একটি অধিবেশন হয় ১৮৫৬, ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। কর্ণেল গুড্‌উইনের সরকারী বাসভবন ছিল ১৩নং কিড স্ট্রীটে। এই ভবনেই সাধারণতঃ সভার অধিবেশন হইত। উক্ত ২৮শে ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে অধ্যাপক রিগ্‌উড ও অধ্যাপক ফাউলার নিজ নিজ কার্যের এক একটি ফিরিস্তি দেন। মুৎ-শিল্প বিভাগের কার্য অতিশয় সম্ভাষণজনক বলিয়া সভায় বিবেচিত হয়। এই বিভাগের অধ্যাপক রিগ্‌উড সমস্তগণকে জানান যে, প্যারিস প্রাষ্টারের অভাবে কার্য বিশেষ ব্যাহত হইবার উপক্রম, তবে যে কোন মুহূর্ত্তে জাহাজ আসিয়া পৌছিতে পারে। কিন্তু ইহার উপর ভরসা করিয়া বাহির হইতে নতুন অর্ডার বা কার্য গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না। ইতিপূর্বে অনেকগুলি অর্ডার তামিল করা হইয়াছে, এখনও কতকগুলি সম্পূর্ণ হইতে বাকি। রিগ্‌উড আরও জানান, বিভিন্ন পক্ষের নিকট মুৎশিল্পাদি পৌছাইয়া দিলেও, ইহার মূল্য বাবদ অনেক টাকা অনাদায় রহিয়াছে। সভা অতঃপর একটি প্রস্তাবে অবিলম্বে এই সকল আদায়ের ব্যবস্থা করিতে কোষাধ্যক্ষকে নির্দেশ দিলেন।

অধ্যাপক ফাউলারও তাঁহার বিভাগের কাজকর্মের একটা বিবরণ পেশ করিলেন। তক্ষণশিল্পে—কাঠ-

খোদাই প্রভৃতি কার্যে অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ব্যাপৃত ছিলেন। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর (বর্তমান পরিভাষায় 'শিক্ষা অধিকর্তা') কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই বিভাগ 'দেসপ্‌স ফেব্রুস'-এর কাঠখোদাই চিত্রগুলি করিয়াছেন। অন্য অর্ডারও তাঁহারা কিছু কিছু তামিল করিয়াছেন। কিন্তু ফাউলার বলেন, ইহার পর এ বিভাগের কাজ তেমন জোর চলে নাই। বাহির হইতে আর কোন অর্ডার না পাওয়ায় তিনি ছাত্রগণকে লিখোর কাজ শিক্ষা দিতেছেন, বাহাতে পরে ইহা দ্বারাও তাঁহারা কিছু কিছু বোজগার করিতে পারে। অধ্যাপক ফাউলারের নিকট হইতে এই বিবরণ শ্রবণান্তর সভা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কাঠখোদাই ও অন্যবিধ তক্ষণ কার্যের অর্ডার চাহিয়া বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে যেন দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

এই দিনের অধিবেশনের আর একটি বিষয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'-সম্পাদক মেরিডিথ টাউনসেন্ডের মারফত তাঁহার জনৈক বন্ধু শিল্পবিদ্যালয়কে এক হাজার টাকা দান করেন। এই মর্মে লিখিত টাউনসেন্ডের পত্র সভায় পাঠ করা হইল। কর্তৃপক্ষ উক্ত দান ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করিলেন।*

শিল্পবিদ্যালয়ের অল্প সরকারী সাহায্য চাহিয়া গত বৎসরই আবেদন করা হয়। হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্তর লরেন্স গীলও প্রথম পূর্বস্ফার-বিতরণ উৎসবে এই উদ্দেশ্যে সরকারকে সনির্ভর অস্থবোধ করিয়াছিলেন। শিল্প বিজ্ঞোৎসাহিনী সভার কর্তৃপক্ষও সাক্ষাৎভাবে ছোটলাট হেলিডেকে এ বিষয়ে অস্থবোধ জানান। কিন্তু ১৮৫৬ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্তও যে খুব বেশী কিছু সরকারী সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এমন তো মনে হয় না। কারণ 'বেঙ্গল হরকরা' ১৮৫৬, ১৯শে এপ্রিল তারিখে ডিরেক্টর-সভা কর্তৃক মাত্রাজের শিল্পবিদ্যালয়ে মাসিক আড়াই শত টাকা বেতনে এ. কোল নামক একজন অধ্যাপক নিয়োগের প্রসঙ্গে লেখেন, 'আমাদের শিল্প-বিদ্যালয় সম্পর্কেও কোর্ট এইরূপ ব্যবস্থা করুক না কেন।'*

তবে সরকার ১৮৫৪ সনের ১৩শে জুলাইয়ের 'শিক্ষা-বিধান' অস্থসারে প্রবর্তিত সাহায্যদান (grant-in aid) শক্তি অস্থসারী যে শিল্পবিদ্যালয়কেও অর্থসাহায্য প্রদান শুরু করিয়া দেন সেরূপ ধারণা করিবারও সম্ভব কারণ আছে।

* The Bengal Hurkaru and the India Gazette, March 5, 1856.

* "We wish the Court of Directors extend its patronage to our School of Industrial Art."

একটু পরেই এ বিষয়ে বলিতেছি। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী-সভার সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনের একটি বিবরণ পাইতেছি। ইহার কথা এখন বলিব।

বার্ষিক সভার অধিবেশন হইল ১৮৫৬ সনের ৯ই মে। ইহার আর একটি স্থগিত অধিবেশন হয় পরবর্তী ১৪ই মে তারিখে। এই দুই অধিবেশনে সভার নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হয়। আগামী বৎসরের জন্য কর্মধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন: কর্ণেল গুডউইন—সভাপতি; পাদ্রী লং, সি. ইয়ং, কিশোরীচাঁদ মিত্র, জি. স্কালে, ডাঃ বোরবেল, ডাঃ বেডফোর্ড—সদস্য; রাজেন্দ্রলাল মিত্র—কোষাধ্যক্ষ এবং এফ. জে. কোবার্ণ—সম্পাদক।

সরকার কি নাগাদ শিল্পবিদ্যালয়ে সাহায্যদান করিতে আরম্ভ করেন? ৩১শে জুলাই ১৮৫৬ দিবসীয় 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে সরকারী সাহায্য সম্পর্কে একটি তথ্যব্লক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে জানা যায়, বাংলা-সরকার পূর্বোক্ত সাহায্যদান পদ্ধতি অনুসারে শিল্পবিদ্যালয়কে অর্থসাহায্য করিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে উহার ব্যয়সঙ্কুলান হওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। তখন তাঁহারা ভারত-সরকারের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, হয় বিদ্যালয়টিকে অতিরিক্ত অর্থ-সাহায্য করা হউক, নচেৎ সরকার পুরাপুরি ইহা হাতে নিল।

বাংলা-সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী নবাগত বড়লাট লর্ড ক্যানিং স্বয়ং শিল্পবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন। তখন মাসিক টানা হইতে বিদ্যালয়ের আয় ক্রমশঃ কমিয়া প্রতি মাসে এক শত নব্বুই টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। ক্যানিং বিদ্যালয়টির কার্যকলাপে মুগ্ধ হইলেও ইহার আর্থিক দুরবস্থা দেখিয়া বিশেষ ব্যথিত হন। তিনি সকৌশল বড়লাট রূপে আদেশ দিলেন যে, ১৮৫৬ সনের ১লা জুলাই হইতে শিল্পবিদ্যালয়ের মাসিক সরকারী সাহায্য বাড়াইয়া ছয় শত টাকা করা হইবে। তবে সন্তু থাকিবে যে, শিক্ষা-অধিকর্তাকে মাঝে মাঝে বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে স্বযোগ দিতে হইবে। বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার উপর থাকুক, তিনি এইরূপ ইচ্ছাই প্রকাশ করিলেন। সভা সরকারী ব্যয়ে একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিয়োগেরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহার পর, বিদ্যালয়ের কার্যকলাপের সংবাদ পরিবেশন সম্পর্কে ভারত-সরকার কর্তৃক ছোটলাট এইরূপ অজ্ঞপ্ত হইয়াছিলেন:

"The Lieutenant-Governor has been requested to issue the necessary instructions to the Director of Public

Instruction regarding the future inspection of this school, and to call upon him to report at the end of three months the form in which, if further aid be needed, it can be given. The Governor-General further added, that in the annual report on education, it should have been stated whether there is any demand for the productions of this school, whether the pupils have as yet been able to turn their knowledge to any account, or to dispose of any other work, either on their own behalf (or) on account of the school, and whether there is reason to believe that the public derive any degree of practical benefit from the operations of the school."

এখানে এই মর্মে বলা হয় যে, শিক্ষা-অধিকর্তাকে শিল্পবিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কে যেন আবশ্যক নির্দেশ দেওয়া হয়। তিন মাস পরে, সাহায্যদান যথেষ্ট কিনা, না ইহা আরও বাড়াইয়া দিতে হইবে, আর কিরূপেই বা ইহা বাড়ানো বাইতে পারে—এই সকল বিষয় যেন তিনি বাংলা-সরকার মারফত ভারত-সরকারকে জানান। শিল্পবিদ্যালয়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদা কিরূপ, এখানে প্রাপ্ত শিক্ষায় ছাত্রদের জীবিকাজ্ঞান সম্ভব কিনা, জনসাধারণই বা কি ভাবে ইহা দ্বারা উপকৃত হইতেছে এই সমুদয় তথ্যও শিক্ষা-বিষয়ক বার্ষিক বিবরণে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।

৪

প্রতি মাসে ছয় শত টাকা সরকারী সাহায্য লাভে শিল্প-বিদ্যালয়ের আর্থিক অসচ্ছলতা অনেকটা নিরাকৃত হইল। শিল্পবিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণে অধ্যক্ষ সভা লিখিলেন:

"The Committee are glad to have it in their power to congratulate the Society on the improvement which has taken place in their position and prospects."

বিদ্যালয়ের সাফল্যে ইহার কর্তৃপক্ষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। প্রতি মাসে প্রাপ্ত সরকারী সাহায্যের কথাও উক্ত বিবরণে স্থান পাইল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্ত্র লরেন্স পীল ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে তাঁহার স্থতিরক্ষার্থ একটি কমিটি স্থাপিত হয় "পীল টেস্টিমনিয়াল কমিটি" নামে। শিল্পবিদ্যালয়ের কার্যে পীল বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কমিটি আদায়ী মবলগ সাড়ে সাত হাজার টাকা শিল্পবিদ্যালয়কে এই সন্তে দান করিলেন যে, উহার হ্রদ হইতে আট টাকা মূল্যের তিনটি মাসিক পীল-বৃত্তি সর্বাঙ্গিক। কৃতী তিন জন ছাত্রকে প্রতি বৎসর দিতে হইবে। এই সংবাদ প্রদানান্তর ২৮শে আগষ্ট 'বেঙ্গল হরকরা' এই মর্মে লেখেন, —শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভা এবং অধ্যাপকগণের মধ্যে

* The Bengal Hurkaru and the India Gazette, August 26, 1856.

মতামৈক্য হেতু বতখানি শিক্ষার উৎকর্ষ আশা করা গিয়াছিল ততখানি হইতে পারিতেছে না। অধ্যাপক ফাউলার সম্বন্ধে সভা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার বিভাগের কার্য ভালরূপ চলিতেছে না। কিন্তু মুংশিল্লের অধ্যাপক মর্সিয়ে রিগ্‌উড সম্পর্কেই বত গোলযোগ। অধ্যক্ষ-সভা তাঁহার পূর্বেকার কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সম্পর্কে স্বেচ্ছা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ তাঁহার অতিরিক্ত দাবি এবং উগ্র ব্যবহারে অধ্যক্ষ-সভা উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার এই অতিরিক্ত দাবি দাওয়া সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক ফাউলার অল্প কয়েক দিনের অস্থখে ১৮৫৬, ৩০শে আগষ্ট দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'ইংলিশম্যান' লেখেন :

"Death of Professor Fowler of the Calcutta School of Industrial Art.—The above institution has met with a sudden loss in the death of Prof. Fowler, who had in charge one-half of the pupils as a co-ordinate teacher with M. Rigaud. He died after a brief illness on Saturday, the 30th of August. He was giving instruction in Drawing, Wood and Copper plate Engraving, Lithographic drawing and Printing, Water-coloured painting, etc. He was no mean chemist, and as a linguist was surpassed by few men of his years in this part of the world. At the age of 27 he has fallen a victim to over earnest study and unremitted application. . . . Latin, Greek, Hebrew, the French, the Italian and other European languages seem to have been familiar to him; and within his two-years past he has acquainted himself with Bengalee, Hindustanee and Persian. There were gift books in his library presented, by their authors, men well-known to the scientific world who seem to prove that the modest merit, which had reached so few in this neighbourhood, was not unappreciated. A wife and a widowed mother were expecting his return to them in England, in a few months. . . ."

শিল্পবিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেক ছাত্রের শিক্ষার ভার ছিল অধ্যাপক ফাউলারের উপর। ফাউলার চিত্রবিদ্যা, কাঠ-খোদাই, তামার পাতের উপর খোদাই, লিথো-চিত্র, মুদ্রণ ও জলরং-চিত্র বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র সাতাশ বৎসর। এই সময়ের মধ্যেই তিনি একজন রাসায়নিক ও বহু ভাষাবিদ রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। লাতিন, গ্রীক, হিব্রু, ফরাসী, ইটালিয়ান ও অস্ট্রিয় বহু ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এখানে, দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে অধ্যাপক

ফাউলার বাংলা, হিন্দুস্থানী ও ফার্সী ভাষা আরও করিয়াছিলেন।

ফাউলারের মৃত্যুর পর তৎস্থলে অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য সাময়িকভাবে একজন অধ্যাপক নিয়োগকল্পে শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন।* কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। ইহার পর অন্ততঃ দুই বৎসরের করারে বিলাত হইতে একজন অধ্যাপক আনাইবার কথা হয়। ষতদিন না একরূপ একজন অধ্যাপক পাওয়া যায় তত দিন কর্তৃপক্ষ রিগ্‌উডকে মাসিক এক শত টাকা অতিরিক্ত বেতন দিয়া ফাউলারের কার্য নিরূপিত করিতে অস্বরোধ করিলেন।†

এখন, অধ্যাপক রিগ্‌উড সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবিধি রিগ্‌উড ইহার সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে অবৈতনে, পরে তিন শত টাকা মাসিক বেতনে তিনি এখানে কার্য করিতে থাকেন। মুংশিল্লাদি নির্ধারণ হইতে যে আয় হইত তাহারও আংশিক লাভ বেতন বাদে তিনি পাইতেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু পরে তিনি দাবি করেন যে, লভ্যাংশ সমুদয়ই তাঁহাকে দিতে হইবে। ইহা লইয়া অধ্যক্ষ-সভার সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটে। অধ্যক্ষ-সভা পক্ষান্তরে রিগ্‌উডের স্বার্থত্যাগ ও কর্মতৎপরতার কথা ভাবিয়া বতদূর সম্ভব তাঁহার দাবি মিটাইতে চেষ্টা করেন।

রিগ্‌উডের দাবি কিন্তু কিছুতেই কমিল না। এই সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ তারিখে শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাধারণ অধিবেশনে রিগ্‌উডের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার উদ্দেশ্যে তিন জন সদস্য লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটিতে ছিলেন—চার্লস এলেন, আর. দ্য. বোরবেল এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র। সাব-কমিটির সদস্যগণও রিগ্‌উডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাঁহার দাবি কোনমতেই কমাইতে পারিলেন না। পরবর্তী ২৪শে সেপ্টেম্বর শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার আর একটি সাধারণ অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে সাব-কমিটির অকৃতকার্যতার কথা যথারীতি বিজ্ঞাপিত হয়।

রিগ্‌উড শিল্পবিদ্যালয়ের একমাত্র অভিজ্ঞ পুরাতন অধ্যাপক। তাঁহার এইরূপ জিদে বিদ্যালয়ের কার্যে স্বভাবতঃই বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তবে চিত্রবিদ্যা ও মুংশিল্পের কাজ কতকটা আগের মতই চলিতে লাগিল। অধ্যাপক রিগ্‌উডের সঙ্গে পরে শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার

* The Bengal Hurkaru, etc., Tuesday Sept. 2, 1856 : Selections.

* The Bengal Hurkaru etc., Sept. 13, 1856.

† The Englishman, October 30, 1856.

একটা আপোষ-রফা হইয়া থাকিবে। কারণ ইহার পরেও দুই বৎসরের অধিককাল তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বিষয় পরে আমরা জানিতে পারিব।

এই সময় শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধ্যক্ষদের মধ্যেও কতকটা শৈথিল্য আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ চারিটি সভার দিন তারিখ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইলেও কোন অধিবেশনের বিবরণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় পাইতেছি না। অধিবেশন হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ বা অন্ততঃপক্ষে তাহার সমালোচনাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত।

৬

শিল্পবিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা এবং ছাত্রদের চিত্র ও শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৫ সনের ১০ই অক্টোবর। ইহার ঠিক এক বৎসর পাঁচ মাস পরে শিল্পবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পুরস্কার বিতরণী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। অধ্যাপক কাউলারের মৃত্যু এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগই যে এইরূপ বিলম্বের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এ নিমিত্ত প্রথম বৎসরে ইহার যেরূপ ক্ষত উন্নতি হইতেছিল দ্বিতীয় বৎসরে তদনুরূপ হইতে পারে নাই। তথাপি ইহা একেবারে ব্যাহত হইয়াছিল এমন কথাও বলা যায় না। যাহা ইউক, শিল্পবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পুরস্কার বিতরণ উৎসব করা স্থির হইল ১৮৫৭ সনের ১২ই মার্চ। এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া ‘ইংলিশম্যান’ (১২ মার্চ, ১৮৫৭) লিখিলেন :

“... and we take the opportunity of requesting all who interest themselves in the advancement of the

people, to go and see for themselves the progress which the school has already made in spite of very restricted means. It is to be hoped that this very useful school will find more favour with the public than it has hitherto done, and that those who liberally support the institutions, the utility of some of which is questionable, will assist one which is intended to give the working classes new methods of self-support, without pressing upon the bounty of their superiors.”

পুরস্কার-বিতরণ উৎসবের কথা ঘোষণা কালে ‘ইংলিশম্যান’ দেশবাসীকে এমন একটি প্রয়োজনীয় ও হিতকর প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইল। ‘হিন্দু পেট্রিফট’ ১৮৫৭ সনের ১২শে মার্চ সংবাদ স্তম্ভে (শুক্রবার, ১৩ই মার্চ) লেখেন :

“The distribution of prizes to the pupils of the School of Industry and Arts took place yesterday. The first prize, a scholarship valued eight rupees a month from the Peel Testimonial Fund, was awarded to Tara-persaud Bannerjea for the composition of the ‘Plague of Pompeii’ executed on four tablets from the artist’s own imagination aided by Bulwer’s ‘Last Days of Pompeii.’

শিল্পবিদ্যালয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় “প্লেগ অফ পম্পিয়াই” শীর্ষক চিত্রের জন্য মাসিক আট টাকা পীল-বৃত্তি লাভ করে। “লাষ্ট ডেজ অফ পম্পিয়াই”র নিরিখে নিজের কল্পনাশক্তি প্রভাবে চারখানি টেবলেটের উপর উহা খোদাই করা হয়।

এইখানেই শিল্পবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্বের অবসান

হইল।

লীলা

জিশুখীর গুণ

বাহিরের মহা-বিষ মনের ভিতরে
কি করিয়া বীরে বীরে ধ্যান-মুগ্ধি ধরে,
গড়ে স্বপ্ন-ভিলোভনা, ভরে চিত্তকল,
কোমলে কঠোর করে, কঠোরে কোমল,
অপরিচয়েতে ঘেরা সেই পরিচয়
জানিতে পেরেও নাহি পারে যে মনয়।
অমল জিজ্ঞাসা ভাই অন্তর-লাগরে
অনু-বিষ মন শুধু কোটে আর বরে।

অসীম অন্তর ত’তে কেন অহরহ
আবেগ-প্রেরণা আর বিপুল বিরহ
বাহিরের মহাবিষে অনন্ত সুখমা
কি ভাবে ফুটাবে ভোলে, চির অহুপমা
করে এই প্রকৃতিরে চিরদিন ধরি,
বুঝি না রহস্য তার, শুধু তেবে মরি।
কড়ে কীবে এ কি লীলা, অন্তরে বাহিরে,
লীলার অসীমে লীলা কেন কিরে কিরে।

কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

কলিকাতার একমাত্র দ্বিশাল বা দোচালা মন্দিরটি উত্তরাংশে বাগবাজারের ২৬/১ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় স্ট্রাটে অবস্থিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অল্পমান করিয়াছিলেন ইহার বয়স অন্তর দুই শত বৎসর। ইহা দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্বশুর প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। মন্দিরে কোন প্রাচীন লিপি নাই। বর্তমানে



কলিকাতার একমাত্র দ্বিশাল বা দোচালা শিবমন্দির
(দুই শত বৎসরের প্রাচীন)

[কটো—ডাঃ লতীমাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

মন্দিরটি জীর্ণপ্রায়। মন্দিরমধ্যে তিনটি শিবলিঙ্গের মধ্যেরটি কালো পাথরে ও পাশের দুইটি সাদা পাথরে নিশ্চিত। মন্দিরের পশ্চিমে ও দক্ষিণে তিনটি দ্বার; দক্ষিণ-পশ্চিমের দ্বারটি ক্ষুদ্র। ভিতরের উত্তর দিকের দেওয়ালে তিনটি বৃহৎ কলুঙ্গ ও পূর্বের দেওয়ালে দুইটি ত্রিকোণ কলুঙ্গ আছে। ছাদটি খিলানে গঠিত, তদুপরি ত্রিশূল।

এই মন্দিরের সমুখস্থ প্রাঙ্গণে বিখ্যাত রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডা ছিল। এক শত আট ছিলিম গঞ্জিকা সেবনে সক্ষম ব্যক্তিরাই তাঁহার আড্ডায় বসিবার জন্য ইট পাইত,

অন্য কেহ নহে। খাঁচার মত একটি গাড়ীতে কবিয়া এই ধনী সন্তানটি বেড়াইতেন বলিয়া ‘রূপচাঁদ পক্ষী’ নাম পাইয়াছিলেন। বৃহৎ কলিকৃত গঞ্জিকা স্তোত্রে ইহার সম্পর্কে আছে: “অভূৎ পক্ষী প্রসাদান্তে রূপচাঁদো জবাযুজ। ইতিতে মহতী কীৰ্ত্তি: শাস্ত্রেণ পরিবিশ্রুতা॥”

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন কলিকাতার এক জন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। বাইশ বিঘা জমির উপর তাঁহার



কলিকাতার একমাত্র দ্বিশাল মন্দির। অত দিক হইতে

[কটো—ডাঃ লতীমাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বাস্ত ছিল। ‘বদেব রত্নমালা’ পুস্তকে কিরূপে তিনি গুরুদেবকে নিজগৃহে আটকাইয়া ভাটপাড়ায় সাড়স্বরে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের অন্নচর্চন করেন ও শ্রাদ্ধদিনে তাঁহাকে ঐ স্থানে লইয়া গিয়া বিস্থিত করেন, তাহার উপাদেশ গল্প আছে।

মন্দিরে মধ্যরকলকে একটি নূতন ভরাটলিপি আছে। উহা “৬ জগতরাম হালদার কর্তৃক স্থাপিত; তদীয় পৌত্র-কন্যা ৬ হেমাদ্বিনী দেবীর পুত্র শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী রমস্বকুমারী দেবী কর্তৃক ১২৭২ সংবৎসরে সংস্কারিত।” এই প্রতুল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা-

চার্জ (Vice-Chancellor) ছিলেন। তাঁহার পত্নী বসন্ত-কুমারী স্রাব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুপুত্র অশ্বতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর দেবসেবার ভার দেন। মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এই ভার পাইয়াছিলেন। বর্তমানে নাট্যকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ২৭নং হরলাল মিত্র স্ট্রীট-নিবাসী ডাঃ সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এসসি, এম-বি. মহাশয় এই মন্দিরের দেবতাগণের সেবক।



রামলক্ষ্মণ দত্তের অষ্টশাল শিবমন্দির

[কটো—অধ্যাপক শ্রীহুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব প্রবন্ধে (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৮) উল্লিখিত বাগ-বাজার-চিংপুর রাস্তার তেমাথার দক্ষিণে অবস্থিত অন্ন-পূর্ণার মন্দির ও শিবের অষ্টশাল চারিটি পূর্বোক্ত দিশাল মন্দিরের সমসাময়িক বলিয়া কথিত হয়। এই অষ্টশাল চারিটির মধ্যের দুইটির দ্বারের উপর, বাম ও দক্ষিণের চৌকাঠের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত তিন সারির খোপগুলিতে প্রাচীন রেখাচিত্র আছে। এই রেখাচিত্র-সমূহের প্রত্যেক দেবতা ও মাছুষই যুদ্ধভঙ্গীতে বর্তমান। উহাদের রং এখন চটিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিত্রগুলি স্বাভাবিকতায় মনোরম। কলিকাতা বা বাংলার আর কোন মন্দিরে এরূপ রেখাচিত্র দেখা যায় না। এই মন্দির দুইটির উত্তরেবর্তিতে দ্বারদ্বীপে একটি কৃত্রিম ফলকে চারি সারি রেখালিপি আছে। উহার পাঠ উদ্ধার করিতে বৈরূপ পারিয়াছি সেরূপই দিতেছি :

শাকে বিলেশয় বিলর্জু বিধৌ বিবর্ধে
চিতে বিলাসফলদং গুরু পাদপদ্ম
মাবাক্তং শিভিভূতো বিজবিষ্ণুরামোহ-
কাবাঁদ্বি মন্দিরমিহং পরমৈজ্ঞান্যজ্ঞী
ছন্দটি বসন্ততিলক, বিলেশয় (সর্প = ৮) বিল (ছিত্র = ০)

ঋতু = ৬ বিধু = ১ = ১৬০৮ শকাব্দে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুরাম মনে গুরুপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে পরলোকের কল্যাণ কামনায় মহাদেবের এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরগুলি ত্রিচূড়; মধ্যের লিঙ্গ চারিটি উত্তম কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত। অন্নপূর্ণা ও শিবের মূর্তি অষ্টধাতু গঠিত—দুইটি বৃহৎ শালগ্রামও আছে।

মধ্য কলিকাতার মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের মর্ম্মর প্রাসাদের পশ্চিমভাগে অবস্থিত তাঁহার গৃহদেবতার মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় বা বিলাতী রীতির একটি নিখুঁত নিদর্শন। মন্দির-চূড়া ক্রমশঃ স্ফন্দাগ্র। চৌর-



রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের খ্রীজগন্নাথ মন্দির

[কুমার শ্রীনীলেন্দ্রনাথ মল্লিকের সৌভদে

বাগান মল্লিক পরিবারের নীলমণি মল্লিক মহাশয় তাঁহার মাতুলালয় হইতে খ্রীজগন্নাথের বিগ্রহ পাইয়া ইং ১৭৭৫-১৮২১ মধ্যে এই মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন। মন্দিরের বর্তমান রূপ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পরিকল্পনা।

রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের পূর্বাংশে অবস্থিত মহাদেবের অষ্টশালটি সনঃ ১২১২ সালের ১লা বৈশাখ রামলক্ষ্মণ দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কলিকাতার সর্কোপেক্ষা উচ্চতম ও বিরাট নবরত্ন মন্দিরটি টালিগঞ্জের আদিগঙ্গাতীরস্থ ১নং মণ্ডল টেম্পল লেনে অবস্থিত। উহার চারিদিকে উচ্চ বোয়াক ও থাম। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে দ্বার। নবরত্নের উচ্চতম চূড়া অবশি সোপান ও চূড়াগুলি খাজবিশিষ্ট। প্রত্যেকটি চূড়ার উপরে লৌহদণ্ডে বিষ্ণুচক্রশোভিত। মন্দির মধ্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি। বোয়াকের অগ্রিকোণের দেওয়ালে কৃষ্ণ-প্রস্তর ফলকে নিম্নোক্ত উৎকীর্ণ লিপি আছে :

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শকাব্দা: ১৭১৮

শাকেষ্টাদশ বাঁজি চন্দ্র পণিতে কুন্ডস্থিতে তাকরে।

রাধাকান্ত মদে শুভাশঙ্করদে গদোপকণ্ঠস্থলে।

অরব্ধ নবরত্নমণ্ডপময় ত্রীরাধাকান্তমন্দির।

সেনাপতি ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত পূর্ণরূপে।

ইতি পুনঃ ১৭৩১ সন্থায়াং সর্ক পূর্ণরূপে।

মর্শ :—“ত্রীরাধাকান্ত রাধাকান্তের ত্রীতির মিত্ত গঙ্গাতীরে ১৭১৮ শকাব্দার ফাল্গুন মাসে শুভেচ্ছা পূর্ণ চিত্রে এই নব রত্ন মন্দির আরম্ভ করেন। ১৭২৯ শকাব্দার চৈত্র মাসে ইহা শেষ হয়। ১৭৩১ শকাব্দার আষাঢ় মাসের সংক্রান্তিতে ইহা সর্কভোভাবে সম্পূর্ণ হয়।”



কলিকাতার সর্কাপেকা বিরাট ও উচ্চতম ত্রীরাধাকান্ত জীউর নবরত্ন মন্দির। ইহা হইতেই দক্ষিণবঙ্গের কালীমন্দিরের আদর্শ গৃহীত হইয়াছিল। লাহানগর ১নং মণ্ডল টেম্পল লেনে ইহা অবস্থিত।

[শ্রীসরোজকুমার মণ্ডলের সৌজতে

আরম্ভ হইতে সমাপ্তি অবধি বর্ষাদিঘোষণায় লিপিটি অভিনব।

মন্দিরের সম্মুখে দুই সারি থামযুক্ত বিরাট নাটমন্দির; প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রাচীরের গায়ে কঙ্করাজি বিরাজিত। প্রবাদ, এই মন্দির বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেন। ইহার কারণ-স্বরূপ নিম্নোক্ত গল্পটি প্রচলিত আছে। এগার জন শ্রমিক প্রত্যহ মন্দির গঠনের কার্য করিত, কিন্তু মন্দির যখন ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে তখন নিম্ন হইতে দেখা যাইত যে বার জন শ্রমিক কাজ করিতেছে। ঐ সকল শ্রমিক যখন নীচে কাজ করিত তখন উপর হইতে মনে হইত যে, বার জনই কাজ করিতেছে। সুদীর্ঘ তের বৎসর

পরে মন্দির ও ঠাকুর-বাড়ী নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। বহির্বঙ্গনে বিরাট রাসমঞ্চ। এই মন্দিরের আদর্শ হইতেই দক্ষিণ-বঙ্গের নবরত্ন নির্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। এই মহোন্নত নবরত্নের কোন নিখুঁত ছবিই নাকি পৃথিবীর কোন দেশের কোন চিত্রশিল্পী লইতে পারেন নাই।

২৪ পরগণা জেলার বাওয়ালী গ্রাম নিবাসী মণ্ডল-পরিবারের আদি বাস বর্তমান জেলায় ছিল। থড়ের ব্যবসায় করিয়া এই বংশ ধনী হন। লাটের সমূহ জমিই ইহার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ সকল লাটের মধ্যে খাড়ি ও জুড়ির আয়ই ছিল বার্ষিক প্রায় দুই লক্ষ টাকা। দিগধর মিত্র ঐ দুইটি লাট কিনিয়াই রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কলিকাতা ডায়মণ্ড হারবার পথের বেহালা হইতে হারবার পর্যন্ত অংশের যাবতীয় হাট ও বিরাট জলাশয়গুলি এই বংশের প্রতিষ্ঠিত। ইহার কুড়ি হাজার বিঘা নিম্নর ভূমির মালিক ছিলেন। গঙ্গার পর-পারে অবস্থিত মন্দিরগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় এই মন্দিরটিই শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। ইহার পূর্বদ্বারের দুইটি বিরাট চৌকাঠই কষ্টিপাথরে নির্মিত। কষ্টিপাথরের একপ প্রকাণ্ড খণ্ড অন্যত্র দেখা যায় না। হরানন্দ মণ্ডলের কনিষ্ঠ পুত্র রামনাথ দাস এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার চারি পুত্র—রামনারায়ণ, রাজনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র মদনমোহন (পত্নী প্রসন্নময়ী) তাঁহার পুত্রদ্বয় কমলকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ। শিবকৃষ্ণের পুত্র শ্রীযতীন্দ্রনাথের চারি পুত্র। শ্রীসরোজকুমার, শ্রীশশীলকুমার, শ্রীঅনিলকুমার, শ্রীঅজিতকুমার মন্দিরের বর্তমান মালিক। ইহাদের কোন পূর্বপুরুষের নাবালক অবস্থার স্বযোগে মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রায় ত্রিশ বিঘা জমি, যাহার বর্তমান মূল্য দশ লক্ষ টাকা—মাত্র এক টাকা রোড সেস বাকীর দায়ে নিলাম হইয়া যায়।

রাস এখানকার প্রধান উৎসব। মন্দির হইতেই সম্মুখের পথটির নামকরণ হইয়াছে। বাওয়ালীর মণ্ডলগণ ধর্ম ও শিল্পোন্নতিতেই নিজেদের অর্থব্যয় সার্থক করেন নাই; তাঁহারা বিদ্যোৎসাহিতারও পরিচয় দিয়াছেন। ভর্তৃহরি ব্যাকরণকে কাব্যের রূপ দিয়া বংশী হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ভারতে সুবিদিত। কিন্তু ব্যাকরণকে নাটকের রূপ দিয়া কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী নামক নদীয়া মহেশপুর নিবাসী যে বাঙালী মহাপণ্ডিত অদ্ভুত কীর্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বিশ্বতির অতল তলে মিলাইয়া যাইত, যদি না বাওয়ালীর শ্রীরাজকিশোর মণ্ডল সন ১৩০১ সালের ১২ই আষাঢ় সেই “অন্তব্যাকরণনাট্য পরিশিষ্ট”কে মুদ্রা-যন্ত্রের মারফত প্রকাশ করিয়া বহুল প্রচারের সহায়তা

করিতেন। এই মহৎ কৰ্মের জন্য তিনি বাঙালী জাতি তথা সংস্কৃতাম্বরাগী ভারতীয়গণের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। এই মণ্ডলগণের পূর্বপুরুষের বিরাট শিল্পকীর্তি বাঙালী-জাতির মহোজ্জ্বল অতীতের মহনীয় নিদর্শন। ইহা অনবদ্য জাতীয় গৌরব।



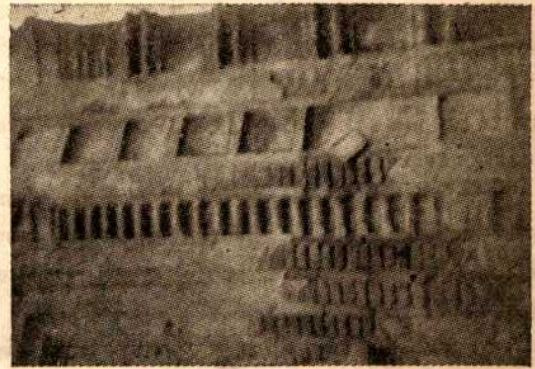
নীতারাণ ঘোষ ষ্ট্রীট ও আমহাট ষ্ট্রীটের সংযোগ-

স্থলের ত্রিচূড় একক শিবমন্দির

[কটো]—অধ্যাপক জীহ্নোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা উড়িষ্যা়র সাগর-সৈকতের মঞ্চপ্রান্তরে কোণারকের ভগ্ন মন্দির দেখিতে ছুটিয়া যাই, আর বিম্বিত হইয়া শিল্পীর জয়গান করি কিন্তু আমাদের ঘরের কোণে এই যে বিরাট অট্টালিকা দেবতার আসনরূপে সাদৃশ্যত বৎসর কল্যাণ বাণী বিতরণ করিতেছে তাহার দিকে কিরিয়াও চাহি না। উড়িষ্যা়র বার বৎসরের রাজকরে রাজা নর-সিংহ দেবের শাসনে, বার শত শিল্পী বার বৎসরের শ্রমে কোণারকের দেউল গড়িয়া তুলিয়াছিল, আর এই মহান দেবনিবাস মাত্র বার জন শ্রমিকের সাধনায়, এক জন অখ্যাত নাগরিকের কষ্টার্জিত বিত্তের সার্থক পরিণতি-দান করিতে, তের বৎসরের যত্নে, আদি গঙ্গার পুত্ৰসৈকতে এক নূতন অমর্যাবতীতে রূপায়িত হইয়াছিল। গঙ্গাদেবী এখন আর এই খাতে নিজ জলধারা বহন করেন না, তাই নদীর পরিসর সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। যেটুকু প্রবাহ বর্তমান তাহাও পঙ্কিল। বিরাট জলযান এদিকে যাতায়াত ছাড়িয়াছে। কাটিগঙ্গার কৃত্রিম পথে তাহাদের গতি পরি-বর্তিত হইয়াছে। কিন্তু অতীতের এই ভূস্বর্গ এখনও মুষ্টিমেয় যাজীর প্রাণে, পবিত্র গাঙ্গেয় প্রণালীর যে স্মৃতি আর

কিরিবে না তাহার হৃদবিধাদবিধুরশ্রুতি ক্ষণিকের শিহরণ আনিয়া দেয়—কৃতী রামনাথ, কুশলী শিল্পকার আর অঘটনঘটনপটু ভাস্কর কালের করাল পরিণামকে সোনার কাঠির ষাটুর্ স্পর্শে যেন ক্ষণিকের তরেও পরাহত করিবার শক্তি অর্জন করিয়া অমর হইয়াছে।



বাগবাজারের লিপিযুক্ত অষ্টশাল শিবমন্দিরের

বেণাচিহ্নযুক্ত খোপসকল

উত্তর কলিকাতার দুইটি প্রাচীনতম চণ্ডীমণ্ডপের একটি নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে হাটখোলার দত্তবাবুদের, অপরটি ১৫৮নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত। উহার বর্তমান মালিক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। কলিকাতার এই অংশের কয়েকটি চকমিলান প্রাসাদের চণ্ডীমণ্ডপ পূর্বদিকে অবস্থিত। উহার বাগবাজার ষ্ট্রীটের নন্দলাল বসুর বাটির মণ্ডপ, গোকুল মিত্র লেনের গোকুল মিত্রের মণ্ডপ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মণ্ডপ, তারক প্রামাণিক রোডে (১৫৪নং) প্রামাণিকদিগের মণ্ডপ। শেখোক্তটির বর্তমান মালিক শ্রীরাখালদাস প্রামাণিক মহাশয়।

গোকুল মিত্রের মণ্ডপের সম্মুখে উচ্চ ধামযুক্ত বিরাট আটচালা। তারক প্রামাণিক মহাশয়ের আটচালা মণ্ডপের পশ্চাতে অবস্থিত। ইহাতে পুরাণ পাঠকের একটি মন্দির বেনী আছে। কয়েকটি মণ্ডপের কাগিসে কাঠের কাজ দেখা যায়। অকুর দত্ত লেনের অকুর দত্তের মণ্ডপের কাগিসের অবলম্বনগুলি কাঠের ও উহাতে স্তম্ভর কারুকার্য আছে। রামবাগানের মিত্রদের, জোড়াবাগান ও পাথুরিয়া-ঘাটার ঘোষেদের মণ্ডপের নিয়ে একটি তল আছে। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের মণ্ডপ (১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট) একটি পৃথক আঙ্গিনায় অবস্থিত।

বাংলা শব্দের উচ্চারণ

শ্রীমনোজমোহন রায়, এম-এ

বাংলা শব্দের উচ্চারণ নিয়ে কয়েক বছর আগে "টচস" জার্নাল"-এ আলোচনা করেছিলাম। তারও আগে প্রভেদ শ্রীরাধেশ্বরের বহু মহাশয়কে অমরোব জানিয়েছিলাম তিনি যেন পকেট অক্সফোর্ড ডিকশনারির বরণে তাঁর "চলন্তিকা"র উচ্চারণ দেন। কিন্তু তিনি জানান যে, ছোট অভিধানে উচ্চারণ দেওয়ার সময় তখনও আসে নি।

বর্তমানে বাংলা ভারতের অল্পতম শ্রেষ্ঠ ভাষা এবং পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা। সুতরাং এখন আশা করা অস্তর হবে না যে, এর একটা প্রমাণ (standard) উচ্চারণ থাকবে।

আমার প্রত্যয় এই যে, বাংলা শব্দের বানান নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন একটি কমিটি করে ব্যবস্থা করেছিলেন, প্রভেদ সুনীতিবাবু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বিদ্বৎ ব্যক্তিকে নিয়ে তেমনি কমিটি করে বাংলা শব্দের বানান সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য ব্যবস্থা হউক।

আমাদের উচ্চারণ-বৈষম্য যে কত তা চিত্তাশীল ব্যক্তিই জানেন। কেবল বিদেশী শিকারীর কাছেই নয়, বাঙালীদের মিজেরের মধ্যেও উচ্চারণের গোলযোগে শুণু হাতোজেকই করে না, ভাল করে বুঝতেও বাধার সৃষ্টি করে।

আমরা কেউ বলি 'দেশলাই', কেউবা 'দেশলাই' বা 'দেশোলাই'। লক্ষণ ও লক্ষণ এর গোলমাল হয়। 'রকা' শব্দকে "রোক্খা" বা 'মশা'কে 'মোশা'র তার উচ্চারণ না করলে জ্রোতা হাসে। অর্থাৎ, 'অ'কারের উচ্চারণ-বিভ্রাট আছে—কোথাও হস্ হয়, কোথাও 'ও'কার হয়। এই সব ব্যাপারে কমিটি যদি একটা নির্দেশ দেন তা হলে ভাল হয়। সংস্কৃত শব্দও (ভৎসব শব্দ) বাংলার বিহুতভাবে উচ্চারিত হয়। এ সম্বন্ধেও নির্দেশ বাহনীয়। 'পতিত্ জমি' না 'পতিত জমি', 'বিনারক্' না 'বিনারক'?

'য'কলার উচ্চারণ নিয়েও গোলমাল বাধে: "ব্যাখা"কে, ব্যাখা, ব্যক্তিকে বেজি বা বোজি, 'উদ্যোগ'কে উদ্যোগ বা

উদগ্গ উচ্চারণ করা হয়। এ বৈষম্যেরও সমাধান প্রয়োজন।

'ব'কলার কোথাও 'ব' উচ্চারিত, কোথাও অহুচ্চারিত। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলতে পারেন না। 'পক'কে কেউ পক্ বলে না, কিন্তু 'উদ্বোধ'কে কেউ উদ্বোধ, কেউ বা উদগ্গ উচ্চারণ করেন। হাতের কাছে ছোট অভিধান যা পাওয়া যায়, তাতে একটা বাধাবরা উচ্চারণবিধি দেওয়া থাকলে দশ-পনের বৎসরের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়।

এ-কার নিয়ে যে গওগোল, রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকাশক তার একটা ব্যবস্থা করেছেন, তবু 'একাকী' অ্যাকাকী না এ-কাকী, এলাচ না অ্যলাচ, এ-কাদশী না অ্যাকাদশী, এ-ফেলা না অ্যাকেলা এ গওগোল যার নি। সুনীতিবাবুর ব্যাকরণ-জাতীয় বই আমাদের কাছে থাকে না, থাকে "চলন্তিকা" জাতীয় অভিধান। সুতরাং উচ্চারণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হওয়া একান্ত দরকার। 'কেবল'কে 'ক্যাবল' বললে হাসি আসে কেন?

বিদেশী শব্দ উচ্চারণে আমরা "হরে-কর-কম-বা-জিও" ইত্যাদি করে কেলি। 'ওয়ার্কিবহাল' কেউ উচ্চারণ করেন 'ওয়ার্কিবহাল', কেউ বা 'ওয়ার্কিব-হাল'। এর ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

'মাতৃভূমি'কে কেউ বলেন "মাত্‌রিভূমি" কেউবা 'মাত্রী-ভূমি'। এই রকম বহু দেখান যায়।

কমিটি বলে যদি একটা নির্দিষ্ট উচ্চারণ-বিধি বাংলায় যেন, তা হলে অদূর ভবিষ্যতে একটি সামঞ্জস্য হবে বলে মনে হয়। বিভিন্ন জেলার উচ্চারণের টান থাকবে, তা দূর হয় না—ইংরেজী শব্দ উচ্চারণেও আছে, কিন্তু আরতি, গান, অভিনয় আদিতে বা ব্যবহৃত হবে তাতে একরকম বিধি হওয়া কাম্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যাক বা সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি বা বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অগ্রণী হলে সমস্তর সহজ সমাধান হবে মনে করি।



দর্শনের দিগ্‌দর্শন

ত্রিবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত

ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আস্তিক ও নাস্তিক। যাহারা বেদ মানেন তাঁহারা আস্তিক। যাহারা বেদ মানেন না তাঁহারা নাস্তিক। আরও দুইটি শ্রেণী বিভাগ আছে। নিরীশ্বর এবং ঈশ্বরবাদী : যাহারা ঈশ্বর মানেন না তাঁহারা নিরীশ্বর ; কিন্তু নাস্তিক নহেন। একমাত্র বেদ না মানিলেই নাস্তিক বলা হয়। হিন্দু ষড়-দর্শন, কপিলের সাংখ্য, পাতঞ্জলের যোগ, গৌতমের জ্ঞান, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনির পূর্বমীমাংসা, বেদব্যাসের বেদান্ত—ইহারা সকলেই বেদ মানেন সুতরাং আস্তিক। কপিল ও জৈমিনি ঈশ্বর মানেন না, তথাপি আস্তিক এবং ষড়দর্শনের মধ্যে আসন পাইয়াছেন। এই ষড়দর্শন ভিন্ন আমাদের দেশে আরও তিনটি দর্শন আছে, তাঁহারা নাস্তিক এবং নিরীশ্বর—বেদও মানেন না এবং ঈশ্বরও মানেন না। এই তিনটির নাম চার্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন এবং জৈনদর্শন।

চার্বাক দর্শনের মধ্যে সাতটি বিভাগ :— ১। শরীরাত্মবাদী, অর্থাৎ শরীরই আত্মা। ২। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ই আত্মা। ৩। মনই আত্মা। ৪। বুদ্ধিই আত্মা। ৫। অহঙ্কারই আত্মা। ৬। পুত্রই আত্মা। ৭। ধনই আত্মা।

বৌদ্ধ মতের চারিটি ধারা। বুদ্ধদেব একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। “সর্বং দুঃখং দুঃখং শূন্যং শূন্যং বিজ্ঞানং বিজ্ঞানং ক্ষণিকং ক্ষণিকং।” বুদ্ধদেবের চারি জন শিষ্য সূত্রের এক একটি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই অনুসারে তাঁহারা চারিটি ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা করিয়াছেন। যথা— ১। সৌত্রান্তিক। ২। বৈভাষিক ৩। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ। ৪। মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ। যিনি সূত্রের শেষ ধরিয়াছেন তিনি সৌত্রান্তিক বা ক্ষণিকবাদী—অর্থাৎ বহির্জগৎ ক্ষণিক, অন্তর্জগৎও ক্ষণিক।

বৈভাষিক বিরুদ্ধ ভাষার সামঞ্জস্য করিয়াছেন। শূন্যও বলিয়াছেন, বিজ্ঞানও বলিয়াছেন। শূন্য হইলে বিজ্ঞান কিরূপে হয়? বৈভাষিক সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন বাহির শূন্য, অন্তর বিজ্ঞানময়।

যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী বলিয়াছেন যে বাহির ও ভিতর উভয়ই বিজ্ঞানময়। অন্তর বিজ্ঞানময় বুঝা যায়, কিন্তু বহির্জগৎ কিরূপে বিজ্ঞানময় এই প্রশ্ন উঠিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ জ্ঞানের আকার-

মাত্র। পাশ্চাত্য দার্শনিক কার্ট এই মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের নিকট হইতে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অনেকেই জানেন না।

মাধ্যমিক সূত্রের মধ্যভাগ লইয়াছেন “শূন্যং শূন্যং”। তাঁহারা শূন্যবাদী। অন্তর বাহির উভয়ই শূন্য। সকলই শূন্য মিলিয়া যাইবে। সুতরাং নির্বাণপ্রাপ্তি সকলের লক্ষ্য। যাহাকে মায়া বলা হয় বৌদ্ধেরা তাহাকে বলেন সংসৃতি। সম্যক বুণোতি আচ্ছাদয়তি। সম্যক-রূপে আচ্ছাদন করে এইজন্য সংসৃতি। তাঁহাদের মতে প্রমাণ দুই প্রকার—অনুমান ও প্রত্যক্ষ। তাঁহারা ‘শব্দ’ প্রমাণ মানেন না।

ভারতবর্ষে এক সময় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, হিন্দুদর্শনের চর্চা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বৌদ্ধমত প্রথম খণ্ডন করেন কুমারিল মিশ্র (ভট্ট)। কিন্তু কুমারিল মিশ্রকেও বৌদ্ধ দার্শনিকের নিকট শিক্ষার্থে যাইতে হইয়াছিল। কুমারিল নিজের ভাব লুকায়িত রাখিয়া বৌদ্ধ ছাত্রগণের সঙ্গে মিশিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধদের নিকট বেদ-নিন্দা শুনিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসাতে বৌদ্ধগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহাদের দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কুমারিল ভট্ট তাহার পর অদম্য উৎসাহে প্রকাশ্যে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যশ ও প্রতিভা চতুর্দিকে বিঘোষিত হইল। কিন্তু কুমারিল গুরুকে প্রতারণা করিয়াছেন এই পাণের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুযানলে প্রাণত্যাগ করেন। কুমারিল পূর্ব-মীমাংসার মতাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং তিনি নিরীশ্বর কিন্তু আস্তিক। সাধারণ আস্তিক নহে, বেদ-নিন্দা শুনিয়া চেষ্টা করিয়াও অশ্রু সঞ্চরণ করিতে পারিলেন না। আচার্য্য শঙ্কর দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া কুমারিল ভট্টের নিকট বিচারের জন্য উপস্থিত হন। তখন কুমারিল তুযানলে বসিয়াছেন। কুমারিল বলিলেন—আমি এখন তুযানলে প্রাণত্যাগ করিতেছি, তুমি আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের নিকট যাও, সে তোমার সঙ্গে বিচার করিতে সমর্থ। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন মধ্যস্থ কে হইবে? কুমারিল উত্তর করিলেন, মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতী। আচার্য্য শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রের সহিত একুশ দিন বিচার করিয়াছিলেন।

উভয় ভারতী মধ্যস্থ হইয়া কৌশলে শঙ্করের পক্ষে জয় ঘোষণা করিলেন।

কুমারিলের পর শঙ্কর বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন। তার পর করেন উদয়নাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তের ভাষ্য করেন। অন্যান্য দর্শনের মত খণ্ডন করিয়া বেদান্ত মত প্রতিষ্ঠা করেন। এই বেদান্তই হিন্দু-ধর্মের মূল ভিত্তি। অন্যান্য মতের উপযোগিতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু বেদান্ত মতই ভারতবর্ষে ও বিদেশে বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের ধ্বংসকাম-বিকাশ হইয়াছে আর কোন দর্শনের সেরূপ হয় নাই। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, শ্রীকৃষ্ণ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিষ্ণু স্বামী ও বল্লাভাচার্য্যের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ, ভাস্করের ব্রহ্ম পরিণামবাদ, বিজ্ঞান ভিক্টর অনাদিসত্যমায়াবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদভেদবাদ এ সকলই বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শঙ্করের মতকে অনেকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলেন। বাস্তবিক শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদের উপাদান পরোক্ষভাবে বৌদ্ধমতের মধ্যে নিহিত একথা বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন মতকে যদি কেহ বিশেষভাবে খণ্ডন করিতে চাহেন তো তিনি অজ্ঞাতদ্বারে সেই মত কিছু পরিমাণে গ্রহণ করেন। আর বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিকট বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে গিয়া বৌদ্ধমত হইতে খুব বেশী দূরে সরিয়া যাইতে পারেন না। তিনি যে শূন্যবাদ হইতে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এইজন্য সমস্ত হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বৌদ্ধদর্শন হইতে হিন্দুদর্শনে পৌছাইবার সোপান শঙ্কর নির্মাণ করিয়াছিলেন।

শঙ্করমতে—জীব অনাদি, সান্ত। ঈশ্বর অনাদি, সান্ত। একমাত্র বিস্কৃত ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত। এই তিনের সম্বন্ধও অনাদি সান্ত। অবিদ্যা—অনাদি, সান্ত। অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ অনাদি সান্ত। অদ্বৈতবাদী কেহ জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলেন, কেহ জীবকে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বলেন। এই দুইটি মতকে যথাক্রমে প্রতিবিম্ববাদ ও পরিচ্ছিন্নবাদ বলা হয়। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব প্রত্যেক জীব। ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের বেরূপ নিজস্ব সত্তা নাই, জীবেরও সেইরূপ নিজস্ব সত্তা নাই। প্রতিবিম্বের সত্তা জ্যোতিষ্মান বস্তুর সত্তার উপর নির্ভর করে। সেইরূপ জীবের সত্তাও ব্রহ্মসত্তার উপর নির্ভরশীল।

জ্যোতিষ্মান বস্তু ও তাহার প্রতিবিম্ব পৃথক জিনিষ। সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে যে আধারে সেখানে সূর্য্য নাই।

সূর্যের মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না। সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে জলে। জল সূর্য্য হইতে পৃথক বস্তু। জীব যদি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হয় তবে জীব ব্রহ্মের বস্তু। যেখানে ব্রহ্ম নাই সেখানে জীব আছে। ব্রহ্ম সর্ব্বগ সর্ব্বব্যাপী। এমন কোন স্থান নাই যেখানে ব্রহ্ম নাই। স্তত্রাং ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব হইতে পারে না। জীব যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না তাহার আর একটি কারণ এই যে, ব্রহ্ম নিরাকার। যাহার আকার নাই তাহার প্রতিবিম্ব কিরূপে হইতে পারে? অপর একটি কারণ এই যে, প্রতিবিম্ব একটি আধারে পতিত হয়। যদি বলা যায়, অন্তঃকরণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে—তাহা সম্ভবপর নহে। অন্তঃকরণ মায়ায় পদার্থ। মায়ার কোন অস্তিত্ব নাই। স্তত্রাং অস্তিত্বহীন পদার্থে কিরূপে প্রতিবিম্ব পড়িবে? এইরূপে প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করা হইয়াছে।

পরিচ্ছিন্নবাদ—এই মতে জীব পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বৈ কিছুই নহে। যেমন মহাকাশের মধ্যে ঘটাকাশ, পটাকাশ আছে, ঘট, পট ভাঙিয়া দিলে ঘটাকাশ, পটাকাশ মহাকাশে মিলিয়া যায় সেইরূপ জীবের মায়া আবরণ দূর হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যায়।

এই মত স্বীকার করিলে ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্নতা দোষ আসিয়া পড়ে। এক হইতে অপর পরিচ্ছিন্ন হয় আকার দ্বারা। স্তত্রাং পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে সাকার বলিতেই হইবে। স্তত্রাং অদ্বৈতসিদ্ধি এই মতে টিকিতে পারে না। এই মতে দুইটি প্রধান দোষ। একটি এই যে, ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। তাহা অসম্ভব। অপর দোষ এই যে ব্রহ্ম সাকার হইয়া পড়েন। এইরূপে পরিচ্ছিন্নবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। শঙ্কর জীবের সত্তা এবং জগতের সত্তা স্বীকার করেন না। শঙ্করের ব্রহ্ম নিগুণ, নির্বিশেষ, নিরাকার, নির্বিকল্প, কূটস্থজ্ঞানস্বরূপ, যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান তিনের পার্থক্য নাই—তিনি এক হইয়া গিয়াছে।

শঙ্কর-মতের প্রতিবাদ করেন শ্রীকৃষ্ণ ও রামানুজস্বামী। দুই জনেরই বিশিষ্টাদ্বৈত মত। শ্রীকৃষ্ণ শৈব, রামানুজ বৈষ্ণব। কিন্তু দুই জনেরই তত্ত্ববিচার একরূপ। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহে, সর্বিশেষ। জগতের সত্তা আছে, জীবেরও সত্তা আছে। জীব এবং জগৎ ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম নিগুণ, নিরাকার নহে। তিনি অপারকারুণ্য-সৌন্দর্য্য-বাৎসল্য, দার্দ্র্য-ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্যমগোদধি। তিনি শ্রীমন্ন নারায়ণ বৈকুণ্ঠনাথ, প্রণতাতিহর, আশ্রিতবাৎসল্যাক-জলধি, অশরণাশরণ্য, অনন্যশরণ।

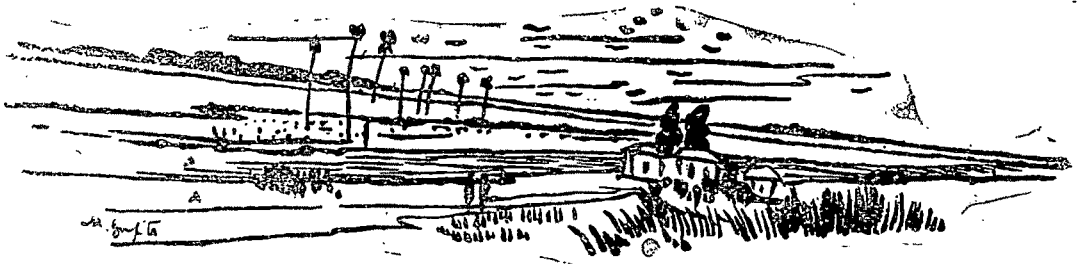
বিষ্ণুস্বামী ও বল্লাভাচার্য্যের মত বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ। এই মতে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম এক—জীবও ব্রহ্মস্বরূপ, জগৎও

একথা বলিলে দোষ হয় না যে, নিষার্কস্বামী মধ্বাচার্য্যেরই অঙ্কসরণ করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য যেখানে যেখানে অভেদ খণ্ডন করিয়া ভেদ স্থাপন করিয়াছেন, নিষার্ক সেখানে সেখানে ভেদের সঙ্গে অভেদও মানিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত চারটি ভেদ মানিয়াছেন, কিন্তু জীব ব্রহ্মে ভেদ মানেন নাই। জীব ও ব্রহ্মের “ভেদাভেদ” সম্বন্ধ মানিয়াছেন। কিন্তু সে ভেদাভেদ অচিন্ত্য। “ভেদাভেদ” সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহাকে “অচিন্ত্য” কেন বলা হইল তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। “অচিন্ত্য” অর্থ প্রমাণের অবিষয়। প্রমাণ প্রধানতঃ চারিটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ। অনুমান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে; উপমানও প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবব্রহ্মের সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমাণসাপেক্ষ নহে। তাহা হইলে একমাত্র “শব্দ” দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু শব্দও ব্রহ্মতত্ত্ব এবং জীবব্রহ্মের সম্বন্ধতত্ত্ব প্রমাণ করিতে অক্ষম। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন, “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”—যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে। শব্দ প্রমাণ হইতে না পারার কারণ এই যে, ইহা জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা এই চারিটি শব্দার্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু ব্রহ্মের জাতি নাই, তাহাকে কোন জাতিভুক্ত করা যায় না, তাহার কোন গুণ নাই। তিনি নিগুণ, তাঁহার ক্রিয়া নাই—তিনি নিষ্ক্রিয়। তাঁহার কোন সংজ্ঞা নাই। সুতরাং শব্দ তাঁহাকে প্রমাণ করিতে পারে না। ব্রহ্ম অচিন্ত্য। ব্রহ্মের সহিত জীবের যে “ভেদাভেদ” সম্বন্ধ তাহাও অচিন্ত্য। এ সম্বন্ধে যুক্তিতর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। “অভেদ”-এবং “ভেদ” এবং “ভেদাভেদ” প্রতিষ্ঠা করিতে যে সকল প্রমাণের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য মাত্র। কিন্তু কোন প্রমাণই

টিকিতে পারে না। যথা শব্দের প্রতিবিষয়বাদ; পরিচ্ছিন্নবাদ আমাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর স্থাপন করা হইয়াছে। আবার বিরুদ্ধপক্ষও সেই প্রমাণ অবলম্বন করিয়াই শব্দের মত খণ্ডন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বপক্ষও যেমন দোষী, উত্তর পক্ষও তেমনি দোষী।

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের নিয়মদ্বারা অতীন্দ্রিয়, অচিন্ত্যতত্ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং এই তর্কের শেষ নাই। এই তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। এই যুক্তি-তর্কের শেষ কথা হইতেছে—এই “ভেদাভেদ” অচিন্ত্য। সাধারণ বুদ্ধির গোচর করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়দ্বারা—অনুমান উপমান দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। “ভেদাভেদ” সম্বন্ধে একটি তর্ক উঠিয়াছে যে ভেদাভেদ একত্র থাকিতে পারে না। যেমন অঙ্ককার ও আলোকের একত্র অবস্থান সম্ভব নহে। কিন্তু জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ অংশাংশী সম্বন্ধ। যেমন সূর্য্য ও তাহার কিরণ। কিরণ সূর্য্যেরই অংশ। সূর্য্যের গুণ কিরণে আছে, কিন্তু কিরণ সূর্য্য নহে। সূর্য্যের সঙ্গে তাহার কিরণের ভেদাভেদ সম্পর্ক—ইহা আমাদের অনায়াস বোধগম্য। জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ অচিন্ত্য। বেদান্ত মতে এই শেষ সিদ্ধান্ত। সকল মতের সমন্বয় এই মতে। এইটি ত্রিচৈতন্য মহাপ্রভুর দান। যিনি বাল্যকালে নবদ্বীপের সমুদয় শাস্ত্রের সকল প্রধান পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের জ্ঞানচর্চার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইয়াছিলেন, যিনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িক বৈদান্তিকের মত অনায়াসে খণ্ডন করিয়াছিলেন। যিনি একবার মত খণ্ডন করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আবার খণ্ডন করিয়া আবার স্থাপন করিয়াছেন, এইরূপে দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধির কৌশলে তিনি যে-কোন মতকে খণ্ডন করিতে এবং প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তিনি জ্ঞানসিন্ধু হইয়াও প্রেমভক্তিকে ঐচ্ছিক স্থান দিয়া ভাবসিন্ধু, প্রেমসিন্ধু নাম ধারণ করিয়াছেন।



রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা তত্ত্ব

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

আমাদের জীবন-সাধনা যেন একটি নিরুদ্দেশ যাত্রা। সাধনার সোনার তরী বাহিয়া আমরা ভাসিয়া চলিতেছি। তরণীর চরম কর্তৃত্ব যাহার হাতে আছে, তাঁহাকে আমরা হয়ত মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি, “আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী, বল কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী?”—কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। তাই আমাদের ভাসিয়া চলিতে হয়, কিন্তু কোথায়? তাহা আমরা জানি না।

বাস্তবিক আমাদের সাধনার চরম কথাটাও আমাদের জানা নাই, কর্তৃত্বও আমাদের নিজের হাতে নাই এবং প্রয়োজনটাও আমাদের নিজস্ব নহে। আমরা আমাদের জীবন-বিধাতা বা জীবন-দেবতার প্রয়োজনেই আমাদের জীবন-কুঞ্জ সাজাইয়া তুলি, বর্ণে গন্ধে রাগিণী ও ছন্দে তাঁহার বাসর-শয়ন গাঁথিয়া তুলি। হয়ত অনেক সময়ই আমাদের কর্তৃত্ব স্তম্ভভাবে প্রতিপালিত হয় না, হয়ত কৰ্ম্মে শৈথিল্য আসে, হয়ত-বা বীণার তার নামিয়া নামিয়া যায়, অর্ধাক্ষয় বিজন-বিপিনে ঝরিয়া পড়ে।

কিন্তু আমাদের অন্তরের দেবতা তাহাতে ক্ষুব্ধ হন না, তিনি বার বার আমাদের আহ্বান করেন, আমাদের খণ্ডিত প্রচেষ্টার ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতাকে অনাগত পূর্ণতার “প্যাটার্নে”র মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া দেন, আমাদের বিভিন্ন কড়ি কোমল স্তরগুলিকে একটা একটা স্তরে গ্রথিত করেন, অসঙ্গতিগুলি ভাবী সঙ্গতির তাৎপর্যে মগ্নিত করিয়া তুলেন।

আমাদের ব্যর্থ-সাধনার অসঙ্গতিকে ভাবী সঙ্গতির তাৎপর্যে তিনি কিভাবে মগ্নিত করিয়া তুলেন? তিনি শিল্পী, তাঁহার শিল্প-সাধনার সৌধটি গড়িয়া তুলিবার জন্য কোনও ইষ্টকে হয়ত ভাঙিয়া, কোনওটিকে হয়ত-বা অখণ্ড রাখিয়াই তিনি তাহার গঠন-কার্য চালাইয়া যান। সমগ্র সৌধটির “প্ল্যান” তাঁহার মাথায় আছে। সেই পূর্ণাবয়ব সৌধটির জন্মই তাঁহার মাথাব্যথা; কাজেই যে ইষ্টকটি অভগ্ন রহিল সমগ্র সৌধটির নির্মাণে তাহার অবদানও যতটা সার্থক, যে ইষ্টকটি ভাঙিয়া গেল তাহারও অবদান ততটাই সার্থক।

আমরা আমাদের জীবন-সাধনা দিয়া আমাদের জীবন-বিধাতাকে যখন সেবা করি, তখন অনেক সময়েই আমাদের “অলন পতন ক্রটি” হয়, তাঁহার কাননে “সেচিবারে গিয়া”

হয়ত অনেক সময়েই আমরা ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়ি, তাঁহার রচিত রাগিণী বেধুয়া হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই, আমাদের যে পূজা সারা হয় নাই তাহা তাঁহার কাছে ব্যর্থ হয় না; যে ফুল না ফুটিতে ফুটিতেই ধরণীতে ঝরিয়া পড়ে, যে নদী মরুপথে তাহার ধারাকে হারাইয়া ফেলে, তাহাও তাঁহার কাছে নিরর্থক নহে; কারণ তাঁহার বীণার তারে আমাদের অনাহত ভাবী রাগিণীও বাজিতে থাকে।

বর্তমান অল্পভূতির সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দিয়া আমরা এই অনাগত ভবিষ্যতের পূর্ণতাকেও যেমন চিনিতে পারি না, তেমনই অতীতের যে সমস্ত অদৃশ ঘটনা আমাদের বর্তমানকে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহাকেও জানিতে পারি না। আমরা শুধু বর্তমান প্রভাতের কুহুম-কলিকা, আমরা ফুল হইতে বীজে এবং বীজ হইতে ফুলে কতবার যে আবর্তন করিয়াছি তাহা আমরা জানি না, আবার কত অতীতের বর্ষা-বাদল “কত বাদলের স্পর্শ কোমল” আমাদের প্রাণের আলোখ্যাটিকে বর্ণের পর বর্ণদম্পাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, সে সংবাদ রাখিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। সে সংবাদ আমরা জানি না, কিন্তু জানেন একজন, যিনি আমাদের জীবন-সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাহার পাদপীঠ আমাদের সমস্ত অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে, অল্পভূতি ও কৰ্ম্মপ্রচেষ্টার মর্ম্মস্থলে।

এই অন্তরের দেবতাকেই রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতা আখ্যা দিয়াছেন। ইহাকে প্রথম হইতেই কবি ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেইজন্যই তিনি এই জীবন-দেবতাকে কখনও “কঠোর-স্বামিনী” রূপে, কখনও প্রেমসী “মর্ম্মের গেহিনী রূপে”, কখনও বা অন্তরতম জীবন-নাথ রূপে দেখিয়াছেন। এই জীবন-দেবতা কখনও বা বীণাপাণি, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্যালক্ষ্মী, যাহার মালঙ্কর মালাকর হইবার জন্ম কবি প্রাণের আকৃতি জানান, কখনও বা তিনি কবির “নীলা-সঙ্গিনী”, যিনি কবির বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার “কাজের কক্ষ-কোণে” আসিয়া তাঁহাকে খেলায় আহ্বান করেন এবং—

“নীলাশ্বরের ভলে

ঘর ছাড়া যত দিশেহারাদের দলে”

যোগ দিতে বলেন; কখনও তিনি হাতে বাঁশী লইয়া কবির নব-যৌবন সভাতে কাজ ভুলাইয়া দেন, কখনও বা

ঝড়ের আধার সঙ্গে করিয়া লৌহ-বলয়ে লৌহদণ্ড বাজাইয়া তাপস মূর্তি ধরিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার এই বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র লীলার জন্যই তাঁহাকে ঠিক চিনিতে পারা যায় না। এই জন্যই জীবন-দেবতার স্বরূপ লইয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছে। এই সমস্ত মতবাদের সংঘর্ষে আলোকেরও যেমন সৃষ্টি হইয়াছে তেমনই উত্তাপ ও ধূমজ্বালেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে আলোকটিও অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অনেক রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচকই “জীবন-দেবতা”কে “বিশ্ব-দেবতা” বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু মোহিতচন্দ্র সেন বলিয়াছেন জীবন-দেবতাকে বিশ্ব-দেবতা বলিলে কবির আকাজক্ষা ও সম্ভোগের যথার্থ তাৎপর্য বুঝা যায় না।

এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি প্রাধান্যযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :

“বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁহার আসন লোকে লোকে এহতল ভারায়। জীবন-দেবতা বিশেষ ভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে বার পীঠস্থান, সকল অশ্রুভূতির সকল অতিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁহাকেই বলিয়াছে যনের মাহুয়” (মানব সভ্যতা; প্রবাসী, ১৩৪০, ক্র্যাক্স)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, “এই জীবন-দেবতাকে আগেকার কবিরা সরস্বতী নামে অভিহিত করিয়াছেন; কবি কুন্তিবাস ওঝা গোড়েশ্বরের সভায় গিয়া আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

‘সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে

নামা শব্দ নানা ভাষা আপনা হইতে ফুরে।’

কবিকে যন্ত্র হিসাবে উপলব্ধ করিয়া যে যন্ত্রী কাব্যসঙ্গীত ফুটাইয়া তুলেন তিনিই জীবন-দেবতা।

অজিতকুমার চক্রবর্তী জীবন-দেবতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনেক জটিল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

“ভারুইনের মতে প্রত্যেক জীবন-কোষের রত্ন ব্যক্তিত্ব আছে। সুতরাং একই মাহুষের মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ খটিয়াছে। কবি তাঁহার দৃষ্টিতে অশুভব করিলেন যে বিশ্ব-অভিব্যক্তির নানা ধারায় তাঁহার যুগযুগান্তরের জীবন প্রবাহিত হইয়াছে। সেই নামা জীবনের নামা ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে—একই অর্থও জীবন-দেবতা তাহাদের সকলকে আপনার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। ফেকনারের চৈতন্যময় বিশ্বপুরুষের আইডিয়াল সঙ্গে, গীতার বিশ্বরূপের সঙ্গে এবং উপনিষদীয় সর্ব ভূতাস্তরায়ার ভাবের সম্পূর্ণ মিল আছে—ইহাই জীবন-দেবতা”

ডঃ এডওয়ার্ড টমসন রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতাকে

কবির কাব্য-বিবর্তনের একটা স্তর হিসাবে দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

“Rabindranath proved his greatness both as a poet and as a man by rising completely above the ‘Jiban/ debata’ phase, so that the thought faded out from his work—faded out gradually, till it was lost in his strong religious experience and absorbed into his general system of thought.”

কিন্তু জীবন-দেবতা কবির কাব্য বিবর্তনের স্তর মাত্র নহে, জীবন-দেবতা হইতেছেন কবির কর্ম-সাধনা ও জীবন-সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তও জীবন-দেবতাকে জীবন-সাধনার প্রেরয়িত্রী ও অধিষ্ঠাত্রী রূপে কল্পনা না করিয়া যেন সাধারণ দেবতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

“কোন কবিতা বাস্তবিক জীবন দেবতা বিষয়ক, ইহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে কোন কাব্যের প্রেরণা আসিয়াছে দেবতার সহিত মিলন বা সেই মিলনের আকাজক্ষা হইতে। বাস্তবিক সেই সকল কবিতাই এই শ্রেণীর মধ্যে পড়িবে, যাহাদের মধ্যে কবি দেবতার সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা প্রকাশ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন—এই দেবতা প্রথমতঃ তাঁহার স্বীয় দেবতাই হউন, অথবা তিনি বিশ্বের দেবতাই হউন, আসল কথা এই, তিনি হইবেন দেবতা” (উদয়ন, ক্র্যাক্স-প্রাবণ, ১৩৪১)।

ডঃ শচীন্দ্রনাথ সেন তাঁহার ‘রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়’ নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার সার্থক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার প্রবন্ধের শেষের দিকটিতে যেন রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতাবাদ ও তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাস এক হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু জীবন-দেবতা সম্বন্ধে বোধ হয় এত জটিল আলোচনার প্রয়োজন নাই। কারণ কবি নিজেই ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন,

“আজ জামিয়াছি যে সকল লেখা উপলব্ধ মাত্র—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহার চেনেও না। তাহাদের রচনায় মনো আদ্য একজন রচনাকার আছেন, যাহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যেক বর্ধমান। ফুৎকার বাঁশীর একটা ছিঁড়ের মধ্য দিয়া এক একটা সুর ভাসাইয়া তুলিয়াছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চৈশ্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিজ্ঞ সুরগুলিকে রাগিণীতে গাঁথিয়া তুলিয়াছে? সু সুর ভাসাইয়াছে বটে, কিন্তু সু তা বাঁশী বাজাইতেছে না; কে সেই বাঁশী বাজাইতেছে, তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্ধমান আছে, তাঁহার অগোচরে কিছুই নাই...এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত অশুকুল-প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা

করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবন-দেবতা' নাম দিয়াছি...আমি জানি অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিশ্বত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন" (মানব সত্য, প্রবাসী, বৈষ্ঠ ১৩৪০)

তবে এই জীবন-দেবতা সম্বন্ধে কবির ধারণাটা এক দিনেই হঠাৎ গড়িয়া উঠে নাই। কবির ৭৮ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার কবিতা রচনা আরম্ভ হয়, ১৪ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার প্রথম কাব্য-কাহিনী "বনফুল" জ্ঞানাসুর পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার জীবন-দেবতা সম্বন্ধে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় চিত্রা কাব্যের মধ্যে। প্রথমে তিনি ছিলেন কবির "অন্তর্ধামী" (১৩০১), পরে কবি তাঁহাকে "জীবন-দেবতা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (১৩০২)।

ইহা ছাড়া চিত্রার 'সাধনা', 'সিক্কুপারে', 'আত্মোৎসর্গ', 'শেষ উপহার' প্রভৃতি কবিতায়, উৎসর্গ কাব্যের 'ছল', 'নববেশ', 'দ্ব্যারে তোমার ভিড় করে আছে যারা' প্রভৃতিতে কল্পনার 'অশেষ' কবিতায়, বলাকার 'শঙ্খ' কবিতায়, পূর্ববীর 'লীলাসঙ্গিনী', 'আহ্বান', 'পদধ্বনি', 'দোসর', 'অন্তর্হিতা' প্রভৃতি কবিতাতেও জীবন-দেবতার প্রসঙ্গ আছে। কবির কাব্যে জীবন-দেবতা-বাদ পরিস্ফুট হইবার পূর্বেই কবি তাহার লীলা-রহস্য বুঝিতে আরম্ভ করেন। সোনার তরীর "নিরুদ্ধে যাত্রা"র মধ্যে তিনি জীবন-দেবতার অজ্ঞাত অভিধানের কথা অনুভব করিয়াছিলেন, "মানস স্তম্ভরী"তে তিনি জীবন-দেবতাকেই হয়ত সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী বা কাব্য-লক্ষ্মীরূপে অনুভব করিয়াছেন এবং "সোনার-তরী" কবিতাতে তিনি জীবন-দেবতার একটা দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পান।

সে-তত্ত্বটি এইরূপ—

সোনার তরী বাহিয়া মহাকাল চলিতেছে। মানুষ তাহার জীবনের ছোট ক্ষেতটিকে সোনার ফসল ফলাইয়াছে। এই ক্ষেতটুকু ছোট একটি দ্বীপের মত, কারণ সেই দ্বীপের চারিদিকই সে অব্যক্তের দ্বারা বেষ্টিত। এইবার বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছে, হয়ত ঐ অব্যক্তের মধ্যে তাঁহার ক্ষেতটুকুও ডুবিয়া যাইবে। কবি এতদিন জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনযাপন করিতেছিলেন। এখন কিন্তু তাঁহার মনটি পরপারে ঝাঁক। "তরুছায়া মসৌমাথা" গ্রামের দিকে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় তিনি দেখিলেন মহাকালের দেবতা কালশ্রোতে তরী ভাসাইয়া চলিতেছেন। কবি তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার সোনার ফসল সমস্তই "থরে-বিথরে" তুলিয়া দিলেন এবং তাহার পর

তাঁহাকেও সেই সোনার তরীতে তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করিলেন। কিন্তু মহাকাল তাঁহার কণ্ঠের ফসলকেই গ্রহণ করিলেন, কবিকে গ্রহণ করিলেন না। কারণ মহাকালের ইতিহাসে আমাদের সাধনার সোনার ফসলই সঞ্চিত হইয়া থাকে, সাধকের স্মৃতি লইয়া তাঁহার কোনও মাথাব্যথা নাই।

এই সোনার তরী হইতেছে কবির তথা সমগ্র মানব জাতির সাধন-তরী। আমাদের সাধনার সোনার ফসল তাহাতে সঞ্চিত ও বাহিত হয়, কিন্তু আমরা সেখানে স্থান পাই না। কোন্ দিন কোন্ অজ্ঞাত শিল্পী আদার সহিত মোরী বাটিয়া বাংলার কলাই-এর ডালের সঙ্গে মূলতানের হিং মিশাইয়া রন্ধনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে খবর আমরা রাখি না; কিন্তু সে প্রক্রিয়াটি মনে রাখিয়াছি। জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই এই জিনিষটি দৃষ্ট হয়। কবে কোন্ বৈজ্ঞানিক প্রথম গাড়ীর চাকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কে আগুন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সমুদ্র হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, খনি হইতে লৌহের সন্ধান করিয়াছিলেন, মহাকালের খাতায় তাহা লিখিত হয় নাই, কিন্তু সেই সব সাধনার ফলগুলি মানব-সভ্যতার ইতিহাসে রহিয়া গিয়াছে।

এই কবিতাটির শেষের স্তবকে কবির জীবন-দেবতা-বাদের স্মরণিত হইয়াছে। মহাকাল কবির সোনার ধান গ্রহণ করিলেন কিন্তু কবিকে গ্রহণ করিলেন না। ফলে কবি সাধনার শেষে যে বিশ্রাম খুঁজিতেছিলেন তাহা তাঁহার ভাগ্যে জুটিল না। ইহাই তাঁহার জীবন-দেবতার অভিশ্রাব। কারণ আমরা কবির জীবন-দেবতা-বিষয়ক পরবর্তী রচনা "অশেষ" ১৩০৬ (কল্পনা), "আহ্বান" (পূর্ববীর), শঙ্খ ১৩২১ (বলাকা) প্রভৃতির মধ্যে দেখিতে পাই যে, সাধনার অজ্ঞিত সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে পূর্বাঙ্গিত অর্থের স্বপ্ন খাটান মহাজনের মত বসিয়া থাকিবার অধিকার জীবন-দেবতা আমাদের দেন না। কারণ সেই কঠোর স্বামিনীর দাবির শেষ নাই, তাঁহাকে সেবা করিলে বিদায় পাওয়া যায় না, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার আহ্বান ধ্বনিত হয়, তাঁহার কাছে আরাম চাহিলে শুধু লজ্জাই পাইতে হয়, কিছুতেই তাঁহার পূজা সাধ্য হয় না, কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি বিধান হয় না। "গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা" তাঁহার ক্ষণিক খেলার জন্য নতন নতন মুক্তি রচনা করিতে হয়, "নিঠুর-পীড়নে নিঙাড়া বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাদম" তাঁহার পান-পাত্র ভরিয়া তুলিতে হয়; আবার এই জীবন দিয়া যখন তাঁহাকে নতন কিছু সেবা করিবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন তিনি মৃত্যুর

ভিতর দিয়া তাঁহার সেবককে নূতন জীবন দান করিয়া তাঁহার নিজের কাজ আদায় করিয়া লইতে চাহেন; তাই কবিকে প্রার্থনা করিতে হয়।

“নূতন করিয়া লহ আর বার চির পুরাতন মোরে
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমার নবীন জীবন ডোরে।”

এই জীবন-দেবতার প্রেরণাতেই কবি বার বার তাঁহার কাব্য-সাধনার সমাপ্তি করিয়াও বার বার নূতন করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। কবি তাঁহার সাধনার শেষ দান মনে করিয়া “চৈতালি” কাব্য (১৩০২-১৩০৩) রচনা করিলেন। কিন্তু এইখানে তাঁহার রচনার শেষ হইল না। ইহার পর “খেয়া” (১৩১৩), “পূরবী” (১৩২৯), “শেষের কবিতা” (১৩৩৬), “পরিশেষ” (১৩৩৭) প্রভৃতি পরি-সমাপ্তি স্বচক গ্রন্থ লিখিয়াও শেষ পর্য্যন্ত “পুনশ্চ” (১৩৩৯) ছের টানিয়া তাঁহাকে চলিতে হইল।

এই তত্ত্বটিই প্রকাশিত হইয়াছে “সোনার তরী”র শেষ শব্দকে। সেখানে দেখিতে পাই কবি যখন কাজের একটা পর্ক শেষ করিয়া একটু বিশ্রামের জন্য সোনার তরীতে স্থান চাহিলেন, তখন তিনি সেই স্থানটুকু পাইলেন না। কারণ ইহাই যে জীবন-দেবতার অভিপ্রেত, তিনি যে ভাবে আমাদের দিয়া কাজ করাইয়া লন তাহার শেষ নাই, বিবর্তনের পর বিবর্তন, আবর্তনের পর আবর্তনের ভিতর দিয়া তাঁহার লীলা চলিতেছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় চৈতালী পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার সাধনার একটা পর্ক শেষ করিলেন বলিয়া তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন :

“চৈতালী শীর্ষককবিতাগুলি লেখকের সর্ব শেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্র মাসে লিখিত বলিয়া বঙ্গের শেষ উৎপন্ন শব্দের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।”

কিন্তু এইখানেই ত কবির সাধনার শেষ হইল না, তাঁহার অঙ্গে ক্লান্তি নামিয়া আসিল, মন্দম্বরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, তবুও তাঁহাকে বলিতে হইল “তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর এখনই অঙ্গ বন্ধ করো না পাখা”(১৩০৪)। ইহার পর “অশেষ” কবিতায় (১৩০৬) কবি নির্ভর স্বামিনী জীবন-দেবতার আহ্বান স্পষ্ট করিয়াই শুনিতে পাইলেন :

“মার্ঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ন ম্লান হেলে
হ’ল অবসান,
পর পারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরগীতে
তবুও আস্থান ?”

কিন্তু এই আহ্বান যিনি করেন তিনি শুধু কঠোর স্বামিনীই নন তিনি “মোহিনী”ও বটে। সেইজন্যই তাঁহার সহিত কবির সম্পর্ক শুধু প্রভুর সহিত ভৃত্যের

দীনতার সম্পর্ক নহে, স্বার্থের সম্পর্ক নহে। এই জীবন-দেবতা কবির জীবনের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীও বটে। তাই তাঁহার সহিত কবির একটা মধুর রসের সম্পর্কও আছে। সেইজন্য কবি সেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর স্বেচ্ছাবন্দী সেবক হইয়া তাঁহার নিকুঞ্জের অন্বেষণে হইতে চান। তিনি এই রাজরাজেশ্বরী মহারাণীর চরণপ্রান্তে যুদ্ধ অস্ত্র ধনুশর উষ্ণীষ রাজসাজ সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, গৌরব ও দস্তের উচ্চ রাজকাব্য প্রত্যাখ্যান করিয়া, রাজসিক দস্ত ও উচ্চাকাজক্ষার পদ ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর মধুর অঙ্গকে ফুলের কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে মধুরতর করিয়া সাজাইয়া তুলিবার অধিকারলাভ করিবার জন্য, তাঁহার মালঞ্চের মালাকর হইবার জন্য আবেদন করেন। ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠার প্রেরণা নাই, আছে শুধু শিল্পীর নিষ্ঠা, আত্মবিস্মৃত প্রেমিকসেবকের সন্ন্যাসীকৃত্য।

এই নিষ্ঠা, এই সন্ন্যাসীকৃত্য আমাদের জীবন-দেবতার নিকট কখনও অবহেলিত হয় না। জগতের সাধারণ লোক আমাদের কাজের মূল্য দেয় কাজের সফলতা দেখিয়া। কারণ স্থূল দৃষ্টিতে এই সফলতার চেয়ে ব্যবহারিক মাপকাঠি মানুষের হাতে নাই। কিন্তু জীবন-দেবতার পীঠস্থান মর্শ্বের মর্শ্বস্থলে, সমস্ত অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে, সেইজন্য আমাদের “যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না” সেই সমস্ত ব্যর্থ-সাধনাকেও তিনি অবহেলা করেন না। আমাদের সাধনার মধ্যে যদি আন্তরিকতা থাকে তাহা হইলে আমাদের কাজ করাটাই তাঁহার চোখে বড় হইয়া উঠে, কাজের ব্যর্থতাটা নহে। সংসারের স্বার্থ-সফল কৃত্তী লোকেরা হয়ত আমাদের ব্যর্থতা দেখিয়া হাসিতে পারে, কিন্তু আমাদের জীবন-দেবতা সেই ব্যর্থতাকে তিরস্কৃত করেন না, তাই তাঁহাকে বলা যায় :

“ভূমি জান ওগো করি মাই হেলা

পথে প্রান্তরে করি মাই খেলা

ভুগু লাগিয়াছি বসি সারা বেলা শতেক বার”—

এইটাই হইতেছে বড় কথা। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের :

“মনে ঘাধা ছিল হয়ে গেল আর

গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার ;”

কিন্তু জীবন-দেবতা ত সেই ভাঙিয়া যাওয়াটাকেই বড় করিয়া দেখেন না, তিনি মনের আন্তরিক বাসনাকেই মূল্য দেন, স্থূল চক্ষে বাহ্যিক সকলের নিকট ধরা পড়ে, সেই সফলতার স্থূল মাপকাঠি দিয়াই তাঁহার বিচার নহে, কারণ আমাদের অন্তরের নিষ্ঠাটা তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়, তাই যে ব্যর্থতার জন্য লোকে আমাদের নিন্দা করে, সেই ব্যর্থপ্রচেষ্টার মূল্যও তিনি দিয়া থাকেন। কারণ :

"All I could never be
All men ignored in me
This I was worth to God whose wheel the pitcher
shaped."

কবির জীবন-দেবতা তাঁহার ব্যর্থ সাধনাকেও যেমন অবহেলা করেন না তেমনই সার্থক সাধনাকে লইয়াও মাতামাতি করেন না। কারণ পূর্ণতা ও সফলতা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অনেক উচ্চ। সেই জন্য আমাদের ক্রটি-গুলিকেও যেমন তিনি উদারভাবে ক্ষমা করিতে পারেন, তেমনই আমাদের লৌকিক সফলতাকেও খুব বড় করিয়া ভাবিতে পারেন না। সেই জন্যই কবি তাঁহার জীবন-দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন :

"বুঝেছি বুঝেছি সব ছলনা

সবার যাছে তৃপ্তি হলো তোমার তাহে হলো না।"

(উৎসর্গ, 'ছল')

এই জীবন-দেবতা যেন রাজরাজেশ্বরী, আমাদের সাধনার দুচ্ছতম, এমন কি ব্যর্থ উপহারকেও তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেন, আবার সকল-সাধনার উপহারে তিনি অভিভূত হন না। কারণ চরম সফলতার যে আদর্শ তাঁহার জানা আছে, তাহাকে আমরা কোনও দিনই পাইতে পারি না, কাজেই সবার যাতে তৃপ্তি হয় এমন সফলতাও তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারে না।

এই জন্যই আমাদের সাধনার শেষ নাই, সার্থকতার পার্বত্য যাত্রাপথের শেষ বিয়ামের অধিত্যকা নাই। সেই সার্থকতা আমাদের অজ্ঞাত, অথচ সেই অজ্ঞাত সাধনার সন্ধানেই "বস্তুরী যুগসম" আপন গন্ধে পাগল হইয়াই আমরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করি, অন্তরের সৌন্দর্য-বোধ ও সৃষ্টির বহিঃপ্রকাশের জন্য এই ব্যাকুলতাই হইতেছে আমাদের অচিন প্রিয়ার বাঁশরীর আঁহান, এই স্বপ্নের আঁহানেই আমাদের "অবারণ চলা আরম্ভ হয়, কখনও তাহার শেষ হয় না, কারণ এই যাত্রা-পথ সঙ্গ রেখায় বিস্তৃত নহে, ইহার একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে আরম্ভ এবং নির্দিষ্ট বিন্দুতে পরিসমাপ্তি নাই, ইহা আবর্তনে আবর্তনে চক্রগতিতে চলে, এই জন্যই সব সময়েই তাহার আরম্ভ, অথচ কোনও সময়েই তাহার শেষ নাই, কোনও সময়েই তাহা একেবারে অসম্পূর্ণ নয়, আবার কোনও সময়েই তাহা সম্পূর্ণও নহে—এ চলার "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?" প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন :

"সাদ হলে মেঘের পালা স্রব হবে সৃষ্টি ঢালা

বরফ জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে—"

মানুষের সাধনার ক্ষেত্রেও সেইরূপ, ইহাই মানুষের জীবন-দেবতারও লীলা।

সমাধান

শ্রীশান্তশীল দাশ

হিসেব নিক্ষেপ করি নাটো আর
এই আছি বেশ ভালো ;
অমেক কমেছে জীবনের জটিলতা ;
জীবনে যেমেছে কতটা আশার,
আর কতটুকু আলো,—
এ হিসাব মাঝে-পাই মে সার্থকতা।
আশারের দাম হাসিমুখে নিই
করি নাটো বুণ্ডার ;
দেখি সে আশার নহে ভোঁ চিরন্তন।

খেঁটকু থাকার তার চেয়ে বেশী
থাকে নাটো সে ভোঁ আর,
কেন হতাশার অকারণ গুঞ্জন।
ভোঁছনা রজনী আসে দেখি গেয়ে,
হই নাটো বিহ্বল,
সাথে আছে তার ওমানিশা সে ভোঁ দানি ;
চিরসাবী নয় বলে ব্যথাভরে
কেলি নাটো আঁবিজল ;
সহজ হৃদয়ে হুঁয়েয়ে নিয়েছি দানি।

এক রাত্রির স্মৃতি

ঐশ্বরীচন্দ্র রায়

মাতৃক পাশ করিবার পর, প্রায় দুই বৎসর বয়সী ক্রমাগত দরখাস্ত ও 'ইন্টারভিউ' দিয়া দিয়া যেমন হতাশ হইয়া পড়িলাম, তেমনি নিঃশেষ উপরও একটা প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মিয়া গেল। তাবিলাম, বাস্তবিকই আমি একটা অকেজো অপদার্থ—নতুবা অস্ত্র সকলের যেমন চাকরি জুটয়া যায়, আর আমারই বা হয় না কেন? আমার মনটা যে শুধু দুঃখেই ভরিয়া গেল তাহাই নয়, হতাশা ঘৃণা বিষাদ বিদেহ কোষ প্রভৃতি মিলাইয়া যে বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ কোন এক ভীষণ নারকীয় বস্তুর সৃষ্টি হইয়া, আমার মনকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া দিল যে, পৃথিবীর সবকিছুই উপর অভিযাত্রার বিবেচ্যতাবাপন্ন হইয়া, অভ্যস্ত অনাসক্ত হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, এই জগৎ সত্যই অতি বিকীর্ণ স্থান, এখানে কোন আকর্ষণ নাই, মধুরতা নাই, সৌন্দর্য্য নাই। বোধ হয়, এইরূপ মনোবিকারের মতোই মানুষ সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যায়, অথবা আত্মহত্যা করিয়া বসে। কিন্তু আমার মন ভিন্ন বাতুতে পড়া। তাই ঐ দুই পন্থাকেই বোম্বুয় বৃদ্ধাশ্রম দেখাইয়া, একদিন সকলের অগোচরে ট্রেনে চাপিয়া বলিলাম—উদ্দেশ্য কলিকাতার বাওরা।

মামা মামীর নিত্য দুই বেলা গল্পনা আর সহ হয় না। বলিতে জুলিয়া গিয়াছি যে, আমি শৈশব হইতেই পিতৃ-মাতৃ-হীন। কলিকাতা রওনা হইবার পূর্বে আমার রূপণ মাতুলের বাক্স খুলিয়া, তাঁহার বহুদিনের সম্বরণকিত অর্থ সরাইয়া তাঁহার তার লাগব করিয়া দিলাম। আমি আমার এই যাওয়াই এখান হইতে শেষ যাত্রা, কারণ আর কখনই মাতুল তাঁহার গৃহে আমার স্থান দিবে না।...

ট্রেনে চাপিয়া বলিয়া, রূপণ মাতুলের অর্থশোকের সেই সময়কার দৃষ্টান্ত ভাবিয়া, মনে মনে হাসিয়া, সস্ত্রীক কঁচি সিগারেটের ভেলভেল কাগজখানি ছিঁড়িয়া একটা সিগারেট বরাইলাম। মাতুলের পরসার সিগারেট টানিতে বেড়ে লাগিতেছে। মনদীপ ষ্টেশন আসিলে, এক পেলাস চা লইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করিতে লাগিলাম। প্রথম সমস্তা দেখা দিল, 'কলিকাতার' কোথায় গিয়া উঠিব। তাবিলাম, মল্লিকদের হরিপদ বড়বাজারে এক মশলার দোকানে কাজ করে। তাহার ঠিকানা ত জানি। উপস্থিত তাহার কাছেই উঠিয়া, যা হোক কোন একটা কাজকর্মের সন্ধান করিব। ইহাই মনে মনে ঠিক করিয়া সিগারেট ফুকিতে ফুকিতে ভবিষ্যতের সোমালী চিহ্ন আঁকিতেছি, আবার কখনও কখনও মাতুলের মুখখানি মনে পড়িতেছে। মনকে

দেখিলাম, মাতুল বাক্স খুলিয়া অর্ধেক হইয়া গেলেন। তারপর টাকতরা মাথায় অবশিষ্ট যৎসামান্য চুলগুলি টানিতে টানিতে মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট ভাগনের সহিত সজিত অর্থগুলির উষাও হওয়ার যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা তারবরে ঘোষণা করিতে করিতে উঠানময় একরূপ উদ্যম নৃত্যই আরম্ভ করিয়া দিলেন। কল্পনার মামা-মামীর যুক্ত গালিগালাজ ও অতিদম্পাতের দৃষ্টান্ত যে বেশ চমৎকারই লাগিল, তা বলা বাহুল্য।

তাবিতে তাবিতে অথবা সিগারেট ফুকিতে ফুকিতে বুকি খুলিয়া গেল। মনে হইল, এতদিন শুধু ভাকঘোণে দরখাস্ত পাঠাইয়াছি, আর ইন্টারভিউ দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু চাকরি পাইতে হইলে যে, তদ্বির ও চেষ্টা করিতে হয়, তাহা ত কোন দিনই করি নাই। উপস্থিত হাতে যখন অর্থ আছে, তখন একবার তাল করিয়া তদ্বির করিয়াই দেখা যাক না। মনে পড়িল—শেষ দরখাস্তখানির কথা। বর্জমান ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার আপিস হইতে যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, ও যাহাতে আমি দরখাস্ত করিয়াছি সেইখানির কথা। এখনও ইন্টারভিউ করিবার তারিখ আসে নাই। এখনই ত তদ্বির করিবার সময়। উহার কতকগুলি লোক লইতেছেন—যাহাদের কাজ গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কাহার কত বিধা জমি আছে—উহার মধ্যে কত আবাদী কত অনাবাদী, অথবা কোন জমিতে কি কি ফসল কত হারে হয় এইসব তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। চাকুরি যদিও অস্থায়ী এবং মাহিমা যদিও কম—মাত্র পরভাজিষ টাকা—তবুও সোলাস টুঙ্গী মাথায় দিয়া অর্ধে বাঁকি প্যাণ্ট সার্ট চড়াইয়া, জুতা মোজা আঁটয়া কিছুকাল একজন মস্ত বড় অফিসার সাজিয়া বেড়াইব। পেরো চাখীরা ও সরল গ্রাম্য লোকেরা সত্যে সেলাম ফুকিবে—কেহ বা বিদ্যা কারণে ঘোশামোদ করিবে। উহাই বা কম আমন্দ না কি। এখন যো সো করিয়া, তদ্বির তদারকের ছোরে চাকরিটা বাগাইয়া কেলিতে পারিলে হয়। তাই ব্যাঙেলে নামিয়া পড়িয়া বর্জমানের গাড়ীতে চাপিয়া বলিলাম। আমার কান-শোমা একটু ছেলে বর্জমানের কোটে কাজ করিত। তাহারই আন্তামায় উঠিলাম। রাজেন তখন সবোচ্চ কোর্ট হইতে কিরিয়া, ভাঙা তক্তপোষের উপর শুইয়া পাখা নাড়িয়া বাতাস খাইতেছে। আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, আরে দাদা যে—

হুহ হাসিয়া তক্তপোষের উপর বলিয়া পড়িলাম।

রাজেন বলিল, তার পর হঠাৎ কি ব্যাপার। মামলা-মোকদ্দমা না কি?

—না হে—ও সব কিছু না। তার চেয়েও বড়। সব বলছি দাঁড়াও একটু। হাত মুখ ধুয়ে, আগে একটু চা খেয়ে জুড়ই। বাবাঃ, গাড়ীতে কি ভিড়। গরমে আর ঠেলাঠেলিতে প্রায় সেদ হয়ে গেছি। হাঁ, তোমার এখানে রাতটা ত কাটাবেই, সম্ভবতঃ কালকেও থাকতে হবে।

রাজেন বলিল, তাতে কি? বহন—ভাল হয়ে বহন।

না—না—ওদিকটায় বেশী চাপ দেবেন না। একটা পাখা ভাঙা, তাই খানকতক ইট দিয়ে কোম মতে খটাককে ঝাড়া রেখেছি। কি জানি চাপ পেলে—ইনি কাৎ মারতে পারেন।—সত্যে সরিষা বসিয়া বলিয়া—ও বাবা। কাজ নেই—সরে বসি। বলি ছারপোকা আছে নাকি হে? কুট কুট করে কাষড়াচ্ছে বে—

রাজেন বলিল—বাঃ থাকবে না মানে? রাতে ও বেটারা ঘুমে দেয় নাকি? সারা রাতই এক একটাকে ধরছি—আর মারছি। একে রেশমের চাল খেয়ে খেয়ে চামচিকেট হয়ে গেলাম—তার ওপর এই রক্ত শোষকগুলোর অত্যাচারে শরীরে আর কিছু হইল না। রাতে প্রতিজ্ঞা করি—সকাল হলেই এই শুকনোপোষক ওদের টান মেঝে ফেলে দেব। কিন্তু সকাল হলে আর হয় না। দশ টাকা দিয়ে কিনেছি কিনা?

বলিয়া—তা বটে। দশ দশটা টাকাই লোকসান হবে।

রাজেন কোম কথা না বলিয়া, দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। এক সময় হুট বিভি বাহির করিয়া বলিল, নিম চাহুন। কিন্তু ব্যাপারটা কি—মানে কি ঘরকারটা তা ত বললেন না। সংক্ষেপে সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলিয়া, দেখ চাকরি আমার চাই-ই। ঘেমন করে হোক—তদ্বির তদারক খোশামোদ করে পারে ভেল দিয়ে—মানে ওটা চাই। নতুবা আমার আর কোন আশা নেই। মাতুলশ্রম বন্ধ—আর ওযুখো হবার উপায় নেই—

রাজেন বলিল, তা তো সবই বুঝলাম। কিন্তু চাকরি—এই বলিয়া রাজেন মুখখান বিকৃত করিল।

বলিয়া—কেন—আশা নেই নাকি? এখন কার হাত আছে—কাকে ধরতে হবে, কি ভাবে তদ্বির তদারক করতে হবে, এই সব সম্ভান আমার বাংলাে দাঁও দেখি। তার পর আমি দেখে দেব।

রাজেন উঠিয়া বলিল, আচ্ছা সে হবে। এখন চলুন, হাত মুখ ধুইগে।

দিন পাঁচ-ছয় কি 'পরিশ্রমই না করিলাম'। রাজেনের নিকট সম্মান লইয়া ঠিক চরকিবাজীর মত বৌ বৌ করিয়া এই কয়দিন ঘুরিয়া অবশেষে সত্য সত্যই চাকরি একটা বাগাইয়া ফেলিলাম। যেদিন চাকরিতে বহাল

হইলাম, সেই দিন মনে হইল, করতলে বর্গরাজ্য নামিয়া আসিয়াছে। রাজেনকে একপেট মীতাভোগ মিহিাদা খাওয়াইয়া দিলাম। রাজেন না থাকিলে এই চাকরি-ঘরে কয় হইতাম না। ও অন্তরালে থাকিয়া, মোক্ষম মোক্ষম ভীর ছুটিয়া আমার জয়ী করিয়া দিয়াছে। রাজেনের নিকট ঠিক ঠিক সম্মান—ঠিক ঠিক খবর না পাইলে এই চাকরি আমার ভাগ্যে জুটত না। শুধু ইচ্ছারতিউ দেওয়াই সার হইত।

এক দিন আপিসের কাগজপত্রসহ সদরের উপদেশ ও আদেশ লইয়া আমার কর্মস্থল সেনপাহাড়ীতে রওনা হইলাম। সেনপাহাড়ী একটা পরগণা। লালমাটি আর কাঁকরে একটা রক্তভা বেন সারা অঞ্চল ছাইয়া রহিয়াছে। বরিশীর স্পর্শে কোমলতা নাই—আছে তীব্রতা। এখানে আসিয়া অতীতের বহু কথা মনে পড়িতে লাগিল।

ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম—এই সেনপাহাড়ী পরগণা অতীতে এককালে গোপভূমি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে মহারাজ চিত্রসেন এই রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার নামানুসারে এই পরগণার নাম হইল সেনপাহাড়ী। আমার মন চলিয়া গেল সেই সুরুর অতীত যুগে—ভিন্ন হাজার বৎসর আগেকার ইতিহাসের পৃষ্ঠায়—সেই সব তেজস্বী বীর বাঙালীর ছবি মনে ভাসিয়া উঠিল। মনে পড়িতে লাগিল, এক দিন বিজয় সিংহ তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে নীল সাগরের বুকে জাহাজ ডাসাইয়া লক্ষাদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন এই রাঢ়দেশ বা সুরজমপদের রাজা—রাজা সিংহবাহুর পুত্র। মনে পড়িল—দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজান্ডার বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। রাঢ়ের দুর্জয় বাঙালী-বাহিনী গঙ্গা-রাঢ়ী সৈন্তের অসীম শৌর্যবীর্যের কাহিনী শুনিয়া আর তিনি অগ্রসর হন নাই। এই মাটিতে—পুরাকালের এই গোপভূমির মাটিতে কত বীর কত যোদ্ধা জন্মিয়াছিলেন—কত যুদ্ধ-বিগ্রহই না এই ভূমির উপর ঘটয়া গিয়াছিল। এই ভূমি—এই লাল মাটি—আর রক্ত কাঁকর, পুরাতন পৃথিবীর জীর্ণভায় আজ প্রাণ-হীন—রসহীন। কিন্তু বোধ হয় এক দিন ছিল—এই ভূমি সুরজা সুরজা। মনে পড়িতে লাগিল—এক দিন, এই স্থান ছিল সিংহবাহু, মহারাজ শশাঙ্ক, কর্ণ সেন, চিত্র সেন, বিশ্বর ঘোষ, হেমন্ত সেন প্রভৃতি বীর পুরুষগণের লীলাস্থল।

অতীতের সেই পৌরবহর যুগে এই জমপদে সেদিন প্রতি সন্ধ্যায়, মন্দিরে মন্দিরে পুজার খটা বাজিয়া উঠিত—ধূপ ধনা গুগুণ্ডলের সুগন্ধে বাতাস সুরভিত হইত—অদ্বারোহী সৈন্তের স্তেরীমিমাণে—অথের সুরাধাতে রাজপথ সচকিত হইয়া উঠিত। তার পর কালস্রোতে সব ভাসিয়া গেল। বাঙালী সভ্যতার আদি ভীর্ণভূমি কালের কঠোর আঘাতে কোথায় ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এখন সেই স্থান শুধু গ্রীহীন

কাঁকর আর লাল মাটিতে পরিপূর্ণ। ছোট বড় নদীসমূহ আর যুগ—কিংবা যুগপ্রায়। গ্রামাঞ্চল—কোথাও বিরলবসতি—কোথাও ঘুঘু করিতেছে প্রান্তর—কোথাও ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বড় বড় দীঘির চারি পাড়ে ঘন জঙ্গল—সাপ আর হিংস্র বন্যজন্তুর আশ্রয়। মন্দিরে মন্দিরে—নরহত্যা ডাকাতিদলের নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

আমি একখানি সাইকেল ঘোণ্ডা করিয়াছিলাম। আমার উপর আদেশ ছিল, এই সেমপাহাড়ীর আশপাশের দশ বারখানি গ্রামের আবাদী ও অনাবাদী জমির হিসাব লইতে হইবে। কোন্ জমিতে কি পরিমাণ ফসল হয়, কি কি ফসল ফলে, সেচের ব্যবস্থা আছে কিনা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখিলাম—অন্ততঃ পনের-ষোল দিনের কম এই সব ব্যাপার চুকিবে না। এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের রূপায় একটা আশ্রয়স্থল জুটয়া গেল। আমি সাইকেলে চাপিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। প্রায়ই সমস্ত দিন আমার একরূপ খাওয়াই হয় না। ভগবানের দয়ায় অবশ্য কোন কোন দিন কোথাও বেশ ভাল আহারই জুটয়া যায়। অনাহারে বিশেষ কষ্ট হয় না—যতটা কষ্ট হয় সময়মত চা না পাইলে। তাই সাইকেলের পিছনের কেবিনে চা, চিনি, কেটলী, একটা কাপ কোলায় করিয়া রাখিয়া লইয়া কাছে বাহির হইয়া যাই। গ্রামের ভিতর ছুঁ জুটয়া যায়। কোন দিন ছুঁ না জুটিলেও অসুবিধা হয় না। বিনা দুধে চা খাইবার অভ্যাস আছে।...

সাইকেল লইয়া গ্রামের পর গ্রাম পার হইতেছি—সমস্ত জমিই ঘুঘু করিতেছে। কোথাও ফসলের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। এখানে ওখানে আগাছা লইয়া, জমিগুলি রিক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় না যে, এখানে কোন দিন চাষ জাবাদ হইয়াছে।

আমার থাকী প্যাট ও সোলার টুপি দেখিয়া অজ্ঞ চাষীরা আমাকে একজন বিশেষ মাতৃগণ্য সরকারী কর্মচারী মনে করিল। উহারা হুই হাত ছোঁ করিয়া কত কাকূতিমিনতি করে—হুঃখের কিরিত্তির, নালিশের শেষ নাই। গ্রামে জল নাই—খাল নাই। গত দুই বৎসর অজন্মা গিয়াছে—এক কোঁটাও বৃষ্টি হয় নাই। পানীয় জলের দারুণ অভাব—এমন কি গরু বাছুরের তৃষ্ণার জল পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। লাল কাঁকর-মাটি কাটিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে বরিক্রীর বিষ-নিঃখাল এই সব পথ দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া সবকিছুকে ভস্ম করিয়া দিয়াছে। দেখিলাম, এই সব গ্রামের বহু দূর দিয়া ক্যামেল গিয়াছে। চাষের সময় একমাত্র আকাশের দয়ায় উপর নির্ভর করিতে হয়। গত দুই বৎসর যে বৃষ্টি বা বর্ষা হয় নাই, তাহার মর্মান্তিক দৃষ্ট দেখা যাইতেছে। সমস্ত মাঠ জমি খাঁ খাঁ করিতেছে, গুহুর দীঘি শুকাইয়া গিয়াছে,

ছোট ছোট কুদীরগুলির চালে বড় নাই—কোনটি বা তরু অথবা অর্ধতরু। সমস্ত গ্রাম যেমন খ্রীষ্টীয় গ্রামবাসীগণের স্বাধ্যও ভেমন। খাদ্য নাই—পানীয় জল নাই—পরণের বস্ত্র নাই—যোগে ঔষধ নাই। এই সব মানুষ একান্ত অবহেলার অসহায় ভাবে মরিভেছে।

ইহাদের লইয়া আমার নিজেরও খুব দুশকিল হইয়াছে। নাম বলিতে চাহে না—জমিতে ধান কি পরিমাণে পূর্বে হইয়াছে—কি কি ফসল জন্মায়—এ সব সংবাদ কিছুই দিতে রাজী হয় না। ভর পায়—বুঝি নুতন করিয়া কোন খাজনা ট্যাক্স পড়িবে। আমার সমুখে অগণিত চাষী মর-নারী হাত-ছোঁ করিয়া শুধু একটামাত্র প্রশ্ন করে, ‘বাবু শুধু চালের ব্যবস্থা করে দাও।’ বেতে পাইনে—মরে গেলাম। মেয়েরা কোলের শিশু শিশুসন্তান লইয়া দেখায়। দেখি, মারের বুকের কাছে এক একটা কফাল। জীবনের স্পন্দন তবুও টপ টপ করিয়া চলিতেছে—তরু হয় বুঝি-বা এখনই ধামিরা যাইবে।

সকলে সম্বরে বলে—সরকারকে বলে চাল দাও বাবু। জলের ব্যবস্থা করে দাও।

কিন্তু আমি—আমি ব্যবস্থা করিবার কে? ইহাদের এই সব অস্ত্রহীন অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিবার সাধ্য কোথায় আমার। আমার সমুখে এই সব নিরস্ত্র বস্ত্রহীন মর-নারী—বালক, বৃদ্ধ, শিশু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উহাদের জ্বালা শুক মুখ—বস্ত্রহীন ব্যাবিগ্রস্ত শীর্ণ দেহ—উহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার কে করিবে! আমি নিজে একজন সামান্য কর্মচারী, আমার নিকট করজোড়ে উহারা কোন প্রতিকার চায়? আমার এই থাকী প্যাট আর সোলার টুপিটা ছাড়াই ফেলিয়া দিলেই, উহাদের সহিত আমার আর পার্থক্য কি?...

তখন আমিও উহাদের মতই, অমনি দুই শীর্ণ বাহু বাড়াইয়া, অমনি বিষগ্রাসী স্রুখা লইয়া, হুই কোটরগত চক্ষু মেলিয়া, শুধু চাহিব—দাও ভাত দাও—দাও একটু জল। উহাদের মতই রৌদ্রপথ পথের উপর নিঃসহায় ভাবে বুক কাটাইয়া চীৎকার করিব—“জ্বালা মরে যাই—দাও ভাত দাও—তৃষ্ণার বুক ফেটে যায়—জল দাও।” কিন্তু সমস্তই বৃথা, কেহ শুনিবে না—কেহ কিছু দিবে না—কেহ কিরিয়াও ভাকাইবে না। এই ক্লম রিক্ত রাঙা কঙ্করময় প্রাণহীন মাটির মত আমারও জীবন অমনি শুকাইয়া প্রাণহীন হইয়া উঠিবে—তার পর এক দিন চক্ষের উপর হইতে সূর্য্যের সমস্ত আলো মুছিয়া গিয়া অস্ত্রহীন ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার নামিয়া আসিয়া গ্রাস করিবে। তখনও প্রবলের করুণত অসংখ্য নিরক্ষরমুখে আবর্ত এই সমাজচক্র ঠিক পূর্বের মতই চলিতে থাকিবে।

কাজ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সাইকেলের

আলোতে পথ চিনিয়া, নিজের আত্মায় কিরিয়া আসি।
সেদিন অনেক দূর গিয়াছি। গ্রামটির নাম করকণা। সমস্ত
হুপু, এ-মার্ট সে-মার্ট করিয়া সেদিন অনেকটা কাজ করিয়া
কেলিলাম। বেলা বোঝ করি ভিতরে বাড়িয়া গিয়াছে।
গাছতলায় বসিয়া শুকনো কাঠ, পাতা যোগাড় করিয়া,
আগুন জ্বালাইয়া, একটু জল ফুটাইয়া, চা করিয়া লইলাম।
সদে মুক্তি ও গুণ ছিল। মুক্তি গুণ সংযোগে হুহুহীম এক
গেলাল চা খাইয়া বেশ আরাম করিয়া সিগারেট টানিতেছি—
হঠাৎ একটা গোলমালে সচকিত হইয়া দেখি, পশ্চিম আকাশে
কালো হইয়া মেঘ করিয়াছে। চতুর্দিক নিভক—গাছপালা
ওরু হইয়া কিসের ঘেন প্রতীক করিতেছে। মনে হইতেছে
আসন্ন ঝলস বুঝি সন্মুখিত। আমি ভাড়াভাড়া সাইকেল
লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু কোথায় যাইব। এক জন
লোক বলিল, একটু জোরে জোরে আগিয়ে চলুন বাবু—কাছে
রায় মশাইয়ের বাড়ী। সেখানেই নিরে বাই। লোকটির
পিছন পিছন সাইকেল ঠেলিয়া চলিতে লাগিলাম। ততক্ষণে
বড় সুরু হইয়া গিয়াছে। গুরু গুরু করিয়া মেঘ ডাকিতেছে—
এক সময় কড়কড় করিয়া ভীষণরূপে সমস্ত পৃথিবী কাঁপাইয়া
বাক পড়িল। শুধু একবার মাত্র, একটা লাল আলো সমস্ত
চরাচর উজাসিত করিয়া আবার নিমেষের মধ্যে মিলাইয়া গেল
—তার পর একটা প্রচণ্ড শব্দ। সেই বৃষ্টি আর বড়ের মধ্যে
ভিজিতে ভিজিতে দুই জনে রায় মশাইয়ের বাড়ীর দিকে
চলিলাম। আমার সোলার টুপি, থাকী প্যাণ্ট, জার্ট, সমস্ত
ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতেছে। বড়ের দাপটে সমস্ত শরীর
হি হি করিয়া শীতে কাঁপিয়া উঠিল।

একটা ছোটমত বাগান পার হইয়া রায় মশাইয়ের
বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীর সমুখে রাশিকৃত গোবর।
তার পাশেই গোদাল। গোবরগুলি জলের সহিত মিশিয়া কল
কল শব্দে বাহির হইয়া যাইতেছে। একটা বিজী গছে সমস্ত
স্থান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গোদালের কিছু দূরে একখানি
চালাখর। এইটাই নাকি রায় মশাইয়ের বাইরের ঘর।
সাইকেল ঠেলিয়া ঘরের বারান্দায় উঠিলাম। বৃষ্টির জলে
ঘরের মেঝে কাঁদা হইয়া গিয়াছে। পুরাতন খড়ের চাল
তেদ করিয়া টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আমাদের
দেখিয়া রায় মশাই আশ্চর্য্য ভাবে তাকাইয়া হাতের হকাটি
নামাইলেন। সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিতেই, রায় মশাই
ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আগে জামা প্যাণ্ট ছাড়ুন। সমস্ত ভিজে
সপ্ সপ্ করছে। এই বলিয়া উঠিয়া হাঁক দিলেন, ‘ওরে
অনি—ও অনি’। ‘বাই—’ ভিতর হইতে, মেয়েলী গলায়
শব্দ আসিয়া আসিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি মেয়ে আসিয়া ঘরে দাঁড়াইল।

রায় মশাই বলিলেন, ‘মা ত মা, একখানি শুকনো কাপড়

নিরে আয়। ভজলোক ভিজে গেছেন।’ মেয়েটি চকিতে
আমার দিকে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেল। আমি
সোলার টুপিটিকে বারকয়েক ঝাঁকানি দিয়া জল কেলিবার
চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সাইকেলটি ঘরের দেয়ালে ঠেসান
দিয়া রাখিলাম। ততক্ষণ মেয়েটি কাপড় আনিয়াছে। তাহার
হাত হইতে কাপড় লইবার সময় একবার ভাল করিয়া চাহিয়া
দেখিলাম। বহন তাহার বোঝ করি ঘোলের উপর—বুঝা
গেল এখনও বিবাহ হয় নাই। গাছের রং শ্রামবর্ণ—মুখখানি
অতি সুসুন্দর আর কচি, দীর্ঘাভ গভীর কালো দুটি
চোখ। মাথার বেণী এক পাশে বুলিয়া রহিয়াছে। মধুর-
পুষ্ট হাত দুটিতে ভিন-চার গাছি করিয়া কাঁচের চুড়ি। শরীরে
কোথাও এতটুকু সোনার চিক্নামাত্র নাই।

আমি প্যাণ্ট ও জার্ট ছাড়িয়া দিতেই, রায় মশাই
মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘মাও ত মা। ওর
জামা প্যাণ্ট ভাল করে নিংড়ে শুকোতে দাও। বাতাসে
শুকিয়ে যাবে।’ তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,
‘বহন ভাল হয়ে বহুন। আর বসেই বা কোথায় দেব।
সবই ভাড়াচোরা।’ আমি একখানি জীর্ণ তক্তপোয়ের উপর
বসিয়া পড়িলাম। বাহিরে তুমুল গর্জনে বড় বৃষ্টি সমানে
চলিতেছে। হৃদয় তখনও কিছু বেলা আছে, কিন্তু তাহা
বুঝিবার উপায় নাই। দিমের আলোর এতটুকু চিহ্ন আর
দেখা যায় না। বড়ে, জলে আর মেঘে চারিদিক অন্ধকার
হইয়া রহিয়াছে।

রায় মশাই ঘরের বাহিরে গিয়া দরবার কাছ হইতে
মেয়েকে বলিলেন, মা, একটু চা করতে পারিস। বাড়ীতে
অভিধি। রাতেও থাকবেন। এখন হটো মুড়িচুড়ি আর
একটু চা যোগাড় করে দে।

আমার কানে সবই আসিতে লাগিল। পরক্ষণে শুনিতে
পাইলাম, মেয়েটি বলিতেছে—চা ত সব ফুরিয়ে গেছে—

রায় মশাই বলিলেন—তবে? উপায় কি এখন—

উপেন কাকার বাড়ী থেকে নিয়ে আসি।

ভিজে ভিজে যাসনে। মাথায় একটা কিছু দিবে মা।
হাঁরে, চাল আছে ত—

চুপি চুপি মেয়েটি কি যে বলিল শুনিতে পাইলাম
না। বাতাসের ঝাপটায় অনির সমস্ত কথা ডুবিয়া গেল।
শুধু কানে আসিল, রায় মশাইয়ের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস—আর
একটা শব্দ—নারায়ণ। বুঝিলাম চা, চাল দুই-ই বার করিতে
এই বর্ষার মধ্যে মেয়েটি চলিয়া গেল। অত্যন্ত লজ্জা অহতব
করিলাম। আমার লজ্জা হাঁহারা কি অহবিধার না পড়িয়াছেন।
অভাবের সংসারে আর একজন অপরিচিত লোক আসিয়া
আরও অটলতা, আরও অহবিধার সৃষ্টি করিয়াছে।—আমার
কাছেও চা ছিল। তাবিলাম, সে কথা বলি। কিন্তু ইহাতে

হয় ত রাগমশাই ক্ষুণ্ণ হইতে বা অপমানবোধ করিতে পারেন। তাই চুপ করিয়া রহিলাম। রাগ মশাই তামাক টানিতে টানিতে কাছে বলিয়া বলিলেন, বড় মেয়েই সংসার মাথায করে রেখেছে। ওর মা আজ তিন মাস শয্যাশায়ী। ছেলেপুলে নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছি। ওই মেয়েই রান্নাবান্না করে, ঘর-সংসারের কাজ—গরুবাছুর দেখা—ছেলেপুলেদের খাওয়ান-দাওয়ান, রপীর সেবা—সবই করছে। মুখে কথা নেই—নিজের দিকে কোন লক্ষ্য নেই। মা আমার বড় লজ্জী। তাবি কি করে যে ওকে সংপাঞ্জ করব।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রাগ মশাই কণেকের লজ্জা অজমক হইয়া যান।

আমি কি বলিব। অথচ চুপ করিয়াও থাকা চলে না। তাই কথার মোড় ঘুরাইবার লজ্জা বলিলাম, আজ বোধ হয় বৃষ্টি থামবে না—

নাঃ। রাতে শুইয়াই। ভাবছি ঝড়ে বরষুচোর উড়িয়ে না নিয়ে যাব। সবই ভাদা আর পুরোনো। তবে খুঁটগুলো হালে বদলে দিয়েছি, তাই ভরসা। রাতে কোমরকমে মাথা ওড়ে কষ্ট করে থাকতে হবে। কোন সামর্থ্য নেই যে আপনার ভালভাবে সেবাশ্রদ্ধ করি। উপরি উপরি ছ'বছর অজম্মা। বলতে গেলে ছ'বছর পর বৃষ্টি মেমেছে। এবার যদি ভগবান মুখ তুলে চান।

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। রাগ মশাই নিজেই একটা লণ্ঠন জ্বালাইয়া দিলেন। মাটির ঘর—উপরে খড়ের চাল। ঘরের মেঝে বেশ সুন্দর করিয়া নিকানো। রাগ মশাই তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, তামাক খান নাকি?

বলিলাম—না। তবে সিগারেট খাই—তা সদেই আছে।

—না-না। তার চেয়ে হ'কোর তামাক খাওয়া চের ভাল। বিড়ি, সিগারেটে শরীরের বেশী কতি করে। রাগ মশাই আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কি জাতি—বাবার নাম, দেশ কোথায়, কিসের চাকরি, কত মাহিমা—এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলাম। তবে মাহিনার বেলায় মিথ্যা কথা বলিলাম। আমি যে একজন গণ্যমান্ত সরকারী চাকর্যো, মাহিমা আমার ছই শতের উপর—এই সমস্ত সবিত্তারে বর্ণনা করিলাম। রাগ মশাই বলিলেন, দেখছেন তো কি কষ্টেই আছি। পাঁচ-ছয় বিধে কোনো জমি—তাও ভাগে চাষ করি। নিজে চাষ করবার মত পরসি কোথায়? রাতে পীরের পাশ দিয়ে ক্যান্ডেল হয়, তার একটা বিবিবাবস্থা করতেই হবে আপনাকে। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ত আর চাষ হয় না। আপনারা বড় চাকর্যো, এক কলম লিখলেই এটা হয়ে যায়।

আমি গভীর হইয়া বলিলাম, “আচ্ছা চেষ্টা করব।” এইরূপ তাব দেখাইলাম, যেন আমার সামান্য চেষ্টাভেই, এই সব গ্রামের সকল দুঃখকষ্টের লাঘব হয়ে যেতে পারে। রাগ মশাই অমর্গলভাবে নিজের দুঃখের কাহিনী বলিয়া

মাইতেছেন। অতীতের সুখের দিনগুলির কথা—ভখনকার ঐশ্বর্য, ভখনকার সচ্ছলতা—প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিতে বলিতে তিনি ভখন হইয়া গিয়াছেন। বাহিরে সুচিন্তিত্য অন্ধকার—মাঝে মাঝে গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকিতেছে—ঝম্ ঝম্ শব্দে অবিজ্ঞাত ভাবে বৃষ্টিপাত হইতেছে। হঠাৎ রাগ মশাইয়ের মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া আমার সম্মুখে এক বাটি চা ও আর এক পায়ে চারটি মুড়ি রাখিয়া বলিল, দিন চা খান। যা বৃষ্টিতে ভিজেছেন। চায়ে আদার রস দিয়েছি।

চায়ে চুমুক দিয়া বলিলাম, বাঃ, বেশ হয়েছে। রাগ মশাই বীরে বীরে নিজের চাহের কাপে চুমুক দিয়া বলিলেন, অনি মা, চা ভালই করে। শুধু চা কেন—ঘর-সংসারের কাজ—রান্নাবান্নার কাজ সবই জানে আর ভালই করে। সেলাই টেলাইও জানে। তবে কি খুব ভাল সেলাই জানে—না তা নয়। গরীবের ঘরের মেয়ে কে শেখাচ্ছে—আর কোথায় বা ভাল ভাল সেলাইয়ের কাজ শিখবে-বলুন—। ওর জেতে বড় তাবমার পড়েছি মজুমদার মশাই। কি করে এখন পাঞ্জ করি, সেই ভাবনা হয়েছে—

আড়চোখে তাকাইয়া দেখিলাম, অনি ভখন কলকেতে ফুঁ দিতেছে।

রাগ মশাই বলিলেন, আপনার সন্মানে ভেমন কোন পাঞ্জ আছে? কিন্তু আমি গরীব—টাকা পরসি দিতে খুঁতে পারব না—

—পাঞ্জ? আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে। অনির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, কলকের আঙনের উত্তাপে তার গাল ঠোঁট লাল হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘায়ত দুইটি কাল চোখ, পুরু গাল, সুন্দর দুইখানি ঠোঁট সবই অপরূপ লাগিতেছে। কালো চুলের রাশি হইতে ছই এক গাছি চূর্ণ কুন্তল কপাল ও গালের উপর আলিয়া পড়িয়াছে। কচি কলাপাতা রঙের পুরাতন শাড়ীখানি এখানে ওখানে ভিজিয়া গিয়াছে। আমি তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। এই বর্ণগুণের রাতে আমার চোখে অনিকে বড় ভাল লাগিল। আমার ছই চোখ যেন এক অপূর্ব মায়ার ভরিয়া গেল।

রাগ মশাইয়ের হাতে কলকে দিয়া অনি বলিল, রান্নাঘরে যাই এখন আর কিছু দরকার নেই তো—

—না মা। রান্নার দিকটা দেখণে। তোমার মাঝে দুধ মাঝে খাইয়ে দাও গে, এক পুরীয়া ওহুধ দিতে হবে যে—। ছেলেগুলো টেচামেটি করছে আবাব।’ অনি একবার আমার দিকে তাকাইয়া, নিঃশব্দে চলিয়া গেল। রাগ মশাই তামাক টানিতে লাগিলেন।

এক সময় বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আর বর্ষার এই মনোরম সজল হাওয়ায় বড় মনুষ্য ঘুম আসিয়াছিল। হঠাৎ কাহার ডাকে জাগিয়া

উঠিলাম, দেখি আমি আমার সম্মুখে ঠাঁড়াইয়া। বয়স আলোকে, ও ঘুমভরা চোখে অনিকে বড় সুন্দর লাগিল। আমি সন্ত-ঘুম-ভাঙা, মুগ্ধ চোখে তাহার দিকে ভাকাইয়া রহিলাম।

‘অনি বলিল, ‘বাবা: কি ঘুম আপনায়। কতকণ ডাকাডাকি করছি। উঠুন অনেক রাত হয়েছে। রাত্না হয়ে গেছে।’ আমি উঠিয়া বলিলাম। আমি আমার হাতে জল ঢালিয়া দিল—পামরা আগাইয়া দিল। ঘরের একপাশে জল ছিটাইয়া, আসন পাতিয়া আমার বাবার দিল। বিচুড়ী, একটা ভাঙা আর আঁচু পটলের তরকারী। চটের আসনটি চমৎকার। নানা রং বেরঙের সুতা দিয়া, বেশ সুন্দর সুন্দর ফুল তুলিয়া আসন বুনিয়াছে। সম্ভবতঃ এটি অনিরই তৈয়ারি। আমি বাইতে বলিলাম, আমি পাখা দিয়া, গরম বিচুড়ীতে বাভাস দিতে লাগিল। রাত্না মশাই বলিলেন, যা হয় চারটি সুখে দিন। ষাওয়ার পূর্ব-কষ্ট হ’ল, কিন্তু আর কি করব বলুন—

বলিলাম—না না। এই ভোঁ যথেষ্ট। এই যা পাচ্ছি—আজকের দিনে কে দেয় বলুন ভোঁ। আপনাদেরই কত কষ্ট দিলাম।

বাধা দিয়া রাত্না মশাই বলিলেন, ‘না না ও কথা বলবেন না। আপনি অভিধি, নারায়ণ। আপনায় পাতে না দিতে পারলাম মাছ—না ছু... এতে যে কত কষ্ট পাচ্ছি তা ভগবানই জানেন।’ আমি একটা কাঁচের ডিলে করিয়া আচার—আনিয়া দিয়া বলিল, আর একটু বিচুড়ী এনে দিই—

ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—না না। এই যথেষ্ট হয়েছে। তখন অতগুলো মুক্তি খেলাম, আর বিদে নেই।

অনি সলজ্জ ভাবে বলিল, কিছু ফেলবেন না—বেয়ে ফেলুন। না হয় একটু তরকারি এনে দিই—

অনির মুখের দিকে ভাকাইয়া বলিলাম, সত্যি বলছি আর কিছু লাগবে না—আবিলাম, কে বলিবে ইহারা অপরিচিত অনাজ্ঞীয়। যেন আমি কত দিনের পরিচিত। বয়সকণের পরিচয়ে বিন্দুস্নান লজ্জা বা জড়তা নাই, দিবা নাই। সহজ সরল মনে মুহুর্তের মধ্যে আমার যেন আপন করিয়া লইয়াছে। ষাওয়া শেষ হইলে আমি হাতের কাছে জল আগাইয়া দিয়া ক্রতপদে বাতীর মধ্যে বাইরা পান লইয়া আসিল। বিহান্না কাঁড়িয়া দিয়া বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন। ঐ কোণে বাবার জল ঢাকা দেওয়া রইল। যদি দরকার হয় বাবাকে ডাকবেন। বাবা পাশের ঘরে থাকেন—

বলিলাম, হাঁ, এবার শুয়ে পড়ব। রাত্না মশাইয়ের ষাওয়া হয়েছে ত—

অনি বলিল, বাবা তাকে তাত খান না। দুটো শুকনো মুক্তি খান। রাতে বাবার তাত লহ হয় না—

আমি বলিলাম, তোমার ভাল নামটা ত শুনলাম না—

—আমার ভাল নাম? অরুণী।

আমি হাসিয়া বলিলাম, নামের সঙ্গে কাদেরও মিল আছে—

অনি মুগ্ধ হাসিল, কোন জবাব দিল না।

—তোমার ষাওয়া হয়েছে—

—না। এখনও রাত্নাঘরের পাট শেষ হইয়া নি। সব সেরে-সুয়ে বেঁচে বলব।

আমি বলিলাম, তোমাদের অনেক কষ্ট দিলাম। যেন যেন ভাবছ কোথাকার কে এসে কত জ্বালাভন করলে। নয় কি?

অনি মুগ্ধ গভীর করিয়া বলিল, ‘হি: কি? যে বলেন। আপনি আমাদের অভিধি। বাবা বলেন, অভিধি নারায়ণ। অভিধির সেবা করাই মানুষের বর্ধ। আগে কত লোকজন আসত। তখন অবস্থা ভাল ছিল—আর এখন’—হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া অনি বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন।—এই বলিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া অনি চলিয়া গেল।

আবার বম্ বম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। সেই বজ্রাকার ধরে বিহান্না শুইয়া চোখ বন্ধ করিলাম। সোঁ সোঁ করিয়া বাভাস বহিতেছে, মাকে মাকে এক-একবার কড়্ কড়্ করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে। আমি চোখ মুদ্রিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বার বার অনির মুখখানি যেন চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। সুন্দর মেয়েটি—দরিদ্র ঘরের মেয়ে, হয়ত এই আকালের বছরে কোন দিন বাইতে পার না—কোন দিন বা একসন্ধ্যা ছোটে। গায়ে কোন অলঙ্কার নাই—কজ্জিম প্রসাধনের কোন চিহ্ন নাই। অজান্তে অধ্যাত এই বন-জঙ্গল-ঘেরা গ্রামের মধ্যে হাসিয়া খেলিয়া বড় হইয়াছে। রাত্না-বান্না করিয়া, ঘর নিকাইয়া, বাসন মাজিয়া, গোয়াল ও গরুর যত্ন করিয়া দিন চলিয়া যায়। এই ত বেশ। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে আজ আমার তরুণ-মনে ধোলা লাগিল। ঐ রকম একটু মেয়ে—অমন আনন্দময়ী, বাহ্যবতী, সরলা মেয়েকে জীবন-সদিনী রূপে পাইলে বোধ করি জীবন হইয়া উঠে মধুময়। অনির সরল আনন্দময় মুখখানি তার দীর্ঘায়ত ক্রুৎকণ্ঠযুক্ত কালো-চোখ দুটির কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল যেন আমি এক নুতন জগতের অজানা আলো দেবিতে পাইলাম। আজ রাজ্য বাহিরে ছরঙ্গ বাতাস হ হ করিয়া বহিয়া বাইতেছে—আকাশ ভাসিয়া বর্ বর্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাসের অবিজ্ঞান হা হা ধনি আমার ছব্বরের অব্যক্ত বাসনাকে ধোলাইয়া জাগাইয়া, এক অমধুর চাকল্যে আন্দোলিত করিয়া নুতন ভাষাতে, নুতন ভদীতে যেন ব্যক্ত করিতে লাগিল। নীচ রচনা করিবার স্বপ্নে বিভোর হইয়া পেলায়। কিন্তু আমি ত আমি আমার সামর্থ্য কড়টুকু। ইহাদের কাছে বড় বড় কথা বলি-রাছি, নিজের মানসজগৎ বাড়াইবার জন্ত, যত মিথ্যা কথাই বলি

না কেন, কিন্তু আমি শু একজন সামান্য অস্থায়ী কর্মচারী। আজ আমি কাল নাই। তবুও এই বর্ষণ-মুখর রাজ্যে, আমি মনে মনে এক স্বপ্ন-রাজ্য গড়িয়া তুলিলাম। আমার সেবা-যত্ন—এইটুকু সময়ের মধ্যে পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা—সরল মুখের মধুর হাসি, সমস্তই বার বার ভাবিয়া দেখিলাম। এতকণে বৃষ্টি ঝামিয়া গিয়াছে, শুধু ভেতের অশ্রান্ত কলরবে মিশ্রিতের শুদ্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। অস্ত গৃহের অনি বোঝ হয় এতকণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ভাবিলাম, আমি কি আমার মত কোন অর্থ-স্বপ্ন দেখিতেছি? আমি কল্পনা করিয়া লইলাম, নরম বালিশের উপর একখানি কোমল স্তনের মুখ। চূর্ণ-কুস্তল ক্ষুদ্র ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এবং দীর্ঘায়ত আঁখির কৃষ্ণপক্ষ কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে। বিছানার এক পাশে নীলবর্ণের কাঁচের চুড়ি-পরা কোমল পৃষ্ঠ হাতখানি অলসভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। তারপর কোন সময় যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তা অরণ্য নাই। ঘুম যখন ভাঙিল তখন বেশ বেলা হইয়াছে। প্রচুর সূর্যালোকে রাজ্যঘাট ভরিয়া গিয়াছে। কান্তবর্ণ প্রভাতে থাকিয়া থাকিয়া একটা জ্বলন্ত হাওয়া বহিয়া বাইতেছে। হাত-মুখ ধুইয়া ফেলিলাম। শুভকণ আমি চা করিয়া লইয়া আসিয়াছি।

রায় মশাই বলিলেন, অনেক কষ্ট হ'ল। রাজ্য ভাল ঘুম হয়েছিল শু।

চায়ে চুমুক দিয়া বলিলাম, খুব ঘুমিয়েছি। কাল আপনাদের আশ্রয় না পেলে কি যে কপালে ঘটত—তাই ভাবছি। আমি আসিয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইল। উহার ছোট তাই দুটি দিদির অকল চাপিয়া ধরিয়া আমার লবঙ্গয়ে দেখিতেছে। রাজ্যে উহার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাই দেখি নাই।

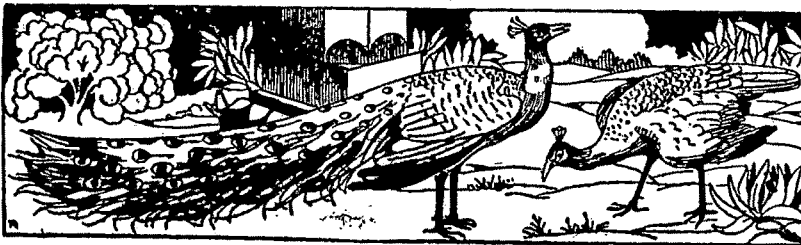
রায় মশাই বললেন, আমার কথাটা মনে রাখবেন। গাঁয়ে যাতে ক্যানেল আসে তার ব্যবস্থাটা করবেন। ক্যানেলটা হলে সময়মত চাষের জল পাওয়া যায়। আকাশের দিকে

ডাকিয়ে থাকতে হয় না। গাঁয়ের অবস্থা শু স্বচক্ষে দেখেই গেলেন। আর হাঁ ঐ যে পাঞ্জের কথাটা—

আমি বলিলাম, হাঁ, মনে আছে। সে রকম সম্মান হলেই আপনাকে জানাব—

—ঠিকানাটা লিখে রেখেছেন শু? তা চিঠি আসতেও সাত দিন লাগে—কখনও পনের দিনও হয়ে যায়। গাঁয়ে শু পোষ্ট আপিস খেই। সপ্তাহে এক দিন পিওন এসে চিঠি বিলি করে যায়। যাই হোক চিঠি দিলে পাব—তা ছ'চার দিন ঘেরি হতে পারে। তবে কথাটা মনে রাখবেন।

প্যাক্ট শার্ট পরিয়া, মাথায় সোনার টুপিটা চাপাইয়া দিলাম। সাইকেল চালাইয়া অনেকটা পথ বাইতে হইবে। চিন্তা হইল, রাস্তায় যদি সে-রকম কালা হস্ত, তবে ভাবনার কথা। সাইকেল তখন যাতে লইতে হইবে। মনে মনে ঠিক করিলাম, আজ আর অস্ত কোথাও যাইব না। বরাবর নিজের আভ্যন্তর করিয়া যাইব। বাহিরের আবহাওয়া ভালই লাগিল। আমি প্রস্তুত হইলাম। পকেট হইতে দুটি টাকা বাহির করিয়া, আমার ছোট দুটি ভাইয়ের হাতে দিলাম। উহার আশ্রয়ে কলরব করিয়া উঠিল। রায় মশাইকে নমস্কার করিলাম। রায় মশাই বলিলেন, যদি কখনও এদিকে আসেন তবে গরীবের ঝুঁড়েঘর ভুলবেন না।—আমি অনির দিকে চাহিয়া বললাম, খুব কষ্ট দিয়ে গেলাম—আচ্ছা আসি তবে। আমি হাসিল না, কোন কথা বলিল না। সাইকেল লইয়া রাস্তায় নামিয়া আসিলাম। মনে হইল, কি যেন হারাইয়াছি, কি যেন পিছনে ফেলিয়া আসিলাম। সাইকেলে উঠিবার আগে আর একবার পিছনে তাকাইলাম, দেখি অনি তাহার দুই দীর্ঘায়ত চক্ষু মেলিয়া নিম্নতর ভাবে ঠিক একখানি ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম, এই পৃথিবীর হাটে একদিন ভূমিও হারাইয়া যাইবে, আমিও হারাইয়া যাইব। কিন্তু এক রাজির কথা একটু বর্ষণ-মুখর ঐতিহাসিক রাজির স্মৃতি—তোমার এই সুকোমল স্তনের মুখখানি আমার মনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।



পাংশুপ্রদানাবদান

শ্রীশুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

দুইটি স্কুমার বালক পৰিপার্শ্বে ক্রীড়া করিতেছে। তাহারা মানারূপ পাংশুপিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে অম্ব্যক্তন মিঠাদাদি নাম দিয়া সংসার পাতিয়াছে। এমন সময় ভিক্ষা-পাত্র হস্তে ভগবান বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হইলেন। বালক দুইটি সঙ্গমে উঠিয়া দাঁড়াইল। একটি বালক এই কল্পিত অম্বাদি আশ্বের সহিত গ্রহণ করিয়া ভাগ্যভেদে ভিক্ষাপাত্রে অর্পণ করিল। দ্বিতীয় বালক হাসিমুখে উহা অম্ব্যমোদন করিল।

ভগবান বলিলেন, “আনন্দ, ভাগ্যভেদে পরিনির্করণের শতবর্ষ পরে এই বালক অধুদীপে সত্রাটী অশোক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। এই সহচর হইবেন তাঁহার অমাত্য রাণাওড়। এই সমস্ত সত্রাটী অশোকের দ্বারা সমস্ত জগতে প্রচারিত হইবে।”

অবদানখানির এক স্থানে এই পাংশুপ্রদানের কথা এবং অধিকাংশ স্থানে পাংশুপ্রদান-পুণ্যের ফলভোজ্য সত্রাটী অশোকের কথা আছে বলিয়া ইহাকে পাংশুপ্রদানাবদান বলা হইয়াছে।^১

ভাগ্যভেদে পরিনির্করণকাল আসন্ন। তিনি মধুরায় অবস্থান করিতেছেন। একদিন তিনি আনন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “আনন্দ, এই মধুরাতে আমার পরিনির্করণের শতবর্ষ পরে শুভমামে এক পদিক অম্ব্যগ্রহণ করিবেন। তাঁহার উপগুপ্ত নামে এক পুত্র হইবেন। শতবর্ষ পরে তিনি বুদ্ধের ভার বর্ষপ্রচার করিবেন। তাঁহার প্রভাবে বহু ব্যক্তি সর্বস্বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া অর্হংপদ লাভ করিবেন। সমস্ত আশ্বের সকল বর্ষপ্রচারকের শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই উপগুপ্ত।

“আনন্দ দূরে বহুদূরে ঐ নীলনীলাশ্বররাজি দর্শন কর। ঐ নীলনীলাশ্বররাজি হইল কুরুযুগে নামক পৈলজ্যেষ্ঠ। শতবর্ষ পরে শামকবাসী নামক এক ভিক্ষু ঐ পর্বতে বিহার স্থাপন করিবেন। তিনি উপগুপ্তকে প্ররজ্যা দিবেন।”

আনন্দ ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “আশ্চর্য্য ভগবান। ইহা অতীব আশ্চর্য্য। আনন্দ উপগুপ্ত বুদ্ধের ভার বহুত্বের ফল্যাপ করিবেন।”

ভগবান বলিলেন, “আনন্দ, আনন্দ উপগুপ্ত যে কেবল এই ভয়েই ভয়গণের এইরূপ হিতসাধন করিবেন তাহা নহে,

তাঁহার পূর্বজন্মেও তিনি ঐরূপ হিতসাধন করিয়া ঐখানেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

“ঐ কুরুযুগে পর্বতের ভিতর পাংশু। এক পার্শ্বে পঞ্চশত “প্রত্যেক বুদ্ধ”^২। এক পার্শ্বে পঞ্চশত ঋষি এবং আর এক পার্শ্বে পঞ্চ শত বানর বাস করিত।

“এই পঞ্চ শত বানরের যে দলপতি সে তাহার দল পরি-ত্যাগ করিয়া যেখানে পঞ্চ শত ‘প্রত্যেক বুদ্ধের’ বাস সেই পার্শ্বে উপস্থিত হইল। প্রত্যেক বুদ্ধগণকে দর্শন করিয়া তাহার অন্তর প্রসন্ন হইল।

“তখন হইতে সেই বানর সেইখানেই বাস করিতে থাকে। সে প্রতিদিন ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক বুদ্ধগণের সেবা এবং তাহাদেরই মত পর্বতবস্ত্র হইয়া উপাসনা করে।

“কিছুকাল পরে প্রত্যেক বুদ্ধগণ পরিনির্করণ লাভ করিলেন। বানর পূর্বের ভার তাহাদের দ্বারা ফলমূলাদি আহরণ করে। কিন্তু তাহারা আর আহার করেন না। বানর তাহাদের চীৎকার করিয়া আকর্ষণ করে, চরণে হাত ধরে; কিন্তু কোনও সাড়া পায় না। অবশেষে তাহাদের শরীরে জীবনের কোমল লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া সে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে পার্শ্বে পঞ্চ শত ঋষির বাস সেই পার্শ্বে উপস্থিত হয়।

“এই ঋষিদের কাহারও বা সর্বশরীর কটকাকীর্ণ, কাহারও বা তন্মাস্থাদিত—কেহ বা উর্দ্ধহস্তে বিরাজমান, কেহ বা পকারির মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন।

“বানর তাহাদের এইরূপ সাধনায় বাবা দিতে লাগিল। সে কটকবিদ্ধ-শরীরীদের কটক-উদ্ধার; তন্মাস্থাদিতদের তন্ম-অপসারণ, উর্দ্ধহস্তদের হস্ত অবনমন এবং পকারিকদের অগ্নি অপসারণ করিতে লাগিল। অতঃপর সে তাহাদের সম্মুখে প্রদীপবস্ত্র হইয়া উপবেশন করিল।

“ঋষিগণ এই সমস্ত ঘটনা তাহাদের আচার্য্যের নিকট নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন, ‘তোমরা ঐরূপ পর্য্যব-বস্ত্র হইয়াই উপবেশন কর।’ এই ভাবে তাহারা ঐ বানর-নির্ভিত পদভিতে সাধনা করিয়া প্রত্যেক বুদ্ধ হইলেন।

“ঐ প্রত্যেক বুদ্ধগণের মনে হইল—‘আমরা প্রেমোলাভ করিয়াছি, তাহা এই বানর হইতেই।’ এই ভাবিয়া তাহারা ফলমূলের দ্বারা ঐ বানরকে পরিপালন করিতে লাগিলেন।

১ ইহা অবদানখানির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। অনুবাদ আক্ষরিক নহে। কিন্তু মূলভাব অক্ষুর রাখা হইয়াছে।

২ বুদ্ধের দ্বারা বিনির্গুণজ্ঞানলাভ করেন, কিন্তু তাহা জগতে প্রচার না করিয়াই দেহত্যাগ করেন, তিনিই “প্রত্যেক বুদ্ধ” (বা গৌণীবুদ্ধ)।

তাহার মৃত্যু হইলে সুগন্ধি কাঠের দ্বারা তাহার সংকার করিলেন।

“দেখ আনন্দ, এই বানরই উপগুপ্ত। সেইজন্য বলিতেছি কেবল ভবিষ্যতেই যে তিনি বহুজনের হিতসাধন করিবেন তাহা নহে, অতীতেও তিনি এইরূপ হিতসাধন করিয়াছেন।”

বুদ্ধের পরিনির্বাণের শতবর্ষ পরে হবির শামকবাসী রুক্মণ্ড পর্বতে বিহার স্থাপন করিলেন। তাঁহার অরণ হইল তথাগতের পরিনির্বাণের শতবর্ষ পরে গুপ্ত নামক গহ্বকের কথা। তিনি ধ্যানযোগে দেখিতে চাহিলেন গুপ্তের জন্ম হইয়াছে কিনা—দেখিলেন হইয়াছে। তাহার পর দেখিতে চাহিলেন—উপগুপ্তের আবির্ভাব হইয়াছে কিনা। দেখিলেন উপগুপ্ত তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

অতঃপর হবির শামকবাসী নানা উপায়ে বুদ্ধধর্মের প্রতি গুপ্তগহ্বকের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিলেন। গুপ্ত যখন বুদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছেন তখন একদিন তিনি তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। গুপ্ত তাঁহাকে একাকী দেখিয়া বিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার সেবক কই?”

হবির বলিলেন, “জরামণী আমার। কোথায় আমাদের সেবক? যদি কেহ শ্রদ্ধাসহকারে প্রজ্ঞাপ্রদান করেন তাঁহাকে আমরা সেবক করি।”

গুপ্ত বলিলেন, “আর্য্য, আমি গৃহবাসে লুপ্ত। বিষয়সম্পত্তি আমার প্রজ্ঞা-প্রদানের শক্তি নাই। যদি আমার পুত্র জন্মে তাহাকে আপনার সেবক করিব।” হবির বলিলেন, “তথাস্তু। কিন্তু বৎস, প্রতিজ্ঞা অরণ রাখিও।”

অতঃপর গহ্বকের পুত্র হইল। তিনি তাঁহার নাম রাখিলেন অশ্বগুপ্ত। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল তখন হবির শামকবাসী গুপ্তগহ্বকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয় অরণ করাইলেন।

গুপ্ত বলিলেন, “আর্য্য, এই আমাদের একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় পুত্রকে দান করিব।” হবির শামকবাসী ধ্যানযোগে দেখিলেন—ইনি উপগুপ্ত মনেন। অতএব “তথাস্তু” বলিয়া বিদায় লইলেন।

ইহার পর গহ্বকের দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম রাখা হইল বনগুপ্ত। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল তখন হবির শামকবাসী গুপ্তগহ্বকে তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয় অরণ করাইলেন।

গুপ্ত বলিলেন, “আর্য্য, কৰ্ম্ম করম। আমার এক পুত্র বিদেশে গিয়া দ্রব্য আহরণ করিবে। অতঃপুত্র গৃহে থাকিয়া তাহার রক্ষা করিবে। আমার তৃতীয় পুত্র আপনাকে দান করিব।”

হবির শামকবাসী ধ্যানযোগে দেখিলেন—ইনিও উপগুপ্ত মনেন। অতএব তথাস্তু বলিয়া বিদায় লইলেন।

অতঃপর গুপ্তের তৃতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। মনোরম তাঁহার রূপ, সুন্দর তাঁহার আকৃতি। তাঁহার নাম রাখা হইল উপগুপ্ত।

হবির শামকবাসী বাল্যকাল হইতেই তাঁহার উপর লক্ষ্য রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার চরিত্রগঠনে সাহায্য করিতেন।

উপগুপ্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন পিতার বাণিজ্য-কর্মে যোগ দিলেন। তিনি ভায় ও সন্তভায় সহিত ক্রয়-বিক্রয় করিতেন। তাঁহার ব্যবসা ছিল সুগন্ধিব্যয়ের। নানারূপ সুগন্ধি সামগ্রী তিনি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেন।

মধুরায় তখন বাসবদত্তা নামক এক সুপ্রসিদ্ধা অপরূপ সুন্দরী গণিকা ছিল। সেই গণিকার দাসী উপগুপ্তের বিপণি হইতে বিলাসসামগ্রী ক্রয় করিত। একদিন বাসবদত্তা তাহার দাসীকে বলিল, দাসি, তুমি এই গহ্বকে প্রবঞ্চিত করিতেছ। এই মূল্যে এই পরিমাণ গন্ধদ্রব্য লাভ সম্ভব নহে।”

দাসী তাহা শুনিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, “মা, উপগুপ্ত অতি ধার্মিক। যেমন তাঁহার রূপ, তেমনি তাঁহার ব্যবহার। রূপে গুণে চাতুর্য্যে মাধুর্য্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়।”

ইহা শ্রবণ করিয়া গণিকা বাসবদত্তা গহ্বক উপগুপ্তের প্রতি অহরহ হইল। সে উপগুপ্তকে নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানাইয়া দূতী পাঠাইল। উপগুপ্ত বলিলেন, “দূতী, আমার হইরা তাঁহাকে বলা—ভগিনী, এখনও তোমার দর্শনের সময় হয় নি।”

সেই সময় বাসবদত্তার দর্শনী ছিল পঞ্চ শত সুবর্ণমুদ্রা। তাহার মনে হইল—নিশ্চয়ই এই বণিক পঞ্চ শত সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহে। তাই তিনি দূতীর দ্বারা পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন—“প্রিয়তম, আপনার সুবর্ণমুদ্রা আমি চাই না। আমি আপনাকে ভালবাসি।” দূতী যখন উপগুপ্তকে সেই কথা শিবেদন করিল—উপগুপ্ত পূর্বের ভায় উত্তর দিলেন, “ভগিনী, এখনও তোমার দর্শনের সময় হয় নি।”

দিনের পর দিন যায়। বাসবদত্তার কোমল পরিবর্তন নাই। সে পূর্বের ভায় পঞ্চ শত কার্ষাপণ দর্শনী লইয়া জন্ম-পদের শ্রেষ্ঠ-বণিক বণিক ও রাজপুরুষগণের সহিত বিলাস-লীলায় মগ্ন হইয়া থাকে।

এক দিন এক শ্রেষ্ঠপুত্র বাসবদত্তার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে—এমন সময় জনৈক বিদেশী সার্ববাহ পঞ্চ শত কার্ষাপণ এবং বহু মূল্যবান উপঢৌকন লইয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইল।

বাসবদত্তা লোভাকুপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠপুত্রকে হত্যা করাইয়া

তাহার যতদেহ মলাধারে লুকাইয়া রাখিল। তাহার পর সেই বিদেশী সার্থবাহকে লইয়া বিলাসে মগ্ন হইল।

ইতিমধ্যে মিহত শ্রেণীপুঞ্জের বহুবর্গ তাহার যতদেহ উদ্ধার করিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিল। রাজাজ্ঞার বাসবদত্তার হস্ত-পদ-কর্ণ-মাসিকা ছিন্ন হইল। বিকৃতদেহ বাসবদত্তা নগরের বহির্ভাগে ঋশ্মানে নির্বাসিত হইল।

উপগুপ্ত যখন বাসবদত্তার এই হ্রস্বকথার কথা শ্রবণ করিলেন তখন ভাবিলেন—‘একদিন সে আমাকে আশ্রয় করিয়াছিল। তাহার সেই আমন্ত্রণগ্রহণের দিন আজ উপস্থিত।’ তিনি শান্ত সংযত চিত্তে সেই ঋশ্মানভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পরমাত্মারী সুগঠিত-সুসুন্দারাকৃতি সর্লকামিজনউপভোগ্য বাসবদত্তা আজ ছিন্নাকী, কুংসিতদর্শনা, সর্লকমপরিভাষা, ঋশ্মানে শকুনি-গৃহিনী শৃগাল কুরুরের উপভোগ্য হইয়াছে। তাহার একটি রাজ দাসী পূর্বোপকার ভুলিতে না পারিয়া, সঙ্গে আসিয়া আজ তাহাকে শকুনি-গৃহিনীর মিথ্যে অভিযাচার হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে।

উপগুপ্তকে আসিতে দেখিয়া সে বাসবদত্তাকে বলিল, “মা, বাহাকে তুমি পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ করিয়াছিলে, সেই উপগুপ্ত আসিতেছেন। নিশ্চয়ই ইনি কামার্ত হইয়া আসিতেছেন।” শুনিয়া বাসবদত্তা বলিলেন—

কুবিয়-রঞ্জিত দেহ বিকৃত-বদন হতশোভা আমি হতভাগী, এদেহের প্রতি হায় গৃহগণ বিনা আর কেবা হবে অহরাসী।

সে পরম উদ্বেগের সহিত দাসীকে বলিল, “দাসি, সন্ধ্যার আমার ছিন্ন অঙ্গসমূহ পটকের (bandage) দ্বারা সংযোজিত কর।” দাসী তাহাই করিল। উপগুপ্ত আসিয়া বাসবদত্তার সমুখে দাঁড়াইলেন। বাসবদত্তা বলিল—

শতদল সমশোভা সুসুন্দার-সুশোভিতা তুমি মম ছিল অল্পমম মুনিমম-ভাস্কর ছিল যবে কান্তি যৌর, তখন এলে না

প্রিয়তম।

কুবিয়-রঞ্জিতদেহ, বিকৃত-বদন, হতশোভা আমি হতভাগী এ দেহের প্রতি আজি, ওগো প্রিয়তম! কেমনে হইলে

অহরাসী?

উপগুপ্ত বলিলেন—

কান্ত-হও হে তগিনী। মহি আমি কানী। কামিজনও

ভাবিবে যে কাম

হেরিবে সমুখে যবে এই বিভীষিকা। কামনার এই পরিণাম।

আজি এ দুদিনে তুমি কারাবিক সমুদ্রে তক্তিতরে

করহ শরণ।

আর্জুন প্রতি ধীর নাহি সীমা করণার আজি তাঁর

লহণে শরণ।

হৃৎকের এ পারাবার পার করে সাধ্য কার করণার

পারাবার ভগাগত বিনা

বিপদ-ভারণ নাথ কর তাঁরে প্রণিপাত, সঁপ. তারে তুমুমন,

অসি, ভাগ্যহীনা।

উপগুপ্তের অলৌকিক চরিত্রের প্রভাবে অল্পম সময় বাসবদত্তার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

যথাসময়ে হবির শানকবাসী উপগুপ্তকে সম্মানসে দীক্ষা দিলেন। উপগুপ্ত তগবান বুকের ভায় মারবিজয়ী হইয়া দেশে দেশে জনপদে জনপদে বুকের ভায় গুজা পাইতে থাকেন। তাহার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি বুদ্ধবর্ধের প্রতি অহরন্ত হর এবং বহু সারক অর্হংপদ লাভ করেন।

এই সময় পাটলিপুত্রে নৃপতি বিন্দুসারের গুণ অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি অভ্যস্ত চণ্ড প্রকৃতির ছিলেন। সেইজন্য তিনি চণ্ডাশোক নামে পরিচিত হন।

তিনি তখন এমনি চণ্ড প্রকৃতির ছিলেন যে একদিন ক্রোধ-ভরে বহুতে পক্ষ শত অমাত্যের শিরশ্ছেদন করেন। আর একবার অন্তঃপুরিকাগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষ শত পত্নীকে বহুতে দগ্ধ করিতে উত্তত হন।

ইহা দেখিয়া তাহার বাল্যবন্ধু অমাত্য রাধাশুণ্ড বলেন, “মহারাজ, বহুতে এইরূপ হত্যাকাণ্ডের কি প্রয়োজন? ইহার ক্রম হাতক নিযুক্ত করুন।”

তখন এতাদৃশ নৃশংস হত্যাকার্য্য করিতে পারে এরূপ ব্যক্তির অমুদ্যান চলিতে লাগিল।

সেই সময় রাজধানীর অনতিদূরে পর্বতপাদস্থলে এক গ্রামে এক তন্তবর বাস করিত। তাহার এক গুজ ছিল। তাহার নাম গিরিক। বাল্যকাল হইতেই সে অতীব নিষ্ঠুর ছিল। পিতামাতাকে অতি কদর্য্য ভাষায় গালি দিত। বালক-বালিকাদের ভাঙনা করিত। পিপীলিকা, মক্ষিকা, মুষিক, পুক্ষী যাহা পাইত, হত্যা করিত। এইরূপ চণ্ড বলিয়া লোকে তাহার নাম দিয়াছিল ‘চণ্ডগিরিক’।

রাজপুরুষগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি সত্রাট অশোকের অধীনে হাতকের কাজ করিতে পারিবে কি?” সে উত্তর দিল—“সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসীর প্রত্যেকের হত্যাকার্য্য করিতেও আমি প্রস্তুত আছি।”

তাহার কথা সত্রাট অশোককে বলা হইল। তিনি তাহাকে তাহার নিকট আনিবার আদেশ দিলেন।

রাজপুরুষগণ তাহাকে বলিল, “এসো, রাজা তোমাকে

ও উপগুপ্তের সহিত অশোকের সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ (অশোকাবদানের অন্তর্গত) “কুনাবদানে” আছে।

আজ্ঞা করিয়াছেন।” সে বলিল, “পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া আসিতেছি।”

তাহার আসিতে বিলম্ব হওয়ার রাজপুরুষগণ স্নানবের কারণ খিজালা করিল। সে উত্তর দিল—“পিতামাতা আমাকে এই কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেছিলেন তাই তাহাদের হত্যা করিয়া আসিলাম। চল, অমর্যক বিলম্ব হইয়া গেল।”

সজাতি অশোক তাহাকে ব্যতকপতির পদ প্রদান করিলেন। অমর্যক হত্যাক্রিয়ায় সে এতদূর অত্যন্ত ছিল যে, অশোকের নিকট বর প্রার্থনা করিল—“আমার অত এক অতি মমোরম গৃহ নির্মাণ করুন। এই গৃহের বহির্ভূৎ এমন চিত্তাকর্ষক হোক যে, যে দেখিবে সেই উহাতে প্রবেশ করিতে চাহিবে এবং যে প্রবেশ করিবে তাহাকেই আমি বধ করিব।”

চতুর্শ্লোক তাহার সম্বন্ধে চওগিরিকের এই প্রার্থনা পূরণ করিলেন। ঐ গৃহে যে কত মিথ্যে, কত সাধু প্রাণ হারাইল তাহার ইহুতা নাই।

একবার এক বিদেশী বণিকপুত্র রাজধানীতে আসিলেন। তাহার পিতামাতা যখন বাণিজ্যের অত সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন তখন অর্ধবশোতের মধ্যেই তাহার জন্ম হয়। সেইজন্য তাহার নাম রাখা হয় সমুদ্র। যাদব বংশের যাবৎ তাহার সমুদ্রে-ভ্রমণ করিতে থাকেন। সহস্র এক দিন অলমসুখগণ। তাহাদের অর্ধবশোত আক্রমণ করিয়া সকলকে হত্যা করে। সমুদ্র কোমরপে রক্তা পায়। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি বৌদ্ধধর্মে প্রভ্রম্য গ্রহণ করেন।

পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইয়া প্রভাজক সমুদ্র ভিক্ষার্থে ঐ মমোরম গৃহে প্রবেশ করিলেন। বহির্ভূৎ অতীব অলম, কিন্তু অভ্যন্তর নরকসদৃশ ভয়াবহ দর্শন করিয়া যখন তিনি বাহির হইয়া আসিতেছেন তখন চওগিরিক তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, “বাইবে কোথায়? এইখানেই তোমার মৃত্যু।”

ভিক্ষু তখন শোকার্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া চওগিরিক বলিল, “বালকের মত রোদন করিতেছ কেন?” ভিক্ষু বলিলেন—

মৃত্যুভয়ে ভীত নহি ভাণা

ভীত বধা সাধারণ লোক।

বাধা হবে যক্ষ আচরণে

তাই আমি করিতেছি শোক।

মূলত এ মর্যদ্ব লভিব কি পুনঃ হায়।

লভিব কি অম পুনরায়

মহামারাদেবী-মৃত-প্রেমধর্ম-বিকৃত

বরণীয়া বধা এ ধরায়।

ভিক্ষু লক্ষ্য করিয়া চওগিরিকের নিকট এক মাস সময়

ভিক্ষা করিলেন। চওগিরিক তাহাকে সাত দিন সময় দিল।

এই সাত দিন ধরিয়া অবিরত আসন্ন মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সেই ভিক্ষুর চিত্ত নির্মল এবং নিব্যক্তানের উপযোগী হইয়া উঠিল। এমন সময় সপ্তম দিবসে সজাতি অশোকের অন্তঃপুরে এক মহা কলকলমক ঘটনা ঘটিল। অন্তঃপুরে কোনও এক রাজার সহিত এক কুমারকে সংরক্ত দেখিয়া সজাতি উভয়ের বধের আদেশ দিলেন। তাহাদিগকে চওগিরিকের কারাগারে পাঠানো হইল। সেখানে অশোক-প্রোণিতে মৃদলের আঘাতে অকুমার সেই বৃক-বৃকতী উভয়েরই দেহ চূর্ণ করা হইল। ভিক্ষু চক্ষের সমুখে এই মৃৎসং হত্যা-কাণ্ড ঘটতে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন—

কামিন্য মনোমোহা অপকৃপ রূপমোহা

আহা একি পরিণাম তার।

একি বধ? একি ভাঙি? কোথা সেই দেহকাঙি?

ফেমপিও-সমান সংসার।

সেই তীষণ দৃষ্ট দর্শন করিয়া সমস্ত রূপ-অপভের উপর তাহার বৈরাগ্য জন্মিল। সমস্ত রাজি ধরিয়া উহাই ভাবনা করিতে করিতে সর্বপ্রকার আগতি হইতে মুক্ত হইয়া তিনি তাহার অতীত অর্ধবশোত করিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

ব্যাকুনি-মধ্যে থাকি লভিলাম দিব্য আধি

সমুদ্রের করুণা অপার।

বহু এই কারাগার আছি তব-পারাবার

হেথা বসি হইলাম পার।

সপ্তম দিবসে রাজনী যখন প্রত্যাত হইল তখন চওগিরিক ভিক্ষুকে সন্ধান করিয়া বলিল, “হে ভিক্ষু! রাজির অবসান হইয়াছে। অর্ধ্য-উদিত হইয়াছে।”

ভিক্ষু বীরে বীরে বলিলেন, “ঐক বলিয়াছ বহু, আমারও মোহরাজির অবসান হইয়াছে।—

আজি এ অন্তরে মম বিচরিত বোয় তম

প্রত্যাত হইল মোহরাজি।

চিদাকাশে রক্ত ছবি উদিল জ্ঞানের রবি

পশিল মোকদারে রাজী।

আজি বহু শুভদিন মহাধমে ধনী দীন

কিছুই অদেয় নাই তার যে—

লহ বহু দেহধান এ তো অতি তুচ্ছ দান

নিরোজ ইহারে নিজ কার্য্যে।

মৃৎসং চওগিরিক মর্যদ্বির-বসামুদ্রপুত্রীয় ও অল পরিপূর্ণ বিরাট লৌহকটাহে ঐ অর্ধভের দেহ মিক্ষেপ করিয়া অগ্নি প্রজ্বালনপূর্বক উহা উত্তপ্ত করিতে লাগিল।

কিন্তু যখন বহু ইচ্ছন সংযোগেও ঐ কটাহের অল উত্তপ্ত করা সম্ভব হইল না, তখন চওগিরিক আশ্চর্য্য হইয়া কটাহের

মধ্যে দেখিল পর্য্যাপ্ত হইয়া নিবাস-বিকল্প প্রদীপের দ্বার
সাবু উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

সে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় সজ্ঞাট অশোককে নিবেদন
করিল। সজ্ঞাট সেখানে আসিলেন।

সেই অপরূপ দৃষ্ট দেখিয়া মন্তমুগ্ধবৎ সজ্ঞাট অশোক করজোড়ে
ঐ মহাদ্বার দ্বার করিতে লাগিলেন। অবশেষে কিতাবে
তাহার প্রীতি উৎপাদন করিবেন তাহা জানিতে চাহিলেন।

সাবু বলিলেন, “মহারাজ, ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন—
‘ভগবত্তের পরিনির্বাণের শতবর্ষ পরে পাটলিপুত্রে অশোক
নামে চক্রবর্তী সজ্ঞাট হইবেন। তিনি সমস্ত পৃথিবীতে এই
মৈত্রীর বার্ম প্রচার করিবেন।’ মহারাজ, ভগবানের কথা
শিখা হইবার নহে। তুমি এই মূশংস অভিযাত্রার পরিত্যাগ
কর। প্রাণিহত্যা তোমার কর্তব্য নহে। প্রাণীর রক্ষার
অন্তই তোমার কৰ্ম।”

“অতএব হে মরেন্দ্র, সমস্ত প্রাণিজনগণকে অভয় দান কর।
তোমার ঐ বলিষ্ঠ বাহ সমস্ত জগৎকে রক্ষা করুক।”

সজ্ঞাট কহিলেন, “ভগবন্ত! আপনি যাহা বলিলেন তাহা

সত্য হোক। আজি হইতে আমি প্রাণিজনগণকে অভয় দান
করিলাম। মরকসদৃশ এই বধ্যশালা, এই ভয়ঙ্কর কারাগার
আজিই ভাঙিয়া ফেলিব।”

সজ্ঞাট অশোককে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া ভিক্ষু অন্তর্দান
করিলেন।

অতঃপর সজ্ঞাট যখন সেই কারাগার হইতে বাহির
হইতেছেন তখন চণ্ডগিরিক সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে বলিল,
“দেব, আপনি বর দিয়াছেন, এই গৃহ হইতে কেহ বাহির
হইতে পারিবে না।”

রাজা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “কি আশ্চর্য! তুমি কি
আমাকেও হত্যা করিতে চাও?” সে উত্তর দিল—“হাঁ
মহারাজ।”

রাজা বিজ্ঞান করিলেন, “আমাদের মধ্যে কে প্রথমে
ইহার ভিতর প্রবেশ করিল?” চণ্ডগিরিক বলিল, “আমি।”

তৎক্ষণাৎ রাজাদেশে চণ্ডগিরিক প্রাণ হারাইল। কারা-
গার ভাঙিয়া ফেলা হইল। রাজা সমস্ত প্রাণিকে অভয় দান
করিলেন।

শুকনো গোলাপ

শ্রীমুখীলকুমার লাহিড়ী

এই যে গোলাপ দেখে প্রিয়া শুকনো সকল দলঙলি,
সুবাস ইহার লুকিয়ে গেছে রক্ত বৃকের দার ধূলি।
তোমার অধর পরশটুকু, বৃকের ভব নিশাস-বায়—
যেমন আমার মাতিয়ে তোলে, তেমনি ইহার সুবাস হায়—
ক’রত আমার আকুল প্রিয়ে—রক্তবরণ গোলাপ সেই—
অতুল তাহার রূপের দ্যুতি—তুলনা তার কোথাও নেই।
চুমায় চুমায় কেবল যবে রাঙাই প্রিয়ে আনন ভব,
শরম-রাঙা মুখখানি সেই—এর রূপের তুল্য কব’।
সেই রূপসী গোলাপ-বালার দিক্ত যে হায় রূপভালি,
শুকনো পাশাপাশি জীবন-হীনা মরণ ছোঁয়ার আঁচ কালি।
ব্যথার বিবশ শূন্য বৃকে রচেছি শেষ শরন ওর,
জীবন বৃকে বাসর-দোলের মরণ যেন চুমায় ঘোর।

নিবিড় সুখে বাঁধা আমার বক্ষভরা উকখালে,
হিমেল ইহার পরশখানি হায় কি নীরব পরিহাসে।
বারে বারেই ভাবছি যে হায় আশার ছলেই ভুলে ভুলে,
বৃক ভরে এর নিশাস বায়ু উঠল বুঝি উঠল ছলে।
কিন্তু যে হায় বিধো আশা, মিছেই রাধা এমন সাধ;
কাজল-হৃদয়ের মেঘের ধারে ভাঙল শেষে চোখের বাঁধ।
ইহার মতই আমিও হায় মরণ-কোলে পড়ব ঢলে,
কণ্ট আমার নীরব হবে কঠোর বিধি-বিধান কলে।*

* শেলির “Song on a faded Violet” কবিতার
ভাবানুবাদ

বাঙা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাঙা—প্রলয় বাঙা, দুনিবার
অঙ্গে অঙ্গে ঘুরিছে ঘূর্ণী তার।
করাল ক্রমে ক্রমাশা কক্ষে ঘর,
সঙ্করে সাথে সদা মনস্তর,
অস্থি-মালার রক্তে রক্তে
রশ্মিরা বনংকার।

তাহার তীক্ষ্ণ “মাম-ভুখা হুই” ডাকে—
ভূতলে গগনে চকিত চমক লাগে।
সে করে শুভ নিশ্চেষ্টে চঞ্চল,
হয় উন্মাদ রক্ত-বীজের দল,
টলে স্থাসন ভুবনেশ্বরী
ঘোড়শ মাছুকার।

গিরিদরী হতে শুনি সে নৃত্যতাল,
ছোট্টে অসংখ্য ক্ষুধিত পঙ্গপাল।
বিপুল তাদের নির্ধম অভিমান,
দিগ্বিজয়ের করে যেন সন্ধান—
‘জেরাকসিসের’ সৈন্ত হতেছে
‘হেলেনস্পঞ্জ’ পার।

কে যেন বলিছে করি গর্জন ঘোর—
‘সাজাও সে চতুরঙ্গ বাহিনী মোর।
সুদূরবিষী সে কোটি শিরস্ত্রাণ—
রণবাদ্যের সাথে হোক আগুমান,
সর্বধ্বংসী অনলবর্ষী
গোলন্দাজের সার।

আরব-উপত্যাসের দৈত্যদল—
করে একত্রে যেন ভীম কোলাহল।
উন্মাদনার বাজাইয়া ডকা,
চলে সমগ্র মরুর আকাজকা,—
‘সমরখন্দ’ ‘গজনী’ ও ‘ঘোর’
বোগদাদ বোধারার।

৬
এমনি বাঙা এসেছে বারম্বার,
হয়ে “খাইবার” গিরি-সকট পার।
হৃৎকর চমু এসেছে গিয়াছে ফের,
‘ম্যাসিডোনিয়া’র বিজয়ী ফ্যালাংসের,
ত্রস্ত করিয়া পকনদ আর
হু’ধার বিতস্তার।

৭
বাঙায় আমি শুনে হই অস্থির,
ভাঙার শব্দ সোমনাথ মন্দির।
চিতোর জহর-ব্রতের গন্ধ পাই।
উড়ে বাঙায় দখ পুঁথির ছাই,
ভস্মীভূত সে পুস্তকাগার
“আলেকজেন্দ্রিয়া”।

৮
হেন বাঙায় উড়িয়া গিয়াছে ঠিক—
রোমান, কারথেনজিয়ান পারসি গ্রীক।
হয়তো উহারি আবর্তে হবে লীন,
অমনি ‘প্যারিস’ ‘লগুন’ ‘বার্লিন’,
‘ষ্টেলিন-গ্রাডের’ রণ-আয়ুধের
অনন্ত ভাণ্ডার।

৯
ক্ষীত আমেরিকা অভিনব গর্ভে,—
ধূলি হয়ে রবে বাঙার গর্ভে।
হয়তো ‘নরেনবার্গের’ ঘূর্ণী
বাবে ইয়াকী জনপদ চূর্ণি
দখ মাটির অভিশাপ আছে
‘হিরোসিমা’, ‘কোরিয়া’।

১০
বাঙা তোমার তাজ এ বৈরীভাব,—
হউক গুণ্য নৃতন জয়লাভ।
আনো আনন্দ, অমৃত হিল্লোল,
ঝুলন ঝুলাও, দাও হিন্দোলে দোল,
ভাসাও উজানে প্লেমের প্রদীপ
কাল জলে বয়নার।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

রথের সময় নিজের 'বাসভূমে' গিয়াছিলাম এবং সেখানে দুই দিনে মোট ৩৮ ঘণ্টা বাস করিয়াছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে কেবল ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণের হুঃখ-দুঃখের কথা শুনিয়াছিলাম। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি বর্তমান মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীমণ্ডলী নিরোগ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া যে ভীত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও শুনিতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস দলভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যাই বেশী ছিল।

এই অঞ্চলে বর্তমান বৎসরে আটল বানের চাষ হয় নাই বলিলেই চলে। প্রায় সর্বত্রই পাটের চাষ হইয়াছে; পাটের অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। ইতিমধ্যেই পাটের গাছে ফুল বরিয়াছে। আমন বানের চাষের জন্য এখনও উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি হয় নাই; তবে স্থানে স্থানে অতি অল্প পরিমাণ জমি 'তাড়া' হইতেছে। স্থানীয় শ্রমিকগণের দৈনিক বেতন মাথাপিছু এক টাকা বার আনা। সাঁওতাল পরগণা, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যে সকল শ্রমিক আসিয়াছে তাহাদের মাথাপিছু দৈনিক বেতন দুই টাকা চার আনা।

বেশনের (সংশোধিত) দোকানে চাল নাই বলিলেই চলে। গম প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু গমের কাটতি কম। গম ভাড়াইবার পক্ষে অনেক অসুবিধাও আছে; ২৩ মাইল দূরে গম ভাড়াইতে হইতে হয়। যাওয়া-আসাতে এবং গম ভাড়াইতে এক জন লোকের আর্থ বেলা মট হয়। গমের-মূল্য, ভাড়াইবার খরচ, এবং এই আর্থ বেলায় পারি-শ্রমিক বরিলে যে খরচ পড়ে তাহার তুলনায় "স্থানীয় বাজারে" চালের মূল্য কম। সুতরাং লোকে স্থানীয় বাজারেই চাল ক্রয় করা সহজতর মনে করে। আর একটা কথা, এক সের গমের দ্বারা যে কয় জন লোকের খাতির ব্যবস্থা করা যায়, এক সের চালের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা বেশী লোকের খাতির ব্যবস্থা হয়। এই দিক হইতেও যে অধিকতর মূল্য চাল ক্রয় করা লোকে সুবিধাজনক মনে করে। দেশে চালের অভাব, সেই হেতু গম খাইতে হইবে, এই বোঝা কয় জনের আছে? বর্তমান সময়ে স্থানীয় বাজারে এক

টাকার এক সের আর্থ পোয়া চাল বিক্রীত হইতেছে—অর্থাৎ মণকরা সাড়ে পঁয়ত্রিশ টাকা।

সর্বপ্রকার উপারে চালের চোরা চালান (smuggling) পুরাদস্তর চলিতেছে। শুনিতে পাইলাম যাহারা 'লাইসেন্স'-প্রাপ্ত ব্যবসায়ী তাহাদের সাহায্যেও এই কারবার বেশ ভালভাবে পরিপুষ্ট হইতেছে। তাহাদের হিসাবপত্র দেখিবার তেমন সরকারী সুব্যবস্থা নাই।

উপমন্ত্রীমণ্ডলের নিরোগ সম্বন্ধে সাধারণের মত এই যে, এক এক জন উপমন্ত্রী যদি এক এক এলাকার এক মাস বা দুই মাস একাধিক্রমে অবস্থান করেন এবং স্থানীয় জন-সাধারণের হুঃখ-দুঃখ, অসুবিধা প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিয়া যথাসম্ভব প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে উপমন্ত্রী নিরোগের সার্থকতা থাকে। ইহাতে চালের চোরাচালানও বন্ধ হইতে পারে।

এই অঞ্চলে কিলের অভাব নাই বলা কঠিন। কয়লার একান্ত অভাব চলিতেছে। কয়লা ব্যবসায়িগণ ঘনি হইতে কয়লা আনিবার "পারমিট" পাইরাছেন, কিন্তু গাড়ী (ওরাগন) পান নাই। গাড়ী পাইতে হইলে বহু "জটিলতার" মধ্য দিয়া বাইতে হয়। কয়লার অভাবে "শুকনব" উৎসব চলিতেছে। দুই-দশটা গাছ যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও আলানির জন্ত কণ্ঠিত হইতেছে। টিন, সিমেন্ট প্রভৃতির অভাবও যথেষ্ট আছে; আবেদনকারিগণ বৎসরের পর বৎসর তাহাদের অপেক্ষার দিন কাটাইতেছে। সরকারী সেচ-বিভাগ দুই একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু 'অঙ্গুষ্ঠানের' জন্য এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতেছে যে লোকে ইহাদের "বাস্তব রূপ" সম্বন্ধে আশা ত্যাগ করিয়াছে। সবই যেন অতি মন্দ পণ্ডিতে চলিতেছে।

এই ত অবস্থা, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেশে দলাদলি, রেয়া-রেমি প্রভৃতির অভাব নাই; স্থানীয় উন্নতির জন্য একতাবদ্ধ হইয়া সংগঠনমূলক ছোটখাটো কোন কাজ করিবার কাহারও অবকাশ নাই। সকলেই মেতার আগনে বসিয়া আছেন, কায়ীর আসন শূন্য। এই অঞ্চলে কংগ্রেসেরও কোন সংগঠন-মূলক কাজ দেখিতে পাই নাই।



এশিয়ার পুনর্গঠন : নূতন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি

শ্রীঅন্নাসাহেব সহস্রবুদ্ধে

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

২

পাঁচ জনে এক জনের অন্নভাব

জাপানের লোকসংখ্যা প্রায় নয় কোটি। যুদ্ধের পূর্বে অপর কতকগুলি দেশ ও অঞ্চল জাপানের অধিকারভুক্ত ছিল। জাপানের শতকরা কুড়ি জন লোক জাপানের বাহিরে থাকিত। জাপান যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় এই সব লোককে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। আজ জাপানের বাসিন্দা প্রতি পাঁচ জন লোকের এক জন বাহির হইতে প্রত্যগত। তাহাদের শরণার্থী বলা যায়। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধে পরাজয়ের পরে জাপানে না ছিল অন্ন, না ছিল কর্ম। প্রতি বৎসর আমেরিকা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল ও গম আসিত। আর এখন পর্য্যাপ্ত এক-পঞ্চমাংশ খাদ্যশস্য বাহির হইতে আসিতেছে। এই অবস্থা পরিবর্তনের নিমিত্ত খাণ্ডে পরিপূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ঐকান্তিক চেষ্টা তাহারা করিতেছে।

জমির ও জঙ্গলের গুরুত্ব সমান

বর্তমানে জাপানের মোট জমির শতকরা বোল ভাগ জমিতে চাষ-আবাদ হয়, আর এই পরিমাণ ভূমি পাওয়ার জন্ত গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তাহাদের অবিরাম চেষ্টা করিতে হইয়াছে। চাষের জমির অল্পপাত বাড়িয়া যাহাতে অন্ততঃ বিংশ-শতাংশ হয় সেদিকে তাহাদের প্রবৃত্তির জ্বলি নাই। পাহাড় কাটিয়া তাহারা চাষের জমি তৈরি করিয়াছে; সমুদ্রকে পিছনে হটাইয়া জমি স্থষ্টির চেষ্টা করিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাপানের সমগ্র ভূমির ষাট ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ। কিন্তু চাষের জমি বৃদ্ধি করার চেষ্টায় নিজেদের বনভূমির কোনরূপ হানি করিতে তাহারা নারাজ, কারণ বন হইতে তাহাদের বহুবিধ পল্লী-শিল্পের উপকরণ আহৃত হয়। তা ছাড়া একথাও তাহারা বিশেষভাবে জানে যে জঙ্গল কমিয়া গেলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, এবং জমির উর্বরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে।

চাষ-আবাদ

এত কম জমিতে চাষ-আবাদ করিতে হয় বলিয়া ক্ষেতকে যেন তাহারা বাগিচার রূপ দিয়াছে। এখানে আমরা যেমন বাগিচার প্রত্যেকটি গাছের তত্ত্ব করি, তেমনি তাহারা ক্ষেতের প্রতিটি অঙ্গুরের উপর নজর রাখে।

আমাদের এখানে ক্ষেতে যতটা ব্যবধানে গাছ রোয়া হয়, উহারা তাহার অপেক্ষা অধিক ব্যবধানে রোপণ করিয়া থাকে। তাই বীজ ও তাহাদের কম লাগে—আমাদের এখানকার এক-পঞ্চমাংশ। জাপানে প্রায় এক শত ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, আর তা হয় বার মাসই। তাহা হইলেও চাষীকে তথায় বৃষ্টির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। নব্বুই ভাগ জমিতে, খাল পুকুরিণী, বা কুয়া হইতে জল-সেচের ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনমত তাহারা উহা হইতে সেচ দিয়া থাকে।

কম্পোষ্ট প্রস্তুত-প্রণালী

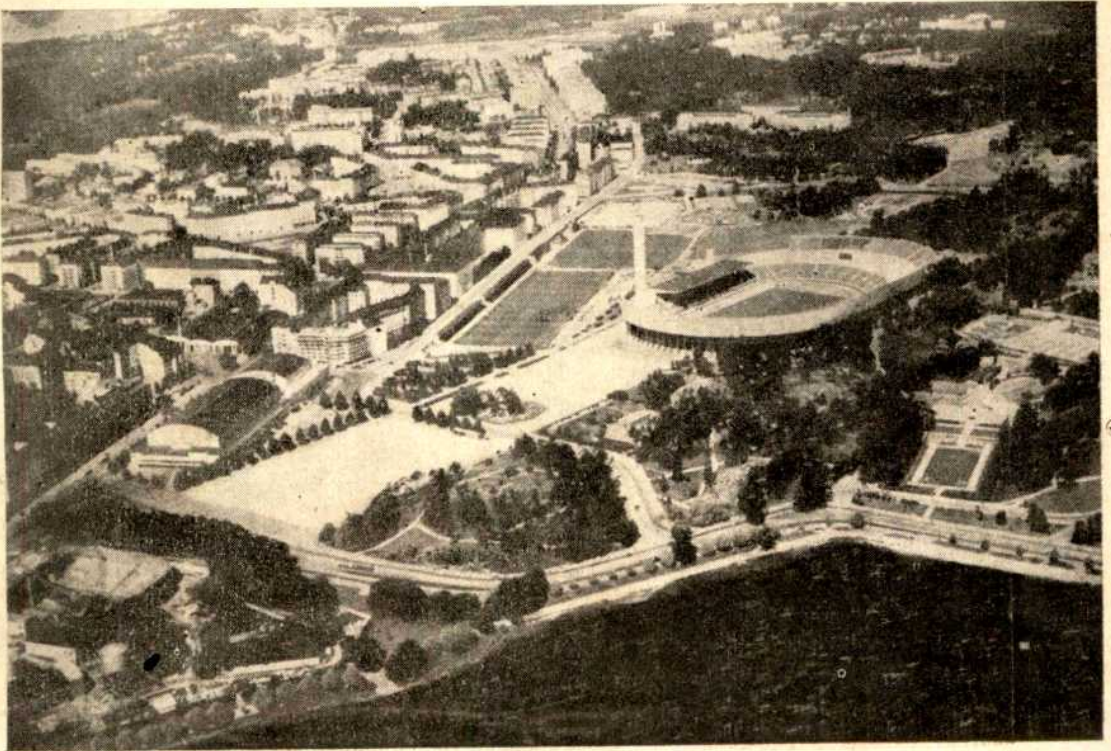
জাপানীরা ক্ষেতে প্রচুর সার ব্যবহার করে। প্রতি চাষীর বাড়ীর সামনে আছে একটি কুঁড়ে ঘর। ঐ কুঁড়ে ঘরে সারা বছর ধরিয়া কম্পোষ্ট সার তৈরি হয়। অবসর সময়ে চাষী বন হইতে ঘাসপাতা সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং নিজ ক্ষেত বার বার নিড়াইয়াও সে কিছু ঘাস পায়। এই সব সে জমা করিয়া রাখে। জাপানের ৭০।৮০ ভাগ জমি পশুর সহায়তা বিনা চাষীরা নিজেরাই আবাদ করিয়া থাকে, কারণ সেখানে গবাদি পশু কম। সুতরাং কম্পোষ্টের জন্য ঘাস, গমের ভুসি, তুষ ইত্যাদির ব্যবহার হইয়া থাকে। কম্পোষ্ট-কুঁড়ের মেকে সিমেন্ট দিয়া বাঁধানো। মেঝেতে চাষী ঐ সব তৃণ-লতা, ঘাসপাতা, ভুসি-তুষ স্তূপীকৃত করিয়া প্রতি সপ্তাহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল ঢালিতে ও উটাইয়া-পাটাইয়া দিতে থাকে। উহা হইতে যে জল চোয়ায় তাহা এক গর্তে গিয়া জমা হয়। ঐ জল পুনরায় ব্যবহার করা হয়। প্রায় ছয় মাস ধরিয়া এই প্রক্রিয়া চলে। তখন ঐ তৃণলতাদির স্তূপ মাথনের মত মোলায়েম সারে পরিণত হয়। ঐ প্রক্রিয়ার ইহা অপেক্ষা অল্প সময়ে সার পাইতে হইলে, এতদ্ব্যতীত উহাতে দুই-তিন শতাংশ ক্যালসিয়াম নাইট্রেট সংযোগ করা হয়। তাহাতে দুই বা আড়াই মাসের ভাল সার পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে যে, তথায় প্রতি একর জমিতে প্রতি বৎসর পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ গাড়ী তথা পাঁচ হইতে দশ টন সার ব্যবহার করা হয়।

পায়খানা নির্মাণ ও মলের সার

সারের জন্ত মাছের মলমূত্রের প্রচুর ব্যবহার করে বলিয়া জাপানী ও চীনা দেশে খ্যাতি আছে। জাপানের ছয়টি বৎ



ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিন্ধির সাধারণ দৃশ্য



হেলসিন্ধির ষ্টেডিয়াম। প্রধানতঃ এখানেই ১৯৫২ সনের অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইতেছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন—



ভোট-বক্স। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে সাধারণ নির্বাচন চলিতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভোট-গ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচন-কালে এই বক্স ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা দ্বারা ভোট গণনায় অনেক সময় বাঁচে



ওহিওতে প্রাথমিক নির্বাচন-কেন্দ্রের একটি দৃশ্য

নগরে ক্রাস পায়খানার ব্যবস্থা আছে। তদ্ব্যতিরেকে, অন্য সব জায়গায়—কি ক্ষুদ্র গ্রাম, কি বড় শহর সর্বত্রই প্রতি বাড়ীতে পায়খানা রহিয়াছে। তথাকার পায়খানা এইরূপ :

চার ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া, চার ফুট গভীর একটি সিমেন্টে তৈরী কুপ। তার উপর তক্তার ছাউনি। আর ঐ পাটাতনের উপর শৌচ-গৃহ নির্মিত। কুপ হইতে মল-মূত্র অপসারণের সুবিধার জন্য বাহিরের দিকে একটি মুখ রাখা হয়। উহা ঢাকিয়া রাখার ব্যবস্থা থাকে। পাটাতনের মধ্যস্থলে এক ফুট লম্বা ও নয় ইঞ্চি চওড়া গোলাকৃতি একটি ফাঁক আর তাহাতে ফোকলা একটি চীনা মাটির বাসন বসানো। মলমূত্র বালতিগুলি বাকি বুলাইয়া বা গাড়ীতে চাপাইয়া ক্ষেতে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রত্যেক ক্ষেতে সিমেন্ট বা পোড়া মাটিতে তৈরী চার ফুট গভীর ও চার ফুট পরিধি বিশিষ্ট দুইটি গোল কুপ থাকে। উহাতে ঐ মল-মূত্র ঢালিয়া তিন-চার বালতি জল মিশায়। পরে খুব ভাল করিয়া ঝাটিয়া পচাইবার জন্য ৮ হইতে ১৫ দিন রাখিয়া দেয়। যখন উহার উপরে মালাইয়ের মত সর পড়ে এবং উহার রঙ কালো বা গাঢ় সবুজ হয় তখন বুঝা যায় যে সার ঠিক পচিয়াছে। তখন কাঠের বড় চামচে দিয়া কাঠের বালতিতে তুলিয়া উহাতে আরও জল মিশান হয় এবং প্রত্যেক গাছের মূলে বড় চামচের এক এক চামচে জল দেওয়া হয়।

মেথরের সমস্তা নাই

বড় বড় শহরে এমন বহু লোক বাস করে যাহাদের ক্ষেত-খামার নাই। তাহাদের বাড়ীর মল অপসারণের কাজটা করে আশপাশের আট-দশ মাইলের কৃষকেরা। এক এক জন চাষী ২৫-৩০ ঘরের ভার লইয়া থাকে। ইহার জন্ত গৃহস্থানীকে তাহাদের কিছু দিতে হয় না, আর তাহারাও গৃহস্থানীকে কিছু দেয় না। ইচ্ছা হইলে কখন-কখন গৃহস্থানীকে কৃষক কিছু শাক-সব্জী দিয়া থাকে, কিন্তু বাধ্যবাধকতা কিছু নাই। ওখানে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে মল অপসারণের জন্ত মেথর নিযুক্ত করিতে হয় না। অতএব মলমূত্র অপসারণের কোন খরচা নাই। বড় বড় সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান, হোটেল, রেল-স্টেশন ইত্যাদির মল-মূত্রও চাষীরাই অপসারিত করিয়া থাকে।

বিজ্ঞানের সহায়তা ও ঋণ সম্পর্কে স্বাবলম্বনের চেষ্টা

চাষীরা কম্পোস্ট, মলমূত্র ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করে। তা ছাড়া তথায় রাসায়নিক সারের ব্যবহারও খুব হয়, সারা ভারতে যে পরিমাণ হয় তার চাইতেও বেশী। প্রতি ফসলে আর প্রতি গাছে তাহার

অল্প অল্প করিয়া সাত-আট বার সার দিয়া থাকে। উপযুক্ত পরিমাণ সার ও জলের ব্যবহার, কীট-নিবারণের যাবতীয় উপায় অবলম্বন, বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক পরিচয় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম হেতু জাপানের একরপ্ত গড়পড়তা খাদ্যশস্যের ফলন ভারতের একরপ্ত ফসলের চারি গুণ অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক। তাহাই নহে, উৎপাদন আরও অধিক বাড়াইবে এবং নিজেদের দেশকে খাদ্যবিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবে এই মহৎ আকাঙ্ক্ষাও তাহারা পোষণ করে।

সেবাগ্রাম পদ্ধতির দোষগুণ :—মলমূত্র অপসারণ ও উহার ব্যবহারবিষয়ক জাপানীদের এই পদ্ধতি* আমাদের কাছে বিশী ও অতিশয় নোংরা মনে হইবে। ইহা অস্বাভাবিকও নহে। সেখানকার কতক শিক্ষিত লোক মনে করেন যে, ঐ পদ্ধতি অপেক্ষা ক্রাস পায়খানা ভাল। কিন্তু ক্রাস ব্যবস্থায় সার নষ্ট হয় বলিয়া জনসাধারণ উহার প্রবর্তনের পক্ষপাতী নহে। সেবাগ্রামের পায়খানা সাফাই দেখিয়া কোন জাপানী ভ্রমলোক মন্তব্য করেন যে, জাপানী পদ্ধতি অপেক্ষা সেবাগ্রাম-পদ্ধতি উন্নততর। কিন্তু তৎসঙ্গে একথাও তিনি বলেন—কি পরিমাণ সারে কি পরিমাণ নাইট্রোজেন ইত্যাদি অত্যাবশ্যক উপকরণ আছে তাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত সেবাগ্রাম-পদ্ধতিকে অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত করা দরকার। জাপানের পদ্ধতি কতকটা নোংরা হইলেও, আমাদের চাষীরা বেরূপ সহজ ভাবে গোবর ব্যবহার করে, জাপানীরা ঠিক সেরূপ সহজভাবে মলমূত্র অপসারণ ও ব্যবহার করে। এ কাজ সেখানে ঘৃণা বিবেচিত হয় না, বরং সমাজে অত্যন্ত মর্যাদার, এ কাজেরও সেই মর্যাদা। খাদ্যসম্পর্কে স্বাবলম্বী হইতে হইলে ভারতবর্ষকেও জমিতে পর্যাপ্ত সার ব্যবহার করিতে হইবে আর তাহার দরুন তাহাকেও সার তৈরীর জন্ত মলমূত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার অবশ্যই করিতে হইবে।

[এ বিষয়ে জাপানের পদ্ধতিসম্বন্ধে ভারত খাদ্য-শাস্ত্রে স্বাবলম্বী হইবে। আর মেথরের প্রতি যে সামাজিক অবিচার চলিয়া আসিতেছে সেই পাপ হইতে আমরা মুক্ত হইব। সমাজের পক্ষে অতি আবশ্যক একটি কাজ মেথর করে, কিন্তু তার বিনিময়ে সে সমাজ হইতে পায় অবিমিশ্র ঘৃণা। এদিকে গান্ধীজী আমাদের চেতনা কতকটা জাগ্রত

* এখানেও গান্ধীজী সকলে কোথাও কোথাও এই ধরনের 'কু-পায়খানা' বড়বরের গ্রীলোকদের ব্যবহারের জন্ত আছে। শৌচাস্ত্রে উহাতে মাটি, বাস-পুড় ও আবর্জনা চাপা দেওয়া হয়। মল যখন সারের পরিণত হয় তখন তাহা তুলিয়া লওয়া হয়। উহা কৃষার মত গভীর। বীধান-গর্ত বলা যাইতে পারে। তেলেকানার গ্রামে কোথাও কোথাও এরূপ পায়খানা চোখে পড়ে।—

করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ আজ সমাজে ক্ষীণ। অতএব অদূর ভবিষ্যতে অল্প কক্ষের মত মেথরের কক্ষকে সমাজ ঘে মধ্যদান দিবে সে ভরসা কম। ব্রাহ্মণ আজ অর্থলোভে চামড়ার কাজ করিতেছে, কিন্তু অর্থলোভ থাকিলেও মেথরের কাজ সে করিত না। কারণ এ কাজটাকেই যে সমাজ হীন করিয়া রাখিয়াছে। বার্ণাভ শ বলিয়াছেন যে, ভাস্করদেরও মল-মূত্র-পুঁজ ঘাঁটার মত নোংরা কাজ করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও লোকে তাহাদের যুগা না করিয়া সম্মান করে। তার কারণ তাহারা

রোজগার করে বেশী। অতএব সমান আয় হইলে সমাজের দৃষ্টিতে মেথরে আর ভাস্করে ব্যবধান থাকিবে না। এই অভিমত স্বীকার করা মুশকিল। কারণ শারীর-শ্রমকে, বুদ্ধি-শ্রম অপেক্ষা হয় মনে করা রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, মেথরের রোজগার ভাস্করের রোজগারের সমান বর্তমান ভারতে হইবার সম্ভাবনা কম। এ ভারত গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত নহে। অতএব এই কণ্ঠটাকে উঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ। জাপানের কৃষক আমাদেব দীক্ষাদাতা হউক।—অম্ববাদক]

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীমুশীলচন্দ্র ঘোষ

১০

প্রদেশ ও প্রদেশবাসীদের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্মৃচ করিতে হইলে প্রদেশ সরকার কেবলমাত্র প্রদেশবাসীদের দ্বারাই গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যিক—অপর প্রদেশবাসীদের দ্বারা ইহার গঠন প্রভাবান্বিত হওয়া আদৌ উচিত নহে। সকলেই জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে অপর প্রদেশবাসী ভোটদাতার সংখ্যা অনেক বেশী। যত দিন পর্যন্ত ইহার পরিবর্তন করিতে না পারা যাইবে, তত দিন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের স্বার্থ রাজ্য-সরকার সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কারণ যাহাদের দ্বারা তাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন ও ভবিষ্যতে হইবেন তাঁহাদের সকলকার সমষ্টিগত স্বার্থ প্রদেশবাসীদের স্বার্থের প্রতিকূল হইলেও রাজ্য-সরকারকে উহা রক্ষা করিতেই হইবে। এই অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হইতেছে এই যে, পশ্চিমবঙ্গে যাহারা স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন তাঁহাদেরই নাম কেবলমাত্র ভোটার তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। গত নির্বাচনে বহু লক্ষ অপর প্রদেশবাসী ব্যবসায়ী ও শ্রমিকের নাম এই প্রদেশের ভোটার-তালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল। ঐ সমস্ত ব্যক্তি এই প্রদেশে ভোট না দিয়া নিজ প্রদেশের স্ব স্ব গ্রামে ও বিভিন্ন এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়া অনায়াসে ডাকবোগে তাঁহাদের ভোটগুলি প্রেরণ করিতে পারিতেন।

গত নির্বাচনী স্বপ্নের পর ভাঃ রায় নিজেই বলিয়াছিলেন যে, মুসলমান ও অপর প্রদেশবাসী ভোটদাতাদের সাহায্যেই এই প্রদেশে কংগ্রেস জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, অধিকসংখ্যক

প্রদেশবাসী কংগ্রেসের বিপক্ষে ভোট দেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস-প্রার্থীগণ নির্বাচনদ্বন্দ্ব জয়লাভ করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, প্রায় প্রত্যেক ভোট-কেন্দ্রে এত অধিকসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন যাহার ফলে ভোটগুলি বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং বহু কেন্দ্রে অধিকসংখ্যক ভোটদাতার সমর্থন লাভ করিতে না পারিলেও অনেক প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন।

অনেকেই মনে করেন যে, হিন্দু মহাসভা, রামরাজ্য পরিষদ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক আখ্যাবিশিষ্ট দলগুলি যদি নির্বাচনদ্বন্দ্ব অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান অধিবাসীরা বিচলিত না হইয়া কেবলমাত্র কংগ্রেস-প্রার্থীদেরই ভোট দিতেন না। একথা লেখা বাহ্যিক যে, যতদিন পর্যন্ত প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীদের মনে কংগ্রেসের ত্রায় একাধিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল আছে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে না পারা যাইবে তত দিন পর্যন্ত তাঁহারা একমাত্র কংগ্রেস-প্রার্থীদেরই ভোট দিতে থাকিবেন এবং কংগ্রেসও ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন। রাজ্য-বিধান সভায় কোনও দলভুক্ত না হইলে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কিছুই করিতে পারেন না ইহা জানা সত্ত্বেও গত নির্বাচনদ্বন্দ্ব বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ায় প্রদেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেরাও মনোনীত হইতে পারেন নাই এবং অনেক সুযোগ্য প্রার্থীরও রাজ্য-বিধান সভায় এবং লোকসভায় মনোনীত হইবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কয়েক ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা রাজ্য-বিধান সভায় মনোনীত হইবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে যোগ

দিয়াছেন। আশা করি, ভবিষ্যতে ভোটদাতারা এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতরাত্রে অস্তভুক্ত হইলেও ভারতের অপরাপর প্রদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ যে সকল ক্ষেত্রে এই প্রদেশের স্বার্থের অক্ষুণ্ণ নহে ইহা লেখাই বাহুল্য। এই প্রদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য লাভ করিবার জন্য অপর প্রদেশবাসীরা এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে নানাভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই উদ্দেশ্যে অস্ত প্রদেশবাসী ধনীসম্প্রদায় অর্থসাহায্যের দ্বারা তাঁহাদের মনোনীত অনেক প্রার্থীকে প্রদেশের রাজ্য-বিধান সভায় নির্বাচিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

যদিও ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাঝেই ভোটাধিকার লাভ করিয়াছেন তথাপি লোকসভা, রাজ্য-বিধান সভা ইত্যাদিতে সভা নির্বাচিত হইতে চাহিলে একমাত্র ধনী ব্যক্তি অথবা অর্থশালী রাজনৈতিক দলের দ্বারা মনোনীত হইতে না পারিলে কাহারও পক্ষে কোনও নির্বাচনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। ইহার প্রতিকারের উপায় প্রচলিত ভোট-ক্ষেত্রের নিয়মবিধি পরিবর্তন করিয়া ভ্রাম্যমাণ ভোট কেন্দ্রের প্রবর্তন করা। পোলিং অফিসার-গণ সরকারী বাসে প্রত্যেক গ্রামে ও পল্লীতে গিয়া ভোট গ্রহণ করিবেন ইহাতে False personification-এর আদৌ সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ গ্রাম ও পল্লীর লোক সঙ্গে সঙ্গে উহা ধরিয়া ফেলিবেন এবং অধিকাংশ জীলোক-ভোটদাতারও ভোট দিতে সক্ষম হইবেন। অবশ্য ইহার দ্বারা এক দিনে ভোট গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না, কয়েক দিন বেশী সময় লাগিবে। এইরূপ প্রথা প্রবর্তন করিলে ভোট-প্রার্থীদের অর্থব্যয়ও খুব কম হইবে।

উপস্থিত লোকসভায় ও রাজ্য-বিধান সভাগুলিতে একমাত্র বামপন্থী দল ভিন্ন অপর কোনও শক্তিশালী বিরোধী দল নাই। এইরূপ অবস্থায় কংগ্রেস-গঠিত রাজ্য-সরকার জনমতকে উপেক্ষা করিলে কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারেন না। এই ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের প্রকট অর্থাভাব ও অন্নভাব থাকা সত্ত্বেও ১৪ জন মন্ত্রী ও ১৬ জন উপমন্ত্রী লইয়া রাজ্য-সরকার গঠিত হইয়াছে। উপরন্তু এ সমস্ত মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে বাহা ভারতরাত্রে অপর কোন রাজ্য-সরকার করেন নাই। প্রজ্ঞেশবাসীদের সেবা করিবার আগ্রহ অপেক্ষা রাজ্য সভার নতুন কংগ্রেসী সভ্যরা যে নিজেদের লভ্যের দিকে বেশী পরিমাণ নজর দিতেছেন ইহা বলাই বাহুল্য। আমাদের পরাধীন অবস্থায় কংগ্রেসের মূলনীতি

ছিল “নিরুপদ্রব অসহযোগিতা”। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে, আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কংগ্রেসের মূলনীতি ক্রমে ক্রমে “নিরুপদ্রব হিটলারবাদে” দাঁড়াইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের স্থান জনসাধারণ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ইহা অস্বস্তি করিয়া সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা একটি “ভারত সেবক সমাজ” গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। খুব সম্ভব তিনি বিশেষভাবে অস্বস্তি করিতেছেন যে, পাঁচ বৎসর পরে নির্বাচনক্ষেত্রে উপস্থিত কংগ্রেসী দল আর সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। সেই কারণ এখন হইতেই তিনি আর একটি কংগ্রেসী উপদল গঠন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু যাহারা একবার কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন অথবা কংগ্রেস-দলের সঙ্গে একমত নহেন তাহারা এই বেনামী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান—“ভারত সেবক সমাজে” যে যোগ দিবেন না ইহা সহজেই অস্বস্তি করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ প্রত্যেক রাজ্যেই যখন কংগ্রেসী দল উক্ত “ভারতসেবক সমাজ”কে প্রভাবান্বিত করিতে থাকিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতরাত্রে অস্তভুক্ত হইলেও, বাঙালীকে জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে কংগ্রেস অথবা অপর কোনও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। কারণ বাংলার সমস্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার সমাধান করিতে হইলে স্বতন্ত্র ভাবে বাংলায় উচ্চ পর্যায়ের একটি অদলীয় “পশ্চিমবঙ্গ সেবক সমাজ” গঠন করা আবশ্যিক। বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থরক্ষাই হইবে ঐ সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন আমরা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিলাম তখন কলিকাতা হাইকোর্টের ও মফস্বলের জেলা কোর্ট-সমূহের শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারজীবীরা সর্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন। বাংলার উপস্থিত জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান করিতে আবার যদি তাহারা অগ্রসর হন তবেই ইহা সম্ভব।

প্রস্তাবিত “পশ্চিমবঙ্গ সেবক সমাজ”কে কংগ্রেস অথবা অপর কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল যাহাতে কোন-রূপে প্রভাবান্বিত করিতে না পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক, নচেৎ ইহার মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি দৈনিক সংবাদপত্র (ইংরেজি ও বাংলা) আছে সেগুলির দ্বারা বাঙালীর স্বার্থ রক্ষা হওয়া সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর নহে। এই সমস্ত দলগত সংবাদপত্রগুলি সকল সময় স্বাধীন

ভাবে প্রদেশ সরকারের কার্যের সমালোচনা করিতে অক্ষম। কারণ প্রথমতঃ প্রতি বৎসর বহু টাকা নিয়মিত ভাবে সরকারী বিজ্ঞাপন হইতে তাঁহারা পাইয়া থাকেন। উপরন্তু ঐ সমস্ত সংবাদপত্রের মালিকগণের কেহ বেহ রাজ্য-বিধান সভায় উপমহাদেশ ও রাষ্ট্রসভায় কংগ্রেস বর্জপক্ষ হইতে মনোনীত হইয়াছেন।

বাঙালী যুবকদের বেকার-সমস্যা সমাধান করিবার জগৎ যে মনোবী আত্মজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছিলেন সেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতিস্মারক কোনও ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত আমরা করি নাই। যদি প্রস্তাবিত “পশ্চিমবঙ্গ সেবক সমাজ” স্বর্গীয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটি স্মৃতি তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন তাহা হইলে আমি মনে করি, পশ্চিম বঙ্গ হইতে দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা আদৌ অসম্ভব হইবে না। উক্ত স্মৃতি তহবিলের অর্থ হইতে একখানি উচ্চ পর্যায়ের বাংলা এবং একখানি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র

বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থরক্ষার্থে প্রকাশ করা যাইতে পারে। সংবাদপত্রগুলি পরিচালনা করিয়া যে অর্থ লাভ হইবে তাহার দ্বারা এবং স্মৃতি তহবিলের অন্যান্য আয় হইতে বাঙালী যুবকদের নানারূপ ব্যবসা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে দেশের বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে।

বাংলা ও বাঙালীর উপস্থিত রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির বিষয় গত কয়েক মাস যাবৎ “প্রবাসী” পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট যতদূর সম্ভব নিবেদন করিয়াছি। আমি মনে করি যে, ইহার প্রতিকার যদি এখন হইতে না করা হয় তাহা হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য ও শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের জন্মভূমি, ধর্মি বহুমন্ডল, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের জন্মভূমি বাংলা—বাঙালীর বাংলা অচিরে ইতিহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইবে।

সমাপ্ত

অন্তর্বর্তীকালীন

শ্রীসত্যাদর্শ বসু

আর তো ওড়ে না বলাকা-বলর বোঝার বিমানবাহিনী,
ককিরে ওঠে না সাইরেন আর তরাতুর শিশু লম,
রোষভরে চেয়ে ধরঙ্গী কামান গর্জার মাকো আর—
যুদ্ধ গিরেছে থেমে,
দুঃখভিক্ষা ও বতায়।

মহামারী আর অজ্ঞান
শত কাহিনীতে ভরতি রয় না প্রভাতের দৈনিক;
পীড়া দেয় মাকো সঙ্গীতপাণি বিদেশের সৈনিক;
শত অভাবের গোলকধাঁসায় ঘুরে—
রোদ-ঝলোমলো বিপুল আশার সকাল বিকাল সন্ধ্যা
কেটে যায় মাকো ভিল ভিল করে নিফল হতাশায়।
তবু কেন আজ শান্তি মাইরে উদেগহীন চিন্তে,
অসোরাভি লাগে কেন, পায়ে কড়ক বিনে মেই ভো,
মির্জাবমার কুলেতে ভিড়েছে তাবনার থেয়া-ভরী
তবু তাবনার চিহ্নিত কেন যুগ ?
উজ্জল-রোদে পিঠ পেতে শুয়ে পড়ে আছে খোলা-পথ—
তবে কেন আজ চলবার মেশা মেই ?
পতি কি হরেছে হারা ?
আকাশের পটে বর্ণবাহার রবির রক্তরাগে,

শাপের বৃক্ষে ভরমর্শ্বের বিহগের কলগানে,
আজিও চলেছে অনাদি কালের খেলা সে চিরন্তন,
আজিও রয়েছে মরমারী আর রঙীন প্রজাপতি—
তবে কি গো আজ বরিজী লীনা, হয়েছে কি মরু বধ্যা ?
হুটী কি গেছে থেমে ?

তা তো নয়, তা তো নয় :
তটিনীর স্রোত কোয়ার তটীর সন্ধিতে আছে ধরকে,
মাহুয়ের মন তাবা না-ভাবার সীমানার গেছে পৌঁছে।
শান্ত বলছে, চলে কিছু কাল সংসারের চাকা,
বিজ্ঞানে কয়, ভেদিত বস্তুর বাস্তবিক হয়ে আলভে—
সময় কিছু মেবে তাই রে—হতাশার কিছু নেই রে,
সমেতে আলিঙ্গা মিলিবে আবার গাম,
সুপ্ত চম্পা জাগিবে আবার সোনার কাঠির পরশে,
নীপ-রোমাঞ্চ জাগিবে বিপুল হরবে
সাত সন্তো পাড়ি দিতে পুনঃ জাগিবে ময়ূরপঙ্খী,
পক্ষীরাজ্যে হুটবে আবার সীমাহীন সেই অজানা ভেপান্তর,
থেমেছে যে রথ আবার চলিবে
আশা উৎসাহ নিশান উড়িয়ে—

চির নবীনের বিজয়-যাত্রাপথে।

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১০

তবেশ বিলাত যাইবে না বলিয়া জবাব দিলেও মিঃ ও মিসেস রায় হাল ছাড়িতে পারিলেন না। মেয়ের জন্ত আই. সি. এস. পাড় হাতছাড়া করা বড় কঠিন কাজ। ছেলের বাপ বড় ব্যারিষ্টারের কালো মেয়েকে মোটা চেকের সহায়তায় পরিবারস্থ করিতে রাজী ছিলেন এক সপ্তের বিনিময়ে। সপ্তটি এই যে, তাঁহার মেয়েটিকে হাই সোলাইটিতে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা মিঃ রায়কে করিতে হইবে। তিনি ধার করিয়া ছেলেকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। ছেলের বিষয়ে যে টাকা পাইবেন তাহা দিয়া ধনযুক্ত হইবেন, অতরাং মেয়ের বিষয়ে টাকা খরচ করিতে পারিবেন না। মিসেস রায় তাবিয়াছিলেন তবেশকে সহজে রাজী করাইতে পারিবেন তবেশের পিতার সাহায্যে।

তবেশেরও ছেলেবেলা হইতে বিলাত যাইবার কল্পনা ছিল। এ পর্য্যন্ত তবেশের ভবিষ্যৎ মকলের জন্ত তাহাকে বিলাত পাঠাইবার প্র্যান মিঃ ও মিসেস রায়ের মাথায় ছিল, তাহাকে বিবাহ দিয়া পাঠাইবার কথা তাঁহার ভাবেন নাই। কিন্তু এলিষ্টাট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বজ্রীর দ্বারা পাইবার পরে পূর্ব প্র্যানের পরিবর্তন হইল।

মিঃ রায় প্রথমটা জীর্ণ প্রভাবে সার দেয় নাই। তিনি তাবিয়াছিলেন মেয়ে বড় হটক, একটা ভাল ছেলে দেখিয়া নিজে খরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইয়া মাহুষ করিয়া আনিবেন, মাহুষ হইয়া আসিলে তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন। দেবানন্দকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল এই ছেলেটিকে লইলে মন্দ হয় না। জীকে সেকথা বলিয়াছিলেন, তিনি ভেতন আপত্তি করেন নাই। বলিয়াছিলেন আরও কিছুদিন ঘাটক, ছেলেটি কি রকম পাস করে, কি রকম তাহার স্বভাব-চরিত্র দেখা যাক।

কিট সম্ভবতঃ ইহার কিছু আভাস পাইয়াছিল। তাহার মনের কথা বলা কঠিন। সে সাহেবী ঠাইলে বরাবর মাহুষ হইয়াছিল, কিন্তু বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ তাহার কিশোর মনকে মাড়া দিলে তাহার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। একটু একটু করিয়া সে তাহার সমাজের আইন-কানূনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। মিঃ ও মিসেস রায় উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তবেশের সঙ্গে দেবানন্দ তাঁহাদের গৃহে আসিবার পর হইতে তাহার এই তাব পপ্ঠ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মিঃ বজ্রীর আবির্ভাবের পরে পূর্ব প্র্যানের আনুল পরিবর্তন

করিতে হইল। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তবেশকে হাতে আনা গেল না, মেয়ের জন্ত হাতের কাছে আই. সি. এস. পাড় পাইয়াও মিঃ বজ্রী সিনিয়রের সপ্তের জন্ত মিঃ রায় বিপদে পড়িলেন। তাঁহার রাগ হইল এই তত্ত্বলোকের উপর। দুই চারি হাজার টাকা বেশী চাইলে তিনি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার নিজের ছেলে বড় হইলেও না হয় একটা ব্যবস্থা করা যাইত। অজ্ঞার আশ্বাস গ্রহিয়া তত্ত্বলোক তাঁহাকে এক মহা সমস্তার মধ্যে কেলিয়াছেন।

সেক্রেটারী অব ষ্টেট মিঃ মলের আদেশে বন্দেয়াতরম সাকুলার উঠাইয়া লওয়া হইল এবং বদেশী আন্দোলনের সংশ্লেষে যে সকল স্কুলের ছাত্র স্কুল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহাদিগকে পুনরায় স্কুলে ভর্তি করা আরম্ভ হইল। উপর-ওয়ালার এই আদেশে স্কুলার সাহেব ও তাঁহার অধস্তন কর্মচারীরা যনঃস্কুল হইলেন। অনেক জায়গায় স্কুলের উপর অপ্রকাশ্য চাপ দিয়া তাহার বিতাড়িত ছাত্র ভর্তি করিবার ব্যাপারে বাধা দিতেছিলেন। সিরাজগঞ্জ স্কুলের সঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষের গোলাযোগ বাধিল। ছোটলাট স্কুলার নিজের হাতে বিষয়টি লইলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলিলেন, সিরাজগঞ্জ স্কুলকে “ডিসএক্লিইট” করো। বিশ্ব-বিদ্যালয় স্কুলারী অহুয়োব অগ্রাহ করিলেন। এই সামান্য ব্যাপার বড়লাটের হাতে গেল। তিনি স্কুলারের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না। সত্য, শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া স্কুলারী শাসনে যে সকল সারস্কুলার জারি হইয়াছিল সেক্রেটারী অব ষ্টেট সেগুলি বাতিল করিবার উপদেশ দিয়া-ছিলেন। সেগুলি বাতিল হইল বটে, কিন্তু সেগুলির জায়গায় পূর্ববঙ্গে নিত্যনূতন আদেশ জারি হইতে লাগিল। এ অবস্থা বর্ণনা করিয়া একখামি কাগজে লিখিল—“মিঃ মলের ভৎসনা সত্ত্বেও শ্রম ব্যামক্লিড স্কুলার আপনার কুঅভ্যাসগুলি সংশোধন করিতে পারেন নাই। ঢোলসহরতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পাঁচজন বা তার বেশী লোক রাস্তায় যাইবার সময়ে জোরে কথা বলিলে বা জোরে হাসিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে। সরকারী কর্মচারীরা কি বসিকতা করিতেছেন, না তাঁহার ‘সিরিয়াস’? সিরিয়াস হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহাদের মাথা বিগড়াইয়াছে এবং তাঁহার আপনাদিগকে হান্ডাপ্পদ করিতেছেন।”

দেশী কাগজগুলি অমবরত অভিযোগ করিতে লাগিল যে, ছোটলাট স্কুলার সেক্রেটারী অব ষ্টেটের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া

যথেষ্ট অত্যাচার চালাইতেছেন। লন্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রভাব পাস করিয়া সেক্রেটারী অব ষ্টেটকে অস্বস্তি করিল। ফুলারকে ফিরাইয়া আন, "হিহ এটুস হাত বিন আভারমাইনিং দি এমপারার" (তাঁহার কার্যের ফলে সাম্রাজ্যের অনিষ্ট হইতেছে)।

ইহার পরে আসিল উদয় পাটনীর কাসির ব্যাপার। ক্রীহটের উদয় পাটনীর কাসির হুকুম হইয়াছিল। সে বড়লাটের কাছে প্রাণ-ভিকার দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল। দরখাস্ত ক্রীহট হইতে সিমলার বড়লাটের হাতে পৌঁছিব্যার আগেই উদয়-পাটনীর কাসি হইয়া গেল। বড়লাট তাহার প্রাণ-ভিকার দরখাস্ত পাইয়া তাহা মঞ্জুর করিয়া পাঠাইলেন। 'পারোনিয়ার' লিখিল, উদয়-পাটনীর কাসি "রিএটেবল ওভারসাইট।" এই কৈকিয়তে সেক্রেটারী অব ষ্টেট সন্তুষ্ট হইলেন না; বলিলেন, ভয় ব্যামফিল্ড ইণ্ডিয়ান লিবার সাভিসের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহার পর হিন্দুবাদী কাগজ লিখিল, "আমরা বিশ্বস্ত হইতে পারিলাম কুলার সাহেব পদ-ত্যাগ পত্র দিয়াছেন এবং লর্ড মিণ্টো তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলা বোম্বর হয় রাহযুক্ত হইল। কিন্তু সুসংবাদ আমরা এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

কুলার সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন দেশের সর্বত্র এই শুভব হুড়াইয়া পড়িল। সুরমা উপত্যকা কমফারেন্সের সভাপতি কলিকাতার কাগজে তার পাঠাইলেন—ক্রীহটের অবিবাহিতা উল্লসিত। প্রাবল্য হইতে তার আসিল—দেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। দলে দলে লোক জটলা করিতেছে—সংবাদ সত্য না মিথ্যা। বরিশাল হইতে অশ্বিনীকুমার দত্ত তার করিলেন—রমেশচন্দ্র। সত্য লিখিল—"কুলারের পদ-ত্যাগে বাড়ীতে আলোকসজ্জা করিয়া নাচিয়া, কীর্তন গাইয়া আনন্দ করিবার হেতু নাই। কুলারের শাসন-পদ্ধতি ফিরিঙ্গী রাজনীতির অহুকুল মছে, তাই পূর্ববদে এক কুলারকে সরাইয়া নতুন কুলার আনা হইবে। কুলার জবরদস্ত শাসন-পদ্ধতি চালাইয়া আমাদের জাতীয় চেতনা জাগাইয়াছে, লর্ড রিপন বা ভয় হেনরী কটন আমাদের এই উপকার করিতে পারিতেন না। কুলার বিষকুস্ত, কিন্তু মিঃ মর্লের মত ধোয়াখুণ বিষকুস্ত নহে।"

কুলারের পদত্যাগে বাংলার মুসলমান-সমাজের এক অংশের মধ্যে ক্রোধ ও অভিমান প্রকাশ পাইল। তাহার বলিল, "ইংলণ্ড কুলারকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া আজ যে দুর্বলতা প্রকাশ করিল ভবিষ্যতে ইহার দৃঢ় গভীর অহুতাপ করিতে হইবে। লর্ড কার্জম হিন্দুদের টিক চিনিতেম এবং তাহাদিগকে শাস্তি করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেম। মুসলমান শাসকদের মধ্যে শুণু সভাটি আলমগীর হিন্দু-চরিত্র বুকিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদের বিষদীপ্ত

ভাবিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তাহাদের মুসলমান প্রভুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করিয়া ইংরেজের হাতে দেশের শাসনভার তুলিয়া দিয়াছিল। নতুন প্রভুর প্রতি তাহার অহরন্ত ধাক্কাবে একথা মনে করা ইংরেজের গুরুতর ভুল হইয়াছে।"

জবলপুর, মাদ্রাজ ও লাহোরে সভা করিয়া মুসলমানরা কুলারের পদত্যাগে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিল। ইংরেজী কাগজ লিখিল, "হি ওয়াজ অকাবুড এফ এ হলোকাস্ট টু রায়-প্যাট র্যাডিক্যালিসম।" (চরমপন্থীদের কাছে তাঁকে বলি দেওয়া হইয়াছে।)

কুলারের জায়গায় ল্যান্সিলট হেয়ার পূর্ববদ ও আসামের ছোটলাট নিয়ুক্ত হইলেন। কাগজে লিখিল, "কুলারের মমমনীতির ফলে পূর্ববদে যে অসন্তোষের আগুন জ্বলিতেছে, নতুন ছোটলাট তাহা নিভাইতে পারিবেন সকলে এই আশা করিতেছে।"

কিটর কমবর্জমান বেয়াড়াপনার মিসেস রায় শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। মিস বাকলের কাছে পড়িতে বসিয়া কিট প্রায়ই তাহার সঙ্গে বগড়া করে; মিঃ বক্সী জুনিয়রের আসিবার খবর পাইলে তাহার মাথা ধরে; বমকাইলে যুখে যুখে জ্বাব দেয়। একদিন মিসেস রায় শুনিলেন সে বিলির কাছে পটলডাকার ভবেশদার হোটেল কতদূর খবর লইতেছে। এই সব লক্ষণ দেখিয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরামর্শ হইল। মিঃ রায় স্থির করিলেন মিঃ বক্সী সিনিয়রকে জানাইবেন অবিলম্বে বিবাহ দিলে তিনি দুই-তিন হাজার টাকা ফালতু দিতে প্রস্তুত আছেন। জানাইবার পূর্বে ভবেশকে রাজী করাইবার একবার শেষ চেষ্টা করিবেন মনে করিয়া ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে কলিকাতা আসিবার দৃঢ় লিখিলেন। চিঠি পাঠাইয়া মিঃ রায় ভবেশকে লিখিলেন, তাহার মাঝে একটা পার্ট দিবেন, এ সম্বন্ধে ভবেশের সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাহেন। সে যেম হই একদিনের মধ্যে আসে।

মাঝে মাঝের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পরে আবার চক্কেবেড়ে হইতে আফ্রান পাইয়া ভবেশ বিরক্ত হইল। তাহার সন্দেহ হইল এই পার্ট সম্বন্ধে পরামর্শ একটা বাধা, সম্ভবতঃ নতুন কোন ঘটনাজের জাল বোনা হইতেছে।

বিরক্তি ছাড়া আর একটা জিনিস ভবেশের মনকে লীড়া দিতেছিল। ভবেশ কিটিকে স্নেহ করিত, আন্তরিক স্নেহ করিত। দেবামঙ্গ প্রথম হইতে ভবেশের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে সে তাহার অন্তরক ও পরম স্নেহভাজন হইয়া উঠিল। কিটিকে দেবামঙ্গের হাতে দিবার দৃঢ় সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে স্থির করিয়াছিল। প্রথম দিকে মাঝে মাঝের তার দেখিয়া সে মনে করিয়াছিল তাহার প্রভাবে

তাহাদের বোধ হয় অমত হইবে না। তাহাকে কিছু না জানাইয়া কটির বিবাহ স্থির করায় সে মনে আঘাত পাইল। দেবানন্দের প্রতি কটির পক্ষপাতিত্বের দুই-একটি দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়িয়া তাহার মন বিষন্ন হইল।

অবেশ বধন চক্রবেড়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল তখন বেশ ঘেরি হইয়াছে, সাত্য মঙ্গলিস জমিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য বসিবার ঘরে ঢুকিল। সে ঘরে ঢুকিতে মিঃ রায় তাহার দিকে চাহিলেন। তাহার মনে পড়িল জীর কথার তিনি এই অব্যবস্থিত সিনেমাটিকে আসিতে লিখিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন—বস তবেশ, তোমার মামীর সঙ্গে দেখা না করে পালিও না।

তবেশ বসিল। সে শুনিয়া মিঃ ডাটা বলিতেছেন—বোধের মিলওয়ালারা বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে হুঁহাতে পরশা লুটছে। ম্যাক্‌গেটার আর সহ করতে পারছে না। এবার বোধওয়ালাদের তাঁড়া করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। মর্গে স্তর হামিণ্টন যথাকে পাঠাচ্ছেন বোধে কাপড়ের কল-গুলিতে লেবর কন্ডিশন সহজে রিপোর্ট করবার জন্ত।

মিঃ রায়—মিলগুলো হাই প্রেসারে কাঁচ করছে। টাইমস অব ইণ্ডিয়া মজুরদের কষ্ট দেখে বড় বিচলিত হয়ে “বোধে স্তর” নাম দিয়ে একটার পর একটা প্রবন্ধ ছাড়াতে থাকে। এই সব প্রবন্ধ পড়ে লণ্ডন টাইমস ও ম্যামচেটারের চোখ থেকে জ্বল পড়তে শুরু করে মজুরদের দুর্দশায়। এ অবস্থার মর্মে কেমস করে স্থির থাকবেন? কাজেই হামিণ্টন যথ আসছে। ইট ইজ দি ওল্ড গেম অব জন বুল (জন বুলের পুরাতন চাল)।

বাংলার রাজনীতিতে মডারেট ও একসটি মিষ্টদের দল-দলি ও কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন লইয়া দুই দলের কলহের প্রসঙ্গ উঠিল। মিঃ ডাটা নতুন পার্টির লোক, বিপিন-চন্দ্র পালের তত্ত্ব। তিনি বলিলেন—

বিপিনবাবু প্রভাব করেছেন দাবাতাই নৌরজীর কারাগার ভিলককে এবার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করা ছোক। উই একসটি মিষ্টম হোলহাটেডলি সার্পোর্ট দি প্রোপোজাল—সমর্থন করি আমরা একসটি মিষ্টরা সর্বাঙ্গ:করণে এই প্রস্তাব। পিটিশন ও প্রেরার অনেক হয়েছে, নো মোর অব মেন্ডিক্যালী (ভিকারিটি আর নয়)। ফুলারের রেসিগনেশন আর বরিশাল কেনে হাইকোর্টের রায়ে দৌলভে মডারেটরা লজ্জার ঘুরে যাওয়া মাথা আবার ওঠাতে সাহস পেয়েছেন দেখছি। আবার তাঁরা কথা কইতে শুরু করেছেন।

মিঃ গাজুলী একটু ব্যাডের হাসি হাসিয়া বলিলেন—উই একসটি মিষ্টম মানে শু অরবিদ্য বোধ, বিপিন পাল, রবি ঠাকুর আর সত্যার ম্যাডক্যাপ উপাধায়? এঁদের তরসায় ইট হোপ টু রেই লীডরশিপ ফ্রম দি হাওস অব দি ভেটের্যান্স,

(অভিজ্ঞ নেতাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চাও)—ফ্রম দি হাওস অব মিঃ সুরেন্দ্র ব্যানার্জি দি হিরো অব হান-ডেড ব্যাটলফিল্ড?

মিঃ রায় সংশোধন করিয়া বলিলেন—হানডেড প্র্যাক্টিসয়ন।

মিঃ গাজুলী—গ্যাক ইট। হিন্দু পেট্রি রট ইজ রাইট। বলেছে, এই “হোম কলার” আর “সেলফ রিলায়েন্টের” দল হচ্ছে এ মিনেস টু দি এম্পায়ার (সাত্রাজ্যের পক্ষে বিপক্ষমক); তাদের আইডিয়ালস “সিলি এণ্ড ডেকারাস” (শিরুদ্ভিতা প্রকৃত ও বিপক্ষমক)।

মিঃ ডাটা—এও দি মডারেটস আর এ ফ্যামিলী অব বেগারস (মডারেটরা ভিক্ষুকের গোষ্ঠী)।

মিঃ গাজুলী—বেগারস নয়, তারা লয়াল পেট্রি রটস। বন্দেমাতরম্ পার্টির ক্যানাটিকরা দেশের অনিষ্ট করছে।

মিঃ রায়—হোমকলারের ক্যানাটিক আইডিয়া মিউ পার্টির সভ্যদের মাথার চুকেছে। আমরা আশা করছি—দে উইল সুন রিটার্ন টু দি ফিল্ড অব প্র্যাকটিকাল পলিটিক্স। (শীঘ্রই তাঁহারা বাস্তব রাজনীতিতে ফিরে আসবেন)।

মিঃ ডাটা দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—এংলো ইণ্ডিয়ান ও মডারেটদের মধ্যে তফাৎ দেখছি না বিশেষ। ইংরেজদের কন্ট্রোলের বাইরে অটোনমি চাই আমরা, এই কথা শুনে এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেস বিট্রিয়ার রোয়ীর মত করছে। মডারেটরা পৌঁ বরছে। অটোনমি ফ্রি অব ব্রিটিশ কন্ট্রোল—উঃ কথাটা ভাবতেই মডারেটদের মাথা ঘুরে যায়, গা কাঁপতে থাকে। তাই অস্থিত বাজার লিখেছে: “বিপিন পাল বলছেন ভারত-বর্ষের শাসনতন্ত্র অটোনোমাস, এবলো লিউটিলি ফ্রি অব ব্রিটিশ কন্ট্রোল হবে (ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবে); এর অর্থ ব্রিটিশ কন্ট্রোলের অধীনে ভারতবর্ষকে অটোনমি দিতে হবে। তাঁর কথার অর্থ যদি এই না হয় তা হলে বলতে হবে হি রোট নমসেল।” (বাক্যে কথা লিখেছেন)

মিঃ গাজুলী—টিক কথা।

মিঃ ডাটা—টিক কথা নয় গাজুলী, “মাইন্ড হিন্দু” উপযুক্ত কথা, গত পঞ্চাশ বছর যারা রাইট অব পিটিশনিং ছাড়া আর কোন রাইট চায় নি ও পায় নি, এখনও যারা শু কৌন রাইটের কথা ভাবতে পারে না তাদের উপযুক্ত কথা। বিলিভী কাগজে “টাইগার কোয়ালিটি অব দি ইম্পিরিয়াল রেস” বলতে শুরু করেছে, সঙ্গে সঙ্গে মডারেট বন্ধুদের পিঁলে চমকে গেছে, নয় কি?

মিঃ রায়—বগড়া থাক ডাটা। টিলক ভারসাস নৌরজী কনটেটে কে ক্ষেতে দেখে নিও। আর বুঝতে পারবে দেশের লোক বন্দেমাতরম্ পার্টির কায়ার ইটারদের পক্ষে, না ড্রোড এন্ড সোবর লীডরদের (অভিজ্ঞ ও স্থিরমস্তিষ্ক নেতাদের) পক্ষে

মি: ডাটা—দেশের লোকের কথা বলো না রায়। মডারেটরা কংগ্রেসকে পকেটে পুরে রেখেছে। সন্ধ্যার কথার দি কংগ্রেস ইজ আওয়ার্স, আমাদের কথা কংগ্রেসকে শুনতে হবে, নইলে—

মি: গাঙ্গুলী—নইলে? কংগ্রেসকে তোমাদের পকেটে পুরবে?

মি: ডাটা—একজ্যাক্টলি (নিশ্চয়)। সন্ধ্যার রেকোল্যুশন দেখেছ? উই আর সিরিয়স, উই ঞ্চাল যুত দি রেকোল্যুশন: “We the representatives of all the people of India assembled, vow that in all our activities and efforts the independence of our nativelyland shall be our one aim” (আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের সমবেত প্রতিনিধিরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমাদের সকল কর্মে ও চেষ্টার স্বদেশের স্বাধীনতা হইবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য)।

মি: গাঙ্গুলী ও মি: রায় হাসিয়া উঠিলেন। মি: গাঙ্গুলী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ইতিপেনডেন্স খ্যাল বি আওয়ার ওয়ান এম”—ইতিপেনডেন্স ছেলের হাতের মোরা।

মি: মিটার এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। অবশেষ মি: গাঙ্গুলীর কথার উত্তেজিত হইয়া কি বলিতে বাইতেছিল, মি: মিটার তাহাকে হাত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন—রায়, তুমি নৌরজী ভারসাস’ ভিলকের কথা বলছিলে। কলকাতা কংগ্রেসে নৌরজী প্রেসিডেন্ট হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিউ পার্টির শক্তির পরিচয় তোমরা এই কংগ্রেসেই পাবে। আর মডারেট স্কুলের রাজত্ব এইবার শেষ হবে। নৌরজী ষ্টাওন কর দি পাঠ এও ভিলক ষ্টাওন কর দি ফিউচার। বকেয়া আইডিয়াল ও ফিউটাইল মেথড আর চলবে না—তোমাদের দল বড় ভাল ইংরেজীতে চিংকার কর না কেন, একটু মিষ্টদের যত গাল দাও না কেন।

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। নিম্নজতা ভাদিয়া মি: রায় ডাকিলেন—বর।

মি: মিটার কি বলিতেছিলেন। মি: গাঙ্গুলী বাধা দিয়া বলিলেন—আর নয় মিটার। আই এম রেডি টু ড্রিক দি হেলথ অব ইওর এট ভিলক।

বর টেতে পেগ সাজাইয়া বরে ঢুকিল। অবশেষ উঠিয়া বরের বাহিরে গেল। মি: রায় অবশেষে বাইতে দাঁড়িলেন, বিশেষ কাজের জন্ত তিনি যে তাহাকে ডাকিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে বাইতে দেখিয়াও কিছু বলিলেন না।

অবশেষ সিঁড়িতে উঠিতে গিয়া থামিল। তাহার মামীর সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি করিবার ইচ্ছা হইল না। একবার একটু কোঁড়হল হইল মামীর এই পার্টির উপলক্ষ্য কি দিগ্জাল

করিবে, আবার ভাবিল, কি হইবে জামিনা? সে নিজের মন এক রকম স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। কলিকাতা হইতে কিছুদিন তাহাকে পালাইতে হইবে। দেবানন্দের রকম-সকম ভাল নহে, সে ঘন ঘন হাতিবাগান অথবা চাপাতলার বাইতেছে। নিজের রাজনৈতিক কাজকর্মের উপরও তাহার বিরক্তি আসিয়াছিল। এদিকে পড়াশুনা কিছুই হইতেছে না।

মি: রায়ের গৃহ হইতে বাহির হইয়া সে রাস্তায় আসিল। চিত্তিতভাবে দক্ষিণ মুখে হাঁটিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল, কলিকাতা হইতে দুই দিনের মধ্যে পালাইবে, কিন্তু তাহার আগে একবার ডা: চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করিবে।

১১

অনেক দিন পরে দেবানন্দ তাহার বরিশালের বন্ধু অতুলের এক চিঠি পাইল। অতুল লিখিয়াছে—“ভাই দেবু, কয়েক দিন হ’ল বাবা মারা গিয়েছেন। মা অনেক দিন আগেই গিয়েছেন। আজ আমি বহুদুঃখ। আপাততঃ বাড়ীতেই আছি, প্রয়োজন হলেই বেরিয়ে পড়ব। স্বদেশ-বান্ধব সমিতির সব কাজের তার আমার ওপর এসে পড়েছে। বাড়ী-ঘর, বাপ-মা ছেড়ে কয়েকটি ছেলে এসে জুটেছে সমিতিতে। তাদের থাকবার, খাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এরা একেবারে শেকল-ছেঁড়া পাগল। কাজ দাও, কাজ দাও করে আমাদেরও পাগল করে তুলেছে। ছুটিকে ঢাকা জাশনাল স্কুলে পাঠিয়েছি, ছুটি গিয়েছে কলকাতার। কাজের তার নিয়ে দেখছি টাকার দরকার। চাদা তুলে কিছু যোগাড় হচ্ছে। দেখছি মুখে বাদ্যের দেশপ্রেমের ঠৈ কোটে, চাদা দেবার বেলায় তারা হাত ওঠিয়ে মের। বলে কাজ কর, টাকার তাবনা কি? বোঝে না কাজ করতে হলে অর-গানাইকেশন চাই, আর অরগানাইকেশন মানে টাকার ব্যাপার। মুষ্টিভিক্ষা আর হু-চার টাকা চাদা দিয়ে এঁরা মনে করেন ইংরেজকে মেয়ে তাক্কাবার জন্য আর বেশী কি চাই? কিছু দিন আগের কথা বলছি। এক তত্রলোক পঞ্চাশ টাকা চাদা দিয়ে বললেন ফুলারকে মারতে হবে। মারতে পারলে আরও পঞ্চাশ টাকা দেব। আমাদের টাকার বড় দরকার, ভাই ঠুঁর টাকা মিলাম। মধ্যে মধ্যে তাক্কা দিতেন, কই, কতদূর হ’ল? ফুলারের রেজিগনেশনের খবর বেরুতে তিনি এসে আমাদের গালাগালি করতে লাগলেন। বললেন, ‘তোমরা সব বাজে বক্তব্যের দল, কোম কাজের মুরোদ নেই। দাও আমার টাকা কিরিয়ে দাও। কেউ পাঁচ টাকা চাদা দিয়ে বলেন—এমার্সন বেটার মাথা চাই। যিনি মুষ্টিভিক্ষা দেন তাঁরও দাবি, আগে বরিশাল থেকে ইংরেজ বেটারদের তাক্কাও

মোটকথা বহু সময় নষ্ট করে ও মেহনত করে যে সামান্য টাকা ওঠে তাতে যারা সব ছেড়েছড়ে এসেছে সেই সব কর্মীর আহারের সংস্থান করাই কঠিন। দেশের লোক, যাদের অক্লেশে মোটা টাকা সাহায্য দেবার অবস্থা আছে, তারাও টাকা দেবে না, শুধু উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে ইংরেজ ভাড়াবার সাহায্য করতে চায়। দায়ে পড়ে পৈতৃক সম্পত্তিতে আমার নিজের অংশ বেচে দিতে হয়েছে। কিছু টাকা পেয়েছি এইভাবে। এই টাকায় মালমশলা সংগ্রহের চেষ্টা করছি। বোম্ব হার আমাদের টাকা, কলকাতা ও চন্দননগর যেতে হবে কয়েক দিনের মধ্যে। টাকা ও কলকাতা থেকে টাকা সংগ্রহের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ পেয়েছি। দেবী চৌধুরাণীর আশ্বাসের ব্যবস্থা। আমি আশঙ্কা করছি এ পথে চললে দেশের লোকের মন আমাদের ওপর বিরূপ হতে পারে। ছেলেরদের সঙ্গে কথাবার্তার বুঝি এ পড়া অসুসরণ করতে তারা ইত্তমতঃ করছে। তার পর এ পথে চলতে হলেও কিছু মালমশলা চাই।

কলকাতা গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি। আমি সম্ভবতঃ কর্ণওয়ালিস প্রিটের ক্ষেত্রে উঠব। হোটেলের বন্ধুদের খবর কি? মহেন্দ্র কেমন আছে?"

অতুলের চিঠি পাইয়া দেবানন্দ আনন্দিত হইল। চিঠি পড়িয়া সে নিজের মনে চিন্তা করিতে লাগিল। অতুল তাহা হইলে কাদের সন্ধান পাইয়াছে? সে এখনও বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কর্তৃপক্ষ শ্রীজ তাহাকে নীক্ষা দিবেন অনিয়াছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার কোন কথা নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই। আর কত দিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে?

পাশের সিটে মহেন্দ্র বসিয়া গীতা পড়িতেছে। জেল হইতে ফিরিয়া তাহার ধর্ম বিশেষ মতি হইয়াছে। সে হঠযোগ অভ্যাস করে, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধ্যান ধারণার ব্যস্ত থাকে। তাহার দিকে চাহিয়া দেবানন্দ বলিল—আমাদের বরিশাল কলেজের অতুল অনেক দিন পরে চিঠি লিখেছে। কলকাতায় আসবে জানিয়েছে।

মহেন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল, ওটা গোলযোগ সমিতির এক পাণ্ডা হয়েছে শুনেছি, পৈতৃক বিষয়বস্তুর সব শেষ করেছে।

ভবেশ হোটেলের প্রচার করিয়াছিল সে শ্রীজই দেশে যাইতেছে। তাহার জ্বিন্দপন্ন গোছান হইতেছিল। আজ ছুটি আছে, হাইকোর্ট বন্ধ। ডাঃ চক্রবর্তী—গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সে দেবানন্দকে বলিল, আমি ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ী যাছি। তুমি কি যাবি?

দেবানন্দ ভাবিল ভবেশদা ত চলিয়া যাইতেছেন ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে আবার কবে দেখা হইবে কে জানে?

সে বলিল, চলুন যাই।

ডাঃ চক্রবর্তীর গৃহে পৌঁছিয়া স্নিগ্ধ পাঠাইলে তিনি বাহিরে আসিয়া তাহারদিকে অভ্যর্থনা করিলেন। দুই বন্ধুকে লাইব্রেরী ঘরে বসাইয়া তিনি বলিলেন, এক মিনিট অপেক্ষা কর। আমি আসছি।

ডাঃ চক্রবর্তী ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন। উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া ঘরের সাজসজ্জা দেখিতে লাগিল। দেবানন্দ দেখিল প্রথম দিনের মত একগোছা রজমীপদ্ম ভ্যাসে রহিয়াছে। টেবিলের উপরে একখানা ছোট রূপার ডিসে এক মুঠা চাপা ফুল। সেদিন এটা ছিল না। বরময় চাপার ঈষৎ উগ্র গন্ধ। দে ভাবিল ডাঃ চক্রবর্তী খুব ফুল ভালবাসেন দেখিতেছি।

পরদা সরাইয়া ডাঃ চক্রবর্তী আসিলেন, তাহার পিছনে সেই ভদ্রমহিলা বাহার মুখের খামিকটা সেদিন ভবেশ ও দেবানন্দ দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার উদ্ভিগা দাঁড়াইল। ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, যুগল, আমার বন্ধু ভবেশ ও দেবানন্দ। ইনি হচ্ছেন মিস্ট্রেস অব দি হাউস।

তাহারা নমস্কার করিল। ভবেশ একটু বিমিত্ত হইল ডাঃ চক্রবর্তী ইহার সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করিয়া দেওয়াতে। সে আরও বিমিত্ত হইল ভদ্রমহিলার আশ্রয়, স্নিগ্ধ রূপ দেখিয়া। ইহার পরিচয় সম্বন্ধে যেটুকু সে শুনিয়াছে তাহাতে এমনটি দেখিতে পাইবে সে কখনও ভাবে নাই।

যুগল বলিল, আপনারা বহন। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবার বড় ইচ্ছে হয়েছিল। আজ এসেছেন ভাল হয়েছে। আজ ত ছুটি, আপনারা দুপুরে যদি এখানে খেয়ে যান বড় সুখী হব।

ভবেশ দেবানন্দের দিকে একবার চাহিয়া বলিল, আজ একটু কাজ আছে, এর পর এক দিন আসব।

যুগল—আপনি ত শীপগিরি বিলেত যাচ্ছেন শুনি, তার আগে সময় হবে ত?

ভবেশ হাসিয়া বলিল, বিলেত যাওয়া আপাততঃ স্থগিত।

যুগল দেবানন্দকে তাহার বাড়ীঘর, আত্মীয়জন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। তার পর বলিল, আপনারা কথাবার্তা বলুন, আমি আসছি। সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

ডাঃ চক্রবর্তী একটি সিগার ধরাইয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া উভয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমরা এসেছ ভাল করছে। আমি এক গভীর সমস্তা নিয়ে বিভ্রত হয়েছি।

তাহার বলিবার ভঙ্গী হইতে দেবানন্দ মনে করিল তিনি রসিকতা করিতেছেন। হাসিয়া বলিল, কিসের সমস্তা তার?

ডাঃ চক্রবর্তী—এদেশের সেরা সমস্তা। মাই ফ্রেণ্ডস, আমি রসিকতা করছি না। আই এম ইম এ সিরিয়াস হুড। বেশীর ভাগ মতেই যেমন দেখা যায় একটি মেয়ে ও তার ছুটি লাকার নিয়ে ইটারন্যাল ট্যাঙ্কল তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর

মাকামাশি থেকে এ দেশের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ট্যাঙ্কল দাঁড়িয়েছে মুসলমানরাগী মেয়েও তার হিন্দু ও ইংরেজ এই দুই লাভার নিয়ে। দুইটি লাভার মেয়েটির কানের কাছে অনবরত ফিসফাস করছে। এই জরীর মধ্যে সম্পর্ক ভারত-বর্ষের ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সন্দেহ, ভয়, ভয় দেখানো ও লোভ দেখানো হচ্ছে প্রধান করেকটি সেক্টিমেন্ট য। এই উপন্যাসের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এই জরীর মধ্যে সাম্প্রতিক সম্পর্কের অব্যাহত নিয়ে আপাততঃ আমি ব্যস্ত রয়েছি।

পূরদা সরাইয়া বেরারা ঘরে আসিল, তাহার হাতে একটি ছে। সে ট্রেট ভবেশ ও দেবানন্দের পাশে একটি ভেপায়ার উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, রোমান্স ছেড়ে ইতিহাসের সাদা কথাই ব্যাপারটা বলছি। আগে হিন্দুদের কথা শোন। একদান কাগজ বলছে—“এ দেশ থেকে কোন সময়ে ব্রিটিশরা চলে গেলে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দেবে বলে মনে হয় না। They will very probably try to make India part of an empire co-extensive with the Moslem world (যুব সম্ভব তারা ভারতবর্ষকে মুসলিম জগৎ-ব্যাপী সাম্রাজ্যের অংশরূপে পরিণত করার চেষ্টা করবে)। অর্থাৎ মুসলমান রাজাদের মৈনামামন্ডের সাহায্যে এ দেশে আবার মুসলমান-আধিপত্য স্থাপন করার চেষ্টা করবে। ভারতবর্ষের মুসলমানরা ভারতবর্ষকে এখনও স্বদেশ বলে মনে করে না—তুর্কী, পারস্য কাবুলের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা বেশী বলে মনে করে। দেশে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে ক্রমাগত। হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস কামনা করতে পারে না। হিন্দুদের রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্রিটিশের আশ্রয়ে জাতীয় উন্নতি করা। এই আশ্রয় সেরে গেলে হিন্দুদের রহু বিপদ ঘটবে। মিরকোব হাভা আর কেউ হিন্দুদের ডিসলগ্নাল বলতে পারে না।

দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের মনে এদেশের মুসলমানদের মতি-গতি সম্বন্ধে সন্দেহ ও ভয় দুই-ই আছে।

মুসলমানদের কথা শোন। আল পাঞ্চ নামে মুসলমান-দের কাগজখানা স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে বলছে, “হিন্দুরা যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা বিদেশী জিনিস কিনবে না তাহা মুসলমানদের কর্তব্য হবে বিদেশী জিনিস বেচবার জন্য এজেন্সী খোলা। হিন্দুরা কুটী অভিসন্ধি নিয়ে মুসলমানদের তাদের আন্দোলনে যোগ দিতে বলছে। এই অভিসন্ধি হচ্ছে মুসলমানদের সর্বনাশ করা।” মুসলমানদের সর্বনাশ কি ভাবে হবে সেটা বলা হয় নাই। অমুমান করা যায় যে, হিন্দুরা পোলিটিকালি প্রাধান্য লাভ করবে ও মুসলমানদের তাদের উদ্বেগের হতে হবে এই ভয় রয়েছে মনে। পূর্ব-

বঙ্গের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্বন্ধে কাগজখানা বলছে, “পূর্ববঙ্গের সরকার মুসলমানদের বেশী সংখ্যার নিয়োগ করা সম্বন্ধে যে সারকুলার জারি করেছেন সেটা বাতিল করে দেবার জন্ত হিন্দুরা মুসলমানদের কেপিয়ে দাঙ্গা বাধিয়েছিল।”

—ভবেন্দ্র বোশ হয় লর্ড মিণ্টো আমীর হবিগুলাকে এদেশে আসবার জন্ত নিমন্ত্রণ করেছেন। কাগজখানা এই উপলক্ষে লিখেছে বাঙালী সিভিলিয়ান ঠাণ্ডা করার সবচেয়ে ভাল উপায় আহমদ শাহরানীর স্মৃতি স্মরণ রাখবার জন্ত প্রতি বৎসর উরস অর্থাৎ উৎসবের ব্যবস্থা করা।

১৬ই অক্টোবর আমরা রাণীবন্দন অনুষ্ঠান করি বঙ্গভঙ্গের দুঃখ স্মরণ করে। পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রতিনিধিরা মোহা-মেডান এসোসিয়েশন এবার ঢাকার বঙ্গভঙ্গের আমদান্যসব করেছে। এই উৎসবের পাণ্ডা ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ। এই উপলক্ষে নবাব সলিমুল্লাহ ছোটলাট ছোয়ারের কাছে পূর্ববঙ্গে সরকারী ছুটি ঘোষণা করার জন্ত দরবার করেছিলেন। ছোয়ার সাহেব অর্ডার এগোন মি। ইংরেজ বড় চমুলজাশীল ছাউ।

—আলিগড়ের স্তর সৈয়দ আহমেদ খাঁ মারা গেলে তাঁর পাবলিক সার্ভিসেস স্মরণ করে ইণ্ডিয়া গবর্নমেন্ট তাঁর পরিবারকে মাসিক তিন শত টাকা পেনসন দিয়েছেন। ১৮৮৬ সনে কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দিতে এসে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত না হয়ে তিনি সেরে পড়েছিলেন, তাঁর পাবলিক সার্ভিসেস আরম্ভ হয় এইভাবে। স্তর সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর পরে শিক্ষিত মুসলমান নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ কংগ্রেসে যোগ দিতে লাগলেন। টাইমস কাগজ লিখল—“সর্বনাশ। শীঘ্র হিন্দুদের কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা।” এই ব্যবস্থার পরিণতি হচ্ছে বিখ্যাত মোস্লেম ডেপুটেশন। এই ডেপুটেশন যে “কম্যাণ্ড পারফরম্যান্স” সেটা সকলে জেনে ফেলেছে। ডেপুটেশনের মেমোরিয়াল লিখে দিয়েছিলেন আলিগড় কলেজের অধ্যাপক মিঃ আর্চবোল্ড ও লর্ড মিণ্টোর প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল ডানলপ শিথ। কিন্তু আস্তে কিছু যায় আসে না। মুসলমানরা দাবি করেছে তাঁদের জন্ত রিজার্ভেশন অব সিটস্ চাই, লোকাল বডিতে শতকরা পঞ্চাশটি আসন চাই।

—পূর্ববঙ্গের হিন্দু-বিদ্বেষী ইংরেজ ও মুসলমান কর্তৃ-চারীরা মিলে এই ডেপুটেশনের পরে মোস্লেম ভিজিলাস কমিটি গড়ে তোলবার সাহায্য করেছেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য হিন্দুদের অত্যাচার হতে মুসলমানদের রক্ষা করা। এই ভিজিলাস কমিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বন্দেমাতরম কাগজের মন্তব্য শোন, “গবর্নমেন্ট আবিষ্কার করেছেন যে হিন্দুরা এদেশ থেকে মুসলমানদের ভাঙিয়ে দেবার জন্ত বড়যন্ত্র করছে; তারা আবিষ্কার করেছেন যে, এই দুই সম্প্রদায়

বরাবর পরস্পরের শত্রু এবং গুয়ারলাইক (সংগ্রামপ্রিয়) মুসলমানরা পৌত্তলিক হিন্দুদের সর্বাত্মকরণে যুগ্ম করে ইত্যাদি। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি এই সব কথা প্রচার করেছে এবং গবর্ণমেন্ট তাতে উৎসাহ দিচ্ছেন। এইভাবে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ সৃষ্টি করার পর গবর্ণমেন্ট মুসলমানদের সতর্ক করে বলছেন তোমরা আত্মরক্ষার জন্য দ্বিজ ভিজিলাল কমিটি গড়ে তোল।”

এই ভিজিলাল কমিটির পত্নর একটা অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম এসোসিয়েশন বা কনফেডারেলী গড়ে উঠেছে। মুসলিম কাগজে খোলাখুলি বলেছে এই এসোসিয়েশনের কাজ হবে গবর্ণমেন্টের সব কাজ আনকনডিশনালি সাপোর্ট করা আর মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব যাতে না বাড়তে পারে ব্যবস্থা করা। এই এসোসিয়েশনের নাম হয়েছে মোসলেম লীগ। এবার দেখে—

পরদা সরাইয়া যুগল ঘরে প্রবেশ করিল। একটু হাসিয়া বলিল, আপনাদের খাবার পাঠিয়েছি। হঠাৎ মনে হ'ল আপনারা বেশি হয় খাবার অবসর পান নি।

ডাঃ চক্রবর্তী—আই এম সরি। তোমরা খেয়ে নাও।

যুগল লেমনেডের বোতল খুলিয়া গ্লাসে লেমনেড ঢালিয়া দিল। ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, জাম ভবেশ, কাল একটা কাগজে,—অফ কোর্স এ হিউ পেপার, আর হিন্দু ছাড়া এমন মানসিক সাইওপিরা—এন্ড ছাভ জগত্তের আর কোথাও পাবে না—পড়ছিলাম প্যান-ইসলাম আন্দোলনের উজ্জ্বল প্রশংসা বৈদাত্তিক ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম—এই তিনের ট্র্যাঙ্গল অব যুনিভার্সাল ফেডের কল্পনা চোখে বাধা লাগিয়েছে লেখকের। একটা আন্দোলনের, বিশেষ করে ধর্মের নামে পোলিটিক্যাল আন্দোলনের তাৎপর্য বোধবার জন্ত তার ব্যাংগ্রাউণ্ডটা একটু ঠাণ্ডি করা যে দরকার—

যুগল বাধা দিয়া বলিল—আপনারা খেয়ে নিম।

ডাঃ চক্রবর্তী হাসিয়া বলিলেন—ওবে হার (ওঁর আদেশ পালন কর)।

ভবেশ ও দেবানন্দের খাওয়া হইলে যুগল ঘর হইতে চলিয়া গেল, বেয়ারা আগিয়া ট্রে উঠাইয়া লইল।

ডাঃ চক্রবর্তী বিষয়ের পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, আমি ওয়াচ করছি হাওয়া কোন দিকে বইছে। আমাদের পোলিটিক্যাল ক্যাম্পে একটা ক্লিভেজ (বিচ্ছেদ) আসন্ন, লক্ষণ দেখে বুঝতে পারছি। এর কথা পরে হবে। আগে যে ক্রিসিসটা সবচেয়ে ঠাইকিং মনে হয় তার কথা বলছি। সন্থা কাগজ-খানা পড় বোধ হয় ১০ স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশে যৈ অর্ধোজ্ঞা রিভাইভ্যালিজম দেখা দিয়েছে তার স্পোক্সম্যান হচ্ছে সন্থার এডিটর এই অজুত মাধব উপাধ্যায়। গত ফেব্রুয়ারী মাসেও সন্থা ইংরেজের বিরুদ্ধে অটফোল ব্যবহারের

নীতিকে নিন্দা করেছে বার বার। দেশের যে ক্ষুদ্র দলটি এই নীতিতে বিশ্বাসী তারা ভ্রান্ত বলে মন্তব্য করেছে। বলছে, ইন্টারনাল ট্রেন্ডকে আগিয়ে তুলিতে হইবে, ফিরিঙ্গীরা বর্জন করিতে হইবে মনে ও বাইরে। বরিশাল কনফারেন্সের পরে সন্থা কি বলছে শোন।—“আমাদের সামনে এই প্রশ্ন উঠেছে। আজ গরু ও ভেড়ার পালের মত চূপ করে মার খাওয়া ভাল না আত্মরক্ষার জন্ত লাঠির বদলে লাঠি চালান ভাল।” ইউ সি, রেগুলেশন লাঠির ঘায়ে আত্মিক শক্তির জাগরণের সমস্তা এক কথার সমাধান হয়ে গিয়েছে।

ভবেশ বলিল, আপনি পোলিটিক্যাল ক্লিভেজের কথা কি বলছিলেন?

ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, বরিশালের ঘটনার পরে যে এক-সাইমেট দেশে দেখা গিয়েছিল সেটা কমে আসছে। কিন্তু এ এক-সাইমেটের স্থায়ী ফল এই হয়েছে যে, নতুন ইডিওলজি নিয়ে একদল লোক দেশের একমাত্র রাজনৈতিক অরগানাইশন কংগ্রেসে ঢুকে পড়েছে। এতদিন তারা সুরোগ পাচ্ছিল না; বরিশালের অত্যাচার লোকের মনকে যে বাঁকা দিয়েছে তার ফলে তারা সামনে আসবার সুরোগ পেয়েছে। এরা হচ্ছে কংগ্রেসের একটা মিষ্ট দল।

ভবেশ বলিল, এটা ভাল বলতে হবে।

ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, ভাল কি মন্দ পরে দেখবে। আই হোপ দি সিচুয়েশন ইজ নাট ক্লিয়ার টু ইউ (আশা করি অবস্থা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ)। বরিশালে রেগুলেশন লাঠির ব্যবহার, অথবা একখানা কাগজের ভাষায়, “দি ডিসেন্টেড ডেসপটিজম অব ফুলার” দেশের লোকের মনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে, যারা আড়াল থেকে কাজ করতে চান তারা এটাকে কাজে লাগাচ্ছেন নিজের কাজের পরিধি বাড়াতো, আর যারা প্রকাণ্ডে কাজ করতে চান তারা এটাকে কাজে লাগাচ্ছেন ওল্ড লীডারশিপকে সরিয়ে নিউ লীডারশিপ প্রতিষ্ঠা করতে।

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, বাই দি বাই, তোমার মামা সে দিন কমপ্লেন করছিলেন ভবেশ। বলছিলেন, তিনি তোমার বিলেত খাবার ব্যবস্থা করছেন আর তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ।

ভবেশ হাসিয়া বলিল, কই, আমি ত পালিয়ে বেড়াচ্ছি না। রওনা হবার দিন ঠিক করুন তিনি, দিনটা জানতে পারলে আমি বধে রওনা হব।

বিদায় লইবার আগে ভবেশ তাঁহাকে একান্তে বলিল, সে-দিন আপনাকে সব কথা বলে বলেছি। আমার কলকাতা ভাল লাগছে না। পড়াশুনোও কিছু হচ্ছে না। তাই ভাবছি কিছু দিন দেওঘরে পালান। সেখানে একটা বাড়ী আছে আমাদের। চূপচাপ বলে পরীক্ষার জন্ত ভৈরি হব। আপনাকে

কথাটা জানালাম, কিন্তু এটা গোপন রাখতে হবে আপনাকে।

ডাঃ চক্রবর্তী হাসিয়া বলিলেন, গোপন রাখব।

দেবানন্দ ও ভবেন্দ্র বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলে ডাঃ চক্রবর্তী যুগলকে ডাকিলেন। উভয়কে নমস্কার করিয়া ভাহারা বিদায় লইল।

দ্বিমুখিমেক পরে ভবেন্দ্র ভাহার পিতার এক চিঠি পাইল। তিনি লিখিয়াছেন, “তোমার মামা আমাকে ও তোমার মাকে কলিকাতা যাইবার জন্য জরুরি টেলিগ্রাম করিয়াছেন। আমার এখন যাওয়া সম্ভব নহে। হিজ অনর স্তর লালিলট হেয়ার, এল-জি বাহাদুর শীত্র এখানে আসিতেছেন। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর জি. ও. চিঠি লিখিয়াছেন এল. জি-র রিসেপশন কমিটিতে আমি ভাইস-

চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছি, আমাকে অবিলম্বে সদরে উপস্থিত হইতে হইবে। তোমার মামাকে আমি একথা জানাইলাম।

আমার উপদেশ এই যে, তুমি কোন প্রকার আন্দোলনের মধ্যে থাকিবে না। নিজের মনে পড়াশুনা করিবে। বহুকট আন্দোলন এখন সরকারের চক্ষুশূল হইয়াছে। তুমি কদাচ এই আন্দোলনের সংস্রবে থাকিবে না। আমাদের বংশ রাজ-ভক্ত বলিয়া পরিচিত। সরকারের অনভিপ্রেত কোন প্রকার আন্দোলনে যোগ দিয়া বংশের সুনামের হানি করিবে না। আমার ও তোমার মাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ জামিবে।”

পিতা কলিকাতা আসিবেন না জামিয়া ভবেন্দ্র নিশ্চিত হইল। দিন দুই পরে দেশে যাইতেছে বলিয়া সকলের কাছে বিদায় লইয়া সে হোটেল ত্যাগ করিল।

ক্রমশঃ

মায়ের ব্যথা

শ্রীজ্ঞানাজন চট্টোপাধ্যায়

তিন বছরের-খোকারে রাখিয়া স্বর্গে গেলেন তিনি,
নাবালক নিয়ে রহিলাম পড়ে আমি হায় অতঃপিনী।
পক্ষীগণীয় বাছারে আমার লইয়া বকপুটে,
চালায়েছি পেট বাড়ী বাড়ী নিতি রান ভেমে চিঁড়েবুটে।
মনে ছিল সাধ বাছারে আমার গড়িব মাছুষ করি,
ভুতের মতন খেটে খেটে তাই হাঁপানীতে আজ মরি।
খোকম আমার হ'ল বিধান মাছুষ হ'ল না হার,
না হ'ত রিডা হইত মাছুষ বুদী যে হতায় তার।
ধনী স্বস্তরের পয়সায় সে যে হয়েছে ব্যারিষ্টার,
মত পসার দেশভোজ্য নাম অথৈ ভরা সংসার।
শহরের বুকে করিয়াছে বাড়ী টাকা টেলে বুড়ি বুড়ি,
বিড়লী আলোকে করে বলমল ঘেন সে ইন্দুপুখী।
কত আসবাব ফুলের বাগান চারটে মোটর গাড়ী,
কত দাসদাসী দারোয়ান মালি জম্ জম্ করে বাড়ী।

নিরে ছিল খোকা ছিলাম সেখানে কয়টি মাসের ভরে,
কেন যে ফিরেছি বলিতে অস্ত্র কণ্ঠ রক্ত করে।
বোমা আমার এম্. এ. পাসকরা শহরের মেঘে বাঁটি,
মেঘের মতন চলন বলন ফিটফিট পরিপাটি।
পাড়াগেয়ে মোর হাততাব বেধে বোমা গেলেন রেগে,
ঠিক করে দিল একখানা ঘর একপাশে মোর লেগে।
কয়েদীর মত থাকিতাম সেখা নিষেধ বাহির হওয়া,
সেখাই আমার রান্নাবান্না সেখা মোর বাওয়া-শোওয়া।
নিভ্য আসিত বোমার কত সাধী সন্ধিনী দল,
আমারে দেখিলে কণ্ঠে তাদের মামিত হাসির ঢল।
শুনিলু একদা শুভার ভাহারা ওটি তোমাদের কি?
উত্তর দিল বোমা হাসিয়া ‘দেশের পুরান বি’।
সেই শুনে আমি আসিলাম কিরে গ্রামের ভিটার পরে,
দিবানিশি তবু বাছার লাগিয়া জাঁপি বর বর করে।
গর্ভে ধরেছি মাসে মাসে বোকা দেয় সে শুদামত্যাড়া,
যে ক’দিন বাঁচি স্বস্তরের ভিটা আর নাহি হব ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্য

শ্রীগোপাললাল দে

রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসম্পর্কীয় সমস্ত কবিতার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং একটি ভাবসাধন দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তাহার একটি মৌলিক, স্থির রূপ আছে। এই ভাবসাধনটিও এতই স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট যে কবির বর্ষাসম্পর্কীয় কবিতাগুলিকে একটি বিশেষ:পর্যায়ের 'নিরীক' কাব্যরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে, যদিও কবিতাগুলি এক স্থানে বা একই কালে রচিত হয় নাই। কবির একই বয়সের অনুভূতিও ইহাতে নাই, পরন্তু 'মানসী' হইতে আরম্ভ করিয়া গীতাঞ্জলি পর্যন্ত, এমন কি কবি-জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহার বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে রচিত হইয়াছে।

এই বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে বর্ষার প্রতি কবির নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাহার বর্ষাবিষয়ক কাব্যগুলির উপর ভারতীয় পূর্বসূরীদের প্রভাব। প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিকের উপরেই পূর্ববর্তী কবি-সাহিত্যিকগণের প্রভাব পড়ে। অক্ষম লেখকদের পক্ষে সে প্রভাব হইয়া দাঁড়ায় অনুকরণ, কিন্তু স্রষ্টা কবির পক্ষে তাহা হইয়া উঠে নবসৃষ্টির উপকরণ। তাহা বর্তমানের কবিকে গৌরবান্বিত করে এবং অতীতের কবি-কৃতিগুলিকে পুনরায় উজ্জল করিয়া তোলে। 'রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতা সম্পর্কে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'তিনি...সমগ্র মেঘদূতের কাহিনীটির সঙ্গে সঙ্গে সেই কাব্যের অবস্থা, চিত্র, বর্ণনা ও এমন কি ভাষা পর্যন্ত নিজের কবিতার অন্তর্গত করিয়া অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। পরের ঐশ্বর্যসম্ভার সঙ্কল্পন করিতে করিতে তাহাকে নিজের কবিত্বে পরিণত করিয়া তোলা অসাধারণ নিপুণতারই পরিচায়ক।' (রবিরশ্মি) এক কথায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বর্ষা-কবিতা আদিযুগ হইতে আধুনিকপূর্ব সমস্ত কবির, বাঙ্গালিকি, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া জয়দেব, বিদ্যাপতি পর্যন্ত সকলের বর্ষাচিত্রের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু এই প্রভাব যে সেই সেই কবির কাব্যপাঠের সাক্ষাৎ এবং সামান্য ফল, তাহা নহে; সে প্রভাবের মূল আরও গভীরে নিহিত।

প্রকৃতপক্ষে বর্ষার প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গিটিই সৃষ্ট হইয়াছে এই সকল কবির বর্ষা-প্রতীতি দ্বারা। মন যে ব্যাপারে নিবিষ্ট হইতে চায় শূন্যের অধিগত কতকগুলি রূপরসশব্দগন্ধ-স্পর্শময় স্মৃতিখণ্ডের ভিতর দিয়াই তাহা হইয়া থাকে। মনোবিজ্ঞান-মতে সেগুলিকে বলা হয় ছায়াস্মৃতি—রূপময় রসময়, শব্দময়, গন্ধময় ও স্পর্শময় ছায়াস্মৃতি। চিন্তাশক্তি

সেই ছায়াস্মৃতি বা স্মৃতিচিত্রগুলিকে বিবিধ কল্পনায় রূপায়িত করে। একই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বিবিধ স্মৃতি পোনঃপুন্য অথবা তীব্রতা ও গভীরতার ফলে কতকটা স্থায়ী রূপ লাভ করে, তখন তাহাদিগকে বলা চলিবে কল্পপ্রতিমা। এই কল্পপ্রতিমাগুলি স্বকীয়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার ফলে প্রতীতিতে পরিণত হয়। বিষয় উপলব্ধির মূলে আছে এই প্রতীতি। ইহাদের স্বকীয়তা, মৌলিকতা অবশ্যই থাকে, কিন্তু সেগুলি গঠিত হয় প্রচুর আহরণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দ্বারা। এই প্রতীতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যক্তি তথা জাতি বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে নূতন দৃষ্টি লাভ করে।

আবার সামান্য মাত্রার চক্ষে হয়ত একটি দৃশ্য নিতান্তই তুচ্ছ, স্বপ্নবৎ, অর্থহীন অলীক কল্পনামাত্র, কিন্তু স্রষ্টা কবির চক্ষে তাহাই পরম মূল্যবান, অর্থপূর্ণ। তাই তো কবি বলিয়াছেন, 'মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকী সব ধন স্বপনে।' লোকে ত বলে কালো, কিন্তু কবি? 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।' এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিও উল্লেখ করা যাইতে পারে :

'A primrose by a river's brim
A yellow primrose was to him,
And it was nothing more.'

কিন্তু কবির দৃষ্টিতে ..

'The meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.'

বর্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতির প্রাতিমারূপগুলিকে লালন করিয়াছেন প্রাচীন কালের ভারতীয় কবিগণ। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বর্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তখন তাহার চক্ষু দিয়া দেখিয়াছেন নিত্য নব বর্ষা-সমারোহকে ব্যাসি, বাঙ্গালিকি, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, বিদ্যাপতি তাহাদের চিত্র অতৃপ্ত চক্ষু দ্বারা। তাই বলিয়া কি কবির বর্ষাদর্শনের মধ্যে কোনও মৌলিকত্ব নাই? এই দৃষ্টি পুরাতন নহে, নূতন দৃষ্টি ও নূতন স্মৃতি—দর্শনের উপায়নগুলি শুধু পুরাতন। পুরাতন উপায়নের সাহায্যে নূতন দৃষ্টিলাভে ও স্মৃতিব্যাপারে কবির পথে বহিরাগত কোন বাধা কার্যকরী হয় না।

তাই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পুরাতন কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পার্থক্য। 'কালিদাস প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ

করেছেন ইন্দ্রিয়ের অল্পভব দিয়ে, কালিদাসে, পাই চিত্রের ও ভাস্কর্যের ধর্ম ও রীতি, রবীন্দ্রনাথে চিত্রের ও সঙ্গীতের ধর্ম ও রীতি।” (নলিনীকান্ত গুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ)

বৈদিক কাল হইতে বর্ষাঋতুর সহিত ভারতীয়দের চিত্ত গভীর ও বিচিত্রভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। মাহুঘের অহুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ ও তদুপযোগী হৃদয়াবেগ, রসাতলভূতি কালক্রমে উপলক্ষ্যের সহিত একান্ত ও অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া যায়।

বর্ষা-সমাগমে প্রাচীন ভারতে নগর জনপদ জুড়িয়া কি বিপুল আনন্দের সাড়া পড়িয়া বাইত সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার ভুরি ভুরি নিদর্শন আছে। সেকালে বর্ষার আগমনে চারি মাস ব্যাপিয়া কত উৎসব, আনন্দ, গান, গল্প—কত দোলনা, কত বুলন!

রবীন্দ্রবর্ষাকাব্য একান্তভাবে ভারতীয়। কবির বর্ষা-সন্তোগ রীতিটি সম্যক্ ফুটিয়া উঠিয়াছে ‘বর্ষামঙ্গল’ কবিতায়। প্রবল বেগ, হর্ষ এবং উৎস্রুকা সহকারে অকস্মাৎ বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে :

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিক্ত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘন-গৌরবে নবযৌবনা বরষা,

শ্রাম গভীর-সরসা।

সুদূর অতীত কাল হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ষা-সন্তোগের অসংখ্য চিত্র বিচ্ছিন্নভাবে এই কবিতাটিকে দ্রুত লয়ে প্রকাশলাভের চেষ্টা করিয়া যেন একটা কোলাহল জাগাইয়া তুলিয়াছে। নববারিসিক্তা ধরণীর স্নগন্ধ, শ্রাম-গভীর বর্ষাদিবা, গুরুগর্জনে শিহরিত নীল অরণ্য, উতলা কলাপীর কেকারব সবকিছু মিলিয়া পাঠককে উতলা করিয়া তোলে। গৃহাভিমুখী প্রবাসী পথিক, গৃহে তাহাদের তরুণী বধূদের উৎকর্ষ, তড়িৎ-চকিতনয়না নগর-বধূর বেশভূষা, মেঘাঙ্কুর পথে ঘননীলবসনা অভিসারিকা, প্রিয়স্বর্ধাগিনী নব অহুরাগিণীদের মৃদঙ্গ-মুরলী-শঙ্খরবে বর্ষা সংবর্দ্ধনা, কুঞ্জকুটার-দ্বারে ভাবাকুললোচনার প্রতীক্ষা, ভূর্জপাতায় মেঘমল্লার রাগিণীতে নব গীত-রচনা, এমনি কত বিস্তৃত চিত্র কবিচিত্তে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

এই বর্ষা প্রবাসীকে গৃহে আনে, প্রিয়জনকে বাহির হইতে অন্তঃপুরে লইয়া আসে, দিবাকে রাত্রিৎ করিয়া মিলনের উপযোগী করে। তাই কবি আধুনিকাদেরও উপদেশ দিয়াছেন, কেতকী কেশরে কেশপাশ সুরভিত করিতে, ক্ষীণ কটিতে করবীর মেখলা ধারণ করিতে, শয়নে কদম্বরেণু বিছাইয়া দিতে। তারপরে অঞ্জন-আঁকা নয়নে নায়িকা যখন কঙ্কণের কণ কণ শিজিতে

তালে তালে ভবন-শিখীটিকে নাচাইবে, তখন তাহার মুখ-খানি স্মিত বিকশিত হইয়া উঠিবে। শূন্য শয়নে বিরহিণী পুরকামিনীকে কবি দেখিতে পান দীপ্ত-দামিনীর চমকে।

সজল সমীরে যুথীপরিমল ভাসিয়া আদে, তমালকুঞ্জ তিমিরে দাহুরী ডাকে, খণ্ডিতা মানিনীর মানের কাল এ নয়। নীপশাখায় ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনায় ছলিবার ছলে অধরে অধরে, অলকে অলকে ঘন ঘন দুর্লভ স্পর্শ লাভ করিবার এই ত প্রকৃষ্ট সময়। তাই কবি অহুরোধ করিয়াছেন, ‘আজিকার নিশি তুলো না।’

অতীতের সংখ্যাতে অতৃপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত দিয়া আর একবার যেন বর্ষাসন্তোগ করিয়াছেন। শেষ স্তবকে কবি বলিয়াছেন,

শতেক যুগের কবি দলে মিলি আকাশে

ধনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে,

শতেক যুগের গীতিকার,

শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা।

এই আকাশ কবির চিত্তাকাশ। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছেন, ‘ভারতবর্ষের সকল দেশের সকল কালের বর্ষার গানের মধ্যে যে মধুরিমা আছে, তাহারই যেন ঘন-সার এই কবিতাটি।’

কিন্তু এহ বাহু। প্রাচীন কবিগণের এই বর্ষাসন্তোগ—ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বর্ষা-উপভোগ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, স্বকের সাহায্যে রসগ্রাহী মন বর্ষাকে সন্তোগ করে। ‘বর্ষামঙ্গলে’ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই ‘অধরে অধরে’ সক্রিয় হইয়াছে। সংস্কৃত কবিদের সীমা প্রায়শঃ এই পর্য্যন্তই। যখন কালিদাস ‘শ্বতুসংহার’ কাব্যে লিখিয়াছেন :
প্রভিন্ন বৈদূর্য্যনিভৈভৃগুধারৈঃ, সমাচিতা প্রোথিতকন্দলীদলৈঃ।
বিভাতি শুক্লতর-রজ্জুভূষিতা, বরীদ্রনেব ক্ষিতিরিঙ্গগোপকৈঃ॥

‘খণ্ডিত বৈদূর্য্যমণির ন্যায় শ্রামবর্ণ তৃণাকুরসমূহ এবং নবজাতকন্দলী পত্রসমূহও লোহিতবর্ণ ইঙ্গগোপকীটে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ভূমি যেন শ্বেতাঙ্গি নানা বর্ণের মণিরস্ত্রে বিমণ্ডিতা বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছে।’

এবং ‘বলাহকাশাশনি শব্দমর্দলাঃ, সুরেন্দ্র চাপং

দধতস্তড়িৎগুণম্।’

স্বতীক্ষ্ণধারা পতনোগ্র সাংকৈঃ, সমাচিতা প্রোথিত
কন্দলীদলৈঃ॥’

‘ব্রজধ্বনিরূপ বাদ্য বাদন করিয়া, সৌদামিনীরূপ ইন্দ্রধনু ধারণ করিয়া, মেঘজাল স্বতীক্ষ্ণ বর্ষণধারারূপ কঠোর শরাঘাতে প্রবাসিগণের চিত্ত প্রমথিত করিয়া দিতেছে।’

অথবা মুচ্ছকটিক নাটকে অভিসারিকা বসন্তসেনা যখন বিটকে বলিতেছেন,

‘এহেহীতি শিখণ্ডিনাং পটুতরং কেকাভিরাক্রমিতঃ ।

প্রোডীয়েব বলাকয়া সরভসং সোংকঠমালিঙ্গিতঃ ॥

হংসৈকজ্জিত পঙ্কজৈরতিতরাং সোদেগমুদীক্ষিতঃ ।

কুর্স্বনঞ্জন মেচকা ইব দিশো মেঘঃ সমুত্তিষ্ঠতি ॥’

‘এই আর একখানা মেঘ, ময়ূবগণের কেকারবে সম্পট-

ভাবে ‘এস, এস’ বলিয়াই যেন আহুত হইয়া, বেগে উড্ডীন বকপক্ষীশ্রেণী কর্তৃক উৎকর্ষার সহিতই যেন আলিঙ্গিত হইয়া এবং পদ্মবন-পরিভ্রমণী হংসসমূহ কর্তৃক উদ্বেষ্টের সহিত দৃষ্ট হইয়া, দিকসকলকে কজ্জল দ্বারাই যেন শ্রামবর্ণ করতঃ আকাশে উঠিতেছে ।’

উত্তরে বিট বসন্তসেনাকে বলিতেছেন,

নিষ্পন্দীকৃত-পদ্ম-বগু-নয়নং নষ্টক্ষপাবাসরম্

বিহ্বাদভিঃ ক্ষণ-নষ্ট-দৃষ্ট তিমিরং প্রচ্ছাদিতাশামুখম্ ।

নিশ্চেষ্টং স্বপিতীব সম্ভ্রান্তি পয়োধারা-গৃহাস্তর্গতম্

ক্ষীতান্ধোদর-বাম-নৈক-জলদ-ছত্রোপিধানং জগৎ ॥

‘পদ্মবনরূপ নয়ন নিষ্পন্দ হইয়াছে । দিন বা রাত্রির কিছু ঠিক নাই ; বিহ্বাতের জন্য ক্ষণকাল অন্ধকার দূরীভূত হইতেছে, আবার দেখা যাইতেছে এবং সমস্ত দিগ্‌মুখ আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে । এই অবস্থায় জলধারাগৃহের অন্তর্গত জগন্মণ্ডল, মেঘের বাটিতে (আকাশে) বহুতর মেঘরূপ ছত্রে আবৃত হইয়া, নিশ্চেষ্ট অবস্থায় এখন যেন নিদ্রা যাইতেছে ।’—তখন বর্ষা ইন্দ্রিয়ভোগ্যরূপেই থাকিয়া যায়, সে ভোগ যত মধুরই হউক না কেন । কিন্তু বর্ষাঋত-নাথ বর্ষাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তরেই রাখেন নাই, তাহাকে প্রায়শঃই এক অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন । এইটি তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । ‘বর্ষার দিনে’ কবিতায় তিনি বলিয়াছেন :

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে

সে কথা আজি যেন বলা যায় ।

কি সে কথা ? এবং কাহাকেই বা বলা যায় ?—তাহার কোনও স্পষ্ট উত্তর মিলে না । বস্তুতঃ সেই অকথিত বাণী এবং সেই অনামিকা নামিকা ইন্দ্রিয়রাজ্যের নহে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় লোকের । ‘আকাঙ্ক্ষা’ কবিতাতেও কবি ‘জীবন-মরণময় স্বপ্নভীর কথা’ শুনাইতে ব্যাকুল হইয়াছেন । মরণ-পরিব্যাপ্ত যে কথা, তাহা কি ইন্দ্রিয়লোকের ? ‘একাল ও সেকাল’ নামক কবিতায় কবি অল্পভব করিতে-ছেন দূর বৃন্দাবনের অভিসারিকা রাধিকার সময় হইতে ‘আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে ।’ এই চিরন্তনীর দার্শনিক উপলব্ধি (অল্পমান নহে) কি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলা যায় ? বর্ষাকে এই চিরন্তনীর পটভূমিকায় সম্ভোগ ঠিক ইন্দ্রিয়সম্ভোগ বলা যায় না ।

‘নববর্ষা’ কবিতায় কবি বলিতেছেন,

‘শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস

কলাপের মত করেছে বিকাশ,

আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া

উল্লাসে কারে যাচেরে ।’

এই অংশ এবং সমস্ত কবিতাটির মধ্যেই একটি অতীন্দ্রিয় অল্পভূতির আভাস পাওয়া যায় । আবার রূপের মধ্যে কবি বার বার রূপাতীতকে দেখিতেছেন :

‘ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে

কে দিয়েছে কেশ এলায়ে, কবরী এলায়ে ।’

‘ওগো নদীকূলে তীরতৃণদলে

কে বসে অমল বসনে, শ্রামল বসনে ।’

বকুল-শাখায় সেই রূপাতীত দোলায় ঢুলে, ‘বিকচ-কেতকী তটভূমি’ পরে তরণী বাঁধিয়া রাশি রাশি শৈবাল তুলিয়া অঞ্চল ভরিয়া লয় এবং সজল নয়নে বাদল রাগিনী গায় । সমস্ত খণ্ডরূপকে বিগুহত করিয়া ইনি কি মূর্ত-প্রতিমা বর্ষা ? একেবারে চিয়র সত্যায় কবিকে দর্শন দিয়াছেন—ব্যক্তিস্বময়ী, অন্তরঙ্গরূপিনী প্রিয়-স্বখভাগিনী ।

গীতাঞ্জলির গানগুলিতে আবার দেখি বর্ষাকে কবি তুলিয়াছেন এক অতি উচ্চ দুর্নিরীক্ষণ অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ক্ষেত্রে । বড়ের রাত তাঁহাকে ‘পরান-সখা’র অভিসারে প্রতীক্ষা করায় । বাহিরে যতই তিনি দেখিতে পান না ততই তাঁহার পথ কোথায় তাহা ভাবিয়া আকুল হন । ‘প্রাণ-ঘন-গহন-মোহে’ সবার দৃষ্টি এড়াইয়া কোন এক ‘একা সখা, প্রিয়তম’ কবির দ্বারদেশে উপস্থিত হন, কবি ব্যাকুল অনুরোধ জানান, ‘সমুখ দিয়ে স্বপন সম, যেখানে যোরে হেলায় চলে ।’

কবির সমগ্র বর্ষা-কাব্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বর্ষা সম্পর্কে কবির একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে । তাহা প্রাচীন কবিদের দ্বারা লালিত ; কবি বর্ষাকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য ভূমিতে উপভোগ করিয়াছেন, অতীন্দ্রিয় ভূমিতেও সম্ভোগ করিয়াছেন ; বর্ষার দৃশ্য কবির অন্তরে শতবরণের ভাব-উচ্ছ্বাস জাগাইয়াছে, আবার কবিও নিজের মনের মাধুরী দিয়া বর্ষাকে নূতন রূপে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন :

‘নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে,

নয়নে লেগেছে ।’

আবার—‘নবতৃণদলে ঘন বন ছায়ে, হরষ আমার

দিয়েছি বিছায়ে,

পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি, বিকশিত

প্রাণ জেগেছে ।’

কবি বর্ধায় রূপ দেখিয়াছেন, রূপাতীতকেও দেখিয়াছেন; কৌতূহল, হর্ষ, ভয় প্রেম, বিশ্বাসের সঙ্গে কবির মনে বর্ধা বাৎসল্য, সখ্যাও জাগাইয়াছে। বর্ধার দৃষ্ণের ভিতর দিয়া কবি বর্তমানকে দেখিয়াছেন আবার অতীত এবং ভবিষ্যৎকেও দেখিয়াছেন; খণ্ড এবং অখণ্ড

উভয়কেই দেখিয়াছেন—জগৎ ও জীবনকে যেমন তেমন জগৎ ও জীবনের অতীত সত্তাকেও দেখিয়াছেন। বর্ধাকে কবি নবাগত অপরিচিত রূপেও দেখিয়াছেন, আবার একান্ত অন্তরঙ্গ পরাণ-সখারূপেও পাইয়াছেন—কবির চিত্তে বর্ধার প্রভাব অপরিণীম।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

বর্তমান বাংলা ও বিহারের সীমারেখা-নির্দেশক অঞ্চলে এবং ভাগলপুরের (প্রাচীন চম্পা) নিকটবর্তী স্থানে বিক্রমশীলা মহাবিহার অবস্থিত ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। তিব্বতী বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, গঙ্গাতীরে একটি তুঙ্গ শৈলের উপরে ‘দেব-বিহার বিক্রমশীলা’ অবস্থিত ছিল।^১ ভাগলপুরের নিকটবর্তী রাজমহল গিরিশ্রেণীর কলগঙ্গ শাখার অন্তর্ভুক্ত পাথরঘাটা শৈলটি গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত। তিব্বতী বর্ণনায় বিক্রমশীল মহাবিহারের পরিচালনাধীন ছয়টি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, বিভিন্ন ছাত্রাবাস, ছাত্র, শিক্ষক ও বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মিলনোপযোগী প্রশস্ত হল-ঘর ও বিভিন্ন মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে। নন্দলাল দেব রাজমহল অঞ্চলে পাথর-ঘাটার তুঙ্গ-শৈলে বিক্রমশীলা মহাবিহারের স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়া নূতন আলোক-সম্পাত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রমশীলার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

বিক্রমশীলা মহাবিহারের বর্ণনায় তিব্বতী তথ্যাদির উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে। এই যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা তিব্বতে প্রবাহিত হইয়াছিল, বিক্রমশীলার পণ্ডিতদের প্রযত্নে। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথ বলিয়াছেন যে, বিক্রমশীলের অধ্যাপকগণ নালন্দা-পদ্ধতির উপরে লক্ষ্য রাখিতেন। বিক্রমশীলা এই সময়ে নালন্দার স্থান অধিকার করিয়াছিল। তিব্বতী পণ্ডিতগণ বাঙলা ও বিহারের পণ্ডিতদের সাহায্যে বিভিন্ন বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, অনূদিত গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা তিব্বতী লামা বু-তোন্ কর্তৃক ত্রয়োদশ শতকে সংকলিত হইয়াছিল। তালিকা গ্রন্থটির নাম ‘তেঙ্গুর’।

তারনাথের বিবরণী এবং সুম্পা রচিত পাগু-সাম-জোন্ জ্ঞান গ্রন্থখানি বিক্রমশীলার ইতিহাসে প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের বর্ণনায় জানিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতেই রাজমহল অঞ্চলে বৌদ্ধ-শ্রমণদের প্রযত্নে, সম্ভারাম ও বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কজঙ্গল প্রদেশের ছয়-সাতটি বিহারে তিন শতের অধিক ভিক্ষু বাস করিতেন। কানিংহাম কজঙ্গলকে রাজমহল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।^৩ সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে ইংসিঙের সমসাময়িক অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজক সেন্‌চি বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, সমতটের খড়্গবংশীয় রাজা রাজতট বৌদ্ধ ছিলেন এবং বাংলায় এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল-দেব সজ্জ-শিক্ষার উন্নতিকল্পে নূতন বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন ওদন্তপুরীতে, নালন্দা হইতে আট মাইল উত্তরে। তারনাথের মতে গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালদেব সজ্জ-শিক্ষার প্রসারকল্পে পঞ্চাশটি বৌদ্ধ-সম্ভারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ধর্মপালদেবই রাজমহল অঞ্চলের বৌদ্ধ বিহারগুলির আরও উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং উচ্চ-শিক্ষার জন্য এই অঞ্চলে বিক্রমশীলা মহাবিহার স্থাপন করেন।

ঐতিহাসিক তারনাথ বিক্রমশীলা মহাবিহারকে মহা-রাজ ধর্মপালের কীর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বিহারটি তিব্বতী বর্ণনায় ‘দেব-বিহার’ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। কবি অভিনন্দের ‘রামরচিত’ নামক গ্রন্থানুসারে মহারাজ ধর্মপালের দ্বিতীয় নাম ‘বিক্রমশীলদেব’। পালবংশীয় অন্ততম নরপতি দ্বিতীয়

^১ Hindusthan Review, March, 1906—S. C. Das, p. 190.

^২ The Glories of Magadha—J. N. Somaddar, p. 158.

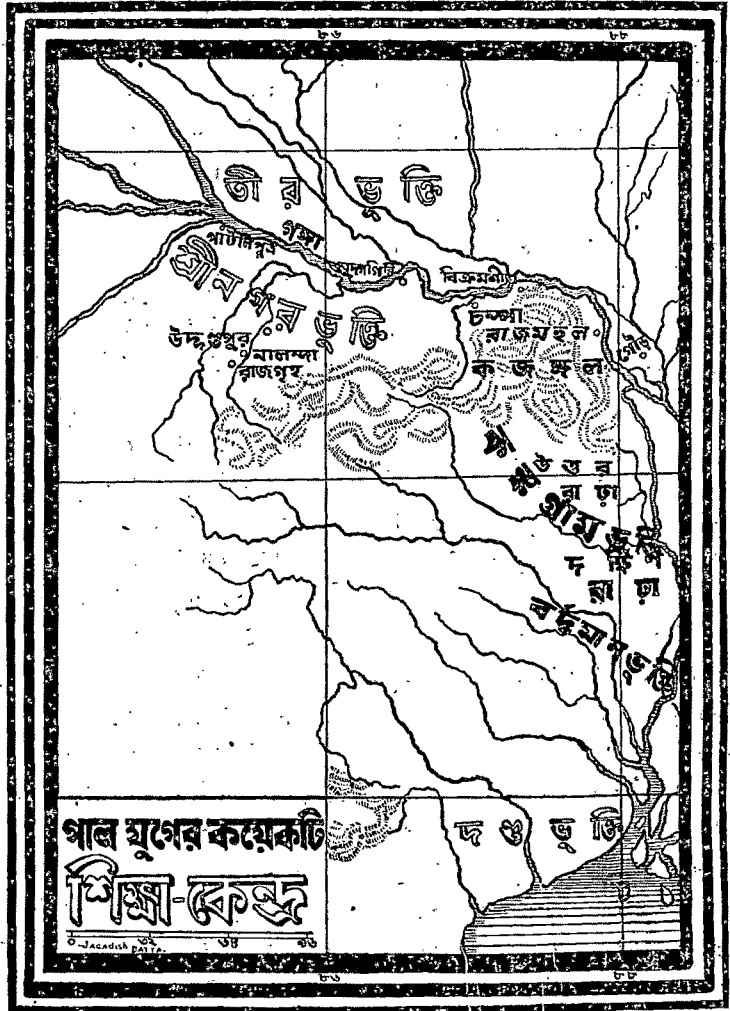
^৩ On Yuan. Chwang's Travels in India—Watters, Vol. II, p. 183.

গোপালদেবের (আঃ ১৪০ ৬০ খ্রিঃ অঃ) সময়ে লিখিত একখানি 'অষ্টদাহত্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতাঃ' পুস্তিকায় বিহারটিকে 'শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেব-বিহার' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'তেজুর'-তালিকার 'রত্নকরগোদাঘাট' নামক অতীশ দীপকরের একখানি গ্রন্থের পুস্তিকায় বিক্রমশীলা বিহার মহারাজ দেবপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ৪ ধর্মপালের বংশধরগণের চেষ্টায় মহাবিহারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল। পালরাজাদের দানে ত্রৈকুটক, সোমপুরী, বিক্রমপুরী, জগদল প্রভৃতি বিহার প্রতিষ্ঠিত হইলেও মহারাজ রামপালের আমল পর্যন্ত বিক্রমশীলা মহাবিহার রাজাহুগ্রহ লাভে কোন সময়েই বঞ্চিত হয় নাই।

বিক্রমশীলা মহাবিহারের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে হইবে। সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক শিক্ষা নালন্দা-পদ্ধতিতে প্রবেশ করিয়াছিল, বিক্রমশীলা-পদ্ধতিতে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করিবার মত।

বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারকগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন তাহারই ফলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল। তান্ত্রিকতামূল বৌদ্ধধর্মের সহিত, এমন কি মহাযান মতবাদের সহিতও কোন মৌলিক সম্পর্কের দাবি করিতে পারে না।

পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে জন্মলাভ করিয়া চুয়াশি জন সিদ্ধপুরুষের সাহায্যে উত্তর ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। ৫ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মতবাদই গ্রহণযোগ্য হউক না কেন, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রথমতঃ নালন্দায় এবং পরে বিক্রমশীলায় এই মতবাদের উত্তরোত্তর প্রাধান্যলাভ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই। বহু-



প্রকার গুহমন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী—মহাযান ধ্যান-ধারণায় প্রবেশলাভ করিল। মন্ত্রগুণে অলৌকিক কাণ্ড্যাবলী সম্পাদিত হওয়ায় তান্ত্রিক মতবাদ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। মন্ত্র-তন্ত্রের সাধনাই বুদ্ধভাবের সহজ উপায় বলিয়া এক শ্রেণীর বৌদ্ধাচার্য্যগণ প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক মতবাদসমূহ মন্ত্র-মাহাত্ম্যকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করিল। মন্ত্র, মন্ত্রা, মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক পদ্ধতি বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-ধারণায় স্থান পাইল। বিভিন্ন যানসমূহ গুহ সাধন-পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, অতএব গুহের নিকট হইতে দীক্ষালাভ ব্যতীত এই সাধনা চলিতে পারে না। মন্ত্রের ধ্বনিতে বিভিন্ন দেব-দেবী রূপ পরিগ্রহ করিয়া মণ্ডলাকারে অবস্থান করেন। তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া, বিশেষ ভাবে বজ্রযান সাধনার এক বিরাট পূজাপদ্ধতি গড়িয়া উঠিল। বজ্রযানকে

৪ বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৭২

৫ History of Bengal, Dacca University, Vol. 'I,

Footnote—1. P. 3২7.

আশ্রয় করিয়া কালচক্রবানের সৃষ্টি। মহাস্বপ্ন বা বোধি-চিন্তা-লাভের প্রধান অন্তরায় 'কাল', অতএব 'কাল' বা বার্তাক্যকে গ্রাস করিয়া মহাস্বপ্নকে চিরস্থায়ী করা কাল-চক্রবানীয় সাধনার উদ্দেশ্য। ক্রমে 'মহাস্বপ্নবাদ' তত্ত্ব বৌদ্ধ তাত্ত্বিক সাধনার প্রধান অঙ্গ হইল এবং মহাস্বপ্নবাদকে আশ্রয় করিয়া সহজ্ঞবানের সৃষ্টি হইল। সহজ্ঞবানে দেব-দেবীর পূজা অল্পাধীন এবং মন্ত্র, মন্ত্রার কোন স্বীকৃতি ছিল না। শূন্যতা বা প্রকৃতি এবং করুণা বা পুরুষ, এই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের ফলেই বোধিচিন্তা পরমানন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হয়; ক্রমে 'দেহবাদ বা কায়সাধন' ধর্মোচ্চাানের অঙ্গ হিসাবে স্থানলাভ করিল।

বিক্রমশীলা মহাবিহারের পণ্ডিতগণের মধ্যে রত্নাকর শাস্তি, নাড়োপা, অতীশ দীপঙ্কর, দিবাকরচন্দ্র, অভয়াবর গুপ্ত প্রভৃতি তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্ম সঙ্ঘে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা তেজুরে রক্ষিত আছে। তাত্ত্বিক মতবাদের অভিনবত্ব বিক্রমশীলার পণ্ডিতগণের ধ্যান-ধারণাকে আবিষ্ট করিলেও, বিস্তৃত মহা-যান মতবাদ এবং বিজ্ঞানবাদের চর্চাও এই সময়ে অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের উপরে জেতারির গ্রন্থসমূহ, আচার্য বুদ্ধশ্রীজ্ঞানের মহাযানীয় পুস্তকাবলী এবং নৈয়ায়িক রত্নকীর্ণির গ্রন্থরাজি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অতীশ দীপঙ্কর এবং তাঁহার পরবর্তী যুগে অভয়াবর গুপ্ত মহাযান মতের উপরে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিক্রমশীলার প্রথম ও মধ্য যুগে মহাবিহারের অধ্যাপক-গণ উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বাদির আলোচনাতেই নিমগ্ন থাকিতেন। মহাবিহারের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনমত তাঁহার কঠোর হইতেন। ক্রমে সহজিয়া ধর্ম ও তাত্ত্বিক সাধনা একাকার হইয়া ধর্মজগতে বীভৎসতা সৃষ্টি করিল। দেহ-বাদই হইল ধর্ম, এমন কি হিন্দু-তন্ত্রের শক্তি বা কালী-মাতার সহিত বুদ্ধের এক রহস্যময় সঙ্ঘও বৌদ্ধ তাত্ত্বিক-গণ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। বৌদ্ধসঙ্ঘসমূহ অনাচার ও আবিলতায় পূর্ণ হইয়া ভ্রবস্থা প্রাপ্ত হইল।

বিক্রমশীলা ছিল একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। মূল বিহারকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এক শত সাতটি ক্ষুদ্র মন্দির, ছয়টি বিদ্যালয়, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট উন্নত প্রণালীর গবেষণাগার, ছয়টি অবৈতনিক ছাত্রাবাস, বিদেশীয় ছাত্রদের জন্য পৃথক ছাত্রাবাস, বিরাট সন্মিলন-গৃহ—এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিল। এক শত চৌদ্দ জন অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ দান করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালনার আর্থিক ব্যবস্থা পালবংশীয়

রাজগণই করিতেন। ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ধনী-সম্প্রদায়ও 'বিহারে' আর্থিক সাহায্য দান করিয়া পুণ্যার্জন করিতেন।

মহাবিহারের প্রধান পরিচালক বা কর্মসচিবকে বলা হইত সর্বাধ্যক্ষ। ছয় জন সভ্য দ্বারা গঠিত একটি-কর্ম-পরিষদ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা হইত। সর্বাধ্যক্ষের অন্তিমোদন ব্যতীত কর্মপরিষদ কোন সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। সর্বাধ্যক্ষ ও কর্ম-পরিষদ মহাবিহার এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় দেশের রাজার সহিত সর্বদাই যোগরক্ষা করিতেন।

তিব্বতরাজ চানচুব্, অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে আম-ন্ত্রণের জন্ত নাগ্‌ছো নামক এক তিব্বতী ভিক্ষুকে বিক্রম-শীলায় পাঠাইয়াছিলেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমাবর্তন উৎসবের স্থায় বিক্রমশীলায় অনুষ্ঠিত একটি বিরাট সন্মিলনে নাগ্‌ছো-যোগদান করেন। স্থবিরের পরিচালনায় আট হাজার অধ্যাপক ও ছাত্র এই সন্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। স্থবিরশ্রেষ্ঠ 'বিদ্যাকোকিল' এই সন্মিলনে পোরোহিত্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর বীরবজ্র, অতীশ-দীপঙ্কর, বিক্রমশীলার মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সন্মিলনে যোগদান করেন। নাগ্‌ছো-বর্ণিত এই বিরাট সন্মিলনে বিক্রমশীলার মহারাজ অপেক্ষাও অধিকতর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন পণ্ডিতপ্রবর বীরবজ্র ও অতীশ দীপঙ্কর প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দ। অতীশ দীপঙ্কর বিহারের ছাত্রাবাস ও বিভাগীয় কার্য পরিচালনার দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাগ্‌ছোর বর্ণনায় আরও জানা যায় যে, তিনি সন্ধ্যার পরে বিক্রমশীলায় পৌছিয়াছিলেন এবং বিহারের বহির্ভাগে ধর্মশালায় এক রাজি-ধাপন করেন—কেননা সন্ধ্যা হইলেই বিহারের প্রধান প্রবেশদ্বার বন্ধ হইত।

তক্ষশীলা ও নালন্দার ন্যায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার জন্য নিদ্রষ্ট ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-শিঙের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হইত না। নালন্দার ন্যায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদের প্রবেশাধিকার সহজ ছিল না। ছয় জন দ্বারপণ্ডিত ছাত্রদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তাহাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হইলে বিশ্ববিদ্যা-লয়ে প্রবেশের অন্তিমতি দিতেন।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রুচী নালন্দার ন্যায় ব্যাপক ছিল না। বৌদ্ধ হইনয়ান ও মহাযান ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ্যশ্রুচীতে স্থানলাভ করিলেও, তাত্ত্বিক বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যয়ন এই সময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণ এবং হেতুবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র পাঠ্যতালিকায় বিশিষ্ট স্থান

লাভ করিয়াছিল। বাহুবিন্দ্য ও যোগশাস্ত্র পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত ছিল। গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ‘শিল্পস্থানবিদ্যা’ বৌদ্ধসংজ্ঞের শিক্ষায় বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন পালি পুস্তকে ‘অষ্টাদশটি শিল্পবিদ্যা’র উল্লেখ রহিয়াছে। ‘মিলিন্দ-পহো’ পুস্তকে উনবিংশটি শিল্পবিদ্যার মধ্যে স্থাপত্য প্রধান শিল্প হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং বিহার ও অট্টালিকা নির্মাণাদি কার্য তিস্তুর অবগতদ্বীয় বর্তব্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। ১৬ ‘শিল্পবিদ্যা’ বিক্রমশীলা-পদ্ধতিতেও স্থানলাভ করিয়াছিল।

তিব্বতী বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, মহাবিহারের প্রধান তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বে নাগাজ্জুন এবং বামে অতীশের মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে সমষ্টি-গত ও ব্যক্তিগত উভয় পদ্ধতিই বিद्यমান ছিল। তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রচলনের ফলে ব্যক্তিগত শিক্ষার চর্চা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাত্ত্বিক সাধনা গুরুর নিকট হইতে দীক্ষালাভ ব্যতীত চলিতে পারে না, বিভিন্ন প্রক্রিয়াদি গুরুর নিকটে সর্বদাই শিক্ষা-সাপেক্ষ বলিয়া গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক আরও গুণীভূত হইয়াছিল। শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় অধ্যাপক ও ছাত্রগণ তুল্য অংশ গ্রহণ করিতেন। শ্রেণী-কক্ষে আলোচনা ও বিতর্কাদি চলিত। শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল মনোবৃত্তি-বিকাশ ও চরিত্রগঠনের প্রধান সহায়ক। শিক্ষক, ছাত্র ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মেলন উপলক্ষে শিক্ষা-সমস্তাদির আলোচনা চলিত। ছাত্রদের পরীক্ষা-পদ্ধতি ছিল মৌখিক। শিক্ষাসমাপ্তির পরে যোগ্য ছাত্রগণ রাজার নিকট হইতে উপাধি লাভ করিতেন। বিক্রমশীলার জেতারি (প্রথমে ছাত্র, পরে অধ্যাপক) রাজা প্রথম মহীপাল কর্তৃক ‘পণ্ডিত’ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কাশ্মীরনিবাসী রত্নবজ্র ‘পণ্ডিত’ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক রত্নকীর্তি ও উড়িষ্যার তথাগত রক্ষিত ‘মহাপণ্ডিত’ ও ‘উপাধ্যায়’ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাগ্‌ছোর বর্ণনায় স্থবিরশ্রেষ্ঠ ‘বিদ্যা-কোকিলের’ উল্লেখ ‘বিদ্যাকোকিল’ পাণ্ডিত্যসূচক কোন সম্মানজনক উপাধি বলিয়াই মনে হয়।

নবম ও দশম শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিবাহী হইয়া ভারত ও ভারতের বাহিরে যাহারা অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিক্রমশীলার প্রথিতযশা কয়েক জন অধ্যাপকের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।

তিব্বতী জনশ্রুতি মতে মহারাজ ধর্মপালের সময়ে আচার্য বুদ্ধশ্রীজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞানপদ বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। মহাবান মতের উপরে তিনি নানকি কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ে জিনমিত্র নামক আর একজন আচার্যের নামও তিব্বতী বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ, প্রথম মহীপালের সময়ে বরেন্দ্রের জেতারি বিক্রমশীলার অন্ততম আচার্য ছিলেন। তিনি অতীশ দীপঙ্করের শিক্ষক এবং মহাবিহারের উত্তর দিকের দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তারনাথের মতে ‘তন্ত্র’ ও ‘মুক্তে’র উপরে তিনি শতাব্দিক পুস্তক রচনা করেন। দশম শতকের শেষার্ধ্বে, সম্ভবতঃ মহারাজ প্রথম মহীপালের সময়ে রত্নাকরশাস্তি, ভগীশ্বর-কীর্তি, নাড়োপা, প্রজ্ঞাকরমতি, রত্নজ্ঞানশ্রী মিত্র নামে ভারত-বিখ্যাত ছয় জন বিদ্বান মহাবিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। তারনাথের মতে রত্নাকরশাস্তি ছিলেন মগধের অধিবাসী। ‘তেজুর’ ঐতিহ্য অনুসারে তিনি অতীশের শিক্ষক এবং অতীশের তিব্বতযাত্রার সময়ে মহাবিহারের সর্বাধ্যক্ষ। আচার্য ভগীশ্বরকীর্তি এবং রত্নবজ্রের তাত্ত্বিক-মতবাদসমূহ অতীশ তিব্বতে প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবিহারের অন্ততম প্রসিদ্ধ দ্বারপণ্ডিত নাড়োপা ‘মহা-চার্য’, ‘মহাবোগী’ ও ‘শ্রীমহামুদ্রাচার্য’ নামে অভিহিত হইয়াছেন। নাড়োপা ছিলেন বরেন্দ্রের অধিবাসী এবং মহারাজ নরপালের সমসাময়িক। তিব্বতী ঐতিহ্য অনুযায়ী চুয়াশী জন সিদ্ধপুরুষের মধ্যে তিনি অন্ততম। আচার্য জেতারির পরে তিনি মহাবিহারের উত্তর দিকের দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ আগমে ছিল তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য। হেরুক, হেবজ্ঞ এবং অন্যান্য বজ্রবানী দেব-দেবীর উপরে প্রায় দশখানি সাধন-গ্রন্থ, কালচক্রবানী দীক্ষা সম্বন্ধে (অন্ততঃ) একখানি গ্রন্থ, দুই-খানি ‘বজ্রগীতি’ ও ‘বজ্রপদ সার-সংগ্রহ’ গ্রন্থের উপরে একটি টীকা তিনি রচনা করিয়াছেন। ১৭ শরৎ চন্দ্র দাস মহাশয়ের বিবরণ পাঠে জানা যায়, জ্ঞানশ্রী মিত্র (গৌড়ের) এবং রত্নবজ্র ধর্মতত্ত্বে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং মহাবিহারের দুইটি প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন।

অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন বিক্রমশীলার ‘শীলভদ্র’। বিক্রমশীলা এই মহাপণ্ডিতকে আচার্যপদে বরণ করিয়া তাঁহার প্রতিভার যোগ্য সম্মান দিয়াছিল। বৌদ্ধজগৎ তাঁহার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং তিব্বত তাঁহার উপস্থিতিতে ধন্য হইয়াছিল। দীপঙ্কর প্রথম মহীপাল কর্তৃক বিক্রমশীলায় আহৃত হন এবং মহারাজ নরপালের

সময়ে মহাবিহারের আচার্য্য-পদ গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১০৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে কিংবা ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতী আচার্য্য বিনয়ধর, তিব্বতী পণ্ডিত গ্যা-চুন, বিক্রমশীলার পণ্ডিত-বীর্ঘ্যচন্দ্র, ভূমিগর্ভ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে তিব্বত যাত্রা করেন। জীবনের অবশিষ্টকাল (আঃ ১০৫৩ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত) তিনি তিব্বতে ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পাগ-সাম-জোন-জাং গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ওদন্তপুত্রী, বিক্রমশীলা ও সোমপুত্রী এই তিনটি বিহারের সহিতই অতীশের সম্পর্ক ছিল। ‘তেজুর’ ঐতিহ্য মতে তিনি বজ্র-যানীয় সাধন ও মহাযানীয় সূত্রের উপরে মৌলিক রচনা ও অল্পবাদে প্রায় দুই শত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

‘অতীশ না থাকিলে ভারতবর্ষ অন্ধকার’—মহাবিহারের সর্বাধ্যক্ষ রত্নাকরশান্তির এই উক্তির নিরিখে বিক্রমশীলার শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস আলোচনা করা যাইতে পারে। ‘কিম্বদন্ত’ নামক তান্ত্রিকসম্প্রদায় অতীশের সময় হইতেই মহাবিহারের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় বিঘ্ন ঘটাইতেছিল চ

হ্মুপার মতে দিবাকরচন্দ্র নামক এক তান্ত্রিক ভ্রমণবে অতীশ মহাবিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। দিবাকরচন্দ্র হয়ত ‘কিম্বদন্ত’ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সময় হইতেই চরমপন্থী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য মহাবিহারে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

অতীশ-পরবর্তী যুগে মহাবিহারের অধ্যাপকদের মধ্যে রত্নকীর্তি, অভয়াকর গুপ্ত ও শাক্যশ্রীভদ্রের নাম উল্লেখ যোগ্য। প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী অভয়াকর গুপ্ত মহারাঃ রামপালের সমসাময়িক ছিলেন।

কালচক্রযান মতবাদ সম্পর্কে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ কর্তৃক বিক্রমশীল ধ্বংসের সময়ে কাশ্মীরবাদী পণ্ডিত শাক্যশ্রীভদ্রের বিহারে অবস্থানের উল্লেখ কোন কোন ঐতিহাসিক করিয়াছেন।

তবকাং-ই-নাসিরীর গ্রন্থকার মীনহাজুদ্দিনের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে, ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বক্ত্রিয়ার ওদন্তপুত্র বিহার ধ্বংস করিলেন এবং সম্ভবতঃ ঐ একই বৎসরে বিক্রমশীলা মহাবিহারও মুসলমান-আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, মহাবিহারে সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজিও ভস্মীভূত করা হয়।

The Glories of Magadha—J. N. Somadder, p. 152

জীবন-বেদ

শ্রী অরুণবরণ চক্রবর্তী

স্বর্গের সূত্রের সাথে পৃথিবীরও সূত্র্য হবে আমি।
সব রূপ রঙ রস উবে যাবে কর্পূরের-মত;
যেমে যাবে চিরতরে স্বভঃক্ষুদ্র সব হাসি পানই,
অবশেষে প্রাণহীন হিমন্তুপে হবে পরিণত।

মাহুষের এত কীর্তি : জয়-পরাজয়, গর্ব-শ্রানি,
হিংসা-প্রেম, ঘেঘ-ঈতি, শাস্তি বা অশাস্তি অবিরত,
স্বাধীন মহত্ত্বের পাশে হীন দুগ্ধ হানাহানি,
কিছুই হবে না আর—তারি সাথে সব হবে গত।

কেন তবে মিথ্যা এই আমার জীবন-সংগ্রাম ?

কেন মাতি আকাজক জীবনের জয় করিবার ?

দিন যায়—রাজি যায়—ফতি কি এ তাবে চলে যেতে ?

কিন্তু সে যে মরণের রূপান্তর। ক্রীকের নিষ্কাম

মজ্জ তাই মোর মনে। আমি চাই অনন্ত প্রেমার

হৃদয়ের—চাই আমি জীবনেরে-দুই হাতে পেতে।

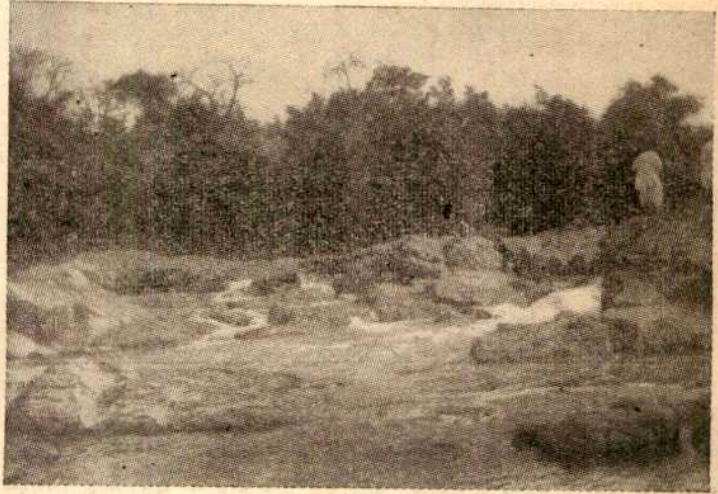
ঝাড়খণ্ডের বর্ণাধারা

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

প্রকৃতির ঐশ্বর্যের উৎস আমার ভ্রমণ-বিলাসী চৈতন্য অহরণ ভুলেছিল। অন্ধরে অন্ধরে অহতব করছিলাম অজানা পথে বেরিয়ে পড়বার এক দুনিবার আকর্ষণ। এক দিন তুফান একপ্রঙ্গে হাজারীবাগ অভিমুখে রওনা হয়ে পড়লাম। আগে

থেকে আশ্রয়ের কোনও ব্যবস্থা আমাদের করা হয়ে ওঠে নি। এ বিষয় আমরা নিলিগে ছিলাম হয় তো এই জন্যেই যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য-নিকেতনই আমাদের নিরন্তর হাতছানি দিয়ে ডাকছিল—আশা আর ভরসা দিচ্ছিল। সন্ধ্যা সাতটায় হাজারীবাগ ষ্টেশনে মেমে মোটরবাসে ৪২ মাইল পার্কভ্য পথ অতিক্রম করে হাজারীবাগ শহর অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। সেদিন কোজাগরী পুণিমার রাত্রি—চাঁদ উঠেছিল আকাশে। দুই ঘরে কোথাও পর্কিত আবার কোথাও বা অরণ্য—মাঝে মাঝে ধু ধু করছে মাঠ। শাল মহড়া বনের স্ত্রাম শোভায় সবুজ মন্থন পথে যাত্রা আমার ভারি ভাল লেগেছিল। রাত্রি সাড়ে নয়টা বেজেছে, আরও এক মাইল দূরে রয়েছে শহর—জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই, কেবল প্রকৃতির

সদর রাত্তর ঝানিকটা দূরে বাউনের আড়ালে ডাকবাংলো, সেখানে ঠাই পাবার আশা ছিল না। সিট নাকি রিজার্ভ হয়ে গিয়েছে সেখানকার ঝানসামা আমাদের জানাল। যাই হোক, অনেক কষ্টে কয়েক জন শিক্ষক ও

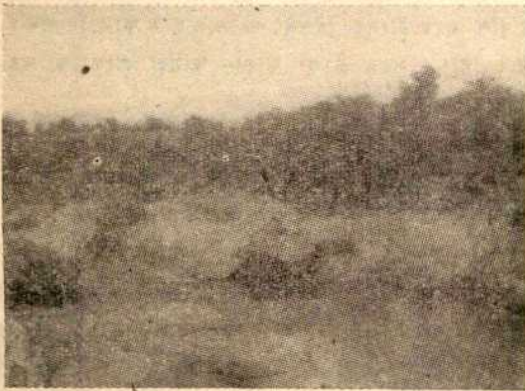


রাজরোপা কলস

অধ্যাপক ভ্রমণকারীর চেটায় ডাকবাংলোয় আমরা একঘানা ঘর পেলাম।

হাজারীবাগ টাউনটি জি. টি. রোডের প্রান্তে অবস্থিত, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য খুব বিস্তৃত—ব্যবসায়ীদেরই নিরন্তর আনাগোনা, কলরব কোলাহল। আশেপাশে অত্র এবং করলার ঘনি আছে। স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবেই হাজারীবাগের আসল পরিচয়। মিশনরীরা এই স্থানের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিল। খ্রীষ্টানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রুচিবোধ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিশনরীদের কলেজ ও স্কুলগুলি আধুনিক রুচিসম্মত। এখানকার অধিকাংশ সাঁওতাল খ্রীষ্টান। হাজারীবাগ মিলিটারীদের একটি প্রধাম আস্তানা, এখানে পুলিশ ট্রেনিং কলেজও আছে।

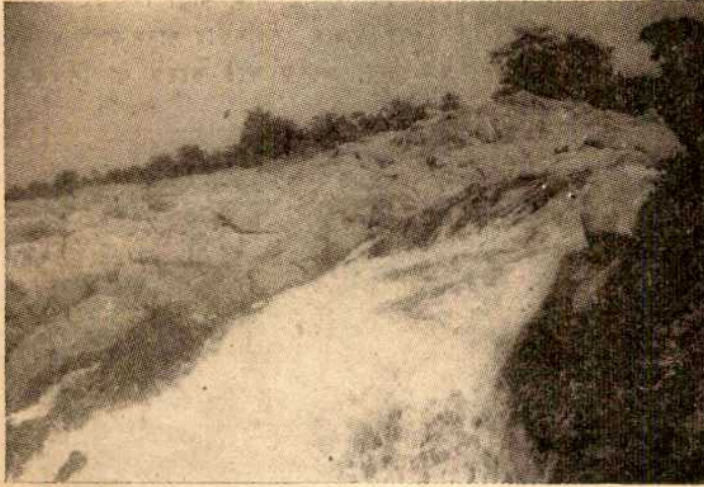
টাউনের বাইরে গেলে হাজারীবাগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে হয়। সেখানে উঁচুদীচু পার্কভ্য প্রান্তর, কখনও মন্থন, কখনও দুই ঘরে শাল মহড়া আর বাউ-বনের সবুজ সমারোহ। ক্যানারি, সীতাগড়, বিজ্যাল, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি পাহাড় ঘন হাজারীবাগ শহরটিকে চারিদিকে ঘিরে রেখেছে। স্রষ্টব্য বিশেষ কিছু না থাকলেও এর অনাড়ম্বর সৌন্দর্য মনকে



টাইগার ফলস

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ অল্পপম সৌন্দর্যে বলমল করছে। অবশেষে মোটর-বাস আমাদের একটা “ডাকবাংলো”র দিকটে বানিয়ে দিলে।

স্পর্শ করে। প্রত্যেক-পাহাড়ই পাঁচ-সাত মাইল দূরে অবস্থিত, সাইকেল-রিক্সাতে যেতে হয়। আসা-যাওয়ার রিক্সাভাড়া দুই-তিন টাকা। সীতাপুত্র ষ্ট্রীটবর্ষ ও সংস্কৃতির অত্যন্ত কেন্দ্র। এখানে বিস্তৃত ভূমিতে কৃষি সংকে নানাপ্রকার পরীক্ষণ হয়ে থাকে।



হুড কুলস

শহরের নামা দৃষ্ট দেখে আমরা এখানকার প্রকৃতির ঐশ্বর্যের উৎস বর্ণার কলস্তান শুনতে, তার উজ্জলিত প্রাণ-প্রবাহ সমস্ত অন্তর দিয়ে অশ্রুত্ব করতে আঠারো মাইল দূরবর্তী পার্কভ্য অফলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গয়া অভিমুখী বাস আমাদের জি.টি.রোডের বননিবিড় মির্জান স্থানে নামিয়ে দিলে, ড্রাইভার বলে দিলে “কোয়টার মাইল এ বাদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে যান, টাইগার কুলস পাবেন।” দুই ধারে গভীর অরণ্যমণী বহু ফুলপাতার সমাচ্ছন্ন। বাতাসে অশ্রুনিপিত হয়ে ভেসে আসছে বর্ণার বহু কলগান—আমরা এ বনান্ত-রালের সঙ্গীতধারাকে অশ্রুসরণ করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। দূরে মেঘে ঢাকা পাহাড় আর নিবিড় জঙ্গল ছাড়া কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। বন্য পশুর পাখের চিহ্ন মাঝে মাঝে দেখতে পেলাম, কোথাও জনমানবের সাড়া নেই।

মহুয়ার বৃকের মধ্যে ভয়ের কাঁপন ছেগেছে, ও আমাদের চুপি চুপি জিজ্ঞাস করল, “মা, তোমার ভয় করে না—”

ইতিমধ্যে আমরা টাইগার বর্ণার নিকট পৌঁছে গেলাম। টাইগার অশ্রান্ত গর্জনমুখরিত মন, কিন্তু রূপ তার অমবদ্য—উপলব্ধও-ধেরা শান্ত নির্বর আপন প্রাণপ্রবাহের উৎস থেকে উৎসারিত। টাইগারের মূল উৎস কোথায় কে জানে? না জানি কোন দূর দূরান্তর থেকে পাহাড় পর্বত ভেদ করে বর্ণাটি এগিয়ে এসেছে। এখানে এসে তার চাকল্য ও বেগের হয়েছ অবসান।

“আমি শুটুনী হইয়া যাইব বহিরা

নব নব দেশে বারতা লইয়া,

—হৃদয়ের কথা কহিরা কহিরা গাহিরা গাহিরা গান।”

এই যেন তার মর্মবাণী। যেন অপূর্ণিমী উমা শিবের তপস্কার পার্শ্ব্য প্রান্তরে আত্মসমাহিত।

বাড়বও অফলের বর্ণাধারার রূপে বৈচিত্র্যের আর এক নিদর্শন দেখলাম আর এক স্থানে। রাজরৌপ্য নিরিবিলা ও দুর্গম স্থানে অবস্থিত, সহজে এবং স্বল্প ব্যয়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

হাজারীবাগ শহর এবং রাঁচি থেকে রাজরৌপ্য ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ট্যাক্সি ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই—সত্তর টাকা ভাড়া। সঙ্গী সংগ্রহ করতে পারলে, খরচ কিছু কম পড়ে। হাজারী-বাগে আমরা সঙ্গী পাই নি। এক দিন পাটনা থেকে রাঁচি অভিমুখী বাসে রাঁচি রওনা হয়ে পড়লাম। সুদীর্ঘ পার্শ্ব্য পথ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন সুন্দর তেমনি বিচিত্র—রামগড় পাহাড়ে গাছী একবার উর্ধ্বে আরোহণ করে,

আবার নামে—দুর্গম পথে যাত্রা দেহমনে অজানা অশ্রুভিত্তির শিহরণ জাগিয়ে তোলে। বর্ত্তান্তিমেকের মধ্যে রাঁচি হোটেল ইউনিয়নে পৌঁছলাম। হোটেলের আমরা রাজরৌপ্যর সঙ্গী পেলাম। রাণাঘাট কলেজের প্রোফেসর চিত্রশিল্পী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মিঃ ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক বীরেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী শিলাহুয়ায় সঙ্গী খুঁজছিলেন, আমাদের পেয়ে খুশি হয়ে তাদের ষ্টেশন ওয়াগনে স্থান করে দিলেন। ষ্টেশন ওয়াগনের সত্তর টাকা ভাড়া—আমরা প্রত্যেকে নয় টাকা দিরাছিলাম।

রাঁচি-রোড, রামগড় পাহাড় অতিক্রম করে এবড়ো-ধেবড়ো গ্রাম্য পথ ছাড়িয়ে আমরা বনান্তরালস্থিত রাজরৌপ্যর নিকটে এসে পৌঁছলাম। ভীরে ভীরে কত গাছ কত ফুল, কত পাতা, শালের কুঞ্জ; পলাশ শেফালী, আমলকী, ডালিম, ভাল, বাঁশ-বাড়, আম, জাম বট বাদামের স্ত্রাম শোভা—ডালে ডালে পাখীর কুঞ্জন স্রমিষ্ট তাম তুলেছে। সু-উচ্চ পার্শ্ব্য প্রান্তরে, শিলা আর উপলব্ধের অজস্র ছড়াছড়ি। পাহাড় কেটে, পাহাড় ডিকিয়ে কোন দূরদূরান্তর থেকে দামোদর হুর্কার গতিবেগে ধরে এসেছে, উজ্জলপ্রবাহিণী ভেড়ামদী এসে মিশেছে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে। দামোদর আর ভেড়ামদীর সঙ্গমস্থলই রাজরৌপ্যর বৈচিত্র্য আর বৈশিষ্ট্য।

তাবয়ুগ্ধ মন নিয়ে আমরা রাজরৌপ্য বর্ণার ধারে ধারে ঘুরে বেড়ালাম। কখনও পর্বতের চড়াই বেয়ে উর্ধ্বে আরোহণ

করি, কখনও উৎরাই পথে নেমে যাই।
যেখানে রাজরোপা জলপ্রপাত নামে-
বরের শীর্ণ অববাহিকায় বয়ে গিয়েছে।
চিক্চিকে বালুচরে পা ফেলে নদী পার
হয়ে অপর প্রান্তে যাই আমরা, স্বর্ঘ্যাস্তের
বর্ণ-সমারোহে নদী-পর্যন্ত হয়ে উঠেছে
অপরূপ। শিল্পী মরেশবাবু রাজরোপার
অনবদ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ণার ধারে
বালুচরে রঙ আর তুলিকার দ্বারা
রূপস্থতির মতো ডুবে গেলেন।

আঁকা শেষ করে শিল্পী ধূশীতে
উজ্জ্বল হয়ে তাঁর আঁকা সুন্দর ছবিখানা
দেখালেন। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে
এসেছে বর্ণাধারা—চিক্চিকে বালুচরের
উপর দিয়ে বয়ে চলেছে, স্বর্ঘ্যাস্তের
বিচিত্র বর্ণ-সমারোহে হয়ে উঠেছে
অপরূপ। দূরে দূরে পাহাড়ের সারি—

আকাশে রং-বেরঙের মেঘের খেলা। এক কথায়
রাজরোপার একখানি জীবন্ত ছবি যেমন ফুটে উঠেছে শিল্পীর
নিপুণ তুলিকায়। হিরমন্তার মন্দিরটি রাজরোপার বৈশিষ্ট্য।

রাঁচির বিখ্যাত জলপ্রপাত হড়কু বাড়বগ অঞ্চলের আর
একটি প্রধান বর্ণা। ট্যান্ডিছাড়া আর কোনও যামবাহনের
চলাচল নেই। হড়কু ও ঘোনা বর্ণায় যেতে ট্যান্ডিছাড়া
পশ্চিম থেকে চল্লিশ টাকা পর্যন্ত।

রাঁচি শহর থেকে পুন্ডলিয়া রোড ধরে আমাদের গাড়ী
হড়কুর দিকে যেতে লাগল। সুন্দর পিঁচচালা মন্থন রাস্তা—
শান্ত নিরিবিলা পরিবেশ, দূরে দূরে পাহাড় আর শালবন,
প্রকৃতির উদার উদ্বুদ্ধ বিস্তৃত প্রাকণের বিচিত্র শোভা। চৌক
মাইল পুন্ডলিয়া রোড অতিক্রম করে পার্কৃত্য প্রান্তরে গাড়ী
এবার বাক মিলে। ষোপবাড় জঙ্গল পেছনে রেখে এবড়ো-
বেবড়ো পথে গাড়ী চলতে লাগল। তের মাইল চড়াই আর
উৎরাই পথ অতিক্রম করে তিন শত ফুট পার্কৃত্যের শীর্ষদেশে
মোটর আরোহণ করল।

হড়কুর নিকটে এসে আমরা পৌঁছলাম। বর্ণা
এখানে যুহ কলভানে আশ্রমগ্ন নর, উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত।
পার্কৃত্যের গহবরের অন্তরাল থেকে আকুল আবেগ আর
কলরোলে উৎসারিত হড়কু উজ্জল প্রবাহে নেমে আসে;
উন্নত গর্জনে পার্কৃত্য, বনবনান্ত ধরধর করে কাঁপে। অশ্রান্ত
গর্জনশীল হড়কুর বিরাট রূপে বিশিষ্ট অভিজুত হলাম।
পার্কৃত্যের পর পার্কৃত্য অতিক্রম করে উচ্চ গতিতে ছুটে চলেছে



ঘোনা ফল্গ

তার উন্নত জলপ্রবাহ। শেষে সমস্তল ভূমিতে এসে হড়কু
রূপান্তরিত হয়েছে অরণ্যের খা মধীতে।

পাহাড় ভেঙে তিন শত ফুট নীচে আমরা নামলাম।
হড়কু শিলা থেকে শিলাস্তরে লাকিয়ে লাকিয়ে সহস্র বারার
নীচে নেমে এসেছে। বহুকণ তরঙ্গ হয়ে তার প্রচণ্ড রূপরশি
দর্শন করে আমরা আবার তিন শত ফুট উপরে উঠে এসে
ঘোনা অভিমুখে রওনা হলাম।

পার্কৃত্য প্রান্তর অতিক্রম করে ফিরে এলাম আবার পুন্ডলিয়া
রোডে, আরও এগার মাইল সাধনের দিকে এসিয়ে গিয়ে
আবার সাত্বে তিন মাইল পাহাড়িয়া পথ অতিক্রম করে
পার্কৃত্যের শীর্ষদেশে আরোহণ করলাম। গভীর অরণ্যে
সমাজ্জর এই পার্কৃত্যের শীর্ষদেশে ঘোনা জলপ্রপাতের গুহা
এবং উৎস দেখা যায় না। আমরা উৎরাই পথে অনেক
নীচে নেমে গেলাম। ঘোনা শিলাখণ্ড অতিক্রম করে হুকার
বেগে বেয়ে আসছে অজস্র বারার—উন্নত নর, অশ্রান্ত নর,
যেন সাধনার সাকল্যে হিজোলিত, ধূশীতে লীলাসিত।

বাড়বগের বর্ণাধারার মতো ঘোনা জলপ্রপাতের নিজস্ব
একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে দেখলাম। বাড়বগ অঞ্চলের বর্ণাধারা-
গুলি যত দেখেছি—মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি, ধূশীতে মন
ভরে উঠেছে। স্থতির মণিকোঠার বাড়বগের বর্ণাধারার
অবগমীয় সৌন্দর্য্যের ছাপ অক্ষর হয়ে রইল।*

* এই প্রবন্ধের কটোয়লি লেখিকা কর্তৃক গৃহীত।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১০

দীপেনবাবু বললেন, বাবুদ মশাই। এক গ্রাস জল খাব।
ঔপত্যাসিক বললেন, আমিও খাব...
দীপেনবাবু বেঁটে-বনজামকে ডেকে বললেন, ওরে বনা।
একটা এদিকে নিয়ে আর...

ঔপত্যাসিক জিজ্ঞাসা করলেন, মরোত্তমের কোন সাতা
পাচ্ছি না যে? সে কি নেই এখানে?

নিবারণ বলল, মোড়ল আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে
পড়েছে...

এক খট জল ধরে ঔপত্যাসিক আবার বলতে আরম্ভ
করলেন—

চন্দ্রকলার লাসটা যখন এ কূলে এসে পৌঁছল তখন
রাতির প্রায় চারটে। হ' তারে সেটাকে ডাঙার তুলে নিয়ে
চুকল নিকটেই একটা গভীর জলের তেতর।

গানের হৃদিকে ছুটে নদী। মোড়লদের বাড়ী থেকে
নবগলার দূরত্ব এক মাইল। আর মধ্যমতীর দূরত্ব হ'মাইলের
কিছু বেশী। হ'তাই বস্তা কীভাবে নিয়ে যতনা হ'ল মধ্যমতীর
উপরে। আকাশে তখন প্রভাতী তারা জল জল করছিল।
সে ছাড়া মরোত্তমের এই কাছের লাক্ষী আর কেউ রইল না।

তার হাতেই থানার সোরগোল পড়ে গেল—লাসটা গেল
কোথায়? দারোগা চৌকিদারদের মারতে যান—বল
ব্যাটার। লাস কি করলি?

সবরে খবর গেল। পুলিশসাহেব নিজেই ছুটে এলেন।
দারোগাকে বদকাতে লাগলেন। থানার হেপাজত থেকে
লাস উদ্ধার, ব্যাপারটা শু সোজা নয়?

দশ-বার থানা ডিকি নিয়ে কমেটবল ও চৌকিদাররা
ঘেরিয়ে পড়ল। নদীর বাঁকে বাঁকে সন্ধান করতে লাগল।
উকানে বা ভাঁটিতে যত নোকা বাতারাও করছিল, তাদের
সবাইকে প্রের করল—কেউ কোন লাস ভেসে যেতে দেখেছে
কিনা?

তরানক বিপদে পড়ল নদীর কেলেরা। তারা অভ্যস্ত
নিরাহ-প্রকৃতি—পুলিশ-জুলুমের তরে কাঁপে। পুলিশের লোক
এসে কোনও প্রশ্ন করলেই জবাবের আগে ঘের হ'চারাটে মাছ
উপচোকন। তাকে ধুশী করে এভাবে পারলেই বাঁচে।
নদীতে যে ঘটনা ঘটেছে—সেজতে জেলেনের দায়িত্ব যেন
তারা বীকার করেই নিচ্ছে। নিজেকে যে অপরাধী মনে
করে—সে শু নির্বাচিত হবেই।

সবাই বলল, আমরা তোরে এসে জাল নিয়ে নোকা

ভাসিয়েছি। বরা পড়ে গেল একটা জেলে। প্রমাণ-হ'ল—
সে প্রায় রাত দুটো-আড়াইটার সময় থানার বাঁকে 'বেপলা-
জালে' মাছ ধরেছে। পুলিশ তার 'হুপসো' কেড়ে নিয়ে
বেদম প্রহার আরম্ভ করল—বল ব্যাটা, লাস কোথায়?

লোকটা পাথুরে-কাল, কিছুই শুনতে পার না। অথচ
বেশী কথা কর। কানের অভাবটা জিত চালিয়েই পুরণ
করতে চেষ্টা করে। প্রশ্নের অসংলগ্ন জবাব শুনে বুড়িমান
দারোগা তাকে লাথি, চড়, হুসি প্রভৃতি উপহার দিয়ে হাঙ্কতে
আটকে রাখলেন।

পুলিশসাহেব এসে তাকে বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করলেন,
কাল রাতে তুই কোথায় ছিলি?

—আজ্ঞে হজুর আমার নাম সৃষ্টিধর...

—নদীতে মাছ ধরতে এসেছিলি?

—আমার বাবা ভাগ্যবর সাধু, রোজ বাবুদের পাদোদক
বেতেন। বুড়ো গলার সাধু গত বছর গলাগায়ে নিয়ে বেহ
রেবেছেন—আমাদের বংশে কেউ কখনও চোর ছিল না
হজুর।

তার সাফাইয়ে বাধা দিয়ে পুলিশসাহেব বললেন, না
জিজ্ঞেস করছি—তার জবাব দে...

—আজ্ঞে হজুর। আজকাল খুব বড় কান্ডলা কি কুই
পাচ্ছি না। পেলেই আপনাকে দিয়ে দাব...

পুলিশসাহেব দারোগার উপর চটে উঠলেন। কেন একটা
গো-বেচারা বদকালাকে হাঙ্কতে আটকে রেবেন? ছেড়ে
দাও...

দু'দিন তিনি থানার রইলেন। বহু চেষ্টা করেও লাসের
কোনও সন্ধান পেলেন না। মরোত্তমকে ডাকিয়ে এনে বহু
জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে দিলে সোজা জবাব। লাস সবচে
কিছুই জানে না।

—তোমার বো কোথায়? পুলিশসাহেব জিজ্ঞাসা
করলেন।

—আমার সঙ্গে বগড়া করে বাপের বাড়ী গিয়েছিল।
সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণাবন গেছে। মণ্ডারও বাবে—শুনতে
পাচ্ছি...

দারোগা বললেন, লোকটা দাকাবাজ। লাঠি ও সড়কির
ওস্তাদ।

—সেকথা সত্যি হজুর। খুব গর্বের সঙ্গে মরোত্তম
বলল, সেজতে সরকার আমাকে পুরস্কার দিয়েছেন। আমি-
দারের বেওয়া হ'চারাটে মেডেলও আছে আমার ঘরে...

উত্তেজিতভাবে দারোগা বললেন, শালা! তুই একটা ডাকাতি। ভোর বৌকে তুই মেরে ফেলেছিস...

নরোত্তমও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে, একটু সামলে নিয়ে পুলিশসাহেবকে লক্ষ্য করে বলল, হজুর আমরা চার জাই, এক বোন। বোনটির এখনও বিয়ে হয় নি। দারোগাবাবু যদি রাজী থাকেন, আজই এনে সাতপাক ঘুরিয়ে দিতে পারি—আপত্তি নেই। ডাকাতি এখনও করি নি। দারোগাবাবুর সঙ্গে কুটুবিভা হলে নিশ্চয়ই করব।

—তুই চুরি-ডাকাতি করিস একথা কে না জানে?

—এই থানার এলেকান্দার চুরি-ডাকাতি কে করে, তা এখনি প্রমাণ হয়ে যেতে পারে। যদি একবার আপনি আমার হবু বোনাইয়ের বাসার ভিতর ঢোকেন। তার পর পুলিশ-সাহেবের পানে তাকিয়ে বললে—হজুর। তা হলে সব বুঝতে পারবেন। জেলেদের কাছ থেকে উনি যে এক থাকা মাছ ভেঙে এনেছেন, তার দাম কি দিয়েছেন? ছোফ্রা জমিদারের বাগান-বাড়ীর মজলিশে খাঁর আজ্ঞা, সকালে চা আর বিকেলে লালাজল টেনে যিনি গরীবের কি-বৌদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন—তাকে উপযুক্ত শিক্ষা এই নরোত্তম একদিন দেবে। যদি আর বেশী দিন উনি থাকেন এই থানার...নরোত্তম বাবুরিটা ঝেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আজ্ঞা তুমি এখন এসো...পুলিশ সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নরোত্তমও নমস্কার জানিয়ে বিদায় হ'ল।...

এই লোকের সঙ্গে তুমি বিরোধ বাধিয়েছ? জমিদারের পক্ষ-সমর্থন করছ? বমক দিয়ে পুলিশসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

আজ্ঞে না...

বুঝতে পেরেছি। জমিদারের সঙ্গে বড় বেশী মাথাপিঠ করে ফেলেছ। এ থানার আর দারোগাগিরি করতে পারবে না তুমি। আচ্ছা, পুলিশ সাহেব তাঁর লগে উঠে রওনা হলেন।

সন্ধ্যার পর নরোত্তম গেল দীনবন্ধুঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। দূর থেকে তাকে দেখেই দীনবন্ধুঠাকুর ছুটে বেরিয়ে এসেন রাজ্যায়। বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—সাবাস! মোড়লের পো! সাবাস! কি করে লাগল উড়িয়ে দিলে, তেবেই পাচ্ছিনে।

মাঘের দশা, আর ভোমাদের ছিরিচরণের আশীর্বাদ। নরোত্তম তার পায়ে ধূলি মাধায় দিলে।

এমন সময় একথাও দা-হাতে শিব এসে হাজির হ'ল সেখানে।

কি রে শিবু খবর কি? দীনবন্ধুঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন। ওই মোড়লকে খুঁজে বেড়াচ্ছি...

কেন রে? নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল।

হাতের দা'খানা দেবিয়ে শিবু বলল—আমি কিন্তু মধু-ঠাকুরকে খুন করব। সে আমার সন্মানশ করেছে। বলেই অবুঝ বালকের মত কঁদে ফেলল।

নরোত্তম বলল—যে কঁদে, সে খুন করতে পারে না। খুন করার সময় চোখে জলবে আগুন! পরে হুকোটা জল ফেলতে চাস ফেলিস—এখন কাদিস নে।

মধুঠাকুরের বাড়ীর পাশেই শিবুর বাড়ী। মেহাত ভাল-মাহুদ শিবচরণ—অত্যন্ত সহজ ও সরল তার বৃত্তি। কোন কুটিলতার ধার সে ধারে না। পত্নী-বিয়োগের পর মধুঠাকুর শোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিবেশীর সেই আকস্মিক বিপদে শিবচরণের মনে সহানুভূতি জেগে উঠেছিল। বিপত্রীক মধুঠাকুরের সেবা ও শুশ্রূষার জন্তে শিবুই তার যুবতী ভার্যা নন্দরাণীকে মিয়ুক্ত করল। এখন আর বৌটা ঘরে ফিরতে চায় না।

নরোত্তম বিরক্ত ভাবে বলল—দেখ শিবু। আমরা সবই জানি। এ ঘটনার জন্তে দায়ী তুই। কেন এখন মিহিমিহি মধুঠাকুরের উপর চটুচ্ছিস?

দীনবন্ধুঠাকুর বিস্মিত ভাবে অশ্রুত স্বরে বললেন—কি লজ্জার কথা, কি ঘোরার কথা। শিবুর বৌ তো আমার বেয়াই—মধুঠাকুরের নাভনী বয়সী।

ভুরু কুঁচকে নরোত্তম বলল—আমার মনে হয়—আজকাল মাঘের মন্দিরে পাঠা বলি তুলে দিয়ে, মধুঠাকুরের মত মাহুদ-দেব বলির ব্যবস্থা করা উচিত। চল দেখি শুভে আসি—মধু-ঠাকুর কি বলে...?

শিবচরণকে সঙ্গে নিয়ে নরোত্তম এসে হাজির হ'ল মধু-ঠাকুরের কাছে। তাকে দেখেই মধুঠাকুর বুঝলেন—ব্যাপার খুব গুরুতর...

সামনে নরোত্তমকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মধুঠাকুর বলতে লাগলেন—আরে এস, এস, মোড়লের পো! তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। অনেক চেষ্টা করছি—কিন্তু কিছুতেই পারছি না শিবুর বৌটাকে ঘর ফিরতে রাজী করতে। সে নাকি জীবনে আর শিবুর মুখ দেখবে না।

কেন, শিবুর অপরাধ কি?

শিবু নাকি তার চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করেছে। যেরেটি যে অতি নির্মলচরিত্রা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে প্রতিজ্ঞা করেছে—দাসীরত্তি করে পেট চালাবে তবু শিবুর সংসার আর করবে না...

ধাম ঠাকুরমশাই। হঠাৎ চোখ রাঙিয়ে চিৎকার করে উঠল নরোত্তম। পরের ধর ভাঙবার ওষাদ তুমি—সেকথা জানি। শিবুর বৌকে একবার ডাক এখানে, আমি তার মুখেই সব কথা শুনব...

নরোত্তমকে মণ্ডীত কর ভয় করেন। ধমকানি খাওয়া বালকের মত তার চোখ বুঁব বেন শুকিয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—আমি কারও সাতেও নেই, পাচেও নেই। দিনরাত রূপতপ আর সন্ধ্যাহিক নিয়ে পড়ে আছি। তবু আমার এ কলঙ্ক কেন? ওরে বাহা মন্দরাগী! মণ্ডীতের অন্দরে ঢুকলেন।

বহুকণ নরোত্তম ও শিবচরণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। মণ্ডীতের বা মন্দরাগীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অবৈধা হয়ে শিবচরণ বললে—কই এল না ত?

ও বৌয়ের আশা তুই ছেড়ে দে শিবু! আর একটা বিয়ে কর। ওকে নিয়ে সংসার করতে পারবি নে...

শিবচরণ ভেট ভেট করে কাঁদতে লাগল। বুক চাপড়ে বলল—মন্দকে ছেড়ে আমি বাঁচব না মোড়ল! বা হোক একটা উপায় কর...

মণ্ডীতের কিরে এসে বললেন, মন্দরাগী আমার বাড়ীতে নেই। তোমরা এসেছ শুনেই পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে...

—কেন মিছে কথা বলছ ঠাকুর? ভাকে আমার সামনে আসতে দেবে না, তাই বল...

—দেখ মোড়ল! তুমি একজন মাতমান লোক। মশখামা গায়ের চাষাভুষার। তোমার কথায় ওঠে বলে। ক্ষমতার অহঙ্কারে ব্রাহ্মণকে অসম্মান কর না। মণ্ডীতের জীবনে কখনও একটি মিছে কথা বলে মি। তেমন বাপের ঠুংসে তার জন্ম হয় নি... বলতে বলতে গলার পৈপাতা মার্জনা করতে লাগলেন।

নরোত্তম শিবুকে আদেশ করল—যা ত শিবু! বাড়ীটার পেছন ঘুরে উত্তর ডাকার ঘা। নতিয়াই যদি যেদিয়ে গিয়ে থাকে—মিষ্করই বেশি দূর যেতে পারে মি। যেখানে পাবি চুলের মুঠো ধরে টেনে আনবি...

—শোন মোড়ল! যেজ্ঞে ঘষে রূপ, আর ধরে বেঁধে পীরিত হয় না। তার চেয়ে একটা কাজ কর...

—কি?

—আমিই ভাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শিবুর ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। শিবু আমার পা ছুঁয়ে এতিজ্ঞা করুক—ভাকে কোন নির্ভাশ করবে না বা তার চরিত্র সম্বন্ধে কোন জুংসা রচাবে না।

উজ্জ্বলিত ভাবে শিবু বলল, সে দিনরাত তোমার ঘরে গিয়ে বসে থাকবে আর এদিকে আমার ভাল ছনে পুড়বে, মাছে কাঁল হবে না। লাঙল ছেড়ে ঘরে কিরে এসে যখন বেঁচে বসব—তখন আমার সামনে এনে ঘরে দেবে এক ঝালা পোড়া ভাত। চাষা আমি। যেজ্ঞা ঐকি রাখব কি করে?

হো হো করে হেসে মণ্ডীতের বললেন—ওরে শিবু! পরিবারের ওসব লোখ-জুটি বরতে নেই।

একটু ধেম মণ্ডীতের বলতে লাগলেন—মোড়ল মিছেই যখন এসেছে—যে ব্যবস্থা ভাল হয় করুক—আমার কোন আপত্তি নেই। মারামরণ, মারামরণ, মারামরণ...

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নরোত্তম বলল—কি আর করব মণ্ডীতের! করবার কিছু নেই। শিবু বোকা, তুমি বুদ্ধিমান! বোকাকে একটা বো দেওয়া যায়—কিন্তু বো ধরে রাখবার বুদ্ধি দেওয়া যায় না। তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের বাড়ীর পাশে বাস করে—বোকা-শিবুর বিয়ে করাটাই অন্যায় হয়ে গেছে।

—কি যে বল মোড়ল! মণ্ডীতের হাসলেন।

—শোন মণ্ডীতের! এ গায়ে ছ'জন শান্তর জামা বাবুন বাস করেন। এক জন তুমি আর এক জন তোমার বেয়াই দীনবন্ধুঠাকুর। তিনি দেবতা, আর তুমি শরতান!

মণ্ডীতের উত্তেজিত ভাবে বললেন—কি বললে? আমি শরতান?

—চোখ রাঙাও না ঠাকুর। শরতানকে টিটু করতে আমি ছামি। কিন্তু আমরা যে বড় বর্ষভীত! টিটু-মামাবলী আর গোপহরত জামা-কাপড়ের আড়ালে যে সব শরতান লুকিয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে পেরে উঠি নে। আমার কি মনে-হজ্ঞে জ্ঞান?

কি? নিলিষ্ট ভাবে মণ্ডীতের জিজ্ঞাসা করলেন।

নরোত্তম বলতে লাগল—পোশাকী শরতানের সংখ্যা দিন দিন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে—তাতে মনে হয়—দেশটা শীগগিরই ধ্বংস হয়ে যাবে। মা-রপচণী আর বেশী দিন সহ্য করবেন না।

১২

উদাস্তরা যে ভিত্তি আশ্রয়টা বিধে বসেছিল—তার আর পোড়া কাঠগুলো একটু নেড়েচেড়ে দিতেই দাউদাউ করে ছলে উঠল। সেই আলোকে সকলের চোখ বুঁব হঠাৎ অতি উজ্জল ভাবে প্রকাশিত হ'ল।

নিবারণের ব্যর্থতা ছিল। নরোত্তম তার কোলের উপর মাথাটা রেখেছিল বটে, কিন্তু ঘুমোর নি। চন্দ্রকলার কথা মনে পড়ে—অলভরা কোটরগত ঝাপসা চোখে চেয়েছিল—অলংঘ্য তারকাখচিত দূর আকাশের দিকে।

এক দিন নরোত্তম বলেছে—‘এ দেশ শীগগিরই ধ্বংস হয়ে যাবে। মা-রপচণী আর বেশী দিন সহ্য করবেন না।’ দে কথাতনে, বিখিত ভাবে নরোত্তমের মুখের দিকে চেয়ে, দীবেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—বুড়ো! তুমি কি জিকালজ?

আজ্ঞে এ অধম আপনাদের দাসাঙ্গদাস! নরোত্তম উঠে বসল।

উদাস্তদের এমন দুর্গতি হবে—তা কি তুমি অনেক আগেই জেনেছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, না জানিয়েছিলেন। জমিদারের অত্যাচার,

গোপহরত জামা-কাপড় আর টিকি-নামাবলীর অমাচার, না কি সইতে পারেন ?

ঔপচাসিকের দিকে চেয়ে দীপেশবাবু বললেন—এ সময়ে রমা দেবী কি করছেন ? তাঁর কথাকাটা একটু বলুন—

ঔপচাসিক বলতে লাগলেন—

শান্ত ও কোমলস্বভাব রমা দেবী অভ্যস্ত বুদ্ধিমতী। নরোত্তমকে এক দিন বেবে, আর তার যুগে মাতৃসম্বোধন শুনে, তিনি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সফল করেছিলেন—কুমার বাহাদুর যতই চেষ্টা করুন, নরোত্তমকে তিনি রক্ষা করবেনই।

দাদার মাথায় নরোত্তমকে জড়ান জমিদারের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। কারণ যে সময়ে দাদাটা বেবেছিল, ঠিক সেই সময়ে রেজেন্সি আপিসে হয়েছিল একখানা সাধারণ দলিল রেজেন্সি। দেখা গেল—সাক্ষী হিসাবে সেই দলিলে আছে নরোত্তমের উপসই।

ক্রোধে অগ্নিবৃষ্টি হয়ে কুমারবাহাদুর বললেন—নিশ্চয়ই রেজিস্ট্রার খুন ধেরেছে...

দীনবন্ধুঠাকুর মস্তব্য করলেন—নরোত্তম এত টাকা কোথায় পাবে যে রেজিস্ট্রারকে খুন খাওয়াবে ?

হাসিতে হাসিতে রমাদেবী বললেন—মা-কালী যার সহায়, তাকে জেলে গুলতে কিছুতেই পারবে না তুমি। যথা চেষ্টা করছ...

আদালত নরোত্তমকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি বিধান ? কালীবাড়ীর পক্ষে ঠাঁড়িয়ে দাফা লড়েছিল কে ?

প্রশ্নের জবাব দেবার সময় নরোত্তমের চোখখুঁপ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হুজুরর কপালে ঠেকিয়ে সে বলল—নিশ্চয়ই মা-দশভুজা। পাঁচ হাতে চ্যাঙা ছুড়েছিলেন, আর পাঁচ হাতে সড়কি চালিয়েছিলেন। সে কথা কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। বিচারক প্রশ্নাধাভাবে নরোত্তমকে বেকসুর খালাস দিলেন।

জমিদারের দ্বিতীয় চেষ্টা—চল্লফলাকে খুন করার অভিযোগ আদালত পর্যন্ত পৌঁছাল না। জমিদার-বন্ধু দারোগা বদলি হয়ে গেলেন। নতুন যিনি এলেন, কুমারবাহাদুরকে স্পষ্ট বললেন তিনি—নির্ভীক প্রমাণ না পেলে কোন লোককে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না।

কিন্তু সফল হ'ল—জমিদারের তৃতীয় চেষ্টা। শিবুর বৌ নন্দরাণী গিয়ে হাজির হয়েছেন কুমারবাহাদুরের কাছে। সঙ্গে তার মণ্ডঠাকুর। নরোত্তম নাকি করেছে—নন্দরাণীর উপর পার্শ্বিক অভিযাচার। সে কথা শুনে, কানে আঙ্গুল গুঁজে, নরোত্তম চিংকার করে উঠল—মা, মা বলে।

জমিদার-বাড়ীর খুল-বারান্দায় একখানা ফোঁচ পেতে বসে রমাদেবী দেখলেন—অন্তগামী সূর্য যেন পশ্চিম আকাশে রক্ত

ঢেলে দিয়েছেন। বাতাসের স্বাদরোধ ঘটেছে—গাছের পাতাটিও নড়ছে না।

হাসিতে হাসিতে কুমারবাহাদুর এসে বললেন—এইবার ? এইবার তোমার মা-কালীর বরপূজটিকে কে রক্ষা করবে ?

শক্তি ভাবে কাঁপতে কাঁপতে রমাদেবী বললেন—তুমি কি উন্মাদ হয়ে উঠলে ? আকাশের গায়ে আঙুল লাগিয়ে দিলে ? খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—চল খোকা। আমরা এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই...

উদ্ভিগ ভাবে দীনবন্ধুঠাকুর ছুটে এলেন নরোত্তমের কাছে। লজ্জার ও যুগায় মাথা হেঁট করে বসে রইল সে। দীনবন্ধু ঠাকুরের যুগের দিকে চাইতে পারল না।

মণ্ডঠাকুর এসে সাফাই শুরু করলেন—আমি শু আগেই তোমাকে বলেছিলাম মোড়ল। শিবুর কথা শুনে মেয়েটাকে বেশী খাটাখাটি করা উচিত হচ্ছে না। এখন তৈলা সামলাও

নরোত্তমের চোখে হঠাৎ আঁশ্বজলে উঠল। চিংকার করে বলল—সরে যাও, সরে যাও মণ্ডঠাকুর। এখন আমি তোমার বুকটা চিরে ভীষের মত রক্ত খেতে পারি...

দীনবন্ধুঠাকুর ছুটে এসে মণ্ডঠাকুরকে আড়াল করলেন। তাঁকে একটা বাক্স দিয়ে বললেন—দীর্ঘনিঃসরে পড় বেরাই। নরোত্তমের মাথা খারাপ হয়ে গেছে...

নারায়ণ। নারায়ণ। অপ করতে করতে মণ্ডঠাকুর ছুটে পালিয়ে গেলেন।

নারায়ণের মুখোঁস মণ্ডঠাকুরের যুগে আর বেশীদিন রইল না। নরোত্তম হাড়তে ভক্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিরমিত ভাবে স্বাভাবিক শুরু করলেন জমিদার-বাড়ীতে।

মণ্ডঠাকুরের অপরাধ শাস্তব্যাব্য। আর অতি উচ্চাদের প্রেম ভণ্ড শুনে শুনে নন্দরাণীর মনে দৃঢ় বারণা জন্মেছিল—একমাত্র মণ্ডঠাকুরের পদসেবা করেই তার পরমাধ প্রাপ্তি ঘটবে। শিবু তার কে ? কেউ নয়।

কিন্তু এ কি ? কেন মণ্ডঠাকুর তাকে জমিদারের বাগান-বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন ? কেন সে তাঁর অমুরোখে বাধ্য হ'ল পুলিশের কাছে কেঁদে কেঁদে নরোত্তমের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতে ? বাবার বরদী নরোত্তম। কি লজ্জার কথা, কি যেনার কথা, হি হি হি—মণ্ডঠাকুর আজ তাকে হাত ধরে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ? সন্দ্বিহ নন্দরাণীর মনে প্রশ্নের অন্ত নেই।

এক দিন সন্ধ্যার পর মাতাল জমিদার তাকে স্পর্শ করতে উদ্যত দেখে নন্দরাণী চমকে উঠল। উৎকট বর্ষাবিধাসের লজ্জা তার যে মধ্যাদাবোধ লুপ্ত হয়ে আসছিল, তা হঠাৎ জেগে উঠল। মণ্ডঠাকুরের কাছে ছুটে গিয়ে কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করল একি ঠাকুর ? কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ ?

ভোমার পদসেবা করেছি বলে জমিদারও কি আমার/পায়ে হাত দেবে?

বাগান-বাড়ীতে বসেই মধুঠাকুর আরম্ভ করলেন—বেদ-পূরণের অপব্যাখ্যা ও শাস্ত্রীয় যুক্তিভরক প্রয়োজনীয় দৃষ্ট-প্রয়োগ।

নন্দরাণীর শোণিতপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল। সে যেন কি এক শক্তির উদ্ভাসনা অনুভব করল। সত্যিই ত নরোত্তম তার শত্রু।

হাসতে হাসতে মধুঠাকুর বললেন—এ ক্ষণে কিছুই সত্য নয়, সবই মায়ী। নির্দ্বন্দ্ব ও নিরহকার ভাবে মায়ার খেলা খেলতে হবে। তুমি যদি কেঁদে কেঁদে ভোমার মিথ্যা অভিযোগগুলি বিচারকের কাছে পেশ করতে পার—তা হলেই নরোত্তমাসুহ-বধ স্থগিত।

নন্দরাণীর মাথা গুলিয়ে যায়। মন্ত্রযুক্তের মত শোনে তার কথা।...

এদিকে নরোত্তম হাজতে পচতে লাগল। সবিচরণ একদিন তার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করল—পুড়িয়ে দেব মধুঠাকুরের বাড়ীঘর? একেবারেই শেষ করে দেব তাকে?

না বেবি মার কি ইচ্ছে...নরোত্তম গভীর ভাবে বললে।

মিষ্টি দিনে মামলা আরম্ভ হ'ল। আদালত লোকে লোকারণ্য। একটা অশিক্ষিত দুর্ভব নেঠেল হলেও, নরোত্তমকে লোকে ভালবাসে। তার মাতৃভক্তি ও বিপন্নোদ্ধার-প্রবৃত্তি সর্বজনবিদিত। কেউ বিশ্বাস করে না যে এমন হীন কাজ করা নরোত্তমের পক্ষে সম্ভব।

নন্দরাণীর পক্ষে তদ্বির চালাচ্ছেন মধুঠাকুর, অর্থব্যয় করছেন জমিদার। কলকাতা থেকে ব্যারিষ্টার এসেছে। রম্যদেবী নিরুপায় হয়ে পড়েছেন। দীনবন্ধুঠাকুরের মারকত নরোত্তম তাঁকে জামিয়ে দিয়েছে—কোন উকিল ব্যারিষ্টারের সাহায্য সে গ্রহণ করবে না। সে শুধু দেখবে—মার কি ইচ্ছে?

মধুঠাকুরের মনে আজ ভয়ানক উবেগ ও অশান্তি। কাল থেকে নন্দরাণীর কিট হচ্ছে। তাকে সুস্থভাবে কাঠগড়ায় তুলবার জন্তে একজন ডাক্তার নিযুক্ত হয়েছেন। শিশিতে দাগ কেটে মাঝে মাঝে তাকে একটু মাল মাল খাওয়ান হচ্ছে। দূরে দাঁড়িয়ে মধুঠাকুর জপ করছেন—নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ...

আসামীর খাঁচার আবদ্ধ নরোত্তম। অতি শান্ত সৌম্য ও অচঞ্চল গভীর-মুগ্ধ। মাথার রুদ্ধ বাবুরি আর মুখের ঈষৎদগ্ধ গোপদাড়ি তার স্বাভাবিক গাভীরাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উদাস ভাবে নরোত্তম চেয়ে আছে বিচারকের মুখের দিকে। বিচারকও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছেন আসামীর সেই নির্লিপ্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মুখের ভাব। বোধ হয় ফাঁসির জুহুম শুনেও সে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা প্রকাশ করবে না।

মধুঠাকুর ও নরোত্তমের মুখের ভাবাভিব্যক্তি ভুলনা করলে স্পষ্টই মনে হয়—আজকের এই বিচারান্তিময়ের আসামী নরোত্তম নয়—মধুঠাকুর। তাঁর চোখে-মুখে উবেগ, অশান্তি ও যন্ত্রণার কালো ছায়া বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নন্দরাণী এসে কাঠগড়ায় দাঁড়াল। বয়স তার সত্তর-আঠারোর বেশী নয়। পরিপূর্ণ যৌবনলী সর্বদাে ফুটে উঠেছে। অসামান্য সুন্দরী না হলেও, অপূর্ণ স্বাস্থ্যবতী। নন্দরাণীর দিকে চেয়ে চোখভরা জল নিয়ে নরোত্তম একটু হাসল। সে অশ্রুসিক্ত সজল হাসি দেখে নন্দরাণীর বুকেটা কেঁপে উঠল। মধুঠাকুরের চোখমুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেল।

ব্যারিষ্টার প্রশ্ন করতে লাগলেন। নিভান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মধুঠাকুরের শেখান জবাবগুলি বীরে বীরে উদ্গীরণ করতে লাগল নন্দরাণী। জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে মধুঠাকুর ছটফট করছিলেন—আর মনে মনে জপ করছিলেন নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ...

গুরুগভীর স্বরে নরোত্তম বলে উঠল—বর্ধাবতার। যেহেতুকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। অস্থ-মতি প্রার্থনা করি।

আদালত অস্থমতি দিলেন।

নন্দরাণীর চোখের দিকে চেয়ে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল, মা। ভোমার একটি ছেলে হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—গত বছর সে মারা গেছে?

—হ্যাঁ।

—তার বয়স হয়েছিল কত?

—হ'বছর তিন মাস।

—মুখে তার কথা ফুটেছিল? ভোমাকে মা বলে ডেকেছিল?

—হ্যাঁ।

—তার মুখখানি ভোমার মনে পড়ে?

—হ্যাঁ, পড়ে...টপ্ টপ্ করে নন্দরাণীর চোখ থেকে হ'ফোটা জল পড়িয়ে পড়ল।

—আচ্ছা মা। সেই ছেলেটি যদি এই আদালতে এসে এখন হাজির হয়—তুমি কি তার মাথার হাত রেখে বলতে পারবে কখনও আমি ভোমার মুখের দিকে কুভাবে তাকিয়েছি, বা ভোমার অঙ্গ স্পর্শ করেছি?

—না, না, না—নন্দরাণী ডুকরে কেঁদে উঠল। মিছে কথা। সব মিছে কথা। মধুঠাকুর আর জমিদার আমাকে বাধ্য করেছে এই সব মিছে কথা বলতে।

আদালতে কল-গুঞ্জন উঠল। ব্যারিষ্টার আপত্তি জানালেন—আসামীকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে বাদিনীকে

হিপনোটাইজড করবার জন্তে। সে এখন সত্য গোপন করে আদালতকে বিভ্রান্ত করছে।

নন্দরাণীকে বমক দিয়ে ব্যারিষ্টার তার পূর্ব বিয়তি বহাল রাখবার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোম কল হ'ল না। সে কিছুতেই স্বীকার করল না যে, নরোত্তম কখনও তার অঙ্গ স্পর্শ করেছে। তার পূর্ব বিয়তি মিথ্যে—শিখিয়ে-বলান কল্পিত কাহিনী মাত্র।

জনতার ভিতর থেকে একটু এগিয়ে এসে মণ্ডাকুর চেষ্টা করছিলেন—নন্দরাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার। হঠাৎ তার দিকে নজর পড়তেই নন্দরাণী উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে উঠল—ওই যে—ওই যে সেই শয়তান-ঠাকুর। ও আমাকে পথে বসিয়েছে, আমার ভালমাহুষ গোদামীকে পাগল করে দিয়েছে...

জনতার মধ্য থেকেই কে যেন বলে উঠল—মার শালাকে।

সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মণ্ডাকুর যে কোন্ দিকে গা-ঢাকা দিলেন তা ঠিক বোঝা গেল না। নন্দরাণী মুচ্ছিত হয়ে পড়ল। সেদিনের জন্তে মামলা মুলতুবি রইল। নরোত্তম হ'ল জামিনে খালাস।

কিছু দিনের মধ্যে মণ্ডাকুরকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। হঠাৎ এক দিন শিবচরণ ওরফে শিবু এসে হাজির হ'ল থানায়, হাতে একখানা রক্তমাখা দা নিয়ে। হাসতে হাসতে বলল, দারোগা সাহেব। মণ্ডাকুরকে আমি কেটে ফেলেছি...

দারোগা তার হাতের দা'খানা কেড়ে নিয়ে বললেন—বেশ করেছ। অতি চমৎকার কাজটি করেছ। দস্তা করে মিছেই এসে ধরা দিয়ে আমাদের পরিশ্রম অনেক লাভব করে দিয়েছে। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন এস—হাজতের দরজা খোলাই আছে...

দারোগা শিবুকে হাজতে আটকালেন।

কমল:

গান্ধীগ্রাম সেবাপ্রমের গ্রামোন্নয়ন

(কলসকাণী, বরিশাল)

শ্রীরঞ্জনকুমার দত্ত

গ্রামের সর্বাঙ্গীণ সেবার আদর্শই আমাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূলে। এই প্রচেষ্টার ছোটো দিক আছে—একটা আত্মোন্নয়ন, অপহটা গ্রামোন্নয়ন। এই উন্নয়ন কেবল একাভিযুগীন নয়, সর্বাভিযুগীন। অন্ন-বস্ত্র-আবাসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাধারণের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নৈতিক-জীবন গঠনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রেও তেমনি এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলার সদভিপ্রায় নিয়ে আমরা কাজ করে চলছি। কিন্তু কতটুকুই বা আমাদের ক্ষতি, আমাদের পৌরুষ। আমাদের সম্মুখ বসতে আছে সাধু সংকল্প, সাধু প্রচেষ্টা, আর আছে জনসাধারণের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ। তবে এই চেষ্টা সার্থক হওয়া না-হওয়া ঈর্ষরেচ্ছা ও আমাদের কর্মকুশলতা-সাপেক্ষ। আমরা যা কিছুই করি না কেন তা নিঃশ্রিত ও পরিচালিত হয় মহাত্মা গান্ধী-প্রদর্শিত আদর্শ পথে। হুঃখের বিষয়, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র পরিচালক অক্সাপদ শ্রীসতীজনাথ সেন, এম-এল-এ (পূর্ব-পাকিস্তান), বর্তমানে রংপুর জেলে রাজবন্দীরূপে আটক আছেন। তাঁকে গভ কেজরারী মাসে এসেবুদী অধিবেশনকালে অভ্যন্তর সহিত ঢাকার পূর্ব-পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ সময় ঢাকার পাকিস্তানের অভ্যন্তর রাষ্ট্রত্যাগী হিসাবে 'বাংলা ভাষা'র দাবিতে ছাত্র-আন্দোলন চলছিল। ২৪শে মার্চ

তারিখে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব মুহূর্ত আমীন প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি মন্তব্য করেন যে, এই ভাষা-আন্দোলনের পশ্চাতে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার একটা স্বতন্ত্র চলছিল এবং সেই স্বতন্ত্রের সহিত বরিশালের সর্বজনপ্রিয় জমিনেতা, পূর্ববঙ্গের একমিষ্ট ও অকপট দেশ-সেবক আমাদের এই গঠনকর্ম-প্রতিষ্ঠানের একমাত্র পরিচালক অক্সাপদ সতীজনাথ সেন লিপ্ত আছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী সাহেব উল্লিখিত মন্তব্য করতে কিছু-মাত্র দ্বিধা করেন নি।

বস্তুত: পাকিস্তান সম্পর্কে সতীজনাথবুর বর্তমান মনোভাব যারা জানেন (আমার বিশ্বাস সরকারও জানেন) তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর এতাদৃশ মন্তব্যে ও তাঁকে আটক করার ব্যাপারে অত্যন্ত মর্মান্বহত হয়েছেন। আমরা আশা করি রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর অকপট সেবাতার ও একমিষ্টতার পরিচয় সম্পর্কে সরকারের গুপ্ত-ভণ্ড-উদঘাটক পুলিশ বিভাগের বিশেষ ভাবেই জানা আছে। সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলতে যাওয়া অনাবশ্যক মনে করি। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের কয়েক মাসের কার্য-বিবরণী এখানে উল্লেখ করছি। পরিচালক-অভাবে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম আঁক খুবই ব্যাহত হচ্ছে। সতীজনাথবুর স্বাস্থ্যও জেলে খারাপ চলছে বলে সংবাদ

পাওয়া গেছে। এই সব বিবেচনা করে সরকার সতীকরণের সম্পর্কে সম্মিলিত কার্য পরিবর্তন করতে পারেন।

আমাদের কর্মবিভাগ :—১। কৃষি, ২। চিকিৎসা, ৩। মৌমাছি-পালন, ৪। হাঁস-মুরগী পালন, ৫। বিতালর, পাঠাগার ও সার্কুলারী অস্থানাদি, ৬। হরিদ্র-উন্নয়ন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা, ৭। স্থা-কাটা, ৮। রাস্তা নির্মাণ।

১। কৃষি—পূর্ববঙ্গ কৃষি-প্রদান দেশ। একপ্রকার বিনা যত্নেই এদেশের কৃষকেরা ফসল ফলিয়ে আসছে। সারের ব্যবহার তারা করে না; তার ব্যবহারও জানে না। সারের ব্যবহার যদি জানত আর ব্যবহার যদি করত, তা হলে পূর্ব-বঙ্গে যেসব জমিতে কৃষিক্রমের চাষ হয় তা দিয়ে কেবল পূর্ব-বঙ্গের নয়, সারা পাকিস্তানের খাজানাব মিটানো যেতে পারত। কিন্তু কৃষকদের ভিতরে সে উদ্ভব ও জ্ঞানের অভাব। গাভী-গ্রাম সেবাশ্রমের কর্মীরা নিজেদের প্রত্যক্ষ কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে গ্রামবাসীর হৃদয়ে সেই শিক্ষা ও উদ্ভব সঞ্চার করতে চেষ্টা করে আসছেন। হাঙ্গুরের মলমূত্রকে উদ্ভব সারে পরিণত করার ও তা জমিতে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া, হাড়ের সার ও অজাভ সারের ব্যবহার, কোন জমিতে কি ভাবে প্রয়োগ করা বিধেয় সে সবের পরিচয় গ্রামবাসীরা প্রত্যক্ষ ভাবে আশ্রম কৃষি-প্রদর্শনীতে পেয়ে থাকে।

বিভিন্ন শ্রেণীর সজী-বীজ ও চারা, ফুলের বীজ প্রভৃতি গ্রামবাসীর মধ্যে বিতরণ ও বিক্রয় করা হয়। গত শতাব্দির সজী হিসাবে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, পালং, লেটুস, ব্লা, গোল আলু, টমেটো, রসুন, বেগুন, মরিচ, লাউ, কুমড়া, পানিকচু, মানকচু প্রভৃতির চাষ করা হয়েছিল। তা হাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর-কলা, পেঁপে, ত্রিহটের আমরাস, আক প্রভৃতির চাষ জমিতে ছিল। শীত-অন্তে গ্রীষ্ম-সজীর চাষের কাজ চলে। একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসলের চাষ ও ফসলের হাস-বৃদ্ধির পরীক্ষাদি কার্যও পরিচালিত হয়। তখনকার প্রতিবেশিনীর একটি বাগান আশ্রমের রক্ষণাধীনে আছে।

এ ছাড়া আশ্রমের নিজ বাগানে আম, লিচু, কাঁঠাল ও নারিকেল প্রভৃতির কয়েকটি গাছ আছে যাদের ফলম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক মানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। গাছের কোনটাতে ফল হয় না, কোনটাতে হয়ে নষ্ট হয়, ফল পচে যায় বা ঝরে পড়ে যায়। কোনও কোনও গাছে নানা-প্রকারের কীট-পতঙ্গের উপদ্রব, পরগাছার উপদ্রব। এ সবের প্রতিকারমূলক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাদির পরীক্ষা-কার্যও পরিচালিত হয়। স্থানীয় লোকদের দৃষ্টি সর্বদা এই সব পরীক্ষাকার্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অল্পসংখ্যক ব্যক্তির সাপেক্ষে কর্মীদের সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা

করেন। বাধরগঞ্জ থানার সরকারী কৃষি আপিসের সহিত সর্বদা যোগাযোগ রাখা হয়।

গ্রামের হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশিগণ আশ্রমকে কিছু বাঁশ ও জুপারি গাছ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ত্রিঅতুলচন্দ্র দাস তাঁর হাল-বলদও মধ্যে মধ্যে আশ্রমকে চাষের কাজের ভাণ্ডে দিয়েছেন।

২। চিকিৎসা-বিভাগ—দরিদ্র গ্রামবাসীদের চিকিৎসাও একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিভাগ খোলা হয়েছে। আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসার উপযোগী ফাউন্ডে ওষধপত্রও এখানে রাখা হয় এবং ১৩৫৪ সালে আশ্রমের প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় হতেই এই চিকিৎসা বিভাগ থেকে বিনামূল্যে এভাবে সম্প্রদায়-নির্কির্শে বশী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর রোগীকেই চিকিৎসা করা হয়েছে। আশ্রমের কোনও স্থায়ী ডাক্তার না থাকায় ও লোকের দানের উপরেই নির্ভর করতে হয় বলে সক্ষম ব্যক্তিদের নিকট থেকে বর্তমানে কিছু কিছু ওষধমূল্য নেওয়া হয়। ওষধমূল্যও বাজারের সাধারণ ব্যবসায়ী ডিসপেনসারীর ওষধমূল্য অপেক্ষা অর্ধেক কম, কিন্তু এই মূল্যও গরীব কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের নিকট থেকে নেওয়া হয় না। চাকার তৈমিক ডাক্তার বন্ধু আশ্রমকে কিছু ওষধপত্র দিয়ে বিভিন্ন সাহায্য করেছেন।

বাধরগঞ্জ থানার কতক এলাকায় কলোরা মহামারীর আকারে দেখা দেওয়ার আশ্রম-সংলগ্ন গ্রামের জনসাধারণকে প্রতিষেধক ব্যবস্থাবল্লব সরকারের ভানিটারী বিভাগের সহ-যোগিতার আশ্রমের ভরফে কর্মীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে এন্টি-কলোরা ইন্জেকশন দিয়েছেন এবং সতর্কভাষূলক ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয়ে জনসাধারণকে উপদেশ দান করেছেন। ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ওষধও দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া কর্মীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে কাজ করতে অনেক সময় দিতে হয়েছে।

৩। মৌমাছি-পালন—আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশে মৌমাছি-পালন কৃষক-গৃহস্থের একটি অবশ্যকরীয় কাজ। মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তারা এটা করে না, কৃষির ফসল উৎ-পাদন বৃদ্ধি অথবা ফুল ফলের পরাগ সংযোগের উৎকর্ষ সাধন হিসাবে সেদেশের এবং পাশ্চাত্যের আরও বহু অঞ্চলে কৃষক গৃহস্থেরা মৌমাছি পালনকে অপরিহার্য শিল্প হিসাবে অথবা কৃষির উপলব্ধ শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ভারত ডোমিনিয়ন ও পাকিস্তান কৃষিপ্রদান দেশ। কাজেই এ দেশে আরও বেশী করেই কৃষকদের পক্ষে মৌমাছি পালন আবশ্যক। গ্রামবাসীর মধ্যে মৌমাছি পালনের অনুগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আশ্রমে কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি পালনের কাজ শুরু করা হয়েছে। এই একটা নতুন বিষয়ে লোকের উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মধু সংগ্রহের পদ্ধতি এদেশের সুন্দরবনের

প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়; আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কৃত্রিম মৌবানি থেকে মুক্ত সংগ্রহ করা হয়।

৪। হাঁস-মুরগী-কবুতর পালন—বাবলনগরের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীরূপে হাঁস, মুরগী ও কবুতর পালনের কাজ কিছুদিন হ'ল হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫। বিদ্যালয়, পাঠাগার ও সার্বজনীন অস্থানাদি—

আশ্রম পরিচালনার গান্ধীজী-পরিকল্পিত ওয়ার্কী-পদ্ধতি অনুযায়ী একটি বিদ্যালয় চলছিল। বিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্মিশেষে-সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েই শিক্ষা লাভ করত। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এখনও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ভয়মন আশ্রয়ী ন'ল হওয়ার এবং অভিভাবকেরাও এর সমর্থক না থাকায় বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি সমগ্রভাবে সুরু করার অসম্ভব হ'চ্ছে। মানা দিক বিচার করে গণ জাহুরারী মাগে পূর্ববঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অগ্রমোদিত পাঠ্যক্রমের সহিত সঙ্গতি রেখে কতক পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা হয়, যাতে করে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে তাবীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রম অগ্রসরণ করতে অসম্ভব না বোধ না করে। সেই সঙ্গে সেলাই, কৃষি পরিচর্যা, হুতাঁকাটা, চরখা-সরঞ্জামের ব্যবহার ও গান্ধীজীর আদর্শে চরিত্র-গঠনের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষয়িত্রী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার নিয়েছেন।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পরদিনে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ ও কৃষী ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা উভোগী হয়ে সার্বজনীন অস্থানাদির আয়োজন করে। এই সব অস্থানে ছেলেমেয়েরা চতুর্পার্শ্বের গ্রামের হিন্দু-মুসলমান মরনারীকে বোগদানে আহ্বান করে। আবৃত্তি, প্রবন্ধাদি পাঠ, গান, শিক্ষাপ্রদ অভিনয়, প্রার্থনাসভা ও আলোচনাদির ভেতর দিয়ে তারা লোকশিক্ষা প্রচারে একটি বড় অংশ নিয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে একটি পাঠাগারও খোলা হ'য়েছে। বর্ষা ব্যতীত অভ্যন্তরীণভাবে প্রতি শুক্রবারে ছেলেমেয়েরা সকালে প্রাতঃ কেরী বের করে। প্রাতঃ কেরী মাগে গণ-সংযোগ। ছেলেমেয়েরা কতকটা সবর গ্রাম সাফ ও পথঘাট সংকারের কাজ করে। বিকালের দিকে বিশেষ প্রার্থনাসভা ও সূর্যযজ্ঞের অস্থান হয়।

কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান বাড়ী থেকে প্রার্থনাসভা ও সূর্যযজ্ঞ অস্থানের আমন্ত্রণ আসে এবং আশ্রমকর্মীরা ও বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা সকলে সোৎসাহে মিলে নিজ চরখা ভকলী পাঁচ হাতে করে আহ্বায়কের বাড়ীতে উপস্থিত হ'ন। সূর্যযজ্ঞ ও গ্রামের লোকের অর্থনৈতিক ও ধর্ম-নৈতিক বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে বিতৃত আলাপ-আলোচনার

পর প্রার্থনা সুরু হয়। আশ্রমের প্রার্থনা-পদ্ধতি গান্ধীজী-প্রবর্তিত প্রার্থনারই অরূপ। সকল ধর্মের প্রতিই সমান শ্রদ্ধা ভাব পোষণ করা গান্ধীগ্রাম সেবাপ্রমের আদর্শ।

৬। হরিজন উন্নয়ন—হরিজনদের সর্বপ্রকার উন্নতিবিধান কর্মসূচীর একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে জাগৃতির অভাব। যে ছ-চার জন লোক এদের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে তাদের প্রায় সকলেই নিজেই নিয়ে অভ্যন্তর ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হরিজনদের অনেকেরই আচার-ব্যবহার প্রায় অমার্জিত, নৈতিক ও আর্থিক জ্ঞানেও তারা অনেকেরই প্রায় বঞ্চিত; আর সেই সব কারণেই সমান সামাজিক মর্যাদার অধিকারীও ভয়মন হতে পারে না। তাই এদেরকে জাগ্রত ও শিক্ষিত করে ভালার চেষ্টা করা হ'য়েছে। নিরন্তর সাহচর্য ও নৈতিক বুদ্ধি দান করে তাদেরকে সুশিক্ষিত করার চেষ্টা চলছে। তাদের নিরন্তরতা দুর্ভাগ্যবশতের উদ্দেশ্যে একটি নৈশ বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা করা হ'য়েছে; বর্ষা ভাবে তাদের সঙ্গে মিলে তাদেরকে মর্যাদাসম্পন্ন মাগরিকের যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে।

হরিজন ছেলেমেয়েদের আশ্রম-বিদ্যালয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্গহিন্দু, হরিজন, মুসলমান ছেলেমেয়ে সকলেই এক সঙ্গে পড়াশুনা ও খেলা করে এবং এই সব ছেলেমেয়ের চরিত্রে বর্গবিবেচনের ভাব একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। আশা করা যায়, এরাই যখন সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে তখন হরত আলকার হৃৎকর মনোভাবের অবগান ঘটবে।

৭। হুতাঁকাটা—পূর্ববঙ্গে বঙ্গ বিষয়ে বাবলনগরের উপযোগী উপকরণের অপ্রভুত নেই। শিক্ষা ও আশ্রমের অভাবেই লোকে এই সব ব্যবস্থা কাজে লাগাতে অসম্মত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গ বিষয়ে আরও বেশ বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতের মধ্যে গিয়ে আমরা পড়ছি। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, শিল্পপ্রধান নয়। কৃষক ব্যতীত বাকী লোকের কর্ম চাই। সবাই কিছু ডাক্তার, মোক্তার, ব্যারিষ্টার হতে পারে না। কাজেই কৃষি-শিল্পের ব্যাপক প্রচলনে উদ্যোগী হলে আমাদের মধ্য-বিদ্য, হরিজ ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান হতে পারে। পূর্ববঙ্গ সরকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর জোর চেষ্টা করছেন এদেশে হুতা ও কাপড়ের কল বসাবার ক্ষেত্রে। আমরা বলি হুতা ও কাপড়ের কল না বসিয়ে 'অতীত শিল্পের কলকার-খামা প্রতিষ্ঠা করা অনেক ভাল এবং সেটিই কাম্য। বঙ্গ-শিল্পকে কেন্দ্রীভূত করার ভাববহতা সম্পর্কে গান্ধীজীর উক্তি আমাদের চোখের সামনে আসে। তিনি বলেছেন : 'বঙ্গ-কলা ইউরোপকে ধ্বংস করতে আরম্ভ করেছে। ইংরেজদের দরজার ধ্বংস করাতে করছে। আধুনিক সভ্যতার প্রবাদ প্রতীক যন্ত্র। যন্ত্র একটি মহাপাপরূপ।

“বোম্বাইয়ের কলগুলোর কর্মীরা গোলাম সেজেছে। কলে যে সব মেয়ে কাজ করে তাদের অবস্থা কি ভয়াবহ। যখন কোমণ্ড কল ছিল না তখন এই সব মেয়েকে অনাহারে থাকতে হয় মি। আমাদের দেশে যদি এই যান্ত্রিক উন্নয়ন বেড়ে চলে, তা হলে এই দেশ অন্নবী দেশে পরিণত হবে।... কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে, ভারতবর্ষে মিলের সংখ্যা বাড়ানোর চাইতে ম্যানচেষ্টারে টাকা পাঠিয়ে কিনকিনে পাভলা ম্যানচেষ্টার-কাপড় এনে ব্যবহার করা অনেক ভাল। ম্যানচেষ্টার-কাপড় ব্যবহার করে আমরা কেবল পরসাই মট করি, কিন্তু ভারতবর্ষে ম্যানচেষ্টার সৃষ্টি করে আমাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদেরকে ধন রক্ষা করতে হবে। কেননা আমাদের মৈত্রিক চুরিদের ভিত্তি মট হবে...। নিঃস্ব ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে পারে, কিন্তু আমার ভারতবর্ষের পক্ষে এটা কঠিন হবে যে দুর্নীতির তেজর দিয়ে ধনবান হয়ে সে তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে।”

পাকীস্তানের এই সাবধানবাণী সন্মুখে রেখে পাকীস্তান সরকার গ্রামের ভেতরে চরখা প্রবর্তনের কাজ করে আসছেন। পূর্ববঙ্গে তুলার অভাব নেই, এই কাজে কতকগুলি গঠনমূলক অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানও আছে। কিন্তু আবহাওয়া অর্থ এবং লোকের মৈত্রিক শিক্ষা ও শ্রমশীলতার অভাবে আমাদের কাজ আশারূপে অগ্রসর হচ্ছে না। সরকার আগ্রহশীল হলে এই সব প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দান করে বস্ত্র-সাবলম্বনের তথা কুটির-শিল্প প্রবর্তনের কাজকে সাকল্যমণ্ডিত করতে পারেন।

এই উদ্দেশ্যে আশ্রম থেকে গ্রামের প্রতিটি হিন্দু মুসলমান বাড়ীতে কার্পাস তুলার বীজ বিতরণ করা হয়েছে। ১৬টি বাড়ীতে ১৪১৪টি বীজ দেওয়া হয়েছে। এই স্রোত বাড়ী বাড়ী বসে বীজ হতে তুলা প্রসূত করা থেকে আরম্ভ করে স্রোতকাটা পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হয়েছে। গ্রামের মরমারী বালকবালিকা স্কুলের মধ্যেই এ বিষয়ে একটা উৎসাহ ও অঙ্গুদ্বিগলার পরিচয় পাওয়া যায়। চরখার অর্থ-মৈত্রিক দিকটা তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

গ্রামের কয়েকটি পরিবারে চরখার স্রোতকাটার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে এবং আশ্রম থেকে তাদের বহু-তকলী

করে দেওয়া হয়েছে। বাঁশের চরখা ও বহু-তকলী গ্রামে বিস্তার করে নিতে পারা যায়। অস্তি সহজ যন্ত্র। তৈরিতে বা ক্রেতে বেশী কিছু ব্যয়ের প্রয়োজন নেই।

৮। রাস্তা নির্মাণ—বেবাক গ্রামে আশ্রমের চেষ্টায় ৭ বছর একটি নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। রাস্তাটি দৈর্ঘ্য ৩১১ হাত। তার মধ্যে ৮০০ হাতের কিছু অধিক খেজাশ্রমে ১৭০৩ হাত ক্রীতশ্রমে বাঁধা। এই রাস্তার জন্ম ইউনিয়ন বোর্ডের মিকট থেকে ৮৫ টাকা সাহায্য পাওয়া গেছে। গ্রামের জমাব হাতেমতাই হাওলাদার ও জমাব মহম্ম হাওলাদার আট টাকা করে ঘোল টাকা ও জমাব এছাহব হাওলাদার, প্রতিশ্রুত নয় টাকার মধ্যে দুই টাকা সাহায্য করেছেন।

এই প্রসঙ্গে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে ত্রিগুণাচরণ কাইতে নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর উত্তম ও সহযোগিতা ন পেনে এই দীর্ঘ রাস্তাটি সম্পন্ন হওয়া দুই হুঃসাধ্য ব্যাপার হ'ত।

এই রাস্তা ছাড়া বেবাক-কলসকাঠি জেলাবোর্ডের রাস্তাটি গত বছরে আশ্রম থেকে পোনে তিন শত টাকা ব্যয়ে মেরামত করা হয়েছে। এ রাস্তার বর্ষাকালে ঢলাফেরা করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। মিঠাজু জরুরী ব্যাপার ছাড়া লোক পথে বেরুত না। এ রাস্তাটি এ বছরে আশ্রমকর্মীরা গ্রামের ছোট ছেলেরা নিয়ে মেরামত করেছে। আশ্রম থেকে টাকা দিয়ে কিছু মাটিও এবার দেওয়া হয়েছে এবং কতকটা অংশ পাক করা হয়েছে। সমগ্র অংশই পাকা করার ইচ্ছা আশ্রম-কর্তৃপক্ষের আছে। কিন্তু আশ্রমের সফল বলতে একমাত্র ভিকারুজি।

তবে এই অনিশ্চিত সময়ের উপর নির্ভর করার অনেক অল্পবিধা ও বিপদ আছে। এইজন্য আশ্রমকর্মীরা চেষ্টা করছেন যেমন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে এই সব সংকল্পের অহুষ্ঠান বজায় রাখতে পারা যায়। পূর্ববঙ্গ সরকার যদি কিছু আর্থিক সাহায্য করেন তবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের মারফতে রাষ্ট্রের তথা জনসাধারণের ত্রিগুণিতক আরও বহু কাজ করা সম্ভব হবে বলে আশা করি।





হেলসিন্কির প্রবেশ-মুখ। ফিনল্যান্ড উপসাগরের দ্বীপাবলী মবাগতদের যেম অভিমুখন জানাইতেছে

হেলসিন্কি

ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিন্কিতে এবারকার অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অচুষ্টিত হইতেছে। এই অচুষ্টিত আগামী ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত চলিবে। এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতেও ফুটবল, হকি, ওয়াটারপোলো প্রভৃতি বিভিন্ন টিমের খেলোয়াড়দল এবং মুষ্টিযোদ্ধা, সাঁতারু ও কুস্তিগীরেরা হেলসিন্কিতে গিয়া পৌছিয়াছেন। এ ক্রীড়াচুষ্টিতে যে দুইটি মেয়ে সমুদ্রগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে গিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের শ্রীমতী আরতি সাহা তাঁহাদের অন্যতমা। এতদুপলক্ষে হেলসিন্কিতে দুই লক্ষেরও অধিক দর্শক সমাগম হইবে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

অগণিত ব্রহ্ম, সমুদ্রগর্ভস্থ অসংখ্য দ্বীপমালা ইত্যাদির সমাবেশে ফিনল্যান্ড প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলানিকেতন। এখানকার বন্যাহরিণ-চালিত স্নেজগাড়ী আর মেরুপ্রদেশের ভল্কেসের কথা আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। প্রধানতঃ বিমানযোগে অথবা রেলপথে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোম হইয়া ফিনল্যান্ডে যাইতে হয়। জলপথে ষ্টকহোম হইতে হেলসিন্কিতে যাইতে লাগে তেইশ ঘণ্টা। কোপেনহেগেন, হামবুর্গ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্যারিস এবং মস্কো হইতেও সরাসরি বিমানপথে হেলসিন্কি পৌছানো যায়।

উত্তর দিক হইতে আর একটি রাস্তা টোর্নিওর হেপারাণ্ডা হইয়া হেলসিন্কিতে গিয়াছে। এই রাস্তায়

গেলে ল্যাপল্যাণ্ড সহস্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে। তুবারাবৃত প্রাস্তর, ইতস্ততঃ বিচরণশীল বন্য হরিণের পাল, স্ত্রামোন মংশ্রে পরিপূর্ণ নদীসমূহ—এই সকল দৃশ্যবৈচিত্র্য ভ্রমণকারীর মনকে বিষয়ে অভিভূত করে।

হেলসিন্কির আয়তন ৬৪ বর্গমাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা চার লক্ষ। সুতরাং ইহা একটি বৃহৎ নগরী বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য মহানগরীর ন্যায় প্রকৃতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। শহরটি প্রায় চারিদিকেই সাগরদ্বারা বেষ্টিত।

জুলাই ও আগষ্ট এই দুইটি মাস হেলসিন্কির গ্রীষ্মকাল। এই সময় এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়নমনমুগ্ধকর। গ্রীষ্মঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই শহরের পতিপার্থস্থ এবং উজ্জানসমূহের অগণিত তরুজাতি প্রচুর শ্রামল পত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, নির্মল বাতাস দেহে বুলাইয়া দেয় স্নিগ্ধ স্পর্শ। এখানকার আকাশ স্বচ্ছ স্থলীল—কারখানার ধূমে কলঙ্কিত নহে এবং বায়ু বিশ্রী গন্ধে ভারাক্রান্ত নহে। শহরের যে-কোন উচ্চ অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া নিম্নাভিমুখে তাকাইলে দীপমালায় ঋচিত সাগরসমূহের বারিরাশির অনন্ত বিস্তার এবং সুবিশীর্ণ স্থলভূমিতে দিগন্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত বনভূমির শ্রাম সমারোহে বিস্মিত বিমুগ্ধ হইতে হয়।

সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি পার্ক, খেলার মাঠ, ব্যায়াম-

প্রাঙ্গণ ইত্যাদি লইয়া হেলসিঙ্কি রীতিমত গোরববোধ করিতে পারে। অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রায় সবগুলিই ব্যবহৃত হইবে। শহরটি সুপরিকল্পিত ভাবে নির্মিত এবং গৃহাদি নির্মাণের সময় বাড়ী ও রাস্তার উপরকার গাছপালা যতদূর সম্ভব কম বিনষ্ট করা হইয়াছে।



বিবাহ-মাটকের একটি দৃশ্য। ক্রন্দনরতা ধর্ম-মাতা কদে'কে ভাবী জীবনের অল্প প্রভু হইতে বলেন। কদে'ও ক্রন্দন করিতে থাকে

যে ষ্টেডিয়ামে ক্রীড়া দি অল্পাধিক হইবে তাহা শহরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ষ্টেডিয়ামের পরেই যে পার্কটির কথা উল্লেখযোগ্য তাহার নাম ইলাইনটাণী অথবা 'জু'। আসল চিড়িয়াখানাটি কিন্তু কোরকিয়াসারি (উচ্চ দ্বীপে) অবস্থিত।

শহরের উপকণ্ঠে বারিরাশির উপর যে অগণিত দ্বীপমালা বিস্তৃত কোরকিয়াসারি তাহাদেরই অন্যতম। শহরের ঠিক মাঝখানটিতে অবস্থিত একটি পোস্তা হইতে নোকাযোগে দশ মিনিটে ঐ স্থানে পৌঁছিতে পারা যায়। সিউরাসারি (সোসাইটি আয়ল্যান্ড) দ্বীপের প্রদর্শনযোগ্য প্রবাদিও দেশের সমুদয় অঞ্চলের অধিবাসীদের আকৃষ্ট করিয়া থাকে। শহরবাসীরা মাঝে মাঝে ছুটির দিনে নগরের বহিঃস্থ মিউজিয়মে গিয়া সেখানকার গোলাবাড়ী, কাঠের তৈরি কুটির, তালুকদারের বাটী, নোকার ছাউনি এবং কাঠের গীর্জা ইত্যাদি দেখিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করে।

ফলে গ্রা.

তাহাদের কখন

হেলসিঙ্কির চতুষ্পা

ইত্যাদির পক্ষে বিশেষ উপযো

দূরে এমন সব চমৎকার বিস্তীর্ণ

যেখানে ক্যাম্প করিয়া থাকা যায়। মিউ

রাজধানীর বাহিরে গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রবাসের

নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া এইরূপ প্রমোদভ্রমণে উৎসাহ

প্রদান করেন। সমুদ্রস্নান এবং গৃহের বাহিরে সাধারণ

স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও যথোচিত ব্যবস্থা আছে।

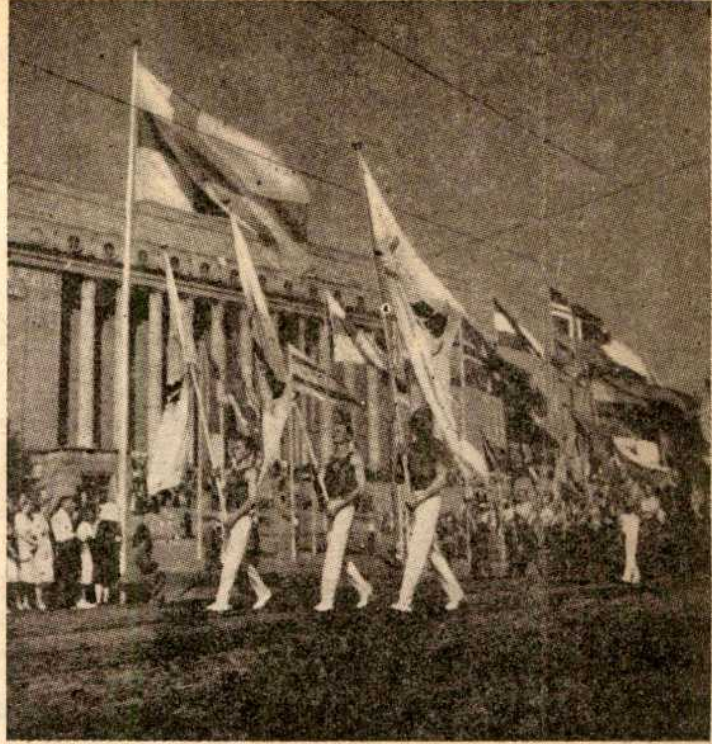


জাতীয় ক্রীড়া দি-দোড়ের অল্প প্রভু

নগরোপকণ্ঠে বহুসংখ্যক কুটিরসম্বিত এমন সব উপ-নিবেশ আছে, যেখানে শহরবাসীরা রোজ অপরাহ্নকাল এবং সপ্তাহান্তে ছুটির দিন কাটাইতে পারে নিজদের ক্ষুদ্রায়তন জমি চাষ করিয়া। তা ছাড়া হাজার হাজার নাগরিক সপ্তাহান্তিক ছুটি এবং অবসর-সময় বাপন করে সাগরের বুকে মাহ ধরিয়া, নোকা বাহিয়া অথবা মন্থা-অনুযায়িত দ্বীপে ক্যাম্প নির্মাণপূর্বক অবস্থান করিয়া। টেনিস এবং অল্পরূপ অন্যান্য জনপ্রিয় ক্রীড়া দিও হেলসিঙ্কির নাগরিকদের গ্রীষ্মকালীন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

শীতকালে ফিনল্যান্ডের পার্কতা প্রান্তর তুষারাবৃত হইয়া এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। ফিনিস ছেলেরা তখন তুষারের উপর স্কি ক্রীড়ার জন্য এক দুনিবার আকর্ষণ অল্পভব করে। শীতের শেষভাগে মেরুপ্রদেশের প্রকৃতি যখন শুভ্র বসনে নিজের দেহ আচ্ছাদিত করে তখন ফিনিস

স্কুলগুলিকে স্কি-ক্রীড়া উপলক্ষে ছুটি দেওয়া হয়। স্কুলের ছাত্র, বাড়ীর গৃহিণী, এমন কি আপিসের কর্মচারীদের দ্বারা পর্যন্ত বোঝাই ট্রেনগুলি স্কি-ক্রীড়া-প্রদর্শনের অভিমুখে রওনা হয়। কোনো কোনো সমিতি ল্যাপল্যাণ্ড অথবা মধ্য-ফিনল্যান্ডের এতদঞ্চলে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে। হেলসিন্কে শহরতলীস্থ তুষার-প্রান্তরেও নিয়মিত ভাবে স্কি-ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। হেলসিন্কে হইতে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরবর্তী এক স্থানে, একটি হ্রদের তীরে 'ফিনল্যান্ডিয়া পিক্টোরিয়াল' নামক কাগজের স্বত্বাধিকারীদের একটি কাঠনির্মিত গৃহ আছে। কোম্পানির জনৈক কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে, 'কোম্পানী বালকসংঘ'র সভ্যরা স্কি-এর ছুটি উপলক্ষে ওখানে গিয়া সকলে মিলিয়া একত্রে ঐ গৃহে মনের আনন্দে অবস্থান করে এবং স্কি-প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।



১৯৪৭ সনের উৎসব-ক্রীড়ায় যোগদানকারীদের মিছিল

ফিনল্যান্ডের পূর্বভাগের গ্রামাঞ্চলে গত শতাব্দীর শেষভাগে যে ধরণের বিবাহ-অনুষ্ঠান উদ্ঘাপিত হইত

তদনুরূপ অনুষ্ঠানের অভিনয় কিছুকাল আগে একদল কারোলিয়ান বর্জুক হেলসিন্কে এগজিভিশন হলে উৎসাহী দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। আনুষ্ঠানটি বড়ই চিত্তাকর্ষক।

বিবাহ-নাটকের যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-মাতার পাশাপাশি মন্ডর পদক্ষেপে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইল কনে'। কিছুক্ষণ পরেই কনে'র ধর্ম-মাতা একেবারে উচ্ছ্বসিতভাবে কান্না জুড়িয়া দিলে—কনেও পিতৃগৃহ হইতে চিরতরে বিদায় লইয়া যাইবার প্রাক্কালে আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। কনে' যদি এই উপলক্ষ্যে না কাঁদে তাহা হইলে নূতন গৃহে যাইয়া সে নাকি স্থখী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য। স্থান কনে'র বাড়ী। বরপক্ষের লোকেরা সেখানে হাজির হইয়াছে, কন্যাপক্ষীদেরা নানা ভেট দিয়া তাদের আপ্যায়িত করিতেছে। পাত্রপক্ষের মুখপাত্রকে একটি কোর্ডা উপহার দেওয়া হইল। তিনি উহা গায়ে দিলে পর কন্যাপক্ষের এক জন বর্ষীয়সী মহিলা প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী কোর্ডার উপর তাঁহার কোমরে একটি বস্ত্রখণ্ড বাধিয়া দিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য। স্থান ভোজনাগার। ডিনার টেবিলের উপর ভোজনপাত্রে অনেকগুলি কেক সংস্থাপিত। অভ্যাগত যথারীতি স্বাগত করা হইল। তারপর বরের পিতা ও কনে'র পিতা করমর্দন দ্বারা এই বিবাহে পারম্পরিক সম্মতি প্রদান করিলেন এবং এই মিলন বাহাতে স্থায়ী হয় সেজন্য একে অপরের কোর্ডার প্রান্ত হস্তধায়া ধারণপূর্বক স্মিত হাস্তে পরস্পরের পানে তাকাইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই এই নাটকের উপর যবনিকা পাত হইল।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে হেলসিন্কে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য এখন এই অনুষ্ঠান প্রত্যাহত হইল তখন এখানকার ক্রীড়াঅুরাগী নাগরিকদের মন নৈরাশ্রে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তার পর হইতেই তাহারা কবে হেলসিন্কে বাস্তবিকই অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হইবে আকুল আগ্রহে সেই শুভদিনটির প্রতীক্ষা করিতেছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা অলিম্পিক ড্রেস রিহাসেলের মত একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তদুপলক্ষে

হেলসিন্কেতে বিবিধ ক্রীড়াকৌশলদি প্রদর্শিত হয়। সেই অমুঠানে বহু সহস্র মল্ল ও ব্যায়ামবীর—তন্মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই ছিল—যোগদান করে।

আজ হেলসিন্কেবাসীদের দীর্ঘকালপোষিত আকাজক্ষা চরিতার্থ হইতে চলিয়াছে। হেলসিন্কে ১৯৫২ সালের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্ররূপে নির্বাচিত হওয়ায় সেখানকার নাগরিকেরা নবীন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া

উঠিয়াছে। এই অমুঠান সর্বাদ্রুদর ও সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পথে যে সকল প্রতিবন্ধক বিद्यমান তৎসমুদয় অপসারিত করিতে আজ তাহারা বদ্ধপরিকর। উৎসবসজ্জায় সজ্জিত পরিচ্ছন্ন হেলসিন্কে নগরী আজ অপরূপ শ্রীমণ্ডিত—অলিম্পিক অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার আয়োজন আজ সেখানে নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গ।*

* ত্রীমলিনীকুমার ভট্ট কর্তৃক সংকলিত।

অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কৌশল

শ্রীগীতা মিত্র ও ক্যাপ্টেন শ্রী আর. ডি. মিত্র

বর্তমানে রক্তনপ্রণালী, খাণ্ডের পুষ্টিকারিতা ও পুষ্টিহীনতা জনিত রোগ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা আছে। রক্তনক্রিয়ায় কি প্রকারে খাণ্ডের পুষ্টিকারিতা, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ অক্ষুর রাখা যায় সেই সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু খাণ্ডের পরিচ্ছন্নতা, রক্তনগৃহের ও রক্তনকারীর পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে রাখিতে হইবে এই সকল বিষয়ের উপরও আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

যদিও আমাদের দেশে বর্তমানে জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার লাভ করিয়াছে, তথাপি এখনও দেশে মলমূত্রের দ্বারা বহুপ্রকার ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া থাকে। নিয়মবদ্ধ ও গন্ধার উপকূলবর্তী প্রদেশসমূহে কলগা রোগের প্রাদুর্ভাব এখনও বর্তমান। এই অবস্থার অমৃততম কারণ জনসাধারণের রক্তনপ্রণালীর অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। এই সম্বন্ধে ভারতীয় সৈন্তবাহিনীর রক্তনগৃহের পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক নির্দেশে কিছু পরিমাণ আলোকপাত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে সহজলভ্য নহে।

সৈন্তবাহিনীর বাহিরে এই সম্বন্ধীয় নির্দেশ বিবল; গত মহাযুদ্ধে বহু নগরীর অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর হোটেলে ও হোষ্টেলে সৈন্যদের খাণ্ডগ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং দেখা বাইতেছে যে, রক্তনগৃহের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিতে হইলে বিশেষ ধরনের নির্দেশ ও নিয়মাবলীর প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সহজ, সরল ও প্রতিপাল্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, বাহাতে লোকে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া নিয়মগুলি মানিয়া চলে। এই নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার পূর্বে সৈন্তবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও সাধারণ হাসপাতালের রক্তনপ্রণালী পরীক্ষা করা হয়। পুণা, কলিকাতা ও দিল্লী প্রভৃতি নগরীর প্রসিদ্ধ হোটেলসমূহে গিয়া তাহাদের রক্তনব্যবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই অনাড়ম্বর, ব্যবহারিক নিয়মগুলিতে

যে পন্থা আপাততঃ দেখিতে ভাল, অথচ সহজ প্রতিপাল্য নহে, তাহার উল্লেখ নাই।

রক্তনশালা ও তাহার চারি ধার

(১) রক্তনশালার চারি ধার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। কাষারস্তের পূর্বে প্রত্যহ রক্তন-কক্ষ ও ভোজন-কক্ষ ঝাঁট দিতে হইবে। ‘প্যাপোম’ হইতে ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। প্রত্যেক বার আহারের শেষে ঝাঁট দিয়া ধূলা না উড়াইয়া ভিজা ঝাড়ন দিয়া রক্তনশালা ও ভোজনকক্ষ মুছিয়া লইতে হইবে। মেঝে পাকা হইলে রাত্রিে গরম জল ও সোডা দিয়া ধুইতে হইবে।

(২) রক্তনশালায় বা উহার নিকট ধূমপান, খুঁ খুঁ ফেলা ও নাক পরিষ্কার করা নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) ভুক্তাবশেষ বা তরিতরকারির খোশা ফেলিবার পাত্র পরিষ্কার রাখিতে হইবে, অমৃত্যয় মাছি জন্মাইতে পারে।

(৪) নিয়োগের পূর্বে রাধুনী ও রক্তনশালার অন্তান্ত লোকেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক নূতন লোকের পূর্বরোগ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। পেটের অম্ল বা ঘোনব্যাধিগ্রস্ত লোককে কিংবা কেহ দুই বৎসরের মধ্যে টাইফয়েড, প্যারা-টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া থাকিলে তাহাকে ভোজনালয়-সংক্রান্ত কোনও কাজে নিয়োগ করা চলিবে না।

(৫) রক্তনশালার লোকেদের একটি তালিকা রাখিতে হইবে, তাহাতে নাম-ধাম, নিয়োগের তারিখ, শেষ ডাক্তারী পরীক্ষার তারিখ, পরবর্তী ডাক্তারী পরীক্ষার দিন, টিকা লওয়ার তারিখ এবং পরে আবার যে তারিখে টিকা লইতে হইবে, তাহা লিখিত থাকিবে। যে তারিখে পরবর্তী ডাক্তারী পরীক্ষা হইবে অথবা টিকা লইতে হইবে, তাহা প্রথমে পেন্সিলে লিখিতে হইবে এবং পরে

পরীক্ষা দিইয়া গেলে পেন্সিলের লেখার উপর কালি দিয়া লিখিতে হইবে। এই তালিকাখানি রক্ষনগৃহের প্রবেশ-পথের নিকটবর্তী দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেকের নামে নামে কাজ ভাগ করিয়া দিতে হইবে—যেমন রান্না, শাকসব্জী কাটা, রান্নাঘরের 'ন্যাতা' ঝাড়নাদি পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

খাত্তব্য ও আবহুযঙ্গিক সরঞ্জামাদি

(৭) প্রত্যহ রান্নার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাত্তব্য রান্নাঘরে রাখা হইবে না। তাহা জাল-দেওয়া আলমারী বা অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে রাখা উচিত।

(৮) যে শাকসব্জী কাঁচা খাওয়া হইবে তাহা নিম্ন-লিখিত উপায়ে ধুইতে হইবে :—(ক) ক্ষত ধারায় পড়িতেছে এইরূপ জলে উত্তমরূপে ধুইতে হইবে, (খ) পরিষ্কার জলে প্রতি গ্যালনে এক চামচ বীজাণুমুক্ত করিবার পাউডার (water-sterilising powder) মিশাইয়া পাঁচ মিনিট ডুবাইয়া রাখিতে হইবে।

(৯) পুনরায় স্বচ্ছ জলধারায় ধুইতে হইবে। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে শাকসব্জীর ভিটামিন বা খনিজ পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়—এই ধারণা ভ্রমাত্মক। কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিষেধের নিমিত্ত উপরোক্ত পন্থা প্রত্যহ অবশ্য অবলম্বন করা উচিত। মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলেই যে এই নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহা নহে।

(১০) কাঁঠরগুড়ের উপর মাংস কাটা উচিত। চপিং ব্লক গরম সোডার জলে বুদ্ধশ দিয়া ধুইয়া, শুষ্কভাবে মুছিয়া, মিহি লবণের গুড়ার দ্বারা প্রত্যহ আবৃত করিয়া রাখা উচিত। রাধুনীদের হাত মোছা গামছা, পাক-করা খাদ্য ঢাকিবার ঝাড়ন সোডার জলে ফুটান উচিত। অন্য সকল ঝাড়ন ও ন্যাতা যাহা রান্নাঘরে ব্যবহার করা হয়, তাহা প্রত্যহ কলের জলে ধোয়া উচিত ও সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে সোডার জলে ফুটান উচিত। ধোয়া কাপড়গুলি সম্পূর্ণ শুকান উচিত।

(১১) বাসনপত্র পরিষ্কার ভাবে ধুইয়া শুষ্ক কাপড়ের টুকরা দ্বারা মুছিয়া আলো-বাতাসময় ঘরের শেলফের উপর অথবা আলমারীতে উপুড় করিয়া রাখা উচিত। সকল বাসনের পরিচ্ছন্নতা সকালে ব্যবহারের পূর্বে ও রাত্রে মাজিবার পর পরীক্ষা করিতে হইবে। রান্নাঘরের যাবতীয় তৈজসপত্র যথা কিম্বার যন্ত্র, চপিং ব্লক, টেবিল, ছুরি, চামচ ও রান্নার বাসন এবং বাসন ধুইবার স্থান সব সময় পরিষ্কার থাকিবে ও কাজের শেষে উত্তমরূপে মাজিয়া রাখিতে হইবে।

কিমা করিবার যন্ত্র ব্যবহার না করাই ভাল। ইহা ও

বাসন ধুইবার স্থান গরম জল এবং সোডা দিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া, মুছিয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক করিতে হইবে। অন্য সব দ্রব্য সাবান ও গরম জলে ধুইলেই চলিবে।

(১২) তেল-ঘি ছাড়াইবার নিমিত্ত বাসন প্রথমে গরম জলে উত্তমরূপে ডুবানো উচিত; সোডা, ছাই কিংবা পোড়ামাটি দিয়া মাজিয়া জলের ধারায় ধোওয়া উচিত। একটি বড় ডামে কিংবা অন্য পাত্রে অনবরত জল গরম করিতে হইবে, ফুটন্ত জলে ভাসমান তৈলাক্ত পদার্থ ঘন ঘন ছাকিয়া ফেলিতে হইবে। ছোট জিনিষ গরম জলে ডুবাইবার জন্য একপ্রকার জলের সাজি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ছাই পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট টিনে রাখা উচিত। তৈলাক্ত বাসন মাজিবার জন্ত নয় ভাগ পোড়ামাটির সহিত এক ভাগ সোডা মিশ্রিত করা বাঞ্ছনীয়। চীনা মাটির পাত্রে জন্ত শুধু সোডা ব্যবহার করা উচিত।

(১৩) ইঁদুর, আরগুলা ও মাছি রান্নাঘরে থাকিবে না। ইঁদুর যে শুধু প্লেগের বীজাণু বহন করে তাহাই নহে। ইহার 'টাইফাস' ও পালাজরের বীজাণুও বহন করে। ইঁদুরের বিষ্ঠায় এক প্রকার কৃমির ডিম প্রচুর পরিমাণে থাকে; খাত্তব্যের সহিত এই বিষ্ঠা পেটে ঢুকিলে উপরোক্ত কৃমি মানুষকে রোগাক্রান্ত করে।

আরগুলা—অনেকে জানেন না যে, আরগুলা মূল-মূত্র দ্বারা সংক্রামিত রোগের একটি প্রধান বাহন। আরগুলা বিষ্ঠা ও বমির উপর বিচরণ করে। কলেরা ও আমাশয় রোগের বীজাণু উন্নয়ন করিয়া আরগুলা এই বীজাণু ত্যাগ করে। ইহা ছাড়াও এই রোগের কোটি কোটি বীজাণু ইহাদের গায়ে ও পায়ে লাগিয়া থাকার জন্ত তাহা অন্যায়সে খাদ্যদ্রব্যে সংক্রামিত হয়।

মাছি—মাছি টাইফয়েড, কলেরা, বম্বা, আমাশয় ও উন্নয়নের বীজাণু খাদ্যে সংক্রামিত করে।

(১৪) রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত নিয়ম যত সামান্যভাবেই কেহ লঙ্ঘন করুক না কেন, নিয়মভঙ্গের জন্য কঠোর ব্যবস্থা রাখিলে নিয়মানুবর্তিতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

তৃতীয় বিশ্বস্বাস্থ্য-সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ কে. ইভাং তাঁহার ভাষণে সতাই বলিয়াছেন যে, আজকাল জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে অজ্ঞতা নহে, বরং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগের অভাবই বহুলপরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। রোগের প্রতিষেধ অথবা চিকিৎসা সম্বন্ধে বর্তমানে যাহা কিছু জানা আছে, তাহার এক-দশমাংশও যদি জনসাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছাক্রমে পরিবেশন করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে বিশ্বের জনসাধারণের জীবনধারণ আজ ভিন্নপ্রকার হইত।

মা-স-য়িন্

ত্রিশান্তিময়ী দত্ত

বার্মা লিমিটে কোম্পানীর বিরাট কারখানাটি ইরাবতী নদীর কোল-ধেসে অবস্থিত। মান্দালয়-রেন্দুস যাতায়াতের পথে ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর বাষ্পীয় পোতগুলি যখন জলদ-গভীর বংশীধ্বনি করিতে করিতে কারখানার ঘাটে আসিয়া ঠেকেত, মাউণ্ড পো-লিন্ তখন তাহার লাল রেশমী লোঞ্জী-খানা কোমরে ঝাটিতে ঝাটিতে বালির ঢালু চড়ার উপর দিয়া উর্ধ্ববাসে ছুটিত। লিমিটের ভারী ভারী বস্তাগুলো নদীর মিলাইয়া গিয়া জাহাজে তুলিয়া দিবার তার তাহার উপর ছিল। দশ মিনিটের মধ্যে অসংখ্য বস্তা উঠাইয়া দেওয়া, হিসাব নিভুল রাখা, মালদ্রাজী সাহেবকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দেওয়া যতক্ষণ না শেষ হইত, ততক্ষণ হাজার ডাকেও পো-লিনের কেহ সাড়া পাইত না। মা-স-য়িন্ জাহাজ ঘাটের কাছে একটা পাছের গুড়ির উপর বসিয়া বালির উপর হুড়ির সাহায্যে আপন মনে কত কি ছবি আঁকিয়া যাইত। দুষ্টি তাহার দিগন্ত-প্রসারিত নদী ও আকাশের মিলন-নীলিমায়। নদী ও পাহাড়ের কোলেই তাহার জন্ম, এ পুরাতন দৃষ্ট সে জন্ম হইতে নিরন্তর দেখিতেছে, তবু প্রতিদিনই তার চোখে কি যে এক নতুন আবেশ আনিয়া দেয়, চাহিয়া চাহিয়া যেন তার আশ মেটে না, মনকে তার “সুহৃদের পিয়াদী” করিয়া তোলে।

পো-লিন চমক ভাঙাইয়া দিয়া বলে, ‘ঘরে, চল মা-স-য়িন্, এক পেয়লা চা না’ পেসে আর গলা দিয়ে কথা বেরছে না।’

মা-স-য়িন্ আনমনে বলে ‘গী-বি-লা?’ অর্থাৎ ‘শেষ হ’ল?’

হুঁকমে গল্প করিতে করিতে বালি-সমুদ্র পার হইয়া চড়াই ভাঙিয়া উপরে উঠিতে থাকে। আশেপাশের লোক উহাদের শুনাইয়া বলে—

‘ভাল যেন আর কেউ বাসে না। বাপরে বাপ্ এই ঠেকো রোজুরে স্বামী মা হয় চাকরীর খাতিরে এতখানি পথ ছুটে আসে, বউটার কি পাগলামি, মেয়েমাছুষ রোদে পুড়ে রোজ রোজ জাহাজখাটার গরম বালিতে পা পুড়িয়ে মরবার দরকার কি বাপু? ঘোড়ে-ঘোড়ে না চললে যেন আর এান ভরে না।’

পো-লিন্ জীকে ঠেলা দিয়া বলে, ‘শুনহিস্ কি বলে সবাই?’

মা-স-য়িনের চোখে তরল ও সুহৃদের নেশা, কিছুই সে শোনে নাই। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলে—জাহাজটার বানী যেন আমার কানে লেগেই আছে, মনে হয় কোন্ সুদূর হতে আমার ডাকছে, আমার মনটাও সাড়া দেয় যাই, যাই।

পো-লিন্ বিমর্ষ ভাবে বলে, ‘আমি ভাবতুম তুই আমার সদ পাবার জন্য বুঝি রোজ রোজ এখানে আসিস্, এখন দেখছি জাহাজের বানীর সুই তোকে পাগল করে, কোন দিন আমাকে ফেলে চলে যাবি না ত?’

মা-স-য়িন্ পো-লিনের কাঁধে হাতখানা রাখিয়া বলে, ‘না না, তোকে ফেলে আমি কোথাও গিয়ে সুখ পাব না, সে ভয় করিস না।’

ঠুন-ভাউণ্ড পাহাড়ের নীচে ধানিকটা সমতল ঘাসঘাস সারি সারি কাঠের ব্যারাক, তাহারই একটি অংশে দুইখানি ঘর ও এক ফালি বারান্দা লইয়া পো-লিন্-দম্পতির বাস। বারান্দার রেলিঙের উপর কাঠের ব্র্যাকেটের সারি সারি কয়েকটি ফুল গাছের টব, লাল টালির ছাদের কিনারা হইতে তারে বোলান অর্কিডের গুচ্ছ। গৃহটি সজ্জা হইলেও লাজে, সজ্জা, পরিচ্ছন্নতার গৃহস্থের অন্তর্ভুক্তির পরিচয় দেয়।

পো-লিনের ঘরের পশ্চাতে বিরাট একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। লাল ফুলের শুবক যখন সবুজ পাতাকে বরাইয়া দিয়া আগুনের বলকের মত চারিদিকের আকাশকেও রক্তবর্ণে রাঙাইয়া দেয়, মা-স-য়িনের মন তখন আর ঘরের কাছে বসে না, কাজের কীকে কীকে ছুটিয়া বাহিরে আসে, আর বরা ফুলের একটি ছোট গুচ্ছ কবরীর এক পাশে গুঁজিয়া দিয়া আনন্দে শিশুর মত করতালি দিয়া গান ধরে।

পো-লিন্ বলে, ‘তুই কি পাগল হয়ে যাবি নাকি? সারা-দিন গাছতলায় গান গেয়ে বেড়ালে কি সংসারের কাজ চলে?’

মা-স-য়িন্ একদিন গভীর ঘরে বলে, ‘জান, কো-লিন্ এই গাছটার এক জন নাই (প্রেত দেবতা) আছে, সে আমার ডাকে, কেবল ডাকে, তার ডাকে আমি ছুটে আসতে বাধ্য হই, আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যা এই গাছতলার পূজো, মৈবেদ্য দিই, একে সন্তুষ্ট রাখার জেদ। আমার মা যখন বেঁচেছিলেন, আমাকে ছোট বেলার বলেছিলেন, ঘরের কাছে যদি কোনও গাছে নাই এসে আশ্রয় নেন, তবে তাকে ধুসি রাখতে হয় নতুবা সে গৃহস্থের অকল্যাণ ঘটায়। এই বাড়ীতে আমার মা চিরদিন বাস করে গেছেন, তিনি জানতেন এই গাছে একটি প্রেত-দেবতার বাস, আমাকে তাই পূজো-অর্ঘ্য দিতে শিখিয়ে গেছেন, আমি যখন ঘরে একা কাজকর্ম করি, মনের ভিতর কে যেন কথা বলে, স্পষ্ট শুনতে পাই, এখন এ কাজ কর না, ওখানে

যেহা না, এ রকম আদেশ করে, অনেক চেষ্টা করেও আমি তার কথা অমাত্য করতে পারি না। মাউন্ট-পো-লিন্ গভীর ভাবে সব শুনিয়া বলিল—“আচ্ছা, স-য়িন্; এত দিন তুমি আমার এ সব কথা বল নিত ? আমি এ সব ভুল-প্রেতে বিশ্বাস করি না, তুমি এমন সেকেন্দ্রে কুসংস্কারি মেয়ে, তা ত জানতাম না। চল, আমরা এ বাড়ী ছেড়ে অল্প একটা বাড়ী নিই, তাতে তোমারও শান্তি, আমিও নিশ্চিন্ত হই। এই জুই বুঝি তুমি বাড়ীতে একা থাকতে চাও না ?”

মা-সয়িন্ স্বামীর গলা হুই হাতে জুড়াইয়া ধরিয়া বলিল—
না, না, কো, তুমি এমন কথা মনেও স্থান দিও না। এত বছরের গৃহ-অধিষ্ঠিত প্রেত-দেবতাকে অমাত্য করতে আমি পারব না, তাতে আমাদের নিশ্চয়ই অমঙ্গল হবে। এককাল মা এ বাড়ীতে থেকের তার দেবা করেছেন, আমার ভাই, বোন, মা সব এ বাড়ীতেই মরেছেন, আমিও যত দিন বেঁচে থাকব, এই দেবতাকে আমিই আহা-জল দেব। তুমি আমার কথা শোন, হুপাতা ইংরেজী পড়ে আমাদের চিরন্তন সংস্কার, বিশ্বাসকে অগ্রাহ করলে ভাল হবে না কখনও, বুঝলে ?”

পো-লিন্ একটি ছোট “হ” বলিয়া চলিয়া গেল।

সেদিন ছোট শহরটিতে আশেপাশের গ্রাম হইতে অসংখ্য গরুর গাড়ী, একা গাড়ী, লাল মাটির পথে ধূলা উড়াইয়া যাত্রী বোকাই করিয়া আসিতেছে। পায়ে-চলার সড় পথে মাঠের উপর দিয়া পিপীলিকার সারির মতন কাল মাগার স্রোত স্থানীয় আদালত-গৃহের অভিমুখে চলিয়াছে। সকলেরই মুখে এক কথা—“আশ্চর্য্য। মা-সয়িন্ বুদী আসামী। এত বিশ্বাস করতে হবে।” বর্মী ভরুণের দল উত্তেজিত—“পো-লিন্ এমন হুনাহসের কাজ করল কেন ? বাপ-পিতামহ যা বলে গেছেন, তা মেনে চলাই ত উচিত ছিল।” ভরুণীরা বাধা দিয়া বলিতেছে—“তা বলে স্বামীকে হত্যা করবে ত্রী ? এত বড় পাপ বর্ধে সইবে না। কত অভিনয়ই করেছিল এই মা-সয়িন্, মাউন্ট লিন্কে যেন কতই ভালবাসত। নিশ্চয়ই সে অল্প কোন পুরুষের প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু অবাধ কাণ্ড, মিছে হাতে কুড়ুলের কোপে কি করে মেয়েমাহুষ স্বামীকে খুন করল, বল ত ?”

কেউ বলছে—“নিশ্চয়ই মা-সয়িন্ পাগল হয়ে গিয়েছিল।”
আদালত লোকে লোকারণ্য। বিচারের সময় উপস্থিত। পুলিশের প্রহরী যখন লোহার শিকলে হাত বাঁধা, শুকনুখ ঘোড়ায় ভরুণী আসামী মা-সয়িন্কে উপস্থিত করিল, চারিদিক হইতে—“আহা, আহা, এই কোমল শিশুর মতন, সজ-কোটা গোলাপের মতন মেয়েটিকে ফাঁস দেবে ? না, না, এমন যেন হয় না, হা ফারা (তগবান বুড়), দয়া কর। কখনও এ মেয়ে বুদী আসামী হতে পারে না”, ইত্যাদি মন্তব্য শোনা যাইতে লাগিল।

জুহসাংহেব মা-সয়িন্কে আদেশ করিলেন—“মা-সয়িন্, তুমি তোমার স্বামী মাউন্ট-পো-লিন্কে হত্যা করেছ, তোমার নামে এই অভিযোগ কি সত্য ? এ বিষয়ে তোমার কি বলবার আছে, নির্ভয়ে সত্য কথা বল।”

মা-সয়িন্ এঞ্জির (গায়েব জামা) আঁতুমে চোখের জল মুছিয়া জুহসাংহেবের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সংযত নির্ভীক কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—“বন্দীবতার, আমি বুড়, বর্ধ এইং সজের শরণ গ্রহণ করে শপথ করে বলছি আমিই আমার প্রাণ-প্রিয়-কো-লিন্কে আপন হাতে হত্যা করেছি। কো-লিনের চেয়ে প্রিয়তর আর কেউ নেই আমার এ সংসারে, তাকে ছেড়ে আমার জীবন দুর্ভর্য হয়েছে—আমার কাতর অহরোধ, আপনি যথাসম্ভব শত্রু আমার কাঁসীর আদেশ দিন, আমি দেহ-যুক্ত হয়ে কো-লিনের সন্ধানে যাই।” অঝোর ধারায় হুই চোখ হইতে অঙ্গুর প্রাবনে বক ভাসিয়া গেল, মা-সয়িনের কণ্ঠের ক্রুদ্ধ হইয়া গেল। বিচারপতি নিজের স্বভাবগাভীরা বজায় রাখিয়া বলিলেন, “কেন তুমি এ অপরাধ করলে তা আমরা শুনে চাই।”

মা-সয়িন্ বলিতে লাগিল—“আমার গৃহের সংলগ্ন একটি বৃক্ষে একটি প্রেত-দেবতা বাস করে। আমার জন্মকাল হতে অর্ধাং আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই আমি মায়ের মুখে ইহার অস্তিত্বের বিষয় জানি। আমার মা তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত এই দেবতার সেবা করেছেন এবং আমাকেও সেবার ভার দিয়ে গেছেন। আমি সর্বদাই এই দেবতার আদেশ পাই, সে আদেশ এমনই স্পষ্ট এবং কঠোর যে অমাত্য করবার উপায় নেই। আমার স্বামী এসব বিশ্বাস করতেন না এবং সর্বদাই আমাকে তিরস্কার করতেন, এ বাড়ী ছেড়ে যাবার অল্প ব্যস্ত হতেন। আমি কিছুতেই সম্মত না হওয়ার তিনি আমাকে না জানিয়ে এক দিন কতকগুলি মজুর নিযুক্ত করে গাছটি কেটে ফেলে গাছের ডালগুলি ছালানি কাঠের ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করবার ব্যবস্থা করেন। গাছ যখন কাটা আরম্ভ হয়েছে, আমার মনে তখন কে যেন ভীতবরে বলতে লাগল—“বাধা দাও, বাধা দাও, কাটতে দিও না।” আমি কো-লিনের পায়ে ধরে কত অহুন্ন-বিনয় করলাম, কো-লিন স্তম্ভল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মড় মড় শব্দে গাছের শুষ্কিত্ত বিরাট গাছটি ভু-শায়িত হ’ল। আর আমার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে গেল, আমি অচেতন হয়ে পড়ে গেলাম।...”

গভীর রাতে আমার যখন চেতনা ফিরে এল, দেখি আমি আমার শয্যার শায়িত, পাশের পাশে স্বামী গভীর নিদ্রিত। মুহূর্তের মধ্যে আমার মন যেন হিংস্র পশুর মত দুর্দম ক্রোধে ভরে উঠল, আমার সমস্ত শরীর-মন যেন অদ্ভুত এক পাশব-শক্তির প্রভাবে প্রচণ্ড হয়ে উঠল। আমি নিজের অস্তিত্ব যেন হারিয়ে ফেললাম, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কো-লিনের দিকে তাকিয়ে মনে হ’ল, এ আমার পরম শত্রু, একে এখন

নির্ণয় করা চাই। নিম্নে যে খবরের কোণ থেকে ধারালো কুঠারখানা ভুলে নিয়ে এক কোণে কো-লিনের মাথা ও দেহ স্থিতি করে ফেললাম। গরম রক্ত কিস্তি দিয়ে আমাকে ঘন স্নান করিয়ে দিল। পাগলের মত হা হা করে হেসে উঠলাম, কুঠার হাতে খবরের বাইরে দৌড়ে গিয়ে সেই কাটা গাছভলার আছাড় বেধে পড়লাম। তখন ভোরের আলো সব হৃদয়ে পড়েছে, আকাশে রাঙা-মেঘের বেলা, যুগ্ম মধুর বাতাস বইছে—আমি সে দৃষ্টি উপভোগ করতে চিরদিনই ভালবাসতাম, বুলোয় গড়িয়ে পড়ে আকাশের পানে ভাঙতেই আমি যেন আবার আমার আমিত্বকে ফিরে পেলাম। রক্ত-মাথা লোজ্জি, এঞ্জির দিকে চেয়ে প্রাণ শিউরে উঠল। টলতে টলতে খবরের দিকে ছুটলাম—আমার কো-লিন, আমার প্রিয়তম কো-লিনকে আমি কেন মারলাম। উঃ সে কি অসহ মানসিক যন্ত্রণা, শোকে অহত্যাপে মন জর্জরিত। খবরের সে বীভৎস দৃষ্টি সইতে না পেরে ছুটে প্রতিবেশীদের

ডেকে এনে সব বললাম। কেউ বিশ্বাস করে না আমার কথা; সকলে ভাবে আমার কোন প্রণয়ী কাজ, আমি তাকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে অপরাধী করছি। শেষে উদ্বোধন মত ছুটে গেলাম পুলিশের থানায়, নিজে ধরা দিলাম। আমি আমার কিছু বলবার নেই, ধর্মরাজ বিচারপতি তুমি, তুমিই এ পাণীকে উচিত শাস্তি দিতে পার। তোমরা আমার দয়া কর না, এখন একটা শাসিত তরবার দিয়ে কি কেউ আমাকে কেটে ফেলতে পার না? বলিতে বলিতে মেয়েটি যুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

আদালত নিভক, বিচারপতি শুভিত। জুরীরা একযোগে ঘেরটেকে নির্দোষী বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

বিচারপতি বিশ্বযে জুরীদের মতে দায় দিয়া বলিলেন—
“একম ঘটনা একেবারেই অতৃপ্ত, সুতরাং আমি বাধ্য হইয়াই জুরীদের সহিত একমত হইলাম।”

* সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

অহিংসা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজীর প্রচারের ফলে অহিংসা ধর্মের প্রতি জগতের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বেদেই অহিংসা ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বেদ বলিয়াছেন, কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না—

ন হিংস্তাৎ সর্বাঃ স্তুতানি।১

কিন্তু যজ্ঞে পশু বধের বিধান আছে, তাহা কি হিংসা নয়? বৈষ্ণব আচার্য্য রামানুজ বলিয়াছেন যে, ইহা হিংসা মহে। যাহারা যজ্ঞ করে তাহারা বিশ্বাস করে যে, যজ্ঞে মিহত পশু বর্গে যাইবে। চিকিৎসক রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করে রোগীর কল্যাণের জন্ত, তাহা যেমন হিংসা নয়, সেইরূপ যজ্ঞে পশুবধ হিংসা নয়। যজ্ঞের পশুকে সদোষন করিয়া বলা হয়, “তোমার মৃত্যু হইতেছে না, তোমাকে হিংসা করা হইতেছে না, তুমি সুগম পথে দেবতাদের নিকট যাইতেছ।”

ন বা উ এতন্ ত্রিষসে ন স্নিগ্ধসি

দেবান্ উৎ এষি পশিতিঃ স্নগেভিঃ

ঋগ্বেদ. সংহিতা, ১-১৬২-২১

১। “অশুভম্ ইতি চৈব ন শকাৎ ব্রহ্মহত্যা ত্যাগঃ। এই যজ্ঞের ভাষ্যে শকর ও রামানুজ উভয়েই এই বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ছানোগ্য উপনিষদের শেষ বাক্যে আদর্শ ধর্মজীবনের বর্ণনায় এই বেদবাক্যের অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়, “অহিংসন সর্বভূতানি অহত্যা তীর্থেভ্যঃ” অর্থাৎ যজ্ঞ ভিন্ন অহত সকল প্রাণিবধ হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, শকর প্রভৃতি অজ্ঞ আচার্য্যেরও এই মত। ব্রহ্ম-সূত্রে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদ সম্বন্ধে নিভুল মত প্রচার করা হইয়াছে, ইহা সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন।

আধুনিক পণ্ডিত এই সকল আচার্য্যকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহারা যজ্ঞে পশুবধ করিত তাহারা পশুদের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা করিত না।

বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে মনুসংহিতা একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। ২ মনু সকল অমৃত্যুর সাধারণ ধর্মের মধ্যে অহিংসাকে সর্বপ্রথম স্থান দিয়াছেন। ৩ তিনি বলিয়াছেন এক শত বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, মাংস-

২। মনুর বিধানসকল বেদানুযায়ী।

যঃ কশ্চিৎ কন্তুচিৎ ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ

ন সর্বোহতিহিতো বেদে— (মনুসংহিতা ২৭)

বেদে বলা হইয়াছে, “মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঐশ্বর্যের স্থায়ী,”

যদ্যৈব কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২২।১০।২)

৩। অহিংসা সত্য মন্তেয়ম্ শৌচমিত্যয় নিগ্রহঃ।

এতৎ সামাসিকং ধর্মং সর্ব বর্ণেহব্রবীদমুঃ ৥ মনু ১০.৬৩

“অহিংসা, সত্য, পরজ্ঞা অগ্রহ না করা, দেহ ও মনের শুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—সকল বর্ণের এই ধর্মগুলি পালন করা উচিত—মনু ইহা বলিয়াছেন।”

ভক্ষণ হইতে বিরত থাকিলে তাহার সমান পুণ্য হয়।^৪ যে বধ করে তাহার বেদন পাপ হয়, যে বধ করিতে বলে, যে মিহত পশুর মাংস খণ্ড খণ্ড করে, যে বিক্রয় করে, যে ভক্ষণ করে, যে রন্ধন করে, যে পরিবেশন করে এবং যে ভোজন করে তাহা-
দেয়ও সেইরূপ পাপ হয়।^৫

মহু বলিয়াছেন যে, বর্ষ্য বিপন্ন হইলে ব্রাহ্মণও অন্নগ্রহণ করিবে। আত্মরক্ষার্থ, স্ত্রী ও ব্রাহ্মণ রক্ষার নিমিত্ত, বন-বা-
পশু হরণ নিমিত্ত যুদ্ধে বধ করিলে দোষ নাই।^৬ ঋষিগণ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সংসারযাত্রাতে ইচ্ছা না করিলেও
মানাবিধ ক্ষুদ্র প্রাণী বধ করা অপরিহার্য। গৃহস্থের স্নিগ্ধ
লিখিত স্থলে প্রত্যহ প্রাণী বধ হয় :—(ক) চুলী, (খ) শিল-
নোড়া, (গ) সমার্কনী, (ঘ) উহ্বল এবং (ঙ) জলের কলস।^৭
এই সকল স্থলে প্রাণিবধ অপরিহার্য হইলেও তাহাতে
পাপ হয়। এই পাপ হইতে পরিজ্ঞানের অল্প নিয়লিখিত
অমুষ্ঠানগুলি প্রত্যহ করিতে বলা হইয়াছে : (ক) অব্যাপন,
(খ) পিতৃপুরুষদের তর্পণ, (গ) হোম, (ঘ) বলি, প্রাণিদগ্ধকে
অন্নদান, (ঙ) অতিথি পূজা।^৮

বর্ষ্যযুদ্ধে যে সন্তবধ করা হয় তাহাতেও হিংসা হয় না।
একট গীতার ব্রীক্ষ অহিংসার উপদেশ দিয়াও অর্জুনকে যুদ্ধ
করিতে বলিয়াছিলেন।

জৈনধর্মে অহিংসা—জৈনধর্মে অহিংসার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব
আরোপ করা হইয়াছে। ইহাকে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ বলা হই-
য়াছে। জৈনধর্ম অহুসারে কোনও অবস্থার কোমণ্ড প্রাণীকে
বধ করা উচিত নহে। যুদ্ধ করা উচিত নয়। মরহত্যা দ্বন্দ্বাত্তেও
বধ করা উচিত নয়। করিলে পাপ হইবে। ক্ষুদ্র প্রাণীকে
বাহাতে বধ করা না হয় একত্ব বুঝ সাবধানে ভ্রমণ, উপবেশন
ও ভোজন করিতে হইবে। সন্ধ্যার পর ভোজন নির্বোধ। যে
বধ করে তাহার পাপ হয়, যে বধ করিতে বলে তাহারও
পাপ হয়। যে ভোজন করে তাহার যে পাপ হয় ইহার উল্লেখ
নাই। যদিও জৈনগণ মাংস ভক্ষণ করেন না তথাপি অল্প
লোক বধ করিলে এবং তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দািলে
যে ভোজন করে তাহার পাপ হয় না ইহাই জৈনধর্মের মত

বলিয়া মনে হয়। কারণ দশবৈকালিক অর্জু নামক জৈনধর্ম
গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মাংসে বেশী অস্থি থাকিলে এবং মংগে
বেশী কাঁটা থাকিলে তাহা ভোজন করিবে না। ইহার
ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হয় এখানে হৃৎকির
সময়ের কথা বলা হইয়াছে, নয় ফলকেই মংগ মাংস বলিয়া
উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা বিশেষ সন্তোষজনক নহে।
ইহা ছাড়া আর এক কারণেও মনে হয় যে, অল্প লোক প্রাণী
বধ করিলে মাংসভোজনে পাপ হয় না। জৈনধর্ম অহুসারে
জলেরও প্রাণ আছে, জল ফুটাইলে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া
যায়। জৈন সাধুরা কাঁচা জল খান না, নিজেরাও জল পরম
করেন না (তাহা হইলে জলের প্রাণ বধ করা হইবে), কিন্তু
কোনও গৃহস্থ জল ফুটাইলে সাধু সেই জল পান করিতে
পারেন।

জৈনধর্ম মতে উদ্ভিদেও ত প্রাণ আছেই—যুগ্ধিকা, জল,
অগ্নি এবং বায়ুরও প্রাণ আছে। অল্প দ্বারা ছেদন বা অগ্নির
দ্বারা দগ্ধ করিলে তাহাদের প্রাণ থাকে না।

বৌদ্ধধর্মে অহিংসা—বৌদ্ধধর্মের অহিংসার প্রচার প্রধানতঃ
যজ্ঞে পশুবধের বিরুদ্ধেই করা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মে পশুবধ
করিলে পাপ হয়, কিন্তু পশুমাংস ভোজন করিলে পাপ হয় না,
যদি ঐ পশু ভোজনকারীর সমুখে নিহত না হয় বা ঐ
ব্যক্তির জন্যই নিহত না হয়। হিন্দুধর্ম অহুসারে মাংস
ভোজনকারীর সকল অবস্থাতেই পাপ হয়, কেবল যজ্ঞে পশুবধ
হইলে পাপ হয় না। হিন্দুধর্মের স্নিগ্ধ অহুসারে মাংসভোজন
অনেক কম হয়—কারণ যজ্ঞ করিতে অনেক আরোহণ
করিতে হয়, অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। কদে
যদিও বুদ্ধদেব পশুবধের বিরুদ্ধে প্রচার করিলেন তথাপি
বাহার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল তাহাদের মধ্যে পশুবধ বেশী
হইল, হিন্দুদের মধ্যে পশুবধ কম হইল। ব্রহ্মদেশ, চীন,
তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে সর্বদাই মাংস খায়,
কুদিরাত (অর্থাৎ সম্রাট) মাংস খায়। একত্ব হিন্দুধর্মই
বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধদেবের কণ্ডকগুলি উপদেশ বিজ্ঞান
কারী।

- ৪। বর্ষে বর্ষেইখনেদেন যো যজ্ঞেত সত্যং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেত্তত্তরোঃ পুণ্য ফলং সমং। মহু ৫.৩৩
- ৫। অমুমন্তাবিলসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রী।
সংকল্পী চোপহন্তী চ খাদকচেতি সাতকাঃ। মহু ৫.৫১
- ৬। আত্মনশ্চ পরিজ্ঞাপে দক্ষিণানি চ সঙ্গের।
স্ত্রী বিপ্রাভূপপত্তো চ স্নান ধর্মে ন দুযতি। মহু ৮.৩৪২
- ৭। পঞ্চমুনা গৃহস্থ চুলী পেশন্যাপকরঃ।
কণ্ডী চোদকুন্ত বধাতে বাস্ত বাহয়ন। মহু ৩.৬৮
- ৮। তাসাং ক্রমেণ সর্বাণাং নিহত্যর্থং মহাবিভিঃ।
পঞ্চ কল্পাঃ মহামজাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাঃ। মহু ৩.৬৯
- ৯। অহিংসা সত্যমক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তিরপেত্তনম্।
দয়া ভূতহেলোলুপ্তং ধ্যানং ব্রীরাচাপলম্। গীতা ১৬।২

খ্রীষ্টানধর্মে অহিংসা—খ্রীষ্টান ধর্মে ইহা বলা হয় নাই যে,
পশুবধ করা পাপ, বা মাংসভোজন করা পাপ। দশবিধ
আদেশ (Ten Commandments)-এর মধ্যে একটি আদেশ
আছে 'হত্যা করিও না' (Thou shalt not kill)। ইহার
অর্থ মরহত্যা করিও না। পশুবধের কোনও দোষ দেখরা হয়
নাই। যিহুখ্রীষ্ট মাংস ভোজন করিতেন।

খ্রীষ্টধর্মে পশুর জীবনের প্রতি যথেষ্ট সহন্য তার দেখান
হয় নাই। অপর পক্ষে মহুয্যের জীবনের প্রতি অতিরিক্ত
করুণা দেখান হইয়াছে। যিহু 'Sermon on the
Mount'-এর উপদেশ অহুসারে কোনও অবস্থার কাছাকাড়

আঘাত করা উচিত নয়। মহত্ত্বাকারী মহাকেও বধ করা বা আঘাত করা পাপ। এই মত অনেকটা জৈনধর্মের অনুরূপ। বলা বাহুল্য, কোমণ্ড ঐষ্টান জাতি এই মত অনুসরণ করে নাই। টলষ্টর শেষজীবনে এই মত অনুসারে চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমগ্র জাতির মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত করিবার চেষ্টা গান্ধীজী করিয়াছিলেন প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকায়, পরে ভারত-বর্ষে। তিনি জিয়ার সকল অপমান শীরবে সহ করিয়াছিলেন, প্রেম দ্বারা মুসলমান জাতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই।

গান্ধীজীর অহিংসা ঐষ্টান ধর্মের অনুরূপ। এছাড়া ঐষ্টান জগৎ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া অভিযাদন করিয়াছিল।

মুসলমান ধর্মের অহিংসা—পশুবধে পাপ নাই এ বিষয়ে মুসলমান ধর্মের মত ঐষ্টান ধর্মের অনুরূপ। যদিও মুসলমান ধর্মের মিস্তকে ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি (prophet) বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তথাপি 'Sermon on the Mount' এর অহিংসা গ্রহণ করা হয় নাই। মহম্মদ মিছেই অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন, মদিনার থাকাকালীন মক্কার বণিকদলকে (caravan) আক্রমণ করিয়াছেন।

সাধারণ মন্তব্য—বিত্তি ধর্মের অহিংসা সম্বন্ধে মতের আলোচনা করিলে হিন্দুধর্মের মত সর্বাপেক্ষা চারান্নমোদিত, সুঅভিচারশীল এবং কল্যাণপ্রণোদিত বলিয়া প্রতীত হইবে। পশুবধ যে অভ্যস্ত পাপজনক এবং কেবল বধকর্তা নহে, যে কেহ পশুবধ হইতে নিজের বাঁধসাধন করে, মাংসভোজনকারী তা বটেই, ইহা হিন্দুধর্মে যেরূপ তুষ্ণভাবের বলা হইয়াছে অজ ধর্মে তাহা বলা হয় নাই।

টলষ্টর কসাইখানার নির্মম দৃষ্টি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘোর কলঙ্ক। যাহারা মাংস ভোজন করে তাহারা সাক্ষাৎভাবে কসাইখানার ব্যাপারে লিপ্ত হয় না বলিয়া অনেক সময় আত্মপ্রলাদ লাভ করে

যে, তাহারা বিশেষ কোনও অত্যন্ত কার্য করিতেছে না। হিন্দুধর্মে বলিয়া দিয়াছে যে, ঐ পাপের ফল মাংসভোজীকে ভোগ করিতে হইবে। ঐষ্টান ও মুসলমান ধর্মে পশুবধ ও মাংসভোজনকে পাপ বলে নাই, ইহা ঐ দুই ধর্মের গুরুতর ত্রুটি। যে ব্যক্তি পশুবধ প্রতি নিষ্ঠুর হয়, সে মহম্মদের প্রতিও নিষ্ঠুর হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের প্রাণের প্রতিও হিন্দুধর্ম যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে। ঐ সকল ক্ষুদ্র প্রাণীরও আত্মা আছে, তাহাদের আত্মা ও আমাদের আত্মা এক বস্তু, এই সকল কথা হিন্দু-ধর্মের সিদ্ধান্ত। মহা বিবিধ জন্তু এবং ক্ষুদ্র প্রাণিবর্ষের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন (মহা ১১:১৩১—১৪১)। মহত্ত্বাকারীকে বধ না করিলে দুষ্টির দমন হইবে না, সমাজে অকল্যাণ হইবে। ঐষ্টান ও জৈনধর্মে বলা হইয়াছে যে, কোমণ্ড অবস্থার মহম্মাকে বধ করিলে বা আঘাত করিলে পাপ হয়। এই ব্যবস্থা অনুসরণ করিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। ঐষ্টান ধর্মের অপরাধ করিলেও মহম্মাকে দণ্ড দিতে নিষেধ করা হইয়াছে (Thou shalt not judge) অথচ রসমাতৃস্তির জন্ত পাণ্ডা প্রভৃতি মহম্মা জাতির বিশেষ কল্যাণ-কর প্রাণীকে বধ করিতে নিষেধ করা হয় নাই। ইহাতে ঘোরতর অসমবুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহা সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। যুক্তির দ্বারা অহিংসা সম্বন্ধে হিন্দু-ধর্মগ্রন্থের সকল ব্যবস্থা সমর্থন করা যায়। যজ্ঞে পশুবধ হইলে ঐ মাংস খাইতে দোষ নাই, নচেৎ মাংসভোজন মহাপাপ এই বিশ্বাস হিন্দুদের মধ্যে মাংসভোজন অনেক কমাইয়া দিয়াছে, বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অত্র প্রদেশে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মাংসভোজন হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিরত হইয়াছে। বাংলাদেশেও পূর্বে দুগা বা কালীপুজার বলির মাংস ভিন্ন অত্র মাংস ব্যবহার হইত না, এক্ষণে ধর্মবিদ্বাঙ্গ শিথিল হওয়ার অর্থাৎ কসাইয়ের মাংস চলিতেছে এবং প্রাণিহিংসারূপ পাপ সমাজে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

টোল ও কোম্পানীর

দাদ ও কাউন্সেল
মেসার্স মলম

ক্রিউটা-টোন
পোড়া বিদনা ও চর্মরোগের জন্য

নিম্ন মলম
খোস পাঁচড়া ও চুলকানীর জন্য



বরানগর, কলিকাতা

ওন্দার মাঠ

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

বিষ্ণুপুরের রাজারা তাঁহাদের রাজ্যে ধান-আবাদ কেমন হইল জানিতে হইলে প্রথমেই ওন্দার মাঠের খবর লইতেম। ওন্দার মাঠে ধান আবাদ হইয়া গেলে তাঁহারা বুঝিতেন—রাজ্যের কোথাও আর আবাদ হইতে বাকি নাই, এবং সে বৎসর রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে ধাত্ত উপন্ন হইবে।

বাকুড়া হইতে টেনে বিষ্ণুপুর আসিতে হইলে উত্তর দিকে রামনাগর পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ সমতল ধানের ক্ষেত—উহাই ওন্দার মাঠ। এই মাঠের মাটি কঙ্করময় নয়, এবং ইহাতে কখনও জল ছিল না।

বর্তমানে ইহা ঘেরাপ শুষ্ক দেবার, পূর্বে ইহা সরুপ শুষ্ক ছিল না। ইহা বাকুড়ার উচ্চ অথচ চাষের উপযোগী ভূমি। স্মৃতি না হইলে ইহাতে এখন আর ভাল ধান জন্মায় না। পূর্বে বাকুড়ার প্রচুর বৃষ্টি হইত, ইহাতে ধানও প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত। বাকুড়ার মাটি দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছে। হেলেবেলায় গ্রীষ্মকালেও ঘেখানে হ্রদ দেখিয়াছি এখন দেখান। শুষ্কভূমি। ওন্দার মাঠে পূর্বে রবিশস্তও প্রচুর উপন্ন হইত। এককালে ইহাতে জোর নীল চাষ চলিয়াছিল। নীল চাষের পর হইতেই সম্ভবতঃ এই মাঠের একরূপ হ্রবস্থা হইয়াছে। নীলচাষের পূর্ব পর্য্যন্ত ইহা সুবর্ণ-প্রস্থ ছিল।

ঐতিহাসিকেরা মনে করেন বাকুড়া পূর্বে নিবিড় বনে আচ্ছন্ন ছিল। প্রস্তরযুগ এই দেশ চাষের উপযোগী ছিল না। এখানে কেবল কোল, ভীল, সাঁওতালরাই বাস করিত। ইহা কত বড় ভুল—ওন্দার মাঠই তাহার প্রমাণ। এই ভুল বারবার বশবর্তী হইয়াই বুঝি ইতিহাসও মাত্র ওন্দার মাঠের একেশ্বরের মন্দির, সোনাভাপলের মন্দির, এবং বাছ-লাড়ার মন্দিরগুলিকে অতি প্রাচীন স্বীকার করিয়াই নীরব হইয়া গিয়াছে।

কোল, ভীল, সাঁওতাল বাসের নিদর্শন এই ভূমিতে অল্পই পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত জাতিগণের বাসের নিদর্শনই এই ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে : গোপ, নাপিত, মোদক, তম্বুলী, বণিক, মালাকার, কর্মকার, শঙ্কর, কুস্তকার, স্বাক্ষর, চিত্রকর, স্বর্ণকার, অট্টালিকাকার, তৈলকার, চর্মকার, কৈবর্ত, বীবর, শবাক, গণক, অগ্রদানী, পাঠক, ভট্ট ইত্যাদি। ইহারা বাকুড়ার আদিম অধিবাসী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই সব জাতির উল্লেখ আছে। ইহাদের একটা বিশেষ সভ্যতা ছিল। বিদেশ হইতে আসিয়া ইহারা এখানে বন কাটিয়া বাস করে নাই। শিল্পকলা ইত্যাদি জানে ইহারা আৰ্য্যদের অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না।

ওন্দার মাঠের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বাছলাড়ার মন্দির, পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে সাপুড় শিবলিঙ্গ, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সোনা-ভাপলের মন্দির এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে একেশ্বরের মন্দির। একেশ্বরের মন্দির এবং সোনাভাপলের মন্দিরের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্রমন্দিরীর গড়। বর্তমান বাকুড়ার দেড় মাইল পূর্বে এই ক্ষুদ্রমন্দিরীর গড় হইতেই প্রকৃতপক্ষে ওন্দার মাঠের আরম্ভ।

বিষ্ণুপুরের রাজা আদিমজের (৮ম শতকের প্রথম) মন্ত্ররাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বেও ওন্দার মাঠ ছিল। ওন্দার মাঠে একেশ্বরের মন্দির ছিল, ক্ষুদ্রমন্দিরীর গড় ছিল, সোনাভাপলের মন্দির ছিল। শুভমিমা শিলালিপির চন্দ্রবর্মার (৪র্থ শতক) কালেও ছিল। গঙ্গাভীর্ণ যত দিনের, কাশীভীর্ণ যত দিনের, একেশ্বরের ভীর্ণ যত দিনের। এখনও 'ভক্ত্যা'রী জয়ধ্বনি করিয়া থাকে—'গঙ্গাতে গদাঘর, কাশীতে বিধেশ্বর, বাকুড়াতে একেশ্বরনাথ-মুনিমহাদেব।' সিংহবর্মী, চন্দ্রবর্মী ক্ষুদ্রমন্দিরীর গড়ের রাজা ছিলেন। পরমহার-গড়ের ডাকা, সিকাঠি কোড়, চান্দাই কোড়—একেশ্বরের মন্দির, ক্ষুদ্রমন্দিরীর গড়, সোনা-ভাপলের মন্দির অপেক্ষা বৃহত্তর প্রমাণ নয়। শিলালিপির পুঙ্খ নক্সা ভীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ক্ষুদ্রমন্দিরীর গড়ের পশ্চাতে হ্রদ ছিল।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেও ওন্দার মাঠ ছিল, ওন্দার মাঠে ভীর্ণ ছিল। সে ভীর্ণে বর্জমান-মহাবীর আসিয়াছিলেন। তখন ওন্দার মাঠের নাম ছিল রাতাপুর। রাতাপুর হইতেই রায়নাগরের সাপুড় শিবলিঙ্গ। ওন্দার মাঠ বনবেষ্টিত ছিল। এখনও ইহা বনবেষ্টিত। বিষ্ণুতন্ত্রিপারায়ণ বর্ষবংশীয় রাজা এখানে ছিলেন বলিয়া ইহার নাম বনবিষ্ণুপুর হইয়াছিল। ক্রম-বর্জমান ছিল বলিয়া বৃহৎসংহিতার কালে ইহার নাম বর্জমান হইয়াছিল। ইহাই মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থের পুরোত্তমবর্জমান। এখনও ওন্দার মাঠে পুরোত্তমপুর রহিয়াছে। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের (একাদশ শতক) রাতাপুরী এই ভূমেই ছিল। সে পুরী সোনাভাপলের নিকট বর্তমান বীরসিংহপুর হইতে একেশ্বরের পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ভূমিই হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি গ্রন্থের (দ্বাদশ শতক) বিষ্ণুগৃহ। এই ভীর্ণে মহারাজ লক্ষণ সেন পূজা দিতে আসিয়াছিলেন।

বর্ষবংশ রাতের অতি প্রাচীন রাজবংশ। টলেমির ভাষ্যলিপ্ত—ভাষ্যলিপ্ত প্রদেশ হইলে সিংহবর্মার পূর্বপুরুষগণের রাজ্য বর্জমান বাকুড়া হইতে ২৪ পরগণা ধুলনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রবর্মার কালে সে রাজ্য সমতট ও ডবাক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত সমতট ও ডবাক জয় করিয়া লইয়া-ছিলেন। বর্ষবংশীয়দিগের রাজ্যই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাহিত্যে

ভাঙ্গাশাসনে রাঢ়া, ভাঙ্গলিগ, বিষ্ণুগুহ, ব্রজ, হরিকেলমণ্ডল ইত্যাদি নামে কথিত হইয়াছে। ইং-সিঙের বিবরণ অনুসারে (৬৭৩-৮৮) হরিকেলমণ্ডল পূর্ববঙ্গের সহিত যুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়।

সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তীকালের আধ্যাযুক্ত-বহিষ্ঠুত বাংলা-দেশই চন্দ্রবর্মার রাজ্য। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে গোপচন্দ্র নামক একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন—ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলা বৃহৎ সংহিতার ভাঙ্গলিগ ও বর্জমান জনপদ—বর্জমান মেদিনীপুর ও বাঁকড়া জেলা। চন্দ্রবর্মার পরবর্তী দুই শত বৎসরেই বর্ম-বংশ অবশ্য লোপ পাইয়া যায় নাই। গোপচন্দ্র বর্ম-বংশীয় ছিলেন মনে করা বোধ করি অসঙ্গত হইবে না।

আশ্চর্যের বিষয়, ওন্দার মাঠে মেদিনীপুর, দাঁতন, চন্দ্রকোণা রহিয়াছে। ক্ষুদ্রিমঘত্তরীর গড়ের নিকট সুবর্ণের ঘড়াহাতি—সুবর্ণনগর (সুর্পনগর), সুবর্ণভোড়, সুবর্ণভূম, সুরগদীধি ইত্যাদি। মহারাজ শশাঙ্কের কথা মনে পড়ে। তিনি রাঢ়ের রাজা ছিলেন। তাঁহার কিরণসুবর্ণ কোথার ছিল আদিও সঠিক নির্ণয় হয় নাই। তাঁহার কাল ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। সেকালে রাঢ় পুরোত্তম বর্জমান—বর্জমান বাঁকড়া জেলা। মল্লতীশুলকর এঘে কামরূপের পরই পুরোত্তম বর্জমান। মহারাজ শশাঙ্ক শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত একেখরের শিবের, রামসাগরের লাপুত শিবলিঙ্গের সম্পর্ক ছিল না—হইতে পারে না। ক্ষুদ্রিমঘত্তরীর গড় হাড়া একেখরের সহিত কে আরও রাজবাল্লের নিদর্শন রহিয়াছে। ঘরকেখরের বাহ-পার্শ্বে যেমন একেখর হইতে ক্ষুদ্রিমঘত্তরীর গড়, সোনাভাপল, কোটালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদ ছিল, ঘরকেখরের দক্ষিণ-পার্শ্বে তেমনি রাজাগ্রাম গড়াবাড়ী, ডাবরা, লোদমা, চন্দ্রকোণা পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদ ছিল। গড়াবাড়ী অবশ্য গড়াবাড়ী। তাবীর—ডাবরা হইয়া ডাবরা হইতে পারে। দক্ষিণ-মেদিনীপুরে আবিষ্কৃত ভাঙ্গাশাসন—শশাঙ্কের স্যাজ্যভুক্ত দণ্ডভুক্ত নামক প্রদেশের তাবীর সংজ্ঞক স্থানের অধিকরণ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। দণ্ডভুক্ত ওন্দার মাঠের দাঁতনও হইতে পারে। শশাঙ্কের দণ্ডভুক্তিই হয়ত পরবর্তীকালের বর্জমানভুক্তি। ভুক্তি—বিভাগ হইলে বর্জমান ভুক্তির অন্তর্গত আবার এক দণ্ডভুক্তি কেমন করিয়া হয় বুঝি না। বেঙ্গবতী এবং দার-কেশীর মধ্যবর্তী ওন্দার মাঠেই হয়ত কামরূপরাজ ভাকর বর্মার সহিত মহারাজ শশাঙ্কের যুক্ত হইয়াছিল।

ওন্দার মাঠের বাহলাভার মন্দিরটি জৈনমন্দির বলিয়া খ্যাত। এরূপ মন্দির নির্মাণ দিগম্বরদিগের কর্ম নয়। ইহা কোমণ্ড রাজা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। জৈনধর্মাবলম্বী কোমণ্ড রাজা এ অঞ্চলে কখনও ছিলেন, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্ট হয় না। বরং এ অঞ্চলে দুই জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজার কথা

ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। এক—হরিকেলমণ্ডলের কান্তিদেব (৮ম শতক)। ইনি দামোদরের উত্তর ভাগে বর্জমান নগরী স্থাপন করেন। বৃহৎ সংহিতার বর্জমান জনপদই তখনকার হরিকেলমণ্ডল। এই হরিকেলমণ্ডলই আবার আয়ারাক হস্তের তখনকার বজ্রভূমি। উক্ত হেমচন্দ্র হারচৌধুরী মনে করেন, বজ্রভূমিই পরবর্তীকালের মদারগ সরকার। মদারগ সরকার আধুনিক বীরভূম, বর্জমান ও হুগলী জেলার কোন কোন অংশ লইয়া গঠিত ছিল। চীমদেশীয় মানচিত্র অনুসারে হরিকেল তখন ভাঙ্গলিগ ও উৎকল এই দুই দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। আর এক বৌদ্ধরাজা চন্দ্রদেব (৮ম শতাব্দীর শেষ)। ইনি কান্তিদেবের রাজ্য বিক্রম দ্বারা লাভ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ওন্দার মাঠেরই কোমণ্ড অংশে কান্তিদেবের পুর ছিল। সে পুর ওন্দার নিকট বর্জমান পুরোত্তমপুর হইতে পারে। চন্দ্রদেবের পুর বাঁকড়া ভেড়ুয়া-শোলার নিকট বর্জমান বিক্রমপুর হইতে পারে। বাহলাভার মন্দির কান্তিদেব অথবা চন্দ্রদেবের কীর্তি হইতে পারে। বাহলাভার মন্দিরকে কেহ সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির বলেন। কেহ বলেন, ইহা সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির, কেহ বলেন জৈনমন্দির, কেহ-বা বলেন বৌদ্ধমন্দির। এই মন্দিরে প্রাপ্ত বালকমূর্তি—পার্শ্বনাথ-মূর্তি অথবা বামনমূর্তি মূর্তিবিদ্যাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত। হয়ত এই অঞ্চলে কোমণ্ড কালে বামনের পূজা প্রচলিত ছিল। বর্জমান মহাবীরকে কুহুর লেলাইয়া দিবার পর রাঢ়ে এরূপ জৈনমন্দির নির্মাণ সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। কান্তিদেব, চন্দ্রদেব পূর্ববঙ্গের হইতে পারেন না। তখনও পূর্ববঙ্গের সৃষ্টি হয় নাই। পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর বিজয়সেনের পর। বৃহৎ সংহিতার বর্জমানজনপদ, ভাঙ্গলিগজনপদ এবং উপবঙ্গ (ব'বীপই) তখনকার বঙ্গদেশ। কান্তিদেব, চন্দ্রদেব বর্মদিগেরই কোমণ্ড শাখার হইতে পারেন। বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনের পর হয়ত তাঁহারা বর্ম উপাধি ভ্যাগ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুর রাজপণের ইতিহাসে দেখা যায়—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত ভিন্ন শত বৎসরে মল্লরাজ্য দক্ষিণে বর্জমান বজ্রপুর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। ৮ম শতাব্দীর শেষের দিকে জগৎমল্ল ওন্দার মাঠের পূর্ব সীমান্তে বর্জমান বিষ্ণুপুরে মাল্ল রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। এই তিন শত বৎসর অবশ্য ওন্দার মাঠ জনশূন্য ছিল না। ওন্দার মাঠের মন্দিরগুলিও শূন্য পড়িয়াছিল না। বরং সে সময় এই স্থান পূর্ণাঙ্গ পৈক্য আরও অধিক জনসমাধাণী ছিল; এ স্থানের মন্দিরগুলিতে আরও অধিক জনসমাধিবস্তু হইত এবং প্রতিটি মন্দিরে অহরহঃ মহাসমারোহে পূজাদি অর্চনিত হইত অসংখ্য করিতে পারা যায়। তখন এ স্থানে অবশ্য রাজা ছিলেন এবং সে রাজা বিষ্ণুপুরের মল্লরাজপণের অপেক্ষা অধিক

পরাজয়শালী ছিলেন। সেই রাজা কাতিদেব, চন্দ্রদেব রাজা আর কে হইতে পারেন?

এককালে ওন্দার মাঠে লুইচন্দ্রের পুত্র প্রচলিত ছিল। ওন্দার মাঠের গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন পুথির আরম্ভে “লুইচন্দ্রকীট” লেখা দেখিয়াছি। লুইচন্দ্র—বর্ধমান কাব্যের হরিচন্দ্র রাজার পুত্র। বিজয়সেনের সমসাময়িক রাজার রাজা হরি-বর্ধাই (একাদশ শতক) কাব্যের হরিচন্দ্র। হরিবর্ধাই সুদী-মহত্তরীর গড়ের রাজা ছিলেন। যে স্থানকে বাকুড়ার লোকে সুদীমহত্তরীর গড় নির্দেশ করে—সে স্থানকে অমেকে মননার ডাকাও বলিয়া থাকে। হরিচন্দ্রের রাণীর নাম—মননা। এজেন্সির মিকটবর্তী অঞ্চলে বলুকার বন, বলুকাছোড়, বলুকা গ্রামও আছে সুনিরাহি (বর্ধমান তেলুঙ্গা)। এজেন্সির মিকট দ্বারিকা গ্রামও রহিয়াছে (বর্ধমান দ্বারিকা)। ইতিহাসে হরিবর্ধার পুত্র—ভোজবর্ধা। ভোজবর্ধা বনরামের বর্ধমান কাব্যের ভোজমহারাজা হইতে পারেন। আশ্চর্যের বিষয়, সুদীমহত্তরীর গড়ের পশ্চাতে মাপিকহুদের মধ্যবর্তী স্থলে মাপিক দ্বীপও রহিয়াছে (বর্ধমান মান্ধ্যার ডাং), কিন্তু তাহাতে খুপ দণ্ডের দেউলের চিহ্ন নাই।

এজেন্সির মদির এবং দোনাভাপলের মদিরের মধ্যবর্তী অঞ্চল পূর্বে জয়বেল্যা তরফ বলিয়া কথিত হইত। মনে হয় এই অঞ্চলে পূর্বে জয় নামক কোনও রাজা ছিলেন। মহারাজ

শশাঙ্কের কাল হইতে রাধাপালের বরেন্দ্রী অভিযানের কাল পর্যন্ত ইতিহাসে জয় নামক দুই জয় উল্লেখযোগ্য রাজার নাম পাওয়া যায়। এক কর্ণসুবর্ণের জয়নাগ, আর এক রাধাপালের বরেন্দ্রী অভিযানের সাহায্যকারী দণ্ডভুক্তির জয়সিংহ। জয়-বেল্যা তরফের মধ্যেই সুবর্ণনগর, সুবর্ণতোড়, সুবর্ণতপন ইত্যাদি এবং ইহারই মধ্যে কর্ণ নামক নদী (বর্ধমানে মজিয়া নিয়াছে)। জয়নাগের নাম অনুসারে জয়বেল্যা হইলে এই অঞ্চল মহারাজ শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ হইয়া পড়ে। আবার রাধাপালের সামন্তচক্রের কোটাটিবি—বিষ্ণুপুরের কোটেখর হইলে এবং অপর মন্দার—মদারগ সরকার হইলে ওন্দার মাঠ দণ্ডভুক্তি হইয়া পড়ে। কারণ মেদিনীপুরের দাঁতন তখন বিজয়সেনের রাজ্যের অন্তর্গত। বিষ্ণুপুরের মজরাছারাও তখন ওন্দার মাঠে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই এবং তখনও তাহাদের কেহ সিংহ উপাধি ধারণ করেন নাই। দণ্ডভুক্তির জয়সিংহের নামানুসারে জয়বেল্যা হইলেও হইতে পারে। সিংহবর্ধার বংশীর কোমণ্ড রাজা দয়ন্ত সিংহ উপাধি ধারণ করিয়া থাকিবেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দিল্লীসাল্ব সিকন্দর বহু সাধু-সন্ন্যাসীকে হত্যা করিয়া হিন্দুর তীর্থযাত্রা নিবারণ করেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে এজেন্সির ভীষণ জনসামাগম ক্রমিতে আরম্ভ করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ওন্দার মাঠে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাথীরের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ “ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

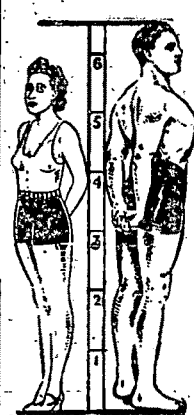
শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমিরোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন-স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়, “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২৯০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১ বি, গোবিন্দ আড্ডা রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—সাঁউথ ৮৮১



দীর্ঘতর হউন !!

আপনি যদি আপনার দৈর্ঘ্য বাড়াইতে চান ২’ ইঞ্চি হইতে ৩’ ইঞ্চি পর্যন্ত তবে অল্প হইতেই আমাদের বিখ্যাত “হিটো মেডিসিন” ব্যবহার করিতে থাকুন। এই ষটিকাগুলি ব্যবহারের ১২ দিনের ভিতরই অত্যন্ত ফল দর্শাইয়া থাকে। যে কোন বৃত্তে নরনারী সকলেই উহা ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য প্রতি বাক্স ৪০০

IMPERIAL CHAMBER OF
SCIENCE
P. B. 61. (D-181-13) AMRITSAR.

“হুগলী জেলার ইতিহাস”

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ আমলে হুগলী নামে জেলার সৃষ্টি হইয়া মুপ্রাচীন দক্ষিণ-রাঢ়ের একটি বিশিষ্ট অংশ পৃথক্ সত্তা লাভ করে। এই ভূভাগের প্রত্নসম্পদ প্রায় অতুলনীয়—কারণ জিব্রেলী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব-ভারতের বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান ইহার অন্তর্গত বটে। বহু মনীষী বাদলার প্রাণকেন্দ্র-রূপ এই জেলার বিবরণ বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে পারেন নাই—বস্তুতঃ এক জনের পক্ষে তাহা অসাধ্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। চারি বৎসর পূর্বে তরুণ সাহিত্যিক শ্রীহরীকুমার মিত্রের শতাধিক চিত্রসম্বলিত সহস্র পৃষ্ঠার গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সাগ্রহে তাহা অধ্যয়ন করি। সমালোচনাচ্ছলে অথবা প্রশংসা করার স্বীতি অবলম্বন না করিয়াও আমরা যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, গ্রন্থকার এই অসাধ্যসাধনে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জেলার প্রায় ২৫০০ গ্রামের পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক চিত্র কিংবা একমাত্র জিব্রেলী-সপ্তগ্রামে আবিস্কৃত প্রত্নলিপ্যাদির বিজ্ঞানসম্মত বিশদ

বিবরণ দেওয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মতে। প্রকৃত পরিপ্রায়ে শতাব্দি প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ সহ সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষার চিত্র বিপুল উপকরণ হইতে নির্বাচন করিয়া তিনি যাহা পরিবেশন করিয়াছেন, তাহার এবং ঘটনাবৈচিত্র্যে তাহা প্রায় উপভাসের মত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে এবং গ্রন্থটির পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। নামে একটি জেলার ইতিহাস হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে বাদলার ইতিহাসেরই একটি প্রধান অংশ এবং বাদলার সমস্ত পাঠাগারে ইহা থাকা উচিত, মতুবা তাহাদের অদ্বাদানি ঘটবে। উপকরণ সংগ্রহকালে অভ্যস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পরিলম্বন করিয়া গ্রন্থকার ধেরূপ প্রমত্ততা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমরা ভরসা করি অদূর ভবিষ্যতে তিনি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন এবং প্রথম সংস্করণে জেলার ইতিহাসের যে হ্রদ্রুতি তিনি গঠন করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা মনোহর দৌধে পরিণত করিয়া কৃতার্ব ও কীর্ত্তিমান হইবেন।



রূপের চর্চার কচিরাগ...

রূপের কলিকে সৌন্দর্য্যকুসুম বিকশিত করে তোলাই এই প্রসাধনীর সাধনা।- রূপসাধক-সাধিকাদের নিকট তাই চিরকাম্য এই সৌন্দর্যের সুরম্যসম্ভার

ক্যালকাত্তাকের

মার্গো সোপ

নিম টুথ পেপ্ট

ভূঙ্গল

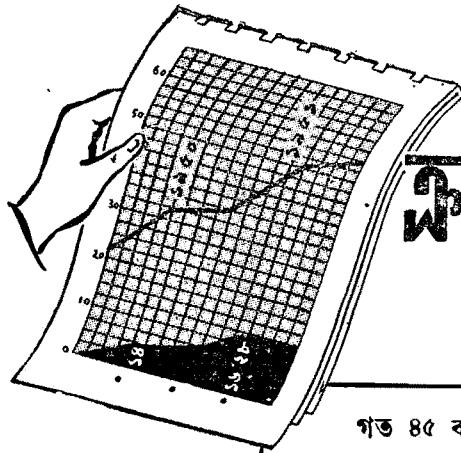
সুগন্ধিত মধুভ্রমরাজ
কেশ ভেল

লারনি স্নো ও ক্রীম

কাস্তা মনোমদ গন্ধসার



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং.লিঃ কলিকাতা-২৯



ক্রমোন্নতির পথে

গত ৪৫ বৎসর যাবৎ হিন্দুস্থান
প্রতি বৎসরই নূতন নূতন শক্তি
ও সমৃদ্ধি আহরণ করিয়া তাহার
ক্রমোন্নতির গৌরবময় ইতিহাস
রচনা করিয়া চলিয়াছে। ভারতীয়
জীবন-বীমার অগ্রগতির পথে
হিন্দুস্থানের এই ক্রমোন্নতি বিশেষ-
ভাবে লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালের বার্ষিক
কার্য-বিবরণীতে পূর্বের মতই
ইহার আর্থিক সারবত্তা, সততা ও
পরিচালন-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।



আর্থিক পরিচয়

মোট চলতি বীমা... ৮১,০২,৩৬,১৬৪
মোট সম্পত্তি ১৯,৯৮,১৩,৮৫৩
বীমা তহবিল ১৭,৬৬,১৯,৬২৮
প্রিমিয়ামের আয়... ৩,৭২,২৭,৫২৮
প্রদত্ত ও দেয়
দাবীর পরিমাণ..... ৮৩,৫৭,৯৭৮

নূতন বীমা

১৬,২৮,৮৫,৮০০

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।



এই গ্রন্থে বহু মূল্যবান ও প্রামাণ্য বিবৃত হইয়াছে—
বাদসার প্রথম গড় পুস্তক (পৃ. ৫৪৪-৫৫), নিমাইতীর্থবাটের
স্বর্ঘ্যযুগি (পৃ. ৬২৭-২৮), মাহেশ্বরের জগদ্বাদেশবের দেবোত্তর
সম্পত্তির মূল দলিল (পৃ. ৬৮১-৮৩) প্রভৃতি। শেষোক্ত
দলিলের তারিখ ১৬৫০ খ্রি. (১৬৪১ মতে) এবং অন্ততম
স্বাক্ষরকারী “রাধব দত্ত” বাঁশবাড়িয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ
রাধব মজুমদার (রাজত্বকাল ১৬২৯-৭৪ খ্রি.) বটেম—তৎকালে
বোড়ো পরগণা “নওবাব খানে আলি সাহ” নামক রাজপুরুষের
‘জায়গীর’ ছিল। জগদ্বাদেশবের অপর একটি দেবোত্তর
‘বালিয়া’ পরগণার “পূর্বের জমিদার ভূপতি শর্মন, বলরাম
দাশদত্ত, মহেন্দ্র রায়, অনন্তরাম রায় ও প্রাণবল্লভ রায়” সেবাস্ত
শিবের অধিকারীকে দান করেন—চতুর্গুণি গ্রামে ২৫/২
পরিমাণ ভূমি। শিবের পৌত্রের কালিচরণ ও রামচন্দ্র
১২১০ সনে লিখিয়াছেন “ভোগ একশত চৌত্রিশ বৎসর”—
অর্থাৎ দানের তারিখ হয় ১০৭৬ সন (হুগলীর ৬৫২৪ মং
ভাদ্রাবাদ)। মাহেশ্বের জগদ্বাদেশবের পদাঙ্গান ও বালারদক

* হুগলী জেলার ইতিহাস—খ্রীষ্টাব্দে কুমার মিত্র। শিশির
পাবলিশিং হাউস, ২২১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
মূল্য পনের টাকা।

নীলার একটি কোড়াকলমক হুগলী মুদ্রিত হইয়াছিল (মণেন্দ্রনাথ
মিত্র রচিত পুরীতীর্থ, ১৩২২, পৃ. ১৩১-৩৪)। প্রসঙ্গতঃ
আমরা জেলার প্রধান তীর্থস্থান ভারকেশ্বরের বিবরণে
(পৃ. ৮১৪-৩১) কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিতেছি। ১২৩৯
সনে মোহন গিরির ‘জুতাবে’ পাণ্ডরা যায়, ১২১৩ সালের
৩২ আষাঢ় ডাকাইতী হইয়া সমস্ত দলিলপত্র নষ্ট হয়—কেবল
রকা পায় “রায় তারামঙ্গর ৭৮৫ সালের আড়দৌড় মহছুত বন্দী
এক কেতা সন্দ”। এই সন্দ (পৃ. ৮২৩ মুদ্রিত) নিশ্চিতই
ভাল—আকবরের পূর্বের বন্দাকের প্রচলন ছিল না। সহদেব
চক্রবর্তী ১১৪১ (বা ১০৪১) সালে ভারকেশ্বরের ‘দহা’ লাভ
করিয়াছিলেন—ঐ সাল তীর্থপ্রতিষ্ঠার তারিখ মতে।
ভারকেশ্বরের দেবোত্তর সম্পত্তির মোট পরিমাণ ১০২৫১১
(১৯৩১ মং ভাদ্রাবাদ) এবং দাতা বধাক্রমে তারামঙ্গ
(আদি মোহন ও মারাগিরি বহুরাম উদাসীন এইতী),
তৎপরে রাধা জগৎ রায়, মহারাজ কীর্তিচন্দ্র (বলভদ্র গিরি
এইতী), চিত্রসেন (শিবচন্দ্রগিরি এইতী), ভিলকচাঁদ
প্রভৃতি। ১১৯৮ সালে বর্ধমানে পরশুরামগিরি বনাম কতে-
গিরির মোকদ্দমা মিলাতি হয় (৬৫১১১১ খ্রি:)। তাহাতে
মোহনদের শিষ্যপরম্পরা এইরূপ পাণ্ডরা যায়—সমুদ্রমাণগিরি,
যমুনাসিরি, লক্ষ্মণসিরি, অন্নপাচলসিরি, প্রসাদসিরি, পরশ-

ঋষি দাসের	ছোটদের অত্যন্তম	ভূতনাথ ভৌমিকের
ছোটদের নিউটন	মাসিক পত্রিকা	ভৌমিনিয়ন ভারতের পথরেখা
ছোটদের আইনস্টাইন		খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
ছোটদের মার্কস	চয়নিকা	গোকার্ণি ছেনেবেলা
ঋতিনাথ চক্রবর্তীর	বৈশাখ হইতে গ্রাহক	মাধুসেনের অ্যাডভেঞ্চার
রানী রাসমণি	হইতে হয়	নির্মলকুমার বসুর
যোগেশচন্দ্র বাগলের	নমুনার জঙ্ঘ	আরব্য উপন্যাস
ভারতের মুক্তি-সঙ্কানী	চারি আনার	কালীকঙ্কর ভট্টাচার্যের
সংকল্প ও সাধনা	ডাক-টিকিট	শ্রীমন্তগবদগীতা
রবীন্দ্রকুমার বসুর	লাগে	রবীন্দ্রলাল রায়ের
মুক্তি-সংগ্রাম	বার্ষিক ৩	বলিত হাসব না
রোলার আলোকে গান্ধীজি	বৈচিত্র্যভরা	নলিনীকুমার ভট্টের
স্বপ্নাচন্দ্র রায়ের	রচনায়	আসামের অরণ্যচারী
স্বরাজ ও সাধনা	সমৃদ্ধ ও	গদাধর নিয়োগীর
প্রফুল্লরতন গদোপাধ্যায়ের	জ্ঞান-বিজ্ঞানের	গল্প-বীথিকা
নবজীবনের পথে হায়দরাবাদ	রত্নধনি	H. Barik's
গিরীন চক্রবর্তীর		Ready Reckoner
দেশবিদেশের লেখা		Pay, Wages &
		Income tables

ভারতী বুক স্টল : ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

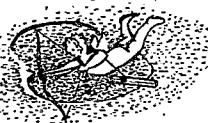
রাম। তৎপরে যথাক্রমে মোহন (১২০৫ সনে হইতে), রত্নচন্দ্র (১২৭২ সনে হইতে), মাধবচন্দ্র (১২৯৯ সনে হইতে) ও সতীশচন্দ্র। মোহনচন্দ্রের অস্ফুট মুদ্রিত তালিকা (পৃ. ৮২৪, সতীশচন্দ্র-কৃত তারকেশ্বর-শিবভক্ত, ২য় সং, ১৩২৮, ক্রম-নামা প্রভৃতি) কল্পিত ও প্রমাণ বিহীন। শ্রীমন্তগিরি মোহন ছিলেন না। তীর্থ-প্রতিষ্ঠা খ্রিঃ ১৭শ শতাব্দীর পরে হয় নাই, কিংবা পূর্বে হইতে পারে। “ছোভশত্ৰু” গ্রামই অধুনা তারকেশ্বর নামে পরিচিত হইয়াছে। পরগণা বালিগড়ির আদি জমিদার রাজা বিজ্ঞানস ১২০৯ সনেই ৭৮ পুরুষ বা ‘আটদশ পুরুষ’ পূর্ববর্তী ছিলেন (৬৪৮৫ ও ২৬৫১১নং তারবাদি দ্রষ্টব্য)—সুতরাং তিনি নিকটই ১৮শ শতাব্দীর লোক নহেন। জেলার অপর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ‘শ্রীপাড়া’র বন্দাবনচন্দ্র বিষয়েও বহু তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এই জেলার দেবমন্দিরের এবং বিশেষ করিয়া শিবমন্দিরের ইয়ত্তা করা যায় না—বস্তুতঃ সম্ভব প্রধান মন্দিরগুলির একটি নির্ভর-যোগ্য তালিকা সংগৃহীত হইলে বর্তমান জনসাধারণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইতে পারিবে, ইংরেজ-শাসনের পূর্বে বাঙালীর মতি-গতি অব্যাহত কতটা উন্নত ছিল। আমরা সোমনারায়ণ রামশঙ্কর-স্থাপিত মহাবিজ্ঞান নামক জগদ্ধাত্রী মূর্তির নবরত্ন মন্দিরের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করিতেছি—ইহার প্রতিষ্ঠাকাল

১৬৮৭ শক (=১৭৬৫-৬ খ্রিঃ)। বৈভবংশীর এই রামশঙ্কর “সারাসংসারস্থ সংগ্রহ” নামে এক বিশাল ভাস্কর্য্য রচনা করিয়াছিলেন।

সামাজিক ইতিহাসের উপকরণস্বরূপ এই গ্রন্থে বহু বিবাহ-কারীর তালিকা সাক্ষর্যে মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ১৯২-৯৮)—মোট সংখ্যা ১৩২ (যুগবংশীয় ৬১, বন্দ্যবংশীয় ৫০, চট্টবংশীয় ১৬ ও গাজুলী ৫ জন) এবং গ্রামসংখ্যা ৭৪। তালিকাটি বহুলাংশে কৃত্রিম বলিয়া বিভাসাগরের সময়েই প্রতিবাদ হইয়াছিল। বস্তুতঃ কৌলীন্যপ্রথার উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ে এ যাবৎ বাহা লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই ভ্রমপ্রমাদবহুল, কারণ যে সকল মূল-কুলগ্রন্থে ইহার বিবৃতি আছে তাহা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অতাপি পরীক্ষিত হয় নাই। উক্ত তালিকার পরিবর্তে এই জেলার গ্রামে গ্রামে যে সকল চতুষ্পাণ্ডী প্রতিষ্ঠিত হইয়া ৩০০৪০০ বৎসর বয়সী শাস্ত্র ও ধর্ম্ম শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা দেশ-বিদেশে প্রচার করিয়াছিল তাহাদের তালিকা প্রকাশ করা কর্তব্য। জিবেগী, বাশ-বেড়িয়া, কোয়গর প্রমুখ গ্রামসমূহে আমরা সহস্রাবি চতুষ্পাণ্ডীর অব্যাপকদের নাম সংগ্রহ করিয়াছি এবং বহু স্থলে কানী-কাকী-জাবিড় হইতে হাজ আলিয়া পড়িয়াছে। বাঙালী জাতির এই গুরু-গৌরবের চিত্র ইতিহাসের অঙ্গরূপে গ্রহণীয়।



এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স



প্ৰধান চিত্রশিল্পীর
অলঙ্কার নির্মাণ ও হীরক ব্যাসায়ী



ব্রাহ্ম হিন্দু-স্থান মার্চ বালিগঞ্জ
১৫৯/১৬ ব্রাহ্মবিহারী এডিন্টি কলিকাতা
গি.কে-৪৪১১

১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহু বাক্সের ফ্রিট কলিকাতা। ফোন-এডিন্টি. ১৭৬১ গ্রাম-টিলিয়ান্স,

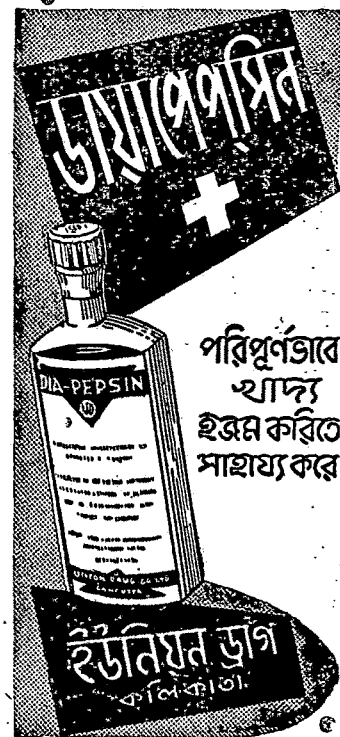
ঐতিহাসিক উপকরণের একটি প্রধান অংশ সংরক্ষিত
ভাষায় লিপিত বটে। বাংলার শিক্ষিত সমাজে সংরক্ষিত
শিক্ষা বহুকাল বিস্মৃতির হওয়ার ফলে সমস্ত ইতিহাস
এছে অতি শোচনীয় ভ্রমপ্রমাদ হান লাভ করিয়াছে—
আলোচ্য গ্রন্থও এ বিষয়ে বাদ পড়ে নাই। পবনদূতের
শ্লোকে (পৃ. ১৪৭) লক্ষ্মণসেনের অভীষ্টদেব “মুরারি শর্মা”র
উল্লেখ নাই, আছে তৎস্থাপিত ‘কমলাকলিকারো মুরারিঃ’
অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর প্রণমী বিষ্ণুমূর্তির কথা। এই গ্রন্থের
বহু স্থলে (পৃ. ২২, ১৪, ৩২১, ৩৬৩, ৩৬৭, ৩৯৩, ৩৯৩, ৪১৭,
৬৩৬, ৭৬১, ৮৩৩) দেশাবলী বিবৃতি ও মিথিয়ার প্রকাশ নামক
দুইটি গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—উভয়ই বিপত্ন শতাব্দীর
প্রথমার্ধে রচিত দুইটি ভাল গ্রন্থ, যাহার একটি উক্তিও বিনা
প্রমাণে গ্রহণ-যোগ্য নহে (*Journal, R. A. S. B. XV,*
1949. pp. 119-123)। শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁহার অনুগত
নগেন বসু গ্রন্থদ্বয়ের কৃত্রিমতা ঘরিতে না পারিয়া বিষম কাণ্ড
ঘটাইয়া সিদ্ধাছেন। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকারদের
বর্ণায়ুক্তমিক তালিকা ও গ্রন্থনাম একটি পরিপ্রশ্নসাধ্য অগূর্ণ
সঙ্কলন এবং বর্ষায়ণ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইলে গ্রন্থের
প্রোতঃশরূপে পরিণত হইতে পারে। সংরক্ষিত গ্রন্থকারদের
নাম পৃথক তালিকার সাবধানে সঙ্কলিত হওয়া কর্তব্য। বহু
বিখ্যাত নাম বাদ পড়িয়াছে, যথা—জিবেগীর চন্দ্রশেখর
বাচস্পতি, বংশবাগীর ভবদেব ভট্টাচলদাস, দীর্ঘাক্ষিবাসী কবি,
আলঙ্কারিক ও বৈতক গ্রন্থকার কবিচন্দ্র দত্ত, স্নগদ্যার বসু-রায়
বংশের বৈতক গ্রন্থকার বৈতরাজ প্রভৃতি। তালিকামধ্যে
কয়েকটি প্রাচীন নাম দেবিনা আমরা অতি রাজ্যের বিনিমিত
হইয়াছে—ভট্টচিন্তামণিকার গদ্যেশ, নিদাম গীকার বিজয়
রচিত, কাশিকারভিকার বামন-জয়াদিত্য, বিবেককার শূল-
পাণি প্রভৃতি। হুগলী জেলার সহিত এই সকল ভারতবিশ্রুত

মহাপণ্ডিতের অসম্ভব সযত্নকল্পনা বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার শোচনীয় অবনতির ফলে সম্ভব হইয়াছে। আমরা বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশ কামনা করিয়া এইটির কিছু ছোট্ট প্রদর্শন করিলাম। স্থানীয় ইতিহাসের উপকরণ প্রায়শঃ এখনও গ্রামে গ্রামে লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং তাহার অতি সামান্য অংশই এধাবৎ উদ্ধৃতি ও পরীক্ষিত হইয়াছে—এ বিষয়ে যে সকল অন্তরায় বিদ্যমান তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল বনী লোকের উদাসীনতা। স্থানীয় গবেষণার বাহারা অভিজ্ঞ তাহার। তিনি কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, তথাকথিত শিক্ষিত লোকের গৃহে পুরাতন প্রমাণপত্র পরীক্ষার বাহির করা কি হুকুম ব্যাপার এবং এ বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় কতদূর পশ্চাৎপদ হইয়া আছি। দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতার প্রাসাদবাসী এক শ্রেণীর লেখক বিনা পরিশ্রমে বনবলে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে বাঙালীকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেছেন। বর্তমান গ্রন্থকার এই সকল অন্তরায়ের সম্মুখীন হওয়ার সাহস ও অদম্য উৎসাহের পরিচয় দিয়া আমাদেরকে বুঝ করিয়াছেন এবং সাদরে তাহার বিপুল পরিশ্রমকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোর কুঁড়ি ২১

আগেই কোন ধারণা-পোষণ না করে এই কবিতার বইখানা দয়া করে দেখুন। অনেক ছবি; নানাবিধ জোরাল ছন্দে জোরাল ভাবপূর্ণ কাহিনী, কথা ও অল্পরকম কবিতা। ভাল লাগবে। এটা লোকভুলানো বিজ্ঞাপন নয়, কবিতাগুলি তা প্রমাণিত করবে। দাশগুপ্ত কোং ৫৪৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও অগ্রাগ্র দোকানে।



পুস্তক পরিচয়

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে) —

শ্রীজ্ঞাননাথ বুলোপাধ্যায় ও শ্রীসহনীকান্ত দাস। রত্নন পাবলিশিং হাউস, ২৭, ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা-৩৭। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।
আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের সম্পর্কে ভক্তেরা নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাংলা ভাষায় তাঁহার যে সকল জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দু'একখানি ছাড়া আর সবগুলিতেই তাঁহাকে ভগবানের অবতার প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পুস্তকে তাঁহার জীবন ও অধ্যাত্ম-সাধনা সম্পর্কে এমন সব কথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহার প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

এমন অনেকে আছেন যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না বটে, তবে তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। কিন্তু একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, পরমহংসদেব ছিলেন কামকামনে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত পুত্চরিত্র, দিব্য জীবনের অধিকারী বিরাট পুরুষ। তাঁহার জীবনে সর্বদ্বন্দ্বসমহারের যে আদর্শ মুর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে এক নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছে। তাঁহার সাধনাপুত জীবনাদর্শ পাশ্চাত্যের কোন কোন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে পর্যাস্ত

গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাঁহার বিরোধানের দশ বৎসর পরে মায়ম্বলার “A Real Mahatman” নামক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার প্রতি প্রত্যাশা নিবেদন করেন। আধুনিককালে রমণী রমণী রামকৃষ্ণদেবের জীবনী লিখিয়া এই মহাপুরুষের আবির্ভাবের নিগূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই লোকোত্তরচরিত্র মহাপুরুষ সম্বন্ধে যে সকল গালগল্প, অতিরঞ্জন এবং অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে ভক্তের অনুরাগ বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু যাহারা সত্যাবেদী, পরমহংসদেবের আসল স্বরূপটি কি ছিল, কোন গুণে আত্মপ্রতিষ্ঠার বীজস্পৃহ হওয়া সম্ভব—

বদ্বন্দ্বাচরিত্রি শ্রেষ্ঠন্তদেবেতরো জনঃ।

স বৎ প্রমাণং কুত্বে লোকন্তদনুবর্ততে ॥

—গীতার এই বাণী তাঁহার জীবনে উদাহৃত এবং সার্থক হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে লোকগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—এই সকল প্রশ্নের সম্বন্ধে যাহারা চান তাঁহাদের একমাত্র উপজীব্য সমসাময়িক সাক্ষ্য-প্রমাণ—প্রত্যক্ষ দর্শন এবং সত্যের ভিত্তির উপর যাহার প্রতিষ্ঠা। এত-কাল পরমহংসদেব সম্বন্ধে সমসাময়িক ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাসমূহে ও অন্তর্জ ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, এবং সেগুলির প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। প্রায় বিশ্বস্তির গর্ভে

ফেথোডের মহাভূমি রাজ তৈল

চুল উঠা বন্ধ করে
মাথা ঠাণ্ডা রাখে



এই মার্কা দেখে কিনুন নকল থেকে সাবধান



বিলাস এই সমস্ত উপকরণ অক্লান্ত পরিশ্রমে সমাহরণপূর্বক গ্রন্থকারের পরমহংসদেবের জীবন ও চরিত্রমাহাত্ম্যকে প্রকৃত সত্যের আলোকে বাঁচাই করিয়া লইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ১৮৭৫ সনের ২৮শে মার্চ কেশবচন্দ্র-পরিচালিত ইন্ডিয়ান মিঃরে প্রথম পরমহংসদেব সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়। তখন হইতে বিরোধানের অব্যবহিত পরবর্তীকাল (১৮৮৮ সালের শেখভাগ) পর্যন্ত এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রায় সমুদয় তথ্যই এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। তা ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি ব্রাহ্ম নেতাদের গ্রন্থে প্রদত্ত পরমহংস-প্রসঙ্গ, ব্রহ্মবাক্য উপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অম্বিনীকুমার দত্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মূল্যবান তথ্যসম্বলিত স্মৃতিকথা ইত্যাদিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকারের সমসাময়িক সংবাদ-পত্রাদি হইতে সঙ্কলিত তথ্য কালানুক্রমিকভাবে পর পর সন্নিবেশিত করিয়াছেন মাত্র, এগুলির উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ বা মনগড়া ভাঙ্গ-রচনা করেন নাই—স্বার্থকে মুগ্ধপ্রবীণ জ্বালাইয়া দেখাইবার ব্যর্থপ্রয়াস না করিয়া ভালই করিয়াছেন। পুস্তকখানি আত্মোপাস্ত অভিনিবেশসহকারে অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে সঙ্কলিত তথ্যটির মধ্যে পরমহংসদেবের অধ্যাত্ম ও ভাব-জীবনের মূল সূত্রটি বিধৃত রহিয়াছে, এবং এগুলির মাধ্যমেই এক মহাজীবনের অজ্ঞেয়ী বিরষ্ট মহিমার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

পরমহংসদেব আত্মপ্রচারে বিমুগ্ধ ছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি কেশবচন্দ্র ঘারা যে তাঁহার মাহাত্ম্য-রূপা, এমন কি উক্তিসমূহ পর্যন্ত ‘কথামৃত’ের বহুপূর্বে প্রথম শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হইয়া সমসাময়িক জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীবৃন্দকে তাঁহার চরণোপাস্তে টানিয়া আনিয়াছিল ইহাও তেমনি ঐতিহাসিক সত্য। কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ এই দুই জন

মহাপুরুষের বিরোধানের পর কে কাহার নিকট কতটা ধনী তাহা লইয়া দলীয় মনোভাব উৎকট আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া বর্মজগতের নির্মল আবেগকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। সাময়িক বুদ্ধিজীবীতা বশতঃ কেশবের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন-প্রয়াসী কেহ কেহ তখন পরমহংসদেবকে ব্যাধিগ্রস্ত এবং বিকৃতমস্তিষ্ক পর্যন্ত বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু সমসাময়িক ‘কেশব-শিষ্টেরা’ পরমহংসদেবকে কোন দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহাকে কিরূপ উচ্চাঙ্গের আত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ মনে করিতেন তাহার ভুরি ভুরি পরিচয় এই পুস্তকে সঙ্কলিত তাঁহাদের স্মৃতি-কথাগুলি হইতে পাওয়া যাইবে। তদুপায়ে *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen* প্রণেতা আচার্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিকথাটি (*The Theistic Quarterly Review*, October-December 1879-এ প্রকাশিত) এমনি যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যসমর্থিত ও অকপট যে তাহা পরমহংসদেবের অধ্যাত্ম-জীবনের দিগ্‌দর্শনে ধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই সমভাবে সহায়ক হইবে। অন্ততঃ, ব্রাহ্ম-সমাজে মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা প্রবর্তনের জন্ত কেশবচন্দ্র যে পরমহংস-দেবের নিকট গুণী, প্রতাপচন্দ্রের রচিত কেশব-জীবনীতে তাহার স্বীকৃতি আছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। কে কাহার নিকট গুণী তাহা লইয়া চুলচেরা বিচার—সার বস্ত ফেলিয়া খোলা লইয়া টানটানি করিবার মত। আসলে পরমহংসদেব এবং কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে কি মধুর আত্মিক সম্পর্ক ছিল, পরস্পরের দর্শনে তাঁহার উভয়ে কিরূপ পুলকিত হইতেন, কেশবের বিরহ পরমহংসদেবের ভাবপ্রবণ অন্তরকে কিরূপ বিচলিত ও বেদনাতুর করিয়া তুলিত তাহার পরিচয় এই পুস্তকের বহু স্থানেই পাওয়া যাইবে।

প্রতাপচন্দ্র ছাড়া সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের স্মৃতি-কথার মধ্যে ব্রহ্মবাক্য উপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী বা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রবন্ধ বেশিষ্টা-পূর্ণ। নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিপুণ তুলিকার পরমহংসদেবের ভাবসমাধি এবং মহাসমাধি দুয়েরই যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অপূর্ব।

লোকচক্ষুর অন্তরালে পরমহংসদেবের অধ্যাত্ম এবং লৌকিক জীবন সম্পর্কিত যে সকল অমূল্য উপকরণ অনাদরে অবহেলায় আত্মগোপন করিয়াছিল সেগুলি আহরণ করিয়া গ্রন্থকারের এক মহৎ কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন—এই তথ্যাবলী পরমহংসদেবের জীবনের তথ্য উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ধর্ম্মান্বোলনের ইতিহাসের উপর অভিনব আলোক-সম্পাত করিয়াছে। আমাদের প্রব বিবাস যে পুস্তকখানি আকার গ্রন্থের মর্যাদালাভ করিবে এবং ভবিষ্যতে বিনিই পরমহংসদেব সম্পর্কে সত্যপ্রিয় তথ্যমূলক জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন এখানি তাঁহার নিকট অপরি-হার্য বলিয়া গণ্য হইবে। পুস্তকের ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও অনবদ্য।

বিনামূল্যে



আমাদের ৫০১ রেজিষ্টার্ড নম্বরযুক্ত কৃষ্ণতৈল ব্যবহারে সব রকম চুল ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং এর পর চিরকাল কাল চুলই গজাইবে। ইহা চুলপড়া বন্ধ করে এবং চুলকে লম্বা, উজ্জ্বল ও কৌকড়ান করে। মূল্য প্রতি শিশি ১০/-, একত্রে তিন শিশি (পূর্ণ কাল) ব্যবহারের জন্ত ২৫ টাকা। এই অত্যুৎকৃষ্ট তৈলকে লোকপ্রিয় করার জন্ত আমরা স্থির করিয়াছি যে, প্রতি এক শিশি ক্রেতাকে শিশির সহিত একটি ২৫ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত স্নান নানানসই হাতঘড়ি এবং নূতন স্বর্ণের একটি আঙটি আর একত্রে তিন শিশির ক্রেতাকে অনুরূপ ৬টি হাতঘড়ি ও ৬টি আঙটি বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হয়। তৈলের গুণ প্রমাণিত না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়। চিঠিপত্রাদি ইংরাজীতে লিখিতে হইবে।

LONDON COMMERCIAL CO.,

P. B. 2 (D-180-14) AMRITSAR.

সরল হিসাব প্রণালী

অধ্যাপক হরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিগুণাত্মক প্রণালীতে (Double-entry) হিসাব-পদ্ধতি শিখিবার একমাত্র পুস্তক, শিক্ষকের বিনা সাহায্যে বুঝা যায়। ছাত্র ও ব্যবসায়ীর পক্ষে সমভাবে উপযোগী। ব্যাক ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত ব্যবসায়-তথ্য জানা যায়। আই-কম পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরসহ মূল্য ৫/- টাকা।

মডার্ন বুক এজেন্সি—কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

এশিয়ার নৃত্য-ছন্দ (নৃত্য-নাটিকা) — বশন বড়ো।

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, বঙ্কিম চ্যাট্জো স্ট্রিট, কলিকাতা ১২।
দায় পাঁচ সিকা মাত্র।

১৯২৭ সনের ২৪শে জানুয়ারী তারিখটি ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দিন রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য নটীর পূজা অভিনীত হইয়া দর্শকদের সমক্ষে এক অভিনব রসলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত করে—নটীর পূজার রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী নৃত্যের সংযোজন করিয়াছিলেন—তাহার স্বজনী প্রতিভার গুণে উক্ত নাটকে সাহিত্য এবং নৃত্যকলার এক অপূর্ণ মিলন সাধিত হয়—তার পর তিনি স্বতন্ত্র, শাপ-মোচন, চিত্রাঙ্গদা ইত্যাদি আরও অনেকগুলি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ক্ষেত্রে তাহার অনুগামীরা সংখ্যা খুবই কম। নৃত্য আজ আমাদের বিবিধ সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ছোট ছোট বালক-বালিকারাও নৃত্যকলানৈপুণ্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাহাদের উপযোগী নৃত্যনাট্য অভিনয়ের অভাব আছে।

খ্যাতিমান শিশু-সাহিত্যিক ‘বশন বড়ো’ এই অভাবপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ জানাইতেছি। বিশেষ ভাবে বালিকাদের অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত এই নৃত্যনাট্যে তিনি যে মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

নাটকের কাহিনীটি শিশুদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিবে। মেঘগর্জন-মুখরিত বিদ্রূপ-চমকিত এক বন্যাকার রাত্রে হুল্লরবনের বাঘের মূলকে দৈবক্রমে সমাগত বর্ষা দেশের পারিষদ কুসুর, আসামের হরিণ, চীনের ডাগুন, দক্ষিণ ভারতের বীর হুম্যান, গুজরাটের হাতী এবং উত্তর ভারতের উট, জাপানের প্রজাপতি, সিংহলের সাপ ইত্যাদি নানা জন্তু জানোয়ারের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিল। মারামারি হানাহানি করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইবার পর তাহারা বুঝিতে পারিল যে, যেতাল হইয়া বেচালে চলিয়া তাহারা ছন্দপনন করিয়া বসিয়াছে, তখন তারা ‘অমিল আর আড়িকে ভুগিয়া ছন্দের আসর বসাইল—প্রথমে প্রদর্শিত হইল শিবদুর্গার গাঁজন নৃত্যের গান, সতীতাণ্ডব আর সাঁওতালী নৃত্য। শেষে প্রত্যেকটি জানোয়ার প্রদর্শন করিল নিজ নিজ দেশের নৃত্যকলা। মিষ্টি সলোপ, নৃত্যের আনুভবিক সঙ্গীতগুলির হুল্লর ছন্দ ও কথার মধ্যে এরূপ যাহ রহিয়াছে যে তাহা এমনি পাঠ করিলেই শিশুটিও নন্দিত হইবে—সুষ্ঠু ভাবে অভিনীত হইলে এই হুল্লর নৃত্যনাট্যখানি যে কি অপরূপ রূপস্থিতি করিতে সক্ষম হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই নাটকে সঙ্গিবিট গানগুলির স্বর সংযোজন করিয়াছেন শ্রীহরীপু ভট্টাচার্য—পুস্তকে সবগুলি গানেরই স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে।

এশিয়ার অনেকগুলি প্রধান প্রধান নৃত্যকে চরণ হুল্লর রূপায়িত করিবার সুযোগ নাটকখানিতে আছে। তবে এই ছন্দের আসরে যবদীপ ও বলিঘোপের দুইটি প্রাণীকে আনিয়া হাজির করিলে ভাল হইত—এশিয়ার নৃত্যকলার ক্ষেত্রে যবদীপ ও বলিঘোপের নৃত্যকলা কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে রবীন্দ্রনাথের ‘বান্দী’ পুস্তকে তাহার পরিচয়

পাওয়া যাইবে—যবদীপের নৃত্যকলাকে রূপদান করিতে পারেন বাংলা দেশে এমন নৃত্যশিল্পীও আছেন।

শ্রীললিনীকুমার ভদ্র

দীনবন্ধু মিত্র—শ্রীহরীকুমার দে। এ. মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। মূল্য ১৫০ পানা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে শরণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-ভাষণে গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই ভাষণ মুদ্রিত হইয়া হৃদয়গ্রন্থকারে এইবার প্রকাশিত হইল। বঙ্গ-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাজেই ইহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিবেন। আমাদের নাট্যসাহিত্যে বেশী সমৃদ্ধ নয়। যে দুই-এক জন অনাধারণ প্রতিভাবান লেখক প্রকৃত নাটক-রচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, দীনবন্ধু, নিঃসন্দেহ, তাহাদের অন্তর্গত। সম্ভ্রুতি তাহার নাটক সম্বন্ধে সাধারণের ‘মধ্যে কিঞ্চিৎ উৎসাহ দেখা যাইতেছে, ইহা হুল্লফণ। তাহার নাটকের নীতি ও রুচিগত দুর্বলতার অভিযোগ মধ্যে মধ্যে শোনা গিয়াছে। সে সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য : ‘বাহারী বলেন, মীলতার চেয়ে অমীলতার দিকেই দীনবন্ধুর ঝোঁক বেশী, তাহারা ভুলিয়া যান যে দীনবন্ধুর মত নাট্যরসিকের সমগ্র জীবনদৃষ্টি মীলও নয়, অমীলও নয়,—নিগিগু ও নিরপেক্ষ।’ উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক ও সামাজিক পটভূমিতে দীনবন্ধুর নাট্যস্থিতি-প্রতিভার পরিচয় দেওয়া বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পাণ্ডিত্য ও রসবোধের সমন্বয়ে গ্রন্থকার সে উদ্দেশ্যসাধনে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছেন।

সবিনয়ে সামান্য একটি ত্রুটির উল্লেখ করি। ৩২ পৃষ্ঠার গ্রন্থকার বলিয়াছেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপজ্ঞান’ ‘১৮৫৫-৫৭’ সালে রচিত। ‘ঐতিহাসিক উপজ্ঞানের’ আখ্যায়িক প্রকাশকাল ১৭৭৯ শক মুদ্রিত আছে; ইহা ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ ছাড়া অনুরূপ হইতে পারে না। ১৮৫৮ সালের মাঘ মাসের ‘প্রবাসী’তে শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, উহার প্রকাশকাল ইং ১৮৫৮।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বাধীন চিন্তা ও নয়াসমাজের গোড়াপত্তন—

শ্রীধর্মোদকুমার ঘোষ। লেখক কর্তৃক পুস্তকালি হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৭। মূল্য ১০ পানা।

দেশের বর্তমান দুঃখদশ, খাদ্যসঙ্কট, রাজনীতি, দলাদলি, সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং নতুন পরিকল্পনায় পুনর্গঠন প্রভৃতি বহু বিষয় লেখক স্বল্পপরিময়ের মধ্যে আলোচনা করিয়াছেন। লেখক আদর্শবাদী এবং তাহার মতে দেশের হিতকামী ব্যক্তিগণ যেভাবে দেশবাসীকে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন তাহা বর্তমান ভারতবর্ষে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী হওয়ার পক্ষে বহু বিঘ্ন আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইতে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ পর্যন্ত একই আদর্শ অনুসরণের দরকার কিন্তু ইহা বিরূপে



অমৃততাণ্ডন
সর্বপ্রকার বোম্বায়ে জাগতিক বোম্বার ন্যায় কার্যকরী।

দাদেব মলম
চন্দ্রা রোগে ‘পরিমার্গ শান্তির’ ন্যায় কার্যকরী।
অমৃততাণ্ডন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭



সম্ভব তাহাই সমস্ত। লেখকের আশাবাদ বাস্তবতাকে ছাড়িয়া অনেক উচ্চে চলিয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে অথক শব্দটির পশ্চাতে স্থাপন করিয়াছে। লেখক অনেক স্থানে ইংরেজী হরফে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ ইহার কোন আবশ্যকতা ছিল না। লেখক চিন্তাশীল, কিন্তু তাহার চিন্তা বাস্তবতার পথে সমস্তার সমাধানে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অধিক খাত্ত উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ।—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত আরও খাত্ত ফলাও সম্প্রসারিত পুস্তিকা। ৫০ পৃষ্ঠার নানা ছবি সম্বলিত এই পুস্তকে আমাদের সরকারের ধান, আলু, পাট প্রভৃতির চাষ, সার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচেষ্টার অনেক তথ্য দেওয়া হইয়াছে। মডেল ফার্মের সাহায্যে জনমত গঠনের চেষ্টাও প্রদর্শনীয়। আন্তর্জাতিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা দ্বারা আমাদের কৃষির শোচনীয় অবস্থা দেখান হইয়াছে। কৃষক ও কৃষি-অনুরাগীদের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার কাম্য।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মনপ্যাথি—শ্রীচন্দ্র নন্দী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পরশুরামের বিখ্যাত হাসির গল্প ‘চিকিৎসা-সঙ্কট’ অবলম্বনে ‘মনপ্যাথি’ নাটকখানি রচিত হইয়াছে। মূল গল্প খুব ছোট। তাহা সবেগে গল্পের মূলভাব অক্ষুর রাখিয়া নাট্যকার আশ্চর্য নৈপুণ্য এবং মুল্লিরানার সঙ্গে ইহাকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসির নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। পরশুরামের প্রত্যেক গল্পেই অনাবিল হাস্যরসের যে ধারা উচ্ছসিত হইয়া উঠে, মনপ্যাথি নাটকের সর্বত্রই সে ধারাটি বজায় আছে, এক কথায় মনপ্যাথি ‘চিকিৎসা-সঙ্কট’র একটি সার্থক নাট্যরূপ। নাটকের চরম সার্থকতা অভিনয়ে। ‘মনপ্যাথি’ নাটকখানি বহুস্থানে—এমন কি হৃদয় লগুনে পর্যন্ত মাফলোর সহিত অভিনীত হইয়াছে। ‘মনপ্যাথি’র হাসির তরঙ্গ যে পাঠক এবং দর্শকের মনকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে নাটকখানির দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

স্বাত্ত-উদয়

স্বাত্তবন্ধু যতদিনের ও যে কোন কারণেই হউক, ২৪ ঘণ্টায় শ্রাব করাইতে অব্যর্থ, নির্দোষ ও সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা বাধক, প্রদর প্রভৃতি রোগেও কার্যকরী হয়। কখনও ব্যর্থ হয় না। মূল্য ৩, মাঃ ১১; স্পেশাল ষ্ট্রং ৯, একষ্ট্রা স্পেশাল ১৮, মাঃ ২১। জাল ও নকল হইতে সাবধান।

• স্বীরোগ-বিশেষজ্ঞ

ডাঃ বি, চক্রবর্তী এম, বি (হোমিও) এম, এইচ, আর, এ ১৪৬, আমহাষ্ট স্ট্রিট, কলিকাতা—২

ব্রাঞ্চ-১১৪বি, হাজরা রোড, (হাজরা পার্কের পশ্চিমে) কলিঃ ২৬

অভিসার রঙ্গনটি—রমাপদ চৌধুরী। কালকট্টা বুক ক্লাব লিঃ। ৮৯, হারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

‘অভিসার রঙ্গনটি’ একখানি ছোট গল্পের বই। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের প্রাণান্তকর প্রয়াস সর্বত্রই সুস্পষ্ট এবং এই নিদারুণ জীবনসংগ্রাম ও প্রতিকূল পরিবেশের জন্য আমাদের জীবনযাপনের প্রণালীও জটিল হইতে বাধ্য এবং স্বাভাবিকভাবেই যে আধুনিককালের মানুষের মানসলোকেও তাহার ছাপ পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য। ‘অভিসার রঙ্গনটি’র গল্পগুলিতে লেখক আধুনিক জীবনের ধানি, প্রবন্ধনা ও বেদনার ছবি আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু সমস্তার উপর আলোকপাত করিলেই সার্থক ছোটগল্প হয় না—রস-রূপ উজ্জ্বল হইয়া না উঠিলে তাহা সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে ব্যর্থ হয়। বাস্তবধর্মী সাহিত্য সকল যুগেই সমকালীন সমাজ-সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমস্তা যেখানে নিছক বিশ্লেষণে পর্য্যবসিত হয়—সাহিত্য আর সেখানে সাহিত্য থাকে না—রসের গভী অতিক্রম করিয়া তাহা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় পরিণত হয়। ‘অভিসার রঙ্গনটি’র গল্পগুলি পড়িয়াও বার বার এই কথাই মনকে পীড়িত করিয়া তোলে। ভাবার বাধু আছে, কখন-কৌশল হ্রস্ব, কিন্তু নাই প্রাণের উত্তাপ। ভঙ্গীসর্ব্বশঃ সাহিত্যের ইহাই প্রধান ক্রটি। প্রচ্ছদপট্ট চমৎকার।

খোলা চিঠি—শ্রীকানাইলাল ঘোষ। দি প্রকাশনী,

২৯, ভারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য দেড় টাকা।

‘খোলা চিঠি’ বইখানিতে উপস্থাপিত বিতৃতি থাকিলেও আসলে ইহা একটি বড় গল্প। সৈনিক হিসাবে লেখক মানুষের মহত্ব, উদারতা, দেশপ্রেমের যেমন পরিচয় পাইয়াছেন তেমনি মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও কপটতাও তাহাকে দৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতাই কাহিনীর আকারে এই বইয়ে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। লেখকের বলিবার ভঙ্গী এমনি হ্রস্ব যে তাহা পাঠকের মনকে বইখানির শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

প্রিয়া ও পরকীয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা। প্রান্তিহান—ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা—৬। মূল্য—২.১।

অবিনাশ বাবুর কবি অথবা উপন্যাসিক পরিচিতি নিশ্চয়োজ্ঞ। ইতিপূর্বে তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি উপন্যাস। চিরন্তন একটি প্রেমের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে, কিন্তু কাহিনী যাহাই হউক না কেন দ্রুত দিয়া নিষ্ঠার সহিত লিখিতে পারিলে অতি সাধারণ বিষয়বস্তুও অসাধারণ হইয়া উঠিতে পারে এবং পাঠকস্বর্গও অমূল্য চিত্রে তাহা গ্রহণ করিতে, বিধা করে না। পুস্তকখানির ছয় নাঙ্গের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার এই উক্তি প্রমাণিত হইয়াছে।

সবার চেয়ে বড় কথা, লেখকের ভাবার এবং পরিবেশ সৃষ্টির উপর সংযম কোথাও ব্যাহত হয় নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত



দেশ-বিদেশের কথা

মানভূমে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব

মানভূমি জেলার কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—“মাদলিক সাহিত্য বীথি”র উদ্যোগে বিশেষ সমারোহের সহিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পূর্ণিলিয়া জেলা জল হলে অক্লান্ত হইয়াছে।

সুসারী গৌরী মজুমদারের উদ্যোগ-সদীভের দ্বারা সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভার মাদলিক সাহিত্য বীথির পক্ষ হইতে শ্রীমৎস্বনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুল প্রচারের জন্য অবিলম্বে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশের অনুরোধ জানানো হউক এই মর্মে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর রমা মজুমদার কর্তৃক “তোমার আসন সূত আজি” সঙ্গীত গীত হইলে সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রীমশোকনাথ চৌধুরী এক অতিশীত ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গীত হইলে পর প্রধান অতিথি মানভূমি জেলার ডেপুটি কমিশনার শ্রীমোহন চৌধুরী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে দেশের তরুণ সজ্জনদেরকে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের তাৎপর্যের অধুপ্রাণিত হইতে আবেদন জানান। সমবেত কর্তে “জনগণমন অধিনায়ক” গীত হইবার পর অহুষ্ঠানের পরি-সমাপ্তি হয়।

রূপনারায়ণ নদী সংস্কার পরিকল্পনা

আমরা নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইয়াছি :

“প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

প্রায় ৪০৪৫ বৎসর পূর্বে বি-এন-আর রেলপুলের লাভটি পিলায়ের নিকট ৮১১০ ওয়াগন রেল-পাথর ঢালার জন্য নদীর স্রোত বন্দীভূত হইয়া দক্ষিণা গিয়াছে। একমাত্র উক্ত কারণে দামোদর, দারকেশ্বর, শয়েল প্রভৃতি ছোট বড় বহু নদী-অঞ্চলে জলের অনটন দেখা দিয়াছে। ফলে নদী হইতে খাল কাটরা ফলসেচন করতঃ একই ক্রমিতে একাধিকবার ফসল কলানোর যে সুবিধা ছিল তাহা বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ার শঙ্ক উৎ-পাদনে বিঘ্ন ঘটতেছে। তাহা ছাড়া নদীর জলের সহিত প্রচুর পরিমাণ খাতোয়ানো মৎস্য পাওয়ার যে সুবিধা ছিল তাহাও আশাতীত রকমে কমিয়া গিয়াছে। ইহা হানীর অধিবাসিগণের আর্থিক সাচ্ছল্যের প্রতিবন্ধক-বরূপ হইয়া

কাড়াইয়াছে। সুতরাং বর্তমান খাত-সকলের গুরুত্ব হ্রাস করি-বার জন্য নদীর সংস্কার করিয়া প্রচুর জল-সরবরাহের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বি-এন-আর রেল কোম্পানীর এই সমস্যার দৃষ্টিপাত হইতে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া বর্তমানে নদীর অবস্থা ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চল ইহার সাক্ষ্য দিবে। সুতরাং সরকারের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতা পাইলে উক্ত সংস্কার-কার্য অসম্ভব হইবে না।

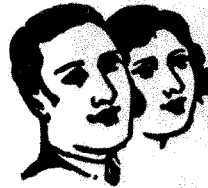
হানীর জনগণের পক্ষে
শ্রীমদীকেশ সরকার”

গ্রাম—সাহাপুর,

পোঃ—কোলাবাট,

মেদিনীপুর।

বিনামূল্যে কাশ্মিরী শাস্ত্র



আপনার অতি প্রয়োজনীয়, বইটি প্রকাশিত হইল। ইহাতে নর-নারীর ২৮৪টি রঙীন চিত্র আছে। বিজ্ঞাপনের খরচা বাবত মাত্র আট আনার ট্যাম্পসহ সত্তর পত্র লিখুন। বিলম্বে হতাশ হইবেন।

PARIS ART HOUSE

HALQA. 5. (D-194) AMRITSAR

নূতন ধরনের কবিতার বই

প্রাত্যহিক

মূল্য দুই টাকা

শ্রীভারপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কালিদাস রায়, সজনীকান্ত দাস, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, বিমলেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বাংলা-দেশের খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক কর্তৃক অভিনন্দিত। অমৃতবাজার পত্রিকা, দেশ, যুগান্তর, পূরীশা, পূরীচল, সংহতি, বর্তমান প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত।
কমলা বুক ডিপো—১৫, বকিম চাটাজি স্ট্রীট, কলিকাতা।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

কর্মবীর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার বরিশাল জেলার গাভা গ্রামে ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। গাভা হাই স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া জ্ঞানচন্দ্র ১৯০৮ সনে বি-এ পাশ করেন। তৎপরে তিনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৯১২ সনে বিখ্যাত দি সিটি অব গ্লাসগো ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্সি লইয়া কর্মজীবন শুরু করেন। দুই বৎসর পর তিনি প্রিন্সিপ্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন। ইউনিভার্সাল



জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

এসিওরেন্স কোম্পানী নামে আর একটি কোম্পানী প্রিন্সিপ্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী কর্তৃক ক্রীত হইলে জ্ঞানচন্দ্র ইহার দায়-আদায় প্রভৃতির বন্দোবস্ত করেন। ভারতীয় বীমার ইতিহাসে এই প্রকার রদ-বদল ইহাই প্রথম এবং তিনি অতি দৃষ্টান্তে এই কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তারপর তিনি বোম্বে মিউচুয়াল বীমা কোম্পানীর চীফ এজেন্সি গ্রহণ করেন।

কলিকাতা শহরই ছিল তাঁহার প্রথম জীবনের কর্মক্ষেত্র। তারপর ক্রমে ক্রমে তিনি সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা ও আসামে তাঁহার কর্মক্ষেত্রের বিস্তার করেন। ১৯৫০ সালে অবসর গ্রহণের সময় তিনি বৎসরে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কাজ

দেখাইয়া গিয়াছেন। এদেশে বোম্বে মিউচুয়াল যে বীমা কোম্পানীর অস্তিত্ব শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহার মূলে আছে জ্ঞানচন্দ্রের অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অমাহুতিক কর্মতৎপরতা। বাংলাদেশে যে কর্মজীবন কীর্তিবীর জীবনবীমার প্রতিষ্ঠাতা জাতিকে অহরন্তর করিয়া তুলিয়াছেন, জ্ঞানচন্দ্র তাঁহার অস্তিত্ব। তিনি অক্লান্ত বহু ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

জ্ঞানচন্দ্র যেমন অল্প অর্থ উপার্জন করিয়াছেন তেমনি মুক্ত-হস্তে এই অর্থের সদ্ব্যয়ও করিয়াছেন। তাঁহার নিজের কোন বিলাসব্যসন ছিল না। বরিশাল সদর হাসপাতালে অস্ত্রোপচার বিভাগের একটি শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার তিনি বহন করিয়াছিলেন। জামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রশীর্ষে তাঁহার দান অসামান্য। তবানীপুর সামরিক হাসপাতালেও তিনি প্রভুত দান করিয়াছেন। গাভার একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন।

ফুটবল খেলায় তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল। এক সময় তিনি ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁহাকে জেনারেল সেক্রেটারী পদে নির্বাচন করিয়াছিল।

চিন্তাহরণ রায়

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রাক্তন ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল চিন্তাহরণ রায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

চিন্তাহরণ রায় ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিত-শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৯০৩ সালে সিল্লীহ সেণ্ট পিটার্স কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ভাগলপুর টি. এন. জুবিলী কলেজে, মীরট কলেজে ও গৌহাটি কলেজেও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৯১১ সালে মহাত্মা অখিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে স্বামী ভাবে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে যোগদান করেন। মুখ্যতঃ তাঁহার ঐকান্তিক প্রয়াসে উত্তরকালে ব্রজমোহন কলেজ অবিভক্ত বঙ্গের অস্ত্যন্তম শ্রেষ্ঠ কলেজে পরিণত হয়।

তিনি এই কলেজে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে যুক্ত ছিলেন। পরে কিছুদিন প্রিন্সিপ্যাল পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এস. কে. মিত্র

গত ২৬শে আষাঢ় এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির জল-সরবরাহ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এস. কে. মিত্র নিজের বাড়ীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর। তিনি জল-সরবরাহ বিভাগের পূর্ণগঠন করেন। শুদ্ধত তাঁহাকে ২০ বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

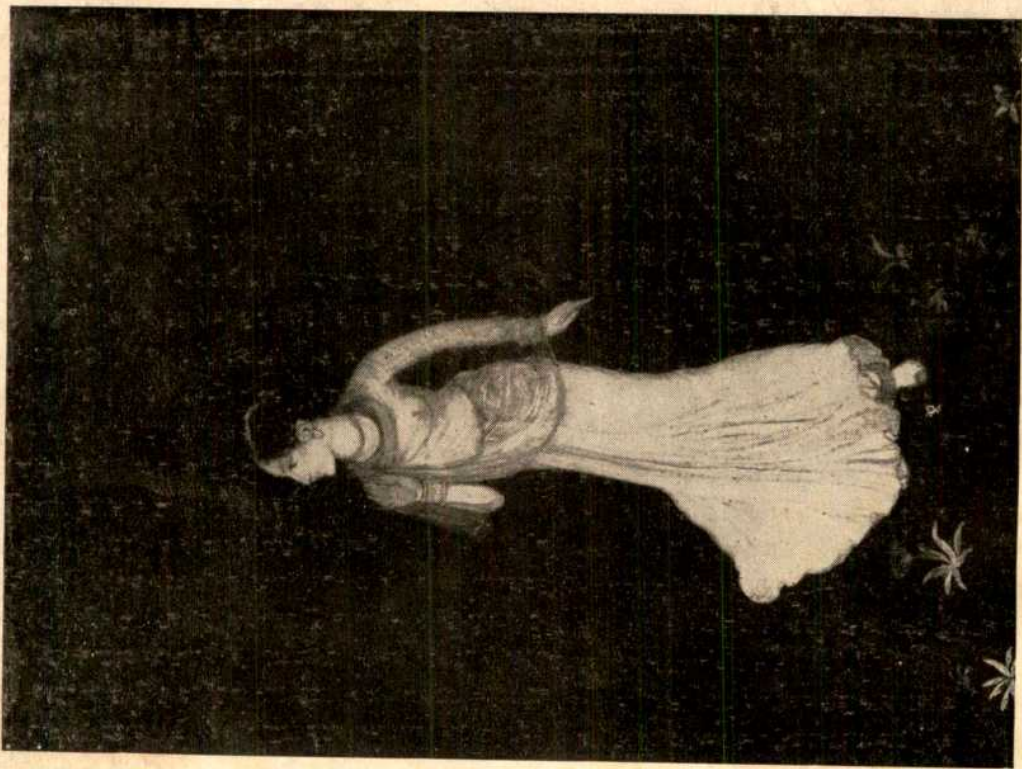


১
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মা ও ছেলে
শ্রীসুখময় মিত্র



বুদ্ধ ও সুজাতা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



অভিসার
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৫৯

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতার পাঁচ বৎসর অতীতের পর্যায়ে চলিয়া গেল। স্বাধীনতা দিবসে লোকের উচিত সেই সব মহামানবের কথা স্মরণ করা যাহাদের দ্বারা ও প্রয়াসে স্বাধীন ভারতের পরি-কল্পনা হৃদে হইয়া উঠে। তাহাদের বাণী ও কীর্তির কথা মনে জাগিলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে যে, যে স্বাধীন দেশের রূপ ধ্যান তাহারা করিয়াছিলেন, আজিকার স্বাধীন ভারত কি তাহাই?

সেই সঙ্গে প্রশ্নের উত্তরও আসে। স্বাধীনতা বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং বাহ্যিক মূল্য আমরা দিয়াছি তাহাই আমরা পাইয়াছি। মূল্য কি কেহই কিছু দেয় নাই? দিয়াছে নিকট দেশমাতৃকার সেই সুলভানগণ, যাহারা প্রত্যাশা কিছুই করে নাই, সর্বত্র রক্ত করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে চরম আহুতি যাহারা দিয়া গিয়াছে এবং প্রথমও দিতে প্রস্তুত আছে। তাহারা কি কি পাইয়াছে? পাইয়াছে নিকট তাহারা কিছু, কেমনা কোনও অভিযোগ তাহাদের শোনা যায় না।

তবে পার নাই কাহারা? যাহারা বিনামূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করিতে চাহে। স্বাধীনতার অর্থ তাহাদের নিকট বিনামূল্যে, বিনা প্রতিদানে স্বাধীনতা ও লালসার তৃপ্তি। এই স্বাধীনতা চিরদিনই তাহাদের নিকট অলীক বস্তু হইয়াই থাকিবে—কেমনা স্বাধীন ও লালসার শেষ নাই, ইহা অপূরণীয়।

এই স্বাধীন ও লালসার সঙ্গে যখন জাতির অভাব, শিকার অভাব ও কর্তব্যবিমূঢ়তা আসে তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাই আমরা আজ চতুর্দিকে দেখিতেছি। বাস্তব অতার অনেক কিছু রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে অভাব কি শুধু গণমতের চীৎকারেই দূর হওয়া সম্ভব? পরের উপর দোষারোপ ও পরস্পরপক্ষী স্বাধীনতার রূপান্তর, উহাতে আত্মনির্ভর বা উদ্যোগময় পৌরুষের কোনও লক্ষণ নাই। দেশের লোক যত দিন কর্তৃত্বপূর্ণ এবং আত্মনির্ভরশীল না হইবে তত দিন স্বাধীনতার অর্থ তাহারা বুঝিবে না এবং অভাব তাহাদের নিত্যসঙ্গী থাকিবেই। বাঙালী বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া আমাদের গর্ব আছে—তাহা সত্যই হটক বা মিথ্যাই হটক, কিন্তু এই লজ্জা কথা তবে বাংলার লজ্জা বুঝিয়াও বুকে না কেন?

বাংলা আজ অভাবগ্রস্ত, সখিবহীন, দুর্বল ও সাহায্যের জন্য পরের দ্বারস্থ। কিন্তু তিকাপায়ে যদি উচ্ছ্রেষ্টের পরিমাণ যথেষ্ট না হয়, তবে তিখারীর কোষ ও কোষের অবসানের জন্য চীৎকার ও পালিবর্ষণ তির উপায় কি? আমরা পথে-ঘাটে দেখিতেছি সেই উপায়ের ব্যবহার—স্লোগানের চীৎকার এবং অহুযোগ ও অভিযোগের অগ্নিবর্ষণ। এই তিকাপথে বাংলার ও বাঙালীর মুখ কি কোন দিন মুচিবে?

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল, আজও কি আত্মপরীকার সময় আমাদের হয় নাই, আত্ম-চেতনার মুহূর্ত্ত কি আসে নাই? আজও কি অস্বাভাবিক অধোগতির চীৎকারই আমাদের একমাত্র অবলম্বন? নিশ্চয়, কর্তব্যজিহীন, বিজ্ঞাত অবস্থার আমরা কোন্ পথে চলিয়াছি তাহা কি বুঝাইবার কেহই নাই?

হইতে পারে অযোগ্য লোকে উচ্চ অবিকার পাইয়াছে, হইতে পারে আমাদের অর্জিত ধন দখল-তরুর, দুর্নীতি-পরায়ণ লোকে অপহরণ করিতেছে, হইতে পারে চোরাকার-বারী, নীতিজ্ঞান ও বর্ধহীন পাষাণেই স্বাধীনতার সব সুখ ভোগ করিতেছে। ইহার প্রতিকারের পথ কি শুধু পালতরী স্লোগান, মিথ্যার বদলে চতুর্গুণ মিথ্যা বা বিদেশীর দয়া ও শক্তির অর্জনা ও আবাহন?

বাংলার উদ্ধার নাই, ভারতেরও উদ্ধার নাই যদি আত্ম-পরীক্ষা ও আত্মনির্ভর আমাদের সকল ব্যবহার মধ্যে প্রথম স্থান না পায়।

“বাঙালী মরিলে বাঁচিবে কে” এ প্রশ্নের উত্তর ‘বাঁচিবে সেই যাহার কর্তব্যজিহীন ও আত্মনির্ভরতা আছে’। পৃথিবীর কত দেশ, কত জমপদ, কত জাতি এখন মোকদ্দতির অতীত। কিন্তু কালের স্রোত কিরে নাই, মাহুয়ের প্রগতির পথও ক্রম হয় নাই। বাঙালী অপেক্ষা তাহারা সকলেই কিছু কম ছিল না।

আমরা বুঝি শুধু গণ-আন্দোলনের পথ এবং বেকী বিপ্লবের পথ। পার্শ্ব-মর্যাদা বা দেশ-সমিতির পুঙ্খ নুহে পরম বহুতা চলিল, তাহার অতিরিক্ত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, কিছুকালের মত দেশের কাজকর্ম স্থগিত বা ব্যাহত হইল,

তাহার পর কিছু, তিকি, কিছু সামান্য দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় জুটল, তার পর সবই শান্ত, সবই শান্ত। ভাগ্যচক্র কণিক ধামিরা আবার সেই পথেই চলিল। নিয়তির চক্রনেমী কি অত সহজে ফিরানো যায়?

বিহার আমাদের পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বহু অঞ্চল অভ্যন্তর-ভাবে অধিকারে রাবিয়াছে। তাহার উদ্ধারের জন্য আমরা চেষ্টা করতুঁক? অতীত পৌরব বা পুরাকালের পৌরুষ কাহিনী শুনাইলেই কি হারানিধির উদ্ধার হইবে? আজ বিহার জানে যে, বাংলা ও বাঙালীর গৃহহালী হইতে আরম্ভ করিয়া কল-কারখানা, পথঘাট নির্মাণ এ সবকিছুতেই বিহারী প্রমিকের স্থান বাঙালী লইতে পারিবে না। বিহারী জানে যে, বাংলা এখন সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী, আত্মকলহে ব্যস্ত এবং সকল দিকেই কর্মবিমুখ। তবে সে কেন তাহার অধিকার ছাড়িবে?

এই কলিকাতায় বাঙালী শিশু বিহারী গোয়ালার উপর নির্ভর করিয়া ছব পায়। বাংলার পোষন মাছা ছিল তাহা এখন কোথায়? গো-হত্যা নিবারণী সভার মামা শুনি, তাহাদের উদ্দেশ্য মহৎ সম্ভেদে নাই, কিন্তু গো-সেবা বা গো-রক্ষার জন্য তাহারা কতটুকু করিতে পারিয়াছেন? শহরে প্রকাণ্ড গো-মাংস বিক্রয়ে নিষ্ঠাবান হিন্দুর মনে আঘাত লাগা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু অস্থিচর্মসার গরু ভিলে ভিলে মরিতেছে দেখিয়াও তাহাকে খাও বা জল দিতে অগ্রসর হন করজম? এই অবহেলার ফলেই ত আজ বাংলার শিশু ছবের কাঙাল এবং ভিন্নপ্রদেশীয়ের দারহ।

ভাষার ভিত্তিতে দেশগঠন কাম্য সম্ভেদে নাই, কিন্তু যত দিন হেঁচো কাঁধা ও জীর্ণ কুটির লইয়াই কাড়াকাড়ি চলিবে, যত দিন আত্মকলহের কোনও চূড়ান্ত মীমাংসা না হইবে তত দিন ঐরূপ দাবী বিফল হইতে বাধ্য। হুর্কলের সহায় বরং ভগবান আছেন, কিন্তু নিজে, অলস ও বাকসর্বস্বের সহায় একমাত্র যম। তবুও আমরা চলিবে এই কর্মহীন লক্ষ্যহীন উচ্ছ্বাসেরই পথে। স্বার্থলোভী নিকোঁধ নেতারা “বিপ্লব” করিতেছেন লোকের কাজকর্ম বন্ধ করিয়া, হেলেনের লেখাপড়ায় ছাই দিয়া, অথচ বাহবা পাইতেছেন তাহারাই। “কংগ্রেস সরকার দেশ হ্রাসিত হইয়া দিয়াছে, জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে”, সুতরাং দেশে আশ্রয় লাগাও, দেশের কোটি কোটি লোক চরম হুর্দশাগ্রস্ত হউক, মুষ্টিময় অধিকারী বর্গ ত জ্বল হইবে। অতএব প্রতিকূলে বুঝাও পরিপ্রেক্ষণ গণভক্তবিরোধী, ছাত্রকে বুঝাও লিখন-পঠন মহাপাপ, তবেই দেশোদ্ধার হইবে। উভোগ, পরিপ্রেক্ষণ, কর্মভ্রমপন্নতা এই সব প্রাচীন শব্দ নব্বা বাংলায় অচল।

“ইয়ে আজাদী হুঁটা হার” একথা সত্য, কেননা আমরা স্বাধীনতা-যজ্ঞের পবিত্র হবি অবহেলা এবং আলক্ষে কুতুরের মুখেই তুলিয়া দিতেছি।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন

পশ্চিমবঙ্গের আরম্ভন বৃদ্ধি ও সীমানার পরিবর্তনের জন্য এই প্রদেশের বিধান সভার নিম্নলিখিত প্রস্তাব আসে:

বিধান সভার অধিবেশন সমাপ্তি বোম্বার পূর্বে ভিন্নমত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। একটি হইতেছে, মিছক বাচার জন্য বাংলার সংসদ এলাকাগুলির জন্য আবেদন, বাহাতে মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও জলপাইগুড়ি দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সংযোগ সাধন হইতে পারে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত পুনর্কাসনে সাঁওতাল পরগণার কতকাংশের জন্যও আবেদন জানান হইয়াছে।

বিহারের প্রস্তাব সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় উদ্বাস্ত ও অর্থনৈতিক সমস্যার চাপে পশ্চিমবঙ্গ যদি ভাদ্রিয়া পড়ে, তাহা হইলে বিহার এবং অত্যাচার রাজ্যের অবস্থা কি হইবে, সেই কথা তাবিয়া দেখার জন্য তিনি বিহারের নিকট আবেদন জানান। তিনি আরও বলেন যে, এক রাজ্যের সহিত অত্যাচার রাজ্যের অঙ্গাদী সম্পর্ক রহিয়াছে। এই কথা যত শীঘ্র আমরা বুঝিতে পারিব, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, বানবাদ ও টাটানগরের ম্যার অর্থকরী এলাকাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের সংসদ এলাকার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। এই সকল এলাকার সহিত বিহার অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গের অধিকতর মিল আছে। দৃষ্টান্তরূপে তিনি সাঁওতাল পরগণার কথা বলেন।

ডাঃ রায়ের মানহুম ও সিংহুম সম্পর্কে এত সহজে ও অল্পে সমুদ্র হওয়ার কারণ আমরা বুঝিলাম না। এই অঞ্চলগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভাষার ও রাজ্যের যে বোঁগ আছে সে বিষয়ে অজ্ঞতা একটি কারণ বোধ হয়। বাহাই হউক, এইরূপ যুহু ভাষার অহুরোধও বিহারী কর্মাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে:

বিহার কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র বলেন যে, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুনর্নির্ধারণ সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ পরিষদে যে বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার মরণ দেখিয়া মনে হয় যে, ডাঃ বিধান রায় ও তাহার বন্ধুগণ যত বোঁটার পিঠে চাবুক মারিতেছেন।

তিনি বলেন যে, বিহার কখনও এই দাবী মানিয়া লইবে না। তিনি আশা করেন যে, কংগ্রেস হাইকমান্ড ডাঃ রায় ও তাহার বাংলার বন্ধুদের প্রজ্ঞার দিবে না।

উহার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মারক শ্রীঅতুল্য বোম্ব নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

“শ্রী বোম্ব বলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে অগতঃ হতভাগ্য উদ্বাস্তদের মাথা ও জিবার টাইয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কিছু হানের

অত্যন্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সর্বসম্মত ভাবে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তৎসম্পর্কে বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ত্রিপ্রজাপতি মিশ্রের উৎকটতাব্যবণ বিবৃতির প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাড়াতাড়ি করিয়া সংবাদপত্রে বিবৃতিদানের পূর্বে ত্রিযুত মিশ্র ঐ প্রস্তাবটি এবং মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন তাহা পাঠ করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই।

ত্রিযুত মিশ্রের দ্বারা একজন সংযত ও দায়িত্বশীল কংগ্রেস-নেতা কিরূপে এইরূপ আত্মাহীন উক্তি করিতে পারেন, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। সম্ভবতঃ এখন বিহারের এই নেতার সুযোগমাত্তিক এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্ত সমস্তা সম্পর্কে তাহার কোন দায়িত্ব নাই। আমরা সকল সময়ই সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছি যে, মানবতার দিক দিয়াই আমাদের দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা ত্রিযুত মিশ্রকে এই আখ্যাস দিতে পারি যে, উদ্বাস্তদের জন্য কিছু স্থান দাবীর পিছনে আমাদের কোন কুশতল্য নাই।

বঙ্গ-বিভাগের ফলে আমরা প্রচণ্ড দুর্ভোগ ভোগ করিতেছি তাহা কে অস্বীকার করিবে? মাথা গুজিবার কিছুটা স্থানের জন্য আমরা কি ভারতের সকল রাজ্য এবং ফেলের নিকট হইতে সহযোগিতা ও সহায়ত দাবী করিতে পারি না?

শ্রী ঘোষের উত্তর তাহার বুদ্ধি-বিবেচনার উপযুক্তই হইয়াছে। কেন, চোরাইমালের অধিকারীকে সোজা কথা বলার সাহস ও সত্যনিষ্ঠা দেখাইলে কি বাংলার কংগ্রেসের জাত যাইবে? মানভূম ও সিংভূমের বিয়াট অংশ ভাষায় সামাজিক প্রধার ও রক্তের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গেরই অংশ একথা তো কংগ্রেসই বহু পূর্বে মানিয়া লইয়াছে। এ বিষয়ে ইতিহাস, ভাষা ও দেশাচার অকাট্য সাক্ষ্য দিতেছে। বাংলাকে ও বাঙালীকে শান্তি দিবার জন্য বিদেশী দস্যু বাংলার যে বন ফাঙিয়া অস্ত্রকে দিয়াছে তাহার উদ্ধারের জন্য সোজা কথা বলারও যোগ্যতা যদি আমাদের না থাকে তবে তাহা কখনও কিরিয়া আসিবে না। এই দাবীর পিছনে সমস্ত দেশের সকলের দাঁড়ানো প্রয়োজন, তবেই এই হারানো সম্ভানদের আমরা কিরিয়া পাইব।

“ভাষাগত রাজ্যগঠন”

ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের পুনর্গঠন সম্পর্কে অল্প প্রদেশের নেতৃবর্গ কিরূপ স্পষ্ট ভাষায় দাবি জ্ঞাপন করেন তাহার উদাহরণরূপে নিম্নোক্ত সংবাদটি পঠনীয়।

অন্ধ্র রাজ্য হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ডাঃ লক্ষ্মানন্দরম্ অমরাবতীতে নিখিল-ভারত ভাষাগত রাজ্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেন, “ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের

এলাকার পুনর্গঠন ও পুনর্গঠনের দাবীর জন্য ভারতের একা কোনক্রমেই ব্যাহত হইবে না। পরন্তু ইহার ফলে প্রত্যেক নাগরিকই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হইয়া গর্বের সহিত নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিবে।”

ভিনি আরও বলেন, “ঐক্যবদ্ধ অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরল রাজ্য ভারত সাধারণতন্ত্রের পরম সম্পদে পরিণত হইবে। পঞ্জাবী ভাষাভাষী রাজ্যগঠনও দেশের কল্যাণ ও শক্তি বৃদ্ধি করিবে।”

ভিনি উহার ভাষণে আরও বলেন যে, ভারত সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্তমান রাজ্যগুলির সীমানা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তনের ব্যবস্থা আছে। ক্ষমতা-মদমত্ত রাজনীতিবিদদের এই অনুচ্ছেদ ধ্বংসের ক্ষমতা যেম কোনক্রমেই না দেওয়া হয়। এই সকল রাজনীতিজ্ঞরা যদি আমাদের লক্ষ্যপথে বাধা দেন তাহা হইলে আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও বৈধভাবে লাভ-ক্ষতির কথা চিন্তা না করিয়া কঠোর সংগ্রামে ব্রতী হইব।

ডাঃ লক্ষ্মানন্দরম্ আরও বলেন, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যসমূহের পুনর্গঠন যে মুহূর্ত্তে শুরু হইবে সেই মুহূর্ত্তে রাজনৈতিক ও গঠনভাগিক সমস্তা এইরূপ প্রবল হইয়া উঠিবে যে, বর্তমানে যে সকল কংগ্রেসী সরকার কার্যে আছে তাহার মধ্যে বহু সরকারই ছেলিয়া পড়িবে। সেইজন্যই বিভিন্ন রাজ্যে এই ক্ষমতা হাতে রাখিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করা হইতেছে না।

ভিনি বলেন যে, আইনসম্মত সীমানা নির্ধারণ জন্য প্রবল ক্ষমতায় গঠন করিতে হইবে। এই কমিশন প্রাক্তন জীগ অব মেশনসের ব্যবস্থাক্ষমারী মাইনরিটি কমিশনের অনুরূপ হইবে। এই কমিশন বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী গঠন করা যাইবে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের লইয়া এই কমিশন গঠন করিতে হইবে এবং উহার ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করিয়া দিতে হইবে।

ভিনি দ্বি-ভাষাভাষী ও বহু-ভাষাভাষী শহরের সমস্ত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই শহর এমন কি কলিকাতা শহরকেও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে পরিণত করিতে হইবে এবং ভারত সরকারের দপ্তর-সমূহ ঐ সকল শহরে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিশেষে ভিনি বলেন যে, অলীক জগতে বাস ও বর্তমান সমস্তাগুলির প্রতি অবহেলার এই নীতি আত্মহত্যার তুল্য।”

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, বাংলার বিষয়ে কোনও সহায়ত্বের চিহ্নও এই বিবৃতিতে নাই। বরং বাংলার প্রধান নগরকে কাটরা লওয়ার প্রস্তাব আছে। আমাদের “নতজাহ ও কুতাঞ্জলীপুট” গুরুত্ব সূচক নেতৃবর্গ বাংলাকে ও বাঙালীকে ভিন্নপ্রদেশীয়ের চোখে এতই হীন করিয়াছেন যে, আমরা এই অবস্থার সন্মুখীন। এখন লক্ষ্মানন্দরম্ জাতীয় কালনেমির

দল ভাগ-বাঁটোয়ারার বাংলাকে আরও খণ্ডিত করিবার কথা অন্যথাসে বলে, কেহ তার প্রতিবাদও করে না।

বিহারে বাঙালীর অবস্থা

ব্রিটিশ শোষকের দল বাংলার যে সকল অঞ্চল বিহারের হাতে তুলিয়া দেয় তাহার মধ্যে মানভূম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সেখানকার বাঙালীর কি দুর্দশা তাহার পরিচয় আমরা পুরুলিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা “যুক্তি”তে পাই। তাহার গত ১৯শে শ্রাবণ সংখ্যার নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয় :

“দামোদর নদীতে কয়েকটি বাঁধ বাঁধাইয়া অভিরিক্ত জল আটক করিয়া বর্জমান জেলাকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার এবং ঐ জলে বিহারের ও বাংলার বহু পরিমাণ জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করিবার জন্য, এবং শিল্পোন্নতি, কলকারখানার পরিচালনা, আলো সরবরাহ, জল সরবরাহ ইলেক্ট্রিসিটি উৎপাদন প্রভৃতি কাজের জন্য বহু কোটি টাকার পরিকল্পনা করিয়া ভারত-সরকার দামোদর ত্যাগি কর্পোরেশন নামে এক আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কর্পোরেশন কয়েক বৎসর যাবৎ ঐ পরিকল্পনা অনুসারে বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির কাজ করিতেছেন। উক্ত কাজের ধরনের তিন ভাগের এক অংশ বিহার সরকার, এবং বাকী দুই অংশ বাংলা-সরকার ও ভারত-সরকার বহন করিয়া আসিতেছেন। বিহার সরকারের এ বৎসরের দেয় অংশের টাকার মঞ্জুরির জন্য বিহার বিধান-সভায় এবং বিধান-পরিষদে জলসেচ মন্ত্রী বাজেট পেশ করিলে উক্ত সভা দুইটির বহু বিহারী সদস্য টাকা মঞ্জুরির প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া টাকা দিতে বিহার সরকারকে নিষেধ করেন। তাঁহারা ঐ সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছেন—দামোদর পরিকল্পনা হইতে বাংলাদেশ যে পরিমাণ লাভবান হইবে বিহার সে পরিমাণে লাভবান হইবে না। তাঁহারা বলেন, এই পরিকল্পনার কাছে শতকরা ৩০ জনের উপর বিহারী চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিলেও উক্ত বেতনের চাকুরিতে বিহারীদের সংখ্যা অল্পপাতে কম এবং এই কাজে বিহারী ইঞ্জিনিয়ার গ্রহণ করা হয় নাই এবং বিহারী কট্টাক্টারদের কাজ দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা আরও বলেন, কর্পোরেশনের প্রধান আপিস কলিকাতা হইতে বিহারে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত টাকা দেওয়া বাইতে পারে না। অবশ্য সেচমন্ত্রী মহোদয় ও কয়েকজন বিহারী সদস্য এরূপ সর্পিণ প্রাদেশিক মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সমগ্রভাবে ভারতের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দিতে বলেন। একথা বলিলে অভ্যুক্তি হইবে না যে, এরূপ উগ্র প্রাদেশিকতা বিহারের বাহিরে অন্য কোমণ্ড প্রদেশে দেখা যায় না। এই সর্পিণ প্রাদেশিক মনোভাবই মানভূমের বর্জমান শোচনীয় অবস্থা তথা বিবিধ অশান্তি, সম্প্রদায়

সম্প্রদায়ের বিভেদ-বিষেদ সৃষ্টি ও জনগণের অশেষ দুর্গতি ও উৎপীড়নের জন্য দায়ী।”

মানভূমে বাঙালী উৎপীড়ন ও বিহারী অধিকারীত্বের স্বৈরাচার সম্পর্কে বহু লেখা “যুক্তি”তে প্রকাশিত হইয়াছে। মানভূমে বাঙালীরা বিহারীর হাতে স্বাধীনতার যে আবাদন পাইয়াছে সে সম্পর্কে ঐ পত্রের ২৬শে শ্রাবণ সংখ্যার ক্রীঅটল-চন্দ্র মাহাত এইরূপ লিখিয়াছেন :

“ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। ভারতবর্ষ আজ নিজেই নিজের ব্যবস্থা চালাইবার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজ আমরা দেখিতেছি দেশসেবার মহান দায়িত্ব যাহাদের হাতে, দেশকে পরিচালনা করিবার ক্রমতা যাহাদের হাতে অর্পিত হইয়াছে তাঁহারা ই আজ সারা দেশ ব্যাপী স্বৈরাচার, অব্যবস্থা অশান্তির অনল জালিয়া চলিয়াছেন। জনগণকে নিত্য নূতন নূতন উপায়ে মিথ্যাসিদ্ধি, লাহিত, অপমানিত, বৃথা হরণ ও কতিপয় কয়লাই সরকারের একমাত্র কর্তব্য হইয়া পড়াইয়াছে। জদল ব্যাপারে দেশের বহু জাতি ও ভূমির উপর অত্যাচার-অবিচার অবাধে চলিয়া আসিতেছে; জদল রক্ষার নামে জদল ধ্বংস হইতেছে। শিকার নামে শিকারকে উচ্ছেদ, রেকগ-মিশন কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। মাতৃত্বাচার উচ্ছেদ করিবার জন্য হীন প্রচেষ্টাসমূহ চলিতেছে। চতুর্দিকে চোর, ডাঙ্গা, জনবাহ-বিরোধীদের অবাধ রাজত্ব সরকারী সমর্থনে চলিতেছে। অভিযোগ সুবিচার, তদন্ত করিবার কেহই নাই। অভিযোগ জানাইতে গেলেই অকিসারেরা লাঠি দিয়া ভাঙাইয়া দিবার কাজ গ্রহণ করিয়াছে। তদন্ত ও আসামীদের অজ্ঞাতেই ধানার অথবা পুরুলিয়া কোর্টেই শেষ হইতেছে। গত ২১শে কৈষ্ঠ বাদ্যোদয়ন হাটে দেখিলাম ধানার নিকটেই জুয়া খেলা হইতেছে। ধান-পুলিস যে দেখেন নাই এমন নয়। আমরা দেখিলাম ধানার জমাদার সিপাহী উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাবিলাম এরূপ কেন হইল। বুবিলাম ইহাই হইতেছে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস-সরকারের বেজা-চারিতার প্রমাণ এবং কংগ্রেস-সরকারের আজ স্থান কোথায় নাহিয়াছে তাহা বুবিবার উপায়। বহুলোক আসিয়া আমাকে এ বিষয়ে অভিযোগ জানাইতে লাগিল, আমিও উহার উত্তর দিলাম। লোকে বলিতে লাগিল—আজ প্রায় ১৮২০ বৎসর যাবৎ ৮৮৯৯১১ রোহিণী, ৮৮১১১১ ও অন্যান্য একনিষ্ঠ ত্যাগী কর্মীদল বহু লাহন লাহ করিয়া হাটে ঐ খেলা বন্ধ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার ৫ বৎসর পরে আবার উহা দেখা বাইতেছে। স্বাধীন উন্নত মস্তক নষ্ট হইয়া গেল।”

ভারত সেরক-সমাজ

ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের পিছনে ছুটিয়া এবং আত্মীয় ও চাইকারবর্গ পোষণ-নীতির ব্যাপক প্রচলনে কংগ্রেস সারা

ভারতকে এক শোচনীয় পরিস্থিতিতে আনিয়াছে। এ বিষয়ে শুধু কংগ্রেস কেন অত সকল রাষ্ট্রনৈতিক দলও প্রায় সকলেই কম বেশী দোষী। এখন এই অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টার এই নতুন সেবক-সমাজ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টার মধ্যে কতটা সত্যতা ও প্রকৃত সেবার ইচ্ছা আছে তাহার উপরই উহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। এ বিষয়ে নিম্ন-লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

১৩ই আগষ্ট—জম-সহযোগিতা অর্জনের জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি শ্রীজবাহরলাল নেহরুকে ভারত সেবক-সমাজের সভাপতি পদ গ্রহণ করিবার এবং সমাজের গঠনতন্ত্র কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত তাহার কার্য পরিচালনার জন্য অমরোহর আশাইয়াছেন। গত ১২ই আগষ্ট এই কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

কমিটি সভাপতিকে সমাজের বস্তু গঠনতন্ত্র অমরোহরী অবিলম্বে একটি অস্থায়ী বোর্ড গঠনের অমরোহরী দিয়াছেন এবং আন্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষী সর্বসম্মতিক্রমে অমরোহরী করিয়াছেন। দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আটটি বড় বিভাগ এই কর্তৃপক্ষীতে রহিয়াছে। কর্তৃপক্ষী এইরূপ :

১। আর্থিক উন্নয়ন

(ক) নির্মাণ—দালান, সড়ক, কূপ, বাঁধ, বায়োমারী বর ইত্যাদি ;

(খ) সমবার উন্নয়ন ও পকারেত্তের কাজে সাহায্য করা ;

(গ) সঞ্চয় ও কৃষ্ণসাধনের আন্দোলন ;

(ঘ) শস্ত সংরক্ষণ ;

(ঙ) গৃহপালিত পশু উন্নয়ন।

২। সমাজ শুদ্ধি

(ক) দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন ;

(১) শপথ—আমি দুই দিব না বা লইব না ;

(২) এই শপথ মানিয়া চলিতে বাহারা অমরোহরী পড়িবে তাহাদিগকে সাহায্য করা।

(খ) ভেজাল বিরোধী আন্দোলন :

(১) শপথ—আমি ঝাড়ে বা ঔষধে ভেজাল দিব না এবং ভেজাল ঝাড়্য বা ঔষধ বিক্রয় করিব না ;

(২) ভেজাল বন্ধ করিবার কাজে জনসাধারণকে সাহায্য করা।

৩। সামাজিক শিক্ষা

(ক) মাদরাসিক অধিকার ও স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষাদান ;

(খ) অর্থনৈতিক অবস্থা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

৪। চিত্তবিনোদন ও জাতীয় ক্রীড়া

স্ববক, বারী ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষী।

৫। বাহ্য

(ক) ম্যালেরিয়া দমন কার্য ;

(খ) বস্ত্র পরিষ্কার ;

(গ) 'রাস্তাবাট পরিষ্কার রাষ্ট্র' আন্দোলন।

৬। শিক্ষাক্রম

(ক) দুর্নীতি ;

(খ) ঝাড়্য ও ঔষধে ভেজাল ;

(গ) অপচয় ;

(ঘ) অপরাপর সামাজিক সমস্যা।

৭। ভাণ্ড ও সাহায্য

৮। সম্পদ

স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহার সংখ্যা কমান বা বাড়াই চলিবে।

অধিবেশনে আলোচনাকালে বিভিন্ন দলের নেতা অংশ গ্রহণ করেন। সকলেই সমাজগঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও বলেন যে, সর্বপ্রকারে ইহার অ-রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্র বন্ধ্য রাবিতে হইবে।

সরকারি দুর্নীতি ও অত্যাচার—যেমন মানদুয়ে চলিতেছে, তাহার প্রতিকার কিরূপে হইবে ?

সভীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বলেন—ভারত সেবক-সমাজের কাজ-কর্মে লোকের প্রয়োজন। স্বায়ত্ত করিবার জন্য শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর ভাষা শ্রীনেহরুর ব্যক্তিগত দায়িত্ব গ্রহণ করা দরকার। যদি কোন উদ্ভেদ সাধনের জন্য সেবা ও ভ্যাগের মনোভাব লইয়া কার্যে বৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলে সাফল্য লাভের আশা থাকে।

ভারত সেবক-সমাজকে কোমণ্ড প্রকারে রাষ্ট্রনৈতিক হইলে চলিবে না বলিয়া কয়েকজন নেতা যে মত ব্যক্ত করেন তাহার উল্লেখ করিয়া পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বলেন যে, এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাবিতে হইলে বাহারা গঠনমূলক কার্যে নিযুক্ত কেবলমাত্র তাহাদিগকেই সমাজের সমস্ত করিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বাহারা রাষ্ট্রনৈতিক দলে থাকিয়াও সমাজে ঘোগ দিবে তাহাদিগকে সমাজের কাজ করিবার সময় সর্বপ্রকার রাষ্ট্রনৈতিক বিভেদ দমন হইতে চুয়ে রাবিতে হইবে।

কমিটি সভাপতিকে সমাজগঠন সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ কথা দিয়াছেন, যেমন—(১) রাজ্যে সমাজের শাখা খুলিবার জন্য আহ্বায়ক নিয়োগ করা, (২) সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য নিয়োগ, (৩) দাখল ও সহকারী সদস্য নিয়োগ এবং (৪) কেন্দ্রে ও রাজ্যে সদস্যদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা।

কংগ্রেসের নৈতিক ভিত্তি ধরিতা পড়িয়াছে এবং সেবক-সমাজ অদৃষ্ট নৈতিক ভিত্তি তির টাড়াইতে পারে না। তাহার কি ব্যবস্থা হইবে ?

দুর্নীতির নিবারণ

“ভারত সেবক-সমাজের” গঠন কেন অত্যাশঙ্কক হইয়াছে তাহা উপরোক্ত শিরোনামায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বুঝা যায়। উহা পুন্ডলিয়ার “বুদ্ধি” পত্রিকার ১৯শে জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত হয়। সরকারী অত্যাচার ও দুর্নীতির পরিচয় এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে :

“বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ক্রীকটজু যিনি এই বিলটি পার্লামেন্টে পেশ করেন—এই বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, দুর্নীতিপূরণ কর্তৃকারীদের জনসাধারণ সামাজিক বরকত করুক। ভাল কথা। অল্প কথা ছাড়া দিলেও বরাবক কোন স্থানে জনসাধারণ কোন ধানার দারোগাকে তাহাই করিল। তাহার ফলে বরকর্তকারীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এবং ধানার জনসাধারণের উপর স্থানীয় সরকারী কর্মতা নানাভাবে অত্যাচার চালাইয়া যাইতে লাগিল। তখন প্রশ্নসহ সেই অভিযোগ লইয়া ক্রীকটজুর কাছে গেলে তিনি ভারতীয় বিধান (ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন) খুলিয়া দেখাইয়া দিবেন যে—প্রতিমন্ত্রিয়াল অটোনমি অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন—এ ক্ষেত্রে আমি কি করিতে পারি? না হয় বড় জোর তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট চাহিবেন; প্রাদেশিক মন্ত্রী জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট লইবেন। ক্রীকটজু সাহেবের নিকট হইতে অভিযোগকারীদের নিকট চিঠি আসিবে—সব মিথ্যা—অজুগতানে জানা গেল। যাহারা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচিত আছেন তাহারা জানেন ইহা কত বড় সত্য।

“আসল কথা, আজ যদি দেশবাসীকে দুর্নীতির জন্ত কাহাকেও বরকত করিতে হয়, তবে তাহা শুধু সরকারী কর্তৃ-কারীদের নয়—সমস্ত কংগ্রেস গবর্নেন্টের ও সমস্ত কংগ্রেসকে। দুর্নীতির এত বড় স্রষ্টা, বাহক, বাহক ও পোষক ভারতবর্ষের ইতিহাস খুজিলে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। বহু যুগের পরাধীনতার বোকা ভারতবাসীর নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়াছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বাধীনতার বিচিত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া সেই দেশবাসীর ভগ্নপ্রায় নৈতিক মেরুদণ্ড শক্তিশালী করিয়া ঠাট্টা করিতেছিল। স্বাধীনতার পরে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যেই কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্নেন্টের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা দেশবাসীর সেই নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভাঙিয়া গুঁড়া করিয়া ছাড়িয়াছে। আজ ইহাদের নিকট হইতে নীতির বাক্য—যাহারা ইহাদের স্বরূপের সহিত পরিচিত তাহাদের নিকট উপহাসের মতই মনে হইবে। কারণ দেশে দেশ-বাসীর অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া ও তাহা ভুল করিয়া কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারী নেতৃত্ব ও ক্ষমতা দেখে যে দুর্নীতির প্রাবল্য বহাইয়াছে তাহারই শক্তিতে আজ কংগ্রেস গবর্নেন্টের পুনরুত্থান সম্ভব হইয়াছে। বর্তমান নেতৃত্বের বাণ

ও বোকার মাগমা হইতে দেশবাসী মিছেকে মুক্ত করিয়া যেদিন সে তাহার নৈতিক মেরুদণ্ড শক্ত করিয়া ঠাট্টাইতে পারিবে, সেদিন কংগ্রেস অথবা কংগ্রেস গবর্নেন্টের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং সত্যকারের দুর্নীতি নিবারণের কাজও সেই দিন হইতেই বাস্তবিক শুরু হইবে।”

রাষ্ট্রপতির আহ্বান

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, জাতি হিসাবে নিজেদেরই আত্মদগ্ধকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন জয় করিতে হইবে এবং তাহা আমরা করিবই সে সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ সচেতনতা এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থাকা প্রয়োজন। ইহার জড় চরিত্রবল চাই। যে চরিত্রবল মোতের নিকট সহজে এবং সহসা নতি স্বীকার করিবে না, যাহা ভ্যাগের জড় সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে, সমস্ত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া যাহা ভারতে অবলম্বন করিয়া রহিবে, যাহা অস্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হইয়া তাহার হৃৎ হৃৎগত আপন করিয়া লইবে, যাহা গ্রহণ অপেক্ষা দান করিবার জন্তই সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে—চরিত্রের সেই দৃঢ়তা আমাদের অর্জন করিতে হইবে। এইরূপ চরিত্রবল শুধু আমাদেরকেই সুখী ও সমৃদ্ধ করিবে না, অল্প সকলকেও সুখী ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে। এইরূপ একটি জাতিতে আমরা যাহাতে পরিণত হইতে পারি, আহুন তাহার জড় আমরা চেষ্টা করি এবং অর্জিত স্বাধীনতাকে আমরা নিজেদের পক্ষে এবং সকলের পক্ষে এক স্তম্ভ আশীর্বাদে পরিণত করিয়া তুলি।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণের এই অংশ আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমাদের অনুরোধ যে, তিনি বিহারী ভান্ডেরা যে ভাষা বুঝে তাহাতে তাহার এই আহ্বান তাহাদের বুঝাইয়া দিল।

ভারত ও কাশ্মীর

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পাকা খেলোয়াড়। তিনি দাবার চাল ও বড়ের চাল দুই-ই সমানে বুঝেন। কিছুদিন পূর্বে দাবার চালে কিছু ভুল করিয়া মিছেকে ও পণ্ডিত নেহরুকে বিপদ-এস্ত করিয়াছিলেন। এখন বড়ের চালে সেটা শুধরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তবে যতদিন ভারতের ক্ষেত্রে তাহার পরম মিত্রবর্গ বিরাজ করিতেছেন ততদিন তাহার কোনও ভয় নাই এবং ভারতবর্ষের কোনও ভয়সাত নাই। ভারতের টাকার স্রোত ও রক্তের স্রোত বহিয়া চলিতেছে, অথচ ভারতের স্থান নীচে। কিবা নীতি, কিবা ব্যবস্থা :

ত্রীনগর ১১ই আগষ্ট—অদ্য কাশ্মীর গণপরিষদে মুখ্যমন্ত্রী শেখ মহম্মদ আবছারী জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভারত-সরকার ও কাশ্মীর-সরকারের মধ্যে যে মীমাংসা হইয়াছে, তাহা পেশ

কৰিয়া বলেন যে, আলোচনাৰ ফলে এক সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইয়াছে এবং “এখন আমরা ভাৰতৰ সহিত আমাদেৱ শাসনভাত্তিক সম্পৰ্ক পৰিষ্কাৰতাবে অহুৰাবন কৰিতে পাৰিব।”

মুখ্যমন্ত্ৰী আবদুল্লা বলেন, “ভাৰতৰ এবং জম্মু ও কাশ্মীৰেৰ জনগণ তাহাদেৱ মুক্তি-সংগ্ৰামেৰ কালে গণভাত্তিক এবং বৰ্দ্ধনপেঞ্চভাত্তিকেই আদৰ্শ বলিয়া গ্ৰহণ কৰিয়াছিলেৰ এবং তাহাৰই ভিত্তিতে যে সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে উহাই হইল বৰ্দ্ধনপেঞ্চভাত্তিক, অপর যে কোন শাসনভাত্তিক বৰ্দ্ধনপেঞ্চ উহাৰ তুলনায় গৌণ হইয়া পড়ে।”

তিনি বলেন, “আমাদেৰ পৰম্পৰেৰ অতিয়ন্তকে সামৰন্ত কৰিবাৰ ক্ষমতা আমাদেৰ কটি ছিল না। ভাৰত-সৰকাৰেৰ প্ৰতিনিধি দল এবং কাশ্মীৰেৰ প্ৰতিনিধিৰা অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তাকে দূৰ কৰিয়া বৰ্দ্ধমান সম্পৰ্কে আৱণ দূৰ কৰিবাৰ আকাঙ্ক্ষা লইয়া কাজ কৰিয়াছেৰ।”

শেৰ আবদুল্লা বলেন, “আমাদেৰ গণভাত্তিক আদৰ্শ এবং আমাদেৰ লক্ষ্যপথে পৌছিবাৰ আশ্ৰকে ৰূপদান কৰিবাৰ জন্য ভাৰত-সৰকাৰ ও ভাৰতৰ জনগণেৰ সপৰ্ণন যে ৰহিয়াছে তাহা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি কৰিয়াছি। আমি আমাদেৰ দেশেৰ স্বাধীনতা ও গণভাত্তিকে সুসংৰক্ষ কৰিব।”

অন্তঃপৰ শেৰ আবদুল্লা বলেন, “ভাৰতৰ সহিত এই ৰাজ্য কি ভাবে কৰ্তৃত্ব হুক্ত থাকিবে তাহা অবন্ত গণপৰিষদই নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিবে। পৰিষদ বৰ্দ্ধমান ভিত্তিতে সম্পৰ্ক বজাৰ ৰাখাৰ সিদ্ধান্তও কৰিতে পাৰে, আবাৰ প্ৰয়োজন-বোধ কৰিলে উহাৰ ক্ষেত্ৰ প্ৰসাৰিত কৰিতে পাৰে। ৰাজ্যেৰ সংবিধান ৰচনাৰ সময় পৰিষদেৰ সদস্যগণ এই সকল সৰ্ত্ত বিবেচনা কৰিয়া দেখিয়া এতৎসম্পৰ্কে তাহাদেৰ মতামত প্ৰকাশেৰ সুযোগ পাইবেন।”

মৃত্যু-কৰ

মৃত্যু-কৰ প্ৰত্যেক গণভাত্তিক ৰাষ্ট্ৰেৰ আয়েৰ এক অগ্ৰতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। তবে উহাৰ পৰিমাণ সম্পত্তিৰ আৱণতনেৰ পাৰ্থক্যেৰ সহিত ভাৰতম্য হওৱা প্ৰয়োজন। মৃত ব্যক্তিৰ উত্তৰাধিকাৰীদিগেৰ ভবিষ্যৎ বাহাতে অনিশ্চিভেৰ কোঠায় না যাৱ সৰূপ ব্যবস্থাও ৰাখা প্ৰয়োজন :

নৱাদিৱী ১১ই আগষ্ট—অন্ত লোকসভাৰ অৰ্ধসভাৰেৰ ৰাষ্ট্ৰমন্ত্ৰী ঐমহাবীৰ ত্যাগী কোনও ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পৰ সম্পত্তি হস্তান্তৰেৰ কালে কৰ বসাইবাৰ উদ্দেশ্যে মৃত্যু-কৰ বিল উপস্থাপিত কৰিয়াছেৰ।

এই বিলেৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে বলা হইয়াছে, “মৃত্বেৰ কাল হইতে উচ্চহাৰে আৱকৰ বাৰ্ধ্য ও সংগ্ৰহ কৰা হইতেছে এবং আৱকৰ তদন্ত কমিশনৰ কৰ কাৰ্য্য দেখা সম্পৰ্কিত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা সম্পৰ্কে তদন্ত কৰিয়াছেৰ। ইহাৰ কলে ৰনীদেৰ

কাছে আৱণ ৰন পুঞ্জীভূত হইতে কিছু বাৰা স্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহা স্বেণ্ড ৰনেৰ বৰ্ত্তনবৈষম্য দূৰ কৰিবাৰ জন্য এই-গুলি কাৰ্য্যকৰী ব্যবস্থা নহে। এই মৃত্যু-কৰ বাৰ্ধ্য কৰা হইলে এই যে ৰনবৰ্ত্তন-বৈষম্য ৰহিয়াছে, তাহা অনেকটা সংশোধন হইবে। এই ব্যবস্থাৰ কলে ৰাজ্যসমূহেৰ উন্নয়নমূলক পৰিকল্পনাগুলিও অৰ্থ পাইবে।”

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আৱণ বলা হইয়াছে, “পৰিকল্পনা কমিশন তাহাদেৰ বসন্তভাঙেও অনতিবিলম্বে তাৰতে মৃত্যু-কৰ বাৰ্ধ্য কৰিবাৰ জন্য আইন প্ৰণয়ন কৰিবাৰ আবন্তকতা সম্পৰ্কে বলিয়াছেৰ।

“ভাৰতে সংবিধান এবং প্ৰাক্তন ভাৰত-শাসন আইনে ৰাজ্যসমূহেৰ ভালিকাতে কৃষি-ভূমিৰ উপৰ কৰ বাৰ্ধ্যৰ অধিকাৰ আছে এবং অ-কৃষি সম্পত্তি পত্তিয়াছে কেন্দ্ৰেৰ ভালিকাৰ। বাহা হটক, এই কৰবাৰ্য্য বাহাতে একৰূপ হয় তদুদ্দেশ্যে কৰেৰটি ৰাজ্য—বোৱাই, উত্তৰপ্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, উজ্জিনা, হাৱদৰাবাদ এবং ৰাজস্থান। সংবিধানৰ ২৫২ বাৱামুৱাৰী আবন্তক প্ৰস্তাব গ্ৰহণ কৰিয়া কেন্দ্ৰকে তাহাদেৰ পক্ষ হইতে কৃষি সম্পত্তি সম্পৰ্কে আইন প্ৰণয়নেৰ অধিকাৰ দিয়াছেৰ।

“এই বিল অহুৰাৱী কৃষিভূমি সম্পৰ্কে যে কৰ আদাৰ কৰা হইবে, তাহা ৰাজ্য পাইবেন। অ-কৃষি সম্পত্তি সম্পৰ্কে সংবিধানৰ ২৬৯ বাৱামুৱাৰী যে বিধান আছে, তদমুৱাৰী সংসদেৰ অতিপ্ৰাৰ মত বৰ্ত্তন হইবে।

মৃত্যু-কৰ বিল নূতন ব্যবস্থা নহে। ১৯২৫ সালে কৰ তদন্ত কমিটি এই ব্যবস্থা গ্ৰহণেৰ সুপাৰিশ কৰিয়াছিলেৰ। গত মৃত্বেৰ কালে বহু লোক বিপুল সম্পত্তি কৰিয়া কেলিয়াছিল, তখনও এটি ব্ৰিটেইনেৰ অহুৰূপ এই মৃত্যু-কৰ বাৰ্ধ্য কৰিবাৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰা হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৫ সালেৰ ভাৰত-শাসন আইনামুৱাৰী ব্যবস্থা কৰা সম্ভব হয় নাই। এই জন্য ১৯৪৪ সালে উচ্চ আইনেৰ সংশোধন কৰা হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালে কেন্দ্ৰীয় আইন সভায় মৃত ব্যক্তিৰ সম্পত্তিৰ উপৰ কৰ বাৰ্ধ্যৰ জন্য একটা বিল পেশ কৰা হয়। কিন্তু মানা কাৰণে তাহা গৃহীত হয় নাই। ১৯৪৮ সালে অহাৱী সংসদে এই মৃত্যু-কৰ বিল পেশ কৰা হইয়াছিল। সিলেট কমিটিৰ মধ্য দিয়া বিল আসিবাৰ পৰও তাহা গ্ৰহণ কৰা যায় নাই। তৎপৰ অহাৱী সংসদ শেষ হইয়া যাৱ, অতৰাং এই বিলও বাতিল হইয়া যায়।

১৯৪৮ সালে যে বিল সিলেট কমিটিৰ মধ্য দিয়া আলে, তাহাই অহুৰ পেশ কৰা হয়। তবে ইহাতে সামান্য সামান্য পৰিবৰ্ত্তন আছে। সেগুলি নিম্নে দেখা গেল :

(১) যখন বিলটি কৰা হইয়াছিল, তখন কৃষি-ভূমি সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰেৰ কোন এজিৱায় ছিল না, কিন্তু সংবিধানৰ ২৫২

বারাহুয়ারী কয়েকটি রাজ্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিরাছে, সুতরাং এই বিল রাজ্যের কৃষি-ভূমির উপরও প্রযুক্ত হইবে। অবশিষ্ট রাজ্যগুলি যখন আবশ্যিক প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন তখন কেন্দ্রীয় সরকার একটা বিজ্ঞপ্তির দ্বারা উক্ত রাজ্যকে আমলে আনিবেন।

(২) যুদ্ধের অবস্থার সম্পত্তির কর বার্ষ্য হইবে যেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতেন। বিলে পরিবর্ত্ত বাসস্থান সম্পর্কে সিলেক্ট করিটি সংশোধন করিয়াছিলেন, তাহা বাদ দেওয়া হইরাছে।

(৩) বার্ষিক অর্থ আইনামুযায়ী আরকর আইন, করের হার বার্ষ্য এবং কি পরিমাণ মজুব হইবে তাহা নিরূপিত হইবে।

(৪) কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে যত্ন-কর কর্তৃপক্ষের থাকিবেন। তিনিই এই কর বার্ষ্য করিবেন।

(৫) যত্ন-কর কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে ১৯২২ সালের ভারতীয় আরকর আইনের মত কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট আপেল করা যাইবে। আইন সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্পর্কে হাইকোর্টে আপেল করা চলিবে।

নাগা পাহাড় ও চীন সীমান্ত

ঐরাবদমাথ বিয়াস পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অনেক কিছু লিখিয়াছেন। তাহার অধিকাংশই গুডকাফরে প্রকাশিত হইরাছে।

তিনি “উত্তরা” (কাশ্মি) পত্রিকার ১৩৫৯ সালের আষাঢ় সংখ্যার উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে লেখকের মনোবৃত্তির পরিচয় এবং কিছু সংবাদ-পাওয়া যাইবে :

“নাগা পাহাড় হতে আরম্ভ করে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত অশাসিত অঞ্চলের শাসনভার প্রকৃতপক্ষে বিদেশী মিশনারী এবং আসামের ‘সাইজুয়া ক্রীকের’ হাতেই ছিল। বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্বেষ্ট ছিল অশাসিত অঞ্চলে একটি স্থায়ী রাজ্য স্থাপন করা এবং সেই স্থায়ী রাজ্য স্থাপনে উত্তর-ব্রহ্ম এবং আগাম সরকার সাহায্য করবে। এতে এক দিকে ইণ্ডিয়া অত্র দিকে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের পদাশ্রিত হয়ে থাকবে, সেই সঙ্গে তিব্বত এবং সিকিয়ার (Sikang) প্রদেশেও ব্রিটিশের প্রাধান্য স্থাপন হবে। সিকিয়ার প্রদেশে মুসলিম চীনাগের সংখ্যা বেশি। আসামের দরং জেলাতে ইতিমধ্যেই পঞ্জাবী মুসলমানদের বসবাসের ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু তারা টকতে পারে নি। পরে ময়মনসিংহের মুসলমানদের বসবাস করানো হয়, তারা এখনও আছে এবং তবিরহতে যদি থাকে তবে তাদের কোন কারণ নাই। চীন স্থায়ী হয়েছেন। নাও-সে-তুমের নৃতন গণভঙ্গ মানেই হ’ল এলিট্যারিয়েট ডিক্টেটরদের অব্যবসায় এবং পেরাসাইট নষ্ট করা।

“ব্রিটিশের ইচ্ছা ছিল আসামের সমগ্রা প্রকৃতির জেলা, তিব্বত, সিকিয়ার এবং নাগা পাহাড় পর্যন্ত এলাকা নিয়ে ব্রিটিশ প্রাধান্যবৃত্ত একটি দেশ গঠন করা। এই সংবাদ যাতে কেউ না পার সেজন্যই কোনো উত্তর রাষ্ট্রজাতীকে লেদিকে পারদর্শন অথবা সাইকেলে ভ্রমণ করবার অসুবিধা দেওয়া হয় নাই। সাধারণ লোক এসব বিষয় চিন্তাও করত না এবং এখনও করে না।

“এখানে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সরকার বর্তমানে তুটান এবং উত্তর বাংলার উত্তর দিকে সেরূপ একটি চালবাজিতে নিযুক্ত আছেন কিন্তু সেই চালবাজিতে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সরকার কোনমতেই কৃতকার্য হবে না। মহাচীন-ইতিমধ্যেই তিব্বতকে নেপালের করদ রাজ্য-রূপে মেনে নিয়েছে এবং করও পাঠিয়ে দিয়েছে। এটা হ’ল সংবাদ। যদি তাই হয়, আপনা হতেই তুটানের অভ্যন্তরে অথবা উত্তরবঙ্গের উত্তর দিকে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান চালবাজি করার মত যদিও কিছু থাকে, তবুও কিছুই কলবতী হবে না। বর্তমান মহাচীন চীনা-সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। গণতন্ত্রবাদী চীন অপরের দেশ অধিকার করে না অথবা ভাড়া অধিকার ছেড়েও দেবে না, এই সত্যটি এংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের জেনে রাখা একান্ত দরকার—সেই সঙ্গে ভাবেদার সরকারদেরও জানা সর্ব্ব কৰ্তব্য।

“চীনের সিকিয়ার প্রদেশে মহামাত আগা বাক রাষ্ট্র করার কথা হয়েছিল। আসামের পাশাও সেই সুযোগ অব্যবহৃত ছিলেন। সকলের আশায় ছাই পড়েছে। সিকিয়ার প্রদেশ বর্তমানে চীনের একটি বিশিষ্ট প্রদেশ। ব্রিটিশ ও দুয়ের কথা ইণ্ডিয়া সরকারও কনুগাল সারতিস রাখে সাহস করেন নি। কনুগাল সারতিস রেখেও লাভ হবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের মারকতে ভারতবাসী দ্বারা ব্রিটিশ চালাতে পোয়েন্দারতি। ইণ্ডিয়া সরকার পোয়েন্দারতি অবলম্বন করতে ইচ্ছুক নয় বলেই, কনুগাল সারতিসেরও দরকার হচ্ছে না। এই কাজটি অত্র কোন সরকার করলেই ভাল হবে।...”

লেখক মহাশয় “ভাবেদার সরকার”, “পোয়েন্দারতি” ইত্যাদি গালতর্য পক্ষ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি নিজে কানার পক্ষ হইয়া লিখিয়াছেন এবং কি মহাজ্ঞানের বলে “মহাচীন”কে সুপারিশ ও আমেরিকার উপর দোষারোপ করিয়াছেন বুঝিলাম না। ভারতীয়ের লেখক, “ইণ্ডিয়া সরকার” পক্ষ ব্যবহার আশ্চর্য।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান সরকার তুটান ও উত্তর বাংলার কি করিতেছে তাহা তিনি দৈববলে জানিয়াছেন কিন্তু “মহা-চীন” ও তাহার করণার যে কালিঙ্গাৎ কি চেটার আছেন তাহা ইনি জানেন না।

নেপালে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র

বিখ্যাত মহানগরের রূপকথার পর বাস্তবের ক্ষেত্রে আমরা আরও আশ্চর্য্য সংবাদ কিছু পাইতেছি। তাহা এইরূপ :

কাঠমাণ্ডু, ১২ই আগষ্ট—চীনা কম্যুনিষ্টগণের সহায়তায় নেপালে নশত্র-বিদ্রোহ করার জন্য কম্যুনিষ্টগণের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, তাহার সীমান্ত অঞ্চলের জুমলা ও ভোটি জেলাসমূহ দখল করিবার চেষ্টা করে। তাহাদের নিকট যে সকল কাগজপত্র পাওয়া যায়, তাহাতে প্রকাশ, এই সকল জেলা দখল করিয়া উহা তাহাদের কার্যপরিচালনার প্রথম ঘাটিতে পরিণত করার উদ্দেশ্য ছিল। জুমলা ও ভোটি অধিকারের পর তরাই অঞ্চলে বনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা এবং নেপালের একটি বা দুইটি জেলা দখল করিয়া তাহাকে গেরিলা কার্যকলাপ পরিচালনার প্রথম কেন্দ্রে পরিণত করা তাহাদের লক্ষ্য ছিল। প্রধানকার পুলিশের প্রধান কার্যালয় হইতে বলা হয় যে, যে সকল তথ্য পুলিশের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়—আত্মপোষনকারী কম্যুনিষ্ট কর্মীগণ তাহাদের পূর্ণ প্রভাবসম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাটি প্রস্তুত করিতেছে এবং এই সকল ঘাটি হইতে রাজনৈতিক ডাকাতি এবং বনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতেছে। তাহার বলেম—তরাই অঞ্চলে সম্ভ্রান্তি যে অশান্তি দেখা যাইতেছে, তাহা বিদ্রোহগণের কার্যকলাপেরই পরিণতি। নেপালে হামায়া ও আভারের অবস্থা সৃষ্টি হইবার উদ্দেশ্য।

এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শ্রী এম. পি. কৈরীলা বলেন, এ যাবৎ নেপালের কম্যুনিষ্ট কর্মীগণ বাংলার কম্যুনিষ্টগণের পরিচালনাধীন কার্য করিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে সর্বপ্রথম সংবাদ পাওয়া গেল যে, নেপালী কম্যুনিষ্টগণ উত্তরাঞ্চল হইতে চীনের ও তিব্বতের কম্যুনিষ্টগণের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীকৈরীলা আরও বলেন, চীনাগণের মানচিত্রে নেপালকে চীন সাম্রাজ্যের অনঙ্গরূপে দেখান হইয়াছে। তিনি এই ঘোষণা করেন যে, বিশ্বপরি-স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, সম্ভবতঃ ভারতের মধ্য দিয়া পথ করিবার জন্য কম্যুনিষ্টগণ নেপাল দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে।

তিব্বতে ডাঃ কে. আই. সিং-এর উপস্থিতির সুযোগ লইয়া কম্যুনিষ্টগণ পশ্চিম নেপালের জনসাধারণের সহায়ত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছে। ডাঃ কে. আই. সিং পশ্চিম নেপালের অধিবাসী। তাহার প্রেরণার পরে এবং তিব্বতে পলায়নের পূর্বে এই অঞ্চল তাহার কার্যকলাপের প্রথম কেন্দ্র ছিল। তিনি সেখানে অভ্যস্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাহার নাম করিয়া এই এলাকার অনেক কিছু করা যাইতে পারিত।

নেপালী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী বি. পি. কৈরীলা

নেপালে কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন, তিনি মনে করেন, “শীঘ্রই হটক, আর বিলম্বেই হটক, কম্যুনিষ্টগণ তাহাদের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল হিসাবে নেপাল আক্রমণ করিবে। কম্যুনিষ্টদের বিখ্যাত এই যে, ইল-মার্কিন-পোজীর অভ্যুত্থান না হইলেও, ভারত মিশরই কম্যুনিষ্ট-সমর্থক নহে, ভারত কম্যুনিষ্ট-বিরোধী এই পট-ভূমিকায় আন্তর্জাতিক সঙ্কটকালে ভারতের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য কম্যুনিষ্টগণ মিশরই নেপালে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইবে।”

বস্তুতঃপক্ষে ভারতের সীমান্তে যে কি চলিতেছে তাহা বুঝা কঠিন। কেবলমাত্র বঙ্গোপসাগর উপর ও অহিংসার উপর নির্ভর করিয়া আমরা শত শত বৎসরের দাসত্ব ভোগ করিয়াছি। এখনও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না?

“ব্রিটিশ গোষ্ঠী”

ময়াদিল্লী ১১ই আগষ্ট—ভারত সরকার যুক্তরাজ্য ও নেপালের মধ্যে যে জিদলীর চুক্তির ফলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতীয় এলাকার গোষ্ঠীসৈন্য সংগ্রহকে প্রলিবার অধিকার পাইয়াছেন অবিলম্বে তাহা বাতিল করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া শ্রীমতী সুচেতা কপালনী, ডঃ জামা প্রসাদ মুখার্জি, শ্রী এ. কে. গোপালম, শ্রী জি. বি. চৌধুরী ও শ্রীমোহন লোকসভার এই পাঁচ জন সমস্ত এক যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাহার বলা হইয়াছে, “ভারতীয় এলাকার ব্রিটিশের গোষ্ঠী রিজুটং কেন্দ্রের অস্তিত্ব একটি উৎসাহজনক জাতীয় সমস্যা এবং কিছুদিন যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। এই কেন্দ্রের অস্তিত্বের কথা গত ৮ই আগষ্ট লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়া ছাড়াও ব্রিটিশ সেনা-বাহিনীকে এই অতিরিক্ত সুবিধাদান আমাদের জাতীয় সন্মানের হানিকর।

মালয়ে যুদ্ধ চালাইবার উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীসৈন্য সংগ্রহের কাজে ব্রিটিশবাহিনীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বহু শহীদের পবিত্র রক্তে বোত জামাদের এই পবিত্র ভূমি ব্যবহারের অহমতি দেওয়ার অর্থ আমাদের স্বাধীনতাপ্রিয় জনসাধারণের সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী মনোভাবকে কঠোর আঘাত দেওয়া।

যুক্তরাজ্য ও নেপাল সরকারের সহিত শীঘ্র এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করা হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমাদের অনুরোধ যে, তিনি যেন অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন।

আমরা এই অনুরোধ সমর্থন করিতেছি। যতদিন দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আছে ততদিন অর্থের বেশ সৈনিকত্ব প্রতি থাকিবেই। কিন্তু ভারতে বিদেশী সৈন্য সংগ্রহের স্থান থাক

আমাদের সম্মানের হানিকর এ বিষয়ে দুই মত না থাকা উচিত।

অপরাধ-নিবারণ আটক বিল

আমরা অপরাধ নিবারণ কৃত আটক করার বিল কিছুতেই স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু রোগ নিবারণের কৃত ভিত্তি ওষধ গলাধঃকরণ করার মত উহা লইতে বাধ্য হইতেছি। তাহার কারণ এবং ঐ ওষধের প্রয়োজন সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ দূর করিয়াছেন এক কমিউনিষ্ট নেতা। নিম্নোক্ত সংবাদে তাহার বিবরণ আমরা পাই :

নয়াদিল্লী, ১১ই আগষ্ট—আজ রাষ্ট্রসভায় অপরাধ-নিবারণ আটক (বিভীত সংশোধন) বিল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা স্বরাষ্ট্র সচিবের উত্তরদানের পর সমাপ্ত হইয়াছে। অন্তঃপর দফাওস্বাক্ষরিতাবে বিলটির আলোচনা করা হইবে।

গতকাল্য কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীমদ্রায়া তাঁহার বক্তৃতায় কমিউনিষ্টদের নিকট যে সকল অঙ্গশস্ত্র রহিয়াছে, কয়েকটি সত্ত্বে তাহা সরকারের নিকট সমর্পণের প্রস্তাব করেন। সাধারণ আলোচনার উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব ডঃ কাটজু আজ এই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলেন—“আপনারা আপনাদের ধুসীমত চলিতে পারেন, কিন্তু ধুসীমত চলার সত্ত্বে সরকার আপনাদের সহিত কোমণ্ড আপোয় রক্ষা উপনীত হইতে পারেন না।” তিনি বলেন যে, ধুসীমত চলার অধিকারকে ‘হুতবিরতি’ বলিয়া মনে করা চলে না।

ডঃ কাটজু দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, এদেশেরই হটক কিংঅপর কোন দেশেরই হটক, কোমণ্ড সরকারের পক্ষেই ব্যক্তি বা দলবিশেষের হুমকির নিকট নতি স্বীকার অসম্ভব। ভারত-সরকারকে অবস্থার প্রতিবিধান করিতে হইবে এবং সরকার উহা করিতে কৃতসঙ্কল্প।

কমিউনিষ্টদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, “আপনারা অঙ্গশস্ত্র নিজেদের নিকট রাখিয়া দিতে পারেন এবং ধুসীমত চলিতে পারেন, কিন্তু নিশ্চিত জানিয়া রাখুন যে, সরকার এই জাতীয় হুমকির নিকট নতি স্বীকার করিবে না।”

কমিউনিষ্টরা অপর যে-কোনও ব্যক্তির মতই দেশকে ভালবাসে বলিয়া কমিউনিষ্ট নেতা যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন যে, ভারতের প্রতি তাঁহাদের ভালবাগা যাহাই হটক না কেন, তাঁহারা যে চলার পথ বাহিয়া লইয়াছেন তাহা তাঁহাদিগকে ভারতে না রাখিয়া অন্য দেশেই লইয়া যাইতেছে।

বিদেশীর পতাকার নীচে বিদেশীর অঙ্গশস্ত্র বাহারা করেন তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম অপূর্ণ। ঐরূপ প্রেমিকের সম্মান পাইরাছিলেন দ্বিষ্ট ইতিহাস কোম্পানী বাহাদুর এবং উহারাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান দালাল।

ট্রান্সজর্ডানে রাজা বদল

আমদ, ১১ই আগষ্ট—“পার্সিয়েটে রাজা তালালের শাসনের অবসান ঘটাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী আবুল হুদা উত্তর পরিষদের গোপন এক যুক্ত অধিবেশনে জানান যে, রাজা তালাল আর তাঁহার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের উপযুক্ত নহেন। কাজেই তাঁহার রোগমুক্তির জন্য অপেক্ষা করা নিরর্থক। রাজার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্প্রতি চিকিৎসকগণ যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তিনি তাঁহার উক্তির সমর্থনে উহা পেশ করেন। প্রায় শাসনামলেক আগে দুই জন মিশরীয় চিকিৎসক রাজার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আমদনে আসিয়াছিলেন। অন্তঃপর নিম্নতম পরিষদের ভিন্ন জন এবং সেনেটের ছয় জন সদস্য লইয়া মেডিক্যাল রিপোর্টগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। দুই দফা আলোচনার পর উক্ত কমিটি প্রধানমন্ত্রীর অতিমত সমর্থন করেন। কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্কের পর রাজা তালালের শাসনের অবসান ঘটাইরা রাজহুমায় হসেনকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করার প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

নুত্তম রাজা হসেন সম্ভবতঃ দ্বিপ্রহ্নে দুইজারল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন করিবেন।”

উপরোক্ত সংবাদে আমরা এশিয়ার যে সকল নিকট-প্রাচ্য নামে অভিহিত তাহার আর এক নুত্তম অঙ্গের আরম্ভ দেখিতেছি। ট্রান্সজর্ডানের নৃপতি আবদুল্লাহ যে ঘটনায় নিহত হন তাহার পূর্ণপ্রকাশ এখনও হয় নাই। তাহার পর তাঁহার পুত্র বিক্রমশক্তিক বলিয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং নুত্তম রাজা এখন অপরিণতবয়স্ক। আরব রাজ্যসকলের মধ্যে ট্রান্সজর্ডান অতি ক্ষুদ্র ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল। এখন তাহার অবস্থা অশিক্ষিতের কোঠার আসিতেছে।

রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে মিশর

মিশরের রাষ্ট্রবিপ্লব ক্ষম্যে স্থিতিশীল অবস্থায় পরিবর্তিত হইতেছে। এখন ঐ দেশের কর্ণধার যিনি তাঁহার চিন্তা-বারার যেটুকু পরিচয় আমরা পাইতেছি তাহাতে মিশরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আশার আলোক দেখা যায়। বাহা তাঁহার মনের ধারণা তাহা যদি বাস্তবে পরিণত হয় তবে হয়ত আরব দেশগুলি পুনরায় প্রাচীন সংকতিমূলক গৌরবের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে :

কারো, ৮ই আগষ্ট—মিশর সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সাম্প্রতিক সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক জেনারেল মহম্মদ মাগুইব এখানে বলেন যে, বর্তমানে মিশরে একমাত্র শাসন-ব্যবস্থা ঘোষণার কোন কারণ নাই। রাজ-নৈতিক ক্ষেত্র হইতে অব্যাহত ব্যক্তিদের অপসারণের কার্যবাহী

এখানে মিশরের রাজনৈতিক দলগুলি যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে একমাত্র শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে। তিনি বলেন যে, গান্ধীজীর রাজনৈতিক আদর্শ প্রাচ্যদেশগুলির আদর্শ হওয়া উচিত।

মিঃ নাগুইব পি. টি. আই-এর প্রতিনিবিকে বলেন যে, দল হইতে হ্রীতিপরায়ণ এবং অব্যাহিত ব্যক্তিদের বিভাজনের দাবী সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট হইতে যে ধরনের সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মিশরে স্ত্রী সংগঠনের পক্ষে ইহাই প্রথম প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, একজন সাময়িক সরকারের মারফতে কঠোর সতর্কবাণী ঘোষণার প্রয়োজন হইতে পারে। স্ত্রীর বিষয় এই যে, সাময়িক বাহিনীর সহিত আলি মাহের সরকারের সম্পর্ক ধুবই ভাল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি সম্পর্কিত ইত্যাহার ও বিরুদ্ধি এবং ‘সুন্নি আন্দোলনের’ ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন যে, এই সকল ব্যবস্থার তিনি মোটেই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি বলেন যে, প্রত্যেকেই মনে করেন তিনি এক জন নিষ্পাপ দেবদূত। মজিসভার কয়েকজন সদস্যসহ ওয়াকফ দল হইতে বিশিষ্ট চৌদ্দ জন নেতা বিভাজনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, দলের উপর হইতে তলা পর্যন্ত বেশীর ভাগ অব্যাহিত ব্যক্তিই এখন পর্যন্ত রহিয়া গিয়াছেন। ওয়াকফ দল সম্পর্কে যে কথা সত্য, অন্যান্য দলের বেলারও তাহাই বাটে। জেনারেল নাগুইব যখন এই বিরুদ্ধি দিতেছিলেন তখন ওয়াকফ দলের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল নাগুইবের সহিত সাক্ষাতের জন্য পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ইদ-মিশর বিরোধ সম্পর্কে কোন আলোচনার অনিচ্ছুক হইলেও জেনারেল নাগুইব বলেন যে, মিশরভূমি হইতে ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণের যে জাতীয় দাবী রহিয়াছে, সে সম্পর্কে মিশর কোমরুপ আপোষ করিবে না। মিশরে ব্রিটিশ বাহিনীর রক্ষার দাবী ব্রিটিশদেরই স্বার্থের প্রতিফল। তাহারাই বুটেন এবং অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছুক। মিশরের সহিত স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজেদের স্বার্থের দিক হইতেই ব্রিটিশদের আপোষ-নীতিমালা করা উচিত।

গান্ধীজীর নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের আদর্শের প্রতি সজ্ঞত প্রদর্শন করিয়া তিনি নূতন শাসন-ব্যবস্থাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য মিশরীদের ঐ আদর্শ অঙ্গুরণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, গান্ধীজীর রাজনৈতিক আদর্শই প্রাচ্য-আদর্শের প্রতীক। মিশরের রাজনীতিবিদগণ, সেনাবাহিনী, সরকারী কর্মচারী এবং জনগণ গান্ধীজী-প্রচারিত নিঃস্বার্থপরতা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সত্যের সাধন কিংবা শরীর পাতনের আদর্শ

অঙ্গুরণ করিয়া নূতন রাজ্যগঠনে সার্থকতা লাভ করিতে পারেন।

কারমোতে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, যে সমস্ত সাময়িক অফিসার-বিরোধ ঘোষণা করিয়া রাজা কারুককে নিক্রাসিত করিয়াছে তাহাদের ‘টিট’ করিবার জন্য রাজা কারুক একটি বিখ্যাত বাহিনী গঠনের কলি আঁটিয়াছিলেন। এল আহবাসের সংবাদে প্রকাশ, এই বিখ্যাত বাহিনী সম্পর্কিত এক রিপোর্ট শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হইবে। এল আহবাসের সংবাদে আরও প্রকাশ, এই বিখ্যাত বাহিনী গঠন করিয়া রাজা কারুক তাঁহার নিজস্ব বাহিনীকে পোক্ত করিতে এবং রাজকীয় বাহিনীর সংখ্যা তিন সহস্রে উন্নীত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

বর্ণবৈষম্যমূলক তেদনীতির বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ চলিতেছে তাহা ক্রমে ব্যাপক রূপ গ্রহণ করিতেছে। আশ্রয় এই সত্যাগ্রহের জন্য কামনা করি :

জোহান্নেসবার্গ, ১১ই আগষ্ট—বিনামূল্যে ভ্রমণ হইতে দশ মাইল দূরবর্তী রুডপুট অঞ্চলে প্রবেশ করার অভিযোগে অন্য রাজ্যে ৩৩ জন আফ্রিকানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দ্বন্দ্ব ব্যক্তিদের মধ্যে সাত জন মারী। ট্রান্সভালে বর্ণবৈষম্য-মূলক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে এই প্রথম মারীরা বেছা-মূলকভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। আগামী কল্যাণ তাহা-মিসকে রুডপুট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এখন পর্যন্ত ২০৪০ জন অশ্বত সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইলেন।

উদ্বাস্ত সম্পত্তির সমস্যা

“ইগান্ডার” পত্রিকায় ৩০শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নিম্নোক্ত বিরুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে সমস্যাটার প্রকৃতি বুঝা যায় :

“কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের জরুরী সেক্রেটারী ব্রিটি, ডি. দম্ভ্যাঙ্গি বর্তমান প্রবর্তে উদ্বাস্ত সম্পত্তির সমস্যা সমাধানে বিলম্বের হেতু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাকিস্থান সরকার আন্তরিকতা সহকারে এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতে-ছেন না বলিয়াই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আড়ও কোনও সমাধান হইতেছে না—ইহাই লেখকের প্রতিপাত বিষয়।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে দেশ বিভাগের পর যে সকল সমস্যা দেখা দেয় উদ্বাস্ত সম্পত্তি তাহাদের অন্ততম। উত্তর দেশের অবিকারিত উদ্বাস্তর পক্ষেই ভারসাম্য একটি

সমাধানের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।

উদ্বাস্ত সমস্যার সঙ্গে উভয় দেশের লোক লোক উদ্বাস্ত পরিবারের সুখ ও তাহাদের সন্তানদের লুপ্তির প্রকৃতি জড়িত।

হিন্দু ও শিখগণ পশ্চিম পাকিস্তানে যে সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছেন এবং মুসলমানগণ ভারতে যে পরিমাণ সম্পত্তি ফেলিয়া গিয়াছেন তাহার একটা বিধায়োগ্য হিসাব এখন করা যাইতে পারে। পূর্ব-পঞ্জাব ও পশ্চিম-পঞ্জাব সরকারের মধ্যে যে সকল রাজস্ব সংক্রান্ত রেকর্ড বিনিময় করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পশ্চিম-পঞ্জাবের বাসিন্দা হিন্দু ও শিখগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তর প্রদেশে বসবাসকারী পঞ্জাবী সন্তানগণ মোট ৬৭,২২,০০০ একর জমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তর অঞ্চল, যেমন—সিদ্ধু, সীয়াস্ত-প্রদেশ প্রভৃতি হইতে আগত অ-পঞ্জাবী হিন্দু ও শিখগণ পরিত্যক্ত জমির যে সকল দাবি পেশ করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, ঐ সকল জমির পরিমাণ ৩০,০০,০০০ একর অর্থাৎ হিন্দু ও শিখগণ পশ্চিম পাকিস্তানে যে পরিমাণ জমি ফেলিয়া আসিয়াছেন তাহার পরিমাণ ৯০ হইতে ১০০ লক্ষ একর। পাকিস্তানে পাকিস্তানাগত মুসলমানগণ ভারতে ফেলিয়া গিয়াছেন প্রায় ৫০ লক্ষ একর জমি। একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, হিন্দু ও শিখগণ যে সকল জমি ফেলিয়া আসিয়াছেন সেইগুলি খুব মূল্যবান ও উর্বর এবং পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ সেচব্যবস্থা ঐ সকল অঞ্চলে বর্তমান। মুসলমানগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত জমিগুলি উৎকর্ষের দিক দিয়া অনেক ধারাপ।

হিন্দু ও শিখগণ পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে যে সব সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছেন, উহার মধ্যে আছে ৪,৩৬,০০০ টি বাড়ী, ২২,০০০ খণ্ড জমি এবং ১১,০০০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। আর ভারতে মুসলমানগণ ফেলিয়া গিয়াছেন শহরের ২,৮৭,০০০ টি বাড়ী, ৯,৬০০ খণ্ড জমি এবং ১,৭৮৪ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত বাড়ীগুলি যে ভারতে মুসলমান পরিত্যক্ত বাড়ীগুলি হইতে অনেক বেশী মজবুত ও মূল্যবান একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

পাঁচ বৎসর হইয়া গেল, এখনও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই উদ্বাস্ত সম্পত্তির সমস্যার মীমাংসা হইতেছে না কেন? আমরা এখানে কেবল প্রকৃত তথ্যগুলি দিয়া বিচারের ভার পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিব।

ভারত পুনঃ পুনঃ এই প্রস্তাব করিয়াছে যে, উভয় সরকার নিজ নিজ এলাকার সম্পত্তিগুলির দখল লইবেন, পরে ঐগুলির মূল্য নির্ধারণ করাইবেন। হয় একটি মুক্ত ভারত-পাকিস্তান সংস্থা অথবা কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা কর্তৃক এই মূল্য নির্ধারণ করা হইবে। মূল্যের যে ভারতমত হইবে, তাহা ঐ

দেশ-পাওনাদার দেশকে স্বীকৃত ব্যবস্থায় স্থায়ী শোধ করিয়া দিবে। পরে প্রত্যেক গবর্ণমেন্ট নিজদেশে আগত উদ্বাস্তদের ক্ষতিপূরণ দিবে। এবং অন্য দেশের দার বা দারিদ্দ আর থাকিবে না। এই ব্যবস্থাকে আমরা সরকারী ভাবে বিনিময় বলিয়া অভিহিত করিব।

কৃষি জমি সম্পর্কে পাকিস্তান নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলেন নাই। এক সময়ে পাকিস্তান সরকারের অফিসারগণ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, দুই পঞ্জাবের মধ্যে সম্পত্তিগুলি সরকারী ভাবে বিনিময় করা হইবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা এই সমাধানে রাজী হইলেন না। প্রথমে তাহারা অজুহাত দেখাইলেন যে, রাজস্ব রেকর্ডগুলি এখনও বিনিময় করা হয় নাই, পরে তাহারা আবার এই সমস্যাতে খালের জল লইয়া যে বিতর্ক সুরু হইয়াছে তাহার সঙ্গে জড়িয়া দিলেন। শহরস্থ সম্পত্তির বেলায় পাকিস্তান এখনও ব্যক্তিগত বিক্রয় ও বিনিময়ই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান বলিয়া মনে করে।

কৃষি জমি সম্বন্ধে তাহারা কি করিতে চান সেই সম্বন্ধে পাকিস্তানী মুখপাত্রগণ কিছুই বলেন না। তাহারা কি কৃষি জমি-বিক্রয়ের অথবা বিনিময়ের অনুমতি দিতে চান? যদি না চান তবে কি ইহা বাধ্যনীর নয় যে, অন্ততঃ জমিগুলি সম্বন্ধে অবিলম্বে একটা মীমাংসা হউক? পাকিস্তান হইতে এই বিষয়ে কোনও উত্তর আসিতেছে না। তাহারা বলেন যে, খালের জলের উপর জমির দর নির্ভর করে, আর ভারত এই জলের প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিবে কি না তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই মুক্তি বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। কারণ যে সকল জমি সম্পর্কে মীমাংসার কথা চলিতেছে তাহার মাত্র ২০ শতাংশ বিতর্কমূলক খালের জলের সেচের অধীন। হিন্দু ও শিখগণ যে এক কোটি একর জমি পশ্চিম পাকিস্তানে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাহার অবশিষ্ট ৮০ শতাংশের মূল্যও ভারতে মুসলমানগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত জমির মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। খালের জলের বিষয়টিও পৃথকভাবে আলোচনা করিব। পরে আমরা এই বিষয়ে আরও আলোচনা করিব।

ব্যক্তিগতভাবে জমি বিক্রয় ও বিনিময় করিতে দিলে নানা প্রকার অসুবিধা ঘটবে। উভয় দেশের নতুন জমি আইনগুলিতে চায়ীকেই জমির মালিক করার চেষ্টা হইতেছে অথচ উদ্বাস্ত মালিকদের অধিকাংশই কৃষক ছিলেন না। তদুপরি উভয় দেশের আগন্তুকদিগকে ইতিমধ্যেই জমি বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি কোনও মালিক এখন ঐ জমি বিক্রয় বা বিনিময় করিতে চায়, তবে তিনি কেতা পাইবেন কি না সন্দেহ; কারণ বর্তমান দখলকারীদিগকে আর একবার উচ্ছেদ করা যাইবে না। পাকিস্তান যে ইহা না বুকে তাহা বলে; কিন্তু একথাও সে বুকে যে, জমির মূল্য প্রত্যেকের

দরুন যে টাকাটা ভারতকে দিতে হইবে তাহা অল্প নহে। এইজন্যই হয়ত তাহার বিষয়টি এড়াইয়া যাইতে চান।

শহরস্থ স্থাবর সম্পত্তির সমস্ত পাকিস্তানী সম্ভাবন করিতে চায় ব্যক্তিগতভাবে এগুলি বিক্রয় ও বিনিময় করিবার অধুমতি দিয়া। পক্ষান্তরে ভারত-সরকার মনে করেন যে, ইহা সম্ভাব্য সম্ভাবন নহে। প্রকৃত ব্যাপার কি?

উত্তর দেশের উদ্বাস্তুদের মোটামুটি এক হিসাবে দেখা যায় যে, ইহাদের শতকরা ৭০ জন ১০,০০০ টাকারও নিম্ন মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিক। ৫,০০০ টাকার কম মূল্যের সম্পত্তির মালিকের সংখ্যাও কম নহে।

এই সকল সরল ও বিকিরোহী ব্যক্তিদের পক্ষে পরিভ্যক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বারংবার উত্তর দেশের মধ্যে যাতায়াত করা সম্ভবপর নয়। যেনে করা বাটক, একজন গরীব সিদ্ধী জব্বলপুরে বসতি স্থাপন করিয়াছে; তাহার পক্ষে কি পশ্চিম পাকিস্তানের শিকারপুরে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য একাধিকবার যাতায়াত সম্ভবপর? জব্বলপুরের যে গরীব মুসলমান শিকারপুরে যর বাঁসিয়াছে, তাহার পক্ষেও অসম্ভবপ অসুবিধাই দেখা দিবে।

সাপ্তাহিক সময়েও গরীবদের পক্ষে দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত দুঃসাধ্য। বর্তমানে যাতায়াত ও অর্থ প্রেরণ ক্ষেত্রে যে সকল বাবা-মিষেব আরোপিত হইয়াছে, উহার ফলে উক্ত দুঃসাধ্য কার্য অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া, ভারত হইতে যে সকল হিন্দু ও শিখ পাকিস্তানে যাইবেন তাহার মধ্যে কোন বহুবাকবের সাহায্য দূরের কথা; তাহাদের দেখাই প্রাইবেন না। পাকিস্তান হইতে আগত মুসলমানদের অবস্থা এ বিষয়ে খুবই অসুস্থ।

সম্পত্তি বিক্রয়ে একটি অন্তর্নিহিত অসুবিধাও আছে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী একমাত্র মালিকই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন; উক্ত ব্যবস্থার আর কোনও বিকল্প নাই।

পূর্বে বিক্রয় পরিকল্পনার কলকল জামিয়ার ক্ষত ভারত গবর্নেন্ট ১৯৪৯ সালে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে যে, ভাষা নামে পশ্চিম পাকিস্তানে পরিভ্যক্ত উদ্বাস্তু-সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য কেতা সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকর। কার্যতঃ ১৯৪৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র একটি উদ্বাস্তু সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে এবং তাহাও খুব সম্ভাব্যতঃ তাহা সত্ত্বেও বিক্রেতাকে অত্যধিক হারে বিক্রয়-কর দিতে হইয়াছে। অপর দিকে, ভারতে পর্যাপ্ত সংখ্যক মুসলমান থাকে সত্ত্বেও ৫০টির বেশী উদ্বাস্তু সম্পত্তি হয় যাদের মধ্যে বিক্রয় হয় নাই।

সরকারী পর্যায়ে উদ্বাস্তু সম্পত্তি বিক্রয়ে পাকিস্তান গবর্নেন্ট গররাজী কেন? তাহাদের একমাত্র যুক্তি এই যে, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় কার্যতঃ অসম্ভব। কিন্তু

মানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও ভারত গবর্নেন্ট বর্তমানে এই কার্য অবিলম্বে শেষ করার ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছেন। যেনে হয়, এ বিষয়ে পাকিস্তান গবর্নেন্টের সাহায্য পাইলে কাজটি আরও দ্রুত শেষ করা যাইত। বস্তুতঃ পক্ষে কাজটি মোটেই অসম্ভব নয়।

এই উদ্বাস্তু সম্পত্তি এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ এ সকলের মূলে আছে ভারত-সরকারের—বিশেষতঃ নেতৃক মন্ত্রিসভার নিদারুণ নির্ধিল মনোভাব। সেই প্রথম ভারত বিভাগের সময় হইতে আজ পর্যন্ত আমরা দেখি আমাদের সরকারের নিষ্ক্রিয়তা, পৌরুষ ও দৃঢ়তার অভাব।

পাকিস্তানের সমস্তা অশেষ। উহার সর্বত্র কম, লোকবল কম, বরাপুতের বা ভূগর্ভের ঐর্ষ্যের একান্ত অভাব। এই অভাবজনিত সোভ এখন ঐ রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক হইতে উচ্চতম অধিকারী পর্যন্ত সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পাকিস্তান তাহার সমস্যা-পূরণে অদম্য মনোবলের পরিচয় দিতে পারিতেছে। ইহার দুই কারণ, প্রথম—তাহার কর্মচারীবর্গ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রচালনা করিতেছে, দ্বিতীয় কারণ—ভারত নামক কামবৈয়র বৈয়ং মনোবৃত্তি। চোখ রাঙ্গাইলেই বা লক্ষ্য করিলেই যদি কার্যসিদ্ধি হয় তবে তাহা করে না কে?

অনধীন ভারতরাষ্ট্র

বর্তমানের প্রাচীনপন্থী “আর্য্য” পত্রিকায় গত শ্রাবণ মাসের ৮ই তারিখে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে:

“মহাভারত অনুশাসন পূর্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতে-ছেন। লোকযাত্রা ও বস্তু অয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অমদানের তুল্য দান আর নাই।

হিলাস রাষ্ট্র-পর্যায়ীন, হইয়াছি: অমধীন—ইন্ডিপেন্ডেন্ট—not dependent on others। এখনও প্রকৃত স্বাধীন হই নাই। উপনিষদের ভাষায় স্বাধীনতার অর্থ: স্ব-মহিলা রাষ্ট্র, আত্ম-মহিমায় বিরাজ করা। স্বকীয় নীতি-বর্ধ, তপস্বী-কর্ম, চারিত্র্যাবতা, পরম্পরাগত সদাচার, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি। জাতীয় চরিত্র: আত্ম ও পর-ভাব-ভাবুক রহিয়াছে বলিয়াই মিথ্য এই মারামারি, কাটাকাটি, এই আত্মঘাত, আত্মদোহ। একদিকে অবিশ্বাস্য উপদ্রব, উৎপাত, অন্যদিকে স্বাধিকারপ্রমত্ততা। এই অবস্থাকে বলে অধোরপহা।”

সেবক যে তথ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা সকল মর-নারীর কাম্য। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্বে হৃদয় না ঢালিয়া কর্মমাক্ত জল ঢালিতেছি, সেইজন্য গুরুদায়িত্ব

মা জল না হুবে পূর্ণ হইতেছে। হরত কোন বার্ষিক নাগরিক তাঁর দেয় হস্ত চালিয়াছিলেন তাই বুঝকা হইয়াছে।

কৃষিক্ষণ

“বাকুড়া-দর্পণ” পত্রিকার ১৬ই শ্রাবণ সংখ্যার সেই পত্রিকার ১৯৪৬ খ্রি: ১৬ই মে সংখ্যা হইতে ‘হুভিকের সময় সরকারের কর্তব্য কি’ প্রকাশিত করিয়া একটি সমরোপযোগী কর্তব্য করিয়াছেন:

“বাংলা-সরকার প্রায় ছয় লক্ষ টাকা সদর মহকুমার জন্য মজুর করেছেন। গত ১৫ই মে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় সদরে সমস্ত রিলিফ অফিসারকে আহ্বান করে একটি অধিবেশনে কিভাবে এই ধন দেওয়া হইবে বুঝাইয়া দেয়।

আমরা কমিশনার মহোদয়কে জানাইতেছি যে, ’৪৬-এর মহন্তের বহু ছোটখাট জমির মালিক বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য জমি বিক্রয় করে এখন তাগচাষীতে পরিণত হয়েছে। এই সব দুঃস্থ ছুঁতাগা চাষীদের সঙ্গে যদি কোন জমির মালিক যোগ দিতে না চান তা হলে কি তারা চাষের জন্য কৃষিক্ষণ পাবে না? কিন্তু *Famine Manual*-এর ২৩ বারার রয়েছে:

“* * If the better off villagers decline to sign joint Bond with poor Landless villagers, it is permissible to advance loans under Rule 6(3) to bodies of 5 or more co-villagers on their Personal Security.”

এ বারা প্রয়োগ না করার কি ভাংপড়া বুঝিলাম না। আমরা এ জেলার দুঃস্থ চাষীদের নিঃসহায় অবস্থা বিবেচনা করে উক্ত বারা পুনর্বিবেচনার জন্য অহরোহ জানাছি।”

পশ্চিম বঙ্গে লিখন-পঠনক্ষম লোকের হার

১৯৩১ সন	শতকরা	১১'৪
১৯৪১ সন	”	১৬'৫
১৯৫১ সন	”	২৪'৮

প্রতি জেলার হিসাব

ক্র.সং.	জিলা	শতকরা
১।	কলিকাতা	৫৩'১২
২।	হাওড়া	২৮'৩৭
৩।	২৪-পরগণা	২৭'৩০
৪।	হুগলী	২৪'৬৬
৫।	মেদিনীপুর	২৩'১৭
৬।	দারজিলিং	২১'১২
৭।	মদীয়া	২১'৩৯
৮।	বর্ধমান	২০'৬৫
৯।	বীরভূম	১৭'৬৬
১০।	বাকুড়া	১৭'২১
১১।	কুচবিহার	১৫'০৯
১২।	পশ্চিমদিকপু	১৪'৭৩
১৩।	জলপাইগুড়ি	১৪'৪৬

১৪। হুশিদিবাদ

১৩'০৬

১৫। মালদহ

১'৫৭

পশ্চিম বাংলা সরকারের জনশিক্ষা বিভাগের সুবিশিষ্ট জনশিক্ষার গুণ শ্রাবণ সংখ্যায় উপরোক্ত হিসাবটি প্রকাশিত হইয়াছে। অগতঃ সত্যজ্ঞাপ্তি বলিয়া বাহারা পরিচয় দেয় তাহাদের মধ্যে আমাদের স্থান কোথায় তাহা এই হিসাবেই বুঝা যায়। মরুময় আরবদেশ বা তিমিরাছর আফ্রিকা ভিন্ন অল্প কোথায়ও নিরক্ষরতার অন্ধকার প্রগাঢ় নয়। ভারতেও আমাদের স্থান সর্বোচ্চে নয়। জিবাজুর, মহীশূর, বরোদা অনেক উচ্চে। মালদহও বোধ হয় উপরেই আছে।

সুতরাং বাঙালীর গর্বের কারণ আর বাহাতেই থাকুক এই বিষয়ে নয়।

বিজ্ঞানচর্চায় প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

“ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের দেহত্যাগের (১৯০৪; ২৩শে ফেব্রুয়ারী) পর তদীয় একমাত্র পুত্র ডাঃ অমৃতলাল সরকার তারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৯ অব পর্যন্ত বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি সভার কার্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ইনিই ভরুণ সরকারী কর্মচারী চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ চাকুরী বজায় রাখিয়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্যে সুযোগ দানের জন্য সভার পরীক্ষা-গার সকল সময় ধূলিয়া রাখার ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞান-সভা স্থাপনার (১৮৭৬) পর গোড়ার দিকে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার নিজেই পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে নিরমিতভাবে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে কাদার লাকৌ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। পরে ডাঃ তারা-প্রসন্ন রায় রসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ে ঐরূপ বক্তৃতা প্রদান করিতে থাকেন। এই সকল বক্তৃতা সাধারণের বোধগম্যভাবে এবং যত্নাদি সহযোগে পরীক্ষা প্রশ্নপত্রপূর্বক প্রদত্ত হইত। বিজ্ঞান-সভার বক্তৃতা শুনিবার জন্য জনসমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৮৮৬ সালে শ্রোতার সংখ্যা ৩০০ পর্যন্ত হয়। কয়েকজন মহিলাও বক্তৃতার যোগদান করিতেন। এই সময় আরও কয়েকজন ব্যক্তিত্বাধী বৈজ্ঞানিকের সহযোগিতাভ্যন্তর সুযোগ ঘটে, কলে অবৈতনিক বক্তৃতাভ্যন্তর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাহাদের সহায়তায় কেবল পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নেই নয়, ভূ-তত্ত্ব, কলিত গণিত, জীব-বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিষয়েও বক্তৃতাভ্যন্তর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। এই সকল অবৈতনিক বক্তৃতাভ্যন্তর বাহারা সভার মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে নিজেদের অমূল্য সময় ব্যয় করেন তাহাদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, তার আন্তর্য্যে সুখোপাধ্যায় এবং তার নীলরতন সরকারও ছিলেন। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ডাঃ চুনীলাল বসু (বাংলা গবর্নমেন্টের রাসায়নিক পরীক্ষক), ডাঃ রজনীকান্ত সেন, শ্রীযুক্ত দত্ত রসায়ন

বিজ্ঞানে, শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীভানুদাস মুখোপাধ্যায় কলিত গণিতে, শ্রীপ্রমথনাথ বসু (টাটা লোহ প্রতীষ্ঠানধ্যাত) কু-তত্ত্ব বিভাগ, শ্রী বি. এল. চৌধুরী জীববিজ্ঞানে, ডাঃ অমৃত-লাল সরকার পদার্থ-বিজ্ঞানে এবং শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ-বিজ্ঞা বিষয়ে বক্তৃতাদান করিতেন। কয়েক বৎসর পরে বিজ্ঞান-সভা ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রদের জন্য উদ্ভিদবিজ্ঞা, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাখা নিয়মিতভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।”

প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্বে এই প্রতিষ্ঠান কার্য আরম্ভ করে। “জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকার কৈষ্ঠ-আঘাট সংখ্যায় শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান-সভা সম্বন্ধে একটি সুচিত্রিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বীরভূম জেলায় ভূদান-যজ্ঞ

শ্রীলালবিহারী সিংহ “হরিজন” পত্রিকার ৩রা প্রাবণ সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠাইয়াছেন: “আমাদের এই যজ্ঞের আরোহণ চলিতেছে। বোধ হয়, আগামী পৌষ-মাস মাসে আচার্য্য বিনোবা তাবে এই যাজ্ঞে পদার্পণ করিবেন।”

বীরভূম জেলার ভূদান-যজ্ঞ সমিতির আহ্বায়ক শ্রীলাল-বিহারী সিংহ গত ২৩-৬-৫২ পর্য্যন্ত মুরারই থানার আমতোল ইউনিয়নের তিমপুর, আমতোল, কলহপুর, অমৃতপুর, নরোত্তম-পুর ও কপকপুর এবং নন্দীগ্রাম ইউনিয়নের ভোগারপাড়া ও নন্দীগ্রাম গ্রামে যাইয়া ভূদান-যজ্ঞ ও সর্বোদার আন্দোলন বিষয়ে ব্যক্তিগত বৈঠক করিয়া ও প্রতিমিহি স্থানীয় লোকদের সত্য আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া বলেন। গ্রাম শান্তি স্থাপন ও উন্নয়ন বিষয়েও গ্রামবাসীদের তিনি পরামর্শ দেন। আম-তোল গ্রামে ২৯-৬-৫২ তারিখে সত্য আলোচনা করিয়া ইউ-নিয়নের প্রতিমিহি স্থানীয় ব্যক্তিগণ সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীবতীজ-মোহন মণ্ডল ও জনাব মহম্মদ কোরবান হোসেন মহাশয়দের উপর ইউনিয়নের সকল বিষয়ের ধীমান্জা, উন্নয়ন ও ভূদান-যজ্ঞের (ইউনিয়নের অংশ ৭ হাজার লোকের পক্ষ হইতে ৭০ একর ভূদান-সংগ্রহ) কাজ করিবার ভার অর্পণ করেন। বিভিন্ন পক্ষ মধ্যে বহুদিন যাবৎ যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহার অবসান হয়। নন্দীগ্রাম ইউনিয়নে ভূদান-যজ্ঞের কাজ করি-বার ভার গ্রহণ করেন জনাব রহিম বক্স, শ্রীশ্রীভোগ্য সেন ও শ্রীমুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়। এই ইউনিয়নে শান্তি স্থাপন ও উন্নয়ন-বিষয়েও কাজ হয়।

আমতোল ইউনিয়নে দাতার ৬-২১ শতক ভূমি দান করেন।

বীরভূম জেলায় এ যাবৎ ১৭ জন দাতা ২২-৩০ ভূমিদান করিয়াছেন এবং বহু স্থান হইতে ভূমিদান দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লেখকের নিকট পত্র দিয়াছেন।

৩০-৬-৫২ লাইকর গ্রামে বীরভূম জেলা ভূদান-যজ্ঞ সমিতির সভা হয়। এই সভার আন্দোলন পরিচালনার জন্ত

৩টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। জেলা সমিতির সিদ্ধান্ত মত সাঁইবিহার বীরভূম জেলা ভূদান সমিতির কার্যালয় খোলা হইয়াছে। শ্রীমিরজাক সরকার কার্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীলালবিহারী সিংহ ১-৭-৫২ হইতে ৮-৭-৫২ পর্য্যন্ত লাইকর, মুরারই, সাঁইবিহার, সিউড়ি, ভাতীপাড়া, রামপুরহাট, বোলপুর ও কলিকাতা গিন্না ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে কর্মীগণের সহিত আলোচনা করেন। শ্রীচাক্রচন্দ্র তান্ত্রী, শ্রীপকামন বসু, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমিহির-লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমল বিষ্ণু, শ্রীপোপিকাবিলাস সেন, শ্রীকামদাক্ষিকর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবসন্তলাল মুরারকার সহিত তিনি এই বিষয়ে পরামর্শ করেন।

কাজি নজরুল ইসলামের বৃত্তি

“নিশান” পত্র ২৬শে প্রাবণ সংখ্যায় নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন :

“১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫২ সালের জুন মাস অবধি কাজি নজরুল ইসলামকে দেয় মাসিক ১০০ টাকা হিসাবে ৬২৫৬০ আনা জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী ডেপুটি হাই-কমিশনার এককালীন শোধ করিয়াছেন। দান বটে কিন্তু ১ বৎসর ৯ মাসে অর্থাৎ ২১ মাসে ১০০ হারে প্রাপ্য হয় ২১০০ টাকা—৬২৫৬০ হয় কেমনে? পাক টাকার ৯২৪ টাকা বেশী হয়—তাহাতে হয় ৩০২৪। তারপর হইল ১০০ টাকার বৃত্তি যদি ৬২৫৬০ টাকার শেখ করা হয় তবে কি বৃত্তিপ্রাপক সে টাকার ফল উপভোগ করিতে পারে—করূপ কবি এতকাল অবধি মা-ও থাকিতে পারিত। দান করিয়া ঢকানিনাদে প্রকাশ না করিলেই শোভন হইত—এত দিন দিতে শক্তি হয় নাই—আজ দিলাম এই শু কণা।”

এ সংখ্যায়ই “বিশিষ্ট হিতৈষী”র উপর পূর্ববক সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে। ভৎসনপূর্ণে হুগো-মোহন বাবু অনেক হা-ছতাপ করিয়াছেন। আমরা মনে করি যে, পূর্ববক সরকারের নিষেধাজ্ঞা বৃক্তিসঙ্গত। কোন রাষ্ট্রই এরূপ দৈত আত্মগত্য সহ্য করিতে পারে না। পূর্ব-বাদের যেতৃস্থানীয় অনেকে এরূপ হু’ নোঁকার পা রাখিয়া চলিতেছেন। শ্রীশ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে পরিবার-পরিজনকে আনিয়াছেন। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্ট, সকলেই সরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ ব্যবহার লকে করাচীর কেজীর-পরিষদে ও পূর্ববাদের পরিষদে গরম গরম বক্তৃতার কোন সঙ্গতি নাই। এই কথাটা মনে রাখিলে, হুগোমোহন বাবুর কোত অন্য তাবে প্রকাশ পাইত।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের নূতন সাহিত্য

হাওড়ার “নব্যভারত” (২৪শে জ্যৈষ্ঠ) নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :

“ঐ অন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্যিক ও কবি বটে, তবে ইহানীং তিনি আটনী ফিরিনী ও তোলা ময়রা কবির মত লড়ায়ে কবির পায়তারা কয়ছেন। তাই তাহার লড়ায়ে কাব্যটা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই লেখা হইয়াছে।... অক্ষমতার দুর্বলতাকে রত্নী সাহিত্যিকরা কবিতা লিখিয়াই চাপা দিয়া থাকেন।”

উড়িয়ার অবস্থা

“যুগান্তর” পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন :

চক্রবর্তীর পরিবর্তনে উড়িয়ার নবরূপ আরম্ভ হইয়াছিল ১৫ বৎসর পূর্বে নরী প্রদেশ সংগঠনের সঙ্গে ১৯৩৬-৩৭ সনে, ১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের অধীনে জয়লাভ, ১৯৩৮-৩৯ সনে কংগ্রেসী শাসনের প্রথম পর্বে ও তার পর সম্মিলিত মন্ত্রিসভাকালে এবং বিশেষ করে ১৯৪৬ সন থেকে মহাত্মা মন্ত্রিত্বের আমলে এ রাজ্যের বিভিন্নস্থী উন্নয়ন দ্বারা ১৯৪৮-৪৯ সনে দেশের রাজ্যগুলির সংযুক্তির সঙ্গে উড়িয়ার বহল সম্ভারনে প্রবল বেগে বহুতর দিকে এগিয়ে যাবে আশা করা গিয়েছিল। যে রাজ্য পূর্বতন সাম্রাজ্য সৃষ্টির, বহু শতাব্দীর ঐশ্বর্য্য কারুকলার, শৌর্য্যবীর্য্যে ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ (১৮০৩ ইং) ব্রিটিশ শক্তির অধীনে স্বাধীনতা হারিয়েছিল, তার নব অভ্যুদয়ের গৌরচন্দ্রিকার ভবিষ্যতের পুনর্গঠনের দিকে যে অতি উচ্চ আশা-ভরসা উজ্জ্বল হইয়াছিল, তা কি জানি যেম কেম, গত দুই-তিন বছরের রাষ্ট্রীয় বা শাসন সম্পর্কীয় অব্যবহার এবং সাধারণো মৈত্রিক পঙ্কিলতার মলিন হতে চলেছে দিনের পর দিন। এ বিপর্য্যের প্রতিরোধ করার মত নিষ্ঠাবান ও কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃত্বের আবির্ভাব না হলে একটা বিরাট জাতির বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা মূল্যহীন হয়ে যাবার আশংকাই হচ্ছে।

এই অবস্থার বা দুর্বস্থার জন্য মানুষই দারী এবং মানুষই তার প্রতিকার করিতে পারে। উড়িয়ার মত ভাগ্যবান প্রায় কোন রাজ্যই নর। তার আরভম বুদ্ধি পাইয়াছে। লোকমত সন্তোষ; শ্রীমবক্ষ্য চৌধুরী রাজ্যের করণার। শ্রীহরেক্ষ মহাত্মার আত্মচরিতের কয়েকটি অংশ “যুগান্তরে” প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকলের পুনরুত্থান সম্বন্ধে মধুসূদন দাশ ও গোপবন্ধু দাশ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ। বিপিনচন্দ্র পাল তাহার আত্মচরিতে “পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের উড়িয়া” নামক অংশে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

পৃথিবীর কোনও দেশ, কোনও রাজ্য বা কোনও জাতি

একবারে ধ্বংসস্বর্ণ হইতে পারে নাই, এমন কি মার্কিন দেশ বা সোভিয়েট রুশও নর। ভারতের যে সকল রাজ্য ভারতরাজ্যের অংশ তাহারাই নর। এই সার কথা বুঝেন এবং এক রাজ্য অতঃকালের সহিত পূর্ণ সৌহার্দ্য ও সহযোগ রাখিয়া চলেন তবেই তাহার প্রগতির পথে চলিতে পারিবেন নতুবা নহে। আসাম, বিহার ও উড়িয়ার এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

স্লাভ শব্দের অর্থ

“স্লাভ” শব্দ আজ ষ্টালিনের মাহাত্ম্যে নুতন করিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধ অর্থ “সবাক জাতি” (the articulate people)। তারা অজ্ঞাত অসভ্য জাতি (barbarians) হইতে পৃথক। এই জাতিগত, বর্ণগত অহমিকার উদাহরণ ইতিহাসের পাতার পাতার পড়া যায়।

চক্ষুনিষ্ঠ শাসকবর্গের পূর্বক জার (Tsar) রাজা-রাজপণ এই জাতিরাচক অহমিকাকে নিজেরে ধারণে ব্যবহার করিয়া ছিলেন। কতবার যে তারা যিহুদী বন্দীবলদ্বীপের বিশেষ করিবার জন্ত জনগণকে কেপাইয়াছিলেন, তার সংখ্যা অগণিত। এবং ষ্টালিনের নেতৃত্বে সেইরূপ “সবাক” রুশগণ অকুশীল জাতিসমূহকে প্রদান করিতেছে।

এই স্লাভ জাতির এবং তাঁদের ক্রিয়াকৌশল ক্রম-জাতিসত্ত্ব ব্যক্তি মন। চেকোস্লাভিয়া দেশবাসী জোসেফ সেকারিস (Josef Sefaris) সর্বপ্রথমে বিজ্ঞানসম্মত স্লাভ-ভাষাসমূহের ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন। আর এক জন চেকোস্লাভিয়াবাসী জ্যান কলার (Jan Kollar) চেকোস্লাভ ভাষার প্রথম বঙ্গদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। তার শিরোনাম—স্লাভ কন্যা (The Daughter of the Slavs)। প্রাগ নগরীতে ১৮৪৮ খ্রিঃ নিখিল-স্লাভ সম্মেলন সংগঠিত হয়। তাহার সভাপতি ছিলেন প্যালেকি ড্রান (Palacky Drawn)। সকল স্লাভ দেশের প্রতিনিধি তাহাতে সমবেত হন। আর এক কথা, এক জন জার্মান এই জাগরণের পরিপোষক ছিলেন। তাহার নাম জোহান গটফ্রেড হার্ডার। স্লাভ-রক্ষকের সহজ জীবনযাত্রার প্রশংসা করিয়া তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই তত্ত্বের একটা প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তাহা এই যে, টিউটন ও ম্যাটিন জাতিসমূহই করিয়ু হইয়া পড়িতেছে। স্লাভ রক্ত প্রবাহিত করাইয়া তাহাদের পুনরায় সতেজ করা যাইতে পারে। নৃতত্ত্ববিদের এই চেষ্টা সভ্য-মিথ্যা মিশ্রিত। তাহার সঙ্গে যখন ভাষাবিদ যোগদান করেন তখন সোনার সোহাগা বেশানো হয়।

ইতিহাসের এই বিবরণ বর্তমান যুগের রাজনৈতিক সমস্তা-বলী বুঝিবার পক্ষে সাহায্য করে বলিয়া দিলাম।

শাহজাদা দারাশুকো

ঐকালিকারঞ্জন কানুনগো

পঞ্চম অধ্যায়

দোটানা শ্রোতে দিল্লীর তথা মোগল সাম্রাজ্য

১

সম্রাট শাহজাহান শুধু পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া নয়, মোগল সাম্রাজ্যের শাসননীতি নির্ধারণ করিতে গিয়া প্রবল দোটানা শ্রোতের মুখে পড়িয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন পিতামহ হইতে তাঁহার কৃতিত্ব কোন অংশে কম নহে; আবুল ফজলের মত একজন ঐতিহাসিক পাওয়া গেলে তাঁহার কীর্তিগাথা পিতামহের গৌরবকে স্নান করিয়া দিত। রাজ্যবিস্তার, গুণীর সমাদর, সাম্রাজ্যের রূপসজ্জা, শাসনকার্য্যে পরিশ্রম ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পিতামহের সহিত প্রশংসনীয় প্রতিস্পর্ধা-ভাব শাহজাহানকে উৎসাহ ও উদ্বীপনা যোগাইয়াছে সন্দেহ নাই। এই প্রতিযোগিতায় তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে আকবরকে হার মানাইয়াছেন বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আকবর বাদশা হুমায়ূ-শেরশাহের ভাঙা দিল্লীতেই পকাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সামিয়ানা খাটাইয়া দরবার-ই-আমে হিন্দুর দেবতার খাটের মত লাল পাথরের চতুর্দিকের মধ্যে মসনদের উপর গালিচা পাতিয়া বসিয়াছেন, সহজলভ্য লাল পাথর দিয়া রাজধানী ফতেপুর সিক্রী নির্মাণ করিয়াছেন, মর্ম্মর পাথরের নামগন্ধ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শাহজাহানের হাতে আগ্রার চেহারা ফিরিয়া গেল, যমুনাতীরে দিল্লী-শাহজাহানাবাদ নির্মিত হইল, গৌরবদুগ্ধা সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর অভিনব রূপসজ্জায় মর্ম্মর-প্রস্তর শিল্পীর বিচিত্র বর্ণসম্ভার-সমৃদ্ধ রত্ন-আলিপনার নীচে যেন আমাদের মাটির প্রলেপ। আকবরের চিত্রশিল্পী সিক্রীর মহলে তুর্কী-হামামের গায়ে যে রূপরেখা রাখিয়া গিয়াছিল, শাহজাহানের শিল্পী ও সাল-সাজ (খোদাইকার) বাটালি ও এক বুড়ি দেশী-বিদেশী নানা রঙের দামী পাথর লইয়া মর্ম্মরের চত্বরে-প্রাচীরে, সম্রাটের ইন্দ্রপুরীর অলকানন্দা নহর-ই-বেহেশতে, সেই ছবির খেলা এবং রঙের যাত্ৰ দেখাইয়াছে। তাজমহলের ইরাণী শান-এ ও মুখর লাস্যে হিন্দুস্থানে মুসলমান স্থাপত্য সৌন্দর্য্যস্থষ্টির পরিসমাপ্তি হইল। হিন্দু ললিতকলাখচিত রত্নাধর-পরিহিতা সিক্রী পূর্বেই অরণ্যবাসিনী হইয়াছিলেন। শাহজাহান মনে করিতেন যে, হিন্দুস্থাপত্য, শিল্পকলাকে মুসলমানরা উত্তর ভারতে তিন শতাব্দী ধরিয়া কবরস্থ

করিতেছিল, আকবর ফতেপুর সিক্রীতে গ্রীকুলির পুনঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া ইসলামের অবমাননা করিয়াছিলেন।

লোকপ্রসিদ্ধ ফতেপুর সিক্রীর নবরত্নের মধ্যমণি আকবর ছিলেন বহুশ্রুত নিরক্ষর বিজ্ঞমাদিত্য; তাঁহার পৌত্র প্রকৃত বিদ্বান, আরবী-ফার্সিতে আলিম, হিন্দী লেখাপড়ায় পাকা কায়স্থ। শাহজাহানের দরবারে পুরুষরত্নের অভাব ছিল না। উঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রত্ন উজীর-ই-আজম সাদুল্লা খাঁ, মুসলমানের চোখে “দজ্জাল” (Anti-Christ) আকবর বাদশার “নওরতন”, নয়টি দুগ্ৰহ। মোল্লা বদায়ুনী দরবারী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবগুলিকে বলিয়াছেন “লুচা”—যাহাদের কথা লিখিলে কলম নাপাক হইয়া যায়।* সাদুল্লা খাঁকে আওরঙ্গজেব বিশেষ হিতৈষী জ্ঞানে অন্ধা করিতেন; দারার সহিত উজীরের প্রায়ই টক্কর লাগিত, সম্রাট এইজন্ত দারাকে শাসাইতেন, শাহজাহান উপর বিরক্তি প্রকাশ করিতেন।

মোগল সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় টোডরমল কিংবা দ্বিতীয় সাদুল্লা জন্মগ্রহণ করেন নাই। রাজা মানসিংহের পৌত্র মৌজ্জারাজা জয়সিংহ মোগল-দরবারে পিতামহের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। মিক্রা তানসেনের নাতি লাল খাঁ দাদা-সাহেবের নাম বজায় রাখিয়াছিলেন। শাহজাহান কিঞ্চিৎ হিন্দুবিষেধী হইলেও সংস্কৃত এবং হিন্দীর উপর সদয় ছিলেন; দরবারী খেতাব, নাম ইত্যাদি নির্দ্বন্দ্বনে তিনি পণ্ডিতী সংস্কৃত পছন্দ করিতেন। দরবারের “গুণী”শ্রেষ্ঠ লাল-খাঁকে তিনি “গুণসমুদ্র” উপাধি দিয়াছিলেন। ফার্সী কবি মোল্লা কুদ্দুসী শাহজাহানের দরবারে—আকবরশাহী দরবারে সেখ ফৈজীর স্থান পূর্ণ করিয়া “কবিসম্রাট” (মালিক-উশ-শোরা) উপাধি পাইয়াছিলেন, ময়ূরভক্তের তক্তায় তাঁহার রচিত মসনবী খোদাই করা হইয়াছিল। ফৈজী এবং কুদ্দুসীর মধ্যে আশমান-জমীন তফাৎ। সম্রাট কবিতা ভাল-বাসিতেন, কিন্তু ভালমন্দ বুঝিতেন না, কাজের কথা, পদের মিল থাকিলেই হইত। তাঁহার কাছে ভাল কবিতাপাঠ “অরসিকেশু রসস্ত নিবেদনম্”—অনেক সময় বিপদ ডাকিয়া লওয়ার মত। দারা একবার তাঁহার বন্ধু প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি ও সাহসী ঘোড়া চম্পতান “ব্রাহ্মণ”কে পুরস্কৃত করিবার জন্য পিতার কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। সম্রাটের অল্পমতি

* Muntekhab-ut-tawarikh, Eng. trans. Vol. III, p. 1.

পাইয়া কবি স্বরচিত একটি স্মৃষ্কানী কবিতা আবৃত্তি করিলেন—ইহার স্তূল্যার্থ :

‘আমি বহুদিন “কাবা” এবং বুতখানার (দেবমন্দির) মধ্যে সংশয়াকুল ভাবে আনাগোনা করিতে করিতে অবশেষে বুতখানায় ঢুকিয়া পড়িলাম।’

কবিতা শুনিয়াই শাহানুশাহ চটিয়া আগুন হইলেন,— এমন বেইমানকে তাঁহার পুত্র হাজির করিয়াছে; এই কবিতায় ইসলামের অপমান করা হইয়াছে, এই কাফের কাবা শরীফ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বুতখানায় ঢুকিয়া পড়িল?—এই কবিতায় আসলে চন্দ্রভানের মৌলিকতা ছিল না, ইহা পূর্ববর্তী মুসলমান স্মৃষ্কগণের ভাব লইয়া রচিত। এই কথা পিতাকে বুঝাইতে দায়া এবং বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তিগণ গলদঘর্ষ হইলেন। আর একজন কবি শাহজাহানকে কবিতা শুনাইতে গিয়া গুরুতর বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই কবি সেলিশ চিশতীর বংশধর ফতেপুর সিক্রীর শেখজাদা পাগলা সৈইদা, খাটি স্মৃষ্কী ও ভাবের পাগল। তিনি আবৃত্তি করিয়াছিলেন :

Chi-st dani bada-i-gulgun musaffa-i-Jauhri :
Husn-ra parawar-digar wa ishq-ra Paigambari.

অর্থাৎ, গোলাপের মত রক্তিমাত পদ্মরাগ মণির নির্মল রক্তিমচ্ছটার গ্রায় সমুজ্জল সুরা কি বস্তু জানা আছে কি? এই সুরা সৌন্দর্যের পরবর-দিগর (প্রতিপোষক) এবং ইশকের (প্রেমের) বার্তাবাহক পয়গম্বর।

হারাম শরাবের সহিত পবিত্র পরবর-দিগর আঞ্জা এবং আঞ্জার রসুল হজরত পয়গম্বরের নাম-সংযোগ শুনিয়া শাহজাহানের ভিতরের আসল মানুষটি বাহির হইয়া পড়িল—বাহার প্রতিচ্ছবি তাঁহার পুত্র আওরঙ্গজেব। কবি গোস্বামী মাপ চাহিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে বুঝাইলেন এই শরাব সাধারণ নেশা নয়, দিলের পেয়ালায় ইশক-ই-হকিকি অর্থাৎ ভগবৎ প্রেম।

২

শাহজাহান স্বয়ং “বিতীয়” তৈমুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, বুল্গা-বিদ্রোহের সময় নৃশংস ধর্মাসক্ততা ও রক্ত-স্নাত বর্করতায় তাঁহার তৈমুর প্রকট হইয়াছিল। ধর্মপ্রাণ মোল্লাগণ তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া প্রচার করিলেন শাহানুশাহ এই জমানার ইমাম মেহ্‌দী, ইসলামকে রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। আকবর-প্রবর্তিত ইলাহী সাল বাতিল করিয়া শাহজাহান শাহী দপ্তরে ইসলামী হিজরী সাল পুনঃপ্রবর্তিত করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের অন্তর্গত ভিখরের জমিদার নিজের জমিদারীর মধ্যে

ধর্মত্যাগ না করিয়া হিন্দুনারীর মুসলমান পতিগ্রহণ এবং মুসলমান জীলোকের হিন্দুর সহিত বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের পথে যোজার এই বিষয় তাঁহার কানে পৌছাইল। তিনি হুকুম দিলেন, যে সমস্ত হিন্দু মুসলমান জী লইয়াছে তাহাদিগকে জী কিংবা ধর্ম দুইটার একটা ত্যাগ করিতে হইবে। বেচারি যোগুণ্ডয়ে মুসলমান হইয়া গেল, প্রজাদেরও ঐ অবস্থা। মুসলমানের দেওয়ান-খানায় হিন্দু পদস্থ কর্মচারিগণকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়—এই অভিযোগে তিনি দেওয়ান-ই-তন দপ্তর হইতে রাজা মণিদাসকে অন্যত্র সরাইয়াছিলেন। সুদক্ষ রাজস্ব-কর্মচারী রাজা রঘুনাথ আজীবন উজীর সাহুল্লার “শেখদস্ত” বা হেড এসিষ্ট্যান্ট রহিয়া গেলেন, টোডরমলের ভাগ্য কোন হিন্দুর হয় নাই। হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে সর্ববিধ সুবিধা জায়গীর ও নগদ পুরস্কার পাইত; বাগলানার হিন্দু রাজার পুত্র প্রেমজী মুসলমান হওয়ায় কুমার আওরঙ্গজেবের সুপারিশে সম্রাটের নিকট হইতে দেড় হাজারী মনসব পাইয়াছিল; রাজা বখতাবর কচ্ছবাহ ধর্ম-ত্যাগের জন্য ইনাম পাইলেন নগদ দুই হাজার টাকা।

হিন্দুর মন্দির ধ্বংসকার্যে পুণ্য অর্জনের বাস্তবিক জাহাঙ্গীরের সময় হইতে কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর বাদশাহ খেয়ালী মানুষ, ধর্মোন্মাদনা বিষমাক্রান্ত জরের মত সময় সময় তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ করিত। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তিনি হিন্দুদিগকে মন্দির নির্মাণে বাধা দিতেন না। শেষ বয়সে ধর্মের রোগ প্রবল হওয়ায় তিনি হুকুম দিলেন নূতন মন্দির যেগুলি সম্পূর্ণ হয় নাই ঐগুলি ঐ অবস্থায় থাকিবে। কাশীতে হিন্দুরা নূতন বাদশাহের কাছে ঐ সমস্ত মন্দির সম্পূর্ণ করিবার আর্জি পেশ করিল। শাহজাহান আদেশ করিলেন, যে অংশ পূর্বে তৈমুর হইয়া গিয়াছে উহাও ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। দরবারী ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরীর বাদশাহনামায় কাশী হইতে ছিয়াত্তরটা হিন্দুমন্দির ধ্বংসের খবর কোন দিন দরবারে পৌছিল—সন তারিখসহ লেখা আছে। বিদ্রোহী পর্ভুগীজ ফিরকীগণের হুগলীর গীজা ধ্বংস করিয়া উহার মুক্তি (Icon)গুলি দরবারে প্রেরিত হইয়াছিল। শাহজাহান ঐগুলি চুরমার করিয়া কেবল দুইটি মাত্র যমুনার জলে বিসর্জন দিয়াছিলেন।

৩

জাহাঙ্গীর বাদশাহ হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা করিতেন, মহাজানী সন্ন্যাসী চিৎরপের (অশুদ্ধ পাঠ ‘বদরূপ’) সহিত দুই বার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন—একবার রাওয়ালপিণ্ডের

নিকটবর্তী বালনাথ বোগীর টিলায় সাধুদিগের বাৎসরিক মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। আকবরের জায় তিনিও পণ্ডিতগণের সঙ্গে বাদামূল্যবাদ করিতেন; অবশ্য হিন্দুধর্ম বুঝিবার মতলবে নয়, উহার মুণ্ডপাত করিবার জন্য। দীন-ই-ইলাহীর গুরু হিসাবে তিনি শিষ্যগণকে দীক্ষা দান করিয়া তাহাদিগকে ধ্যানের প্রতীক শাস্ত প্রদান করিতেন। আকবরশাহী আমলের এই ধারা শাহজাহান লোপ করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান পীর ফকিরগণের (যথা লাহোরের মিঞা মীর) সঙ্গ করিতেন; দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া সূফীর কেরামতি দেখিতেন। ১৬৫২ সনের পূর্বে কোন এক দিন শেখ নাজীর নামক নাম-জাদা সূফীর হঠাৎ শাহী দরবারে বৈষ্ণবী “দশা” হইয়া গেল। ঐ অবস্থায় তিনি এক গেলাস জল চাহিলেন; এক চুমক পান করিবার পর তিনি উহা উপস্থিত ব্যক্তিগণকে চাখিয়া দেখিতে বলিলেন, সকলেই অবাক হইয়া বলিতে লাগিল-মধু। টাটকা খালিস মধু। নাজীরের এই বেনজীর কেরামতির পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্ত ঐখানে উপস্থিত ছিলেন শাহজাদা দারা, সত্যবাদী কাজী মহম্মদ আসলম এবং রাজা বিক্রমজিৎ (বিলোচপুরের যুদ্ধে নিহত বীর বিক্রমজিৎ নহেন)। শাহজাদা ও কাজী বাদশাহকে নিবেদন করিলেন তাঁহার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন পীর সাহেব একবার একটি বদনা এবং আর একবার একখানা ক্রমালকে কবুতর করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। রাজা বিক্রমজিৎ বলিলেন, একবার শেখ নাজীর নমাজ করিবার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখিলেন নমাজের অবস্থায় শেখজীর কাঁচা গালপাট্টা সাদা হইয়া গেল এবং এক দিকে মাথা ও অষ্ঠ দিকে খড় পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরেই আবার দুইটা জোড়া লাগিয়া গেল।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিবেন শাহী দরবার লক্ষ্মীয়েব গুলি-খোরের আড্ডা; কিন্তু বিক্রমজিৎ কাকের হইলেও মিথ্যা-বাদী ছিলেন না—এই সন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন সমসাময়িক দরবারী ঐতিহাসিক লাহোরী। এই রকম ব্যাপারে শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের বিশ্বাসের কিছু মাত্রা ছিল; কিন্তু বিশ্বাসপ্রবণ দারার মাত্রাজ্ঞান ছিল না।

8

আকবর ও জাহাঙ্গীর হিন্দু প্রজার উৎসবের আনন্দে অংশ গ্রহণ করিতেন। বিজয়া দশমী, রাধীবন্ধন মানাই-তেন, দীপালীর রাত্রিতে শাহী মহলে আলোকসজ্জা হইত। শাহজাহান হিন্দুধর্মীর প্রশংসা পাণকার্য্য জানে এই সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। দীপালীর পরিবর্তে “শবে বরাত”,

মুসলমানের গণ্ডীর মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্বাব সৃষ্টি এবং পুণ্য অর্জনের জন্য বাৎসরিক “মিলাদ শরীফ”কে সম্রাট জাতীয় উৎসবের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। লাহোরে শবে বরাত রাত্রির (১১ই শাবান ১০৪২ হিঃ) বর্ণনা বাদশাহ-নামায় লিখিত আছে। আলীমর্দান খাঁ দরবার-ই-আমের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অপূর্ণ আলোকসজ্জা করিয়াছিলেন। ঐখানে এবং বাহিরে দর্শনকারোকার নীচে আভসবাজী পোড়ান হইয়াছিল। ঐ রাত্রিতে শাহানশাহ মোল্লা ফাজিল এবং শিয়ালকোটবাসী মোল্লা আবদুল হাকিমকে জন্মতিথির তুলাদানের সোনা হইতে দুই শত আসরফী প্রত্যেককে দান করিয়াছিলেন এবং দশ হাজার টাকা গরীব ফকীরদিগকে দান-খয়রাতে খরচ করিয়াছিলেন।

মহা ধুমধামের সঙ্গে আগ্রা দুর্গে একবার মিলাদ শরীফের উৎসব হইয়াছিল (১২ই রবিয়ুল আউয়াল ১০৪৩ হিঃ)। মিলাদের মজলিসে অনেক বিদ্বান, কোরাণ-পাঠক এবং ধর্মাত্মা ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। হজরত মহম্মদের জন্মতিথির এই অল্পস্থানে স্বয়ং সম্রাট সিংহাসন ছাড়িয়া সাধারণ ভাবে মজলিসের গালিচায় বসিলেন। হজরত রসুলুল্লাহ পবিত্র জীবনী এবং গুণাবলীর আলোচনার সময়ে গোলাপজল বর্ষণ এবং আতর বিতরণ করা হইল, ইহার পরে বড় বড় খালায় ভোজনসামগ্রী মিঠাই এবং হালুয়া সকলকে পরিবেশন। এই রাত্রির উৎসবে ফকিরদিগকে শাল ও ফরুজী দান করা হইয়াছিল; গরীব-দুঃখীদিগকে খয়রাতে খরচ হইয়াছিল মোট বিশ হাজার টাকা।

আকবরশাহী আমলের “তুলাদান” হিন্দু অল্পস্থান হইলেও অমঙ্গলের আশঙ্কায় সম্রাট শাহজাহান বৎসরে দুই বার সৌর ও চাত্র জন্মতিথিতে যথারীতি “তুলাদান” করিতেন। যে সমস্ত দ্রব্যের সহিত সম্রাটের ওজন হইত ঐগুলি আকবর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের পণ্ডিত এবং আলেমগণকে দান করিতেন। কখনও কখনও বা তুলাদানের দ্রব্য একটি ভাণ্ডারে জমা রাখিতেন এবং মুসলমান পূর্ব উপলক্ষ্যে সূফী-মোল্লা ইত্যাদিকে দান করিতেন।

শাহজাহানের রাজত্বকালে আকবরের উদারনীতি ক্রমশঃ সক্ষীর্ণ হইয়া আসিলেও বাহুদৃষ্টিতে উহা ধরা পড়ে নাই। দরবারে সংস্কৃত ও হিন্দী কবিগণ যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেন; হিন্দুদর্শন ও জ্যোতিষচর্চা হইত, সংস্কৃত পুস্তকের ফার্সী অনুবাদও হইত।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ শাহী দরবারে সর্কাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিত ছিলেন। আবদুল হামিদ লাহোরী লিখিয়া-

ছেন, জগন্নাথ ঐ যুগের “গ্রন্থকারগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়” (সরামদ্-ই মুসল্লিফান্) এবং শ্রেষ্ঠ গায়ক; কিন্তু তিনি কর্ণাটক ভাষায় গান করেন। লাহোরী কোন গ্রন্থের নাম না করিলেও সংস্কৃত কাব্যরসিকগণের নিকট জগন্নাথ-রচিত “রসগঙ্গাধর”, মল্লিনাথের টাকা, “মনোরমা”র “মনোরমা-কুচমর্দন”, “ভামিনী-বিনাস” প্রভৃতি গ্রন্থ সুপরিচিত। টলেমীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থের আরবী অনুবাদ “অল-মাজিষ্ট” নামক পুস্তক অবলম্বনে জগন্নাথ “সিদ্ধান্তসার-কৌস্তভ” এবং আর একখানা জ্যোতিষগ্রন্থ “সম্রাট-সিদ্ধান্ত” লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রশস্তিরচনা জগন্নাথ পণ্ডিতের আয়ের প্রশস্ত পথ ছিল, শাহজাহানের শুল্কর এবং প্রধানমন্ত্রী আসফ খাঁর নামে “আসফ-লহরী” লিখিয়াছেন, আরও অনেক “লহরী” হয়ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এমন এক “লহরী” উপহার লইয়াই জগন্নাথ “কলাবন্ত” ১০৪৪ হিজরীর ২২শে বরিউস-সানী তারিখে কাশ্মীরের পথে ভীষ্ম নামক স্থানে সম্রাটের সঞ্চর্দনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হইয়া বাদশা সমান ওজনের টাকা বক্শিশ দিলেন। জগন্নাথ পণ্ডিতের ওজন হইয়াছিল ৪৫০০ সিকা টাকা অর্থাৎ এক মণ সওয়া ঘোল সের; তাঁহার সৌভাগ্যের প্রতিস্পর্শী মোল্লা কবি কুদসী ওজনে এক হাজার তোলা বেশী। জগন্নাথকৃত এই লুপ্ত লহরীর একটি মাত্র শ্লোক মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে :

দিবীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথান পুরিত্ব সমর্থঃ।

অনৈভু পালৈঃ পরিদীয়মানঃ শাকায় স্থাং লবণায় স্থাং বা।

দরবারী ইতিহাসে জগন্নাথ পণ্ডিতকে পণ্ডিত বা কবি না বলিয়া কলাবন্ত বলা হইয়াছে। জগন্নাথ শাহানশার নামে গান রচনা করিয়াছিলেন, “লেকিন্ কর্ণাটক” ভাষায় (লাহোরী)। পাকা মুসলমান হইলেও শাহজাহান গান-বাজনার আওয়াজ শুনিলে কানে আঁদুল দিতেন না। সঙ্গীতে তাঁহার অহুরাগ আকবর হইতে ন্যূন ছিল না। দরবারে লাল খাঁ এবং তাঁহার দুই পুত্র খুশহাল এবং বিশ্রাম খাঁ ব্যতীত আর একজন গুণী ছিলেন দরাজ খাঁ। দরাজ খাঁ পুরস্কারস্বরূপ সমান ওজনে ৪৫০০ টাকা পাইয়াছিলেন (লাহোরী)।

শাহজাহান জগন্নাথকে প্রথমে কবি রায় এবং পরে মহাকবি রায় খেতাব দিয়াছিলেন। জগন্নাথ শাহজাদা দারার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি দারার জীবনী-মূলক এক মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, নাম ‘জগদাভরণম্’। আওরঙ্গজেবের রাজ্যারোহণের পর জগন্নাথ কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের আশ্রয়প্রার্থী হন। এখানে তিনি

উক্ত মহাকাব্যে দারার নামের স্থানে রাজার নাম বসাইয়া প্রাণাভরণম্ খাড়া করিয়াছিলেন। শেষবয়সে ভোগে বিভূষ হইয়া কবি রাজশেখরের ন্যায় পাপের বোঝা নামাইবার জন্য তিনিও বারাগসী “অশেষণ” করিয়াছিলেন।

শাহজাদা দারার সম্রাসীপুরু কবীজ্ঞাচার্য্য সরস্বতী ভারতের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মুখপাত্র রূপে তীর্থকর রহিত করিবার আবেদন লইয়া সম্রাটের দরবারে গিয়াছিলেন। আকবরের পর দ্বিতীয় বার সম্রাটের রূপায় তীর্থকর হইতে হিন্দুগণ রক্ষা পাইল। কবীজ্ঞাচার্য্য এই কৃতিত্বের জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের নিকট হইতেও অভিনন্দন লাভ করিয়াছিলেন। কবীজ্ঞাচার্য্য রচিত “কবীজ্ঞকল্পলতা” নামক হিন্দী কবিতায় শাহজাহানের স্তুতিগান করিয়াছেন। লাহোরী লিখিয়াছেন—১০৬২ হিজরীর ২রা জিলকাদ তারিখে কবিন্দর সম্রাটের সহিত (লাহোরে) দেখা করিয়া ১৫০০ টাকা ইনাম পান। উজীর-আজম আসফ খাঁর প্রচুর হিন্দুবিদ্বেষ থাকিলেও উহা সামরিক এবং রাজনীতির গুণী ছাড়াইয়া যায় নাই। তিনি এক দিন (১৪ই সেপ্টেম্বর ১৬২৯) সম্রাটের দরবারে ক্রিহতবাসী (দারবন্দ ও মুজাফর-পুর) দুই জন ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়র এবং কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া নিবেদন করিলেন। সভাস্থ পণ্ডিতগণ ইহাদের পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া দশ জন পণ্ডিত ক্রমাক্রমে মুখে মুখে রচিত এক একটি শ্লোক একবার মাত্র আবৃত্তি করিয়া গেলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ দুই জন ঠিক ঐ ক্রম-অনুসারে প্রত্যেক শ্লোক পুনরাবৃত্তি করিলেন, অধিকন্তু উঁহারা প্রত্যেকেই পণ্ডিতগণের দশটি শ্লোকের বিষয়বস্তুর উপর ঠিক ঐ সমস্ত শ্লোকের ছন্দে আরও দশটি পান্টা শ্লোক শুনাইয়া দেন। সম্রাট এই দুই জনকে খেলাত এবং নগদ এক হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দিলেন।*

মুলতান মামুদের মজলিশে নবাগত কবি ফিরদোসীকে সভাকবিগণ ইহা অপেক্ষা অল্পেই বেহাই দিয়াছিলেন।

৬

সম্রাট শাহজাহানের ত্রিশ বর্ষব্যাপী রাজত্বকালে মধ্য-যুগের ইতিহাসে ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলা, হিন্দুর প্রতিপত্তি এবং হিন্দী সাহিত্যের জোয়ার কানায় কানায় ভরিয়াছে—ভাটীর বিলম্ব নাই।

আকবর বাদশাহ মুখে-মুখে হিন্দী দোহা রচনা করিয়াছেন; শাহজাহান হাতেকলমে আওরঙ্গজেবের অবোধ্য

হিন্দী ভাষায় চিঠিপত্র লিখিতেন, কায়েতী হিসাব পরীক্ষা করিতেন। উদারচিত্ত শাহজাদা দারা আরও উর্দু উঠিয়াছিলেন, হাতের আংটিতে পবিত্র আরবী হরফে “আল্লাহ” খোদাই না করিয়া মোল্লাটা মুসলমানের চক্ষুশূল দেবনাগরী অক্ষরে “পরভূ” খোদাই করাইয়া ভারী অমঙ্গল ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন আল্লা অক্ষরাভীত; হিব্রু, আরবী, দেবনাগরী প্রভৃতি মাছুষের সৃষ্ট বর্ণমালা সবই তাঁহার অশরীরী দৃষ্টিতে এক সমান, ইতরবিশেষ নাই। একমাত্র আরবী খোদাতালার ভাষা, আদম-সন্তানকে কোন ভাষা না শিখাইলে আল্লার প্রিয়তম জবান আরবী আপনা হইতেই তাহার নিষ্পাপ জিহ্বায় আসিয়া পড়িবে—মোল্লাদের এই দাবি তাঁহার প্রতিপত্তি আকবর বৃংগা-মহলের নৃশংস পরীক্ষার দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। স্ততরাং আরবী অল-রৌব্ এবং হিন্দী পরভূর মধ্যে ধার্মিকের দৃষ্টিতে কোন প্রভেদ নাই; যিনি স্বয়ং নামরূপবজ্জিত তাঁহাকে যে-কোন নামে ডাকিলেই তিনি সাড়া দিয়া থাকেন। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব ইসলামে সনাতনপন্থী, তাঁহারা আল্লা ব্যতীত God, পরভূ কিংবা পরব্রহ্মকে আমল দেওয়ার পাত্র নহেন। স্নেহের দৌর্য্য-বশতঃ হাল ছাড়িয়া শাহজাহান পুত্র দারার শরিয়ৎ-বিরুদ্ধ ভাবের পাগলামি, শুজার শিয়া-প্রীতি, মোরাদের জাহেলী (ধর্মবিমুখতা) সবই সহ্য করিতেন। আওরঙ্গজেব “আল্লা-আল্লা” করিয়া স্বযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, পাইলেই খোদাতালার নামে প্রথমেই বেইমান দারার মাথা হাতে লইবেন।

সম্রাট শাহজাহানের দরবারে অনেক হিন্দী কবি রাজারুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তখন সুরদাস, তুলসীদাস ও কেশবদাসের যুগ অতীত হইয়াছে। বিহারীলালের প্রতিভা ফুটেনোমুখ, হিন্দী সাহিত্যের অগ্রগতির শ্রোতে ভাটা পড়ে নাই। সে যুগের হিন্দী সাহিত্যচার্য্যগণ দীর্ঘা করিয়াই যেম দরবারী হিন্দী কবিদিগকে বিশেষ আমল দেন নাই; ছুৎ করিয়া বলিয়াছেন :

হুয় হুয়, তুলসী সন্নী, উড়ুগণ কেশবদাস।

অব্ কৈ কবি খ্যাৎ সম, জঁহ উঁহ করে প্রকাশ।

অর্থাৎ, সুরদাস (কাব্যগগনের) সূর্য্য, তুলসীদাস চন্দ্রমাতুল্য, এবং কেশবদাস (সপ্তবিমণ্ডল); আজকালকার কবি জোনাকি পোকা, যেখানে-সেখানে বিকমিক করেন।

দরবারী ইতিহাসে দুই জন হিন্দী কবির নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আদ্রিসাত্ত্বিক স্তম্ভর-শঙ্কর কাব্য-প্রণেতা কবি স্তম্ভর সম্রাটের নিকট হইতে প্রথমে “কবিরায়” এবং পরে শ্রেষ্ঠ সম্মান “মহাকবি-রায়” উপাধি

পাইয়াছিলেন। আকবরী দরবারের হিন্দীকবি নরহরি মহাপাত্রের বংশজগণ মোগল দরবারে বংশানুক্রমে রাজকবি ছিলেন। নরহরি-পুত্র* কিংবা পৌত্র হরিনাথ ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের, ২০শে জানুয়ারি সম্রাটের নিকট হইতে একটি ঘোড়া, একটি হাতী এবং নগদ এক লক্ষ দায় (২৫০০ টাকা) পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য কিংবা রাজা ভোজের দরবারেও হাতী-ঘোড়া ইনাম কোন কবি পাইয়াছিলেন কিনা জনশ্রুতিতেও জানা যায় না। সম্রাট শাহজাহান স্বপাত্রের দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, হরিনাথ মহাপাত্র যখন ভারী ইনাম লইয়া দরবার হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভিক্ষাপ্রার্থনা করিয়া একটি দোহা মহাপাত্রকে শুনাইয়াছিল; তিনি এক লক্ষ দায় পথিমধ্যে দান করিয়া শূন্য হাতে ফিরিলেন, বাদশাহী হাতী ও ঘোড়ার কি গতি হইল জানা নাই।

শাহজাদা দারা হিন্দী ভাষার সমাদর করিতেন, স্বয়ং চর্চাও করিতেন। তাঁহার লিখিত দুইখানি হিন্দী পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির নাম দোহাস্তব সংগ্রহ এবং সারসংগ্রহ। দরবারের বাহিরে সামন্ত নৃপতি এবং মনসবদারগণ হিন্দী কবিগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, কয়েকজন মুসলমান হিন্দী কবিতা লিখিয়াছেন। মীরজা রাজা জয়সিংহ, মহারাজা যশোবন্ত সিংহ রাঠোর, যশোবন্তের নিকটাসিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভীমকর্ণা অমর্য্যপরাগণ রাও অমরসিংহ রাঠোরক কাব্যরসিক এবং হিন্দী কবিগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথমে ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ এবং চারণ ভাটের মুখে মুখে প্রচলিত পৃথীরাঙ্গ-রাসো মহাকাব্য সংগ্রহ এবং সঙ্কলিত করিয়াছিলেন (নাগরী প্রচারিণী সভা সংস্করণ)।

কবিতার গুণাগুণ অপেক্ষা কাব্যে স্ততি প্রশংসা এবং

* হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণের সমদামরিক ইতিহাসের সহিত পরিচয় আছে কিনা বলা যায় না। “মিশ্রবন্ধুবিনোদ” অনুসারে হরিনাথ নরহরির পুত্র; দুই পুরুষে প্রায় এক শত বৎসর পার হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। “কবিতা-কৌমুদী” সঙ্কলয়িতা শ্রীরামনরেন দ্বিপাঠী দোহা উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, লাখ টাকাটা কবি রাজা মানসিংহের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর হিন্দীপ্রেরণের কাছে দোহা, কিংবদন্তী আবদুল হামিদ লাহোরী অপেক্ষা অধিক নিঃসংযোগ।

+ অমরসিংহ নাগোরের রাও এবং উচ্চ মনসবদার ছিলেন। আগ্রা শহরে দারার প্রাসাদে সম্রাটের সম্মুখে একাধ দরবারে যীর বকসী সলাবৎ থাকে একটি অর্ধ উচ্চারিত শব্দের জন্য জমচাড়ের এক কোপে বিখণ্ডিত করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে এই রাঠোরশাহীদুল বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অমরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রী এবং মীরজা জয়সিংহের ভাগিনের সন্তান দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার হুসেমান শুকোয়া বিবাহ হইয়াছিল।

নামপ্রচারের আশা সম্রাটের বদান্যতার পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিত। ইহাই সেকালে এবং একালেও বড়লোকদের দানের রীতি, মাহুঘের স্বাভাবিক দুর্লভতাও বটে। নিজের এবং পূর্বপুরুষের সত্যমিথ্যা বশোগান নিত্য চারণের মুখে শুনিবার জন্যই রাজপুত আধিপেটা খাইয়া চারণকে আধা রুটি দিত। ইউনানী ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ জুলকরুনাইন ফিরিদী (আর্ম্যানী খ্রীষ্টান) সম্রাটের নামে এমন কিছু লিখিয়াছিলেন যাহার জন্য তিনি পাঁচ শতী মনসব পাইয়াছিলেন (লাহোরী)।

এইরূপ দানে এবং গুণগ্রাহিতায় সম্রাট জাতি ধর্ম কিংবা দেশ বিচার করিতেন না। ইহা আকবরশাহী আমলের ধারা।

দুনিয়া যেমন আজকাল একটা পোশাকী pose বা ঢঙে আসলকে চাপা দিয়া সোয়াস্তি লাভ, মতলব হাসিল কিংবা দেমাক জাহির করিয়া চলিয়াছে পূর্বে বিশেষতঃ মোগলাই আমলে খোদ বাদশাহ হইতে বাদুদার পর্য্যন্ত কেহই লোক-চক্ষুর সম্মুখে একটা পোজ বা চেহারা না করিয়া চলিত না। দরবারী ইতিহাসে এইজন্যই সে যুগের সহজ মাহুঘ বিচক্ষণ ঐতিহাসিকের নজরেও সহজে ধরা পড়ে না। আত্মজীবনী (তজুক) মধ্যে তবুও একটা পোজ; কিন্তু যে সমস্ত ইতিহাসের (যথা, আকবরনামা এবং বাদশাহনামা) প্রত্যেক পৃষ্ঠা আকবর কানে শুনিতেন কিংবা শাহজাহান নিজে পড়িয়া উহার উপর কলম চালাইতেন সেখানে আমরা উক্ত সম্রাটদ্বয়কে উভয় 'পোজে'ই দেখিতে পাই,— একটা ঐতিহাসিকের মনোবৃত্তির পোজ, অন্যটি মানব কিংবা মুসলমানস্বভাব সম্রাটের অহমিকার পোজ। শাহজাহানের দরবারী পোজ আরও জটিল; ইহার মধ্যে "আসল" তিনি আছেন এবং তদুপরি একটা গতাভুগতিক ইমাম মেহদী বা 'কব্বি অবতারের' পোজও রহিয়াছে।

বাদশাহনামা পড়িয়া মনে হয়, সম্রাট শাহজাহান ছিলেন প্রতাপে দোলেমান বাদশাহ, বুদ্ধিতে বজ্রগ মেহের, ত্রায় বিচার ও ইসলামের প্রতি অখণ্ড নিষ্ঠায় হজরত ওমর এবং কাকের নিধন ও মূর্তি-ধ্বংসে মামুদ গজনভী। লাহোরী কেবল মন্দির ধ্বংস ইত্যাদি হিন্দুধর্ম-নির্ধাতনের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুদের কাছে "পাথুরে প্রমাণ" রহিয়াছে—পশ্চিম ভারতে জৈন সম্প্রদায় শাহজাহানের

রাজত্বকালেই একাধিক মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গোকুলস্থ বল্লভাচার্য্য গৌসাইগণ আকবরের সময় হইতে শাহজাহানের রাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত গোকুলে গোবর্দ্ধন এবং সাহার পরগণায় বিশেষ অধিকার পুরুষাবৃত্তকমে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের কাছে যে সমস্ত বাদশাহী ফরমান ও নিশান (সরকারী চিঠি) আছে সেগুলি হইতে জানা যায় তাঁহাদের ভূমির উপর রাজস্ব ও অতিরিক্ত কর, মাঙ্গল ইত্যাদি মাপ ছিল, গোকুল গোবর্দ্ধনে অবাধ গোচারণের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, ময়ূর ও অন্যান্য প্রাণী শিকার মঠসমূহের সম্পত্তির এলাকায় নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।*

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই বাদশাহী শীলমোহর-যুক্ত এইরূপ দুইখানা ফরমান বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়কে দেওয়া হইয়াছিল; অথচ তিন বৎসর পরে মুর্শিদকুলী খাঁকে মথুরার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া শাহজাহান হুকুম দিলেন ঐ অঞ্চলে বিদ্রোহ এবং মূর্তিপূজা যেন কঠোর হস্তে দমন করা হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পরে দেখা যায় গৌসাইগণের অধিকার স্বীকার করিয়া শাহজাদা দারা ৪ খানা ও অন্য দুই জন স্থানীয় ফৌজদার সম্রাটের অনুমোদিত ২ খানা নিশান জারি করিয়াছিলেন।

এই পরস্পরবিরোধী অস্থির নীতির মূলমন্ত্র কোথায়? অজ্ঞাতসারে কোন দোটানা-স্রোতে না পড়িলে শাহজাহানের রাষ্ট্র ও ধর্মনীতি পালন ও দমন, মৃত-সহিষ্ণুতা ও নির্ধাতন-স্পৃহার মধ্যে ঘুরপাক খাইত না। মোগল সাম্রাজ্যে সম্রাটকে মধ্যবিন্দু করিয়া দারা এবং আওরঙ্গজেবের মধ্যে প্রথম হইতেই যেন একটা দড়িটানাটানি চলিয়াছিল; দারা মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বস্বত্তি এবং আওরঙ্গজেব উহার ভাবী নিয়তির অঙ্গুলি-সংকেত।

* দাতার নাম	সংখ্যা
সম্রাট আকবর	৪
হামিদা বানু (আকবরের মাতা)	১
খান-খানাম আবদুর রহিম (আকবরের সেনাপতি)	১
জাহাঙ্গীর	০
শাহজাহান (সম্রাট)	২
দারাসুকে	৪
মোয়াক্কামত খাঁ (শাহজাহানের কর্মচারী)	১
ইস্হাক খাঁ	১
আওরঙ্গজেব	০
প্রথম শাহ আলম	১
দীর্ঘা নজক খাঁ (দ্বিতীয় শাহ আলমের সেনাপতি)	১

উষ্টবা—Imperial Furmans by K. M. Jhaveri Bombay.

ভূরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

হাওড়া ও হুগলী জেলার ঐতিহাসিক উপকরণ যাহারা সংগ্রহ করিতে সামান্ত চেষ্টাও করিয়াছেন তাঁহারা ই বিলুপ্ত ভূরশুট রাজ্যের “বামন রাজা”র দেওয়া দানপত্রাদির কথা জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু অল্প পর্য্যন্ত এই রাজবংশের নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। কেবল কতকগুলি প্রবাদমাত্র কল্পনার আশ্রয়ে পরিবর্তিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে (৮বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যাকৃত “রায়-বাঘিনী” দ্রষ্টব্য) এবং তাহাই জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। মুসলমান আমলের পূর্বে “ভূরশুট” দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত একটি গ্রামমাত্র ছিল—এই গ্রামনিবাসী ভারতবিশ্রুত দার্শনিক কন্দলীকার শ্রীধরচাৰ্য্যের প্রামাণিক বিবরণ আমরা পূর্বে প্রকাশিত করিয়াছি (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ. ১১৪-১৬ : বঙ্গ নব্যজ্ঞানচর্চা, পৃ. ৬-৮)। শ্রীধরচাৰ্য্যের পৃষ্ঠপোষক কায়স্থ-রাজা পাণ্ডুরাম সমগ্র দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, তদন্তর্গত কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরই ছিলেন। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম কি ছিল জানিবার উপায় নাই—সম্ভবতঃ তাহার ভূরশুট নাম ছিল না। মুসলমান আমলে রাঢ় অঞ্চলে ভূরশুট একটি প্রসিদ্ধ এবং বৃহৎ “পরগণা” বা রাজ্যের নাম ছিল। আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়, সরকার সোলেমানাবাদের অন্তর্গত ৩১টি মহালের মধ্যে সর্কাপেক্ষা বেশী রাজস্ব ছিল “বসন্তরী” পরগণার। তৎপরেই ভূরশুট—রাজস্ব ১২৬৮৯০ (প্রায় বিশ লক্ষ) “দাম” (Ain-i-Akbari : II. p. 140 —ব্রহ্মদেব সাহেব মহালের নাম লিখিয়াছেন Bhosat। পাদটীকায় উদ্ধৃত পাঠান্তর Bhorsat যে বিতুদ, স্থানীয় অসুস্থতার অভাবে সাহেব তাহা ধরিতে পারেন নাই)। লক্ষ্য করা আবশ্যিক সরকার সাতগাঁও ও সরকার মাদারনে কোন পরগণার রাজস্ব এতদধিক ছিল না। প্রবাদ অনুসারে এই বৃহৎ পরগণার আদি জমিদার বাগ্‌দীরাজাকে পরাজিত করিয়া “চতুরানন মহানেউকী” (অর্থাৎ মহা-নিউগী) নামক একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরগণা দখল করিয়া-ছিলেন। এই নাম একটি কুলপঞ্জীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, বসন্তপুরের রাম চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে রক্ষিত কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় :—“শতানন্দ চতুরানন মহানেউকীর কণ্ঠা-গ্রহণে ভঙ্গ” (২৬২ পত্র)।^১ মহানিউগী উপাধি পাঠান

আমলে রাঢ়ীয় উচ্চপদের জ্ঞাপক—চতুরানন সম্ভবতঃ হুসেন শাহের রাজত্বের ঐ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাষ্ট্রাধিপতির আনুকূল্যে বৃহৎ ভূ-ভাগ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভূরশুটে এই ব্রাহ্মণ-রাজবংশের অধিকারকাল প্রায় ২০০ বৎসর। ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তির ফলে রাষ্ট্রাধিপতির আনুকূল্যে বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্র বলপূর্বক ভূরশুট রাজ্য দখল করিয়া ব্রাহ্মণ-রাজবংশের আধিপত্য ধ্বংস করেন। প্রামাণিক উপকরণ হইতে ইহার বিবরণ সঞ্চলিত হইল।

বর্ধমানাধিপতির হস্তে ভূরশুটরাজ্য ধ্বংসের একটি আনুষঙ্গিক ফল বঙ্গদেশের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল। অগ্রথা মহাকবি ভারতচন্দ্রকে আমরা পাইতাম না—রাজ্য-ভ্রষ্ট বালকের প্রতিভা-স্মৃতি এই পারিবারিক বিপর্যয় দ্বারাই নাশিত হইয়াছিল। নতুবা হয়ত ক্ষুদ্র রাজত্ব ভোগ করিয়াই তিনি পিতৃ-পিতামহের মত প্রায় বিস্মৃত হইয়াই থাকিতেন।

রাজা কৃষ্ণ রায়

ভারতচন্দ্র তাঁহার কুলপরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন :

হুসেন মুখটি নুসিংহের অংশ ভায় (পরিষৎ সং, পৃ. ৩৯৬)।

নুসিংহ প্রথম কুলীন উৎসাহ-পুত্র আহিতের প্রপৌত্র এবং চতুর্দশ সমীকরণের বিখ্যাত কুলীন (মহাবংশ, পৃ. ১৩)। নুসিংহ হইতে ভূরশুট রাজবংশের আদি রাজা পূর্বোক্ত ‘চতুরানন মহানিউগীর দৌহিত্র “কৃষ্ণ রায়” কয় পুরুষ অধস্তন তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ নানা মতের দ্বারা এতকাল সংশয়াকুল ছিল। সম্প্রতি কৃষ্ণ রায়ের কাল-নির্ণায়ক নবাবিকৃত প্রমাণ ও কুলগ্রন্থের সাহায্যে তাহার নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে। যে কয়টি কুলপঞ্জীতে ভূরশুট রাজ-বংশের নামমালা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সর্বত্র আদি-পুরুষের নাম লিখিত হইয়াছে “মদন ভট্টাচার্য্য”। ঢাকার একটি পুথিতে তাঁহাকে নুসিংহের পৌত্র স্বপ্রসিদ্ধ মুরারি ওরার অগ্রতম পুত্র বলিয়া ধরা হইয়াছে (মহাবংশ, পৃ. ৩৯) এবং পূর্বে আমরা এই মতটিকে প্রামাণিক মনে করিয়া-ছিলাম (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১২৩)। কিন্তু এই মদনের উপাধি ছিল ওরার, ভট্টাচার্য্য নহে (কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণী দ্রষ্টব্য) এবং তদনুসারে কৃষ্ণ রায়ের জন্ম-তারিখ

হয় প্রায় ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ—তাহা এখন প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইতেছে। প্রমাণটি বিবৃত হইল। ভূরশুট পরগণার বহুতর তায়দাদ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি—রাজা প্রতাপ-নারায়ণের পূর্বকালীন একটি মাত্র ভূমিদানের বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১২০২ সনের ২০ ফাল্গুন (= ১৮০৩ খ্রী.) সাদক মহামুদ দৌগর “সাং বোডহন” তাঁহাদের নিষ্কর সম্পত্তির বিবরণ দাখিল করেন (হুগলী কালেক্টরীর ৮৩৫৪ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে “খএয়াত ডাঙ্গা বাস্তবচী” মোজো বোডহন ৬/০ বিঘা তাঁহাদের পূর্বপুরুষ সেনা নৌলতকে দান করিয়াছিলেন “রাজা রায় কৃষ্ণ”—দান-পত্রের তারিখ পরিষ্কার লিখিত আছে “১২০০ সাল” (অর্থাৎ ১৫৮৩-৪ খ্রী.)। স্বতরাং রাজা কৃষ্ণ রায়ই সম্রাট আকবরের সময়ে ভূরশুট রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই প্রমাণপত্রের আবিষ্কার-ফলে রায় বাঘিনী প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত চিরস্মরণীয় নানাবিধ মনোহর প্রবাদ-কাহিনী সমস্তই আকাশকুসুমের পরিণত হইয়া গেল। কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতার পৌত্র রাজীবই ছিলেন কালাপাহাড়। কৃষ্ণ রায়ের পুত্র দেবনারায়ণ ১৩০৬ শকাব্দে মন্দির নির্মাণ করেন, প্রতাপ-নারায়ণের মাতা রায় বাঘিনী পাঠান আমলে বুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিয়াছিলেন ইত্যাদি সমস্তই কবি-কল্পনা, বাস্তব ঘটনা নহে। আমরা একাধিকবার লিখিয়াছি পারিবারিক ইতি-হাসের উপকরণ কুলগ্রন্থ ও তায়দাদ প্রভৃতি প্রমাণপত্র ব্যতীত কেবল মৌখিক প্রবাদ এবং কল্পিত বস্তু হইতে উদ্ধার করা সম্ভব নহে।

কৃষ্ণ রায়ের উর্দ্ধতন পুরুষের নামমালা ভূরশুটের অন্তর্গত বসন্তপুরের পুথিতে স্থানে স্থানে ক্রটিত। যথা, “গোপালের পুত্র—তৎপুত্র মদন ভট্টাচার্য্য তাঁহার পুত্র—তাঁহার পুত্রষষ্ঠ শতানন্দ বৈষ্ণবনাথ” ইত্যাদি।^২ ঢাকার পুথি অল্পসারে, মদন—কাকুশ—শ্রীহরি রায়—সদানন্দ—কৃষ্ণ রায় রাজাখ্যাতি (৩১৫২ পত্র, সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১২৩)। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথিতে দুই বকম লেখা আছে। মুরারি ওঝার পুত্র সৌরিন এক বুদ্ধপ্রপৌত্র চক্রপাণি—তৎপুত্র গোপাল তৎপুত্র মদন ভট্টাচার্য্য “ভূরশুট নিবাসিনঃ” (৪২৪২ পত্র)। অত্র আছে, সৌরি—গোপাল—বহুদানন্দ ভট্টাচার্য্য (মদন নহে)—শ্রীধর—সদানন্দ—শ্রীমন্তশ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি (৪২৬২ পত্র)। আমাদের নিকট রক্ষিত যশোহর জয়ন্তীপুরের পুথি

অল্পসারে, সৌরি—গোপাল (কিংবা গোপী) “ধর্ম্মাধিকারী”—মদন ভট্টাচার্য্য—শ্রীবরাচার্য্য—সতানন্দাচার্য্য—রাঘব (কেশবকো)—শ্রীমন্ত-জয়কৃষ্ণ-রায়কো (৮৩২, পত্র)। রাজসাহীর একটি পুথিতেও সৌরিপ্রকরণে “গোপাল স্বত মদন ভট্টাচার্য্য ভূরশুট নিবাসী” লিখিত আছে (৩১৪২ পত্র)। সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক, এক ঢাকার পুথি ভিন্ন সর্বত্র এই রাজবংশ ফুলিয়ার মুখবংশীয় সৌরিপ্রকরণের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং ক্রবানন্দের মতবিরুদ্ধ হইলেও তাহাই প্রামাণিক বলিয়া ধরিতে হইবে। মদনের বুদ্ধপ্রপৌত্র রাজা কৃষ্ণ রায় (এই অংশে ঢাকার পুথির নামমালা সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক) মহাকবি কুন্তিবাসের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ হইতেছেন—কারণ সৌরি ছিলেন কুন্তি-বাসের স্ম্যেষ্ঠতাত। কুন্তিবাসের জন্ম আমাদের মতে ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৬, পৃ. ৩০২) এবং সৌরির পুত্র গোপাল ধর্ম্মাধিকারীর জন্ম অল্পমান ১৩৫০ খ্রী. ধরা যায়। তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া কৃষ্ণ রায়ের জন্ম হয় ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ গোড়াধিপতি হুসেন শাহের রাজত্বকালে এবং তৎকালে কৃষ্ণ রায়ের মাতামহ চতুরানন ভূরশুট রাজ্যের নূতন অধিপতি। জয়ন্তীপুরের পুথি অল্পসারে গোপাল হইতে শতানন্দ পর্য্যন্ত সকলেই শাস্ত্র-ব্যবসায়ী উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন এবং এরূপ স্থলে এক পুরুষের গড়পড়তা ৩৫-৪০ বৎসর ধরা উচিত। তাহা হইলে কৃষ্ণ রায়ের জন্ম হয় শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এবং চতুরাননের অভ্যুদয়কাল শের শাহের রাজত্বকালে পড়ে।

রাজা প্রতাপনারায়ণ

এই রাজবংশের সর্বাপেক্ষা কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন “প্রতাপনারায়ণ”। ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীর আরম্ভে লিখিয়া-ছেন : ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যবাসী, নানাকাব্য অভিলাষী, যে বংশে প্রতাপনারায়ণ। (পরিষৎ সং, পৃ. ৩৯৯)। অথচ এই প্রতাপনারায়ণ ভারতচন্দ্রের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ ছিলেন না। প্রতাপনারায়ণের বহু পারিবারিক বিবরণাদি আমরা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১২৪-৯৮) এবং বহুতর নূতন তথ্য সম্প্রতিও আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। এই সকল সমৃদ্ধ উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা সারসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লিখিতেছি। (১) অধুনা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় প্রতাপনারায়ণ রাজা কৃষ্ণ রায়ের প্রপৌত্র ছিলেন। কিন্তু নামমালা দ্বিবিধ পাওয়া যাইতেছে—কৃষ্ণ-রায়ের পুত্র দর্পনারায়ণ, তৎপুত্র উদয়নারায়ণ, তৎপুত্র প্রতাপ (বসন্তপুরের পুথি)। অন্য মতে কৃষ্ণ রায়ের পুত্র রাজা দক্ষিণ রায়, তৎপুত্র উদয়নারায়ণ (জয়ন্তীপুরের পুথি,

২। এই পুথি আমরা ষয় পরীক্ষা করিতে পারি নাই। সূত্রধর শ্রীপঞ্চানন রায়ের গবেষণালব্ধ বস্তু তাঁহার সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিলাম।

৮৩-৪ পত্র)। শেষোক্ত মতের সমর্থন একটি পারিবারিক ঘটনায় পাওয়া যায়—সাগরদিয়া বন্দ্যবংশীয় দামোদরের এক বৃদ্ধ-প্রপৌত্র (কাশীনাথ ন্যায়বল্লভের পুত্র) বিমলানাথ 'রাজা দক্ষিণ রায়ে'র পৌত্রের নিকট কন্যা বিবাহ দিয়াছিলেন (পরিষদের উক্ত পুথি ২৭১২ পত্র)। বিক্রমপুর সিংপাড়ার একটি ঘটক-গ্রন্থে এই সম্বন্ধের স্পষ্ট বিবৃতি আছে "ভূরশ্ত দক্ষিণ রায় রাজার পৌত্রে উদয়নারায়ণস্বত"

(১৩৮১ পত্র)। সম্ভবতঃ স্বয়ং প্রতাপনারায়ণই এই গৌরবজনক বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ রায় ও প্রতাপনারায়ণের মধ্যে কালব্যবধান ৭০ বৎসর হইতেও কম। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ৮ পুরুষ কিংবা ৬ পুরুষ ব্যবধান হইতেই পারে না—রায় বাঘিনী ও ঢাকার পুথির লেখা ভ্রমাত্মক। (২) প্রতাপনারায়ণ বহু ভূমিদান করিয়াছিলেন—কয়েকটি দানপত্রের তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, ১০৫২ সাল ৩ জ্যৈষ্ঠ (= ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ) রাজা প্রতাপনারায়ণ বুড়ননিবাসী সাহা জাহের আলীর পূর্বপুরুষকে "লাখে রাজ নজর" দান করিয়াছিলেন (হুগলীর ৩২২৪ নং তায়দাদ)। আর একটি লাখে রাজ ১০৭৫ সনে প্রদত্ত হয় (ঐ, ১৩২২৪ নং)। "শ্রীযুত মহারাজা প্রতাপনারায়ণ ১০৭৭ সালে ৬ রেজা সখড্যাকে খয়রাত খানাবাটী দিয়াছিলেন (ঐ, ১৩৮৮৭ নং)। ১০৯১ সনে মোস্তা সৈদ মহিবুল্যাকে তিনি খএরাত দিয়াছিলেন (ঐ, ২৬৭৭৬ নং)।" সুতরাং রাজা প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকাল নানপক্ষে ৩৩ বৎসর (১৬৫২-৮৪ খ্রী:) ছিল। তিনি সম্রাট সাজাহান ও আওরঙ্গজেবের অধীন জমিদার ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার অধিকার মধ্যে ভূরশ্টি পরগণায় নবাব আমিরুল উমরা (অর্থাৎ শায়েস্তা খাঁ) ১০৯৪ হিজরী সনে (১৬৮৩ খ্রী:) মদদমাষ দান করিয়াছিলেন (ঐ, ২২২৩ নং)।

(৩) প্রতাপনারায়ণ দে যুগের একজন বিখ্যাত বিদ্বৎসেবী ছিলেন। তাঁহার অন্ততম সভাসদ সুবিখ্যাত বৈদ্যগ্রন্থকার ভরত মল্লিক তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। "চন্দ্রপ্রভা" (১৫২৭ শক) ও "রত্নপ্রভা" (প্রায় ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) গ্রন্থে ভরত মল্লিক আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন—

"ভূরশ্ঠমহীপালসভাপতিভিষকতঃ"

(চন্দ্রপ্রভা পৃ: ৩২, রত্নপ্রভা পৃ: ১৪)।

অতঃপাশ্বে লিখিয়াছেন,

ইতি প্রজাপতির-ধীরবীর "প্রতাপনারায়ণ"সংসদন্তঃ।

শ্রীকৃষ্ণানন্ত জগৎপ্রসিদ্ধাং বংশাবলীঃ শ্রীভরতো জগাদ।

(ঐ, পৃ: ২৭ ও ১১)

ভরত মল্লিকের গ্রন্থ রচনাকাল ঠিক প্রতাপনারায়ণের

রাজত্বকালেই পড়িতেছে। (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ: ১২৬: I. H. Q. XVIII pp 168-75)।

(৪) প্রতাপনারায়ণের একমাত্র পুত্রের নাম "শিবনারায়ণ" (বসন্তপুর ও ঢাকার পুথি)। তিনি বোধ হয় পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগমন করেন। সাগরদিয়া-বংশীয় বাণী শিকদারের এক প্রপৌত্র বিষ্ণুদেবের সম্বন্ধে লিখিত আছে, "ভূরশ্ঠ নিবাসিন: রাজা শিবনারায়ণস্বত কংবিভঙ্গ:" (কুলকল্লজম, বন্দ্যবংশ পৃ: ২২)। "শিবনারায়ণ রায় মহাশয়ের দত্ত" একটি মাত্র দানপত্রের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি—শিবঠাকুর, ৬সিংহবাহিনী ও বিশালাক্ষীর দেবোত্তর (৩১৫৫ নং তায়দাদ)। গড়-ভবানীপুরের মণিনাথজীর সেবায়েৎ মণিরায় গিরি গোস্বামী ১০১৩/০ দেবোত্তর পাইয়াছিলেন। আমাদের পরীক্ষিত মূল সনদের তারিখ ৫ বৈশাখ ১০৯২ সন—কিন্তু দাতার নাম নাই। শিবনারায়ণ হইলেও হইতে পারে। শিবনারায়ণের একমাত্র পুত্র রাজা নরনারায়ণের প্রদত্ত শতাধিক দানপত্র এবং পারিবারিক নানা সম্বন্ধের কথা অবগত হওয়া গিয়াছে—তাঁহার রাজত্বকাল ঠিক ১০৯২-১১১৮ সন মধ্যে। তাঁহার জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঠিক ১১১৯ সনে বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্র বলপূর্বক ভূরশ্ঠ পরগণা দখল করেন। তারিখটি আমরা গড়-ভবানীপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণমধ্যে আবিষ্কার করিয়াছি। ৪৮০৭৫ নং তায়দাদের "সনন্দর ইকীকত" হইতে একটি পঙ্ক্তি অবিকল উদ্ধৃত হইল:

"বর্দ্ধমানের জমিদারের সহিত সাবেক ব্রাহ্মণ জমিদারের সহিত লড়াই হয় ইহাতে গড়বাটী লুট হয় সনল পত্র: খোয়া গেছে-সন ১১১৯ সাল।"

অতঃপাশ্বে লিখিত আছে,

"...লড়াই হইয়া সাবেক জমিদারের জমিদারি বর্দ্ধমান চাকলা সামীল হয় তাহাতে শ্রীশ্রীদেবে বর্দ্ধমান লইয়া জাইয়া কথক দীন সেইখানে সেবা করিয়া পুনরায় সন (১১২৫) পচিশ শালে ঐ জমি এবং গড় বাড়ি শ্রীশ্রীজিউদীর্ঘে দীয়া স্থাপিত করিলেন।"

গড়-ভবানীপুরে অদ্যাপি গোপীনাথজীর দ্বিতল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিজ্ঞান আছে এবং উক্ত তায়দাদের একটি কন্দে দেবালয়ের কোতুকজনক একটি নক্সা অঙ্কিত আছে—তন্মধ্যে কোন দেবতা কোন কোঠায় প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা যথাযথ চিত্রাকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেবতাদের তালিকা এই—চতুর্ভূজ গণেশ; দ্বিভুজা ইন্দ্রাণী, দ্বিভুজা অভয়া, চতুর্ভূজা সিংহবাহিনী, দশভুজা, দ্বিভূজ ভৈরবী, চতুর্ভূজা ভুবনেশ্বরী, চতুর্ভূজা গজলক্ষ্মী। দ্বিতলে—গঙ্গাধর শিব, গোপাল, গোপীনাথ, দামোদর (চক্র), রাধিকা ও কাশীনাথ শিব। সমস্তই "৬মহারাজা

প্রতাপনারায়ণ ও ৬মহারাজা (নর) নারায়ণ রায় প্রকাশ করিয়া দেন।" এই সকল বিবরণ এখন কোথায় আছে অজ্ঞানসন্ধানযোগ্য।

রাজ্যহীন রাজবংশের পুরুবর্তী বিবরণ শোচনীয়। নরনারায়ণের দুই পুত্র ছিল—“রাজা” লছমীনারায়ণ ও হীরারাম রায়। কীর্তিচন্দ্রের পুত্র রাজা চিত্রসেন বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর লছমীনারায়ণকে দান করেন এবং বাঁশবাড়িয়ার রাজারা (গোবিন্দদেব, মনোহর ও মুকুন্দ) হীরারাম রায়কে বোরো পরগণায় মোট ৬১/০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর করিয়া দেন। হীরারাম সম্ভবতঃ ভূরশট ত্যাগ করিয়া বাঁশবাড়িয়া রাজাদের আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে লছমীনারায়ণের পুত্রেরা তাহা ভোগ করেন। লছমীনারায়ণের তিন পুত্র রাম-নারায়ণ, রূপনারায়ণ ও হরনারায়ণ গড়ভবানীপুর পরিত্যাগ করিয়া ভূরশটের অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন এবং ১২০২ সনে জীবিত থাকিয়া পরস্পর ‘কাজিয়াতে’ কাল ক্ষেপণ করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ কেহ কেহ অद्याপি তথায় বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদের প্রদত্ত সম্পত্তির বিবরণে (৩৬৬১৩ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য) ভূরশট রাজবংশের কীর্তিকলাপের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর মোট ভূমির পরিমাণ ১১৪৬½ কাঠা—তন্মধ্যে “ভবানীপুর ভদ্রাসন গড়বাটি আন্দাজী ২৫ তোষাখানার বাটি ৫ ছাওনাপুর আন্দাজী ৫১ রানিবারাজ ভদ্রাসন বাটি আন্দাজী ১২০০ রাজবলহাটি গড়বাটি ৭।” নানাস্থানে দীঘি পুষ্করিণীর মোট সংখ্যা ২৬। “দেবোত্তর—শ্রীশ্রী/সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী, মোজা রানিবারাজ আন্দাজি জমি ২০০ ৬রাজবলহাটি ঠাকুরাণী মোজাহায়ে রাজবলহাট...৫০০ ৬গোপীনাথ জীউ ভবানীপুর দী, গর আন্দাজী ১০০”=৮০০।

স্বপ্রাচীন রাঢ়দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিণতি সমগ্র বঙ্গদেশে আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং পাঠান মোগল আমলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ পরগণা বা রাজ্যের অধিপতিগণই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া এই সামাজিক আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মোগলরাষ্ট্রের পক্ষপুটে উপচিত বর্দ্ধমানরাজ একে একে এই সকল রাজ্য গ্রাস করিয়া হয়ত রাষ্ট্রীয়ভাবে রাঢ়দেশের সংহতি বিধান করিয়াছিল। কিন্তু রাঢ়দেশের ঐতিহাসিক উপকরণরাজি রাজবংশগুলির সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়াছে “রায়-বাগিনী” জাতীয় উপগ্রাস—নামটিও রাজপরিবারের সম্পর্কিত কি না সন্দেহ। বরদা পরগণার শ্রামস্বন্দরপুর

গ্রামে “শ্রীশ্রী/রায়-বাগিনী” ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিল (৬১৪০২ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)।

রাজবংশের অন্ত শাখা

প্রতাপনারায়ণের সময়ে সমগ্র ভূরশট রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ভবানীপুর শাখার দখলে ছিল, ১০/০ আনা অংশ পেড়ো-শাখার এবং ১০/০ আনা অংশ দোগাছীয়া শাখার। শেষোক্ত শাখা রাজা কৃষ্ণ রায়ের এক পুত্র মুকুট রায় হইতে উৎপন্ন (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ: ২০০)। মুকুট রায়ের পৌত্র “পরগণা ভূরশট কি দুই আনার সাবেক জমিদার ৬৭গত বজ্রত রায়” ৭ কার্তিক ১০৮৫ সনে (= ১৬৭৮ খ্রি:) ভূমিদান করিয়াছিলেন (৬৭২০ নং তায়দাদ)। অর্থাৎ তিনি প্রতাপনারায়ণের ভ্রাতৃসম্পর্কিত এবং সমকালীন ছিলেন। এই শাখার বহু বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। জগদ্বল্লভের পুত্র শিবচরণ রায়ের সময় রাজ্যের এই অংশও কীর্তি-চন্দ্র গ্রাস করিয়াছিলেন—পরে কীর্তিচন্দ্র স্বয়ংই শিবচরণের পুত্র ঘনশ্রাম ও বীরেশ্বর রায়কে ২৫৪/০ ছুঁমি দান করিয়া-ছিলেন (৪১৩৫০ নং তায়দাদ)।

“প” ভূরসীউ ১০/০ ছয় আনির সাবেক জমীদার ভগীরথ রায় চৌধুরী ব্রাহ্মণ জমীদার” ২০ কার্তিক ১০৬০ সনে (১৬৫৩ খ্রি:) রহমত খাঁকে লাখেরাজ দিয়াছিলেন (৩৯৬৭ নং তায়দাদ) তাহার আংশিক অবস্থানস্থল “পার রাধানগর”ই পাণ্ডুয়া (বা পাণ্ডুয়ার) নামান্তর বটে। প্রতাপনারায়ণের সমকালীন এই চৌধুরীর নাম বংশাবলীতে নাই। সম্ভবতঃ রাজা কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতা শ্রীমন্ত রায়ের প্রপৌত্র “ভূপতি রায়ের” নামই মুসলমান প্রজা ভুল করিয়া লিখিয়াছে। ভারতচন্দ্র ভূপতি রায়ের নাম নগৌরবে উল্লেখ করিয়াছেন:

ভরদাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ;

সদাভাবে হতকাংস ভূরশটে বসতি। (সন্তানারায়ণের ব্রতকথা)।

অজ্ঞান হই চতুরাননের দৌহিত্রঘন শ্রীমন্ত রায় ও রাজা কৃষ্ণ রায়ের সময় হইতেই ভূরশট রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হইয়া শ্রীমন্ত ১০/০ ও কৃষ্ণ রায় ১০/০ পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপনারায়ণ বোধ হয় এই ১০/০ আনা গ্রাস করিয়াছিলেন। কারণ ভূপতি রায়ের পুত্র সদাশিব প্রভৃতি কেহই ভূমি দান করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তাঁহারা অনেকেই রাজা নরনারায়ণের নিকট ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়াছেন। যথা নরনারায়ণ পাণ্ডুয়ার সদাশীব, নরেন্দ্র, চতুর্ভূজ ও দয়ারাম রায়কে ১৪৯৬৩ দান করেন (৩৩৪৩ নং তায়দাদ)—১২০২ সনে দখলকারদের মধ্যে (ভারতচন্দ্রের পুত্র) পরীক্ষিতের নাম আছে। পরীক্ষিত বোধ হয় মুলাঘোড় ছাড়িয়া

পৈতৃক ভিটিতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সদাশিব-নরেন্দ্র-চতুর্ভূজ তিন পুরুষের একসঙ্গে উল্লেখ লক্ষণীয়। নর-নরনারায়ণ ভারতচন্দ্রের অপর ভ্রাতা অজুর্ন রায়কেও ১১১৮ সালে ভূমি দান করেন (৩৬৪৪ নং তায়দাদ)। উক্ত রাজা নরেন্দ্র রায় ও চতুর্ভূজ রায়কে ১১০৯ ও ১১১২ সনে মোট ২৭৬।০ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন (৫১২৩০ নং তায়দাদ)। তন্নিম্ন চিত্রসেন প্রদত্ত ২৫

অগ্রহায়ণ ১১৫১ সনের সনন্দে ইহাদের সম্পত্তির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়—মূল সনন্দ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। ইহাতেও সদাশীব রায়, নরেন্দ্র রায়, চতুর্ভূজ রায় প্রভৃতির নাম আছে—বুঝা যায় প্রায় শত বৎসর বয়সে সদাশিব তখনও জীবিত ছিলেন। এই সকল প্রমাণপত্র হইতে ভারতচন্দ্রের পিতৃবিবরণে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

জন্মান্তর সঙ্গতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পরিচয় পাই তার,
এই পৃথিবীতে এসেছি গিয়েছি,
আমি যে অনেকবার।
সে তারার আলো এখনো রয়েছে,
যে তারকা গেছে ডুবে,
মৃগ নাই, মৃগনাভি গন্ধ—
এখনো যায় নি উবে।
কত জনমের আখির পরশ,
রয়েছে রূপের গায়,
প্রণয়ের গাঢ় আলিঙ্গন যে
দাগ রাখিয়াছে তায়।
চেনা চেনা লাগে দেখে—
মাণিক্য-হারে রয়েছে আমার
বুকের কস্ যে লেগে।

সকল শব্দ ভাষা ও কাকলী
সব স্বর, সব গীতি,
আমার জিহ্বা কণ্ঠ, তালুর
বহিভেদে পরিচিতি।
স্বরের মীড় যে কোন্ নীড়ে ডাকে
ভাবিয়া পাই না সীমা,
বিশ্বত প্রিয় কতই কণ্ঠ
দিল ওতে যথুবিয়া।
ভাল-লাগা সব বর্ণে গন্ধে
ভাল-লাগা সব গানে,
জন্মান্তর সৌন্দর্যের
অভিজ্ঞান যে আনে।
পাইনি অমর বর,
যুগের যুগের প্রেম শুধু মোরে,
করেছে জাতিস্মর।

স্পর্শে গন্ধে রসে কি আভাস,
কি যে ইঙ্গিত বয়,
প্রতি শৈলেতে রয়েছে আমার
শিলালিপি মনে হয়।
হেথাকার প্রেম-স্নেহ মমতায়
অক্ষুরন্তের চিনে,
আগন্তকেরা ধরাকে বেঁধেছে
অপরিশোধ্য স্থানে।
লয়ে যে বিপুল পণ্য এ মন
করে হেথা কারবার,
একটা জন্মে হিসাব-নিকাশ
চুকিতে পারে না তার।
তাই এই গতায়তি—
অপার্থিবের পরিবেশে করে
ধরাকে কান্তিমতী।

এসেছি গিয়েছি এটা ঠিক জানি
দিয়ে নিয়ে গেছি কি?
নিয়ে গেছি এর বেদনা—দিয়েছি
বুকের সামগ্রী।
রূপে অপরূপ ওই লাভ্য,
ওই যে আকর্ষণ—
ফিরিয়া আসিতে বার বার মোরে
করেছে নিমন্ত্রণ।
বিদায়ী নয়নে যেই রূপ ভাসে
যা ত্যজিতে ব্যথা বাজে,
ধরার কঠিন বন্ধন তাই
পুনরাগমন যাচে।
অমৃতের কণা বহি—
এসেছি গিয়েছি ধরার প্রেমকে
করিবারে কালজয়ী।

চিত্রচোর

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরদিন প্রভাতে প্রাতঃরাশের সময় লক্ষ্য করিলাম দাম্পত্য কলহ কেবল বাড়ীর উপরভলয় আবদ্ধ নাই, নীচের ভলয় নামিয়া আসিয়াছে। সত্যবতীর মুখ ভারী, ব্যোমকেশের অঙ্গে বক্সিম কঠিনতা। দাম্পত্য কলহ বোধ করি সন্ধিকালির মতই ছোঁয়াচে যোগ।

কি করিয়া দাম্পত্য কলহের উৎপত্তি হয়, কেমন করিয়া তাহার নিরস্তি হয়, এসব গুঢ় রহস্য কিছুই আমি না। কিন্তু জিনিষটা নুতন নয়, ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। ঋষি-জ্ঞানদের ভায় মহা বুদ্ধিমত্তার সহিত আরম্ভ হইয়া ইহা অচিরে প্রভাতের মেঘডগ্বরবৎ খুঁড়ে মিলাইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, অজিত, চল আজ সকালবেলা একটু বেরুনো যাক।

বলিলাম, বেশ চল। সত্যবতী তৈরি হয়ে নিক।

সত্যবতী বিরসমুখে বলিল, আমার বাড়ীতে কাজ আছে। সকাল বিকেল টো টো করে বেড়ালে চলে না।

ব্যোমকেশ উঠিয়া শালটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'আমরা দু'জনে যাব এই প্রভাবই আমি করেছিলাম। চল, মিছে বাড়ীতে বসে থেকে লাভ নেই।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের পায়ের দিকে একটা কটাকপাত করিয়া ভীকু স্বরে বলিল, 'যার রোগা শরীর তার মোজা পায়ের দিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত।' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি হাসি চাপিতে না পারিয়া বারান্দার সিঁদা দাঁড়াইলাম। কয়েক মিনিট পরে ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। তাহার ললাটে গভীর জ্রকুট, কিন্তু পায়ের মোজা।

রাস্তার বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের যে কোমল বিশেষ গন্তব্য স্থান আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। ভাবিয়া-ছিলাম হাওয়া বদলকারীর স্বাভাবিক পরিভ্রম-স্পৃহা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু কিছু দূর যাইবার পর একটা খালি রিক্সা দেখিয়া সে তাহাতে উঠিয়া বলিল। আমিও উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডেপুটি উষানাপ বাবুকা মোকাম চলো।'

রিক্সা চলিতে আরম্ভ করিলে আমি বলিলাম, 'হঠাৎ উষানাপ বাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তিনি বাড়ী থাকবেন। তাঁকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।'

আব.মাইল পথ চলিবার পর আমি বলিলাম, ব্যোমকেশ,

তুমি ছবি চুরির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ মনে হচ্ছে। সত্যি কি ওতে গুরুত্ব কিছু আছে?

সে বলিল, সেইটেই আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।

আরও আব.মাইল পথ উত্তীর্ণ হইয়া উষানাপ বাবুর বাড়ীতে পৌঁছান গেল। হাকিমপাড়ার বাড়ী, পাঁচিল দিয়া ঘেরা। ফটকের কাছে রিক্সাওয়ালাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমেই চমক লাগিল, বাড়ীর সদরে কয়েকজন পুলিশের লোক দাঁড়াইয়া আছে। তার পর দেখিলাম ডি-এস-পি পুরন্দর পাণ্ডের মোটরবাইক রহিয়াছে।

উষানাপ ও পাণ্ডে সদর বারান্দায় ছিলেন। আমাদের দেখিয়া পাণ্ডে সবিস্ময়ে বলিলেন, 'একি, আপনারা।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তাই বেড়াতে এসে-ছিলাম।'

উষানাপ হিমশীতল হাসিয়া বলিলেন, 'আনুন। কাল রাজে বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে?'

'তাই নাকি? কি চুরি গেছে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা এখনও জানা যায় নি। রাজে এঁরা দৌড়লার শোন, নীচে কেউ থাকে না। ঘর বন্ধ থাকে। কাল রাজে আপিস-ঘরে চোর ঢুকে আলমারি খোলবার চেষ্টা করেছিল। একটা পর-চাবি তালার চুকিয়েছিল, কিন্তু সেটা বের করতে পারে নি।'

'বটে। আলমারিতে কি ছিল?'

উষানাপ বাবু বলিলেন, 'সরকারী দলিলপত্র ছিল, আর আমার জীর পয়সার বাজ ছিল। গিলের আলমারি। লোহার সিন্দুক বলতে পারেন।'

উষানাপ বাবুর চোখে কালো চশমা, চোখ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তৎসঙ্গেও তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, তিনি ভয় পাইয়াছেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'তা হলে চোর কিছু নিয়ে যেতে পারে নি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা আলমারি না খোলা পর্যন্ত বোকা যাচ্ছে না। একটা চাবিওয়ালা তাকতে পাঠিয়েছি।'

'হ। চোর ঘরে ঢুকল কি করে?'

'কাঁচের জানালার একটা কাঁচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি ধুলেছে। আনুন না দেখবেন।'

উষানাপ বাবুর আপিস-ঘরে প্রবেশ করিলাম। মাঝারি আয়তনের ঘর, একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, গিলের আলমারি, দেওয়ালে ভারত-সন্ন্যাসীর ছবি—এ ছাড়া আর

কিছু নাই। ব্যোমকেশ কাঁচ-ভাঙা জামালা পরীক্ষা করিল; আলমারির চাবি ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চাবি ঘুরিল না। এই চাবিটি ছাড়া চোর নিজের আগমনের আর কোনও নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই। আপিস-ঘরের পাশেই ড্রিং রুম, যাক্ দরজা। আমরা সেখানে গিয়া বলিলাম। আলমারিটা খোলা না হওরা পর্য্যন্ত কিছু চুরি গিয়াছে কিনা জানা যাইবে না। উষানাথ বাবু চোরের প্রভাব করিলেন, আমরা স্বাধীন নাড়িয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম।

ড্রিং-রুমটি খালি ভাবে সাজান গোছান। এখানেও দেওয়ালে ভারত-সজ্জার ছবি। এক কোণে একটি রেডিও-যন্ত্র। চেয়ারগুলির পাশে ছোট ছোট নীচ টেবিল; তাহাদের কোনটার উপর পিভলের ফুলদানী, কোনটার উপর ছবির এল্বাম। দামী জিনিস কিছু নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, ‘চোর বোধ হয় এ ঘরে ঢোকে নি।’

উষানাথ বাবু বলিলেন, ‘এ ঘরে চুরি করবার মত কিছু নেই।’ বলিয়াই তিনি লাকাইয়া উঠিলেন। চোখের কাল চশমা কণেকের জন্য তুলিয়া কোণের রেডিও-যন্ত্রটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর চশমা নামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘আমার পরী! পরী কোথায় গেল।’

আমরা সম্বরে বলিলাম, ‘পরী।’

উষানাথ বাবু রেডিওর কাছে গিয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে বলিলেন, ‘একটা রূপোলী গিল্টি-করা ছোট পরী—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী আশাকে উপহার দিয়েছিলেন—সেটা রেডিওর ওপর রাখা থাকত। নিশ্চয় চোরে নিয়ে গেছে।’ আমরাও উঠিয়া গিয়া দেখিলাম। রেডিও-যন্ত্রের উপর আগুলির মত একটা স্থান সম্পূর্ণ ধুসিশূন্য। পরী ঐ স্থানে অবস্থান করিবেম সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, চোরে হয়ত মের নি। আপনার ছেলে খেলা করবার জন্য নিয়ে থাকতে পারে। একবার খোঁজ করে দেখুন না।

উষানাথ বাবু ক-কখন করিয়া বলিলেন, ‘খোঁজা সভ্য ছেলে, সে কখনও কোনও জিনিসে হাত দেয় না। যাহোক; আমি খোঁজ দিচ্ছি।’

তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ পাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করিল, কাউকে সন্দেহ করেন নাকি?

পাণ্ডে বলিলেন, ‘সন্দেহ—না, সে রকম কিছু নয়। তবে একটা আরদালি বলছে, কাল রাজি আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় একটা পাগলাটে পোলের লোক ডেপুটি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ডেপুটি বাবু দেখা করেন নি, আরদালি বাইরে থেকেই ভাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। আরদালি লোকটার যে-রকম বর্ণনা দিলে—তাতে শু মনে হয়—’

‘কালুদী পাল?’

‘হাঁ। একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি।’

উষানাথ বাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া জানাইলেন তাহার স্ত্রী-পুত্র পরীর কোনও ধবরই রাখেন না। নিশ্চয় চোর আর কিছু না পাইয়া রৌপ্যভমে পরীকে লইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ক-কুঁচকাইয়া বলিয়া দিল, মুখ তুলিয়া বলিল, ‘ভাল কথা, সেই ছবিটা আছে কিনা দেখেছিলেন কি?’

‘কোন ছবি?’

‘সেই যে একটা গ্রুপ-ফটোর কথা মহীধরবাবুর বাড়ীতে হয়েছিল।’

‘ও—না, দেখা হয় নি। ঐ যে আপনার পাশে এল্বাম রয়েছে, দেখুন না ওতেই আছে।’

ব্যোমকেশ এল্বাম লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাতে উষানাথবাবুর পিতা-মাতা, ভাই ডাগিনী, স্ত্রীপুত্র সকলের ছবি আছে, এমন কি মহীধরবাবু ও রজনীর ছবিও আছে, কেবল উদ্ভিষ্ট গ্রুপ-ফটোখানি নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, ‘কৈ দেখছি না তো?’

‘নেই।’ উষানাথবাবু উঠিয়া আসিয়া নিজে এল্বাম দেখিলেন, কিন্তু কটো পাওয়া পেল না। তিনি তখন বলিলেন, ‘কি জানি কোথায় গেল। কিন্তু এটা এমন কিছু দামী জিনিস নয়। আলমারি থেকে যদি দলিলপত্র কিংবা গরমার বাজ চুরি গিয়ে থাকে।’

ব্যোমকেশ গাজোখান করিয়া বলিল, ‘আপনি চিন্তা করবেন না, চোর কিছুই চুরি করতে পারে নি। গরমার বাজ নিরাপদে আছে, এমন কি আপনার পরীও একটু বুজলেই পাওয়া যাবে। আজ তা হলে আমরা উঠি। মিষ্টার পাণ্ডে, চোরের যদি সন্ধান পান আশাকে বঞ্চিত করবেন না।’

পাণ্ডে হাসিয়া স্বাক্ষর নাড়িলেন। আমরা বাহিরে আসিলাম; উষানাথবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ব্যোমকেশ উষানাথবাবুকে ইসারা করিয়া বারান্দার এক কোণে লইয়া গিয়া চুপিচুপি কিছুক্ষণ কথা বলিল। তার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ‘চল।’

রিক্সাওয়ালার অপেক্ষা করিতেছিল; আমরা ফিরিয়া চলিলাম। ব্যোমকেশ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তার পর এক সময় বলিল, ‘অজিত, উষানাথবাবু এক সময় চোখের চশমা তুলেছিলেন, তখন কিছু লক্ষ্য করেছিলেন?’

‘কৈ না। কি লক্ষ্য করব?’

‘উষানাথবাবুর বাঁ চোখটা পাথরের।’

‘ভাই নাকি? কালো চশমার এই অর্থ?’

‘হাঁ। বছর তিনেক আগে তাঁর চোখের ভেতরে কঁোড়া হয়, অজ্ঞ করে চোখটা বাদ দিতে হয়েছিল। তাঁর সর্কদা ভয় সাহেবেরা জানতে পারলেই তাঁর চাকরি যাবে।’

‘আচ্ছা ভীতু লোক তো। এই কথাই বুঝি আড়ালে গিয়ে হচ্ছিল?’

‘হ্যাঁ।’

এই তথ্যের গুরুত্ব কতখানি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। উধানাথবাবু যদি কানা-ই হন তাহাতে পৃথিবীর কি ক্ষতিবৃদ্ধি?

রিজা ক্রমে বাড়ীর নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ বলিল, ‘অজিত, যাবার সময় তুমি প্রশ্ন করেছিলে, ছবি চূরির ব্যাপার গুরুত্ব কি না। সে প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়া যেতে পারে। ব্যাপার গুরুত্ব।’

‘সত্যি? কি করে বুঝলে?’

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল।

৬

অপরাত্নে আমরা মহীশরবাবুর বাড়ীতে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। সত্যবতী বলিল, ‘ঠাকুরপো, টর্চ নিয়ে যেও। ফিরতে রাত করবে নিশ্চয়।’

আমি টর্চ পকেটে লইয়া বলিলাম, ‘তুমি এবেলাও তা হলে বেরুচ্ছ না?’

সত্যবতী বলিল, ‘না। ওপরতলার একটা মাহুস অহুস হয়ে পড়ে আছে, কথা কইবার লোক নেই। তার কাছে হুঁদও বসে ছোটো কথা কইলেও তার মনটা ভাল থাকবে।’

বলিলাম, ‘মালতী দেবীর প্রতি ভোমার সহানুভূতি যে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে।’

‘কেন বাড়বে না? নিশ্চয় বাড়বে।’

‘আর রজনীর প্রতি সহানুভূতি বোধ করি সেই অনুপাতে কমে যাচ্ছে?’

‘যোটেই না, একটুও কমে নি। রজনীর দোষ কি। বত নষ্টের গোড়া এই পুরুষ জাতটা।’

তর্জন করিয়া বলিলাম, ‘দেব, জাত তুলে কথা বললে ভাল হবে না বলছি।’

সত্যবতী নাক সিটকাইয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

মহীশরবাবুর বাড়ীতে যখন পৌঁছিলাম তখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু বাগানের মধ্যে ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে। খোলা ফটকে লোক নাই। রাস্তাও বোধ হয় ফটক খোলা থাকে, কিংবা গন্ধ-ছাপলের গতিরোধ করিবার জন্ত আগত লাগানো থাকে। মাহুসের স্বাভাব্যতা বাধা নাই।

বাড়ীর সদর দরজা খোলা; কিন্তু বাড়ীতে কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। দুই-তিন বার হেঁসা-ধরনিবৎ গলা খাঁকারি দিবার পর একটু বুরুগোছের চাকর বাহির হইয়া আসিল। বলিল, ‘কর্তাবাবু ওপরে শুয়ে আছেন। দিদিমণি বাগানে বেড়াচ্ছেন। আপনারা বহুন, আমি ডেকে আনি।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘দরকার নেই। আমরাই দেখছি।’ বাগানে নাহিয়া ব্যোমকেশ বাগানের একটা কোণ লক্ষ্য করিয়া চলিল। গাছপালা ঝোপকাড়ে বেশীদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় না, কিন্তু খালে ঢাকা গভীর পথগুলি মাকড়সার জালের মত চারিদিকে বিভূত হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম ব্যোমকেশ কান্ডনী পালের আশানার সন্ধানে চলিয়াছে।

বাগানের কোণে আসিয়া পৌঁছিলাম। একটা মাটির ঘর, মাথার চালির ছাউনি; সম্ভবতঃ মালীদের যন্ত্রপাতি রাখিবার স্থান। পাশেই একটা প্রকাণ্ড ইঁদারা।

ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অন্ধকার। আমি টর্চের আলো ভিতরে ফেলিলাম। অন্ধকারে বড়ের বিছানার উপর কেহ শুইয়া ছিল, আলো পড়িতেই উঠিয়া বাহিরে আসিল। দেখিলাম কান্ডনী পাল।

আজ কান্ডনীর মন ভাল নয়, কণ্ঠস্বরে ঔদাসীত-ভরা অস্তিম্যান। আমাদের দেখিয়া বলিল, ‘আপনারাও কি পুলিশের লোক, আমার ঘর খানাতল্লাস করতে এসেছেন? আশ্বন—দেখুন, প্রাণ তরে খানাতল্লাস করুন। কিছু পাবেন না। আমি গরীব বটে, কিন্তু চোর নই।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আমরা খানাতল্লাস করতে আসি নি। আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞাস করতে চাই। কাল রাত্রে আপনি উধানাথবাবুর বাড়ীতে কেন গিয়েছিলেন?’

কান্ডনী ভিজুয়রে বলিল, ‘তার একটা ছবি এঁকেছিলাম, তাই দেখাতে গিয়েছিলাম। দারোহান দেখা করতে গিয়ে ‘না, ভাড়িয়ে গিয়ে। বেশ কথা, ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য পুলিশ লেলিয়ে দেবার কি দরকার?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘তারি অন্যায়। আমি পুলিশকে বলে দেব, তারা আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।’

‘বন্যবাদ’ বলিয়া কান্ডনী আবার কোটরে প্রবেশ করিল। আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

দিনের আলো প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা বাগানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু রজনীকে দেখিতে পাইলাম না।

বাগানের অন্য প্রান্তে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড় দিয়া একটা উচ্চ ক্রীড়াশৈল রচিত হইয়াছিল; তাহাকে ঘিরিয়া সবুজ ঝাওলার বহনী। ক্রীড়াশৈলটি আকারে চারকোণা, দেখিতে অনেকটা পিরামিডের মত। আমরা তাহার পাশ দিয়া ঘাইতে ঘাইতে ধমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পিরামিডের অপর পার হইতে আবেগোত্তর কণ্ঠস্বর কানে আসিল, ‘ছবি ছবি ছবি। কি হবে ছবি। চাই না ছবি।’

‘আন্তে। কে শুনতে পাবে।’

কণ্ঠস্বর দুইটি পরিচিত; প্রথমটি ডাক্তার ঘটকের, দ্বিতীয়টি রজনীর। ডাক্তার ঘটককে আমরা শান্ত সংযতবাক্ মাহুস

বলিয়াই জানি, তাহার কণ্ঠ হইতে যে এমন আর্ন্ত উগ্রতা বাহির হইতে পারে তাহা কল্পনা করাও হৃৎকর। রজনীর কণ্ঠধরেও একটা শক্তি নীংকার আছে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক নয়।

ডাক্তার ঘটক আবার যখন কথা কহিল তখন তাহার স্বর অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু আবেগের উদ্ভাসনা কিছুমাত্র কমে নাই। সে বলিল, ‘আমি তোমাকে চাই—তোমাকে। হৃৎকের বদলে জল খেয়ে মাতৃস্থ বাঁচতে পারি না।’

রজনী বলিল, ‘আর আমি। আমি কি চাই না? কিন্তু উপায় যে নেই।’

ডাক্তার বলিল, ‘উপায় আছে, তোমাকে বলেছি।’

রজনী বলিল, ‘কিন্তু বাবা—’

ডাক্তার বলিল, ‘তুমি নাবালিকা নও। তোমার বাবা তোমাকে আটকাতে পারেন না।’

রজনী বলিল, ‘তা জানি। কিন্তু—। শোন, লক্ষ্মীটি শোন, বাবার শরীর ধারাপ যাচ্ছে, তিনি সেয়ে উঠুন—তার পর—’

ডাক্তার বলিল, ‘না। আজই আমি জানতে চাই তুমি রাজী আছ কিনা।’

একটু নীরবতা। তার পর রজনী বলিল, ‘আচ্ছা, আজই বলব, কিন্তু এখন নয়। আমাকে একটু সময় দাও। আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তুমি এস, আমি এখানে থাকবে; তখন কথা হবে। এখন হয়তো বাড়ীতে কেউ এসেছে, আমাকে না দেখলে—’

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে আমার হাত বরিয়া টানিয়া লইল।

হৃৎকনে পা টিপিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, হঠাৎ চোখে পড়িল পিরামিডের অল্প পাশ হইতে আর একটা লোক আমাদেরই মত সম্ভরণে দূরে চলিয়া যাইতেছে। এক বার মনে হইল বুঝি ডাক্তার ঘটক, কিন্তু ভাল করিয়া চিনিবার আগেই লোকটি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পিরামিড হইতে অনেকখানি দূরিত্ব দূরে আলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘চল, বাড়ী ফেরা যাক। আজ আর দেখা করে কাজ মেই।’

রাভার বাহির হইলাম। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; আকাশে চন্দ্র নাই, পথের পাশে কেরোসিনের আলোগুলি দূরে দূরে মিটমিট করিয়া আলিতেছে। আমি মাঝে মাঝে উর্জ আলিয়া পথ নির্ণয় করিতে করিতে চলিলাম।

ব্যোমকেশ চিন্তার মগ্ন হইয়া আছে। দুইটি বিজোহোমুখ যুবক-যুবতীর মিশ্রিত কোন্ কুটিল পথে চলিয়াছে—বোধ করি তাহাই নির্ধারণের চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহার ধ্যানভঙ্গ করিলাম না।

বাড়ীর কাছাকাছি পৌছিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রেরণ করিল, ‘অল্প লোকটিকে চিনতে পারলে?’

বলিলাম, ‘না। কে তিনি?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘তিনি হচ্ছেন আমাদের গৃহস্থানী অধ্যাপক আদিমাধ সোম।’

‘তাই নাকি। ব্যোমকেশ, ব্যাপারটা আমার পক্ষে কিছু জটিল হয়ে উঠছে। ছবি চুরি, পত্রী চুরি, শেখাখোর চিত্রকর, কান্না-হাকিম, অশ্লীল প্রেরণ, অধ্যাপকের আড়িপাতা—কিছু বুঝতে পারছি না।’

‘না পারবারই কথা। রবীন্দ্রনাথের গান মনে আছে—‘জড়িয়ে গেছে সন্ধ্যা মোটা হুটা ভারে, জীবন-বীণা টিক পুরে তাই বাজে না রে?’—আমিও সন্ধ্যা-মোটা ভারের জট ছাড়াতে পারছি না।’

‘আচ্ছা, এই যে ডাক্তার আর রজনীর ব্যাপার, এতে আমাদের কিছু করা উচিত নয় কি?’

ব্যোমকেশ দৃঢ়স্বরে বলিল, ‘কিছু না। আমরা ফিকেট খেলার দর্শক, ছাড়াভালি দিতে পারি, ছুরো দিতে পারি; কিন্তু খেলার ঘাটে নেমে খেলার বাগড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে ঘোর বেয়াদপি।’

বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম সত্যবতী একাকিনী বসিয়া পশমের গেঞ্জি বুনিতেছে। বলিলাম, ‘তোমার রুগ্নের খবর কি?’

সত্যবতী উত্তর দিল না, সেলাইয়ের উপর বুকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কি মুখে কথা? নেই যে। মালতী দেবীকে দেখতে গিয়েছিলে তো?’

‘গিয়েছিলাম’—সত্যবতী মুখ তুলিল না, কিন্তু তাহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ অদূরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল, হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া নিজের শরনকক্ষে প্রবেশ করিল। সত্যবতী সূচীবিন্দবৎ চমকিয়া উঠিল, শরনকক্ষের দ্বারের দিকে একটা ক্রুদ্ধ কুটাক্রপাত করিল, তার পর আবার সম্মুখে বুকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া বলিলাম, ‘কি ব্যাপার বলে বল দেখি।’

‘কিছু না। চা খাবে তো? জল চড়াতে বলে এসেছি। দেখি’—বলিয়া সে উঠিবার উপক্রম করিল।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, ‘আহা কি হয়েছে আগে বল না। চা পরে হবে।’

সত্যবতী তখন আবেগভরে বলিয়া উঠিল, ‘কি আবার হবে, ঐ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমাতৃঘটার কাছে আমার যাওয়াই ভুল হয়েছিল। এমন পচা দোংরা মন—আমাকে বলে কিনা—কিন্তু সে আমি বলতে পারব না। যার অনন মন তার মুখে হুড়ো খেলে দিতে হয়।’

শয়নকক্ষ হইতে আর এক রমক হাতির আওয়াজ আসিল। সভ্যবতী চলিয়া গেল। ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। রাগে আমার মুখও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সন্ধি-মনা জীলোকের সন্দেহ পাড়পাড়ী বিচার করে না জানি, কিন্তু সভ্যবতীকে যে জীলোক এরূপ পক্ষি দোষারোপ করিতে পারে, তাহাকে গুলি করিয়া মারা উচিত। ব্যোম-কেশ হাঙ্গর, আমার গা রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

রাজে শয়ন করিতে গিয়া ঘুম আসিল না; সারাদিনের নানা ঘটনার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে। খড়িতে দেবীলাস দশটা; ডিসেম্বর মাসে রাজি দশটা এখানে গভীর রাজি। ব্যোমকেশ ও সভ্যবতী অনেকক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিছানার তইয়া ঘুম না আসিলে আমার সিগারেটের পিপাসা জাগিয়া ওঠে, সুতরাং শয্যাভ্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। গায়ে আলোয়ান দিয়া সিগারেট ধরাইলাম। কিন্তু বহু ঘরে ঘুমপান করিলে ঘরের বাতাস ধোঁয়ার দূষিত হইয়া উঠিবে; আমি একটা জানালা ঈষৎ খুলিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম।

জানালাটা সদরের দিকে। সামনে ফটক, তাহার পর-পারে রাস্তা, রাস্তার ধারে মিউনিসিপ্যালিটির আলোকস্তম্ভ; আলোকস্তম্ভ না বলিয়া ধুমস্তম্ভ বলিলেই ভাল হয়। প্রদীপের তৈল শেষ হইয়া আসিতেছে।

মিনিট দুই তিন জানালায় কাছে দাঁড়াইয়া আছি, বাহিরে একটা অস্পষ্ট ধস্ ধস্ শব্দে চকিত হইয়া উঠিলাম। কে ঘেন বারান্দা হইতে নামিতেছে। জানালায় ফাঁক দিয়া দেবীলাস একটা হায়ারুজি ফটক পার হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আলোকস্তম্ভের পাশ দিয়া রাইবার সময় তাহাকে চিনিতে পারিলাম—কালো কোট-প্যাণ্ট-পর্য্যাপ্ত গোম।

বিহ্বাৎ চমকের মত বুঝিতে পারিলাম এত রাজে তিনি কোথায় যাইতেছেন। আজ রাজি সাড়ে দশটার সময় মহী-ধর বাবুর বাগানে ডাক্তার ফটক এবং রজনীর মিলিত হইবার কথা; সন্ধ্য-স্থলে সোম অনাহুত উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু কেন? কি তাহার অভিপ্রায়?

বিশ্রমবিষ্ট হইয়া মনে মনে এই কথা ভাবিতেছি, সহসা অধিক বিষয়ের কারণ ঘটিল। আবার ধস্ ধস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবার বাহির হইয়া আসিলেন মালতী দেবী। তাহাকে চিনিতে কষ্ট হইল না। একটা চাপা কাশির শব্দ; তার পর সোম যে পথে গিয়াছিলেন তিনিও সেই পথে অদৃষ্ট হইয়া গেলেন।

পরিস্থিতি স্পষ্টই বোঝা গেল। স্বামী অভিযানে যাইতে-ছেন, আর স্ত্রী অসুস্থ শরীর লইয়া এই শীতকালের রাজে তাহার পশ্চাৎগমন করিয়াছেন। বোধ হয়, স্বামীকে হাতে হাতে বলিতে চান। উঃ, কি দুর্ভাগ্য ইহাদের জীবন। প্রেমহীন

স্বামী এবং বিখ্যাতহীন পত্নীর দাম্পত্য জীবন কি ভয়ঙ্কর। এর চেয়ে ডাইভোর্স ভাল।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমার কিছু করা উচিত কিনা তাবিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশকে জাগাইয়া সংবাদটা দিব? না, কাজ মাই, সে ঘুমাইতেছে ঘুমাৎ। বরং আমার ঘুম ঘোরপ চট্রা গিয়াছে, হু'বটার মধ্যে আসিবে খুলিয়া মনে হয় না। সুতরাং আমিই জানালায় কাছে বলিয়া পাহারা দিব। দেখা-যাক কোথাকার জল কোথায় পড়ায়।

আবার সিগারেট ধরাইলাম।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। দীপস্তম্ভের আলো ধোঁয়ার দম বহু হইয়া মরিয়া গেল।

একটি মূর্তি ফটক দিয়া প্রবেশ করিল। মকদ্দমের আলোয় মালতী দেবীর ভারী মোটা চেহারা চিনিতে পারিলাম। তিনি পদশব্দ গোপনের চেষ্টা করিলেন না। তাহার কণ্ঠ হইতে একটা অবরুদ্ধ আওয়াজ বাহির হইল, তাহা চাপা কাশি কিংবা চাপা কান্না বুঝিতে পারিলাম না। তিনি উপরে চলিয়া গেলেন।

এত শীঘ্র শ্রীমতী কিরিয়া আসিলেন, কিন্তু শ্রীমানের দেখা নাই। অনুমান করিলাম, শ্রীমতী বেশী দূর স্বামীকে অনুসরণ করিতে পারেন মাই, অন্ধকারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তার পর এদিক ওদিক নিফল অন্বেষণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

সোম ফিরিলেন সাড়ে এগারটার সময়। বাহুড়ের মত নিঃশব্দ সন্ধারে বাড়ীর মধ্যে মিলাইয়া গেলেন।

৭

সকালে ব্যোমকেশকে রাজির ঘটনা বলিলাম। সে চুপ করিয়া শুনিল, কোনও মন্তব্য করিল না।

একজন কনেটবল একটা চিঠি দিয়া গেল। ডি-এস-পি পাণ্ডের চিঠি, আগের দিন সন্ধ্যা ছটার তারিখ। চিঠিতে মাজ কয়েক ছত্র লেখা ছিল—

প্রিয় ব্যোমকেশ বাবু,

ডেপুটি সাহেবের আলমারি খুলিয়া দেখা গেল কিছু ছুরি যায় নাই। আপনি বলিয়াছিলেন পরীক্ষা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, কিন্তু পরী এখনও নিরুদ্দেশ। চোরেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তাই লিখিলাম। ইতি

গুরুদাস পাণ্ডে

ব্যোমকেশ চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া বলিল, পাণ্ডে লোকট সত্যিকার সন্ধান।

এই সময় যিনি সবসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার। মহীধর বাবুর পার্টির পর রাত্তার নকুলেশ বাবুর সহিত হু'একবার দেখা হইয়াছিল।

ভিনি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, এদিক দিবে যাছিলাম তাবলাম খবরটা দিবে যাই। শোমেন নি নিশ্চয়ই? কান্ডনী পাল—সেই যে ছবি আঁকত—সে মহীধর বাবুর বাগানে কুয়োয় ডুবে মরেছে।

কিছুক্ষণ শুভিত হইয়া রহিলাম। তার পর ব্যোমকেশ বলিল, কখন এ ব্যাপার হ'ল?

মকুলেশ বলিলেন, বোধ হয় কাল রাত্তিরে, ঠিক জানি না। মাতাল-দাঁতাল লোক, অন্ধকারে ভাল সামলাতে পারে নি, পড়েছে কুয়োয়। আজ সকালে আমি মহীধর বাবুর খবর নিতে গিয়েছিলাম, দেখি মালীরা কুয়ো থেকে লাশ তুলছে।

আমরা নীরবে পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাছিলাম। কাল রাতে মহীধরবাবুর বাগানে বহু বিচিত্র ব্যাপার ঘটয়াছে।

আচ্ছা আজ তা হলে উঠি; আমাকে আবার ক্যামেরা নিয়ে কিরে যেতে হবে—। বলিয়া মকুলেশ বাবু উঠিবার উপক্রম করিলেন।

বহুন বহুন, চা খেয়ে যান।

মকুলেশ চায়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, বসিলেন। অচিয়াং চা আসিয়া পড়িল। হু'চার কথার পর ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, সেই গ্রুপ ফটোর মেগেটিক্সানা বুঝেছিলেন কি?

কোন মেগেটিক্স। ও—হ্যাঁ, অনেক বুঝেছি মশাই, পাওয়া গেল না।—আমার লোকসানের বরাত; থাকলে আরও পাঁচখানা বিক্রী হ'ত।

আচ্ছা, সেই ফটোতে কে কে ছিল বলুন দেখি?

কে কে ছিল? পিকনিকে গিয়েছিলাম বহু—আমি, মহীধর বাবু, তাঁর মেয়ে রজনী, ডাক্তার ঘটক, সঙ্গীক প্রফেসর সোম, সপরিবারে ডেপুটি উষমানাথ বাবু আর ব্যাক্সের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। সকলেই ফটোতে ছিলেন। ফটোখানা ভারি উৎরে গিয়েছিল—গ্রুপ ফটো অত ভাল বড় একটা হয় না। আচ্ছা, চলি তা হলে। আর এক দিন আসব।

মকুলেশবাবু প্রস্থান করিলেন। হু'জমে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কান্ডনীর কথা ভাবিয়া মনটা ভারী হইয়া উঠিল। সে মেশাধোর লক্ষ্মীছাড়া ছিল, কিন্তু ভগবান তাহাকে প্রতিভা দিয়াছিলেন। এমনভাবে অপবাদ যত্নই যদি তার মিস্তি, তবে তাহাকে প্রতিভা দিবার কি প্রয়োজন ছিল?

ব্যোমকেশ একটা মিঃথাস কেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'এ সম্ভাবনা আমার মনেই আসে নি। চল, বেরুনো যাক।'

'কোথায় যাবে?'

'ব্যাকে যাব। কিছু টাকা বের করতে হবে।'

এখানে আসিয়া স্থানীয় ব্যাকে কিছু টাকা জমা রাখা

হইয়াছিল, সংসার-খরচের প্রয়োজন অনুসারে বাহির করা হইত।

আমরা সদর বায়ালার বাহির হইয়াছি, দেখিলাম অধ্যাপক সোম ডেসিং পাউন পরিহিত অবস্থায় নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মুখে উদ্বিগ্ন গাভীর্ষ্য। ব্যোমকেশ যাবুলি সম্ভাষণ করিল, 'কি খবর?'

সোম বলিলেন, 'খবর ভাল নয়। জ্বর অসুখ বুঝেছে। বোধ হয় মিউমোনিয়া। জ্বর বেড়েছে; মাঝে মাঝে ভুল বকছেন মনে হ'ল।'

আশ্চর্য নয়। কাল রাতে সন্দির উপর ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। কিন্তু সোম বোধ হয় তাহা জানেন না। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে খবর দিয়েছেন?'

ডাক্তার ঘটকের নামে সোমের মুখ অন্ধকার হইল। তিনি বলিলেন, 'ঘটককে ডাকব না। আমি অত ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কেন? ডাক্তার ঘটকের ওপর কি আপনার বিশ্বাস নেই? আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন কিন্তু আপনি ঘটককেই সুপারিশ করেছিলেন।'

সোম গুষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন। ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'সে যাক। এই মাত্র খবর পেলাম কান্ডনী পাল কাল রাতে মহীধরবাবুর কুয়োয় ডুবে মারা গেছে।'

সোম বিশেষ গুৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, 'তাই নাকি! হয়তো আত্মহত্যা করেছে। আর্টিষ্টরা এতটুকু অব্যবস্থিতি হইত—'

ব্যোমকেশ বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করিল, 'প্রফেসর সোম, কাল রাত্রি এগারোটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

সোম চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ পাংশু হইয়া গেল। তিনি অলিভবরে বলিলেন, 'আমি—আমি—! কে বললে আমি কোথায় গিয়েছিলাম?—আমি তো—'

হাড তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মিছে কথা বলে লাভ নেই। প্রফেসর সোম, আপনার জ্বর যে আচ্ছ এত বাড়ি-বাড়ি হয়েছে তার জেডে আপনি দায়ী। তিনি কাল আপনার পেছনে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। এই রোগে যদি তাঁর মৃত্যু হয়—'

ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া সোম বলিলেন, 'আমার জী—ব্যোমকেশবাবু, বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না—'

ব্যোমকেশ গুর্জনী তুলিয়া ভয়ঙ্কর গভীর স্বরে বলিল, 'কিন্তু আমরা জানি। আমি আপনার শুভাকাজ্জী, তাই সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনি সাবধানে থাকবেন। এম জিজ্ঞাস্য।'

সোম স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। রাত্তার কিছু দূর গিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘সোমকে খুব ভয় পাইয়ে দিবেছি।’ তার পর বড়ি দেখিয়া বলিল, ‘ব্যাক খুলতে এখনও দেহি আছে। চল, ডাক্তার ঘটকের ভিস্‌পেন্সারিতে একবার চুঁ মেরে যাই।’

বাঙ্কায়ের দিকে ডাক্তারের ঔষধালয়। সবে পুলিশাছে। আমরা ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করিতে যাইব, তুলিলাম সে এক জনকে বলিতেছে, ‘দেখুন, আপনার ছেলের টাইকনেড হয়েছে, লম্বা কেস, সারাতো সময় লাগবে। আমি এখন লম্বা কেস হাতে নিতে পারব না। আপনি বরং জীঘরবাবুর কাছে যান—তিনি প্রবীণ ডাক্তার—’

আমরা প্রবেশ করিলাম, অত লোকটি চলিয়া গেল। ডাক্তার সামনে আমাদের অভ্যর্থনা করিল। বলিল, ‘আমুন আমুন। রোগী যখন সশরীরে ডাক্তারের বাড়ীতে আসে তখন বুঝতে হবে রোগ সেরেছে। মহীধরবাবু সেদিন আমাকে ঘোড়ার ডাক্তার বলেছিলেন। এখন আপনিই বলুন, আমি মাহুষের ডাক্তার কিংবা আপনি ঘোড়া।’—বলিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিল। ডাক্তারের মন আজ ভারি প্রফুল্ল; চোখে আনন্দের জ্যোতি।

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, ‘আপনি মাহুষের ডাক্তার এই কথা স্বীকার করে নেওয়াই আমার পক্ষে সম্মানজনক। মহীধরবাবু কেমন আছেন?’

ডাক্তার বলিল, ‘অনেকটা ভাল। প্রায় সেরে উঠেছেন।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘ফান্‌সী পাল মারা গেছে শুনেছেন কি?’

ডাক্তার চকিত হইয়া বলিল, ‘সেই চিত্রকর! কি হয়েছিল তার?’

‘কিছু হয় নি। কাল রাতে জলে ডুবে মারা গেছে—’
ব্যোমকেশ যতটুকু জানিত সংক্ষেপে বলিল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ বিম্বা হইয়া রহিল, তার পর বলিল, ‘আমার যাওয়া উচিত। মহীধরবাবুর হুর্দল শরীর—। যাই, এক বার চট করে ঘুরে আসি।’—ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ সহসা জিজ্ঞাসা করিল, ‘আপনি কলকাতা যাচ্ছেন কবে?’

ডাক্তারের মুখের ভাব সহসা পরিবর্তিত হইল; সে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ব্যোমকেশের চোখের মধ্যে চাহিয়া বলিল, ‘আমি কলকাতা যাছি কে বললে আপনাকে?’

ব্যোমকেশ কেবল মুহূর্ত হাসিল। ডাক্তার শুধন বলিল, ‘হ্যাঁ, শিগগিরই একবার যাবার ইচ্ছে আছে। আচ্ছা চললাম। যদি সময় পাই ওবেলা আপনাদের বাড়ীতে যাব।’

ডাক্তার ফুজ মোটরে চড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা ব্যাকের দিকে চলিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, ডাক্তার

কলকাতা যাচ্ছে কামলে কি করে? তুমি কি আজকাল অন্তর্ধামী হয়েছ নাকি?

ব্যোমকেশ বলিল, না। কিন্তু একজন ডাক্তার যখন বলে লম্বা কেস হাতে নেব না, অত ডাক্তারের কাছে যাও, তখন আন্দাজ করা যেতে পারে যে সে বাইরে যাবে।

কিন্তু কলকাতায়ই বাবে তার নিশ্চয়তা কি?

ওটা ডাক্তারের প্রফুল্লতা থেকে অনুমান করলাম।

ডাক্তারের ঔষধালয় হইতে অনতিদূরে ব্যাক। আমরা গিয়া দেখিলাম ব্যাকের ঘর পুলিশাছে। ঘরের দুই পাশে বন্দুক-কিরিচ-বারী দুই জন সাক্ষী পাহারা দিতেছে।

বড় একটা ঘর দুই ভাগে বিভক্ত, মাঝে কাঠ ও কাঁচের অমুচ বেড়া। বেড়ার গায়ে সারি সারি জানালা। এই জানালা দিয়া জমলাধারণের সঙ্গে ব্যাকের কর্মচারীদের লেন-দেন হইয়া থাকে।

ব্যোমকেশ একটা জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া চেক্‌ লিখিতেছে, দেখিলাম বেড়ার ভিতর দিকে ম্যানেজার অমরেশ রাহা দাঁড়াইয়া একজন কেরানীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। অমরেশ বাবুও আমাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি শ্রিত-মুখে বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, ‘নমস্কার। ভাগ্যে আপনাদের দেখে ফেললাম, নইলে ত টাকা নিয়েই চলে যেতেন।’

অমরেশ বাবুকে চায়ের পার্টির পর আর দেখি নাই। তিনি সেজন্ত লজ্জিত; ফ্রেঞ্চ-কাঠ বাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, ‘রোজই মনে করি আপনাদের বাড়ীতে যাব, কিন্তু একটা না একটা কাজ পড়ে যায়। ব্যাকের চাকরি মানে অষ্ট প্রহরের গোলামি।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘এমন গোলামিতে সুখ আছে। হরদম টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।’

অমরেশ বাবু করুণ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, ‘সুখ আর কৈ ব্যোমকেশ বাবু। চিনির বলদ চিনির বোকা বয়ে মরে, কিন্তু দিনের শেষে যায় সেই হাস জল।’

ব্যোমকেশ চেকের বদলে টাকা পকেটস্থ করিলে অমরেশ বাবু বলিলেন, ‘চলুন, আজ যখন পেরেছি আপনাকে সহজে ছাড়ব না। আমার আপিস-ঘরে বসে ধানিক পল্ল-পল্ল করা যাক। আপনার প্রতিভার যে পরিচয় অভিজ্ঞ বাবুর লেখা থেকে পাওয়া যায়, তাতে আপনাকে পেলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আমাদের দেশে প্রতিভাবান মাহুষের বড়ই অভাব।’

ভয়লোক শুধু যে ব্যোমকেশের প্রতি প্রজ্ঞাশীল ভাবাই নয়, সাহিত্য-রসিকও বটে। সেদিন তাঁহার মুহূর্তে অধিক আলাপ করি নাই বলিয়া অমুচও হইলাম।

ভিনি আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার একটি নিজস্ব আপিস-ঘর আছে, তাহার দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া ভিনি বলিলেন, ‘না, এখানে নয়। চলুন, ওপরে যাই। এখানে গও-গোল, কাকের হড়োহড়ি। ওপরে বেশ নিরিবিলা হবে।’

আপিস-ঘরের দরজা খোলা ছিল; ভিতরে দুটি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, মানুষি টেবিল চেয়ার খাড়াপড়া, কয়েকটা বড় বড় লোহার সিন্দুক ছাড়া আর কিছু নাই।

কাছেই সিঁড়ি। উপরে উঠিতে উঠিতে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, ‘ওপরতলাটা বুঝি আপনার কোয়ার্টার?’

‘হাঁ। ব্যাকের ও সুবিধে, আমারও সুবিধে।’

‘জী-পুত্র পরিবার সব এখানেই থাকেন?’

‘জীপুত্র পরিবার আমার নেই ব্যোমকেশ বাবু। ভগবান স্মৃতি দিয়েছিলেন, বিয়ে করি নি। একলা মানুষ; তাই তজ্ঞ-ভাবে চলে যায়। বিয়ে করলে হাঁড়ির হাল হ’ত।’

উপরতলাটি একজন লোকের পক্ষে বেশ সুপরিসর। তিন চারিটি ঘর, সামনে উদ্বুদ্ধ ছাদ। অমরেশ বাবু আমাদের বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। অমরেশ্বর পরিচ্ছন্ন ঘর; দেওয়ালে ছবি নাই, মেঝের গালিচা নাই। এক পাশে একটি ছাফিম-ঢাকা চৌকি, দুই-তিনটি আরাম-কেদারা, একটি বইয়ের আলমারি। নিতান্তই মানুষি ব্যাপার, কিন্তু বেশ তৃপ্তিদায়ক। গৃহস্বামী যে পোছালো স্বভাবের লোক তাহা বোকা যায়।

‘বহুদ, চা তৈরি করতে বলি।’ বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

বইয়ের আলমারিটা আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, উঠিয়া গিয়া বইগুলি দেখিলাম। অধিকাংশ বই গল্প উপভাস, চলচ্চিত্র আছে, সঙ্গীতা আছে। আমার রচিত ব্যোমকেশের উপভাসগুলিও আছে দেখিয়া প্রস্তুত হইলাম।

ব্যোমকেশও আসিয়া ছুটিল। সে একথানা বই টানিয়া লইয়া পাশা ধুলিল; দেখিলাম বইখানা বাংলা-ভাষার নয়, তারতবর্ষেরই অল্প কোমণ্ড প্রদেশের লিপি। অনেকটা হিন্দীর মন্তন, কিন্তু ঠিক হিন্দী নয়।

এই সময় অমরেশ বাবু ফিরিয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, ‘আপনি গুজরাটি ভাষাও জানেন?’

অমরেশ বাবু মুখে চট্কার শব্দ করিয়া বলিলেন, ‘জানি আর কৈ? এক সময় শেখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ও আমার দ্বারা হ’ল না। বাঙালীর ছেলে মাড়ভাষা শিখতেই গলদবর্ষ হয়, তার ওপর ইংরেজী আছে। উপরন্তু যদি একটা তৃতীয় ভাষা শিখতে হয় তাহলে আর বাঙালীর শক্তিতে কুলোর না। অথচ শিখতে পারলে আমার উপকার হ’ত। ব্যাকের কাছে গুজরাটি ভাষা জানা থাকলে অনেক সুবিধা হয়।’

আমরা আবার আসিয়া বসিলাম। দুই-চারিটা একথা লেকচার পর ব্যোমকেশ বলিল, ‘কান্ডনী পাল মারা গেছে শুনেছেন বোধ হয়?’

অমরেশ বাবু চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন। ‘জ্যা। কান্ডনী পাল মারা গেছে। সে কি! কবে—কোথায়—কি করে মারা গেল?’

ব্যোমকেশ কান্ডনীর যুত্যা-বিবরণ বলিল। শুনিয়া অমরেশ বাবু হুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ‘আহা বেচারী! বড় দুঃখে পড়েছিল। কাল আমার কাছে এসেছিল।’

এবার আমাদের বিমিত হইবার পালা। ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, ‘কাল এসেছিল? কখন?’

অমরেশ বাবু বলিলেন, ‘সকালবেলা। কাল রবিবার ছিল, ব্যাক বন্ধ; তবে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে বসেছি, কান্ডনী এসে হাজির। আমার ছবি একেছে তাই দেখাতে এসেছিল—’

‘ও—’

চাকর তিন পেয়ালা চা দিয়া গেল। ভকমা-আঁটা চাকর, বুঝিলাম ব্যাকের পিওন; অবসরকালে বাড়ীর কাজও করে। তাবগতিক দেখিয়া মনে হইল অমরেশবাবু টাকা-পয়সার ব্যাপারে বিলক্ষণ হিসাবী।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালার চামচ ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, ‘ছবিখানা কিমলেন নাকি?’

অমরেশবাবু বিমর্ষ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, ‘কিনতে হ’ল। পাঁচ টাকা দিতে গেলাম কিছুতেই নিলে না, দশ টাকা আদায় করে ছাড়ল। এমন জানলে—’

ব্যোমকেশ চারে একটা চুমুক দিয়া বলিল, ‘যত চিত্র-করের শেষ ছবি। দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।’

‘দেখুন না। ভালই একেছে বোধ হয়। আমি অবশ্য ছবির কিছু বুঝি না—’

বইয়ের আলমারির নীচের দেয়াড় হইতে একখণ্ড পুরু চতুর্ভুজ কাগজ আনিয়া ভিনি আমাদের সম্মুখে ধরিলেন।

কান্ডনী ভাল ছবি আঁকিয়াছে; অমরেশবাবুর বিশেষত্ব-হীন চেহারাও উজ্জ্বল হইয়া ফুটয়া উঠিয়াছে। ব্যোমকেশ চিত্রবিভার একজন জহরী, সে জু কুঞ্চিত করিয়া ছবিটি দেখিতে লাগিল।

অমরেশবাবু আগে বেশ প্রকুরমুখে কথাবার্তা বলিতে-ছিলেন, কিন্তু কান্ডনীর যুত্যাংবাদ শুনিবার পর কেমন যেন মুখড়াইয়া পড়িয়াছেন। প্রায় নীরবেই চা-পান শেষ হইল। পেয়ালা রাখিয়া অমরেশবাবু ভিমিত স্বরে বলিলেন, ‘কান্ডনীর কথা মনে পড়ল, সেদিন চায়ের পার্টিতে শুনেছিলাম পিকনিকের ফটোখানা চুরি গেছে। মনে আছে? তার কোমণ্ড হাদিস পাওয়া গেল কিনা কে জানে।’

ব্যোমকেশ মগ্ন হইয়া ছবি দেখিতেছিল, উত্তর দিল না।
আমিও কিছু বলা উচিত কিনা বুঝিতে না পারিয়া বোকার
মত অমরেশবাবুর পানে চাহিলাম। অমরেশবাবু তখন
নিজের বলিলেন, 'সামান্য ব্যাপার, তাই ও নিয়ে বোর হয়
কেউ মাথা বাহার নি।'

ব্যোমকেশ ছবি নামাইয়া রাখিয়া একটা মিঃখাগ ফেলিল,
'চমৎকার ছবি।' লোকটা যদি বেঁচে থাকত, আমিও ওকে
দিয়ে ছবি আঁকিয়ে দিতাম। অমরেশবাবু, ছবিখানা যত্ন
করে রাখিবেন। আজ ফাল্গুনী পালের নাম কেউ জানে না,
কিন্তু এক দিন আসবে যেদিন ওর আঁকা ছবি সোনার মরে
বিক্রী হবে।'

অমরেশবাবু একটু প্রকৃত হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি।
তা হলে দশটা টাকা জলে পড়ে নি? ছবিটা বাঁধিয়ে
দেয়ালে টাঙানো চলবে?'

'নিশ্চয়।'

অতঃপর আমরা গাজোখান করিলাম। অমরেশবাবু
বলিলেন, 'আবার দেখা হবে। বহর শেষ হতে চলল,
আমাকে আবার সববর্ষের ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে হেড
আপিসের কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। এবার
সববর্ষে দু'দিন ছুটি।'

'দু'দিন ছুটি কেন?'

'এবার একজিমে ডিসেম্বর রবিবার পড়েছে। শনিবার
যদি অর্ধেক দিন ধরেন, তা হলে আড়াই দিন ছুটি পাওয়া
যাবে। আপনারা এখনও কিছুদিন আছেন তো?'

'হ্যাঁ জাহ্নবীর পর্যন্ত আজি বোর হয়।'

'আচ্ছা নমস্কার।'

আমরা বাহির হইলাম। ব্যাকের ভিতর দিয়া নামিতে
হইল না, বাড়ীর পিছনদিকে একটা খিড়কি-সিঁড়ি ছিল সেই
পথে নামিয়া রাস্তায় আসিলাম। বাজারের মধ্য দিয়া
যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সিগারেট ফুরাইয়াছে।
বলিলাম, 'এস, এক টন সিগারেট কিনতে হবে।'

ব্যোমকেশ অত্যন্তমগ্ন ছিল, চমকিয়া উঠিল। বলিল,
'আরে তাই তো। আমাকেও একটা জিমে কিনতে হবে।'

একটা বড় মগিহারীর দোকানে ঢুকিলাম। আমি এক দিকে
সিগারেট কিনিতে গেলাম, ব্যোমকেশ অল্প দিকে গেল। আমি
সিগারেট কিনিতে কিনিতে আড়চোখে দেখিলাম ব্যোমকেশ
একটা দামী এসেলের শিশি কিনিয়া পকেটে পুহিল।

মনে মনে হাসিলাম। ইহারা কেন যে ঝগড়া করে,
কেনই বা ভাব করে কিছু বুঝি না। দাম্পত্য-জীবন আমার
কাছে একটা হাস্যকর প্রহেলিকা।

সেদিন দুপুরবেলা আহালাদির পর একটু বিশ্রাম করিবার

কর্ত্ত বিছানায় লম্বা হইয়াছিলাম, ঘুম ভাঙিয়া দেখি বেলা
সাড়ে তিনটা।

ব্যোমকেশের ঘর হইতে ঘুর ফুরানার শব্দ আসিতেছিল,
উঁকি মারিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়া আছে
এবং সত্যবতী তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাতে তাহার
গলা জড়াইয়া কানে কানে কি সব বলিতেছে। হৃৎকেন্দ্র
মুগ্ধেই হাসি।

গরিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, 'ওহে কপোত-কপোতী,
তোমাদের কুজন-গুজন শেষ হতে যদি দেরি থাকে তা হলে
না হয় আমিই চায়ের ব্যবস্থা করি।'

সত্যবতী সলজ্জভাবে মুখের ঝানকটা আঁচলের আড়াল
দিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং রান্নাঘরের দিকে চলিয়া
গেল। ঝানক পরে ব্যোমকেশ অলস্ত সিগারেট ঘাতে ধোয়া
ছাড়িতে ছাড়িতে বাহির হইল। অবাক হইয়া বলিলাম,
'ব্যাপার কি। ইঞ্জিনের মত ধোয়া ছাড়ছে যে।'

ব্যোমকেশ এক গাল হাসিয়া বলিল, 'পার্মিশান পেয়ে
গেছি। আজ থেকে যত ইচ্ছে।'

বুঝিলাম, দাম্পত্য-জীবনে কেবল প্রেম থাকিলেই চলে না,
কুটুম্বিক্তিও প্রয়োজন।

চা পান করিয়া উপরতলায় রোগিণীর সংবাদ লইতে
গেলাম। সামাজিক কর্তব্য পালন না করিলে নয়।

অধ্যাপক সোমের যুগ চিন্তাজ্ঞাত। মালতী দেবীর
অবস্থা খুবই খারাপ, তবে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার মত
নয়। হুটা ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অক্সিজেন দেওয়া
হইতেছে। অর পুং বেনী, রোগিণী মাঝে মাঝে ভুল বকিতে
ছেন। একজন নার্সকে সেবার জন্ত নিয়োগ করা হইয়াছে।

স্বপ্নাত সলিল। সহানুভূতি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

নীচে নামিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বটক
আসিল। এবেলা ডাক্তারের ভাবভঙ্গী অল্প প্রকার। একটু
সতর্ক, একটু সন্নিগ, একটু অন্তঃপ্রবীষ্ট। ব্যোমকেশের পানে
মাঝে মাঝে এমন ভাবে ডাকাইতেছে যেন ব্যোমকেশ সম্বন্ধে
তাহার মনে কোনও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

কথাবার্তা সাধারণ ভাবেই হইল। ডাক্তার সকালে
মহীঘর বাবুর বাড়ীতে গিয়া ফাল্গুনীর লাস দেখিয়াছিল সেই
কথা বলিল। ব্যোমকেশ বিজ্ঞাণা করিল, 'কি দেখলেন?
যত্নের কারণ জানা গেল?'

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'অটপ্তি না হওয়া
পর্যন্ত ছোর করে কিছু বলা যার না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভব, আপনি ডাক্তার, আপনি কি
কিছুই বুঝতে পারলেন না?'

ইতস্ততঃ করিয়া ডাক্তার বলিল, 'না।'

ব্যোমকেশ তখন বলিল, ‘ও কথা থাক। মহীধর বাবু কেমন আছেন? কাল বিকেলে আমরা তাঁকে দেখতে গিয়ে-ছিলাম, কিন্তু ভাড়াডাকি করেও কারুর সাড়া পাওয়া গেল না, তাই ফিরে এসাম।’

ডাক্তার সন্তর্ক ভাবে প্রশ্ন করিল, ‘ক’টার সময় গিয়ে-ছিলেন?’

‘আদালত পাঁচটার সময়।’

ডাক্তার একটু ভাবিয়া বলিল, ‘কি জানি। আমিও বিকেলবেলা গিয়েছিলাম, কিন্তু পাঁচটার আগে ফিরে এনে-ছিলাম। মহীধর বাবু ভালই আছেন। তবে আজকে বাড়ীতে এই ব্যাপার হ’ল—একটু শক পেয়েছেন।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আর রজনী দেবী! তিনি কেমন আছেন?’

ডাক্তারের যুথের উপর দিয়া একটা রক্তাভা খেলিয়া গেল। কিন্তু সে ধীরে ধীরে বলিল, ‘রজনী দেবী ভালই আছেন। তাঁর অস্থব্ব করেছে এমন কথা শুনি নি। আচ্ছা, আচ্ছা উঠি।’

ডাক্তার উঠিল। আমরাও উঠিলাম। দ্বার পর্যন্ত আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘আপনার কলকাতা বাওয়া তা হলে স্থির?’

ডাক্তার কিরিয়া দাঁড়াইল, ডাক্তার চোখ দুটো সহসা জলিয়া উঠিল। সে দাঁড়ে দাঁত চাপিয়া বলিল, ‘ব্যোমকেশ বাবু, আপনি এখানে শরীর সারাতে এসেছেন। গোয়েন্দাগিরি করতে নয়। যা আপনার এলাকার বাইরে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।’ বলিয়া গৃহ গৃহ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমরা কিরিয়া আসিয়া বলিলাম। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, ‘ডাক্তার যতক এমনিতে বেশ ভাল-মাস্থ, কিন্তু ল্যাঞ্চে পা পড়লে একেবারে কেউটে সাপ।’

বাহিরে মোটর বাইকের ফট ফট শব্দ আসিয়া ধামিল। ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, ‘আরে, পাণ্ডে সায়েব এসেছেন। ভালই হ’ল।’

পাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। ক্রান্ত হাসিয়া বলিলেন, ‘ব্যোম-কেশ বাবু, আপনার কথা ফলে গেল। পরী উদ্ধার করেছি।’

ব্যোমকেশ তাঁহাকে চেনার দিয়া বলিল, ‘বহুশ। কোথা থেকে পরী উদ্ধার করলেন?’

‘মহীধর বাবুর কুয়ো থেকে। ফাল্গুনীর লাস বেরুবার পর কুয়ের ডুবুরি নামিয়েছিলাম। উষানাগ বাবুর পরী বেরিয়েছে।’

ব্যোমকেশ কিছুকণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া বলিল, ‘আর কিছু?’

‘আর কিছু না।’

‘পোষ্ট মট্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?’

‘পেয়েছি। ফাল্গুনী জলে ডুবে মরে নি, যত্নের পর তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।’

‘হ। অর্থাৎ কাল রাতে তাকে কেউ বুন করেছে। তার পর যতদেহটা কুয়ের ফেলে দিয়েছে। আশ্চর্য্য নয়।’

‘তাই শু মনে হচ্ছে। কিন্তু ফাল্গুনীর মতন একটা অপদাৰ্ণ লোককে বুন করে কার কি লাভ?’

‘লাভ নিশ্চয় আছে, নইলে বুন করবে কেন? অপদাৰ্ণ লোক যদি কোনও সাংঘাতিক গুপ্তকথা জানতে পারে তা হলে তার বেঁচে থাকা কারুর কারুর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ফাল্গুনী অপদাৰ্ণ ছিল বটে, কিন্তু নিরোষ ছিল না।

পাণ্ডে বিরস মুখে বলিলেন, ‘তা- বটে। কিন্তু আমি ভাবি, পরীটা কুয়ের মধ্যে এল কি করে? তবে কি ফাল্গুনীই পরী চুরি করেছিল? বুনীর সঙ্গে ফাল্গুনীর কি পরী নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি হয়েছিল? তার পর বুনী ফাল্গুনীকে ঠেলে কুয়ের ফেলে দিয়েছে?—কিন্তু পরীটা শু এমন কিছু দাখী খিনিষ নয়।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘ভাল কথা, ফাল্গুনীর গায়ে কি কোনও আঘাত-চিহ্ন পাওয়া গেছে?’

‘না। কিন্তু তার পেটে’ অমেকখানি আক্ষিপ পাওয়া গেছে। মদের সঙ্গে আক্ষিপ মেশান ছিল।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘বুঝছি। দেখুন, কি করে ফাল্গুনীর যত্ন হ’ল সেটা বড় কথা নয়, কেন যত্ন হ’ল সেইটেই আসল কথা।’

পাণ্ডে উৎসুক চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, ‘এ বিষয়ে আপনি কি কিছু বুঝেছেন ব্যোমকেশ বাবু?’

ব্যোমকেশ যত্ন হাসিয়া বলিল, ‘বোম হর কিছু কিছু বুঝছি। আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আপনার পোমবার সময় হবে কি?’

পাণ্ডে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বলিলেন, ‘সময় হবে কিনা দেখাচ্ছি। চলুন আমার বাড়ীতে, একেবারে রাজির বাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরবেন।’

পাণ্ডে ব্যোমকেশকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমি আর সভ্যবতী রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাস লইয়া গোলামচোর খেলিলাম।

ব্যোমকেশ কিরিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কি হ’ল এতক্ষণ ধরে?’

ব্যোমকেশ স্বর্গীর হাস্য করিয়া বলিল, ‘আঃ, মুণিটা যা দে’বেছিল।’

ধমক দিয়া বলিলাম, ‘কথা চাপা দিও না। পাঁচ ঘণ্টা ধরে কি কথা হ’ল?’

ব্যোমকেশ জিত কাটিল, ‘পুলিশের গুপ্তকথা কি বলতে আছে? তবে এমন কোনও কথা হয় নি যা তুমি জান না।’

‘হত্যাকারী কে?’

‘পাঁচকড়ি দে।’ বলিয়া ব্যোমকেশ হঠ করিয়া পয়নককে চুকিয়া পড়িল।

আগামীবারে সমাপ্য

ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আসল শিল্পীর লক্ষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রম্যা রল্যা বলেছেন :

To live, to live too much ! A man who does not feel within himself this intoxication of strength, this jubilation in living—even in the depths of misery—is not an artist. This is the touch-stone.

—(John Christopher)

অর্থাৎ, বাঁচতে হবে—জোরের সঙ্গেই বাঁচতে হবে। যে মানুষ গভীর হৃৎকের মধ্যেও নিজের ভিতরে অম্লভব করে না শক্তির এই উন্মাদনা, বেঁচে থাকার এই উল্লাস—সে আর্টিষ্ট নয়। কে শিল্পী এবং কে শিল্পী নয় তা যাচাই করার এই হল কণ্ঠপাথর।”

শিল্পীর এই স্বার্থ পরিচয় পাই আমরা রবীন্দ্র রচনাবলীর সর্বত্র। স্বাভাবিক কোথাও তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। স্বাভাবিককে কটাক্ষ করে ‘সোনার তরী’তে একদা তিনি লিখেছিলেন :

যুগ যুগান্তর ধরে পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিভেছে শিখাস,
বিষাতার জগতেরে হাত্‌কোঁড় মানি,
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাস।
লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেবেলা।

কবি চিরদিনই জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ। জোরের সঙ্গে বাঁচার মজ্জাই উচ্চারণ করেছেন তিনি। শুষ্ক বৈরাগ্য-সাধনের মধ্যে যুক্তিকে কখনো অদেষণ করেন নি। ভালবেসেছেন এই পৃথিবীকে, ভালবেসেছেন জাতিধর্মনির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে। ‘সোনার তরী’র অন্ত একটি কবিতার শেষে আছে :

তালোবাসিনাছি আমি ধূলিমাটি তোর।
জমেছি সে মর্ত্য-কোলে যুগা করি তারে
ছুটব না স্বর্গ আর মুক্তি দুঁজিবারে।

‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ কবিতার মধ্যেও একই সুর—মর্ত্যভূমিকে তার সমস্ত আলো-হাস্যের বৈচিত্র্য নিয়ে ভালো-বাসার সুর। পৃথিবীকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন :

অগ্নি দীনহীনা

অশ্রু-আঁখি হুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অগ্নি মর্ত্যভূমি। আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে যৌবনচিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়-হৃৎখে শুষ্ক হই চোখ
অশ্রুতে পূরিল—অমনি এ স্বর্গলোক

অসল কল্পমাণ্ডার কোথার মিলাল
হাস্যছবি। ভব শীলাকাশ, ভব আলো,
ভব জনপূর্ণ লোকালয়, সিঁহুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাভট, শীল গিরিশিরে
শুভ্র হিমরেখা, তরু-শ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
‘অবমতযুগী’ সন্ধ্যা—বিন্দু অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন মর্গণের ভলে
পড়েছে আসিরা।

জীবনের প্রতি এই অসুরত অসুরাগ, মানুষের প্রতি এই অসহনীয় প্রতি, প্রকৃতির প্রতি এই সুবিবিধ তালোবাসা—এর পরিচয় ‘ছিন্নপত্রের’ পাতার পাতায়। ছিন্নপত্রের যুগ রবীন্দ্র-নাথের অজ্ঞাতবাসের যুগ। ‘নোবেল প্রাইজ’ ভবনও তাঁকে খ্যাতির শিখরদেশে উত্তীর্ণ করে দেয় নি। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে নৌকায় নৌকায় তাঁর দিন কেটে যায় প্রকৃতির নিভৃত অন্তঃপুরে। সন্ধ্যা কাটে পদ্মার নিভৃত চরে। ‘সৃষ্টি ছাড়া, সৃষ্টি মাঝে’ কবির মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটে ঋতুতে ঋতুতে জন্মভূমিকে নব নব রূপে দেখে দেখে। ‘ছিন্ন-পত্রের’ যেকোন পাতা বুললেই দেখতে পাওয়া যাবে—কি অসীম কৌতুহল নিয়ে কবি দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণ করে গেছেন বাংলাদেশের আশ্রয় জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারকে। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জুলাই সাতক্ষারপুরের কুটুবাড়ীতে বসে লিখেছেন :

“বেলা নৌকো পারাপার করছে, পাছরা ছাতা হাতে করে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেঘেরা ধূমি ডুবিয়ে চাল ঘুচ্ছে, চাষীরা আঁটি বাঁধা পাট মাথার করে হাতে আসছে, ছোটো লোক একটা গাছের শুঁড়ি মাটিতে কেলে হুড়ুল নিয়ে ঠক ঠক শব্দে কাঠ চেলা করছে, একটা ছুতোর অশ্ব গাছের ভলার ছেলে ডিঙি উলটে কেলে বাটালি হাতে ঘেরামত করছে, আঁদের কুহুমটা খালের ধারে ধারে উদ্বেগ-হীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুটিকতক গোরু বর্ধার ঘাস অপরিপাক পরিমাণে আহারপূর্বক অসল ভাবে রোজে মাটির উপর পড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি ভাড়াচ্ছে এবং কাক এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর বসে যখন বড়ো বেশি বিরক্ত করছে তখন একবার পিঠের দিকে মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। এখানকার এই দুই একটা একঘেরে ঠক ঠক ঠক ঠক শব্দ, উলফ ছেলেমেয়েদের খেলার কঁকোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের সুপকাশ ঘনি, কলুর বাঘির

তীক্ষ্ণকাতর নিষাদবন, সমস্ত কর্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাবীর ভাঙ এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ঘটছে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময় স্বপ্নময় করুণামাধা একটা বড়ো সংগীতের অন্তর্গত—খুব বিস্তৃত অথচ সংযত মাদ্যার বাঁধ। আমার মাথার মধ্যে স্রব্ধের আলোক এবং এই সমস্ত শব্দ একেবারে যেন কানার কানার তরে এসেছে অতএব চিঠিপত্র বন্ধ করে বানিককণ পড়ে থাক।

যা অত্যন্ত পরিচিত, যা অত্যন্ত নিকটের ভারই মধ্যে জীবনের এই গভীর আনন্দকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার ক্ষমতাই হ'ল শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় আমরা দেখতে পাই এই বৈচিত্র্য থাকার উল্লাস (This jubilation in living)। এই যে 'passionate curiosity and zest in life'—এ অনুরাগ, এ কৌতূহল যার মধ্যে নেই তাকে শিল্পীর পর্দায়ের কখনও ফেলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে ভালবেসেছিলেন। এমন করে সমস্ত সত্তা দিয়ে পৃথিবীকে ভালো না বাসলে তাঁর পক্ষে এত বড় কবি হওয়া কখনই সম্ভব ছিল না। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কালিগ্রামে বসে তিনি লিখেছিলেন :

"এই যে মস্ত পৃথিবীটা চূপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি। ওর এই গাছপালা নদীমাঠ কোলাহল নিশ্চিন্ততা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটাই হৃৎ হৃৎ আঁকড়ে ধরেছে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছে থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর রস পেয়েছি এমন কি কোমল বর্ণ থেকে পেয়েছি।" (ছিন্নপত্র)

১৩২১ সালের ২৯শে পৌষ সন্ধ্যায় লেখা একটি কবিতার আছে :

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতের ;

পাকে পাকে করে, করে

আমার জীবন দিয়ে জড়িয়েছি এর ;

প্রভাত-সন্ধ্যার

আলো অন্ধকার

মোর চেতনার গেছে তেলে ;

অবশেষে

এক হ'য়ে গেছে আজ আমার জীবন, আর

আমার ভুবন।

ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো

জীবনের তাই বাসি ভালো।

গড়ে আর পড়ে জগতের ও জীবনের প্রতি একই মৃগভীর অনুমোদনের স্বর।

ছিন্নপত্রের একখানি পাতার আছে :

"যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব। এরা কেবলই দিনরাত্রি মিসম এবং দেয়াল সাঁঝে, পাছে ছোটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই ভয়ে বহু

যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত। এরা যে ফুলের পাছে এক একটা ব্যারোটোপ পরিবে রাখে নি, চাঁদের নীচে চাঁদোরা খাটার নি সেই আশ্চর্য।"

পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই চারিদিকের প্রকৃতি এবং মানুষগুলি সম্পর্কে উদাসীন। জীবনকে জানবার কোন উৎসাহ এবং কৌতূহল নেই তাদের অন্তরে। তাদের চোখ আছে কিন্তু দেখে না। দুষ্টি যাদের নেই তারা সৃষ্টি করবে কেমন করে? পোষ্ট মাস্টার, কাবুলিওয়ালার—এসব গল্প-রচনার মূলে রবীন্দ্রনাথের দুষ্টি। কাবুলিওয়ালার পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা লোকের কাছে একজন লণ্ডনবাসী কোক্স-পরা মেওয়াওয়ালার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। তাঁর অস্তিত্বের বহিরাবরণ তেদ করে তাকে পশুপূর্ণ সহ্যহুস্তির চোখ দিয়ে দেখবার লোক জগতে সত্য সত্যই দুর্লভ। কিন্তু এমন এক একজন মানুষ কালেভদ্রে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন জীবনকে জানবার কৌতূহল এবং উদ্যাদনা যাদের হৃদয়মনীয়। এঁদের দেখা আর দশ জনের মত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা নয়। সেই দেখার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় মানুষের সত্য পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের দুষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল রহস্য কাবুলিওয়ালার সত্য পরিচয়। সে তো কেবল মেওয়াওয়ালার মত—সে স্নেহময় পিতা। পৃথিবীর সব দেশের পিতার হৃদয়ে সন্তানের জন্ম যে সুগভীর স্নেহ—রহস্যভেদ হৃদয়েও তাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে একটি মৌলিক ঐক্য রয়েছে—সেই ঐক্যের উপলব্ধি থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে বেরিয়ে এসেছে :

"দেখিয়া আমার চোখ হলহল করিয়া আসিল। ভবন সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালার, আর আমি যে একজন বাঙালী সন্তান্তবংশীয় তাহা ভুলিয়া গেলাম—ভবন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা।"

আমরা শতকরা নিরানব্বই জন লোক ভতখামি হৃদয়-হীন নই যতখানি আমরা উদাসীন। আমাদের অন্তরে চারিদিকের জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে কৌতূহলের মারাত্মক অভাব। আমরা যদি তেমন করে দেখতে পারতাম তবে আমরা নিশ্চয়ই ভালবাসতেও পারতাম আর সেই সমবেদনা থেকে আসত সৃষ্টির প্রতিভা। ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি সমবেদনার গভীরতা থেকেই ত উৎসারিত হ'ল আদিকবির প্রথম শ্লোক, জগতের প্রথম সঙ্গীত।

'ছিন্নপত্র' পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয় মনের মধ্যে কি অপরিমেয় কৌতূহল নিয়ে চারিদিকের জীবনকে কবি দেখেছিলেন। তাঁর সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে এই কৌতূহলেরই পরিচয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই শিলাইদহে লেখা একখানি পত্রে পাই :

“আমার বোটের সামনে ছুটি রাখাল বালক একপাল গরু নিয়ে এসে চরাচ্ছে; গরুগুলি কচর মচর শব্দ করে এই বর্ষাসভেজ সরসস্থানল সিক্ত ঘাসগুলির মধ্যে মুখ তুলে দিয়ে লাজ মেড়ে পিঠের মাছি ভাঙতে ভাঙতে স্নিগ্ধ শান্ত মেজে আহার করে করে বেড়াচ্ছে...এই গরুগুলির চোখের দৃষ্টি কেমন বিষন্ন শান্ত সুগভীর নেহেম্বর।”

গরু চরাচ্ছে এ আমরা সবাই দেখি। কিন্তু এমন অসুস্থগ-ভরা কোতুল নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা কবির পক্ষেই সম্ভব। “বিদায় অভিশাপ” কবিতার কচের মুখ থেকে হোম-বেহুয় যে বর্ণনা পাই তা ফটোগ্রাফের ছবির মতই নিখুঁত। দেবমানীকে কচ বলছে :

সুখ হতে সুখাময়

হৃদয় তার; দেখে তারে পাণকর হয়,
মাতুলগণা, শান্তিধরুপীণী, শুভকান্তি
পদ্মখিনী। না মানিয়া সুখাত্মক আশি
তারে করিয়াছি সেবা, গহম কামমে
ভ্রামশল্প স্রোতখিনীতীরে, তারি সনে
কিরিয়াছি দীর্ঘদিন; পরিভ্রমি করে
সেচ্ছামতে ভোগ করি নিরন্তর ‘পরে
অপর্যাপ্ত তৃপ্তাশি স্নিগ্ধ কোমল—
আলস্ত-মহুর তনু লতি তরুতল
রোমস্থ ক’রেছে বীরে গুরে তৃণাসনে
সারা বেলা; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে
সকলজ্ঞ শান্ত দৃষ্টি মেলি, গাঢ় স্নেহ-
চক্ষু দিয়া লেহন করিছে ঘোর দেহ।
‘মনে ম’বে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অচঞ্চল,
পরিপূর্ণ শুভ্রতম্ব চিকণ পিচ্ছল।

শিলাইদহে লেখা পক্ষে গরুর চোখের দৃষ্টির যে বর্ণনা আছে, কচের হোমবেহুয় দৃষ্টির বর্ণনার মধ্যে ভার্যই প্রতিফলি। দুই জায়গাতেই বিচরণশীল গরুর পটভূমি একই—নদীতীরের সরসস্থানল অপর্যাপ্ত তৃপ্তাশি।

‘চতুরঙ্গ’র মধ্যে অভুক্ত দামিনী হাঁটুজল ভেঙে খাবারের থালা নিয়ে যেখানে উপস্থিত হয়েছে শতীশের কাছে সেখান-কার বালুচরের দৃষ্টি যেমন ভীষণ তেমনি নিখুঁত। সেখানে আছে :

“চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে—জমপ্রাণীর চিহ্ন নাই।
রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলোও ভেমনি। তারা যেমন
শুভতার পাহারাওয়াল, গুঁড়ি যারিরা সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোন ডাকের কোন সাড়া, কোন প্রেমের কোন
জবাব নাই এমন একটা সীমানাহারা ক্যাকাসে সাদার
মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক জমিয়া গেল। এখানে যেমন
সব যুহিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদার গিয়া

পৌছিয়াছে। পায়ের তলার কেবল পড়িয়া আছে, একটা
না। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি, তাহাতে না
আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে
আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুরা। যেন একটা যত্নার
মাধায় একাঙ ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন শুভ আকাশের
কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মন্ত একটা ত্বকার দরখাস্ত
মেলিয়া বসিয়াছে।

কোন দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির
উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ বসিয়া চলিতে
চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌছিল সেখানে একটা জলা।
তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখীর পদচিহ্ন।
সেইখানে বালির পাড়ির দ্বারায় শতীশ বসিয়া।”

এইবার ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শিলাইদহে লেখা একখানি পত্রের
কিরদংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

“শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের
বোট লাগানো আছে। একাঙ চর ধূ ধূ করছে। কোথাও
শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায়
অদীর রেখা দেখা যায়—আবার সময়ে সময়ে বালিকে নদী
ব’লে ভ্রম হয়। গ্রাম নেই, লোক নেই, ভরু নেই, তৃণ নেই—
বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গার জায়গার কাটল বরা ভিজে কালো
মাটি, জায়গার জায়গায় শুকনো সাদা বালি। পূর্বদিকে
মুখ কিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অদন্ত নীচিয়া
আর নীচে অনন্ত পাণ্ডুরতা। আকাশ শূন্য এবং বরষাও শূন্য,
মিচে দরিল, শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার
শূন্যতা। এমনস্তর desolation কোথাও দেখা যায় না।”

শিলাইদহের অপর পারে জনহীন চরের এই যে বর্ণনা—
এর সঙ্গে চতুরঙ্গের বালুচরের বর্ণনার মিল খুবই স্পষ্ট।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস ভাল করে উপলব্ধি করবার জন্য
‘হিন্নপত্র’ গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করবার অবশ্যই
প্রয়োজন আছে। হিন্নপত্রের মধ্যে ‘হায়াময় নদীস্নেহবস্ত্রিত
প্রচ্ছন্ন’ বাংলার পটী-প্রকৃতির যে বিচিত্র বর্ণনার সঙ্গে আমাদের
পরিচয় ঘটে, সেই বর্ণনাগুলিই রবীন্দ্রনাথের নানা উপভাসে,
নানা কবিতায়, নানা সঙ্গীতে নব নব ভঙ্গীতে প্রকাশ
পেয়েছে। শুকাৎ কেবল ভাষার, বর্ণনার বিষয়বস্তু একই।

হিন্নপত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। হিন্নপত্র পড়তে
পড়তে কেবলই মনে হয় গোর্কির সেই ‘স্বর্গীয় কথাস্তম্ভ :

And what a privilege it is to be human! How
much that is wonderful leaps to the eye—how the
presence of beauty causes the heart to throb with a
voluptuous rapture that is almost pain.

আমাদের চারিদিকের প্রকৃতি নিমেষে নিমেষে যে সৌন্দর্য
আমাদিগকে পরিবেষণ করছে তাকে অঙ্গুলি ভরে গ্রহণ কর-
বার মত স্নান অঙ্গুষ্ঠি থাকলে তবেই হৃদয় স্বতঃই বলে ওঠে :

“কিরেছি সেই স্বর্গে শূভে শূভে

কাঁকির কাঁকা ফাহুস্।

কত-যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে

জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলা-মাটির মাহুস্।” (বলাকা)

বাঁচার আনন্দ উপভোগ করবার জুজু যা হুজুজ, যা হুজুপা, যা অল্পম তারই অমূল্যমান করা আমাদের শিক্ষিত-সমাজের একটা মজাগত সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সহজে আমরা চারিদিক থেকে যা পাচ্ছি তার মধ্যেই কি আমাদের আনন্দের প্রচুর বোরাক নেই? ছিন্নপত্রের পাতার পাতার কবির আনন্দের অভিযান্ত্রিকি, আর এই আনন্দ তাঁকে দিয়েছিল এই বাংলাদেশেরই প্রকৃতির বিচিত্র ছবি। ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা আমাদের বাই হোক না কেন—প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার মত আমাদের আত্মার যদি অমূল্যবের শক্তি থাকে ত মাটি-মায়ের কোলেই আমরা স্বর্গকে বুজে পাব, কবির সঙ্গে বলতে পারব:

‘স্বর্গ আমার ছদ্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে

বাস্তাসে সেই ঘবর ঘোটে আনন্দ-কল্লোলে।’ (বলাকা)

এমন কথা বলতে পারেন তাঁরাই যাদের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক খুব শিথিল এবং প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের নিঃশেষে ঢেলে দেবার শক্তি বিপুল। সকলের এ ক্ষমতা থাকে না। যাদের থাকে না তারা গোক-বাছুব, ফেড-খামার, বর-গৃহস্থালির বাইরে আর কোন কথা ভাবতে পারে না। নদীর তীরে নৌকা লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন যুদ্ধনেত্রে দেখতেম ছবির পর ছবি আর তাঁর আনন্দের অমূল্যতিকে হুটুয়ে ডুলভেন কানজুতানো মর্মান্বশী ভাষায় ভবন পল্লীর যারা কলসী-কাঁখে জমিদারবাথুকে সকাঁতুকে মিরীকণ করত—তারা কবির অন্তরের ইতিহাস বিন্দুবিসর্গে বুঝতে পারত না। অথচ সেই শিলাইদহের এবং সাজাদপুরের অজ্ঞাতবাসের যুগে কবি যে ‘কর্মবিহীন বিজ্ঞান সাধনা’র মধ্যে ডুবেছিলেন তার গুরুত্ব ছিল বিরাট। সে যুগে যা-কিছু তিনি অমূল্য করেছিলেন অন্তরের গভীরে, তা তিনি কবিতার পর কবিতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই সব কবিতা পড়লে আজও আমাদের অন্তর আনন্দে ভরে ওঠে।

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর শিলাইদহে লেখা একখানি পত্রে পাই:

“যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপরে চূপ করে বসে থাকি, জল শুধু থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে এবং আকাশের প্রান্তে স্বর্ধ্যাত্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্কাদে এবং সমস্ত মনের উপর নিভৃত নভমেজ প্রকৃতির কি একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অমূল্যব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ। এই লোক-নিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জিন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা

তন্ত্রিত ক্ষয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি; কেবল মৌলবীটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক বক করে আমাকে ব্যথিত করে তোলে।” (ছিন্নপত্র)

চারিদিকের প্রকৃতির কাছ থেকে সহজে আমরা যা পাই তার মধ্যে নিজের প্রাণ-প্রবাহকে এই ভাবে মিশিয়ে দিতে পারলে যে অনির্বচনীয় শান্তি অমূল্যব করতে পারি তারই কথা ছিন্নপত্রের পাতার পাতার। জীবন ভাদেরই কাছে একটা অর্থহীন বোকা বলে মনে হয় যারা প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের যোগ হারিয়ে ফেলেছে।

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের একখানি তারিখহীন পত্রে (শিলাইদহে লেখা) পাই:

“পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতার থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ঘোটে নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে স্বর্ধ্য প্রতিদিন অন্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাতে শতসহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অত্যাশ্চর্য হচ্ছে, জগৎ-সংসারে এষে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা—তা এখানে আসলে ভবে বোকা যায়।”

ছিন্নপত্র থেকে এবং আরও কোম কোমও লেখকের লেখা থেকে এত যে উদ্ধৃতি দেওয়া হ’ল সে কেবল একটি বিরাট সত্যকে পাঠক-পাঠিকাদের মনের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্ত। সত্যটি হ’ল—আনন্দ রয়েছে অল্প কোথাও নয় এইখানেই, ভাবীকালের মধ্যে নয়—বর্তমানের তরঙ্গচূড়ায়। কেন আমরা আনন্দকে দূরে দূরে অবস্থান করে বেড়াব?

উইলিয়াম জেমস বলতেন:

Even prisons and sick-rooms have their special revelations

হৃৎধের গভীরতম অন্ধকারেও মানুষ আনন্দলোকের ভাড়া দেখতে পারে যদি চারিদিকের প্রকৃতির মধ্যে যা যা ঘটে চলেছে তা দেখবার মত চোখ থাকে। এই চোখ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জোড়া-সাঁকোর বিব্যাভ ঠাঁহুর পরিবারে। ছিন্নপত্রের পটভূমি কাশ্মীরের সুবর্ণ নয়, সুইজারল্যান্ডের হ্রদের তীর নয়, পাহাড়-ঘেরা মানস সরোবরও নয়। সে পটভূমি এই বাংলারই ‘অতি দূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখা’, পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে ‘বঁাকা ক্রুশ চাঁদখানির আলো’, তৃণতরুশূন্য পদ্মার চর, ‘অন্ধকারজড়িত, বনবেষ্টিত স্তম্ভপ্রায় গ্রাম’, ‘জল-ধারাপ্রকৃষ্ট শস্তের বেড়’, ‘পরিপূর্ণ দিগন্তপ্রসারিত নদীর মধ্যে স্বর্ধ্যাত্ত’, ‘নিভরঙ্গ নদীর উপরে হুটুটে জ্যোৎস্না’, ‘বেগু-চরা মাঠ, পারে যাবার বেয়াঘাট, পাখী-ডাকা ছায়ার ঢাকা পল্লীপথ। হাজার হাজার লাখে লাখে মানুষ রয়েছে এই বাংলাদেশে যাদের মনে এরা কোন সাড়া জাগায় না। অথচ

রবীন্দ্রনাথের কাছে শিলাইদহের এবং গাজীপুরের এক একটি দিন মনে হয়েছে এক একটি সম্পূর্ণ মত। পদ্মা একটি দিনের লজ্জা তাঁর কাছে মনে হ'ল না পূরনো। ছিন্নপত্রের একখানি পত্রে আছে :

“প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধ হয় পূরনো হ'য়ে গেছে—কিন্তু যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চারিদিকে জল-জল কল কল করে উঠে, চারিদিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ যুদ্ধকলধ্বনি একটা স্নেহাঙ্গল নীল বিস্তার, একটা স্নানবীণ শ্রাবলরেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটা নিত্য উৎসব উদ্ঘাটিত হয়ে যায় তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়।”

কেন আমরা বড় বড় ছরাশার মোহে জীবনের ছোট ছোট আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে উপবাসী করে রাখি? কেন প্রতিদিনের অধাচিত ছোট ছোট আনন্দগুলিকে প্রতিদিন উপভোগ করে নিই নি? ছিন্নপত্রের এক কায়দায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

“এই সমস্ত রং, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই ছালোক ছলোকের মাঝখানে সমস্ত শূন্য পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, —এর জন্ম কি কম আয়োজনটা চলছে। কত বড় উৎসবের ক্ষেত্রটা। আর আমাদের ভিতরে ভাল করে তার সাজা পাওয়াই যায় না। জগৎ থেকে এতই তকাত্তে আমরা বাস করি।”

চারিদিকের এই আকাশ, জল, বাতাস আলোকে যদি ভালবাসতে পারতাম, সাজা দিতে পারতাম প্রকৃতির আঙ্গানে, চোখ মেলে দেখতে পারতাম যেমন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বিশ্বপ্রকৃতিকে—কোন হুঃখ থাকত না, কোন গ্লানি থাকত না মনের মধ্যে। বেশীর ভাগ লোকই বোকা-অন্ধ। বন্ধ পাল্কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তারা চলে যায়। তাই অন্তরের প্রচ্ছন্ন অতৃপ্তি এবং আত্ম-গ্লানি থেকে কিছুতেই তারা মুক্তি পায় না। দরকার হচ্ছে চারিদিকের বিশ্বপ্রকৃতির আঙ্গানে সাজা দিতে পারা। পৃথিবীকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে জীবনের দিকে পিছন ফেরানো নয়; জীবনের সমস্ত সৌন্দর্যকে, সুষমাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারাটাই হচ্ছে বড় কথা। রোম্যা রুল্যার ‘জন্ম ক্রিষ্টোফার’ উপন্যাসের মারক ক্রিস্টফ বাস্তবের রূঢ় আঘাতে বাঁচার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে। জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে যাবে এমন সময়ে পানের একটি গাছে ছোট একটি পাখী গান শুরু করে দিল। নিঃশব্দ বন্ধ করে ক্রিস্টফ শুনতে লাগল সেই সঙ্গীত। কানে আসতে লাগল জন্মের কলধ্বনি। বাতাসের কোমল চুম্বনে কলকলগুণের সোনালি শিশুগুলো উঠল ছলে ছলে। পপলার গাছের পল্লবে

পল্লবে আগল পলকের শিহরণ। রাতার ওপারের একটা বাগানে মোচাক ভরে উঠেছে মোমাহিদের মধুর গুঞ্জন-ধ্বনিতে। বাতাসে তাদের গন্ধ-ভরা গানের সুর। নদীর ওপারে একটা গরু রোমন্থন করছে। তার চোখের চাউনিতে কি করুণ কোমলতা। প্রাচীরের উপরে বসেছিল একটা ছোট মেয়ে। মাথায় তার একরাশ সোনালি চুল। নগ্ন পা ছাখনি ছলিয়ে ছলিয়ে আপন মনে সে গুন গুন করে গান করছিল। অনেক দূরে একটা মাঠে সাদা একটা কুহর ঘুরছিল আর মাঝে মাঝে লাকাচ্ছিল। ক্রিস্টফ একটা গাছে হেলান দিয়ে বসন্তের পৃথিবীর আনন্দ-কল্লোল শুনতে লাগল মুগ্ধ হয়ে। হুঁচোখ ভরে দেখতে লাগল তার সৌন্দর্যরাশি। আনন্দে এবং শান্তিতে তার মন উঠল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে। আঘাতের সমস্ত স্মৃতি সে ভুলে গেল, ভুলে গেল মাহুঘের দেওয়া সমস্ত হুঃখ। সহসা সে হুঁহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল গাছটাকে। তার পর মাটিতে উবুদ হয়ে ঘাপের মধ্যে ডুবিয়ে দিল তার মুখ। আনন্দে বিহ্বল হয়ে হাসতে লাগল সে। জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য, সুষমা এবং মায়া তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল; প্রবেশ করল তার ক্রিস্টফের প্রাণের পরতে পরতে। পৃথিবীকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে বিহ্বল করে সে বলতে লাগল :

এত সুন্দরী তুমি পৃথিবী! কিন্তু হার, মাহুঘ কেন এমন হুঃসিত? আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমারই। ওরা তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে। ওরা যা বুশী তাই করুক। আমারে যত পারে ওরা হুঃখ দিক। হুঃখও জীবন।

জীবনকে ভালবেসে ক্রিস্টফের আর মরা হ'ল না। প্রকৃতির রূপসাগরের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দিতে পারলে সব হুঃখকে আমরা জয় করতে পারি। ক্রিস্টফের মত যার responsive sensibility আছে, জীবনের সৌন্দর্যের এবং সুষমার আঙ্গানে চিত্ত যার সাজা দিতে পারে—অভিজ্ঞ তার কাছে কোনকালেই হুর্কিহ বলে মনে হবে না। আর সৌন্দর্য এবং সুষমা নেই কোন্ বামে? চোখ মেলে দেখবার লোকেই নেই। রবীন্দ্রনাথ চোখ মেলে পৃথিবীকে দেখেছিলেন, সে দেখার মধ্যে ছিল অসীম কৌতূহল আর সেই দৃষ্টি ছিল বলেই এমন অপূর্ণ সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন :

শুভ প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে ;

নদীর এপারে ঢালুতে

চাষী করিতেছে চাষ ;

উড়ে চলিয়াছে হাঁস

ওপারের জনশ্রুত তপশ্ব্য বালুতীরতলে।

চলে কি না চলে

ক্লান্তমোহে শ্রীমদী নিমেষ নিমেষ

আধকাণা নয়নের মত।

পঞ্চবাণি বাঁকা

বহুশত বরষের পদচিহ্ন আঁকা

চলেছে মাঠের ধারে—কসল-ক্ষেতের ঘেম মিথা—

নদীশাণে কুটীরের বহে কুঁচুখিতা।

কান্তনের এ আলোয় এই গ্রাম ওই শূণ্য মাঠ

ওই খেয়াখাট

ওই মীল নদীরেখা, ওই দূর বাজুকার কোলে

নিভৃত জলের ধারে চবাচবি কাকলী-কল্লোলে

যেখানে বসায় মেলা—এই সব ছবি

কত দিন দেখিয়াছে কবি! (বলাকা)

যাত্রা এই রকম করে জীবনকে স্বীকার করতে পারলে, দেখতে পারলে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য, ভায়াই যুগে যুগে বৃষ্টি করেছে সাহিত্যের সেই রসলোক যেখানে মাছুষ বুঁজে পেয়েছে তাদের প্রাণের আরাধ, চিত্তের সান্ত্বনা, পিপাসার অমৃত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দুইখানি পত্র

শ্রীযুক্তজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দুইখানি মূল্যবান পত্র এখানে প্রকাশিত হইল। জাতিভেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট অস্পৃশ্যতা তাঁহার মত মনীষী ও সমাজসিঁড়ি মহাপ্রাণ পুরুষকে কিরূপ মর্যাদাসিক হুঃখ দিত, পত্র দুইটিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। যে প্রসঙ্গে তিনি পত্র দুখানি লেখেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

১৯৩২ সনে দৌলভপুৰ কলেজের মঃশুভাদি ছাত্রগণ কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট আশাহুত্বপ সম্ভাবহার না পাইয়া বাংলার সর্বজনমাত্রে বহু মন্তব্য নিকট তাহাদের হুঃখের কথা জানাইয়া পত্র লেখে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাহাদের সেই পত্র পাইয়া অত্যন্ত মর্মান্বিত হন। পত্র দুইটির মধ্যে মধ্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

উক্ত পত্র যখন প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট পৌঁছে, তখন তাঁহার (করিদপুর জেলায়) গোপালগঞ্জ যাইবার কথা চলিতেছিল। সেখানকার শ্রীমতী কন্যা “গোপালগঞ্জের গান্ধী” শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে গোপালগঞ্জের সন্নিকটস্থ উলপুরের এক “কৃষক সম্মিলনে” সভাপতিত্ব করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করেন।

গোপালগঞ্জ অঞ্চলে কয়েক হাজার বিঘা জমি সর্বনা জলে ডুবিয়া থাকিত। সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে এ জমি যে কখনও উদ্ধার করা সম্ভব হইবে, তাহা কেহ ভাবিতে পারিতেন না। এ জমির মালিক প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার-বর্গও হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ অসীম অধ্যবসায়বলে, তাঁহার ভক্ত বহু সহস্র মঃশুভ ও মুসলমানের সাহায্যে এ সমস্ত জমি উদ্ধার করিয়া অসাধ্যসাধন করেন।

তিনি তাঁহার উক্তদের সাহায্যে বীৰ বহন এবং জোশ-ব্যাগী ধাম-ধনমের দ্বারা এ বিষয়ে জাকজ্য লাভ করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মূখেই শুনিয়াছি, তিনি যখন কলিকাতায় বলিয়া এ খবর পান, তখন তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাহার পর ঘটনাবলিে সিদ্ধি এ বিব্রাট কার্য প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি বিশ্বাসে অভিভূত হন এবং চন্দ্রনাথকে বৃকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণ ধরিয়া আশীর্বাদ করেন।

দুইটি পত্রেই উপরোক্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে।

দৌলভপুৰ কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণ যবাদি বর্ষশাস্ত্রের বিধানমতে এ কলেজ চালাইবার চেষ্টা করিতেন। যত্নে তৎকালিণ অস্পৃশ্যদের প্রতি ধেরূপ আচরণের আদেশ আছে, তাহা তাঁহারা নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাসমত মানিয়া চলিতেন। তাঁহাদের ধারণায় এ যুগে বাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা কিন্তু এ বিধান মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাহা লইয়াই বিরোধ ঘটয়াছিল। তখন কোনমতে সেই বিরোধের সমাধা করিয়া, জোড়াভালি দিয়া যে সমাধন বিধি রক্ষিত হইয়াছিল, আদ্য পাকিস্থানে পড়িয়া তাহা চুরমার হইয়া গিয়াছে।

University College of Science
and Technology
Department of Chemistry
92, Upper Circular Road
Calcutta...12.12...1932

কল্যাণবরষ

তোমাদের ২ই তারিখের পত্র পাইয়া আমি মর্মান্বিত হইলাম। বাস্তবিক জাতিভেদ তৎসংশ্লিষ্ট অস্পৃশ্যতাক্রূপ বিব হিন্দু-সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের যে কি সর্বনাশ করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আজ যে আমরা ৭০০ বৎসর পরাধীন হইয়া বিদেশীর জুতা, লাথি ইত্যাদি খাইতেছি, আর কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি; তাহা তোমরা বিদিত আছ। এই পাপ দূরীভূত না হইলে কখনই জাতিগঠন হইতে পারে না। দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল হইল, মহামতি Aesop উপজ্ঞাসছলে ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন: The belly and the other members—তাই আজ হিন্দু-সমাজ পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিবর্জিত। আমি “বর্ণাশ্রম” বিশ্বাস করি না; হিন্দু-ভারত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও এই অভিশাপ নাই। ৪৫ কোটি চীন। ইংরেজ ও আমেরিকার লেখকগণ একবাক্যে বলেন যে Untouchability has been unknown there for the last three thousand years and China is the least caste-ridden in the world; ইংলও ও আমেরিকায় যদিও জাতিভেদ নাই, কিন্তু dollar ও gold worship আছে। Chinaতে তাহাও নাই।

২২শে ডিসেম্বর Barisal Express-এ রওনা হইয়া গোপালগঞ্জ সন্নিকট উলপুর আমার বাইবার কথা আছে, সেখানে নাকি ১০১৫ হাজার নমঃশূদ্র প্রজা ও মুসলমান রায়তও সমবেত হইবে; তাহার নাকি সমবেত চেষ্টিয় বাঁধবন্দী করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। সেখানে বিরাট জনসভা ও প্রদর্শনী হইবে। ফেরতাবেলা অর্থাৎ আন্দাজ ১লা জানুয়ারী খুলনায় halt করিতে পারি, তবে তখন তোমাদের কলেজ বন্ধ থাকিবে। সেই সময় এ বিষয় আলোচনা করিতে পারি। অবশ্য আমি Daulatpur college-এ Trustee বা Board of council-এ নহি, সুতরাং আমি সাক্ষাৎভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না, তবে খুলনায় গান্ধীপার্ক যদি প্রতিবাদসূচক meeting কর, আমি উপস্থিত থাকিয়া মত প্রকাশ করিতে পারি। ফলকথা জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এখন প্রকাশে যুদ্ধ ঘোষণা করা দরকার এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর যাহাতে তোমাদের সহিত “জলচল” হয়, তাহার ব্যবস্থা অচিরে করা কর্তব্য। আর “কথায় চিড়ে ভেজে না।”

পুঃ—তোমাদের পত্রে কাহারও নাম না থাকায় লোক-মারফৎ এই পত্র পাঠাইলাম।

শুভার্থী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

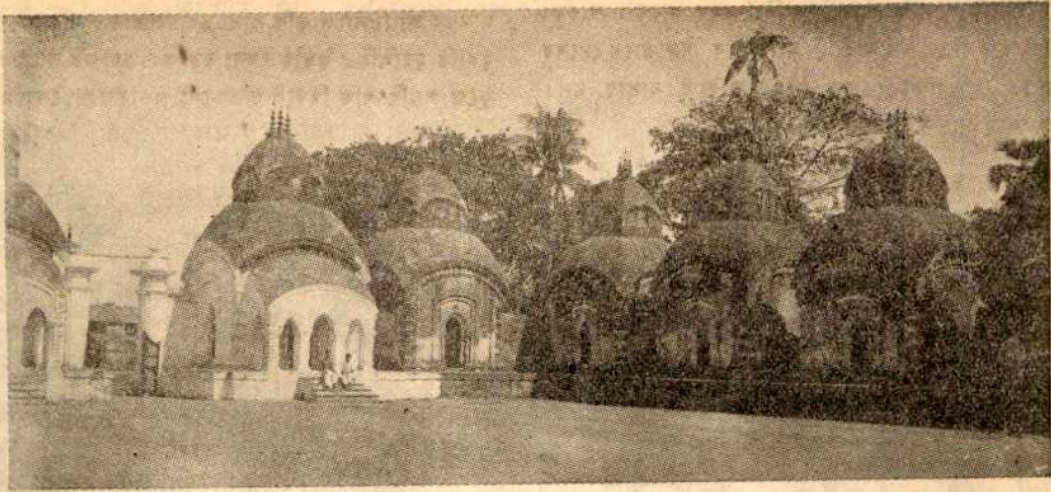
Calcutta..... 24. 12...1932

কল্যাণবরেণ্য,

তোমাদের ৭ই তারিখের পত্র পড়িলাম। বাহা বাহা লিখিয়াছ তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমি সম্প্রতি এক পুস্তক রচনা করিয়াছি। তাহাতে এই “বর্ণাশ্রম” ও অস্পৃশ্যতা হিন্দু-সমাজের ‘কি সর্বনাশ করিয়াছে তাহা দেখাইয়াছি। অন্যান্য বিশ বৎসর যাবৎ আমার বাহা কিছু দুর্বল শক্তি-সামর্থ্য তাহা ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার জন্য প্রয়োগ করিয়াছি। বর্ণাশ্রম সম্বলিত অস্পৃশ্যতা কোন ধর্মের অঙ্গ হইতে পারে না। ইহাকে আমি উপধর্ম, অপধর্ম, অধর্ম ও পৈশাচিক ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করি। আজও পর্যন্ত হিন্দু-সমাজ এই বিষয় পোষণ করায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সাড়ে সাত শ’ বছর যাবৎ পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিধান করিয়া বসিয়া আছে। কত কুলীন ব্রাহ্মণ তাহার নিজ-ভবনের সন্নিকটে হাড়িনী, ডোমনী, ইত্যাকার উপপত্নী প্রকাশে রাখিয়া বাইরে টিকীধারী ও নামাবলী গায় দিয়া হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন! লেমনেড, সোজা, বরফ পান করিতে দ্বিধা নাই, অথচ তথাকথিত অস্পৃশ্য আমার রান্নাঘরের চৌকাটের ভেতরে পা দেয় তখনই আমার ভাতের হাঁড়ি ও জলের কলসী অপবিত্র হইয়া গেল!! অথচ কুকুর বেড়াল আন্তাকুড় বেড়াইয়া পচা ইন্দুর বা গোমাস ভক্ষণের পর রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ভাতের পাত হইতে মাছের মুড়াটি মুখে করিয়া চলিয়া যাইতেছে অথবা দুধের কড়ায় চপ্ চপ্ করিয়া দুধ পান করিতেছে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র মনে বিকার হয় না। হায়রে হিন্দুধর্ম !!! ইহা এখন কেবল কতকগুলি দূষিত কদাচারের সমষ্টিমাত্র।

আমার ২২শে তারিখ বরিশাল Express-য়ে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় ষ্টীমারে উঠিবার কথা এবং গুনিয়াছি সেই ষ্টীমার রাত্রিবোগে চলিয়া ৩০শে অতি প্রত্যুষে উলপুরে যায়, সেখানে ৭ই তারিখে Exhibition খুলিতে হইবে এবং পরদিন নাকি mass meeting হইবে—ইহার উত্তোক্তাগণ আমাকে বলিয়াছেন যে, অন্যান্য ১০১২ হাজার নমঃশূদ্র এবং কতক মুসলমান (ইহারা প্রায়ই কৃষক শ্রেণীর) সমবেত হইবেন। আমার ফিরিতে ১লা অথবা ২রা জানুয়ারী হইবে। তখন X’mas ছুটি। সুতরাং তোমরা mess-য়ে নাও থাকিতে পার। নচেৎ আমার সঙ্গে Ry. Stn. বা ষ্টীমারে দেখা করিতে পার। শুভার্থী—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়



৮০নং টালীগঞ্জ রোডস্থ দ্বাদশ শিবালয়ের একাংশ। দ্বারপাথরের অষ্টশাল দুইটির পরচালা লক্ষ্যীয়

[শ্রীঅনাথনাথ মণ্ডলের সৌজন্যে]

কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

৩

আদি গঙ্গার উভয় তীরে পুণ্যার্থীদের প্রতিবন্দিতার যে পরিচয় প্রচ্ছন্ন তাহার সাক্ষীরূপেই যেন দেবমন্দিরসমূহের অবস্থিতি। ৮০নং টালীগঞ্জ রোডে ফীণশ্রোতা স্বরধুনীর সৈকত-সন্নিধানে একটি ঠাকুরবাড়ী দুই ভাগে বিদ্যমান। একাংশে একটিমাত্র অষ্টশাল। উহা সম্মুখে থামযুক্ত ত্রিচূড়—চূড়ায় দুই থাক আমলার উপর বিষ্ণুচক্র। মন্দিরের দেবতা শ্রীরাধা মদনমোহন। উহার গাত্রে এই রেখালিপিটি আছে :

শ্রীত্রীরাধাকৃষ্ণ শুভমন্ত শকাব্দা: ১৭৫০ সম ১২৩৫। কীর্তি শ্রীউদয়নারায়ণ দ্বাষ মণ্ডল শাক্তিম বাওয়ালি।

মন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দির ও চত্বরের চারিদিকে প্রাচীরের গাত্রে কঙ্করাজি।

অপর্যাংশে চত্বরের চারিদিকে মোট তেরটি মন্দির। দক্ষিণ-পশ্চিমেরটি খাঁজযুক্ত চূড়াবিশিষ্ট পঞ্চরত্ন। বাকী মন্দিরগুলি অষ্টশাল। উত্তরদিকের দ্বারের উভয় পাথের দুইটি অষ্টশাল পরচালাযুক্ত। এরূপ পরচালা কলিকাতায় আর নাই। দ্বাদশটি অষ্টশালেই শিবলিঙ্গ আছে। পঞ্চরত্নে কোন দেবতা নাই। চত্বরের অগ্নিকোণে একটি চতুঃশাল রাসমঞ্চ। নৈঋত কোণের পঞ্চরত্নটির ঠিক উত্তরের অষ্টশালে একটি পোড়ামাটির ফলকে লিপি ছিল; এখন উহা নোনা ধরিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলকটির উত্তর প্রান্তে

উপর হইতে নীচে মাত্র এই অক্ষরগুলি অবশিষ্ট আছে। ৩১ (৭) তটে, ৩১ বৈ, ভামাসি, শ্রীশ্রী—মোট পাঁচ সারি। লবণাক্ত-ভূমির মন্দিরে পোড়ামাটির লিপি কম। এইটি লুপ্তপ্রায়।

৮৬এ টালীগঞ্জ রোডে একটি ত্রিচূড় অষ্টশাল এখন দেবতাবজ্রিত হইয়া উদ্বাস্তর আশ্রয়-শিবিরে পরিণত। উহার চূড়ায় দুই থাক কলস ও ত্রিশূল। সম্মুখের অলিন্দে দুইটি অর্ধ থামযুক্ত থিলান।

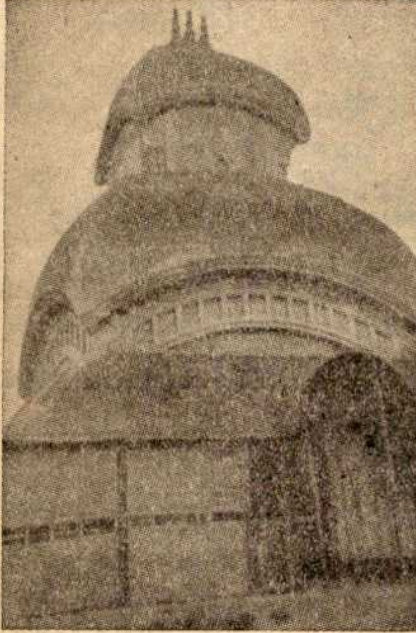
২৩নং টালীগঞ্জ রোডে দশটি অষ্টশাল শিবালয় ও একটি নবরত্ন—ইহার দুই পাশে দুইটি পঞ্চরত্ন। নবরত্নের দেবতা গোপাল ও গোবিন্দ। মন্দিরসমূহের অলিন্দ ও চত্বর মর্ম্মরমণ্ডিত। পঞ্চরত্ন ও নবরত্নের উপরিস্থ দেউল-গুলি খাঁজবিশিষ্ট। ঠাকুরবাড়ীর বহির্দ্বারের উভয় পাশে মর্ম্মরফলকে রেখালিপি। উহাতে মন্দির-প্রবেশের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের সহিত কৃত্তীর দিব্য বা শপথবাক্য পোদিত আছে। প্রবেশপথের বামভাগের লিপির ফলকটি দীর্ঘতর, ডাহিনেরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

বাম পাশের ফলকের লিপি :

শ্রীত্রীরাধাকৃষ্ণ শুভমন্ত। ষাটমর্কা পাঠকৈর্যাপি শিরসা হস্তধৃত্য। গঙ্গানানেন গম্যেত দেব দেবালয়েষু চ। ইতি পরাগর সংহিতায়াং। অম্বাৰ্ণ ১।

সকলের চরণে আশ্রয় এই নিবেদন। দেবালয়ে যাইবে

না করি আরোহণ। নিষেধ বিধি কহি কিছু সত্যের অপ্র-
তাপে। পাণ্ডি পালকি বোড়া গজাদি নিষেধ আপে। পাছকা
পান্ডেতে আর শিরে ছত্র ধরে। না যাইবে গজান্বানে দেবের
মন্দিরে। মুনিবাক্য হেলন করে জাইতে যাহার মন।
শপথ আছেয়ে প্রবেশ করিতে অঙ্গন।



পরিভ্রাজ্য চিচুড় অষ্টশাল, ৮৬এ টালীগঞ্জ রোড

[কটো—লেখক

আরও সন ১২৫২ সাল তারিখ ২৭ ফাল্গুন পিত্তিষ্টা সন
১২৫৩ সাল তারিখ ৩১ চৈত্র। ত্রিপ্যারিলাল দাস। ত্রিমহি-
মোহন দাস।

লিপির বাংলা অংশের অর্থ সরল। স্মৃতিশাস্ত্রের
প্রমাণসহ প্রবেশের বিধিনিষেধ ও শপথযুক্ত সবিনয়
অহরোধ লিপিটিকে একটি অভিনব রূপ দিয়াছে। কৃতীর
শ্রদ্ধালু বিনয় মৃতি ও শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাসের একরূপ নিদর্শন
তুল্য। ডাহিনের মর্ম্মরফলকে রেখালিপি :

শকাব্দ ১৭৬৭। এই ত্রিঐ৭ বাটিতে কেহ পাছকা পায়ে
দিয়া জাইবেন মাই কে জাইবেন তাহাকে ভালাক—সন ১২৫২
সাল।

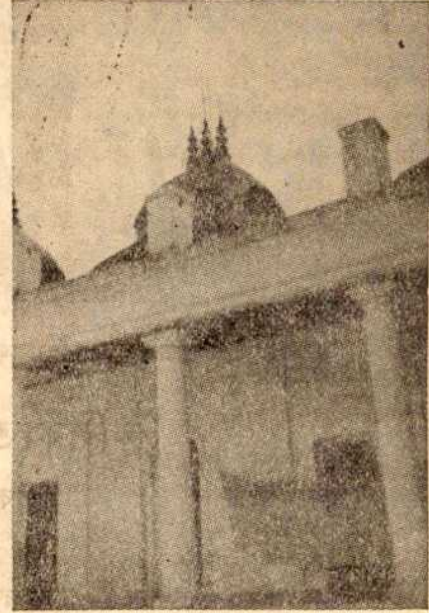
বচনটির রূঢ়তাকে আবৃত করিয়া কৃতীর অন্তরের
খানিকটা দরদ এই লিপিটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঘাৱের ভিতরে অঙ্গনের ডাহিনে কাল পাথরে রেখা-
লিপি :

শাকে নৈলাক বৈজ্ঞ প্রদিত ইহ ঘটে ভেন সপ্তাকি মানে।

গৌরী আদেদিশান্তে স্তবধুদিতটপং ঘাদশং সংজয়া ৮।

পোপালট্যাক হর্ম্ম্যং প্রণতি মন্ত শিরান্তত মধ্য করোতি।
দাসন্তং প্যারিলালোচ্চবি হরিহরধামেতি দায়াপ্রকাশং।
মুরারি মুরলিছিত্র কুমার বদনঃ রত্নাকর শুধাকর শাকের গণনঃ
কুন্তে সপ্তবিংশতি দিবসে শুভক্ষণেঃ শুভারন্ত সুরশৈবলিনী
সঙ্গিধামেঃ।



চিচুড় অষ্টশাল, ২৩নং টালীগঞ্জ রোড

[কটো—লেখক

রাশীসংখ্যা কানীপতি সানন্দে বেষ্টিতঃ মধ্য মবরজে ত্রিগোপাল
বিরাজিতঃ।

বাল্যবেশে ননী আসে ভদ্রী মনোহরঃ তুলনা কি দিব রূপ জিনি
জলধরঃ।

অজালয় নাম হৈল হরিহরধামঃ প্যারিলাল দাসের আশা লইতে
হরিনামঃ।

সংস্কৃত লিপির ছন্দ স্রগ্ধরা। উহারই মর্ম্ম বাংলা
কবিতা। ইহা শাস্ত্র রসের ত্রোতক। দুইটি বিন্দু
বিরামচিহ্নরূপে ব্যবহৃত। মুরারি মুরলি ছিত্রে সাত,
কুমার বদনে ছয়, রত্নাকরে সাত ও শুধাকরে এক
বুঝাইতেছে। রাশীসংখ্যা কানীপতি বলিতে দ্বাদশ শিব।
বর্ণাঙ্কজি লক্ষণীয়। কৃত্য প্যারীলাল এই আদি গজাতীয়হ
ঠাকুরবাড়ীকে পৃথিবীতে হরিহরধামরূপে পরিচিত করিবার
অভিলাষী। মনে হয়, ইহা বিদ্যাপুরের মহারাজা
জয়নারায়ণ ঘোষালের পরিখাবেষ্টিত জলাশয় উপবনাদি-
শোভিত প্রাসাদমধ্যস্থ ঠাকুরবাড়ীর কুকৈলাস নামকরণের
অঙ্গকরণ। কুকৈলাসের মন্দিরগুলি হরিহরধামের-মন্দির-

সমূহ অপেক্ষা প্রাচীন। চৈত্র মাসের শেষে রাসঘাট হরিহরধামের প্রধান উৎসব। ইহা বলরামের রাসঘাট নামে কথিত। এই সময় এখানে একটি মেলা বসে। ইহাতে স্থানটি কিছুদিনের জন্ত উৎসবমুখর হইয়া উঠে।

এই স্থানের অদূরে কেওড়াতলার মহাশ্মশান। উহার মধ্যে একটি বিরাট নবরত্ন সমাধি শিবাঙ্গ। উহার লিপি :

নমঃ শিবায় Maimensing Memorial. জেলা মহম্মদ সিং আঠার বাড়ী নিবাসী মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী শ্মশান মন্দির।

ইহার দেউলগুলি খাঁজযুক্ত। লিপিতে কোন সন তারিখ নাই!

নিকটে নকুলেশ্বর শিবের আশ্রান ও মহাকালীর বিরাট অষ্টশাল। ইহাতে কোন প্রাচীন লিপি নাই। অষ্টশালের স্ত-উচ্চ পীঠের গহবরে দক্ষিণাকালীর প্রস্তরমূর্তি, সম্মুখে নাট্যমন্দির। কালীঘাটের এই মহাকালীর আশ্রান নাই কলিকাতাকে তীর্থের মর্যাদা দিয়াছে। রুদ্রধামলতন্ত্রের মতে এই কালী সমগ্র বঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তন্ত্রচূড়ামণি বলেন, এখানে সতীর দক্ষিণ পদের অঙ্গুলিসকল পড়িয়াছিল, নকুলেশ এখানকার ভৈরব। কালীদেবতা সর্বসিদ্ধিকারিণী। ইহা কালীপীঠ নামে আখ্যাত। বহুকাল ধরিয়া এই তীর্থ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শক্তিসাধক তন্ত্র হিন্দুকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। গঙ্গার আদিখাতের সান্নিধ্যে ইহার প্রভাবেই স্থানটি পবিত্রতম বিবেচিত হওয়ায় পুণ্যার্থী ধনবানগণ স্তূর অতীত কাল হইতেই এখানে মঠ, মন্দির, ধর্মশালা, যাত্রীনিবাস, আরোগ্যশালা, তীর্থ-সোপান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর।

ভূকৈলাস, হরিহরধাম প্রভৃতি ইহার প্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণাত্যের প্রধান দেবতা কালীকৈয়ের স্তবর্ণ-গঠিত মূর্তি ও বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে এখানে অধিষ্ঠান করেন। স্থানটি তীর্থক্ষেত্র, কিন্তু স্বার্থপর পূজক, পাণ্ডা, ব্যবসায়ী ও ভিক্ষুকের সংখ্যাধিকা ইহার মহিমাকে কতকটা ধ্বংস করিয়াছে। কালীঘাটের এই মন্দিরটিও কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খুব প্রাচীন নহে। উত্তর



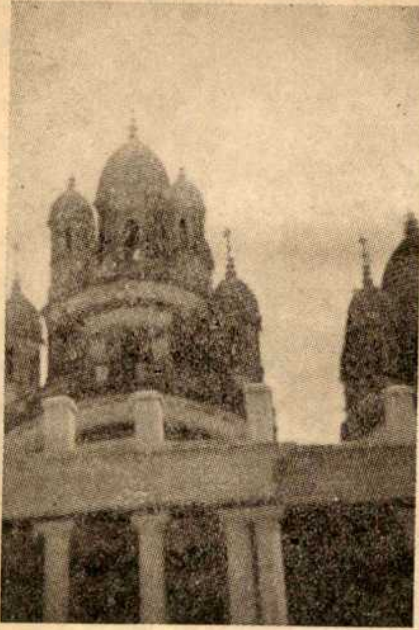
৮-নং টালীগঞ্জ রোডস্থিত শ্রীরাধামদনমোহনের অষ্টশাল

[ঐজনাথনাথ মণ্ডলের সৌজন্যে]

কলিকাতার পাণ্ডুরিয়াঘাটায় নাকি দেবীর আদি অধিষ্ঠান ছিল—ইহা কোন কোন পুরাতাত্ত্বিকের মত। বৎসরের বিশেষ বিশেষ পর্বে সমাগত জনতার চাপে এখানে ভক্তের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাটার অষ্টশাল দুইটির বৈশিষ্ট্য আছে। যেন দুইটি কুটার উপরি-উপরি স্থাপিত।

কলিকাতার উত্তর-পূর্ব কোণে ইটালি পল্লীর দেব লেনের আনন্দ-কাননের দক্ষিণভাগে ছয়টি অষ্টশাল শিব-মন্দির আছে। উহাদের প্রত্যেকটির তিনটি চূড়ায় কলস-জয়, ঘণ্টা ও ফলক-উ-টানো ত্রিশূল শোভিত। পূর্বদিক হইতে প্রতি মন্দিরের শিবলিঙ্গের নাম—লোকনাথ, বৈষ্ণ-নাথ, বিষ্ণুনাথ, কেদারনাথ, পশুপতিনাথ ও অমরনাথ। কেদারনাথ মন্দিরে লিপি : “শ্রীদেবনারায়ণ দেবেন স্থাপিতঃ সন ১২৬১/৩১ চৈত্র।” স্থানটি পুষ্পোচ্চানে রমণীয়। শিব-লিঙ্গগুলির নাম দেখিয়া মনে হয় কৃতী প্রতিষ্ঠাতা পুরীধামের লোকনাথ ও অষ্টাঙ্গ তীর্থের বিখ্যাত শিবলিঙ্গসকল দর্শনাঙ্কে



গোপালের নবরত্ন, ২০নং টালীগঞ্জ রোড

[ফটো—লেখক]



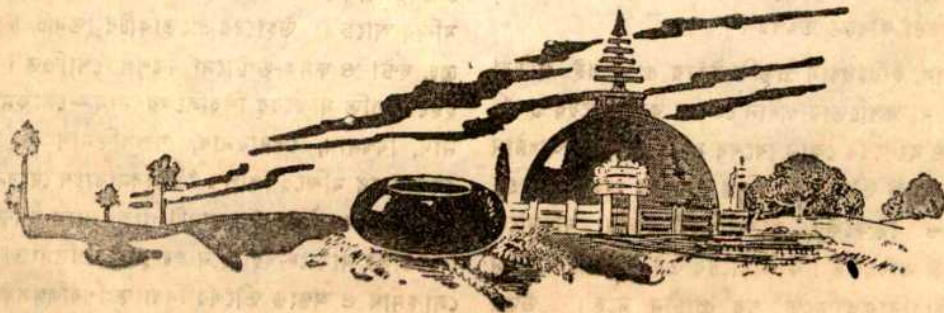
কালীঘাটে শ্রীকালীমাতার অষ্টশাল ও নাটমন্দির।

চুড়ায় দুই সান্নি আমলা

[ফটো—লেখক]

ফিরিয়া সেই সেই তীর্থের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বীয় প্রাতিষ্ঠিত শিবালয়গুলির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের ঐরূপ নাম-করণ করিয়াছেন। প্রবাদ—এই সকল মন্দির-প্রতিষ্ঠা সময়ে সমাগত অধ্যাপকগণকে বিদায় কে দিবেন ইহা লইয়া বিতর্ক হইলে, খ্যাতনামা শত্ৰুনাথ পণ্ডিত দেবনারায়ণকেই দিতে বলেন। তিনি বলেন, “আমি কি দিব।” শত্ৰুনাথ বলেন, “তোমার নামের আগে দে পরে দে, তুমি দিবে না ত দিবে কে?”

মহানগরীর অন্যান্য অঞ্চলের মণ্ডপগুলির মধ্যে জান বাজারের রাণী বাসমণির জামাতৃগণের মণ্ডপপঞ্চকই উল্লেখযোগ্য—ইহাদের পূর্বাংশেরটি চকমিলানের পূর্বাংশে, বাবীগুলি উত্তরাংশে। ভবানীপুর অঞ্চলে বহু-পরিবারের মণ্ডপ প্রাচীনতম। ইটালীর দেবনারায়ণ দেবের মণ্ডপ দুইটি—একটি চকমিলান প্রাসাদ-মধ্যে উত্তরাংশে, অপরটি আনন্দ-কাননে পূর্বাংশে অবস্থিত। অট্টালিকারূপের নিবিড়তায় মণ্ডপবাস্তুর সন্ধান ও প্রাচীনতা-নির্ণয় দুষ্কর।



পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বর্তমান বিধান সভার অধিবেশনে অনেক সদস্যই পল্লী অঞ্চলের শোচনীয় অবস্থা এবং উহার উন্নতিসাধনের কথা বলিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু সদস্যগণের অধিবেশনের আলোচনা বাস্তবে কি রূপ পরিগ্রহ করিবে সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ আছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে কোন-না-কোন বিষয়ের উন্নতি-সাধনের চেষ্টায় যে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। স্বতরাং পল্লী অঞ্চলের উন্নতিসাধনের জন্ত একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কয়েকটা হাসপাতাল ও শিক্ষালয় স্থাপন, স্থানে স্থানে বাস্তাঘাট নির্মাণ, জল সেচনের বা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতির জন্ত এখানে সেখানে অল্প পরিমাণ সার, বীজ, কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহ, অধিকতর ফসল উৎপাদনের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে অধিকতর পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দান প্রভৃতির দ্বারা পল্লী অঞ্চলের স্থায়ী কোন উন্নতি সাধিত হইবে না। পল্লী অঞ্চলের উন্নতিসাধন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে কৃষির এবং কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট কৃষীর শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইবে; এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। এমন সব শিল্পের প্রবর্তন করিতে হইবে যাহাতে পল্লী অঞ্চলের বেকার যুবকগণ নিজেদের গ্রামে অবস্থান করিয়া সেই সকল শিল্পে নিজেদের নিযুক্ত করিতে পারে এবং তদ্বারা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে। যান্ত্রিক শিল্পের প্রতিযোগিতায় তাহারা ধেন হটিয়া না যায় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া এমন ব্যবস্থাও করিতে হইবে যাহাতে কৃষিজাত এবং শিল্পজাত পণ্যসমূহ সহজে এবং উচিত মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। পল্লী অঞ্চলের প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বকমের শিল্পের প্রবর্তন করাই বাঞ্ছনীয় যাহাতে পল্লী অঞ্চলেই উহাদের কাটুতি সহজসাধ্য হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হইতেছে—স্বাস্থ্যের উন্নতি। পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্যের যে কি পরিমাণ অবনতি ঘটিয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত। স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের জন্যও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ ব্যাধির স্ক্রুচিকিৎসারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয় বিষয়টি হইতেছে—রাস্তা, ঘাট প্রভৃতির উন্নতি

সাধন। ইহাদের অভাবে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিগণের হৃগতির সীমা নাই।

চতুর্থ বিষয়টি হইতেছে—ভবিষ্যৎ নাগরিক প্রস্তুতের ব্যবস্থা। ইহার জন্য চাই বিভিন্ন বকমের উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ছাত্রদের শিক্ষার জন্য সংগঠনমূলক নানাবিধ কার্যের প্রবর্তন।

আরও অনেক বিষয় আছে তাহাদের আর উল্লেখ করিলাম না।

সমাজ-সংগঠনের (community project) নূতন পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম বাংলার আটটি 'ব্লক' ছোট ছোট জনপদ বা টাউনশিপ গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পশ্চিম বাংলার আয়তন ও প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি সামান্য প্রচেষ্টা; অথচ ইহার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইবে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে নগর স্থাপিত না করিয়া পল্লী অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে কেবল মাত্র "পল্লী উন্নয়ন"র প্রচেষ্টার পথে কোন অন্তরায় থাকিতে পারে না; মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অনুসারে কয়েকটি স্থানে কেবল গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুবোধ করিতেছি। অবশ্য জানি এই অনুবোধ "অরণ্যে যোদন" মাত্র হইবে।

সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম গিয়াছিলাম, শুনিলাম 'কমিউনিটি প্রোজেক্ট পরিকল্পনা' অনুসারে এই স্থানে একটি জনপদ বা টাউনশিপ গঠিত হইবে। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা নাই, কোন উৎসাহও দেখিলাম না। বাহা হউক, দুই-একটা কথায় ঝাড়গ্রামের বর্তমান আর্থিক অবস্থার কথা কতকটা বুঝা যাইবে। সেখানকার কৃষি মহাবিদ্যালয় কৃষি-ক্ষেত্রের একজন অমিকের মুখে শুনিলাম যে, সে মাসিক ৩৫ টাকা বেতন পায়। তাহার পরিবারে মোট আট জন লোক—প্রতিদিন এই আট জনের জন্য ৮ সের চাউল লাগে। তাহার জমিজমা বিশেষ কিছু নাই। পরিবারে আর একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি আছে, টাকার দুই সের করিয়া চাল ক্রয় করিতে হয়। সে এই আয়ের দ্বারা কি ভাবে তাহার পরিবার-বর্গের গ্রাসাচ্ছাদন চালায় এই প্রশ্ন করায় সে বলিল তাহার গরু, বাছুর, ঘটিবাটি, ঘরদোর প্রভৃতি সবই মহাজনের কাছে বন্ধক আছে। এই বর্ণন কাহিনী পল্লী

অঞ্চলের অসংখ্য লোকের নিকট হইতে শুনা যাইবে; কিন্তু ইহার প্রতিকার কে করিবে বা কিরূপে হইবে?

পল্লী অঞ্চলের উন্নতিকল্পে অনেক বরকমের পরিকল্পনার কথা সংবাদপত্রে পাঠ্য করি, কিন্তু কোথায় কি ভাবে তাহা দের বাস্তব রূপ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যে পল্লী অঞ্চলের কোন্ স্থানে এবং কোন্ ক্ষেত্রে পল্লীবাসিগণ কি পরিমাণে উপকৃত হইয়াছেন তাহার বিশেষ পরিচয় পাই না। ভারত-সরকারের 'প্ল্যানিং কমিশনে'র সদস্য শ্রীশঙ্করজীবলাল নন্দ বলিয়াছেন যে, absence of substantial signs of progress and achievement and a series of unexplained and inexplicable failures and mistakes অর্থাৎ এক কথায় ক্রমাগত সরকারী নীতির শোচনীয় ব্যর্থতা বর্তমান পল্লীসমাজের মানসিক জড়তার অন্যতম প্রধান কারণ। কথাটা খুবই সত্য।

গত আবার মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "পাড়াগাঁয়ের কথা"র আমার একটি পুঙ্খনিপাত সংস্কার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানাইয়াছিলাম। প্রায় দেড় বৎসর 'হয়রানির' পর আমার ঋণের আবেদন কি ভাবে বাতিল করা হইয়াছিল, তাহাও প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আবার এক পত্রে আমাকে জানান হইয়াছে যে, সেই পরিকল্পনা আবার মঞ্জুর করা হইয়াছে। হুগলী জেলার মংশ-কর্মচারী লিখিয়াছেন:

"Further to this office memo No. 92/TDS/P, dated 6.2.52, I am to inform you that the scheme in question has since been sanctioned.

"If you are still interested in taking the loan for improvement of 'Nai-Pukur' I am to request you to

submit the detailed scheme as per *pro forma* already given to you"

একটা প্রচলিত কথা আছে 'ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়'। এ ক্ষেত্রে সেই কথাই বার বার মনে হইতেছে।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে লিখিত "পাড়াগাঁয়ের কথা"র কৃষি-বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। ঐ সম্পর্কে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত শ্রীকনীন্দ্রনাথ দত্ত (পোঃ হরিপাল, জেলা হুগলী) মহাশয়ের একখানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল। যুগান্তরে প্রকাশিত একখানি প্রতিবাদ-পত্রে দত্ত মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি পূর্বে প্রকাশিত পত্রের লেখক নছেন। তাহার প্রতিবাদ-পত্রখানি এইরূপ:

"আমার নাম কনীন্দ্রনাথ দত্ত; সন ১৩৫১ সাল ১০ই বৈশাখ তারিখের পত্রিকার চিঠিপত্রের স্তম্ভে কৃষি বিভাগের অব্যবস্থা শীর্ষক আমার নামীর চিঠিখানা পড়িয়া আমি বিস্মিত ও মর্মান্বিত হইলাম; অতীব হৃৎকের সহিত জামাইতেছি আমি ইহার বিদ্রুপসংগত জানি না; উপরন্তু কৃষি বিভাগের সম্মানার্থের পর আমরা বিশেষ ভাবে ইহার সারিষ্য লাভ করিয়াছি এবং কৃষিকার্যের উন্নতিবিধারক সর্বপ্রকার সাহায্য পাাইতেছি।"

দেখা যাইতেছে যে, যিনি প্রথম পত্রখানির প্রকৃত লেখক তিনি সংসাহসের অভাবে নিজের নাম ও ঠিকানা দেন নাই; কিন্তু এমন কাঁচা কাজ করিয়াছেন যে তাহাতে তাহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল না, বরং কৃষি বিভাগ ভাল কাজের জন্য 'সার্টিফিকেট' পাইলেন। পত্র লেখকের এইরূপ আচরণ খুবই গর্হিত।

মিছিল

শ্রীশশীকুশলেশ্বর চক্রবর্তী

রাত্রি-বিবল হুঁ পাহ চলে,
পৃথিবীর গর্বে চলে জনতার ভিড়।
আঁধারে আলোকে নিঃসীম নভোভলে,
হুঁকে হুঁকে কিরে সে কোন্ যন্ত্র-শীত।
কত আকাঙ্ক্ষা, কত না উদ্বীপনা,
কেণে কেণে উঠে হ'রে বার নিঃশেষ।

মিতে মিতে বার প্রাণের বহিঃ-কণা
কত সঙ্গীত হারাইয়ে কেলে রেণ।
অনন্ত পথ—অনন্ত দিবারাতি
শত হৃৎবেগে পাহ প্রাণহীন।
চলিছে মিছিল চলার মেঘার মাতি,
যুগ-যুগান্ত তার মাঝে হয় লীল।

শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-স্থান

শ্রীসুন্দরানন্দ বিজ্ঞাবিনোদ

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে গোকর্ণক্ষেত্র* হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা-কুমারিকা পর্বন্ত একটি সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। উক্ত শৈলমালা ভাষা ও দেশ ভেদে 'সহ্যাদ্রি', কোল পর্বত, মলয়গিরি প্রভৃতি নামে খ্যাত। গিরিশ্রেণী একটি সুপ্রাচীন পুণ্যময় ভূভাগের পূর্বদিকে মালাকারে বেষ্টিত রহিয়াছে। বিশাল আরব সমুদ্র পশ্চিমে বিরাজিত থাকিয়া যেন সেই পুণ্য-তীর্থের পাদদেশ ধৌত করিয়া দিতেছে। এই পবিত্র ভূভাগ 'পরশুরামক্ষেত্র' নামে কথিত। শ্রীপরশুরাম স্বয়ং কর্মলেপরহিত হইয়াও লোকোপদেশার্থ মাতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য গোকর্ণক্ষেত্র হইতে কন্যাকুমারিকা-ক্ষেত্র পর্যন্ত বাণ প্রয়োগে সমুদ্রকে অপসারিত করিয়া তথায় এক নতুন ভূভাগ সৃষ্টি করেন এবং উহা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-গণকে দান করেন। এই পরশুরামক্ষেত্র উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত আদি কেরল, মধ্য কেরল, ও অন্ত্য কেরল—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। আদি কেরল উত্তর কর্ণাট ও দক্ষিণ কর্ণাট—এই দ্বিবিধ প্রদেশে পরিগণিত। উত্তর কর্ণাটকে 'কানারিজ' ভাষা আর দক্ষিণ কর্ণাটকে 'তুলু' ভাষারই বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। এই দক্ষিণ কর্ণাটক প্রদেশই 'রজতপীঠপুর' বা 'রৌপ্যপীঠপুর' নামে প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল।

ত্রিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে পরশুরামভক্ত রামভোজ নামক কোন ক্ষত্রিয় ভূপতি বিষ্ণুপ্ৰীতির জন্য একটি যজ্ঞাস্থলানের অভিলাষ করিয়া যজ্ঞবিদ্যানিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণের অমু-সন্ধানে তৎপর হইয়াছিলেন। কোথায়ও তাঁহার অভীষ্টা-স্থায়ী স্থানিপুণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে পাকালদেশান্তবর্তী গঙ্গাতীরস্থ অহিছত্র দেশ হইতে কর্ম-কাণ্ডনিপুণ ও পরম পণ্ডিত এক শত বিশ জন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের কুটুম্বগণের সহিত স্বদেশে আনয়ন করেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের বংশ অদ্যাপি পরশুরামক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। কাল-প্রভাবে তাঁহাদের কয়েকটি বংশ লুপ্ত হইলেও এখনও শতাধিক ব্রাহ্মণ-বংশ তথায় দৃষ্ট হয়। ইহারা সকলেই শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাবের পর মধ্বাহুগত হইয়া 'মধ্বব্রাহ্মণ' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। রামভোজ নৃপতি ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন

করিয়া যখন যজ্ঞস্থলীর শুদ্ধির নিমিত্ত স্বহস্তে লাঙ্গলাদি দ্বারা ভূমির শোধন করিতেছিলেন, তখন একটি বৃহৎ সর্প লাঙ্গলপরিসরে পতিত হইয়া আহতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। রামভোজ নৃপতি তাঁহার সেই কার্যের প্রায়শ্চিত্তার্থ চতুঃ-সীমায় 'ভান্ডোডু', 'মান্ডোডু', 'অরিতোডু' ও 'মুচ্চিলকোডু' নামক দেবালয় চতুষ্টয় নির্মাণ করাইয়া মধ্যস্থলে ক্রোশ-



শ্রীমধ্বাচার্য

ব্যাপী রজতময় পীঠ সংস্থাপন করেন এবং পীঠোপরি স্বর্ণ 'শেখ' মূর্তি প্রকট করিয়া তাঁহার পূজা বিধান করেন। কালে সেই পীঠ ভূগর্ভস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। যজ্ঞকালে ভগবান শ্রীপরশুরাম রজতপীঠস্থ স্বর্ণ-সর্প-ফণার অধোভাগে লিঙ্গাকারে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। সেই শেষায়ী 'অনন্তেশ্বর' নামক বিষ্ণুর পুরাতন দেবালয় অদ্যাপি উড়ুপীতে বর্তমান রহিয়াছে। রৌপ্যপীঠের (সিংহাসনের)

* উড়ুপী হইতে ঐয় ৫২ ক্রোশ দূরে সমুদ্রতটে উত্তর কানাড়া জেলায় অবস্থিত।

সংস্থান হেতু সেই স্থান (উড়ুপী) প্রাচীনকাল হইতে 'রক্তপীঠপুর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

এই স্থানের 'উড়ুপী' নাম সম্বন্ধেও একটি পৌরাণিক উপাখ্যান আছে। অগ্নিনী, ভরণী, কৃতিকা, রোহিণী প্রভৃতি সাতাশটি তারা চন্দ্রের পত্নী। ইহারা সকলেই দক্ষের কন্যা। চন্দ্র দক্ষের অপর কন্যাগণের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র রোহিণীতে আসক্ত ছিলেন। অপর কন্যাগণের প্রার্থনায় এইরূপ অসম ব্যবহারের জন্য দক্ষ চন্দ্রকে কলাহীন হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়া স্বীয় কলাক্ষয় পরিহারার্থ সেই পরশ-

এবং 'শ'-পতি। চন্দ্রের তপঃপ্রসন্ন ক্রতুদেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলিয়া এ স্থানের নাম 'উড়ুপী' হইয়াছে। যে সর্বো-বরের মধ্যে ক্রতুদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহার তট-প্রদেশে অধুনা শ্রীকৃষ্ণ 'চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব' নামে খ্যাত হইয়া সুবৃহৎ দেবালয়াভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত আছেন।

উড়ুপী এই সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ 'উদিপি' শব্দটি ক্রমশঃ অধিক প্রচলিত হয়। তদনুসারে এই স্থান সাধারণতঃ 'উদিপি' নামেই আখ্যাত। বস্তুতঃ ইহার শুদ্ধ নাম 'উড়ুপী'। এই উড়ুপীরই নামান্তর রক্তপীঠপুর, রোপা-পীঠপুর, শিবালী ইত্যাদি। কানারিজ ভাষায় 'শিবালী বা শিববেলী' শব্দে শিবের রোপা বুঝায়। উড়ুপীর অনন্তেশ্বরের রোপা সিংহাসনের সহিত এই সকল নামের সংশ্লিষ্ট আছে।

পথের পরিচয়

উড়ুপী দক্ষিণ কানাড়া জেলার একটি কৃষ্ণ মিউনিসিপ্যাল শহর এবং উড়ুপী তালুকের সদর। ইহা মাদ্জালোর শহর হইতে ৩৭ মাইল উত্তরে এবং আরব সাগরের তট হইতে ৩ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত।

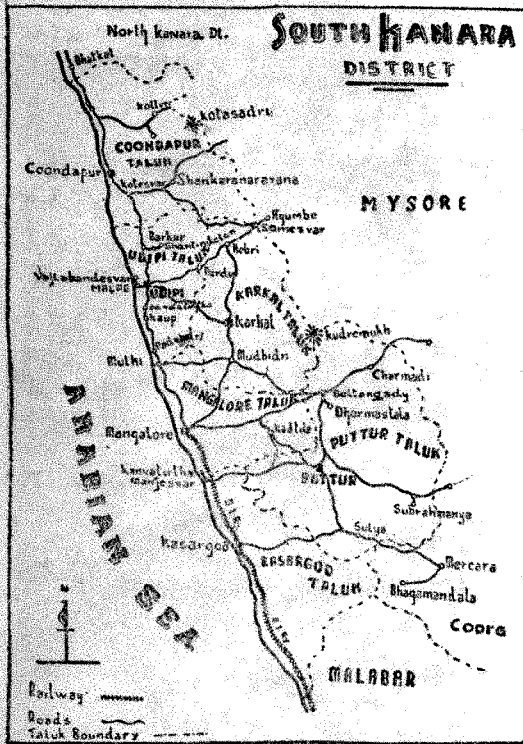
দ্বৈতবাদাচার্য শ্রীমন্মথের প্রধান গাদি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ মঠ এবং শ্রীঅনন্তেশ্বর ও শ্রীচন্দ্রমৌলীশ্বরের দুইটি প্রাচীন মন্দিরের অবস্থানহেতু উড়ুপীতে নানা দেশ হইতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়।

দক্ষিণ দেশীয় অভ্যন্তর যাত্রীগণের নিকট উড়ুপী যাইবার পথ সেরূপ দুর্গম মনে না হইলেও বঙ্গদেশীয় যাত্রীদের পক্ষে বিশেষ দুর্গম। তথায় সমগ্র বৎসরে একজনও বাঙালী যাত্রীর সমাগম হয় কিনা সন্দেহ। বোম্বাই হইতে ষীমার-যোগে সমুদ্রপথে উড়ুপী যাইবার একটি পথ আছে। তাহা অপেক্ষাকৃত সুগম ও সুন্দর।

উড়ুপী যাইবার প্রধান পথসমূহের কথা নিয়ে উল্লিখিত হইল :

১। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ব্রড-গেজের শেষ স্টেশন মাদ্জালোর হইতে উড়ুপীতে প্রত্যাহ অনেকগুলি মোটর-বাস যাতায়াত করে। তন্মধ্যে যে সকল বাস সমুদ্রতীরবর্তী পথ দিয়া চলাচল করে, সেই সকল বাসে আরোহণ করিলে মাদ্জালোর হইতে উড়ুপী মাত্র ৩৭ মাইল পথ; কিন্তু তাহাতে চারি বার বাস বদল করিয়া নৌকায় নদী পার হইতে হয়। ইহাতে বাসভাড়া অপেক্ষাকৃত কম হইলেও শারীরিক ক্লেশ হয়, সময়ও বেশী লাগে। এই পথে গমনকালে মাঝে মাঝে সমুদ্র দেখা যায়।

২। মাদ্জালোর হইতে মোটর বাসের আর একটি পথ আছে। পর্বত কাটিয়া মোটর চলাচলের জন্য যাত্রা



রামক্ষেত্রে 'অজারণা' নামক স্থানে তপস্তা দ্বারা ক্রতুকে তুষ্ট করেন। তখন ক্রতুদেব রক্তপীঠক্ষেত্রস্থ বৃহৎ সর্বো-বরটিতে আবির্ভূত হন এবং চন্দ্রের সম্পূর্ণ কলাক্ষয় নিবারণার্থ তাঁহাকে বিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তাঁহার এক পক্ষে ক্রমে কলাক্ষয় এবং অপর পক্ষে ক্রমে কলাবৃদ্ধি হইবে। সেই সময় হইতেই কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের উদ্ভব হয়। উড়ুপ শব্দের অর্থ চন্দ্র। 'উড়ু' পদে নক্ষত্র

* উড়ুপীর শ্রীকৃষ্ণ মন্দির হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরত্ব এই স্থানটিতে বর্তমান পুণোদ্ভাবন রচিত হইয়াছে। এই স্থানের পুণ্য দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়।

নির্মিত হইয়াছে, ইহাতে চড়াই-উৎড়াইয়ের মধ্য দিয়া ৫৭ মাইল পথ যাইতে হয়। চতুর্দিকেই শ্রামল বিটপীশ্রেণী-শোভিত পর্বতমালার সুন্দর দৃশ্য। সেই প্রদেশের পার্বত্য পথে যাইতে যাইতে বহু কৃষ্ণবর্ণা গাভী দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা মাঙ্গালোর হইতে উড়ুপী পর্যন্ত এবং উড়ুপী হইতে পাজ্জাকক্ষেত্র পর্যন্ত শত শত কৃষ্ণা গাভী দেখিয়াছি। “গোয়ু কৃষ্ণা বহু ক্ষীরা” এইরূপ কথা আছে; কিন্তু সেই প্রদেশের কৃষ্ণা গাভীগুলি অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে না; তবে উহাদের দুগ্ধ স্মিট ও উহার খর্বাকৃতি।

৩। মাঙ্গালোর হইতে কারকল* নামক স্থান ৩৩ মাইল। কারকল হইতে উড়ুপী ২৪ মাইল। মাঙ্গালোর হইতে কারকল দিয়া উড়ুপী পর্যন্ত ৫৭ মাইল পথ সরাসরি বাসে যাওয়া যায়। কোথাও নৌকায় নদী অতিক্রম বা ‘বাস’ পরিবর্তন করিতে হয় না। মাঙ্গালোর হইতে অপরাহ্ন ৫টার বাসে যাত্রা করিলে রাত্রি প্রায় চাটায় সেই বাস উড়ুপী পৌছায়। বাস কারকলে কিছুকাল অপেক্ষা করে।

৪। সমুদ্রতীরবর্তী পথে বাসের ভাড়া মাঙ্গালোর হইতে উড়ুপী জনপ্রতি এক টাকা দুই আনা এবং কারকল হইয়া যে বাস যায়, তাহার ভাড়া দুই টাকা এক আনা এবং এক্সপ্রেস বাসের ভাড়া দুই টাকা এগার আনা। এক্সপ্রেস বাসে নির্দিষ্টসংখ্যক আসন থাকে। আমরা যে সময় (২০শে কার্তিক ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) মাঙ্গালোর হইতে উড়ুপী যাই, সেই সময় উড়ুপী হইতে অনেকগুলি বাস ঘন ঘন যাতায়াত করিত।

মাঙ্গালোর একটি বৃহৎ বাণিজ্য-নগর। মাঙ্গালোর স্টেশন হইতে অনতিদূরে প্রায় দুই ফার্লঙের মধ্যে অনেকগুলি হোটেল ও স্বরম্য বাসভবন আছে। মাঙ্গালোরে কাদ্রী ও মঙ্গলাদেবীর দুইটি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান; এখানে তিনটি কলেজ ও অনেকগুলি স্কুল আছে—খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রচুর।

৫। বোম্বে স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর কতকগুলি স্টীমার অক্টোবর মাস হইতে মে মাস পর্যন্ত অর্থাৎ বর্ষার চারি মাস ব্যতীত অন্য সময়ে বোম্বে হইতে মাঙ্গালোরে গমনাগমন করে। আরোহিণী উক্ত কোম্পানীর স্টীমারে মাল্পী বন্দরে অবতরণ করিতে পারেন। মাল্পী বন্দর

* কারকল উড়ুপীর ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। এই প্রদেশ এক সময় জৈনরাজগণের অধিকারে ছিল—ইহার অনেক নিদর্শন অত্মাশি এখানে দেখা যায়। একটি অখণ্ড প্রস্তরের ৪২ ফুট উচ্চ স্তম্ভ (জৈন-গোমাতার স্তম্ভ) একটি উচ্চ পর্বতের উপরে বাস-বাগিগণের দৃষ্টপথে পতিত হয়। এখানে একটি সংস্কৃত কলেজ আছে।

হইতে উড়ুপী মাত্র চারি মাইল; তথা হইতে পদব্রজে, মোটর-বাসে বা গো-বানে উড়ুপীতে যাওয়া যায়।

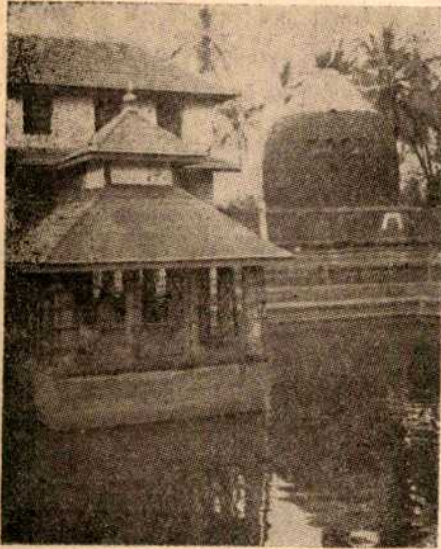
মোটর বাসের টিকেট এক দিন পূর্বে ক্রয় না করিলে যথাসময়ে বাসে স্থান পাওয়া যায় না। মাঙ্গালোর কছাইও বুক এজেন্সির সহিত পূর্ব হইতে বন্দোবস্ত করিলে দক্ষিণ-ভারতের তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান স্থানে টেনের সমগ্রাঙ্কযাত্রী গমনাগমনের মোটর-বাস পাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। মোটর-বাস এ প্রদেশে সর্বত্র চলাচল করায় প্রত্যেক বড় বাস-স্টেশনেই বিশ্রামগৃহ, ভোজনাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। উড়ুপী-মোটর-বাস স্টেশন হইতে উড়ুপীর শ্রীকৃষ্ণ মন্দির মাত্র তিন ফার্লং পথ।



শ্রীবাদিরাজ বামী (বিভিন্ন মঙ্গাচার্য)

উড়ুপী হইতে প্রায় আট মাইল পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পাপনাশিনী নদীর তটে ‘বিমানগিরি’ নামক একটি উচ্চ পর্বত বিরাজিত। পুরাকালে পরশুরাম শিলাখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া সেই পর্বতের চতুর্দিকে পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, বাণ-তীর্থ ও গদাতীর্থ নামক কুণ্ডচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিমানগিরির শিখর-প্রদেশে পরশুরাম-স্থাপিত বোগমায়া একটি বৃহৎ মন্দিরভাস্তরে বিরাজমানা থাকিয়া অধুনা অদম্যরমণীয় মাধব ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নিত্য পূজিতা হইতেছেন। বিমানগিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে বাসুদেবতীর্থ বিরাজিত। ইহার সম্মিহিত প্রদেশেই

‘পাজকাক্ষেত্র’। পাতি ইতি ‘প’, ন জায়তে ইতি ‘অজ’, পশ্যামৌ অজশ্চৈতি পাজঃ, পাজাং কং (অলং) যস্মিন্ তং পাজকম্ অর্থাৎ উৎপত্তি-রহিত পরশুরাম-বিষ্ণু দ্বারা যে ক্ষেত্রে জল অর্থাৎ ধনুস্তীর্ণাদির প্রকাশ হইয়াছে, তাহারই নাম পাজকাক্ষেত্র।



শ্রীমহাদেবের (শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের পূর্বভাগে অবস্থিত)

এই পাজকাক্ষেত্রে মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন বেদবেদান্তকুশল সদাচাররত জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পুরাকালে রামভোজ নৃপতি অহিচ্ছত্র প্রদেশ হইতে যে এক শত বিশ জন ব্রাহ্মণকে পরশুরামক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গৃহাদি নির্মাণ করেন। সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি গ্রামের মধ্যভাগে গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন, তিনিই ‘মধ্যগেহ’ নামে পরিচিত হন। ‘মধ্যগেহ’ শব্দটিকে কন্নড় ভাষায় ‘নড্ডন্তিলায়’ বলা হয়। নড্ (মধ্য) + অন্ত (স্থ) ইল্লায় (গৃহবান্)। মধ্যগেহ-বংশোৎপন্ন পাজকাক্ষেত্রবাসী সেই সদাচাররত ব্রাহ্মণের নাম ছিল ‘নারায়ণ ভট্ট’। তিনি তাঁহার সহধর্মিণী বেদবতী বা (বা বেদবিজ্ঞা) দেবীর সহিত পাজকাক্ষেত্রে বাস করিয়া পরশুরামপীঠস্থ স্বকুলদেবতা শেষশায়ী ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদ-বতীর গর্ভে একে একে দুইটি পুত্র জাত হইয়া অচিরকাল-মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মধ্যগেহ ভট্ট পুত্রহুখে বঞ্চিত হইয়া একজন দীর্ঘায়ু বৈষ্ণবপুত্র লাভ করিবার আশায় রজতপীঠপুবাধিপতি শেষশায়ীর (অনন্তেশ্বরের) ভজনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীশেষশায়ী ভগবান

ভক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-দম্পতির তপস্কার সমুচিত পুরস্কার দিয়াছিলেন।

এই পাজকাক্ষেত্রেই শ্রীমহাদেব (মধ্বাচার্যের পূর্বাশ্রমের বা বাল্যকালের নাম) আবির্ভূত হন। এই ক্ষেত্রে বাসুদেবের (শ্রীমধ্বাচার্যের) আবির্ভাব-পীঠস্থান অস্ত্রাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উড়ুপী হইতে দক্ষিণ দিকে তিন মাইল অতিক্রম করিবার পর ‘উদীয়াবর’ নদী। বাহারা উড়ুপী হইতে ট্যাক্সি-যোগে সরাসরি পাজকাক্ষেত্রে গমন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ট্যাক্সিসহ চাপের নৌকায় উক্ত নদী পার হইতে হয়। দুইটি নৌকা পাশাপাশি একত্রিত করিয়া উহার উপর কাঠের বিস্তৃত পাটাতন ও দুই দিকে লোহার বেটনী দিয়া উক্ত চাপের নৌকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ট্যাক্সি পারাপারের মাশুল পাঁচ টাকা। মাঙ্গালোর হইতে বাহারা সমুদ্রতীর-পথে চারিবার নদী পার হইয়া উড়ুপীতে মোটর-বাসে গমন করেন তাঁহাদিগকে শেষবার উক্ত নদী পার হইতে হয়। মোটর-বাস-যোগে বাহারা পাজকাক্ষেত্রে বান, তাঁহাদিগকে উদীয়াবর নদীর উত্তর তীরে বাস হইতে অবতরণ করিয়া খেয়ায় উক্ত নদী পার হইয়া দক্ষিণ পার হইতে অল্প বাসে চড়িয়া পাজকাক্ষেত্রে বাইতে হয়। উক্ত নদীর দুই পার্শ্বে শ্রীমল্লেশ্বর নারিকেলকুঞ্জ শোভা পাইতেছে। মধ্য মধ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের জায় নারিকেলকুঞ্জ-শোভিত ভূখণ্ড আছে। নদীটি প্রায় ১৥ ফার্লং প্রশস্ত হইবে—খুব গভীর নহে। এ প্রদেশের মহিলাগণও উদীয়াবর নদীপথে ছোট ছোট ভেলায় নানা স্থানে গমনাগমন করেন। উদীয়াবর নদীর সহিত পাপনাশিনী মিলিত হইয়াছে। নদীতে চড়া পড়ায় সোজাসৃজি নৌকায় পার হওয়া যায় না। কতকটা অন্য দিকে গিয়া নদী পার হইতে হয়। নদী পার হইবার পর আরও পাঁচ মাইল অতিক্রম করিলে পাজকাক্ষেত্র পাওয়া যায়। পাজকাক্ষেত্রের প্রায় অর্ধ মাইল পূর্বদিকে পরশু-তীর্থ; পাজকাক্ষেত্রের পশ্চিমে ও বিমানগিরি যোগমায়া-মন্দিরের দক্ষিণ দিকে বাণতীর্থ। এই তীর্থের জলের দ্বারা শ্রীযোগমায়া-অভিষেকাদি হয়। যোগমায়া মন্দিরের উত্তরে এবং পরশুমন্দিরের নিম্নে গদাতীর্থ। পাজকাক্ষেত্রস্থ মঠের পূর্বদিকে প্রায় তিন মাইল দূরে পর্বতের উপরে ধনুস্তীর্থ অবস্থিত। পাজকাক্ষেত্রে শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-পীঠের উত্তর-পূর্ব কোণে ‘বাসুদেবতীর্থ’ নামক একটি সুপ্রাচীন সরোবর (কুণ্ড) আছে। মধ্যগেহ ভট্ট ও বেদবতী পরশু-রাম প্রতিষ্ঠিত বিমানগিরির চতুষ্পার্শ্ব চারিটি তীর্থে (পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, বাণতীর্থ ও গদাতীর্থ) প্রত্যহ স্নান করিতেন। বিমানগিরি কেন্দ্রস্থলে ছিল। একাদশীর উপ-

বাসের পরদিবস কোন এক বিশেষ দ্বাদশীতে অত্যন্তকালমাত্র পারণকাল অবশিষ্ট ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে চারিটি তীর্থে স্নান সমাপন করিয়া তিথির সম্মানরক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। এই কারণে বাসুদেবের মাতাপিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের সন্তোষবিধানার্থ বালক বাসুদেব পাজ্জাক্ষেত্রে তাঁহার গৃহের সন্নিকটে সমস্ত তীর্থের সমাবেশ করিয়া একটি তীর্থ প্রকট করেন। বাসুদেবের নাম হইতেই সেই সরোবরের নাম হইল 'বাসুদেব তীর্থ'। মাতাপিতা বালক-পুত্রের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করায় বাসুদেব তাঁহাদের প্রত্যয়ের জন্য একটি আল (বট) বৃক্ষ আনয়ন করিয়া উদ্ভিদিকে উহার মূল ও নিম্নদিকে পত্রাদি রাখিয়া একাদশী দিবসে উক্ত সরোবরের তটে রোপণ করিয়া বলিলেন, "বদি দ্বাদশীতে উদ্ভিদগন্ধ বৃক্ষমূলে অঙ্কুরোদগম হয়, তবেই আমার কথায় তোমরা আস্থা স্থাপন করিও।"

মাতাপিতা বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং দ্বাদশী দিবস প্রত্যুষে সত্য সত্যই উক্ত বটবৃক্ষের উদ্ভিদগন্ধে অঙ্কুরোদগম

হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। তখন বাসুদেবের কথায় নারায়ণ ভট্ট ও বেদবতীর বিশ্বাস জন্মিল এবং তথায় সমস্ত তীর্থের আগমন হইয়াছে জানিয়া তাঁহারা উক্ত সরোবরে স্নানান্তে দ্বাদশীর পারণ করিলেন। তদবধি ঐ সরোবরটি 'বাসুদেবতীর্থ' নামে খ্যাত হইল। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বেও সেই স্থানে উক্ত বৃক্ষটি প্রকট ছিল। যাহারা অচক্ষে উহা দর্শন করিয়াছেন, এক্রপ কয়েক জন আমাদের নিকট বিষয়টি বর্ণনা করিলেন। শ্রীমদ্বৈষ্ণৱ জন্মপীঠের পূর্বদিকে কিছুদূরে সেই লুপ্ত বটবৃক্ষের স্থানটি অজ্ঞাপি দৃষ্ট হয়। এই বাসুদেব-তীর্থ-সরোবরের তীরে কানুঙ্ক-মঠের একটি ক্ষুদ্র শাখামঠ বা দেবালয় আছে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে উক্ত মঠের তদানীন্তন মঠাধীশ বাসুদেবের প্রকটকালীন পর্ণকুটিরাদিষ্টিত স্থানে দেবালয়টি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

বাসুদেব-তীর্থের উত্তর দিকে বালক বাসুদেব যে স্থানে এক উত্তমর্ণ নৃণিককে অর্থের পরিবর্তে এক মুষ্টি বীজ প্রদান করিয়া মাতাপিতার স্বপ্ন শোধ করিয়াছিলেন, সেই



উৎকৃষ্ট শ্রীমদ্বৈষ্ণৱের সপ্তম গৌরম (পশ্চিমদুর্গ) এবং দক্ষিণে অবস্থিত শ্রীমদ্বৈষ্ণৱ

স্থানটি অজ্ঞাপি দেখা যায়। জন্মপীঠের উত্তরভাগে একটি শিলাখণ্ড রহিয়াছে। ইহার উপর বসিয়া বাসুদেব মধ্যগেহ ভট্টের নিকট বর্ণমালা শিক্ষা করিতেন। মধ্যগেহ পূর্বদিবসের লিখিত অক্ষরগুলি বালকের স্মরণার্থ পুনরায় লিখিয়া দিলে বালক বলিয়াছিলেন, "লিখিতমেব পুনর্লিখিতং কৃতঃ?" অর্থাৎ, গত দিবসের লিখিত অক্ষর-গুলি অজ্ঞ পুনরায় কেন লিখিয়াছেন? একবার দেখিয়াই সমস্ত বর্ণমালা বাসুদেবের আয়ত্ত হইয়া গিয়াছিল। বাসুদেব কর্তৃক বিষধর সর্পাকৃতি মণিমান রাক্ষসের বধস্থান বিমান-গিরির উপত্যকার পূর্বভাগে এখনও রহিয়াছে। বাসুদেব-তীর্থের চতুর্দিকে শ্রীমদ্বৈষ্ণৱের অলৌকিক বাল্যলীলার স্মৃতিস্মৃতি আরও কতিপয় স্থান অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্বৈষ্ণৱের আবির্ভাব-পীঠে অনন্তপদ্মনাভ শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীবিগ্রহ উপবিষ্ট চতুর্ভুজ মূর্তি। মূর্তিটি খাছুময়ী। কানুঙ্ক মঠের স্থানীয় অর্চক বামনাচার্যজী

বলিলেন, উক্ত শ্রীবিগ্রহ মধ্যগেহ ভট্ট ও বেদবতী সহস্রে পূজা করিতেন। শ্রীবিগ্রহের নিকট লক্ষ্মী-নুসিংহ, উগ্র-নুসিংহ ও একটি উৎসব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। যখন মধ্যগেহ ভট্ট চিরায়ুঃ পুত্রলাভের জন্ত রজতপীঠপুরস্থ শ্রীঅনন্তেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅনন্তেশ্বরের মধ্যগেহ ও বেদবতীকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া তাঁহার উৎসব-বিগ্রহকে পাজকাক্ষেত্রে লইয়া গিয়া নিষ্ঠার সহিত পূজা করিবার আদেশ করেন। তদবধি তাঁহারা রজতপীঠপুর হইতে শ্রীঅনন্তেশ্বরের উৎসব-বিগ্রহ পাজকাক্ষেত্রে স্থাপন-পূর্বক নিত্য পূজা করিতেন।

এই স্থানের সেবার জন্ত কানুক মঠ হইতে ধান্যক্ষেত্রের বন্দোবস্ত আছে। শ্রীমধ্বাচার্যের তিরোভাব-তিথিতে এখানে উৎসব হয়। ইহা তাঁহার আবির্ভাব-স্থান হইলেও আশ্রয়বিগ্রহগণের (আচার্যগণের) আবির্ভাব-উৎসব তত্ত্ব-বাদী সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অল্পসারে অল্পষ্টেই নহে বলিয়া আবির্ভাব-তিথিতে কোনও উৎসব হয় না।

‘বিমানগিরি’ নামক পর্বতে এক দিন বাহুবল বাহুবলীড়ায় রত ছিলেন, তখন মাতা বেদবতী পুত্রকে আহ্বান করেন। বাহুবল উক্ত পর্বত হইতে এক লক্ষ পাজকাক্ষেত্রে মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। গিরি-সাহস্রদেশস্থ পাজকাক্ষেত্রের শিলাময় স্থানে বায়ু, হুহমান ও ভীমের অবতার শ্রীমধ্বাচার্যের পদতীর পতিত হওয়ায় ঐ স্থান তৎপদাক্ষে চিহ্নিত হয়। পরে যখন বাদিরাজস্বামী

এই স্থানে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে আগমন করেন তখন শ্রীমধ্বাচার্যের একটি প্রস্তর-মূর্তি এখানে স্থাপন করিয়া যান। পূর্বোক্ত আবির্ভাব-ক্ষেত্রের কানুক মঠের শাখামঠের অনতিদূরে পশ্চিমভাগে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে সেই পদচিহ্ন ও বাদিরাজ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমধ্বমূর্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীমধ্বাচার্যের মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বরদ-মূর্তি ও বাম হস্তে পুষ্টি।

শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-পীঠ হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে বিমানগিরি-শিখরে পরশুরাম-প্রতিষ্ঠিত দুর্গাদেবী আছেন। এই মন্দির অদম্যার মঠের অধিকারভুক্ত। দুর্গা-মন্দিরের সম্মুখে পরশুরামের একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি খুব প্রাচীন। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি স্বদীর্ঘ গুহা আছে। প্রায় এক শত বর্ষ পূর্বে পলমার মঠের তদানীন্তন মঠাধীশ একটি মশালের সাহায্যে উক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় প্রবেশ করিয়া বাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও নিকট তাঁহার আর ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য হয় নাই। তিনি তথায় বিষ্ণুর এক অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত হন। তিনি তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত যোগমায়ার মন্দিরের নিম্নভাগে একটি গভীর কূপ আছে। তথায় পরশুরামের গভীর পশ্চাদহুসরণকারী জনৈক ব্রাহ্মণের বহু ধনরত্ন নিহিত এইরূপ প্রবাদ আছে। দস্যুর ভয়ে নাকি উক্ত কূপে ঐ ধনরত্ন রক্ষিত হইয়াছিল।

ফের আশুন

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বজ্র-মুখর আশুন কি কের অলবে ?

মদের মেশার মাতাল পৃথিবী টলবে ?

হানাহানি—এই ভর

মুখে দিতে কেউ কল্যাণকামী নয় ?

মশা ও হাছির মতই জীবন

হুত্যাতে পাবে নয় ?

তবু হাই-চাপা হঠাৎ আশুন

মড়ে-চড়ে’ ওঠে দ্রুত বহুগুণ,

ফুলিদিশিখা আকাশে ছড়ায়—

বর্ষা, মালয়, চীন, কোরিয়ার,

শত আশ্রয়-দীপ

ঠুনকো কাঁচের মতই কখন

ভেঙে হয় চৌচির।

বাক্রমের বাক্রম—

নারা অবশ্যে ফুলকি আশুন-বজ্র

ছড়াতে চার কি—মহাক পৃথী’পর ?

—ভাই বিদ্যাৎ কাঁপে ?

পৃথিবী হবে কি পুড়ে’ হারণার

বারবার অভিশাপে ?

ইখর ভূমি নেই ?

এ মাটির ঢেলা নির্দম আঘাতেই

অবিরাম চিৎ বাবে ?

বৈজ্ঞানিক কি সত্যবে

এ হনমন্থনা চাকো,

বাক্রম অকাং রাণো

আছে বা পৃথিবী ভুড়ে’।

মান দিগন্তে উজল রোদুরে

আর বার ছবি আকো

ইখর কাছে থাকো।

দর্পণ-বিসর্জন

শ্রীকমল সরকার

একটি মেয়ে। মেয়েটি আঠারো বছরে পা দিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। সত্তেরো বছর দিনে দিনে যা সঞ্চয় করেছে সেদিকে হঠাৎ ওর নজর পড়েছে। নজর পড়তে ও যেন নিজেকে আবিষ্কার করলে। আর সেই আবিষ্কারের আনন্দ বেছে উঠল বাণীর মত। বাণি বাজতে লাগল ওর মনের কোণে, ওর দেহের অঙ্গে অঙ্গে। নিজেকে আর বরো রাখতে পারলে না, উপচে পড়তে লাগল থেকে থেকে। কখনও ছলছলিয়ে বয়ে যায়, কখনও নুপুরের মত কব্বক্ব করে বাজে। ঘরের মধ্যে চলতে কিরতে হঠাৎ ওর পায়ে কাপে নাচের হুল, বিহান্না বাজতে বাজতে গলার গান ওঠে গুণ্গুনিয়ে; পতীর রাতে সবাই ঘখন ঘুমে অসাড়, ও তখন জেগে উঠে চুপে চুপে ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসে, কিরকিরে বাতাসে আবেশ-ধন হয়ে বসে থাকে কতক্ষণ। সন্ধ্যাবেলা গা ঘুরে এসে কোন কোনও দিন আরনার সঙ্গে কথা কইতে বসে। নিজেকে নিজের গালে হাত রেখে বলে, কি গো, আজ যুধাণা! অমন তার তার কেন?—বলেই ঝিলঝিল করে হেসে ওঠে।

বনানী রূপালী নয়। রঙ কালো, কিন্তু যুধাণা লাগা মাথা। একহারি গড়ন, মাথার একরাশ চুল। চেহারার চেয়ে তার ভদ্রিমার বেশি আকর্ষণ। বনানীর হাসিটি মিষ্ট, গলার বয়ে বাণি না বাজলেও স্তনতে ভাল লাগে। তার চলার মধ্যে হন্দ আছে, আর একটু বাজ বেকিয়ে যখন কথা বলে, সে তকীটও মধুর। সব মিলিয়ে সে পুরোপুরি একটি মেয়ে, নিজের ঐখ্যে ঐখ্যাম্বরী। তার নিজের অনেক আছে বলেই রঙের যুধাণা পরতে হয় নি, কখনো মনেও ওঠে নি ক্রিম কোলুস কোটাবার কোনও উপায়ের কথা।

যখনকার কথা বলছি, তখন বনানী সবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। কলেজে যাবার ভাড়া নেই, বই খাতা মোটরুক পড়ার টেবিল থেকে ভাকের ওপর ভুলে দিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। পরীক্ষার কলাকলার কথা যে মনে আসে না তা নয়, কিন্তু তার অনেক বেশি। তা ছাড়া বনানীর মনে মনে বিশ্বাস—যেমন করে হোক, পাস করা তার আটকাবে না।

এক দিন সে নিজের ঘরে বসে রাউসের হাতার একটি রঙীন ফুল কোটাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় ওর ছোট বোন ফলসগী লাকাত লাকাত এল।

—আনিস দিচ্ছাই, তোর এবার বিয়ে হবে—

—যাঃ, তোকে বলেছে।

—বারে, আমি যে এতদিন শুনে এলাম। মা বাবাকে বলছিলেন, বিনির তো এগারদিন হয়ে গেল, এই বার ওর বিয়ের চেষ্টা দেখ।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তোকে আর জ্যাঠামি করতে হবে না।

বললে বটে, কিন্তু বনানীর কথার রাগের লক্ষণ তখন প্রকাশ পেলে না, বরং গলাটা ঘেম কেঁপে গেল। কল্যাণী বুঝতে পারেনি তো? হিঃ হিঃ ছোট বোনের কাছে তা হলে আর লজ্জার লেশ থাকবে না। লজ্জার কথা মনে হতে লজ্জা আরও ওকে পোরে বসল। ওর কান লাল হয়ে উঠল, বুকের মধ্যে স্তনতে পেল চিপচিপ আওয়াজ। নিজেকে ঢাকবার জন্যে ও তাড়াতাড়ি অত কথা পাড়লে।

—এদিকে আর তো দেখি, চুলের একি ছিরি হয়েছে?

এই তো বিকেলবেলা চুল আঁচড়েছে, এর মধ্যে চুল কি করে ধারণ হতে পারে ভেবে পেলে না কনি। কিন্তু উত্তর দেবার অবসর পেলে না। দিদি বললে, চিরুণী আর আনার মাথার তেলের শিশিটা নিয়ে আর—মাথার জট আর ময়লা বোরাই করে রেখেছে।

দিদি চুল বেঁধে দেবে এত বড় সৌভাগ্য কনি কল্পনা করে নি। সে এক দোঁড়ে সাজসজ্জাম নিয়ে এসে চুল বাঁধতে বসল। আর তার দিদি বোনের মাথার চিরুণী টানতে টানতে নিজের কল্পনার জট ছাড়াতে লাগল।

বনানীর বিয়ে। সেই আশ্চর্য ঘটনা এবার ঘটতে চলেছে। যে সম্প্রদায়বান তার নিজস্ব অবসরে, তার ভক্তার ঘোরে হঠাৎ বলকানি দিয়ে মিলিয়ে যেত, সেই ভাবনা আজ বনানীর কাছে বরা দিয়েছে—ওর চোখে এক দীপ্তি ফুটে উঠল। কি আশ্চর্য, ওরও বিয়ের সময় হয়েছে, এগিয়ে আসছে সেই দিন, যেদিন রূপালে চন্দনভিলক একে, রক্তাঘরে দেহ ঢেকে সে যুধাণে সাজবে, যেদিন ভাকে নিয়ে উৎসব হবে, তার কল্যাণে বাজবে শাঁখ, তারই সম্মানে একটি রাত উজ্জল হয়ে উঠবে। সেই আলোতে, সেই আনন্দ-গুণ্গুনের মধ্যে বনানী লজ্জামত মুখে বসে থাকবে রাজপুত্রের প্রতীকার।

বনানীর বিয়ের কথাবার্তা চলতে লাগল, এবং কিছু দিন যেতে-না-যেতে বাড়ীতে লোকজন আনতে লাগল মেয়ে দেখতে। একটা বিষয়ে বনানী নিশ্চিত ছিল যে, তার বাবা তার মত না নিয়ে কিছু ঠিক করবেন না। বাবার উপর তার অগাধ বিশ্বাস। তাই-বোনদের মধ্যে বনানী সবচেয়ে বড়

বলে, বাবা তাকে অনেকটা হেলের মত দেখেন। নানা বিষয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করেন, পরামর্শ করেন, মতামত নেন। বিয়ে-খার কথা উঠলে অনেক বার তিনি বলেছেন যে, বিয়েতে হেলের মত যেমন বরকার, তেমনই মেয়ের মতটাও অগ্রাহ্য করবার নয়। ওঁর এক ভাইবির বিয়ে তিনি এক বার ভেঙে দিখেছিলেন, কারণ সে বিয়ের নামে ঘরে নাকি কারা-কাটি করেছিল। তাই থেকে বনানীর বিশ্বাস যে, তার সম্পূর্ণ মত না থাকলে বাবা কোথাও তার বিয়ে ঠিক করবেন না।

বাবার উপর নির্ভর করলেও বনানী ক্রোড়হল চাপতে পারত না। বথম বাড়ীতে কোনও সময়ের কথা আলোচনা হ'ত তখন লুকিয়ে লুকিয়ে অতি সতর্পণে কান পাতিত, বা হঠাৎ আলোচনার জায়গার এগে এমন ভাব দেখাত যেন সংসারের কি একটা জরুরি কাজ সারতে এসেছে। সম-বয়সীদের কাছে কখনও কখনও ইচ্ছা করে বরা পড়ত।

এমন করে আশা-আনন্দ-উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বনানীর দিন কাটিতে লাগল। ইতিমধ্যে ওর পরীক্ষার ফল বের হ'ল। যা আশা করেছিল তার চেয়ে ভাল। কাঠ ডিভিশনে পাস করলে, লজিকে একটা লেটারও পেলে। বনানী তখন নির্ভাবনার কল্পনার রাশ ছেড়ে দিলে, কিংবা বলা যেতে পারে কল্পনা থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল—চলল সত্যন এক দিকে। এত দিন বেশি করে ওর চোখে আসছিল, একগাঙ্গি উৎসবের ছবি। তাতে মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে, উলু দিচ্ছে, বাড়ীর ভেতরে বাইরে আলোর মালা, আনন্দের কলগুঞ্জন, শাড়ী-গয়না, বিনিসপত্রের হুড়াহুড়ি, বেল-জুই, রজনীগন্ধার গন্ধে বাতাস মগির। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, তত এই উৎসবের চিত্রটা রান্না হয়ে আসতে লাগল। তখন কল্পনা রঙ দিতে লাগল। সেই মাহুঘটির গায়ে যে এসে গ্রহণ করবে বনানীকে, তবে তুলবে তার জীবন। তাকে নিয়ে সে ঘর ঝাঁবে, তাকে ঝাঁবে ভালবাসা দিয়ে। যত ভালবাসা বুকে আছে সব সে উজাড় করে ঢেলে দেবে। শুধু ভালবাসা কেন, সে নিজেকেই দিয়ে দেবে। কিছু বাকী রাখবে না। সে কি অসহ আনন্দ, কি অপরিণীত ছুটি।

এমন সময় এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। বনানীর বাবা অবিনাশবাবু একদিন সকালবেলা আদালত থেকে ফিরে হঠাৎ বললেন, শরীর বড় খারাপ লাগছে, আমার বিধানাটি করে দাও।—তরুণ ডাক্তারকে ডেকে আনা হ'ল, কিন্তু চিকিৎসার সন্ধান হ'ল না। বর্টারানেকের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, এপোপ্সিস।

আবার এত ভীত ও আকস্মিক যে বাড়ীর লোকের চোঁচেরে কাঁদলে না; কিছুদিন শুম্যদৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে শু

তাকিরে রইল। এই আশ্রয় ভাবটা বনানী যখন কাটিয়ে উঠল, তখন ওর কল্পরাজ্য ভেঙে ভেঙে চুরমার হয়েছিল, এমন কি অতি বাস্তব যে মাটির উপর তর করে দাঁড়িয়েছিল, চলছিল ফিরছিল, সেই মাটিও যেন পারের তলা থেকে সরে সরে যেতে লাগল। অবিনাশবাবুর কাগজপত্র খেঁটে দেখলে তিনি মাত্র সাত হাজার টাকার ইনসিওর করে গিয়েছেন। জমানো মগদ টাকা কয়েক শ' মাত্র। এর মধ্যে হাজার পাঁচেক দুই মেয়ের নামে, তাদের বিয়ের খরচ হিসেবে। বলে খেলে ও টাকার আর কতদিন? এদিকে শুধু সংসার-খরচ নয়, কণিকে অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা পাস না করলে বিয়ে দেওয়া শক্ত হবে। কণির পর ছোটতাই অবনী। সে সব ক্লাস সেভেনে পড়ছে। সুতরাং বেশ কয়েক বছর ধরে তার পড়ার খরচ টানতে হবে। কি করে এই খরচ সামলানো যাবে তেবে কলকিনারা পেনে না যা ও মেয়ে। বাড়ীতে দ্বিতীয় পুরুষ-অভিভাবক নেই। অবনীরা লেখাপড়া শিখে রোজগার করতে চের দেয়। অত আত্মীয় বারা আছেন তাঁদের কাছে আত্মীয়তা চলে, হাত পাটা চলে না।

প্রাথমিক চুকে গেলে এক দিন বনানীর মা ওকে ডেকে বললেন, ইয়ারে, এবার কি উপায় হবে বল দেখি।

বনানীর মনে পড়ল বাবাকে। তিনি বললেন, দুই আমার বড়ছেলের মতন।—বড়ছেলের কাছেই এখন তাকে করতে হবে।

বললে, দেখি কি করতে পারি।

—কি করবি তুই?

—তা এখন বলতে পারি না।

কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নিরেছিল বনানী, সে কি করবে। ভেতরে ভেতরে ও চেষ্টা করতে লাগল যদি কোন মেয়ে-জুলে মাঠারি পায়। কলেজের প্রোফেসরদের কাছে থেকে টেলি-মোনিয়াল জোগাড় করে, এখানে-ওখানে এর ওর কাছে ঘুরে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি মিউনিসিপ্যাল স্কুল জুলে ও একটা কাজ পেলে। সেই সঙ্গে জোড়ালে সকালে বিকেলে টাইশান। কোনও গভীকে সংসার চলতে লাগল।

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। বনানীর সবচেয়ে বড় আশ্রয় চক্ষুর নিম্নে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কোথায় রইল তার ঘর বাঁধবার কল্পনা, কোথায় মিলিয়ে গেল তার হাসি, কোথায় কত ঘুরে মিলিয়ে গেল সেই সব নানা রঙে রঙীন দিনগুলি, যা তার মুখে আনত স্বর্ষ্যোদয়ের আভা, চোখে ফোটাড তার, কণ্ঠে দিত গান। যে বাসনা নিয়ে বনানীর রিলাস, যাকে খেলানোতে ছিল ওর খেলা, তাকে সে মনের ঝাঁপিতে বন্ধ করে রাখলে। ও দেখলে ঘরেই বাঁধা পড়েছে ওর ঘর বাঁধবার কল্পনা। মনে মনে বললে, না, নিজের কথা ভাববার এখন সময় নেই। এখন সংসার

রয়েছে আমার মুখ চেয়ে, আমি না দেখলে এদের দেখবার কেউ নেই। এই সংসারকে যদি কোনও দিন দাঁড় করাতে পারি, যদি ভেতন দিম আসে, তখন ভাবব নিজের কথা।

টাকা রোজগারের একটা মোহ আছে। কাজ করতে করতে বনানীকেও কাজের নেশা পেয়ে বসল। প্রথম থেকেই সে প্রচুর পরিশ্রম করতে লাগল—স্কুলের কোনও টিচার না এলে সে নিজে ঘেচে ক্লাস নিজে লাগল। কলে কর্তৃপক্ষের স্নানকরে পড়তে ওর ঘেরি হ'ল না। বছর ঘুরতে না ঘুরতে মাইনে বাড়ল। চাঁদশানও আসতে লাগল বেশি বেশি টাকার।

প্রথম দিকে বনানী ভেবে রেবেছিল যে, কল্যাণী ম্যাট্রিক পাস করলে থাকেও কোনও একটা কাজে ঢুকিয়ে দেবে। বিশ-পঁচিশ ঘাই রোজগার করুক সেটা সংসারের সাশ্রয়। জুজনে কাজ করলে সে নিজে সংসারের দায়িত্ব থেকে ঋণিকটা মুক্তি পাবে এই ভেবেছিল। কিন্তু কণি সত্যি সত্যি যখন ম্যাট্রিক পাস করলে তখন ও ভাবল, ছোট বোনটাকে এই বয়স থেকে চাকরিতে ঢুকিয়ে লাভ কি? এমন নয় যে শুধু কণির রোজগারে সংসার চলবে। বনানীকে চাকরি করতেই হবে এবং এতদিন যখন সে-ই চালিয়ে এসে, তখন আর ছোট বোনের রোজগারের পরস্যা কেন হাত পেতে নেবে।

কণিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, এখন কি করবি? ভোর কি আরও পড়বার ইচ্ছে আছে?

—পড়তে পারলে ত ভালই হয়। অন্ততঃ আই-এটা পাস না করলে কাজকর্ম পাওয়া শক্ত হবে।

বনানীও ভেবে দেখলে কথাটা ঠিক। তা ছাড়া কর্তব্য করে যাওয়ার মধ্যেও একটা মোহ এবং মর্যাদাবোধ আছে—সেটা স্কুল কর্তৃক বনানীর মন উঠল না। বললে, তা হলে ভোকে কলেজে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করি।...

আরও হ'বছর। হ'বছর বাদে কণি যখন আই-এ পাস করলে তখন বনানী আবার মত পরিবর্তন করলে। এত দিন যদি সংসারের সকল ভার সে একলা বয়ে থাকতে পারে, তা হলে আজ কেন সে বোনের কাছে ছোট হবে। চাকরিতে ঢোকানো মানে কণির জীবনটাও নষ্ট। দুটো জীবন নষ্ট করে লাভ কি? প্ররোজনের চাপে বাধ্য হয়ে ওকে যে-জীবন বেছে নিতে হয়েছে, সে জীবনের স্বাদ কণি নাই বা পেলে। বরং এখন ওর বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে এক গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বাবা যা টাকা রেখে গিয়েছেন তাতে ওর বিয়ের খরচ চলে যাবে।

এক দিন মাঝেমাঝে বনানী বললে, আমার ইচ্ছে কণির এবার বিয়ে দিই। তোমার কি মত?

—সে দিতে পারলে ত মাথা থেকে মত্ত ভার নামে। কিন্তু তুই? সংসারী হবি না?

—আমি?

একটা বিষয় হাসির রেখা বনানীর মুখে ফুটে উঠল। বললে, এই তো আমি তোমাদের নিয়ে সংসার করছি। তারপর কিছুক্ষণ ধৈর্যে সহজ গলায় বললে, আমার কথা এখন ভাবতে হবে না।

যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চূপ করে গেলেন। বলবার, জোর কর-বার কিছু ছিল না। আজ যদি বিনি বিয়ে করে সংসারী হয় ত কাল থেকে সংসার অচল। মা-মেয়ে তাই খোঁজখবর করে কণির বিয়ের চেষ্টা দেখতে লাগল। বড় বোন থাকতে ছোট বোনের আগে বিয়ে হবে এই কথাটা কখনও-সখনও বনানীর মনে উঠত, কিন্তু সে ভাবনাটাকে ও জোর করে দূরে ঠেলে দিত। মনে মনে বলত, হি, হি, কণি আমার ছোট বোন, ও কেন আমার জন্তে অপেক্ষা করে থাকবে, আমার জন্তে ওর সাধ-আহ্লাদ মিটবে না কেন? বিয়ের কথা শুনে ও নিজে থেকে যখন আপত্তি করে নি, তখন নিশ্চয় ওর ইচ্ছে আছে। এ-বয়সের কোন্ মেয়েরই বা না থাকে?

অনেক চেষ্টার ফলে কণির বিয়ে হয়ে গেল। খরচপত্র যা হবে ঠিক ছিল, ভার চেয়ে বেশিই হ'ল। তাতে বনানীর মনে কোনও ঘিবা হ'ল না। সে স্পষ্টই বললে, আমার জন্তে টাকা রাখবার দরকার নেই, বিয়ের খরচ বাদে যা থাকবে সেটা সংসারের নামে থাক। যদি কখনও দরকার হয় নেবে।

কণির বিয়ে হ'তে বনানী ভারি নিশ্চিন্ত বোধ করলে। মত বড় এক দায়িত্ব মাথা থেকে নামল। এখন ওর বাকী রইল একটিনাজ কাজ—অবনীকে বি-এ পাস করানো। সে রোজগার করতে আরম্ভ করলেই ওর ছুটি। ছুটি হলে কি করবে সেই ভাবনাটা আবার একটু একটু করে ভাবতে শুরু করলে। পুরোনো দিনের সেই সব ভাবনা মাঝে মাঝে ফিরে আসতে লাগল। কিন্তু পুরোনো দিনের মত এখন আর সে ভাবনায় ভেতন চমক ছিল না, শিহরণ ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চকলতা কমে আসছিল। উদ্বাস কল্পনা নয়, স্নিগ্ধ অন্তরঙ্গ ভাবনা। এমন কেউ আসবে কি ওর জীবনে থাকে ওর হৃৎকেন্দ্র কাহিনী নিঃসঙ্কোচে বলা যাবে, যে নেবে ওর ব্যথার অংশ, যে পৌরুষের নিঃসংলগ্ন দৃঢ়তায় ওকে বলবে—ভর কি, আমি ত আছি।

অবনী পর পর হ'বছর ফেল করাত্তে হ'বছর নষ্ট হ'ল। তৃতীয় বারে পাস করল। কিন্তু পাস করলেই কি আর চাকরি মেলে—বিশেষতঃ যার সুপারিশের জোর নেই। এখানে ওখানে ঘুরে, আড্ডা দিয়ে আরও প্রায় বছর দেড়েক কাটিয়ে

দিলে। হু'একটা হেসে পড়াত, কিন্তু যা রোজপার হ'ত তার থেকে সিগারেট খরচ, ট্রান্স বাস ভাড়া আর নিজের কাপড় কামার খরচ বাদ দিয়ে বেশি কিছু উদ্ধৃত থাকত না। এই দীর্ঘকাল বনানী সংসারের তার টেনে চলল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা স্থল থেকে ফিরে বনানী ক্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে, এমন সময় অবনী এসে ডাকল, দিদি—

—উ ?

—একবার মাথাটা তোল ভ—

ভাড়াভাড়ি উঠে বসে বনানী জিজ্ঞাসা করলে, কেন রে ? অবনী ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। বললে, সিভিল সাপ্লাই আপিসে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, আছে চিঠি পাঠিয়েছে।

—সত্যি ?

আনন্দে, উত্তেজনার বনানীর চোখ দুটো যেন জলে উঠল। নীরবে তাইয়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলে। তারপর কিছু যেন সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, মাইনে ক'র রকম ?

—একশ' হুড়ি। তা ছাড়া ডিম্মারনেস এলাউল আছে।

—মাকে প্রণাম করেছিস ?

—হ্যাঁ।

—চল, মার কাছে যাই।

মা এদিকেই আসছিলেন, কিন্তু উৎসাহের আভিলাষে বনানী অবনীর হাত ধরে এগিয়ে গেল। হঠাৎ যেন ও জীবন্ত হয়ে উঠল। সেদিন সন্ধ্যাবেলাটা সে অবনীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে, মার সঙ্গে কথাবার্তা করে জমিরে রাধলে। রান্নাঘরে গিয়ে নিজে হু'একখানা ভরকারি রাঁধলে, অবনী মাল্পো বেতে ভালবাসে বলে মাল্পো তৈরি করলে। তারপর বধন রাঙ্গি গভীর হ'ল, বধন পথের ফলরং মীরব হয়ে এল, আর দক্ষিণ দিক থেকে বইতে লাগল বিবুধিরে বাতাস, তখন বনানী ওর নিজের ঘরে এসে বিছানার এলিয়ে পড়ল। এতদিনে, এতকাল পরে মিলেছে ওর ছুটি। বাবা মারা গেছেন প্রায় বার বছর। বার বছর পরে আছ ও পেলে শিক্তি। অবনী এবার সেবে সংসারের তার। এখন আর বনানীর উপার্জনের উপর ভরসা করে থাকবে না না-ভাই। আর তার নিজের প্রয়োজন কতটুকু ? ইচ্ছে করলে কালই সে

চাকরিভে ইন্তকা দিতে পারে। মুক্তি, এতদিন পরে বনানীর মুক্তি।

কিন্তু মুক্তির পর ?

হঠাৎ বনানীর দেহের মধ্য দিয়ে যেন এক বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। একই প্রহ্ন যেন চারিদিক থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল—‘মুক্তির পর ?’ উত্তর মনে এল না। অবনী না হয় মায়ের দায়িত্ব নিলে, বনানীর তার সে নেবে কেন ? সে নিলেও বনানী কেন চিরকাল তাইয়ের ও সংসারের তার হয়ে থাকবে ?

একটা সম্ভাবনার কথা মনে এল—বহুদিন ভুলে থাকা, বহু পম্ভাতে ফেলে আসা সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা যেন আকার নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। রূপবতী সম্ভাবনা, অষ্টাদশী রূপমাধুরী। কি স্থলর চেহারা মেয়েটির, কি মিষ্টি ওর মুখের হাসি।...কিন্তু অন্তরে যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বেড়-হুইচটা বনানীর হাতের মধ্যে নড়ে উঠল—এ যে, এ শু দেয়ালে লাগানো ফ্রেমের মধ্যে মেয়েটি বসে রয়েছে।...কিন্তু, কিন্তু ওর কপাল এত চওড়া দেখাচ্ছে কেন ? টান করে চুল বেঁধেছে বলে ? একটানে কবরীমূল শিথিল করে দিলে, সীমস্তের প্রশস্ত ঘোহানা ঢাকল না। মেয়েটি তখন হাত রাখল নিজের গালের উপরে। কিন্তু হেসে উঠল না পুরোনো দিঘের মত। হঠাৎ নজরে পড়ল মুখের হু'ধারে ছই গভীর রেখার উপর। আঙলের চাপে চাপে রেখা দুটোকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা বাম হয়ে রয়ে পড়ল। আঙলে চোখ নাড়িয়ে নিলে, কিন্তু সেখানেও নিরাশ। দেহ জালিত্য-হীন, দেহরেখা লুপ্তপ্রায়।

শিউরে উঠে বনানী মুখ ঢাকলে। বার বছর আগে দর্পণে যার ছবি পড়ত, এ শু সে নয়। আঠার বছরের সে মাদুরীকে বার বছরের জমা শিক্মিজীর শুক কাঠিন্য গ্রাস করেছে। আঠার বছরের আকর্ষণ হবে বিকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার বছরে বুইয়েছে আঠার বছরের সঞ্চয়, লাভ করেছে কিছু অর্থ, কিছু-বা সম্মান, আর অসমবয়সীর ভয়ভক্তি। তাই সঞ্চয় করে জীবন কাটাতে হবে। মহান্ আদর্শের নামে মাপের পর মাপ, বছরের পর বছর, প্রতিদিন পাঁচ-সাত ঘণ্টা অনর্গল বকে অর্ধাটীন মেয়ের দলকে পড়িয়ে যেতে হবে ছুগোল ব্যাকরণ, পাটিগণিত।



‘সাবসিডি’ কাদের জন্য ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

খাজ-সাবসিডি উঠিয়ে দেওয়ার কথা ভারত গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করার পর থেকে সারা ভারতে সাবসিডি পুনঃপ্রবর্তনের সপক্ষে ভুলে আন্দোলন শুরু হয়েছে। বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী, শিল্প-পতি-শ্রমিক, সাংবাদিক প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী—সকলেই এক হুয়ে এই সরকারী নীতির প্রতিবাদ করেছেন। কোনও কোনও দল আবার সভাএই, হরভাল প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ করছেও ছাড়ে নি। ব্রিটিশ কোনও নীতি অবলম্বন করলে আমরা পরাধীন থাকার সময় সেই নীতিতে সন্দেহের চোখে দেখছি এবং বিরুদ্ধ আন্দোলন চালিয়েছি; স্বাধীন হয়েও আমরা সে অভ্যাস ছাড়তে পারি নি। তাই অধিকাংশ সময়েই বিকিচারাে সরকারী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করি। সাবসিডি সম্বন্ধেও সেই অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে বিষয়টির ক্রিফিং আলোচনা করে দেখা যাক।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, যখন গবর্ণমেন্টের নির্দেশ বা অনুমোদনে কোন পণ্য ক্রীত দর (বা উৎপাদন-ব্যয়চার) অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করবার ব্যবস্থা থাকে এবং বিক্রেতার যা লোকসান হয় তা অর্থ-সাহায্য দিয়ে পূরণ করে দিতে গবর্ণমেন্ট প্রস্তুত থাকেন, তখন বলা হয় যে পণ্যটির দর সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধের সময় সাধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন ও আমদানী সাধারণতঃ কমে যায়। চাহিদার তুলনায় পণ্যের যোগান কম থাকে বলে পণ্যের দর চড়তে থাকে। সমাজসোহী কালোবাজারীর দল তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থার জনসাধারণের মুখ চেয়ে গবর্ণমেন্টকে ঐ সব পণ্যের মিস্রল হাতে তুলে নিতে হয়। সাধারণের ক্ষয়-শক্তির দিকে দৃষ্টি রেখে গবর্ণমেন্ট তখন একটা দর বেঁধে দেন—এটাই হ’ল কর্ট্রোল দর। খাজ, বস্ত্র প্রভৃতির মিস্রল আসে গবর্ণমেন্টের হাতে এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে। খাজশস্যের দর বেঁধে দিয়েই গবর্ণমেন্ট নিশ্চিন্ত হন নি, শিল্পক্ষেত্রে খাজ সরবরাহও করেছেন। খাজশস্যের যে দর গবর্ণমেন্ট বেঁধে দিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশী দর দিয়েও খাজশস্য সংগ্রহ করতে হয়েছে সরকারকে। সুতরাং গবর্ণমেন্টকে বেচতে হয়েছে কেশা দ্বায়ে চেষ্টা করে কম দরে; তাই কর্ট্রোলের নির্দারিত দরে বেচতে গিয়ে সরকারকে লোকসান দিতে হয়েছে। এই লোকসানটাই হ’ল ‘সাবসিডি’। কিন্তু সাবসিডির (অর্থাৎ লোকসানের) টাকাতা এসেছে কোথা থেকে? এসেছে সাধারণ করদাতার পীঠ থেকে, প্রত্যক বা পুত্রাকভাবে।

কর্ট্রোল-দরের অনুপাত হয় বিপত মহামুদ্রের সময়।

যুদ্ধে সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির উৎপাদন যাতে অর্ধুভাবে চমকে পারে তার জন্য প্রয়োজন হয় কারখানার মজুরদের সন্তুষ্ট রাখা। তাই, মজুররা যাতে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলি সস্তার ও যথেষ্ট পরিমাণে পায় সেজন্য কর্ট্রোল-দরে পণ্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কর্ট্রোল-দরের সুযোগ-সুবিধা তাই পেয়েছে শিল্পকল; শিল্পকলের বাইরের লোক সে সুবিধা পায় নি। মজুরদের কল্যাণার্থে কর্ট্রোলের ব্যবস্থা হলেও, একমাত্র কারখানার মজুররাই সব সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে; তার ছিটে-কোটাও পায় নি কৃষি-মজুর। অথচ কৃষি-মজুরের সংখ্যা কারখানা-মজুরের তুলনায় কম নয়। এক পশ্চিম বাংলাতেই আছে বিশ লক্ষের অধিক কৃষি-মজুর। কারখানার মজুরের আর কৃষি-মজুরের চেয়ে অনেক বেশী। অধিকন্তু, কারখানার কর্মচারীদের জন্য আছে বিনা-ভাত্যার থাকার ঘর, কলের জল, বিদ্যুৎ-বাতি, কয়লা, বাতাসদরের চেয়ে কম দরে নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান, বার্কস্যা-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা প্রভৃতির ব্যবস্থা। কৃষি-মজুর বা সাধারণ পল্লীবাসীর কাছে ঐ সব গল্পকথা। কারখানার মজুর-হ’ল সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় একটা নগণ্য অংশ—১০ ভাগের অধিক নয়; তবু এরাই পাচ্ছে এই সব সুবিধা। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, গবর্ণমেন্ট পক্ষপাত দেখিয়েছেন শিল্পের প্রতি। শিল্পকল গড়ে উঠেছে এই পক্ষপাতের আওতায়। আর এই একচকু-নীতির ফলে পল্লী-অঞ্চল হয়ে উঠছে মরুভূমি।

ব্রিটিশ ঐতিহ্যই আমাদের দিয়েছে অনুপ্রেরণা। ব্রিটেনে শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হয়েছে এই ধরনের মানা-বিধ সাহায্য দিয়ে। ভারতের শিল্পকলগুলিও আমরা গড়ে তুলছি ব্রিটিশ-আদর্শে। তাই পল্লীকে বঞ্চিত করে সব সুযোগ-সুবিধা শিল্পকেন্দ্রগুলিকে দিতে আমাদের বাধ্য হওয়া। কিন্তু ভারত যে ব্রিটেন নয় সে কথা আমরা ভুলতে বসেছি। ব্রিটেন হ’ল শিল্পনির্ভর দেশ। সেদেশের অধিকাংশ লোকের মরণ-বাচন নির্ভর করে শিল্পের উপর; শিল্পই তাদের প্রাণ। তাই কারখানার মজুরের উপরই থাকে সকলের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত। ভারতের কথা আলাদা। ভারত হ’ল কৃষি-প্রধান দেশ; কৃষিই হ’ল ভারতের প্রাণ; জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। কৃষিই হ’ল ভারতের আর্থিক কাঠামোর বুনিয়াদ। সুতরাং কৃষি-সংশ্লিষ্ট লোকের জীবনধারণের উন্নতি-বিধানই হওয়া দরকার ভারতের ‘জাশনাল পলিসি’ বা জাতীয় নীতি। তাই সব প্রয়াসের পিছনে থাকা উচিত কৃষকের

উন্নতি। ভারতের কৃষকশ্রেণী সাধারণতঃ অসহায়; নিজেদের দাবি জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে জানে না; অভাব-অভিযোগ জানাবার ক্ষমতা তাদের নির্ভর করতে হয় সহায় তৃতীয় ব্যক্তির উপর। পঞ্চাশের কারখানার মজুর সজবস্ত; পাশ্চাত্য দেশের অল্পকরণে তারাও করেছে ট্রেড ইউনিয়ন; রাজনীতির কল্যাণে তাদের গৃহপোষকেরও অভাব হয় না। কৃষক-সমাজের তুলনায় তাদের সংখ্যা নগণ্য হলেও তাদের গলার ছোর বেশী—সরকারের করণে প্রবেশ না করেই পারে না। সাবসিডি পুণঃপ্রবর্তনের ক্ষমতা বোম্বাই শহরে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সেটা কি এই কথারই সমর্থন করে না? শিল্পাঞ্চলের যুষ্টিমের লোকের সুবিধার জন্য সাবসিডির পুণঃপ্রবর্তন যাত্রা করার অর্থ বাকি শতকরা ১০ জন করদাতার উপর চাপ বৃদ্ধি। এতে বঞ্চিতদের অবিকৃত বঞ্চিত করে, এক শ্রেণীর যুষ্টিমের লোকের সুবিধা করে দেওয়াই হয় নাকি? আন্দোলন-কারীরা একথা কি একবারও ভেবে দেখেছেন?

সাধারণ করদাতার ‘কষ্ট অক্‌জিডিং’ (ভরণপোষণ খরচ) কমিয়ে আনাই হ’ল ‘সাবসিডি’র উদ্দেশ্য। কিন্তু এ উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে? এক বৎসরের অভিজ্ঞতা কি? যে সব এলাকার রেশনিং চালু ছিল সেই সব এলাকায় খাদ্য-শস্ত্র বিক্রয় হয়েছে একটা নির্দিষ্ট দরে—বাড়ে নি। কালো-বাজারের কথা এখানে বরা হছে না, কেমনা কালো-বাজারকে বাদ দিয়েও লোকের পক্ষে চাল-আটা সংগ্রহ করে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু রেশনিং-বহির্ভূত এলাকার যেখানে চাল জমায় সেখানে চালের দর বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে—

বৎসর	চালের দাম
১৯৪৭	১৫৮/০ আনা মণ
১৯৪৮	১৯/০ " "
১৯৪৯	১৯৮/০ " "
১৯৫০	২২৮/০ " "
১৯৫১	২৭৮/০ " "

অত্যাধিক ‘রেশনিং’ এলাকার বহির্ভূত অঞ্চলের লোকদের তুলনায়, রেশনিং এলাকার লোকেরা খাদ্য সম্বন্ধে কিছু সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পণ্যের দর ক্রমশঃ বেড়েই গেছে—

১৯৩৯ আগষ্ট ১০০

	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১
খাদ্যশস্ত্র	৩১২	৪৪৩	৪৬৫	৪৭১	৪৮৩
ডাল	৪৭১	৪২৪	৪৩৮	৪৪৯	৫০৬
চামড়া	৩০২	৩০৪	৩১২	৩৫৪	৪৫৩
উদ্ভিজ্জ তৈল	৫২৫	৫২২	৬১১	৬৮৬	৬৭৯
মুতা	২৯৫	৪৪৮	৪৩০	৪১১	৪৮৩
বাড়	১৩১	১৭০	১৭৩	১৭৭	১৯৭

ধৈইল	১১২	৪০১	৪০৩	৪৭০	৫০০
টেক্সটাইল	৩১৪	৪০৪	৩৯৮	৪০২	৪৬৮
কারখানাজাত পণ্য	২৭৬	৩৪১	৩৪৪	৩৪৩	৩৯৬

মজুরশ্রেণীর কষ্ট অক্‌জিডিং-এর ইন্ডেক্স দেখলেও এই কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়—

১৯৩৯ আগষ্ট ১০০

	বোম্বাই	আমেদাবাদ	শোলাপুর	কানপুর	মাজাজ	কলিকাতা
১৯৪৭	২৬৫	৩০০	৩৪০	৩৭৮	২৭৭	৩০৯
১৯৪৮	২৮৮	৩৩০	৪০০	৪৭১	৩১৫	৩৩৯
১৯৪৯	২৯২	৩৩৯	৪১০	৪৭৮	৩৩০	৩৪৮
১৯৫০	২৯৮	৩৫১	৩৯৮	৪৩৪	৩৩২	৩৪৯

অতএব বলা যায় যে, কষ্ট অক্‌জিডিং নামিয়ে আমার প্রয়াস সফল হয় নি; শুধু পল্লীর জনসাধারণের তুলনায় শিল্পাঞ্চলের লোক কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছে। শিল্পাঞ্চলের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখানোর ফলে যদি ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন বেড়ে যেত তা হলেও কথা ছিল, কিন্তু তাও হয় নি। কর্টোল-আমলে কৃষিক পণ্যের দর বেড়েছে সত্য, কিন্তু কৃষিক পণ্যের তুলনায় অন্যান্য পণ্যের দর বেড়েছে অনেক বেশী। তাই চাষীর চাষের খরচা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। কসল বিক্রি করে চাষী বা পার, অর্থাৎ তার যা মার্জিন বা উদ্ধৃত থাকে, তার মাত্রা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। চাষীর বাড়তির মাত্রা যেমন একদিকে কমে এসেছে, তেমনি অন্যদিকে তার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দরের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। চাষীর কাছে খাদ্যশস্ত্র উৎপাদন করা ভাই হয়ে উঠেছে অ-লাভের ব্যাপার। চাষের জমি ভাই হয়েছে মাছের বিলে পরিণত, ধান জমি হয়েছে পাটের জমিতে রূপান্তরিত। ধান চাষ করার যে অল্পপ্রেরণা তার হয়েছে অভাব। এর উপর আছে প্রকৃতির খেলা, তাই খাদ্যশস্ত্রের উৎপাদন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে কমে আসছে শিল্পের উৎপাদন। এরূপ আত্মঘাতী নীতি কোন ‘ওয়েল্‌ফেয়ার’ স্টেটেরই (কল্যাণকারী রাষ্ট্র) বাহ্যনীর নয়।

দেশজ পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পেয়ে যদি ষাটতি দেখা দেয়, তা হলে বিদেশ থেকে সেই পণ্যটি আমদানী করাই হ’ল প্রকৃষ্ট উপায়। যুদ্ধাবসানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হক্ক তাতে খাদ্যশস্ত্রের দর হ্রাসের বাজারে যথেষ্ট চড়ে যায়। যে সব দেশ বাড়তি উৎপাদন করেছে তারা পেল অপরূপ সুযোগ। বুভুক্ষু ভারতের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা হাঁকল অসম্ভব রকম চড়া দর। এই চড়া দরে খাদ্যশস্ত্র বরাদ্দ করা ছাড়া ভারতের গত্যন্তর ছিল না। মুখর (articulate) শিল্পাঞ্চলের দাবি যত বাড়তে লাগল, ভারতের আমদানির পরিমাণও সেই অল্পপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ’ল। প্রদেশগুলির দাবি যে অল্পপাতে বেড়ে চলল, সেই অল্পপাতে চাষীর কাছ থেকে

প্রদেশগুলির সংগ্রহের পরিমাণ কমতে লাগল। প্রদেশগুলির দাবি সে সব সময়ে ন্যায়সঙ্গত ছিল না, তা বুঝা যায় এই দোষে যে সাবসিডি উঠিয়ে দেওয়ার পর তাদের চাহিদা গেল কমে। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে সাবসিডি পুরামাআর বজায় রাখলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের পক্ষে বাজেট ব্যালান্স করা জমশ: অধিক-তর কষ্টসাধ্য হয়ে উঠত। এই হিসাবে বলা যায় যে সাবসিডি উঠিয়ে দেওয়াই হয়েছে যুক্তিসঙ্গত।

সাবসিডি-প্রাপ্ত পণ্য যে দরে বিক্রয় হয় সেটা তার স্বার্থ দর নয়। পণ্যটির স্বার্থ দর হ'ল=যে দরে পণ্যটি বিক্রয় হচ্ছে+সাবসিডি যা দেওয়া হচ্ছে। সমাজের লোকসংখ্যা যদি হয় "ক", এবং মাথা-পিছু "খ" পরিমাণ খাতশস্ত্র যোগান দিতে হয়, তা হলে গবর্ণমেন্টকে মোট যোগান দিতে হয় "কখ" পরিমাণ খাতশস্ত্র। এখন যারা কট্টোলদরে খাতশস্ত্র পায় তাদের সংখ্যা যদি হয় "ক১" ও মাথা-পিছু পায় "খ১" তা হলে মোট "ক১ খ১" পরিমাণ খাতশস্ত্রের দাম পাওয়া যাবে "রেশনড" এলাকা থেকে এবং বাকী শতের (কখ-ক১খ১) দায়িত্ব পড়ে গবর্ণ-মেন্টের ঘাড়ে—অর্থাৎ, তার মূল্যের জন্য দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হয় (ক-ক১) লোককে।

কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বোঝার চেষ্টা করা যাক। চালের কথাই বলি। গবর্ণমেন্ট চাষীদের কাছ থেকে চাল সংগ্রহ করেন সাধারণত: ১৬ দরে। যে পরিমাণ চাল পূর্বে সংগৃহীত হত এখন তা হচ্ছে না; চাল-সংগ্রহের পরিমাণ শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগ কম গেছে। দেশের চাষী-দের কাছ থেকে চাল সংগ্রহের পরিমাণ যে অনুপাতে হ্রাস পায়, যোগান অব্যাহত রাখার জন্য সেই পরিমাণ চালের আমদানী বাড়াতে হয়। আমদানী করা চালের জন্য দাম দিতে হয় ২২ টাকা থেকে ২৭ টাকা পর্যন্ত; গড়ে বরতে পারি ২৪।০ আনা। বরা যাক, গবর্ণমেন্টের পক্ষে সংগ্রহ করে মজুত রাখা দরকার "ক" পরিমাণ চাল। দেশের চাষীদের কাছ থেকে সমস্তটা সংগ্রহ করতে পারলে খরচ পড়ত (১৬×ক) = ১৬ টাকা। কিন্তু দেশের মধ্য থেকে সংগ্রহের পরিমাণ ২৫ থেকে ৫০ ভাগ কম গেছে বলে এখন খরচ পড়বে—(১৬×৭৫ক+২৪.৫×২৫ক) = ১৮ক টাকা থেকে (১৬×৫ক+২৪.৫×৫ক) = ২০.২ক টাকা। তার মানে এই হ'ল যে, দেশের মধ্য থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ করতে না পারার দরুন সংগ্রহ-ব্যয়ই বেড়ে গেল শতকরা ২৫ টাকা; এবং গবর্ণমেন্টের খরচ বাড়ার অর্থই হ'ল সাধারণ করদাতার চাপ বাড়। রেশনিং এলাকার অন্তর্ভুক্ত লোকদের কট্টোল-দরে চাল সরবরাহ করতে গিয়েই এই অভিরিক্ত খরচ হচ্ছে। অথচ অভিরিক্ত খরচের চাপটা বহন করতে হবে কেবলমাত্র রেশন এলাকার বহির্ভূত লোকদের। অধিকন্ত

জনসমষ্টির মাত্র ১০ ভাগকে এই বোঝা বইতে হবে বলে তাদের উপরের চাপ আরও ১১ ভাগ বেড়ে যাবে। সাধারণ কর-দাতাকে এই চাপের হাত থেকে মুক্তি দিতে হলে রেশন এলাকার বহর বাড়ালে চলবে না; কেননা রেশন এলাকার বহর বাড়ানোর অর্থ হ'ল গবর্ণমেন্টের সংগ্রহ-ব্যয় বাড়ানো এবং তার অর্থ পরোক্ষভাবে করদাতার উপর চাপ বৃদ্ধি করা—যেন এক হাতে মুষ্টি-ভিক্ষা দিয়ে অপর হাতে মোটা মুষ্টি অপহরণ করা হ'ল। সুতরাং একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সাব-সিডি তুলে দেওয়া।

উপরের আলোচনার দোখাতে চেয়েছি সাবসিডির পুনঃ-প্রবর্তন অর্থনীতির দিক থেকে কল্যাণকর নয়। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় কি? বিশেষত: পশ্চিম বাংলার নীতি কি হওয়া বাঞ্ছনীয়?

'কমল বাড়ানো' আন্দোলন চালিয়ে এবং এই আন্দোলনের সমর্থনে দমির উদ্বারসাধন করেও বিশেষ ফল পাওয়া যায় নি। এ বছরে চাষের বহর দেবে অনুমান করা যাচ্ছে যে, এবার শস্যের ঘাটতি হবে আনুমানিক শতকরা ২৬ ভাগ। সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ্য করে বলা যায় যে, মোটামুটি তাবে ১০ থেকে ১৫ ভাগ পর্যন্ত ঘাটের ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা—

বৎসর	শতকরা কত ভাগ ঘাটতি হয়েছে
১৯৪৭	৬
১৯৪৮	১০.৫
১৯৪৯	২০
১৯৫০	১৬
১৯৫১	৬.৫
১৯৫২	২৬ (আনুমানিক)

শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ ঘাটতি এমন কিছু মাত্রাত্মক নয়। চাষী উদ্দীপনা পেলে সহজেই এই ঘাটতির অনেকটা পুষিয়ে দিতে পারে। সুতরাং হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার কারণ থাকা উচিত নয়। অথচ সে অবস্থার উদ্ভব হওয়ার বোঝা যায় যে, গবর্ণমেন্টের বাতর্নীর মধ্যে কোথাও গলদ রয়েছে। সাবসিডিই পরোক্ষ ভাবে চাপ দিয়ে চাষীর উৎপাদনের প্রেরণাকে করেছে ব্যাহত। মজার কথা এই যে, হ্রাসকপীড়িত অঞ্চলের জন্য দরদ যারা দেখাচ্ছেন তাঁরাই আবার সাবসিডির সপক্ষে অভিযান চালিয়েছেন।

রেশনিং এলাকার খাতশস্ত্র সরবরাহ করবার জন্য চাষীর কাছ থেকে গবর্ণমেন্ট যে চাল সংগ্রহ করেন তার পরিমাণ মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগের বেশী নয়—

বৎসর	সংগ্রহের পরিমাণ টন	মোট উৎপাদনের শতকরা
১৯৪৭	৪,৪৭,০০০	১৩'৮
১৯৪৮	৪,৬৭,০০০	১৪'৭
১৯৪৯	৪,৩৭,০০০	১৪'৫
১৯৫০	৪,৭৩,০০০	১৪'২
১৯৫১	৪,৩২,০০০	১১'৯

কোন একটি বড়োয় খাজদারি বসেছিলেন যে, শিল্পাঞ্চলের লোকের যা প্রয়োজন তার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র অবৈধ উপায়ে (আগসত্) গ্রাম থেকে শিল্পাঞ্চলে আসে; অর্থাৎ উর্দ্ধপক্ষে ২ লক্ষ টন চাল গ্রাম থেকে কলিকাতা অঞ্চলে আসার কথা। সুতরাং শতকরা ৮০ ভাগ কসল (১০০ - [১৫ + ৫]) পল্লী অঞ্চলেই থাকার কথা এবং তা যদি থাকে তা হলে সেখানে হাহাকার উঠে কেন? তা হলে এই চাল গেল কোথায়? অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষীর ঘরে লুকান আছে—অল্পমান করলে কি তুল হয়? পল্লীর লোকের হুখে শোনা যায় যে, এই ভাবে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে প্রতি বৎসরই বহু বান ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। অধিকন্তু ক্যানিং প্রভৃতি লীমাস্ত্র অঞ্চলের লোকেরা সুপারি ও নানা পণ্যের বিনিময়ে বহু পরিমাণ বান অবৈধ উপায়ে পূর্ব-পাকিস্থানে চালান করে দেয় বলেও শোনা যাচ্ছে। গবর্ণমেন্টের তুল নীতিই এই পরিস্থিতির জন্ম দায়ী।

পশ্চিম বাংলার চাষী-পরিবারের সংখ্যা হ'ল ২১,৮০,০০০—এদের মধ্যে ৫ একরের অধিক পরিমাণ জমির মালিক শতকরা ১৫টি পরিবারের বেশী নয় (ইশাক কমিটির রিপোর্ট)। অন্ততঃ ৫ একর জমি থাকলে একটি পরিবারের স্বচ্ছন্দে চলে। অতএব বলা যায় যে শতকরা ৮৫টি চাষী পরিবারের যা আর তা 'সাবসিস্টেন্স মেডেলে'র উপরে নয়। অর্থাৎ—উর্দ্ধ কসলের মালিক প্রধানতঃ মাত্র কয়েক শত পরিবার। বিত্ত ও প্রতিপত্তির জোরে এরা গবর্ণমেন্টের সংগ্রহনীতি বানচাল করে দিতে সক্ষম। তাই সরকারকে চাল সংগ্রহের জন্ত নির্ভর করতে হয়েছে প্রধানতঃ ছোট ছোট চাষী-পরিবারের উপর। এই সংগ্রহনীতির ফলে চাষীর হাতে কিছুই উর্দ্ধ থাকে না। গ্রামের চাষী-মজুর বা ভাগচাষীর অভাব পড়লে এরাই তাদের দান দিবে বাচিয়ে রেখেছে। তাই চাষী-মজুরের অবস্থা কোনকালে সচ্ছল না থাকলেও, বাস্তবাবে তাদের অমাহারে থাকার সম্ভাবনা ছিল না। যে চাষী অভিজি-অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করতে সদাই প্রস্তুত থাকত, সেই চাষী আজ বর্তমান সংগ্রহনীতির ফলে অভিজি দেখলে আতঙ্কিত হয়। বড় চাষী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হ'ল বিদেশী, মহাজন বা প্রবাসী। গ্রামবাসীর সঙ্গে তাদের নাকীর যোগ নেই। তাই দরদের অভাব। ছোটখাটো চাষী এরূপ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাই

পল্লীতে ভাগে হাহাকার। এই হাহাকারের সম্মুখীন হয়ে অনেকেই বজায়ে রেশনিং এলাকা বিত্ত করত। কিন্তু রেশনিং বাড়ানোর অর্থ হ'ল সংগ্রহ বাড়ানো। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা কতটা সম্ভব ও মুক্তিসদৃশ ভেবে দেখা দরকার। সংগ্রহের পথে বাধা সৃষ্টি করে রেশনিং ব্যাপকতর করতে বজার অর্থ তাই আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পাঞ্চলকে খাওয়াতে গিয়ে পশ্চিম বাংলা গবর্ণমেন্টকে সমস্যার পড়তে হচ্ছে। সুতরাং শিল্পাঞ্চলকে খাওয়ানোর দায় থেকে যদি অব্যাহতি পাওয়া যায় তা হলে পশ্চিম বাংলার খাদ্যসমস্যার অনেকটা সুরাহা হয়। অধিকন্তু কারখানার কর্মচারীদের মধ্যে বাংলার বাইরের লোকই শতকরা ৮০ জন। ১৯৪৯ সনে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে এক অল্পসন্ধান চালানো হয়েছিল; সেই কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় :

কোন দেশের অধিবাসী শতকরা করজন কাজ করে—

পশ্চিম বাংলা	২৪'৫
বিহার	২৯'৯
উড়িষ্যা	১০'৯
উত্তর প্রদেশ (ইউ. পি.)	২০'৫
মধ্যপ্রদেশ	২'৮
পূর্ব-পাকিস্থান	৬'৩
অন্ধ্র প্রদেশ	৫'১
	১০০'০

কারখানার কর্মীদের সম্ভাব্যবিস্থানের জন্তই প্রধানতঃ যখন 'সাবসিস্টাইন্স' হারে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা তখন এই অঞ্চলের খাদ্য সম্বন্ধে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারেরই লওয়া উচিত। আশার কথা যে, খাদ্যমন্ত্রী কিদওয়াই সে দায়িত্ব-ভার বহন করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

অতএব শিল্পাঞ্চলকে বাদ দিয়ে যে অংশ, তার ভার রইল পশ্চিম-বাংলা গবর্ণমেন্টের উপর। শিল্পাঞ্চলের ৫০ লক্ষ লোককে বাদ দিলে বাকী রইল ২ কোটি লোক এবং এদের জন্ত প্রয়োজন ৩১,৫৯,০০০ টন চাল। বিগত কয়েক বৎসরের হিসাব দেখলে বোকা যায় যে, কলিকাতা অঞ্চলকে খাদ্য যোগাতে না হলে খাদ্যের বিশেষ অভাব হয় না—

বৎসর	খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ (শতকরা ১০ ভাগ বীজ, নষ্ট হওয়া প্রভৃতির জন্ত বাদ দিয়ে)
১৯৪৭	৩২,৩৬,০০০ টন
১৯৪৮	৩১,৬১,০০০ "
১৯৪৯	৩০,১৫,০০০ "
১৯৫০	৩৩,২৬,০০০ "
১৯৫১	৩৬,৩৫,০০০ "
১৯৫২	৩০,৩৪,০০০ (আনুমানিক)

গবর্ণমেন্ট খোষণা করেছেন—আমদানী শুল্কশেতর পড়তা যা পড়বে সেই দরে “ফেরার প্রাইস” দোকানে চাল বিক্রি হবে—কলিকাতার “ফেরার প্রাইস” দোকানে চাল ৩০ টাকা দরে বিক্রী হয়। সুতরাং হুনিয়ার বাজারে চালের দর ২৭ টাকা থেকে ৩০ টাকা বরঙে পারি। অথচ চাষীর কাছ থেকে আমরা চাল সংগ্রহ করছি ১৬ টাকা দরে। খোলা বাজারে চাষীর পক্ষে ২০।২৫ টাকা দর পাওয়া অসম্ভব ছিল না। চাল সংগ্রহের দর, হুনিয়ার বাজারের দরের তুলনায় যদি অস্বাভাবিক রকম কম রাখা যায়, তা হলে চাষীর উৎপাদন করার প্ররুতি নষ্ট হয়। বেশী ফসল পেতে হলে চাষীকে দিতে হবে “ইনসেন্টিভ” বা অনুপ্রেরণা। তাই অধিকতর উৎপাদনে চাষীকে উৎসাহ করতে হলে গবর্ণমেন্টকে সংগ্রহ-দর (প্রকিওরমেন্ট প্রাইস) বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিযোগিতার বেচবার সুযোগও দিতে হবে। পূর্বেই দেখেছি চাষী-পরিবারের সংখ্যাই অধিক। সামান্য যা তারা উৎপাদন করে তা থেকে পরিবারের লবঙ্গসরের খরচ ও বীজধানের জন্য খাম খরে ভুলে রেখে যদি কিছু উৎসাহ থাকে তবেই তারা বাজারে বিক্রী করতে আসে। সুতরাং খোলাবাজার পেনে পল্লী অঞ্চল খাদ্যহীন হয়ে যাবে এ ধারণা অস্বলক। পক্ষান্তরে মহাজন, জমিদার প্রভৃতি বড় বড় চাষী, ‘কর্ডন’ থাকলেও লাভের সম্ভাবনায় ‘মাগল’ করতে পক্ষাৎপন্ন হবে না। কিন্তু খোলাবাজার থাকলে এই খোলাবাজারীদের বেচতে হবে উচ্চ দরে; অধিকন্তু লুকানো ফসলও এসে উঠবে বাজারে। আর প্রথম বাজার পাবার জন্য লুকানো চাল যদি প্রতি-যোগিতার বাজারে আসতে থাকে তা হলে বাজার বেমে যাওয়াই সম্ভব। সুতরাং সংগ্রহ-দর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে চাল সংগ্রহ করে প্রত্যেক ধানার যদি “ফেরার প্রাইস শপ” খোলা যায় এবং ফেরা-বেচার সর্ববিধ বাধা অপসারিত করে স্বাভাবিক ভাবে কারবার করতে দেওয়া হয়, তা হলেই খাদ্যসমতা আয়ত্তের মধ্যে আসার সম্ভাবনা। সংগ্রহ-দর বাড়িয়ে দিলে গবর্ণমেন্টের খরচ কিছু বাড়বে সত্য, কিন্তু সাবসিডি দিতে হলে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হ’ল তা হবে না, অথচ গবর্ণমেন্টকে পক্ষপাত-দোষেও দোষী হতে হবে না। চাষীও তখন পাবে অধিকতর উৎপাদনের প্রেরণা।

কলিকাতাই হ’ল খোলাবাজারের কেন্দ্র। কলিকাতার বাজারে চাহিদা প্রবল থাকলে খোলাবাজারীরা ‘মাগল’ করতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং প্রথমতঃ কলিকাতার চাহিদাই হ’ল খোলাবাজারী-দরের নিয়ামক। কলিকাতার এই চাহিদার প্রকৃতিটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। সপ্তাহে একজন লোকের গড়ে ৩।০ সের চাল লাগে, খাদ্য-গবেষকেরা বলে-ছেন। কর্টেলের বরাদ্দ সপ্তাহে ১ সের চাল ও ১ সের দশ ছটাক আটা ময়দা বা গম; অর্থাৎ মোট ২ সের ১০ ছটাক।

সুতরাং খাটতি হয় ১৪ ছটাক খাদ্যশুল্ক। আমাদের পারি-বারিক অভিজ্ঞতাও তাই। সাধারণতঃ লোকের কালোবাজার থেকে সপ্তাহে এক সের করে চাল খরিদ করতে হয়। কালো-বাজারের দর এই এক সের চাহিদার উপর নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্ডনিং-এর ফলে মাগল করা যত অনুবিধায়মক হয় কালো-বাজারের দর তত চড়ে থাকে। অধিকন্তু খোলাবাজারে কেনার উপায় নেই বলে যাদের সামর্থ্য আছে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরিদ করে ভবিষ্যতের জন্য মজুত রাখতে উদ্বুদ্ধ হয়। খোলাবাজারের দর এতেও কিছু চড়ে, লোকে তাই সেরপ্রতি এক টাকা থেকে দেড় টাকা পর্যন্ত দিলে চালের অভাব পূরণ করতে বাধ্য হয়।

কলিকাতা অঞ্চলে খাদ্য বর্ডনের যে নতুন ব্যবস্থা হ’ল তাতে আমরা কর্টেলের দরে ২ সের ১০ ছটাক খাদ্যশুল্ক ত পাবই, অধিকন্তু ফেরার প্রাইস শপ থেকে ৩০ টাকা দরে অতিরিক্ত ৬ ছটাক চালও পাব। সুতরাং আমাদের অভাব থাকবে মাত্র ৮ ছটাকের। অতএব এখন খোলা-বাজার বা খোলাবাজারের দর নির্ভর করবে এই ৮ ছটাক চাহিদার উপর। পুলিশের কুলের ও ভোর ভয় না করে খোলাবাজার থেকে প্রয়োজন বোধ করলেই যখন যতটা ইচ্ছা চাল বা আটা যে-কোন সময়েই কেনা যাবে তখন পূর্ন থেকে কিনে গরুর করে রাখার প্ররুতি না জাগাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে এই অতিরিক্ত ৬ ছটাক দিয়েই দুই এক সপ্তাহ চালিয়ে নেওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং চাহিদা হ্রাস পাওয়ার, এবং ভীতভা কমে যাওয়ার খোলাবাজারের দর পড়াই স্বাভাবিক। আশপাশের গ্রাম থেকে যে সব মেয়েপুরুষ লুকিয়ে চুরিয়ে ছ-দশ সের চাল মাথার করে এনে আমাদের অভাব মিটিয়েছে এখন তারা বেচতে চাইলে তাদের বেচতে হবে সের প্রতি ১২ আনার কমে; তাই খুব বেশী চাল ‘মাগল’ হয়ে কলিকাতার দিকে আসার সম্ভাবনা কম। বর্তমান নীতির ফলে তাই সাধারণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প দরে চাল কিনে অভাব মেটানো সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

বর্তমান খাদ্যনীতির ফলে খোলাবাজারীরা যাতে গ্রামকে নিঃস্ব করে সমস্ত চাল কলিকাতা এলাকায় এনে ফেলতে না পারে তার জন্য গবর্ণমেন্ট চেয়েছেন কলিকাতা অঞ্চলকে কর্ডনের বেড়া-জাল দিয়ে ঘিরতে। ব্যবস্থাটা খুব সুজি-সঙ্গত বলে আমরা মনে করি না। পূর্বেই বলেছি যে, খোলাবাজার বা খোলাবাজারের দর কলিকাতা অঞ্চলে নির্ভর করবে ৮ ছটাক খাটতি চাহিদার উপর। ‘মাগল’ করার প্ররুতি তখনই প্রকট হয় যখন যু কির অস্থপাতে হুদাকা পাওয়া যায় প্রত্যেক। বাজার হুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে “ফেরার প্রাইস শপ” প্রবর্তন করার খোলাবাজারে চালের দর থাকবে ৩০ টাকায় কাছাকাছি; অতিরিক্ত চালের দর

অদূর ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎকালও বাতানো গবর্ণমেন্টের পক্ষে যদি সম্ভব হয় তা হলে বাজার না মেমেই পারে না। এরূপ অবস্থার কর্তনের খেড়া তুলে কৃত্রিম উপায়ে ঘোণান ব্যাহত করে কালোবাজারীদের সুবিধা করে দেওয়ার কোন অর্থই বুঝে পাওয়া যায় না। দুনিয়ার বাজার-দরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেচার কিছু সুযোগ চাষীরা যদি পায় তা হলে লাভের মুখ দেখে তারা স্বভাৱেই অধিকতর উৎপাদনে উদ্বৃত্ত হবে। গ্রাম থেকে কলকাতার দিকে চালের অভিযান নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা যদি থাকে তাহলে কর্তৃনির্ভর বদলে 'ল্যাণ্ড কাষ্টমসের' ব্যবস্থা করলে স্কুল পাওয়া যাবে আশা করা যায়। স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে অঘণা বাধার সৃষ্টি করলে কৃষি বা বাণিজ্য কোনটাই প্রসারলাভ করতে পারে না। মাত্র একটা ডিক্লোরেশন বিবৃতি দিয়ে যে-কোন বণিক বা চাষী যদি চাল কলকাতা অঞ্চলে চালান দিতে সমর্থ হয় তা হলে ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা স্বাভাবিক পথে চলতে পারে। কলকাতার বাইরের দরের সঙ্গে, কলকাতার দরের সমতা রাখার জন্ত একটা সমতামূলক শুল্ক যদি ধার্য করা যায়, তা হলে আর আশঙ্কার কারণ থাকে না; অধিকন্তু গবর্ণমেন্টও একটা নূতন আয়ের পথ বুঝে পান।

বর্তমানে যেভাবে চাল সংগ্রহ করা হয় তাতে চাষীর মনে 'জোর-জবরদস্তি'র একটা ধারণা জন্মে; তাই অনেক ক্ষেত্রেই বাবাদামের কথা শোনা যায়। কিন্তু স্বাধীনভাবে বেচবার ও যে-কোন স্থানে (পশ্চিম বাংলার ভিতর) বেচবার অধিকার যদি থাকে, তা হলে ভাষ্য-দরে গবর্ণমেন্টকে না বিজ্ঞী করবার কোন কারণ নেই, বরং তারা বুশীমনেই এসিয়ে আসবে। সরকারের মত ধরিদারকে যখন পাবে তখন চাষীর না বেচবার কোন মুক্তিসঙ্গত কারণ বুঝে পাই না। মহাজন-চাষীর কাছেই বিশেষতঃ কলকাতার বাজার লোভের বস্তু। যে সব ষাঁটী দিয়ে কলকাতায় চাল প্রবেশ করা সম্ভব, সেই

সব ষাঁটীতে যদি "কাষ্টমস পোষ্ট" বসান যায় এবং ঘোষণা করা হয় যে, শুধু দিয়ে কলকাতায় যে কেউ চাল আমদানী করতে পারে এবং চাল আমদানী করতে গেলে কাষ্টমস পোষ্টে একটা ফিল্মিতি দিতে হবে যে কে, কার কাছ থেকে, কত চাল আমদানী করছে ইত্যাদি এবং ঐ কাষ্টমস ষাঁটীতে নির্দিষ্ট হারে শুল্ক আদায় করে ছাড়পত্র সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয় তা হলে যারা প্রকৃত বণিক তারা সুযোগ পাবে এবং তার ফলে কলকাতার বাজারদর নাযায় সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে এই নীতি অনুসরণ করলে গ্রামকে দ্বিত্ব করে সব চাল কলকাতা অভিমুখে আসার সম্ভাবনাও কমে যায়। মুশাকার সম্ভাবনা থাকলে কালোবাজারীদের কর্তনের বেড়াভাল দিয়ে দূরে রাখা যাবে না, 'স্মাগল' তারা করবেই। অথচ শুধু দিয়ে চাল আমদানী করার সুবিধা যদি থাকে, তা হলে কালো-বাজারীদের সঙ্গে সত্যকারের বণিকদের চলবে প্রতিযোগিতা এবং এই উভয়ের প্রতিযোগিতায় চাষী পাবে ভাল দর, তথা অধিকতর উৎপাদনের প্রেরণা। অধিকন্তু গবর্ণমেন্টও লাভ-বান হবেন, শুল্ক বাবদ কিছু আয় হবে এবং তাই দিয়ে চাষীর কাছ থেকে বড়িও দরে সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। তা ছাড়া, কোন আড়তদারের ধরে কত চাল উঠল তারও একটা হিসাব হাতে হাতে পাওয়া যাবে। সুত্তরাং আড়তদার-দের কাকি, জুয়াচুরি ধরাও অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। বাজার কোণঠাসা করে বাজার চড়াবার প্রবৃত্তি যদি আড়তদারদের মনে জাগে, তা হলে মজুত মাল বাজেরাগ্রস্ত করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। অবশ্য জনসাধারণের সহ-যোগিতা পেলেই যে-কোন নীতি সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। যারা জনসাধারণের প্রকৃতই হিতকারী—তাঁরা তিনি যে দলেরই হউন না কেন, আশা করা যায়, তাঁরা এই নীতি অনুসৃত হলে সর্বাঙ্গতঃ করণে সহযোগিতা করবেন, কেননা এখন ষাণ্ডসমস্তাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

সুরেন্দ্রনাথ

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্র-শত্রু,

মাতৃ-ঘট্র শত্রু

হ'ল তব তুর্ধ্য-রবে হে সুরেন্দ্রনাথ।

ভদ্র-বদে এল মন-চেতনার প্রসন্ন প্রভাত।

প্রাণ-স্পন্দ ফুট হ'ল কতালের : ক্ষতীরতা জয়-দৃষ্ট-চিত্তে

সাজিল সৈনিক-বেশে লৌহকারা বিচূর্ণ করিতে।

অন্ত হ'ল রাজ-শক্তি : হ'ল নত পির

দন্ত বিদেশীর।

মহারথ।

আত্মের পর্কিত

ভেমিরা ভোমার রথ অব্যাহতগতি :

মুক্তভর আত্মবোধ অত্যায়ে করে নাই নতি।

জাতিরে দেখালে পথ, পৌরুষের বীরমন্ত্র ক'রে গেলে দান :

বাকালীর হাতে তুমি তুলে দিলে বিজয়-রূপাণ।

বদেশের মুক্তি লাগি' ক'রেছ সংগ্রাম :

তোমায় প্রণাম ॥

পৌরাণিক গ্রন্থে ভারতের আদিম মানব-প্রসঙ্গ

শ্রীকালিদাস দত্ত

ভারতবর্ষের হিন্দু-সভ্যতা কেবলমাত্র আৰ্য্যজাতির অবদান নহে। স্বদূর অতীত যুগ হইতে বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির সমন্বয়ে উহা গঠিত হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে ভারতের বর্তমান বিরাট হিন্দুজাতিরও উদ্ভব হইয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক আদিম অনাৰ্য্য জাতিও আছে। আৰ্য্যজাতির আগমনের বহু পূর্বকালে উহারা ভারতভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তন্মধ্যে দুই-একটি জাতি অল্পকাল প্রাকৃতিক পরিবেশে উচ্চাঙ্গের সভ্যতা গঠনেও সক্ষম হয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অভাবে এই সমস্ত আদিম মানবের প্রকৃত ইতিবৃত্ত পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের বহুদিনের অন্বেষণের ফলে উহা ক্রমশঃ জ্ঞানগোচর হইতেছে। পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে এই শ্রেণীর মানবগণের কথাই দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস, বানর ও পক্ষীরূপে বহু অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত কাহিনীর সহিত বিজড়িত আছে। তজ্জন্যই এই সকল গ্রন্থে উহারা অতি-প্রাকৃতরূপে বর্ণিত হইলেও, দেখা যায় যে মনুষ্যের অল্পরূপ উহাদের মন, বুদ্ধি ও কথাবার্তা ছিল। উহারা গ্রাম নগরাদিতে গৃহাদি নির্মাণ-পূর্বক বসবাস করিত। উহাদের মধ্যে বহু যোদ্ধা, রাজা, ও শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল। সময় সময় আৰ্য্যেরাও এরূপ দানব বা অসুরের স্তম্ভরীকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন। আৰ্য্যবংশীয় ঋষিপুত্রগণও আবার পতিত হইয়া উক্ত রাক্ষস-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতেন।

এই সমস্ত বিষয়ের উদাহরণ-স্বরূপ বাণ্মীকি রামায়ণ হইতে রাবণের লঙ্কাপুরীর বিবরণ^১, বানররাজ বালির স্বর্ণখচিত যশস্কর্ণ ও ধ্বজাশোভিত রাজধানীর বৃত্তান্ত^২, জটায়ু পক্ষীর পৈতৃক রাজ্যশাসন ও রাজা দশরথের সহিত সখ্যের কথা^৩, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে সর্পশাস্ত্রবিদ্যার পিজলাক্ষ, বিরোধ, স্থপুত্র ও স্থমুখ নামক পক্ষীদের বিদ্রোহ-চলে জৈমিনীকে মার্কণ্ডেয়-ক্ৰোধে পুড়িয়া সংবাদ উপক্রম দ্বারা ব্যাখ্যার কাহিনী^৪, এবং পুরাণসমূহ হইতে আৰ্য্যপুত্র যযাতি কর্তৃক দানবরাজ যবপর্কের দুহিতা শর্মিষ্ঠার পাণি-গ্রহণ^৫ ও আৰ্য্যধর্মবিগর্হিত কার্য্য করিবার জন্য সূর্য্যবংশীয়

রাজা কল্যাণপাদ^৬ এবং ঐলবিল বিশ্রবা ঋষির পুত্র রাবণ ও বিভীষণ প্রভৃতির রাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হইবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাইতে পারে।^৭

এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল অসুর, রাক্ষস, বানর ও পক্ষী মনুষ্য ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। বৈদিক গ্রন্থে যে পঞ্চকৃষ্টি বা পঞ্চ মনুষ্য-জাতির উল্লেখ আছে যাক্ষ প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিত উহা গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণকে বুঝাইত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।^৮

পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে অনাৰ্য্যদের এরূপ বর্ণনার কারণ অল্পসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতীয় আৰ্য্যেরা চতুর্দিকে এই সকল আদিম জাতির দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত ভারতীয় আৰ্য্যদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির গুরুতর পার্থক্য ছিল। আৰ্য্যেরা তাহা ভীতভাবে অনুভব করিতেন। সে কারণ তাঁহারা এই সকল অনাৰ্য্যকে মানব-অপেক্ষা হীন বিবেচনার নিম্নাত্মক দৈত্য, দানব, রাক্ষস, বানর, অসুর ও পক্ষী সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐতরেয় আরণ্যকে বজ্র, বগধ ও চের এই ত্রিবিধ প্রজা বা মানবের বিহঙ্গ নামে যে উল্লেখ আছে উহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।^৯ কালক্রমে এই প্রকার উক্তিসমূহ জনপ্রবাদের সাহায্যে সাধারণ লোকের মনে বিকৃতরূপে বদ্ধমূল হইলে, অবাস্তবে বিধাতার, সনাতন-সংস্কারসম্পন্ন কবি ও লেখকগণ যে কাল্পনিক বর্ণনার দ্বারা উহা এরূপ অতি-প্রাকৃত ও ভয়াবহ করিয়া তুলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কল্পনাপ্রসূত এই প্রকার বহু অবাস্তব বিবরণের সহিত জড়িত হওয়ায় পৌরাণিক বৃত্তান্তগুলিতে কোন ঐতিহাসিক সত্য থাকার সম্ভাব্য নহে এই ধারণা পূর্বে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অল্পসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা স্বদূর অতীতের অন্ধকার হইতে ভারত-বর্ষের প্রকৃত ইতিহাস ক্রমশঃ আবিষ্কারের ফলে এই সমস্ত পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে স্থানে স্থানে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে সেগুলির উপরও কিছু কিছু আলোকপাত হইতেছে।

১ বাণ্মীকি রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৩য় সর্গ।

২ এই কিকিষ্কাকাণ্ড, ১৪শ সর্গ।

৩ এই অরণ্যকাণ্ড, ৫০ ও ৫৩ সর্গ।

৪ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, অবতারণিকা।

৫ মৎস্যপুরাণ, ৩০।৩২।৩৩ অধ্যায়।

৬ বিষ্ণুপুরাণ, ৪২ অধ্যায়।

৭ কুর্ধপুরাণ, ৪২ অধ্যায়।

৮ নিকন্ত (৩৮)

৯ মৎস্যপুরাণ, ১৪২ অধ্যায়, (১৭।২১)

পুরাণকারগণ ভারতের প্রাচীন মানব-সভ্যতার বয়স দিব্যমানের হিসাবে দশ হাজার আট শত বৎসর ধরিয়েছেন এবং উহা কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপর নামে তিনটি যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্ত হিসাবমতে কৃতযুগ চারি সহস্র বৎসর ও উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ চারি শত হিসাবে আট শত বৎসর, ত্রেতাযুগ তিন সহস্র বৎসর ও উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন শত হিসাবে ছয় শত বৎসর এবং দ্বাপরযুগ দুই সহস্র বৎসর—উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত হিসাবে চারি শত বৎসর।

পুরাণে উল্লিখিত এই কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপর তিনটি কালই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্গত। তন্মধ্যে প্রথমটি উহার আদি, দ্বিতীয়টি মধ্য ও তৃতীয়টি অন্তকাল। উক্ত আদিকালের মানবগণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পৌরাণিক গ্রন্থে আছে এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে।

বহু কাল্পনিক অবাস্তব বিবরণের সহিত জড়িত থাকিলেও ইহার কিয়দংশের সহিত অন্তঃসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা লব্ধ আদিম মানবগণের বিবরণের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। বায়ু-পুরাণে উক্ত অংশ এইরূপ :

“সরিংসরঃ সমুদ্রাংশঃ সেবন্তে পর্কতানপি ।
ভদ্রা নাভ্যবু শীতোষ্ণ যুগে তস্মিন্চরন্তি বৈ ॥
পৃথিবীসৌভবং নাম আহারং জাহরন্তি বৈ ।
তাঃ প্রজাঃ কামচারিণ্যো মানসীং সিদ্ধিমাশ্ৰিতাঃ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মো ন ভাবান্তাং নির্বিশেষাঃ প্রজান্ততাঃ ।
তুল্যমানুঃ স্বর্গং রূপং ভাসাং তস্মিন্ কৃতে যুগে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মো ন ভাবান্তাং কল্লদৌতু কৃতে যুগে ।
যেন বৈশাধিকারেণ জজিরে তে কৃতে যুগে ॥

...
নির্বিশেষান্ত তাঃ সর্কা রূপাবু শীলচেষ্টিভেঃ ।
অবুদ্ভি পূর্ককং বৃত্তং প্রজামানু জাহরতে বয়ম্
অপ্রবুদ্ভিঃ কৃত যুগে কর্দ্দণোঃ শুভপাপয়োঃ ।
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাস্ত ন ভদাসন্ন লকরঃ ১১০

অর্থাৎ—সেই আদিম যুগে শীত, বৃষ্টি ও আতপাদি কম ছিল, প্রজাগণ সরিৎ সরোবর ও পর্কতাদিতে তখন বাস করিত। সেই সমস্ত কামচারী মনঃসিদ্ধিসম্পন্ন প্রজাগণ পৃথিবীর স্বভাবজাত আহারসমুদয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম ছিল না, সকলেই নির্বিশেষ ছিল। স্বখাদি সকল বিষয়ে তাহারা তুল্য ছিল। সকলেই নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া জীবন যাপন করিত।...রূপ,

স্বভাব ও ক্রিয়া প্রভৃতি সকলেরই সমান ছিল। কাহারও কিছুমাত্র বিদ্বেষ দেখা বাইত না। কেহ ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া কোন কাজ করিত না, পরন্তু স্বভাববশেই কাজ করিত। কৃতযুগে শুভ অশুভ কোন বকম কর্ণেরই প্রবৃত্তি ছিল না, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাও ছিল না।

ঐ সময় মানবেরা যে যাবাবর ছিল তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, “কৃতং সম্পত্ততে চরণ” (কৃত-যুগে মানবেরা বিচরণশীল ছিল) এই উল্লেখ হইতে।^{১১}

মহাভারতে তৎকালীন নারীদেরও বিবরণ এইরূপ, “মহিলারা তখন অনাবৃত থাকিত। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিত। কোমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। তখন ঐরূপ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত ছিল।”^{১২}

মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত আছে যে ঐ প্রকার আদিম সভ্যতার অবসানে ত্রেতাযুগের আরম্ভ হয় এবং সেই সময় হইতেই ঐরূপ মানবগণের মধ্যে গৃহ ও গ্রাম নির্মাণ এবং বার্তাবিনিময়ের প্রবর্তন হইতে থাকে। যথা :

“অন্তহিতায়াং সন্ধ্যায়াং সার্কং কৃত যুগেন হি ।

কামাখ্যায়াং প্রযত্নায়াং প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে তদা ॥

ওষধীসু চ জাতাসু প্রযত্নে বৃষ্টি সর্জনে ।

প্রতিষ্ঠাভায়াং বার্তায়াং গ্রামেষু চ পুরেষু চ ॥^{১৩}

অর্থাৎ—কৃতযুগ সন্ধ্যা সহ অন্তহিত হইলে ত্রেতাযুগের আরম্ভ হয়। পরে স্রবৃষ্টির ফলে সর্কজ ওষধিসমূহের উদ্ভব হয় এবং গ্রাম পুরাদি প্রতিষ্ঠা ও বার্তাবিনিময় প্রবর্তিত হইতে থাকে।

বায়ু-পুরাণকার ঐ সময়ের অবস্থা আরও বিশদভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই :

“কৃত্য ঘন প্রভীকারং নিকৈতানি হি তেজিরে ।

পূর্কং নিকামচারান্তে অনিকৈতাশ্রয়া ভূশম্ ।

যথাযোগ্যং যথা শ্রীতি নিকৈতদ্ববসন্ পূমঃ ।

মরুৎঘনু নিয়মু পর্কতেষু নদীসু চ ।

সংশ্রয়ন্তি চ দুর্গাণি ধ্যানং শাখতোদকম্ ।

যথাযোগ্যং যথাকামং সমেষু বিষমেষু চ ॥

আরক্তান্তে নিকৈতান বৈ কর্দ্দং শীতোষ্ণাবরণম্ ।

ভত্তঃ সংস্থাপন্য মাস খেটানি চ পুরাণি চ ॥

গ্রামাংষ্টব যথাভাগং তথৈবান্তঃ পুরাণি চ ।

ভাসামান্যমবিকল্পান সন্নিবেশান্তরাণি চ ॥

১১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,

১২ মহাভারত, আদিপর্ব, ১২২ অধ্যায়

১৩ মৎস্যপুরাণ, ১৪০ অধ্যায়, ২, ৩

চক্ৰভঙ্গা যথা প্রাক্তন মিথ্যা মিথ্যাপ্রণোহুতৈঃ ।

মনোহৰ্হাণি প্রমাণানি ভদ্রা প্রভৃতি চক্ৰিয়ে ॥ ১৪

অর্থাৎ—সেই যথেষ্টবিহারী গৃহহীন প্রজাগণ গাঁজাবরণ দ্বারা শীতবাততাপ-ক্লেণ নিবারণ করিয়া বাসগৃহসমূহ আশ্রয় করিতে আরম্ভ করে। তাহারা যথাযোগ্য স্ব-স্ব প্রীতি অল্পদ্বারে গৃহনির্মাণপূর্বক স্থখে বাস করিতে থাকে। মরু, উন্নত, নিম্ন, পর্বত, নদী, জলপ্রায়, সম, বিষম, দুর্গম, ইত্যাদি নানাস্থানে আপন আপন রুচিমত শীততাপ-ক্লেণ নিবারণ-উদ্দেশ্যে গৃহাদি নির্মাণ আরম্ভ করে। তাহাতেই খেট (ক্ষুদ্র পল্লী) গ্রাম ও পুর ইত্যাদি স্থাপিত হয় এবং সেই সকলের দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদি পরিমাপ করণার্থ তখন অঙ্গুলিদ্বারা বিবিধ পরিমাণ সংজ্ঞাও বিহিত হয়।

১৪ বায়ু পুরাণ, ৮ অধ্যায় ২৩-১০১

বর্তমান কালের অল্পসন্ধানলব্ধ সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে, পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত কৃতযুগের বহু পূর্বকাল হইতে পৃথিবীর নানাস্থানে আদিম মানবগণের অস্তিত্ব ছিল এবং তাহারা তখন সম্পূর্ণ বৃত্ত অবস্থায় কালান্তিপাত করিত। কতকাল পূর্বে পৃথিবীতে ঐরূপ বৃত্ত মানবের সৃষ্টি হয় তাহা এখনও সঠিক নির্ধারিত হয় নাই। প্রাচীনতম বৃত্ত মানব-প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত ওলন্দাজ নৃতত্ত্ববিদ Dr. Gustav von Koeningswald বলিয়াছেন :

“Man in the original form lived in the trees and was a powerful creature. When the forests vanished, the creature moved to the ground and began to specialize in the various avenues of intelligence, such as making of implements.”

ফরাসী রসায়নবিদ্ গে লুসাক

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের যে-কোন এক দিন ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস নগরীর একটি নামকরা রাসায়নিক গবেষণাগার দেখে যে পর্যটকই গিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, চোখে চশমা-পরা গম্ভীর প্রকৃতির এক ফরাসী ভদ্রলোক পরীক্ষাগারের চারদিক ভদ্রাক্ষ করছেন, সঙ্গে তাঁর অল্পবয়সী স্ত্রী এক জার্মান যুবক। ঐ চশমা-পরা ভদ্রলোক হচ্ছেন তাঁদেরই অন্ততম বাদ্যের ঐকান্তিক সাধনা, অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং সত্যানুসন্ধি-সার গুণে রসায়নশাস্ত্র ভার পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর নাম জোন্সেফ লুই গে লুসাক—সংক্ষেপে গে লুসাক; আর জার্মান যুবকটি হলেন জাস্টাস ভন লিবিগ—উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান রসায়নবিদদের মধ্যে একজন নামকরা ব্যক্তি, রসায়নে প্রথম পাঠ গ্রহণ করবার সময়ই শিক্ষার্থী বীর নামের সঙ্গে পরিচিত হয় ‘লিবিগ-কন্ডেলার’ এই কথটির মারফতে। এ সময় লিবিগ গে লুসাকের সহকারী হিসাবে কাজ করছিলেন প্যারিসের গবেষণাগারে।

গে লুসাক জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফরাসীর অন্তর্গত লিমোজ নামক স্থানে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আইনব্যবসায়ী, তা ছাড়া তাঁর ছোটখাটো জোতদারীও ছিল। ফরাসী দেশের অবস্থা তখন অর্ধবিপ্লব এবং আরও নানা কারণে ঘোটেই শান্তিপূর্ণ ছিল না; তাই গে লুসাক

বাড়ীতেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে বাধ্য হন। ১৭৯৪ সালে তিনি প্যারিসে এলেন সেখানকার একজন পলিটেকনিক নামক বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্তে। শহরতলীর কোন এক ভদ্রমহিলার বাড়ীতে তিনি থাকতেন। মহিলাটি প্রতি রাতে গাড়ীভর্তি দুধ বিক্রী করবার জন্তে প্যারিসে আসতেন। সঙ্গে থাকতেন গে লুসাক। সকালবেলা বাড়ী ফেরবার সময় দেখা যেত, গে লুসাক গাড়ীর মেঝের গুয়ে গুয়ে বীজগণিত বা জ্যামিতির পড়া ভেরি করতেন।

১৭৯৭ সালে গে লুসাক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পলিটেকনিক বিভাগে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা পাশ করলেন। তিন বছর পর তিনি এখানকার পড়া শেষ করে ফুরকোয়া এবং বারথোলের সহকারী রূপে কাজ করতে আরম্ভ করেন। বারথোলে তাঁর কর্মজীবনপত্র এবং প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁর নিজস্ব গবেষণাগারে লুসাককে কর্মে নিযুক্ত করলেন। বারথোলে এ সময় নানাবিধ গ্যাস নিয়ে উত্তাপ-প্রয়োগে তাদের আয়তনবৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন। এখান থেকেই গে লুসাক সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি গ্যাসের চাপ, জলীয় বাষ্পের চাপ, ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন।

১৮০৪ সালে গে লুসাক বায়টের সঙ্গে বেজনে চড়ে উদ্ভা-কাশে চুবকের আকর্ষণ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষণ-কার্য করেন। তিনি দেখে পান যে, পৃথিবী থেকে লাভ হাজার মিটার উচ্চ

পর্যাপ্ত চূষক-আকর্ষণের কোনরূপ ভারতম্য হয় না। এক বছর পর তিনি জার্মানী এবং ইটালীতে ভ্রমণের জন্তে বেরিয়ে পড়লেন, উদ্দেশ্য—দেশ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভ। ভ্রমণকার দিনের বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের অনেকের সঙ্গেই তিনি এ ভ্রমণকালে সাক্ষাৎলাভ করেন। বোলোদায় গবেষণাকার্য্য করতেন এ সময় জগদ্বিখ্যাত বিদ্যুৎ-গবেষক ভোল্টা। তিনি সহজ, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। কাছেই তাঁকে খুঁজে পেতে গে লুদাকের একটু অসুবিধা হয়েছিল।

দু'বছর এমনি ভাবে কাটিয়ে গে লুদাক প্যারিসে ফিরে এলেন। এখানে আসার পরই তাঁকে ইনস্টিটিউট ডু ক্রাল-এর সদস্য করা হ'ল। এর দু'বছর পর অর্থাৎ ১৮০৮ সালে তিনি তাঁর 'বায়বীয় পদার্থের মিলনত্ব' (Law of gaseous volume) আবিষ্কার করেন। এর পর থেকে তিনি লুই জ্যাক থের্মার্ডের সঙ্গে একত্রে গবেষণা-কার্য্য আরম্ভ করেন। বিরেণ্ড করেন তিনি এই বছরেই। জোসেফাইন বোজো কাজ করতেন এক কাপড়ের দোকানে। এক দিন গে লুদাক সে দোকানে পোশাক কিনতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে, মেয়েটি অবসর-সময়ের রসায়নের বই পড়ছেন। গে লুদাক তখনই তাঁকে তাঁর চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিলেন। পড়া-শুনা শেষ হলে গে লুদাক জোসেফাইনকে বিয়ে করেন। তাঁরা ছিলেন আদর্শ দম্পতি—বিয়ের সময় অবশ্য গে লুদাকের ভণ্ডন ভর্ষি চাকরি ছিল না, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই (১৮০৯ সালে) তিনি একল পলিটেকনিকে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন।

গে লুদাক এবং থের্মার্ড অনেক দিন একই সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৮০৭ সালে ভৎফালীন সুরবিখ্যাত রাসায়নিক ডেভি এসকালি মেটাল আবিষ্কার করে বিশেষ নাম করে-ছিলেন। তাঁর আবিষ্কারের চেয়ে উচ্চ স্তরের আবিষ্কার যাতে গে লুদাক এবং থের্মার্ড করতে পারেন সেজন্মে ভৎফালীন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন এদের বহু প্রকারে সাহায্য করেছিলেন। কিছুদিন পর তাঁরা 'বেরোন' আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। তা ছাড়া এসকালি মেটাল, ক্যালসিয়াম, বেরিয়াম ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ গবেষণা-কার্য্য তাঁরা করেছেন। এ সব কাজ করতে গিয়ে এক ছুঁটিনার গে লুদাক একবার আহত হয়েছিলেন। চোখে এমন আঘাত লেগেছিল যে, তিনি দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারাতে বসেছিলেন।

ক্লোরিন গ্যাস সম্বন্ধে ভণ্ডনকার দিনের রাসায়নিকদের

মধ্যে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। লেভসেয়ারের মত ছিল যে, ক্লোরিন গ্যাস কোন ধৌলিক পদার্থ নয়, এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে অক্সিজেন। কিন্তু ডেভি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ক্লোরিন একটি ধৌলিক পদার্থ। গে লুদাক এবং থের্মার্ড লেভসেয়ারের সিদ্ধান্তই সমর্থন করতেন বলে ডেভি এবং এদের মধ্যে সামান্য বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। ১৮১৪ সালে গে লুদাক 'আইডিন' সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা করে বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেন। ক্লোরিন গ্যাস নিয়েও তিনি অনেক কাজ করেছেন।

১৮১৫ সালে গে লুদাক 'সাইমোজেন' আবিষ্কার করেন। পর বৎসর নাইট্রোজেন অক্সাইড সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হয়। এর তিন বছর পর তিনি আবিষ্কার করেন ডাইফাণ্ডনিক এসিড। এর পরে থেকে কি করে রসায়নবিদ্য মানা কাজে লাগান যায় সে দিকে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি দেখতে পান যে, বোরাক্স বা এমোনিয়াম কসফেটের জ্বাণে কাঠ ডুবিয়ে মিলে তার দহনশীলতা অনেক কমে যায়। সালফিউরিক এসিড তৈরি করতে গিয়ে গে লুদাক দেখেন টাওয়ারের একান্ত প্রয়োজন। এই টাওয়ারটির বারগা নিভান্ত আকস্মিক ভাবে তাঁর মনে আসে এবং তার পরের দিন সকালেই একজন সহকারীর সাহায্যে তিনি তা কাছে পরিণত করে ফেলেন। আরও অনেক রকম রাসায়নিক বিষয় নিয়েও তিনি বহু মূল্যবান গবেষণা করেছেন—কাঠ থেকে অকজালিক এসিড তৈরি তার মধ্যে অন্যতম।

গে লুদাক যদিও একটু গভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যবহার ছিল চমৎকার। তিনি ছিলেন সাহসী এবং বৈধাশীল। বন্ধুপ্রীতি ছিল তাঁর অসাধারণ তাঁর সমসাময়িক রসায়নবিদ ডেভি, বারথোলে প্রভৃতি যুক্ত কর্তে তাঁর উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন।

বৃদ্ধাবস্থায় গে লুদাক তাঁর স্বগ্রামে গিয়ে বাস করতে শুরু করেন। ১৮৫০ সালে তিনি এখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দু'মাস পর তাঁকে প্যারিসে নিয়ে আসা হ'ল। এখানে তিনি ঐ বছরেই মে মাসে দেহভ্যাগ করেন।

গে লুদাক আজ ইহলোকে নাই। কিন্তু যতদিন রসায়ন-শাস্ত্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত তার নাম লোকে ভুলবে না। যে সব বিজ্ঞান-সাধকের অক্ষান্ত চেষ্টায় রসায়ন-শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই লেভসেয়ার, ডলটন, বার্জেসিয়াস প্রভৃতির সঙ্গে গে লুদাক রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।



মুঘল অন্তঃপুরে অসমীয়া রাজকুমারী

শ্রীশুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগে মুঘলদের সর্ব হিসাবে বিজিত দেশের মুসল্লী রমণী আহরণ বীরপুরুষদের মধ্যে প্রায়ই নিত্যমুসলিমিতিক ব্যাপার ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বীরভোগ্যা বস্ত্র-দ্বার মত মারীও ছিল বীরভোগ্যা। ঘোড়শ ও গুপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লীর পাদশাহী আমলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রমও ছিলই না, বরং মুঘল অন্তঃপুরে ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহিরের বহু রমণী (এমন কি অল্পবয়স্ক বালিকা পর্যন্ত) মুঘলদের কলে বা ক্রম-বিজয়ের দরুন অথবা আহুগভোর বীকৃতিস্বরূপ সংগৃহীত হইয়া রংমহল শীষমহলের শোভা বৃদ্ধি করিত। পূর্বমুসল্লীদের নুপূর-মিকণে বন্দীরা গান গাহিত কিনা ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় না, কিন্তু নওরোজের উৎসবের দিনে নহবতে তান যে মিলাইয়া যাইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইরান, তুরান, বাব্বীক, কাস্মীর, জর্জিয়া, আফগান-বাইকান, তুর্কীস্থান প্রভৃতি বহু দেশ হইতে মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী মহিলা ছাড়াও মুঘল-দ্বারেমে মাঝে মাঝে হিন্দু-রমণীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত। কোন কোন রাজপুত্র অধি-পতিরা এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন একথাও ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্য রাজপুত্র-রমণীরা দিল্লী-আগ্রা অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেও নিজেদের হিন্দু দাসী-বান্দী রাখিতেন এবং পূজা-পদ্ধতি পালন করিতেন।

সমসাময়িক ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, মীরজুমলা কর্তৃক পরিচালিত মুঘল-আহোম সংঘর্ষের কলে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের বিলাকারি খাটের সন্ধির সর্বস্বরূপ একটি অসমীয়া রাজ-কুমারীকে দিল্লীর পাদশাহী অন্তঃপুরে পাঠানো হয়। শ্রদ্ধেয় ডঃ যত্ননাথ সরকার তাঁহার *History of Bengal* (vol. III, p. 350, Ch. XVIII)-এ এই সর্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আসাম বুরঞ্জীতে ইহার উল্লেখ আছে এবং এই বিষয়টি আসামের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীশুধাংশুমোহন তুণ্ডা সবিত্তারে নানাস্থানে আলোচনা করিয়াছেন। অসমীয়া বুরঞ্জীগুলির ঐতিহাসিক পণ্ডিতসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি ইতিহাসের এক মূল্যবান ভাণ্ডারের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বুরঞ্জীতে সন্ধির সর্ব এইরূপ—

“শ্রীশ্রীজিহ্নব পাংসাহর দসখত মোহর। শ্রীশ্রীরাজা জয়ধ্বজসিংহ। সকলম স্বকারতে, ১ মাঘ সন ১০৭২, বঙ্গলা-দেব—সত ১৫৮৪ সাল। লিখিত শ্রীশ্রীরাজা জয়ধ্বজ সিংহ ও শ্রীবড়গোহাঞি ও শ্রীবুঢ়াগোহাঞি ও শ্রীবড়পাঞ ও শ্রীবড়মন্ড বিলাসত আসামকত...”

তাছাড়া আসাম জাতি ও মল্লিক রাধিবীর কারণ শ্রীজু

নবাবদলের ঝাঁক জামিন দরমিয়ান দিয়া ২০০০০ বিস হাজার তোলা সোনা ও ১২০০০০ একলাখ আর বিস হাজার রূপা ও নবৈ হাতি সমেত দিয়া আসাম রাজা জয়ধ্বজসিংহর বেটি অরু তিপাম রাজার বেটি ৩৬৬৬৬৬৬৬ দিবার কবুল করিলে।...

এহি করারে আমরা আপনা দসখত ও মোহর করিয়া তমস্ক লিখিয়া দিলু...দসখত মোহর...”

অর্থাৎ—দিল্লীর পাদশাহের কাছে একরান্নায়া লিখিয়া দেওয়া হইল যে, প্রাণ ও মূল্য (রাজ্য) রাধিবীর জন্য বিশ হাজার তোলা স্বর্ণ ও এক লাখ কড়ি হাজার তোলা রৌপ্য, মক্কাইটি হাতি ও রাজা জয়ধ্বজসিংহের কন্যা এবং তিপাম রাজার কন্যা পাদশাহ দরবারে প্রেরিত হইবে। এই সন্ধিতে আরও দেখা যায় যে, পাদশাহী থানা গোহাটি লওয়া ও পাদ-শাহী গ্রাম হইতে রায়ত প্রজা উঠাইয়া নিজের রাজ্যে বসানো—রাজা জয়ধ্বজসিংহের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ ছিল। সেই জন্য “শ্রীযুত নবাব খানখানা (মীরজুমলা) ৩৯৯৯ লৈয়া আসাম মল্লিক মারিলেক, আমি পলাই আসিয়া নামরূপের পাহারত টঙ্কিলো”

এই সন্ধি অনুসারে যে কুমারীকে মুঘল সেনাপতি মীর-জুমলার হাতে সমর্পণ করা হয় সেই কুমারীর নাম হইতেছে গাভর বা রমণী গাভর এবং তিনি আহোমরাজ জয়ধ্বজসিংহের একমাত্র কন্যা। তিপাম রাজার কন্যার কথা ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সিহাবুদ্দীন ডালিশ নামে এক গ্রন্থকার মীরজুমলার আসাম ও কুচবিহার আক্রমণের এক কাহিনী লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, মীরজুমলার আদেশে এই মুঘল সৈন্যের কক্ষ ও কতির কথা গোপন রাখা হয়।*

এই পুস্তকটি উদ্ধৃত মীরবাহাদুর আলিহোসেন কর্তৃক ১৮০৫ সনে অনূদিত হয় ও তাহার পরে ১৮৪৫ সনে টি. পেভি কর্তৃক ফরাসী ভাষায়ও তর্জমা হয়। রুক্ষম্যানও ‘জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’-এ ইহার উল্লেখ করেন।

যদিও মীরজুমলা এই অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে যত্নাযুগে পতিত হন এবং তাঁহার বন-সম্পত্তি ও মুদ্রাস্তার বহুল পরিমাণে পরহস্তগত হয়, তথাপি আহোমরাজ-প্রদত্ত সম্রাটের প্রাপ্য পেশকশ ও কুমারী গাভর ঘে যথাসময়েই দিল্লীর দিকে মিকট পৌছিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিল্লীতে পৌছি-

*“The author states in the preface that the sufferings and losses of the Imperial Army had been kept secret by the wish of the Khan Khanan... Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum, Vol I.”

বার পর অসমীয়া রাজকুমারী মুখল অস্ত্রপূৰ্ণে কিতাবে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহার শিক-দীক কিতাবে পৰিচালিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন প্রত্যক প্রমাণ নাই। হয়ত আর পাঁচ জন আশ্রিতা রমণীর মত গাভৰুও পাদশাহী হারেমেয় রীতিনীতি ও আদব-কায়দায় অশিক্ষিতা এবং মুসলমান ধৰ্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার নুতন নামকরণ হয় রহমত বাহু বেগম। “মাসির-ই-আলমগির” এষ্টে এই রাজকুমারীর সহিত পাদশাহ আলমগিরের তৃতীয় পুত্র সুলতান আজমশাহের বিবাহের বর্ণনা আছে এবং এই বিবাহে এক লক্ষ আশী হাজার টাকা মোহর ব্যয় হয়। যদি মাসির-ই-আলমগিরের ভণ্ডা সত্য হয় তাহা হইলে বিবাহ-কালে (১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ ২রা বা ৩রা মে) রাজকুমারীর বয়স বার ও সুলতান আজমশাহের বয়স ছিল ১৬ এবং এই অসমীয়া কুমারীই আজমশাহের প্রথম বিবাহিতাঙ্গী। পরে অবশ্য তিনি দারাসিকোর কন্যা জানি বেগমকে ও বিজাপুরের সুলতান-কন্যাকেও বিবাহ করেন। জানি বেগমের সঙ্গে বিবাহ উপলক্ষেই আওরঙ্গজেব তাঁহাকে “আজমতারা” উপাধি দেন। মাহুচ্চির মতে এই কুমারী ছিলেন ইজিয়াসন্ত, বদমেজাজী ও রুক্ষ প্রকৃতির। তিনি সকলের প্রতি অশোভন আচরণ করিতেন এবং লোভীও ছিলেন। দিল্লী পাদশাহীর অসমীয়া বিবরণিতেও এই শাহজাদা সম্বন্ধে বিশেষ গুণ-কীর্তন নাই। তিনি মাকি বাংলার স্বেদার থাকাকালে শিকারে গিয়া লক্ষ টাকা মূল্যের একটি জহরং হারাইয়া আসেন। যে ভূমিদারের এলাকায় ঐটি হারায় তাঁহার এক লক্ষ টাকা অৰ্ধও হয়। পরে ঐ জহরংটি পাওয়া গেলে তিনি জহরংটিও রাখিয়া দেন, দণ্ডহুস্তে প্রাপ্ত অৰ্ধও ফেরত দেওয়া হয় না।

রমণী গাভৰুর বিবাহের সময় আজমতারা বোহিলধণ্ডের কৌদদার ছিলেন, পরে তিনি সুলতান ও রিহার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ও নবাব শাহজোয়াঁর প্রথম স্বেদারীর পর কিছুদিনের জন্ত স্বে বাংলারও স্বেদার হইয়াছিলেন। মীরজুমলায় সহিত সন্ধির পরও আহোম-মুঘল সংঘর্ষ বন্ধ হয় নাই এবং গৌহাটি শহর মুঘলদের হাত হইতে অসমীয়া কাড়িয়া লয়। আওরঙ্গজেব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অৱরাধিপতি জয়সিংহের পুত্র রাজা রামসিংহকে আসামে পাঠান। অনেক মনে করেন যে, রাজা রামসিংহ শিবাজীর দিল্লী হইতে পলায়নে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া আওরঙ্গজেবের সন্দেহ হয় এবং সজ্ঞাওঁত শিবজীও তাঁহার প্রতি বঙ্গবত্বাপন্ন দেখিয়া সত্ৰাট তাঁহাকে সাজাভ্যেয় অদূরপ্রান্তে পাঠাইয়া দেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি কামরূপীয়া কস্তাদের যাহ্নময়ের

প্রত্যব হইতে তাঁহার গৈভদলকে রক্ষা করিবার জন্য গুরু তেগ্‌বাহাদুরকে আসাম অভিযানে সঙ্গী করিয়া লন। অসমীয়া সেনাপতি লাচিত বড়ফুকন রামসিংহকে পরাজিত করিয়া হঠাৎই দেন। লাচিতের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাতা লালুক বড়ফুকন গৌহাটীর শাসনকর্তা হন। তিনি যত রাজা জয়সিংহ সিংহের ছালক ও সম্পর্কে গাভৰুর মাতুল।

রামসিংহের প্রত্যাগবর্তনের পরও সত্ৰাট আহোমদের পুনরায় পরাজিত করার এবং গৌহাটী পুনরাক্রমণের আশা ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি বিহারের তৎকালীন স্বেদার সুলতান আজমতারা-কে আসাম আক্রমণের নির্দেশ দেন।

অসমীয়া বুরঞ্জীতে উদ্ধৃত পদ্মালোপের মতল হইতে ডঃ ভূঞা দেখাইয়াছেন যে, রাজ্যমাটির মুখল কৌদদার আবু নছর বাংলার স্বেদার শাহজোয়াঁ, গৌহাটীর শাসনকর্তা লালুক বড়ফুকন, বাহুলি ফুকন, সত্ৰাটপুত্র আজমতারা ও সত্ৰাটপুত্রের অসমীয়া মহিষী রহমতবাহু বেগমের মধ্যে আসাম আক্রমণ সম্বন্ধে পরামর্শ ও পদ্মালোপ হয়। মূল পত্রগুলি পাওয়া যায় নাই, বুরঞ্জীতে উদ্ধৃত সারাংশ পরিপোষক অল্প প্রমাণ ব্যতিরেকে কতটা নির্ভরযোগ্য তাহা ইতিহাসবিদ্রাই বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন।

আবু নছর খাঁর পত্রের মর্ম হইতেহে “পাদশাহজাদা সুলতান আজমতারা-ই এক লাখ ঘোড়া আর তিনশ’ হাতী সহিতে রাজমহল সোয়াইছে। বুলি মৌলে বার্ডা দিছে, আর তেও মোমাশহর বরফুকনলৈ এ ঘোড় চিরপার চিরপার আর...তার কলত যদি পোত্রাক্ষণ হানি হয় সেই পরিণামর তার বড়ফুকনে পাব”

এই পত্রের মধ্যে মুসলমান সেনাপতির গোত্রাক্ষণের জন্ত যে কাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খুব স্বাভাবিক নয়। অবশ্য এই চিঠিকে ভয় প্রদর্শনের হুম্ম রীতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। লালুক বড়ফুকন মুখলকে গৌহাটী প্রত্যর্পণ করিয়া আজমতারার সাহায্যে আশ্রিত বুঢ়াগোহাঁইকে সরাইয়া নিজেই আসামরাজ্যের সর্বস্বস্বত্ব হইতে চাহিতেছিলেন। সেই সময় মাঘচরণ ও ঘনন্দন নামে দুই জন দূত স্বেদার-দরবারে আহোম রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন। তাহারা যে চিঠি আনিয়াছিল তাহা-বিজপায়ক মনে হওয়ার তাহাঙ্গিকে প্রথমে বন্দী করা হয়। তাহার পর গাভৰু বেগমের অনুরোধে সুলতান আজমশাহ তাহাঙ্গিকে মুক্তি দেন। অসমীয়া বুরঞ্জীর মতে তাহারা নানা উপহার লইয়া আসে।

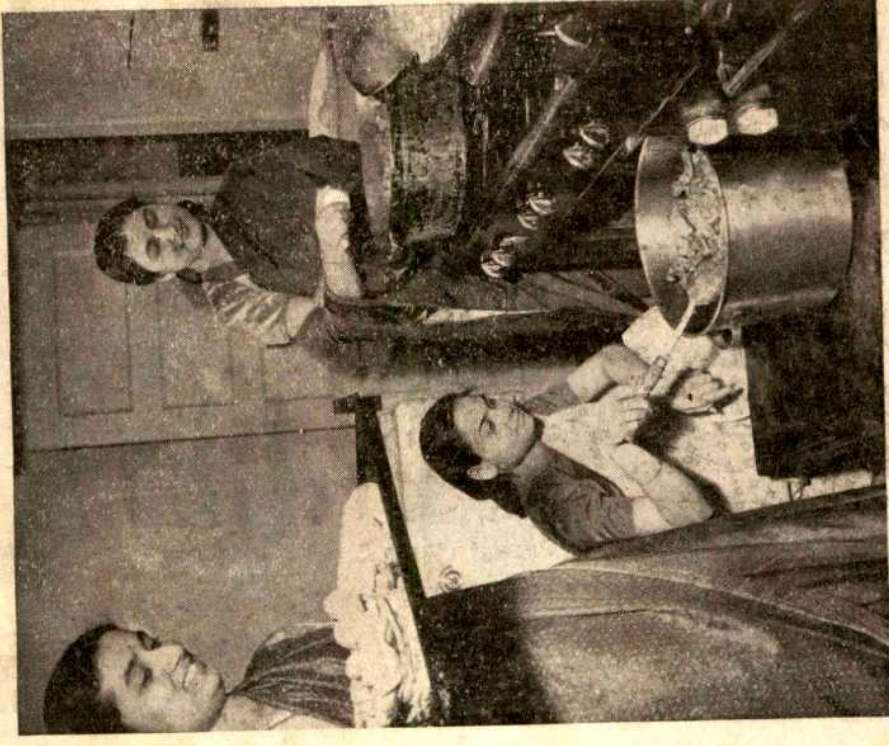
আর একটি পত্রের উপর ডঃ ভূঞা ও জীযুক্ত বেণ্ডের শর্দা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেইটি হইতেহে অসমীয়া কটকী বা হুতের সঙ্গে প্রেরিত স্বদেশ ও স্বজাতি বিরোধী কোন কার্য না করিতে অনুরোধ করিয়া মাতুল লালুকের প্রতি মুঘলমহিষী গাভৰুর পত্র। এই পত্রটি কার্সা ভাষায়

* Niccolao Manucci: Storia Do' Mogor, p. 462.

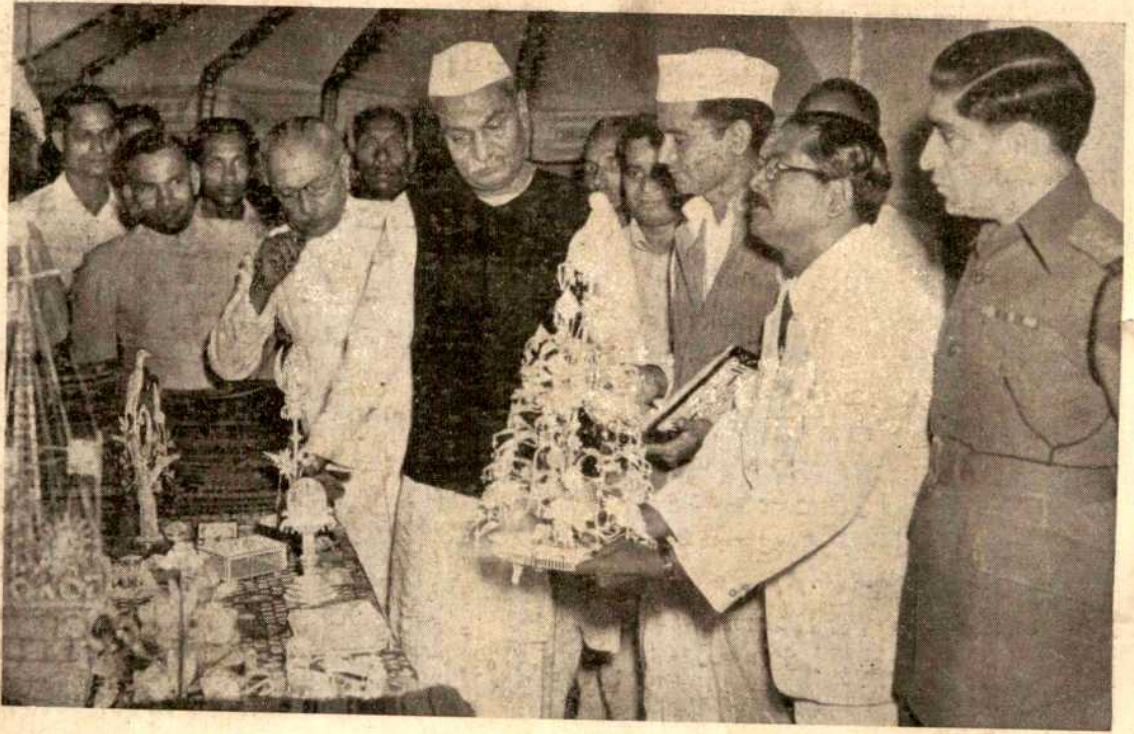
† Annals of the Delhi Badshahate: Edited by Dr. S. K. Bhuyan.



প্যারিসে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রী কুমারী ইন্কা পল পল কর্তৃক মিসেস এলিনোর
রুজভেল্টকে প্যারিসের আন্তর্জাতিক শিশুকেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ



ওয়াশিংটনস্থ আন্তর্জাতিক 'ফুডেটস্ হাউস'র ভারতীয় ছাত্রীগণ কর্তৃক
ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত খাদ্য পরিবেশন



পুরীতে অনুষ্ঠিত ওড়িয়া শিল্প-প্রদর্শনীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ



দেরাহন 'ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে' ভারতের কাষ্ঠ-সম্পদ প্রদর্শন

লিখিত বলিয়া বুঝিতে উল্লিখিত এবং ইহার সারাংশ বুঝিতে সংরক্ষিত। ইহার পরিপোষক অত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মাসির-ই-আলমগির ও অসমীয়া বুঝী ছাড়া বেগম রহমত বাহুর অত কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এই পত্রের বেখানে গাভরু তাহার মাতুলকে লিখিতেছেন যে, ছয় বৎসর বয়সে তোমরা আমাকে মুঘলদের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলে আর আজ আমার উনিশ বৎসর বয়স—এই তের বৎসর এই দুঃখিনীর কোন রাত্তাই তোমরা লভ নাই, তখন বন্ধন-বিরহ-বিষম এই স্বাক্ষরতার মধ্যে সত্যই পাঠকের মন কোমল হইয়া উঠে।

লালুক ফকরের সঙ্গে গোপন আয়োজন অনুসারে নবাব মনসুর খাঁ ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিনা বাধায় পুনরায়

গৌহাটি অধিকার করেন। দুইমুখে বিনা রক্তপাতে মুঘল কর্তৃক গৌহাটি দখলের সংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে রাজসভার আজমতারার দূত সংবলিত হন এবং তাহাকে বানা উপহার দেওয়া হয়। তদনন্তর ছিল উনিশটি নিহৃত মুক্তার একটি মালা।

আজমতারা সত্ৰাটের প্রিয় পুত্র ছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষের নানা স্থানে স্নেহকারী করিয়াছেন, কিন্তু তাহার আশাম অতি-ধানের পর তাহার প্রথমা মহিষী রহমত বাহুরকে গাভরু বেগমের কি হইল তাহা জানা যায় না। আওরঙ্গজেবের যত্নের পর আজমতারা নিজেকে সত্ৰাট বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৭০০, জুন মাসে আজমশাহ বাহাদুর শাহের সহিত মৃত্যু নিহত হন।

ভারতের বহির্বাণিজ্য—১৯৫১-৫২

শ্রীশিবপ্রভ ষোষ

ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১-৫২ সালের আমদানী ও রপ্তানীর মোট পরিমাণ বৈকল্প দাঁড়াইয়াছে, ভারতের বাণিজ্যের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও এরূপ হয় নাই। এ বৎসরে আমদানী-রপ্তানি মিলিয়া মোট ১৬২১ কোটি টাকার লেনদেন হইয়াছে। বাণিজ্যের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের বাণিজ্যিক গতি এ বৎসরও তাহার প্রতিকূলে; অর্থাৎ—মোট আমদানী অপেক্ষা মোট রপ্তানির মূল্য কম হওয়ায় বৎসরান্তে প্রচুর ঘাটতি হইয়াছে। এ বৎসরের দেনার পরিমাণ ১৮৭৭৩০ কোটি টাকা। এই বিরাট ঘাটতির কতক অংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট সঞ্চিত ষ্টালিংয়ের সাহায্যে আমাদের পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার পরিমাণ বৈকল্প ক্রত ক্ষয় পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ইহার অভাবে ভারতীয় বাণিজ্য বিশেষ অস্থিবিধা ঘটিতে পারে।

এ বৎসর যে পরিমাণ ঘাটতি হইয়াছে, ইতিপূর্বে বৈদেশিক-বাণিজ্যে সম্ভবতঃ এত অধিক ঘাটতি আর হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে আমদানীর পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই এরূপ প্রচুর ঘাটতির উদ্ভব হইয়াছে। মোট আমদানীর পরিমাণ—২০৪৩৯ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ এবং ৪৯-৫০ সালের আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৮৯ ও ৬১৭ কোটি টাকা। আমদানী-বাণিজ্যের পরিমাণ ক্ষতি হইবার প্রথম ও প্রধান কারণ দেশে অম-

ভাব। জীবনধারণের পক্ষে অন্ন ও বস্ত্র অপরিহার্য। এগুলির অভাব মাস্তুষের জীবনের সর্কোপেক্ষা বড় অভিশাপ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্নবিষয়ে ভারত এখনও একান্ত ভাবে পরমুখাপেক্ষী। প্রতি বৎসরই কোটি কোটি টাকার খাজশস্ত্র আমদানী করিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও অভাব মিটাইতে হয়। অগ্রাঙ্ক বৎসর অপেক্ষা ১৯৫১-৫২ সালে আমাদের দেশে খাজ-সমস্তা তীব্র আকার ধারণ করায় এ বৎসর বিদেশী খাজ-শস্ত্রের আমদানী পূর্বের সকল বৎসরের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। একমাত্র খাজ-শস্ত্র আমদানী করিতে এবৎসর ব্যয় হইয়াছে ২২৮ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত বোতলে ভরা খাজ, ফল, শাকসব্জী, মশলা, পানীয় ইত্যাদি লইয়া আরও ৩৪ কোটি টাকার খাদ্যসম্ভার এ বৎসর আমদানী হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে এই হিসাবে ব্যয় হইয়াছিল ১০৬ কোটির কিছু অধিক।

বস্ত্রাদি—বিশেষতঃ বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য কাঁচা মাল আমদানী বিশেষ দৃষ্টিস্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, এ বৎসর কার্পাস-তুলা ১৩৬৪৬ কোটি টাকা এবং কার্পাসবস্ত্র ও সূতা ৬ কোটি টাকা—অর্থাৎ মোট ১৪২ কোটি টাকার আমদানী হইয়াছে। ইহা ছাড়া, পশম ও পশমী দ্রব্য, রেশম, রেশমী বস্ত্র, কৃত্রিম-রেশম, সূতা ও সূত্রজাত বস্ত্র একত্রে ধরিলে আরও ৪২ কোটি টাকা দাঁড়ায়। অর্থাৎ বস্ত্রাদির জন্য এক বৎসরে মোট ব্যয় হইয়াছে ১৮৪ কোটি টাকা। সূতরায় খাদ্যের জন্য ২৬২

এবং বস্ত্রের জন্য ১৮৪ কোটি, অর্থাৎ ২০৪ কোটি টাকার আমদানীর মধ্যে একমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই আমাদের লাগিয়াছে ৪৪৬ কোটি টাকা। গত বৎসর ইহার জন্য ২৩২ কোটি টাকার মত ব্যয় হইয়াছিল।

অন্ন ও বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছে যন্ত্রপাতি-খাতে। সকল প্রকার যন্ত্রপাতির মোট আমদানীর পরিমাণ ১০৪ কোটি টাকা। এ বৎসরের অন্যান্য প্রধান প্রধান আমদানী-দ্রব্যের নাম ও মোট আমদানীর পরিমাণ নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

দ্রব্যের নাম	আমদানীর পরিমাণ কোটি টাকা
মানাকরূপ তৈল	৭৯
মণিমুক্তা	৪৪
রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৩৫
শামবাহন	৩৩
লৌহ-দ্রব্য	২১
বিভিন্ন বাস্তব পদার্থ	২০
রং	১৯
কাগজ	১৪

১৯৫১-৫২ সালের রপ্তানি-বাণিজ্যের আলোচনাশ্রমে প্রথমেই বলা যায় যে, এ বৎসরে বাণিজ্য বিশেষ সম্ভাষণজনক হইয়াছে। রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ অত্যন্ত বৎসরের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭১৬.২৫ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে বৈদেশিক দ্রব্যের পুনরায় অন্যত্র রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ১৪ কোটি টাকা। গত বৎসর ও তৎপূর্ব বৎসরে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০৭.৮৯ ও ৪৮৬ কোটি টাকা। বাহা হউক, ভারতের রপ্তানি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা এবং কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্য ধরিলেই রপ্তানির অর্ধেকের বেশী হইয়া যায়। ১৯৫১-৫২ সালে ইহাদের রপ্তানি যথাক্রমে ২৭০ কোটি টাকা, ৯৩ কোটি টাকা এবং ৭৯ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট রপ্তানির ৭১৭ কোটি টাকার মধ্যে ৪৪২ কোটি টাকা

গত বৎসরের অর্ধেকের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, কার্পাসদ্রব্যের রপ্তানি বেকুপ হ্রাস পাইয়াছে, উহা অপেক্ষা তুলনায় পাট ও চায়ের রপ্তানি বহুলাংশে বাড়িয়াছে। গত বৎসর পাটজাত দ্রব্য, চা ও কার্পাসদ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে, ১১৪, ৮০ ও ১৫৩ কোটি টাকা।

অপরপূর রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে মশলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লকা, মরিচ, আদা, এলাচ ইত্যাদি মিলিয়া ২৭ কোটি টাকা হইয়াছে। ইহার পরই কাঁচা চামড়ার স্থান। ইহার রপ্তানির পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতি, আকরিক ধাতব পদার্থ এবং তামাকের নাম করিতে হয়। এ বৎসর ইহাদের পরিমাণ হইয়াছে যথাক্রমে ২৩, ১৯ ও ১৬ কোটি টাকা।

১৯৫১-৫২ সালের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিরাট ঘাটতি এক বিপর্যয় সৃষ্টি করিলেও রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু আশার সঞ্চার হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের বাণিজ্য এক অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক চাপে পড়ায় আমদানীর পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য ও বস্ত্রের আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইলে শীঘ্রই এদেশের বাণিজ্যিক অবস্থার উন্নতি ঘটিবে বলিয়া আশা হয়। আমদানীর পরিমাণ হ্রাস এবং রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বহির্বাণিজ্যের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টার প্রয়োজন। বর্তমানে আমদানী কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলেও বহু টাকার অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার প্রতি বৎসরই আমরা আমদানী করিতেছি; তন্মধ্যে মণিমুক্তা, মাদকদ্রব্য, প্রসাধন-সামগ্রী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলির আমদানী আরও নিয়ন্ত্রিত হওয়া বিধেয়। আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কার্পাস-শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতির দ্বারা অনায়াসেই ইহার পরিমাণ বর্তমানে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় প্রায় সকল প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা নিকটবর্তী বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিতে যথেষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং দেশে শিল্প-প্রসারের সহিত রপ্তানি-বাণিজ্যের ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতি ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়।



নজরুল ইসলাম

শ্রীসুধাংশু চৌধুরী

নজরুল ইসলাম বেঁচে আছেন। বোধ হয় এই বেঁচে থাকা তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাঙ্কেডি। ব্যাধি তাঁকে প্রাণে মারল না : কিন্তু ভুলিয়ে দিল তাঁর আত্ম-পরিচয়। তিনি আছেন, কিন্তু তাঁর গীতরচনা নেই এবং কাব্যরচনার শক্তি তাঁকে বহু আগেই ছেড়ে গিয়েছিল।

গীতরচনার ক্ষমতাও তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছিল নাকি ? কোন কোন শক্তির ভর যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সব ঠিক থাকে। যখন সে শক্তি ছেড়ে চলে যায়, তখন হয়তো ঘটে অঙ্গহানি বা মনোবৈকল্য।

নজরুলের কবিত্ব-শক্তিতে ভর করবার মত কতকগুলি লক্ষণ আছে। তাঁর উত্তরাধিকার ভাল করে জানা নেই। বাল্যে যে শিক্ষা অনুশীলন তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল, যে মন বা প্রবণতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তাও লেখকের অজ্ঞাত। কেন যেন মনে হতে চায়, নজরুলের কবিত্ব তাঁর শিক্ষা, চিন্তাবৃত্তি এবং উত্তরাধিকারের যোগাযোগে লব্ধ জিনিষ নয়। কোন হঠাৎগের দ্বারা সহসা কবিত্বের সিদ্ধাই তিনি লাভ করেছিলেন, তারপর সে সিদ্ধাই যখন তাঁকে ছেড়ে গেল তখন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি আয়ু্যর দেনা শোধ দিতে বেঁচে রয়ে গেলেন।

‘বল বীর, চির উন্নত মম শির’ পড়ে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়। দেবতারা ভয়ে সন্ত্রস্ত ! নূতন এক দৈত্য তপস্বী দ্বারা আদিত্য বসু দিকপালগণকে জয় করেছে, জয় করেছে অগ্নি-তপন-ইন্দ্র-পবনকে। পুরাণে এ ঘটনা বারবার ঘটেছে। কেটে গেছে কল্ককল্লান্ত ; সপ্তবিমণ্ডলের অগস্ত্য মুনি গুহে নিয়েছেন কালের অতলান্ত সমুদ্র। তারপর স্বর্গের নিত্য অধিকার আবার ফিরে পেয়েছেন দেবতারা। বিধাতৃবিদ্রোহের পৌরাণিক কল্লনা মিলিয়ে গেছে মহা-শূন্যে।

নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ ‘কবিতা’য় এক দেবতাজয়ী দলুজবীৰ্য্য প্রকট হয়েছে। কাব্যের তপস্বী—

‘ভুলোক হ্রালোক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন আরণ ছেদিয়া’

—তথাপি উঠছে পতনের পৌরাণিক ভুজ্জ স্থানে, এবং পুরাণের পরিণামের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেরি হয়নি।

নজরুল যুদ্ধে গিয়েছিলেন। ফিরে কোন সাধনা তিনি করেছিলেন, তা লোকালয় এবং দিবালোক জানে না।

তারপর তাঁর কবিত্ব সিদ্ধাই ব্যক্ত হ’ল ‘বিদ্রোহী’ কবিতায়। তিনি নাম পেলেন ‘সৈনিক কবি’।

আমাদের বয়স তখন যোল-সতের। গুজরাটের সমুদ্রোপকূল থেকে জাতীয় আন্দোলনের বহা তখন সমস্ত ভারতবর্ষকে ছেয়ে ফেলেছে, আসমুদ্র হিমাচল টলমল করছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্র দিনে-রাতে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে। দিবাভাগের নেতৃত্ব গান্ধীজী, আর রাত্রিভাগের নেতৃত্ব স্বাধীনবাদীদের হাতে।

আকাশে তারা জ্বলছে। জাতির জীবনের হাজার হাজার বছর পিছনে জ্বলছে ভগবদগীতার বাণী। ক্রীষক পরিহরণের সেই দূরশ্রুত বাণী কানে ভেসে আসছে,

ময়া হতাশঃ জহি, মা ব্যধিঃ
যুধ্যস্ব জ্ঞেতাসি রণে সপত্নান্।

একজন কবির দরকার ছিল সেই তিমিরঘন রণক্ষেত্রের জন্য। মনে হয় নজরুল সেই কবি। কে যোগাবে বাজীর মশাল—যা নিয়ে রাত্রির তিমির ভেদ করে রুধিরাক্ত রণক্ষেত্রে এগুতে হবে। বেদ নয়, বীণা নয়, বাঁশী নয়—অগ্নিবীণা এবং বিষের বাঁশীর কবি—তাই কাজি নজরুল।

নজরুলের ষাট বছর আগে মাইকেলে এমনিতর কবিত্বের বিকাশ হয়েছিল। শক্তির সে আর এক ‘পূরোৎ-পীড় পরিবাহঃ’। দাম দিতে কেউ রাজী নয়, কিন্তু মাইকেল অকুতোভয়। বাঙালীর জাতিসত্তা নিয়ে পরীক্ষা চলছিল তখন। রাষ্ট্র, অর্থনীতির বহির্বেষ্টন ইংরেজের। হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষার মারফত ইউরোপীয় সভ্যতার মাদকতা কলিকাতার নব্য যুবসম্প্রদায়ের মনের গভীরতর সভায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া কি হবে মাইকেলে তার চরম পরীক্ষা এবং সে পরীক্ষার উত্তর ‘মেঘনাদবধ কাব্য’।

অত্যন্ত সময়ে আত্মরূপান্তরের চরমে পৌঁছবার চরম পহা তাঁর। ক্রমবিকাশ নয় ; প্রবল ব্যতিক্রম দ্বারা বিকাশ। অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়ের হঠকারিতা তাঁকে ক্রমবিকাশের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তীরে আছাড় মেরে ফেলে রেখে গিয়েছিল। সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্যপুষ্ট রামরাবণের প্রস্তর মূর্তিকে মাইকেল এক রাতে নূতন করে গড়তে গিয়েছিলেন। পয়ারছন্দের শৃঙ্খল তিনি ভেঙে ফেলেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে।

বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় শক্তিসাধক কবি কাজি নজরুল। তখনও সে আর এক আত্মরূপান্তরের পথ চলছে জাতি-

সত্তার। মশাল চাই রাজির অন্ধকারে। অতিদ্রুত ভগবদগীতার দেবভাষা স্বাধীনতার রণক্ষেত্র কাঁপিয়ে তুলতে পারছে না। তখন ধ্বনিত হ'ল নজরুলের,

বল বীর চির উন্নত মম শির।

কিন্তু গোড়া থেকেই নজরুলের কাব্যে কাব্যবিরোধী ক্রটি ছিল, সে হচ্ছে তাঁর অদম্য ধ্বনিপিপাসা। সে পিপাসা অগস্ত্যের মত। ধ্বনির সমুদ্র গুলে ফেলেও তাঁর পিপাসা যেটে না।

শোঁও শব্দ নম নম, শব্দ নম নম

শাঁই শাঁই

ঘুরপাক খাই, খাই পাই পাই

ইহা তাত্ত্বিক সাধনার মন্ত্র হতে পারে, কবিত্ব নয়।

অমাবস্তার অন্ধকারে নৃশংসালিনীর অক্ষিতারকা হুটো জল্জল্ করে তাকিয়ে আছে শবাসীন তাত্ত্বিক সাধকের দিকে। নৈয়ামিকের আদিকারণ তাত্ত্বিকের তরল পানীয় হয়ে নরকপালে রক্ষিত—প্রবেশ করেছে সে কারণ দেহে, রক্তে শিরোধর্মনীতে—অস্তিত্বের ত্রিগুটি ওঁ হ্রীং ক্রীং ধ্বনির কুণ্ডলী পাকিয়ে সহস্রারে এসে সংহত হয়েছে—তখন ধ্বনির ঘূর্ণ্যাবর্ত সৃষ্টি করতেই হবে। ধ্বনি, আরও আরও ধ্বনি; সে ধ্বনি থেকে বস্তু ও অর্থ অন্তর্হিত হয়েছে, সে ধ্বনির সঙ্গে জীবন-জগতের মথুরা-বৃন্দাবন সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। তবুও আদিকারণের উন্মাদনাবিহীন সাধক সেই ধ্বনিসাহায্যেই ত কারণাতীত অবস্থায় পৌছে যাবে। স্তবরাং—

শোঁও শব্দ নম নম, শব্দ নম নম

শাঁই শাঁই,

ঘুরপাক খাই, খাই পাই পাই

এর ধ্বনি মুখবাদান করে বলতে হবে,

আমি একটি বিশ্ব গ্রাসিগাছি

পারি গ্রাসিতে এখনও ত্রিশটি।

মানুষের ভাষাসৃষ্টির একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। মানবেতর জীবের বাগ্‌মূল অপটু। তার জড়তার মেঘরন্ধ-চ্যুত চেতনা একটি বা ছুটি ধ্বনিতে মাত্র ব্যক্ত। পাখীর বা পশুর কণ্ঠে একটিমাত্র ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সেই ধ্বনি সেই পাখী বা পশুর স্বকৃৎ ভাবনা-বেদনার বাহন। জীব-পর্যায়ে মানুষ যখন প্রথম দেখা দিয়েছিল তখন ভাষার উপরে জন্মগত অধিকার তার ছিল না। আদিম সমাজ-সংগঠনের মধ্য দিয়ে অল্পসংগ্রহ ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম মানুষকে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত করেছে। সে পরিচয়ের স্বাক্ষর পড়েছে দুই প্রান্তে। এক, বাইরের বস্তু পরিচয়; দ্বিতীয়, ভিতরের ভাবপরিচয়

এবং একই পরিচয়ের দুই প্রান্তে, বাইরে ও ভিতরে, মানুষ তার চেতনার ছাপ দিয়ে দিয়েছে বাগ্‌মূল থেকে উৎপন্ন ভাষার সাহায্যে।

সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী হয়েছে ভাষারও ক্রমবিকাশ এবং সে ধারা ধীর অথচ অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে ভাবীকালের অভিমুখে।

কিন্তু তবুও অপরিচয়ের সীমাহীন বস্তু ও ভাববিশ্ব ঘিরে রয়েছে মনুষ্যসমাজকে এবং সে অপরিচয়ের সীমানায় দাঁড়িয়ে মানুষ তার ভাষা ও ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার হারিয়ে ফেলে। প্রকাশক্ষমতার অকিঞ্চিৎকরতায় অভিভূত হয়ে মানুষ বিরাট অব্যক্ত ও নৈশব্দের কাছে করে স্বরের আত্মনিবেদন। মনুষ্যের জীবশ্রেণীর কণ্ঠের স্বর এবং মানুষের কণ্ঠের স্বরে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। প্রথমটা নিশ্চেতনতার বাহন, দ্বিতীয়টা অতিচেতনতার। প্রথমটার রয়েছে অক্ষমতার অসীম মৈত্র, দ্বিতীয়টার আছে নিজের ক্ষমতাকে পুনরায় ছাড়িয়ে উঠবার স্লামনীয় পরাভব।

কবির কাব্যমাত্রের স্বরের এই উভয়মুখী টান থাকে। শুধু কাব্য কেন, প্রতিটি শব্দ ব্যবহার দ্বারা যে চেতনাকে মানুষ প্রকাশ করছে, সে চেতনার দূর অতীতে রয়েছে অচেতনতার স্বরের হাতছানি, এবং দূর ভবিষ্যতেও রয়েছে বিদ্রুততার চেতনতার স্বরমোহানা।

নজরুলের কাব্যের শব্দ-প্রয়োগ লক্ষ্য করলেই মনে হয় শব্দের চেতনা বহন করার ক্ষমতার প্রতি তাঁর ততটা খেয়াল নেই, যতটা রয়েছে তার যাত্ত্বিক ধ্বনিবৈভবের দিকে।

আনোয়ার জিজির পরা মোরা যিজির

শুখলে বাজে শোম মোনা রিম বিন্‌কির,

মিষু মিষু কোয়ারা বহির কিনকির,

গর্দানে জিজির।

ইহা ছেলেভুলানো শব্দের আগড়ম-বাগড়ম, কবিতা নয়।

নিজের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বিপুল বিস্তার বর্ণনা করতে রবীন্দ্রনাথ মাত্র বলেন,

“ঠেকেছে মাথা মোর

মেঘের মাঝখানে—”

আর নজরুল বলতে থাকেন,

আমি বজ্র আমি ঈশান, বিঘাণে ওড়ার

আমি ইত্বাকিলের শিকার মহা হকার,

আমি পিনাক-পাণির ডমরু জিশুল বর্ষারাজের দণ্ড,

আমি চক্র মহাশব্দ, আমি প্রববদার প্রচণ্ড

আমি ক্যাপা হুর্কোলা বিধামিজ শিষ্য

আমি দাবানল দাহ, দাহন করি বিশ্ব।

এর শেষ হবে তখন—

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাভাসে ধ্বনিবে না
অভ্যাচারীর ধ্বংস-কুপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।

এই উদ্গু নৃত্যযুগির পাকে পাকে শব্দগুলির পৃথক অর্থ-অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। কেবল ধ্বনির একটা বৌও বৌও শব্দ চারদিকে ঘুরতে থাকে। ভাষানিহিত ভাষারই অন্তর্বিরোধ স্বর এসে চেতনামঞ্চ অধিকার করে।

নজরুলের সমগ্র কাব্যে এই ঘটনা ঘটেছে। কবি তিনি, শব্দের উপরে তাঁর সারস্বত অধিকার। তথাপি শব্দ-গুলোকে মুঠো করে ধরে তিনি স্বরের বানভাসিতে ছেড়ে দেন, ঘটান তাদের পৃথক অর্থব্যক্তিত্বচ্যুতি।

উপরের মন্তব্যের সপক্ষে হয়তো অনেকেই সায় দেবেন না। শিল্পের স্থূলপাঠ্য জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ এটা নয় যে, বিনা প্রমাণেই প্রতীতি জন্মাবে।

কিন্তু প্রমাণ স্বয়ং নজরুলই হাজির করে দিয়েছেন শিল্পী হিসাবে তাঁর আত্মরূপান্তরের মধ্য দিয়ে।

নজরুল কাব্য-রচনা ছেড়ে গীতকথা-রচনার ক্ষেত্রে চলে আসেন। কথার মাধ্যম ছেড়ে নামেন স্বরের মাধ্যমে। সমাজেরই চেতনার ধাক্কায় নজরুলের এই অবতরণ! সে চেতনা ভাল ব্যবহার পায় নি নজরুলের হাতে। কোথায় বুদ্ধি আবেগের উচ্চ থেকে উচ্চতর সংস্থিতির ধাপে ধাপে কবির বাক্যপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমাজের চেতনা এগিয়ে চলবে বিস্তৃততর ভবিষ্যতের দিকে—তা না হয়ে সে চেতনার বাস্তব প্রতিনিধিত্ব নজরুলের হাতে পড়ে বাধ্য হয়েছে ধ্বনির ভৈরবীচক্রে যোগদান করতে, এবং শেলশূল-বাহুত শ্মশানান্ধকারে এই কবির সিদ্ধাই রূপে রয়েছে তাঁর আজীবন হয়ে।

এর প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। ‘বিদ্রোহী’ বা ‘ধুমকেতু’র মত কবিতা ধীর রচিত তিনি নিঃসন্দেহে বড় কবি। কিন্তু শক্তিচ্যুতির অব্যবহিত পূর্বে, শক্তির চরমপ্রকাশ গ্রীক-ট্রাজেডিতে দেখা যায়, এবং বত স্তম্ভভাবেই হোক, সে চ্যুতি বা পতনের কারণ অব্যবহিত পূর্ব-দৃষ্টির বিস্ময়কর শক্তিমত্তার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে।

নজরুলে তাই হয়েছে। সমসাময়িক সমাজের সম্বন্ধ চেতনাপীঠ থেকে অপেক্ষাকৃত অবিকশিত চেতনার নিম্ন ধাপে তিনি অবরোহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কথার

বদলে বাহন পেয়েছেন স্বরকে তাঁর শিল্পীজীবনে, আর গীতিকাররূপে নজরুলের তুলনা নেই। কে যেন তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে গান গেয়েছিল। গান গেয়েছিল তাঁর চক্ষু দিয়ে শ্রোত্র দিয়ে শুক দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের গান—তার সঙ্গে নজরুলের গান। দেহ-মমতার প্রতিকূল এবং অহুকুল বেদনা। স্বরের মন্দাকিনী আর ভোগবতী। বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্যকে উপনিষদ দিয়ে শোধন করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, আর তাল্লিকতা দিয়ে ভয়াল করে নিয়েছেন নজরুল। শিল্প-মহিমায় নজরুলের গান তাঁর কবিতার চেয়ে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ এবং তা ‘বিদ্রোহী’ বা ‘ধুমকেতু’কে বাদ দিয়ে নয়।

বাঙালীর কাব্যভূমির যথেষ্ট প্রসার হলেও তার গোড়ার দিকের জমিটা এখনও বেশ ঢালু এবং পিচ্ছিল আছে, নজরুলে তৃতীয় বারের জগৎ তা সপ্রমাণ হ’ল। প্রথম প্রমাণ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিলোত্তমাসম্ভব এবং যেখনাদবধ কাব্য দিয়ে স্বর করে তিনি ব্রজাঙ্গনা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। স্বর-কালিন্দীর কূলে এসে অকালে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তাঁর স্বত্বা ঘটে।

মিস্টনকে দিয়ে গীতিকথা রচনা কেউ আশা করতে পারেন?

দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গীতিকার এবং কবির দ্বন্দ্ব-সম্বন্ধ চলছে। গীতাজলি, গীতালি, গীতিমাল্যের তৃতীয় অঙ্কে এসে গীতিকার রূপে রবীন্দ্রনাথের জয়-জয়কার ঘোষিত হয়েছিল। বার্গস’য়ের Creative Evolution বিধৃত জীবনদর্শন যথাসময়ে মঞ্চে এসে হাজির হয়েছিল—তাই ‘বলাকা’র কবির পুনর্জন্ম।

তৃতীয় নজরুল। কবিত্বের দ্বিগুণ সত্ত্বও কবিত্বেরই অন্তর্নিহিত বিরোধ স্বর হয়ে তাঁর রূপান্তর ঘটান—বদলে গেল শিল্পের মাধ্যম, কবি পরিণত হলেন গীতিকারে।

কিন্তু জীব-বিজ্ঞানের পৃথক পৃথক জীবশ্রেণীর ত্রায়, শিল্প-বিজ্ঞানে গীতিকথা এবং কবিতা যে পৃথক শিল্পশ্রেণী বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে এ নিয়ে বাংলা-সাহিত্যে ভাল করে আলোচনা হয় নি। তা হলে কবি থেকে গীতিকারে নজরুলের রূপান্তর আরও ভাল করে বোঝা যাবে।

দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১২

অবেশ চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরের কথা।

দেবানন্দ টাপাতলায় কানাই বরের সেনে যুগান্তর আপিসে গিয়া শুঘিল সেই দিনই তাহাকে দীক্ষা দেওয়া হইবে এবং নীত্রই তাহার উপর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়িবে। শুনিয়া সে আনন্দিত হইল।

দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষার পরে তাহার মনের ভাব কানিবার দৃঢ় দেবানন্দের ডায়েরী হইতে এখানে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে :

ব্রিটিশ রাজত্ব ধ্বংস ও ব্রিটিশ রাজত্বের রক্ষক ইংরেজ রাজকর্মচারীদের ধ্বংস করবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে আমি মলে দীক্ষিত হয়েছি। গীতা ও তত্ত্বাবধি স্পর্শ করে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে আমার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছি। আমাকে কে দীক্ষা দিলেন জানি না। মূপের ঘোঁরাই অঙ্ককার ছোট একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বেদীর সামনে বসিয়ে দিলেন। গভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে আমাকে আদেশ দিলেন মারের খড়্গ ও পবিত্র গীতা স্পর্শ করে মন্ত্র বল। কনের মন্ত আমি মন্ত্র বলে গেলাম। তার পর কঠিন শপথ, সর্ব্বের ত্যাগের শপথ করে ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ করে দেশে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প ঘোষণা করলাম। অঙ্ককারের মধ্যে কঠিন স্বরে কে বললেন, মন্ত্রগুণ্ডির শপথ ভঙ্গ করলে তার শাস্তি কি দান ?

আমি বললাম, মৃত্যু।

—বিধানসভাকতার কি শাস্তি দান ?

আমি বললাম, মৃত্যু।

গীতা ও মারের খড়্গকে প্রণাম করে উঠবার আদেশ হ'ল। ছোট ঘর হতে বেরিয়ে আর একটি ঘরে এসে বসলাম। আমার বুকের মধ্যে ভখনও মপ্ মপ্ করে শব্দ হচ্ছে উত্তেজনার। চোখে যেন ভাল দেখতে পাচ্ছি না। মনে কেবল একটি চিন্তার আলোড়ন অনুভব করছি, আজ থেকে আমার মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী, সংসারের সকলের সঙ্গে স্নেহের বানধা ছিঁড়ে গেল, আমি আর তাদের কেউ নই। কণাটা ভাবি আর চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসে। আমি যে এত দুর্বল আগে জানতাম না।

হে আমার দেশ, হে আমার বহু শতাব্দীর পরাধীন মাছুষ্মি, আমার সকল জ্ঞান, বুদ্ধি, উজ্জ্বল, সাহস আজ হতে তোমার মুখলমোচনের চেষ্টার নিয়োজিত করব, আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত তোমার সেবায় পাশ করব।

দীক্ষার মাসখানেক পরের কথা।

মাণিকভালা বাগানে কি কাজের দ্রুত দেবানন্দের ডাক পড়িয়াছিল। কাজ সারিয়া সে দিল্লিত্যেক পরে হাট্টেলে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল অবশেষে গিটে বরিশাল কলেজ হাট্টেলের নির্মল বসিয়া আছে, ঘরে আর কেহ নাই।

দেবানন্দকে দেখিয়া নির্মল তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, উঃ, কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা দেবুদা।

দেবানন্দ নির্মলকে দেখিয়া আশ্চর্য হইল। বলিল, তুই কি করে এখানে এলি ? মহেজ কোথায় ?

নির্মল—মহেন্দা বিডন ধীটে এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়েছে, সেখানে কার অস্থি। আমি এখানে পড়তে এসেছি। কলেজে গিট পেলে ভর্তি হব। টাকা-পয়সার অভাবে এত দিন পড়া বন্ধ ছিল। একজনরা ধরত দেবে, তাই আবার পড়ব। অতুলদার কাছে মহেন্দার টিকানা জেনে নিয়ে এখানে উঠেছি।

দেবানন্দ—অতুল কোথায় এখন ? তার এক চিঠি পেরেছিলাম, এ পর্যন্ত উত্তর দেওয়া হয় নি।

নির্মল—এখন সে কোথায় বলতে পারি না, কলকাতার আসবে বলেছিল।

তার পর সে বলিল, কাল সকালে দু'জন হলে এসেছিল তোমার কাছে। একটা কাগজের বাঙালি দিয়ে গেল তোমাকে দেবার জন্ত।

মহেন্দের টেবিলের উপর হইতে সে বাঙালিট লইয়া দেবানন্দকে দিল। বাঙালি খুলিয়া বাহির হইল দশ কপি যুগান্তর।

যুগান্তর দেখিয়া নির্মল উহার একখামা টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। মিনিট দুই পড়িয়া নির্মল বলিল, দেবুদা, শোন যুগান্তর কি লিখেছে। কি সাহস কাগজখামার।

“ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব।”

দেবানন্দ উঠিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিল। নির্মল হাসিয়া বলিল, পয়সা দিয়ে কিনে রাজাঘাটে যেখানে সেখানে লোকে পড়ছে আর তুমি দোর বন্ধ করলে।

সে পড়িতে লাগিল—“রাধীনভালাভের দ্রুত ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার প্রয়োজন নাই—দেশের এক দল লোক এই কথা বলিতে চাহেন। তাহাদের বক্তব্য এই যে, দেশের লোক যদি ইংরেজের অধীনে চাকুরী করিতে অস্বীকার করে, ইংরেজকে কোনভাবে সাহায্য করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে এত বড় দেশকে জমকয়ে বিদেশীর পক্ষে

অধীনে রাধা অসম্ভব হইবে এবং তাহাদের রাজ্য ভাঙিয়া পড়িবে।

—“আইন বাঁচাইয়া চলিবার আশ্রয় হইতে নিষ্কিন্ন প্রতিরোধের কথা বলা হয়। অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া প্রতিকার করিবার চেষ্টা ইংরেজের আইনে অপরাধ নহে, এইজন্য উহা যুক্তিযুক্ত ও সদৃশ উপায়—এই ধারণার মধ্যে গলদ রহিয়াছে। ইংরেজ আইন বালাইরাছে তাহার সুবিধার দৃষ্ট ও দেশের সর্বনাশ করিবার দৃষ্ট। ইংরেজের ভৈরৱি এই আইন মানিবার জন্য আমাদের কিসের বাধ্যবাধকতা ?

—“ইংরেজের ভৈরৱি আইনের মূলে রহিয়াছে তাহাদের গায়ের জোর। এই আইনের কবল হইতে যুক্তিলাভ করিতে হইলে আমাদেরকেও গায়ের জোরের চর্চা করিতে হইবে। এই পথ হইতেছে আমাদের পক্ষে সঠিক পথ।

—“কি ভাবে আমরা প্রবলপ্রতাপশালী ইংরেজের সঙ্গে গায়ের জোরের পাল্লা দিতে পারি ?

—“যুবক ম্যাটিসনির কথায় প্রথমে তাহার দেশের বেই লোক কর্ণপাত করিত না। আজ ইটালী তাহার কলক-কালিমা যজ্ঞের ধারায় বুইয়া ফেলিয়াছে।

—“এদেশে ইংরেজের সংখ্যা এক লাখের বেই নহে। প্রতি জেলার কত জন ইংরেজ কর্মচারী আছে ? এক দিনে তোমরা ইংরেজের শাসন খতম করিয়া দিতে পার।

“আজ সময় আসিয়াছে ইংরেজকে বুঝাইয়া দিবার যে পরের দেশ অন্যান্য করিয়া দখল করিয়া রাজ্যভোগ করিবার আনন্দ চিরকাল চলিতে পারে না।

“একটি জীবন শেষ করিয়া একটি জীবন দিবার জন্য প্রস্তুত হও। স্বাধীনতার মন্দিরে তোমার জীবন উৎসর্গ কর। বিনা রক্তপাতে দেবীর পূজা সম্পন্ন হইবে না।”

নির্মূল ধামিল। কাগজখানার আর এক অংশে দৃষ্টিপাত করিয়া পড়িতে লাগিল—“অর্থসংগ্রহের উপায়। ধনী ব্যক্তিদের অর্থ লুণ্ঠন, সরকারী অর্থ লুণ্ঠন, জনসাধারণের নিকট ট্যাক্স আদায়,—এই কয়েকটি উপায়ে সমগ্র বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে।”

হুই জন কিছুকণ চুপ করিয়া রহিল। প্রথমে কথা বলিল নির্মূল। হাসিয়া সে বলিল, দেবুলা, একটা মজার কথা যেনে হ’ল যুগান্তর পড়ে। যুগান্তরের মত শুনলে। অন্যদিকে আবার বঙ্গবাসী দলের কাগজগুলো কি বলে জান ? তাদের মতে “ইংরেজের সাহায্য ছাড়া আমরা কোন দিন স্বরাজ পাব না। ইংরেজকে গুরুত্ব মত শ্রদ্ধা কর, সেবা কর, বিপ্লবের কথা মন থেকে দূর করে দাও। বরকট বড় ধারণা জিনিস, কারণ এতে যেন বিদ্রোহ আনে।”

দেবানন্দ কোন উত্তর দিল না। সে ভাবিতেছিল ব্যান-বারণায় মধ্য দিয়া যুগান্তর দল কি এবার ভগবানের ইচ্ছিত

দেখিতে পাইল ? তাহাদের নিজেদের সঞ্চয় কতখানি হইরাছে যে দেশের লোককে প্রকৃতভাবে তাহাদের পথের সন্ধান দিতে সাহস করিতেছে ?

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নির্মূল কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় দরজার আঘাতের শব্দ হইল। দেবানন্দ নির্মূলকে বলিল, কাগজপত্র বালিশের নীচে রাখ। সে দরজা খুলিয়া দিতে মহেজ্ব ঘরে প্রবেশ করিল। দেবানন্দকে দেখিয়া সে বলিল, তুই কখন এলি দেবু ? বিকলে দোর বন্ধ করে ছটোতে যুগুচ্ছিস নাকি ?

নির্মূল বলিল, রুগ্ন আত্মীয়ের সেবা করে আর কতদিন কলেজ কাছাই করবে মহেনদা ? কিন্তু ভোমার চেহারা-খানা ত রাত জেগে সেবা করবার মত শুকনো লাগছে না ?

মহেজ্ব হাসিতে লাগিল। বলিল, সে এক আত্মব কাণ্ড। গিরিধারীকে ডেকে কিছু খাবার আনতে দে আগে। অনেক দূর, সেই আলমবাজার থেকে আসছি, ঘিমে পেয়ে গেছে।

দেবানন্দ বারান্দার গিয়া গিরিধারী, গিরিধারী বলিয়া ডাকিল। “ঘাউচি এজ্ঞে” বলিয়া গিরিধারী সাড়া দিল।

নির্মূল—আলমবাজার থেকে আসছ মানে ? ভোমার আত্মীয়ের বাড়ী বিভন্ন দ্বীটে শুনেছিলাম না ?

গিরিধারীর হাতে খাবার আনিবার পরসা দিয়া দেবানন্দ ঘরে আসিল।

মহেজ্ব হাসিয়া বলিল, আত্মীয়ের বাড়ী বিভন্ন দ্বীটে, কিন্তু আমি থাকি আলমবাজারে। কাণ্ডটা কি এবার বলি শোন। আত্মীয়ের অসুখ বটে, কিন্তু আমাকে তলব করবার কারণ অল্পরকম। আমার এক মাসী এসেছেন তাঁর বিধবা নন্দনের মেয়ে নিয়ে। মেয়েটি আইবুড়ো এবং মাসীর পোস্ত। প্রথম দিন খবর পেয়ে যেতেই মাসীমা কেঁদে-কেটে অস্থির। তাঁর পেটে ব্যথা হয়েছে, আর বাঁচবেন না। কিন্তু পিতৃমাতৃহীনা এই যে অনাথা মেয়েটিকে মাহুষ করেছেন তার কি গতি হবে ভেবে মরতে পারছেন না। তুই যদি একটু দয়া করিস বাবা—বলে আমার হুই হাত জড়িয়ে ধরলেন। মেয়েটি সেই ঘরের এক কোণে বসে ফাঁস ফাঁস করে কাঁদতে লাগল। বোঝ হয় তাঁকে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা হয়েছিল। আমাকে হঠেলে আসতে দেবেন না। ডাঃ কেদার দাসকে দিয়ে দেখাবেন, আমাকে সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমি ছাড়া আর কে তাঁকে দেখবে ?

নির্মূল—কিন্তু ভোমার বিভন্ন দ্বীটের সেই আত্মীয় ত নিজেই ডাক্তার।

মহেজ্ব—হ্যাঁ, বেশ নামকরা ডাক্তার। তা হলে ব্যাপারটা ত বুঝতে পারছিস ? অসুখ হয়েছে, ডাক্তার-আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠেছেন। আর বড় ডাক্তার দেখাবার, চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার তার নিতে হবে আমাকে। সেদিন কোন

গভিকে পালিয়ে এসে আর ওযুখো হই নে। লোক আসে ডাকতে। তাকে বললাম তাঁদের ওখানে যাছি কিন্তু একেবারে আলমবাজারে আমার গিশতুতো ভাই মনীন্দার বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। আলমবাজার থেকে কলেজ করি আর বিকেলে দক্ষিণেথরে গদার ঘাটে গিয়ে বসে থাকি। এবার আমাকে ডাকতে লোক এলে বলবি আমাকে পুলিশ বরে নিয়ে ছেলে রেখেছে।

তাহার কথা শুনিয়া দেবানন্দ ও নির্মল হাসিতে লাগিল। গিরিধারী শালপাতার ছই চৌত্তা ভর্তি ধাবার আনিল। ভিন জনে ভাগাভাগি করিয়া খাইতে শুরু করিল। মহেন্দ্র বলিল, গিরিধারীমণি, ভিন গেলাস জল ঐ কুঁজো থেকে গড়িয়ে দিতে খাচ্ছা করুন।

আদরের সন্তাষণ শুনিয়া গিরিধারী আকর্ণবিহ্বত হাসি হাসিল। ভিন গেলাস জল টেবিলের উপর রাখিয়া সে গ্রহান করিল।

মহেন্দ্র বলিল, দক্ষিণেথরে এক দিন আমাদের অভূতের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। বড় বড় চুল রেখে সে বাবাজী-গোছের চেহারা করেছে। ‘মাসেল’ সেই রকম আছে। দেখে মনে হয় একটা যুগ্মার্থী বাবাজী বটেন। বলল, বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, তাদের সকলের ধর বুট্টেয়ে জিজ্ঞাসা করল। বলল, দেবানন্দকে একখানা চিঠি লিখেছি, উত্তর পাই নি। এক দিন আসবে এখানে বলল। কাল আবার দেখা হয়েছিল। তারি উত্তেজিত মনে হ’ল শুকে দেখে। বলল, ও কুমিল্লা ঘাবার আদেশ পেয়েছে, রাজে চলে যাবে। আরও অনেক কথা বলল। কুমিল্লা, ঢাকা, মৈমনসিংহে নাকি ভ্রমণক গেলমানের আশঙ্কা হয়েছে। বরিশাল ও রাজ-সাহীতে নাকি অবস্থা ভাল নয়। ঢাকার ন্যাপনাল জুলের মাঠার ও অহুদীলন সমিতির নেতা পুলিশ দাসকে কয়েক জন মুসলমান গুণ্ডা মিলে মারধোর করেছে। ধর পেয়ে ছেলেরা কেপে গেছে। নানা জায়গা থেকে ছেলেরা কুমিল্লা, মৈমনসিংহ ঢাকার দিকে যাচ্ছে।

কথাবার্তার সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মহেন্দ্র বলিল, আজ উঠি ভাই। বলে আসি নি, নইলে আজ এখানেই থেকে যেতাম। আমার ভয় আছে, ধর না পেয়ে মাসীমা নিজেই হয়ত হঠেল পর্যন্ত বাওয়া করবেন। বলবেন, ডাঃ কেশার দাস বলেছেন, তুই সঙ্গে না নিয়ে গেলে রোগি দেখবেন না, আর বাবা, গাড়ীতে উঠে আর।

তাহার কথা শুনিয়া নির্মল হাসিতে লাগিল। মহেন্দ্র বলিল, ছুলিস না, এবার কেউ খোঁজ নিতে এলে বলবি তাকে বরে নিয়ে ছেলে রেখেছে। তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে হঠেলে আসতে পারি।

নির্মল—তুমি কাল চলে এসো। দারোয়ানকে শিখিয়ে রাখব। কেউ ভোয়ার খোঁজ নিতে এলে নীচে বসিয়ে রেখে আমাদের ধর দেবে। আমরা নীচে গিয়ে তাকে বাগা দিয়ে বিদেয় করব।

মহেন্দ্র—ভাল বুদ্ধি করেছিস। আমি কাল কলেজ থেকে হঠেলে ফিরব।

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। নির্মল বলিল, দেবুদা একটু বেড়িয়ে আসবে? আমাকে ছই-একটা জিনিস কিনতে হবে। চল না একসঙ্গে বেরুই।

দেবানন্দ—তুই যা। আমার ছই-একখানা চিঠি লেখবার আছে, সেয়ে রাখি।

নির্মল ভাষা গায়ে দিয়া বাহিরে গেল।

১৩

ভবেশ প্রায় দাস দুইয়ের মত অল্পপস্থিত। দেবানন্দ তাহাকে দেশের ঠিকানায় চিঠি লিখিয়াছিল, কোন উত্তর আসে নাই। ইহা শুনে কিছু বিস্মিত হইলেও দেবানন্দ এ সব দিকে বেশী মন দিবার সময় পায় না। এক দিকে পরীক্ষার পড়া, অন্য দিকে দলের নানা রকম কাজ লইয়া সে সর্বদা ব্যস্ত থাকে।

ভবেশ চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ রায়ের পরিবার ও ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়াছে। হঠাৎ এক একবার হয়ত চকিতে কিটর কথা মনে পড়ে, ডাঃ চক্রবর্তীর কথা, তাহার লাইব্রেরী বরের জানালার দিকে নীল রঙের ‘ভাসে’ রজনীগন্ধার গুচ্ছ, যুগলের স্নিগ্ধ, সুন্দর হাসির কথা মনে উদয় হয়, কিন্তু এ সব চিন্তাকে সে প্রায় দেয় না যেমন সে প্রায় দেয় না আত্মীয়-স্বজনের চিন্তাকে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোবৃত্তি হইয়াছে, পূর্বাভাস ভগ্নভের সঙ্গে তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, হৃদয়ের সকল আন্তরিকতা ও প্রত্যয় দিয়া এই কথাই সে আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে।

মৈদিন সকালবেলা মহেন্দ্র তাহার হঠযোগিক প্রক্ৰিয়াদি সমাপ্তির পর স্নান করিয়া বরে ফিরিয়াছে, দেবানন্দ ও নির্মল পড়াশুনা করিতেছে, দারোয়ান আসিয়া খানাইল এক বাবুজী ও ছই খোঁকীলোগ আসিয়াছে, তাহারা ভবেশ বাবুজীর ধর গৃহ করলেন।

ধর শুনিয়া মহেন্দ্র, দেবানন্দ ও নির্মল এ-ওর যুথের দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে চাহিল। মহেন্দ্র বলিল—বলে দাও ভবেশ বাবু মুখুক গিয়া। দারোয়ান চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, উলোগ দেবানন্দ বাবুকা বাত গৃহতা।

মহেন্দ্র—তোমার খোঁজ করছে দেবু, গিয়ে দেখে এস।

নির্মল বলিল—আমিও বাই।

মহেন্দ্ৰ তাহাকে ধমকাইয়া বলিল—তুই বাবি কি ৱে ?
তোকৈ ডেকেহে মাৰ্কে ? সেই শুনেহে বোঁকী এসেহে অমনি
আমি যাই ? বোঁস চূপ কৰে।

যবক খাইয়া নিৰ্ম্মল অৱস্তাত হইয়া বসিরা মহিল। দেবা-
নন্দ দীচে মাথিয়া গেল।

হঠেলেৰ সাৰমে ৰাস্তায় এক ল্যাণ্ডো গাড়ীতে একজন
অপরিচিত যুবক, কিট ও তাহাৰ বহনী একটী মেয়ে
হাসিরাছিল। দেবানন্দকে দেবিয়া যুবকটি বলিল—
আপনার নাম দেবানন্দ বাবু ? আমি ডাঃ ৱায়েৰ বাড়ী
থেকে আসছি। ভবেশদা আমার পিসতুতো ভাই। তাঁর
কোন খবর পাচ্ছি না আমরা। তিনি দেশে যান নি, কল-
কাতায় কোন আত্মীয়বাড়ীতেও নেই। কোথায় গেলেন
আপনি কিছু জানেন ? ক’দিন বাদে আমার এক বোনের
বিয়ে—

দেবানন্দ দেখিল কিটী অচ দিকে চাহিয়া আছে।
তাহাকে কোন সম্ভাষণ কৰিল না। সে একটু বিস্মিত ও
হুঃখিত হইল। যুবকটির কথাৰ উত্তরে সে বলিল—

হঠেলে সকলে জানে তিনি দেশে গৈছেন। আমি দেশের
ঠিকানার চিঠি দিয়েছিলাম, উত্তর পাই নি।

যুবকটি চিন্তিত ভাবে বলিল—কিন্তু দেশে ত তিনি যান
নি ? কোথায় গেলেন তবে ? কিটী চল বাড়ী ফিৰি
আছা, নমস্কাৰ।

দেবানন্দ হঠেলেৰ দিকে ফিৰিল। ৰাস্তা পাৰ হইয়া
ফটকে ঢুকিতে গিয়া পিছনে ডাক শুনিয়া সে ঘূৰিয়া দাঁড়াইল।
বিস্মিত হইয়া সে দেখিল কিটী ৰাস্তা পাৰ হইয়া তাহাৰ পিছনে
আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেবানন্দেৰ মুখেৰ দিকে একবার
চাহিয়া কিটী তাহাকে প্ৰণাম কৰিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল
—আমার বিয়ে হবে শীগগির। তোমাকে নিমন্ত্ৰণ কৰব না।
আশীৰ্বাদ কৰ।

তাহাৰ কথা শুনিয়া দেবানন্দ মুহু হাসিল। বলিল—
আমার আশীৰ্বাদ ? বেশ, আশীৰ্বাদ কৰি, দেশেৰ প্ৰতি
তোমাৰ ভক্তি ও ভালবালা অক্ষয় হোক।

আশীৰ্বাদ শুনিয়া কিটী মাথা হেঁট কৰিল। ৰাস্তাৰ লোক
কোত্থলী দৃষ্টিতে তাহাদেৰ দিকে চাহিতেছিল। কিটী
গাড়ীৰ দিকে ফিৰিয়া চলিল।

গাড়ীৰ উপৰ মেয়েটি তাহাৰ জ্যেষ্ঠত্ব বোন সন্ম। সন্ম
গাড়ীৰ একপাশে হেলিয়া সন্ধানী দৃষ্টিতে দেবানন্দ ও কিটীকে
দেখিতেছিল। কিটী গাড়ীতে ফিৰিলে গাড়ী চলিতে লাগিল।
সন্ম জিজ্ঞাসা কৰিল—এই ছেলেটিৰ সন্দে ভোৰ কত দিনেৰ
আলাপ ৱে ?

কিটী অচ দিকে মুখ ফিৰাইয়া বসিরাছিল। সন্ম
প্ৰশ্নেৰ কোন উত্তৰ দিল না।

দেবানন্দ ৱেৰে ফিৰিলে মহেন্দ্ৰ ও নিৰ্ম্মল একগদে জিজ্ঞাসা
কৰিল—কাৱা এসেছিল ?

দেবানন্দ—একজন মিঃ ৱায়েৰ মেয়ে, একজন ভবেশদাৰ
বড় মায়া ডাঃ ৱায়েৰ ছেলে, আৰ একজন কে চিনি মা।

মহেন্দ্ৰ—ভবেশেৰ বোঁকে হঠেলে পৰ্যন্ত এসেছিল কেন ?

দেবানন্দ সংক্ষেপে বলিল—ভা ত জানিনে। তিনি দেশে
যান নি, তাই বোঁক নিতে এসেছিল হঠেলে।

মহেন্দ্ৰ মন্তব্য কৰিল—তবে ভবেশ গেল কোথায় ?

দাৱোদান আগিয়া দেবানন্দেৰ সীটেৰ উপৰ একখানা
খবৰেৰ কাগজ ৰাখিা গেল। নিৰ্ম্মল কাগজ খুলিয়া প্ৰথম
পাতায় চোখ বুলাইয়া বলিল—শোন, শোন, “কুমিল্লায় মুসল-
মানদের শুভামি। হিন্দু দোকান-পাট লুঠ। পঞ্চাশী হিন্দুদের
বেপৰোয়া আক্রমণ। সলিমুল্লাহ নুতন কীর্তি।”

তিন জন একগদে কুমিল্লাৰ দাদাৰ বিবৰণ পড়িতে
লাগিল।

হুই-চাৰি দিনেৰ মধ্যে কুমিল্লাৰ দাদা সৰহে নানা বকম
খবৰ চাৰদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কেহ বলিল কুমিল্লাৰ এই
দাদা নবাব সলিমুল্লাহৰ আগমনেৰ ফল। সলিমুল্লাহ মুসলমান
দাদাকামীদিকে হিন্দুৰ দোকানপাট লুঠ কৰিবাৰ আদেশ
দিয়াছিলেন। দাদাকামীদেৰ ভাওব চোখে দেখিয়াও
জেলা ম্যাজিষ্ট্ৰেট ও পুলিস সাহেব নিজৰ ভাবে বসিরাছিল।
দাদাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত ও আহত হিন্দুৰা ধান্যৰ গেলে পুলিস
তাহাদেৰ এজাহাৰ লইতে অস্বীকাৰ কৰিরাছে। আহত ও
হুগ্ৰভদেৰ কোন প্ৰকাৰ সাহায্য দিবাৰ ব্যবস্থা কৰা হয় নাই।
একখানি কাগজেৰ সংবাদদাতা লিখিল—হিন্দুৰা যতক্ষণ মাৰ
খাইতেছিল, দাদা ধান্যইবাৰ কোন চেঠাই কর্তৃপক্ষ কৰিলেন
না। একজন মুসলমান গুলিতে নিহত ও পুলিসসাহেব গ্ৰহণ
হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্ৰেট চোখ বুলিলেন।

সন্ম লিখিল—“কুমিল্লাৰ দাদা হুইতে বুঝা যাইতেছে
হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া ভাড়াভাবে কাঁধে কাঁধ দিয়া দাঁড়াইবাৰ
দিন বহু দূৰে। ফিৰিদিয় শয়তানি কত দূৰ যাইতে পারে এই
দাদা হুইতে আমরা জানিতে পারিলাম।” অচ একখানি
কাগজ লিখিল, “সলিমুল্লা পাটীপানের সমর্থনে সভা কৰিবাৰ
চেঠা কৰাতে দাদা বাঁধিয়া গেল। সরকারী বিবৰণ হুইতে
জানা যায়, মুসলমানৰা কর্তৃপক্ষকে অগ্ৰাহ কৰিয়া বেআইনী
শোভাযাত্রা কৰিয়া আজা হো আকবৰ ধ্বনি দিতে দিতে
শহৰেৰ ৰাস্তা চৰিয়া বেড়াইতে লাগিল, হিন্দুদেৰ বেপৰোয়া
মারপিট কৰিতে লাগিল।” একখানা কাগজেৰ সংবাদদাতা
লিখিল—“কুমিল্লায় মগৱাৰ যে গুৰ্বা মিলিটারী পুলিস বসান
হুইরাছে তাহাৰ কম্যাণ্ডাণ্ট বলিয়া বেড়াইতেছে বন্দোবস্তৰ
বন্ধ কৰিবাৰ অচ প্ৰত্যেক জেলাৰ কতকগুলি ছেলেকে গুলি
কৰিয়া মাৰিতে হুইবে।”

হুমিলায় দাকার ব্যাপারে দেশের কিছু লোক বিম্বিত হইয়া দেখিল এদেশীয় ইংরেজ রাজপুরুষগণ স্বদেশী আন্দোলন দমন করিবার জন্ত নিজেদের পদোচ্চিত কর্তব্য ভুলিয়া কতদূর বিপথে যাইতে পারে। লোকের মূর্ত্তিকিত হুর্কিল, ফুলারী আশঙ্কের কথা অনেকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল।

একখানি কাগজ লিখিল—“হুমিলা কি ঘণের যুক্ত? সোধনে যাহা ঘটিল, এক বৎসর আগে কোন ভারতবাসী কি কল্পনা করিতে পারিত সত্য ইংরেজশাসিত দেশে, বিংশ শতাব্দীতে তাহা কখনও ঘটতে পারে? দেশবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস—বিভেদসৃষ্টির নীতি দেশে এই সর্বশাস্ত্র আশ্রয় জালিবার জন্ত দায়ী।” সমগ্র অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া সজীবনী লিখিল—“যখন লাঠির সাহায্যে স্বদেশী আন্দোলন দমন করা গেল না তখন বিভেদের বীজ বুনবার জন্ত ফুলার সাহেব মুসলিম প্রেমে আকুল হইলেন। হেয়ার সাহেবের আমলে পুলিশের লাঠি আড়ালে রাখা হইয়াছে, মুসলমানরা লাঠি হাতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দাঙ্গা বাধিতে দেবিয়া কোন কোন ইংরেজ পুরুষ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন। হুমিলায় দাঙ্গা ও লুণ্ঠ-ভরাজের প্রথম দিন ম্যাডিক্সট্রেট ও পুলিশ দাঁড়াইয়া মজা দেখিল। বিত্তীয় দিন একজন হিন্দুর মাথা কাটিয়াছে দেবিয়া তাহার হাত পরিহাস করিল। তৃতীয় দিন যখন দোকানপাট লুণ্ঠ করা আরম্ভ হইল—লুণ্ঠ বন্ধ করিবার জন্ত তাহার কোমর চেষ্টা করিল না।”

হুমিলায় দাঙ্গার বিস্তারিত সংবাদ পৌঁছিলে যুগান্তর লিখিল, “হুমিলায় খটনাগুলির মধ্য দিয়া তগবানের ইঙ্গিত আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। দেশের সর্বত্র এই ধ্বনি উঠুক, আজ ক্ষান্তিতির উদ্বোধন চাই।”

বন্দোবস্তম্‌ ঘোষণা করিল, “বাংলার সর্বত্র আজ ‘জীগ অব মিউচুয়েল ডিফেন্স’ গঠন করা আবশ্যক হইয়াছে।” হুমিলায় যে সকল ছাত্র মুসলমান গুণাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের প্রশংসা করিয়া লিখিল—The boys are to be regarded as the chosen instruments of God” (ছেলেদের তগবানের নির্বাচিত যন্ত্র)।

হুমিলায় দাঙ্গা সম্পর্কে স্বদেশী ভলান্টিয়ারদের নাম সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। হুমিলা শহরের যেতাজী প্রমুখ সারকিট হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং সারকিট হাউসে থিয়ারা বহিল রাইফেলধারী গুর্খা। লোকে রটাইল বন্দুকের শব্দ শুনিয়া জঙ্গসাহেবের পত্নী মুর্ছা গিয়াছিলেন। লাঠি ও বল্লম সজ্জিত হইয়া ভলান্টিয়ারগণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শহরে পাহারা দিতে লাগিল।

মবাব আলি চৌধুরী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত মিহির ও সুধাকর কাগজ হুমিলায় দাঙ্গাহাদাঙ্গা সম্পর্কে লিখিল :

“হিন্দু রেসকর্পচারীরা মবাব সলিমুল্লা যে ট্রেনে হুমিলা আসিয়াছিলেন সেই ট্রেন ধ্বংস করিবার যত্নবদ্ধ করিয়াছিল। মবাবকে যখন শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন এক হিন্দুবাড়ী হইতে তাহাকে ঝাঁটা দেখান হয়। হিন্দুরা রাজ্যে কেজ পরিয়া পথেঘাটে মুসলমানদের মারপিট করে। হিন্দুদের ভয়ে মুসলমানরা দল বাঁধিয়া রাস্তায় চলাফেরা করে, এক জন দুই জন রাস্তায় চলিতে সাহস পায় না।

“বাঙালীদের আর ভীত বলিয়া উপহাস করা চলিবে না। তাহার প্রথম লাঠি ধরিতে শিখিয়াছে, পুলিশ সাহেবের গারে হাত ভুলিতে ভয় পায় না, খেলা ম্যাডিক্সট্রেটকে টিল মারিতে ইত্তমত করে না, গুলি চালাইয়া মুসলমানকে মারিতে সাহস করে—আন্দোলন চালাইয়া তাহার এক জন হোটেলারের চাকুরি থাইয়াছে। রাজ্যে হুমিলা শহরের নানা জায়গায় বিভিন্ন রকমের আওয়াজ শোনা যায়। এই আওয়াজের অর্থ কি আমরা জানি না। এই সব ব্যাপারে মেন্ডিডোনের বিজ্ঞোহের কথা মনে পড়ে। হঠাৎ আশ্রয় জালিয়া উঠা বিচিত্র নহে।”

দিনকয়েক পরে দেবানন্দ কেজ হইতে আদেশ পাইল তাহাকে প্রচারের জন্ত ও অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্ত মক্কাবন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে কিছুদিনের জন্য। ভাস্করমহাশয়, হুগলী, চন্দননগর হইয়া কটকে ও ছোটনাগপুরে যাইতে হইবে। আরও আদেশ হইল গেরুয়া লইয়া সরাসরীবেশে বেড়াইতে হইবে। সেদিন কেজে একটু উত্তেজনার তাব লক্ষ্য করিল সে। একটা ঘরে নগেনদা এবং আরও কয়েক জনের মধ্যে তর্ক হইতেছিল। ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া কথাবার্তার ঝানিকটা শুনিয়া সে বুঝিল পূর্ববঙ্গের অবস্থা ও দলের কর্তব্য তর্কের বিষয়।

এক জন বলিল—টাকার দল বা পারে কল্লক। এখান থেকে সাহায্য পাঠাতে হয় অস্থলীলম সমিতির কেজে পাঠাবে। আমাদের অন্যদিকে মন দিলে চলবে কেন?

নগেনদা বলিলেন—দলদলির কথা তুলো না। যুগান্তর যখন টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে যায় তখন টাকা এসেছিল কোথা থেকে? রংপুরের কেজে থেকে টাকা আসে, তাই দিয়ে যুগান্তর চালু করা হয়। নিশ্চয় আমরা লোক পাঠাব যদি অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়।

প্রথম ব্যক্তি বলিল—লোক ত পাঠাবে। মালমশলার—

তাহার চোখ দেবানন্দের দিকে পড়তে সে থামিয়া গেল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তার পরে স্থির হইল আর কয়েক দিন পরে দেবানন্দের পরীক্ষা, পরীক্ষা শেষ হইলে সে হঠেন ছাড়িয়া চাপাতলার কেজে চলিয়া আসিবে, তারপর বাহিরে যাইবে।

পরীক্ষা শেষ হইল। দেশে যাইতেছে বলিয়া সে জিনিষ-পত্র গুছাইতে লাগিল। রাজ্যে সে দুইখানি চিঠি লিখিতে বসিল। একখানি লিখিল তাহার মাতাকে, সংক্ষেপে জানাইল সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে, ইহাই তাহার শেষ পত্র। বিত্তীয় পত্র লিখিল ইজের কাছে। লিখিল—ভাই ইজ, এই চিঠিতে কয়েকটা দরকারী কথা লিখছি। তোকে আমি নিজের ভাইয়ের মত দেখি তাই লিখছি। তোকে একথা সেখা বাহুল্য হলেও লিখছি। বাবার অভাবে আমার মা, ভাইবোনদের একটু দেখিস। আমি এক অজানা পথে পা দিইয়াছি। আমার গতিবিধির আর ঠিকানা কেউ পাবে না এর পর। ভ্রত নিয়েছি মন্ত্রের সাধন কিংবা জীবনপাত। সংসার ও মায়া হস্ত মনে সাময়িক হ্রস্বলভা আনবে, কিন্তু আমার সঙ্গ ঘেন একটু নাজ হ্রস্বল না হয় এই প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে।

—অজানা পথের কথা বলেছি। ইজ, শুধু তোকে বলছি ভাই, পথ শুধু অজানা নয়, অন্ধকারময়। কিন্তু আমি এক জন সামান্য দৈনিক মাত্র হতে চাই, বিচারের চেষ্ঠা আমি করব না। চোখের সাধনে দেখছি, সঙ্কল্পে অবিচলিত, সাহসে দুর্জয় শত শত তরুণ সৈনিক এই অতিমানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কোন দিন কিরতে পারবে কিনা তারা জানে না, লক্ষ্যে পৌছতে পারবে কিনা তারা জানে না, তবু তারা পা বাড়িয়েছে।

—আমি তাদের পিছনে যাবার জন্য অধীর হয়েছি। হিসাব, বিচার-বিশ্লেষণ অনেক হয়েছে, অনেক দিন ধরে, অনেকের ঘারা হয়েছে। আবেদন-নিবেদনের চূড়ান্ত করা হয়েছে। দস্ত্যকবলিত রক্ত ঘে শুধু রক্তের মূল্যে উদ্ধার করা সম্ভব এই চরম ও পরম সত্য আমরা বুঝতে চাই নি এতদিন। সেদিন দেখি একখানা কাগজ—বন্দোবস্তরম কাগজের নাম তুই নিশ্চয় শুনেছিল, ঠিক আমার মনের কথা লিখেছে :

“To avoid violent and bloody methods, the gentle, spiritual, law-abiding people are trying to invent new ways of regeneration which are, however, delusive. The petitionary delusion has been played out, and the medium of religion or industrialism though helpful are in themselves insufficient to effect the desired result. Politics is the work of the Kshatriya whose first virtue is ‘not to bow his neck to the unjust yoke’.”

(উগ্র ও রক্তসিক্ত পথে যাহাতে না যাইতে হয় এজন্য ভক্ত, ধার্মিক, আইন-ভক্ত লোকেরা মুক্তিলাভের নুতন নুতন উপায়ের সন্ধান করিতেছেন, কিন্তু এই সকল উপায় ভ্রান্তি-জনক। আবেদন-নিবেদনের মোহ পূর্য হইয়াছে। ধর্ম বা শিল্পোন্নতির পথে ধার্মিকতা কাছ হইতে পারে, কিন্তু এই

পথে অতীষ্টলাভ হইতে পারে না। রাজনীতির চর্চা কবিরের কর্ম, কবিরের প্রথম গুণ অন্যায় বিধানের নিকট মন্তক মন্ত করিতে অস্বীকার করা)।

কিন্তু এখন আর বিচারের কথা নয়, এখনকার কথা :

We are not to reason why.

We are but to do or die.

হাঁ, টু ডু অর ডাই, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—আমার পক্ষে এই একমাত্র পথ।

ভাই ইজ, আজ তোদের কাছ থেকে বিদায় নেবার কথা। ভোর কথা, লক্ষ্মীর কথা আর মার কথা মনে পড়ছে বার বার। চেষ্ঠা কয়েও মন থেকে সরতে পারছি না। জানি না আর কোন দিন তোদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা।

ভাই, এই চিঠিতে যা লিখলাম গোপন রাখবি। এক সময় না এক সময় বাড়ীতে সবাই জানতে পারবে। তুই কিছু জামাস না। আমার ভালবাসা মিল। লক্ষ্মীকে আমার ভালবাসা দিস।

* * *

ইজ কয়েক দিন খুব ব্যস্ত। গহরডোবা কাছারী লুঠ হইবার সম্ভাবনার কথা শুনিয়া সে সেখানে কয়েক জন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইল।

এদিকে উলিপুরের উত্তরে বিলের মধ্যে কোন কোন গ্রামে মারধোর, লুঠপাটের সংবাদ আসিতে লাগিল। ফেলে, ময়শূর চাষী, দুই-চার ঘর কৈবর্ত, কুমার, কামার, ভেলি মুদিখানার দোকানী মুসলমান গ্রামগুলিতে বাস করিত। তাহাদের কেহ কেহ জী-পুজ লইয়া রাজনগরে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। ইজ ও তাহার গ্রামরক্ষী দল ইহাদের জন্য ব্যবস্থা করিবার ভার লইল।

দিমকয়েক পরে সন্ধ্যার দিকে গ্রামরক্ষীদের এক জলাভিয়ার আসিয়া ধবর দিল যতীন মাষ্টার মহাশয় কিরিয়া আসিয়াছেন। ইজ হাতের কাছ ফেলিয়া রাবিয়া ভাড়া-ভাড়া স্কুলের কাছে যতীন মাষ্টারের বাড়ীর দিকে চলিল।

তখন আবছা অন্ধকার হইয়াছে চারদিকে। ইজ অন্ধকারে দেখিল বাহিরের ঘরের বারান্দায় কে একজন বসিয়া আছে। সে ডাকিল—মাষ্টার মহাশয়, বাড়ী আছেন?

বারান্দার উপবিষ্ট সেই লোকটি অভিশয় স্নেহবিগলিত স্বরে বলিল, আও বেটা আও, তুমহারে লিয়ে মায় বই দিনভর বৈঠ রহতা হ। অ লাও মেয়া বেটা।

বিস্মিত ইজ বলিল, আপনি কে? মাষ্টার মহাশয় কোথায়?

ইজের সাজা পাইয়া যতীন মাষ্টার ঘর হইতে বারান্দায় আসিল। বলিল, কে? ইজ নাকি? এসো এসো।

উপবিষ্ট লোকটি প্রতিবাদের স্বরে বলিয়া উঠিল—আরে

ইন্দির কোন ছায় ? বহুত মেয়া বেটা ছায়। আও বেটা আও।

তার পর সে অটহাভ করিল। বলিল, বাবু মশা, আনুন। খাবজাবেন না। আমি কিংবাহার মেনাপানী আছি।

ইল্ল কোন উত্তর না দিয়া বসে ঢুকিল। ঘরে হেরিকেন লগ্নন অনিভেছিল। ছুইট ছেলে বসে বসিয়া ছিল, ইল্ল বসে ঢুকিতে তাহারা ভাড়াভাড়া ভিতরে চলিয়া গেল। ইল্ল লগ্ননটি উঠাইয়া লইয়া বারান্দায় আসিয়া উঠু করিয়া বসিল। দেখিল বিরাটদেহ গেরুয়াধারী এক সন্ন্যাসী মাটিতে কহল পাতিয়া বসিয়া আছেন। মাথার প্রকাণ্ড গেরুয়া কাপড়ের পাগড়ি।

তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া ইল্ল বলিল—আপনি কোন মেনাপানের মেনাপানী ? দেখে শু মনে হচ্ছে গ্যালিতারের ভবভিগঙ্গাগ থেকে এসেছেন।

সন্ন্যাসী ও যতীন মাষ্টার তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। লগ্নন নামাইয়া রাখিয়া ইল্ল বলিল—মাষ্টার মশায়, কুমিল্লার খবর বলুন। কাগজ পড়ে আমরা চিন্তিত আছি।

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—

চিড়া কর দুই বাহা চিড়া কর দুই

মানিকপীর খরগ করে ঢালাও লগ্নন।

এই মাষ্টার। ঘরে চল বাপু। মুড়ি টুটি থাকে শু বামা-খানেক আন। ঘরে ছুইট এরেছে, তার ওপর কমিদার অতিথি।

সকলে ঘরে ঢুকিল। যতীন মাষ্টার দরজা বন্ধ করিল। সন্ন্যাসী পাগড়ী পুলিশা শুভ্রপোষের উপর বসিল। ডাকিল—ওগো ধুকীরা, এদিকে এস শু হ'বোন।

ইল্ল দেখিল যে ছেলে ছুইট তাহাকে দেখিয়া ঘর ছুইতে পালাইয়াছিল তাহারা হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল। ছেলে ছুইটর পনের ঘোল বছরের বেশী বয়স নয়। একটির চেহারা আম্রবর্ণ, একটু বেঁটে, অটুট কসাঁ, মেয়েলী, কোমল চেহারা। তাহারা হাসিতেছিল। সন্ন্যাসী বলিল—বস ইন্দির বাবু, এদের পরিচয় দিই। এই যে আমার মত কলে কিন্তু বেঁটে বন্ধুদের ইনি হচ্ছেন ত্রিমতী গণেশ। আর উই রাধা-রাধা চেহারা যার তাঁর নাম ত্রিমতী দেবেশ। এঁরা দুই যতীন মাষ্টারের বিবাহিতা ভগ্নী। দাদার সঙ্গে পিড়ালয় কুমিল্লা থেকে খন্ডরালয়ে রাজ্য করেছেন। এখানে জারি ব্রেক করেছেন। যে খণ্ডাবের মাহুয ভোমরা ছুই ঠাকরুণ, এক দিন সরকারী খন্ডরালয়ে গিয়ে ত্রিজগদ্বা বলে কানিকাঠে ঝুলতে হবে নিশ্চিত থাক।

ছেলে ছুইট এই বক্তৃতা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। ইল্ল এই বক্তৃতার বিন্দুবিগ্ন বৃষ্টিতে পারিল না। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে যতীন মাষ্টারের দিকে চাহিল।

সকলে কহল পাতিয়া মেঝেতে বসিল। যতীন মাষ্টার

সন্ন্যাসীর পরিচয় দিয়া বলিল—এ সন্ন্যাসী প্রভু হচ্ছেন মি—। এক সাহেব কোম্পানীর ট্রাভেলিং সেন্সম্যান। বছরপাঁচ মাহুয, কখন সাহেব, কখন সন্ন্যাসী, কখন ভোক্তাপুরী দারোয়ান। নানা বেশে নানা কাজে বিহার থেকে চাটগাঁ, বর্ধা পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান। আমরা এঁকে কানি জিভুদা বলে। আর এই ছেলে দুই কুমিল্লা জ্বলের ছাত্র। বুনের চার্জে পুলিশ এদের পিছনে লেগেছে, এদের মেয়ে সাজিরে মিয়ে সরে পড়তে হয়েছে। কুমিল্লার থাকলে নির্ধাত বরা পড়ত। পুলিশ নিবারণ নামে একজনকে বেরিয়ে—গুলি করে একজন মুসলমানকে বুন করার জন্ত।

ইল্ল—কুমিল্লার অবস্থা কি দেখলেম বলুন।

জিভুদা—বেশ কথা বললে হে ছোক্তরা ? আমরা কি অবস্থা দেখতে গিয়েছিলাম সেখানে ? চাটগাঁ, ফকী আর বরিশালের কয়েকজন মাজ ঘেলে ছিল বটে, কিন্তু যা করবার কুমিল্লার ছেলেরা নিজেদাই করেছে।

যতীন—কুমিল্লা ঠিক আছে। মাবালক মিঞা অবজ্ঞা এখনও গোলমাল বাধাবার চেষ্টায় আছে পুলিশের সাহায্য নিয়ে। কুমিল্লা শহরে সুবিধে করতে না পেরে এখন মগরা-ছাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৈমনসিংহে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা চলছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রটাচ্ছে রাজ্য জুড়েজমাথ হকুম দিরেছেন হিন্দুদের মুসলমান দেখলেই মারবে—গোলমাল বাধিয়ে ভাল তা হলেই পার্টিশন রদ হবে। জামালপুরে মুসলমানরা নাকি শোষ নেবার জন্ত ভৈরি হচ্ছে। টাঙ্গাইলে, ফরিদপুরে, এটি-সেদে মিটিং হচ্ছে খবর পাওয়া গেল। নবাব সলিমুল্লা চুপি চুপি কুমিল্লা থেকে সরে পড়েছেন। কেউ কেউ বলছে মেয়ে সেজে পাকী চড়ে পালিয়েছেন। ঢাকার কিরে এক ইত্তাহার বের করেছেন—কুমিল্লার হিন্দুরা ভীষণ অত্যাচার করেছে মুসলমানদের ওপর; একজন শহীদ, অনেক জখম হয়েছে, তাই সব, ভৈয়ের হও। ইত্তাহারখানা বের হয়েছে সলিমুল্লার শালার নামে। ঢাকার বিটিমিট লেগেই আছে।

ইল্ল কুমিল্লার ছেলে ছুইটর পরিচয় পাইয়া তাহাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হইল। অনেক রাত পর্যন্ত নানা কথাবার্তার কাটাইয়া সে বাড়ী ফিরিল। যতীন মাষ্টার লগ্নন হাতে লইয়া তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিল। পথে আসিতে আসিতে ইল্ল বলিল—মাষ্টার মশাই আমাকে দলে নিন, বাইরে পড়ে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না।

যতীন মাষ্টার—বাইরে থেকে তুমি অনেক কাজ করবে ইল্ল। বাইরে থেকে কাজ করবার ভাল লোকের খুব প্রয়োজন। আমার মনে হয় কি জান, কুমিল্লার হিন্দুরা এই ভাবে ক্রমে দাঁড়ানোতে সরকার পক্ষের চমক লেগেছে। তারা বুঝতে পেরেছে একটা দল গড়ে উঠেছে হিন্দুদের মতো, তারা আর চুপ করে ছুই পক্ষের মার খাবে না। কাজেই ভোক্ত-

কোঁড় হবে এদের চিঠি করবার জন্ত। কুমিল্লায় বহু অপোগণ্ড
জ্বলের ছেলেকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ চালাম দিচ্ছে।
আমার অমরোব তুমি কোন দলের ভিতরে ঢুকো না, বাইরে
থেকে কাজ কর।

ইন্ড জুর হইল, কিন্তু আর কিছু বলিল না।

পরের দিন দুপুরে ইন্ড দেবানন্দের চিঠি পাইল। অমেক
বার সে চিঠিখানি পড়িল, চিঠির পরিষ্কার অর্থ যেম তাহার

বোধগম্য হইল না। শুধু একটা কথা তাহার সমস্ত চেতনাকে
আলোড়িত করিতে লাগিল—দেবুদা, তাহাদের সঙ্গে সকল
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলেন এখন হইতে।

দেবানন্দের মাতাকে লিখিত পত্রের কথা গ্রামে প্রচারিত
হইল, সকলে আমিল দেবানন্দ সন্ন্যাসী হইয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরে দেবানন্দের প্রথম বিভাগে পাশ
করিবার সংবাদ প্রকাশিত হইল।

ক্রমশঃ

কবি মোহিতলাল

শ্রীমুনীলকুমার বসু

মোহিতলাল আর ইহলোকে নাই। যে বয়সে তিনি
মর্ত্যের মায়া কাটাইয়াছেন, সাধারণ বাঙালী-জীবনের
পরিমাপ অনুসারে তাহা বার্কক্য। সে বয়সে বাঙালীর
মনন-প্রতিভায় গোখলির প্রায়াক্ষকার ঘনাইয়া আসে।
মোহিতলালের বেলায় কিন্তু ইহা ঘটে নাই। মোহিতলাল
মনন-শক্তির ভাষার জ্যোতির মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন।
তাঁহার বাণী অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবন-দর্শন
পরিণত বয়সের গাঢ় বুদ্ধিচ্ছটায় ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।
তাহার সব ফলটুকু তিনি আমাদের দিয়া বাইতে পারেন
নাই।

মোহিতলালের সাহিত্যানুগ্ৰাহের সর্বাপেক্ষা বড়
বৈশিষ্ট্য তাঁহার নিষ্ঠা। সাহিত্য আমরা অনেকই ভালবাসি,
সাহিত্যচর্চাও করি বটে, কিন্তু এমন করিয়া সাহিত্যের
মধ্যে একাত্মীভূত হইয়া বাইতে পারি না। মোহিত-
লালের সাহিত্যানুগ্ৰাহ অত্যন্ত নিবিড় ও একাগ্র ছিল।
তাঁহার নিষ্ঠা তাঁহাকে তাঁহার বাঞ্ছিত বস্তুর মধ্যে বিলীন
করিয়া দিয়াছিল—তাহার বাহিরে তাঁহার কোন অস্তিত্ব
ছিল না। প্রকৃতি, উদ্দেশ্যহীন বর্তমান যুগে মোহিত-
লালের একাগ্রতা তাঁহাকে প্রচলিত অর্থে একেবারে অচল
করিয়া দিয়াছিল। যুগের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ
খাওয়াইতে পারেন নাই। যুগ-বিশেষের অন্তর্নিহিত
বাণীর ছন্দে তিনি কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন
বটে, তাঁহার তারুণ্য তারুণ্যজনের ভালবাসায় অভিষিক্ত
হইয়াছিল, ইহাও সত্য। কিন্তু ধীরে ধীরে বাহিরের জাঁক-
জমক ও চটলতা অতিক্রম করিয়া বস্তুর অন্তরে যে সত্য
আছে, বাহ্য যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যায় না,
তাঁহার কাব্য সেই সত্যের সন্ধানে ব্রতী হইয়াছিল। যদি
সাহিত্যে শাস্ত্রের কোন মূল্য থাকে, পরিবর্তনশীল

জগতের ছায়াচিত্রের ইন্দ্রজাল অতিক্রম করিয়া চিরন্তন
আনন্দলোক সন্ধানের কোন সার্থকতা থাকে, তবে
মোহিতলালের সাহিত্য-সাধনা চকল জীবন-শ্রোতের মধ্যে
এক দিন স্থায়িত্বের সার্থক আশ্বাস দিবে। মোহিতলাল
জানিতেন যে প্লাবন আসে, ভাসাইয়া নেয়, আবার চলিয়া
যায়, কিন্তু চিরন্তন জীবনধাত্রী মাটি অপরিবর্তনীয় রহিয়া
যায়।

মোহিতলাল জানিতেন সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করা
স্বলভ নহে, তাহার জ্ঞান রীতিমত মূল্য দিতে হয়। সে
মূল্য তিনি পুরামাত্রায় দিয়াছিলেন। সাম্প্রতিক কালে
যখন তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থান করিতেন তখন
লেখক অনেকবার সেই সুন্দর গ্রাম্য-পরিবেশের মধ্যে
তাঁহার সহিত দেখা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি
দেখিয়াছেন, জাগতিক ও বাস্তব পরিবেশ সন্মুখে তাঁহার
বৈরাগীর মত উদাসীন্য, দেখিয়াছেন সাহিত্য ব্যতীত অন্য
কোন কিছুর কথা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিত না।
হয়ত পাখির জীবনের দিক দিয়া ইহা অন্যায়। কিন্তু
সাহিত্য-প্রেতির এমন প্রগাঢ় ও নৈষ্ঠিক নিদর্শন, এমন খাঁটি
পরিপূর্ণ সাহিত্যানুগ্ৰাহ, এ যুগে বিরল। তাঁহার সহিত
ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করিতে করিতে লেখকের মনে
হইত চতুর্দিকের সমস্ত পরিবেশ বিশ্বস্তির অতলে তলাইয়া
গিয়াছে—শুধু বাঁচিয়া আছে এক স্পন্দমান অনুগ্ৰাহ।
লেখকের আরও মনে পড়ে মোহিতলালের কবিতা
আবৃত্তি। মোহিতলালের মুখে কাব্যের যে আবৃত্তি শুনি-
বার সৌভাগ্য লেখকের বহুবার হইয়াছে, তাহা অপূর্ণ।
আবৃত্তির সময় মোহিতলালের চক্ষু দুটি ভাবাবেগে অর্ধ-
নিম্নলিত হইয়া পড়িত, সে দৃষ্টি আজও তাহার চোখের
সামনে ভাসিতেছে।

মোহিতলালের রক্তে সাহিত্য-প্রেরণা উত্তরাধিকার-স্বত্বে প্রবহমান। মাতুলগোষ্ঠীর দিক দিয়া তিনি যুগ-সন্ধির কবি ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। কাঁচড়া-পাড়ায় তাঁহার মাতুলালয়। সেখানে ১২০৫ বঙ্গাব্দের ১১ই কার্তিক তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। পিতৃকুলের দিক হইতে ললিতভাষী ভাবুক কবি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তিনি আত্মীয়তা-স্বত্বে আবদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবও কিছু কিছু তাঁহার উপর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। হুগলী জেলার জিরাট-বলাগড় গ্রামে তাঁহার পৈতৃক নিবাস। মোহিতলালের পিতাও সাহিত্যরসিক ছিলেন। সংসারের প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। এই উদাসীন্য মোহিতলালের চরিত্রেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মাতুলালয় ও স্বীয় গ্রামে বাল্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতায় কলেজ জীবনে প্রবেশ করেন ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাস করেন। দারিদ্র্যের নিম্পেষণে তিনি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিতে বাধ্য হন।

অল্প বয়সেই মোহিতলালকে জীবিকার সন্ধানে ছুটিতে হয়। অস্থায়ী সরকারী চাকুরি উপলক্ষে কলিকাতার বাহিরে নগ্ন প্রকৃতির বৃকে তাঁহাকে কিছুদিন বাস করিতে হয়। তাহার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। শিক্ষকতা কাজে তিনি অনেক দিন ব্রতী ছিলেন। কলিকাতার ভালতলা স্কুল ও ক্যালকাটা হাই স্কুলে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৩৩৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সেখানে প্রায় বার-তের বৎসর অধ্যাপনা করেন। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নগরীর উপকণ্ঠে নিভৃত পল্লীভরনে সাহিত্য-সাধনায় নিরত থাকিয়া দিন যাপন করিতেছিলেন।

‘মানসী’ পত্রিকায় মোহিতলাল সত্যিকারের সাহিত্য-সাধনা শুরু করেন এবং ১৩১৬ সাল হইতে ঐ পত্রিকায় তাঁহার গল্প রচনা ও কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু ভারতী গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রতিভা ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে শুরু করিল। যে সব বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সান্নিধ্যলাভে তিনি অমূল্য-প্রাপিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ১৩২৮ সালে তাঁহার ‘স্বপন-পসারী’ প্রকাশিত হয় এবং তাহার ৫ বৎসর পরে ‘বিশ্বরঙ্গী’ প্রকাশের ফলে তাঁহার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় তাঁহার অনেক সৃষ্টিতৈ প্রবন্ধ ও মূল্যবান কবিতা প্রকাশিত হয়। ‘শনিবারের চিঠি’কে

কেন্দ্র করিয়া তিনি শনিচক্রের একজন উৎসাহী সভ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই পত্রিকায় তাঁহার অনেক সৃষ্টিতৈ সাহিত্যিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩৪৩ সালে তাঁহার বিশিষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ ‘আধুনিক বাংলা-সাহিত্য’ এবং তাহার দুই বৎসর পরে তাঁহার দ্বিতীয় সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ-পুস্তক ‘সাহিত্যকথা’ বাহির হয়। মোহিতলালের সাহিত্যিক জীবন দীর্ঘ হইলেও বহু রচনার ভারে ভারাক্রান্ত নহে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের তুলনায় তাঁহার কাব্যের সংখ্যা কম। তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলীও সংখ্যায় অধিক নহে। মোহিতলালের রচনায় নিবিড়তা বেশী, বিস্তৃতি বেশী নয়। তাই প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে গাঢ়তা এবং ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গিকে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত ও উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিবার মত অমুভূতির স্পর্শ আছে। তাহার ভাব যেমন গভীর ও বিচিত্র, রচনা-শৈলীও সেইরূপ অনবদ্য—কি কবিতায়, কি গল্প-প্রবন্ধে। গল্প-রচনায় তিনি যে ষ্টাইল সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যে শুধু তাহার স্বকীয়তা ও মৌলিকত্বের জন্যই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাহা নহে—সে ষ্টাইল বিস্তৃততা, প্রাঞ্জলতা এবং ওজোগুণেও অনবদ্য।

১৩২৮ বঙ্গাব্দে মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘স্বপন-পসারী’ প্রকাশিত হয় বলিয়াছি। ইহার পর হইতে তাঁহার দীর্ঘ কবি-জীবনের মধ্যে বাংলা কাব্যধারায় অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ১৩২৮ সালে বা তাহার অব্যবহিত পূর্বে নূতন ও পুরাতনের কোলাহলময় দ্বন্দ্ব বাংলা-সাহিত্য মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় ‘স্বপনপসারী’র আবির্ভাবে পাঠকশ্রেণী চকিত ও পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল একটা নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখিয়া। সে যুগের পক্ষে ‘স্বপনপসারী’র কবিতা নূতন, সংস্কারবিরোধী ও বিদ্রোহাত্মক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সেই কারণে সে যুগে ‘সাহিত্য’-সম্পাদক স্বরেশচন্দ্র সমাজপতির নিকট তাঁহাকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল।^১ ইহার পাঁচ বৎসর পর ‘বিশ্বরঙ্গী’ প্রকাশিত হইলে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে তিনি বিশেষভাবে সম্বন্ধিত হন।^২ সংস্কারবিরোধী তরুণ লেখক-গোষ্ঠী তাঁহাকে সংস্কার-মুক্তির অগ্রতম পথ-প্রদর্শক হিসাবে গণ্য করেন। কিন্তু যখন ‘স্বরগরল’ প্রকাশিত

১। মাসিকপত্র সমালোচনা (‘ভারতী’তে প্রকাশিত মোহিতলালের ‘স্বপনপসারী’ কবিতা সম্পর্কে), সাহিত্য, মাঘ, ১৩২৬।

২। ‘বিশ্বরঙ্গী’র সমালোচনা, ‘কালিকলম’, বৈশাখ, ১৩৩৪; ‘প্রগতি’ মাঘ, ১৩৩৪।

হইল, তখন যেন মোহিতলাল অনেকটা শিছাইয়া পড়িয়াছেন এবং বাংলা কবিতার অগ্রগতির কথা ভাবিয়া নিজেই নিজের অসাময়িকতা ও সংস্কারপ্রীতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন।

কোন কাব্যই স্বয়ম্ভূ নয়। সমস্ত কাব্যরীতি বা কাব্য-ধারার পিছনে একটা ইতিহাস থাকে। মোহিতলালের কাব্যেরও আছে। মোহিতলালের কাব্যও বহু দেশী ও বিদেশী কবির প্রভাবের চিহ্ন ও স্বাক্ষর বহন করে। তাহাতে অবশ্য তাঁহার মৌলিকতা ও স্বকীয়তা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার পিতার আরবী ও ফারসী-সংস্কৃতির প্রতি অল্পরাগ তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে। সমসাময়িক বিভিন্ন কবির প্রভাবও তাঁহার কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুস্থানীয়। এ বিষয়ে তাঁহার 'সাহিত্য-বিচার' দ্রষ্টব্য। বাড়ালী পারিবারিক জীবনের রমণীয় মাধুর্য্য দেবেজনাথের কাব্যে ছুটিয়াছিল। মোহিতলালের কোনও কোনও কবিতায় ইহার প্রভাব আছে। সনেট-রচয়িতা হিসাবেও মোহিতলাল দেবেজনাথের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু মোহিতলালের মানসিক গঠন দেবেজনাথ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাই তাঁহাদের কাব্যরীতিও পৃথক হইতে বাধ্য। গোবিন্দদাসের দেহসচেতন কবিতার ছাপ মোহিতলালের উপর রহিয়াছে। সর্বোপরি রবীন্দ্র-প্রভাব মোহিতলাল এড়াইতে পারেন নাই। তরুণ লেখকগণ অবশ্য সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "বিশ্বরণী" প্রকাশিত হবার পর এ কথা বলা বাহুল্য যে বাংলার কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই।"

তরুণদের এই অতিশয়োক্তির মধ্যে সত্য এইটুকু যে, রবীন্দ্র-প্রভাবের ভিতর দিয়া মোহিতলাল একটা নতুন রচনা-শৈলী সৃষ্টিতে সফল হইয়াছেন, কিন্তু সে প্রভাব হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারেন নাই। সংস্কৃত-কাব্যের ভাব-গভীর বাচন-রীতি তাঁহার কবিতায় মহা-কাব্য-স্থলভ গাভীর্ঘ্য আরোপ করিয়াছে। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কীটস ও টেনিসনের কাব্যরীতির সঙ্গে তাঁহার সামঞ্জস্য দেখা যায়, অবশ্য প্রধানতঃ তাঁহার প্রথম বয়সের কবিতায়। কীটসের প্রথম জীবনের অসংযত রোমাটিকিজম্-এর মত 'স্বপনপসারী'তে মোহিতলালের রোমাটিকিজম্ও স্থানে স্থানে ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে; বিশেষ করিয়া তাঁহার আরবী-ফারসী প্রভাবিত কবিতা-গুলিতে (ইহাদের উপর সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবও স্পষ্ট)।

'স্বপনপসারী' অপরিণত কাব্যরীতির প্রকাশ—একটা পরখ বা experiment, ভাব অপেক্ষা ভাবালুতাই ইহাতে বেশী—তাঁহার আত্মজ্ঞা এখানে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

কীটসের মত ইঞ্জিরগ্রাহতা আছে, কিন্তু concreteness বা বস্তুরূপ নাই। এই হিসাবে তিনি কীটস অপেক্ষা টেনিসনের সমগোত্রীয় অনেক বেশী। শেখোক্ত কবির দুইটি কবিতার অল্পবাদ তিনি 'হেমন্ত-গোধূলি'তে স্থান দিয়াছেন। 'বিশ্বরণী' তাঁহার শ্রেষ্ঠতম কাব্যগ্রন্থ। অল্পত্র 'উচ্চৈঃশ্রবা' নামক তাঁহার একটি কবিতা আছে। ইহাতে উচ্চৈঃশ্রবা গ্রীক পুরাণের 'পেগাসিস'-এর মত মহাকাব্যের প্রতীক। এই "অতি-দুর্শদ-উন্নাদবেগ" উচ্চৈঃশ্রবাকে কবি আয়ত্তাধীনে আনিয়া দিয়াছেন—

মাঠের মাঝারে স্তম্ভিত ভূণের পাশে
সেধার মধুর প্রভাতে পুলকভরা
ছুটিছে টুটিছে রাখালিয়া দ্বিত চুম্বনে কলহালে
অমরার শোভা পলকে বরিছে ধরা।

অর্থাৎ, তিনি এই মহাকাব্যোচিত বীররসের প্রতীক পৌরাণিক হয়রাজকে বাংলার স্নিগ্ধ, গ্রামল, ললিতকান্ত গীতিগুঞ্জনের ঐতিহ্যের সঙ্গে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছেন। ক্লাসিক ও রোমান্টিক কাব্যরীতির এই সমন্বয়ই তাঁহার কাব্যের অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই হিসাবে 'বিশ্বরণী' তাঁহার পূর্ণতম ও সার্থকতম সৃষ্টি। এই কাব্যে দেখা যায় শব্দচয়নে অসাধারণ নৈপুণ্য, নব-পুরাণ সৃষ্টি, ভারতীয় পুরাণকে নবরূপ প্রদান। ভাবের দিক দিয়া ইহাতে দেখা যায় মানবতা, দেহ-বাদ ও তজ্জনিত দুঃখবাদ ও তাত্ত্বিক সাধনার অল্পসরণে দেহ ও দেহাতীতের সমন্বয় বিধানের চেষ্টা। জগৎকে অস্বীকার করিয়া তিনি নিরালস্য শূন্যে মুক্তি খোঁজেন নাই। তাঁহার এই কাব্যে একদিকে দেহময় অল্পভূতি ও বাসনা উজ্জল হইয়া উঠিয়া দেহাতীত নির্মাণের সম্ভাবনা ও প্রলোভনকে অগ্রাহ করিয়াছে, অথচ কামনার অন্তর্নিহিত অসমাপ্তি, ভোগের অপ্রশমনীয় তৃষ্ণা তাঁহাকে দুরাভিষাজী করিয়া তুলিয়াছে। মৃত্যুর অনন্ত প্রাহেলিকা, জীবনের অপরিণীত স্বগভীর রহস্য কবির পিপাসু অন্তঃকরণকে বৈরাগীর রঙীন বসনে সাজাইতে চাহিয়াছে। পৃথিবীর বাসনা-কামনার স্তম্ভিত ও পুলকে ভরপুর কবি বলিতেছেন :

"জীবন মধুর! মরণ মিষ্ট—তাহারে মলিষ পান,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেরালায়।"

(অবোরপহী। স্বপনপসারী)

তিনি বলিতেছেন :

"সত্য শুধু কামনাই, মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা।"

পুনরায় :

"দেহ তরি কর পান কবোকে এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাটি দুঁড়ি লও কামনার কাঁচ যদি ছিরা।"

অম্বুটি দ্য বোরা কাঙালের মত;

বরগীর শুভযুগ করি দিব ক্ষত,

নিঃশেষ শোধণে—

(‘মোহমুদার’)

বহুভাবে, বহুরূপে তিনি তাঁহার এই আকর্ষণ কামনার কথা বলিতে চাহিয়াছেন। যেমন, “জীবনের দুঃখস্বখ বার বার ভুঞ্জিতে বাসনা”, “ব্যথায় বিবশ তবু তবু হোম করি জ্বালি কামানল, এ দেহ ইন্ধন তায়।” কিন্তু এই কামনার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে ক্রান্তি, অবসান, হতাশা ও দুঃখের করুণ কাহিনী লেখা রহিয়াছে। ‘বিশ্বরণী’র পান্থ কবিতায় দার্শনিক সোপেনহাওয়ারকে লক্ষ্য করিয়া তিনি আবার সেই কামনার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—কিন্তু দেহবাদী কবিতাগুলির মদির ছন্দ এখানে নাই, অসমাপ্তি ও অবসাদের ক্রান্তিময় মুছনা এখানে বাজিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন :

“যে স্বপ্ন হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্নহর।

ভারি মায়াযুক্ত আমি, দেহে মোর আকর্ষণ পিপাসা।

মৃত্যুর মোহন মন্ড্রে জীবনের প্রতিটি গ্রহর

কপিছে আমার কানে লকরণ মিনতির ভাষা”

(‘পান্থ,’ ‘বিশ্বরণী’)

‘মৃত্যুই’ যেন জীবনের হাজার কামনা-বাসনাকে কবির কাছে প্রিয়তম করিয়া তুলিয়াছে। মনে হয় প্রথম যৌবনের উগ্র ভোগলালসা মৃত্যুর দুরাগত কটাক্ষে শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—জীবনের খণ্ডিত আনন্দ সেই মৃত্যুর আলোতে শুদ্ধ, স্নিগ্ধ, করুণ হইয়া দেখা দিয়াছে। ‘মৃত্যু ও নচিকেতা’ কবিতায় এই মৃত্যু একটা বিরাট অপরিমেয় বিশ্বরূপে দেখা দিয়াছে। ঔদ্ধালক-আকর্ণির পুত্র বালক নচিকেতার চোখে যে মৃত্যু-জিজ্ঞাসা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কবির নিজের চোখেও তাই। যতবার তিনি পৃথিবীর প্রত্যক্ষ সম্পদ ছুই বাছ দ্বারা আকড়াইয়া ধরিতেছেন, ততবারই মৃত্যুর রহস্য প্রাবৃত্তি সন্ধ্যার মত ঘন ছায়া মেলিয়া তাঁহার চোখের সামনে বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই বালক নচিকেতার কণ্ঠে বাজিয়া উঠে পৃথিবীর প্রথম বিশ্বয়, প্রাগৈতিহাসিক অপরাঙ্কে কোতুল—

“ওগো মৃত্যু! কহিয়াছি কামনা আমার

হেরিব স্বরূপ তব। স্নিগ্ধ কি নির্মম,

করুণ কোমল, কিবা ভীষণ ভয়াল

হেরিতে বাসনা চিতে।”

‘স্বরগরল’ প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালে। ইহা বিশ্বরণীর পরিণতি—প্রবীণতা ইহার অঙ্গ অঙ্গ। এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ‘প্রেম ও ফুল’ একটা নূতন ধরণের সার্থক সৃষ্টি। ভাবের দিক দিয়া এই কাব্য বিশ্বরণীর ক্রমান্বয়বন্ধী। ইহাতে পরিণত বয়সের মননশীলতা ও পরিপক্বতা পরিস্ফুট।

কবি যেন এখানে স্বেচ্ছায় দার্শনিক সাজিয়াছেন। কবিতার শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত্ত হইতেছে সেই শুভ গোধূলিলয় যখন মননের সঙ্গে প্রাণের মধুর মিলন ঘটে। ‘বিশ্বরণী’ সেই গোধূলি আলোয় অবগুষ্ঠিত মিলনের রহস্যময় অঙ্গীকার। কিন্তু এখানে মননই যেন সর্বময় হইয়া উঠিয়াছে। কবিতার কাঠামোটা ঠিক ক্লাসিক্যাল। কিন্তু অতিভাষণ দোষ স্পষ্ট। ‘বিশ্বরণীর,’ ‘পান্থ’ ও এই কাব্যের ‘বুদ্ধ’ তুলনীয়। শেষোক্ত কবিতাতেও জীবনের চরম সমস্তা দুঃখ ও চরম সত্য মৃত্যু কবিকে পীড়িত করিতেছে। ‘হেমন্ত-গোধূলি’তে কুহেলি-মলিন শান্ত, শীতল সন্ধ্যায় কবি হৈমবতীরূপে স্তম্ভরীকে দেখিয়াছেন। যৌবনের প্রার্থনা শেষ হইয়া গিয়াছে। স্নিগ্ধ, বিধুর জীবন-সায়াকে হেমন্ত-গোধূলিই কবির স্তিমিত-‘তেজ সৌন্দর্য্যাত্মভূতির প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। এখানে তাঁহার লেখনী “নীরব নিখর রঙের পাথার” হইতে স্নিগ্ধ স্নান মধুরিমা চয়ন করিতে বাস্তু। গীতিকবিতার পক্ষে ইহা বিশেষ ভাবে উপযোগী। ‘স্বপ্নসঙ্গিনী,’ ‘ফুল ও পাখী’ প্রভৃতি কবিতা এই হিসাবে বিশেষ ভাবে উপভোগ্য। গীতিকার্য্য হিসাবেই ‘হেমন্ত-গোধূলি’র মূল্য অবিসংবাদিত থাকিবে।

মোহিতলালের কাব্যসম্বন্ধে এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাহার দুই-একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখানে সামান্য কিছু আলোচনা করা হইল। তাঁহার কাব্য শেষ পর্য্যন্ত বিবর্তনের ছন্দে ঘেরুপই গ্রহণ করুক না কেন, ‘স্বপ্নপসারী’ ও ‘বিশ্বরণী’ স্মরণীয় সৃষ্টি সন্দেহ নাই। ইহার আর একটি কারণও আছে। সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখি মোহিতলালের কাব্যধর্ম সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের অনেক কবির কাব্যপ্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—তাঁহাদের মধ্যে অন্ততম প্রথম কাজী নজরুল। রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির নেশা যখন তরুণ সাহিত্যিকদের পাইয়া বসিয়াছিল তখন মোহিতলালের কাব্য যে তাহাদের চোখের সামনে একটা নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে শেষ কথা এই যে, মোহিতলালের কাব্যের সার রসবস্তুটুকু চিরন্তন, তাহা সমসাময়িক বা যুগ-বিশেষের বস্তু নহে। সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই চিরকালের, শুধু বর্তমান কালের নহে।

সমালোচক মোহিতলালের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যালোচনার মান বা standard নির্দিষ্ট করা। এই বস্তুটির অভাবে বাংলা-সাহিত্যে সমালোচনা বলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুঝাইত হয় জুতিগান না হয় তিরস্কার। মোহিতলাল বুঝিয়াছিলেন, ইহার কারণ

সাহিত্য-সমালোচনার মানের অভাব। তাই তিনি বাংলা সাহিত্যে 'aesthetics' বা রসশাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক মতামত যাহাই হউক না কেন, একথা সত্য যে, শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দেখিবার তাঁহার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তাঁহার সমালোচনা বলিষ্ঠ তেজোগর্ভ ও গঠনমূলক। ভাষার দিক দিয়া তিনি রীতি-বিশুদ্ধির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজ ও রাজনীতির দিক দিয়া তিনি ছিলেন খাটি বাঙালী। বাংলার সংস্কৃতি ছিল তাঁহার প্রাণের একান্ত প্রিয়। বাঙালীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

নেতৃত্বে তিনি অগ্রবাহন ছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, বাঙালী আবার ভারতের ভাগ্যান্বিত প্রাণী। তাই বর্তমানের উন্নয়নগামী, অবনত, সঙ্কটাপন্ন বাঙালী-সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার জন্য তিনি অশ্রান্ত ভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন। আজ বাংলা-সাহিত্যে রীতিসম্মত সাহিত্যালোচনা চালু হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে মোহিত-লালের দান অসামান্য। বাংলা গদ্য-প্রবন্ধ তাঁহার কাছে অশেষ ভাবে স্বর্গীয়। বাংলার সাহিত্য-রসিকেরা চিরদিন তাঁহাকে স্মরণ রাখিবেন। কারণ তিনি তাঁহাদের দৃষ্টির মোড় ফিরাইয়া দিয়াছেন।

হাফিজ

জীনরেন্দ্র দেব

ভক্ত করে যত্ন সব, জীবনের ফলস্বরূপ, ঘোবনের আনন্দ-সদীত ;
ভিন্নিত কটাক্ষ থাকি, স্পন্দনহীন দেহহীন,

বন্ধ তার বন্ধের সহিত ;
অধরে চুপরি আঁখি লুপ্ত হয় মরণের হিমশীর্ণ বিবর্ণতা মাখি ।
কাতরা যুক্তিকা রাতা সন্ধানে সন্নেহে রাখে

নিজ কোড়ে লগোপনে ঢাকি ।

এই তো চলেছে বহু, মানবের ইতিবৃত্ত,

যুগে যুগে ধরিত্রীর কোলে,

কে কাহারে মনে রাখে ? স্থিতি হেথা সীমাবদ্ধ ;

কালক্রমে লোকে সবই ভোলে ।

তুমি কিন্তু করিয়াছ সে অমল কালচক্র

আপনার মহিমায় জয়,

তোমার সঙ্গীত-সুধা উজ্জ্বলি উঠিছে

আজও দিল্লিরায় সারা বিশ্বময় ।

যে হাসি নিভিয়া গেছে তারে তুমি করিয়াছ

মান ওঠে পুন উদ্বীপিত ;

যে প্রেম শুকায়ে গেছে, তুলেছে সজীব তারে

নব রসে ভব প্রেমাত্মক ।

জীবনের শূন্য পাশ্বে ভরিয়া দিয়াছ তুমি অনন্তের

ভীত প্রাণ-সুধা,

রূপহীনা নাগিসের মুকুল মুঞ্জরি ওঠে

অরূপের সৌরভে বিধুরা ।

বলবুলের কণ্ঠে তুমি উজ্জীবিত করিয়াছ মর্দ-ছোয়া অভিনব সুর,
গজলু গুঞ্জরি ফিরে অন্তরের ভীয়ে ভীয়ে রতঃ স্তম্ভ বিচিত্র মধুর,
যত্নের অমৃত বাণী যুক্তিকার বন্ধে আনি শিরস্তর শুনাও হরবে,
নীলস মনের মল্ল সুষমা সরস হ'ল প্রেমলিঙ্গ তোমার পরশে ।

ইরাণের নীলাকাশ উঠেছিল তারি ভব নিতি নব সুরের প্রলাপে
ভেগেছিল ব্যাকুলতা বোদাদের বাগিচায়

আরক্তিম গোলাপে গোলাপে ;
ভরদিয়া তুলেছিল কুকনাবাদ

শ্রোতৃবিনী সুরামৃত দেওরান্না বাতাস,
কুঞ্চিত কুন্তলপুঞ্জে কাঁদে কত প্রেমোন্মাদ তরুণের উফ দীর্ঘশ্বাস ।

জানি জানি, এনেছিলে বোরাসানি ইস্পাহানি

বুশ-রোজের বেহেশত তুলোকে,
সাত্রাক্য চেয়েছ নিতে আনন্দ-বিহ্বল প্রাণ

প্রেরণীর প্রেমের প্লবকে
প্রিয়ার কপোল-লয় এক বিন্দু কৃষ্ণ তিল

সৌন্দর্যের বিনিময়ে তার,
বুঝা সামান্যবান্দ-হেলার বিলায়ে দিলে

হে চরম প্রেমিক উদার ।

আজও যারা হাসে গার প্রণয় রতনে করে পরস্পরে আলোষ চুষন,
তুষার তাদের কণ্ঠে ভব প্রেমাত্মক সুরা জয়ে জয়ে করে অবেষণ ।

জলে না যাদের ধরে প্রদোষে সন্ধ্যার ভোরে
হাসি কারা স্নেহ-রাঙা দীপ,

সেবাও দীওরান্ ভব বস্তু করে অভিনব কল্লোলক
হে প্রেম-অবীণ ।

জীবনের পাহাশালে ক্রান্ত মুসাফির যারা পবন্রমে অবসর আজ,
যাদের সুরায়ে আসে ছুঁদিনের হাসি খেলা

হুনিয়ার তাল মন্দ কাল ;
উদাসী তাদের হিরা তোমারে হুঁজিয়া করে

মরমিয়া হে বহু হাফিজ,
আছে তব পানশালে সুরাপাশে লগোপিত

যত্নাধরী মহামুগ্ধ বীজ ।

বাতি-দান

ত্রীসাধনা কর

মুশিদ্দাবাদ—লালবাগ, জাকরাগঞ্জ, খোশবাগ মনীপুর—
ভারতের ইতিহাসের এক অধ্যায়ের স্থিতি তাদের বুকে।
তাদের ধূলার ধূলার হতভাগ্য সিরাজের উখাম-পডম অদৃষ্ট
রেণুকণার মত বিজড়িত। তাদের বন-জঙ্গলের মর্মরে
বাংলার অতীত কাহিনী দিনে রাতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।
ভাগীরথীর স্বচ্ছ জলধারা নিরন্তর বয়ে চলেছে, তারই কূলে
ক'খানা শুণীকৃত ইট—জগৎশেষের ঐখর্য-গরিমা বাদ-বিসম্বাদ
মান-সন্মান জন্মের উত্তাপ-সম্ভাপ এরই মধ্যে বিলীন হয়ে
আছে। সারাটা দিন হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম—
সিরাজদৌলার প্রাসাদ হাফার-ছত্রাঙ্গী, মসজিদ ইমামবাড়া,
সিরাজের কবর, তার মতিঝিল; জগৎশেষের কঙ্কি-পাথরের
মন্দির, তার ভাঙা অটালিকা; লালগোলাব বাগান—আরও
কত কি। মন এক অদ্ভুত অস্থিভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।
বেলা তখন ডিমটে-চারটে। অরণ্য-পথ বয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে
এসে পৌঁছলাম এক কবরস্থানে। নবাব আর বেগমদের
কবর। লালবাগ, জাকরাগঞ্জ, খোশবাগ জারগাঁওলি ঘন বনে
ঢাকা। হুশ' বছর আগে তার যে সৌন্দর্য্য, যে সাজসজ্জা,
যে কলরবপূর্ণ জীবন-শ্রোভ ছিল, তা যেন এখনও শুক হয়ে
রয়েছে এই অরণ্যে। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুদ্ধ-
বিগ্রহ হানাহানি কোম কিছুতেই সে শুকতা ভাঙতে পারে
নি। তার বুকে সাইকেল-রিক্সা চলছে, মটর ছুটছে, ঘোড়ার
গাড়ীর ঘর ঘর রবও শোনা যাচ্ছে, এক এক জারগাঁওলি নগর
এবং জনপদের আভাসও মিলল, কিন্তু রাস্তার হু'বারের
গহনতা ছুঁতে; তার নীরবতা এতটুকু নষ্ট হয় নি। সেই
অরণ্যের বুক চিরে চিরে রক্তরেণার মত সফ্র জীর্ণ রাজপথ—
আলোহাওয়ায়, ধুলোবালিতে পাখীর কলহরে আর গাছপালার
স্নান শব্দে বিগতকে জাগিয়ে রেখেছে। চলতে চলতে
নবাবদের প্রিয় আম আতা-নোনা এ সকল কলের গাছ আর
টাঁপা বকুল প্রভৃতি ফুলের গাছের সঙ্গে আরও অজস্র গাছের
ভিত্তি পেরিয়ে হঠাৎ দেখা দেয় এক-একটি জারগাঁ, নবাব
আমলের স্থিতি। তারা যেন সত্য নয়, এ পৃথিবীর বুকের
নয়, যেন দেখতে চাইছি বলেই সেই বনানীর সুপের
আবরণ সরিয়ে কে তুলে ধরছে অতীতের ছায়া, যেন ছবি
ফুটে উঠল।

কবর-স্থানটির দুই মাইলের মধ্যেও বোধ হয় একটি জন-
পদ নেই। চারপাশের বন ভাকে অতি গোপন মণির মত
জুকিয়ে রেখেছে। নিরালা হুপুর। পাথ-পাথালির ডাক
নেই, মাহুয়ের চিহ্নও নেই। শুধু আঁচের মেঘ-ভাঙা খাঁ খাঁ

রোদ, আর চোখের সামনে নবাব আমলের বিলান-দেওয়া
দেওয়াল-ঘেরা কবরস্থান। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। বিরাট
বিলানের দোর, তার হু'বারের স্তম্ভে দুটো কাচের বাতি, আর
ধোঁপে ধোঁপে পায়রা পাঁজবার চিহ্ন। দরজার হুন্দর কাজ-
করা। কয়ে এসেছে, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ডান পাশে
অর্ধচন্দ্রাকার বারান্দা, দু'একটা টুল-বেঞ্চ রয়েছে—আগন্তুক-
দের বিশ্রামের জন্য কিংবা শব নিয়ে যারা আসে তাদের
বসবার জন্য। আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট শিশু—বয়স
তার বছর দশ-বারো, সে বললে—বাবাঃ, মাথাটা চমচন
করছে।—রোদে ঘুরে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, বসে
বিশ্রাম করতে লাগলাম।

প্রায় বিধা দুই-আড়াই হান পুরু দেওয়াল-ঘেরা। মাঝে
সবটাই প্রায় পাষাণ-বাঁধানো—ছোট-বড় কবর-খণ্ড। তার
মাথার-মাথার পাষাণ-কলকে নাম ধাম ইতিহাস লেখা। মাঝ-
খানটা আবার ছোট দেওয়াল দিয়ে অবরুদ্ধ, বিশ্রাম করে আমরা
উঠলাম। কবরগুলি বকুবকে শুকতকে, সয়তুরকিত।
বাইরের কবরগুলি দেখে ছোট দেওয়াল-ঘেরা অবরোধের
কবার্ট ধুলে ভিতরে গেলাম। বেগমদের কবরস্থান—আজ-
ঘেরা। সেখানেও এতটুকু অযত্নের চিহ্ন নেই। এদিক-ওদিক
ঘুরে দেখলাম। বিলানের ধোঁপে ধোঁপে হু'চারটে পায়রা
বসে আছে। তারাও এমন নিদ্রালস বিজ্বল হয়ে ডাকছে,
হুপুরের নিশুম হয়ে তাদের ঘর মিলে যাচ্ছে। কড়া রোদ,
কবরের পাশের সিমেন্টে দাঁড়ানো যাম না। যাম বরতে
লাগল, হু'মাথা ভেঙে উঠল, আবার এসে বারান্দায়
বসলাম। অত্যধিক প্রাঙ্গির জন্মেই হোক কিংবা রোদের
জন্মেই হোক অথবা সমস্ত জারগাঁটার একটা অতীত মোহ
আমাদের অভিভূত করে ফেলার জন্মেই হোক, বারান্দায় বসে
আর সহসা উঠতে ইচ্ছে করল না। শিশু শু একেবারে
হাত-পা ছড়িয়ে দিলে বেঞ্চে। বললে—মাথাটা শুক্কর
ব্যথা করছে। সেই জনহীন দীপ্ত রশ্মিরা প্রথরতা,
বারান্দায় বসে কপোতের গুল্মমধুরি শুভতে লাগলাম।

ধানিককণ কেটেছে, এক সময় মনে হতে লাগল
কপোতের অলস কুঁজনের সঙ্গে সঙ্গে মাহুয়ের গলার স্বর
শোনা যাচ্ছে। সে যে মাহুয়ের স্বর, বোকা যাচ্ছে না। কখনও
মনে হয় হাওরারই মর্মরধ্বনি, কিংবা হুপুরের বিহ-ধরা স্বর,
কখনও বা পরিষ্কার মাহুয়ের কথা—যেন অতীতের বিদেহী
আত্মারা তাদের কভদিনের জমায়ো কথা বলতে উৎসুক
হয়ে উঠেছে, কত কি বলে চলেছে—আমাদের এমন কান

মেই, এমন অমুত্থিত মেই যে তা শুভতে পারি, বৃষতে পারি।
তাবল্যাম এ বুরি আমার একার অমুত্থিত। দেখলাম তা নয়।
চারদিকেই বিস্মিতভাবে যুগের দিকে তাকিয়েছি। শিবু
ত রীতিমত ভয় পেয়েছে। মাহুষের কথা কোথা থেকে
আসছে। ভুল নয়, অত কোন জীবজন্তুর আওয়াজ নয়।
দিনহুগুর, পরিষ্কার মাহুষের কথা শুনিছি। একটি শব্দও
বৃষতে পারছি না। অতি কোমল সলিত সুরের কথা।
জামাইবাবু বেতারে কাজ করেন। বলে উঠলেন—বাঃ,
আশ্চর্য। যিসিভার কানে দিলে এমন অনেক অদ্ভুত কথা
ভেসে যেতে শোনা যায়। খালি কানেও যে শুনিমি শুনিছি।

আমরা বলে উঠলাম—আমরাও শুভতে পাচ্ছি যে।

জামাইবাবু হেসে রহস্য করে বললেন—কবর-স্থানে বলে
আছি, বিদেহীরা খবর পাঠাচ্ছে বোধ হয়।

আমরা অবস্থা হাসলাম। কিন্তু সেই পরিবেশে বসে
কথাটা মোটেই অবিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছিল না; বরং কথাটাকে
স্বীকার করতেই সমস্ত মন উল্লুখ হয়ে উঠল। এদিক-ওদিক
তাকালাম। নির্জন স্থান, পুবালি বাতাস বইছে এসোমেসো।
কথাগুলি মনে হচ্ছে কবরের ভিতরে কাছে-দূরে ঘুরে
বেড়াচ্ছে। ক্রমে ক্রমে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল।
যেন ফিরে গেল কে, কোন অজানা অদৃশ্য রাজ্যে। সবাই
বিস্মৃত। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। দিনের এই ধর
আলো, অজীভিন্ন কিছু কি সত্যি ঘটতে পারে। চারদিকে
তাকাচ্ছি, হঠাৎ সামনে তাকিয়ে চমকে উঠলাম—জীর্ণ ধীর
এক বৃদ্ধ—শুলকেশ, শুভ্র মুসলমানের সাজ, বকের পালকের
মত সাদা কোমল শুল্কপুচ্ছ, চোখের জল অবশি শরতের মেঘের
মত ববববে, শুধু তার ভিতরের হির কালো দীপ্ত দৃষ্টি
অন্তঃস্পর্শ। সে রূপ যে কোন মাহুষের, সহসা বিশ্বাস হয়
না। কবর থেকে যেন ভেসে উঠল এক অশরীরী আত্মা।
ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল, সেলাম জানালে, স্নিগ্ধ হাসি
হাসল। বড় সুন্দর সে হাসি। জামাইবাবু বলে উঠলেন—
কে তুমি? কোথেকে এলে?

বৃদ্ধ হেসে বললে, আমি এখানেই থাকি, নাম জালালুদ্দিন।

এ সব কবর দেখাশুনো করা আর মোজা সজ্জাবেলা
এখানে বাড়ি দেওয়া আমার কাজ।

—তুমিই কথা বলছিলে?

বৃদ্ধ বললে, কে এখানে আছে, কার সঙ্গে কথা বলব?
ওই যে দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট খোপ দেখছেন, ওইই
ওপাশে ছুখানা খঁর আছে। আমি সেখানে বসে কোরাণ-
শরীফ আওড়াচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে যেন মাহুষের মত
দেখলাম এখানে, উঠে এলাম দেখতে।

এতকণে রহস্য বোকা গেল। দেয়ালের ডাম-পাশের
গবাকপথও চোখে পড়ল। সে মবাব আমলের গবাকই

বটে। জালিকাদের ভিতটে ফোকরমাত্র। ভিতর থেকে
ভেজানো ছিল, ওপাশে বর আছে বোকা কটিন। জামাই-
বাবু বললেন—বসো বসো, কতদিন আছ এখানে?

বৃদ্ধ বলল। জামাইবাবু আলাপী মাহুষ, অল্পকণের মধ্যে
বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প জমিয়ে দিলেন—কে কে তার আছে, কিতাবে
চলে, বয়স কত, ইত্যাদি।

বৃদ্ধ অতি ধীর নম্র গলার উত্তর দিতে লাগল। প্রত্যেক
কথায় তার হাসিটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার ঠাকুর্দার বাবা
নাকি অল্প বয়সে শেষ নবাবের হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে
লড়েছিল। সেই থেকে তারা বংশাধিক্রমে মবাববাড়ীতেই
কাজ করে আসছে। তার বয়স অসুখান হ'ল মকবাইয়ের কাছ-
কাছি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই সে এখানে কাজ নিয়েছে।
অখনই বয়স হু'রুড়ি মশ পেয়েছে গেছে। তার পর থেকে
এখানেই পঁচিশ ত্রিশ বছর আছে। স্ত্রী মারা গেছে, ভিন্ন
ছেলেমেয়ে ছিল, ছেলের বউ ছিল, কেউ বেঁচে নেই। মবাব-
বাড়ী থেকে তার জন্ম সিধে আর কবরস্থানে বাড়ি দেবার
ভেল বরাদ্দ আছে। সপ্তাহে দু'দিন কি এক দিন এক জন
লোক এসে সে সব দিয়ে যায়। লোকের সঙ্গে সংস্রব তার
নেই বললেই চলে। যারা কবরখানা দেখতে আসে তাদের
সঙ্গে একটু কথাবার্তা হয়, আর বছর পাঁচ সাত কিংবা আরও
পরে হয় ত মবাববাড়ী থেকে আসে শব। সেদিন সারাদিন
বা সারারাত এখানে লোকজন থাকে। বৃদ্ধ এসে দেখে,
ওদের সঙ্গে নমাজ পড়ে, তার পর থেকে নতুন কবরে দেয়
বাড়ি।

ছুটা পায়রা বটপট করতে করতে একটা আয়গা একটু
অপরিষ্কার করলে, তাদের পালক খসে পড়ল দুটো। আমা-
দের অত বেয়াল হ'ল না। কিন্তু বৃদ্ধ উঠে তৎপূর্ণি জারপাটা
সাক করে এল। চোখ বুজিয়ে দেখে নিলে চারদিকটা।
বললে—পায়রাদের ফিরবার সময় হয়ে এল, জল আর চানা
দিয়ে রাখতে হবে।

চেয়ে চেয়ে দেখছি সেই বৃদ্ধকে। জরায় তার পা কাঁপছে,
অমুত্থিত ঠিকমত চলতে পারছে না, কিন্তু অতি যত্নে সে
আপন কাজ করে এল। তার চোখের দৃষ্টিতে কি ত্রীভি।
কাজ করতে গভীর আনন্দ। এখানকার পাখাপও তার কাছে
যেন জীবন্ত। এমনি মরদ হাঁটা চলার। আমার একটা
কমেন আকর্ষণ জন্মে গেল বৃদ্ধের উপর। জামাইবাবু এবং
ছোড়দারও ভাল লাগছে। তাদের আগ্রহভরা কথাতাই তা
বৃষতে পারলাম। এখান থেকে যাবার কথাই তারা যেন ভুলে
গেছেন। বৃদ্ধ এসে বলতেই আবার তার সঙ্গে গল্প করতে
লাগলেন।

আমার গভীর অন্তরে অতি হৃদয়ভাবে বাজতে লাগল—এ
কি সত্যি মাহুষ! মাহুষ তার কথার হাসিতে চোখের

চাউনিতে মানুষকে অভিভূত করে ফেলতে পারে এত অল্প সময়ের মধ্যে? তিতরে তিতরে একটু অব্যক্তি বোধ হতে লাগল। এই জনশূন্য কবর-স্থান তার মধ্যে শুই রহছে ভরা অভূত মানুষ। তাকে দেখে ভয় হয় না, কিন্তু একটা অপূর্ণ বিষয়ে মন ভরে ওঠে।

জামাইবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—কি করে তুমি এখানে থাক? এই প্রেতপুরী কবরের মধ্যে?

বুড় ভেমনি মধুর করে হাসল। কিন্তু তার চোখের কালো গভীর দৃষ্টি বেদনার ভরে উঠল। তাকে বোকা যায় না, কিন্তু প্রাণ ব্যাধার কৈপে ওঠে। একটু অতঃকৃত হয়ে গেল, তার পরে বললে—প্রথমে তাই মনে হ'ত বটে। ক'বরর ও পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রত্যেক মুহুর্তে মনে হ'ত পালিয়ে যাই। এখন নিমেষের ক্ষণে আমি এখান ছেড়ে এক পা যেতে পারি নে। নবাববাড়ী থেকে কতবার খবর এসেছে—এবার কাজ থেকে ছুটি। আমি অতঃকৃত করে বলে রেখেছি আমাকে যেম এখান থেকে সরানো না হয়।

বুড় মাথা নাড়তে লাগল। তার সেই স্থির দৃষ্টি ক্রমশঃ আবেগে-চকল হয়ে উঠল, তার বর শুধু হয়ে এল—না, না, আমি কোথাও যাব না, যেতে চাই নে।

আমরা বিষয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কি ব্যাপার! এই কবরের মধ্যে কি সে এমন পেরেছে যে, এখান থেকে চলে যেতে হবে শুনেই বুড় এত অধীর। জামাইবাবু বললেন—তোমার ছেলে যেহে জীর কবরও কি এখানে আছে?

বুড় জিত কেটে বললে—না, এখানে শুধু নবাব আর বেগমদের কবর দেবার নিয়ম। আমরা শুধু সাধারণ লোক। তারা এখানে কেউ মারাও যায় নি। আমার জীর কবর আমার মনীপুরের বাড়ীতে আছে। ছেলেমেয়েরা বিদেশে মারা গেছে।

—তবে কেন তুমি এখান থেকে যাবে না বলছ? কি পেয়েছ এখানে?...

বুড় অপরাধ প্রীতিমাথা হাসি হাসল। মানুষের মুখে এমন হাসি কখনও দেখিনি। আমাদের মন প্রশান্তিতে ভুরিয়ে গেল। বুড় একটু চুপ করে থেকে যুহ কোমল স্বরে বললে—সে আসবে, আমি জানি সে আসবেই, এক দিন তাকে আসতেই হবে। মানুষের আকাজক্ষা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না।

তার চোখে পিঙ্গলাভ তীর জ্যোতি, ফুটে বেরুল, তার মুখের পেশীতে পেশীতে দৃঢ় আশার ছাপ। সে কবরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল আমাদের অভিভূত ভুলে। আমাদের বিষয় আরও বেড়ে গেল। বুড় কি স্নহ স্বাভাবিক মানুষ, না পাগল? এ কবরস্থানের কে আসবে? বুড় বললে—তবে শুধু না।

সে নীরব হয়ে রইল ষানিক্রকণ, তার পরে ধীরে ধীরে

বলতে লাগল—এখানে এসেছি তার হুঁচার বছর পরের কথা।—আমার জী এবং ছেলেরা তখন সব মারা গেছে। মেয়ের ছেলেবেলা বিয়ে হয়ে গেছে, যুগুতর করছে। বন্ধন বলতে আমার কিছু ছিল না। শোক পেয়ে পেয়ে আমার মন কেমন হয়ে গেছে। লোকজন ভাল লাগে না। এখানে কাজ নিয়ে এলাম, এই নির্জনতা আরও তার হয়ে চেপে বসল। নিমেষেই প্রেতলোকের অপহায়ার মত মনে হতে লাগল। সে কি অশান্তি! দিন রাত হটকট করছি। ক্রমে ক্রমে এই কবরের পাষাণের মতই সমস্ত হৃদয় যেম পাষাণ হয়ে এল। সুখহঃখের অহুভুতিও ভুলে যেতে লাগলাম। কাজে আনন্দ নেই, খাওয়া নেই, চোখে ঘুম নেই—সে এক কেমন ভাব নিবেই জানি নে। এমনি তাবে দিন কাটছে, এই সময় এক দিন নবাব-বাড়ী থেকে এল এক শব—নবাবের এক বেগমের। অল্প দিন আগে হঠাৎ মারা গেছেন। সজ্জার কিছু আগে শব এল—কফিনে ভরা। মারা যাবার পরেও বেগমদের শব দেহ কেউ দেখতে পার না। ইনি নবাবের এক বিশেষ প্রিয় বেগম ছিলেন। তাঁর রূপ নাকি ছিল রূপকথার পরীদেব মত। জিশ-বজিশ বংসর বয়সেই তিনি মারা গেলেন। নবাব খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন তাঁকে হারিয়ে। সমারোহের সহিত বেগমকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আর এখানে এই বারান্দার রূশীতে নবাব স্থির গভীর হয়ে বসে। তাঁর সঙ্গে এসেছে ন'দশ বছরের নবাবপুত্রী—সেই বেগমের একমাত্র সন্তান। সে যে কি রূপ বলতে পারব না। নবাব-পরিবারের রূপের ব্যাতি দেশজোড়া। বেগম বারা আসেন তাঁরা বাছাই-করা শ্রেষ্ঠ রূপসী। এই বেগম ছিলেন আবার তাঁদের মধ্যেও সেরা। রূপবান নবাবের কোল আলো করে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। আমি কাছে এসে বসলাম, নবাব তার পিঠে মাথার হাত বুলিয়ে শীরবে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, সে তার সজল কালো হুঁচোখ ভুলে তাকিয়ে দেখছে শবযাত্রার সমারোহ। আরোহণ ক্রিয়াকাত শেখ হ'ল। কফিন কবরে নামানো হ'ল। এবার মাটি ঢাপা দেওয়া হবে। সমাধি পড়া হবে। নবাব উঠলেন। মেয়েকেও ভুলে গিয়ে তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালেন কবরের সামনে। অক্ষুট স্বরে কোরাণের বয়েং আওতাতে লাগলেন। সবাই ভিড় করে নিম্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে। নবাবপুত্রী এই বারান্দা থেকে মর্মরমুত্তির মত তাকিয়ে আছে। আমি কাছে বসে। সে হঠাৎ নড়ে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললে—মা কি আর আসবে না?

অত্যন্ত সহজ সরল শিশুর প্রশ্ন। নবাবপুত্রী—নবাব আর বেগমের আদরের বন, জন্ম থেকে উৎসবে আনন্দে প্রতিপালিত। কোন দিন কোন ছঃখ-আঘাত পার নি, সংসারের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, তখনও সে সত্যকোটা হুলের

মত নির্মূল পবিত্র। প্রথম আঘাতে বিন্দিত হয়ে গেছে। সেই সরল হৃদয়ের আকুল প্রাণ আমার মনের রক্তে রক্তে বেজে উঠল—আসবে না? যে গেল সে কেন আর আসবে না? তাকে কিরে পাবার কি কোনও উপায় নেই? হঠাৎ বলে ফেললাম—নিশ্চয় আসবে।

নবাবপুত্রী চঞ্চল হয়ে উঠল। আগ্রহভরে চোখ তুলে আমাকে বীণার বন্ধারের মত কল্পিত সুরে বললে—কবে আসবে? কি করে আসবে?

মিথ্যা ভোকবাক্যই বেরিয়ে গিয়েছিল বালিকার কাছে। কিন্তু বালিকার চোখে-মুখে প্রগাঢ় প্রত্যয়ের ছাপ ফুটে উঠল। সে ব্যাকুল ভাবে বললে—সবাই বলছে আসবে না, মা বেহেস্তে চলে গেছেন। তুমি বলছ আসবে, কি করে আসবে?

আমি সহসা কথা বলতে পারলাম না। মিথ্যা বলে কেলো ভীত প্রাণিতে মন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে আবার বললে—বল না, মা আসবেন? কেমন করে আসবেন? বল।

বলে ফেললাম—তুমি যে তাকে ভালবাস। বেহেস্ত যে বড় সুন্দর আর ভাল, সেখানে ভালবাসাই মাত্র পৌঁছায়।

নবাবপুত্রী আনন্দে উজ্জল হয়ে বললে—হ্যাঁ, বাবা বলেছেন সে জায়গা সুন্দর আর ভাল। এই পৃথিবী কেন তেমন নয়? তবে ত মা এখান থেকে যেতেন না।

একটু অমায়মক থেকে আবার সে স্বরু করলে—কবরের কাজ শেষ হয়ে গেল। সবাই কিরে এল। নবাব এসে ঘিঁষে বুক দিয়ে গাড়িতে উঠলেন। আমি তাকে বললাম—রোক সন্ধ্যাবেলা আমি আলো জ্বলে রাখব এখানে।

নবাবপুত্রী বললে—আমি দেখতে আসব।

সেদিন থেকে কবরখানা আমার কাছে বেহেস্ত। কদিন নবাবপুত্রী গাড়ি করে সন্ধ্যার সময় বাতি দেওয়া দেখতে আসত। আমার সঙ্গে সে নমাজ পড়ত, আমার সঙ্গে কত গল্প করত। সেই আনন্দ আমি কোনদিন ভুলব না। কুড়ি-পঁচিশ বছর হয়ে গেছে এখনও সে সন্ধ্যাগুলির মোহ আমি লুপ্ত অহুতব করি। তারপর সে বড় হয়ে গেল। আর এল না। আমাকে বলে গেল—তুমি কবরখানাকে বেহেস্ত করে রেখো। মা তবে নিশ্চয় এখানে থাকবেন।

এমনি ভাবে কাটল বহুদিন। ক্রমে সে বড় হ'ল, সুনাম তার বিয়েও হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আর আমার দেখা হ'ল না। আমার চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে, আমার শরীর ভেঙে এসেছে, আমার আর কাজ করবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু সে আমাকে জাগিয়ে রেখে গেছে, কররের মধ্যে আনন্দ দিয়ে গেছে, এই পাষণ্ড, এই কবর এখন আমার কাছে বড় দরদের। আপনারা বিশ্বাস করবেন না, দিনে দিনে আমার মন বলছে যতও জেগে উঠবে, এই কবরও জীবন্ত। আমি মিথ্যা বলি মি। আমি তাকে দেখতে পাব। আমি

তাই কোথাও যেতে পারব না, তাকে দেখতে চাই আমি।

বুড় সেই সন্ধ্যার আরছারার অরণ্যের মাধার দিনের শেষ-শিখার মত কাঁপতে লাগল। তাকে দেখে, আমরা শুক হয়ে গেলাম। বুড় উঠে কাছে চলে গেল। এদিকে তাকিয়ে দেখি শিবু কান্ডরাচ্ছে। তার চোখ লাল, মুখ লাল। মাধার অসহ যন্ত্রণা হচ্ছে। বেকের উপরই শুয়ে পড়েছে। এমনিতেই সে বাস্তবান নয়। অনেককণ থেকেই অসহ বোঁদ করছিল। এতক্ষণ এ সব দেখবার কৌতূহলে কিছু বলে মি। এখন আর চেপে রাখতে পারলে না। তার অবস্থা দেখে আমরা রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লাম। লোক-জমহীম বিভূই জায়গা। এই পরিবেশ। এই বৃষ্টিও কেমন রক্তভরা। এখন উপায়। নৌকা করে বহরমপুর থেকে এসেছি এ সব দেখতে। সিরাজের প্রাসাদ সেই হাজার হাজারী মাটে রয়েছে নৌকা। মাইল দুই-আড়াইয়ের পথ। কি করে ওঁকে নিয়ে যাব। বুড় এসে তাকে সব বললাম। সে অত্যন্ত দরদভরা সুরে বললে—রোদে সুরে অমন হয়েছে। বাচ্চা ছেলে। কিছু ভয় নেই। চল আমার ঘরে, এখানে ত পাঁচটার পরে থাকবার নিয়ম নেই। একটু সুরে থাক, আমি ওমুখ দিচ্ছি; সেয়ে যাবে। থোকা, বুঝ কষ্ট হচ্ছে?

বুড় এসে শিবুকে পরম স্নেহে তার ঘরে নিয়ে গেল। পাড়ি রিহিয়ে দিলে, বদমা ভরে ঠাণ্ডা জল দিলে। কি একটা গাছের পাতা এনে রগড়ে শিবুর কপালে বাড়ে মাধার ভালুতে লাগিয়ে দিলে। এমন একান্তভাবে কয়েক মিনিট সেবা-শুশ্রূষা করলে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই শিবু সুস্থ হয়ে উঠল। এদিকে বন-ঘটার ঘিরে ছোর এক পাখী বৃষ্টি এসে গেল। বুড় কিছুতে আমাদের ছাড়বে না। পাড়ি নিয়ে আসতে বললে। শিবুকে ঠাণ্ডা জলে যেতে দেবেনা। আমাইবাবু গাড়ির বোঁদে গেলেন। আমরা বুড়ের ঘরে বসে রইলাম। বৃষ্টি ধামলে বুড় আবার সমস্ত কবরখানা বাতপোঁছ করে এল, খিলাম মুছলে, বাতি সাফ করলে। বাগানের আশেপাশে অবুঁদে ঘুরে দেখে এল।

জিজ্ঞেস করতে বললে, বৃষ্টিতে বাতাসে অনেক সময় পাখীর হামা ডানা ভেঙে পড়ে যায়। ভাল হ'ল বৃষ্টি হয়ে। অনেক দিন জল হয়নি, গাছগুলি তৃষ্ণার বেন উর্ধ্ব হয়েছিল। দেখলাম কি দরদ দিয়ে সে অরণ্য আর পাষণ্ড-ঢাকা যন্ত্রের কবরকে প্রাণময় করে রেখেছে, সুন্দর করে রেখেছে। এক মিনিট তার বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই, লজ্জা বা অসুস্থতাবোধ নেই। বুড়ের দিকে তাকিয়ে আছি, তার প্রত্যেকটি কাজ দেখছি, আর বিশ্বাস গীমা অভিক্রম করছে। বুড় সেদিন যেন বড় বেশী অস্থির, নিজেই বললে—ছানি নে জাক, কি

হয়েছে, কেন সমস্ত মন এমনভাবে ব্যাধার আমন্দে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আশায় কি দিন শেষ হয়ে এল।

তার পরে বিভ্রান্ত করে বললে—তাকে কি তবে দেখতে পাব না? না, না, নিশ্চয় দেখতে পাব, হয় তো আছেই; কেন এমন মনে হচ্ছে। এমন তো কৌমদিন হয় না।

সে কোরাণের বয়েং আওড়াতে আওড়াতে কেবল ক্রম-কম্পমান পদক্ষেপে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমাদের মনে হতে লাগল বৃদ্ধ যে-কোন মুহূর্তে ছুটে চলে যাবে; সত্যিই দেহ মন দিয়ে সে কি বুঝতে পারছে, জানতে পারছে। এই বাদল সন্ধ্যায়, ওই সন্সন্-পাগল হাওয়ার সমস্ত কবরখানা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। যে-কোন মুহূর্তে অলৌকিক অত্যাচার্য্য কিছু ঘটী অসম্ভব নয়। বৃদ্ধ যেম সেই অভূতেরই প্রতীক্ষায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বৃদ্ধ কবরখানার বাতি দিতে চলে গেল। আমরা ঘুলঘুলি দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। সে খিলানে বাতি জ্বললে। প্রত্যেকটি কবরে বাতি দেখালে। ভয়ঙ্কর হয়ে কি আওড়ালে। সেই গাঢ় অন্ধকার আর অস্পষ্ট আবহা আলোর বৃদ্ধের চেহারা হারার মত দেখাতে লাগল। সমস্ত কবরে বাতি দেখানো হয়ে গেলে সে যখন তার সেই বৃদ্ধ কোমল মুখে কোরাণ-শরীক আওড়াতে আওড়াতে আসছে, হঠাৎ কাপটী বাতাসে তার হাতের আলো নিভে গেল, দুঃাগত গুরুগুরু শব্দ শোনা গেল, হু হু করে হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল। বৃদ্ধ চকিত হয়ে আবিষ্টের মত সামনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, আর এক পুঞ্জীভূত কালোহারার তপের মধ্যে থেকে অপক্লপ এক নারী-মূর্তি তেমে উঠল। শিশু শুয়েছিল, আমি আর ছোট্টা ঘুলঘুলির মাঝে বৃদ্ধকে পড়লাম। চোখের দৃষ্টি সমস্ত ইন্ড্রিয়ের একাগ্রতা নিয়ে ঐ দিকে নিবিষ্ট হ'ল। ভয় নয়, অস্পষ্ট নয়, কালো স্তম্ভ-ময়ূর বোরখার ঢাকনা, তারই ভিতর থেকে প্রস্ফুটিত চন্দ্রমার মত-স্নিগ্ধাকান্তি অলৌকিকময় নারী-মূর্তি, বয়স-জিশ-পর্যজিশ বহর, পরিপূর্ণ যৌবনের স্থির কমলের মত অর্ধকারের বৃদ্ধকে সে অনিন্দিত রূপ ফুটে আছে। কবরের খিলানে দুইটি বাতি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে, তারই আলো পড়েছে, বৃদ্ধ আর নারী-মূর্তি স্পষ্ট চোখে দেখছি। কেবল মনে হচ্ছে—মাহুয়ের প্রেম কি এমন হতে পারে, যত্নকে আগিরে তুলতে পারে এমন সত্য করে? নারী-মূর্তি হাসল, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধও কঁপে উঠল। আমাদের মতই বিমূঢ় হয়ে বৃদ্ধ এতক্ষণ তাকিয়েছিল—হু হাত বাড়িয়ে বসে পড়ে বলল, এসেছ, তুমি এসেছ?

তার সমস্ত শরীর ধর ধর করে বাতাসে-কাঁপা শিখার মত কাঁপছে। তার চোখে-মুখে সে কি আমাদের জ্যোতি। কি ক্রীতির স্নিগ্ধতা উপচে পড়ছে। নারী অকস্মাৎ পিছন ফিরে তাকাল; চকিতে কালো হারা মিলিয়ে গেল। আমরা এমনি

অভিভূত হয়ে পড়েছি, মনে হচ্ছে ভেগে নেই, স্বপ্ন দেখছি। চেয়ে আছি কি নেই ভাও বুঝতে পারছি না। কারণ এই মাত্র বেখানো নারী-মূর্তি দেখলাম। সেখানে খিলানের বাতির আলো পড়েছে, বৃদ্ধ ভিত্তির মত বসে আছে, আর ত কেউ নেই। চোখ রগড়ে নিরে তাকালাম। বৃদ্ধ ভীত দৃষ্টিতে অর্ধকারের দিকে অমন করে তাকিয়ে আছে কেন? ছোট্টা দার দিকে তাকালাম। সে দেখলাম ভিতরের কবরের দিকে তাকিয়ে নেই, কান পেতে ওদিকে কি শুনছে। বলে উঠল—জামাইবাবু বোধ হয় এসেছেন।

চকিত হয়ে শুভলম বাইরে লোকের কথা মতই শোনা যাচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই জামাই-বাবু এসে ঢুকলেন। তার পিছনে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের সুন্দর-বলিষ্ঠ এক-পুরুষ। মুসলমানী ময়ূর-মেরুজাই, পাঞ্জাবী আর কেছ পরা। অভিজাত-বংশের সৌষ্ঠব তার হাঁটা-চলায়।

জামাইবাবু বললেন; গাড়ী এসে গেছে চল। সেই কোন্ লালবাগের পথ থেকে আমতে হ'ল। গাড়ী কি আর পাই। কতদূর পথ। রাত হয়ে গেল। ইনি হলেন বৃদ্ধের সেই নবাব-পুঞ্জী স্বামী।

ভ্রলোক চমৎকারভাবে অভিযান করলেন। পথে পেয়ে জামাইবাবু তাঁকে আমাদের বিপদের কথা বলেছেন। ভ্রলোকের কাছ থেকে জানা গেল—নবাবপুঞ্জীকে এই বৃদ্ধ অত্যন্ত ভালবাসে সেই তার মায়ের যুভ্যুদিন থেকে। নবাবপুঞ্জীও তাকে কি চোখেই যে দেখেছে সে-ই জানে। প্রায়ই তার কথা বলে। বৃদ্ধকে দেখতে চায়, কিন্তু তাঁরা গোঁড়া মুসলমান, অভিজাত বংশ। সে বাড়ীতে একবার মেয়েরা ঢুকলে বাপের বাড়ীতেই সহজে আসতে পারে না, এখানে আসা অসম্ভব। বৃদ্ধ ক'দিন থেকে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে। যে লোক সিঁধে আনে তাকে দিয়ে ধবর পাঠিয়েছে; কিন্তু বাড়ীর লোক রাজী হয় নি। বার বার ধবর পাঠিয়েছে বৃদ্ধ। নবাবপুঞ্জীও অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আসা অসম্ভব। সামাজিক রীতি, বংশের সম্মান, আর সংস্কার সব অটল হয়ে অবরোধ করেছিল পথ। দৈবক্রমে সে দিনই অশ্রুতিপর বৃদ্ধ নবাব অস্থির হয়ে পড়েছেন। দেখতে চেয়েছেন মেয়েকে। এক দিনের জন্ত তাই স্বামীর সঙ্গে মেয়েটি এসেছে তাঁকে দেখতে। নবাব একটু ভাল আছেন। কিন্তু এখানে এসে অস্থির বাপকে দেখার পর নবাবপুঞ্জী এমন কাঁতার হয়ে পড়েছেন, এমন কাঁতারতায় স্বামীর কাছে বৃদ্ধকে দেখবার জন্ত অহুন্ন-বিনয় করতে লাগলেন যে, স্বামী উপেক্ষা করতে পার-লেন না। কবরস্থানে সাধারণ বাতি দেওয়ার লোক এই বৃদ্ধকে তাঁরা দেখতে এসেছেন, এসেছেন গাড়ী করে এই সন্ধ্যার অন্ধ-কারে। এতখুনি চলে যাবেন। বুঝলাম সেই নারী-মূর্তি নবাব-

পুতী। আমাইবাবুর পাড়ীর শব্দ শুনে বোরখা ঢাকা দিয়ে সরে গেছে বারান্দার কোণে।

আমরা তল্ললোককে নমস্কার জানিয়ে বৃদ্ধকে আমাদের কণা বলতে বলে পাড়ীতে এসে উঠলাম। ঘোড়ার পাড়ী ঘর ঘর শব্দ তুলে লেই অরণ্য-পথ ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। চোখে পড়ল—হূরে অন্ধকারের মধ্যে কবরের

বিলামে বাতি দুটি জ্বলছে—যন্ত্রের কবরে মাহুদের অন্নর প্রেমের অনির্বাপ বাতি। এবার মনে হ'ল কবরখানা নয়, সভ্যই সে প্রেমের বেহেত্।

কখন এসে হাজারহাজারী পৌছলাম খেয়াল রইল না। পাড়ী বাহার ঝাঁঝমিতে দেখলাম লোকালয়ে এসে গেছি, পাড়ী থেকে মেমে পড়লাম।

বর্তমানের চাষ-বাস

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার অঞ্চলের (আটপুর পোঃ, জাজীপাড়া থানা, জেলা হুগলী) বর্তমান সময়ের চাষ-বাসের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

রোয়া আমন ধানের চাষই এখন প্রধান; কৃষকের ও বলদের এখন পহিঞ্জমের অন্ত নাই, কিন্তু দুই-ই দুর্বল,

আনা পরিমাণ জমিতে চারা রোপণের কাজ শেব হইয়াছে; উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টির অভাবে উচু বা ডাঙা জমিতে এখনও চারা রোপণ সম্ভব হয় নাই; এইরূপ জমির কৃষকগণ আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। পুকুর, ডোবা, খাল ইত্যাদি এখনও জলে ভরিয়া যায় নাই।



আমেরিকান "কেয়ার মিশন" কর্তৃক প্রদত্ত 'কেয়ার' লাঙ্গলে চাষ হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ পল্লী-মঙ্গল সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত আটপুর (হুগলী) পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীতে এই লাঙ্গল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল

দুইয়েরই খাণ্ডের অভাব, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব, রোগের সূচিকিৎসার অভাব। এবারকার জলবায়ু রোয়া আমন ধানের চাষের পক্ষে মোটামুটি অসুস্থ; প্রায় চৌদ্দ



লাঙ্গলের আর একটি চিত্র

শ্রমিকের পারিশ্রমিক দৈনিক জলখাবার সমেত দুই টাকা চারি আনা। শ্রমিকের বধেষ্ঠ অভাবও আছে। সঁওতাল পরগণা, রাঁচি প্রভৃতি স্থান হইতে বহু শ্রমিক আসিয়াছে। স্থানীয় শ্রমিক অপেক্ষা, ইহাদের কাজের

পরিমাণ বেশী, সেইজন্য ইহাদের চাহিদাও বেশী। চাহিদার অল্পপাতে ঘোগান কম।

এই অঞ্চলে আউশ ধানের চাষ বর্তমান বৎসরে খুবই কম; তবে ইহার অবস্থা মোটামুটি ভাল। কৃষিবিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত শ্রেণীর আমন ও আউশ ধানের চাষের পরিমাণ খুবই অল্প। প্রধানতঃ তিনটি কারণে আউশ ধানের চাষের পরিমাণ কম হইয়াছে। গত বৎসর পাটের দাম অতি উচ্চ স্তরে ছিল, বর্তমান বৎসরে সেইরূপ উচ্চ দরের আশায় কৃষকেরা পাটের চাষ খুবই বাড়াইয়াছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় প্রতিকূল আবহাওয়া এবং পরবর্তী অবস্থায় ব্যাপকভাবে পোকাকার আক্রমণ পাটের খুবই ক্ষতি করিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই ফলন খুবই কম হইবে। আউশ ধানের জমির পরিমাণ কম হওয়ার অপর একটি কারণ প্রতিকূল আবহাওয়া। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের অনাবৃষ্টি আউশ ধানের চারা প্রস্তুতের পক্ষে আদৌ অল্পকূল ছিল না। অনেক স্থলে বীজতলা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই,



আউশ ধানের ক্ষেতের একটি দৃশ্য

আবার অনেক স্থলে অনাবৃষ্টির জন্য চারা বাঁচাইয়া রাখা খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয় কারণ, বীজের অভাব। ৪০।৪২ টাকা দরে এক মণ বীজ বিক্রয় হইয়াছে; কোথাও কোথাও ৬০ টাকা দরও দিতে হইয়াছে।

স্থানে স্থানে পাট কাটা আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন

স্থানে পাট কাটার পর পাটের জমিতে আমন ধানের চারা রোপণের রীতি প্রচলিত আছে—ইহা ভাঙ্গ মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। পাট কাটয়া লইবার পর পাটের জমিতে রোয়া আমন ধানের চাষের প্রবর্তন যত বেশী বাড়িবে ততই দেশের মঙ্গল হইবে। এই দিকে কৃষি-বিভাগ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন জানি না।

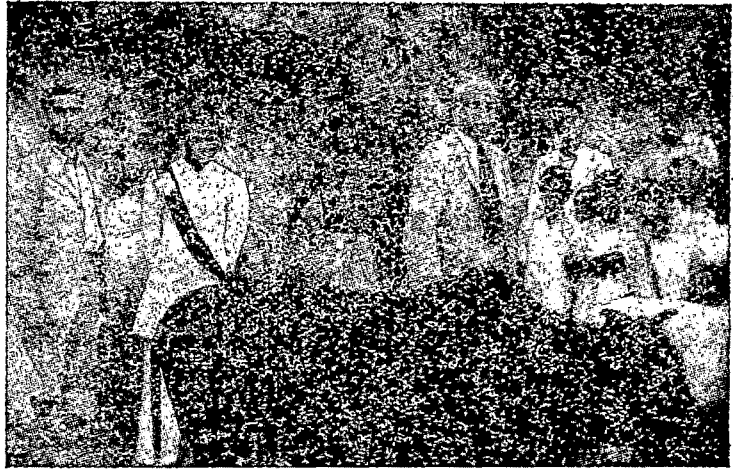
এবার প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বেগুন, ঝিঙে, করলা, চিচিঙ্গা প্রভৃতির ফলনও কম হইয়াছে এবং স্থানীয় বাজারে উহাদের আমদানী খুবই কম।

গরু কিনিবার জন্য স্থানে স্থানে সরকারী ঋণ প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু উহার পরিমাণ খুবই সামান্য—যে ক্ষেত্রে ২৫০০০ টাকার ঋণের আবেদন ছিল, সে ক্ষেত্রে হয়ত ২০০০ টাকার ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

কোন স্থানেই উন্নত প্রণালীর কৃষি প্রবর্তিত হয় নাই, অন্ততঃ চোখে পড়ে না। পুরাতন প্রথা ও পদ্ধতিতেই কৃষি চলিতেছে। তবে স্থানে স্থানে উন্নত শ্রেণীর বীজ প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও স্থানে স্থানে কৃষকদের মনে কৃষি-বিভাগের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিতেছে। এই অঞ্চলের জাদীপাড়া থানার নিকটবর্তী একজন অভিজ্ঞ কৃষক গত বৎসর কৃষি-বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রায় সাত বিঘা জমিতে কৃষি-বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রংবুল আলুর বীজ বপন করিয়াছিলেন। এই সাত বিঘা জমির জন্য তাঁহাকে নয় মণ বীজ সরবরাহ করা হইয়াছিল। জমি প্রস্তুত, বীজ বপন, পরবর্তী পরিচর্যা কৃষি-বিভাগের উপদেশ অনুসারেই করা হইয়াছিল। বীজ খুব সম্ভোষজনকভাবেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল, চারা গাছগুলিও খুব তেজী ও জোরালো হইয়াছিল। প্রথমে বীজের প্রশংসা সারা অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল, কৃষকের মন আনন্দে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়, কিছু দিন পরেই দেখা গেল যে কতক কতক গাছ অকালে শুকাইয়া যাইতেছে। এইরূপ ভাবে শতকরা প্রায় ৫০টি গাছ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কলিকাতার রাইটাস্ বিল্ডিংস্ হইতে বিশেষজ্ঞ আসিলেন, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, মাটিতে কোন দোষ নাই, চাষের পদ্ধতিতে এবং ফসলের পরিচর্যাতেও কোন ত্রুটি নাই, বীজের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। বীজের মধ্যেই এই রোগের বীজাণু বর্তমান থাকে এবং যে সকল বীজে এইরূপ বীজাণু বিদ্যমান থাকে সেই সকল বীজ হইতেই অঙ্কুরিত গাছ এইরূপ রোগে আক্রান্ত হয় এবং অকালে মরিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে এই রোগ সংক্রামক নহে। ইহার ফলে কৃষি-বিভাগের উপর স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের যে অবিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহার দূর করিতে দীর্ঘ-

কাল লাগিবে। কৃষকের যে ক্ষতি হইল তাহা কি ভাবে পূরণ করা হইয়াছে জানি না।

উন্নত শ্রেণীর বীজ উৎপাদনের জন্য কৃষি-বিভাগ স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র আয়তনের কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতেছেন। কৃষকের জমি—কৃষি-বিভাগের তত্ত্বাবধানে ঐ জমিতে কৃষিকাজ এবং বীজ উৎপাদন হইবে। পূর্বে এই জমির আয়তন ৪০।৪২ বিঘা নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল, যতদূর সম্ভব এক লপ্তে জমির অবস্থান হওয়া চাই। এই পরিমাণ জমির চাষের জন্য কৃষি-বিভাগ বীজ, সার, কৃষি-যন্ত্রাদি সরবরাহ বার্ষিক ১৫০০ টাকা সাহায্য দিতেন; বর্তমান বৎসরে এইরূপ কৃষি-ক্ষেত্রের আয়তন বার বিঘা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং এই আয়তনের জমির চাষবাসের জন্য কৃষি-বিভাগ ১০০০ টাকা সাহায্য করিবেন। যিনি এই পরিমাণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া এইরূপ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিবেন তাঁহাকে ইহার পরিসরভুক্ত উক্ত কৃষি-ক্ষেত্রে উৎপাদিত উন্নত



আটপুর গো-প্রদর্শনীতে আনীত একটি গাভী

উন্নত কৃষি-যন্ত্রাদির প্রচলন নাই বলিলেই চলে। গত মার্চ মাসে আটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীতে সর্বোত্তম পুরস্কার হিসাবে আমেরিকার 'কেয়ার মিশন' কর্তৃক প্রদত্ত একটি 'কেয়ার' লাঙ্গল জাদীপাড়া নিবাসী শ্রীগোকুলচন্দ্র সিংহ রায়কে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি একজন অতি অভিজ্ঞ কৃষক, মহিষের সাহায্যে তিনি এই লাঙ্গল ব্যবহার করিতেছেন—দেখি বলদ এই লাঙ্গল টানিতে পারে না। গোকুলবাবু বলেন দেখি লাঙ্গলের অপেক্ষা এই লাঙ্গলের কার্যকারিতা বেশী।

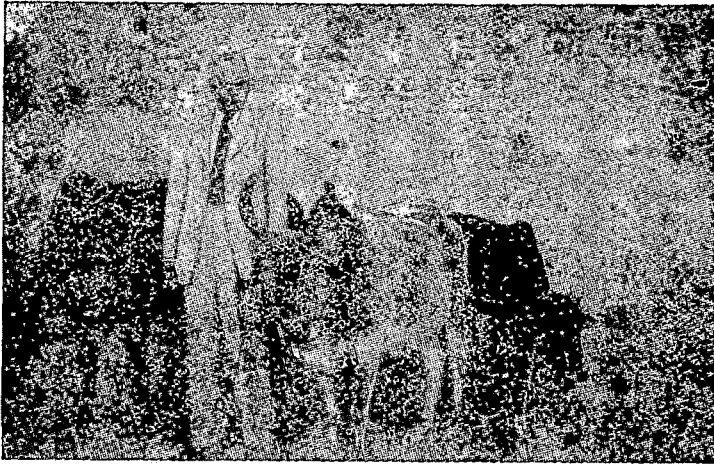
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনা কৃষি-বিভাগের একটি প্রধান কাজ। এই সকল পরিকল্পনার প্রত্যেকটির মোট ব্যয় ১০,০০০ টাকার বেশী হইবে না। স্থানীয় কৃষকগণকে খরচের এক-তৃতীয়াংশ দিতে হইবে; অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে। এই পরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব এই যে, খরচের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ কৃষকগণ নগদ অর্থে দিতে না পারিলে গায়ে-গতরে খাটিয়া পরিশোধ করিতে পারেন। জাদীপাড়া থানার কৃষি-কর্মচারী মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, তাঁহার এলাকায় গত ২।৩ বৎসরে ৫।৬টি এইরূপ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা হইয়াছে এবং উহাদের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৫।৬ হাজার টাকা।



কৃষিক্ষেত্রে আটক আউশ ধান

শ্রেণীর ধানের বীজ ৩০ মণ এবং গমের বীজ ১০ মণ দিতে হইবে। সংগৃহীত বীজ স্থানীয় কৃষকগণের মধ্যে আগামী ঋতুতে বিতরণ করা হইবে।

১০ হাজার টাকার উচ্চের পরিকল্পনা সেচ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই এলাকায় আমার গ্রামের এই রূপ একটি পরিকল্পনার কথা জানি; পরিকল্পনার নাম "Re-excavation of Khurigachi Khal and Construc-



আটপুর গো-প্রদর্শনীতে আনীত গরু, বাছুর

tion of a sluice gate at Tarajol in P. S. Jangipara"। এই পরিকল্পনার স্থচনা হয় ১৯৫০ সালের ১৬ই জুন। গত ১৯৫২ সালের ১১ই জুলাইয়ের ২৯৫০-১ নম্বর পত্রে কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, অমুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল, অমুসন্ধানের পর্যায়েই পরিকল্পনাটি এখনও আছে। ইহা "লাল ফিতা"র একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কর্তৃপক্ষ বুঝেন না যে, এইরূপ "লাল ফিতা"র ফলে স্থানীয় জনসাধারণের মনে হতাশার সঞ্চার হয়; আগ্রহ ও উৎসাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

আর একটি পরিকল্পনার নাম "রণের খাল"; এই খালের সংস্কার হইলে ২১৩ হাজার বিঘা "পতিত জমি" চাষে আনা যাইবে, ৭৮ হাজার বিঘা জমিতে দুইটি ফসল উৎপাদন করা যাইবে এবং বর্তমান আবাদী জমির ফলন বাড়িবে। কিন্তু ইহাও দুই বৎসরের উপর "লাল ফিতা"র কবলে পড়িয়া আছে।

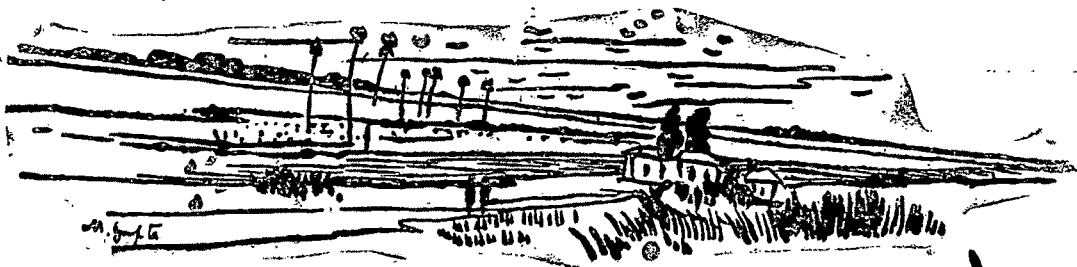
সারের সরবরাহও চাহিদার অল্পপাতে খুব কম; ধানের জমির জন্য কৃষি-বিভাগ একরকম সারের প্রচারকার্য

চালাইতেছেন, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইহা বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রীত হইতেছে, মূল্য প্রতি মণ ১০ টাকা। এই সারের উপর কৃষকের সম্পূর্ণ আস্থা এখনও জন্মে নাই।

অতি সাধারণ উন্নত প্রণালীসমূহও অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয় নাই। উদাহরণ-স্বরূপ কম্পোষ্ট প্রস্তুত, গোবর সংরক্ষণ প্রভৃতির কথা বলিতে পারি। কৃষির উন্নতির জন্য অতি ছোট ছোট কাজও কৃষকের সমবেতভাবে সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হয় না, একটা 'জাওনার' অল্প অংশ কাটিয়া দিলে জল সরবরাহের সুবিধা হয়, ২১০ জন মিলিয়া এই অল্প

কাজ অনায়াসে করা যায়, কিন্তু কেহ করে না—সরকার বা জমিদারের উপর দোষারোপ করিয়া নিজেদের কর্তব্য করে। সরকারী বা বেসরকারী নেতৃশ্বের একান্ত অভাব।

জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র খুবই নিম্নে নামিয়া যাইতেছে। জুয়া খেলার সাহায্যে 'বারোয়ারী' অল্পপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, চোরাকারবারীদের আর্থিক সাহায্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত বা পুষ্ট হইতেছে। জেলা মৎস্য-কর্মচারীর মুখে শুনিলাম জেলেরদের মধ্যে জুয়া খেলার নেশা অতি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। ফল, মূল, মাছ প্রভৃতির চুরিও খুব বাড়িয়াছে। আমার পিতার আমলের পুরাতন ভৃত্য এককড়ি বলিল, লোকে স্বভাব এবং অভাবের জন্যই চুরি করে, বর্তমানে লোকের স্বভাব খুব বেশী নষ্ট হইয়াছে এবং অভাবও খুব বাড়িয়াছে; স্বতরাং চুরিও বাড়িয়াছে। স্থানীয় বাজারে টাকায় এক সের এক ছটাক চাউল বিক্রীত হইতেছে, অর্থাৎ এক মণ ৩৭১০ টাকা, ইহা ১১ই আগষ্টের দর।



কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

১০

তিন মাস পরে হাজত থেকে ফিরে এসে মরোত্তম মন—
জমিদার কালীবাড়ী দখল করেছেন। বিনা প্রতিবাদে
সেবারেই ঠাকুরও মাকি করেছেন তার কাছে বস্ততা
খীকার।

জমিদারের পূর্বপুরুষের মত একধামা দলিলের বলে
সেবারেই উপরেই হস্ত ছিল দেবসেবার তার। আর
সেবারেই রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ও বৈষয়িক কার্য-পরি-
চালনার দায়িত্ব সম্বন্ধে মোড়লদের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল
একটা চুক্তি। বংশপরম্পরায় মোড়লরা সে চুক্তির সর্ব পালন
করে আসছে, জমিদারের প্রদত্ত কিছু নিছক জমিদারীও
ভোগদখল করছে।

দলিলখানার মুসাবিদার মধ্যে এমন একটা আইনগত
জটিল ছিল, যার ব্যাখ্যা হয়েছিল—‘জোর যার—কালীবাড়ী
তার।’ জমিদার ইচ্ছা করলেই মোড়লদের বেদখল করতে
পারেন।

মোড়লদের সঙ্গে কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ করা পূর্ববর্তী
জমিদারেরা সম্মানজনক মনে করেন নি। কিন্তু বর্তমান মতপ
কুমারবাহাদুরের চক্ষুজ্জ্বল বালাই ছিল না। মরোত্তমের কাছে
বারবার অপদস্থ হয়েও তিনি নিরুৎসাহ হন নি। মরোত্তমের
হাজতবাসের সুযোগ নিয়ে কালীবাড়ী দখল করা খুব সহজ-
সাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু বিবিধব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো কোন-
প্রকারেই সম্ভবপর হয় নি। কুমারবাহাদুরের ইচ্ছা ছিল—
কালীবাড়ী বিসর্জন দিয়ে, কালীবাড়ীকে জমিদারের বাগান-
বাড়ী বা কাছারিবাড়ী ঘোষণা করা। কিন্তু কল্যাণচরীর
কেউই সে বিষয়ে জমিদারকে সহায়তা করতে রাজী হ'ল না।
জনমত উগ্র হয়ে উঠার আশঙ্কা কুমারবাহাদুর একেবারে
উপেক্ষা করতে পারলেন না।

বিশেষভাবে কুমারবাহাদুরের পৌত্তলিকতাবিরোধী মত-
বাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন রমাদেবী। তিনি বললেন—
মা-কালীর বিতীষিকার মধ্যে বাস্তবতার কোন প্রদর্শনই উঠে না।
আত্মরিক অত্যাচার বা অবিচারের বিরুদ্ধে ঐশী শক্তির ঐক্য
একটি প্রতিবাদবুক্তির পরিকল্পনা—হুর্দল মানব-মনের স্বাভাবিক
সাহস। মানবতার বিরুদ্ধে তোমার আত্মসম্মতি দানবতাকে
দমন করবার জেতে খাঁড়ি নিয়ে মাকালীর আবির্ভাব, আমিও
আশঙ্কা করি...

কুমারবাহাদুর হো-হো করে হেসে উঠলেন। তুমি কি
বলতে চাও—কালী আমার হুণ্ড কেটে রক্ত পান করবেন ?

—হিরমন্তা রূপে নিজের হুণ্ড কেটেও রক্তপান করেন
তিনি। তাঁর রক্ত-পিপাসা আর বাড়িয়ে তুলে না। মোহাই
তোমার।

কুমারবাহাদুর গভীরভাবে বললেন—হি হি হি রমা।
তুমি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দাবি একেবারেই ভাগ করেছ
দেখছি...

—কারণ তোমার মত বিভ্রান্ত হই নি...

—শোনো রমা। আমি অকৃতজ্ঞ নই। বাবা আমাকে
নিশ্চরই ত্যাগপূজ্য করতেন। তোমার জেতেই এ জমিদারী
আমি পেয়েছি। তাই তোমাকে অনেকখানি সহ্য করি।
কিন্তু তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ...

—তার মানে ?

—আমি জানতে পেয়েছি—আমার বিরুদ্ধে মরোত্তমকে
তুমি অর্থসাহায্য করেছ...

—হ্যাঁ, করেছি। বাবা আমাকে যে টাকা দিয়ে গেছেন,
তা আমি কিতাবে ব্যয় করছি—জানবার প্রয়োজন তোমার
নেই। জমিদারীর টাকা উড়িয়ে তুমি যে বাগানবাড়ীতে
কুঠি আয়োদ চালাচ্ছ—তার প্রতিবাদ ত আমি করি না ?

—সে অধিকার তোমার নেই...

রমাদেবীর চোখখুঁচ রাঙা হয়ে উঠল। উত্তেজিতভাবে
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি বললে ? সে অধিকার আমার
নেই ? আমি তোমার কেউ নই ?

—না।

—বেশ, আমার খোকার পক্ষে দাঁড়িয়ে জমিদারীর
ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করবার অধিকার আমার আছে কি না তা
তুমি শীগগিরই জানতে পারবে...

এই ঘটনার পর কুমারবাহাদুরের সঙ্গে রমাদেবীর বাক্যা-
লাপ বন্ধ হয়ে গেল। দেওয়ানাকাতের সম্ভাবনাও বেশী রইল
না।

ঠিক এই সময়ে একজন ভাস্কর সাধু এসে চাপলেন
জমিদারের ক্ষেত্রে। মাকে নিবেদন করে, মন্দিরে বসেই তিনি
মস্তপান আরম্ভ করলেন। কুমারবাহাদুরকে দীক্ষা দিলেন
কারণ-মন্ত্রে। তাঁর মতে বিশ্বপ্রসবিনী মহাশক্তির কাছে কোন
উচ্চ জ্ঞানতাই অমার্জ্জনীয় অপরাধ নয়। পঞ্চ-মকারের নির্দিষ্ট
সাধকই পারে মাত্রজমীর কপালভ করতে।

সেবারেই প্রথমে এই ভাস্কর গুরুর বিরোধিতা আরম্ভ
করেছিলেন। মন্দিরের পবিত্রতার দাবি বিষয়ে লজাগ হয়ে উঠে-
ছিলেন তিনি। কিন্তু গুরুজী একদিন তাঁকে অন্তরালে ডেকে

নিরে ভীত ভৎসনা করলেন। কর্তৃত্বের স্বরে বললেন—
খুঁজ তুমি। তুমি কি জান না—‘বিষম বিষমোদয়’? মদের
সাহায্যেই মাভালকে মদ ছাড়াতে হয়। এই উচ্ছৃঙ্খল
যুবকের মনে মাতৃমন্দির ধ্বংস করার যে হুজুর্জি দেগে
উঠেছে, তাকে ধ্বংস করার ভেতাই ত এসেছি আমি। এ
ছাড়া পাশও-দলনের আর কি পছন্দ আছে? শুধুই দেবার্জনা
কর, মানব প্রকৃতির রহস্য যে কত জটিল তা ত জান না?
শুগ্লিরই আমি ওকে এক মহাখশানে নিয়ে যাব। তার পর
দেখো—ওই দুর্দান্ত মাভাল হয়ে উঠেছে কত বড় মাতৃভক্ত।
কত সংযতচিত্ত সাধুপুরুষ।

সেবারেত লক্ষ্য করতে লাগলেন—বীরে বীরে অহিন্দু
মতবাদী অমিহার-নন্দনের রুচি ও প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটছে।
মাংসাশী-হলেও তাকে নিবেদন না করে এখন তিনি আর
মাংস-খেতে চান না।

গুরুদ্বী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে। কি
দেখছে?

সেবারেতও-হেসে বললেন—বেশ, ভালই...

গুরুদ্বী বলতে লাগলেন—তোমরা অতি অগভীর জলের
শুকনো। ধর্মের তত্ত্ব যে কোন্ গুহাতে নিহিত আছে, তা
জানা খুব সহজ নয়। দণ্ড্য রত্নাকরের মধ্যে বাস্তবিক স্মিরে-
ছিলেন। তাকে ভাগাতে হলে, মহাকাব্যের উৎসমূখ বুলতে
হলে, উচ্ছৃঙ্খল দস্যুকে কি উপেক্ষা করা চলে? তাই তো
ওই বরাভয়দাজী মা-রক্ষমণী সবাইকেই কাছে ডাকছেন।
তার কাছে হিন্দু বা অহিন্দু নেই। খাও বা অখাও নেই।
তার তৃতীয় নয়নের আঙনে পুড়ে সমস্ত পাপ-প্রযুক্তি হাই হয়ে
যায়। যা থাকে তা খাঁটি সোনা।

নরোত্তমও শুনল জমিদার মন্দিরে বসেই মৃতপান করছেন।
সেবারেত তার কোন প্রতিবাদ করছেন না। কি অস্যাচার!
সুপার ও বিতৃষ্ণ নরোত্তমের মন বিষাক্ত হয়ে উঠল।

দীনবন্ধু ঠাকুর এসে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কি করবে
মোড়ল?

—কি আর করব ঠাকুরবুড়ো। কালীবাড়ীমুখো আর
যাব না। এখান থেকেই গড় করব। বলেই মাটিতে মাথা
রেখে নরোত্তম কাঁপতে লাগল। দীনবন্ধু ঠাকুর তাকে সাবুনা
দিলেন।

নিবারণ পরামর্শিকের বাড়ী ছিল মোড়লদের পাশের
গায়ে। সপ্তাহে ছ’দিন সে আসত নরোত্তমের বাড়ীতে।
নরোত্তমকে সে মনে করত মা-কালীর বরপুত্র। মা-কালীকে
সে অত্যন্ত ভয় করত। বহুমেজাজী কর্তার কাছে পৌছানোর
সাহস বার নেই, সে তার পেরাদাকেই খুশী রাখবার চেষ্টা
করে। নিবারণের অন্তিমস্তিত বিবৃতি শুনতে নরোত্তমেরও
খুব ভাল লাগত।

হাওতবাসের পর নরোত্তমের পরিষ্কার সুখানা অভ্যস্ত
বোংরা হয়ে আছে। খবর পেয়েই নিবারণ ছুটে এল—ফুর-
নরুণ আর কাঁচি শানিয়ে নিয়ে। নরোত্তম একটু হেসে
বলল—মা নিবারণ! পৌফদাজি আর কাঁচাব না। ত্রিহন্দাবন
যাব।

—কেন মোড়ল? বিশিষ্টভাবে নিবারণ চেয়ে রইল
তার সুখের দিকে।

—বিবাসি হব। গেরুয়া পরে গজার একটা তুলসীর
মালা বাঁধব। লাঠিবাড়ী আর কখনও করব না।

সে কি? নিবারণ চমকে উঠল। জমিদারের অভ্যাচারের
বিরুদ্ধে নরোত্তমের লাঠিই যে জনসাধারণের একমাত্র ভরসা,
তা কে না জানে? নরোত্তমের বৈরাগ্য যে দেশের পক্ষে
কতখানি ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে, তা ভাবলেও
নিবারণের জংকল্প উপস্থিত হয়। দেশে-বিদেশে নরোত্তমের
লাঠি-সড়কির অন্তিমস্তিত গল্প প্রচার করে নিবারণ সবাইকে
ভরসা দিয়ে থাকে। কোন ভয় নেই। আমাদের নরোত্তম
মোড়ল আছে। জমিদারের সাব্য কি যে টু-শকটি করে?
দেই নরোত্তমের লাঠি আজ কদমতলার বাঁশী হয়ে যাবে—
একথা নিবারণ ভাবতেই পারছে না।

দীর্ঘবাস ত্যাগ করে নরোত্তম বলল—তবু তুমি এসো
নিবারণ। লাঠি-সড়কি ছাড়লেও তোমার ফেনিয়ে-তোলা
গল্প-শোনার সোভ ছাড়ব না...

নিবারণের প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সে যাকে
পছন্দ করে, তাকে আকাশে তোলে। যাকে পছন্দ করে না
তাকে নিতান্ত আবর্জনার মতই আত্মকুঁড়ে ফেলে দেয়।
নরোত্তম তা জানে।

নিবারণ বলে উঠল—কাল একটা অতি আশ্চর্য ঘটনা
ঘটেছে মোড়ল।

—কি ঘটনা?

—আমাদের গাঁয়ের মেজবাবু আমাকে কত ভালবাসেন
তা তো জান? রাত তখন সাড়ে বারোটা। মেজবাবু
এসে বললেন—নিবারণ! জাহাই এসেছেন। ঘরে মাই
দেই। জাত যে যার। কি সর্বনাশ! মেজবাবুর জাত যাবে?
কিন্তু উপায় কি? এত রাজে কোথার পাওয়া যাবে মাই?
হাওয়ার বসে খুঁটী। হেলান দিয়ে ভাবছি। এমন সময়
খড়্ খড়্ শব্দ। মতুন বাঁশের খুঁটি। এই সেদিন জল থেকে
তুলে ঘরে লাগিয়েছি। আবার খড়্ খড়্ শব্দ। ছেলেকে
ডেকে বললাম—কুড়ুলটা নিয়ে আর তো রে। চাল থেকে
বুলে নিয়ে, কেঁড়ে ফেললাম খুঁটী। তোমাকে কি আর
বলব মোড়ল। গোমা এক কুড়ি কইমাছ উঠানে হাড়িরে
পড়ল। একটা বেশীও নয়, একটা কমও নয়। সে কি

আমন্দ আমার। মেজবাবুর জাতরফে হ'ল। কি ভাগ্যবান লোক আমাদের মেজবাবু...

—মেজবাবুর ধর কি? একটু হেসে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল।

—তার কথা আর বলো না। মেজবাবুর বাত-বাত্ত ঘেঁষে হিংসের অলপুড়ে মরছেন।

—সুন্দরাম হুশো টাকা দিয়ে একটা গরু কিনেছেন?

—হু'বেলা দশ সের দুধ দিচ্ছে সে?

—মিছে কথা, মিছে কথা। মুখটা বিকৃত করে মিবারণ বলল। ছটাকখানেক দুধ হয়। মরা গরু, খাস পায় না। সেদিন আমাকে গাধের আলার বলেছেন—‘মিবারণ তোকে আমি দেখে নেব।’ হেসে আর বাঁচি নে। নরোত্তম মোড়ল ঘর সহায়—সে তো জমিদারকেই ভয় করে না। ভূমি কোণাকার মেজবাবু হে?

গভীরভাবে নরোত্তম বলল—তা তো বটেই। আজকাল বুঝি আর জমিদার-বাড়ীতে যাও না?

—কেন যাব? মাতাল-জমিদার বলে—তার মাকের নীচের দর ছোট একটু গৌক রাখতে হবে। কি অভাৱ কথা বল তো? কামাতি তো সব কামা। আর না হয় কার্তিক-ছাঁটাই করে দি—গৌকে তা' দে। তা নয়, মাকের নীচের ছোট গৌক!

—একটু থেমে মিবারণ আবার বলতে লাগল—আহা হা হা! কামাতার গুঁর বাবা সেই বুড়ো জমিদারকে। এক দিম গিয়ে দেখি—বৈঠকখানা ঘরের ফরাসের উপর ভাকিয়া ঠৈনাম দিখে ঘুমিয়ে আছেন। সেই ঘুমন্ত মুখেই ফুর চালিয়ে কামিয়ে ফেললাম। ঘুম ভেঙে, আমাকে দেখেই বললেন—মিবারণ এসেছিস? দে, দে, কামিয়ে দে...আমি একটু হেসে বললাম—আজ্ঞে হজুর। কামানো হয়ে গেছে। ব্যা, বলিস কি? মুখে হাত দিয়েই জমিদার অবাক। তখন গাধের শাল-খানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেম—আমার কাঁধের উপর। এখনও সে শাল আমার ঘরে আছে।

হঠাৎ নরোত্তমের চোখে পড়ল—দূর থেকে কে যেন আসছে তাদের বাড়ীর দিকে। পরিণামে রক্তের মত রাঙা কাপড়। উপবীতের মত গলায় গুলামো রাঙা চাদর। কপালে জল জল করছে ভৈলজক মোটা সিঁহরের কৌটা। তার সঙ্গে লম্বা লাঠি-হাতে দুই জন জমিদারের পাইক।

—কে? কে আপনি? নরোত্তম বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল আগন্তকের মুখের দিকে।

—চিনতে পারলে না নরোত্তম? একটু হাসলেন তিনি।

চিনতে পারেনে বলেই নরোত্তমের বিশ্বাসের অবশি বাকি নেই। এও কি সম্ভব? শার্ট গায়ে, ঢিলে পা-জামা পরা, চুল উণ্টানো, আর মাকের নীচে ছোট গৌক ওয়ালা যে কুমার-

বাহাদুরের চেহারা ছিল নরোত্তমের চক্ষুশূল, তাঁর এ কি রূপসজ্জা? কপালের উজ্জল সিঁহরের কৌটার দিকে চেয়ে চেয়ে নরোত্তমের সর্কাক যেন শিথিল হয়ে আসছিল। ইদিকে সে মিবারণকে বলল, চৌকিটা এগিয়ে দিতে।

জমিদার বললেন, না, না, বলব না। একটা বিশেষ অহরোধ জানাতে এসেছি তোমাকে। আজই সন্ধ্যার পর মন্দিরে গিয়ে আমার সঙ্গে একবার উ দেখা করবে...

—কেন বলুন ত? সন্নিহিতভাবে নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল।

কুমারবাহাদুর বললেন, সিঁহিনাতের কড়ে কালই আমি মহাশয়শাসে যাচ্ছি শুক্লবেবের সঙ্গে। যা আদেশ করেছেন—তোমার উপরেই মন্দিরের তার রেখে যেতে হবে...

মিছের কান ছটোকে নরোত্তম যেন বিধ্বাস করতে পারছে না। কথামূলি আর একবার ঘাটাই করে শুনে হঠাৎ বলে উঠল—সত্যিই আপনাকে আমি চিনতে পারছি না, বুঝতে পারছি না। একটু থেমে নরোত্তম বলতে লাগল, হু' মাস আগে আমাকে একটা মিথ্যা মামলার অভিযোগে জেল বাড়ীতে চেঁচা করেছেন। কালীবাড়ী দখল নিয়েছেন। শুনেতে পাই মন্দিরে বসেই অবাধ বাচ্ছেন—মদ চালাচ্ছেন। এখন হঠাৎ আপনার এ কি চেহারা? আপনি সন্ন্যাসী? এ কি আপনার কোন জমিদারী চাল? আমাকে আরও বেশী বিপদে ফেলবার চেঁচা? সত্যি বলুন ত আপনার মতলব কি? কুমারবাহাদুর একটু হাসলেন। অকপট সে হাসি নরোত্তমের অন্তর স্পর্শ করল। সে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ল।

অতি শান্ত ও সংযতভাবে কুমারবাহাদুর বলতে লাগলেন, শোন নরোত্তম, অতীতের কোনও কাজের অহুশোচনা আজ আর করব না। শুধু একটা কথা তোমাকে বলব। যে জমিদারকে তুমি চিনতে, সে জমিদার আমি নই।

নরোত্তমের চোখে দারুণ বিশ্বাস ও কৌতূহলের দৃষ্টি। এত অল্প দিনের মধ্যে কোন বাহু-মস্ত্রে এরূপ রুচি-পরিবর্তন ঘটতে পারে? সেই জমিদারই বলছেন, আমি সে জমিদার নই? কি আশ্চর্য।

ভেমন শান্তভাবে ও শ্রিতমুখে কুমারবাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাবছ নরোত্তম? যা ভাবছ তা বুঝতে পারছি। এ সংসারে যা-কিছু ঘটছে সবই সেই ইচ্ছামন্ত্রীর ইচ্ছায়। সম্ভব আর অসম্ভবের প্রমাণ মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে। তাঁর ইচ্ছাশক্তির ত কোনও নির্দিষ্ট গভী নেই। সুহৃদের ভূমিকম্প যদি একটা পাহাড় ধ্বসে যেতে পারে, কোনও মানুষের অহঙ্কারই বা চূর্ণ হতে পারবে না কেন?

নরোত্তমের বিশ্বাসের ঘোর তরলও কাটে নি। সে যেন সংজ্ঞাহীন অচঞ্চল পাথরের বৃষ্টি। কুমারবাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, মাতাল-জমিদারের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে দেখা করতে

তর পাছ ? তোমার দুঃসাহসের যে সব গল্প শুনেছি তাতে মনে হয়েছিল, তর কাকে বলে তা তুমি জান না...

হঠাৎ নরোত্তম আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল—ওধু আমার মাকে ছাড়া এই ছদ্মকার আর কাউকে তর করি না আমি...

—তবে সেই মন্দিরে যাবার সাহস নেই কেন ?

—মনে হচ্ছে—তার কাছে আমি বোধ হয় কোনও অপরাধ করেছি...

—হ্যাঁ, করেছ। কুমারবাহাদুর আবার একটু হাসলেন। সে অপরাধ হচ্ছে—তোমার লাঠি-সত্কির আর বাবুরীর অহঙ্কার। মনে মনে ভেবেছিলেন—বাবুরী ঐক্যেই তুমি আমাকে মন্দিরে চুকতে দেবে না। তা কি পার নরোত্তম ? মা যাকে টানেন, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। এত দিন মায়ের কাছে আমাকে আসতে না দিয়ে তুমি যে অপরাধ করেছ—তার শাস্তি মা তোমাকে নিশ্চয়ই দেবেন...

অতি বীর স্থিরভাবে কথাগুলি বলেই কুমারবাহাদুর চলে গেলেন। নির্বাক, নিষ্পন্দভাবে বহুক্ষণ বসে রইল নরোত্তম।

ভয়ে ও বিষয়ে নিবারণ এতক্ষণ নির্বাক বসে ছিল। জমিদার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল—ব্যাপার কি মোড়ল ?

—কিছু না। হঠাৎ যেন নরোত্তম একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। নিবারণের কাছে এসিয়ে বসে বলল, এ পৌক-দাড়ি কামিয়ে দাও নিবারণ। এবুনি কামিয়ে দাও...

—কেন ? ক্রীন্দাবন হবে না ?

—না। মা ডেকেছেন। আবার বোধ হয় লাঠি ধরতে হবে...

—তাই নাকি ? বেশ, বেশ, মা-কালী তোমাকে সুবুদ্ধি দিন—নিবারণ সোৎসাহে নরোত্তমের ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করল।

১৪

সন্ধ্যার পর গোপীযন্ত্র বাজিয়ে সখিচরণ গান বলল—

ও আমার প্রাণের ঠাকুর।

প্রাণ কঁাদে আজ তোমার জামি

বাইরে দেখি রং-তামাশা—

আমার মন হ'ল সংসার-বিরাগী।

আমি পাই যা-কিছু হারাই অনেক বেশী,

হার না-মেনে চালাই রেবারেঘি—

এই পাওনা-দেমা বেচা-ফেমার হাটে

হই সুখের দেশার, দুখের ভাঙ্গি।

হঠাৎ গানে বাধা পড়ে গেল। সখিচরণের স্ত্রী সুহাসিনী এসে বজ্রার দিয়ে বলল—বলি, তুমি ভেবেছ কি ?

—যা ভেবেছি—তা কি গানের ভিতর দিয়ে পরিকার শুদ্ধ না ? সত্যিই আমি ভেবেছি—এ সংসার আমার।

—কেন মেজদি আমাকে বাদী বলে গালাগালি দেবে ?

—তা হলে সংসার যে আমার, সেই কথাই ত মানতে হ'ল ? এস এখন, বাদী-বাদী দু'জনেই গলাধরাধরি করে কাঁদি আর বলি—

“অসার সংসারে আসা বারে বারে,

জামিলাম অন্তরে—কেহ কার নয় আপন।”

—বাঞ্চে বকো না। শোন বলছি—এ অচারের বদি কোনও বিচার না হয়, তা হলে কাল ভোরেই আমি বাপের বাড়ী চলে যাব।

—খোকাকে রেখে যাবে ত ?

—কেন ? সে আমার ছেলে। আমিই তাকে বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছি।

—সে কথা কে অস্বীকার করছে ? তবে, তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়ে, খোকার কি হাল হবে, সে কথাটা আমাকে বলে যাওয়া উচিত।

একটি রোরুতমান হেলেকে বুক নিয়ে জামাচরণ এসে দাঁড়াল সেখানে। মেজবোঁ সৌরভিনীর পক্ষ-সমর্থন করে বলল—দেখ মেজবোঁমা। মেজবোঁ বড়, তুমি ছোট। ছোটকে বাদী বলার অধিকার বড়র নিশ্চয়ই আছে...

—হারামজাদী বাদী বলে, চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে বাড়ী থেকে যে ভাঙিয়ে দেন নি—সেই-তোমার ভাগ্যি—খুব গভীর ভাবে সখিচরণ বলল।

বাধা দিয়ে জামাচরণ বলল—মা না, তত দূর কেন করবে ? আসল কথা কি জানিস স'থে। উল্লুনের ভাপে মেজবোঁয়ের সোমার অঙ্গ কালি হয়ে যাচ্ছে। সংসারের জ্বলে সারাদিন খেটে খেটে হাড় গুঁড়ো করে ফেলছে। তার একটা চড়া কথা শুনলে তোমাদের গায়ে কোস্কা পড়ে কেন বোঁমা ?

—মেজবোঁয়ের চামড়া বেজার পাতলা মেজদা। কি করা যায় বল ত ?

ঘোমটা টেনে, ভান্নরের সম্মান রেখে সুহাসিনী এতক্ষণ অস্ত্র দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। আর সহ করতে পারল না। কঁদে বলল—কেন ? আমরা কি রাঁধতে জামি না ? মিছের আর মিছের ছেলেমেয়েদের ভালমন্দ খাবার ব্যবহার জ্বলে দিন রাত যিনি হৈসেল আগলে পড়ে থাকেন, তার বাটুনির জ্বলে দারী কে ?

—শুনলি স'থে মেজবোঁমার কথা ?

—হ্যাঁ শুনলাম মেজদা। একটু মোছা হয়ে বসে সখিচরণ বলল—আমি একটা কথা ভাবছি...

—কি ?

—বড়দা বেজার ভাগ্যবান...

খুব দ্রুততার সঙ্গে স্নাহাসিনী বলে উঠল—সে ভাগি তোমারও হবে খুব শীগিরি। আমিও বড়দির মত আমগাছে ঝুলব।

—না না, সেজবো! দোহাই তোমার—করজোড়ে সখি-চরণ বলতে লাগল—তোমর কাজ ক'খেনো করো না। রাত দুপুরে কেলে হাঁড়ি মাথার নিরে নিঃশব্দে সীতার কাঠিতে পারব না আমি। তার পর আমাচরণের দিকে ঘুরে বসে বলল—তোমার পাখ পড়ি মেজনা। বৌদিকে হৈসেল থেকে বেরিয়ে আসতে বল। তার গুঁড়ো হাড় খেয়ে খেয়ে আমা-দেও অজীর্ণের ব্যারাম ধরবে। বৌরাত দড়ি নিয়ে ছুটোছুটি করবে আম-বাগানে। দরকার কি? দিনরাত বিছানার ভয়ে থাকুন তিনি। তুমিও তার পদসেবা করে শান্তি পাও, আমিও নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে বাঁচি...

সখিচরণের ভীষণ বিজ্ঞপ চিরদিনই আমাচরণের অসহ। হঠাৎ একটা চচ্চ মেয়ে কোলের ছেলটাকে আরও বেশী কাঁদিয়ে নিয়ে হন হন করে সে চলে গেল সেজবো সৌরভিনীর ঘরে।

সখিচরণ তার গোপীঘন্ত্রটা হাতে তুলে নিয়ে বেশ শান্ত-ভাবে বলল, তা হলে দয়াময়ী। কাল ভোরেই ত তুমি যাচ্ছ? বাপের বাড়ীতে পৌছেই একখানা চিঠি লিখো।

—আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও কেন? আর একটা বো-ঘরে আনবে বুঝি? অভিমানভরে স্নাহাসিনী জিজ্ঞাসা করল। গোপীঘন্ত্রটা রেখে, নিজের নাক আর কান অতি নির্দ্বন্দ্ব-ভাবে মর্দন করে সখিচরণ বলল, আবার? সর্কনাশ! যে ভুল একবার করেছে, তার বাল সামলাতে কান বেরিয়ে যাচ্ছে—আবার সেই ভুল করব? হেঁঃ।

গোপীঘন্ত্রটা তুলে নিয়ে সখিচরণ গাইতে লাগল—

কেন, ভুল ক'রে তুই বাইরে এলি—

নিজের ঘরের দোর খুলে?

ওরে, পর কি কখন হয়রে আপন?

মিছেই টাক-ঢাকা তোর পর-চুলে।

নিজের ঘরে নিজের আলো জালতে যে না-জানে,

চোখ-বাঁধানো পরের আলো, বাইরে ডাকেই টানে।

আপনারে, সে চিন্তে নারে—ও মন।

ভুল থেকে যায় যায় মূলে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে শুনতে স্নাহাসিনী চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। রাগের জ্বালায় হাজার বার মুখে বললেও, সখিচরণকে ছেড়ে যাওয়ার কথা সে মনে তাবতে পারে না। আপনতোলা সখিচরণকে অত্বরের সঙ্গে ভাল-বাসে সে। তার বাহ্যিক উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্য দিয়েও স্নাহাসিনী অহত্ব করে সখিচরণের আন্তরিক সহদয়তা ও স্নেহাৰ্ভ প্রাণের পরিচয়।

চোখ দুহে বীরে বীরে স্নাহাসিনী গিরে বলল সখিচরণের পারের কাছে। উপস্থিত এসদটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে কান্ডরতাবে বলল, একটা কথা বলব, শুধবে?

—একটা কেন? কথার জাহাজ তুমি। তোমার পেট তত্ত্বি কত রামায়ণ আর মহাভারত আছে, তা কি আর জানি মে? উপরাতে না পারলে পেট ফুলে মরে যাবে যে। বল, বল, শুনি...

—তোমাদের বোন কাহ যে মরেছে...

সখিচরণ চমকে উঠল। বিস্মিতভাবে ঘুরে দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—মরেছে মানে? কখন মরল? এই যে এই মাতর আমাকে এক বট জল দিয়ে গেল...

—সে মরা মর...

—ভবে আবার কোন্ মরা? মেয়েদের রকমারি মরণ আছে নাকি?

—হ্যাঁ আছে। ও পাড়ার কানাইকে ত চেন? যে বাজার দলে কেউঠাকুর সাজে। মেচে মেচে গান গায় আর আড়-বাঁশী বাজায়?

—চিনলাম। সে কি করেছে?

—যোজই আসে তোমাদের বাড়ীতে।

—কারণ?

—ছোট বৌয়ের কি রকম ভাই হয় যে...

—ভাই বল। সেই কারণেই ছোট বৌমার ঘরে মাঝে মাঝে গাঁজার গন্ধ টের পাই...সেই অজমিকে যুগ কিরিয়ে সখিচরণ ডাকল—মনোহর। মনোহর ঘরে আছিস?

মনোহর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—ডাকছ কেন সেজনা?

—কানাই ছোট বৌমার কি রকম ভাই রে?

—মামাতো বা পিসতুতো—এই রকম কি একটা হবে।

—কি আশ্চর্য! আমি ভেবেছি—তুই বুঝি একটু গাঁজা খেতে শিখছিস। যাকগে—ছোকরাকে বারণ করে দিস—সে ঘেঁষ আমাদের বাড়ীতে আর আসে না। বড়দার চোখে পড়লে এমন ঝগড় হবে যে ঘুরে পড়েই মরে যাবে...

—তা ত মরবে। স্নাহাসিনী চোখযুগ ঘুরিয়ে বলল, এদিকে তোমাদের বোন কাহ যে মরে ছুত হয়ে আছে। কাল তারা অন্ধকারে ঐ কামিনী ফুল পাছটার ভলায় দাঁড়িয়ে কিসকিস করেছে। নিজের চোখে দেখেছি—কানাইকে দেখবার জেতে কাহ যেন ছটকট করে। গোপনে দেখাশুনাও আরম্ভ হয়েছে।

—যাও, যাও, বাজে বকো না। সখিচরণ উত্তেজিত ভাবে বলল—মরোত্তম মোড়লের বোন কাহ! সে মান-মর্যাদাবোধ তার নিকরই আছে। দু'দিন বাদে ঢাল-

সফকি হাতে নিয়ে যাবে সোনারদীর ঘর করতে। ফেট-
ঠাকুরের বাঁশী শুনে পাগল হওয়ার মত মেয়ে সে মর।

মনোহরের দিকে কিরে সঞ্চিচরণ বলল—শোন মনোহর।
হোকরাকে বলে দিস—বাঘের বাচ্চী নিয়ে খেলা করবার
ছক্কুতি যেন তার না হয়...

বাইরের ঘর থেকে মরোত্তম ডাকল—স'বে।

—বাই বড়ল...বলেই সঞ্চিচরণ গিয়ে ছাডির হ'ল—
মরোত্তমের সামনে।

মরোত্তম বলল—আমি একটু কালীবাড়ির দিকে যাচ্ছি—
কিরতে দেখি হতে পারে...

বিশিষ্টভাবে সঞ্চিচরণ জিজ্ঞাসা করল—কেন?

—জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে...

—কি সর্বনাশ! একলা এই রাত্তিরকালে! তুমি কি
বলছ?

সে জমিদার আর নেই...

অবিধানের ভদ্রীতে সঞ্চিচরণ বলল—হ্যাঁ, শুনেছি—
খোলসটা বদলেছেন, মদ তো ছাড়েন নি? জমিদারী ঠাঁট সবই
বজার আছে।

—তা থাক। আমার জেতে তাবতে হবে না। তোরা
লাবনামে থাকিস...বলেই মরোত্তম রওনা হ'ল। বিকেল-
বেলা। অর্থমণ্ড সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিষে আসে নি। পিছনে-
পিছনে কিছুদূর গিয়ে নীচু স্থরে সঞ্চিচরণ জিজ্ঞাসা করল—
অস্ত্রধারী কি নিয়ে যাবে না?

—না। শুধু হাতেই বাব...

মরোত্তম চলে গেল। সঞ্চিচরণ একটু অবস্থি বোধ করতে
লাগল। নিজের ঘরের বারান্দার কিরে এসে গোপী-মল্লটী
বাগিরে নিয়ে আবার গান ধরল:

মন! ভোরে আর কেমন ক'রে—

বোকাই আমি বল?

তুই, হরদিকে ছয় রিপূর টানে

সদাই থাকিস্ যে চকল।

ভোর, অঙ্গে লাগে পাগলা-হওয়া

সুখ-বসন্ত কালে—

ভোর, রক্ত নাচে পলাশবনের

ফুল-ফোটারো ভালো।

ও মন! মন্ডরে আমার—

ধ্বন আসবে বর্ষা—মাস্তম কসী—

বরবে চোখে জল।

গান থামবার সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চিচরণের নাকডাকা সুরু
হ'ল। এমন সময় কুম্বমিরে রুটি নামল। টিমের চালে
বর্ষণের বড়ারের সঙ্গে পাঁজা দিতে লাগল সঞ্চিচরণের বাসিকা-
গর্জন। বাইরে এসে সুহাসিনী তার হাতধানা বের টেনে

তুলল। বিন্নজভাবে বলল—মেলা করেছ বাকি? গারে
যে জলের কাপুটা লাগবে, সে ছ'সু মেই?

নিজাতুর সঞ্চিচরণ টলতে টলতে ঘরে ঢুকল।

১৫

কালীবাড়ির সিং-দরবার পৌছেই মরোত্তম দেখল—
তাকে সাধর অভ্যর্থনা জানাবার জেতে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন
সেবারেত ও ম্যানেজার।

মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে সাঠাড়ে দা-কালীকে একটা
প্রণাম করে মরোত্তম গেল অম্বিদারের সঙ্গে দেখা করতে।

মাধু-সন্ন্যাসী বা বিশিষ্ট অভিধিদের আশ্রয়দানের জেতে
কালীবাড়ীর প্রাচীর বেইনীর মধ্যেই আছে একটি সুদৃশ্য ছোট
বাড়ী মন্দির থেকে কিছু দূরে একটা নির্জন পঞ্চদী-বনে।
বাড়ীটার সামনেই পদ্মপুকুর। তার কালো জল, পদ্মপাতা
আর পদ্মফুলে ঢাকা। চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। সৎকারের
অভাবে বহুদিন বাড়ীটা পড়ে ছিল—জললাকীর্ণ হয়ে
অব্যবহার্য অবস্থার। মরোত্তম দেখল—জমিদার দখল
নেওয়ার পরে সেখানে যেন গড়ে উঠেছে একটি ছোট মন্ডম-
কানন। মালী নিযুক্ত হয়েছে। সুবিশস্ত ফুলগাছের
কেয়ারীতে ফুটে উঠেছে নানাবিধ সুদৃশ্য ও সুগন্ধি ফুল।
ভাদের বর্ণ-সুসমার সজ রং-ধরানো বাড়ীটাকে আলোকিত
করেছে। পদ্মপুকুরের মাঝখানে এক ঝাঁক রক্তপদ্মের দিকে
চেরে চেরে মরোত্তমের মনে শৈশব-স্মৃতি জেগে উঠল। মাসের
পুখার জেতে কত দিন সে সাতার ফেটে রক্তপদ্ম তুলে এনেছে।
সেদিনকার মত আজও এক ছোড়া রাজহাঁস পদ্মফুলের কাঁকে
কাঁকে ঝাড় ছলিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। পুকুর-পাড়ে রক্তজবা
আর হলপদ্ম যেন ফুটে উঠার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। সত্যিই
ত জমিদারকে কালীবাড়ীতে ঢুকতে না দিয়ে মরোত্তম গুরুতর
অপরাধ করেছে। তার জেতেই এত দিন কালীবাড়ীর এই
দিকটা শুধন অন্ধকার হয়ে ছিল।

বাড়ীটার দোতলার একটা ঘরে ঢুকে মরোত্তম দেখল—
বিশুত ব্যাজ-চর্মের আসনে বসে আছেন অম্বিদারের তান্ত্রিক
গুরু। রক্তবস্ত্র পরিহিত ও জটাজুটধারী। একটু কাত হয়ে
একটা ব্যাজ-মুণ্ডের উপর তিনি দেহভার রেখেছেন। ব্যাজের
কজ্রি কাঁচের চোখ দুটোর চেয়েও তার চোখ দুটি যেন বেশী
জ্বলছে।

মরোত্তমকে দেখেই সোজা হয়ে উঠে বসলেন তিনি।
গভীর স্বরে বললেন—এস, এস, তোমার জেতেই অপেক্ষা
করছি।

জমিদার বসে আছেন তার গুরুদেবের পায়ে কাছ।
মরোত্তম দূর থেকেই হুকমকে দণ্ডবৎ করল। গুরুজী হাত
তুলে আশীর্বাদ করলেন। পূর্বের কখনও এই তান্ত্রিক সাধুকে

নরোত্তম দেখে মি। কিন্তু সাধুজী এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে নরোত্তমের পারিবারিক কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, ভাঙে মনে হ'ল যেম মোড়লরা তাঁর পূর্বপরিচিত।

গুরুজী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি একটু বস নরোত্তম, আমরা আসছি...বলেই কুমারবাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হুই দেয়ালের কাঁচের দীপদানিতে ছোটো ঘোমবাতি জ্বলছিল। হঠাৎ সে দেখল—বাতি ছোটো মিশেষে পুড়ে নিবে আসছে। এঘনি ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু কই, গুরুজী শু কিয়ে এলেন না?

ঘরের সামনে একটা বুল-বারান্দা। বারান্দার দিকে আছে একটা জানালা ও একটা দরজা। সেই দরজাই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার একমাত্র পথ। দরজাটার কাছে গিয়ে নরোত্তম দেখল—বাইরের দিক থেকে তালা বন্ধ। তা হলে কি সে এই ঘরে বন্দী? কি আশ্চর্য!

বাতি নিবে গেল। ঘরে দুটুদুটে অন্ধকার। নিকটে বা দূরে জন-মানবের সাক্ষাৎক নেই। এ ভাবে তাকে একটা নির্জন ঘরে বন্দী রাখবার তাৎপর্য নরোত্তম ঠিক বুঝতে পারল না। ভাবিত সাধুর উদ্দেশ্য কি?

হঠাৎ নরোত্তম দেখল, বাইরের বারান্দায় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন সাধুজী। অন্ধকারে অতি অস্পষ্ট তাঁর চোখ মুখ। গভীর সুরে বললেন তিনি—নরোত্তম! আজ অমাবস্তার রাত তা বোধ হয় জাম?

নরোত্তম কোন জবাব দিল না। একটু এগিয়ে এসে দেখল—গুরুজীর পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে কাঁপছে নন্দরাণী।

সাধুজী বললেন—মহাপুত্র! অঙ্গে আজই শেষরাত্রে, তোমাকে আর এই নন্দরাণীকে বলি দেওয়া হবে। মা তোমাদের রক্ত চেয়েছেন।

উজ্জ্বল ভাবে নরোত্তম বলল—মা যদি আমার রক্ত চেয়ে থাকেন, আমি নিজেই দেব। আপনারা কেন হত্যা করবেন আমাকে? এ যতব্য কেন?

—তুমি নিজেই রক্ত দেবে?

—হ্যাঁ দেব...

—প্রাণের মমতা নেই তোমার?

—না।

—তবেই নন্দরাণী? নরোত্তম নিজেই মরতে পারে।

তুমি শু পার না?

—মা মা, আমাকে বলি দেবেন না—। আমার বড্ড ভয় করে। নন্দরাণী ডুকরে কেঁদে উঠল।

—বেশ, তা হলে আমাদের সঙ্গে মহাশয়ানে চল...

নন্দরাণীকে টেনে নিয়ে সাধুজী অদৃশ্য হলেন। নরোত্তম বহুকণ জানালার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল।

অমাবস্তার রাত্রি। স্মৃতিভেদ অন্ধকার। দূরে বা নিকটে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নরোত্তম নিজের শরীরটাকে পর্যাক্ষ দেখতে পাচ্ছে না। সত্যিই কি তাকে মরতে হবে? এই অন্ধকারেই কি সে নিজেকে চিরতরে হারিয়ে ফেলবে? অন্ধকারের ভিতর দিয়েই ত আসে বিশ্বাস ও বিলুপ্তি। যত্নর অন্ধকারেই নিবে যায় জীবনের আলো।

মা, মা, মা! নরোত্তম ডেকে উঠল—সত্যিই কি তুমি আমার রক্ত চাও? যে মা বুকের রক্ত দিয়ে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখে—সে কি তার রক্ত চাইতে পারে? মিছে কথা। ও কে? ও কে? নরোত্তমের মনে হ'ল, চক্ষুকলা এসে দাঁড়িয়েছে জানালার ধারে। সে যেম হাতছানি দিয়ে নরোত্তমকে ডাকছে আর কেঁদে কেঁদে বলছে—ওগো! চলে এসো, চলে এসো আমার কাছে। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারছি নে। কত ভালবাসতাম তোমাকে—তা কি জান না? আমি মরেছি, কিন্তু আমার ভালবাসা তো মরে নি? তাই তো আমার অন্ধ ভালবাসা এই অমাবস্তার অন্ধকারে তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে...

অন্ধকারে চক্ষুকলার ওই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি কি নরোত্তমের দুর্বল-মানসের কল্পনামাত্র? নরোত্তমের মাথার ভিতর সবই যেম ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে—কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে।

—মা মা, চক্ষুকলা! এভাবে মরতে পারব না আমি। এ বেজমিদারের হীন যত্নবজ্র! মা আমার রক্ত চাইতে পারেন না। আমাকে বাঁচতেই হবে। নরোত্তম জানালা-দরজাগুলি পরীক্ষা করতে লাগল।

বহুকালের পুরানো বাড়ী। নরোত্তমের মনে হ'ল, রং লাগিয়ে নৃত্য করলেও কাঠের সঙ্গে চুপ-শুপকির বাঁধ নিশ্চয়ই তত শক্ত নেই। বারান্দার দিককার জানালাটাকে সে অনেক টানাটানি করল। সেটা একটুও নড়ল না। রোজ-রুটির আড়ালে ছিল বলেই তার শক্তি এখনও হ্রাস পায় মি। বাইরের দিককার একটা ছোট জানালাকে একটু ঝাঁকানি দিতেই নড়ে উঠল। নরোত্তমের দেহে অস্ত্রের শক্তি। দেয়ালে পা বাধিয়ে শিক ঘরে ঝাঁকানি দিতে দিতে জানালাটাকে সে ধুলেই ফেলল। কিন্তু নীচে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। লাক্ষিয়ে পড়লে কোথায় গিয়ে পড়বে তাও ঠিক ঠাণ্ড করতে পারছে না।

খোলা কাঁক দিয়ে গলাটা বের করে নরোত্তম চারদিক দেখছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা লম্বা লম্বির আগা এসে লাগল তার মাথায়। চমকে উঠে বপুকের আগাটা ঘরে টেনে তুলল লম্বিটাকে। খুব লম্বা লম্বি। কে তাকে এ লম্বিটা পৌছে দিচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারল না।

নরোত্তম বলল—নীচে যে থাক সরে বাও, আমি এই

লগি নিয়ে লাকিরে পড়ছি। কোথায় পড়ছি জানি না...

লগির পোড়োটা মাটিতে গিয়ে ঠেকল। আগার নরোত্তম। তার দেহতার অনেকখানি লুপ্ত হয়ে গেল। যেখানে গিয়ে সে পড়ল—সেখানে ছিল কতকগুলো রক্তদীপকা গাছ। তারা মলিত ও মলিত হয়ে গেল। এদিক-ওদিক চেয়ে নরোত্তম দেখল—দূরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখল—কালীবাড়ীতে যে পাগলাটা পড়ে থাকে—সে। লগি ভুলে ধরবার খেয়ালটা তার মনে কে জানিয়ে দিয়েছে? কি আশ্চর্য ঘটনা!

নরোত্তম কাছে যেতেই সে থিলথিল করে হাসতে লাগল। নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল—কে ভোকে বলেছে এই লগিটা আমার কাছে পৌঁছে দিতে?

—ভোর মা বলেছে। ভোর বাবা বলেছে। অশ্রাব্য গালিগালাজ দিতে দিতে পাগলাটা চলে গেল।

কালীবাড়ীর পেটা খড়িতে বারোটা বাজল। যে লোক খড়ি পেটাচ্ছিল, সে একটা পশ্চিমা দারোয়ান। নরোত্তম তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—জমিদার-সাহু কোথায়?

—সাবুলোক তো সব চোলে গেল...

—কোথায় গেল তাই শু জিজ্ঞেস করছি...

—সে হামি জানে না।

—সেবারেই কোথায়? তাঁকে একটু ডেকে আন। বলবে—নরোত্তম মোড়ল ডাকছে—

ধবর-পেরেই সেবারেই মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। বিন্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি করে বেরিয়ে এলে নরোত্তম?

নরোত্তম বলল, সেকথা পরে বলছি। আগে জানতে চাই—আমাকে এভাবে বন্দী রাখার মানে কি? সাধু-জমিদার আর তাঁর গুরুজী কোথায়?

—এই একটু আগে নৌকো ভাসিয়েছেন। রাতারাতি কোথায় কোন এক মহান্নাশনে গিয়ে পৌঁছবেন। একটু বেয়ে সেবারেই বললেন, তোমার সবচেয়ে আমাকে বলে গেছেন—কাল সকালে তোলা ধুলভে...

কেমন বলুন ত?

—তা আমি জানি না। আমি খুব প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলাম ওভাবে নরোত্তমকে বন্দী রাখতে পারবেন না। সে বেরিয়ে পড়বেই। গুরুজী বললেন—যদি বেরিয়েই পড়ে থাকে বলা—আজ রাতে সে যেন উপবাসী থাকে। আর, মায়ের প্রসাদ মুখে না দিয়ে কালও যেন অন্নভক্ষণ না করে।

—এ আদেশের মানে?

—তা জানি না। তবে বলেছেন—এ আদেশ অমান্য করলে তোমার মুখ দিয়ে নাকি রক্ত উঠবে...

নরোত্তম বিন্মিতভাবে চেয়ে রইল সেবারেইয়ের মুখের দিকে। অল্পটু স্বরে বলল—ব্যবসেই পারছি না এ অদ্ভুত সাহুটির উদ্দেশ্য কি?

—‘উদ্দেশ্য যাই হোক’, সেবারেই বললেন, ‘তিনি যে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উজ্জ্বল কুমারবাহাদুরকে যেভাবে পোষা প্রাণীটির মত সড়ে নিয়ে চলে গেলেন, তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

—কোথায় গেলেন? কেন গেলেন? কবে ফিরবেন? তা ত আপনি বলতে পারেন না?

—না।

—আশ্চর্য!

মাথাটা চেপে ধরে নরোত্তম বহুক্ষণ বসে রইল মন্দিরের সিঁড়ির উপর।

ক্রমশঃ

হুপুর বিকেল হয়

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

হুপুর বিকেল হয় : পাবীর পালক কাঁপে অরণ্যের মনে, নির্ঝন্ড হৃদয়ের অরণ্যের দীপ নিয়ে প্রাণের প্রাকণে অনেক প্রেমের মতো ক্রান্তিহীন কামনার তারাররা মুখ যত মুখি সব এসে আমার দেহের ঘূমে নীরবে মিশুক। নীরবে মিশুক সব ধন কালো অন্ধকার : চোখের ভিমির ধন হোক কালো কালো আকাশের কোল ছুড়ে এই পৃথিবীর। সেই সব কালো রাত ব্যাকুলিত কামনার সক্রণ হয়ে বলবে কত-না কথা অরণ্যের হলোহলো মনের হুপুরে।

তাই তো তোমার এই হুপুরের বিকেলের দীপ-কাঁপা মেঘ নিঃশেষে শেষ করে আমার প্রাণের থেকে বৃকের আবেগ। ঝিঝিরে বাতাসের ধরে ধরে ধরে কত রাতের সুবাস, যে সুবাস দিয়ে সব চ'লে গেছে সজ্জার সূর্যের হাঁস। রঙ-মেখে সূর্যের সে রঙীন অকাশের ঝিঝি-ঝিঝি রেশ তাই তো কেবলি আনে মনে মনে কামনার নিবিড় আবেশ।

গান

(ভীমপল্লী—তেতালা)

গলার এ হার রাখিব না,
আজো প্রভু মোর ভবনে এল না।
যার লাগিয়ে মন বিচলিত হয়েছে,
কোন দেশে গিয়ে বিস্মিয়া রয়েছে,
যাও যাও অতুস্কান কর তার
যদি পাও জনাবে বেদনা॥*

রচনা—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩	সাঁ	না	রঁসাঁ	সাঁ	১	না	সর্গনা	পা	১	মজ্জা	মজ্জা	মা	১	না	পা	সাঁ	১	সাঁ	১	রঁসাঁ	সাঁ	১
{	গ	না	রঁ	০	০	এ	হাঁ	০	০	-	রা	০	ধি	০	না	-	আ	-	জো	০		
০	না	প্র	না	পা	১	মা	জ্জা	মা	পা	১	মা	জ্জা	রা	সা	II							
	প্র	ভু	-	মো		র	ভ	ব	নে		এ	ল	না	০								
০	না	না	পা	পা	১	পা	মা	জ্জা	মা	১	পা	না	না	না	না	১	সাঁ	সাঁ	সাঁ	না	না	
	যা	-	র	না		গি	য়ে	ম	ন		বি	চ	লি	ত	হ	য়ে	ছে	-	কো	০	ন	

* এই গানটি সদারঙ্গকৃত “পরবা হরবা জবোঙ্গী মৈ” এই গজল গানটির অনুরূপে রচিত।

তান :—

৫। ^১গসা জুমা পনা সর্গী | ^২সর্গা ধপা মজ্জা রসা II

আঁ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৬। ^১রর্গা সর্গা ধপা মপা | ^২গর্গা পমা জুমা সা II

আঁ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

৭। ^৩গসা জুমা পজা মপা | ^০জুমা পনা মজ্জা রসা | ^১জুমা সর্গা জর্গী | ^২সর্গা ধপা মজ্জা রসা II

আঁ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

অন্তরায় তান :

৮। ^০মপা জুমা পা সর্গী | ^১না না না না | ^২গর্গা যী জর্গী রর্গী | ^৩গর্গা সর্গা ধপা II

আঁ০ ০০ ০ ০ - - - - ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০

বীতি :—

৯। ^১গসা জুমা পপা গা | ^২পঃজুমা মঃ পনা সর্গী | ^৩সর্গা ধপা মজ্জা মপা | ^০মজ্জা রসা সর্গী |

গলা র এ হার রা বি ব না আঁ০ জো০ এঁভু মোর ভব নেএ না০ গলা র

^১গধাণঃ পা জুা মঃ | ^২গপা সর্গী সর্গা সর্গী | ^৩গধাণঃ পা জুা মঃ | ^০গপা সর্গা সর্গী |

এ০ হা র রা বি ব০ না গলা র এ০ হা ব০ না গলা র

^১গধাণঃ পা জুা মঃ | ^২গা পা সর্গী না II

এ০ হা র রা বি ব ০ না -

নন্দ প্রব্রাজন

শ্রীমনীগোপাল চক্রবর্তী

কপিলবাস্ত। রাজপ্রাসাদের ইন্দ্রপুরীগৃহ সপ্তভল কক্ষে যৌবন-
উৎসবে মত্ত রাজপুত্র নন্দ ও তদীয় পত্নী সুন্দরী ভদ্রা। পত্নীগত-
প্রাণ রাজকুমার নন্দের রমণীগণমুকুটমণি ভদ্রা। জগতের সমস্ত
সৌন্দর্যের সমাবেশে বুঝি তাঁকে গড়েছিলেন বিধাতাপুরুষ।
নন্দপ্রিয়র ভিন্নটি নাম ছিল। রূপ ও সৌন্দর্যের জুড়ে তাঁকে
সবাই সুন্দরী বলে ডাকত। উজ্জ্বল ও গরুর ছিল বলে পৌরজন
তার নাম রেখেছিল মালিনী। আর দীপ্তি ও স্থানের জুড়ে
তার নাম ছিল ভাদ্রিনী। ভদ্রার ক্ষণিক অদর্শনে শাক্যপুত্র
নন্দ জগৎ-সংসার অন্ধকার বলে মনে করেন। মোহময়
প্রমোদমদিরা পানে মদ্য প্রণয়ীযুগল। তাবাহুরক্ত কিম্বর-
কিম্বরীর ছায় উভয়ে সৌন্দর্যে যেন পরস্পরকে ভিন্নত্ব করে
রাজপ্রাসাদের শোভা বর্ধন করছেন। প্রতিদিন নন্দ প্রিয়তমা
দয়িতাকে মানা বসন-ভূষণে সাজাতেন। সাজিয়ে তার আশা
মিটত না। অপলক দৃষ্টিতে তিনি পুষ্পিত-যৌবনা প্রিয়র
অরবিন্দসহ যুথের পানে চেয়ে থাকতেন।

চৈত্র মাসের প্রভাতবেলা। দূরে শৈলরাজির তুষারমুকুট
অর্ধাশ্রমেবর তরুণ রশ্মিপাতে বলয়ল করছে। বলভীপুটস্থ
পারাবতের দল সামনে ডেকে চলেছে। জাতিপুঙ্গ-সুগন্ধি
ভেসে আসছে চৈতানী পবনে।

প্রমোদ-কক্ষ। সপ্রেম কটাক্ষ দরিতের যুথের উপর
নিক্ষেপ করে সুভগা ভদ্রা বললেন, দেখ, চন্দ্রমাদি দ্বিধে
আমার বদন চিত্রিত করব। চিত্রকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত
এই আরাধনা আমার সামনে ধরে থাক।

যথা আজ্ঞা, দেবি! বলে নন্দ আদেশ পালনে রত হলেন।

নভজ ভদ্রার আয়তলোচন দুটি কোঁতুকে প্রোজ্জ্বল হয়ে
উঠে। তার বিশ্বদৃশ অধরে চাপল্যের আভাস খেসে গেল।
তর্জনী হেলিয়ে শাসনের সুরে নন্দকে বলে, উঁহ, ঠিক হচ্ছে
না। এই এমনি ভাবে ধরে থাক।

অপাঙ্গে দরিতের শ্রুত নিরীকণ কর্তে কর্তে সুন্দরী
নিজের যুখে অহরূপ শ্রুত চিত্রিত করছেন। মুচকি হেসে
নন্দ নিখাসবাস্য দ্বারা দর্পণধানি দোষযুক্ত করলেন।

‘বটে। দেখাচ্ছি তোমার’—বলে যৌবনমদে মত্তা সুন্দরী
ভদ্রা নন্দের সুস্বকৃৎসদৃশ অংগে কর্ণোৎপল নিক্ষেপ করলেন।
পরক্ষণেই হাতে বিগলিত হয়ে সুন্দরী স্বীয় যুগলোপম ভূজ-
বল্লরী দ্বারা নন্দকে জড়িয়ে ধরে নিজেই এলিয়ে গেলেন।
স্বামী উমত্ত বক্ষপুটে।

অন্তঃপুর মদমুকুটিভাঙ্গী ভদ্রা হস্ত দ্বারা আপনার রক্ত-
কমল গুণ্ডালে বিশেষক রচনা করলেন। চকল কুণ্ডলের

সংস্পর্শে বিশেষকের প্রান্তদেশ জুগু হতে লাগল। কারও-
ক্লিষ্ট অরবিন্দের ছায় তার মুখশ্রী দর্শনে নন্দের চিত্ত-চাকলা
অধিকতর বর্ধিত হ’ল।

প্রাসাদের চারিদিকে কর্ণব্যস্ততা। গৃহস্বামীর প্রসাধন ও
কীড়াহরূপ জব্যাসস্তার সংগ্রহের জুড়ে যুবতী দাসীরা ব্যতি-
ব্যস্ত। কেউ খেত ও রক্তচন্দন ঘর্ষণ করছে; কেউ বস্ত্রাদি
গন্ধযুক্ত করছে; কেউ জাতিপুঙ্গের সুগন্ধি মালা রচনা করছে;
কেউ বা স্থানের আয়োজন করছে।

এদিকে ভিক্ষাকাল সমাপ্ত। আত্মাধীশ্বর ভগবান ভগাণ্ড
কপিলবাস্তর অধিবাসীদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরছেন।
অবশেষে ভিনি কনিষ্ঠ ভাতা নন্দের গৃহে ভিক্ষার জুড়ে উপনীত
হলেন।

ভগবান সুগণ্ডের উপস্থিতি কারও দৃষ্টিগোচর হ’ল না।
ভিক্ষা ব্যাক্য কিংবা আসন না পেয়ে ভিনি সেখান থেকে
প্রস্থান করলেন। নন্দের এক দাসী প্রাসাদের বাতায়ন-পথে
বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। সে মেঘযুক্ত উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট
সুগণ্ডকে নন্দের মহল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল। গৃহ-
স্বামীর অমঙ্গলানুভব তার অন্তর কেঁপে উঠল। অর্জনের
অর্চনা করতে গেলে না বলে সে নিজেই শতবার বিদ্যার
দিলে। কল্পিত পদে নন্দের প্রমোদকক্ষে উপনীত হয়ে ভগবান
ভগাণ্ডের আগমন এবং ভিক্ষা ও পাত-অর্ঘ্য না পেয়ে চলে
যাবার কথা নিবেদন করল।

আজ কত কথা মনে পড়ল নন্দের। কত যুগ পরে
ভগবান সুগণ্ড কপিলবাস্ততে ফিরে এসেছেন। সমস্ত নগরী
তার আগমনে আনন্দসাগরে নিমগ্ন। ভ্রমোবারাম বিহারে
অবস্থান করছেন ভিনি। মহাপ্রজ্ঞাপতি গোতমীর বড় স্নেহের
পাত্র ছিলেন সর্বার্থসিদ্ধ। মহামায়ার যুতায় পর ভিনিই
কোলে-পিঠে করে মাহুয করেছিলেন সিদ্ধার্থকে। প্রৌঢ়
বয়সে ভিনি নন্দকে অর্কে পেয়েছিলেন। সর্বার্থসিদ্ধ যেদিন
প্রিয়তমা পত্নী ও শিশু-সন্তানের মায়ী কাটিয়ে রাজধানী
ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, সেদিন কপিলবাস্তর অধিবাসিগণের
সঙ্গে বালক নন্দও কেঁদেছিলেন।

সর্বার্থসিদ্ধের গৃহভ্যাগের পর অনেক কাল গত হয়েছে।
ইতিমধ্যে নন্দ যৌবনে পদার্পণ করেছেন। পাছে কনিষ্ঠও
ছোঁঠের পদাঙ্ক অহুসরণ করে এই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন রমণী-
কুলপ্রধান জনপদকল্যাণী সুন্দরীর সঙ্গে নন্দের বিবাহ দিলেন।
নন্দ নবপরিণীতা বধুর সঙ্গে আমোদ-আজ্ঞাদে মত্ত হলেন।
এদিকে সর্বার্থসিদ্ধ শিবসহ অর্হস্ত লাভ করে জগতের কল্যাণে

বর্ষচক্র প্রবর্তন করলেন। ক্রমশঃ বর্ষচক্র এগিয়ে চলল।
দেখতে দেখতে কান্ধী গয়া গিরিজা পাটলিপুত্র প্রভৃতি জন-
পদের অধিবাসীদের মস্তক আনন্দিত হ'ল বুকের চরণতলে।
জনগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে :

যুদ্ধ শরণ গচ্ছামি

বর্ষ শরণ গচ্ছামি

সন্তান শরণ গচ্ছামি।

ভগবান ভাগবতের বর্ষবিজয়ের কথা কপিলবাস্তবে এসে
পৌছল। জ্যেষ্ঠের গৌরবে গৌরবান্বিত নন্দ। অবশেষে
সশিষ্য ভগবান জিন মহাবাহী প্রচার করবার জন্তে জন-
নগরীতে আগমন করেছেন। কপিলবাস্তুর জনগণ তাঁর চির-
মহুনিচ্ছন্দী মোক্ষোপদেশ গ্রহণ করে বসে আছে। কিন্তু হায়,
মোহের বশীভূত নন্দ প্রিয়র সঙ্গ প্রাসাদেই বিহার করতে
লাগলেন।

মহাপ্রাণ ভগবান সুগত নন্দের আলয়ে এসে ভিক্ষা না
পেরে ফিরে গেলেন, একথা শ্রবণ করে নন্দের সুপ্ত ভ্রাতৃপ্রেম
জ্বলে উঠল। তিনি স্নানস্থলে কৃতাঞ্জলিপুটে ভার্ধ্যাকে
বললেন, দেবি, আমি ভগবান জিনকে প্রণাম করতে যাব।
আমার কণিকের জন্তে বিদায় দাও।

কোন এক ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কার স্তম্ভী ভদ্রার বুক
হুত্ব হুত্ব করে কঁপে উঠল। আর্দ্রবিলেপনযুক্ত বাহুলভা
স্বারা প্রিয়ভ্রাতৃকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে বললেন, ভার্ধ্যা-
পুত্র, তুমি ভগবান সুগতকে দেখতে অভিলষ্য করছ। আমি
তোমার বর্ষগীতার কারণ হতে চাই নে। তুমি যাও; কিন্তু
বিশেষক ভক্ত হবার পূর্বেই ফিরে এস।

একথা শুনে নন্দ বিনীতভাবে বললেন, তাই হবে প্রিয়ভ্রাতৃ,
তাই হবে। ভগবান ভাগবতের বৈদী দূর গমনের পূর্বে
আমায় ছেড়ে দাও।

ভদ্রা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দয়িতকে বাহুপাশ থেকে
মুক্ত করলেন। তাঁর আয়তলোচন অশ্রুতে টলমল করছে।
বেচারী নন্দ। তাঁর মন চাইছে না প্রিয়ভ্রাতৃকে ছেড়ে যেতে।
ভকু যেতে হবে। তিনি বিলাস-বেশ ভ্যাগ করে ভংকাল-
যোগ্য বেশে সজ্জিত হলেন। অশ্রুযুগ্মী ভদ্রার দিকে পুনঃ-
পুনঃ দৃষ্টিপাত করতে করতে নন্দ বিলাসকক ভ্যাগ করলেন।
কামনারাগে রুদ্ধগতি ও বর্ষরাগে আকৃষ্ট হয়ে অভিকণ্ঠে চলতে
লাগলেন।

সূর্যের ডার দীপ্তিমান ভগবান জিন রাজপথ আলোকিত
করে ভ্রাতৃগোষ্ঠার বিহার পানে-মহর-গতিতে চলেছেন। দশ-
বলযুক্ত ত্রিভুজ রাজপথে অগণিত নরনারী কর্তৃক স্তুত হয়ে
অতিকণ্ঠে জনসমূহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। আনুমান্য
নন্দ জনতার ভিত্তেই মহামুনি বৃন্দদেবের নিকট যেতে না
পেরে দূর থেকে ঐই মহান দৃষ্ট দেখতে লাগলেন। ভ্রাতৃগণের

তাঁর সমস্ত অন্তর ভরে উঠল। 'হে শাক্যবংশাবতংস, কনিষ্ঠের
প্রণাম গ্রহণ করুন'—মনে মনে জ্যেষ্ঠের উদ্দেশে জদি-নৈবেদ্য
নিবেদন করেন তিনি। অন্তর্ধর্মী ভগবান সুগত গৃহাঙ্ক
নন্দকে আকর্ষণ করবার জন্তে জনাকীর্ণ রাজপথ পরিভ্রাণ
করে নির্জন পথে চললেন।

মধ্যাহ্নকাল। সূর্যদেব মধ্যাগনে প্রথর কিরণ বর্ষণ
করছেন। নন্দ অগ্রসর হয়ে গলগলীকৃতবাসে ভগবান
ভাগবতকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, ভগ্নে, দয়া
করে আপনি আমার আলয়ে অহুগ্রহ প্রদর্শন করতে গিয়ে-
ছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃগ্যবশতঃ অর্হতের অর্চনা করবার সৌভাগ্য
থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি। আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ
মার্জনা করুন, দেব। হে মহাভিক্ষু, দয়া করে আমার আলয়ে
চলুন।

ভগবান সুগত নন্দের মধ্য মোক্ষের বীজ মিহিত
দেখলেন। তাই স্নেহবশতঃ তাঁকে উদ্ধারে স্বত্বান্ব হ'লেন।

পদ্মলাশলোচন ভগবান বুদ্ধ তাঁর হস্তে স্বীয় কলহটি তুলে
দিলেন; ইদ্রিতে তাঁকে অগ্রসর করতে বলে ভ্রাতৃগোষ্ঠার
বিহারের দিকে অগ্রসর হলেন। নন্দ হুঃখিতচিত্তে মহামুনি
বুদ্ধের অহুগ্রহণ করলেন। ভার্ধ্যার চকলনরনশোভিত
বিশেষকমণ্ডিত আমন পুনঃ পুনঃ তাঁর মনে পড়তে লাগল।
বুদ্ধের অলক্ষ্যে তিনি দীর্ঘনিদ্রাস মোচন করলেন। বিভিন্ন
পথ অভিক্রম করে অবশেষে উভয়ে জামের আলয় বুদ্ধবিহারে
উপনীত হলেন।

সর্বভূতে দয়াবান্ ভগবান ভাগবত স্বীয় চক্রচিহ্নিত
করন্তল নন্দের মস্তকোপরি স্থাপন করে সন্মুখে বসলেন,
হে সৌম্য, জন্ম হলোই মরণ আছে। একথা জেনেও অসার
কামরূপে মগ্ন হয়ে শাস্ত্র আনন্দ ও মুক্তিলাভে বঞ্চিত হওয়া
কি বাহনীর? ভগ্নতে ভদ্রার ভূত্যা অশিব বস্ত্র আর বেই;
ব্যাধিই একমাত্র অনর্থের মূল। একমাত্র মৃত্যুতয়েই জীবকূল
ভীত সন্তত। ইন্দ্রিয়পরবশ অসংযমী ব্যক্তি অবিচারতিতে
আলস্ত হয়ে একে পরম স্রব বলে মনে করে। কিন্তু মোহগ্রস্ত
সে জানে না যে, এটা হুঃখদায়ক। একমাত্র অধ্যাত্ম-সুখই
সত্য। ঠিক কিনা বল।

হ্যাঁ ভগ্নে, সত্যই তাই।

ভগ্ন বলে কিছু নেই। তা অলীক এবং হুঃখময়।
অতএব ক্লীবজ পরিহার করে কাম-মৃত্যু শিরোধের জন্তে যোগ
অবলম্বন কর। যোগবলে অন্তরে আত্মভেদ উদ্ভব হলে
ভবজ্ঞানলাভে সমর্থ হবে। যে আদিত্যের আজ তুমি হাবুডু
ধাচ্ছ তা প্রজ্ঞার আলোকে অতি তুচ্ছ বলে মনে হবে।
অতএব আলোয়ার পিছনে ছুটে নিজেদের নষ্ট করো না। আজ
তুমি নিজেকে বণুমান্য বলে গর্ব করছ। হুঃখিন বাদে দেখবে
তোমার এই স্তম্ভ-সুষ্ঠা দেহশানি জরাধীর্ণ হয়ে পড়ে।

যাতে পুনঃ পুনঃ ভয়গ্রহণ করে অর্ধরত্নরত্ন-বজ্রণা এবং রোগ-শোক আদি ভোগ করিতে না হয় সেরূপ ব্যবস্থা করা কি সমীচীন নয় ?

ভগ্নে, উচিত ।

বুদ্ধদেব নন্দের সম্মতিসূচক উত্তরে সুখী হলেন । তিনি ভিক্ষু আনন্দকে বললেন, আনন্দ, একে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।

মহাভিক্ষু যাতে অন্তরে কিছুমাত্র ক্লেশ না পান সেজন্মে নন্দ যুগন্তের উপদেশে এতদূর মৌখিক উৎসাহ দেখিয়েছেন । এক্ষণে জ্যেষ্ঠের নির্ধর্ম আদেশ শুনে তাঁর মাথার বেন আকাশ ভেঙে পড়ল । প্রিয়তার অশ্রুসজল মুখখানি তাঁর অন্তরাকাশে বিদ্যুৎচমকের ছায় বেলে গেল । কিন্তু তিনি ক্রিয় । বিনা বিচারে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালন করাই কাজবন্দ । তাই তিনি কোন উচ্চবাচ্য না করে অধোবদন হয়ে চূপ করে রইলেন ।

ভগবান ভগবন্ত সন্নেহে ডাকলেন, নন্দ, আমার কথার উত্তর দাও । প্রব্রজ্যা গ্রহণে কি তোমার মত নেই ?

জ্ঞান হাসি হেসে নন্দ বললেন, প্রভো, আপনি যা আদেশ করেন ।—যুখে তাঁর হস্তাশার ছাপ ।

তবে আজই মুণ্ডিত মস্তকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর । শুভ শুভ । অনর্থক কালক্ষেপে এ মাহেজযোগ নষ্ট করো না । যুখেই জীবনে একবারই আসে । অন্তঃকরণ, বৎস, প্রস্তুত হও । আসুন ।

আনন্দ অগ্রসর হলেন । পশ্চাতে নন্দ । কিয়ৎকাল গমন করে আনন্দকে বললেন, আমি গৃহে যাব, প্রব্রজ্যা গ্রহণ আমাধারা হবে না । এ মহান ব্রত গ্রহণের আমি সম্পূর্ণ অসু-পযুক্ত । আমার মার্জনা করবেন ।

স্ববির আনন্দ বুদ্ধের ত্রীপাদপদে সমুদর বৃত্তান্ত বিবেচন করলেন । স্থিতপ্রজ্ঞ ভগবান জিনের ললাটি কুণ্ঠিত হ'ল । বললেন, আনন্দ, তুমি নন্দকে গিয়ে বল, আমি তাকে ডাকছি ।

ভগবান, আপনার যেরূপ আদেশ ।

আনুমান নন্দ অগ্রজের আদেশ শুনে মহা মুশকিলে পড়লেন । আজ্ঞাসুবর্তিতা শাক্যবংশের প্রধান বন্দ । কিন্তু—রাজকুমার নন্দ অবনত মস্তকে অগ্রজের সম্মুখে এসে উপনীত হলেন ।

করুণার মূর্ত্যপ্রতীক ভগবান ভগবন্ত কনিষ্ঠের মুখের দিকে চেয়ে সন্নেহে বললেন, নন্দ, যা শুনেছি তা কি সত্য ।

হ্যাঁ ভগ্নে ।

পরমকারণিক বিনায়ক অগ্রজের সত্যবানিত্যের সন্তুষ্ট হলেন । কিন্তু কনিষ্ঠের মধ্যে কামনা-রাগের প্রাণভ দেখতে পেয়ে ব্যথা অসুতব করলেন ।

শোন নন্দ, আমি তোমার অগ্রজ । অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও সবকিছু পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি । আমার উপদেশে আত্মীয়গণের মধ্যে অনেকেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ

করেছে । গৃহিণী সংস্রমী হয়েছে । অথচ এ সব দেবেও তোমার জ্ঞানের উদ্রেক হচ্ছে না । এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় । জগৎ নশ্বর । এখানে অমৃত্যুর কিছুই নাই । দারাপুত্র-পরিজন সবকিছুই ঐচ্ছিকালিক মায় । অমিত্য প্রিয় বস্তুর প্রতি অমৃত্যুর ত্যাগ কর । শ্রেয়সাভে যত্নবান হও ।

অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান নন্দ । জ্যেষ্ঠের উপদেশ শ্রবণ করে বিনীত বচনে বললেন, ভগ্নে, আপনি যেরূপ বলেন আমি তাই করব ।

স্ববির আনন্দ নন্দে মথ্যে শুভ বুদ্ধির উদ্রেক দেখে তাঁকে পরম স্নেহভরে আলিঙ্গন করলেন ।

আনন্দ তাঁর চাঁচর চিত্তের মুগ্ধন করলেন । অন্তঃপর প্রব্রজ্যার আত্মনিক ক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল । কাষার বজ্র পরিহিত নন্দ কৃষ্ণপঙ্কজের অবসানে নবোদিত চন্দের ছায় শোভা পেতে লাগলেন ।

“বিশেষক শুভ হবার পূর্বেই আসব” বলে সেই যে প্রিয় চলে গেছে এখনও এল না । করতলে আনন ভণ্ড করে হৃদয়ী ভদ্রা ভাবছেন । তাঁর মুখখানি বর্ষাঙ্গলক্রিয় পদের ছায় শোভা পাচ্ছে । প্রিয়বিশ্রুতা হৃদয়ী বৈবর্ধ্য ও হীরকখচিত বিচিত্র কোমল আবরণযুক্ত পালকে বীর দেহতার এলিয়ে দিলেন । কিন্তু ঘোটেই স্বস্তি পেলেন না । মুগ্ধকেন্দ্রিত শয্যা কণ্টকের ছায় মনে হ'ল । শয্যাত্যাগ করে ভূমিশয়া গ্রহণ করলেন । কক্ষতল আগুনের ছায় ভণ্ড বলে মনে হ'ল ।

ভূমিশয়া পরিত্যাগ করে কক্ষের বহির্দেশে গমন করলেন । কবরী এলিয়ে পড়েছে ; পরিধান-বজ্র বিপর্যস্ত । চক্ষুর আরক্ত । মুহূর্ষ দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করছেন । প্রাসাদ-অলিন্দে দেহতার ভণ্ড করে নত হয়ে রাজপথের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন । কিন্তু হার, দম্বিতের আগমনের কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না । ব্যর্থ প্রতীকার কিছুকাল তদবস্থার থেকে নন্দ-হৃদয়রঙ্গিণী ভদ্রা শ্রান্ত দেহতার আর বইতে পারলেন না । দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে অশ্রুসিক্ত বিবর্ণ মুখে পুনরায় প্রমোদককে প্রবেশ করলেন । স্বামীর আনন্দ-বর্জনের নিমিত্ত তিনি নানাবিধ কাকুতর্ক্যখচিত অলঙ্কার পরিধান করেছিলেন । বীর গাজ থেকে অলঙ্কাররাশি একে একে উন্মোচন করে কক্ষের চারদিকে ছড়িয়ে ফেললেন । সেগুলোর আর প্রয়োজন কি ?

আমার দম্বিত স্বহস্তে ধারণ করেছিলেন—একথা স্মরণ করে হৃদয়ী ভদ্রা দর্পণখানি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করে তাতে গণ্ডস্থল সজোরে ঘর্ষণ করতে লাগলেন । স্বামীর ব্যবহৃত বিলাস-দ্রব্যাদি দর্শনে তার শোকাবেগ আরও বর্ধিত হ'ল ।

‘দম্বিতপ্রতিজ্ঞ আজ কেন মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হলে ? আর্ধ্যপুত্র, তুমি এত পাষণ্ড হলে কিরূপে ? ওগো পাষণ্ড দেবতা, কিরে এস ।

স্বামী সন্তান্য নামা বিপদের আশঙ্কা করে স্তম্ভরী ভদ্র।
কাদতে লাগলেন। পারাবতের ক্রন্দন-শব্দে কোথায়
ছুবে গেল।

প্রাসাদের প্রহরিনী ও দাসীগণ গৃহস্থামিনীর ক্রন্দন-শব্দে
সত্যিক্ত এবং ভীত হয়ে পড়ল। তারা দ্রুতগদে গিয়ে ভয়ে
ঘরদেখে উপনীত হ'ল।

শাক্যানী ভদ্রা কখন যোদন করছেন, কখন-বা ছ'হাতে চুল
ছিঁকছেন, আবার কখনও বা ছ'হাতে বুকে আঘাত হানছেন।
অঙ্গে পদ্মরাগ বসনধামি বিস্তৃত। রত্নমী-বিহারের জন্তে রচিত
জ্যোতিপুষ্পের স্তম্ভজি মালা রোষে বিকৃত করে দূরে নিক্ষেপ
করলেন। শেষ পর্যন্ত ভদ্রা পাগল হয়ে গেল নাকি।

দাসীগণের মধ্যে একজন স্তম্ভরী ভদ্রার অক্রমোচন করে
সান্ত্বনার সুরে নানারূপ উপদেশ দিতে লাগল। দেবি, শোক
করা তোমার শোভা পায় না। বৈধ্য ধারণ কর।

আচ্ছা, তিনি নাকি প্ররজিত হয়েছেন। এ সংবাদ কি
সত্যি?

হাঁ দেবি, সত্যি। তবে এর জন্তে শোক প্রকাশ করা
সঙ্গত নয়; কারণ তপোবলই ইক্ষাকু-বংশীয়দের একমাত্র
কাম্য। তুমি রাজর্ষি-বধূ। স্বামী সন্তের শরণ নিষেহেন,
এতে তোমার আনন্দ করা উচিত। যদি অপর কোন রমণীর
প্রেমে তিনি আসক্ত হতেন তবে সে ছিল আলাদা কথা।

প্রিয়সুখভাগিনী স্তম্ভরী কোনক্রমেই বৈধ্য ধারণ করতে
পারলেন না। তাঁর শোক আরও বর্ধিত হ'ল। তিনি
অবিরলবারায় অক্রমোচন করতে লাগলেন। দাসীগণ
গৃহস্থামিনীর স্তম্ভজি রত হ'ল। কেউ ব্যজন করতে লাগল,
কেউ বা ভদ্রার থেকে স্তম্ভজি তুল চোখে মুখে দিতে লাগল।
এমনিধারা বিবিধ প্রকারে ভদ্রার পরিচর্যা চলল।

প্রাপ্তক বটনার পর একটি বছর অতীত হয়েছে। পুনরায়
মধুসূদনের আগমনে বনজী ফুটে উঠেছে। নাগকেশর কিংবদন্ত
বকুল চম্পক ও শিরীষ ফুলের অপক্কণ সমাবেশ। ময়ূরের
কেকাধনি, কোকিলের কুহবর ও মধুপানমত্ত ভ্রমরের গুঞ্জন-
শব্দে কাননভূমি সুধরিত। আত্র-মুকুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে
সর্বত্র।

শ্রুতবনবিহারের এক নিভৃত প্রদেশে রাজকুমার নন্দ
ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করে অবস্থান করছেন। কিন্তু অষ্টাদ-
মার্গের অস্থলীন যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে না। আজও
নন্দের বিরহী মন কপিলবাস্তুর প্রতিটি বস্তুর স্মৃতিতে তার-
জ্ঞাত। ভিক্ষুচিহ্ন ধারণ করেও নন্দ তার কিছুমাত্র মর্যাদা
দিতে পারেননি। বসন্তকালীন পুষ্পশোভা তাঁকে বিভ্রান্ত
করে তুলেছে। কোনও একটি চতুর্ভুজ কুসুমিত মাধবীলতা
ছড়িয়ে আছে। নন্দের মনে পড়ে—এমনি করে প্রিয়া তাঁকে
আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করত। নন্দ কিছুতেই স্তম্ভরী ভদ্রার

চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারছেন না। প্রিয়ার অভিশ্রিয়
প্রিয়চুলতা দেখে তাঁর সমস্ত হৃদয় মথিত করে দীর্ঘবাস বেরিয়ে
এল।

মাঃ—ভদ্রাকে ছেড়ে আর থাকা চলে না। প্রিয়াকে
ছেড়ে কিছুতেই তিনি বাঁচবেন না। বিনয় প্রতিপালন অষ্টাদ-
মার্গের অস্থলীন সব কিছুই অর্থহীন। আকাশে বাতাসে
সর্বত্র যেন তিনি প্রিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে পান—ওগো দয়িত,
ফিরে এস। বিশেষক ভক্ত হবার পূর্বকই ফিরে এস।

নন্দ চিত্তফলার পারদর্শী ছিলেন। প্রিয়ার বিরহ সহ
করতে না পেরে অবশেষে তিনি ভদ্রার একটি প্রতিমূর্তি
পাষণ্ডকলকে চিত্রিত করলেন। প্রিয়াকুল মূর্তিধামি ফুলের
যেণু দিয়ে অহ্নেপন করেন; বিবিধ পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত
করে আবেগভরে আলিঙ্গন করেন। মূর্তির প্রতি অগলক
দৃষ্টিতে ভাকিয়ে থাকেন; কখনও বা প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়ে চিত্র-
ধামি চুম্বন করেন।

এমনি ভাবে কত বিনীত রত্নমী ফাটে। কোথায় রইল
বিনয় প্রতিপালন, আর কোথায় গেল অষ্টাদমার্গের অস্থ-
লীন।

ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে তপশ্চর্য্যার রত ভিক্ষুগণ জানতে
পারলেন।

বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে অনেক উদ্ভ্রান্তচিত্ত নন্দকে
অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। জীবিত্যত মদাপবাদ
প্রভৃতির দোষ বর্ণনা করলেন। কিন্তু করলে কি হবে।
প্রিয়ার চিন্তায় নন্দের চিত্ত তরপুর। বিহ্বলতা হেতু তিনি
সকল উপদেশ শুনেও গেলেন না।

দিন যায়। দেখতে দেখতে তিন-চার মাস হয়ে গেল।
নন্দের উদ্ভ্রান্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধন-তপস্কার
পরিবর্তে প্রিয়াকে স্মরণ-মনন করে নন্দের দিন কাটে।

সেদিন ভগবান জিন ভিক্ষায় গমন করেছেন। বিরহী নন্দ
পাষণ্ডকলকে অকিত প্রিয়ার প্রতিমূর্তি আলিঙ্গন করে
স্বগতোক্তি করছেন—কল্যাণী, আমি যাব। তোমাকে
ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আমার কিছুমাত্র শান্তি নেই। অর্হতের
পরিত্রাণ ধারণ করে এরূপ আচরণ আমার শোভা পায় না।
মিথ্যা প্রতিজ্ঞ বলে আমার ভাবহ। কিন্তু আমার অবস্থাটা
একবার বিবেচনা করে দেখ, তা হলে বুঝতে পারবে কতটা
অবস্থাবৈধর্য্যে এত নির্ভর হতে হয়েছে আমাকে। ক্ষমা কর
দেবি, তুমিই আমার ইহকাল-পরকালের যথাসর্ব্বদ। প্রভু
ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। গুরুদেবের অস্থপস্থিতিতে বিহার ত্যাগ
করাই ভাল।

কিন্তু নন্দের আত্ম যাওয়া হ'ল না। ভিক্ষু আব্দুল এসে
জামালেন—প্রভু বুদ্ধ আপনাকে স্মরণ করেছেন।

ইতিমধ্যে নন্দের কীর্তি-কাহিনী ভগবান ভগবতের নিকট

পৌছেছে। জীর প্রতি অমুরাগী নন্দ। রূপযুক্ত সে। শুধু আদেশ-উপদেশে হবে না। নন্দের ভালবাসা কল্যাণী ভদ্রার দেহ-বসুনা কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। প্রেমাস্পদার প্রতি তার সফল প্রেমকে নিছক প্রেমে পরিণত করতে পারলেই নন্দ মুক্তির পথ—অমৃতের আবাদন লাভে সমর্থ হবে। তাই অমুরাগ দ্বারা অমুরাগ নষ্ট করতে ইচ্ছা করে ভগবান স্নগত নন্দকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শাখাপ্রশাখা-বিলম্বিত এক প্রকাণ্ড মাগকেশর বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ভগবান জিন। ব্যানগজীর তাঁর মুক্তি। পরম বিনামকর দেহনিঃসৃত জ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। তাঁকে ঘিরে রয়েছে শিষ্য-প্রশিষ্যরা। প্রাণাতিক অস্থানাদি সবে-মাত্র শেষ হয়েছে। এমন সময় দত্ত মন্তকে সলজ্জভাবে নন্দ সেখানে এসে উপনীত হলেন। ভগবান ভাগ্যভক্ত প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কনিষ্ঠের মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বৃদ্ধদেব স্নেহে ডাকলেন, নন্দ।

তত্তে, আদেশ করুন।

তোমার চিত্তবিকারের কারণ কি? ভূমি যা করছ তা ত্রিভুব পক্ষে অস্বাভাবিক অপরূপ। তোমার এরূপ আচরণে সত্যিই আমি মর্মান্বিত।

তত্তে, চিত্তবিনয়ের জন্তে; বাস্তবিকই আমি লজ্জিত; কিন্তু আমি উপায়হীন। আজও আপনার ভ্রাতৃবধু শাক্য-কুললক্ষ্মী ভদ্রার কথা ভুলতে পারছি না। আমার সমস্ত অন্তর্গত জুড়ে তিনি রয়েছেন। সাধন-তপস্কার আমি সম্পূর্ণ অপরূপ। পূজ্য-চিহ্ন ধারণ করে আজ আমি ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ সম্পদ হারাতে বসেছি। আপনি অমুমতি দিন, আমি গৃহে যাব।

ভগবান জিন অতিশয় সন্তোষে কনিষ্ঠের চিত্ত-বিভ্রমের কাহিনী শুনলেন। তিনি আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। পরম স্নেহভরে অমুরাগের হস্ত ধারণ করে বললেন, চল নন্দ, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

বিশ্ববিশ্বল চিত্তে নন্দ দেবলেন, তাঁরা উভয়ে আকাশ-পথে উৎসাহিত কোথায় ছুটে চলেছেন। দেখতে দেখতে পারের নীচে সমস্ত পৃথিবী মিলিয়ে গেল। উভয়ে ভদ্রাশাখা বনমূলত হারাচ্ছন সিং-চারণ-সেবিত হিমবানের কোনও এক প্রদেশে উপনীত হলেন। কোথাও ময়ূরগণ পুচ্ছ গুটিয়ে বিশ্রামার্থ উপভোগ করছে; কোথাও বা কিসরীগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। নন্দ মুগ্ধমেজে এসব দেখছেন। পরমবিশ্বাসে তাঁর বাক্যস্মৃতি হচ্ছে না। এই সময় রক্তমুখী একচক্ষুহীন একটি বাঘের দৃষ্টিপথে পড়িত হ'ল। ভগবান স্নগত কনিষ্ঠকে বললেন, আচ্ছা নন্দ, বল দেবি শাক্যকুলবধু এবং এই বানরীর মধ্যে কে অধিক সুন্দর।

নন্দ ঈষৎ হেসে বললেন, ভগবন্, আপনি কি যে বললেন। আপনার ভ্রাতৃবধু স্নন্দরী ভদ্রার সঙ্গে কোনক্রমেই এর তুলনা সম্ভবে না।

মনে মনে হেসে ভগবান ত্রিবৃত্ত নন্দকে সঙ্গে করে ইঞ্জের নন্দনকাননে উপস্থিত হলেন।

অপূর্ব দেশ। অপূর্ব তার পরিবেশ। অপূর্ব সদীভলহরী বাতাসে ভর করে তেজে আসছে। সে স্বর্গীয় সদীভ কর্ণে যেম সুধা ঢেলে দিচ্ছে। সমস্ত নন্দনকানন স্বপ্নময়।

এমন সময়ে চির-যৌবনা অপরূপ নীলিশোভিতা লাভময়ী দেবদানাগণ অদূরে আবির্ভূত হলেন। নন্দ বিশ্বমোহকুল-লোচনে সেদিকে চেয়ে রইলেন। কি অপূর্ব দেহতী! অপাদে সুভীক্ষু সায়ক।

অপ সরাগণের ভুবনমনোমোহিনী সৌন্দর্য দর্শনে নন্দের চিত্তচঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। অমুরাগে নন্দের দেহ রোমাঞ্চিত হচ্ছে। একান্ত প্রেমাস্পদা স্নন্দরী ভদ্রাকে তিনি বিশ্বস্ত হলেন। বিশ্বস্ত হলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে। কোথায় রইল আবারো জীভাত্মি কপিলবাস্ত। সবকিছু বিশ্বস্তির অন্তল সাগরে তলিয়ে গেল। তাঁর সমস্ত দেহমন একান্ত উত্তর হয়ে উঠল স্বর্গবিভাগরীদের ভোগ করবার জন্তে। তাঁকে বড়ই বিহ্বল দেখাতে লাগল।

সর্বজ্ঞ ভগবান জিন। মধুর স্বরে নন্দকে বললেন, ভাল নন্দ, এবার সত্য করে বল দেবি শাক্যকুলগর্ভে ভদ্রাদেবী অথবা এই সব দেবাদনা—এদের মধ্যে রূপে ও গুণে কে তোমার নিকট প্রেষ্ঠ?

অনন্তযৌবনা অপরূপের প্রতি ভ্রাতৃভ্রাতৃ নন্দের হৃদয় তখন অমুরাগে জর্জরিত। তিনি উত্তর দিলেন, তত্তে, এঁরা দিব্যাদনা, আর আপনার ভ্রাতৃবধু মানবী। এঁরা চিরজীবী, কিন্তু শাক্যানী ভদ্রা জরায়ুত্যাগ অধীন। কোন বিষয়েই এঁদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য নেই, তুলনা কিরূপে সম্ভবে।

তবু বল, তুনি।

ভগবন্, এঁদের তুলনায় জনপদকল্যাণী ভদ্রা ওই এক-চক্ষুহীন বানরীর চেয়ে। পূর্বে একমাত্র ভদ্রাদেবীকেই রমণীকুলপ্রধানা মনে করে গর্ভে অমৃতব করতাম। আজ আমার সে অহংকার চূর্ণ হয়েছে। দেখছি, এঁদের তুলনায় শাক্যানী কত ভূচ্ছ।

শোন নন্দ, একমাত্র তপোবল দ্বারা এঁদের লাভ করা যায়, অস্ত কিছুতেই নয়।

বদি অপরূপকে পেতে চাও, তবে অপ্রমত্ত হয়ে বিনয় পালন করে স্নিহভক্তচারী হও; দেখবে সমস্ত অপরা তোমার চিত্তবিনোদন করছে। এ বিষয়ে আমি অস্বীকার করছি। কেমন রাজী আছ?

নন্দ পদজ্ঞভাবে বললেন, তত্তে, তাই যদি হয়, আপনার

ত্ৰীপাদপদ্ম হুঁরে শপথ গ্রহণ করছি, আজ থেকেই আমি নিবিষ্টচিত্তে বিনয় প্রভৃতি পালন করব।

আবার জেতবন বিহার। এবার সাধন-ভগ্নতা মোক্ষলাভের জন্তে নয়, স্বর্গবিভাষরীণদের নিমিত্ত। অপ্সরাগণের চিত্তা এবং কঠোর তপস্চর্যা পালনে তাঁর দেহত্ৰী বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে শরীর ক্ষীণভাপ্রাপ্ত হ'ল।

প্রিয়ভার্য্য নন্দ। আজ কিম্বা ভাৰ্য্যাবিষয়ে তিনি বিগত-সুখ। আশ্চর্য্য মাহুষের মন! সমবয়সী তিস্কদের মধ্যে নানারূপ কল্পনা-কল্পনা হয়।

নন্দ যেখানে যোগাঙ্গনে নিম্নলিখিত নয়নে ব্যাময়গ্নয়নহেয়, সেখানে হবির আমন্দ বীর পদক্ষেপে উপনীত হলেন। কণকাল মন্দের ভগ্নতাক্রিষ্ট যুগের পানে চেয়ে রইলেন। আহা বেচারী নন্দ! হবির আনন্দ পরম স্নেহভরে ডাকলেন, আশুমান, একবার কৃপাচুষ্টি করুন।

নন্দ বীরে বীরে হবির আনন্দের প্রতি তাকালেন। দৃষ্টিতে পরম বিশ্বাস। স্নান পদ্মদৃশ্য বিরল বদন মন্দের।

আনন্দ বললেন, আশুমান, তখনতে পাচ্ছি আপনি অপ্সরা লাভের জন্তে বর্ষ আচরণ করছেন। এ কথা কি সত্যি কিংবা পরিহাস?

আনন্দের কথায় নন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে অধো-বদনে নীরব রইলেন। মন্দের মৌনতাব দেখে আমন্দ বুকতে পারলেন, তাঁর অসুখ্যাম মিথ্যা নয়। তখন তিনি বীরে বীরে বললেন, তজ্জ, আপনার এই ব্রতপালন বাহিক, আন্তরিক নয়। আপনার হৃদয় কামাগ্নিতে প্রদীপ্ত। কিন্তু বিন্মত হবেন না, কামের প্রাৰ্থনা হুঃখময়; হৃৎকর্ণের অবসানে মাহুষ আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। যদি প্রকৃত আনন্দ পেতে চান, তা হলে অধ্যাত্মবিষয়ে মন দিন।

আনন্দের প্রযুথং স্বর্গও পরিণামে হুঃখাবহ অতৃপ্তিদায়ক এবং কদম্বল জেমে প্রভ্রজিত নন্দ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি স্বর্গকে প্রব মনে করে অপ্সরালভের জন্তে ব্যাকুল হয়েছিলেন। এবার তিনি স্বর্গস্থলের আশার জলাঞ্জলি দিলেন, হবির আমন্দকে অশেষ বক্তব্য জ্ঞানালেন। অপ্সরাদর্শনে তিনি প্রিয়ভাৰ্য্য ভাৰ্য্য্য স্তম্ভরী তজ্জাকে বিন্মত হয়েছিলেন; এবার অপবর্গপ্রাপ্তির জন্তে ব্যাকুল হলেন।

হবির আমন্দকে বিদায় দিয়ে নন্দ ভগবান জিনের সকাশে উপনীত হলেন। ভগ্নগতকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে অমৃতভণ্ড হৃদয়ে করকোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভগবান ভগ্নগত প্রশান্ত চিত্তে তাঁর দিকে তাকালেন। দেখলেন, লজ্জাক্রণ মুখ নন্দের; নয়নদয় বাপ্পাকুল।

ব্যাপার কি, নন্দ?

ভক্তে, বড়ই অবশিষ্ট বোধ করছি। আত্মনিয়ম পালন ও ব্যাধি দ্বারা স্বর্গলাভ হলেও কালে কৰ্ম্মকর হলে শাকি

পৃথিবীতে আবার ফিরে আসতে হয়। এরূপ স্বর্গে আমার প্রয়োজন নেই। অপ্সরালভের জন্তে ভগ্নগত প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন, আর আপনার প্রতিভূ থাকবার দরকার নেই।

সাধু চক্ষুমান নন্দ, সাধু। বুঝলাম এতদিনে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। তোমার হৃদয়ে প্রেয়ের প্রতি প্রত্যাশা আছে। ভগ্নগত আর তোমায় আকর্ষণ করতে পারবে না। সজ্জের প্রধান অবলম্বন প্রকার প্রতি নিষ্ঠাবান হও। দেখবে মার ও তার বিকটাকার অমৃতচরণ তোমার জিসীমায় আসতে পারবে না। জরা-ভীতি এবং পাণিব প্রলোভনাদি আর তোমায় কিছুই করতে পারবে না।

ভক্তে, আপনার অমৃতশাসন যথামণ পালন করতে চেষ্টা করব। আমি আজ বৃত্ত।

ভগবান জিন অমৃতপ্রাপ্তির উপায়-রূপ আৰ্য্যগত্যা হুঁয়রূপে ব্যাখ্যা করে অমৃতকে পোনালেন। ত্রীযুগের উপদেশে নন্দ অমৃত-স্নাত হয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। অনন্তর তিনি গুরুদেবকে তজ্জিতাবে প্রণাম করে বললেন, ভক্তে, আশীর্বাদ করুন ঋদ্ধিলাভে যেম সমর্থ হই।

বৎস, তোমার মনের অভিসাষ পূর্ণ হোক।

আবার ভগ্নগত্যা। এবার সাধনা পূর্ব্বের চেয়ে কঠিন। বীরাসনে উপবিষ্ট নন্দ। কারগত স্তুতি এবং আত্মাতে সমস্ত ইঞ্জির নিরুদ্ধ করে যোগাত্যাগ করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে পাঁচ পাঁচটি বসন্ত তাঁর অত্যা সাধনাকে প্রণতি জানিয়ে গেল।

এক দিন রাজ্যশেষে চারদিক যেম এক স্বর্গীয় মুর্ছমায় জেগে উঠেছে। দিব্য গন্ধ ও পূণ্যবাসু প্রবাহিত হচ্ছে। অশেষ কুছুসাধনের পর নন্দ অর্হু লাভ করেছেন। তাই কি দেবহুস্তি-নিমিত্ত শোমা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে মবারুণছটার পূর্ব্বদিক সমুদ্রাসিত হয়ে উঠল। পূণ্যভূমি জেতবন বিহারে স্রুত হয় প্রাতিভিক অমৃতান। কাকলি-মুখরিত বনভূমি।

নবজীবনের প্রথম প্রভাত। অর্হুলাভের সংবাদ দিতে হবে ভগবান জিনকে। পুষ্প-প্রকীর্ণ বনপথ অতিক্রম করে নন্দ ছোষ্ঠের সকাশে উপনীত হলেন। ভগবান ভগ্নগত দেখলেন, প্রজ্ঞার আলোকে বলমল করছে কনিষ্ঠের আনন্দ-ধামি। পদপ্রান্তে আনমিত প্রিয় ভাতার মন্তকে বীর চক্র-লাহিত করপল্লব স্থাপন করে আশীর্বাদ করলেন।

বৃত্ত নন্দ, সাধনায় তোমার সিদ্ধিলাভে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। বহু দিনের আশা; তোমাকে সন্তোষে করকবাহী দেখব। তুমি আমার সে ইচ্ছা পূরণ করো।

গদগদচিত্তে স্থিরবুধি নন্দ কুতাজলিপুটে বললেন, ভক্তে, প্রাতিভাসিক জগতের বন্ধন থেকে আপনি আমার মুক্ত করেছেন। আর আমার ইঞ্জিরহৃদয়ের আকাজ্জা নেই;

আপনার করুণায় জীবন সংসারের মোহ থেকে মুক্ত হয়েছি।
পুনরায় আগনি অহুকের প্রণাম গ্রহণ করুম।

শোন নন্দ, আজ তুমি যে বোধি লাভ করেছ তা জগতের
কল্যাণে প্রচার কর। অমৃতের পুত্রেরা ভোগাসক্ত হয়ে
অনিবার পুণ্য রত, তাদের তুমি অমর জীবনের পথে পরি-
চালিত কর।

ভক্ত, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

আর একটি কথা। প্রবাসী সুন্দরী ভক্তকে সন্তর্পণে
দীক্ষিত করবে। তাঁর প্রতিও তোমার কর্তব্য রয়েছে।

যথা আজ্ঞা দেব।

কপিলবাসুর রাজপথ। সৌম্যদর্শন প্রশান্তচিত্ত নিরুদ্ভ-
কর্ণা কাষায়বস্ত্রপরিহিত মুণ্ডিতমস্তক নন্দ ভগবান বুদ্ধের
মহাবাহী প্রচার করে চলেছেন। অগণন জনতা। সবাই
বিমিতচিত্তে বলাবলি করছে, কি আশ্চর্য্য। মোহাসক্ত
প্রিয়ভার্য্য রাজপুত্র নন্দ কিনা আজ মোকের কথা বলছেন।

এমন সময়ে সমবেত নর-নারী সবিস্ময়ে দেখতে পেল,
আলুলাস্তিকুণ্ডলা স্তম্ভবসনা নিরাতরণা কীর্ণাঙ্গী প্রিয়মুখবকিতা
শাক্যকুলবধু সুন্দরী ভক্তা পাগলিনীর চার ছুটে আসছেন।
সবাই সমস্ত্রমে পথ ছেড়ে দিলে। ভক্তা প্রেরিতের সম্মুখে
এসেই তাঁর চরণপ্রান্তে যুঁজিঁতা হয়ে পড়লেন।

বহুকাল পরে নরমহচরীর দর্শনে অহর্ভের হৃদয় উদ্বেলিত
হয়ে উঠল কি। নন্দ শান্ত অথচ গাঢ়স্বরে ডাকলেন, কল্যাণী
ভক্তা, ওঠ।

দরিত্রের আস্থানে ভক্তা ধীরে ধীরে মুদিত নয়নপল্লব
উদ্বীলন করলেন। অক্ষুট স্বরে ডাকলেন, ভার্য্যাপুত্র।

দেবি।

অভাগিনী ভক্তার কথা কি এতদিনে মনে পড়ল। ওগো
পার্বণ-দেবতা, আর আমার পরিভ্যাগ করে যেও না।
প্রাসাদে ফিরে চল।

দেবি, নন্দর ভোগবিলাসের প্রতি অবধা আমার আকৃষ্ট
করতে চেষ্টা করো না। ত্রিরত্নের শরণ লও। দেববে অব্যাহতের
তুল্য প্রশান্ত ও অনবদ্য রতি আর নেই। শরীর অপবিত্র,
দুঃখজনক, অনিত্য এবং নিরাশ্রয়। যৌবন ক্রান্ত চলে যার,
ফিরে আসে না।

মানব-জীবনের ভয়াবহ পরিণতির কথা শুনে সুন্দরী ভক্তা
ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বললেন, স্বামিন্, আমার বলে দাত,
এখন আমার কর্তব্য কি।

কল্যাণী, ভগবান জিন কৃপা করে তোমার পথনির্দেশ করে
দিয়েছেন। আমার পথই তোমার পথ। সন্তর্পণে দীক্ষিত
হও। ভগবান ভগবন্ত-প্রবর্তিত বর্ষচক্রের সাহায্যে জীলোক-
দের মোক্ষসাধনায় অহুপ্রাণিত কর।

প্রভো, তোমার বর্ষই আমার বর্ষ। তুমি না বলবে
আমি তাই করব।

ভগবান ভগবন্ত তোমার মদন করুন। প্রভু বুদ্ধকে প্রণাম
করবে চল।

মুষ্টিমণ্ডী ভক্তির চার ভক্তা চক্ষুস্থান নন্দের অঙ্গুগমন
করলেন। সমবেত নর-নারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল :

বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি

বর্ষ শরণং গচ্ছামি

সজ্জ শরণং গচ্ছামি।*

* মহাকবি অববোধ প্রণীত 'সৌন্দর্য্যনন্দ' কাব্য অবলম্বনে।

কবি-প্রশান্তি

শ্রীগোপাললাল দে

'তোমারে খে জানি' একথা বলিব কেমন করে,
'জানি না তোমারে' হেম কথা বলা বিষয় দায়;
'তোমারে জানার সাধনা লয়েছি জীবন ভরে';
স্বর্গ-সুখ এত গৌরব সাড়ে না দায়।

জীবনে জেগেই হেরেছি রবিরে জ্যোতির্ময়,
কবির ভাষাই বাঙ্গালীর ভাষা ভারতী-ভাষা,
কায়মনোবাক্য সাধনা তোমার রূপ নিল জাতি-অভ্যুদয়,
গান্ধী সূতায় জগতের পুর তোমার আশা।

বসিষ্ঠ মেহে প্রবল কর্মে প্রচুর জ্ঞানে,
অবারিত কালে অ-বলয় দেশে মানব-প্রীতি;
আমরা দেশের ভাষা মানবের, ভারতের গৌরব সকল হানে
অসীমে সীমায় মিলায় দুয়ার তোমার গীতি।

মহাভারতের ঋষি-কবি-বানী দেশে কালে চলে নির্বিশেষ,
'আমার জীবনে লভিয়া জীবন, জানোরে সকল দেশ।'

এশিয়ার পুনর্গঠন : নূতন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি

শ্রীঅন্নাসাহেব সহস্রবুদ্ধে

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

৩

সঙ্গীত শিক্ষা-ব্যবস্থা

সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দৃষ্টি : জাপানের এই যে প্রগতি—
যতই যাহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার কৃতিত্ব
বহুলাংশে তৎকালীণ শিক্ষা-পদ্ধতির প্রাপ্য। জাপানী শিশু
মাতা সন্তানের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ
করিয়া থাকে এবং তজ্জন্ত তাহারাই অশেষ যত্নও করে।
এইজন্য তাহারাই ভ্যাগবীকারও করিয়া থাকে। বালক-
বালিকা উভয়ের পক্ষেই শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।
ময় বছর তাহাদের স্থলে ঘাইতেই হয়। এই ময় বৎসরের
মধ্যে প্রথম ময় বৎসরের শিক্ষাকে প্রাথমিক বলা হয়;
পরের তিন বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষা বলিয়া গণ্য। সাধারণতঃ
ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বালক-বালিকারা পাঠশালায় ভর্তি হয়
এবং বয়স পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত পড়িতেই
হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বে শিশুদের শিশুশিক্ষায়তনে দুই
বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু তাহা বাধ্যতামূলক নহে।
আর সকলের পক্ষে তাহা স্থলভও নহে। যে গ্রামেই ঘাইবেন,
দেবিতে পাইবেন যে প্রাথমিক পাঠশালার গৃহ অভি-
চয়কার। গ্রামের লোকেরা তাহাদের শিক্ষা-মিক্ষেতনকে
গ্রামের ভূমণ ও গৌরব মনে করিয়া থাকে। প্রাথমিক
পাঠশালা—অর্থাৎ প্রথম ময় বৎসর বালক-বালিকারা যে পাঠ-
শালায় যায় তাহা গ্রামের সংলগ্ন হওয়া চাই। পাঠশালায়
পৌছিতে বালক-বালিকাদের এক মাইলের অধিক ঘাইতে না
হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠশালা-গৃহ নির্মাণ করা হয়।
মাধ্যমিক স্কুল-গৃহ দুই-তিনটি গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে, স্থানীয়
প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুল-গৃহ কোন গ্রাম
হইতে দুই-আড়াই মাইলের অধিক দূরে নহে। স্কুল-গৃহগুলি
দেবিতে যেমন সুদৃশ্য, তেমনই তাহাতে হাওয়াও বেলে
পর্যাপ্ত। প্রত্যেক স্কুলে এক-একটি প্রশস্ত ফীড়া-প্রাঙ্গণ
আছে। অনেক ক্ষেত্রে স্কুলের ছোটখাটো বাগানও থাকে।
পাঠশালায় বিপ্রহরের আহ্বারের জন্য প্রশস্ত ভোজনাগারের
ব্যবস্থা আছে। পাঠশালায় অপর সমবেত কাজেও ঐ গৃহ
ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রামবাসীদের দায়িত্ব : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের গৃহ
গ্রামবাসীদের তৈরি করিয়া দিতে হয়। ইহা জাপানের প্রথা।
শিক্ষা-বিভাগ হইতে প্রতি বৎসর গ্রামবাসীদের নূতন স্কুল-গৃহ
নির্মাণের, অথবা পুরাতন গৃহের আরতনবুতির নির্দেশ দেওয়া

হয়। গ্রামবাসীদের বিবেচনার নিয়িত শিক্ষা-বিভাগ পরি-
কল্পমাণ পাঠাইয়া থাকে। পাঠশালা নিজ গ্রামের সম্পদ-
স্বরূপ—এই ধারণাবশতঃ অনেক স্থলে গ্রামবাসীরা সরকারী
নির্দেশ অপেক্ষা অধিক ব্যয়ে সুবৃহৎ মনোরম গৃহ নির্মাণ
করিয়া দেয়। তার জন্ত তাহারাই নিজেরা মজুরি করে, চাঁদা
দেয়। গাঁয়ের কাহারও নিজের বন থাকিলে স্কুল-গৃহের জন্ত কাঠ
ইত্যাদিও দিয়া থাকে। এক গাঁয়ে দেখিলাম সোরা লাখ টাকা
ব্যয়ে পাঠশালা নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি
পঞ্জীর সকল লোকে পাঠশালা পর্যন্ত এক মাইল দূর। রাস্তার
দুই দিকে মাটি ফেলার কাজ করিয়া সবটা মজুরি—সাড়ে চারি
হাজার টাকা স্কুল-ভবনবিলে দিয়া দিয়াছে। অপর এক পাড়ার
লোকেরা দুই রাক্সি জাল ফেলিয়া সমস্ত রোজগার—প্রায় কুড়ি
হাজার টাকা স্কুলকে দিয়াছে। কাঠ-মিজী, কামার ও অপর
কারিগরেরা অভিরিক্ত কাজ করিয়া যে বাড়তি রোজগার
করিয়াছে তাহা স্কুল-কণ্ডে চাঁদা দিয়াছে। এই সব সত্ত্বেও যে
টাকা বাটতি পড়িয়াছিল, প্রত্যেক গৃহস্থের কাছ হইতে তাহা-
দের সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা তুলিয়া তাহা পূরণ করা হয়। স্কুল-
গৃহ এতই স্থানীয় যে, গ্রামের লোকেরা গর্ব করিয়া বলিতে
পারে, এমন স্থানীয় স্কুল দশ মাইলের মধ্যে আর একটি নাই।
স্কুল-গৃহ নির্মাণ করিয়া দেওয়াতেই গ্রামবাসীদের কর্তব্য শেষ
হয় না। বেকি, ব্ল্যাক-বোর্ড ইত্যাদি শিক্ষার যাবতীর
উপকরণ তাহাদেরই যোগাইতে হয়। বছরের পর বছর এই
সব উপকরণ বাড়িয়া চলে।

প্রাথমিক বিভাগ : প্রাথমিক বিভাগে সাধারণতঃ জাপানী
ভাষা, সমাজবিদ্যা, গণিত, শাসন-বাহিনী, নৃত্য, চিত্রকলা, সৃষ্টি-
বিজ্ঞান, হস্তশিল্প, শারীরশ্রম, ব্যায়ামাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।
শিল্পের প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়—ওপপপিক ও ব্যবহারিক
দুই-ই। কৃষি, বৃক্ষ সংবর্দ্ধন, স্থানীয় শিল্প ব্যবসাদি, বাগ-বাগিচা
ইত্যাদির সহিত বালক-বালিকাদের যাহাতে অনান্যাসে পরি-
চয় ঘটে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণ
করা হয়।

মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম : তিন বর্ষব্যাপী মাধ্যমিক (লোয়ার
সেকেন্ডারি) পাঠ্যক্রম কতকগুলি বিষয় অবশ্যপাঠ্য, আর
কতকগুলি বেছা-গ্রাহ্য। জাপানী ভাষা, সমাজবিদ্যা, গণিত,
সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য, চিত্রকলা, শারীরশ্রম, ব্যায়াম, হস্তশিল্প,
ইত্যাদি অবশ্যপঠনীয়। বিদেশী ভাষা (ইংরেজীই ছাত্রছাত্রীরা

সাধারণতঃ লইয়া থাকে) ও শিল্প-কারিগরি-শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয়। এই মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম এমন ভাবে রচনা করা হয় যে, যে ছাত্র উত্তরজীবনে কৃষক হইতে ইচ্ছা করে সে ধেন কৃষি ও মিল্লীর কাজ ঐচ্ছিক বিষয় রূপে লইতে পারে। প্রাদেশিক অবস্থাতেই মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রয়োজনমত ছেরকের করা চলে। কৃষি, বৃক্ষ-সংবর্ধন, পল্লীর অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকে অনেকগুলি পাঠ থাকে। এই কারণে বালক-বালিকাদের মনে কৃষি ও শিল্প-কারিগরি ইত্যাদির প্রতি অস্বাভাবিক সৃষ্টি হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল : উচ্চ মর বছরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাও বিশেষ বিশেষ বিষয় ও শিল্প ব্যবসায়াদিবিদ্যা বিশেষ ভাবে অধ্যয়নের নিমিত্ত বালকেরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (অপার সেকেন্ডারি) প্রবেশ করে। সাধারণতঃ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের নিমিত্ত জাপানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে :—কৃষি ও বৃক্ষ-সংবর্ধন, (২) যন্ত্রতত্ত্ববিষয়ক (টেকনিক্যাল), (৩) ব্যবসা-বাণিজ্য, (৪) মৎস্যপালন, (৫) মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (ডোমেস্টিক সায়েন্স), (৬) সাহিত্য, কলা, শিক্কা ইত্যাদি সাধারণ বিষয়।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার স্কুল : মেয়েদের গার্হস্থ্য-ব্যবস্থা বিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল আছে। তবে তাহারা ইচ্ছা করিলে অপরাপর বিষয়ের অধ্যাপনা যে স্কুলে হয়, সে স্কুলেও পড়িতে পারে। যে সব বিদ্যার্থী পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে এই সব স্কুলে উচ্চ ধরনের ঔপপত্তিক (theoretical) শিক্ষা দেওয়া হয়। আর যাহারা মাধ্যমিক শিক্ষান্তে চাকরি বা উপার্জনের জন্য অল্প কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহে তাহাদের সেই সেই বিষয়ে উচ্চাঙ্গের ব্যবহারিক শিক্ষাদান করা হয়। যে সব ছাত্রের পক্ষে দিনের বেলা স্কুলে যাওয়া অস্বাভাবিক তাহাদের জন্য মৈশ-বিদ্যালয় রহিয়াছে। কোন বিদ্যার্থী যদি কেবলমাত্র একটি বিষয় পড়িতে চাহে তা সে সুযোগও আছে। তবে মৈশ স্কুলে যাহারা যায়, তাহাদের দুই বৎসরের স্থলে তিন বৎসর পড়িতে হয়।

স্কুলের সময় : সাধারণতঃ এই সকল স্কুল সকাল সাড়ে আটটায় বসে ও দ্বিপ্রহর আড়াইটার সময় ছুটি হয়। দুপুর বারোটা হইতে একটা পর্যন্ত ষাওয়ার জন্য ক্লাস বন্ধ থাকে। প্রত্যেক ছাত্র সপ্তে খাবার লইয়া আসে এবং বড় 'হল'ঘরে সকলে একসঙ্গে বসিয়া আহার করে। প্রত্যেক ঘণ্টার পরে দশ মিনিটের ছুটি তাহারা পায়। এই সময় তাহারা ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে গিয়া খেলে, এবং চাফা হইয়া অল্প পাঠ গ্রহণের জন্য ক্লাসে আসে। বিদ্যালয়ে গড়পড়তা উপস্থিতি শতকরা নিম্নানকুই।

সহ-শিক্ষা : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালকদের মাথা বেঁধা করিতে হয়। মেয়েদেরও এক বিশেষ ঢঙে চুল কাটাইতে হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রেরা লম্বা চুল রাখিতে পারেন। বিদ্যার্থীদের লিপষ্টিক ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রদানের সুলভতা : বিদ্যালয়মাঝেই শিক্ষার যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাঙ্গসরঞ্জাম ও অযোগ্য সুবিধার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছোট বালক-বালিকাদের জন্য মাইক্রোফোনের বন্দোবস্ত আছে। পালারমে বালকেরা উঠাতে কথা বলার শিক্ষা পাইয়া থাকে। গান, বাজনা ও নৃত্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা বিদ্যালয় মাঝেই থাকে, আর তার জন্য একটি আলাদা হল-ঘরও থাকে। প্রথম শ্রেণী হইতেই চিত্রকলা শেখানো হয়। বালক-বালিকারা কাগজ, পেন্সিল, রং ইত্যাদি বাড়ী হইতে আনে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম ও প্রশস্ত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ থাকে। বেসবল জাপানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় খেলা। প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সেলাই-কল, রন্ধনের হাড়ি-কুঁড়ি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য হাতিয়ার, কাঠ-মিল্লীর যন্ত্রপাতি ও বাগ-বাগিচার সামগ্রী থাকে। মেয়েরা পালারমে নিজেদের বাড়ী হইতে রান্নার বাসন-কোসন, ভরি-ভরকারি ইত্যাদি লইয়া আসে; রান্না করিয়া তাহারা পরিবেশন করিয়া থাকে। প্রত্যেক পাঁচটি মেয়ের জন্য একটি সেলাই-কল থাকা চাই—ইহা নিয়ম।

শিক্ষক-অভিভাবক সম্বন্ধ : প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার সহিত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের খুব নিকট সম্বন্ধ। প্রত্যেক পাঠশালার এক-একটি শিক্ষক-অভিভাবক সম্বন্ধ আছে। গাঁয়ের যে-কোন অভিভাবক এই সম্বন্ধের সদস্য হইতে পারেন। কখনও কখনও অল্প লোককেও সদস্য করিয়া লওয়া হয়। এই সকল সদস্য নিজেদের মধ্য হইতে এক কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করিয়া লয়। প্রতি মাসে এই সমিতির ও শিক্ষকদের সংযুক্ত বৈঠক বসে। প্রত্যেক সদস্যকে এই সম্মেলন মাসিক টাকা দিতে হয়। এই টাকা পাঠশালার উপকরণগুলির জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। প্রতি মাসে একবার সকল অভিভাবক পাঠশালার আসেন এবং তাহাদের বালক-বালিকাদের শিক্ষা কিরূপ হইতেছে তাহা পরীক্ষণ করেন। তার পর শিক্ষক ও অভিভাবকদের সংযুক্ত বৈঠকে ছাত্রদের ও পাঠশালা সম্বন্ধে আলোচনা চলে। কোন ছাত্রের কোন বিষয় লওয়া উচিত এবং কোন লওয়া উচিত এ সম্বন্ধে এই বৈঠকে আলোচনা হইয়া থাকে। অভিভাবকদের মধ্যে সকলেই শিক্ষিত ও বিদ্বৎ।

তাহারা মধ্যে মধ্যে পাঠশালায় আসেন বলিয়া শিক্ষকেরা তাহাদের সমীহ করিয়া চলেন।

ছুটির সদ্যবহার : জাপানের বিভাগবিশেষের গ্রীষ্মের ছুটি ২১শে জুলাই হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত। বজের সময়ে জুল হইতে ছাড়াই লইয়া যাওয়া হয়। আট-দশ দিনের জন্য তখন তাহারা শিবিরে থাকে। সমুদ্রের ধারে উপযুক্ত স্থানে এই সব শিবির সংস্থাপিত হয়। ছাড়াইদের সহিত শিক্ষকেরাও থাকেন। তখনকার প্রথম কার্যক্রম হইতেছে সাঁতারকাটা ও খেলা। এই কার্যে অভিভাবকদেরও সহযোগিতা পাওয়া যায়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পালাক্রমে অভিভাবকরাই করেন। উচ্চ প্রাথমিক বিভাগবিশেষের ছাড়াইরা ছুটির সময়ে নিজ নিজ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালভ্যের নিমিত্ত কৃষিক্ষেত্রে বা কারখানায় গিয়া কাজ করে। কতক ছাড়াই কর্মের বিনিময়ে বেতনও পায়। ছুটি ভিন্ন অন্য সময়ে পাঠশালায় ও পড়াশুনার কাজের অবকাশে বালক-বালিকারা মা-বাপের কাজকর্মের সহায়তা করিয়া থাকে। বান রোপণের সময়ে এই সকল বিভাগবিশেষের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাড়াই এবং কারখানার বহু শ্রমিক এখানে-সেখানে এই কাজে লাগিয়া যায়। ছুটির সময়ে কখন কখন শিক্ষক ও ছাড়াইরা মিলিয়া রাভাঘাট তৈরি করে, সাকাই বা অল্প কোম সার্কজমিক কাজও করিয়া থাকে।

শিক্ষক : ১৯৪০ সালে জাপানে ছয় লক্ষ পনের হাজার দুই শত পঁচাত্তর জন প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। তন্মধ্যে তিন লক্ষ ত্রিশতর হাজার শত শত পরীক্ষিত জন পুরুষ এবং দুই লক্ষ বিশ হাজার পাঁচ শত চৌদ্দ অর্থাৎ শতকরা ৩৮ জন ছিলেন স্ত্রীলোক—অবশিষ্টেরা ছিলেন অর্ধ সময়ের শিক্ষক। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া যাহারা শিক্ষকতা করিতে চাহেন, তাহাদের চারি বৎসর শিক্ষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে হয়—ইহা সাধারণ নিয়ম। ইহাদের কাষ্ট-এড শিক্ষক বলা হয়। কোন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদেরও শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাহাদিগকে পাঁচ বছর পরে একবার ও দশ বছর পরে আর একবার পরীক্ষা দিতে হয়। এইরূপ-শিক্ষকদের দশ বছর পরে সেকেন্ড এড পদে উন্নীত করা হয়। সাধারণতঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক-দের বেতন মাসিক সত্তর টাকা, সেকেন্ড এড শিক্ষকদের মাহিমা আশি টাকা ও কাষ্ট-এড শিক্ষকদের নব্বই টাকার আরম্ভ হয়। তা ছাড়া বিবাহিত শিক্ষকেরা পত্নীর জন্ম দশ, প্রথম সন্তানের জন্ম দশ ও পরবর্তী প্রত্যেক সন্তানের জন্ম মাথাপিছু আট টাকা করিয়া মাসিক ভাতা পাইয়া থাকেন। শিক্ষকদের মাহিমা বাড়িতে বাড়িতে উর্ধ্বকক্ষে দুই শত পর্য্যন্ত হইতে পারে। মাহিনাবৃদ্ধি নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে ত হয়ই, উপরন্তু শিক্ষকের যোগ্যতাসূচক হইয়া থাকে।

‘নাভানা’র বই

বাঙলা সাহিত্যের গর্ব

প্রেমেন্দ্র মিশের
শ্রেষ্ঠ গদ্য

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ॥ রচনার উৎকর্ষ ও
সজ্জা-সৌষ্ঠবে অভুলনীয় ॥ দাম : পাঁচ টাকা ॥

৩

দ্বিতীয় প্রকাশিত হচ্ছে

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের

সলসলির খুঁজ

সরস ও সার্থক সাহিত্যের আশাদে জাতীয় ইতিহাস রচনায়
নতুন দিকনির্দেশ ॥ অসংখ্য দুর্লভ প্রামাণ্য চিত্রে সমৃদ্ধ ॥

বুদ্ধদেব বসুর

স্বপ্ন-লেখোচ্ছিন্ন মেঘে

নতুন শোভন সংস্করণ

প্রেমেন্দ্র মিশের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

বুদ্ধদেব বসুর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রতিভা বসুর নতুন উপগ্ৰাস

মনের সমুদ্র



৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

প্রত্যেক শিক্ষককে সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। কিন্তু বস্ত্রভঃ তাঁহাকে সাড়ে আটটা হইতে আড়াইটা পর্য্যন্ত, এবং কখনও কখনও তাঁহার পরেও পাঠশালায় কাজ করিতে হয়। মেয়েদের সঙ্গে তাঁহাদের খেলিতেও হয়। দীর্ঘ ছুটিতে তাঁহাদের ভ্রমণে বাহির হইতে, শিবিরে বাস করিতে, রিক্রেশন কোর্স ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হয়।

বিদ্যবিভাগ : উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে স্বল্পসংখ্যক বিদ্যার্থী বিদ্যবিভাগে প্রবেশ করে। উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের মত বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপনার নিমিত্ত পৃথক পৃথক বিদ্যবিভাগের আছে। মেয়েদের আলাদা তেত্রিশটি বিদ্যবিভাগের আদ্যে রহিয়াছে। মেয়েদের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, গাঠন্য-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিত্রকলা, গান-বাজনা, নৃত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যবিভাগের আছে। লেগানে বহুসংখ্যক মেয়ে পড়ে। সর্বত্র বিদ্যবিভাগেই শিক্ষার মাধ্যম আদ্যাদি ভাষা। বিদ্যবিভাগসমূহে অধ্যাপক, অধ্যাপক, লেকচারার্স ইত্যাদি মিলিয়া উৎকর্ষিত হাজার, হুতি জন লোক কাজ করেন। ইহাদের মধ্যে ছই হাজার

সাত শত মহিলা আছেন। পক্ষার হইতে সত্তর বৎসর বয়সের অধ্যাপকের সংখ্যা ছই হাজার সাত শত পঞ্চমটি। একাত্তর বৎসরের অধিকবয়স্ক অধ্যাপক আছেন এক শত ছাব্বিশ জন। তাঁহাদের অনেককে গবেষণা-কার্যে লিপ্ত।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমিরোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন-স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়, “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২।০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১।১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—মাউথ ৮৮১



এম.বি. প্রকার ১৩ প্রণ

শ্রীমতী সীতাবতীর
অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী

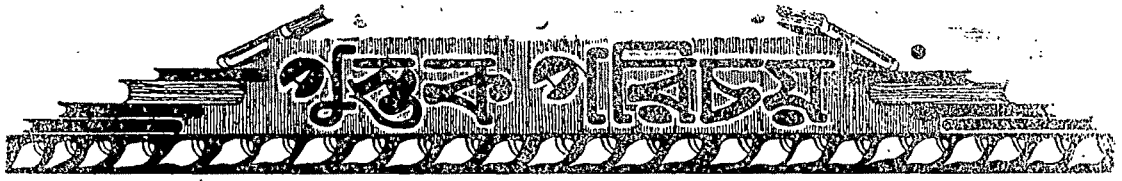


ব্রাহ্ম হিন্দুস্থান মার্চ মালিগঞ্জ

১৫৯/১ বি. রাসবিহারী এডিন্টি কলিকাতা

ফোন-৮৮১১

১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুতাজার স্ট্রীট কলিকাতা। ফোন-এডিন্টি. ১৭৬১ গ্রাম-ট্রিনিয়ান্স,



নাথ পত্নী—শ্রীকলাগী মল্লিক। বিববিভাসংগ্রহ ৮৮। বিখ-

ভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধ নাথ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিবৃত্ত আলোচ্য পুস্তিকায় সংকলিত হইয়াছে। কলিকাতা বিখবিভালায় কর্তৃক প্রকাশিত 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী' নামক বৃহৎ গ্রন্থে লেখিকা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। লেখিকার মতে 'নাথ ধর্মকে তন্ত্র ও যোগের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। নাথ যোগীরা প্রধানত শৈব, তাই তাঁহার শৈব তান্ত্রিক নামে পরিচিত।... অবশ্য আদর্শবাদী নাথ গুরুরা কোল...নাথপন্থে বৌদ্ধ মহাজ্ঞানীদের রহস্যবাদও কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে' (পৃ: ৩৩, ৩৪, ৩৫)। এই সম্প্রদায়ের আচারগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখিকা বলিয়াছেন—'যোগীদের মধ্যে জাতিভেদ নাই।...মাংস আহার নিষিদ্ধ না হইলেও মৎস্য হইতে মৎস্তেন্দ্রনাথ জাত বলিয়া মৎস্য আহার নিষিদ্ধ। এখন এই সকল যোগীর উপাস্ত দেবতা ধর্মঠাকুর' (পৃ: ২০, ১৫)। এগুলি কোন স্থানের যোগীদের বৈশিষ্ট্য তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। তবে বাংলার যোগীদের সম্বন্ধে এসব উক্তি ঠিক খাটে বলিয়া মনে হয় না। একদা 'যে বোপা জাতি বঙ্গদেশে ও পূর্ব-ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন'—বাঁহারী 'রাজার গুরু' ছিলেন, সম্রাসী হইলেও ধর্মযুদ্ধাদিতে যোগ দিতেন, আহার দর্শনের গ্রন্থ ও পত্রাদি রচনা করিতেন' (পৃ: ১৫) তাঁহাদের সে সৌরব কখন কি ভাবে ক্ষুণ্ণ হইল সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা লেখিকা করেন নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি এসম্পর্কে পাঠকের ওৎহকা নিবারণে যত্নবতী হইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নূতন ধরণের কবিতার বই

প্রাত্যহিক

মূল্য দুই টাকা

শ্রীভারপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কালিদাস রায়, সজনীকান্ত দাস, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বীরেন্দ্রনাথ রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বাংলা-দেশের খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক কর্তৃক অভিনন্দিত। অমৃতবাজার পত্রিকা, দেশ, যুগান্তর, পূর্বাশা, পূর্বাচল, সংহতি, বর্তমান প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত।

কমলা বুক ডিপো—১৫, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা

বিদায় বর্ষা—শ্রীমাননী মুখোপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং

হাউস, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

১৯৪২ সালে জাপানী আক্রমণের সময় বঙ্গদেশে হইতে বহু ভারতীয় ইঁটাপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। সেই পথ ছিল দীর্ঘ, দুর্গম এবং বিপৎদুল্ল। লেখিকা তাঁহার স্বামী ও কন্যা সমভিব্যাহারে এই পূর্ব-অরণ্যময় দুর্গম পথ কখনও পদব্রজে, কখনও বা নানাবিধ যানে অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। সপথের ভ্রমণ ও প্রাণের দায়ে পথ অতিবাহন এই দুইয়ে আকাশগাতাল প্রভেদ। একটিতে দেশ ও মানুষ, দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানুষের রীতিনীতি প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া উপভোগ করিয়া ধোঁল মেজাজে বর্ণনা দেওয়া স্বাভাবিক। অজ্ঞাতে কারিক ক্লেশ, প্রতিদিন আশ্রয় ও আহার সংগ্রহের চেষ্টা, পরিজনসহ হৃদয় দেহে নির্ঝরে দেশে পৌঁছানোর দুশ্চিন্তা প্রভৃতি লইয়া মানসিক প্রকলিত বজার রাখা হ্রস্ব; অথচ লেখিকা এই সব বিপত্তিকে গ্রাহ্য না করিয়া হ্রস্ব ভরিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যমুখা পান করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্যে ছবি আঁকিয়াছেন অজস্র। তাঁহার প্রকৃতি-দর্শনের সমারোহে পথের ক্লেশ তো মুছিয়া গিয়াছে—পথের দুর্গমতাও ঘুচিয়া গিয়াছে। পাঠকও বহুবিষমর এই পথযাত্রাকে এসময় মনে গ্রহণ করিবেন।

= নূতন বই =

ভূপর্ষটক শ্রীক্ষিতীশ ব্যানার্জী প্রণীত

১৮৬, বহুবাজার স্ট্রীট, (উপরতলা) কলিকাতা—১২

ভ্রমণ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই

১। সাইকেলে বন্ধান ভ্রমণ ৩

২। মানুষ-না-জানোয়ার (ডিটেকটিভ) ১১

—অজ্ঞাত বিখ্যাত বই—

৩। প্রবাসে ৭

৪। ইউরোপে (ইংলণ্ড ও জার্মানী) ২১০

৫। সাইকেলে পশ্চিম এশিয়ায় ২১০

৬। বিভিন্ন দেশের নারী ও সমাজ ২১০

৭। উদ্দাম যৌবনে (উপন্যাস) ২১

৮। সচিত্র জন্ম-নিয়ন্ত্রণ (বিভিন্ন পদ্ধতি) ১০

রাম রহিম—খ্রীষ্টান্ধর বনোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বক্স চার্টার্ড স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। মূল্য আড়াই টাকা।

বিগত মহাযুদ্ধের আঘাতে পৃথিবীর মানচিত্রই শুধু বদলায় নাই, মানুষের সমাজ-ব্যবস্থাও রীতিমত চুটাইয়া গিয়াছে। পুরাতন নীতি-আদর্শবাদের সঙ্গে সৎ বুদ্ধিগুলিও বৃষ্টি নিঃশেষিত হইয়াছে। জগৎময় আজ অস্তিত্বের প্রশ্ন। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এইগুলি মোটামুটিভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া মানুষের অশান্তি বাড়িতেছে, সভ্য-শিব ও হুম্মর ভাষাকে আশ্রয় দিতে পারিতেছে না। এই অস্বাস্থ্যকর সামাজিক প্রতিবেশে কেন্দ্রীভূত জীবনের ভাব ও ভাবনা ইহানীন্তন বাংলা কথা-সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইতেছে। এই জগতে অন্ধকার যেমন গাঢ়—পশু-দের কোলাহলও তেমনি শব্দ। আলোচ্য গল্প-সংগ্রহে পাশবিক জীবনের লোভ-লালসা বকনা ও পীড়নের ছবিই পাওয়া যায়। গল্পগুলি সময়ের স্রোত তৈলিয়া বেন্দীদূর অগ্রসর হয় নাই—ভিত্তিস্বাদভরা জীবনের গ্রানি-বেদনা বার্ষিক্যের মধ্যেই পাক খাইয়া ঘুরিতেছে। আত্মিকার সর্বাত্মক দুর্দ্বিপাকের উর্দ্ধ তুলিয়া ব্যক্তি ও বস্তুকে চিনিয়া লইবার অবকাশ সকলের ঘটে না—রূঢ় বাস্তবই মানুষকে, সে অবকাশ দেয় না। লেখকও সে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার দুঃখবেদনাবোধ তীব্র এবং সেই কারণেই চিত্রগুলির বাস্তব স্পর্শ যেমন নিবিড়, চিত্তের ক্ষেত্রও তেমনি প্রসারিত। ছোট গল্পের বুনন-রীতিতেও লেখকের নৈপুণ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রোবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম—স্পর্শদণ্ডি। সি. সি. বসাক
এও সঙ্গ, ১২৭, মসজিদবাড়ী স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ৪০ টাকা।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান ভাষাতেই ওমর-খৈয়ামের রুমধুর রুবাই-গুলির অনুবাদ বর্তমান। বাংলাতেও একাধিক অনুবাদ-গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া ভাবা-লালিত্যের জন্ত কাস্তিচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকার জন্ত ডক্টর শহীদুল্লাহের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। তথাপি আর অনুবাদের প্রয়োজন নাই একথা বলিতে পারি না। নানা জনের প্রয়াসের ফলে হয়তো কবির আরও বিভিন্ন পদের অনুবাদ পাইতে পারি, অনুবাদের ভাষাও ক্রমশঃ অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে।

আলোচ্য অনুবাদ-গ্রন্থের ভাষা সুখপাঠ্য ও সাবলীল।

“বখন তুমি ও আমি চলি” বাব যবনিকা-পারে

তারও পরে কতকাল রবে বিশ্ব, তার সিংহঘাসে

কতদিন তারও পর তুমি আমি এসে যাব ফিরে

কেহ করে চিনিবে না বাসুকণা সম সিন্ধুতীরে।”

বিষয়ের গভীরতা এই অনুবাদে ফুর হয় নাই। তবে কোনটির গভীর ভঙ্গী, কোনটির চটুল চপল ছন্দ পাশাপাশি থাকিয়া যেন সামঞ্জস্য ভঙ্গ করিয়াছে।

বলাকা-কাব্যপরিক্রম—শ্রীক্ষিতমোহন সেন। এ.
মুখার্জি এও কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪০ টাকা।

মনস্থিতার সঙ্গে কল্পনার মিলনে অপূর্ব রসসৃষ্টি হইয়াছে ‘বলাকা’ কাব্যে। ইহার ভাব হৃগভীর বলিয়া পাঠক অনেক সময়ে ব্যাখ্যা বা আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই গ্রন্থ সে প্রয়োজন মিটাইবে। রবীন্দ্রনাথ ‘বিষভারতীতে সাহিত্যের ক্লাসে এই কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই স্বর্ণ আলোচনা ‘শান্তিনিকেতন’ পত্রিকা হইতে সম্বন্ধে সংগ্রহ করিয়া আচার্য্য ক্ষিতিমোহন এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল কবির সান্নিধ্যে ছিলেন, সেজন্য নানা স্থান হইতে এই কাব্য সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য সংগ্ৰহ করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নিজস্ব পাণ্ডিত্য ও রসানুভূতিগুণে তিনি অনেক জ্ঞানিবার ও ভাবিবার কথা হুল্লর করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিয়াছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



সরল হিসাব প্রণালী

অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিগুণাত্মক প্রণালীতে (Double-entry) হিসাব-পদ্ধতি শিখিবার একমাত্র পুস্তক, শিক্ষকের বিনা সাহায্যে বুঝা যায়। ছাত্র ও ব্যবসায়ীর পক্ষে সমভাবে উপযোগী। ব্যাক ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত ব্যবসায়িক তথ্য জানা যায়। আই-কম পরীক্ষার প্রয়োজনসহ মূল্য ৫০ টাকা।

মডার্ন বুক এজেন্সি—কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মর্ম-মরাল—গ্রীষ্মি শুভ। গ্রীষ্মবিশ্ব আশ্রম, পড়িচেরী।
২৪, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

শ্রুতি-কবিতার বই। উনষাটটি কবিতার সমষ্টি। জন্মের অমৃতভূতি
কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। জীবনপথের বাত্মোষ্যে তরুণ
মনে একটি আবেগ আসিয়াছে। সে আবেগের স্বরূপ সম্পূর্ণ নির্ণীত হয়
নাই।

'কে' কবিতার পাই,

মরণের সুরের সাথে কোন্ মিষিড়ের
পাপড়ি খোলে গন্ধ মেখে।

আমার এই গহন-মনের অচিন বনে
না-জানা-ফুল ফোটায় সে কে ?

'উদ্ভুক্তি'তে আছে,

মর্মের মলিন খুলিল দুয়ার,
এল কোন্ স্বপ্নের জ্যোতির-জ্যোয়ার।

'বসন্তে' পাই,

স্বর্ণলতা দীপন-ব্রতা কোন্ সে আলো-সন্ধান
ছাড়ে দিয়ে তোমার ধরা স্তব্ধে সে জাগল কি ?
দিনের হৃদনার আলো-ছায়া মিশাইয়া আছে,
ভোরবেলাকার স্বপ্নাধা আবছা আলোর কোলে
রাতের আশা দোলে।

তার পর মধ্যদিনে,

মনের মাঠে রাখাল-রাজা বাজার যে তার রূপান্তরের বাশি,
কালো দীঘির দর্পণ উদ্ভাসি'।

আর নিশীথে,

তুমি শিখিয়েছ শিখাটিরে মোর অজিতে তোমারি পানে।
তাই,

আজ বঙ্গুর পথ বন্ধনহীন সংশয়-লেশ নাই,

আজ মর্মের শোণ-বহির সুর সত্যের ডাক চাই।

'চন্দ্রালোকে',

মোর মানসের নিমীম নীলে চিরকালের শুক্ল শশী,
সব আবরণ দীর্ণ করি' ভুবন আমার যাও বিলসি'।

'আহ্বান'—গ্রীষ্মবিশ্বের 'ইন্ডিকেশন' নামক বিখ্যাত কবিতার
অনুবাদ। অনুবাদে মূলের গাভীর্বা ও প্রেরণার পরিচয় পাই,

অধীপ আমি ভুলতমের—প্রলয়-অধীপ,

গর্ব আমার অতল উৎস—সত্তা প্রমুক্তির

অটুট শক্তি যে-বীর ধরে, বিপদ স্বজন যার

অঙ্গী সে মোর রাজ্যমণির—সজী সরণীর।

'রূপান্তর' চমৎকার। কবিতাগুলি উপভোগ্য। বিচিত্র ছন্দ এবং
আবেগ-স্বক্লারের মধ্য দিয়া 'মর্ম-মরালে' মরমী কাব্যের সুরের আভাস
ধনিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা



রূপরচনার কাচরাগ...

রূপের কলিকে সৌন্দর্য্যকুসুমের বিকশিত করে তোলাই এই প্রসাম্বদী
সাধনা। রূপসাধক-সাধিকাদের নিকট তাই চিরকাম্য এই
সৌন্দর্য্যের সুরম্যসম্ভার

কৃত্রিমের

মার্গো সোপ

নিম্ন টুথ পেস্ট

ভূঙ্গল

লাবনি স্নোও ক্রীম

কাস্তা



দি ক্যালকাটা কোষিক্যাল বা. লি. কলিকাতা

স্মৃতি-কথা—শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিন খণ্ডে প্রকাশিত এই বিরাট পুস্তকখানি লেখকের আত্মচরিত। ইহাতে বহু গুণসি লীড়মূলক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে এবং সমসাময়িক ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা ও বাংলার কয়েক জন শ্রনামধন্য পুরুষের জীবনের উপর নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে।

জীবনী লেখা কঠিন ব্যাপার; আত্মচরিত লেখা আরও কঠিন। লেখকের অন্তর্দৃষ্টির অভাব ও আত্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা এই দুইটিই সার্থক আত্মজীবনী লেখার পরিপন্থী। যে কঠোর সত্যনিষ্ঠা ও আত্ম-সমীক্ষা আত্মজীবনীর প্রাণ তাহা সত্যই দুর্লভ। অতএব আত্মচরিত লিখিতে হইলে 'অহং'-কে নিঃশব্দভাবে লিপ্সিষ্ট করিয়া সত্যকে অকুণ্ঠ প্রকাশের অবসর দিতে হয়। লেখক পুস্তকে যে বিচিত্র ও মনোজ্ঞ বর্ণনায় স্মৃতি করিয়াছেন, তাহার প্রায় প্রতিটি রেখার আমরা সেই সত্যনিষ্ঠা ও অকপটতার অনুসন্ধান করিয়াছি। চকিত হইয়াছি, শঙ্কা জন্মিয়াছে, কিন্তু হতাশা হই নাই। লেখকের প্রতিজ্ঞাবাগী মনে পড়িয়াছে, "স্মৃতি-কথায় বাহ্য লিখিয়াছি তাহা আমার অভিজ্ঞতার সত্য— কোন কথা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত লিখি নাই।"

স্মৃতির দূরদৃষ্টি-চক্ষুণ্য হইতে হৃদয় করিয়া বার্কোর প্রাকাল পর্যন্ত 'স্মৃতি-কথার' বিষয়বস্তু। বাল্যের তুচ্ছ ঘটনাগুলিও মধুর; বাল্য-লীলার বিলাস হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; প্রাণোচ্ছল যৌবনের আবেদন প্রাণে মাড়া জাগায়। লেখকের পিতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম, কণ্ঠাব্যনয়না, ছাত্র-শ্রীতির প্রশংসা করিতে হয়।

পুস্তকের প্রায় সর্বত্র—বিশেষতঃ তৃতীয় খণ্ডে লেখকের গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাস, নির্ভরতা ও শ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের চিন্তা যেন ক্রমশঃই ঐহিক ছাড়িয়া পারত্রিকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সে ভক্তি-বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ—স্বভাবসম্মিত ভক্তির মন্যাকিনীধারা পুস্তকের বহু স্থান স্পর্শ করিয়াছে, মার্জনা করিয়াছে, সিক্ত করিয়াছে।

লেখকের মানবশ্রীতি ঈশ্বর-শ্রীতিতে পরিণত হইয়াছে; আবার ঈশ্বরশ্রীতি মানবশ্রীতির বাহুবন্ধনে ধরা দিয়া সার্থকতার পথে ছুটিয়াছে।

পুস্তকখানি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইলেও, অতি দীর্ঘ বর্ণনা ও একই 'ছাঁচের' চরিত্রসৃষ্টির বাহুল্যে, স্থানে স্থানে একঘেয়ে মনে হয়। শ্রীপ্রাণ-কিশোর গোস্বামী সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি, ভিক্টোরিয়া কলেজের মেয়েদের সম্বন্ধে 'পরশ্রৈপনী' জ্ঞানের উপর গবেষণা চাপলোর কান ঘেসিয়া গিয়াছে। পুস্তকের গাভীঘা ও নৈতিক মানের সহিত উহার সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। আর একটা অসঙ্গতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। অধ্যাপক মহাশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁর ছাত্রবৃত্ত অগণিত। তাহারা ভালবাসিয়া তাঁহাকে সন্দেহ, মাহ, বৃত্তি-শাড়ীর "ভেট" পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি আশ্বহারা হইয়া যে বর্ণনার শ্রোত বহাইয়াছেন, তাহা অত্যাশ্চিত্তে পূর্ণ। এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও পুস্তকখানি যে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

ঋষি দাসের:		ছোটদের অন্ততম		ভূতনাথ ভৌমিকের	
ছোটদের নিউটন		মাসিক পত্রিকা		ভৌমিকের ভারতের পথরেখা	
ছোটদের আইনস্টাইন		চয়নিকা		সন্তোষকুমার ঘোষ	
ছোটদের মার্কস		বৈশাখ হইতে গ্রাহক		রূপকথার রাজ্য	
শ্রীভূতনাথ চক্রবর্তীর		হইতে হয়		খগেন্দ্রনাথ মিত্রের	
রানী রাসমণি		নমুনার জুতা		গোর্কীর ছেনেলবেলা	
যোগেশচন্দ্র বাগলের		চারি আনার		মাধুসেনের অ্যাডভেঞ্চার	
ভারতের মুক্তি-সঙ্কলনী		ডাক-টিকিট		সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী প্রত্যেকটি	
সংকল্প ও সাধনা		নাগে		(১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ)	
রবীন্দ্রকুমার বসুর		বাধিক ৩		নির্মলকুমার বসুর	
মুক্তি-সংগ্রাম		বৈচিত্র্যভরা		আরব্য উপন্যাস	
রোলার আলোকের গান্ধীজি		রচনায়		কালীকিশোর ভট্টাচার্যের	
স্ববোধচন্দ্র রায়ের		সম্বন্ধ ও		শ্রীমন্তগবদগীতা	
স্বরাজ ও সাধনা		জ্ঞান-বিজ্ঞানের		রবীন্দ্রলাল রায়ের	
প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়ের		বস্তুখনি		বলিত হাসব না	
নবজীবনের পথে হায়দরাবাদ				নলিনীকুমার ভদ্রের	
গিরীন চক্রবর্তীর				আসামের অরণ্যচারী	
দেশবিদেশের লেখা				গদাধর নিয়োগীর	
				গল্প-বীথিকা	
				H. Barik's	
				Ready Reckoner	
				Pay, Wages, Income tables	

ভারতী বুক স্টল : ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

১। শিশু ও শৈশব—অধ্যাপক শ্রীমেশ দাস। পৃঃ ৩৫।

২। শিশু পালনে কোনটি চাই—বংশগতি না
পারিপার্শ্বিক : অধ্যাপিকা শ্রীমতী নীতা ঘোষ।

৩। আপনার শিশু কি লেখাপড়ায় পিছিয়ে
পড়ে?—শ্রীমতী গুহ। 'মণিমেলা' মহাকাব্যের সহযোগিতায়
প্রকাশিত। সম্পাদনা—নির্মল চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান ১৩২, কাঁটাপুকুর
ঘাট বাই লেন, হাওড়া। পৃঃ ৩২। মূল্য চারি আনা।

আলোচ্য পুস্তিকা তিনখানি শিশু লালনী-গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত এবং
মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত। শিশুরা মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ
সম্পদ, কারণ এরাই মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখে, জাতীয় সংস্কৃতির
উত্তরাধিকারী হয়ে দেশকে মহত্ত্বের সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।
কিন্তু আমাদের দেশে শিশুকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব এবং সমস্ত
সম্বন্ধে বেশী ভাৰ শিক্ষিত পিতামাতাই অনবহিত; অশিক্ষিতদের
তো কবাই নাই। সম্ভাব্যের প্রতি নেহ আছে সকল পিতামাতারই,

কিন্তু কিসে তার মজল হবে, তার জীবনপটন হঠাৎ হবে, তার হৃৎ শক্তি
গুলির বিকাশ ঘটবে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই। ক্লেশা বলেছিলেন,
'সন্তানকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যে নিতে পারে না তার পক্ষে
সন্তানের জন্মদাতা হওয়া অপরাধ।' এ অপরাধে আমাদের সমাজের
অনেকেই অপরাধী।

শিশু লালনী-গ্রন্থমালার পরিকল্পনা এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করে এর
উত্তোত্তরা বাঙালী অভিভাবকদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।
সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও পুস্তিকাগুলিতে শিশুর মন, প্রকৃতি, বুদ্ধির ধারা,
জড়বুদ্ধির কারণ, তা দূর করার উপায় প্রভৃতি অতি সহজবোধ্য ভাষায়
মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ পুস্তিকা-
গুলি পিতামাতার কৌতুহল জাগ্রত করে তাঁদের সম্ভাব্যের প্রতি দায়িত্ব
সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে সহায়তা করবে। সমাজের কল্যাণকামী
সকলেরই পুস্তিকাগুলি যত্নের সঙ্গে পাঠ করা উচিত। বহুল প্রচারের
দিকে লক্ষ্য রেখে পুস্তিকার নামমাত্র মূল্য ধার্য করা হয়েছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

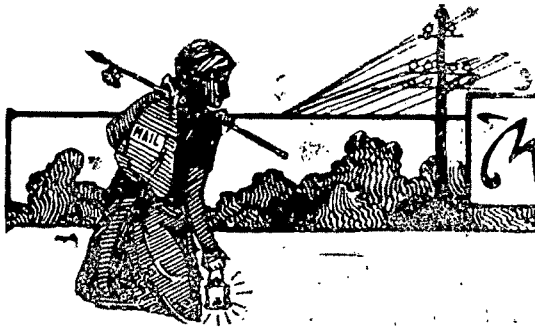
ফে.থোডেজ
মহাভুজবাজ তৈল

চুল উঠা বন্ধ করে
মাথা ঠাণ্ডা রাখে



এই মার্কা দেখে কিনুন নকল থেকে সাবধান





দেশ-দ্বিদেশের কথা

গ্রামসেবা-সঙ্ঘ

গত ১৯৪৯ সনের ১লা ডিসেম্বর হাটধুবা গ্রামে গ্রাম-সেবা-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সঙ্ঘ গোড়ার গ্রামের কয়েকটি মৌলিক অভাব পূরণে গ্রামবাসীদের সচেতন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তন করিয়াছে—

(১) দুই জন অভিজ্ঞ এল.এম.এফ. চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত এক বৎসরে ৫২২৮ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। এই বাহ্যিকক্ষেত্রে মাড় এবং শিশু-মদল সমিতির অভিজ্ঞ বাহ্য-পরিদর্শিকার পরিচালনার ১২ জন মহিলাকে বাড়ীবিভাগ শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) গ্রাম্য মহিলাদের উপার্জনের সুযোগ দিবার জন্য তাহাদের জীবনশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জীবন বিভাগের মহিলা কর্মীগণ আর করিয়াছেন ১৫১২।৭০ পাই। এই বিভাগ থেকে গ্রাম ৩০ হইতে ৪০ জন মহিলা-কর্মী শিক্ষা পাইয়াছেন।

(৩) তাঁতশিল্পের প্রসারকল্পে একটি আদর্শ বয়নাগারের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই বিভাগে ৪ বানি তাঁত ও কয়েকটি চরকা এবং শুক্লির সাহায্যে গ্রামীণ মহিলাদের বয়ন এবং হুতাকাটা শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৪) সরকারী রিলিক ডিপার্টমেন্টের সাহায্যে বোধ কারবারের আদর্শে আশ্রয়হীন বাস্তব মহিলাদের বোতাম-তৈরি শিক্ষার জন্য একটি মহিলা সমবায় শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

(৫) এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত বিভাগ, লোকশিক্ষা সংসদের শাখা, ছাত্রাবাস, সাধারণ গ্রন্থাগার ইত্যাদিও উক্ত সঙ্ঘের

উভোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং দুঃস্থ মহিলাদের উপার্জনের জন্য একটি 'বান ভানি বিভাগ' খোলা হইয়াছে। ইউ. সি. আর. ড্রিউ. কর্তৃক প্রদত্ত ১৬০০ টাকা দ্বারা দুঃস্থ মহিলাদের বান জর করিয়া দেওয়া হয়, এবং আবশ্যিকবোধে টেকির ব্যবস্থাও করা হয়।

(৬) ইউ. সি. আর. ড্রিউ. হইতে খুন্সি-শাখী, সার্ট বিভিন্ন কলোনির দ্বিবিজ বাস্তবায়নের মধ্যে বিলি করা হয়।

এই জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্রে সজ্ঞানিত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সরকার, সমাজ-কল্যাণকারী সংস্থাসমূহ এবং জনসাধারণ সকলেরই এই প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত অর্থসাহায্য করা কর্তব্য।

কার্সিয়ং যক্ষ্মা-হাসপাতালে পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের দান

কার্সিয়ং এম. বি. দে ভানাতোরিয়ামের ব্যৱসিকারাহার পশ্চিমবঙ্গ সরকার সজ্ঞানিত এই প্রতিষ্ঠানকে এক লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এই দানের একটি বিশেষ সর্ভ এই যে, ভানাতোরিয়ামের 'জি বেডের' মধ্যে পশ্চিমা দার্জিলিং জেলার যক্ষ্মা-পীড়িত পার্শ্বত অধিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। ইহার কার্যসম্প্রসারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিপূর্বে চার লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

রাধারমণ কীর্তন-সমাজ

গত ১৪ই জুন, শনিবার রাইটাস বিল্ডিং-এ এক সম্মেলন অনুষ্ঠানে রাধারমণ কীর্তন-সমাজ কর্তৃক 'নৌকাবিলাস' গীত হয়। স্থলিত বৈষ্ণব পদাবলী শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ত্রিভুক্ত হেমচন্দ্র নন্দর মহাশয়



অমৃততাঞ্জান
সর্বপ্রকার বেদনায় জাগতিক বোমার ন্যায় কার্যকরী!

দাদের মলম
চক্ষু রোগে 'পরমাণু শক্তির' ন্যায় কার্যকরী!
অমৃততাঞ্জান লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭



স্বাগিতা ১৮৯৩

উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গত সরোজমুন্দরী দেবীর উদ্যমে উক্ত কীর্তন-সমাজ ১৯৪১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিষ্টাচারপালন উচ্চাচার্যের শিক্ষকতার ইহার বিশেষ উন্নতি বিধান হয়। ভদ্রাবি দীর্ঘ এগার বৎসর ধরিয়া এই কীর্তন-সমাজ বিদ্যা পারি-
ত্রমিকে কলিকাতার ও কলিকাতার বাহিরে কীর্তনগান প্রচার করিয়া আসিতেছে।

জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বে সফল বাঙালী বাংলার বাহিরে একনিষ্ঠ সেবাধারা এবং চরিত্রবলে সর্বসাধারণের প্রভা অর্জন করিয়াছেন, বাঙালী মিউনিসিপালিটির প্রাক্তন সেক্রেটারী জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। গত ২৮শে জুন এই কৃতী প্রবাসী বাঙালী পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৮৯০ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বৈরাট গ্রামে জন্মকালীনামের জন্ম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি অয়েন্ট টেকনিক্যাল বোর্ডের পরীক্ষা পাস করেন। তার পর মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলাসপুরে পি-ভলিউ-ডি'র সার্ভে ওয়ারসিয়ার নিযুক্ত হন। সে কর্ম ত্যাগ করিয়া ১৯১৩ সালে তিনি বাঙালী মিউনিসিপালিটির ওয়ারসিয়ার হইয়া আসেন এবং ১৯২৭ সালে সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেন, কিন্তু পূর্ণকালের বিশেষ অধ্যয়ন-ক্রমে তাঁহাকে আবায় বৎসরাধিক কালের জন্য 'ওয়ারটার ওয়ার্কস্ সুপারভাইজার' নিযুক্ত করা হয়। তিনি সবুজ ৩৭ বৎসর মিউনিসিপালিটির সেবা করেন, এবং বাঙালীতে স্থানীয় বায়ন্ত শাসনের অদৃষ্ট ভিত্তি স্থাপনে সহায়ক হন।

কৃষ্টিবাস অর্চিত

সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

অনামধন্য ভ্রাতা-মাননন্দ ভট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
সুবিখ্যাত কৃষ্টিবাসী রামায়ণের সর্বোৎকৃষ্ট

অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত ছট্টিস

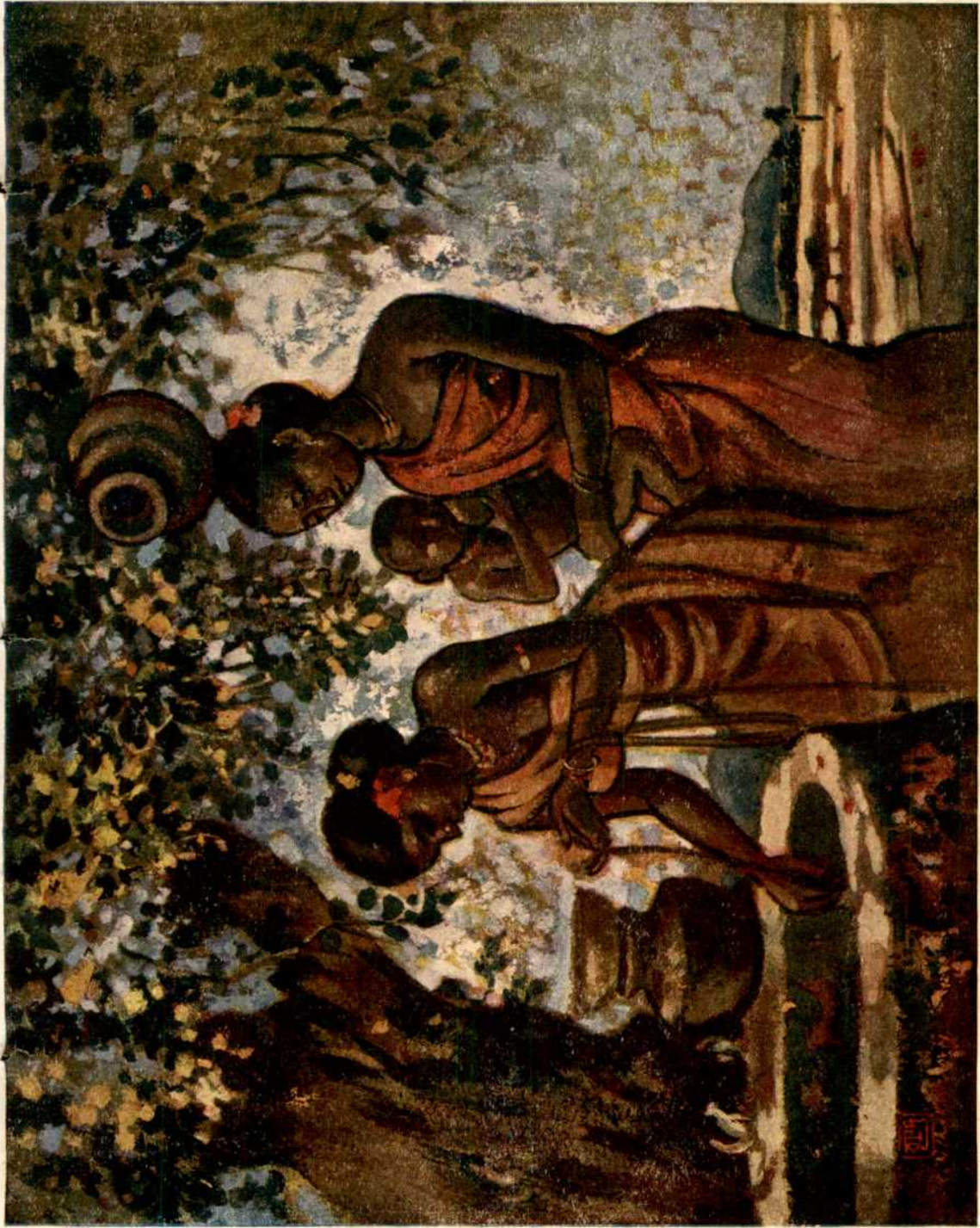
কোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত বাবতীয় প্রকিপ্ত অংশবদ্ধিত যুগগ্রহ অঙ্কসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ। ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আঁকা রঙীন বোলধানি এবং এক বর্ণের তেজস্বিনী ছবি আছে। রঙীন ছবিগুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশালা হইতে সংগৃহীত ছবির অঙ্কলিপি। অন্যান্য বহুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীসম্রাট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রবি বর্মা, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকাল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহামেব বিশ্বনাথ গুরুদ্বার, অসিতকুমার হালদার, সুব্রেন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র দে প্রভৃতির সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত।

অ্যাক্টমুদ্রিত উত্তম পুরু বোর্ড বাইন্ডিং মূল্য ১০.০০, প্যাকিং ও ডাকব্যয় ১.

প্রবাসীর গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নথরসহ সম্মত আবেদন করুন। এই সুযোগ সর্বপ্রকার ছদ্ম স্বেচ্ছা দিনে বেশী দিন স্থায়ী থাকিবে না।

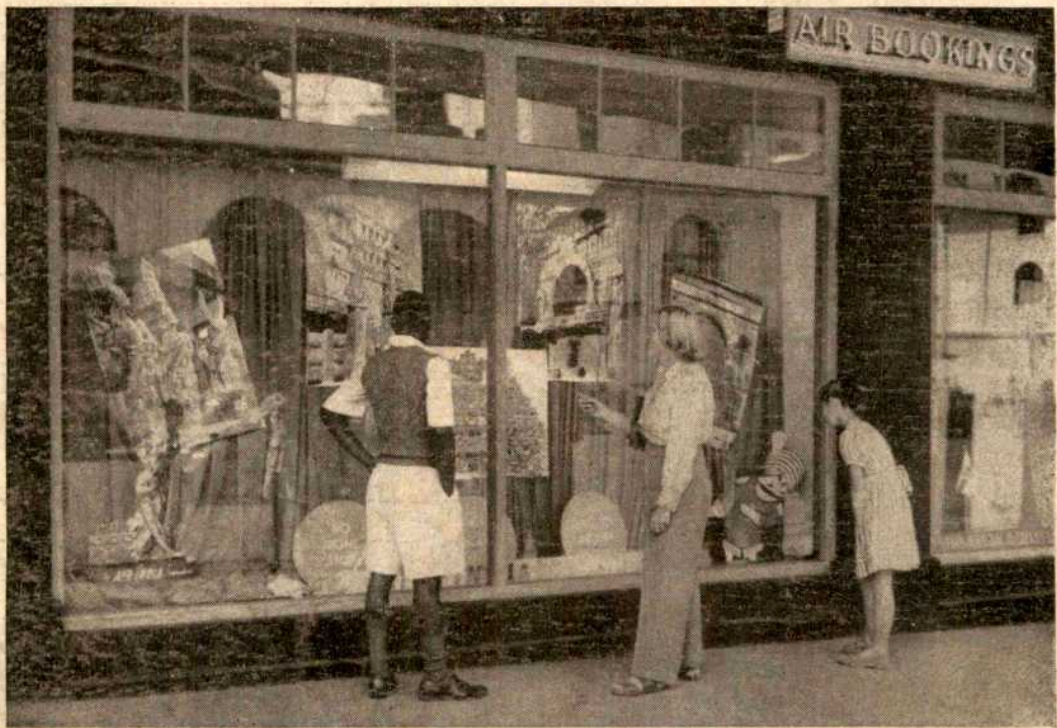
প্রবাসী কার্যালয়—১২০১২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীবিহারগুপ্ত দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০১২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

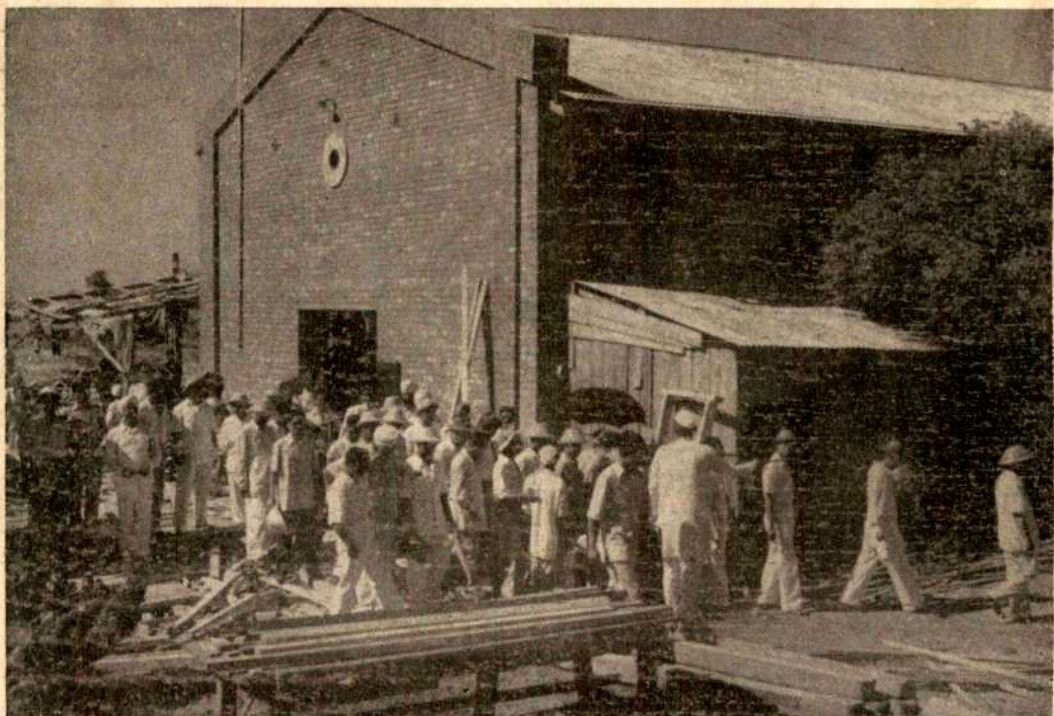


কুমার ধারে
শ্রী ব্রহ্মদেব চন্দ্রবর্মণ

প্রবাসী গোস্বামী কলিকাতা



নাইরোবিতে “এয়ার ইণ্ডিয়া” কর্তৃক ভারত-চিত্র প্রদর্শন



বাস্তুরূপের শহর, নীলোখেরির কাঠের কারখানায় ‘কমিউনিটি প্রজেক্ট অফিসারগণ’ •

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নারায়ণা বলহীনেন লভ্যঃ”

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৫৯

৬৪ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শারদীয়া

শারদীয়া পূজা আগত। বাঙালী ও বাংলার এইটি মহত্ম আনন্দোৎসব। কিন্তু আজ সে আনন্দ কোথায়? দুই-চারি জন ভাগ্যবানের গৃহে হয়ত সত্বপায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সমাগম হইয়াছে, দুই-চারি শত কালোবাজারী বা চোরাকারবারী হয়ত অসত্বপায়ে বিলাস ও ভোগের উপকরণ একত্র করিয়াছে, কিন্তু সমগ্র দেশ ও দেশবাসীর দিকে দেখিলে পূর্বেরকার সে আনন্দোচ্ছ্বাসের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

ইহার কারণ কি বলিতে গেলে তর্কের অবতারণা করা হয়। বাংলায় আর যে কোন প্রকার অভাব থাকুক বা না থাকুক, কুট-তর্কিক ও মিথ্যাবাগীশের কোনই অভাব নাই। সুতরাং বাংলা ও বাঙালীর এত দুঃখ, এত অভাব কেন সে বিচার করিতে গেলে মিথ্যা ও ভুয়া বাক্যজাল কাটিতেই সময় শেষ হইয়া যায়। চল, ছুতা ও মিথ্যাই আজকাল বাজারচলতি জিনিষ, কেননা উহা সহজেই মুখরোচক করা চলে। অগ্রির সত্যের সে গুণ নাই, সে চটক নাই।

এক দিন বাঙালী চিন্তাশীল ছিল এবং তাহার কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ প্রখর ছিল। তাহার সমস্ত মেধাশক্তি ও ক্ষমতা সে কর্তব্য বিচারে ও পালনে প্রয়োগ করিত। সেদিন ছিল বাঙালীর উজ্জল গৌরবের দিন, এবং বাঙালীর উত্তোগ, বাঙালীর প্রয়াস তখন শত বাধা সত্ত্বেও চতুর্দিকে জয়যুক্ত হইত। বাংলার সম্ভান সেদিন নিজের পুরুষকারের বলে আসন্ন দুর্বিষমাতলে বাংলার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ব্যাপ্ত করিয়াছিল। বাঙালী কষ্টে বলিগা, বাঙালী বুদ্ধিমান বলিগা সমগ্র ভারতে সম্মান পাইয়াছিল।

আজিকার “গতগৌরব হৃতআসন” বাঙালীর ও সেদিনকার বাংলার স্বস্বস্তানের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধের। সহজে প্রাপ্ত স্বাধীনতার ফলে আজ আমাদের স্বত্ব ও অধিকার জ্ঞান অতিশয় প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই স্বত্ব ও অধিকার যে কর্তব্য রক্ষা ও দায়িত্বপালনের উপর নির্ভর করে, সে জ্ঞানটুকু আমাদের হয় নাই, স্বাধীনতার বিষয়ে আমরা এতই অজ্ঞ ও এতই

অর্ধাচীন। সে জ্ঞান যদি আমাদের থাকিত তবে আজ আমাদের এইরূপ অবহেলিত ও উপেক্ষিতের ঘৃণা অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিত না।

কলিকাতা নগরী শুধু পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী নহে। ইহা ভারতের বৃহত্তম পুরী, সমস্ত এশিয়া মহাদেশে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ নগর আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আজ এই পুরীর যানবাহন চলাচল হইতে পৌরজনের নাগরিক ও সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার কঠোর প্রকাশ দেখা যায়। টাক্সি ও বাস-চালক যেখানে খুসী থামে, যেভাবে খুসী অন্যের অসুবিধা ও বিপদের দিকে দৃকপাত মাত্র না করিয়া চলে, কেহ তাহাদের কিছু বলে না। নিয়ম অনেক প্রকার আছে কিন্তু সে নিয়মভঙ্গই এখন দস্তুর। প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে শোচাদি ক্রিয়া এ তো কলিকাতার সাধারণ ব্যাপার, গলিতে বা ছোট পথে আরজ্জনার স্তূপ ঢালা দেও সাধারণ ব্যাপার। জল দূষিত, বায়ুও অত্যধিক ধোয়া ও দুর্গন্ধ কলুষিত। “প্রাসাদপুরী” কলিকাতা এখন রোগের খনি, এবং রোগের প্রতিকার দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতেছে। হাসপাতালে স্থান নাই, ঔষধ অগ্রিমূল্য—উপরন্তু ভেজালে ভরা—এবং চিকিৎসকের দক্ষিণা ক্রমেই উচ্চে উঠিতেছে। নাগরিক জীবনের বাহিরেও যে দৈনন্দিন জীবন তাহাতেও বাধা-বিপত্তি অভাব-অনটন বাড়িয়াই চলিতেছে।

কলিকাতাতেই অবস্থা এইরূপ, কলিকাতার বাহিরে, মকস্বেলে, লোকে যে অবস্থার আছে তাহা বর্ণনার অতীত। অনাচার ও অব্যবস্থার প্রাবল্যে তো সারা দেশ—কি নগর, কি গ্রাম—ভুবিতে চলিয়াছে। কে কাহাকে উদ্ধার করিব, দবাই হয় নিজের গণ্ডা বুঝিতেই বাস্তব—নয় হতাশ ভাবে শুধু দিনগত পাপক্ষয়ের কার্যে নিবিষ্ট। এই অভিশপ্ত দেশে লোকের মত মিথ্যা বিচারের ক্ষমতা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যজ্ঞান সবই যেন লোপ পাইয়াছে।

দায়িত্বজ্ঞানের অভাবে দেশের যে কত প্রকার ক্ষতি হইতেছে তাহার নিদর্শন নিম্নোক্ত সংবাদে পাওয়া যায় :

“দার্জিলিং, ১৫ই সেপ্টেম্বর—দার্জিলিংয়ের খাদ্য দপ্তরের গুদাম হইতে খাদ্যদ্রব্যের প্রায় ১৮ শত মণ চাউল উধাও হইয়াছে বলিয়া

ধবর পাওয়া গিয়াছে। দার্জিলিংয়ের খানদণ্ডের মহকুমা কন্ট্রোলার কর্তৃক অনুসন্ধানকালে এই ব্যাপারটি ধরা পড়ে। এই সম্পর্কে গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয় বটে, কিন্তু পদে তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন।

১৮ শত মণ চাউল হুই এক জন লোকের পক্ষে লওয়া সম্ভব নয়। কতজন লোক এই ব্যাপারে জড়িত তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ দণ্ডের কি কোনও দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত সং লোক ছিল না যে ঐরূপ বিরাট অনুপাতে অনাচারের প্রতিরোধ হইল না?

সমস্ত পৃথিবীতে যুদ্ধের মধ্যে কন্ট্রোল ব্যবস্থা কোন না কোন রূপে ছিল। কিন্তু এ দেশে তাহার যে বিষময় ফল দেখা দিয়াছে, অন্য কোনও সভ্য দেশে ততটা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। দেশে যে অনাচার ও দুর্নীতিপরাগণতার শ্রোত বহিতেছে তাহার মূলে এই কন্ট্রোল বিভাগের শৈথিল্য, বিশৃঙ্খলা, কর্তব্যজ্ঞানের অভাব ও দুর্নীতি। কিন্তু কেবলমাত্র সরকারী উচ্চ অধিকারী বা সরকারী বিভাগকে দোষ দিলেই চলে না। ঐরূপ দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসী যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আন্দোলন করিত তবে তাহা বহু পূর্বেই লোপ পাইত।

দেশে আন্দোলন বা অভিযোগ অনুযোগের চীংকারের অভাব নাই। কিন্তু মূলতঃ সং উদ্দেশ্যে—সত্যগ্রহের ন্যায়—কয়টি চালিত বা ঘোষিত হয়? অধিকাংশই ত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য ফাঁকির অভিধান।

শারদীয় প্রকৃত পূজারী যে, সে দেবতার কাছে বর চাহিবে ঐ দিব্যজ্ঞানের, যাহার বলে দেশ জাতি হইয়া বুঝিবে কর্তব্য কি, দায়িত্ব কি। নাইলে এদেশের উদ্ধার নাই।

মানভূম

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন-বৃদ্ধির জন্ত এক প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে সর্বদলের সমর্থনে গৃহীত হয়। প্রস্তাবের ভাষা এবং প্রস্তাবনার চুক্তি হুই-ই বহু দোষযুক্ত। উহার মধ্যে আমাদের চরম আপত্তি ভিকার ইঙ্গিতে। যুক্তির মধ্যে অধিকাংশই অসার এবং অলীক। তবে ঐরূপ অদ্ভুতভাবে প্রস্তাব করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী দল “প্রাদেশিকতা” দোষ বাঁচাইয়াছেন। মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া “জাতধর্ম” রক্ষা যেমন নিয়গামী সমাজের লক্ষণ তেমনিই এইরূপ কপটতাও কংগ্রেসের অধঃপতনের প্রধান নিদর্শন। এ বিষয়ে ১২ই ভাদ্র সংখ্যা ‘সৈনিক’ পত্রিকায় যে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যথার্থ:

“ইংরেজ রাজনীতির প্রয়োজনে বাংলার খানিকটা অংশ বিহারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেদিন সারা ভারতবর্ষ ইংরেজের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, বার বার আমরা চীংকার করেছি বাংলার অংশ বাংলাকে ফিরিয়ে দাও...ইংরেজ শোনে নি।

ইংরেজ চলে গেল, বাংলা আবার ভাগ হ’ল। এবারের ভাগ মারাত্মক ভাগ। দেশকে স্বাধীন করতে বাংলা সে ক্ষতিও স্বীকার করে নিলে। বাংলার মাটি ভাগ হ’য়ে গেল, কিন্তু বাংলার মানুষ ভাগ হ’ল না। তারা চলে আসতে বাধ্য হ’ল। দলে দলে উদাস্তর দল ভীড় করে এসে জমতে লাগল পশ্চিম বাংলার মাটিতে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অবশিষ্ট মাটিতে তাদের স্থান সংকুলান হ’ল না। হুই বাংলার লোক এক বাংলার এসে আজ ভীড় করেছে। আজ জমির আয়তন না বাড়ালে তাদের জায়গা দেওয়া যাবে না।

দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে যে বাংলাকে একদিন ভাগ করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই বাংলাকে সমুদ্র করত রাষ্ট্রের প্রথম কর্তব্য ছিল তার ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধি করা। কিন্তু রাষ্ট্র তা করে নাই।

একদিন গান্ধীজী বলেছিলেন ভাষা হিসেবে রাজ্যগঠন হবে। আজ সে প্রস্তাবকে এঁরা প্রাদেশিক বলে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ভাষা নয়, ভূমি—ভূমির প্রয়োজনে বাংলার নিজস্ব অংশ তার সিংভূম মানভূমকে আজ তাদের প্রতারণা করতেই হবে।

বাংলার আজ উদাস্ত সমস্তা একটা বড় সমস্তা। আজ তাকে জায়গা দিতে হলে কাউকে না কাউকে জমি ছাড়তেই হবে। কিন্তু বাংলার নিজস্ব জমি পড়ে রয়েছে বিহারে—আজ বাংলা সেই জমিটুকুই ফিরে পেতে চায়। কিন্তু বিহার তার স্বেচ্ছা প্রমাণ ভূমি ছাড়বে না বলেছে। বিহারের এ মনোবৃত্তি প্রাদেশিকতা হ’ল না, কিন্তু বাংলা তার নিজস্ব জমি ফিরিয়ে নেবার দাবী করতেই প্রকাশ পেলে তার উৎকট প্রাদেশিকতা।

বাংলা কোনদিনই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার কথা বলে নি। যেখানেই সে বাংলার কথা বলতে চেয়েছে, সেখানেই বলেছে ভারত। স্বামিজী একথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। শুধু বাংলার কথা বাংলার কোন মনীষীই বলেন নি। তবু বাংলাকে আজ প্রাদেশিক অপবাদ সহিতে হচ্ছে।

বাংলার এই আন্দোলনকে তাঁরা যে নামেই অভিহিত করুন, বাংলা তার দাবী ছাড়বে না। আজ তাকে বাঁচতে হবে, এবং মানচিত্রের ক্ষীণ পরিসর তাকে বাড়াতেই হবে। এ প্রাদেশিকতার কথা নয়, মানবতার কথা।

বস্তুতঃপক্ষে প্রাদেশিকতা দোষ কেবল বাঙালীর বেলায়। অল্প সমস্ত প্রদেশে আজ “ডোমিশিল”, অর্থাৎ প্রদেশে স্থায়ী বসবাস, একটা প্রধান অধিকার সূত্র, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়। বিহারে, উড়িষ্যায় ও আসামে ত ভিন্ন প্রদেশীয়ের সকল অধিকার লোপের প্রচেষ্টা সবোঙ্গে চলিতেছে। প্রত্যেক প্রদেশই অল্প প্রদেশীয়ের লাভ লোক-মান বর্ধবোরও মধ্যে আনে না, শুধু পশ্চিমবঙ্গের সে সকল বিচার করিতে হয়। চাকুরীর ক্ষেত্রে মাদ্রাজী, পঞ্জাবী, বিহারী, গুজরাটী যে ভাবে নিজ জাতি ও জাতি পোষণ করেন তাহা তাঁহাদের ক্ষেত্রে স্বজাতিপ্রেম, বাঙালীর পক্ষে তাহা প্রাদেশিকতা।

যাহা হউক, প্রস্তাবের ফল একই হইল। বিহারী দল গর্জন

করিয়া উঠিলেন। তখন আমাদের কংগ্রেস-কুলতিলক শ্রীঅতুল্য ঘোষ এক অপরূপ ভাষণ দিলেন। তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ এইরূপ :
 “বিহারে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধির দাবি সম্পর্কে বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র যে বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন এবং বিহার কণামাত্র ভূমি ছাড়িয়া দিবে না বলিয়া যে উক্তি ও বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বেদনাদায়ক। বাংলার তথা ভারতের প্রতি তাঁহার সামান্যতমও দরদ নাই। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে যে বাংলা স্বাধীনতার জন্ত চরম মূল্য দিয়াছে, নিজেকে দ্বিগুণিত করিয়াছে, বাংলার সংস্কৃতি বাংলার প্রাণকে নিষ্ঠুরভাবে বলি দিয়াছে, আজ তাহার বাঁচিবার সামান্যতম নম্র দাবিকে এইভাবে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

“বাংলার আয়তন বৃদ্ধির দাবি সম্পূর্ণ ঋায়সঙ্গত এবং বৃহত্তর মানবতা-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলার জনসংখ্যার অল্পপাতে তাহার স্থান অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সেই ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ স্থানের উপর পূর্ব-বঙ্গ হইতে ত্রিশ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু আসিয়াছেন। তাঁহাদের স্থান দানের জন্ত বাংলার এই যে দাবি তাহা যুক্তিপূর্ণ, সময়োপযোগী এবং সঙ্গত। সেইজন্য বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি যদি আজ বাংলা দাবী করে—তবে সে দাবী কখনো অজ্ঞায় নহে। বাংলার কল্যাণে বিহারের কল্যাণ তথা সমগ্র ভারতের কল্যাণ হইবে।

“আজ বিহারের নিকট সম্পূর্ণ মৈত্রী ও শ্রীতির ভাব লইয়া নতজাহ্নু হইয়া কব্বোড়ে জানাইতেছি। ঐ সকল অঞ্চল আমাদের দিতে হইবে।

“তাই আজ বিহারের নিকট আমাদের আবেদন, আমাদের প্রার্থনা, মানবতার নামে আমাদের দাবি, তাঁহার যেন আমাদের বাঁচিবার মত স্থান দান করেন।

“যদি বিহার সেই দাবিকে উপেক্ষা করে, যদি বাংলার এই নম্র দাবি, এই বাঁচিবার মত দাবি উপেক্ষিত বা পদদলিত হয়, তাহা হইলে বিহার যেন জানিয়া রাখে বাংলা সংগ্রামের পথই বাছিয়া লইবে।

“আমরা দমিব না, বা ভয় পাইব না। বাংলা কাহাকেও ভয় করে না। বিহারের কোন হুমকি তাঁহাকে তাহার লক্ষ্যস্থল হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিবে না। আমরা দলে দলে পায়ে হাঁটিয়া বিহারের ঐ সমস্ত অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করিব। অশেষ দুঃখ, অশেষ নির্যাতন বুক পাতিয়া লইব।”

“নতজাহ্নু” ও “করজোড়” হওয়া অবশ্য আজ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস অধিকারীবর্গের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু একেজ্ঞে একরূপ ব্যায়ামের ফল নেতৃবর্গের উদরের পরিধি হ্রাস ভিন্ন অথ কোনও লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা ইন্দোয়ের নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে দেশের উচ্চতম অধিকারী শ্রীনেহরুর ভাষণেও বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তিনি বিহার-বাংলা সমস্যা সম্পর্কে বলিয়াছেন :

বাংলা-বিহার সমস্যা লইয়া যে তিক্ততা ও উত্তেজনার স্রষ্ট

হইয়াছে, তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতজী বলেন, “দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ অত্যধিক ক্লেস ভোগ করিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে বহু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে ভীড় করিয়াছে; বাংলার সমস্যা আমি বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু যে ব্যাপারে আমি অতিশয় অভিভূত হইয়াছি, তাহা হইল এই যে ভারতীয় ইউনিয়নের দুইটি রাজ্য এমন মতবিরোধ ও তীব্র পার-স্পরিক সমালোচনায় লিপ্ত হইয়াছে যেন তাহারা দুই পরস্পর-বিরোধী দেশ। দুইটি রাজ্যের মধ্যে যদি কোনও বিষয় লইয়া মত-বিরোধ থাকে, তাহা হইলে উহার মীমাংসা করিতে হইবে শান্তিপূর্ণ ভাবে। কিন্তু উপযুক্ত বুঝাপড়ার জন্ত চাই আন্তরিকতাপূর্ণ আব-হাওয়া।”

পার্লামেন্টে বিহারের (মানভূম) সদস্য শ্রীভজহরি মাহাতের বিবৃতি কি পণ্ডিতজী শুনে নাই? যদি না শুনিয়া থাকেন তবে কি “হরিজন” পাঠও তিনি বন্ধ করিয়াছেন? যদি তিনি শুনিয়া থাকেন বা পড়িয়া থাকেন—এবং আমাদের বিশ্বাস তিনি তাহা শুনিয়াছেন ও পড়িয়াছেন—তবে ঐ “আন্তরিকতাপূর্ণ আবহাওয়া” ইত্যাদি ভূয়া কথা অবতারণা তাঁহার পক্ষে চলনা মাত্র। শ্রীভজ-হরি মাহাতের বিবৃতি এইরূপ :—

[শ্রীভজহরি মাহাত ১৯৫২ সালের ১২ই জুলাই বিহারের মানভূম কেন্দ্র হইতে লোকসেবক সংঘের পক্ষে ভারত লোকসভায় নির্বাচিত হন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি লোকসভায় হিন্দীতে নিম্নলিখিত ভাষণ দিয়াছেন :

—অতুলচন্দ্র ঘোষ]

“সমস্যা বিষয়ে নিজেদের মনোভাব ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া লোকসেবক সংঘের পার্লামেন্ট সদস্য শ্রীভজহরি মাহাত বিগত ১২ই জুন লোকসভায় নিম্নলিখিত মত বক্তৃতা করেন। বক্তাদের নাম-তালিকায় পূর্ব হইতে তাঁহার নাম না থাকা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবের সহিত মানভূমের সমস্যা জড়িত থাকায় স্পীকার শ্রীমভলঙ্কর শ্রীভজহরি মাহাতকে বক্তৃতার বিশেষ অধুমতি প্রদান করেন। বক্তৃতার বিশদ বিবরণ এই :

আমি মানভূমের অধিবাসী। আমার ভাষা বাংলা। আমি ইংরেজী একেবারেই জানি না। হিন্দীও প্রায় জানি না। ইংরেজী আমলে জেলের সুযোগলাভে হিন্দী লেখাপড়া সামান্য করিয়া ছিলাম। বাহিরেও ইদানীং হিন্দী শেখার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু হিন্দীপ্রেমীর দল মানভূমে জ্বরদস্তী হিন্দী চালাইবার জন্ত যে অবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আমরা সেই সব অত্যাচার লইয়াই অস্থির আছি—হিন্দী শেখার অবস্থা আর নাই। আমি হিন্দী বিশেষ কিছু না জানিলেও রাষ্ট্রভাষা বলিয়া আমি ভাষা হিন্দীতেই কোন রকমে বলিতে চেষ্টা করিতেছি। ভুল হইলে মাক করিবেন।

ভাষার ভিত্তিতে দেশগঠনের প্রশ্ন মানভূমের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানভূমে এই ভাষাভিত্তিক প্রদেশের প্রশ্ন লইয়া যে অত্যাচার চলিতেছে তাঁহার জন্তই ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে।

“আমরা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্নকে কখনো প্রাদেশিকতার দৃষ্টিতে দেখি নাই। মানভূমে আমরা বরাবরই সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত ভাবে কাজ করিয়াছি। আমরা কংগ্রেসেই ছিলাম। কংগ্রেসকে আমরা গড়িয়াছি। শ্রীঅতুল বাবুর নেতৃত্বে আমরা বরাবরই ঐ ভাবেই কাজ করিতে-ছিলাম। কিন্তু কংগ্রেস ছাড়িতে বাধ্য হইলাম। সুতরাং আমরা ভাষার ভিত্তিতে দেশগঠনের প্রশ্নকে প্রাদেশিকতার দৃষ্টিতে না দেখিয়া বরাবরই গান্ধীজীর বিচার ও শিক্ষায় শাসন ব্যবস্থায় স্তবধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলাম। তথাপি আমরা নিজেরা এ বিষয় কখনো উত্থাপন করি নাই। কারণ আমরা ভাবিতে-ছিলাম—ভারতের নেতৃবৃন্দ নিজেরাই এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন। নেতৃবৃন্দকে জানাইতেছি—এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা উচিত নয়—শীঘ্র এ বিষয় চূকাইয়া ফেলা উচিত। কারণ এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকার জন্ত মানভূমের উপর যে অবস্থা করা হইতেছে—তাহাতে এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে—মানভূমের জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লব দেখা দিবে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কথা উত্থাপন করিলে তাহাকে প্রাদেশিকতা বলা হইতেছে। কিন্তু যাহারা ঐ কথা বলিতেছেন এবং যাহাদের হাতে আজ শাসন তাঁহাদেরই আজ প্রাদেশিকতা করিবার সুযোগ হইয়াছে এবং তাঁহারা প্রাদেশিকতা করিতেছেন। নিজ রাজ্যের সীমা হইতে অল্প ভাষাভাষী অঞ্চল যাহাতে ভাষার প্রশ্নে বাহির হইয়া যাইতে না পারে তজ্জন্ত প্রাদেশিক সরকার অল্পভাষাভাষীদের উপর জবরদস্তি হিন্দী চালাইয়া তাহাদের মাড়ুভাষা নষ্ট করিতেছেন। ইহারাই প্রাদেশিকতা করিতেছেন।

“বলা হইতেছে—মানভূম প্রভৃতি স্থানের এই ভাষার প্রশ্ন বিহার ও বাংলা প্রদেশ মিলিয়া স্থির করিয়া লও। কিন্তু আমি বুঝি না যে আসামী ও বাদীর নিজেদের মধ্যে মীমাংসা কি করিয়া হইবে? কাশ্মীর ব্যাপারে বিশ্বজাতি সংঘ বলিতেছেন পাকিস্থানে ও হিন্দুস্থানে মিলিত ভাবে মীমাংসা করিয়া লও। কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী বলিতেছেন—তাহা হইতে পারে না। কাশ্মীরের জনগণই নিজেদের বিষয় নিজেরা স্থির করিবে। অথচ ভারত-সরকার জাতি সংঘের মত বলিতেছেন যে, এই সমস্তা বাংলা বিহারে মিলিয়া করিয়া লও। এখান মন্ত্রীর দাবির মত আমরাও বলিতেছি যে, ইহা মানভূমবাসীরাই স্থির করিবে; মানভূমের জনসাধারণকে নিজের ভবিষ্যৎ স্থির করিতে অধিকার দেওয়া হউক। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি বিষয়ে আমাদের লোকসেবক সংঘের নিজ সিদ্ধান্ত থাকিলেও, এ বিষয়ে নিজ ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থির করিবার অধিকার মানভূমের জনগণের উপর আমরা রাখিয়াছি।

“মানভূমের অবস্থা আজ পাকিস্থানের মত। পাকিস্থানে হিন্দুদের উপর যেমন অত্যাচার চলিতেছে—ভাষার প্রশ্নে বিহার সরকার মানভূমের বাংলাভাষাভাষীদের উপর পাকিস্থানের স্থায় বৈষম্যমূলক

ব্যবহার ও অত্যাচার করিতেছেন। এই প্রশ্নের শীঘ্র সমাধান করা প্রয়োজন। শীঘ্র তদন্ত করিয়া দেখা হউক—বিহার সরকার ঠিকমত শাসনের দায়িত্ব পালন করিতেছেন কি না। সরকার যখন ভাষার প্রশ্নে প্রাদেশিকতা ও উৎপীড়ন করিতেছেন—তখন ভাষার প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত, মানভূমের শাসনভার বিহার-সরকারের হাত হইতে লইয়া লওয়া হউক। বিহার সরকার মানভূমের জনগণের উপর যেভাবে উৎপীড়ন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা মানভূম-বাসী ভারতীয় শাসনের অধীনে যে কোন স্থানে থাকিতে পারি, কিন্তু আমরা আর বিহার সরকারের শাসনাধীনে থাকিতে কখনই চাই না; আমরা মুক্তি চাই। (হিন্দীতে প্রদত্ত বক্তৃতার বাংলা তর্জমা)

“দ্রষ্টব্য : নির্বাচনে যে সকল বিভিন্ন দল অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমি যতটা সংবাদ পাইয়াছি, শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ পরিচালিত মানভূমের লোকসেবক সংঘের কার্যপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত নির্দোষ বলিয়া মনে হয়। বিহার আইন সভার ১১ কিংবা ১২টি আসনের মধ্যে এই দল ৭টি এবং বিহার হইতে লোকসভার নির্বাচনে ২টি আসন লাভ করিয়াছে। ইহার কেবলমাত্র লোকপ্রিয়তার শক্তিতেই এই আসন লাভ করিয়াছে, ইহাদের অর্থবল তেমন ছিল না। বহুদিন ধরিয়াই অতুলবাবুর সহিত আমার পরিচয়, তাহার মধ্যে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা নাই। মানভূমের গুণগোলের জন্ত বহুলাংশে দায়ী বিহার গবর্ণমেন্টের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও জবরদস্তীপূর্ণ ব্যবহার। যদি বিহার নিজের চোঁহদীর মধ্যে মানভূমকে রাখিতে চায় তবে তাহাকে নত হইয়া এবং প্রেম ও স্নায়পূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা জেলার বাংলাভাষাভাষীদের মন জয় করিতে হইবে। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি তর্জনগর্জনকারীদের সমীহ করিয়া চলিতেছে অথবা যতকাল সম্ভব সমস্তকে ধামাচাপা দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এই দুর্বলতার জন্ত তাঁহাদের সুনাম নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে।”—(“হরিজন” সম্পাদক কিশোরীলাল মশরুওয়ালার মন্তব্য)

“নভজানু কৃতাজলিপুট” মহাশয়কে আমাদের নিবেদন। এইমাত্র যে, মানভূমের বাঙালীর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলিতেছে তাহার প্রতিকার চেষ্টা কি আমাদের কর্তব্য নয়? বিহারের মহৎ ব্যক্তিগণের বাঙালী-প্রেম কিরূপ সে বিষয়ে শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালার মন্তব্য সাক্ষ্য দিতেছে।

বর্তমান বিহারী নেতৃবর্গের বাঙালী-বিরোধ অস্থিমজ্জাগত। তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি বিহারের ভূমিকম্পের সময়, যখন রাজেন্দ্রবাবুর স্বৈচ্ছাসেবক দল একদিকে বাঙালীর “মেয়স ফণ্ড” হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিতেছিলেন, অন্যদিকে বিহারের ভূমিকম্পপ্রিষ্ট ও আহত “বাঙালী লোগ” যাহাতে কোনও সাহায্য না পায় তাহার চেষ্টাও চালাইতেছিলেন। এ বিষয়ে কলিকাতার সংবাদপত্রে অভিযোগ প্রকাশিত হইলে রাজেন্দ্রবাবু প্রথমে সজোরে বলেন, উহা সর্বৈব মিথ্যা। পরে অভিযোগ সভা বলিয়া প্রমাণিত হইলে তিনি স্বয়ংস্বাক্ষরিত হইয়াছেন—

গত যুদ্ধের মধ্যে, '৪২ সনে পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা ও হিন্দু নিধাতন চলে।—যুদ্ধের ওজুহাতে ব্রিটিশ সরকার সে সকল সংবাদ চাপিয়া দেয়। তখন একমাত্র পথ ছিল এই বিষয় উল্লেখ করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদ স্বাগত করার প্রস্তাব আনয়ন করা। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঢাকায় স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা দেখিয়া এরূপ প্রস্তাব আনয়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার নিজের দল ছোট বলিয়া ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী দলের সমর্থন প্রার্থনা করেন, এবং সে দলের তখনকার অধিনায়ক শ্রীকিরণশঙ্কর রায় তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু তখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং তাঁহার অনুমতি বিনা কংগ্রেস দল উহা সমর্থন করিতে পারিত না। শ্যামাপ্রসাদবাবু অনেক কষ্টে, কিরণ বাবুর মারফৎ, রাজেন্দ্রবাবুর সহিত এ বিষয়ে টেলিফোনে আলোচনা করেন। রাজেন্দ্রবাবু অতি রুঢ় ভাবে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এমন কি স্বচক্ষে দর্শনের জ্ঞাত তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি বলেন তাঁহার নানা স্থলের নিমন্ত্রণ রক্ষা হইলে পরে তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন। অর্থাৎ বাঙালী মরে কি বাঁচে সেটা তিনি ধর্মবোয়ের মধ্যেই আনিতে চাহেন নাই।

শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাদের এ সকল কথা জানাইলে আমরা উত্তর প্রদেশের এক বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীর মারফৎ এই সকল কথা ও শ্যামাপ্রসাদ বাবু-প্রদত্ত দাঙ্গার বিবরণী মহাত্মা গান্ধীর নিকট ওয়ার্কায় পাঠাই। সে সকল দেখিয়া, তিনি রাজেন্দ্রবাবুকে কঠোর তিরস্কার করিয়া তাঁহার কর্তব্যের কথা বুঝাইয়া দেওয়ায় উহা স্বাগত করার প্রস্তাবে শ্যামাপ্রসাদবাবু কংগ্রেস-দলের সমর্থন লাভ করেন।

রাজেন্দ্রবাবু বিহারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বর্তমানে তাঁহার মনোভাব অনেক উন্নত, অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। ময়ুরাঙ্গী পরিকল্পনার মশানজোড়স্থিত প্রধান বাঁধের নির্মাণে বিহারীরা দুই বৎসর নানা মিথ্যা ওজুহাতে বাধা দেয়। রাজেন্দ্রবাবু সেখানে হস্তক্ষেপ করাতেই তাহার নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বিহারের নেতৃবর্গের মনোভাব কিছুমাত্র পরিবর্তিত হইয়াছে মনে হয় না।

এই তো অবস্থা। এখানে করজোড় ইত্যাদি নাটকীয় প্রক্রিয়ায় কোন বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। এখানে প্রয়োজন স্পষ্ট ভাবায় অপহৃত অঞ্চলের প্রত্যর্পণ দাবি এবং তাহার সমস্তটা। অত্থায় প্রয়োজন দেশব্যাপী সবল, স্বদৃঢ় সত্যার্থ অভিযান। তাহার পথ আছে, সে বিষয়ে দেশবাসী নিশ্চিত থাকুন।

শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর “হরিজন” সম্পাদক শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা ৬২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে শ্রীকিশোরলালের স্থান অত্যন্ত ছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য, শ্রান্ত মন লইয়া তিনি কিছুদিন যাবৎ অবসর লইবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু সে অবসর তাঁহার জুটিল অস্তিমরূপে।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর হইতেই তিনি গুরু পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া “হরিজন” সম্পাদনা করিতেছিলেন। একাধিকার, সত্যনিষ্ঠা ও

নিরপেক্ষতার গান্ধীজী সাংবাদিক জগতে “হরিজন”কে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন শ্রীকিশোরলাল সেই উচ্চ আদর্শ তাঁহার সাধ্যমত উজ্জ্বল রাখিতে সদাই চেষ্টা করিতেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের সম্পাদকমণ্ডলীর এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

পণ্ডিত নেহরু তাঁহার মৃত্যুসংবাদে শোক প্রকাশ করিয়া যে টেলিগ্রাম করেন তাহাতে তিনি বলেন,

“তিনি সেই মহৎ দলের একজন যাহারা আজকার ঘটনা শ্রোতে বিচলিত না হইয়া স্থিরভাবে গান্ধীজীর মহান আদর্শের পথে চলিয়াছেন।”

সাংবাদিক জগতে আজ সুবিধাবাদই প্রশস্ত পথ। এই পথে সত্যাসত্যের কোনও বালাই নাই, ন্যায়ধর্মের কোনও কথাই নাই। আছে শুধু আয়ের চেষ্টা ও পরোক্ষভাবে খ্যাতির চেষ্টা। সেই হিসাবে এই সত্যকাম, মিতভাবী ও ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিকের মৃত্যুতে কোনও বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু চিরন্তন যদি কিছুমাত্র এই ক্ষেত্রে থাকে, বাহা সাংবাদিকের উচ্চতম আদর্শের পর্যায়ে পড়ে, তবে সেই হিসাবে আমরা বলির আমাদের একজন অন্যতম পথপ্রদর্শকের তিরোধান হইয়াছে।

সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় বৃত্তি

“বিগত ২৬শে জুলাই সেনেটের অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে সুধীরকুমার বৃত্তি ফাণ্ডে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার জ্ঞাত ধন্যবাদ জানান। এই ফাণ্ডের টাকায় বাঙালী যুবকদের সাময়িক বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হইবে। এক বৎসর পর পর এই ফাণ্ড দেওয়া হইবে বা অনুরূপ কোন সরকারী কলেজে সাময়িক শিক্ষালাভের জ্ঞাত একটি ছেলেকে বাৎসরিক ১০০০ টাকার বৃত্তি দিবে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় এই লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা অর্পণ করিলেন। বিভিন্ন খাতে এই অর্থ হইতে উপযুক্ত ছাত্রদিগকে সাহায্য করা হইবে। একমাত্র সন্তানের স্মৃতিতে অর্পিত এই অর্থ উপযুক্ত পাত্রের শিক্ষায় ব্যয়িত হইলে বাঙালী ছেলের কৃতিত্বের মধ্যেই তাঁহার পুত্র ভবিষ্যতের বাংলাদেশে চিরজীবী হইয়া থাকিবে।

রাজ্যপালের দৃষ্টান্তে আরও অনেকে এইরূপ ত্যাগের ও মহানুভবতার পরিচয় দিলে দেশের কল্যাণ হইবে।”

‘শিক্ষা’ পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় উপরোক্ত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন শিক্ষাব্রতী। তাঁহার কৃষ্ণসাধনের ফলেই এরূপ মহা-দান-ব্রতের উদযাপন সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার আদর্শে দেশের লোক অনুপ্রাণিত হউক।

রাজনীতিতে শব্দের মায়াজাল

কলিকাতা হইতে নব-প্রকাশিত “এশিয়া” পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব সদস্য আর্থার কোয়েসলার

লিখিতেছেন, “...আমরা এক শব্দার্থ স্ফীতির মধ্যে বাস করছি যার ফলে ভাষা এবং তার অর্থের একটা কালোবাজার জন্মেছে; যেখানে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের ব্যবসা তার ‘অর্থ’ মালের উপর চলছে; যার সঙ্গে তার সরকারী গৃহীত অর্থের বহুত পার্থক্য রয়ে গেছে।...” “...‘ধনতত্ত্ববাদ’ ও ‘সমাজতত্ত্ববাদ’, ‘দক্ষিণপন্থী’ এবং ‘বামপন্থী’ ইত্যাদি বিপরীত অর্থবোধক শব্দগুলো আজ প্রকৃত পক্ষে অর্থহীন হয়ে পড়েছে।...” উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে ‘রাজনৈতিক বামপন্থী’ শব্দের উৎপত্তি হয়—১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে। পরিবর্তন কক্ষে গণতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী সভাবন্দ রাষ্ট্রপতির বাম দিকে আসন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করার ক্রমে ইউরোপে এই প্রথা গৃহীত হয়। কালক্রমে “সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক, উদারনৈতিক চরমপন্থী, প্রগতিশীল অথবা বৈপ্লবিক ভাবধারাকে বুঝাইবার জন্ত ‘বামপন্থী’ শব্দ দিয়া আলঙ্কারিক প্রয়োগ করিবার দস্তর চালু হইল, এবং যতই এই শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্রের সীমা তাহার নিজস্ব অর্থবোধকে ছাড়িয়া যাইতে লাগিল, তাহার আবেগময় আবেদন করিবার শক্তিও ততই জোরদার হইতে লাগিল। এই ভাবে, এই শব্দটি তাহার নিজ জন্মস্থানে অর্থাৎ ফরাসী চেম্বরে গত যুদ্ধের প্রারম্ভকালে প্রায় আধ ডজন রাজনৈতিক দলের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহাদের কার্যকলাপ এবং সাধারণ বিচারের মান অনুযায়ী কিন্তু এই দলগুলির প্রত্যেকটিই রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল এবং বাস্তবিক পক্ষে বামপন্থীবিরোধী।

মানব মনের উপর ভাষা তথা শব্দের প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি আমাদের শব্দের বর্ণনামূলক এবং আবেগমূলক ব্যবহারের মধ্যের মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে বলেন। “যদি কয়েকটি শব্দ, যথা বাম, শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি সাধারণ মনে কি ভাবে রেখাপাত করে সে সম্বন্ধে কেউ চিন্তা করেন তবে দেখবেন যে, বর্তমানে এই শব্দগুলোর স্বকীয় কোন মানে নেই। অথচ এই শব্দগুলোর সঙ্গে কি প্রচণ্ড আবেগের বারুদ জড়ান রয়েছে। এই থেকে এই সন্দেহ খুব স্বাভাবিকভাবেই আসবে যে, রাজনৈতিক জগতে এমন কোন নিয়ামক হস্ত আছে যাহার প্রভাবে শব্দের সাধারণ অর্থ আর তার আবেগময় প্রভাবের মধ্যে এক বিপরীত সম্পর্কের আত্মপাতিক নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।”

“বাম’ শব্দটি আজকের দিনে প্রয়োজনহীন এক ক্ষতিকারক স্বার্থে ব্যবহৃত হইতেছে। উদারনৈতিক হইতে স্তব্ধ করিয়া চরম বামপন্থী পর্যন্ত সকলের উপরই অবিরামভাবে ইহার বর্ণসমারোহের প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে এবং এই ভাবে উদারনৈতিক প্রগতিপন্থী এবং অত্যাচারী ত্রাসপূজারীদের মধ্যে এক মূলগত ঐক্যবোধের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। এই এলোমেলো পরিভাবকে উদাসীনভাবে মেনে নেওয়ার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ এই শব্দটির অন্তর্নিহিত প্রগতিমূলক চিন্তাধারাকে কমুনিষ্ট অরাজকতাবাদের সহিত এক করে দেখিয়ে থাকে। তা ছাড়াও মানব মনের উপর শব্দের

এমনই যাত্ৰাকরী ক্ষমতা আছে যার ফলে যিনি নিজেকে বামপন্থী বলে অভিহিত করতে থাকেন তাঁর অবচেতন মনে ‘বামপন্থী’ রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যে ঐক্যবোধের সূচনা হয় তা ক্রমশঃ মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও এক বাস্তব একতাবোধের পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।”

এরই বাস্তবরূপ আমরা দেখিতে পাই “শান্তির সংগ্রাম” “জনগণের গণতন্ত্র” ইত্যাদি বুলির কমুনিষ্ট কূটনৈতিক কালো-বাজারের ফাঁদে অনেক বিখ্যাত এবং মহৎ ব্যক্তির মানসিক দাসত্ব।

স্বাধীনতা সংগ্রামে কমুনিষ্টদের ভূমিকা

গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টি সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত যে সহযোগিতা করিয়াছিল তাহা সর্বজনবিদিত। টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রতম নেতা তারেব স্লীম সম্প্রতি ভারতবর্ষে এক সংবাদপত্র সম্মেলনে কমুনিষ্টদিগের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষ ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। ২১শে ভাদ্র তারিখের এশিয়া পত্রিকা হইতে তাঁহার ভাষণের অংশ-বিশেষ পাঠকদিগের অবগতির জন্ত উদ্ধৃত করা হইল :

“তিনি বলেন, যতক্ষণ তাঁহারা (কমুনিষ্ট) ক্ষমতায় থাকেন না ততক্ষণই নিজদলগত স্বার্থে, জনমত পাইবার জন্ত, উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার কথা আড়ড়াইয়া থাকেন মাত্র। ১৯৪৫-৪৬ সালে ফরাসী কমুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা আসিলে তখন কমুনিষ্ট মন্ত্রীরা স্বয়ং দমনের অস্ত্রস্বরূপ হইয়া টিউনিসিয়ার সর্বপ্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছিল। তিনি বলেন যে টিউনিসিয়ার কমুনিষ্টরা ফরাসী কমুনিষ্ট পার্টির শাখা মাত্র (এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ কমুনিষ্ট পার্টির সহিত ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির সম্পর্ক স্মরণীয়)।”

টিউনিসিয়ার এই বীরনেতার মার্থার উপর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদিগের প্রাণদণ্ডাদেশ বুলিতেছে।

ভারতের জনগণনা

১৯৫১ সালের লোকগণনায় ভারতের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ। জম্মু ও কাশ্মীরের লোকসংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। জম্মু ও কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যা বর্তমানে ৪৪ লক্ষ। ভারতে পুরুষের সংখ্যা ১৮ কোটি ৩৩ লক্ষ, আর নারীর সংখ্যা ১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ, অর্থাৎ প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৯৪৯। ১৯০১ সালে বর্তমান বিভক্ত ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৮৪ লক্ষ, ১৯১১ সালে ২৫ কোটি ২৩ লক্ষ; ১৯২১ সালে ২৫ কোটি ১৫ লক্ষ; ১৯৩১ সালে ২৭ কোটি ৯২ লক্ষ; এবং ১৯৪১ সালে ৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ। গত দশ বৎসরে ভারতে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে ৪ কোটি ২০ লক্ষ। মোট শতকরা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১২.৫; আর বৎসরে গড়পড়তা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.২।

বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতি পরিকল্পনার দ্বারা নির্বাহিত হয়, সেই জন্ত জনগণনার সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

১৯৫০ সালে আমেরিকার জনগণনার মাথাপিছু ২,৮৫০ টাকা খরচ হইয়াছিল, ভারতে মাথাপিছু খরচ হইয়াছে প্রায় ২০১২ টাকা।

ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জন প্রায় চাষী। চাষীদের শতকরা ৩৩ জনের জমি নাই। এদেশের শহরবাসীর সংখ্যা ৬ কোটি ২০ লক্ষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ জন শহরে বাস করে। বাংলাদেশে শহরবাসীর সংখ্যা কিছু বেশী, এখানে শতকরা প্রায় ২৫ জন শহরে বাস করে। ১৯৪১ সালে ভারতে শতকরা ১৪ জন শহরে বাস করিত। এক লক্ষ বা ততোধিক লোক বাস করে এরকম শহরের সংখ্যা বর্তমানে ৭৫টি, ১৯৪১ সালে ছিল ৪৮টি এই রকম শহর। এদেশে গ্রামীণ সভ্যতার পরিবাহক হিসাবে দেখা যায় উড়িষ্যা, আসাম এবং বিহারকে। এই তিনটি প্রদেশে শতকরা ৪ হইতে ৬ জন শহরে বাস করে।

ভারতে প্রতি বর্গ মাইলে গড়পড়তায় ২৮১ জন বাস করে। বাংলাদেশে বসতিঘনতা অনেক বেশী, এখানে প্রতি বর্গ মাইলে গড়পড়তায় ৮৩৯ জন বাস করে। কলিকাতায় প্রতি বর্গ মাইলে গড়পড়তায় ৭৭,২৬৩ জন বাস করে; হাওড়ায় প্রতি বর্গ মাইলে ২,৮৮৫ জন বাস করে, হুগলীতে—১,২৯১ জন; ২৪ পরগণায়—১,১৪৪; বর্ধমানে—৮০৯; মুর্শিদাবাদে—৮৩১; নদীয়ায়—৭৬০; মালদায়—৬৮০; মেদিনীপুরে—৬৩৫; বীরভূমে—৬১৩; পশ্চিম দিনাজপুরে—৫০৯; কুচবিহারে—৫০৭; দার্জিলিঙে—৩৭৩ এবং জলপাইগুড়িতে—৩৬৩ জন। ভারতে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে বসতিঘনত্ব সবচেয়ে বেশী; সেখানে গড়পড়তায় প্রতি বর্গমাইলে ৯২৯ জন বাস করে।

কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড

কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এক্ট অনুসারে কর্মীদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রথা বর্তমানে চালু করা হইয়াছে। কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যাপারে বর্তমান ব্যবস্থাটি সারা এশিয়ার মধ্যে অতুলনীয়। কারণ এত অধিক সংখ্যক কর্মীদের জন্ম নাকি এইরূপ ব্যবস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর কোথাও নাই। এতদ্বারা প্রায় ১৬ লক্ষ লোক উপকৃত হইবে। বর্তমানে ছয়টি শ্রমশিল্পে এই আইনটি প্রচলিত করা হইবে, যথা, বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প, সিমেন্ট কারখানা, যন্ত্রশিল্প, কাগজ এবং সিগারেট।

সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে স্বাস্থ্যবীমাকে অগ্রণী করা হইয়াছে। বর্তমান রাষ্ট্র মাজলিক রাষ্ট্র এবং সামাজিক নিরাপত্তাবিধান মাজলিক রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ। এই সকল শিল্পে যে সব কারখানার পঞ্চাশ বা ততোধিক কর্মী আছে তাহাদের পক্ষেই এই আইনটি প্রযোজ্য। অবশ্য সরকারী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠানগুলি এই আইনের আওতায় পড়িবে না। যে সকল কর্মীর এক বৎসর চাকরী হইয়াছে এবং বাদের মূল মাহিনা তিন শত টাকার অধিক নহে কেবলমাত্র তাহারাই ইহার দ্বারা উপকৃত হইবে। তবে চুক্তিবদ্ধ কর্মী সকল বাদ থাকিবে।

কর্মীদের মোট মাহিনার প্রতি টাকার এক আনা করিয়া দিতে হইবে, এই এক আনা মূল মাহিনা তথা মাগ্‌গী ভাতার উপর দিতে হইবে। মালিক সমপরিমাণ অর্থ, অর্থাৎ টাকার এক আনা হিসাবে দিবে।

কেন্দ্রে এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ট্রাস্টি বোর্ড থাকিবে এবং ইহারাই প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিবে। সরকারী প্রতিনিধি, কর্মীদের প্রতিনিধি এবং মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া ট্রাস্টি বোর্ডগুলি গঠিত হইবে। পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইলে কর্মী তাহার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড হইতে সকল টাকা পাইবে—নিজের এবং তাহার মালিকের প্রদত্ত অংশ। তবে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর তারফাণ্ডের সভ্য হওয়া প্রয়োজন। যে কোন সময়ে যদি সে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হয় তাহা হইলেও সে সকল টাকা পাইবে। আর জীবনবীমার পলিসির জন্ম টাকা দিবার প্রয়োজন হইলে ফাণ্ড হইতে মাঝে মাঝে ধার লইতে পারে।

ভারতে আয়কর

ভারতের আয়করের ১৯৫১-৫২ সালের হিসাব সম্প্রতি ভারত সরকার প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫১-৫২ সালে ১৮৫ কোটি টাকা আয়কর হিসাব পাওয়া যায়। পূর্ব বৎসর মোট আয়কর ছিল ১৭৫ কোটি টাকা। বর্তমান বৎসরে আয়কর অধিক-সংখ্যক লোকের উপর ধার্য করা হইয়াছে। ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ৮,৮৫,৩৯৯ জনকে আয়কর প্রদানকারী হিসাবে ধরা হয়। ১৯৪৮ সালে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা ছিল ৫,৪০,০০২। অর্থাৎ, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ পর্য্যায়শ্রমী হাজার বেশী লোক আয়কর দিতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা এই কয়েক বৎসরে প্রায় শতকরা ৬৩ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাহদের বাৎসরিক আয় ২৫,০০০ টাকা বা তদুর্দ্ধ তাহাদের ধরা হয় প্রথম শ্রেণীতে এবং বাহাদের বাৎসরিক আয় ১০,০০০ টাকা হইতে ২৫,০০০ টাকার মধ্যে তাহাদের ধরা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে। তাহা হইলে দেখা যায় যে, উচ্চ শ্রেণীর আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত বৎসর প্রায় ১৩৮ কোটি টাকার আয়কর বাকী পড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ আদায় করা হইয়াছে। এখনও ১১৩ কোটি টাকা বাকী পড়িয়া আছে। গুণ্ডু বোম্বাই শহর ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ কোটি টাকার মত আয়কর অনাদায়ী পড়িয়া আছে। আয়কর বিভাগের খরচ হইতেছে শতকরা ১'৪৪ টাকা হিসাবে। মোট খরচ হইয়াছে গত বৎসর দুই কোটি ছেইটি লক্ষ টাকা।

স্বচ্ছার বাহারী গুপ্ত আয়ের সম্বন্ধ দিয়াছে তাহাতে আজ পর্য্যন্ত ৩০ কোটি টাকা আয়কর হিসাবে ধরা হইয়াছে। মোট ১০৩ কোটি টাকা গুপ্ত আয় প্রকাশিত হইয়াছে।

আয়কর নির্ণয়ের একটি প্রধান দোষ এই যে, বাহারী প্রকাশ

ভাবে আরকরের হিসাব রাখে তাহাদের উপরই ইহার চাপ অধিক। দোকানপাট আপিস না করিয়া খুচরা কেনাবেচা যাহারা করে তাহাদের সংখ্যা এখন বিপুল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শতকরা দুই জনও আরকর দেয় কি না সন্দেহ। কলিকাতায় বা অন্য প্রধান শহরে বসিয়া কাজ-কারবারে বাৎসরিক ১০।১২ হাজার টাকা উপায় করে, এরূপ অসংখ্য লোক আছে। তাহাদের আয়ের হিসাব ধরা অতি দুর্ব্ব ব্যাপার। তাহারা বাড়ীঘর করে বা জমিজমা কেনে সুদূর গ্রামে বা ছোট শহরে যেখান হইতে আরকর বিভাগের খোঁজ পাওয়াও অসম্ভব। এই শ্রেণীর লোক আজকাল বিশেষভাবে চোরাকারবারে নামিয়াছে। ইহারা জাতির আয়ের কোঠায় প্রত্যক্ষভাবে কিছুই দেয় না, পরোক্ষভাবেও অতি অল্পই দেয়। অথচ জাতীয় অর্থব্যয়ের ফলে যে সকল সংস্থা সাধারণের হিতার্থে স্থাপিত হয় তাহার সকল সুযোগই উহারা পায়।

পল্লী-শিল্পই একমাত্র উপায়

উপরোক্ত শিরোনামায় ৬ই সেপ্টেম্বরের “হিরিজন পত্রিকা”র ভূদান-যজ্ঞের ঋষিক জীবিনোবা ভাবের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় ১০ই আগষ্ট তারিখে বারানসীতে প্রদত্ত প্রার্থনার ভাষণ। তিনি গোরক্ষপুর এবং দেওরয়ার দুভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, “...সঙ্কটের একটি উদ্বেগজনক দিক আমি আপনাদের ভাবিয়া দেখিতে বলি। তাহা এই : সকলের কুলাইবার উপযোগী যথেষ্ট খাদ্য এ অঞ্চলে রহিয়াছে, কিন্তু লোকে কিনিয়া খাইতে পারে না। কারণ তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতার অভাব রহিয়াছে।

“ইহার অর্থ কি? আমাদের কাছে এই কথা নতুন নয়। গঠন-কর্মিগণ আরম্ভ হইতেই এই কথার উপর জোর দিয়া আসিতেছেন যে, পল্লী-শিল্পের প্রসার ব্যতিরেকে ভারতের সঙ্কটমোচনের অল্প কোন উপায় নাই। ইহা সরল সত্য, যিনিই বুঝিয়া দেখিতে চান তিনিই ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। কিন্তু হুভাগ্যক্রমে এই সরল সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি জাগিতেছে না এবং অর্থনৈতিক কূটতর্কের কুজাটিকার আড়ালে আলো ঢাকিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সকল তর্কে আমার কোন আগ্রহ নাই। আমি শুধু বলি গ্রামবাসীকে কাজ দাও, পল্লী-শিল্পের মাধ্যমে না দাও অল্পপ্রকারে দাও, যন্ত্রসাহায্যে কাজ দিতে চাও তাহাই দাও। কিন্তু যন্ত্র তো উপস্থিত নাই, এদিকে লোক কর্মের অভাবে হুঃখভোগ করিতেছে। আমার দাবী এই যে, পল্লীবাসীদিগকে পল্লী-শিল্পের মাধ্যমে ছাড়া কাজ দেওয়া যাইবে না...।”

তিনি আরও বলেন, “যন্ত্রচালিত শিল্পকে পল্লী-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া উচিত নহে।” দেশের দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের স্থায়ী সমাধানের নির্দেশ করিয়া তিনি বলেন, যেহেতু “পল্লীবাসী জনসাধারণের ভরণপোষণ কেবলমাত্র কৃষিকর্ম দ্বারা সম্ভব নহে, অতএব পল্লী-শিল্প রক্ষণ ও প্রসারের জন্ত আমাদেরকে জোর করিতে হইবে।”

ধূতি-শাড়ী বুনবার কাজে তাঁতিদিগের রক্ষা করিবার জন্ত রাজাজী সম্প্রতি যে আবেদন জানাইয়াছেন বিনোবা তাহা সমর্থন করিয়া বলেন, “স্বাধ্য কর্তব্যের পক্ষেই রাজাজীর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে।” কারণ মাত্রাজে জনসাধারণের প্রতি বার জনের মধ্যে এক জন তাঁতি। মিলের প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য নানাবিধ অন্ত্রবিধা সহ করিয়াও তাহারা যেভাবে কাঁচা করিয়া বাইতেছে তাহাতে বিনোবার মতে “আমাদের জাতীয় অধ্যবসায় ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।”

তিনি বলেন যে, “বলা হয় মিলের কাপড় তাঁতের কাপড়ের চেয়ে সস্তা কিন্তু ইহা যন্ত্রনির্ভর অর্থনীতি হইতে সস্তাত একটি মরীচিকা মাত্র।...মিল আসিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে আশ্রয়চ্যুত করিয়া বেকার থাকিতে বাধ্য করে। মিলের দ্বারা বেকার করা এই সকল সহস্র, লক্ষ লোকের ভরণপোষণের খরচ অগ্রে মিলের স্বক্ষে চাপাইয়া তৎপর হিসাব করিয়া দেখা হউক, মিলের কাপড়ের দর সত্যিই সস্তা পড়ে কিনা।—মিল-বস্ত্রের দর সস্তা শুধু আপাতদৃষ্টিতে...“কারণ খাদির মূল্য সমপরিমাণ মিল-বস্ত্রের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলেও এই অতিরিক্ত মূল্য আমাদের গ্রামের ভাই-বোনদের ভরণপোষণে যায়। পক্ষান্তরে মিল-বস্ত্র কিনিতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহার সবটাই মিলমালিকের খলি ভারী করিতে চলিয়া যায়।” বিনোবা বলেন, “সুতরাং মিলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিতে হইবে। না হইলে “লোকে বলিবে এবং বলা অর্থোক্তিক হইবে না যে, মিলমালিকরা গবমেণ্টকে নিজের পক্ষে টানিতে পারে, গবমেণ্ট তাহাদের মুঠার মধ্যে।”

তিনি বলেন, “পল্লী-শিল্প সম্পর্কে আমার অল্প আসক্তি কিছু নাই, একটি মাত্র আসক্তি আমার আছে স্বীকার করি। বুদ্ধি ও অভাব হইতে মুক্তির প্রতি আমার আসক্তি আছে।” রাজসরকার বৃহৎ বাস্তবিকশিল্পের চর্চা করিয়াও কোন ফল দেখাইতে পারেন নাই। বিনোবা তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, “রাজসরকারকে আমার বলা উচিত, তাহারা সময় থাকিতে জাগ্রত হউক, পল্লী-শিল্পকে অবলম্বন করুক। পল্লী-শিল্পই রাজসরকারকে আমাদের দেশের দরিদ্র অবস্থা হইতে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে সন্দেহ নাই।”

মিলের ও হাতে কাটা ও হাতের তাঁতে বোনা কাপড়ের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা পূরণ করার দুইটি মাত্র উপায়। প্রথম এই যে, মিলের কাপড়ের উপর শুদ্ধ চাপাইয়া সেই শুদ্ধের অংশ খানিক্তে দেওয়া। দ্বিতীয় এই যে হাতে কাটা সুতার সর্ববিধভাবে উন্নতি করা, যাহাতে তাঁতির কাজ সহজ হয় এবং ঐ সুতায় প্রস্তুত কাপড় টেকসই ও উৎকৃষ্ট ধরণের হয়। পূর্বেকার দিনে তাহাই ছিল এবং রাধানগর, শান্তিপুর, ঢাকা ইত্যাদির বিখ্যাত কাপড় হাতে কাটা সুতাতেই নাম করিয়াছিল। পুনর্ব্বার সেরকম হয় কিনা তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ খদ্দেরের কাপড় টেকসই করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। ইহার জন্য উৎকৃষ্ট কাপাঁসের চাষও ঘরে ঘরে হওয়া উচিত।

দেশের লোকের মন যাহা সহজে গ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ্য না রাখিলে কোনও চেষ্টাই সফল হইবে না। ধর্ম তখনই লোকে সহজে লইবে যখন তাহা টেকসই এবং কিছু উন্নততর বস্তুর যুক্ত হইবে। দরিদ্রের ভরণপোষণে সকলেরই কিছু কিছু সাধন করা উচিত। কিন্তু কিছু সাধন সহের সীমার মধ্যে থাকা প্রয়োজন। সমস্ত দেশের লোককে আদর্শের পথে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা অতি মহান উদ্যোগে সন্দেহ কি? কিন্তু সেই চালনা তখনই সফল হইবে যখন চালক বাস্তবের রূপও সম্যকভাবে বিচার করিয়া পথনির্দেশ করিবেন।

“নবমহাভারতের রচনা”

বালিখানা ভাঙলের মাসিকপত্র “সাধারণী” ভাদ্র সংখ্যায় লিখিয়াছেন, “মানুষের লোভে পৃথিবীতে আজ পাপের সঞ্চয় হয়েছে, বিপুল। সকল হিংসার, মূলেই মানুষের এই লোভ, এই শোষণ। তাই অজ্ঞানের দ্বারা যারা সঞ্চয় করেছেন, সেই সঞ্চয় আজ তাঁদের কিরে দিতে হবে সেই বঙ্কিতদের, পৃথিবীর, অত্যাচারের তাড়নায় যারা তাড়িত হয়ে বেড়াচ্ছে। ‘সব ভূমি গোপালকী’ গান্ধীজীর এই বাণীই আজ বিনোবার বাণী। যাদের ভূমির সঞ্চয় রয়েছে আজ তাঁরা ভূ-দান যজ্ঞে সেই সঞ্চয় অর্পণ করুন। রাজস্ব নেহে, আজ বিনোবার আহ্বান এই ‘প্রজাস্ব যজ্ঞে’। আজ প্রজার অভিযেকের পর্ব আরম্ভ হবে আমাদের এই নবমহাভারত রচনায়। ‘ভূমিওয়াল রাবা’ বিনোবা... ছয় বৎসরে ভারতের নগর জনপদে অন্ততঃ ২৫ হাজার মাইল ভ্রমণ করে রক্ষিতদের জন্ম... ভূদান সংগ্রহ করবেন। প্রজাস্ব যজ্ঞে ভূ-দান উৎসর্গ করে সকলের কণ্ঠে স্বাধীনতা উচ্চারিত হউক। পুণ্যময় হউক এই ভারত।...”

এই “নবমহাভারত-রচনা”র ইঙ্গিত আমরা পাই বিনোবাজীর ভ্রমণ-পঞ্জী হইতে। উত্তর প্রদেশের উত্তরগতি হামিরপুর জেলার একটি গ্রাম মানগ্রোথ। এই গ্রামের অধিবাসিগণ তাহাদের সমস্ত জমি ভূ-দান যজ্ঞে দান করিয়া দিয়া ‘সব ভূমি গোপালকী’ এই মহান আদর্শ অনুসরণ করিবার অতুলনীয় গৌরব অর্জন করিয়াছে। এই চমকপ্রদ ঘটনার বর্ণনা করিয়া শ্রীদামোদর দাস মুন্ডা এই সেপ্টেম্বরের “হরিজন” পত্রিকায় লিখিয়াছেন : “বিনোবা নিজে এই গ্রামে যান নাই।... বিনোবার একটি মাত্র ভ্রমণ হইতে তাহার এই বিষয়ে অনুপ্রাণিত হন... এই গ্রামের ৬৬ জন ভূস্বামী সকলেই তাহাদের সমগ্র ১৩০০ একর ভূমি বিনোবাকে দান করিলেন।...”

“এখন মানগ্রোথে একজনও ভূমিহীন ব্যক্তি রহিল না। সমস্ত যাচক অযাচকে পরিণত হইল। জমি সাধারণভাৱে একত্রে চাষ করিতে সকলে সম্মত হইল। গ্রামকে আদর্শরূপে গড়িতে বিনোবার পরামর্শক্রমে কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। সেই দিন হইতে বিনোবা প্রত্যেক গ্রামে তাহার প্রত্যেক ভ্রমণে মানগ্রোথের কথা উল্লেখ করিয়া উহার স্থপীতি করেন।...”

এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইতিমধ্যেই এক গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়াছে।

শ্রীমুন্ডা হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছেন, “মানগ্রোথ সকল সমস্তা ও সন্দেহের সমাধান করিয়াছে। জোতজমির ঋণীকরণ, একটি দান অথবা দুইটি দান, সম্ভার কৃষি বনাম ব্যক্তিগত কৃষি, পতিত জমির উদ্ধারের সমস্তা প্রভৃতি সকল প্রশ্নের সমাধান জমিতে একমাত্র ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব ভাগের দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছে। ভূ-দান যজ্ঞের আরম্ভেই এইরূপ একটি আদর্শের কথা বিনোবার মনে জাগরুক ছিল। কিন্তু তিনি যদি গোড়াতেই ইহার জন্ম চাপ দিতেন তাহা হইলে আমরা ভূ-দানের এই মহান রূপ দেখিতে পাইতাম না।...”

মানগ্রোথের এই সাফল্যের পর বুন্দেলখণ্ডে বিনোবার দাবি সর্বোচ্চ স্তরে উঠিল। “প্রারম্ভে তেলঙ্গানায় তিনি দিনে প্রায় ১০০ একর ভূ-দান পাইতেন। ওয়াধায় ফিরিবার কালে ইহা ২০০ একরে দাঁড়ায়। ওয়াধা হইতে দিল্লীর পথে তিনি গড়ে দিনে ২৫০ একর করিয়া পান। উত্তর প্রদেশের পূর্ব জেলাগুলি হইতে ৩০০ একর করিয়া পাওয়া যায়। সেবাপুরী সম্মেলনের পর দিনে ১০০০ একর করিয়া সংগ্রহ হইতে থাকে। প্রথম প্রত্যেক জেলা হইতে বিনোবার দাবি ছিল মাত্র ১০,০০০ একর। এখন দাবির পরিমাণ বাড়িতে লাগিল এবং জালাউল হইতে তিনি ২০,০০০ একর পাইলেন। কিন্তু দাবির উর্দ্ধগতি বাড়িয়াই চলিল এবং হামিরপুরকে ৩৪,০০০ একর সংগ্রহ করিয়া দিতে বলা হইল। পরিশেষে বান্দা এক লক্ষ একর সংগ্রহ করিয়া দিতে সম্মত হইল। এক্ষণে বিনোবা তাহার দাবি এক লক্ষ একরের নীচে নামাইতে রাজি নন। তিনি বলেন, “অবশেষে প্রতি জেলা দুই লক্ষ একর জমি অবশ্যই সংগ্রহ করিয়া দিবে। তাহা হইলে ভারতবর্ষের মোট ২৫০টি জেলা পাঁচ কোটি একর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। এবং ইহাই আমার শেষ লক্ষ্য।...”

“সব ভূমি গোপালকী” যে আদর্শের মূল কথা, তাহার সঙ্গে কম্যুনিষ্ট ভূমিনীতির সাদৃশ্য যথেষ্ট। কিন্তু বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে মূলনীতিগত। আদর্শবাদের মতে বিনামূল্যে ভূমি উৎসর্গ করা হয় ভগবানের কাছে, দরিদ্রের সেবায়। কম্যুনিষ্ট মতে দানের মাহাত্ম্য নাই, সবলে ভূমির অধিকারী হইতে চিনাইয়া লওয়ারই গুরুত্ব আছে। অর্থাৎ অপরের ক্ষতি ও অপমান ভিন্ন কম্যুনিষ্ট মত সফল হয় না।

অল্প কথায় পার্থক্য হিংসা ও অহিংসার নীতির এবং দুর্নীতিমূলক অত্যাচারের ও প্রতিহিংসার। কোনটা ভারতীয় প্রাচীন নীতি সম্মত তাহার বিচার করা দুরূহ নয়।

জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ

গত ১৭ই ভাদ্র কটিতে প্রার্থনা সভায় আচার্য্য বিনোবা ভাবে বলেন, “যদি কংগ্রেসের মত এক অসাধারণ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠন-মূলক কার্যে নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠান উহার আদর্শ হারাষ্টয়া ফেলিবে এবং শতাব্দির আড্ডাখানায় পরিণত হইবে।

“যদি কংগ্রেস আইনসভার কাজ ভাগ নাও করিতে পারে, তাহা হইলেও কংগ্রেসের জনগণ এবং সরকারের মধ্যে যোগসুত্ররূপে কাজ করা উচিত হইবে।”

আইনসভায় যে সকল কংগ্রেসপন্থী আছেন এবং আইনসভার বাহিরে যে সকল কংগ্রেসসেবী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কি প্রকার সম্পর্ক থাকিবে এবং কংগ্রেসসেবীদের সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকিবে কিনা সে প্রশ্ন আবার উঠিয়াছে।

“মহাত্মাজী এই সমস্তার সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর ‘কংগ্রেস লোকসেবক সম্ভে পরিণত হইবে।’

“সরকার এবং জনগণের মধ্যে একটা যোগসুত্র রাখিতেই হইবে। আমি এই সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমি মনে করি যে, কংগ্রেস যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তাহা হইলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। কংগ্রেস সরকার ভারত সেবক সমাজ গঠনের কথা ভাবিতেছেন কিন্তু কংগ্রেস যদি দূরে দাঁড়াইয়া থাকে তবে এই ভারত সেবক সমাজ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে না। একটা বিয়াট প্রতিষ্ঠান বাহার শাখা-প্রশাখা সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া আছে, সেই প্রতিষ্ঠান চূপ করিয়া থাকিতেও পারে না, উহা শয়তানের আড্ডাখানায় পরিণত হইতে পারে না।”

আচার্য্য ভাবে বলেন, “কংগ্রেসের নিজের স্বার্থেই উহাকে আইনসভার কাজের সহিত গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই গঠনমূলক কার্য ব্যতীত অপর কোন ব্যবস্থার দ্বারাই কিংবা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন করিলেও অবস্থার প্রতিকার হইবে না। কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হইলে স্বেচ্ছাচারের বিপদ থাকিবে। যদি এই দুই পদ পৃথক ব্যক্তির হাতে থাকে, তাহা হইলে সম্বর্ধেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং যদি কংগ্রেস সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর লোক হন, তাহা হইলে তিনি তাহার আজ্ঞাবহ ব্যতীত আর কিছুই হইবেন না। এই অবস্থার উহা কাহার পক্ষেই কল্যাণকর নহে।”

উপসংহারে আচার্য্যজী বলেন, “আমি মনে করি যে, কংগ্রেস যখনই গঠনমূলক কাজ হাতে লইবেন, তখনই সকল দলীয় বিরোধের অবসান হইবে এবং অস্তিত্ব দলগুলিও জাতি গঠনমূলক কার্যে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিবেন।”

আমরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশী মাথা ঘামাই না। প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্মী যদি আদর্শে অটুট থাকেন, তবে কংগ্রেস ঠিক থাকিবে বা তাঁহারা অল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া দেশের সেবা করিবেন।

কৃষিমন্ত্রীর আবেদন

গত ১৬ই ভাদ্র তারিখের “খাদ্যোৎপাদন” পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগীয় মন্ত্রী ডাঃ আর. আহমেদের এক আবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি

বলিয়াছেন যে, চাউলই আমাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু আজ পৃথিবীর সর্বত্রই চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে। বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়া আমাদের দেশের খাদ্যাভার দূর করা অসম্ভব। সুতরাং দেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

তিনি বলিয়াছেন, “এ বছর বৃষ্টি ভালই হয়েছে এবং আমনের রোয়াও শুরু হয়েছে। কিন্তু ধানের ফলন বাড়িতে হলে ক্ষেতে স্বাভাবিক ও রসায়নিক সার প্রয়োগের ওপরই বেশি নজর দিতে হবে। আমাদের চাষীরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে নিজ নিজ ক্ষেতে যথাসাধ্য সার প্রয়োগ করেছেন কিন্তু যারা নাইট্রোজেন, রাফসফেটযুক্ত সার ব্যবহার করেন নি তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন অবিলম্বে এগুলো জমিতে দেন। সর্বাধিক ফলনের জন্য বিধাপ্রতি যে পরিমাণ ঐ জাতীয় সার প্রয়োজন তার একটি তালিকা প্রয়োগের সময় নির্দেশসহ নিম্নে দেওয়া হ’ল চাষীদের অবগতির জন্য। গ্র্যামোনিয়াম সালফেট—১৫-২০ সের বা থৈল ১-২ মণ কাদানোর সময় কিংবা রোয়া লাগানোর ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে কিংবা উভয়তঃ। হাড়ের গুঁড়া বা সুপার-ফসফেট ১০।১৫ সের কিংবা আরও বেশি জমি তৈরির সময় অথবা কাদানোর সময় এবং ধানের মুসন মিশ্রসার ১ মণ ২৭ সের কাদানোর সময় অথবা পরে টপড্রেসিং হিসাবে অথবা দুই ভাবেই। সার বটন ব্যবস্থা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১,৬৩,০০০ মণ থৈল, ৮১,৬০০ মণ সুপার-ফসফেট কম দামে সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন সরকারী এজেন্টের মাধ্যমে। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজের সাবডিপো মাধ্যমে বিতরণ করা হবে ৩,০০,০০০ মণ গ্র্যামোনিয়াম সালফেট। আমাদের এজেন্ট মেসার্স তালুকদার এণ্ড কোম্পানীর মাধ্যমে ৬০০ আনা মণ দ্রব বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে ৮১,০০০ মণ বিশেষ ভাবে তৈরি ধানের মিশ্র সার। থৈল, গ্র্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার-ফসফেট, হাড়ের গুঁড়া ও তালানি সার মিলিয়ে এই মিশ্র সার তৈরি। একর প্রতি ৫ মণ এই মিশ্র সার দিলে ধানের ফলন শতকরা অন্ততঃ ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ বাড়বে বলে আশা করা যায়।”

তিনি অনুরোধ করিয়াছেন, “চাষী বন্ধুরা যেন আমাদের এজেন্টের ডিপোতে সরাসরি গিয়ে দরকারমত এই মিশ্র সার সংগ্রহ করেন। যারা এই ডিপোগুলির খবর রাখেন না তাঁরা নিকটবর্তী ইউনিয়নে কৃষিক্ষেত্রচারী অথবা কৃষিপরিদর্শকের থানা অফিসে দেখা করে চাহিদা অনুরোধী মিশ্রসার সংগ্রহ করবেন। কৃষিক্ষেত্রচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা চাষীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন এই সার সংগ্রহ ব্যাপারে। যে পরিমাণ সার সরবরাহের ব্যবস্থা এ বছর করা হয়েছে তার প্রতিটি কণা যাতে ধানের ফসলে ব্যবহার হয় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ উদগ্রীব।”

চাষীদের নিকট এই সার ব্যবহারের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া এবং পল্লীগ্রামের শিক্ষিত সমাজ যাতে এই সার সংগ্রহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করেন তার আবেদন জানাইয়া কৃষিমন্ত্রীর ভাষণের সমাপ্তি।

কৃষিক্ষেত্রের আবেদন সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের “সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ ও অভিমত” পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বয়ালাসীমার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধারণকে সাহায্যের আবেদন জানাইয়া: অন্ত্র প্রাদেশিক সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটির সম্পাদক ক্রীকুঞ্চরও সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় শ্রমিক সঙ্ঘের নিকট যে বার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে ডি. কুজনেসেক লিখিয়াছেন:

“অন্ত্র প্রদেশের মেহনতী জনগণ ও সাম্রাজ্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের এই মহা দুর্ভিক্ষপাকে সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতী জনসাধারণের পক্ষ থেকে সোভিয়েৎ ট্রেড ইউনিয়ন তাহাদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং দুর্ভিক্ষভ্রাণ সংযুক্ত কমিটির নিকট নিম্নলিখিত সাহায্য পাঠাচ্ছে, ১০ হাজার টন গম, ৫ হাজার টন চাউল, ৫ লক্ষ টন জমান দুগ্ধ এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ভারতীয় মুদ্রা।”

দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যের কাজে অন্ত্র কমিটির সাফল্য কামনা করিয়া তাহার পত্র সমাপ্ত হইয়াছে।

পরবর্তী এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত-সরকার চীন এবং সোভিয়েৎ সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, উক্ত দেশগুলি হইতে প্রেরিত সাহায্য হয় সরকারী প্রতিষ্ঠান মারফত না হয় ভারতীয় রেড ক্রস মারফত বর্জন করা হইবে। অন্য কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্ত্র কমিটির মারফত এই সাহায্য বর্জনে ভারত-সরকার সম্মত নহেন। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েৎ ট্রেড ইউনিয়ন ভারতীয় রেড ক্রসের মারফত প্রেরিত খাদ্যবস্তু বর্জন করিতে সম্মত আছেন।

রাজনীতি ও দলাদলি

“স্বাধীন ভারতে”র শ্রাবণ ১৩৫৯ সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমন্বয়পযোগী:

“সমষ্টিগতভাবে তথাকথিত বামপন্থী দলসমূহের সহিত কংগ্রেসের এবং ব্যক্তিগতভাবে একটি বামপন্থী দলের সহিত অপরাটর যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিद्यমান, যে সংস্কৃতি ও অসঙ্গতি প্রত্যক্ষগোচর, পূর্ববর্তী সংখ্যায় যদিও আমরা তাহার বিস্তৃত পর্যালোচনা করিয়াছি, তথাপি নব উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার পুনরালোচনা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। দেশের সাধারণ নির্বাচনকে সম্মুখে রাখিয়া রাজনৈতিক দাবার ছক্ ভেভাবে সঞ্জিত হইয়াছিল, নির্বাচন পূর্ব সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছকের শক্তি সংস্থাপন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে এবং তদনুযায়ী ছকের গুটি-সমূহের সঙ্গে সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে চাকল্যের সঞ্চার। নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করিবার সর্ববাদিসম্মত সঙ্কল্প সম্বল করিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মী ও বিপরীত কর্মদলসমূহের মধ্যে আপাততঃ মিলনের যে সাধারণ স্তর রচিত হইয়াছিল, নির্বাচন সমাপ্ত হইবার

পর হইতেই তাহার বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করে এবং আজ অবস্থাগতিকে সে মিলনগ্রন্থি বহুধা-বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম।”

উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ

গত ৯ই ভাদ্র তারিখের “বাহারী” পত্রিকা এই বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আরও কঠিন ভাষা প্রয়োগ করা যায়:

“পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ ক্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি নদীয়া জেলার কয়েক স্থানে সফর করিয়া ও সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য। রাজ্যপাল বলিয়াছেন—পাকিস্তানের চাপ পড়িলে উদ্বাস্তুগণ ভারতে চলিয়া আসেন, ভারতের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তারপর আবার পাকিস্তানে চলিয়া যান। ইহাতে সরকারী অর্থের অপচয় হয়।” কয়েকদিন পূর্বে আমরা পশ্চিম বাংলা সরকারের সাহায্য ও পুনর্বাসন ডেপুটি মন্ত্রীদ্বয়ের সহিত হাঁসখালি থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর উদ্বাস্তু কলোনী দেখতে গিয়াছিলাম। এই কলোনীতে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত উদ্বাস্তু পরিবার ছিলেন এবং সকলেই প্রায় সরকারী সাহায্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে অর্ধেক পরিবার উক্ত কলোনীতে নাই। হয় তাহারা পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন, আর না হয় অগ্রজ সরিয়া পড়িয়াছেন।

“রাজ্যপাল বলিয়াছেন—পাকিস্তানের মোহ ত্যাগ করিয়া উদ্বাস্তুগণকে সম্পূর্ণ ভারতীয় নাগরিকরূপে বসবাস করিতে হইবে।” রাজ্যপালের বক্তব্যের সহিত সুর মিলাইয়া আমরা ঐ একই কথা বলি যে, পাকিস্তান ছাড়িয়া যখন চলিয়াই আসিতে হইয়াছে তখন আবার পাকিস্তানের মোহ বা জমি-জমার লোভ কেন? পাকিস্তানের হিসাবনিকাশ শেষ করিয়া ভারতের নাগরিকরূপে বাস করিবার জন্ত মনোনিবেশ করাই ভাল।

“এমন অভিযোগও পাওয়া গিয়াছে যে, অনেক উদ্বাস্তু ভারত হইতে অর্থ, লাড়ল, বন্দ প্রভৃতি সাহায্য লইয়া পাকিস্তানে পলাইয়া গিয়াছেন। ভারতের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া পাকিস্তানে পলাইয়া যাওয়া অথবা স্বাণ প্রভৃতি কাকি দিবার জন্ত অগ্রজ সরিয়া পড়া বা নাম বদলাইয়া ফেলা—এ সকলই গভীরভাবে নিন্দনীয়।”

পাকিস্তানে সংবাদপত্রের মিথ্যা প্রচার

“ত্রিপুরায় জনৈক উদ্বাস্তু হত্যাকাণ্ডের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের উপর অত্যাচার ও অগ্নি সংযোগের যে অভিযোগ পাকিস্তান হইতে ক্রমাগত করা হইতেছে, তৎসম্পর্কে তদন্তের জন্ত কলিকাতা-স্থিত পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী গত ২৯শে জুলাই আগরতলা আসিয়াছিলেন।

“ত্রিপুরার ডি. এম. ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সংখ্যালঘু বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী লী এস. আর. গুপ্ত এবং লিয়াজ অফিসার মিঃ শরিফের সহিত তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ বিষয়ে তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট সত্যমত প্রকাশ

করিতে অসম্মত হন। কেননা বিষয়টি বর্তমানে বিচারার্থীন রহিয়াছে এবং ইহার সহিত জড়িত ব্যক্তিগণ প্রেক্ষার হইয়াছে। এ সম্পর্কে পাকিস্তানের কোন কোন সংবাদপত্রে যে সকল খবর বাহির হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, এগুলি অতিরঞ্জিত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সকল লোক বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলেই কিরিয়া আসিয়াছে। ত্রিপুরা সরকার নগদ টাকা ও জিনিষপত্র দিয়া তাহাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেছেন। গব.মন্ট এতদঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণের জন্ত যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্তান বেতারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে দাবি করা হইয়াছে, উহা অপ্রাসঙ্গিক। কেননা গব.মন্ট এই ব্যাপারের সহিত জড়িত নহেন।

গত ২০শে শ্রাবণের “যুগশক্তি” (করিমগঞ্জ) পত্রিকায় উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। আশা করি হামিদ সাহেবের স্বীকৃতিতে পাকিস্তানী নাগরিকের চৈতন্যোদয় হইবে।

মিশর

মিশরের পরিস্থিতি আজ সার্ব জনিয়া আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। যখন ২৬শে জুলাই সেনাপতি নেগুইবের আদেশে রাজা ফারুক সিংহাসনচ্যুত করা হইল, সেদিন মিশরবাসীরা আশার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। রক্তবিহীন সামরিক বিপ্লব জনগণের বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনার প্রতীক্ষমান ছিল। মিশরের দ্রুত পট-পরিবর্তনে প্রধান মন্ত্রী আলি মেহের পিছাইয়া পড়িলেন। ফারুকের সিংহাসনচ্যুতির পিছনে ছিল মেহের এবং নেগুইবের যুক্ত প্রচেষ্টা। আলি মেহেরের দূরদৃষ্টির অভাব ছিল, কারণ তাহার বুঝা উচিত ছিল তাহাকেও রাজা ফারুকের পথ অনুসরণ করিতে হইবে।

রাজা ফারুকের সিংহাসনচ্যুতির খবর আজ পুরানো হইয়া গিয়াছে। রাজার জন্ত নাকি কেহ চোখের জল ফেলে নাই—খুবই স্বাভাবিক। ফারুকের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ মিশরের জনসাধারণের মঙ্গল তাহার চিন্তায় কখনই উদ্ভিত হয় নাই। আত্মস্বার্থেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন এবং রাষ্ট্রের টাকার অপব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আরও অভিযোগ ছিল যে, বিগত প্যালেস্টাইন যুদ্ধে অস্ত্র-সরবরাহের কেলস্কারী ব্যাপারে রাজা ফারুকের খানিকটা যোগ ছিল; অন্ততঃ যাহারা অস্ত্র সরবরাহের প্রহসনে টাকা করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে প্যালেস্টাইন রণক্ষেত্রে মিশরের সৈন্যদের প্রতারণা করিয়াছে তাহাদের রাজা ফারুক কোন শাস্তি দেন নাই। প্যালেস্টাইন যুদ্ধে পরাজয় মিশরের সামরিক মনে প্রচণ্ড দগ্ধ রাখিয়া গিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত তাহারই আলোড়নের ফলে ফারুককে সিংহাসন হারাইতে হয়।

মিশরে বহু দল আছে, তাহার মধ্যে ওয়াক্ফ দলই প্রধান এবং ইহাদের সভাসংগী অনেক বেশী। নাহাশ পাশা ইহার নেতা এবং

সেরাগ-এল-দিন প্রধান সচিব ছিলেন। আলি মেহের এই দলেরই সভা। গত জাহুয়ারী মাসে কায়রোতে যে দাঙ্গা হয় তাহার জন্ত রাজা ফারুক নাহাশ পাশাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে চ্যুত করেন। জাহুয়ারী মাসের দাঙ্গার পর হইতেই মিশরে রাজকীয় বিপ্লবের বহিঃস্থায়িত হইয়া উঠিতেছিল। সামরিক বিপ্লব আকস্মিক হইতে পারে, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ছিল না।

ফারুকের পর মিশরের প্রকৃত শাসক হইলেন সেনাপতি নেগুইব, যদিও আইনতঃ তিনি ছিলেন কেবল প্রধান সেনাপতি মাত্র। আলি মেহের হইলেন প্রধান মন্ত্রী। নেগুইব জানিতেন যে, ওয়াক্ফ দলের সমর্থন ব্যতীত রাজা ফারুককে বিতাড়ন করা সম্ভবপর নয়; তাই আলি মেহের হইয়াছিলেন ফারুক বিতাড়নে শিথলী। ওয়াক্ফ দল গঙ্গাজলে ধোয়া ছিল না সে কথা নেগুইবের জানা ছিল।

নেগুইব দাবি করিলেন যে, মিশরের রাজনৈতিক দলগুলি যেন অবিলম্বে নিজেদের পুনর্গঠন করিয়া অর্থ নৈতিক বিপ্লবের আয়োজন করে। নেগুইব আরও দাবি করিলেন, কোন জমির মালিকের ২০০ একরের বেশী জমি থাকিতে পারিবে না। আলি মেহের দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন। জমির পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থায় হাত দেওয়া তিনি বিপজ্জনক মনে করিলেন, কারণ তাহাতে ওয়াক্ফ দলের বহু-সভ্যের স্বার্থে বা পড়িবে। ওয়াক্ফ দলের সচিব সেরাগ-এল দিন কোটিপতি এবং ক্ষমতাসালী—তাঁহার স্বার্থে হাত দেওয়া আলি মেহেরের ক্ষমতার বাহিরে ছিল। তাই যাহা অবশ্যস্বার্থী তাহাই ঘটিল—আলি মেহের পদত্যাগ করিলেন। সেনাপতি নেগুইব হইলেন মিশরের প্রধান মন্ত্রী, যুদ্ধমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি—মিশরের ভাগ্যবিধাতা।

এই সেপ্টেম্বর প্রত্যয়ে সেনাপতি নেগুইব মিশরের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। সেদিনই মিশরের ৫১ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকে বন্দী করা হয়। ওয়াক্ফ দলের প্রায় সকল নেতাকেই বন্দী করা হইয়াছে—কেবলমাত্র আলি মেহের ও নাহাশ পাশা মুক্ত আছেন। নেগুইব প্রধান মন্ত্রী হইয়া প্রথমেই দুইটি আদেশ জারী করিয়াছেন—দুই শত একরের বেশী কাহারও ধানজমি থাকিবে না এবং দ্বিতীয়তঃ মিশরের সমস্ত রাজনৈতিক দলের আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

নেগুইবের শুভ প্রচেষ্টা সফল হউক। নেগুইব তথা মিশরের ভবিষ্যৎ সকলেই সাগ্রহে লক্ষ্য করিবে। শুভ আদর্শ সর্বদা ভাল, কিন্তু তার প্রচেষ্টা সর্বদা শুভফল নাও দিতে পারে। ওয়াক্ফ দল মিশরের প্রধান রাজনৈতিক দল এবং ইহার জনসমর্থন যথেষ্ট। আজ ওয়াক্ফ দল নেগুইবের বিরুদ্ধে—তাই সঠিক কিছু বলা যায় না। নেগুইবের ভবিষ্যৎ কর্মধারা কি রূপ লইবে। তবে একথা ঠিক যে স্বদানের উপর মিশরের দাবি অনিশ্চিত। কালের জন্ত ধামাচাপা পড়ল। মিশর আজ অস্ত্রবিপ্লবে দ্বিধা-বিচ্ছিন্ন, সামরিক শক্তি আজ তার ভাগ্যবিধাতা—এ অবস্থায় স্বদান মিশরের সহিত মিলিত হওয়ার কল্পনাও করিতে পারে না। সম্প্রতি স্বদানের উপর মিশরের দাবি পিরকট হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মিশরের পট-পরিবর্তনে নেগুইবের

করিয়া সে দাবি মিটাইবেন তাহা লক্ষ্যের বিষয়। পূর্বের বছর সাধারণ নির্বাচনের পর যখন রাষ্ট্রতান্ত্রিক গণমন্ডল প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন শিশর নেতৃবৃন্দকে কি ভাবে লইবে তাহা আলোচনার বিষয়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও স্বর্ণপরিমিত

যুদ্ধোত্তর স্বর্ণপরিমিত বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এক আউল সোনার মূল্য ৩৫ ডলার হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। যে সকল দেশ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সভ্য তাহারা এই মূল্যে অর্থাৎ এক আউল ৩৫ ডলারে বেচা-কেনা করিতে বাধ্য। এক আউলে প্রায় আড়াই ভরি হয়। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্বে সোনার আন্তর্জাতিক মূল্য ছিল ১১৬ টাকায় আড়াই ভরি। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর বর্তমানে আড়াই ভরি সোনার মূল্য হইয়াছে ১৬৬ টাকা। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতে যে সোনার মূল্য তাহা হইতেছে কালাবাজারের মূল্য, যদিও এদেশে আইনসম্মত ভাবে ১০১২ টাকায় সোনার ভরি বিক্রি হইতেছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মান হিসাবে সোনার মূল্য বর্তমানে ৬৬ টাকায় এক ভরি হওয়া উচিত ছিল, এবং মুদ্রামান হ্রাসের পূর্বে এক ভরি সোনার মূল্য ৪০ টাকা হওয়া উচিত ছিল। ভারতে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে কোন সময়েই এ মূল্য সোনা পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষকে তাই বলা হয় সোনার চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য। ভারতের বাজারে সোনার দাম আন্তর্জাতিক মূল্য হইতে অনেক বেশী, স্বভাবতঃই তাই পৃথিবীর অস্বাস্থ্য দেশ হইতে এদেশে সোনার গুপ্ত আমদানী হয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় যথেষ্ট পরিমাণে সোনা উৎপন্ন হয়। তার দাবি হইতেছে যে, সোনার ডলার-মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহা না হইলে স্বর্ণ-উৎপাদক দেশগুলির কোনই লাভ থাকে না। ৩৫ ডলারে এক আউল সোনা ১৯৩৫ সাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় স্বর্ণ উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই সোনার বাজারদরও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কয়েক বৎসর আলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার দক্ষিণ-আফ্রিকাকে ৩৫ ডলারের অধিক মূল্যে সোনা বিক্রি করিবার অনুমতি দিয়াছিল। প্রায় বৎসর ছই দক্ষিণ-আফ্রিকা পৃথিবীর বাজারে ৩৮৪০ ডলারে এক আউল করিয়া সোনা বিক্রি করিয়াছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক সোনার বাজার আজ মন্দা, তাই অধিক মূল্যে সোনা আজ আর তেমন বিক্রি হইতেছে না।

সোনার চাহিদা প্রধানতঃ গহনা ও অস্বাস্থ্য সৌখিন জিনিষের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ নোটের বিরুদ্ধে জমা রাখা। দ্বিতীয় কারণে সোনার চাহিদা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অর্থাৎ, বর্তমানে রাষ্ট্র কাগজের নোট বাহির করে ছিট কিংবা বিলের বিরুদ্ধে। তাই সোনার ব্যবহার এই ব্যাপারে প্রায় অচল। আর গহনা প্রভৃতির জন্য সোনার চাহিদা এক ভারতবর্ষেই বেশী।

ইউরোপে এবং পৃথিবীর অস্বাস্থ্যদেশে গহনার জন্য সোনার চাহিদা অত্যন্ত গণ্য। সোনার চাহিদার জন্য একটি কারণ ছিল যে, সোনা জমানো। কোরিয়ার যুদ্ধ তথা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনিশ্চিত হওয়ার সোনা জমানোর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তৃতীয়-মহাযুদ্ধ অনিশ্চিতের গর্ভে চলিয়া যাওয়ায় সোনা জমানোর চাহিদাও হ্রাস পাইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চড়া মূল্যে দক্ষিণ-আফ্রিকা সোনা বিক্রি করিতে পারিল না। তাই সোনার কালাবাজার প্রায় অচল, অবস্থা ভারতবর্ষ ব্যতীত।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অধিবেশন হইয়া গেল। বাৎসরিক রিপোর্টে সোনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার মন্তব্য করিয়াছে যে সোনার গুপ্ত আমদানী বন্ধ করিতে হইলে শুধু আইন দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না। সত্যিকারের প্রয়োজন হইতেছে স্বচ্ছল বাজেট এবং ব্যাঙ্কের ঋণদানের বিনিয়ন্ত্রণ। ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতির সহায়ক এবং সেইজন্য সোনা জমানোর চাহিদা বাড়িয়া যায়, কারণ ঘাটতি বাজেটে মুদ্রামূল্য হ্রাস পায় তাই লোকে সোনা জমাইতে চায়। ১৯৫১ সালে সোনা জমানোর চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায়, প্রধানতঃ ভারতবর্ষে। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ সোনা আজ ভারতমুখী, অবস্থা অধিকাংশই চোরাকারবারি হিসাবে। কারণ ভারতে সোনার দর বেশী। কিন্তু চাহিদার তুলনায় সোনার অধিক আমদানী হওয়ায় সোনার দাম পূর্বাঙ্গীকৃত খানিকটা কমিয়াছে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় ছয় শত কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট হইবে। অর্থাৎ, এই ঘাটতি টাকার কিছু জনসাধারণের নিকট হইতে সরকার ঋণ হিসাবে লইবেন এবং বাকিটা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজের নোট ছাপাইবেন। যেখানে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানে সোনার মূল্য যে কমিবে সে ভরসা কম। তবে যদি ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ যদি সোনা জমানোর প্রবৃত্তি হ্রাস পায় তবেই সোনার মূল্য কিছু কমিতে পারে। তবে গহনার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ও গহনার দোকানের সংখ্যা যে ভাবে বাড়িতেছে তাহাতে এদেশে সোনার মূল্য হ্রাসের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে।

ইউরোপীয় কয়লা এবং লৌহ-শিল্প সমন্বয়

সার প্রদেশ জার্মানীর প্রধান কয়লা উৎপাদনের উৎস। সার ও জার্মানীকে কয়লা দেয় না, দেয় সম্পদ এবং সামরিক বল। সার প্রদেশবিহীন জার্মানীর সামরিক সম্পদ বহল পরিমাণে হ্রাস পাইবে—একথা ক্রান্ত জ্ঞানো। জার্মানীর পুনর্গঠনে আরার যদি সে সার প্রদেশ ফ্রিয়া পায় তাহা হইলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই জার্মানী পুনরায় দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। সেই চিন্তায় এতদিন ফ্রান্সের চোখে ঘুম ছিল না। অথচ জার্মানীকে আবার সামরিক শক্তিতে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। তাহা না হইলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ায় কে প্রতিবেকে? তাহা হয়ত পারিবে। একদিকে জার্মানী, জার্মানী জাজুরিচ্ছিন্ন, সেইজন্য ইউরোপের

শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ আজ জার্মানীকে বাঁচাইবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু শক্তিশালী জার্মানী যে ফ্রান্সের ভয়ের কারণ। 'অন্ততঃ সার' বিহীন জার্মানীর বিঘ-দাঁত কয়েকটা ভাঙা থাকিবে—ইহাই হইতেছে ফ্রান্সের কথা। জার্মানীকে বাঁচাও, কিন্তু সার প্রদেশ দিও না। জার্মানী উত্তর দিল সার প্রদেশ ব্যতীত জার্মানী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। মীমাংসা হইল এই বলিয়া যে, মিত্রশক্তি পক্ষের ইউরোপীয় দেশগুলি লোহ-শিল্প ও কয়লা-শিল্প একত্রীকরণ করা হউক, যাহাতে নিজস্ব কোন দেশ এইগুলিকে যুদ্ধে না লাগাইতে পারে। এই শিল্প একত্রীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ফ্রান্স-জার্মান প্রযোজ্য দূর করা। ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী স্ত্রুমান এইরূপ শিল্প একত্রীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রুমানের কথা হইতেছে লোহ ও কয়লা শিল্প একত্র করিলে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ যে শুধু অচিস্তনীয় হইয়া উঠিবে তাহা নহে, পরস্তু যুদ্ধ করা অসম্ভব হইবে। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক সমন্বয় দ্বারা ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমন্বয় সম্ভবপর হইবে এবং ফলে এখানে শান্তিরক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রিটেন প্রথম থেকেই এই প্রস্তাবে আপত্তি জানাইয়া আসিতেছে, কারণ সে মনে করে যে অর্থনৈতিক সমন্বয় দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার হানি হইবে।

নয় জন সভ্য লইয়া একটি পরিচালক সভা থাকিবে। ছয়টি সভ্য দেশ আট জন পরিচালক নিযুক্ত করিবে এবং এই আট জন সভ্য নবম সভা নিযুক্ত করিবে। পরিচালকগণ ছয় বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবে। এই পরিচালকবর্গের একটি উপদেষ্টামণ্ডলী থাকিবে, যাহারা উপদেশ দিবে। কতকগুলি নিাদ্ধ ব্যাপারে পরিচালকবর্গের আদেশ বাধ্যতামূলক হইবে এবং অন্যান্য ব্যাপারে শুধু উপদেশ দিবে। জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম, হল্যান্ড এবং লুক্সেমবুর্গ এই শিল্প-সমন্বয়ের সভ্য। পরিচালকবর্গের অধীনে একটি মন্ত্রী-পরিষদ থাকিবে। মন্ত্রী-পরিষদ হইবে কার্য্যকরী সমিতি।

ইউরোপীয় শিল্প-সমন্বয় চুক্তিকে আর্থিক যুক্তরাষ্ট্র বলা যাইতে পারে। সভ্যদেশগুলির মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহার সমাধানের জন্য একটি উচ্চ আদালত স্থাপিত হইয়াছে। সাত জন বিচারক লইয়া এই আদালত গঠিত হইয়াছে। যদি কোন দেশ মনে করে যে পরিচালকবর্গের কোন আদেশ সেই দেশের আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে অনিষ্টকর, তাহা হইলে সে দেশ আদালতের কাছে আবেদন করিতে পারে।

ইউরোপীয় কয়লা ও লোহ-শিল্প সমন্বয় একটি নূতন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। জাতিসম্মেলন কিংবা বর্তমান ইউ-এন-ও'র প্রধান অসুবিধা হইতেছে যে, সভ্যদেশগুলি তাহাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ছাড়িতে রাজী নহে। সেইজন্য ইউরোপীয় শিল্প-সমন্বয়ের ভবিষ্যৎ কি হইবে, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। কারণ আজ পরাজিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন জার্মানীর হাত হইতে তাহার সার প্রদেশ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাহার উপর প্রায় জোর

করিয়াই শিল্প-সমন্বয় চাপানো হইয়াছে। দ্বিধাবিভক্ত জার্মানী যখন যুক্ত হইবে তখন সংযুক্ত জার্মানী কি ভাবে ফ্রান্সের সর্দারী গ্রহণ করিবে তাহা দেখিবার বিষয়।

রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি

গত ১৬ই ভাদ্রের "বাকুড়া-দর্পণ" সাপ্তাহিক পত্রিকায় দুর্গত নর-নারীর দুঃখ লাঘবের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে :

"জেলার বিভিন্ন স্থানে অন্নান্নাভাব প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। মধ্যবিত্ত ও কুলি-মজুরদের খাদ্যাভাবই অধিক। সেদিন খাতড়া থানার এক সভায় নাকি জেলাশাসক জানিয়াছেন অন্নান্নাভাব মুক্তার সংবাদ। কাজেই তৎকালীন মনোভাবাপন্ন সরকারী কর্মচারীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনসেবা মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের একটি সভা গঠন করতঃ জেলার প্রতি গ্রামের অবস্থা সম্যক অবগত হইয়া কার্য্য করিলে তথাকথিত খাদ্যাভাব মুক্তার সংবাদ আর আমাদের কাছে গুনিতে হইবে না বলিয়া বিশ্বাস করি। ১৯৪২ সনের দুর্ভিক্ষের সময় হইতে এইরূপ একটি সমিতি কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। আমাদের মনে হয় আবার সেইরূপ একটি জেলা রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি অচিরে গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

জেলার দুঃস্থ অঞ্চলে সাহায্যের জন্য প্রয়োজন—

- (ক) যথেষ্ট ল্যাণ্ড ইমপ্রুভমেন্ট লোন
- (খ) ট্যাক্স ইমপ্রুভমেন্টের কাজ আরও বেশীভাবে চালান।
- (গ) ধান নিড়াইতে ও উন্টাতে যথেষ্ট পরিমাণ কৃষিখণ।
- (ঘ) সমস্ত দুঃস্থ ইউনিয়নের রিলিফ টেষ্টওয়ার্ক খোলা প্রয়োজন।

ইহাতে অনেক কুলি-মজুর কাজ পাইবে এবং সেই সকল স্থানে ৭৫০ টাকা মণ দরে সরকার হইতে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের এখানে একজন অভিজ্ঞ সদর মহকুমা শাসক আসিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি অচিরে উক্ত কমিটি গঠন করতঃ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। তিনি অবশ্য একথা বুঝেন যে, এক একজন সার্কুল অফিসারের এরিয়া অনেক বড়—সকল স্থানের সকল খবর রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

হাওড়া জেলায় কৃষি-ঋণ

"নব্য-ভারত" পত্রিকায় ১৪ই ভাদ্র সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল :

"কৃষিকার্য্যে ঋণ সম্বন্ধে হাওড়া জেলায় অত্যন্ত অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। সমবায় সমিতির আপিস হইতে বহু ইউনিয়নের সমবায় সমিতি গঠনের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় এবং যথারীতি সমবায় সমিতিও গঠিত হইয়াছে। ঐ সমিতির প্রয়োজনীয় সরকারী ব্যবস্থামত সব কিছু করার পর কৃষকেরা ঋণ পায় নাই। এ সকল দরখাস্ত সময় মত করা হইয়াছিল, বলিয়া শোনা গিয়াছে। হাওড়া জেলা

সম্ভব কর্তৃপক্ষের নিকট এ সকল জানান হইয়াছিল। তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না বলিয়াছেন। ইহা খুবই আশ্চর্য্য ব্যাপার। অর্থ বন্টনের ভার তাঁহারই উপর অথচ সদর ও উল্বেড়িয়া মহকুমার অর্থ নিকাশিত করিয়া বন্টনের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। সরকারী কর্মচারীদের অমনোযোগিতায় বা খেচ্ছাচারিতায় জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহার নিরসন হইতে বহু অসুবিধা হয়। আমরা এ সম্বন্ধে সম্ভব মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মন্ত্রী মহাশয় বক্তাদের এগুন ও সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিলে করিতে পারেন। শুনিতেছি সরকার কৃষিক্ষেত্রের অর্থ ও সময় বাড়াইয়া দিতেছেন।

এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎপর হওয়া উচিত। কৃষি-বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী প্রসন্নচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে। কারণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না হইলে তাঁহার নিজের বিফলতা প্রমাণিত হইবে।

বর্ধমান শহরের হাসপাতাল

আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯শে ভাদ্র সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বর্ধমান, বাঁকুড়া, জলাপাইগুড়ি শহরের ডাক্তারী স্কুল লইয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাহা করিতেছেন। তাহা বুঝা সহজ নয়। কেন এ-সব স্কুলকে দুর্দশায় ফেলিতেছেন তৎসম্বন্ধে নানাবিধ বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। তার কলে বিষয়টি আরও ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে।

বর্ধমানের সংবাদ, “তথাকার হাসপাতালের প্রস্তুতি বিভাগের সম্ভাবনামূলক রোগিণীদের দৈনন্দিন আহার লইয়া মহাসমস্যা দেখা দিয়াছে। সমস্যাটা অবশ্য খাণ্ড প্রস্তুত এবং পরিবেষণ লইয়া নয়। রোগিণীদের জন্ম নিয়মিত খাদ্য পরিবেষণের পর ইত্যন্তঃ বিচরণশীল গরু, ছাগল ও কুকুর আসিয়া প্রায়ই তাহা গলাধঃকরণ করিতেছে। একটামাত্র পরিচারিকা রহিয়াছে। তাহার দ্বারা উপরোক্ত বেপরোয়া জীবগুলিকে আগলাইয়া থাকা কিংবা বিতাড়ন করা সম্ভব হইতেছে না। সে বিধিমতে উদ্ধৃত্তন কর্তৃপক্ষের নিকট বিবরণ জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছে। কিন্তু প্রতিকার যাহারা করিবেন, তাহারা নাকি এক প্রকার অসহায়তা জ্ঞাপন করিয়াছেন। হাসপাতালের প্রস্তুতি বিভাগে কোলাপসিবল গেট বসাইলে ইত্যন্তঃ বিচরণশীল গরু, ছাগল ও কুকুরের উপদ্রব বন্ধ হইতে পারে, ইহা কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্ম সরকারের নিকট টাকা চাহিয়া কোন জবাব মিলে নাই বলিয়া হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ সমস্তায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। সংবাদটি পাঠ করিলে মনে হয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতিকারের ভার আপাততঃ ইত্যন্তঃ বিচরণশীল গরু, ছাগল ও কুকুরের উপর ছাড়িয়া দিয়ই নিশ্চিন্ত আছেন। প্রকৃতপক্ষে এই আচরণ কুখ্যাত বেডটেপিজম বা আমলাতন্ত্রী গতাযুগতিকতারই চূড়ান্ত নিদর্শন।”

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী-সমাজ

“এই হতভাগ্য দেশে হতভাগ্য জাতির মধ্যে সহস্রা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার পক্ষে একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙিতে পারিত, কখন কেহ নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র শিল্পবিপত্তি তৈলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা যাহা সর্ববিধ মিথ্যাচার ও কপটচারণ হইতে আপনাকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে বাঙালীর মধ্যে অবিভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইতে পারে, সন্দেহ নাই।”—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

“বিদ্যাসাগরের কথা চিন্তা করলে এই কথাই মনে হয়। বাঙালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ও একমাত্র সিংহ যিনি, সেই ঈশ্বরচন্দ্র মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মেছিলেন ১৮২০ সালে। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই, আজ থেকে ঠিক ৬১ বছর আগে। খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়। বিদ্যাসাগরকে স্বচক্ষে দেখেছেন এমন অনেক লোক আজও বাংলাদেশে জীবিত আছেন। তাঁদের মুখে আজও শোনা যায় বিদ্যাসাগরের অমিত-বিক্রমের কথা। মনে হয় যেন রূপকথার কাহিনী শুনছি। চারিদিকের এই কলরবের মধ্যে আজ আরও বিশেষভাবে বিদ্যাসাগরের অভাববোধ করতে হয়। মনে হয়, আজ যখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সমগ্র বাঙালী জাতির চরম জীবনসঙ্কটের দিনে, তখন কোথায় বিদ্যাসাগর, কোথায় সেই পুরুষসিংহের পঞ্জরভেদী গর্জন! বাংলাদেশে বাঙালীর জন্তে আজ যেমন বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন, বোধ হয় বিদ্যাসাগরের আমলেও তেমন প্রয়োজন ছিল না। ভারত-বর্ষে এমন রাজা নাই বাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পায়ে টুক করিয়া লাখি না মারিতে পারি—একথা বিদ্যাসাগর একদিন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলেন। এতবড় কথা বলবার সাহস আজ পর্যন্ত আর কোন বাঙালীর হয় নি, অন্ততঃ কোন চটিজুতাপরা বাঙালীর। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন :

দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাহার অজের পৌরুষ, তাহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব। বিদ্যাসাগরের এই পৌরুষ, এই মনুষ্যত্ববোধই মৃতপ্রায় বাঙালী সমাজে প্রাণসঞ্চার করেছিল বিগত শতাব্দীতে। আজও সেই প্রাণ-স্পন্দনটুকুই আমাদের জাতীয় জীবনের অত্যন্ত উত্তরাধিকার। তার অনেকটাই বিদ্যাসাগরের দান, এবং বাঙালীর নব-জীবনমন্ত্রের প্রধান দীক্ষাগুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর—বাঙালী জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে দুটি মাইলষ্টোন, অর্থাৎ দুটি প্রধান বাঁকের নিশানা। রামমোহন ছিলেন চিন্তানায়ক, বিদ্যাসাগর ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। প্রাচীন ও নবীনের যুগসন্ধিক্ষেত্রে রামমোহনের

অবির্ভাব, তাই ছুয়ের সময়সাধন করাই ছিল তাঁর জীবনের অত্যন্ত ব্রত। বিদ্যাগারের অবির্ভাব নবীনের গুণবাত্মকত্বে, তাই অবি-
রাম চলার পথে গতিসংকার করা এবং সেই পথকে টেঁতেরি করাই
ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। রামমোহনকে যদি 'আর্কিটেক্ট'
বলা যায়, তাহলে বিদ্যাগারকে বলতে হয় 'ইঞ্জিনিয়ার' ও 'বিল্ডার'।
আধুনিক শিক্ষার জন্মে রামমোহন চিঠি লিখেছিলেন আমহাষ্টকে,
হেয়ার ধারে এংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; নারীর শিক্ষা
ও সমান্যধিকারের দাবীও সমর্থন করতেন এবং সত্যীদাহ প্রথা
উচ্ছেদের জন্মে আন্দোলনও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের
অধিকাংশ সময় প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র থেকে একেশ্বরবাদ প্রমাণ ও
প্রতিষ্ঠা করতে কেটে গেছে। ধর্মসম্বন্ধেই রামমোহনের জীবনের
অত্যন্ত কীর্তি। বিদ্যাগার জীবনে কোনদিন 'ঈশ্বর' নিয়ে বা
'ধর্ম' নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁর অত্যন্ত কর্মক্ষেত্র ছিল 'সমাজ'
এবং 'সাধারণ বাঙালী সমাজ'। বিদ্যাগারের জীবনের জপ-তপ-
ধ্যান ছিল শিক্ষার মাধ্যমে, মানবিক ও সামাজিক অধিকার-প্রতিষ্ঠার
ভেতর দিয়ে, প্রত্যেক মানুষের উত্তবুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে
তোলার।

ক্রিয়ার ঘোষ কানীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তি সংক্রান্ত
যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃতাংশ দেওয়া হইয়াছে।
বিদ্যাগার-যুগান্তর। ক্রিয়ারবিন্দুর ভাষায় সাহিত্য ও সমাজে
সর্বাধিনায়ক। তাঁহার সময়েই রাজেন্দ্রলাল সিন্ধের মত পণ্ডিত,
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ধর্ম-বিদ, রাজনারায়ণ বসুর মত স্বদেশ-
প্রেমিক এবং বল্লভচন্দ্র ও মধুসূদনের মত গদ্য ও পদ্য-সাহিত্যের
নূতন পথিকঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর
প্রথম ৫০ বৎসরের বিশেষত্ব।

শ্রীহট্ট সম্মিলনী

শ্রীহট্ট সম্মিলনীর ১৯৫১-৫২ সনের কার্যবিবরণী পাঠ করিয়া
এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ খ্রিষ্ট বৎসরে ভারতের নব-জাগরণের যে
ইতিহাস স্বরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি লোকনায়কবৃন্দ লিখিয়া গিয়াছেন, তার
মধ্যে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর, ত্রিপুরা সম্মিলনীর, বিক্রমপুর সম্মিলনীর,
ময়মনসিংহ সম্মিলনীর, করিমপুর সম্মিলনীর, বরিশাল সম্মিলনীর নাম
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। আজ এই সব প্রতিষ্ঠান পূর্বের
কোন কাজই করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের
সাধারণ ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত সমাজের এই সব
প্রতিষ্ঠান নিজেদের জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।
কলিকাতা নগরীর জনারগোর মধ্যে যে তাহাদের অগণিত দেশবাসী
লুকাইয়া আছে নানা কাজ-কারবারের মধ্যে, তাহাদের সঙ্গে যোগসূত্র
স্থাপিত করিতে পারে নাই। পিদিরপুর, টেরেটিবাজার, কলেজ
স্ট্রীট বাজার, বেলেঘাটা অঞ্চলে অগণিত শ্রীহট্টবাসী বাস করিতেছেন।
তাহাদের 'আদমশুমারি' লইবার চেষ্টা করিলে এইরূপ জন-সেবার
গোড়া পত্তন হইবে।

আমরা মনে করি যে, এই সব প্রতিষ্ঠান এখনও নূতন যুগ
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে নিজেদের জেলাবাসীর সেবা করিয়া পূর্ব-
গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারেন।

বেণীমাধব দাস

গত ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শিক্ষক-সমাজের
অত্যন্ত প্রধান শিক্ষাব্রতী, ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন ধর্মপ্রাণ বেণীমাধব
দাস তাঁহার বালীগঞ্জস্থিত বাসভবনে ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন
করেন।

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত সারোয়াতলী গ্রামে তিনি
জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ উপাধি
লাভ করিয়াই চট্টগ্রাম হাই স্কুলে তাঁহার শিক্ষকতা আরম্ভ হয়।
তার পর কটক রাডেনশ কলিজিয়েট স্কুলে অধ্যাপনার কার্য করেন।
নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। নেতাজী
তাঁহার জীবনীতে এই মধুর সম্পর্কের ও তাঁহার নিকট হইতে
উৎসাহ ও উদ্দীপনালভের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার পর তিনি কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে ও তার পর
সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি
আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। কেবলমাত্র কঠিন শাসনযন্ত্রের
দ্বারা যে ছাত্রমণ্ডলীকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়, একথা তিনি
বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু মধুর কোমল আদর্শেও যে ছাত্র-
সম্প্রদায়কে সমানভাবেই সুপরিচালিত করা যায়, স্বর্গত বেণীমাধব
বাবুই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শিক্ষক-সমাজে দেখাইয়া গিয়াছেন।
ছাত্রমণ্ডলে উচ্চ আশা জাগ্রত করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।
তাঁহার চরিত্রে একাধারে বজ্রসমান কঠোর ও কুসুমের মত কোমল-
ভাবে অপরূপ সমন্বয় যে দেখিয়াছে সেই বিস্মিত ও পুলকিত
হইয়াছে। তাঁহার অনন্তসাধারণ ব্যক্তিত্বের সম্মুখে সকলকেই মস্তক
অবনমিত করিতে হইয়াছে।

তিনি ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। তাঁহার
দৃঢ় নৈতিক চরিত্রবল সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিত। তাঁহার
মধুর অমায়িক ব্যবহার, শেষজীবন পর্যন্ত অগ্নির মঙ্গল চিন্তা করা,
সকলের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করা যে দেখিয়াছে তাহারই
অন্তরে তাঁহার এই পবিত্র স্মৃতি অমর হইয়া থাকিবে।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্যালয় ৯ই আশ্বিন (২৫শে
সেপ্টেম্বর) হইতে ২২শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) পর্যন্ত বন্ধ
থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকা-কড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে
ব্যবস্থা খুলিবার পর করা হইবে।

এই সুজ্ঞে জানানো যািতেছে যে, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানা-
পরিবর্তন, প্রবাসী-অগ্রাণ্ডি—এতদ বিধরক চিঠিপত্র "ম্যানেজার,
প্রবাসী" এই নামে প্রেরিতব্য।

শাহজাদা দারাশুকে

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

ষষ্ঠ অধ্যায়—গৃহযুদ্ধের কারণ ও দায়িত্ব

মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে দারার হৃর্ভাগ্য, শাহজাহানের বন্দীদশা, শুজা ও মোরাদের শোচনীয় পরিণাম—ইহার জন্ত দায়ী কে? এই প্রশ্ন নিতান্ত সহজ নহে। ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে একতরফা রায় দেওয়া সেকালের কাজীর বিচার, একালে ঐ জাতীয় ঐতিহাসিক বিচার গবেষণার নামে ওকালতী। বোধ হয়, আওরঙ্গজেবের মনে সন্দেহ হইয়াছিল খোদাতালা ছাড়া পাঠিষ্ঠ মানুষও হয়ত কোন দিন তাঁহার কাজের বিচার করিবে। এইজন্ত প্রাথমিক সাবধানতাস্বরূপ তিনি দরবারী ইতিহাস-রচনা এক রকম বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, গৃহযুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত পিতার সহিত শাসনসংক্রান্ত ও পারিবারিক ব্যাপারে যে সমস্ত চিঠি লেখালেখি হইয়াছিল এবং শাহী দরবারে দারার চক্রান্তে বিপন্ন ইসলামের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত নিজে কিরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় দলিল দস্তাবেজে প্রস্তুত রাখিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের ছয় মাস পূর্ব পর্যন্ত দারা তাঁহার দিল্লীস্থ “নিগম-বাধ-মঞ্জিল” প্রাসাদে উপনিষদের ফার্সী অনুবাদকার্যে মহাব্যস্ত ছিলেন; তাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রস্তুতি কিংবা মোকদ্দমা সাজাইবার তাঁহার সময় কোথায়? দারা মানুষকে বড় বিশ্বাস করিতেন; বিশ্বাস করিয়া ঠকিয়াছিলেন, বিচারের ভার মানুষের উপরই ছাড়িয়া গিয়াছেন। নিরপেক্ষ সত্য অনুসন্ধিৎসায় যাহা সম্ভব, এই প্রশ্ন গীমাংসার আচার্য যদুনাথ চূড়ান্ত রায় দিয়াছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের উপর গৃহযুদ্ধে দায়িত্বের অংশ ত্রায্যমত বণ্টন করিয়াছেন।* সম্প্রতি আমরা সংক্ষেপে শাহজাহান এবং তাঁহার পুত্র চতুষ্ঠয়ের অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ আলোচনা করিব।

২

পুত্রের পিতা এবং সম্রাট হিসাবে শাহজাহানের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের প্রধান অভিযোগ—

(ক) স্নেহ ও অনুগ্রহ বর্টনে দারার প্রতি অর্থোক্তিক পক্ষপাতিত্ব।

(খ) দারার মৃত্যুতে আওরঙ্গজেবের কার্যে বাধাদান ও তাঁহাকে অপমান।

(গ) আওরঙ্গজেবের প্রতি বিদ্বেষ ও অযথা সন্দেহ।

ইহার সহিত ইতিহাসের দুইটি অতিরিক্ত ধারা—

(ঘ) সম্রাটের দোষ-ত্রুটি পুত্রগণের বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ কি না।

(ঙ) আসন্ন গৃহযুদ্ধ নিবারণের জন্ত সম্রাট সমস্ত সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না।

শাহজাহান পুত্র চতুষ্ঠয়ের প্রতি বিশেষ স্নেহাসক্ত ছিলেন, কিন্তু অনুগ্রহ সমান ভাবে বর্টিত হয় নাই—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তিনি আওরঙ্গজেবকে শাসনকার্যে দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্ত যথোচিত প্রশংসা করিতেন এবং কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্ত সুর্যোগ দানে কার্পণ্য করেন নাই। “প্রশংসা” শক্রমিত্র সকলের নিকট হইতে জ্বরদস্তী করিয়া আদায় করা যায়, কিন্তু “ভালবাসা”র উপর আবদার চলিতে পারে, জ্বরদস্তী চলে না। আওরঙ্গজেবকে ভালবাসার পাত্র হইবার মত, কিংবা হুনিয়ার স্ত্রীপুত্র-মিত্রকে বিশ্বাস ও ভালবাসিবার ক্ষমতা খোদাতালা দেন নাই। নিজের পুত্রগণের প্রতি আওরঙ্গজেবের নিশ্চয় কঠোরতা এবং সতর্ক দৃষ্টি যদি শাহজাহানের থাকিত তাহা হইলে পুত্রের মত তিনিও গৃহযুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিতেন, বন্দী-দশার তাঁহার মৃত্যু হইত না। গুণ ও কার্যের অনুপাতে দারা অপেক্ষা আওরঙ্গজেব কম জায়গীর ও মনসব পাইয়াছিলেন; কিন্তু বিচার্য বিষয়, দারা অপেক্ষা বেশী পাইলে তিনি কি করিতেন? জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রিয়তম এবং যোগ্যতম তৃতীয় পুত্র শাহজাদা খুরমকে (পরে সম্রাট শাহজাহান) ত্রিশ হাজারী মনসবদারী প্রদান করেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রকে বাদ দিয়া তাঁহাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন—এইরূপ সুরিচারে খুরমের পিতৃদ্রোহ নিবারিত হইল না কেন? আসল কথা, শাহজাহান পুত্রকে চিনিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব যে “সুরিচার” দাবি করিতেন, দিল্লীসাম্রাজ্য এবং অত্যাশ পুত্রের জীবন বিপন্ন করিয়া উহা পূর্ণ করিলে শাহজাহান রাজধর্মচ্যুত হইতেন, মাতা মমতাজ বাঁচিয়া থাকিলেও আওরঙ্গজেব ময়দান সাফ করিয়া ফেলিতেন। অত্যাশ পক্ষপাতিত্বের নমুনা :—

১।—সুবা মুলতান এবং সুবা লাহোরের সীমায়ুখে ইসমাইল হত নামক এক বেলুচ জমিদার মুলতান-সুবাদার আওরঙ্গজেবের আদেশ অমান্য করিয়া লিখিয়াছিল, সে লাহোরের সুবাদার শাহজাদা দারার প্রজা এবং অজুহাত

* বর্তমানে কয়েকজন লেখক ইতিহাসের নামে “অজুহাত নামা” [Apologia] লিখিয়াছেন, যথা—মৌলানা শিবলী হুমায়ী (উদ্ভূ); কোরেশী —History of Aurangzeb.

স্বরূপ দারার চিঠিও দাখিল করে। আওরঙ্গজেব দারার বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। সম্রাট স্বয়ং দুই সুবার সীমানির্দেশ করিয়া আওরঙ্গজেবের সপক্ষে রায় দিয়াছিলেন।

২। ইহার দুই বৎসর পরে আওরঙ্গজেব যখন দ্বিতীয়-বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া বদলি হইলেন তখন মুলতান-সুবা দারাকে দেওয়া হইয়াছিল। সুবাদার বদলি হওয়া সুবার প্রজাগণের পক্ষে এক মহা উৎপাত। যিনি বদলি হইতেন তাঁহার কর্মচারিগণ জবরদস্তী করিয়া কিস্তীর খাজানা আগাম উত্তুল করিত; তখন সুবার অবস্থা যেন পররাজ্যে দখলকারী ফৌজের পশাদপসরণের আত্মঘাতিক অরাজকতা। অপর পক্ষে, নূতন সুবাদারের পাইক বরকন্দাজ দেওয়ান ফৌজদার দখল কায়েম করিবার জন্ত সুবার অবস্থা নববিজিত দেশের স্থায় করিয়া তুলিত। মুলতানে দারার কর্মচারিগণ অভিযোগ করিল, পূর্ববর্তী সুবাদারের আমলারা মুলতান শহরে সরকারী ইমারতগুলি ভাঙিয়া কড়ি-বরগা ও চৌকাঠ পর্যন্ত বিক্রী করিয়া গিয়াছে। দারা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া সরাসরি ঐ অভিযোগ দরবারে পেশ করিলেন। আওরঙ্গজেবের কাছে কৈফিয়ৎ তলব হইল। আওরঙ্গজেব এইরূপ কাঁচা কাজ করিবার লোক ছিলেন না; বিচারে দারার কর্মচারিগণও দোষী সাব্যস্ত হইল।

৩

আওরঙ্গজেবের প্রতি শাহজাহানের সন্দেহ ও অবিশ্বাস অধিকাংশ স্থলেই অমূলক ছিল না। তবে একটি ব্যাপারে আওরঙ্গজেবের প্রতি তিনি নিঃসন্দেহ অবিচার এবং অশোভন সন্দেহ করিয়াছিলেন যাহা “ঘাট বুদ্ধি নাট” ছাড়া কিছুই নহে।

বুরহানপুরের শাহীবাগে একটা আমগাছ ছিল—নাম বাদশাপছন্দ। ঐ আমগাছের জন্ত দাক্ষিণাত্যের সুবাদারকে শাহী খেদমতের ব্যবস্থা করিতে হইত এবং আম পাকিলে কিস্তী করিয়া জরুরি ডাকচৌকি মারফত দিল্লী আশ্রয় পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিতে হইত, আমের বুড়ি কোথায়ও মাটিতে রাখিবার হুকুম ছিল না। দ্বিতীয় বার আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যে বদলি করিবার সময় শাহজাহান পুত্রকে এই আমগাছের কথা বিশেষ ভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন। ঐ গাছের তদারক করিবার জন্ত নূতন সুবাদার এক অতি বিশ্বস্ত কর্মচারীকে বুরহানপুরে রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমের প্রথম বুড়ি দরবারে পৌঁছিবার পর আম খাইয়া আলা হজরত বলিলেন, এইবার আম ঠিক সময়ে তোলা হয় নাই। দ্বিতীয় বুড়ির উপর মন্তব্য হইল, আম বোধ হয় আসিবার সময় মাটিতে রাখা হইয়াছিল। তৃতীয় বুড়ি দেখিয়া সম্রাট বলিলেন,

আম এই বৎসর যেন সংখ্যায় কম; জাহানারা ভাইকে ঐই কথা জানাইয়া দিলেন। আওরঙ্গজেব প্রমাণাদিসহ কৈফিয়ৎ দিলেন বাড়ে একটা বড় ডাল ভাঙিয়া গিয়াছে এবং আমও কম ফলিয়াছে। ইহাতেও নিস্তার নাই। পরের কিস্তি পৌঁছিবার পর আলা হজরত বলিলেন, আমের বুড়ি বোধ হয় বুরহানপুর হইতে দৌলতাবাদ ঘুরিয়া আসে।

এইরূপ উক্তি সম্রাটের সমাগত দ্বিতীয় শৈশবের ছায়া।

আওরঙ্গজেবের চিঠিপত্র হইতে দেখা যায়, দ্বিতীয় বার দাক্ষিণাত্যে আগমনের পর হইতেই শাহজাহান এবং দারার বিরুদ্ধে তাঁহার বেশীর ভাগ অভিযোগ। এই সমস্ত অভিযোগ সত্য হইলেও ঐগুলিকে গৃহযুদ্ধের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই শুজার সহিত দিল্লীতে এবং মোরাদের সহিত মালবে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আওরঙ্গজেব দারার বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ করিবার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ইহার পর হইতে এই গুপ্ত “ত্রিবর্গ” মিত্রশক্তির তিনিই সেক্রেটারী এবং পোস্ট-আপিস স্বরূপ কাজ করিতেছিলেন; সুতরাং দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার আওরঙ্গজেবের যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুতি—উহাকে “কার্য্য” বলা যাইতে পারে, “কারণ” নহে। দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার সংক্ষেপে এইরূপ :

ইরাণ দেশের ইম্পাহান শহর হইতে এক তেলীর ছেলের (তবুও পৈয়দা) গোলকুণ্ডায় আসিয়া ক্রমে হীরা-জহরত-ব্যবসায়ী এবং পরে সুলতান আবদুল্লা কুতব শাহের উজীর-আজম হইয়াছিলেন—ইহার ইতিহাসবিখ্যাত নাম মীরজুমলা। অতঃপর তেলী-নন্দনের কোথায়ও একজন স্বাধীন সুলতান হইবার বাসনা হইল। তিনি পুত্র মহম্মদ আমিনকে গোলকুণ্ডায় নায়েব-উজীর রাখিয়া গোলকুণ্ডার সৈন্য ও অর্থ-বলের সাহায্যে কুতবশাহের নামে পূর্বকর্ণাটক অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং এখানেই স্বাধীনভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এই দিকে মহম্মদ আমিন কুতবশাহের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। কুতবশাহ দিলদরিয়া লোক; সঙ্গীত ও সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়াই থাকিতেন। এক দিন নায়েব-উজীর মহম্মদ আমিন পানোন্মত্ত অবস্থায় মসনদের উপর শাহী গালিচায় শুইয়া কুতবশাহের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে গালিচার উপর শরাব বমি করিয়া ফেলিলেন। ভাল মানুষ কুতবশাহ হঠাৎ রাগিয়া নায়েব-উজীরকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং কর্ণাটক হইতে মীরজুমলাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন। আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে আসিয়াই মীরজুমলার সহিত কুতবশাহের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং গোলকুণ্ডা আক্রমণের অছিলা খুঁজিতেছিলেন। আমিনকে মুক্তি দিবার জন্য শাহজাহান যে ফরমান আওরঙ্গ-

জেবের সঙ্গে লিখিত চিঠির সহিত পাঠাইয়াছিলেন, তিনি উহা জব্বা ভাবে চাপা দিয়া সম্রাটের আদেশ অমান্যের অজুহাতে গোলকুণ্ডারাজ্য আক্রমণ করিলেন, আসল ব্যাপার কুতবশাহ বা সম্রাট কাহাকেও জানিতে দিলেন না (১০ই জানুয়ারি ১৬৫৬)। কুতবশাহের দূত অনন্যোপায় হইয়া প্রভুকে এই অন্যায় আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য দারার শরণাপন্ন হইলেন। দারার নিকট হইতে প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া কুতবশাহকে ক্ষমা করিয়া সম্রাট এক ফরমান পাঠাইয়াছিলেন (৮ই ফেব্রুয়ারি ১৬৫৬)। আওরঙ্গজেব উহাও চাপা দিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। দারা ও জাহানারা উভয়েই এইবার কুতবশাহকে রক্ষা করিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কড়া আদেশ পাঠাইলেন, যুদ্ধ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া বাদশাহী ফৌজকে গোলকুণ্ডা রাজ্য হইতে সরিয়া আসিতে হইবে (৩০শে মার্চ, ১৬৫৬)।

আওরঙ্গজেব মনে করিলেন ইহা দারার ষড়যন্ত্র, পিতার অবিচার।

বাঘের মুখ হইতে শিকার কাড়িয়া লওয়া বিপজ্জনক হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ কার্যকে কেহ বাঘের প্রতি অবিচার বলিবেন কি? হুই হুই খানা শাহী ফরমান বোমালুম পায়ের করিয়া ফেলিবার অপরাধের জন্য আওরঙ্গজেবকে বদলি করিলেই সুবিচার হইত।

৪

সম্রাট শাহজাহানের লোভে পাপ এবং পাপে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছিল। এই লোভের বশেই তিনি পুনরায় আওরঙ্গজেবের কাঁদে পড়িলেন। পুত্রের চিঠিতে গোলকুণ্ডার প্রতি বিশ্বাসঘাতক মীরজুমলার গুণরাশি শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিলেন এবং মৃত উজীর সাহল্লার স্থলে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন (জুলাই ১৬৫৬ ইং)। সম্রাট কিছুদিন তাঁহার পরামর্শ অল্পসারে চলিতে লাগিলেন; দারার কথায়ও আমল দিতেন না। ঐ বৎসর (৪ঠা নবেম্বর, ১৬৫৬) বিজাপুরের পরাক্রান্ত এবং শাহজাহানের বন্ধুস্থানীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হওয়ার পর ঐ রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিয়াছিল। আওরঙ্গজেব এই সুযোগে বিজাপুর জয় করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং সম্রাটের কাছে লিখিলেন, আদিল শাহের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় আদিল শাহ তাঁহার আসল পুত্র নহে। মীরজুমলা সম্রাটকে বুঝাইলেন বিজাপুর অতি সহজে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার ইহাই সুবর্ণ-সুযোগ। শাহজাহান এই

লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না; বিজাপুরের বিরুদ্ধে এই “অধর্ম”-যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের কাছে একেবারে সাদা চেক পাঠাইয়া দিলেন। মালব এবং অত্যাশ্চর্য্য সুবার বাদশাহী ফৌজ লইয়া মীরজুমলা আওরঙ্গজেবের সাহায্যার্থ ১৬৫৭ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে শাহজাদার সহিত মিলিত হইলেন। আওরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য সফল হইল।

আলা হজরত জহরত ভাল চিনিতেন; কিন্তু এই ইরাণী শিয়া জহুরী তাঁহাকে ঠকাইয়া গেল। আট মাস পরে বিজাপুরের রাজদূত শাহজাদা দারার মারফত সন্ধিপত্রাখী হইলেন। ইতিমধ্যে মোহগ্রস্ত সম্রাট চৈতন্তলাভ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের কুমতলব আশঙ্কা করিয়া তিনি হুকুম পাঠাইলেন, তাঁহার নির্দিষ্ট সর্ভে সন্ধি করিয়া ফরমান পাওয়া মাত্র যেন যুদ্ধ বন্ধ করা হয়; অধিকন্তু হিন্দুস্থানের বাদশাহী মনসবদারগণের কাছে সোজাসুজি ফরমান প্রেরিত হইল তাঁহারা যেন অবিলম্বে ফৌজসহ দরবারে ফিরিয়া আসেন (সেপ্টেম্বর, ১৬৫৭)। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ জীয়াইয়া রাখিয়া হিন্দুস্থানের বাদশাহী ফৌজ তাঁহার অধীনে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলে দারা আত্মরক্ষার উপায় হইতে বঞ্চিত হইবে—এই মতলবেই আওরঙ্গজেব বিজাপুর-গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অত্যাচার যুদ্ধপক্ষে সম্রাটকে প্রলোভিত করিয়াছিলেন।

সম্রাট এই অত্যাচার কার্যে অসঙ্গত দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া আওরঙ্গজেবের হাতে ক্রীড়নক হইলেও অনিবার্য্য গৃহযুদ্ধ তিনি নিবারণ করিতে পারিতেন না।

৫

গৃহযুদ্ধের জন্য কোন কোন ঐতিহাসিক শাহজাহানের উপর প্রধান দায়িত্ব চাপাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রথম অভিযোগ, পুত্রগণের ধর্ম-শিক্ষায় সম্রাট উদাসীন ছিলেন, দারাকে পাকাসুন্নী বানাাইলেই মুসলমানেরা ধর্মের নামে আওরঙ্গজেব কর্তৃক প্রতারণিত হইত না। ইহা অতি স্থূল যুক্তি। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, পুণ্যাত্মা খলিফা হজরত আলীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ মুসলমান অভিজাতবর্গ কপটী মুনাফেক মাঝিয়ার সহিত যোগ দিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে আলীর চাচা আব্বাসও ছিলেন। দারা সুন্নী হইলে তাঁহার পথ কিঞ্চিৎ সুগম হইত, কিন্তু দারা ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে সম্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। শাহজাহান পুত্রগণের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগির পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন; কিন্তু উহাতেও শান্তির আশা ছিল না। ভাগের কষলে সাত জন ফকির নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে পারে; কিন্তু সঙ্গার সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর আধিপত্য একজন বাদশাহের মাটির ক্ষুধা মিটাইতে

পারে না। শাহান্‌শাহ দিল্লীর বাদশাহী নিজের ওজনে চারি পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেও গৃহযুদ্ধ বন্ধ হইত না। শাহজাহানের মত অবস্থার পড়িয়া খলিফা হারুণ-অল-রসিদ পর্যন্ত ঐরূপ ভাগাভাগি করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন—“অন্তে পরে কা কথা”।

একমাত্র রুমী কায়দা ব্যতীত বংশানুক্রমিক সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তুর্কী সুলতানগণ তাঁহাদের জীবদ্দশায় পুত্রগণের মধ্য হইতে একজনকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিয়া বাদশাহী জন্ত আজীবন কারাগারেই আরামের ব্যবস্থা করিতেন। আওরঙ্গজেবকে প্রথম বরসে পদচ্যুতির পর সরাসরি মক্কাশরীফে পাঠাইয়া দিলে গৃহযুদ্ধের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। মমতাজের মৃত্যুর পর পিতার শাসন অপেক্ষা মাতার স্নেহ সম্ভানগণ শাহজাহানের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। অন্তর হইতে মমতাজের স্মৃতিকে বিদর্জিত দিয়া, পাশ্বে তাঁহারই ছায়া জননীর প্রতিচ্ছবি কণ্ঠা জাহানারার মর্মে আবাত করিয়া এইরূপ কার্য শাহজাহান করিলে তাঁহারই হৃদয়ের মর্ম্মগ্রস্থি ছিন্ন হইয়া যাইত। পুত্রগণ বিদ্রোহী হওয়ার পরেও এই স্নেহ তাঁহার করণত রাজদণ্ডের শক্তিকে দুর্বল করিয়াছিল।

৬

গৃহযুদ্ধের জন্ত দায়ী না হইলেও দারার দুর্ভাগ্যের জন্ত পিতা ভ্রাতা কিংবা জগৎপিতা কেহই দায়ী নহেন। তিন পিতৃদত্ত সুর্যোগের যথোচিত ব্যবহার করেন নাই, যুবরাজের বিপদ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না—অতি বিলম্বে তাঁহার “যোগনিদ্রা” ভঙ্গ হইয়াছিল। ছয় সূবার বিপুল অর্থ এবং সেনাবাহিনী তিন ভ্রাতার সম্ভাব্য বিরোধিতা ব্যাহত করিবার জন্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকিলে অবস্থা অল্প রকম হইত; অবহেলা করিয়া তিনি নিজে ডুবিলেন রক্ত পিতাকেও ডুবাইলেন। দলগঠনে আওরঙ্গজেবের মত দক্ষতা শাহজাদা দারার ছিল না; অথচ তিনি দলের উর্দ্ধে থাকিতে পারেন নাই—ধাঁহার প্রকৃত কাজের লোক তাঁহাদিগকে চটাইয়াছেন। এই হিসাবে প্রতিপক্ষকে সুর্যোগ দেওয়ার দোষ এবং গৃহযুদ্ধের জন্ত পরোক্ষ দায়িত্ব হইতে দারা সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইতে পারেন না।

আকবরের উদার নীতি অনুসরণ করিয়া শাহজাদা দারা রাজনীতিক্ষেত্রে দৃষ্টির প্রসার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান-সমাজে ক্রমবর্ধমান ধর্ম্মান্ধতার জোয়ারে ভাঁটি সাতরাইবার মত প্রপিতামহের অনন্তসাধারণ শক্তি তাঁহার ছিল না—আওরঙ্গ-

জেব এই জোয়ারে গা ভাসাইয়া তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া অতীষ্ট লক্ষ্যে অন্নারাসে পৌঁছিয়াছিলেন।

৭

“রাজতন্ত্র” মতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিপরীত সাধনায় নিম্ন কুমার আওরঙ্গজেবের মধ্যে ঐতিহাসিক “মহা”-পুরুষের সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজধর্ম্মের প্রথম সূত্র, “মনস্তত্ত্ব বচস্তত্ত্ব কশ্মণ্যন্ত—” তাঁহার চরিত্রে সুপরিষ্কৃত। তিনি চিরকাল মনে এক, কথার অন্ত এবং কাজে আর কিছু। তৎকালীন সমাজে কিংবা মোগলদরবারে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে এই নীতি দোষাবহ কিংবা নিন্দনীয় ছিল না। বর্তমান যুগেও বিশ্বের দরবারে কার্যোদ্ধারের জন্ত এই নীতি কেহ কেহ অপরিহার্য বিবেচনা করিয়া থাকেন।

আওরঙ্গজেব স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন তিনি কাহারও হাতে “কোরবানে”র উট হইবেন না; তাঁহার ভাগ্যে হয় দরবেশী, না হয় বাদশাহী। তিনি জানিতেন আল্লা তাঁহার একমাত্র প্রকৃত সহায়, গুজা-মোরাদ ভয়ী রোশনারা, মাতুল শায়স্তা খাঁ কিংবা মেসো জাফর-খলিল উল্লা নহে; জীবনে যদি ঈদ কখনও আসে উহাতে আল্লার নামে উৎসর্গীকৃত তাঁহার ঈদের উট-ছাগল হইবে দারা গুজা ও মোরাদ। সরল জীবন-যাত্রা, সরলতা-বর্জিত সৌজন্য ও প্রিয়ভাষিতা এবং শরিয়তে সুবিধাবাদী নিষ্ঠায় কুমার আওরঙ্গজেব প্রথম হইতেই উদীর-মান “জিন্দাপীর”;—মুখে ককিরী ছাপ ও দরবেশী বুলি, ইসলামের জন্ত প্রচারমূলক আশঙ্কা, পিতার প্রতি ভক্তির বাণী এবং গুজা ও মোরাদের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম ও হিত-চিন্তার ফোয়ারা। কার্যে তাঁহার অতি প্রশংসনীয় শাস্ত্রোক্ত “আফল-কর্ষোদয়” নীতি ফলপ্রসূ না হইলে তিনি কি করিবেন কাহারও সন্দেহ কিংবা অনুমান করিবার সাধ্য ছিল না—ফলপ্রসূ হইবার পূর্বে কেহ জানিতে পারিত না। শাহজাহানের রাজত্বে অভিনীত বীভৎস-বিরোগান্ত গৃহযুদ্ধ নাটিকার নটগুরু কিন্তু স্বয়ং আওরঙ্গজেব। তিনিই প্রযোজক, তিনিই প্রথম অঙ্কে গুজা ও মোরাদের উপদেষ্টা সাজিয়া তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা-বহিতে ইন্ধন জোগাইয়াছিলেন—এই অভিযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পিতার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহী হইলেও গুজা ও মোরাদের দায়িত্ব আওরঙ্গজেব অপেক্ষা অনেক কম।

শাহজাহানের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে অপর অপেক্ষা বেশী “লায়েক” মনে করিতেন। ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ মোরাদ ছিলেন চরিত্রে আওরঙ্গজেবের ঠিক বিপরীত। চিন্তা-ভাবনা ভয়-কপটতা সংঘ-ধর্ম্মনিষ্ঠা মোরাদের

ছিল না। “বলং বলং বাছবলম্” বলিয়া সর্বদা বাহ্যাস্ফোটন—
শাহীপরিবারে তিনি যেন “বলভদ্রে”র তুর্কী অবতার—বুদ্ধিতে
হলধর, পান-ভূমিতে মদিরালোলাক্ষ স্বলিতপ্রয়াত কাদম্বরী-
পানোদ্ধত-পৃথুশ্রী রেবতীরমণ, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বিক্রমে সঙ্করণ।
তিনি প্রায় প্রকৃতিস্থ থাকিতেন না, হয় রক্তপাত না হয়
শরাব ও সুন্দরী তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া রাখিত। দাদা
আওরঙ্গজেব বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে দিল্লীর তক্তে
বসাইয়া মকাত্যাত্রা করিবেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া
এবং ষড়যন্ত্র-জালে আবদ্ধ হইয়া মোরাদ প্রথমেই যুদ্ধে নামিয়া
পড়িয়াছিলেন। মোরাদের অসুর-বিক্রম আওরঙ্গজেবের ইঙ্গিতে
চালিত হইয়া দারার শক্তি ধূলিসাৎ করিয়াছিল, দিল্লীশ্বর ও
দিল্লীসাম্রাজ্যকে আওরঙ্গজেবের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল।
দাদাকে তিনি সরল মনে নিজের মাথার কাঁঠাল ভাঙিতে দিয়া
মাথাটাও হারাইয়াছিলেন। গৃহযুদ্ধে আওরঙ্গজেব মুখ্য, এবং
মোরাদ গোণ অপরাধী; শুজা ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে প্রায়
সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

সুলতান শাহশুজা শাহজাদা দারার তের মাস পরে ভূমিষ্ঠ
হইয়াছিলেন। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতামহ জাহাঙ্গীরের
আদরে লালিত-পালিত হইয়া তাঁহার দোষ-গুণ অনেক-
কিছু তিনি পাইয়াছিলেন; কোন নূরজাহানের হাতে পড়িলে
বোধ হয় নাতি-ঠাকুরদার মধ্যে ইতিহাসে কোন তফাৎ
থাকিত না। নিষ্ক্রিয়বাদে দিল্লীর সিংহাসনে বসিতে পারিলে
সম্রাটের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে শুজাই যোগ্যতম উত্তরাধিকারী
হইতেন। দারার দাক্ষিণ্য, উদারতা ও চরিত্রমাধুর্য্য, এবং
আওরঙ্গজেবের বাস্তব দৃষ্টি, মাত্রাজ্ঞান, ব্যবহারিক বুদ্ধি, নীতি-
প্রয়োগ, শৌর্য্য ও শাসনক্ষমতার একত্র সমাবেশ তাঁহার
মধ্যেই ছিল; অথচ কোন প্রকার ভাবের পাগলামি, ছেলে-
মানুষি, গৌড়ামি, ভণ্ডামি কিংবা সহজাত দুষ্ট বুদ্ধি ছিল না।
বয়সে ছোট হইলেও তিনি দারার পূর্বেই প্রথম মনসবদার ও
সুবাদার হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের মত একটানা কঠোর
পরিশ্রমে উৎসাহ ও দৃঢ়তা, প্রারম্ভ কার্য্যে একাগ্রতা
ও ধৈর্য্য কিংবা ব্যসন-সংযম তাঁহার ছিল না। বাল্যারম্ভ
কুটনীতি চর্চ্চা, শাসনকার্য্য ও যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের প্রশংসনীয়
গুণসমূহ পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল; কিন্তু সুযোগের
সম্ভাবনার না হওয়ায় শুজার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভা
বাংলাদেশে পল্ল ও মলিন হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার কোষবদ্ধ
তরবারি শাণ ও পান দুইটাই হারাইল।

প্রায় একটানা সতর বৎসর সুবা বাংলার নিরুপদ্রব
সুবাদারী শুজার পক্ষে শুভ হয় নাই। বাংলার দোজখে ভাল
ভাল ভেগের জিনিষের অভাব ছিল না; আকাশ-বাতাসে

আরাম-আয়েস ভাসিয়া বেড়াইত। আওরঙ্গজেবের মত পদে
পদে খোদাকে ভয় কিংবা শরিয়তের পা-বন্দী হইয়া তিনি
চলিতেন না। তিনি অতিমার্জিতকৃষ্টি, সঙ্গীতপ্রিয় এবং
কাব্যরসিক ছিলেন; শিয়া-সুন্নীর সঙ্গীর্ণতা তাঁহার ছিল না।
তাঁহার শাসনকালে দিল্লী-আগ্রা হইতে অনেক বিশিষ্ট শিয়া-
পরিবার ঢাকায় স্থায়ী উপনিবেশ-স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার
দরবারী বিশ্বস্ত অনুচরগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ইরানী
শিয়া। লোকে আওরঙ্গজেবকে একটা “ভয়স্থান” মনে করিত;
শুজাকে রাজোচিত গাভীরের জন্ত সমীহ করিত, মানুষ
হিসাবে বিশ্বাস করিত এবং ভালবাসিত। শুজা দারাকে ঈর্ষা
করিতেন, হিংসা কিংবা অসৌজন্য তাঁহার প্রতি কখনও প্রকাশ
করেন নাই। ছোট ভাই আওরঙ্গজেবকে পিতা তাঁহার
সমন মনসব দিয়াছিলেন এই জন্ত তিনি কখনও অভিযোগ
করেন নাই, জাহানারা এবং পিতার উপর অভিমান তাঁহার
থাকিলেও আক্রোশ ছিল না। দারার বিরুদ্ধে এক পথের
যাত্রী হইয়াও শাহ-শুজা “গুভচিন্তক” আওরঙ্গজেবকে বিশ্বাস
করিতেন না, মোরাদের লক্ষ-বক্ষ দেখিয়া হাসিতেন।

শাহশুজার চরিত্রে “একোহি দোষো গুণরাশিনাশী”
হইয়াছিল। এই দোষ: তাঁহার মজাগত আলস্য এবং
আনুযায়িক অত্যাচার ব্যসন। সেকালে বাংলাদেশে যদি কোন
কালিদাস থাকিতেন তাহা হইলে রঘুরাজ অগ্নিবর্ণের ভোগ-
বিলাসের ছায়া ঢাকা-রাজমহলে শাহশুজার অন্তঃপুরে
দেখিতে পাইতেন। মহারাজ অগ্নিবর্ণের মত এই মোগল
রাজকুমার ছিলেন, “রাত্রিজাগরো দিব্যশয়ঃ”, অর্থাৎ:

“বামাস্পর্শ সূখে যাপিয়া যামিনী

হতেন নিদ্রিত দিনে নরমণি।” [নবীনচন্দ্র দাস]

শাহশুজার হারেম ছিল একটি নিত্যনুতন ভ্রাম্যমাণ
বেহেশত; অন্দরমহলে পালে পালে ছর-পরীর নাচগান,
শরাবের নহর। ঢাকা ও রাজমহলের অলস অপরাহ্ন তিনি
বুড়ীগঙ্গা কিংবা জাহবীর ডেউ গণিয়া কাটাইয়াছেন, হয়ত
দেখিয়াছেন অদূরে নর্তকীর বিলসিতানুকারিণী তবী
তরঙ্গ-নীবিবদ্ধা সঞ্চারিণী বলাহকমালাবিলম্বী বোলাভূমির
নিতম্বদম্বী। নাচওয়ালীর রূপের হাটে তিনি রাত্রি প্রভাত
করিয়া দিনকে রাত করিতেন; ভোগের ক্লান্তি ও অবসাদ
দূর করিবার জন্ত কয়েকদিন শাসনসংক্রান্ত বকেয়া ও হালের
যাবতীয় কার্য্য উর্দ্ধ্বাসে অথচ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করিয়া
আবার কিছুদিন আরাম-আয়েসে ডুবিয়া থাকিতেন। ইহার
ফলে তিনি অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া চল্লিশের এগারেও
চামেলি ফুল অপেক্ষা কোন ছোট জিনিষ চোখে দেখিতেন
না। সুশাসন ও দানশীলতার গুণে বাংলার লোক তাঁহাকে

প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত, পূর্ববঙ্গ “নকল শুজার” জন্ম আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। শুজার শৌচনীয় পরিণামের জন্ম দায়ী তাঁহার ব্যসনপ্রবণস্বভাব—বাংলার মাটি নহে। সুযোগের অভাব প্রার ক্ষেত্রে অলস ব্যক্তির অজুহাত। শুজার পরিবর্তে সম্রাট যদি আওরঙ্গজেবকে বাংলাদেশে রাখিতেন তবুও তাঁহার অদম্য ইচ্ছাশক্তি, আক্রমণাত্মক স্বভাব এবং ময়ূরসিংহাসনের স্বপ্ন নিশ্চয়ই অনুকূল কর্মক্ষেত্রে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত। গোলকুণ্ডা-বিজাপুরের মত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য বাংলার সীমান্তে না থাকিলেও অবিজিত আশাম, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম, মর্গ-পর্তুগীজ ছিল; সুতরাং বাংলার সুবাদারের তলোয়ারে মরিচা ধরার কোন সম্ভব কারণ ছিল না।

৮

পিতৃসিংহাসনের আশা আলস্তপরায়ণ শাহশুজার ধ্যানে বহু বৎসর “আচ্ছন্ন” অবস্থার স্তরে ছিল। তিনি চাহিয়াছিলেন সম্রাটের জীবদ্দশায় তিক্ততার সৃষ্টি না করিয়া সুবা উড়িয়া এবং বিহার যেন বাংলার সহিত তাঁহার অংশস্বরূপ নির্দিষ্ট করা হয়; পরে কাড়াকাড়িতে গোটা বাদশাহী পাওয়া না গেলে অন্ততঃ তিনি “উড়িয়ারমগধবঙ্গ ত্রিদেশ-ঈশ্বর” থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবেন। কয়েক বৎসর পরে উড়িয়া তিনি পাইয়াছিলেন; কিন্তু সুবা বিহার এবং তাঁহার মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ হইয়া রহিলেন দারা। মনের এই অবস্থা লইয়া ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে শুজা লাহোর গিয়াছিলেন, পথশ্রম ও কান্দাহার অভিযানে সেনাপতিত্বলাভের আশাভঙ্গ-জনিত অপমান ব্যতীত তাঁহার কোন লাভ হইল না। ফিরিবার পথে সম্রাট আদেশ দিয়াছিলেন তিনি ও আওরঙ্গজেব যেন এক মঞ্জিল আগে পিছে লাহোর হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত পথ অতিক্রম করেন, অর্থাৎ কেহ কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ না করেন। এই দুই পুত্রের প্রতি সমান আচরণ এবং সমান অবিশ্বাস তাঁহাদিগকে দারার বিরুদ্ধে একজোট হইবার প্রেরণাই যোগাইয়াছিল। ইহার পূর্ণ সুযোগ লইলেন আওরঙ্গজেব। রাস্তায় না হইলেও দিল্লীতে পিতার আদেশ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা কয়েকদিন পরস্পরকে ভোজে আপ্যায়িত করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিয়া ফেলিলেন। পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই শুজার কথ্য গুলরুখবানুর সহিত আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতানের “সগাই” [বাগদান] পাকাপাকিভাবে সম্পন্ন

হইয়া গেল। পরে এই ব্যাপার লইয়া আওরঙ্গজেব এবং সম্রাটের মধ্যে কড়া চিঠিপত্র লেখালেখি হয়। শাহজাহান শুজাকে স্বপক্ষে আনিবার জন্ম তাঁহার কাছে আওরঙ্গজেবের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিলেন, এবং জানাইলেন আওরঙ্গজেবকে সরাইয়া তিনি দক্ষিণের পাঁচ সুবা বাংলা ও উড়িয়ার পরিবর্তে তাঁহাকে দিতে প্রস্তুত আছেন। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং গুপ্ত সন্ধি হওয়ার পূর্বে হয়ত সম্রাটের এই অনুগ্রহ তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না; কিন্তু পরে শাহশুজা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিলেন।

শুজার দিল্লীর সিংহাসনের আশা “আচ্ছন্ন অবস্থা” হইতে ভাই আওরঙ্গজেব একেবারে “কূটস্থচৈতন্য” অবস্থায় উঠাইয়া দিয়াছিলেন; কোহিনূরখচিত মুকুট তাঁহার কাছে তখন হস্তামলকবৎ। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন রাজ্যে তাঁহার স্পৃহা নাই, পুত্রের ভবিষ্যৎ দাদার হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিত; তবে বেয়াড়া মোরাদকে বাগ মানাইতে হইবে এবং সেই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করিয়া তিনি নন্দমা অতিক্রম করিবেন। মালবের পথে দো-রাহা নামক স্থানে কয়েকদিন পরে (২৩শে ডিসেম্বর ১৬৫৭ ইং) শুজারট হইতে আসিয়া মোরাদ আওরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—ইহা কাক-তালীয়বৎ ঘটনা নহে। শুজা, আওরঙ্গজেব এবং মোরাদের মধ্যে পিতার অজ্ঞাতসারে একযোগে দারাকে আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল; আওরঙ্গজেবের মারফত কিংবা তাঁহার সুবার মধ্য দিয়া তেলেকানার পথে শুজা ও মোরাদের মধ্যে গুপ্ত ডাকের ব্যবস্থা, সংকেতলিপির কোড আওরঙ্গজেবের মাথা হইতে বাহির হইয়াছিল। শুজা আওরঙ্গজেবকে বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু উপায় কি? দারার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা এবং স্বার্থনাথনের জন্ম আওরঙ্গজেবের সাহায্য আপাততঃ তাঁহার প্রয়োজন; তিনি শাহীতক্তে বসিতে পারিলে হয় নিজ নিজ সুবা লইয়া আওরঙ্গজেব ও মোরাদকে সমুদ্র থাকিতে হইবে, না হয় তাহাদের বরাতে যাহা আছে তাহাই হইবে।

মোটায়ুটি বলা যাইতে পারে, গৃহযুদ্ধের দায়িত্ব আওরঙ্গজেব হইতে শুজার কিছু কম। তিনি নিরপেক্ষ থাকিলে আওরঙ্গজেব ও মোরাদ এত সহসা হয়ত যুদ্ধ বাধাইতেন না, বাধাইলে পরাজিত হইতেন—দারার নিকট হইতে তিনি স্বাধীনতা না পাইলেও সুবিধাজনক সর্ভ পাইতেন, নির্বাসনে শৌচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতেন না।

হাসির অশ্রু

ত্রিবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গাড়ীতে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল বিকেলটা যেন সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। একটা ঝাপসা নীল মেঘের স্তর দক্ষিণ দিকে উঠে সমস্ত আকাশটা ছেয়ে ফেললে, তারপর ক্রমাগতই হালুকা হালুকা মেঘের স্তূপে সেটা পুরু হয়ে উঠেছে। রেন-কোটটা বাসায় ফেলে এসে ভুল করেছে গিরীন। মেঘ দেখে আজ বড় অশ্রুমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, তবুও কথাটা এক একবার মনে পড়ছিল; এ যা রুষ্টি নামবে, শুধু ছাতায় তার কিছুই আটকানো যাবে না।

গাড়ী থেকে নেমে যখন রিক্সতে উঠেছে, একেবারে মুখলধারায় রুষ্টি নামল। তখন মনে পড়ল ছাতাটাও গাড়ীতে এসেছে ভুলে। তখন কিন্তু আর উপায় নেই, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, প্ল্যাটফর্মের শেষে গার্ডের গাড়ীর লালটুকু যাচ্ছে দেখা।

পাড়াগাঁয়ের সাইকেল-রিক্স, ছইয়ের কাপড়টা শতছিন্ন। চেনা রিক্সওলা হুলাল সেই লজ্জাতেই বললে, “না হয় ফিরে যাবেন দাদাবাবু ইষ্টিশেনে?...কাপড়টা আজ কাল করে পাল্টানো হয় নি...”

“তোমার কষ্ট হবে?...ফিরে গেলে কিন্তু আজ আর বেরুতে পারা যাবে না স্টেশন থেকে।”

“কি যে ক’ন দাদাবাবু! আমার কথাই যেন ভাবছি!” জোরে পা চালিয়ে দিলে হুলাল।

গিরীনই কি নিজের কথা ভাবছে? নিজের কথা যে ভাবে, সে কি ভরা শ্রাবণে নিজের রেন-কোট বাসায় ফেলে আসে? তার পরেও কি চৈতন্যোদয় না হয়ে, অমন ঘনঘটা দেখেও ছাতাটা দাতব্য করে আসে রেলগাড়ীকে?...অথচ এই বর্ষার চিত্রই অনুরূপ তার চোখের সামনে ভাসছিল।

অবশ্য তার কোলে আছে আরও একটি চিত্র, মেঘের কোলে বিছাতের মতই। প্রভেদ এই যে বিছাটটি স্থির, নিরবচ্ছিন্নতার দীপ্তি মনের আকাশে।

বাড়ীতে সুরবালা এসেছে আজ দিন সাত হ’ল। মাকের এই ক’টা দিন যে কি করে কেটেছে, তা যার কেটেছে সেই জানে। কিন্তু রুষ্টির জলের সঙ্গে সে আপশোসটা ধুয়ে যাচ্ছে গিরীনের, ও-যেন আদর করে গা পেতে নিচ্ছে বর্ষার ধারাকে। আজকের এই মেঘ-মেঘুর অম্বর, সব লুপ্ত করা অবিরাম ধারাপাত—এ যে একান্তই ওদের দু’জনের জন্তে। এই যে সন্ধ্যাকে এগিয়ে আনা, এ ত ওদের মিলন-রজনীকে দীর্ঘ করবার জন্তেই দিনের খানিকটা অংশ ছিন্ন করে নিয়ে

তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে।...কার উপর অসীম কৃতজ্ঞতায় মনটা আসছে ভরে।

হুলাল বলছে, “জর-জালা যে হচ্ছে বড় গাঁয়ে, সেই ভয়—নইলে বর্ষায় কি আর ভিজেনা লোকে?...ভিজেনা...তবে, ঐ জর-জালা যে হচ্ছে বড়...”

—তা হোক জর, সে ত আশীর্বাদ, দুটি নেবার পথ খুলবে, সেবার হাতে সুরবালা থাকবে বসে পাশটিতে। কিছু একটা বলতে হয়, সেইজন্তেই বললে, “তা হোক, তুই একটু জোরে পা চালা দিকিন...”

—আজ সব চিন্তার মাকেই যে সুরবালা এসে পড়ছে। রাস্তার সামনেই যে দোতলার ঘরটা, ফুলশয্যা দিয়ে যেটা ওদের দু’জনের ঘর করে দেওয়া হয়েছে, তার জানলার পরাদ ধরে সুরবালা আছে পথের পানে চেয়ে...ভাগ্যিস রুষ্টিটা সামনা-সামনি নয়...কিন্তু তবুও ত পাশ ঘেষে আসছেই খানিকটা ছাট...সুরবালার কি সাড় আছে কতটা ভিজল, কতটা শুকনো রইল?...চারিদিকে এই জর-জালা!...“আর একটু পা চালাতে পারিস না হুলাল? তোর জন্তেই বলছি, যতটা কম ভিজিস...”

“ছাটটা যে উল্ট আসছে, নইলে...এই ত সিদিন লতুন বৌদিদিরা এল—তেনার কাকা, ছোট বোন—বৌদিদি দু’বোনেরা আমারই রিসকায় ছেলো ত—বলোদ-গাড়ীতে মাল-পত্তর...সিদিনও ত বিষ্টি ছেলো গো, তবে এই রকম উল্টো ছাট কি?...শুদিও না লতুন বৌদিকে—ড্যাংডেঙিয়ে নে’ গিয়ে দরজার দাখিল করলুম...”

—গিরীন হাতটা সীটের গদির ওপর আস্তে আস্তে বুলাতে লাগল—সুরবালার বসে থাকাক্টুকুকে যে শত রুষ্টিতেও ধুয়ে ফেলতে পারে না; বললে, “না হয় আস্তেই চালা, তাড়া কিসের এমন? ট্রেন ধরতে ত যাচ্ছে না লোকে!...হ্যাঁরে, ওরাও তোর এই ছেঁড়া রিক্সর বিষ্টি মাখায় করে...”

“কি যে বলে দাদাবাবু!...তিনখানা রিসকা; য’তে ভাবছে আমার রিসকায় চাপুক লতুন বৌদি, ব’দে ভাবছে আমার রিসকায় চাপুক, আমিও কোন্ না সেই কথাই ভাবছি মনে মনে, কর্তা বললেন, হুলালের খানাত্তেই উঠুন বৌমা ওঁর বোনকে নিয়ে, ওর ছেঁদের কাপড়টা ভালো। ভালোই ছেলো কিনা, এই পরশুকার ঝড়ে রিসকাসুহ্য উল্টে দিয়ে দিলে যে ফাংরাফাঁই করে...”

গিরীন সীটটাতে সেই রকম আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে, বড়ো উল্টেছিল বলে আরও যেন মায়া পড়ে গেছে রিক্সার উপর; বললে, “তা মেরামত করিয়ে নে কাপড়টা।”

“আমার নাম তুলাল হাজরা দাদাবাবু; ওদের মত সেলাই তালি দেওয়া রিসকা ঠেলতে আমার পা ওঠে না।...তা পর আছে লতুন বোঁদির, সমস্ত হপ্তাটা কামালুম কি রকম! এবার যা ইউডের কাপড় কিনব ভেবে রেখেছি...”

গিরীন একটু হেসে বললে, “কিন্তু পর যে বলছিস, রিক্সা ত তোর গেল উল্টে...”

“আর ব’দের যে চাকাই দিলে তেউড়ে, য’তে এখনও পায়ে চুগ-হলুদ নাগাচ্ছে—হিসেব করে দেখুন নোকসানটা। দাদাবাবু বলে পর নেই।”

একটু চুপ করে রইল গিরীন, তারপর প্রশ্ন করলে, “তাকত জমল তোর—নতুন কাপড় যে কিনবি?”

“ন’টা টাকা লাগবে, সাতটা জম্যে ফেলেছি—মাল হাটের মোয়াড়াটা একাই সামলালুম ত...”

বাইরেটা যে পরিমাণ ভিজল, ভিতরটা ভিজছে তার চেয়ে ঢের বেশী; সেখানে ত সাতটা দিনের মেঘ জমে গুমরাচ্ছিল। রিক্সা থেকে নেমে, ভাড়ার উপর দুটো টাকা বেশী দিলে তুলালকে। ছেলেরা ভাল, একটু লজ্জিতভাবে বললে, “তা আপনি কেন গুনোগাং দেবে দাদাবাবু; বড়ো লোকসান করেছে—সবারই করেছে...”

গিরীন হেসে বললে, “এ ত গুনোগাং নয়...আর তা যদি বললি, আমি নিজের পকেট থেকে দিচ্ছি নাকি? আদায় করব না তোর বোঁদির কাছ থেকে!”

—বেশ লাগছিল—গরীব, বিস্তর প্রভেদ, গ্রাম-সম্পর্কে বোঁদিদি পাতিয়ে বসেছে, হয়তো নিজের অন্তরের প্রেরণাতেই; এনে যে পৌঁছে দিয়েছে তার গুমর রাখবার জায়গা নেই। আজকের সে সুর তার সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে।

তুলালও কি ভেবে হাসলে, বললে, “তা যদি বলছ ত ছাও। তা হলে ভিতরকার কথাটাও বলি দাদাবাবু, আনলুম নতুন বোঁদিকে—রিস্কার এক হিসাবে জন্ম পালটে যাওয়াই ত, তা কর্তাবাবু বক্শিশ করলেন মোটে চারটি গুণা পয়সা। ভাগ্যিস একটু আড়ালে ছিলুম বলে কারুর নজরে পড়ে নি—সেটাকে আট গুণা বলে চালিয়ে দিলুম।...তা ছাও—সোয়ামী হ’ল গিয়ে ইস্তিরার আর্দ্রাঙ্গিনী, মনে করব লতুন বোঁদিদির পয়মন্ত হাত থেকেই নিলুম।”

এ পর্যন্ত গোরচন্দ্রিকা ত বেশ হ’ল, কিন্তু মূল গান এসে পড়া পর্যন্ত যে ক্রমাগতই বেমুহুরা চলেছে, তার কি করা যায়?

রিক্সাটাকে রাস্তা থেকেই বিদায় করে দিয়েছিল। তারপর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে পুকুরের পাশ দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাড়ীটা। জল-কাদার মধ্যে দিয়ে মাইল দেড়েকের পথ, সন্ধ্যা প্রায় হয়েই এসেছে; গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেলে সুরবালা যে জনলা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, অনেকখানি দেখা যাবে; নইলে রিক্সা আসছে দেখে সে আগে-ভাগেই সরে দাঁড়াবে না?

গোটাটিনেক গাছের আড়াল কাটিয়েই একটা বাকের মুখ থেকে উপরের জানলাটা দেখা যায়। জানলাটা নিতান্ত নিষিকার ভাবেই রয়েছে বন্ধ।

একটা আঘাত লাগল, তবে খুব বেশী নয়। দাঁড়িয়ে যে থাকবেই একথা ত লেখা ছিল না চিঠিতে; একটা আন্দাজ করে নেওয়া। নানা কারণেই সে আন্দাজ না ফলতে পারে; কিংবা হয়ত ছিল দাঁড়িয়ে, বিলম্ব দেখে সরে গেছে। আর এও ত ভাববার কথা—এক-বাড়ী লোক, নতুন বউ সে স্বামীর পথ চেয়ে কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?... আন্দাজটাই কি ভুল হয় নি?

তবুও হ’ল নিরাশ। নব-বিবাহিতের মন, কোথা দিয়ে কি হয়, সে যেন কোন যুক্তিই মানতে চায় না। একটু যেন অভিমান নিয়েই বাড়ীতে প্রবেশ করলে গিরীন।

তারপর এই অভিমানই যাচ্ছে যেন ক্রমশঃ বেড়ে, চেষ্টা করছে ঠেকিয়ে রাখতে যুক্তি দিয়ে, কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে যেন।

প্রথমতঃ তার এই ধারান্নান—এই ভিজে চুপসে যাওয়া নিয়ে বাড়ীতে যে একটা চাক্ষু্য পড়ে গেল—“তোরা আন—কাপড় দে শুকুনো—চা কর শীগ্গির—একি কাণ্ড!—না হয় না—ই আসতে আজ!...”

—আশঙ্কা অনুযোগ ভংসনা; এর মধ্যে সুরবালা কোথায়? মন বোঁয়—মা, বোন, ভাজ, ওঘর থেকে বাবাও যোগ দিচ্ছেন, এর মধ্যে সুরবালার স্থান হয় কি করে? কিন্তু বোঁালে শোনে কে?—

মনে হয়—তবুও...

তবুও কি?...তবুও একজনের ডুরে শাড়ীর একটুখানি আঁচল কি এই বাতুলে হাওয়ার কাছের কোন দোরের আড়াল থেকে একটু উড়ে আসতে পারত না? গুরুজনদের সামনে একজনের সংঘম কি দুটো চুড়ির শিঞ্জেও একটু শিথিল হয়ে যেতে পারত না?

নিচেই অনেকক্ষণ দেরি করল গিরীন। জামা-কাপড় নিচেই ছাড়লে, তারপর গল্প-গুজব। কিন্তু সুরবালা বলে যে

কোনও জীব বাড়ীতে আছে তার ত কোন লক্ষণই নেই। তারপর মনে হ'ল, উপরেও ত থাকতে পারে তারই প্রতীক্ষায়। যেমন বলা উচিত, উপরেই সবাইকে আসতে বলে সিঁড়ির দিকে এগুলা। কেউ আসছে না দেখে একটু আশাও হ'ল, তারপর গিয়ে দেখে উপরের ঘরও শূন্য।

নতুন করে এই অভিমানটুকু বেশ ভাল হয়ে জমে উঠবার আগেই কিন্তু সুরবালা এসে উপস্থিত হ'ল। হাতে খাবারের রেকাবি আর চায়ের পেয়ালা।

গিরীন প্রথম সম্ভাষণ করলে—“তুমি এখানেই আছ নাকি?”

সুরবালা একটু চোখ তুলে চেয়ে হাসলে, রেকাবি আর ডিস-সুদু চায়ের পেয়ালা একটা ছোট টেবিলের উপর রেখে টেবিলটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, “না থাকলে কি একজন এই বড়-বৃষ্টি মাখায় করে...”

“আসত? ঠিক কথা। কিন্তু এল যে, সেকথা কি একজনের মনে ছিল?”

“এই দেখ, এসেই কবিত্ব, আমার ঘর বিছানাপত্র ভিজ়ে যাবে যে!”—

তাড়াতাড়ি গিয়ে সুরবালা-সামনের জানলাটা বন্ধ করে দিলে, তারপর বিছানার একটা কোণে, গিরীনের চেয়ারের সামনা-সামনি হয়ে বসে বললে, “চাটুকু আগে খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।...মনে থাকবার কথা বলছ; নিজের পায়ের তদারক করেই ফুরসত নেই ত পরের কথা মনে থাকবে কি?”

চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে গিরীন থমকে গেল, জিজ্ঞাসা করলে, “কি হ'ল পায়ে?”

“মচকে গিয়ে যা ব্যথা! রান্নাঘরে বসে কোমেন্ট দিচ্ছিলাম...খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছি বিকেল থেকে...কে জিজ্ঞেস করে বল সেকথা?”

“কই, এখন ত খোঁড়াচ্ছিলে না...মানে, তাইতে জিজ্ঞেস করি নি আমি...কই, দেখি কোনখানটা...”

উঠে এগিয়ে যাবার আগেই সুরবালা চাপা গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল, বললে, “বস, কি জালা! কোমেন্টের ব্যবস্থা না হলে তোমার চায়ের জল তৈয়ের থাকত কি করে? কাপড় ছেড়েই যে এক কাপ পেলে!...হ্যাঁ, এইবার গিয়ে বলে দাও যে, ওঁদের বউ উপরে এসে আর খোঁড়াচ্ছে না...”

মুখে কাপড় চেপে হাসতে লাগল।

মুখে অল্প হাসি নিয়ে ছোট ছোট চুমুকে চা খেতে লাগল গিরীন, ছুঁমির কথাটুকু ভেবে মাঝে মাঝে চাইছে সুরবালার দিকে। বৃষ্টিটা একটু যেন নরম হয়েছিল, জানলার উপর বাপটায় মনে হচ্ছে আবার জোর হ'ল।

বললে, “খুলে দেবে না জানলাটা?”

“কি গেরো! জানলা না খুললে...আমার কিন্তু মচকানো পা, বারবার ওঠা-নাগা করতে পারব না, জানলা খুলে ঐদিক দিয়ে নেমে যাব। আমার কাজ রয়েছে বিস্তর”

“মচকানো পা নিয়ে শুয়ে থাকাই ভাল...”

“মচকানো পা নিয়ে খেটে বেড়ানো আরও ভাল। সবাই ভাববে—দেখেছ, কি কাজের বউ! এ বউ কি কে এল বাড়ীতে, কে গেল, তার খোঁজ রাখতে পারে?”

গিরীন নিজেই গিয়ে জানলাটা খুলে দিলে। ফিরে দেখলে কিন্তু সুরবালা একেবারে সিঁড়ির কাছে। ছুঁপা এগিয়ে এসে বললে, “খেয়ে নাও, ওগুনো, দিবা রইল; আমার ফুরসত নেই এখন বসবার।...বিকলে মাছ পায় নি, পুকুরে জাল ফেলতে বলেছেন বাব...”

“তুমি ফেলবে?”

সিঁড়ির একটা ধাপে পা দিয়েছে সুরবালা, আঙুলটা উঁচিয়ে ঠোঁট নেড়ে জানালে—“পাবে উত্তর।”

এই রকম করে ক্রমাগতই যতিভঙ্গ করে চলেছে সুরবালা—ক্রমাগতই। বাইরের দুর্ভোগ অন্তরের ব্যাকুলতাকে যত দিচ্ছে জাগিয়ে, যত মনে হচ্ছে সার্থক করে তুলি আজকে এই দুর্লভ রাত্রিটিকে, ততই সে ওর এই ছোট ছোট আঘাত দিয়ে, ওর এই অকরণ হাসি দিয়ে যেন সেটাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। বিশেষ করে এই হাসি—এতটুকু ভাবানুতাকে এক মুহূর্তের জন্তেও দাঁড়াতে দিচ্ছে না; এ কি রোগ দাঁড়িয়েছে নতুন!

ভাল হয়তো লাগছে, তার কারণ সুরবালার সবকিছুই ভালো। কিন্তু তবুও আজকের রাত্রিটি যদি এই করে হয় বিফল—ওর মনের সুরের সঙ্গে সুরবালার মনের মিল না থাকে—তা হলে সে আপশোস রাখবার জায়গা কোথায় ওর? বিয়ের পর এই প্রথম এই রকম একটি বর্ষারজনী...

কোন রকমে ওর মনের ঠিক তন্ত্রীটিতে দেওয়া যায় না একটু আঘাত?

সেই উদ্বেগে গল্পটা বলছে গিরীন। মনে করেছিল কখনও বলবে না।...তোমার পেতে আমার যে কি আত্ম-ত্যাগ—তোমার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে এক দিন আমার মনও যে কি মহিমময় হয়ে উঠেছিল, একথা কি যায় মুখ ফুটে বলা? তবু হচ্ছে বলতে—আজ ওর জন্যে যতই দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই আলেয়ার মত ও যাচ্ছে পেছিয়ে; অথচ এক দিন কত আশা নিয়েই না এই সুরবালার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল যে ওর মত নিঃশেষ করে কেউই বোধ হয়, নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে না—

সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে এতক্ষণ পরে পেয়েছে সুরবালাকে। সমস্ত সংসারের চঞ্চলতা সব শব্দ থেমে গিয়ে বর্ষার সঙ্গীতটুকু আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—শুধু বারবর শব্দের সঙ্গে ভেকের অবিরাম কলরব। রাত্রিটুকু দুটি প্রাণীর হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত গল্পী গভীর স্থপ্তিতে মগ্ন।

জানলাটা খোলা, সামনে একটা কোঁচের একটি ধারে গিরীন বসে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। সুরবালা আসে নি, পাশেই বিছানা, তাইতেই আছে শুয়ে। অবশ্য জেগেই আছে, গল্পও করছে।

আহ্বানের উত্তরে হেসে বললে—“কি করব, আমি কবি নই, খেটেখুটে এসে বিছানাটাই লাগছে ভাল।”

গল্পই হচ্ছিল—একথা-সেকথা নিয়ে। গিরীন বললে, “যখন এসে পড়ে কবিত্বের লগ্ন তখন কবি হওয়াতেই লাভ—এই রকম একটি লগ্নে সাড়া দিয়ে আমি এক দিন আমার জীবনের যা সবচেয়ে পরম সম্পদ তাই পেয়েছি...”

সুরবালা মাথাটা ঘুরিয়ে ছুঁছুঁমি করে জুঁকুঁকে বললে, “তোমার পরম সম্পদ তো শ্রীমতী সুরবালা দেবী—এই তো এত দিন জানতাম...”

উপরে গুরু ছুঁজেনেই, ছাতের দরজাও বন্ধ; তার উপর বর্ষণের শব্দ—বেশ মুক্তভাবেই হেসে উঠল একটু।

গিরীন বললে, “শ্রীলক্ষ্মীকৃষ্ণেশ্বরী সুরবালা দেবীরই কথা হচ্ছে।”

“মহারাজীরা জুড়ে দাও—পরম সম্পদই তো।”

“শ্রীলক্ষ্মীকৃষ্ণেশ্বরী মহারাজী সুরবালা দেবীর কথা।”

“শুনতে হয় তো তা হলে।”

“তা হলে আসতে হয় এখানে।”

সুরবালা খিলখিল করে হেসে ঘুরে গুল।

“কি হ’ল আবার?”—বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করলে গিরীন।

“মহারাজীর ছকুম—এইখানে এসে কবিকে তার কাব্য-কাহিনী শোনাতে হবে।”

এই পথেই চালিয়ে নিয়ে আসছিল, বিজয়িনীর মত আরও মুক্ত কণ্ঠে হেসে উঠল।

গিরীন উঠে গেল, একটা হাত চেপে ধরে বললে, “দোহাই তোমার সুরো, এই রকম হাসি দিয়ে আজকের এমন রাতটা আর দিও না ছিন্নভিন্ন করে। ওঠ, লক্ষ্মীটি।”

খানিকটা জোর করেই টেনে নিয়ে এসে কোঁচটাতে দিলে বসিয়ে। সামনের অন্ধকারের গায়ে স্বস্তির বাতিটা যেন উজ্জ্বল করে দিয়ে বলতে লাগল—

“তোমায় আমি যেচে বিয়ে করতে গেলাম কেন—এ নিয়ে সবাই আশ্চর্য্য হয়েছে...”

আবার পাশে চোখ তুলে হাসলে সুরবালা।

“কেন, তুমি জানতে ব্যাপারটা? কৈ, বল নি তো!... তা হলে আর নতুন কি শোনাচ্ছি।”

“কি ব্যাপার তা জানি না, তবে আমি যে সুন্দরী এটা তো জানতাম।”

“ও, আবার সেই ছুঁছুঁমি!”

আবার বলতে আরম্ভ করলে—

“প্রথম হয়ে পাস করেছে। খণ্ডর হবার জন্তে চারিদিকে রেবারেখি পড়ে গেছে—বিলেত পাঠিয়ে কেউ-বিছুঁ করে আনবে, মেয়েদের ফটো যা আসতে লাগল মাথা ঘুরিয়ে দেয়, এমনও নয় যে বিলেত যাবার অসাধ বা সুন্দরী চেনবার চোখ নেই—এমন অবস্থায় হঠাৎ একি মতিগতি হ’ল!—হ্যাঁ, মেয়েও যে খুব সুন্দরী তাও তো নয়...”

“ইস্!...নয়!”

“সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। আসল কথাটা কাউকে বললাম না; শুধু জিদ ধরে রইলাম—এ মেয়ে না হলে করবই না বিয়ে। একটু মোলায়েম করে বললাম অবশ্য—এখন থাক, নিজের পায়ে দাঁড়াই...মিথ্যে কথা সব...”

“এখন তার ফল ভুগছি...” একটু খুক খুক হাসি উঠল কথাগুলোর সঙ্গে।

“বিয়ের চিন্তাতেই কিন্তু মনটা আমার পূর্ণ হয়ে রয়েছে—তবে আমার রোমান্স একটু অল্প ধরণের। তাই নিয়ে তোমাদের বাড়ীটা আমায় বড় চানত। আমি তখন ঐ অঞ্চলে হুভিক নিয়ে কাজ করছি। অজ পাড়াগাঁ, তার মধ্যে এক প্রান্তে ঐ রকম একটা প্রকাণ্ড বাড়ী জাঁক হয়ে আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে, লোক নেই; বড় নাড়া দিত মনটাকে। বড় রাস্তা থেকে একটু ঘুরে বাড়ীটা, কাজে থাকতাম ব্যস্ত, মনও শান্ত থাকত, কাছ দিয়ে কখনও যাই নি। পুরনো বাউ আন্ বটল-পামের ফাঁকে ফাঁকে উপরের যেটুকু দেখা যেত সেটুকু নিয়েই রোমান্স সৃষ্টি করতে করতে বেরিয়ে যেতাম আমাদের ক্যাম্পের দিকে। বলা বাহুল্য, সেই রোমান্সের কল্পলোকে একটি মেয়েও ছিল, বিয়ে না করায় সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় বিয়েরই স্বপ্ন দেখছি তখন। তার পর এক দিন সন্ধ্যায় কি মনে হ’ল—বড় রাস্তা ছেড়ে ঐদিক ঘুরেই আসব, টের পেলাম বাড়ীটার নিচের একটা অংশ রয়েছে লোক, যেতে যেতেই দরজার মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ল রকে একটা লালঠেঁম জ্বলছে আর তারই আলোয় রকের উপর দেয়ালে ঠেস দেওয়া এক গোছা বাসন বাক বাক করছে। রোমান্স খানিকটা ধোরাক পেলো। দু’দিন বেশ অশ্রমস্ব রইলাম, তৃতীয় দিনে আবার ঐ পথে আসতে হওয়ায় ঐদিক হয়েই ঘুরে আসতে আসতে দেখি মেয়েটিও কল্পলোক থেকে নেমে এসেছে, তার কণ্ঠস্বর

শুনলাম—ছোট্ট একটি কথায়।...তুমি অত্মমনস্ক হয়ে যাচ্ছ যে সুরো ?”

“কল্পলোক থেকে নামতে পারছি না।” এবারের হাসিটা যেন জোর করেই হাসলে সুরবালা।

“কিছুদিন আমার অত্ম গ্রামে গিয়ে কাজ করতে হ’ল।

তাতে রোমান্স গুণিয়ে নিশ্চিন্তি হবারই কথা, কিন্তু দিন-দিনই যেন আরও শাখা-পল্লবে সজীব হয়ে উঠতে লাগল, আনন্দটা ক্রমে যেন যন্ত্রণার দাঁড়াচ্ছে। এই সময় মনের অবস্থা অত্যধিক দিয়েও ভাল নয়, দুভিক্ষের অনেক দিন হয়ে গেছে, লোকের দেবার ক্ষমতা বা স্পৃহা এসেছে কমে। প্রথমটা যেমন পাবার বা দেবার উন্মাদনায় মানুষের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠছিল, তেমনটি আর নেই। কেউ দিতে জানে না নিজেকে...একেবারে নিজেকে ভুলে যদি বিলিয়ে দিতেই না পারলে তো কেমন করে মেটাবে ক্ষুধা? ঐটেই তখন মূল চিন্তা মনের, তার পর এক সময় চিন্তাটা কি করে স্থান আর পাত্র পরিবর্তন করলে, দেখলাম বড়ক্ষুদের জায়গার এসে পড়েছি আমি আর দাতার জায়গায়...”

“সেই মেয়েটি।...কি রোমান্স বাবা!” এবারও হেসে উঠল সুরবালা। কিন্তু সে অকৃত্রিম সুর ফোঁটাতে পারলে না।

বর্ষার বিরাম নেই। ঘোরটা এবার কাটল না গিরীনের; আবিষ্টভাবেই বললে—“এ সময় সেই ঘটনাটুকু চোখে পড়ল।”

একটু চুপ করলে, মনটা যেন সিন্ত অন্ধকারের মধ্যে কোথায় গেছে তলিয়ে। সুরবালাকে তাগাদা দিতে হ’ল—“যুম এদিকে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে...”

“সেদিন কিন্তু মেয়েটি নিজের কথা একেবারেই ভাবে নি। কাজ খুব কম, জোগানের অভাবেই প্রায় গুটিয়ে এসেছে। তাইতে নিজের কথাই বড় হয়ে পড়েছে বলে ঐ বাড়ীটার ওদিক দিয়েই ক্যাম্পে ফিরে আসছি—বর্ষার সন্ধ্যাই, তবে রষ্টি নেই, আকাশে মেঘ থমথমে হয়ে রয়েছে। দেখি একজন ভিথিরী ঐ বাড়ীর দরজায় বসে রয়েছে। হয়তো আসলে ভিথিরী নয়, দুভিক্ষ বাদের ভিথিরী করে তুলছে তাদেরই এক জন, আর তো আমাদের কাছেও বড় একটা পাচ্ছে না কিছু।

যারা এই সব কাজ নিয়ে থাকে তাদের মনটা যে সর্বদাই করুণায় ছল ছল করতে থাকে এমন নয়, বরং দেখে শুনে বেঁটেযুঁটে খানিকটা নিরীকারই হয়ে যায়। এগিয়েই যেতাম, কতবার গেছি এই রকম, সেদিন কিন্তু কি হ’ল, হঠাৎ মনটা বড় টনটনিয়ে উঠল, মনে হ’ল ঐ মানুষটা শুধু ঐ মানুষই নয়, জগৎ জুড়ে যাবু দীন-নয়নে রয়েছে হাত পেতে তাদের যেন প্রতীক। একটু এগিয়েই গিয়েছিলাম, ঘুরে দাঁড়লাম।

দোরের দিকে একটু তেরছা হয়ে বসেছিল, ঘুরে দাঁড়াতে ভাল করে নজর পড়ল। পুরুষ নয়, মেয়েছেলে। শীর্ণ, কালো, মাথার চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ঘাড়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে; পরনে একটা শতছিন্ন ময়লা কাপড়, গুটিয়ে-সুটিয়ে উবু হয়ে বসে রয়েছে বলেই যেন কোনরকমে লজ্জা নিবারণ হয়েছে; ঐ কাপড়েরই খানিকটা পিঠের উপর টানা।

মুখে কথা নেই। যেন ডেকেছে, সাড়া পায় নি, আর ডাকবার শক্তি নেই, উঠবারও শক্তি নেই, তাই হাত পেতে আছে বসে। চারিদিকের ঘন গাছপালার ছায়ার উপর মেঘলা সন্ধ্যার ছায়া এসে পড়ায় সমস্ত দৃশ্যটি অস্পষ্ট, সেই জন্যই যেন আরও করুণ।

বলতে বাধা নেই, আমার একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল। কি রকম গৃহস্থ জানি না, তবে ইচ্ছে থাকলেও ত এই ভর-সন্ধ্যার সময় কিছু দেবে না; হাত দুটো আপনিই কখন পকেটে গিয়ে সঁদিয়েছে, এক পকেটে একটা দোয়ানি আর এক পকেটে আধখানা পাঁউরুটি ঠেকল।...দিয়ে আসি, তার পর এক পাশে বসিয়ে ক্যাম্প থেকে আরও কিছু না হয় নিয়ে আসা যাবে।

পা বাড়িয়েছি, বাধা পড়ল। দরজার ভেতর দিয়ে উঠোনটার খানিকটা নজরে পড়ে, দেখছি একটা মেয়ে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে যেন বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে এগিয়ে আসছে।...বুকেটা ধড়াস ধড়াস করে উঠল—দুটি ভিথিরীকে একসঙ্গে দয়া—এ যে কল্পনাভীত, একজনকে না হয় শুধু দেখা দিয়েই...

একটু আড়াল হয়ে দাঁড়লাম। আড়াল থেকে আরও একটু অস্পষ্ট, তবু যা দেখবার তা পাচ্ছি দেখতে।...দরজায় এসে একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভেতরে দেখে নিলে, তার পর গলা বাড়িয়ে বাইরেটাও চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রথমে একটা সাড়ি দিলে কোলের উপর ফেলে, তার পর চাপা-গলায় তার-ই একটু আঁচল মেলে ধরতে বলে কৌচড় থেকে কতক-গুলো মুড়ি বের করে দিলে, খান দুই রুটি, আর একটু লম্বা-গোছের গোটা দু’তিন কি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভিথিরী বোধ হয় হাত তুলে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছিল, হাত তুলে চাপা গলায় বললে—“চুপ।” দাঁড়িয়ে পড়ে একটু যেন কি ভাবলে, তার পর আর একবার ভেতর-বার দেখে নিয়ে পিঠের আঁচলটা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলে। আবার সতর্ক চাউনি, তার পর নিজের গায়ের ব্লাউজটা তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে ওর কোলে ছুঁড়ে ফেলে আঁচলটা আবার জড়িয়ে উঠানে অদৃশ্য হয়ে গেল।”

গিরীন চুপ করে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল—অনেকক্ষণ। তারপর বললে, “মনে হ’ল পেয়েছি।

যে এই রকম ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলে তার কাছে হাত না পেতে অন্য কার কাছে দিতে যাব ধরনা ? তার পর দিনই চিঠিটা লিখি—অভিভাবক দাদা—লিখলাম বাবাকে বোনের বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি দিন।”

মনে আছে সুরবালার। যদিও ঐ স্মৃতিই যে বিবাহ এটা জানলে এই প্রথম। ওরা দু’শো টাকা পেয়েছিল সেদিন। কোনও সিনেমার একটা অংশ, পুরনো জীর্ণ জমিদারের বাড়ী দরকার, একটি পতিত অভিজাত বংশের মেয়ের চরিত্রে নাকি দেখান হচ্ছে। তারই গুটিং হচ্ছিল সেদিন—আরও এক দিন হয়েছিল।...মেয়েটির সঙ্গে ওর একটু আলাপও হয়েছিল—তবে মা দিদি কিন্তু পরিচয়টা বাড়তে দেয় নি।

এত বড় হাসির কথা—নিজ্জলা কবিত্বের এতবড় হাস্য-কর পরাজয় আর হয় না। মুখে আঁচল চেপে উঠলই যেন

একটু খিলখিল করে সুরবালা ; তার পরেই একটু চুপ, তার পরেই স্পষ্ট মনে হ’ল যে আঁচলের মধ্যে যেন ফুঁ পিয়ে ফুঁ পিয়ে কান্নার শব্দ।

অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে এগিয়ে বসল গিরীন—সত্যিই ফোঁপাচ্ছে সুরবালা ! বুকে চেপে ধরে বললে—“কি ! কি হ’ল সুরো ?—হঠাৎ...”

সুরবালা মুখটা বুকে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গেই পারলে না কিছু উত্তর দিতে। তার পর ভাঙা ভাঙা কথায় কান্নার মধ্যে দিয়ে বলে চলল—“একদিন শুনবে—যেদিন হাসির মধ্যে দিয়েই বলবার ক্ষমতা পাব ফিরে...তার আগে একটা কথার উত্তর দাও—পোড়া হাসির রোগ রয়েছে বলে তোমার কি একটুও এমন সন্দেহ আছে যে, আমি সেদিনকার চেয়ে আরও নিঃশেষ করে তোমার পায়ে লুটিয়ে দিই নি নিজেকে ?...বল না—এই রকম একটা রাতেই যে বলবার কথা সেটা...”

মানবশিশুর রহস্য

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

জীবদৃষ্টির আদিপর্বে যার মধ্যে প্রথম প্রাণের অস্তিত্ব দেখা দিয়েছিল সে ছিল নিতান্ত সরল এক-কোষবিশিষ্ট প্রাণী। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। এই জেলি-জাতীয় প্রাণী থেকেই পৃথিবীর যাবতীয় জীবের উৎপত্তি হয়েছে। শুধু জীবজগৎ নয়, তরুলতা-তৃণশৃঙ্গাদি যাবতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তিও এই ক্ষুদ্র প্রাণবিন্দু থেকে। একথা চিন্তা করে নানা জাতীয় বৃক্ষলতশোভিত অরণ্য, বিবিধ পুষ্পসমৃদ্ধ তরু, নানা জীবজন্তু—এক কথায় এই বৈচিত্র্যময় পরিবেশের দিকে তাকালে মনে হয়, কোন মহা-যাদুকর একেবারে ‘কিছুই না’ থেকে এই রূপরসগন্ধভরা অপূর্ণ সুন্দর বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কোন যাদু-দণ্ড-স্পর্শে এক নিমেষের মধ্যেই এই বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় নি, বহু লক্ষ বৎসরের নীরব অথচ সূক্ষ্ম ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়ে জীবকূল বর্তমান অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে। কিরূপে এ পরিবর্তন ঘটেছে এইটেই হ’ল বড় প্রশ্ন। ব্যাঙ বা টিকটিকি কিরূপে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার কিংবা জিরাফে পরিণত হ’ল, কেমন করেই বা এদের কোন শাখা বানর, বন-মামুষ এবং অবশেষে মানুষের স্তরে এসে পৌঁছেছে এই সীম কোঁতুলোদীপক প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেবে কে ?

লামার্ক এবং ডারুইন প্রাণিজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেছেন তাই জীবতত্ত্ব আলোচনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ লামার্ক বলেন, প্রাণিজগতের নিয়ম এই যে, পিতার গুণ, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য সন্তানে বর্তে ; সন্তান পিতার অনুরূপ হয়ে গড়ে উঠে, তবে সম্পূর্ণ তাঁর অনুরূপ হয় না—কতকটা গুণ সে নিজেও অর্জন করে। এই অর্জিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য সে আবার তার নিজের সন্তানে সঞ্চারিত করে যায়। এইরূপে পুরুষপরম্পরায় অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ হেতু জীবের মধ্যে পিতৃগুণেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শেষে সে জীব এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছে যখন অনেককাল আগেকার আদিপুরুষের সঙ্গে তার বিশেষ কোন মিল থাকে না ; তাকে তখন আদিপুরুষ থেকে স্বতন্ত্র জীব বলে মনে হয়।

লামার্ক-তত্ত্বের মূল কথা হ’ল দুটি : প্রথম, সন্তান পিতার স্বভাবধর্মের অধিকারী হয় ; জীব যেন সন্তানের ভিতর দিয়ে নিজেকেই নূতন করে প্রচার ও প্রসার করছে। দ্বিতীয়, একপুরুষের অর্জিত বৈশিষ্ট্য সন্তানে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় স্মৃতিটি স্বীকার করলে একথা মানতে

হয় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে জীব যে অঙ্গের বেশী ব্যবহার করে ক্রমে তা পুষ্টিলাভ করে এবং সেই অর্জিত শক্তি এবং বৈশিষ্ট্য সন্তানেও প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, ব্যবহারের অভাবহেতু কোন অঙ্গ ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে একেবারে লোপ পাওয়াও অসম্ভব নয়। এই যুক্তির বলে লামার্ক জীবের ক্রমপরিণতির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, রূপান্তরিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে যাওয়ার ফলে জীবকে নানারূপ চেষ্টা করতে হয়েছে। এই চেষ্টার ফলে তার দৈহিক যা-কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, তা সন্তানে প্রতিফলিত হয়েছে। এইভাবে জীবের ক্রমাভিব্যক্তিতে বানর যে নবোপরিণত হবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু লামার্কের এই মত সর্বজনস্বীকৃত হয় নি।

লামার্কের পরে ডারুইন। ডারুইন লামার্ক-তত্ত্বের প্রথম স্মৃতি স্বীকার করেন। তিনিও বলেন, সন্তান পিতার স্বভাব এবং গুণগুলি পায়। রক্তের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ যেমন বীজের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় লুক্কায়িত থাকে, জীবের বিশেষ লক্ষণ ও গুণগুলিও তেমনি সন্তান-উৎপাদনকারী বীজের মধ্যে অবস্থান করে। কালক্রমে এগুলি বিকাশলাভ করতে থাকে। এ পর্যন্ত লামার্ক ও ডারুইন উভয়েই একমত। কিন্তু সন্তান যদি ছবছ পিতার অনুরূপই হতে থাকে, সন্তানকে যদি পিতার অপরিবর্তনীয় নূতন সংস্কারণ বলা চলে, তবে জীবের ক্রমপরিণতি প্রমাণ করার উপায় কি? টিকটিকি তবে চিরদিন টিকটিকি হয়েই রইল না কেন? এর উত্তরে ডারুইন বলেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনই জীবের অভিব্যক্তির বা ক্রমোন্নতির কারণ। কথটি একটু স্পষ্ট করে বলা যাক।

এই পৃথিবীতে জলে স্থলে যত জীবজন্তু বৃক্ষ তৃণলতা রয়েছে এদের সকলের উপযোগী খাদ্য পৃথিবীতে নাই। বাঁচতে হলে এক জনের পক্ষে অপরকে হত্যা করে উদর পূরণ করা ছাড়া উপায় নাই। যে সবল সে দুর্বলকে ভক্ষণ করে বেঁচে আছে; শুধু তাই নয়, সবলতরের আক্রমণ থেকে তাকে আত্মরক্ষাও করতে হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিশ্বসংসার একটি বিরাট 'রণরঙ্গভূমি'। এখানে প্রতিমুহূর্তে চলছে তীব্র জীবনমরণ-সংগ্রাম। প্রাণীমাত্রেরই প্রধান কামনা বেঁচে থাকা। সেই প্রেরণার বশে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকবার উপযোগী শক্তি তারা অর্জন করেছে। এ শক্তি সকলের এক রকম নয়। বাঘের ধারালো দাঁত নখ, হরিণের দ্রুত পলায়নক্ষমতা, বরাহের দাঁত, মহিষের শিং, গিরগিটির দেহের রঙ পরিবর্তন করে অপরকে ফাঁকি দিবার কৌশল—এ সবই জীবন-সংগ্রামের যোদ্ধাদের আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ।

কেহ গায়ের জোরে অপরকে মেরে নিজে বেঁচে আছে, কেহ পালিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় গ্রহণ করেছে, কেহ বা দৈহিক শক্তির অভাব বুদ্ধি দ্বারা পূরণ করেছে। এই টিকে থাকবার প্রতিযোগিতায় যে অপারগ, তার বাঁচবার কোন অধিকার নাই, সে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই। যে শক্তিমান কেবল তাকেই প্রকৃতিদেবী বাঁচবার যোগ্য বলে নির্বাচন করে নিচ্ছেন। এই হল প্রাকৃতিক নির্বাচন। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জীবনযুদ্ধের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করার ফলে জীব আত্মরক্ষার তাগিদে দেহের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে করতে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। এ সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নি; স্বতঃ দিন ধরাপুষ্টে জীব আছে, তত দিন চলেবে। লামার্ক ও ডারুইনের প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা মানবশিশুর ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করার পূর্বে শুধু এইটুকু উল্লেখ করতে চাই যে, সন্তান পিতার গুণ ও স্বভাবধর্ম উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে পূর্বপুরুষের ধারাকে বহন করে চলেছে। এই গুণ বা স্বভাবধর্মের যেগুলি জীবের একান্ত মজ্জাগত সেগুলিই সন্তানে সংক্রামিত হয়; আকস্মিকভাবে অর্জিত কোন বৈশিষ্ট্য পিতার নিকট থেকে সন্তান পায় না; যেমন ইঁদুরের লেজ কেটে দিলে তার বাচ্চাদের লেজ কাটা থাকে না; আকস্মিক কারণে কোন ব্যক্তির কোন অঙ্গহানি হলে তার সন্তানে সে অঙ্গের বিকলতা দেখা যায় না। জীবের স্বভাবধর্ম যে বীজকণিকার মধ্যে নিহিত থাকে তা এমন সূক্ষ্ম এবং বাহিরের প্রভাব থেকে এমন স্বয়ং-সহকারে রক্ষিত যে, অকস্মাৎ এতে কোন পরিবর্তনসাধন সম্ভবপর নয়। প্রকৃতিদেবী এ বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া। জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি যেন গোপনপুরে মণিকোঠায় স্বৈত স্তম্ভের অভ্যন্তরে হীরা-বাঁধানো কোঁটার মধ্যে বদ্ধ করে রেখেছেন। এর ফল হয়েছে এই যে, এক দিকে যেমন মানুষের অর্জিত কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ—যথা বিদ্যা, শিল্পে নিপুণতা; সত্যবাদিতা প্রভৃতি সন্তানে আপনাআপনি সংক্রামিত হয় না, অল্প দিকে তেমনি গুণহীনতা বা ব্যবহার-গত দোষও সন্তানকে স্পর্শ করে না। সন্তানের ভিতর দিয়ে প্রকৃতি জীবের মৌলিক ধারাটিই প্রবাহিত রাখতে চান।

ইতর প্রাণিজগতে এই পৈতৃক ধারাবহন সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। এখানে পিতা এবং সন্তানে বিশেষ কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না; সন্তান যেন পিতারই নব রূপায়ণ; জিনকই যেন সন্তানদের ভিতর নূতন করে দেহ ধারণ করেছে। কিন্তু মানুষের বেলায় এরূপ ছবছ মিল দেখা যায় না। পিতা এবং সন্তানে দৈহিক পার্থক্য ত কিছু-না-কিছু থাকেই, বুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক শক্তিতেও তারতম্য

দেখা যায়। কেন এরূপ হয় তা জানার কোতুহল হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক।

মানবশিশুর স্বভাবে বৈচিত্র্য

মানুষের স্বভাবে বৈচিত্র্য দেখা যায় কেন তা বুঝতে হলে শিশুর জন্মের মূল রহস্যটি জানা দরকার। প্রাণিজগতে মানুষ সর্বাপেক্ষা উন্নত জীব। অন্যান্য জীবের মত মানুষেরও রয়েছে কতকগুলি স্বাভাবিক জীবধর্ম—যেমন বাঁচবার বাসনা, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজন, কামক্রোধ, প্রজনন, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষের মধ্যে সাধারণ জীবধর্ম যেমন ক্রিয়াশীল রয়েছে, তেমনি মন বুদ্ধি ও বিবেক মহত্তর কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার করে এগুলি নিরস্ত্রিত করেছে। মানুষের মাঝে তাই জীব ও শিবের মিলন ঘটেছে। জীবধর্ম ত সকলের মধ্যেই বিত্তমান; তবে ব্যক্তিগতভাবে যার মধ্যে শিবধর্ম যত বেশী প্রবল তিনি তত উন্নত স্তরের মানুষ।

কাজেই দেখা যায়, জীবধর্ম অনুসারে সকল মানুষ একই প্রকার হলেও ধী-শক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতি, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতির তারতম্য হেতু তাদের পরস্পরের মধ্যে অন্তর্নিহিত পার্থক্য থাকে। সন্তান তার পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট থেকেই এই শক্তিগুলি লাভ করে। তার মধ্যে যেন দুইটি স্রোতের ধারা এসে মিশেছে। এই এক একটি স্রোতে আবার অন্য কত স্রোত এসে পড়েছে। এই ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মানুষ তার দেহমনের উপাদান কত বিভিন্ন সূত্র থেকে লাভ করে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ব্যাপারটি কি ভাবে ধরা পড়ে দেখা যাক।

পিতা ও মাতার দেহনিঃসৃত জার্ম-সেল বা জীবকোষের মিলন থেকেই শিশুর জন্ম। যে মুহূর্তে দুইটি বীজকণিকা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'ল তখন থেকেই সুরু হ'ল শিশুর জীবন-লীলা। এই মুহূর্তেই শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেলঃ তার দেহের গড়ন কেমন হবে, হাত-পা, চোখ-মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন হবে, কি পরিমাণ মেধা, কলন-শক্তি প্রভৃতি মানসিক সম্পদের মূলধন নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করবে তাও ঐ সময়েই নির্ধারিত হয়ে গেল। তখন হতে নিষ্কল বীজকোষটি ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে থাকে। পুষ্টির জন্য জরায়ুসংলগ্ন ফুলের (placenta) ভিতর দিয়ে মাতৃদেহ থেকে রসগ্রহণ করলেও শিশু-ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্ম অল্প কারও উপর আর নির্ভরশীল নয়। বৃক্ষের একটি পরিপক্ব বীজকে কোমল, আর্দ্র এবং অল্পর উদ্যমের পক্ষে অনুকূল মাটিতে বপন করলে বীজের অভ্যন্তরস্থ যুগ্ম বৃক্ষশিশুটি জেগে উঠে এবং মাটি থেকে খাণ্ড গ্রহণ করে আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেড়ে উঠতে থাকে। মাতৃজঠরে অবস্থিত শিশুও

বৃক্ষশিশুর মতই। বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জলমৃত্তিকা আলোবাতাসের দাক্ষিণ্য ও শিশুর প্রয়োজন মাতৃদেহ হতে আহৃত পুষ্টিকর রসধারা। খাতের পরিমাণ ও গুণাগুণ শিশু-দেহের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল কিংবা প্রতিকূল হতে পারে, কিন্তু এতে তার দেহমন গঠনের মূল উপাদানে কোন পরিবর্তন ঘটে না।

এখন প্রশ্ন হ'লঃ এই মূল উপাদানের স্বরূপ কি? এর ভিতরই যদি শিশুর ভবিষ্যতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে তবে একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে হয়ত এক দিন ইচ্ছা-মত গুণসম্পন্ন মানবসৃষ্টি সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রকৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া মানুষের অন্য উপায় নাই।

পিতা এবং মাতার দেহজাত যে দুইটি জীবকোষের মিলনে শিশুর উৎপত্তি, তা গঠিত হয়েছে চক্ৰিশ জোড়া অতি মিহি সূতার মত ক্রোমোসোম দ্বারা। দুইটি জীবকোষের মিশ্রণের ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দাঁড়াল আটচল্লিশ জোড়া। প্রকৃতির অতি নিহৃত কারখানায়—জরায়ুর অভ্যন্তরে কোন দুর্জের নিয়মে কে জানে, এই আটচল্লিশ জোড়া ক্রোমোসোমের ভিতর থেকে মুহূর্তের মধ্যে বাছাই কাজ সমাধা হয়। প্রতি জোড়া থেকে একটি করে ক্রোমোসোম সূত্র খসে বাতিল হয়ে বাদ পড়ে যায়। তার ফলে সংমিশ্রিত জীবকোষের ভিতরও শেষ পর্যন্ত চক্ৰিশ জোড়া ক্রোমোসোমই ঠিক থাকে। এই সংমিশ্রিত জীবকোষ-টিই শিশুর দেহমন, প্রকৃতি, স্বভাব সবকিছুর মূল উপাদান। এই উপাদানের অর্ধেক পিতার নিকট থেকে এবং আর অর্ধেক মায়ের নিকট থেকে পাওয়া। পিতা ও মাতার বংশের দুইটি পৃথক ধারা এসে একত্রে মিলিত হয়েছে। দুই দিক থেকে আগত চক্ৰিশ জোড়া করে আটচল্লিশ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বংশগতি একত্রিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে কতক বাদ দিয়ে কতক গ্রহণ করা হ'ল। আটচল্লিশ জোড়া ক্রোমোসোম সূত্র হতে চক্ৰিশ জোড়া বাছাই করে নিতে গেলে লক্ষ লক্ষ রূপ ভিন্ন প্রকারে সংমিশ্রণ করা সম্ভবপর। এই সংমিশ্রণ ইচ্ছামত সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যের অতীত।

জীবকোষের উপাদান ক্রোমোসোমগুলির মধ্যেই মানুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পিতার কিছু বৈশিষ্ট্য এবং মাতার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়েই শিশুর জীবন সুরু হয়। পিতা এবং মাতার দিক থেকে কোন বৈশিষ্ট্য সে পাবে বা কোনটি পাবে না—তা কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। এখানে দৈবই একমাত্র ভাগ্যবিধাতা।

মাতৃদেহের অভ্যন্তরে নীরবে ধীরে ধীরে সংমিশ্রিত জীব-কোষটি পুষ্টিলাভ করতে থাকে। মাতৃজঠরস্থিত শিশুর বৃদ্ধি ও জন্মের সঙ্গে বৃক্ষজাত ফলের ক্রমপুষ্টিলাভের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। গাছে ফুল ফুটলে মৌমাছি, প্রজাপতি ও অণ্ডাণ্ড কীটপতঙ্গ এসে জোটে মধুপান করতে। এরা এক ফুলের রেণু অণ্ড ফুলে বহন করে নিয়ে যায়। এইভাবে পুষ্পের পুংকেশর থেকে রেণু বা পরাগ স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভকেশরে নীত হয়। পরাগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় ফল। ফল বোঁটাতে লেগে থাকে এবং বৃক্ষের রস থেকে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করতে থাকে। অবশেষে সম্পূর্ণ পরিপক্ব হলে আপনা থেকেই ফলটি রস্তুচ্যুত হয়। বৃক্ষের সকল বৈশিষ্ট্য বীজের মধ্যে সম্বন্ধে রেখে দিয়ে, বীজের খাত্তস্বরূপ কিছু মূলধন ফলের মধ্যে স্থাপন করে বৃক্ষ যেন নিজের সন্তানকে নূতন করে বিধে উপনিবেশ স্থাপন করবার জ্ঞান পাঠিয়ে দিলে। ফলের মধ্যে বৃক্ষের সন্তান ঘুমিয়ে রয়েছে।

মানবশিশুরূপ ফলটিও মাতার জরায়ুর মধ্যে অবস্থান করে, মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে যথাকালে পরিপক্ব রস্তুচ্যুত ফলের মত ভূমিষ্ঠ হয়। বৃক্ষ একাধারে ফলের পিতা ও মাতা। কারণ একই বৃক্ষে স্ত্রী-পুষ্প ও পুং-পুষ্প প্রস্তুতি হয়; কখনও বা একই ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে। কাজেই ফলের মধ্যে কেবল একটি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্যই নিহিত থাকে। কিন্তু মানব-শিশুর মধ্যে এসে মিলেছে পিতৃবৃক্ষ ও মাতৃবৃক্ষের দুইটি পৃথক ধারা। তাই শিশুর জীবনে এত বৈচিত্র্য।

একই পিতামাতার সব ক'টি সন্তান সব বিষয়ে একই রূপ হয় না। দেখা যায়, সন্তান হয়ত মায়ের গায়ের রং, পিতার মত চুল, চোখ, নাক, ঠাণ্ডুরদাদার মত দেহের গড়ন পেয়েছে। কণ্ঠস্বরে কেউ সম্পূর্ণ একপ্রকার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তান পিতামাতার দৈহিক অবয়ব ও মানসিক গুণগুলির অধিকারী হয়। গুণের পরিমাণে অবশ্য তারতম্য থাকতে পারে এবং থাকাই স্বাভাবিক। তাই দেখি সাহিত্য, সঙ্গীত, গণিত বা চিত্রকলা প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ সকল ভাই-বোনের একরকম হয় না; এ সকল আয়ত্ত করার মত মানসিক শক্তি এবং প্রবণতাও সকলের থাকে না। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় কবির ছেলে সাহিত্যরসে বঞ্চিত, চিত্রশিল্পীর ছেলে রংকানা, গণিতজ্ঞের ছেলে অঙ্কশাস্ত্রে নিরুৎসাহ। আবার ঠিক এর বিপরীত অবস্থাও বিরল নয়।

এর কারণ নির্দেশ করতে গেলে বলতে হয়, শিশুর

জীবন সূত্র হওয়ার মুহূর্তে পিতা ও মাতার জীবকোষের ক্রোমোসোমগুলির মধ্য থেকে যে বাছাই সম্পন্ন হয় তার উপরই সবকিছু নির্ভর করে। শিশু মায়ের নিকট থেকে অর্দেক এবং বাবার নিকট থেকে অর্দেক মূলধন নিয়ে জীবন আরম্ভ করে। তার পিতামাতা উভয়েই আবার তাঁদের বাবা ও মায়ের নিকট থেকে অর্দেক পরিমাণ করে উপাদান নিয়ে নিজেদের জীবন গঠন করেছিলেন। কাজেই শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া উপাদানের ভিতর দিয়ে পিতামহ ও মাতামহের এক-চতুর্থাংশ করে দেহমনের উপাদান লাভ করে। এইভাবে পিতা ও মাতার দিক থেকে আগত দুইটি ধারা অবলম্বন করে পূর্বপুরুষের কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পিতামাতা ও পূর্বপুরুষের নিকট থেকে আমরা দেহমনের উপাদান পেয়ে থাকি। এই উত্তরাধিকারকে বলা হয় বংশগতি (heredity)। এখানে একটি প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুণ বা মানসিক শক্তি ও প্রবণতার অভাব থাকতে পারে কিংবা কোন কোন গুণ এবং মানসিক শক্তি একেবারেই নাও থাকতে পারে, কিন্তু কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা সকল দেশের সকল জাতির মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। এগুলিকে বলি স্বাভাবিক বা সহজাত প্রবৃত্তি। এগুলি মানুষের জীবধর্ম। কোন ইমারতের গঠনাকৃতি পৃথক হতে পারে। এর দেয়ালের কারুকাকার্যে এবং বর্ণে নূতনত্ব থাকতে পারে—কিন্তু মূল উপাদান সকলেরই এক—ইট-কাঠ-লোহা-পাথর। তেমনি বিভিন্ন মানুষের গায়ের রঙে পার্থক্য আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্যে ও সৌষ্ঠবে ইত্যবিশেষ আছে, মানসিক শক্তির কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচুর্য্য আছে, অভিনবত্ব আছে—এ সকল বিষয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে তা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু মানুষের জীবধর্মে একের সঙ্গে অণ্ডের কোন পার্থক্য নাই। সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রকোভ অর্থাৎ ভাবাবেগ সকল মানুষের মধ্যেই সক্রিয় রয়েছে। শিশুর ক্রমবিকাশের গতিপথ জানতে হলে, কিভাবে ক্ষুদ্র অসহায় মানবশিশু বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় তা বুঝতে হলে সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রকোভের স্বরূপ কি তা জানা প্রয়োজন। এগুলিই মানুষের জীবন-প্রেরণার উৎস।*

* লেখকের প্রকাশিতব্য পুস্তকের একটি অধ্যায়।

স্থপতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দীপ নাম তার, ভাস্কর তার, বছদিন হেথা বাস,
গৌরবময় বংশের ইতিহাস।
পাঠশালে মোর সহপাঠী ছিল, মেধাবীও ছিল বটে,
আজ ভিক্ষুক কপালে যা থাকে ঘটে।
ভাবিলু এবার তীর্থভ্রমণে যাইব একটু দূর—
সমুদ্রতটে পুরী জগবন্ধুর।
দীপ আসি, মোরে আগ্রহে বলে' সঙ্গে যাইব আমি
টেনেছেন মোরে প্রভু অন্তর্ধামী।
পুরীধামে গিরা মাসেক কাটানু, তৃপ্তি দেহে ও মনে
জগন্নাথ আর জলনিধি দর্শনে।
দীপ খায় দায়, বিমোয় ঘুমায়, জাগায় তাহারে কে?
বেড়াতে গেলাম উভয়ে কোণার্ক।
বিশাল সূর্যমন্দির যেই চক্ষে পড়িল তার
নূতন মানুষ, সে দীপ নহে সে আর।
উল্লাসে তুলি' অঙ্গুলি তার দেখালো দেউল মোরে,
সুন্দর এক সূর্য্যোদয়ের ভোরে।
হেরি স্মৃষ্টিত পাষণ-প্রতিমা আগে চোখে পড়ে যেটি,
দীপ বলে 'আজও দাঁড়ায়ে আছিস বেটি?'
সব যেন চেনা—চলেছে ক্ষিপ্ত দৃষ্ট পদক্ষেপে—
জাগে র্যোবন সর্ব্বশরীর ব্যোপে।
প্রতি প্রস্তর প্রতি মূর্তিটি নেহারে বারম্বার,
ওরা জীবনের শিলালিপি যেন তার।
পাষণ পুষ্প গন্ধ বিতরে, ছবি যেন হাসি নমে,
যুগান্তরের স্মৃষ্টিদের সমাগমে।
কি ঔজ্জ্বল্য, কি ঔৎসুক্য, ওকি ছন্দিত গতি?
ভিখারী তো নয়—রাজ্যের অধিপতি!
শীর্ণ শরীরে ও কি লাভন্য! ঐশ্বর্য্যের ছাপ,
দেখিনি তো হেন পুনর্জন্ম লাভ!
সম্মুখে তারে ডাকিয়া বলিলু 'কিরিতে হবে যে স্বরা',
দীপের চক্ষু এখনো স্বপ্নভরা।
কহিল 'বন্ধু, অপেক্ষা কর, দেখ হয়ে স্মৃষ্টির,
আমার হস্তে গড়া এই মন্দির।

আমি করিয়াছি পাষণের এই সূর্য্য অর্থ্য দান,
কালের পরশ করিতে নারিবে ম্লান।
গড়িয়া দেউল, লভেছিলু আমি সবিতার কাছে বর—
—এখানে এলেই হইব জাতিঘর।
হেরিয়া দেউল, ফিরিয়া পেলাম সেই যে মমতা প্রীতি,
মানসে জাগিছে জননান্তর স্মৃতি।
অর্কপুষ্প, বন-উষেখা হলিতেছে সমীরণে,
প্রথম দাঁড়ানু ওখানে, রয়েছে মনে।
প্রধান স্থপতি, প্রথম পাথর স্থাপিলু যখন আসি,
খণ্ড চন্দ্রে হেরিলু পৌর্ণমাসী।
সে কি আনন্দ, সে কি উচ্ছ্বাস, আমোদিত ভূভুব
চৌদিকে ধ্বনি 'আরম্ভ হোক গুপ্ত'
বিপুল জনতা, ধ্বজা ও পতাকা, বাজ শব্দ রব,
মনে পড়ে সেই যজ্ঞ মহোৎসব।
গায়ত্রীকে যে আমি দেখিয়াছি হইতে মূর্তিমতী।
সৃষ্টি আমার হইয়াছে শাস্তী।
এই বিটক্ষে, কপোত কপোতী হ'জনে থাকিত বেশ,
মন্দির-গড়া তখনো হয় নি শেষ।
কণিক দিয়া পাষণে পাষণে এইখানে দিলু জোড়
দেখিনি, নৃপতি পার্শ্বে দাঁড়ায়ে মোর।
বিদায়ের দিনে এই দেহলীতে বাঁধিলু যন্ত্রপাতি
উত্তরায়ণে শেষ প্রস্তর গাঁথি।"

আমি নির্ব্বাক, বিমুগ্ধ মোরে করিয়াছে যাহুকর
যা দেখায় দেখি—অনিদ্য সুন্দর।
দীপ তেজোময়, সর্ব্ব অঙ্গে জ্যোতি, কি অপাখিব,
কথায় আমি কি বর্ণনা তার দিব?
হেরিলু তাহার সত্য মূর্তি, গুনিহু সত্য ভাষ,
জন্মান্তর করি আমি বিশ্বাস।
আমার সঙ্গে দীপ গিয়াছিল বলিয়া ফেলিছি ভ্রমে
দীন গিয়াছিল রাজেন্দ্রসঙ্কমে।

কবিতার্থে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

স্বচেন্দ্রের প্রিয় শহর এডিনবরা। ওঁরা বলেন, এ ত শহর নর, এ আমাদের সুসজ্জিত নাট্যশালা! নিউইয়র্ক শহরের নাম রেখেছেন ওঁরা সিনেমা। উত্তর সাগরতীরের এই সুন্দর শহরটিকে প্রকৃতি আর মানুষ উভয়ে মিলে গড়ে তুলেছে। একদা এইখানে একটি পাহাড় ছিল। মানুষ তাকে 'কিল্লা-দার শহর' বানিয়ে বসেছে। এডিনবরা শহর ও দুর্গ এমন সুকৌশলে নির্মিত যে সহজে বুঝায় না এটি পাহাড়ের উপর তৈরি হয়েছে, না পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে! পাহাড়ের ঢালু পিঠ, যা চূড়ার উপর থেকে গড়াতে গড়াতে সাগরের দিকে নেমেছে, কবে কোন্ যুগে স্বচেন্দ্রা করেছিল সেখানে বসতি। গড়ে উঠেছে জনপদ। তৈরি হয়েছে সেখানে ফুলের বাগান—তাতে সুদৃশ্য চতুকোণ, অষ্টকোণ, অর্ধচন্দ্রাকার কত রকমের কেয়ারি। এরই সামনে দিয়ে চলে গেছে দীর্ঘ সুবিস্তৃত রাজপথ। এডিনবরার গর্কের ধন প্রিন্সেস স্ট্রিট!

অসম এই মানব-জীবনের যে ছন্দ, সে ছন্দের প্রধান মাত্রাই হ'ল বৈবম্য। বৈপরীত্যের মধ্যেই বেজে ওঠে আমাদের আনন্দের সবচেয়ে মূরুর সুরগুলি। শুরু মোটা তারের অসঙ্গতির মধ্যেই বস্তুত হয় সঙ্গীতের বর্ণা। সুরের সপ্তগ্রাম এইখানেই। এডিনবরার নানাস্থানে নগরের রূপে এই বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে একটু বেশী। কোথাও বা সে রুক্ষ ধূসর, কোথাও বা স্নিগ্ধ শ্রামল। এই বৈচিত্র্যই এডিনবরার প্রধান আকর্ষণ। স্বচ মানুষগুলির প্রকৃতিও অবিকল তাদের দেশের মত। অর্থাৎ, কতকগুলি মানুষ অসহ্য গোঁয়ার, আবার কতকগুলি লোক একান্ত বিনীত ও ভদ্র। পুরাতন প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি এদের গতানুগতিক আনুগত্য যেমন, তেমনি আবার সৃষ্টিছাড়া পাগলা ক্র্যাপার দেশও এটা। এরা যেমন শাস্ত্র স্থির, তেমনি আবার রুচ চপল! অনেক সময় একই লোকের মধ্যে এই দুই বিপরীত প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়! সে আরও বিপদ! কাজেই এদের সঙ্গে বেশীদিন বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলা একটু কঠিন। এদের রুচি ও রসবোধ একাধারে রোমান্টিক আবার ক্লাসিক্যাল! বস্তুতাত্ত্বিক অথচ ভাবধর্মী! কোমলে কঠোরে গড়া সৃষ্টিছাড়া মানুষ এরা। কখনো এদের হৃদয়ে দেখা দেয় অমীরের মত উদারতা, কখনো রূপণের মত সঙ্কীর্ণতা। আমরা দীর্ঘ এক পক্ষকাল অন্তরঙ্গের মত এদের সঙ্গে একত্র রসরাস করে এসেছি। অতিথিদের সম্পর্কে, বিশেষতঃ

বিদেশী যারা, তাদের বেকার এরা একেবারে দোজখ ও শিষ্টাচারের অবতার। এদের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর অভাব নেই। ইংরেজরা যতই বলুক না স্বচেন্দ্রা বেনিয়ার



নার্ ওয়াস্টার স্ট

জাত; পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আমরা কিন্তু তা বলব না। কারণ আমরা ওদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কিছু বলবার মত কোনও ক্রটি খুঁজে পাই নি, কেবল ওদের ঐ হাইল্যান্ডার স্মার্ট, কোমরে চামর বোলা না, মাথায় পালকের টুপী ইত্যাদি পোশাক মনে হয়েছে এ যুগে অচল! সেকালের জাতীয় পোশাকের প্রতি ইংরেজ-বিশ্বেষ-বশতঃ আজকাল ওদের মনে যে অহেতুক গীতির বান ডেকেছে তার একটুও প্রশংসা করতে পারছি না। এই বিংশ শতাব্দীতে এগুলোকে এখন ওদের শরীরের চেয়ে এডিনবরা মিউজিয়মের শো-কেসেই মানায় ভাল।

ধাক্ ওদের পাহাড়িয়া জংলি পোশাক। যে কথা বলছিলাম। মানুষ তখনই পশুর পর্যায়ে গিয়ে পড়ে যখন তার সংস্কৃতি বলে কিছু থাকে না, স্বল্প সৌন্দর্য্যবোধ থাকে না, রসসৃষ্টি ও রসোপভোগ থেকে যখন সে বঞ্চিত থাকে।

সুখের বিষয় স্বচেরা এর কোনটাই হারায় নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীন কবি ডানবার থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর সুরসিক কবি রবার্ট বার্নস এবং উনবিংশ শতাব্দীর কবি ও কথাসিঙ্গী রবার্ট লুই স্টিভেনসন ও সার জেমস বারী



সার ওয়াল্টার স্কটের স্মৃতি-মন্দির
[এডিনবরা শহরে প্রিন্সেস গার্ডেনের মধ্যে]

পর্যন্ত সাহিত্যের অবহাওয়ার স্কটলও ভরপুর ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর স্কট সাহিত্য-আকাশের প্রদীপ্ত সূর্য—‘সার ওয়াল্টার স্কট’। এর সন্ধক্ষে লর্ড রোজবেরী একবার বলেছিলেন—“উভয় প্রদেশের শাসন-পরিষদের সংযোগের ফলে ইংলও এক দিন স্কটলওকে পেয়েছিল বটে, কিন্তু ‘স্কট’র অনুগ্রহে সমগ্র পৃথিবী আজ ‘স্কটলও’কে পেয়েছে!”

এডিনবরার সবচেয়ে বড় ও সুদৃশ্য রাস্তা হ’ল প্রিন্সেস স্ট্রিট। লণ্ডনের পিকাডিলি বা কলকাতার চৌরঙ্গীর সঙ্গে এর তুলনা করলেও করা যেতে পারে। তবে কিনা লণ্ডন বা কলকাতা পার্শ্বত্যা শহর নয়; এডিনবরা পার্শ্বত্যা-নগরী। এর একধারে প্রাসাদোপম সব ঘরবাড়ী, বড় বড়

দোকান, প্রসিদ্ধ সব হোটেল, আর একধারে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর একটি ফুলের বাগান,—প্রিন্সেস গার্ডেন—সেখানে অজস্র রঙীন ফুল ফুটে রাজপথটিকে যেন আলো করে রেখেছে। এই প্রিন্সেস স্ট্রিট বাগানের পূর্বদিকে আর একটি ঘেরা পুষ্পোদ্যানের মধ্যে স্বচেরা তাদের সাহিত্য-সম্রাট সার ওয়াল্টার স্কটের একটি সুন্দর ‘স্মৃতি-মন্দির’ নির্মাণ করে রেখেছে। এই স্মৃতি-মন্দিরটি দেখে মনটা থুশী হয়ে উঠল। হ্যাঁ, এরা স্কটলওর শ্রেষ্ঠ কবির প্রাপ্য মর্যাদার যথাযোগ্য স্মৃতি-মন্দিরই নির্মাণ করেছে। দেখে মনে হয় যেন লোকান্তরিত কবির যশের চূড়াগুলি একে একে উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধতর লোকে উঠে চলেছে। দূর থেকে এটিকে যেন উপাসনা-মন্দিরের চূড়া বলেই মনে হয়। কারণ সেই রকম মন্দিরের ধরণেই এটি তৈরি হয়েছে। তিন পেনি মাত্র দক্ষিণা দিয়ে এটি দর্শন করতে হয়। দেখতে দেখতে ভাবছিলাম—কলকাতার লোয়ার সারকুলার রোড সিমেন্টিতে মহাকবি মাইকেলের যে ছুখীর ঝার এতটুকু একটি ‘স্মৃতিমঠ’ করা হয়েছে সে কি প্রচণ্ড প্রতিভাধর মধুসূদনের যোগ্য স্বদণিকা? ‘দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম তব যদি বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল’—এত বড় অনুবোধ করবার অধিকার কি সেই অতি ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভটির আছে? ওকে ভেঙে গড়তে হবে—মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের যোগ্য স্মৃতি-মন্দির করে। রবীন্দ্রনাথের নিমতলা-শ্মশানবাটের ভস্মাবশেষ চিতার মাটি লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা আছে বটে, কিন্তু শরৎ চন্দ্রের কেওড়াতলা শ্মশানের চিতা হারিয়ে গিয়েছে। এর কোনটিতেই আজ পর্যন্ত একখানি ইটও গাঁথা হয় নি। কোনও স্মৃতি-মন্দির নির্মাণের চেষ্টাও দেখা যাচ্ছে না।

আজ থেকে একশ’ আশী বছর আগে এক দিন এই সুন্দর এডিনবরা শহরেই স্কটের জন্ম হয়েছিল। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তিনি পৃথিবীতে এসে প্রথম আলোর দিকে চোখ মেলেছিলেন। পিতা ওয়াল্টার স্কট ছিলেন সরকারী রেজেন্ট্রী আপিসের আইন-কর্মচারী। মাতা এনী রাদারফোর্ড ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ জন রাদারফোর্ডের কন্যা। সুতরাং তিনি যে পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই ছিলেন সৎশ-সম্মত ও অভিজাত একথা বলাই বাহুল্য।

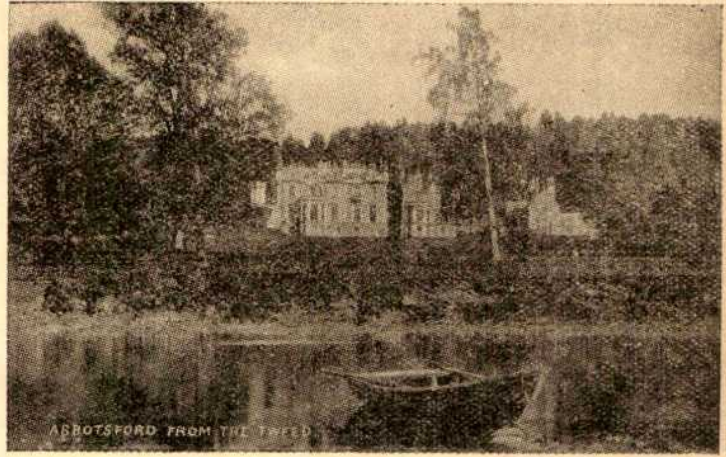
আঠারো মাসের শিশু। দাঁত উঠছে না। বাপ-মা কাতর। ছেলে কেবলই জরে ভুগছে। শেষে দেখা গেল, শিশু ওয়াল্টারের ডান পা-টি অবশ হয়ে গেছে। তিন বছর বয়সে তাঁকে পাঠানো হ’ল স্কটিশল্যান্ডের তাঁর ঠাকুরদাদার কাছে। এইখানেই প্রথম শিশু ওয়াল্টার আয়ত্ত্ব করতে শিখলেন স্কটলওর গ্রাম্য ছড়া, লোকসঙ্গীত ও গাথা।

আট বছর বয়সে বালক ওয়ান্টারকে নিয়ে যাওয়া হ'ল প্রেটনপ্যাসে। এইখানে তাঁর পরিচয় হয় লোকগাথা বিষয়ে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ডালগেটি এবং জর্জ কন্স্টেবলের সঙ্গে। এঁদের কাছে তিনি অনেক কিছু নতুন ছড়া শেখেন এবং সেই কিশোর বয়সেই নিজেকে কিছু কিছু গাথা রচনা করতে শুরু করেন।

এডিনবরা হাইস্কুলে পড়বার জন্ম তিনি যখন আবার এডিনবরায় ফিরে এলেন তখন তাঁর বয়স সবে ন'বছর পূর্ণ হয়েছে। এই অল্প বয়সেই তিনি স্কুলের রেস্তোর অধ্যাপক এডামের কাছে কিছু কিছু ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন। বালকের মধ্যে যে কাব্যপ্রতিভা ছিল, অন্ধকবি ও শিক্ষক ডঃ ব্র্যাকলকু তা আবিষ্কার করে তাঁকে কবিতা-রচনার প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই সময় স্কটলণ্ডের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ কবি বার্নসের সঙ্গে বালক স্কটের যে অস্বর্ণীয় সংস্রব পরিচয় ঘটে, তা আজ এক ঐতিহাসিক ঘটনার পরিণত হয়েছে।

এডিনবরা হাইস্কুলে স্কট তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চশিক্ষার জন্ম প্রবেশ করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভাষা বা সাহিত্য কোনটাতেই তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নি। ল্যাটিন শেখা তাঁর অসম্পূর্ণ হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধান থাকা সত্ত্বেও তিনি গ্রীক-ভাষা শিখতে কিছুতেই রাজী হলেন না। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পনেরো বছর বয়সে স্কট এস চুকলেন তাঁর বাবার আপিসে। অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি স্কটলণ্ডের আইন-বিদ্যা অধিগত করে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে আদালতে ব্যবহারজীবীরূপে প্রবেশ করলেন।

আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারেই তাঁকে এই সময় একবার উত্তর স্কটলণ্ড অর্থাৎ হাইল্যান্ড অঞ্চলে যেতে হয়। ইনভার্নহেল তাঁর অপরিচিত ছিল না। এইবার তরুণ স্কটের জীবনে হ'ল রোমান্সের আবির্ভাব। শুধু আইনের বিধান তাঁর কবিমানসকে নীরস করে তুলতে পারে নি। তিনি লেডি লুইসা মার্গারেট ষ্টুয়ার্টকে হৃদয় উজাড় করে ভালবেসে ফেললেন। যদিও এই বিহ্বল রসিকা রূপসীকে তিনি পল্লী রূপে গৃহে আনতে পারেন নি, কিন্তু মানসলোকের রস-সজ্জিনী রূপে পেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অটুট ছিল। স্কটের



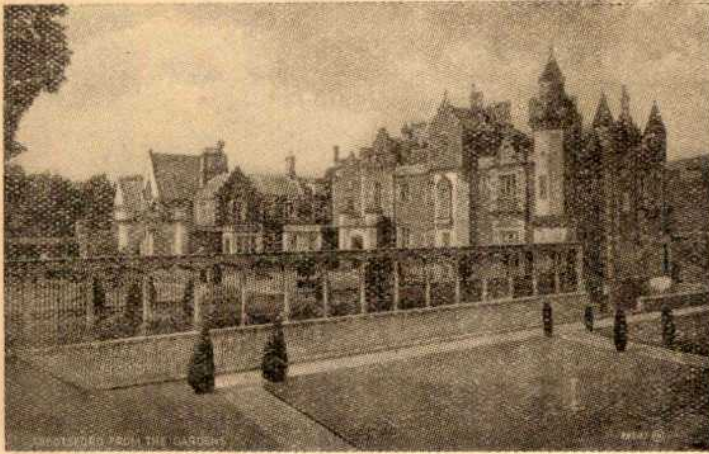
সার ওয়ান্টার স্কটের এবট সফোর্ড প্রাসাদ

[হুইড্‌নদীর তীর থেকে ছবির মত দেখায়]

সাহিত্য-জীবনের প্রকৃত প্রাণরসায়ণ ছিল এই সুন্দরী মার্গারিটার লেখা সুন্দরতম সরস লিপিগুলি।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কটের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রচনাগুলি ছিল লোকগাথারই ছন্দোবদ্ধ মার্জিত রূপ। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কবির বয়স যখন ছাব্বিশ বছর, হঠাৎ তাঁর স্বপ্ন হ'ল স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক হবার। সারা বসন্তকালটা তিনি অস্বাভাবিক সৈনিকের কুচকাওয়াজ নিয়েই কাটিয়ে দিলেন। এই সময় তাঁর *Black Dwarf* নামে খ্যাত ডেভিড রিটার সঙ্গে সাক্ষৎ পরিচয় ঘটে। তার পর টুইডেল থেকে কবি ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হন গিল্‌সল্যাণ্ডে। এইখানেই তরুণ কবি প্রথম দর্শনেই দেখে মুগ্ধ হলেন কুমারী শার্লোটি মার্গারেট কার্পেনটার বা শাপেতিরাকে। ইনি একটি রূপসী বিহ্বল ফরাসী মেয়ে। এর পিতা ছিলেন ইংলণ্ড-প্রবাসী একজন ফরাসী। এই বছরেই অর্থাৎ ঐ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের অধিবাস রাত্রে কার্লাইলের এক গীর্জায় সেই ফরাসী মেয়েটিকে তিনি বিবাহ করে ফেললেন।

মধুচন্দ্র যাপন করতে নববধূকে নিয়ে কবি গেলেন লিওন্সডেলে। এখানে তাঁর পৈতৃক জমিদারী। পিতার দেওয়া ছোট্ট টাট্টু ঘোড়াটি চড়ে প্রায়ই তিনি এখানে বেড়াতে আসতেন। প্রাচীন গ্রাম্যগাথা বা ব্যালাড সংগ্রহের জন্মও ইতিপূর্বে একবার এখানে এসে কিছুদিন ছিলেন। এবার ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বিবাহের পর থেকে স্কট এই সময় প্রতি বৎসর এখানে সঙ্গীক আসতে শুরু করেন। এই অবকাশে বহু গ্রাম্যগাথা, লোক-সঙ্গীত, পল্লীকাহিনী ও কিংবদন্তী ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন



এবটস্‌ফোর্ড প্রাসাদ [উদ্যানের দিক থেকে]

তিনি। নানা চরিত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন জানা যায়। এম্. জি. লুইস্ এই সময় একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর অনুবোধে স্কট এই গ্রন্থের জন্ত ‘গ্লেনফিন্লাস’ এবং ‘জিভ অফ সেন্ট জন’ এই রচনা দুটি লিখেছেন এবং জার্মান মহাকাবি গ্যেটেরও একটি রচনা অনুবাদ করে দিয়েছিলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে স্কটিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারা সার্ব ওয়াণ্টার মেলকার্‌শারারের শেরিফ নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন ‘কেলসো’র ছিলেন তখন পুস্তক-ব্যবসারী জেমস ব্যালাণ্টাইন তাঁর কাছে এসে তাঁর রচিত একখানি বই প্রকাশ করবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তারই ফলে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আর একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—*The Border Minstrelsy*। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিত্ব ছড়িয়ে পড়ে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে; যখন তাঁর *The Lay of the Last Minstrel* বইখানি প্রকাশিত হ’ল। এই গ্রন্থ স্কটকে সেদিন সর্বজনপ্রিয় লেখক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিলে। স্কটের বয়স তখন মাত্র ৩৪ বৎসর। যৌবনের জয়পতাকা পূর্ণ তেজে উড়ছে।

কিন্তু নিদারুণ এক আর্থিক বিপর্যয় এসে কবিকে এই সময় একেবারে নিঃশ্ব করে ছেড়ে দিলে। তাঁর দুই প্রকাশক—ব্যালাণ্টাইন ও কনস্টেবল যাদের উপর বিশ্বাস করে তিনি ঘর থেকে টাকা বার করে দিয়ে এঁদের ব্যবসায়ের অংশীদার হয়েছিলেন, তাঁরা দু’জনেই নিজেদের অব্যবসারীর ছায় আচরণের ফলে কারবারে ফেল হলেন। স্কট ছিলেন কবি। ব্যবসাবুদ্ধি তাঁর একেবারেই ছিল না। বিষয়বুদ্ধিও ততোধিক শোচনীয়। কাজেই আর্থিক ব্যাপারে তিনি

কোনদিনই স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারেন নি। এই দুর্ঘটনার পর তিনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা ত্যাগ করে এশেটিলে গিয়ে বাস করেন। এশেটিল টুইড নদীকূলের একটি ছোট গ্রাম। এই টুইড নদীটি কিন্তু নেহাৎ ছোট নয়। প্রায় একানব্বই মাইল লম্বা। স্কটলওকে ইংলণ্ডের সীমান্ত থেকে পৃথক করে রেখেছে এই টুইড নদী।

এখান থেকে কবি ‘এডিনবরা রিভিউ’ পত্রিকায় প্রবন্ধাদি পাঠাতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ‘ওয়েভালি নভেল্‌স্’ এই সময় তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীন ব্যবহার-জীবীর পেশা ত্যাগ করে দায়রা আদালতের বেতনভোগী আইনজ্ঞের কাজে

যোগ দেন। কারণ ওকালতী কাজটা তাঁর সাহিত্য-সাধনার পক্ষে বাধা হয়ে উঠেছিল। এরই ঠিক দু’বছর পরে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁর ‘মন্সিয়ন’ বইখানি প্রকাশিত হ’ল তখন স্কটের খ্যাতি বেড়ে গেল। কিন্তু লর্ড ফ্রান্সিস জেকরি, তদানীন্তন একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক তাঁর ‘এডিনবরা রিভিউ’ পত্রিকায় বেশ একটু বক্রোক্তি করায় এবং ‘এডিনবরা রিভিউ’ পত্রিকা এই সময় আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও গণতন্ত্রের সমর্থক হয়ে ওঠায়, তিনি ঐ পত্রিকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেই ‘এডিনবরা কোয়ার্টার্লি’ নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করতে সুরু করেন। এই সময় তাঁর সম্পাদনার ‘ড্রাইডেন’, ‘সুইফট’ প্রভৃতি ক্লাসিক রচনাবলী প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে স্কটের *Lady of the Lake* (সর্বসুন্দরী) গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্বখ্যাতি অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্কট এই সময় গ্রেট ব্রিটেনের পশ্চিমাকুলের দ্বীপাবলী পরিভ্রমণে যান। এখানে এসে তাঁর খেয়াল হয় ‘লর্ড অফ দি আইলস্’ নামে ‘লেডি অফ দি লেক’-এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর একখানি গ্রন্থ রচনা করবেন। কল্পনামুখায়ী একটি খসড়াও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সে বই আর তখন লেখা হয় নি। কারণ ওখান থেকে ফিরেই তিনি এবটস্‌ফোর্ডে খানিকটা আবাদী জমি কেনেন কৃষিক্ষেত্র করবার জন্ত। এই জমির উপর একখানি ছোট কুটির ছিল। কবি সর্বপ্রথম এই কুটিরখানির সংস্কারে মন দিলেন। এই হ’ল তাঁর কাল। কবির খেয়ালে সেই কুটির হয়ে উঠল ‘এবটস্‌ফোর্ড প্রাসাদ’ যা বহু রাজপ্রাসাদকেও লজ্জা দিতে পারে! এই প্রাসাদ নিম্নাংশে তাঁর

যথাসর্বস্ব ব্যয় হয়ে গিয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গের *Rokeby* প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি তাঁর ব্যর্থ রচনা বলেই গণ্য হয়েছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজদরবার থেকে তাঁকে 'Poet Laureate' বা রাজকবির সম্মানে ভূষিত করবার প্রস্তাব আসে। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কবিবন্ধু রবার্ট সাড়ে এ পদের একজন প্রার্থী জেনে তিনি সাঁদর অলুকুল 'লরিয়েট' হবার রাজ-আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। স্বর্গ ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। রাজসম্মান তাঁর কাছে বন্ধুপ্রীতির চেয়ে বড় বলে মনে হয় নি।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গের "লাইফ অফ সুইফট" রচনাটি সমাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয় তাঁর বেনামী রচনা 'ওয়েভালি'। স্বর্গের এই 'ওয়েভালি' উপন্যাস প্রকাশ হবামাত্র বিংশ একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু যশ-নির্লোভ কবি নিজেকে এ গ্রন্থের রচয়িতা বলে কিছুতেই প্রকাশ করেন নি। এর কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, "ওয়েভালি" লেখবার সময় আমি যে প্রেরণা পেয়েছিলাম, পরবর্তী রচনার যদি সে শক্তি না থাকে তা হলে ভাল বই লেখা আর আমার দ্বারা সম্ভব হবে না যে! হৃত লেখাই ছেড়ে দিতে হবে। আমি অভাবের তাড়নার উপন্যাস লিখি, নিজের আগ্রহে নয়। আমি 'ঔপন্যাসিক' নামে পরিচিত হতে চাই না!" কবির বয়স এ সময় চুয়াল্লিশ হয়েছিল। যৌবন-সীমন্ত উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রৌঢ়ের রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু ওয়েভালির এই অপপ্রত্যাশিত বিঘ্নজন সহসা যেন তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিল যৌবনের অমিত উদ্যম ও উৎসাহ! ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে পর পর প্রকাশিত হয় তাঁর সেই *Lord of the Isles* (দ্বীপেশ) *Guy Mannering* উপন্যাস এবং *Antiquary* শীর্ষক গ্রন্থখানি।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর নিজের এই ভীষণ অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর রচনার যে এতটুকু স্বাস্থ্যহানি ঘটে নি তার প্রমাণ পাই আমরা কবির এই সময়ে প্রকাশিত *Rob Roy* এবং *The Heart of Midlothian* গ্রন্থ দুটি থেকে। এর পর মাত্র দুটি বছর যেতে না যেতেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কবি পুনরায় সাংঘাতিক পীড়িত হয়ে পড়েন। এবার তাঁর জীবনসঙ্কট বলেই মনে হয়েছিল। এই অসুস্থতার মধ্যেও রোগযন্ত্রণায় কাতর

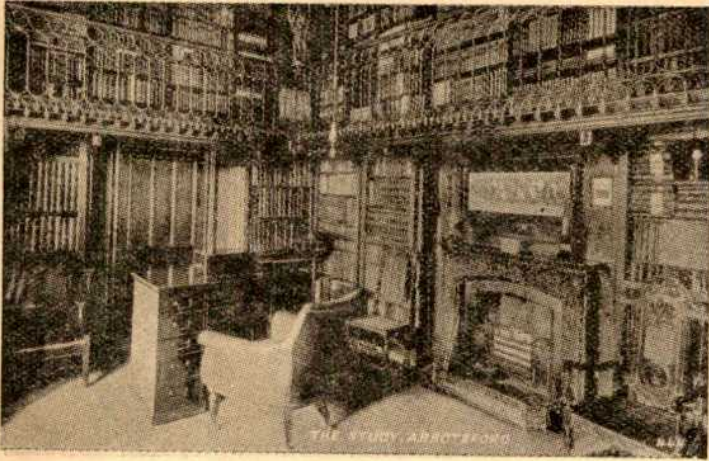


সার্ ওয়াল্টার স্বর্গের গ্রন্থাগার

কবি শয্যাশায়ী অবস্থাতেই মুখে মুখে বলে লিখিয়েছিলেন তাঁর অমর গ্রন্থ *The Bride of Lammer Moor*।

এরপর ভগবানের দয়ায় তিনি কতকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। শরীর যদিও সম্পূর্ণ সারে নি, কিন্তু রচনাশক্তি তাঁর একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। এই সময় যখন প্রকাশিত হ'ল 'আইভান হো' তখন আবার রসবেস্তা পাঠক-সমাজের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্নম সমালোচকদের মুখেও স্বর্গের জয়ধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *The Monastery* কাউকে তেমন খুশী করতে পারে নি। এই বছরই রাজদরবার থেকে তাঁকে ব্যারনেটের সম্মানে ও উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এখন থেকে তিনি সার্ ওয়াল্টার স্বর্গ নামে অভিহিত হতে থাকেন। কবির উপর এই রাজ-উপাধি বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে কবির লেখনীতেও যেন বর্ষের বহু দেখা দেয়। এর পর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর *The Abbot, Kenilworth, The Pirate, The Fortune of Nigel, Peveril of the Peak, Quentin Durward, Red Gauntlet* প্রভৃতি গ্রন্থরাজি। ১৮২০ থেকে ১৮২৪ মাত্র এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি আটখানি বেশ বড় বড় উপন্যাস লিখে ফেলেন। তিনি স্বীকার করে গেছেন তাঁর এটনুফোর্ড প্রাসাদ রক্ষা করবার জ্ঞান এবং ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে স্বাক্ষর চাপা ধ্বংসের বোঝা পরিশোধ করবার জ্ঞান তাঁকে দিবারাত্র কলম চালাতে হয়েছে। সখ করে নয়।

খ্যাতির বিপত্তির সঙ্গে উপাধির মর্যাদা সংযুক্ত হওয়ার পর থেকে সমাজের উচ্চ স্তরের ভক্তসম্প্রদায় দেশ-বিদেশ থেকে দলে দলে ছুটে আসতে শুরু করেছিলেন কবির 'এটনুফোর্ড প্রাসাদে' তাঁকে দর্শন করতে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে,



সারু ওয়াগটারের ফুটের লেখাপড়ার ঘর

তঁার হাতের লেখা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে। এঁরা কিস্তি কবির একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধনার কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মাতে পারেন নি। এমন কি নানা সামাজিক কর্তব্য পালনেও তাঁকে কোনও দিন অবহেলা প্রদর্শন করতে দেখা যায় নি। নৃপতি চতুর্থ জর্জ যখন স্কটলণ্ডে পদার্পণ করেন তখন এডিনবরার উপস্থিত থেকে তিনি রাজ-অভ্যর্থনার বিপুল সমারোহ নিপুণভাবেই সম্পন্ন করেন। তিনি স্বেচ্ছাকারের আদালতে নিয়মিত এসে মামলার বিচার করতেন। ‘স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যবাহিনী’ গঠনের কাজে তাঁকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে দেখা গেছে। প্রতিদিন তিনি অগণত চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন। সারু ওয়াগটার স্কটকে পত্র লিখে উত্তর পায় নি এ অভিযোগ করবার সুযোগ তিনি কাউকে দেন নি। এ গুণটি আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও তাঁকে পত্র লিখলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেত। সারু ওয়াগটারের হৃদয় ছিল অতি কোমল। দরিদ্রের প্রতি তাঁর করুণা ছিল অসীম। হাতে টাকা থাকলে তিনি প্রার্থীকে কখনও বিমুখ করতেন না।

উপন্যাস-রচনা তাঁর কোনদিনই বন্ধ ছিল না, উপরন্তু তিনি মহাবীর নেপোলিয়নের জীবনী রচনা করতেও শুরু করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর *Journal* প্রকাশ হতে আরম্ভ হয়। *Woodstock* রচনা করবার সময় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার ব্যবসার বাজার ভেঙে পড়ে এবং আর পাঁচ জনের মত স্কটও এ ব্যাপারে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু নীলকণ্ঠ শিবের মত ঋণভারের জটা শিরে নিয়ে তিনি অবিকৃত চিন্তে সে ক্ষতির বিষ পরিপাক করেন। এখন থেকে তিনি পদাধিকার সংক্রান্ত জনসেবার কাজ ছাড়া তাঁর

অবশিষ্ট সমস্ত সময়টুকু সাহিত্যরচনার কাজেই নিরোগ করেন। এই দীর্ঘ-কালীন কঠিন পরিশ্রমের ফলে শেষ পর্যন্ত কবি তাঁর ঋণদার থেকে মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলেন, তবে সে মুক্তি তাঁর জীবদ্দশার অবশ্য সম্পূর্ণরূপে ঘটে নি। তাঁর আত্মাও সেই সঙ্গে দেহমুক্ত হয়েছিল।

শেষজীবনে কবি খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পত্নীবিয়োগের বেদনায় কবি যখন একান্ত কাতর সেই সময় প্রকাশকের কাছ থেকে *Count Robert of Paris* বইখানির পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনার অমনোনীত হয়ে ফেরত এল। এ আঘাত কবিকে একেবারে বিকল

করে দিলে। এর উপর আবার এই সময় জেডবরার র্যাডিক্যাল মতাবলম্বী উচ্ছৃঙ্খল দল কবিকে এত বেশী অবমাননা বর্ষণ করতে শুরু করে যে দুঃসহবোধে কবি দেশ ছেড়ে ভূমধ্যসাগরে সমুদ্রবিহারে চলে যান। কিন্তু এত দুঃখোগের মধ্যেও সাহিত্যদেবা তিনি ছাড়তে পারেন নি। *The Siege of Malta* গ্রন্থখানি তিনি এই সময় রচনা করতে শুরু করেন।

কবি গৃহে ফিরে এলেন যেন মৃত্যুকে বরণ করবার জন্মই। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর স্কটলণ্ডের এই বিরাট প্রতিভাধর কবি, এন্টসফোর্ডের সাহিত্য-স্বর্গ্য অন্তর্মিত হন। ড্রাইববার্গ এবি উপাসনা-মন্দিরের সমাধিক্ষেত্রে অমর কবির নম্বরদেহ সমাহিত করা হয়।

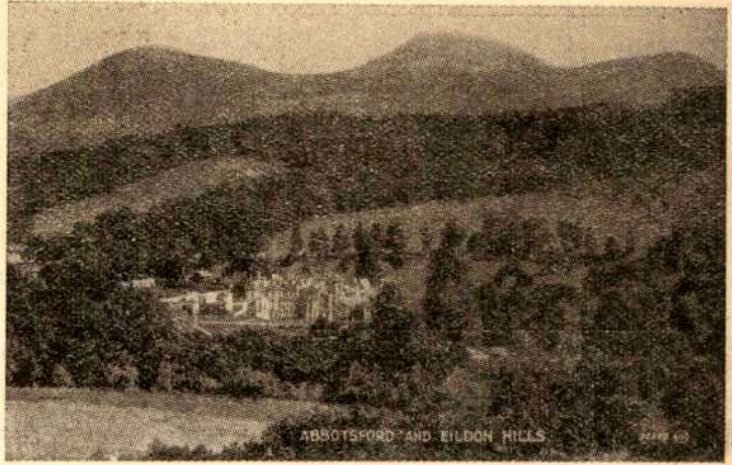
কবির দেহান্তের অষ্টাদশাধিক শত বৎসর পরে ভারতের পূর্বপ্রান্তের এক নগর্য কবি-দম্পতি গিয়েছিল সেই সুদূর স্কটলণ্ডের এন্টসফোর্ড কবিতীর্থে সারু ওয়াগটার স্কটের চরণধূলিপূত গৃহ-প্রাঙ্গণে তাদের শ্রদ্ধার প্রণাম-অর্থ্যখানি রেখে আসতে। ১৯৫০ সন। আগষ্ট মাসের শেষের সপ্তাহ। এডিনবরার বসেছে সাহিত্যের রাজহর যজ্ঞ—‘ইন্টারন্যাশনাল পেন-কংগ্রেস’। পৃথিবীর সর্বদেশের সাহিত্যিকেরাই সমবেত হয়েছিলেন এখানে। ভারতের প্রতিনিধিরূপে আমরাও উপস্থিত ছিলাম এই বিশ্ব-লেখক-মহাসম্মেলনে। স্কটিশ পি-ই-এন সেন্টারের কর্তৃপক্ষ যারা এডিনবরার এই সম্মেলন আয়োজন করেছিলেন, তাঁরা এক দিন আমাদের সকলকে নিয়ে গেলেন এন্টসফোর্ডে এই কবিতীর্থে দেখিয়ে আনতে।

যথার্থই দেখলাম সে এক বিরাট প্রাসাদ। নদী হ্রদ ও পর্বত পরিবেষ্টিত নিবিড় কাননভূমির মধ্যে ছবির মত এই

কবির বাড়ী। প্রাসাদের মধ্যস্থলের স্থাপত্যকৌশল 'গথিক হলে'র অমূল্যকরণে প্রস্তুত। তা ছাড়া, কবি তাঁর দেশ-ভ্রমণকালে যেখানে যেটি ভাল দেখেছিলেন তাঁর সাধের এবটস্‌ফোর্ড প্রাসাদে সেগুলি সবই প্রায় নির্মাণ করিয়েছিলেন : যেমন, প্রবেশদ্বার তৈরি হয়েছিল প্রাচীন এডিনবরা নগরের তোরণদ্বারের অমূল্যকরণে। লক লেভেন ক্যাসেলের অমূল্যকরণও অনেককিছু করেছিলেন। কত লক্ষ টাকা যে কবি এর পিছনে ব্যয় করেন তা বলা যায় না। তবে এটা ঠিক যে, কবির পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকাই এই বাড়ীখানি প্রাপ্ত করেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব উত্তমর্গদের নামে লিখে দিয়ে এবং মাসে মাসে কিস্তিবন্দী হিসাবে তাঁদের বাকী পাওনাটুকু পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তবে এবটস্‌ফোর্ড প্রাসাদ রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

মানুষের বিপদ কখনও একা আসে না। স্কটের এই বিপদ অবস্থার মধ্যেই প্রচণ্ড শক্তিশালী সাহিত্য-সমালোচক কার্লাইল স্কটের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা-প্রসঙ্গে অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম ভাবে লিখে চলেছিলেন—“স্কটের রচনার কোনও সঙ্গতি নেই, কোনও ধারাবাহিক পারম্পর্য্য রক্ষিত হয় নি। তাঁর রচনার মধ্যে কোনও সজীব বা প্রাণবন্ত জীবনের স্পন্দন নেই। তাঁকে কোনও কারণে প্রথম শ্রেণীর একজন অসাধারণ লেখকের সম্মান দেওয়া চলে না। তাঁর যা কিছু কল্পনা তা এই মাটির পৃথিবীর বাস্তব সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। জগতে যা কিছু স্থূল ও প্রত্যক্ষগোচর তারই সৌন্দর্য্যটুকু তিনি প্রকাশ করতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর রসালুভূতি কোথাও সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়লোকে পৌঁছতে পারে নি। প্রতিভা, মেধা, মনীষা যাই বলুন না কেন, স্কটের সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই অধ্যাত্মলোকে কোনদিনই পৌঁছতে পারেন নি, যেখানে পরমানন্দ-সাগরে আত্মার বিহার ঘটে। স্কটের কাছে সে তত্ত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।”

কার্লাইলের সমালোচনা সেইদিন সাহিত্য-জগতে একটা আলোড়ন তুলেছিল বটে, কিন্তু বিরাট প্রতিভাধর স্কটের কোনও ক্ষতি করতে পারে নি। তিনি ছিলেন গভীর দেশপ্রেমিক। জন্মভূমি স্কটল্যান্ডকে ভালবাসতেন প্রাণের অধিক। তাঁর রচনা স্কটল্যান্ডকে সেদিন জগতের চক্ষে মননীয় করে তুলেছিল। এইখানেই কবির জীবনের সার্থকতা।



ইল্ডন শৈলমালা [সার্ ওয়াল্টার এবটস্‌ফোর্ড প্রাসাদের অলিম্প থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুহূর্তে এই দৃশ্য দেখতেন]

আমরা গভীর শ্রদ্ধানত চিত্তে এই কবিতীর্থে প্রবেশ করলাম। সার্ ওয়াল্টার স্কটের পৌত্র দ্বিতলের সিঁড়ির মুখে তাঁর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ইনি বিপত্নীক। একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ। এঁর নাম মেজর জেনারেল সার্ ওয়াল্টার ম্যাক্সওয়েল স্কট সি-বি-ডি-এস-ও, ডি-এস-সি। ইনি আমাদের আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর মহান পিতামহের তীর্থতুল্য আলয়ে। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে তাঁর বিদুষী ও রূপসী কন্যা ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলেন—সার্ ওয়াল্টার স্কটের ড্রিংরুম ও লাইব্রেরী। ছুটিই বেশ প্রশস্ত বড় ঘর। সার্ ওয়াল্টার যে ঘরে বসে লেখাপড়া করতেন, তাঁর টেবিল চেয়ার, দোয়াত কলম, বুক-কেস, তাঁর ডায়েরী, হিসাবের খাতা, চিঠিপত্র সমস্ত সযত্নে মিউজিয়মের মত রাখা হয়েছে। তাঁর শয়নঘর, ভোজনাগার, কবির ব্যবহৃত কত দ্রব্যাদি সমস্তই এখানে পবিত্র দেবোত্তর সম্পত্তির মত সুব্যবহার সংরক্ষিত।

সার্ ওয়াল্টার স্কটের লেখাপড়ার ঘরখানি দেখতে দেখতে তাঁর পৌত্র ম্যাক্সওয়েল স্কট প্রসঙ্গতঃ আমাদের বলেছিলেন, “আমার পিতামহ তাঁর এই পড়ার ঘরের এক কোণে টেবিলে বসে লেখনী চালনা করে পৃথিবীতে অমর হয়ে গেছেন! আর, আমি, তাঁর অযোগ্য বংশধর, এতকাল মৃত্যুকে তুচ্ছ করে কত দেশ-বিদেশে ছুটে গিয়ে অসিচালনা করেছি, কিন্তু অমরত্ব অর্জন করা দূরে থাক্—আমার নামও কেউ জানে না! ‘Pen is mightier than sword’ একথা আর কেউ



ড্রাইবার্গ এবের মধ্যে সার্ ওয়াটার স্টের সমাধি

স্বীকার করুক বা নাই করুক, আমি তা করতে বাধ্য।”

তার পর তিনি আমাদের একটি ছোট বারান্দার নিয়ে গিয়ে দেখালেন, এইখানে কবি নিত্য বসে দেখতেন ঐ এবটস্-ফোর্ডের দিগন্তে ঈল্ডন পাহাড় চূড়ার অন্তরালে সূর্য্যাস্তের অপকল্প দৃশ্য। কবির স্বহস্তে রচিত উদ্ভানে এলুম ও পাইনের যে চারাগুলি শৈশব থেকে যৌবনের তেজে বেড়ে উঠেছিল, তারই শাখাপল্লবকিশলয়ের ফাঁকে ফাঁকে নৃত্যতরঙ্গিনী টুইড নদীর স্নিগ্ধ শুভ্রোজ্জ্বল প্রবাহ চোখে পড়ে। নেপলস থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত অসুস্থ কবি এইখানে দীর্ঘকাল বসে

প্রকৃতির শাস্ত সুন্দর রূপের মধ্যে আত্মসমাধিত হয়ে পড়তেন। যত্নের পূর্ব্বকণ্ঠে কি জানি কি প্রেরণায় কি রচনা করে যাবার তাগিদে তিনি একবার তাঁর কলমটি হাতে নিয়ে টেবিলে বসেছিলেন। কিন্তু কিছুই লেখা হ’ল না। এবটস্ফোর্ডের পার্শ্বত্বে বনভূমির দিকে নিঃশেষ নরনে নিশ্চল হয়ে চেয়ে রইলেন। বোধ করি তাঁর স্বর্গগতা প্রিয়তমার কথা ভাবছিলেন। কখন যে তাঁর অজ্ঞাতসারে হাত থেকে কলমটি খসে পড়ে গিয়েছিল কবি তা টের পান নি। তাঁর দেখাশোনার জন্ত নিযুক্ত কর্তব্যপরায়াণ সেবিকা কবিকে সযত্নে তুলে এনে শয্যায় শুইয়ে দিলেন। কবির শেষ কথা—“বড় ঘুম পাচ্ছে।”

কবির সে ঘুম আর ভাঙে নি। এবটস্ফোর্ড থেকে মাত্র এক মাইল দূরে তাঁর মাতামহবংশের দান ‘ড্রাইবার্গ এবে’তে কবির সমাধি দেখে এলাম। বীমারসাইড পাহাড়ের আড়ালে তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। কবির সমাধিশিয়ারে দাঁড়িয়ে মনে পড়ছিল তাঁর হৃদয়ের মংলু, তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেম, তাঁর বাৎসল্যরসান্বিত স্নেহপ্রবণ হৃদয়, তার মধুর স্বভাব যা তাঁর আশ্চর্য্য প্রতিভাকে জ্যোতির্ম্ময় কর তুলেছিল। এই মহাপ্রাণ কবির উদ্দেশে আমাদের প্রণাম জানিয়ে আমরা সাক্ষ্যভোজের আগেই এডিনবার্গ ফিরে এলাম।

ভাদরে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রজনীগন্ধার গন্ধ আত্র সমীরণে
ভেসে আসে। একটানা কিঁকির আওয়াজ
আঁধারের রন্ধে রন্ধে। ভাদ্রের গগনে
মেঘেদের গুরু গুরু বাজে পাখোয়াজ।
নাহি তারা, নাহি চন্দ্র, নাহিকো তপন;
অন্ধকার-সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার
দিকে দিকে। মুখোমুখি আমি আর মন
চুপ করে বসে আছি,—কেহ নাহি আর।

ভালো লাগে এ আঁধার, এই সুমধুর
পুষ্পের সৌরভে পূর্ণ সুস্নিগ্ধ বাতাস;
ভালো লাগে কিঁকির এ একটানা সুর;
ভালো লাগে মেঘালো এ রাতের আকাশ।
দিবসের কর্ম্ম আনে চিত্তের বিক্ষেপ;
রাত্রি আনে মর্মে স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ।

চিত্রচোর

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১০

বড়দিন আসিয়া চলিয়া গিয়াছে ; নববর্ষ সমাগতপ্রায় । এখানে বড়দিন ও নববর্ষের উৎসবে বিশেষ হৈ চৈ হয় না, সাহেব-মেমেরা হইলি খাইয়া একটু বেশী নাচানাচি করে এই পর্য্যন্ত ।

এ কয়দিনে নূতন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই । মালতী দেবীর রোগ ভালর দিকেই আসিতেছিল ; কিন্তু তিনি একটু সংবিৎ পাইয়া দেখিলেন ঘরে যুবতী নাস রহিয়াছে । অমনি তাঁহার ষষ্ঠ রিপু প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি গালাগালি দিয়া নাসকে তাড়াইয়া দিলেন । ফলে অবস্থা আবার বায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে, অধ্যাপক সোম একা-হিম-সিম খাইতেছেন ।

শনিবার ৩০শে ডিসেম্বর সকালবেলা ব্যোমকেশ বলিল, ‘চল আজ একটু রোঁদে বেরুনো যাক ।’

রিক্সা চড়িয়া বাহির হইলাম ।

প্রথমে উপস্থিত হইলাম নকুলেশ বাবুর ফটোগ্রাফির দোকানে । নীচে দোকান, উপর তলায় নকুলেশ বাবুর বাসস্থান । তিনি উপরে ছিলেন, আমাদের দেখিয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন । মনে হইল তিনি বাধা-ছাঁদা করিতেছিলেন ; কাষ্ঠ হাসিয়া বলিলেন, ‘আমুন—ছবি তোলাবেন নাকি ?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘এখন নয় । এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনার দোকানটা দেখে যাই ।’

নকুলেশ বাবু বলিলেন, ‘বেশ বেশ । আমি কিন্তু ভাল ছবি তুলি । এখানকার কেষ্ট-বিষ্ট সকলেই আমাকে দিয়ে ছবি তুলিয়েছেন । এই দেখুন না ।’

ঘরের দৈয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙানো রহিয়াছে ; তন্মধ্যে চেনা লোক মহীধর বাবু এবং অধ্যাপক সোম । ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, ‘বাঃ, বেশ ছবি । আপনি দেখছি একজন সত্যিকারের শিল্পী ।’

নকুলেশ বাবু খুশী হইয়া বলিলেন, ‘হেঁ হেঁ । ওরে লালু, পাশের দোকান থেকে দু’ পেয়লা চা নিয়ে আয় ।’

‘চায়ের দরকার নেই, আমরা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি । আপনি কোথাও যাবেন মনে হচ্ছে ।’

নকুলেশ বাবু বলিলেন, ‘হ্যাঁ, দু’ দিনের জন্তে একবার কলকাতা যাব । বৌ-ছেলে কলকাতায় আছে, তাদের আনতে যাচ্ছি ।’

‘আচ্ছা, আপনি গোছাগাছ করুন ।’

রিক্সাতে চড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘ষ্টেশন চল ।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘ব্যাপার কি ? সবাই জোট বেঁধে কলকাতা যাচ্ছে ।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘এই সময় কলকাতার একটা নিদারুণ আকর্ষণ আছে ।’

‘রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম । ব্রাঞ্চ লাইনের প্রান্তীয় ষ্টেশন, বেশী বড় নয় । এখান হইতে বড় জংসন প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে, সেখানে নামিয়া যেন লাইনের গাড়ী ধরিতে হয় । রেল ছাড়া জংসনে যাইবার মোটর-রাস্তাও আছে ; সাহেব-সুবা এবং বাহাদুর মোটর আছে তাহারা সেই পথে যায় ।’

ব্যোমকেশ কিন্তু ষ্টেশনে নামিল না, রিক্সাওয়ালাকে ইসারা করিতেই সে গাড়ী ঘুরাইয়া বাহিরে লইয়া চলিল । জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কি হ’ল, নামলে না ?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘তুমি বোধ হয় লক্ষ্য কর নি, টিকিট-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার ঘটক টিকিট কিনছিল ।’

‘তাই নাকি ?’ আমি ব্যোমকেশকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে যেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভান করিয়া উত্তর দিল না ।

বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বড় মণিহারীর দোকানটার সামনে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম । ব্যোমকেশ রিক্সা থামাইয়া নামিল, আমিও নামিলাম । জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আবার কি মংলব ? আরও এসেল চাই নাকি ?’

সে হাসিয়া বলিল, ‘আরে না না—’

‘তবে কি কেশটেল ? তরল আলতা ?’

‘এসই না ।’

দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ডেপুটি উদ্যনাথ বাবু রহিয়াছেন ; তিনি একটা চামড়ার স্টুটকেস কিনিতেছেন । আমার মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, ‘আপনিও কি কলকাতা যাচ্ছেন নাকি ?’

উদ্যনাথ বাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, ‘আমি ! নাঃ ! আমি ট্রেজারি অফিসার, আমার কি ষ্টেশন ছাড়বার জো আছে ? কে বললে আমি কলকাতা যাচ্ছি ?’ তাঁহার স্বর কড়া হইয়া উঠিল ।

ব্যোমকেশ সাস্তুনার স্বরে বলিল, ‘কেউ বলে নি । আপনি স্টুটকেস কিনছেন দেখে অজিত ভেবেছিল—। যাক, আপনার পরী পেয়েছেন ত ?’

‘হ্যাঁ, পেয়েছি ।’ উদ্যনাথ বাবু অসন্তুষ্ট ভাবে মুখ কিরাইয়া লইয়া দোকানদারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন ।

আমরা ফিরিয়া গিয়া রিক্সাতে চড়িলাম । বলিলাম, ‘কি হ’ল হজুর হঠাৎ চটলেন কেন ?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘কি জানি । গুরু হয়ত মনে মনে কলকাতা যাবার ইচ্ছে, কিন্তু কর্তব্যের দায়ে ষ্টেশন ছাড়তে পারছেন না তাই মেজাজ গরম । কিংবা—’

রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, ‘আভি কিধু বানা হায় ?’

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডি-এস-পি পাণ্ডে সাহেব।'

পাণ্ডে সাহেবের বাড়ীতেই অ'পিস! আমাদের স্বাগত করিলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সব ঠিক?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সব ঠিক।'

'ট্রেন কখন?'

'রাত্রি সাড়ে দশটায়। সওয়া এগারটায় জংসন পৌছবে।'

'কলকাতার ট্রেন কখন?'

'পৌনে বারটায়।'

'আর পশ্চিমের মেল?'

'এগারটা পর্য্যন্ত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ। তা হলে ওবেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় আমি মহীধর বাবুর বাড়ীতে যাব। আপনি সাড়ে পাঁচটার সময় যাবেন। মহীধর বাবু যদি আমার অল্পরোধ না রাখেন, পুলিশের অল্পরোধ নিশ্চয় অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।'

গভীর হাসিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'আমারও তাই বিশ্বাস।'

ইহাদের টেলিগ্রাফে কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই; জানি প্রশ্ন করিলেই ব্যোমকেশ জিত্ কাটিয়া বলিবে—পুলিশের গুপ্তকথা।

পাণ্ডের আপিস হইতে ব্যাঞ্চে গেলাম। কিছু টাকা বাহির করিবার ছিল।

ব্যাঞ্চে খুব ভিড়; আগামী দুই দিন বন্ধ থাকিবে। তবু ক্ষণেকের জন্ত অমরেশ বাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি বলিলেন, 'এই বেলা যা দরকার টাকা বার করে নি। কাল পরশু ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কিরছেন কবে?'

'পরশু রাত্রেই ফিরব।'

কাজের সময়, একজন কেরানী তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা টাকা বাহির করিয়া ফিরিতেছি দেখিলাম ডাক্তার ঘটক ব্যাঞ্চে প্রবেশ করিল। সে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু যেন দেখিতে পায় নাই এমনি ভাবে গিয়া একটা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ আমার দিকে চাহিয়া সহাস্য চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিল। তারপর রিক্সাতে চড়িয়া বসিয়া বলিল, 'ঘু চলে।'

১১

অপরাত্ন পাঁচটার সময় আমি আর ব্যোমকেশ মহীধর বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি বসিবার ঘরে ছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে। মুখের ফুটি-কাটা হাসিটি ত্রিযমাণ, চালতার মতন গাল দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

বলিলেন, 'আস্থন আস্থন। অনেক দিন বাঁচবেন, ব্যোমকেশ বাবু, এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম। শরীর বেশ সেয়ে উঠেছে দেখছি। বাঃ বেশ বেশ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনার শরীর তো ভাল দেখছি না।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'হয়েছিল একটু শরীর খারাপ—এখন ভালই। কিন্তু একটা বড় ভাবনার কারণ হয়েছে ব্যোমকেশবাবু।'

'কি হয়েছে?'

'রজনী কাল রাত্রে কলকাতা চলে গেছে।'

'সে কি? একলা গেছেন? আপনাকে না বলে?'

'না না, সে সব কিছু নয়। বাড়ীর পুত্রানো চাকর রামদীনকে তার সঙ্গে দিয়েছি।'

'তবে ভাবনাটা কিসের?'

মহীধরবাবুর মনে ছলচাতুরী নাই। তিনি সোজাসজি বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'গুহুন বলি তা হলে। কলকাতায় রজনীর এক মাসী থাকেন, তিনিই ওকে মাছুষ করেছেন। কাল বিকেলে ওর মেসোর এক 'ভার' এল। তিনি রজনীকে ডেকে পাঠিয়েছেন—মাসীর ভারি অসুখ। রজনীকে রাত্তিরের গাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। ও এমন প্রায়ই যাতায়াত করে, পাঁচ ছয় ঘণ্টার রাস্তা বৈ তো নয়। রজনী আজ সকালে কলকাতায় পৌছে গেছে, 'ভার' পেয়েছি।

'এ পর্য্যন্ত কোনও গোলমাল নেই। তারপর গুহুন। আজ সকালে দুখানা চিঠি পেলাম; তার মধ্যে একখানা রজনীর মাসীর হাতের লেখা—কালকের তারিখ। তিনি নিতান্ত মামুলি চিঠি লিখেছেন, অসুখ-বিস্ময়ের কোনও কথাই নেই।'

মহীধরবাবু শঙ্কিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন। ব্যোমকেশ বলিলেন, 'এমনও তো হতে পারে চিঠি লেখবার পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'তা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু ওহু চিঠিখানার কথা এখনও বলি নি। বেনামী চিঠি। এই পড়ে দেখুন।'

তিনি একটি খাম ব্যোমকেশকে দিলেন। খামের উপর ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া বোঝা যায় এই শহরেই ডাকে দেওয়া হইয়াছে। ব্যোমকেশ চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। শাদা এক তক্তা কাগজের উপর মাত্র কয়েকটি কথা লেখা ছিল—

আপনার চোখের আড়ালে একজন ভদ্রবেশী দুষ্ট লোক আপনার কণ্ঠার সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছে। ইহারা যদি ইলোপ করে, কেলঙ্কারীর একশেষ হইবে। সাবধান! ডাক্তার ঘটককে বিশ্বাস করিবেন না।

ব্যোমকেশ চিঠি পড়িয়া ফেরত দিল। মহীধরবাবু কম্পিত স্বরে বলিলেন, 'কে লিখেছে জানি না। কিন্তু এ যদি সত্যি হয়—'

ব্যোমকেশ শাস্তস্বরে বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে আপনি জানেন। সে এমন কাজ করবে বলে আপনার মনে হয়?'

মহীধরবাবু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'ডাক্তারকে তো ভাল ছেলে বলেই জানি; যখন তখন আসে আমার বাড়ীতে। তবে পরচিত্ত অন্ধকার। আচ্ছা, সে কি আছে এখানে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে। আজ সকালেই ওকে দেখেছি।'

মহীধরবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আছে? যাক তা হলে বোধ হয় কেউ মিথ্যে বেনামী চিঠি দিয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার কিন্তু আজ রাত্রে কলকাতা যাচ্ছে।'

মহীধরবাবু আবার ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'অ্যা—যাচ্ছে! তবে—?'

ব্যোমকেশ দৃঢ় স্বরে বলিল, 'মহীধরবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও কেলেকারী হবে না। আপনি মিথ্যে ভয় করছেন।'

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'সত্যি বলছেন? কিন্তু আপনি কি কর জানলেন—আপনি তো—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি অনেক কথা জানি যা আপনি জানেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি না। রজনী দেবী দু'দিন পরেই ফিরে আসবেন। তিনি এমন কোনও কাজ করবেন না যাতে আপনার মাথা হেঁট হয়।'

মহীধরবাবু গদগদ স্বরে বলিলেন, 'বাস, তা হলেই হ'ল। ধন্যবাদ ব্যোমকেশবাবু। আপনার কথায় যে কত দূর নিশ্চিন্ত হলাম তা বলতে পারি না। বুড়ো হয়েছি—ভগবান একবার দাগা দিয়েছেন—তাই একটুতেই ভয় হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকথা ভুলে যান। আমি এসেছি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে।'

মহীধরবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'বলুন বলুন।'

'আপনার মোটরখানা আজ রাত্রে একবার দিতে হবে। জংসনে যাব। একটু জরুরি কাজ আছে।'

'এ আর বেশী কথা কি? কখন চাই বলুন?'

'রাত্রি নটার সময়।'

'বেশ, ঠিক নটার সময় আমার গাড়ী আপনার বাড়ীর সামনে হাজির থাকবে। আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

এই সময় পাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া চা ও প্রচুর জলখাবার ধ্বংস করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

ঠিক নটার সময় মহীধরবাবুর আট সিলিগুর গাড়ী আমাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া থামিল। আমি ব্যোমকেশ ও পাণ্ডে সাহেব তাহাতে চাপিয়া বসিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। একটি কালো রঙের পুলিশ ভ্যান আগে হইতেই দাঁড়াইয়া ছিল, সেটি আমাদের পিছু লইল।

শহরের সীমানা অতিক্রম করিয়া আমাদের মোটর জংসনের দীর্ঘ গৃহহীন পথ ধরিল। দুই পাশে কেবল বড় বড় গাছ; আমাদের গাড়ী তাহার ভিতর আলোর স্তূপ রচনা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

পথে বেশী কথা হইল না। তিন জনে পাশাপাশি বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট টানিয়া চলিয়াছি। একবার ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার আসামী ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনবে।'

'হাঁ। আমারও তাই মনে হয়। যে ক্লাসেই উঠুক, ইন্সপেক্টর হবে পাশের কামরায় থাকবে।'

'পুলিস মহলে আসল কথা কে কে জানে?'

'আমি আর হবে। পাছে আগে থাকতে বেশী হৈ চৈ হয় তাই চুপিসারে মহীধরবাবুর গাড়ী নিতে হ'ল। পিছনের ভানে যারা আছে তারাও জানে না কি জন্তে কোথায় যাচ্ছি। পুলিশের থানা থেকে যত কথা বেরায় এত আর কোথাও থেকে নয়। ঘূষখোর পুলিশ তো আছেই। তা ছাড়া পুলিশের পেটে কথা থাকে না।'

পুরন্দর পাণ্ডে নির্মলচরিত্র পুরুষ, তাই স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি সত্যবাদী।

দশটার সময় জংসনে পৌঁছিলাম। লাল সবুজ অসংখ্য আকাশ-প্রদীপে স্টেশন ঝলমল করিতেছে।

পুলিস ভানে দুই জন সব-ইন্সপেক্টর ও কয়েকটি কনেষ্টবল ছিল। পাণ্ডে তাহাদের স্টেশনের ভিতরে বাহিরে নানা স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন; তারপর স্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন, 'আমার একটা 'লগ' আসবার কথা আছে। এলেই খবর দেবেন। আমরা ওয়েটিং রুমে আছি।'

আমরা তিন জনে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়া বসিলাম। পাণ্ডে ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখিতে লাগিলেন।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় স্টেশন মাষ্টার খবর দিলেন, 'লগ এসেছে। সব ভাল। ফার্স্ট ক্লাস।'

এখনও পয়তাল্লিশ মিনিট।

কিন্তু পয়তাল্লিশ মিনিট সময় যত দীর্ঘই হোক, প্রাকৃতিক নিয়মে শেষ হইতে বাধ্য। গাড়ী আসার ঘণ্টা বাজিল। আমরা প্ল্যাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের সকলের গায়ে ওভারকোট এবং মাথায় পশমের টুপি, স্ততরাং সহসা দেখিয়া কেহ যে চিনিয়া ফেলিবে—সে সম্ভাবনা নাই।

তারপর বহুপ্রতীক্ষিত গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

পাণ্ডে সাহেব নাটকের রঙ্গমঞ্চ ভালই নির্বাচন করিয়াছিলেন, আয়োজনেরও কিছু ত্রুটি রাখেন নাই; কিন্তু তবু নাটক জমিতে পাইল না, পটোভোলনের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িয়া গেল।

গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কামরা যেখানে থামে আমরা সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। ঠিক আমাদের সামনে প্রথম শ্রেণীর কামরা দেখা গেল। জানালাগুলির কাঠের কবচ বন্ধ, তাই অভ্যন্তর-ভাগ দেখা গেল না। অন্ধকাল-মধ্যে দরজা খুলিয়া গেল। একজন কুলি ছুটিয়া গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দুইটি বড় বড় চামড়ার স্টুকেস নামাইয়া রাখিল।

কামরায় একটি মাত্র বাড়ী ছিলেন, তিনি এবার বাহির হইয়া আসিলেন। কোটপ্যাণ্ট-পর্য্যাপ্ত অপরিস্রব ভদ্রলোক, গৌফদাড়ি কামানো, চোখে ফিকা নীল চশমা। তিনি স্টুকেস দুটি কুলির মাথায় তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, পাণ্ডে এবং ব্যোমকেশ তাঁহার

হুই পাশে গিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ একটু দুঃখিত স্বরে বলিল, 'অমরেশবাবু, আপনার যাওয়া হ'ল না। ফিরে যেতে হবে।'

অমরেশবাবু! ব্যাক্সের ম্যানেজার অমরেশ রাহা! গোঁফদাড়ি কামানো মুখ দেখিয়া একেবারে চিনিতে পারি নাই।

অমরেশ রাহা একবার দক্ষিণে একবার বামে ঘাড় ফিরাইলেন, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া নিজের কপালে ঠেকাইয়া ঘোড়া টানিলেন। চড়াং করিয়া শব্দ হইল।

মুহূর্ত-মধ্যে অমরেশ রাহার ভূপতিত দেহ ঘিরিয়া লোক জমিয়া গেল। পাণ্ডে হুইসল বাজাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের বহু লোক আসিয়া স্থানটা ঘিরিয়া ফেলিল। পাণ্ডে কড়া স্বরে বলিলেন, 'ইন্সপেক্টর ছুবে, স্ট্রটকেস দুটো আপনার জিম্মায়।'

একজন লোক ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। চিনিলাম, ডাক্তার ঘটক। সে বলিল, 'কি হয়েছে? এক কে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'অমরেশ রাহা। দেখুন ভো বৈচে আছে কি না।'

ডাক্তার ঘটক নত হইয়া দেহ পরীক্ষা করিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'মারা গেছে।'

ভিড়ের ভিতর হইতে দস্তবাগসহযোগে একটা বিস্ময় কুতূহলী স্বর শোনা গেল, 'অমরেশ রাহা মারা গেছে—অ্যা! কি হয়েছিল তার দাড়ি কোথায়—অ্যা!—!'

ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার।

ডাক্তার ঘটক ও নকুলেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের গাড়ীও এসে পড়েছে। এখন বলবার সময় নেই, ফিরে এসে গুনবেন।'

১২

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা সাংঘাতিক ভুল করেছিলাম। অমরেশ রাহা ব্যাক্সের ম্যানেজার, তার যে পিস্তলের লাইসেন্স থাকতে পারে একথা মনেই আসে নি।'

সত্যবতী বলিল, 'না, গোড়া থেকে বল।'

২রা জানুয়ারী। কলিকাতার কিরিয়া চলিয়াছি। ডি-এস-পি পাণ্ডে, মহীধরবাবু ও রজনী ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এতক্ষণে আমরা নিশ্চিত মনে একত্র হইতে পারিয়াছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুটো জিনিষ জট পাকিয়ে গিয়েছিল—এক, ছবি চুরি; দ্বিতীয়, ডাক্তার আর রজনীর গুপ্ত প্রণয়। ওদের প্রণয় গুপ্ত হলেও তাতে নিষেধ কিছু ছিল না। ওরা কলকাতায় গিয়ে রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করেছে। সম্ভবতঃ রজনীর মাসী আর মেসো জানেন, আর কেউ জানে না; মহীধরবাবুও না। তিনি যতদিন রৈচে থাকবেন ততদিন কেউ জানবে না। মহীধরবাবু সেকলে লোক নয়, তবু বিবাহ-বিবাহ সম্বন্ধে সাবেক সংস্কার ভাগ করতে পারেন নি। তাই ওরা লুকিয়ে বিয়ে করে সব দিক রক্ষা করেছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খবরটা কি ডাক্তারের কাছে পেলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উঁহু। ডাক্তারকে ঘাঁটাই নি; ও যে রকম কণ্ঠে ছিল, কিছু বলতে গেলোই কামড়ে দিত। আমি রজনীকে আড়ালে বলেছিলাম, সব জানি। সে জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যোমকেশ বাবু, আমরা কি অন্য় করেছি? আমি বলেছিলাম—না। তোমরা যে বিদ্রোহের ঝোঁকে মহীধরবাবুকে দুঃখ দাও নি এতেই তোমাদের গোরব। উগ্র বিদ্রোহে বেশী কাজ হয় না, কেবল বিরুদ্ধ শক্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়। বিদ্রোহের সঙ্গে সহিষ্ণুতা চাই। তোমরা স্থখী হবে।'

সত্যবতী বলিল, 'তারপর বল।'

ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল, 'ছবিচুরির ব্যাপারটাকে যদি হান্কা ভাবে নাও তা হলে তার অনেক রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু যদি গুরুতর ব্যাপার মনে কর, তা হলে তার একটামাত্র ব্যাখ্যা হয়—ঐ গ্রুপের মধ্যে এমন একজন আছে যে নিজের চেহারা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চায়।

'কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?—একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে ওই দলে একজন দাগী আসামী আছে যে নিজের ছবির প্রচার চায় না। প্রস্তুত। কিন্তু টেকসই নয়। ঐ গ্রুপে যারা আছে তারা কেউ লুকিয়ে বেড়ায় না; তাদের সকলেই চেনে। স্তরং ছবি চুরি করার কোনও মানে হয় না।

'দাগী আসামীর সম্ভাবনা ভাগ করতে হচ্ছে। কিন্তু যদি ঐ দলে এমন কেউ থাকে যে ভবিষ্যতে দাগী আসামী হবার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছে, অর্থাৎ একটা গুরুতর অপরাধ করে কেটে পড়বার চেষ্টায় আছে, তা হলে সে নিজের ছবি লোপাট করার চেষ্টা করবে। অজিত, তুমি ত লেখক, শুধু ভাবার দ্বারা একটা লোকের এমন ছব্ব বর্ণনা দিতে পার যাতে তাকে দেখলেই চেনা যায়?—পারবে না; বিশেষতঃ তার চেহারা যদি মামুলি হয় তা হলে একেবারেই পারবে না। কিন্তু একটা ফটোগ্রাফ মুহূর্তমধ্যে তার চেহারাখানা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে। তাই দাগী আসামীদের ফটো পুলিশের ফাইলে রাখা থাকে।

'তা হলে পাওয়া গেল, ঐ দলের একজন একটা গুরুতর অপরাধ করে ডুব মারবার ফন্দি আঁটছে। এখন প্রশ্ন এই—সংকল্পিত অপরাধটা কি এবং লোকটা কে?

'গ্রুপের লোকগুলিকে একে একে ধরা যাক।—মহীধর বাবু ডুব মারবেন না; তাঁর বিপুল সম্পত্তি আছে, চেহারাখানাও ডুব মারবার অল্পকূল নয়। ডাক্তার ঘটক রজনীকে নিয়ে উধাও হতে পারে; কিন্তু রজনী সাবালিকা, তাকে নিয়ে পালানো আইন-ঘটিত অপরাধ নয়। তবে ছবি চুরি করতে যাবে কেন? অধ্যাপক সোমকেও বাদ দিতে পার। সোম যদি শিকল কেটে উড়বার সঙ্কল্প করতেন তা হলেও স্রেফ ঐ ছবিটা চুরি করার কোনও মানে হ'ত না। সোমের আরও ছবি আছে; নকুলেশ বাবুর ঘরে তাঁর ফটো টাঙানো আছে আমরা দেখেছি। তারপর ধর নকুলেশ বাবু; তিনি পিক-

নিকৈৰ দলে ছিলেন। তিনি মহীধৰ বাবুৰ কাছে মোটা টাকা ধাৰ কৰেছিলেন, স্ততৰাং তাঁৰ পক্ষে গা-টাকা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তিনি ফটো তুলেছিলেন, ফটোতে তাঁৰ চেহাৰা ছিল না। অতএব তাঁৰ পক্ষে ফটো চুৰি কৰতে যাওয়া নিৰর্থক।

‘বাকি রয়ে গেলেন ডেপুটি উমানাথ বাবু এবং ব্যাংক-ম্যানেজাৰ অমৰেশ ৰাহা। একজন সরকারী মালখানার মালিক, অল্পজন ব্যাংকৰ কৰ্মী। দেখা যাচ্ছে, ফেৰাৰ হয়ে যদি কালুৰ লাভ থাকে ত এঁদের দু’জনের। দু’জনের হাতেই বিস্তৰ পৰেৰ টাকা; দু’জনেই চিনিৰ বলদ।

‘প্ৰথমে উমানাথ বাবুকে ধৰ। তাঁৰ স্ত্ৰী-পুত্ৰ আছে; চেহাৰা-খানাত এমনি যে ফটো না থাকলেও তাঁকে সনাক্ত কৰা চলে। তিনি চোখে কালো-চশমা পৰেন, চশমা খুললে দেখা যায় তাঁৰ একটা চোখ কানা। বেষী দিন পুলিসেৰ সন্ধানী চক্ষু এড়িয়ে থাকা তাঁৰ পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া তাঁৰ চৰিত্ৰও এমনি একটা দুঃসাহসিক কাজ কৰাৰ প্ৰতিকূল।

‘বাকি ৰইলেন অমৰেশ ৰাহা। এটা অবশু নেতি প্ৰমাণ। কিন্তু তাৰপৰ তাঁকে ভাল কৰে লক্ষ্য কৰলে দেখবে তিনি ছাড়া আৰ কেউ হতে পাৰে না। তাঁৰ চেহাৰা নিতান্ত সাধাৰণ, তাঁৰ মত লক্ষ লক্ষ বৈশিষ্ট্যহীন লোক পৃথিবীতে ঘূৰে বেড়াচ্ছে। তিনি মুখে জ্বলকাট দাড়ি ৰেখেছেন। এ ৰকম দাড়ি ৰাখাৰ সুবিধা, দাড়ি কামিয়ে ফেলেলেই চেহাৰা বদলে যায়, তখন চেনা লোকেও আৰ চিনতে পাৰে না। নকল দাড়ি পৰাৰ চেয়ে তাই আসল দাড়ি কামিয়ে ফেলা ছদ্মবেশ হিচাবে ঢ়েৰ বেষী নিৰাপদ এবং নিৰ্ভৰযোগ্য।

‘অমৰেশ বাবু অবিবাহিত ছিলেন। তিনি মাইনে ভালই পেতেন, তবু তাঁৰ মনে দাৰিদ্ৰ্য্যেৰ ফোঁড় ছিল; টাকার প্ৰতি হৃদম আকাজ্জা জন্মোছিল। আমাৰ মনে হয় তিনি অনেকদিন ধৰে এই কু-মতলব আঁটছিলেন। তাঁৰ আলম্বাৰিতে গুজৰাটী বই দেখেছিলে মনে আছে? তিনি চেষ্টা কৰে গুজৰাটী ভাষা শিখেছিলেন; হয়ত সফল ছিল টাকা নিয়ে বোম্বাই অঞ্চল গিয়ে বসবেন। বাঙালী-দেৰ সঙ্গ গুজৰাটীদেৰ চেহাৰাৰ একটা ধাডুগত ঐক্য আছে, ভাষাটোও ৰপ্ত থাকলে কেউ তাঁকে সন্দেহ কৰতে পাৰবে না।

‘সব দিক ভেবে আঁটিঘাট বেঁধে তিনি তৈৰি হয়েছিলেন। তাৰপৰ যখন সফলকৈ কাজে পৰিণত কৰবাৰ সময় হ’ল তখন হঠাৎ কতকগুলো অপ্ৰত্যাশিত বাধা উপস্থিত হ’ল। পিক্নিকৈৰ দলে গিয়ে তাঁকে ছবি তোলাতে হ’ল। তিনি অনিচ্ছাভৱে ছবি তুলিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু না তোলালে লোকেৰ মনে সন্দেহ জাগতে পাৰে। ভাবলেন, ছবি চুৰি কৰে সামলে নেবেন।

‘যা হোক, তিনি মহীধৰ বাবুৰ বাড়ী থেকে ছবি চুৰি কৰলেন। পৰদিন চায়েৰ পাটিতে আমৰা উপস্থিত ছিলাম; সেখানে যেসব আলোচনা হ’ল তাতে অমৰেশ বাবু বুঝলেন তিনি একটা ভুল কৰেছেন। শ্ৰেফ ছবিখানা চুৰি কৰা ঠিক হয় নি। তাই পৰেৰ বাৰ যখন তিনি উমানাথ বাবুৰ বাড়ীতে চুৰি কৰতে গেলেন তখন আৰ

কিছু না পেয়ে পৰী চুৰি কৰে আনলেন। আলম্বাৰিতে চাবি ঢুকিয়ে এমনি একটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰলেন যাতে মনে হয় ছবি চুৰি কৰাটা চোৱেৰ মূল উদ্দেশ্য নয়। অধ্যাপক সোমৈৰ ছবিটা চুৰি কৰাৰ দৰকাৰ হয় নি। আমাৰ বিশ্বাস তিনি কোনও উপায়ে জানতে পেৰেছিলেন যে, মালতী দেবী ছবিটা আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিংবা এমনিও হতে পাৰে যে, তিনি ছবি চুৰি কৰতে গিয়েছিলেন কিন্তু ছবি তাৰ আগেই নষ্ট কৰা হয়েছিল। হয়ত তিনি ছেঁড়া ছবিৰ টুকৰোঙলো পেৰেছিলেন।

‘আমাৰ আবিৰ্ভাবে অমৰেশ বাবু শঙ্কিত হন নি। তাঁৰ মূল অপৰাধ তখনও ভবিষ্যতেৰ গৰ্ভে; তিনি টাকা নিয়ে উধাও হবাৰ পৰ সবাই জানতে পাৰবে, তখন আমি জানলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ফাল্গুনী পালেৰ প্ৰেতমুৰ্ত্তি যখন এসে দাঁড়াল, তখন অমৰেশ বাবু মাখায় হাত দিয়ে বসলেন। তাঁৰ সমস্ত গ্লান ভেসে যাবাৰ উপক্ৰম হ’ল। ফাল্গুনী থাকতে ফটো চুৰি কৰে কি লাভ? সে স্মৃতি থেকে ছবি এঁকে ফটোৰ অভাব পূৰণ কৰে দেবে।

‘কিন্তু পৰকীয়া-প্ৰীতিৰ মত বেআইনী কাজ কৰাৰ একটা তীব্ৰ উত্তেজনা আছে। অমৰেশ বাবু তাৰ স্বাদ পেৰেছিলেন। তিনি এতদূৰ এগিয়ে আৰ পেছুতে পাৰছিলেন না। তাই ফাল্গুনী যে দিন তাঁৰ ছবি এঁকে দেখাতে এল সেদিন তিনি ঠিক কৰলেন ফাল্গুনীৰ বেঁচে থাকা চলবে না। সেই ৰাত্ৰে তিনি মদেৰ বোতলে বেশ খানিকটা আকিম মিশিয়ে নিয়ে ফাল্গুনীৰ কুঁড়ে ঘৰে গেলেন। ফাল্গুনীকে নেশাৰ জিনিষ খাওয়ানো শক্ত হ’ল না। তাৰপৰ সে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ল তখন তাকে তুলে কুয়োৰ ফেলে দিলেন। আগৈৰ ৰাত্ৰে চুৰি কৰা পৰীটা তিনি সঙ্গ এনেছিলেন, সেটাও কুয়োৰ মধ্যে গেল; যাতে পুলিস ফাল্গুনীকেই চোৰ বলে মনে কৰে। এই ব্যাপাৰ ঘটেছিল সম্ভবতঃ ৰাতি এগাৰোটাৰ পৰ, যখন বাগানৰে অল্প কোণে আৰ একট মন্ত্ৰণাসভা শেষ হয়ে গেছে।

‘পোষ্ট মৰ্টেম ৰিপোৰ্ট থেকে মনে হয় ফাল্গুনী জলে পড়বাৰ আগেই মৰে গিয়েছিল। কিন্তু অমৰেশ বাবুৰ বোধ হয় ইচ্ছে ছিল সে বেঁচে থাকতে থাকতেই তাকে জলে ফেলে দেন, যাতে প্ৰমাণ হয় সে নেশাৰ বোঁকে অপৰাধ জলে ডুবে মৰেছে।

‘যাহোক অমৰেশ বাবু নিষ্কণ্টক হলেন। যে ছবিটা তিনি আমাদেৰ দেখিয়েছিলেন, ৰবুনা দেবাৰ আগে সেটা পুড়িয়ে ফেলেলেই নিশ্চিত, আৰ তাঁকে সনাক্ত কৰবাৰ কোনও চিহ্ন থাকবে না।

‘আমি যখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পাৰলাম, এ অমৰেশ বাবুৰ কাজ তখন পাণ্ডে সাহেবকে সব কথা বললাম। ভাৰি বুদ্ধিমান লোক, চট কৰে ব্যাপাৰ বুঝে নিলেন। সেই থেকে এক মিনিটেৰ জন্তেও অমৰেশ বাবু পুলিসেৰ চোখেৰ আড়াল হতে পাৰেন নি।’

ব্যোমকেশ সিগাৰেট ধৰাইল।

আমি বলিলাম, ‘আচ্ছা, অমৰেশ ৰাহা যে ঠিক ঐ দিনই পালাবে, এটা বুঝলে কি কৰে? অল্প যে-কোনও দিন পালাতে পাৰত।’

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা কোনও ছুটির আগে পালানোর সুবিধে আছে, দু'দিন সময় পাওয়া যায়। দু'দিন পরে ব্যাক্স খুললে যখন চুরি ধরা পড়বে, চোর তখন অনেক দূরে। অবশু বড়দিনের ছুটিতেও পালাতে পারত; কিন্তু তার দিক থেকে নববর্ষের ছুটিতেই পালানোর দরকার ছিল। অমরেশ রাহা যে ব্যাক্সের ম্যানেজার ছিল সেটা কলকাতার একটা বড় ব্যাক্সের ব্রাঞ্চ অফিস। প্রত্যেক মাসের শেষে এখানে হেড আপিস থেকে মোটা টাকা আসত; কারণ পরের মাসের আরম্ভেই ব্যাক্সের টাকায় টান পড়বে। সাধারণ লোক ছাড়াও এখানে কয়েকটা খনি আছে, তাতে অনেক কর্মী কাজ করে, মাসের পয়লা তাদের মাইনে দিতে হয়। এবার সেই মোটা টাকাটা ব্যাক্সে এসেছিল বড়দিনের ছুটির পর। বড়দিনের ছুটির আগে পালালে অমরেশ রাহা বেশী টাকা নিয়ে যেতে পারত না। তার ছুটি স্টকেস থেকে এক লাখ আশী হাজার টাকার নোট পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ লম্বা হইয়া ওইল, বলিল, 'আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

'দাড়ি কামালে কখন? ট্রেনে?'

'হ্যাঁ। সেইজন্তেই ফাষ্ট ক্লাস টিকিট কিনেছিল। ফাষ্ট ক্লাসে সহযাত্রীর সম্ভাবনা কম।'

'সত্যবতী বলিল, 'মহীধর বাবুকে বেনামী চিঠি কে দিয়েছিল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রফেসার সোম। কিন্তু বেচারার প্রতি অবিচার কোরো না। লোকটি শিক্ষিত এবং সজ্জন, এক ভয়ঙ্করী স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে তাঁর জীবনটা নষ্ট হতে বসেছে। সোম সংসারের জ্বালায় অভিষ্ট হয়ে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিকেও কিছু হ'ল না, ডাক্তার ঘটকের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হেরে গেলেন। তাই ঈর্ষার জ্বালায়—। ঈর্ষার মতন এমন নীচ প্রবৃত্তি আর নেই। কাম ক্রোধ লোভ—ষড়রিপুর মধ্যে সব চেয়ে অধম হচ্ছে মাংসর্ঘ্য।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মালতী দেবীর অসুখের খুবই বাড়িবাড়ি যাচ্ছে। কাকুর মৃত্যু-কামনা করতে নেই, কিন্তু মালতী দেবী যদি সিঁথেয় সিঁথুর নিয়ে এই বেলা স্বর্গারোহণ করেন তা হলে অন্ততঃ আমি অসুখী হব না।'

আমিও মনে মনে সায় দিলাম।

সমাপ্ত

গানের জাগরণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আকাশ নীল, শ্রামল ধরা, আলোকে ব'রে সোনা,
সে গান আমি গাহিব না-কি স্বপ্নে যাহা বোনা?
সে-সব কথা থাকুক আজি, শারদ দিবা কয়,
শ্রামল গীতি, সুনীল গীতি, সোনালী গান নয়।

উতল চাঁদ বুকের সুধা রাখিতে নারে ধরি,
আত্মহারা—উৎসারিয়া জ্যোৎস্না পড়ে বরি।
ধরিব কি-সে সুরের ধারা? শারদ রাত্তি কয়,
অপক্লপের রূপ-জাগানো রূপালী গান নয়।

শুভ্র মেঘ, খণ্ড মেঘ—বাঁধন-ছেঁড়া তরী,
লক্ষ্যহারা ভাসিয়া চলে দূরের পথ ধরি'।
উর্দ্ধ হ'তে অসীম নীল ইমারা করি' কয়,
দূরের গান, সুরের গান, ভাসার গান নয়।

শ্রোতস্বিনী বহিয়া চলে কলধ্বনি তুলি,
ও-কথা শুধু কহিতে গিয়ে এ-কথা যায় ভুলি।
কি-কথা যেন বলিবে বলি' তরল সুরে কয়,
যে-সব কথা হয়েছে বলা সে-সব কথা নয়।

ব্যাকুল বায়ু বনের পথে কেবাল মরে ঘুরি,
ব'রায়ে পাতা, দোলায়ে শাখা, ফুটায় যায় কুঁড়ি।
বহিয়া যেতে সহসা খামি চপল সুরে কয়,
বনের গান, ফুলের গান, ভুলের গান নয়।

আবেশ-ভরা নয়নে কেন চাহিছ অকারণ,
মধুর সেই স্মরণ 'পরে পড়ুক আবরণ।
সবার সুখ-দুঃখ মাঝে প্রাণের পরিচয়,
তোমার গীতি, আমার গীতি—একার গীতি নয়।

মানব কুরে যেথায় চির বেদন-নিবেদন,
সেথায় জানি জীবন-মাবো গানের জাগরণ।
অপূর্ব সে সুরের ধ্বনি হৃদয় ভরি রয়,
করণ গীতি, কোমল গীতি, বিলোল গীতি নয়।

ভুমি ও আমি ছিলাম একা,—সেদিন অবসান,
বিশ্বপ্রাণে বাজিছে আজি রক্তরাঙা গান।
স্বপ্নভাঙা সুরের ভাষা কবিরে ডেকে কয়,
সবুজ গীতি, সুনীল গীতি, সোনালী গান নয়।

শারদীয়া

শ্রীরঘুনি ভট্টাচার্য্য, এম-এ

ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য যুগে যুগে নব নব কবির চিত্রে নূতন নূতন সৌন্দর্য্যে রূপায়িত হয়েছে। আদিকবি বাম্বীকি থেকে শুরু করে ব্যাসদেব ও পরবর্তীকালে কালিদাস, ভারবি, ভট্টহরি, মাঘ প্রভৃতি কবিরা কেউ বা অংশতঃ কেউবা পূর্ণাঙ্গভাবে এই ঋতুচক্রের বর্ণনায় স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের বর্ণনাই প্রকাশভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ। অনুপম শোভা-সৌন্দর্য্যের আকর শরৎ সুদূর অতীতকাল থেকেই এই সব কবির চোখে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ধরা দিয়েছে।

কবিকুলের মধ্যে বাম্বীকি ও ভট্টহরি শরদাগমে 'স্থলে, জলে আর গগনে গগনে' প্রকৃতির সর্বত্র—প্রকীর্ণ সৌন্দর্য্যকেই বড় করে দেখেছেন। তাই আদিকবির বর্ণনায় দেখতে পাই—পুষ্পভারাবনত সপ্তপর্ণে, নির্মেষ আকাশে, সূর্য্য-চন্দ্র-তারকার দীপ্তিতে ও মদমত্ত মাতঙ্গের লীলায়িত গতিতে শরৎ এক অভূতপূর্ব্ব শ্রীর সঞ্চার করেছে—

শাখাস্থ সপ্তচ্ছদপাদপানং প্রভাস্থ তারার্কনিশাকরাগাম্।

লীলাসু চৈবোত্তমবারণানাং শ্রিয়ং বিভজ্যাচ্চ শরৎ প্রবৃত্তা।

রামা-কিকি ৩০।২৮

অরুণ কিরণে রঞ্জিত কমল যেন উন্মীলিত নয়নে শরৎকে দেখছে, তাতে শরতের শ্রী হয়েছে আরও বদ্ধিত—

সূর্য্যগ্রহস্তপ্রতিবোধিতেষু পদ্মাকরেদ্যভ্যধিকং বিভাতি।

রামা-কিকি ৩০।২৯

শরৎ গো-কূলে এনে দিয়েছে মত্ততা ও নদীসমূহে স্বচ্ছতা। শরতের-শোভাবর্ধনে এরাও যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে কবিগুরু বাম্বীকি সে কথাও যেন প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন :

গবাং সমূহেষু চ দর্পিতেষু

প্রসন্নতোয়াসু চ নিম্নগাম্

বিভাতি লক্ষ্মীর্বহুধা বিভক্তা ॥ রামা-কিকি ৩০।৩২

রামায়ণে শরতের এই বহুধাপ্রকট সৌন্দর্য্য সীতাবিরহী রামচন্দ্রের বিরহাতনাকে যেন তীব্রতর করে তুলেছে। তিনি অনুজ লক্ষ্মণকে সন্বেদন করে বলছেন :

“প্রিয়া বিহীনে হৃৎখণ্ডে হৃতরাজ্যে বিবাসিতে।

কৃপাং ন কুরুতে রাজা স্ত্রীীবো ময়ি লক্ষণ ॥”

রামা-কিকি ৩০।৬৬

“হে লক্ষণ! আমি সীতার বিরহে বিধুর—বিমাতা কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বনে নির্বাসিত। আমার এ অবস্থা দেখেও স্ত্রী বানররাজের চিৎ দয়ার উদ্বেগ হচ্ছে না।”

রামচন্দ্রের অনুগ্রহে রাজ্যলাভ করে স্ত্রীীব ভোগৈশ্বর্য্যে মগ্ন। বিরহ-সন্তাপ যে কি তা তার অজ্ঞাত। কাজেই অশ্রুর ব্যথায় সে ব্যথিত হবে কেন? স্ত্রীীবের সহানুভূতি-হীনতা রামচন্দ্রের এই উক্তিতে করুণ সুরে ধ্বনিত হয়েছে।

ভট্টিকাব্যে দেখতে পাই শরতের সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হয়েছে একাধারে বনস্পতিতে, সরোবরে, নদীতে, জ্যোতিষ্ক-সমূহে, প্রাণিনিচয়ে ও দিগ্ভিভাগে :

বনস্পতীনাং সরসাং নদীনাং তেজস্বিনাং কাঙ্ক্ষিতাং দিশাঞ্চ।

নিধায় তত্শাঃ স পুরঃ সমস্তাচ্ছিন্নং দধানাং শরৎ দদর্শ ॥ ভট্ট ২।১

তপোবিষকারী রক্ষঃকুলের বধার্থে রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ-সহ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করছেন। শারদাগমে প্রকৃতির এই নিরুপম শ্রী অযোধ্যা থেকে সত্তোয়ানিক্ষান্ত রামচন্দ্রকে বিমুগ্ধ করেছে।

কালিদাস, ভারবি ও মাঘ কিন্তু এই প্রবিভক্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরালে এক অখণ্ড সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন— সে সত্তা হচ্ছে শারদলক্ষ্মী। কালিদাস শরতের আগমনে গুনতে পেয়েছেন নববধূর সলজ্জ অভিষারের নূপুর-নিকণ। কাশকুসুম পেয়েছে তার শুভ্র বসনের রূপ, ফুলকমল পেয়েছে তার মুখ-পঙ্কজের শ্রী, আর কেলিমত্ত মরালকুলের কর্ণধ্বনি যেন তার নূপুরের ধ্বনি অনুকরণ করেই হয়েছে মধুর। পকপ্রায় শালিধাত্তের রূপে কল্লিত হয়েছে তার মনোহর দেহ-যষ্টির রূপ :

কাশাংগুকা বিকচপদমনোজ্জবজ্জা সোম্মাদহংসনূপুরনাদরম্যা।

আপকশালিকচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা ॥

ঋতুসংহার ১।১

আবার, এই-লজ্জামুকুলিতাক্ষী মুগ্ধা নববধূ ক্রমে পেয়েছে যৌবনরসে উচ্ছল কামিনীর রূপ। নীলোৎপল যেন তার দৃষ্টি চুরি করেই হয়েছে সুন্দরতর, আর তার গুচিহাস্তে মণ্ডিত কুমুদ হয়েছে শুভ্রতর।

বিকচকমলবক্তা ফুলনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশখেতবাসো বসানা।
কুমুদকচিরহাসা কামিনীবোম্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরৎশেতসঃ

প্রীতিমধ্যম ॥ ঋতু ২৬

রঘুবংশে চতুর্থ সর্গে দেখি মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় যাত্রা-কালে শরৎ কল্যাণবিধায়িনী রাজলক্ষ্মীরূপে ব্যগ্র হয়ে এসেছে তার উপচারসম্ভার নিয়ে যাত্রারস্তুর মাস্তুলিক অনুষ্ঠানের জন্তে—

পার্ব্ববজ্রীর্ধ্বীতীয়েব শরৎপঙ্কজলক্ষণা। রঘু ৪।১৪

কবি মাঘের বর্ণনায় শরৎ পেয়েছে নৃপতির অঙ্কশায়িনী

মহিবীর রূপ। বিহাবেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন রৈবতক পর্বতের অভিমুখে। ছয় ঋতু এসেছে পুষ্পের পসরা সাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করার জন্তে। পর্যায়ক্রমে শরৎও এসেছে। বায়ু-চালিত শুভ্র মেঘপুঞ্জ আকাশের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সে দৃশ্য দেখে শ্রীকৃষ্ণের মনে হ'ল যেন শরৎ-রাণীর শুভ্রবসন অনুরাগে স্থলিত হচ্ছে।

স বিকচোৎপলচক্ষুর্নৈক্ষত দ্বিতীভূতোহঙ্কগতাং দয়িতামিব।

শরদমচ্ছগলবসনোপমাংক্ষমজ্ঞানামজ্ঞানশীতনঃ ॥ শিশু-৬।৪২

কিরাতাজ্জুনীয়তে দেখতে পাই শরদাগমে স্থলভূমি পেয়েছে প্রিয়ার যৌবনলাবণ্য। অর্জুন পাণ্ডপত অস্ত্রলাভের জন্তে তপস্বী করতে চলেছেন হিমশৈলে। পাণ্ডুতাণ্ডণ-বিশিষ্টা প্রাপ্তযৌবনা, হস্তমুখরা, কলভাবিণী প্রিয়া-যেমন মেখলাকিঙ্কণীতে সূচকিত করে সখীগণের সমীপে আগমন-পূর্বক তাদের আনন্দবর্ধন করে, শরতের আবির্ভাব তেমনি লোকালয়ে করেছে অভূতপূর্ব সৌন্দর্যের সঞ্চার। শ্রেণীবদ্ধ কলনাদী মরালকুল হয়েছে স্থলভূমির মেখলাস্বরূপ, পঙ্ক শস্য রচনা করেছে তার পাণ্ডুতাণ্ডণ। শরতের এই অল্পম রূপ অর্জুনের নয়ন-মন হরণ করেছে।

ততঃ স কুজংকলহংসমেবলাং সপাক্ষস্থাহিতপাণ্ডুতাণ্ডণাম্।

উপাসাদোপজনজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ামিবাসাদিত্যৌবনশ্রীঃ ॥

কিরাত-৪।২

এও সেই 'অঙ্গে অঙ্গে' যৌবনতরঙ্গোচ্ছল শরতের পরিপূর্ণ লাবণ্যের রূপ। শরতের আবির্ভাবে প্রকৃতির ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য্যও পূর্বোক্ত কবিদের বর্ণনায় সুন্দর-রূপেই ফুটে উঠেছে। সে বর্ণনাগুলিতে করিকুলের ভাবসাম্য অপেক্ষা ভাবের বৈচিত্র্যই সুপরিষ্কৃত। কোন কোন বিষয়ে উত্তরকালের কবিদের উপর পূর্ববর্তীদের কিছু কিছু প্রভাব পড়লেও তাঁদের নিজস্ব নিপুণ তুলিকাপাতে বর্ণিত বিষয়গুলি এরূপ অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, চিত্রগুলি স্বপ্রকাশেই ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

শরতের এই অল্পম শ্রীর বর্ণনাক্রমে দেখতে পাই আদিকবি সুনীল আকাশকে স্বচ্ছতায় সরোবরের উপমান রূপে কল্পনা করেছেন। হৃদের বক্ষে একটি হংস অচঞ্চল—মনে হয় যেন সুপ্ত। চতুর্দিকে অসংখ্য কুমুদ প্রস্ফুটিত। নির্মেঘ আকাশে অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে চন্দের সৌন্দর্য্যও যেন তোয়াধারের সৌন্দর্য্যের কাছে লীন হয়ে গেছে।

সুপ্তেকহংসং কুমুদৈকপেতং মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।

ঘর্নৈবিস্মৃক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রঃ তারাগণাকীর্ণমিবাস্তরীক্ষম্ ॥

রামা-কিঙ্কি ৩০।৪৮

'সুপ্তেকহংস' মহাহ্রদের এ রূপ অনবদ্য সৃষ্টি হিসাবে কাকে

না মুগ্ধ করে? মহাকবি কালিদাসের চোখেও আকাশ ও সরোবরের ঠিক এই চিত্রই ধরা পড়েছে, তবে তাঁর বর্ণনায় আকাশই হয়েছে উপমের আর সরোবর হয়েছে উপমান।

শুটকুমুদচিতানাং রাজহংসস্থিতানাং মরকতমণিভাসা বারিণা

ভূষিতানাম্।

শ্রিয়মতিশয়রূপং যোম তোয়াশরানং বহতি বিগতমেঘং

চন্দ্রতারাবকীর্ণম্ ॥ ঋতু-২১

চন্দ্রতারাকালোভিত মেঘমুক্ত আকাশ প্রস্ফুটিত কুমুদে পরিব্যাপ্ত, রাজহংসশোভিত মরকতমণির আয় সুনির্মল জলরাশিবিভূষিত জলাশয়সমূহের শোভা ধারণ করেছে।

শরতে আকাশের গাঢ় নীলিমা দেখে কবি কল্পনা করেছেন যেন সমস্ত আকাশে কে কজ্জল লেপন করে দিয়েছে।

ভিন্নাঙ্গনপ্রচয়কাস্তি নভো মনোজ্ঞম্। ঋতু ৫

যে সহজাত সৌন্দর্য্যের অধিকারী তার রূপ বাহ্যিক উপকরণের অপেক্ষা না করেই মানুষকে মুগ্ধ করে। তাই প্রতিগৃহগমনোত্ততা ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিতা সালঙ্কারা শকুন্তলার রূপও একবেণীধরা মলিনবসনা নিরাভরণা শকুন্তলার রূপের কাছে হার মেনেছে। শরতের নিরাভরণ আকাশের সৌন্দর্য্যও কবি ভারবির চিত্তকে করেছে বিমুগ্ধ। বর্ষাকালে উড্ডীয়মান বলাকাশ্রেনী ও ইন্দ্রধনু আকাশকে শোভাময় করে রেখেছিল। কিন্তু আজ তারা কোথায় যে বিলীন হয়ে গেছে তার কোনও নিদর্শন নেই। তবু আকাশের সৌন্দর্য্য যেন অধিকতর প্রতিভাত হচ্ছে।

পতন্তি নাস্মিন্ বিশদা পতত্রিণো ধুতেন্দ্রচাপা ন পয়োদপংক্তয়ঃ।

তথাপি পুষ্পাতি নভঃ শ্রিয়ম্পরায় ন রম্যমাহার্ষমপেক্ষতে গুণম্ ॥

কি ৪।২৩

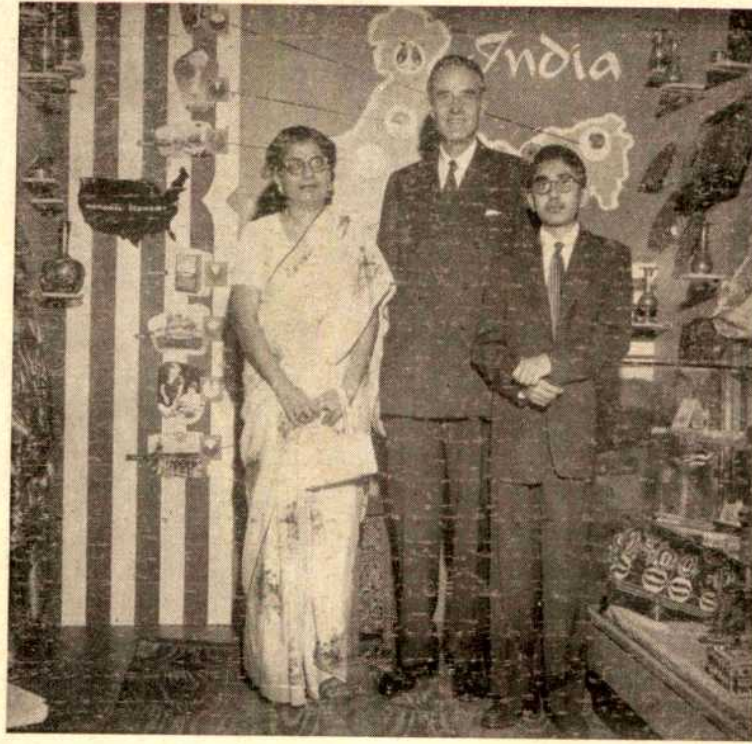
শরতে দিকসমূহের প্রসন্নতা বর্ণনা করতে গিয়ে বাস্কীকি একটি সুন্দর রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। অন্ধকার আছে বলেই তো আলোর মহিমা ফুটে উঠেছে। বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন দ্বিধিভাগ ছিল যেন অন্ধকারের মসীতে লিপ্ত। বর্ষাপগমে মেঘজাল অপসৃত হওয়ায় সূর্য্যের কিরণে দ্বিধধূদের রূপ যেন ঝলমল করে উঠেছে। আদিকবির বর্ণনায় অন্ধকার ও মেঘ অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

তমোবিমুক্তাশ্চ দিশঃ প্রকাশাঃ। রামা-কিঙ্কি ৩০।৩৬

কালিদাস দিকসমূহের প্রসন্নতা আরও মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন যে প্রায়ুট কালের অন্তর্দ্বানে জ্বলদজ্বল হয়েছে তিরোহিত। তাই দ্বিধিভাগসমূহ হয়েছে মনোহর।

বিগতজলদবৃন্দা দ্বিধিভাগা মনোজ্ঞাঃ। ঋতু ২২

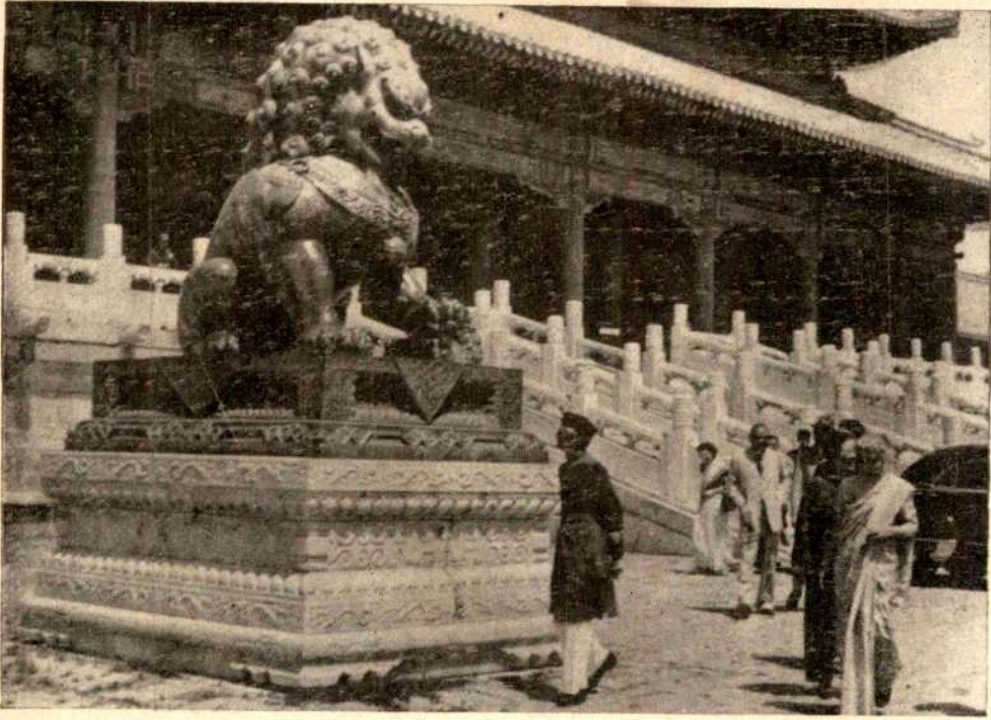
ভারবির দৃষ্টিতে শরতে দ্বিধধরা পেয়েছে এক অপরূপ



ওয়াশিংটনে বিশ্ববাণিজ্য প্রদর্শনীতে ভারতীয় প্যাভিলিয়নে ইউ. এস.
এড মিনিষ্ট্রেশনের ডাইরেক্টর মিঃ হ্যারিয়ামান



দান ব্রানসিঙ্কোতে বিশ্ববাণিজ্য মেলায় বোম্বাইয়ের কুমারী ডেরিকা ডিজ কর্তৃক



পিকিঙের 'সামার প্যালেস' পরিদর্শনরত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন



পিকিঙের 'লেবোরা প্যালেসে' ভারতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে চীনা বালক-বালিকা

রূপ। বর্ষার কদম্ব রেণু সম্প্রতি অনিল কলিত হয়েছে তাদের পতিরূপে। বর্ষাপগমে কদম্বানিল হয়েছে অন্তহিত। প্রোষিতভর্তৃকা দিগ্বৃদ্ধের মেঘরূপ পরোধরে বিদ্যারূপ হার শোভা পাচ্ছে না। বিরহবিধুরা হয়ে তারা আজ ক্ষীণকায়; তবুও তাদের সৌন্দর্য্য অনবদ্য।

বিপাণ্ডুভিন্নানতয়া পরোধরৈশ্চ্যুতাচিরাভাণ্ডগহেমদামভিঃ।

ইয়ং কদম্বানিলভর্তৃকভ্যয়েন দিগ্বৃদ্ধাং কুশতান রাজতে॥

কিরাতঃ ৪১২৪

শরতে জল ভাগের বর্ণনায় আদিকবি বলেছেন—কিন্দীকি প্রস্রবণ সকলেরই গতি হয়েছে মন্থর, তাদের ধ্বনি হয়েছে নীরব—

নদীঘনপ্রস্রবণোদকানামতিপ্রবৃদ্ধানিলবর্হিণানাম্।

প্রবঙ্গমানাক গতোৎসবানং ধ্রুবং রবাঃ সম্প্রতি সম্প্রনষ্টাঃ॥

রামা-কিঙ্কি ৩১৪৩

বাক্মিকি ও কালিদাস উভয়েই নদীর সঙ্গে কামিনীর অপরূপ রূপের তুলনা করেছেন। চঞ্চল মীনকুল যেন তাদের মেখলা—

মীনোপসন্দর্শিতমেখলানাং নদীবধুনাং গতয়োহন্ত মন্দাঃ।

রামা-কিঙ্কি ৩০১৩৪

মদমত্তা কামিনী শ্রোণিভারে হয় অলসগামিনী। তেমনি বিশাল পুলিনা যে তটিনী-বধূদের নিতম্ব গুরুভার আজ তারা ঐ গুরুভারেই হয়েছে মন্থরগামিনী। প্রান্তস্থিত যেত হংস শ্রেণী হয়েছে নদীবধূদের হার।

চক্ষ্মানোজ্ঞসফরীষসনাকলাপাঃ পর্যন্তসংস্থিতসিতাণ্ডজপাক্তিহারাঃ

নজো বিশালপুলিনাস্তনিতম্ববিধাঃ মন্দং প্রযাতি সমদাঃ প্রয়দা

ইবাচ্ছ॥ স্বকৃত-৩

যেমন সুবিশৃঙ্খল ভরণা বরাদ্দনা নায়কের মনকে মুগ্ধ করে তেমনি শরতে পদ্মিনীমণ্ডিত, কলহংসাকীর্ণ বাপীসমূহের সৌন্দর্য্য আদিকবিকে মুগ্ধ করেছে। হংসশ্রেণী হয়েছে যেন তাদের মেখলা, বিকসিত কমল ও কুমুদরাজি তাদের কণ্ঠ-হার।

প্রকীর্ণহংসাকুলমেখলানাং প্রবৃদ্ধপদ্মাংপলমালিনীনাম্।

বাপ্যন্তমানামধিকাক্ত লক্ষ্মীবরাদ্দনানামিব ভূষিতানাম্॥

রামা-কিঙ্কি ৩০১৪৯

কালিদাসের কবি দৃষ্টির নিকটে প্রতিভাত হ'ল, শরদাগমে সঞ্চারিত এক অভিনব ক্রী। মত্ত-হংসমিথুন, প্রস্ফুটিত কমল ও ইন্দীবর এবং প্রভাত সমীর হিল্লোলে চঞ্চল তরঙ্গমালা কবিচিহ্নকে উদ্দীপিত করেছে।

সোমাদহংসমিথুনৈরুপশোভিতানি স্বচ্ছানি কুলকমলোৎপলভূষিতানি॥

মন্দপ্রভাতবনোদগত বাচিমাল্যাত্মকঐশ্বর্য্যি সহসা ছন্দয়ং সরাংসি॥

ঋ-১২

কিরাতার্জুনীয়ে দেখি সরসী প্রিয়ার দৃষ্টি শোভা হরণ করেছে। সরসী আজ কমল-নয়ন উন্মীলিত করে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি দান করেছে। চঞ্চল শফরীকুলের বিবর্তন তার লোল অপাঙ্গের রূপ পেয়েছে। তাই তার দর্শনে প্রিয়ার মুখছবি কবির স্মৃতিপথে উদ্ভিত হচ্ছে।

নিরীক্ষ্যমাণা ইব বিস্ময়াকুলেঃ সরোভিক্ষ্মীলিতপদ্মলোচনৈঃ।

হৃত-প্রিয়াদৃষ্টি-বিলাস-বিভ্রম্য মনোহন্ত জহুঃ শফরীরিবৃত্তয়ঃ॥

কিরাতঃ ৪১৩

শরতের পুষ্পোদগমে স্থল ও জলভাগের সৌন্দর্য্য একটি সুন্দর উৎপ্রেক্ষামূলে বর্ণনা করেছেন কবি ভর্তৃহরি। কুসুম-নিকরে বনভূমি হয়েছে সমৃদ্ধ; প্রস্ফুটিত কমলবন সমস্ত জল-ভাগকে যেন আলো করে রেখেছে। তাতে চঞ্চল ভ্রমরকুল মধুপানে মত্ত। তাই দেখে কবির প্রীতিতে হচ্ছে যেন বন-লক্ষ্মী ও জললক্ষ্মী পরম প্রীতিতে বিমুগ্ধ হয়ে পরস্পরের সৌন্দর্য্য অবলোকন করছেন।

বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্লৈঃ পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ মিলীনভূজৈঃ।

পরস্পরাং বিষয়বন্তি লক্ষ্মীমালোকরাক্তকুরিবাদরেণ॥ ভটি ২১৫

এখানে স্থল ভাগে ও জল ভাগে শরৎ সৌন্দর্য্যের দুইটি পূর্ণাঙ্গ রূপ অনবদ্য ভাবে চিত্রিত হয়েছে।

শরতে পুষ্প সমৃদ্ধির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিরা সকলেই কমল কুমুদকে শরৎ শোভার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে স্বীকার করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন রূপকের সাহায্যে এদের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন। আদিকবির বর্ণনায় প্রভাতের সূর্য্যকরে প্রস্ফুটিত কমলের অপরূপ প্রীতে শরৎ শোভা সার্থক রূপে ফুটে উঠেছে। রাত্রিকালে চন্দ্র-করমাত কুমুদরাজি নক্ষত্রনিচয়ের সৌন্দর্য্যকেও পরাস্ত করেছে।

প্রিয়সমাগমে নায়িকার মুখকমলে এক অভূতপূর্ব আনন্দ ফুটে উঠে। আর প্রিয়ের প্রবাস গমনে তাদের মুখ-ছবি হয় করুণ, বিষাদপাগুর।

দিবসকরমুখৈর্বোধমানং প্রভাতে বরযুবতি-মুখাভং পক্ষজং

জতুতেহন্ত।

কুমুদমপি গতেহন্তং লীয়তে চন্দ্রবিষে হসিতমিব বধুনাং

প্রোষিতৈর্পু-প্রিয়েষু॥ স্বকৃত-২৩

প্রভাতে কমলিনী-নাথের উদয়ে প্রস্ফুটিত পদ্ম-নিকরে কবি কালিদাস দেখতে পেয়েছেন গুচিস্মিতা প্রিয়ার মুখছবি আর কুমুদনানায়ক চন্দ্রের অন্তগমনে স্নানায়মানা কুমুদিনীর পাণ্ডুর দৃগু দেখে, প্রোষিতভর্তৃকা প্রিয়ার মলিন-মুখছবি কবিচিহ্নে উদ্ভিত হয়ে তাকে ব্যথাভুর করেছে। প্রভাতের তরঙ্গহিল্লোলে চঞ্চল আরক্ত কমলে ভ্রমরকুল মধুপানে মত্ত। উৎপলের এই শোভা কবি ভর্তৃহরির দৃষ্টিতে প্রদীপ্ত বহির

সৌন্দর্যকে পরাহত করে প্রতিভাত হয়েছে। ঘনকৃষ্ণ ভঙ্গ-
কুল তার শিখারূপে কল্লিত হয়েছে।

তরঙ্গসঙ্গারপল্লৈঃ পলাশৈঃ জালাশ্রিয়ং সাতিশয়ং দধন্তি।

সধুমদীপ্তাগ্নিকটীনি রেজুঃ তাম্রোৎপলাত্মকুলবট্পদানি॥

ভট্ট ২১২

কবি মাঘের তুলিকায় নবারুণ-রাগে আরক্ত কমলের সৌন্দর্য
কি অপূর্ব কুশলতা সহকারেই না চিত্রিত হয়েছেঃ—
কমল কুমুদ ছাড়াও সপ্তচ্ছদ, কাশ, স্থলপদ্ম, কোবিদার বন্ধু-
জীব প্রভৃতি পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন কবির বর্ণনায় শরৎ শোভার
অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারবি ও
মাঘের দৃষ্টিতে পুষ্পিত বনশ্রেণী পেয়েছে নববধূর যৌবন-
সুখমা। অলঙ্কার-বিশ্বাসে জবা পেয়েছে তার বিশ্বাধরের
রক্তিম আভা আর বিষ্ঠিকা পেয়েছে তার ভাবাবেশে মুগ্ধ
নয়নের শোভা।

অনুবনং বনরাজি-বধুমুখে বহলরাগজবাধরচারুণি।

বিকচবাণদলাবলয়োহধিকং রুরুচিরে কচিরেকর্ণবিভ্রমাঃ॥

শিশু ৬৮৬

কবি ভারবি দেখলেন সপ্তপর্ণপরাগে সমগ্র বনরাজি
হয়েছে আচ্ছন্ন। এ যেন অভিসারোৎকণ্ঠিতা নববধূর আর
এক রূপ। সপ্তপর্ণরজ ও বাণপুষ্প যথাক্রমে হয়েছে তার
শুভ্র উত্তরীয় ও শুচিহাস্ত—

বিপাণ্ডুসংখ্যানমিবানিলোদ্ধতং নিরুদ্ধতীঃ সপ্তপলাশজংরজঃ।

অনারিলোদগ্নীলিতবাণচক্ষুঃ সপুষ্পহাসাঃ বনরাজিযোষিতঃ॥

কিরা ৪১২৮

বর্ষাবসানে পুষ্পোদ্যম শোভারহিত কদম্ব, কুটজ, সর্জ, অর্জুন ও নীপ বৃক্ষের স্ত্রানিমা কবিদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে—
আবার কুমুমভূষণে সজ্জিত সপ্তচ্ছদের অপূর্ব শোভা শরতের
শ্রীকে সার্থক করে তুলেছে।

মুক্তা কদম্বকুটজাজুনসর্জনীপান্ সপ্তচ্ছদানুপগতা কুমুমোদগমত্রীঃ।

ঋ-১৩

কাশকুমুমের শুভ্রতা কোথাও বা রূপায়িত হয়েছে শারদলক্ষ্মীর
হাস্তদীপ্তিতে কোথাও বা শরৎকে ব্যজন করবার ভার তার
উপর হস্ত হয়েছে—

অকলয়দ্যুতিমিব-সর্বতঃ স শারদং শরদন্তরদিম্মুগম্।

শিশু ৬৮৪

পুণ্ডরীকাতপত্রস্তং বিকসংকাসচামরঃ ঋতুবিভ্রম্যামাস ন পুনঃ
প্রাপ ভচ্ছিয়ম্॥ রঘু ৪১১৭

সিত শতদল অধিরাজ শরতের ছত্র আর কাশ তার
চামর। তা দিয়ে সে বুথাই চামরের দ্বারা বীজ্যমান ছত্র-
শোভিত নৃপতি রঘুর অনুকরণ করছে।

শরতে ধীর সমীরণ-স্পর্শে কোবিদারের শাখা-প্রশাখা

কম্পমান। তাত্রাভ কোমল কিসলয় ও পুষ্পের সমুদ্বিতে সে
সমুদ্র। আবার তার কুসুম কুসুমে মধুপানমত্ত মধুকুলকে
দেখে কবির চিত্ত হচ্ছে বিদীর্ণ।

মন্দানিলাকুলিতচারুতরাশ্রাখঃ পুষ্পোদগমপ্রচয়কোমল পল্লবাণঃ।

মত্তদ্বিরেকপরিপীতমধুপ্রসেক্ষিচিৎ বিদারয়তি কস্ত ন কোবিদারঃ॥

ঋ-৬

কোথাও বা সরোবরতীরের অরণ্যবীথিকা ফুলে ফুলে
ছেয়ে আছে। তাদের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়েছে জলে।
তাতে তীরভূমি মনে করছে যেন জল তার পুষ্পসমুদ্বি হরণ
করে নিয়েছে। এই দুঃসহ পরাভব সে সহ করবে কেন?
এর শোধ তুলবার জন্য সেও উদ্যোগ করতে লাগল। সঙ্গে
সঙ্গে স্তবকে স্তবকে স্থলপদ্ম হ'ল বিকসিত। তাদের সৌন্দর্য
যেন জলপদ্মের শোভাকেও হার মানাল। স্থলপদ্মশোভিত
স্থলভূমির এই অপরূপ শ্রী কবি ভর্তৃহরির চিত্তকে বিমুগ্ধ
করেছে।

বিধাগতৈস্তীরবনৈঃ সমুদ্বিঃ নিজাং বিলোক্যাপহতাং পয়োভিঃ।

কুলানি সামর্থ্যতেব তেজঃ সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ॥

ভট্ট ২১৩

শরতে দিগন্তে বিলীয়মান সন্ধ্যার মধ্যে আদিকবি
বান্ধবীকি দেখেছেন অনুরাগিনী আদেশবিহ্বলা নায়িকার
অপরূপ রূপ। নায়কের কোমল কবচস্পর্শে নায়িকার আঁখি
হয় ধীরে ধীরে লজ্জা মুকুলিত, তার অঙ্গাবরণ হয় স্থলিত।
তেমনি চন্দ্রকবচস্পর্শে অনুরাগ ভরে সন্ধ্যা অশ্রুর পরিত্যাগ
করছে। আকাশ তার বসন আর তারকারাজি তার হর্ষে
উদ্দীলিত নয়ন—

চঞ্চলকবচস্পর্শহর্ষোদ্দীলিততারকা। অহো রাগবতী সন্ধ্যা-

জহাতি স্বয়মধ্বরম্॥ রামা-কিঙ্কি ৩০৮৫

আদিকবি শারদীয়া নিশীথিনীর রূপকে গুরুবসনা নারীর
অনুপম সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চন্দ্র যেন হরণ
করেছে তার আননের মধুরিমা, তারকানিচয় পেয়েছে তার
অপলক দৃষ্টির মনোহর শোভা আর সিন্ধু জ্যোৎস্নার শুভ্রতাও
তার শুভ্র বসনের অন্তরালে হয়েছে বিলীন।

রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবস্ত্রা। তারাগণোদ্দীলিতচারুনেত্রা।

জ্যোৎস্নাংগুণপ্রাবরণা বিভাতি নারীর গুণাংগুণসংবতাদী॥

রামা-কিঙ্কি ৩০৮৬

মহাকবি কালিদাসের দৃষ্টিতেও রাত্রির এই অনবদ্য
সৌন্দর্য ধরা পড়েছে কতকটা ভিন্ন রূপে। তাঁর বর্ণনায়
তারকারাজি রজনীর অলঙ্কারসম্ভার। মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র
তার সৌম্য মুখশ্রী, সিত জ্যোৎস্না তার গুরু পটবস্ত্র।

শুধু শূন্যে, জলে, স্থলে প্রকৃতির শোভা বর্ধন করেই যে
শরৎ ক্ষান্ত হয়েছে তা নয় প্রাণিজগতের উপরও তার প্রভাব

সুপরিষ্কৃত। বর্ষা প্রাণীদের মধ্যে এনে দিয়েছিল জড়তা, শরৎ তাদের জড়তাব দূর করে তাদের মধ্যে এনে দিলে অপূর্ব শ্রী আর প্রাণচাঞ্চল্য, তাই আদিকবি মদমন্ত রঘুভকুলের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

শরৎসু গাণ্যায়িতরূপশোভাঃ প্রহর্ষিতা পাণ্ডুসমুখিতাঙ্গাঃ ।

মদোৎকট্য সস্ত্রাতি যুগলুকাঃ বৃষা গবাং মধ্যগতা নদন্তি ॥

রামা-কিঙ্কি ৩০।৩৮

নদীর কূল খননকারী রঘুভকুলকে দেখে কালিদাসের মনে হ'ল যেন তারা রঘুর বিক্রমের অল্পকরণ করছে।

মহোদগ্ধাঃ ককুদন্তঃ সরিতাং কুলমুজ্জ্বলা ।

লীলাখেলমমুপ্রাপুঃ মহাফাস্তস্ত বিক্রমম্ ॥ রঘু ৪।২২

কিরাতার্কজনীরতে শরৎ শোভাযিত মদমন্ত রঘুর এই উৎখাত কেলিই কবিদৃষ্টিতে মূর্তিমান দর্পরূপে কল্পিত হয়েছে।

দদর্শ পুষ্পদধতীং স শারদীং স বিগ্রহং দর্পমিবাধিপংগবাম্ ॥

কিরাত ৪।১১

বর্ষাপগমে যুগকুল বনপ্রান্তে বিচরণশীল। প্রস্তুতিত উৎপলের শোভা হরণকারী তাদের নয়ন দেখে সবার চিত্ত হয়েছে উৎকণ্ঠিত।

পৰ্বন্তস্যস্থিতমৃগীনরনোৎপলানি প্রোৎকণ্ঠয়ন্ত্যপবনানি মনাংসি পুংসাম্

ঋতু—১৪

ভারবির বর্ণনায় পাই, মৃগীরা মধুকণ্ঠী গোপীদের গীতে মুগ্ধ হয়ে শস্ত্র ভক্ষণে বীতম্পৃহ হয়েছে—

কৃতাবধানাঞ্জিতবহির্ধন্বনো সুরজ্জগোগীজনগীতনিঃশ্বনে ।

ইদঞ্জিঘংসামুপহায় ভূয়সীং ন শসমভ্যেতি মৃগীকদম্বকম্ ॥

কিরাত ৪।৩৩

শিশুপালবধকাব্যেও কৃষক বধূদের গীতে প্রসক্ত যুগ-যুগের অনুরূপ একটি চিত্র ফুটে উঠেছে—

বিগত শস্ত্রজিঘংসনঘট্টয়ং কলমগোপবধূন মৃগব্রজম্ ।

শ্রুততদীরিতকোমলগীতকধ্বনিমিবেহনিমেঘেদধমগ্রতঃ ॥

শিশু ৬।৪৯

ভর্তৃহরি দেখছেন যুগকুল একমনে ভ্রমরগুণ্ডন শ্রবণ করছে। তাদের নিকটেই যে ব্যাধ উপস্থিত সে বিষয়ে তারা আদৌ অবহিত নয়। পক্ষান্তরে ব্যাধেরাও হংসের মধুর কাকলীতে আকৃষ্ট হয়ে যুগবধের জন্তে শরসম্মান করতেই ভুলে গেছে।

দত্তাবধানং মধুলেহীগীতো প্রশান্তচেষ্টং হরিণং ভিঃসাম্ ॥

আকর্ণয়ন্তুং শ্রুতকংসনাদান লক্ষ্যে সমাধিং ন দদে মৃগাবিৎ ॥

ভট্ট ২।৭

পক্ষিকুলের মধ্যে মরালকে কবির সকলেই শরৎশোভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন। আদিকবির বর্ণনায়

চক্রবাক ও সারসকে দেখি মরালকুলের ক্রীড়াসহচর রূপে। মহানদীর তীরে চক্রবাকের সঙ্গে ক্রীড়ারত হংসদের শোভা কবির নয়ন মুগ্ধ করেছে।

মহানদীনাং পুলিনোপযাতঃ ক্রীড়ন্তি হংসাসহ চক্রবাকৈঃ ।

রামা-কিঙ্কি ৩০।৩১

কোথাও বা সারসের, কুজনে নদীবক্ষ হয়েছে মুগ্ধ। শরৎগমে মানস-প্রত্যাবৃত্ত হংসেরা হৃষ্টচিত্তে তাদের এই আনন্দোৎসবে যোগ দিতে নদীগর্ভে নিপতিত হচ্ছে।

সসারসারাবিনিদিতান্ন নদীষু হংসাঃ নিপতন্তি হৃষ্টাঃ ।

রামা-কিঙ্কি ৩০।৪২

শরতে কেলিমন্ত হংসের গতি কালিদাসকে মুগ্ধ করেছে। অঙ্গনাগের সুললিত গতিও তাদের গমনভঙ্গীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে—

হংসৈর্জতা সুললিতা গতিরঙ্গনাগাম্ । ঋতু-১৭

ভট্টিকাব্যে দেখতে পাই হংসশ্রেণী কোথাও বা শ্বেতপদ্মের, আবার কোথাও বা শুভ্র কেনপুঞ্জের অন্তরালে লীন। তারা দৃষ্টিগোচর না হলেও তাদের মধুরকাকলী শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করছে আর তা থেকেই তাদের অস্তিত্ব সহজে অনুমিত হচ্ছে।

সিতারবিন্দপ্রচয়েষু লীনাঃ সংসক্তফেনেষু চ সৈকতেষু ।

কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ প্রতীযিরে শ্রোত্রস্থথৈর্নিনাদৈঃ ॥

ভট্ট ২।১৮

বর্ষাত্যয়ে ময়ূরেরা বিষধচিত্তে নৃত্য পরিত্যাগ করেছে, তাদের সৌন্দর্য্য হয়ে গেছে ম্লান, পক্ষান্তরে হংসদের কলকাকলী সকলেরই চিত্ত জয় করেছে। মীনকেতনও বুঝি তাই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

নৃত্যপ্রয়োগরহিতাশ্চিহ্নিনো বিহায় হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্ ।

ঋতু-১৩

সদৃশগুণই মানুষের চিত্তজয়ে সমর্থ হয়। বর্ষাত্যয়ে কেকারবকারী শিখিকুলের স্বর হয়েছে কর্কশ, পরন্তু কামমন্ত হংসের কলস্বর সকলকেই করছে আকৃষ্ট। ক্ষণিকের পরিচয়েও হংসেরা কলকাকলী ধ্বনিতে সবার চিত্ত এক নিবিড় মাধুর্য্যে ভরে দিয়েছে। ভারবির বর্ণনায় দেখি দীর্ঘকালের পরিচিত ময়ূরদের অশ্রদ্ধা করোও সকলে হংসদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে—

বিহায় বাঙ্গামুদিতো মদাত্যাদরক্তকণ্ঠস্তা রুতে শিখণ্ডিনঃ ।

শ্রুতিঃ শ্রয়ত্যান্মদহংসনিঃশ্বনং গুণাঃ প্রিয়ত্বেহধিকৃতাঃ ন সম্ভবঃ ॥

কিরাত ৪।২৫

কবি মাধ বলেছেন, সময়ই প্রাণিগণের মধ্যে সবার ও দুর্বলতা সঞ্চার করে এই শাশ্বত বাণীর সার্থকতা সম্পাদন

করে যেন শরতে হংসের স্বর হয়েছে মধুর আর নিস্তেজ ময়ূরের
স্বর হয়েছে কর্কশ।

সময় এব করোতি বলাবলং প্রণিগদন্ত ইতীব শরীরিণাম্।

শরদি হংসরবাঃ পরমীকৃত স্বরময়ূরময়ূরমণীয়তাম্ ॥ শিশু ৬।৪৪

জলে স্থলে আকাশে শরৎ সুসমার এই বৈচিত্র্য ভাগবত-
কারের বর্ণনায় গোণ স্থান লাভ করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে
শরতের সৌন্দর্য্য বিষুভক্তের মনে পরম আনন্দের সঞ্চার
করেছে আর তাতেই তার সার্থকতা প্রতিপাদিত। ভক্তের
মনোমুকুরে ফ্লাদৈকময়ী ভগবদ্ভক্তি প্রতিফলিত। সেই
চিন্তের মাধুর্য্য বর্ণনাই ব্যাসদেবের শরৎ-বর্ণনায় মুখ্য।

শরদাগমে আকাশ থেকে মেঘ দূরীভূত হয়েছে। কৃষ্ণ-
ভক্তিতে যেমন সমস্ত অশুভ দূর হয়ে যায় তেমনি শরৎ কৃষ্ণ-
মেঘজালকে অপসারিত করে সর্বকল্যাণের নিধানরূপে
ধরাতে অবতীর্ণ হয়েছে।

ব্যোমোহভ্রং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঞ্চমপাংমলম্

শরজ্জহারশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্বথাগুভম্ ॥ ভাগবত ১০মা২০শা৩৪

কোথাও বা জলহারা নবনীত শুভ্র মেঘখণ্ড আকাশের

কোলে ভেসে বেড়াচ্ছে। কবির দৃষ্টিতে তারা সংসারত্যাগী-
নিরাসক্ত নিষ্পাপ মুনির মত পবিত্র।

সর্বস্বং জলদা হিহা বিরজুঃ শুভ্রবর্চসঃ।

যথা তাক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিঞ্চিৎ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০মা২০শা৩৫

এই ভাবে দেখা যায় বাল্মীকি থেকে শুরু করে কবি-
পঞ্চক মূলতঃ জলে, স্থলে, আকাশে ও প্রাণিজগতে শরতের
বহুবিভক্ত সৌন্দর্য্যকেই উপলব্ধি করেছেন। এই বিচিত্র
সৌন্দর্য্যরহস্তে তাঁরা এতই অভিভূত হয়েছেন যে, তাতেই
তাঁরা পেয়েছেন ব্রহ্ম লীলারসের তুল্য আনন্দ। তাই এই
সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যেই তাঁরা অসীমের পরিপূর্ণ প্রকাশকে
প্রত্যক্ষ করেছেন। এ বিষয়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের সঙ্গে তাঁদের
কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বাল্মীকি, কালিদাস, ভারবি,
ভট্টহরি ও মাঘ শরতে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়-আশ্রয়ী ক্রীতে
তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করেছেন। প্রকৃতির এই মনোজ্ঞ
বেশ ভাগবতকারের দৃষ্টিবহির্ভূত ছিল না বটে, তবে ভক্তের
দৃষ্টিতে ভক্তি-উদ্বল চিন্তের মাধুর্য্যের কাছে প্রকৃতির
সৌন্দর্য্য হয়েছে উপমেয়।

শারদোৎসব

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদ্রভী

কোথা উৎসব কোথা আনন্দ উল্লাস কলরব,
দ্বারে সমাগত, চির প্রার্থিত মধু শারদোৎসব।
পূজা-উপাচার, অর্ঘ্য পুষ্প, ধূপ দীপ, চন্দন ;
পূর্ণ রয়েছে মঙ্গল ঘট—প্রস্তুত শুভ অভিষেক ;
হাসিগান-ভরা আলোকোজ্জ্বল শত দিঠি অনিমেধ ;
রয়েছে জনতা, নেই জীবনের জাগ্রত স্পন্দন।
নীল নিশ্চেষ্ট উদার শান্ত গগন-সরগী বাহি—
কাশ-কুসুমিত ব্রহ্মপুত্র জাহ্নবী অবগাহি,

হলুদ ধাতু-মঞ্জরী বরা সবুজ শস্যক্ষেতে
শিউলী অতসী-সুরভি-উতল শ্রামল কুঞ্জপথে,
হিমালী তুহিন শৈলশিখর অক্লেশে অবতরি।
শারদলক্ষ্মী এসেছে বঙ্গে আনন্দ সঞ্চারি।
বাজিছে বাত উদ্দীপনায়, উতরোল উৎসব ;
মৃন্ময়পাটে চিন্ময়ী রূপ হয় না তো উদ্ভব ?

শশী মাষ্টার

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দূরদৃষ্টকণী ভাই যতীশ এসে ধরল, দাদা, শশী মাষ্টারের কাছে একবার যাবেন আমার সঙ্গে? চলুন না, এখন ত আপনাদের হাতে তেমন কাজ নেই।

ব্যাপারটা কি—হঠাৎ এমন জরুরি ভাড়া?

আর বলেন, কেন, ছেলেটা টেষ্টে সুরবিধে করতে পারে নি—হেড মাষ্টার কিছুতেই ওকে এলাউ করবেন না। দেখা যাক যদি বলে-কয়ে—

কিন্তু বলে-কয়ে পাঠালেই কি ছেলে পাস হয়ে যাবে?

যায় বৈকি দাদা—এমন ত হামেশাই হচ্ছে। টেষ্ট পরীক্ষাটা শক্তই হয় ত। তা ছাড়া ছেলে ধনু-কভাড়া পণ করেছে—এলাউ না হলে একদিক পানো চলে যাবে।

ছেলের ভীষণ-প্রতিজ্ঞার কথা শুনে অবশ্য বিস্মিত হলাম না। এমন অনেক ছেলেই এ হেন অবস্থায় পড়ে এই রকম শক্ত-শক্ত-প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করে অভিভাবকদের আতঙ্কিত করে তোলে। ওদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে কতখানি আগুন জ্বলে সে জানি না—তবে তাপটা যেন মাত্রা ছাড়িয়েই যায়। একবার যেন বলেছিলামও—একাত্তরে, এই আগুনটা যদি সারা বছর জ্বলিয়ে রাখতে পারতে ত...

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের তাপকে ওরা এমনই তীব্র করে তুলতে পারে যার সঙ্গে সারা বছরের তাপটা পাল্লা দিতে পারে না। বুললাম—ভাতপুত্রটিও নাটকীয় মুহূর্তটি ভাল ভাবেই তৈরি করেছেন, শশী মাষ্টারের শরণাগত না হয়ে উপায় নাই।

কিন্তু আমাকে আর কেন?

আপনি গেলে অল্পরোধের গুরুত্ব বাড়বে। হাজার হোক, কলেজে প্রবেশের করেন।

হা—মাষ্টারের সম্মতি যদি আদায় করতে হয় ত অল্পরোধের আঁকশিটাকে শক্ত করতেই হবে। গাছের মোটা ডাল নোয়াতে গেলে ঢিলে বাঁধনের আঁকশি নিলে চলবে না।

জানি—শশী মাষ্টার লোকটি নিতান্ত অসামাজিক। সংসারী মানুষ, কোনদিন গুর ছায়া মাড়ায় না—সংসার-বোধ মাষ্টারের বেশ-খানিকটা কম বলেই। দোতলার লম্বা একটি ঘরে আকণ্ঠ বই বোঝাই রয়েছে—তাক আলমারি টেবিল চেয়ার-ছায়ের মাথা ছাপিয়ে বই উপচে পড়েছে মেঝেতে। একটি তক্তাপোশ—তার একাংশে স্বল্পপরিমিত শয্যা ঘিরে বইয়ের রাশি। কথায় বলে হরির লুঠ; এ ঘরে এলে মানুষের মনে হবে শুধু বাতাসা-পাটালিতে নয়—হরির লুঠ বইয়েতেও দেওয়া সম্ভব। যে সব জ্ঞানের তরঙ্গ অসংখ্য পুস্তক-পত্রকে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে—তাদের মুক্তিদাতা যেন একমাত্র শশী মাষ্টার। তিনি ছাড়া লোকই-বা কে আছে গ্রামে?

সবাই সংসার নিয়ে ব্যস্ত। সংসারের বাইরে যে একটা রাজত্ব চলছে তার হিসাব রাখার দায় যে মহা দায়ই সে বোধ-কয়জনেরই বা আছে আর তা বহন করার ক্রেশ কেন ভোগ করবে সংসারী-মানুষ! গ্রামের ব্যতিক্রম এই সংসার-বিচ্ছিন্ন মানুষটি নিজেকে নির্বাসিত করেছেন দ্বিতলের এই ঘরখানিতে। কণ্বাস্ত দিনের সকাল সন্ধ্যার অবসর এবং ছুটির দিনের সমস্তটাই এই ঘরে কাটে শশী মাষ্টারের। শুধু বই পড়া নয়—শুনি খানিকটা সময় জপধ্যান পূজাতেও যায়। বাড়ীতে একটিমাত্র দোতলা ঘর—পূব-দক্ষিণ খোলা। অব্যবহৃত আলো-হাওয়ার পিপাসার জন্ত না হোক—বাড়ীর কুচো-কাঁচা ছেলেমেয়ে ও কর্তা-গিন্নীদের কোলাহল কোন্দল থেকে নিষ্কৃতিলাভের ইচ্ছা শশী মাষ্টারের প্রবলই ছিল—তাই কোলাহলের অপর পারে তাঁর বাসা। রাশভারি গম্ভীর-প্রকৃতির মানুষ—উনি ঘরে থাকলে ছেলেমেয়েরা সামনের ছাদে কদাচিৎ আসে। যদি আসে ত ভয়ে ভয়ে বলে, আপনার ভাত বাড়ি হয়েছে জ্যেঠামশাই। কিংবা—একজন লোক আপনাকে ভাকছে বাইরে। কিংবা—

গুর ছোট ভাইপোটিকে ধরলাম সদর দরজায়। বললাম, থোকা তোমার জ্যেঠাকে গিয়ে বল ত—হুঁজন লোক দেখা করতে এসেছেন।

দশ বছরের ছেলে জ্যেঠাতের আচার-আচরণ সধকে ওয়াকিব-হাল। বললে, জ্যেঠা পড়ছেন যে।

তা হোক—গুর দাও গে।

অনেক সাধ্যসাধনা করতে ছেলেটি ভিতরে গেল এবং খানিক পরে ফিরে এসে বললে, আসুন।

মস্ত উঠানের পর অনেকগুলি একতলা ঘর রয়েছে সারি সারি। সেকালের পাতলা ইঁটে তৈরি ঘর—পলস্তারা নেই। ইঁটে নোনা ধরেছে এমন সাংঘাতিক ভাবে যে আধখানা ভিঁই কে যেন কুরে কুরে ফোঁপরা করে দিয়েছে। সেকালের চওড়া ভিঁই বলে ঘরগুলি ভূমিসং হয় নি। লম্বা টানা একতলার পাশ দিয়ে দোতলার উঠবার সিঁড়ি। অপ্রশস্ত—ইট-খসা। সাবধানে উঠতে হয়। দোতলার সামনে রয়েছে একতলার বিস্তীর্ণ ছাদ—তার সঙ্গে মিটালি পাতিয়েছে আকাশ আর আলো। একতলার বহু পুরাতন জরাজীর্ণ জগৎ পেরিয়ে এক নিমেষে এসে পড়লাম যেন চির নূতন কোন দেশে!

আমাদের পায়ের শব্দে শশী মাষ্টার দোরগোড়ায় এসে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন, আসুন।

চেয়ারের উপর থেকে বইগুলি তুলে বললেন, বসুন।

বসব কি—ঘরের শোভা দেখেই চক্ষুর পলক আর পড়ছে না।

কি অগোছালো বইয়ের স্তূপ। মলাট-হেঁড়া, পাতা-খসা—হাজার হাজার বই এধার-ওধার চারধারে ছড়ানো। একটা আলনা রয়েছে—তাতেই কেবল জামা-কাপড়—সেখানে বই রাখবার সুবিধা হলে বোধ করি পরিধেয় থাকত না। আর সর্বত্র বই—বই। পুরাতন বইয়ের গন্ধে ঘরখানি ভরপুর।

আমাদের বিস্ময় দেখে শশী মাষ্টার বললেন, ওই একটা সখ ছিল—পড়া। ছেলেবেলা থেকে যা পেয়েছি কুড়িয়েছি—কাউকে ফেলা ত পারি নি।

আপনার সময় নষ্ট করলাম। কমা-প্রার্থনার সুরে বললাম। সময়! হাসলেন শশী মাষ্টার। হাঁ, ছেলেবেলায় যেন পড়ে ছিলাম—সময় আর শ্রোত অপেক্ষা করে না কারও জন্তে।

বললাম, কিন্তু অনর্থক নষ্ট হওয়ার সার্থকতা কি?

আপনি ত কলেজে পড়ান, বলতে পারেন ওকথা। আমাদের সময় আর সার্থক হতে পারে কই! তিন বার এম-এ দিলাম—প্রাইভেট—তিন বারই পারলাম না। সময় নষ্ট হয় নি বলর কোন মুখে?

কিন্তু আপনার মত বয়সে—

বিভাগশিক্ষার আবার বয়স কি—সারাজীবনই ত শিক্ষা নেওয়া যায়। তবে আমরা কিনা সারা বছরই পরীক্ষা করছি ছেলেদের—নিজের বোধশক্তি ওরই চাপে কখন ভোঁতা মেরে যাচ্ছে।

একথা সেকথায় অনেকফণ কাটল। যতীশ ইতিমধ্যে বার-তিনেক গা টিপেছে। সময় নষ্ট হলে শশী মাষ্টার আক্ষেপ না করুন, আমাদের বাজার-হাট কেনাকাটা ইত্যাদি টুকটাকি কাজ রয়েছে, বহুফণ বসে বসে কারও জীবন কাহিনী শুনে সময়ের অপব্যবহার করতে পারি না।

অবশেষে আমাকে সচেতন করতে না পেরে যতীশ গলা ঝেড়ে বললে, আজ্ঞে আপনার কাছে এসেছি—

হাঁ, হাঁ। কি জন্ম এসেছেন বলুন? অপ্রতিভ শশী মাষ্টার মাথা চুলকাতে লাগলেন।

‘আমার মেজ ছেলে সুরীল’, যতীশ গলাটা ঝেড়ে বক্তব্য শেষ করলে, ‘আপনাদের ইস্কুলেই পড়ে কিনা’।

শশী মাষ্টার সবিস্ময়ে বললেন, তাই নাকি? তা কোন ক্লাসে—?

আজ্ঞে এইবারই ত ম্যাট্রিক দেবে। তা—

ওহো সুরীল! তাই বলুন।—আলো দেখতে পেয়ে উৎসাহিত হলেন শশী মাষ্টার। একটু থেমে বললেন, তা সত্যি বলতে কি ছেলেটা পড়াশোনায় একটু মাটো। এবার ভাল মার্ক রাখতে পারে নি বলে এলাউ করি নি। একটু নজর রাখবেন ওর উপর—আসছে বার যাতে ভাল ভাবে পাস করে যায়।

আজ্ঞে এইবারই একটা চান্স দিন না দয়া করে।

শশী মাষ্টার অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন মিনিটখানেক। বললেন, বলেন কি, ভাল ভাবে তৈরি না হয়েই... না না, এমন

অনুরোধ করবেন না। ছেলের আখের নষ্ট করবেন না। টায়ে-টোয়ে যদি পাসই করে—থার্ড ডিভিসনে—তাতে লাভটা কি। শুনি ত অনেক আপিসে আজকাল থার্ড ডিভিসন নিচ্ছে না।

যতীশ বললে, আপনি ওকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন—আমরা কেয়ার নেব’খন—যাতে সেকণ্ড ডিভিসনটা হয়।

বলেন কি—সারা বছরে যে রেজাল্ট ভাল করতে পারলে না সে ত্রুতিন মাসে মেক-আপ করবে? না যতীশবাবু, ছঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আপনারা ছেলের সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন—

যতীশ তাড়াতাড়ি বললে, না না, উচ্চ ধারণা আমি পোষণ করি না, তবু একটা চান্স দিলেই বা ক্ষতি কি?

‘ক্ষতি আছে’। শশী মাষ্টারের কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। ‘ইস্কুলের স্নানাম—এটিও দেখতে হয় আমাদের। সরকারের সাহায্য যাতে বজায় থাকে—সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। সেন্ট পারসেন্ট ছেলে পাঠালে পাস করে যদি টোয়েন্টি কি টোয়েন্টি-ফাইভ—সেটা ইস্কুলের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা?’

প্রশ্নটা আমার পানে চেয়েই করলেন। আত্মীয়ের মুখ চেয়েও প্রতিবাদ করতে পারলাম না।

তার চেয়ে ওকে ভাল করে পড়ান—আর একটি বছর। এবার কেয়ার নিন, দেখবেন, ওই ছেলেই ফার্স্ট ডিভিসন নেবে আসছে বার।

মনঃক্ষুব্ধ যতীশ বললে, ছেলে বলছে এবার না হলে আর পড়বে—না।

এই কথায় উচ্চ হাস্য করে উঠলেন শশী মাষ্টার।—বলেন কি! ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনিং হ’ল একমাত্র ওষুধ। রোগী যদি বলে ওষুধটা বড় তেতো—খাব না, তা হলে রোগ সারবে? যেমন রোগ—তেমনি চিকিৎসা। আপনি ত কলেজে পড়ান, আপনি কি বলেন?

কলেজের ছেলেরা ইস্কুলের ছাত্রদের চেয়ে স্বাধীন, তাদের ওপর খুব কড়া আইন চাপানো যায় না।

তার ফলও হচ্ছে চমৎকার! দিন দিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেমে আসছে দেখছেন ত?

কিন্তু দোষ শুধু ছাত্রদেরই? যুছ প্রতিবাদ করলাম।

দোষ যারই হোক, নিজের দোষটুকু অন্ততঃ বুঝতে চেষ্টা করা আর বুঝে শুধরে নেওয়া উচিত কিনা?

যতীশ বললে, সে আর ক’টা মানুষ পারে! বয়স্ক মানুষরাই পারে না—তা ক’টি ছেলেরা!

ঠিক বলেছেন। বড়রা দুর্বল বলেই ছেলেরা আদরে হয়। সে আদার রাখতে গেলে ক্ষতি করা হয় তাদেরই।

প্রকারান্তরে শশী মাষ্টার অমত করলেন ছেলেটিকে পাঠাতে। অগত্যা আমরাও উঠলাম।

দোর পর্দাস্ত্রঃএগিয়ে এলেন শশী মাষ্টার। বললেন, আবার আসবেন সময় পেলে।

কিন্তু আপনার সময় ত কম।

হাঁ, ছেলেদের ভার নিয়েছি—বডুই জড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু কি করি বলুন, একটা কাজ না নিয়ে থাকলে সংসার চলে না—মনও ভরে না। বিকেলে আমার বখেট সময় আছে। তখন ছেলে পড়াই না, নিজে পড়ি। কেউ গল্প করলে শুনি, ভাল জিনিস আদায় করে নিই লোকের কাছে। আসুন না বিকেলে?

আমাকে আর আপনি আপনি কেন, আমি বয়সে আপনার চেয়ে অনেক ছোট।

আপনি ব্রাহ্মণ, বয়সে ছোট হলেও নমস্ত্র আমার। শশী মাষ্টার হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

বাইরে এসে যতীশ বললে, লোকটা ওই এক রকম! সংসারের অনেক ব্যাপার গুঁর মাথায় ঢোকে না। একটা বছর পড়ানোর পরচ আমাদের মত নিভা-আনা নিভা-খাওয়া লোকের পক্ষে টেনে যাওয়া যে কি মর্যাস্তিক তা উনি বোঝেন না।

কিন্তু কথাটা গুঁর মিথ্যা নয়।

আরে ভাই—সত্য নিয়ে যদি সংসারে বাস করতে হয়, তা হলে পেটে ভাত আর পরণে কাপড় জোটে না। যতীশ উষ্ণ স্বরে বললে, —আমাদের মত লোকের স্কুল-কলেজে ছেলেদের পড়ানো ত বিজ্ঞ-শিক্ষার জন্তে নয়—কোনমতে একটা ছাপ জোগাড় করে চাকরিতে বহাল করে দেওয়া এই হ'ল উদ্দেশ্য। এমনিতেই ত সংসারে ধারকর্জ—আরও একটা বছর...

সারাদা পথ যতীশ গজ গজ করতে লাগল। বাড়ীর কাছে এসে হঠাৎ সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বললে, একটা উপায় আছে—অগত্যা তাই করতে হবে।

উপায়?

উপায়টা গুনলে সকলে হাসবে—কিন্তু এ ছাড়া গতিই বা কি! কি জানেন—দেবদ্বিজে গুঁর অসীম ভক্তি—পরম বৈষ্ণব উনি। তার স্ত্রধোগ কে না নিচ্ছে! আমিও নেব।

আমি হাঁ করে চেয়ে আছি দেখে যতীশ হেসে ফেললে। বললে, দেশে থাকেন না ত—জানেন কি করে। ব্রাহ্মণের ছেলে যদি গুঁর পা চেপে ধরে তো কেমন উনি এলাউ না করেন দেখি!

আশ্চর্য্য হবারই কথা। শিক্ষা সম্বন্ধে শশী মাষ্টারের অভিমতটা নিতান্ত খেলো নয়। শিক্ষালয়ের প্রতি গুঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা—সেখানকার অনুমাত্র মর্যাদাহানি সহিতে পারেন না অথচ তিনি যে এমন একটা ছেলেমানুষির প্রশ্রয় দেন—এটা কল্পনাতীত।

দু'দিন পরে সত্যিই আশ্চর্য্য হলো যখন যতীশ এসে বললে, দাদা কেল্লা কতে—থোকা এলাউ হয়েছে।

বল কি?

হাঁ। তবে সোজা আঙুলে ঘি ওঠে নি—একটু বাঁকতে হয়েছে আঙুলটিকে। থোকা গিয়ে যাঁহাতক পা চেপে ধরে বলেছে

যদি শ্রার না পাঠান আমাকে—এইখানেই আত্মহত্যা করব। বাস, মস্ত্রের মত কাজ হয়ে গেল। ওকে সঙ্গে করে ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে খাতায় নাম বসিয়ে দিয়েছেন।

বললাম, উনি যে এতটা দুর্বল প্রকৃতির জানতাম না।

যতীশ হাসলে। দেশে থাক না জানবে কি করে! চিরকালই উনি দুর্বল। বয়স হয়ে আরও বেড়েছে দুর্বলতা। দুর্বল না হলে স্ত্রীরিয়োগের তিন মাস পেরুতে-না-পেরুতে দ্বিতীয়পক্ষ করেন? দুর্বল না হলে কুলগুরুকে তাগ করে ছ' ছ'বার গুরু বদল করেন। দুর্বল না হলে সমাজে সেবার যে গোলমাল হ'ল—তাতে একবার এ পক্ষ আর বার অল্প পক্ষে যোগ দেন? লোকটি মাষ্টার হিসেবে ভাল, কিন্তু মেরুদণ্ড নেই।

সে বিবৃত কাহিনী যতীশের মুখেই গুনলাম।

শশী মাষ্টারেরা ছিলেন চার ভাই। পূর্বকালের একানবতী পরিবারের বাধন গুঁদের কালে শিথিল হয়ে এসেছে একাধিক কারণে। একটা বাধা আয়—জমির কিংবা গচ্ছিত অর্থের হুদ অথবা পরি-জনের কারও মোটা মাইনের চাকরি না থাকায় সংসারের কর্তৃত্ব বার-কয়েক হাতবদল হয়ে চার ভাগ হয়ে গেল।

বড় বললেন, দিনকাল যা পড়েছে তাতে সবাই সমান টাকা না দিলে সংসার চলবে না।

মেজ শশী বললেন, সকলের আয় ত সমান নয়, সমান টাকা দিতে পারবে কেন?

সেজ বিনোদ বললে, দিতে পারলেই বা দেবে কেন? যার সংসারে পুষ্টি বেশী তারই ত বেশী দেওয়া উচিত।

এই কথায় বড় কাশীনাথ উষ্ণ হয়ে বললেন, তোদের ছোট সংসার এক দিন বড় হবে সেটা মনে রাখিস।

তখন হিষ্টোমার্কি টাকা নিও আশ্রয় করে। সেজও চড়া গলায় জবাব দিলে।

বাড়ীর মেয়েদের মধ্যেও কলহ শুরু হ'ল। কাপড়, গহনা, খাওয়া-পরা, ছেলেদের পোশাক-পরিচ্ছদ, নিজেদের খাটা-খাটুনি ইত্যাদি সব ব্যাপার নিয়ে কোলাহল বাড়তে লাগল।

বড় বললেন, আর নয়, কাল থেকে আমার রান্নাঘর আলাদা—তোদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না।

অল্পজেরাও অধিজের পথ অবলম্বন করলে।

বুদ্বা মা বললেন, আমার গতি কি হবে?

কেন চার ভাই মিলে তোমার খাওয়া-পরার খরচা দেব!

কোথায় থাকব আমি? কার ঘরে?

পালা করে থাকবে এর ঘরে ছ'মাস, ওর ঘরে ছ'মাস।

শশী বললেন, বাড়ী বিষয় যা ভাগ হবার হোক, গর্ভধারিণীতে ভাগ করার দুর্নীতি যেন আমাদের না হয়। উনি আমার কাছেই থাকবেন।

শশীর অল্প খেয়েই মা শেষ পর্যন্ত দেহ রাখলেন। মাতৃশ্রাবের

ব্যয় তাও সম্পূর্ণ বহন করলেন শশী। কারণ পৃথগ্ন হয়ে অবধি সংসার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সে বিচ্ছেদের প্রাচীর কাদা দিয়ে তৈরি নয়—সিমেন্ট আর ইটে গাঁথা। এই প্রাচীর-ঘেরা সংসারে কিছুদিন পরে অপত্রক শশীর স্ত্রী-বিয়োগ হ'ল। অস্বাস্থ্যেরা তখন প্রতিবেশীর দূরত্বে সমাসীন। প্রতিবেশী-স্বভাব মনোভাবে উদ্ভুদ্ধ হয়েই অশৌচাস্ত পর্যন্ত তারা সংসার চালিয়ে দিলে, তারপর আর কোন সম্পর্ক রাখলে না। তখন জ্ঞানের সাধক শশী পড়লেন বিপাকে। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি নন; হু'কুল রফার কোন উপায় না দেখে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করলেন। আত্মীয়েরা দ্বিধার দিলে প্রচণ্ড ভাবে। নিঃসন্তান শশীর বিষয়-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব যাদের অর্শাবে তাদের দ্বিধার দিবার হেতুটিও বোঝা যায়। ওঁদের মতে স্ত্রীবিয়োগে শশী নাকি হায় হায় করে কাঁদেন নি। স্ত্রীর স্মৃতি আজীবন বয়ে বেড়াতে পারেন তেমন প্রমাণই বা দিলেন কই। যারা বিষয়-সম্পত্তির আশা রাখেন না—তেমন আত্মীয়দল বললেন, বিয়ে না করে ওঁর গতিই বা কি! সংসার-ছাড়া মানুষগুলিকে সংসারে বহাল-তবিরতে স্থস্থ করে জীইয়ে রাখা নিতান্ত অন্তরঙ্গজন ছাড়া কারই বা সাধ্য। যদি বল উনি আত্মসুখপরাণ তাই সেবার জন্তে অস্তমিত যোঁবনেও একজন সঙ্গিনী বেছে নিলেন, তাতেই বা ক্ষতি কি।

শশীও মাঝে মাঝে আক্ষেপ করেছেন, আমি দুর্বল, আমি অধম তাই এমন মতি হ'ল আমার।

কথাপ্রসঙ্গে এক দিন বলেছিলেন, তোমরা ছেলেমানুষ—বুঝবে না মানুষের প্রাক্তন কর্মের ব্যাপার। ফল ভোগ না করে তার উপায় কি?

কেন, যা বুঝি অগ্নায় তাকে প্রাক্তন কর্মের দোহাই দিয়ে মেনে নেব কেন?

একটু হাসলেন এই কথায়। বললেন, পরমহংসদেবের একটি গল্প মনে পড়ল। শোন। এক ব্রাহ্মণ এক দিন মনস্থ করলেন সন্ন্যাস নেবেন—ঘারে ঘারে ভিক্ষা করে থাকেন। তাঁর সঙ্গলের কথা শুনে ব্রাহ্মণী বললেন, সন্ন্যাস নিয়েও পেটের জন্তে যদি পাঁচ দোরে ভিক্ষে করতে হয়—তার চেয়ে এক দোরে ভিক্ষে করাই কি ভাল নয়? তাতে মেহনত কম—সময় নষ্ট হবে কম—ভগবানকে ডাকতে পারবে অনেকক্ষণ ধরে। আমাদেরও জ্ঞানচর্চা ওই রকম। গৃহিণী চলে যেতেই দেখলাম—পেটের চিন্তাই সব চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠছে, রান্না, খাওয়া আর ইস্কুল। ইস্কুলে পড়াই, পুরো মন দিতে পারি না। কর্তব্য-অবহেলার অমুতাপ দিনরাত পুড়িয়ে মারতে লাগল। এ ছাড়া আর উপায়ই-বা ছিল কি।

পরে অবশ্য বুঝি নিঃসন্তান মানুষের সবচেয়ে বড় সহায় তার সহধর্মিণী। ওঁরা সংসারের হাল ধরে থাকেন বলেই ঝড়-তুফানে নৌকো চলে নির্বিক্রে। কত ছোটখাটো তুচ্ছ ব্যাপার বা জীবনের পক্ষে শেষ বলে মেনে নিতে বাধে অথচ সেগুলির সহযোগিতা না পেলে শেষলভের তপস্বীটা নিফল হয়ে যায়। 'অন্নচিন্তা' চমৎকারের মধ্যে রুঢ় বাস্তব আমাদের প্রতিনিয়তই শাসন করছে।

কিন্তু এই কুংসা-রটনা মিলাতে-না-মিলাতে আর একটি বিপত্তি ঘটল। সেটা সামাজিক দলাদলির তাণ্ডব। সেকালের রক্ষণশীল সমাজ জাহাজে কালাপানি পার হওয়া সহ্য করতে পারত না। স্ব-জাতীয় কোন যুবকের এই হুঁসাহস হওয়াতে তাঁরা কঠিন হয়ে উঠলেন।

অপর পক্ষে তরুণদের নিয়ে দল গড়ে উঠল। স্বরূপ হ'ল কর্দম-নিক্ষেপ।

সমাজের মধ্যে বিদ্যার প্রতিষ্ঠায় শশী ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি—প্রায় পুরোভাগে ছিল তাঁর আসন। কিন্তু শশী সমাজ-সংস্কারক নন—সমাজ পরিচালনার স্বপ্নও দেখেন নি কোনদিন। বিদ্যা ঠেকে অহঙ্কৃত করে নি এ প্রমাণ বহুবার দিয়েছেন—এই উপলক্ষে আর একবার দিলেন।

সমাজপতি বললেন, এই স্লেচ্ছাচার সমর্থন কর তুমি? সমাজ ধ্বংস হোক এই চাও?

শশী বললেন, সে কি—তা কখনও হয়!

তা হলে কাগজে লেখ—আন্দোলন চালিয়ে যাও।

সেই লেখা নিয়েই বাধল গোল।

বিপক্ষ দলের শিশির বললে, কাকাবাবু, এটা আপনার কাছে আশা করি নি। আপনি ত ওঁদের মত কুপমণ্ডুক নন। নানা জ্ঞানলাভ করে উদার হয়েছেন—আপনি কি করে লিখলেন, বিদেশ-যাত্রার কুফল সমাজে অল্পভূত হবেই। নানান জাতির সঙ্গে মিশলেই কি জাত যায়? ছুঁমার্গকে আপনি পরম কল্যাণজনক মনে করেন?

শশী বিব্রত হয়ে বললেন, না না, তা কেন! তবে এতটা উচ্ছৃঙ্খল হওয়া—

বেশ ত—শাসন করুন আমাদের। শিক্ষা দিন—দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। আমরা নতুন,—বাঁধন ছিঁড়ে বেশি লাকলাকি করে থাকি যদি, নতুন বাঁধন দিয়ে বুঝিয়ে দিন—কিসে হিত কিসে অহিত।

শশী মাষ্টার দ্বিতীয় প্রবন্ধ কিন্তু লিখলেন না।

সমাজপতি জুড় হয়ে বললেন, শশী, তুমিও ওঁদের সমর্থন করছ?

না। আমি ওঁদের বুঝিয়ে দেব কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ।

বাড়ীর ছেলে যদি দুষ্টুমি করে তাকে বাড়ীর বার করে দিয়ে সমস্তা মিটানো যায় না। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—

সমাজপতি রুষ্ট হয়ে বললেন, বুঝি তোমার ভীমরতি হয়েছে।

এদিকে ছেলেরাও তাঁর কথা পুরোপুরি মেনে নিলে না। বললে,

ওঁদের গোঁড়ামি ভাঙ্গব আমরা। সমাজের মাথায় চড়ে ওরা মনে করেছে যা খুশী তাই করবে? হাড়বজ্জাতের দল! এই সমাজ আমরা ভাঙ্গব।

ভাঙ্গবে কেন—ওর দোষ-ত্রুটি শুধরে নতুন করে তৈরি কর।

শশী মীমাংসার ভঙ্গিতে বললেন।

তা হয় না। পুরনো পচা বাড়ী ভেঙে নতুন বাড়ী গড়া যায় না।

অনেক বুঝলেন শশী। শেষ অবধি এই মন্তব্য গুনলেন, যান যান মশাই, আপনিও ত কুয়ের বাণ্ড। লেগাপড়াই শিখুন আর মাষ্টারিই করুন বাইরের জগতের ধারণা করবেন কেমন করে।

শশী মাষ্টার ফিরে এলেন নিজের ঘরে। নিজের সঙ্কীর্ণ ঘর ছাড়া তাঁর জায়গা কোথায়? সংসারে প্রাচীর উঠেছে বহুকাল, আজ সমাজের সংযোগ-সেতুটি ভেঙ্গে পড়ল। ছুপক থেকে অবিরাম চলছে হাসি শ্বেষের কথাসাথী...ঘরের মধ্যে আসন পাতলেন শশী মাষ্টার।

জ্ঞান-জগতের আর একটি প্রকোষ্ঠে এসে পৌঁছলেন। তিস্ত মন অবসন্ন দেহ আর নিঃশব্দিত শক্তি নিয়ে সেই ঘরের ধূলিময় মেঝের উপর বসলেন। রিক্ত ঘর—আকাশের বিস্তার নিয়েই তার চারটি দেয়াল—আকাশের নীল রঙে ভেসে বেরাচ্ছে রিক্ততা। মন হু হু করে, তবু মনে হয় এই শূন্যতার পারেও কি বস্তুর প্রকাশ চোখে পড়বে না? নীলের মাঝেও ত পাটল মেঘের আবির্ভাব হয়; একদা নিবিড়-জলদ-জালে আবৃত প্রকৃতি শ্রাম স্নিগ্ধ রূপে হৃদয় মন ভুলিয়ে দেয়। এই শূন্যতা মন্থন করে সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে। চেয়ে থাকেন উঠানের শিউলি গাছের দিকে। অন্তরের দৃষ্ট খুলে যায়। দেখেন, আকাশের আলো আর মাটির রস নিয়ে শিউলি তার পাতায় ঘন সবুজের সমারোহ ছড়িয়ে দেয়—শাখা ভরে ফুটিয়ে তোলে গৈরিক-বৃন্ত সাদা ফুলের রাশি। সে ফুল শাখার উচ্চাসনে বসে সৌন্দর্যের ঐক্যে মানুষকে আকর্ষণ করে না, মাটিতে বিছিয়ে পড়ে সৌরভে ভরিয়ে তোলে দিক। যার দানে সমৃদ্ধ তারই পায়ে প্রণাম জানিয়ে অলঙ্কৃত করে তার আসনবাণী।

বইয়ের আলমারির পাশে একখানি ছবি টাঙিয়ে দিলেন। সকাল সন্ধ্যায় ধূপধূনা জ্বলে আসন পেতে বসতে লাগলেন সেই ছবির নিয়ে। শূন্যতার মাঝে লঘু মেঘ-বগুণের মত কিসের আভাস যেন মাঝে মাঝে ভেসে আসে আর ভেসে যায়। ধরি ধরি করে সে আলোয়াকে ধরা যায় না। অথচ সে আলোয়ানয়—রহস্য নয়—অশাস্তি ত নয়ই।

কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিলেন।

গুরুদেব, কেন এ আকুতি? সত্যিই কি ঈশ্বর আছেন? তাঁকে দেখা যায়?

যায় বৈকি। ভক্তেরা সব দেখেছেন। প্রহ্লাদ, ধ্রুব—

আপনি দেখেছেন?

আমি? গুরু আমতা আমতা করেন। আমার সে সাধনা কই—কেমন করে দেখব। তবে সাধনা করলে অবশ্যই তাঁকে পাওয়া যায়।

সাধনা করেন না কেন?

সংসারী গুরু বিপদে পড়েন—কি যে উত্তর দেবেন ভেবে পান না। অবশেষে বলেন, সে ত একজন্মের সাধনায় হয় না।

তা হলে এ জন্ম নিয়ে কি লাভ আমার!

লাভ? এই সংসারও ত কর্মক্ষেত্র—এখানে জনক রাজার মত থাকতে হয়। সংসারে থেকেও নিলিঙ্গ।

শশী বুঝলেন, এই পথের বেশী দূর পর্য্যন্ত জানা নেই গুরু।... এর পর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গেলেন পুরীধামে। রথে চ বামনং দৃষ্ট। পুনর্জন্ম ন বিজ্ঞতে। পুনর্জন্ম না হোক—পথের আরও থানিকটা নজরে পড়ল।

নরসমুদ্রের মাথায় ভাসছে তিনটি মাত্র ফুল। জ্ঞান আর সিদ্ধির ঐশ্বর্যে ভরা বস্ত। চৈতন্যের রূপটি জড়বস্তুর অল্পকৃতিতে মিলবে না তাই কল্যাণের অবয়বহীন। এ যেন—

অচক্ষু দেখিতে পান—অকর্ণ শুনিতে পান,

অপদ সর্বত্র গতাগতি।

পদহীন অথচ গতির এমন অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে নি ইতিপূর্বে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভনতা—সমুদ্র চেউয়ে চেউয়ে বিক্ষুব্ধ। বিরাট শ্রোতে ভেসে চলেছে জীবজগৎ—যাঁর চৈতন্যে বিশ্বের চেতনা—তাঁরই পরম রূপটি রথযাত্রার গতিপথে চোখে পড়ল।

এক বৈষ্ণব সাধুর আশ্রমে উঠেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ, জীবজগৎ কি এমন ভাবেই চলেছে?

হাঁ। সমুদ্রের ঢেউ দেখলে ত? ব্রহ্মাণ্ড তাঁর দীলা-নিকেতন। তিনি একরূপে সৃষ্টি করে অল্পরূপে আশ্বাদ করছেন। একটি আগুনের অনন্ত কোটি ফুলিঙ্গ।

এই ফুলিঙ্গ সবই কি সেই আগুনে মিশতে পারে?

যতক্ষণ মিশত না পারে ততক্ষণই চলে তার মেশার সাধনা।...

গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন দেশ। ঘরের মধ্যে আর একখানি ছবি টাঙালেন। লোকে বললে, গুরুত্যাগী—দুর্বল চিত্র।

বছর দুই পরে এই দুর্বলতাকে প্রমাণ করলেন এক কালী-সাধকের কাছে পুনর্বীর দীক্ষা নিয়ে।

সাধক বললেন, এই কালীই সৃষ্টিরূপা পরমাপ্রকৃতি শক্তি। নিজস্ব ব্রহ্ম শক্তি সঞ্চার না হলে লীলা প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। লীলাই ত শোভা—জলের যেমন ঢেউ। প্রত্যেক জীবই আছেন ভগবান। যত্র জীব তত্র শিব—এই উপলব্ধি যতক্ষণ না হবে তোমার মুক্তি নেই। এই বিজ্ঞাই যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, পরা বিদ্যা। অপরা জ্ঞান জাগতিক নাম রূপের আবর্তে থালি পাক থাইয়ে মারে। সংশয়, তর্ক, অহঙ্কার, প্রচার—এ সবের মধ্যে পড়েই জীবের শাস্তি নেই।

ছবির সংখ্যা বাড়ল ঘরে। জপ, স্তোত্রপাঠ, পূজা এ সব বহু সময় ব্যয় হয়। বৈকালে নিয়মিতভাবে পড়েন চৈতন্যচরিতামৃত, তন্ত্র, পুরাণ, উপনিষদ আর পাশ্চাত্য দর্শনের বই। কেউ ঘরে এলে আলাপ চলে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত। আলাপ শেষে বলেন, গরীবের ক্ষুদ-কুঁড়ো যদি অল্পগ্রহ করে—

ঘরের মানুষ একটু বিপদে পড়েন। শশী মাষ্টার হাসিমুখে জ্ঞান করেন সেই বিপদ থেকে। বলেন, আজ আমার ক্ষিধের জোর নেই কম করে খাবার দেবে। যা আছে সকলে ভাগ করে খাই এস।

এত করেও কিন্তু সর্বজীবে ভগবৎসত্তা অল্পভূত হয় না।

আপন-পর ভেদাভেদ মুছে যায় না। কর্তব্যের অহঙ্কার দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠে। চরম পরীক্ষা হয়ে গেল এক দিন।

সেদিন স্ত্রী বললেন, একজন বামুনের মেয়ে এসেছিল বাড়ীতে। তোমার কাছে তার নালিশ আছে।

নালিশ? আমার কাছে!

হাঁ। তার ছেলেকে নাকি তুমি স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ?

ছেলেটির নাম কি ভূপেন? প্রতিপ্রশ্ন করেন শশী।

হাঁ—তারই মা এসেছিল। বেচারী ভারি কান্নাকাটি করছে।

ছেলেটিকে কোন রকমে ইস্কুলে রাখা যার না?

না। ওপর থেকে হুকুম এসে গেছে। ছেলেটি ভারি বদ। যা করেছে—ইস্কুলের আইনে তার উচিত শাস্তিই হয়েছে।

তাকে শাস্তি দেবার সময় তার মায়ের কথা ভেবেছিলে?

ইস্কুলের আইন ছেলেদের নিয়ম—অভিভাবকদের নিয়ম নয়।

তবু তাঁরা কেন ইস্কুলে ছেলে দেন—সেটাও ভেবে দেখা উচিত নয় কি? ছেলে উপায় করে সংসার চালাবে, পেটে হুঁমুঠো ভাত, পরণে একখানি দশি জুটবে—এই না আশা! আর বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে—তাঁর আশা কতখানি জান?

একজনের জন্তে সব ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারি না।

তুমিই বা শাস্তি দেবার কে? অজ্ঞের ভবিষ্যৎ দেখবার ক্ষমতা ই বা কে দিলে তোমায়? বিধবার চোখের জল মোছাতে না পারলে যদি—কিসের তোমার জপ ধ্যান পূজো পাঠ? তুমিই তো বল ভগবান আছেন সর্বভূতে—ওই ছেলেটিকে ছুনিয়া ছাড়া?

এসব প্রশ্ন স্ত্রী করে নি—আপন মনেই করেছিলেন শশী। কর্তব্যের আত্মপ্রসাদে যে প্রদীপ জ্বলে পরিহৃত হয়েছিলেন—তার তলায় ছিল খানিকটা ছায়া। ছায়া দীপের তলাতেই থাকে। সেটি বৃহৎ হয়ে সবকিছুকে ঢেকে ফেলেছে। কেন তিনি অসম্মান করলেন ব্রাহ্মণের? কেন নিরুপায় করলেন বিধবাকে? এই কর্তব্যজ্ঞান কি অহঙ্কারের নামান্তর নয়?

পরের দিন হৈ হৈ উঠল গ্রামে—একটি ছেলে পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার কারণ—প্রশ্নপত্র চুরির অপরাধে ছেলেটির রাষ্ট্রিকেশন হয়েছিল ইস্কুল থেকে। ছেলেটি অপমান সহিতে পারলে না।

সারাদিন ঘর থেকে বার হলেন না শশী। জলম্পর্শ করলেন না। জাহ্নু পেতে বসে প্রার্থনা করলেন; চোখের জলে ভাসতে লাগলেন।

বললেন, হে দেবতা, ক্ষমা কর আমায়। কর্তব্যের ছদ্মবেশে অহঙ্কার আমায় গ্রাস করেছিল—মানুষের সত্যাকার রূপ দেখতে ভুল করেছি আমি। তুমি যে সর্বভূতে আছ—সকলকে শাসন করছ—পালন করছ—এই জ্ঞান হারিয়েছিলাম। তাই এত বড় শাস্তি দিলে আমায়।

পরের দিন কর্মত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন ইস্কুলে।

সেক্রেটারি ছুটে এলেন বাড়ীতে। বললেন, ইস্কুলের এই টালমাটাল অবস্থা—এখন আপনি রিজাইন দিলে সব ডুববে।

না, না, আমাকে আর জড়াবেন না। করজোড়ে অনুন্নয় করলেন শশী মাষ্টার। বয়স হয়েছে—কত দিন আর কাজ নিয়ে জড়িয়ে থাকব!

অন্ততঃ একটি বছর দয়া করুন। আমরা সামলে নিই একটু, এতগুলি ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শশী মাষ্টার বললেন, তারা—তারা।...

তারপর আরও অনেক বছর কেটেছে—শশী মাষ্টার চাকরিত ইস্তফা দিতে পারেন নি। যুদ্ধোত্তর যুগ জীবনযাত্রার মান এমন পর্যায়েরে উঠছে যে ঘরে বসে কর্মহীন হয়ে কেউ পরম নির্ভরতার সঙ্গে বলতে পারে না, হে ঈশ্বর যা কর তুমি।

তিনি যে দুর্বল—এ কথা শশী মাষ্টার প্রতিদিন প্রার্থনার সঙ্গে স্বীকার করেন। প্রার্থনা শেষে তাঁর হুঁচোখে জলধারা নামে।

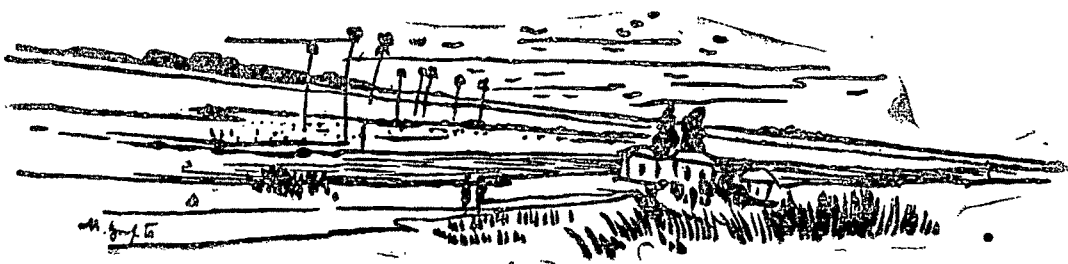
এক দিন বললাম, আমি দুর্বল—আমি পাপী এই চিন্তা মনের মধ্যে থাকলে মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারে কি?

শশী মাষ্টার হেসে বললেন, তাঁর কাছে পৌঁছবে এত কি সাহস আমার! চোখের জলে মনের ময়লা ধুয়ে গিয়ে মনটা যদি সাফ হয়—সেই তো পরম লাভ ভাই। আমার আমার জ্ঞানটা এই করতে করতে যদি একদম মুছে যায়—

শশী মাষ্টারের কথায় বেশ বুঝলাম ওর সংসারত্যাগের দিন আসন্ন হয়ে উঠছে।...

তার পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বুদ্ধ শশী মাষ্টার আজও সংসার ত্যাগ করেন নি। ইস্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন—কিন্তু সকালে বিকালে ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা দেন। সংসারের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

সংসারী আর বিবাসী দু'পক্ষই বলে, ও রকম দুর্বল প্রকৃতির মানুষ এ গ্রামে কেন—ভূভারতে আর ছুটি নেই।



কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

৪

ভূকৈলাস দক্ষিণ-কলিকাতার একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। পরিখা-বেষ্টিত রাজবাটীর জলাশয়, উপবন ও প্রাসাদরাজির মধ্যস্থিত এখানকার বিচিত্র রীতির মন্দির-সমূহের স্বাভাবিক বিশিষ্টতা আছে। গঠনবৈচিত্র্য, অলঙ্কার-বিহীন ও লিপি-প্রাচুর্য্যে এখানকার মন্দিরবাজি সমৃদ্ধ। কলিকাতার প্রাচীন বংশসম্ভূত ঘোষাল-পরিবারের একাংশ

বাংলা ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সাহিত্য এই পরিবারের উৎসাহে পরিপুষ্টলাভ করিয়াছিল। মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীধামের বঙ্গানুবাদ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এখানকার মন্দির ও মণ্ডপে নিজস্ব ও বৈদেশিক উভয় রীতিই পরিস্ফুট। মন্দিরে দেবতাগণের মত মল্লমূর্তিও



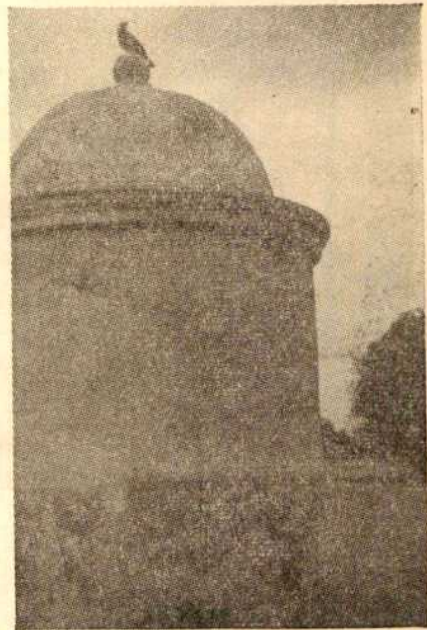
মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের মন্দির, ভূকৈলাস।

রোমীয় স্থাপত্যের আকরণ

ঐশ্বর্য্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ও বারানসীধামে যুগপৎ খ্যাতিমান হইয়া উঠেন। সম্ভবতঃ এই পরিবারের লোকেরাই বঙ্গের বাহিরে খ্যাতিমান বাঙালীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বারানসীধামের নানাস্থানে এই ঘোষাল-পরিবারের নাম ও কীর্তির বিবরণ প্রস্তরে ক্ষোদিত দেখা যায়। কাশী-ধামের রেউড়িতলায় একটি বিদ্যালয়ে লিখিত আছে :

“This school was formerly established by Maharaja Joynarain Ghosal in MDCCCXVIII,”

অভিজাত ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন হইলেও এই পরিবারের উপর একই সঙ্গে পুরোহিত ও পাছরী-সম্প্রদায়ের আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল। ব্রিটিশ সরকারের সহিত পত্রালাপে এই বংশ



শ্রীকার্ত্তিকের মন্দির, ভূকৈলাস। উপরে গহ্বজ

পূজিত। এই রাজবাটীর জলাশয়ের উত্তরাংশে সোপানরাজির সন্নিকটে পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি বিরাট অষ্টশাল দণ্ডায়মান। পশ্চিমেরটির অধিষ্ঠাতা বিশাল কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ—এই মন্দিরে কোন লিপি নাই। পূর্বদিকের মন্দিরে অম্লরূপ রক্ত-কমলেশ্বর নামক মহালিঙ্গ। মন্দিরের দুই সারি থামযুক্ত, উজ্জ্বল চারি-পাঁচটি কলস-শোভিত ত্রিশূল-শীর্ষক তিনটি চূড়া। রক্তকমলেশ্বর মন্দিরে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার কৃষ্ণ-প্রস্তরে নিম্নোক্ত লিপি আছে :

“চৈত্রের পক্ষ গণিতেহনি পূর্ণিমায়া

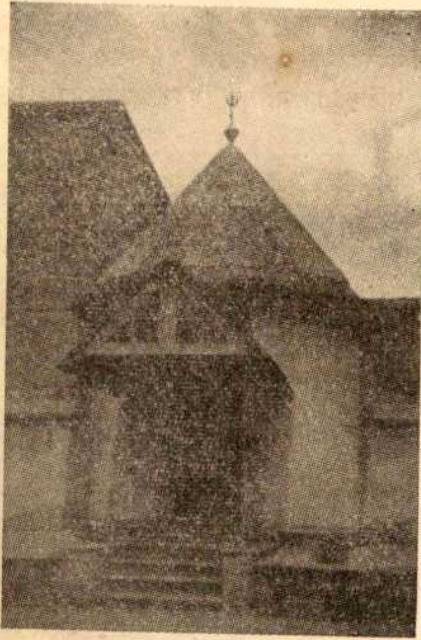
শাক্যেশ্বর জলবিন্দুমিতে গৃহেশ্বিন্

ত্রিযুক্ত রক্তকমলেশ্বর নামলিঙ্গ

বারে রবে: পশুপতে: কৃপয়া বিরাসীত

শকাব্দা ১৭০২

লিপিতে বিরামচিহ্ন ও লুপ্ত অকার বজ্জিত হইয়াছে। ১৭০২ শকাব্দার ২৯শে চৈত্র রবিবার পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরক্ত-কমলেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইরাছিলেন। মন্দিরের উপরিতন চতুঃশালে বারটি বস্তুর মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট সাধকগণের মূর্তি। দ্বারের সম্মুখস্থ প্রাচীরে কিছু কিছু অলঙ্করণ আছে।



পঞ্চানন্দ মন্দির, ভূকৈলাস। বিলাতী রীতি

রাজবাটীর পশ্চাত পৃথক মহলের উত্তরাংশে অষ্ট-ধাতুর দশভুজা মহিষ-নির্গত অসুরবাতিনী ঘোটকাকৃতি সিংহে আরুঢ়া সিংহবাহিনীর স্তম্ভশোভিত মন্দিরমণ্ডিত মণ্ডপ, তিনটি বহুং লিপি ফলকে সমাকীর্ণ। মণ্ডপের সোপানরাজির উপরিস্থিত মধ্যবর্তী দুইটি স্তম্ভের পশ্চিমেরটির গাত্রে ভূকৈলাস নামকরণের ইতিহাস শক তারিখাদিযুক্ত কৃষ্ণ-প্রস্তরের উৎকীর্ণ লিপিতে প্রকাশিত :

“শিবৈক্যং বিরমুনীন্দুমিত শাক বর্ষে বিধৌদিনেনদিনকরে ভিসংক্রমিত মীন রাশৌ ঘটতইং কলিভবার্ঘবে পতিতমেঘং সংরক্ষিতুং জগত-পতিত পাবনীবিবাদ সীদিয়া ভূদাদ্গীত সুমোদদায়ী সুমনোরাজী বিরাজিহুরমাণী বল্লিচয়াধিতাটবি সদানন্দুল্লস তাণ্ডব কৈলাসেশ-শিবাসিত্য পুরমিদ কৈলাসভুল্যং ভুবি তস্মাদর্থ বিদাকৃত্যং জগতি-ভূকৈলাস সংজ্ঞাং যবৌ।

শিবৈক্যং=৩, বিরং=০, মুনী=৭, ইন্দু=১ একুনে ১৭০৩।

উক্ত শকাব্দার ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন রবিবারে কলিযুগে ভবসাগরে পতিত মনুষ্যগণের স্বাকার নির্মিত জগতের পতিত পারনির

অবস্থানে ভূঙ্গসঙ্গীত সমন্বিত সৌরভ সঞ্চারী কুসুমরাজির শোভামণ্ডিত নানা তরুলতার সুন্দর উপবনে সর্বদানন্দীর তাণ্ডব নৃত্য সংঘ কৈলাসেশ শিবযুক্ত এই পুরীপৃথিবীতে কৈলাসভূলা হওয়ার অর্থজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহার ভূকৈলাস নামকরণ করিলেন।”

লিপিটি গম্ভ ও পদ্মে মিশ্রিত কিংবা ভাস্কর অশুদ্ধভাবে উৎকীর্ণ করার ঐরূপ হইয়াছে। ইহাতেও লুপ্ত অকার নাই। এই ভূকৈলাস নাম জনসাধারণের বহুল ব্যবহারে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া সুবিদিত তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। সম্মুখের রাজপথটিও ভূকৈলাস নাম পাইয়াছে। ইহার অনুকরণে নির্মিত টালিগঞ্জের হরিহরধাম ঐরূপ সার্থকতা লাভ করে নাই। যে দিব্যসুখমার মণ্ডিত এই স্থান ভূকৈলাস নাম পাইরাছিল, আজ তাহার সেই সৌন্দর্য্য অন্তহিত; জনসাধারণের অবিবেচনা ও কর্তৃপক্ষের অক্ষমতা ইহাকে পাখিব প্রবাসে পরিণত করিয়াছে। আজ ইহার পরিখা কচুরিপানায় সমাচ্ছন্ন দুহিত জলে পরিপূর্ণ। উদ্যান অন্তহিত, জলাশয় ও প্রান্তর রূপভ্রষ্ট হইয়া বিকৃতাকার।

দ্বারের পূর্বাংশের প্রস্তর-ফলকে রেখালিপিতে ঘোষাল-বংশের কুলপঞ্জী দেওয়া আছে। ইহা নয়টি সারিতে সম্পূর্ণ :

শ্রীমদ্বারাগোজয়তি। সুধানিবির্বাংস্ত গোত্রো ছান্দন্তংসুতো মহান্। আদিশুরস্ত বজ্রার্থ মাগতো রাঢ়দেশভাব্। তংসুতঃ শ্রীধরস্তস্তা ঘোষালঃ সুরভিঃ স্মৃতঃ। তংসুতঃ সাগরস্তস্তাতমোপহ উদাহতঃ। বিশ্বামিত্র স্ততোজজ্ঞে জিতামিত্রশ্চ তংসুতঃ। সরণি-স্তনরস্তস্ততঃ পিঙ্গল নামকঃ। ততো জাতঃ শিরোধীমান্ বল্লাল রাজপুজিতঃ। ততোজাত উধস্তস্ত কোচ স্তংসুত আভকঃ। তস্ত পুত্রঃপার্শ্বোম তংপুত্র উদয়স্মৃতঃ। ততো বাণেশ্বরো জজ্ঞে বিশ্বনাথশ্চ তংসুতঃ। কংসারিস্তনরস্তস্ত সর্বদানন্দীতি মেলকঃ। শ্রীধরশ্চতস্তস্মাদ যদুনাথশ্চ পাঠকঃ। নানা শাস্ত্রাধ্যাপকশ্চ কুল-বিচ্ছেদকারকঃ। গোপীকান্তস্ততোজাতো রামকৃষ্ণশ্চ তংসুতঃ। তস্তপুত্রোহি রাজেন্দ্রোবিষ্ণুদেবোহপি তংসুতঃ। অহুজো বিষ্ণুদেবস্ত কৃষ্ণ দেবোহপুত্রক বিষ্ণুদেবস্য কন্দর্পো রামহলাল এবচ। তংপুত্রো রামনিবিস্তংসুতো রামলোচনঃ। তস্তপুত্রোহাপুত্রশ্চ রামজীবন নামকঃ। কন্দর্পস্ত ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কৃষ্ণেন্দ্রোগ্রজোমহান্। তথা গোকুলচন্দ্র রামচন্দ্রাঙ্কঃস্মৃতঃ। পঞ্চ গোকুলচন্দ্রস্ত পুত্রোবল্লাবনাগ্রজঃ। রামনারায়ণশ্চৈব হরিনারায়ণস্তথা। লক্ষ্মীনারায়ণশ্চৈব গঙ্গা নারায়ণোপিচ। এতে স্তুতাহ-পুত্রাশ্চ স্বল্পকালেন স্বর্গতাঃ। কৃষ্ণচন্দ্রাগ্রজোবীমান্ জয়নারায়ণঃ স্ববীঃ। কালীশঙ্কর ঘোষাল স্তংসুতোধীর সন্মতঃ। তস্তস্মতনরঃ খাতাঃ কাশীকান্তোগ্রজো মহান্। সত্যপ্রসাদসুদহু তৃতীয়ঃ সত্য-কিঙ্করঃ। চতুর্থঃ সত্যচরণ ঘোষালঃ পরিকীর্তিতঃ। পঞ্চমঃ সত্যশরণঃ যষ্ঠঃ সত্যপ্রসন্নকঃ। ঐতিব্যাং কুনারাণ্যং সত্যভক্তস্ত সপ্তমঃ। শকাব্দা ১৭৬৮ সন ১২২৭।

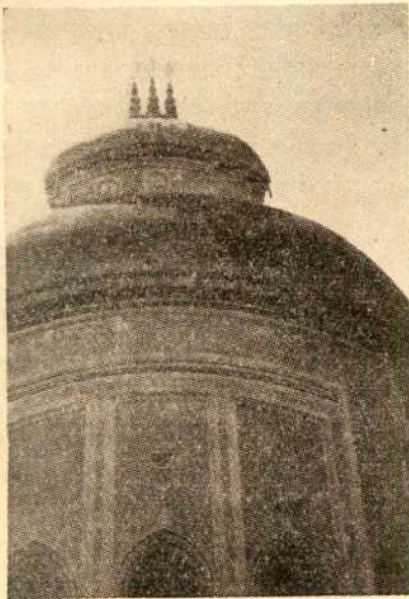
মহারাজ মন্দিরের ধামেও এই পর্য্যন্ত লিপি আছে।

তস্তানুজো মৃতৌ বালো কাশীকাস্ত্রভৌততঃ। জায়ান্ সত্য-
দয়ালাত্যঃ কনিষ্ঠঃ সত্যবল্লভঃ ॥ পিতৃঃ পশ্চান্মৃতো বেতৌ স্মৃতঃ সত্য-
প্রসাদতঃ। সত্যজীবন নামৈক স্ত্যপুত্রঃ সত্যকিঙ্করঃ ॥ শ্রীসত্য-
চরণাং খ্যাতঃ সত্যানন্দোঃ পরঃ। সত্যসত্যাবিধঃ সত্যশরণাং
সত্যহর্ভঃ ॥ জনকাগ্রে মৃতে তস্মিন্ জাতঃ সত্যপ্রসন্নতঃ। সত্যরঞ্জন
নামাস্য সত্যকৃষ্ণস্তচাণ্ডিমনা শ্রীযাদবচন্দ্রভাস্করেন খোদিতং

শ্রীরাধানাথেন সম্পাদিতম

শকাব্দাঃ ১৭৬৭ সন ১২৫২

বাংস্রগোত্রীয় সুধানিধির পুত্র ছান্দড় আদিশুরের যজ্ঞ-
সম্পাদনের নিমিত্ত রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার



রক্তকমলেশ্বরের অষ্টশাল, ভূকৈলাস। এই মন্দিরটির লিঙ্গ মহারাজ
জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহারুরের মাতার নাম বহন করিতেছে।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি কালো ফলকটিতে লিপি আছে

পুত্র শ্রীধর স্মৃত সুরভি ঘোষাল স্মৃত সাগর স্মৃত তমোপহ স্মৃত
বিশ্বামিত্র স্মৃত জিতামিত্র স্মৃত সরণি স্মৃত পিঙ্গল স্মৃত শির।
ইনি রাজা বল্লাল সেন পূজিত কুলীন। স্মৃত উধ স্মৃত কোচ
স্মৃত আভক স্মৃত পশো স্মৃত উদয় স্মৃত বাণেশ্বর স্মৃত বিশ্বনাথ
স্মৃত কংসারি। ইনি সর্বানন্দী মেলভুক্ত হন। স্মৃত শ্রীধর
স্মৃত যদুনাথ পাঠক। ইনি নানা শাস্ত্রজ্ঞ ও কুলভঙ্গকারী।
স্মৃত গোপীকান্ত স্মৃত রামকৃষ্ণ স্মৃতরয় রাজেন্দ্র, বিষ্ণুদেব ও
কৃষ্ণদেব। ইনি অপুত্রক। বিষ্ণুদেবের পুত্রদ্বয় কন্দর্প ও
রামহুলাল। রামহুলাল স্মৃত রামনিধি স্মৃত রামলোচন স্মৃত
রামজীবন অপুত্রক। কন্দর্পের পুত্ররয় কৃষ্ণচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র

ও রামচন্দ্র। গোকুলচন্দ্রের পঞ্চ পুত্র বৃন্দাবন, রামনারায়ণ,
হরিনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ। ইহঁরা অপুত্রক
ও বাল্যে স্বর্গত। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র পণ্ডিত জয়নারায়ণ।
স্মৃত কালীশঙ্কর ঘোষাল। ইহঁর সাত পুত্র কাশীকান্ত, সত্য-
প্রসাদ, সত্যকিঙ্কর, সত্যচরণ, সত্যশরণ, সত্যপ্রসন্ন, সত্য-
ভক্ত। শকাব্দা ১৭৩৮ সন ১২২৩।

অমুজদ্বয় বাল্যে স্বর্গত হন। কাশীকান্তের পুত্রদ্বয় সত্য-
দয়াল ও সত্যবল্লভ। পিতার পরে ইহঁরা লোকান্তরিত হন।
সত্যপ্রসাদের পুত্র সত্যজীবন স্মৃত সত্যকিঙ্কর। সত্যচরণের
দুই পুত্র সত্যানন্দ ও সত্যসত্য। সত্যশরণের পুত্র সত্য-



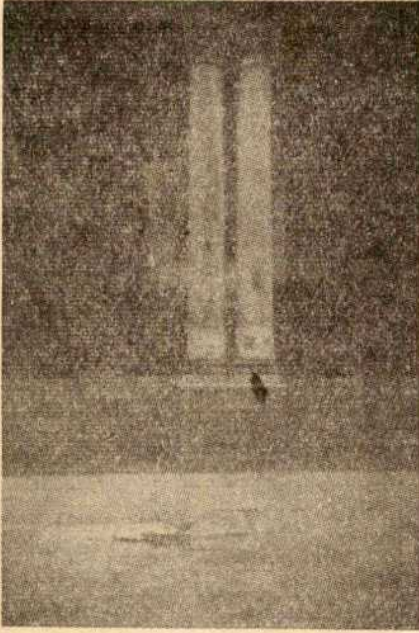
কলিকাতার ঘোষাল বংশের কুলপঞ্জীর ফলক। ভূকৈলাসের রাজবাটি

চলভ। ইনি পিতার জীবদশায় গত। সত্যপ্রসন্নের পুত্র-
দ্বয় সত্যরঞ্জন ও সত্যকৃষ্ণ। শকাব্দা ১৭৬৭ সন ১২৫২
শ্রীযাদবচন্দ্র ভাস্কর খোদাই করেন ও শ্রীরাধানাথ লিপি
সম্পাদন করেন। সম্ভবতঃ প্রথমার্শ ১২২৩ ও দ্বিতীয়ার্শ
১২৫২ সালে ক্ষোদিত।

এই মণ্ডপের অলিন্দের পূর্বদিকের গায়ে ইংরেজী ও
ফারসী ভাষায় “Life of Maharaj Joynarain Ghosal”
পিতুল-ফলকে ক্ষোদিত আছে। ইংরেজী অক্ষরগুলি
হস্তলিখিত বর্ণে খচিত।

মণ্ডপের প্রাঙ্গণের চারি কোণের চারিটা খ্রীষ্টীয় বা
বিলাতী রীতির মন্দিরের চূড়া—স্বস্ত্যগ্র অষ্টকোণসম্বিত।
বাঁমুকোণে মকরবাহিনী গদা। নৈঋত কোণে কৃষ্ণ-]

হুমারোহী পঞ্চমুখ (একটি মুখ মস্তকের উপর শায়িত) চতুর্ভুজ কুবের পঞ্চানন্দ। রাম হস্তধরে নিয়ে মুষ্টি ও উর্দ্ধে টাঙ্গী। দক্ষিণ হস্তধরে অভয় মুদ্রা। অগ্নিকোণে রাজ-রাজেশ্বর মহালিঙ্গ। দীর্ঘাণ কোণে কালভৈরব—ইহার গলে মুণ্ডমালা, ইনি ত্রিনয়ন—বামহস্তে খট্টাঙ্গ, ডাহিনে খেট, বাহন কুব্জবয়ুগল। সকল মূর্তিই প্রস্তরনির্মিত।



ভূকৈলাসের সিংহবাহিনীর মণ্ডপ।

ভূকৈলাস নামকরণের কারণনির্দেশক ফলকটি দেখা যাইতেছে

পূর্বকথিত অষ্টশাল দুইটির সম্মুখের জলাশয়ের পশ্চিম ও পূর্ব পারে ছয়টি মন্দিরের প্রত্যেকটির শিরে গম্বুজ থাকায়, ইহাদের রীতিতে ইসলামীয় প্রভাব পরিস্ফুট। মন্দিরবিচ্ছাদ—প্রতি কোণে চারিটি মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি। দক্ষিণের মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। বায়ুকোণের দেবতা, বাম হস্ত-ধরে উর্দ্ধ ও নিম্নক্রমে খেট, মালা, ডাহিনে ধনু ও কমণ্ডলু-ধারী ময়ূর্বাহন বম্মুখ কার্তিক—তিনটি মুখ সম্মুখে অপর তিনটি পশ্চাতে। পশ্চিমের মন্দিরে স্বেতবর্ণ চতুর্ভুজ—উর্দ্ধ হস্তধরে পদ্ম, নিম্নের ডাহিনে মালা, বামে চক্রাকার বস্ত্রধারী বোটকবাহী, রথারোহী সত্ত্বতঃ সূর্যদেবতা। নৈঋতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। অগ্নিকোণে রাম, সীতা ও মহাবীর। পূর্বের গণপতি। দীর্ঘানে গৌর ও নিতাইয়ের যুগল প্রতিমূর্তি।

জলাশয়ের দক্ষিণাংশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গম্বুজধারী মন্দিরটির চারিকোণে যুগ্ম স্তম্ভ। ইহাতে রোমীয় রীতি

সুপ্রকট। মধ্যে স্তম্ভোপরি ষোণাসনে জপরত মহারাজ জর-নারায়ণ ষোণাল মহাশয়ের রঙীন মূর্তি। স্তম্ভগাত্রে ক্ষুদ্রাক্ষরে একটি লিপি। সম্মুখ বা উত্তর দ্বারের বামে মর্ম্মরে লোহিত বঙ্গাক্ষরে একটি রেখালিপি।

“ভূকৈলাসস্ত শোভায়ৈ নিয়তঃ সুপ্রযত্নবান্। রাজক্লীসতাচরণ ঘোষালঃ শরণাগ্রজঃ। তদাজ্জয়া শ্রিয়া রামকমলঃ কৰ্ম্মপেশলঃ। মুখোপাধায়কঃ সৈবঃ কৃতবান্ থেয়মুত্তমঃ। শশোর কারুণ্যাত্ত রচিতঃ সংক্রমোত্তমঃ। বেদত্বন্ধি নিশিনাথ সম্মিতে শক বংসরে। জৈষ্ঠে-মাসি সিতে পক্ষে সম্পূর্ণত্ব মিতাবুভো। লিঙলিন কোং।”

একটি ইউরোপীয় কোম্পানী মর্ম্মরফলকে বঙ্গাক্ষরে এই সংস্কৃত লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছেন। চতুর্ভুজের মধ্যের অংশটি জুড়িয়া দেওয়া। মর্ম্মঃ—ভূকৈলাসের শোভার জ্ঞাত সর্বদা যত্নবান রাজা শ্রীসত্যচরণ ঘোষালের (সত্যশরণের অগ্রজ) আজ্ঞার কৰ্ম্মপটু রামকমল মুখোপাধ্যায় ১৭৬৪ শকাব্দার জৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিধা ও জলাশয় খনন সম্পন্ন করেন। থেয় শব্দের অর্থ পরিধা। দেবতাগণের মতই মন্দিরে পিতৃপুরুষকে স্থান দিয়া তাঁহার পূজা-ব্যবহার একটা অভিনবদ্ব থাকিলেও বঙ্গদেশে ইহা নূতন নহে। বর্দ্ধমানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণ দিকে এই মন্দির-নির্মাণেও “পিতৃণাং স্থানমাকাংগ দক্ষিণাদিক তথৈবচ” (পিতৃগণের স্থান আকাশ ও দক্ষিণ দিক) এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ মূর্তি-প্রতিষ্ঠার মূল পাশ্চাত্যের অনুকরণও আছে।

হিন্দু, মুসলিম ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি সমভাব, বিচার সাধনা ও বিদ্যোৎসাহিতা, শিল্পে বিভিন্ন রীতির প্রয়োগ, ইতিহাস-রক্ষণে যত্নশীলতা, জাতীয়তা ও জাতীয় ভাষার মর্যাদারক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ভূকৈলাস রাজকুলের বিশিষ্টতা আছে। প্রাচীন যুগের রাজা প্রতাপনারায়ণ রায় ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র অলঙ্কৃত ভুরিষিট রাজবংশ এবং পরবর্ত্তী যুগের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবংশ এইরূপ বৈশিষ্ট্যের জ্ঞাত প্রসিদ্ধ। প্রতি ঘণ্টায় ঘড়ি ও নিত্যনিয়মিত নববত বাজাইয়া ভূকৈলাসে প্রাচীন রীতি রক্ষিত হইয়া থাকে।

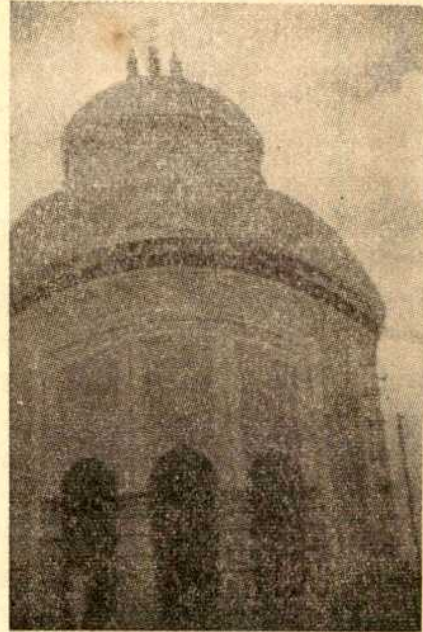
হাওড়া জেলার বাকসারা গ্রামে এই ঘোষাল-বংশের আদিনিবাস ছিল। ঐ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কন্দর্প ঘোষাল ব্যবসায়সূত্রে আসিয়া গড়-গোবিন্দপুরে বাস করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ বাৎসন ১১৫৯ সালের ৩রা আশ্বিন শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। ফোট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণকালে কন্দর্প ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া কিছুদিন বেহালায় থাকেন; পরে সন ১১৬১ সালে তিনি খিদিরপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। জয়নারায়ণ সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, ফারসী, দেবনাগরী ও হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। পনের বৎসর বয়স হইতেই তিনি

মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, বর্তমান প্রভৃতি স্থানে দেশের কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় অসীম কার্যকুশলতা দেখাইয়া নবাব ও ইংরেজ রাজ-পুরুষগণকে মুগ্ধ করেন। ব্যবসারে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন, সুতরাং ঐ সকল কার্যের বিনিময়ে তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না।

তৎকালীন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মোবারক উর্দোলা, টম্যাস প্যাটাল, জন সেক্সপিয়র, ক্যামাক, ওরারেন হেষ্টিংস প্রমুখ ইংরেজ রাজপুরুষগণ জরনারায়ণের কার্যকুশলতার এরূপ মুগ্ধ হন যে, বাং ১১৮৬ সালের শ্রাবণ মাসে অসুস্থতা হেতু তিনি অবসর লইলে, হেষ্টিংসের সুপারিশে দিল্লীর তৎকালীন বাদশাহ মহম্মদ জাহান্দর শাহ শাহজাদা মির্জা জওরান বখতের দীল ও সহির মারফত জরনারায়ণকে ১১৯৮ হিজরির ২৯শে রবিয়াল আউলে তিন হাজারী মনসবদারীসহ মহারাজবাহাদুর উপাধি দান করেন। জরনারায়ণ বন-বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহের জমিদারী পরিচালনা বিষয়েও প্রচুর সাহায্য করেন। বাংলার বহু জেলা ও খিদিরপুরে জরনারায়ণ বিস্তর জমিদারী ক্রয় করেন। খিদিরপুরের বিস্তৃত জলাভূমি ভরাট করিয়া তিনি গড়বেষ্টিত ভূ-কৈলাস রাজবাটি প্রতিষ্ঠা করেন। উহার মধ্যস্থিত শিবগঙ্গা নামক পুকুরিণী ও পূর্বোক্ত দেবতাসকল তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ পিতৃনামে, রক্তকমলেশ্বর মাতৃনামে ও রাজরাজেশ্বর লিঙ্গ পত্নীর নামে প্রতিষ্ঠিত। সিংহবাহিনী বা পতিতপাবনী প্রাণনা কুলদেবী। ইনি ঝুলন ও জমাষ্টমীতে কৃষ্ণরূপ ও কান্তিকী অমাবস্ত্যর কালীরূপ ধারণ করেন—ইহা এখানকার এমন এক অভিনব ব্যাপার যাহা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাশীধামে তিনি করুণানিধান নামক কৃষ্ণবিগ্রহ ও দুর্গাকুণ্ডের নিকট গুরুধামে গুরুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এখানে গুরুকুণ্ড খনন করেন। এখানে ১৮১৭ সালে একটি প্রস্তর-নির্মিত চারিতল বাটী নির্মাণ করাইয়া তিনি দুই শত ছাত্রের সংস্কৃত, বাংলা, ফারসী, হিন্দী ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত পণ্ডে শঙ্করী সঙ্গীত, ব্রাহ্মগার্গন-চন্দ্রিকা ও জরনারায়ণ কল্পদ্রুম তাঁহারই রচিত। কাশীধামের বঙ্গাভিবাদ ও করুণানিধান বিলাস নামক বাংলা গ্রন্থও তাঁহার রুচি। কালীঘাটের কালীমাতার চারিটি রজত-হস্ত তিনিই করাইয়াছেন। উহা এখনও বর্তমান আছে। (কিছুদিন আগে ‘মাসিক বঙ্গমতীতে’ উহা গোকুলচন্দ্রের দান বলিয়া উল্লিখিত হয়—তাহা ভুল।) বাং ১২২৮ (ইং ১৮২১) সালের ২৫শে কার্তিক শুক্রবার ৬৯ বৎসর বয়সে জরনারায়ণের কাশীপ্রাপ্তি

হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল। কুমার সত্যমোহন ঘোষাল এই বংশের শেষ সরকার-স্বীকৃত কুমার। ইনি করোনেশন মেডাল প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র সত্যবিজয় ঘোষাল দরবারে নিমন্ত্রিত হন। বর্তমানে শ্রীসত্য-তাপস ঘোষাল ও শ্রীসত্যতোমোজ ঘোষাল ভ্রাতৃত্ব বংশের গৌরবরক্ষায় যত্নশীল।



কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর মন্দির, ভূকৈলাস

খিদিরপুর পুলের নিকট দুই পটি কালীবাজারের মধ্যে ৬ধবলেশ্বর মহাদেবের একটি খাঁজযুক্ত সূচাম পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। লিঙ্গটি শ্বেত পাথরের, উহার মহাস্তম্ভ তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা পাইয়া সন ১৩০২ সালের ৫ই মাঘ সদয় পাণ্ডাকে দান করেন। পরে তাঁহার চেলা গোবিন্দ পাণ্ডা ইহার মালিক হন। উমাকান্ত পাণ্ডা ইহার বর্তমান মালিক। মন্দিরে একটি পুরাতন লিপির ফলক ছিল—বৈষয়িক স্বার্থে ইহা এখন অপসারিত।

এই স্থানে পথের উত্তর পার্শ্বের পঞ্চাননতলায় মহাদেবের একটি অষ্টশাল আছে। ইহার উপরের চতুঃশালের গাত্রে নাগর অক্ষরে একটি সুদীর্ঘ লিপি আছে। ইহা আধুনিক বলিয়া মনে হয়। কোন সংস্কারক ইহা যোজনা করিয়া দিয়া থাকিবেন।

ঋষি

[বৈদিক, ঔপনিষদিক ও পৌরাণিক]

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

পৌরাণিক কাহিনী হইতে দধীচি, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, দুর্বাসা প্রভৃতি কয়েক জন প্রসিদ্ধ ঋষির পরিচয় পাই। ইহারা প্রত্যেকেই এক এক জন স্বনামধন্য ঋষি। ইহাদিগকে লইয়া যে সকল উপাখ্যান রচিত হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই ঋষিরা প্রভূত তপোবলের অধিকারী ছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়া ঐ তপোবল তাঁহারা অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে তাঁহারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন—অঘটন ঘটাইতে পারিতেন। ঋষি-মুনিরা বর প্রদান করিয়া কাহাকেও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করিতে পারিতেন; আবার অভিসম্পাত দিয়া প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকেও দুর্গতিভোগ করাইতে পারিতেন। মুনিঋষির ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে শত শত মানুষ ভয়ীভূত হইয়া যাইত। দেবতারাও তাঁহাদের অভিসম্পাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

দুর্বাসা, দধীচি, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা গৃহী ছিলেন না। আবার বশিষ্ঠ প্রভৃতি অনেক ঋষি গৃহস্থ ছিলেন। আশ্রম স্থাপন করিয়া শিষ্যদিগকে বিদ্যাদান করিতেন; কখনও কখনও তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা যে তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ ও আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী ছিলেন, কাহিনীগুলি হইতে তাহা সুস্পষ্ট নহে। ইহারা যেন উপাখ্যানের চরিত্র। প্রত্যেকে এক একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। সেই ভূমিকায় তাঁহারা লৌকিক মানুষ হইয়াও অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং এই অলৌকিকতাই যেন তাঁহাদের ঋষিত্বের পরিচায়ক। পৌরাণিক কাহিনী-গুলি নীতি, উপদেশ ও কবিত্বের সম্ভার হইলেও ঘটনাবলীর অনেক কিছুই উদ্ভট—একালে ঐ প্রকারের কার্যকলাপ বাস্তবে সম্ভব বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না।

এ যুগের লেখকেরা যেমন নিজস্ব কল্পনার সাহায্যে উপন্যাস রচনা করেন, পুরাণকারেরা ঠিক সেইভাবে পৌরাণিক কাহিনী লেখেন নাই। যে সকল কাহিনী সুদূর অতীত, এমন কি প্রাগ বৈদিককাল হইতে লোকের মুখে মুখে পরিবর্তিত হইতে হইতে তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত ছিল তাহাই তাঁহারা কল্পনায়, কবিত্বে প্রসারিত করিয়া পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকার রূপ দিতেন এবং উহা পুরাণমধ্যে গ্রথিত করিয়া রাখিলেন। মূল কাহিনী, বাহা এক সময় সংক্ষিপ্ত বা বীজরূপে ছিল, কালে তাহা শাখা-প্রশাখা ও পত্রপুষ্প-

সমন্বিত বিস্তৃত আকারের রূপে পরিণত হইল। ঋষি-চরিত্রও এইরূপে বৈদিক সময়ে বাস্তবে বাহা ছিল, কালস্রোতে তাহা সম্পূর্ণ অন্তরূপ ধারণ করিল। বৈদিক ঋষিরা যেরূপ ছিলেন, পরবর্তী সময়ে উপনিষদের ঋষিরা তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ। পুরাণের ঋষিরা মানুষ হইয়াও দৈবশক্তি-সম্পন্ন অর্দ্ধদেবতা অভিমানব কল্পিত হইয়াছেন।

উপনিষদ্ তত্ত্বালোচনা-প্রধান। একারণ উপনিষদে বর্ণিত যে ঋষিদিগকে পাই তাঁহারা তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ গৃহস্থ। ইহারা পৌরাণিক ঋষিদের ত্যার কেহ সুদীর্ঘকাল তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন অথবা তপোবলের দ্বারা অদ্ভুত কিছু করিলেন এরূপ পাওয়া যায় না। জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই ঔপনিষদিক ঋষি। বিদেহরাজ জনক রাজ্য পরিচালনা করিতেন, কিন্তু পরম নিলিপ্তভাবে। জনকের উক্তি “মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে লাভো ন মে ক্ষতিঃ”—মিথিলা রাজ্য অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেলেও জনকের তাহাতে লাভ বা ক্ষতির কিছু নাই। রাজর্ষি জনক গীতা-কথিত অনাসক্ত মুক্তস্বের বাস্তব মূর্তি। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে লইয়া সংসার করেন। তাঁহার বহু শিষ্য সমন্বিত আশ্রম আছে। আশ্রমের ও নিজের প্রয়োজনে গো-ধন সংগ্রহে উৎসাহী।

জনক যজ্ঞ কবিরূপে। যজ্ঞ উপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠজনী জানিবার জন্ত এক সহস্র গরু বাঁধিয়া রাখিলেন এবং প্রত্যেক গরুর দুই শৃঙ্গে দশ দশ পাদ সুবর্ণ বাঁধিয়া দিয়া ঘোষণা করিলেন, “ভগবান্ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদিগের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি এই সকল গাভী লইয়া যাউন।”

কেহই গাভী লইয়া যাইতে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য উঠিয়া তাঁহার এক শিষ্যকে ঐ গাভীসমূহ লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া জানিতে চাহিলেন যাজ্ঞবল্ক্য যে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ তাহা তিনি কি প্রকারে বলিতেছেন? ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্য যে উত্তর দিলেন তাহা অতীব সরল। বলিলেন, “নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্মে, গোকামা এব বয়ং অ।”—ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি, আমরা গো-লাভ করিতেই ইচ্ছা করি।

অনন্তর অঞ্চলপ্রমুখ আট জন ঋষি, নারী-ঋষি গার্গী বাচরুরী (গর্গ গোত্রের বচরু কন্যা) প্রভৃতির সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের যে প্রশ্নোত্তর বা আলোচনা হইল তাহা হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইল।

এক দিন জনক রাজসভায় বসিয়া আছেন এমন সময় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? পশুলাভের ইচ্ছায়, না আমার সহিত স্মৃতিতত্ত্বের আলোচনা করিবার জন্য?” এখানেও ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সরল উত্তর। বলিলেন, “হে সম্রাট, উভয় উদ্দেশ্যেই।” অর্থাৎ স্মৃতিতত্ত্বের আলোচনাও হইবে, গাভী সংগ্রহও করিব।

উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ তত্ত্বালোচনা হইল। জনক তাঁহাকে তাঁহার উপদেশের জন্য হস্তিতুল্য। রথভসহ সহস্র গাভী দান করিতে চাহিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তৎক্ষণাৎ সেই দান গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, “আমার পিতা বলিতেন, সম্যক উপদেশ না দিয়া দান গ্রহণ করিবে না।” অর্থাৎ উপদেশ অসমাপ্ত রাখিয়া দক্ষিণা তিনি গ্রহণ করিবেন না। ঋষি নির্লোভ, তিনি গাভী চান, কিন্তু তাহা শাস্ত্রসম্মত উপায়ে—ব্রহ্মবিদ্যা দানের দক্ষিণা স্বরূপ।

যাজ্ঞবল্ক্যের উভয় স্ত্রীর মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ মৈত্রেয়ীর উক্তি হইতে এই নারী-ঋষির আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাই। গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার সময় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বলিলেন—“আমি অন্য আশ্রমে যাইবার জন্য ইচ্ছুক, এ কারণ আমার যে বিত্ত আছে তাহা তোমার ও অপর পত্নী কাত্যায়নীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে চাই।”

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বিত্ত প্রাপ্তির সম্ভাবনার উৎফুল্ল না হইয়া জানিতে চাহিলেন, “বিত্তসমূহের দ্বারা আমি কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব?” তাঁহার প্রয়োজন অমৃতত্বের, বিত্ত দ্বারা যদি তাহা লাভ হয় তবেই তিনি বিত্ত লইবেন, নচেৎ উহাতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “অমৃতস্ত তু নাশাস্তি বিত্তেন”—বিত্তদ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই। মৈত্রেয়ী জানাইলেন “যেনাহং নামুতা স্মাৎ কিমহং তেন কুর্ধ্যাম্?” যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না তাহা দ্বারা কি করিব?

বলাকি-অজাতশত্রু-সংবাদে, গার্গ্য বলাকি নামে একজন বিদ্বান ঋষির পরিচয় পাই। ইনি নিজেকে অতিশয় বিদ্বান মনে করিতেন। এজন্ত গরিবতন্মভাব ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল রাজর্ষি জনক অপেক্ষাও তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। একদা কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমি আপনাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিব।” অজাতশত্রু

বলিলেন, “আপনি যে আমাকে এই কথা বলিলেন ইহার জন্তই আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি।”

বলাকি ও অজাতশত্রুর মধ্যে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল। উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা হইলে, বলাকি বুঝিতে পারিলেন অজাতশত্রু তাঁহা অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ। নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কাশীরাজকে বলিলেন, “আমি আপনার শিষ্যরূপে উপস্থিত হইতেছি, আমাকে উপদেশ করুন।” এখানেও ঋষিস্বভাবে অপূর্ব সরলতা। ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাহা স্বীকার করিলেন ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্ত ব্রাহ্মণঋষি ক্ষত্রিয় রাজর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। উপনিষদে ক্ষত্রিয় ও নারী ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু পুরাণে কেহ নারী-ঋষি নাই এবং এক বিশ্বামিত্র ভিন্ন অপর কেহ ক্ষত্রিয় ঋষিও নাই। বিশ্বামিত্রও ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্বী দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। উপনিষদের জনক যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞ রূপে চিত্রিত হইয়াছেন, পৌরাণিক জনক সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞরূপে অঙ্কিত হন নাই—তিনি বিদেহরাজ মাত্র।

উপনিষদের ঋষির সহজ সরল গৃহস্থ এবং তত্ত্বজ্ঞ বা তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু। পৌরাণিক ঋষির দ্বারা অতিমানুষ্য তাঁহার। আদৌ নহেন। পুরাণসমূহ কাহিনী-প্রধান। পুরাণোক্ত কাহিনীর সহায়তায় জনসাধারণের মধ্যে নীতি উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে। অপর পক্ষে উপনিষদগুলি তত্ত্বালোচনা-প্রধান। একারণ উপনিষদের ঋষিদিগকে গভীর তত্ত্বালোচনা-পরায়ণ রূপেই দেখতে পাই। ছোটখাট যে কয়েকটি কাহিনী পাওয়া যায় তাহার কাহিনী-অংশ তত্ত্বালোচনার ভূমিকা মাত্র।

ঋগ্বেদের মধ্যে বৈদিক যুগের যে সকল ঋষির নাম পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে মনু, ভৃগু, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ, কণ্ব, অজিরা, কক্ষীবান, শুনশেপ, দধীচি, দীর্ঘতমা, গোতম, চ্যবন, অগস্ত্য ইহাদের নাম পুরাণমধ্যেও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ঐ সকল বৈদিক ঋষি পুরাণকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র হন নাই। কাহিনী রচনায় ঐ সকল প্রসিদ্ধ ঋষির নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। পুরাণে যে সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবার কথা আছে তাহা অতিরঞ্জন। ঋগ্বেদে মানুষ্যের জীবনকাল এক শত বৎসর নির্দিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে।

আদিতে, অর্থাৎ ঋগ্বেদের সময়ে ঋষি বলিতে কিরূপ মানুষ্যকে বুঝাইত তাহা তাঁহাদের রচিত মন্ত্রগুলি হইতে জানিতে পারা যায়। তাঁহারা সকলেই গৃহস্থ ছিলেন। অনার্য্যদিগের সহিত প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হইত। একারণ তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইত। আর্য্যদিগের বিভিন্ন

গোষ্ঠীর মধ্যেও যুদ্ধ হইত। সুদাস রাজার সহিত ভরতবংশীয় দশ জাতির একটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধে ভরত-দিগের পুরোহিত ছিলেন বিশ্বামিত্র এবং সুদাস রাজার পুরোহিত ছিলেন বশিষ্ঠ। সুদাস জয়ী হন। বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ—ঋষি হইয়াও যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। জীবিকার জন্ত কৃষি ও গো-পালন সকল ঋষিই করিতেন। জাতিভেদ তৎকালে প্রবর্তিত হয় নাই, কাজেই ব্রাহ্মণ-ঋষি, ক্ষত্রিয়-ঋষি, এরূপ কোন পার্থক্যও তাঁহাদের মধ্যে ছিল না।

বিভা ও বুদ্ধির পার্থক্যে মানুষ চিরকালই একজন আর একজন হইতে অধিক সম্মান পাইয়া থাকে। আৰ্য্যদিগের মধ্যে যাহারা বিদ্বান্ এবং চিন্তাশীল ছিলেন ও ঋক্ (অর্থাৎ মন্ত্র) রচনা করিতেন তাঁহারা ঋষি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। ঋক্‌সমূহ প্রধানতঃ দেবতার নিকট প্রার্থনা। এই প্রার্থনা অত্যন্ত স্পষ্ট। জাগতিক ধনসম্পদের অধিকারী হইয়া নিরুপদ্রবে সুস্থশরীরে পুত্রপৌত্রাদি সহ শত বৎসর জীবিত থাকিবার কামনা। শত্রুর বিনাশ চাহিয়াও তাঁহারা দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। ইহারা সকলেই জাগতিক মানুষ এবং বাস্তববাদী ছিলেন। তত্ত্বচিন্তা মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম। চিন্তাশীল ঋষিরা পাপের অনুশোচনা করিয়াছেন, গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তা সমন্বিত উক্তিও

করিয়াছেন। এই সকল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উক্তি বিস্তৃত হইয়া উপনিষদ্ রচিত হইল। উপনিষদ্‌সমূহে ঋষিদের ধারণারও পরিবর্তন ঘটিল। তাঁহারা সাংসারিক মানুষ হইলেও জাগতিক বিষয়ে নির্লোভ, অনাসক্ত, তত্ত্ব-চিন্তাপরায়ণ ও ব্রহ্মিষ্ঠ রূপে চিত্রিত হইলেন। বৈদিক ঋষিরা ছিলেন রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ—জাগতিক ও আধ্যাত্মিকের সংমিশ্রণ। উপনিষদের ঋষিরা হইলেন আদর্শ আধ্যাত্মিক মানুষ।

বৈদিক উক্তি ও বৈদিক কাহিনী কালক্রমে লোক-মুখে পরিবর্তিত হইতে লাগিল, অপর দিকে বেদ ও উপনিষদের চর্চা সাধারণের মধ্যে ক্রমে অপ্রচলিত হইল, এই সময়ে ঐ সকল কাহিনী বহুলপরিমাণে পল্লবিত হইয়া সম্পূর্ণ এক অলৌকিক কাহিনীতে পরিণতি লাভ করিয়া পুরাণমধ্যে স্থান পাইল। তখন মূল, (অর্থাৎ ঋগ্বেদোক্ত) ঋষি চরিত্রের মধ্যে অনেকখানি কল্পনার সমাবেশ হইল। পৌরাণিক বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, গোতম, কপিল, দধীচি, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা ঐ সকল নামের বৈদিক ঋষি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন মানুষরূপে আখ্যায়িত হইলেন। বৈদিক ঋষিরা ছিলেন বাস্তব মানুষ, উপনিষদের ঋষিরা হইলেন আদর্শ মানুষ। পৌরাণিক ঋষিরা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাপ্রসূত অলৌকিক মানুষ।

নীড়ভ্রষ্ট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

নীড়হারা পাখী, নূতন কুলায়
ভালো কি লাগে না তোরা ?
বাঁধিয়াছে তোরে পুরাতন তরু
আজো দিগে মায়াডোর !
সেই কুলহারা পদ্মার জল
চেউ লেগে শুধু করে কল কল—
তারি কল্লোল-সঙ্গীতে তোরা
এখনো পরাণ ভোর !

ধেঁলু-চরা আর বেণু-বাজা সেই
পদ্মার চর আর
ওরে উন্মাদ, ফিরে পেতে চাস
রখা তুই বার বার।

ফিরে ফিরে পাবি সেই মেঠো হাওয়া,
পল্লীর বীথি ফুলে ফুলে ছাওয়া ?
সাধের কুলায় ছিল যে শাখায়
সে আজি ভাঙ্গসার !

কত তরুশাখে জনমে জনমে
বাঁধিতে যে হবে নীড়,
কত অরণ্য ডাকিবে রে তোরে
নিয়ে ছায়া স্নানিবিড় !
ভাঙ্গিবে গড়িবে কত শত বাসা,
করিবি কেবল যাওয়া আর আসা ;—
কিসের ছুঃখ ? ওরে পাখী তুই
পাবি কত নদীতীর !

একটি পুরানো প্রেমের কাহিনী

চারণচন্দ্র দত্ত

[এইরূপ শুনা যায়, বিলাতের বহু অভিজাত পরিবারে ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া এদেশে কার্যে নিযুক্ত শ্বেতকার্যগণ কেহ কেহ ইংলণ্ডে যান। তাঁহাদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততিরা ইংরেজ-সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ জনশ্রুতির মূলে যে সত্য অনেকখানি নিহিত রহিয়াছে, বর্তমান কাহিনীর বিষয়বস্তু হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আর একটি কারণে এই কাহিনী সম্বোধনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। সেযুগে যখন মোগল আমল একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই এবং ইংরেজ-প্রভুত্বও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন ইংরেজগণ ভারতবাসীর ভাষা শিখিতেন, ভারতবাসীর আচার-আচরণ গ্রহণ করিতেন, এক কথায় তাঁহাদের পুরাপুরি ভারতীয় বনিয়া যাওয়াও অশ্চর্য্য ছিল না। কিন্তু তাঁহাদেরই হাতে যখন শাসনভার গস্ত হইল তখন তাঁহারা অস্তরূপ ধরিলেন। জাতিগত পার্থক্য ক্রমে জাতি-বৈরিতায় পরিণত হইল। এই দৃষ্টান্ত হইতে বর্তমানেও আমাদের কিছু শিখিবার আছে এবং সাবধান হইয়া চলা প্রয়োজন। কেননা আজ পুনরায় কোন কোন শ্বেত-জাতি নিত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সাহিত্য ও সমাজের প্রতি সহানুভূতিতে আকুল হইয়া পড়িতেছে। বর্তমান যুগপরিবর্তনকালে ইতিহাসের শিক্ষা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।—প্রবাসীর সম্পাদক]

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ। মোগল বাদশাহীতে ভাঙন ধরেছে। দিল্লীতে বড় বড় আমীর-ওমরাও নিজের নিজের দল পাকাচ্ছেন। বাংলার গদীতে অধিরাজ অলস অকর্ষণ্য বিলাসী সুরফরাজ খান। তাঁহার শান্তিরক্ষার ক্ষমতাও নেই, ফুরশতও নেই। উড়িষ্যার পথে নাগপুরের বর্গীরা বার বার হানা দিয়ে মেদিনীপুর বর্ধমান অঞ্চল বিধ্বস্ত করছে। বড় বড় বাঙালী জমিদারবর্গ একটা বিপ্লব আসন্ন জেনে আপন আপন সৈন্যবল বাড়িয়েছেন, ভাবছেন কি করে আবার বারো-ভূঞার যুগ ফিরিয়ে আনবেন। নানাজাতীয় সাহেব কোম্পানী নানাহানে কুঠি বেঁধে বসেছেন। তাঁরাও সেনাবৃদ্ধি করছেন, গুণ্ডাগেলের মাঝে যদি কিছু সুবিধা করতে পারেন এই আশায়। ইংরেজ কলকাতায়, ফরাসী ফরাসডাঙ্গাতে, ওলন্দাজ চুঁচুড়াতে, গঙ্গাতীরে নিজ নিজ কেল্লা বেঁধেছেন। এখনও ইংরেজ-ফরাসীর, ইংরেজ-ওলন্দাজের, ইংরেজ-মোগলের মধ্যে চরম বল পরীক্ষা হয় নাই। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী শেষ পর্যন্ত কাকে বরণ করবেন, তা জানা নাই। এই পরিবেশে একটি বড় মধুর প্রেমের ব্যাপার ঘটেছিল, সেই গল্প পাঠককে আজ শোনাব।

কলকাতা ও ফরাসডাঙ্গার মাঝামাঝি ভাগীরথী-তীরে ভৈরবপুর গ্রাম, প্রধানতঃ চাষাভূমির বাস। সেই গ্রামের উপকণ্ঠে, ঠিক নদীর উপরেই, একখানি সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট-খাটো বাড়ী। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, বেশ উঁচু দাঁওয়া। সামনে ক্ষুদ্র একটি বাগান, তাতে নানাবরকম ফুল কোটে, প্রধানতঃ বড় বড় গাঁদা ও চামেলি। পিছনে উঁচু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা উঠান। সেই উঠানের এক পাশে ছোট্ট একখানি রান্নাঘর, অল্পপাশে গোয়াল। কোণে লাউ-কুমড়োর মাচা। সবটা পরিষ্কার, তকতক করছে। খিড়কির দরজা হতে একটি সঙ্গীর্ণ পথ চলে গেছে নিকটস্থ গঙ্গার ঘাট অবধি।

বাড়ীর কর্তা পঞ্চানন কাব্যতীর্থ ঠাকুর এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত। এককালে অস্ত্রতর তাঁর এক বড় টোল ছিল, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেই দিন কাটাতেন। খুব নামডাক ছিল, দেশ-বিদেশ থেকে সব ছাত্র আসত তাঁর কাছে কাব্য-সাহিত্য পড়তে। বছর দুই হ'ল সে সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ এইখানে গঙ্গা-তীরে এসে বসবাস শুরু করছেন। তাঁর এক বাণ্যবন্ধু ও ভক্তশিষ্য থাকবার জন্য বাড়ীটা করে দিয়েছেন, পণ্ডিতমশায় পূজা-অর্চনা করে কাল কাটান। কখন কখন বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেন। পরিবারে তিনটি মানুষ—ঠাকুর নিজে, তাঁর ব্রাহ্মণী ও একটি মেয়ে দুর্গা। মেয়েটি পরমা সুন্দরী, বয়স সতের বছর, বাল-বিধবা। অসাধারণ বুদ্ধিমতী, সাত বছর বাপের কাছে ব্যাকরণ ও কাব্য-সাহিত্য পড়ে সে বুদ্ধি আরও মার্জিত হয়েছে। তার সখী-সান্নিধ্য কেউ নেই, সর্বদা বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাঁর পূজা-আরাধনার আয়োজন করে দেয়। তাঁর সঙ্গে স্তব পাঠ করে, পদাবলী গায়। একেবারে পিতৃগতপ্রাণ। ব্রাহ্মণী ঘর-সংসার নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু সকল কাজের মাঝে তাঁর চোখ ছুটি যেন সদাই খুঁজে বেড়ায় বৃদ্ধ স্বামী ও আদরের কন্যাটিকে। সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের পূজা বা পাঠের কাছে বন্ধা চুপটি করে বসে থাকেন পরিপূর্ণ আনন্দে। তখন সস্তা-গুণ্ডার দিন, ভক্ত শিষ্যেরা যা দিত-থুত তাতেই এঁদের সংসার বেশ চলে যেত, কোন অভাব ছিল না, ভাবনা-চিন্তাও ছিল না।

দুর্গার কথাটা আর একটু খুলে বলি। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা মেয়ে, নির্ভাবতী ব্রহ্মচারিণী সে নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তার অন্তর একটুও নীরস ছিল না। থাকতেও পারে না, যখন সে সংস্কৃত-বাংলা কাব্য-সাহিত্যের রসগ্রহণ

করতে শিখেছে। সরস হৃদয় নইলে কি কেউ শকুন্তলা মেঘদূত উপভোগ করতে পারে, না জয়দেব বিজাপতি চণ্ডী-দাসের পদাবলী অমন মধুর স্বরে গাইতে পারে! পদাবলী গাইতে গাইতে যখন মেয়ের হুঁচোখ বেয়ে জল পড়ত, তখন বাপ-মা মুগ্ধনয়নে চেয়ে দেখতেন সেই প্রেমমূর্তি। তবে দুর্গার কাঠামোর মধ্যে এতটুকু স্বার্থপরতা কোথাও ছিল না। তাই তার হৃদয়ের প্রেম ছিল স্বচ্ছ নির্মল, সে প্রেমে কামনা-কালিমার স্পর্শমাত্রও ছিল না।

কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে একটা দুর্বিনীত অধীর সত্তা আছে। সে কখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ‘যুদ্ধং দেহি’ বলে হাঁক ছাড়বে তার কোন ঠিকানা নেই। যখন সে এই রকম কোমর বেঁধে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় তার একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। নইলে মানুষ স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে যায়। দুর্গার আমাদের শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনে এইরকম একটা সঙ্কট এসে পড়ল। ভেসে যাওয়ার মেয়ে ত সে নয়! কিন্তু তার কি কিনারা হ’ল, পাঠক শুনুন।

কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানীর কুঠীতে এক তরুণ কর্মচারী ছিল। তার নাম জন স্পেন্সার। সে বিলাতের এক পুরানো জমিদার ঘরানার ছোট ছেলে। সেদেশের আইন অনুসারে তার দাদাই সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিলেন। জন এক হাজার পাউণ্ড বকশিশ পেয়েছিল মাত্র। তাই সে দীর্ঘ ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে এদেশে এসেছিল। তখনকার দিনে বিলেতে একটা বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষে অতি সহজেই লক্ষপতি হওয়া যায়। জন বেচারী কিন্তু তিন বছরেও সেই কুবের-ভাণ্ডারের কোন সন্ধান পায় নাই। তবে সাবধানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সে তার হাজার পাউণ্ড পুজিকে প্রায় দেড় হাজারে তুলেছিল। জনকে কার্যসূত্রে রোজ জলপথে চন্দননগর যাওয়া-আসা করতে হ’ত। গঙ্গার দু’পারের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে যেত। ছেলেটি ভাবপ্রবণ; যা দেখত সবই তার কাছে নূতন, খুব ভাল লাগত। এদেশের লোককে সে অবজ্ঞা করতে শেখে নাই নেটিব বলে। বরং বাঙালী ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পথে-ঘাটে যেচে আলাপ করত, তাদিকে আদর করত, খেলনা, পুতুল, বাতাসা কিনে দিত। পাল-পার্বণে বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ পেলে আনন্দে নিমন্ত্রণ রক্ষা করত। যত্ন করে বাংলা বলতে শিখেছে—সত্যিকার বাংলা, “টুমি কে আছে” গোছ অদ্ভুত ভাষা নয়। অল্প সাহেবেরা পিছনে যতই তাকে ঠাট্টা-তামাশা করুক না কেন; সম্মুখে কিছু বলতে সাহস করত না, কারণ জন বনেদী ঘরের ছেলে এবং খুব রাশভারী। ভাবগতিক সে দেখাত যেন খুব

অল্পদিনের জুই সে ভারতবর্ষে এসেছে, এখানকার সাহেবদের নিন্দা বা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না।

আগে জন ভোরের অন্ধকারেই আহিরীটোলা ঘাট থেকে পাক্সী করে ফরাসডাঙ্গা রওনা হ’ত। এখন সূর্যোদয়ের পরে বেরোচ্ছে। এক দিন যখন ভৈরবপুরের ঘাটের কাছ দিয়ে নৌকা যাচ্ছে তখন সাহেব দেখলে যে এক অপূর্ণ সুন্দরী, সজ্জাতা, কলসী কাঁখে ধীরে ধীরে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে। প্রাতঃকালের সূর্যের আলো তার উপর পড়ে তার সমস্ত দেহখানি উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সেই সোনালী আলোতে, গঙ্গাবক্ষের সেই শীতল হাওয়াতে জনের অন্তরটা বলে উঠল, “কি সুন্দর, কি সুন্দর, এমন রূপ ত কখনও দেখি নি!” হাঁ করে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল। কে এই তরুণী, একি তার চেনা কেউ? তা কি করে হবে? সে ইংরেজ, মেয়েটি বাঙালী, দু’জনের পূর্বপরিচয় অসম্ভব। সঙ্গে যে বাঙালী কেরানীটি ছিল তাকে জন অগম্যমন্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে, “কাদের মেয়ে?” বাবুটি ধূর্ত, ভাবলে যে এই শিবির সাহেবের হাতে তুলে দিতে পারলে বেশ দু-পয়সা বকশিশ পাবে। খুব অমায়িক হাসি হেসে উত্তর দিলে, “বামুন পণ্ডিতের বিধবা মেয়ে, খুব গরীব ওরা, সন্তায় পাওয়া যাবে। চেষ্টা দেখব সাহেব?” কথাটা কানে যেতেই জনের গোলাপী নেশা ছুটে গেল, গর্জন করে উঠল, “চুপ কর, বেয়াদব। ফের ওরকম কথা মুখে আনলে মুখ ভেঙে দেব।” বাবু চেপে গেলেন, “বেশ, বেশ, সবুরে মেওয়া ফলে।” নৌকা এগিয়ে চলল। যতক্ষণ দেখা যার জন চেয়ে রইল দুর্গার পানে। তার পর আশ্বে আশ্বে পাক্সীর ভিতরে উঠে গিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

এদিকে দুর্গা যখন প্রথম দেখলে যে একটা সাহেব তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে তখন ভারি বিরক্ত হ’ল। মনে মনে “পোড়ারমুখো!” বলে মাথার কাপড় টেনে ধীরে ধীরে বাড়ী চলে গেল। পোড়ারমুখো সাহেবটা বেয়াদব ত বটেই, কিন্তু দুর্গার বুকের ভিতরটা অমন টিপ টিপ করছে কেন? ভরে? কে জানে! মুখখানি লাল টুকটুকে করে যখন উঠানে চুকল, মা জিজ্ঞাসা করলেন, “কি রে দুর্গা, মুখটা অমন রাঙা হ’ল কেন? রোদ লেগে গেছে বুঝি? কাল থেকে আর একটু সকাল সকাল ঘাটে যাও।” মেয়ে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে বটে, কিন্তু বুক তার তখনও দুর্ক দুর্ক করছে। ছি, ছি কি হ’ল তার! মালবিকার কথা, দময়ন্তীর কথা, শকুন্তলার কথা সে পড়েছে। কিন্তু বই পড়ে আর প্রেমের ধর্ম কে কবে বুঝেছে! অতনুর শরের যা এক বার খেলে তবে না বোঝা যায় তার শক্তি কেমন দুর্জয়! সে রাতটা দুর্গার ভাল করে ঘুম হ’ল না। একটা অজানা কিসের

উত্তেজনা তার অন্তরে তোলপাড় করতে লাগল। ভয়ও হচ্ছিল, আবার ভালও লাগছিল।

পর দিন সকালবেলা ঘাটে যেতেই দুর্গা দেখলে যে সেই সাহেবটির পান্সী সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সাহেব আগের দিনের মতই তার পানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। আজ সেও চোখ তুলে সাহেবকে এক বার দেখলে। চার চোখ মিলল। চোখে চোখে কিছু কথা হ'ল কি? বোধ হয় হ'ল। নৌকা চলে গেলে দুর্গা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। আজ মনটা তার কেমন হালকা বোধ হচ্ছে। পান্সী একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেইদিকে সে চেয়ে রইল। তার পর স্নানাদি সেয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে গেল। মনে-একটা খটকা লেগেছে, “আমি কিছু অত্যাচার করলাম কি?”

সারাদিন সারারাত কত কি ভাবছে দুর্গা। সাহেব দেখতে বড় সুন্দর। ছিঃ, ও-কথা কি মনে করতে আছে। দেখলে কিন্তু ভাল লোকই মনে হয়। তা হলে কি চায় সে দুর্গার কাছে? দুর্গাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে তার বাপ-মার কাছ থেকে? না, কখন নয়, সে রকম সাহেব এমন! তবে তার মতলব কি, ও রকম করে তাকিয়ে থাকে কেন? তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা হয়েছে? লোকটা নিশ্চয় পাগল। নইলে সাহেব হয়ে বামুনের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়! চায় তাই বা কে বললে? কি সব ছাই কথা মনে আসছে! না, কাল থেকে আর সকালবেলা ঘাটে যাবে না দুর্গা। এক বার ভাবলে, বাবাকে বলি সব কথা। সব কথা আবার কি! কে এক জন সাহেব তার দিকে চেয়ে চেয়ে গেছে, সেও তার পানে এক বার তাকিয়েছে। এতে হয়েছে কি? নিশ্চয় দুর্গার নিজের মাথা খারাপ হয়েছে; নইলে এমন করে তিলকে তাল করে তুলছে কেন? না, বাপকে এসব কথা বলতে বড় লজ্জা করবে। দিনকয়েক দেরি করে ঘাটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তা হলেই সাহেব তার খেয়াল ছেড়ে দেবে।

পর দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঘাটে বেরুল না, জোর করে ঘরের খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে বসল। মা খুব বকুনি দিলেন, “এখনও ঘাটে গেলি না, দুর্গা, সেদিনকার মত আবার রোদ লাগাবি!” দুর্গার মন একটা ছতো খুঁজছিল মাত্র। “এই যাচ্ছি মা” বলেই কলসী নিয়ে ছুটল নদীর পানে। ঘাটের কাছবরাবর গিয়ে দেখলে যে সাহেবের পানসী ধীরে ধীরে ঘাট পার হয়ে যাচ্ছে। সাহেব হাঁ করে ঘাটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, দুর্গা ছুটে আসছে দেখে একটু হাসলেন। দুর্গার চোখের কোণেও কি একটু হাসি ফুটে উঠল? ঠিক বলা যায় না, তবে তার মনে যে একটা আনন্দের ছোট্ট লহরী খেলে গেল, সেটা নিশ্চিত। এই রকম চলল মাসখানেক।

ক্রমশঃ দুর্গা যেন শ্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে। বড় মধুর লাগে তার এই প্রতিদিনের দেখা। এক একবার মনে করে, “এ আমি কোথায় ভেসে চলেছি?” আবার সব ভাবনা-চিন্তা বেড়ে ফেলে দিয়ে বললে, “পারি না ভাবতে। যা হবার তাই হবে। শেষ পর্যন্ত মা গঙ্গা আছেন।” বাপ-মাকে কিন্তু কিছু বলতে পারলে না লজ্জায়।

জন স্পেন্সারও গা ভাসিয়ে দিয়েছে। রোজ সকাল-বেলায় দুর্গাকে দেখে দিনটা বেশ গোলাপী নেশায় কেটে যায়। সেই কেরানী বাবুটি ত রোজ সাহেবের সঙ্গে পানসীতে থাকে, সাহেবের রকম-সকম নজর করে দেখে। দুই একবার বলেওছে, “কেন কষ্ট পাচ্ছেন, স্ত্রীর! হুকুম পেলে অতি সহজেই আমি ঠুঁকে এনে দিতে পারি। এ রকম ত রোজই হয় হজুর!” খুব তাড়াও খেয়েছে প্রভুর কাছে, “দূর হয়ে যা, শয়তানের বাচ্চা। খবরদার, এসব নীচ কথা মুখে আনবে না!” দুর্গাকে জন ছাড়তেও পারছে না, আবার তাকে অপমান করা, তার ক্ষতি করাও জনের পক্ষে অসম্ভব। খুব জোর করে নিজেকে বলে, “না, ইংরেজ-ভদ্রলোকের ছেলে স্ত্রীলোককে অপমান করে না। যাকে ভালবাসি, তার মানসম্মত রক্ষা করতে না পারি ত কিসের ভদ্রলোক আমি!” অনেক ভেবে-চিন্তে নিজের কর্তব্য স্থির করলে, সে দুর্গার বাপের কাছে যাবে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। সে বিলেতী সাহেব, অত কি জানে যে হিন্দুর সঙ্গে খ্রীষ্টানের বিয়ে হয় না। যদি সে রকম কোন কথা শুনেও থাকে ত সেটা অন্ধ কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে সে প্রস্তুত। কেরানীবাবুকে এক দিন বললে বিবাহ-প্রস্তাবের কথা। বাবু হো হো করে হেসে উঠল, “বলেন কি, হজুর, বামুনের ঘরের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করবেন! আমি বলতে গেলে আমাকে জুতো-পেটা করবে।” জন উত্তর দিলে, “তোমাকে কিছু বলতে যেতে হবে না, বাবু। তুমি নৌকায় বসে থাকবে, যা বলবার আমি নিজে গিয়ে বলব। যদি আমার বাংলা বিছাতে না কুলোয়, তা হলে তোমাকে ডাকব।” বাবু মনে মনে হেসে বললে, “বিয়ে না নিকে! যা হোক আমার খটকবিদায়টা না মারা যায়, দেখতে হবে।”

বিয়ের কথা যে দুর্গার মনে একেবারে আসে নি, তাও নয়। এই এক মাস ধরে সে কত কুখাই না ভেবেছে! কাব্য-সাহিত্যে সে গান্ধার্ব বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত পেয়েছে। গান্ধার্ব বিবাহ যে জাতকুলের বাধা মানে না, তাও সে জানে ত। এসব কথা ভাবতে ভাবতে দুর্গার ছোট্ট কান দুটি লাল হয়ে উঠত। বড় ভাল লাগত তার এই সব দিবাসপ্র। তবে এই স্বভাব-পবিত্র ব্রাহ্মণ কন্যার স্নিগ্ধ মধুর প্রেমের মধ্যে লালসার কোন ছোঁয়াই ছিল না। তার একবারও মনে

হ'ত না যে সাহেবকে ভালবেসে সে নিজেকে কোন রকমে খাটো করছে। তবু বাবা মা মত না দিলে সে বিয়ে করবে না, এটা নিশ্চিত। পূজায় বসে ঠাকুরের চরণে কত প্রার্থনাই না সে জানাত! দেখা যাক, ঠাকুর শেষ অবধি কি ভাবে নিষ্পত্তি করলেন দুর্গার সমস্যা।

এক দিন সূর্য উঠতে না উঠতে সাহেবের পানসী এসে লাগল ভৈরবপুরের ঘাটে। সাহেব লাকিয়ে নেমে পড়লেন। ঠিক সেই সময়ে দুর্গা কলসী নিয়ে আসছিল নদীর পানে; জনকে নামতে দেখে সে কেমন যেন ভয় পেয়ে একছুটে বাড়ী পালাল। মা উঠানে বসে তরকারি কুটছিলেন। দুর্গা তাঁকে জড়িয়ে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, “মাগো, কে একজন সাহেব এসেছে বাবার কাছে।” বলতে বলতে একবার তার মুখখানি পাক্সাশ হয়ে গেল, আবার তখনই শিরায় শিরায় একটা রক্তের বলক উঠে মুখে যেন সিঁদুর লেপে দিলে। দু'হাতে চোখ ঢেকে দুর্গা ছোট্ট মেয়েটির মত-মায়ের কোলে গুয়ে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কঁাদতে কঁাদতে চুপি চুপি মাকে কত কথাই বললে। আজ আর তার কোন লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। জীবন-মরণের সমস্যা এসে পড়েছে। ওদিকে, জন যখন নৌকা থেকে নেমে দেখলে যে দুর্গা দৌড়ে পালাচ্ছে তখন একটু থমকে দাঁড়াল। তার পর, বর দুই গা বাড়া দিয়ে বললে, “না, কর্তব্য যখন স্থির করেছি আর ইতস্ততঃ করব না।” বলে মাথা উঁচু করে দৃঢ় ভাবে দুর্গাদের বাগানের দিকে এগোল। পণ্ডিত মশায় তখন খুরপি নিয়ে বাগানে কাজ করছিলেন। একজন শ্বেতকায় ভদ্রলোককে চুকতে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, “কাকে চান আপনি সাহেব?” জন সসম্মমে টুপী তুলে উত্তর দিলে, “আপনার কাছেই এসেছি, মশায়। আমার একটা বিনীত প্রার্থনা আছে।” ঠাকুর মশায় হেসে উঠলেন, “উপহাস করছেন, সাহেব? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত, আপনি সম্ভ্রান্ত বণিক, আমি আপনাকে কি দিতে পারি বলুন?” জন একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললে, “না, উপহাস করি নেই, মশায়। এ উপহাসের কথা নয়। আপনার এক অনূল্য রত্ন আছে, সেই রত্ন আমি ভিক্ষা করতে এসেছি। আপনার মেয়েকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। তাকে আপনি দয়া করে আমার হাতে দিন। আমি পুরানো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, আপনার মেয়েকে যথাসাধ্য যত্নে আদরে রাখব। বিবাহ করে তাকে আমি আমার দেশে নিয়ে যাব।” ব্রাহ্মণ অট্টহাসি হেসে উঠলেন, “সাহেব, তুমি পাগল। বামুনের মেয়ের সঙ্গে কি খ্রীষ্টান সাহেবের বিয়ে হয়!” জন আজ সাহসে বুক বেঁধে এসেছে; বিনীত স্বরে বললে, “বিবাহ

হিন্দুমতে না হতে পারলেও খ্রীষ্টানমতে হতে পারে। আপনি সদয় হয়ে অনুমতি দিলেই আমি সব ব্যবস্থা করব।” ব্রাহ্মণ প্রসন্ন বদনে জনের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন, “সাহেব, তুমি সত্যই বড় ভাল লোক। আমি বুড়ো মানুষ, দীন দরিদ্র, এ দেশের রাজা অক্ষম অকর্মণ্য, তুমি ইচ্ছা করলেই দুর্গাকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারতে। তা না করে তাকে তোমার ধর্ম অনুসারে বিবাহ করতে চাইছ। জান, সাহেব, এক দিন আমাদের দেশে গান্ধর্ব বিবাহ হ'ত? সে বিবাহে জাতকুলের কোন কথাই উঠত না। আজকের সমাজে কিন্তু তা চলে না। আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। বর-কনে পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরাগী না হলে গান্ধর্ব বিবাহের কথাই ওঠে না। তুমি ত আমার দুর্গাকে চেনই না!” জনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সলজ্জ হাসি হেসে উত্তর দিলে, “তার সঙ্গে আমার কোন দিন বাক্যালাপ হয় নেই বটে। কিন্তু আজ এক মাস দু'জনে দু'জনকে দেখছি। আমার মনে হয় না যে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। তবে তিনি যদি আমাকে না চান, তা হলে আমি চিরদিনের জ্ঞাত বিদায় নেব, আর আপনাদের কাছে দেখা দেব না।”

এই রকম দু'জনে কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় ব্রাহ্মণী বেরিয়ে এলেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি দোরের আড়াল থেকে তোমাদের সব কথা শুনেছি। মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে সাহেবকে কোন জবাব দিও না। মেয়ে আমাকে আজ অনেক কিছু বলেছে।” ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, “মা, একবার এখানে আয় ত!”

দুর্গা মাথা হেঁট করে এসে দাঁড়াল। বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, “খুকী, তুই এই সাহেবকে চিনিস?” দুর্গা একবার সাহেবের দিকে চেয়ে দেখে মাথা-নেড়ে জানালে যে সে তাঁকে চেনে। বাপ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “সাহেব তোকে খ্রীষ্টান ধর্মমতে বিয়ে করতে চান। তোর কি তাতে মত আছে?”

মেয়ে কোন উত্তর দিলে না; লজ্জায় তার মাথা বুকের উপর নুয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ কাছে গিয়ে আদর করে মুখখানি তুলে ধরতেই তার দু'চোখ বেয়ে জল ব'র ব'র করে পড়তে লাগল। ব্রাহ্মণী একটু হেসে বললেন, “কি আর জিজ্ঞাসা করছ, ঠাকুর? দেখছ না যে মেয়ে তোমার স্বয়ম্বরা হয়েছে! ওকে আর আটকে রেখে কি হবে? আটকে রাখলে ও বাঁচবে না। এখন বুঝতে পারছি যে, কেন আজ একমাস থেকে মেয়ে ভাল করে খায় না, ঘুমোয় না, সদাই যেন আনমনা। তুমি সমাজের ভয় ছেড়ে দিয়ে ওকে সাহেবের হাতে তুলে দাও, দু'জনকে আশীর্বাদ কর,

সুখী হোক। এতে আমরা ভগবানের চোখে দোষী হব না, সমাজ যাই বলুক না কেন।”

ব্রাহ্মণ একটুকু চুপ করে রইলেন। তার পর জনকে কাছে ডেকে বললেন, “বৎস, তুমি আমার খুকীকে নাও। আমি ওকে খুশী হয়ে তোমার হাতে সমর্পণ করছি।” দুর্গার হাত জনের হাতে রেখে আশীর্বাদ করলেন, “ভগবান তোমাদিকে সুখী করুন। সমাজের সঙ্গে একটু ছলনা করতে হবে, তা আমি করব।” জন সাহেব হলোও একেবারে কাঠখোঁটা ছিল না। চোখ মুছতে মুছতে করুণ স্বরে বললে, “ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। আমি দুর্গাকে সকল রকমে সুখী করতে চেষ্টা করব।”

উপসংহার দীর্ঘ নয়। কয়েকদিন পরে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মেয়েকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরলেন। তিন মাস পরে যখন দেশে ফিরলেন, তখন দুর্গা তাঁদের সঙ্গে নেই। সবাইকে বললেন, “মেয়েটা তিন দিনের ব্যারামে কাশীতে মারা গেল, সবই অদৃষ্ট!”

এদিকে জন দুর্গাকে যথারীতি কলকাতার বড় গীর্জায় বিয়ে করে তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বিলেত চলে গেল। কেননা খবর এসেছিল যে কয়েক সপ্তাহ আগে তার দাদা হঠাৎ মারা গেছেন। জন এখন আইন অনুসারে বিশাল পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হয়েছে; এখন তার বিলেতে জমিদারীতে বাস করা একান্ত আবশ্যিক। কয়েক মাস পরে সার জন ও লেডী স্পেন্সার তাঁদের পুরানো ভ্রাসন স্পেন্সার হল-এ বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। ইংরেজী ভাষা ও আদব-কায়দা আয়ত্ত করতে দুর্গার মত বুদ্ধিমতীর বেশী দেবী হ’ল না। অল্পকালের মধ্যেই সে নিজগুণে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল।

ভৈরবপুরে বুড়োবুড়ী বড় হুংখে দিন কাটাচ্ছেন। একে ত মেয়ের জন্ম অহরহ মন কেমন করছে, তার উপর দারুণ অর্থকষ্ট। যে শিষ্য বন্ধুটী বসন্তবাড়ী করে দিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে অর্থসাহায্য করতেন, তিনি একেবারে বৈকে দাঁড়িয়েছেন। কেননা লোকের মুখে মুখে একটা কথা রটেছিল যে, দুর্গা একজন ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, আর সেই ফিরিঙ্গীটার কাছে বামুন টাকা পেয়েছে। ক্রমশঃ সবাই ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করলে। মনের হুংখে পরসার অভাবে বুড়ো বয়সে তিনি যজমানরত্তি আরম্ভ করলেন, তাও বহু দূরদূরান্তের গ্রামে।

প্রায় তিন বছর পরে একদিন বুড়োবুড়ী জীর্ণ বাড়ী-খানির দাওয়াতে বসে সুখ-দুঃখের কথা ক’ইছেন। বুড়ী স্নান মুখে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হ্যাঁগা, তোমার কি মনে হয় ওরা ভাল আছে? কতদিন কোন খবর আসে নি।” ব্রাহ্মণ বললেন, “চিঠি ত সেই একখানা মাত্র এসেছিল আর বছরে খোকার জন্মের খবর দিয়ে। কিন্তু দেখ, আমার দেবতা বলছেন, সবাই ভাল আছে, সুখে আছে। তুমি ভেব না।” বলতে বলতে হঠাৎ ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে উঠলেন, “ওগো দেখ, দেখ, ঘাটে একখানা মস্ত বড় পাননী লেগেছে, কারা সব নামছে। ওঠ, গিন্নী ওঠ, মেয়ে জামাই এসেছে দেখছ না! ওগো, আর কে এসেছে, জান? ঐ দেখ, দেখ, দুর্গার কোলে খোকা!” এই না বলে দৌড়লেন হুঁজনে ঘাটের পানে। জন দুর্গা ছুটে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। খোকা বাঁপিয়ে পড়ল দিদিমার কোলে। তার পর সবাই মিলে দাওয়াতে বসে কত সুখ-দুঃখের গল্প করলেন। যাওয়ার আগে জন খুঁড়কে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে এই অনুরোধ করলে, “বাবা, যদি আপনার অনুমতি পাই ত আমার বড় সাধ যে এইখানে আপনার আর মায়ের জন্ম একটা কোঠা-বাড়ী তুলে দিই, আর বন্দোবস্ত করে যাই যে কলকাতার কুঠী থেকে মাসে মাসে কিছু টাকা আসবে আপনাদের নিত্য খরচের জন্ম। আমাদের জন্ম অনেক কষ্ট পেয়েছেন-হুঁজনে। এইটুকু ব্যবস্থা আপনাদের জন্ম করতে দিন। টাকা আমি দিচ্ছি না, আপনার মেয়ে নিজে দিচ্ছেন।” একটু ইতস্ততঃ করে বৃদ্ধ শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। জন দুর্গা যে ক’দিন কলকাতায় ছিল, রোজ একবার খোকাকে নিয়ে ভৈরবপুর আসত। তার পর সময় হলে তারা বিলেতে ফিরে গেল।

যথাসময় কোঠাবাড়ী উঠল, বুড়োবুড়ী সেখানে থাকতে গেলেন। কলকাতা হতে নিয়মিত টাকাও আসতে লাগল। যজমানদের বাড়ী বাড়ী ঘোরার দায় হতে বৃদ্ধ মুক্ত হলেন। কিন্তু অদৃষ্টে না থাকলে কি আর সুখ পাওয়া যায়!

বিলেতে ফিরে যাবার বৎসরখানেক পরেই প্রথমে খোকা, তার পর দুর্গা মারা গেল। কলকাতার কুঠীর বড়সাহেব সেই হুংসংবাদ ভৈরবপুরে দিলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সে নিদারুণ শোক সহ হ’ল না। কয়েক মাস মাত্র রোগ-ভোগ করে তাঁরা পর পর মেয়ের কাছে চলে গেলেন।

বছরখানেক বাদে জন যখন ভারতবর্ষে এল তাঁদিকে দেখতে, তখন তাঁরা দুজনেই পরলোকে, বাড়ী জ্ঞাতিদের দখলে। সেই বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজও আছে, অন্ততঃ কিছু দিন আগে অবধি ছিল—ছুটি বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন দেশের তরুণ-তরুণীর বিমল প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ।

কবিগুরু 'চিত্রা' কাব্যে রূপলোক ও ভাবলোক

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের জীবনে সত্যের সহিত পরিচয় দুই প্রকারে হইয়া থাকে। এক হইল রূপের মধ্যে যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করি তাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বস্তুজগতের নানা ঘট-প্রতিঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা নিয়ত স্পর্শ করিয়া আমাদেরকে তৎপ্রতি সচেতন করিয়া রাখে। সে সত্যকে তুলিয়া থাকিবার জো নাই, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য, আমাদের ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর। এই যে রূপ-সত্য, তাহার সহিত আমাদের পরিচয় সহজ ও ঘনিষ্ঠ। জীবনের প্রারম্ভেই তাহার সহিত আমাদের পরিচয় শুরু এবং তাহার সহিত সর্ব্ব বাবহারে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত।

আর একটি সত্য আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করে; তাহা হইল ভাব-সত্য। এই সত্যের স্থান আমাদের মনে, তাহার স্বীকৃতি আমাদের উপলব্ধিতে। রূপ-সত্যকে যেমন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূলভাবে স্পর্শ করি, এই ভাব-সত্যকেও তেমনি আমাদের বিভিন্ন, বিচিত্র অনুভূতিগুলির দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিয়া যাই। তাহাকে আমরা আমাদের মনের মধ্যে আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া অনুভব করি, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া কোনমতে উড়াইয়া দিতে পারি না। অথচ তাহা রূপ নয়, তাহা ভাব মাত্র, তাহাকে হাতে ধরিয়া রূপজগতে হাজির করিবার উপায় নাই, তাহা মনের দ্বারাই উপলভ্য। রূপ-সত্য যেমন বৈজ্ঞানিক, ভাব-সত্য তেমনি আধ্যাত্মিক।

আমাদের ভাব-সত্য রূপজগতের সহিত আমাদের ব্যবহারকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। এই ভাবলোকের সত্যকে আশ্রয় করিয়া ঘিরিয়া থাকে আমাদের আদর্শ, আমাদের আশা-ভরসা, আমাদের সাধনা। রূপ-সত্য আমাদের জীবনকে সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে, ভাব-সত্য আমাদের জীবনকে একটা অসীমতার দিকে পরিবর্তিত করিয়া দেয়। রূপলোক ও ভাবলোক লইয়া আমাদের জীবন সংহত ও বিস্তৃত। ইহাদের কোন একটিকে অস্বীকার করিলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। যদি ভাবলোককে আমরা রূপলোক হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখি তবে জীবনের সহিত তাহার যোগ দুর্বল হইয়া যায়, তবে সেখানকার সত্যকে আমরা সন্দেহ করিতে থাকি, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "বাহিরের জগতে মানুষের যে পরিচয় সেইটেকেই তার প্রতিষ্ঠা। বাহিরের এই পরিচয়টি যদি ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোন অংশে না মেলে তা হলে তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে।" অর্থাৎ, বাহির এবং ভিতর এই উভয়ের পরস্পরের যোগ না থাকলে কোন একটি সত্য পরিপূর্ণ মর্যাদা পায় না। বাহিরের দিকটিকে অস্বীকার করিয়া আত্মগত ভাবসাধনার মধ্যে সত্যকে ধরিতে চাহেন এরূপ escapist-

এর (পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন) সংখ্যা আমাদের দেশে বিরল নয়। বস্তুতঃ ভাবকে রূপের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দেখা একটি শিল্পী-দৃষ্টি। সে শিল্প-প্রতিভা সকলের থাকে না। শিল্পী তাঁহার ভাবকে রূপায়িত করেন; আমরা সেই রূপ হইতে ভাবকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সত্যকে অনুধাবন করি।

এই শিল্প-কর্মটি খুব সহজ নয়। কত বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়া আমাদের জীবন এই রূপজগতে বিস্তৃত; আমাদের ভাব-সত্যটি এই বৈচিত্র্যের সংস্পর্শে আসিয়া নানা বিরোধের সম্মুখীন হয়। এমন সাধক খুব কমই আছেন যাহারা তাঁহাদের জীবন-সত্যটিকে শত বিরোধের মধ্যেও অবিকৃত অবস্থায় ধরিয়া রাখিতে পারেন। তাঁহাদেরই জীবন-শিল্পী বলা যাইতে পারে, শত বন্দ-বিরোধের মধ্যেও যাহাদের জীবনের প্রকাশটি তাঁহাদের জীবন-সত্যকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রূপায়িত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এমনই এক জীবন-শিল্পী। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-জীবনদর্শন সামগ্রিকভাবে পধ্যালোচনা করিলে আমরা এই জীবন-শিল্পীর শিল্প-প্রকাশ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের নিগূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে পারিব। ইহা গভীর ও বিশদ আলোচনাসাপেক্ষ, একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সুষাগ নাই। চিত্রা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় তাঁহার ভাবলোক ও রূপলোক স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; বর্তমান প্রবন্ধে ইহারই আলোচনা করিয়া কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কবিচিন্তার ক্রিয়াটি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

'মানসী'র কবি রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার বাসনা-কামনাময় ভালবাসা লইয়া রূপজগতের মধ্যে আপনার মানসিক ভোগের সন্ধান করিতেছিলেন তখন সেখানে রূপলোকের সহিত ব্যবহারে তাঁহার চিত্ত কেবলই অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। কবিপ্রকৃতি এই অশান্তি ও বিক্ষুব্ধতাকে একটা কাব্যসৃষ্টি দিয়া নিবৃত্ত হইতে চাহিয়াছে সত্য, কিন্তু রূপলোকের সহিত কবির ব্যবহারটি সহজ হইয়া উঠে নাই। কবি আপনার মধ্যে যে তৃষ্ণা অনুভব করিতেছিলেন, রূপলোকে সে তৃষ্ণা মিটিতেছিল না। রূপলোক যেন কবিচিন্তকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া বাধিতে পারিতেছিল না, কবিচিন্ত তাহাকে ছাপাইয়া উঠিতেছিল। ইহাতে রূপলোকের অপূর্ণতা ও দীনতা কবির কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং কবি ইহাই পূর্তির জন্ম আপনার মানসলোকে রূপকে একটি ভাবের সাধনায় গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। এইরূপে ধীরে ধীরে মানসীতে কবির মানসিকতায় একটি ভাবলোক গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেখানে কবি তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জড়ো করিয়াছেন। এই ভাবলোকের পিছনে রূপলোকের একটা আবেদন থাকিলেও সেখানে বাস্তব-সত্যকে ছাড়াইয়া কবিস্বলভ ভাবকল্পনাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কবির এই মানসবিহারটি গগনবিহারী বিহঙ্গের পক্ষ-বিস্তারের জায় প্রতীয়মান হয়। দেখি, কবির মন-বিহঙ্গটি পৃথিবীর বৃক্ষে যে নীড় বাঁধিয়াছিল, বৃক্ষের আন্দোলনে সেই নীড়টিকে ছাড়িয়া কেবলই তাহার চারিপাশের আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। যে বৃক্ষে তাহার বাস, সেই বৃক্ষটিকেও যেমন সে ভাল করিয়া চেনে নাই, বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া যে অসীম শূন্য সে তাহার পক্ষ বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, সেই আকাশকেও সে তেমনি চেনে নাই। রূপলোক ও ভাবলোক উভয়ের সঙ্গেই তাহার পরিচয় অসম্পূর্ণ। তাই ভয়-ভাবনা, আশা-নিরাশা, স্বথ-দুঃখের কাকলিতে এই ক্ষণটি মুগ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর জীবনের সহিত পরিচয় ক্রমশঃ যত গভীর হইতে লাগিল, ততই রূপলোক কবির কাছে আপনার অর্থ লইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ভাবলোকে কবির পক্ষবিলাসও গভীরতর তাৎপর্যলাভ করিল। মানসীর পর 'সোনার তরী'তে কবির মনে একটি দার্শনিক বোধ সঞ্চারিত হইয়া উঠিল এবং তাহাতে কবির ভাবলোক একটি নূতন উপাদানে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এই দার্শনিক বোধটি কোন এক জ্ঞানসাপেক্ষ তত্ত্ব হিসাবে কবির চিত্তকে সমৃদ্ধ করে নাই, পরন্তু তাহা জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে একটি বেদনাময় উপলব্ধির মধ্য দিয়া কবিচিন্তে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। 'তুই পানী' কবিতাটিতে এই অভিজ্ঞতার কথাটি বলা হইয়াছে। খাঁচার সঙ্কীর্ণ গুণ্ডির মধ্যে জীবনের যে প্রকাশ, একটা বৃহত্তর জীবন কেবলই তাহার উপর স্পর্শ রাখিতে চাহিতেছে এবং খাঁচার বাধা দূর করিয়া ক্ষুদ্রকে বৃহত্তর মধ্যে লীন করিতে চাহিতেছে। এই বৃহত্তর জীবনবোধে কবির ভাবলোকটি এখানে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবি 'দীপ্তি-ভরা নয়নমাঝে তৃপ্তিহীন তৃষা' লইয়া এই নূতন জগতে উপস্থিত হইয়াছেন। এখনও ইহার সম্যক পরিচয় পান নাই; আপনার 'ছোট ক্ষেত' হইতে ইহাকে একখানি 'তরু-ছায়া-মসী-মাথা' মেঘে ঢাকা গ্রামের মত প্রতীয়মান হইতেছে। কবি শুধু কল্পনায় সেই ঘূমের দেশে নিদ্রিতা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর, গলায় মালা পরাইয়া দিয়া আসিতে পারেন, তাহার শুভ-দৃষ্টীলাভ করিবার সৌভাগ্য তাহার এখনও হয় নাই। একদা জীবনের নবীন প্রভাতে কবি সেই বিদেশিনীর আহ্বান শুনিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইলেন। সেখানে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পার হইয়া গভীর তিমিরময়ী রাত্রির মধ্যে পথ কোথায় চলিয়া গিয়াছে! সোনার ফসল ফলাইতে ফলাইতে কবি এই পথে চলিতে লাগিলেন। এই যাত্রার মূলে যে সত্যটি রহিয়াছে, 'সোনার তরী' কবিতাটিতে তাহা অতি সুন্দর-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

'সোনার তরী'তে এই যে একটি বৃহত্তর জীবনবোধ কবির ভাবলোকে পুষ্ট করিয়াছে, চিত্রা কাব্যে তাহাই রূপজগতে প্রতিকলিত হইয়াছে এবং কবির রূপলোক ও ভাবলোক নূতন অর্থ লইয়া স্ব স্ব বিশিষ্টতায় কবির মনোজগতে ধরা পড়িয়াছে।

চিত্রায় 'স্বথ' কবিতাটিতে কবির রূপলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে রূপলোকের নূতন অর্থটি কবির কাছে অভিব্যক্ত

হইয়াছে। মেঘমুক্ত প্রসন্ন আকাশের তলায় কবি দৈনন্দিন পৃথিবীর ছবিটি দেখিতেছেন এবং অন্তরের মধ্যে একটি অনাবিল শান্তি অনুভব করিতেছেন। এখানে রূপবস্ত্র সাধারণ ও সামান্য : অর্দ্ধময় বালুচর, ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু, প্রচ্ছন্ন কুটির, বক্রশীর্ণ গ্রামাপথ, কৌতুকালোপে মগ্ন স্নানরত গ্রামবধূগণ, নৌকার উপরে কণ্ঠনিরত জেলে ও তাহার উলঙ্গ বালক, আতপ্ত পবনে সঞ্চারিত আত্মমুকুলের গন্ধ ও বিহঙ্গের মধুর স্বর,—এ সকলি একটি শাস্ত ছন্দ রক্ষা করিয়া কবি-চিত্তে গভীর ও সহজ ভাবের আবেদন জানাইতেছে। ইহা যেন বিশ্ববীণা হইতে গানের মতন উঠিয়া সমস্ত গগন নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে প্রকাশ করিতে কবি উৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু ইহাকে ধরা তো সহজসাধ্য নয়। এই রূপকে যখনই আঁকড়িয়া ধরিতে বাইতেছেন, বাসনার মধ্যে, ভোগের মধ্যে যখনই তাহাকে আবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন, তখনই তাহার মধ্যে স্তম্ভের ব্যঞ্জনা অন্তহিত হইতেছে। তাই কবি এখানে মানসীর যুগের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়াছেন :

কঠিন আগ্রহভরে

ধরি তারে প্রাণপণে মুঠির ভিতরে

টুটি যায়, হেরি তারে তীব্রগতি ধাই

অন্ধবেগে বহুদূরে লজ্জি চলি যাই,

আর তার না পাই উদ্দেশ।

ইহারই জ্ঞান মহাবিশ্ব-সঙ্গীতটিকে কবি সহজে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। এই অপ্রকাশের বেদনা কবির কাব্যজীবনে বরাবর রহিয়া গিয়াছে। বলাকাতেও কবি বলিতেছেন :

যে কথা বলিতে চাই,

বলা হয় নাই,

সে কেবল এই

চির দিবসের বিশ্ব অধি সম্মুখেই

দেখিছ সহস্রবার

দুয়ারে আমার।

অপরিচিতের এই চির পরিচয়

এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়,

সে-কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী

আমি নাহি জানি ॥

মানসীর যুগে রূপলোকের মধ্যে এই বিশ্ব-সঙ্গীতটির পরিচয় কবি পান নাই (অবশ্য 'অহল্যা' কবিতাটিতে ইহার একটি অনুকরণ লক্ষিত হয়); চিত্রায় রূপলোকের মধ্যে এই বিশ্ব-সঙ্গীতটিকে, এই শাস্ত সরল ছন্দটিকে তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন এবং তাহার উদ্দেশে প্রণতি জানাইয়াছেন। 'বিজয়িনী' কবিতাটিতেও সমগ্র বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্যের কেন্দ্রীভূত সত্তার কাছে অনঙ্গদেবতার অনুরূপ একটি প্রণাম দেখি। সৌন্দর্য-সত্যকে অনঙ্গ-দেবতা ভোগের মধ্যে বাঁধিতে পারেন নাই, তাহাকে প্রণাম জানাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

চিত্রায় রূপলোকের মধ্যে এই সহজ সবল ছন্দের আবিষ্কারটি অভিনব। ইহাতে কবি রূপলোকের মধ্যে একটি মহিমা দেখিতেছেন, একটি গভীরতাও ব্যাপ্ত দেখিতেছেন। এখন তিনি পূর্ণিমার আলোতে একটি লোক-লোকান্তরপূর্ণ মৌন বাণী ব্যঞ্জনা দেখিতেছেন, ধূলির মধ্যে ব্রতচারিণী মাতৃমূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ধূলিকে উদ্দেশ্য করিয়া কবি বলিতেছেন :

অগ্নি ধূলি, অগ্নি তুচ্ছ, অগ্নি দীনহীনা,
সকলের নিয়ে থাক নীচতম জনে
বক্ষে বাঁধিবার তরে ; সহি সর্ব ঘৃণা
কারে নাহি কর ঘৃণা। গৈরিকবসনে,
হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা
বিশ্বজনে পালিতেছ আপন ভবনে।
নূতনেই নিবিচারে কোলে লহ তুলি,
পুরাতনে বক্ষে ধর, হে জননী ধূলি ॥

এইরূপে বাহা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ কবিদৃষ্টিতে তাহা মহিমা লাভ করিতেছে। রূপলোকে বাহা অসম্পূর্ণ সহস্র আঘাতে চূর্ণ, বিদীর্ণ, বিকৃত, মৃত্যুর দ্বারা নানা ভাবে খণ্ডিত, কবি মৃত্যুর পরপারে তাহারও একটি সম্পূর্ণতা, সফলতার সম্ভাবনা আশা করিতেছেন :

হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়
অনিভা চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে অপূৰ্ণ নূতন রূপে
হয় সে সফল।
চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,—
জন্মান্তর নবপ্রাতে সে হয়তো আপনাতে
পেয়েছে উত্তর ॥

এই রূপলোক অনিত্য, চঞ্চল, বিফলতাময় ; কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন জলস্থল, নভঃস্থল মৌন, স্তম্ভিত, বিধাদে নিমগ্ন তখন সেই ধূসর সন্ধ্যায় এই পৃথিবীর দিকে চাহিয়া কবি তাহার জীবন-যাত্রাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। কবির মনে হইতেছে, ধরিত্রী যেন আপনার মধ্যে একটি পরিদ্রুতনোন্মুখ জীবনকে ধারণ করিয়া আছে ; নীহারিকা হইতে তাহার স্রব এবং লক্ষ কোটি জীব বক্ষে ধারণ ও লালন করিয়া বহু দুঃখ-ক্ষতির মধ্য দিয়া আজ তাহার বর্তমান পারগতি। এই জীবধাত্রী জননীর কাজ এখনও শেষ হইয়া যায় নাই, সে ভবিষ্যতের ঘোর তমসার দিকে চাহিয়া আপনার শেষ সার্থকতা খুজিতেছে :

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার
গাঢ়তর নীরবতা—বিশ্বপরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে স্রগভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন, ঠিকি ক্লান্ত স্বপ্ন
শূন্যপানে—“আরো কোথা ! আরো কতদূর।”

এইরূপে রূপলোকে কবি সামগ্রিক ভাবে দেখিতেছেন এবং ইহাতে এক দিকে যেমন সেখানে একটা সহজ স্ত্রী ও সার্থকতা দেখিতে পাইতেছেন, অপর দিকে তেমনি একটি বৃহত্তর পটভূমিকায় জীবনকে অবলোকন করিয়া জীবনের মহত্তর ধর্মগুলি এবং জীবনের দীনতা উভয়ই অনুভব করিতেছেন। ‘ব্রাহ্মণ’ এবং ‘পুরাতন ভূত’ কাহিনী দুইটিতে জীবনের সত্যধর্ম ও প্রেমধর্মের মহান রূপ দেখাইয়াছেন, আবার ‘দুই বিঘা জমি’তে উৎপীড়কের হীন অত্যাচারের ছবি স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়াছেন। ‘নগর-সংগীত’ এবং ‘নীতে ও বসন্তে’ কবিতায় আমাদের প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ জীবনকে কবি বিজ্ঞপ করিয়াছেন। রূপলোকের মধ্যে কবি যে ব্যাপ্তি, যে স্ত্রীকূ দেখিতেছেন আমাদের নাগরিক জীবনের তুচ্ছতা ও সঙ্কীর্ণতা তাহার অনেকখানি ব্যাহত করিতেছে। ইহাতে কবিচিন্তে বিরোধ জাগিয়াছে এবং তাহা কবিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্যাচায়াইষ্ট করিয়াছে। কিন্তু চিত্রা কাব্যে রূপজগতের সহিত ব্যবহারে স্নেহের স্রব মুখ্য হইয়া উঠে নাই, কারণ কবির অন্তলোকে একটি বৃহত্তর, পূর্ণতার ও মহিমার ভূমিকা রহিয়াছে এবং তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে কবি বাহা তুচ্ছ, বাহা দীন তাহাকে-শোধন করিয়া লইতে চাহিতেছেন, তাহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য, একটা সার্থকতা দেখিতে চাহিতেছেন।

এই ভাবলোকে কবি একটি অভিনব উচ্চতর মানসিক ভোগের সন্ধান করিতেছেন, সেখানে এক সম্পূর্ণতাকে ধরিতে চাহিতেছেন। তাহা এই রূপলোকের পরপারে রহিয়াছে। রূপলোকে কবি তাহাকে ধরিতে পারিতেছেন না, কিন্তু রূপ হইতেই সেই অরূপের তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিতেছে। পূর্ণমা রাতে যখন চতুর্দশ ওষ্ম জ্যোত্স্নার আবেশবিহীন, তখন সেই রূপলোকের মধ্যে থাকিয়া কবির চিত্ত অরূপ-সৌন্দর্যের তৃষ্ণার আকুল হইয়াছে :

আমি যে কাতর
অনন্ত তুষার আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চির রাজিদিন,
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর মন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি—বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে নাহি তার সীমা ?

অনন্ত আকাশ হইতে চন্দ্রলোক আসিয়া কবিকে স্পর্শ করিতেছে, তাঁহাকে তৃষ্ণায় ব্যাকুল করিতেছে, কবি সেই রূপের পর্দা সরাইয়া তাহারই পরপারে রূপাতীতকে ধরিতে চাহিতেছেন :

কোনো মত দেখে নাই
যে দিব্যমুরতি আমাদের দেখাও তাই
এ বিশুদ্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।

কবি অনুভব করিতেছেন, রূপের পরপারে রহস্যময়ী সৌন্দর্যালম্বী রহিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে এই রূপস্রোত ভাসিয়া আসিতেছে এবং কবির চেতনাকে স্পর্শ করিয়া কবিকে সেই অরূপের জন্ত চঞ্চল

করিয়া তুলিতেছে, কবির অন্তরে অপূর্ণ বিরহ জাগাইয়া তুলিতেছে।

কবি ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন :

খোলো দ্বার, খোলো দ্বার।

তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার

সৌন্দর্যসভায়। নন্দনবনের মাঝে

নির্জন মন্দিরখানি, সেখায় বিরাজে

একটি কুসুমশয্যা—রত্নদীপালোকে

একাকিনী রসি আছে নিদ্রাহীন চোখে

বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ীবালা

আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা ॥

'সোনার তরী'তে ভাবলোকে এই অরূপ-ধ্যান অঙ্গীকৃত ছিল।

সেখানে কবি স্বপ্নের মধ্য দিয়া ঘূমের দেশে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর গলায় মালা পরাইয়াছিলেন। এখানে রূপপ্রবাহ বাহিয়া রূপের পরপারে অরূপমূর্তির গলায় মালা দিতে চলিয়াছেন। এখানে কবি সচেতন, কবির ভাবলোক শুধুমাত্র স্বপ্ন দিয়া তৈয়ারি নয়, একটা নিদারূপ তৃষ্ণা, একটা গভীর বিরহ-বেদনা কবিকে ভাবলোকে উন্নীত করিয়াছে। সৌন্দর্যসভার জন্ম এই যে অনন্ত বাসনা ও বিরহানুভূতি, 'উর্ধ্বশী' কবিতায় ইহার তত্ত্বটি প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মানসস্বর্গে এই সৌন্দর্যসভা মূর্তিমতী, তাহার জন্ম আমাদের বাসনা সর্বদা জাগ্রত।

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উর্ধ্বশী

হে ভুবনমোহিনী উর্ধ্বশী।

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,

ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা

মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার

অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার

অতি লঘুভার

অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঞ্জিনী,

হে স্বপ্নসঙ্গিনী।

এই যে গভীর তৃষ্ণা কবিকে অরূপের ধ্যানে সমাহিত করিতেছে, 'মরীচিকা' কবিতাটিতে সেই তৃষ্ণার্ত অবস্থার রূপটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :

কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে ধৈর্যে

ওগো দিক্‌ভ্রান্ত পান্থ, তৃষ্ণার্ত নয়নে

লুক্ক বেগে। আমি যে ভূষিত তোমা চেয়ে।

আমি চিরদিন থাকি এ মরুশয়ানে

সঙ্গীহার। এ তো নহে পিপাসার জল,

এ তো নহে নিকুঞ্জের ছায়া, পক্ষফল

মধুরসে ভরা,...

শুধু জেনো, একখানি বহিসম শিখা

তপ্ত বাসনার তুলি আমার সখল

অনন্ত পিপাসাপটে এ কেবল লিখা

চিরতৃষাতের স্বপ্ন মায়ামরীচিকা ॥

এই ভাবলোকে কবি যাহা অনুভব করিতেছেন তাহা অর্থহীন শূন্যতা নহে, কবির কাছে তাহা একান্ত সত্য। এ সত্য বস্তুগত নহে, ইহা আত্মিক; তাই ইহাকে কবি বাহিরের রূপলোকের মধ্যে উপস্থিত করিয়া প্রমাণ করিতে পারেন না, শুধু আপনার মধ্যে ইহার সত্যতা অনুভব করেন। 'প্রেমের অভিব্যেক' কবিতায় এমনই এক ভাবসত্ত্বের উপলব্ধির কথা কবি বলিয়াছেন। তিনি আপনার অন্তরে প্রেমের মহিমা অনুভব করিতেছেন এবং ইহাতেই প্রেমের সত্যতায় অস্থাবান হইয়াছেন। রূপলোকে কবি যে দৈন্ত অনুভব করিতেছিলেন, এখন প্রেমের উপলব্ধিতে সে দৈন্ত দূর হইয়া গিয়াছে। কবি বলিতেছেন :

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে

পরাসেছ গৌরবমুকুট। পুষ্পভোরে

সাজায়েছ কণ্ঠ মোর; তব রাজটিকা

দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা

অহনিশি। আমার সকল দৈন্ত লাজ

আমার ক্ষুদ্রতা যত ঢাকিয়াছ আজ

তব রাজ-আস্তরণে।...

...সেখা আমি জ্যোতির্মান

অক্ষয় যৌবনসম দেবতা সমান,

সেখা মোর লারণ্যের নাহি পরিসীমা

সেখা মোরে অগ্নি যাচ্ছে আপন মহিমা

নিখিল প্রণয়ী; সেখা মোর সভাসদ

রবিচন্দ্রভাবা, পরি নবপরিস্ফদ

শুনায় আমারে তারা নব নব গান

নব অর্থভরা; চির-সুহৃদ সমান

সর্বচরাচর ॥

এই যে নূতন রসসম্পদে কবির ভাবলোক ভরিয়া উঠিয়াছে বাহার মহিমা কবি আপনার মধ্যে নিয়ত অনুভব করিতেছেন, তাহাতেই কবির আত্মোপলব্ধি সুর হইয়াছে, আপনার মধ্যে কবি একটি ভাব-সভার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন এবং তাহার প্রকাশটি বুঝিতে পারিতেছেন। এই প্রকাশকে কবি আপনার মধ্যে একটা উৎসব বলিয়া মনে করিয়াছেন। 'উৎসব' কবিতায় সেই কথাটি ব্যক্ত হইয়াছে :

ওগো যে তুমি আমার মাঝে নূতন নবীন

সদা আছ নিশিদিন

তুমি কি বসেছ আজ

নববরবেশে সাজি

কুন্তলে কুহুমরাজি অঙ্কে লয়ে বীণ।

ভরিয়া আরতি থালা

আলায়েছ দীপমালা

নূতন নবীন,

আজি বসন্তের দিন ॥

কিন্তু এই উপলব্ধির সময় কবিকে রূপলোক ছাড়িয়া ভাবলোকের মধ্যে আসিতে হইতেছে। তখন :

সমস্ত জগৎ

বাহিরে দাঁড়য়ে আছে নাহি পায় পথ

সে অন্তর-অন্তঃপুরে।

ইহাতে এই দুই বিভিন্ন জগৎ তাহাদের বিশিষ্টতা লইয়া কবির কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যকার বিরোধটি সম্বন্ধে কবি সচেতন হইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন :

আজি এ উৎসব কলরব কেহ নাহি জানে;

শুধু আছে তাহা প্রাণে।

এই ভাবলোক কবির আত্মবোধের ভূমি। অহং-এর ক্ষুদ্র, খণ্ড, সীমাবদ্ধ প্রকাশ হইতে দূরে এখানে একটি অখণ্ড ভাবসত্তার উপলব্ধি। ‘অন্তর্যামী’ কবিতাটিতে কবি এই ভাবসত্তার রহস্য খুঁজিয়া জীবনের সহিত তাহার সংযোগটি দেখাইতে চাহিয়াছেন এবং তাহার তত্ত্ব ও তাৎপর্য নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এখানে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার একটি সংশয়ময় জীবন-দর্শন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। চিত্রা কাব্যে এই জীবন-দর্শনটি শুধুমাত্র রস-চেতনায় আশ্বাদিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে ‘মানুষের ধর্ম’ ও ‘শান্তিনিকেতনের’ বাণীগুলিতে ইহা জানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কবি বলেন, রূপলোকের সহিত তাঁহার যে কারবার, সেখানে তাঁহার জীবনের যে প্রকাশ সে সকলই ভাবলোকের রহস্যময় সত্তার অভিপ্রায়ে হইতেছে। তাই সে সকলকে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হইলেও তাহার পরস্পরের সহিত একটি গভীর অর্থ সংযুক্ত হইয়া একটি নিগূঢ় তাৎপর্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং একপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই এ একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না, যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি; তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিস্মৃত তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।...আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষমাত্র—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন যাহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।...শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন। তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে,

তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাড়াচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়—আমার স্বার্থ আমার প্রবৃত্তি আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন; তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত, বিরাতের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন।...এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি ‘জীবনদেবতা’ নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে একা দান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিশ্বত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন; সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ শ্রুতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।

এই ভাবটি অন্তর্যামী কবিতার একটি অপূর্ব কাব্যসুষ্ঠি লাভ করিয়াছে। আপনার ভাবলোকে কবি এই রহস্যময়ী সত্তার আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন এবং তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া ধরিতে ছুঁতে চাহিতেছেন, কিন্তু চিত্রা কাব্যে ইহাকে কবি একটা আবেগের মধ্যে লাভ করিয়াছেন মাত্র, এখানে ইহা একটি রসসত্তোগের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, এখনও কবির ইহা পরিপূর্ণ উপলব্ধির বিষয় হইয়া উঠে নাই। তাই এখানে অপরিচয়ের বেদনাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং অরূপসত্তার ধ্যানটি কবি-মানসের অপূর্ণ রসবিলাসে পরিণত হইয়াছে—

ছাড়ি কোঁচুক নিতানূতন

ওগো কোঁচুকময়ী

জীবনের শেষে কী নূতন বেশে

দেখা দিবে মোরে অগ্নি।

চির দিবসের মর্মের ব্যথা,

শত জনমের চির সফলতা,

আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,

আমার বিশ্বরূপী,

মরণ নিশায় উষা বিকাশিয়া

শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া

মধুর অধরে করুণ হাসিয়া।

দাঁড়াবে কি চুপি চুপি।

ললাট আমার চুশন করি

নবচেতনায় দিবে প্রাণ ভরি

নয়ন মেলিয়া উঠিব শিহরি

জানি না চিনিব কি না।

শূভ্র গগন নীল নির্মল

নাহি রবি শশী গ্রহমণ্ডল

না বহে পবন, নাহি কোলাহল

বাজিছে নীরব বীণা।

এইরূপে দেখি চিত্রা কাব্যে কবির ভাবলোকে কবির জীবন-দেবতার আসনটি পাতা হইয়াছে। তাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে একটি গভীর বিশ্বাস এবং একটি অস্পষ্ট বোধ। জীবনদেবতাকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বাস ও বোধ হইতে ক্রমশঃ কবির জীবন-ধর্মটি পরিষ্কৃত হইয়া উঠিতেছে।—“আমার ধর্ম আমার উপচতন লোকের অন্তকারের ভিতর থেকে, ক্রমে ক্রমে চতন লোকের আলোতে যে উঠে আসছে এই লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলে, বোঝা যায় যে, সে পথ চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন দিকে সে যাচ্ছে। পথটা সংসারের কি অভিসংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্ছে তাকে নাম দিতে পারছে না, তাকে নানা নামে ডাকছে।” এই প্রসঙ্গে কবি আরও বলেন, “ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ধৃত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মান করিতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করিতে চাই, তারপরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।” এই ভাবলোকে কবির জীবনদেবতার প্রতিষ্ঠা, কবির ধর্মের উদ্বোধন।

কিন্তু ভাবলোকে কবি যে পূর্ণতাকে দেখিতেছেন, রূপলোকে খণ্ডের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই পূর্ণতাকে এখনও উপলব্ধি করেন নাই। ‘চিত্রা’ কবিতাটিতে কবি রূপলোকে বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং আপনার ভাবলোকে একাকিত্বের মধ্যে যে একই সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাহা চিত্রা কাব্যের শেষকথা; ইহা একটি তত্ত্ব রূপে এখানে স্বীকৃত হইয়াছে, জীবনে ইহার পরিচয় এখনও কবি পান নাই। ইহারই জন্ম রূপলোকের সহিত ভাবলোকের বিরোধ মিটে নাই, যদিও উভয়ের মধ্যে একটি সময়ের বিশ্বাস কবি অন্তরের মধ্যে পোষণ করিয়া চলিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি এইরূপ সমন্বয় করিয়াছেন যে, এই অখণ্ড, এই পূর্ণ অরূপসত্তা, খণ্ডের মধ্য দিয়া রূপের মধ্য দিয়া বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। ইহা তো রূপবিচ্ছিন্ন একটা নিচক আইডিয়া মাত্র নয়, ইহা রূপের মধ্য দিয়াই বিকাশমান একটা ভাবসত্তা। রূপ যেখানে ইহাকে প্রকাশ করে সেখানে রূপের মহিমা; রূপ যেখানে ইহাকে আচ্ছন্ন করে, সেখানে রূপের দীনতা, রূপের বার্থতা। (এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, আপনার অন্তর্ধর্মীকে কবি যখন বিভিন্ন বিচিত্র রূপের মধ্যে বিকশিত দেখিলেন, তখন কবির জীবনদেবতা বিশ্বদেবতার পরিণত হইয়া গেলেন।)

কবির এই ভাবলোক—যেখানে পূর্ণের প্রতিষ্ঠা, সেখানে সমস্ত বিক্ষোভ প্রশমিত, গভীর শান্তি ও স্তব্ধতা সেখানে বিরাজ করিতেছে।

এই ভাবলোকে আসিতে হইলে কবিকে রূপলোক ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। কবি এই বিচ্ছিন্নতাকে যখন অনুভব করিলেন তখন এই ভাব-সাধনাকে কবির গীতবিলাস বলিয়া মনে হইল।—

যেদিন জগতে চলে আসি

কোন মা আমারে দিলি শুধু এই থেলাবার বাঁশি।

বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার স্বরে

দীর্ঘ-দিন দীর্ঘ-রাত্রি চলে গেছে একান্ত স্নদুরে

ছাড়ায়ে সংসারদীমা।

রূপলোক হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মগত ভাবসাধনার মধ্যে সমাহিত হওয়া একটা ‘এস্কেপিজম’। যিনি পৃথিবীর কবি, তাহার পক্ষে এই এস্কেপিজম কবি-ধর্মের বিরোধী। কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই বিরোধ দেখা দিয়াছে। ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ এবং ‘এবার ফিরাও মোরে’, এই দুইটি কবিতায় ইহার পরিচয় পাই।

‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ কবিতাটিতে কবি আপনার ভাবস্বর্গ হইতে বিদায় লইবার কথা বলিয়াছেন। ‘স্বর্গে সকলই পূর্ণ; সেখানে চিরন্তন সুখ বিরাজমান। সেখানে সবকিছু আপনার সার্থকতায় ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ক্রটির ক্ষমা নাই, ক্ষতির স্বীকৃতি নাই। অপূর্ণতা সেখানে লালিত, মহিমা ক্ষীণ হইলে সেখানে হইতে চলিয়া আসিতে হয়। এহেন স্বর্গলোকে আত্মমহিমায় কবি স্থান-লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু কবির সঙ্গীতের উৎস সেখানে অনেকখানি রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহার কবি-ধর্ম ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। বেদনাই সঙ্গীতের প্রধান উৎস, কিন্তু পূর্ণতার মধ্যে বেদনা নাই। পূর্ণতা হইতে স্তবগান বা বন্দনা জাগিতে পারে, কিন্তু বেদনা হইতে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, পূর্ণতা সে সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে পারেন না। স্বর্গের যে মন্দার-মালিকা, যে পারিজাত পুষ্প কখনও ম্লান হইয়া যায় না, তাহার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ কবি স্তবগান রচনা করিতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীর যে ফুল না ফুটিতে ঘরিয়া যায়, তাহাই কবির শ্রেষ্ঠ কার্যের উপকরণ। বেদনাবোধ কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপকরণ বলিয়া পাওয়া অপেক্ষা না পাওয়া, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, জীবনের ছন্দ-রক্ষণ অপেক্ষা ছন্দপতনই অধিক প্রেরণা জোগায়। স্বর্গে পূর্ণতার রাজ্যে এই বেদনার স্বীকৃতি নাই। তাই ছন্দপতন সেখানে প্রশ্রয় পায় না, অশ্রু সেখানে প্রকাশ পায় না, বিরহের ছায়া মিলনের আনন্দকে ম্লান করে না। কাব্যসৃষ্টির এবং মূল্যবান উপকরণগুলির অভাবে স্বর্গে কবি-ধর্ম ক্ষুণ্ণ ও পীড়িত।

পৃথিবীর কবি তাই এই পূর্ণতার রাজ্য হইতে অপূর্ণ রূপজগতে ফিরিয়া আসিতে আগ্রহ বোধ করিয়াছেন। এই দীন পৃথিবীতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হাসি-অশ্রু, চাওয়া-পাওয়ার দ্বারা তরঙ্গিত জীবনলীলাকে কবি আনন্দের সহিত মানিয়া লইবেন। তাই স্বর্গের অপূর্ণতার অন্ধান নয়নজ্যোতি অপেক্ষা কবির কাছে পৃথিবীর প্রেরণীর শক্তি কল্পিত হৃদয়ের অক্ষুট প্রেমোভিযুক্তি আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। একটিতে রহিয়াছে বৈচিত্র্যহীন স্তব্ধতার নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি, আর একটিতে রহিয়াছে প্রেমবেদনার তরঙ্গ-বিক্ষোভ; একটিতে সঙ্গীত

সমাপ্তির নীরবতা, আর একটিতে গীতস্রষ্টার ব্যাকুলতা। কবি এই তরঙ্গ দোলায়িত হইয়া গীত-মুগ্ধ হইতে চাহিয়াছেন। কবি জানেন ইহার মধ্যেই তিনি তাঁহার স্বর্গকে অনুভব করিবেন, এই অপূর্ণতাই পূর্ণতায় বিকশিত হইয়া উঠিবে।—

মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্ন-সম—যবে কোন অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি, নিম্ন লম্বায়াতে
পড়েছে চন্দের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে পসি
প্রস্থি সরমের; মুহু সোহাগচূষনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর; দক্ষিণ-অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সূর্য শাখে।

যখন কবি বেদনার মধ্য দিয়া এই রূপলোকের সহিত প্রেমের সংযোগ অনুভব করিলেন তখন, ‘অমনি এ স্বর্গলোক অলস কল্পনা প্রায় কোথায় মিলালো ছায়াচ্ছবি।’ তখন কবিচিন্তা ইহাকেই সাংগ্ৰহে অবলম্বন করিল।

কিন্তু ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতায় দেখি, কবি তাঁহার ভাবলোক হইতে পৃথিবীর যে পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে চাহিয়াছেন, সেখানে যে-কোন প্রকার সৌন্দর্যের উৎসারণই রুদ্ধ, সেখানে চরম দৈন্য তাহার সকল প্রকার বীভৎসতা লইয়া মুখবাদান করিয়া আছে। পৃথিবীর পরিচর যে স্রবের নয়, সেখানে যে প্রেয়সীর বাহুবন্ধন দর্পিত্র আনন্দলোক রচনা করিয়া রাখে না, নানা অত্যাচার অবিচার নিপীড়নে আর্জুনের হাহাকার আকাশ-বাতাস ভরিয়া রাখিয়াছে—পৃথিবীর এই পরিচরটিও কবিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিল। কবির ভাবলোকের সহিত এই পৃথিবীর কোথাও মিল নাই। তথচ এখান হইতে পলায়ন করিয়া কবি যে আত্মগত ভাবসাধনার মধ্যে নিমগ্ন থাকিবেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতেছে না; মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত এই দীন বাস্তব পৃথিবী কবিকে, তাঁহার কল্পলোক হইতে নামাইয়া আনিতেছে।

এখানে আসিয়া কবি চারিদিকে শত অভাব দেখিলেন এবং সেই অভাবের মধ্যে আপনার কবি-কর্মটিকে যুক্ত করিতে চাহিলেন। সেই কবি-কর্মটি এইরূপ :

সে বাণীতে শিখেছি যে সুর

তাঁহারি উল্লাসে যদি গীতশ্রু অবসাদপুর
ধনিয়া তুলিতে পারি, মুহুরী আশার সঙ্গীতে
কর্ম হীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
গুণ মুহুর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা
সুপ্তি হ’তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি—তবে ধন হ’বে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

কবি তাঁহার বাণীতে কি সুর শিখিয়াছেন, জীবনের মধ্যে তাহার প্রয়োগই বা কিরূপ?

কবির সুর আত্মবোধের বাণী। আপনার একক ভাবসাধনার কবি যে আদর্শের ধ্যান করিয়াছেন, যে মহিমার প্রতি সচেতন হইয়াছেন, তাহারই প্রভাবে কবি বুঝিয়াছেন যে, পৃথিবীতে কেহই দীন নয়। আমরা যদি আমাদের আত্মবোধ জাগাইয়া তুলি, যদি শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ের দিকে, পূর্ণতার দিকে দৃঢ়পদক্ষেপে আগাইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিতে পারিব।

মুহুর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে;

যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অস্ত্রার ভীক তোমা চেয়ে,

যখন জাগিবে তুমি তখন সে পলাইবে ধৈর্যে।

মানব-মহিমার প্রতি এই যে বিশ্বাস, কবি তাঁহার আদর্শলোক হইতে সেটিকে ধূলির পৃথিবীতে লইয়া আসিবেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শবাদ, তাঁহার জীবনের এই ভাবসত্যকে অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন না—তাহাকে রূপ-নিরূপক একটি তত্ত্ব হিসাবে একটা ‘ecstasy of art or contemplation’—‘রস-সাধনা বা ধ্যান কল্পনার আত্মস্তিক স্রুৎ-সংগোপ’ হিসাবে দেখিয়া জীবনের সহিত তাহার যোগটির গুরুত্ব অনুভব করেন না বা জীবনসাধনার তাহার উপর নির্ভর করেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে ভাবসত্যকে রূপসত্যের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন, এবং রূপসত্যকে বাহার অনুগামী করিয়া উভয়ের মধ্যে একটা গভীর ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, সেই ভাবসত্যের সাধনাকে অনেকেই জীবনের একটা সার্থক সিদ্ধির পন্থা বলিয়া গণ্য করেন না। সাধারণ মানুষের পক্ষে ‘এক রূপ ক্ষণিক চিত্তবিলাস মাত্র’ মনে করিয়া তাহাকে জীবনসাধনা হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখেন। জীবনের মধ্যে সেই ভাবসত্যকে রূপায়িত না দেখিয়া তাঁহারা ইহাকে শুধুমাত্র কাব্যের সত্য বলিয়া বিচার করেন এবং এই জন্তই জীবন হইতে তাহাকে বিবিক্ত করিয়া দেখিয়া জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য কবি-মানসের কল্পনা-বিলাস বলিয়া ইহার চড়া মূল্য নির্ধারণ করেন।

কিন্তু এই attitude বা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিতে বসিলে রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদকে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এমন সত্যকে কখনও স্বীকার করিতে চাহেন নাই, জীবনের সহিত বাহার যোগ নাই বা জীবনের মধ্য দিয়া বাহা উপলভ্য নয়। এই অভিজ্ঞতার জ্ঞান তিনি আপনার ব্যক্তি-জীবনের উপর নির্ভর করেন নাই, পরন্তু আপনার মধ্যে এক বিশ্বমানবিক সত্যকে উপলব্ধি করিয়া সেই জীবনের দর্পণে যাবতীয় সত্যের আলোককে প্রতিফলিত করিয়াছেন। ইহাতে কবি-জীবনের সত্য বিশ্ব-জীবনের সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বিশ্ব-জীবনের সত্যকে কবি-কল্পনা বলিয়া মানব-সাধারণ হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার কারণ নাই। ‘মানব-সাধারণ’ একটি রূপসত্য এবং ‘বিশ্বমানবতা’ ইহা হইতেই উদ্ভূত একটি ভাব-সত্য। একটি অপরাটকে ধারণ করিয়া আছে, একটি অপরাটের মধ্য

দিয়া প্রকাশমান। কবিচিত্র এই ভাবসত্যটিকে উপলব্ধি করিয়া রূপ-সত্যের মধ্যে তাহার প্রকাশ দেখাইতে চাহিয়াছে। ইহাতে হরত যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না তাহার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু জীবনে যাহা সম্ভব নয়, জীবন যাহাকে রূপায়িত করিতে পারে না, তাহার কথা কোথাও বলা হয় নাই। ইহা একটি বৃহত্তর জীবন-সত্য যাহার দিকে সাধারণ-জীবন অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। উদাহরণ-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'কথা' হইতে একটি কবিতার উল্লেখ করিব :

বিপ্র কহে, "রমণী মোর
আছিল-যেই ঘরে
নিশীথে সেথা পশিল চোর
ধর্ম্মনাথ তরে।
বোধেছি তারে, এখন কহ
চোরে কি দিব সাজা?"
"মৃত্যু" শুধু কহিল তারে
রতনরাও-রাজা।
ছুটিয়া আসি কহিল দূত
"চোর সে যুবরাজ।
বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে
কাটিল প্রাতে আজ।
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে
কী তারে দিবে সাজা?"
"মুক্তি দাও" কহিলা শুধু
রতনরাও-রাজা।

কবিতাটির নাম "রাজ-বিচার"। ইহার মধ্য দিয়া যে-জীবনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা সাধারণের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, তাহা একটি বৃহত্তর জীবনের পরিচর আমাদের কাছে আনিয়া দেয়। ইহার সত্য এমন একটি আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে আদর্শ জীবন-বিচ্ছিন্ন একটা নিছক শূণ্য কল্পনার মধ্যেই তাহার চরম পরিচয় লাভ করে নাই, যাহা জীবনের মধ্য দিয়াই উপলভ্য একটি ভাব-সত্য। এই ভাবসত্য যেখানে রূপের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছে সেখানে রূপ সাধারণ হইতে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, সেখানে সে একটি বিকৃতি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কখনই এমন ভাব-সত্যকে লইয়া আকড়াইয়া থাকেন নাই রূপের মধ্য দিয়া যাহার প্রকাশ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। ইহারই জগৎ রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদকে মানবিক ব্রহ্মবাদের দ্বারা শোধন করিয়া লইয়াছেন এবং তাহারই দিকে বিশ্বমানব-জীবনের অভিব্যক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন।

'এবার কিরাও মোরে' কবিতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন, "যে-শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে হৃন্দের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রেয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় 'এবার কিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।" আদর্শবাদী ব্যক্তিমাত্রেরই মানুষের

জীবনে এই শ্রেয়-সাধনার গুরুত্বকে স্বীকার করিবেন। বঙ্কিম-চন্দ্রও আদর্শবাদকে জীবন-সাধনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস-যে, এক সময়ে সকল মানুষই ধার্মিক হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন তাহার আদর্শের অনুসরণ করুক।...যে যাহা হইতে চায় তাহার সম্মুখে তাহার সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শরূপ না হউক, তাহার নিকট-বর্তী হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ-রূপ-চরিত্র। 'অনুশীলনে' তিনি সেই আদর্শ ও তাহা লাভের উপায়ের কথা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এক মানবিক ব্রহ্ম; 'মানুষের ধর্ম্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শের পথে জীবনের যাত্রাটি দেখাইয়াছেন।

আদর্শকে লাভ করিবার জগৎ যে জীবন-সাধনা, সেই জীবন-সাধনাকে, সেই কর্ম্মকে রবীন্দ্রনাথ কোন দিন অস্বীকার করেন নাই। কর্ম্মহীন ভাব-সাধনার মধ্যে আদর্শকে শুধুমাত্র ধ্যানে একটি ভাব-মূর্ত্তিতে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার প্রকাশটি কখনই কর্ম্ম-নিরপেক্ষ নয়। মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাটিকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা যে জীবন-সাধনাকে স্বীকার করিয়াছে তাহাতে "বাস্তবের সহিত প্রকৃত বোঝাপড়া নাই, ক্রুর-কঠিন-কুংসিতের সহিত সংগ্রাম নাই—সে সকলকে একরকম অস্বীকার করিয়া, সকল অসম্পূর্ণতা সেই ভাবকল্পনা দ্বারা পূর্ণ করিয়া আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিতে হয়। ইহা জীবনে শক্তির সঞ্চার করিতে পারে না।...বস্তু ও আদর্শের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা দূর-করিবার জগৎ ভাব-সাধনাই যদি যথেষ্ট হয়, বস্তুর অসম্পূর্ণতা যদি ভাবের দ্বারা পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কোন দুঃখ, কোন অভাবই আর থাকে না, জীবনের সহিত মুম্বিবার প্রয়োজন হয় না। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ খাটি Idealist। বঙ্কিম-চন্দ্র এবং বিবেকানন্দও Idealist বটেন, কিন্তু তাহাদের সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হয় জীবনের বাস্তব সাধনা দ্বারা; এজগৎ সে ক্ষেত্রে, ভাব-সাধনা নয়—শক্তি-সাধনাই প্রকৃত সাধনা।"

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবি বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম আসলে কবিকর্ম্ম; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ত কোথাও মানবের কর্ম্মকে, তার জীবন-সাধনাকে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে ভাবসাধনা গ্রহণ করিতে বলেন নাই। বস্তু ও আদর্শের মধ্যে ব্যবধান দূর করিবার পথ তিনি তাঁ কবিতা লেখার মধ্যে নিহিত দেখেন নাই। তাঁহার আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে গেলে জীবনের বাস্তব সাধনার প্রয়োজন হয় না এ অসম্ভব ধারণার সৃষ্টি কিরূপে হইল? রবীন্দ্রনাথের সাধনাকে 'খাটি বৈষ্ণব সাধনা' আখ্যা দিয়া শক্তি-সাধনা হইতে তাহাকে পৃথক করিলেই সত্য মিথ্যা হইয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ কোনকালে 'খাটি বৈষ্ণব' নহেন এবং তাঁহার আদর্শকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করিতে হইলে কর্ম্মনিরপেক্ষ ভাবসাধনাকে অনুসরণ করিলে চলে না। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এই দু'জনের জীবনের সত্য যদিও এক হয়, তাহার রূপায়ণ বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের কর্ম্ম শিল্প-কর্ম্ম, কিন্তু আদর্শকে বাস্তবে

রূপ দিবার জ্ঞান বিবেকানন্দ যে ভাবে যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে যেমন একথা বুঝি না যে, আমাদের সকলকেই বেদান্তের ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইবে, রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতেও তেমনি এ ধারণা করা চলে না যে আমাদের সকলকে ভাবুক ও কবি হইয়া উঠিতে হইবে। আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করিতে গেলে তাহা কদাচ নিছক ভাবুকতার দ্বারা হয় না, তাহার জ্ঞান কর্মসাধনার প্রয়োজন। জীবনের রূপায়ণে এই বাস্তব জীবন-সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও অস্বীকার করেন নাই। পরন্তু যেখানে এই অস্বীকৃতি দেখিয়াছেন, সেখানে কবি দ্বিকার দিয়াছেন। ‘শিক্ষার মিলন’ প্রবন্ধে কবি এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন,—“আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকেরদের জিজ্ঞাসা করলুম, ‘সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগলো, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি কেন?’ তারা বললে ‘কপাল’। আমি বললুম, ‘কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিসনে কেন?’ তারা তখন বললে, ‘আজ্ঞে, কড়ার ইচ্ছে হলোই হয়।’ বাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব, তাদেরই জলদান করবার ভার কোন একটি কড়ার। স্ততরাং যে করে হোক এরা একটি কড়ী পেলে বেঁচে যায়।’ এখানে দেখি রবীন্দ্রনাথ জীবন-সমস্যার সমাধানে ‘অমৃত পায়স’ বিতরণ করেন নাই, তাহার বাস্তব মীমাংসাই করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন, তাহাকে যাহার ভাববিলাস বলিয়া দেখেন রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদকে যথাযথ ব্যাখ্যা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

ইহারই জ্ঞান ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতাটির দ্বিতীয় অংশটির যেখানে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন—“অনেকেই তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করেন। মোহিতলাল বলেন,—“রবীন্দ্রনাথ বাস্তব হৃৎথকে একরূপ অস্বীকার করিয়া এই দুর্গত মনুষ্যসমাজের আর্জিনাশের জ্ঞান অতি উচ্চ ভাবসাধনার পন্থাই নির্দেশ করিলেন; ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জ্ঞান যে অল্পজল তাহার পরিবর্তে পরম সত্যের অমৃত পায়স, মনুষ্যজীবনের পরিবর্তে বিশ্ব-জীবন, এবং নিষ্ঠুর নিয়তিরূপিণীর পরিবর্তে নিরুপমা সৌন্দর্য-প্রতিমার আধ্যাত্মিক আরাধনাকেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন।...বাহারা “শুধু ছুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্ট স্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া”—তাহাদের সেই সাক্ষাৎ হৃৎথের প্রতিকার চিন্তা না করিয়া, কবি উপদেশ দিলেন—

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গতে নাচিতে নাচিতে

নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া প্রবতারা।

কিন্তু মোহিতলালের এই ব্যাখ্যাটিকে আমরা মানিয়া লইতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে বাস্তব হৃৎথকে এড়াইয়া যাইতে চাহেন নাই। একজন রাজনীতিক বা সমাজসংস্কারক জীবনের সমস্যা-সমাধানে যে যুগোপযোগী পন্থা নির্দেশ করিবেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সাময়িক আরোগ্যের কথা এখানে বলেন নাই, একথা সত্য—কারণ কবি হইয়া তিনি মানুষের অল্পবল্যের প্রয়োজন অনুভব

করিলেও তাহা মিটাইবার পন্থা নির্দেশ করিবার দায়িত্ব তাঁহার নিজের বলিয়া অনুভব করেন নাই। ইহার জ্ঞান সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির দায়িত্ব বহিয়াছে। আদর্শের পথে মানবের অভি-ব্যক্তিকে যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই আদর্শের সাধনাই মানুষের মনুষ্যত্ব, ইহা জীবনবহির্ভূত কোন উচ্চাঙ্গের ভাবসাধনা নয়। ইহা কোন প্রকার পলায়নী মনোবৃত্তি নয়। মহাপুরুষেরা মানুষের এই সাধনাকেই নিজ নিজ জীবনে দেখাইয়া যান। জীবনের সমস্যা সমাধানের জ্ঞান কবি এই জীবনসাধনার কথা বলিয়াছেন। এই যে বৃহত্তর জীবন, ইহা আমাদের দৈনন্দিন তুচ্ছ জীবন হইতে পলায়ন নয়, ইহা সার্থকতার মধ্যে মহিমার মধ্যে আমাদেরই দীন জীবনের অভিব্যক্তি। ইহা বাস্তব জীবনেরই মধ্য দিয়া—তাহাকে এড়াইয়া আসিয়া কোন নিষ্ঠুর একক ভাববাজার মধ্যে নয়। কবি এখানে আমাদের সকলকে এই বৃহত্তর জীবনের দিকে যাইতে বলিতেছেন। ইহা শুধু তাঁহার নিজের সাধনাই নয়, এই বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিয়া কবি আমাদেরই বৃহত্তর জগতের মধ্যে ফিরাইতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কদাচ জীবনকে বিস্মৃত হইবার কথা বলেন নাই, তিনি বৃহত্তর জীবন-সাধনার দ্বারা ক্ষুদ্র জীবনকে জয় করিবার কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার অমোঘ বাণী :

কি গাহিবে, কি শুনাবে। বলা মিথ্যা আপনার স্তম্ভ,

মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ

বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

ইহাতে জীবন হইতে পলায়নের কথাও নাই, জীবনকে বিস্মৃত হইবার কথাও নাই। বিকৃত দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত অর্থ অজ্ঞ প্রকার। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেই তো আমরা দেখি যে বহু বাসনা-কামনা চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বকে আমরা প্রায়ই তুচ্ছ বলিয়া অস্বীকার করিতে চাই, নতুবা জীবন কেবলই বড় বেশী করিয়া সীমাবদ্ধ হইয়া যায়, সকল চাওয়াগুলি মিটাইতে গেলে জীবন অগ্নির হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র ‘ধর্মতত্ত্বে’ বাচস্পতি মহাশয়ের সকল জাগতিক হৃৎথকেই তুচ্ছ বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-সাধনাকে অস্বীকার করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-সাধনার যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বাচস্পতি মহাশয়ের মিথিষ্টি ও সর্ব চালের ভাত কোন দিনই জুটিবে না, কিন্তু বাচস্পতির জীবন আর একদিকে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে, বাচস্পতি প্রকৃত ‘মানুষ’ হইয়া উঠিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাচস্পতিকে ধর্মাচরণ করিতে বলিয়াছেন, আদর্শের অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সম্যক অনুশীলনের দ্বারা। বস্তুতঃ মানবধর্ম হইতে বিচ্যুতিই সকল হৃৎথদুর্দশার মূল ইহাই বঙ্কিমচন্দ্র মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, ‘মানুষের যে সকল সুখ-দুঃখ আছে, মানুষের স্বকৃত কর্ম ভিন্ন তাহার অন্য কারণও আছে’; কিন্তু হৃৎথ দূর করিবার জ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মাচরণের কথাই বলিয়াছেন। আদর্শকে ঠিক রাখিয়া বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের জ্ঞান ইহাও এক বাস্তব জীবন-সাধনা।

রবীন্দ্রনাথও মানুষের দুঃখদর্শনা দূর করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মাচরণের কথাই বলিয়াছেন এবং তাহাও বাস্তব জীবন-সাধনা সাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথও আদর্শের পথে জীবনের যাত্রাটি দেখাইয়াছেন। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া দুর্গতদের কথা ভুলিয়া আপনার জীবনদেবতার ধ্যানের কথা বলেন নাই, তিনি জীবনের আদর্শকে রূপ দিবার জন্ত বিশ্বের সাধকদের জীবন-সাধনার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং দুর্গতদিগকে সেই জীবন-সাধনা সন্ধানে সচেতন হইতে বলিয়াছেন।

'জীবনদেবতা' এই নামে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আপনার করিয়া তাঁহার আদর্শকে উপলব্ধি করিয়াছেন একথা সত্য; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপ্রিয়া' 'মহিমালক্ষ্মী' 'সৌন্দর্যপ্রতিমা' বলিয়া যাহার উল্লেখ করিতে চাহিয়াছেন তাহার মধ্যে কবির জীবনদেবতা-বোধ মিশিয়া থাকিলেও তাঁহার সহিত অগাধ সাধকের আদর্শবোধের বিরোধ নাই। 'বিশ্বপ্রিয়া' এই নামেই রবীন্দ্রনাথ তাই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। উপরন্তু পৃথিবীর কঙ্করকণ্টকময় পথ 'কোনরূপে অতিক্রম' করিবার কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেন নাই। কবি যে জীবন-সাধনার কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা এই :

—তারি লাগি রাতি অন্ধকারে

চলেছ মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝাঝড়া বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অস্তুর-প্রদীপখানি। শুধু জানি যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্তমাঝে, দিগেছে সে বিশ্ববিসর্জন
নির্ধাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি : যুগ্মের গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিক্র করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে
সর্বপ্রিয় বস্ত্র তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বলেছে সে হোম হুতাশন—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপন্ন-অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তির জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্যা, বিধরে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন : বিধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহর কুশাকুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মৃত বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতি পরিচিত অরজায় ; গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীর্বেষ করণ নেত্রি—অস্তুরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য প্রতিমা।

এই পংক্তিগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যে-জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবতাবিজিত নিছক ভাববিলাস নহে। ইহাতে জীবনকে কোথাও অস্বীকার করা হয় নাই। এখানে সাধকদের যে জীবন-সাধনার কথা কবি বলিয়াছেন,

তাহা শুধুমাত্র বাজনা ও ইঙ্গিতে আপনার প্রকৃতিটিকে জানাইয়াছে।

এই কবিতাটির আলোচনা-প্রসঙ্গে এত কথা বলিতে হইল এই জন্য যে, অনেক স্থানীয় ব্যক্তিও এই কবিতাটির শেষাংশের অপব্যাখ্যা করেন। ইহাতে চিত্রার যুগে রবীন্দ্র-মানসে রূপলোক ও ভাবলোকের বিভিন্ন প্রকৃতিটি ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধটি সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কবিমানসে রূপলোক ও ভাবলোক উভয়ই ক্রমশঃ একটি পরিষ্কৃত সত্যমূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল। মানসীর যুগে এই অস্পষ্টতা ও অপরিচ্ছন্ন হৃদয়ের স্রষ্টা করিয়াছিল। সেখানে রূপজগতে কবি যেমন একটা স্বাভাবিক স্ত্রী ও ছন্দ্রের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, বিভিন্ন বিরোধমূলক চিত্র কবির মনে সংশয় ও প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিতেছিল, কবির ভাবলোকও তেমন নিছক জীবনসাধনাবিহীন মানসবিলাসের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। জীবনের সহিত তাহার সত্য যোগ ছিল না। যদি ইহার মধ্যেই কবির মানসিকতা চরম পরিণতিলাভ করিত তাহা হইলে কবিকে এস্কেপিষ্ট বলিতাম। কিন্তু কবি আপনার ভাবনার মধ্যে বিশ্বের ভাবনার যোগ অনুভব করিয়াছেন, তাহার ধ্যান একটি বিশ্বজনীন সত্যের ভূমিকালভ করিয়াছে। 'মেঘদূত' কবিতায় ইহার প্রথম পরিচয় পাই। ইহাতে পবনভীকালে কবি রূপলোককে যেমন স্পষ্ট করিয়া চিনিতে চাহিলেন, তাহার ভাবলোকে তাঁহার আদর্শ এবং গভীর বিশ্বাসও স্পষ্ট-অস্পষ্ট বোধের দ্বারা মগ্ন হইয়া উঠিল। এখন তিনি রূপসত্যকে দেখিলেন, ভাবসত্যকেও বুঝিলেন, ইহাদের বৈপরীত্য সন্ধানে কবি সচেতন হইলেন—কবিচিন্তে আর পূর্বের মত অপরিচয়ের নিমিত্ত প্রবল দ্বন্দ্ব রহিল না। কিন্তু এই দুই সত্যের মধ্যে বিরোধ রহিয়া গেল। এক সত্যকে ছাড়িয়া আর এক সত্যকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতে চাহেন নাই বলিয়া এই বিরোধই কবির জীবনে বরাবর রহিয়া গিয়াছে।

° রবীন্দ্রনাথ খাটি বৈষ্ণব নহেন। খাটি বৈষ্ণবের সাধনা যে স্তরে পৌঁছিয়াছে রবীন্দ্রনাথ সে স্তরে যাইতে চাহেন নাই। তবে তাঁহার জীবন-সাধনাটি বৈষ্ণবীয় বলিয়া মনে হয়, কারণ খাটি বৈষ্ণবের জায় তিনিও অরূপ ও অরূপের লীলা বা রূপপ্রকাশকে ধরিতে চাহিয়াছেন—তবে তাহা তাঁহার এই মানব-বুদ্ধি দিয়াই, এবং এই জীবনের মধ্যেই, এই জীবনকে ত্যাগ করিয়া কোন অতিমানবিক বুদ্ধিতে নয়।

চিত্রা-কাব্যের 'চিত্রা' কবিতাটিতে দেখি জীবনদেবতাকে কবি সম্পূর্ণ দুই বিপরীত সত্য-মূর্ত্তিতে উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু তাহার তাহাদের বৈপরীত্য লইয়া কবিকে আঘাত দিতেছে না বা বিক্ষুব্ধ করিতেছে না। কবি বৈপরীত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াই উভয়কে গ্রহণ করিয়াছেন এবং একট 'মানসিক শান্তি রক্ষা করিয়াছেন। চিত্রা-কাব্যের সর্বত্রই কি রূপানুভূতিতে, কি অরূপানুভূতিতে, কবির মানসলোকে এই শান্তিরক্ষার প্রয়াসটি দেখিতে পাই। ভাবসত্য ও রূপসত্যের বৈপরীত্য কবি দূর করিতে পারেন নাই, কিন্তু উভয়ের

দ্বন্দ্বটি মিটাইতে চাহিয়াছেন। অথচ চিত্রা-কাব্যে স্থির বিশ্বাসের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ-সূত্রটিকে উপস্থিত করিতে পারেন নাই বলিয়া একটি 'মদি', 'হয়তো' ইত্যাদির স্পর্শ তাঁহার মনে রহিয়া গিয়াছে। তাহাতে রোমান্টিকতার সুরটি আরও স্পষ্ট হইয়া কাব্য-মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে রূপ ও অরূপের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধের ও সামঞ্জস্যের বিশ্বাসের উপর কবির জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারই দিকে চিত্রা-কাব্যটি কবিকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। চিত্রার যুগে ভাবসত্যকে রূপায়িত করিবার সাধনায় প্রার্থিত ও কাম্য সিদ্ধির প্রতি যে ক্ষীণ সংশয়ের সুর লক্ষ্য করি, বলাকার যুগে গভীর বিশ্বাসের মধ্যে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাই না।

অটল বিশ্বাসের মধ্যে ভাবসত্যকে এ জীবনে রূপায়িত করিবার যে প্রচেষ্টা, চিত্রাকাব্যে জীবনের সেই অভিযান-সুর হইয়াছে। চিত্রাকাব্যের মধ্য দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে আমরা তাই এই মহান জীবনশিল্পীর শিল্পক্রিয়ার প্রকৃতিটি অনুভব করিতে পারি এবং তাঁহার বহুদূরবিস্তৃত জীবন-সাধনার মূল-সূত্রগুলির সন্ধান পাই। চিত্রাকাব্যটি রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবনের এমন একটি পরিচয় বহন বাহার মধ্যে কবির জীবন তাহার ভবিষ্যতের প্রতিকৃতি লইয়া একটি সামগ্রিক মূর্তিতে আপনাকে আভাসিত করিয়াছে। নবীন জীবনের মাধুর্য্য ও রোমান্টিকতায় সমগ্র কাব্যটি তাই অপূর্ব স্রীতে মণ্ডিত।

বজ্র-সুন্দরী

শ্রীশৈরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বজ্রের মত তুমি রুদ্রাঙ্গী সুন্দরি,
পদ্মের মত তুমি কমলীয়া ধরা,
দুর্নীত-নাশে এলে অগ্নির চোখ নিয়ে
শিল্পীরে দিলে তুমি আনন্দ-বন্যা :
সৃষ্টির সুখমার লক্ষ্মীর ধ্যান থেকে
মর্ত্তেতে রূপ নিল তব দেহ ছন্দে,
হুগার তেজ ধরো গীর্বাণী-বেদগানে
অনন্তা এলে নামি রূপে, রসে গন্ধে।
প্রেমিকা তপস্বিনি, প্রিয়তম লাগি তব
যমের সঙ্গে তুমি করি বাক্যুদ্ধ
মৃত্যুর সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয় করি
বাঞ্ছিতে কেড়ে নিয়ে হয়েছ মা শুদ্ধ।

তিনলোক শিল্পীর শিল্পের কল্পনা—
গল্পের ফুল ফোটে তব দেহতীরে,
মদন ভাষ করি শিবের চিত্ত কাঁদে
সুন্দরী গোঁরী মা পদে তব ফিরিতে।
শৃঙ্খলা ভেঙে যবে হও বিশৃঙ্খল
লক্ লক্ করে জিত হাতে দোলে খড়্গ,
পা'র তলে মঙ্গল-মহাদেব শঙ্কর
খাবি খায়, গর্জায় প্রলয়ের বাড় গো।

বন্ধিম চাহনিতে বিদ্যৎ চমকায়
শঙ্কর বাড় বয় ক্রোধভরা চক্ষে,
তব অভিসম্পাত বজ্রের বঙ্কন
সৃষ্টির বাঞ্ছারে বহ তুমি বক্ষে।

তব দেহ সৃষ্টির উৎসব-ধ্যান শেষে
ব্রহ্মার কল্পনা হয়ে গেছে নিঃশ্ব,
শ্রামচাঁদ বংশীতে বাজায়েছে তোরি গান
বন্দনা দিল তব এ নিখিল বিশ্ব।
সৃষ্টির সুখমার পূর্ণ বিকাশ অয়ি,
রুদ্রের রুদ্রাঙ্গী কামজয়ী অঙ্গ,
দুর্নীত অসুরেরা মাগি তোমা ক্রোধে তব

হৃদয় গুনি ওগো রণে দিল ভঙ্গ।
যারা শিবসুন্দর তাহাদের লাগি তুমি
বক্ষে রেখেছ দেবী ভরি প্রেমকুন্ত,
পশু-মানবের লাগি ধরো তুমি খড়্গ মা
ধ্বংসিল তব হাতে শুভ নিশুভ।
সুন্দরি, ধরা আজ যুগা যে কামায়নে
লালসায় পশুসম দুর্নীত নর গো,
কটাক্ষে আজ তব জেলে রেখে বজ্র মা
রুদ্রাঙ্গী বেশে সদা হাতে রেখে খড়্গ।

সেন্ট মরিস্

শ্রীশেফালি নন্দী, এম-এ

ছেলেবেলার ভূগোলে পড়া “ভূস্বর্গ-সুইজারল্যান্ড” ভেসে উঠল চোখের সামনে যখন শোনা গেল ট্যারিষ্ট কোম্পানী সব ব্যবস্থাই ঠিক করে ফেলেছে। ঈষ্টারের তুষারপাত উপেক্ষা করে রওনা হলাম দূর ভ্রমণের উদ্দেশ্যে—ট্যারিষ্টদের পক্ষে সময়টা অসুবিধাজনক

ডলারের পরই সুইস মুদ্রার প্রাধান্য। ভারতের ব্রাহ্মণ্যযুগের পুরাহিতের জায় আমেরিকান ডলার-বাহকের অসীম প্রভাব এই



লুগানো

হলেও ইংলণ্ড-প্রবাসীর পক্ষে এ মুক্তির আনন্দ। তাই ফ্রান্স পেরিয়ে যখন সুইজারল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে লুগানো শহরে এসে পৌঁছলাম—বিদেশিনীর শাড়ীর প্রতি বিন্দুমাত্র অল্পকম্পা না দেখিয়ে সুইস প্রকৃতিদেবী শুরু করলেন প্রচণ্ড বর্ষণ।

ইউরোপের তুষারপাত দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম লুগানো থেকে সেন্ট মরিস্-এর পথে। আলপসের এই পাহাড়চূড়াটি যদিও সর্বোচ্চ নয় তথাপি তার সৌন্দর্য আর স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের জন্য প্রতি গ্রীষ্মের শুরুতে এখানে স্বাস্থ্যকামী সৌন্দর্য্যপিয়াসীদের সমাগম হয়। সুইজারল্যান্ড পথিকদের কাছ হতে বার্ষিক যে দশ লক্ষ পাউণ্ড আদায় করে তার প্রায় এক-চতুর্থাংশই আসে এই সেন্ট মরিস্-এর কল্যাণে। স্বর্গধামের এই-ই হ'ল ইন্দ্রলোক—এর নামে একবার অন্ততঃ যাবার লোভ হয় না—ইউরোপথণ্ডে এমন লোকের সংখ্যা বিরল।

পথের শেষ আছে, কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই—তাই সুইস সীমান্ত পার হয়ে আমরা চাইলাম ইটালীর সীমানায় প্রবেশ করতে; বাধা দিলেন ইটালীয় সরকার—কারণ উপযুক্ত ছাড়পত্রের অভাব। বারত্বয়েক সীমান্ত পার হতে গেলে আমার ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, সেন্ট মরিস্ অবধি পৌঁছান আর হবে না। উচ্চ ইটালীয় ফাঁপাই মুদ্রাব্যবহারকারীর কাছে সুইস মুদ্রার কোলীজের অসীম প্রভাব। গোটা পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকান



সুইস-ইটালীয় সীমান্তের ঘরবাড়ী

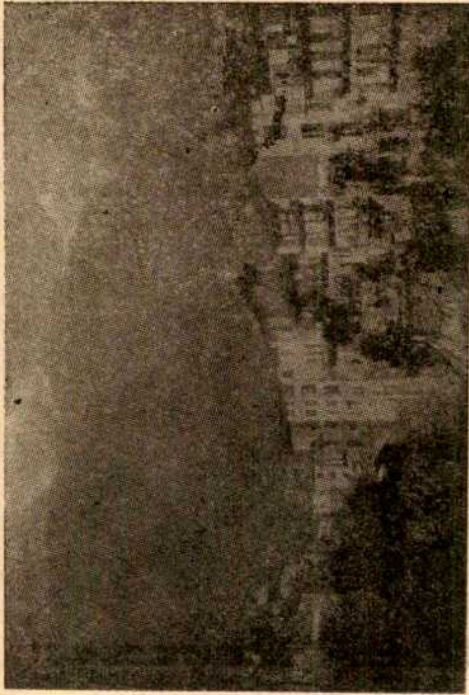
পশ্চিম ভূখণ্ডে, আমেরিকাবাসীর প্রতাপে পাউণ্ড-এলাকার অধিবাসীরা ত ইউরোপের চোখে রুপার পাত্র। বারকয়েক কথাকাটাটির পর প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নিলাম। প্রকৃতির অঙ্গে অন্ত্রোপচার করে তৈরি হয়েছে যে সুউঙ্গ সেটা



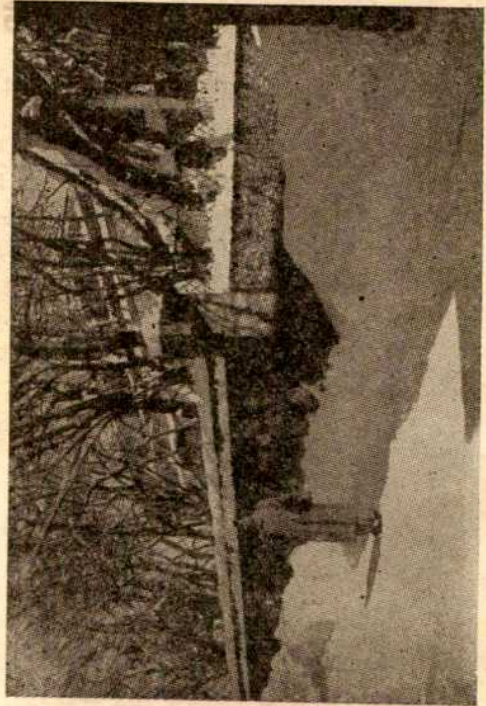
কোমো হ্রদ

পেরিয়ে কোমো লেকের পাশে এসে পড়লাম—প্রকৃতি যেন হেসে উঠলেন তীর্থযাত্রীর পানে চেয়ে। এতক্ষণ আমরা আকাশের চেহারা দেখে ভাবছিলাম ইংলণ্ডই এলাম বুঝি আবার।

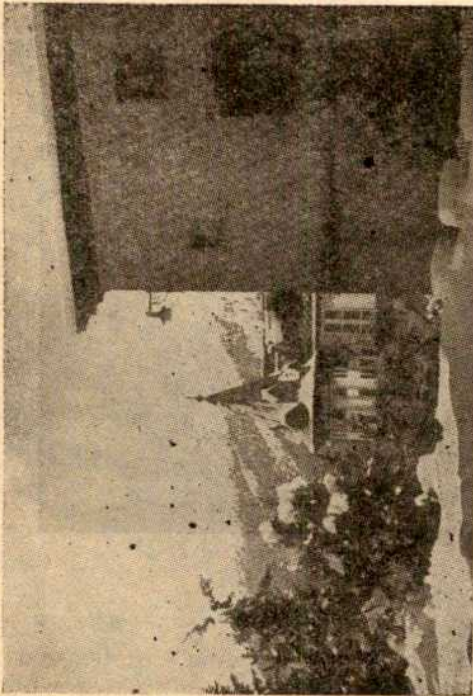
চোখ মেলে তাকালাম—



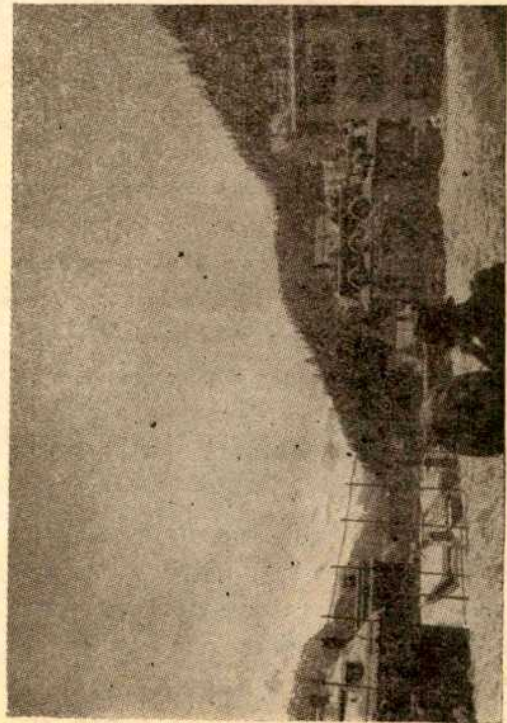
সেন্ট মরিস্—পাহাড়ের উপর গ্রাম



সেন্ট মরিস্-এর চূড়ায় নাইলন ঝিকড়ের দোকান



ভূবরাবৃত্ত সেন্ট মরিস্-এর পাথে বিশপমাগার ও হোটেল

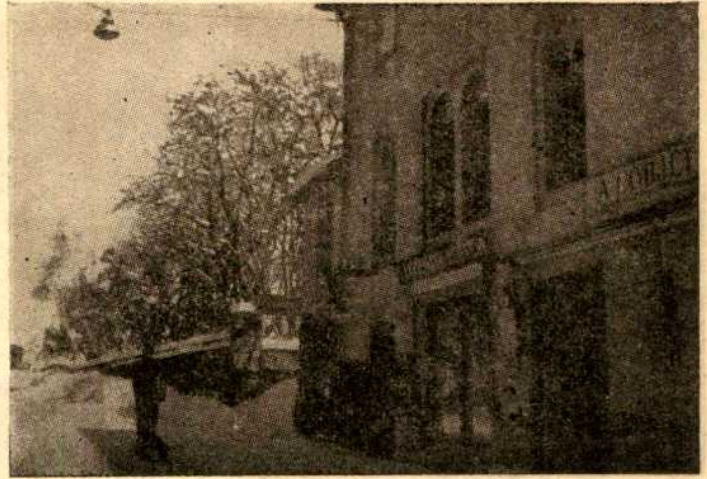


সেন্ট মরিস্-এর পাথে

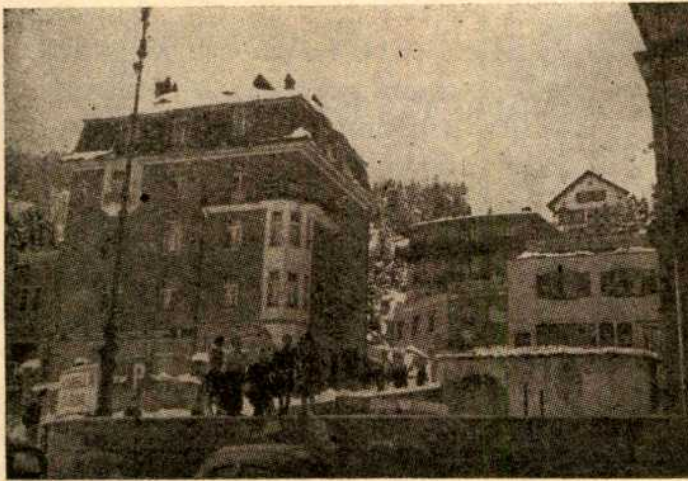
“নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?”

এ প্রশ্নের জবাব আজ পেলাম—পাহাড় আর পাহাড়—পাহাড়ের কোলে নিস্তরক নিস্তরক ব্রহ্ম ইত্যন্ততঃ ভাসমান ছোট নৌকা—পাহাড়ের মাথায় বরফ পড়ে বাকমক করছে প্রকৃতি—তারই গা বেয়ে নেমে আসছে সংকীর্ণ স্বর্ণাধারী, গড়িয়ে পড়ছে ছোট বরফগলা স্রোতস্বিনীর বৃকে—সে আবার ছুটে চলেছে মাটিমায়ের আকর্ষণে, ছোট ছোট উপলব্ধের বাধাকে অতিক্রম করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এ ব্রহ্মরূপী প্রিয়ের কাছে। এই খেলা চলেছে পৃথিবী জুড়ে—পর্বতশীর্ষে হিমকণা, ভূগর্ভে সাগরবারি—জাতি এদের একই ; একে অজ্ঞের পরিপূরক—কিন্তু কি বৈচিত্র্য !

লুগানো ব্রহ্মের পাশ দিয়ে আমাদের কোম চলেছে—দীর্ঘ দীর্ঘে আমরা নীচে নামছি। পাহাড় আর তার পাশের বাঁকা রাস্তা



একটি বিপণির দৃশ্য



সেন্ট মরিস-এর শিশুগণ

দিয়ে সুন্দর তার গতি। এসে নামলাম দুই পর্বতের মধ্যবর্তী প্রশস্ত উপত্যকায়, ছ'ধারে সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো—এখানে সেখানে ছিল আনন্দক্ষেত—তার চিহ্ন বিজ্ঞান। বসন্তের শেষে গাছে গাছে স্বক হয়েছিল মুকুল ধরার পালা—কোনটার রঙ, নীলাভ—কোনটা হালকা বেগুনী, কোনটা সাদা। আর তাদের শাসন করছে উন্নত সিটান, সাইপ্রেস, ওলিভ আর পপলারের দল।

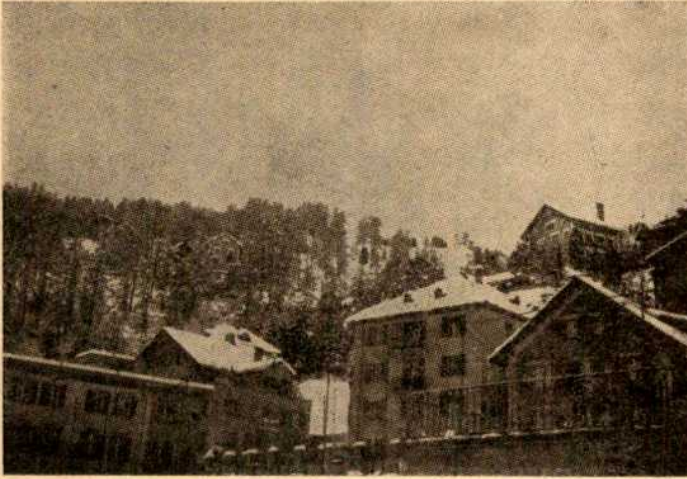
আবার ইটালীর সীমানা। কোমো ব্রহ্মের বৃকে পড়েছে তার প্রিয় শৈলের ছায়া ওরা মুখ দেখছে কোমোর কাকচক্ষুর মত নিখিল নীরে। ভাসছে একটা-দুটো ছোট নৌকা—সেই বর্ণিকমলভ-চেচামেচি—পরিবেশের রূপ ওদেরও দিয়েছে নিস্তরক করে।

এবার আমরা উঠছি তুষাররাজ্যে।

রাস্তার আশেপাশে ছড়ানো হিমকণা—ক্রমশঃ তুষারে ছেয়ে গেল চারিদিক। চার দিকে শুধুই সাদা। রোদের আলো পড়ে তার থেকে প্রতিবিম্ব ঠিকরে পড়ছে—তাকানো ক্রমশঃ দুধর হয়ে উঠছে। এ উচু পাহাড়-চূড়া, পাশের এ প্রাসাদগুলো, আমাদের ডানদিক ও বাঁদিক ৮০০০ ফুট নীচে এ যে গ্রামের রেখা দেখা যায় সবই যেন মান্ন দিয়ে তৈরি। হাত দিলেই গলে যাবে যে! এ চূড়ায় শুভ্র হিমালী ধারণ করেছে ভাস্করের সাতটি রঙ—তারই অদূরে ছোট একগুঁড় মেঘ সোনালী আর গৈরিক বর্ণে সেজে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জ্ঞা। এ সাইপ্রেস গাছগুলো ধরে রেখেছে রাশি রাশি পেঁজা তুলো। এক বার একটু হাল্কা হাওয়া এসে মজা দেওয়ার জ্ঞা ওলন্দে

চুল ধরে একটু নাড়া দিয়ে যাচ্ছে আর গুড়ো হয়ে বরষে পড়ছে হীরার কণা, শাপা তুলিয়ে এরা করছে আমাদের অভিভাদন, যতই উপরে উঠছি জমানো বরফের চোখ কলসানো রূপ ততই তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে। পাশে পেলাম ছোট একটি জলধারা—যা অতি কষ্টে নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। আমাদের স্নাইস পথপ্রদর্শক গর্বভরে বলল—জান, এই আমাদের নদী। দেখতে মনে হচ্ছে খুব ছোট, আসলে এই-ই কিন্তু অষ্ট্রিয়ার দানিযুব আর জার্মানীর ‘রাইন’কে জল যোগায়।

শ্রমপ্রিয় স্নাইস জাতি পথিকের সুখস্ববিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে পথের আশেপাশে তৈরি করেছে হোটেল রেস্তোরাঁ—চা-খানা আর



সেন্ট মরিস্-এর শীর্ষস্থানে

কক্ষখানা। তারই ফলে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট গ্রাম। স্বাস্থ্যনিবাস আর বসতবাড়ী কিছুই অভাব নেই। ক্রান্ত পথিক চা, কফি, সুরা, খাণ্ড—যার যাতে রুচি তার সদ্যবহার করে আবার যাত্রা করে শুরু—এখানে-সেখানে কর্মরত সুইস ছেলেমেয়ের দল হাত তুলে জানায় সহাস্ত অভিনন্দন। ব্যবহার এদের অত্যন্ত হৃদয়তাপূর্ণ। অতিক্রম করে যাই পাহাড়ের আর এক ধাপ। আর ১০০০ ফুট বাকী হঠাৎ গাড়ীর গতিবেগ কমে কমে ক্রমশঃ একেবারেই ফাস্ত হয়ে গেল। প্রকৃতি সহ্য করবে না যান্ত্রিক সভ্যতার অত্যাচার—তাই পাঠিয়েছে তুষার স্তূপ আমাদের পথ অবরুদ্ধ করতে। কিন্তু আমরা বিংশ শতাব্দীর নব-নারী তাই হার মানব না—গাড়ীর চাকার বেধে নিলাম লোহার শিকল আঁঠেপুঁঠ, আর সুইস পথরক্ষকেরা যন্ত্রেরই সাহায্যে বরফ পরিষ্কার করে অতিথিদের যাত্রাপথ করে দিলে স্বগম। এই অবসরে আমরা ছবি তুললাম, মধুচন্দ্রিকাবাপনকারী প্রেমিক প্রেমিকারা উপভোগ করে নিলে নীরব প্রকৃতির শাস্ত সৌন্দর্য—পরস্পরের দেহে তুষারকীলক ছুঁড়ে তারা অভিবাদন করল সেন্টমরিস্ উপত্যকাকে। ওদের পাশ হতে সরে গিয়ে চেষ্টা করলাম বরফের উপর গড়িয়ে ঢালু রাস্তা দিয়ে নীচে নেমে যাবার—বরফের ঘায়ে একটু রক্তপাত হ'ল মাত্র।

পাঁচ মিনিট চলার পরই হোটেলে এসে পৌঁছলাম। সেখানে লাফ খাওয়ার পর আবার উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। ৩০৫৮ মিটার (১০,০০০ ফুট) উচু এই গিরি-শৃঙ্গের অন্তরালবর্তী উপত্যকা প্রকৃতির মায়ামুখী। কল্পনা এখানে মুক—ভাষা এখানে নীরব। ধাপে ধাপে উচু হয়ে গিয়েছে যে হিম-অচল তারও দেহে অস্ত্রোপচার করেছে আধুনিক সভ্যতা। বাড়ীগুলো উঠেছে তার অঙ্গ ঘিরে। কিন্তু আজ তারা তুষারে আবৃত। গৃহবাসীর দল আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের নীচে—সমতলভূমিতে। দার্শনিক জীষ্টানরা এখানে তৈরি করেছে গীর্জা। বীণুজীষ্টের শিষ্য সেন্ট মরিস্-এর নামে উৎসর্গীকৃত একটি

মন্দির। দোকান, বাজার, হোটেল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার যত কিছু অত্যাশঙ্ক উপকরণ সবই এই দশ হাজার ফুট উপরে পাওয়া যায়। হেয়ার ডেসিং এমন কি 'নাইলনের মোজা সারাবার' দোকান পর্যন্ত। যারা এখানে বাস করতে আসেন তাঁরা কোনরকম অসুবিধা সহ্য করতে অভ্যস্ত নন। কি করে অতিথিকে স্বাচ্ছন্দ্য আর তৃপ্তি দিতে হয় তা এরা জানে। তাই যে একবার এখানে আসে, আবার সে আসতে চায়। আর্থিক লেনদেনের ভিতর দিয়েও এরা যে আন্তরিকতা দেখায় তার তুলনা ইংলণ্ডে ত নয়ই, আজকাল আমাদের দেশেও মেলে না। ইদানীং ইংলণ্ডের মুদ্রানিয়ন্ত্রণ-নীতির ফলে সুইজারল্যান্ডের ক্ষতিই বোধ হয় হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

—ওখানে গিয়ে বসবাস করা অনেকের

পক্ষেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। ফলে সুইস আতিথেয়তার সঙ্গে অর্থনীতি জড়িত হয়ে ওদের ব্যবহারকে করেছে আরও ভদ্র, আরও আন্তরিকতাপূর্ণ।

সেন্ট মরিস্‌এর উপর হতে নেমে আসার আয়োজন করছি হঠাৎ পিঠে আঘাত পেয়ে চমকে তাকলাম উপর দিকে—বরফে ঢাকা একটি বাড়ীর বারান্দা হতে সহাস্ত এক দল শিশু আমাদের বরফের গোলা ছুঁড়ে অভিবাদন করেছে। আমরাও চেষ্টা করলাম প্রত্যুত্তর দিতে। কিন্তু সমতলভূমির লোক আমরা পারব কেন ওদের সঙ্গে—রণে ভঙ্গ দিয়ে সহাস্তে আশ্রয় নিলাম “বাসহুর্গে”। চারিপাশের তুষাররাজ্যের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, “নবনীত গুহ” কথাটার মানে বোধ হয় এর আগে এমন করে আর বুঝি নি। মনে হয় হাত দিলে গলে যাবে—কিন্তু এরা বজ্রের মত কঠোর। বেশী চাপ দিলে গুড়া হয়ে যায়—জল হয় না—এরা ভাঙে তবু মচকায় না। যে কোন মালিঙ্গ এদের কাছে হার মানে। নীল আকাশের কোলে অপূর্ব গুহ পর্বতশ্রেণী একের কাঁধের উপর দিয়ে অপরে উকি মারছে, পায়ের কাছে পড়ে আছে হেলায়, জমে যাওয়া হ্রদের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। উত্তপ্ত তপন এর কাছে মাথা নীচু করে আপনার কিরণ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এই ত ভূস্বর্গ।

নেমে এলাম এই স্বরলোক থেকে। পড়ন্ত সূর্য্যের আলোর আশী মাইল পথ অতিক্রম করলাম তিন ঘণ্টায়। ঢালু পথে বিশেষ সাবধানে চলতে হয়—না হলে পদে পদে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। ফেরবার পথে গাইড আমায় জিজ্ঞাসা করল—কেমন দেখলে আমাদের দেশ। আমি বললাম, ‘চমৎকার’! সে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে আবার বলল, জানো, আমাদের এই দেশে থাকার জন্য লোকের আগ্রহের আর সীমা নেই—কি স্বন্দর আমাদের দেশ, মজা দেখার জন্য বললাম, “আমার কিন্তু মনে হয় না কেউ এখানে চিরকাল বাস করতে চাইবে, শুধু ধাকা আর খাওয়াটাই কি জীবনের সব?” সে

নিতান্ত বিশ্বয়ভরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বইল—এমন কথা সে বোধ হয় আর কখনও শোনে নি। তার পর তাকিলাভরে বলল—কি জানো, ভিন্ন রুচিহী লোকাঃ। আমি হেসে বললাম—তা ত বটেই। তবু প্রায় জমে উঠছিল হঠাৎ এক ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, ‘সুইস জাতির দেশের প্রশংসা করলে এরা তোমার বন্ধু—আর ওদের বিরুদ্ধে কিছু বললে বা সমালোচনা

করলে এরা তোমার কুপার চোখে দেখবে।’ বিদেশে বন্ধুঘটা বড়ই মূল্যবান, তাই প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্ত বললাম, দেখেছ এ কোমো গ্রামটি কি সুন্দর দেখাচ্ছে—সুখ্যাস্তের রঙ পড়ে আলপসের বৃকে রক্তিম কোমোগ্রাম আমাদের জানাল বিদ্যার-অভিনন্দন, আমার সঙ্গীর মুখ হয়ে উঠল উজ্জল, আমরাও নেমে এলাম আমাদের আবাসে।

কি ছিল, কি হ'ল ?

শ্রীজলুধর চট্টোপাধ্যায়

১৬

আবার আগুন নাড়াচাড়া পড়ল। কয়লা-ঝরা কাঠের আগুন দাউ দাউ করে জ্বল উঠল।

দীনেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—রমাদেবী এখন কি করছেন ? তার কথা ত আর বলছেন না কিছু ?

উপত্যাসিক একটু হেসে বললেন, তিনিই ত করছেন সবকিছু। আড়ালে বসে ভাগ্যদেবীর মত উপত্যাসের নায়ক নরোত্তমের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনিই। একটা কথা এখন বলব ?

—কি কথা ?

—না, থাক। এখন বললে রসভঙ্গ হবে। পরে বলব। কি বলেন ?

—বলব বলে না বললে উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠে। বলুন, বলুন...

—উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে নিতে পারলেই ত উপত্যাস জমে। যাক গে বলেই ফেলি। তাত্ত্বিক সাধুটি কে—বুঝতে পেরেছেন ?

—আজ্ঞে না।

উপত্যাসিক হাসতে হাসতে বললেন, এই তাত্ত্বিক সাধুটি হচ্ছেন রমাদেবীর পিতা...

অনেকেই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল—তাই নাকি ? রমাদেবীর পিতা !

—হ্যাঁ। রমাদেবী তাঁকে চেনেন না। কিন্তু তিনি রমাদেবীকে চেনেন। ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রমাদেবী মাতৃহীন হয়েছিলেন। পিতাও সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাসী অনেক দেশ ঘুরেছেন। তারপর তাত্ত্বিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বহুদিন পরে আজ মেয়েকে দেখতে এসেছেন।

সাধুজী আত্মগোপন করে জমিদারের অন্দরমহলে গিয়ে রমাদেবীকে দেখলেন। শুনলেন তাঁর অদৃষ্টের বিড়ম্বনার কথা, বিবাহিত জীবনের লাঞ্ছনার কথা। রমাদেবী কৈদে কৈদে সন্ন্যাসীর পায়ে নিবেদন করলেন—তাঁর সকল মন্দ্বৈদনা।

সাধুজী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ‘কৈদে না মা। মা ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছায় আমি যখন এসে পড়েছি তখন তোমার আর কোন ভয়

নেই। তোমার স্বর্গীয় স্বপ্নের ছিলেন আমার পরম বন্ধু। তার ছেলের মতিগতি পরিবর্তনের চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করব।’ সাধু কিন্তু রমাদেবীকে জানতে বা বুঝতে দিলে না যে, তিনিই তাঁর পিতা। রমাদেবীও চিনলেন না পিতাকে।

মন্দিরে বসেই গুরু-শিষ্যের মণ্ডপান লক্ষ্য করে, রমাদেবী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কুমারবাহাহুরের বেশভূষার পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হলেন। তারপর কোন এক মহাশয়ানের অভিমুখে ছ’জনাই যাত্রা করছেন শুনে রমাদেবীর বিশ্বাসের সীমা রইল না। শুনলেন—নন্দরাণীও নাকি যাচ্ছে তাঁদের সঙ্গে। কি আশ্চর্য্য।

একটি বছর গুরু-শিষ্যের আর কোন খবর পাওয়া গেল না। কুমারবাহাহুরের অভাবে জমিদারীতেও নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটতে লাগল। রমাদেবী নরোত্তমকে ডেকে পাঠালেন।

—এখন উপায় কি নরোত্তম ?

দৃঢ়তার সঙ্গে নরোত্তম বলল, কোন ভয় নেই মা ! তোমার এই বড় ছেলে যত দিন বেঁচে আছে, তত দিন তার নাবালক ছোট ভাইটির অনিষ্ট করতে কেউ পারবে না।

নন্দরাণীর অনুপস্থিতির জন্তে আসামী নরোত্তমের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ আর টিকল না। মামলা ডিসমিস হয়ে গেল। নরোত্তম এখন হুবেলাই জমিদার-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করছে। রমাদেবী লক্ষ্য করছেন—অশিক্ষিত হলেও নরোত্তম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কৌশলী। অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চশিক্ষিত ম্যানেজারকে সে টেনে আনল মুঠোর মধ্যে। জমিদারীতে আর কোন বিশৃঙ্খলা ঘটবার আশঙ্কা রইল না।

এদিকে সখিচরণের চেষ্টায় কাদম্বিনীর বিয়ের ব্যবস্থা উঠল। নরোত্তম কোন আপত্তি করল না। মনোহরের ইচ্ছা ছিল—এবারই তার ইট তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু সখিচরণ অত্যন্ত

কালি দেয়, ইমারতের চূণ-বালি দিয়েও সে কালি ঢেকে রাখা যাবে না।

কাদম্বিনীর বিয়ের জট্টাই ইমারতের ভিত্তি গাঁথা বন্ধ রইল। মেঝে খুঁড়ে নোটভর্তি ঘাটগুলো সবই তোলা হ'ল। বরাভরণ, বরশয্যা ও বরণ নগদ চাই। পাত্রটি কোন অবস্থাপন্ন মণ্ডল-পরিবারের ম্যাট্রিক পাস ছেলে। স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন।

চাষী মোড়লরা সবাই নগদ টাকা দিয়ে মেয়ে কেনে। কিন্তু আজ এ কি ব্যাপার? কালো অক্ষরের মান, এত দাবি-দাওয়া? ছেলের চাহিদা দেখে সবাই বিস্ময় বোধ করতে লাগল।

হাসতে হাসতে সখিচরণ বলল—বড়দা! কি ভুলই করেছ। ছোটবেলার আমাদের কেন পাঠশালাটা ঘুরিয়ে আন নি? খন্তর ব্যাটার কান মুচড়ে কিছু টাকা আদায় করতে আমরাও ত পারতাম?

নরোত্তম গম্ভীরভাবে বলল, টাকা নেওয়ার চেয়ে দেওয়ার সুখ বেশী...

সখিচরণ নীচু স্বরে টিপ্পনী কার্টল—অবিশ্বাস, যদি থাকে...

নরোত্তম সম্ভবা করল—ধানের দাম বেড়ে গেছে। আমাদের লাঙলের ফালে বত টাকা উঠছে—কোন কলমপেয়া কেরাণী তা কামাতে পারছে না।

শ্রামাচরণ বলল, তবে ও পোশাকী বাবু ছেলেটিকে পছন্দ করলে কেন? আমাদের মত টিপসই লাঙলা-ছেলে তো দেশে চের আছে।

মনোহর বলল, কানাই ছেলেটাই বা মন্দ কি? তার সঙ্গে ত...

কানাইয়ের নাম শুনেই সখিচরণ রেগে উঠল। চিংকার করে বলল, গঁজেল কানাইকে যদি এ বাড়ীতে আর কোন দিন দেখি—তাহলে তার মুণ্ড উড়িয়ে দেব...

ঠিক এই সময়ে অগ্ন ঘরে সেজবোঁ সুহাসিনী নন্দিনী কাদম্বিনীর চোখ মুছিয়ে বলছিল—কাদিস নে। কি সুন্দর লেখাপড়া জানা ছেলেটি। মুখ্য কানাই তার বা-পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারে না। অব্য বালিকার প্রেমে বিধাতার যে কি ভয়ানক অভিযাপ আছে—কাদম্বিনী তা জানে না।

শুভদিনের তিন চার দিন আগে দীনবন্ধুঠাকুর এসে বিয়ে বাড়ীর কর্তা সেজে বসলেন। মোড়লরা টিপসই মাত্র করতে পারে। নরোত্তমের অনুরোধে—ফর্দ-ফিরিস্তি ও হিসাবপত্র লেখবার ভার তিনিই নিতে বাধ্য হলেন। নরোত্তম পরগণা নিমন্ত্রণ করল। ব্রাহ্মণপাড়াতে গিয়েও সকলের পায়ের ধুলা প্রার্থনা করে এল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণবাড়ীতে চাল ভাল, ছুন তেল, মাছ ছুঁ ও তরিতরকারী

স্বাভাবিক হয়ে গেল। চার ভাই পরস্পরের সঙ্গে প্রতি-
ভাবের এমন একটা বিরাট পরিকল্পনা ফেঁদে
উঠলেন। পোতা টাকার ঘটি
করলেন না।

শ্রদ্ধ নিয়ে নরোত্তম গিয়ে

দাঁড়াল জমিদার-গৃহিণী রমাদেবীর সামনে। বলল, মা! একটা কথা বলব? অপরাধ নেবে না?

—ছিঃ নরোত্তম! মায়ের সঙ্গে কি ওভাবে কথা বলতে আছে? এখে বড্ড দূরের ভাব। মা ভালবাসে ছেলের আদ্যার। বল, কি বলবে?

অতি বিনীতভাবে নরোত্তম বলল—মা! তোমারই মেয়ের বিয়ে। আমার ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে তুমি কি একবার পায়ের ধুলা দেবে না সেখানে?

রমাদেবী একটু হেসে বললেন, আমি ত ভেবেছিলাম—তুমি একবার মুণের কথাটাও বলবে না আমাকে। যাঁক্গে। এখুনি বোহারাদের খবর পাঠাও। কাল ভোরেই আমি যাব তোমাদের বাক্সীতে। সারাদিন সেখানে থাকব। নিজেই দেখে শুনে মেয়ের বিয়ে দিয়ে রাত্রে ফিরে আসব।

—বল কি মা! নরোত্তম অভিভূত হয়ে পড়ল। সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, না, না, তা হতে পারে না। তোমাকে একটু বসতে দেব, এমন আসনও ত নেই আমার বাড়ীতে। সারাদিন কোথায় থাকবে তুমি?

—সে ভাবনা তোমার নয়—আমার। একটু ভেবে রমাদেবী বললেন, ম্যানেজারকে খবর পাঠাও—এখুনি আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে...

নরোত্তমের হুঁচোখ থেকে তখনও আনন্দাশ্রু বরছিল। ম্যানেজারকে কথাটা জানিয়েই ছুটে গেল নিজের বাড়ীতে।

নরোত্তমের প্রতীক্ষার দীনবন্ধুঠাকুর রাস্তার এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাকে দেখেই বললেন—কোথায় গিয়েছিলেন?

কেন?

—তোমাদের পোতা টাকা ত ফুরিয়ে গেছে। এখন উপায় কি? এদিকে, নারদের নেমস্তন্ন করে বসে আছ। হালুইকর এসে গাঁজা টিপছে। মালমশলার ব্যবস্থা কি? টাকা কোথায়?

—সে ভাবনা আমার নয় ঠাকুরবুড়ো, আমার মায়ের। মা নিজেই আসছেন।

মাতৃভক্ত নরোত্তমের মা যে কে, তা দীনবন্ধুঠাকুর ভানেন। সেই প্রস্তরময়ী মা ত যুগযুগান্ত জিভ্ বের করেই দাঁড়িয়ে থাকেন। ভক্তের কুল জল ও প্রেমাক্ষ গ্রহণ করেন। তাঁর কোন কণ্ঠ নেই, কণ্ঠফলপ্রাপ্তির আনন্দ বা অনুশোচনাও নেই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তির অভ্যুত ফিরে গেলেও, তিনি ভাঁপুরে গিয়ে মিষ্টান্ন পরিবেশনের ভার গ্রহণ করবেন না। একটু বিরক্ত ভাবে বললেন, পাগলামো কর না নরোত্তম, কারও ছুঁখ নিবারণের জন্তে মা কোনদিন মন্দিরের বাইরে আসে নি, আসবেও না।

—তাই নাকি? নরোত্তম হো হো করে হেসে উঠল। ঠাকুরবুড়ো, তোমরা শুধু মস্তুর আওড়াতেই জান। ভাব বুঝি মা আমার দিনরাত ওই মন্দিরেই বন্দী থাকে? তা নয়—তা নয়। দরকার হলে মাঝে মাঝে মা বেরিয়েও পড়ে, নরোত্তমের ডাকে

সাদা না দিয়ে পারে না। দাদার মাঠে যাকে দেখতে পাই—
কাছুর বিয়ের দিনে সেই মা আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো না দিয়ে
কি পারে? অ'সবে, আসবে—আমার মুখ রক্ষা করবে। তুমি
নিশ্চিন্ত থাক...

নরোত্তমের নিশ্চেষ্টতা ও মায়ের উপর নির্ভরপরায়ণতা দেখে
দীনবন্ধুঠাকুর বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। হালুই-
করার বসে আছে। ছানা আছে, চিনি নেই। সন্দেশের পাক উঠছে
না। হাটের বেলা হয়ে গেছে, তরিতরকারি আনবার কোনও
বন্দোবস্ত হচ্ছে না। টাকা নেই। উপায় কি?

দীনবন্ধুঠাকুর বিরক্ত ভাবে বললেন, শোন নরোত্তম, প্রায়
পাঁচ হাজার লোক নেমস্তন্ন করছে। তোমার আত্মীয়-কুটুম্বরা
এসে বাড়ী ভর্তি করে ফেলছে। এ কাজের কর্তৃত্ব ভার দিয়ে
আমাকে একটা লজ্জার ভিতর ফেলবে নাকি?

দীনবন্ধুঠাকুরের বসবার আসন ছিল—বাইরের ঘরের বারান্দায়
পাতা একটা নূতন মাদুর। একটি নূতন মেটে হাঁড়ির ভিতর ছিল
—দোয়াত, কলম ও হিসাবের কাগজপত্র। এক খণ্ড কাগজ টেনে
নিয়ে দীনবন্ধুঠাকুর চিঠি লিখতে বসলেন। নরোত্তমকে বললেন,
শীগগির একবার মনোহরকে ডাক তো...

—কেন?

—এই চিঠিখানা নিয়ে এখুনি যাও...

—কোথায়?

—আমার গিল্লীর কাছে।

—কি লিখছ তাঁকে?

—তার গলার হার ছ'গাছা, আর হাতের আটগাছা চুড়ি—

এখুনি পাঠিয়ে দিও।

—না, না, সে কথা লিখ না। লিখে দাও, কাল সকালে হার
আর চুড়ি পরে সে-জ-গু-জ বসে থাকতে। নরোত্তম গিয়ে তার
খুড়িমাঝে নিয়ে আসবে।

—না, না, তিনি এখানে আসবেন না।

—কেন আসবেন না? মা এলে, খুড়িমাঝেও আসতে হবে...

এমন সময় একটা সাইকেল চেপে ম্যানজার এসে বললেন,
নরোত্তম, কাল তোমার মা এসে কোন ঘরে থাকবেন? কি, কি
আসবাব্যপত্র সেখানে দরকার হবে? একটা ফর্দ করে দাও...

দীনবন্ধুঠাকুরের হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। তিনি অবাক
হয়ে চেয়ে রইলেন ম্যানজারের মুখের দিকে। অশ্রুত স্বর বললেন,
কি বলছেন আপনি? জমিদার-গৃহিণী আসবেন নরোত্তমের
বাড়ীতে?

ম্যানজার বললেন, হ্যাঁ, কাল ভোরেই আসবেন তিনি।
সারাদিন থাকবেন এখানে। রাত্রে বিয়ে দেখে, ফিরবেন।

দীনবন্ধুঠাকুর ভাবতে লাগলেন—তাদের শাস্ত্র-জ্ঞান, আর ফুল-
পাতা দিয়ে দেব-দেবীর অর্চনা একেবারেই পণ্ডশ্রম। মাতৃমস্ত্রে
উৎকৃষ্ট নরোত্তমের সর্বত্র মাতৃ-দর্শন—সাধনায় সিদ্ধিলাভের একমাত্র

পন্থা। তাই তো মা এসে ভক্ত-রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়ে-
ছিলেন। আজ মাতৃভক্ত নরোত্তমের মানব্ধর্য জন্মে কোন মা
আসছেন? ধনীর ঢুলালী জমিদার-গৃহিণীর অন্তরে নরোত্তম আজ
কোন মাকে জাগিয়ে তুলেছে? মন্দিরের পাষাণী মা-ই কি মন্দির
ছেড়ে বেরিয়ে এলেন? মাতৃসাধক নরোত্তম! তুমিই ধন্য।

পল্লীগ্রামের জমিদারের আভিজাত্যের অহঙ্কার যে-কোন সম্রাটের
চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। জমিদাররা কখনও কোন প্রজা-বাড়ীতে
পদধূলি দিতেন না। জমিদার-গৃহিণীর প্রজার গৃহে আগমনের কথা ত
কেউ ভাবতেই পারে না। জমিদারীর ইতিহাসে যে ঘটনার কোনও
নজির নেই, উদার-হৃদয়া তেজস্বিনী রমাদেবী আজ তাই করছেন।
জমিদার-পরিবারে বিক্ষোভ আরম্ভ হ'ল। কর্মচারীরাও বিরুদ্ধ
মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু সামনে এসে কেউ কোনও
প্রতিবাদ করতে সাহসী হ'ল না।

একজন অতি বুদ্ধ কর্মচারী, যিনি এই জমিদারীর তিন-পুরুষ
দেখে আসছেন, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। কাঁপতে
কাঁপতে এসে বললেন, মা! কাজটা কি ভাল হচ্ছে? জমিদারের
সম্মান...

—‘খামুন!’ ধমক দিয়ে রমাদেবী বললেন, ‘জমিদারের সম্মান
কিসে বাড়ে—তা আমি জানি! স্বার্থ-বুদ্ধি নিয়ে আপনারাই ত
চিরদিন জমিদারকে আড়ালে রেখেছেন, প্রজা-মনিব স্বত্বকে
বিবাস্ত করে তুলেছেন। নরোত্তম আমার ডেলে!’

নরোত্তমের বাড়ীতে জমিদার-গৃহিণী আসছেন। পরগণায় একটা
দৈ-চৈ পড়ে গেল। মোড়লরা চার ভাই আজ আনন্দে আত্মহারা।
পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনরাও সে আনন্দোৎসবে যোগদান
করেছে। কাদম্বিনীর বিয়ের চেয়েও, মোড়লদের বাড়ীতে রমাদেবীর
অবস্থান—বেশী আকর্ষণীয় ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তাঘাট
পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। বাড়ীর প্রবেশ-পথে, ফুলপাতা দিয়ে
তোরণ তৈরি হচ্ছে। শেখ-রাজ্রেই বাজকররা নহবতে উঠবে।
এলাহি ব্যাপার!

সবচেয়ে বেশী ছোটোছুটি করতে হচ্ছে—দীনবন্ধুঠাকুরকে। তাঁর
কাছটা বার বার খুলে যাচ্ছে! কাঁধের নামাবলীখানাও পড়ে
যাচ্ছে। সখিচরণ এসে পায়ের ধূলা মাখায় নিয়ে করজোড়ে নিবেদন
করল—ঠাকুরখুড়ো! অনুমতি করুন—আপনার কাপড়খানা ভুঁড়ির
উপর গেলো দিয়ে বেঁধে দি। একটু সাবধান হওয়া ভাল...

মৌরভিণী, স্ফাসিনী আর নীহারিকা ততস্থ হয়ে আছে।
নরোত্তমের আদেশ—তাদেরই করতে হবে জমিদার-গৃহিণীকে সেবা
ও যত্ন।

সখিচরণ হাসতে হাসতে স্ফাসিনীকে জিজ্ঞাসা করল—ওকি!
তোমার চোখ ছটো ছল্ ছল্ করছে কেন?

—আমাকে বাপের বাড়ীতে...

দেখব না...

—কেন?

—আমার বড় ভয় করছে...

—ভয় কি? তিনি সাপও নন—বাঘও নন। তোমাদের মতই একটি মেয়ে। এই যে মেজবোদি, দোহাই তোমার—ছেলেমেয়েদের যত শাসন করতে চাও, আজ রাতেই করে কেল। কাল কিন্তু কারও গায়ে একটি চড়-চাপড় মারতে পারবে না।
শুনলাম—তিনি নাকি তোমাদের ষগড়া-ঝাটি শুনতেও রাজী আছেন, কিন্তু কোনও বাচ্চাকে ঠেড়ানো সহ্যবেন না! এই যে ছোটবোমা, তোমার চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? তুমি ত একটু লেখাপড়া জ্ঞান? শুভ মার্গ বলে সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। ভয় কি?

১৭

আষাঢ় মাস। তখনও পল্লীর মাঠে ঘাটে বর্ষার বান ডাকে নি। হাণি-কান্নার মত আকাশের কোলে উষার উজ্জল আলো, আর জলভরা ছিন্ন মেঘের গাঢ় অন্ধকার, শুভ দিনেও অনিশ্চিত আবহাওয়ার সূচনা করছে।

মাঠের বর্ণ বিস্তার এক ঢালা সবুজ। বর্ষান্নাত সতেজ ধানের চারাগুলি বাতাসে হেলে-তুলে চাষীর মনে আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছে। গাছে গাছে সবুজের আনন্দ। জীবনীশক্তির পূর্ণ বিকাশ। ফুল-ফসলের পূর্ণাভাস।

আট-বেহারার পাকীতে চড়ে রমাদেবী আসছেন নরোত্তমের বাড়ীতে। পল্লীপথ আনন্দ-কলরবে মুখরিত। হেলে-বুড়ো সবাই এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের বাইরে। মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে, উলু দিচ্ছে। পল্লীবধূরা ঘোমটার ভিতর থেকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে রমাদেবীকে একবার দেখবার জন্তে।

রমাদেবী তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমেরিকার রাজপথে ঘুরছেন। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার বিলাস-বৈভব ও জীবন-যাপনের স্বাচ্ছন্দ্য অল্পভব করে এসেছেন। কিন্তু, দরিদ্র ও অল্পশ্রুত বাংলার পল্লীপথে আজ তিনি একি দেখছেন? চারিদিকে প্রাণমাতানো সবুজের লীলা, সহজ ও সরল পল্লী-জীবনের আনন্দ-মেলা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ-শক্তির স্বভাব-সুন্দর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ!

ভোর পাঁচটা থেকেই নহবত বাজছে। বেলা সাতটায় রমাদেবীর পাকী এসে খামল মোড়লদের বাড়ীর সামনে, ফুল-পাতায় সাজানো তোরণ-দ্বারে। মোড়লরা চার ভাই গলবস্ত্রে ও করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। নরোত্তমের হুঁচোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে। পথঘাট লোকারণ্য। মানুষের গায়ে মানুষের চাপ। চাষীরা কেউ আজ লাঙল নিয়ে মাঠে যায় নি। সবাই এসেছে রাণীমাকে দেখতে।

রমাদেবীকে ঘরে নিয়ে তুলবার পথটায় মেয়েদের রঙীন শাড়ী পাতা। রাণীমার পায়ে যেন একটুও জলকাদা বা ধূলোবালি না পড়ে। রাণীমাকে পাকী থেকে নামলেন।
—কিন্তু...
—মাটিতে পা রাখ না।

বোঁদের শাড়ী তারাই পেতে দিয়েছে। ওতে তোমার পা লাগলে, তারা যে ধ্বংস হয়ে যাবে মা!

রমাদেবী সেই শাড়ী মাড়িয়েই ঘরে উঠতে বাধ্য হলেন। বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে উঠে বসলেন। চারদিক থেকে আরম্ভ হ'ল মেয়ে-পুরুষের প্রণামের পালা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রমাদেবীর পা-ছানা ঢাকা পড়ল প্রণামীর ঢাকায়।

রমাদেবী অতি নিখুঁতগঠন ও অপূর্ব সুন্দরী। দুধে-আলতা রং আর ভ্রমর-কালো চুল। সবচেয়ে সুন্দর তাঁর চোখ দুটি। কত স্বচ্ছ, কত করুণ আর কত মধুর আবেশভরা তাঁর দৃষ্টি! এ কোন্ ভাস্করের সৌন্দর্য-পরিকল্পনার চরম সৃষ্টি? চাষী ছেলে-মেয়েরা অবাক হয়ে ভাবছে আর দেখছে কোলে তাঁর কি সুন্দর গোলাপফুলের মত কচি ছেলেটি!

চাষী-মেয়েদের অলঙ্কার-প্রিয়তা খুব বেশী। সোনারপো না জুটলেও একগোছা কাঁচের চুড়ি তারা পরবেই। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখতে লাগল—রাণীমার হাতে খুব সুরু হুঁগাছা সোনার চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নেই। গলায় আছে এক ছড়া দামী মুক্তার মালা।

বোঁদের সবাই সঙ্গেই রমাদেবীর আলাপ-পরিচয় হ'ল। হৈসেলেও না ঢুকে ছাড়লেন না তিনি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, তত্ত্ব ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, সবাইকে। ছোট বোঁয়ের ঘরে ঢুকে দেখলেন—বিয়ের কনে' কাদধিনী এক কোণে চুপটি করে বসে কাদছে। তার হলুদমাথা অঙ্গ আর পরিধানের লালপেড়ে নতুন শাড়ীখানা দেখেই চিনলেন তাকে। আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, আজকের এই শুভ দিনে তুমি চোখের জল ফেলছ কেন?

কাদধিনী মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর কথার কোন জবাব দিল না।

নরোত্তম এসে জিজ্ঞাসা করল, মা! কাছের কল্যাণে কালী-বাড়ীতে আজ একশ' আটটি পাঠা বলি হবে। তুমি কি দেখতে যাবে?

—একশ' আটটা? রমাদেবী শিউরে উঠলেন।

—এই পরগণার প্রায় পাঁচ হাজার লোক মায়ের প্রসাদ পাবে। একশ' আটটা তো খুব বেশী নয় মা?

—না, না, অত বড় একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখব না আমি।

—আমি নিজেই তো খাঁড়া ধরব...

—একশ' আটটা জীব হত্যা করতে তোমার হাত কাঁপবে না? তুমি কি বলছ নরোত্তম?

—কেন কাঁপবে! আমার মা যে বস্তু পেতে চান। একশ' আটটা কইমাছ কাটিতে দেখলে তো তোমরা শিউরে উঠ না মা! হুটুস্ত তেলে তাজা কইগুলোকে ভাজতেও মেয়েদের হাত কাঁপে না। পাঠাগুলোর উপর এত দরদ কেন?

—আমি মাছও পাই না, মাংসও পাই না। বিষয়: কথা হচ্ছে

মেয়ের বিয়ের রাতে মাকে উপবাসী থাকতে হয়। বিয়ের পর একটু দুই-মিষ্টি খাব। কালীরাড়ীতেই হোক, আর এখানেই হোক, আমার কোন খাবারের ব্যবস্থা করো না কিন্তু...

নরোত্তমের সঙ্গে বাইরে গিয়ে রমাদেবী দেখলেন, একটা খোলা জায়গায় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। তার নীচের তক্তাপোশের মুখে ভেলভেট দিয়ে ঢাকা চেয়ার। সামনে ছোট টেবিলের উপর দুটো ফুলদানি। তার চারিদিকে বহুলোক সমবেত হয়েছে। দীনবন্ধুঠাকুরের অনুরোধে রমাদেবী গিয়ে বসলেন সেই চেয়ারে।

কুমারবাহাদুরের অত্যাচারে বহু প্রজা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। খাজনা-আদায় বন্ধ করেছিল। আজ তারা সবাই এসেছে নরোত্তমের বাড়িতে রাণীমাকে দেখতে ও প্রণামী দিতে।

এক জন বৃদ্ধ চাবী চীংকার করে উঠল—‘জয় আমাদের রাণীমার জয়!’

রমাদেবী বলতে লাগলেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিছি—তোমাদের প্রত্যেকটি গায়ে আমি যাব মায়ের দাবী নিয়ে। তোমরা আমাকে যত টাকা প্রণামী দেবে তার পাঁচ গুণ আশীর্বাদী আমি দেব—সেই গায়ের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্তে। মনে রাখবে—জমিদার তোমাদের প্রভু নন, সেরক।

সমবেত জনগণ রমাদেবীর উচ্চ প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে উঠল।

ছোটবেলা নীহারিকার ঘরে তখনও কাদম্বিনী কেঁদে কেঁদে বৃদ্ধ ভাসাচ্ছিল। নীহারিকা তর্জনী তুলে মনোহরকে বলল, আমি এখনও বলছি—তোমার দাদাদের বল—আমার ভাই কানাইয়ের সঙ্গেই ওকে বিয়ে দিক। নইলে অনর্থ ঘটবে...

মনোহর বলল, এখন আর সেকথা আমি বলতে পারব না। তাতে যদি ও বিধ বেয়ে মরতে চায়, মরুক। আমি এনে দিছি...

কাদম্বিনী শুধুই কাঁদে, কোন কথা বলে না। তার পক্ষে ওকালতি করে নীহারিকা। নীহারিকা বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের পাঠ সমাপন করেই হুঁচারণা আধুনিক গল্পের বই পড়ে ফেলেছে। নিজেও আধুনিকা হতে চেষ্টা করছে। ‘আমি তোমার সেবাদাসী নই!’ দিনের মধ্যে দশ বার একথাটা সে মনোহরকে শুনিয়ে দিচ্ছে। সবলা পল্লী-বালিকা কাদম্বিনীর মনের উপরেও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। কাদম্বিনীকে বুঝিয়ে দিয়েছে—প্রেমের জন্তে আত্মোৎসর্গ করলে মেয়েরা স্মরণীয় হয়। কানাইয়ের সঙ্গে কাদম্বিনীর পূর্বরাগের প্রেমপালা নীহারিকার তত্ত্বাবধানেই ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে উঠেছে। এখন তার নাটকীয় পরিণতির জন্তে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া কাদম্বিনীর আর কি উপায় আছে?

আর এক বার চোখ রাঙিয়ে নীহারিকা মনোহরকে বলল, এখনও সাবধান হও। লেগাপড়া তো জান না? এই বইখানা যদি পড়তে পারতে, তা হলে বুঝতে—‘ব্যর্থ-প্রেমের’ পরিণতি কি ভয়ানক!—বলেই সে একখানা বই ছুঁড়ে ফেলল মনোহরের গায়ের উপর। বইখানা কুড়িয়ে নিয়ে মনোহর দেখল, তার রঙীন মলাটে একটি রোক্তমীনা স্তম্ভরী ছবি। এই ছবি দেখিয়েই নীহারিকা

কাদম্বিনীকে তৈরি করেছে। তার ব্যর্থ প্রেমের ভাবসমাপ্তি গড়ে তুলেছে।

মনোহর নিপুণ মৎস্ত-শিকারী। হোচ-কোঁচ বড়শী-পোলো দোয়াড-ঘুনসী প্রভৃতি মৎস্ত-শিকারের বহুবিধ যন্ত্র তার ঘরে আছে। রমাদেবীর আদেশে জমিদার-বাড়ীর দীঘি থেকেই বড় বড় কুই-কাতলা ধরে আনবার ব্যবস্থা হয়েছে। এখন জেলেরা এসে বেড়-জাল নিয়ে নামবে। মনোহরের উপর পড়েছে তত্ত্বাবধানের ভার। প্রেমভক্ত আলোচনার সময় এখন তার নেই। সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

—তোমরা যা জান কর। আমি চললাম...বলেই একগাছা খেপলা-জাল কাঁধে ফেলে মনোহর রওনা হ'ল।

নীহারিকা চোখমুখ ঘুরিয়ে কাদম্বিনীকে বলল, এসব আয়োজন তো তোর জন্তে নয়, জমিদার-গিল্লীর জন্তে। তোর খবর কে রাখছে? তুই কে?

কাদম্বিনী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে নীহারিকার মুখের দিকে। মনে মনে ভাবে, সত্যিই তো সে কে? তার চোখের জলে বৃদ্ধ ভেসে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা-লগ্নেই বিয়ে। বর এসেছে। নহবতখানায় সানাই বেজে উঠেছে। প্রাণমাতানো মধুর রাগিণী সে শুভসংবাদ চারিদিকে ঘোষণা করছে। পাড়াময় হৈ চৈ। উদ্বেলিত জনসমুদ্র যেন মোড়লদের বাড়টাকে ভাসিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। কোন দিকেই শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব হচ্ছে না। নিরবস্থ উপবাসী দীনবন্ধুঠাকুর গলদ-ঘর্ম হয়ে ছুটোছুটি করছেন। বর এসে রমাদেবীর পায়ের উপর প্রণাম করল।

শুভলগ্ন উপস্থিত। বরকে সভাস্থ করা হ'ল, কিন্তু কাদম্বিনী কোথায়? তাকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? কেউ বুঝতে পারছে না—ব্যাপার কি? পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে—কাহ কোথায়?

মনোহর ছুটতে ছুটতে এসে নীহারিকাকে জিজ্ঞাসা করল—কাহ কোথায়?

নীহারিকা সোজা জবাব দিল—জানি না।

কাউকে কিছু না বলে মনোহর ছুটে গেল কানাইয়ের বাড়ীর দিকে। একটা মাঠের ওপারে তার বাড়ী। জংলা-বাড়ীতে মাত্র একখানা ভাড়া খড়ের ঘর। এক বুড়ী-ঠাকুরমা ছাড়া কানাইয়ের আর কেউ নেই।

মনোহর তাকেই জিজ্ঞাসা করল—কানাই কোথায়?

বুড়ী বলল, সে তো এই সন্ধ্যার ইষ্টিমারে কলকাতায় রওনা হয়ে গেছে...

মনোহর মাথায় হাত রেখে বসে পড়ল। সে বৃদ্ধ সর্বনাশ হয়েছে। এখন আর প্রতিকারের কোন উপায় নেই। ফিরে এসে সখিচরণকে সব কথা বুঝিয়ে বলল। সখিচরণ বলল নরোত্তমকে।

কানাই স্বপ্নে কাদধিনী'র দুর্বলতার কথাটা ভায়েরা সবাই জানে, জানে না শুধু নরোত্তম। চন্দ্রকলা তো বেঁচে নেই? - কে তাকে জানাবে? বুদ্ধিমান ভায়েরা কথাটা এক বার নরোত্তমের কানে তোলাও আবশ্যক বোধ করে নি।

সংগীতের কাছে আত্মপূর্বিক শুনে নরোত্তম কেঁদে উঠল—ওরে বোকারা, এতদিন কথাটা আমার কাছে গোপন রেখেছিলি কেন? না হয় কানাইয়ের সঙ্গেই তাকে বিয়ে দিতাম। এমন জাতিনাশা কেলেকারী তো ঘট না? নরোত্তম বুক চাপড়ে আর্দ্রনাদ করতে লাগল।

রমাদেবীও অতন্ত মর্গাহত হয়ে পড়েছেন। নরোত্তমকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—কিন্তু সে কি আর সান্ত্বনা মানে? কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা! নরোত্তমের উঁচু মাথাটি আজ মাটিতে মিশল। মায়ের পেটের বোন আজ আমাকে যে শান্তি দিলে, তা আর কেউ কখনও পারে নি। কত দাঙ্গায় লাঠি-সড়কি নিয়ে লাকিয়ে পড়েছি। ছুঁচাঘটি মাথা না নিয়ে কিরি নি। কিন্তু কাহু আমার সে লাঠি-সড়কির অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ করে দিয়ে গেছে। নরোত্তম আর নেই।

রমাদেবী তাঁর ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, কাল সকালেই একথানা 'ভার' করে দিন শিয়ালদার ষ্টেশন-মাষ্টারের নামে।

—তার করে আর কি হবে মা?

—তুমি কি বলছ নরোত্তম? একটা চরিত্রহীন বদ জেলের কুপরামর্শে একটি অবুঝ মেয়ে তার সর্বনাশ করবে, আর আমরা নিশ্চেষ্ট থাকব?

—তাকে কি আর ফিরিয়ে আনা যাবে?

—কেন যাবে না? একসপ্রেসটা পৌঁছেবে কাল এগারটায়। তার আগেই আমাদের তার পৌঁছে যাবে। নিশ্চয়ই তারা ধরা পড়বে...

রমাদেবীর পায়ের উপর মাথা রেখে নরোত্তম কেঁদে কেঁদে বলল, মা! আমার কাহুকে ফিরিয়ে আন। নইলে আমি বাঁচব না।

রমাদেবী মনে মনে ভাবছিলেন—যার কল্যাণকামনা করে একশ' আটটা জীবহত্যা করেছে—তার জীবনের এই পরিণতির জন্তে বোধ হয় তুমিই দায়ী নরোত্তম! একের অনিষ্টসাধন করে অশ্রের ইষ্ট কামনা শুধু নির্বন্ধিতা নয়, পাপ—ধর্মের নামে অধর্ম!

ক্রমশঃ

এবার পূজা অশ্রু-গঙ্গাজলে

শ্রীনীলরতন দাশ

আজি বাংলার ভাঙা ঘরে কেন এলে মা শরণ-রাণী?
কে গাহিবে তব আগমনী; কে বা পূজিবে চরণখানি?

কে সাজাবে তব বরণের ডালা,

মঙ্গল ঘট, কুসুমের মালা?

কাঁদে নিরন্ন, কাঁদে বিগ্ন দহি' সদা দুখানলে,
এবার তোমার বোধন হবে মা ব্যথার বিষদলে

বাহিরে শরণ এসেছে বন্ধে, বারিছে শেফালিদল
অন্তরে তার দুখ-বরণার ধারা করে অবিরল

বন্ধ দেবীর মন্দিরদ্বার,

চারি ধারে ক্রন্দন হাহাকার

গৃহহারা আর পৃথের ভিখারী ঘুরিতেছে দলে দলে,

এবার তোমার পূজা হবে মা গো অশ্রু-গঙ্গাজলে!

কণ্ঠ সবার বাষ্পরুদ্ধ, নাহি হাসি কলরব;

পূজারী ভুলেছে পূজার মন্ত্র, ভক্ত মাতৃস্তব।

উপবাসী কোটি সন্তান যার

কোথা পাবে তারা ষোড়শোপচার?

হৃগতি মাঝে কি অর্ঘ্য তারা দিবে তব পদতলে?

এবার তোমার অর্চনা শুধু বেদনার শতদলে!

হিন্দু কোড বিল

ত্রিযোতির্ময়ী দেবী

৬ই মে, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকায় এ. ডি. গোড়ওয়ালার হিন্দু কোড বিল নামে যে লেখাটি বেরিয়েছে, অনেকেই হয় ত তা দেখেছেন এবং তা পাঠ করে বহু জন আশ্বস্ত হই নি, পণ্ডিতজীর বহুপ্রতিশ্রুত বাক্যের পর, তারা আশ্চর্য্য হয়েছি—এই আমাদের মেয়েদের দিকের কথা—আর কি বা বলা যায়?

এর পর প্রায় এক মাস কুড়ি দিন পরে ২৫শে জুনের খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদকীয়তেও ত্রিযুক্ত গোড়ওয়ালার কথারই আভাস দেওয়া হয়েছে বা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। খ্রিষ্টাব্দে যা বলেছেন তার মূল বক্তব্য এই—‘দেশের বহুসংখ্যক শিল্পপতি, ধনীসমাজ এবং বহু রক্ষণশীল দল এই বিলটি পছন্দ করেন না, সমর্থনও করবেন না। অথচ দেশের এখনকার নানাবিধ পরিকল্পনা ও উন্নতির ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যের জন্ত দেশকে এখন তাঁদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে, কাজেই পণ্ডিতজী তাঁদের বিরুদ্ধে গিয়ে এই বিলটির জন্তে মাথা ঘামাতে ইচ্ছা করেন না। সুতরাং পণ্ডিতজী বলছেন—আগে দেশের উন্নতি হোক।’

আমরাও বলি—তোমারই বা তোমাদেরই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। অর্থাত্—ধনীরা আরও ধনবান হোন, (দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হোক), শক্তিশালীরা আরও শক্তিশালী হোক, (অশক্ত নারী ও দাসেরা আরও অশক্ত হোক)। দেশের সব উন্নতি সারা হলে তখন হিন্দু কোড বিলের কথা, ভাবাভিত্তিক প্রদেশের গঠনের কথা, মুটে-মজুর চাষাভূষীদের অনবদ্য শিক্ষার কথা ভাবা যাবে। কেননা ‘কাল ত নিরবধি’—কর্তাদেরই হাতে আছে। মানুষ না হয় মরণশীল।

ত্রিযুক্ত আবেদকরের পদত্যাগের পর অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন শাসনতন্ত্রের অনেক পরিকল্পনার দশাই কবির ভাষায় ‘অর্দ্ধেক পরিকল্পনা তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা’ না হয়।

হিন্দু কোড বিলের খণ্ডিত রূপে আমরা সেই কল্পনারই আভাস পাচ্ছি। জনমতকে উপেক্ষা করবার প্রথম সূচনা এতেই হ’ল বলা যায়। প্রগতিশীল বিলকে এই ভাবে চাপা দেওয়ার চেষ্টা মেয়েদের মধ্যে যে কি পরিমাণ তিক্ততার সৃষ্টি করেছে, তা বোধ হয় কর্তারা বোঝবার চেষ্টা করেন নি। যাক সে কথা।

শুধু একটু আলোচনা করে দেখা যাক, স্বাধীন ভারতের পার্লামেন্টে এই বিলের শুধুমাত্র আলোচনাতেই রক্ষণশীল বিত্তশালী সমাজের পুরুষদের কেন এত ভয়-ভাবনা।

এটা ভুল নয় যে সত্যি করেই এই ভয় ও ভাবনার কারণ আছে। কেননা এই বিলটি যদি পাস হ’ত, তা হলে প্রতিক্রিয়াশীল পুরুষসমাজ যে বড় বড় তিনটি অধিকার চিরকাল ধরে ভোগ করছিলেন, তা থেকে বঞ্চিত হতেন ঠিকই।

প্রথমতঃ, হিন্দু কোড পাস হলে পুরুষের বহুবিবাহ করার অধিকার থাকবে না। সকলেই বহুবিবাহ করুন বা না করুন, অধিকার বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা ত আছে, তাতে ত সন্দেহের অবকাশ নেই এবং রাজা, মহারাজা, বহু জমিদার ও ধনশালী ব্যক্তি যে একাধিক বিবাহ করে থাকেন এবং সাধারণ লোকেরাও যে ইচ্ছে করলে ও উপায় থাকলে একাধিক বিয়ে করেন, সে কথা কে না জানে? এখন যদি রাজা মহারাজাদের উপরও এই বিলটি প্রযুক্ত হয়, তা হলে ভেবে দেখুন, কত অসুবিধা হবে তাঁদের! অগাধ টাকা, অথচ অবসর থাকতে যদি অবাধ বিবাহ না করতে পারেন তা হলে জীবনের যে একটা পরম বিলাস থেকেই তারা বঞ্চিত হবেন! বিল পাস হলে—একটি মাত্র স্ত্রী, তাকেও ত্যাগ করলে তবে আবার একটি বিবাহ হতে পারবে। সেও আবার কিছু ওজর অছিল। দেখাতে হবে—বন্ধ্যা, অসতী, রুগ্না ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদ। বিবাহ-বিচ্ছেদ হিন্দু সমাজে নেই বলে লোকের ধারণা—সেটা ভুল। বিবাহ-বিচ্ছেদ বাস্তবিকই আছে। স্ত্রী ত্যাগ করা যায় অনায়াসে। তাড়িয়ে দেওয়া যায় স্ত্রীকে পুত্রকন্ডাসহ, ছেলেমেয়ে কেড়ে নিয়ে বিতাড়িত করা যায়, ঘরে রেখে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করা যায়, অপমান করা যায়। সব চলে স্বামীর। এই ব্যবহারগুলিকে কেউ বিবাহ-বিচ্ছেদ বলুন বা না বলুন, এগুলি বিচ্ছেদই বটে তবে একতরফা। এই অধিকারগুলি স্ত্রীদের নেই। তার ইচ্ছামত চলে যাবার অধিকার নেই—অপমানিত হলেও; আবার ইচ্ছামত বাড়ীতে থাকবার অধিকারও নেই, যদি স্বামী তাড়িয়ে দেন। কোনও কালে—কোনও অবস্থাতেই আমৃত্যু তাঁর স্ত্রীস্বত্ব থাকবে না—তিনি সেই স্বামীটির স্ত্রী থেকেই যাবেন চিরদিন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই বিলটি পাস হলে স্ত্রীদের নিজেদের দেহের উপর বা অস্তিত্বের উপর একটা অধিকার জন্মাত। পরিত্যক্ত হয়েও স্বামীর সম্পত্তি

হয়ে থাকতে হ'ত না। আইনানুসারে যে-কোনও প্রতিকূল অবস্থাতেই স্ত্রী চলে যেতে পারত, পৃথক হতে পারত এবং ইচ্ছে হলে আবার বিয়েও করতে পারত।

তৃতীয়তঃ, যে একচ্ছত্র অধিকারে পুরুষেরা অংশীদারিত্বের আশঙ্কা করে বিরোধিতা করছেন সেটা হ'ল সম্পত্তিতে অধিকার। হিন্দু কোড পাস হলে মেয়েরা সম্পত্তিতে অধিকার পেতেন। দেশে অধিকাংশই ত দরিদ্র। তবু এই বিলে যার সম্পত্তি আছে, তাঁর কতাসন্তান কিছু পেতে পারতেন।

কিন্তু বহু পিতারই (এবং মাতারও) অবধে কন্যার জনকজননী হয়েও সেটা অপছন্দ। তাঁদের মনে হয় ধনসম্পদ পুরুষ পরম্পরায়ই থাকা উচিত—সন্তান পরম্পরাক্রমে করলে কত্যা বংশে চলে যাবে আর বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব হবে—ভাই-বোনে, জামাতা-স্বস্ত্রী সম্পর্কে। তাঁরা আরও বলেন, মেয়ের বিবাহ হলে পৈতৃক ধনসম্পত্তির খানিকটা পরিবারের বাইরে চলে যাবে—ছেলের ভাগে কম হবে। (যদিও সে পরের মেয়েটি ঘরে আসবে, সেও ত তার পিতার সন্তান হিসাবে কিছু সম্পত্তি আনবে।) তাঁরা আরও বলেন, এখন ভাইয়ে ভাইয়েই অমিল হয়, তখন ব্যাপার আরও জটিল হবে। সম্পত্তি টুকরা টুকরা হবে ইত্যাদি।

আমাদের বক্তব্য এই, ব্যাপার জটিল হবে বা কোনও অসুবিধা হবে বলে মানুষের অধিকার মানুষকে না দেওয়া, সন্তানের অধিকার তার না পাওয়া বঞ্চারই সামিল। পূর্বে এক সময় বলেছিলাম—মানুষের জন্মই সম্পত্তি, সম্পত্তির জন্ম মানুষ নয়। এখনও সেই কথাই বলব। কতাসন্তানকে পরিপূর্ণ সন্তান মনে করতে হবে এয়ুগে। তাদের শিক্ষাহীন, মানুষের অধিকারহীন করে রাখা চলবে না। এখনি দারুণ বিভ্রাটের উদয় হয়েছে তাদের মনে, এর পরে সমাজ আপনি ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাবে। সম্পত্তিতে অধিকার থাকলে তার পরের গলগ্রহ হয়ে হীন জীবন যাপন করতে হয় না—সেকথা মেয়েরা আজ বুঝতে পেরেছে।

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হিসাবে বলা যায়, মাতৃতন্ত্র সমাজের কথা এবং মুসলমান সমাজের কথা। মাতৃতন্ত্র সমাজে মালাবারে (দাক্ষিণাত্যে) আজ অবধি যে প্রথা চলে আসছে সেটাতে নারী ধনাধিকারশালিনী। সে সমাজে নারীদের অবস্থা

পিতৃতন্ত্র সমাজের চেয়ে ঢের উন্নত। পরের গলগ্রহ জননী ভগিনী-কন্যা হয়ে তাঁরা বেঁচে থাকেন না। সেই সমাজে নারী সম্পত্তি পাওয়াতে পুরুষের অর্থের অভাব হয় নি। আর মেয়েরা দাসীর ছাড়া জীবন যাপন করেন না, কেননা গলগ্রহ নন্দ।

মুসলমান সমাজে নারীদের অনেক অধিকারই নেই আমাদেরই মত। কিন্তু দুটি বড় অধিকার আছে, যা আমাদের নেই। প্রথম পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার আছে—ভাইয়ের সঙ্গে বোনের। মেয়ে পিতার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পান। দ্বিতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ তাঁদের সমাজে আছে। যদিও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার সর্ভাধীন। যেমন—বহু বিবাহ পর্দাপ্রথা প্রভৃতি কতকগুলি কুপ্রথা মেয়েদের স্বাধীনতা অনেকটা হরণ করে নিয়েছে, তেমনি এই দুটি মৌলিক অধিকার থাকায় তাঁরা ততটা দীনহীন অসহায় জীবনযাপন করেন না। পিতৃগৃহে স্থান আছে—পতিগৃহে না থাকলে আবার পরিত্যক্তা হলে ইচ্ছা থাকলে আবার নতুন জীবন আরম্ভ করতেও পারেন।

এখন পুরানো কথায় ফেরা যাক। এই হিন্দু কোড বিল পাস হলে মেয়েরা যে অধিকার পেতেন—সেই অধিকার হারাবার জন্তে পুরুষের এত ভয়। অবশ্য আমাদের মতে সত্য সত্য পুরুষমানুষদের এই অধিকারগুলিতে বঞ্চিত হবার ভয়ে 'গেল রাজ্য গেল মান' বলে হৈ চৈ করতে লজ্জাই হবার কথা।

যাই হোক, 'মানুষের দশ দশা' বলে একটা কথা আছে। হিন্দু কোড বিলটিরও 'দশ দশা'র ভাগ্য যদি ধরে নিই তা হলে তার মাত্র তিনটি দশা এখন পর্যন্ত হয়েছে। প্রথমে দেশমুখ বিল, তার পর রাও বিল, এখন হিন্দু কোড বিল। সে হিসাবে আমরা তার আর বাকি সাত দশার স্বপ্ন দেখতে পারি। বঞ্চিত রূপে ম্যারেজ বিলও কি সেই দশ দশার এক দশা?

অতএব, আপাততঃ এখন 'কত কাল পরে যদি ভারত রে' স্বাধীন হ'ল—'দীপমালা নগরে নগরে পরে'—মেয়েরা 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই থাকুন। ধনিক বণিক ভীতচকিত পণ্ডিতজী, মাননীয় সন্ত্রীক রাষ্ট্রপতিজী ও বক্ষণশীল দলেরই জয়জয়কার হোক।



বিনুক ও শঙ্খা .

(সাগরকূলে গোপালপুর)

শ্রীজীবনময় রায়

বিনুক

শিশু-স্বর্ঘের পাল

উদয় উষার কোলে ভোরের বেলা,
আকাশে চলেছে যবে আবীর খেলা,
আধারের কোলে কোলে সাগরতীরে
রাড়িয়া উঠিছে ঢেউ আকাশ ঘিরে ।
দিকে দিকে বালুচরে দেখি যে চেয়ে,
তারা হুটে আছে যেন আকাশ ছেয়ে ।
রাঙা রাঙা কঁাকড়ার ভঁরে আছে চর-
লক্ষ হাজার ছোট গর্তের পর ;
কটকটে সাদা চোখ টকটকে গায়,
স্বর্ঘের ছটা হানে রাঙা রাঙা পায়,
উদয়-রবির পানে ঠায় আছে চেয়ে ;
অরুণ বরণ হ'ল আলোকিতে নেয়ে ।
গুটি গুটি সাগরের গহন ঠেলে,
ওঠে রাঙারবি, ছটা-কিরণ মেলে ।
বিপুল কঁাকড়া যেন আকাশ পরে
বুলায় সোহাগ-কর সাগর চরে ।
খুসীতে ফুলায়ে বুক লক্ষ মুখে—
শুধিছে কিরণ-সুধা-প্রসাদ স্নেহে—
রাঙা রাঙা ক্ষুদে শিশু-স্বর্ঘের পাল,
পান করি রাঙা আলো হয়েছে মাতাল ।

বাঁশী

রেলের বাঁশীটা আচম্কা দিল পিলে চমকানো ডাক,
বমদুতটার গলা যেন ঠিক পাঁচ শত চেরা বাঁশ ;
সে বরণ ভাল—জাহাজের সেই পেঙ্গী-তানান হাঁক—
চেউয়ের উপরে কুরাশা নয়, ও রাক্ষুসে রাজহাঁস ।

চেউয়ের সোহাগ

ঝিঁঝিঁ ঝিম্ ঝরা নিঝম দুপুর রাত—
বিনা মেঘে এ কি ? হঠাৎ বজ্রপাত ?
না-না—সাগরের ঢেউ জোয়ারের মুখে—
বিপুল সোহাগে ঝাপটি পড়িছে ভূষিতা বেলার বৃকে ।

বিনুকের কদর

হুলিয়ানী বুড়ি কঁাকালেতে ঝড়ি বিনুক কুড়িয়ে ফেরে,
শামুক শীঘ্র বিনুকের রাশ জমা করে এক টেব্রে ।

ঝড়ি-ভরা কত রং-বেরঙের কত না চঙেতে গড়!...

খোঁকাখুকী দেখে চোখ করে ছানাবড়া ।—

“ও দাদা ! দেখ না !” “দে না গো মা বুড়ি !

খোঁকা ছুটে গিয়ে ধরে তার ঝড়ি ;

খাঁক খাঁক করে বুড়ি ওঠে তেড়ে

“পয়সাটি দে”—পকেটট' ঝেড়ে

মুখভার করে বলে খোঁকা, “বুড়ি, পয়সা যে নেই ।”

মনের হুংখ চাপ্ল মনেই ।

খুকী ত বোঝে না, খুকী বলে “ওগো দেব পুতুলের বিয়ে
গয়না গড়াবে ; কি হবে তোমার ঝড়ি ঝড়ি এত নিয়ে !”

বুড়ি বলে “যা যা, পুড়িয়ে করব চূণ ।”

ওনে ছল্ ছল্ খোঁকার হুঁচোপ, খুকী কেঁদে হয় খুন ।

কঁাকড়ার কদর

উদাম হুলিয়া ছেলে—পিছনে কুকুর—ঘুরে ফিরে,

সাগরের তীরে বালুচরে ;

পুচকে পুচকে জ্বালে কত যে গর্ত ফেলে ঘিরে,

কঁাদ পাতে কঁাকড়ার ঘরে ।

কঁাকড়াও প্রাণ নিয়ে বালি খুঁড়ে সোঁদোয় বিবরে—

চলে যেন লুকাচুরি খেলা ;

বালি খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে, ঝুলির ভিতরে জমা করে ;

এমনি চলেছে সারা বেলা ।

জ্বালের ঝুলির পেটে কঁাকড়ার বাঁক ওঠে ফেঁপে—

কী খুসীতে দেখছে ছেলেটা ।

কাকেরা উড়ছে লোভে—কুকুরটা তেড়ে যায় ফেঁপে—

কী ফ্যাসাদে পড়েছে কেলেটা ।

উচু পাড়িটায় বসে আশ্রয়েল কয়ছে বিচার—

(কঁাকড়ার নামে—মুখে জল ;)

যেউ যেউ ডাকে কেলো—চায় না সে আর ভাগীদার—

যত হাড়হাতাতের দল !

ছোঁড়াটা কি বেয়াড়া হে ! কঁাকড়া সে, বেচবে না ! থাকে !

আশ্রয়েল কত যে বোঝায় !

মানুষগুলো কি ছোঁচা ! ঘেন্নায় কুকুরটা ভাবে ।

কঁাকড়ার প্রাণ যায় যায় ।

মনিব, কুকুর, কাক, সাহেব করিছে হানাহানি,

কঁাকড়ার বেড়ে ওঠে দর—

জীবন সফল তত প্রাণ নিয়ে যত টানাটানি,

তবু বুঝল না বোকা কঁাকড়ার আপন কদর ।

শব্দ

কাব্য-লক্ষ্মী

তুমি আর আমি এ বিজন রাতে
 সাগর তীরে,
 চলেছি ধীরে।
 রাঙা পায়ে তব ভেঙে পড়ে ঢেউ,
 কী পরশ রসে জানে কি তা কেউ!
 ও চরণ চুমি সৈকত ভূমি
 মরিছে কি বে!
 দক্ষিণা বায় কোঁতকে ধায়
 নাচিয়া ফিরে
 তলুটি ঘিরে।
 অধারে অধারে দোলে পারাবারে
 আলোক-মালা
 বিজলী-জালা।
 অঙ্গে অঙ্গে নাচে তারি ছায়া,
 নব যৌবন বিছুরিছে মায়া;
 গিরি বনভূমি উঠিছে কুসুমি
 ভরিছে ডালা;
 গগন সোহাগে দেয় অমুরাগে
 অর্ঘ্য থালা—
 দীপালি জ্বালা।
 সকল ভুবন জাগে অমুরাগে
 তোমারি ভরে,
 সোহাগ ভরে।
 আকাশ বাতাস সাগর ধরণী,
 যুচায়ে দিয়েছে মায়া-আবরণী;
 তোমার দেহের দেহলী ছায়া
 লুটায় পড়ে
 না মানে বারণ দেয় আভরণ
 অঙ্গ ভরে,
 যতন করে।
 শুনি দিকে দিকে বন্দনা তব
 বিশ্ববাহী—
 নীরবগ্রাহী।
 দেখি চেয়ে চেয়ে আরতি তোমার,
 তারায় তারায় চলে অনিবার;
 এ রাজসভায় মোর গান হায়
 কেমনে গাহি!

সঙ্কোচে লাজে সুর নাহি বাজে—

কণ্ঠ বাহি;

করি নিবেদন হৃদয় বেদন—

চিত্ত-দাহী—

বচন নাহি।

শ্রাবণ পূর্ণিমায়—ব্যাক ওয়াটার লেক

ধীর গম্ভীর নীরব তবী কালো সে কিশোরী মেয়ে,
 স্বচ্ছ সলিলে সজল কাজল আঁখি;
 এ মোর ছুঁচোখ, রূপের ভিখারী, দেখেনি তো ফিরে চেয়ে—
 সাগরের রূপে মুগ্ধ নয়ন পাখী।
 নীল অশ্বের সরমে আবারি' দেহ
 সঙ্কোচে জ্রাসে সরে থাকে পাশে, হেলা করে পাছে কেহ।
 নিত্য তাহারি পথে আসি যাই সাগরের টানে ধয়ে;
 সজল নয়নে শুধু চেয়ে থাকে অভিমানী কালো মেয়ে।
 সহসা একদা কোথা হতে নামে ফ্যাপা শ্রাবণের ঢল,
 উছলি উঠিল কানায় কানায় যৌবন ছলোছল;
 শান্ত সাগর টলোমলো করে ঢলোঢল রূপে ছেয়ে—
 কল কল হাসে জাগে উল্লাসে তবী কিশোরী মেয়ে।
 নয়ন ফিরানো নাহি যায়,
 নীরদ বরণ নবীন রূপের গরিমায়।
 ঘেরিয়া শোভন গিরি-বাউ বন—শিহরে সজল গগনে,
 কুলে কুলে ছাপি যুহু কল ভাবে, ভাকে মোরে ভাকে সঘনে।
 আজি শ্রাবণের ভরা-পূর্ণিমা-চন্দন লেপি অঙ্গে
 কালো মেয়ে তোর এ কী রূপ খরসান!
 আপনা পাশরি ঝাঁপ দিয়া পড়ি ডুবির অতলে রঙ্গে
 রূপের সায়রে লভি বাঞ্ছিত অবসান।

সঞ্চয়ী

সাগরের তীরে তীরে পাগল কুড়ায়ে ফিরে
 রঙীন ফিলুক;
 গুন গুন গান গায় চলে গুটি গুটি পায়
 হয়ে অধোমুখ।
 ছোট বড় নানা রং কত না বিচিত্র ঢং
 কত শত রূপ;
 কুড়ায়ে কুড়ায়ে তার কামনা মিটে না আর
 জমে ওঠে স্তূপ।
 অবিরাম কল কলে সাগর উছলি চলে
 ওঠে পড়ে ঢেউ,
 হ্রস্ব প্রাণের আশা অশান্ত বুকের ভাষা
 বোঝে না ত কেউ।

পাগল আপন মনে কুড়াইছে অকারণে
 ঝিল্লকের ঝাঁক ;
 বোঝা হয়ে ওঠে ভার পশেনাক' কানে তার
 সাগরের ডাক ।
 দিন আসে দিন যায় পাগল নাহিক চার
 কোনো দিকে ফিরে ;
 জমে ওঠে স্তূপাকার নিত্য সঞ্চয়ের ভার
 সিক্ত বালুতীরে ।
 শ্রামল ধরণী 'পরে নামে ঋতু স্তরে স্তরে
 প্রাণের হিল্লোল,
 আনন্দে আলোকে গানে ওঠে দশ দিক পানে
 উৎসবের রোল ।
 কত নব নব আশা প্রাণভরা ভালবাসা
 জীবনের গান,
 আনন্দের অশ্রুস্রাব স্নেহমুখা ধরণীর
 প্রাণের আহ্বান ।
 এ আহ্বান কেবা শোনে ! পাগল আপন মনে
 করিছে সঞ্চয় ।
 শুধু মনে জাগে ভর পাছে হয় অপচর,
 পাছে হয় ক্ষয় ।
 জানে নাকি হবে তার এই সঞ্চয়ের ভার
 তবু অমুরাগী—
 কুড়াইছে একমনে ; সঞ্চয়িছে নিরঞ্জে
 নিত্য কার লাগি !

গগনে গরজে মেঘ বেড়ে ওঠে বায়ুবেগ—
 চমকে বিহ্বল
 হানিছে তরঙ্গফণা কেনিল জ্বর কণা—
 মরণের দূত ।
 উচ্ছলি তরঙ্গ-ভার ডাকে তারে বার বার
 মৃত্যুনাঈল নীর ;
 তবু সে পাতে না কান শুনিবারে সে আহ্বান
 অমোঘ—গভীর ।
 শ্রামা ধরণীর 'পরে তুলিতেছে থরে থরে
 প্রাণের পসরা,
 তরঙ্গে তরঙ্গে তার বহিছে অমৃতধার—
 স্নেহস্রবা ভরা ।
 উচ্ছসিত গন্ধভারে ধরণী পাঠায় তারে
 প্রাণের আহ্বান—
 পাগল কিরিয়া খুঁজি' স্তূপাকার করে পুঁজি,
 নাহি দেয় কান ।
 একদিন দেখি শেষে সাগরের কূলে এসে
 ঝিল্লকের স্তূপ—
 জড়াবে দু'বাহু ডোরে পাগল রয়েছে পড়ে
 নিশ্চল, নিশ্চুপ ।
 সাগরের চেউ তারে লেহিতেছে বারে বারে
 টানিছে অকূলে
 উত্তলা পূরবী বাত কোঁড়কে খেলিয়া যায়
 আলুখালু চলে ।

জাগর-রাতি

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

বাসনা আমার লয় হয়ে গেল তোমার আলিঙ্গনে,
 স্তম্ভিমগন মুগ্ধ চেতন, অধর আলিঙ্গনে ;
 বাহিরে বিশ্ব রয়েছে দাঁড়ায়ে—নীরব নিশার প্রায়,
 মগ্ন পরাণে প্রেমের দেউলে জাগি মোরা হৃৎজনায়ে ।

নিখর আকাশ কান পেতে আছে মিলন বাসরদ্বারে,
 দীপ নিভে গেছে মধু-নিশ্বাসে নীরবে প্রদীপাধারে ;

কাঁপিছে রজনী, কাঁপিছে সজনী, কাঁপিছে হিয়ার তার,
 দেহতন্ত্রীর লহরী তুলিয়া ওঠে সুর-বন্ধার ।

দেহের মিলনে, প্রাণের মিলনে হয়ে গিয়ে একাকার,
 ফুটায় তুলিল রূপ-মঞ্জরী মঞ্জুল স্রবমার ;
 ফুটায় তুলিল দিগ্ধ-কিনারে শুকতারকার বাতি,
 সার্থক করে এপারে ওপারে মোদের জাগর-রাতি ।

দেবানন্দ

শ্রীনীমাধব চৌধুরী

১৪

কর্তৃপক্ষের আদেশে দেবানন্দ হোস্টেল ছাড়িয়া চাপাতলা আপিসে আসিয়া উঠিল। চাপাতলা আপিসে জিনিসপত্র রাখিয়া সম্মাসীর বেশে দেবানন্দ ডায়মণ্ড হারবারের দিকে রওনা হইল, উদ্দেশ্য বিপ্লববাদ সম্বন্ধে দেশের লোকের মনোভাবের পরিচয় লওয়া, অর্থ-সংগ্রহ ও লোকসংগ্রহ। দেবানন্দের প্রথম প্রব্রজ্যায় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাহার ডায়েরীতে লিখিত বিবরণ হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে :

সমাজের মধ্যে নিজের নির্দিষ্ট ও পরিচিত পরিবেষ্টন ছেড়ে বাইরে এসে দেখতে পাচ্ছি দেশের সাধারণ লোক দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কত উদাসীন। নানা রকম লোকের সঙ্গে আলাপ করছি। কেউ ভাবে আমি জুয়াচোর, কেউ ভাবে কোন মামলার পলাতক আসামী, আবার কেউ ভাবে আমি বাড়ী থেকে ঝগড়া করে পালিয়েছি। 'তুই-একজন ভাবে আমি ভুক্তাক' জানা সম্মাসী। কেউ হাত দেখতে বলি, কেউ অস্থলের ঔষধ চায়। সেদিন লক্ষ্মীকান্তপুরের পথে এক বুড়ো চাষীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। নিজের নানা দুঃখের কথা বলল সে। আমি জিজ্ঞেস করলাম,—তোমার এই দুর্দশার কারণ কি জান? সে বলল—খুব জানি ঠাকুরমশাই। জমিদার আমাদের যত কষ্টের গোড়া। আমি বললাম—এটা তোমার ভুল। সব দোষ সরকারের। এই সরকার কে জান? একটা বিদেশী জাত সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে এসে আমাদের শুবে থাকছে। বুড়ো চাষী বড় বড় যোজাটে চোখ তুলে আমার দিকে চাইল। বলল—আপুনি কি কইলেন ঠাকুর বোঝলাম না। আমার সঙ্গে আর কোন কথা না বলে সে পা চালিয়ে চলে গেল। বোধ হয়, সে আমাকে কোন মতলববাজ লোক বা পাগল বলে ভাবল।

সন্ধ্যার আগে জয়নগরে পৌঁছে একটা থাকবার জায়গার সন্ধান করছি, পাঁচ-ছয় জন যুবক এসে আমাকে ঘিরে ধরল রাস্তায়। একজন এগিয়ে এসে বলল,—ওহে সম্মাসী বাবা, চণ্ডী থেকে দু'চারটে স্নোক মুখস্থ বলতে পারবে? গ্যাজা চাও গ্যাজা দেব, বিলেতী, মাল-চাল, তাও দেব। তোমাকে প্লে কর্তে হবে প্রতাপাদিত্য নাটকে। সঁতে পাটটা নিয়েছিল, কিন্তু জর করে বসেছে, আর লোক পাচ্ছি না।

আমাকে টেনে নিয়ে চলল তারা। আমি ঝোলা থেকে একখান "সোনার বাংলা" বের করে একজনের হাতে দিয়ে বললাম—আপনারা একজন চেষ্টায়ে এইটে পড়ুন। পড়া শেষ হলে আপনাদের কার কি মত শুনে আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।

যার হাতে ওটা দিয়েছিলাম সে চেষ্টায়ে কয়েক ছত্র পড়ে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাইল। সঙ্গীদের সে বলল—ওটাকে ছেড়ে দে।

আমাকে বলল—সম্মাসী ঠাকুর, থমে পড়ো ত বাবা।

আমি হেসে বললাম—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করব বলে এসেছি। আপনারা প্রতাপাদিত্য নাটক করছেন আর আমার হুটো ভাল কথা শুনবেন না।

একজন মন্তব্য করিল—স্বদেশী যাত্রা, স্বদেশী বোরগীর কথা শুনেছি, এ যে দেখছি স্বদেশী সম্মাসী।

অন্য একজন বলল—আমরা বাবা গিল্যাণ্ডার, এনডু ইয়ল, রেলী ব্রাদার্সের চাকুরি করে থাই। একবার স্বদেশী করে ঝাকপুজ চাকুরি যাবার যোগাড় হয়েছিল, আবার স্বদেশী? তুমি পথ দেখ ত ঠাকুর।

আমাকে পথ দেখতে হ'ল না, তারাই পথ দেখল। দলের মধ্যে যেটি ছোট সে বলল—হরেন দা, ও কাগজটা দাও ওকে কিরিয়ে দি।

হরেন কাগজখানা মাটিতে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলল। ছেলেটি সেটা কুড়িয়ে নিজের পকেটে রাখল, দলের কেউ লক্ষ্য করল না। আমার কাছে এসে সে বলল,—এ বটগাছতলায় আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি ফিরে এসে আপনাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব।

সে দলের সঙ্গে চলে গেল।

সত্যি ছেলেটি ফিরে এল। তার নাম সোমেন। সে স্বাক্ষর তাদের বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম। তার বাবার সঙ্গে আলাপ হ'ল। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, কলিকাতার কোন কলেজে প্রফেসরি করেন। ভদ্রলোক প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করলেন—আপনার সম্মাসীর বেশ, পরিচয় জিজ্ঞাসা করব না, কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিলেন কেন? আপনার ত এখন পড়াশুনা করবার বয়স, সেটাও একটা তপস্যা।

আমি—এ তপস্যা আমরা পুরুষাত্বক্রমে করে আসছি। এ তপস্যার দেশের কি লাভ হয়েছে?

তিনি—লাভ কিছু হয় নি কি? দেশে শিক্ষার প্রসার হয়েছে বলে স্বদেশী আন্দোলন করছি আমরা। গবর্ণমেন্টের কাছে অধিকার দাবি করছি, হৌগল্লের কথা বলছি স্বরাজের কথা বলছি, করাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে আমরা সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্বের কথা বলতে শিখেছি, কৃষিকার নিহিলিষ্টদের আন্দোলনের কথা পড়ে গবর্ণমেন্টকে ভয় দেখাবার কথা ভাবছি। ইটালীয়ানদের স্বাধীনতা আন্দোলন, আইরিশদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা পড়ে প্রেরণা পাচ্ছি। সেদিন একজন ভদ্রলোককে বেলজিয়ামের

স্বাধীনতা লাভে আনন্দ প্রকাশ করতে গুনলাম। দেশে শিক্ষার প্রদার না হলে এটা কি সম্ভব হ'ত?

আমি—আপনার কথা মানছি; কিন্তু কি পেয়েছি আমরা?

তিনি—কিছু পেয়েছি বই কি? আরও পাব। আমেরিকা ফিলিপিনোদের সেল্ফ গবর্নমেন্ট দিলে সেদিন। আমরাও সেল্ফ-গবর্নমেন্ট পাব।

আমি—আমরা কিছুই পাব না। ইংরেজ কাউকে নিজে থেকে একফোটা অধিকার দিয়েছে কোন দিন? আপনি আমেরিকার কথা বললেন। আমেরিকানরা ইংরেজের জাতভাই। বৎস্র না তারা লড়াই করে নিজেদের দাবি আদায় করে নিল ততক্ষণ ইংরেজ তাদের কিছু দিয়েছিল?

তিনি—আপনারাও লড়াই করে আদায় করবেন না কি? চোখ রাঙানিতে ভয় পাবার ছেলে ইংরেজ নয়। স্মরেন ব্যানার্জি ও বিপিন পালের বক্তৃতায় ভয় পেয়ে ইংরেজ কিছু দেবে না।

আমি—আমিও সেই কথাই বলছি। কাঁদাকাটি করলেও দেবে না, গরম গরম বক্তৃতা করলেও দেবে না। তবে দেবে আর কিসে?

তিনি—সেই পরামর্শ দিয়েছেন আপনার প্রধান মন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা। বলেছেন কনস্টিটুশানাল এজিটেশন কর।

আমি—কাউন্ট ওকুমা ইংরেজের ওকালতি করে আমাদের বিনিময় উপদেশ দিয়েছেন।

তিনি—আপনার কথা ত খুব ডেয়ারিং; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি করতে পারেন?

আমি—আমেরিকা যা করেছিল, ইটালীয়ানরা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যা করেছিল আমরাই বা তা করতে পারব না কেন।

ভদ্রলোক জোরে হেসে উঠলেন। বললেন—আনআরমড, টিমিড বেঙ্গালীজ টু থিংস অব আনমড রিবেলিয়ন! (নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালী সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা ভাবে।)

আমি গম্ভীরভাবে বললাম—নয় কেন? আপনার মত শিক্ষিত, জ্ঞানী লোক এর মধ্যে অসম্ভব দেখলেন কি।

তিনি—আপনি ছেলেমানুষ, কি করে বোঝাই বলুন? প্রথমতঃ আম'ড রিবেলিয়ন বা আম'ড রেজিস্ট্রান্স ইজ রেপাগনান্ট টু দি ইণ্ডিয়ান স্পিরিট (সশস্ত্র বিপ্লব বা সশস্ত্র প্রতিরোধের চেটা ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তা ও ভাবধারার বিরোধী)। একথা

আমি বলছি না, আমাদের দেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা যারা লীডারস অব থট তাঁরাই বলেছেন ও বলছেন। ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদের দেশ, তাই দেখুন স্তব্ধকাল পরাধীন থেকেও শি-হাজ নট লস্ট হার সোল (ভারতবর্ষের আত্মা গ্রানিমুক্ত থাকতে পেরেছে), জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ঠিক আছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করা ইণ্ডিয়ান ট্রািশন (ভারতের ঐতিহ্য) নয়। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ আজ পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শক্তিশালী জাত। আমাদের মত নিরস্ত্র জাতির পক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে আম'ড রিবেলিয়নের কল্পনা করাই পাগলামি। অস্ত্র কথা ছেড়ে দিলেও অস্ত্রশস্ত্র পাবেন কোথায়?

আমি—অস্ত্রশস্ত্রের অভাব তা হলে আপনার মতে আম'ড রিবেলিয়নের বিপক্ষে বড় যুক্তি?

ভদ্রলোক কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ পরে বললেন—আপনি কে? কি বলতে চান।

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম—আই এম দি রিবেলিয়াস স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ (আমি পরাধীন ভারতের বিদ্রোহী আত্মা)। বলতে চাই আপনারা এগিয়ে আসুন। নিজে না পারেন টাকা পয়সা দিয়ে লোক দিয়ে তাদের সাহায্য করুন যারা মায়ের শৃঙ্খল যে-কোন উপায়ে ভেঙ্গে ফেলে দেবার ব্রত নিয়ে কাজে নেমেছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে হু'হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, এ রকম লোক কি আছে এদেশে? তারা কাজে নেমেছে? তুমি সত্যি বলছ?—দেখলাম নিজের অজান্ত-সারে ভদ্রলোকের ধারণা আধ্যাত্মিকতার যুক্তি উড়ে গেছে। তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। আমি বললাম, আপনি বসুন।

তিনি একটু লজ্জিতভাবে বসলেন। আমার চোখে পড়ল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটি আমাদের এ বাড়ীতে এনেছিল, সে ও একটি মেয়ে আমাদের আলাপ গুনছে। ছেলেটি এগিয়ে এসে তক্তাপোশের একপাশে বসল। আমি বললাম, আপনি যে রকম লোকের কথা বললেন, সে রকম লোক এদেশে আছে। নিজেদের সামান্য সম্বল নিয়ে তারা কাজ করছে। টাকা ও লোক দরকার তাদের।

তিনি—হু'সাহসিক চিন্তা ও হু'সাহসিক কাজ করবার লোক তা হলে আমাদের মধ্যে আছে। কাজ আরম্ভ করা শক্ত কথা। আরম্ভ হলে,

Freedom's battle once begun

Bequeath'd by bleeding sire to son

Though baffled oft is over won.

হাঁ, টাকা ও লোকের কথা বলছিলেন না? লোক আর কোথায় পাব আমি? আমি দরিদ্র ছা-পোষা মানুষ, দেখতেই ত পাচ্ছেন। বাট'আই শাল কর্টি বিউট মাই মাইট (আমার সামান্য শক্তিমত দেব)। আজ রাত হয়েছে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করুন। কাল সকালে যাবেন।

এই কৃতকাৰ্য্যতায় মনে একটু আত্মপ্রসাদের ভাব এল। সেটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলাম। বোধ হয় ভদ্রলোকের মেয়ে, সোমেনের বোন পরিবেশন করছিল। কয়েক বার মেয়েটি উৎসুক ভাবে আমার দিকে চাইল লক্ষ্য করলাম। বোধ হয়, কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইছিল।

পরদিন সকালে উঠে বিদায় নিলাম। ভদ্রলোক পচিশটি টাকা আমার হাতে দিলেন। বললেন, কোথায় টাকা পাঠাতে হবে ঠিকানা দেন। আমি সাধামত মাঝে মাঝে কিছু পাঠাব। আমি চাঁপাতলা কেন্দ্রের ঠিকানায় মনি-অর্ডার লিখে তাঁর হাতে টাকাটা

কিরিয়ে দিলাম। বললাম, আপনি পাঠিয়ে দেবেন। আমি আরও অনেক জায়গায় যাব, টাকা সঙ্গে রাখতে চাই নে।

সোমেনের খবর জিজ্ঞাস্য করাতে বললেন, সে খুব সকালের গাড়ীতে মগরাহাট গিয়েছে, সেখানে চাবুরি করে।

মগরাহাট পৌঁছে ষ্টেশনের গায়ে বড় বড় টিনের গুদাম-ঘর দেখে আশ্চর্য হলাম। অসংখ্য গরু, হিষের গাড়ী বোঝাই চাল আসছে আর ওজন হয়ে গুদামে বোঝাই হচ্ছে। ঘুরে ফিরে দেখলাম বোম্বে কোম্পানীর গুদাম, রেলী ব্রাদার্সের গুদাম, স্নোডার স্মিডের গুদাম, সোয়ালীর গুদাম রয়েছে। রেলী ব্রাদার্সের গুদাম বিরাট আয়তনের। সোয়ালীর গুদাম বাঙালীর। কোম্পানীগুলির নীচের দিকের বস্তাবন্দী বাঙালী। তারা চাল কিনেছে বেপারীর কাছে। এই চাল বস্তাবন্দী ও ওয়াগন ভর্তি হয়ে রেল চলে যাচ্ছে বাইরে রপ্তানির জন্ত। বাংলায় আকাল লেগেছে। যশোর ও করিমপুরে লোক না খেতে পেয়ে মরছে। নদীয়ায় চালের মণ ৬০/০ উঠেছে। লোকে এক বেলা খাচ্ছে। বিহারে আকাল লেগেছে। গবর্ণমেন্ট পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছে সাহায্যের জন্ত। বাংলার গবর্ণমেন্ট রিলিফ ওয়ার্ক শুরু করেছে কয়েকটা জেলায়। এদিকে বিলিতি ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ মণ চাল বিদেশে পাচার করছে। গবর্ণমেন্ট দেশের অবস্থা দেখেও এই রপ্তানি বন্ধ করে নাই। এক মগরাহাট থেকে বছরে ২০ লক্ষ মণ ধান-চাল রপ্তানি হয় বিদেশে। কলকাতায় বঙ্গবাসীর বরদা বোস অন্তরক্ষণী সভা ডেকেছেন, ঘরভাঙ্গার মহারাজা তার সভাপতি। অন্তরক্ষণী সভায় বক্তৃতার ছড়াছড়ি হচ্ছে আর শত শত ওয়াগন বোঝাই অন্ন সকলের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশে। হায় রে দেশ?

ঘুরতে ঘুরতে নজর পড়ল স্নোডার স্মিড কোম্পানীর গুদামের পাশে একটা ইঁটুলগাছের নীচে চেয়ার টেবিল পেতে জয়নগরের সেই ছেলেটি খাতায় হিসাব লিখছে, তাকে ঘিরে বহু লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আমি মনে মনে একটু হাসলাম। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ধান-চাল লোপাট করে দেশে আকাল এনেছে, আর ইংরেজ গবর্ণমেন্ট রিলিফ ওয়ার্ক খুলেছে। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরছে, আবার সেই দেশের লোক নিজেদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে সাহায্য করছে ইংরেজ ব্যবসায়ীকে। কাগজে হা হতাশ করে তুঁচার ছত্র লিখছে মাঝে মাঝে, এ পর্যন্ত। কি চমৎকার বন্দোবস্ত ইংরেজের আর কি নির্বোধ লয়াল গোলাম আমরা! ভাবলাম ছেলেটিকে ডেকে দু' একটা কথা বলি, কিন্তু আমার কথা শোনবার অবকাশ কই তার?

অনেক জরগা ঘুরে বেড়লাম কিন্তু জয়নগরের মত সাড়া পেলাম না কোথাও। এবার চুঁচুড়া, চন্দননগর হয়ে সাঁওতাল পরগণায় যেতে হবে।

বিশ্রাম করবার জন্ত যখন কীরামপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চে বসে ছিলাম তখনকার একটা ঘটনার কথা মনে আছে। ঘটনা

বিশেষ কিছু নয়, আমার পাশে উপবিষ্ট তিনটি ভদ্রলোকের মধ্যে অলাপ হচ্ছিল তার খানিকটা কানে এল।

প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, ফিনান্স মেম্বর এডামসন আমাদের দাবির উত্তরে বলে দিয়েছে—Self-Government is an absurd plea and is thoroughly impractical (স্বায়ত্ত শাসনের দাবি বাজে ও অসম্ভব দাবি)। কথাটা মন্দ বলে নাই। আমাদের আবার সেল্ফ-গবর্ণমেন্ট! দলাদলি, খেয়োখেয়ি লেগেই রয়েছে। আগে নিজেরা যোগ্য হ'—হ'পাতা ইংরেজী পড়েই দাবি করছে সেল্ফ-গবর্ণমেন্ট চাই, স্বরাজ চাই। যত সব ইয়ে—

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিবাদের সুরে বললেন, তাদের চোখে যোগ্য আমরা কোন দিন হতে পারব মনে কর? এই দেখ ঈষ্ট বেঙ্গলে কি কাণ্ড তারা বাধিয়ে দিয়েছে। মারামারি বাধিয়ে দিয়ে বলছে, তোমরা অযোগ্য, আমরা চলে গেলে তোমরা যে মারামারি করাই শেষ হবে।

প্রথম ব্যক্তি—ঈষ্ট বেঙ্গল আসামের সঙ্গে গেছে ভালই হয়েছে। ওটা বাংলার গ্যাংগ্রিনাস লিভ (কৃতজ্ঞ অঙ্গ) এম্পুটেট (কেটে বাদ দিয়ে) করে ভাল করেছে। নইলে পশ্চিম বাংলাতেও ঐ গ্যাংগ্রিন হ'ত।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা স্বদেশী করে, দোতরফা মার খাচ্ছে আর তুমি ভাবছ আমরা ত বেঁচে গেছি। সে দিন এক জন বললেন, সম্বলপুরের একথানা উড়িয়া কাগজ পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের গালাগালি করেছে আর মুসলমানদের উপর দরদে গুলে গিয়েছে। তোমারও দেখছি প্রায় সেই অবস্থা। তা, বহরমপুর কনফারেন্সে দীপনারায়ণ সিংহকে সভাপতি কর আর যাই কর, বিহারীরা তোমাদের সঙ্গে হাত মেলাবে না। পশ্চিম বাংলা থেকে আলাদা হবার জন্ত তারা আন্দোলন করছে। উড়িশা-উইল ফ্লা (উড়িয়া তার অনুসরণ করবে)। ইউ আর নট লাইকড রাই এনিবডি (তোমাদের কেউ পছন্দ করে না)।

প্রথম ব্যক্তি একটু চটে গেলেন। বললেন, পছন্দ না করল ত বয়ে গেছে। যত সব ইয়ে—

আমি উঠে দাঁড়লাম। চং চং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। একথানা ডাউন গাড়ী আসছে। আমি দ্বিতীয় ব্যক্তির কোলের উপর একথানা “সোনার বাংলা” ফেলে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকলাম।

দু'দিন পরে দুপুরবেলা চন্দননগরে গ্রীণ ট্রাঙ্ক রোডের উপর এক বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। বাড়ীর মালিক খালি গায়ে র বর উপর এক মোড়ায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। উজ্জল রং, খাড়া নাক, দীর্ঘ দাড়ি, কপালে, বাহুতে চন্দনের ছাপ। মুখের ভাব প্রশান্ত ও গম্ভীর। অলাপ করবার জন্ত কাছে গিয়ে বললাম, আজকের কাগজ কি? একটু দেখতে পারি?

খবরের কাগজ পড়তে চায়—এই রকম সন্ধ্যাসীর দিকে তিনি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন। তারপর গৈরিক বসনকে সম্মান দেখিয়ে মোড়া ছেড়ে দিয়ে বললেন, বসুন। কাগজখানা আমার হাতে দিলেন।

আমি বললাম, আপনি বসুন। আপনি বয়োবৃদ্ধ। আমি মাটিতে বসছি।

তিনি আপত্তি করলেন, আপনি সন্ধ্যাসী, গৃহস্থের সম্মানের পাত্র, আপনি বসুন।

তারপর ভদ্রলোক আমাকে জেরা করতে লাগলেন। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ধ্যাসী—না অষ্টনামী সম্প্রদায়ের সন্ধ্যাসী জিজ্ঞেস করলেন। এত অল্প বয়সে সন্ধ্যাস নেবার কারণ জানতে চাইলেন।

আমি দেশেবক সন্ধ্যাসী শুনে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমি একখানা “সোনার বাংলা” পুস্তিকা তাঁকে দিলাম। তিনি সেখানা পড়তে লাগলেন।

পড়া শেষ করে বললেন—আমি জানি চন্দননগরেও আপনাদের দলের কয়েক জন আছেন। হুঁ একজনের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে—ইংরেজ দেশের রাজা। রাজা নরদেহে সাক্ষাৎ ভগবান। রাজদ্রোহ কি ধর্মসঙ্গত না শাস্ত্রসঙ্গত? রাজদ্রোহ মহাপাপ। ভগবানের বিধানে আমাদের মঙ্গলের জন্য অত্যাচারী, বিধর্মী, মুসলমানের হাত থেকে দেশের শাসনভার ইংরেজের হাতে গিয়েছে। ইংরেজ রাজধর্মচ্যুত হলে ভগবান স্বয়ং তার প্রতিবিধান করবেন। আপনারা অহংজ্ঞানে মত্ত হয়ে তাঁর বিধান লঙ্ঘন করতে গেলে দেশের অমঙ্গল হবে। আমি গৃহস্থ, আপনি সন্ধ্যাসী, আপনাকে উপদেশ দিতে চাই না, কিন্তু আমাদের ধর্ম ও শাস্ত্রে যা বল সেই কথা আপনাকে বলছি।

ভদ্রলোকের এই বক্তৃতা শোনবার পর আমি বুঝলাম এখানে কিছু সুবিধে হবে না। বললাম—আপনি জানী লোক, যা বললেন চিন্তা করে দেখব। আচ্ছা, নমস্কার।

ভদ্রলোক হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন—বসুন, বসুন। আপনি সন্ধ্যাসী, ছাপুরে গৃহস্থের বাড়ী এসেছেন। দুটি অন্ন গ্রহণ না করে আপনি যেতে পাবেন না।

আমি উঠছিলাম, ফের বসলাম। ভদ্রলোক বহুক্ষণ আমাদের ধর্ম, শাস্ত্র, সমাজ, বেদবেদান্ত, মণ্ডদর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে বলে গেলেন। তারপর স্নানাহারের ব্যবস্থা হ'ল। আহার সেরে ভদ্রলোককে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে গঙ্গার ঘাটে চলে এলাম। মনে মনে ভাবছিলাম ভদ্রলোক শাস্ত্রের দোহাই দিলেন, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার ট্রাডিশনের দোহাই দিলেন। বোধ হয়, ইংরেজী শিক্ষায় তেমন অগ্রসর নন, অগ্রসর হলে নিশ্চয় আধ্যাত্মিকতার যুক্তি উঠাতেন।

ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে এসে ছেলে এল। সে ক্ষুদ্ররাম নামে একটি ছেলের কথা বলল। এক

গঙ্গার ঘাটে। দৃষ্টি রাখছি আলাপ করবার মত কোন লোক দেখতে পাই কিনা।

ক্রমে সূর্যাস্ত হ'ল। ঘাট ছেড়ে রাস্তায় নেমে, ঘুরতে ঘুরতে গোন্দলপাড়ার পথ ধরলাম। নজরে পড়ল সাহেবী পোশাক-পরা সাড়ে ছয় ফুটের মত চেহারার এক দেশী সাহেব টলতে টলতে চলেছেন আমার আগে আগে তার ইংরেজীতে মাঝে মাঝে কি বুকনি দিচ্ছেন। আমার কেমন যেন মনে হ'ল ভদ্রলোক নকল মাতাল। দেখলাম রাস্তায় এক করাসী পুলিশ তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে তিনি পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে ছুড়ে দিলেন রাস্তায়।

একটু তফাৎ থেকে আমি ভদ্রলোককে অনুসরণ করলাম। তাঁর চলবার ভঙ্গী বেশ স্বাভাবিক হয়েছে দেখতে। অঙ্কুর হয়ে এল। চলতে চলতে পুকুরের পাশে একটা দোতলা বাড়ীর ফটকে এসে ফটক বন্ধ দেখে তিনি দোরের হাঁক দিলেন। একটু বাদে লঠন হাতে একজন লোক বাতী হাতে বেড়িয়ে এসে ফটকের তাল খুলে দিল। লঠনের আলোতে লোকটির মুখ দেখতে পেয়ে ডাকলাম—জ্ঞানদা।

আমার ভুল হয়নি। হাতিবাগান কেন্দ্রের জ্ঞানদা বটে। আমার গলাগুণ্ঠনে সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে ফিরে বললেন—আরে, কোথাকার একটা নেটি ইন্দুর সঙ্গ নিয়েছে দেখি।

আমাকে বললেন—কোন ছায় তু বাতী জলদি। আমি তাঁর পাশ দিয়ে ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। জ্ঞানদাকে পেয়ে আমার খুব আনন্দ হ'ল।

জ্ঞানদা ফটকে আবার তাল দিলেন, আমরা সকলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম।

পরদিন চন্দননগরে থেকে কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হ'ল, চন্দননগর, মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েকটা জায়গা সম্বন্ধে কিছু খবর পেলাম।

প্রথমেই রাস্তার সেই নকল মাতাল লোকটির কথা বলতে হয়। আমি কথায় কথায় আবিষ্কার করলাম বরিশালের অতুল এক চিঠিতে যে জিতুদার কথা লিখেছিল—ইনি সেই জিতুদা, কোন বিলিভী কোম্পানীর ট্রাভেলিং সেলসম্যান।

জিতুদা এখানে এসেছেন মালমসলা সংগ্রহের জন্য কিছু কিছু এর মধ্যে যোগাড় করেছেন—শুনলাম। দ্বিতীয় দিন দেখা হ'ল একজন ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি ডুপ্পে কলেক্টর গণিত অধ্যাপক সেন মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র। শুনলাম একত্র পাস করে কিছুদিন

ই-আই-আরে চাকরি করেছিল। এখন বি-এ পড়ছেন। রোগা, অত্যন্ত সাধারণ চেহারা, চোখে পুরু ক্রশমা, কথাবার্তা কম বলে। কোন কারণে উত্তেজিত হলে তার সর্ব চেহারাটা বদলে যায় দেখলাম।

আমি রওনা হবার দিন মেদিনীপুর কেন্দ্রের একটি মেলায় “সোনার বাংলা” বিলি করতে গিয়ে সে ধরা পড়েছিল

পুলিসের হাতে। অনেক দিন তাকে হাজতে রেখে পুলিস ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেবার সময় পুলিস নাকি বলেছে,—“কুই কাতলার সন্ধান নেবার জন্ত এই পুঁটি মাছকে চাড়াছি।”

চন্দননগরে আর একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তার নাম বলাই। বলাই ইতিহাস পড়েছে তার গুরু অধ্যাপক রায় মশায়ের কাছে। আইরিশ আন্দোলন ও নিহিলিষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর খুব ভাল পড়া আছে দেখলাম। আর একটা জিনিস তার মধ্যে দেখে ভাল লাগল, সেটা হ'ল ধ্যানধারণার ওপর অনাসক্তি। চেহারা তার রোগোপানা হলে কি হয়, বস্ত্রি ও স্ট্রিঙে হাত খুব ভাল।

বলাই হাসতে হাসতে একটা গল্প বলল। ঘটনাটা দেখে তখনকার লোকের মনের ভাব কি রকম দাঁড়িয়েছে বোঝা যায়।

চন্দননগরের হাটখোলায় একটা বড় স্বদেশী সভা করা হবে স্থির হ'ল। শ্রীমন্তের চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতি, হাজার হাজার লোক সভায় উপস্থিত, চন্দননগরের মেয়ের ম'সিয়ে তার দিভিয়েল বন্দুক কাঁধে জন পচিশেক মাত্রাজী সেপাহী নিয়ে এসে হুকুম করলেন—সভা বন্ধ কর। ছেলের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। কাছে একটা খালি বাড়ীতে সভা বসল। সভায় স্থির হ'ল মেয়েরকে আক্রমণ করা হবে। শ'থানেক ছেলে লাঠি, বন্দুক, বল্লম, খাঁড়া বুড়ুল নিয়ে লড়াইয়ের জন্ত প্রস্তুত হ'ল। বলাই হাসতে হাসতে বলল লড়াই বেধে যায় আর কি। অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে বাড়ী পাঠানো হ'ল। অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল ম'সিয়ে তার দিভিয়েলকে শায়েস্তা করবার ব্যবস্থা করা হবে।

এই পর্য্যন্ত বলে হাসি থামিয়ে বলাই গভীর ভাবে বলল,— শায়েস্তা আরও অনেককে করতে হবে। তার দিভিয়েল, এনডু ফ্রেজার, ক্রিসফোর্ড—

তার হুঁচোখ জলে উঠল। একটু পরে মুহূ হাসির রেখা দেখা দিল তার মুখে। বলাইয়ের কথা আমি ভুলব না। কথা বলে বুঝলাম এগোবার পথ তার কাছেও অস্পষ্ট; কিন্তু তার বিশ্বাসের জোর।

জিতু-দা চলে গেলেন। বড় একটা চামড়ার স্টকেস কুলির মাথায় চাপিয়ে ফাষ্ট ক্লাসে উঠে বসলেন। পুলিস যদি জানত এই স্টকেসে কি সব মাল আছে।

জিতু-দার কথা বলবার একটা নিজস্ব ধরণ আছে। অনেক কথা বলেন তাঁহার স্বরচিত অভিধানের শব্দসম্পদ ব্যবহার করে। লোকে শুনে ভাবে লোকটা কি রসিক। গাড়ী ছেড়ে দেবার সময় আমাকে বললেন, শোন নেংটি ইন্দুর, একটা ছড়া শোন—

অবসর গিরিত্ত কসে নাক টেপো পুত

নাক টিপলে হুধ ভাত নইলে খাবে বুটের গুতো।

ছড়া বলে নিজেই খানিকটা হাসলে।

গাড়ী ছেড়ে দিল। জিতু-দা জানালা দিয়ে গলা বের করে কুমাল নাড়তে লাগলেন।

চন্দননগর ছেড়ে যাবার দিন গায়ে একটা ব্যাপার জড়িয়ে

কাঁপতে কাঁপতে বলাই এল স্টেশনে। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি খুব জ্বর। বলাই হেসে বলল, দেখ দেখি জরের আক্কেল। ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠে একটু ঘুরে আসব। মনের কথা জানতে পেরে বেটা বাগড়া দিলে।

১৫

দেশের প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলা হইতেছে।

বাংলায় দুই বৎসরের স্বদেশী আন্দোলন, সরকার পক্ষের অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী। বন্দেমাতরম, নিউ ইণ্ডিয়া, যুগান্তর ও সন্ধার নূতন জাতীয়তার বাণী প্রচার এবং মহারাষ্ট্রের এরষ্ট্রিগিষ্ট আন্দোলন অন্য প্রদেশগুলিতে কোন চাঞ্চল্য আনিতে পারে নাই এ পর্য্যন্ত। বাঙালী ও মারাঠি চরমপন্থী নেতাদের চেষ্টায় ফিরোজ শা মেটা প্রভৃতি মডারেট ধরনের গণের মুষ্টিমুত কংগ্রেসের মতের পরিবর্তন হইল না।

বাংলায় তখনকার মডারেট দলের মধ্যেও তিন শ্রেণীর রাজনৈতিক মত দেখা যাইত। এক শ্রেণীর মডারেট দলের কাগজ ছিল হিন্দু পেট্রিয়ার্ট, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি। এই দল বলিতে লাগিল, ইংরেজ আমাদের ব্যবহারে রাগ করিয়া এদেশ হইতে চলিয়া গেলে আমাদের সর্বনাশ হইবে। সুতরাং বরকট চালাইয়া তাহাকে চটাইও না, বরকট ইজ সিলি ও রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে এরোবারে অচল। হে দেশবাসী, তোমরা কথায় ও কাজে মডারেশন অভ্যাস কর। দ্বিতীয় শ্রেণীর মডারেটরা বলিতে লাগিলেন ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ মনে রাখিও না। ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আজ আমরা পথে ঘাটে হাটে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডীর নাম শুনিতে পাই, দেশবাসীর মনে নূতন ভাব জাগিয়াছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা কি পাগলামি নহে? ইহাদের কেহ কেহ আবার মুস্তির রকমফের করিয়া বলিতে লাগিলেন : পাশ্চাত্য রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও জলবায়ুর উপযোগী নহে, ও পথ ছাড়িয়া দাও। তৃতীয় শ্রেণীর মতকে বলা হইত মলে ইজম, স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের যুগের নেতারা এই মত অনুসরণ করিতেন। বন্দেমাতরম পাটিল একস্ট্রিমিষ্টরা ইহাদের আবেদন-নিবেদন পছন্দ ও একান্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা বিজ্ঞপ করিয়া ইহাদের বলিতেন—ব্রিটিশ লিডারস, গ্রীক কোরাস। একস্ট্রিমিষ্ট আন্দোলনের বন্যা রোধ করিবার জন্য ইহাদের চেষ্টাকে ঝাঁটা হাতে মিসিস পাটিংটনের আটলান্টিক মহাসাগরের জলোচ্ছ্বাস রোধ করিবার প্রয়াসের সঙ্গে তুলনা করিতেন।

“মলে যিয়ান দলের উৎপত্তির কথা বলা হইতেছে। জন মলে ইণ্ডিয়া আপিসের ভার লইবার পরে কিছুদিন যাইতে বিলাতী কাগজ ও এদেশের ইংরেজ পরিচালিত কাগজগুলির সুরের পরিবর্তন হইয়াছিল। কংগ্রেস একস্ট্রিমিষ্টদের হাতে না গিয়া পড়ে এজন্ম মডারেট দলকে সমর্থন করা আবশ্যক মনে হইল। এই প্রয়োজন-বোধ হইতে জন্ম নিল “র্যালি দি মডারেটস” নীতি। একস্ট্রিমিষ্টদের

ভাষভঙ্গীর উপর দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হইল। মাঝে মাঝে এই এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করিতে লাগিল—বাংলায় “সোশিয়ালিস্টিক সোসাইটি” গড়া হইতেছে। উপদেশ দিল, জাপান গবর্ণমেন্ট যেমন শক্ত হাতে এই সব সোসাইটি দখল করিয়াছে তোমরাও তাহাই কর। এদিকে বয়কট আন্দোলন ব্যর্থ করিবার জন্য ইংরেজ বার্নকেরা ভারতবর্ষের কলকারখানা খুলিবার প্রস্তাব করিল।

একট্রিমিষ্ট মতের লোকেরা একদিকে কংগ্রেস দখল করিবার আশায় আপনাদের শক্তিবৃদ্ধি করিবার দিকে মন দিলেন প্রকাশ্য ভাবে গুপ্ত সংগঠনে সাহায্য করিয়া। ‘সন্ধ্যা’ ঘোষণা করিল—“স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আমাদেরগিকে চারিটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—স্বদেশী, বয়কট, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও শক্তির প্রয়োগ।” যুগান্তর বলিল, “দেশবাসীর মন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিতে সংবাদপত্র গান, সাহিত্য, যাত্রা ও থিয়েটারের সাহায্যে বিপ্লবের বাণী প্রচার করিতে হইবে। সকলের উপরে প্রয়োজন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠনের।”

বাংলা মহারাষ্ট্র বাদে অল্প প্রদেশগুলি এ পর্য্যন্ত রাজভক্তির আদর্শস্থল হইয়াছিল। রাজভক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে প্রথমে গোল-যোগের সূত্রপাত হইল পঞ্জাবে, লাহোরের সংবাদপত্র “পাঞ্জাবী”কে লইয়া। একটি প্রবন্ধে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করিবার অভিযোগে সম্পাদক ও মুদ্রাকরের জেল হইল। পুলিশ তাহাদের উপর যে পীড়ন করিয়াছিল তাহার বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়ায় পঞ্জাবে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। এই বিক্ষোভের সংবাদে ছুই বৎসর একক আন্দোলন চালাইবার পরে আর একটি প্রদেশকে দোমর পাওয়া গেল ভাতিয়া বাংলার একট্রিমিষ্ট দল উল্লসিত হইল। ব্রহ্মাবাক্তব সন্ধ্যায় লিখিলেন—“স্বদূর কলিকাতায় বসিয়া,

লাহোরের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া উঠে ভগবানের কাছে যুক্তপাণি হইয়া আমরা প্রার্থনা করি দেশের সকল সেবক, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, আর্ধ্য, মাদ্রাজী, মারাঠা, যিনি হউন, পাঞ্জাবীর সম্পাদকের মত তাহার অভিব্যে বেন সম্পন্ন হয়। তাহার উপর পীড়ন নয়, দেবতার আশীর্বাদী নির্মালোর মত বেন আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি।”

পঞ্জাবে স্মার চার্লস রিভাজের প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন এবং ক্যানেল অঞ্চলে সরকারী খাস জমি পত্তনের পুরাতন ব্যবহার পরিবর্তন নূতন অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। জাঠরা ইহার ফলে উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। বিহারের চম্পারণ জেলার জাওতোলিয়া গ্রামে অত্যাচারী নীলকর বুমকিন্ডকে হত্যা করিবার সন্দেহে পুলিশ ও ফ্যাক্টরির সাহেবের মিলিয়া সমস্ত গ্রাম চব্বিয়া ফেলিল। দোষী-নির্দোষ নির্দিষ্টারে সকল প্রজার উপর উংপীড়নের সংবাদ প্রকাশিত হইল। এই উংপীড়নের সংবাদ পাটনার এক বাঙালী-পরিচালিত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার জন্য বিহারী কাগজ সহযোগীর উপর কষ্ট হইয়া উংপীড়িত চাষীদের উপদেশ দিল কুলোকের পরামর্শে ছোট লাট, বড়লাটের কাছে দরখাস্ত না পাঠাইয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরবার কর। বিপিনচন্দ্র পাল তখন মাদ্রাজে; স্বদেশী, বয়কট ও স্বরাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন। রাজমুহুরীতে তাহার বক্তৃতা শুনিয়া গবর্ণমেন্টে কলেজের ছেলেরা ধর্মঘট করিল; তাহার বক্তৃতার ফলে মাদ্রাজের শহরে ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হইল।

এই ভাবে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের পরে পঞ্জাব ও মাদ্রাজে একস্টিমিষ্ট মতের প্রসার হইল।

ক্রমশঃ

আর এক জীবন

ত্ৰীঅমলেন্দু দত্ত

অনেক স্বপ্নের নীল কামনার উজ্জ্বলিত রঙীন পালক উড়ে উড়ে ফিরেছিল এ মনের প্রান্ত ছুঁয়ে স্বর্ণ-সীমানার, মনে হ'ত কি ফেনিল ঘোবনের সুরাপানে বুনো হাঁস-বক সন্ধ্যার স্তম্ভিত ক্ষণে চলে' যেত রাস্তা চোখে বিশ্রান্ত ডানার : কতো মুগ্ধ রজনীর চান-জাগা নৈশ-দার নির্জন প্রহরে দিগন্তে সবুজ বনরেখা হতে হাতছানি দিয়ে কে ডেকেছে— 'এখানে অটল শাস্তি স্বপ্ন, শুধু মিছে পড়ে থেক নাক' ঘরে' বিহবল মুহূর্তে জানি অনেক তারকা-মেয়ে সলাজ হেসেছে !

আকাশে আকাশে ঘুরে কল্পনার জাল বনে কেটে গেছে দিন কি এক কুহক বেন ! মনে হত এ-কুহকে জীবন বিলীন ! এখানে মাটির বৃকে কান্না জমে ; খর খর কান্নার আবগে বাথার ফসল বৃকে প্রাণপণ আঁকড়ে থাকা বিবর্ণ শঙ্কায় কখন দস্যুরা আসে, ভেঙে পড়ে বজ্র নিয়ে দুর্গোগের মেঘ ; এখানে গুমোট কান্না জীবনের জায়মান ক্ষতের জ্বালায় ! আনেক জীবন তবু ; স্পর্শে গন্ধে তত্ত্বভবে হাসিতে অজ্ঞাতে মিশে আছে একাকার এ আমার শোণিতের অণুতে অণুতে !

মুক্তি-সাধনার পথে অন্ধ্রদেশ

শ্রীললিনীকুমার ভদ্র

বহু দিনের সাধনার, বহু দেশপ্রেমিকের ত্যাগ, তিতিক্ষা, দুঃখবরণ ও আত্মোৎসর্গের দরুন আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের দান কতখানি সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এমন কি বাংলার জাতীয়তার ভাবধারা একলা ভারতের অগ্ন্যন্ত প্রদেশের অধিবাসীদের মনে কতটা ভাবোদ্ভাবনা এবং কর্ণপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল তৎসম্বন্ধেও বহু তথ্য আজও অল্পদ্রব্যটিত রয়ে গেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল মুক্তিসাধক জাতীয়তার পাদপীঠে সমিধ সংগ্রহ করে গেছেন তন্মধ্যে কত জনের কীর্তিকথা যে আজ বিশ্বস্তির অন্ধকারে অবলুপ্ত তার আর অস্ত নেই।



পি. আনন্দ চাট্‌জী

ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের কতকগুলি অজ্ঞাত অধ্যায় আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয় অন্ধ্রদেশের কবরুর বীরমন্দির নামক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে। অন্ধ্রদেশের যে সকল সুসন্তান মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের জন্তে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁদের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয় অজ্ঞের অজ্ঞতম শ্রেষ্ঠ লোকনায়ক 'দেশভক্ত' ভেঙ্কটাপ্পাইয়া কর্তৃক ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখে। এই স্মৃতিমন্দিরে প্রবেশ করলে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাচীরগায়ে বিলম্বিত অন্ধ্রদেশের দেশপ্রেমিক বীর সন্তানদের অনেকগুলি তৈলচিত্র। স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন আন্দোলনের অজ্ঞতম অগ্রদূত দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পাস্তুল,

চিরল সত্যার্থের নেতা অজ্ঞরত্ন গোপাল কৃষ্ণাইয়া, গুন্ডেম এজেন্সির সশস্ত্র বিদ্রোহের অধিনায়ক সীতারাম রাজু (আল্লাউল্লাহ সীতারামরাজা) প্রভৃতির ছবি দর্শককে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অন্ধ্রদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বীরমন্দিরের কক্ষায়া শুধু দেশের বীর সন্তানদের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন নাই, অন্ধ্রদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করে তাঁরা তাঁদের মাতৃভূমির দুই শত মুক্তিসাধকের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছেন—তৈলচিত্রানার শহীদদের সম্বন্ধেও বহু অপ্রকাশিত তথ্য আহরণ করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন। বীরমন্দিরে সমস্ত সংরক্ষিত এই সমস্ত উপকরণের সাহায্যে এক বিরাট গ্রন্থ-রচনার পরিকল্পনাও কর্তৃপক্ষের আছে।

মুক্তি-আন্দোলনের শ্রোত অন্ধ্রদেশের বুকের উপর দিয়ে বারংবার বিচিত্র ভাবে আবর্তিত হয়ে চলেছে। জাতীয়তার প্রবল ভাববল্লার যখনই এই সমুদ্রমেখলা, শৈলকিরীটিনী ভূমি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তখনই দেশহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এক এক জন শাক্তধর পুরুষ এই রাধভাঙা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে পরম মুক্তিযুদ্ধের অভিযুগে পরিচালিত করেছেন—বহু সাধকের ত্যাগ, তপস্বী ও আত্মদান অন্ধ্রদেশকে পরিণত করেছে মুক্তিসাধনার পাদপীঠে। বর্তমান প্রবন্ধে এই সমস্ত মুক্তিসাধকের জীবন ও কর্মের নিরিখে আমরা অন্ধ্রদেশের মুক্তি-আন্দোলনের ধারাটি অনুসরণ করবার চেষ্টা করব।*

কংগ্রেসের আদিযুগ—আনন্দ চাট্‌জী : যে কয়জন মুক্তিসাধকের অক্সান্ত চেষ্টায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি গোড়ার দিকে দৃঢ়তর হয়েছিল, আনন্দ চাট্‌জী তাঁদের অজ্ঞতম। মাদ্রাজ তাঁর কর্ণক্ষেত্র হলেও তিনি ছিলেন অন্ধ্রদেশের লোক, জাতিতে তেলুগু। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে অহুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। সেই প্রথম অধিবেশনেই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ মেটা, দাদাভাই নৌরোজী প্রভৃতির মত আনন্দ চাট্‌জীও তাঁর বক্তৃতায় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে নূতন আদর্শ ভিতরে ভিতরে শক্তিসঞ্চয় করছিল তার ইঙ্গিত প্রদান করেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দ চাট্‌জী নাগপুর কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর উদ্বীপনাপূর্ণ ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে।

* এই প্রবন্ধের বহু উপকরণ বীরমন্দিরে সংরক্ষিত কাগজপত্র থেকে সংগৃহীত। কবরুর সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রী কে. ভি. এন. আচার্য্য ও তেলুগু ভাষায় লিপিবদ্ধ এই সমস্ত তথ্য ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আনন্দ চালু ছিলেন তেজস্বী পুরুষসিংহ, তাঁর অন্তরে দেশ-প্রেমের হোমশিখা ছিল অমৃত্যু অনির্বাপ। তাঁর অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে এক অপূর্ব অমুপ্রেরণার সৃষ্টি করত। প্রায় দু'দশক ধরে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-স্বরূপ। যদিও তাঁর অমুগামী কেউ ছিল না, বা তিনি কোন নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তকও নন, তথাপি তিনি খ্যাতির শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিলেন—বাগ্মী হিসাবেও তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল অসাধারণ।

এন. সুক্কারাও পাণ্ডুলু : আনন্দ চালুর মত নায়পতি সুক্কারাও পাণ্ডুলুও কংগ্রেসের জন্মকাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কংগ্রেসের চতুর্থ (এলাহাবাদ, ১৮৮৮) অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর থেকেই তিনি লবণ আইন, বিচার এবং শাসন বিভাগ, ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয়দের প্রবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন, অন্ধমোদন এবং সমর্থনাদি দ্বারা কংগ্রেসে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হন। 'ইম্পীরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্যরূপে তিনি একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিয়োগের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সুক্কারাও পাণ্ডুলু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে বৃত্ত হন।* স্তর উইলিয়াম হান্টারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলেন, কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনের ও ইংরেজী শিক্ষার ফল। তখনও যে শাসক-দল সকল কার্যে ঘড়মুগ্ন দেখিতেছিলেন, তিনি তাহাতে হুঃখ প্রকাশ করেন।

"১৯১৪, ১৫, ১৬, ১৭ এই চারি বৎসর তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু মিসেস বেসান্ত যখন সি পি রামস্বামী আয়ারকে প্রকৃত 'ওয়ার্কিং সেক্রেটারী' রূপে গ্রহণ করেন সুক্কারাও তখন (১৯১৭) ধন্যবাদের সঙ্গে সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন।"

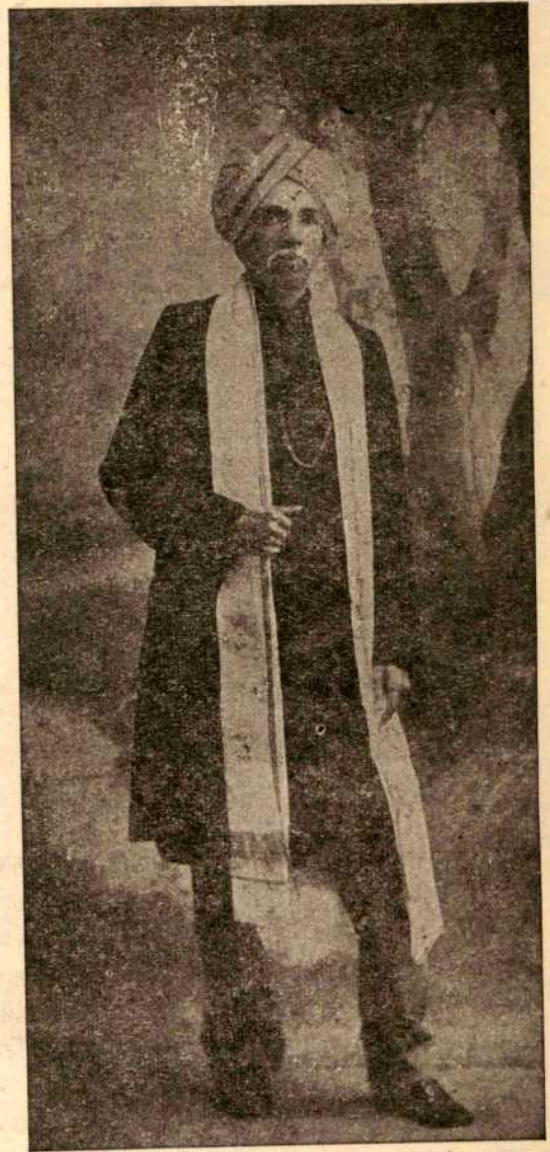
অন্ধদেশের শিক্ত মহলে সুক্কারাওয়ের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ইনি অন্ধদেশের ভীষ বলে পরিচিত ছিলেন।†

অন্ধের জাতীয়জীবনে বাংলার স্বদেশী ভাবধারার প্রভাব : অন্ধদেশে নেতাজীস্বভাবচন্দ্রের প্রভাব যে কি গভীর তা তাঁর কংগ্রেস-সভাপতি-নির্বাচন ব্যাপারেই পরিস্ফুট হয়েছে। অন্ধ দেশের জনমনে আজও সে প্রভাব রয়েছে অক্ষুণ্ণ। বাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি অন্ধবাসীদের এই যে অমুরাগ তা আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়—এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘকালের একটা

* কংগ্রেস—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পৃ. ৭৮

† ১৮৯৩ সনে অন্ধের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্ধ দেশে যান। সেই সময় রাজমহেন্দ্রের যে সভায় তিনি বক্তৃতা করেন তাঁর সভাপতি হয়েছিলেন সুক্কারাও পাণ্ডুলু। তখন তাঁর বয়স আশী বৎসর। ১৮৯৩, আবার সংখ্যা প্রবাসীতে 'অন্ধ দেশে দৃষ্টি নিবেদন' নামক প্রবন্ধে রামানন্দবাবু প্রসঙ্গক্রমে এই বর্ণনায় দেশসেবকের কথা বলেছেন।

ঐতিহ্য। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় যে নব জাতীয়তার উদ্বোধন হয় তা একদা অন্ধদেশে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল।



এন. সুক্কারাও পাণ্ডুলু

১৯০৩-৪ সালে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর সাপ্তাহিক নিউ ইণ্ডিয়ান মাধ্যমে ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তার ভাবধারা এবং জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদির যে অভিনব ব্যাখ্যা করেন তা অন্ধদেশে ক্ষেত্র তৈরি করে রাখে, এবং ১৯০৭ সালের গ্রীষ্মকালে বিপিনচন্দ্রের অন্ধদেশ ভ্রমণ সেখানে জাতীয়তার নব ভাবধারা ও আদর্শপ্রচারের কি দিবে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বিপিনচন্দ্র রাজমহেন্দ্রীত (রাজমহেন্দ্রবরম্) গেলে পর উক্ত

শহরের অধিবাসীরা সেখানে একটি জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে কৃতসঙ্কল্প হয়। গবর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজের ছাত্রেরা তাঁকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করার অপরাধে (?) কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়—বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত এই সকল ছাত্রেরাই শেষ



দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পান্ডলু

পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় সংগ্রামের সৈনিক। ১৯০৭ সালে বিপিনচন্দ্র কর্তৃক মসলিপট্টমে (মছলিপটনম) উদ্ভূত জাতীয় শিক্ষার বীজ অচিরে অঙ্কুরিত হয়ে উঠে। সেই উদ্ভিন্ন অঙ্কুর ১৯১৭ এবং ১৯২১-এর জাতীয় আন্দোলনের মলিলসিঞ্জন এবং সার-প্রয়োগের ফলে পরিণত হয় বিরাট মহীকছে এবং সরকারী বিরোধের প্রচণ্ড উত্তাপ ও বিধিগারী বাস্তব মধ্যো ফলে পুষ্প স্নোভিত হয়ে আজও সেই বৃক্ষ সগর্বে দণ্ডায়মান।*

১৯০৭ সনে স্বদেশী বয়কট এবং জাতীয় শিক্ষার অভিনব শ্লোগানে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত হয়ে উঠল মুগ্ধিত।

"The seed of National education sown by Pal in the year 1907 at Muslipatam (Muchlipatnam) sprouted forthwith was since watered and manured by the National movements of 1917 and 1921 and has grown into a tree and remains there to this day, bearing flower and fruit, such as we can expect under the withering winds and the scorching heat of State displeasure."

History of the Indian National Congress by B. Pattabhi Sitaramayya—p. 69.

বাংলা, মহাবল্লভ, মধ্যপ্রদেশ এবং পঞ্জাবের এখানে-ওখানে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল জাতীয় বিদ্যালয়, কোথাও কোথাও বা গড়ে উঠল এক একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—এমনিভাবে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন প্রসারলাভ করল দূরদূরান্তরে।

১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে বাঙালী বীর-বালক ক্ষুদ্রিরামের ফাঁসি এবং তার কিছুকাল পূর্ব স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুগান্তর-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জেল হ'ল। দেশের জগৎ বাঙালীর কৃচ্ছ সাধন এবং আত্মদানের কাহিনী স্মরণ অন্ধ্রদেশে প্রচারিত হয়ে সেখানকার অনেক দেশপ্রেমিককে দীক্ষিত করল অগ্নি-মন্ত্রে। রাজদ্রোহের জগৎ প্রদত্ত সরকারী শাস্তি লোকের মনে ভীতি উদ্ভূত করতে আর সক্ষম হ'ল না। দেশের সর্বত্র প্রচারিত হতে লাগল রাজদ্রোহের বাণী। "বন্দেমাতরম"—এ রাজদ্রোহ-প্রচারের অভিযোগে অরবিন্দ অভিযুক্ত হলে, তাঁর পক্ষসমর্থন করে প্রবন্ধ লেখার অপরাধে ১৯১৮ সনের ১৩ই জুলাই মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করা হ'ল এবং ঠিক উক্ত দিবসেই অন্ধ্রদেশে হরিসকোত্তম বাও ও অপর দুই ব্যক্তিকে অরবিন্দের পক্ষসমর্থনের অপরাধেই গ্রেপ্তার করা হ'ল। তিলক সবস্বত্ব সাড়ে ছয় বৎসরের জগৎ নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। অন্ধ্রের হরিসকোত্তম বাওকে প্রথমে নয় মাসের জগৎ শাস্তিপ্রদান করা সাব্যস্ত হ'ল। কিন্তু সরকার তাঁর অপরাধের পুনর্বিচার করা স্থির করলেন এবং হাইকোর্ট মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে তিন বৎসরের দণ্ডদেশ প্রদান করলেন।

৩

অন্ধ্রের স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন—কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পান্ডলু : অন্ধ্রপ্রদেশ মাদ্রাজের অন্তর্গত। বিস্তৃত মাদ্রাজীদের ভাষা তামিল আর অন্ধ্রদের ভাষা তেলুগু—তামিল এবং তেলুগু সংস্কৃতির মধ্যেও বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে। অন্ধ্রকে মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত করে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের খেলালমাসিক প্রদেশগঠন তেলুগুদের জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে যে কতদূর পরিপন্থী সে সূচকে অন্ধ্র বাসীদের সর্বপ্রথম যারা সচেতন করে তোলেন, দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পান্ডলু তাঁদের অগ্রতম। ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশের পুনর্গঠন আন্দোলনের অগ্রতম অগ্রদূত তিনি।

১৮৬৬ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী গুণ্টুরে ভেঙ্কটাপ্পাইয়া পান্ডলুর জন্ম হয়। ম্যাট্রিক পাস করবার পর তিনি মাদ্রাজের একটি কলেজে গিয়ে ভর্তি হন এবং বি-এ ও আইন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। প্রথমে তিনি আইন-ব্যবসায় শুরু করেন মসলিপট্টমে। কর্মজীবনের প্রারম্ভ থেকেই জনকল্যাণমূলক কর্মের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগের সূচক হয়। তিনি কৃষ্ণা ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন এবং এই সংস্থার মুখপত্র "কৃষ্ণা" পত্রিকার অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা। এই পত্রিকাখানি অন্ধ্রবাসীদের কতভাবে যে সেবা করেছে তা বলে শেষ করা যায় না। মসলিপট্টমে কয়েক বৎসর আইন ব্যবসায় এবং বিবিধ জনহিতকর কর্মে লিপ্ত থাকবার পর পান্ডলু গুণ্টুরে চলে আসেন এবং গুণ্টুরকেই তাঁর কর্মস্থল বলে বরণ করে নেন। তামিল ভাষা এবং সংস্কৃতি

পেয়ে তেলুগুদের জাতীয় সত্তা কি ভাবে নিশ্চিত হচ্ছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তিনি ১৯১১ সনে অপর কয়েক জনের সহযোগিতায় অন্ধ্রের স্বাভাব্য-প্রতিষ্ঠা-আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। ভেঙ্কটাপ্লাইয়া এবং তাঁর সহকর্মীদের উদ্যোগে ১৯১৩ সনে বেপাতলায় প্রথম অন্ধ্র কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। তেলুগুদের জন্মগত অধিকার অর্জনের জন্ত পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে দেশভক্ত বিপুল লাভজনক আইন-বাবসা পরিচালনা করে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করেন। এমনই ভাবে গান্ধীজী প্রবর্তিত বরকট আন্দোলনের পূর্বেরি ব্রিটিশের আদালত বর্জন করে তিনি দেশবাসীর সমক্ষে ত্যাগের এক জলন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি ১৯১৫ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম উত্থাপিত হয়।* কিন্তু তখন কংগ্রেস এর উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন নি। ১৯১৬ সালে অন্ধ্র মহাসভার ষ্ট্যান্ডিং কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী-রূপে দেশভক্ত গুথক অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশের দাবি করে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। ১৯১৭ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত ব-ধাচিহ্নিতভাবে আলোচনাশ্চে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই প্রস্তাবের মূলনীতি গ্রহণ করেন এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তেলুগুভাষী জেলাসমূহ নিয়ে স্বতন্ত্র কংগ্রেস প্রদেশ গঠিত হোক এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯১৭ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে বিষয়টি নিয়ে তুমুল বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এমন কি স্বয়ং গান্ধীজী পর্যন্ত এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, শাসনসম্বার প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি মূলতঃ রাধা উচিত। কিন্তু প্রকৃত প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের পক্ষে ভাষাভিত্তিক প্রদেশগঠন যে অপরিহার্য, অন্তঃসাধারণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা:ল লোকমাত্ত তিলক তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। কলিকাতা কংগ্রেসের (১৯১৭) সভাপতিত্ব করেন মিসেস বেনার্ট। তিনি এবং জনকয়েক নেতৃস্থানীয় দক্ষিণী তামিল প্রতিনিধি তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। প্রস্তাবটি নিয়ে দু'ঘণ্টারও অধিক-কাল বাদপ্রতিবাদে তুমুল ঝড় বয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কিছু রাত্রি সোয়া দশটার সময় ভোটাবিক্ষে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ফলে ১৯১৮ সালে স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হ'ল— দেশভক্ত হলেন এর প্রথম সেক্রেটারী এবং ১৯২০ সালে তিনিই অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ঐ বৎসরেই নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে কংগ্রেসের নিরমতন্ত্র পরিবর্তিত হওয়ায় যে নূতন কর্ম-তালিকা প্রণয়ন করা হয়, কংগ্রেস-প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হ'ল তার অন্তর্ভুক্ত। নয় বৎসর পূর্বে অন্ধ্রের স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেশভক্ত দেখেছিলেন, বহু আলাপ-

আলোচনা ও আন্দোলনের ফলে এবার তার আংশিক সাফল্যের সূচনা দেখা দিল।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বিপুল ভাববহু্য সমগ্র ভারতবর্ষ যখন পরিপ্লাবিত হয়ে গেল, দেশভক্ত তখন বিপুল উত্তমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মসমূহে। গুণ্টুর জেলায় পেডানাণ্ডিপেড়ুতে করবন্ধ আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে তিনি যে কর্মক্ষমতা ও সংগঠনশক্তির পরিচয় দেন তা মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এবং তার পর থেকেই মহাত্মাজী অন্ধ্রের এই লোকনায়ককে বিশেষ শ্রীতির চক্ষে দেখতে শুরু করেন।

১৯২৩ সালে অন্ধ্রদেশের কোকনদাতে মৌলানা মহম্মদ আলির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে (৬৮তম) অধিবেশন হয় তাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্লাইয়া পান্থলু। তাঁর অভিভাষণের গোড়ার দিকে তিনি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অবিবেচনাশ্রমিত নীতির ফলে তিন্নভাষাভাষী প্রদেশের অস্তিত্ব হওয়া অন্ধ্রবাসীদের ব্যক্তিহ্রবিকাশের পক্ষে যে কতদূর পরিপন্থী হয়েছে তা উল্লেখ করেন, এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কিভাবে অন্ধ্রবাসীদের রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনপূর্বক তাদের অন্ধ্র-আন্দোলন তথা ভারতের প্রদেশসমূহকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্বর্জন আন্দোলন প্রবর্তনে প্রণোদিত করে, জোরালো যুক্তিতর্ক সহকারে তিনি বিশদভাবে সেকথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

“After this part of the country came under the British the individuality of the Andhras became obscured by being indiscriminately mixed up with communities speaking other languages by a Government unmindful of the progress of the people under its rule. But during the days of agitation against the partition of Bengal, the consciousness of the Andhras was roused under the influence of the great national movement and they endeavoured to reassert their individuality by starting the “Andhra movement.” They advocated the redistribution of provinces in India on linguistic basis as essential for the development the races living in different provinces and also for the solidarity of the Indian Nation.”*

দেশভক্তকে প্রতিকূল রাজশক্তির সঙ্গ সংগ্রামে বহু শক্তিকর্ম করতে হয়েছে, সংগ্রামের আহ্বান যখনই এসে পৌঁছেছে তখনই তিনি সাড়া দিয়েছেন। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে এক বার এবং ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে আর এক বার তিনি ক্যারাবরণ করেন। তাঁর আসল অনুরাগ কিন্তু ছিল জাতি-গঠনমূলক কর্মের প্রতি এবং জাতির সর্বদ্বন্দ্বী মুক্তির জন্ত গঠন-মূলক কর্মের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

* Report of the 38th Indian National Congress, Cooanada, 1923, p. 10.

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই রিপোর্ট ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

* “which travelled on to the Congress of 1915”—
History of the Indian National Congress, p. 147.

করতেন। কোকনদা কংগ্রেসের ভাষণেও তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের চেষ্টা, খন্দরপ্রচার, অস্পৃশ্যতাবিদূষণ, সমগ্র ভারতের জঙ্গ সাধারণ ভাষা প্রচার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন।

অন্ধ্রের আদিবাসীদের শোচনীয় অবস্থা এই দরদী দেশসেবকের মনকে গভীরভাবে বিচলিত করে তুলেছিল। তাদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকেও তিনি জীবনের অঙ্গতম ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। ঠেকর বাপা প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীর আদিম-জাতি সেবক সঙ্ঘের' সহিত সংশ্লিষ্ট 'অন্ধ্ররাষ্ট্র আদিমজাতি সেবক-সঙ্ঘের' তিনি ছিলেন সভাপতি। অন্ধ্রের এজেন্দী অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে অন্ধ্র শ্রমিক ধর্মরাজ্য-সভার কর্মীদের গঠনমূলক কার্যের কথা শুনে তিনি উক্ত সংস্থার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ১৯৪২ সালে শ্রীমৎশ্বর শর্মা সহ মহুগোলার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সেখানকার দুর্গত আদিবাসীদের ভগ্ন হৃদয়ে নবীন আশার সঞ্চার করেন। আদিবাসীদের প্রতি এই জরাজীর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য সপ্ততিপন্ন বৃদ্ধের অপরিণীত দরদ ও প্রীতির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে শ্রমিক ধর্মরাজ্যসভার কর্মীরা নবপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। এই বৎসরেই বীর-মন্দিরের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার জন্তে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হ'ল। গোদাবরী নদীর পূর্বতীরস্থ সেই পরিভ্রম্ভূতি-মন্দির-সংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে দেশভক্ত সেদিন যে অপূর্ব ভাষণ দিলেন, শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভার সভ্যদের তা গঠনমূলক কর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলল।

১৯৪৯ সনের ১৫ই আগষ্ট, আমাদের স্বাধীনতালাভের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবসে অন্ধ্রদেশের এই সর্বজনবরেণ্য নেতা মরলোক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর অপূর্ব জীবনাদর্শ যে বিরাট আলোক-সুজ্জ্বল ছায়া দীর্ঘকাল জাতিকে পথনির্দেশ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

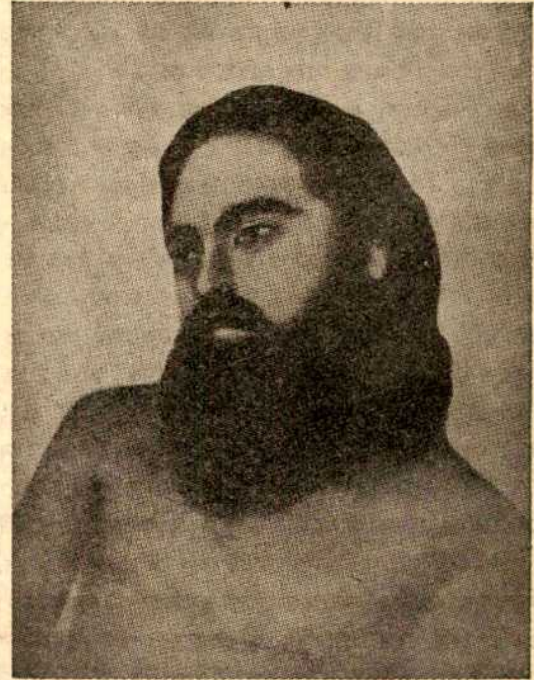
৪

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারা যেমন ১৯০৭ সনে অন্ধ্র-দেশে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছিল তেমন ১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধীর সত্যগ্রহের আদর্শও অন্ধ্রবাসীদের অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল এক অপূর্ব কর্মপ্রেরণায়। অসহযোগ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে তখন অন্ধ্রদেশের চিরলে যে গণ-অভ্যুত্থান হয় তার অধিনায়করূপে অন্ধ্ররত্ন গোপালকৃষ্ণাইয়ার নাম ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

কিন্তু অন্ধ্রের মুক্তি আন্দোলন শুধু অহিংস সংগ্রামের পথেই অগ্রসর হয় নাই। ক্ষেত্রবিশেষে তা সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারেও আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯২২ সনে অন্ধ্রের গুন্ডেম এজেন্দীতে ভিজাগাপট্টম (বিশাখাপট্টম) এবং গোদাবরী জেলায় সীতারাম রাজু (শ্রীরামরাজ) নেতৃত্বে আদিবাসীদের অভ্যুত্থান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। সমগ্র ভারতের মুক্তির পরিকল্পনা নিয়েই যে শ্রীরামরাজ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন,

বীরমন্দিরে তাঁর তৈলচিত্র উন্মোচন উপলক্ষে অন্ধ্র সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা এম. শ্রীঅন্নপুর্ণা সেকথার উল্লেখ করেন।*

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অন্ধ্রদেশ কখনও পিছিয়ে থাকে নি। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনেও বহু অন্ধ্রবাসী দেশের জঙ্গ দুঃখবরণের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, ১৯৩১-এ 'গান্ধী-আর-উইন পাক্ট' স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও অন্ধ্রবাসীরা সরকারের লাঞ্ছনা এবং নিধাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। পূর্বগোদাবরী



অন্ধ্রবীর আলুড়ি শ্রীরামরাজ (সীতারাম রাজু)

জেলায় ভাদাপল্লীতে তখনও বহু লোক পুলিশের গুলিবর্ষণে আহত, এমন কি কয়েকজন নিহত পর্যন্ত হয়েছে। ১৯৪০-১৯৪১এ গান্ধীজী যখন সমগ্র ভারতে ব্যক্তিগত সত্যগ্রহ আন্দোলন প্রবর্তন করলেন তখন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সারা ভারতের মধ্যে অন্ধ্রবাসীদের উপরেই সব চেয়ে বেশী জরিমানা ধাৰ্য করা হয়েছিল। ৪২-এর আগষ্ট বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা করে অন্ধ্রের ছাত্র ও তরুণ-সম্প্রদায় এক অভিনব রেকর্ড স্থাপন করেছে—জাতীয় পতাকার মৰ্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে আত্মহত্যা দিয়েছেন বীর মোগলাইয়া। এমনি ভাবে, বহু বীরসন্তান-প্রসবিনী অন্ধ্রদেশ শত অত্যাচারে অবিচলিত থেক একান্তিক নিষ্ঠার অগ্রসর হয়েছে মুক্তিসাধনার পথে। কিন্তু তার বিশদ বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্পপরিধারে সম্ভব নয়।

*Raja started his revolution in the Andhra Agency, as a part of a premeditated and preplanned All-India one for the liberation of the country—Jugodharma a bilingual fortnightly, edited by R. M. Sarma.

শিল্পবিদ্যালয়ের পরিণতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের জল্পনা-কল্পনা ও প্রতিষ্ঠাবিধি প্রথম চারি বৎসরের বিবরণ আমরা এ পর্যন্ত মোটামুটি জানিতে পারিয়াছি। এ বিষয়ে ১৮৫৪-৫৭ সনের সংবাদপত্রাদির উপরই আমাকে একান্তভাবে নির্ভর করিতে হইয়াছে। ১৮৫৬ সনের প্রথম হইতে শিল্পবিদ্যালয় সরকারী সাহায্য-লাভে সমর্থ হয়। এই সাহায্য অল্পকালের মধ্যেই বাড়িয়া মাসিক ছয় শত টাকা দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৫৭ সনের মে মাসে সিপাহী যুদ্ধ শুরু হয়। তখন কর্তৃপক্ষ স্বাভাবতঃই অত্যন্ত বিভাগে ব্যয়সঙ্কোচ করেন। ১২৬৪, ১লা আষাঢ় সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকরে' পূর্ববর্তী 'জ্যেষ্ঠ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণে' প্রকাশ, "কোর্ট অফ ডিরেক্টস সাহেবরা কলিকাতায় শিল্পবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক ৩৫০ টাকা প্রদান করণের অনুমতি প্রেরণ করেন।" যুদ্ধের অবসান হইলে এই সাহায্য বাড়িয়া পূর্ব পরিমাণ ছয় শত টাকাই করা হইয়াছিল—এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

যাহা হউক, এই সময় হইতেই শিল্পবিদ্যালয় সরকারী আওতায় আসিয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫৮ সনের ৭ই মে শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার অধ্যক্ষ-সমিতির একটি অধিবেশনের বিবরণ 'বেঙ্গল হরকরা'য় (১৭ মে, ১৮৫৮) পাইতেছি। সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট সি. ই. এস. উইলিয়ামসের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় উইলিয়ামসের প্রস্তাবে মেজর ষ্ট্রাসি এবং কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ অধ্যক্ষ বা পরিচালক সমিতির সদস্য হইলেন। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ছাত্রদের চিত্র ও শিল্পদ্রব্যাদির একটি প্রদর্শনী হইবে এইরূপ কথা ছিল। এই বিবরণ হইতে আরও জানা যায়, মিঃ হুইলি তখন তক্ষণশিল্পের অধ্যাপক। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কার্যোৎকর্ষের জন্ত সভা আনন্দ প্রকাশ করেন। তক্ষণ শিল্পবিভাগে কাজের চাপ বেশী; কারুণ রাহির হইতেও বেশ অর্ডার পাওয়া যাইতেছিল। এ সময় শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদকের নাম পাইতেছি এইচ. স্কট স্মিথ, আর সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজই ছিল সভাস্থল।

ছিল মেসার্স চার্লস নেফিউ এণ্ড কোংএর ভবনে। ঐ দিন বৈকাল ৫টার সময় উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত একটি সাধারণ সভাও হইয়াছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সার আর্থার ডবলিউ. বুলার। শিল্পরসিক সরকারী বেসরকারী দেশীয় বিদেশীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে পাদরী লড্জ, সি. এইচ. এ. ডাল, ডাঃ মোএট, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরস্কার বিতরণ, সভাপতির বক্তৃতা প্রভৃতি হইতে শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইতেছে। তখন বিদ্যালয়ে ছয়টি শ্রেণী ছিল—(১) মৃৎপুত্তলি নির্মাণ ও ছাঁচে ঢালাই, (২) আকৃতি অঙ্কন—প্রথম শ্রেণী, (৩) ঐ—দ্বিতীয় শ্রেণী, (৪) দৃশ্যচিত্র অঙ্কন, (৫) তক্ষণশিল্প ও (৬) ফটো-গ্রাফি। বিভিন্ন শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে নগদ টাকা, পুস্তক ও মাসিক 'পীল'-রুত্তি দেওয়া হয়। পীল-রুত্তির অধিকারী হইলেন পাঁচ জন। ইহারা যথাক্রমে : প্রথম শ্রেণীতে প্রমথনাথ মিত্র—মাসিক আট টাকা; পীল-রুত্তি; দ্বিতীয় শ্রেণীতে জে. এল. পাইন—পাঁচ টাকা; তৃতীয় শ্রেণীতে হরিশঙ্কর থা—পাঁচ টাকা, চতুর্থ শ্রেণীতে প্রসন্নকুমার রায়—চারি টাকা এবং পঞ্চম শ্রেণীতে কালিদাস পাল—চারি টাকা। ষষ্ঠ শ্রেণী, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফিতে কাহাকেও পীল-রুত্তি দেওয়া হয় নাই।

সভাপতি বুলারের বক্তৃতা ছিল একাধারে পাণ্ডিত্য ও তথ্যপূর্ণ। ইহা হইতে জানা যায়, বেসরকারী চাঁদা হইতে তখন বিদ্যালয়ের আয় দাঁড়াইয়াছিল মাসিক মাত্র নব্বুই টাকা। সরকারী মাসিক সাহায্য ছয় শত টাকা হইতেই প্রায় সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করিতে হইত। সরকার তখনও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। বুলার বলেন, সরকারী সাহায্য রদ হইলে যে-কোন মুহূর্তে বিদ্যালয়ের কার্য বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কাজেই এরূপ একটি হিতকারী প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধানকল্পে তিনি সভাস্থগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান এবং নিজেও মাসিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, অর্থাভাবে সমুদয় বিভাগের কার্য সূষ্ঠরূপে আরম্ভ না হইলেও তখন পর্যন্ত যে-যে কাজ হইয়াছে তাহাতে নিরাশ হইবার

ছাত্রদের শিল্পদ্রব্যাদির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইল কিন্তু কয়েক মাস পরে—১ই সেপ্টেম্বর তারিখে। প্রদর্শনী-ক্ষেত্র

কোনই কারণ নাই। ভারতবাসীর স্বাভাবিক শিল্পপ্রীতি রহিয়াছে। নানা কারণে এতদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকিলেও কুতবমিনার, তাজমহল ও মসলিনের দেশে সামান্যমাত্র সুযোগ-সুবিধা পাইলেই যে তাহা আবার উজ্জীবিত হইতে পারে, শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে ও হইবে। পূর্বে বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক পুস্তক চিত্রিত করিবার উপায় ছিল না। বিলাত হইতে ডিজাইন ও ব্লক করাইয়া আনিতে বিস্তর অর্থব্যয় ও সময়-ক্ষেপ হইত। বুলার বলেন, শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষাশুণে এ অভাব ও অসুবিধা নিরাকৃত হইয়াছে। সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান পুস্তক চিত্রিত করিতে এখন আর বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। তিনি আশা করেন, চিত্রবিদ্যা শীঘ্রই এতটা উৎকর্ষ-লাভ করিবে যে, ইংলণ্ডের শিশু-সাহিত্যের মত এখানকার শিশু-সাহিত্যও চিত্র সহযোগে প্রকাশিত হইয়া অচিরে শিশু-চিত্র হরণ করিতে সমর্থ হইবে। তক্ষণশিল্পে ভারতবর্ষ চিরদিনই উন্নত। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, অস্ত্র, শস্ত্র দ্বারা অলঙ্করণশিল্প খোদাই ও গড়ন কাহার না জানা? বিদ্যালয়ে নব-প্রবর্তিত ফটোগ্রাফি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতিও সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে প্রদত্ত বুলারের এই বক্তৃতা পাঠ করিলে আজিও আমাদের প্রাণে নূতন আশা ও নব বলের সঞ্চার হয়।*

৩

বড়লাট লর্ড ক্যানিং সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছয় শত টাকায় বাড়াইবার নির্দেশ দিয়া বাংলা-সরকারকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বলা হয় যে, শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা (D. P. I.) এই বিদ্যালয় তিন মাস অন্তর পরিদর্শন করিবেন, আর এই বিদ্যালয়ের কার্যকলাপের বিষয় সরকারী শিক্ষা বিবরণে উল্লিখিত হওয়া উচিত। ১৮৫৯-৬০ সনের সরকারী শিক্ষা-বিবরণেই সর্বপ্রথম আমরা শিল্পবিদ্যালয়ের উল্লেখ পাই। এই বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে, সরকারী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ঐ সময়কার অধ্যক্ষ মেজর জর্জ চেস্নী শিল্পবিদ্যালয়ের 'একস-অফিসিও ডিজিটর' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের কথা তখনই কর্তৃপক্ষ ভাবিতেছিলেন। তক্ষণশিল্প—বিশেষতঃ কাঠ-খোদাই বিভাগটি তখন বেশ চলিতেছিল। অধ্যাপক রিগ'র (Regaud) নেতৃত্বে যুগপুত্তলি-নিষ্কাশ ও ছাঁচে-ঢালাইয়ের কাজ বেশ উৎকর্ষলাভ করে। পূর্বোক্ত পুরস্কার-বিতরণী

সভার সভাপতি বুলার অধ্যাপক রিগ'র কর্মকুশলতার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার মনকষাকষি লাগিয়াই ছিল। উক্ত সরকারী বিবরণে প্রকাশ—১৮৫৯ সনের আগষ্ট মাসে শিল্প-বিদ্যালয়ের সঙ্গে রিগ' সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাঁহার স্থলে কোন অধ্যাপক নিযুক্ত না হওয়ায় ঐরূপ সুপরিচালিত বিভাগটির কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে হয়। এই সম্পর্কে শিক্ষা-বিবরণে বলা হয় :

"This interruption is unfortunate, but it affords no ground for doubting the ultimate success of the school."

কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়টির উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। সরকার মাসিক ছয় শত টাকা হিসাবে পুনরায় দুই বৎসর সাহায্যদানে সম্মত হন। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা নিজস্ব বিদ্যালয়টি পুনর্গঠনের জন্ত মাদ্রাজের শিল্প-বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ ডঃ হান্টারের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন বলিয়াও উক্ত সরকারী বিবরণে লিখিত আছে।

পর বৎসরের (১৮৬০-৬১) শিক্ষা-বিবরণে শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাই। এই সনে বিদ্যালয় এক আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ একটি 'পটারি' বা যুগপাত্র-নিষ্কাশ বিভাগ খুলিবার মনস্থ করেন। মাদ্রাজ হইতে ডঃ হান্টারের সুপারিশে এই কার্যে পটু এক জন ইউরোপীয় ও এক জন দেশীয় শিক্ষক আনীত হন। এগার শত টাকা ব্যয়ে একটি চুল্লীও নি্মিত হইল। কিন্তু কার্যারম্ভের পূর্বেই ইউরোপীয় শিক্ষকটি মারা যান। ইহাতে দেশীয় মাদ্রাজী শিক্ষকটিও বিশেষ ভয় পাইলেন এবং স্বদেশে চলিয়া গেলেন। তক্ষণশিল্প (কাঠ-খোদাই প্রভৃতি) বিভাগে গড়ে ছাত্র ছিল আঠার জন। এ বিভাগটি লাভজনক, কাজও হইত বেশ। কিন্তু সম্পাদকের বিরতি হইতে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরের মধ্যে সকল ছাত্রই বিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কৈফিয়ত-স্বরূপ তাহারা বলে যে, বিদ্যালয়ে থাকিয়া তক্ষণকার্যে তাহাদের যাহা আয় হয়, স্বাধীনভাবে কাজ করিলে তাহারা তাহার অধিক আয় করিতে পারিবে। তক্ষণ-বিভাগের দিনিয়র ছাত্রগণ প্রত্যেকে মাসে বার টাকা পর্য্যন্ত আয় করিত। অঙ্কন ও তৈলচিত্র বিভাগেও ভাল কাজ হয়। এই বৎসরের ছাত্র-সংখ্যা চুয়াল্লিশ, পূর্ব বৎসরে ছিল মাত্র চব্বিশ জন।

* General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1859-60., pp. 40-1.

১৮৬১-৬২ সনের সরকারী শিক্ষা-বিবরণে শিল্প-বিদ্যালয়ের কোন উল্লেখ পাই নাই। তবে এই সময় হইতে যে ইহার উন্নতি ও পুনর্গঠনের জন্ত বিশেষ চেষ্টা সুরু হয়, পরবর্তী বৎসরের (১৮৬২-৬৩) সরকারী শিক্ষা-বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যায়। শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভা এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়া সরকারকে পেশ করেন। এই সময় শিল্পবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিঃ গ্যারিক। ১৮৬২-৬৩ সনের প্রথম আট মাস :পর্যন্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন মিঃ মেডলিকট। তাহার পর সম্পাদক হন মিঃ এইচ. এফ. ব্লানফোর্ড। সুতরাং ব্লানফোর্ডই পূর্ব-সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে সব কথা জানিয়া ইহাদের সাহায্যে বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই বিবরণ হইতে জানিতে পারি, তখন শিল্পবিদ্যালয় সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শ্রেণীগুলি এইরূপ : (১) মণ্ডনশিল্প ও আকৃতি চিত্রণ, (২) তক্ষণশিল্প (কাঠ খোদাই প্রভৃতি), (৩) লিথোগ্রাফি, (৪) তৈলচিত্র, (৫) মৃৎপুতলি নির্মাণ ও ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজ, (৬) মৃৎপাত্র নির্মাণ এবং (৭) ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র।

সম্পাদক ব্লানফোর্ড দফাওয়ারি ভাবে প্রতিটি শ্রেণীর কার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। মৃৎপুতলি নির্মাণ ও ছাঁচে-ঢালাই শিল্পের শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত দেখিতেছি মিঃ ওয়েব নামক জনৈক শিক্ষাব্রতীকে। এ বিদ্যায় তাহার দক্ষতা ছিল সুবিদিত। তথাপি সংস্কারবশে ভদ্রশ্রেণীর খুব কম যুবকই তাহার নিকট কাঁদা লইয়া কাজ করিতে রাজী হইত। এ কারণ এ বিভাগের কাজ তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই। বাহির হইতে অর্ডার আসিলে, বা বিক্রয়ের জন্ত কিছু কিছু কাজ এখানে করা হইত। মৃৎপাত্র-নির্মাণ শ্রেণীরও ঐ একই অবস্থা। তবে কুস্তকার জাতীয় কয়েকটি ছাত্র এ বিভাগে মাঝে মাঝে আসিয়া কাজ শিখিত। দারিদ্র্য-হেতু নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতে না পারিলেও তাহারা অল্প সময়ে কাজে বেশ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তাহাদিগকে ছাত্র বলিয়াও গণ্য করা যাইতে পারে।

আকৃতি অঙ্কন ও মণ্ডনশিল্পের শ্রেণীতে প্রত্যেক ছাত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পর প্রথম পাঠ লইতে হইত। ইহাতে কতকটা দক্ষতা না জন্মিলে কেহই তক্ষণ-শিল্প, লিথোগ্রাফি প্রভৃতি বিভাগে প্রবেশ করিতে পাইত না। এ কারণ এ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যাও হইত বেশী, ঐ সনে ছিল আঠার জন। প্রাথমিক পাঠ লইবার পর অগ্রাঙ্ক বিভাগে

চলিয়া যাওয়ায় এ বিভাগে বেশী ছেলে রাখা যাইত না। চিত্রকলার নৈপুণ্য অর্জনের পক্ষে এ শ্রেণীতে ছাত্রদের দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ একান্ত প্রয়োজন। এই বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে, বাহাতে এ শ্রেণীতে অন্ততঃ কয়েকজন ছেলে অধিক দিন চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে, সেজন্ত প্রধান শিক্ষক কর্তৃক অনুকল্প হইয়া অধ্যক্ষ-সভা সরকারের নিকট কয়েকটি বিশেষ বৃত্তি স্থাপনের প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন।

তক্ষণশিল্পের শ্রেণী কাজের দিক দিয়া উৎকর্ষ লাভ করে। এখানকার ছাত্রসংখ্যা ছিল চৌদ্দ। বাহির হইতে যে সব অর্ডার পাওয়া যাইত তাহাতে দক্ষ ছাত্রেরা সঙ্ঘসর ধরিয়া যথেষ্ট কাজের সুযোগ পাইত। বিদ্যালয়ের নিজস্ব লিথোগ্রাফির যন্ত্র থাকিলেও এ বিভাগে তেমন কাজ হয় নাই। ছাত্রসংখ্যাও কম ছিল। তাহাদের আয়ের পস্থা বাহাতে বাড়ে এ বৎসর তাহার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তৈল-চিত্র শ্রেণীতে মাত্র তিন জন ছাত্র ছিল। এই বিভাগের উন্নতি হওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বর্ণিত হয়। ফটোগ্রাফি শ্রেণীতে ছিল পাঁচ জন ছাত্র।*

অধ্যক্ষ-সভার পূর্বোক্ত পরিকল্পনা ভারত-সরকার সহায়তায় সঙ্গে বিবেচনা করিলেন। শিল্পবিদ্যালয়ের জন্ত মাসিক সাত শত টাকা বেতনে একজন প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইল। তবে সরকার ইহার সঙ্গে একটি সর্ত্ত জুড়িয়া দেন যে, যে পর্যন্ত না ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করিয়া আনা হয় এবং তিনি এখানকার অবস্থার সঙ্গে সম্যক পরিচিত না হন তত দিন এই খাতে কোনরূপ অর্থব্যয় করা হইবে না। অধ্যক্ষ-সভা এই সর্ত্তে সম্মত হইয়া বিলাতে লণ্ডন স্কুল অফ ডিজাইন-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ রেডগ্রেভ, আর-এ'র নিকটে একজন উপযুক্ত শিল্পীকে মনোনয়ন করিয়া পাঠাইবার জন্ত পত্র লিখিলেন।* রেডগ্রেভ মহোদয় মিঃ এইচ. এইচ. লককে উক্ত পদের জন্ত নির্বাচন করেন।

লক ১৮৬৪ সনের ২৯শে জুন কলিকাতার পৌছেন এবং পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই দিন হইতে সরকার শিল্পবিদ্যালয়ের ভার পুরাপুরি গ্রহণ করিলেন। সরকারের পক্ষে লক সাহেব অধ্যক্ষ-সভার হস্ত হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে শিল্পবিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার লইলেন, তাহার উপরওয়াল হইলেন সরকারী শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা। অধ্যক্ষ-সভা অতঃপর মাত্র একটি পরামর্শদাতা কমিটিতে

* Ibid, for 1862-63, pp. 23-25.

† Ibid, for 1863-64, pp. 62-3.

পর্যবসিত হইল। কমিটির অনুমোদনক্রমে অধ্যক্ষ লক শিল্পবিদ্যালয়ের পুনর্গঠন উদ্দেশ্যে প্রস্তাব তৈরি করিয়া সরকারের নিকট পাঠাইয়া দেন। সরকারের অনুমোদন-লাভের পর ইহা পুনর্গঠিত হয়। এ বিষয় পরে আলোচ্য। এই সময় হইতে শিল্পবিদ্যালয়ের নাম হইল ‘গবর্ণমেন্ট স্কুল অফ আর্ট’।*

১৮৬৪-৬৫ সনে বিদ্যালয়টির জন্ম ভারত-সরকার ১৫,৩৫৩ এবং বাংলা-সরকার ১,৬৭১ মোট ১৭,০২৪ টাকা ব্যয় করেন। শিল্পবিদ্যালয় এই বৎসরে ১৬৬ নং বোর্ডবার্ষিক ট্রাস্ট ভবনে স্থানান্তরিত হইল।

* Ibid, for 1864 65 pp. 23-4.

† Ibid, Appendix, p. 94.

গ্রামের নাম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ইতিপূর্বে কৃষ্ণকান্তের উইলের ‘হরিন্দ্রগ্রাম কোথায়?’ শীর্ষক আলোচনায় লিখিয়াছিলাম : ‘হরিন্দ্রগ্রাম’ এই নাম হইতে উৎপন্ন কোন জেলায়, তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারি। কোন জেলায় “—গ্রাম” এইরূপ নামের গ্রামের প্রাচুর্য্য। কোনও জেলার সমুদয় গ্রামের নামের তালিকা পাইলে তাহা হইতে সেই জেলায় কয়টি—“গ্রাম” আছে বাহির করা সহজসাধ্য, কিন্তু এইরূপ নামের তালিকা সরকারী দপ্তরে থাকিলেও সাধারণের পক্ষে তাহা পাওয়া সহজসাধ্য ত নহেই, উপরন্তু বহু ব্যয়সাপেক্ষ। আজকাল প্রায় প্রত্যেক গণ্ড-গ্রামে, বর্ধিষ্ণু গ্রামে ডাকঘর আছে। কোনও জেলায় যদি গ্রামের নামের মধ্যে—“পুর” শতকরা দশটা, “—গ্রাম” শতকরা সাতটা, “—গড়” শতকরা পাঁচটা “—পাড়া” শতকরা তিনটা করিয়া থাকে তবে ডাকঘরের নামের তালিকার মধ্যেও আমরা শতকরা দশটা “—পুর”, সাতটা “—গ্রাম” পাঁচটা “—গড়” ও তিনটা “—পাড়া” দেখিতে পাইব আশা করিতে পারি। সুতরাং ডাকঘরের তালিকা হইতে কোন জেলায় “—গ্রাম” এই নামের প্রাচুর্য্য তাহা আমরা কতকটা আন্দাজ করিতে পারি। ‘হরিন্দ্রগ্রামে’ একটা ডাকঘর ছিল, সুতরাং ডাকঘরের তালিকা দেখিয়া যদি আমরা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাহা হইলে সেটি অসঙ্গত হইবে না। ২৪ পরগণা জেলায় মোট ১৭৪টি ডাকঘরের মধ্যে “—গ্রাম” এই নামের ডাকঘর একটি আছে, যথা : শিকড়া কুলীন গ্রাম। পূর্বে এই স্থানের নাম শুধু শিকড়া ছিল। পরে বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে হইবার পর, রেল-স্টেশনের নাম লইয়া অল্প স্থানের রেল-স্টেশনের নামের সহিত গোলযোগ হওয়ায় ইহার নামপরিবর্তন করিয়া “শিকড়া কুলীনগ্রাম” রাখা হয়। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মস্থান। হুগলী জেলায় ১২৬টি ডাকঘরের মধ্যে এইরূপ “—গ্রাম” আছে তিনটি যথা : বৈচি গ্রাম (এটিকে আমরা বাদ দিতে পারি, কারণ বৈচি ডাকঘর হইতে এটি যে পৃথক তাহা দেখাইবার জন্য এই নামকরণ)।

নদীয়া জেলায় ১৭৬টি ডাকঘরের মধ্যে চারটি “—গ্রাম” আছে, যথা : দেবগ্রাম, মাঝেরগ্রাম ও বিব গ্রাম। হাবড়া জেলায় ১০৯টি ডাকঘরের মধ্যে “—গ্রাম” একটি মাত্র—দেউলগ্রাম—আছে। মেদিনীপুর জেলায় ১৯৬টি ডাকঘরের মধ্যে পাঁচটি “—গ্রাম” আছে, যথা : কালাগ্রাম, দাসগ্রাম, নয়া-গ্রাম, ঝাড়গ্রাম, ও নন্দীগ্রাম। মুর্শিদাবাদ জেলায় ৯২টি ডাকঘরের মধ্যে আটটি “—গ্রাম” আছে, যথা : মতিগ্রাম, খড়গ্রাম, মাড়গ্রাম, নবগ্রাম, পাঁচগ্রাম, সিজগ্রাম, তালগ্রাম ও কাগ্রাম। যশোহর জেলায় ১৬০টি ডাকঘরের মধ্যে চারটি “—গ্রাম” আছে। যথা : রাধানগরগ্রাম, রায়গ্রাম, জয়গ্রাম ও শুকুগ্রাম। আর বর্ধমান জেলায় ২২৭টি ডাকঘরের মধ্যে ২২টি গ্রাম আছে, যথা : জয়গ্রাম, কেতুগ্রাম, নন্দীগ্রাম, গোবগ্রাম, মন-নবগ্রাম, আউসগ্রাম, ক্রীগ্রাম, মোগ্রাম, চণ্ডীপুর, কোগ্রাম, মাঝিগ্রাম, বেড়ুগ্রাম, জোগ্রাম, কুলীন-গ্রাম, মধ্যগ্রাম, কসুমগ্রাম, মসাগ্রাম, নবগ্রাম ও নাড়ুগ্রাম। এতৎসম্পর্কিত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

জেলার নাম মোট ডাকঘরের গ্রাম এই নামের ডাকঘরের শতকরা

	সংখ্যা	সংখ্যা	
২৪ পরগণা	১৭৪	১	০.৮
হুগলী	১২৬	৩	২.৪
নদীয়া	১৭৬	৪	২.৩
হাবড়া	১০৯	১	০.৯
মেদিনীপুর	১৯৬	৫	২.৫
মুর্শিদাবাদ	৯২	৮	৮.৭
যশোহর	১৬০	৪	২.৫
বর্ধমান	২২৭	২২	৯.৭

সুতরাং ‘হরিন্দ্রগ্রাম’ হয় বর্ধমানে না হয় মুর্শিদাবাদে রাঢ় অঞ্চলে—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসঙ্গত হইবে না। অত্যাশ্চর্য্য যুক্তি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এখানে উল্লেখ করিলাম না।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সেপাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রিয়াক্ষম অশোক মিত্র আই-সি-এস কর্তৃক সংকলিত হুগলী জেলা সম্বন্ধীয় ডিস্ট্রিক্ট হাণ্ডবুক দেখিবার সুযোগ বর্তমান লেখকের হইয়াছে। সার উইলিয়াম উইলসন হাটার কর্তৃক প্রকাশিত Statistical Account of Bengal-এর পরে এ বিষয়ে এক্ষণে তথ্যবহুল পুস্তক আমরা দেখি নাই। এই নূতন ডিস্ট্রিক্ট হাণ্ডবুকে হুগলী জেলার ১৯০৬টি গ্রামের নাম, কালি, লোক-সংখ্যা, বাড়ীর-সংখ্যা, লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ও গ্রামবাসীদের পেশা ইত্যাদি দেওয়া আছে। এই তথ্যগুলি অনুধাবন করিতে করিতে মনের মধ্যে কতকগুলি জিনিস পরিষ্কৃত হইল। দেখিলাম যে, শেষাংশে “পুর” শব্দযুক্ত নামবিশিষ্ট গ্রামের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য।

একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মৌজাকেই এই পুস্তকে গ্রাম বলিয়া ধরা হইয়াছে। আমরাও যখন গ্রামের নাম লইয়া আলোচনা করি তখন প্রকৃতপক্ষে মৌজার নাম লইয়াই আলোচনা করি। এককালে মৌজা ও গ্রাম—সমাজবিশিষ্ট গ্রাম অভিন্ন ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এক্ষণে মৌজা ও সমাজবিশিষ্ট গ্রামের মধ্যে পার্থক্য হইয়াছে। এ বিষয়ে ইংরেজী ১৯১১ সালের আদমশুমারির সুপারিন্টেন্ডেন্ট এল. এস. এস. ওয়ালি সাহেব লিখিয়াছেন :

“The marginal statement (here given below) shows the number of inhabited mauzas and residential villages or hamlets in the districts” of West Bengal. [West Bengal then meant the Burdwan and the old Presidency Divisions.]

Divisions	Inhabited mauzas	Inhabited villages
Burdwan	24,132	29,451
Presidency	13,389	21,233

দেখা যায়, কোন কোন স্থানে মৌজা বাসগ্রামের চেয়ে ছোট ;

আবার কোনও কোনও স্থানে বাসগ্রাম অপেক্ষা বড়। বর্তমান বিভাগে মৌজার কালি গড়ে ৩৭২ একর; আর তখনকার প্রেসিডেন্সী বিভাগে মৌজার কালি গড়ে ৭৮১ একর—পার্থক্য দ্বিগুণের উপর। বাসগ্রামের কালির পার্থক্য কিন্তু তত বেশী নহে। যেমন, বর্তমান বিভাগে গড় কালি ৯৩০ বিঘা ; আর প্রেসিডেন্সী বিভাগে ১৪২০ বিঘা—পার্থক্য দেড়গুণের কাছাকাছি।

হুগলী জেলার ১৮টি থানা ও ১৯০৬টি গ্রাম আছে। ৩টি মহকুমায় এই ১৮টি থানা। সমস্ত জেলায় কয়েকটি “—পুর”, কয়েকটি “—ডাঙ্গা”, কয়েকটি “—পাড়া”, কয়েকটি “—বাটা”, কয়েকটি “—নগর”, কয়েকটি “—গ্রাম” ইত্যাদি আছে, তাহার আলোচনা মহকুমা-ওয়ারি ও থানা-ওয়ারিভাবে করিলাম। তালিকাটি এইরূপ। যথা :

মোট মৌজার সংখ্যা	সদর মহকুমা থানার নাম					
	চুঁচুড়া	ধনেখালি	পোলা	মগরা	বলাগড়	পাণ্ডুয়া
মোট মৌজার সংখ্যা	২২	২১৪	১২৪	৫৩	১৩৬	১৫৮
“—পুর”	৫	৯৯	৪৮	২০	৪০	২২
“—ডাঙ্গা”	৩	২	৩	—	৩	১
“—গড়, গড়া, গড়িয়া”	২	৫	১	—	৩	৫
“—পাড়া”	১	৭	১২	১	১৩	১১
“—বাটা”	—	১	—	১	—	—
“—বাটা”	—	৫	৫	১	৪	২
“—ঘরা”	—	২	—	১	—	—
“—নগর”	১	১	৪	১	১	২
“—গ্রাম”	—	১	২	১	—	৮

কীরামপুর মহকুমা

থানার নাম

	কীরামপুর	উত্তরপাড়া	ভদ্রেশ্বর	হরিপাল	তারকেশ্বর	সিঙ্গুর	চণ্ডীতলা	জাদীপাড়া
মোট মৌজার সংখ্যা	২৭	১২	২১	১৫৪	২০	১০৩	১০২	১২৯
“—পুর”	৮	২	৪	৭১	৪০	৩২	৩৯	৫০
“—ডাঙ্গা”	—	—	—	—	—	২	৩	—
“—গড় ইত্যাদি	—	—	—	২	৫	২	১	২
“—পাড়া”	—	২	২	৫	২	২	২	৩
“—বাটা”	—	—	—	—	—	৩	—	—
“—বাটা”	১	—	—	১১	৮	৭	২	৬
“—ঘরা”	—	—	—	—	—	—	৪	১
“—নগর”	—	১	—	৫	৪	৭	২	৮
“—গ্রাম”	১	—	১	—	১	—	—	১

আরামবাগ মহকুমা				
খানার নাম				
আরামবাগ	পুরহা	গোঘাট	খানাকুল	
মোট মোজার সংখ্যা	১৭৫	৫০	২১১	১৪৭
“পুর”	৬০	১৭	৫০	৫০
“ডাঙ্গা”	—	—	১	১
“গড়, গড়া” ইত্যাদি	২	—	৫	২
“পাড়া”	৪	৫	৫	২
“ঘাটা”	—	—	—	—
“বাটা”	৪	২	১০	৩
“ঘরা”	১	—	১	—
“নগর”	৩	—	২	৮
“গ্রাম”	৪	—	৬	—

বিভিন্ন খানায় বিভিন্ন কারণে মোজার সংখ্যার বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। সেজ্ঞ উপরি-উক্ত সংখ্যাগুলির প্রকৃত তাৎপৰ্য্য বুঝিবার পক্ষে শতকরা হিসাবটি অধিকতর সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি। নিম্নে আমরা মহকুমাওয়ারী কোন মহকুমার “পুর”র শতকরা অনুপাত কত, “ডাঙ্গা”রই বা কত, “পাড়া”র বা “নগর”র কত তাহা দেখাইলাম। খানাওয়ারী হিসাবে দিলে যে তথ্যগুলি অনুধাবন করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত তাহা মনে হয় না। কারণ খানাগুলির মধ্যে আয়তনগত যথেষ্ট তারতম্য আছে। যেমন চুঁচুড়া খানা ১৪৫ বর্গমাইল, উত্তরপাড়া খানা ১১২ বর্গমাইল; পদ্মাস্তরে ধনিরাখালি খানা ১০৬২ বর্গমাইল; গোঘাট খানা ১৪৫৩ বর্গমাইল। ৩টি মহকুমাই যে সমান আয়তনের তাহা নহে; তবে খানার ঞায় অত বেশী বৈষম্য নাই। মহকুমাগুলির আয়তন নিম্নে দেওয়া গেল। যথা :

সদর মহকুমা—	৪৪৬.১ বর্গমাইল
জীরামপুর „	৩৪৯.৮ „
আরামবাগ „	৪১২.৫ „

মহকুমাগুলি এরূপ ভাবে গঠিত যে, এক আরামবাগ মহকুমা ব্যতীত অল্প দুইটি মহকুমার সহিত তুলনা করিয়া কোনও regional peculiarity বা স্থানীয় বিশেষত্ব দৃষ্টে মত প্রকাশ করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শতকরা হিসাব দিবার পূর্বে মহকুমাওয়ারী পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সদর জীরামপুর আরামবাগ জেলা হুগলীতে				
				সর্বমোট
মোট মোজার সংখ্যা	৭৭৭	৬৩৮	৫৮৩	১৯০৬
“পুর”	২৩৪	২৪৬	১৭৭	৬৫৭
“ডাঙ্গা”	১২	৫	২	১৯
“গড়, গড়া” ইত্যাদি	১৬	১২	১০	৩৭
“পাড়া”	৪৫	১৮	১৬	৭৯

“ঘাটা”	২	৩	—	৫
“বাটা”	১৭	৩৫	১৯	৭১
“ঘরা”	৩	৬	২	১১
“নগর”	১০	২৭	১৩	৫০
“গ্রাম”	১২	৪	১০	২৬

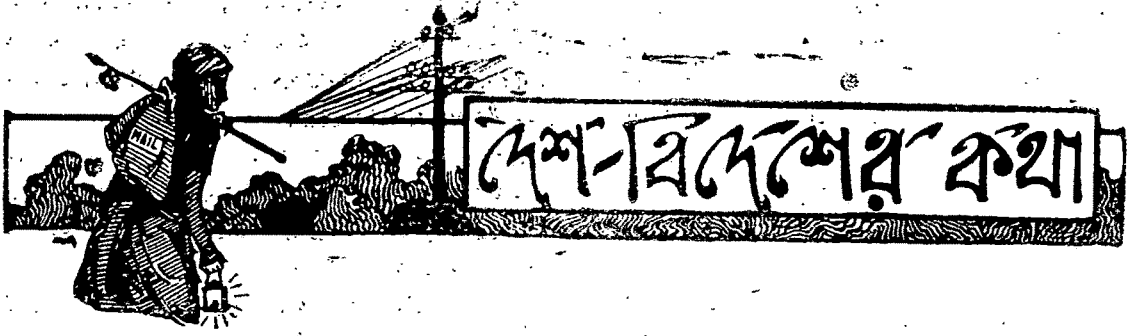
একটা জিনিষ লক্ষণীয় যে, সব মহকুমাতেই “পুরের” সংখ্যা খুব বেশী। সদর মহকুমা তার নীচেই “পাড়া”র সংখ্যা; কিন্তু জীরামপুর ও আরামবাগ মহকুমায় “বাটা”র সংখ্যা তার পরেই। “বাটা” সদর মহকুমায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে; “নগর” জীরামপুর মহকুমার তৃতীয়; “পাড়া” আরামবাগ মহকুমায় তৃতীয়। “গ্রাম” সর্বত্রই “নগর” অপেক্ষা সংখ্যায় কম। খানা হিসাবে ধরিলেও একমাত্র পাণ্ডুরা ছাড়া অন্যত্র “গ্রাম” নগর অপেক্ষা সংখ্যায় কম। “পাড়া”র সংখ্যা “গ্রাম”র সংখ্যার চেয়েও বেশী। কোনও খানার (যেমন সিঙ্গুরে) “ভেড়ী”, কোনও কোনও খানার (যেমন গোঘাটে) “গঞ্জ” ইত্যাদি আছে। সমগ্র জেলায় এই গ্রাম নগরাদির হিসাব ধরা হয় নাই।

এইবার আমরা মহকুমাওয়ারী শতকরা হিসাব নিম্ন দিলাম :
শতকরা হিসাবে—

	সদর	জীরামপুর	আরামবাগ	সমগ্র জেলা
	মহকুমায়	মহকুমায়	মহকুমায়	হুগলী
“পুর”	৩০.০	৩৭.০	৩০.৩	৩৪.৬
“ডাঙ্গা”	১.৫	০.৮	০.৩	১.০
“গড়, গড়া গড়িয়া”	২.০	১.৯	১.৬	২.০
“পাড়া”	৫.৯	২.৮	২.৭	৪.১
“ঘাটা”	০.৩	০.৫	০	০.৩
“বাটা”	২.২	৫.৫	৩.৩	৩.৭
“ঘরা”	০.৪	০.৯	০.৩	০.৮
“নগর”	১.৩	৪.২	২.২	২.৮
“গ্রাম”	১.৫	০.৫	১.৭	১.৩

হুগলী জেলার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মোজা হইতেছে খানাকুল খানার অন্তর্গত বোমপুর। ইহার কালি ৩২৮২ একর। লোকসংখ্যা ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১২৮১। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মোজা হইতেছে বলাগড় খানা অন্তর্গত রাজবল্লভপুর। ইহার কালি মাত্র ৩৪ একর বা ১০।১১ বিঘা। এই মোজার কিয়দংশ গঙ্গাগর্ভগত হওয়ার দরুনই ইহার আয়তন এরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে লোকবসতি নাই। এই জেলায় ৪৫টি মোজা লোক-বসতি শূন্য। যখন মোজা গঠিত হইয়াছিল তখন নিশ্চয়ই লোকের বসতি ছিল।

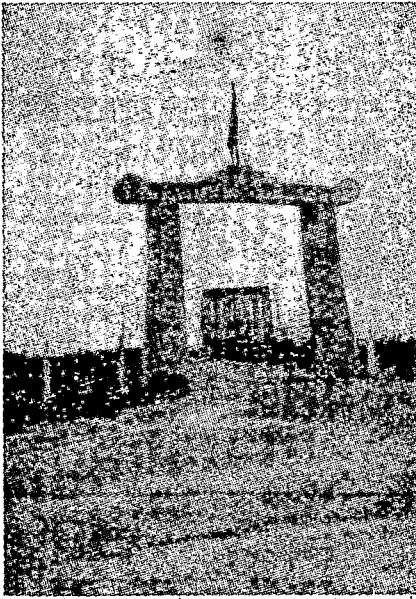
কয়েকটি খানার, প্রথম কয়েকটি “পুর”র, “পাড়া”র, “নগর”র, “বাটা” প্রভৃতির কালির গড় নিম্নে দেওয়া হইল। যে কয়টি “পুর” বা “পাড়া” বা “নগর” প্রভৃতি লইয়া গড় ধরা হইয়াছে তাহার সংখ্যা গড়ের পাশে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।



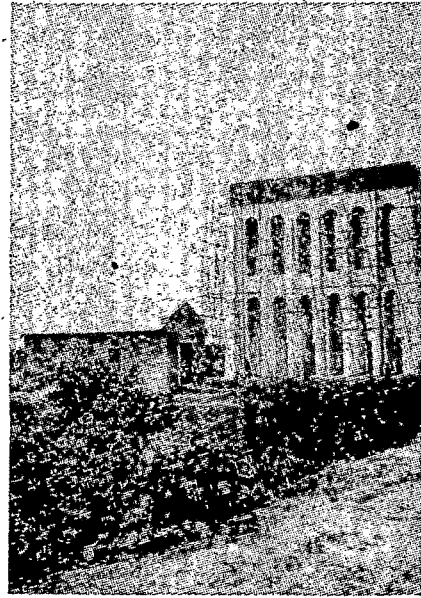
বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগ

বাংলা, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। বাঁকুড়া জেলার ভের লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় পঁয়ষাট হাজার লোক অর্থাৎ শতকরা পাঁচ জন এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগ সংক্রমণের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

জানাইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে কতকটা আগ্রহ দেখাইয়াছেন এবং সরকারী প্রচেষ্টায় বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গৌরীপুরে একটি কুষ্ঠ হাসপাতাল নির্মিত হইতেছে। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটে বদড়া গ্রামে ব্রিষ্টান মিশনারী-দের দ্বারা যে ক্ষুদ্র হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে মাত্র দুই শত



কুষ্ঠ হাসপাতালের ফটক



কুষ্ঠ হাসপাতালের একাংশ

মাত্র বাঁকুড়া জেলার মধ্যে আবার সদর মহকুমায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। প্রায় প্রতিটি পল্লীতে আট-দশ জন কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পল্লীতে এমনও দেখা যায় যে, একটি পরিবারের প্রায় সকলেই এই রোগে আক্রান্ত। সম্প্রতি এ বিষয়ে সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ করিয়া বাঁকুড়া জন কল্যাণ সমিতি আন্দোলন চালাইতেছে। বাঁকুড়ার হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট নেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য শ্রীরামহরি চট্টোপাধ্যায় এই ব্যাধির প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে বিশেষভাবে তৎপর হইবার জন্ত সরকারকে অনুরোধ

রোগী ওষধ পাইয়া থাকে এবং সেখানে সকল রোগীর থাকিবার স্থানের অভাব। বাঁকুড়াতে একটি বৃহৎ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া ১৯৪৭ সালে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাঁকুড়া শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে একটি হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থান সরকার কর্তৃক অধিকার করা হয়। এই স্থানটির আয়তন প্রায় তিন শত একর। প্রথম দফায় হাসপাতালের গৃহনির্মাণে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, দ্বিতীয় দফায় কার্য আরম্ভ হয় ১৯৪৯ সালে। এই দফায়

কালির গড় :—

থানার নাম

পোষা	গোঘাট	ধনিয়াখালি
“—পুর” ২৩৭ (১০)	৩৮১ (১০)	২৯৩ (১০)
“—পাড়া” ৪৪৩ (১০)	৪৪৬ (৫)	২০৪ (৭)
“—নগর” ২২৭ (৪)	১৬৫ (২)	৫৮৯ (৪)
“—বাটা” ৩৭৫ (২)	৩৭২ (১০)	২৭৪ (৬)
“—গ্রাম” ২১০ (২)	৪০০ (৫)	২৭৮ (১)
“—ঘাটা” —	—	২৪৭ (১)
“—ডাঙ্গা” ২৬৫ (৩)	৩২৬ (১)	৩০৯ (২)
“—গঞ্জ”	৪০০ (৩)	

পোষা থানা ও ধনিয়াখালি পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি থানা। গোঘাট থানা হুগলী জেলার সর্বপশ্চিম প্রান্তস্থ থানা। ১৮টি থানার মধ্যে লটারি করিয়া বাছিয়া এই ৩টি থানা লওয়া হইয়াছিল। উপরি-উক্ত পরিসংখ্যান অনুধাবন করিলে কালির মধ্যে বড় একটা regional peculiarity (আঞ্চলিক বিশেষত্ব) পরিলক্ষিত হয় না। পোষা ও ধনিয়াখালিতে—পুরের “বদলি কতকটা সমান সমান হইলেও, “—নগর” বা “—গ্রামের” বেলায় এই সমতা আরো দৃষ্ট হয় না।

পোষা থানায় “—পুর” ও “—নগর”র কালি প্রায় একইরূপ; ধনিয়াখালিতে “—পুর” অপেক্ষা “—নগর” ঢের বড়—প্রায় দ্বিগুণ। পক্ষান্তরে গোঘাটে “—পুর” “—নগর” অপেক্ষা দ্বিগুণের চেয়ে বড়। “—বাটার” আয়তন পোষা ও গোঘাটে প্রকই রূপ; কিন্তু ধনিয়াখালিতে অনেক ছোট। “গ্রামের” আয়তনের পার্থক্য খুব বেশী দেখিলে বুঝিতে হইবে ইহা নিতান্ত accidental বা আকস্মিক।

সাধারণতঃ আমাদের ধারণা এই যে, “গ্রাম” অপেক্ষা “নগর” বড়; আর “পাড়া”র চেয়ে “গ্রাম” বড়। এই প্রচলিত ধারণার কোনও সমর্থন উপরে যে সমস্ত পরিসংখ্যান ও তথ্যাদি প্রদত্ত হইল তৎসমুদয় হইতে-পাওয়া যায় না।

এইবার গ্রামের নাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যে সকল প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি। তারকেশ্বর থানায় ভরবলভপুর নামে একটি গ্রাম আছে (J. L. no ৩৮)—ইহার আয়তন ১০৩ একর। হরিপাল থানায় ভরবলভপুর (J. L. no ৩০ নামে আর একটি গ্রাম আছে—ইহার আয়তন ১৫৬ একর। এই দুইটি স্থানের সহিত ৩তারকেশ্বর মন্দিরের দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা রাজা ভরমল্লের কি কোন সংশ্রব আছে? মগরা থানায় “গজবর্গা” নামে একটি গ্রাম আছে—ইহা সরস্বতী নদীর উত্তর তীরে। যদি হাতীশালার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকে ত ইহা নদীর তীরে হওয়াই স্বাভাবিক। সিঙ্গুর থানায় “সিংহল পাটন” নামে একটি গ্রাম আছে—ইহার সহিত মঙ্গলকাব্যের “সিংহল পাটনের” সংশ্রব থাকা অসম্ভব নয়। ঐরূপ থানাকুল থানায় “গুজ-রাট” নামে একটি গ্রাম আছে—ইহার আয়তন ৩৯৪ একর। ইহার সহিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত, কালকেতু-প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরীর কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

এই সব বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। হুগলীতে একটি “টিটাগড়” আছে—ইহার সহিত ২৪ পরগণার বিখ্যাত টিটাগড় শহরের নাম-সাদৃশ্য আছে। অত্যাশ্চর্য জেলায়ও কি টিটাগড় নামে কোনও গ্রাম বর্তমান? এই নাম-সাদৃশ্যের হেতু কি? এই সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-সম্পর্কে বহু অপ্রকাশিত তথ্য উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

টোল ও কোম্পানীর

দাঙ্গ ও কাউন্সেলর

কিউটা-টোল

পোড়া বেদনা ও চর্মরোগের জন্য

নিম্ন মলমল

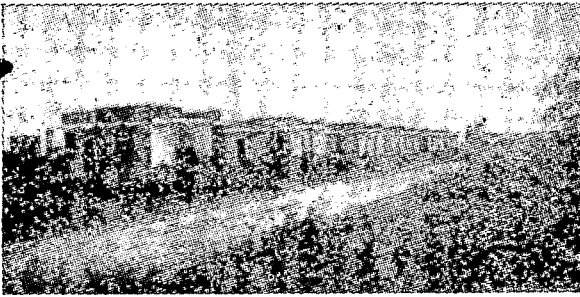
খোস পাঁচড়া ও চলকানীর জন্য






বনানগর কলিকাতা

প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ হয়। ১৯৫২ সালে তৃতীয় দফার কার্য জারিস্ত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুই শত চিকিৎসা জন রোগীর থাকিবার উপযোগী হাসপাতাল ভবনটি নির্মিত হইয়াছে। হাসপাতালে ১৬৫টি রোগী চিকিৎসাবীনে



বাঁকুড়া কুষ্ঠ হাসপাতালের সাধারণ দৃশ্য

আছে, তাহারা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজকর্ম করিতেছে। তাহাদের জন্য একটি 'রিক্রিয়েশন ক্লাব' ও পার্কাগার আছে। সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী এই হাসপাতালের 'বেডের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, ইহাতে বাঁকুড়ার কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে শতকরা ষাট জনের অবস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারে। এক হাজার বেডের মধ্যে বাঁকুড়ার অধিবাসীরা পাইবেন ছয় শত বেড। বাঁকুড়ার রোগীর সংখ্যা সাড়ে ছয় হাজার, এই স্বল্পসংখ্যক বেডের সাহায্যে সরকার কি ভাবে রোগ প্রতিরোধ করিত পারিবেন তাহা ভাবিবার বিষয়। গোঁরীপুরের চায় রাণীরাও প্রভৃতি জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে সরকার যদি এইরূপ আরও কয়েকটি হাসপাতাল নিৰ্মাণ করিয়া রোগী ভর্তি করেন, তবে বাঁকুড়া জেলার অধিবাসীদের কুষ্ঠরোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা হইবে।

বাঁকুড়া জনকল্যাণ সমিতির কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। টাকাকড়ি উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীশক্তিপদ বরাটের নিকট প্রেরিতব্য।

‘সন্ধ্যা’র বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৪শে আগষ্ট এলাহাবাদে সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা-সেবক শিবিরে ‘সন্ধ্যা’র বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন উত্তর প্রদেশের সূচনা (Information) বিভাগের মন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী। এই সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহের জন্ত ‘সন্ধ্যা’ নিখিল-ভারত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে।

১। ভারতের জাতীয় চেতনার অমূলক পদ্ধতিতে ও সমরোপযোগী সমস্ত দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্য তথা শিল্পকে উজ্জীবিত করা।

২। সাম্প্রদায়িক এবং শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের হিংসাত্মক বিশ্বাস হইতে সাহিত্য ও শিল্পকে বাঁচানো।

‘নানানা’র বই

প্রকাশিত হল

প্রতিভা বন্স নতুন উপগ্রাস

মনের ময়ূর

অনস্থায়ী আর বিনয়। সংবাদপত্রের আইন-আদালতের স্তম্ভে একদা বিলুপ্তি উঠেছিলো সতেরো আর চব্বিশ বছরের দুই বিজোহী যৌবন। তারপর কে কোথায় তলিয়ে গেল সংস্কারজীর্ণ সমাজের ফাটলে হতাশার হিমালয় বৃকে নিয়ে। জীবন-বিধাতার বিদ্রূপ কিনা কে জানে— বয়স-বদলানো সেই অনস্থায়ী ও বিনয়ের ভাঙা মনের দর্পণে অস্পষ্ট ইন্দ্রধনুর ছায়া যেন এক নতুন জিজ্ঞাসা; ‘মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে নাচাও কি?’ বর্ণাঢ্য অমৃভূতির উজ্জল অভিব্যক্তিতে, রুচি ও রচনার উৎকর্ষে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ লেখিকা উপগ্রাসের কাব্যমণ্ডিত কাহিনীটিকে এমন জায়গায় পৌছে দিলেন যেখানে ‘মনের ময়ূর’ নামটি স্বতঃই সার্থক।

মুদ্রণ-পারিপাট্য ও প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনায় অভিনব

৥ তিন টাকা ৥

বাঙলা সাহিত্যের গর্ব

অমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে

৥ সুনির্বাচিত গল্পসমূহের মনোজ্ঞ সংকলন ৥

৥ পঁচ. টাকা ৥



৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

৩। যে সকল লেখক এবং শিল্পীর মৌলিকত্ব আছে তাহাদের প্রচেষ্টাকে দেশ ও সর্বসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরা।

৪। সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের সমষ্টিগত চরিত্রের বিকাশ।

৫। রাষ্ট্র ও মানবতার জ্ঞান এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক পটভূমিকার সৃষ্টি।

৬। লেখক এবং শিল্পীদের মধ্যে জাতি ও সমাজগঠনমূলক কর্মের প্রেরণা সঞ্চার।

৭। জনসাধারণের মধ্যে সং সাহিত্যের প্রচার।

৮। তরুণ লেখক ও শিল্পীদের সম্ভবপর উপায়ে সাহায্য প্রদান করিয়া তাদের প্রতিভা-বিকাশের পথকে স্মৃগম করিয়া দেওয়া।

৯। লেখক ও শিল্পীদের স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের আর্থিক জীবনের মান উন্নত করা।

ভারতের সকল প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী লেখক ও শিল্পীদের পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের সাহায্যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য 'গত' এক বৎসর যাবৎ 'সন্ধ্যা' কাজ করিয়া আসিতেছে।

সম্মেলনে ভারতীয় কপিরাইট এক্টের সংশোধনের জ্ঞান দাবি উত্থাপন করা হয়। তাম্রলীল সাহিত্য ও ফিল্মের উপর হস্তক্ষেপ এবং বিকৃত সিনেমা-সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করার জ্ঞাত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

'সন্ধ্যা'র কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন জীরাজেশ্বরপ্রসাদ সিংহ, ক্রীসমর সোম ইহার কণ্ঠ-সচিব। আগামী ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে এক নিখিল-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্তও 'সন্ধ্যা'র বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে।

ধর্ম এবং বিশ্বমৈত্রী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং 'ফ্রেটারনিটি অব ফেথস অরগেনাইজেশনের' উজোগে গত ২৫শে আগষ্ট সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রার্থনাগৃহে এক আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়।

সরল হিসাব প্রণালী

অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

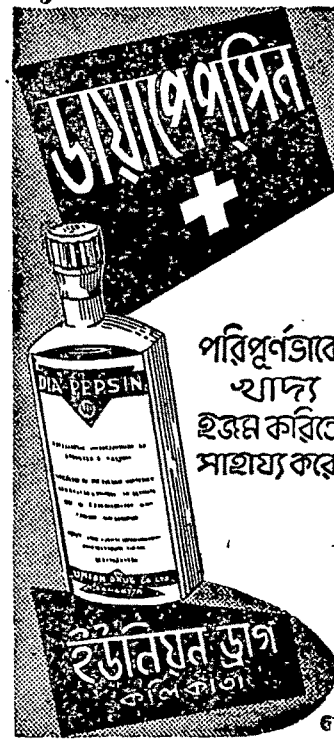
দ্বিগুণাত্মক প্রণালীতে (Double-entry) হিসাব-পদ্ধতি শিখিবার একমাত্র পুস্তক, শিক্ষকের বিনা সাহায্যে বুঝা যায়। ছাত্র ও ব্যবসায়ীর পক্ষে সমভাবে উপযোগী। ব্যাঙ্ক ও ঘোঁষ কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানা যায়। আই-কম পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরসহ মূল্য ৫০ টাকা।

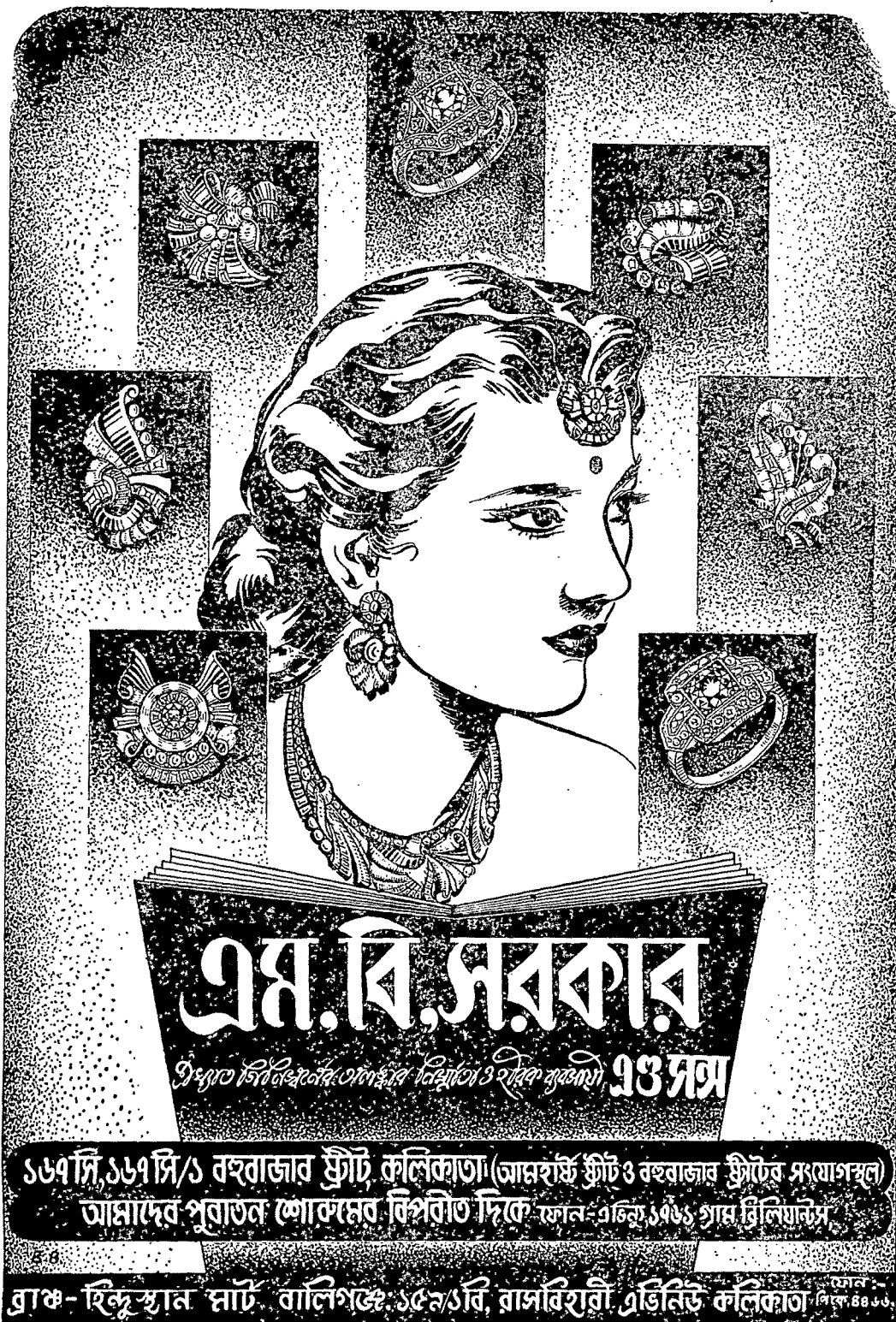
মডার্ন বুক এজেন্সি—কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর ক্রীশনকুমার মুখোপাধ্যায় এই অল্পটানে পৌরোহিত্য করেন।

আলোচনীর উদ্বোধন করিতে গিয়া ডক্টর জে. কেলাস বলেন, ধর্মকে মূল্য দিতে হইবে তাহার নিজের জন্তই—অন্য কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য নহে। বিশ্বমৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা আজিকার দিনে যত বেশী অনুভূত হইতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন কালে ততটা হয় নাই। কিন্তু এই ঐক্য মাহুঘের গড়া প্রতিষ্ঠান বা রাজ-নৈতিক কূটনীতি ইত্যাদি দ্বারা অর্জিত হইতে পারে না, কেবলমাত্র ভগবদ-বিশ্বাসের বলেই ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমরা, যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাহারা ছুইটি উপায়ে নাস্তিকতা ও সর্বগ্রাসিতার প্রতিরোধ করিতে পারি। একটি হইতেছে, মানুষকে সদভাবে জীবনযাপনের পন্থার নির্দেশ প্রদান এবং অপরটি তাহাকে এমন কিছু দেওয়া যাহা সে জীবন অপেক্ষাও শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে। সার সত্যের প্রতি বিশ্বাসের জন্য আমরা যদি আমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হই, কেবলমাত্র তাহা হইলেই যে সর্বনাশের মুখোমুখি আমরা দাঁড়াইয়া আছি তাহাকে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইতে পারে।

কাজী আবদুল ওহুদ বলেন, ধর্মের সার কথা ভগবানে আশ্রয়-সমর্পণ। অন্যান্য ঐহিক ব্যাপারাদির জন্য ইহার সঙ্গে কোন আপোষরকা হইতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীর প্রতি মৈত্রীভাব যেন





এম.বি.সরকার

শ্রীমত জিওর্জিনেট ওল্ডফার বিম্বাতি ও হীরক মুদ্রাশিল্পী ১৩ সন্ন্য

১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুতাজার স্ট্রীট, কলিকাতা (আমদারি স্ট্রীট ও বহুতাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল)
আমাদের পুরাতন শোভামের বিপরীত দিকে ফোন-এডিক ১৭৬১ গ্রাম টেলিফোন

ব্রাঞ্চ-হিল্লু স্ট্রাট স্মার্ট বালিগঞ্জ ১৫৯/১বি, রাসবিহারী এডিটিউ কলিকাতা ফোন-৮৪৩৬

আমাদিগকে উদ্ধৃত্ত করে। যাবতীয় প্রাণীর এই শুভকামনা! সকল ধর্ম্মেই অনুমত হয়। উপনিষদের ঋষিরা বলিয়াছিলেন—“শুভ্র বিধে অমৃতত্ব পূত্রাঃ।” কিন্তু আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস সত্ত্বেও আমরা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অনশনে রাখিয়া মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভোগ-সুখের ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার প্রতিকার করা আমাদের অবশ্য-কর্তব্য। অন্যথা মানবজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

রেভারেণ্ড শীলভদ্ৰ বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্বমৈত্রীর উপর জোর দিয়া বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মে স্বার্থপরতার স্থান নাই। বুদ্ধদেব সমগ্র মানব-জাতির প্রতি প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করেন। বর্তমান জগতে বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য যদি সক্রিয় হইয়া উঠে তাহা হইলে জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মিঃ এ. দিনশা বলেন, জরথুষ্ট্র এবং রামমোহন রায় এই দুই জনের প্রচারিত ধর্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। শুষ্ঠা যখন একজন তখন সকল মানুষই পরস্পরের ভ্রাতা। আমাদের জীবনে এবং আচরণে এই সত্যের উপলব্ধি দ্বারা কেবলমাত্র বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ডক্টর সরোজ দাস বলেন, এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সকলকে বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হইতে হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন, আমাদের ভগবদগীতায় ভগবান বলিয়াছেন—“সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মাংসং শরণং ব্রজ”—অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাতে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমাদের এই পৃথিবীতে অনেক ধর্ম্ম বিদ্যমান, সত্য কিন্তু এক। সত্যের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিয়া আমরা যদি ইহা উপলব্ধি করিতে পারি তাহা হইলে আর সবকিছুই ইহার অনুগামী হইবে এবং বিশ্ব-মৈত্রীর প্রতিষ্ঠাও বিলম্বিত হইবে না। শাস্ত্রীয় অনুশাসন, ধর্ম্মমত, “ইজম” ইত্যাদি পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টি করে। কিন্তু সত্য একের প্রতিষ্ঠা করে।

ডঃ মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে বলেন—গত মহাযুদ্ধ মানব সভ্যতার উপর যে প্রচণ্ড আঘাত হানে তাহার দরুন বিশ্বের রাষ্ট্র-সমূহের ঐক্যপ্রতিষ্ঠার আদর্শের জন্ম হয়। পারস্পরিক বুঝাপড়া, পারিপাশ্বক অবস্থার চাপ অথবা দৈবহর্ষিকপাক এবং বৃথা যুদ্ধ এই সকলের মধ্যে কোনটির প্রতিক্রিয়ায় এই ঐক্যবদ্ধ পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে, ভবিষ্যৎই তাহার বিচার করিবে, কিন্তু ইহার জন্ম অবশ্যস্তাবী বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। যুগে যুগে ধর্ম্ম মানবজাতির জন্য

আধ্যাত্মিকতার যে দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ব্যাটির জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র তাহারই আছে। ধর্ম্ম যেমন মানুষকে তাহার ব্যক্তিগত ‘অহং’ জয় করিতে সাহায্য করিয়াছে, তেমনি ধর্ম্মই মানুষের জাতিগত অহমিকা জয় করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে।

বি. এম. বসু

ভারত সরকারের উত্তর প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী-পরিষদের ‘ইন্সপেক্টর অফ ট্রেনিং’ বি. এম. বসু গত ২৬শে আগস্ট বিমানযোগে দিল্লী হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হইয়াছেন। কারিগরি (ভোকেশনাল) শিক্ষণপদ্ধতি সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভার্থ তিনি ভারত-গবর্ণমেন্ট কর্তৃক তথায় প্রেরিত হইয়াছেন।

বি. এম. বসু ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার খগেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি-ই (মেকানিক্যাল) উপাধি লাভ করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি একজন কৃতী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন।

বর্তমান কক্ষে নিযুক্ত হইবার পূর্বে বসু মহাশয় বাংলাদেশে অর্ড্য়ান্স ক্যাক্টরিতে কাজ করিতেন। সেখানে কারিগর এবং শিল্পীদের তত্ত্বাবধায়কদের শিক্ষাদানে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাহার প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই আজ সারা ভারতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অর্ড্য়ান্স ক্যাক্টরিতে (আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের কারখানা) দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত আছেন। কারিগরদের (টেকনিসিয়ান) শিক্ষাদান বিষয়ে বসু মহাশয়ের বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি এ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করিবার সুযোগ লাভ করিবেন।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ “ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমিরোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন-স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়, “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ভাঃ মাঃ সহ—২০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—সাউথ ৮৮১



অমৃততাঞ্জন
সর্বপ্রকার বেদনায় জাগতিক রোগের ন্যায় কার্যকরী।

দাদের মলম
চক্ষু রোগে ‘পরমাণু শক্তির’ ন্যায় কার্যকরী।
অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭





রূপরচনার রুচিরাগ...

রূপের কলিকে সৌন্দর্য্যকুসুম বিকশিত করে তোলাই এই প্রসাধনীর সাধনা। রূপসাধক-সাধিকাদের নিকট তাই চিরকাম্য এই সৌন্দর্য্যের স্বরম্যাসম্ভার

ক্যালকেষিকোর

মার্গো সোপ
নিম্ন টুথ পেণ্ট

ডুঙ্গল সর্বোৎকৃষ্ট মধুসূর্য্য
কেশ তিল

লারনি স্নো ও ক্রীম

কাস্তা মলোমদ গন্ধসার



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং. লিঃ কলিকাতা

ফে.থ্যেজ হাওস্‌রাজ তেল

চুল উঠা বন্ধ করে
মাথা ঠাণ্ডা রাখে



কী দেখে কিনুন • নকল থেকে সাবধান



পুস্তক পরিচয়

পূর্বকুস্ত—শ্রীরাণী চন্দ। বিখ্যাত গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

শ্রেষ্ঠ কলাবৎ তানপুরার তারের স্বর বাঁধিয়া রাগের আলাপ আরম্ভ করিবামাত্র যেমন রসজ্ঞ শ্রোতার মনে খুশীর আমেজ লাগে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেও তেমনি স্বরভেদেই 'সাধা' হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। "পূর্বকুস্ত" ঠিক সেই ধরণের একখানি বই যা একেবারে স্বর হইতেই পাঠকের মনে চমক লাগাইয়া দেয়। প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই 'শিমুল ফুলের ভিতরে বাট-ভরা মধুর' স্নায়ু ইহার প্রতিটি ছত্র যেন রসে একেবারে টসটস করিতেছে এবং আশ্চর্য্য এই যে, এই অনাবিল রস পুস্তকখানির একেবারে শেষ পর্যন্ত অক্ষুর রহিয়াছে—কোথাও রসভাস ঘটে নাই।

আত্মীয়দের সঙ্গে লেখিকা চলিয়াছেন হরিবারে অমৃতকুণ্ডে—তীর্থের প্রতি দূর্নিবার সে আকর্ষণ, কিন্তু পিছন হইতে ঘরের মায়া তাঁহার মনকে শতপাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। তীর্থযাত্রার প্রাকালে দেখিয়া আসিয়াছেন—বসন্তের ছোয়ায় আভিনায় সবে স্বর হইয়াছে শিমুল পলাশ ফোটার পাল—অন্তরের অন্তঃপুরে চলিতেছে স্মৃতির রোমন্থন। আর তাঁর নিপুণ তুলিকায় বসন্তের পুষ্পসস্তারসমূহ গৃহ-প্রান্তরের কি অপরূপ স্মৃতি-চিত্রই না ফুটিয়া উঠিয়াছে!

রূপশৃঙ্গির আনন্দে কথার সাহায্যে ছরির পর ছবি আঁকিয়া লেখিকা এই ভ্রমণ-কাহিনীতে। আশ্চর্য্য তাঁহার দেখিবার চোখ। দৃষ্টই, পারিপার্শ্বিক কোনো ঘটনাই—আপাতদৃষ্টিতে তা যতই তুচ্ছ ও বلیয়া প্রতীয়মান হোক না কেন—তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় অপূর্ব্ব তাঁহার মাত্রাজ্ঞান। এক-একটি নৈসর্গিক ঋণুদৃশ্যের বর্ণনা তুলির নিপুণ টানে স্বতন্ত্রকর্তৃত্ব ভাবে ফুটিয়া-উঠা এক-একটি নিরূপিত ছবি। কোথাও রেখার বাছল্য নাই, রঙের জলসে চোখে ধাঁধা প্রয়াস নাই—রঙে রেখায় যতটুকু প্রকাশিত, ব্যঞ্জনা তাঁহার বেশী।

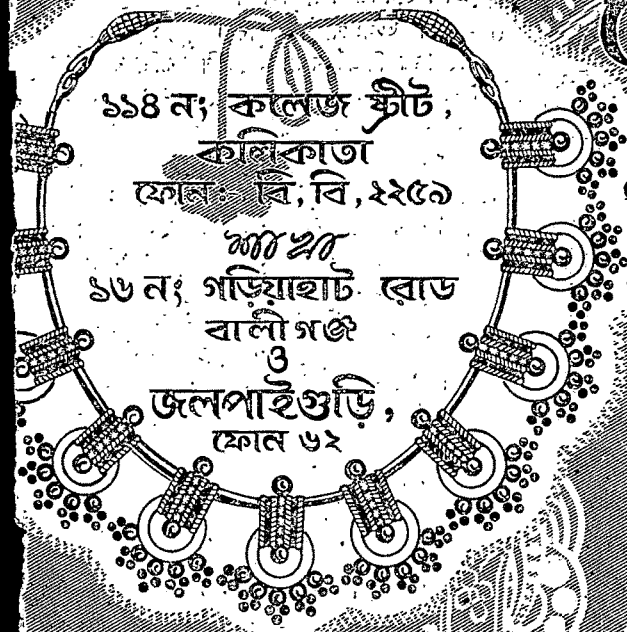
কি সে যাহা লেখিকার ভাষা ও বর্ণনাতন্ত্রীর মধ্যে বাহা আয় মাখাইয়া দেয় মায়া-অঞ্জন। তাঁহার প্রভাবে তাঁহার চোখ দেখি তাহাই ভালো লাগে, কোথা হইতে অদৃষ্টতির একটা অজানা আসিয়া পড়িয়া সবকিছুকে যেন এক দিব্য-বিভাষ উদ্ভাসিত করিতে তোলে। বর্ণনাগুণে আমাদের মনে শুধু আবেগই নয়, সঞ্চারিত হয়। আমরাও যেন এই পৃথিবীখানির সঙ্গে সঙ্গে হরিবারে—পূতললিলা গঙ্গাতীরে। তাঁদের সঙ্গে কি এক অপূর্ণ সম্পদের আশায় বিচরণ করি তপোভূমির মন্দিরে মন্দিরে, সপ্ত

নাটক	উপন্যাস	বিবিধ গ্রন্থ	কান্য-গ্রন্থ
কীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ	ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী	কবি সত্যেন্দ্রনাথ
রঘুবীর ২১০	সতী ২১০ লক্ষ্মীছাড়া ২১	বৌগিক ব্যায়াম (আসন) ২০	কুহ ও কেক
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী	লুপ্তশিখা ২১ ভাবিজ ২১	যোগবলে রোগ-আরোগ্য	অভ্রআবীর
পথের সাথী ২১	চরণদাস ঘোষ	—পাঁচ টাকা—	তীর্থ-সলিল
পরিণীতা ২১০	তেপান্তর ২১	ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন ২১	বেণু ও বীণা
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রফুল্লকুমার সরকার	স্বামী ভূমানন্দ	মণি-মঞ্জুষা
অন্ধভেজ ২১	বালির বাঁধ ২১	স্বামী সারদানন্দ ৩১	বেলাচন্দ্রের
কেলোর কীর্তি ২১	দীনেন্দ্রকুমার রায়	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	বিদায় আর
উপেক্ষিতা ২১০	রহস্তের খাসমহল ৩১০	রাফস থোফস ৫০/০	তীর্থরেণু
শঙ্খধ্বনি ২১০	নাট্যের মহাশয় ২১০	ভূত পেঙ্গু ৫০	তুলির লিখন
কৃতান্তের বঙ্গদর্শন ১১	দিলীপকুমার রায়	ছেলে ও ছবি ৫০	
শিবপ্রসাদ কর	নানাকুপী ১১		
স্বর্ণলক্ষা ২১	অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	অতঃ গুপ্ত	— ভ্রমণ
নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	পৃথিবীর প্রেম ২১০	রোমাঞ্চকর উপন্যাস	প্রমোদকুমার চ
অভিষেক ২১	জগদীশ গুপ্ত	ভয়ঙ্কর তুন্দরবন ১১০	নতন সংস
জলধর চট্টোপাধ্যায়	অসামু সিদ্ধার্থ ২১	রেসিটেশনের বই	হিমালয়
সত্যের সন্ধান ২১	রূপের বাহিরে ২১	আরম্ভ-ধারা ১১০	কেলাস ও মান
রাঙারাত্তি ২১			— মাত
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য			
আগামী কাল ২১০			
আশুতোষ সাহা			
বন্ধিনী ২১০			

আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স—২০৪নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ঘোষ ব্রাদার্স

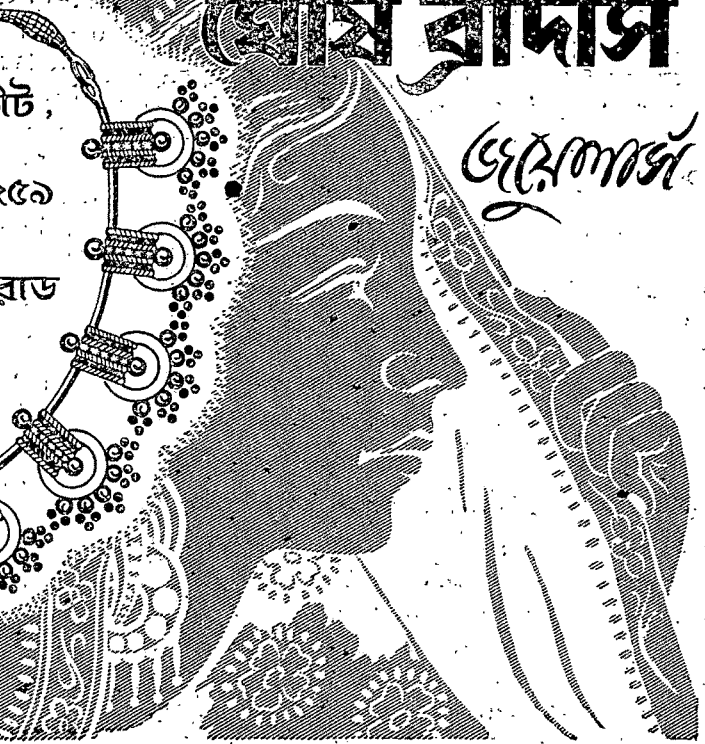
ফেব্রুয়ারী



১১৪ নং কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ১২৫০

১৬ নং গড়িয়াহাট রোড
বালীগঞ্জ

জেলপাইগুড়ি,
ফোন ৬২



ঋষি দাসের	
র নিউটন	১১০
র আইনস্টাইন	১১০
র মার্কস	১১০
ঋতিনাথ চক্রবর্তীর	
সমগ্ন	১
যোগেশচন্দ্র বাগলের	
র যুক্তি-সম্বাদী	২১০
র সাধনা	১১০
রবীন্দ্রকুমার বসুর	
গ্রাম	৪৮০
আলোক গান্ধীজি	১১০
স্ববোধচন্দ্র রায়ের	
সাধনা	১১০
রতন গঙ্গোপাধ্যায়ের	
পথে হায়দরাবাদ	১১০
গিরীন চক্রবর্তীর	
দেশের লেখা	৩

ছোটদের অগ্রতম
মাসিক পত্রিকা

চয়নিকা

বৈশাখ হইতে গ্রাহক	
হইতে হয়	
নমুনার জন্ম	
চারি আনার	
ডাক-টিকিট	
নাগে	
বার্ষিক ৩	
বৈচিত্র্যভরা	
রচনায়	
সমৃদ্ধ ও	
জ্ঞান-বিজ্ঞানের	
বস্তুধনি	

ভূতনাথ ভৌমিকের	
ভোমিনিয়ন ভারতের পথরেখা	২
সন্তোষকুমার ঘোষ	১১০
রূপকথার রাজ্য	১১০
খগেন্দ্রনাথ মিত্রের	
গোর্কীর ছেলেবেলা	১১০
মাধুসেনের অ্যাডভেঞ্চার	৮০
সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী প্রত্যেকটি	১০
(১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ)	
নির্মলকুমার বসুর	
আরব্য উপন্যাস	২
কালীকঙ্কর ভট্টাচার্যের	
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২
রবীন্দ্রলাল রায়ের	
বলিত হাসব না	৮০
নলিনীকুমার ভট্টের	
আসামের অরণ্যচারী	১১০
গদাধর নিয়োগীর	
গল্প-বীথিকা	১৮০
H. Barik's	
Ready Reckoner	৩
Pay, Wages, Income tables	২

ভারতী বক স্টল : ১১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-১

অনতিদূরবর্তী হুগলদেবের আশ্রমে বসিয়া এই মহাপুরুষের প্রমুখ্যে শ্রবণ করি সরল বিশ্বাসের মাহাত্ম্য-কথা, অগণিত তীর্থযাত্রীর ভিড়ে এককণ্ঠের, তাঁরে বসিয়া স্বানার্থী সাধুদের শোভাযাত্রার সমারোহ অরলোকন করিয়া অভিভূত হই নির্বাক বিশ্ময়ে। তারপর বৃন্দাবনে গিয়া হোলি উৎসবে লালে লাল 'এজ রজঃ' সর্বদঙ্গে মাখিয়া হই পুলকিত। অবশেষে মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী, বিজ্ঞাচল প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রের তীর্থযাত্রীতে হৃদয়ের পাঁচ পূর্ণ করিয়া গৃহ প্রত্যাবর্ত হই।

এই ভ্রমণ-কাহিনী আমাদিগকে যে রহস্যময় জগতের দ্বারদেশে লইয়া যায় তাহার পরিবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেখানে পৌছিয়া মনে হয়, ভারতের তীর্থ-মন্দিরে, পুণ্যসলিলা গঙ্গা-অলকানন্দার তীরে তীরে অগণিত সাধু-সন্ন্যাসীর ভগ্নশাস্ত্রে হিন্দুজাতির অধ্যাত্মসত্তার যে বহুবিচিত্র বিকাশ, কেবলমাত্র ভক্ত বিশ্বাসী-হিন্দুর দৃষ্টিতেই তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধ হইতে পারে। কুন্তলো উপলক্ষে হরিদ্বার এবং বৃন্দাবনে সমাগত লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসীর কঠোর তপশ্চর্যা দেখিয়া লেখিকার মত আমাদের মনেও এই কৃচ্ছসাধনের সার্থকতা কি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু লেখিকার সহযাত্রী ভক্তিমতী 'বুদ্ধি'র সেই সরল বিশ্বাস—যার প্রসাদে ভিত্তে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্নত্বের সর্ব-সংশয়ঃ, তাহা আমাদের অন্তরেও সঞ্চারিত হইয়া সকল সংশয়ের নিরাসন করে।

লেখিকা প্রসঙ্গক্রমে পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, ভোলানন্দ-গিরি, ভাস্করানন্দ, হৈলঙ্গস্বামী প্রমুখ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলিও মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। এই অপূর্ণ গ্রন্থপাঠে একদিকে যেমন পাঠকের রসপিপাসা চরিতার্থ হয়, অতীতকে তেমনি ইহা তাহার মনকে লইয়া যায় এক উন্নততর স্তরে, অধ্যাত্ম-জীবনের জন্ত তাহার মনে এক অনির্দেশ্য ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়। অল্পভূতির গভীরতা, দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবতা, প্রকাশের স্বচ্ছতা—এই সমস্ত গুণের সমন্বয়ে পুণিক্ত বাংলা-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে।

মুক্তিপথের গান—শ্রীঅমরকুমার দত্ত, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত 'কবিতাসমষ্টি' লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন—“ভারতের এই বিরাট জাতীয় জীবন সময়ে সময়ে যে আলোড়ন এনেছে ভারতবাসীর মনে তারই একটি অকিঞ্চিৎকর ছবি আমার এই “মুক্তি-পথের গান”। এই বইয়ের কবিতাগুলি তিনটি ভাগে বিভক্তঃ—মুক্তিপথের গান, অভিযান, অগ্রগামী। ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের ঝাঁপ স্বত্বিক সেই বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের উদ্দেশে রচিত কবিতাগুলি আছে প্রথম ভাগে। “অভিযান” অংশে, সন্ন্যাসীবিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি-প্রাণ, পর্যন্ত যে সকল মুক্তি-আন্দোলন দেশের বুকে মাড়া জাগাইয়াছে তৎসম্বন্ধে রচিত কবিতাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় অংশে হুদিরাম, যতীন দাস, নেতাজী সুভাষ প্রমুখ দেশের অগ্রগামী বীর সন্তানদের স্মরণে লিখিত কবিতাবলী স্থান পাইয়াছে।

একটা তেজোদগ্ধ পৌরুষের সুর এই বইয়ের কবিতাগুলির মধ্যে অনু-রূপিত। ভাবের গাভীরা, হৃদয়বিচলিত শব্দচয়ন এবং ছন্দোবৈচিত্র্যে অনবদ্য কবিতাগুলি পাঠ করিলে মনে একটা অপূর্ণ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। বর্তমানের খণ্ডিত আশাহত বাংলার ঘর ঘর সঙ্কীর্ণনী মনোবিধায়ক এই সকল কবিতা পঠিত হওয়া আবশ্যক। কবিতাগুলি গীতিধর্মী, সুর-তান-লয়ে গীত হইলে এগুলির প্রভাব অধিকতর কার্যকরী হইবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ভাগ্যহীনের বিধিলিপি—শ্রীপ্রমদারঞ্জন সেনগুপ্ত।
মুত্তিমন্দির। ৩৮নং যোগীনগর, ঢাকা। মূল্য ১২ মাত্র।

গ্রন্থকারের নিজের কথায় গ্রন্থখানি “ব্যথিতের শ্রলোপ ও উচ্ছাসমাত্র।” পরলোকগত পুত্রের স্মৃতি এবং শোকসন্তপ্ত ম-চিহ্ন। কয়েকটি প্রবন্ধ-আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিপ্রতীপ—শ্রীঅবিনাশ রায় ও আর এক জন। এ. সি কোম্পানি, ৩২-৪ বীডন স্ট্রিট, কলিকাতা ৬। মূল্য ১০।

আধুনিক কবিতার বই। সম্পূর্ণ খেয়ালের খেলা। ভূমিকায় বলিয়াছেনঃ “আমরা কবি নই, তবে কবিতা পড়ে থাকি। কবিতা—এ যুগের চাঁদ,” আরম্ভঃ

“বলি কানে কানে আসে

এ যুগের চাঁদ কাণ্ডে।”

কবিতার নাম ‘?’।

আশা করি, ইহা হইতেই লেখকদ্বয়ের [সত্যই কি দুই খেয়ালীপনার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। অন্ততঃ ছাপার ভাঁহাদের সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

নবদীপন—নিশিকান্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, মূল্য ২৫।

কাব্যরসিক বাঙালী-মাত্রেই নিকট নিশিকান্তের কবিতা চিত। ভাবের গভীরতা এবং ভাষার পূর্ণতা তাহার পরিণত কবিতা নিদর্শন। শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রাণ উপলক্ষে রচিত এই ত্রিশটি যে পবিত্র ভাবদীপ্ত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা পাঠকগণের হৃদয়ে

শ্রীঅরবিন্দের

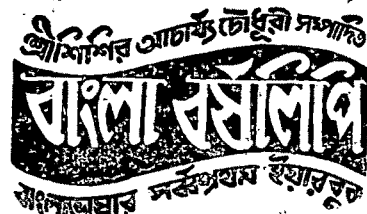
বিপ্লব যুগের কার্যাবলী

(যাহা অপ্রকাশিত ছিল)

চারুচন্দ্র দত্ত কর্তৃক রচিত

পুরানো কথা--উপসংহ

মূল্য তিন টাকা মাত্র



নবম বর্ষ—মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

— সংস্কৃতি বৈঠক —

১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা—২৪

= বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ রচনা =

অরুণাশঙ্কর রায়
২১০ বিহুর বই ২১
যেথা দেশ ৪১০
আমরা ১০
জীবন শিল্পী ১০
মর্তের স্বর্গ ৪১০
জীবন কাটি ১০
পাকালপাত্র ১০
মন পবন ২১
মন ছালা ২১ প্রত্যয় ১১০
তির পরিহাস ২১
নূতন রাধা ২১০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
আবতী পথে ৩১০
তিকথা (চার খণ্ড প্রত্যেক) ৩১০
নালী রং ৪১০ নাস্তিক ৩১
ভিজ্ঞান ৫১ অন্তরাগ ৪১০
মহী ভার্যা ৩১০ যৌতুক ৩১০
অমল ৩১০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপ্ন ২১০ মহানন্দা ৩১০
মন্ত্রমুখর ২১
ট ও শ্রেষ্ঠী (২য় সং) ২১০
তুপাটক রামনাথ বিশ্বাস
জাতির নুতন জীবন ২১০

সমরেশ বসু
পুরের মাটি ৩১০
ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য
ক্ষণ ৪১ দুই নৌকা ৩১০
৩১০ যুক্তধারা ৪১০
৩১ পদব্রজ ৪১
মী চাঁদ ২১০
৩ সাগর ২১০
পেপের রানী ৩১০

তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নাগিনী কন্যার কাহিনী (২য় সং) ৪১
অর্ঘ্য ৪১০ মাটি ২১

বুদ্ধদেব বসু
মৌলিনাথ ৩১০
নির্জন আফর ৩১
এরা ওরা আরো অনেকে ৪১
কানো হাওয়া ৫১ বন্দীর বন্দনা ২১০
পারিবারিক ৩১০ রূপালি পাখি ১১০

যবনিকা গতন ৪১
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কল্লোল সুগ ৫১
পাখনা ২১০ কালোরক্ত ২১০
যায় যদি যাক ৩১০
বিষাটের চেয়ে বড় ৪১০

বনফুল
তরী ৪১ কষ্টিপাথর ২১০
ডানা ১ম খণ্ড ৩১০ ২য় খণ্ড ৪১০
ক্রীমধূসূদন ৩১ বিজ্ঞাসাগর ৩১
নবদিগন্ত ৫১০ নিমেষ ৪১০
চতুর্দশী ৫১০ মধ্যবিন্দু ১১

মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রাগিনী ৪১

গোপাল হালদার
ভূমিকা ৩১০

যোগেশ চৌধুরী
দ্বিধিজয়ী ২১০ মাকড়সার জাল ২১০
অনিল ও বিধায়ক ভট্টাচার্য
সেই তিমিরে ২১
বিধায়ক ভট্টাচার্য
মাটির ঘর ২১
বিশ বছর আগে ২১

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম
হাফিজ ২১০ বুলবুল (২য় সং) ২১
কুহেলিকা ৩১ সঞ্চিতা ৫১
বাঁধনহার ৩১ মৃত্যুক্ষুধা ৩১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সার্বজনীন ৩১০ পেশা ৩১
অহিংসা ৩১০ চতুর্ভুজ ৩১০
সহরবাসের ইতিকথা ২১

স্ববোধ ঘোষ
ত্রিশমা ৬১ শতভিষা ২১
কল্পলতিকা ৩১

ভবানী মুখোপাধ্যায়
বিপ্লব-যৌবন (২য় সং) ৫১

অমরেন্দ্র ঘোষ
একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী
দায়-২১০

নবেদু ঘোষ
আজব নগরের কাহিনী ৬১
বসন্ত বাহার ৩১০
ফিরাস লেন ২১০
নাগরক ও লেখক ২১০

ইসাদোরা ডানকান
আমার জীবন ২১০

মনীন্দ্রলাল বসু
রমলা ৪১ সহযাত্রী ৪১
জীবনানন্দ ৪১০

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
বুড়ুক্ষা ৪১

নীহারবরুণ গুপ্ত
বৌরানীর বিল ৪১
রাহুল্লাস ১ম ৩১, ২য় ২১, ৩য় ৩১
কালোছায়া ১ম ২১০, ২য় ২১০,
৩য় ২১০, ৪র্থ ৩১
দুঃস্বপ্ন ৩১০
অভিশপ্ত পুঁথি ১ম ২১০, ২য় ৪১

আলোক বিকীর্ণ করিবে। প্রতি কবিতার শেখাংশে বাজিয়াছে একটি মন্ত্রের সুর : “শ্রী অরবিন্দ বিবহান্

নবকল্পের জগদগুরু
আরম্ভে তব বিভা আবিস্কৃত
আবরণে নব দীপন সুর।”

ভজনমালা (স্বরলিপিসংগ্রহ)—কুমারী শ্রীবিজন ঘোষ দস্তিদার, সঙ্গীত বিদ্যালঙ্কার। ৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ১২। মূল্য ২৫।

স্বরলিপিসংগ্রহ ১৬টি ভজনগানের সংকলন। যিনি সংকলন করিয়াছেন, সঙ্গায়িকা এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞা বলিয়া কেবল বাংলাদেশে নহে, বাংলার বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি আছে। এই স্বরলিপি-পুস্তকখানি সঙ্গীত-চর্চাকারী এবং ভজন-অনুরাগীদের সমাদর লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাত্মাজীর প্রিয় বিখ্যাত ‘রামধন’ ও এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাত্যহিক—শ্রীভারতপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। কমলা বুক ডিপো, ১৫ বঙ্কিম চার্টার্ড স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ২।

নূতনত্বের মোহে বিভ্রান্ত না হইয়া এই নবীন কবি কাব্যের স্রষ্টাশক্ত সনাতন পথেই যাত্রা করিয়াছেন। পরিচ্ছন্ন ভাষায় ও মনোরম ছন্দে অনায়াসে ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে, এই কাব্যগ্রন্থখানিতে তাঁহার পরিচয় পাইয়া তৃপ্তিবোধ করিলাম।

পূজার ছুটিতে রাজগীর বেড়াতে যাচ্ছেন ?

ডক্টর শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন প্রণীত

রাজগৃহ ও নালন্দা

(সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত বহু চিত্র ও মানচিত্র সম্বলিত)

পুস্তকখানি সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। মূল্য ১৬০

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন—“রাজগৃহ ও নালন্দার সম্বন্ধে বাঙ্গালী পর্যটকদের যথেষ্ট কৌতুহল আছে, কিন্তু উভয়ের সম্বন্ধে প্রামাণিক অথচ অল্প মূল্যের কোনও বই নাই। ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেনের বইখানি সেই দিক দিয়া খুবই উপযোগী হইয়াছে। বাজিগণের পক্ষে কোথায় থাকা হবিধা, সমগ্র রাজগৃহের পরিভ্রমণ কেমনভাবে করিলে সবই দেখা যায়, অথচ অকারণ শক্তির অপচয় করিতে হয় না, তাহার বিস্তারিত ব্যবস্থা পুস্তকখানির মধ্যে পাঠক সহজে লাভ করিবেন।”

এই লেখকেরই প্রণীত

“অশোক লিপি”

অশোকের শিলালিপি সম্বন্ধে প্রমাণ ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বলিত পুস্তক। অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে।

প্রাপ্তিস্থান :

ভারত বিদ্যাবিহার—২১নং বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলিঃ—৪
কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাবেন।

রাজগীর জাপান মন্দিরেও এ বই কিনতে পাবেন।

মেঘে ঢাকা চাঁদ—শ্রীমতী মিনতি নাথ। দাশগুপ্ত কোম্পানি লিমিটেড। ৫৪৩, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ২১০

বালিকার লেখা কবিতার বই—সে দিক দিয়া আশাশ্রয়। ভাষা ও উপর লেখিকার দখল আছে। তাঁহার রচনা যে উত্তরোত্তর রূপে রসে হইয়া উঠিবে, তাহার প্রতিশ্রুতি এই কবিতাগুলির মধ্যে আছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাধা-মদনমোহন—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। আর, কে, লিংশ কোম্পানী, ১১এ, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা। মূল্য ৮।

মানুষের মনোভূমিতে দেবতার বাস; হৃদয় মানুষের দৈনন্দিন মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অস্বীকার করার উপায় নাই। পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির কাহিনীগুলিতে মানুষ এবং দেবতা এক হইয়া রহিয়া স্বর্গ ও মর্ত্যের ব্যবধান—তাঁহাদের প্রীতি প্রেম সখা বাৎসল্যের প্রবাহ মুছিয়া গিয়াছে। পুত্র, পিতা, সখা, প্রভৃ কিংবা প্রেমাস্পদ প্রভৃতি রূপে এই দেবতা আমাদের জীবনের বৃত্তিগুলিকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন—আপন জনের মত তাঁহাকে লইয়া হাসি অশ্রু আনন্দ বেদনা মি আমরা গল্প রচনা করিয়াছি অনেক। বাগবাজারের মদনমোহনকে বাংলায় তেমনই এক হৃদয় প্রেমভক্তিশূলক কাহিনী প্রচলিত আছে।

পূর্বের রাজবংশ আর বাগবাজারের গোকুল মিত্র এই কাহিনীর সঙ্গে প্রোথ ভাবে জড়িত। এই মদনমোহন দাঁলের কুটার হইতে আশীষ রাজার প্রাসাদে, আবার রাজহর্য হইতে গিয়াছেন ভক্তের তরুণ কাহার ‘কিছু’ হারাইলেই যে মদনমোহন পলাইয়া যান—বহুপ্রচলিত প্রবাদটি ছেলেদের মুখে মুখে বহুকাল হইতেই ফিরিতেছে। সে ‘কিছু’ ছাড়া যে অস্ত্র বস্তু নহে—মদনমোহনের লীলা-কাহিনীতে তাহাই হইয়াছে। লেখক ঠাকুরের সেবায়ত্ত বংশের অন্ততম। এই লিখিবার অধিকার তাঁহার আছে এবং লেখনীমুখে সেই যোগ্যতার প্রবল তিনি রাখিয়া দিয়াছেন। তথাপি এই ভক্তি-উপচারে যে সামান্য রহিয়া গিয়াছে তাহা ভক্ত-মনকে পীড়িত করে—এবং এই সম্বন্ধে প্রশ্নও মনে জাগে। পুস্তকের জন্ত অপেক্ষাকৃত ভাল কাগজ সংকট ছিল কি? মদনমোহন বিগ্রহের আলোকচিত্র তোলা বা অচিত্র অঙ্কন করা নিষিদ্ধ কিনা? তৎপরিবর্তে আধুনিক সম্ভায় সচিত্রের কয়েকখানি ছবি দিবার সার্থকতা কি? ইহাতে বস্তুকে উপ উপকরণকে প্রচার করার অশোভন ব্যগ্রতাই দেখা যায়।

**প্রবীণ আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সং**

মূল্য ১৬০

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের

অনন্তের সুরে—৩

(ট্রাইনের অল্পবাদ)

আনন্দবাজার—“পুস্তকখানি বিশ্বের সম্পদ...
যে কোন চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ হইতেও মধুর ও আকর্ষণীয়

এশিয়া পাব্লিশার্স—১৫৮বি, লিটল স্ট্রিট, কলিকাতা

ইকিটস্ : সেন রায় কোং—কলেজ স্কোয়ার
অগ্রাগ্র পুস্তকালয়।

নদী ও নারী—হুমায়ুন কবীর। ওরিয়েন্ট লংম্যানস লিমিটেড, ব্রিঙ্গন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩। মূল্য ৪৫০ টাকা।

লাচা উপত্যাস্থানির নাম হইতেই বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। গ্রীষ্মে নতুন চরে নতুন মানুষেরা আসিয়া ঘর বাঁধে। চাষের জমি বাড়ে, সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠে। আসে নারী—সমাজ গড়িয়া উঠে। এক নারী অল্প কূল ভরিয়া নদী যেমন বহিয়া যায়, নারী তেমনি সংসারের মুহুরি দেয়—অল্প কূলকে করিয়া তুলে সমুদ্র। নতুন চরের বন মাটি তৈয়ার করিয়া তাহাতে সোনা ফলাইয়া যে ছ'জন মানুষ একদিন শান্তির সঙ্গে শান্তিতে দিন যাপন করিয়াছে, পরে তাহারাই পরস্পরের ক্রতে রূপান্তরিত হইয়াছে। নদীর রহস্য যেমন সর্বনাশ ও সমৃদ্ধির লেখা থাকে, এই দুটি মানুষের বিবেকের মধ্যে তেমনি আছে এক লিলাবাস। এই ভালবাসা একটি জীবনকে জ্বলাইয়া আর একটি গাম শত্রু-সমারোহে সার্থক হইয়াছে।

এই কাহিনী সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষদের—মাদারের জীবিকা চাধ-মাদারের পৃথিবী একটি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহার পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষী। ইহাদের হৃৎ-ছঃখের সঙ্গে পরিচয় থাকায় যে ছবি লেখক আঁকিয়াছেন তাহা জীবন্ত হইয়াছে। সেই সঙ্গে জীবন্ত সর্বনাশী পদ্মা। নিম্নবিত্ত মুসলমান-সমাজের রীতিনীতি গল্পটিকে গূর্ণ দিয়াছে। ঘটনাপরম্পরা কোঁতুলকের হস্ত ধরিয়া যে চরম ত পৌঁছিয়াছে তাহা অত্যন্ত করুণ। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য কোঁশলে চমৎকারিত্ব আছে। মাত্র একটি বিষয়ের অনবধানতা সম্পূর্ণ বাস্তব-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। গল্পের চরিত্রগুলি সংলাপে সে গুণের সীমা লঙ্ঘিত হইয়াছে। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের

মুখে কেতা-দ্রুত বুলি কেমন যেন বেমানান লাগে। এই ক্রটিটুকু না থাকিলে 'নদী ও নারী' নিম্নবিত্ত সমাজের নিখুঁত আলেখ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। প্রচ্ছদপট চমৎকার।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ধর্মতত্ত্বের অর্থনীতি বা সামাজিক স্বাক্ষরিকা—

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, হারিসন রোড, কলিকাতা—৯। পৃষ্ঠা ১১৪, মূল্য ২/-।

এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য—'সনাতনী মূল্যতত্ত্বের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে নতুন সামগ্রিক অর্থনীতির স্থূল কাঠামোকে বিরূত (ব্যাক্ত) করা।' নিম্নলিখিত আটটি অধ্যায়ে বা প্রস্তাবে এই জটিল বিষয়টি ব্যাখ্যাত হইয়াছে: সমাজের বাস্তব (আর্থিক) রূপ; আয়ের ত্রিবেণীধারা (খাজনা, মজুরী এবং হুদ); সমাজের ব্যয় বা আয়ের ব্যবহার; সরকার ও সামাজিক আয়-ব্যয়; বাজার ও মূল্যক্রম; অর্থ, আয় ও মূল্যক্রম; বহির্বাণিজ্য ও সামগ্রিক আয় এবং স্বক্ৰিয় ও রাষ্ট্রশাসন।

ধনোৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার দরুন সমাজের ঐহিক বা আর্থিক কল্যাণ বর্তমানকালে নানা জটিলতায় আচ্ছন্ন, অথচ ক্রমেই জনসাধারণকে—শিক্ষিতের ত কথাই নাই—মিতান্ত জীবনধারণের প্রয়োজনে এই সকল তত্ত্বে ওয়াকি-বহাল হইতে হইতেছে! বর্তমান গ্রন্থে লেখক ইংরেজী শব্দের ব্যবহার প্রায় না করিয়াই অর্থতত্ত্বের জটিল বিষয়টি যেরূপ সরল ভাষায় পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন তজ্জন্ম তিনি কৃতজ্ঞতা দাবি করিতে পারেন। অর্থনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে লেখকের এই গ্রন্থ যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

STEEL and STAG

by

VLADIMIR POPOV

Rs. 1-14

(STALIN Prize Winner in 1948. The novel in conveying the poetry of industrial labour and the pride of the Soviet worker for peaceful reconstruction.)

For all other
SOVIET PUBLICATIONS

Please write to

CURRENT BOOK DISTRIBUTORS

3/2, MADAN STREET, CALCUTTA-13

স্বকিত্ত্বের চিত্র ও ছবিটি পরিসংখ্যান পুস্তকের বক্তব্যের বোধগম্যতার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পদ্যচণ্ডী (দুর্গায়ণ) — শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যাতীথ। ১৩৪৫

এবং হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে শ্রীসমরকুমার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮/১৮৭ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অন্ততম শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। ইহার সহজ সাবলীল ছন্দ এবং সরল মধুর সংস্কৃত ভাষার স্বাক্ষর সকলকেই উচ্চ ভাবে আকর্ষণ করিয়া তুলে। এহেন মাধুর্যের খনিকে রায়গুণাকরাদি অমর কবিগণ স্থললিত বাংলা পদ্যাকারে পরিবেশন করিয়াছেন। গ্রন্থকার চণ্ডীপাঠের অব্যর্থ ফললাভ স্বত্বকে, ভূমিকায় ব্রাহ্মসংস্কারের বচন উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়াছেন, যে অর্থ জানে না সে শুক তরুর মত ভারবাহী, যিনি অর্থজ্ঞ তিনিই উত্তম ফল পান। বাংলা পদ্যাকারে পাঠ করিয়াও সকলে অর্থ বা মর্ম কতটা অনায়াসে বুঝিবেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ ছইট মূল শ্লোক এবং উহাদের পদ্যানুবাদ উল্লেখ করিতেছি :

- ১। যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥
মাতৃরূপিণী যে দেবীরে জানি সন্তোষ স্বত্বকুলে।
নমিস্তোঁতরে নমি তাঁরে নমি তাঁরে, নমি নমি পূজি ফুলে ॥
- ২। সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে ! শিবে ! সর্বার্থসাধিকে !
শরণ্যে ! ত্র্যম্বকে ! গৌরী ! নারায়ণি নমোহস্ততে ॥
কল্যাণকুলে কল্যাণী তুমি শিবে, সফলতা দাও।
নয়নত্রিতয়ে শরণ গৌরী, নারায়ণী নতি নাও ॥

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বীণুশ্রীফটের জীবনী — শ্রীঅমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পি.

ফোর্সে, এন্স জে। বঙ্গীয় কাথলিক সমিতি, ৩০ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য কাগজে বাঁধাই ১৬০ ও বোর্ড বাঁধাই ১৮০।

খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সঙ্গে শিক্ষিত জন মাঝেই কম বেশী পরিচিত। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ইহার বঙ্গানুবাদ হয়। আজিকার দিনে এ অনুবাদ প্রায় অচল। বাইবেলে যে চারিটি গম্ভীর বা হৃদয়মাগার ছিল ইহাতে তাহাই অনুবাদ করিয়া দেওয়া হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানির পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। বাইবেলে বীণুর যে চারি জন শিষ্য-প্রশিষ্যের রচনা আছে তাহা যথানিয়মে সন্নিবিষ্ট করিয়া খ্রীষ্ট-জীবনী

লেখা হইয়াছে। এখানি উক্ত চারিটি হৃদয়মাগারের অনুবাদ হইলেও তৃত্ব দিক দিয়া এইরূপ সমাবেশ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার ভাষায় “মূল গ্রন্থগুলির পাঠ ছাড়া আমরা কিছুই যোগ করি নি, মঙ্গল সমাচারের মধ্যে যা আছে তাই একত্র এক-হস্তে গোঁথেই লিপিবদ্ধ। একটা ঘটনা বা উপদেশের বিবৃতি দু’জন বা তিন লেখকের রচনায় পাওয়া গেলে আমরা নানা বিবৃতি মিলিয়ে যেটি পরিচয় ও ঘটনা বা উপদেশের বর্ণনা অধিক স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেছে নিয়েছি।” এই অনুবাদ গ্রন্থখানি জীবনী-সাহিত্যে একটি অভিন্ন প্রবর্তন করিয়াছে। ইহা বাংলা ভাষায় বীণুশ্রীফটের একখানি হৃদয় এবং সেই সঙ্গে বাইবেলের সৃষ্ট অনুবাদ-গ্রন্থের অভাব অনেকাংশে করিয়াছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে খ্রীষ্টজীবন ও ধর্মের সঙ্গে সাধারণের পরিচয়লাভের সুযোগ দিয়া গ্রন্থকার ও বঙ্গীয় বা সমিতি পাঠকদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহার প্রচ্ছদপট ও কাণ্ড চিত্রগুলি বড়ই সুন্দর।

প্রেমানন্দ জীবন-চরিত — স্বামী ও কারেখরানন্দ।

সাধন-মন্দির, পোঃ কুণ্ড, দেওঘর, এস. পি। মূল্য স্থলভ সংস্ক. অঙ্ক ৪।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত অটপুর একটি জনপদ। এই গ্রামে ঘোষ পরিবারে স্বামী প্রেমানন্দের জন্ম হয়। পূর্বদ্বীপের নাম বাবুরাম ঘোষ। তিনি প্রথম যৌবনে রামকৃষ্ণ পরমহংস সাংঘ্য সংস্পর্শে আসেন। নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, শরৎ প্রভৃতির মত ঠাকুরের কৃপা লাভ করেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর বাবুরামের ভবনে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রথম তাঁহার কয়েক জন শিষ্য মানবজাতি সম্রাসের সম্বন্ধ গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, বাবুরাম তাঁহাদের ছিলেন অন্ততম। বাবুরাম ক্রমে নিজগুণে এই মণ্ডলীর অন্তর উঠেন। বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিতে এবং রামকৃষ্ণ বাগী তাঁহার কৃতিত্ব যথেষ্ট ছিল। সেবা দ্বারা নিজ মণ্ডলী এবং বাহিরের সমাজের চিত্ত তিনি জয় করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ সাধক বিস্তৃত জীবন-কাহিনী আলোচ্য পুস্তকে যথাযথ পাওয়া যাইবে। কয়েকখানি চিত্রও সংযোজিত হইয়াছে। ড. শ্রীআম্রাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভূমিকাটি পুস্তকখানির গুরুত্ব অনেকটা বাড়াইয়া দিয়াছে। এই সমগ্র আয় কুণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-মন্দিরে ব্যয়িত হইবে বলিয়া গ্রন্থকার করিয়াছেন।

রামমোহন গ্রন্থাবলী — শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য—১৬০।

আমরা ইতিপূর্বে রামমোহন গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ছয় খণ্ড পরিচয় দিয়াছি। বর্তমানে ‘গৌড়ীর ব্যাকরণ’ (১৮৩৩ সাত খণ্ড) রামমোহনের সমগ্র বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। দিনে-যখন জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগের পর্যালোচনা হ্রস্ব এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ জাতীয় ইতিহাস রচনার আয়োজন চলিতেছে তখন রামমোহনের ইংরেজী বাংলা রচনাবলীর সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। রামমোহনের বাংলা গ্রন্থনিচয়ের অধিকাংশই ও শাস্ত্রবিচার বিষয়ক, তথাপি এ সমুদয়ের মধ্যেও জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির অনেক হস্ত মিলিবে। এই সময়ে পরিবর্তন রামমোহন-রচিত একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বাংলাভাষী মাত্রেই কৃতজ্ঞতা করিয়াছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র

বিনা অস্ত্রে

অর্শ, ভগন্দর, শোষ, কার্বাঙ্কল, একজিমা, গ্যাংগ্রীন প্রভৃতি ক্ষতরোগ নির্দোষরূপে চিকিৎসা করা হয়।

৩৫ বৎসরের অভিজ্ঞ

আটময়ের ডাঃ শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল,

ব্রজেননাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা—১৪

প্রকাশক ও প্রকাশক — শ্রীনিবারচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০১২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৮।